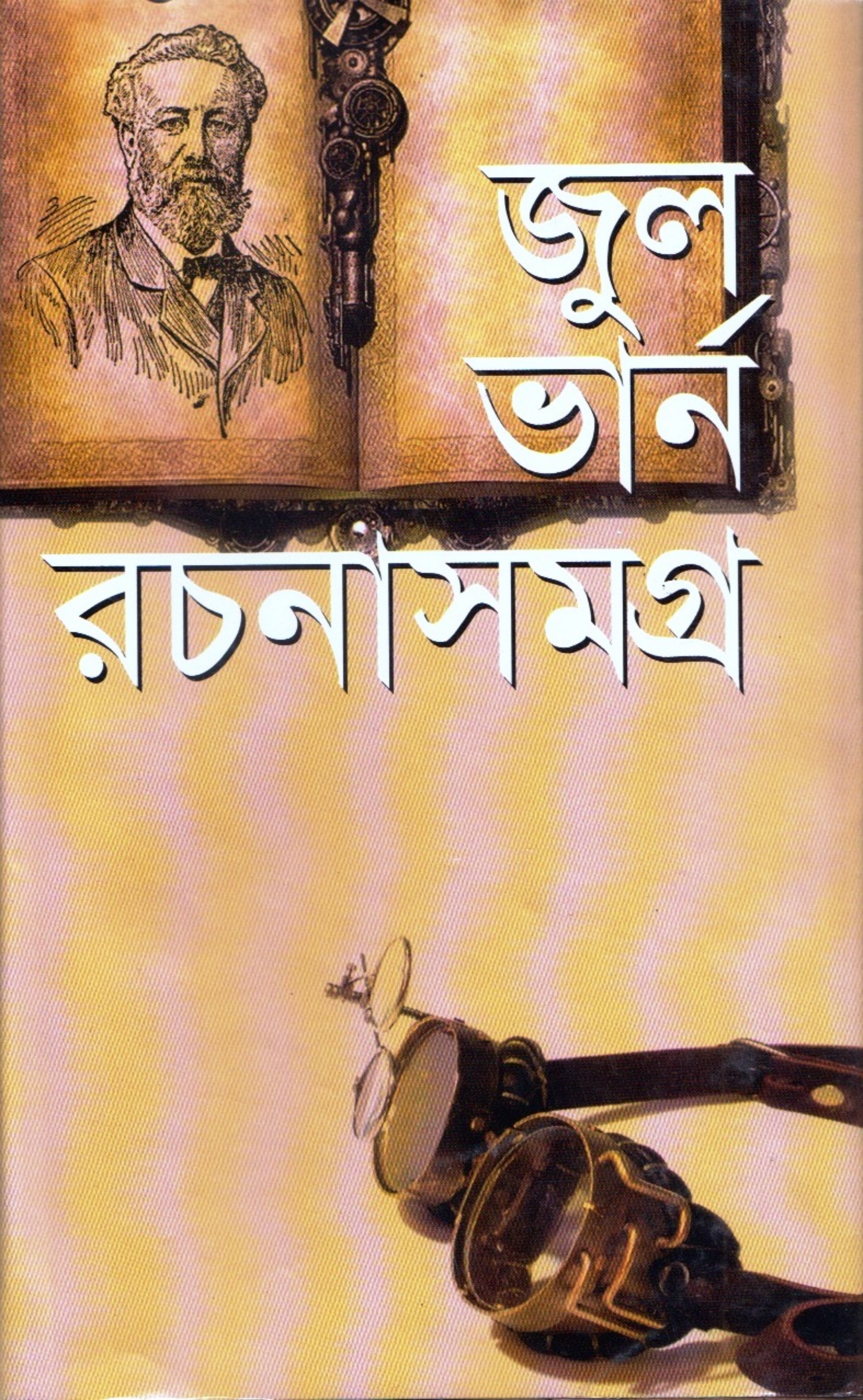
জুল ভার্ন
রচনাসমগ্র

জুলভার্ন রচনাসমগ্র

অনুবাদ

প্রফেসর লোকমান হোসেন

দি স্কাই পাবলিশার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

ঘরে বসে দি স্কাই পাবলিশার্স এর সকল বই কিনতে ভিজিট করুন
http.rokomari.com/thesky
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫১৯৫২১৯৭১ হট লাইন ১৬২৯৭
সিঙ্গাপুর পরিবেশক ॥ শহীদ ট্রাভেল্‌স অ্যান্ড ট্যুরস প্রাঃ লিঃ
১৮১ কিচেনার রোড, ০১-১২/১৩ নিউ পার্ক হোটেল শপিং আর্কেড, সিঙ্গাপুর ২০৮৫৩৩
উত্তর আমেরিকায় পরিবেশক ॥ মুক্তধারা, জ্যাকশন হাইট, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্য পরিবেশক ॥ সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
FAX : 020 72475941

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৬

প্রকাশক : মোঃ মিজানুর রহমান, দি স্কাই পাবলিশার্স, ৩৮/২ক বাংলাবাজার
(মান্নান মার্কেট, ৩য় তলা), ঢাকা-১১০০, সেল : ০১৬৭০৭৩৫৮০৮/০২৭১১১৯৭৯
অক্ষরবিন্যাস : কম্পিউটার ল্যান্ড, ৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ : হেরা প্রিন্টার্স, প্রেস পল্লী, তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ : মোবারক হোসেন লিটন
e-mail : theskypublishers@yahoo.com, www.bio-mela.com

মূল্য : ৭০০ টাকা মাত্র

ISBN 984-70145-0143-7

www.pathagar.com

সূচিপাতা

টুয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগস আন্ডার দ্য সি ৭
মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড ৬৬
ব্ল্যাক ডায়মন্ডস ১২০
এরাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটটি ডেজ ১৭৪
জার্নি টু দ্য সেন্টার অব দ্য আর্থ ২১৪
দ্য লাইট হাউস এ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড ২৪৭
মাইকেল স্ত্রভ গফ ২৭৮
অ্যাডভেঞ্চার অফ ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ৩০৮
ক্লিপার অব দ্য ক্লাউডস ৩৫৫
সিক্রেট অব উইলহেম স্টোরিজ ৪০১
ভিলেজ ইন দি ট্রি টিপস ৪৩৭
প্রপেলার আইল্যান্ড ৪৫৮
কার্পেথিয়ান ক্যাসল ৪৮৪
স্টিম হাউস ৫২৯
অ্যাড্রিফট ইন দ্য প্যাসিফিক ৫৫৪
এ ফ্লোটিং সিটি ৪৬৯
বেগমস ফরচুন ৪৭৯
ইন্টারন্যাল অ্যাডাম ৬১৬
ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন ৬২৭
রাউন্ড দি মুন ৬৫২
ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন ৬৭৮
অফ অন এ কমেট ৭০৯
দি পারচেজ অব দি নর্থ পোল ৭২৪
মাস্টার অব দি ওয়ার্ল্ড ৭৫৯
দি গ্রিন ফ্লাশ ৮১৬
এক্সপেরিমেন্ট অব ড. অক্স ৮৩৩
দি স্কুল ফর রবিনসন্স ৮৫৫
ইন টু দ্য নাইজার বেন্ড ৮৭১
সিটি ইন দ্য সাহারা ৯০৬
মাস্টার জ্যাকারিয়ুস ৯৪৭
মিস্টিরিয়াস ডকুমেন্ট ৯৫৮
অন দি ট্রাক ৯৭৩
দি সিক্রেট অব দি আয়ল্যান্ড ৯৮৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

টুয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগস আন্ডার দ্য সি

আঠার শ ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দের কথা।

সেই সময় এমন একটা অভাবনীয় রহস্যজনক ঘটনা ঘটেছিল যে-জন্য পৃথিবীর মানুষ আজো সে বছরটাকে মনের মধ্যে সযত্নে জাগরুক রেখেছে।

সে বছর এমন কী ঘটেছিল যে-জন্য বছরটা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে? হ্যাঁ, ঘটনাটা সত্যই অকল্পনীয়, চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী, রীতিমতো রহস্যজনকই ছিল বটে।

কী ঘটেছিল যে-জন্য পৃথিবীবাসী আজো ঘটনাটাকে অন্তরের অন্তঃস্থলে সযত্নে পোষণ করে চলেছে?

রহস্যজনক সে ঘটনাটা ছিল—উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের ওপর দিয়ে পথ পাড়ি দেবার সময় জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং খালাসিরাই কেবল নয় যাত্রীরাও অতিকায় একটা প্রাণীকে জলের ওপর ভেসে থাকতে দেখেছে। আবার পর মুহূর্তেই চোখের পলকে তাকে যুবে যেতে দেখেও কম অবাক হয় নি। বিচিত্র দর্শন অতিকায় প্রাণীটার শরীর লম্বাটে। তার সামনের দিকটা অনেকটা মোচার অগ্রভাগের মতো শঙ্কুর আকৃতিবিশিষ্ট।

সমুদ্রের বুকে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী সর্বাধিক আয়তনবিশিষ্ট প্রাণী তিমির চেয়েও অনেক অনেক বড় সে রহস্যজনক প্রাণীটা।

আতঙ্ক সৃষ্টিকারী রহস্যজনক সে প্রাণীটার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেটা ছিল খুবই দ্রুতগতিসম্পন্ন। পৃষ্ঠদেশ ছিল খুবই মসৃণ, একেবারে তেল চিকচিকে। আর গা দিয়ে অনবরত ফসফরাসের মতো অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি ঠিকরে বের হত।

রহস্যসৃষ্টিকারী অতিকায় প্রাণীটা জনমানসে এতই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল যার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তথ্যসমৃদ্ধ রাশি রাশি চিঠি আসতে লাগল। তবে প্রতিটা চিঠির ভাষা ভিন্নতর হলেও তথ্যগুলি কিন্তু মোটামুটি একই ছিল। প্রতিটা চিঠিতেই অতিকায় ত্রাস সঞ্চারকারী সামুদ্রিক প্রাণীটার আকৃতি ও অবিশ্বাস্য গতিবেগের উল্লেখ ছিল।

ভুল? চোখের ভুল? তা-ই বা কীভাবে মেনে নেয়া সম্ভব? দুই দশজনের ব্যাপার হলেও না হয় চোখের ভুল বলে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব হত। কিন্তু এতগুলো চোখ সমুদ্রের বিভিন্ন প্রান্তে যাকে দেখেছে বলে দাবি করছে তাকে তো আর চোখের ভুল বলে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়।

সেদিনটা ছিল আঠার শ ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দের বিশ জুলাই। সেদিন দুপুরের কাছাকাছি 'ক্যালকাটা অ্যান্ড বার্নাক স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির গভর্নর হিগনসন' নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন ও খালাসিরা বিচিত্রদর্শন গতিশীল বস্তুটাকে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল থেকে মাইলপাঁচেক দূরবর্তী সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়াতে দেখেছিল।

www.pathagar.com

অনুসন্ধিৎসু নজরে কয়েক মুহূর্ত অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে জাহাজটার ক্যাপ্টেন বেকার প্রথমে ভেবেছিলেন অতিকায় বস্তুটা নির্ঘাৎ একটা বালিয়াড়ি। আর কিছুক্ষণ সেটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন সেটার পৃষ্ঠদেশ থেকে জলের ফোয়ারা তীব্র বেগে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। জল প্রায় একশো পঞ্চাশ ফুট ওপরে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁর মনে খটকা লাগল, তবে কি বালিয়াড়িটার কেন্দ্রস্থলে কোনো প্রস্রবণ রয়েছে? তাঁর এরকম সিদ্ধান্ত নেয়ার পিছনে যুক্তিও ছিল যথেষ্টই। পৃথিবীর বড় বড় জীববিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত এমন কোনো অতিকায় জীবের সন্ধান পান নি যার পিঠ থেকে গ্যাসমিশ্রিত জলরাশি সবেগে আকাশের দিকে উত্থিত হয়ে থাকে।

তেইশে জুলাই ওয়েস্ট ইন্ডিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক্ স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির জাহাজ কলম্বাসের ক্যাপ্টেন প্রশান্ত মহাসাগরে একই দৃশ্যের মুখোমুখি হন। গভর্নর হিগিনসন নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন বিশালায়তন ও বিচিত্রদর্শন সামুদ্রিক প্রাণীটাকে চাক্ষুস করার পর কলম্বাসের ক্যাপ্টেন সেটাকে দেখতে পান। জাহাজ দুটোর মধ্যে তখন স্থানগত ব্যবধান ছিল দুই হাজার চার শত পঞ্চাশ মাইলেরও বেশি।

উপরোক্ত ঘটনাটার পর আরো পনের দিন পেরিয়ে গেল। পনের দিনের দিন পূর্ববর্ণিত সমুদ্রের এলাকা থেকে আরো পনের অন্তত দুই হাজার মাইল দূরবর্তী স্থানে পর পর দুটো জাহাজের ক্যাপ্টেন ও খালাসিরা অতিকায় ও বিস্ময় সৃষ্টিকারী চলমান বস্তুটাকে চাক্ষুষ করল।

জাহাজ দুটোর মধ্যে একটা ছিল 'হেলভেশিয়া' এবং দ্বিতীয়টা 'প্যাসন'।

'অ্যালিওশিয়ান', 'উসগালিক' এবং 'কুলাম্পাক' প্রভৃতি দ্বীপগুলোই পৃথিবীর সর্বাধিক বিশালায়তন তিমির বিচরণ ক্ষেত্র। কিন্তু তাদের কোনোটারই দৈর্ঘ্য ষাট ফুটের বেশি হয় না।

পেরেরা নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন আরও একটা বিশেষ ঘটনার দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি জানালেন যে, ইনসান কোম্পানির 'অ্যাটনা' নামক জাহাজের সঙ্গে নাকি অতিকায় প্রাণীটার সংঘর্ষ হয়েছে।

আমেরিকা ও ইওরোপের অত্যুৎসাহী অনুসন্ধানী ব্যক্তিরা ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন।

ব্যস, তখনকার মতো এ পর্যন্তই। উপরোক্ত ঘটনাগুলোর রহস্য সঞ্চারকারী দৈত্যাকৃতি প্রাণীটার আর কোনো হদিস মিলল না। তাই সঙ্গত কারণেই রহস্যজনক ঘটনার ব্যাপার মানুষের মন থেকে ক্রমে ধুয়ে মুছে যেতে লাগল।

প্রায় একটা বছর কেটে গেল।

আঠার শো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দ। সে বছর গোড়ার দিকে সমুদ্রযাত্রীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী রহস্যজনক দৈত্যাকৃতি প্রাণী আবার সমুদ্রের বুকে ভেসে উঠল। সেটা এতদিন কেবল জীববিজ্ঞানীদের কাছেই গভীর সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এতদিন বার্লিনের 'জিওগ্রাফিক্যাল ইনস্টিটিউশান', ও 'রয়্যাল একাডেমি অব সায়েন্স', ওয়াশিংটনের 'স্মিথ সোনিয়াল ইনস্টিটিউশান' এবং 'ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশান' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান উদ্ভূত সমস্যাটার রহস্যভেদ করার চেষ্টায় ব্রতী ছিল। আর এখন? তাঁদের সঙ্গে যোগ দিল সমুদ্রযাত্রীদের আতঙ্ক আর হতাশা। তাদের কেউ অতিকায় সামুদ্রিক প্রাণীটিকে ছোট্ট একটা দ্বীপ বলে প্রচার করল। আবার কেউ-বা এটাকে চলমান শিলা বলে মতামত ব্যক্ত করল। তারা এও বলল এ দ্বীপটা একটা অজ্ঞাত রহস্যের আধার।

www.pathagar.com

আঠার শো সাতষট্টির পাঁচই মার্চ। সে তারিখের রাতে মন্ট্রিল ওশান কোম্পানির 'মোরাভিয়ান' নামক জাহাজটা দেখল ২৭.৩ অক্ষাংশ ও ৭১.১৫ দ্রাঘিমার মধ্যে বিশালায়তন একটা শিলা চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সবচেয়ে আশ্চর্য হতে হল যখন জাহাজের চার্টে সে জায়গাটায় শিলাখণ্ডের খোঁজ করতে গিয়ে হতাশ হতে হল। শিলাখণ্ডের নামগন্ধও সেখানে আছে বলে বোঝা গেল না।

বরাত ভালো যে, 'মোরাভিয়ান' নামক জাহাজটা অতিকায় ও বিশেষ শক্তিশালী ছিল। নইলে সাঁইত্রিশ জন যাত্রীসহ তার সলিল সমাধি ঘটে যেত। জাহাজের উচ্চপদস্থ অফিসাররা ঘটনার রহস্যভেদ করতে দারুণভাবে হতাশ হলেন।

উপরোক্ত ঘটনার সপ্তা তিনেক বাদে এক বিকেলে, তিনটে সতের মিনিটে এমন ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে যার ফলে মানুষের আতঙ্ক দ্বিগুণ বেড়ে যায়। জাহাজটা হঠাৎ খুব জোরে দুলে ওঠে। ভয়ঙ্কর সে ধাক্কা।

না, ধাক্কাটা যে অবশ্যই স্কোরশিয়া মারে নি, এব্যাপারে কারো মনেই এতটুকু দ্বিধার সঞ্চার হয় নি। সবাই দৃঢ় মতবাদ প্রচার করল, দ্রুতগামী সুতীক্ষ্ণ কোনো অতিকায় বস্তুর দ্বারা ঘটনাটা ঘটেছিল।

প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজটাকে মেরামত করতে গিয়ে কর্মীরা দেখল, তার তলদেশটা অস্বাভাবিকরকম দুমড়ে মুচড়ে একসার হয়ে গেছে।

স্কোরশিয়া জাহাজটার গঠনপ্রণালী অন্যসব সাধারণ জাহাজের তুলনায় একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তার নিচের তলাটা সাতটা পৃথক পৃথক কক্ষের সমন্বয়ে গঠিত। ক্যাপ্টেন দ্রুত নিচের তলায় গিয়ে লক্ষ করলেন, পাঁচ নম্বর কক্ষের এক জায়গায় একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। আর সেখান দিয়ে জল ভেতরে ঢুকে আসছে। বরাত ভালো যে বয়লার ও ইঞ্জিন ওই কক্ষে ছিল না। যদি থাকত তবে আর দেখতে হত না।

ক্যাপ্টেন কোনোক্রমে জাহাজটাকে নিয়ে তিন শো মাইল দূরবর্তী কেপ ক্লিয়ার বন্দরে নিয়ে ফেললেন। জাহাজের তলদেশে এত পুরু লোহার পাত ছিদ্র হয়ে গেছে দেখে সবাই ভাবলেন সুতীক্ষ্ণ কোনো অস্ত্রের সাহায্য ছাড়া তো এরকম অবিশ্বাস্য রকমভাবে ছিদ্র হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব নির্ঘাৎ কঠিন কোনো না কোনো সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে সজোরে স্কোরশিয়ার তলদেশে আঘাত হানা হয়েছে। ব্যাপারটা চারদিকে প্রচারি হতে দেরি হল না। ব্যস, সমুদ্রযাত্রীদের মধ্যে ভয়ানক আতঙ্কের সঞ্চার হল। তবে? তবে কেন এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটল। এবার থেকে সমুদ্রে কোনো জাহাজ দুর্ঘটনার শিকার হলেই সঙ্গত কারণেই অতিকায় ওই সামুদ্রিক প্রাণীটার ওপরই যাবতীয় দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হতে লাগল।

রহস্যজনক অতিকায় প্রাণীটার আতঙ্কের মধ্য দিয়ে সমুদ্রযাত্রীরা যখন দিন কাটাচ্ছিল আমি তখন সবে আমেরিকার দুর্গম নেব্রাস্কা অঞ্চল থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ মিটিয়ে স্বদেশের মাটিতে ফিরে এসেছি। এর-ওর মুখে বিশালায়তন ওই প্রাণীটা এবং সমুদ্রযাত্রীদের আতঙ্কের ব্যাপার-স্যাপার শুনে আমিও কম অস্থির হয়ে পড়িনি। সত্য বলতে কি, ব্যাপারটা আমাকেও রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল, বুকে রহস্যের সঞ্চার করল। আর সামুদ্রিকপ্রাণীটার অস্তিত্বের ব্যাপার আমার মধ্যে সামান্যতম দ্বিধাও রইল না।

আমি নিউইয়র্কে থাকাকালীন শুনেছিলাম, সেটা কোনো ভাসমান দ্বীপ বা বালিয়াড়ি ছাড়া কিছু নয়। সেটা যদি নেহাৎই কোনো চড়া হয় তবে তার ভেতরে কোনো শক্তিশালী

www.pathagar.com

যন্ত্র বসানো রয়েছে যার দ্বারা খুবই দ্রুতগতিতে স্থানান্তরে গমন করতে সক্ষম হয়। আর কারো কারো মধ্যে দুরকম ভাবনার উদয় হল—হয় সেটা কোনো সাবমেরিন নতুবা অমিত শক্তিধর কোনো না কোনো অতিকায় জলজপ্রাণী। তবে সাবমেরিনের যুক্তিটা টিকল না। বিভিন্ন দেশে খবরাখবর নেয়ার পরে সবাই জানাল তাদের কারোরই সাবমেরিন নেই।

রহস্যটার পিছনে যে কোনো কারণই থাক না কেন আটলান্টিক মহাসাগরের উভয় তীরবর্তী দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা মারাত্মক সমস্যা আর বিপদসঙ্কুল হয়ে দাঁড়াল। আর এরই জন্য সব দেশকেই অপূরণীয় লোকসানের বোঝা বইতে হল।

আমি যখন ফরাসিদেশে অবস্থান করছিলাম তখন 'সাবমেরিনের রহস্য' নাম দিয়ে দুখণ্ডের একটা বই লিখে বিদ্বৎসমাজে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলাম। তাই নিউ ইয়র্কে পা দিতে না দিতেই অনেকেই অত্যুগ্র হল প্রসঙ্গটা নিয়ে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে।

গোড়াতে আমি সতর্কতার সঙ্গে ব্যাপারটা সম্বন্ধে উদাসীন থাকলেও পরিস্থিতির চাপে পড়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে মুখ না খুলে পারলাম না। নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত হ্যারল্ড পত্রিকা ও প্যারিস মিউজিয়ামের অধ্যাপক অ্যারোনাক্স আমাকে অনুরোধ করে বসল।

হেরল্ড পত্রিকার ত্রিশে এপ্রিল সংখ্যায় ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার সুচিন্তিত ও সারগর্ভ বক্তব্য সম্বলিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। তাতে আমি ব্যক্ত করলাম, অতিকায় কোনো জলজ প্রাণী সমুদ্রবক্ষে অবস্থান করছে। সমুদ্রের গভীরে, বারো কি পনের মাইল জলের তলায় কোন কোন সামুদ্রিক প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে তা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি বহির্ভূত। আর তাদের জৈবিক ক্রিয়া সম্বন্ধেও আমরা একেবারেই অজ্ঞ। ব্যাপারটা দুঃসাধ্যও বটে। সমস্যা থেকে উতরানোর উপযোগী ও নির্ভরযোগ্য যে কয়টা সূত্র পাওয়া গেছে তা থেকে কেবল অনুমান করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এখন জিজ্ঞাস্য যে, আমাদের গ্রহের যাবতীয় প্রাণীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় রয়েছে কি না? সবার আগে আমাদের খোঁজ নিতে হবে মৎস্যবিজ্ঞানের বহির্ভূত কোনো জলচর প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে কি না। যদি পাওয়াই যায় তবে মেনে নিতেই হবে সেটা সমুদ্রের তলদেশে বসবাসকারী কোনো একটা অজ্ঞাত প্রাণী। আর কখনো সখনো খেয়ালবশত সমুদ্রের উপরিতলে ভুস করে ভেসে ওঠে ও ভেসে বেড়ায়। নইলে অতিকায় দাঁতযুক্ত দৈত্যাকৃতি কোনো তিমি। এরা খুব বড় হলে ষাটফুট মতো দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হয়। যদি তাদের কারো আকার পাঁচ থেকে দশগুণ বেড়ে যায় তবে এমন দৈত্যাকৃতি অমিত শক্তির অধিকারী আবারও একটা সামুদ্রিক প্রাণী আমাদের নজরে পড়বে।

অতিকায় দাঁত দুটোকে তিমিরা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। জাহাজের গায়ে তাদের দাঁত গেঁথে থাকতে দেখা গেছে। এমন ঘটনার বহু নজির রয়েছে। পনের ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট আক্রমণাত্মক, একটা মারাত্মক অস্ত্র প্যারিসের চিকিৎসা বিভাগের মিউজিয়ামে সযত্নে সংরক্ষিত হচ্ছে।

পত্রিকার পাতায় আমার প্রবন্ধটা ছাপা হওয়া-মাত্র সমুদ্রযাত্রীদের মধ্যে বিশেষ ভীতির সঞ্চার করল। সকলে আতঙ্কে শিউরে উঠল। বিমা প্রতিষ্ঠানগুলোও কম ভাবিত হয়ে পড়ে নি। তবে নৌ-বিমার পরিমাণ বৃদ্ধি করার নোটিশ দেয়া হল।

আমেরিকার উপকূলবর্তী সমুদ্রবক্ষ থেকে জমাটবাঁধা আতঙ্কের অবসান ঘটাতে বিশালায়তন জাহাজ অব্রাহাম লিঙ্কনের ওপর দায়িত্বভার অর্পণ করা হবে মনস্থ করা হল।

www.pathagar.com

দ্রুতগতি ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজটাকে যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে তুলতে সাধ্যমতো ব্যবস্থা নেওয়া হল।

আশ্চর্য ব্যাপার! আব্রাহাম লিঙ্কন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার পর আর রহস্য ও আতঙ্কসৃষ্টিকারী অতিকায় সামুদ্রিক প্রাণীটার টিকির নাগালও পাওয়া গেল না। হতচ্ছাড়া প্রাণীটা হঠাৎ গা-ঢাকা দেওয়ার ফলে আমাদের দুমাসের উদ্যোগ আয়োজন বৃথা গেল।

আব্রাহাম লিঙ্কন যাত্রা করার ঠিক তিনঘণ্টা পরে লেখা একটা চিঠি আমার হাতে এল। নৌ-বিভাগের সেক্রেটারি জে. বি. হবসন চিঠিটার লেখক। চিঠিতে তিনি আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন, আমি আব্রাহাম লিঙ্কনের দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্গী হলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ আনন্দিত হবে।

চিঠিটা হাতে পাওয়ার পর আমি ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ কৌতূহলী ও আগ্রহান্বিত হয়ে পড়লাম। এর আগে এটা নিয়ে আমার সামান্যতম আগ্রহও ছিল না।

আমার বয়স তখন বছর চল্লিশেক। আর আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী ও গৃহভৃত্য কনসিলকে সঙ্গে নিতে ভুললাম না। তার বয়স মাত্র ত্রিশের কাছাকাছি। এর আগে কঙ্গো ও চীন প্রভৃতি দেশে যখনই গেছি তখন ওর বুদ্ধি পরামর্শ আমার কাজের বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এবার আমার অভিযান অবশ্য স্বতন্ত্র ধরনের। আমার প্রস্তাব শোনার পরই সে সোৎসাহে যাত্রার প্রস্তুতি নেয়ার কাজে মেতে গেল।

জাহাজঘাটে আমাদের স্বাগত জানাতে ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট জাহাজের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি মুচকি হেসে আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে আমার জন্য রক্ষিত সুসজ্জিত ক্যাবিনে আমাকে নিয়ে গেলেন।

বিশালায়তন জাহাজটা সত্যই উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন। ঘণ্টায় প্রায় আঠার মাইল বেগে ছুটতে পারে। তবে দ্রুতগতিসম্পন্ন সামুদ্রিক প্রাণীটার তুলনায় এর গতিবেগ খুবই নগণ্য।

ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুটা খালাসিদের জাহাজের নোঙর তোলার নির্দেশ দিলেন।

বিশালায়তন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিঙ্কন সমুদ্র তোলপাড় করে দ্রুত এগিয়ে চলল গভীর সমুদ্রের দিকে। জাহাজের গতিবেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল।

ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট প্রবীণ ব্যক্তি। জাহাজ চালনার ব্যাপারে তার জুড়ি পাওয়া ভার। তার দৃঢ় বিশ্বাস, সমুদ্রের বুকে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী অতিকায় সামুদ্রিক প্রাণীই সমুদ্রযাত্রীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে। এর বিরুদ্ধে মন্তব্যকারীদের তিনি মোটেই বরদাস্ত করতে পারেন না। আর তাঁর মনে এ আশঙ্কাও রয়েছে অতিকায় সে প্রাণীটাকে ধরতে গিয়ে তাদের বিপদাপন্ন হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। যাই ঘটুক না কেন তাকে তিনি যে করেই হোক ধরবেনই। জাহাজের অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ অতিকায় জন্তুটাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য শক্তিশালী দূরবীন চোখে লাগিয়ে সমুদ্র বক্ষের ওপরে চঞ্চল চোখের মণিগুলোকে বারবার ঘোরাতে লাগল। এর কারণও রয়েছে যথেষ্টই। জাহাজের ক্যাপ্টেন ঘোষণা করেছিলেন, যে সবার আগে রহস্য সঞ্চারকারী অতিকায় সামুদ্রিক প্রাণীটাকে দেখতে পাবে তাকে পুরস্কারস্বরূপ দুই হাজার ডলার দেবেন। তাই তো জাহাজের অনেকেই দূরবীণ চোখে লাগিয়ে বাঞ্ছিত সে প্রাণীটাকে খুঁজে বের করার তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। তবে খুবই সত্য বটে, আমার

www.pathagar.com

সর্বক্ষণের সঙ্গী গৃহভৃত্য কনসিলের মধ্যে সামুদ্রিক প্রাণীটা সম্বন্ধে সামান্যতম উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষিত হয় নি।

একটা কথা আগেই বলে রাখা উচিত ছিল। ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট দেশের সেরা তিমি শিকারি, হারপুন ছোড়ার অদ্বিতীয় বীর নেডকে জাহাজে, আমাদের সঙ্গী হিসেবে নিয়েছিলেন। এবারেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়, স্বীকার করতেই হয়। তার ছোঁড়া হারপুনের আঘাত অগ্রাহ্য করে পাড় পেতে পারে এমন কোনো তিমি আছে বলে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

অতিকায়, অমিত শক্তিশালী ও দ্রুত গতিবেগ সম্পন্ন জাহাজ 'আব্রাহাম লিঙ্কন' প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তিন সপ্তাহ কাটিয়ে দিয়েছে।

এক বিকেলে জাহাজের ডেকের ওপরে নেডকে নিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম। একথা সেকথার পর আমি তাকে বললাম—'নেড, একটা কথা, বিশালায়তন ওই তিমিটার ব্যাপারে তোমার মতামত কী, খোলসা করে বলো তো?'

সে মুচকি হেসে আমার প্রশ্নের জবাবে বলল—'প্রফেসর, অন্ধের পক্ষে পৃথিবীর সবকিছু অকপটে মেনে নেওয়া খুবই সহজ বটে। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ এবং জ্যোতির্বিদদের পক্ষে ভূতপ্রেত বা প্রেতাত্মার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া কি সহজ, আপনিই বলুন? আমি ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে তিমি শিকার করতে গিয়ে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা আমার ঝোলায় সঞ্চয় করেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোনো নিদর্শন আমি পাই নি যে, তিমির দাঁতে জাহাজের খোল ফুটো হওয়া তো দূরের ব্যাপার, জাহাজের গায়ে সামান্য আঁচড় লেগেছে।

নেড কোনো যুক্তিতেই এমন ভয়ঙ্কর ও অমিত শক্তিধর কোনো সামুদ্রিকপ্রাণীর অস্তিত্বের কথা মেনে নিতে উৎসাহী হল না। মোদ্দা কথা, তাকে কিছুতেই স্বীকার করানো গেল না।

আমি আমতা আমতা করে তবুও বললাম, 'সমুদ্রের অতল গহ্বরে বসবাসকারী অতিকায় কোনো সামুদ্রিকপ্রাণীর অস্তিত্ব যদি স্বীকার করাই হয় তবে সে যে অমিত শক্তির অধিকারী হবেই, আশ্চর্য কি? তার শারীরিক গঠনেও অবিশ্বাস্য বৈচিত্র্য থাকা অসম্ভবই বা কী?'

'আমি তবুও বলব, তার শারীরিক গঠন বৈচিত্র্যময় হওয়ার সঙ্গত কারণই বা কি থাকতে পারে প্রফেসর?'

'এর সঙ্গত কারণও রয়েছে। সমুদ্রে অতল গহ্বরে, অত্যন্ত গভীরে জলের চাপ প্রবল। সেখানে সে চাপ অমিত শক্তিধর কোনো প্রাণী ছাড়া কারো পক্ষে বরদাস্ত করাই তো সম্ভব নয়। জলজ প্রাণীদের জলের তলায় কী অস্বাভাবিক চাপ সহ্য করে টিকে থাকতে হয়, বলছি শোন—যদি তুমি কোনোক্রমে জলের বত্রিশ ফুট গভীরে যাও তবে তোমার দেহকে, প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে পনের পাউন্ড চাপ সহ্য করতে হবে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যাবে, প্রায় দুমাইল গভীরে প্রতি বর্গ ইঞ্চির জন্য পাঁচ হাজার দশ পাউন্ড চাপ সহ্য করতে হবে। তোমার এ দেহটা কত ইঞ্চি জায়গা দখল করতে পারে তা হয়ত তোমার অজানা। বলছি শোনো, প্রায় দুই হাজার পাঁচ শ' ইঞ্চি। প্রতি ইঞ্চিতে যদি পনের পাউন্ড চাপ প্রয়োগ হয় তবে হিসাব করলে দেখা যাবে তোমার দেহটা মোট সাতানব্বই হাজার পাঁচ শ' পাউন্ড চাপ সহ্য করার ক্ষমতা ধারণ করেছে।

www.pathagar.com

আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, তোমার দেহের ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রাখে বিপরীত দিকের বাতাসের চাপ। আরো আছে ঊর্ধ্বচাপ এবং নিম্নচাপ আমাদের শরীরের ভারসাম্য অক্ষুণ্ন রাখার মূলে অবস্থান করে।

নেড-এর মুখে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে এবার মুখ খুলল—'হ্যাঁ, এতক্ষণে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হল।'

'তবে আমরা বুঝতে পারলাম, বত্রিশ ফুট জলের গভীরে তোমার দেহ সাতানব্বই হাজার পাঁচ শ' পাউন্ড আর তিন শ' কুড়ি ফুট গভীরে তার প্রায় দশগুণ হবে। আবার বত্রিশ হাজার ফুট গভীর জলে তোমার দেহ প্রায় সাতানব্বই কোটি পাঁচলক্ষ পাউন্ড ওজন বহন করবে।'

'আরে অবাক ব্যাপার! এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড!' কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে নেড বলে উঠল।

'নেড, এবার তুমিই ভেবে দেখ, কয়েক শ' গজ দৈর্ঘ্য ও সে অনুপাতে প্রস্থবিশিষ্ট একটা প্রাণী যখন জলের তলায় অবস্থান করে তখন কতখানি চাপ তাকে সহ্য করতে হয়। তার দেহের ওপর সে সহজেই কয়েক কোটি পাউন্ড চাপ বহন করে। এখন তুমিই ভেবে দেখ, যে প্রাণীটা এমন অবিশ্বাস্য চাপ সহ্য করতে সক্ষম সে কেমন অমিত শক্তির অধিকারী। আর তার শরীরের যন্ত্রতন্ত্র কতখানি শক্তিশালী! ঠিক এমনই অতিকায় এবং অমিত শক্তিধর সামুদ্রিক প্রাণী যে স্কোরশিয়া জাহাজের তলদেশ ফুটো করে দিয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ত্রিশে জুন। এর আগে পর্যন্ত লক্ষণীয় কোন ঘটনার মুখোমুখি আমাদের হতে হয়নি। ত্রিশ তারিখেই আমরা কয়েকটা আমেরিকান তিনি শিকারী জাহাজ দেখতে পেলাম। তাদের মধ্যে একটা জাহাজের নাম 'মনরো'। মনরোর ক্যাপ্টেনের অনুরোধে আমাদের জাহাজের ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট, নেডকে অনুমতি দিলেন সে জাহাজে গিয়ে হারপুন ছুঁড়ে তিমি বধ করে দিয়ে আসার জন্য।

বীর নেড হারপুন ছুঁড়ে দুটো তিমি ঘায়েল করে ফিরে এল। অব্যর্থ বটে তার লক্ষ্য।

সাতই জুলাই। সেদিন আমাদের জাহাজ 'আব্রাহাম লিঙ্কন' উত্তাল-উদ্দাম প্রশান্ত মহাসাগরের পড়ল।

জাহাজের কর্মীদের অনুসন্ধিৎসু সজাগ দৃষ্টি সমুদ্রের বুকে অস্থিরভাবে ঘুরপাক খেতে লাগল। সবার চোখে-মুখেই অত্যুগ্র আগ্রহের প্রলেপ। আসলে পুরস্কারের লোভই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে কাজ করছে।

দুর্বার গতিতে পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের পক্ষীরাজ 'আব্রাহাম লিঙ্কন' কর্কটক্রান্তি অতিক্রম করে ম্যাকুইস এবং স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি হাজির হল। বিশালকায় সামুদ্রিকপ্রাণীটাকে সবাই এ অঞ্চলেই দেখতে পেয়েছিল।

আমাদের জাহাজটা উল্কার বেগে জাপান ও আমেরিকার উপকূলে ছুটোছুটি করে বেড়াল রহস্য ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী বিশালায়তন প্রাণীটার সন্ধানে। ভস্মে ঘী ঢালাই সার হল।

আমাদের জাহাজ আব্রাহাম লিঙ্কন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তিন তিনটে মাস অনবরত চক্কর মেরে বেড়াল।

www.pathagar.com

দিনের পর দিন ব্যর্থপ্রয়াস চালিয়ে আমাদের জাহাজের কর্মীরা হতাশ হয়ে পড়ল। যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সবাই জাহাজে উঠেছিল আজ তা প্রায় নিঃশেষ হতে চলেছে।

ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তিনি ভাঙবেন কিন্তু মচকাবার পাত্র নন। তিনি একটু নরম হলেই হতাশায় জর্জরিত জাহাজের কর্মীরা এতক্ষণে প্রত্যাবর্তনমুখী থাকত।

দিনের পর দিন ব্যর্থতা আর হতাশায় জর্জরিত হয়ে জাহাজের কর্মীরা অনন্যোপায় হয়ে জোটবেঁধে ক্যাপ্টেনের কেবিনের দরজায় হাজির হল। জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে স্বদেশের অভিমুখে যাওয়ার জন্য বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই তাঁর কাছে তাদের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করল।

ক্যাপ্টেন তার অধঃস্তন কর্মীদের কাছ থেকে তিনদিনের সময় চাইলেন। এর মধ্যে যদি বহু আকাঙ্ক্ষিত সামুদ্রিক প্রাণীটার দেখা না পাওয়া যায় তবে তিনি অবশ্যই তাদের অনুরোধ অনুযায়ী কাজ করবেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন।

জাহাজের কর্মীরা এবার নতুন উদ্যমে অতিকায় তিমিটাকে গভীর জল থেকে ওপরে তুলে আনার জন্য চমৎকার একটা ফন্দি বের করল। তারা একের পর এক শুয়োরের মাংসের টুকরো উত্তাল উদ্দাম সফেন সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল।

হায় কপাল, জাহাজের কর্মীদের ফেলা শুয়োরের মাংস দিয়ে হাঙরের ভোজ চলতে লাগল।

নিরবচ্ছিন্ন হতাশা আর হাহাকারের মধ্য দিয়ে জাহারের কর্মীদের চৌঠা নভেম্বরের রাত্রি কাটল।

পুব আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠল। পাঁচই নভেম্বরের ভোর। সেদিন বেলা বারোটা বাজলেই ক্যাপ্টেনের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাবে।

যাত্রীদের মনে অফুরন্ত আনন্দের জোয়ার। আর মাত্র ঘণ্টা ছয় বাদেই জাহাজের মুখ ঘোরানো হবে। উল্কা বেগে স্বদেশের দিকে বিশালায়তন জাহাজ আব্রাহাম লিঙ্কন ধরতে হবে।

আব্রাহাম লিঙ্কন এখন জাপান দ্বীপপুঞ্জ থেকে দুশো মাইল ভেতরের দিকে অবস্থান করছে।

ঘড়িতে তখন আটটার কাছাকাছি বাজে। আমি জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে, রেলিঙের ওপর ঝুঁকে সমুদ্রের ওপর নজর রেখে চলেছি। আমার ব্যক্তিগত ভৃত্য কনসিল আমার প্রায় গাঘেঁষে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের জলরাশির ওপর ব্যস্ত চোখের মণি দুটোকে বুলিয়ে চলেছে।

জাহাজের ক্যাপ্টেন আমাদের থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে। তাঁর চোখে দূরবীণ। অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে সমুদ্রের ওপর নজর রেখে চলেছেন।

আমরা যখন অনুসন্ধিৎ দৃষ্টিতে সমুদ্রের বুকে বাঞ্ছিত সে বিশালায়তন সামুদ্রিকপ্রাণীটার খোঁজ করে চলেছি ঠিক তখনই হারপুনবির নেড-এর আর্তস্বর কানে এল—'ওই—ওই যে দেখুন! ওই দিকে—ওই দেখুন! আমরা উদ্ভ্রান্তের মতো যার খোঁজ করে বেড়াচ্ছি—ওই যে সে! ওই যে—ওই দেখুন!'

নেড-এর আর্তস্বর জাহাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ফলে জাহাজের ক্যাপ্টেন থেকে শুরু করে খালাসি পর্যন্ত সবাই হুটোপাটা করে ডেকের ওপর উঠে এল। এমন কি

www.pathagar.com

ইঞ্জিনিয়ার ও স্ট্রোকাররাও তাদের দায়িত্বপূর্ণ কাজ ফেলে হন্তদন্ত হয়ে ডেকের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

আমার মনেও সন্দেহ দানা বাঁধল, নেড কি তবে সত্যই কিছু দেখেছে? ফলে আমার পক্ষে উত্তেজনা এড়িয়ে দূরে থাকা সম্ভব হল না। আমি ভিড় ঠেলে নেড-এর কাছে হাজির হয়ে দেখি, সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে ক্যাপ্টেনকে কী যেন দেখাচ্ছে।

আমি নেড-এর অঙ্গুলি নির্দেশিত পথে দৃষ্টিপাত করামাত্র সচকিত হয়ে খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে পড়লাম। চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে তাকিয়ে রইলাম জাহাজ থেকে মাত্র দু রশি দূরবর্তী স্থান অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মি চোখ ধাঁধিয়ে দিতে লাগল। সমুদ্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অভাবনীয় সে আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপার দেখে আমার হৃদপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হল।

প্রথম দর্শনে আমি ধরেই নিয়েছিলাম, সেটা ফসফরাসের আলো ছাড়া কিছু নয়। পর মুহূর্তেই আমার মনের ধন্দ ঘুচল। অতিকায় একটা দানব ভুস করে জলের তলা থেকে ভেসে উঠেছে।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। শরীরের সব কটা স্নায়ু যেন একসঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে রহস্যময় দানবটা অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মিসহ আবার জলের তলায় গাঢাকা দিল। ব্যস, একেবারে নিশ্চিহ্ন।

আমি পূর্বস্মৃতি মন্থন করতে লাগলাম। হ্যাঁ, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন জাহাজের নাবিকদের মুখ থেকে অত্যুজ্জ্বল আলোকটার যে বর্ণনা শুনেছিলাম এর সঙ্গে সামান্যতম বৈসাদৃশ্য তো নেই-ই বরং পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। আর আলোটা অনবরত নড়ছিলও বটে।

রহস্য সঞ্চারকারী আলোটা দেখামাত্র এমনিতেই জাহাজের সবার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড় হয়েছিল। তার ওপর যখন দেখা গেল সেটা আবার অতর্কিতে ভেসে উঠে আমাদের জাহাজটার দিকে এগিয়ে আসছে তখন জাহাজময় গগনবিদারী আর্তনাত শুরু হয়ে গেল। অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় সবাই কাঠ হয়ে যাবার জোগাড় হল।

ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেনের হুকুম তামিল করতে গিয়ে ঝট করে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে সাধ্যমত দ্রুত গতিতে জাহাজ ছুটিয়ে দিলেন। না, এতেও নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় দেখা গেল না। রহস্যজনক আলোটা যেন অলৌকিক গতিতে, আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ দ্রুত গতিতে, আমাদের জাহাজের দিকে ধেয়ে আসতে লাগল।

অত্যাশ্চর্য আলোটার কাণ্ড দেখে জাহাজের খালাসিরা তো চোখ বন্ধ করে ভগবানের নাম করতে লাগল। অজানা আতঙ্কে শরীরের রক্ত হিম হয়ে যাবার মত ব্যাপারই বটে। আসলে বস্তুটা সম্বন্ধে আমাদের সামান্যতমও ধারণা না থাকার জন্যই আমরা অকস্মাৎ মুষড়ে পড়েছিলাম।

অজ্ঞাত আলোটা আমাদের জাহাজটাকে বার কয়েক চক্কর মেরে একসময় আরো অভাবনীয় কাণ্ড করে বসল। দ্রুতগতিতে আমাদের জাহাজটা থেকে দুতিন মাইল দূরে সরে গেল। পরমুহূর্তেই আবার ফুসফুসকাঁপানো শব্দ করে উঠল উল্কা বেগে ছুটে এসে আমাদের জাহাজটা থেকে প্রায় কুড়ি ফুট দূরবর্তী স্থানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যস, একেবারে নিশ্চল নিথর।

www.pathagar.com

জাহাজের সবাই ধরেই নিল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের জাহাজটার সঙ্গে রহস্যময় আলোর আধারটার সংঘর্ষ বেঁধে যাবে।

কাঁপা কাঁপা গলায় ক্যাপ্টেন কোনোরকমে উচ্চারণ করলেন—'অতিকায় প্রাণীটা সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে না পারায় কোনোরকম ঝুঁকি নিতে উৎসাহ পাচ্ছিনে। সবচেয়ে বড় কথা তার স্বভাবচরিত্র, বিশেষ করে আক্রমণ পদ্ধতিও আমাদের বিন্দুমাত্রও জানা নেই।'

'আমার বিশ্বাস, এটা বিশালায়তন একটা দাঁতাল তিমি। আপনার কি অন্যরকম কোনো ধারণা—'

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ক্যাপ্টেন আবার বলতে শুরু করলেন, 'অবশ্য না। বরং এ ব্যাপারে আমি শতকরা একশো ভাগ নিঃসন্দেহ।'

'সঙ্গে টর্পেডো না থাকলে এমন বিশালায়তন ও ভয়ঙ্কর একটা তিমির সঙ্গে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হওয়ার চিন্তা পাগলের খেয়াল ছাড়া কিছুই নয়।'

'আপনার ধারণাই অভ্রান্ত। আর তাই যদি সত্য হয় তবে এটা পৃথিবীর বৃহত্তম তিমি হিসেবে দাবি করতে পারে। আর সবচেয়ে ভয়ঙ্করও বটে।'

আমরা জাহাজের সবাই নিদারুণ অস্থিরতার মধ্য দিয়ে সারাটা রাত্রি নির্ঘুম অবস্থায় কাটিয়ে দিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই আতঙ্ক সৃষ্টিকারী রহস্যময় প্রাণীটা সমুদ্রের জলে গা-ঢাকা দিয়ে দিল।

তখন একটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। অকস্মাৎ সুতীব্র একটা হুইসেলের আওয়াজ শোনা গেল।

অভিজ্ঞ তিমি-শিকারি হারপুনবির নেড বার-কয়েক এদিক ওদিক নজর ফিরিয়ে ক্যাপ্টেনকে লক্ষ্য করে বলল, 'স্যার, এর আগে আমি বহুবার তিমির গর্জন শুনেছি বটে, কিন্তু এমন বুক-কাঁপানো গর্জন তো কোনোদিনই শুনি নি! ইস, আমি হারপুনের আওতায় যদি একটা বারের জন্য পেতাম, মজা কাকে বলে হতচ্ছাড়া তিমিটাকে টের পাইয়ে দিতাম।'

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে দুটোর ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। রাত্রি প্রায় দুটো বাজতে চলেছে। আবার রহস্যজনক অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মিটা অতর্কিতে সমুদ্রের বুকে ভুস করে জেগে উঠল।

আমাদের জাহাজ থেকে আলোটার দূরত্ব অনুমান করা সম্ভব হচ্ছিল না।

কেন? কেন রহস্যসঞ্চারকারী অতিকায় প্রাণীটা বারবার এমন করে জলের ওপর ভেসে উঠছে, আর কেনই বা কয়েক মুহূর্ত পরে আবার জলের তলায় গাঢাকা দিচ্ছে? হয়ত বা নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য সেটা বারবার ভেসে উঠছে। এর সপক্ষে যুক্তিও রয়েছে। তার শ্বাসক্রিয়া চালাবার ফোঁস ফোঁস আওয়াজ পর্যন্ত বাতাসে ভেসে আমাদের কানে পৌঁছচ্ছিল।

লড়াই। হ্যাঁ, অতিকায় সামুদ্রিকপ্রাণীটার সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতেই হবে। মাছধরা বিশালায়তন ও মজবুত জাল সমুদ্রের জলে নামিয়ে দেয়া হল। হারপুন ছোঁড়ার বন্দুকগুলোকে এনে হাতের কাছে জড়ো করা হল। সেগুলো থেকে এক মাইল দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত হারপুন ছোঁড়া যায়। কিছুসংখ্যক গাদা বন্দুকও জাহাজের গুদাম থেকে বের করে এনে একধারে রাখা হল।

www.pathagar.com

তখন ঘড়িতে আটটা বাজে। বিশালায়তন সামুদ্রিকপ্রাণীটা তখন আমাদের জাহাজটা থেকে মাইল দেড়েক দূরে পিঠ ভাসিয়ে চুপচাপ পড়ে রয়েছে। তার গায়ের রঙ কালচে। আর আক্রোশে জলের ওপর বারবার এত জোরে হিংস্র সামুদ্রিকপ্রাণীটা আঘাত হানছিল যার ফলে কেবল জল তোলাপাড়ই হচ্ছিল না, রীতিমতো ঘূর্ণিরও সৃষ্টি হচ্ছিল।

আমাদের জাহাজ আব্রাহাম লিঙ্কন সেটার দিকে ধীরমন্থর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল।

আমি অতিকায় প্রাণীটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, হেলভেটিয়া আর শ্যামনের ক্যাপ্টেন ও জাহাজের কর্মীরা রহস্যজনক অতিকায় প্রাণীটার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আসলের সঙ্গে বেশকিছু পরিমাণে খাদ মিশিয়ে পরিবেশন করেছে। আমি কিন্তু নিশ্চিত সেটা লম্বায় ত্রিশ ফুটের বেশি কিছুতেই হবে না।

আরে ব্বাস! অকস্মাৎ বিশালদেহী প্রাণীটার পিঠের ছিদ্র দিয়ে প্রায় দুশো কুড়ি ফুট ওপরে জল উঠে গেল। সেটা ঠিক যেন একটা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ফোয়ারা।

ক্যাপ্টেনের কেবিনে ইঞ্জিনিয়ারের তলব পড়ল। ক্যাপ্টেন তাঁকে বললেন—'আপনি তৈরি হয়ে নিয়েছেন তো? বয়লারে যথেষ্ট বাষ্প সঞ্চিত আছে তো?'

ইঞ্জিনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'বাষ্প যথেষ্টই সঞ্চিত।'

'তবে জাহাজটাকে সাধ্যমতো দ্রুতগতিতে ছুটিয়ে দিন।'

ক্যাপ্টেনের নির্দেশে ইঞ্জিনিয়ার সাধ্যমতো দ্রুতগতিতে আব্রাহাম লিঙ্কন ছুটিয়ে নিয়ে চললেন। প্রায় পৌন এক ঘণ্টা ছুটোছুটি করে সেটা সামুদ্রিক প্রাণীটাকে ধরার জন্য দাপাদাপি করল। কিছুতেই সেটাকে দুশো গজের মধ্যে আনা সম্ভব হল না।

নেড হারপুন হাতে সুযোগের সন্ধানে রইল। কিন্তু সে যেই হাতের হারপুনটাকে ছুঁড়তে যাবে অমনি সেটা আগের চেয়ে দ্রুতগতিতে হারপুনের আওতার বাইরে চলে গেল।

এবার ক্যাপ্টেনের নির্দেশে কামান দাগা হল। আশ্চর্য ব্যাপার তো! কামানের গোলাটা জন্তুটার কয়েক ফুট ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে সমুদ্রের জলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। চেষ্টা ব্যর্থ হল।

ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন, 'জন্তুটার গায়ে যে আঘাত হানতে পারবে তাকে নগদ পাঁচ ডলার পুরস্কার দেয়া হবে।'

এক বৃদ্ধ অভিজ্ঞ গোলন্দাজ এবার জন্তুটাকে লক্ষ করে কামান দাগল। হ্যাঁ, কাজ হয়েছে। কামানের গোলাটা তার গায়ে লাগল।

আমাদের জাহাজ তীব্রতর গতিতে জন্তুটার দিকে ধেয়ে চলল। আমাদের জাহাজ ধ্বংস না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই হতচ্ছাড়া জন্তুটাকে নিস্তার দিচ্ছি নে।

আমাদের বিশ্বাস ছিল, অনবরত ছুটোছুটি দাপাদাপি করে করে জলচর প্রাণীটা একসময় কাহিল হয়ে রণে ভঙ্গ দেবে, হয়রান হয়ে এলিয়ে পড়বে। ব্যস, আমরা কাজ হাসিল করে ফেলতে পারব।

কিন্তু সেটা আমাদের অবাক করে, ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমুদ্রের বুকে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল।

একসময় সমুদ্রের বুকে সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আমার ফুসফুস নিঙড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। আপন মনে বলে উঠলাম, 'হায়! তবে কি সব শেষ। আমাদের লম্ফঝম্ফ কি এ পর্যন্তই? অতিকায় হিংস্র জলচরটার দেখা কি আর পাওয়াই যাবে না?'

www.pathagar.com

না, যা আশঙ্কা করেছিলাম তা নয়। রাত্রি এগারোটায় আবার সমুদ্রের বেশ কিছুটা অংশ হঠাৎ অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় ঝলমলিয়ে উঠল।

আমি ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকালাম। দাঁতাল ভয়ঙ্কর সে তিমিটাকে এক জায়গায় নিশ্চল নিথরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে।

জাহাজের ক্যাপ্টেন হঠাৎ হাতে আসা সুযোগটাকে কাজে লাগাবার জন্য ডেকের ওপর অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন।

আব্রাহাম লিঙ্কন নিঃশব্দে, সাধ্যমত চুপিসারে ভয়ঙ্কর দাঁতাল তিমিটার দিকে গুটিগুটি এগোতে লাগল।

দুর্ধর্ষ তিমি শিকারি নেড হারপুন হাতে ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে।

জাহাজ আর সামুদ্রিক দানবটার মধ্যে ব্যবধান কমতে কমতে মাত্র কুড়ি ফুটে দাঁড়িয়েছে। ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরি না করে অস্থিরচিত্ত নেড শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে দিল হাতের হারপুনটাকে ছুঁড়ে।

বিকট একটা আওয়াজ বাতাসবাহিত হয়ে আমাদের কানে এসে পৌঁছাল। হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। হারপুনটা তীরবেগে ছুটে গিয়ে হিংস্র সামুদ্রিক দানবটার গায়ে আঘাত হানল। আরে, কী অদ্ভুত ব্যাপার! দানবটার গায়ে হারপুনের আঘাত লাগামাত্র অত্যুজ্জ্বল আলোটা দুম করে নিভে গেল। আর মুহূর্তের মধ্যে পর্বতপ্রমাণ দুটো সুউচ্চ জলস্তম্ভ সবেগে ওপরের দিকে উঠে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিশালায়তন জাহাজটা মোচার খোলার মতো অনবরত দোল খেতে লাগল। চোখের পলকে মাস্তুলের দড়িগুলি গেল ছিঁড়ে। আর আমরা, জাহাজের লোকজন শোলার পুতুলের মতো যে যেদিকে পারলাম ছিটকে আছাড় খেয়ে পড়লাম উন্মত্ত সমুদ্রের বুকে। আমি? কয়েকবার শূন্যে চক্কর মেরে বেসামাল হয়ে সমুদ্রের বুকে আছাড় খেয়ে পড়ামাত্র প্রচণ্ড বেগে জলের প্রায় কুড়ি ফুট নিচে চলে গেলাম। পিতৃপুরুষের বরাতের জোরে প্রাণে বেঁচে গেলাম। সাঁতারে দক্ষ না হলে আমার গতি যে কী হত স্বয়ং ঈশ্বরও হয়ত জানতেন না।

প্রাণরক্ষার তাগিদে উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের সঙ্গে উদ্ভ্রান্তের মতো আমি লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলাম।

প্রাণের মায়ায় অনবরত হাতপা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভাবতে লাগলাম, আমি যে অসহায়ভাবে সমুদ্রের বুকে ছিটকে পড়েছি তা আমার জাহাজের সঙ্গীরা দেখেছে কি? আমাকে উদ্ধারের জন্য নৌকা পাঠাবে কি? আমার প্রাণ রক্ষা হবে কি? আমি বাঁচব! বাঁচার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে কি?

একসময় আবছা অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তিকে একটু একটু করে নজরের আড়ালে চলে যেতে দেখলাম। চোখে বারবার নোনা জলের ঝাপটা লাগায় ভালো দেখতে পাচ্ছিলাম না বটে, তবে সেটা যে আমার প্রাণরক্ষার একমাত্র সম্বল আব্রাহাম লিঙ্কনের তা বুঝতে ভুল হল না। তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, তাই বার বার সাধ্যমত গলা ছেড়ে চিৎকার জুড়ে দিলাম, 'বাঁচাও! বাঁচাও! বাঁচাও! আমি সমুদ্রে—সমুদ্রে পড়ে গেছি! এই যে, এখানে আমি। কে আছ, বাঁচাও!'

কে, কার কথা শোনে? কে, কাকে বাঁচাবে? প্রাণের তাগিদে আমি ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্রের বুকে অসহায়ভাবে হাতপা ছুঁড়েই চললাম।

www.pathagar.com

হায় ঈশ্বর! আব্রাহাম লিঙ্কন তবে আমাকে সমুদ্রের বুকে নির্মমভাবে নির্বাসন দিয়ে চলেই গেল। জাহাজটার সঙ্গে চিরদিনের মতো সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।

আচমকা আমার জামা ধরে কে যেন টান দিল। চমকে উঠলাম। ধরেই নিলাম, জীবন সংশয়। নির্ঘাৎ কোনো হিংস্র সামুদ্রিকপ্রাণীর খপ্পড়ে পড়েছি। হাতপা শিথিল হয়ে আসতে লাগল। ভয়ে ভয়ে কোনোরকমে ঘাড় ঘোরালাম। ব্যাপার দেখে আরো চমকে উঠলাম। দেখি, আমার একেবারে গা-ঘেঁষে কনসিল সাঁতার কেটে চলেছে। সে বলল, 'স্যার, আমার কাঁধে ভর দিন। দেখবেন, সাঁতারকাটা অনেকটা সহজ হবে।'

'কিন্তু তুমি? তুমিও কি জাহাজ থেকে ছিটকে—'

'না স্যার, আপনাকে জাহাজ থেকে ছিটকে জলে পড়ে যেতে দেখেই আমি জলে ঝাঁপ দিই।'

কনসিল, আমার অনেকদিনের ভৃত্য, একান্ত পার্শ্বচর কনসিলের কৃতজ্ঞতায় আনন্দে আমার প্রাণটা নেচে উঠল।

আমি কনসিলের কাঁধে ভর রেখে কোনোরকমে পিতৃদত্ত প্রাণটাকে রক্ষা করার জন্য সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই অব্যাহত রাখলাম।

চাঁদের আলোয় প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে আমাদের আব্রাহাম লিঙ্কনকে ছায়ামূর্তির মতো দেখা যেতে লাগল।

এতক্ষণ মরিয়া হয়ে ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মৃত্যুদূত ভয়ঙ্কর সে সামুদ্রিক দানব তিমিটার কথা মন থেকে মুছে গিয়েছিল। হঠাৎ তার স্মৃতি বুকে ভেসে উঠল। ব্যস, আতঙ্কে হাত পা ক্রমেই শিথিল হয়ে আসতে লাগল।

আচমকা কোনো একটা শক্ত জিনিসের স্পর্শে চমকে উঠলাম। মনে হল, কে যেন আমাকে ধরে টানাটানি করছে।

পারলাম না। আর নিজের মনকে শক্ত রাখতে পারলাম না। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম।

যখন সংজ্ঞা ফিরে পেলাম তখন দেখি, আমার একদিকে ভৃত্য কনসিল আর অন্য দিকে অন্য আর একটা ভেজা ঝাপসা মুখ, উভয়ে ধরাধরি করে আমাকে কোনোরকমে চাঙা করে রেখেছে। অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকিয়ে চমকে না উঠে পারলাম না।

আমার বিস্ময়ের ব্যাপারটা অনুমান করে সে বলে উঠল, 'স্যার, আমি নেড। আমি জাহাজ থেকে ছিটকে জলে না পড়ে ভাসমান দ্বীপটার ওপর আছাড় খেয়ে পড়েছিলাম। না, দ্বীপ নয়, বরং অতিকায় ভয়ঙ্কর তিমিটার ওপর পড়েছিলাম।'

একটু দম নিয়ে সে আবার বলতে শুরু করল,. 'স্যার, আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করলাম। আমার ছোঁড়া হারপুনের ফলাটা একেবারে ভোঁতা—দুমড়ে মুচড়ে একসার হয়ে গেছে। তার দেহটা শক্ত পুরু লোহার চাদরে মোড়া না হলে তো এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার কিছুতেই সম্ভব নয়।'

আর কিছুক্ষণ লড়াই চালাবার পর আমরা তিনজন কোনোরকমে রহস্যজনক দ্বীপটার ওপরে উঠে গেলাম। ভাবলাম, বরাতে যাই থাকুক না কেন, কিছু সময় বিশ্রাম করে স্বস্তিতে একটু দম তো অন্তত নিয়ে নেয়া যাক।

বুঝলাম, যে বস্তুটার ওপর বসে আমরা বিশ্রাম করছিলাম তার দেহের অর্দ্ধাংশ জলের নিচে তলিয়ে রয়েছে। বার-কয়েক পদাঘাত করে বিস্মিত না হয়ে পারলাম না,

www.pathagar.com

যত বড় সামুদ্রিকপ্রাণীই হোক না কেন তার পিঠটা এমন অস্বাভাবিক কঠিন কী করে হতে পারে? হায় ঈশ্বর! এ যে লোহাকেও হার মানাবে!

নেড তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'স্যার, সামুদ্রিকপ্রাণী না হয়ে, স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীভুক্ত না হয়ে সরীসৃপ গোষ্ঠীর কোনো প্রাণী হলেও তবু না হয়ে বিশ্বাসযোগ্য হত। কুমীর বা কচ্ছপ হলেও কিছুটা বিশ্বাস করা যেত। আবার গিরগিটি বা সরীসৃপজাতীয় প্রাণীর পিঠই বা এমন মসৃণ কী করে হতে পারে? সবচেয়ে বড় কথা, হারপুনটা আঘাত করা ঘাত যে গম্ভীর আওয়াজের উদ্ভব হয়েছিল তাতে আমার ধারণা একেবারে বদলে গেছে—'

আমি সচকিত হয়ে তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'সে কী নেড, বলছ কি হে! পৃথিবীর সর্বপ্রান্তের বিদগ্ধজন রহস্যজনক সামুদ্রিকপ্রাণীটিকে কেন্দ্র করে হৈ চৈ বাঁধিয়েছে—আর তুমি কি না কোটি কোটি মানুষের ধারণাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছ! তুমি বলতে চাইছ, এটা আদৌ কোনো প্রাণী নয়! মানুষের সৃষ্ট অত্যাশ্চর্য কোন বস্তু এটা!'

হারপুনবীর নেড এবং আমার ভৃত্য কনসিলের দৃঢ় বিশ্বাস, এটা ইস্পাতের তৈরি অতিকায় কোন মাছ বা সে জাতীয়ই কিছু একটা।

চোখের পলকে বিশালায়তন বস্তুটা আরও অবিশ্বাস্য কাণ্ড শুরু করল। তার পিঠের এক জায়গা থেকে জল বেরোতে লাগল। এবার রহস্যসৃষ্টিকারী বস্তুটা একটু একটু করে এগোতে শুরু করল।

কী বিচিত্র কাণ্ডরে বাবা! বিশালায়তন বস্তুটার ভেতর থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। খুবই ক্ষীণচাপা কণ্ঠস্বর। ব্যাপার দেখে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বুকের ভেতরে ঢিবঢিবানি শুরু হয়ে গেল। আর শরীর ক্রমেই শিথিল হয়ে আসতে লাগল। এমন একটা ভয়ঙ্কর রহস্যজনক ঘটনার মুখোমুখি কোনোদিন হতে হবে, স্বপ্নেও ভাবি নি।

উৎকর্ণ হয়ে নিঃসন্দেহে হবার চেষ্টা করলাম, আদৌ সেটা মানুষের কণ্ঠস্বর, নাকি আতঙ্কগ্রস্ত মনের ধন্ধ।

না, মনের ভুল নয়। মানুষের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল।

ভোরের হাল্কা আলো সমুদ্রের বুকে উঁকি দিতেই আমি সাহসে ভর করে উদ্ভূত রহস্যটা ভেদ করার জন্য প্রয়াসী হলাম। জন্ম যখন হয়েছে তখন আজ না হোক কাল মৃত্যু হবেই। তাই বলে এমন জমাটবাঁধা আতঙ্কের মধ্যে ধুঁকে ধুঁকে মরার চেয়ে যদি হঠাৎ করে প্রাণটা বেরিয়েই যায় আক্ষেপের কীই বা থাকতে পারে।

হ্যাঁ, আমার ধারণাই অভ্রান্ত। মানুষের কণ্ঠস্বরই বটে। পর মুহূর্তেই ডুবোজাহাজটার ভেতর থেকে দুম করে একটা শব্দ ভেসে এল। লোহার ঢাকনাটা খুলে কে যেন বাইরে বেরিয়ে আসতে গিয়ে আমাদের দেখে বিকট আর্তনাদ করে আবার সশব্দে ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দরজাটা দুম করে খুলে গেল। ভেতর থেকে আটজন ষণ্ডামার্কা মুখোশধারী লোক নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল। তেমনি নিঃশব্দে আমাদের বন্দি করে ভেতরে নিয়ে গেল।

আমি নিঃসন্দেহ হলাম, জলদস্যুদের ডুবোজাহাজ এটা। অত্যাধুনিক কায়দায় সমুদ্রের বুকে লুঠতরাজ করছে।

www.pathagar.com

নেড সত্যই অকুতোভয়! প্রাণের মায়া তার নেই। ভয়ডর কাকে বলে সত্যই তার জানা নেই। নইলে এমন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কেউ মুখ খোলে, গলা ছেড়ে প্রতিবাদ করতে উৎসাহী হয়? নিশ্চিত মৃত্যুভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া আমি ও কনসিল সাধ্যমতো থামিয়ে তাকে সতর্ক করে, সামলে সুমলে রাখার চেষ্টা করলাম।

অন্ধকার একটা কামরায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। চারদিকে কোনো দরজা জানালা আছে বলে মনে হল না। অকস্মাৎ অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় কামরাটা ঝলমলিয়ে উঠল। এবার নিঃসন্দেহ হলাম, এ আলোই সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের এবং সমুদ্রযাত্রীদের মধ্যে রহেস্যর সঞ্চার করত।

আমাদের কামরাটার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ষণ্ডামার্কা মুখোশধারীরা তেমনি নীরবে চলে গেল। কামরাটার ভেতরে আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ ছিল না।

আচমকা সশব্দে একটা দরজা খুলে গেল। দুজন লোক নীরবে কামরার ভেতরে ঢুকে এল। তাদের একজন বেঁটে, গাট্টাগোট্টা। আর দ্বিতীয়জন অপেক্ষাকৃত লম্বা।

কামরার ভেতরে ঢুকেই লোক দুটো অনুসন্ধিৎসু নজরে আমাদের তিনজনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। দুর্বোধ্য ভাষায় অপেক্ষাকৃত লম্বা লোকটা তার সঙ্গীকে কী যেন বলল। এবার সে তেমনি দুর্বোধ্য ভাষাতেই আমাকে কী যেন জিজ্ঞেস করল।

আমি অসহায় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে কোনোরকমে উচ্চারণ করলাম, 'ক্ষমা করবেন, আমি ফরাসি ভাষা জানি না।'

তাদের ভাবখানা দেখে বুঝলাম, তারাও আমাদের কথা কিছুমাত্রও বুঝতে পারল না। ফলে আমাদের পরিস্থিতি যারপরনাই সঙ্কটজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি হাল ছাড়লাম না। কনসিলের পরামর্শে আমি আমাদের মর্মান্তিক পরিস্থিতির কথা সবিস্তারে তাদের কাছে ব্যক্ত করলাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত ফল যা হল, ভস্মে ঘি ঢালা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার কথার একটা শব্দও তাদের হৃদয়ঙ্গম হল বলে মনে হল না। শেষপর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে মুখ বুজে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে অদৃষ্ট সম্বল করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

লোক দুটো কয়েক মুহূর্ত নিজেদের মধ্যেই সেই দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব বলাবলি করল। চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে তুলে একসময় তারা কামরা ছেড়ে গেল। আমরা অজ্ঞাতপরিচয় রহস্যজনক লোকগুলোর হাতে বন্দি হলাম।

আমরা অসহায় দৃষ্টি মেলে একে অন্যের মুখের দিকে বারবার তাকাতে লাগলাম। একটু পরেই আবার সশব্দে দরজাটা খুলে গেল। কিছু পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে এক ভৃত্য ঘরে ঢুকে এল। সেই ইশারায় আমাদের বুঝিয়ে দিলে পোশাক বদলে নাও।

পোশাকগুলো নতুন এক বিশেষ ধরনের তন্তু দিয়ে তৈরি বুঝলাম।

আমরা পোশাক বদলানোর কাজ সারতে না সারতেই সে ভৃত্যটাই আবার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে এল। এবার তার হাতে রয়েছে বিচিত্র সব খাদ্যবস্তু। খাবারের থালার মধ্যে যা-কিছু রয়েছে তাদের মধ্যে একটা বস্তুই আমাদের পরিচিত দেখতে পেলাম—কাঁটাচামচ।

থালা ও কাঁটাচামচের গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা দেখলাম, 'মোবিলিস এন মোহিলি-এন'।

www.pathagar.com

অক্ষরগুলো পড়ে অনুমান করলাম, 'এন' কোন একজনের নামের আদ্যক্ষর। আর 'এন' আদ্যক্ষরযুক্ত নামের কোনো এক ব্যক্তি এ ডুবোজাহাজটার মালিক বা প্রধান পদাধিকারী।

আহারাদি সেরে সবে চেয়ারে বসে একটু ঝিমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি। ঠিক সে মুহূর্তেই মনে হল ডুবো জাহাজটা অল্প অল্প করে জলে তলিয়ে যাচ্ছে।

ডুবোজাহাজটার চারদিকে শক্ত কাচ দিয়ে ঘেরা। ভেতরে বসেই বাইরের দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায়। সেটা জলের নিচে যেতে যেতে একসময় বেশ গভীরে চলে গেল।

কাচের দেয়াল দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতেই আমার বুকের ভেতরে কেমন মোচড়ামুচড়ি শুরু হয়ে গেল। হাজার হাজার বিচিত্র চেহারাধারী সামুদ্রিকপ্রাণী আমাদের ডুবোজাহাজটার গায়ে চরম আক্রোশে ছুটে এসে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। কেউবা অবাঞ্ছিত বস্তুটাকে মোটেই বরদাস্ত করতে না পেরে বিরাট গ্রীবা বিস্তার করে লম্বা লম্বা দাঁতে কাচের গায়ে সজোরে কামড় বসাতে ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে লাগল।

আমি চেয়ারটার গায়ে হেলান দিয়ে অথর্ব পঙ্গুর মতো বসে নিবিষ্ট মনে ভাবতে লাগলাম, 'ডুবোজাহাজটা কোন্ শক্তিবলে চালিত হচ্ছে? কোন্ প্রক্রিয়াতেই বা শ্বাসকার্যের একান্ত অপরিহার্য অক্সিজেন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে? আর কেনই বা এটা একটু পর পর ভুস করে জলের উপরিভাগে ভেসে ওঠে? এমন বহু টুকরো টুকরো চিন্তা আমার মাথায় ভিড় করতে লাগল।

একসময় আকস্মিক তর্জন গর্জনে আমি সচকিত হয়ে ঘাড় ঘোরালাম। ব্যাপার দেখে রীতিমতো চমকে উঠলাম। দেখি ইতোমধ্যে কে একজন ঘরে ঢুকেছে। অন্য কোনো ভৃত্য হবে হয়তো। নেড তাকে দেখেই উন্মাদের মতো তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তর্জন গর্জন শুরু করে দিয়েছে।

আমি ও কনসিল ব্যস্ত হয়ে নেডকে নিরস্ত করার জন্য এগিয়ে যেতেই পিছন দিক থেকে ভেসে আসা এক গম্ভীর কণ্ঠস্বর কানে আসতে থমকে গেলাম, 'নেড ক্ষান্ত হও। ওকে ছেড়ে দাও।'

এবার আগন্তুক আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তেমনি গম্ভীর স্বরে বললেন, 'অধ্যাপক অ্যারোনাক্স, আপনাকে কটা কথা বলার জন্য এসেছি। অনুগ্রহ করে আমার বক্তব্য শুনুন—

ইংরাজি, ল্যাটিন, ফরাসি ও জার্মান চারটে ভাষাই আমার রপ্ত রয়েছে। অতএব আশা করি অনুমান করতে পারছেন, আমি অনেক আগেই আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করতে আসতে পারতাম। কিন্তু আসি নি কেন, জানেন? আসলে আগে আপনাদের ভালভাবে জানতে, বুঝতে সময় নিয়েছি। আর আশা করি এও অনুমান করতে পারছেন, আপনাদের সব পরিচয়ই আমার নখদর্পণে। আপনি প্যারিস মিউজিয়ামের উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক অ্যারোনাক্স। আর ইনি আপনার পারিবারিক ভৃত্য কনসিল। আর উনি আমেরিকান জাহাজ আব্রাহাম লিঙ্কন-এর তিমিশিকারি হারপুনবীর নেড—নেড ল্যান্ড—ঠিক বলি নি?'

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে একসময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে আগন্তুক এবার বললেন, 'একসময় আমি সভ্যসমাজ থেকে বহু দূরে সমুদ্রের বুকে নিরিবিলি জীবনযাপন করছিলাম। আপনারা এসে আমার সে শান্তি কেড়ে নেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন, আমাকে যারপরনাই অস্থির করে তুললেন।'

www.pathagar.com

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'কথাটা অবশ্যই মিথ্যা নয়। তবে এটুকু অন্তত জানবেন, নিতান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবেই—'

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'কী? অনিচ্ছাকৃতভাবে? সে কী! আব্রাহাম লিঙ্কনকে নিয়ে আপনারা যে রকম হন্যে হয়ে আমাকে রোজ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতেন তা কি নেহাতই অনিচ্ছায়, আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? আর নেড যে হারপুন ছুঁড়ে আমার ডুবোজাহাজটাকে ঘায়েল করতে চেয়েছিল তাও কি অনিচ্ছাতেই? আর আপনাদের ছোঁড়া কামানের গোলাটা যে আমার ডুবোজাহাজটার গায়ে আছড়ে পেড়েছিল তাও কি আপনাদের অনিচ্ছাতেই বলতে চাইছেন?'

দম নিয়ে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তাঁর কথার জবাব দিতে গিয়ে বললাম, 'আপনার ডুবোজাহাজটা প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে যে রহস্য ও আতঙ্কের সঞ্চার করেছিল তা নিরসনের জন্যই আমরা সে কাজে উৎসাহী হয়েছিলাম। আসলে এটা যে একটা ডুবোজাহাজ তা আবিষ্কারের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল আমরা কোনো একটা অতিকায় সামুদ্রিকপ্রাণীর পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছি। আর একটা কথা হয়তো আপনার জানা নেই, এ ডুবোজাহাজটাকে কেন্দ্র করে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে যে কী গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে তা আপনাকে ভাষায় বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে, যদি বুঝতে পারতেন এটা একটা ডুবোজাহাজ, মোটেই সামুদ্রিকপ্রাণী নয় তবে কি আমাকে নিস্তার দিতেন, বলুন? এবার আশা করি মেনে নিচ্ছেন, আমরা যে আপনাদের শত্রুজ্ঞান করছি তার যথেষ্ট সঙ্গত ধারণ রয়েছে। তাই আপনাদের প্রতি শিষ্ট আচরণ করতে আমি মোটেই বাধ্য নই। আমি চাইলে আপনাদের জলে ডুবিয়ে মারতেও কিছুমাত্র—'

'সে কী! এ যে রীতিমত পাষণ্ডের কাজ জনাব! এ যে সভ্যতা বহির্ভূত বর্বরের মত কাজ!'

'সভ্যতা? সভ্য মানুষ বলতে আপনাদের যা কিছু বিশ্বাস, যাদের সভ্য ভাবেন তারা কিন্তু আসলে মোটেই সভ্য নয়। বিশেষ ব্যক্তিগত কোন কারণে আমি আজ মনুষ্য সমাজের সঙ্গে সম্পর্কছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছি। আর সে কারণেই আমি সমাজে প্রচলিত নিধিনিষেধ মানতে আগ্রহী নই—বাধ্যও অবশ্যই নই। আপনাকের আমি সতর্ক করে দিচ্ছি অধ্যাপক, ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে এ প্রসঙ্গে কিছু বলার চেষ্টা করবেন না। এটা আমার অনুরোধ এবং আদেশ দুই মনে করতে পারেন।'

দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে ভদ্রলোক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'আপনারা এখানে এসেই যখন পড়েছেন তখন এখানেই থাকবেন। তবে একটা শর্ত—এখানে বহুদিন আপনাদের বন্দি জীবনযাপন করতে হবে। আর মনে রাখবেন, আমি বল প্রয়োগ করে কাউকে দিয়ে কিছু করাতে আগ্রহী নই। আমার হুকুম তামিল করবেন, কথা রইল। তবে হ্যাঁ, জাহাজের সর্বত্র আপনাদের যাওয়ার অনুমতি রইল। কিন্তু কোনোক্রমে জাহাজ ছেড়ে যেতে পারবেন না। তবে এটুকু আপনাদের বলতে পারি, আপনাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কষ্টকে আমার ডুবোজাহাজ অবশ্যই ভুলিয়ে

www.pathagar.com

দিতে সক্ষম। বুঝতেই পারছেন, আমি যে-জন্য পৃথিবীবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, আপনাদের ছেড়ে দিলে আমাকে সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হবে।'

আমি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে হতাশা সুরে বললাম, 'অনুগ্রহ করে আপনার নামটা বলবেন কি?'

'আমাকে আপনারা ক্যাপ্টেন নিমো বলেই সম্বোধন করবেন। আমার এ ডুবোজাহাজটার নাম 'নোটিলাস।'

ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কামরা ছেড়ে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ক্যাপ্টেন নিমো আবার আমাদের কামরায় ফিরে এলেন। আমাদের সঙ্গে তার প্রিয় নোটিলাসকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। সবার আগে তাঁর সুসজ্জিত গ্রন্থাগারটা দেখালেন। সেলফে স্তরে স্তরে বহুমূল্যবান বই সাজানো দেখলাম। ঘরের কেন্দ্রস্থলে একটা টেবিলে কয়েকটা সংবাদপত্র, সাময়িকী আর কাগজপত্র সাজানো গোছানো। সমুদ্রের তলদেশে এমন মূল্যবান গ্রন্থসমৃদ্ধ একটা গ্রন্থাগার দেখে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না।

আমার বিস্ময়টুকু অনুধাবন করে ক্যাপ্টেন নিমো মুচকি হেসে বললেন, 'অধ্যাপক অ্যারোনাক্স, এখানে বিভিন্ন ভাষা ও বিষয়ের ওপর লেখা বারো হাজার বই রয়েছে। পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারলেও একমাত্র পার্থিব বস্তু বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারিনি। বরং এদের প্রতি অত্যুগ্র আগ্রহই বোধ করি। আপনাকে বলে রাখছি অধ্যাপক, আপনি নির্দ্বিধায় এসব বই ব্যবহার করতে পারেন।'

ক্যাপ্টেন নিমো এবার আমাদের নিয়ে বেশ বড়সড় একটা ঘরে হাজির হলেন। ধূমপান গৃহ।

ক্যাপ্টেন নিমো আমাকে তাঁর মুখোমুখি একটা সোফায় বসালেন। একটা চুরুট আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'নিন চুরুট খান। হাভানা থেকে সংগ্রহ করা নয়। এক বিশেষ জাতের সামুদ্রিক উদ্ভিদের পাতা থেকে তৈরি।'

আমি কৌতূহলবশত চুরুটে অগ্নি সংযোগ করে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলাম—'বাঃ চমৎকার তো? সামুদ্রিক উদ্ভিদের পাতা থেকে এমন চুরুট যে তৈরি করা সম্ভব, ভাবাই যায় না!'

ধূমপান সেরে ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের নিয়ে দুষ্প্রাপ্য শিল্পদ্রব্য ও প্রকৃতিবিদ্যার সামগ্রীকে সুসজ্জিত একটা কামরায় নিয়ে গেলেন। রীতিমতো একটা যাদুঘর।

এক সময় ক্যাপ্টেন নিমো একটা রেকাবির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'অধ্যাপক, এসব মুক্তো আর ঝিনুক আমি নিজে হাতে সমুদ্রের তলদেশ থেকে সংগ্রহ করেছি। আমি গবেষণা করিনি এমন কোন সমুদ্রই নেই।'

ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের নিয়ে পায়ে পায়ে সুসজ্জিত একটা কামরায় হাজির হলেন। চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরটার মেঝেতে পা দিয়েই ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, 'অধ্যাপক, একটা আপনার থাকার ঘর। আশা করি তেমন কোনো অসুবিধা হবে না, কী বলেন? আপনার পাশেরটাই আমার মাথা গোঁজার জায়গা।'

আমাকে চেয়ার বসতে বলে তিনি নিজে অন্য একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন, 'অধ্যাপক, আমার ঘরটা একবারটি ঘুরে দেখে আসবেন নাকি?'

'অবশ্যই। আপনি কীভাবে এখানে ডুবোজাহাজে বাস করছেন তা দেখার কৌতূহল থাকাটাই তো স্বাভাবিক।'

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের নিয়ে একটা বড়সড় কামরায় হাজির হলেন। দেয়ালের গায়ের একটা সেল্‌ফের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, 'অধ্যাপক, এদের এ ডুবোজাহাজ নোটিলাসকে চালাতে ব্যবহার করতে হয়। এদের ব্যবহারের মাধ্যমে আমি নোটিলাসের অবস্থান নির্ণয় করতে পারি। নোটিলাস কোন পথে, কোনদিকে যাচ্ছে, তাও নির্ণয় করতে পারি এদের ব্যবহারের মাধ্যমেই। যেমন মনে করুন, এ থার্মোমিটারটার সাহায্যে তাপমাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। আর এর নাম ব্যারোমিটার। আবহাওয়ার পূর্বাভাস আর বায়ুর ওজন নির্ণয়ে এটাকে ব্যবহার করি। আর এ হাইগ্রোমিটারটা ব্যবহার করে আবহাওয়ার শুষ্কতা অনুমান করা যায়। এটা স্টর্ম গ্লাস। আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেত জানিয়ে এটা ডুবোজাহাজটাকে চালানোর কাজে আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে দ্রাঘিমার হিসাবে করার সহায়ক কম্পাসটা আর ক্রনোমিটার। আর এ কাচগুলোর কাজ ডুবোজাহাজটা কোথায় ভেসে উঠল তা বুঝতে সাহায্য করা। আর মনোমিটারটাকে ব্যবহার করি জলের গভীরতা নির্ণয় করতে। ফলে আমি ডুবোজাহাজটাকে নির্বিঘ্নে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আর একটা হচ্ছে—বিদ্যুৎ যা ডুবোজাহাজটার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলা যেতে পারে।'

আমি কপালের চামড়ায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বলে উঠলাম—'বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ মানে—'

আমাকে এথাটা শেষ করতে না দিয়েই ক্যাপ্টেন নিমো বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, বিদ্যুৎ। তবে হ্যাঁ, আমি যে বিদ্যুৎ শক্তি এতে ব্যবহার করি তা অবশ্য একটু স্বতন্ত্র ধরনের। আপনার অবশ্যই জানা আছে, প্রতি একহাজার গ্রাম সমুদ্রের জলে শতকরা ৯৬১/৩ ভাগ জল, ৩২/৩ ভাগ সোডিয়াম ক্লোরাইড আর সামান্য ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়াম ক্লোরাইড বর্তমান। তাই বুঝতেই পারছেন, এতে সোডিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ খুব কম নয়। সমুদ্রজলের সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহারের মাধ্যমে আমি বিদ্যুৎ তৈরি করি। আমার এ ডুবোজাহাজ নোটিলাসের প্রাণশক্তিই তো এ-বিদ্যুৎ। এ ব্যবহার করেই তো আমি এটাকে চালনা করি। আর পাই আলো।'

আমি কপালের চামড়ায় বিস্ময়ের ভাঁজ কটা বজায় রেখেই বললাম, 'ক্যাপ্টেন নিমো, আর একটা জিনিস, শ্বাসক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যে অক্সিজেন প্রয়োজন হয় তা সংগ্রহ করেন কীভাবে?'

'হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে বাতাস তৈরি করার ক্ষমতাও আমার আছে। কিন্তু তার আর দরকার হয় না। কারণ, আমি তো যখন তখন নোটিলাসকে জলের ওপর ভাসাতে পারি। আর একটা ব্যাপার, এই যে ঘড়িটা রয়েছে এও বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যেই চলছে। বিদ্যুত্তের আর একটা অবিশ্বাস ক্ষমতা দেখুন, এর ডায়ালটা নোটিলাসের গতির পরিমাণ নির্দেশ করে। এদিকে লক্ষ করুন, আমাদের ডুবোজাহাজটা এখন পনের মাইল গতিবেগে এগিয়ে চলেছে।'

ক্যাপ্টেন নিমো এবার দরজার বাইরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললেন, 'লোহার সিঁড়িটার ওপরে নৌকাটাকে দেখতে পাচ্ছেন? এর গঠন বৈচিত্র্য যেমন দৃষ্টিনন্দন হাল্কাও ঠিক তেমনই। এটায় চেপে বেড়ানো আর মাছ ধরা হয়। জাহাজের গায়ে আর একটা নৌকা ঝুলানো রয়েছে যার গঠন প্রণালীরও আকর্ষণীয়। সবচেয়ে বড় কথা, এক ফোঁটা জলও এতে ঢুকতে পারে না। কি, বৈচিত্র্যের অধিকারী, তাই না?'

* * *

www.pathagar.com

এক বিকেলে ক্যাপ্টেন নিমো আর আমি মুখোমুখি খোস মেজাজে ধূমপান করছি। তিনি দাঁত দিয়ে চুরুটটাকে চেপে ধরে নোটিলাসের নকশাটা আমার চোখের সামনে মেলে ধরলেন। এর গায়ে নোটিলাস-এর গঠনপ্রণালী স্পষ্টভাবে আঁকা রয়েছে। রক্সাটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'আমার ডুবোজাহাজ নোটিলাসের গঠন অনেকটা চুরুটের মতো। এটার দৈর্ঘ্য ২৩২ ফুট আর প্রস্থে ২৬ ফুট। এর মোট আয়তন ১৯১১ মিটার ৪৫ সেন্টিমিটার। আর ওজন? ১৫০০ টন।

চুরুটটাকে ঠোঁট থেকে নামিয়ে এবার বললেন, 'এর মূল কাঠামোটা দুটো অংশে বিভক্ত। অংশ দুটো ইংরেজি 'টি' আকৃতিবিশিষ্ট একটা শক্ত লোহার সাহায্যে জুড়ে দেয়া আছে। এদের প্রথম অংশটা আড়াই ইঞ্চি পুরু আর ওজন তিন শ' চুরানব্বই টন। আর দ্বিতীয়টার উচ্চতা কুড়ি ইঞ্চি, আর পুরু দশ ইঞ্চি। এর ওজন বাষট্টি টন। ইঞ্জিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি মিলে মোট ওজন নয় লক্ষ দুই হাজার একশো বাষট্টি টন। জলে ভাসমান অবস্থায় নোটিলাসের এক দশমাংশ জলের ওপরে ভেসে থাকে। জাহাজটাকে জলের ওপরে ভাসিয়ে রাখার জন্য এর একভাগের সমপরিমাণ জল ধরে রাখার জন্য যদি আমি জলাধার ব্যবহার করতাম তবে এ পরিস্থিতিতে জাহাজের ওজন দাঁড়াত এক হাজার পাঁচশো সাত টন। এবার তবে অবশ্যই অনুমান করতে পারছেন, এ-পরিস্থিতিতে জাহাজটা তলিয়ে যেত। নোটিলাসের গঠনপ্রণালী একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এর জলের জলাধারগুলো জাহাজের তলদেশে রক্ষিত আছে। জলাধারগুলোতে জল ভরতে শুরু করামাত্র জাহাজটা ক্রমে ডুবতে শুরু করবে। এ সময়ে নোটিলাসকে প্রতি ইঞ্চিতে পনের পাউন্ড পরিমাণ জলের চাপ সইতে হয়।'

একটু থেমে দম নিয়ে ক্যাপ্টেন নিমো আবার বলতে শুরু করলেন, 'অধ্যাপক, একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে, সবকিছুর মধ্যেই জলে ডুবে যাবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বর্তমান। নোটিলাসকে জলের তলায় ডুবিয়ে রাখতে হলে কতখানি চাপের প্রয়োজন তার হিসাব করতে গিয়ে লক্ষ রাখি, জলের উচ্চচাপ গভীরতা অনুযায়ী কতটা কমছে।'

আমি চুরুটের শেষাংশটুকু ঠোঁট থেকে নামিয়ে নিয়ে বললাম, 'ক্যাপ্টেন, ব্যাপারটা তবে দাঁড়াল, আপনার নোটিলাসকে একহাজার গজ জলের তলদেশে একশো স্তরের জলের চাপ সইতে হয়। কি বলেন? জল নির্গমণের মাধ্যমে নোটিলাসকে ভাসিয়ে রাখার যে ইঙ্গিত দিচ্ছেন, তাই যদি হয় তবে তো পাম্পগুলোকে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এক হাজার পাঁচশো পাউন্ড চাপ সহ্য করতে হয়। এ শক্তি সংগ্রহের উপায় কী?

'বিদ্যুৎ। শক্তি বিদ্যুৎই জোগায়। তার ওপর আমার ইঞ্জিনও অমিত শক্তিধর।'

'আর একটা প্রশ্ন—কোথায় বসে আপনি এ কঠিনতম কাজটা সম্পন্ন করেছিলেন, অনুগ্রহ করে বলবেন কি?'

'অধ্যাপক, আপনি শুনলে হয়ত-বা অবাকই হবেন, সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ এক দ্বীপে আমার কারখানাটা গড়ে তুলেছিলাম। কয়েকজন অসীম সাহসী সহকর্মীকে নিয়ে আমি এমন একটা কঠিন কাজ সম্পন্ন করি। কাজ মিটে যাওয়ার পর দ্বীপে অগ্নি সংযোগ করে আমার কাজের চিহ্ন নষ্ট করে ফেলি।' একটু থেমে আবার তিনি মুখ খুললেন, 'এটা তৈরি করতে আমার কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে, ভাবছেন? অধ্যাপক, আপনি হয়ত জানেন, লোহার তৈরি একটা সাধারণ জাহাজের জন্য টন প্রতি পঁয়তাল্লিশ পাউন্ড খরচ

www.pathagar.com

হয়। আর আমার নোটিলাসের মোট ওজন পনের শো টন। অতএব হিসাব করলে দাঁড়াবে সাতষট্টি হাজার পাঁচ শো পাউন্ড। কিন্তু এর পৃথক পৃথক অংশগুলোকে জোড়া দিতে আরও অতিরিক্ত আশি হাজার পাউন্ড লেগেছে। সে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার জন্য যা কিছু ব্যয় হয়েছে তা দিয়ে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে দুই লক্ষ পাউন্ড।'

তাঁর কথা শুনে আমার মূর্ছা যাবার অবস্থা। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে এবার প্রশ্ন করলাম, 'ক্যাপ্টেন, এমন বিপুল অর্থ সংগ্রহ তো কঠিন সমস্যা! তবে বলতেই হয় আপনি অগাধ অর্থের মালিক, ঠিক কিনা?'

মুচকি হেসে ক্যাপ্টেন নিমো আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন, 'যথার্থই বলেছেন। আমি অপরিমিত বিত্তের অধিকারীই বটে। সত্য বলতে কি, ফ্রান্সের যাবতীয় ঋণ যদি আমি পরিশোধ করে দিই তবুও আমার তহবিল শূন্য হবে না।'

আমি বুঝতে পারলাম না, ক্যাপ্টেন নিমো সুযোগ বুঝে আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন কিনা। কৌতূহল ভবিষ্যতে যদি নিবৃত্ত হয় সে আশায় তখনকার মতো নিজেকে সংযত রাখতেই হল।

নোটিলাসকে জলের ওপরে ভাসিয়ে তুলতে গিয়ে ক্যাপ্টেন নিমো একটা বোতামে আলতো করে টিপ দিলেন। ব্যাস, ডুবো জাহাজটার তলদেশের ট্যাঙ্ক থেকে শোঁ শোঁ করে জল বেরোতে লাগল। আর লক্ষ করলাম, মনোমিটারের কাঁটাটা এগোতে এগোতে একসময় নিশ্চল নিথর হয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, 'অধ্যাপক, আমরা জলের ওপরে পৌঁছে গেছি।' লম্বা লম্বা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। লক্ষ করলাম, নোটিলাসের পৃষ্ঠদেশের সঙ্গে সামুদ্রিকপ্রাণীর পৃষ্ঠদেশের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এবার ধন্ধ দূর হল কেন আমরা আব্রাহাম লিঙ্কন থেকে নোটিলাসকে সামুদ্রিকপ্রাণী মনে করে বারবার ভুল করেছিলাম।

একটু পরেই জরুরি কাজের তাগিদে ক্যাপ্টেন নিমো ব্যস্তপায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন।

সুযোগ বুঝে নেড বিমর্ষমুখে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। সে এখান থেকে মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করছে, বুঝতে অসুবিধা হল না।

আমি তাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বললাম, 'নেড, কিছুদিন অন্তত ভুলেও এমন কোনো চিন্তা মাথায় এনো না। আমার মনেও কি শান্তি বা স্বস্তি কোনোটা আছে, বলো? একটা কথা মনে রাখবে, ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের জন্য সবকিছু করতে রাজি, কিন্তু দলত্যাগের কথা বললেই একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবেন। তবে এও সত্য নেড, সুযোগের সন্ধানে আমরা থাকব। আর একটা কথা, এমন একটা সুযোগ যখন বরাতগুণে হাতের মুঠোয় এসেই গেছে তখন এর যান্ত্রিক কলাকৌশল ও যন্ত্রবিদ্যার উৎকৃষ্টতা ভালোভাবে দেখে না গেলে অপূর্ব একটা জিনিস সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যাব, বঞ্চিত হব।'

আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই আচমকা বিকট একটা শব্দ শুনে সচকিত হয়ে পড়লাম। ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যাবার জোগাড় হল। আতঙ্কিত চোখে চারদিকে দৃষ্টিপাত করতেই অত্যুজ্জ্বল একটা আলোকচ্ছটা চোখে পড়ায় চোখ দুটো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। নোটিলাস থেকে আলোকরশ্মি নির্গত হচ্ছে। পর মুহূর্তেই চোখ দুটোতে আলোকরশ্মিটুকু সামলে নিয়ে বললাম, 'নেড, সমুদ্র কী অপূর্ব সাজে সেজেছে! সমগ্র

www.pathagar.com

বিশ্বের সৌন্দর্যরাশি যেন সমুদ্রের বুকে এসে জড়ো হয়েছে। আর কত সব বিচিত্র রং আর বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট মাছের সমাবেশ ঘটেছে, দেখ!'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘরের আলোটা জ্বলে উঠল। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের দেয়ালে রক্ষিত যন্ত্রপাতিগুলোর ওপর চোখ বুলাতে লাগলাম। কম্পাসের কাঁটা উত্তরপূর্বে অবস্থান করছে। আর নোটিলাস ঘণ্টায় পনের মাইল বেগে ধেয়ে চলেছে।

ব্যস, সেদিন ওই পর্যন্তই। রাতে আহারাদি সেরে আমরা বিছানা আশ্রয় করলাম।

নয়ই নভেম্বর। সকালে ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে দেখা করার আশায় খুঁজতে খুঁজতে সেলুনে গেলাম। হতাশ হতে হল। এখানেও তাঁর দেখা পেলাম না। তবে সেখানে কাচের জারে বহুবর্ণ ও বহু আকৃতিবিশিষ্ট কিছু সামুদ্রিক গাছ আমার মন কেড়ে নিল।

বিচিত্র গাছগাছালি দেখে সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। সেদিন সারাটা দিন খোঁজাখুঁজি করেও ক্যাপ্টেন নিমোর দেখা পেলাম না।

পরদিন দশই নভেম্বর। সেদিনটাও বৃথা গেল। ক্যাপ্টেন নিমোর দেখা মিলল না। তাঁকে তো দূরের কথা ডুবোজাহাজটার একটা কর্মচারীকেও দেখতে পেলাম না। এ কী আশ্চর্য ব্যাপার বাবা! জাহাজের লোকজন গেল কোথায়? কর্পূরের মতো উবে গেল না তো!

বাইশে নভেম্বর। ভোর হতে না হতে আমি বুঝতে পারলাম, ডুবোজাহাজটা ক্রমে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। অত্যাবশ্যকীয় অক্সিজেন সংগ্রহের জন্যই তার ওপরে ওঠা।

ক্যাপ্টেন নিমোর খোঁজে ডুবোজাহাজের ওপরে উঠে গেলাম। ভোরের সমুদ্রের রূপ সৌন্দর্য উপভোগ করছি, এমন সময় পিছন থেকে কার পায়ের শব্দ শুনে সচকিত হয়ে পিছন ফিরতেই দেখি ক্যাপ্টেন নিমো নন, তার সহকারী।

ভদ্রলোক জাহাজের ছাদে উঠে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে অনুসন্ধিৎসু নজরে কী যেন দেখার চেষ্টার করছেন।

একটু পরেই তিনি চোখ থেকে দূরবীনটা নামিয়ে নিম্নোক্ত আদেশ জারি করলেন—'NAUTRON RESYOCTORR VIRCH। কথাটা আমার কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য মনে হ'ল।

কথাটা আমার উদ্দেশ্যে বলেই লম্বা লম্বা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে তিনি নিচে নেমে গেলেন।

আমি তাঁর কথার মর্মার্থ উদ্ধার করতে না পারলেও মোটামুটি অনুমান করলাম, নোটিলাস এখন জলের নিচে তলিয়ে যাবে। অতএব আমি যেন শীঘ্র কামরায় চলে যাই।

তারপর আরো পাঁচ-পাঁচটা দিন আমাদের নোটিলাসেই কেটে গেল। এবার থেকে ক্যাপ্টেন নিমোর সহকারী এসে আমাকে একই দুর্বোধ্য ভাষায় সতর্ক করে দিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যেতেন।

আমি ধরেই নিলাম, ক্যাপ্টেন নিমোর দেখা আর কোনোদিনই পাব না।

আমি বিষণ্নমনে নিজের কামরায় ফিরেই থমকে গেলাম। দেখি, আমার টেবিলে ফরাসি ভাষায় লেখা একটা চিঠি। ক্যাপ্টেন নিমোর লেখা। তিনি লিখেছেন, "প্রফেসর অ্যারোনাক্স, ক্রিস্পো দ্বীপের গভীর জঙ্গলে শিকারে অংশগ্রহণ করতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি আশা করি, আপনি আপনার সঙ্গীদের নিয়ে এ শিকার অভিযানের অংশগ্রহণ করবেন। ইতি—ক্যাপ্টেন নিমো ॥"

www.pathagar.com

সবার আগে আমার জানা দরকার ক্রিম্পো দ্বীপটা কোথায় অবস্থিত। মানচিত্রের ওপরে চোখ বুলিয়ে দেখলাম, ওই দ্বীপটা ৩২.৪° উত্তর অক্ষাংশে এবং ১৫৭.৫° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আর দ্বীপটাকে ক্যাপ্টেন নিমোই আবিষ্কার করেছেন।

তার পরদিন সতেরই নভেম্বর। পোশাক পাল্টে দ্রুত কামরা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। সেলুনে ঢুকেই ক্যাপ্টেন নিমোর মুখোমুখি হলাম। তাঁর দীর্ঘ অদর্শনের ব্যাপারে আমি কোনো প্রশ্ন করলাম না। তিনি নিজেও কিছুই বললেন না।

প্রাতঃরাশ সারতে সারতে ক্যাপ্টেন নিমো প্রথম মুখ খুললেন, 'অধ্যাপক, শিকারের আমন্ত্রণ পেয়ে আমাকে নিশ্চয়ই একজন বদ্ধ পাগল ঠাওরেছেন, তাই না? আপনার তো আর অজানা নয় যে, বাতাসের সুব্যবস্থা থাকলে মানুষের পক্ষে জলের তলায় অবস্থান করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। আর এ-ও জানেন, ডুবুরিরা টিউবের ভেতরে বাতাস নিয়ে জলের তলায় যায়। কিন্তু আমার জাহাজ নোটিলাসের কর্মচারীরা কাজ করার সময় মাথায় বিশেষ ধরনের টুপি ব্যবহার করে। আর তাদের প্রয়োজনীয় বাতাস সরবরাহ করা হয় যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পাম্প করে। ডুবুরিদের পক্ষে ইচ্ছানুযায়ী চলাফেরা করা সম্ভব নয়। কারণ বাতাসের টিউব তাদের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। তাই আমি সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির যন্ত্রপাতি এ কাজের জন্য ব্যবহার করি। লোহার পাতমোড়া একটা পাত্রে বাতাস ভরে ডুবুরিদের পিঠে বেঁধে দেই। ডুবুরিদের নাক ও মুখের সঙ্গে সংযুক্ত দুটো নল বাতাসের পাত্রটার গায়ে লাগানো থাকে। একটার কাজ পাত্র থেকে বাতাস ফুসফুসে চালান দেয়া আর দ্বিতীয়টা দিয়ে ফুসফুসের বাতাস বের করে দেয়া।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ক্যাপ্টেন, যদি কোনোক্রমে পাত্রের বাতাস ফুরিয়ে যায়, তখন?'

'আপনাকে তো বলেইছি অধ্যাপক, আমাদের নোটিলাসের পাম্প যন্ত্রগুলো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। প্রচুর পরিমাণে বাতাস সংরক্ষণও করে রাখতে পারে।'

'চমৎকার! বাতাসের ব্যবস্থা না হয় হল। কিন্তু আলো? আপনি কীভাবে আলো জ্বালেন?'

'রুমকর্ফ দিয়ে তৈরি একটা যন্ত্রের সাহায্যে। এর একটা থাকে কোরের সঙ্গে আর দ্বিতীয়টা আটকানো থাকে পিঠের সঙ্গে। আমি ব্রাইক্রোনেট অব পটাসের পরিবর্তে সোডিয়াম ব্যবহার করি। এতে সুবিধা হচ্ছে, লণ্ঠনের ভেতরে সামান্য কার্বোলিক গ্যাস থাকে। একটা তার দিয়ে লণ্ঠনটাতে বিদ্যুৎ নিয়ে আসা সম্ভব হয়। স্যুইচ টিপলেই লণ্ঠনের কার্বোলিক গ্যাস জ্বলতে থাকে।'

মুহূর্তের জন্য থেমে ক্যাপ্টেন নিমো আবার বলতে লাগলেন, 'এবার শুনুন জলের তলায় আমরা কোন ধরনের বন্দুক ব্যবহার করি। বলতে পারেন সেগুলো এক-একটা এয়ার গান। বারুদের পরিবর্তে বাতাস ব্যবহার করা হয়। আর এর গোলাগুলো কাচের তৈরি। ভেতরে থাকে সিসার গুলি আর বাইরের দিকে থাকে লোহার পাতলা প্রলেপ দেয়া। যতই অমিত শক্তিধর বা হিংস্র জন্তুই হোক না কেন এগুলির আঘাতে সে কাবু হতে বাধ্য।' কথা বলতে বলতে ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের নিয়ে জাহাজের অস্ত্রাগারে গেলেন। রবারের তৈরি পোশাক পরে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম। সবাই একটা করে এয়ারগান কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম। আর পিঠে বেঁধে নিলাম বাতাসের পাত্র। শিরস্ত্রাণে একটা বাতির ব্যবস্থা রইল।

www.pathagar.com

আমি ভাবলাম, এমন জবরদস্ত পোশাক পরে কী করে জাহাজের ছাদে যাব। কিন্তু মুহূর্তে আমার চিন্তা ভাবনার অবসান ঘটিয়ে আমাদের জাহাজটা ধীরে ধীরে নিচে নামতে লাগল। পর মুহূর্তেই দেখলাম, তীব্রবেগে জল ঢুকে পুরো ঘরটা কানায় কানায় ভরে গেছে। ব্যাপারটা সম্বন্ধে ধারণা করার আগেই আমি বুঝতে পারলাম, আমরা সমুদ্রের একেবারে তলদেশে, মাটিতে পা ঠেকে রয়েছে। সে মুহূর্তে আমার সে কী আনন্দ! বুকভরা আনন্দ নিয়ে আমি বালির ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলাম। আমার ওজন সামান্যতমও আছে বলে মনে হল না। আমি তখন ত্রিশ ফুট জলের তলায় অবস্থান করছি।

অদূরে কতসব নাম না জানা সুদৃশ্য গাছগাছালি দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। জলের এত গভীরে সূর্যরশ্মি পৌঁছোতে পারে ভেবে আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। শুধু কি এই? চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথর, ঝিনুক, শামুক আর লতাপাতার ওপর সূর্যের কিরণ পড়ায় এক অভূতপূর্ব মনোলোভা দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে, লক্ষ করলাম।

ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের আগে আগে পথ প্রদর্শকরূপে অগ্রসর হতে লাগলেন। একসময় অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'অধ্যাপক, ঐ-ঐ যে ক্রিস্পো দ্বীপ দেখা যাচ্ছে।'

সামান্য এগিয়ে আমরা ক্রিস্পো দ্বীপের জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। এখানে বিচিত্র সব গাছের সমাবেশ ঘটেছে। আরো অবাক হলাম খাড়াভাবে উঠে যাওয়া গাছগুলো দেখে। ডালপালা পর্যন্ত এদিকওদিক ছড়ানো নয়।

একটা ব্যাপার আমাকে আরো অবাক করল। এখানকার কোনো গাছেরই পাতা নেই। ডালপালা পর্যন্ত এদিকওদিক ছড়ানো নয়।

একটা ব্যাপার আমাকে আরো অবাক করল। এখানকার কোনো গাছেরই পাতা নেই। ডালপালা থেকে আঁকড়া গজায়।

আমরা আরো কিছুটা এগিয়ে ক্যাপ্টেন নিমোর নির্দেশে একটা অতিকায় থালারিগাছের তলায় দাঁড়ালাম। খুব ইচ্ছা করছিল কথাবার্তার মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে মনের ভাব আদান প্রদান করি। কিন্তু তা যে সম্ভব নয়।

গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে বিশ্রাম করতে করতে আমি কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বুঝতেই পারি নি।

ক্যাপ্টেন নিমোর ধাক্কায় ঘুম থেকে জেগে হুড়মুড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘাড় ঘুরাতেই চমকে উঠলাম। দেখি, অতিকায় একটা সামুদ্রিক মাকড়সা। সেটা ডিমের মতো চোখ দুটো মেলে পিট পিট করে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মাকড়সাটা বাস্তবিকই দানবাকৃতি। লম্বায় তিন ফুট তো হবেই। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছে, বুঝতে পারলাম। তবু ভরসা যে, সে আমার গায়ের ডুবুরির পোশাক ভেদ করে কামড়াতে পারবে না। তবু বিপদাশঙ্কায় আমার বুকের ভেতরে কামারের হাঁপর চলতে লাগল। বন্দুকে হাত দেবার মতো শক্তিটুকুও যেন আমার মধ্য থেকে নিঃশেষে উবে গেছে।

আমি যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় অথর্বের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছি ঠিক তখনই ক্যাপ্টেন নিমো বন্দুকের কুঁদো দিয়ে সজোরে দানবাকৃতি মাকড়সাটার গায়ে আঘাত হানলেন। প্রাণীটা যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে লম্বা-সুতীক্ষ্ণ নখযুক্ত থাবাগুলিকে মাটিতে বারবার আছাড় মারতে লাগল। ব্যস, সব শেষ। হিংস্র জানোয়ারটা এলিয়ে পড়ল।

www.pathagar.com

আমরা আবার ক্যাপ্টেন নিমোকে অনুসরণ করে সংকীর্ণ একটা উপত্যকায় হাজির হলাম। এখানে জলের গভীরতা প্রায় একশো পঞ্চাশ গজ। সমুদ্রের এত গভীরে সূর্যরশ্মির পক্ষে হানা দেওয়া সম্ভব নয়। ক্যাপ্টেন নিমো বৈদ্যুতিক আলো জ্বালতেই আমাদের সামনে সবকিছু ঝলমলিয়ে উঠল। আমিও বৈদ্যুতিক আলো জ্বেলে দিলাম।

অত্যুজ্জ্বল আলো দেখে কৌতূহলবশত কিছু প্রাণী গুহা থেকে বারবার উঁকি মারতে লাগল। তবে প্রাণনাশের ভয়ে এগোতে কারো আর সাহসে কুলিয়ে উঠল না। ব্যাপারটা চোখে পড়তেই ক্যাপ্টেন নিমো ঝট করে বন্দুকটা হাতে নিয়ে নিলেন। বলা তো যায় না, হিংস্র প্রাণীগুলো যদি আচমকা আমাদের আক্রমণ করে বসে।

চারঘণ্টা একনাগাড়ে পথ চলার পর আমাদের থামতে বললেন।

এবার আমাদের নোটিলাসে ফেরার পালা। ক্যাপ্টেন এবার একটা নতুন পথ ধরে আমাদের নিয়ে ফিরতে লাগলেন। খুবই খাড়াই সে পথ। হাঁটা রীতিমতো কষ্টসাধ্য। তাই কখনো সাঁতরে, আবার কখনো-বা পায়ে হেঁটে আমরা পথ পাড়ি দিতে লাগলাম।

একসময় লক্ষ করলাম, ক্যাপ্টেন নিমো বন্দুকটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরে লম্বা লম্বা পায়ে ঝোপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। মনে হল কিছু একটা দেখার ফলে তাঁর মধ্যে এমন ব্যস্ততা প্রকাশ পেয়েছে।

আচমকা বিকট আর্তনাদ করে ভয়ালদর্শন অতিকায় একটা প্রাণী অস্বাভাবিক যন্ত্রণায় দাপাদাপি করতে লাগল।

আমি দুরুদুরু বুকে সামান্য এগিয়ে কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে দেখি অতিকায় একটা সামুদ্রিক ভোঁদর। চতুষ্পদ। সামুদ্রিকপ্রাণীদের মধ্যে একমাত্র ভোঁদরই চতুষ্পদ। এদের বাদামি চামড়া দিয়ে চমৎকার কোট তৈরি করা যায়। তাই এরা মূল্যবান প্রাণী বিবেচিত হয়। তবে শিকারিদের লিপ্সার শিকার হয়ে বর্তমানে এরা পৃথিবী থেকে লোপ পেতে বসেছে।

মৃত ভোঁদরটাকে নিয়ে সামান্য এগিয়ে আমরা একটা বালির স্তূপে হাজির হলাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বন্দুকের গুলির শব্দ আমার বুকের মধ্যে নতুন করে কাঁপুনি শুরু করে দিল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। দেখি, অতিকায় এক সামুদ্রিক পাখি। গুলিবিদ্ধ। কাৎরাচ্ছে। আমার কানের কাছে মুখ এনে ক্যাপ্টেন নিমো মুচকি হেসে বললেন—'এর নাম অ্যালবেট্রেস। লম্বা ডানা মেলে উড়ে যেতে দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। গুলি করে ফেলে দিলাম।'

এবার অনবরত হেঁটে আমরা দুর্গম অ্যানজির জঙ্গল পেরিয়ে গেলাম।

আমি এদিকওদিক তাকাতে তাকাতে পথ পাড়ি দিয়ে চলেছি হঠাৎ কাঁধে আলতো চাপ অনুভব করলাম। ক্যাপ্টেন নিমো আমাকে ইশারায় বসে পড়তে বললেন।

ঝট করে বসে পড়লাম। অকস্মাৎ আমার বুকের ভেতরে হৃদপিণ্ডের লাফালাফি দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। বিপদাশঙ্কায় শরীরের স্নায়ুগুলো একসঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠল। চোখ দুটো নিশ্চিত মৃত্যুভয়ে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। এরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে জানলে আমি অন্তত ক্যাপ্টেন নিমোর প্রস্তাবে রাজি হতাম না। দু-দুটো অতিকায় হাঙরকে গ্রীবা বিস্তার করে দ্রুত এগোতে দেখলে এমন কোন বীরপুরুষ আছে যে নিজেকে শক্ত রাখতে পারে? আঁৎকে উঠে স্বগতোক্তি করলাম, 'হায় ঈশ্বর! এ কী সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ফেললে।'

www.pathagar.com

হাঙর দুটো গ্রীবা বিস্তার করে এগোচ্ছে তো এগোচ্ছেই। যাক, তবু রক্ষা। একঝাঁক রুপালি রঙের মাছ দেখে আচমকা গতিপথ পাল্টে বাঁদিকে এগোতে লাগল যমদূত দুটো। আমাদের প্রতি অশেষ করুণা প্রদর্শনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতেই হল।

আরো আধঘণ্টা হাঁটাহাটির পর আমাদের আশ্রয়স্থল নোটিলাসে পৌঁছাতে পারলাম।

পরদিন আঠারোই নভেম্বর। সকাল। আমি একাকী নোটিলাসের প্লাটফর্মের ওপরে দাঁড়িয়ে। একটু পরেই ক্যাপ্টেন নিমো সেখানে হাজির হলেন। তার সঙ্গে রয়েছে দুজন আফ্রিকান নাবিক।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আগের দিন যে জালগুলো সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল সেগুলো তোলার জন্য কৃষ্ণকায় গাট্টাগোট্টা নাবিক দুটো প্লাটফর্মে হাজির হয়েছে। জাল তোলা হল। বিভিন্ন রঙ ও আকৃতিবিশিষ্ট মাছগুলো আমার চোখ ও মনকে যারপরনাই অভিভূত করল। ব্যাঙের মতো অতিকায় কিছু মাছ আমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিস্ময় সৃষ্টি করল। ক্যাপ্টেন নিমো পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন—এগুলো 'ট্রিগার' ফিস। আর ওইগুলো 'ট্রিবিউরি'। সদ্য ধরা মাছগুলোকে রান্নাঘরে চালান দিয়ে দেয়া হল।

ক্যাপ্টেন নিমো এবার চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে একগাল ধোঁয়া ছাড়লেন। এবার মুচকি হেসে বললেন, 'অধ্যাপক অ্যারোনাক্স, সমুদ্রের বুকে দিন কাটাতে আপনার কেমন লাগছে বলুন তো! যত দিন যাচ্ছে ততই বিস্মিত হচ্ছেন, তাই না? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সমুদ্রের বুকের ভেতর দিয়ে চলাফেরা করা বাস্তবিকই এক অকল্পনীয় আনন্দময় ব্যাপার, স্বীকার করতেই হবে।'

আমি তাঁকে সমর্থন করতে গিয়ে বললাম, 'খুবই সত্য বটে। তবে দেখার মতো চোখ না থাকলে সমুদ্রজীবন দুঃসহ যন্ত্রণার কারণ হতে বাধ্য।'

'ভালো কথা, সমুদ্রের গভীরতা কত আপনার জানা আছে কি অধ্যাপক?'

'সমুদ্রের গভীরতা অবশ্যই সর্বত্র সমান নয়। স্থান বিশেষে এর গভীরতা বিভিন্ন। উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রের গভীরতা আট হাজার গজ, ভূমধ্যসাগরের গভীরতা ২,৫০০ গজ, দক্ষিণ আটলান্টিকের গভীরতা বারো হাজার গজ থেকে শুরু করে পনেরো হাজার গজ পর্যন্ত।'

'যদি তাই হয় তবে আমি আপনাকে প্রমাণ করে দেখাতে পারি, সমুদ্রের এ অঞ্চলের গভীরতা মাত্র চার হাজার গজ। চলুন, এবার সেলুনে গিয়ে একটু আয়েশ করে বসা যাক।

আমি ক্যাপ্টেন নিমোকে অনুসরণ করে সেলুনের দিকে এগিয়ে চললাম।

ক্যাপ্টেন নিমো আবার পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। একেবারে বেপাত্তা। একনাগাড়ে কয়েক সপ্তাহ তাঁর দেখা পাওয়া গেল না। তাঁর পুনরায় অন্তর্ধানে আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না।

সাতাশে নভেম্বর। সেদিন ক্যাপ্টেন আমাদের জানান নোটিলাস স্যান্ডউইচ দ্বীপের কাছাকাছি হাজির হল। এটা এ অঞ্চলের দ্বীপগুলোর মধ্যে বৃহত্তম।

নোটিলাসের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সের উচ্চতম পর্বত চূড়া হেভার মার্টিনের রূপ সৌন্দর্য আমার মনকে রীতিমতো দোলা দিল।

www.pathagar.com

এগারোই ডিসেম্বর। গবেষণার কাজে অত্যাবশ্যক কিছু কালসার মাছের বৈচিত্র্যময় আকৃতি ও দৃষ্টিনন্দন রঙ আমাকে মুগ্ধ করল।

বারোই ডিসেম্বর। প্রাতঃরাশ সেরে ক্যাপ্টেন নিমোর গ্রন্থাগারে বসে 'পাকস্থলীর মূল্য' নামক বইটার পাতায় চোখ ও মনকে আবদ্ধ রাখলাম। দুপুরের কাছাকাছি অকস্মাৎ কনসিলের ডাক শুনে দৌড়ে বাইরে গেলাম।

কনসিলের তর্জনি-নির্দেশিত পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই চমকে উঠলাম। দেখি, কালো মত বিশালাকৃতি একটা বস্তু পড়ে রয়েছে। আচমকা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল 'আরে ব্বাস! এ যে একটা জাহাজ! ভাঙা একটা জাহাজ পড়ে রয়েছে!'

নোটিলাস আরও কিছুটা এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল কয়েকটা ভাগ্যহত নারী-পুরুষের মৃতদেহ ভাঙা জাহাজটার বিভিন্ন অংশের সঙ্গে আটকে রয়েছে। মনটা যারপরনাই বিষিয়ে উঠল। যে মর্মান্তির দৃশ্য! কী অসহনীয় যে সে দৃশ্যটা তা ভাষায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আকস্মিক বিষাদ-আতঙ্কে মনপ্রাণ বিষিয়ে উঠল। আর একটা দৃশ্য আজও আমার বুকে ছবির মত গাঁথা রয়েছে। ক্যাপ্টেনের মৃতদেহ। তাঁর হাত দুটো দিয়ে চাকাটা তখনও শক্ত করে ধরে রাখা। নিঃসন্দেহ হলাম, শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি জাহাজটাকে রক্ষা করার জন্য মরিয়া হয়ে লড়াই করেছেন।

দেখলাম জাহাজের গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে, 'দ্য ফ্লোরিডো স্যান্ডার ল্যান্ড'।

জলের ভিতর দিয়ে পথ পাড়ি দিতে গিয়ে আরও এমন কিছু বীভৎস নরকীয় দৃশ্য নজরে পড়ল যা আজও আমাকে ব্যথিত মর্মাহত করে। অগণিত শিশু, নারী ও পুরুষের মৃতদেহ, কঙ্কাল, ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতি, কামান, নোঙর, লোহার শেকল এবং ছোট-বড় বহু বাক্স পেটরা চারদিকে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

এগারোই ডিসেম্বর। সেদিন আমরা পেরিয়ে এলাম প্রবাল নির্মিত পোটেসেটাই দ্বীপসমূহ।

আমাদের ডুবোজাহাজ নোটিলাস দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। এবার আমরা ক্যাপ্টেন নিমো কর্তৃক ১৮৬২ বাষট্টি সালে আবিষ্কৃত 'কারমন্টটনেরে' নামক সাগরে-ঘেরা সবুজে ঢাকা চমৎকার একটা দ্বীপকে পাশে রেখে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এখানকার জলের উষ্ণতা বড় জোর ১০—১২°। পনেরই ডিসেম্বর আমরা অতিক্রম করলাম রূপ-সৌন্দর্যের আকর 'তাহিতি' দ্বীপটা। লক্ষ করলাম, সমুদ্রের এ অঞ্চলে মাছ যেন কিলবিল করছে। শুধু মাছ আর মাছ।

১৬০৬ সালের কথা। সে বছর সমুদ্রপ্রেমী কুইবোস 'নিউহেব্রাউডিস' নামক বিশালায়তন দ্বীপটা আবিষ্কার করে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। আমাদের ডুবোজাহাজ পঁচিশে ডিসেম্বর ইতিহাস-বিখ্যাত এ দ্বীপটাকে পাশে রেখে দ্রুত এগিয়ে গেল।

সাতাশে ডিসেম্বর সকালে ক্যাপ্টেন নিমো আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমার চোখ দুটো তখন মানচিত্রের ওপর অলসভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে। ক্যাপটেন ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'অধ্যাপক, 'ড্যানিকোরা' দ্বীপের নাম অবশ্যই শুনে থাকবেন। ওই দেখুন, আমাদের নোটিলাস এখন 'ড্যানিকোরা' দ্বীপটাকে পাশে রেখে এগিয়ে চলেছে।

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন! আমি ওই দ্বীপটাকে ঘুরে দেখার সুযোগ পেতে পারি। ওর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বইতে পড়েছি বটে। এত কাছে এসেও যদি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারি তবে আমৃত্যু আপশোষ থেকে যাবে।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন মুচকি হেসে ইঞ্জিন ঘরের দিকে হাঁটলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারলাম আমাদের জলযানটা ড্যানিকোরা দ্বীপে ভিড়ছে।

দু-দুটো আগ্নেয়গিরি সম্বলিত দ্বীপ ড্যানিকোরা। চারদিকে চল্লিশ মাইল জুড়ে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন প্রবাল-প্রাচীর। পর্যটক ডুমন্ট ডি উরভিল এর নামকরণ করেছিলেন—'আইল দ্য রেচেচে'। সম্প্রতিকালে এ নামেই দ্বীপটাকে সবাই চেনে।

আমি ক্যাপ্টেন নিমোকে বললাম, 'আপনি হয়ত জানেনই, ডুমন্ট ডি উরভিল দ্বীপটাকে কেন্দ্র করে একটা সুন্দর কাহিনী রয়েছে।'

আমি এবার লা প্যারাউজের লিখিত কাহিনীটা সংক্ষেপে ব্যক্ত করলাম, '১৮৮৫ সালের কথা। সে বছর লা পেরাউজ এবং তাঁর সহকারী ক্যাপ্টেন ডে ল্যাংলের ডাক পড়ল রাজা ষোড়শ লুই-এর দরবারে। রাজামশাই জাহাজ ও প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে তাঁদের দুজনকে সমুদ্রযাত্রায় পাঠালেন। উদ্দেশ্য সমুদ্রের বুকে নিখোঁজ হওয়া দুটো জাহাজের খবর সংগ্রহ করে রাজার কাছে পৌঁছে দেয়া। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা জাহাজ নিয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ সাগর, মহাসাগর ও উপসাগর তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। বৃথা চেষ্টা। শেষপর্যন্ত ক্যাপ্টেন ডিলম এক প্রবীণ নাবিক লা পেরাউজের জাহাজের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পেলেন। আঠার শো চব্বিশের পনেরোই মে ক্যাপ্টেন ডিলম তাঁর প্রিয় জাহাজ সেন্ট পেট্রিকে চেপে টিকোপিয়াসে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক মাঝবয়সী লোকের কাছ থেকে রূপার একটা তরবারির হাতল কিনলেন। কথা প্রসঙ্গে লোকটা তাঁকে বলল, 'প্রায় ছয় বছর আগে ড্যানিকোরা দ্বীপে দুজন ইউরোপিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হয়। তাঁদের দুটো জাহাজ নাকি খাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগায় ধ্বংস হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন ডিলম ভাবলেন, তাঁরা নির্ঘাৎ লা পেরাউজের ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

ক্যাপ্টেন ডিলম মনস্থির করে ফেললেন তিনি যে করেই হোক ড্যানিকোরাতে গিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ দুটোর খোঁজ করবেন। কিন্তু বিধি বাম। প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব অগ্রাহ্য করে তাঁর পক্ষে সেখানে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হল না। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তাঁকে ফিরে যেতেই হল।

১৮২৭ সালে ক্যাপ্টেন ডিলম অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে কলিকাতাস্থ এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এ সংস্থার পক্ষ থেকে তিনি রোর্চেচ নামক একটা জাহাজ সাহায্যস্বরূপ পেলেন। এবার রোর্চেচ-এ চেপে তিনি ড্যানিকোরা-তে হাজির হলেন। সাধ্যাতীত কায়দা কসরতের মাধ্যমে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ দুটো থেকে একটা ব্রোঞ্জের ঘড়ি, লোহার বাসনপত্র এবং অন্যান্য কিছু দ্রব্য সামগ্রী উদ্ধার করতে পারলেন।

১৮২৮ সালের মাঝামাঝি তিনি ফ্রান্সে ফিরে রাজা দশম চার্লস-এর দরবারে উপস্থিত হলেন।

এদিকে ঘটে গেছে আর এক ঘটনা। ডুমন্ট ডি উরভিল ডিলমের অজ্ঞাতসারে জাহাজ দুটোর খোঁজ করতে রওনা হয়ে গেছেন।

ডিলম ড্যানিকোরা ছেড়ে যাওয়ার ছয় মাস বাদে ডুমন্ট ডি উরভিল সেখানে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে কিছু দিন অবস্থান করে ডিলমের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য অবগত হন।

এত কিছু সত্ত্বেও সব পরিশ্রম পণ্ডশ্রমে পরিণত হল। জাহাজটার খোঁজ পাওয়া তো দূরের ব্যাপার, সেটা কোথায় নিখোঁজ হয়েছে সে খোঁজও কারো কাছ থেকে পেলেন না। বরাত নেহাত মন্দ। হতাশ হয়েই তাকে সেখান থেকে ফিরে আসতে হল।'

www.pathagar.com

আমি ঘটনাটার এ পর্যন্ত বলে চুপ করলাম।

আমাকে থামতে দেখে ক্যাপ্টেন নিমো জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অধ্যাপক, আপনি কি তবে এটাই বলতে চাইছেন যে, তৃতীয় জাহাজটার ব্যাপারে কেউ-ই কিছু জানে না?'

'হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় নি।'

ক্যাপ্টেন প্রসঙ্গটাকে আর এগোতে না দিয়ে সেলুনের দিকে হাঁটতে লাগলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম।

ক্যাপ্টেন কাচের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বক্তব্য শুরু করলেন, 'অধ্যাপক, সেটা ছিল সতের শো পঁচাশির সতেরই ডিসেম্বর। লা বুসোল এবং অ্যাস্ট্রোরেল জাহাজ দুটো নিয়ে লা পেরাউজ যাত্রা করলেন। দুর্বার গতিতে অগ্রসর হবার সময় ড্যানিকোরা অজ্ঞাত খাঁড়িতে প্রথমে লা অ্যাস্ট্রোরেল এবং তারপর লা বুসোল অকস্মাৎ আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ব্যস, দু-দুটো জাহাজ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়। লা প্যারাউজ এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মী প্রাণে বেঁচে গেলেন। জাহাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার খবরটা অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারা লা প্যারাউজ আর তাঁর সহকর্মীদের অতিথি হিসেবে দ্বীপে নিয়ে যায়।

এবার লা প্যারাউজ তাঁর সহকর্মীদের সাহায্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ দুটোর কিছু ভাঙাচোরা অংশ জল থেকে উদ্ধার করলেন। এবার তিনি তাদের সাহায্য সহযোগিতায় জাহাজের অংশগুলো দিয়ে ছোট্ট একটা জাহাজ তৈরি করে ফেললেন। অদৃষ্টের ফেরে তাঁকে সে জাহাজটাও হারাতে হল।'

ক্যাপ্টেন নিমো এবার হাত বাড়িয়ে তাক থেকে ছোট্ট একটা টিনের বাক্স টেনে নিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তার গায়ে ফরাসি দেশের সিলমোহর দেখতে পেলাম।

আমি তাঁর হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে ডালা খুলতেই জীর্ণ একটা কাগজ ভেতর থেকে উঁকি মারল। তবে তার লেখা পাঠোদ্ধার করতে কিছুমাত্রও অসুবিধা হল না।

ক্যাপ্টেন নিটো বললেন, 'অধ্যাপক, এটা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আর ফ্রান্সের তৎকালীন নৌ-বিভাগের মন্ত্রী লা পেরাউজকে যেসব নির্দেশ দিয়েছিলেন সেসব কথা এতে লিখিত রয়েছে।' মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্যে কাটিয়ে এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—'অধ্যাপক, একজন নাবিকের পক্ষে এভাবে মৃত্যুবরণ সত্যই গৌরবের। প্রবাল স্তূপের সমাধির চেয়ে শান্তি আর কোথায়, আপনিই বলুন? আমার আর আমার সহকর্মীদের কাছে এরকম মৃত্যুর চেয়ে গৌরবের আর কী-ই-বা থাকতে পারে?'

১৮৬৮, ১ জানুয়ারি। ভোর হতে না হতেই কনসিল আমাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাল। আমি প্রত্যুত্তরে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। কনসিল বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে।

আমরা যাত্রা শুরু থেকে পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত ১১,৩৪০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছি।

সেদিন নাবিকরা বিচিত্র ধরনের কিছু মাছ ধরল। গার্মান মাছ। ডোরাকাটা নীলচে রঙবিশিষ্ট মাছ। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, মৃত্যু হওয়ামাত্র তাদের গায়ের ডোরাগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন নিমোর মুখে শুনলাম, তিনি এবার টোরেস প্রণালী দিয়ে ভারত মহাসাগরে যেতে চাচ্ছেন।

টোরেস প্রণালীতে অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপের বিচিত্র সমারোহ। যে-কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা। তাই ধীরমন্থর গতিতে, খুবই সাবধানতার সঙ্গে নোটিলাসকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। আবার এখানে প্রবাল প্রাচীরও মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কম সমস্যা সৃষ্টি করছে না।

আমি তখন গ্রন্থাগারে বসে একটা বইয়ের পাতায় অলস চোখের পাতা দুটোকে বুলোচ্ছি। ঠিক তখনই মনে হল প্রমাদ ঘটল বুঝি। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। খোঁজ নিয়ে জানত পারলাম অজ্ঞাত এক খাঁড়ির সঙ্গে আমাদের নোটিলাস-এর আচমকা সংঘর্ষ হয়েছে।

ক্যাপ্টেনকে তার একান্ত সহকারীর সঙ্গে কথা বলতে শুনলাম। তাঁর মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত হতে চলেছে। নোটিলাস আটকা পড়ে গেছে। পরিস্থিতি খুবই সঙ্গীন।

নোটিলাসের তেমন কিছু ক্ষতি হয় নি বটে, তবে বহু চেষ্টা চরিত্র করেও তাকে কিছুতেই ভাসানো সম্ভব হচ্ছে না। তাকে বের করে আনতে না পারলে চিরদিনের জন্য আমাদের আটকা পড়ে থাকতে হবে।

ক্যাপ্টেন নিমো ভাঙবেন তবু মচকাবার পাত্র নন। তার দৃঢ় বিশ্বাস পাঁচদিন পর পূর্ণিমা তিথিতে জোয়ারের সময় নোটিলাস আবার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পাবে।

কনসিলের মুখ আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। তার পালিয়ে যাবার আশা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছে।

আমরা তখন চমৎকার একটা দ্বীপের গায়ে অবস্থান করছি। সবুজ দ্বীপ। জানা-অজানা গাছের বিচিত্র সমারোহ।

পাপুই দ্বীপ। নোটিলাস থেকে বেরিয়ে দ্বীপে গিয়ে শিকার করার জন্য সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ক্যাপ্টেন নিমোর কাছে নেড-এর শিকারে যাবার অত্যুগ্র বাসনার কথা জানাতেই তিনি এক কথাতেই সম্মতি দিয়ে দিলেন।

ব্যস, আর দেরি নয়, আমি নেড আর কনসিলকে নিয়ে পাপুই দ্বীপে পদার্পণ করলাম। আমাদের সঙ্গে রয়েছে বন্দুক, কুঠার আর একটা বড়সড় ছোরা।

দ্বীপের মাটিতে পা দিয়েই নেড যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবার জোগাড় হল। এমনটা তো হবার কথাই বটে। কতদিন পর মাটির স্পর্শ পেল, ভাবা যায়! তার আনন্দ উচ্ছ্বাসের আরো কারণ রয়েছে। বহুদিন পর আজ মাংস খেতে পারবে। হরিণের ঝলসানো মাংস।

আমরা অফুরন্ত উৎসাহ উদ্যম নিয়ে বনের গভীরে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

কনসিল কাঠবিড়ালির মতো তরতর করে গাছে উঠে কিছু নারকেল পেড়ে নিয়ে এল। নারকেলের সুপেয় জল আর শাস আমাদের তৃপ্ত করল। আরও কিছুটা এগিয়ে রুটিফল গাছের প্রাচুর্য আমাদের বিস্মিত করল। মালয়ের অধিবাসীদের কাছে রুটিফল "রিমা" নামে পরিচিত।

নেড ঝটপট শুকনো ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বেলে রুটিফল দিয়ে উৎকৃষ্ট মুখরোচক খাদ্য তৈরি করে ফেলল। একটু বাদেই কনসিল বন্দুকের গুলিতে একটা সাদা পায়রা

www.pathagar.com

আর একটা বুনো পায়রা শিকার করল। নেড ব্যস্ত হাতে সে দুটোর পালক ছাড়িয়ে ঝলসে ফেলল। বহুদিন পর আমাদের জিভ মাংসের স্বাদ পেল। সবার চোখেমুখেই খুশি আর তৃপ্তির স্বাদ।

আমার বার্ড অব প্যারাডাইস শিকারের ইচ্ছা। কিন্তু নেড ছোঁক ছোঁক করতে লাগল কোনো চতুষ্পদ প্রাণী ঘায়েল করার জন্য।

নেড—হ্যাঁ, নেডই সুদৃশ্য একটা বার্ড অব প্যারাডাইস ভূপাতিত করে আমার শখ পূরণ করল। আমি আহত পাখিটাকে হাতে তুলে নিয়ে তার সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম। কী যে তার রূপের বাহার তা ভাষায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তিন ফুটের ওপর লম্বা জখম পাখিটা তার যন্ত্রণাকাতর চোখ দুটো মেলে করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমার মনটা অস্বাভাবিক রকম বিষিয়ে উঠল।

আমি যখন মৃত্যুপথযাত্রী বার্ড অব প্যারাডাইসটাকে হাতে নিয়ে তার সৌন্দর্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি ঠিক তখনই নেড একটা বিশালদেহী শূয়োর শিকার করে আমার সামনে হাজির হল। দুম করে সেটাকে কাঁধ থেকে মাটিতে ফেলল। কনসিল মুহূর্তমাত্র দেরি না করে তাকে ঝলসে নেয়ার কাজে মেতে উঠল।

নেড কিছুতেই দ্বীপটা ছেড়ে আসতে চায় না। কিন্তু নিরুপায়, নোটিলাসে ফিরে আসতে হবেই।

আমরা সবে নোটিলাসে ফেরার উদ্যোগ নিচ্ছি ঠিক সে মুহূর্তেই ঘটে গেল একেবারে অবিশ্বাস্য অঘটনটা। নেডের ঠিক পায়ের কাছে এসে পড়ল পাথরের টুকরোটা। আমরা রহস্যভেদ করার আগেই আরো একটা পাথরের টুকরো দুম করে করে আমাদের সামনে এসে পড়ল। অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় আমাদের বুকের ভেতর ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেল। আতঙ্কিত চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম।

আতঙ্কিত কনসিল কাঁপা-কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল, 'নির্ঘাত এ দ্বীপের অসভ্য অধিবাসীদের কাজ।'

আমরা তিনটি প্রাণী প্রাণরক্ষার তাগিদে উদ্ভ্রান্তের মতো তীরের দিকে ছুটতে লাগলাম। আমচকা জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে কয়েকটা অসভ্য জংলীকে ভূতের মতো এগিয়ে আসতে দেখলাম। সামান্য এগিয়ে তারা ঝোপের আড়াল থেকে অনবরত পাথর ছুড়তে লাগল।

আমরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে নৌকায় উঠে পড়লাম। ব্যস, নেড পাগলের মতো বৈঠা চালিয়ে নৌকাটাকে বিপদসীমার বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

অসভ্য জংলীগুলো কোমরজলে দাঁড়িয়ে বারবার দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে অবোধ্য ভাষায় চিল্লাচিল্লি করতে লাগল।

আমি তখনো মন থেকে আতঙ্কটুকু নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারি নি। দুরু দুরু বুকে ক্যাপ্টেন নিমোর কাছে অসভ্য দ্বীপবাসীদের ব্যাপারটা বলার জন্য সেলুনে হাজির হলাম। আমার মুখ থেকে সবকিছু শুনে ক্যাপ্টেন নিমো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'অধ্যাপক, আমরা যতই সভ্যতার বড়াই করি না কেন, পৃথিবীর বুকে আজও কোটি কোটি মানুষ পশুর মতো জীবন যাপন করছে। তারা কবে যে সভ্যভব্য হয়ে উন্নত জীবনের স্বাদ পাবে, কে জানে?'

www.pathagar.com

তার পরের দিন আটই জানুয়ারি। আমাদের জাহাজ তখনও পাপুই দ্বীপের কাছে আটকা পড়ে রয়েছে। আমি হাঁটতে হাঁটতে প্লাটফর্মে পা দিয়েই থমকে গেলাম। দেখি অসভ্য জংলী দ্বীপবাসীরা তকনও হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে বিস্ময়মাখানো দৃষ্টিতে আমাদের জাহাজটার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের দেহসৌষ্ঠব বাস্তবিকই লক্ষণীয়। মাথায় ঝাঁকড়া-কোঁকড়ানো চুল। গলায় হাড়ের টুকরোর মালা। আর কান ফুটো করে হাড়ের টুকরো গেঁথে রেখেছে।

গাট্টাগোট্টা একজন লোকা সামান্য এগিয়ে নোটিলাসের দিকে কৌতূহল মিশ্রিত রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। আমি ইচ্ছা করলে তাকে গুলি করতে পারতাম। কিন্তু সে কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখলাম। অবশ্য তারা যদি আক্রমণ করতে আসত তখন হয়ত আর নিজেকে সংযত রাখতে পারতাম না।

দুপুর একটা বাজল। জোয়ারের জল ক্রমে বাড়তে শুরু করল। অসভ্য জংলী দ্বীপবাসীদের পক্ষে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। তারা হুড়মুড় করে উঠে দ্বীপের জঙ্গলের ঢুকে গেল।

আমি তখনও নোটিলাসের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে দ্বীপটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলাম।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিল।

অসভ্য জংলী দ্বীপবাসীরা কয়েকটা ডোঙায় চেপে আমাদের নোটিলাসের দিকে এগোতে লাগল। তারা সংখ্যায় কম হলেও একশো তো হবেই। ব্যাপারটা দেখে আমি রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। তারা সবাই আমার দিকে তীর বাগিয়ে ধরে ক্রোধোন্মত্ত বাঘের মতো রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। তাদের চোখ-মুখের আদিম হিংস্রতার ছাপটুকু আমার নজর এড়াল না।

ব্যস, অসভ্য দ্বীপবাসীদের আক্রোশ চরম রূপ নিল। তারা উন্মাদের মতো আমাদের নোটিলাস-এর ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বর্ষণ করতে শুরু করল।

পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে আমি প্লাটফর্ম ছেড়ে ক্যাপ্টেন নিমোর খোঁজে সেলুনের দিকে ছুটলাম। দরজায় পা দিয়ে দেখি, তিনি বীজগণিতের পাতায় চোখ রেখে তন্ময় হয়ে বসে।

আমি আতঙ্কিত মুখে দরজায় দাঁড়িয়েই কাঁপা কাঁপা গলায় কোনোরকমে উচ্চারণ করলাম, 'ক্যাপ্টেন, একদল অসভ্য জংলী দ্বীপবাসী তীর-ধনুক নিয়ে আমাদের নোটিলাসের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে!'

আমার কথায় ক্যাপ্টেনের মধ্যে সামান্যতম ভাবান্তরও হল না। তাঁর কাছে এটা যেন নিছকই একটা সামান্য ব্যাপার। তিনি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে একটা বোতাম টিপলেন। এবার আমার দিকে ফিরে মুচকি হেসে বললেন, 'ও কিছু না। তবে আমাদের উচিত ছিল আগেই জাহাজে প্রবেশের মুখ বন্ধ করে দেয়া। এখন তারা তো সামান্য ব্যাপার অধ্যাপক, কামানের গোলাও লজ্জায় ফিরে যেতে বাধ্য হবে। ভাববেন না, আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

আমি আশ্বস্ত হয়ে সেখান থেকে ফেরার উদ্যোগ নিলে ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, 'অধ্যাপক, আগামীকাল দুপুর ঠিক তিনটে বাজতে কুড়ি মিনিট আগে টোরেস প্রণালী থেকে আমাদের জাহাজ যাত্রা করবে।' কথাটা শেষ করে তিনি আবার বইয়ের পাতার দিকে চোখ ফেরালেন।

www.pathagar.com

শিকারি নেডের কল্যাণে আমাদের নৈশভোজ ভালোই জমেছিল।

রাত্রে কেবিনে শুয়েও ক্রোধোন্মত্ত অসভ্য জংলী দ্বীপবাসীদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। আমরা তিনটি প্রাণী ছাড়া জাহাজের অন্য কারোর মধ্যেই দ্বীপবাসীদের ব্যাপার নিয়ে লেশমাত্রও আতঙ্ক লক্ষিত হল না।

সকাল হল। প্লাটফর্মে গিয়ে দ্বীপের দিকে নজর ফেরাতেই ক্রোধোন্মত্ত দ্বীপবাসীদের আস্ফালন নজরে পড়ল। ফলে কেবিনে শুয়ে বসেই দুপুর পর্যন্ত কাটিয়ে দিলাম।

আড়াইটার কাছাকাছি ক্যাপ্টেন নিমো আমার দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'অধ্যাপক, জোয়ার শুরু হয়ে গেছে। পূর্ব নির্ধারিত সময়েই আমাদের নোটিলাস টোরেস প্রণালী ছেড়ে এগিয়ে যাবে। আমি ঢাকনা খোলার অনুমতি দিয়ে এলাম।'

ঢাকনা খোলার কথাটা কানে যেতেই আমি যন্ত্রচালিতের মতো সোজা হয়ে বসে পড়লাম। চোখের তারায় আতঙ্কের ছাপ এঁকে বললাম, 'সে কি ঢাকনা খুললে ক্রোধোন্মত্ত অসভ্য জংলীগুলো—'

'হুড়মুড় করে জাহাজে ঢুকে পড়বে, তাই না?' তাচ্ছিল্যের হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলে ক্যাপ্টেন নিমো আমার দিকে কথাটা ছুড়ে দিলেন।

তাঁর কথাটা শেষ হতে না হতেই মৃদু শব্দ করে নোটিলাসের ঢাকনাটা খুলে গেল।

ব্যস, উত্তেজিত দ্বীপবাসীরা ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করতে করতে নোটিলাসের কাছে এগিয়ে এসে সিঁড়ির রেলিঙ ধরতেই বিকট আর্তনাদ করে কোন এক অদৃশ্য শক্তি বলে পিছন দিকে এক এক করে ছিটকে পড়তে লাগল। এক-এক করে সবাই একইভাবে আর্তনাদ করে জলে ছিটকে পড়ল।

রেলিঙে বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়োগ করা ছিল। তবে খুবই সামান্য পরিমাণে। ক্যাপ্টেন নিমো অবশ্যই তাদের নিধন করতে চান নি। অসভ্য জংলী দ্বীপবাসীদের আক্রমণের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই এরকম একটা অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

তিনটে বাজতে ঠিক কুড়ি মিনিট আগে আমাদের ডুবোজাহাজ নোটিলাস সামান্য দুলে উঠল। এবার টোরেস প্রণালীকে বিদায় জানিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম সমুদ্রের দিকে।

দশই জানুয়ারি অর্থাৎ তার পরের দিন। আমাদের নোটিলাস ঘন্টায় প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে পশ্চিমদিকে ছুটে চলল।

এগারোই জানুয়ারি। নোটিলাস তার চলা অব্যাহত রেখে কেপ ওয়েলস অতিক্রম করে গেল। এ অঞ্চলে অসংখ্য খাঁড়ি ছড়িয়ে রয়েছে।

তেরোই জানুয়ারি আমরা ট্রিমর সাগরে উপস্থিত হলাম। এবার নোটিলাস দক্ষিণ-পশ্চিম কোণা বরাবর ভারত মহাসাগরের দিকে ছুটে চলল।

ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, তিনি মনস্থ করেছেন উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে আন্টার্টিকার তুষার রাজ্যে যাবেন। সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে প্রশান্ত মহাসাগরের এ অংশেই নাকি আবার ফিরে আসবেন।

চৌদ্দই জানুয়ারি। আমরা এবার এক এক করে হাইবারনিয়া, কাটিয়েরও সেরিঙ্গাপট্টম প্রভৃতি বালুকাময় দ্বীপগুলো অতিক্রম করে যেতে লাগলাম। ক্যাপ্টেন নিমো নিবিষ্টমনে সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলের জলের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে চলেছেন।

www.pathagar.com

পনেরোই জানুয়ারি। দুপুরের আগে নোটিলাস থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। জলের সামান্য তলা দিয়ে যাবার সময় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গেছে। নাবিকরা মেরামতি কাজে লিপ্ত হল।

আমি সমুদ্রের ওপর চোখের মণি দুটো নিবদ্ধ রাখলাম। একসময় বিশেষ ধরনের রুপালি দ্যুতি আমার চোখ দুটোতে ধাঁধা লাগিয়ে দিল। প্রথমে ভাবলাম, নোটিলাস হঠাৎ করে বৈদ্যুতিক আলো সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে দিয়েছে। পর মুহূর্তেই আমার ভুল ভেঙে গেল। দেখলাম, একপ্রকার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রাণীর গা থেকে অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা নির্গত হয়ে সমুদ্রের জলে এমন অবিশ্বাস্য আলোর বন্যা বইয়ে দিয়েছে। ঠিক যেন গলিত সিসার স্রোত বয়ে চলেছে।

একটু বাদেই আরও অবাক হতে হল। প্রায় দশ-বারো ফুট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট সোর্ডফিস আর অতিকায় কয়েকটা শুশুককে সাঁতার কেটে এগিয়ে যেতে দেখলাম। সোর্ড ফিসের আগুনের মতো আলোকরশ্মি রয়েছে বটে, সেগুলো জ্বলে কিন্তু দহন করার ক্ষমতা নেই। আশ্চর্য! সমুদ্রের বুকে যে এমন আরও কত অত্যাশ্চর্য অবিশ্বাস্য ব্যাপার ছড়িয়ে রয়েছে, তাই বা কে জানে।

ষোলই জানুয়ারি আমাদের আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে এমন একটা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে গেল যা আমাদের মধ্যে যারপরনাই আতঙ্ক সঞ্চার করল।

বাতাসের চাপ হঠাৎ অস্বাভাবিক কমে গেল। নোটিলাস তখন ১৫০° দ্রাঘিমাংশ এবং ১৫° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থান করছে। আচমকা বাতাসের চাপ কমে যাওয়ায় সমুদ্র উত্তাল রূপ ধারণ করল।

ক্যাপ্টেন নিমোর মতো ধীরস্থির প্রকৃতির লোকের মধ্যেও ব্যস্ততা প্রকাশ পেল। তিনি দূরবীণের নলটা চোখে লাগিয়ে দিগন্তে পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত হলেন।

আচমকা দূরবীণটাকে চোখ থেকে নামিয়ে সহকারীর সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় দু-একটা কথা বলেই আমার দিকে একঝলক দৃষ্টিপাত করলেন। মুখে কিছুই বললেন না। পাশ কাটিয়ে দ্রুতবেগে সেখান থেকে চলে গেলেন।

ক্যাপ্টেন নিমো এবার জলের ওপর ঝুঁকে কী যেন খুঁজতে লাগলেন।

এবার ক্যাপ্টেন নিমোর সহকারী ব্যস্তপায়ে এগিয়ে এসে সমুদ্রের এক বিশেষ স্থানের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর চেষ্টা করলেন। অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে সেদিকে তাকিয়ে তিনি কী যেন দেখতে লাগলেন। একসময় আচমকা ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে টেলিস্কোপটা ছিনিয়ে নিয়ে চোখে লাগালেন। পর মুহূর্তেই সেটাকে চোখ থেকে সরিয়ে নিলেন। তাঁর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল। সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি কী যেন ভাবতে লাগলেন। তাঁর পায়ের কাছে আমার টেলিস্কোপটা পড়ে রইল।

কেন যে ক্যাপ্টেনের মধ্যে এমন আকস্মিক ক্রোধের সঞ্চার হল আমি ভেবে পেলাম না। ব্যাপার কী? তিনি কি ভেবেছেন, আমি তাঁর কোনো গোপন তথ্য জেনে ফেলেছি?

একসময় কিছুটা স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে ক্যাপ্টেন বেশ একটু গম্ভীর স্বরেই আমাকে বললেন—'অধ্যাপক অ্যারোনাক্স, একটা শর্তসম্বন্ধে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি খুশি হয়ে যতদিন আপনাদের মুক্তি না দেব ততদিন নির্দিষ্ট কামরায় আপনারা বন্দিজীবন যাপন করবেন, মনে থাকে যেন।'

আমি নীরবে ঘাড় কাৎ করলাম। চোখের ভাষায় তাকে বুঝিয়ে দিলাম, আপনিই আমার বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সবকিছু।

www.pathagar.com

নৈশভোজ সেরে বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি নিঃসন্দেহ হলাম, আমাদের বন্দি করেও ক্যাপ্টেন নিমো নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। তাই আমাদের খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যত বেশি সময় আমাদের ঘুমে আচ্ছন্ন করে রাখা যায় সেজন্যই এ-ব্যবস্থা।

পরের দিন দুপুরে আমি কলকব্জার ঘরে বসে আপন মনে কাগজপত্র গোছগাছে ব্যস্ত। এমন সময় ক্যাপ্টেন নিমো সেখানে এলেন। ভাবলাম, গত দিনের রহস্যটার ব্যাপারে তিনি নিজে থেকেই কিছু বলবেন। তাই আমি নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

না, ক্যাপ্টেন নিমো মোটেই মুখ খুললেন না। আমি আড়চোখে তার মুখের দিকে একঝলক তাকালাম। তার চোখ মুখের ক্লান্তি ও অবসাদের ছাপটুকু আমার চোখে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল।

সে সময় আমার দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, 'অধ্যাপক, আপনি কি চিকিৎসাবিদ্যা জানেন?'

সত্য বলতে কি এমন কোনো প্রশ্নের জন্য আমি একেবারেই তৈরি ছিলাম না। তবে এও সত্য যে, এক সময় আমি হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জেন এবং ডাক্তারের পদে নিযুক্ত ছিলাম।

আমি সামান্য ঘাড় কাৎ করে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিলাম। তিনি তার এক অসুস্থ নাবিককে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অনুরোধ করলেন।

রোগীকে আমার সামনে হাজির করা হল। এক নজর দেখেই মনে হল লোকটা অ্যাংলো-স্যাক্সন। তবে তেমন অসুস্থ নয়। আহত। মাথায় পট্টি বাঁধা। তাতে শুকনো রক্ত দেখা যাচ্ছে। পট্টিটা খুলতেই ভয়ঙ্কর একটা ক্ষত আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মাথার ঘিলু পর্যন্ত ঠিকড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নাড়ীর গতি খুবই ক্ষীণ। ক্রমেই শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। মৃত্যু আসন্ন।

আমি ক্যাপ্টেন নিমোকে প্রশ্ন করলাম, 'এতবড় আঘাত কীভাবে লাগল?'

আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'ওর অবস্থা কি বুঝছেন? খারাপ কোন আশঙ্কা করছেন কি?'

ক্ষণিক ইতস্ততের পর না বলে পারলাম না—'আর মাত্র দুতিন ঘণ্টার মধ্যেই—'

আমার কথাটা শেষ হবার আগেই তিনি বলে উঠলেন, 'অধ্যাপক, আপনি এখন যেতে পারেন।'

আমি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

পরের দিন সকালে ক্যাপ্টেন নিমো আমার কামরায় এলেন। তার চোখে মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি কোনোরকম সম্ভাষণ না করেই আমাকে বললেন, 'আমি সমুদ্রের তলদেশে যেতে চাইছি, আপনার পক্ষে আমার সঙ্গদান করা কি সম্ভব?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'আপনার আদেশ পালন করতে আমি এক পায়ে খাড়া। আপনার সঙ্গে যমের দক্ষিণ দুয়ারে যেতেও আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই ক্যাপ্টেন।'

ক্যাপ্টেন নিমোকে অনুসরণ করে জলের তলদেশে নামতে নামতে আমি প্রায় তিন শো গজ নিচে নেমে গেলাম। এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য এখানে লক্ষ করলাম। গাছগুলো সবই খনিজ পদার্থের রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আরও কিছুটা এগিয়ে ক্যাপ্টেন নিমো একজায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘাড় ঘোরাতেই নজরে পড়ল আমাদের পিছন

www.pathagar.com

পিছন একটা চৌকোণা বাক্স নিয়ে চারজন আসছে। আমি কেবল এটুকুই বুঝলাম, অচিরেই আমি কিছু একটা অদ্ভুত ঘটনার মুখোমুখি হব।

ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গীদের একজন কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল। ব্যাপারটা এবার আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। কবর খোঁড়া হচ্ছে। আর ওই বাক্সটায় সে হতভাগার মৃতদেহটা রয়েছে।

কবর খোঁড়ার কাজ সেরে শববাহকরা আবরণে আচ্ছাদিত মৃতদেহটাকে ধীরে ধীরে তার মধ্যে রেখে দিল। মাটিচাপা দিয়ে কবর দেওয়ার কাজ মিটিয়ে ফেলল। এবার সবাই কবরের সামনে হাটুগেড়ে বসে প্রার্থনা করল।

তারপর আমরা প্রবাল দ্বীপের পাশ দিয়ে নোটিলাস-এ ফিরে এলাম। ক্যাপ্টেন নিমোর বৈচিত্র্যময় জীবনের আর একটা দিক কবরস্থানে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করলাম।

ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে জানতে পারলাম, তিনি যে কেবল সমুদ্রের বুকে স্বেচ্ছা নির্বাসন জীবন যাপন করছেন তাই নয়, বিশ্রাম গ্রহণও তাঁর আর একটা উদ্দেশ্য।

চব্বিশে জানুয়ারি। নোটিলাস জলের তলায় যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা তখন ভারত মহাসাগরের বুকে অবস্থান করছি।

প্রায় তিন শো থেকে ছয় শো ফুট জলের তলা দিয়ে নোটিলাস এগিয়ে যেতে লাগল। এ অবস্থায় আমরা কয়েকটা দিন অতিবাহিত করলাম। এ অঞ্চলে ভারী সুন্দর অ্যালবেট্রস ও শঙ্খচিল আমার চোখ ও মনকে যারপরনাই আনন্দ দিল। অ্যালবেট্রস অনেকটা গাধার ডাকের মতো সুর করে থেকে থেকে চিল্লিয়ে ওঠে। আর দেখলাম, লাল ডোরাকাটা প্রচুরসংখ্যক পায়রার মতো ফিটন পাখি। আর্মাডিলো মাছগুলো কচ্ছপের মতো খোলসের ভেতরে থাকে। তবে আবরণটা খড়ি বা পাথরের মত নয়। প্রকৃত হাড় দিয়ে গঠিত। আর চিটোভন মাছও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এদের গঠন বৈচিত্র্যের মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় মুখের দুপাশের শুঁড় দুটো। এদের শিকার ধরার কাজে ব্যবহার করে। আবার বন্দুকের গুলির মতো অত্যাশ্চর্যভাবে জল ছুঁড়তেও এরা ওস্তাদ।

একুশ থেকে তেইশে জানুয়ারি নোটিলাস চার শো পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করে ফেলল।

চব্বিশে জানুয়ারি নোটিলাস কীলিং দ্বীপকে পাশে রেখে এগিয়ে চলল।

কিলিং দ্বীপের এলাকা ছাড়িয়ে নোটিলাসের গতি অনেকাংশে মন্থর করে দেওয়া হল।

পঁচিশে জানুয়ারি নোটিলাস ধীর মন্থরগতিতে এগিয়ে যাওয়ার সময় একঝাঁক আরগোনটস দেখে আমি ও কনসিল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লাম। এরা শামুক জাতীয় প্রাণী। লম্বা শুঁড় দিয়ে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে কয়েক শো আরগোনটস সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে লাগল। প্রত্যেকের আটটা করে শুঁড়। এদের মধ্যে দুটোকে ইচ্ছানুযায়ী এদিক ওদিক চালাতে পারে। দৈর্ঘ কমাতে-বাড়াতেও পারে।

পরের দিন ছাব্বিশে জানুয়ারি। আমরা এবার উত্তর গোলার্ধে প্রবেশ করলাম। এখানে বসে আমরা ভয়াল দর্শন ও ভয়ঙ্কর প্রকৃতিবিশিষ্ট হাঙরের মুখোমুখি হলাম। এরা সমুদ্রের আতঙ্ক হিসাবে বিবেচিত হয়। আর বংশবৃদ্ধিও খুবই দ্রুত হয়। সেসট্রাশি ও ফিলিস্ট গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এরা। এদের পিঠ গাঢ় খয়েরী, পেটের দিকটা সাদা আর গলায়

www.pathagar.com

কালো দাগের চারদিকে সাদা দাগ থাকে। একটা ব্যাপার ভাবলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। এদের মুখে এগারো সারি লম্বা লম্বা দাঁত।

দানবাকৃতি অমিতশক্তিধর প্রাণীগুলো প্রচণ্ড আক্রোশে বার বার নোটিলাসের গায়ে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। হাতের নাগালের মধ্যে এতগুলো হাঙর পেয়ে হারপুনবির নেডের আঙুলগুলো রীতিমতো নিসপিস করতে লাগল।

সাতাশে জানুয়ারি। সেদিন ভোর হতে না হতেই বঙ্গোপসাগরে ঢোকার মুখে অনেকগুলো মৃতদেহ জলে ভেসে যেতে দেখে চমকে উঠলাম। অদৃষ্ট বিড়ম্বিত ভারতীয় গ্রামবাসীদের মৃতদেহ ওগুলো। গঙ্গা দিয়ে ভেসে সমুদ্রে এসে পড়েছে। মনে হল এখনও শকুনের শ্যেনদৃষ্টিতে পড়ে নি।

সন্ধ্যা সাতটার কাছাকাছি কনসিল। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আমাকে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই আমার চোখ দুটোও সমুদ্রের ওপর স্থির হয়ে গেল। দেখি সমুদ্রের জল দুধের মতো সাদা। অ্যামবয়নার উপকূলবর্তী অঞ্চলেও এরকম দৃশ্য নজরে পড়ে। ইনফিউসেরিয়া নামক অসংখ্য পোকা একত্রিত হয়ে সমুদ্রের জলকে এমন করে তোলে। এরা এক একটা এতই ক্ষুদ্র যে, এক ইঞ্চির হাজার ভাগেরও কম। কখনও দেখা যায় এরা চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল এলাকা ঢেকে ফেলে।

আঠাশে জানুয়ারি। সকালে আমাদের নোটিলাস সমুদ্রের জলের ওপর ভেসে ওঠায় বুঝলাম, আমরা সিংহল দ্বীপের দিকে এগোচ্ছি।

বিকালের দিকে ক্যাপ্টেন নিমো আর তাঁর সহকর্মীদের দর্শন মিলল। তিনি তাঁর সহকারীকে নির্দেশ দিলেন, মান্নার উপসাগরের দিকে নোটিলাসের মুখ ঘুরাতে। মানচিত্রের ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, 'অধ্যাপক, মুক্তো সংগ্রহের ব্যাপারটা তেমন জটিল কাজ নয়। তবে মুক্তো সংগ্রহের সময় এখনও হয়নি। কিন্তু মনের সাধ মিটিয়ে হাঙর শিকার করা যাবে। তাই জাহাজের মুখ ঘুরাতে বলেছি।'

হাঙর শিকারের লোভটা আমার মনকে রীতিমতো চঞ্চল করে তুলল। ভারতবর্ষের জঙ্গলে বাঘ আর সুইজারল্যাণ্ডের জঙ্গলে ভল্লুক শিকার করা একই ব্যাপার। কিন্তু হাঙর শিকার করতে নামার আগে একবার ভেবে নেওয়া দরকার। হাঙরের সঙ্গে জলে ছুটোছুটি ও বারবার ওঠানামা করতে হয়। তখনই বুঝা যায় হাঙর শিকার কী কঠিন সমস্যা। জলে তারা অমিত শক্তিধর। মানুষের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি শক্তি—আমার ভালোই জানা আছে।

আন্দামানের অসভ্য জানোয়ারা একহাতে সুতীক্ষ্ণ ছোরা আর অন্য হাতে দড়ির ফাঁস নিয়ে হাঙরের সঙ্গে লড়াই করতে যায়। তাদের খুব কম সংখ্যই প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারে।

আমি কনসিল আর নেডকে মুক্তো সম্বন্ধে বুঝাতে গিয়ে বললাম, 'মুক্তো এক একজনের কাছে এক এক রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে। কবির দৃষ্টিতে একটা মুক্তো এক বিন্দু চোখের জল, প্রাচ্যের মানুষরা একে শিশির বিন্দুর সঙ্গে তুলনা করে, নারীরা রত্ন নাম দিয়ে হাতে কানে গলার গহনায় ব্যবহার করে।

বৈজ্ঞানিকদের কাছে মুক্তো ফসফেট এবং কার্বোনেট অব লাইমের মিশ্রণমাত্র। আর আমাদের মত বৈজ্ঞানিকরা বলেন, বিশেষ একপ্রকার ক্ষরিত রসই মুক্তো। সে যাই হোক,

www.pathagar.com

শোনা গেছে,একবার নাকি একটা ঝিনুক ভেঙে একশো পঞ্চাশটা মুক্তো বের করা হয়েছিল।

ঝিনুক থেকে মুক্তো বের করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, সমুদ্রের পাড়ে মাদুর বিছিয়ে ঝিনুকগুলো উপুড় করে রাখা। খোলা-বাতাসের সংস্পর্শে তারা মারা যায়। দশ-বারোদিন পরে তারা পচতে থাকে। এবার তাদের সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে রাখা যায়। তারপর খোসা ছাড়িয়ে ঝিনুকের ভেতরের অংশটা সিদ্ধ করা হয়। এবার সতর্কতার সঙ্গে ছেঁকে নেয়া হয় যাতে মুক্তো বাইরে বেরোতে না পারে।

পরের দিন সকালে আমরা ডুবুরির পোশাক গায়ে চাপিয়ে ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে প্লাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালাম। ডাঙার দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম, নোটিলাস সিংহল দ্বীপের পশ্চিমে অবস্থান করছে। প্রায় কুড়ি মাইল এলাকা জুড়ে অফুরন্ত মুক্তো মেলে।

আমাদের নৌকো দ্বীপটার তীরের কাছাকাছি গেল। ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, 'অধ্যাপক, ডুবুরিরা সমুদ্রের জলে হাতড়ে হাতড়ে মুক্তো সন্ধান করে।'

এবার বাতাসের যন্ত্রটা পিঠে ঝুলিয়ে নিলাম। গলা পর্যন্ত রবারের পোশাক তো আগেই পরে নিয়েছি। আমি জলের তলায় আলো পাওয়ার জন্য রুমকর্ক যন্ত্রটার দিকে হাত বাড়াতেই ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, আমরা এমন কোন গভীর জলে যাব না যেখানে সূর্যের আলো প্রবেশাধিকার পায় না। আরও বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে, তার অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মি স্থানীয় অধিবাসীদের নজরে পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। তারা এমন হিংস্র যে, যে-কোনো সময় বিষমাখা তীর ছুঁড়ে প্রাণহানি ঘটাতে পারে। অতএব আলো জ্বালার পরিণাম শুভ না হওয়ারই কথা।

ক্যাপ্টেন আমার হাতে বন্দুকের পরিবর্তে একটা ছোরা তুলে দিলেন। মুচকি হেসে তিনি বললেন—'সিসার চেয়ে ইস্পাতের ক্ষমতা অনেক গুণ বেশি।'

ক্যাপ্টেনের ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র অবিশ্বাস্য উপায়ে একটা সমুদ্রের ঢেউ আচমকা এগিয়ে এসে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

সামান্য যেতেই অকস্মাৎ একটা গুহা আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। ক্যাপ্টেন নিমো তার ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমরাও এক এক করে তাঁকে অনুসরণ করলাম। এবার বুঝলাম, খাড়া উৎরাই বেয়ে আমরা একটা গোলাকার গর্তের ভেতরে নেমে গেছি। ক্যাপ্টেন নিমোর তর্জনি-নির্দেশিত পথে চোখ ফেরাতেই অতিকায় একটা ঝিনুক চোখে পড়ল। সেটার প্রস্থ আড়াই গজেরও বেশি। এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম, একটা গ্রানাইট পাথরের ওপরে এবং পরবর্তীতে গুহার জলে ক্রমে আয়তনে বেড়ে উঠেছে। অনুমানে বুঝতে পারলাম, সেটার ওজন দুশো পাউন্ডের কম নয়।

ক্যাপ্টেন নিমোর কথায় বুঝলাম, ঝিনুকটার অস্তিত্বের কথা ক্যাপ্টেন নিমো আগেই জ্ঞান ছিলেন।

ক্যাপ্টেন নিমো সেটার ডালা দুটো সামান্য ফাঁক করে তাতে হাতের ছোরাটা ঢুকিয়ে দিলেন, যাতে বন্ধ হয়ে না যায়।

আমি উপুড় হয়ে উঁকি দিতেই ঝিনুকটার ফাঁক দিয়ে প্রায় নারকেলের সমান গোলাকার একটা মুক্তো স্পষ্ট চোখে পড়ল। তার অত্যুজ্জ্বল কিরণচ্ছটা জানান দিচ্ছিল, অমূল্য একটা রত্ন।

অকস্মাৎ ক্যাপ্টেন নিমো হেঁচকা টানে হাতের ছোরাটাকে বের করে নিলেন। বুঝতে অসুবিধা হল না। গুহাটার গোপন অন্তরালে ঝিনুকটা আরও বেড়ে উঠুক, তাঁর ইচ্ছা।

www.pathagar.com

ঝিনুকটার গা থেকে বছর বছর রস ক্ষরিত হলে মুক্তোটার আকৃতি ক্রমেই বাড়তে থাকবে। আমার বিশ্বাস, সেটার তখনকার দামই কম সে কম পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড।

আরো মিনিট দশেক গুহাটার ভেতরে কাটিয়ে আমরা বেরোবার জন্য তার মুখে আসতেই ক্যাপ্টেন নিমো থমকে গেলেন। ইশারা করে আমাদের বসতে নির্দেশ করলেন। ফাটলের ধারে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতে বললেন। অতিকায় একটা ছায়া চোখে পড়তেই বুঝতে পারলাম, ক্যাপ্টেন নিমো কেন আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন। প্রথমে ভাবলাম, সেটা হাঙরের ছায়া। বসে, আমার কাঁধের কাছ থেকে একটা হিমেল স্রোত সোজা নিচে নেমে এল। বুকের ভেতরে ধড়াস ধড়াস শুরু হয়ে গেল। আর শরীরের স্নায়ুগুলো ক্রমে শিথিল হয়ে আসতে লাগল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমার ভুল ভেঙে গেল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, সেটা হাঙর তো নয়ই অন্য কোনো সামুদ্রিকপ্রাণীও নয়—একজন ভারতীয় জেলে। মুক্তোর লোভে সমুদ্রে হানা দিয়েছে। তার পা দুটোর ফাঁকে একটা পাথর বাঁধা। আর একটা লম্বা দড়ির সাহায্যে নৌকার সঙ্গে দেহের সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। ঝিনুক কুড়িয়ে কুড়িয়ে সে কোমরে বাঁধা একটা ঝোলায় ঢুকিয়ে দিতে লাগল।

ডুবুরিটা আমাদের দেখতে পায় নি। দেখলেও ধরে নিত তারই মতো কেউ ঝিনুক কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ঝোলাটা বোঝাই হলেই ওপরে গিয়ে ঝিনুকগুলো নৌকোয় ঢেলে রেখে আবার ফিরে আসতে লাগল। রাশিরাশি ঝিনুক সে কুড়িয়েছে বটে। কিন্তু তাদের কটার মধ্যেই বা মুক্তো আছে? হয়ত বা একটাতেও না। তবুও পেটের তাগিদে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সমুদ্রের তলায় ঘোরা ফেরা তাকে করতেই হয়।

একসময় দেখলাম, লোকটা ব্যস্ত হয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। পর মুহূর্তেই একটা অতিকায় ছায়া নজরে পড়ল। দানবাকৃতি একটা হাঙর। বিশালাকৃতি গ্রীবা বিস্তার করে দ্রুত তার দিকে ধেয়ে আসতে দেখা গেল। হিংস্র প্রাণীটার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সে ঝট করে শুয়ে পড়ল।

বুদ্ধিটা কাজে লাগল না। হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণীটা লেজ দিয়ে সজোরে তার গায়ে আঘাত হানল। তার পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে ক্যাপ্টেন নিমো হাতের ছোরাটাকে শক্ত করে ধরে বিদ্যুৎগতিতে তার দিকে ছুটে গেলেন। ক্রোধোন্মত্ত হাঙরটা তখন সুতীক্ষ্ণ দাঁতগুলি দিয়ে হতভাগাটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেয়ার জন্য তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হতেই ক্যাপ্টেন নিমো নরমাংসলোভী হিংস্র প্রাণীটার গায়ে ছোরাটা আমূল গেঁথে দিলেন। ব্যস্, ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। সমুদ্রের জল লাল হয়ে উঠল। শুরু হয়ে গেল হিংস্র প্রাণী আর মানুষের মরাবাঁচার লড়াই। অচিরেই ক্যাপ্টেন নিমোর অভিজ্ঞ হাতের ছোরাটা হাঙরটার এক পাশের ডানার তলায় আবার গেঁথে গেল। হাঙরটার দাপাদাপি লেজের এক ঝটকায় ক্যাপ্টেন নিমো মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি তাঁকে সাহায্য করতে গিয়ে আর্তনাদ করার চেষ্টা করলাম—আমার একটা পা পাথরের ফাটলে আটকে গেছে। হাঙরটা আমার দুরবস্থার ব্যাপারটা হয়ত বুঝতে পেরেছে। ক্যাপ্টেন থেকে আমি তার কাছাকাছি হওয়ায় সে গ্রীবা বিস্তার করে ফুঁসতে ফুঁসতে আমার দিকে ধেয়ে এল। ঠিক সে মুহূর্তেই নেড বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে তার গায়ে হাতের ছোরাটা গেঁথে না দিলে সে নির্ঘাৎ আমার মাংসেই জীবনের শেষ ভোজ সেরে তবে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করত।

www.pathagar.com

আমরা যখন অক্ষত দেহে নোটিলাসে পৌঁছলাম তখন সাড়ে আটটা বাজতে চলেছে।

মান্নানের তীরে যে ক্যাপ্টেন নিমোকে আমি দেখলাম তাতে একটা ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি মনুষ্যসমাজ ছেড়ে সমুদ্রে সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছেন সত্য বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর স্নেহ-মায়া-মমতা কী গভীর। হৃদয়বৃত্তিটাকে তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি বলেই তো নিজের জীবনের মায়া তুচ্ছ করে হিংস্র হাঙরটার কবল থেকে ডুবুরিটাকে রক্ষা করার জন্য ছুটে যেতে উৎসাহী হয়েছিলেন।

* * *

উনত্রিশে জানুয়ারি। আমরা ক্রমে সিংহল থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। একসময় দ্বীপটা আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

নোটিলাস এবার কিলটার দ্বীপের গা দিয়ে সোজা এগিয়ে চলল। ভাস্কো-ডা-গামা চৌদ্দ শো নিরানব্বইয়ে এ দ্বীপটাকে আবিষ্কার করেছিলেন।

আমরা জাপান থেকে সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ করার পর এ পর্যন্ত মোট ষোল হাজার দুশো কুড়ি মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি।

ত্রিশে জানুয়ারি। আমাদের জলযান নোটিলাস আরব এবং ভারতের মধ্যবর্তী সমুদ্র দিয়ে ওমানের দিকে ছুটে চলছিল।

আশ্চর্য ব্যাপার! ক্যাপ্টেন নিমো যে আমাদের কোথায়, কোনদিকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন তা কিছুতেই আমার মাথায় আসছিল না। পারস্য উপসাগর থেকে তো বেরোবার কোনো পথ নেই। পারস্য উপসাগরের পর বাবেলমণ্ড প্রণালী দিয়ে অবশ্য লোহিত সাগরে হাজির হওয়া যায়।

তেসরা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অর্থাৎ পুরো চারটা দিন ধরে বিভিন্ন গতিপথ ধরে ও গভীরতায় নোটিলাস ওমান সাগরের জল তোলপাড় করে ফেলল। কিন্তু কর্কটক্রান্তি পেরিয়ে আসা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না।

শেষপর্যন্ত পাঁচই ফেব্রুয়ারি এডেনে উপস্থিত হতে পারলাম।

পরের দিন ছয়ই ফেব্রুয়ারি। নোটিলাস এডেনের কাছাকাছি একটা পাথরের ওপরে উঠে গেল। দুর্গ। আঠার শো উনচল্লিশে ইংরেজরা এটা তৈরি করেছিল।

সাতই ফেব্রুয়ারি। নোটিলাস বাবেলমণ্ডের প্রণালীতে প্রবেশ করল। এর দৈর্ঘ বত্রিশ মাইল আর প্রস্থ কুড়ি মাইল। নোটিলাসকে এবার জলের তলদেশ দিয়ে কিছুটা পথ অতিক্রম করতে হল। কারণ, বোম্বাই, কলকাতা ও মেলবোর্নগামী বহু জাহাজ ও স্টিমার বন্দরে নোঙর করে অবস্থান করছিল।

আটই মার্চ। আমরা লোহিত সাগর দিয়ে যাবার সময় অধুনালুপ্ত মোচা শহরটাকে একঝলক দেখে নিলাম। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এখনও কেবল দু-একটা প্রাচীর নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

নোটিলাস এবার আফ্রিকার দিকে ছুটতে লাগল।

নয়ই ফেব্রুয়ারি নোটিলাস পূর্বদিকে কুমফিদা আর পশ্চিমদিকে সৌযাকিন উপকূল রেখে এগিয়ে চলল। সত্য বলতে কি নোটিলাস যে কেবল উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্র পাড়ি দেয়ার পক্ষেই উপযোগী তা-ই নয়, যথেষ্ট নির্ভরযোগ্যও অবশ্যই।

www.pathagar.com

প্রাচীনকালেও ঝড়ঝঞ্ঝার ব্যাপারে লোহিত সাগরের খুবই অখ্যাতি ছিল। লাতিন এবং গ্রিক ঐতিহাসিকদের কেউ-ই এর যশগান করেন নি। আরবি ঐতিহাসিক এর্দ্রিসি আর স্ট্র্যাবো উভয়েই এর অখ্যাতি করতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, ঝড়ের কবলে পড়ে এখানে বহু জাহাজ ধ্বংস হয়েছে। আর রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে কেউই এখানে জাহাজ চালাতে সাহস করে না। আগাথার সুইডিস, আর্টেস ডোরাস ও আরিয়ান প্রমুখরাও একই মত পোষণ করতেন। এসব থেকে বোঝা যাচ্ছে, ওইসব ঐতিহাসিক বা অন্য কোনো সমুদ্রযাত্রীই ডুবোজাহাজে চেপে লোহিত সাগর অতিক্রম করার সুযোগ পান নি।

প্রসঙ্গক্রমে ক্যাপ্টেন নিমো মুচকি হেসে বললেন, 'অধ্যাপক, কথাটা খুবই সত্য বটে। আধুনিক জাহাজও তো উন্নত হতে হতে বহুদিন বাদে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। বাষ্পের আবিষ্কার হতেই তো কয়েক যুগ পেরিয়ে গেছে। অতএব আর একটা নোটিলাস তৈরি করতে আরও একশো বছর পেরিয়ে যাবে, ঠিক কি না? আর মানুষের অগ্রগতি ঘটেছে খুবই ঢিমে তালে।'

আমি মুচকি হেসে ঘাড় কাৎ করে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলাম, 'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ক্যাপ্টেন, একটা প্রশ্ন করছি, সমুদ্রের সঙ্গে আপনার পরিচয় তো দীর্ঘদিনের। লোহিত সাগর নামের উৎস আপনার জানা আছে কি?'

'হ্যাঁ, আছে। অনেক ঐতিহাসিকই এ ব্যাপারে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেছেন বটে। তবে এখন আপনাকে চতুর্দশ শতাব্দীর এক ঐতিহাসিকেদর মতামতের কথা বলছি। যদিও তিনি কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, তবু বলছি। তিনি বলেন, মিশরের ফ্যারাও যখন মুশাকে তাড়া করে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন মুশাক নির্দেশে সমুদ্র উত্তাল উদ্দাম রূপ ধারণ করে ফ্যারাও ও তার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তখন থেকেই এর নামকরণ করা হয় 'রেডসি' বা 'লোহিত সাগর।'

'এটা তো নিছকই একটা কল্পনাপ্রবণ মনের ব্যাখ্যা। এ ব্যাপারে আপনার মত কি ক্যাপ্টেন?'

'আমার বিশ্বাস, এ নামটা প্রাচীন হিব্রু শব্দ 'অ্যাডস' থেকেই উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীনকালের মানুষ সমুদ্রটাকে জলরাশির রঙের বিশেষত্বের দিকটা বিবেচনা করেই এরকম নামকরণ করেছেন। আর একটু এগিয়ে গেলেই রঙের বিশেষত্বের ব্যাপারটা আপনার চোখেও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে অধ্যাপক। আর এখানকার জল লাল রঙ বিশিষ্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে, এখানকার জলে এক প্রকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র লাল রঙের প্রাণী বিদ্যমান। তারা অসংখ্য অগণিত। খালি চোখে রঙ ছাড়া তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব
.'

ক্যাপ্টেন, মুশা ও ফ্যারাও যে পথ ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন লোহিত সাগরের বুকে কোন নিদর্শন আপনার চোখে পড়েছে কি?'

া। সে পথটা এখন বালিচাপা পড়ে গেছে। সে পথে নোটিলাসকে নিয়ে যাওয়া নয়। আশা করি বুঝতেই পারছেন অধ্যাপক?' ক্যাপ্টেন নিমো এবার লেন—আগামী পরশুর মধ্যে পোর্ট সৈয়দের ধার দিয়ে যাব। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও সুয়েজের ভেতর দিয়ে আপনাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না, কারণ, তার তলদেশে একটা ভূগর্ভস্থ রয়েছে।

www.pathagar.com

আমাদের নোটিলাস এবার আরবের তীরভূমির দিকে এগিয়ে চলেছে।

পরের দিন, দশই ফেব্রুয়ারি সমুদ্রের বুকে অকস্মাৎ কি যেন একটা লম্বাকৃতি বস্তু দেখতে পেলাম। নোটিলাস থেকে এখন তার দূরত্ব এক মাইলেরও কম ছিল। গোড়াতে আমি সেটাকে একটা বালুতট ভেবেছিলাম। একটু বাদেই আমার ভুল ভাঙল। প্রকৃতপক্ষে সেটা একটা ডিউগং। অতিকায় সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী।

ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, 'ডিউগং শিকার করা বাস্তবিক কঠিন সমস্যা। তারা অতর্কিতে শিকারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর নৌকা ডুবিয়ে দেয়া তাদের পক্ষে কোনো সমস্যাই নয়।'

আমরা নৌকা নিয়ে ডিউগংটার দিকে ধীরগতিতে এগিয়ে যেতে লাগলাম। নেড হারপুন হাতে নৌকার গলুইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে। সেটার সঙ্গে কুড়ি ফুট লম্বা শক্ত দড়ি বাঁধা।

অতিকায় দানবটার মুখের দুই ধারে হাতির মত লম্বা দুটো দাঁত ঝকঝক করতে লাগল। আর সে নিজে চল্লিশ ফুট লম্বা তো হবেই।

দূর থেকে মনে হল সামুদ্রিক দানবটা ঘুমে অচৈতন্য। মাত্র ছয় গজ দূর থেকে নেড হারপুনটা ছুঁড়ে দিল। বরাত মন্দ। হারপুনটা তার গায়ে আঘাত করল না। সে কেবলমাত্র বার কয়েক সুতীব্র স্বরে হিসহিস শব্দ করে ঝপ করে ডুব দিল। ব্যস। একেবারে উধাও। হারপুনটা গিয়ে সশব্দে জলে আছাড় খেয়ে পড়ল।

না, ডিউগংটা জলের তলায় বেশিক্ষণ রইল না। কয়েক মুহূর্তেই আবার ভুস করে ভেসে উঠল। নেড হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। তাঁকে তাড়া করল। আবার শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে দিল হারপুনটাকে ছুঁড়ে। এবারও প্রয়াস ব্যর্থ হল। হারপুনটা ছুঁড়তে না ছুঁড়তেই সে আচমকা ডুব দিয়ে নজরের আড়ালে চলে গেল।

ডিউগংটার শয়তানি দেখে নেড তো রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। প্রায় একঘণ্টা ধরে হতচ্ছাড়া ডিউগংটা নেডের সঙ্গে লুকোচুরি খেলল।

এবার ডিউগংটার মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল। আমাদের নৌকা থেকে মাত্র কুড়ি ফুট দূরে অবস্থান করে সে অত্যাশ্চর্য এক কাণ্ড করে বসল। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সে রুখে দাঁড়িয়ে বিশালায়তন নাকের ছিদ্র দুটো দিয়ে নিঃশ্বাস নিল। শক্তি সঞ্চয় করে অতর্কিতে একটা লাফ দিয়ে দুম করে আমাদের নৌকার ওপর এসে পড়ল। তারপর সে কী দাপাদাপি! আমাদের মাঝি খুবই অভিজ্ঞ বলে কোনোরকমে নৌকাটাকে রক্ষা করতে পেরেছে। এদিকে নেড তার গায়ে হারপুন দিয়ে ঘন ঘড়ন আঘাত হানতে লাগল। সবশেষে চরমতম একটা আঘাত হেনে সামুদ্রিক দানবটাকে কাবু করতে পারল। দশ হাজার পাউন্ড ওজনবিশিষ্ট মড়া ডিউগংটাকে নিয়ে আমাদের নৌকাটা নোটিল দিকে এগিয়ে চলল।

এবার আমাদের ডুবোজাহাজটা একটা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগল। মিনিট চল্লিশ চলার পর সেটা সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে ভূমধ্যসাগরে হাজির হল।

পরের দিন চৌদ্দই ফেব্রুয়ারি, ক্যাপ্টেন নিমো এক অত্যাশ্চর্য কাণ্ড করে বসলেন। সেলুনের জানালাগুলো দৃঢ়ভাবে আটকে দিলেন। এরকম ঘটনা এই প্রথম দেখলাম।

www.pathagar.com

আমি সেদিন এক ধরনের ক্ষুদ্রাকার ও অত্যাশ্চর্য প্রকৃতির মাছ দেখতে পেলাম। ক্যাপ্টেন নিমো বললেন—'এরা রোমোরো মাছ। এরা অদ্ভুতভাবে হাঙরের পেটের সঙ্গে ঝুলে থাকে। প্রাচীন লোকদের মতে জাহাজের তলদেশে এরা অনায়াসে আটকে থেকে তার গতি রুদ্ধ করে দেয়। কথিত আছে, অ্যাকটিয়ামের যুদ্ধচলাকালীন এরা সম্রাট অ্যান্টমের জাহাজের গতি রুদ্ধ করে দিয়ে সম্রাট অগাস্টামের জয়লাভ সহজতর করে দিয়েছিল। গ্রিকদের কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত হয় যে অ্যানথিই মাছ তাও চোখের সামনে দেখলাম। 'অ্যানথিই' নামটার অর্থ ফুল।

ক্যাপ্টেন নিমো এক বুড়ো ডুবুরির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে খুব কম সময়ই ডাঙায় কাটায়। তার নাম নিকোলাস পেস্কা। মুক্তোর খোঁজে সে এমন কি ক্রিট দ্বীপ পর্যন্ত চলে যায়।

এক দুপুরে ক্যাপ্টেন নিমোকে দেখলাম সিন্দুক খুলে তার ভেতরে থেকে একটা বাক্স বের করতে। তার মধ্যে অনেকগুলো সোনার বাট। আমার ধারণা কম হলেও চার হাজার পাউন্ড সোনা তো হবেই। আর সেগুলোর দাম অন্তত দুই লক্ষ পাউন্ড। আমি আড়াল থেকে তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম। তিনি এবার বাক্সটার গায়ে ঠিকানা লিখলেন। মনে হল তিনি গ্রিক ভাষা ব্যবহার করলেন। বাক্সটাকে আবার সিন্দুকটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তারা বন্ধ করলেন। এবার বোতাম টিপলেন। চারজন গাট্টাগোট্টা লোক ছুটে এসে সিন্দুকটাকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে গেল। তারপর কপিকলের সাহায্যে সেটাকে ওপরে তুলে নেয়া হল।

আমি মনোমিটারের দিকে চোখ ফেরালাম। বুঝলাম, আমরা সাট ফুট জলের তলায় রয়েছি। কিন্তু খুব গরম বোধ করতে লাগলাম। মনে হল নোটিলাসে বুঝি আগুন লেগে গেছে। নইলে এত গভীর জলে তো কিছুতেই গরম লাগতে পারে না। ঠিক তখনই ক্যাপ্টেন নিমো সেখানে এলেন। আমার বিস্ময়ের কারণ বুঝতে পেরে মুচকি হেসে বললেন, 'অধ্যাপক, আমরা এখন ফুটন্ত জলের মধ্য দিয়ে পথ পাড়ি দিচ্ছি।'

বাইরের দিকে চোখ ফেরাতেই নজরে পড়ল, সাদা জল। গন্ধকের গন্ধ বেরোচ্ছে। আর জল রীতিমতো টগবগ করে ফুটছে।

ক্যাপ্টেন নিমো আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে বললেন, 'আমরা এখন সানটোরিন দ্বীপের কাছাকাছি অবস্তান করছি। আমাদের বর্তমান অবস্থান পলিবেমেন্নি ও নিয়োকেমেন্নির মধ্যস্থলস্থ একটা খাল। সমুদ্রের যে অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি রয়েছে সেখানকার গঠনকার্য এখনও মোটেই সম্পূর্ণ হয়নি।

আঠার শো ছেষট্টির তেসরা ফেব্রুয়ারি নিয়াকেমেন্নির কাছে গন্ধক পরিপূর্ণ উষ্ণ বাষ্পের মধ্য থেকে একটা দ্বীপের আবির্ভাব ঘটেছিল। 'জর্জ আইল্যান্ড' যার নামকরণ করা হয়। সে মাসেরই ছয় তারিখে দ্বীপটা আবার সমুদ্রে তলিয়ে যায়।

অ্যাফ্‌ফোয়েসরা দ্বীপটা আবির্ভূত হয় তার সাতদিন বাদে, তেরোই ফেব্রুয়ারি। অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা যখন ঘটে আমি তখন সমুদ্রের ওপরে অবস্থান করছি। সেটা একটা গোলাকার দ্বীপ। তার ব্যাস তিন শো ফুট এবং উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ত্রিশ ফুট। কেমেন্নির কাছাকাছি রেকা নামক সে দ্বীপটার অবস্থান।

আমাদের ডুবোজাহাজ নোটিলাস জিব্রাল্টার প্রণালীর ঢিবি অতিক্রম করল। আমরা ভূমধ্যসাগরের দ্বিতীয়ার্ধে হাজির হলাম ষোলই ফেব্রুয়ারি। এখানে গভীরতা ছয় হাজার ফুটের কাছাকাছি।

www.pathagar.com

আঠারোই ফেব্রুয়ারি বলা তিনটায় নোটিলাস জিব্রাল্টার প্রণালীর কাছাকাছি পৌঁছে গেল। হারকিউলিসের সুদৃশ্য মন্দিরটার ধ্বংসাবশেষ আমাদের মাত্র একঝলক দেখার সৌভাগ্য হল।

আমরা সুপ্রশস্ত আতলান্তিক মহাসাগরে হাজির হলাম। এতে পৃথিবীর বৃহত্তম নদীগুলি পতিত হয়েছে। টেম্পেস্ট ও হর্ন অন্তরীপ দুটো এর দুধারে অবস্থান করছে।

নোটিলাস চলেছে তো চলেছেই। তার চলার বুঝি শেষ হবে না কোনোদিনই। এবার আমরা ভিস্কো উপসাগরে হাজির হলাম।

অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো নোটিলাসের চারদিকে ছড়িয়ে নেয়া হল।

ক্যাপ্টেন নিমো সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলতে লাগলেন—'অধ্যাপক, এটাই সতের শো দুই সালের বাইশে অক্টোবরের রণক্ষেত্র বলে পরিচিত। এখানেই স্পেনীয় জাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে এখানকার যাবতীয় ধনরত্নের আমিই একমাত্র মালিক। একমাত্র এখানেই সোনাদানা ও মণিমুক্তো প্রভৃতি প্রায় দুই কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে। ভিস্কো উপসাগরের এ জায়গাটা ছাড়াও আরো হাজারো স্থানে জাহাজডুবি হয়েছে। আমার মানচিত্রে সবগুলো জায়গার উল্লেখ রয়েছে।'

এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে তিনি বললেন, 'অধ্যাপক, এবার আশা করি বুঝতে পারছেন, আমার কাছে কোটি কোটি টাকা কোত্থেকে আসে, তাই না?'

* * *

উনিশে ফেব্রুয়ারি। ক্যাপ্টেন নিমো আমার কামরায় এলেন। কোনোরকম ভূমিকার অবতারণা না করেই তিনি সরাসরি প্রস্তাব দিলেন, আমাকে নিয়ে একটা জায়গায় বেড়াতে যেতে আগ্রহী। আর আজ পর্যন্ত আমাকে যত জায়গায় নিয়ে গেছেন সবই দিনের আলোতে। এবার রাত্রের অন্ধকারে আমি বেড়াতে উৎসাহী কি না?

আমি এক কথাতেই রাজি হয়ে গেলাম।

কেবল বাতাসের পাত্রটা পিঠে ঝুলিয়ে নিলাম। আর একটা বর্শা ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নিতে দিলেন না। এমনকি অত্যাবশ্যক আলোটা পর্যন্ত না। তাঁর কথায় বুঝলাম, আমরা দুজন ছাড়া আর কেউই সঙ্গে যাচ্ছে না।

আমরা যাত্রা করলাম। আশ্চর্য ব্যাপার! মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা আতলান্তিকের তলদেশে পৌঁছে গেলাম। গাঢ় অন্ধকারে মোড়া সম্পূর্ণ অঞ্চলটা হঠাৎ একটা অত্যুজ্জ্বল লাল আলো আমাকে যারপরনাই বিস্মিত করল। আরও অবাক হতে হল রহস্যজনক আলোটার উৎসস্থল খুঁজতে গিয়ে। সেটা যে কিভাবে জ্বলছে কিছুতেই আমার বোধগম্য হল না।

ক্যাপ্টেন নিমোকে অনুসরণ করে কিছুদূর অগ্রসর হতেই আলোটার রহস্যভেদ করতে পারলাম। আট শো ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থিত সাদা উজ্জ্বল একটা পিণ্ড থেকে অত্যুজ্জ্বল যে আলোকচ্ছটা নির্গত হতে দেখলাম, পাহাড়ের ওপরের আলো স্বচ্ছ জলে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের ঘাড়ে পড়ছে, এবার বুঝতে পারলাম।

সকাল হলে আমরা পাহাড়ের ওপরের একটা ঢালু জায়গায় হাজির হলাম। বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিলে তবে তার চূড়ায় উঠতে পারব। ক্যাপ্টেন নিমো বীরবিক্রমে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। হাতের বর্শাটার ওপর ভর দিয়ে, সন্তর্পণে উঠতে হচ্ছে। কোনক্রমে পা হড়কে গেলে আর দেখতে হত না।

www.pathagar.com

আমাদের তখনও এক শো ফুট ওঠার বাকি। দুধারে জানা অজানা কত সব গাছের জঙ্গল। তার মাঝখান দিয়ে পথ তৈরি করে করে আমাদের এগোতে হচ্ছে।

পাহাড়টার আরও কয়েকটা ধাপ উঠে বিরাট একটা শহরের ধ্বংসাবশেষ আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। বুঝতে অসুবিধা হল না, ঈশ্বর নন, মানুষই এর সৃষ্টিকর্তা। কারণ, দুর্গ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে এরকম না ভেবে উপায় কী? আরো বুঝলাম প্রলয়ঙ্কর প্লাবনের ফলে শহরটা কোনো না কোনোদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। শহরটার নাম কী? এ আমি কোথায় এসেছি, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ক্যাপ্টেন কিছুই বললেন না। কেবলমাত্র অঙ্গুলিনির্দেশ করে আমাকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ করলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে গেলাম। পরে বুঝতে পারলাম যেটা আগুনের মতো রক্তাভ দেখতে সেটা আসলে আগ্নেয়গিরি। সেটাই মশালের মত সমুদ্রের অনেকখানি অংশ অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মিতে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। এটা কেবল লাভা উদ্গীরণই করে। আগুনের বৃদ্ধি পেতে পারে না। বিভিন্ন প্রকার গ্যাস, লাভা সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হতে থাকে। প্রথমে পাহাড় সৃষ্টি করেছে। পরে সেগুলো পাহাড়টার গায়েও তার পাদদেশে সঞ্চিত হচ্ছে। ভিসুভিয়াসে ঠিক যেমন অগ্ন্যুৎপাত ঘটে থাকে। বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে।

আমি চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে টাস্কান স্থাপত্য ও সভ্যতার নিদর্শন চাক্ষুস করতে লাগলাম। আর এখানেই তো একটা গ্রিসীয় দুর্গ ছিল। অ্যাথিনি দেবীর মন্দিরের চূড়াটাকেও জলে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেলাম। আর বন্দরের ধ্বংসাবশেষও আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

কিন্তু একটা কথা বারবার আমার মনের কোণে উঁকি মারতে লাগল—আমি কোথায় এসেছি? এর উত্তর না জানা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নাই। ক্যাপ্টেন নিমোকে জিজ্ঞাসা করেও ফল পেলাম না। এবারও তিনি সতর্কতার সঙ্গে প্রশ্নটা এগিয়ে গিয়ে কালো একটা পাথরের গায়ে বড় বড় হরফে লিখলেন—'অ্যাটলান্টিস'।

'অ্যাটলান্টিস' শব্দটা পড়তেই আমার সর্বাঙ্গে কেমন যেন একটা শিহরণ জাগল। মনপ্রাণ অবর্ণনীয় রোমাঞ্চে ভরপুর হয়ে গেল। ভাবলাম, তবে প্লেটো ও থিওসপাস ওরিজেন জ্যামব্লিকাস, অ্যাটলান্টাস, হ্যামবোল্ট এবং মন্টেব্রুন প্রভৃতি সভ্যতার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছেন। আর আমি এ-ও স্পষ্ট অনুমান করতে পারলাম, ইউরোপ, এশিয়া, লিবিয়া এবং হারকিউলিস স্তম্ভের ওপর অবস্থানরত এ ঐতিহ্যময় দেশটা বিরাট কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তাকেই আজ আমি চোখের সামনে দেখছি। এখানে, ঐতিহ্যের ধারক ও স্থানেই একদিন পৃথিবীর প্রথম মানুষ আর তার সঙ্গী সাথীরা বসবাস করত।

ক্যাপ্টেন নিমোর পিছনে পিছন নোটিলাসে ফিরে এলাম। তার পরের দিন অর্থাৎ বিশে ফেব্রুয়ারি কম্পাসের দিকে তাকালাম। বুঝলাম, নোটিলাস দক্ষিণাদিকে, ঘণ্টায় কুড়ি মাইল বেগে ছুটে চলেছে। এখানে পাঁচ ফুট লম্বা রে মাছ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তা ছাড়া পনের ফুট লম্বা গ্লকাস মাছ, বিভিন্ন জাতের হাঙর তো আছেই।

কনসিল প্রায় তিন গাজ লম্বা এক ঝাঁক মাংসল ম্যাকারাইস মাছের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

www.pathagar.com

আরো কিছুটা পথ অতিক্রম করে দক্ষিণ প্রান্তে সুদীর্ঘ একটা প্রাচীর আমার চোখে পড়ল। দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

ক্যাপ্টেন নিমো মুচকি হেসে বললেন—'অধ্যাপক, আমরা এখন একটা মৃত আগ্নেয়গিরির ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছি। আপনি তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। নোটিলাস একটা খালের ভেতর দিয়ে এ গর্তটায় প্রবেশ করে। এমন নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল সচরাচর পাওয়া যায় না। ঝড়ের প্রকোপ কিছুই করতে পারে না।'

আমি বললাম, 'এখানে প্রবেশ, মানে আশ্রয় নেওয়ার দরকার কি, বলুন তো?'

'বিদ্যুৎ তৈরি করে নিতে—নোটিলাসের গতির জন্য এর দরকার। বিদ্যুৎ তৈরি করতে গেলে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর মধ্যে প্রথম নাম করতে হয়। সোডিয়ামের। কয়লা থেকে সোডিয়াম পাওয়া যায়। এখান থেকে আমার লোকেরা কয়লা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। সোডিয়াম থেকে আমি বিদ্যুৎ তৈরি করে নোটিলাসে ব্যবহার করি।'

পাহাড়টার চূড়ার দিকে ওঠা সম্ভব হল না। ফলে নামতে লাগলাম। মৃত আগ্নেয়গিরির মুখটাকে বিশাল একটা কুয়োর মতো মনে হল। আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে আমরা নোটিলাসে ফিরে আসতে পারলাম।

আটলান্টিকে 'গালফ' নামে একটা উষ্ণ জলস্রোত আছে। এটা মেক্সিকো উপসাগর অতিক্রম করে দুটো পৃথক ধারায় বিভক্ত হয়ে এগিয়ে গেছে। একটা ধারা আফ্রিকার তটভূমি হয়ে আটলান্টিকের দিকে বিস্তৃত আর অন্যটা আয়ারল্যান্ড ও নরওয়ের দিকে এগিয়ে গেছে। আতলান্তিকে সার্গাসো নামে একটা হ্রদ বর্তমান। এতে এমনসব সামুদ্রিক উদ্ভিদ রয়েছে যারা জাহাজ চলাচলে বাধা প্রদান করে।

বাইশে ফেব্রুয়ারি। সামুদ্রিক উদ্ভিদ আচ্ছাদিত সমুদ্র পাড়ি দিতে গিয়ে আমাদের সারাটা দিনই কাটিয়ে দিতে হল।

তেইশে ফেব্রুয়ারি থেকে বারোই মার্চ পর্যন্ত আমাদের আটলান্টিকের মধ্যভাগেই কাটাতে হল। আমি ভাবলাম, নিমো হর্ন অন্তরীপ ঘুরে অস্ট্রেলিয়ার কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে হাজির হবেন।

নেড এবার ক্যাপ্টেনের মতিগতিতে ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে লাগল। দ্বীপহীন সমুদ্রে নোটিলাস ছেড়ে পালানোর চিন্তা তো করাই যায় না। তাছাড়া তাঁর মতের বিরুদ্ধে পা বাড়াবার ক্ষমতাই বা আমাদের কোথায়?

গত উনিশ দিন লক্ষণীয় কিছুই ঘটে নি।

এবার নোটিলাস প্রায় চল্লিশ হাজার ফুট জলের তলা দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। এখানে জলের চাপ এতই বেড়ে গেছে যে, নোটিলাসের লোহার পাতগুলো বেঁকে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হল।

আরও—আরও গভীরে যেতে লাগল নোটিলাস। আমরা এবার জলের ছিয়ানব্বই হাজার গজ তলায় অবস্থান করছিলাম। আরও কিছুটা পথ পার হয়ে ক্যাপ্টেনের নির্দেশে নোটিলাসকে ক্রমে ওপরে তুলে নেয়া হল।

তেরো এবং চৌদ্দই মার্চ নোটিলাস সোজা দক্ষিণ মুখো এগিয়ে মেরু প্রদেশের দিকে চলতে লাগল।

একটা ব্যাপার আমার নজরে পড়ল—ইদানিং নেড খুবই কম কথা বলছে। দীর্ঘ বন্দিদশাই তার মুখের ভাষা একটু একটু করে কেড়ে নিচ্ছে। বুঝতে অসুবিধা হল না।

www.pathagar.com

তাছাড়া এখন ক্যাপ্টেন নিমোকে দেখলেই সে রেগে একেবারে কাঁই হয়ে যায়। মুখ গোমড়া করে অনবরত ফুঁসতে থাকে। আমার একটাই ভয়, মাথা গরম করে আবার হাঙ্গামা জুড়ে না দেয়।

সেদিনই কনসিল আমার কামরায় ঢুকে সরাসরি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার, নোটিলাসে কজন আছে বলে আপনার বিশ্বাস?'

তার এরকম আচমকা প্রশ্নে আমি একটু ঘাবড়েই গেলাম। মনের ভাবটুকু সামলে নিয়ে বললাম, 'এটা তো আমার পক্ষে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।' আমতা আমতা করে বললাম, 'এটা চালানোর জন্য জনা দশেক লোকই যথেষ্ট। আসলে বোধ হয় বেশিই রয়েছে।'

'আপনি কি হিসাব করে বের করতে পারবেন না স্যার? এর আয়তন, কতখানি বাতাস ধরতে পারে—চব্বিশ ঘণ্টায় তো জলের ওপর ভেসে বাতাস সংগ্রহ করে নিতে হয়। পারবেন না হিসাব কষে লোকের সংখ্যা বের করতে?'

'এভাবে একেবারে নির্ভুল সংখ্যা পাওয়া সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে ঘণ্টায় কুড়ি গ্যালন অক্সিজেন একজনের পক্ষে পক্ষে দরকার হয়। তবে চব্বিশ ঘণ্টায় চারশো আশি গ্যালন অক্সিজেন এক-একজনের চাই। তবে নোটিলাসে কত গ্যালন বাতাস মোট ধরে। নোটিলাসের মোট ওজন দেড় হাজার টন। এক টনে দুহাজার গ্যালন বাতাস বহন করতে পারে। তবে মোট বাতাসের পরিমাণ হচ্ছে, ত্রিশ হাজার গ্যালন। একে আটচল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে ফল দাঁড়ায় ছয়শো পঞ্চাশ গ্যালন। এতে একজন লোক চব্বিশ ঘণ্টা সুষ্ঠুভাবে শ্বাসকার্য চালাতে সক্ষম হয়।'

আমার কথা শুনে কনসিল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফ্যাকাশে মুখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে নেডের ব্যাপার-স্যাপার দেখে কনসিল আবার আমার কামরায় এল। বলল, 'স্যাল, নেড যেন একেবারে ক্ষেপে গেছে। তার পক্ষে সম্ভব নয় এমন কোন কাজই নেই। সে থেকে থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।'

সেদিন নেড বিষণ্ণমনে দাঁড়িয়ে। অতিকায় একটা তিমি দেখে সোল্লাসে আমাকে বলে উঠল, 'স্যার, ওই দেখুন! ওই যে, ওই দিকে কত বড় একটা তিমি! তার নাক দিয়ে তীব্র বেগে জল বেরিয়ে আসছে, দেখুন!' হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—'ধ্যৎ চাই! এ খাঁচায় বন্দি থেকে জীবনটা একেবারে বরবাদ হয়ে গেল! এমন একটা তিমি হাতের নাগালে পেয়ে কিচ্ছু করার নেই।' কথাটা বলেই সে আক্রোশ ও উত্তেজনাবশত নোটিলাসের গায়ে আচমকা একটা ঘুষি হাঁকিয়ে বসল।

পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'স্যার, এগুলো অনেকটা উত্তরাংশের তিমির মতোই, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমি এক হাত পর্যন্ত লম্বা তিমি দেখেছি। শুনেছি, অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের উমগালিক লা হুমালক দ্বীপে নাকি দেড় শো হাত লম্বা তিমি দেখা যায়।' নেড এবার আমাকে লক্ষ করে বলল, 'স্যার, আপনি বলেছিলেন, ক্যানেটরা ছোট্ট প্রাণী। আসলে তা কিন্তু নয়। আর বুদ্ধিও খুব তীক্ষ্ণ তারা নাকি সামুদ্রিক গাছগাছালি দিয়ে নিজেদের সারা দেহ এমন অত্যাশ্চর্যভাবে ঢেকে রাখে যে, লোকে তাকে দ্বীপ ভেবে আশ্রয় নিতে যায়—আরে এযে দেখছি দশ-দশটা—না, দশটা নয়, কুড়িটা।—আরেব্বাস! তিমির পুরো একটা দল! হায়! এ দেখেও আমাকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে!'

www.pathagar.com

আমি নিতান্তই নিরুপায়—অসহায়! কথাগুলো বলে সে উত্তেজনাবশত ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

একটু পরে ক্যাপ্টেন নিমো সেখানে এলেন। নেড নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে বলে উঠল, 'স্যার, আমি একজন দক্ষ হারপুনবির। আমাকে যদি দয়া করে তিমি শিকারের অনুমতি দেন—'

'কেন অনুমতি দেব? নিতান্তই শিকারের নেশা? তিমির চর্বিব প্রয়োজন আমাদের তো হয় না। তবে লোহিত সাগরে ডিউগংটাকে শিকার করতে গিয়েছিলাম আমাদের মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য। শোন, শখ পূরণ করতে গিয়ে ধ্বংস করতে তো আমি দিতে পারি না। তেল ব্যবসায়ীরা এমনিতেই তিমি মেরে মেরে তাদের বংশলোপাটা করতে চলেছে!'

এবার আমার দিকে ফিরে বললেন, 'অধ্যাপক, সমুদ্রের বুকে ওই যে কালো মতো বস্তু দেখা যাচ্ছে, ওটা ক্যাচাল্টে নামক ভয়ঙ্কর একপ্রকার প্রাণী। তিমির প্রধানতম শত্রু। এক একটা দলে একশো থেকে দুশো পর্যন্ত ক্যাচাল্টে থাকে। থারা খুবই হিংস্র। তাদের হত্যা করলে আমার তিলমাত্রও আক্ষেপ হয় না। হিংস্র প্রাণীদের জন্য আমার সামান্যতমও মায়া-মমতা নেই।'

পকেট থেকে চুরুট বের করে ক্যাপ্টেন নিমো তাতে অগ্নিসংযোগ করে একগাল ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'ক্যাচাল্টেদের এক একটার দৈর্ঘ প্রায় পঁচাত্তর ফুট। দেহের এক তৃতীয়াংশই মাথা। এক ইঞ্চি লম্বা পঁচিশটা করে দাঁত তাদের ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। তিমির সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে তারা দুদিক থেকে সুবিধা পায়। যেমন ধরুন, তিমির চেয়ে অনেক, অনেক বেশি সময় ক্যাচাল্টে জলের তলায় অবস্থান করতে পারে। আবার অস্ত্রও তিমির চেয়ে অনেক বেশি।'

ব্যস, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দুই সমুদ্র-দানবের মুখোমুখি লড়াই। ভয়ঙ্কর সে লড়াই। সমুদ্রের জল রীতিমত তোলপাড় করতে লেগে গেল। কেবলমাত্র তিমিই নয়, হিংস্র ক্যাচাল্টেদের মধ্যে কয়েকটা তো নিদারুণ আক্রোশে নোটিলাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু নোটিলাস তো নিজেই একটা ভয়ঙ্কর অস্ত্র। ফলে সমুদ্রের জল রক্তবর্ণ ধারণ করল। আর সে লালবর্ণ বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে নিল। শেষ পর্যন্ত বেগতিক দেখে চার-ছয়টা ক্যাচাল্টে প্রাণ নিয়ে পালাল।

নোটিলাসের গা ঘেঁষে একটা তিমিকে ভেসে যেতে দেখা গেল। মরা তিমি। নোটিলাসের দুজন কর্মী এক অবাক কাণ্ড শুরু করে দিল। তারা দুটো বালতি নিয়ে নোটিলাস থেকে বেরিয়ে তিমিটার বুকের ওপর চেপে বসল। তার বুক থেকে দুধ দোহন করতে লাগল। পুরো দুই বালতি দুধ নিয়ে তারা আনন্দে নাচতে নাচতে নোটিলাসে ফিরে এল। একটু পরে আমাকে এক গ্লাস গরম তিমির দুধ পান করতে দিল। আশ্চর্য ব্যাপার তো, মনে হল আমি বুঝি মৌজ করে গরুর দুধ পান করছি।

চব্বিশে মার্চ। নেড ইতিপূর্বে একবার উত্তর মেরুতে যাওয়ার সৌভাগ্যলাভে ধন্য হয়েছিল। কিন্তু আমি আর কনসিল এই প্রথম সেদিকে এগোচ্ছি। জলে ভাসমান বিশালায়তন বরফের চাঁইকে সূর্যের আলোয় ঝলমল করতে দেখে আমরা উভয়েই খুশিতে লাফালাফি করতে লাগলাম। সূর্যের আলো এদের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে নানারঙে আমাদের চোখে হাজির হয়।

www.pathagar.com

বরফের রাজ্য দিয়ে নোটিলাসকে এগোতে এগোতে একসময় ষাট ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছাতেই দেখলাম আমাদের পথ রুদ্ধ। ক্যাপ্টেন অনেক চেষ্টা করে সংকীর্ণ একটা পথ দিয়ে সেটাকে কোনোক্রমে বের করে আবার এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন।

বরফের সমতল ক্ষেত্রে পৌঁছে দেখলাম সেখানে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির চেয়েও তিন ডিগ্রি নিচে। ক্যাপ্টেন বৈদ্যুতিক শক্তির মাধ্যমে নোটিলাসকে সাধ্যমত গরম রাখার ব্যবস্থা করলেন। আমরা যদি আরও দুই মাস পরে এখানে আসতাম তবে সূর্যের পূর্ণ আলোক দেখে চোখ ও মনকে ধন্য করতে পারতাম। এখন ঘণ্টা তিনেক করে অন্ধকার এখানে বিরাজ করে। ক্রমে কমতে কমতে একসময় এক নাগাড়ে ছয় মাস সূর্য অদৃশ্য থাকবে—ঘুটঘুটে অন্ধকার।

ষোলই মার্চ নোটিলাস দক্ষিণ মেরুর মেরুবলয় অতিক্রম করে এগিয়ে চলল। তুষারাজ্যের সৌন্দর্য যে এমন অকল্পনীয় হতে পারে তা নিজের চোখে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে উৎসাহ পাওয়া যায় না।

আমি কথা প্রসঙ্গে বললাম, 'ক্যাপ্টেন, একটা কথা, এর আগে কেউ দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ করতে পেরেছেন কি?'

মুচকি হেসে ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, 'না, কেউই না। আমরাই প্রথম দক্ষিণ মেরুতে যাচ্ছি।'

ক্যাপ্টেনের কথায় গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠল।

নোটিলাসকে বরফের ওপর দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটিয়ে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করলাম।

ক্যাপ্টেন মুচকি হেসে বললেন—'না, এখন থেকে আর বরফের ওপর দিয়ে নয়, নোটিলাস এবার থেকে বরফের তলা দিয়ে পথ পাড়ি দেবে।'

'বরফের তলা দিয়ে' কথাটা শুনেই আমার বুকের ভেতরে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল।

ক্যাপ্টেন নিমো আমার মনে অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন—'হ্যাঁ, অবাক হবার মতো কথাই বটে। সাধারণ জাহাজের পক্ষে অসম্ভব বিবেচিত হলেও নোটিলাস অনায়াসেই বরফের তলা দিয়ে যেতে পারে। অধ্যাপক, আপনি তো জানেনই, বরফ এক ফুট জলের ওপরে থাকলে তিন ফুট থাকে জলের তলায়, এ তুষারশৈলটার উচ্চতা যদি জলের ওপরে উচ্চতা তিন শো ফুটের বেশি না হয়, তবে নয়শো ফুটের বেশি এর গভীরতা হতে পারে না। আর আপনি তো জানেনই, নয়শো ফুট তলা দিয়ে পথ পাড়ি দেওয়া নোটিলাস-এর পক্ষে মোটেই সমস্যার ব্যাপার নয়।

ব্যস, ক্যাপ্টেন নিমো এবার দুঃসাধ্য অভিযান শুরু করলেন।

একসকালে আমাদের জলযান নোটিলাস সুদৃশ্য একটা পাথরের ঢিবির কাছাকাছি এগিয়ে গেল। আমরা দ্বীপটায় নামার জন্য নৌকায় চেপে সেটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

দ্বীপটার গায়ে নৌকাটা ভিড়তেই কনসিল ব্যস্ত হয়ে লাফিয়ে নৌকা থেকে দ্বীপে নামতে চেষ্টা করল। ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, 'এ দ্বীপে আজ পর্যন্ত মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি।'

কথাটা শুনেই আমি কনসিলকে থামিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বললাম—'এ দ্বীপে প্রথম পদার্পণের অধিকার কিন্তু আপনারই ক্যাপ্টেন নিমো।'

www.pathagar.com

মুচকি হেসে ক্যাপ্টেন নিমো ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে নৌকা থেকে দ্বীপে নেমে গেলেন। এবার আমরা এক এক করে দ্বীপের মাটিতে পদার্পণ করলাম।

একনজরে দেখেই আমার মনে হল দ্বীপটা আগ্নেয়গিরির লাভা দিয়ে গঠিত। আমার জানা আছে, মেরু অঞ্চলের টেরর এবং এরেবাস নামক আগ্নেয়গিরি দুটোকে জেমুসরস আবিষ্কার করে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

বিশ মার্চ। তুষারপাত বন্ধ থাকায় আমরা দলবেঁধে তুষার রাজ্য পরিক্রমায় বেরোলাম। পথ চলতে চলতে বিভিন্ন আকারের সিলমাছ দেখলাম। তারা স্তন্যপায়ী প্রাণী। দলবদ্ধভাবে বাস করে। কয়েকটা জলহস্তীকে অস্থিরভাবে চলাফেরা করতে দেখলাম।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে ছোট্ট একটা পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেলাম। সেখান থেকে একদল প্রাণীকে তীব্রস্বরে ডাকাডাকি করতে শুনলাম। ষাঁড়ের ঐকতানের মত তাদের কণ্ঠস্বর। পরে নিঃসন্দেহ হলাম সেটা জলহস্তীদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পুরুষ জলহস্তী তার প্রেয়সীকে প্রেম নিবেদন করছে। জলহস্তীগুলো এক একটা সোয়া চার গজ লম্বা। ওজনও সে পরিমাণই। গায়ের চামড়া খুব মোটা হলে কি হবে একেবারে তেলতেলে।

একুশে মার্চ সূর্য নিরক্ষরেখা অতিক্রম করবে। তখন দিনরাত্রি সমান হয়ে যাবে। ব্যস, এবার থেকে পুরো ছয় মাস সূর্যকে আর দেখা যাবে না।

সেপ্টেম্বর মাসে আবার সূর্যোদয় হবে। তখন থেকে আবার চলবে একনাগাড়ে ছয়মাস দিন।

ক্যাপ্টেন নিমো মেরু অঞ্চল পর্যবেক্ষণের বাকি কাজটুকু দ্রুত সেরে নিতে লাগলেন। কারণ, রাত্রির পালা শুরু হয়ে গেলে কাজ বন্ধ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

পাহাড়টার চূড়ায় পৌঁছেই ক্যাপ্টেন নিমো ব্যারোমিটার নিয়ে কাজে মেতে গেলেন। এবার আতসকাচ চোখের সামনে ধরে সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

আমিও হাতগুটিয়ে বসে নেই। ক্রনোমিটারের দিকে দৃষ্টি রাখলাম। সূর্যের অর্ধাংশ যদি বেলা বারোটায় নিশ্চিহ্ন অর্থাৎ ডুবে যায় তবে ধরে নিতে হবে আমরা দক্ষিণ মেরুতে হাজির হয়ে গেছি।

বেলা ঠিক বারোটায় আমি চিৎকার জুড়ে দিলাম, 'সূর্যের অর্ধাংশ ডুবে গেছে! ক্যাপ্টেন, দেখুন—ওই দেখুন!'

ক্যাপ্টেন নিমো সোল্লাসে বললেন, 'পৌঁছে গেছি! আমরা দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে গেছি অধ্যাপক!'

ক্যাপ্টেন নিমো আমার কাঁধে হাত রেখে আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বলতে লাগলেন, 'আমি, আমি ক্যাপ্টেন নিমো, আজ আঠারো শো চৌষট্টি সালের একুশে মার্চ দক্ষিণ মেরুর নব্বই ডিগ্রিকে উপনীত হয়েছি।' কথাটা বলেই তিনি 'এন্' শব্দ চিহ্নিত একটা পতাকা বের করে সেখানে পুঁতে দিলেন। এবার বিদায়ী সূর্যের শেষ রক্তিম আভাটুকুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আবেগমধুর স্বরে উচ্চারণ করলেন, 'হে সূর্য, বিদায়! তোমাকে আমি বিদায় জানাচ্ছি। এবার আমার সদ্য বিজিত রাজ্যে ছয় মাসের জন্য রাত্রির নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার নেমে আসুক। বিদায়—তোমাকে বিদায়।'

www.pathagar.com

* * *

পরের দিন বাইশে মার্চ। আমাদের যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। তাপমান যন্ত্রের কাঁটা শূন্যের নিচে বারো ডিগ্রিতে রয়েছে দেখা যাচ্ছে।

নোটিলাস জলের তলায় নামতে শুরু করল। প্রায় এক হাজার ফুট জলের তলায় নেমে সেটা স্থির হল। সেটা এবার সোজা উত্তর দিকে এগোতে লাগল।

রাত তখন তিনটা। আকস্মিক একটা ঝাঁকুনিতে আমি ঘুম থেকে জেগে হুড়মুড় করে বসে পড়লাম। পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলাম। নিজেকে সামলাতে না পেরে ছিটকে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম।

খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, নোটিলাস আচমকা দ্বিগুণতম শক্তি প্রয়োগ করে একের পর এক আঘাত হেনে চলেছে।

মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, নোটিলাস তখন প্রায় চার শো মিটার জলের তলায় অবস্থান করছে। ঠিক তখনই ব্যস্তপায়ে ক্যাপ্টেন নিমো সেখানে এলেন। কোনো কথা না বলে সবার আগে কম্পাসের দিকে তাকালেন, পরে ক্রনোমিটারের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

আমি ছোট্ট করে বললাম, 'ক্যাপ্টেন, কোনো ঘটনা—'

আমাকে কথাটা বলতে না দিয়েই বিবর্ণ মুখে তিনি বললেন, 'ঘটনা না বলে একে দুর্ঘটনাই বলা ভালো! তবে আমাদের কোনো ত্রুটি এর জন্য দায়ী নয়। প্রকৃতির বিরুদ্ধতার জন্যই এমনটা হতে চলেছে। বিশালায়তন একটা বরফের চাঁই, পুরো একটা পাহাড়ই উল্টে পড়ে গেছে অধ্যাপক। সেটা পড়তে গিয়ে নোটিলাসের গায়ে আছড়ে পড়েছে। নোটিলাস একদিকে কাৎ হয়ে পড়েছে। আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি, বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য। ক্রনোমিটারের দিকে তাকিয়ে দেখুন, নোটিলাসকে ইতোমধ্যেই অনেকখানি সোজা করে ফেলেছি। প্রায় দশ মিনিটের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ক্যাপ্টেন নিমো নোটিলাসকে পুনরায় সোজা করতে সক্ষম হলেন।

কিছুদূর এগোতেই হাত দুটো চোখের ওপর চেপে ধরতে বাধ্য হলাম। নোটিলাস পূর্ণ গতিতে চলছে বলে বরফের অত্যুজ্জ্বল সাদা রঙ শতগুণ উজ্জ্বল হয়ে কাচের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে চোখ দুটোকে ধাঁধিয়ে দিতে লাগল।

সর্বনাশ! আমাদের জলযান নোটিলাস বরফে আটকা পড়ে গেছে। বরফ সরাতে না পারলে আর অব্যাহতি নেই। এদিকে বাতাসও ফুরিয়ে এসেছে। ভয় হচ্ছে—বাতাসের অভাবে এতগুলো প্রাণীকে শেষ পর্যন্ত দাপাদাপি করে মরতে না হয়।

ক্যাপ্টেন নিমোর অশেষ ধৈর্য। এমন দুঃসময়েও মাথা ঠাণ্ডা রেখে কর্তব্যকর্মে অবিচল রয়েছেন দেখে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না।

ক্যাপ্টেন নিমোর নির্দেশে কয়েকজন নাবিক কোদাল, গাঁইতি, শাবল আর বেলচা নিয়ে বরফ কাটতে লেগে গেল। কনসিল আর নেড-ও তাদের সঙ্গে কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেল। তবে বরফ কেটে সঠিক রাস্তা করা দুঃসাধ্য বলে নোটিলাস-এর চতুর্দিকে পরিখা খনন করতে লাগল। বারো ঘণ্টায় ছয়শো গজ বরফ কাটা গেল। হিসাব করে দেখা গেল পাঁচ দিন পাঁচরাত্রি একনাগাড়ে বরফ কাটলে তবে আমরা তুষার সমাধি থেকে মুক্তি পাব।

www.pathagar.com

এবার সমস্যা নতুনতর রূপ নিয়ে দেখা দিল। এক রাত্রে বরফের সঙ্গে কিছু জল পরিখার ভেতরে ঢুকে গেল। এবার বরফের চাপে নোটিলাস ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে গুঁড়ো হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্যাপ্টেন ফ্যাকাসে মুখে বললেন—'এটা দেখছি একটা বাড়তি উৎপাত শুরু হল! বাঁচার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে, জল জমে উঠতে উঠতেই আমাদের যে-কোনো ভাবে এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে। আর যেটুকু বাতাস রয়েছে তাতে কোনোরকমে কাল পর্যন্ত চালিয়ে নেয়া যাবে। ব্যস, তারপরই—' কথাটা শেষ না করেই তিনি কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভেবে বললেন—'অধ্যাপক, চমৎকার একটা উপায় আমার মাথায় এসেছে। গরম জল—'

আমি চমকে উঠে বললাম—'গরম জল! গরম জল—কী ব্যাপার?'

'প্রচুর পরিমাণে গরম জল ঢালতে পারলে ক্রমে জমে ওঠা জলের জমাটবাঁধার ব্যাপারটাকে বন্ধ করা যাবে।'

ক্যাপ্টেন নিমো পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু করলেন। যন্ত্রের সাহায্যে জল গরম করা শুরু হল। জলের উষ্ণতা একশো ডিগ্রি হলে তাকে পাম্পের ভেতর দিয়ে চালান দেয়া হতে লাগল। হ্যাঁ, ফল পাওয়া গেল। তার পরের দিন অর্থাৎ সাতাশে মার্চ হিসাব করে দেখা গেল, আর আটচল্লিশ ঘণ্টার কাজ বাকি রয়েছে।

দূষিত বাতাস গ্রহণ করে করে আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

অভিন্নহৃদয় ভৃত্য আমার শিয়রে বসে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'হায় ঈশ্বর। নিঃশ্বাস না নিয়ে যদি থাকা সম্ভব হত তবে আমার ভাগের বাতাসটুকু প্রভুর সেবায় লাগাতাম।'

বরফ কাটার কাজ জোরকদমে চলতে লাগল। আর মাত্র দুই গজ পরিমাণ বরফ কাটার বাকি। মাত্র দুই গজ বরফ! এদিকে হাওয়া প্রায় শেষ। দম আটকে আসার জোগাড় হল। তার পরের দিনও একইরকম দুঃসহ যন্ত্রণা। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। আর বাঁচার আশা বুঝি নেই।

আমাদের বন্দিজীবনের ষষ্ঠদিন। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে নোটিলাসের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ছাড়া বাকি সব বের করে দিয়ে সেটাকে হাল্কা করে ফেলা হল। এবার তার ওজন দাঁড়াল মাত্র আঠার শো টন।

অকস্মাৎ বিকট আওয়াজ করে বরফের স্তরটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ব্যস, আর দেরি নয়, নোটিলাস নামতে নামতে নিচে ডুব দিল।

ক্যাপ্টেনের নির্দেশে বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে জলাধারের জল বের করে দেয়া হল।

মনোমিটারের কাঁটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, নোটিলাস দ্রুত ওপরে উঠে যাচ্ছে। প্রাণান্ত চেষ্টা চরিত্রের মাধ্যমে শেষপর্যন্ত নোটিলাসকে জলের ওপরে তুলে আনা সম্ভব হল। ফুসফুস বরে সমুদ্রের মুক্তবায়ু নিয় পিতৃদত্ত প্রাণটাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হল। অক্সিজেনের যে কী অপরীসীম ক্ষমতা এবার যেন নতুন করে উপলব্ধি করলাম।

আমরা আবার এগোতে লাগলাম। সূর্য তখন উত্তরদিকে অবস্থান করছে। নোটিলাস উত্তর দিকেই এগিয়ে চলেছে।

www.pathagar.com

আমাদের ভয় ছিল, যে সুবিশাল সাগর আমেরিকা ও এশিয়াকে স্পর্শ করে রেখেছে ক্যাপ্টেন নিমো হয়ত আমাদের নিয়ে সেদিকেই এগিয়ে যাবেন।

একত্রিশে মার্চ আমরা মেরু বলয় অতিক্রম করে হর্ন অন্তরীপকে ছাড়িয়ে এগোতে লাগলাম।

তেসরা এপ্রিল আমরা পেন্টাগোনিয়ার তটরেখার ধার দিয়ে এগোতে লাগলাম।

চৌঠা এপ্রিল নোটিলাস উরুগুয়ে পেরিয়ে আরো ছাপ্পান্ন মাইল পথ পাড়ি দিয়েছিল।

জাপান সমুদ্র থেকে যাত্রা করার পর আমরা ইতিমধ্যে ষোল হাজার মাইল পথ পাড়িয়ে দিয়ে ফেলেছি। এবার উল্কা বেগে ছুটে নোটিলাস ক্রিয়ো অন্তরীপকে পিছনে ফেলে এগোতে লাগল।

কয়েকদিন ক্রমাগত পথ পাড়ি দিয়ে নোটিলাস নয় এপ্রিল দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বপার্শ্বস্থ স্যামরোক অন্তরীপকে পিছনে ফেললাম।

নোটিলাস তখন জলের তলা দিয়ে এগোতে এগোতে এগারোই এপ্রিল ভেসে উঠল।

আমরা জাল ফেলে দুদিনে প্রচুর সংখ্যক মাছ, যেমন—প্রায় চার শো পাউন্ড ওজনবিশিষ্ট ও খুব সুস্বাদু কাকুয়ানি মাছ ধরলাম। আর সামুদ্রিক কচ্ছপও কম ধরলাম না। কয়েকটা সরীসৃপও জালে ধরা পড়েছিল।

ষোলই এপ্রিল আমরা গুয়াজলুপ মাটিনেকের শৃঙ্গ দেখে চোখ ও মনকে তৃপ্ত করলাম। নোটিলাসে আমরা প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত করে ফেলেছি। আর প্রায় সতের হাজার মাইল পথ ইতমধ্যেই পাড়ি দিয়ে দিয়েছি।

আমাদের হতাশা ক্রমে চরম সীমায় পৌঁছোতে লাগল। আমরা নিঃসন্দেহ, ক্যাপ্টেন নিমো নিজে থেকে আমাদের মুক্তি দেবেন না। অতএব ফন্দি ফিকির যা-কিছু আমাদেরই করতে হবে। তার ওপর ক্যাপ্টেনের মধ্যে নির্জনপ্রিয়তা লক্ষিত হচ্ছে। সতর্কতার সঙ্গে আমাদের সংস্রব এড়িয়ে চলতেই তিনি উৎসাহী, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। কিন্তু কেন?—কেন এ মৌনব্রত?'

বিশে এপ্রিল। সেদিন আমরা প্রায় পনেরো ফুট ওপরে উঠে গেলাম। তখন আমাদের সবচেয়ে কাছের স্থলভূমি ছিল বাহামা দ্বীপপুঞ্জ।

বেলা এখন এগারোটা। কনসিল নিকটবর্তী একটা গুহার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমার মনে হ'ল ওটা পোল্প-গুহা। দৈত্যাকৃতি পোল্পরা যদি গুহা থেকে বেরিয়ে আসে তবেই সর্বনাশের চূড়ান্ত ঘটিয়ে ছাড়বে।

কনসিল কাঁপা কাঁপা গলায় কোনোরকমে উচ্চারণ করল, 'স্যার, আমি সেন্ট মালোর একটা গির্জায় ছবিতে দেখেছি, একটা পোল্প তার দাঁড়া দিয়ে একটা জাহাজকে টেনে নিয়ে চলেছে।'

নেড তাকে সমর্থন করতে গিয়ে বলল, 'এ কথা আমিও শুনেছি। তাই যদি হয় তবে তো এরা নোটিলাসকে শুকনো পাতার মতো টেনে নিয়ে যাবে।'

আমি হেসে বললাম, 'ওটা আসলে একটা কিংবদন্তীর ছবি। কিংবদন্তী আর উপকথার সবকিছুতেই সম্ভব করে তোলা যায়, জানই তো। তবে আমিও গল্প শুনেছি, কেবল জাহাজকে টেনে নেওয়াই নয়, কোনো কোনো পোল্প নাকি একটা দ্বীপের আয়তনের সমান হয়ে থাকে। প্রাচীন জীববিজ্ঞনীগণ বলেন, পোল্পদের অত্যাচারে বিভ্রালটার প্রণালী দিয়ে জাহাজ নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আবার পন্টোপিডান নামে

www.pathagar.com

এক বিশপ বলেন—বিরাট এক সেনাদল ভুল করে একটা পোল্পের পিঠে নেমে গিয়েছিল। দুই গজ লম্বা একটা পোল্পের কঙ্কাল মন্টোপোলিওর যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এক জীববিজ্ঞানী লিখেছেন, দুই ফুট লম্বা একটা পোল্পের দাঁড়াগুলো লম্বায় সাতাশ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। কী ভয়ঙ্কর প্রাণী ওরা আশা করি অনুমান করতে পারছ?' মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে আমি আবার বলতে লাগলাম—'আঠারো শ' একষট্টি খ্রিস্টাব্দে একটা ঘটনায় মানুষ বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে যে, পৃথিবীতে এখনও এরকম ভয়ঙ্কর প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে।'

একসময় আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে নোটিলাস থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, গোটা সাতেক কাটল মাছ নোটিলাসের পিছনে আসছিল। তাদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে এ সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

হ্যাঁ, কাটল মাছ সত্যিই দানবাকৃতি। এক-একটা প্রায় আট গজ লম্বা। মাথায় আট-আটটা করে দাঁড়া। আর ওজন? চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার পাউন্ড তো হবেই।

ক্যাপ্টেন দৌড়ে এলেন। একপলকে দেখে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই। ওদের জন্য নোটিলাস থেমে গেছে। ওদের চোয়ালে ব্লেড আটকে গিয়ে হয়ত-বা এ সর্বনাশা কাণ্ড ঘটেছে। জলের ওপরে উঠে গিয়ে ওদের ধ্বংস না-করা পর্যন্ত আমাদের এখানে আটকা পড়েই থাকতে হবে।

জাহাজের দশ-বারোজন কর্মী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হল। নেড দাঁড়াল তার হারপুন হাতে নিয়ে। নোটিলাস ক্রমে ওপরে উঠতে লাগল।

হঠাৎ একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড দেখে চমকে উঠলাম। একটা অক্টোপাস তার ইয়া লম্বা একটা পা নোটিলাসের জানালা দিয়ে গলিয়ে দিয়েছে।

ক্যাপ্টেন নিজে কুড়োলের এক কোপে তার পা-টাকে কেটে নামিয়ে দিলেন। মুহূর্তে সে আরো দুটো পা ঝট করে তুলে একজন নাবিককে জাপ্টে ধরে ফেলল। প্রাণভয়ে সে তো বিকট আর্তনাদ জুড়ে দিল। সে কী ভয়ঙ্কর আর মর্মান্তিক দৃশ্য! আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। না, কিছুতেই বেচারাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল না। কেউ এগোতে সাহসী হল না। ক্যাপ্টেন নিমো আবার কুড়োলের এক কোপে হতচ্ছাড়া জন্তুটার আর একটা পা কেটে ফেললেন। তার আটটা পায়ের মধ্যে সাতটা পা-ই আমরা টুকরো করে ফেলেছি। সবশেষে অবশিষ্ট একটা পা দিয়েই সে অদৃষ্ট বিড়ম্বিত নাবিকটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। উপায়ন্তর না দেখে ক্যাপ্টেন নিমো সেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ব্যস, তার গা থেকে গলগল করে আলকাতরার মতো কালো বস্তু বেরিয়ে এল। সবকিছু যেন হঠাৎ অন্ধকারে ঢেকে গেল। সুযোগ, অপূর্ব সুযোগটাকে অক্টোপাসটা কাজে লাগাতে ছাড়ল না। যখন জলের রঙ কিছুটা স্বাভাবিকতা ফিরে পেল তার আগেই অতিকায় কিম্ভূতকিমাকার জন্তুটা গা-ঢাকা দিল। অদ্ভুত কৌশল!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমাদের নোটিলাসের চারদিকে ক্রোধোন্মত্ত অক্টোপাসদের মেলা বসে গেল। একটা পা আচমকা হারপুনবির নেডকে জড়িয়ে ধরে আছাড় মেরে ফেলে দিল। ব্যাপার দেখে আমার তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাওয়ার জোগাড়। শরীর কেমন অবশ হয়ে আসতে লাগল। আমি রীতিমতো হায় হায় করতে লাগলাম।

ক্যাপ্টেন নিমো কর্তব্যে অটল। তিনি কুড়োল দিয়ে অক্টোপাসটার পা-টায় একের পর এক ঘা মেরে চলেছেন।

www.pathagar.com

নেড সুযোগ বুঝে হাতের হারপুনটা সজোরে বিকটদর্শন অক্টোপাসটার পেটে গেঁথে দিল।

ক্যাপ্টেন এবার অক্টোপাসটার গ্রীবায় উন্মাদের মতো কুড়োল চালাতে লাগলেন।

প্রায় এক ঘন্টাকাল তুমুল লড়াই চালিয়ে হিংস্র জন্তুগুলো হতাশ হয়ে প্রাণ নিয়ে পালাল। আমরা এবার সত্যি সত্যিই শত্রুমুক্ত হতে পারলাম।

* * *

ক্যাপ্টেন নিমো তার দুজন সঙ্গীকে আমাদের চোখের সামনে হারালেন। অক্টোপাসের হাতে যে হতভাগাটা প্রাণ দিয়েছে তার জন্য আমার আক্ষেপের সবচেয়ে বড় কারণ, সে ছিল আমার দেশবাসী।

নোটিলাসের পরিস্থিতি দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ক্যাপ্টেন নিমো মনের দিক থেকে বড়ই ভেঙে পড়েছেন, হতাশায় জর্জরিত।

আটই মে আমরা হাটেরাস অন্তরীপ অতিক্রম করছিলাম, এখানে গালফ গভীরতায় দুশো দশ গজ আর পঁচাত্তর মাইল বিস্তৃত।

আমরা এবার পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা করতে লাগলাম। ধারে কাছে লোকালয়ও রয়েছে। পালিয়ে বাঁচার অপূর্ব সুযোগ। পরে আর এমন সুযোগ নাও আসতে পারে। বোস্টন ও নিউইয়র্কে অসংখ্য জাহাজ চলাচল করতে দেখলাম। দরকার হলে তাদের কারো কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করা যাবে। কিন্তু প্রবল ঝড়তুফান আমাদের পালিয়ে যাওয়ার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। এ পরিস্থিতিতে নৌকা নিয়ে পালানোর চেষ্টা করার অর্থই হচ্ছে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া।

নেড কিন্তু পালানোর জন্য একেবারে ক্ষেপে গেছে। সে বেশ রাগতস্বরেই আমাকে বলল, 'স্যার, আমার সাফ কথা শুনুন, ক্যাপ্টেনের ধান্দা হয়ত উত্তর মেরুর দিকে যাওয়া। দক্ষিণ মেরুতেই আমার সাধ মিটে গেছে। উত্তর মেরুর দিকে আমি আর যেতে নারাজ। তার চেয়ে চলুন, ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বলি আমরা এবার আমার দেশের পাশ দিয়ে যাচ্ছি—সেন্ট লরেন্সে এবার আমরা পড়ব। সেটা আমার দেশের নদী। তারই তীরে আমার বাড়ি। কুইবেক শহর তো নদীটার একেবারে পাড় ঘেঁষে। চলুন, দেখাই যাক না, ক্যাপ্টেন কী বলেন?'

নেডের অত্যুগ্র আগ্রহে আমি তাকে নিয়ে ক্যাপ্টেন নিমোর কামরায় উপস্থিত হলাম।

ক্যাপ্টেন নিমো নিবিষ্ট মনে কাজ করছেন।

আমি বললাম, 'ক্যাপ্টেন, আপনার সঙ্গে একটা জরুরি ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই।'

ক্যাপ্টেন নিমো কাজের মধ্যে ডুবে থেকেই বললেন, 'আমি এখন ব্যস্ত, জরুরি একটা কাজ করছি। যদি তেমন কিছু বলার থাকে পরে না হয় আসবেন।'

ক্যাপ্টেন নিমোর ব্যবহার আমার কাছে মোটেই বাঞ্ছনীয় মনে হল না। বাধ্য হয়ে আবারও বললাম, 'আমি এমন একটা জরুরি ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি যা কিছুতেই দেরি করা যায় না।'

'আপনি কি হঠাৎ কোনো কিছু আবিষ্কার করে ফেললেন নাকি অধ্যাপক? যাক গে, এ বাক্সটায় আমার সমুদ্রবিষয়ক গবেষণার যাবতীয় তথ্য, আমার জীবনকাহিনী ও

www.pathagar.com

নোটিলাসের যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করা আছে। এগুলো একটা বাক্সবন্দি হয়ে জলের ওপর ভেসে বেড়াবে। আমার আন্তরিক ইচ্ছা, আমার দেহাবসানের পর এ ইতিহাস যেন বেঁচে থাকে। আর এও আমার ইচ্ছা, নোটিলাসের শেষ জীবিত লোকটা বাক্সটাকে জলে ভাসিয়ে দেবে।

আমি ভেতরে ভেতরে পুলকিত হলাম, একদিন না একদিন ক্যাপ্টেন নিমোর যাবতীয় রহস্যের পর্দা সরে গিয়ে মানুষের নজরে আসবে। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে আমি একসময় আমতা আমতা করে বললাম, 'আমাদের ব্যাপারে আপনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী? আপনি কি আমাদের আমৃত্যু এখানে বন্দি করেই রাখবেন?'

'অধ্যাপক আমি তো আগেই বলেছি, আজও আবার বলছি, নোটিলাসের দরজা দিয়ে যে একবার ঢোকে সে আর জীবন্ত অবস্থায় বাইরে বেরোতে পারে না। ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে আর এ প্রসঙ্গে কথা বলতে উৎসাহী হবেন না এটাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা, মনে রাখবেন।'

নেড আমার মুখ থেকে ক্যাপ্টেন নিমোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা শুনে রাগে গজগজ করতে করতে বলল, 'নোটিলাস লং আইল্যান্ডের দিকে যাচ্ছে। সেখানে আবহাওয়া যেমনই থাক না কেন চম্পট দিতেই হবে।'

ঊনিশে মে নোটিলাস লং আইল্যান্ডের কাছে হাজির হল। ঝড়ের তাণ্ডব উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। ক্যাপ্টেন নিমো নোটিলাসকে জলে ডুবিয়ে না নিয়ে ওপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চললেন। ঝড় তুফানের রুদ্রমূর্তি দেখে চোখ ও মনকে তৃপ্ত করলাম। প্রায় পঁচিশ ফুট উঁচু ঢেউ ভাগ্যে না থাকলে চোখের সামনে দেখা দেখা যায় না।

রাত প্রায় সাড়ে বারোটায় নোটিলাসের ট্যাঙ্কে জল ভরার শব্দ কানে এল। বুঝলাম, সেটা জলে ডুবে যাচ্ছে। ঝড়ের জন্য আমাদের পূর্ব দিক দিয়ে যেতে হয় বলে নিউইয়র্ক বা সেন্টলরেন্সে আমাদের পালানোর আশাই ছাই পড়ল। নেড মুষড়ে পড়ল।

সতেরই মে আমরা হার্টস কনটেস্ট থেকে পাঁচ শ' মাইল দূরে প্রায় সাড়ে আট হাজার ফুট সমুদ্রের গভীরে একটা বৈদ্যুতিক তার দেখতে পেলাম। আঠার শ' সাতান্ন—আটান্ন সালে প্রথমে এটা সমুদ্রের নিচে পাতা হয়। চার শ'টা টেলিগ্রাফের বার্তা পৌঁছে দিয়েই এটা অকেজো হয়ে পড়ে। তারপর আঠার শ' তেষট্টিতে দু-হাজার মাইল লম্বা এবং চার হাজার পাঁচ শ' টন ওজনের আরও একটা তার পাতা হয়। আজ সেটাও অকেজো হয়ে পড়েছে।

নোটিলাস তখন যেখান দিয়ে যাচ্ছিল তারটা সেখানেই ছিঁড়ে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়েছিল। তারপর সাইরাস ফিল্ডের তত্ত্বাবধানে আবার তারটা জোড়া দেওয়া হয়। তারপর আর সমস্যা দেখা দেয় নি।

আঠাশে মে নোটিলাস এমারব্যান্ড দ্বীপটাকে অতিক্রম করার সময় ক্লিয়ার অন্তরীপের আলোকস্তম্ভটা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হল।

১ জুন ক্যাপ্টেন নিমো নোটিলাসকে দুই হাজার পাঁচ শ ফুট জলের তলায় নিয়ে গেলেন। এখানে সেটাকে মাটিতে দাঁড় করানো হল। একটা বিশালায়তন উঁচু ঢিবির ওপর আমার চোখ পড়ল। বুঝলাম, এটা একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত মাস্তুলবিহীন জাহাজ। ক্যাপ্টেন নিমো বললেন—'অধ্যাপক, এক সময় জাহাজটার নাম ছিল 'মার্সেইলার্স' সতের শ' বাহান্নতে প্রথম জলে ভাসানোর সময় চুয়াত্তরটা কামান এতে বসানো ছিল।

www.pathagar.com

সতের শো আটাত্তরের প্রেস্টনদের বিরুদ্ধে এবং একম্পিতে কোৎসিগ্রসের যুদ্ধে একটা অংশ নিয়েছিল। সতের শো চুরানব্বইয়ের ষোলই এপ্রিল আমেরিকা থেকে খাদ্যশস্য বহন করে নিয়ে আসার সময় একটা ব্রিটিশ জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ডুবে যায়। আজ আঠার শো আটষট্টির পয়লা জুন—ঠিক চুয়াত্তর বছর আগে এখানে, ১৭.২৮° অক্ষাংশে এবং ৭৪.২৪° দ্রাঘিমাংশের মধ্যে জাহাজটা ডুবে যায়। দুই শত ছাপ্পান্ন জন নাবিক জাহাজের গায়ে তাদের দেশের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিয়ে জাহাজের বুকে চেপেই হাসিমুখে জলে তলিয়ে যায়। জলে তলিয়ে যাবার সময় তারা সমস্বরে ধ্বনি দিচ্ছিল—'ফরাসি সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!'

এবার আমার মনে পড়ল জাহাজটার নাম দেওয়া হয়েছিল—'দ্য অ্যাডভেঞ্চার'।

নোটিলাস ইতিমধ্যে জলের ওপরে উঠতে লাগল। অকস্মাৎ একটা গুলির শব্দ কানে এল। ক্যাপ্টেন নির্বাক। দৌড়ে বাইরে এসে দেখি একটা যুদ্ধজাহাজ। নোটিলাস থেকে সেটার দূরত্ব মাত্র দুই মাইল।

নেড এবার পালাবার জন্য রীতিমত ক্ষেপে গেল। সে বলল, 'স্যার, জাহাজটা যখন আমাদের থেকে এক মাইল দূরত্বে চলে আসবে তখন আমি অবশ্যই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব, কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।

মুহুর্মুহু কামান দাগার শব্দ কানে আসতে লাগল। আর সেটা আমাদের লক্ষ করে কামান দেগে চলেছে দেখে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবার জোগাড় হল।

নেড বলল, 'স্যার, তারা বোধ হয়, এ জীবটার রহস্য জেনে ফেলেছে।'

আমার মনেও কেমন যেন সন্দেহ হল। আমরা যখন আব্রাহাম লিঙ্কনে ছিলাম তখন ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট নিঃসন্দেহ হতে পেরেছিলেন, এটা অবশ্যই দাঁতাল তিমি নয়—ডুবোজাহাজ।

এমন সময় ক্যাপ্টেন নিমোকে অদ্ভুত একটা কাজ করতে দেখলাম। কালো একটা পতাকা উড়িয়ে দিলেন। আমাদের নিচে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

আমি চোখ দুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে বললাম. 'একী ক্যাপ্টেন, আপনি কি তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে চাচ্ছেন নাকি!'

'কেবল আক্রমণই নয় অধ্যাপক, আমি তাদের ডুবিয়ে ঝাড়ে বংশে ধ্বংস করে ছাড়ব।

'অধ্যাপক, অনুগ্রহ করে আমার কাজের সমালোচনা, বা বিচার করতে উৎসাহী হবেন না। এখন আপনার লোকজন নিয়ে নিচে চলে যান। আমাকে কর্তব্য সম্পাদন করতে দিন। আমি চাই, জাহাজটা কাদের সেটা আপনার কাছে গোপন রাখতে।'

আমি এবার নেড ও কনসিলকে নিয়ে গোমড়ামুখে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলাম।

নোটিলাস এবার ক্রোধোন্মত্ত হিংস্র জানোয়ারের মত ওই অতিকায় জাহাজটাকে কায়দা কৌশল করে পূর্বদিকে টেনে আনতে লাগল।

আমি আবার সাহসে ভয় করে ক্যাপ্টেন নিমো-র পাশে এসে দাঁড়ালাম। তিনি ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন—'হতচ্ছাড়া ওই জাহাজটার জন্যই আমি প্রিয়বন্ধু ও প্রিয়জনদের হারিয়ে সর্বসান্ত হয়েছি, যন্ত্রণায় দগ্ধে মরছি। আজ আমিই বিচারক। আমার কথাই আইন। ওকে আমি ধ্বংস করবই—করতেই হবে আমাকে।'

www.pathagar.com

আমি ব্যস্তপায়ে নেড আর কনসিলের কাছে ছুটে এসে বললাম—'আজ রাত্রের মধ্যে ক্যাপ্টেন ওই জাহাজটাকে ডুবিয়ে দেবেন। আমার মতে, এতবড় একটা অন্যায় কাজের সঙ্গী হওয়ার চেয়ে উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রে ডুবে মরা অনেক, অনেক শ্রেয়।'

নেড ও কনসিল সোল্লাসে আমাকে সমর্থন করল।

তখন রাত্রি তিনটা। আমি গুটিগুটি প্লাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালাম। সকাল ছয়টা পর্যন্ত সেখানেই অস্থিরভাবে কাটিয়ে দিলাম। ওই জাহাজটার সঙ্গে নোটিলাস-এর ব্যবধান যখন মাত্র দেড় মাইল দাঁড়াল, তখন নতুন করে গোলাবর্ষণ শুরু হল।

আমি এবার বুঝতে পারলাম, নোটিলাস ক্রমে জলে তলিয়ে যাচ্ছে। বুঝলাম, নোটিলাস তলা থেকে ওই জাহাজটার ওপর আঘাত হানার পরিকল্পনা করেছে।

আচমকা কোন জিনিস দুমড়ে মুচড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে আমি শিউরে উঠলাম। হ্যাঁ, অনুমান অভ্রান্ত। নোটিলাস ওই জাহাজটার তলদেশে ছিদ্র করে দিয়েছে। শোঁ শোঁ শব্দে জল ঢুকছে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল। ব্যস, জাহাজটা টুকরো টুকরো হয়ে ডুবে যেতে লাগল।

আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্যাপ্টেন নিমো-র দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম—কী ভয়ঙ্কর প্রকৃতির নিষ্ঠুর এ লোকটা! জ্বলন্ত ঘৃণায় এর মনটা পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে গেছে।

ক্যাপ্টেন নিমো বিষণ্ণমুখে ধীরপায়ে একটা ঘরে ঢুকলেন—এক মহিলা আর শিশুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মহিলাটার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে ডুকড়ে ডুকড়ে কাঁদতে লাগলেন। ব্যাপার দেখে আমি রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দরজা জানালা বন্ধ করে যবনিকা টেনে দেওয়া হল।

নেড-এর ব্যাপার স্যাপার দেখে কনসিল একেবারে ঘাবড়ে গেছে।

নোটিলাসের পাহারা দেয়ার কাজ মোটামুটি বন্ধ হয়ে গেছে। কনসিল ও নেড এরকম একটা অপূর্ব সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য বদ্ধপরিকর। আমার কাছে পালাবার প্রস্তাব দিল। নোটিলাসের কাছাকাছি এখন যে দেশ বা যে রাজ্যই হোক না কেন তারা এবার পালাবেই। তাদের প্রস্তাবে আমিও রাজি হয়ে গেলাম। যে করেই হোক বন্দিজীবনের অবসান এবার ঘটাতেই হবে।

দশটা বাজতে চলল। আমরা তিনজন সাধ্যাতীত সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সেলুনের দরজায় গেলাম। দেখলাম, ক্যাপ্টেন নিমো দরজার দিকে পিছন দিয়ে বসে আপন মনে অর্গান বাজিয়ে চলেছেন। তারপর রুদ্ধশ্বাসে লাইব্রেরি সিঁড়ি ও প্লাটফর্ম একসময় ডিঙিয়ে এলাম।

আচমকা নোটিলাস থেকে তার গর্জন কানে এল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আতঙ্কিত হয়ে ভাবতে লাগলাম—তবে কি সুচতুর ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের দুরভিসন্ধির কথা টের পেয়ে গেছেন!

উৎকর্ণ হয়ে লক্ষ করলাম। নিঃসন্দেহ হলাম, কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর নয়। ঘূর্ণিঝড়—সুতীব্র ঘূর্ণিঝড়ের শব্দ আমাদের কানে চিৎকারের মতো মনে হতে লাগল।

আমাদের নৌকা ঢেউয়ের তালে তারে বার বার ওঠানামা করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগল। তবে তখনও আমাদের নৌকাটা নোটিলাসের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা।

www.pathagar.com

একসময় চমকে উঠলাম। গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাবার জোগাড় হল। লক্ষ করলাম, আমাদের নৌকাটা তীব্রবেগে ঘূর্ণিঝড়ের দিকে ধেয়ে চলেছে।

তারপর যা কিছু ঘটল সবই আমার অজ্ঞাতসারেই ঘটল। আমি সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে এক সময় চোখ মেলে তাকালাম। দেখি, এক জেলের ঝুপড়িতে আমি শুয়ে।

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম, সেটা গফোডন দ্বীপপুঞ্জ।

সেখান থেকে সরাসরি ফ্রান্সে যাবার কোন উপায় ছিল না। সেখান দিয়ে কেপ নর্থের একটা স্ট্রিমার মাসে একবার যাতায়াত করে। অনন্যোপায় হয়ে আমাকে তারই জন্য অধীর প্রতীক্ষায় থাকতে হল।

কেউ বিশ্বাস করবে কি না জানি না। কিন্তু আমি তো জানি, দশ মাসে আমি বিশ হাজার লীগ পাড়ি দিয়ে এসেছি।

কিন্তু নোটিলাস-এর কী অবস্থা হল? কোথায়, কী অবস্থায়ইবা সেটা আছে, কিছুই আমার জানা নেই। আর ক্যাপ্টেন নিমো? তিনি কি আজ জীবিত, নাকি প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে তাঁর দেহাবসান ঘটেছে? আমি কি কোনদিনই তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানতে পারব না? তিনি কে, কোন্ দেশের অধিবাসী? কে আমাকে বলে দেবে? তার অন্তরের অতল গহ্বরে ডুব দিতে না পারলে তাঁকে চেনা, সত্যোপলব্ধি করা সম্ভব নয়। উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের ঢেউ কি কোনদিন ক্যাপ্টেন নিমোর জীবনকথা সম্বলিত পাণ্ডুলিপিটা সমেত বাক্সটাকে সভ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে?

---

www.pathagar.com

মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ ২৩ মার্চ, বিকেল চারটা।

প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল-উদ্দাম-সফেন জলরাশির ওপর, শূন্য থেকে কয়েকটা পুরুষ-কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগল। গল্প বা হাসি-মশকরা নয়। জটিল সমস্যা সমাধানের সুচিন্তিত পরামর্শ। বরং বলা চলে টুকরো টুকরো প্রশ্নোত্তর।

'কী ব্যাপার বল তো? আমরা কি তবে ওপরে উঠে চলেছি?'

'না। ওপরে অবশ্যই নয়।'

'ওপরে উঠছি না? তবে? তবে কি নিচেই নামছি?'

'হ্যাঁ, নিচেই নামছি বটে। তবে পরিস্থিতি অবশ্যই স্বাভাবিক নয় স্যার, আমরা ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি হয়েছি।'

ক্যাপ্টেন যন্ত্রচালিতের মতো সোজা হয়ে বসেত গিয়ে বলে উঠলেন, 'ভয়ঙ্কর বিপদ? কী রকম পিবদ বলো তো? ব্যাপার কী?'

'স্যার, আমরা পড়ে যাচ্ছি। দ্রুত নিচে পড়ছি।'

'এক কাজ করো, যত তাড়াতাড়ি পার বেলুনের ওজন কমানোর চেষ্টা করো।'

'সে চেষ্টারও ত্রুটি রাখি নি স্যার। অনেক আগে থেকেই বেলুনের ওজন কমানোর জন্য সাধ্যমতো প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি।'

অস্থিরচিত্ত ক্যাপ্টেন ধমকের স্বরে প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন, 'ওজন কমানোর ব্যবস্থা যদি গ্রহণ করাই হয়ে থাকে তবে বেলুনটা ওপরে উঠছে না কেন?'

বিপরীত দিক থেকে কোনো উত্তরই ভেসে এল না।

কয়েক মুহূর্ত পরে আবার ক্যাপ্টেনের অস্থির কণ্ঠ ভেসে এল, 'কী ব্যাপার, মুখে কুলুপ এঁটে দিলে কেন?' উন্মত্ত বাতাসের তীব্র আর্তনাদ ভেদ করে ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ ভেসে এল, 'কী বুঝছ, বেলুনটা কি এখন ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যাচ্ছে?'

'না।' নিচের দিক থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ ভেসে আসছে, ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্রের নিরবচ্ছিন্ন গর্জন।

কথাটা শেষ হতে না হতেই আর্তস্বর শোনা গেল, 'সর্বনেশে কাণ্ড ঘটতে চলেছে! গেল! সব গেল! সমুদ্র যে মাত্র শো পাঁচেক ফুটও নিচে নয়। ফেলে দাও, ফেলে দাও। বেলুনে ভারী যা কিছু আছে সমুদ্রের জলে ফেলে দাও। বেলুনটাকে ভারমুক্ত করো। গোলাবারুদ, বন্দুক আর খাবারদাবার যা কিছু আছে ফেলে দিয়ে বেলুনটাকে হাল্কা করে ফেলো।'

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে দেখা দিল এক প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের তাণ্ডব। সর্বগ্রাসী ঝড়। এ ধ্বংসাত্মক ঝড় পরবর্তীকালে কিংবদন্তী হয়ে দীর্ঘদিন মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে জাগরুক ছিল। গল্পকথার মতো দীর্ঘদিন সবার মুখে মুখে ঘুরে বেরিয়েছে।

১৮ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত ধ্বংসাশ্রয়ী এ ঝড়ের তাণ্ডবে ইওরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার বিরাট একটা ভগ্নাংশ ধ্বংসস্তূপের রূপ নিয়েছিল।

www.pathagar.com

বিশালায়তন একটা বেলুন উন্মত্ত এলোপাথাড়ি ঝড় আর জমাটবাঁধা কুয়াশার কবলে পড়ে অনবরত চক্কর মারতে মারতে নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল। বেলুনের গা থেকে ঝুলন্ত একটা দোলনায় পাঁচজন লোক হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে, অদৃষ্ট সম্বল করে বিরুদ্ধ প্রকৃতির মোকাবেলা করে চলেছে। তারা পাশাপাশি কাছাকাছি অবস্থান করলেও ঘন কুয়াশায় কেউ কাউকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না।

বাতাসের দাপটে দোল খেতে খেতে বেলুনটা ক্রমে নিচের দিকে নামছে তো নামছেই।

বিপদ আরো ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দেখা দিল যখন বোঝা গেল বেলুনটার আয়তন ক্রমেই কমে আসতে লাগল। আসলে তার গায়ে সূক্ষ্ম একটা ছিদ্র তৈরি হয়ে তিরতির করে গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে। চিপসে যাওয়া বেলুনটা পথহারা উদ্ভ্রান্ত পথিকের মতো ধীর-মন্থর গতিতে গর্জনরত ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্রের দিকে নেমে যাচ্ছে।

একদিকে উম্মত্ত ঝড়ের তাণ্ডব আর পায়ের তলায় ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্রের নিরবচ্ছিন্ন ফোঁস ফোঁসানি। উভয়ের মর্মভেদী গর্জনে বুকের ভেতরে ফুসফুস দুটোকে অস্থির করে তুলেছে। বেলুনের নির্ভীক যাত্রীরা আর কতক্ষণই বা নিজেদের মনকে শক্ত রাখতে পারে। ক্রমেই তাদের মধ্যে হতাশা আর হাহাকার দানা বাঁধতে লাগল।

আরও—আরও নিচে নেমে গেল দিশাহারা বেলুনটা। বেলুনের যাত্রীরা প্রমাদ গুণল। সমুদ্রের বুকে বেলুনসমেত তারা আছাড় খেয়ে পড়বে। উঃ! ভাবলেও বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবার জোগাড়। তকন কি মর্মান্তিক অবস্থা যে তাদের হবে তা স্বয়ং ঈশ্বরও বুঝি অনুমান করতে পারছেন না।

বেলুনের যাত্রীদের শরীরের স্নায়ুগুলো ক্রমে শিথিল হয়ে আসতে লাগল।

এবার দমকা ঝড়ের কবলে পড়ে বেলুনটা তিরতির করে আবার ওপরের দিকে কিছুটা উঠে গেল।

রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে পুব-আকাশে হাল্কা রক্তিম ছোপ ফুটে উঠল। সমুদ্রের বুকে শুরু হল আলো-আঁধারীর খেলা। কুয়াশার দাপটও অনেকাংশে হাল্কা হয়ে আসতে লাগল।

সকাল হল। চব্বিশে মার্চের সকাল।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস। বেলুনটা আবার দ্রুত নিচের দিকে নামতে লাগল।

হাল্কা কুয়াশায় মোড়া গোপন অন্তরাল থেকে আবার পূর্বপরিচিত সেই নির্ভীক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'এবার? এবার কর্তব্য কী?'

'বেলুনে অদরকারি জিনিসপত্র এখনো যা কিছু আছে সব সমুদ্রে ফেলে দেয়াই একমাত্র কর্তব্য।'

ক্যাপ্টেনের নির্দেশে বেলুন থেকে ঝপাঝপ কিছু জিনিসপত্র সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হল।

হায় ঈশ্বর! এতকিছু সত্ত্বেও বেলুনের গতি উর্ধ্বমুখী না হয়ে ক্রমেই নিচের দিকে নেমে যেতেই লাগল। এখন উপায়!

মুমূর্ষু রোগীর মতো ধুঁকতে ধুঁকতে বেলুনটা তিরতির করে আরও কিছুটা পথ এগিয়ে গেল। কিন্তু জল আর জল। গাছপালা বা বাড়িঘরের চিহ্নমাত্রও কারো নজরে পড়ছে না।

আবার অদৃশ্য আর্তস্বর শোনা গেল—'আবার—আবারও আমরা নিচের দিকে নামতে শুরু করেছি! আমরা নামছি—পড়ে যাচ্ছি!'

www.pathagar.com

'হায় ঈশ্বর! কপালে কি এই লিখে রেখেছিলে—সমুদ্রের বুকেই বেঘোরে প্রাণটা খোয়াতে হবে! ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্রে ডুবেই যাব! ডুবেই মরতে হবে আমাদের!'

বাতাসবাহিত নির্ভীক কণ্ঠের অভয়বাণী শোনা গেল—'ধ্যুৎ! এমন করে মুষড়ে পড়লে চলবে কেন? বেলুন থেকে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সবকিছু ফেলে দেওয়া হয়েছে কি? ভালো করে দেখে নাও, কিছু পড়ে রয়েছে—'

'না। একমাত্র ডলারের থলেটা রয়ে গেছে। চার হাজার ডলারের থলেটার কথা বলছি।'

'ফেলে দাও। মিছে মায়া করে সর্বনাশ ডেকে আনার কোন মানে হয় না। ডলারের থলেটাও ফেলে দাও।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই ছোট্ট একটা থলে নিচে নেমে গেল। ঝপ করে পড়ল গিয়ে জলে।

কই, তেমন কাজ হল না তো। আচমকা ভারমুক্ত হওয়ায় বেলুনটা মুহূর্তের জন্য ওপরে উঠে গেল বটে, কিন্তু সে আর কতটা বা কতক্ষণের জন্য? পরমুহূর্তেই আবার সেটা বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করল।

আবার সে অদৃশ্য কণ্ঠের স্বর ভেসে এল—'কাজ হল কই? এখন উপায়? বেলুন থেকে সবই তো ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর তো কিছুই ফেলার মতো নেই।'

'আছে। দোলনা—উইলো কাঠের দোলনাটা এখনও রয়ে গেছে।'

ব্যস, বেলুনের যাত্রীরা শক্ত দড়ি দিয়ে বেলুনের আঙটার সঙ্গে নিজেদের বেঁধে ফেলল। আর ছুরি দিয়ে দোলনার বাঁধন কেটে ফেলে দিল সমুদ্রের জলে।

দোলনাটার ভারমুক্ত হওয়ার ফলে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বেলুনটা দ্রুতগতিতে অনেকখানি ওপরে উঠে গেল। কিন্তু কপাল নেহাৎই মন্দ। কিছুতেই কিছু হবার নয়। বেলুনের গ্যাস কমতে কমতে একেবারেই চিপসে পড়ছে। এদিকে বাতাসের বেগও অনেকাংশে কমে এসেছে। ফলে বেলুনটা আবার ধুঁকতে ধুঁকতে নিচের দিকে নামতে লাগল।

সকাল পেরিয়ে দুপুর হল। ক্রমে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হতে চলেছে। ঘড়িতে প্রায় চারটা বাজে। বেলুন আর সমুদ্রের মাঝখানে আর মাত্র পাঁচশো ফুট ব্যবধান। ব্যস, তারপরেই যাত্রীদের নিয়ে বেলুনটা ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্রের বুকে আছাড় খেয়ে পড়বে।

পর মুহূর্তেই একটা কুকুর তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

আরোহীদের একজন বলল—'মনে হচ্ছে টপ কিছু দেখতে পেয়েছে—কিছু বলতে চাচ্ছে।

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, ডাঙা—ঐ তো ডাঙা! ডাঙা দেখা যাচ্ছে! ঐ যে ডাঙা!'

ডাঙা। সত্যি ডাঙা দেখা যাচ্ছে বটে। তবে তার দূরত্ব ত্রিশ মাইল তো হবেই। বাতাস এখনি প্রতিকূল থাকলে পথটুকু পাড়ি দিতে ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে। আর এরই মধ্যে বেলুনের গ্যাস বেরিয়ে একেবারে চিপসে যাবে। ব্যস, সমুদ্রের বুকে ধপাস করে পড়তে হবে। এতগুলো প্রাণীর সলিলসমাধি হয়ে যাবে।

বেলুনের অভিযাত্রীরা হতাশায় ভেঙে পড়ার জোগাড় হল। তবু তারা মনকে শক্ত করল, যে করেই হোক তাদের আজ্ঞাতপরিচয় দ্বীপটাকে পৌঁছাতে হবেই।

হায় ঈশ্বর! শেষ রক্ষা বুঝি আর করা গেল না। বেলুনটা ক্রমে আরও চিপসে গিয়ে সমুদ্রের একেবারে কাছাকাছি নেমে গেল। জলের ছিঁটা লেগে তার নিচের দিকটা ভিজে

www.pathagar.com

জবজবে হয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াল যে, জলের ঝাপটায় অভিযাত্রীরাও ভিজে গেল। জল ছিটকে এসে নাকে মুখে লাগছে।

ক্যাপ্টেন আর্তনাদ করে উঠলেন, 'সবাই শরীর থেকে দড়ির বাঁধন খুলে ফেলো। এবার সবাই দড়ি ধরে বাদুরের মতো ঝুলতে লাগল। ঢেউয়ের সঙ্গে বারবার আছাড় খেয়ে খেয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে এগোতে লাগল।

ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে খেতে অভিযাত্রীরা একসময় অজ্ঞাতপরিচয় দ্বীপটার নরম বালির ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরি নয়, অভিযাত্রীরা এক এক করে দড়ি ছেড়ে বালির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল। পাঁচ-পাঁচজন লোকের বোঝা হাল্কা হওয়ায় বলুনটা ভারমুক্ত হয়ে দ্রুতগতিতে ওপরের দিকে উঠে গেল। চোখের পলবে সটা বাতাসে ভাসতে ভাসতে সবার নজরের বাইরে চলে গেল।

আনন্দ-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বেলুনের অভিযাত্রীরা বালির ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? অকস্মাৎ সবার মুখে নেমে এল বিষাদের কালো ছায়া। ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং আর তাঁর প্রিয় কুকুরটা কোথায়? কোথায় তাঁরা? তবে? তবে কি বেলুনেই রয়ে গেলেন?

আমেরিকার মানুষ যখন গৃহযুদ্ধের তাণ্ডবলীলায় মত্ত, তখনকার এক রোমহর্ষক কাহিনী নিয়ে এ গল্পের অবতারণা।

আঠার শো পঁয়ষট্টি সালের কথা।

বল্গাহীন অত্যাচার আর সর্বনাশা এ মারণযজ্ঞকে বন্ধ করার অভিপ্রায়ে জেনারেল গ্রান্ট রিচমন্ড নগর অবরোধ করলেন। তিনি দাসপ্রথা উচ্ছেদকারীদের একজন বড় সমর্থক। অভিশপ্ত দাসপ্রথা উচ্ছেদ করার জন্য তিনি সাধ্যাতীত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু হায়। এত কিছু সত্ত্বেও তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হল। রিচমণ্ড নগর আয়ত্তে আনতে পারলেন না। কাজ যেটুকু হল, জেনারেল গ্রান্টের কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার রিচমন্ড নগরে বন্দি হয়েই রইলেন। আর তাদের ওপর চলতে লাগল বল্গাহীন অত্যাচারের তাণ্ডব। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, প্রবীণ ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং। আর তাঁর সঙ্গে গারদে ঢুকতে হয়েছে নিউইয়র্ক হ্যারাল্ডের প্রধান সাংবাদিক গিডিয়ান স্পিলেট। চল্লিশের কাছাকাছি তাঁর বয়স। তিনি পিস্তল ও কলম—উভয় ব্যাপারেই সমান পারদর্শী। বন্দি হবার পূর্বমুহূর্তে তিনি দিনলিপির পাতায় লিখেছেন, 'এক পুলিস আমার দিকে রাইফেল উঁচিয়ে নজর রেখে চলেছে। কিন্তু—'

কর্তব্যকর্মে অবিচল না হলে এমন নজির কেউ সৃষ্টি করতে পারেন? মৃত্যু শিয়রে জেনেও কেউ কি কর্তব্যকর্মে এমন অবিচল থাকতে পারেন? সাংবাদিক গিডিয়ান স্পিলেট এবং প্রবীণ ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং পূর্বপরিচিত নন। তারা কেউই কাউকে চিনতেন না। তবে হ্যাঁ, উভয়েই উভয়ের নাম ও গুণাবলির কথা অনেকবার শুনেছেন।

সাংবাদিক গিডিয়ান স্পিলেট এবং ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং উভয়েই রিচমন্ড নগরের সীমানার মধ্যে বন্দি ছিলেন, কড়া পাহারায়। নগরের সীমানা ছেড়ে বাইরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। একদিন ঘটনাচক্রে তাঁরা পরস্পরের সান্নিধ্যে এলেন।

www.pathagar.com

পরিচয় হল। মনের ভাব বিনিময় হল। মতলব আঁটতে লাগলেন, প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে কীভাবে রিচমন্ড নগর থেকে পালিয়ে যাওয়া যায়।

সাইরাস হার্ডিং আর গিডিয়ান স্পিলেট যখন প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাবার মতলব আঁটছেন ঠিক তখনই প্রবল বিক্রমে নেবুচ্যাডনেজার শহরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। তিনি ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর দীর্ঘদিনের ভৃত্য। অনন্য তাঁর প্রভুভক্তি। হার্ডিং বহুদিন আগেই তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রভু শত্রুকবলিত। জানতে পেরে কৃতজ্ঞতাবশত দুর্বার গতিতে ঢুকে পড়েছেন নগরের অভ্যন্তরে। তাঁর একমাত্র সঙ্গী ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর প্রিয় কুকুর।

রিচমন্ড নগর অবরোধ করেও জেনারেল গ্রান্ট তেমন সুবিধা করতে পারলেন না। কেবলমাত্র নগরের মানুষগুলো আটকা পড়ায় কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যস, এর বেশি কিছু নয়।

ব্যাপার দেখে জেনালের লি মহা ফাঁপরে পড়লেন। তিনি রিচমন্ডের সর্বেসর্বা—শাসনকর্তা। সেনাপতিদের আদেশ পাঠানো তো দূরের ব্যাপার, তাঁর পক্ষে যুদ্ধের পরিস্থিতি পর্যন্ত জানা সম্ভব হচ্ছে না। কিছুতেই যখন সুবিধা করতে পারছেন না তখন বুদ্ধি করে একটা বেলুন সংগ্রহ করলেন। ভাবলেন, বেলুনটায় চেপে কয়েকজনকে নগরের বাইরে পাঠিয়ে সেনাধ্যক্ষকে খবর দেবেন।

জেনারেল লি তার মতলবটাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারলেন না। দমকা বাতাস প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। কারণ, বাতাসের বেগে বেলুন পথভ্রষ্ট হয়ে অন্য পথে চলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মনস্ত করলেন, বাতাসের বেগ একটু কমে গেলে তিনি পরিকল্পনাটাকে বাস্তবায়িত করবেন।

জেনারেল লি তাঁর গোপন অভিসন্ধিটার কথা ক্যাপ্টেন ফরেস্টারের কাছে ব্যক্ত করলেন।

জেনারেল লি এবং ক্যাপ্টেন ফরেস্টারের গোপন শলাপরামর্শের কথা প্যানক্রফট নামের এক নাবিক গোপন অন্তরাল থেকে শুনে ফেলল। সেও রিচমন্ড নগর থেকে গা-ঢাকা দেয়ার চেষ্টায় বেশ কয়েকদিন ধরে ছোঁক ছোঁক করছে। সে এবার ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করল। বেলুনটা চুরি করে রিচমন্ড গা-ঢাকা দেয়ার সুবর্ণ সুযোগের কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করল।

এমন একটা অপূর্ব সুযোগের কথা শুনে ক্যাপ্টেন হার্ডিং যেন আচমকা আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেন। তিনি এবার ব্যস্তপায়ে সাংবাদিক গিডিয়ান স্পিলেটকে অপূর্ব সুযোগ ও গোপন পরিকল্পনাটার কথা জানালেন।

সাংবাদিক গিডিয়ান স্পিলেট অভাবনীয় পরিকল্পনাটাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পরামর্শের মাধ্যমে স্থির করে ফেললেন, রাত্রি দশটায় বেলুন অভিযান শুরু করবেন।

বেলুনে চাপার পূর্ব মুহূর্তে ক্যাপ্টেন হার্ডিং ঈশ্বরের কাছে করজোড়ে একটাই প্রার্থনা করলেন, 'হে ঈশ্বর! ঝড়ের বেগ যেন বন্ধ করে দিও না।'

স্পিলেট, প্যানক্রফট, নেবুচ্যাডনেজার আর তার প্রিয় কুকুর টপকে নিয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডিং ঈশ্বরের নাম নিয়ে বেলুনে চাপলেন।

১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের ২০ মার্চ রাত ঠিক দশটায় অভিযাত্রীদের নিয়ে গ্যাসবর্তি বিশালায়তন বেলুনটা শূন্যে উড়ল। তিরতির করে পথ পাড়ি দিতে শুরু করল।

www.pathagar.com

নির্জন-নিরালা দ্বীপের বালির স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে গিডিয়ান স্পিলেট ফ্যাকাসে বিবর্ণমুখে ভাবতে লাগলেন, ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং কোথায় উধাও হয়ে গেলেন? জলজ্যান্ত একটা লোক একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেলেন।

গিডিয়ান স্পিলেট সঙ্গীসাথীদের নিয়ে চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলেন। বলা তো যায় না। কোন অসতর্ক মুহূর্তে উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের বুকে পড়ে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

একসময় বিস্তীর্ণ দ্বীপ ও অন্তহীন সমুদ্রের বুকে নেমে এল সন্ধ্যার অন্ধকার। অভিযাত্রীরা তবু ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

প্যানক্রফট চমৎকার একটা মতলব বের করলেন, ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর খোঁজ করে অগ্রসর হওয়ার সময় আগুন জ্বেলে পদচিহ্ন রেখে যাওয়া যাক। সকাল হলে ক্যাপ্টেন যদি তাঁদের খোঁজ করেন তবে অনায়াসেই তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন।

কাঠকুটো তো জোগাড় করা যাবে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল আগুন জ্বালা নিয়ে। আগুন জ্বালার কোনো উপকরণই তাঁদের কারো সঙ্গে নেই।

প্যানক্রফট-এর পকেটে ম্যাচ একটা ছিল বটে। সমুদ্রের জল সবকিছু ভিজিয়ে জবজবে করে দিলেও সেটার তেমন ক্ষতি করতে পারে নি।

কাঠ জোগাড় করতে গিয়ে হতাশ হতে হল। দীর্ঘ সময় হাঁটাহাটি করেও তারা এক টুকরো কাঠ জোগাড় করতে পারল না। পারবে কী করে? দ্বীপের এদিকটায় গাছগাছালি মোটে নেই। রুক্ষ-রুষ্ট। কেবল বালি আর বালি।

একসময় অভিযাত্রীরা হতাশ হয়ে বালির স্তূপের ওপর বসে পড়লেন। প্যানক্রফট চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ক্যাপ্টেনকে আমরা হয়ত কোনোদিনই খুঁজে বের করতে পারব না। উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের মানুষখেকো প্রাণীরা তাকে হয়ত খেয়েই ফেলেছে।'

মনের জমাটবাঁধা হতাশা আর হাহাকার গোপন রেখে স্পিলেট দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করলেন, 'সকাল হতে ভালো করে খুঁজলে তাঁকে অবশ্যই পাওয়া যাবে। যে করেই হোক খুঁজে বের করতেই হবে। এমনও তো হতে পারে, দ্বীপের কোথাও আছাড়া খেয়ে পড়ে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছেন। যার ফলে আমরা তাঁর হদিস পাচ্ছি না। তাঁর নিষ্প্রাণ শরীরটাকে নিজের হাতে স্পর্শ না করা পর্যন্ত আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না, তিনি আমাদের মধ্যে নেই।'

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই আবছা অন্ধকার থেকে ছপছপ আওয়াজ ভেসে এল। নেবুচ্যাডনেজার জলে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরাতে শুরু করলেন। প্রভুঅন্তঃপ্রাণ নিগ্রোটা নিজের প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে সাঁতরাতে সাঁতরাতে প্রভুর নাম ধরে অনবরত ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

একসময় ছোট্ট একটা নদী পেরিয়ে তিনি বিপরীত পাড়ে হাজির হলেন।

অভিযাত্রীরা সারাদিন দ্বীপে হাঁটাহাটি করলেন। ক্ষুধা-তেষ্টায় সবাই কাহিল হয়ে পড়েছেন।

ইতিমধ্যে হতাশ হয়ে নেবুচ্যাডনেজার সঙ্গীদের কাছে ফিরে এসেছেন।

খাবারের খোঁজে বেরিয়ে অভিযাত্রীরা কিছু ঝিনুক সংগ্রহ করলেন। কাঠকুটো জোগাড় করে আগুন জ্বালালেন। তাদের ইচ্ছা, ঝিনুকগুলো ভেঙে তাদের মাংস আগুনে ঝলসে নিয়ে পেটের জ্বালা নেভাবেন। চেষ্টা চরিত্র করে তারা করলেনও তাই।

www.pathagar.com

নেবুচ্যাডনেজার কিন্তু তাঁর প্রভু ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং-এর কথা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছেন না। তিনি অন্য সবার থেকে দূরে বিষণ্ণমুখে বসে নিবিষ্টচিত্তে অনবরত প্রভুর কথাই ভেবে চলেছেন। তাঁর একমাত্র চিন্তা, কী করে প্রভুকে খুঁজে বের করবেন।

*   *   *

বেলুনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পূর্ব মুহূর্তে বেলুন থেকে শাবল, গাঁইতি, কাটারি প্রভৃতি ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল। এবার অভিযাত্রীরা এক-এক করে সেগুলো খুঁজে বের করলেন। জড়ো করলেন এক জায়গায়।

অভিযাত্রীরা এবার খোঁজাখুঁজি করে একটা গুহা বের করলেন। আশ্রয় নেবার মতো উপযুক্ত জায়গাই বটে। প্যানক্রফট তাঁর গাদা বন্দুকটাও খুঁজে পেলেন।

সূর্য পশ্চিম আকাশের গায়ে হেলে পড়েছে। অভিযাত্রীরা দ্বীপের বুকে হাঁটাহাঁটি করতে করতে এক বিচিত্র ধরনের পাখি দেখতে পেল। ইয়া দশাসই তাদের এক একটার চেহারা। প্যানক্রফট গাদা বন্দুক দিয়ে তাদের একটাকে ঘায়েল করতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র তিনি নন। মাথা খাটিয়ে অদ্ভুত একটা ফন্দি বের করলেন। শক্ত অথচ সরু লতার এক প্রান্তে বাবলা কাঁটার মতো কাঁটা বেঁধে তাতে কেঁচোর টোপ গেঁথে দিলেন। সেগুলো পাখির বাসায় রেখে তারা দূরে ঘাপটি মেরে রইলেন। পাখিরা বাসায় ফিরে টোপগুলোকে গপ্‌গপ্‌ করে গিলতে চেষ্টা করল। ব্যস, কাঁটাগুলো গলায় বিঁধে শিকারির কব্জায় পড়ে গেল বহুসংখ্যক পাখি। দারুন কায়দা—কাঁটার বড়শী দিয়ে পাখি শিকার।

পাখির মাংস আর ঝিনুকের মাংস পুড়িয়ে ভোজের আয়োজন করা হল। সে সঙ্গে পাখির ডিমের ওমলেট তো রইলই।

নেবুচ্যাডনেজার-এর মন কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। প্রভু ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং-এর অনুপস্থিতিই তাঁর বিষণ্ণতার একমাত্র কারণ।

পাখির ডাকে সকাল হল। অভিযাত্রীরা দেখলেন, নেবুচ্যাডনেজার গুহায় অনুপস্থিত। তারা ব্যস্ত হয়ে তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। সবাই ধরেই নিলেন, তিনি হন্যে হয়ে প্রভুকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ল। বিকেল হতে না হতেই প্রবল ঝড় উঠল। ঝড়ের প্রকোপ ক্রমে বেড়েই চলল। অভিযাত্রীরা গুহা ছেড়ে বেরোতেই পারলেন না। তখন রাত্রি প্রায় আটটা। অভিযাত্রীরা গুহার ভেতরে গুটিসুটি মেরে বসে। এমন সময় গুহার অদূরে টপ বিকট স্বরে আর্তনাদ জুড়ে দিল।

অভিযাত্রীরা টপ-এর আর্তস্বর শুনে হুড়মুড় করে গুহার বাইরে বেরিয়ে এলেন।

হার্বার্ট একসময় চেঁচিয়ে উঠলেন—'তিনি আসছেন। অবশ্যই আসছেন তিনি। প্রভুকে ছাড়া টপ একা ফিরে আসার পাত্র নয়।'

কথা বলতে বলতে হার্বার্ট একটি জ্বলন্ত কাঠ অন্ধকারে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—'টপ, আমরা এখানে। এদিকে—এদিকে আমরা।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তীব্রস্বরে ঘেউ ঘেউ করতে করতে টপ গুহার মুখে হাজির হল। তাকে একা দেখে সবাই অবাক হলেন। আরও অবাক হলেন, যখন দেখলেন, ঝড়-বাদলের মধ্যে সে ছুটে এসেছে অথচ তার গায়ে এক ফোঁটাও জল নেই।

www.pathagar.com

অসম্ভব—একেবারেই রহস্যজনক এক ব্যাপার। কী করে যে সম্ভব হল তা কারো পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব হল না। রহস্যময় দ্বীপের প্রথম ধাপ।

স্পিলেট বললেন, 'আমার মনে হয় টপকে যখন পাওয়া গেছে তখন তার প্রভুকেও অবশ্যই পাওয়া যাবে।'

অস্থিরচিত্ত টপ ঘেউ ঘেউ করতে করতে পিছন ফিরে আবার হাঁটতে লাগল। অভিযাত্রীরা ব্যস্তপায়ে তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

টপ আর্তনাদ করতে করতে একটা গর্তের মুখে পৌঁছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর্তস্বরের মাধ্যমে অভিযাত্রীদের সঙ্কেত দিয়ে টপ অকস্মাৎ গর্তটার মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

অভিযাত্রী তিনজন কোনোরকম দ্বিধা না করে নিজেদের জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়ে টপের পিছন পিছন রহস্যজনক গর্তটার মধ্যে ঢুকে গেলেন।

গর্তটার মধ্যে ঢুকেই অভিযাত্রীরা চমকে উঠলেন। তাঁরা দেখলেন, ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এলিয়ে পড়ে রয়েছেন। আর তাঁর শিয়রে বিষণ্ণমুখে বসে তাঁরই প্রিয় নেবুচ্যাডনেজার।

স্পিলেট ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন। ক্যাপ্টেনের ডানহাতটা তুলে তাঁর নাড়ীর অবস্থা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। পরমুহূর্তেই সোল্লাসে বলে উঠলেন—'আছে! আছে—প্রাণ আছে, ক্যাপ্টেন বেঁচে আছেন।'

নেবুচ্যাডনেজার যেন অকস্মাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলেন। কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলে উঠলেন, 'বেঁচে আছেন? আমার প্রভু বেঁচে আছেন? কীভাবে, কী করলে এখন সংজ্ঞা ফিরে পাবেন বলুন?'

নেবুচ্যাডনেজার যেন অকস্মাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলেন। কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলে উঠলেন, 'বেঁচে আছেন? আমার প্রভু বেঁচে আছেন? কীভাবে, কী করলে এখন সংজ্ঞা ফিরে পাবেন বলুন?'

সংক্ষেপে নেবুচ্যাডনেজারকে প্রবোধ দিয়ে স্পিলেট এক মুঠো শুকনো ঘাস পাতা তুলে নিয়ে ক্যাপ্টেনের হাত ও পায়ের পাতাগুলোতে জোরে জোরে ঘষতে লাগলেন।

নেবুচ্যাডনেজার এবার বললেন যে তাঁর প্রভুকে খুঁজে বের করার জন্য গভীর রাতে তিনি সবার অলক্ষে গুহা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। প্রভুর নাম ধরে গলা ছেড়ে চিৎকার করে দ্বীপে ছুটোছুটি দাপাদাপি করতে লাগল। প্রভুভক্ত কুকুর টপও তাঁর সঙ্গে ছিল। একসময় টপ তাঁর টাউজার ধরে টানতে টানতে গর্তটার ভেতরে নিয়ে গেল। নেবুচ্যাডনেজার দেখলেন, তার প্রভু ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এলিয়ে পড়ে।

স্পিলেটের কাছে এবার রহস্যটা পরিষ্কার হল—ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও টপের গায়ে কেন এক ফোঁটাও জল লাগে নি।

শুকনো ঘাস-পাতা দিয়ে অনবরত ঘষার ফলে ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং-এর ফ্যাকাশে বিবর্ণমুখে দেখা দিল রক্তের ছোপ। ফিরে এল প্রাণের স্পন্দন। ঠোঁট দুটো বারবার নাড়তে লাগলেন। স্পিলেট বুঝলেন, তিনি কিছু বলতে চাইছেন। তার মুখের ওপর ঝুঁকে তাঁকে কথা বলাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন শত চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারলেন না।

স্পিলেটের অনুরোধে হার্বার্ট ও প্যানক্রফট ডালপালা দিয়ে একটা স্ট্রেচারের মতো তৈরি করে নিয়ে এল।

www.pathagar.com

স্পিলেটের সাহায্যে ক্যাপ্টেন কোনোরকমে উঠে বসলেন।

ক্যাপ্টেনকে স্ট্রেচারে তুলে অভিযাত্রীরা তাদের আশ্রয়স্থল গুহাটায় নিয়ে এলেন।

ঝলসানো পাখির মাংস আর কয়েক ঢোক জল পান করে ক্যাপ্টেন এবার কিছুটা সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। তিনি এবার সহযাত্রীদের কাছে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কাহিনী বলতে লাগলেন, 'সমুদ্রের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে আমরা যখন এগোচ্ছিলাম তখন আচমকা ঢেউয়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে হাতের দড়িটা ফসকে সমুদ্রের বুকে আছাড় খেয়ে পড়ে যাই। ক্রোধোন্মত্ত ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে এগোতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি আমার ঠিক আগে আগে প্রিয় কুকুর টপও সাঁতরে চলেছে। বুঝলাম, আমার পিবদ দেখে সেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পাহাড়সমান ঢেউগুলোর সঙ্গে লড়াই করে করে আমি কাহিল হয়ে এলিয়ে পড়তে লাগলাম। আমার বিপদ দেখে টপ আমার ট্রাউজারের কোণা কামড়ে ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। টেনে হিঁচড়ে পাড়ে তুলে নিল। তারপর যে কী হল, কিছুই বলতে পারব না।'

ম্যাচে দুটো মাত্রই কাঠি ছিল। অনেক আগেই সে দুটো ফুরিয়ে গেছে। আগুন জ্বেলে রাখা হয়েছিল। চেষ্টা করে টিকিয়েও রাখা হয়েছিল দীর্ঘসময়। কিন্তু ক্যাপ্টেনের খোঁজ করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত সে আগুন নিভে গেছে।

ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং একজন কৃতী বৈজ্ঞানিক। অদ্ভুত তাঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতা। পৃথিবীর তাবড় তাবড় বৈজ্ঞানিকরা আজ পর্যন্ত যেটুকু জানতে পেরেছেন তিনি একাই যেন তা জেনে ফেলেছেন। তাঁর ছোট্ট মাথাটার ওপর তাঁর সহযাত্রীদের অগাধ বিশ্বাস।

প্যানক্রফট কোথায় যেন শুনেছিল, অসভ্য জঙ্গলীরা শুকনো কাঠে কাঠ ঠুকে আগুন জ্বেলে থাকে। তিনি দু টুকরো কাঠ সংগ্রহ করে ঠোকাঠুকি করতে লাগলেন। তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে ক্যাপ্টেন বললেন, 'আরে করছ কী হে? আগুন জ্বালার জন্য এত ভাবনা কিসের। অপেক্ষা করো, আমি কেমিক্যাল দেশলাই তৈরি করে দিচ্ছি।'

ক্যাপ্টেনের কথা শুনে সবার তো চক্ষুস্থির। সবাই বলাবলি করতে লাগল, তিনি কি জাদু জানেন নাকি?

হার্বার্ট চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বলে উঠলেন, 'স্যার, আপনি কি যাদুমন্ত্র জানেন, নাকি আপনার কাছে বার্নিং গ্লাস আছে?'

'বার্নিং গ্লাস? না, বার্নিং গ্লাস ছিল না বটে। তবে একটু আগে একটা বার্নিং গ্লাস তৈরি করে নিয়েছি। আমার আর স্পিলেটের ঘড়ির কাচ দুটো খুলে নিয়ে পাশাপাশি রাখলাম। কাদামাটি দিয়ে ফাঁকগুলো বন্ধ করে দিলাম। একটামাত্র জায়গায় সামান্য একটু ফাঁক রেখে দিতে ভুললাম না। সেটা দিয়ে জল ঢুকিয়ে দিলাম। ব্যস, এতে পেটটা পুরু এবং কিনারা পাতলা একটা লেন্স তৈরি হয়ে গেল। যাকে বলা হয় কনভেক্স লেন্স। তার ওপর সূর্যের উত্তাপ পড়ে কেন্দ্রীভূত হয়, সূচাগ্র বিন্দুতে জড়ো হয়। সূর্যের উত্তাপে খড়কুটোর ওপর লেন্সটাকে ধরলে কিছুক্ষণের মধ্যে দপ করে জ্বলে ওঠে।

কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে। তার ওপর দমকা বাতাসের তাণ্ডব তো রয়েছেই। আগুন জ্বালানো সম্ভব হওয়ায় সবাই চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়াল। রাত্রি একটু গভীর হলে সবাই স্ফূর্তি করে শূয়োরের রোস্ট দিয়ে রাত্রের খাবার সারলেন।

পরদিন ২৯ মার্চ। সকাল দশটা বাজে। অভিযাত্রীরা এবার পর্বতারোহণ শুরু করলেন। ব্যাসাল্ট আর পিউনিস পাথর দিয়ে তৈরি পাহাড়। পাহাড়ে উঠতে উঠতে হার্বার্ট কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখতে পেলেন। বড় বড় জানোয়ারের পায়ের ছাপ।

www.pathagar.com

আরও কয়েক পা এগোতেই কয়েকটা বেশ বড়সড় ভেড়াকে ছুটোছুটি করে পালিয়ে যেতে দেখলেন। হার্বাট উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'মুশামন! মুশামন!'

কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অভিযাত্রীরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে পারলেন। উত্তর দিকে দৃষ্টিপাত করতেই নজরে পড়ল কেবল জল আর জল। আর দক্ষিণ দিকে দ্বিতীয় চূড়াটা কাৎ হয়ে থাকায় বোঝা গেল না জল, নাকি কোনো মহাদেশ সেটা। দ্বিতীয় চূড়াটায় পা দিতেই লাভাস্রোতের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক জমে থাকতে দেখা গেল। অচিরেই রাতের অন্ধকার নেমে এল। বাধ্য হয়ে তারা সেখানেই রাত কাটাতে লাগলেন।

মাথার ওপরে শুক্ল পক্ষের চাঁদ। ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর পক্ষে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। তিনি চাঁদের হাল্কা আলোয় হার্বাটকে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে লাগলেন। এক জায়গায় পৌঁছে তারা একটা বিশালায়তন গহ্বর দেখতে পেলেন। ক্যাপ্টেন হার্ডিং ব্যস্ত হয়ে গহ্বরটার ভেতরে উঁকি দিয়ে চমকে উঠলেন। দেখলেন প্রকৃতিদেবী যেন নিজেই চমৎকার একটা সিঁড়ি তৈরি করে রেখেছেন। তিনি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলেন। হার্বাট তাঁকে নিঃশব্দ অনুসরণ করে চললেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং তাঁর সহযোগী হার্বাটকে নিয়ে ঘন অন্ধকার এক স্থানে হাজির হলেন। অন্ধকারের জন্য তিনি বুঝতে পারলেন না, সেটা কোনো দ্বীপ, নাকি কোন মহাদেশ।

হাজারখানেক ফুট উঁচুতে যখন তাঁরা উঠলেন তখন নিঃসন্দেহ হলেন সেটা আসলে কোনো মহাদেশ নয়, একটা দ্বীপ। উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের বুকে দ্বীপটা অতিকায় একটা তিমি মাছের পিঠের মতো ভাসছে।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং জ্বালামুখ থেকে ওপরে উঠে এলেন। তিনি দীর্ঘ পথ হাঁটাহাঁটি করে আর একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হলেন। দ্বীপটায় মনুষ্যবসতি নেই। আর যদি থাকত তবে অবশ্যই কদিনে চোখে পড়ত।

সেদিনটা ছিল ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের ৩০ মার্চ। সেদিন গুপ্তঘাতকের গুলিতে আব্রাহাম লিঙ্কন প্রাণ দেন। অভিযাত্রীরা তাঁর সুমহান কীর্তিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে দ্বীপটার নামকরণ করলেন—'লিঙ্কন আইল্যান্ড।'

১৬ এপ্রিল। সারা বছরে যে চারদিন প্রকৃত সময় গড় সময়ের সমান হয় কাল অর্থাৎ ১৭ এপ্রিল সেই দিন। এ তারিখে সূর্য ঠিক বারোটায় মধ্যরেখা অতিক্রম করে যায়।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর ইচ্ছা, সুযোগ যখন হাতের মুঠোয় রয়েছে তখন লিঙ্কন দ্বীপটার দ্রাঘিমা নির্ণয় করবেন।

ক্যাপ্টেনের ইচ্ছার কথা শুনে স্পিলেট বললেন—'দ্রাঘিমা নির্ণয় করতে হলে তো সেক্সট্যান্ট যন্ত্র চাই-ই।'

ক্যাপ্টেন মুচকি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, সেক্সট্যান্ড যন্ত্র ছাড়াই দ্রাঘিমা নির্ণয় করব।'

ক্যাপ্টেন দ্রাঘিমা নির্ণয়ের কাজে মেতে গেলেন। কাঠ চেঁছে ছুলে দুটো চ্যাপ্টা স্কেলের মতো তৈরি করে ফেললেন। এবার দুটো বাবলার কাঁটা দুদিকে আটকে চমৎকার একটা কম্পাস তৈরি করলেন। এবার সদ্য তৈরি কম্পাসটা নিয়ে অভিযাত্রীদের সঙ্গে করে প্রসপেক্ট হাইটে উঠে গেলেন। আকাশের দিকে ঘাড় ফেরাতেই হঠাৎ সাদার্নক্রস নজরে পড়ল। তার নিচে দেখা গেল আলপা নক্ষত্র যার গা ঘেঁষাঘেঁষি করে অবস্থান করছে দক্ষিণ মেরু। ক্যাপ্টেন হার্ডিং জানেন, দক্ষিণ মেরু থেকে আলফা নক্ষত্রের ব্যবধান সাত

www.pathagar.com

শো ডিগ্রি। তিনি এবার কম্পাসের কাঁটা ফেললেন আলফার দিকে। এভাবে দিগন্ত নক্ষত্রের কৌণিক দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হল। এবার অঙ্ক কষে বের করে ফেললেন দিগন্ত থেকে আলফার দূরত্ব কত।

সেদিনটা ছিল ইস্টার সানডে। ক্যাপ্টেন হার্ডিং সেদিন কোনো কাজই করলেন না। পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মনটাকে চাঙা করে নিলেন।

বিকেলে জঙ্গলে হাঁটাহাঁটি করতে করতে ক্যাপ্টেন ওঅর্ম উড নামে একটা গাছ আবিষ্কার করে ফেললেন। এটা একটা উল্লেখযোগ্য কাজ বটে। পটাসিয়াম নাইট্রেটে এ গাছের কাঠ শুকিয়ে নিতে পারলে দেশলাইয়ের অভাব পূরণ করা যায়। দ্বীপে পটাসিয়াম নাইট্রেট আর সোডা প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এবার আর আগুন জ্বালানোর কোনই সমস্যা রইল না।

ভাগ্য যদি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লিঙ্কন আইল্যান্ডেই রেখে দেয় তবে আমাদের ধীরে ধীরে বেঁচে থাকার মতো বন্দোবস্ত করে নেয়া দরকার।

হার্বার্ট একা হাঁটতে হাঁটতে বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। একসময় তাঁকে বিমর্ষমুখে ফিরে আসতে দেখে ক্যাপ্টেন হার্ডিং বিস্মিত হলেন।

হার্বার্ট ফ্যাকাশে বিবর্ণমুখে ফিরে এসে ক্যাপ্টেন হার্ডিঙের কাছে দুটো মাত্র শব্দ কোনোরকমে উচ্চারণ করতে পারলেন, 'আগুন' আর 'অসভ্য জঙ্গলী'। শব্দ দুটো অভিযাত্রীদের মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার করল। তাঁরা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে চললেন। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা একসময় আগুনটার কাছে হাজির হলেন। ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে কয়েকবার উঁকি দিয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডিং বলে উঠলেন, 'সাধারণ আগুন নয়—গন্ধকের আগুন। তাই আগুনের রঙ নীলাভ। আর গ্রানাইট পাথর দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, একসময় এখানে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি ছিল। দিনের পর দিন লাভা জমতে জমতে গ্রানাইট পাথর সৃষ্টি হয়েছে।

বিকেলের দিকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে হার্বার্ট এক সময় সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওই যে ক্যাঙারু! ক্যাঙারু। ক্যাঙারুর মাংস খুবই সুস্বাদু।'

নেবুচ্যাডনেজারকে সঙ্গে নিয়ে হার্বার্ট লাঠিসোটা হাতে করে ক্যাঙারুর পিছনে ধাওয়া করলেন। কিন্তু জানোয়ারগুলো লম্বা লম্বা পা চালিয়ে চোখের পলকে গভীর জঙ্গলে গা-ঢাকা দিল। তারা বাধ্য হয়ে বিষণ্ন মনে ফিরে এলেন।

২ এপ্রিল। ক্যাপ্টেন হার্ডিং মৌলিক পথ অবলম্বন করে লিঙ্কন দ্বীপটার মধ্যমা নির্ণয় করলেন।

সূর্য ঠিক কোন স্থান থেকে উদিত হয়েছে লক্ষ করলেন। গতদিন কোন স্থান থেকে উদিত হয়েছিল তাও সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ রেখেছিলেন। এবার লক্ষ করলেন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ঠিক বারো ঘন্টা চব্বিশ মিনিট। অর্থাৎ ছয় ঘন্টা বারো মিনিটের পর সূর্য মধ্যরেখায় উপস্থিত হয়।

ক্যাপ্টেন হার্ডিঙের চেষ্টায় অভিযাত্রীরা ইট তৈরি করে মাথাগোঁজার মতো চমৎকার একটা আস্তানা বানিয়ে ফেলল। এখানেই যখন থাকতে হবে তখন ঠাঁই তো একটা চাই।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বাস্তবিক একজন যথার্থ বিজ্ঞানসাধক। তিনি এক-একটি কাজের মাধ্যমে একের পর এক বিস্ময় উৎপাদন করে চলেছেন।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন এবার বারো ফুট একটা লাঠি নিলেন। সেটাকে সমুদ্র থেকে ২০ ফুট এবং পাহাড় থেকে ৫০০ ফুট দূরে পুঁতে দিলেন। মাটির ওপরে রইল দশফুট আর বাকি চার ফুট পুঁতে দিলেন মাটির তলায়।

ক্যাপ্টেন এবার মাটিতে শুয়ে শুয়ে ক্রমে পিছিয়ে যেতে লাগলেন। যেখানে দেখলেন, লাঠির মাথা ও পাহাড়ের চূড়াটা এক দৃষ্টিরেখায় অবস্থান করছে সেখানে ছোট লাঠিটাকে মাটিতে পুঁতে দিলেন। এবার দেখলেন, কাঠি ও লাঠিটার মধ্যে ব্যবধান ১৫ ফুট এবং কাঠি ও পাহাড়ের দূরত্ব ৫০০ ফুট। এবার পাথরের গায়ে জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন ও অঙ্ক কষার কাজে মেতে গেলেন। হিসেব কষে বের করলেন ভূমি থেকে পাহাড়টার চূড়ার উচ্চতা ৩৩৩ ফুট। ব্যস, এবার কাঁটাকম্পাস নিয়ে বালির ওপর বৃত্ত ও বৃত্তচাপ প্রভৃতি আঁকার কাজ শুরু করলেন। একটা বৃত্ত এঁকে তাকে ৩৬৮ ভাগে ভাগ করে ফেললেন। এর মাধ্যমে নির্ণয় করলেন দক্ষিণ মেরু থেকে আলফার উচ্চতা ২৭ ডিগ্রি।

এবার বাকি রইল দ্রাঘিমা নির্ণয় করা। ভাবলেন দুপুরবেলা একাজটা সারবেন।

অভিযাত্রীরা এবার দলবেঁধে এগিয়ে এমন জায়গা আবিষ্কার করলেন, যেখানে সুবিশাল এলাকা জুড়ে মুক্তোর ছড়াছড়ি।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মুক্তোর দিকে কোনোই ঝোঁক নেই। অতিকায় সিলমাছগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলে উঠলেন—'আমাকে আবারও এখানে আসতে হবে। কথা বলতে বলতে ছয় ফুট লম্বা একটা লাঠি সমুদ্রের তীরে পুঁতে দিলেন। লাঠির মাথাটাকে দক্ষিণদিকে সামান্য হেলিয়ে দিলেন। এটাকে তিনি সূর্যঘড়ি হিসাবে ব্যবহার করলেন। স্পিলেট বালির ওপর ছায়ার অবস্থান লক্ষ করে করে সময় বলতে লাগলেন আর ক্যাপ্টেন হার্ডিং তা শুনে শুনে বালির ওপর আঁক কষতে লাগলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং পাথরের গায়ে অঙ্ক কষে বের করে ফেললেন, লিঙ্কন দ্বীপ ও ওয়াশিংটনের মধ্যে দূরত্ব ঘণ্টা-পাঁচেকের পথ।

সূর্য ষাট মিনিটে পনেরো ডিগ্রি পথ পাড়ি দিচ্ছে। অর্থাৎ পঁচাত্তর ডিগ্রি যেতে সময় লাগে পাঁচ ঘণ্টা। আর ওয়াশিংটন গ্রিন উইচের সাতাত্তর ডিগ্রি পশ্চিমে অবস্থান করছে। এ হিসাব অনুযায়ী লিঙ্কন দ্বীপের দ্রাঘিমা একশো বাহান্ন ডিগ্রি (পশ্চিম)। তা যদি নাও হয় তবে অবশ্যই একশো পঞ্চাশ থেকে একশো পঞ্চান্ন ডিগ্রির মধ্যে।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর অঙ্ক কষার বিরতি নেই। হিসেব নিকাশের মাধ্যমে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন, লিঙ্কন দ্বীপ ও তাহিতি আর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে ব্যবধান কম করেও ১২০০ মাইল। আবার লিঙ্কন দ্বীপ থেকে নিউজিল্যান্ডের দূরত্ব ১৮০০ মাইলের বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। আর এও হিসেব কষে তিনি বের করে ফেললেন লিঙ্কন দ্বীপ থেকে সাড়ে চার হাজার মাইল অতিক্রম করলে তবে আমেরিকার উপকূলে হাজির হওয়া যাবে।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং সহযাত্রী সহকর্মীদের নিয়ে আলোচনা করলেন, বিশালায়তন একটা নৌকা তৈরি করতে পারলে ১২০০ মাইল দূরবর্তী তাহিতি দ্বীপে পৌঁছানো সম্ভব। আর তার জন্য কুড় ল, করাত, হাতুড়ি ও র‍্যাদা প্রভৃতি অব্যশই চাই। আর দ্বীপে রয়েছে অফুরন্ত খনিজ পদার্থ। মহা মূল্যবান সব খনিজ পদার্থ। একমাত্র কারখানা গড়ে তোলার মাধ্যমেই সেগুলোকে কাজে লাগানো সম্ভব।

নৌকো তৈরি বা কারখানা গড়ে তোলার ব্যাপারে প্যানক্রফট-এর মোটেই মাথাব্যথা নেই। তাঁর কাছে সবচেয়ে দরকারি একটা বন্দুক তৈরি করা।

www.pathagar.com

বন্দুকের ব্যাপারে প্যানক্রফটকে ভাবিত দেখে স্পিলেট তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন. 'বন্দুক তৈরির ব্যাপারটা মোটেই তেমন সমস্যা নয়। কার্তুজ তৈরির বারুদ তৈরি করার উপযোগী অফুরন্ত সোরা, গন্ধক আর কয়লা রয়েছে দ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তে। ব্যাপারটা নিয়ে—'

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডিং বলে উঠলেন—'যত সহজ ভাবছেন, বন্দুক তৈরির কাজটা কিন্তু অত সহজ নয়। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ছাড়া বন্দুক তৈরি করা সম্ভব নয়। তবে প্যানক্রফটকে আমি হতাশ করছিনে। ভবিষ্যতে অবশ্যই চেষ্টা করে দেখব, যদি প্যানক্রফটের আশা পূরণ করা সম্ভব হয়।' এবার প্যানক্রফটের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন—'প্যানক্রফট, আমরা সেফটি আইল্যান্ডে পৌঁছালে আপনি লোহা সাফাইয়ের কাজে লেগে যাবেন। লোহা তাতাবার জন্য সিলের চামড়া দিয়ে হাঁপর তৈরি করে নেব।'

সেফটি আইল্যান্ডে গিয়ে অভিযাত্রীরা খুঁজতে খুঁজতে একটা সিলকে বালির ওপর শুয়ে রোদ পোহাতে দেখলেন। ব্যস, তারা চারদিক থেকে বেচারা জলচর প্রাণীটাকে ঘিরে ফেললেন। লাঠির আঘাত আঘাতে তাকে মেরে ফেললেন। ক্যাপ্টেন হার্ডিং তার চামড়টাকে শুকোবার জন্য বালির ওপর মেলে দিলেন।

বিশে এপ্রিল। ক্যাপ্টেন হার্ডিং আকরিক লোহা থেকে চমৎকার একটা কুড় ল তৈরি করে ফেললেন।

একুশে এপ্রিলের সকাল। ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর এক মুহূর্তও নষ্ট করার মতো সময় নেই। তিনি একটি লোহার স্তর বের করলেন। মাটিতে ছোট্ট একটা গর্ত করে তাতে কয়লার টুকরো ছড়িয়ে দিলেন। মাটি দিয়ে চমৎকার একটা চোঙ তৈরি করে হাঁপরের গায়ে লাগিয়ে দিলেন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল কাজ চলার মতো একটা হাঁপর। হাঁপরের বাতাস পেয়ে কয়লা পুড়ে কার্বলিক অ্যাসিডে পরিণত হবে, তারপরই তৈরি হবে কার্বন মনোক্সাইড। এ পদ্ধতিতে আয়রন অক্সাইড থেকে অক্সিজেন বেরিয়ে গিয়ে পড়ে থাকবে আয়রন। এবার লোহা গলানোর কাজ শুরু হল। লোহা গলে জলের মত তরল হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন হার্ডিং গলানো লোহা থেকে অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করে ফেললেন। এভাবেই পৃথিবীর প্রথম ধাতুবিদরা লোহা বের করেছিলেন। ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর উদ্ভাবনী প্রতিভা ও অনন্য অধ্যবসায়ের ফলে তৈরি করা সম্ভব হল—কুড় ল, কোদাল, শাবল, গাঁইতি, ছুরি, কাঁচি ও খুন্তি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি।

পাঁচই মে। অভিযাত্রীরা সদ্য তৈরি করা যন্ত্রপাতি নিয়ে ছাউনিতে ফিরে এলেন। সেদিনের মতো বিশ্রাম।

৬ মে। সামনে শীতকাল। অভিযাত্রীরা ভালো একটা গুহার খোঁজে বেরোবার উদ্যোগ নিলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং একটা গভীর রহস্যের মুখোমুখি হলেন। রেডক্রিক থেকে জল বেরিয়ে এসে হ্রদে আছাড় খেয়ে পড়ছে। কিন্তু জল তো কোথাও বেরিয়ে যাচ্ছে না। তবে? এত জল কোথায় যাচ্ছে? কোনো না কোনো পথ ধরে লেকের জল সাগরে গিয়ে মিশছে। ব্যাপারটার কিনারা করার জন্য হার্ডিং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর ব্যাপার দেখে স্পিলেট যারপরনাই বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'জনাব, এ কী পাগলামি জুড়ে দিলেন! হ্রদের জল যে পথ দিয়েই সাগরে গিয়ে পড় ক না কেন তা নিয়ে আপনার মাথায় পোকা ঢুকল কেন, ভেবে পাচ্ছি নে তো!'

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন হার্ডিং চোখে-মুখে চিন্তার ভাব ফুটিয়ে তুলে বললেন—'আমার বিশ্বাস, কোনো না কোনো সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে হ্রদের জল তীব্র বেগে এগিয়ে গিয়ে সাগরে পড়ছে। সে সুড়ঙ্গটাকেই আমি মাথা গোঁজার জায়গা হিসাবে ব্যবহার করতে চাই।

প্রভুভক্ত কুকুর টপ সর্বক্ষণ ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর পিছুন পিছুন ঘুরে বেড়ায়। মুহূর্তের জন্যও সে তাঁর পিছুন ছাড়ে না।

টপ একসময় ঘেউ ঘেউ করতে করতে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঠিক সে মুহূর্তেই অতর্কিতে অতিকায় একটা তিমি জলের ওপর ভুস করে ভেসে উঠল। টপ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিমিটা অকস্মাৎ জলে তলিয়ে গেল। টপও জলে ডুব দিল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে আচমকা জলের প্রায় ফুট দশেক উঁচুতে ছিটকে উঠে গেল। কোনো এক অদৃশ্য শক্তি যেন তার ওপর ভর করেছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপারই বটে। তার গায়ে রক্ত থাকা তো দূরের ব্যাপার, সামান্য একটা আঁচড়ও লাগে নি।

একটু পরেই হ্রদের জল ভীষণরকম তোলপাড় হতে শুরু হল। লাল জল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ব্যাপারটা আরও অবিশ্বাস্য রূপ নিল যখন দেখা গেল অতিকায় তিমিটার নিঃসাড় দেহ জলের ওপর ভেসে উঠল। দানবাকৃতি প্রাণীটা নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ অবস্থায় জলের ওপর ভাসতে লাগল। এবার বুঝা গেল, ওটা তিমি নয়। বিশালাকৃতি একটা ডুগং। গলার কাছে বেশ বড়সড় একটা কাটা দাগ।

টপের দাঁতে ক্ষত অবশ্যই নয়। ছুরি জাতীয় ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।

ব্যাপার দেখে প্যানক্রফট আর্তনাদ করে উঠল—'হায় ঈশ্বর! ছুরি—জলের তলায় ছুরি কোত্থেকে আসবে!'

মুচকি হেসে ক্যাপ্টেন হার্ডিং বললেন—'ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও মোটেই অসম্ভব নয়। এমন একটা রহস্যময় দ্বীপে সবই সম্ভব।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি এবার বললেন—'জল থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আমাকে কে গর্তটার ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল? ঝড় বাদলের দিনে কে টপকে সম্পূর্ণ শুকনো অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছিল? জলের তলায় কেই বা ডুগংটাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেছে, এমন সব রহস্য একের পর এক আমাদের চোখের সামনে হাজির হচ্ছে যার হিসাব আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি করতে অক্ষম। নির্ঘাত কেউ না কেউ আমাদের এমন রহস্যের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আর সে আমাদের ওপর প্রতি মুহূর্তে নজর রেখে চলেছে। কে? কে সে? তাকে খুঁজে বের করাও আমাদের অন্যসব জরুরি কাজগুলোর মধ্যে একটা।' ক্যাপ্টেন হার্ডিং কপালের চামড়ায় দুশ্চিন্তার ভাজ এঁকে অন্যমনস্কভাবে কথাগুলো ছুড়ে দিলেন।

৭ মে। ক্যাপ্টেন হার্ডিং হ্রদের ধারে, ডুগং বধের জায়গাটায় হাজির হলেন। রহস্যটা তাকে উদ্ধার করতেই হবে। কে সে? কী সে চায়? কেনই বা জোঁকের মতো তাঁদের পিছনে লেগে রয়েছে?

ক্যাপ্টেন হার্ডিং অকস্মাৎ লক্ষ করলেন, হ্রদের জলে স্রোতের টান দেখা দিয়েছে। পর মুহূর্তের লক্ষ করলেন—ঘূর্ণিপাক। বিরাট একটা ঘূর্ণিপাক। জল দ্রুতবেগে চক্কর খাচ্ছে। তিনি ঝট করে শুয়ে পড়ে ভূমিতে কান পাতলেন। আচমকা উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন—'পেয়েছি! পেয়েছি! এখানে, মাত্র কয়েক ফুট নিচেই সুড়ঙ্গ রয়েছে।'

www.pathagar.com

স্পিলেট হাঁটতে হাঁটতে সেখানে হাজির হলেন। উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে ক্যাপ্টেন হার্ডিং তাঁকে বললেন—'সুড়ঙ্গ! জলটাকে কোন একটা পথে বের করে দিয়ে আমি সুড়ঙ্গটাকে শুকিয়ে ফেলব। যেদিকে সমুদ্র রয়েছে সেদিকটা গ্রেনেট দিয়ে উড়িয়ে দেব। মাত্র ফুট তিনেক জল কমিয়ে দিতে পারলেই কাজ মিটিয়ে ফেলতে পারব।'

স্পিলেট চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বললেন—'এ কী আজব কথা শোনাচ্ছেন ক্যাপ্টেন। বারুদ দিয়ে গ্রেনেট ফাটাবেন? তাও আবার কেবল গান পাউডার ব্যবহার করে?'

'ঈশ্বরের কৃপায় প্রয়োজনীয় মালমশলা দ্বীপেই অঢেল রয়েছে। কেবল বুদ্ধি ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে বিস্ফোরক তৈরি করে নিতে হবে।'

ব্যস। ক্যাপ্টেন হার্ডিং কাজে লেগে গেলেন। বিশেষ ধরনের সামুদ্রিক গুল্ম পুড়িয়ে সোডা সমৃদ্ধ ক্ষার তৈরি করা হল। তা দিয়ে সাবান তৈরি করা হল। এতে চর্বি থেকে গ্লিসারিন পৃথক হয়ে গেল। মৃত ডুগংটার চর্বি আগেভাগেই যত্ন করে রেখে দেয়া হয়েছিল। তা এখন কাজে লাগানো হল। সোডার সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে তরল পদার্থ তৈরি করে নেয়া হল। এবার তেজস্ক্রিয় নাইট্রোগ্লিসারিন। এ দিয়ে কেবল সুড়ঙ্গটাকেই নয় সমগ্র দ্বীপটাকেই উড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। অনায়াসে গ্রানাইট পাথর গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়া কিছুমাত্রও অসম্ভব নয়।

২১ মে। ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর নির্দেশে প্যানক্রফট গাঁইতি-শাবল দিয়ে গর্ত খোঁড়ার কাজে মেতে গেলেন। দিনভর হাড়ভাঙা খাটুনি করে প্রয়োজনীয় গর্তটা খুঁড়ে ফেলা সম্ভব হল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং তিনটা খুঁটি গর্তে পুঁতে তাদের মাথাগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে দিলেন। তার মাথায় একটা বড়সড় লোহার টুকরো ঝুলিয়ে রাখলেন। এবার গন্ধকের বারুদ ছড়িয়ে গায়ে মাখিয়ে দিলেন। তারপর লোহার টুকরোটার ঠিক নিচে নাইট্রোগ্লিসারিন ঢেলে দিলেন। ব্যস, কাজ সারা হয়ে গেল। এবার গন্ধকের বারুদমাখানো দড়িটার গায়ে দিলেন আগুন ধরিয়ে। দড়িটা পুড়তে পুড়তে একসময় লোহার টুকরোটা নাইট্রোগ্লিসারিনের ওপর দুম করে পড়ে গেল। বিকট আওয়াজ হল। সম্পূর্ণ দ্বীপটা তিরতির করে কেঁপে উঠল। এমনকি মাইল দুই দূরে যে-সব অভিযাত্রী ছিলেন তাঁরাও দমাদম আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। আর ইয়া বড় বড় পাথরের চাঁই শোলার মতো আকাশের দিকে উঠে যেতে লাগল। রীতিমতো এক তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। প্রবল বেগে হ্রদের জল সাগর গিয়ে পড়তে লাগল। ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মুখে যুদ্ধজয়ের হাসি ফুটে উঠল।

সুড়ঙ্গটার পরিধি বাড়িয়ে চওড়া করা দরকার। ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর নির্দেশে প্যানক্রফট গাঁইতি-শাবল নিয়ে কাজে লেগে গেলেন।

সুড়ঙ্গটার ভেতরে দিয়ে অগ্রসর হতে গিয়ে অভিযাত্রীরা লক্ষ করলেন, তার ছাদটা ক্রমেই উঁচু হয়ে গেছে। সবার আগে আগে টপ হেঁটে চলেছে। কিছুটা পথ পাড়ি দিয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে কর্কশস্বরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। সবাই ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন। বুঝলেন, অতিকায় কোনো জলচর প্রাণী হঠাৎ কুয়োর ভেতরে ঢুকে গেল। সেটাকে দেখেই টপ এমন চিল্লাচিল্লি করছে।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন হার্ডিং অঙ্ক কষে সিদ্ধান্তে এলেন, কুয়োটা কম হলেও নব্বই ফুট গভীর তো হবেই।

গুহার ভেতরে যাতে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে সেজন্য তার গায়ে গর্ত তৈরি করতে সবাই লেগে পড়লেন। দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলে তা শেষপর্যন্ত সম্ভব হল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং গুহাটাকেই মাথাগোঁজার স্থান হিসাবে নির্বাচিত করলেন। তার নামকরণ করলেন 'গ্রানাইট হাউস'।

জুন মাস পড়ল। শীতের প্রকোপ ক্রমেই বেড়ে চলল। নতুন বাসস্থলে এসে অভিযাত্রীরা নিশ্চিন্ত হলেন। এবার গুহার ভেতরে আলোর সমস্যা দূর করতে মোমবাতি তৈরি করা দরকার।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং মোমবাতি তৈরি করার কাজে লেগে পড়লেন। সালফিউরিক অ্যাসিড, চুন আর সিলের চর্বি দিয়ে তিনি চমৎকার মোমবাতি তৈরি করে ফেললেন। সলতে তৈরি করলেন শাক সবজির আঁশ দিয়ে।

শীত! হাড়কাঁপানো শীত! শীতের প্রকোপ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ক্যাপ্টেন হার্ডিং চমৎকার কয়েক জোড়া জুতা তৈরি করে ফেললেন। চামড়ার অভাব পূরণ করল সিলের চামড়া। আর গরম পোশাক তৈরি করলেন ভেড়ার মতো লম্বা ল্যাজওয়ালা মুশামনের চামড়া দিয়ে। গায়ে চাপালে রীতিমত গরম বোধ হয়।

লিঙ্কন দ্বীপে প্রয়োজনীয় কোনো সামগ্রীরই অভাব নেই। একরকম গাছের শেকড় থেকে টক সরবৎ তৈরি করা হল, যা দারুণ উপাদেয়। মাছ, মাংস, ঝিনুক আর লবণ তো অফুরন্ত। ম্যাপল গাছ দিয়ে চিনির অভাব মেটানো সম্ভব হল। এবার দরকার চায়ের মতো কোন ক্লান্তি দূরকারী পানীয়। একরকম ঘাস দিয়ে সে অভাবও মেটানো গেল বটে।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বনের পথ দিয়ে যাতায়াতের সময় দুধারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, ব্রেডফুড জাতীয় কোনো গাছ যদি নজরে পড়ে। তা দিয়ে রুটির অভাব মেটানো সম্ভব।

হার্বার্ট দেশে থাকার সময় পায়রা পুষতেন। হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে গেল। দেশে পায়রার খাবার হিসেবে ক্যান্টের পকেটে গম রাখতেন। পকেটের এক কোণে অদ্ভুতভাবে কয়েকটা গমের দানা আটকে ছিল। তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে সেগুলোকে ভেজা মাটিতে পুঁতে দিলেন। বৃষ্টির জল পেয়ে তাতে চারাগাছ গজাল। সেগুলো ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগল।

পাঁচ জুলাই ক্যাপ্টেন হার্ডিং বিকেলের দিকে তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন।

হাঁটতে হাঁটতে স্পিলেট বললেন, 'ক্যাপ্টেন, মহাদেশে যেসব জন্তু জানোয়ার দেখা যায় এখানকার জঙ্গলেও সে সবের অভাব নেই। ব্যাপারটা আশ্চর্য হবার মতোই বটে, তাই না?'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং মুচকি হেসে তাঁকে সমর্থন করতে গিয়ে বললেন, 'দ্বীপটার গঠনবৈচিত্র্য আমাকেও ভাবতে উৎসাহিত করছে, সুদূর অতীতে দ্বীপটা কোনো মহাদেশের অঙ্গ ছিল। শোনা গেছে, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলেশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া মিলে নাকি পৃথিবীর ষষ্ঠ মহাদেশ ছিল। তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এদেশটাও সমুদ্রের জলে তলিয়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। বর্তমান কেবল পর্বতের চূড়াটা মাথা উঁচিয়ে

www.pathagar.com

অতীতের স্বাক্ষর বহন করছে। প্রবাল কীটের দৌরাত্ম্যে সমুদ্রের বুকে একের পর এক দ্বীপ গড়ে উঠছে। এটা অবশ্য প্রবাল দ্বীপ নয়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতেরই ফসল।

রাত আটটায় অভিযাত্রীরা গুহাবাড়িতে ফিরে এলেন।

আগস্টের মাঝামাঝি হাড়কাঁপানো শীতে অভিযাত্রীরা গরম জামা-কাপড়ের অভাব বড্ড বেশি করে বোধ করতে লাগলেন। লিঙ্কন দ্বীপে ভল্লুক থাকলে শীতের মোকাবেলা করার উপযোগী পোশাক তৈরি করা কোনো সমস্যার ব্যাপারই ছিল না। তাই ক্যাপ্টেন হার্ডিং সহযোগীদের নিয়ে জঙ্গলে ফাঁদ পেতে কিছু সংখ্যক শেয়াল ধরে ফেললেন। কয়েকটা বুনো শূয়োরও ফাঁদে ধরা পড়ল।

দ্বীপবাসী অভিযাত্রীরা আগস্টের শেষার্ধটা ধরতে গেলে গুহার ভেতরেই কাটিয়ে দিলেন। এক সকালে বরফ পড়া বন্ধ থাকলে তারা গুহা থেকে বেরিয়েই চমকে উঠলেন। দেখলেন, গুহার মুখে চতুষ্পদ প্রাণীর থাবার চিহ্নের মত কিছুসংখ্যক চিহ্ন বরফের গায়ে জ্বল জ্বল করছে। তারা ভাবলেন, পশ্চিমের দ্বীপ থেকে কোনো হিংস্র প্রাণী প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় লিঙ্কন দ্বীপে পালিয়ে এসেছে। টপ-এর অস্থিরতা বেড়ে গেল। সে কুঁয়োটার পাড়ে বসে হরদম চিল্লাচিল্লি করতে লাগল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং নিঃসন্দেহ, নির্ঘাৎ কোনো না কোনো হিংস্র প্রাণী কুঁয়োর ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে। নইলে টপ এমন উত্তেজিত হবে কেন?

কিছুদিন যেতে না যেতেই এমন এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল যা লিঙ্কন দ্বীপের ক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে রইল।

২৬ অক্টোবর। দুপুরের দিকে অতিকায় একটা শুয়োর বাচ্চাকাচ্চাসহ ধরা পড়ল। সেদিন দুপুরে অভিযাত্রীরা পরম তৃপ্তিতে ক্যাঙারুর ঝোল আর বাচ্চা শুয়োরের স্যাঁকা মাংস দিয়ে ভোজ সারতে মেতে গেলেন। মাংস চিবোতে গিয়ে কী যেন শক্ত একটা জিনিস প্যানক্রাফট-এর দাঁতে বাঁধল। খট করে উঠল। ভাবলেন, শুয়োরের ভাঙা দাঁত। আঙুলে করে মুখ থেকে বের করে এনেই চমকে উঠলেন 'হায় ঈশ্বর! এ যে বন্দুকের গুলি। পাণ্ডববর্জিত এ-দ্বীপে বন্দুকের গুলি এল কোত্থেকে।' ব্যাপারটা দ্বীপবাসী অভিযাত্রীদের মনে যারপরনাই বিস্মিত করল।

ম্যাকক্রুনড

হায় ঈশ্বর! বন্দুকের গুলি!

যে দ্বীপে মানুষের অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না সেখানে জানোয়ারের গায়ে বন্দুকের গুলি এল কোত্থেকে? অবশ্যই কোনো না কোনো মানুষের কাজ। কিন্তু কে সে?

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বন্দুকের গুলিটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে এক সময় বললেন—'প্যানক্রফট, বুলেটটা যার গায়ে ছিল তার বয়স কত হতে পারে, বলো তো?'

'বড়জোর মাস তিনেক। ফাঁদে আটকা পড়েও শুয়োরের বাচ্চাটা মায়ের দুধ খাচ্ছিল।'

'তবে ধরে নিতেই হয় তিন মাসের মধ্যে কেউ না কেউ তাকে গুলিবিদ্ধ করেছিল। ঠিক কি না? তাই এবার থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। হয়ত কেউ ধারে কাছে ঘাপটি মেরে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। আর সে মালয়-ডাকাত হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

www.pathagar.com

পাঁচদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে দ্বীপবাসী অভিযাত্রীরা একটা ক্যানো জাতীয় নৌকা তৈরি করে ফেললেন। উদ্দেশ্য, নৌকায় চেপে দ্বীপটাকে প্রদক্ষিণ করা। নদীগুলি দিয়ে ঘুরে ঘুরে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা, দ্বীপটায় অন্য কারো অস্তিত্ব রয়েছে কি না।

এবার অভিযাত্রীরা রীতিমতো অবিশ্বাস্য এক কাণ্ডের মুখোমুখি হলেন। অতিকায় একটা কচ্ছপকে সমুদ্রের কিনারা বরাবর বালির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে দৌড়ে গিয়ে সেটাকে চিৎ করে দিলেন। কোনোক্রমে কচ্ছপকে চিৎ করে দিতে পারলে তার পক্ষে আর চলার ক্ষমতা থাকে না। তারপরও অধিকতর সতর্কতাস্বরূপ চারদিকে পাথরের চাঁই সাজিয়ে দিলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং তখন গ্রানাইট হাউসে ছিলেন। অভিযাত্রীরা তাকে খবরটা দিতে এবং একটা ঠেলাগাড়ি এনে কচ্ছপটাকে নিয়ে যাবার জন্য সেখানে গেলেন।

ঠেলাগাড় নিয়ে এসে অভিযাত্রীরা তো রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। এতকিছু আয়োজন ব্যর্থ করে দিয়ে কচ্ছপটা পালিয়েছে। এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার ঘটল কী করে। ব্যাপারটা তাদের মনে গভীর রহস্যের সঞ্চার করল।

ব্যাপারটা ক্যাপ্টেন হার্ডিং-কে যারপরনাই ভাবিয়ে তুলল। তিনি নতুনতর এক ভাবনার জালে জড়িয়ে পড়লেন।

উনত্রিশে অক্টোবর। সকাল হতে না হতেই অভিযাত্রীরা সদ্য তৈরি নৌকাটা নিয়ে উল্লাস করতে করতে সমুদ্রের তীরে হাজির হলেন।

সমুদ্রের গা ঘেঁষে নৌকাটাকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলতে চলতে একসময় হার্বার্ট আতঙ্কিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন—'ওই—ওই যে। ওটা কী? ওটা কী? ওই যে—ওটা—'

হার্বার্ট-এর অঙ্গুলি-নির্দেশিত পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই প্যানক্রফ্‌ট আঁৎকে উঠলেন। তিনি দেখলেন, সমুদ্রের জলে দুটো ইয়া পেল্লাই পিপা ভাসছে। আর তাদের মাঝখানে একটা সিন্দুক বাঁধা। তীরের কাছাকাছি ছিল সেগুলো।

অভিযাত্রীরা জলে নেমে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সিন্দুক সমেত পিপা দুটোকে টেনে হিঁচড়ে পাড়ে তুলে আনলেন। কঠিন-কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এমন একটা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছেন।

সিন্দুকটাকে পিপে দুটোর বাঁধন মুক্ত করা হল। এবার সিন্দুকটাকে ঠেলে তাঁদের আস্তানা গ্রানাইট হাউসের সামনে নিয়ে এলেন।

সিন্দুকটাকে নিয়ে সবাই নানা জল্পনা কল্পনায় মেতে উঠলেন। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন, মালয়-দস্যুদেরই সিন্দুক এটা। কোথাও থেকে ডাকাতি করে নিয়ে পালাচ্ছিল। জাহাজডুবির ফলে তা আর তাদের বরাতে জুটল না।

অভিযাত্রীরা ছুটোছুটি করে হাতুড়ি, শাবল ও গাঁইতি নিয়ে এলেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শেষ পর্যন্ত রহস্যজনক সিন্দুকটাকে খোলা সম্ভব হল। আশ্চর্য ব্যাপারতো। দীর্ঘ সময় জলে থাকাতেও ভেতরের কোনো কিছুই নষ্ট হয় নি।

জামা কাপড়, বইপত্র, রান্নার সামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র এবং অত্যাবশ্যক বহু যন্ত্রপাতিতে সিন্দুকটা একেবারে বোঝাই। খোঁজাখুঁজি করে একটা ক্যামেরা, ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার ও সেক্সট্যান্ট ও পেন্সিল প্রভৃতিও পাওয়া গেল। বৈজ্ঞানিক গবেষণার যন্ত্রপাতি পেয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর আনন্দ যেন আর ধরে না।

আশ্চর্য ব্যাপার। সিন্দুকটায় এতসব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে কিন্তু কোনটির গায়েই লেখা নেই সেগুলো কোন দেশে এবং কবে তৈরি হয়েছে।

www.pathagar.com

রাতে খাবার আগে ক্যাপ্টেন হার্ডিং সিন্দুক থেকে পাওয়া বাইবেলটার পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

প্যানক্রফট উৎসাহিত হয়ে বললেন—'স্যার, একটা কাজ করুন। হঠাৎ করে বাইবেলের কোনো একটা জায়গা খুলুন, দেখবেন বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য কী, উপদেশ দেয়া রয়েছে।'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং হঠাৎ করে বাইবেলের একটা জায়গা খুললেন। সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকটার দিকে তার চোখ পড়ল। সেখানে লেখা রয়েছে—"ঈশ্বরের কাছে যা কিছু প্রার্থনা করা যায় তা-ই পাওয়া যায়। যে তাঁকে আন্তরিকভাবে খোঁজে, সে-ই পায়।"

৩০ অক্টোবর। সকাল হল। ঘড়িতে তখন সকাল ছয়টা বাজে।

দ্বীপবাসী অভিযাত্রীর দল ক্যানোয় চেপে মার্সি নদীপথে দ্বীপটাকে ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছেন।

একসময় হার্বার্ট গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—'ইউক্যালিপটাস! ইউক্যালিপটাস!'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন—'অস্ট্রেলিয়ার মানুষরা ইউক্যালিপটাসকে বলে 'ফিভার-ট্রি'। এগাছের হাওয়ায় জ্বর হয় ভেবে মুষড়ে পড়লে আমরা কিন্তু ভুলই করব। বরং বলা চলে, এ গাছের হাওয়ায় গা থেকে জ্বর পালিয়ে যায়।'

আরও কিছুদূর এগিয়ে তাঁরা একদল প্রাণীকে কিচির মিচির করতে করতে ডালে ডালে ছুটোছুটি করতে দেখলেন। মানুষের প্রায় সম আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণী এই প্রথম তারা দেখতে পেলেন।

বরাত মন্দ। নৌকো বালির চড়ে আটকে গেল। নদীর এ অংশে জল খুবই কম। নৌকা নিয়ে আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বুঝতে পেরে অভিযাত্রীরা নদীর পাড়ে, পাথরের ওপর শুয়ে-বসে রাত্রি কাটালেন।

পুব আকাশে রক্তিম ছোপ দেখা দিল। সকাল হল। ৩১ অক্টোবরের সকাল।

দ্বীপবাসী অভিযাত্রীরা জঙ্গলের পথ ধরে এগোতে এগোতে ছোট্ট একটা ঝর্নার ধারে হাজির হলেন। ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মনে একই চিন্তা বার বার ঘুরপাক কেতে লাগল, কদিন ধরে সমুদ্রের তীরে হাঁটাহাঁটি করেছেন তবু জাহাজডুবির কোনো চিহ্নও নজরে পড়ল না। কোনো জাহাজ যদি ডুবে নাই থাকে তবে সিন্দুকটা এল কোত্থেকে?

ঝর্নার পাড় ধরে আধ মাইলখানেক পথ পাড়ি দিয়ে তবে দ্বীপবাসীরা সমুদ্রের তীরে হাজির হতে পারলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং একটা ব্যাপার দেখে অবাক না হয়ে পারলেন না। সমুদ্রের পূর্বদিকে পাথরের যে বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে তার পশ্চিম দিকটায় ঘন সবুজের সমারোহ।

এখানে দীর্ঘ সময় ধরে হাঁটাহাঁটি করেও জাহাজডুবির কোনো চিহ্ন না দেখতে পেয়ে তিনি আরও হতাশ হলেন, একেবারেই মুষড়ে পড়লেন। তিনি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বলে উঠলেন—'তবে... তবে কি এ-দ্বীপেই কোনো মানুষ বাস করছে? নইলে শূয়োরের গায়ে বুলেটটা এলই বা কোত্থেকে?

ক্যাপ্টেন হার্ডিং তাঁর সহচরদের নিয়ে অদূরবর্তী কার্পেন্টাইন অন্তরীপে যাওয়ার উদ্যোগ-আয়োজন করতে লাগলেন।

www.pathagar.com

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ক্যাপ্টেন হার্ডিং সবাইকে নিয়ে কার্পেন্টাইন অন্তরীপের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

একসময় সন্ধ্যার অন্ধকার মেনে এল। হার্বার্ট খোঁজাখুঁজি করে একটা গুহা বের করে ফেললেন। সেটা বেশ বড়সড়ই বটে। পাঁচ-সাতজন লোক অনায়াসে শুয়ে-বসে রাত্রি কাটিয়ে দিতে পারে।

গুহাটার কাছে গিয়ে ভেতরের দিকে উঁকি দিয়েই হার্বার্ট ঝট করে একলাফে পিছিয়ে এলেন। তিনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন, ভেতরে কে যেন গম্ভীর স্বরে গর্জন করে চলেছে।

হার্বার্টকে ভীত-সন্ত্রস্তভাবে পিছিয়ে যেতে দেখে স্পিলেট ব্যস্তপায়ে এগিয়ে গেলেন। প্যানক্রফটের কাঁধে সদ্য তৈরি একটা গাদা বন্দুক আছে বটে। কিন্তু সেটা এতই ছোট ও কম ক্ষমতা সম্পন্ন যে, বড় কোনো জানোয়ারকে তার গুলি ঘায়েল করতে পারবে না।

এদিকে স্পিলেট সাহসে ভর করে গুহার মুখে এগিয়ে যেতেই অদ্ভুত দর্শন ভীষণাকৃতি একটা জানোয়ার থাবা বাগিয়ে, ভয়ঙ্কর হুঙ্কার দিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সামনের পা দুটো উঁচু করতেই তিনি ঝট করে প্যানক্রফটের হাত থেকে বন্দুকটা নিয়েই চোখের পলকে তার ঘোড়াটা টিপে দিলেন।

অব্যর্থ লক্ষ্য। জানোয়ারটা বুকফাটা তীব্র আর্তনাদ করে শূন্যে লাফ দিল। পর মুহূর্তেই সেটা মাটিতে পড়ে দাপাদাপি শুরু করে দিল। মরণযন্ত্রণা।

দুচোখের ফাঁকে বন্দুকের গুলি আঘাত হেনেছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। রক্তে মাখামাখি অবস্থা বেশিক্ষণ তাকে আর অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কাটাতে হল না। অচিরেই দৈত্যাকৃতি জানোয়ারটা এলিয়ে পড়ল। শেষ—সব শেষ!

জানোয়ারটার বিশাল বপুটা এলিয়ে পড়তেই নেবুচ্যাডনেজার সুতীক্ষ্ণ ছুরিটা নিয়ে এগিয়ে গেল। ব্যস্ত-হাতে তার গা থেকে চামড়া ছাড়াতে লেগে গেল। শীতের মধ্যে মাংসের চেয়ে চামড়ার লোভেই সে এমন কঠিন পরিশ্রম করতে উৎসাহী হয়েছে।

দ্বীপবাসীরা এবার হৈ হৈ করে গুহাটার ভেতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। দেখেন, গুহাটার ভেতরে হাড়ের পাঁজা। উৎকট গন্ধে ভেতরে দাঁড়ানো সাধ্য কি?

ক্যাপ্টেন হার্ডিং সতর্কতা অবলম্বন করতে গিয়ে অদ্ভুত একটা ব্যবস্থা করলেন। শুকনো কাঠ আর লতাপাতা দিয়ে আগুন জ্বেলে দিলেন। কিছু শুকনো বাঁশের টুকরো এনে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেয়া হল। বিকট আওয়াজ তুলে বাঁশের গাঁটগুলো ফাটতে লাগল। জন্তু-জানোয়ার তো দূরের কথা ভূতপ্রেত বা দত্যিদানোও সাহস করে গুহার কাছে আসবে না।

দ্বীপবাসীরা গুহাটার ভেতর থেকে হাড়গুলো বের করে মোটামুটি বসবাসোপযোগী করে নিলেন।

সকাল হল। ক্যানোটাকে মার্সি নদীর কিনারায় বাঁধা অবস্থায় রেখেই দ্বীপবাসীরা দক্ষিণদিকে যাত্রা শুরু করলেন।

পথে যেতে যেতে তারা জাহাজডুবির চিহ্ন নজরে পড়ে কি না সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগলেন।

দীর্ঘ পথ পাড়িয়ে দিয়ে দিলেন, তবু জাহাজডুবির কোনো চিহ্নই কারো নজরে পড়ল না। আশ্চর্য ব্যাপার তো! জাহাজ ডুবি না হলে সিন্দুকটার আবির্ভাব কী করে সম্ভব হল। ব্যাপারটা ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মধ্যে গভীর রহস্যের সঞ্চার করল। তিনি কিছুতেই রহস্যটার কূলকিনারা করতে পারছেন না।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মনোভাব অনুমান করতে পেরে প্যানক্রফট বললেন—'জাহাজ ডুবি যদি সত্য সত্যই হয়ে থাকে সে কি আর আপনার জন্য মাথা ভাসিয়ে রেখেছে নাকি? মাস্তুল সমেত কবেই জলের তলায় চলে গেছে।'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ ফুটে উঠল।

প্যানক্রফট বলে চলল—'জলে যদি তলিয়ে না-ই গিয়ে থাকে তবে নির্ঘাত সেটা বালির তলায় চাপা পড়ে গেছে।'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং নিরুত্তর রইলেন।

পথ চলতে চলতে দ্বীপবাসীরা বেলা তিনটার সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আসলে ক্যাপ্টেন হার্ডিং চোখের সামনে দূরবীণ ধরে কী যেন দেখার চেষ্টা করলেন। আপন মনে বলে উঠলেন—'ধ্যুৎ, জাহাজের কোনো চিহ্নই তো নজরে পড়ছে না! এ কেমন ভোজবাজির খেল রে বাবা!'

এমন সময় অদূরবর্তী ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে হার্ডিং-এর প্রিয় কুকুর টপের তীব্র আর্তনাদ কানে ভেসে এল।

দ্বীপবাসীরা তখন বিশালায়তন একটা সরোবরের ধারে দাঁড়িয়ে। পাশেই গভীর জঙ্গল। সবার পিছন পিছন হাঁটতে হাঁটতে টপ কখন যে চুপিচুপি ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেছে কারোরই জানা ছিল না।

মুহূর্তের মধ্যেই টপ এক চিলতে কাপড় মুখে করে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। সেটাকে সবার সামনে ফেলে দিয়েই সে তেমনি উত্তেজিতভাবেই আবার ঝোপটার ভেতর ঢুকে গেল। ব্যাপারটা দ্বীপবাসীদের মধ্যে নতুনতর এক গভীর রহস্যের সঞ্চার করল। রহস্যের পর রহস্য!

প্যানক্রফট উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে টপকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

দ্বীপবাসীদের সবার মনেই গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। ঝোঁপের ভেতর থেকে প্যানক্রফটের উত্তেজিত ও ব্যস্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল—'এই যে—এই যে, পেয়েছি। জাহাজের চিহ্ন পেয়েছি। জাহাজের চিহ্ন—এখানে।'

অস্থিরচিত্ত দ্বীপবাসীরা ছুটোছুটি করে ঝোপের ভেতরে সামান্য ঢুকে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। সবার চোখের সামনে ভেসে উঠল, অনুচ্চ একটা গাছের ডালে কাপড় আলতোভাবে বাতাসে দোল খাচ্ছে। এরই একটা প্রান্ত টপ কোনোক্রমে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে তাঁদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

স্পিলেট কয়েক মুহূর্ত অপলক চোখে কাপড়ের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল—'আমি নিঃসন্দেহ এর সঙ্গে জাহাজ বা জাহাজডুবির কোনো সম্পর্কই নেই। আসলে এটা আমাদের বেলুনটার কাপড়। বেলুনটার ধ্বংসাবশেষ।'

প্যানক্রফট এবার বললেন—'বেলুনের কাপড় হলেও এটা আমাদের উপকারে আসবে, সন্দেহ নেই। নৌকোতে ব্যবহার করা যাবে। আর আমাদের পরিধেয় বস্ত্রের অভাবও কিছু না কিছু পূরণ হতে পারে।'

নেবুচ্যাডনেজার, প্যানক্রফ্‌ট আর স্পিলেট চোখের পলকে গাছটায় উঠে ডাল থেকে কাপড়টাকে পেড়ে নিয়ে এলেন।

বেলুনটার অংশ বিশেষ ছিঁড়ে উধাও হয়ে গেলেও যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। বেলুনটার সঙ্গে বেশ কিছু দড়িও পাওয়া গেল যা আখেরে বড়ই উপকারে আসতে পারে।

www.pathagar.com

দ্বীপবাসীরা জায়গাটাকে ছেড়ে যাওয়ার সময় তার নামকরণ করলেন, 'বেলুন-বন্দর'। আর যেখানে সিন্দুকটাকে পাওয়া গিয়েছিল তার নাম দেয়া হল 'ফ্লোটমাস পয়েন্ট'।

দ্বীপবাসীরা আবার দক্ষিণদিকে হাঁটতে লাগলেন। এবার তাঁরা মার্সি নদীর যে জায়গায় পৌঁছোলেন তার বিস্তার প্রায় আশি ফুট।

ভেলা ছাড়া নদীটা অতিক্রম করা কিছুতেই সম্ভব নয়। প্যানক্রফট দা-কুড়োল নিয়ে ভেলা তৈরির জন্য প্রস্তুত হলেন। এমন সময় অভিযাত্রীরা এক অত্যাশ্চর্য—একেবারেই অবিশ্বাস্য দৃশ্যের মুখোমুখি হলেন। দেখলেন, তাদের ক্যানোটা ভাসতে ভাসতে এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা রীতিমতো রহস্যজনকই বটে। শুধু রহস্যজনক বললেই যথেষ্ট হল না, তাদের কাছে এটা অলৌকিক ব্যাপার বলেই মনে হল। শক্ত বাঁধন খুলে ক্যানোটার তো কিছুতেই চলে আসা সম্ভব নয়। তবে? বিজ্ঞানকে যাঁরা প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করছেন তাঁদের কাছে এমন একটা অভাবনীয় অলৌকিক ব্যাপার একেবারেই অপ্রত্যাশিত। ভুতুড়ে ব্যাপারটাকে মন থেকে মেনে নিতে না পারলেও চোখের সামনে ঘটে পাওয়া দৃশ্যটাকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্যানক্রফট হাঁটু জলে নেমে একটা লগি দিয়ে ক্যানোটাকে টানাটানি করে তীরে নিয়ে এলেন। তার সঙ্গে বাঁধা দড়িটার দিকে নজর পড়তেই ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর দৃষ্টিশক্তি স্থির হয়ে গেল। তিনি ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠল। ব্যাপারটাকে অধিকতর রহস্যজনক বলেই তাঁর কাছে মনে হল। বুঝলেন, কোনো ধারালো পাথর দিয়ে ঘষে ঘষে দড়িটাকে কেটে দেয়া হয়েছে। কে এ অদৃশ্য ভুতুড়ে কাণ্ডের নায়ক? কেই বা তাদের সামনে একের পর এক রহস্যের সঞ্চার করে চলেছে? শুধু কি এই? বিপদের মুহূর্তে রহস্য সৃষ্টিকারী বারবার বন্ধুর মতো, পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। কে সে? কেনই বা নিজেকে গোপন অন্তরালে রেখে এমন রহস্য সঞ্চার করে চলেছে?

ক্যানোটায় চেপে দ্বীপবাসীরা তাদের আশ্রয়স্থল গুহাটার কাছে হাজির হলেন। গুহার মুখে যাওয়ার আগেই আর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার মুখোমুখি হলেন তাঁরা। টপ নৌকো থেকে নেমেই ঊর্ধ্বশ্বাসে গুহার দিকে ছুটে গিয়েছিল। গুহার মুখে পৌঁছেই সে আবার পিছন ফিরে ঘেউ ঘেউ করতে করতে তাঁদের দিকে ছুটে আসতে লাগল।

ব্যাপার দেখে সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবার জোগাড় হলেন। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন—'এ কী অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! টপ আবার কোন রহস্যের গন্ধ পেল, বোঝা যাচ্ছে না তো!'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং হন্তদন্ত হয়ে গুহাটার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে স্বগতোক্তি করে উঠলেন—'এ কী সর্বনেশে কাণ্ড! এ কী হল! কে এমন একটা কাজ করল। গুহায় ওঠার ঝুলন্ত সিঁড়িটা গেল কোথায়? সেটাকে তুলে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল?'

দ্বীপবাসীরা একে অন্যের মুখের দিকে নীরব দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন। কারো মুখেই রা সরছে না। বিস্ময়ে সবাই যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।

রহস্য! একের পর এক রহস্যের মুখোমুখি হয়ে দ্বীপবাসীরা যেন ক্রমেই স্তম্ভিত হয়ে পড়তে লাগলেন।

www.pathagar.com

সবাই হন্যে হয়ে সিঁড়িটার খোঁজে লেগে পড়লেন। না, তাঁদের সব প্রয়াসই ব্যর্থ হয়ে গেল। কোথাও সিঁড়িটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

স্পিলেট প্রায় হাহাকার করে উঠলেন—'বরাতে যা ছিল, হয়ে গেল। এখন নিঃসন্দেহ হওয়া গেল, যে রহস্যজনক ব্যক্তি শূয়োরটাকে গুলিবিদ্ধ করেছিল সেই আমাদের সিঁড়িটাকে নিয়ে বেপাত্তা হয়ে গেছে। এবার আমাদের একমাত্র সম্বল গুহাটাও হাতছাড়া হয়ে গেল। আমাদের এখন নিশ্চেষ্টভাবে কপাল চাপড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নেই।

গুহাটার মুখের কাছাকাছি পৌঁছে অস্থিরচিত্ত প্যানক্রফট গলা ছেড়ে গালিগালাজ শুরু করে দিলেন।

না, গুহাটার ভেতর থেকে কোনো সাড়াই ভেসে এল না। কেবল তাঁরই কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসতে লাগল। তবে হ্যাঁ, মনে হল ভেতর থেকে কার যেন মৃদু হাসির শব্দ ভেসে এল। আর তাতে বিদ্রূপের ছোঁয়া রয়েছে বলেই মনে হল।

উপায়ান্তর না দেখে দ্বীপবাসীরা তাদের আশ্রয়স্থল গ্রানাইট-হাউসের মায়া ত্যাগ করে বিষণ্নমনে চিমনি গুহার দিকে যাত্রা করলেন। স্থির করলেন ভোরের আলো ফুটে উঠলে আবার সিঁড়িটার খোঁজ করবেন।

তবে ব্যাপারটাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য জ্ঞান না করে তাঁরা গ্রানাইট হাউসের দরজায় অকুতোভয় টপকে পাহারায় নিযুক্ত করে রেখে এলেন।

ভোরের আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই দ্বীপবাসীরা ছুটোছুটি করে গ্রানাইট হাউসের কাছ গেলেন। তন্নতন্ন করে সিঁড়িটার খোঁজ করলেন। দেখলেন, সিঁড়িটাকে কে যেন চাতালের ওপর তুলে রেখে গেছে। জানালাগুলো আগের মতোই বন্ধ। কিন্তু দরজাটা কোন অদৃশ্য হাত যেন খুলে রেখে দিয়ে গেছে। ভুতুড়ে কাণ্ড ছাড়া একে কী-ই বা বলা যেতে পারে?

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বুদ্ধি খরচ করে একটা আঁকশি দিয়ে মইটাকে চাতাল থেকে টেনে নামানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু অলৌকিক ব্যাপারের মুখোমুখি হতেই তিনি সচকিত হয়ে আঁকশিটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। সিঁড়িটা সামান্য নামিয়ে আনতেই রহস্যজনক একটা হাত এগিয়ে এসে সেটাকে টেনে আবার চাতালটার ওপর তুলে নিল। হাতটা গ্রানাইট হাউসের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার সেই পথেই বিদ্যুৎগতিতে ভেতরে ঢুকে গেল। রীতিমতো ভুতুড়ে কাণ্ডই বটে।

প্যানক্রফট গলা ছেড়ে গালিগালাজ শুরু করে দিলেন—'হতচ্ছাড়া তুই বানর, গরিলা, বেবুন বা ওরাংওটাং যাই হোস না কেন, একটামাত্র বুলেটে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। শয়তানি করার আর জায়গা পাসনি!'

প্যানক্রফট-এর হম্বিতম্বি শেষ হতে না হতেই জানালা দিয়ে একটা বাঁদরের মুখ উঁকি দিল। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যেই তার বন্দুক থেকে একটা সিসার গুলি ছিটকে গিয়ে বাঁদরটার মাথায় আঘাত হানল। বিকট গর্জন করে তার রক্তাক্ত দেহ ওপর থেকে দুম করে মাটিতে পড়ে গেল। কয়েকবার আছাড়ি পিছাড়ি করে সেটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিশ্চল হয়ে পড়ল।

এবার তাঁদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল, সেটা বাঁদর নয়, ওরাংওটাং।

দ্বীপবাসীরা এবার নিঃসন্দেহ হলেন, লিঙ্কন দ্বীপে তাঁদের প্রধানতম শত্রু ওরাংওটাং। তাদের একটাকে ঘায়েল করলেন বটে। কিন্তু আরও আছে। এবার থেকে বুদ্ধিমান মানুষ আ জঙ্গলি জানোয়ার ওরাংওটাং-এর মধ্যে লড়াই বেঁধে গেল।

www.pathagar.com

শয়তান ওরাংওটাংটার মৃত্যুসংবাদ মুহূর্তের মধ্যেই বনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। তারা তাদের জাতভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দল বেঁধে হাজির হল গুহাটার কাছে। শুরু হয়ে গেল তুমুল লড়াই। তারা গুহাটার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে লাগল। বন্দুকের আওয়াজ শুনে তারা গুহার মধ্যে ঘাপটি মেরে রইল।

ওরাংওটাংগুলি গুহা ছেড়ে বেরোচ্ছে না দেখে দ্বীপবাসীরা গুহার মুখে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কেউ টু শব্দটিও করলেন না। ওরাংওটাংগুলো ভাবল, শত্রুরা হতাশ হয়ে গুহার মুখ ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে।

ওরাংওটাংরা বুদ্ধি রাখে যথেষ্ট। গরিলাদের মতো অস্থিরচিত্তও নয়। দুম করে কোনো কাজ তারা করে না। বুদ্ধি খরচ করে, আগে পিছে ভেবে তবেই কাজ করে। আবার বেবুনদের মতো নির্বোধও নয়। দ্বীপবাসীদের সব বুদ্ধি জঙ্গী জানোয়াররা ভোঁতা করে দিল।

অনন্যোপায় হয়ে দ্বীপবাসীরা সাব্যস্ত করলেন, হ্রদের দিককার জানালাটা খুলে গুটি গুটি ভেতরে ঢুকে যাবেন।

শাবল আর গাঁই নিয়ে দ্বীপবাসীরা হ্রদের দিককার জানালাটা খোলার চেষ্টা শুরু করতেই টপকে অস্থিরভাবে ছুটোছুটি করতে দেখা গেল। আর সেই সঙ্গে গলা ফাটানো চিৎকার চেঁচামেচি চালিয়েই যাচ্ছে।

টপের অস্থিরতা লক্ষ করে সবাই ছুটোছুটি করে গুহাটার মুখের কাছে জড়ো হল। জানোয়ারগুলোর আকস্মিক নীরবতাও তাদের কম ভাবিয়ে তুলল না। মনে হল, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তারা মুষড়ে পড়েছে।

প্যানক্রফট সুযোগ বুঝে বন্দুক চালাতে লাগলেন। এলোপাথাড়ি বন্দুক চালানো যাকে বলে। গুহার ভেতরে তুমুল আর্তনাদ শুরু হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গুহার ভেতর থেকে কোনোরকম শব্দ আসা বন্ধ হয়ে গেল। একতরফা লড়াইয়ে তারা বেশিক্ষণ সুবিধা করতে পারল না।

সম্পূর্ণ অভাবনীয় একটা কাণ্ড আচমকা ঘটে গেল। হঠাৎ করে সিঁড়িটায় অপেক্ষমাণ দ্বীপবাসীদের সামনে চলে এল। রহস্যের পর রহস্য!

ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরি না করে সবাই হুড়মুড় করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যেতে লাগলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং ছিলেন সবার ওপরে। তিনি সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠেই যন্ত্রচালিতের মতো হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। আচমকা বিকট একটা চিৎকার শুনে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। সাক্ষাৎ যমরাজের কোনো দূত যেন আচমকা গুহাটার ভেতরে ঢুকল। ওরাংওটাং—ওরাংওটাং।

আসলে ওরাংওটাংটাকে কুড় ল নিয়ে নেবুচ্যাডনেজার তাড়া করেছে বলেই তার অতর্কিত আগমন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং তাকে বাধা দিয়ে বললেন—'খবরদার, এটাকে না মেরে ধরার চেষ্টা করো। আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে তাকে তৈরি করে নেব। আমাদের উপকারে আসবে।'

সবাই মিলে জানোয়ারটাকে ধরে দড়ি দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেললেন। তার নামকরণ করা হল জ্যাপ। আদর করে সবাই তাকে 'মাস্টার জ্যাপ' বলে ডাকেন।

www.pathagar.com

বহু চেষ্টা চরিত্রের পর দ্বীপবাসীরা তাদের বাসস্থল গুহাটার দখল পেলেন সত্য, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এতগুলো লোক প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েও লিঙ্কন দ্বীপের সর্বশেষ রহস্যটার কূলকিনারা করতে পারলেন না।

জ্যাপের প্রশিক্ষণ পুরোদমে চলতে লাগল। আশ্চর্য ব্যাপার! মানুষের স্বভাবচরিত্র ও কাজকর্মের পদ্ধতি অনুকরণের চেষ্টায় লিপ্ত থাকা ছাড়া তার মধ্যে তিলমাত্র ঔদ্ধত্বও মুহূর্তের জন্য প্রকাশ পায় না।

জ্যাপ কঠোর পরিশ্রম করে মার্সি নদীর ওপর বিশেষ ধরনের ও চমৎকার একটা সেতু তৈরি করে ফেলল। অদ্ভুতভাবে সেটার মাঝখানের অংশ খুলে রাখা যায়। এতে দ্বীপবাসীদের নদীর ওপারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ছাড়াও হিংস্র জন্তুজানোয়ারদের নদীর বিপরীত দিক থেকে আসা বন্ধ। গ্রানাইট হাউসের দিকে আসা বন্ধ করা গেল। 'সাবাস জ্যাপ! মাস্টার জ্যাপ'—গায়ে হাত বুলিয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডিং তাকে আদর করলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং নাইট্রোগ্লিসারিন ব্যবহার করে মার্সি ও লেকগ্রান্টের মাঝখানের শক্ত পাথরের বাধা দূর করে ফেললেন।

এবার নেবুচ্যাডনেজার আর প্যানক্রফট মিলে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে মজবুত একটা খোঁয়াড় তৈরি করে ফেললেন। তাদের পরিকল্পনা মার্সি নদীর ওপার থেকে লম্বা লোমওয়ালা জন্তু আর মুশমন ধরে এনে পুষবেন। শীতের খাদ্যাভাব দেখা দিলে তাদের ব্যবহার করবেন। আর একটা পোলট্রিও তৈরি করে ফেললেন। এখানে পাখি পুষে ডিম আর মাংসের অভাব পূরণ করবেন।

দ্বীপবাসীরা নিঃসন্দেহ যে, তাঁদের এখানেই জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত কাটাতে হবে। তাই প্যানক্রফেটর উদ্যোগে জঙ্গল সাফাই করে তাঁরা চাষের জমিও গড়ি তুললেন। পাখির উৎপাত ঠেকানোর জন্য চাষের ক্ষেতে বিকটদর্শন কাকতাড় য়ার মূর্তিও তৈরি করা হল। সেটাকে বসিয়ে দেওয়া হল ক্ষেতের ঠিক মাঝখানে। অবশ্য এতে জ্যাপই কায়িক পরিশ্রম বেশি করল। শাবল দিয়ে শক্ত মাটি খোঁড়া তো সামান্য ব্যাপার নয়, ইয়া পেল্লাই সব পাথরের চাঁই সে অনায়াসে বয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। সে যেন গায়ে হাতির শক্তি ধরে। আর তার বুদ্ধিবিবেচনাও প্রায় মানুষেরই মতো।

২৩ ডিসেম্বর। দ্বীপবাসীরা মনস্থ করলেন, সেই গুহায় রক্ষিত ছেঁড়াফাটা বেলুনটাকে বয়ে গ্রানাইট হাউসে নিয়ে আসবেন। কিন্তু অতিকায় ও পাহাড়ের মতো ভারী বেলুনটাকে বয়ে আনা তাদের কাজ নয়। এমনকি জ্যাপের সাহায্যেও নয়। তবে ঘোড়া বা বলদের মতো আর দু-একটা জানোয়ার হলে হয়ত কাজটা সেরে ফেলা যেত। কিন্তু কোথায় মিলবে তাঁদের বাঞ্ছিত সে শক্তিশালী জন্তু জানোয়ার?

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর প্রিয় কুকুর টপই দ্বীপবাসীদের সমস্যার সমাধান করে দিল। এক সকালে সে দেখল, ইয়া দশাসই চেহারাধারী একটা জন্তু চাষের ক্ষেতের ফসল খাচ্ছে। জন্তুটা ঘোড়ার মতো হলেও ঢংঢাং অনেকটা গাধার মতো।

হার্বার্ট অদ্ভুত দর্শন জন্তুটাকে দেখেই সনাক্ত করে ফেললেন। তিনি সোল্লাসে চিল্লিয়ে উঠলেন—'ওনাগা! ওনাগা! কোনাগার আর জেব্রার মিলনের ফলে এদের সৃষ্টি।'

প্যানক্রফট বললেন—'ওনাগা, জেব্রা বা গাধা যাই হোক না কেন জন্তুটা আমাদের গাড়ি টানার কাজে লাগবে।

www.pathagar.com

চাষের ক্ষেতের বেড়ার একটা জায়গা ভেঙে যাওয়ার জন্যই জন্তুটা ভেতরে ঢুকতে পেরেছে। একটা নয় দুটো।

নেবুচ্যাডনেজার জ্যাপের সাহায্যে ঝটপট বেড়ার ভাঙা জায়গায় কয়েকটা পাথরের চাঁই ফেলে বন্ধ করে দিলেন। ব্যাস, বাছাধন ওনাগা আটকা পড়ে গেল। এবার সবাই মিলে ছুটোছুটি দাপাদাপি করে তাদের ধরে ফেললেন। অবশ্য একাজে জ্যাপ আর টপের কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশি।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং এবার ওনাগা দুটোকে বশ মানাবার ব্যবস্থা করলেন। বশে আনতে না পারলে তাদের মধ্যে আতঙ্কহীন প্রভুভক্তি জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। বহু কায়দা কসরৎ করে তাদের বশীভূত করা সম্ভব হল।

প্যানক্রফট এবং জ্যাপের সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতায় চমৎকার একটা গাড়ি তৈরি করে ফেললেন। তাতে অতিকায় ও অমিত শক্তিধর ওনাগা দুটোকে জুড়ে দিয়ে অনায়াসেই বিশালায়তন বেলুনটাকে গ্রানাইট হাউসের সামনে আনা সম্ভব হল।

নতুন একটা পরিবেশকে মানুষের বাসোপযোগী করে তুলতে গেলে হাজারো ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হয়। দ্বীপবাসীদেরও লিঙ্কন দ্বীপটাকে মনের মতো করে গড়ে তুলতে কম ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না।

প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি দু দুটো মাস কেটে গেল। সমুদ্র থেকে পাওয়া সিন্দুকটায় কয়েকটা সূঁচ পাওয়া গিয়েছিল। আর বেলুনের কাপড় থেকে পাওয়া গেল শক্ত সূতো। তা দিয়ে বেলুনটার কাপড় কেটে কেটে প্যানক্রফ্‌ট চমৎকার কয়েকটা জামা তৈরি করে ফেলল। আর জুতো? সে সমস্যা তো সিলের চামড়া দিয়ে আগেই মেটানো হয়েছে। শক্ত ও মজবুত চামড়ার জুতো পায়ে পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটাচলা অনেকাংশেই নিরাপদ।

এ মুহূর্তে নেবুচ্যাডনেজারের সবচেয়ে বড় চিন্তা কী করে পাউরুটি তৈরি করা যায়। জ্যাপ তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। তাকে নিয়ে নেবুচ্যাডনেজার পরিকল্পনা করতে লাগলেন, যে করেই হোক উপাদেয় পাউরুটি তৈরি করবেন। পাউরুটি না হলে পাখির মাংস জমে না।

ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের ওপর একটা প্রশস্ত সমতল জায়গা বেছে নিয়ে অধিকতর মজবুত আর একটা খোঁয়াড় তৈরি করা হল। পাথরের দেয়াল সম্বলিত রীতিমতো মজবুত খোঁয়াড়।

সাতই ফেব্রুয়ারি দ্বীপবাসীরা মুশমনদের বিচরণ ক্ষেত্রে হাজির হলেন। জ্যাপ আর টপ তো সঙ্গেই রয়েছে। তারা মুশমনের একটা ঝাঁককে তাড়িয়ে খোঁয়াড়ের দিকে নিয়ে এলেন। শ'খানেক মুশমনের মধ্যে মাত্র ত্রিশটাকে খোয়াড়ে ঢোকানো সম্ভব হল। ভেতরে ঢুকে স্বাধীনচেতা জানোয়ারগুলো মাথা দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালাল। বৃথা চেষ্টা। খোঁয়াড়া ভেঙে কিছুতেই বাইরে বেরিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হল না। নিতান্ত অনন্যোপায় হয়েই তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। এবার থেকে মাংস, পশম আর চামড়া কোনটারই অবাব রইল না। কিছুদিন আগে প্যানক্রফট বন-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে এক বিশেষ ধরনের শুকনো বীজ সংগ্রহ করে এনে চাষের জমিতে পুঁতে দিয়েছিল। চমৎকার লকলকে গাছ হয়েছে।

www.pathagar.com

প্যানক্রফট এবার ক্লান্তি অপনোদনের চমৎকার একটা উপায় বের করে ফেললেন। নতুন ধরনের গাছগুলোর শিকড়ের রস নিঙড়ে বিয়ার জাতীয় মদ তৈরি করে ফেললেন। এর দু-এক গেলাস গলায় ঢাললেই শরীর একেবারে চাঙা হয়ে ওঠে। প্যানক্রফটের আবিষ্কৃত মদ দ্বীপবাসীদের কাছে অমৃততুল্য হয়ে উঠল।

দ্বীপবাসীরা নিঃসন্দেহ যে, এখানেই তাঁদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটাতে হবে। অতএব নিজেদের চেষ্টাতেই জীবনরক্ষার অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী জোগাড় করে নিতে হবে।

সহযোগীদের ব্যাপার স্যাপার দেখে ক্যাপ্টেন হার্ডিং তেমন কিছু বলেন না বটে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপের ওপর সর্বদা নজর রাখেন। কখনো তাদের নানাভাবে উৎসাহিত করেন আবার কখনো-বা হাসেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং দিনের একটা ভগ্নাংশই নির্জনে বসে কাটান। আপনমনে ভাবেন, কুহক দ্বীপে কতই না রহস্যের জাল ছড়িয়ে রয়েছে। কত ভেলকিই না চাক্ষুষ করতে হচ্ছে। আরো কত রহস্যই যে তাঁকে ভেদ করতে হবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। আজ পর্যন্ত যে-সব রহস্যের সম্মুখীন হয়েছেন তাদের সবকটার রহস্যভেদই তো করতে পারলেন না।

ফেব্রুয়ারি গিয়ে মার্চ মাস এসে গেল। মাসের মাঝামাঝি আসতে না আসতেই ঝড়বৃষ্টির প্রকোপ শুরু হয়ে গেল। আর দমকা হাওয়া তো সর্বক্ষণ লেগেই রয়েছে। মোটা জামা কাপড় না হলে ঠাণ্ডা হাওয়ার মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং কাঠ কেটে কেটে কিছুসংখ্যক বোতাম তৈরি করে জামার সঙ্গে আটকে দিলেন। জামা কাপড় কাচা ধোয়ার কাজ জ্যাপের ওপর বর্তাল।

সবই তো এক এক করে তৈরি করা হল। দ্বীপের জীবনযাত্রা এখন অনেকটা সুখকর হয়ে উঠেছে বটে। কিন্তু গুহা ঘরে ওঠার ঝামেলা এড়াবার জন্য এখন একটা লিফট গোছের যন্ত্র তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বীপবাসীরা ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে ফিলট তৈরির ব্যাপারে ধরে বসলেন।

তাঁদের ইচ্ছার কথা শুনে ক্যাপ্টেন হার্ডিং মুখে কিছুই বললেন না, কেবল ঠোঁট টিপে টিপে নীরবে হাসলেন। শেষমেশ মুখ খুললেন—'তোমাদের নতুন আব্দারটার কথা আমার শোনা রইল। আশা করি অচিরেই তোমাদের আশা পূরণ করে সমস্যা দূর করতে পারব।'

চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে প্যানক্রফট বললেন—'লিফট না হয় তৈরি করলেন, কিন্তু সেটা চলবে কী করে তা তো আমার মাথায় আসছে না।'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে ক্যাপ্টেন হার্ডিং জবাব দিলেন—'আরে চলবে—চলবে। জলের শক্তিতে লিফট চলবে।'

কাজটা ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর পক্ষে মোটেই সমস্যার নয়। নেহাতই মামুলি ব্যাপার। একটা চোঙ নিয়ে তার এক প্রান্তে কয়েকটা বৈঠা আর বিপরীত প্রান্তে একটা মোটা ও লম্বা দড়ি লাগিয়ে দিলেন। দড়িটার বিপরীত প্রান্তে ঝুড়ি বেঁধে দিলেন। গ্রানাইট হাউসের ভেতরে, ছোট একটা ঝর্নার ঠিক নিচে চোঙটাকে রেখে দেয়া হল। জলপ্রপাতে যখন তীর বেগে জল নেমে আসে ঠিক তেমনিভাবে বৈঠাগুলোর ওপর প্রবল বেগে জল পড়তে লাগল। অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় জল কুয়োতে গিয়ে পড়তে লাগল। এর ফলে চোঙটা

www.pathagar.com

ঘুরতে লাগল। আর মোটা লম্বা দড়িটা চোঙের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে শুরু করল। এতে দড়িতে টান লাগায় সেটা গুটোতে গুটোতে গ্রানাইট দরজার সামনে ঝুড়িটাকে তুলে দিল। ঝুড়িটায় চেপে একজন মানুষ অনায়াসেই ভূমি থেকে গ্রানাইট হাউসের দরজায় পৌঁছে যেতে পারে।

১৭ মার্চ। এদিনই প্রথম ওয়াটার লিফট চালু করা হল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং এতেই সন্তুষ্ট হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার পাত্র নন। তিনি এবার কাচ তৈরির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। উনুনে গনগনে আগুন জ্বেলে নিলেন। এবার বালি, খড়ি ও সোডা একসঙ্গে মিশিয়ে গুলিয়ে নিলেন। তরল হওয়া মাত্র তাতে লোহার নলের সাহায্যে ফুঁ দিয়ে দিয়ে তিনি ইচ্ছামতো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করে নিতে লাগলেন।

প্যানক্রফট হাপরে লোহার পুড়িয়ে, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে যে লোহার নলটা তৈরি করেছিলেন, আজ ক্যাপ্টেন হার্ডিং সেটার সদ্ব্যবহার করলেন। এবার আর কাচের দ্রব্যসামগ্রী তৈরির কোন বাধাই রইল না। কেবল প্লেট বা গ্লাসই নয়, দরজা-জানালার শার্সি পর্যন্ত কাচ দিয়ে তৈরি করে নেয়া হল। তবে অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতির অভাবে সদ্য তৈরি করা সামগ্রীগুলো একটু-অধটু বাঁকা-ট্যাড়া হল। কিন্তু কাজ তো চলে যাচ্ছে।

১ এপ্রিল। দ্বীপবাসীরা কাজের ফাঁকে বসে গল্পগুজব করছেন। এমন সময় ক্যাপ্টেন হার্ডিং প্রস্তাব দিলেন, সেক্সট্যান্টের সাহায্যে তিনি নির্ণয় করতে চান লিঙ্কন দ্বীপটা প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক কোন স্থানে অবস্থিত?

সমুদ্র থেকে পাওয়া সিন্দুকে একটা উন্নত মানের সেক্সট্যান্ট ছিল। অতএব কাজ শুরু করতে কোনো বাধাই নেই।

স্পিলেট তাঁকে সমর্থন করলেন। এর মাধ্যমে লিঙ্কন দ্বীপের কাছাকাছি অন্য কোনো দ্বীপ বা মহাদেশের অবস্থিতি আছে কি না জেনে রাখলে ভবিষ্যতে উপকারে আসতে পারে।

হার্বার্ট এবার ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর নির্দেশে সিন্দুক হাতড়ে একটা মানচিত্র বের করে ফেললেন। ক্যাপ্টেন হার্ডিং মানচিত্রটার ওপরে চোখ বোলাতে লাগলেন। অঙ্ক কষে হিসেব নিকেশ করার দায়িত্ব পালন করতে লাগল সেক্সট্যান্ট নামক যন্ত্রটা। হিসেব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে সেক্সট্যান্টের হিসেবের সঙ্গে সূর্যের হিসেবের হুবহু মিল রয়েছে। হিসেব অনুযায়ী দেড় শো মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে একটা দ্বীপ রয়েছে। মানচিত্রেও এর উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে একে 'ট্যাবর দ্বীপ' নামে উল্লেখ করা রয়েছে।'

বেশ বড়সড় একটা নৌকা তৈরি করা হল। উদ্দেশ্য ট্যাবর দ্বীপে যাওয়া হবে। পালে হাওয়া লাগলে দুদিনেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব।

স্পিলেট আর হার্বার্ট জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে একেবারেই অপ্রত্যাশিত এক আবিষ্কার করে ফেলেন। ডালে ডালে আঙুরের মতো থোকা থোকা ফল ঝুলছে এমন এক অত্যাশ্চর্য গাছ তাঁরা পেয়ে গেলেন। ফলগুলি যেমন মিষ্ট তেমনি সুস্বাদু। আর মুখে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে গলে যায়।

স্পিলেট তারপর যা আবিষ্কার করলেন তাতে প্যানক্রফট উল্লসিত হয়ে তাকে কাঁধে, নাকি মাথায় তুলে নাচবেন ঠিক করে উঠতে পারলেন না। কি যে অমৃততুল্য সামগ্রী, তাই না। তামাকগাছ। এর জন্য তিনি এতদিন ধরতে গেলে জীবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন।

www.pathagar.com

এক বিকেলে দ্বীপবাসীরা সমুদ্রের তীর বরাবর হাঁটাহাঁটি করতে করতে অতিকায় একটা তিমিকে চর্কির মতো বারবার পাক খেয়ে বেড়াতে দেখলেন। ব্যাপারটা সেরকমই বটে। সামান্য একটা হারপুনের অভাবে একটা শিকার হাতছাড়া হলে কপাল চাপড়বার মতো ব্যাপারই বটে।

না, হারপুন ব্যবহারের আর দরকার নেই। বিশালায়তন জলজ প্রাণীটি নিশ্চল নিথর। অনেক আগেই মারা গেছে। শকুন আর অন্যান্য কয়েকটা পাখি মাংসের লোভে জল থেকে মাত্র কয়েক হাত উঁচু দিয়ে উড়ে বেড়াতে লাগল।

দ্বীপবাসীরা ভাসমান মড়া তিমিটার দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে রইলেন। এক সময় তিমিটার গায়ে একটা হারপুন গাঁথা রয়েছে দেখে তাঁরা চমকে উঠলেন।

ব্যাপারটা দ্বীপবাসীদের ভাবিয়ে তুলল। তারা বলাবলি করতে লাগলেন, 'তবে কি তাঁদের বা দ্বীপের কাছাকাছি কোনো তিমি-শিকারি আত্মগোপন করে রয়েছে? নইলে তিমিটার গায়ে হারপুন বিদ্ধ করল কে?'

হারপুন! হারপুনটা দ্বীপবাসীদের মধ্যে নতুন করে রহস্যের সঞ্চার করল।

ব্যাপারটা স্পিলেটকেই সবচেয়ে বেশি করে ভাবিয়ে তুলেছে।

প্যানক্রফ্‌ট তাঁকে বুঝাতে গিয়ে বললেন, 'মি. স্পিলেট, ব্যাপারটা তো এমনও হতে পারে যে, তিমি-শিকারি দ্বীপে তো দূরের ব্যাপার, কয়েক শো মাইলের মধ্যেও নেই। আমার ভালোই জানা আছে, তিমিরা হারপুনবিদ্ধ অবস্থায় হাজার হাজার মাইল জুড়ে ছুটোছুটি দাপাদাপি করতে পারে। এমনও হতে পারে অদৃষ্ট বিড়ম্বিত তিমিটা মরণবাণ পিঠে নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে দাপাতে দাপাতে প্রশান্ত মহাসাগরে এসে মৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণ করেছে।

প্যানক্রফট তিমির চরিত্র সম্বন্ধে ভালোই জ্ঞান রাখেন। তিনি একসময় তিমি শিকারে বিখ্যাত জাহাজ হোয়েলারে কাজ করতেন।

স্পিলেট আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিস্তেজ নিথর তিমির গা থেকে হারপুনটা তুলে নিয়েই চমকে উঠলেন। তার গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে, 'মেরিলা স্টেলা—ভিনিয়ার্ড'। কারণ স্পিলেট জানেন, ভিনিয়ার্ড প্যানক্রফট-এর জন্মস্থান আর মেরিলা-স্টেলা তার খুবই পরিচিত তিমি শিকারের জাহাজ। তাই স্পিলেট ভাবল প্যানক্রফট হারপুনটার পরিচয় পেলে নির্ঘাত আনন্দে নাচানাচি জুড়ে দেবেন।

দ্বীপবাসীরা টানাটানি করে নিষ্প্রাণ তিমিটাকে ডাঙায় তুলে আনলেন। তিমির দেহের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান তার চর্বির স্তরটা। হাড়গোও কম দরকারি নয়।

কুড় ল আর সুতীক্ষ্ণ কাটারি দিয়ে কাটাকাটি করে তিমিটার গা থেকে চর্বি বের করে আনা হল। কেবল তিমিটার জিভটা থেকেই দুশো পাউন্ড এবং নিচের ঠোঁট থেকে প্রায় চার শো পাউণ্ড চর্বি বের হরা হল।

গ্লিসারিন ও স্টিয়ারিন উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের জন্য চর্বিগুলো জমিয়ে রেখে দেয়া হল।

প্যানক্রফট কেবল চর্বিতেই খুশি থাকতে পারলেন না। তিনি ব্যস্তহাতে তিমিটার হাড়গোড় বের করে জড়ো করে ফেললেন। তিনি ভালোই জানেন, রাশিয়া ও আমেরিকার কোনো কোনো অঞ্চলের অ্যালুইসিয়ান শিকারিরা তিমির হাড়ের এক বা

www.pathagar.com

উভয় প্রান্ত ছুঁচলো করে নিয়ে বরফচাপা দিয়ে রাখে। বেশ কিছুদিন বাদে তাদের আকৃতির পরিবর্তন হয়ে যায়। বেঁকে গিয়ে অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এবার মাংসের টুকরো গেঁথে জঙ্গলে রেখে দিলে ক্ষুধার্ত জানোয়াররা সেগুলো গিলে ফেলে। সকালে শিকারিরা তাদের জ্যান্ত বা মৃত অবস্থায় ধরে নিয়ে যায়। তাদের মাংস দিয়ে খিদে নিবৃত্ত করে আর চামড়া দিয়ে চমৎকার পোশাক তৈরি করে।

প্যানক্রফট উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'বরাতের জোরে হারপুন যখন একটা পাওয়াই গেছে তখন আমরা এবার তিমি-শিকারে মন দেব। তাদের চর্বি আর হাড় আমাদের অনেক সমস্যা দূর করবে।'

প্যানক্রফটকে উৎসাহিত করার জন্য স্পিলেট পকেট থেকে তামাকের পোঁটলাটা বের করে তার হাতে দিলে বললেন, 'আপনার কাজের পুরস্কার।'

তামাক তো নয় যেন প্যানক্রফট আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছেন। দ্বীপে আসার পর থেকে তিনি হন্যে হয়ে তামাকগাছের খোঁজ করেছেন। আজ এতদিন পরে তা স্পিলেটের দৌলতে হাতে পেলেনে। আর দেরি নয়। তিনি তামাক গুটিয়ে গুটিয়ে চুরুট তৈরি করে নিলেন। তারপর তাতে অগ্নি সংযোগ করে পরপর কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে পরম তৃপ্তিতে এক গাল ধোঁয়া ছাড়লেন।

জুন মাস। মাসের গোড়া থেকেই শীত পড়ে গেছে। শীতের প্রকোপ ক্রমেই বাড়তে লাগল। প্রচণ্ড শীতে দ্বীপবাসীরা গুহা ছেড়ে বেরোতেই পারছেন না। হাত-পা যেন আড়ষ্ট হয়ে অবস্থা।

কফি আর তামাক নিয়ে দ্বীপবাসীরা অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে গোল হয়ে মৌজ করে বসে গল্প গুজবে মেতে গেলেন।

কথার ফাঁকে স্পিলেট বললেন, 'পৃথিবীর দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরের কয়লার স্তর যেদিন ফুরিয়ে যাবে সেদিন যন্ত্রসভ্যতা মুখ থুবড়ে পড়বে। তখনই পৃথিবীবাসী পড়বে প্রকৃত সমস্যায়—'

ঠোঁটের কাছ থেকে কফির পাত্রটা নামিয়ে নিয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডিং বললেন, 'এখন বহুদিন প্রায় আড়াই-তিন শো বছরের আগে পৃথিবীর অভ্যন্তরের কয়লা ফুরোবার নয়। তার পৃথিবীবাসী—'

'তারপর? তারপর পৃথিবীর মানুষ কী করবে?'

'পৃথিবীর মানুষ তখন কয়লার বিকল্প সামগ্রী আবিষ্কার করে ফেলবে।'

'বিকল্প? কয়লার বিকল্প এমন কি আবিষ্কার করতে পারবে যাতে আগুন জ্বালার সমস্যা মিটতে পারে?'

'জল। জলই হবে ভবিষ্যৎপৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্বল।'

'জল? জল দিয়ে ট্রেন আর জাহাজ—'

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডং বলে উঠলেন—'প্যানক্রফ্‌ট, আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর মানুষ অদূর ভবিষ্যতে জল থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করে কলকারখানার মেশিন চালাবে, আলো জ্বালাবে আর ট্রেনও চালাতে সক্ষম হবে। অফুরন্ত এ বিদ্যুৎশক্তির ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সভ্যতা গড়ে উঠবে। মানুষের কাছে জল তখন আর কেবল—'

www.pathagar.com

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই টপ-এর বিকট আর্তস্বর শোনা গেল। কুয়োর দিক থেকেতার আর্তনাদ ভেসে আসছে মনে হল। উৎকীর্ণ হয়ে সবাই ব্যাপারটা লক্ষ্য করার চেষ্টা করলেন। হ্যাঁ, টপের সঙ্গে জ্যাপও গলা মিলিয়েছে। টপ-এর ঘেউ-ঘেউ আর জ্যাপের ঘোঁৎ ঘোঁৎ মিলে সে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হল।

সবাই ছুটোছুটি করে এগিয়ে গেলেন।

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে স্পিলেট বললেন—'ব্যাপার কী? সামুদ্রিক প্রাণীটা আবার কুয়োর ভেতরে আশ্রয় নেয় নি তো?

আরও সামান্য এগিয়ে প্যানক্রফট জ্যাপের নাম ধরে এমন গম্ভীর স্বরে ধমকাতে লাগলেন যে, সে থমমত খেয়ে মুখেকলুপ এঁটে দিল। সে সঙ্গে টপও ঘাবড়ে গিয়ে গর্জন বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ব্যাপারটা ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মধ্যে বিশেষ ভাবান্তর ঘটাল, মনে হল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, তিনি মুখে কিছুই বললেন। তবে এটুকু বুঝা গেল তাঁর মধ্যে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা আশ্রয় করেছে।

ক্যঅপ্টেন হার্ডিংকে বহুভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরও তাঁর মুখ থেকে কিছুই বেরল না। কপালের চামড়ায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ এঁকে তিনি নীরবে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়ায় ব্যস্ত রইলেন।

আগস্টের গোড়াতেই আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করল। আকাশের সে গোমড়া ভাব আর নেই।

৩ আগস্ট। দ্বীপবাসীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শিকারে বেরোলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং শিকারে গেলেন না। তিনি একাই গ্রানাইট হাউস আগলাতে লাগলেন। কোন এক জরুরি কাজের নাম করে তিনি শিকারে বেরোলেন না। তাঁর জরুরি কাজটা যে কিতা অনুমান করা কারোর পক্ষেই অসুবিধা হল না। কিন্তু কেউই মুখ খুললেন না।

গ্রানাইট হাউসে একা একা বসে ক্যাপ্টেন হার্ডিং গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। তার এখন সবচেয়ে বড় ভাবনা, টপ মাঝে মধ্যেই কুয়োর ধারে গিয়ে তর্জন গর্জন করে—কেন? কেন তার মধ্যে নিদারুণ অস্থিরতা ভর করে? কুয়োর মধ্যে কার উপস্থিতি তার মধ্যে অস্থিরতা জাগিয়ে তোলে। তবে কি সমুদ্র ছাড়া অন্য কোনো স্থানের সঙ্গে কুয়োটার সম্পর্ক রয়েছে? কার? কার উপস্থিতি? তবে কি কোনো গোপন সুড়ঙ্গ কুয়ো আর পাতালের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে? তাঁকে কি এটাই বিশ্বাস করতে হবে, রহস্যময় কুহক দ্বীপে আজ পর্যন্ত যত কিছু রহস্যের মুখোমুখি তারা হয়েছেন সবকিছুরই উৎস কি এ কুয়োটা? ব্যাপারটা অনেক আগেই ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মাথায় এসেছিল। কিন্তু সুযোগের অভাবে কুয়েটার মধ্যে নেমে রহস্যভেদ করা হয়ে ওঠে নি। তিনি চান একা—একেবারে একা কাজটা করবেন। কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও তাঁর মতলবের কথা জানতে না পারেন।

দীর্ঘ অধীর প্রতীক্ষার পর আজ অপূর্ব সুযোগ এসেছে। লিফট তৈরি করার পর মইটাকে গুহার একধারে রেখে দিয়েছিলেন। সেটাকে কোনরকমে নামিয়ে এনে কুয়োটার ভেতরে খাড়া করে দিলেন। একটা পিস্তল আর সূতীক্ষ্ম ছুরি কোমরের বেল্টের সঙ্গে বেঁধে

www.pathagar.com

নিলেন। আর হাতে নিলেন একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন। এবার অকুতোভয় হার্ডিং মইয়ের একের পর একধাপ নেমে চললেন।

কুয়োটার দেয়ালের গা মসৃণ—একেবারে তেলতেলে। এর গা-বেয়ে কোনো জন্তু জানোয়াররের পক্ষেই ওঠানামা করা সম্ভব নয়।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং মইয়ের একেবারে শেষধাপের কাছাকাছি নেমে গেলেন। কই, কিছুই তো নেই। কাউকেই তো নজরে পড়ছে না। আর সুড়ঙ্গ বা নালা জাতীয় কোনো কিছুর অস্তিত্বও তাঁর চোখে পড়ল না। শুধু কি এই ? জল পর্যন্ত শান্ত। তবে? না, কোনো সিদ্ধান্তেই তিনি আসতে পারলেন না।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং সত্যই মহাসমস্যায় পড়ে গেলেন। তাঁর চোখ বলছে, কুয়োর ভেতরে রহস্য সঞ্চারকারী কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। কিন্তু মন কিছুতেই একথা মানতে নারাজ। মন রীতিমতো দৃঢ়তার সঙ্গেই বলছে—আছে ! আছে! আছে! আর সে যখন কুয়োর মধ্যে আবির্ভূত হয় ঠিক তখনই টপ গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। অন্য সবের চোখে ধুলো দিতে পারলে টপকে ঠকানো সম্ভব নয়।

শিকার সেরে দ্বীপবাসীরা গ্রানাইট হাউসে ফিরে এলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর পক্ষে নিজেকে আর সামলে রাখা সম্ভব হল না। তিনি স্পিলেটকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা খোলসা করে বললেন।

স্পিলেট-এর চোখে মুখেও দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'আমিও এমন কিছুই অনুমান করেছি। এমন কোনো ভয়ঙ্কর জানোয়ার কুয়োটার ভেতরে মাঝে মধ্যে আসে। সে আমাদের চোখে ধুলে দিলেও টপের নজর এড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হয় না।'

১১ আগস্ট। স্পিলেট ছোট্ট একটা ভুল করার ফলে বিশ্রী একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

শেষ রাতের দিকে সবাই যখন ঘুমে অচৈতন্য তখন টপ বিকট স্বরে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিল। ব্যাপারটা কেবল অত্যাশ্চর্যই নয়, রহস্যজনকও বটে। সে ছুটোছুটি দাপাদাপি করছে আর অনবরত গর্জন করছে।

প্যানক্রফট হুড়মুড় করে ঘুম থেকে উঠে চারদিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে আঁচ করে নিতে চাইলেন। জমাটবাঁধা অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকার ভেদ করে অদৃশ্য কণ্ঠের চাপা গর্জন তাঁর কানে এল।

ইতিমধ্যে সবার ঘুম ভেঙে গেছে। প্যানক্রফট কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন—'সর্বনাশা ব্যাপার ঘটে গেছে।! প্লটোতে কোন জানোয়ার হয়ত ঢুকেছে।'

নেবুচ্যাডনেজার ভুরু কুঁচকে, চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বললেন—'গর্জন শুনে মনে হচ্ছে নেকড়ে। নেকড়ে যদি নাও হয় তবে অবশ্যই কোন না কোন হিংস্র জনোয়ার—'

'সে না হয় হল। কিন্তু জানোয়ারটা নদী পেরিয়ে এখানে এল কী করে এল কী করে?'

হার্ডিং রীতিমতো রাগতস্বরেই বললেন—'তোমাদের খামখেয়ালি জন্যই এমন একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটেছে। নির্ঘাত তোমাদের কেউ না কেউ পোলটা তুলতে ভুলে গেছ।'

স্পিলেট নিতান্ত অপরাধীর স্বরে বলে উঠল—'আমি, আমিই এমন ভয়ঙ্কর ভুলটা করেছিলাম। পোলটা তোলার কথা একদম খেয়াল ছিল না।'

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বললেন, 'দোষ-গুণ বিচারের সময় এটা নয়। সবার আগে সমস্যার সমাধান করা দরকার।'

আবার ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই হিংস্র জানোয়ারের তর্জন গর্জন শুরু হয়ে গেল। তবে এখন মনে হচ্ছে, জানোয়ারের সংখ্যা অবশ্যই একটা নয়, অনেকগুলো।

হার্ডিং নিঃসন্দেহ হলেন এরা নেকড়ে জাতীয় এক বিশেষ ধরনের জানোয়ার। হিংস্র শেয়াল কাউকে বাটে পেলে জান খতম না করে রেহাই দেয় না।

দ্বীপবাসীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়লেন। ব্যস, শুরু হয়ে গেল হিংস্র জানোয়ারদের সঙ্গে তুমুল লড়াই। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে প্রায় একশো জোড়া চোখ জ্বলজ্বলে করতে লাগল।

হিংস্র জানোয়ারদের ওপর অকুতোভয় টপ বীর বিক্রমে গর্জন করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুতীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে সে কতকগুলো জানোয়ারকে টুটি চেপে ধরে ঘায়েল করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল রীতিমতো রক্তারক্তি কাণ্ড। ভোরের আলো ফুটে উঠলে দেখা গেল প্রায় পঞ্চাশটা হিংস্র জানোয়ার মাখামাখি অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হল, সবার হুঁশ হল। জ্যাপ কোথায়? কই তাকে তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। দ্বীপবাসীরা চারদিকে ছুটোছুটি দাপাদাপি করে তার খোঁজ করতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত ক্ষেতের আলে কাছে জ্যাপের নিঃসাড় দেহটাকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখলেন।

অস্থিরচিত্ত নেবুচ্যাডনেজার প্রায় মাটিতে শুয়ে পড়ে জ্যাপ-এর বুকের ওপর মাথা রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। একসময় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আছে, প্রাণ আছে। জ্যাপ বেঁচে আছে!'

সবাই মিলে ধরাধরি করে জ্যাপকে গ্রানাইট হাউসের সামনে নিয়ে শুইয়ে দিলেন। তার ঘাড়ের কাছে একটা ক্ষত। হিংস্র জানোয়ারদের দাঁতের দাগ।

জ্যাপরের শোচনীয় পরিস্থিতিতে টপের মন ভারাক্রান্ত। ছলছল চোখ দুটো মেলে তার দিকে তাকিয়ে সে সর্বক্ষণ গুম হয়ে শুয়ে রইল।

দ্বীপবাসীদের আন্তরিক সেবা যত্নে কয়েক দিনের মধ্যেই জ্যাপ সুস্থ হয়ে উঠল, স্বাভাবিকতা ফিরে পেল।

২৫ আগস্ট। জ্যাপ আবার কাজে মেতে গেল। সে এক অত্যাশ্চর্য কাজের মাধ্যমে নতুন করে দ্বীপবাসীদের চমক লাগিয়ে দিল। দ্বীপবাসীরা যখন নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত তখন গুটিগুটি গ্রানাইট হাউসে ঢুকে প্যানক্রফটের পাইপটা নিয়ে তামাক টানতে লাগল। ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। পায়ের ওপর পা তুলে সে যখন মৌজ করে তামাক টানছে তখন সবাই এক-এক করে ঘরে ফিরলেন। তার কাণ্ড দেখে সবাই তো হেসে গড়াগড়ি যাবার জোগাড় হলেন।

প্রভুদের দরজায় দেখেই জ্যাপ দুম করে লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে নিল। নিতান্ত অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। এখন আর সবাই সরবে না হেসে পারলেন না।

www.pathagar.com

অক্টোবর মাস এল। দ্বীপবাসীরা নতুন একটা নৌকা তৈরি করলেন। সদ্য তৈরি বিশালায়তন নৌকাটার নামকরণ করা হল—'বন-অ্যাডভেঞ্চার।'

নৌকাটাকে জলে ভাসানো হল। দ্বীপবাসীদের নিয়ে সেটা উল্কার বেগে ছুটে চলল।

একসময় হার্বার্ট নৌকা থেকে জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে রহস্যজনক একটা কাচের বোতল তুলে নিলেন। তার ছিপিটা খোলামাত্র তার ভেতর থেকে একটা পাকানো কাগজ বেরিয়ে এল। তাতে দুটো ছত্র লেখা—

"ট্যাবর দ্বীপে নির্বাসিত এক অদৃষ্টবিড়ম্বিত।

১৫.৩ পশ্চিম দ্রাঘিমা ও ৩৭.১১ দক্ষিণ অক্ষাংশ।

প্যানক্রফট ইতিপূর্বে ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে ট্যাবর দ্বীপের কথা বহুবার বলেছেন। কিন্তু কোনো প্রয়োজন বোধ না করায় তিনি বারবারই নানা কৌশলে তাঁর প্রস্তাবটাকে এড়িয়ে গেছেন। রহস্যজনক বোতলটা আবিষ্কৃত হওয়ায় তিনি এখন নিজে থেকেই সেখানে যাওয়ার কথা তুললেন। কাগজের টুকরোটার গায়ে আর একবার চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন, 'কাগজের চিলতেটার লেখা পড়ে মনে হচ্ছে, নির্বাসিত ভদ্রলোট নৌ-বিদ্যার অনেক কিছুই রপ্ত করেছেন। আর তিনি হয় আমেরিকান, না হয়ত ইংরেজ। নইলে ছত্র দুটো ইংরেজিতে লিখতেন না।'

ব্যাপারটা অত্যাশ্চর্যই বটে। নইলে বোতলটা তাঁদের নৌকার ধার-কাছ দিয়ে না গিয়ে অন্য কোনো জায়গা দিয়েও তো ভেসে যেতে পারত।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। ট্যাবর দ্বীপে যাবেনই।

ভোরের আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই দ্বীপবাসীদের নিয়ে বন-অ্যাডভেঞ্চার ট্যাবর দ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা করল।

বেলা এগারোটার কাছাকাছি অ্যাডভেঞ্চার দ্বীপের মাটি স্পর্শ করল।

ব্যাপার দেখে দ্বীপবাসীরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। লোকটার তো সমুদ্রের পাড়ে ছুটে আসা উচিত ছিল। বহু দূর থেকেই তো নৌকাটাকে দেখা গেছে। নির্বাসিত লোকটা কি এতক্ষণেও তাঁদের দেখতে পায় নি?

দ্বীপবাসীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, দ্বীপে নেমে খোঁজাখুঁজি করলে নির্ঘাত তাকে পাওয়া যাবে।

দ্বীপের এবড়োখেবড়ো পথ ধরে কিছু দূর এগোতেই তারা একটা কাঠের ঘর দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ধরেই নিলেন এটাই নির্বাসিত লোকটার আস্তানা। এগিয়ে গিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে উঁকি দিয়েই তাঁরা যারপরনাই বিস্মিত হলেন, ভোঁ-ভোঁ—ভেতরে কেউ-ই নেই।

দ্বীপের বুকে ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। তবু অদৃষ্ট বিড়ম্বিত লোকটার ডেরায় ফেরার নামটিও নেই।

উপায়ান্তর না দেখে প্যানক্রফট গলাফাটা চিৎকার চেঁচামেচি করে লোকটাকে বহুভাবে সম্বোধন করে ডাকাডাকি করতে লাগল। বৃথা চেষ্টা। কোনো সাড়াই এল না।

ঘরের ভেতের পাত্রভর্তি বারুদ আর কার্তুজ ছাড়াও অনেক কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল। তবে? লোকটা গেল কোথায়? তবে কি দ্বীপ ছেড়ে চলেই গেছে। তা যদি না হয় তবে তার দেহটা বা দেহের খাঁচাটাই বা গেল কোথায়? ঘরটার মধ্যে সবাই গুটিসুটি মেরে রাতটা কাটিয়ে সকাল হতেই সবাই নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দ্বীপটাকে চক্কর মারার জন্য।

www.pathagar.com

দ্বীপবাসীরা রহস্যময় লোকটার ঘরে শুয়ে বলাবলি করছিলেন—'ঘরটা কাঠের তৈরি। জাহাজের কাঠ। জাহাজের ভাঙা অংশ। একটা কাঠের গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা—'BR—TAN—A' অর্থাৎ সম্পূর্ণ নামটা হয়ত 'BRITANIA' ছিল। মাঝের কয়েকটা অক্ষর রোদ বৃষ্টিতে মুছে গেছে।

দ্বীপের চারদিকে একবার চক্কর মেরে দ্বীপবাসী অভিযাত্রীরা এবার সত্যসত্যই হতাশ হলেন।

একসময় নৌকা থেমে নেমে তাঁরা খাবারের খোঁজে জঙ্গলের ভতরে ঢুকলেন। ফলমূল খোঁজাখুঁজি করতে করতে তাঁরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ পর একসময় হার্বাটের বুকফাটা আর্তনাদ তাঁর সহযাত্রীদের কানে এল। কণ্ঠস্বরটা অনুসরণ করে সবাই উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করে কাছে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভয়ঙ্কর একদৃশ্যের মুখোমুখি হলেন তাঁরা। দেখলেন, হার্বাট চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে আছাড়ি পিছাড়ি করতে করতে বুকফাটা আর্তনাদ করছে। আর ভীষণাকৃত একটা দানব তাঁর বুকের ওপর বসে চরমতম আক্রোশে তাঁকে কিল চড় মেরে চলেছে। রীতিমতো ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য।

সবাই ছুটোছুটি করে অনেক কষ্টে ভয়ঙ্কর সে দানবটার কবল থেকে হার্বাটকে মুক্ত করলেন। পূর্বপুরুষের বরাতের জোরে তিনি এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলেন।

কারো বুঝতে অসুবিধা হল না এ লোকটাই নির্বাসিত লোক। জনমানবহীন দ্বীপে একা একা বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে গিয়ে তার মনুষ্যত্ব লোপ পেয়ে গেছে। আজ সে মানুষের স্বভাব হারিয়ে পশুতে পরিণত হয়েছে।

দ্বীপবাসীরা রহস্যজনক নির্বাসিত লোকটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। সে রাগে অনবরত ফুঁসে চলেছে। দীর্ঘদিন একা কাটিয়ে সে কেবল হিংস্র ভাবই পায় নি। হারিয়েছে বিবেক, মনুষ্যত্ব আর মুখের ভাষা পর্যন্ত, আজ পশুর মতোই বোবা। বিশ্রীস্বরে ঘোৎ গোৎ করা ছাড়া আর কোনো সাধ্যই তার নেই।

স্পিলেট বললেন—'লোকটাকে আমরা লিঙ্কন দ্বীপে নিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার ভেতরের মনুষ্যত্বটাকে আবার জাগিয়ে তুলব। অচিরেই তাকে আবার অন্য দশজনের মতোই সভ্যভব্য করে তোলা যাবে।

রহস্যজনক লোকটাকে ঝলসানো শূয়োরের মাংস খেতে দেয়া হল। সে চরম বিতৃষ্ণায় সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল। কিন্তু কাঁচা মাংসের টুকরো দিতেই ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পরম তৃপ্তিতে খেতে আরম্ভ করল।

পনেরই অক্টোবর।

সকালে বন অ্যাডভেঞ্চার লিঙ্কন দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। ১৭ অক্টোবর দ্বীপবাসী অভিযাত্রীদের নৌকা নির্বিঘ্নেই চলল। বিকেলের দিকে নৌকারোহীরা প্রমাদ গুনলেন। প্রবল ঝড় উঠল। ঝড়ের বেগ ক্রমেই বেড়ে চলল। প্যানক্রফটের কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল।

১৭ অক্টোবরও নৌকারোহীরা নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাবনার মধ্যে কাটালেন।

বিকালের দিকে একেবারেই অভাবনীয় ও অবিশ্বাস্য এককাণ্ড ঘটে গেল। দেখা গেল, কয়েদি দানবটা তার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে। ডেকের কার্নিশের কাঠ ভেঙে নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকে এসেছ। নৌকার ভাঙা জায়গা দিয়ে হুড়হুড় করে নৌকার

www.pathagar.com

ভেতরের জমে থাকা জল বেরিয়ে যাওয়ায় নৌকাটা অস্বাভাবিক হাল্কা হয়ে গেল। আশ্চর্য! নৌকাটা এবার উল্কার বেগে ছুটতে শুরু করল।

কয়েদিটার উপস্থিত বুদ্ধি দেখে স্পেলেট রীতিমতো হকচকিয়ে গেল। চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে অপলক চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তখন রাত্রি দুটোর কাছাকাছি। নৌকারোহীরা হঠাৎ অদূরে আলো দেখে উল্লসিত হয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আলো! আলো! ওই যে, আলো দেখা যায়।'

হ্যাঁ, আলোই বটে। ক্যাপ্টেন হার্ডিং লিঙ্কন দ্বীপের গ্রানাইট হাউসে আগুন জ্বেলেছেন। আলোকরশ্মিটুকুর উৎস ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এরই জ্বালা আলো।

এতক্ষণ নৌকাটা লিঙ্কন দ্বীপটাকে ছেড়ে ভুল পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর আলো নৌকারোহীদের পথের নির্দেশ দান করল।

গ্রানাইট হাউসে পৌঁছে দ্বীপবাসীরা ট্যাবর দ্বীপ থেকে বন্দি করে নিয়ে আসা রহস্যজনক নির্বাসিত লোকটাকে ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর সামনে হাজির করলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং দুপা এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখতেই একটা অদ্ভুত ভাবান্তর লক্ষ করলেন।

প্যানক্রফট বললেন, 'মাস কয়েক আগেও সে আমাদের মতোই সুস্থ স্বাভাবিক ছিল। জ্ঞান-বুদ্ধি আর বিবেচনাবোধ পুরোদস্তুর ছিল। তা যদি না-ই ছিল তবে লোকটা এমন গোছগাছ করে চিঠি লিখে বোতলে করে পাঠালোই বা কী করে?

এদিকে বিচক্ষণ হার্ডিং অপলক চোখে অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে রহস্যজনক লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ইতিমধ্যে অনেক কিছুই আবিষ্কার করে ফেললেন। তিনি নিঃসন্দেহ হলেন, লোকটার মধ্যে চেতনার স্ফুলিঙ্গ ছাইচাপা পড়ে রয়েছে। সুযোগ পেলে যথা সময়েই তার প্রকাশ ঘটতে বাধ্য।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর নির্দেশে দ্বীপবাসীরা আগন্তুক লোকটার সঙ্গে স্নেহ, মায়া, মমতাপূর্ণ আচরণ করতে লাগলেন। অচিরেই তার মধ্যে স্বাভাবিকতা ফিরে এল। তার মাথার উসকো-খুসকো চুল অন্য দশজনের মতো করে কেটে দেওয়া হল। বুক পর্যন্ত নেমে আসা দাড়িগুলোকে কামিয়ে পরিষ্কার করে দেয়া হল। আশ্চর্য ব্যাপার লোকটা কিছুমাত্রও আপত্তি করল না। কথাবার্তা, চালচলন ও চাহনি ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল। আর হৃতস্মৃতিও একটু একটু করে ফিরে আসার লক্ষণ প্রকাশ পেল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর চেষ্টার অন্ত নেই। তিনি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে লোকটাকে স্মৃতি রোমন্থন করতে উৎসাহিত করতে লাগলেন। ফল যে কিছু পাচ্ছেন না তাও নয়।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং ইতিমধ্যেই লোকটার মুখ থেকে নৌ-বিদ্যা সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত ও চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পেরেছেন যা তাঁকে যারপরনাই অভিভূত করেছে।

কিছুদিন যেতে না যেতেই স্পষ্ট বুঝা গেল লোকটা ক্রমেই ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর অনুগত হয়ে পড়েছে। সে সর্বদা তাঁর কাছাকাছি পাশাপাশি থাকার চেষ্টা করে।

এক বিকেলে ক্যাপ্টেন হার্ডিং লোকটাকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে হাজির হলেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য সমুদ্র দেখে তার মধ্যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তবে এদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগলেন, লোকটা যদি অতর্কিতে পালাবার চেষ্টা করে তবে যেন অনায়াসেই জাপ্টে ধরে ফেলতে পারেন।

www.pathagar.com

আশ্চর্য ব্যাপার! লোকটা কিন্তু পালানোর চেষ্টাও করল না। বরং সে সমুদ্রের দিকে কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে একসময় ধীরে ধীরে পাশের জঙ্গলের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অপলক চোখে তাকিয়ে কী যেন দেখতে লাগল। একটু পরেই তার দুচোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নেমে এল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং লোকটার কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে বলতে লাগলেন, ভাই, আমি তোমার দুঃখ যন্ত্রণার কারণ পুরোপুরি উপলব্ধি না করতে পারলেও এটুকু অন্তত বুঝতে পারছি, তোমার মধ্যে পুরনো স্মৃতি ফিরে আসছে। নইলে অবশ্যই তোমার চোখ দুটো এমন করে জলে ভরে উঠত না।'

সন্ধ্যার কিছু আগে ক্যাপ্টেন হার্ডিং লোকটাকে নিয়ে গ্রানাইট হাউসে ফিরে এলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং অন্যান্য দ্বীপবাসীদের কাছে বিকেলে সমুদ্রের তীরে যা কিছু ঘটেছে হুবহু বর্ণনা করলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং ভাবাক্লিষ্ট মুখে বললেন, 'কী জানি, হলে হতেও পারে। তবে একটা কথা, আমাদের কাছে আজ পর্যন্ত তো কোনো অপরাধ করে নি। সে নির্দোষ বলেই আমরা জানি। আর যদি কোনো অন্যায় করে তবে অবশ্যই তাকে তার প্রাপ্য শাস্তি পেতেই হবে, কোনো ভুল নেই।'

এবার রহস্যজনক লোকটা চোখের জল মুছতে মুছতে ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'স্যার, আপনারা কি ইংরেজ, নাকি—'

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই ক্যাপ্টেন হার্ডিং বললেন, 'না, ইংরেজ নয়। আমরা আমেরিকান তুমি কোন দেশের লোক, বলোতো ?—ইংল্যান্ডের?'

'হ্যাঁ,আপনার অনুমান অভ্রান্ত। ইংল্যান্ডেরই বটে।'

কথাটা বলেই সে অস্থিরভাবে কয়েক মুহূর্ত পায়চারি করে একসময় ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এবার বলল, 'আচ্ছা, এটা কোন মাস, বলুন তো ?'

'নভেম্বর।'

'নভেম্বর ? কত সাল বলুন তো?'

'১৮৬৭।'

আচমকা উল্লসিত হয়েসে বলে উঠল, 'বারো বছর! বারো! বারো বছর পেরিয়ে গেছে!'

'পাণ্ডববর্জিত ট্যাবর দ্বীপে তুমি বারোটা বছর একা একা কাটিয়ে দিয়েছ!' লোকটা নীরবে ঘাড় কাৎ করল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বলে চললেন, 'কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তুমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছ, বলবে কী?'

লোকটা মৌনব্রত গ্রহণ করল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং স্বগতোক্তিকরলেন—নির্দিষ্ট সময়ের আগে কিছুতেইমুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় বলেই নিতান্ত নিরুপায় হয়েই সে বোতলে চিঠি ভরে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

রহস্যজনক লোকটা আবার মৌনব্রত গ্রহণ করে পাহাড়ের নির্জন-অন্ধকার গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল। খেতে পর্যন্ত আসে না। রাত্রেও বিষণ্নমনে সেখানেই কাটায়।

www.pathagar.com

দ্বীপবাসীরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন না একদিন সে তার অতীত জীবনের কাহিনী বলে নিজের মনকে হাল্কা করবেই।

১০ নভেম্বর। রাত্রি আটটা। লোকটা হঠাৎ ক্রোধোন্মত্ত সিংহের মতো তর্জন গর্জন করতে লাগল, 'আমাকে কেন এখানে নিয়ে আসা হল? আমাকে এখানে আনার অধিকার কে দিয়েছে, জান তে চাই? আপনারা কী আমার পরিচয় জানেন? কেন আমাকে পট্যাবর দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়েছে, জানেন কি আপনারা ?'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং ছুটে ক্রোধোন্মত্ত লোকটার কাছে উপস্থিত হলেন। তাকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করার প্রাণান্ত চেষ্টা চালাতে লাগলেন।

আশ্চর্য ব্যাপার! লোকটা কিছুতেই শান্ত হল তো না-ই, বরং ঘাড় ঝাঁকিয়ে উন্মাদের মতো বলতে লাগল 'না-না-না! একটা কথার জবাব না পাওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই থামব না।'

'কী ? কী সে প্রশ্ন ?'

'আমি কেবল জানতে চাই—আমি কি স্বাধীন, নাকি পরাধীন? চুপ করে থাকবেন না, উত্তর দিন—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ক্যাপ্টেন হার্ডিং এবার বলে উঠলেন, 'স্বাধীন। অবশ্যই স্বাধীন।'

হঠাৎ লাফিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সে এবার বলল, 'স্বাধীন? তবে আমি চললাম।'

কথা বলতে বলতে লোকটা বিদ্যুৎগতিতে জঙ্গলের দিকে ছুটে গেল।

প্যানক্রফট আর হার্বার্ট তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করল। বৃথা হল চেষ্টা। চোখের পলকে সে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। একেবারে বেপাত্তা।

দীর্ঘ সময় ধরে জঙ্গল তোলপাড় করে তল্লাশি চালিয়ে তাঁরা বিষণ্নমুখে ফিরে এসে বলল, 'হায়! লোকটা পালিয়েছে। আর কোনো দিনই সে ফিরে আসবে না।'

দ্বীপবাসীরা রহস্যজনক সে লোকটাকে ফিরে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিলেন, এবার তাঁরা একটা বায়ুকল তৈরির কাজে মেতে উঠলেন। প্রসপেক্ট হাউসের ওপর সেটাকে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

৩ ডিসেম্বর।

লেকের দক্ষিণ দিকে মাছ ধরতে গিয়ে হার্বার্ট বিকট একটা আর্তনাদ শুনে চমকে উঠলেন। বুকের ভেতরে ফুসফুসের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল।

আতঙ্কিত দ্বীপবাসীরা ছুটোছুটি করে গিয়ে দেখলেন, দানবাকৃতি একটা জাগুয়ার। ভয়ঙ্কর হিংস্র জাগুয়ার কলিজা-কাঁপানো স্বরে তর্জন গর্জন করে চলেছে। একটা মোটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে হার্বার্ট থরথরিয়ে কাঁপতে লাগলেন।

ক্রোধোন্মত্ত হিংস্র জাগুয়ারটা হার্বার্টের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিতেই অতর্কিতে ঝোপের আড়াল থেকে রহস্যজনক সে লোকটা সুতীক্ষ্ণ একটা ছুরি হাতে হিংস্র জানোয়ারটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এক হাতে সজোরে তার টুটি চেপে ধরল। আর অন্য হাতে ঘন ঘন ছুরির আঘাত হানতে লাগল।

www.pathagar.com

রক্তাপ্লুত জাগুয়ারটা বিকট আর্তনাদ করে শূন্যে দুই তিনটে পাক খেয়ে দুম করে আছাড় খেয়ে পড়ল। বার কয়েক আছাড়ি পিছাড়ি করে একসময় নিশ্চয় নিথরভাবে মাটিতে এলিয়ে পড়ল। ব্যস, সবশেষ।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং এগিয়ে গিয়ে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, 'বন্ধু, তুমি যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষীর কাজই করলে বটে। নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে তুমি এই যে হার্বার্ট-এর জীবন রক্ষা করলে এতে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলে।'

'জীবন? জীবন তুচ্ছ করা? আমার জীবনের কী-ই বা দাম আছে বলুন?'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং এগিয়ে গিয়ে করমর্দনের জন্য তার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিতেই সে যন্ত্র চালিতের মতো কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'কেন? আমাকে দিয়ে আপনাদের কি দরকার? কে-ই বা আপনারা? না-না-না আমাকে ছোঁবেন না। আপনারা সাধু—সজ্জন—মহৎ! আর আমি—'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং রহস্যময় লোকটার কথার মধ্যে তার অতীতজীবনের সামান্যতম হলেও ইঙ্গিত পেয়ে গেলেন। সে যে নিজেকে চরম অপরাধী জ্ঞান করছে তা 'সাধু-সজ্জন—মহৎ' শব্দগুলো থেকে অনুমান করতে পারলেন।

রহস্যজনক লোকটা এবার আর গভীর বনে অদৃশ্য না হয়ে পাহাড়ের অদূরবর্তী একটা ফাটলে আশ্রয় নিল। কিন্তু দ্বীপবাসীদের এড়িয়ে চলার একটা ঝোঁক তার মধ্যে দেখা গেল।

১০ ডিসেম্বর।

রহস্যজনক লোকটা হঠাৎ ক্যাপ্টেন হার্ডিংয়ের সামনে এসে করজোড়ে নিবেদন করল, 'স্যার, আমার একটা অনুরোধ রয়েছে। আপনাদের খোঁয়াড়টা দেখাশোনার দায়িত্ব যদি আমাকে—'

'জায়গাটা খুবই নির্জন। তোমার পক্ষে একা সেখানে থাকা সম্ভব হবে। তুমি যদি নিতান্তই খোঁয়াড়ের দায়িত্ব নিতে চাও তবে না হয় তোমার জন্য একটা ঝুপড়ি বেঁধে দেব।

রহস্যজনক লোকটার আগ্রহে ক্যাপ্টেন হার্ডিং খোঁয়াড়টার গায়ে একটা ঝুপড়ি বানিয়ে দিলেন। সে সেখানে থেকে খোঁয়াড় পরিচর্যা করতে লাগল।

এক সকালে ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে কথাপ্রসঙ্গে বলল, 'আমার অতীতজীবনের কাহিনী আপনাকে বলতে চাই, অবশ্য যদি আপনি শুনতে আগ্রহী হন। বলছি শুনুন—ডানকান তো সমুদ্রে গা-ঢাকা দিল। আয়ারটন রয়ে গেল একেবারেই একা। দ্বীপে খাবার দাবার আর গুলি বারুদ সবই ছিল। শুরু হল তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত। অন্তর্জ্বালায় দগ্ধে মরতে লাগল আয়ারটন। নিজেও ভালোই বুঝত, একদিন সে মনুষ্যত্ব হারিয়ে জঙ্গলী জানোয়ারে পরিণত হবে। হলও ঠিক তা-ই। আপনারা সে জানোয়ারটাকেই বারো বছর পর উদ্ধার করে এখানে নিয়ে এলেন।' কথাটা বলেই সে একরাশ দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ছড়িয়ে দিল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং তার কাঁধে আলতো করে হাত রেখে সমবেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন, 'বন্ধু, পাপ হয়ত তুমি করেছিলে ঠিকই। কিন্তু অন্তর্জ্বালার আগুনে সে পাপ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এখন থেকে তুমি আমাদেরই একজন হয়ে নিতান্ত আপনজনের

www.pathagar.com

মতো গ্রানাইট হাউসে থাক। খোঁয়াড়ে থাকার আর দরকার নেই, গ্রানাইট হাউসেই আমাদের কাছাকাছি পাশাপাশি থাক।'

'না, আমাকে এখানে, খোঁয়াড়েই স্বেচ্ছা নির্বাসন জীবন যাপন করতে দিন। পাপজ্বালায় পুড়ে পুড়ে আমার এখনো খাঁটি হওয়ার কিছু বাকি রয়েছে।'

রহস্যজনক লোকটা আরো কিছুদিনের জন্য খোঁয়াড়েই রয়ে গেল।

খোঁয়াড় ছেড়ে যাবার মুখে ক্যাপ্টেন হার্ডিং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'একটা কথা, বোতলের চিঠিতে তুমি তোমার ঠিকানা লিখে পাঠিয়েছিলে কোন উদ্দেশ্যে, বলো তো?'

চিঠির কথা শুনে লোকটা যেন আচমকা ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। সে চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বলল, 'ঠিকানা? কই, আমি তোমাকে, কোনো ঠিকানাই লিখে পাঠাই নি।'

'ঠিকানা লেখ নি?' চোখ দুটো কপালে তুলে ক্যাপ্টেন হার্ডিং বললেন, 'ঠিকানা লেখনি? বোতলে করে অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা লিখে—'

লোকটা তেমনি মাথা ঝাঁকিয়ে এবারও রীতিমতো দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'না, না। অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা বা ঠিকানা—আমি কিছুই পাঠাই নি।'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মুখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। তিনি কপালের চামড়ায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ এঁকে এক পা দু'পা করে খোঁয়াড় ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

বোতলের চিঠি বা ঠিকানা তবে বুড়ো আয়ারটন পাঠায়নি? তবে? তবে কে সেটা সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল? ঠিকানার ব্যাপারটা ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে নতুনভাবে এক রহস্যের জালে জড়িয়ে ফেল। কে? তবে কে বোতলটাকে ঠিকানা সমেত সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল? আজ পর্যন্ত লিঙ্কনদ্বীপে ক্যাপ্টেন হার্ডিং যতকিছু রহস্যজনক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন তাদের মধ্যে বোতলের ঘটনাটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও রহস্যের সঞ্চার করেছে।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং আপন মনে বলে উঠলেন, 'রহস্যগুলোর কিনারা করতে গিয়ে আমাকে যদি দ্বীপের পেটের ভিতরেও সেঁধিয়ে যেতে হয় তবু কুণ্ঠিত হব না। বরাতে যা ঘটে ঘটুক, রহস্যভেদ আমাকে করতেই হবে।'

নানা ঘটনা দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে দ্বীপবাসীরা আরও দু-দুটো বছর কাটিয়ে দিলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং মানচিত্রে তন্ন তন্ন করে লিঙ্কন দ্বীপের নাম খুঁজতে লাগলেন। হতাশ হতে হল তাঁকে। পৃথিবীর সভ্য মানুষের কাছে এ দ্বীপটা একেবারেই অজ্ঞাত। ভুলেও কোনোদিন কেউ এখানে জাহাজ ভেড়াবে না।

ট্যাবর দ্বীপ? এর নাম সবাই জানে। আয়ারটনকে সেখানে নির্বাসিত করা হয়েছিল। তার নির্বাসনের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। অচিরেই তাকে নিয়ে যেতে সেখানে জাহাজ আসার কথা। তাই সেখানে একটা বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দেয়া দরকার। তার গায়ে লিঙ্কন দ্বীপের অবস্থান, আয়ারটন-এর বর্তমান ঠিকানা লেখা থাকবে।

জাহাজ আসবে। কিন্তু কবে? কবে জাহাজ আসবে তারই বা নিশ্চয়তা কি? এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে না থেকে সবাই মিলে কসরত করে একটা জাহাজ তৈরি করে নিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়। কাঠ ও যন্ত্রপাতি কোনো কিছুরই তো এখানে অভাব নেই। মাত্র বারো শো মাইল নিয়ে এত ভাববার কী আছে? স্পিলেট তাঁর জাহাজ তৈরির পরিকল্পনার কথা ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর কাছে ব্যক্ত করলেন।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন হার্ডিং ধৈর্য ধরে স্পেলেটের বক্তব্য শুনে বললেন, 'আমার পরিকল্পনাটা আবার অন্যরকম। সবার আগে ট্যাবর দ্বীপে গিয়ে লিঙ্কন দ্বীপের ঠিকানা সম্বলিত বিজ্ঞপ্তিটা সমুদ্রের ধারে ঝুলিয়ে রাখা দরকার।'

ক্যাপ্টেন হার্ডিংয়ের কথায় স্পিলেট মুখ গোমড়া করে বসে রইলেন।

ষোলই এপ্রিল দ্বীপবাসীরা বন-অ্যাডভেঞ্চারে রচেপে লিঙ্কন দ্বীপটাকে ভালো করে ঘুরে দেখতে বেরোলেন। বিরাট নৌকা তরতর করে এগিয়ে চলেছে।

কথা প্রসঙ্গে স্পিলেট বললেন, 'একটা কথা ক্যাপ্টেন হার্ডিং, আমাদের পক্ষ থেকে আপনার কিন্তু একটা ধন্যবাদ পাওয়া রয়েছে। সেদিন রাতে ট্যাবর দ্বীপ থেকে ফেরার সময় আপনি যে লিঙ্কন দ্বীপ থেকে আগুন জ্বেলে পথনির্দেশ দিয়েছিলেন তার কথা বলতে চাইছি। সেদিন আমরা পথ হারিয়ে যে চক্করে পড়েছিলাম, কোনোদিন এখানে ফিরতে পারতাম কিনা—'

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ক্যাপ্টেন হার্ডিং বলে উঠলেন, 'আগুন? আগুনের সঙ্কেত? কই, আমি তো আগুন জ্বালিনি, সঙ্কেত দেই নি। সেটা তো উনিশে অক্টোবর ছিল। সে রাতে আমি আবার আগুন কখন জ্বাললাম। নির্ঘাত তোমাদের কোথাও ভুল হচ্ছে।'

বিকেল চারটের কাছাকাছি মার্সি নদীর কিনারায় নৌকাটা নোঙর করানো হল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ। উনিশে অক্টোবর রাতে আগুনের রহস্যটা তার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল।

২৫ এপ্রিল। সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। প্রকৃতির বুকে আলো-আঁধারির খেলা শুরু হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন হার্ডিং সবাইকে নিয়ে গল্পে মেতে গেলেন।

কথা প্রসঙ্গে তিনি সবাইকে লক্ষ করে বললেন, 'আমার মধ্যে কতকগুলো রহস্যজনক ঘটনা জমাটবেঁধে রয়েছে। আর সেগুলো আমাকে প্রতিনিয়ত উত্যক্ত করছে। রহস্যজনক সে ঘটনাগুলো নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমি খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই। গোড়াতেই সে রহস্যের মুখোমুখি হয়েছিলাম—বেলুনটা থেকে আচমকা ছিটকে পড়েছিলাম। সমুদ্র থেকে সিকি মাইল দূরে জঙ্গলের ভেতরের এক গর্ত থেকে আমাকে তোমরা উদ্ধার করলে। টপের পক্ষে তোমাদের কাছে খবরটা পৌঁছে দেয়া কী করেই বা সম্ভব হয়েছিল। ঠিক কি না? আবার দেখ টপ ঝড়বাদলের মধ্যে ছুটে গেল, এক ফোঁটা জলও তার গায়ে লাগল না। আবার ডুগং-এর মৃত্যুর ব্যাপারটাও কম রহস্যজনক নয়। বলতে পারো, কার সুতীক্ষ্ণ ছুরির ফলা দিয়ে তার কণ্ঠনালীটা কেটে দেয়া হয়েছিল? আবার কেই বা টপকে অমন করে শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, ভেবে দেখ তো? শূয়োরটাকে গুলি করার ব্যাপারটাও আমাদের মধ্যে কম রহস্যের সঞ্চার করে নি। ঠিক তেমনি রহস্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, জাহাজডুবির ব্যাপারটা। সমুদ্র ও দ্বীপের উপকূলবর্তী অঞ্চল চষে ফেলেও আমরা কিন্তু জাহাজডুবির চিহ্নমাত্রও দেখতে পাই নি। জাহাজডুবি যদি নাই হয়ে থাকে তবে সিন্দুকটা তো আকাশ থেকে পড়ে নি বা উড়েও আসে নি, কী বলো?'

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডিং আবার বলতে শুরু করলেন, 'ভালো করে ভেবে দেখ তো, আয়ারটানের ঠিকানাসহ বোতলটা কেই বা জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। এ ব্যাপারে আয়ারটন কিছুই জানে না, তোমরা তো তার মুখ থেকেই

www.pathagar.com

শুনেছ। আমাদের প্রিয় সঙ্গী টপ কোনো না কোনো রহস্যের গন্ধ পেয়ে মাঝে মাঝেই চিৎকার চেঁচামেচি করে, তোমরা তো জানই? সে নির্ঘাত এমন কিছুর অস্তিত্ব টের পেয়েছে যার ফলে তার মধ্যে এমন অস্থিরতা ভর করে কবার বলছি, শক্ত করে বেঁধে রাখা নৌকাটার ব্যাপার! সেটা আপনা থেকে বাঁধন খুলে আমাদের কাছে এসেছিল এটাই কি আমরা বিশ্বাস করব? আমি নিশ্চিত যে, দ্বীপে এমন কোনো রহস্যজনক ব্যাপার রয়েছে যা আমাদের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত। আর সে প্রতিনিয়ত আমাদের মঙ্গল কামনাই করে চলেছে। কে সে? কোথায়ই বা সে থাকে? আর কেনই বা প্রতিনিয়ত ছায়ার মতো অনুসরণ করে আমাদের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি থেকে বারবার উদ্ধার করে চলেছে।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি।

১৭ অক্টোবর ক্যাপ্টেন হার্ডিং ক্যামেরা নিয়ে নতুন সাজে সজ্জিত দ্বীপটার ছবি তুলে বেড়াতে লাগলেন। অন্ধকার কামরায় রাসায়িনক তরল পদার্থে ধুয়ে ফটো নেগেটিভ করে নিলেন। সেগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে একটার গায়ে সাদা দাগ নজরে পড়ল। জল দিয়ে আচ্ছা করে ধুয়ে ফেললেন। না, রহস্যজনক দাগটাকে কিছুতেই ওঠাতে পারলেন না।

সেদিনই বিকেলের দিকে হার্বার্ট টেলিস্কোপের মাধ্যমে ছবিগুলো দেখতে গিয়ে থমকে গেলেন। তার কপালের চামড়ায় বিস্ময়ের ভাঁজ ফুটে উঠল। আবার টেলিস্কোপের ছিদ্রে চোখ লাগিয়েই সোল্লাসে চিল্লিয়ে উঠলেন—'জাহাজ! জাহাজ! এটা জাহাজের দাগ—জাহাজের ছবি। জাহাজেরই বটে।'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে হার্বার্টের হাত থেকে নেগটিভটাসহ টেলিস্কোপটা নিয়ে চোখের সামনে ধরলেন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, জাহাজ! হার্বার্ট ঠিকই বলেছে—জাহাজই বটে। লিঙ্কন দ্বীপের দিগন্তে একটা জাহাজ দেখা দিয়েছে। জাহাজ! জাহাজ!'

দ্য সিক্রেট অব দ্য আইল্যান্ড

লিঙ্কন দ্বীপে জাহাজ আসছে।

দ্বীপবাসীদের দীর্ঘদিনের অধীর প্রতীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে। তবু দ্বীপবাসীদের মনে স্বস্তি বা শান্তি কোনোটাই নেই। কেন ? কি-ই তার কারণ ? দ্বীপ ছেড়ে স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করতে হবে বলেই কি তাদের মধ্যে এমন আকস্মিক ভাবান্তর ঘটেছে ? হ্যাঁ, এটাই স্বাভাবিক। দীর্ঘদিন নির্জন নিরালা দ্বীপে থাকার ফলে এখানকার ধুলো-মাটি থেকে শুরু করে প্রতিটা গাছগাছালির সঙ্গে যেন তাঁদের আত্মিক সম্পর্কে গড়ে উঠেছ। সে সম্পর্কের আজ ছেদ ঘটতে চলেছে বলেই আজ মন ভারাক্রান্ত, অকথিত ভাবান্তর ঘটেছে।

জাহাজটা এখনো প্রায় কুড়ি মাইল দূরে রয়েছে। হ্যাঁ, তবু তার গতি লিঙ্কন দ্বীপের দিকেই। কিন্তু এমনটা কী করেই বা হতে পারে? প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অজ্ঞাত পরিচয় দ্বীপটার খবর কারো তো জানার কথা নয়। তবে কেন, কী করেই বা জাহাজটা এদিকে ধেয়ে আসছে? ব্যাপারটা দ্বীপবাসীদের মধ্যে গভীর কৌতূহলের সঞ্চার করল।

আয়ারটনকে খোঁয়াড়বাড়ি থেকে ডেকে আনানো হল।

www.pathagar.com

আয়ারটনের চোখের সামনে টেলিস্কোপটা ধরে অস্থিরচিত্ত ক্যাপ্টেন হার্ডিং বললেন, 'দেখ তো জাহাজটাকে চিনতে পার কি না? ভালো করে লক্ষ্য করো, এটা কি ডানকান জাহাজ?'

টেলিস্কোপের নলটাকে বারবার এদিক-ওদিক নেড়েচেড়ে আয়ারটন বলল, 'না, ডানকান বলে তো মনে হচ্ছে না। ডানকান তো কলে চলে। কলের জাহাজ এটা নয়।'

দ্বীপবাসীরা জাহাজের কথা শুনে উল্লসিত হলেন। ক্যাপ্টেন হার্ডিং কিন্তু এটাকে মোটেই সৌভাগ্য বলে মেনে নিতে পারলেন না। জাহাজটার অতর্কিত আবির্ভাব তাঁর মধ্যে গভীর ভাবনার সঞ্চার করল।

টেলিস্কোকপের নলে এবার প্যানক্রফট চোখ লাগালেন। অনুসন্ধিৎসু নজরে মুহূর্তকাল জাহাজটার দিকে তাকিয়ে থেকে একসময় বললেন, 'কটা ফ্লাগ—জাহাজটার মাথায় একটা ফ্লাগ উড়ছে। ওই তো মাস্তুলের ডগায় পতপত করে উড়ছে সেটা। ফ্লাগটা আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের তো নয়ই, মনে হচ্ছে জার্মানি বা ফরাসিরও নয়। আর যদি স্পেনের ফ্লাগ হত তবে তো তার রঙ হলুদ হওয়া উচিত ছিল।'

টেলিস্কোপটা ছোঁ মেরে প্যানক্রফটের কাছ থেকে নিয়ে আয়ারটন চোখের সামনে ধরল। আচমকা সে আর্তনাদ করে উঠল, 'হায় ঈশ্বর। এ কী সর্বনেশে কাণ্ড ঘটাতে চলেছে! এ যে কালো ফ্লাগ। জলদস্যুদের প্রতীক—জলদস্যুদের জাহাজ!'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং এতক্ষণ যা আশঙ্কা করেছিলেন, যে আতঙ্কে ভুগছিলেন, কার্যত ঘটতেও চলেছে ঠিক তাই। তিনি সবাইকে কড়া নির্দেশ দিলেন। বন্দরের সব আগুন নিভিয়ে ফেলার জন্য। গ্রানাইট হাউসের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিতে বললেন। এক টুকরো আলোও যেন ঘরের বাইরে যেতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সবাইকে বার বার নির্দেশ দিতে লাগলেন।

দ্বীপবাসীরা একজোট হয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, মরবেন তবু দ্বীপের দখল ছাড়বেন না।

রাতের অন্ধকারে জাহাজটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। জাহাজটার আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে সহজেই অন্ধকারের বুকে তলিয়ে যেতে পেরেছে বিশালায়তন যন্ত্রদানবটা।

প্যানক্রফট এক মুহূর্তের জন্যও চোখ থেকে টেলিস্কোপটা নামালেন না। একসময় ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে লক্ষ করে বললেন, 'এ কি, জাহাজটায় কামানও রয়েছে দেখা যাচ্ছে!'

তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই সমুদ্রের বুকের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ভেদ করে কামানের শব্দ ভেসে এল। আলোও দেখা গেল। আলো দেখা আর শব্দ শুনতে পাওয়ার মধ্যে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধান। ক্যাপ্টেন হার্ডিং হিসেব করে দেখলেন, জাহাজটা তাঁদের কাছ থেকে প্রায় সওয়া মাইল দূরে অবস্থান করছে। একটু বাদেই অন্ধকার থেকে কড়কড় শব্দ ভেসে এল। দ্বীপবাসীরা নিঃসন্দেহ হলেন, জাহাজ নোঙর করেছে। মোটা শিকলের শব্দ সেটা।

ব্যস, আর কোনো সাড়া শব্দ শোনা গেল না। দ্বীপবাসীরা ধরেই নিলেন, বাকি রাতটুকু জাহাজে কাটিয়ে বোম্বেটেরা জাহাজ ছেড়ে দ্বীপে নামবে।

হর্ডিং বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করতে নারাজ। তিনি সহযোগীদের নিয়ে বোম্বেটেদের মোকাবেলা করার জন্য সাধ্যমতো প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মনে বিচ্ছিন্ন চিন্তা ভর করল। বোম্বেটেরা সংখ্যায় কত জানা নেই। তার ওপর তাদের সঙ্গে কামান রয়েছে। কামানের সঙ্গে কয়েকটা মাত্র গাদা-বন্দুক নিয়ে লড়াইয়ে নামতে যাওয়া তো পাগলের খেয়াল ছাড়া কিছুই নয়।

এমন সময় আয়ারটন অদ্ভুত একটা প্রস্তাব দিল, 'স্যার, যদি অনুমতি দেন তবে আমি গোপনে গিয়ে বোম্বেটেরা সংখ্যায় কত দেখে আসি।'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। নিজের জেদ বজায় রাখতে জান কবুল করতেও পিছপা হন না। তিনি আয়ারটনকে প্রায় ধমকের স্বরেই বলে উঠলেন, 'কোনো দরকার নেই। আমি কাউকেই পরোয়া করি না। আর প্রাণের মায়া? প্রাণের মায়া আমার আদৌ নেই।'

'স্যার, মাত্র সোয়া মাইল পথ, এক ছুট্টে চলে যাব। চোখের পলকে খবরটা নিয়ে ফিরে আসব।' কথা বলতে বলতে আয়ারটন ঠাণ্ডা কম লাগার জন্য গায়ে চর্বি মেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল।

জাহাজের কাছে পৌঁছেই আয়ারটন নোঙরের মোটা শেকলটা বেয়ে তরতর করে জাহাজের ডেকের ওপর উঠে গেল। জমাটবাঁধা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে জাহাজের যাত্রীদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। জাহাটার নাম 'স্পিডি'। আর তার ক্যাপ্টেনের নাম বব হার্ডি।

ক্যাপ্টেন বব হার্ডির নাম কানে যেতেই অতীত স্মৃতি তার মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বব হার্ডি অস্ট্রেলিয়ার জেল-পালানো কয়েদিদের নিয়ে দুর্ধর্ষ একটা ডাকাতদল গড়ে তুলেছিল। নাবিক হিসেবে তার খ্যাতি রয়েছে। আর দুর্ধর্ষ ডাকাত বলেও কম অখ্যাতি নেই। প্রচুর গোলাবারুদ আর অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ স্পিডি জাহাজটা বব হার্ডির দল অস্ট্রেলিয়ার নরফোক দ্বীপের কাছাকাছি সমুদ্রের বুক থেকে করায়ত্ত করে নিয়েছে।

আয়ারটন ভাবতে লাগর, সামান্য কয়টা গাদা বন্দুক নিয়ে মাত্র ছয়জন দ্বীপবাসীর পক্ষে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া পাগলের খেয়াল ছাড়া কিছুই নয়।

আরো মুহূর্তকাল নীরবে মাতাল বোম্বেটেদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে সে ভাবল, যদি আত্মবিসর্জনের কারণ ঘটে তবু কয়েকজন হিতকারী দ্বীপবাসীর প্রাণরক্ষা পাবে, জাহাজের বারুদঘরে সে আগুন ধরিয়ে দেবে। চোখের পলকে জাহাজটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

আচমকা কে যেন পিছনদিক থেকে শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে তার ঘাড়টা চেপে ধরে গর্জে উঠল, 'খবরদার!খবরদার, এক পাও এগোবে না, বলে দিচ্ছি!'

আচমকা ঘাড় ঘুরিয়েই আয়ারটান চিনে ফেলল 'ববি হার্ডি।' তার কণ্ঠস্বরও তাকে সনাক্তকরণে সাহায্য করল।

ববি হার্ডি কিন্তু আয়ারটনকে মোটেই চিনতে পারল না। পারার কথাও তো নয়। কারণ, সে নিশ্চিত জানে, আয়ারটন অনেক আগেই মরে ভূত হয়ে গেছে। কেউ বললেও সহজে বিশ্বাস করতে উৎসাহী হবার কথা নয়।

তাদের চেঁচামেচিতে মাতাল নাবিকদের একজন আয়ারটনের কাঁধে আচমকা পিছনদিক থেকে গুলি চালিয়ে দিল। বরাত ভালো যে, আঘাত সামান্যই লেগেছে।

আয়ারটন বুদ্ধি করে বন্দুকের গুলিত লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল। জাহাজের বুকে নেমে এল নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। ব্যস, অন্ধকারে আত্মঘাতী লড়াইয়ে মেতে উঠল। একের পর

www.pathagar.com

এক রক্তমাখা বোম্বেটের রক্তমাখা শরীর মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে কাতরাতে লাগল।

সুযোগ বুঝে আয়ারটন শিকলটা বেয়ে তরতর করে জলে নেমে গেল। নিঃশব্দে সাঁতার কেটে কূলের দিকে এগোতে লাগল।

আহত আয়ারটন কাজ হাসিল করে দ্বীপবাসীদের কাছে ফিরে এল।

পুব আকাশে রক্তিম ছোপ ফুটে উঠল। ভোরের হাল্কা আলোয় স্পিডির ঝাপসা চেহারা দ্বীপবাসীদের চোখেল সামনে ভেসে উঠল।

বুদ্ধি করে দ্বীপবাসীরা চারটে দলে বিভক্ত হয়ে বোম্বেটেদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হলেন।

আয়ারটন ইয়া পেল্লাই একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলেন।

এদিকে বোম্বেটেরা জাহাজ থেকে দ্বীপটা লক্ষ করে মুহর্মুহু কামান দাগাতে লাগর।

দ্বীপবাসীরাও সুযোগ বুঝে মাঝে মাঝে বন্দুক ছুঁড়ে দু-একটা করে বোম্বেটেকে ঘায়েল করতে লাগলেন।

বন্দুকের ধোঁয়া লক্ষ করে বব হার্ডির কামান গর্জে উঠতে লাগল।

কয়েক মিনিট পরে জাহাজ থেকে দুটো নৌকা নেমে এল। কয়েকটা বোম্বেটে হুটোপাটা করে জাহাজ থেকে নৌকায় নেমে এল। এবার একটা নৌকা লিঙ্কন দ্বীপের দিকে এবং অন্যটা মার্সি নদীর মোহনার দিকে উল্কার বেগে ছুটে চলল। আয়ারটন ও প্যানক্রফট বিশালায়তন একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়াল থেকে বন্দুক চালিয়ে দু-একটা করে বোম্বেটেকে গুলি করতে লাগলেন। পাথরের আড়াল থেকে গুলি করার জন্য বোম্বেটেদের গুলি তাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারছে না।

মার্সি নদীর দিকে বন্দুক হাতে অপেক্ষা করছিলেন বীরযোদ্ধা স্পিলেট। তিনি একটা মোটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সুযোগের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। বোম্বেটেদের নৌকাটা কাছাকাছি আসতেই তিনি বন্দুকের ঘোড়া টিপতে লাগলেন ব্যস, চোখের পলকে দুজন বোম্বেটে বিকট আর্তনাদ করে নদীর জলে আছাড় খেয়ে পড়ল। আচমকা দোলা লাগায় নৌকাটা প্রচণ্ড বেগে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা পাথর ধাক্কা খেল। ব্যস, মুহূর্তে সেটা গুঁড়ো হয়ে গেল। বোম্বেটেরা দারুণভাবে আহত হল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং আগেই অনুমান করেছিলেন, অচিরেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাবে। বোম্বেটেরা খাড়ির দিকে স্পীডিকে নিয়ে এগোবে। তারা শেষপর্যন্ত করলও তাই।

সমূহ বিপদ বুঝে নেবুচ্যাডনেজার ও স্পিলেট দ্রুত চিমনিতে ঢুকে গেলেন। বোম্বেটেরা চিমনিটা লক্ষ করে কামান দাগল। চিমনির গায়ে ফাটল দেখা দিল। কামানের একটা গোলা বাতাসের বেগে ছুটে গিয়ে গ্রানাইট হাউসের গায়ে আঘাত করে উঠলেন। বোম্বেটেরা তাদের মাথাগোঁজার জায়গাটার হদিস পেয়ে গেছে।

একটু পরেই জাহাজটার দিক থেকে অনকেগুলো মানুষের সমবেত আর্তস্বর শোনা গেল। দ্বীপবাসীরা যে যার গোপন অন্তরাল থেকে উঁকি দিয়ে দেখলেন, বোম্বেটেদের একমাত্র সম্বল স্পীডি জলস্তম্ভের মাথায় চেপে সজোরে আছাড় খেয়ে পড়ল। মুহূর্তে গুঁড়ো হয়ে গেল এমন বিশালায়তন জাহাজটা।

ব্যস, সব শেষ।

www.pathagar.com

স্পীডি কেন অকস্মাৎ এমন করে ধ্বংস হয়ে গেল? এমন একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা কেন ঘটল?

ভাঁটার টানে স্পীডির ধ্বংসাবশেষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এমন একটা অপূর্ব সুযোগ দ্বীপবাসীরা নষ্ট করতে নারাজ। তারা গাঁইতি, শাবল, কুড়োল আর কাটারি প্রভৃতি নিয়ে লেগে পড়ল ভাঙা জাহাজটার প্রয়োজনীয় অংশ কাটাকাটি করে দ্বীপে তুলে নেয়ার জন্য। জোয়ার আসার আগেই কাজ মিটিয়ে ফেলতে হবে তাই এ ব্যস্ততা। বাক্স-পেটরা, ছোট বড় যন্ত্রপাতি, গোলাবারুদ, বন্দুক, বাসনকোসন আর অতিকায় দুটো সিন্দুক তারা ভাঙা জাহাজটা থেকে উদ্ধার করল।

দ্বীপবাসীরা সমুদ্রের ধার বরাবর হেঁটে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পাথরের ওপর পড়ে থাকা একটা লোহার চোঙ তাদের গতিরুদ্ধ করে দিয়েছে।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং চোঙটা দেখেই চমকে উঠলেন। অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি সহজেই চিনতে পারলেন, এটা অবশ্যই মামুলি একটা চোঙ নয় টর্পেডোর ধ্বংসাবশেষ।

হ্যাঁ, টর্পেডোর ধ্বংসাবশেষই বটে। কিন্তু এটা এখানে এল কী করে? ক্যাপ্টেন হার্ডিং ভাবছেন—তবে কি কেউ গোপন অন্তরাল থেকে মারাত্মক অস্ত্র টর্পেডোটা ছুঁড়ে বিশালায়তন জাহাজটাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে? কে? কে সে? আবার একটা রহস্যজনক ঘটনা ঘটে গেল দ্বীপবাসীদের চোখের সামনে। তবে কি ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর কথাই ঠিক, কোনো এক অজ্ঞাত শক্তি তাদের একের পর এক ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে অব্যাহতি দিয়ে চলেছে ? কি সে রহস্য ? আর সে রহস্যের শেষ কোথায় তাই বা কে জানে?

ক্যাপ্টেন হার্ডিং আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় মারাত্মক মারণাস্ত্র টর্পেডোর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তার অসীম শক্তি, বোম্বেটেদের জাহাজ স্পীডি তো সামান্য ব্যাপার, ছোটোখাটো একটা পাহাড়কেও গুঁড়িয়ে দিতে পারে। কে সে অকৃত্রিম হিতাকাঙ্ক্ষী যে গোপন অন্তরাল থেকে অলৌকিক, অপার্থিব এবং অমানুষিক ক্ষমতাবলে একের পর এক রহস্য সৃষ্টি করে দ্বীপবাসীদের বিস্ময় উৎপাদন করে চলেছে?

জাহাজ থেকে পাওয়া কামানটা গ্রানাইট হাউসে বসিয়ে দিয়ে প্যানক্রফট সেটাকে রীতিমতো একটা দুর্গ বানিয়ে তুলেছে। আর বারুদের স্তূপও সেখানেই রাখা হয়েছে।

এবার দ্বীপবাসীদের চিন্তা যে ছয় জন বোম্বেটে বেকায়দায় পড়ে জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়েছিল তাদের খুঁজে বের করার ব্যাপারে। আবার নৌকোয় চেপে সটকে পড়াও বিচিত্র নয়। আর সবচেয়ে বড় কাজ, হিতকারী অদৃশ্য ব্যক্তিটাকে সন্ধান করা।

হার্বার্ট, প্যানক্রফট আর স্পিলেট তাদের জলযান বন-অ্যাডভেঞ্চারের বাঁধন খুলতে গিয়ে যারপরনাই বিস্মিত হলেন। গাছের সঙ্গে নৌকাটাকে বেঁধে রাখা ছিল। গিটটাই তাদের বিস্ময়ের কারণ। তাঁদের মধ্যে এমন গিঁট কেউই দেয় না, দিতে পারেও না। তবে? কে এমন অসম্ভব একটা কাজ করল? এতেও রহস্যজনক হিতাকাঙ্ক্ষীটার হাতের ছোঁয়া পড়েছে দেখা যাচ্ছে। কে এই রহস্যসৃষ্টিকারী অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি।

আয়ারটন খোঁয়াড়ের অবস্থা দেখতে গিয়েছিল, কাজ সেরে তার অনেক আগেই ফিরে আসার কথা। তার অস্বাভাবিক দেরি দেখে দ্বীপবাসীরা অস্থির হয়ে তার খোঁজে গেলেন। খোয়াড়ের সামনে পা দিয়েই সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ার জোগাড়। আয়ারটন অনুপস্থিত। খোঁয়াড়টাও লণ্ডভণ্ড। সবাই মিলে আয়ারটনের নাম ধরে ডাকাডাকি করে চারদিকে খোঁজ করলেন। কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।

www.pathagar.com

দ্বীপবাসীরা যখন হতাশদৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কর্তব্য নির্ধারণে ব্যস্ত ঠিক তখনই টপকে অস্বাভাবিক অস্থির হয়ে পড়তে দেখা গেল। সে অনবরত ঘেউ ঘেউ করতে করতে চারদিকে ছুটোছুটি দাপাদাপি শুরু করে দিল।

টপের অস্থিরতার কারণ জানতে হার্বাট উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে যেতেই আচমকা বিকট আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনে স্পিলেট ও প্যানক্রফট ছুটোছুটি করে এগিয়ে গিয়ে দেখেন, হার্বাটের রক্তাপ্লুত দেহটা মাটিতে পড়ে আছাড়ি পিছাড়ি করছে। তবে প্রাণে বেঁচে গেছেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছে গেছেন। তিনিও বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনে হার্বাটের দিকে এগোতে লাগলেন। এমন সময় তাঁর দিকে বন্দুকের একটা গুলি ছুটে এল। ব্যাপারটা লক্ষ করে তিনি অতর্কিতে বসে পড়ে প্রাণ বাঁচালেন। একটা বোম্বেটে। বন্দুকের গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় অসহায় দৃষ্টি মেলে ক্যাপ্টেন হার্ডিংয়ের দিকে সে তাকিয়ে রইল। ক্যাপ্টেন হার্ডিং একলাফে তার ওপর পড়ে হাতের ছুরিটা তার বুকে আমূল গেঁথে দিলেন।

বোম্বেটেগুলো খোঁয়াড়ে আশ্রয় নিয়েছে। সারাদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে খাবারে খোঁজ করে আর তারা রাত কাটায় খোঁয়াড়ে। দ্বীপবাসীরা এসে পড়ায় তাদের অসুবিধা ঘটেছে।

২৭ নভেম্বর। স্পিলেট টপকে নিয়ে ভোরে বনের দিকে রওনা হলেন। সোয়া মাইল গিয়ে টপ গলা ছেড়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। সে দৌড়ে গিয়ে অদূরবর্তী ঝোপের ফাঁক থেকে রক্তমাখা পোশাকের একটা টুকরো বের করে আনল। তাকে সেটা দাঁতে কামড়ে আনতে দেখেই স্পিলেট চিনতে পারলেন, এটা আয়ারটনের পোশাকের টুকরো ছিড়ে গাছে আটকে গেছে। তবে? তবে কি সে বেঁচে রয়েছে?

২৯ নভেম্বর। কদিন ধরে নেবুচ্যাডনেজার একা গ্রানাইট হাউস আগলাচ্ছেন। সেদিন দুপুরের ঠিক আগে ব্যস্ত-পায়ে জ্যাপ খোঁয়াড়বাড়িতে হাজির হল। তার গলায় একটা চিরকুট বাঁধা। তাকে লেখা—"শুক্রবার সকাল ছয়টায় বোম্বেটেরা প্লেটোর ওপর চড়াও হয়েছে।—ইতি নেব।"

চিঠিটা পড়েই দ্বীপবাসীরা রীতিমতো হায় হায় করে উঠলেন।

ওনাগা দুটোকে গাড়িতে জুড়ে দেয়া হল। অসুস্থ হার্বাটকে গাড়ি ছাড়া নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সে সংজ্ঞাহীন। গায়ে তখনও জ্বর। ক্যাপ্টেন হার্ডিং জঙ্গল থেকে উইলো গাছের ছাল এনে রস করলেন। হার্বাটকে খাইয়ে দিলেন। কুইনাইনের বিকল্প ব্যবস্থা। তবু তাঁর জ্বর ছাড়ল না। একমাত্র কুইনাইন প্রয়োগ করতে পারলে জ্বর অবশ্যই ছাড়বে।

অনন্যোপায় হয়ে তখনকার মতো যাত্রা স্থগিত রাখতেই হল। অচৈতন্য হার্বাটকে নিয়ে এতটা পথ যাওয়ার ঝুঁকি নিলেন না।

হার্বাট সারারাত জ্বরের ঘোরে ছটফট করলেন। সকালে এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। একে অলৌকিক ব্যাপারও বলা চলে। খোঁয়াড়বাড়ির সামনে একটা শিশি পড়ে থাকতে দেখা গেল। তার গায়ে লেখা—সালফেট অব কুইনাইন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর নির্দেশে কফির সঙ্গে আঠার গ্রেন কুইনাইন মিশিয়ে হার্বাটকে খাইয়ে দেয়া হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্বর কমতে লাগল। বিকালে উপসর্গও রইল না। প্রলাপ বকাও বন্ধ হয়ে গেল।

www.pathagar.com

কুইনাইনের শিশিটা দ্বীপবাসীদের মধ্যে নতুন করে রহস্যের সঞ্চার করল। কে শিশিটাকে খোঁয়াড়ের দরজায় রেখে দিয়ে গেল। কে সে শুভাকাঙ্ক্ষী?

ফেব্রুয়ারি মাস পড়ল। দ্বীপবাসীরা গ্রানাইট হাউসে অবস্থান করছেন। এদিকে বোম্বেটেদের উপস্থিতির কিছু কিছু চিহ্ন এখানে ওখানে পাওয়া যেতে লাগল। ভাঙা ডালপালা, পায়ের চিহ্ন, পোড়া ছাই দেখে দ্বীপবাসীরা নিঃসন্দেহে হলেন, দুর্ধর্ষ বোম্বেটেরা ধারে কাছেই ঘর ঘুর করছে।

স্পিলেট ভাবছেন, বোম্বেটেরা হয়ত-বা ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের গুহায় মাথা গুঁজেছে। তারা সাবই আবার কদিনের জন্য খোঁয়াড়-বাড়িতে গেলেন। সেখান থেকে ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের প্রতিটা গুহায় হানা দিয়ে বোম্বেটেদের খোঁজ করতে লাগলেন।

এক বিকেলে দ্বীপবাসীরা ফ্রাঙ্কলিন পাহাড় থেকে খোঁয়াড়-বাড়িতে ফিরে চমকে উঠলেন। দেখলেন ঘরের ভেতরে কে একজন পিছন ফিরে শুয়ে। দরজা দিয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়েই তারা চিনে ফেললেন, আয়ারটন পিছন ফিরে শুয়ে।

দ্বীপবাসীরা ব্যস্তপায়ে ঘুরিয়ে তাদের দিকে তাকাল। ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বিপদ সামনে। বন্দুক নিয়ে সবাই তৈরি থাকুন।'

ঠিক তখনই টপ-এর গর্জন শোনা গেল। বন্দুক-হাতে তার কণ্ঠস্বর অনুসরণ করলেন। সামান্য এগিয়েই তারা ঝর্নার ধারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাদের সামনে পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পাঁচ-পাঁচটা বোম্বেটের মৃতদেহ পড়ে। কে দ্বীপবাসীদের চরমতম শত্রু বোম্বেটেদের মেরে সাবাড় করল? রহস্য! গভীর রহস্য! দ্বীপবাসীরা নতুনতর এক সমস্যায় জড়িয়ে পড়লেন।

আয়ারটন একটু সুস্থ হলে তার দুরবস্থার কথা এক-এক করে বলতে লাগল। আয়ারটন খোঁয়াড়ে আসার পরদিনই কে বা কারা যেন আচমকা পিছন থেকে তার চোখ দুটো চেপে ধরল। পিঠমোড়া করে বেঁধে ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের গুহায় নিয়ে গেল। বোম্বেটেদের একজন তাকে হঠাৎ চিনে ফেলল। তাকে না মেরে দ্বীপবাসীদের তথ্য সংগ্রহের আশায় জিইয়ে রাখল। কিন্তু আয়ারটন তাদের হতাশ করল। কোনো তথ্যই সে তাদের কাছে ফাঁস করল না। তার পরের ঘটনা, কী করে সে খোঁয়াড়বাড়ির ঘরে এল—কিছুই তার জানা নেই। তাই বোম্বেটেদের হত্যার ব্যাপারটা রহস্যের আড়ালেই রয়ে গেল। এতবড় একটা রহস্য আড়ালেই থাকল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বোম্বেটেদের লাশগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নিঃসন্দেহ হলেন, কোনো উন্নত ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে তাদের হত্যা করা হয়েছে। আবার একটা রহস্য ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মাথায় ভর করল।

১৯ ফেব্রুয়ারি। অজ্ঞাতপরিচয় দেবতুল্য হিতাকাঙ্ক্ষীকে খুঁজে বের করার জন্য দ্বীপবাসীরা ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ে হাজির হলেন।

একটা অন্ধকার গুহার দরজায় গিয়ে অনুসন্ধানকারী দ্বীপবাসীরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, গুহার জমাটবাঁধা অন্ধকার থেকে কেমন একটা চাপা গুঞ্জন ভেসে আসতে লাগল। গুঞ্জন ঠিক নয়—দুমদুম আওয়াজ।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং রহস্যটার সমাধানের জন্য তৎপর হলেন।

স্পিলেট বললেন, 'আমরা বোধ হয় ভয়ঙ্কর এক বিপদের মুখোমুখি হতে চলেছি। আমার মনে হচ্ছে, অদূরে কোনো সুপ্ত আগ্নেয়গিরি নতুন করে অগ্নি-উদগীরণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার যদি হয়ই তবে আমাদের মৃত্যু কেউই রদ করতে পারবে না।'

www.pathagar.com

স্পিলেট-এর কথায় ক্যাপ্টেন হার্ডিং মোটেই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন না। হিতকারী অধিদেবতা থাকতে তিনি কোনো বিপদকেই যথার্থ বিপদ মনে করেন না। তাঁর একমাত্র চিন্তা, তাঁকে খুঁজে বের করা।

ইতোমধ্যে দ্বীপবাসীরা ভাঙা জাহাজটার ভাঙা খোল, পাটাতন ও মাস্তুলটা ব্যবহার করে চমৎকার একটা জাহাজ তৈরি করে ফেলেছেন।

১৫ অক্টোবর একেবারেই নতুনতর একটা ঘটনা ঘটে গেল। টেলিগ্রামের বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটা ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং করে বেজে উঠল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ার জোগাড় হলেন। দ্বীপবাসীরা সবাই তো তাঁর কাছাকাছি রয়েছেন। তবে কে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। তিনি ব্যস্তপায়ে এগিয়ে যন্ত্রের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে? কে আপনি? কী চাই, বলুন?'

'মুহূর্তমাত্র দেরি না করে আপনারা সবাই খোঁয়াড়বাড়িতে চলে আসুন।' বিপরীত দিক থেকে অচেনা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং আপন মনে বলে উঠলেন, 'এতদিনে তবে রহস্যের পর্দা একটু একটু করে সরে যেতে শুরু করেছে।'

জ্যাপের ওপর গ্রানাইট হাউস রক্ষার যাবতীয় দায়ীত্ব দিয়ে দ্বীপবাসীরা দলবেঁধে খোঁয়াড়বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

হার্বাট খোঁয়াড়বাড়িতে পৌঁছেই এক ছুটে ঘরের ভেতরে চলে গেলেন। দেখলেন, টেবিলের ওপর একটা চিরকুট পড়ে। ইংরেজিতে একটা ছত্র লেখা—

'নতুন তার অনুসরণ করে চলে আসুন।'

তিনি এক লাফে ঘরের বাইরে এসে দেখলেন, পুরনো তারের গায়ে নতুন তার রাখা হয়েছে।

দ্বীপবাসীরা চিঠির বক্তব্য অনুযায়ী নতুন তার অনুসরণ করতে করতে সমুদ্রের ধারে হাজির হলেন। তারটা সমুদ্রের জলে নেমে গেছে দেখা গেল।

দ্বীপবাসীরা তো একেবারেই মুষড়ে পড়লেন। পরমতম হিতাকাঙ্ক্ষীর খোঁজে শেষপর্যন্ত সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে হবে নাকি?

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর পরামর্শে সবাই ভাঁটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ভাঁটার টানে জল নেমে গেলে পরিস্থিতি কী দাঁড়ায় তারই অপেক্ষায় থাকা। কোনো গুহার মুখও ভেসে ওঠা অসম্ভব নয়।

একটু বাদেই তুমুল ঝড় আর মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। কড়াক কড়াক শব্দে বাজও পড়ছে মুহুর্মুহু।

জোয়ারের জল নেমে যেতেই সত্য সত্যই একটা গুহার মুখ দ্বীপবাসীদের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

দেখা গেল টেলিগ্রাফের তারটা সোজা গুহার ভেতরে ঢুকে গেছে। গুহার মুখে কালো একটা বস্তু দেখতে পেয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডিং সেটা ধরে এক হেঁচকা টান দিলেন। একটা লোহার নৌকার গলুই এগিয়ে এল। সবাই টানাটানি করে নৌকাটা বের করে ফেললেন। মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সবাই নৌকাটায় চেপে দ্রুত গুহাটার ভেতরে ঢুকে গেলেন। নৌকা এগিয়ে চলল অন্ধকার গুহা পথে।

কিছুদূর যেতেই নৌকারোহী দ্বীপবাসীরা সামনে অত্যুজ্জ্বল একটা আলো দেখতে পেলেন। সেটাকে বৈদ্যুতিক আলো বলেই মনে হল।

www.pathagar.com

আরও কিছুদূর যেতেই ক্যাপ্টেন হার্ডিং দেখলেন অতিকায় একটা মাছের মতো বস্তু। মাছের মতোই তার দুদিক সরু। তাঁতের মাকু যেমনটা হয়ে থাকে।

অতিকায় বস্তুটাকে দেখেই ক্যাপ্টেন হার্ডিং সোল্লাসে বলে উঠলেন—'হ্যাঁ, আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীর খোঁজ পাওয়া গেছে। পেয়েছি। হ্যাঁ, ব্যাপারটা বুঝতে আমার মোটেই ভুল হয় নি। হ্যাঁ, ইনিই তিনি! পেয়েছি! পেয়ে গেছি!'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং এগিয়ে গিয়ে লম্বা একটা সিঁড়ির গায়ে নৌকাটা ভেড়ালেন। সবাই ব্যস্তপায়ে সিঁড়িটা বেয়ে নিচে নামতে লাগলেন। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই ক্যাপ্টেন হার্ডিং বিনীতস্বরে নিবেদন করলেন—'ক্যাপ্টেন নিমো, আপনি আমাদের ডেকেছেন? আমরা এসেছি। ক্যাপ্টেন, এই যে আমরা।'

মাথা নিচু করে গভীর ভাবনায় তলিয়ে থাকা ক্যাপ্টেন নিমো ধীরে ধীরে মুখ তুললেন। গম্ভীরস্বরে উচ্চারণ করলেন, '—না, আমার কোনো নাম নেই। আজ আমি নামগোত্রহীন বৃদ্ধ—'

'আপনার কিছুই আমার অজানা নেই ক্যাপ্টেন। আমি আপনাকে চিনি, জানিও সবই।'

'জানলেই বা এখন আর ক্ষতি কী? আমার তো সময় ঘনিয়ে এসেছ। মরতে বসেছি।' মুহূর্তের জন্য ক্যাপ্টেন হার্ডিংয়ের দিকে নিস্তেজ চোখের মণি ঘুরিয়ে ক্যাপ্টেন নিমো এবার বললেন, 'আপনি কি আমার নাম জানেন ? বলুন তো, কী নাম আমার ?

'ক্যাপ্টেন নিমো। ঠিক কি না? আর আপনার এই অত্যাশ্চর্য, একেবারেই অবিশ্বাস্য ডুবোজাহাজটার কথাও আমার অজানা নয়।'

'হ্যাঁ, আমার প্রিয়তম বাহন এই নোটিলাসে চেপে আমি অনেকগুলো বছর অতিবাহিত করেছি। একটা কথা, পৃথিবীর সঙ্গে তো দীর্ঘদিন আমার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন। বলুন তো, আমার অজ্ঞাতবাসের খবরটা কে প্রচার করেছে ?'

'তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক তো নেই-ই এমনকি তার ওপর কোনো কর্তৃত্বও আমার নেই। তাকে বিশ্বাসঘাতক জ্ঞান—'

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ক্যাপ্টেন নিমো চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। ষোল বছর আগেকার কথা। এক ফরাসি ভদ্রলোক, নাম তাঁর প্রফেসর অ্যারোনাক্স, তখন আমার এই ডুবোজাহাজে এসেছিলেন। তিনিই আমার অজ্ঞাতবাসের খবরটা চাউর করেছেন। আমি তো নিশ্চিত ছিলাম, নরওয়ের ঘূর্ণিপাকে পড়ে তিনি প্রাণ হারিয়েছেন।'

'অবশ্যই না। তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। আর স্বদেশে ফিরে আপনার কীর্তিকাহিনী সম্বলিত 'টুয়েন্টি থাউজেন্ড লিগস্ আণ্ডার দ্য সি' নামে এক বই লিখে জনসমাজে প্রচার করেন।'

'সে যা-ই হোক না কেন, সাত মাসের বিস্ময় ভরা কীর্তিকথাই আপনাকে বিশ্ববাসীর কাছে অমর করে রাখবে ক্যাপ্টেন নিমো।'

চোখে-মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে তুলে ক্যাপ্টেন নিমো এবার বললেন, 'অমর চিরজীবী স্মরণীয়—তাই না ? কেন স্মরণীয়? সমাজবিরোধী, সভ্যমানুষের চরমতম শত্রু জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত হিসাবে স্মরণীয় ঠিক কি না?'

www.pathagar.com

'ক্যাপ্টেন নিমো আপনার কাজের সামলোচনা করতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। তাছাড়া আপনার অতীত কাহিনীও আমার অজানা। কেবল এটুকুই উপলব্ধি করেছি, আমরা লিঙ্কন দ্বীপে পা দেয়ামাত্র একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, যথার্থ বন্ধু প্রতি মুহূর্তে আমাদের সঙ্কটমুক্ত করার জন্য তৎপর। আর সে পরোপকারী মহাত্মার স্নেহ মায়া মমতার জন্যই আমরা এতগুলো প্রাণী আজও প্রাণে বেঁচে রয়েছি। আর সে হিতাকাঙ্ক্ষী, অকৃত্রিম বন্ধুটি হচ্ছেন আপনি। —হ্যাঁ, আপনি ছাড়া আর কেউ নন।'

'হ্যাঁ, আমিই সে ব্যক্তি। আমার জীবনকথা আপনার কাছে তুলে ধরছি। সবকিছু শুনে আমার সম্বন্ধে যা ধারণা করার করবেন।'

ক্যাপ্টেন নিমো এবার যা বলরেন তার মর্মার্থ হল—তিনি একজন ভারতবর্ষীয়। বুন্দেলখণ্ডের রাজকুমার। রাজকুমার ডাক্কার ছিল তাঁর ছাত্র, ছয় থেকে ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞান, শিল্পবিদ্যা আর সাহিত্যচর্চা করে অতিবাহিত করেন। ভবিষ্যতে স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়াই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। নিজেকে সেভাবেই তৈরিও করছিলেন।

১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের জোয়ার বইতে লাগল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। রাজকুমার ডাক্কারও বিদ্রোহের সামিল হলেন। তাঁর বীরত্বের ব্যাপার চাক্ষুস করে ইংরেজ সরকার তাকে জ্যান্ত অথবা মৃত ধরিয়ে দেয়ার বিনিময়ে মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন। উপায়ান্তর না দেখে তিনি আত্মগোপন করলেন। বিদ্রোহ দমন করে ইংরেজ দেশগুলোকে পূর্ণ দখল করে ফেলল। বিদ্রোহী বীর রাজকুমার ডাক্কার বিশ জন অনুগত সহকর্মীকে নিয়ে বুকে অনন্ত হাহাকার আর জমাটবাঁধা ঘৃণা নিয়ে গা-ঢাকা দিলেন।

শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষরা যেখানে তাঁর টিকির নাগালও পাবে না এমন শান্তির স্থান সাগরের বুকে আশ্রয় নিলেন তিনি। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে এক নির্জন নিরালা দ্বীপে তিনি হঠাৎ হাজির হলেন। অস্ত্র ফেলে সৈনিক হলেন একজন বৈজ্ঞানিক। নিজের পরিকল্পনামাফিক অত্যাশ্চর্য এক ডুবোজাহাজ তৈরি করলেন। তার নামকরণ করলেন 'নোটিলাস'। অত্যাশ্চর্য পদ্ধতিতে তৈরি এটা। সমুদ্রের জল থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করে ব্যবহার করতে লাগলেন।

নোটিলাসে চেপে ক্যাপ্টেন নিমো সাত সমুদ্র চষে বেড়াতে লাগলেন। কখন সমুদ্রের বুকে আবার কখনো-বা জলের তলা দিয়ে অগ্রসর হতে হতে ক্যাপ্টেন নিমো কত সব জাহাজডুবির ধনরত্ন উদ্ধার করেছেন তার শেষ নেই।

১৭০২ সালে কোটি কোটি মোহর ও মূল্যবান সম্ভার নিয়ে স্প্যানিশ জাহাজ সমুদ্রে তলিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন নিমো পরবর্তীকালে সেগুলো উদ্ধার করে স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দরাজহাতে বিতরণ করলেন। তবে সতর্কতার সঙ্গে নিজের নাম ও পরিচয় গোপন রাখলেন।

সেটা ছিল ১৮৬৬ সালের শেষ। ডুবোজাহাজ নোটিলাসে এসে আশ্রয় নিলেন ফরাসি প্রফেসর অ্যারোনাক্স। সঙ্গে এল তাঁর এক ভৃত্য ও এক যুবক জেলে। তাঁরা নোটিলাসকে ধ্বংস করার গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হয়। তাঁদের দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে ক্যাপ্টেন নিমো তিনজনকেই কয়েদিদের সঙ্গে আটকে রেখেছিলেন।

www.pathagar.com

১৮৬৭ সালের ২৩ জুন সুযোগবুঝে তাঁরা তিনজনই নোটিলাসেরই এক নৌকায় চেপে পালিয়ে যান। নোটিলাস তখন নরওয়ের কুখ্যাত ঘূর্ণিপাক মেলস্টেমের এলাকায় অবস্থান করছিল। অতএব ক্যাপ্টেন নিমো নিঃসন্দেহ হলেন তাদের তিনজনেরই সলিলসমাধি হয়েছে।

ঈশ্বর সহায় থাকলে মারে সাধ্য কার? তারা প্রাণে বেঁচে গেলেন। নিজের দেশে ফিরে প্রফেসর অ্যানাক্স ক্যাপ্টেন নিমোর বিচিত্র কাণ্ডকারখানা সম্বলিত 'টুয়েন্টি থাউজেন্ড লগিস আন্ডার দ্য সি' নামক বইটি লেখেন।

ক্যাপ্টেন নিমো এখন নিঃসঙ্গ—একেবারেই একা। তাঁর সহকর্মীরা এক-এক করে সবাই মারা গেছে। লিঙ্কন দ্বীপের এ গহ্বরে নোটিলাস দুবছর কাটাচ্ছে। আগ্নেয়গিরির লাভা জমে জমে গহ্বরটার মুখ ছোট করে দিয়েছে। নোটিলাসের বেরোবার পথ বন্ধ। তাই এখানেই তিনি মৃত্যুর জন্য ধীর প্রতীক্ষায় রয়েছেন। এমন সময় একদিন ক্যাপ্টেন নিমো দেখলেন, অতিকায় একটা বেলুনে চেপে কয়েকজন লোক লিঙ্কন দ্বীপে পড়ছেন। ক্যাপ্টেন হার্ডিং আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললে ক্যাপ্টেন নিমো তাকে কাঁধে তুলে গর্তটার মধ্যে রেখে দিয়ে এসেছিলেন, ভাবলেন, পাঁচজন দ্বীপবাসীর কাছে নিজেকে গোপন রাখবেন। তিনি তাদের গতিবিধি লক্ষ করে বুঝলেন, লোকগুলো সৎ, নিষ্ঠাবান, খুব উদ্যমী ও পরিশ্রমী। ডুবুরির পোশাক পরে গ্রানাইট হাউসের কুয়োয় ঢুকে তিনি মাঝে মধ্যেই তাঁদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নীরবে শুনতেন। এভাবেই তিনি জানতে পারলেন, তাঁরা দাসপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশছাড়া হয়েছেন। তাই মুক্তিকামী উদারহৃদয় ক্যাপ্টেন নিমোর সাহায্য পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হলেন। এবার থেকে তিনি তাঁদের ছায়ার মতো অনুসরণ করে বিভিন্নভাবে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

ক্যাপ্টেন নিমো দ্বীপবাসীদের বিশেষ করে ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে কিছু জরুরি উপদেশ দেয়ার জন্য এখানে, নোটিলাসে ডেকে এনেছেন।

ক্যাপ্টেন নিমো তাঁর অতীতকাহিনী শেষ করে এবার বললেন, 'আমার কথা তো শুনলেনই। আবার বলুন তো আমার সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা জন্মাল?'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বুঝতে পারলেন ক্যাপ্টেন নিমো বিশেষ একটা জাহাজডুবির কথা জানতে আগ্রহান্বিত। ডুবোজাহাজ নোটিলাস প্রচুরসংখ্যক শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাসহ যে জাহাজটাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল, তার কথা। ব্যাপারটা নিয়ে সভ্যসমাজে সমালোচনার জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। ফলে ক্যাপ্টেন হার্ডিং তাঁর প্রশ্নটাকে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে গেলেন। তিনি কেবল বললেন, 'ক্যাপ্টেন নিমো, আপনার শারীরিক অবস্থা দেখে আমি সত্যি আতঙ্কিত। আপনার মতো একজন হিতাকাঙ্ক্ষীকে হারালে আমাদের আপশোষের সীমা থাকবে না। নোটিলাসের বাইরে নিয়ে গেলে হয়ত আপনার শরীরের অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে—'

'তা কী করে হয়, বলুন তো? নোটিলাসের সঙ্গে আমার আত্মিক যোগ রয়েছে। এখানেই আমি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করতে চাই। আগামীকাল আমি পৃথিবী ছেড়ে যাব।' কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে আবার ক্ষীণকণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'আমার একটা অনুরোধ আপনাদের রাখতে হবে। রাখবেন তো? আমার মৃত্যুর পর আপনাদের এ-দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে হবে। রাজকুমার ডাক্কারের এক বাক্স হীরে আপনার হাতে তুলে

www.pathagar.com

দিলাম। সময় সুযোগমতো সৎ কাজে এগুলো ব্যয় করবেন। আর কিছু সমুদ্রের মহামূল্য মোতি দিচ্ছি। আমার শরীর থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলে নৌকায় উঠলে দেখতে পাবেন, নোটিলাসের গায়ে সামনের দিকে দুটো ছিদ্র আছে, তাদের মুখ খুলে দিলে নোটিলাসের তলদেশের জলাধারে হুড়হুড় করে জল ঢুকবে। আমার মৃতদেহ নিয়ে নোটিলাস ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে থাকবে। এবার ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে মিনতির স্বরে বললেন, 'আমার অন্তিম বাসনা পূর্ণ করবেন, কথা দিচ্ছেন তো ?'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং ঘাড় কাত করে তার কথার সম্মতি জানালেন।

পরের দিন সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন নিমো পরপারের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

দ্বীপবসীরা চোখ মুছতে মুছতে হাঁটু গেড়ে বসে পরমপিতার কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতির জন্য প্রার্থনা করলেন।

ক্যাপ্টেন নিমোর নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাপ্টেন হার্ডিং কাজ কররেন। তাঁর নশ্বর দেহটাকে বুকে নিয়ে নোটিলাস ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং এবং তাঁর সহকর্মীরা কঠোর পরিশ্রম করে বিশালায়তন নৌকাটার তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করে ফেললেন।

১৮৬৯ সালের ১ জানুয়ারি।

প্রকৃতি হঠাৎ ভীষণ ক্ষেপে গেল। ঝড় ঝঞ্ঝা আর বজ্রপাতের তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। বজ্রপাতে গাছাপালা জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যেতে লাগল। ক্যাপ্টেন হার্ডিং লক্ষ করলেন, এ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে পাতালপুরীর যেন একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। নইলে আগ্নেয়গিরিই বা এমন করে ক্ষেপে উঠবে কেন? খোঁয়াড়ের দিকে গলিত লাভা ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলেছে। অস্থিরচিত্ত বন্যজন্তু জানোয়াররা বিকট আর্তনাদ করতে করতে ছুটোছুটি দাপাদাপি করছে।

সকাল সাতটার কাছাকাছি প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। জঙ্গলে আগুনের বন্যা শুরু হল। এমনকি খোঁয়াড়ে যাবার পথও বন্ধ হয়ে গেল।

লেকের জল একমাত্র ভরসা। জল শুকিয়ে গেলে পানীয় জলের অভাবে দ্বীপবাসীদের তৃষ্ণায় বুক চাপড়াতে হবে। মরতে হবে অসহায়ভাবে।

কিছুক্ষণ কাটতে না কাটতে পাহাড় থেকে পাথরের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আর আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভার স্রোত তো রয়েছেই।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং আর্তনাদ করে উঠলেন, 'হায়! তোমার হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছ! তাড়াতাড়ি যন্ত্রপাতি নিয়ে এসো। বাঁধ দিয়ে লাভার স্রোত আটকাতে হবে। আতঙ্কিত দ্বীপবাসীরা ব্যস্ত হাতে পাথরের চাঁই সাজিয়ে প্রায় তিন ফুট উঁচু করে বাঁধ দিয়ে দিল।

জোর কদমে নৌকা তৈরির শেষ কাজটুকু তারা সেরে ফেলল। কুড়িদিনের কাজ মাত্র দুদিনে সেরে ফেলল। আবার আবার লাভার স্রোত বইতে লাগল। এবার উত্তপ্ত গলিত লাভা প্রসপেক্ট হাউস পর্যন্ত ধেয়ে এল। দ্বীপবাসীরা, এমন কি টপও পর্যন্ত আতঙ্কে মুষড়ে পড়ল। একসময় প্রসপেক্ট হাউস আর গ্রানাইট হাউস উভয়ই লাভার স্রোতের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল।

দ্বীপবাসীরা সকাল হলেই নৌকা জলে ভাসাবার পরিকল্পনা নিলেন। কিন্তু হায়! সকাল আর হতে পারল না। তার আগেই প্রচণ্ড শব্দসহ অগ্নিবাষ্প প্রায় হাজার তিনেক

www.pathagar.com

ফুট উঁচু হয়ে আকাশের দিকে উঠল, চারদিক ছেয়ে ফেলল। সমুদ্রের তলদেশের ফাটল দিয়ে লাভার স্রোত ঢোকায় প্রচণ্ড শব্দ করে জল ওপরের দিকে ছিটকে ছিটকে উঠতে লাগল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। প্রবল বাষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।

পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে প্রবল বেগে ওপরের দিকে উঠে পর মুহূর্তেই সমুদ্রের বুকে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। সৃষ্টি ধ্বংস করার চক্রান্ত।

দ্বীপবাসীরা উপায়ন্তর না দেখে জলে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হলেন। একটুকরো পাথর ছাড়া লিঙ্কন দ্বীপের কিছুই যে আর অব্যাহতি পেল না।

দ্বীপবাসীরা সমুদ্রের ভয়ঙ্করতাকে অগ্রাহ্য করে সাঁতরে চলেছেন। কিন্তু বেচারা জ্যাপ একটা ফাটলে আটকে পড়ে অসহায়ভাবে প্রাণ দিল। দ্বীপবাসীরা কোনোরকমে সাঁতরে পর্বতের অবশিষ্ট অংশটুকুতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। দীর্ঘ নয় দিন অনাহারে অনিদ্রায় সেখানেই কাটিয়ে দিতে বাধ্য হলেন সবাই। পাথরের খাঁজে যেটুকু বৃষ্টি জল জমেছিল তা ভাগাভাগি করে এতগুলো প্রাণী পিতৃদত্ত প্রাণরক্ষা করলেন। আয়ারটন ছাড়া বাকি সবাই কাহিল হয়ে পড়লেন।

২৬ মার্চ।

আয়ারটন বিষণ্ন মনে উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসে রইল। একসময় সমুদ্রের বুকে কালো একটা বিন্দুর মতো দেখতে পেল। ব্যাপারটা তার মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার করল। বিন্দুটার আকৃতি ক্রমে বড় হতে লাগল। ক্রমে আরো বড়—আরো—আরো। হ্যাঁ, তার অনুমান অভ্রান্ত। জাহাজ—হ্যাঁ, জাহাজই বটে। পালতোলা জাহাজ। ডানকান জাহাজ। অকস্মাৎ আয়ারটন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

আয়ারটনের যখন সংজ্ঞা ফিরল তখন সে দেখল, সুসজ্জিত কেবিনে নরম বিছানার ওপর শুয়ে।

রবার্ট গ্রান্ট কী করে জানতে পারলেন, আয়ারটন লিঙ্কন দ্বীপে বাস করছেন।

দ্বীপবাসীদের কৌতূহল দমন করতে গিয়ে রবার্ট গ্রান্ট বললেন, 'চরম উত্তেজনা ও আতঙ্কে বোধ হয় আপনাদের স্মৃতিভ্রম ঘটছে। জনাব, আপনারাই তো ট্যাবর দ্বীপে বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দিয়ে এসেছিলেন।'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মুখে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। একসময় ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'তবে এটা নির্ঘাৎ ক্যাপ্টেন নিমোর কাজ। তিনি আমাদের অজান্তে এমন একটা কাজ করে এতগুলো প্রাণীর জীবন রক্ষা করে গেছেন।'

উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে দ্বীপবাসীরা স্বদেশে ফিরে এলেন। ক্যাপ্টেন নিমোর দেয়া হীরা-মোতি বিক্রি করে নতুন একটা লিঙ্কন দ্বীপ গড়ে তুললেন তাঁরা। একটা মাত্র গ্রানাইট পাথরের টুকরোর ওপর গড়ে উঠল ক্যাপ্টেন নিমোর চিরশান্তির নীড়, তার সমাধিস্তম্ভের সাক্ষ্য বহন করতে লাগর সদ্য গড়ে তোলা লিঙ্কন দ্বীপ।

---

www.pathagar.com

ব্ল্যাক ডায়মন্ডস

১৮০০ সালের তেসরা ডিসেম্বর।

ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার সকালে এক জরুরি কাজের তাগিদে বাড়ি থেকে বেরোবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

জেমস স্টার যখন কোর্টের শেষ বোতামটা লাগাতে ব্যস্ত ঠিক তখনই সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। ব্যস্ত হয়ে দরজার শিটকিনি খুলতেই ডাক পিওন সুপ্রভাত জানিয়ে বাদামি রঙের একটা খাম তাঁর হাতে ধরিয়ে দিল।

জেমস স্টার হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে সিলমোহরের দিকে একবার নজর ফিরিয়ে নিলেন। হ্যাঁ, সকালের ডাকেই চিঠিটা এসেছে। খামটার গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা—'মি. জে. স্টা—ইঞ্জিনিয়ার (ত্রিশ, ক্যানন গেট, এডিনবরা) সমীপেষু—

খামটার সামান্য অংশ ছিড়তেই জেমস স্টার দেখলেন, হালকা আকাশী রঙের এক চিলতে কাগজ ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে।

বুড়ো ওভারম্যান সাইমন ফোর্ড চিঠিটা লিখেছেন। চিঠির বক্তব্য—"মি. জেমস স্টার, আগামীকাল অ্যাবারফয়েল কয়লাখনিতে এলে (ডোচার্ট পিট, ইয়ারো শ্যাফট) এমন একটা ব্যাপার সম্বন্ধে অভিহিত হতে পারবেন, যা আপনার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত এবং আকর্ষণীয় বিবেচিত হবে।"

সাইমন ফোর্ড চিঠিতে এও জানালেন, প্রাক্তন ওভারম্যান সাইমন ফোর্ডের ছেলে হ্যারি ফোর্ড মি. জেমস স্টারের অপেক্ষায় ক্যালানডার স্টেশনে উপস্থিত থাকবে। আর বিশেষ একটা সনির্বন্ধ অনুরোধও করেছেন, তিনি যেন এ গোপন অনুরোধের ব্যাপারটা কারো কাছেই ফাঁস না করেন।

জেমসস্টার চিঠিটা গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত বারবার অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে পড়লেন। তাঁর মধ্যে কেমন যেন একটা অবর্ণনীয় মানসিক উত্তেজনা ভর করল। বারবার পড়েও চিঠিটার বক্তব্যে সামান্যতমও প্রবঞ্চনার আভাস লক্ষিত হল না। অর্থাৎ চিঠিটার বক্তব্যের মধ্যে তাঁর মনে বিরূপ কোনো চিন্তারই উদয় হল না। ওভারম্যান সাইমন ফোর্ড দীর্ঘদিনের সহকর্ম হিসাবে তাঁরা কাছাকাছি পাশাপাশি অবস্থান করেছেন।

ইঞ্জিনিয়ার-জীবনের পঞ্চান্নটা বসন্ত পেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু তাঁকে একনজরে দেখলে চল্লিশ বছরের বেশি বয়স মনেই হয় না। ব্রিটেনে যাঁরা পদের অবদানে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছেন, ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক তাঁদের অন্যতম বিবেচিত হন।

ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধকার পাতালপুরী থেকে কয়লার স্তর ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে তুলে আনার ওপরে নির্ভর করে আজকের যে অপ্রত্যাশিত সাফল্য, তার মূলে রয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, অ্যাবার ফয়েল কয়লাখনির ব্যাপারে তাঁর নাম আগে উল্লেখ করতে হয়।

দিনের পর দিন কয়লাখনির সংখ্যা বৃদ্ধি আর সবদিক থেকে উত্তোলনের উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে কয়লার চাহিদাও বেড়েই চলেছে। আর সে চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে বহু খনি নিঃস্ব—একেবারে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। অনবরত কালো হীরা জোগান দিয়ে

www.pathagar.com

অ্যাবারফয়েল আজ সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। আর আজ সেটা একবারেই অবহেলিত।

আজ থেকে দশ বছর আগের ঘটনা। শেষদিন একটন কালো হীরা উপহার দিয়ে অ্যাবারফয়েল রিক্ততা ঘোষণা করে। বাধ্য হয়েই খনির মালিক পাতালপুরী থেকে সাধ্যমতো যন্ত্রাংশ তুলে নিয়ে এলেন। কয়লা বহন করার ঠেলাগাড়ি, লিফটের খাঁচা আর বাতাস সরবরাহের নল প্রভৃতি পাতালপুরীর গহ্বর থেকে তুলে এনে পর্বতপ্রমাণ উঁচু করে পাঁজা করে ফেলে রেখেছেন।

আজ অতিকায় বীভৎস চেহারাধারী বহুপদ জানোয়ারের কঙ্কালের মতো পড়ে রয়েছে নিঃস্ব-রিক্ত যক্ষপুরী কয়লাখনিটা। আচমকা একনজর দেখলেই আঁতকে উঠতে হয়। খনিগর্ভ থেকে যাবতীয় যন্ত্রপাতি তুলে আনলেও একটামাত্র নড়বড়ে সিঁড়ি আজও মায়া কাটিয়ে খনি ছেড়ে আসতে পারে নি। অব্যবহৃত—অবহেলিত অবস্থায় সেটা আজও একই জায়গায় পড়ে ধুঁকছে।

শেষের সেদিনটার স্মৃতি জেমস স্টার-এর অন্তরের গভীরে আজও জ্বলজ্বল করছে। প্রবেশপথের একধারে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ডোচার্ট পিটের ওভারম্যান সাইমন বোর্ড (তখন পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক) আর কয়েকজন বিভাগীয় ম্যানেজার তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সবার মুখেই বিষণ্ণতার ছাপ সুস্পষ্ট। আর অন্তরের অন্তস্থলে অন্তহীন হতাশা আর হাহাকার। সবাই মাথা থেকে টুপি নামিয়ে হাতে ধরে রেখেছেন। চোখের তারার নীরব ভাষা—খনি নিঃস্ব রিক্ত। এক টুকরো কয়লাও অবশিষ্ট নেই। সে বছর খনির কয়লা কুড়িয়ে কুড়িয়ে যে লাভ হয়েছিল তা কর্মীদের মধ্যে সমহারে বিলি করে দেয়া হয়। যাতে নতুন চাকরি জোগাড় না হওয়া পর্যন্ত অন্তত রুটির জোগাড় তাদের হতে পারে। ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার সবাইকে চিরদিনের মত বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন। বিদায় মুহূর্তে তাঁর মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য সবাই অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে।

ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার বিষণ্ণমুখে শ্লেষ্মাজড়িত ভাঙা ভাঙা গলায় কোনোরকমে উচ্চারণ করলেন, 'বন্ধুগণ, আমাদের বিচ্ছেদের মুহূর্ত আসন্ন। যে কয়লাখানি একদিন আমাদের সবাইকে সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার ডোরে বেঁধে কাজে নিযুক্ত করেছিল আজ সে নিস্ব রিক্ত। দীর্ঘদিন খোঁজাখুঁজি করেও আমাদের নিদারুণভাবে ব্যর্থ হতে হয়েছে—কিন্তু কোনো স্তরেরই হদিস পাওয়া যায় নি। এইমাত্র ডোচার্ট পিট থেকে শেষ চাঁইটাকেও তুলে আনা হয়েছে, আপনারা তো দেখলেনই।'

খনি শ্রমিকরা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারকে বিদায় জানিয়ে ধীরপায়ে এগিয়ে গেল। অন্তহীন অন্ধকার আর নীরবতা বুকে নিয়ে যক্ষপুরী কয়লাখনিটা পড়ে রইল।

জেমস স্টার চোখের তারায় ঔদাসিন্যের ছাপ এঁকে অন্ধকার দিগন্তের দিকে নির্বাক ও নিশ্চল নিথরভাবে তাকিয়ে রইলেন।

জেমস স্টার সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, তার পাশে একজন দাঁড়িয়ে। না, একজন অবশ্যই নয়, দুজন। তাদের একজন ওভারম্যান সাইমন ফোর্ড আর দ্বিতীয়জন এক কিশোর। তার ছেলে, বড়জোর বছর পনের তার বয়স। সে কিছুদিন কয়লাখনিতে কাজ করেছিল।

www.pathagar.com

ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাদের দিকে তাকালেন। ওভারম্যান হাত তুলে বললেন, 'গুডবাই। মি. স্টার, গুডবাই।'

ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বিষণ্ণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'মি. স্টার, এডিনবরা তো অনেক দূরের পথ। ডোচার্ট পিট আর এডিনবরার মধ্যে বিস্তর ফারাক।'

'সে কী!' অনেক দূর বলছ যে বড়! তুমি তবে এবার কোথায় মাথা গুঁজছ, বলবে কি?'

'এখানে।' এখানেই রয়ে যাচ্ছি।'

'অন্ধকার এ-যক্ষপুরীতে একা থাকবে, বলছ কী!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাইমন ফোর্ড এবার বললেন, 'তা হোক গে, তবু এখানেই থেকে যাব। বৌ-ছেলে নিয়ে কোথাও যাচ্ছি না, এখানেই থাকব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি।'

ইঞ্জিনিয়ার জেমজ স্টার অনন্যোপায় হয়ে এখানেই কথার ছেদ টানলেন, 'তবে দেখ চেষ্টা করে যদি থাকতে পারো।'

কয়লাখনির বাইরে প্রকৃতির বুকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। জেমস স্টারকে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে তবে পাড়ি পৌঁছোতে হবে। তাই অভিন্ন হৃদয় সহকর্মী বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে বিষণ্নমুখে উচ্চারণ করলেন, 'বিদায় সাইমন, বিদায়। এখন তবে আসি।'

সাইমন শোকে মূহ্যমান হয়ে বললেন, 'বিদায়। মিঃ স্টার, দয়া করে একটা কথা মনে রাখবেন, আমাদের আবার এ অ্যাবারফয়েল খনিগর্ভেই দেখা হবে।'

জেমস স্টার নিঃসন্দেহ যে, সাইমন-এর দুরাশা কোনোদিনই পূরণ হবে না, হতে পারে না। তবু একটা বুড়ো মানুষকে আশাহত করে, মনে ব্যথা দিয়ে কী লাভ? এরকম ইচ্ছা তাঁর আদৌ ছিল না। সবার অলক্ষে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এবার বিষণ্নচোখে তাকিয়ে থাকা কিশোর ছেলেটার সামনে তার বাবার হাত দুটো আবেগভরে জড়িয়ে ধরলেন। পরমুহূর্তেই হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে ধীর-মন্থর পায়ে নিজের গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চললেন।

ইতিমধ্যে দশ-দশটা বছর পেরিয়ে গেছে। এ দীর্ঘ কয়েক বছরে জেমস স্টার তাঁর প্রাক্তন সহকর্মী ওভারম্যান সাইমন ফোর্ড-এর কাছ থেকে চিঠিপত্র তো দূরের কথা, এমন কি কোনো খবর পর্যন্ত পান নি।

এই প্রথম—এতদিন পর জেমস স্টার সাইমন ফোর্ড-এর কাছ থেকে জঠরশূন্য পরিত্যক্ত কয়লাখনিতে আমন্ত্রণ পেয়েছেন।

জেমস স্টার চিঠিটার ওপর চোখের মণি দুটো নিবদ্ধ রেখেই ভাবেন—'আর দুটো ছত্র লিখলেই তো ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ধারণা করে নেয়া যেত। সাইমন ফোর্ড অ্যাবারফয়েল কয়লাখনির গর্ভে এমন কিসের সন্ধান পেল যা তাঁর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে? আসল ব্যাপারটা কী? বুড়ো ওভারম্যান হঠাৎ করে আবার কয়লার স্তর আবিষ্কার করে ফেলেছে নাকি? মুহূর্তকাল অস্থিরভাবে ভেবে নিয়ে আবার স্বগতোক্তি করলেন—'নতুন কয়লার স্তর আবিষ্কার? কিন্তু তা কী করে হতে পারে! জঠরশূন্যখানি আবার কোত্থেকে কয়লা দেবে?'

www.pathagar.com

চিঠিটা হাতে করে কয়েকবার অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করে তিনি আবার ভাবতে লাগলেন, 'কই, চেষ্টার সামান্যতম ত্রুটিও তো তখন তিনি রাখেন নি। জঠরশূন্য, একেবারে নিঃস্ব রিক্ত কয়লাখনির প্রতিটা শিরা-উপশিরা তিনি হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন, নতুন কোনো কয়লা স্তরের হদিস যদি মেলে। বারবারই ব্যর্থ হতে হয়েছে তাঁকে। অনন্যোপায় হয়ে তিনি অ্যাবারফয়েল খনিগর্ভ ছেড়ে উঠে এসেছেন। ব্যস, অ্যাবারফয়েলের সঙ্গে সম্পর্ক চিরদিনের মতো তিনি মিটিয়ে এসেছেন। কিন্তু আজ, এতদিন পর কেন আবার এ-চিঠি? কেন অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণ নিয়ে চিঠিটা তাঁর কাছে হাজির হল?

হ্যাঁ, খনির কাজে, বিশেষ করে কয়লাখনির ব্যাপারে সাইমন ফোর্ড-এর দক্ষতা বাস্তবিকই অতুলনীয়। দীর্ঘদিন ধরে তিলে তিলে অর্জিত তাঁর অভিজ্ঞতাকে তো আর অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

অ্যাবারফয়েল খনিগর্ভ ছেড়ে আসার পর থেকে জেমস স্টার ওভারম্যান সাইমন ফোর্ডের কোনো খবরই জানেন না। তিনি সপরিবারে কোথায় মাথাগুঁজে দীর্ঘ দশ বছর কাটিয়েছেন, এটা তাঁর কাছে একেবারেই অজানা। দীর্ঘদিন পর পাঠানো কাগজের চিলতেটায় তিনি লিখেছেন, 'সাইমন ফোর্ড তাঁর জন্য ইয়ারো শ্যাফটে অপেক্ষা করবেন। আর ক্যালানডার স্টেশনে তাঁকে স্বাগত জানাতে, থাকবে তার ছেলে হ্যারি।'

জেমস স্টারের পক্ষে বুড়ো সাইমন ফোর্ড-এর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ইয়ারো শ্যাফটে তিনি অবশ্যই যাবেন।

জেমস স্টার সারাটা দিন এক অকথিত অস্থিরতার মধ্যে কাটালেন। দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মুহূর্তের জন্যও তাঁর মধ্যে এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে নি যার ফলে তিনি চিঠিটার বক্তব্যকে নিছক ভাঁওতা জ্ঞান করে উড়িয়ে দিতে পারেন।

চোখের পলকে একেবারে অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটে গেল। ডাক পিওন সন্ধ্যা ছয়টার ডাকে আসা আর একটা পুরু ও খসখসে খাম জেমস স্টারের হাতে দিয়ে গেল।

খামটার ওপরে ঠিকানাটা বড় বড় হরফের লেখা। কাঁচা হাতের লেখা। অবশ্যই স্বল্প শিক্ষিত কারো লেখা, বুঝতে অসুবিধা হল না।

খামটা হাতে পাওয়া মাত্র জেমস স্টার-এর মধ্যে এক অবর্ণনীয় অস্থিরতা ভর করল। ব্যস্ত হাতে খামের মুখটা ছেঁড়ামাত্র অযত্নে রক্ষিত বহু পুরনো একটা কাগজের টুকরো ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। টানাটানি করে খামের ভেতর থেকে কাগজের টুকরোটা বের করে চোখের সামনে ধরতেই তাঁর চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের মণি দুটো চিঠিটার ওপর ব্যস্ততার সঙ্গে বুলাতে লাগলেন। অনভ্যস্তহাতে লেখা রয়েছে—'ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার, হন্যে হয়ে ছুটোছুটি করাই সার হবে। পরিশ্রম কিন্তু একেবারেই বৃথা যাবে।'

চিঠিটার ওপর চোখের মণি দুটো নিবদ্ধ রেখেই তিনি এবার ভাবতে লাগলেন—তবে তো সাইমন ফোর্ডের চিঠিটা একেবারেই অর্থহীন মনে হচ্ছে। ছোট্ট চিঠিটার তলায় কারো নাম বা স্বাক্ষর কিছুই নেই। আর ইচ্ছাকৃত, সতর্কতার সঙ্গেই পত্রলেখক এ ব্যাপারটাকে এড়িয়ে গেছে, তাঁর বুঝতে অসুবিধা হল না।

জেমস স্টার সাইমন ফোর্ডের চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে যে নিদারুণ ও নিরবচ্ছিন্ন অস্থিরতার মধ্য দিয়ে সারাটা দিন কাটিয়েছেন তা অপ্রত্যাশিতভাবে ছোট্ট এ চিঠিটা মুহূর্তের মধ্যেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

জেমস স্টার সদ্য হাতে পাওয়া চিঠিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সিলমোহরটা দেখতে লাগলেন। আশ্চর্য ব্যাপার তো! এ খামটার গায়েও তো অ্যাবারফয়েল ডাকঘরের সিলমোহর অঙ্কিত রয়েছে। তবে এটা অবশ্যই বুড়ো সাইমনের হাতের লেখা নয়। তার হাতের লেখা তিনি খুব ভালোই চেনেন।

অস্থিরচিত্ত জেমস স্টার কয়েকবার ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে একসময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আবার তিনি আপনমনে বলতে লাগলেন, 'চিঠিটা যে-ই লিখুক, সে এমন একজন যে প্রথম চিঠিটার বক্তব্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। এটা তবে কার লেখা চিঠি? এমন একটা উড়োচিঠি দেয়ার অর্থই বা কী? কী তার উদ্দেশ্য? কী-ই বা চায়? এমন কি গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে ছোট্ট এ চিঠিটাকে?'

জেমস স্টার অকস্মাৎ নতুন করে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন।

তিনি আবার স্বগতোক্তি করলেন, 'সকালের ডাকে আসা চিঠিটা কি তবে সত্য সত্যই অর্থহীন? কোন মূল্যই কি তার নেই? নাকি এ চিঠি দুটোকে কেন্দ্র করে কোনো জটিল রহস্য সংগোপনে কাজ করে চলেছে?'

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে তিনি এবার বিপরীত ভাবনার জালে জড়িয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন, কোন কুচক্রীর দূরভিসন্ধি এর পিছনে অন্তরাল থেকে কাজ চলেছে না তো? তাঁর অ্যাবারফয়েল কয়লাখনিতে যাওয়া বন্ধ করার মতলবে নেই তো? বুড়ো সাইমন ফোর্ডের পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেয়ার কুমতলব নিয়ে রহস্যময় অজ্ঞাত পরিচয় লোক এ পথটাকেই আঁকড়ে ধরে নি তো?

ধ্যুৎ! তিনি আর ভাবতে পারছেন না। টুকরো টুকরো হাজারো চিন্তার জট ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকের মাথায় ভর করে তাঁকে অস্থির করে তুলেছে। বিপরীত বক্তব্যবাহী চিঠি দুটো তাঁর মানসিক অস্থিরতাকে চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। তিনি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়লেও একসময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন—এর পিছনে রহস্যই লুকিয়ে থাক না কেন ডোচার্ট পিটে তিনি অবশ্য যাবেন। ভাঁওতা যদি হয় হোক। অন্তত আসল রহস্যটাতো ভেদ করতে পারবেন।

জেমস স্টার চিঠি দুটোর মধ্যে প্রথম চিঠিটার গুরুত্ব দিয়ে ডোবার্ট পিটে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। আর বিকালের ডাকে আসা চিঠির ব্যাপারটাকে মনব থেকে ধুয়ে মুছে ফেললেন। নিজের মনকেএই বলে প্রবোধ দিলেন, সেটা তো নিছকই নামঠিকানাহীন একটি উড়ো চিঠি।

সকাল পাঁচটা। ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারের ঘুম ভেঙে গেল। মাথার কাছেই জানালাটা ফাঁক করে দেখলেন, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ভাবলেন যাত্রা করতে দেরি করা উচিত হবে না। পোশাক বদলে বৃষ্টির মধ্যেই তিনি রাস্তায় নেমে পড়লেন।

লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে জেনারেল রেলওয়ে স্টেশনে হাজির হলেন। ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে গেছেন। কোটের পকেট হাতড়ে রুমালটা বের করে কাকভেজা মাথাটাকে মুছে নিলেন।

জেমস স্টারের আধঘণ্টা সময় লেগে গেল নিউ হ্যাভেন গ্রামে পৌঁছতে। প্রায় দৌড়েই তিনি 'প্রিন্স অব ওয়েলস' জাহাজে উঠতে পাররেন। স্টোরিং বন্দরে পৌঁছতে জাহাজটা প্রায় তিন ঘণ্টা সময় নিয়ে নিল।

www.pathagar.com

জাহাজ থেকে নেমে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে তিনি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে স্টেশনের প্লাটফর্মে পা দিলেন।

মিনিট পাঁচেক সময়ের মধ্যেই ট্রেন এসে গেল। এক ঘন্টা ছুটে ট্রেনটা ক্যালানডার স্টেশনে থামল। জেমস স্টার ট্রেন থেকে নেমে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে মাথার টুপিটা নামিয়ে আনলেন। অনুসন্ধিৎসু নজরে চারদিকে চোখের মণি দুটোকে বুলিয়ে নিলেন। ট্রেন থেকে যেসব যাত্রী নেমেছিল সবাই প্লাটফর্ম ছেড়ে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে।

এক কিশোর প্লাটফর্মের এক ধারে দাঁড়িয়ে অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে যাত্রীদের মুখের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে এক সময় জেমস স্টার-এর মুখে তার দৃষ্টি স্থির হল। হ্যাঁ, সে চিনতে পেরেছে, নিঃসন্দেহ হল।

এবার কিশোরটা জোর কদমে এগিয়ে এসে ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাঁর মুখের দিকে নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে রইল।

জেমস স্টার দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তাকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'তুমিই কি হ্যারি ফোর্ড? তুমি কি সাইমন ফোর্ড-এর ছেলে হ্যারি?'

কিশোরটি মুচকি হেসে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, মি. স্টার। আমিই হ্যারি ফোর্ড। আপনাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'তাই নাকি হে? আর দেখ দেখি, আমি তো তোমাকে চিনতেই পারি নি! বছর দশেকেই তুমি এমন বদলে গেছ, লম্বা চওড়া হয়ে গেছ!'

হ্যারি ফোর্ড মাথার টুপিটা নামিয়ে হাতে নিয়ে সলজ্জ বিনয়ের সঙ্গে জেমস স্টারের প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'স্যার, আমি কিন্তু আপনাকে এক নজরে দেখেই ঠিক নিচে ফেলেছি।'

'আরে জলবৃষ্টির মধ্যে টুপিটা মাথা থেকে খুললে কেন!' তার মাথায় টুপিটা পরিয়ে দিতে দিতে এবার বললেন, 'বিনয় প্রদর্শন করতে গিয়ে বৃষ্টির জল লাগিয়ে তুমি কি সর্দি-জ্বর বাঁধাবে নাকি হে!'

'কি ঠিক কররেন স্যার? বৃষ্টি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, নাকি—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই জেমস স্টার বলে উঠলেন, 'না হে, কতক্ষণ আর অপেক্ষা করব। বৃষ্টির যা ধরণ তা কিছুক্ষণের মধ্যে থামবে বলে মনে হচ্ছে না। চলো, হাঁটা শুরু করা যাক।'

পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পথ পাড়ি দিতে গিয়ে জেমস স্টার বললেন, 'তোমার বাবা কেমন আছেন, বলো তো? তোমার মাই বা কেমন—'

'উভয়েই ভালো আছেন।'

'ভালো কথা, তোমার বাবা আমাকে আসার জন্য চিঠি দিয়েছেন, কিন্তু কেন আমাকে তলব করেছেন, জান কিছু?'

হ্যারি মুচকি হেসে তাঁর কথার উত্তর দিল—'হ্যাঁ, জানি।'

'কেন বল তো?'

'একটু বাদেই তো বাবার সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন। তাঁর মুখেই না হয় কানণটা শুনবেন।'

'তোমার বাবা এখন কোথায় আছেন?'

www.pathagar.com

'কেন? খনির ভেতরে। আমরা তো সেখানেই—'

'সে কি হে! খনির ভেতরে! খনি বলতে সে ডোচার্ট পিটের ভেতরে তাই না? তোমরা কি তবে সেখানেই থাক নাকি?'

'হ্যাঁ, সেখানেই। আমরা সে জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই নি। সেই থেকে খনির ভেতরেই আছি।'

'তাই বুঝি! কী অবাক কাণ্ড হে! তোমরা এতদিন সেখানেই ছিলে? খনির কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তোমরা খনি ছেড়ে যাও?'

'অন্য কোথায় আবার যাব?'

'মানে খনির বাইরে কোথাও—'

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই হ্যারি এবার বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল, 'অবশ্যই না। একটা দিনের জন্যও আমরা খনি ছাড়ি নি। আমার বাবাকে তো আপনি ভালোই চেনেন স্যার। তাঁর ওই এক কথা, খনিতে জন্মেছি—মরতে যদি হয় খনির ভেতরেই মরব।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেমস স্টার এবার বললেন, 'হ্যারি, আমি সবই জানি, বুঝিও সব। খনিটা তো তার কাছে নিছক একটা খনিই নয়, সেটা যে তার জন্ম ও কর্মস্থল। শত কষ্টে পড়লেও মানুষ তার জন্মস্থলের মায়া কাটাতে পারে না।' মুহূর্তের জন্য হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে এবার বললেন, 'হ্যারি, একটা কথা—'

'বলুন।'

'সত্যি করে বলতো, খনির ভেতরে বাস করে তোমরা, মানে তুমি কি সুখী?'

'অবশ্যই, কেনই বা সুখী হব না? আমাদের চাহিদা তো মোটেই বেশি নয়। একেবারেই—' কথা বলতে বলতে তাঁরা ইতিমধ্যেই স্টেশন চত্বর ছেড়ে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে দিয়েছেন।

এডিনবরা থেকে গ্লাসগো পর্যন্ত দশ-বারো মাইল পথ জুড়ে অনেকগুলি কয়লাখনি রয়েছে। আজ তারা প্রত্যেকেই নিস্ব—রিক্ত। ধরতে গেলে সবাই পরিত্যক্ত। আজ যে কয়লাখনি অবহেলিত সে অ্যাবারফয়েলের দুই হাজার ফুট গভীরে ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার বহুবার হানা দিয়েছেন, নতুন কয়লার খোঁজে বারে বারে ছুটোছুটি করেছেন। কিন্তু না, তাঁর প্রয়াস সার্থক হয় নি। ব্যর্থতার জ্বালা বুকে নিয়ে বারবারই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। ব্যস, অ্যাবারফয়েল কয়লাখনি থেকে তিনি জন্মের মতো বিদায়, অবসর নিয়েছেন।

হ্যারিফোর্ডের পাশাপাশি পথ চলতে চলতে তিনি এবার আপনমনে ভাবতে লাগলেন, 'তবে? তবে কি তাঁর অনুসন্ধান কার্যে কোনো ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল? ব্যাপার কী? অ্যাবারফয়েলের জঠরে কি তবে নতুন কোনো কয়লার স্তরের হদিস পাওয়া গেছে? কিন্তু এও কি কখনো সম্ভব হতে পারে? আর তা যদি নিতান্তই হয় তবে তো তাঁরই সবচেয়ে বেশি খুশি হওয়ার কথা। অ্যাবারফয়েলের প্রতিটা শিরা-উপশিরার সঙ্গে তার তো একেবারে আত্মিক যোগ ছিল, আজ দীর্ঘদিন পরেও সে সম্পর্কে এতটুকু চিঁড় ধরে নি, ধরা সম্ভবও নয়।

ইয়ারো শ্যাফট থেকে ক্যালানডার প্রায় চার মাইল পথ। এক সময় কয়লাবাহী গাড়ি আর খনিশ্রমিকদের যাতায়াতে এ বিস্তীর্ণ অঞ্চল গমগম করত। আজ খনিশিল্প বিদায়

www.pathagar.com

নিয়েছে। কৃষিশিল্প সেখানে একাধিপত্য বিস্তার করেছে। চাষের ক্ষেত আর কৃষকদের খামার গড়ে উঠেছে। মাইলের পর মাইল জুড়ে নিস্তব্ধ বিরাজ করছে মহাশূন্যতা নেমে এসেছে অঞ্চলের প্রতিটা আনাচে কানাচে। জেমস স্টার পথ চলতে চলতে বারবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। তার বারবারই মনে হচ্ছে, এটা কি তাঁর পরিচিত অ্যাবারফয়েল অঞ্চল, নাকি ভুল করে অন্য কোথাও তিনি হাজির হয়েছেন? এ যেন তাঁর পরিচিত এলাকা নয়, কোনো না কোনো মরু প্রান্তরের ওপর দিয়ে তিনি পথ পাড়ি দিচ্ছেন।

হ্যারি ফোর্ড-এর বয়স বড় জোর বচর পঁচিশেক হলেও তার চেহারাটা একটু বেশি রকমই ভারিক্কী হয়ে পড়েছে। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় আসলের চেয়ে তার বয়স যেন অনেক বেশিই।

হ্যারির জন্ম হয়েছিল খনির ভেতরেই। পাতালপুরীর অন্ধকারের ভেতরেই তার শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের দুরন্তপনার দিনগুলি কেটেছে।

হ্যারি ছেলেবেলা থেকেই খনির কাজে যোগদান করেছিল।

দীর্ঘ সময় ধরে বিষণ্নমনে পথ চলতে চলতে এক সময় জেমস স্টার মুখ খুললেন, 'এ কী আজব ব্যাপার হ্যারি! এ যে একেবারেই বদলে গেছে দেখছি! কয়লাখনির সামান্যতম স্মৃতিচিহ্নও যে কোথাও নজরে পড়ছে না! আশ্চর্য ব্যাপার তো!'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হ্যারি বিষণ্নকণ্ঠে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন মি. স্টার। সব কিছুই বদলে গেছে। অ্যাবারফয়েল অক্ষমতা প্রকাশ না করলে পরিস্থিতি অবশ্যই এমনটা হত না। বসুমতী যদি অনাদি অনন্ত কাল ধরে জঠর থেকে কয়লা জোগান দিতে সক্ষম হত, তবে আমাদের এমন দুঃসহ দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হত না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেমস স্টার বললেন, 'এমনটা হলে তবে তো কথাই ছিল না হে। কিন্তু হ্যারী, এমন অসম্ভব যে কিছুতেই সম্ভব হবার নয়। বসুমতী বড়ই কৃপণা। তার দৃষ্টিও বড়ই প্রখর। তাই তো নিজ জঠরের বিরাট ভগ্নাংশ জুড়ে চুনাপাথর ভরে রেখেছে। আর বেলে পাথর ও আগ্নেয় পাথরের পরিমাণও নেহাত কম নয়। আগুন এদের কাউকেই স্পর্শ করতে পারে না। কয়লার পরিমাণ এতই কম যে—'

'একদম ঠিক কথা বলেছেন স্যার। তাই তো বসুমতী আজও নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে পেরেছে। নইলে পৃথিবীর সভ্য শিক্ষিত মানুষ সভ্যতা গড়ে তোলার অত্যুগ্র আগ্রহে বসুন্ধরার জঠর, গোটা পৃথিবীটা খুঁড়ে খুঁড়ে একেবারে অন্তসারশূন্য করে ছাড়ত। আর তা আগুনে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে ফেলত। স্যার, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?'

'হ্যাঁ, তুমি যথার্থই বলেছ।'

কথা বলতে বলতে তাঁরা আরো অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন। সেখান থেকে আবছা অন্ধকারে ডোচার্ট পিটকে ঝাপসা দেখাচ্ছে। ভূতের মত মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাতাঝরা ন্যাড়া গাছগুলো। হঠাৎ করে দেখলে বুকের ভেতরে ফুসফুস আতঙ্কে কেমন নড়ে চড়ে ওঠে।

একসময় জেমস স্টার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখলেন, পথের ধারে, টিলার ওপর একান্ত অবহেলা অযত্নে দৈত্যাকৃতি একটা লোহার কঙ্কাল মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। একসময় এর খুবই সমাদর ছিল। একদিন এটাই খাঁচাভর্তি মানুষকে তাদের দড়ির টানে অনায়াসেই ওপরে তুলে আনতে পারত। আর নিচের তলার ইঞ্জিনঘরটার শোচনীয়

www.pathagar.com

অবস্থা দেখলে বুকফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চায়। দীর্ঘদিন অযত্নে পড়ে থাকা হতশ্রী ধ্বংসাবশেষটুকুর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে জেমস স্টার একরাশ দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ছড়িয়ে দিলেন। পরমুহূর্তেই অদূরবর্তী একটা ভাঙা তোবড়ানো বালতির দিকে তাঁর চোখ পড়ল। তারই পাশে টুকরো টুকরো, দোমড়ানো, মোচড়ানো ও জংপড়া রেললাইনের অংশ, আর ভাঙা যন্ত্রণাংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে।

ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে জেমস স্টার বিষণ্ন মনে ভাবতে লাগলেন, এ যেন যুদ্ধবিধ্বস্ত কোন অঞ্চলের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। আর মাত্র কয়েক হাত দূরে আদ্যিকালের কামানের মত নিশ্চল নিথরভাবে পড়ে রয়েছে ভাঙা চিমনি আর তার ছোট-বড় টুকরোগুলো।

আর? কয়েকটা লম্বালম্বা কড়ি বরগা ও বয়লারের ভাঙা দুমড়ানো প্লেট ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে।

শুক্লাপক্ষের আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণায় ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারের বুকের ভেতরটা বারবার কেমন মোচড় দিয়ে উঠতে লাগলেন। নিজের অজ্ঞান্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি আপন মনে বলে উঠলেন, 'এ আমি কোথায় দাঁড়িয়ে। এ যেন খনি অঞ্চল নয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনো দুর্গ। কোন এক সময়ের আকাশচুম্বী দুর্গ যেন অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ মুখ থুবড়ে পড়ে।

সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে ফেলে ধ্বংসস্তূপের লোহালক্কর ডিঙিয়ে ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার ইয়ারো শ্যাফটের প্রবেশপথে হাজির হলেন। পাতালপুরীর প্রবেশপথের মুখের ছাউনিটা আজও কোনোরকমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে দেখতে পেলেন। জেমস স্টার ভাবতে লাগলেন, এ যেন কোনো মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। দীর্ঘদিন ফুটন্ত লাভা আর বাষ্প উদগীরণ করে করে আজ ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

উচ্ছ্বসিত আবেগে আপ্লুত জেমস স্টার অন্ধকার পাতালপুরীর প্রথম চাতালটায় পা রাখলেন। একসময় স্বয়ংচালিত যন্ত্রদানব মই শ্রমিকদের নিয়ে অ্যাবারফয়েল খনির প্রবেশপথে ওঠা নামা করত। সেটাকে বসানোর ব্যাপারে, ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারের কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশি ছিল। তারই বুদ্ধি-কৌশলে এটা তৈরি করা হয়েছিল। তিনি স্বনির্মিত যন্ত্রটার 'ইঞ্জিন-মানব' নামকরণ করেছিলেন। খনির কাজ আজ বন্ধ হওয়ায় সেটা অন্তর্হিত হয়ে দীর্ঘাকৃতি কয়েকটা মই তার জায়গা দখল করেছে।

এক একটা চাতাল প্রতি পঞ্চাশ ফুট দূরত্বে অবস্থান করছে। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা মইয়ের বন্দোবস্ত। সবচেয়ে নিচের গহ্বরে নামতে এরকম ত্রিশটা মই বেয়ে নেমে যেতে হয়। যাকে বলে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৫০০ ফুট পাতালগহ্বরে চলে যাওয়া। এটা ছাড়া অন্য কোনো প্রবেশপথের অস্তিত্ব নেই যেখান দিয়ে ডোচার্ট পিটের খনিগর্ভে নেমে যাওয়া সম্ভব।

হ্যারি একটা তেলের সলতে জ্বালিয়ে মই বেয়ে আগে আগে নামতে লাগল। আর তার পিছনে খুবই সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে নেমে চললেন জেমস স্টার।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দুটো ছায়ামূর্তি অন্ধকার অতল গহ্বরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একচক্ষু বিশিষ্ট প্রাণীর মতো তেলের সলতেটা ধিক ধিক করে অনবরত জ্বলতে লাগল।

www.pathagar.com

এক এক করে পর পর দশটা মই ডিঙিয়ে জেমস স্টারের হাঁপ ধরে গেল। মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে নিলেন। আবার শুরু হল সলতের আলোয় আলোকিত মই বেয়ে অনবরত পাতালপুরীতে নেমে যাওয়া।

একসময় জেমস স্টার আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নিজে থেকে যেন দাঁড়াননি তিনি। কে যেন জোর করে তাঁরা পা দুটো চেপে দরেছে। অন্ধকার যক্ষপুরীর কোনো এক গোপন অন্তরাল থেকে অতর্কিতে ভেসে আসা রহস্যজনক একটা শব্দ তাঁর গতি স্তব্ধ করে দিয়েছে। তাঁর শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। শরীরের সব কয়টা স্নায়ু যেন এক সঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল, যেন এক সঙ্গে সচকিত হয়ে ঝনঝনিয়ে উঠল।

খুবই ক্ষীণ রহস্য সঞ্চারকারী সে কণ্ঠস্বর। ভীতি সঞ্চারকারী তো বটেই। অবাঞ্ছিত সে শব্দটা যেন এবার ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। কাছে, আরো কাছে এগিয়ে এল, রহস্য সঞ্চারকারী সে শব্দটা।

অজানা একটা ভয় ভীতিতে জেমস স্টারের সর্বাঙ্গ কেমন অবশ হয়ে আসতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর কপালে জমে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম। হাত মুঠো করে সাধ্যমতো শক্ত করে মইটাকে আঁকড়ে ধরলেন তিনি।

রহস্য সঞ্চারকারী সে গোপন শব্দটা ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল।

জেমস স্টারের পক্ষে আর মুখবুজে থাকা সম্ভব হল না। অন্তরের অন্তস্থলের পুঞ্জীভূত ভয় ভীতিটুকু গোপন রাখার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েই বললেন, 'হ্যারি, ওটা কী, বল তো? ও কিসের শব্দ। ওটা কার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে?'

জেমস স্টারের কথার জবাব দেয়ার আগে হ্যারি উৎকর্ণ হয়ে শব্দটাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করল। এক সময় মুখ খুলল, 'না, কিছুই বুঝতে পারছি না তো।'

'তোমার বাবার কণ্ঠস্বর না তো?'

হ্যারি আবার মুহূর্তকাল উৎকর্ণ হয়ে কণ্ঠস্বরটা শোনার ও বুঝার চেষ্টা করে বলল, 'আমার বাবার? না, না বাবার কণ্ঠস্বর অবশ্যই নয়। তাঁর কণ্ঠস্বর তো এরকম—'

'তোমার বাবার কণ্ঠস্বর না হলে প্রতিবেশী কারো হবে হয়ত।' মনে সাহস সঞ্চার করতে গিয়ে জেমস স্টার বলে উঠলেন—'হ্যাঁ, সেরকমই কারোর—'

জেমস স্টারকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই হ্যারি প্রতিবাদের স্বরে বলল, 'প্রতিবেশী? আমাদের কোনো প্রতিবেশীই নেই, আবার কণ্ঠস্বর। আমরা একাই তো খনির মধ্যে বাস করি।'

জেমস স্টার ইতিমধ্যে জোর করে যেটুকু সাহস সঞ্চার করেছিলেন তা মুহূর্তে মন থেকে উবে গেল। ফুটো বেলুনের মতো চিপসে গিয়ে এবার কোনোরকমে উচ্চারণ করলেন, 'তবে এক কাজ করা যাক হ্যারি। আমরা বরং এখানেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি।' এবার অপেক্ষাকৃত কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন, 'ওই—ওই শোন হ্যারি, শব্দটা ক্রমেই এদিকে এগোচ্ছে।'

তাঁরা চাতালে পৌঁছেই থমকে গেলেন। অজ্ঞাত রহস্যজনক কণ্ঠস্বরটা এবার আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠল। এবার স্পষ্ট মনে হল, নিছক কথা বা শব্দ নয়, গানের কলি।

উৎকর্ণ হয়ে তাঁরা রহস্যজনক কণ্ঠের গানের কলি লক্ষ করে বুঝলেন—স্কটল্যান্ডের গানের কলিই বটে। ওই—ওই তো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

হ্যারি তাচ্ছিল্যের সঙ্গেড় বলল, 'কেউ সরোবর সঙ্গীতের সুর ধরেছে।'

www.pathagar.com

আরও কয়েক মুহূর্ত নীরবে লক্ষ করে হ্যারি এবার বলল, 'জ্যাকরিয়ান। জ্যাকরিয়ান ছাড়া অন্য কারোর কণ্ঠস্বরই এটা নয়। হ্যাঁ, জ্যাকরিয়ানই বটে।'

কপালের চামড়ায় পরপর কয়েকটা ভাঁজ এঁকে জেমস স্টার বললেন, 'জ্যাকরিয়ান? তোমার ওই জ্যাকরিয়ানটা কে হে? গলাটা খুবই মিষ্টি তো! সুরজ্ঞানও খুবই ভালো!'

হ্যারি ধীরপায়ে চাতালটার ধারে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'জ্যাকরিয়ান! একসময় এ খনিরই শ্রমিক ছিল জ্যাক। আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। অভিন্ন হৃদয় বন্ধু।' চাতালটার একেবারে শেষপ্রান্তে এগিয়ে গিয়ে সে এবার গলা ছেড়ে হাঁক দিল, 'জ্যাক, জ্যাক! এ-ই জ্যাক!'

জমাটবাঁধা অন্ধকার ভেদ করে বিপরীত দিক থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কে? কে রে, হ্যারি নাকি?'

'হ্যারি, আমি হ্যারি। জ্যাক, এদিকে আয় তো একবার।'

'একটু অপেক্ষা কর আসছি।'

মিনিট কয়েকের মধ্যেই দীর্ঘদেহী এক যুবক গুনগুন করে গানের কলি ভাজতে ভাজতে এগিয়ে এসে হ্যারি আর জেমস স্টারের মুখোমুখি দাঁড়াল।

জেমস স্টার সলতের অনুজ্জ্বল আলোতে জ্যাকরিয়ানের হাসির প্রলেপ দেয়া মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

উচ্ছ্বসিত আবেগে হ্যারি ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার-এর সঙ্গে জ্যাকরিয়ানের পরিচয় করিয়ে দিল।

সদ্য পরিচিত যুবক জ্যাকরিয়ান-কে লক্ষ্য করে জেমস স্টার বললেন—'খনির কাজ তো বন্ধ, এখন করছ কী?'

'কী-ই বা করার আছে বলুন?' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জ্যাকরিয়ান বলল, 'উপায়ান্তর না দেখে চাষ আবাদ করেই দিন কাটাতে হচ্ছে। তেমন সুবিধে করতে পারছি নে।'

জেমস স্টার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জ্যাকরিয়ান বলে চলল, 'আসল কথা কি, জানেন স্যার? গাঁইতির মতো কোদাল চালাতে পারে নি—উৎসাহ পাই নে।' এবার হ্যারির দিকে ঘাড় ঘুড়িয়ে সোল্লাসে বলল, 'আরে হ্যারি, আমি তোর খোঁজেই এসেছিলাম। আমাদের মহল্লায় একটু গান-বাজনার মজলিশের আয়োজন করেছি। সেখানে তোকে আশা করছি, আসছিস তো?'

অপ্রতিভমুখে হ্যারি বলল, 'দুঃখিত। আমার হয়ত যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে না ভাই। যেতে না পারলে কিছু মনে করিস না যেন। আসলে মি. স্টার আমাদের অতিথি। তিনি এখানেই কিছুদিন—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই জেমস স্টার বলে উঠলেন, 'আরে, আমার জন্য ভাবছ কেন? তুমি যাবে, অবশ্যই যাবে। আমার জন্য তোমার যাওয়া আটকাবে না।'

হ্যারি এবার জ্যাকরিয়ানের হাত দুটো ধরে বলল, 'ঠিক আছে, তোমার কথা রাখব, আমি তোমাদের গানের মজলিশে উপস্থিত থাকছি।'

জ্যাকরিয়ান তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আগের মতোই গুনগুনিয়ে গানের কলি ভাজতে ভাজতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

জ্যাকরিয়ানের অনুজ্জ্বল লণ্ঠনটা দূরে সরতে সরতে একসময় চোখের আড়ালে চলে গেল।

www.pathagar.com

হ্যারি হাতের জ্বলন্ত সলতেটা আবার উঁচু করে ধরে মই বেয়ে অন্ধকার যক্ষপুরীর দিকে নেমে চলল। জেমস স্টার মইয়ের ধাপে মৃদু শব্দ করে করে তাকে অনুসরণ করে চললেন।

গোটা পঞ্চাশেক ধাপ নামতে না নামতেই জেমস স্টার আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। আচমকা একটা পাথরের চাঁই বুককাঁপানো শব্দ করে লাফাতে লাফাতে হুড়মুড়িয়ে তার পায়ের কাছে এসে পড়ল।

কেবল জেমস স্টারই যে ভয়ে কুঁকড়ে গেলেন তা নয়। আকস্মিক রহস্যজনক ঘটনাটার মুখোমুখি হয়ে কিশোর হ্যারিও কম ঘাবড়ে যায় নি, রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়ল সে। আজানা এক ভয় ভীতিতে তার সর্বাঙ্গ ছমছম করতে লাগল।

জেমস স্টার অতর্কিতে লাফিয়ে উঠে দুই পা সরে গেলেন। কারো মুখেই কোনো কথা নেই। নির্বাক নিস্পন্দ।

পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াল যে, বুকের জমাটবাঁধা আতঙ্কে জোরে নিশ্বাস নিতেও তাদের সাহস হচ্ছে না।

কাঁপা কাঁপা গলায় কোনোরকমে জেমস স্টার উচ্চারণ করলেন, 'আরে ব্বাস! অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি। আর একটু হলেই—পিতৃদত্ত প্রাণটা তবে এ যাত্রায় রক্ষাই পেয়েই গেল।'

একটু দম নিয়ে তিনি কিছুটা স্বাভাবিক স্বরেই উচ্চারণ করলেন—'হ্যারি, ব্যাপার কী বলতো? ছাদের কোনো অংশ হঠাৎ খসে পড়ে নি তো?'

বিচলিত হ্যারি ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখে বলল, 'না স্যার, ছাদের কোনো অংশ ধ্বসে পড়ে নি, ছাদ থেকে খসেপড়া পাথর এমন করে কিছুতেই গড়াতে পারে না। কেউ না কেউ অতর্কিতে পাথরটাকে ছুড়ে মেরেছে। আর তা মানুষেরই কাজ। নির্ঘাৎ কেউ—'

'মানুষ! কী বললে? মানুষের কাজ! মানুষ পাথরটাকে এমন করে ছুড়ে মেরেছে। এ কী অদ্ভুত কথা বলছ হ্যারি! কী বলতে চাচ্ছ, খোলসা করে বল তো?'

নিজেকে সামলে নিয়ে হ্যারি বলল, 'ও কিছু না স্যার।' মুহূর্তের জন্য উদ্বেগ উকণ্ঠা ভরা দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে এবার সে বলল, 'আকস্মিক কোনো ব্যাপার ট্যাপার হবে। ব্যাপারটা আসলে কিছুই না। চলুন, যাওয়া যাক।'

এবার কাছাকাছি, একেবারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে তারা একটা একটা করে ধাপ নামতে লাগলেন আর প্রতিমুহূর্তে চারদিকে সতর্ক ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে নিয়ে তবে পরবর্তী ধাপটাতে নামার চেষ্টা করছেন।

একসময় হ্যারি অখণ্ড নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, 'স্যার, আসলে এরকম রহস্যজনক ব্যাপার আগে কোনোদিনই খনির ভিতরে ঘটে নি। আচমকা পাথর ছিটকে আসা—'

মনে সাহস সঞ্চয় করে জেমস স্টার বললেন, 'হ্যারি, একেই তো বলে দুর্ঘটনা। যে-কোনো সময়, যে-কোনো পরিস্থিতিতে তো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এত সহজে ঘাবড়ালে চলবে কেন হে?'

আর কয়েকটা ধাপ সতর্কতার সঙ্গে নেমেই হ্যারি আবার সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বার বার এদিক ওদিক দৃষ্টি ফিরিয়ে উৎকর্ণ হয়ে কী যেন লক্ষ করে একসময় শুকনো গলায় বলল, 'স্যার, ব্যাপারটা কেমন যেন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, হঠাৎ করে

www.pathagar.com

যেন পায়ের শব্দ কানে এল। আর একটু কাছে সরে আসুন। ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

হ্যারি আবার সতর্ক দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকিয়ে নিল। বৃথা চেষ্টা। বহু চেষ্টা করেও রহস্যটার কিনারা করতে পারল না। সামান্য সলতের আলোয় জমাটবাঁধা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ল না।

আরও কয়েক ধাপ নেমে হ্যারি এক সময় বলল, 'স্যার, আমরা এসে গেছি। আর মাত্র কয়েকটা ধাপ নামলেই আমাদের আস্তানা।'

বুড়ো ওভারম্যান সাইমন ফোর্ড পাতালপুরীর অন্ধকার গহ্বরেই কুঁড়েঘর তৈরি করে মাথাগোঁজার জায়গা করে নিয়েছেন। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৫০০ ফুট নিয়ে তাঁর এ শান্তির নীড়। কয়লাখনির সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ, নাড়ীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাঁর জন্মও হয়েছিল প্রাচীন এক খনি পরিবারে। নিউক্যাসলের ২০০০০ খনি পরিবারের মধ্যে তাঁর পূর্বপুরুষও ছিলেন একজন। আর তিনি নিজে ডোচর্টপিটে ওভারম্যান হিসাবে কাজ করেছেন পাক্কা ত্রিশটা বছর। তাইতো তাঁর পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব নয়, অ্যাবারফয়েল চিরদিনের মতো অক্ষম, জঠরশূন্য হয়ে পড়েছে।

অ্যাবারফয়েলের প্রসঙ্গ উঠলেই বুড়ো সাইমন ফোর্ড দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে ওঠেন—'না, না মরে নি। অ্যাবারফয়েল ঘুমিয়ে আছে। আজ না হোক কাল তার ঘুম ভাঙবেই। আবার তার বুকে মানুষের ব্যস্ততা শুরু হয়ে যাবে। আবার যন্ত্র আর মানুষ এক সঙ্গে কর্মচঞ্চল হয়ে পড়বে।'

বুড়ো সাইমন ফোর্ড ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারকে দেখেই সোল্লাসে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে তাঁকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

রাত্রে খাবার খেতে খেতে জেমস স্টার কথায় কথায় বললেন—'ফোর্ড, তোমার চিঠিটা কিন্তু রীতিমতো কৌতূহল উদ্যেককারী বলে দাবি করতে পারে। আচ্ছা, আসল ব্যাপারটা কি খোলসা করে বল তো?'

মুখের কাছ থেকে হাতটা নামিয়ে নিয়ে সাইমন ফোর্ড মুচকি হেসে বললেন, 'বলব, সবই বলব স্যার। আর এসেই যখন পড়েছেন সবই নিজের চোখেই দেখতে পাবেন, জানতেও পারবেন সবই। আগে ধীরেসুস্থে খেয়ে নিন।' কথা ক'টা জেমস স্টারের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়ে হাতের খাবারটুকু মুখে পুড়ে দিলেন।

জেমস স্টার বাঁ হাতে বুক পকেট থেকে বেনামী চিঠিটা টেনে বের করলেন। সেটা সাইমন ফোর্ড-এর চোখের সামনে ধরে বললেন, 'ভালো কথা, এটা কার চিঠি বল তো?'

সাইমন ও ফোর্ড উভয়েই সুতীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে মুহূর্তকাল জেমস স্টারের হাতের চিঠিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসাই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হল না।

এক সময় সাইমন ফোর্ড চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'মি. স্টার, আপনি এখানে আসুন এটা হয়ত কারো মনঃপূত নয়। তাই আপনার আসা বন্ধ করার জন্যই উড়ো চিঠিটা ছেড়ে দিয়েছে।' এবার অধিকতর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমার গুপ্তরহস্য জেনে ফেলেছে। কিন্তু কে—কে সে? কি তার উদ্দেশ্য? কীই বা তাঁর নাম? আশ্চর্য!'

নৈশ ভোজ সারা হলে জেমস স্টার অদূরবর্তী একটা চাতালে বুড়ো সাইমন ফোর্ডকে পাশে বসালেন। অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন, 'সাইমন, এবার তোমার গোপন রহস্যটা কি, খুলে বলে আমার নিরবচ্ছিন্ন কৌতূহল নিবৃত্ত করো।'

www.pathagar.com

সাইমন ফোর্ড কিন্তু জেমস স্টার-এর কথার জবাব না দিয়েই হ্যারিকে বললেন, 'বাছা, তাড়াতাড়ি একটা সেফটি ল্যাম্প জ্বেলে তৈরি হয়ে নাও।'

সেফটি ল্যাম্পের কতায় জেমস স্টার-এর মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার করল। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'সে কী হে, সেফটি ল্যাম্প দিয়ে কী হবে? খনিতে কোনো দাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব থাকলে তবেই না দুর্ঘটনার ভয় থাকে, সেফ্‌টি ল্যাম্প ব্যবহার করার দরকার পড়ে। কয়লাই যখন নেই—'

'মি. স্টার, ঝুঁকি না নেয়াই উচিত। বলা তো যায় না?—কথা বলতে বলতে তিনি গাঁইতি আনতে এগিয়ে গেলেন।

মুহূর্তের মধ্যে গাঁইতি কাধে আর হাতে সেফ্‌টি ল্যাম্প ঝুলিয়ে সাইমন ফোর্ড বললেন, 'চলুন স্যার আমি তৈরি। চলুন, এবার হাঁটা যাক।'

এই তল্লাটের, বিশেষ করে খনি শ্রমিকরা ভূতপ্রেত দত্যি দানবের খুবই বিশ্বাসী। অশরীরী আত্মারা নাকি রাতের অন্ধকারে সর্বদা পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায়। কেবল এ-অঞ্চল বা খনি শ্রমিকদের কথাই বা বলি কেন সমগ্র পোল্যান্ড ও হাইল্যান্ড উভয় অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ভূত-প্রেত দত্যি-দানোর আর অশরীরী আত্মাদের নিয়ে কত সব রোমহর্ষক গল্প প্রচলিত রয়েছে। মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটলেও কুসংস্কারমুক্ত মনোভাবের একান্ত অভাব।

খনিগর্ভে বারো মাসই ভূত-প্রেতের উপদ্রব লেগেই থাকে। আর খনির উপদেবতা নাকি অসীম শক্তিধর। খনির মানুষদের বিশ্বাস, ফায়ার ড্যাম্প অর্থাৎ দাহ্যগ্যাস তো তারাই ধরিয়ে দিয়ে মানুষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে। আর বিধ্বংসী প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণের নায়কও তারাই। দুর্যোগের রাত্রে তারাই নাকি পৃথিবীকে নাড়া দেয়, আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর অ্যাবারফয়েল কয়লাখনিতে—হ্যাঁ, এখানেও ভূতপ্রেত বিশ্বাসীদের সংখ্যা যথেষ্ট দেখা যায়।

বুড়ো সাইমন আর তার কিশোর ছেলে হ্যারি অবশ্য ভূতপ্রেতের ব্যাপারে একটু অন্য ধরনের। অশরীরী আত্মাটাত্মায় তাঁদের বিশ্বাস নেই। ভূতপ্রেতে তাঁরা যেমন বিশ্বাসী নন তেমনি তার চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাসী, অ্যাবারফয়েলের জঠর একেবারে কয়লাশূন্য হয়ে পড়ে নি। আর এ বিশ্বাসটুকু তাঁদের মধ্যে বদ্ধমূল বলেই তাঁরা বাপ-বেটায় দশ দশটা বছর গাঁইতি কাধে করে সেফটি ল্যাম্প হাতে নিয়ে অন্ধকার পাতালপুরীতে হন্যে হয়ে ঘুরছেন। গাঁইতি নিয়ে আঘাত করে, উৎকর্ণ হয়ে লক্ষ্য করেছেন পরিচিত সে কণ্ঠস্বর শোনা যায় কিনা। কয়লাস্তরের শব্দের কথা বলা হচ্ছে।

এরকম হন্যে হয়ে গাঁইতি চালাতে চালাতে হ্যারি একদিন আচমকা একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল। মনে হয়েছে, সে যেন গাঁইতি দিয়ে কয়লাস্তরে আঘাত করেছে। সে এক অবিশ্বাস্য রহস্যজনক শব্দ। শব্দটা শোনামাত্র তার গা ছমছম করতে লাগল। সর্বাঙ্গে এক অবর্ণনীয় শিহরণ জেগে উঠল।

শব্দটার উৎসস্থলের সন্ধান করতে সে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটোছুটি শুরু করে দিল। কিছুই দেখতে পেল না। কাউকেই নজরে পড়ল না তার। কিন্তু তার যে স্পষ্ট মনে হল অদূরে কে যেন গাঁইতি দিয়ে কয়লাস্তরে আঘাত হানছে। ছুটোছুটি করল বহুক্ষণ। কিন্তু না, কাউকেই দেখতে পেল না সে। তবে? কিন্তু কোনো মানুষের লুকিয়ে থাকার মতো

www.pathagar.com

কোনো গহ্বরও তো ধারে কাছে নেই। বিস্ময়ে অভিভূত হ্যারি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে সেদিন কুঁড়েঘরে ফিরে এসেছিল।

আবার! অবাক কাণ্ড তো! আবার সে রহস্যজনক শব্দটা হ্যারি কানে এল। আবার তার মনে হল কে যেন গাঁইতি দিয়ে কয়লার স্তরে আগাত হানছে।

এক মাসের মধ্যে পর পর দুবার অবিশ্বাস্য শব্দটা শুনতে পেয়ে আশান্বিত হ'ল। আরও বেশি বিস্মিয় হল যেদিন সে শুনল অবিকল ডিনামাইট ব্যবহার করে কয়লাস্তর বিচ্ছিন্ন করার মতো শব্দ। এবার তাঁর বুক আশায় একেবারে ভরে উঠল। সে অনুসন্ধানের কাজ আরও ক্ষিপ্রতর করল। অচিরেই সে একটা ধ্বসেপড়া থাম আবিষ্কার করল। তার গায়ে সদ্য বিস্ফোরণের সুস্পষ্ট চিহ্ন।

হ্যারি এবার নিঃসন্দেহ হল, কেউ না কেউ গোপনে কয়লার স্তর খোঁজ করছে। আর তা প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারেই করছে। কিন্তু কে? কে সে? রহস্যজনক কয়লা অনুসন্ধানকারীটি কে? কেই-বা এমন গোপনে একের পর এক রহস্যজনক ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে?

ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার খনিতে ফিরে আসার মাত্র সপ্তাহ দুই আগেকার কথা।

এক সকালে হ্যারি একা একা খনিগর্ভে হারা উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অকস্মাৎ একটা উজ্জ্বল আলো তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। ব্যাস, মুহূর্তকাল পরেই মাত্র শ-খানেক ফুট দূরে অবস্থানরত আলোটা দুম করে নিভে গেল।

সাইমন ফোর্ড সদ্য আগত অতিথি জেমস স্টার-কে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রধান গ্যালারির মাইল দুই অতিক্রম করে ফেললেন। এবার তাঁরা এক সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ পথ ধরলেন। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৫০০ ফুট গভীরে অবস্থানরত সুড়ঙ্গটা ফর্থ নদীর গতিপথ বরাবর এগিয়ে গেছে।

হ্যারি সেফটি ল্যাম্প হাতে আগে আগে আলো দেখিয়ে চলেছে। হঠাৎ তার পা দুটোকে যেন ভূমির সঙ্গে চেপে ধরল। চলার শক্তি হারিয়ে ফেল্ল। কেন? এমন কী ঘটল যে, তার গতি হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে গেল? হ্যাঁ, কারণ অবশ্যই আছে। একটা ছায়ামূর্তি তার পা দুটো থামিয়ে দিয়েছে। ছায়ামূর্তিটা যেন বাতাসের বেগে এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ব্যস, সবই ভোঁ ভাঁ। হ্যারি ব্যাপারটাকে নিঃশব্দে হজম করে নিল। জেমস স্টার তো দূরের ব্যাপার, এমনকি তার বাবার কাছেও আকস্মিক দেখা রহস্যজনক ছায়ামূর্তিটার কথা ফাঁস করল না।

সাইমন ফোর্ড জেমস স্টারকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে ফোকলা দাঁতে মুচকি হেসে বললেন, 'স্যার আর বেশি দূরে নয়। এই তো ওই বাঁকটা ঘুরলেই আমরা জায়গামতো পৌঁছে যাব, আধমাইল খানেক—'

'আধমাইল? আধ মাইল তো এ স্তরটাকে একেবারে শেষ প্রান্তে হে!'

সাইমন ছোট্ট করে হেসে বললেন—'স্যার, এতদিন হয়ে গেল তবু কিছুই স্মৃতি থেকে মুছে যায় নি দেখছি! সেখান থেকেই তো কয়লার শেষ চাঙরটাকে তুলে এনেছিলাম, মানে আছে নিশ্চয়?'

'হুম্।'

'মি. স্টার, গাঁইতির শেষ ঘা-টা আমিই মেরেছিলাম।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার সাইমন বললেন—'ওসব কথা ছাড়া যাক। স্যার, একটা আশার আলো, মানে আশার সূত্র

www.pathagar.com

পেয়েছি। আমার বিশ্বাস, ডোচার্ট পিট আজও বেঁচে আছে। আমি তার প্রাণের স্পন্দন শুনতে পেয়েছি।'

জেমস স্টার অতর্কিতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন।

সাইমন ফোর্ড বলে চললেন—'আমার কথা শুনে আপনি হয়ত ভাবছেন আমি কয়লার স্তরের সন্ধান পেয়ে গেছি। কিন্তু আসলে এতদূর এগোতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, কয়লার স্তরের অবস্থিতির উপযুক্ত প্রমাণ আমি হাতেনাতে পেয়ে গেছি।'

কণ্ঠস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করে জেমস স্টার বলে উঠলেন—'কয়লার স্তরের অস্তিত্বের প্রমাণ?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ। ফায়ার-ড্যাম্প অর্থাৎ কয়লার খনির দাহ্য গ্যাস কি কয়লার অবর্তমানে বেরোয়, নাকি কখনও বেরনো সম্ভব, আপনি বলুন?'

'না, তা কি করে সম্ভব। কারণ ছাড়া কার্য তো সম্ভব নয়। কয়লার অস্তিত্ব নেই, ফায়ার-ড্যাম্পও অনুপস্থিত।'

'তবে?'

'তবে কি আপনি, বলতে চাইছেন হাইড্রোজেন আর কার্বোরেটের হদিস পেয়েছেন?'

'স্যার, খনির ব্যাপার স্যাপার, মানে খনির চরিত্র সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যথেষ্টই—একজন বাস্তুঘুঘু। তাই আশা করি স্বীকার করবেন, এত সহজে ভুল করার পাত্র এ বান্দা নয়। আমাদের চিরশত্রুই হচ্ছে ফায়ার ড্যাম্প। আর তাকেই চিনতে আমার মত লোকের ভুল হবে? কখনই না।'

জেমস স্টার রুদ্ধশ্বাসে সাইমন ফোর্ডের কথাগুলো শুনতে লাগলেন।

সাইমন ফোর্ড বলে চললেন—'মি. স্টার, আসল ব্যাপারটা বলছি শুনুন—আমরা বার দুই খনির পশ্চিমদিকে আগুন দেখতে পেয়েছিলাম। চোখের পলকে আবার সেটা নিভেও গিয়েছিল। ফায়ার ড্যাম্পের উপস্থিতি ছাড়া তো আর আগুন জ্বলে নি, আপনি কী বলেন?'

জেমস স্টার তাঁর কতার কি জবাব দেবেন হঠাৎ করে গুছিয়ে উঠতে না পেরে চুপ করেই রইলেন।

সাইমন বলে চললেন, 'স্যার, তাই যদি সত্য হয় তবে মেনে নিতেই হয় ধারে-কাছে কোথাও না কোথাও কয়লার স্তরের উপস্থিতি রয়েছে।

'বিস্ফোরণ আগুন থেকে ঘটে নি।'

'আপনার তো আর অজানা নয় মি. স্টার, বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভি সেফটি-ল্যাম্প আবিষ্কার করার আগে কয়লাখনিতে কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো হত।'

জেমস স্টার বললেন—'তুমি তো মঙ্ক-এর কথা বলতে চাইছ, তাই না? হ্যাঁ, আমি শুনেচি বটে। তবে নিজের চোখে দেখি নি।'

'আমি দেখেছি।' মুচকি হেসে সাইমন বললেন—'স্যার, আপনি তো জানেনই, আমি আপনার চেয়ে কম হলেও দশ বছরের বড়। অন্ধকার খনিগহ্বরে, বিভীষিকা জমাটবাঁধা অন্ধকারে সর্বশেষ মঙ্কের কাজ কারা করত? তারা মঠবাসী সন্ন্যাসীদের মত ইয়া লম্বা আলখাল্লা পরত বলে তাদের নামকরণ হয় মঙ্ক বা সন্ন্যাসী। কাজের প্রকৃতি অনুসারে তাদের 'আগুন যোদ্ধা' নামেই অভিহিত করাই সঙ্গত ছিল। তখনকার দিনে ছোটকাটো বিস্ফোরণের মাধ্যমে ফায়ার-ড্যাম্পের গ্যাস জ্বালিয়ে দেওয়া হত। নইলে সে গ্যাস ছাদে গিয়ে জমা হয়ে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সর্বনাশের চূড়ান্ত করে ছাড়ত। মঙ্করা মশাল

www.pathagar.com

নিয়ে ওপরের দিকে তুলে অনবরত নাড়ত। গ্যাস জমে থাকলে তা সশব্দে ফেটে যেত। কিন্তু গ্যাসের পরিমাণ বেশি হলে মক্ষ অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যুর শিকার হত। মি. স্টার, ব্যাপার স্যাপার আমার ভালই জানা রয়েছে, তাইতো ফায়ার-ড্যাম্পের উপস্থিত অনুমান করতে পেরে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি। আর পিটে নতুন কয়লার অস্তিত্বেরও সন্ধান পেয়েছি।'

হ্যাঁ, সাইমন ফোর্ডে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ফায়ার ড্যাম্প, কার্বোরেটেড হাইড্রোজেন বা মার্শ গ্যাস কেবলমাত্র যে গন্ধহীন তা নয়, বর্ণহীনও বটে। আর তা ধিকধিক করে জ্বলতে থাকে।

অন্ধকার খনির জঠরে ও গ্যাস অল্প অল্প করে জমকে জমকে একসময় শ্রমিকদের শ্বাসকার্য চালানোর কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আর যদি তা কোনরকমে আগুনের ছোঁয়া পায় তবে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তা সর্বনাশের কারণ হয়।

সাইমন ফোর্ড কথা প্রসঙ্গে জেমস স্টারকে বললেন—তিনি কনির পশ্চিমাংশে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফায়ার-ড্যাম্পের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছেন।

সাইমন ফোর্ডের বক্তব্য শুনে জেমস স্টারের মধ্যে নিদারুণ উত্তেজনা ভর করল।

সেফটিল্যাম্প-হাতে আরও সামান্য এগিয়ে হ্যারি ঘাড় ঘুরিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—'মি, স্টার, আমরা সে জায়গাটায় পৌঁছে গেছি।'

জেমস স্টার অভাবনীয় আগ্রহ-উত্তেজনায় হ্যারির অঙ্গুলি নির্দেশিত জায়গাটাকে দেখতে লাগলেন। এখান থেকেই দশ বছর আগে সর্বমেষ কয়লার চাঁইটা কেটে নেয়া হয়েছিল।

সাইমন ফোর্ড ছোট্ট করে একটা গাঁইতির ঘা মেরে অত্যুগ্র আশা ও আগ্রহ প্রকাশ করে বলে উঠলেন—'স্যার, কঠিন পাতরের স্তরটাকে কোনক্রমে সরিয়ে ফেলতে পারলেই কালো হীরে উঁকি মারবে। ভূমি থেকে প্রায় দশফুট ওপরে এখানেই ফায়ার ড্যাম্প বেরোতে দেখা গেছে।'

জেমস স্টার আশান্বিত বাপ-বেটার মুখের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। তাঁর চোখের তারায় অবিশ্বাসের ছাপ। এর সঙ্গত কারণও রয়েছে। কারণ, বাতাসে বিসাক্ত গ্যাসের সামান্যতম গন্ধও পাচ্ছেন না। গ্যাসের পরিমাণ যত কমই হোক না কেন, তাঁর অভিজ্ঞ নাককে ফাঁকি দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাঁর ভাবনা হল, সাইমন আর হ্যারি-র কি তবে ভুলই হয়েছে? সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত ভাবনার উদয় হল, তাও তো হবার নয়। এরা যে জাতশ্রমিক। এদের তো এতবড় একটা ভুল হতে পারে না।

হ্যারির মনে সন্দেহের উদ্রেক ঘটল। নাকটাকে দেওয়ালের কাছাকাছি নিয়ে বলল—'বিষাক্ত গ্যাস তো আর বেরোচ্ছে না। এখন তবে বন্ধ।'

সাইমনও অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে ফায়ার ড্যাম্পের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা নিতে চেষ্টা করলেন। বৃথা চেষ্টা। ধাতব প্লেটটা সরানোতেও কোন ফল পাওয়া গেল না। লণ্ঠনটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়াতেও চটপট বা অন্য কোন আওয়াজ হল না। নামমাত্র ফায়ার ড্যাম্প থাকলে অদ্ভুত এক শব্দ তোলে। লণ্ঠনটা লাঠির মাথায় বেঁধে ওপরে তুলে ব্যর্থ হলেন। কোনো প্রতিক্রিয়াই লক্ষিত হল না। হ্যারিও বহুভাবে চেষ্টা করল ফায়ার ড্যাম্পের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে। সব প্রয়াসই ব্যর্থ হল।

www.pathagar.com

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লণ্ঠনের আলোয় দেওয়ালের গা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে এক সময় হ্যারি বিকট স্বরে চিল্লিয়ে উঠল—'এই যে!—এই দেখুন! পাথরের গ্যাসের ফাটলটা কে যেন বন্ধ করে দিয়েছে।' হাতের লণ্ঠনটা সাধ্যমত উঁচু করে দরে সে এবার বলল—'এই যে, এই দিকে—এখানে!'

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে জেমস স্টার বুঝলেন, হ্যারির অনুমান অভ্রান্ত। সিমেন্ট বালির প্রলেপ জ্বলজ্বল করছে।

হ্যারির মুখে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠল—'এবার বুঝলাম, কাজটা সে—ই করেছে!' সে ছাড়া আর কারোর দ্বারা অন্য কারোর পক্ষে—'

'সে? সে বলতে কার কথা বলতে চাইছ হ্যারি? কে? কে সে?

'আমার অনুমান সম্পূর্ণ অভ্রান্ত। রহস্যজনক আগন্তুক ছাড়া আর কারোর পক্ষে এমনটা করা সম্ভব নয়। প্রেতচ্ছায়ার মতই সে সংগোপনে পাতালপুরীর খনির জঠরে হানা দিচ্ছে! তাকে চোখে দেখেছি বটে, কিন্তু হাতে নাতে ধরা সম্ভব হয়নি।

জেমস স্টারের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে অস্থিরচিত্ত হ্যারি বলল—'মিঃ স্টার, যে উড়োচিঠি দিয়ে আপনার এখানে আসা বন্ধ করার চক্রান্ত করেছিল, যে ইয়ারো শ্যাফটের সুড়ঙ্গপথে আমাদের দিকে পাথর ছুড়ে মেরেছিল, তার কথা বলতে চাইছি। একই লোক সব কাজ করে চলেছে।'

হ্যারির দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে জেমস স্টারের মন থেকে দ্বিধা দ্বন্দ্বের মেঘ অল্প অল্প করে সরে যেতে লাগল। আর প্রমাণ তো হাতেনাতেই পেয়েছেন। কাল রাত্রেও সেখান দিয়ে তির তির করে বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়েছে। এখন সেখানে সিমেন্ট-বালির প্রলেপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সাইমন ঝট হরে হামা দিয়ে বসে পড়লেন। তার কাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে হ্যারি সিমেন্ট বালির প্রলেপের গায়ে গাঁইতি দিয়ে আঘাত হানতেই ভুসভুস করে বিষাক্ত গ্যাস বেরোতে শুরু করল।

হ্যারি অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে হাতের লণ্ঠনটাকে উঁচু করে ফাটলটার কাছে নিতেই বাজির মত চটপট আওয়াজসহ রক্তিম আলোক শিখা যার চার দিকটা নীলাভ—এমন অদ্ভুত আলোকচ্ছটা ঠিকরে পড়তে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে গেল। একমাত্র আলেয়ার খেলার সঙ্গেই এর তুলনা করা চলে।

সাইমন ঝট করে জেমস স্টার-এর হাত দুটো চেপে ধরে উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন—'স্যার, আছে! ফায়ার-ড্যাম্পের অস্তিত্ব আছে! ফায়ার-ড্যাম্প যখন আছে তখন কয়লাও অবশ্যই আছে। কয়লা—কয়লা আছে মি. স্টার!'

হ্যাঁ, ফায়ার ড্যাম্পের অস্তিত্ব বলে দেয়, কয়লার স্তর অবশ্যই আছে। ফায়ার ড্যাম্প আর কয়লার ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ খনি শ্রমিকদের অজানা নয়। ব্যস, কয়লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারোর আর সামান্যতম দ্বিধাদ্বন্দ্বও থাকার কথা নয়।

ডোচার্ট পিটে কয়লা যে আছে এতে আর কারোর সন্দেহের অবকাশই রইল না বটে। তবে এখন যা ভাবা দরকার, সেখানে কী পরিমাণ কয়লা রয়েছে? আর তা কোন জাতের?

জেমস স্টার কয়লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর ভাবতে লাগলেন—'কয়লার খোঁজ যখন পাওয়া গেছে তখন তাকে উদ্ধারের আয়োজনও করতে হবে। কিন্তু হাজারো সমস্যা এতে। দশ দশটা বছর আগের যন্ত্রপাতিগুলোকে অনাদরে

www.pathagar.com

অযত্নে ফেলে রাখায় অধিকাংশই আজ বিকল। ঝেড়েমুছে মেরামত করে সেগুলোকে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হলে হ্যাপাও অনেক। তা হোক গে। এমন একটা কাজ করতে গেলে ঝুঁকি নিতেই হবে। এর শেষ না দেখে ছাড়া যায় না।'

সাইমন ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন—'মি. স্টার। আপনার ডোচার্ট পিটে ছুটে আসা সার্থক হয়েছে, ভাবছেন তো? নাকি—'

'হ্যাঁ, অবশ্যই সার্থক হয়েছে। চল, এবার তোমার আস্তানায় গিয়ে কালকের কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করা যাক। কাল ভোরে ডিনামাইট নিয়ে হাজির হব। পাথরের বুক চিরে কালোহীরের মুখ না দেখা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। নিউ অ্যাবারফয়েল কোম্পানি আমরাই গড়ে তুলব সাইমন।' দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বলতে বলতে জেমস স্টার সেখান থেকে ফেরার উদ্যোগ নিলেন।

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ভোর হল। সাইমনফোর্ডের স্ত্রীও তাদের পিছন ধরলেন।

ডিনামাইট, সেফটি ল্যাম্প, লণ্ঠন, শাবল, আর গাঁইতি প্রভৃতি অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি ঘাড়ে নিয়ে পুরো দলটা এগিয়ে চলল সুড়ঙ্গের সর্বশেষ প্রান্তটার উদ্দেশ্যে।

জেমস স্টার জায়গামত পৌঁছে সবার আগে নিশ্চিন্ত হয়ে নিলেন, ফায়ার-ড্যাম্প বেরিয়েই চলেছে। গাঁইতি শাবল দিয়ে ঘা মেরে মেরে বড় সড় কয়েকটা ছিদ্র করে নেয়া হল।

ডিনামাইট কার্টিস ঠেসে ঠেসে ছিদ্রগুলোর ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হল। এবার লম্বা সলতেটাকে সাধ্যমত দূরে টেনে নেয়া হল। সলতের মাথায় অগ্নিসংযোগ করে সবাই ছুটোছুটি করে নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে অধীর প্রতীক্ষায় রইলেন।

ব্যস, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিকট গম্ভীর আওয়াজে পাতালপুরী থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

সবার মধ্যে নিদারুণ অস্থিরতা ভর করলেও সাইমন ফোর্ডের নির্দেশে বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা অধীর প্রতীক্ষায় রইলেন।

একটু পরে হ্যারি ব্যস্ততার সঙ্গে সদ্য তৈরি গর্তটার মধ্যে লণ্ঠন নিয়ে ঢুকে গেল। গর্তটার মুখ খুবই ছোট। একজনের বেশি কিছুতেই ঢোকা সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে অন্য সবাই গর্তের মুখেই অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে লাগলেন।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরেই চলেছে। কিন্তু হ্যারির ফেরার চিহ্নও নেই। কোথায় সে? কোথায় গেল সে! ফিরতে এত দেরি করছে কেন? কী আশ্চর্য ব্যাপার। হ্যারি কি বাতাসে উবে গেল নাকি?

অস্থিরচিত্ত জেমস স্টার বার বার গর্তের মুখে উঁকি দিয়ে লণ্ঠনের আলোয় হ্যারির খোঁজ করতে লাগলেন। ব্যর্থ প্রয়াসের কোন চিহ্নও নেই।

বুড়ো সাইমন ফোর্ড এবং তাঁর স্ত্রী ম্যাগ অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় মুষড়ে পড়ার জোগাড় হলেন। সাইমন আর ধৈর্য ধরতে না পেরে গর্তটার মধ্যে ঢোকার জন্য একটা পা ভেতরে চালান দেয়ামাত্র জমাটবাঁধা অন্ধকার ভেদ করে মৃদু একটা আলো হঠাৎ দেখতে পেলেন।

মুহূর্তের মধ্যেই হ্যারির কণ্ঠস্বর ভেসে এল—'মি. স্টার, আসুন। এসে দেখুন, কী অবিশ্বাস্য কাণ্ড! মা-বাবা তোমরাও এস। সবাই নিজের চোখে দেখে যাও, অ্যাবারফয়েলের দ্বারোদ্‌ঘাটন করে ফেলা হয়ে গেছে। বুকভরা কালো হীরা নিয়ে পাতালপুরী সবাইকে আহ্বান করছে! এসো! সবাই এসে নিজের চোখে দেখে যাও!'

www.pathagar.com

আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ব্যস্ত পায়ে ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার আর বুড়ো ওভারম্যান সাইমন ফোর্ড গর্তটার ভেতর দিয়ে সদ্য আবিষ্কৃত খনিটার দিকে এগিয়ে চললেন।

সুড়ঙ্গটা ধরে সামান্য যেতে না যেতেই তাঁরা রীতিমতো চমকে উঠলেন। আশ্চর্য ব্যাপার তো! এ যে পুরোদস্তুর একটা গ্যালারি। মানুসের অভিজ্ঞ হাতের ছোঁয়ায়ই বুঝি এমন একটা অসম্ভব কে বাস্তবে পরিণত করা হয়েছে। শাবল আর গাঁইতির ঘা মেরে মেরে, কে যেন সবার অলক্ষ্যে গ্যালারিটা তৈরি করে রেখে গেছে। ঠিক যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনো একটা খনি।

আসলে কোনো মানুষের হাতের স্পর্শে গড়ে তোলা গ্যালারি এটা মোটেই নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে, ভূস্তরই নিজের খেয়ালের বশে নিজেকে এমন অদ্ভুতভাবে গড়ে তুলেছে।

অফুরন্ত কালো হীরার মুখোমুখি হয়ে বুড়ো সাইমন রীতিমতো স্তম্ভিত। মুখ দিয়ে রা পর্যন্ত তাঁর বেরোচ্ছে না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে একদম শেষপ্রান্তে গিয়ে সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন।

গ্যালারিটার একেবারে শেষ প্রান্তে বিশালায়তন একটা গর্তের দিকে সবার নজর গেল। তারা তার ভেতরে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে গভীরতা সম্বন্ধে ধারণা করে নেওয়ার চেষ্টা করল। বৃথা চেষ্টা। গর্তটার গভীরতা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করতে পারল না। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় বুঝা গেল জলস্তর স্থির।

সাইমন ফোর্ড সেদিনের মতো ফিরে আসার প্রস্তাব দিলেন।

সবাই পিছন ফিরতেই হ্যারি থমকে গেল। উৎকর্ণ হয়ে কোন একটা অত্যাশ্চর্য শব্দ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য উৎকর্ণ হয়ে মুহূর্তকাল কাটিয়ে বলল, 'ওই—ওই যে শুনুন, মাথার ওপর কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ভূপৃষ্ঠের পাথরের স্তরে চাপা দুম দুম শব্দ ভেসে আসছে।'

সাইমন এবার কানে হাত রেখে আকস্মিক উদ্ভুত শব্দটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে সোল্লাসে বলে উঠলেন—'কী আশ্চর্য কাণ্ড স্যার! এরই মধ্যে নিউ অ্যাবার ফয়েল ট্রাক চলাচল করতে লেগেছে। ট্রাকের মব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।'

'না, ট্রাকের শব্দ বলে তো মনে হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে, সমুদ্রের ঢেউ তীরে এসে সবেগে আছাড় মেরে পড়ছে। ওই—ওই সমুদ্রের গর্জন!'—হ্যারি উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলল।

সাইমন চোখে মুখে চিন্তার ছাপ অক্ষুণ্ন রেখেই এবার বললেন—'সমুদ্রের গর্জন হওয়ার কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। আমরা হয়ত বালক ক্যাটরিনের ঠিক তলায় অবস্থান করছি। আর ছাদটা তেমন পুরু না হওয়ায় আওয়াজটা হয়ত এমন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।'

হ্যারি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জেমস স্টার-এর মুখের দিকে তাকাল। জেমস স্টার তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরে মুচকি হেসে বললেন—'সাগরের তলদেশে হলেও এখান থেকে কয়লা তোলা সমস্যার ব্যাপার হবে না। আমরা এমন একটা সুড়ঙ্গ গড়ে তুলব যার ভেতর দিয়ে আমেরিকায় হাজির হওয়া সম্ভব হবে।'

সাইমন ফোর্ড তাঁর কথাটাকে নিছক তামাশা বলে ধরে নিলেন।

www.pathagar.com

এবার ফিরে আসার পালা।

মাইলখানেক পথ তাঁরা নির্বিঘ্নেই ফিরে এলেন। এবারই একেবারে অকল্পনীয় এক ঘটনার মুখোমুখি হলেন। হঠাৎ এক জোড়া অতিকায় ডানার জটপটানি তাঁদের কানে এল।

মুহূর্তের মধ্যে এমন একটা ঝাপটা লাগল যে হ্যারির হাতের লণ্ঠনটা হাত থেকে খসে পড়ল। ব্যস, একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেল একমাত্র সম্বল লণ্ঠনটা। নিমেষে খনিগর্ভের জমাটবাঁধা অন্ধকার চারদিক ছেয়ে ফেলল। চোখের পলকে বুড়ো সাইমন ফোর্ড, ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার, হ্যারি ফোর্ড আর তার মা সবাই কে কোথায় যে ছিটকে পড়ল তার ঠিক ঠিকানা রইল না। অজানা এক ভীতি আর বিপদশঙ্কায় সবাই কুঁকড়ে গিয়ে বাকশক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছেন।

আতঙ্কিত হয়ে সবাই ধরেই নিলেন, অদৃশ্য সে শয়তানটারই কাজ। হতচ্ছাড়াটা কি তবে খনিগর্ভে কারো উপস্থিতিই বরদাস্ত করতে চাইছে না। তাই সে বিভিন্ন কৌশলে আক্রোশ প্রকাশ করে সবার মনে আতঙ্কের সঞ্চার করে চলেছে!

ভীতসন্ত্রস্ত মনে সবাই ভাবতে লাগলেন, সবে এক মাইল পথ অতিক্রম করতে পেরেছেন। এখনো পাঁচ মাইল বাকি।

সাইমন ফোর্ড সবার মধ্যে সহাস সঞ্চার করতে গিয়ে বললেন—'কেউ ভয় পাবেন না। মুষড়ে পড়ার কোনোই কারণ নেই। পথ তো আমাদের চেনাই। অন্ধকার হলেও হাতড়ে হাতড়ে ঠিক ডেরায় ফিরে যেতে পারব। পাশাপাশি গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে চলুন। দলছুট হবেন না।'

সবার মধ্যেই অজানা একটা ভীতি কাজ করে চলেছে—কে? কে এই অদৃশ্য শত্রু? শয়তানটা কেন বারবার অতর্কিত আক্রমণে এমন উৎসাহী হচ্ছে? কিই বা তার উদ্দেশ্য?

সাইমন ফোর্ড পথপ্রদর্শক হয়ে আগে আগে চলেছেন। কিছুটা পথ অতিক্রম করে এক সময় আর্তনাদ করে উঠলেন—'হায় সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে গেছে! আর বাঁচার কোনো উপায় নেই—!'

'পথ হারিয়ে অন্যদিকে চলে এসেছি। পাতালের অন্ধকার পুরীতে আমরা বন্দি হয়ে পড়েছি। পথ যদি নাও হারাই তবে কোন শত্রু পাথর চাপা দিয়ে পথ বন্ধ করে দিয়েছে। অন্ধকার কারাগার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোনো ফিকিরই দেখা যাচ্ছে না।'

ব্যস, নিউ অ্যাবারফয়েলে জেমস স্টার সদলবলে কয়েদ হয়ে পড়লেন। অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন সবাই।

একদিন—দুদিন করে পুরো একটা সপ্তাহ কেটে গেল।

* * *

হঠাৎ আবিষ্কার করা হল, ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার নিরুদ্দেশ। একেবারেই বেপাত্তা হয়ে গেছেন তিনি। গলাছেড়ে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করে তাঁর কোনোই হদিশ পাওয়া গেল না। চারদিকে খোঁজখবর ও জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, ভদ্রলোক গ্র্যানটনশায়ার বন্দর থেকে জাহাজে উঠেছেন।

বহুভাবে তল্লাশি চালিয়ে প্রিন্স অব ওয়েলসের ক্যাপ্টেনকে বের করা সম্ভব হল।

মাঝবয়সী ক্যাপ্টেন বললেন, তিনি নাকি ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারকে স্টার্লিং বন্দরে জাহাজ থেকে নামিয়ে দিয়েছেন। ব্যস, এর বেশি কিছুই তাঁর জানা নেই।

www.pathagar.com

বুড়ো সাইমন ফোর্ড ক্যাপ্টেনের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখলেন, তিনি যেন ব্যাপারটাকে কারোর কাছেই ফাঁস না করেন।

ব্যাপারটা নিয়ে এডিনবয়ার রীতিমত হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারের অন্তর্ধান জনমানসে ক্রমশ রহস্যের সঞ্চার করল, লোকের মুখে মুখে নানা কল্পিত কাহিনী ঘুরে বেড়াতে লাগল। হাটে-মাঠে-বাজারে ও হোটেল-রেস্তোরাঁয় একই গল্প। আর সব গল্পের নায়ক একই ব্যক্তি—জেমস স্টার।

একদিন রয়েল ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট স্যার ডব্লিউ এনফিসস্টোন ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারের লেখা একটা চিঠি পেশ করলেন। চিঠিটার বক্তব্য থেকে জানা গেল, তিনি এডিনবরার বাইরে কোথাও রয়েছেন। কিন্তু কোথায়, কেন এবং কোন অবস্থায় রয়েছেন তার কিছুই জানা গেল না। পুরো ব্যাপারটা রহস্যের আড়ালেই রয়ে গেল। আসলে তিনি যে অ্যাবারফয়েলে পাড়ি জমিয়েছেন তা তো আর কারোরই জানা নেই। অতএব এদিকটা নিয়ে কারো চিন্তার অবকাশও নেই।

একমাত্র জ্যাকরিয়ান জেমস স্টারকে দেখেছিল। তাও অ্যাবারফয়েল খনি থেকে মাইল চল্লিশের দক্ষিণ পশ্চিমে। আর সে গানবাজনা নিয়েই সর্বক্ষণ মেতে থাকে। এসব ব্যাপার নিয়ে তার মাথা ঘামাবার সুযোগই বা কোথায়?

চারদিকে লোকজন ছুটোছুটি করে ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারের খোঁজ করতে লাগল। খবরের কাগজের পাতায় বিজ্ঞাপনও ছাপা হল। কিন্তু সবই বৃথা চেষ্টা। কেউই তাঁর খোঁজ দিতে পারল না।

বারোই ডিসেম্বর। সে রাত্রে এক অত্যাশ্চর্য, একেবারেই অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড ঘটে গেল। যারা ভূতপ্রেত, অলৌকিক অশরীরী আত্মার গল্প শুনে নাক সিঁটকায় তারাও কাণ্ডটা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

হায় ঈশ্বর! এ কী কেলেঙ্কারী কাণ্ড। এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ডও কোননি ঘটতেপারে! অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা হচ্ছে—ফির্থ অব ক্লাইভের বাঁকে পোতাশ্রয়ে একটা আলোকস্তম্ভ গড়ে রাখা হয়েছে। এর ভূমিকা জাহাজকে উপকূল আর চোরা পাহাড়ের সংকেত দেখানো।

অরভিন নগরের একান্তে একটা ভাঙাচোরা দূর্গ আছে। জায়গাটা একেবারেই জনমানবশূণ্য। এরকম নির্জন নিরালা পরিবেশে নাকি প্রেতাত্মারা দাপাদাপি করে বেড়ায়। পোল্যান্ড ও হাইল্যান্ডের মানুষ ভূতপ্রেত দৈত্য দানোর প্রতি বিশেষ আস্থাভাজন। কেবলমাত্র অরভিন নগরের ভাঙা দূর্গটাই নয়, সবচেয়ে পুরনো দূর্গ রবার্ট স্টুয়ার্ট-এর ডোনডোনাল্ড দূর্গকে নিয়েও কম অলৌকিক কাহিনী জনসমাজে প্রচলিত নেই। তবে জনসমাজে যত কাহিনী প্রচলিত রয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও রোমহর্ষক আগুন ডাইনীর বুক কাঁপানো কাহিনী। সে নাকি মুখে লকলকে আগুনের শিখা নিয়ে আকাশচুম্বী মিনারের চূড়ায় রোজ রাত্রে রীতিমতো দাপিয়ে বেড়ায়। এমুহূর্তে অশরীরী আত্মা আগুন ডাইনির কাহিনী জনগণের মনে সবচেয়ে বেশি আতঙ্ক সঞ্চার করেছে।

এক রাত্রে জ্যাকরিয়ান সমুদ্রের কাছাকাছি একটা ঘরে গান বাজনার মজলিশ বসিয়েছে। আচমকা সমুদ্রের দিক থেকে বুকফাটা কান্না ও চেঁচামেচি ভেসে এল। তিনজন লোক একটা বড়সড় পাথরের চাঁইয়ের ওপরে দাঁড়িয়ে গল্প ছেড়ে চেঁচাচ্ছে। জ্যাক রিয়ানের দলের সবাই ছুটোছুটি করে গিয়ে এমন অবিশ্বাস্য দৃশ্যটার মুখোমুখি হল।

www.pathagar.com

অন্ধকার ভেদ করে একটা জাহাজ উল্কার বেগে তীরের দিকে ছুটে আসছে। সেটা দেখেই লোক তিনজন এমন আর্তস্বরে চিৎকার করছে বুঝা গেল। সামনেই চোরা পাহাড়। মুহূর্তে জাহাজটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে।

অস্থির চিত্ত জ্যাকরিয়ান অনুসন্ধিৎসু নজরে চারিদিকে দৃষ্টি ফিরিয়েই রীতিমত শিউরে উঠল। সে দেখল, অদূরবর্তী ডানডোল্যান্ড দুর্গের চূড়া থেকে আগুন ডাইনি লকলকে আগুনের শিখা ছড়াচ্ছে। দমকা বাতাসে অলৌকিক আগুনের শিখাটা নাচানাচি করছে। আর সেটাকে লাইট হাউস ভেবে জাহাজের ক্যাপ্টেন পুরোদমে জাহাজ চালিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, কাছেই উপসাগর আছে। অতএব কোনই সমস্যা নেই। কিন্তু আগুন ডাইনি বা ভৌতিক আলোর ব্যাপারটা তো আর তাঁর জানা নেই।

উপস্থিত সবাই তারস্বরে চিল্লিয়ে উঠল—'সিগন্যাল। সিগন্যাল দেখাও। জাহাজটা চোরা-পাহাড়ে আছাড় খেয়ে গুঁড়িয়ে যাবে যে! কিন্তু কার বুকের পাটা এমন শক্ত যে, আগুন ডাইনির কাছে গিয়ে জাহাজটাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে।

না, জাহাজটা রক্ষা পেল না। উল্কার বেগে ছুটতে ছুটতে এসে বিশালায়তন জাহাজটা চোখের পলকে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। শেষ! সব শেষ! কোনোরকমে সবাই ছুটোছুটি করে গিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজটার ক্যাপ্টেন ও জনা আটেক সংজ্ঞাহীন নাবিককে উদ্ধার করতে পারল।

জাহাজটার আকস্মিক দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হল। ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত। সবাই একই কথা বলল। ডানডোনাল্ড দুর্গের রহস্যজনক অলৌকিক আগুনই এর জন্য একমাত্র দায়ী।

ভূতপ্রেত বা অশরীরী আত্মার ব্যাপারে বিচারক উৎসাহী নন। এসব ব্যাপার বিচারে স্থান পায় না। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া বিচারক এক পাও নড়তে নারাজ। দুর্গের চূড়ায় নির্ঘাৎ কোনো না কোনো চক্রান্তকারী আগুন জ্বালে।

পুলিশের বাঘা বাঘা অফিসারেরা ডানডোনাল্ড দুর্গে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াল। অশরীরী আত্মার পদচিহ্ন মাটিতে পড়ে না বটে, কিন্তু মানুষের পায়ের ছাপ দুর্গের মেঝেতে পড়তে বাধ্য। না, পায়ের ছাপতো দূরের ব্যাপার। দেশলাইয়ের কাঠি বা একটা কাগজের টুকরোও কারো চোখে পড়ল না। অনন্যোপায় হয়ে পুলিশের লোকেরা পথ ছেড়ে দাঁড়াল। এবার ভূত প্রেতে বিশ্বাসীদের উল্লাস হাজার গুণ বেড়ে গেল।

একদিন জ্যাকরিয়ান স্টেশনে দাঁড়িয়ে। ট্রেনের দেরি থাকায় প্লাটফর্মে পায়চারি করছে। হঠাৎ একটা পোস্টারের দিকে তার চোখ পড়ল। তাতে লেখা—"এডিনবরার ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার গত ৪ ডিসেম্বর গ্র্যান্টনলায়ার বন্দর থেকে প্রিন্স অব ওয়েলস জাহাজে চেপে যাত্রা করেন। সেদিনই তিনি স্টার্লিং বন্দরে জাহাজ থেকে নামেন। তারপর থেকেই তার আর কোনোই খবর নেই। তার খোঁজ কারোর জানা থাকলে অনুগ্রহ করে এডিনবরা রয়েল ইনস্টিটিউশনের সভাপতিকে জানালে বাধিত হব।"

বিজ্ঞপ্তিটা পড়া শেষ করে জ্যাকরিয়ান আপনমনে বলে উঠল—'যা বাবা! এ যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখছি! জেমস স্টারকে ৪ ডিসেম্বরেই তো হ্যারির সঙ্গে দেখেছি। এই তো ৭-৮ দিন আগেকার কথা। ব্যস, তারপর থেকে ভদ্রলোক বেপাত্তা। এজন্যই হয়ত হ্যারি আমার গানের মজলিশে উপস্থিত থাকে নি।'

পোস্টারের বক্তব্য পড়ার পর ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারের খবরটা রয়েল ইনস্টিটিউশনের সভাপতিকে পৌঁছে দেয়ার জন্য জ্যাকরিয়ান খুবই চঞ্চল হয়ে উঠল।

www.pathagar.com

ইয়ারো শ্যাফটের মুখে গিয়ে দেখা ভেতরটায় জমাটবাঁধা অন্ধকার বিরাজ করছে। অন্ধকার অগ্রাহ্য করে সে মই বেয়ে নামতে লাগল। পরপর ত্রিশটা চাতাল পেরিয়ে হ্যারির আস্তানায় হাজির হওয়া যায়। এ পথ তার খুব চেনা। একের পর এক ধাপ বেরিয়ে সে সাতাশ সংখ্যক মইটার পরের ধাপে পা দিতে গিয়ে থমকে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার তো! মইটা তো যথাস্থানে নেই! তবে কি সেটাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে? তবে কি জেমস স্টার হ্যারির সঙ্গে পাতালপুরীতে নেমে যাওয়ার পর মইয়ের অভাবে আর উঠে আসতে পারেন নি? তবে কি গত দশদিন জেমস স্টারসহ সবাই পাতালপুরীতে বন্দিদশা প্রাপ্ত হয়েছে? সবাই অসহায়ভাবে আটকা পড়ে গেছে?

ব্যস, মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে জ্যাকরিয়ান মই বেয়ে তরতর করে পাতালপুরী ছেড়ে ভূপৃষ্ঠের ওপরে উঠে এল।

এডিনবরা থেকে ফিরে জ্যাকরিয়ান অবিশ্বাস্য খবরটা যথাস্থানে পৌঁছে দিল। ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার যে পাতালপুরীতে পড়ে অসহায়ভাবে বন্দি জীবন যাপন করছেন এব্যাপারে কারোর মনে এতটুকুও সন্দেহ জাগল না।

ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারের সহকর্মী ও অভিন্ন হৃদয় বন্ধু স্যার উইলিয়ম এলফিনস্টোন ব্যাপারটা শোনামাত্র যত শীঘ্র সম্ভব অ্যাবারফয়েল খনির মধ্যে লোক নামানোর জন্য জরুরি হুকুম জারি করলেন। আর হুকুম দিলেন, যে-কোনোভাবে জেমস স্টার-এর খবর এনে তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে জ্যাকরিয়ানের নেতৃত্বে একদল লোক শাবল, গাঁইতি ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতিসহ খনিগর্ভের সাতাশ নম্বর চাতালেত হাজির হল। এবার ইয়া লম্বা দড়ির প্রান্তে লণ্ঠন বেঁধে সোজা নিচে নামিয়ে দিল।

লণ্ঠনের আলেও অনুজ্জ্বল হলেও স্পষ্ট দেখা গেল নিচের মইটা হাফিস হয়ে গেছে।

এবার দড়ির মই বেয়ে স্যার উইলিয়ম এলফিনস্টেন ও অন্যান্যরা নিচে নেমে চলল। সবার শেষ চাতালটায় পৌঁছেও কারোরই সাড়া মিলল না।

একসময় জ্যাকরিয়ান চিৎকার করে উঠল 'ওই—ওই যে, পোড়া মইটা পড়ে রয়েছে। মইটাকে কে যেন পুড়িয়ে দিয়েছে।'

পোড়া মইটা দেখে স্যার উইলিয়ম হঠাৎ অস্বাভাবিক মুষড়ে পড়লেন। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি সদলবলে সাইমনের ডেরায় হাজির হলেন।

উইলিয়মের আশা ছিল সাইমনের বাড়ি এলে আসাল ব্যাপারটা জানতে পারবেন। কিন্তু কুঁড়েঘরটার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই সবাই আঁতকে উঠলেন। ঘর ফাঁকা। ভোঁ ভাঁ! এতগুলো লোক কোথায় চলে গেল!

সাইমন, হ্যারি আর জেমস স্টারের নাম ধরে গলা ফাটিয়ে ডাকাডাকি করা হল। ব্যর্থ প্রয়াস। কেউই সাড়া দিল না।

ঘরের ভেতরে ঢুকে ক্যালেন্ডারটার দিকে চোখ পড়তেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। সামইনের স্ত্রী ম্যাগি ক্যালেন্ডারে দাগ দিয়ে দিয়ে হিসাব রাখতেন। দেখা গেল ২রা ডিসেম্বরের তারিখটা শেষ কাটা হয়েছে। এবার বুঝা গেল, ফোর্ড-পরিবারের সবাই ছয়ই ডিসেম্বর অর্থাৎ ঠিক দশদিন আগে বাড়ি ছেড়ে কোথাও না কোথাও চলে গেছে। ভয়ঙ্কর কোন পরিণতির আশঙ্কায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে উইলিয়মন কপালে হাত দিয়ে মাটিতে ধপাস করে বসে পড়লেন।

www.pathagar.com

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জ্যাকরিয়ান চিল্লিয়ে উঠলেন—'ওই—ওই যে, একটা আলোকশিখা দেখা যাচ্ছে! ওই যে, ওই আলোকশিখা!'

উইলিয়ম ঝট করে লাফিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মধ্যে অবর্ণনীয় উত্তেজনা ভর করল। অস্থিরভাবে ডানদিক-বাঁদিক বেঁকে আলোকশিখাটাকে বার বার দেখতে লাগলেন।

উইলিয়ম অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠলেন—'ধর! ধর! দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেল।'

জ্যাক প্রতিবাদের স্বরে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কাকে? কাকে ধরতে বলছেন? ওটা তো আর সাধারণ আলোকশিখা নয় যে ধরে ফেলবেন?'

'তবে? ওটা তবে কী?'

'অশরীরী আত্মা! পেত্নীর আলো! আপনি বলছেন ওটাকে ধরতে?'

উইলিয়ম ভূত প্রেত বা অশরীরী আত্মাটাত্মার প্রতি আস্থা রাখেন না। তিনি কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে বলে উঠলেন, 'ধ্যাৎ! আরে রাখ তোমার ভূতপ্রেত আর অশরীরী আত্মা! কথা বলতে বলতে তিনি লম্বালম্বা রহস্য সঞ্চারকারী আলোকশিখাটার দিকে ধাওয়া করলেন। বাধ্য হয়ে জ্যাকরিয়ান আর উপস্থিত অন্যান্যরাও তাঁকে অনুকরণ করতে লাগলেন।

আলোকশিখাটার পিছনে তারা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে লাগলেন। দৌড়াচ্ছেন তো দৌড়াচ্ছেনই। দৌড়! দৌড়! আর দৌড়! দৌড়াতে দৌড়াতে সবার হাঁপ ধরে গেল। জিভ বেরিয়ে আসার উপক্রম। কিন্তু আলোকশিখাটাকে ধরতে পারা তো দূরের কথা, তার কাছাকাছি পর্যন্ত দলের কেউ যেতে পারলেন না। মায়া আলোক শিখাটা কখনো অদৃশ্য হচ্ছে, কখনো নিভে যাচ্ছে আবার কখনো-বা অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

জ্যাকরিয়ান আলেয়ার আলোর মতো রহস্যময় আলোক শিখাটার দিকে তাকিয়ে অনবরত ইষ্টনাম জপ করতে লাগল। কারণ, ভূত পেত্নীর পিছন ধাওয়া করে মানুষের যে শেষ পরিণতি কী হয় তা সে যে ভালোই জানে।

উইলিয়ম যখন বুকভরা হতাশা আর ব্যর্থতার জ্বালা নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে ছুটছেন তখন দেখা গেল আলোক শিখাটার সঙ্গে তাদের ব্যবধান ক্রমে কমে আসছে। সেটা আগের মতো নিভছে—জ্বলছেও, না আর অদৃশ্যও হচ্ছে না। আর দূরত্ব কমতে কমতে শ' দুই ফুট থেকে এখন মাত্র ফুট পঞ্চাশে দাঁড়িয়েছে।

জ্যাকরিয়ান একসময় থমকে গেলেন। আশ্চর্য ব্যাপার তো! এবার আলোক শিখাটার তলায় অস্পষ্ট একটা প্রাণীর মতো কী যেন দেখতে পেলেন। আলোর শরীর? না, তা কী করে সম্ভব? ঠিক যেন একটা মানুষের অবয়ব। এ কী অলৌকিক কাণ্ড রে বাবা! আলোর দেহান্তর! ধ্যুৎ, এ কী করে হতে পারে! তবে ওটা কি? জ্যাকরিয়ান মহাধন্ধে পড়ে গেলেন।

আশঙ্কাটা প্রথম উইলিয়মের মগজে এল। রহস্যসঞ্চারকারী মনুষ্যদেহধারী আলোটা আবার যে পাত্তা না হয়ে যায়। তার ভাবনাটাই বাস্তব রূপ পেল। চোখের পলকে আলোটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাধ্যমত দ্রুত ছুটে সবাই সেখানে হাজির হয়ে থমকে গেলেন। দেখলেন, বিশাল একটা ফাটল। আর তার পাশেই বিরাট একটা সুড়ঙ্গ।

www.pathagar.com

উইলিয়ম মুহূর্তমাত্র দেরি না করে সুড়ঙ্গটার মধ্যে ঢুকে গেলেন। অন্যান্যরা দুরু দুরু বুকে তাঁকে অনুকরণ করলেন।

ক্রমে সঙ্কীর্ণ হয়ে যাওয়া সুড়ঙ্গটা ধরে সামান্য অগ্রসর হয়েই সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। হঠাৎ দেখলেন, দেওয়াল ঘেঁষে চার চারটে মানুষ নিশ্চল নিথর ভাবে পড়ে।

উইলিয়ম স্বগতোক্তি করলেন, 'লাশ? লাশ নাকি?' পরমুহূর্তেই তিনি বিকট আর্তনাদ করে উঠলেন, 'জেমস! জেমস স্টার! বন্ধু জেমস!'

জ্যাকরিয়ান আঁতকে উঠে বুকফাটা আর্তনাদ করল, 'হ্যারি! হ্যাঁরি! এ কী হল! হায় ঈশ্বর—এ কী করলে!'

হ্যাঁ, নিশ্চল নিথরভাবে পড়ে থাকা শরীর চারটে ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার, বুড়ো ওভারম্যান সাইমন ফোর্ড, তাঁর স্ত্রী ম্যাগি ফোর্ড আর কিশোরপুত্র হ্যারি ফোর্ড-এরই বটে।

মুহূর্তের মধ্যে ম্যাগি ক্ষীণকণ্ঠে কোনোরকমে উচ্চারণ করলেন, 'ওঁদের—ওঁদের, আগে ওঁদের—'

উইলিয়মন ফ্লাস্ক থেকে কয়েক ফোঁটা করে ব্রান্ডি সবার মুখে দিতে লাগলেন। সামান্য পরিমাণে ব্রান্ডি পেটে যেতেই এক এক করে সবাই নড়েচড়ে উঠতে লাগলেন। আরও মিনিট কয়েকের মধ্যে তাঁরা প্রায় চাঙা হয়ে উঠলেন।

জেমস স্টার সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'গত দশদিনে আমাদের অবশ্যই স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটত। কিন্তু এ দশদিনে তিনবার কোনো এক অজ্ঞাত পরিচয় উদার হৃদয় ব্যক্তি আমাদের অগোচরে পাউরুটি আর জগভর্তি জল শিয়রে রেখে গিয়ে আমাদের ধড়ে প্রাণটুকু টিকিয়ে রেখেছে।'

উইলিয়ম ভাবলেন, তবে কি সে উদার হৃদয় ব্যক্তিই তাদের আলোর নিশানা দেখিয়ে এখানে টেনে এনেছে? মৃতপ্রায় মানুষগুলোকে বাঁচানোই কি তার অভিপ্রায়?

জেমস স্টারএরও একই ধারণা, এখানে এমন কেউ একজনও রয়েছে যাকে শত্রু বলে অভিহিত করা চলে। সে ছায়ার মতো তাঁদের পিছনে লেগে রয়েছে। অদৃশ্য সে শক্তিধরই তাদের আলো নিভিয়ে দিয়ে চরমতম সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। আর অ্যাবারফয়েল খনির প্রবেশপথ বন্ধ করে নিয়ে সে শক্তিই মরণ ফাঁদ তৈরি করেছিল।

* * *

ইতিমধ্যে তিন তিনটা বছর কেটে গেছে। এতদিনে দ্রুত পরিবর্তন হতে হতে নিউ অ্যাবারফয়েল কয়লাখনি পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করেছে। পুরনো সে খনি থেকে আবার নতুন করে কয়লা ওঠানোর কাজ পুরোদমে চলেছে।

আমেরিকায় যতগুলো প্রাকৃতিক গুহা রয়েছে তাদের মধ্যে 'ম্যাডাম ডোথ' বৃহত্তমের দাবিদার। সেখানে পাঁচ হাজার মানুষ ভালোভাবেই থাকতে পারে। অ্যাবারফয়েল বিশালতার দিক থেকে তার সমকক্ষ।

গম্বুজের ঠিক নিচের দিকে রয়েছে স্বচ্ছ ও মিঠা জলের হ্রদ একমাত্র যার তুলনা চলতে পারে। সেটা ম্যামাথ গুহার অভ্যন্তরস্থ ডেডসি।

হ্রদটার গা ঘেঁষে সাইমন ফোর্ড তাঁর নতুন বাড়িটা তৈরি করেছেন। তারই পাশে আর একটা নতুন বাড়ি তৈরি করে জেমস স্টার মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করেছেন। লেক

www.pathagar.com

ম্যানকমের তীরে সারিবদ্ধ বাড়ি তৈরি করে খনির শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেখতে দেখতে টিলার ওপরে সুন্দর একটা গির্জাও তৈরি করে ফেলা হল।

জেমস স্টার আর সাইমন ফোর্ড খনির কাজেই মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছেন। নিউ অ্যাবারফয়েল খনিই তাঁদের ইহকাল পরকাল—সর্বস্ব।

একদিন কথা প্রসঙ্গে সাইমন বললেন, 'জ্যাক-এর জন্যই আমরা এতগুলো মানুষ প্রাণে বেঁচে গেলাম। নইলে এতদিনে—'

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই জ্যাকরিয়ান অপ্রতিভ মুখে বলে উঠল, 'আমি আর তেমন কী-ই বা করেছি, আপনাদের প্রাণ রক্ষার কৃতিত্ব তো খনির উপদেবতারই পাও না।'

'ধ্যুৎ! উপদেবতা আবার কি হে! তোমরা এখনও কুসংস্কারে ডুবে রয়েছ।'

'সে কী হে হ্যারি! এ কী বলছ! উপদেবতার অস্তিত্বের কথা আমরা সেদিন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলাম! খনির ভেতরে আমরা যখন দৌড়ে দৌড়ে হয়রান হয়ে পড়েছিলাম তখন উপদেবতাই তো তোমাদের কাছে আমাদের পৌঁছে দিয়েছিলেন। নইলে রহস্যজনক অলৌকিক আলোটার খপ্পরে পড়ে আমরা এতক্ষণে পরপারের বাসিন্দা হয়ে যেতাম।'

'ভালো কথা, প্রতিজ্ঞা করছি তুমি যাকে রহস্যজনক অলৌকিক আলো বলছ, তার রহস্যভেদ আমি করবই করব।'

'হায় ঈশ্বর। ভুলেও সে চেষ্টা কোরো না হ্যারি। এতে কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয় ডেকে আনা ছাড়া লাভ কিছুই হবে না।'

বুড়ো সাইমন ফোর্ড এবার আগ বাড়িয়ে বলে উঠলেন—'ভালো, দেখাই যাক না আসল রহস্যটা কী?'

খনি গর্ভের প্রতিটা নাড়ি নক্ষত্র কিশোর হ্যারির নখদর্পণে। বিচিত্র এক কিশোর সে। একটা লণ্ঠন আর অবসর পেলেই পঁই পঁই করে খনি আনাচে কানাচে সে চক্কর মেরে বেড়ায়। যে রহস্যময় হিতাকাঙ্ক্ষী স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে তাদের চার-চারটে প্রাণীকে নিশ্চিতমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে, তার হদিস তাকে পেতেই হবে। করতে হবে গভীর রহস্যটার কিনারা। খনিগর্ভে নতুন কয়লার স্তর আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে ফোর্ড পরিবারের ওপর আর অতর্কিত আক্রমণ হচ্ছে না।

পাতালপুরীতে সাইমন ফোর্ড, জেমস স্টার প্রমুখ সবাই নিরবচ্ছিন্ন অনাবিল আনন্দ স্ফূর্তির মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করলেও হ্যারির মধ্যে মোটেই আনন্দ নেই। বরং সে কী যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিয়ে প্রতিটা মুহূর্ত কাটাচ্ছে। সর্বদা মনমরা হয়ে বসে কিসের যেন ভাবনায় তলিয়ে থাকে। কারো কথায় থাকে না। ঠাট্টা তামাসাও সতর্কতার সঙ্গে আজকাল এগিয়ে চলে।

অস্থিরচিত্ত হ্যারি একদিন কথার ফাঁকে বলল, 'জ্যাক, আমার শেষ কথাটা শুনে রাখ। পাতালপুরীতে রহস্য সঞ্চারকারী উপদেবতাটাকে আমি খুঁজে বের করবই। সে রহস্যভেদ আমি করবই করব।'

'ভালো কথা। কিন্তু তুমি শুনে রাখ হ্যারি, আজ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে সবকিছুর নায়ক কিন্তু একই ব্যক্তি, নির্ঘাত কোনো না কোনো পাগল—'

www.pathagar.com

'শোন জ্যাক, আমি অদ্ভুত একটা কুঁয়োর খোঁজ পেয়েছি। নিউ অ্যাবারফয়েল থেকে মাইল-পাঁচেক পশ্চিমে সেটার অবস্থান। আমি ভেতরে উঁকি দিয়ে ভেতরের দিকটা দেখে বুঝেছি, দেওয়ালটা একেবারেই খাড়া ও মসৃণ। মই ছাড়া তার ভেতরে নামে কার সাধ্য। দিন-সাতেক আগে আমি সেটার গভীরতা মাপতে গিয়ে দড়ি ছাড়ছিলাম। কিছুটা দড়ি ছাড়ার পর আমি কৌতূহলবশত নিচের দিকে ঝুঁকতেই অদ্ভুত একটা রহস্যজনক ব্যাপারের মুখোমুখি হই। মনে হল কুঁয়োটার ভিতরে কে যেন ভীষণরকম আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। উৎকর্ণ হয়ে উদ্ভূত আকস্মিক শব্দটা লক্ষ্য করে বুঝলাম, বিশালায়তন কোনো একটা পাখি অনবরত ডানা ঝাপটাচ্ছে। ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক সে শব্দ।

জ্যাকরিয়ান তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'ভেতরে কোনো পাখি ঢুকে থাকবে হয়ত।'

হ্যারি গম্ভীরমুখে প্রতিবাদ করল—'না, কেবল একটা পাখির ব্যাপার বলে মেনে নিতে পারি মোটেই মন থেকে উৎসাহ পাচ্ছি না জ্যাক।'

'আজ সকালেই কৌতূহলবশত কুঁয়োটার ধারে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়েই আমি চমকে উঠি। গায়ে রীতিমত কাঁটা দিয়ে ওঠে। শরীরের সব ক'টা স্নায়ু যেন একসঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল। আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম, কুঁয়োটার ভেতরে কে যেন থেকে থেকে গোঙাচ্ছে।'

জ্যাক চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বলল, 'গোঙাচ্ছে! কে গোঙাচ্ছে? কিসের গোঙানি অনুমান করতে পেরেছিস কিছু? ওসব বাজে ঝামেলা ছাড়ান দে। নিশ্চয়ই দমকা বাতাসের শব্দকেই তুই গোঙানি মনে করে আঁৎকে উঠেছিলি।'

'সে যা-ই হোক না কেন, আমি কুঁয়োটার মধ্যে নেমে রহস্যটার কিনারা করবই। কালই, আগামীকালই নামব।'

'সে কী রে! তুই কি ক্ষেপেছিস! যুগ যুগ ধরে পতিত পড়ে রয়েছে এমন একটা কুঁয়োয় তুই নামতে চাচ্ছিস।'

কোনো যুক্তির অবতারণা করেই জ্যাকরিয়ান হ্যারিকে নিবৃত্ত করতে পারল না।

পরদিন ভোর হতে না হতেই হ্যারি ইয়া লম্বা ও মোটা একটা দড়ি নিয়ে রহস্য সঞ্চারকারী কুঁয়োটার ধারে হাজির হল। দুরু দুরু বুকে জ্যাকরিয়ান তার পিছন পিছন গিয়ে কুঁয়োটার ধারে দাঁড়াল। সে চারজন খনি শ্রমিককেও সঙ্গে নিল।

ব্যাপারটা হ্যারির বাবা-মায়ের কাছে গোপনই রাখা হল।

হ্যারি ঝটপট দড়ির একটা প্রান্ত নিজের কোমড়ে বেঁধে ফেলল। তারপর সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন কায়দায় উরুর সঙ্গে বাঁধল যাতে সে অনায়াসে শূন্যে ঝুলে থাকতে পারে। প্রয়োজনে যাতে ব্যবহার করতে পারে সেজন্য খালি রেখে দিল। আর কোমরে সুতীক্ষ্ণ একটা ছুরি গুঁজে নিল। আর নিল একটা সেফটি ল্যাম্প। এবার দড়ির বিপরীত প্রান্তটাকে অদূরবর্তী একটা শক্ত খুঁটির সঙ্গে বেঁধে তৈরি হয়ে নিল।

এবার জ্যাক ও অন্যান্যরা দড়ি ধরে হ্যারিকে ধীরে ধীরে কুঁয়োটার মধ্যে নামিয়ে দিতে লাগল।

হ্যারি অন্ধকার কুঁয়োটার ভেতরে নামতে নামতে সেফ্‌টি ল্যাম্পের আলোয় কুঁয়োটার আনাচে কানাচে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগল।

দড়িতে ঝুলন্ত হ্যারি মাঝে মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে অন্ধকার ভেদ করে ক্রমেই নিচে নামতে লাগল।

www.pathagar.com

হ্যারি ভাবল, দড়ি ছাড়া এমন মসৃণ দেওয়ালযুক্ত একটা কুঁয়োর ভেতরে নামা কিছুতেই সম্ভব নয়। অতএব এর ভেতরে মানুষের অবস্থান কেবল অসম্ভবই নয়, কল্পনাও করা যায় না।

কুঁয়োর ভেতরের সেই চাপা গোঙানির শব্দটা হ্যারির কানে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। অত্যাশ্চর্য ভীতিপ্রদ আর ভয়ঙ্কর রহস্যজনক সে শব্দটা অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কা আর আতঙ্কে তার বুকের ভেতরে ঢিবঢিব করতে লাগল। স্নায়ুগুলো ক্রমেই যেন কেমন অসাড় হয়ে পড়ছে, শরীরের রোমগুলো পড়ছে খাড়া হয়ে।

হ্যারি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না, শব্দটা কিসের? আসল ব্যাপারটাই বা কি? কেই বা এমন বিশ্রী স্বরে গোঙাচ্ছে? কেনই বা তার এরকম যন্ত্রণার উদ্রেক ঘটছে? তবে কি মানুষেরই কণ্ঠস্বর সেটা? যদি মানুষের কণ্ঠস্বর হয়েই থাকে তবে সে এমন মসৃণ একটা কুঁয়োর মধ্যে কেন—হ্যারি বুঝল, ব্যাপার সুবিধার নয়। সে কোমর থেকে ঝট করে ছুরিটা টেনে হাতে নিয়ে নিল। অকস্মাৎ যে-কোনো বিপদের মুখোমুখি হলে যাতে অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও মোকাবেলা করতে পারে।

হ্যারি কান দুটোকে সজাগ রেখে খুবই সন্তর্পণে মরণফাঁদের ভেতরে নেমে যেতে লাগল। খুবই দ্রুত নামছে। মিনিট দুইয়ের ভেতরেই সে প্রায় একশ' কুড়ি ফুট গভীরে নেমে গেছে। সে নামছে তো নামছে, আরও কত গভীরে নামতে হবে তাই বা কে বলতে পারে।

আরও কিছুটা নামার পর সেফ্‌টি ল্যাম্পের আলোয় হ্যারি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল, কুয়োটার নিচের দিকটা যেন ক্রমেই সরু হয়ে গেছে।

হ্যারি নামছে তো নামছেই। অনবরত নেমেই চলেছে। এবার তার মনে হল যত নিচে নামছে ততই যেন কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। হিমেল বাতাস বইছে। কিন্তু নিচের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জমাটবাঁধা অন্ধকার ছাড়া কিছুই তার নজরে পড়ছে না। শুধুই অন্ধকার আর অন্ধকার। অথৈ অন্ধকার সমুদ্রের ভেতর দিয়ে সে কেবলই নিচে নামছে।

এবার যেন হ্যারির দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হল। গা ছমছম করা একেবারে থমথমে ভাব।

আশ্চর্য ব্যাপার তো! ভূপৃষ্ঠ থেকে সে এত গভীরে নেমে এসেছে, কিন্তু এখনও রহস্যজনক কোন কিছুরই মুখোমুখি হল না তো? হিংস্র থাবা নিয়ে কেউ-ই তো তার পথ আগলে দাঁড়ায় নি। এখন দড়িটা কেটে দিয়েও তাকে নির্মম নিষ্ঠুর মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় নি।

হ্যাঁ, রহস্যময় গোঙানিটা কিন্তু থামে নি, বরং অবাঞ্ছিত কুস্বরটা অনবরত হ্যারির কানে ভেসে এসে আতঙ্কটাকে আরও গভীরতর করে তুলছে।

নামতে নামতে হ্যারি ১৮০ ফুট গভীরে নেমে গেল। জ্যাকরিয়ান ও অন্যান্যরা, যারা ওপর থেকে দড়ি জুগিয়ে চলেছে তারা হঠাৎ লক্ষ করল দড়িটার টান হঠাৎ যেন বন্ধ হয়ে গেছে। দড়িটা এখন রীতিমত হাল্কা বোধ হচ্ছে। সবাই ভাবল, তবে কি হ্যারি একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল? নইলে দড়িটা কেনই বা ঢিলে হবে?

ঠিকই, হ্যারি কুঁয়োটার শেষ প্রান্তে, একেবারে তলদেশে পৌঁছে গেছে। তার পা দুটো মাটি স্পর্শ করেছে।

www.pathagar.com

হ্যারি সেফটি ল্যাম্পের আলোটাকে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে একসময় চমকে উঠল। সচকিত হয়ে ফুটখানেক সরে গিয়ে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। হ্যাঁ, তার আশঙ্কা অভ্রান্তই বটে। কুঁয়োটার তলদেশে সঙ্কীর্ণ একটা সুড়ঙ্গ তার নজরে পড়ল। আলোটা সে ঘোরাল। না, নিঃসীম অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। আর সেটা এতই সঙ্কীর্ণ যে, একটা মানুষের পক্ষে অনায়াসে তার ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়।

হ্যারি ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে বসল। এবার প্রথমে মাথাটাকে সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গটার ভেতরে গলিয়ে দিল। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ফুট পাঁচেক এগিয়ে যেতেই তাকে থমকে থেকে যেতে হল। আচমকা ফুটখানেক পিছনের দিকে সরে এল।

সুড়ঙ্গটা এতই সঙ্কীর্ণ যে, সেফটি ল্যাম্পটাকে বাড়িয়ে ধরে সে ব্যাপারটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে তারও উপায় নেই, কাঁপা কাঁপা ডান হাতটাকে ধীরে ধীরে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল। অন্ধকারে এমন কোন কিছুর সঙ্গে হাতটা গিয়ে ঠেকল যার ফলে সে কেন্নোর মতো হাতটাকে ঝট করে গুটিয়ে আনতে বাধ্য হল।

হ্যারির হাতটা কিসের, কার গায়ে গিয়ে ঠেকল যার ফলে সে আতঙ্কে এমন মুষড়ে পড়েছে? কি? কী ওটা? ওটা কি সত্যি কোনো মানবদেহ। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে এত গভীরে মানবদেহের অস্তিত্বের কথা ভাবতেও সে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। অসম্ভব—একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

সত্যিই কি সেটা কোন মানবদেহ? যদি মানবদেহই হয়ে থাকে তবে সে মৃত, নাকি জীবিত?

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে আতঙ্কিত হ্যারি আবার কাঁপা কাঁপা হাতটাকে সামনের দিয়ে এগিয়ে নিতে লাগল। আবার সে বস্তুটাকে হাত ঠেকল। এবার সাহসে ভর করে তার গায়ে হাতিয়ে হাতিয়ে ব্যাপারটাকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল। হ্যাঁ, তার অনুমান অভ্রান্তই বটে। সত্যিই ওটা মানবদেহ। আর তার হাতটা, যাকে স্পর্শ করেছে সেটাও একটা পা। কিন্তু ঠাণ্ডা, ধরতে গেলে বরফের মত ঠাণ্ডা। হায় ঈশ্বর! রহস্যময় লোকটা কি তবে মৃত? আবার নিশ্চল নিথর পা-টার গায়ে হাত বুলাতে লাগল। না, হাঁটুর কাছাকাছি তেমন ঠাণ্ডা নয়তো। হাতটা যত ওপরে উঠছে ততই যেন তার গরম বোধ হতে লাগল, এবার পা-টা আর নিশ্চল রইল না। পায়ের মালিক আচমকা সেটাকে টেনে নিল।

হ্যারি সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল—'আছে! আছে! প্রাণ আছে! বেঁচে আছে'—

হ্যারি এবার সজোরে এক টান দিয়ে রহস্যময় লোকটার পা-টার কিছু অংশ বাইরে বের করে নিয়ে এল। তারপর আবার টানতে লাগল। ক্রমে তার সম্পূর্ণ শরীরটাই সুড়ঙ্গ থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। সেফটি ল্যাম্পের আলোয় তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। এবার সে বুঝল, সেটা একটা শিশু। তার নাকের কাছে হাত নিয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, ক্ষীণ হলেও শ্বাসক্রিয়া চলছে। কিন্তু এতই ক্ষীণ যে, যে-কোনো মুহূর্তে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতে পারে।

হ্যারির মধ্যে ব্যস্ততা প্রকাশ পেল। যত শীঘ্র সম্ভব তাকে ওপরে তুলে নিয়ে যেতে হবে। দেরি করলে তাকে কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না।

আর মুহূর্তমাত্রও সময় নষ্ট না করে হ্যারি মৃতপ্রায় শিশুটাকে কাঁধে তুলে নিল। বাঁ হাতটা দিয়ে তাকে শক্ত করে ধরল। এবার দড়িটার গায়ে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। এর

www.pathagar.com

মাধ্যমে ওপরে অপেক্ষমান জ্যাকরিয়ান ও অন্যান্যদের দড়িটা টেনে ওপরে তোলার ইঙ্গিত দিল।

ব্যস, দড়িটা এবার হ্যারিকে নিয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগল।

হ্যারি কাঁধের শিশুটাকে বাঁ হাত দিয়ে জাপ্টে ধরে গায়ের সঙ্গে মিশিয়ে রাখল। আর ডান হাতে ছোরাটাকে শক্ত করে ধরে রাখল বেকায়দায় পড়লে যেন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারে।

দড়ির টানে হ্যারি ক্রমেই ওপরে উঠতে লাগল। ক্রমে উঠতে উঠতে অর্ধেকের চেয়ে বেশি পথ ওপরে উঠে এল।

এক সময় হঠাৎ হ্যারির পায়ের তলা থেকে বুক কাঁপানো একটা শোঁ শোঁ শব্দ ভেসে আসতে লাগল। মনে হল কুঁয়োর তলদেশে ভীষণ ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

হ্যারি কাঁধের শিশুটাকে জাপ্টে ধরে কুঁয়োর তলদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। না, কিছুই দেখতে পেল না। কেবল নিঃসীম অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই তার নজরে পড়ল না।

রহস্য সঞ্চারকারী শোঁ শোঁ শব্দটা ক্রমেই যেন হ্যারির কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। একেবারে তার পায়ের কাছে উঠে এল। এমনকি এক ঠাণ্ডা বাতাস পর্যন্ত অনুভব করল সে। ব্যাস, অবাঞ্ছিত শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল।

হ্যারি ডান হাতের ছুরিটাকে সাধ্যমত চেপে ধরল। আচমকা তার গায়ে কিছু ঝাঁপিয়ে পড়লে যাতে মোকাবেলা করে আত্মরক্ষার চেষ্টা অন্তত করতে পারে।

হ্যারি কুসংস্কারের ধার ধারে না। ভূত প্রেত বা অশরীরী আত্মাটাত্মার ব্যাপারে বিশ্বাসী নয়। তবু নিজেকে উৎকণ্ঠামুক্ত করতে পারছে না। স্পষ্ট বুঝতে পারল বুকের ভেতরে ফুসফুসের দাপাদাপি অনবরত হয়েই চলেছে।

দড়ির টানে সে ওপরে উঠেই চলেছে। আর মাত্র পঞ্চাশ ফুট বাকি। একটু উঠে যেতে পারলে সব আশঙ্কা আর আতঙ্কের অবসান ঘটে যাবে। ব্যস, একেবারে তখন সে নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

জ্যাক ও তার সঙ্গী সাথীরা হ্যারির সমস্যা ও ভয়ঙ্কর বিপদের কথা কিছুই জানতে পারে নি। আর যদি জানতেই পারত তবে অবশ্যই দড়িটাকে আরও দ্রুত গতিতে টেনে তাকে ওপরে তুলে নেয়ার জন্য তৎপর হত।

আবার! আবার সেই অবাঞ্ছিত শোঁ শোঁ শব্দটা তার কানে এল। এবার শব্দটা তাকে পাশ কাটিয়ে ঝট করে তার ওপরে উঠে গেল।

বিপদ অধিকতর কঠিন রূপনিয়ে দেখা দিল। হ্যারি এবার নিশ্চিন্ত হল, বিশলাকৃতি একটা পাখি তার ঠিক মাথার ওপরে বার বার ডানা ঝাপটাচ্ছে। শুধু কি এই! সঙ্গে সঙ্গে সুতীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে তার মাতায় ঘন গন ঠোকর মারছে।

অসহ্য! একেবারেই অসহ্য। দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপারটায় হ্যারি উন্মাদের মত হাতের ছুরিটা অনবরত চালাতে লাগল। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সে দৈত্যাকৃতি পাখিটার গায়ে সামান্যতম আঁচড়ও দিতে পারছে না, আসলে শয়তান পাখিটা এমন ক্ষীপ্রগতিতে আক্রমণ করে উড়ে পালাচ্ছে যার ফলে আঘাত হানা তো দূরের ব্যাপার সে তার পালক পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারছে না।

হ্যারির ধমক ধামক বা ছোরাটা কোনো কিছুই ক্রোদ্ধোন্মত্ত পাখিটার মধ্যে এতটুকুও ভীতির সঞ্চার করতে পারছে না।

www.pathagar.com

আর একবার! আর একবার পাখিটা হ্যারির কপালের কাছে সজোরে একটা ঠোকর বসিয়ে দিল।

হ্যারি পড়ল মহাসঙ্কটে। একদিকে হিংস্র পাখিটার কাছ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা আর অন্যদিকে কাঁধের শিশুটা যাতে অসতর্কতার মুহূর্তে আচমকা পড়ে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। তবে হ্যাঁ, হ্যারি অন্তত একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পেরেছে যে, শিশুটা ক্রোধোন্মত্ত পাখিটার আক্রমণের লক্ষ নয়। তার গতিবিধিই তাকে এরকম ভাবতে সাহায্য করছে। তবে এও তার বুঝতে বাকি রইল না যে, তার ক্রোধের কারণ, আক্রমণের উদ্দেশ্য শিশুটাই।

পাখিটার সুতীক্ষ্ণ ঠোঁটের মুহুর্মুহু আঘাতে জর্জরিত হয়ে হ্যারি একবার ভাবল শিশুটার জন্যই যখন তাকে এমন দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে তখন তাকে কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে বিপদমুক্ত হয়ে যাবে। ব্যাপারটা ভাবেতই তার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। এত উঁচু থেকে একটা শিশুকে অতর্কিতে ছেড়ে দেয়ার পরিণাম যে কী হবে তা ভেবেই সে ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে যাওয়ার জোগাড় হল।

হ্যারি পারল না কাঁধের অসহায় শিশুটাকে ফেলে দিয়ে পাখিটার ক্রোধ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। এত চেষ্টা করে, নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে যাকে সুগভীর সুড়ঙ্গটা থেকে উদ্ধার করে এনেছে তাকে মুহূর্তে নির্মমবাবে যমের হাতে ঠেলে দিতে তার মনপ্রাণ কাতর হয়ে পড়ল। শিশুটাকে সে কাঁধ থেকে ফেলে তো দিলই না বরং আগের চেয়ে শক্ত করে জাপ্টে ধরে গায়ের সঙ্গে একেবারে সেঁটে নিল।

একটু বাদেই শয়তান হিংস্র পাখিটার আক্রমণ বন্ধ হয়ে গেল। যমের সাক্ষাৎ বাহন পাখিটার শোঁ শোঁ গর্জনও আর হ্যারি-র কানে আসছে না। হ্যারি ভাবল, পাখিটা হয়ত হতাশ হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে, আক্রমণ বন্ধ করে সরে পড়েছে।

হ্যারি এবার একটু যেন দম ফেলার সুযোগড় পেল। সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল সে। ওপরের দিকে সাধ্যমত ঘাড় ঘুরিয়ে জ্যাকের নাম ধরে গলা ছেড়ে কয়েকবার ডাকাডাকি করল।

হ্যাঁ, হ্যারির আর্তস্বর জ্যাক শুনতে পেয়েছে বটে। শুনতে অবশ্যই পেয়েছে। নইলে দড়ির টান অকস্মাৎ এমন বেড়ে গেল কেন?

হ্যারি এবার দড়ির টানে আগের চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে ওপরের দিকে উঠে যেতে লাগল।

হ্যারি অবস্মাৎ মাথার ওপরের দড়িটার দিকে চোখ ফেরাল, তার দৃষ্টি এক জায়গায় থমকে গেল। বুকের ভিতরে হৃদপিণ্ডটা যেন আচমকা ডিগবাজি খেয়ে আবার ধীরে ধীরে সোজা হতে লাগল। দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হল তার। এ কী সর্বনেশে কাণ্ড! এখন উপায়? এমন কি দেখল হ্যারি যার জন্য তার মধ্যে অকস্মাৎ এমন আতঙ্কের সঞ্চার ঘটল?

হ্যারি দেখল, তার মাথা থেকে আড়াই ফুটমত ওপরে শয়তান হিংস্র পাখিটা পায়ের সুতীক্ষ্ণ নকের আঁচড় আর ঠোঁটের কামড়ে দড়িটা কাটতে শুরু করেছে। ব্যাপার দেখে হ্যারির বুকের ভেতরে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল।

হ্যারি অনবরত হাতের ছুরিটা নাচিয়ে মুখে হিঁস হিঁস শব্দ করে পাখিটাকে তাড়াবার চেষ্টা করল। ব্যর্থ প্রয়াস। পাখিটা নির্বিকার। এবার সে আরও সর্বনেশে কাণ্ড শুরু করল। পায়ের লম্বা লম্বা নখগুলি দিয়ে দড়িটাকে আঁকড়ে ধরে ঠোঁট দিয়ে একের পর এক সুতো ছিঁড়তে লাগল।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে হতচ্ছাড়া শয়তান পাখিটা দড়িটার অনেকগুলো সুতো কেটে কাজ হাসিল করার পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে। হ্যারি আঁৎকে উঠে ভাবতে লাগল দড়িটা ছিঁড়ে কোনোক্রমে সুগভীর কুঁয়োকটা মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়লে আর দেখতে হবে না। চোখের পলকে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে যাবে।

নিশ্চিত মৃত্যুভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হ্যারি তবু বাঁচার প্রাণান্ত প্রয়াস চালাতে গিয়ে ঘন ঘন হিস হিস শব্দ করে পাখিটাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা অব্যাহত রাখল। কিন্তু পাখিটাকে নিরস্ত করতে পারল না। যমদূতটা নিবিষ্ট মনে তার কাজ করেই চলল।

মৃত্যুভয়ে কাতর হ্যারি এবার গলাছেড়ে বিকট চিৎকার করতে লাগল। এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! ওপর থেকে কোন অভয়বাণীই ভেসে এল না।

জ্যাক তার সাহায্যকারীদের কাছ থেকে কোনো প্রত্যুত্তর না পেয়ে হ্যারি আরও মুষড়ে পড়ল। সে ভাবল, জ্যাকরিয়ান যখন তার কণ্ঠস্বর শুনতে পায় নি তবে কি ভূপৃষ্ঠে ওঠার এখনও অনেক পথ বাকি? প্রাণরক্ষার কোনো আশাই কি তবে নেই?

চোখের তারায় আতঙ্কের ছাপ এঁকে হ্যারি আবার মাথার ওপরে অবস্থানরত পাখিটার কাজের অগ্রগতি দেখার চেষ্টা করল। সে রীতিমত আঁৎকে উঠে এবার বলল, 'হায় ঈশ্বর! এ যাত্রায় কি তবে রেহাই নেই! কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে।"

ক্রোধোন্মত্ত পাখিটা সে তার ওপর এমন ভয়ঙ্কর পথ অবলম্বন করে প্রতিশোধ নেবে ঘুণাক্ষরেও সে ভাবে নি।

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। হ্যারি শেষ চেষ্পা করতে গিয়ে অধিকতর ক্ষীপ্রতার সঙ্গে হাতের দড়িটাকে নাচিয়ে সজোরে হিঁস হিঁস শব্দ করতে লাগল।

না, এবারও তার প্রায়স সার্থক হল না। পাখিটা জ্বল্‌জ্বল করে হ্যারির দিকে তাকিয়ে দড়িটা কাটার কাজ অব্যাহত রাখল।

হ্যারি এবার সরিয়া হয়ে ভাবল, যার জন্য তাকে এমন ভয়ঙ্কর সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হয়েছে সে শিশুটাকে কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে পিতৃদত্ত প্রাণটাকে রক্ষা করবে। একজনের জন্য দুই দুজনের জীবন নষ্ট করা বোকামি ছাড়া কী।

হাতের বাঁধন সামান্য শিথিল করতেই তার বুকের ভেতরে কেমন যেন একটা অব্যর্থ যন্ত্রণার উদয় হল। তার মনে হল বুকের ভেতরে কেন অকস্মাৎ কঁকিয়ে উঠল।

না, হ্যারি পারল না। কাঁধের শিশুটাকে অন্ধকার সুগভীর সুড়ঙ্গে ফেলে দিয়ে নিজের জীবন রক্ষার মতলবটাকে বাস্তবায়িত করতে পারল না। বরং অধিকতর বল প্রয়োগ করে তাকে চেপে ধরে রইল।

হ্যারি এবার প্রাণান্ত প্রয়াস চালাল, দড়ির যে অংশটা পাখিটা কেটে ফেলে তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে বদ্ধপরিকর সে জায়গাটাকে ডান হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু হায়! সে জায়গাটা ধরা তো দূরের ব্যাপার হাতটা তার কাছাকাছিও পৌঁছল না।

দড়িটার আরও কয়েকটা সুতো কেটে দিয়ে শয়তান পাখিটা এখন এমন অবস্থা করেছে যে, যেকোন মুহূর্তে অবশিষ্ট সুতো কয়টা ছিঁড়ে গিয়ে হ্যারির চরম পরিণতি ঘটিয়ে দেয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

www.pathagar.com

নিরুপায় হয়ে হ্যারি এবার পাখিটাকে লক্ষ্য করে একমাত্র সম্বল হাতের ছোরাটা ছুঁড়ে দিল। হ্যাঁ, ছোরাটা তার গায়ে আঘাত করল ঠিকই। কিন্তু সেটা তাকে কতখানি আহত করেছে তা সে বুঝতে পারল না।

কাজ হয়েছে। ছোরাটা ছুঁড়ে মারায় কাজ অবশ্যই কিছু হয়েছে। আঘাত পেয়েই পাখিটা দড়ির আশ্রয় ছেড়ে উড়ে গেল। চোখের পলকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

হ্যারির উপস্থিত বুদ্ধি ও তৎপরতার ফলে পাখিটা উড়ে গেল বটে। বিপদ কিন্তু পুরোপুরি কাটল না। কারণ, পাখিটা উড়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দড়িটার সুতো কাটতে কাটতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তাতে সে কতক্ষণ যে হ্যারি ও শিশুটার ভার সইতে পারবে, বুঝা যাচ্ছে না। বাকি সুতো কয়টা ছিঁড়ে গিয়ে যেকোন মুহূর্তে তাদের পাতালপুরীতে নিক্ষেপ করতে পারে।

না, ব্যাপারটা নিয়ে হ্যারির ভাবনা চিন্তার অবকাশ নেই। মৃত্যুপথযাত্রী সে এবার বাঁচার শেষ চেষ্টা চালাতে গিয়ে বহু কায়দা কসরৎ করে কোনরকমে দড়িটাকে ধরে মুখের কাছে নিয়ে এল। এবার বহু কষ্টে সেটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে সাধ্যমতো ওপরের কাটা অংশটা ছাড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করল। পেরেছে—হ্যাঁ, হ্যারি পেরেছে। দড়ির কাটা অংশের ঠিক ওপরের একটা জায়গা সে খপ্ করে ধরে ফেলল। হ্যারি যেন নবজন্ম লাভ করল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

হ্যারি এবার নিঃসন্দেহ হল, কোনোরকমে দড়ির এ-জায়গাটা ধরে রাখতে পারলে এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যাবে। কিন্তু হায়! এ যে আরও সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তিনেকের মধ্যেই পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে পড়ল। হাতের শিরা উপশিরাগুলি ফুলে উঠেছে। ব্যথায় রীতিমতো টনটন করছে। গেল! গেল! এই বুঝি দড়িটা হ্যারির হাত থেকে খসে গেল। সে দাঁতে দাঁত চেপে সেটাকে ধরে রাখার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালাতে লাগল। কিন্তু সে আর কতক্ষণই বা।

হ্যারি দাঁতে দাঁত চেপে ধড়িটাকে শক্ত করে ধরে মুহূর্তের জন্য ওপরের দিকে নজর ফেরাতেই সে আশান্বিত হল। আশা আনন্দে বুকটা ভরে উঠেছে। জ্যাকরিয়ান ও অন্যান্য খনিকর্মীদের গলা কানে এল। মাত্র আর কয়েক ফুট উঠতে পারলেই সে স্বস্তি পেয়ে যাবে।

এদিকে হ্যারির অবস্থা শোচনীয় অনুমান করে জ্যাকরিয়ানরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দড়িটাকে টেনে হ্যারি-কে ওপরে তুলে নিতে থাকল।

এদিকে হ্যারির শক্তি প্রায় নিঃশেষ। মুঠোর মধ্যে দড়িটা থেকে থেকে হড়কে যেতে চাইছে। কিন্তু কাঁধের শিশুটাকে কোনকরমে ছুঁড়ে ওপরে ফেলে দিতে পারলে সেও বাঁচত আর তার নিজের প্রাণটাও কোনরকমে রক্ষা পেয়ে যেত। কারণ, দুহাতে দড়িটাকে আঁকড়ে ধরতে পারলে তো আর সমস্যাই থাকে না। হ্যারি উপায়ান্তর না দেখে শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে দড়িটাকে ধরে রইল। না, আর সম্ভব নয়। শেষ রক্ষা করা আর কিছুতেই সম্ভব নয়। তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। শরীরের সবটুকু রক্ত বুঝি মুখে এসে ভর করেছে।

হায় ঈশ্বর! হ্যারির হয়ত আর প্রাণরক্ষা হল না। দড়িটা ঠিকই ওপরে পৌঁছবে, কিন্তু হ্যারির পক্ষে তা আর সম্ভব হবে না। পৌঁছোবে কেবলমাত্র দড়ির প্রান্তটা। নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কায় তার চোখদুটো আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে এল।

www.pathagar.com

গেল! গেল! গেল! এই বুঝি দড়ি আর হ্যারির হাতটার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। হাতের কব্জি আলগা হয়ে যাবার জোগাড় হল। গেল—এই গেল-গেল—

হ্যারি আচমকা চোখ মেলে তাকাল। হ্যাঁ, শেষ রক্ষা হয়েছে। অকস্মাৎ সবল দুটো হাত শিশুটাকে সমেত হ্যারি-কে খপ করে ধরে ফেলল।

ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। জ্যাক ও অন্যান্য খনি শ্রমিকরা হ্যাঁচকা টানে হ্যারিকে ওপরে তুলে আনল। হ্যাঁ, শেষপর্যন্ত হ্যারি সত্যই ওপরে উঠতে পারল।

ওপরে উঠেই হ্যারি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। তার ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা জ্যাক রিয়ান এর কাঁধে এলিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যেই খনি শ্রমিকদের একজন ছোঁ মেরে তার কাঁধ থেকে শিশুটাকে নিয়ে নিয়েছে।

জ্যাকরিয়ান বহু কষ্টে হ্যারি-র হৃত সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনল। শিশুটা তো গোড়া থেকেই নিশ্চল নিথর। চোখ দুটো বন্ধ করে হ্যারির কাঁধে মড়ার মত এলিয়ে পড়েছিল। তাকে উদ্ধার করার জন্য হ্যারি এতক্ষণ নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে হতচ্ছাড়া শয়তান অতিকায় পাখিটার সঙ্গে কীভাবে লড়াই চালিয়েছে সেসবের কিছুই তার জানা নেই। খনিশ্রমিকদের একজন তার বুকের ওপর কান ঠেসে ধরে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল—'আছে! আছে! প্রাণ আছে—এখনও বেঁচে আছে!'

জ্যাকরিয়ান সঙ্গে সঙ্গে এক যুবক খনিশ্রমিককে দিয়ে শিশুটাকে কটেজে হ্যারি-র মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিল।

হ্যারির মা ম্যাগি দুধ গরম করে চামচে দিয়ে অল্প অল্প করে দুধ শিশুটাকে মুখে দিতে লাগলেন। আশ্চর্য ব্যাপার তো। শিশুটা মৃদু শব্দ করে করে সবটুকু দুধই খেয়ে ফেলল। এবার সে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতা ফিরে পেতে লাগল। একটু বাদেই সে বাদামি চোখ দুটো মেলে ম্যাগির মুখের দিকে তাকাল।

ম্যাগি ব্যস্ত হয়ে তার মুখের ওপর ঝুঁকে অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন—'কী? কিছু বলবে বাছা?'

না, কিছুই বলল না সে। আসলে কিছু বলার ক্ষমতাই তার নেই। জীবনীশক্তি প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। ম্যাগির প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে সে আবার ধীরে ধীরে চোখ দুটো বন্ধ করে দিল।

এদিকে জ্যাকরিয়ানের অকৃত্রিম সেবায় হ্যারির মধ্যে ক্রমে সংজ্ঞা ফিরে আসতে লাগল। একসময় সে চোখ মেলে তাকাল। অস্থির চোখের মণি দুটোকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে কাকে যেন খুঁজতে লাগল। এক সময় জ্যাকরিয়ানের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করল—'কোথায়? সে কোথায়? শিশুটা কোথায়? কেমন আছে সে?'

'ভালোই আছে। তাকে তোমার মায়ের কাছে কটেজে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

জ্যাক তার প্রশ্নের উত্তর দিল। সে এবার হ্যারি-কে নিয়ে কটেজের দিকে যাত্রা করল।

বুড়ো সাইমন ও তাঁর স্ত্রীর সেবা যত্নে শিশুটা এখন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

হ্যারি কটেজে পৌঁছে লণ্ঠনহাতে ব্যস্ত-পায়ে শিশুটার দিকে এগিয়ে গেল।

লণ্ঠনের আলোয় তাকে এক ঝলক দেখে নিয়েই সে চমকে উঠল, 'আরে এ যে শিশু বা কিশোর নয়। কিশোর! বয়স পনের ষোল তো হবেই। অপুষ্টিজনিত কারণে দৈহিক

www.pathagar.com

বৃদ্ধি না হওয়ায় তার চেহারা কঙ্কালসার হয়ে পড়েছে। ঠিক যেন কোন এক কিশোরীর কঙ্কালের ওপর চামড়া জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এক পলকে দেখলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আর দীর্ঘদিন সূর্যালোকের স্পর্শ না পাওয়ায় তার গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। শ্বেতীরোগীদের চামড়া ঠিক যেমনটা হয়ে থাকে। আর মায়ের জঠর থেকে পড়ার পর পুষ্টিকর খাদ্যের মুখ সে কোনদিনই দেখে নি।

হ্যারি চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, কোনো কিশোরী এমন শীর্ণ ও নিস্তেজ হতে পারে এ যে কল্পনাও করা যায় না।

জ্যাকরিয়ান কুসংস্কারে বিশ্বাসী। সে মেয়েটাকে পরি বলে পরিচিত মহলে প্রচার করতে লাগল। তার মত, পরি না হলে এমন অলৌকিকভাবে তার আবির্ভাব কী করে সম্ভব হত? তার ওপর মেয়েটার গড়নেও অস্বাভাবিকতা রয়েছে যা সাদারণ মেয়েদের মধ্যে আদৌ দেখা যায় না। জ্যাকরিয়ানের চোখে সবচেয়ে বেশি করে যে অস্বাভাবিকতাটুকু ধরা পড়েছে তা হচ্ছে মেয়েটার চোখের চাহনি। আর চোখের তারাগুলোও অপ্রতিভ যা মানবীর মধ্যে চোখে পড়ে না। লণ্ঠনের আলোয় সে নীরব চাহনি মেলে কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। চারদিকে দৃশ্যাবলি, লোকজন যা কিছু দেখছে সবই তার কাছে বিস্ময়ের সামগ্রী। কোন মানবীর মধ্যে এমন অমানবিকতা এবং অলৌকিকতা কখনই লক্ষিত হতে পারে না।

পরি কিশোরীটা ম্যাগির বিছানায় শুয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল না। যেন কয়েক বছরের ঘুম এক সঙ্গে ঘুমিয়ে নিয়েছিল পাতালপুরীর অন্ধকার কুঁয়োটার ভেতরে।

ম্যাগি সস্নেহে বললেন, 'বাছা তোমার নাম কী, বলো তো?'

পরি কিশোরী ক্ষীণকণ্ঠে প্রায় অস্ফুট উচ্চারণ করল, 'নেল।'

'আচ্ছা নেল, তোমার কি কোনো কষ্ট, কোনো যন্ত্রণা—'

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই নেল বলল—ক্ষিধে—বড্ড ক্ষিধে। কিছু খেতে দিন। বহুদিন খাওয়া জোটে নি আমার।

'ঠিক আছে বাছা, আমি এখনই তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসছি।'

ম্যাগি কিছু হাল্কা ধরনের খাবার এনে নেলের সামনে রাখতেই সে গোগ্রাসে সেগুলোর সদ্ব্যবহারে মেতে গেল।

একটু বাদে ম্যাগি বললেন, 'নেল, ওই কুঁয়োটার ভেতরে তুমি কতদিন ছিলে বলো তো?'

নেল নিরুত্তর। মনে হল সে যেন গম্ভীর মুখে কিছু একটা ভেবে চলেছে।

ম্যাগি এবার বললেন, 'ঠিক কতদিন ছিলে বলতে পারছ না! তবু আনুমানিক কতদিন ওখানে ছিলে বলো তো?'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে নেল উচ্চারণ করল, 'দি-ন? দি-ন, ক-ত দিন?' তার ভাব দেখে মনে হল 'দিন' শব্দটার সঙ্গে তার ইতিপূর্বে কোনোদিন পরিচয় ছিল না। আজই প্রথম, এইমাত্র শুনল।

'ঠিক আছে দিনের কথা নাই বা বলতে পারলে, বলো তো তোমার বয়স কত?'

এবারও সে চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে আগের মত অসহায় দৃষ্টি মেলে নীরবে তাকিয়ে রইল। আসলে 'বয়স' শব্দটাও সে আজই প্রথম শুনল।

হ্যারি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তার মধ্য থেকে আগেকার ঘোরটুকু নিঃশেষে কেটে গেছে।

www.pathagar.com

হ্যারি এবার পায়ে পায়ে রুগ্ন অসহায় মেয়েটার বিছানার কাছে এগিয়ে গেল। শিয়রে বসল। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার ডান হাতটা নিজের মুঠোয় তুলে নিল।

এবার নেলের ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে হাল্কা হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। শৈশব অতিক্রান্ত হওয়ার পর হয়ত বা সে আজই প্রথম হাসল।

হ্যারি তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'নেল একটা প্রশ্নের জবাব দেবে? বলো তো, কুঁয়োর ভেতরে তুমি ছাড়া আর কে কে ছিল? তুমি কি একাই ছিলে, নাকি অন্য কেউ তোমার সঙ্গে সেখানে ছিল?'

নেল এবার যেন কেমন ক্ষেপে গেল। প্রায় চিল্লিয়েই তার প্রশ্নের জবাব দিল, 'একা? একদম একা। আমি ছাড়া আর কেউই সেখানে ছিল না।'

'তোমার কে কে আছে? কোথায়—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই নেল বলে উঠল, 'আমার কেউ নেই। আমি একা—একদম একা। আমি সহায় সম্বলহীনা। বড় একা আমি।' কথাটা বলেই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তখন আর কোনো কথা হল না।

হ্যারি এবার নেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর গিয়ে বসল। তার মাথায় টুকরো টুকরো বহু ভাবনা এসে ভিড় করল। সে আপনমনে ভাবতে লাগল, 'কে এই নেল। কী-ইবা তার পরিচয়? কী করে সে অন্ধকার কুঁয়োটার অতল গহ্বরে গিয়ে আশ্রয় নিল? অন্ধকার যক্ষপুরীতে সে কতদিন ধরে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছে? তার এমন মর্মান্তিক অবস্থা কি করেই বা হল? তার সে পাতাল জীবনের সঙ্গে অতিকায় পাখিটারই বা কী সম্পর্ক? নেলকে নিয়ে কুঁয়োটা থেকে উঠে আসার সময় কেনই বা সে এমন মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালিয়ে হ্যারিকে বিপর্যস্ত করেছিল?' পাখিটার সঙ্গে তার কোন গভীর রহস্য জড়িয়ে রয়েছে যার জন্য সে শেষ পর্যন্ত লড়ে গেছে?' এরকম বিচ্ছিন্ন হাজারো ভাবনা তাকে নিদারুণ অস্থির চঞ্চল করে তুলল।

কুঁয়োর অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করে আনা নেলের রহস্যজনক ব্যাপারটা কেবল ফোর্ড পরিবার ও অন্যান্য জনা কয়েক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। পাতালপুরীর খনি শ্রমিকদের মুখে মুখে ঘুরতে লাগল তার রহস্যজনক কুঁয়ো জীবন আর আকস্মিক আবির্ভাবের কাহিনীটা। তবে হ্যাঁ, অনেকেই আসল ঘটনার সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত খাদ মিশিয়ে প্রচার করতেও ছাড়ল না।

এক সময় নেলের ব্যাপারটা পাতালপুরী থেকে উঠে এল স্টার্লিং শায়ারের কফি হাউসে, রেস্তোরাঁ, অফিস-কাছারি আর মাঠে ময়দানে কৌতূহলী মানুষের মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অনেক পরিবর্তন আর খাদ মেশাতে মেশাতে শেষপর্যন্ত কাহিনীটা এমন দাঁড়াল যে, নেলকে নাকি কয়লার স্তরের ভেতরে থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে। কয়লার স্তরের ভেতরে যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু কঙ্কাল গাঁইতি আর শাবলের আঘাতে উঠে আসে তেমনি রহস্যজনকভাবেই নাকি নেলকেও আবিষ্কার করেছে। শুধু কি এ-ই? কত শত বছর কয়লার স্তরের ভেতরে অবস্থান করেও তার জীবনীশক্তি অব্যাহত রয়েছে। ঘটনাটা যেখানে, যে রূপ নিয়েই পরিবেশিত হোক না কেন আসলে নেল একজন সর্বজন পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেল।

www.pathagar.com

যে নেলকে খনি-শ্রমিক থেকে শুরু করে ভূপৃষ্ঠের হাজার হাজার মানুষ আলোচনার ঝড় তুলে চলেছে সে কিন্তু এসবের তিলমাত্রও জানে না। মাত্র কয়েকটা দিনের মধ্যে সে যে কতখানি বিখ্যাত হয়ে গেছে তা তার একেবারেই অগোচরে রয়ে গেল।

সে অঞ্চলে অন্ধ কুসংস্কারের পূজারীর সংখ্যাই বেশি। ভূত-প্রেত বা অশরীরী আত্মাটাত্মার ব্যাপারে যারা বিশ্বাসী তারা পাতাল-কন্যা নেলকে কেন্দ্র করে রোমহর্ষক অত্যাশ্চার্য গল্প ফাঁদতেও ছাড়ল না। আবার কেউ বা নেলকে অশরীরী আত্মার ছায়ামূর্তিতে পরিণত করে আসর জমিয়ে বসল। আবার কেউ কেউ তো সরাসরিই প্রেতাত্মা বলতেও দ্বিধা করল না।

জ্যাকরিয়ান বন্ধুদের মুখে শোনা নেলকে কেন্দ্র করে তৈরি কিছু কিছু খোস গল্প হ্যারিকে শোনাল।

গল্প শুনে হ্যারি মুচকি হেসে বলল—'মন্দ কি? যেভাবেই হোক না কেন হ্যারি তো বিখ্যাত হয়ে উঠছে। যদি কিছু মনে না করিস তোকে একটা কথা বলতে পারি জ্যাক।'

'কী? কী কথা? এত দ্বিধার কি আছে বুঝছি না তো? কি বলতে চাইছিস, বলেই ফেল না।'

'শোন, না হয় মেনেই নিলাম, নেল অশরীরী আত্মা। তবে শুনে রাখ, সে যদি অশরীরী আত্মা হয়েই থাকে তবু অশুভ আত্মা মোটেই নয়—শুভ আত্মা।'

'কী করে? শুভ আত্মা কেন?'

'সে যদি অশুভ আত্মা নাই হয়ে থাকে তবে জল আর খাবার দিয়ে আমাদের জীবন রক্ষা করতে অবশ্যই উৎসাহী হত না, ঠিক কি না? আমি হলপ করে বলতে পারি নেলই কাজটা করেছিল। তবে এ-ও শুনে রাখ জ্যাক, খনিতে একটা অশুভ আত্মার অস্তিত্বও রয়েছে। আমি প্রতিজ্ঞতা করছি, যে করেই হোক আমি তাকে খুঁজে বের করবই। আমাকে সে রহস্যটা ভেদ করতেই হবে।'

নেল বছরের পর বছর অন্ধকার কুয়োটার অতল গহ্বরে বাস করার ফলে তার চোখের মণি সরে গিয়েছিল। তাই মাত্রাতিরিক্ত দ্যুতিসম্পন্ন আলো তার কাছে পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। অত্যুজ্জ্বল আলোর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে তার চোখ দুটো যেন ঝলসে যায়। অসহ্য যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে একধারে সরিয়ে নেয়। তবে অন্ধকারে তার দৃষ্টিশক্তি এতই প্রখর যেকোন প্রাণীর চোখের সঙ্গেই তার চোখের তুলনা চলে না। জমাটবাঁধা অন্ধকারে অনেক দূরের জিনিসও সে যেন এখন স্পষ্ট দেখতে পায়।

নেল কুয়োটার পাতাল গহ্বরেই জীবনের চৌদ্দ-পনেরটা বছর কাটিয়েছে। কুয়ো আর খনি ছাড়া আর কিছুই সে দেখে নি। ভূপৃষ্ঠের মানুষের কথা কারোর মুখে শোনেও নি কোনোদিন।

সবার মনেই একটা কৌতূহল কাজ করে চলেছে।

নেল কি কোনদিন সূর্য দেখেছে, পৃথিবীর বুকে কত সব সমৃদ্ধ নগর রয়েছে সে-সব ব্যাপারে সে কিছু জানে নি?

নেলকে ঘিরে প্রতিনিয়ত কৌতূহলী মানুষের ভিড় লেগেই থাকে। হাজার জন হাজাররকম প্রশ্ন করে করে তাকে রীতিমতো বিভ্রান্ত করে তুলতে লাগল। নেল তাদের কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

একদিন ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার নেলকে আচমকা প্রশ্ন করে বসলেন, 'নেল, মন খোলসা করে বল তো, তুমি কি আমাদের সঙ্গে এখানেই বাস করতে উৎসাহী, নাকি তোমার প্রিয় সে কুঁয়োটাতেই ফিরে যেতে চাইছ?'

'না, আমি এখানেই থাকতে চাই।' কথাটা বলার পর তার দুচোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নেমে এল।

আশ্চর্য! সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার! পর পর এতগুলো ঘটনা চোখের ওপর ঘটে গেল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ঘটনা সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তই জেমস স্টার বা সাইমন পরিবারের কেউ দিতে পারলেন না। তবে এও সত্য যে, গত তিন বছরে কয়লাখনিতে কোনো রহস্যজনক ঘটনা ঘটে নি।

হ্যারি সম্প্রতি একটা নতুন ব্যাপার আবিষ্কার করল। ব্যাপারটা হচ্ছে, পাতালপুরীতে যে অন্ধকার কুয়োটা রয়েছে তার ভেতরে একটা সুড়ঙ্গ রয়েছে। সেটা দিয়ে হুড়হুড় করে কুয়োটার ভেতরে জল ঢোকে। তবে বেশি জল থাকে জোয়ারের সময়। জেমস স্টার, বুড়ো সাইমন ও তাঁর ছেলে হ্যারি আর তাদের জানা পরিচিত ব্যক্তিরা ব্যাপারটা নিয়ে খুবই ভাবিত। তবে তাদের বিশ্বাস পাতালপুরীতে কোন বিপদাশঙ্কা থেকেই থাকে তবে নেল অবশ্যই তাদের সতর্ক করে দিত।

কয়েকদিন পর এক অত্যাশ্চর্য, একেবারেই অভাবনীয় এক ব্যাপার হ্যারি আবিষ্কার করে ফেলল। ব্যাপারটা হচ্ছে, আরভিন ডানডোনাল্ড দুর্গের রহস্যজনক আগুনপরিদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল যা কারো পক্ষে কোনো যুক্তি তর্কের মাধ্যমেই খণ্ডন করা সম্ভব হল না। হ্যারি পরপর কয়েকদিন অভিযান চালিয়ে সঙ্কীর্ণ একটা গলিপথ ধরে কোনোরকমে ওপরে উঠে দুর্গের একটা ফাটলে গিয়ে দেখল পথটা থেমে গেছে। গলি থেকে বেরিয়ে ফাঁকা জায়গাটায় পা দিয়েই সে চমকে উঠল। দেখল, চারদিকে দুর্গটার ধ্বংসস্তূপ।

ব্যাপারটা সম্বন্ধে এর আগে কারো কিছুই জানা ছিল না, নিউ অ্যাবারফয়েল খনি আর দুর্গটার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কোনো সঙ্কীর্ণ গলির অবস্থান রয়েছে। সাধারণের জানার কোনো উপায় নেই, সত্য। ওপরে থেকে দেখলে ধ্বংসস্তূপের ইট, কাঠ আর ভাঙাচোরা লোহা লক্কর ছাড়া কিছুই নজরে পড়ে না। তাই তো ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ পুঙ্গবরা বারবার অভিযান চালিয়েও রহস্যজনক অগ্নিশিখার রহস্যভেদ করতে পারেন নি।

ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার হ্যারির সদ্য আবিষ্কারটার কথা শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। তার সঙ্গে সেখানে পৌঁছে সুড়ঙ্গপথটা সরজমিনে তদন্ত করতে গিয়ে তিনি রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন। মুচকি হেসে বললেন, 'ভূত-প্রেত দৈত্যি-দানো আর অশরীরী আত্মাটাত্মার রহস্য এবার ফাঁস হয়ে গেল।' সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপারটা প্রচার হতেই সবাই তো হেসে গড়াগড়ি যাবার যোগাড়।

হ্যারি এবার বলল, 'আগুনপরির রহস্যভেদ করা গেলেও খনির রহস্য এখন গোপন অন্তরালেই রয়ে গেল কিন্তু মি. স্টার।'

চোখে মুখে বিষণ্ণতার ছাপ এঁকে জেমস স্টার বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ হ্যারি। যে-সব রহস্য আজও খনির অন্ধকার অতল গহ্বরে গা ঢাকা দিয়ে রয়ে গেছে তাদের ইঙ্গিতই তুমি দিচ্ছ, ঠিক কি না? একটা ব্যাপার কিন্তু আমাদের কাছে এখন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল, সুড়ঙ্গপথটার মাধ্যমেই সে রহস্য সঞ্চারকারী বাইরের জগতের সঙ্গে

www.pathagar.com

যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। এখন একটাই জিজ্ঞাস্য, সে বা তারা যে-ই হোক এখন কোথায়? বেকায়দায় পড়ে এখন কি চম্পট দিয়েছে, নাকি খনিরই কোন আনাচে কানাচে ঘাপটি মেরে রয়েছে?'

কণ্ঠস্বরে রীতিমত দৃঢ়প্রত্যয় প্রকাশ করে হ্যারি এবার বলল, 'আছে মি. স্টার। অবশ্যই আছে। এখানে, খনির অন্ধকারেই লুকিয়ে রয়েছে। আমি একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি, এসব প্রসঙ্গ উঠলেই নেল-এর মধ্যে কেমন অস্বাভাবিক ভাবান্তর ঘটে, চোখে, মুখে অবর্ণনীয় বিষণ্নতার ছাপ ফুটে ওঠে। যদি তাদের অস্তিত্ব নাই থাকত তবে সে আঁতকে উঠবে কেন আর কেনই বা আতঙ্কে এমন শিউরে উঠবে?'

হ্যারির বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে কিছুমাত্রও দ্বিধা থাকার কথা নয়। রহস্যময় প্রেতচ্ছায়ার মতো কেউ না কেউ অন্ধকার খনিতে ঘুরে বেড়ায় বলেই তো নেল-এর মধ্যে এমন গভীর আতঙ্কের সঞ্চার করে, সে মিইয়ে গিয়ে একেবারে কেঁচোর মতো হয়ে যায়। কোনো প্রশ্ন করলে সে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে গিয়ে নীরব চাহনি মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কেন? কেন তার এ নীরবতা? আর কিসেরই বা আতঙ্ক? কারণ একটাই হতে পারে, তাদের অসীম-অপরাজেয় ক্ষমতার কথা স্মরণ হলেই তার কলিজা শুনিয়ে কাঠ হয়ে যায়।

জেমস স্টার এত সহজে রণে ভঙ্গ দেয়ার পাত্র নন। এ রহস্যের শেষ কোথায় দেখে তবেই ক্ষান্ত হবেন। প্রেতচ্ছায়ার মত কে বা কারা অন্ধকার খনি গহ্বরে ঘুরে বেরিয়ে অনবরত রহস্য সঞ্চার করে চলেছে তার কিনারা তিনি করবেনই। খনিতে যে বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করেছে তার হিল্লে করতে না পারলে সর্বনাশের চূড়ান্ত করে ছাড়বে।

রহস্যটা উদ্ধার করতে হ্যারি ও জেমস স্টার সতর্কতার সঙ্গে খনির অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, পুরনো দূর্গে বার বার হানা দিয়েছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝোপেঝাড়ে বসে নীরবে মশার কামড় খেয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে জেমস স্টার ও হ্যারি তখনকার মত হাল ছেড়ে দিল।

সবাই নিঃসন্দেহ, রহস্য সঞ্চারকারী শয়তান হানাদারটা বেগতিক দেখে খনি ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছে। অথবা নেলকে পাতালপুরীর যে কুঁয়োয় রেখে গিয়েছিল সেখানে নেলের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে হতাশ হয়ে খনি ছেড়েছে।

ব্যাপারটা এমনও হতে পারে খনিটা এতদিন পতিত পড়ে থাকায় হানাদার ভেবেছিল, এখানে নিশ্চিন্তে থাকা যাবে। কিন্তু নতুন খনিটা আবিষ্কৃত হওয়ায় আর লোকজন চলাচল শুরু করায় তার পক্ষে জায়গাটা অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

জেমস স্টার বা হ্যারি কেউই ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারল না। নেলকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব হল না। তাদের বদ্ধমূল ধারণা, খনির রহস্যের সঙ্গে তার অবশ্যই কোন না কোনোভাবে যোগসাজোস রয়েছে। নইলে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা যখন দূর হয়েছে তখন আর তার মুখ খোলার সমস্যা তো থাকার নয়।

ছুটির দিন। খনির কাজকর্ম বন্ধ।

বিকালের দিকে হ্যারি লেনকে নিয়ে ম্যালকম হ্রদের বাঁদিকের পথটা দিয়ে অলসভাবে হাঁটাচলা করছে। একটু পরেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। একে একে বৈদ্যুতিক

www.pathagar.com

বাতিগুলো জ্বলে উঠল। অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোতে চলাফেরা করতে এখন আর নেলের তেমন অসুবিধা হয় না।

হ্যারি কৌতূহলাপন্ন হয়ে বলল, 'আচ্ছা নেল, বৈদ্যুতিক আলো তোমার কাছে এখন আর তেমন অসুবিধা হয় না, কী বলো? ভালো কথা, সূর্যের আলো তোমার চোখ দুটো এখনও বরদাস্ত করতে পারে না, তাই না?'

মুচকি হেসে নেল বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ হ্যারি। তোমার মুখে সূর্যের কথা যা শুনেছি তাতেই তো আমার বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে যায়। সে রকম আলো সহ্য করার মতো—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই হ্যারি বলে উঠল, 'নেল, সূর্যের আলো সহ্য করার মতো করে তোমার চোখ দুটোকে যেদিন তৈরি করে নিতে পারবে, পৃথিবীকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে সেদিন দেখবে পৃথিবী নিজেকে কেমন অপরূপ করে সাজিয়ে তুলেছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বলল, 'আর তুমি মনে মনে উপলব্ধি করবে, দৃষ্টিহীনদের ব্যথা কত মর্মান্তিক!'

'জন্মের পর খনির নিঃসীম অন্ধকার ছেড়ে কোনোদিনই আমার পৃথিবীকে দেখার সৌভাগ্য হয় নি।'

অত্যুগ্র আগ্রহ হয়ে হ্যারি বলল, 'নেল, যাবে তুমি, অপরূপ পৃথিবীকে নিজের চোখে দেখতে, তার সৌন্দর্যরাশি উপভোগ করতে? যাবে? যাবে নেল? দেখতে পাবে—'

'হ্যারি, এখন নয়। আর কয়টা দিন যাক, চোখ দুটোকে আরও আলো সহনীয় করে তৈরি করে নিই। তারপর যাব, অবশ্যই যাব। আর যাব তোমার সঙ্গেই।'

'হ্যারি, আলোর সমস্যাটাই পৃথিবী সম্বন্ধে তোমার আতঙ্ক আর অনাগ্রহের একমাত্র কারণ, নাকি—'

উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে নেল বলে উঠল, 'প্লিজ হ্যারি, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। হ্যারি, পৃথিবী জুড়ে সৌন্দর্য ছড়িয়ে রয়েছে তা তো তোমার মুখ থেকে অনেকবারই শুনেছি। লোভও হয় কম না। কিন্তু একটা কথা তো মিথ্যা নয়, সৌন্দর্য দেখার মতো চোখ অবশ্যই থাকা চাই।'

'একটা কথা, একা একা থাকতে তোমার ভয় করে না নেল?'

ভয়ের কথা শুনে নেল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বলল, 'ভয়? সে কি, ভয় করবে কেন? না, ভয় কাকে বলে আমি জানি না। একেবারেই ভয় করত না।'

'যদি কনির অলিগলির মধ্যে হারিয়ে যেতে?'

'সে কী! হ্যারি যাব আমি! খনির প্রতিটা নাড়ী নক্ষত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় রয়েছে। আর আমি হারিয়ে যাব!'

'তুমি তবে বলতে চাইছ, নতুন খনির বাইরে কোনোদিনই আস নি?'

'কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মাঝে-মধ্যে অ্যাবারফয়েলের পুরনো খনিতে চলে গিয়েছিলাম।'

'তাই বুঝি? আমাদের সেই পুরনো কটেজটা দেখেছিলে?'

'তোমাদের কটেজটার কথা বলছ তো? অবশ্যই দেখেছিলাম। আড়াল থেকে কটেজের বাসিন্দাদের দেখতাম। কৌতূহল হত খুবই।'

www.pathagar.com

'কাদের তুমি দেখতে। বলতে পার? আমার মা বাবা আর আমাকে দেখতে?'

'খনির সবাই তো এক এক করে খনি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে রয়ে গিয়েছিলেন কেন?'

'মায়া। খনির সঙ্গে এতদিনের সম্পর্ক, মায়ার বাঁধনে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। তাই তো অন্য সবার মতো খনি ছেড়ে যেতে পারি নি।'

'হ্যারি, কেন ও কাজ করতে গিয়েছিলে বল তো? খনি ছেড়ে চলে গেলেই তো তোমাদের পক্ষে মঙ্গল হত।'

'সে কী! কটেজ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাই নি বলেই তো আমাদের পক্ষে নতুন খনিটার সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়েছে। নতুন খনিটা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে কত লোকের নুন রুটির ব্যবস্থা হয়েছে, বল তো? আর আমরা খনি ছেড়ে চলে গেলে তোমার পক্ষে কি প্রাণ ফিরে পাওয়া সম্ভব হত, একবারটি ভেবে দেখ তো?'

'হ্যাঁ, আমার অশেষ উপকার হয়েছে, খুবই সত্য বটে। কিন্তু অন্য কারো তো উপকার হল না।'

হ্যারি চোখ দুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে বলল, 'অন্য কারো কোন উপকারই হল না! অন্য কারো বলতে তুমি কী বলতে চাইছ, খোলসা করে বল তো হ্যারি?'

হ্যারির কথায় নেল যেন অকস্মাৎ কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। পর মুহূর্তেই নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, 'না, না, ও কিছু নয় হ্যারি। কিছু মনে কোরো না। আসলে অন্যমনস্কতা বশত আমি একটু অসংলগ্ন কথা বলে ফেলেছি।'

'আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি নেল, তুমি ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেয়ার ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছ। আসল কথাটা কী, খোলসা করে বল তো?'

'নতুন খনিটা মোটেই নিরাপদ নয়। তুমি জান কি না জানা নেই। কিছুদিন আগে একবার বহুলোক খনির ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু বেরোবার সময় পথেরই হদিস পায় নি। আসলে বাতি নিভে যাওয়ায় তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়, পথ হারিয়ে ফেলে। অনন্যোপায় হয়ে তারা আটদিন আটরাত্রি অন্ধকার যক্ষপুরীতে কয়েদ হয়ে থাকে। তারা নির্ঘাত প্রাণে মারা যেত। কিন্তু একটা পরীর দয়ায় তাদের পক্ষে পিতৃদত্ত প্রাণরক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। সেই পরোপকারী পরী তৃষ্ণার জল আর খাবার জুগিয়ে পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর কাজ করেছিল। তার অকৃত্রিম দয়া ও মায়া মমতার কথা আমি অন্তত ভুলতে পারব না কোনদিন।'

সেদিন আর কোনো কথা হল না। হ্যারি নেলকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

নতুন কয়লাখনিটা আবিষ্কারের ফলে চারদিকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জ্যাকরিয়ান কোম্পানির অংশীদার হয়েছে। বুড়ো সাইমন ফোর্ড অক্ষমতার জন্য কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁর পদে উন্নীত হয়েছে তাঁর ছেলে হ্যারি ফোর্ড। সাইমন ও জেমস স্টার অনেক, অনেক আগে থেকেই কয়লাখনির লভ্যাংশ আধাআধি করে নিতে শুরু করেছিলেন। ফলে উভয়েরই বরাত খুলে গেছে। হ্যারি এখন ওভারম্যান। খনির কাজের একটা বড় ভগ্নাংশই তার ওপর বর্তেছে।

জ্যাকরিয়ানও কম খুশি নয়। হ্যারির খুশিই তাকে খুশির জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। আসলে হ্যারি আর নেল-এর ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বেড়ে চলেছে বলেই তার মনে এমন অবর্ণনীয় খুশির আমেজ।

www.pathagar.com

জ্যাকরিয়ান একদিন কথা প্রসঙ্গে বলল, 'কী হে হ্যারি, আর কতদিন, মেয়েটাকে আশায় আশায় রাখবে, বল তো? বিয়ের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেললেই তো ল্যাটা চুকে যায়।'

হ্যারি চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বলল, 'বিয়ে? কাকে? 'মেয়েটা' বলতে কার কথা বলতে চাইছ, বল তো?'

'ন্যাকা কোথাকার! এমন ভাব দেখাচ্ছিস যেন কিছুই বুঝতে পারছিস না! নেল-এর কথা বলছি। বিয়েটা মিটিয়ে ফেল। আমরাও কবজি ডুবিয়ে খানাপিনা—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই হ্যারি বলে উঠল—'জ্যাক, তুমি আমার অভিন্ন হৃদয়বন্ধু। তোমার কাছে গোপন করার ইচ্ছা আমার নেই। আর সে চেষ্টা করবও না। আসল কথা কী জান? মেয়েটা অন্ধকার পাতালপুরীতে প্রায় জন্মের পর থেকেই কাটিয়েছে। সূর্যের অত্যুজ্জ্বল আলো ধরতে গেলে তার কাছে অসহনীয়। এমনকি পৃথিবী সম্বন্ধে সে একেবারেই অজ্ঞ। আর পেটে কালির অক্ষরও নেই। এমন একটা জড়বস্তুকে বিয়ে করার কথা বলছ! আর নেলই বা আমাকে বিয়ে করতে—'

'সে কী হ্যারি! তোমাকে পেলে নেল তো বর্তে যাবে হে। আর তুমি কি তাকে পাঠশালায় পাঠিয়ে—'

'পাঠশালায় না হয় নাই পাঠালাম। আমি নিজেই তাকে পড়িয়ে শুনিয়ে অন্য দশটা মেয়ের মতো শিক্ষায় দীক্ষায় ভব্য করে তুলব।'

'আর পৃথিবীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটাতে যদি তুমি আগ্রহীই হয়ে থাক তবে তাকে নিয়ে কদিনের জন্য কোথাও থেকে ঘুরে এলেই তো পাব।'

'যাব। ক'দিনের মধ্যেই যাব ভাবছি। আর এখন সে বোধ হয় সূর্যের আলো সহ্য করতে পারবে। ভাবছি, খুব শীঘ্রই একদিন তাকে নিয়ে গিয়ে সূর্য দেখিয়ে আনব।'

ক'দিনের মধ্যেই খনির সবাই হ্যারি আর নেল-এর ব্যাপারটা নিয়ে কানাঘুসো শুরু করে দিল! হ্যারি-র বাবাও তাদের বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী। খনির কর্মী খনিতেই জন্ম এমন একজনকে জীবনসঙ্গিণী করবে আশ্চর্য কি! তবে বিয়ের আগে নেলকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে নিতে হবে।'

একদিন হ্যারি কথা প্রসঙ্গে জেমস স্টারকে বলল—'নেল তার ব্যাপার স্যাপার সম্বন্ধে কোলসা করে কিছুই বলছে না। কথা পাড়লেই সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যায়। তবে আমার বিশ্বাস, আমাদের বিয়ের বিয়ে পর সে স্বেচ্ছায়ই মুখ খুলবে। তখন সবকিছু ফাঁস করে আমাকে অবশ্যই সতর্ক করে দেবে। তাতে করে খনির সবাই অনিশ্চিত ভয়ভীতি ও বিপদাশঙ্কার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। আর পাতালপুরী হবে উৎকণ্ঠামুক্ত। তাই সবকিছু বিবেচনা করে ভাবছি, বিয়ের পাটটা যত শীঘ্র সম্ভব মিটিয়ে নেয়াই উচিত।'

এবার ঘটে গেল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। হ্যারি আর নেলের বিয়ের খবরটা চারদিকে চাউর হয়ে গেলে সবার মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেলেও একজন অন্তত খবরটা শুনে যারপরনাই অখুশি হয়েছে। কে সে? খনির কাজ মিটে গেলে আলোগুলো রোজ নিভিয়ে দেওয়া হয়। খনিগর্ভে তখন নামে যমপুরীর নিঃসীম অন্ধকার। তখন অজ্ঞাত পরিচয় রহস্যময় ছায়ামূর্তি তার গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে চরম আক্রোশে খনিগর্ভে দাপিয়ে বেড়ায়, তার কথা বলা হচ্ছে।

www.pathagar.com

ব্যাপারটা খনিবাসীদের খুবই ভাবিয়ে তুলেছে। তাদের সবার একই বক্তব্য—অজ্ঞাত পরিচয় রহস্যময় ব্যক্তিটি কে? কেনই বা সে হ্যারি আর নেলের বিয়ের খবরে অন্য সবার মত খুশি হতে পারে নি? আর তার রহস্যময় আবির্ভাবেরই বা কারণ কী? জমাটবাঁধা অন্ধকার। অন্ধকারে কেনই বা সে গুটিগুটি হানা দেয়? কিসের জ্বলন্ত আক্রোশে সে প্রতিনিয়ত দগ্ধে মরছে? চরম আক্রোশ বশে কেন সে হ্যারির বাড়ির দরজার শ্বাপদের মতো বারবার গুটিগুটি হানা দেয়? কেন? কেন সে এমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার করছে? কী তার উদ্দেশ্য? কী চায় সে? ভয়? কিসের ভয়? কাকে ভয়? এটা কি তার ভয়ের। নাকি প্রতিহিংসার বহির্প্রকাশ? অন্তরের অন্তস্থলের কোন অসৎ উদ্দেশ্যের তাড়নায় সে রোজ রাত্রে দাপিয়ে বেড়ায়? কয়েকজন এমন ঘটনাও চাক্ষুস করেছে রহস্যময় ছায়ামূর্তিটা গভীর রাতে অন্ধকার কালোঘোমটার আড়ালে দাঁড়িয়ে হ্যারির জানালার ফাঁক দিয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করে, উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শোনার জন্য তৎপর হয়। এক গভীর রাত্রে হ্যারির ঘরের বাইরে তাকে ভয়ানক ক্ষেপে গিয়ে চরম আক্রোশে দাপাদাপি করতে দেখেছিল অনেকেই। মনে হচ্ছিল আক্রোশবশত সে সবকিছু ছারখার করে দেবে। গুঁড়িয়ে দেবে। প্রলয়ঙ্কর কিছু একটা করার জন্য সে যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কেন তার এমন জ্বলন্ত বিক্ষোভ? প্রতিহিংসায় এমন দাপিয়ে বেড়ায়? কিসেরই বা এ প্রতিহিংসা?

হাঁ, রহস্যময় ছায়ামূর্তিটার ক্ষোভের একটাই কারণ হতে পারে। হ্যারি আর নেল-এর বিয়ের পরিকল্পনা। তাদের বিয়ে ভাঙার জন্যই তার এই অতর্কিত হানা। বিয়েটাকে ভেস্তে দেওয়ার জন্যই রহস্যময় চায়ামূর্তিটা নিদারুণ আক্রোশের মধ্য দিয়ে বার বার হানা দিচ্ছে হ্যারি-র বাসস্থলে।

বিশে আগস্ট।

হ্যারি তার প্রেয়সী নেলকে নিয়ে খনির বাইরে যাবার উদ্যোগ আয়োজন করছে। পরে ঠিক হল জেমস স্টার এবং জ্যাকরিয়ান তাদের সঙ্গ দান করবে।

তারা চারজন রাত্রির অন্ধকারে যাত্রা করল। কেন তারা দিনের আলোয় যাত্রা না করে রাত্রির অন্ধকার শ্বাপদের মতো যাত্রা করল? কারণ অবশ্যই আছে? কারণ একটাই, রাত্রির অন্ধকার ঘুচে গিয়ে যখন দিনের আলো একটু একটু করে উঁকি দেবে তখন নেল-এর অনভ্যস্ত চোখ প্রত্যক্ষ করবে কীভাবে অন্ধকারের বুক চিরে আলোর উৎস সূর্যটা পৃথিবীর বুকে ধীরে ধীরে উঁকি দেয়। আর তাকে অসহ্য জ্ঞান না করে নেল-এর চোখ দুটো বরং স্বাগতই জানাবে।

চারজন রাত্রির শেষ ট্রেনে চেপে খনি থেকে অনেকখানি দূরে চলে এসেছে।

নীল আকাশের গায়ে ভাসমান পেঁজা তুলোর মতো মেঘগুলোর দিকে অপলোক চোখে তাকিয়ে থাকার পর একসময় কৌতূহলবশত নেল বলল, 'হ্যারি, মাথার ওপরে ওগুলো কী ভেসে বেড়াচ্ছে, বল তো?'

হ্যারি তার কৌতূহল নিবৃত্তি করতে গিয়ে বলল, 'নেল তোমাকে তো বহুবারই বলেছিলাম আকাশের মেঘরাত্রির কথা, মনে নেই তোমার? আর মেঘের ফাঁকে ওই যে, মিটমিট করছে ওগুলো তারা? তারার কথাও তো তোমাকে বলেছিলাম, তাই না?'

www.pathagar.com

নেল আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ঘাড় কাত করে হ্যারির কথায় সম্মতি জানাল। তারপর বলল, 'কিন্তু তারাগুলো আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে কই? তুমি না বলেছিলে, সূর্যের আলো খুবই তেজি, চোখ ঝলসে দেয়, বল নি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, বলেছিলাম। আসল ব্যাপার কী জান নেল? ওই তারাগুলো সূর্যের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি দূরে অবস্থান করে বলে এত দূরবর্তী পৃথিবীতে তাদের আলো পৌঁছায় না। দূরত্বের জন্যই তাদের এক একটা জোনাকির মতো আকাশের গায়ে জ্বলতে দেখা যায় আর সূর্য অপেক্ষাকৃত কাছে থাকায় তাকে বড় দেখায় ও তার আলো ও তেজ আমাদের কাছে অনায়াসেই পৌঁছে যায়।

পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্রের নাম তুমি অবশ্যই জান না? তার নাম ভেগা। পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব পাঁচ হাজার কোটি লাখ অর্থাৎ পনের হাজার কোটি মাইল।

ফোর্থ-এর তীরে তারা যখন পৌঁছাল তখন রাত্রি সাড়ে এগারোটা। জেমস স্টার আগে থেকেই নৌকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তারা নৌকায় উঠল।

নেল কৌতূহলাপন্ন হয়ে গণ্ডূষ ভরে জল নিয়ে মুখে ঠেকিয়েই থু থু করে উঠল। মুখ বিকৃত করে বলে উঠল, 'ওরে ব্বাস, জলটা কী নোনতা রে বাবা!' হ্যারি-র মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'কেন? এর জল এমন নোতা কেন গো?'

'হ্যাঁ, এসময়ে এর জলের লবণতা একটু বেশি থাকে জোয়ারের সময় কি না। এসময়ে সমুদ্রের জল বেশি পরিমাণে এতে ঢুকে যায়।

মুহূর্তকাল পরে বলল, 'নেল, পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর একভাগ স্থল তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম, তাই না?'

'তুমি তো আমাকে বইতে পড়িয়েছ, সূর্যের উত্তাপে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে। সে মেঘই বৃষ্টির কারণ, তাই যদি সত্য হয় তবে নদীর জল মিষ্টি কেন, মাথায় আসছে না তো?'

'সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায় বটে। কিন্তু লবণটুকু পড়েই থাকে। কেবলমাত্র জলই বাষ্পীভূত হয়। জলীয় বাষ্প উর্ধ্বাকাশে উঠে গিয়ে শৈত্যের সংস্পর্শে মেঘের রূপ ধারণ করে। তারপর সে মেঘ ভাসতে ভাসতে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত ঘটায়। সে জল ভূমিভাগ, নদী আর সমুদ্রে পড়ে।'

আকাশের গায়ে অলসভাবে চোখ বুলাতে বুলাতে নেল এক সময় চিল্লিয়ে উঠল—'আগুন! ওই দেখ, আগুন! আকাশের গায়ে আগুন লেগে গেছে।'

হ্যারি কিছু বলার আগেই জেমস স্টার হো হো করে হেসে বললেন—'দূর পাগলি। আগুন লাগতে যাবে কেন? আকাশের গায়ে ওটা তো চাঁদ। ঝকঝকে চকচকে চাঁদ।

নেল চাঁদের রূপ সৌন্দর্যের কথা বহুবারই শুনেছিল। তাই জেমস স্টারের সামনে এমন বোকামি করার জন্য অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেল।

নৌকাটি ছোট্ট একটা ধাক্কা খেয়ে গ্রান্টন বন্দর স্পর্শ করল। এবার হ্যারি সবাইকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আর্থাস সিটের চূড়ায় হাজির হল।

ছোট্ট পাহাড়। উচ্চতা মাত্র ৭৫০ ফুট। সর্বজনবন্দিত সাহিত্যসাধক স্যার ওয়ালটার স্কট তাঁর এক বিখ্যাত উপন্যাসে লিখেছেন, সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের শোভা দেখে আনন্দ পেতে হলে এখানে চলে এসো। এখানে, এ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে রূপ সৌন্দর্য উপভোগ কর।

www.pathagar.com

জেমস স্টার সবাইকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে একটা প্রায় সমতল ও প্রশস্ত পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসলেন।

পুব আকাশের গায়ে রক্তিম ছোপ ফুটে উঠল। ভোরের পূর্বাভাস, রক্তিম আভাটা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে মাথার ওপরের ভাসমান মেঘ খণ্ডের গায়েও প্রভাব বিস্তার করতে লাগল।

আর্থাস সিট পাহাড়ের পাদদেশের এডিনবরা শহর তখনো কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় গভীর ঘুমের ঘোরে কাটাচ্ছে।

ভোরের মৃদু আলো কী অতুলনীয় শোভার সঞ্চারই না করেছে।

নেল পুব আকাশের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। চোখের পাতা বন্ধ করলেই যে লোকসান, রূপ সৌন্দর্যের কিছু না কিছু অংশ থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

একটু পরেই নেল নিদ্রাচ্ছন্ন এডিনবরা শহরের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

পর মুহূর্তেই পুব আকাশের দিকে ফিরতেই সে দেখল রক্তিম ছোপ আর বেগুনি ছোপ মিলেমিশে এক অপরূপ শোভার সৃষ্টি করেছে।

এবার পুব আকাশ একটু একটু করে ফর্সা হতে হতে অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। এবার সমুদ্রের বুক থেকে রক্তজবার মতো লাল টুকটুকে একটা থালা যেন একটু একটু করে উঠে আসছে। রক্তিম থালাটা যেন লক্ষ লক্ষ ফার্নেসের লকলকে গনগনে আগুন একত্রে পুঞ্জীভূত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে।

নেল এবার অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ করে হাত দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে ফেলল।

হ্যারি ও জেমস স্টার তাকে পশ্চিমদিকে ঘুরে দাঁড়াতে বললেন।

নেল প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলল, 'না, অমন কথা আমাকে বলবেন না। আমাকে সইতে দাও হ্যারি। সূর্যের অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মি আমার চোখ দুটোকে একটু একটু করে সইতে দাও।'

মুহূর্তকাল পরে নেল হাতের আঙুলগুলো সামান্য ফাঁক করে রক্তিম সূর্যের আলোয় চোখদুটোকে একটু একটু করে সইয়েনিতে লাগল। পরমুহূর্তেই আবার আঙুলগুলো জুড়ে দিল। বার কয়েক এমনি করার পর একসময় চোখের ওপর থেকে হাত দুটোকে আলতো করে সরিয়ে নিল। চোখের পাতাগুলো তিরতির করে কাঁপতে লাগল। উচ্ছ্বসিত আবেগভরে সে বলে উঠল? 'ভগবান, কী অপূর্ব তোমার সৃষ্টি! তোমার নিপুণ হাতের সৃষ্টি আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমার সৃষ্ট সৌন্দর্য আমার মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছে। আমি পাগল হয়ে গেছি! হ্যাঁ, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যরাশি প্রত্যক্ষ করে আমি যেন সত্যি পাগল হয়ে গেছি!'

সৌন্দর্য! পৃথিবীর অফুরন্ত সৌন্দর্যের মুখোমুখি হয়ে নেল সংজ্ঞা হারিয়ে হ্যারি কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

জেমস স্টার এমন এক ভ্রমণসূচি তৈরি করে নিয়েছেন যাতে দুদিন ধরে ঘুরে নেলকে সৌন্দর্যের আকর পৃথিবীটার কিছুটা অংশ অন্তত দেখিয়ে নিতে পারেন।

জেমস স্টার এবার সঙ্গীদের নিয়ে ট্রেনে চাপলেন। গ্লাসগো হয়ে রবরয়ের মুলুকে যাবেন মনস্থ করেছেন। স্যার ওটাল্টার স্কটের খুবই প্রিয় রবরয়। পাহাড় আর সবুজের সমন্বয়ে গঠিত রূপসীর মনোলোভা চিত্র তাঁর এক উপন্যাসে নিপুণ হাতে এঁকে রেখেছেন। স্টিমবোট রবরয়। অপূর্ব তার গঠন বৈচিত্র্য।

www.pathagar.com

জেমস স্টার রবরয়ের পথ চলতে চলতে নেলকে দু-ধারের সৌন্দর্যমণ্ডিত দৃশ্যাবলি সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

চারজনের দলটা হাঁটতে হাঁটতে লক ক্যাটারিনের পাড়ে হাজির হলেন। কোনো নদী বা উপসাগর এটা নয়। আসলে এটা একটা হ্রদ। আকাশচুম্বী পর্বতমালাবেষ্টিত দৃষ্টিনন্দন হ্রদটাকে দুচোখ ভরে দেখে নেল আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে পড়ল।

জেমস স্টার বললেন, 'জান নেল, এ হ্রদের জল জমে কোনদিন বরফে পরিণত হয়ে যায় না। মনে রেখো, এ লেকের জলেই লেডি অব দ্য লেকের সর্বজন সমাদৃত অ্যাডভেঞ্চার ঘটেছিল।'

একের পর এক অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে নেলের বিস্ময় বিস্ফারিত চোখের মণি দুটো যেন অস্থির হয়ে পড়েছে। মাত্র তো চব্বিশটা ঘণ্টা। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত সৌন্দর্য তার অনভ্যস্থ চোখ দুটোর বরদাস্ত করতে পারার কথাও নয়। তাই তার শরীর ও মন দুইই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

হ্যারি তার মনের মানুষ নেলকে একটু আড়ালে আবডালে পেয়ে হঠাৎ তার হাত দুটো চেপে ধরল। আবেগমধুর স্বরে বলে উঠল, 'নেল, প্রেয়সী আমার! ঈশ্বর সাক্ষী, মানুষ সাক্ষী আর পাহাড় ঘেরা প্রকৃতি সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তোমায় আমার করে, একান্তই আমার করে পেতে চাই। নেল, আমার প্রাণাধিকা নেল, তুমি সে অধিকার আমাকে দেবে কি, খোলসা করে বল। তোমাকে আপন করে পাবার অধিকার আমাকে দেবে কি তুমি?

আবেগে আপ্লুত নেল আকস্মিক আনন্দটুকু সইতে পারল না। তার দুচোখের কোণ বেয়ে আনন্দাশ্রুর ধারা নেমে এল। হ্যারি, আমি তোমার সুখের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াব না। তুমি সুখী হও। তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সুখ শান্তিতে ভরপুর হয়ে উঠুক এটাই আমার একমাত্র কাম্য। তুমি আমার, আর আমি তোমারই হয়ে থাকব চিরকাল।'

নেল আকস্মিক আনন্দটুকু সইতে না পেরে হ্যারি-র বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

একটু পরেই এক অভাবনীয় ঘটনার মুখোমুখি হল এ অভিযাত্রী দলটা। তারা তখন স্টিমবোট রবরয় ভ্রমণ সারছে। এমন সময় সেটা ভীষণ রকম দুলে উঠল। তীর থেকে তখনো মাইল খানেক দূরে রয়েছে সেটা। তার তলদেশ হ্রদের তলদেশ ঘষে ঘষে চলতে লাগল। তার যুবক চালক সাধ্যাতীত কসরত করেও জলযানটাকে একচুল সরাতে পারল না।

দুর্ঘটনা। হ্যাঁ, একে দুর্ঘটনা ছাড়া কীই বা বলা যেতে পারে? জানা গেল, লক ক্যাটারিনের পূর্বদিকটা হঠাৎ শুকিয়ে গেছে। হ্রদের তলদেশে বিশালায়তন একটা ফাটল সৃষ্টি হওয়ার জন্যই এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে। আর তার ভেতর দিয়ে হ্রদের জল গলগল করে নেমে যাচ্ছে। জলরাশি পাতাল গহ্বরে গিয়ে হাজির হচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ার পরিস্থিতিটা হৃদয়ঙ্গম করে ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলেন—'সর্বনাশ হতে চলেছে। সর্বনাশ! সব গেল! সব তলিয়ে গেল! হায় ঈশ্বর! এ বিচিত্র খেয়াল তোমার! অ্যাবারফয়েলও যে মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। অসহায় আবালবৃদ্ধবনিতাকে নির্মমভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার বিচিত্র খেলায় তুমি মেতেছ! কেন? কেন? কেন তুমি নির্মম হয়ে উঠলে?'

www.pathagar.com

সেদিন কাজের শেষে, সাইমনফোর্ড তাঁর স্ত্রী ম্যাগিকে নিয়ে কটেজের সামনের অপ্রশস্ত সমতল প্রাঙ্গণে বসলেন, বাক্যালাপে মগ্ন। তাঁরা উভয়েই একমাত্র পুত্র হ্যারি এবং ভাবী পুত্রবধূ নেলের প্রত্যাবর্তনের দেরি দেখে উদ্বিগ্ন। তাদের প্রসঙ্গেই তারা টুকরো টুকরো বাক্যালাপে মগ্ন।

অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর একটা শব্দ সমগ্র পাতালপুরী কাঁপিয়ে দিল। সে কী কম্পন! পাতালপুরী একেবারে চুরমার হয়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবার জোগাড় হল। মনে হল বহু উঁচু কোনো জায়গা থেকে তীব্র বেগে জল খনিগর্ভে পড়তে শুরু করেছে।

আকস্মিক প্রলয়ঙ্কর কর্কশ শব্দটা হতে না হতেই খনিবাসীরা প্রাণভয়ে কান্নার রোল তুলল। প্রবল বিক্রমে জল যেন গলগল করে খনিগর্ভ ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর।

ম্যালকম হ্রদের জলরাশি ফুলে ফেঁপে তীব্রবেগে খনিগর্ভের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার জন্য ছুটছে। আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসে দিশাহারা হয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য খনিবাসীর অসহায় নরনারী নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটোছুটি দাপাদাপি ঝুড়ে দিল। বুড়ো সাইমন স্ত্রীকে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন। সবাই গিয়ে উঁচু একটা পাথরের ওপর গিয়ে আশ্রয় নিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফাড়া কেটে গেল। ক্রোধোন্মত্ত জলরাশি একসময় বিশেষ একটা সীমা পর্যন্ত উঠেই থেমে গেল।

আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে খনির তেমন কিছু ক্ষতি হয় নি। তলদেশে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া বড় রকমের কোনো ক্ষতি হতে পারে নি।

খনিবাসীদের অবর্ণনীয় দুরবস্থার কথা খবরের কাগজের পাতায় বড় বড় হরফে ছাপা হল।

ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার সফর শেষ করে হ্যারি ও নেলকে নিয়ে খনিতে ফিরে কাহিনীর যে বর্ণনা দিলেন, খনিবাসীরাও একই কথা বলল।

এ কী ভুতুড়ে কাণ্ডরে বাবা! এমন দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে খনিবাসীরা এর আগে আর কোনদিনই পড়ে নি।

ব্যাপারটা কেবল অবিশ্বাস্য বললে যথাযথ বলা হবে না। বরং তার সঙ্গে অলৌকিক শব্দটা জুড়ে দেয়াই বুঝি সঙ্গত। অবিশ্বাস্য তো বটেই। কয়েক সেকেন্ডে এমন বিশালায়তন ও সুগভীর একটা হ্রদের জল চোঁ চোঁ করে শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে আর কীভাবেই বা ব্যাখ্যা করা চলে?

এখন সবার মনেই কৌতূহল দানা বেঁধেছে, ব্যাপারটা কি নিছকই কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নাকি অতি প্রাকৃতিক কোনো ব্যাপার এর সঙ্গে জড়িত? আবার কেউ কেউ এমনও ভাবতে লাগল, রহস্যজনক ঘটনাটার পিছনে কোনো কুচক্রীর কালো হাত থাকলে থাকতেও পারে।

জেমস স্টার আর হ্যারি ফোর্ড অন্য কোনো আশঙ্কা করে আকস্মিক অবিশ্বাস্য ঘটনাটা সম্বন্ধে নেলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের পীড়াপীড়িতে তার মুখের এমন ভাবান্তর ঘটল যে, তার মুখ থেকে ঘটনাটা সম্বন্ধে কোনো অর্থই বের করতে পারলেন না। বুঝলেন, যে-কোন কারণেই হোক ব্যাপারটা সম্বন্ধে সামান্যতম আলোকপাত করাই তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর মন খোলসা করে প্রকৃত ব্যাপারটা বলতে না পারার বেদনা তাকে আরো বেশি করে মুষড়ে দিয়েছে।

www.pathagar.com

কোনো সিদ্ধান্তেই আসতে না পেরে অস্থিরচিত্ত হ্যারির উপায়ান্তর না দেখে রহস্যভেদ করার জন্য একাই একদিন নৌকায় চেপে বসল। পাথরের থামের ওপর হ্রদটার যেদিকটার ভার রক্ষিত ছিল তার কাছাকাছি যেতেই পুরো ব্যাপারটা তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। এর পিছনে কোনো না কোনো কুচক্রীর কালোহাতের ছোঁয়া যে রয়েছে এতে তার তিলমাত্র সন্দেহও রইল না।

খনির একদিকটায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক ব্যবহার করে এরকম ভয়ঙ্কর একটা ধ্বংসাত্মক কাজ করা হয়েছে, সে নিঃসন্দেহ।

হ্যাঁ, বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণ ঘটিয়েই ধ্বংসাত্মক কাজটা করা হয়েছে। পাথরের গায়ে বিস্ফোরণের দাগ, বারুদের চিহ্ন সুস্পষ্ট। শক্তিশালী ডিনামাইট ব্যবহার করে লেকের পাথরের থামটা উড়িয়ে দিয়েছে। ফলে ক্যাটারিনের জলের ভার পাথরে সহ্য করতে পারল না। ছাদ ধ্বসে গিয়ে সর্বনাশ কাণ্ডটা ঘটে গেছে।

জেমস স্টার আঁতকে উঠে বললেন—'বিস্ফোরণের ফলে কেবল লেকটা ধ্বসে না গিয়ে হুড়মুড় করে পুরো খনিটা ধ্বসে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র ছিল না।

এদিকে হ্যারি আর নেলের বিয়ের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসছে খনিতে একের পর এক হিংসাশ্রয়ী ধ্বংসাত্মক কাণ্ড ঘটে চলেছে।

জ্বলন্ত কাঠের স্তূপের ধারে একটা লণ্ঠনও পাওয়া গেছে। বরাত ভাল যে, আগুন নিভিয়ে বড় রকমের একটা সর্বনাশ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

দুই দিন নির্বিঘ্নে কাটল বটে। তৃতীয় দিন মাইন ইঞ্জিনের ইয়া মোটা খুঁটি কেটে দিয়ে খাঁচাটাকে নিচে ফেলে দিয়ে গেছে। এতে হ্যারি প্রাণে মারা না গেলেও মারাত্মক আহত হয়েছে। রক্তক্ষরণও হয়েছে প্রচুর।

আবার! আবার এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে গেল পাতালপুরীতে। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। এতেও হ্যারি বাদ গেল না। আর একটু হলেই ওয়াগানভর্তি কয়লা চাপা পড়ে তার জীবনাবসান ঘটে যেত।

তার পরদিন আবার রহস্যময় সে কালো হাতের ছোঁয়ায় অন্ধকারে লাইনের ওপর মোটা একটা কাঠের বরগা ফেলে রেখে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটানো হয়।

তারপর দুদিনও কাটল না। কাজের শেষে হ্যারি বাড়ি ফেরার সময় অতর্কিতে ইয়া বড় একটা পাথরের চাঁই তার ঠিক সামনে, একেবারে পায়ের কাছে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল। পিতৃপুরুষের ভাগ্যের জোরেই তার প্রাণটা রক্ষা পেয়েছে।

একের পর এক ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটতে দেখে খনিবাসীরা আতঙ্কে মুষড়ে পড়ল। খনি তো নয় যেন এক বিভীষিকার রাজ্য গড়ে উঠেছে।

একের পর এক ঘটে যাওয়া অলৌকিক কাণ্ডকারখানার কথা পুলিশের কানে না দিয়ে পারা গেল না। রহস্যজনক ঘটনাগুলোর কিনারা করার জন্য তাঁরা প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েও হতাশ হয়েছে। অনন্যোপায় হয়ে হাল ছেড়ে দিতেই হল। তবে সম্ভাব্য স্থানগুলোতে বন্দুকধারী পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

হিংসাত্মক প্রতিটা আক্রমণের লক্ষ্য যে একমাত্র হ্যারি তা আর কারো বুঝতে বাকি রইল না। তবে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এসব কথা নেল-এর কাছে গোপন রাখা হয়েছে।

হ্যারি তার বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে খুবই ভাবিত। দুশ্চিন্তার মধ্যে প্রতিটা মুহূর্ত সে কাটাতে লাগল। তার বিয়ের দিন হয়ত চক্রান্তকারী চরম আক্রমণ চালিয়ে সর্বনাশের

www.pathagar.com

চূড়ান্ত করে দেবে। ভয়ঙ্কর কোন হিংসাত্মক কাণ্ডের মধ্যে সে সম্পূর্ণ খনিটাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেওয়াটাও কিছুমাত্র অবাক হবার নয়।

হ্যারি আর নেলের বিয়ের মাত্র আর এক সপ্তাহ বাকি। এক রাত্রে অন্ধকারে হাঁটতে গিয়ে সে চোখের সামনে ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল। কি? কী দেখে তার মধ্যে এমন অবর্ণনীয় ভাবান্তর ঘটল? সে অপলক চোখে সামনের একটা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত চোখে রহস্যজনক কয়েকটা ছত্রের ওপর চোখ বুলাতে লাগল। সেখানে কে যেন লিখে রেখেছে—"সাইমন ফোর্ড, তুমি আমার হাত থেকে পুরনো খনির সর্বশেষ কয়লার স্তরটাকেও ছিনিয়ে নিয়েছ। আমার বুকের ধন নেলকে তোমার পুত্র হ্যারি ছিনিয়ে নিয়েছে। তুমি নিপাত যাও! যাহান্নামে যাও! নিউ অ্যাবারফয়েল ধ্বংস হোক!—ইতি, সিলফ্যাক্স।"

নেল বিকট স্বরে আর্তনাদ করে উঠল—'সিলফ্যাক্স! সিলফ্যাক্স।"

কথাটা বলেই নেল দুম করে মাটিতে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। তার চিৎকার শুনে ম্যাগি ছুটে এলেন। কোনোরকমে কোলে তুলে কটেজে নিয়ে গেলেন।

সিলফ্যাক্স! কে এই সিলফ্যাক্স? কোথায় থাকে সে? কোন্ অন্ধকার গুহায় আশ্রয় নিয়ে সে একের পর এক হিংসাত্মক ঘটনাগুলো ঘটিয়ে চলেছে?

দেয়ালের লেখাটার ওপর একটাবার মাত্র অস্থির চোখের মণি দুটো বুলিয়ে নিয়ে জেমস স্টার তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'চিনি, আমি চিনি। এ হাতের লেখা আমার পূর্বপরিচিত।'

ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার এবার সাইমনকে লক্ষ্য করে বললেন, 'সাইমন, তোমার চিঠির পাল্টা চিঠি যে আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল এটা তারই হাতের লেখা। এতদিন অন্তত এটুকু জানা গেল, তার নাম সিলফ্যাক্স।

সিলফ্যাক্স-এর নামটা কানে যেতেই বুড়ো সাইমনের মুখ ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠল। যেন অকস্মাৎ তিনি ফুটা বেলুনের মতো চিপসে গেলেন। তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে একটা সুপরিচিত মুখ অতর্কিতে ভেসে উঠল। ডোচার্ট সুড়ঙ্গের সর্বশেষ মঙ্কের নাম ছিল সিলফ্যাক্স। খুবই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক ছিল। মৃত্যুভয় তার আদৌ ছিল না। খনিগর্ভের যেসব স্থানে বিষাক্ত গ্যাস জমে বিপদজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করত সেখানে মৃত্যু ভয় অগ্রাহ্য করে সে লণ্ঠন হাতে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে খনির নিরাপত্তা ব্যবস্থা করত।

এমন অকুতোভয় দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মঙ্ক সিলফ্যাক্স একদিন কোথায় উধাও হয়ে গেল। যাবার সময় অনাথিনী নেলকে সঙ্গে নিয়ে গেল। সিলফ্যাক্স তার ঠাকুরদা। সে ছাড়া নেলের তিনকুলে আপনজন বলতে কেউ-ই ছিল না।

সিলফ্যাক্স কেন যে অতর্কিতে অন্ধকার গা ঢাকা দিয়েছিল আজ পর্যন্ত কারো পক্ষে সে রহস্যের কিনারা করা সম্ভব হয় নি। তার অন্তর্ধানের কাহিনী আজও পর্দার আড়ালেই রয়ে গেছে।

আজ থেকে পনের বছর আগে সিলফ্যাক্স লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছিল। তার বয়স সাইমন ফোর্ডের চেয়ে বছর বিশ বছর বেশি।

www.pathagar.com

চোখের তারায় জিজ্ঞাসার ছাপ এঁকে ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার বললেন, 'সাইমন, একটা কথা কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না—'আমার হাত থেকে তুমি কয়লাখনির সর্বশেষ স্তরটাকে ছিনিয়ে নিয়েছ' এর মাধ্যমে সিলফ্যাক্স কী বুঝাতে চাইছে?'

ম্লান হেসে সাইমন বললেন, 'শেষের দিকে তার মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছিল। তার বিশ্বাস জন্মেছিল, অ্যাবারফয়েল কয়লাখনিতে তার অধিকার রয়েছে। তাই খনি থেকে কয়লার চাঁই কাটার নামে সে রীতিমতো ক্ষেপে লাল হয়ে যেত।'

কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে জেমস এবার বললেন, 'হ্যাঁ, কথাটা খুবই সত্য বটে। এতক্ষণে আমারও মনে পড়েছে, সে নতুন একটা কয়লাস্তরের সন্ধান পাওয়ার পর উন্মাদের মতো সেটাকে সবসময় আগলে রাখত। অন্ধকার পাতালপুরীতে প্রতিনিয়ত চক্কর মেরে মেরে গোপন রহস্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করে নিয়েছিল। তাই তো তোমার আমন্ত্রণপত্রের পাল্টা চিঠি দিয়ে আমার এখানে আসা বন্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিল। তাই প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে আমাদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যা কিছু রহস্যের সঞ্চার করেছে, ধ্বংসাত্মক কাজগুলোর নায়কের ভূমিকা পালন করেছে।'

'উন্মাদ! বদ্ধ উন্মাদ! সিলফ্যাক্স একজন বদ্ধ উন্মাদ মি. স্টার। তা যদি না হত সে কিছুতেই অতিকায় হিংস্র পেঁচাটাকে দিয়ে আমাদের লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়ে বেকায়দায় ফেলত না। আবার আমি নেলকে নিয়ে কুয়োটা থেকে ওঠার সময় পেঁচটাকে দড়িকাটার কাজে নিযুক্ত করে আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করে জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে কিছুতেই উৎসাহী হত না'—হ্যারি বলল।

জেমস স্টার এবার মুখ খুললেন, 'সে না হয় হল। কিন্তু সিলফ্যাক্স যে চরম পত্র দিয়েছে তার প্রতিকার কি করবে, একবারটি ভেবে দেখেছি কি? উন্মাদ শয়তানটার পৈশাচিক মনোবৃত্তির জবাব আমরা কি করে দেব, ভেবে দেখেছ কি?'

জ্যাকরিয়ান এবার মুখ না খুলে পারল না। সে বলল, 'আজকের সিলফ্যাক্স আর অতীতের সিলফ্যাক্স যে একই ব্যক্তি এ ব্যাপারে কি আমরা নিঃসন্দেহ? অতীতের সিলফ্যাক্স-এর বয়সের হিসাব করলে আমরা মানতে বাধ্য যে, সে আজ আর ইহলোকে নেই। আর নেহাতই যদি বেঁচে থাকে তবে অবশ্যই অর্থব হয়ে গেছে। চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। আজ পর্যন্ত খনিগহ্বরে যেসব হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে তা কি কোন অতিবৃদ্ধের পক্ষে সম্ভব? তাই আমার বিশ্বাস, আজকের সিলফ্যাক্স নির্ঘাত অন্য কোন লোক, তা নইলে পুরনো সিলফ্যাক্সের সহযোগী কেউ না কেউ আছে।'

জ্যাকরিয়ান-এর পরামর্শ অনুযায়ী সবাই নেল-এর শরণাপন্ন হল।

নেল চোখের জল মুছতে মুছতে কান্নাভেজা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করল, 'আপনারা যাকে ঘরের বউ করতে উৎসাহী তাঁরা ধৈর্য ধরে শুনুন—আমি, হ্যাঁ আমিই সিলফ্যাক্সের নাতনি। আপনারা যে সিলফ্যাক্সেকে চিনতেন তিনিই আজকের সিলফ্যাক্স। বার্ধক্য তার শরীরের অমিত শক্তিকে তিলমাত্র গ্রাস করতে পারে নি। আজও বাঘের শক্তি তাঁর গায়ে। যাক, এবার আমার প্রসঙ্গে আসা যাক, মা কি জিনিস আমার জানা ছিল না। এখানে এসে তা জানতে পারলাম, বুঝতে পারলাম। বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত আমি। এখানে এসে ওনাকে পেয়েছি। পেয়েছি বাবার অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা।' এবার হ্যারির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে নেল বলল, 'এতদিন অন্ধকার কুঁয়োর ভেতরে বন্ধুবান্ধবহীন

www.pathagar.com

নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়েছে আমাকে। এখানে আসার পর অভিন্ন হৃদয় বন্ধুরূপে হ্যারিকে পেয়ে আমার সে অভাব পূরণ হয়েছে, পেয়েছি পরিপূর্ণ স্বাদ।

আশা করি আপনাদের আর বলতে হবে না, একমাত্র সাথী বুড়ো ঠাকুরদাকে নিয়ে অন্ধকার যক্ষপুরীতে আমাকে পনেরটা বছর কাটাতে হয়েছে। ঠাকুরদার মধ্যে ভয়ঙ্করতা পরিপূর্ণ থাকলেও আমাকে কিন্তু খুবই স্নেহ করতেন। কুদর্শন অতিকায় একটা পেঁচা ছিল ঠাকুরদার সর্বক্ষণের সঙ্গী। নাম তার হারফাঙ। গোড়ার দিকে তো ওটাকে দেখলেই আমি ভয়ে কুঁকড়ে যেতাম। পরে কিন্তু হারফাঙ ঠাকুরদার চেয়ে আমারই বেশি অনুগত হয়ে পড়ে।

আর একটা কথা, খনিরাজ্য বিশাল। তা সত্ত্বেও ঠাকুরদা আড়াল থেকে আপনাদের কটেজের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকতেন। খনির মধ্যে আপনাদের উপস্থিতি তিনি কোনক্রমেই মেনে নিতে পারতেন না। তিনি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন, যখন স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, পুরনো খনিতে আপনারা আদৌ সন্তুষ্ট না থেকে ঠাকুরদার খনির দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। স্বার্থগৃধ্ন মন নিয়ে হাত বাড়াচ্ছেন। অস্থিরচিত্ত ঠাকুরদার ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করলেন, খনির দিকে পা বাড়ালেই আপনাদের জানে মেরে ফেলবেন। আমি ভয়ে কুঁকড়ে গেলাম। আসলে আমার নিজের জন্য ভয় মোটেই নয়, ঠাকুরদা আর আপনাদের জন্যই ছিল আমার যত ভয়। ভয়ঙ্কর কোন সর্বনাশ ঘটিয়ে না দেন। আপনারা নতুন খনিতে পা দেয়ার দিনই আমার স্বার্থগৃধ্ন প্রতিহিংসাপরায়ণ ঠাকুরদা রেগে একেবারে লাল হয়ে গেলেন। জ্বলন্ত ক্রোধে গর্জন করতে করতে পাথর চাপা দিয়ে সুড়ঙ্গের পথটা দিলেন বন্ধ করে। ক্রোধে রীতিমত ফুঁসতে লাগলেন। কয়েকজন খ্রিস্টান না খেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে মারা যাবে এই আশঙ্কায় আমি ঠাকুরদার অগোচরে আপনাদের জন্য রোজ কিছু জল আর রুটি রেকে যেতাম। ভেবেছিলাম আপনাদের বন্দিদশা থেকে মুক্তিও দেব। কিন্তু সম্ভব হল না। আমার মনের ইচ্ছা মনেই রয়ে গেল। অতন্দ্রপ্রহরী আমার ঠাকুরদা চোখের ধুলো দিয়ে আপনাদের কয়েদমুক্ত করতে পারলাম না। একদিন জ্যাকরিয়ানকে আলো দেখিয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিলাম। ফেরার পথে আমাকে ঠাকুরদার মুখোমুখি পড়তে হল। হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলাম। তাঁর রোষদীপ্ত মুখের দিকে চোখ পড়তেই আমার কলিজা কেঁপে উঠল। তিনি আমার প্রাণনাশ করলেন না। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন অন্ধকার পাতাল কুঁয়োতে। সেখানে কয়েদ করে রাখলেন। আমার পাহারায় রাখলেন হিংস্র পেঁচা হারফাঙকে।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্যে কাটিয়ে একটু দম নিয়ে নেল আবার মুখ খুলল, 'আশা করি আর আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারছেন, হ্যারির সঙ্গে আমার বিয়ের পরিণাম কী ভয়ঙ্কর হতে পারে? আমাকে বরং কয়েক দিনের জন্য আমার ক্রোধান্মত্ত ঠাকুরদার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি চেষ্টা করে দেখি, বুঝিয়ে শুনিয়ে যদি তাঁকে ক্রোধমুক্ত করতে পারি।'

'না, তা হয় না নেল। সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে তোমাকে ছেড়ে দেয়া মোটেই সঙ্গত হবে না। তার চেয়ে বরং আমরা প্রতিসিংহাপরায়ণ শক্তিধরকে নাশ করার চেষ্টা করি। সফল আমাদের হতেই হবে।' হ্যারি ও জ্যাকরিয়ান সমস্বরে বলে উঠল।

নেল তাদের কথায় সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। সে ঠাকুরদার কাছে যাওয়ার জন্য জেদ ধরল। এতকাল বুড়ো সিলফ্যাক্স তার মনে মানুষের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মাবার জন্য একটা

www.pathagar.com

কথাই বার বার বলেছে, মানুষজাতটা বিশ্বাসঘাতক, দারুণ স্বার্থগৃধ্নু। কিন্তু ফোর্ড-পরিবার ও জেমস স্টার-এর সান্নিধ্যে এসে সে এ সত্যই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে, ঠাকুরদা এতকাল তাকে ভুলপথে চালিত করেছে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে পাওয়া অফুরন্ত স্নেহ-মায়া-ভালবাসা তাকে মুগ্ধ করেছে। তাই আজ নেল-এর একান্ত ইচ্ছা, বুঝিয়ে শুনিয়ে তার ঠাকুরদাকেও ক্রোধমুক্ত করে সৎপথে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।'

কিন্তু হ্যারি ও তার মা-বাবার প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করে নেল-এর পক্ষে আর তার ঠাকুরদার কাছে ফিরে যাওয়া সম্ভব হল না।

হ্যারি ও নেল-এর বিয়ের তারিখ এগিয়ে আসতে লাগল। সিলফ্যাক্স তাদের বিয়ে ভণ্ডুল করার জন্য যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে পথ থেকে তাকে ফেরাবার জন্য হ্যারি ও জ্যাক সাধ্যাতীত প্রয়াস চালাতে লাগল।

শেষপর্যন্ত বহু আকাঙ্ক্ষিত বিয়ের তারিখ এল। ইতিমধ্যে সিলফ্যাক্স-এর দিক থেকে আর কোনোই প্রতিহিংসার লক্ষণ প্রকাশ পেল না।

হ্যারি ও নেল-কে নিয়ে সাইমন পরিবার গির্জার দিকে নৌকাযোগে যাত্রা করল। তাদের নৌকাটা যখন গির্জা থেকে মাইলখানেক দূরে ঠিক তখনই আচমকা ভাঙা একটা পাথরের ফাঁক থেকে উল্কার বেগে ছোট্ট একটা নৌকা বেরিয়ে এল। নৌকার গলুইয়ে ছিপছিপে গড়নের এক বুড়ো সোজাভাবে দাঁড়িয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো পোশাকে ঢাকা। মাথায় একরাশ কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা রুক্ষ পাকা চুল আর শনপাটের মতো সাদা দাড়িগুলো বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। তার হাতে একটা সেফটি ল্যাম্প।

পাতালপুরী কাঁপিয়ে বুড়ো সিলফ্যাক্স বিকট আর্তনাদ করে উঠল, 'ফায়ার ড্যাম্প! ফায়ার ড্যাম্প! সব ধ্বংস হয়ে যা! ছারখার হয়ে পাতালপুরীর অন্ধকার খনিতে ছড়িয়ে যা। ধ্বংস হয়ে যা।'

সিলফ্যাক্স-এর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বাতাসবাহিত কার্বোরেটেড হাইড্রোজেনের গন্ধ সবার নাকে আসতে লাগল।

একটু আগে বিশালায়তন চাতালটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছিল। তার ফাঁক দিয়ে বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে কনির সর্বত্র ছড়িয়ে যেতে লাগল। জেমস স্টারও অন্যান্য নৌকা-যাত্রীরা মৃত্যুভয়ে মুষড়ে পড়লেন। খনি ছেড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা পাগলের খেয়ালমাত্র। পালাবেই বা কি করে? ক্রোধোন্মত্ত সিলফ্যাক্স পথ আগলে দাঁড়িয়ে। তার চোখে মুখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলজ্বল করছে। আর বিশালায়তন হিংস্র পেঁচা হারফাঙ তার মাথার ওপর দিয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে উড়ে বেড়াচ্ছে।

সবাই প্রমাদ গনল। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এতগুলো মানুষ সিলফ্যাক্স-এর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ দেবে। কারোর সাধ্য নেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পায়।

জ্যাকরিয়ান আচমকা নৌকা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার উদ্দেশ্য ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা ঘটার আগেই ক্রোধোন্মত্ত বুড়োর সিফল্যাক্স-এর নৌকায় হাজির হবে।

জ্যাকরিয়ানকে উদ্ভ্রান্তের মতো সাঁতার কেটে এগিয়ে যেতে দেখেই সিলফ্যাক্স অকস্মাৎ ডেভিল্যাম্পের কাচটা দুম করে ভেঙে দিল।

www.pathagar.com

ভয়ঙ্কর সে মুহূর্ত আসন্ন! মৃত্যুভয়ে কাতর সবাই চোখ বন্ধ করে ইষ্টনাম জপ করতে লাগল।

সিলফ্যাক্সের ডাকে অতিকায় পেঁচা হারফাঙ বাতাসের বেগে উড়ে এসে ভাঙা ডেভি ল্যাম্পের জ্বলন্ত সলতেটা ছোঁ মেরে নিয়ে উড়ে চলল। এমন সলতে ব্যবহার করে সে এর আগেও বহুবার খনিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

ব্যাপার সঙ্গীন দেখে নেল গলা ছেড়ে হারফাঙ-এর নাম ধরে ডাকতে লাগল। নেলের গলা শুনে সে কর্তব্য ভুলে গিয়ে আচমকা মুখের সলতেটা মুখ থেকে ফেলে দিল। নেলকে পেয়ে সে যেন আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে। সে আহ্লাদে গদ গদ হয়ে নেলের মাথার ওপরে হাল্কা ভাবে ডানা ঝাপ্টাতে লাগল। এদিকে দরজায় কড়া নাড়ছে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সিলফ্যাক্স ছুটে গিয়ে আচমকা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

জ্যাকরিয়ান ইতিমধ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে সাঁতার কেটে সিলফ্যাক্স-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

পরিস্থিতি ভয়াবহ অনুমান করে নেল বিকট স্বরে আর্তনাদ করে উঠল, 'বাঁচাও! বাঁচাও! বাঁচাও! জ্যাককে বাঁচাও?'

না, জ্যাকের কোনো বিপদই ঘটল না। আসলে প্রতিহিংসাপরায়ণ সিলফ্যাক্স তীব্রস্বরে গর্জন করতে করতে সেই যে জলে ঝাঁপ দিল সেখান থেকে আর উঠল না। সে আতঙ্কে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করল। জীবন্ত সলিলসমাধি।

শুভ মুহূর্তে হ্যারি আর নেল-এর বিয়ে হয়ে গেল। তারা বুড়ো সাইমনের কটেজেই সুখে দাম্পত্যজীবন যাপন করতে লাগল।

বুড়ো সিলফ্যাক্স পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। তার বিয়োগ-ব্যথা নেলকে চরম মর্মাহত করে। সে অতিকায় পেঁচা হারফাঙকে নিজের কাছে রাখতে চাইল। পারল না। সে তার প্রভু সিলফ্যাক্সের মতোই সভ্য মানবসমাজ থেকে দূরে থাকতেই আগ্রহী। সে বিষণ্নমনে মালকম হ্রদের দিকে সেই যে উড়ে গেল আর কোনোদিনই মানুষের সংস্পর্শে আসে নি। তার বয়স কত হয়েছে কেউ জানে না আর কতদিনই বা সে পৃথিবীর বুকে থাকবে তাও সবার ধ্যানধারণা বহির্ভূত। তবে মালকাম হ্রদের শান্ত জলরাশির ওপর দিয়ে অনেকেই তাকে মাঝেমধ্যে উড়তে দেখে। বিষণ্নতার প্রতিমূর্তি হাড়ফাঙের চোখ দুটো হন্যে হয়ে কাকে খোঁজে? তার অতিবৃদ্ধ প্রভু সিলফ্যাক্সকে কি? হয়ত-বা তাই সত্য।

—

www.pathagar.com

এরাউন্ড দ্য ওয়ার্লড ইন এইটটি ডেজ

আঠার শতকের শুরুর কথা।

ফিলিয়াস ফগ ছিলেন রিফর্ম ক্লাবের সদস্য। ভদ্রলোকটি ছিলেন একজন যথার্থই ধনকুবের। কিন্তু কী করে যে তিনি এই অগাধ অর্থ উপার্জন করেছেন সাধারণের কাছে সত্যই এক মহারহস্য। তিনি দুই হাতে টাকা আয় করতেন, কিন্তু খরচ কম। কথাও বলতেন কম, মেপে মেপে। তাঁর সংযম ছিল অনুকরণযোগ্য। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে তাঁকে কৃপণও বলা যাবে না। কেন না তাঁর দানের পরিমাণ ছিল অসীম। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, খুবই সময়ের মূল্য দিতেন। ঘিড়ের কাঁটা ধরে প্রতিটি কাজ করে যেতেন।

ফগের ভূগোল-বিষয়ে জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। আর এরই ফলে পরিচিত মহলের ধারণা ছিল, তিনি বহু দেশ বিদেশে ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু অত্যাশ্চর্য ব্যাপার যে, তিনি ভুলেও কোনোদিন লন্ডনের বাইরে পা দেন নি।

নেশা? না, বাজি রেখে তাস খেলা ছাড়া ফগ আর কোনো নেশারই বশীভূত ছিলেন না। তবে তাস খেলায় তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। বাজি জিতে পকেট ভারী না করে কোনোদিনই বাড়ি ফিরতেন না। কিন্তু লব্ধ টাকার একটা কানাকড়িও নিজে ভোগ করতেন না, নিঃশেষে দান করে দিতেন।

এতবড় দুনিয়ায় ফগ সম্পূর্ণ একা। আপন বলতে তাঁর কেউই ছিল না। কস্মিনকালেও তাঁর বাড়িতে কেউ যেত না। সারাদিনে মাত্র ঘণ্টা-দশেক তিনি বাড়ি থাকতেন। জেমস নামে এক ভৃত্য তাঁর অবর্তমানে বাড়ি সামলে রাখত, তাঁর পরিচর্যা করত। একদিন ঘটল এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। জেমস তাঁকে দাড়ি কামানোর জন্য যে জল দিয়েছিল তার উষ্ণতা ছিয়াশি ডিগ্রি না হয়ে চুরাশি ডিগ্রি হয়ে গিয়েছিল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে তাকে চাকরি হারাতে হয়।

ফিলিয়াস ফগের বিচিত্র ধরনের একটি ঘড়ি ছিল। তাতে ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড তো বটেই, বারের নাম, মাসের নাম, বছর পর্যন্ত নির্দেশ করত। ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারটা বাজলে তিনি ক্লাবের উদ্দেশে পা বাড়াতেন।

একদিন বছর ত্রিশের এক ফরাসি যুবক ফিলিয়াস ফগের ঘরে ঢুকল। যুবকটি যথোচিত অভিবাদন করে জানাল, তার নাম জাঁ—জাঁ পাসোপার্তু। সে এও জানাল, কিছুদিন রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়িয়েছে, এক সার্কাসের দলের সঙ্গেও ঘুরে বেড়িয়েছে, কিছুদিন এক কুস্তির আখড়ায় মাতব্বরিও করেছে। সব শেষে সে নাকি প্যারির রেলের ফায়ারম্যানের কাজেও নিযুক্ত ছিল। পাঁচ বছর হল ফ্রান্স ছেড়ে এসেছে। ইংল্যান্ডে এসে এক ভদ্রলোকের বাড়ি কাজ করেছিল, পোষায় নি। কাজের আশায় ফগের শরণাপন্ন হয়েছে।

ফিলিয়াস ফগ তার সার্টিফিকেটগুলো দেখে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। তোমার সততার কথা জানলাম। কিন্তু চাকরির শর্তগুলো তোমার জানা আছে কী?'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ, স্যার।'

'ভালো কথা। এখন কয়টা বাজে, বলো তো?'

পাসোপার্তু পকেট থেকে ঘড়ি বের করে বলল, 'এগারটা বাইশ'।

'না, মোটেই না। তোমার ঘড়ি স্লো। চার মিনিট স্লো। এটা অবশ্য তেমন সমস্যা নয়। শুধরে নিলেই চলবে। মনে থাকে যেন। ১৮৭২ সালের ২ অক্টোবর বেলা ১১.২৬ মিনিটে, তুমি আমার কাজে বহাল হলে।'—কথা কটা কোনোরকমে তার দিকে ছুড়ে দিয়ে ফগ ঘরে থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পাসোপার্তু কয়েক মিনিটের পরিচয়েই বুঝে নিয়েছে, ফগ দারুণ সময় মেনে চলেন। অহেতুক সময় নষ্ট করা ও প্রয়োজন ছাড়া কোনো কাজও করেন না। একটা মাত্র কথায় কাজ মেটার সম্ভাবনা থাকলে ভুলেও দ্বিতীয় কথা উচ্চারণ করেন না। সোজা পথে কম সময়ে কোথাও যাওয়া গেলে অতিরিক্ত এক পাও হাঁটতে রাজি নন তিনি। কোনো কাজে হাত দিলে শেষ না করে স্বস্তি পান না। প্রতিটা মুহূর্ত নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। সাতে পাঁচে নাক গলানো তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

পাসোপার্তু? মানুষ হিসাবে সেও ভালোই বলা চলে। দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত। কয়েকটা দিন গায়ে একটু হাওয়া লাগানোর জন্যই সে ফগের বাড়ি কাজ নিয়েছে।

পাসোপার্তু এ ঘর ও ঘর ঘুরে কাজ বুঝে নিয়ে নিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকল। ঘরটা ভালোই দেখল, দেয়ালে টাঙনো একটি বোর্ডে পরিচারকের প্রাত্যহিক কাজের ফিরিস্তি লেখা রয়েছে। পাসোপার্তু ওটায় একবারটি চোখ বুলিয়ে নিল—সকাল আটটা তেইশে প্রাতঃরাশ, নয়টা সাঁইত্রিশে দাড়ি কামানোর গরম জল, পৌনে দশটায় স্নানের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

হুইস্ট খেলার জন্য বন্ধুরা এক এক করে তাঁর বাড়ি হাজির হতে লাগলেন। আঁদ্রে স্টুয়ার্ট, জন সলিভান, স্যামুয়েল ফলেন্তিন, টমাস ফ্ল্যানাগেন, তার ব্যাঙ্কের অন্যতম অধিকর্তা গথিয়ার র‍্যালফ—সবাই ফগের বন্ধু, নামকরা হুইস্ট খেলোয়াড়।

খেলার ফাঁকে তাঁরা সমানতালে বাক্যালাপও চালাচ্ছিলেন। র‍্যালফ বললেন, 'এই যে বিরাট ডাকাতিটা হয়ে গেল, কিছু হদিশ পাওয়া গেছে কি?'

'কি আর পাওয়া যাবে, বলুন। ব্যাঙ্কের টাকাগুলো মার গেল।' স্টুয়ার্ট বললেন।

র‍্যালফ দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করলেন, 'আমার বিশ্বাস, চোর অবশ্যই ধরা পড়বে। পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলোতে আমাদের ডিটেকটিভরা ছড়িয়ে রয়েছে। বন্দরগুলোতেই খবর পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এদের চোখে ধুলো দেয়া এত সহজ নয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—টাকাটা যে হাতিয়েছে, সে মোটেই চোর নয়।

'এ কী বলছেন জনাব। যে লোক সাড়ে আট লক্ষ টাকার নোট নিয়ে কেটে পড়তে পারে, তাকে চোর বলব না?'

ফগ খবরের কাগগ থেকে মুখ তুলে বললেন, 'এই তো মর্নিং ক্রনিকলে পরিষ্কার লেখা রয়েছে, নোটগুলো যে নিয়েছে তিনি নাকি যথার্থই এক ভদ্রলোক।'

ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর র‍্যালফ ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, 'ক্যাসিয়ার ভদ্রলোকের এতে তিলমাত্র দোষও নেই। সে তখন মাথাগুঁজে হিসাব মিলাচ্ছিলেন।'

www.pathagar.com

যাঁরা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে আসেন কর্তৃপক্ষ তাদের কোনো সন্দেহই করেন নি। টাকাকড়ি ও হিরে মুক্তো পরীক্ষা করে কর্মচারীরা যথাস্থানে রেখে দেয়। কিন্তু সেদিন যিনি নোট জমা নিয়েছিলেন, যথাস্থানে রাখেন নি। পাঁচটায় ব্যাঙ্ক বন্ধ করার সময় প্রথম জানা গেল, ব্যাঙ্কের সাড়ে আট লাখ টাকা চুরি গেছে।

খবরটা চাউর হতে না হতেই চাদিকে ডিটেকটিভরা ছুটোছুটি জুড়ে দিল। ইংল্যান্ডে ঘোষণা করা হল টাকাগুলো উদ্ধার করতে পারলে ত্রিশ হাজার টাকা পুরস্কার তো পাবেই, উপরন্তু যে পরিমাণ টাকা ফিরে পাওয়া যাবে তার ওপর শতকরা ত্রিশ টাকা হিসেবে কমিশন দেয়া হবে।

মর্নিং ক্রনিকল কাগজের বক্তব্য, ঘটনার দিন ভদ্রবেশী এক সুপুরুষকে সেদিন নোট পরীক্ষা করে নিতে দেখা গিয়েছিল। সুযোগ বুঝে খবরের কাগজগুলো হৈ চৈ জুড়ে দিল।

ব্যাঙ্কের ডিরেকটর র‍্যালফের দৃঢ় বিশ্বাস, পুরস্কারের লোভে ডিটেকটিভরা চোর ধরে ফেলবেই।

স্টুয়ার্ট বললেন, 'আমার বিশ্বাস, চোরটি মহা ধড়িবাজ। সবার চোখে ধুলো দিয়ে সে পালিয়েই যাবে।'

'হ্যাঁ, পালাতে চেষ্টা তো করবেই—পালিয়ে যাবে কোথায়?' র‍্যালফ বললেন।

'এত বড় দুনিয়ায় তার জায়গা হবে না?'

ফিলিয়াস ফগ এবার মুখ খুললেন, 'দেখুন জনাব, আজকের দিনে পৃথিবীটা আর বড় নেই। পৃথিবীটা চক্কর মেরে আসতে আজ যে সময় লাগে, আগে তার দশগুণ সময় লাগত। তাই বলছিলাম, তাড়াতাড়িই চোরকে ধরে ফেলা যাবে।'

স্টুয়ার্ট ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'আজ তিন মাসে পৃথিবীটা ঘুরে আসা যায় বলে নিশ্চিন্তে হাত গুটিয়ে থাকতে বলছেন।'

'তিন মাস তো খুবই বেশি জনাব—মাত্র আশি দিনে পৃথিবীটা চক্কর মেরে আসা যায়।'

ফগকে সমর্থন করতে গিয়ে সলিভান মন্তব্য করলেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। মর্নিং ক্রনিকলও একই কথা লিখেছে, দেখুন—মঁসেনিস ও ব্রিন্দিস হয়ে রেল ও স্টিমারে লন্ডন থেকে সুয়েজ সাতদিন। স্টিমারে সুয়েজ থেকে বোম্বাই তের দিন, রেলে বোম্বাই থেকে কলকাতা তিনদিন লাগবে। এবার কলকাতা থেকে হংকং স্টিমারে তেরদিন, স্টিমারে হংকং থেকে ইয়োকোহামা ছয়দিন, স্টিমারে ইয়োকোহামা থেকে সানফ্রান্সিসকে বাইশ দিন। এবার সানফ্রান্সিসকো থেকে লন্ডন আসতে সময় লাগবে নয় দিন—সাকুল্যে আশি দিন লাগবে।'

'হ্যাঁ, হিসাবে আশিদিনই হচ্ছে বটে। কিন্তু ঝড়-তুফান, জাহাজডুবি, রেল-দুর্ঘটনা—এগুলো যাবে কোথায়? এসব তো আশি দিনের বাইরে।'

'না মোটেই বাইরে নয়। সবকিছু ধরেই আশি দিন হিসাব করা হয়েছে।'

বিদ্রূপের সুরে স্টুয়ার্ট বলে উঠলেন, 'তাই যদি হয় তবে আপনিই একবারটি পৃথিবী পরিক্রমা করে দেখান না জনাব। আশি দিনে ফির আসতে পারলে নগদ ষাট হাজার টাকা বকশিস পাবেন, আমি দেব।'

'ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি রওনা দিতে প্রস্তুত। তবে আগেই বলে নিচ্ছি, সব খরচ কিন্তু আপনাকে বহন করতে হবে।'

www.pathagar.com

'দেখুন মি. ফগ একবার যখন ষাট হাজার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তখন কথার নড়চড় অবশ্যই হবে না।'

'ঠিক আছে, আমিও এত সহজে দমছি না। বেরিং-এর গদিতে আমার তিন লাখ টাকা জমা রয়েছে, পুরোটাই বাজি রাখছি।'

ফগের কথায় সলিভান রীতিমত হায় হায় করে উঠলেন, 'পাগল হলেন নাকি জনাব! রাস্তায় কত সব বিপদ আপদ ওঁত পেতে থাকে। আশি দিনে সম্ভব না' হওয়াটাই স্বাভাবিক। ঝোঁকের মাথায় কাজ করতে গিয়ে সব কিছু খুইয়ে দেউলে হবেন নাকি?'

'দেখুন আমি সব দিক ভেবে চিন্তেই বলছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস চোখ কান খুলে পথ চললে অদৃষ্টপূর্ব কিছু তো ঘটেই না, বরং আশি দিনের আগেই পৃথিবী চক্কর মেরে ফিরে আসা সম্ভব। আর একটা কথা মনে রাখবেন, প্রকৃত ইংরেজ বাজি রেখে রসিকতা করে না। আমি আশি দিনের মধ্যেই আবার একানে ফিরে আসব, আপনারা রাজি আছেন কি না, বলুন?'

অন্যান্য সবাই পরামর্শ করে সম্মতি দিলেন।

'ভালো কথা, রাত পৌনে নটায় ডোভার মেল ছাড়ে। আমি ওই ট্রেনেই যাত্রা শুরু করছি। আজ ২ অক্টোবর বুধবার। ২১ ডিসেম্বর শনিবার রাত পৌনে নয়টার মধ্যেই এখানে ফিরে আসছি। এই নিন, তিন লাখ টাকার চেক। আমি যথা সময়েই পৃথিবী ঘুরে আসতে না পারলে, পুরো টাকাটাই আপনাদের পকেটে যাবে।'

সেখানেই শর্ত উল্লেখ করে দলিল তৈরি হয়ে গেল। উভয় পক্ষই দলিলে স্বাক্ষর করলেন। সাক্ষী সাবুদ তো নিকটেই, কোনো অসুবিধা হয় নি।

রাত তখন সোয়া সাতটা। ফগ তাস খেলা ছেড়ে উঠে পড়লেন। ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরে যাত্রার জন্য তৈরি হতে ঘণ্টাখানেক সময়ে তো লাগবেই।

ফগ বাড়ি ফিরে পাসোপার্তুকে ভ্রমণের কথা পাড়তেই সেও এক কথায়ই রাজি হয়ে গেল, দেশভ্রমণের এতবড় সুযোগটা হাতছাড়া করার পাত্র সে নয়। তবে ব্যাপারটাকে সে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারল না। আশি দিনে পৃথিবী ঘুরে আসা। তার জন্য আবার তিন লাখ টাকা বাজি। তবে কি তাঁর পাগলের বাড়িতে চাকরি হল। শেষে এই ভেবে মনকে আশ্বাস দিল টাকা তো আর তার নয়, মালিক ফগের। গৌরি সেনের টাকা যাবে, তার ভাবনা কী?

রাত তখন ঠিক আটটা। পাসোপার্তু জিনিসপত্র গোছগাছ করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। ফগও তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে 'ব্রাডশ' ও কন্টিনেন্টাল গাইড বুক'। তিনি পকেট থেকে একটি নোটের গোছা বের করে পাসোপার্তুল ব্যাগে গুঁজে রাখতে রাখতে বললেন—ব্যাগটা সাবধানে রাখবে, তিন লাখ টাকার নোট রাখলাম।'

পাসোপার্তু চোখ দুটো কপালে তুলে বলল, 'তিন লাখ টাকার নোট।'

কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকতা বজায় রেখেই ফগ বললেন, 'পথে কখন কী ঘটে বলা যায় না। সঙ্গে টাকা একটু বেশি রাখা ভালো।'

রিফর্ম ক্লাবের সভ্যরা ফগকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে স্টেশনে এসেছেন।

www.pathagar.com

ফগ তাদের দেখেই বলে উঠলেন, 'এই দেখুন আমি সত্য সত্যই রওনা হচ্ছি। আমার পাসপোর্টে কনসালের সই দেখলে আশা করি আপনাদের আর সন্দেহ থাকবে না?'

র‍্যালফ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'সে কি জনাব। আমনার পাসপোর্ট দেখার দরকার কী? আপনার মুখের কথার দামই আমরা বেশি দিয়ে থাকি।'

রাত পৌনে নয়টায় ডোভার মেল বিশ্রী সুরে গোঙাতে গোঙাতে প্লাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে চলল।

মি. ফিক্স ডিটেকটিভ

বিচিত্র ধরনের এই বাজির কথা খবরের কাগজগুলো রীতিমতো ফলাও করে ছাপাল। ব্যস, আর যাবে কোথায়? ব্যাপারটা নিয়ে ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডে একেবারে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। হোটেল রেস্তোরাঁয় হাটে বাজারে রাস্তাঘাটে সর্বত্র এই দুংসাহসিক পৃথিবী পরিক্রমণা নিয়ে কত সব জল্পনাকল্পনা শুরু হয়ে গেল। অধিকাংশ লোকের মত—ফগের পরাজয় নিশ্চিত। আশি দিনের মধ্যে পৃথিবী ঘুরে আসার চিন্তা নিছক পাগলামি ছাড়া কিছু নয়।

পত্রপত্রিকাগুলোও সমস্বরে ফিলিয়াস ফগের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের কথা ব্যক্ত করল। রিফর্ম ক্লাবের সদস্যদেরও কেউই ছেড়ে কথা বলল না। তাদের উন্মাদ আখ্যায় ভূষিত করল।

ইল্যাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ প্রথম পাতায় বেশ বড় করে ফিলিয়াস ফগের ছবি ছাপল। এতে কিন্তু দেশের অনেক মহিলাই ফগকে সমর্থন করলেন।

রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি পত্রিকা বিরাট এক প্রবন্ধ ছাপাল। এর সারমর্ম হল—ফিলিয়াস ফগ উন্মাদ। আশি দিনে পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়ে তিনি লোকের হাসির পাত্র হলেন। প্রবন্ধটি বিলেতের সবকটা কাগজেই ফলাও করে পুনর্মুদ্রণ করল। সবার একই মত—ফিলিয়াস ফগ উন্মাদ। এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেকেই নিজেদের মধ্যে বহু টাকা বাজি ধরেছিল। কাগজগুলোর মন্তব্য পড়ে সবাই বাজি তুলে নিল। সাতদিনের মধ্যেই এক পক্ষ একেবারে নেতিয়ে পড়ল।

একদিন ঘটল এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বড় সাহেব নিচের টেলিগ্রাফটা হাতে পেলেন, "ব্যাঙ্কের নোট—চোর ফিলিয়াস ফগের খোঁজ পেয়েছি। তাকে বোম্বাইয়ে গ্রেফতার করার জন্য পরোয়ানা দরকার"—ডিটেকটিভ ফিক্স।

খবরটা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যে ফগ জনমানসে দস্যুতে পরিণত হয়ে গেলেন। কেউ কেউ একথাও বলাবলি করতে লাগল—ব্যাঙ্কের টাকাটা হাতে পড়ায় ফগ দেশভ্রমণের ছুতো করে গা ঢাকা দেয়ার চাল চেলেছিল। কী সাংঘাতিক লোক রে বাব্বা!

যতগুলো জাহাজ সুয়েজ দিয়ে যাতায়াত করে তাদের মধ্যে পি. এন্ড. ও. কোম্পানির মঙ্গোলিয়াই দ্রুতগামী। নয়ই অক্টোবর বুধবার মঙ্গোলিয়া সুয়েজ বন্দরে নোঙর করার কথা। তাই জাহাজ ঘাটে আগেভাগেই লোক এসে ভিড় জমিয়েছে। দুজন কেতাদূরস্থ ভদ্রলোক একটু ফাঁকায় ফাঁকায় পায়চারি করছেন। তাদের একজন সুয়েজের ইংরেজ কনসাল। আর দ্বিতীয়জন ফিক্স, খ্যাতনামা ডিটেকটিভ। ব্যাঙ্ক ডাকাতকে কবজা করার জন্য সুয়েজ বন্দরে পাঠান হয়েছে।

www.pathagar.com

ফিক্স কথা প্রসঙ্গে কনসাল ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, 'একটা কথা, মঙ্গোলিয়া কী সব সময়ই ব্রিন্দিসি থেকে আসে?'

'হ্যাঁ। ওখান থেকেই ভারতবর্ষের ডাক ওঠে। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, ব্যাঙ্ক ডাকাতকে যে আপনি ধরতে এসেছেন, দেখলে কি তাকে চিনতে পারবেন?'

'দেখুন জনাব, কোনো কোনো সময় এমনও তো হয় চোখে না দেখলেও গায়ের গন্ধে মানুষ চেনা যায়। নচ্ছারটা যদি এ জাহাজে এসেই থাকে, আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না জেনে রাখবেন। ওর মতো ধড়িবাজ চোর আজকাল যদিও বড় একটা দেখা যায় না। ছিঁচড়ে চোরের উৎপাতই বেশি।'

জাহাজ আসতে দেরি করায় অপেক্ষমান যাত্রীরা ক্রমেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। ফিক্স ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কনসাল ভদ্রলোককে বললেন, 'যা ব্যাপার দেখছি জাহাজ হয়ত আসবেই না।'

'মনে হয় আর দেরি করবে না, কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বে।' কনসাল একপলকে ঘড়িটা দেখে নিয়ে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন।

'ভালো কথা, জাহাজ এখানে কতক্ষণ নোঙর করবে, বলুন তো?'

'চার ঘন্টা। আপনি যথেষ্ট সুযোগ পাবেন।'

কয়েক মিনিট পরেই ঘন ঘন সিটি শোনা গেল। ঠিক এগারোটায় মঙ্গোলিয়া নোঙর করল।

জাহাজটা যাত্রী বোঝাই। যাত্রীদের কেউ কেউ ডেকে দাঁড়িয়ে বন্দরের দৃশ্য দেখতে লাগল, কেউ বা নৌকায় চড়ে তীরে এল। ডিটেকটিভ ফিক্স একপাশে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। ব্যাঙ্ক ডাকাতের খোঁজে তিনি যখন হাঁইফাঁই করছেন ঠিক তখনই এক ভদ্রলোক এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল। ছোট করে জিজ্ঞেস করল, 'জনাব, কনসাল অফিসটা কোথায় বলতে পারেন?' কথা বলতে বলতে আগন্তুক পকেট থেকে একটা পাসপোর্ট বের করে বলল, 'পাসপোর্টটায় কনসালের সই নিতে ইচ্ছুক।'

ফিক্স আগন্তুকের হাত থেকে পাসপোর্টটা নিলেন। একটিবার চোখ বুলিয়েই আঁতকে উঠলেন—কী সাংঘাতিক ব্যাপার। এ যে সেই ব্যাঙ্ক-ডাকাতের পাসপোর্ট। ছবিটাও যে সেই ডাকাতেরই।

তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন, 'এটা কার পাসপোর্ট? এটা তো তোমার নয়।'

আগন্তুক নির্দ্বিধায় উত্তর দিল, 'না। আমার মনিবের পাসপোর্ট। তিনি জাহাজে রয়েছেন। আমাকে বললেন সই করিয়ে আনতে।'

'তুমি কন্‌সাল-অফিসে গেলে কাজ হবে না। তাঁকেই যেতে হবে। সামনে ওই যে বড় বাড়িটা দেখছ, ওখানেই অফিস।'

আগন্তুক মুখ কাচুমাচু করে বলল, 'তবে যাই, তাঁকেই পাঠাই। কথা বলতে বলতে সে জাহাজের দিকে হাঁটা জুড়ল।'

ফিক্স ব্যস্ত হয়ে কন্‌সালের ঘরে ঢুকলেন। সসম্ভ্রমে নিবেদন করলেন, 'দেখুন, ব্যাঙ্ক-ডাকাত মঙ্গোলিয়াতেই রয়েছে।' এবার ব্যাপারটা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

কনসাল বললেন, 'দেখাই যাক না, কী হয়। লোকটা যদি সত্যিই সেই ব্যাঙ্ক-ডাকাত মঙ্গোলিয়াতেই রয়েছে।' এবার ব্যাপারটা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

www.pathagar.com

'সে যা-ই হোক, যদি আসে কিছুতেই আপনি পাসপোর্টে সই করবেন না। লন্ডন থেকে যতক্ষণ না ওয়ারেন্ট পাচ্ছি ততক্ষণ তাকে এখানেই আটকে রাখতে হবে।'

'দেখুন, এটা হল আপনার ব্যাপার। আমার সামনে পাসপোর্ট এগিয়ে দিলে, সই আমাকে দিতেই হবে।'

তাদের কথা চলাকালীনই দরজার কড়া বেজে উঠল। কনসালের নির্দেশে দ্বাররক্ষী দুজন অপরিচিত লোককে ঘরে নিয়ে এলেন। তাদের মধ্যে একজন তাঁর টেবিলে একটি পাসপোর্ট মেলে ধরে সই চাইলেন।

কনসাল পাসপোর্টটার গুটি কয়েক পাতা উল্টে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—'আপনার নামই কি ফিলিয়াস ফগ? আর এই বা কে?'

'হ্যাঁ, আমিই ফিলিয়াস ফগ। এ আমার ভৃত্য। নাম জাঁ পাসোপার্তু।'

'আপনি তো দেখছি লন্ডন থেকে আসছেন, কোথায় যাবেন?'

—'বোম্বে যাব। আমি এখানে এসেছি আপনার সই-এ তার প্রমাণ রাখার ইচ্ছা।'

কনসাল আর অযথা কথা না বাড়িয়ে পাসপোর্টে সই করে দিলেন। পাসপোর্টটা পকেটে রাখতে রাখতে আগন্তুক কনসালকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

ফিলিয়াস ফগ বিদায় নিলে ডিটেকটিভ ফিক্স বললেন, 'কী বুঝলেন বলুন তো জনাব? তবে তাঁর ভৃত্যের কাছ থেকে সত্য কথাটা আদায় করতে অসুবিধা হবে না। আপনি হয়ত লোকটাকে নিরাপরাধ ভালোমানুষ মনে করতে পারেন। কিন্তু একটা কথা, ব্যাঙ্ক-ডাকাতের চেহারার সঙ্গে লোকটার চেহারার হুবহু মিল আছে বলে মনে হচ্ছে, কী বলেন?'

'হ্যাঁ মিল আছে। কিন্তু চেহারা সর্বদা—'

ফিক্স তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখছি, কী করা যায়। তার ভৃত্যের সঙ্গে কথা বললেই সব বেরিয়ে আসবে।' কথা কটা কোনোরকমে শেষ করে তিনি পাসোপার্তুর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

পাসোপার্তুকে কয়েকটা খুচরো কাজের ভার দিয়ে ফগ জাহাজে ফিরে গেলেন। তাঁর দিনলিপির পাতায় ২ অক্টোবর থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক দিনের জন্য আলাদা আলাদা স্থান নির্দিষ্ট ছিল। কোন মাসে কত তারিখে কী বারে এবং কয়টায় প্যারি, ব্রিন্দিসি, সুয়েজ, বোম্বাই প্রভৃতি জায়গায় পৌঁছোতে হবে, স্পটাক্ষরে লেখা ছিল। কত বেশি সময় বা কম সময় লাগছে তাও লিখে রাখছেন। একটা পাতায় লেখা ছিল, ২ অক্টোবর বুধবার রাত পৌনে নয়টায় লন্ডন থেকে রওনা। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা চল্লিশে প্যারি। শুক্রবার ৪ অক্টোবর সকাল দুটো পঁয়ত্রিশে মঁসিনেই-এর তুরিন শহরে আগমন। আটটা কুড়িতে তুরিন থেকে পুনর্যাত্রা। শনিবার ৫ অক্টোবর বিকেল চারটায় ব্রিন্দিসি, বিকেল পাঁচটায় মঙ্গোলিয়া জাহাজে রওনা। বুধবার ৯ অক্টোবর বেলা এগারটায় সুয়েজ বন্দরে আগমন।

ডিটেকটিব ফ্রিক্সের অনুসন্ধানপর্ব

জেটিতে ফিক্স পাসোপার্তুকে পেয়ে গেলেন। মুচকি হেসে ফিক্স তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে, তোমাদের পাসপোর্টের সইয়ের ব্যাপারটা মিটেছে কি? বোম্বাই যাচ্ছো না কি?'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ। এমন ঝড়ের মতো পথ পাড়ি দিচ্ছি যে, পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। এটা তো সুয়েজ, মানে আমরা এখন আফ্রিকায় রয়েছি। ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন তো জনাব কেমন তাজ্জব ব্যাপার! মনিবের নির্দেশে একজোড়া জুতো ও কয়েকটা জামা কিনে আনতে হবে। আসলে হঠাৎ করে রওনা দিতে হয়েছে কিছুই গোছগাছ করে আনতে পারি নি।'

'ঠিক আছে, আমিই তোমাকে বাজারে নিয়ে যাচ্ছি, চল। জাহাজ ছাড়তে দেরি আছে, সবে বারোটা বাজে অনায়াসে ফিরে আসতে পারবে।'

পাসপোর্তু পকেট থেকে বিরাট একটা ঘড়ি বের করে বলল, 'বারোটা বলছেন কি জনাব। আমার ঘড়িতে তো নয়টা বাহান্ন বাজে দেখছি।'

'এমনটা তো হবারই কথা। তোমার ঘড়িতে যে লন্ডনের সময় রয়েছে, সুয়েজের সময় আর লন্ডনের সময় তো এক হবে না। সুয়েজে বারোটা বাজলে লন্ডনের সময় হবে দশটার কাছাকাছি। যখন যেখানে যাবে, সে দেশের ঘড়ির সঙ্গে নিজের ঘড়িটা মিলিয়ে নেবে। তবেই ঠিক সময় জানতে পারবে।'

পাসোপার্তু সদম্ভে মন্তব্য করল, 'দরকার নেই, জনাব। আমার ঠাকুমার আমলের ঘড়ি কখনই ভুল সময় দিতে পারে না।'

'যাক, একটা কথা, ব্যস্ত হয়ে তো লন্ডন থেকে বেরিয়েছ। কিন্তু বোম্বে হয়ে কোথায় যাবে।'

'ব্যস্ত হয়ে তো নিশ্চয়ই। বুধবার রাত আটটায় ক্লাব থেকে ফিরে মনিব বললেন, 'ব্যাগ গোছাও, এক্ষুনি গাড়ির জন্য ছুটতে হবে।' আসলে তিনি দুনিয়াটা চক্কর মারতে বেরিয়েছেন যে। মাত্র আশি দিনে পুরো দুনিয়াটা ঘুরে আসবেন বলে বাজি ধরেছেন।'

'বিচিত্র চরিত্রের লোক তো তোমার মনিবটি! ওনার টাকার পাহাড় আছে নাকি?'

'টাকার গোছা নিয়ে বেরিয়েছেন। নির্দিষ্ট সময়ের আগে বোম্বাই বন্দরে পৌঁছে দিতে পারলে মঙ্গোলিয়ান ইঞ্জিনম্যানকে পুরস্কার দেবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।'

ব্যাঙ্ক ডাকাতির পরপরই বাজির অছিলায় নোটের গোছা নিয়ে বেরিয়ে পড়ার ব্যাপারটাকে ফিক্স স্বাভাবিকভাবে নিতে তো পারলেনই না, বরং তাঁর মনের সন্দেহটাকে পাকা করে তুলল।

পাসোপার্তু জিজ্ঞেস করল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, বোম্বাই তো ভারতবর্ষে, এশিয়ায় তাই না? অনেক দূরের পথ বুঝি?'

'হ্যাঁ, দূর তো নিশ্চয়ই।' ফিক্স-এর মাথায় একটাই দুশ্চিন্তা চক্কর মারছে, শিকার হাতে এসেও ফস্কে যেতে বসেছে। ফিলিয়াস ফগ তুড়ি মেরে চোখের সামনে দিয়ে বোম্বাই পালাচ্ছে। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে কেন? পুরস্কারের টাকাটা শেষ পর্যন্ত মারই যাবে দেখা যাচ্ছে। ব্যাঙ্ক-ডাকাতকে ধরার উপায় নেই, দেরি করার সময়ও হাতে নেই।

কনসাল বললেন, 'কিন্তু কী করতে চাচ্ছেন?'

'টেলিগ্রাম করব। ওয়ারেন্ট পাঠাবার জন্য লন্ডনে টেলিগ্রাম করব। ওয়ারেন্টটা বোম্বাইয়ে এলেই চলবে। আমি এই জাহাজেই বোম্বাই যাচ্ছি। বোম্বাইয়ে ইংরেজের রাজত্ব, ব্যাঙ্ক-ডাকাতকে হাতকড়া পরাতে অসুবিধা হবে না।'

www.pathagar.com

মঙ্গোলিয়া বন্দর ছেড়ে এগিয়ে চলল। ফিক্স জাহাজে বোম্বাই যাচ্ছেন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে টেলিগ্রাম করেই জাহাজে উঠেছেন।

এডেন ও সুয়েজের মধ্যে দূরত্ব ১৩০০ মাইল। সাধারণ জাহাজের ১৩৮ ঘন্টা সময় লাগার কথা। কিন্তু মঙ্গোলিয়া যেভাবে উল্কার বেগে ছুটে চলেছে, যাত্রীদের বিশ্বাস, নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই সে এডেন বন্দরে ভিড়বে।

পাসোপার্তু আচমকা জাহাজের ডেকে ফিক্সের মুখোমুখি হতেই চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বলল, 'সে কী, আপনিও বোম্বাই যাচ্ছেন নাকি?'

'হ্যাঁ তোমাকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে ভালোই হল, গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।'

'একটা কথা? আপনি এর আগে কখনও বোম্বাই গিয়েছিলেন কি? লোকে বলে ভারতবর্ষ আজব এক দেশ, তাই কি?'

'ভারতবর্ষে অনেকবারই আমি গিয়েছি। আসলে আমি একসময় পি. অ্যান্ড ও কোম্পানির এজেন্ট ছিলাম। তুমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানতে চাইছ তাই না?' মুহূর্তের মধ্যে পুঁথিগত বিদ্যাটাকে একবার মনে মনে আওড়ে নিয়ে বললন, হ্যাঁ, ভারতবর্ষ সত্যই আজব দেশ। সেখানে মন্দির, মসজিদ আর মিনারের ছড়াছড়ি দেখতে পাবে। কত রকম সাপ সেখানে দেখা যায়, সে আর বলে শেষ করা যাবে না। কিন্তু তোমার মনিবকে তো কখনো ডেকে আসতে দেখি না? আমার বিশ্বাস, আশি দিনে পৃথিবী চক্কর মারার ব্যাপারটা নেহাতই একটা ধাপ্পা। এর পিছনে অবশ্যই কোনো জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লুকিয়ে আছে, তোমার কী মনে হয়?'

'আমি তো কদিনমাত্র কাজে যোগ দিয়েছি। এ-সবের কিছুই আমার জানা নেই। তাছাড়া জানার বিন্দুমাত্র কৌতূহল আমার নেই।' সেদিন ওই পর্যন্তই। পরে একটু সুযোগ পেলেই ফিক্স পাসোপার্তুকে ডেকে নিজের ক্যাবিনে নিয়ে যেতেন, মদ দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। উদ্দেশ্য ফগ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা।

মঙ্গোলিয়া মোসা ছাড়ল। ক্রমে বেবেলমন্ডও ছেড়ে চলল। এডেন বন্দরের উত্তরে অবস্থিত স্টিমার পয়েন্টকেও একসময় পিছনে ফেলে এগোতে লাগল। সেখানে থেকে বোম্বাই ১৬৫০ মাইল। পনের তারিখে এডেনে নোঙর করার কথা। চৌদ্দই অক্টোবর সন্ধ্যায়ই জাহাজ বন্দরে ভিড়ে গেল। ফিলিয়াস ফগের ষোল ঘন্টা সময় বেঁচে গেল। তিনি স্টিমার পয়েন্টে নেমে পাসপোর্টে সই করিয়ে নিলেন। ফিক্স কিন্তু আঠার মতো তাঁর পিছনে লেগেই রয়েছেন।

তখন সন্ধ্যা ছয়টা। জাহাজ নোঙর খুলল। ভারত মহাসাগরের উত্তাল-উদ্দাম ঢেউ কাটিয়ে মঙ্গোলিয়া দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল।

সঙ্কটমুহূর্তে

নির্দিষ্ট দিনের দুদিন আগেই ইঞ্জিনম্যান বোম্বাই বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়ে দিল। সন্ধ্যা আটটায় কলকাতার ট্রেন ছাড়ার কথা। পাসোপার্তুকে কয়েকটা দরকারি জিনিস কিনতে নির্দেশ দিয়ে ফগ নিজে চললেন কনসাল অফিসে। পাসপোর্টে সই করিয়ে সোজা রেলওয়ে স্টেশনে হাজির হলেন। পাসোপার্তু পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী স্টেশনেই তাঁর সঙ্গে মিলিত হল। সেখানেই উভয়ে নৈশ ভোজন সেরে নিলেন।

www.pathagar.com

ফিক্স জাহাজ থেকে নেমে কনসাল অফিসে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাঙ্ক ডাকাত ফিলিয়াস ফগের নামে কোনো ওয়ারেন্ট এসেছে কি?'

কনসাল জানালেন, 'কোন ওয়ারেন্ট আসে নি।'

ফিক্স হতাশ হলেও মাল ছাড়ার পাত্র নয়। পুলিশ কমিশনার জানালেন—তাঁর ওয়ারেন্ট দেবার অধিকার নেই। ওয়ারেন্ট দিতে হলে বিলেত থেকেই দেবে। অনন্যোপায় হয়ে বিলেতের ওয়ারেন্টের প্রত্যাশায়ই তাঁকে থাকতে হল। এই মুহূর্তে ফগকে ছায়ার মতো অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর কিছুই করার নেই।

ফিক্স ভেবেছিলেন, ফগ অবশ্যই কয়েকদিন বোম্বাইয়েই থাকবেন। কিন্তু অচিরেই তাঁর ভুল বাঙল। তিনি জাহাজ থেকে নেমে সোজা স্টেশনে গেলে তাঁর মন বিষয়ে উঠল। ওয়ারেন্ট এসে পৌঁছোলেও দেখা যাচ্ছে কোনো কাজে আসবে না।

পাসোপার্তু ফগের নির্দেশিত জিনিসপত্র কিনে বোম্বাইয়ের পথে পথে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল। জাঁকজমকপূর্ণ বোম্বাই তার চোখ ও মনকে মুগ্ধ করল। এখানে অন্তত দুটো দিনও থাকা হবে না শুনে ব্যথিত মর্মাহত হল। স্টেশনে আসতে গিয়ে সে মালাবার গিরিশৃঙ্গে একটা মনোমুগ্ধকর মন্দির দেখল।

হিন্দুমন্দিরে নিয়মকানুন তার জানা নেই। প্রথমত খ্রিস্টানরা সেখানে ঢুকতে পারে না। উপরন্তু জুতো পরে প্রবেশ নৈব নৈব চ। সে যখন কাঁটামারা বুটে গুরুগম্ভীর আওয়াজ তুলে মন্দিরের চত্তর দিয়ে হেঁটে ভেতরে ঢুকছিল তখন তিনজন বৃদ্ধ পুরোহিত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। বাজখাই গলায় দুর্বোধ্য ভাষায় বকাবকি করতে লাগল। ধরে প্রহার করতেও দ্বিধা করল না। পাসোপার্তু একসময় কোনোরকমে নিজেকে সামলে পিতৃদত্ত প্রাণটুকু নিয়ে স্টেশনের দিকে ছুটল। সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত অবস্থায় স্টেশনে হাজির হল। জামা-প্যান্ট ছেঁড়া, মাথায় টুপি নেই, পায়ের একপাটি জুতোও মন্দিরে ধস্তাধস্তির সময় কোথায় ছিটকে পড়েছে। ফগের জন্য কেনা জিনিসপত্রও কে যেন হাপিস করে দিয়েছে। ফিক্স ফিলিয়াস ফগের অনতিদূরে একটা মোটা থামের আড়ালে লুকিয়ে তাঁকে চোখে চোখে রাখছিলেন।

পাসোপার্তুর দুরবস্থার জন্য ফগ কিন্তু তাকেই দায়ী করলেন, বকাবকিও করলেন যথেষ্ট।

ফিলিয়াস ফগ যে ট্রেনে উঠলেন সেই ট্রেনেই জেনারেল স্যার ফ্রান্সিস কোমার্ট ছিলেন। জাহাজে ফগের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। ফগের পাগলামো দেখে ভদ্রলোক অবাক হলেন। দেশভ্রমণে বেরিয়ে তিনি জাহাজের ছোট খুপরিটাতেই কাটিয়েছিলেন। আবার বোম্বাই বন্দরে জাহাজ থেকে নেমে সোজা স্টেশনে, এদিক ওদিক ভুলেও ঘাড় ঘুরিয়ে একবারটি তাকালেন না। বিচিত্র প্রকৃতির দেশভ্রমণকারী। তাঁর বাজির ব্যাপারটাও হাসির উদ্রেক করে।

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে বিকট গর্জন করতে করতে ট্রেন কলকাতার দিকে এগোতে লাগল।

স্যার ফ্রান্সিস কথা প্রসঙ্গে বললেন—'মি. ফগ, আর কিছুদিন আগে হলে আপনার আশি দিনে পৃথিবী পরিক্রমার সাধ মিটে যেত। কারণ ট্রেন পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত চলত। ঘোড়া বা পাল্কি করে পথ পাড়ি দিতে হত।'

www.pathagar.com

'দেখুন, প্রবল ইচ্ছাশক্তির কাছে সামান্য বাধা টিকতে পারত না।'

'তার ওপর আপনার পাসোপার্তু মন্দিরে যে কাণ্ড বাধিয়েছিল, আপনাকে হয়ত তার জন্য অপেক্ষা—'

'কিছুতেই অপেক্ষা করতাম না। আমি আমার পথে এগিয়ে যেতাম। সে ছাড়া পেয়ে য়ুরোপে ফিরে যেত।'

পূর্ব আকাশে সূর্যদেব একটু একটু করে উঁকি দিতে লাগল। ট্রেনের বাইরের প্রান্তরে আলো-আঁধারীর খেলা চলছে। পাসোপার্তু কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় উঠে বসল। জানালা দিয়ে খেয়ালি প্রকৃতির খেলা দেখতে লাগল। মল্লিনাথ ইলোরা, ঔরংগাবাদ ছাড়িয়ে বেলা সাড়ে বারোটার কাছাকাছি বহরমপুর স্টেশনে ট্রেন থামল।

পাসোপার্তু জানলার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। রূপসী ভারতবর্ষ তার মনে পুলকের সঞ্চার করল। ফিলিয়াগ ফগের কেবল এগিয়ে যাবার চিন্তা লক্ষ করে তার ধারণা স্পষ্টতর হল—বাজির ব্যাপারটা সত্য। আশি দিনে পৃথিবী চক্কর মারার ব্যাপারটা নিয়ে সেও এখন ভাবিত। বোম্বাইয়ে মন্দির দেখতে গিয়ে যে ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসেছিল তাতেই দু-চারদিন সময় নষ্ট হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য ছিল না।

২২ অক্টোবর। সকাল আটটায় রোথাল থেকে পনের মাইল দূরে ট্রেনটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গার্ড সাহেব চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন—'সবাই নেমে পড়ো। এখানে ট্রেন বদল করতে হবে, নামো সবাই।'

গার্ড সাহেবের কথার অর্থ বুঝতে না পেরে ফিলিয়াস ফগ স্যার ফ্র্যান্সিসের মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টি ফেলে তাকালেন। পাসোপার্তুর চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। সে নেমে গিয়ে খবর নিয়ে এল।

'ট্রেন আর এগোবে না, পথ নেই।'

ব্যাপার বেগতিক দেখে ফিলিয়াস ফগ আর স্যার ফ্র্যান্সিস নেমে গার্ডের কাছে গেলেন। গার্ড জানালেন, এদিকে রেল লাইন তৈরি হয়নি, ট্রেন আর যাবে না।

'আমরা এখন কোথায়?'

'এটা খেলবি গাঁ। এখান থেকে এলাহাবাদ পঞ্চাশ মাইল। এ পথটুকুতে লাইন বসানো হয় নি।'

স্যার ফ্রান্সিস খেঁকিয়ে উঠলেন, 'ট্রেন যাবে না মানে? খবরের কাগজে লিখেছে। লাইন পাতা হয়ে গেছে। তাছাড়া টিকিটই বা দিল কেন?'

টিকিট সরাসরি কলকাতারই দেয়া হয়। যাত্রীরা সবাই জানে, খেলবি থেকে এলাবাহাদ নিজের ব্যবস্থায় যেতে হয়। এর বেশি আমার কিছু বলার নেই।'

অযথা সময় নষ্ট করা বোকামি ভেবে ফিলিয়াস ফগ বললেন, 'মি. ফ্র্যান্সিস, যে করেই হোক এলাহাবাদ তো যেতেই হবে। দেখা যাক, কিছু একটা উপায় বের করা যায় কি না?'

আক্ষেপসূচক শব্দ উচ্চারণ করে স্যার ফ্রান্সিস বললেন—'আপনার বাজি তো দেখছি এখানেই ইতি।'

'দেখুন, এসব আমি আগেই ভেবে রেখেছি। লাইন পাতা হয় নি, এ-কথা অবশ্য ভাবি নি। তবে হাজারো বাধাবিপত্তির মুখোমুখি যে হতে হবে সন্দেহ ছিল না। ব্যবস্থা

www.pathagar.com

কিছু একটা হবেই। ২৬ অক্টোবর দুপুরের আগে তো আর কলকাতা থেকে হংকং-এর জাহাজ ছাড়বে না। অন্য যাত্রীরা ব্যাপারটা জানত, আগেভাগেই এলাহাবাদ যাবার ব্যবস্থা করে রেখেছে।

পাসোপার্তু সত্যই করিতকর্মা ছেলে। বাইরে বেরিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা হাতির খোঁজ নিয়ে এল। সে ফগ স্যর ফ্রান্সিসকে নিয়ে হাতির মালিকের কাছে গেল। হাতির মালিক ফগকে হতাশ করল—হাতির নাকি গরম হয়েছে। হাতি ভাড়া দেবে না।

ফিলিয়াস ফগ কিছু হটার পাত্র নন। তিনি বললেন—'আমি চার শো টাকা ভাড়া দেব, কথা দিচ্ছি।'

'তা হোক গে। সাহেব, আপনারা বরং অন্য ফিকির খুঁজুন।'

'ঠিক আছে, ভাড়া নাই বা দিলে, বিক্রি করে দাও। আমি নগদ পনের হাজার টাকা দাম দিচ্ছি।'

হাতির মালিক এমন একটা ভাব নিয়ে তাকাল যেন কোন পাগলকে সে সামনে দেখেছে।

ফিলিয়াস ফগ আর কিছু দাম বাড়াতে ইচ্ছুক বুঝে স্যর ফ্রান্সিস বাধা দিয়ে বললেন, 'আর একটা পয়সাও নয়। এর চেয়ে অনেক কম দামে এখানে হাতি বিক্রি হয়।'

'কিন্তু জনাব, সময় নষ্ট করা যাবে না। এর ওপর তিন লাখ টাকার বাজি নির্ভর করছে। হাতিটা আমাকে যে পেতেই হবে।'

পনের হাজার থেকে বিশ হাজার। তারপরে পঁচিশ হাজার দাম হাঁকলেন। হাতির মালিক তবু মাথাগুঁজে বসে রইল। এবার ফগ এক ডাকে ত্রিশ হাজারে উঠে পড়লেন। হাতির মালিক আর লোভ করতে ভরসা পেল না। সাহেবের মন ঘুরে গেলে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। ত্রিশ হাজারে সে রাজি হয়ে গেল।

হাতির মালিকই একজন মাহুত ব্যবস্থা করে দিল। এখানকার পথঘাট পার্সি মাহুতটির খুবই পরিচিত সুবিধা হল। সে বড় রাস্তা ছেড়ে বন-জঙ্গলের পাশ দিয়ে চলল। এতে কুড়ি মাইল পথ সংক্ষেপ হওয়ায় ফগের খুবই সুবিধা হল। ঘন্টা দুই চলার পর তারা বুন্দেলখণ্ড পৌঁছলেন। সামান্যকিছু আহার বিশ্রাম সেরে আবার যাত্রা শুরু হল। বিশালদেহী হাতিটা দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়ায় পথচারী কয়েকজন উত্তেজিত হল। এমন একটা ভাব দেখাতে লাগল তারা যেন সুযোগ পেলেই দু' চার ঘা বসিয়ে দেবে। বলা বাহুল্য এরাই বুন্দেলখণ্ডের দস্যু। ফিলিয়াস ফগ কোনোরকমে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিলেন।

আবার যাত্রা শুরু হল। তখন প্রায় সন্ধ্যা গড়িয়ে এসেছে। বিন্ধ্যপর্বতের কয়েকটা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে একটা ভাঙাচোরা বাড়ির সামনে হাতি দাঁড়িয়ে পড়ল। ফিলিয়াস ফগ হিসেব করে দেখলেন অর্ধেক পথ আসা হয়েছে। পার্সি মাহুত হাতিটাকে পাশের একটা মোটা গাছে শেকল দিয়ে বেঁধে দিল। এবার সে শুকনো কাঠকুটো কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বালল। সবাই আগুনের চারদিকে গোল হয়ে বসে রাত কাটালেন। পথে দস্যুদলের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই এ-ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

ভোরের আলো ফুটতেই সবাই আবার হাতির পিঠে চাপলেন। মাহুত জানাল, সন্ধের আগেই এলাহাবাদ পৌঁছে দেবে।

কিছুদূর গিয়ে হাতিটা আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস মাহুতকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার! হাতি থামল কেন হে?'

'কী জানি, বুঝতে পারছি না তো।' কয়েক মুহূর্ত পরে আবার বলল, 'কী যেন আসছে এদিকে। ওই শুনুন না বাজনা বাজছে।'

পাসোপার্তু একলাফে হাতির পিঠ থেকে নামল। এক ছুটে ব্যাপারটা দেখে এসে বলল, 'শোভাযাত্রা।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল লোক বাজনার তালে তালে উন্মাদের মতো নাচতে নাচতে তাদের দিকে এগিয়ে এল। তাদের পিছনেই কয়েকটা ঘোড়া ছোট একটা রথ টেনে আনছে। রথটা আরো এগিয়ে এসে দেখা গেল তার ওপরে একটা দেবী মূর্তি, ভয়ঙ্কর তার রূপ। দেখলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। মূর্তি দেখে স্যার ফ্রান্সিস চিনতে পারলেন। তিনি ফগকে লক্ষ করে বললে, 'মি. ফগ, এটাই হচ্ছে হিন্দুদের কালি মূর্তি। হিন্দুদের প্রেম আর মুক্তির প্রতিভূ হচ্ছেন দেবী কালী।'

ফিলিয়াস ফগ এতক্ষণ বেশ কৌতূহলী দৃষ্টিতে পুরোহিতদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন। অকস্মাৎ এক জায়গায় এসে তার চোখের মণিদুটো নিশ্চল হল। বিস্ময়ভরা চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। কম বয়সী এক ভদ্রমহিলাকে কয়েকজন লোক টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। পূর্ণ যৌবনা, রূপের বিচিত্র সমারোহ তার দেহে। মহিলাটি ক্রন্দনরতা। বারবার মাটিতে শুয়ে পড়ছেন। তার চারদিকে ঢাক-তরবারি হাতে কয়েকজন ষণ্ডামার্কা লোক, তার দিকে নজর রেখে রেখে পথ চলছে। তারই ঠিক পিছনে নাদুসনুদুস্ চেহারার কয়েকজন টিকিধারী উন্মাদের মতো নাচানাচি করছে। মহিলার আর্তস্বর বাজনার আওয়াজে চাপা পড়ে যাচ্ছে।

বিষণ্নমুখে স্যার ফ্রান্সিস মাহুতকে বললেন—'এই বুঝি সতী?'

মাহুত ঠোঁটের কাছে আঙুল নিয়ে সকলকে চুপ থাকতে বলল।

শোভাযাত্রা এগিয়ে গেলে ফিলিয়স ফগ জিজ্ঞেস করলেন, 'সতী? সতী কী?'

'এক ধরনের নরবলি। তবে এইটুকুই তফাৎ, এরা স্বেচ্ছায় প্রাণ দেয়। যাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে দেখলেন, কাল ভোরে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মাহুতি দেবে। স্যার ফ্রান্সিস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সঙ্গের ঐ মৃতদেহটা কার?'

'ঐ হতভাগিনীর স্বামীর। তিনি নাকি এখানকার স্বাধীন রাজা ছিলেন। তবে এটুকু সান্ত্বনা ভারতবর্ষের বেশিরভাগ জায়গা থেকেই এ নিষ্ঠুর প্রথা উঠে গেছে। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডে এখনো প্রচলিত। স্বাধীন রাজা বলে ইংরেজ আইন এখানে খাটে না। এভাবে স্বামীর চিতায় পুড়ে না মরলে আজীবন তাকে দুঃখের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। সমাজের কেউ তাঁর হাতে জল খাওয়া তো দূরের কথা, ছায়া পর্যন্ত মাড়াবে না। আমি তখন বোম্বাইয়ে, এক মহিলা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়ার জন্য ইংরেজ সরকারের অনুমতি চেয়েছিল। সেখানে এক রাজার সাহায্যে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জীবন বিসর্জন দিল।'

তাদের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মাহুত বলল, 'কাল যে সতীদাহ হবে তা কিন্তু মোটেই স্বেচ্ছায় হবে না। বুন্দেলখণ্ডের সবাই এ কথা জানে।' ফিলিয়াস ফগ বললেন, 'কিন্তু তাকে তো কোনোরকম প্রতিবাদ বা বাধা দিতে দেখা গেল না।'

www.pathagar.com

'কী করেই বা প্রতিবাদ করবে? আফিং আর ধোয়ায় তিনি তো প্রায় সংজ্ঞা হারিয়ে বসেছেন। পিল্লাজির মন্দিরে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে। সবাই রাতে সেখানে থাকবে। খুব ভোরে তিনি সতী হবেন।'

ফিলিয়াস ফগ আচমকা বলে উঠলেন, 'মি. ফ্রান্সিস আমরা যদি তাঁকে রক্ষা করি। তাকে প্রাণে বাঁচাই?'

চোখের মণি দুটো কপালে তুলে ফ্রান্সিস বললেন, 'সে কী কথা জনাব! বাধা দেবেন কি!'

'দেখুন বারো ঘণ্টা সময় এখনো আমার হাতে রয়েছে। একবারটি চেষ্টা করেই দেখা যাক না।'

'স্বীকার করছি, আপনি হৃদয়বান। হৃদয়ের আবেগে—'

'আপনি যাই বলুন না কেন, মহিলাটিকে রক্ষা করার চেষ্টা করবই।'

বিপদ ডেকে আনা

বাস্তবিকই ব্যাপারটা দুঃসাহসিক, বিপদের ঝুঁকিও কম নয়। মি. ফগ, এমন একটা দুঃসাহিক কাজে না গলালেই ভালো করতেন। চিরদিনের মতো কারাগারে আটকা পড়ে থাকবেন কি না, কে জানে? যে কাজ সিদ্ধ করতে অমানুষিক পরিশ্রমের ঝুঁকি নিয়েছেন সব ভেস্তে না যায়। মন কিন্তু কোনো বাধাই মানল না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, স্যার ফ্রান্সিস ও পাসোপার্তু তাঁকে এ মহান ব্রত পালনে অবশ্যই সাহায্য করবে। সমস্যা হচ্ছে পার্সি মাহুতকে নিয়ে। সে বিপক্ষ দলে যোগ দিলেই বিপদ। ফগ মনে মনে বললেন, 'অদৃষ্টে যা হয় পরে দেখা যাবে।'

ফগের কথায় মাহুত বললেন, 'হুজুর, এতে বিপদ খুবই। শেষপর্যন্ত কোথাকার জল গড়িয়ে কোথায় যাবে, কে বলতে পারে? আপনি যখন বিপদ মাথা পেতে নিয়েছেন, শেষটুকু তো দেখতেই হবে।'

'মহিলাটি কে, জানো তুমি?'

'অবশ্যই তাঁর নাম আউদা। বোম্বাইয়ের এক মস্ত বড় ধনীর মেয়ে। মাস তিনেক আগে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক বুড়োকে বিয়ে করতে হয়েছে। অদৃষ্ট মন্দ দেখে তিনি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করেন নি। তিনি বেঁচে থাকলে আত্মীয়দের সম্পত্তি ভোগের অসুবিধা। তাই তাঁরা ধর্মের দোহাই দিয়ে তাঁকে হত্যার তাণ্ডবে মেতেছে।'

'ঠিক আছে, কোনরকম শব্দ না করে হাতিটাকে পিল্লাজির মন্দিরের যত কাছে পার নিয়ে চলো।'

মন্দিরের কাছে পৌঁছে মাহুত প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, 'রানি আউদাকে হয়ত মন্দিরের ভেতরে বন্দি করে রেখেছে।'

'গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে খুব সাবধানে কাজ হাসিল করতে হবে। প্রহরীরা সিদ্ধি খেয়ে ঘুমে বিভোর।'

তাঁরা মন্দির থেকে কিছু দূরে একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় রইলেন।

রাত গভীর হল। মন্দিরের ভেতরে বাইরে সবাই গভীর ঘুমে মগ্ন। মন্দিরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা না করাই শ্রেয়।

www.pathagar.com

প্রহরীদের ঘুম ভেঙে গেলে কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত করে ছাড়বে। শেষপর্যন্ত স্থির হল, পাসোপার্তু ও মাহুত বড় ছুরি দিয়ে জীর্ণ মন্দিরের পিছনের দিকটার ইঁট খুলে রাস্তা তৈরি করবে।

পাসোপার্তু ও মাহুত কাজ শুরু করে দিল। দু-একটা ইঁট খুলতে না খুলতেই ভেতরে ও বাইরে চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। পাসোপার্তু ও মাহুত কাজ ফেলে পালাল।

আবার সেই ঝাঁকড়া গাছটার নিচে সবাই জড়ো হলেন। ফ্রান্সিস বললেন, 'মি. ফগ, আর কেন, চলুন রণে ভঙ্গ দিয়ে পথ দেখি।'

'এত ব্যস্ততার কী আছে। আমি আগামীকাল দুপুরে যদি এলাহাবাদে পৌঁছোতে পারি তবেই যথেষ্ট। শেষপর্যন্ত দেখাই যাক না সুযোগ একটা আসতেও পারে।'

'ঠিক আছে, দেখি তবে শেষপর্যন্ত আপনি কী খেল দেখান।'

পাসোপার্তু মনে মনে একটা ফন্দি এঁটেছিল। হঠাৎ দেখা গেল সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে অন্ধকারে কোনোরকমে নদীর ধারে চিতাশয্যার দিকে এগোতে লাগল। কে জানে, সে কোথায় চলেছে।'

সকাল হতে না হতে ঢাক ঢোল, কাঁসর ঘন্টা বেজে উঠল। প্রধান পুরোহিত রানি আউদাকে ধরে চিতাশয্যার দিকে হাঁটল। অন্য সবাই জয়ধ্বনি দিতে দিতে প্রধান পুরোহিতকে অনুসরণ করল। আড়ালে দাঁড়িয়ে ফিলিয়াস ফগ এই নারকীয় দৃশ্য দেখতে লাগল।

চিতার ওপর মৃত রাজা শুয়ে। তার পাশে প্রায় অচৈতন্যা রানি আউদাকে শুইয়ে দেয়া হল। রাশিকৃত চন্দনকাঠ সাজিয়ে দেয়া হল। প্রধান পুরোহিতের নির্দেশে বিকট আওয়াজ করে বাজনা বেজে উঠল। উপস্থিত শবযাত্রীরাও গলা ফাটানো চিৎকার জুড়ে দিল।

চকচকে একটা ছুরি হাতে ফগ সেই চিতার দিকে এগোতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্যার ফ্রান্সিস মাহুত তাঁকে জোর করে আটকে রাখলেন।

এমন সময় হঠাৎ একটা অভাবনীয় ব্যাপারে শবযাত্রীদের মধ্যে ছুটোছুটি দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। সবাই যখন হৈ হুল্লোড়ে ব্যস্ত ঠিক তখনই আচমকা ঘটে গেল ব্যাপারটা। সবাই দেখল চিতায় শায়িত মৃত রাজা হঠাৎ বসে পড়েছেন। চিতার ওপরে বসে রানি আউদাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন। এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দেখে প্রধান পুরোহিত থেকে শুরু করে বাদ্যকাররা পর্যন্ত প্রাণের মায়ায় যে যেদিকে পারল ছুটে পালিয়ে গেল।

একসময় প্রেতাত্মাটি ফিলিয়াস ফগের কাছে এসে বলল—'স্যার এক মুহূর্তও দেরি নয়, চলুন পালাই।'

শবযাত্রীরা দূরে গাছের আড়াল থেকে ও ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখল—বৃদ্ধ রাজা পুনরুজ্জীবন ফিরে পেয়ে রানিকে সঙ্গে করে কে বা কাদের সঙ্গে কী সব বলাবলি করছেন। ব্যাপার বেগতিক দেখে তারা আর কাছে ভিড়ল না।

মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সবাই মিলে ধরাধরি করে প্রায় অচৈতন্য আউদাকে হাতির পিঠে তুলে নিলেন। মাহুতের নির্দেশ পেয়ে হাতিটি জোর কদমে ছুটতে লাগল। শবযাত্রীরা কর্তব্য স্থির করতে করতে ফিলিয়াস ফগ তাঁর সহযাত্রীরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেলেন।

www.pathagar.com

ফিরিয়াস ফগ মুচকি হেসে পাসোপার্তুকে বললেন—'এই তো চাই। সাবাস জোয়ান!'

হাতির পিঠে বসে ফিলিয়াস ফগ অচৈতন্য রানির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন, 'এ-তো না হয় হল, কিন্তু রানির গতি কী হবে? ইনি ভারতবর্ষে যতদিন থাকবেন, শত্রুরা পিছন ছাড়বে না। ইংরেজ সরকার তাঁর আইনের সাহায্যে এঁকে রক্ষা করতে পারবে না। সব মিলিয়ে ভারতবর্ষে এর জীবন কোনো অবস্থাতেই নিরাপদ নয়। ভারতবর্ষের বাইরে যেতে পারলে অবশ্য জীবনের আশঙ্কা থাকে না।

এলাহাবাদ যখন তাঁরা পৌঁছলেন ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় দশটা। আউদা ক্রমে জ্ঞান ফিরে পেতে লাগলেন। তাঁকে হাতির পিঠ থেকে নামিয়ে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে নিয়ে যাওয়া হল।

এখন সমস্যা দেখা দিল হাতিটাকে নিয়ে। সবাই বলাবলি করতে লাগলেন ওটার কী গতি হবে, ফিলিয়াস ফগই সমস্যার সমাধান করে দিলেন—'এই যে মাহুত ভায়া, তোমার কাজে আমরা খুবই সন্তুষ্ট। তাই হাতিটা তোমাকেই দিতে চাচ্ছি। তুমি এতে খুশি তো?'

মাহুত একগাল হেসে বলল, 'কত্তা, কথায় আছে মরা হাতিও লাখ টাকা। মরার ওপর এটা তো এক্কেবারে তাজা—'

'ঠিক আছে, পুরস্কারস্বরূপ ওটা তোমাকেই দিলাম।'

মাহুত ঘন ঘন সেলাম ঠুকে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিল।

ট্রেন ছাড়ল। রানি আউদা জ্ঞান ফিরে পেয়ে বিমর্যভাবে বসে। তাঁর কাছে যেন সবকিছু কেমন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। এরা কাঁরা? এদের সঙ্গে ট্রেনে চেপে কোথায় যাবেন তিনি? পরিচিত সেই শবযাত্রীরাই বা গেল কোথায়—এমন হাজারো প্রশ্ন তাঁর মাথায় এসে ভিড় করতে লাগল। একসময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ভবিষ্যতের চিন্তাই তাঁর এই অস্থিরতার অন্যতম কারণ।

ফিলিয়াস ফগ বললেন, 'মিছে কেঁদে কী করবেন, বলুন? আপনার ভয়ের কী আছে? আমি হংকং যাচ্ছি; আপত্তি না থাকলে, আমার সঙ্গে যেতে পারেন।'

রানি আউদা কান্না থামিয়ে বললেন, 'হংকং-এ আমার এক নিকট আত্মীয় থাকেন। আশা করি আমাকে আশ্রয় দেবেন।'

'তবে তো কোনো সমস্যাই নেই। আমরা তাঁকে খুঁজে বের করে আপনাকে সেখানে পৌঁছে দেব, কথা দিচ্ছি।'

বিপদ যখন দেখা দেয়

সেটা ছিল পঁচিশে অক্টোবর। কাকডাকা সকালে ফিলিয়াস ফগড় কলকাতা পৌঁছলেন। হংকংগামী জাহাজ বেলা একটায় ছাড়বে। দিনলিপি খুলে ফগ লিখতে বসলেন—ছাব্বিশে অক্টোবর তাঁর কলকাতা পৌঁছবার কথা। তেইশ দিন হল তিনি লন্ডন থেকে রওনা দিয়েছেন। জাহাজের ইঞ্জিনম্যান যে দুদিন সময় বাঁচিয়ে দিয়েছিল তা আউদাকে উদ্ধার করতে গিয়ে ব্যয় হয়ে গেছে। হিসেব করে বুঝলেন, বাজির শর্ত অনুযায়ী কাজ করতে হলে তাঁকে একটার জাহাজ ধরতেই হবে।

www.pathagar.com

হাওড়া স্টেশনে গাড়ি থেকে নামতেই এক ইংরেজ দারোগা ফিলিয়াস ফগের সামনে এসে দাঁড়াল। একনজরে তাকে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল—'আপনার নামই কি ফিলিয়াস ফগ?'

ফিলিয়াস ফগ ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালেন।

দারোগা বললেন, 'অনুগ্রহ করে একবারটি আমার সঙ্গে আসবেন কি?'

দারোগার কথায় ফগ কিন্তু মোটেই ঘাবড়ালেন না। ইংরেজদের দৃষ্টিতে আইন বড়ই পবিত্র জিনিস, আর দেশের আইন শৃঙ্খলার রক্ষক হচ্ছে পুলিশ।

ফিলিয়াস ফগ কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকতা বজায় রেখেই বললেন, 'সে না হয় যাচ্ছি, কিন্তু এই ভদ্রমহিলাকে আমাদের সঙ্গে নিতে পারি কি?'

'কোনই আপত্তি নেই।'

দারোগা তাদের লাল রং-এর একটা বাড়িতে নিয়ে গেল। একটা ঘরে বসতে দিয়ে বলল, 'এখানে অপেক্ষা করুন। এগারটায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াদিয়ার কাছে আপনাদের বিচার হবে।'

দারোগার কথায় আউদার চোখের কোণে জল দেখা দিল। কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছে কোনো রকমে উচ্চারণ করলেন—'আমার জন্যই আপনাদের এই বিপদে পড়তে হল, আপনারা বন্দি হলেন।'

'দেখুন, ইংরেজ রাজত্বে সতীদাহ নিবারণ করা অন্যায় নয়। পুলিশ হয়ত অন্য কাউকে ধরতে গিয়ে আমাকে ধরে এনেছে। আপনাকে হংকং-এ পৌঁছে দেবই; ভাববেন না। একটায় জাহাজ ছাড়বে। তার আগেই আমরা এখান থেকে ছাড়া পেয়ে যাব।'

বেলা সাড়ে এগারটায় দারোগা এসে ফিলিয়াস ফগকে বিচারালয়ে নিয়ে গেল। ম্যাজিস্ট্রেট এসে আসনে বসলেন। আরদালি তিনজন প্রবীণ পুরোহিতকে আদালতে হাজির করল। পাসোপার্তু বিড়বিড় করে বলল, 'আরে, এ যে সেই পুরোহিতগুলো যারা আউদাকে পুড়িয়ে মারছিল।'

আসামীদের অপরাধের বিবরণ পড়ে শোনানো হল—'হিন্দুদের অপবিত্র করার দায়ে ফিলিয়াস ফগ ও তার ভৃত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।'

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ফিলিয়াস ফগকে জিজ্ঞেস করলেন—'অভিযোগের বিরুদ্ধে আপনাদের কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন।

ফিলিয়াস ফগ বললেন—'আমি অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু পিল্লাজির মন্দিরে ওই রাত্রে যে কাণ্ড ঘটেছিল সে সম্পর্কে কিছু শুনাতে চাচ্ছি।'

পাসোপার্তু বলল, 'হ্যাঁ, সে ঘটনার কথা আমরা শুনাতে চাচ্ছি। সেখানে এরা এক নির্দোষ মহিলাকে পুড়িয়ে মারার উদ্যোগ করছিল। ব্যাপারটা তাদের মুখ থেকে—'

তার মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই বিচারক ওয়াদিয়া বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—'সে কী কথা। কাকে? কাকে পুড়িয়ে মারার উদ্যোগ করছিল? বোম্বাইয়েই কি ঘটনা ঘটে?'

পাসোপার্তু বলল, 'হ্যাঁ'।

'অভিযোগ পিল্লাজীর মন্দির প্রসঙ্গে নয়, আমরা মালাবার মন্দির অপবিত্র করার কথা বলছি। পেশকার বলল। অপরাধের প্রমাণস্বরূপ এই যে জুতো জোড়া আদালতে হাজির করা হয়েছে।'

জুতোজোড়া দেখেই পাসোপার্তু চিনতে পারল, এগুলো তারই জুতো।

www.pathagar.com

পূর্বেকার কথা কিছু বলে নেয়া দরকার। ডিটেকটিভ ফিক্স যখন বুঝলেন ব্যাঙ্ক-ডাকাত-কে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না তখন মন্দিরের পুরোহিতদের প্রচুর টাকা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে মন্দির অপবিত্র করার জন্য মামলা দায়ের করাতে রাজি করালেন।

পঁচিশে অক্টোবর ফিলিয়াস ফগ সদলবলে ট্রেন থেকে নামলে ফিক্স-এর নির্দেশে দারোগা তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। আসলে ব্যাঙ্ক-ডাকাতকে গ্রেপ্তার করার আশা ফিক্স তখনও ছাড়েন নি।

ফিলিয়াস ফগ অপরাধ স্বীকার করলে, ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াদিয়া বিচারের রায় দিলেন—'পাসোপার্তু গত বিশে অক্টোবর বোম্বাইয়ের অন্তর্গত মালাবারের মন্দিরে প্রবেশ করে অপবিত্র করেছে। পনের দিনের জন্য বিচার মুলতবি। ততদিন তাকে হাজতবাস করতে হবে। যদিও ফিলিয়াস ফগ মন্দিরে প্রবেশ করেন নি, মন্দির অপবিত্র করার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে নেই, তবু অপরাধীকে পলায়নে সাহায্য করার দায়ে তার প্রতি একই আদেশ রইল।

বিচারকের রায় শুনে আদালতের এককোণে ঘাপটি মেরে বসে থাকা ডিটেকটিভ ফিক্স উৎফুল্ল হলেন সন্দেহ নেই। তিনি ভাবলেন, অন্তত দু' সপ্তাহের জন্য নিশ্চিন্ত। ইতিমধ্যে বিলেত থেকে ফিলিয়াস ফগের নামে ওয়ারেন্ট এসে যাবে।

বিচারকের রায় শুনে ফিলিয়াস ফগ স্বাভাবিক স্বরেই উচ্চারণ করলেন—'আমি জামিন চাই। আমাকে জামিন নিতে দেয়া হোক।'

'হ্যাঁ, জামিন পেতে পারেন, তবে এক একজনের জন্য পনের হাজার টাকা করে জমা দিতে হবে, জামিন পেয়ে যাবেন।'

ফিলিয়াস ফগ কথা না বাড়িয়ে একগোছ নোট টেবিলে রাখলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াদিয়া বললেন—'বিচারের দিন আদালতে হাজির হলে টাকাটা ফেরত পেয়ে যাবেন।'

এতগুলো টাকার জন্য তাঁর বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। পাসোপার্তুকে নিয়ে হাসিমুখে আদালত থেকে বেরিয়ে এলেন।

ঘড়িতে তখন একটা বাজতে মাত্র আধঘণ্টা বাকি। মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে ফগ সবাইকে নিয়ে জাহাজঘাটের দিকে ছুটলেন। তাঁরা রেঙ্গুনগামী জাহাজে উঠলেন। ফিক্স তাদের পিছনে জাহাজঘাট পর্যন্ত এলেন। দূরে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ভাবতে লাগলেন—'কী ধড়িবাজ লোকরে বাবা! হাসিমুখে এতগুলো টাকার মায়া ছাড়ল। ব্যাঙ্ক-ডাকাতি করা টাকা না হলে এমন করে হেলায় টাকা নষ্ট করতে পারত না, টাকার মায়া অবশ্যই হত।'

ফিক্স কিন্তু শিকারের আশা ছাড়লেন না। এবার বিলেতের ওয়ারেন্ট হংকং-এ পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে ফগের সঙ্গে রেঙ্গুনের জাহাজে উঠলেন। তিনি বুঝে নিয়েছেন, ব্যাঙ্ক-ডাকাতকে হংকং-এ গ্রেপ্তার করতে না পারলে অবশ্যই আশা ছাড়তে হবে। হংকং থেকে রওনা দিয়ে ফগ চীন, জাপান ও শেষে আমেরিকা যাবেন। সাধারণ ওয়ারেন্ট ব্রিটিশ এলাকার বাইরে কার্যকরী হবে না, বিশেষ ওয়ারেন্ট আনতে ফগ নাগালের বাইরে চলে যাবেন। সমস্যাও অনেক, ফিক্স এতদিন ঘোরাঘুরি করেও যদি তাকে গ্রেপ্তার করতে না পারেন তবে তাঁকে সুনাম খোয়াতেই হবে।

www.pathagar.com

আর একটি দুশ্চিন্তা ফিক্সের মাথায় ঘুরছে। ফগ-এর সঙ্গে মহিলাটি কে? কী তার পরিচয়! অবশ্যই বোম্বাই থেকে কলকাতা আসার সময় সঙ্গ নিয়েছে। অতএব ফগ নিশ্চয়ই তাকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।

জাহাজে ফিক্সের সঙ্গে পাসোপার্তুর দেখা হয়ে গেল। তাকে দেখেই ফিক্স উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলে উঠলেন—'কী ব্যাপার, তুমি রেঙ্গুন-জাহাজে যে!'

'আপনিও কি সারা দুনিয়া পরিক্রমায় বেরিয়েছেন নাকি?'

'তোমাদের মতো বাজে ঝোঁক আমার নেই। ভাবছি, হংকংটা একটু দেখে আসব। ভালো কথা, মি. ফগ কেমন আছেন, বলো তো?'

'ভালোই। পরিকল্পনা মাফিক সবকিছু হয়ে যাচ্ছে। কদিন আগে একটু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। আরে জনাব তিনি অন্য ধাতু দিয়ে গড়া, সহজে পিছিয়ে যাবার লোক নন।' পাসোপার্তু গত কয়েকদিনের ঝক্কিঝামেলাগুলো একে একে ব্যক্ত করল। মালাবার মন্দিরে সে যে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিল, খোলচিতে হাতি কেনা, পিল্লাজির মন্দিরে রানি আউদাকে নিয়ে ঝামেলা, কলকাতার আদালতে বিচার, কিছুই বাদ দেয় নি। আসলে তো তিনি সবই জানেন, তবুও না জানার ভান করলেন।

ফিক্স অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন—'আউদা কি তোমাদের সঙ্গেই চলেছেন? মানে মি. ফগ কি তাঁকে ইওরোপ নিয়ে যাচ্ছেন?'

'না, সেখানে নিয়ে যাবেন কেন? হংকং-এ তাঁর নাকি এক নিকট আত্মীয় রয়েছেন। তাঁর কাছে তাঁকে পৌঁছে দেবেন।'

ফিক্স হতাশ হয়ে ভাবতে লাগলেন—'এ কেমন হল? লোকটা তো মহা ধড়িবাজ! কিছুতেই তো হাতের মুঠোয় আনা যাচ্ছে না! এত সাধ্য সাধনা সবই ভেস্তে দেবে নাকি?'

ডিটেক্‌টিভ ফিক্সের প্রয়াস

ফিক্স এত সহজে হতাশায় ভেঙে পড়ার পাত্র নন। তিনি খবর সংগ্রহের একমাত্র সম্বল পাসোপার্তুর পিছনে আঠার মতো লেগে রইলেন। পাসোপার্তুর সঙ্গে দেখা হলেই এ-কথা সে-কথার পরই ফিলিয়াস ফগের প্রসঙ্গ পেড়ে বসেন। ব্যাপারটা পাসোপার্তুকেও ভাবিয়ে তুলল—'লোকটা কি তবে আমাদের পিছু নিয়েছেন? আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেও দেখছি সে-পথই ধরছে। নাকি গোপনে পৃথিবীটাকে চক্কর মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? দেখাই যাক, শেষপর্যন্ত কী দাঁড়ায়।'

রেঙ্গুন জাহাজ তিরিশে অক্টোবর বুধবার বিকেলে মালাক্কা প্রণালী ধরল। পরদিন সকালে সিঙ্গাপুরে নোঙর করল। নির্দিষ্ট সময়ের আরো আগেই পৌঁছে গেছে। ফিলিয়াস ফগ রানি আউদাকে নিয়ে জাহাজ থেকে নামলেন। কিছু সময় পেয়ে শহরটা ঘুরে দেখার সখ হল।

ডিটেকটিভ ফিক্স গোপনে তাদের পিছু নিলেন। তিনি কিন্তু পাসোপার্তুর নজর এড়াতে পারলেন না। সেও গোপনে ফিক্সকে নজরে নজরে রাখতে লাগলেন।

রেঙ্গুন জাহাজ বেলা এগারোটায় বারকয়েক সিটি দিয়ে ছেড়ে এগিয়ে চলল। এখনও ১৩০০ মাইল সমুদ্র পাড়ি দিলে হংকং-এ পৌঁছবে। ফিলিয়াস ফগ হিসেব করলেন, ছদিনের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন।

www.pathagar.com

দুদিন যেতে না যেতেই ভীষণ ঝড় উঠল। পেনিনস্যুলের এন্ড ওরিয়েন্টাল কোম্পানির কর্মীরা সুদক্ষ। ঝড়ের সঙ্গে মরিয়া হয়ে মোকাবেলা করতে লাগল। ঝড় ও বৃষ্টি যেন পাল্লা দিয়ে জাহাজের ওপর আক্রমণ চালাতে লাগল।

ডিটেকটেভ ফিক্স কিন্তু এত কিছুতেও কর্তব্যচ্যুত হন নি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাত্রীরা ভাবিত। তিনি কিন্তু খুঁজে খুঁজে পাসোপার্তুকে বের করেছেন। তাকে সমাদর করে পাশে বসিয়ে এ-কথা সে-কথার পর বললেন—'মি. ফগ কি এবার হংকং থেকে ইয়কোহামার জাহাজ ধরবেন?'

'হ্যাঁ সেরকমই তো জানি।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, তিনি এই যে রহস্যময় পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়েছেন, এটা কি তুমি বিশ্বাস করো?'

'অবিশ্বাসের তো কিছু দেখছি না। আপনি শেয়ানা পাগল, বিশ্বাস নাও করতে পারেন।'

পাসোপার্তুর মুখে আচমকা এ ধরনের মন্তব্য শুনে ফিক্স রীতিমতো চমকে উঠলেন, মুষড়েও পড়লেন যথেষ্ট। তিনি ভাবলেন, আমি যে ডিটেকটিভ, লোকটা কি ধরে ফেলেছে?

আর একদিন সকালের কথা। পাসোপার্তু ডেকে রেলিং ধরে অন্যমনস্কভাবে সমুদ্রের ঢেউ দেখছিল। পিছনে ফিক্স-এর গলা শুনল—'আরে পাসোপার্তু যে, একা একা দাঁড়িয়ে করছ কী?'

'কী আর করব ঢেউ দেখে সময় কাটাচ্ছি। মি. ফিক্স আশা করি হংকং-এ আপনাকে এমনি আমাদের পিছনে লেগে থাকতে দেখতে পাব, তাই না? চলুন না জনাব খুব আনন্দ হবে। একসঙ্গে এতটা পথ এলাম। মাঝপথে ছাড়াছাড়ি হলে ভালো লাগবে না। প্রথমে তো শুনেছিলাম, বোম্বাই পর্যন্ত, এখন তো দেখছি চীনেই এসে পড়েছেন। চলুন জনাব, আমেরিকা আর কতটুকু পথ, তারপর ইউরোপ। নাগালের মধ্যেই ধরতে গেলে।'

ডিটেকটিভ ফিক্স স্বাভাবিক সুরেই বললেন—'দেখি কী হয়। আমার ব্যাপার আলাদা, জানই তো। পকেটের পয়সা খরচ করে আমি তো আর সময় কাটাতে বেরোই নি।' আচমকা বৃষ্টি নামায় তাঁদের আলোচনা আর এগোতে পারল না।

ডিটেকটিভ ফিক্স ভাবলেন—'ফিলিয়াস ফগের চাকরটা যখন তাঁর আসল পরিচয় আঁচ করেই ফেলেছে তখন তার কাছে সব কথা খুলেই বলা যাক। এমনও হতে পারে সে হয়ত তার মনিবের কীর্তিকলাপ জানে না। সব ফাঁস হয়ে গেলে তাঁর গোয়েন্দাগিরিতে সাহায্যও করতে পারে।'

ঝড়বৃষ্টির কবলে পড়ে জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ের পুরো একটা দিন পরে হংকং বন্দরে পৌঁছল। ইয়কোহামার জাহাজ ছেড়ে দেবারই কথা। এই আশঙ্কার ফগ খুবই মুষড়ে পড়লেন। জাহাজ ছেড়ে দিলে কেলেঙ্কারীর একশেষ হবে। ফগ ব্যস্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে একজনকে জিজ্ঞেস করল—'ইয়কোহামার জাহাজ ছেড়েছে কি না বলতে পারেন।'

'ছাড়েনি জাহাজের বয়লার খারাপ হয়ে যাওয়ায় দেরি করছে। শুনলাম কাল সকালে জোয়ার এলে ছাড়বে।'

ফিলিয়াস ফগের ভাগ্য সবদিক থেকেই ভালো দেখা যাচ্ছে। পথে বাধা বিঘ্ন কিছু দেখা দিচ্ছে বটে। কিন্তু তাঁর যাত্রাপথে বড় রকম সমস্যা সৃষ্টি করছে না। ইয়কোহামা

www.pathagar.com

থেকে কর্নাটক জাহাজ তাঁদের ফেলে ছেড়ে গেলে পুরো সাতটা দিন অপেক্ষা করতে হত। চব্বিশ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেলেও তেমন বেকায়দায় পড়তে হবে না। সে জাহাজ ইয়কোহামা থেকে সানফ্রান্সিসকো যাতায়াত করে তা 'কর্ণাটক' না পৌঁছানো পর্যন্ত ছাড়ার নিয়ম নেই। প্রয়োজনে সাত দিনও অপেক্ষা করতে হবে। এদিকে হিসাবের বাইরে একদিন বেশি সময় খরচ হয়ে গেলেও ভরসা এটুকু আগামী বাইশ দিনের যাত্রায় সেটুকু পুষিয়ে দেবে, ফগ অনুমান করেছেন।

পাসোপার্তু তাড়াতাড়ি কর্নাটকে তিনটে সিট রিজার্ভ করতে চলে গেল। নদীর মুখে ভিক্টোরিয়া বন্দর। এখান থেকেই 'কর্নাটক' ছাড়বে। সিট রিজার্ভেশন এখান থেকেই করতে হয়। বন্দরে পা দিয়েই সে ডিটেকটিভ ফিক্স-এর মুখোমুখি হয়ে গেল। ফিক্স হতাশ মনে পায়চারি করছিলেন। পাসোপার্তু মুচকি হেসে বলল, 'কি মি. ফিক্স, আপনিও দেখছি, আমাদের পিছন পিছন আমেরিকা যাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।' বিতৃষ্ণার সঙ্গে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন।

'আমি তো আগেই বলে রেখেছি, আমাদের পিছন ছাড়তে পারবেন না। চলুন তবে সিট রিজার্ভ করে নেয়া যাক।'

রিজার্ভেশন কাউন্টারে গিয়ে তারা শুনলেন, কর্ণাটক জাহাজের বয়লার মেরামত করা সম্ভব হয়েছে। জাহাজে পরদিন সকালের পরিবর্তে রাত্রেই যাত্রা করবে।

খবরটা কানে যেতেই পাসোপার্তু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলল, 'এ তো খুবই মঙ্গলের কথা। মি. ফগ-এর দিক থেকে খবরটা অবশ্যই শুভ। তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে খবরটা জানিয়ে আসি।'

'জাহাজ ছাড়তে দেরি আছে। তোমার মনিবকে খবরটা একটু পরে দিলেও চলবে। চলো, রেস্তোরাঁয় গিয়ে একটু জলযোগ করে নেয়া যাক।' ফিক্স-এর উদ্দেশ্য জলযোগের লোভ দেখিয়ে পাসোপার্তুর মুখ থেকে কিছু তথ্য বের করা।

ক্ষিধের সময় পাসোপার্তু জলযোগের লোভ সামলাতে পারল না। ফিক্স তাকে নিয়ে প্রায় অন্ধকার একটি ঘরে ঢুকলেন। ঘরের ভেতর বিভিন্ন বয়সের জনা বিশেক লোক অগোছালোভাবে বসে ঝিমোচ্ছে। কেউ দড়ির খাটিয়ায় বসে আবার কেউ মেঝেতে আধশোয়া অবস্থায় বসে। ঘরের চারদিকে একবারটি চোখ বুলিয়ে পাসোপার্তুর বুঝতে অসুবিধা হল না। এটা রেস্তোরাঁ নয়, গুলিখোরদের আড্ডা। চীনা সরকার শত চেষ্টা করেও এরকম কিছু নরককুণ্ড নিশ্চিহ্ন করতে পারেন নি। আসলে ফিক্সও ব্যাপারটা জানতেন না। রেস্তোরাঁ ভেবেই পাসোপার্তুকে নিয়ে এসেছেন। উপায় নেই, যা হোক করে কাজ সারতে হবে। দুবোতল পোর্ট আনিয়ে পাসোপার্তুকে একটা দিলেন, নিজে রাখলেন একটা। পাসোপার্তু মুহূর্তের মধ্যে পুরো বোতলটাই খালি করে দিল। ফিক্স তাড়াতাড়ি আরো একটা পোর্টের হুকুম দিলেন। উদ্দেশ্য, তাকে গলা পর্যন্ত মদ খাইয়ে বেহুঁশ করে তোলা, মাতাল অবস্থায় ফগ সম্বন্ধে সত্য কথা ফাঁস করেও দিতে পারে।

পাসোপার্তু দ্বিতীয় বোতলটাও চোখের পলকে শেষ করে ফেলল।

ফিক্স সুযোগ বুঝে বললেন, 'যদি আপত্তি না থাকে, তোমার মনিব সম্বন্ধে কয়টা কথা জিজ্ঞেস করি।'

'বলুন, কী শুনতে চান?'

www.pathagar.com

'আগে বলো, আমি কে তুমি বুঝতে পেরেছ কী?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু তাঁরা আপনাকে শুধু শুধু পাঠিয়েছেন।'

'হ্যাঁ কুড়ি হাজার পাউন্ড, মানে তিন লাখ টাকা।'

যেন একটু উত্তেজনার সঙ্গে ফিক্স বললেন—'কুড়ি হাজার নয়, পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড।'

ফিক্স-এর কথায় পাসোপার্তু যেন হঠাৎ সচকিত হল, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড। তবে তো আর এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা উচিত নয়।

'হ্যাঁ, পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড। আমি সফল হলে দুহাজার পাউন্ড পেয়ে যাব। তোমাকেও কিছু পাউন্ড দিতে পারি। অবশ্য তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য করো।' কাজটা খুব কঠিন নয়। মি. ফগ যাতে কয়েকটা দিন এখানে থাকেন তার ব্যবস্থা করা।

'ছি-ছি-ছি! আপনি এত নীচ তা তো জানতাম না। লোকটার পিছনে লেগে কতকিছুই তো করলেন। এখন চাচ্ছেন, যাতে শর্ত অনুযায়ী লন্ডনে পৌঁছোতে না পারেন। এঁরাই নাকি তাঁর বন্ধু, রিফর্ম ক্লাবের সদস্য। কিন্তু মি. ফিক্স, আপনি আমার মনিবকে চেনেন না। আসলে কিন্তু তাঁর মতো সজ্জন সচরাচর দেখা যায় না।'

'সে না হয় হল। কিন্তু আমার পরিচয় কিছু অনুমান করতে পারছ?'

'না পারার কী আছে? আপনি রিফর্ম ক্লাবের একজন গুপ্তচর। মি. ফগকে পথে আটকে তাঁর সময় নষ্ট করার জন্যই আপনি আমাদের পিছু নিয়েছেন। মি. ফগ মনে দুঃখ পাবেন ভেবেই এতদিন তাঁকে আপনার ব্যাপার স্যাপার কিছু বলি নি। এখন দেখছি না বলাটাই বরং বোকামি হয়েছে।'

'তবে কি মি. ফগ আমার কথা কিছু জানেন না?'

'না, এখনো না?'

ডিটেকটিভ ফিক্স ভাবলেন, পাসোপার্তু অবশ্যই ব্যাঙ্ক ডাকাতির বিন্দু বিসর্গও জানে না। কিন্তু আমার পরিচয় পেলে সে অবশ্যই মি. ফগ-কে গ্রেপ্তার করতে সাহায্য করবে। তিনি একসময় বললেন, 'একটা কথা বলছি শোনো, তুমি আমাকে যা ভেবেছ, আসলে তা নই। আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ। এই দেখ, আমার কার্ড। এবার বলছি শোনো, বাজি ধরার মিথ্যা অজুহাতে মি. ফগ তোমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছেন, ধাপ্পা দিয়েছেন। রিফর্ম ক্লাবের সভ্যদেরও ধাপ্পা দিয়েছেন।'

'কিন্তু এভাবে ধাপ্পা দিয়ে তাঁর লাভ?'

'শোনো তবে, গত ১৮ সেপ্টেম্বর ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া থেকে যে পঞ্চান্ন হাজার পাউন্ড চুরি গেছে সেটা কে করেছে জানো? মি. ফগ-এর সঙ্গে তার হুবহু মিল রয়েছে।'

'কিছুতেই এ হতে পারে না।'

'দেখ, তুমি তো তখন সবে তার বাড়িতে কাজ নিয়েছিলে। অতসব না জানারই কথা। এবার মনে করে দেখ তো, বাড়ি থেকে রওনা দেবার সময় তাঁর সঙ্গে কী কী ছিল? উল্লেখযোগ্য জিনিসপত্র কিছু ছিল কি? কেবল একটা ব্যাগ আর প্রচুর পরিমাণ ব্যাঙ্ক নোট। আর আশি দিনে পৃথিবীটা ঘুরে আসবে, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা। দস্যুকে সাহায্য করে তুমি জেলের ঘানি টানতে চাচ্ছ, নাকি?''

পাসোপার্তু হঠাৎ যেন কেমন হকচকিয়ে গেল। সে কী কথা। ফিলিয়াস ফগ একজন ডাকাত? না, না এটা বাজে কথা। ফিক্সই বা মিছামিছি একথা বলতে যাবেন কেন? তাঁর

www.pathagar.com

কী স্বার্থ থাকতে পারে এতে? ফিক্সের মুখের দিকে নিতান্ত অপরাধীর সুরে বললেন, 'কিন্তু আমাকে কী করতে বলছেন?'

'বলছি শোন, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চেয়ে পাঠিয়েছি, আজও এল না। মি. ফগ যাতে হংকং ছেড়ে না যেতে পারেন সে ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে।'

পাসোপার্তু একলাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে চিৎকার করে উঠল—'না, আমার দ্বারা সেটি হচ্ছে না। মি. ফগ যদি ব্যাঙ্ক ডাকাতই হন তবুও আমি তাঁর সাথে বেইমানি করতে পারব না।'

'তবে তুমি রাজি নও, এই তো? ঠিক আছে আমাদের মধ্যে যে-সব কথাবার্তা হয়েছে সব তোমাকে ভুলে যেতে হবে।' পাসোপার্তু গলা পর্যন্ত মদ গিলে একেবারে বেসামাল হয়ে পড়েছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাও যেন কষ্টকর।

ফিক্স ঠিক করলেন, কিছুতেই তাকে মি. ফগ-এর কাছে যেতে দেওয়া হবে না। টেবিলের একপাশে আফিংভরা একটা নল পড়েছিল। সেটাকে তুলে পাসোপার্তুর হাতে দিয়ে টানতে বললেন। সুবোধ বালকের মতো পাসোপার্তু নলটাকে মুখে দিয়ে কয়েক টান দিতেই নেশা জেঁকে ধরল, সংজ্ঞা হারিয়ে টেবিলে মাথা দিয়ে এলিয়ে পড়ল।

প্রবল ইচ্ছাশক্তি

ফিলিয়াস ফগ 'দি টাইমস ও ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন' নিউজ পড়ছেন। পাসোপার্তুর ফিরতে দেরি হওয়ায় তিনি মোটেই ভাবিত নন। কারণ, তিনি তো জানেন সকালের আগে জাহাজ ছাড়বে না। মধ্যরাত গড়িয়ে গেলে তিনি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসলেন। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার মধ্য দিয়ে সকাল হল। উপায়ান্তর না দেখে তিনি রানি আউদাকে নিয়ে জাহাজঘাটে গেলেন। জাহাজঘাট ফাঁকা। জেটিতে জাহাজ নেই, যাত্রীদেরও দেখা যাচ্ছে না। ফগ বিমর্ষভরা চোখে চারদিকে তাকালেন। ফিক্স কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ভালোমানুষের মতো এক পা দু পা করে তাদের কাছে এগিয়ে এলেন।

ফিলিয়াস ফগ তাঁকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো, কর্ণাটক জাহাজ—'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ফিক্স বললেন—'সে তো কাল রাত্রেই ছেড়ে গেছে। আপনিই তো কাল রেঙ্গুন জাহাজে এসেছিলেন, তাই না?'

'হ্যাঁ,।

'ভেবেছিলাম, আপনাদের সঙ্গে পাসোপার্তুকেও দেখতে পাব।'

আউদা ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—'তাকে আপনি চেনেন? সে কোথায় জানেন কিছু? কাল সন্ধ্যা থেকে তার কোনো খবর নেই। আমরা ভাবছি সে কি কর্ণাটক জাহাজেই উঠে পড়ল?'

'মাপ করবেন আপনারাও বুঝি ওই জাহাজেই যাবেন, ঠিক ছিল? আমিও যাব ঠিক করেছিলাম। জাহাজ খারাপ, মেরামতির কাজ হচ্ছে শুনে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ জাহাজ ঠিক হয়ে যাওয়ায় ঘোষিত সময়ের বারো ঘণ্টা আগেই নোঙর তুলে চলে গেছে।'

ফিক্স ভাবলেন এক সপ্তাহের জন্য নিশ্চিন্ত। এর মধ্যেই ফগকে গ্রেপ্তার করার ওয়ারেন্ট এসে পড়বে। ব্যস, কাজ হাসিল। ফিলিয়াস ফগ যেন ব্যাপারটাকে তেমন আমলই দিলেন না। স্বাভাবিক স্বরেই বললেন—'কর্ণাটক গেছে, কি আর করা যাবে? কর্ণাটক ছাড়া কত জাহাজ আছে ইয়কোহামা যাবার।'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই।'

ফিলিয়াস ফগ জাহাজঘাটে ঘুরে খোঁজ নিতে লাগলেন, কোন জাহাজ ইয়কোহামা যেতে রাজি আছে, কি না? এক জাহাজ মালিকের সঙ্গে দেখা, তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন রওনা দিতে পারে তেমন কোন স্টিম-বোট খোঁজে আছে কি? খুব দ্রুত গতিতে যেতে হবে কিন্তু।'

'আছে। তেতাল্লিশ নম্বর স্টিম বোটটাই আমার। ঘণ্টায় আট নয় মাইল করে ছুটতে পারে।'

'আমি—ইয়কোহামা যেতে চাচ্ছি, অবশ্য তুমি যদি রাজি থাক।'

লোকটা চোখের মনি দুটো কপালে তুলে বলল—'মশায় আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?'

'কেন? রসিকতা করতে যাব কেন? কর্ণাটক জাহাজ ধরব, ইচ্ছা ছিল। পারি নি, ছেড়ে চলে গেছে। চোদ্দ তারিখের মধ্যে আমাকে যে করেই হোক ইয়কোহামা পৌঁছোতে হবে। খুবই জরুরি ব্যপার। আমাকে সেখান থেকে সানফ্রান্সিসকো জাহাজটা ধরতেই হবে।'

'দুঃখিত। একেবারেই অসম্ভব জনাব।'

'অসম্ভবের কী আছে? দিনে একশো পাউন্ড করে ভাড়া পাবে। সময়মতো পৌঁছে দিলে আরো দুশো পাউন্ড বকশিস দেব কথা দিচ্ছি। এতগুলো টাকার কথায় লোকটা খুব দোটানায় পড়ল। কয়েক মুহূর্ত ভেবে বলল, 'কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমার নৌকাটা খুবই ছোট। ঝড় তুফানে অতটা পথ যেতে ভরসা পাচ্ছিনে। কিছু না হলে ১৬০০ মাইল পথ তো বটেই, তবে একটা কাজ করা যায়। এখান থেকে নাগাসিকার দূরত্ব ১১০০ মাইল আর ৮০০ মাইল সাংহাই। সাংহাই যদি—'

'সাংহাই গেলে কাজ মিটবে কী করে, ইয়কোহামা থেকে আমার যে আমেরিকার ডাক জাহাজ ধরা দরকার।'

'হ্যাঁ, সেখান থেকেই পাবেন। সানফ্রান্সিসকোর জাহাজ তো সাংহাই থেকেই ছাড়ে, ইয়কোহামা থেকে নয়। এগারোই নভেম্বর সাংহাই থেকে জাহাজ ছাড়বে। চারদিন সময় পাবেন—অর্থাৎ কি না ছিয়ানব্বই ঘণ্টা, ঘণ্টায় আট মাইল করে যেতে পারলে ভালোভাবেই সাংহাই পৌঁছনো যাবে।'

লোকটার কথায় ফিক্স-এর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম। শিকার হাত ছাড়া হবার আশঙ্কায় রীতিমতো মুষড়ে পড়ল।

ফিক্স দেখলেন, লোকটা টোপ গিলেছে। পকেট থেকে দুটো নোট বের করে তার সামনে ধরলেন—'আগাম দুশো পাউন্ড দিলাম।' ফিক্স পাশেই দাঁড়িয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। ফগ বললেন—যদি আপত্তি না থাকে আপনিও—'

'ধন্যবাদ। আমি আপনাকে অনুরোধ করব ভাবছিলাম।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আউদা বললেন—'কিন্তু পাসোপার্তুর কি হবে?'

ফগ বললেন—'আমি সাধ্যমত সব ব্যবস্থাই করব। পুলিশ অফিসে গিয়ে পাসোপার্তুর চেহারা বিবরণ দিয়ে তার অনুসন্ধানের খরচ এবং বিলেতে ফিরে যাবার টাকা জমা দিয়ে আসব।'

www.pathagar.com

ফিক্স আগেভাগেই গিয়ে নৌকোয় উঠে বসেছিলেন। ফিলিয়াস ফগ এলেন সঙ্গে আউদাকে নিয়ে। এবার কিন্তু ফিক্স-এর মধ্যে একটু সঙ্কোচের ভাব দেখা দিল। ব্যাঙ্ক ডাকাতের আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে স্বপ্নেও ভাবেন নি। মনে মনে ভাবলেন, ব্যাঙ্ক-ডাকাত হলেও লোকটা ভদ্র, সন্দেহ নেই। নৌকো ছাড়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তার ভয়, পাসোপার্তু যদি হঠাৎ এসে উদয় হয়, সব ফাঁস করে দেবে।

নৌকো ছেড়ে দিল। উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের বুকে মোচার খোলার মতো স্পিড বোটটা এগিয়ে চলল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল বিস্তীর্ণ সমুদ্রের বুকে। উত্তর আকাশের গায়ে দেখা দিল এক টুকরো মেঘ। ক্রমে তা আকাশ ছেয়ে ফেলতে লাগল। আউদার চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে মেঘের গতিবিধি লক্ষ করতে লাগলেন। ভাবলেন, অথৈ সমুদ্র, ছোট্ট নৌকা নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়া মোটেই ঠাণ্ডা মাথার কাজ নয়। পুরস্কারের লোভে মাঝি মরিয়া হয়ে নৌকো চালাতে লাগল।

দুটো দিন নির্বিঘ্নেই কাটল। তৃতীয় দিনে দুর্যোগ চরম রূপ নিয়ে দেখা দিল। সকাল থেকেই আকাশে মেঘে জমাট বাঁধতে লাগর। শুরু হল সর্বনাশা ঝড়। সে সঙ্গে সমুদ্রের সর্বগ্রাসী তাণ্ডব তো রয়েছেই। আউদার মুখ শুকিয়ে গেল। নৌকোর মাঝি আশ্বাস দিল—ভয় পাবেন না! আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব নৌকো সামলাতে। আশা করি শেষরক্ষা করতে পারবই। লোকটার সত্যিই হিম্মত আছে! রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগ গেল আরও বেড়ে। সমুদ্র উন্মাদের মতো দাপাদাপি শুরু করে দিল। ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে নৌকো একবার পাহাড়সমান উঁচুতে উঠছে পরমুহূর্তে আবার আছাড় খেয়ে নেমে যাচ্ছে। এতকিছু সত্ত্বেও নৌকো অক্ষত থেকে সবাইকে অবাক করে দিল। আরও পঁয়তাল্লিশ মাইল গেলে তবে সাংহাই বন্দর। আর এদিকে মাত্র দুঘণ্টা সময় হাতে রয়েছে।

সন্ধ্যা ছয়টা, সাংহাই মাত্র তিন মাইল দূরে। নৌকোর মাঝি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—'স্যার, বোধ হয় শেষরক্ষা করতে পারলাম না। আপনাদেরও উপকারে এল না, আমিও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হলাম।'

কিছুদূরে জাহাজের চোঙ দেখা গেল। নৌকার মাঝি জাহাজ দেখেই চিনতে পারল, আমেরিকা যাচ্ছে।

ফগ ব্যস্ততা প্রকাশ করে বললেন—'দেরি নয়, তাড়াতাড়ি জাহাজ ডাকো।'

ফগ-এর পরামর্শ অনুযায়ী মাঝি নৌকোয় যে পেতলের কামান ছিল, তাড়াতাড়ি বারুদ ঢেলে দিল। মাস্তুলে বিপদজ্ঞাপক সাংকেতিক নিশান তুলে দিল, আগুন ধরিয়ে দিল বারুদে। ব্যস, কামান বিকট আওয়াজ করে গর্জে উঠল।

জাপানি সার্কাস

কর্ণাটক সাতই নভেম্বর হংকং থেকে রওনা দেয়। আট তারিখের সকালে কর্ণাটকের নাবিকরা জাঁ পাসোপার্তুকে বিমর্ষমুখে জাহাজের ডেকের ওপর বসে থাকতে দেখল। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, অফিসের আখড়া থেকে সে জাহাজে এল কী করে? সে তো সেখানে নেশার ঘোরে চৈতন্য হারিয়ে পড়েছিল। ফিক্স তাকে এ অবস্থায় ফেলে পালিয়েছিলেন। তিন ঘণ্টা পড়ে থাকার পর একটু একটু করে সে জ্ঞান ফিরে পেতে লাগল। পুরনো ঘটনা কিছুই মনে পড়ল না তার, কেবল মনে পড়ল কর্ণাটক, টলতে টলতে বারবার আছাড় খেতে খেতে কর্ণাটকে গিয়ে উঠল। কোনোরকমে এক কোণে

www.pathagar.com

বসে পড়ল। শরীর দুর্বল বসে থাকা কষ্টকর। কিছুক্ষণ বাদে শুয়ে পড়ল। কখন সে ঘুমে বিভোর হয়ে পড়ল, জাহাজের কর্মীরা ব্যাপারটা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় নি। ইয়কোহামার যাত্রীরা প্রায়ই এমনটা করে।

সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় পাসোপার্তু সুস্থ হয়ে উঠল। সে পাশের এক যাত্রীকে জিজ্ঞেস করল—'এটা কি কর্ণাটক?'

সে যাত্রীটি খেঁকিয়ে উঠল—'সে কি হে! জাহাজে উঠেছেন, কোন জাহাজ কোথায় যাচ্ছে, কিছুই জানেন না।'

পাসোপার্তু আর কথা বাড়াল না। আস্তে আস্তে উঠে এদিক ওদিক ঘুরে তার মনিবের খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু কোথায় পাবে তাঁকে? এবার সব ঘটনা আরো স্পষ্ট হয়ে মনের কোণে ভেসে উঠল। ফিক্স-এর ওপর ভীষণ চটে উঠল। কাছে পেলে হয়ত তাঁর টুটি চেপে ধরত।

শরীর দুর্বল। মাথা ঝিমঝিম করছে। বেশিকিছু ভাবা সম্ভব হল না। সিঁড়ি বেয়ে কোনোরকমে ওপরে উঠে গেল, বিমর্ষ মনে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল।

কর্ণাটক সময়মতো ইয়কোহামায় নোঙর করল। জাহাজ থেকে নেমে হারার উদ্দেশ্যে বড় রাস্তার দিকে গেল। কিছুদূর গিয়ে দেখল, রাস্তার ধারে কারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে। সেদিকে নজর দেওয়ার মতো মানসিক অবস্থা তার নেই। নিজের কথা, মনিব ফগ-এর কথা ভেবেই অস্থির। মনে মনে ঠিক করল প্রয়োজনে ইংরেজ বা ফরাশি কনসাল-এর সঙ্গে দেখা করে নিজের ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা জানিয়ে সাহায্য চাইবে।

একটা কানাকড়িও সঙ্গে নেই যে, যা থেকে কিছু কিনে পেটের জ্বালা নেভাবে। ঘড়িটা তো সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু দাদার আমলের ঘড়ি, বিক্রি করতে মন চাইল না। সবদিক চিন্তা করে পুরনো পোশাকের দোকানে গিয়ে ঢুকল। নিজের ভালো পোশাক দিয়ে পুরনো পোশাক নিল। নগদ পয়সাও কিছু হাতে পেল। দোকান থেকে সামান্যকিছু খেয়ে জাহাজঘাটে গেল। ইচ্ছে ছিল, আমেরিকাগামী কোনো জাহাজে চাকুরি নিয়ে জাপান থেকে বিদায় নেবে। কিন্তু অপরিচিত জায়গা, চাকুরি কে দেবে? পাশেই বিরাট একটা বিজ্ঞাপন ছিল—'প্রখ্যাত উইলিয়ম বাটুলকারের সার্কাস দল। আমেরিকা যাওয়ার আগে শেষ রজনী।'

পাসোপার্তু বিজ্ঞাপনটা বারবার পড়ল। ভাবল, দলটি যখন আমেরিকা যাচ্ছে, কোনরকমে তাদের সঙ্গে ভিড়তে পারলে কাজ হাসিল।

সে মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সোজা দলের মালিক বাটুলকার-এর কাছে গেল। নিজের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করল।

বাটুলকার জিজ্ঞেস করল—'তুমি গান গাইতে পার কি?'

'জানি।'

জানি বললেই তো আর চলবে না। এ কিন্তু সাধারণ গান নয়। মাটিতে মাথা রেখে পা দুটো ওপরে তুলে দিতে হবে। বাঁ-পায়ের তলায় একটা লাটিম ঘুরবে, ডান পায়ে একটা তলোয়ার থাকবে—এ অবস্থায় গান গাইতে হবে। যদি পার বলো। জানা থাকলে আমার দলে চলে এসো। ব্যস, সার্কাসের দলে সে একটা চাকুরি বাগিয়ে নিল।

সার্কাস শুরু হল। আশ্চর্য নাকের খেলা চলছে। দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে খেলা দেখছে। এমন সময় ঘটল এক বিপর্যয়। নাকের পিরামিডের খেলা চলছিল। দর্শকদের মধ্যে একজন চিৎকার করে ডাকলেন, 'পাসোপার্তু। আরে পাসোপার্তু যে!'

www.pathagar.com

পাসোপার্তু একছুটে কাছে এসে বলল, 'আজ্ঞে হাঁ। আপনারা এখানে কী করে।'

'যাও তাড়াতাড়ি জাহাজে ওঠ গে।' পাসোপার্তু সার্কাসের মালিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিলিয়াস ফগ ও আউদার সঙ্গে জাহাজে গিয়ে উঠল।

এবার সাংহাই বন্দরের ঘটনায় ফিরে আসা যাক। নৌকার মাঝি কামান দাগলে ডাকজাহাজ দাঁড়িয়ে পড়ে। মাঝিকে তার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিলেন, প্রতিশ্রুত বকশিস দিতেও ভুললেন না। শুরু হল ইয়কোহামা যাত্রা। সেখানে পৌঁছে ফিলিয়াস ফগ খবর নিয়ে জানলেন, পাসোপার্তু নামে এক ফরাসি সেই জাহাজেই ইয়কোহামা এসেছে। তারপর শুরু হল খোঁজ। খুঁজতে খুঁজতে সার্কাসে গিয়ে তাকে পাওয়া গেল। আউদার মুখ থেকে পাসোপার্তু শুনল, ফিক্স নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁদের নৌকোয়ই ইয়কোহামা এসেছেন। তাঁর নামটি কানে যেতেই পাসোপার্তু রেগে একেবারে বেসামাল, হাতের কাছে পেলে যেন মুরগির মতো টুটি ছিঁড়ে ফেলবে।

জাহাজ ছাড়ল। ফিক্স জেনারেল গ্র্যান্ট জাহাজের যাত্রী। ইয়কোহামায় পা দিয়েই তিনি তাঁর বহু প্রত্যাশিত ওয়ারেন্ট হাতে পেলেন। বিলেত থেকে এসেছে। ওয়ারেন্ট হাতে পেয়েও তিনি অসহায়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক্তিয়ারের বাইরে এই ওয়ারেন্টাই মূল্যহীন, কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না। এখানে একমাত্র স্পেশাল ওয়ারেন্টই কার্যকর, ফিক্স জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন—ওয়ারেন্ট যখন হাতে পেয়েছি শিকার হাতছাড়া হতে দিচ্ছিনে। পাখি খাঁচায় পুরবোই। ইংল্যান্ডের মাটিতে পা দেয়া-মাত্র বাছাধনকে হাতকড়া পরিয়ে ছাড়ব।

জাহাজের ডেকে পাসোপার্তুকে দেখে ফিক্স তার দিকে এগিয়ে গেলেন। একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন—'তুমি সুযোগ বুঝে আমার ওপর খুব তম্বি করেছ, খুবই স্বাভাবিক। আমি কিন্তু এটা আগেই জানতাম! তবু বলছি, ধৈর্য ধরে আমার কথা শোনো। আমি এতদিন তাঁর সঙ্গে শত্রুসুলভ আচরণই করেছি। এখন কিন্তু যথার্থ বন্ধু। যদিও আমি ভালোভাবেই জানি, তিনি ব্যাঙ্কডাকাত। অমন চটে যাওয়ার কী আছে? শোনোই না ধৈর্য ধরে। তিনি যতদিন ব্রিটিশ এলাকায় ছিলেন ততদিন গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেছি, এখন তা আর কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস, মি. ফগ এখন বিলেতে ফিরছেন। আমি তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করব। এই মুহূর্তে আমার একমাত্র চিন্তা, কী করে তিনি নিরাপদে বিলেতের মাটিতে পা দিতে পারেন। সেখানে গেলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে তিনি নির্দোষ কি দোষী।'

ডিটেকটিভ ফিক্স কথাগুলো এমন সমবেদনার সুরে বললেন যে, পাসোপার্তু একবারে গলে জল হয়ে গেল। তাঁকে বিশ্বাস করে বসল। সে গলাছেড়ে বলে উঠল—'আমরা উভয়ে তবে আজ থেকে মি. ফগ-এর হিতাকাঙ্ক্ষী, তাই তো? তবে একটা কথা শুনে রাখুন, যদি কোনোরকমে তাঁর অনিষ্ট করার চেষ্টা করেন তবে আপনাকে দু-টুকরো করে ছাড়ব।'

দ্রুতগামী জাহাজ এস, এস, জেনারেল গ্রান্ট সমুদ্রের বুক চিরে এগিয়ে চলল। ফিলিয়াস ফগ হিসেব করে দেখলেন, তিনি ২ ডিসেম্বর স্যানফ্যান্সিসকো পৌঁছচ্ছেন, নিউইয়র্ক যাচ্ছেন ১১ তারিখ, আর লন্ডন পৌছচ্ছেন ২০ তারিখে।

www.pathagar.com

ফিলিয়াস ফগ এক বিকেলে আউদাকে নিয়ে জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ক্রমেই রূপ সৌন্দর্যের আকর আউদার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে লাগলেন।

ইয়াংকিদের মহলে

ভোরের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে।

আমেরিকার মাটিতে পা দিয়েই ফিলিয়াস ফগ নিউ ইয়র্কগামী ট্রেনের খোঁজ নিলেন! সন্ধ্যা ছয়টায় ট্রেন ছাড়বে। সারাটা দিন কাটাতে হবে। একটা ভালো হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, প্রাতরাশ সেরে ইংরেজ কনসালের অফিসে গেলেন পাসপোর্ট সই করাতে। সঙ্গে করে আউদাকে নিয়ে গেলেন। কী যে হয়েছে ছাই, তাঁকে ছাড়া যেন এক পাও চলতে পারেন না।

কনসাল অফিস থেকে ফেরার পথে পাসোপার্তুর সঙ্গে দেখা। সে বলল, 'শোনা যায়, আমেরিকান ট্রেনে নাকি ডাকাতদের খুব উৎপাত। চলন্ত ট্রেনেই নাকি তারা ডাকাতি করে। কয়েকটা পিস্তল কিনে নিলে কেমন হয়?'

ফগ কথাটাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, 'আমার মনে হয় না ওসবের দরকার পড়বে। তবু বলছি, তোমার ইচ্ছে হলে কিনে নিতে পার।'

পাসোপার্তু বাজারের দিকে পা বাড়াল। ফগ কয়েক পা এগাতেই ফিক্স-এর সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে দূর থেকে ফগ সোল্লাসে বললেন, 'আরে, মি. ফিক্স যে। কোথায় চললেন? কী আশ্চর্য ব্যাপার বলুন তো জনাব! আমরা একই জাহাজে এলাম, অথচ জাহাজে একটিবারও দেখা হল না।'

'দেখুন, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার। জরুরি কাজে ইওরোপ যাচ্ছি। আমরা তো একসঙ্গেই যেতে পারি, অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।'

'আপত্তি বলছেন কী জনাব! আমরা দুজনেই সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। কাজ সেরে চলে আসুন, একসঙ্গেই যাওয়া যাবে।'

তারা মন্টুগোমারিতে পথে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। হঠাৎ সামনে লোকের ভিড় দেখলেন। কিছুলোক চিৎকার করে ছুটোছুটি করছে, কিছু একটা বড় পোস্টার নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে, আবার কয়েকজন গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে—'ক্যামেরফিল্ড জিন্দাবাদ! ক্যামেরফিল্ড জিন্দাবাদ! মভিয়া জিন্দাবাদ! মভিয়া জিন্দাবাদ!'

ব্যাপার দেখে ফিক্স বুঝে নিলেন, নিশ্চয়ই কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যাপার। তিনি ফগকে বললেন, 'এখানে থাকা নিরাপদ নয়। এক্ষুনি হয়ত দাঙ্গা বেঁধে যাবে। চলুন মানে মানে সরে পড়ি। ফগ তাঁকে সমর্থন করলেন। লম্বা লম্বা পায়ে তাঁরা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে হাঁটতে লাগলেন।'

হ্যাঁ, ফিক্সের কথাই ঠিক। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লাঠিসোটা নিয়ে ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। পিস্তলের শব্দও কয়েকবার কানে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরের অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। ষণ্ডামার্কা একজন ইয়াংকি হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে ফগ-এর মাথা লক্ষ্য করে লাঠি চালাল। আশ্চর্য ব্যাপার ফগের কিছু হল না। লাঠিটা গিয়ে লাগল ফিক্স-এর মাথায়। তবু ভালো তেমন কিছু হল না, আঘাত সামান্যই লেগেছে। মাথার ডান দিকটা সামান্য ফুলে গেছে এইমাত্র। মাথায় লোহার টুপি ছিল তাই রক্ষা।

ফগ অনেক কষ্টে আউদা ও ফিক্সকে নিয়ে হোটেলে ফিরে এলেন।

www.pathagar.com

পাসোপার্তু বারোটা অটোমেটিক পিস্তল ও বেশ কিছু গুলি কিনে আগেভাগেই হোটেলে পৌঁছে গেছে। ফিক্সকে দেখেই তার রক্ত গরম হয়ে উঠল। কিন্তু ফগ যখন বললেন যে, তাঁর জন্যই ফগের জীবনরক্ষা হয়েছে। ফগকে লক্ষ করে মারা লাঠির ঘা তিনি নিজে মাথা পেতে নিয়েছেন, তখন সে কিছুটা ঠাণ্ডা হল।

ফগ ট্রেনে উঠতে উঠতে ফিক্সকে বললেন, 'সেই ষণ্ডামার্কা ইয়াংকিটার সঙ্গে আর দেখা হল না। নচ্ছারটা ইংরেজকে অপমান করে বহাল তবিয়তে থাকবে ভেবে থাকলে ভুল করবে। তার কাজের প্রতিশোধ নিতে এদেশে আবার আসতেই হবে আমাকে। তখন দেখব বাছাধন, কত শক্তিধর।'

ফগ-এর কথা শুনে ফিক্স ভাবলেন, 'তোমাকে আর এখানে ফিরতে হচ্ছে না ইংল্যান্ডের মাটিতে একবার পা দাও, জেলের ঘানি টানিয়ে ছাড়বে।'

ট্রেন ছাড়ল। নিউইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকোর দূরত্ব ৭৮৬ মাইল। এখন এই দীর্ঘ পথ গাড়ি দিতে পাত্র একসপ্তাহ লাগছে, আগে কিছু না হলেও ছয় মাস তো লাগতই।

ফিলিয়াস ফগ যে কামরায় উঠলেন, তাতে ডাইনিংরুম ও স্মোকিং রুম প্রভৃতি সবরকম ব্যবস্থাই রয়েছে। চলন্ত অবস্থায়ই এককামরা থেকে অন্য কামরায় যাতায়াত করা যায়। গাড়ির মধ্যে একটা প্রেস রয়েছে। সেখান থেকে খবরের কাগজ পর্যন্ত ছাপা হয়ে বোরোয়। ট্রেনে সিটগুলো এমন অদ্ভুত কায়দায় তৈরি যে, স্প্রিং টিপলেই তার পিছনের অংশ খুলে যায়, বেরিয়ে আসে বিছানা।

প্রথম কয়েকদিন নির্বিঘ্নে ট্রেন চলল। সাতই ডিসেম্বর দেখা দিল সমস্যা। গ্রিন রিভার স্টেশনে ট্রেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গতরাতে বরফ পড়েছিল। সকালেও লাইনে বরফ জমা হয়ে গেছে।

বেলা বাড়লে বরফ গলে লাইনে ট্রেন চলাচলযোগ্য হল। গ্রিন রিভার ছেড়ে ট্রেন আবার এগিয়ে চলল।

একসময় আউদা একজন যাত্রীকে দেখে চমকে উঠলেন! জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পাশের কামরায় বসেছিল সে। লোকটা আর কেউ নয়, কর্নেল প্রকটর। ফগ ট্রেনে উঠার সময় যাকে দেখে নেবেন বলেছিলেন। কর্নেলকে ট্রেনে দেখে তিনি আতঙ্কিত হয়ে ফিক্স আর পাসোপার্তুকে ব্যাপারটা বললেন। ফগ ঘুমে অচৈতন্য। তিনি ব্যাপারটা জানতে পারলেন না।

ফিক্স বললেন, 'ঘাবড়াবার কী আছে, বলুন তো? কর্নেলকে কিছু করতে হলে আগে আমার সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে।'

পাসোপার্তু তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'ওরকম অনেক দোষ আছে। তিনি বলেই রেখেছেন, আপনাদের প্রতিশোধ নিতেআবার আমেরিকা আসেবন।'

ফিক্স বললেন, 'দেখুন আমি কথা দিচ্ছি, মি. ফগকে জীবন্ত অবস্থায় বিলেতে নিয়ে যেতে আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না।'

আউদা প্রায় কাঁদো কাঁদো সুরে বললেন, 'তাঁদের যাতে মুখোমুখি দেখা না হয় দয়া করে তার ব্যবস্থা করুন আপনারা।'

বললাম তো আমি নিজের জীবন দিয়ে মি. ফগকে রক্ষা করব। তিনি বাজি জিততে পারুন আর নাই পারুন দেরি হয়ে গেলে সব পণ্ডশ্রম হবে।

ফিক্সের কথায় আউদা কিছু আশ্বস্ত হলেন।

www.pathagar.com

মেডিসিন বো স্টেশনের আগে ট্রেনটা আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। স্টেশনমাস্টার লোক পাঠিয়ে জেনেছেন সামনের একটা সেতুর অবস্থা খুবই সঙ্গীন। মাইলখানেক দূরের ওই সেতুটার তলা দিয়ে একটা পাহাড়ি নদী হয়ে চলেছে। জলের ধাক্কায় ধাক্কায় তার কয়েকটা বীম ভেঙে গেছে।

যাত্রীরা গার্ডের কামরার কাছে গিয়ে হুজ্জুতি জুড়ে দিল। অসহায় গার্ড জানালেন, 'আমি অন্য আর একটা ট্রেনের জন্য ওমাহা স্টেশনে আসতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না। তাছাড়া পথ এক মাইল হলে কী হবে, হেঁটে যেতে ছয় ঘণ্টাই লেগে যাবে। নদী পার হবার ব্যাপার রয়েছে। পাহাড়ি নদী। স্রোত খুবই বেশি। নৌকার সাধ্য কি সাঁকোর কাছে যায়। ওপারে যাবার একটাই ঘাট, দশ মাইল দূরে।'

অনেক ভেবে চিন্তে ড্রাইভার বলল—'বিম ভেঙেছে মিথ্যে নয়। তবু চেষ্টা করলে ট্রেন নিয়ে যাওয়া যাবে। খুব স্পিডে ট্রেন চালিয়ে দিয়ে চোখের পলকে ট্রেন ব্রিজ পেরিয়ে যাবে।'

যাত্রীরা ড্রাইভার-কে সমর্থন করল। ইয়াংকিদের কথা শুনে পাসোপার্তুর মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম হল!

ড্রাইভারের আশ্বাস পেয়ে গার্ড বলল, 'সবাই ট্রেনে উঠে পড় ন। এক্ষুনি ট্রেন ছাড়বে।'

ব্যাস ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। যাত্রীরা যে যার কামরায় উঠে গেল। ড্রাইভার পরপর কবার সিটি দিয়ে ট্রেনটাকে প্রায় মাইলখানেক পিছনে নিয়ে গেলন। সেখানে থেকে তীব্র বেগে এগোতে লাগল। তার গতি ঘণ্টায় একশ মাইলের কম হবে না। আচমকা যেন একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। ট্রেনটি যেন কেবল ব্রীজের প্রান্ত দুটো স্পর্শ করে চোখের পলকে ওপারে চলে গেল। সবার চোখের সামনে ব্রীজটা টুকরো টুকরো হয়ে নদীতে পড়ে যেতে লাগল।

এতকিছু ঘটে গেল, ফগ কিছুই জানতে পারলেন না। ট্রেনের গতি বেড়ে যাওয়ার সময় ঘুমের ঘোরে কেবল একবারটি পাশ ফিরে শুলেন।

তিন দিন তিন রাত ট্রেনেই কেটে গেল। ইতিমধ্যে ১৩৮২ মাইল ট্রেনটা পেরিয়েছে। সন্ধ্যার কিছু পরে ট্রেনটা ইভান্স পাশ স্টেশন ছাড়িয়ে ক্রমেই নিচের দিকে নামতে লাগল।

একটা ছোট স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াল। ফগ ট্রেন থেকে নেমে প্লাটফর্মে একটু পায়চারি করবেন ভাবলেন। পাসোপার্তু, ফিক্স ও আউদা বারবার তাঁকে ট্রেন থেকে নামতে বারণ করলেন। এই ট্রেনেই যে সেই বদমায়েশ কর্নেল রয়েছে সে কথাও বললেন। ফগ তাদের কথায় আমল না দিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন। যে কথা সেই কাজ। প্লাটফর্মে ফগকে পায়চারি করতে দেখে পাশের কামরা থেকে কর্নেল নেমে এল। ব্যাপার বেগতিক দেখে পাসোপার্তু ও ফিক্স ট্রেন থেকে নেমে ফগের কাছে গেলেন।

কর্নেল পাশে ফিরে দাঁড়াতেই ফগ নরম সুরে বললেন—'কর্নেল, আমার কিন্তু তাড়াতাড়ি ইওরোপে ফিরে যাওয়া খুবই দরকার। এখানে দেরি হলে আমার মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'ক্ষতি হলে আমার অসুবিধা কোথায়?'

www.pathagar.com

'দেখুন, সানফ্রান্সিসকোতে আপনার সঙ্গে বিবাদের পর আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ইংল্যান্ডের কাজ মিটিয়ে আপনার সঙ্গে মোকাবেলা করতে আমেরিকা আসব। ভালো কথা, ছয় মাস পরে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কী?'

দাঁতে দাঁত চেপে কর্নেল জবাব দিলেন, 'ছয় মাসের কথা কেন বলছেন, বরং বলুন ছয় বছর।'

'না, ছয় বছর নয়, ছয় মাস পরেই আমি এখানে পৌঁছে যাব।'

কর্নেল গর্জে উঠলেন, 'পাগল নাকি। আমার কথা শুনুন জনাব, যদি হয় এখনই হয়ে যাক, নইলে কখনও না!'

'ভালো কথা, তাই হবে। আপনি নিউইয়র্ক যাচ্ছেন, নাকি?'

'তা দিয়ে আপনার দরকার কী? পরের স্টেশনের নাম প্লামফ্রিক। দশ মিনিট ট্রেন দাঁড়াবে। সেখানে। কয়েকটামাত্র পিস্তলের গুলি তো চালাতে হবে, কতক্ষণ আর লাগবে বলুন তো?'

'উত্তম প্রস্তাব। প্লামফ্রিক—এই যা হোক, একটা রফা হয়ে যাক।'

'দেখুন জনাব, নামলে আর কপালে ওঠা হয়ে উঠবে না, বলে রাখছি।' ট্রেন ছেড়ে দিল ব্যাপার দেখে আউদা কপালে হাত দিয়ে বিমর্ষ মুখ বসে রইলেন। তাঁকে অভয় দিতে গিয়ে ফগ বললেন, 'অল্প জলে পুঁটিমাছ এমন ছটফট করেই থাকে। ঘাবড়াবার কিছু নেই। এবার ফিক্স-এর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'মি. ফিক্স, আশা করি, আপনি ডুয়েলে আমাকে সেকেন্ড করবেন?'

ফিক্স সম্মতি জানালেন।

এগারটায় ট্রেন প্লামফ্রিক স্টেশনে দাঁড়াল। ফগ প্লাটফর্মে নামলেন। ফিক্স ও পাসোপার্তু পিস্তল হাতে তাঁকে অনুসরণ করলেন। আউদা জানালা দিয়ে ছলছল চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পাশের দরজা দিয়ে কর্নেল নামলেন। একজন আমেরিকান তাকে সেকেন্ড করতে রাজি হয়েছে।

তাদের প্লাটফর্মে নামেত দেখেই গার্ড হৈ হৈ করে উঠল—'করছেন কি! নামছেন কেন? এমনিতেই ট্রেন কুড়ি মিনিট পিছিয়ে পড়েছে, এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না।'

ফগকে দেখিয়ে কর্নেল বললেন—'আমি ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু ডুয়েল লড়তে চাচ্ছি।'

'দুঃখিত। ঐ শুনুন, ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা পড়ে গেছে। তাছাড়া নেহাৎই যদি ডুয়েল লড়ার সখ হয়ে থাকে চলন্ত ট্রেনেও তো সম্ভব।'

ফিলিয়াস ফগ কয়েক পা এগিয়ে বললেন, 'আমার অসুবিধা কিছু নেই, আপনার সুবিধে হলেই হল।'

গার্ড নিজের কামরা থেকে তাঁদের কামরার কাছে এসে জানালা দিয়ে অন্য যাত্রীদের বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, এঁদের একটু বোঝাপড়ার ব্যাপার রয়েছে। আপনারা দয়া করে একটু জায়গা করে দিলে বড়ই উপকার হয়।'

যাত্রীরা উপায়ান্তর না দেখে অন্য কামরায় গিয়ে আশ্রয় নিল। কামরাটা লম্বায় পঞ্চান্ন ফুট। ডুয়েল লড়ার পক্ষে উপযোগী। ফিলিয়াস ফগ ও কর্নেল পিস্তল হাতে তৈরি হয়ে দাঁড়ালেন। ঠিক হল ট্রেনের সিটি বাজলেই লড়াই শুরু হবে।

www.pathagar.com

কামরার সবাই যখন ট্রেনের সিটি শোনার জন্য উৎকীর্ণ হয়ে পড়েছেন তখন হঠাৎ তুমুল হৈ হট্টগোল শোনা গেল। ট্রেনে ডাকাত পড়েছে। ডাকাতদের একজন লাফিয়ে ইঞ্জিনের ওপর উঠে গিয়ে ড্রাইভার ও ইঞ্জিনম্যানকে আহত করল। তার ইচ্ছে ছিল ট্রেন থামিয়ে রাখা। যন্ত্রের ব্যবহার না জানায় বাষ্প-নলের মুখ দিল খুলে। ব্যস, আর যাবে কোথায়, উল্কার বেগে গাড়ি ছুটতে লাগল। অন্যান্য দস্যুরা যাত্রীদের ওপর চড়াও হল। পিস্তল আর বন্দুকের ঘন ঘন শব্দে কানে তালা লাগার উপক্রম।

ফগ হাতের পিস্তল ফেলে কামরার ভেতর দিয়ে গিয়ে গার্ডের কাছাকাছি গেলেন। গার্ড ফগকে দেখেই চিৎকার করে উঠলেন—'ট্রেন থামাতে না পারলে একজনও বাঁচবে না।'

ফগ এবার ট্রেনের সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

পাসোপার্তু তাঁকে নিরস্ত করতে গিয়ে বললেন, 'আপনি কোথায় যাবেন? এ কি আপনার কাজ নাকি? আমি দেখছি, কী করা যায়। ফগকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে থেকে জানালা ধরে ঝুলে পড়ল। এভাবে জানালা ধরে ধরে সে সন্তর্পণে ইঞ্জিনের দিকে এগোতে লাগল। লাগেজ গাড়ি ইঞ্জিনের মাঝখানের লোহার রডটা এক হাতে শক্ত করে ধরে অন্য হাতে দুগাড়ির সংযোগ-শৃঙ্খল খুলে দিল। যে লোহার রডটা দিয়ে ইঞ্জিন ও লাগেজ গাড়ির সংযোগ রক্ষা করা হয়েছিল তা আচমকা সশব্দে ভেঙে গেল। খালি ইঞ্জিন মুহূর্তের মধ্যে সামনের দিকে উল্কার বেগে ছুটে চলল। ইঞ্জিনবিহীন কামরাগুলোর গতি ক্রমেই কমতে লাগল, ডাকাতরা তখন প্রাণ নিয়ে পালাতে পথ পায় না। স্টেশনের কাছাকাছি ট্রেন গেল থেমে।

পাসোপার্তু কোথায়? ফগ ট্রেন থেকে নেমে তাকে খুঁজতে লাগলেন। তিনি উভয় সঙ্কটে পড়লেন। একদিকে নিউইয়র্ক থেকে জাহাজ ধরার চিন্তা, অন্যদিকে পাসোপার্তুকে খুঁজে বের করা।

রেল লাইনের ধারে ফোর্ট কিয়ার্নি নামে ছোট্ট একটি দূর্গ। দূর্গের সৈন্যরা বন্দুকের শব্দ শুনে ছুটোছুটি করে ট্রেনের কাছে এসেছিল। ফগ তাদের কমান্ডারকে বললেন—'এ যে মহা মুস্কিলে পড়া গেল! তিনজন যাত্রীর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তারা মারা যাক, বা ডাকাতদের হাতে বন্দি হোক, যে-কোনো অবস্থায় তাদের খুঁজে বের করা দরকার; যদি দয়া করে—'

কমান্ডার ভদ্রলোক বললেন—'এ কী করে সম্ভব! ডাকাতরা ছুটোছুটি করে কোন দিকে গেছে কে জানে?'

কমান্ডার অস্বীকার করলে ফগ একাই ডাকাতদের খোঁজে যাবেন মনস্থ করলেন। ব্যাপারটা ফিক্স-এর বিবেকে বাঁধল। তিনি বললেন—'সে কী কথা! আপনি কোথায় যাবেন? যে লোকটা সবার প্রাণ বাঁচাতে নিজের জীবন তুচ্ছ করে গাড়ি থামাতে গেল তাকে ডাকাতদের হাতে ফেলে আমাদের চলে যাওয়া মোটেই উচিত নয়। আপনি আউদা দেবীকে নিয়ে এখানে অপেক্ষা করুন। আমি যাচ্ছি পাসোপার্তুর খোঁজে।' তিনি এবার অন্য যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি ত্রিশজন লোক চাই, কে কে যাবেন বলুন?'

ফগের কথা শেষ হতে না হতেই যাত্রী ও সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই যাবার জন্য হাত তুললেন। কমান্ডারের নির্দেশে একজন প্রবীণ অফিসার সে দলের নেতৃত্ব দিলেন।

www.pathagar.com

ফিলিয়াস ফগও দলের সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি হলেন। তাঁর ব্যাঙ্ক-নোটে বোঝাই ব্যাগটা আউদার কাছে জমা দিয়ে তৈরি হলেন। সৈন্যদের বললেন, 'আমার কর্তব্যপরায়ণ ভৃত্য পাসোপার্তুর খোঁজ পেলে আপনাদের এক হাজার পাউন্ড পুরস্কার দেব। কথা দিচ্ছি।'

আউদা ওয়েটিংরুমে অদৃষ্ট সম্বল করে বসে রইলেন। এমন সময় পরপর কয়েকবার ট্রেনের সিটি শোনা গেল। পাসোপার্তু যে ইঞ্জিনটা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল তা কিছুদূর উল্কার বেগে ছুটে গিয়ে কয়লার অভাবে থেমে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে আহত ড্রাইভারদের একজনের জ্ঞান ফিরে এসেছে। সে ব্যাপারটা অনুমান করতে পারল। সে কয়লা দিয়ে আবার আগুন জ্বেলে ইঞ্জিনটাকে সচল করে তুলল। এবার বিচ্ছিন্ন কামরাগুলোর খোঁজে পিছিয়ে এল।

ফোর্ট কিয়ার্নি স্টেশনে ইঞ্জিন আসতেই অপেক্ষমাণ আহত যাত্রীরা আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল।

আউদা ভিড় ঠেলে ড্রাইভারের কাছে গিয়ে বললেন—'কিছু যাত্রী বন্দিদের খোঁজে গেছেন। তারা ফিরে না এলে—'

'কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। এমনিতেই ট্রেন তিন ঘণ্টা পিছিয়ে পড়েছে। সন্ধের দিকে ট্রেন আছে, তাতে যাবেন।'

গার্ড ও ড্রাইভারের নির্দেশে যাত্রীরা ছুটোছুটি করে উঠল। পরপর কয়েকবার সিটি দিয়ে ট্রেন প্লাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে চলল।

আউদা হতাশ দৃষ্টিতে এগিয়ে যাওয়া ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিলিয়াস ফগ, জাঁ পাসোপার্তু ও ফিগ স্টেশনে ফিরে এলেন। স্টেশন থেকে কয়েক মাইল দূরে দস্যুদের সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছিল! দূর থেকে পাসোপার্তু ও অন্য দুজন যাত্রীকে ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করতে দেখে ছুটে গিয়েছিল। সৈন্যদের সাহায্যে ফগ তাদের উদ্ধার করে স্টেশনে ফিরে এলেন। স্টেশনে এসে তিনি আউদার মুখে শুনলেন, ট্রেনটা চলে গেছে! সন্ধ্যার আগে আর কোনো ট্রেন আসবে না। কথাটা কানে যেতেই ফগ এর মুখে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল!

আত্মবিশ্বাস

পাসোপার্তু বিষণ্ন মনে ভাবতে লাগল—আমার জন্যই মনিবের দেরি হয়ে গেল। দু এক ঘণ্টা নয়, পুরো ২০ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে ফিলিয়াস ফগ-এর।

ফিক্স কপালের চামড়ায় দুশ্চিন্তার রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন—তাই তো একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, বিলেতের ডাকজাহাজ ধরতে চেয়েছিলেন কি? তাই যদি হয়, নিউইয়র্কে এগারো তারিখের আগেই আপনার পৌঁছানো দরকার।'

'হ্যাঁ, ডাকজাহাজই আমাকে ধরা দরকার। ওটার ওপরই আমার এত সাধ্য সাধনার ফল নির্ভর করছে।'

'এত ঝুট ঝামেলায় না পড়লে আপনার হাতে বরং বার ঘণ্টা সময় থেকে যেত। ধীরে সুস্থে জাহাজ ধরতে পারতেন। দেখুন, আপনার মোট ২০ ঘণ্টা দেরি হয়েছে। তা থেকে বারো ঘন্টা বাদ দিলে মোট দেরি দাঁড়াচ্ছে আট ঘণ্টা তাই না। পথে আসতে আসতে আমি একজনর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, শ্লেজ গাড়ি ভাড়া দেয়। পথে বরফ জমে

www.pathagar.com

রয়েছে, হাওয়াও যথেষ্ট। পাল তুলে দিলে ট্রেনের মতোই নাকি ছুটবে। স্টেশনের কাছেই বাড়ি। বেশ বড় সড়কও আছে। অনায়াসে শ্লেজে পাঁচ-ছয়জন লোক ধরবে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নাকি ওমাহা স্টেশনে পৌঁছে দিতে পারবে। ওমাহা থেকে নিউইয়র্ক শিকাগোগামী ট্রেন ঘন ঘন ছাড়ে।

ঘড়িতে তখন বেলা আটটা। ফগ শ্লেজেই যাবার ব্যবস্থা করলেন। শ্লেজ-চালক পাল তুলে দিল। হু হু শব্দে শ্লেজ ছুটে চলল। ফগ ভাবলেন, এভাবে চলতে পারলে অনেকটা সময় সঙ্কুলান করা যাবে।

একে তো বরফের ওপর দিয়ে গাড়ি চলেছে, তার ওপর দমকা বাতাস শীতে গায়ের রক্ত জমে যাবার উপক্রম।

দক্ষ চালক দৃঢ়হাতে হাল ধরে রাখল। পক্ষীরাজের মতো উড়ে চলল শ্লেজ গাড়িটা। কতকগুলো বরফছাওয়া ঘরের সামনে শ্লেজ গাড়ি দাঁড়াল। শ্লেজ-চালকের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে ফগ সবাইকে নিয়ে শিকাগোগামী ট্রেনে চাপলেন। ভাগ্য ভালো, পাঁচ মিনিট দেরি হলেই এত প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যেত।

পরদিন ১০ ডিসেম্বর। বিকেল চারটেয় ফগ শিকাগোতে পৌঁছলেন। স্টেশনে পা দিয়েই শুনলেন, নিউইয়র্কগামী ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। ড্রাইভার গার্ডের সঙ্কেতের অপেক্ষায় রয়েছে। গার্ড পতাকা দেখাল ধীরমন্থর গতিতে প্লাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে চলল। পরদিন বেলা এগারোটায় ট্রেন নিউইয়র্ক জাহাজঘাটে থামল। প্লাটফর্মে পা দিয়েই ফগ শুনলেন—প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা আগে লিভারপুলগামী 'চায়না জাহাজ' বন্দর ছেড়ে গেছে। হায়! তীরে এসে তরী ডোবার উপক্রম। লিভারপুল যাওয়ার আর কোনো জাহাজ নাকি নেই। পাসোপার্তু উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল—'অ্যা! এ কী হ'ল!'

ফিলিয়াস ফগ কিন্তু নির্বিকার। চোখের ওপর এতবড় একটা সর্বনাশ হয়ে গেল দেখেও তাঁকে এতটুক বিচলিত হতে দেখা গেল না।

সকাল হল, ১২ ডিসেম্বর। ফগের হাতে আর নয় দিন তের ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় রয়েছে, হিসেব করে করে দেখলেন। চায়না জাহাজ হাতছাড়া না হলে ঠিক সময়েই ফগ লন্ডনে পৌঁছতে পারতেন। অনায়াসে বাজি জেতা সম্ভব হত।

ফগ সঙ্গীদের ওয়েটিংরুমে বসিয়ে রেখে বললেন—'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কেউ এখান থেকে নড়বেন না। দেখে আসি, কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না।'

হাঁটতে হাঁটতে ফগ হার্ডসন নদীর ধারে এলেন। বন্দরে অনেক জাহাজ দাঁড়িয়ে। কেউ কেউ ছাড়ার উপক্রম করছে দেখলেন। সবই পালের জাহাজ। ভাবলেন, এতে সুবিধা হবে না। কিছু দূরে এসে 'হেনরিয়েটা' নামে একটা জাহাজকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। নৌকো করে জাহাজটায় গিয়ে উঠলেন। ক্যাপ্টেনকে খুঁজে বের করে বললেন—'আমার নাম ফিলিয়াস ফগ, বাড়ি লন্ডনে। আপনি জাহাজ ছাড়ার উপক্রম করছেন, মনে হচ্ছে! যাবেন কোথায়?'

'হ্যাঁ, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ছাড়ব। বোঁর্দো যাব, জাহাজ খালিই যাবে।'

'আপনার জাহাজ কি তাড়াতাড়ি চলতে পারে?'

'হ্যাঁ। ঘণ্টায় তের চৌদ্দ মাইল তো বটেই। হেনরিয়েটা জাহাজের কথা সবাই জানে জনাব।'

www.pathagar.com

'আপনাকে একটা অনুরোধ করছি, আমরা চারজন রয়েছি, লিভারপুল যাব। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের পৌঁছে দিলে বড়ই উপকার হয়। ভাড়ার জন্য ভাববেন না, যা চাইবেন দিয়ে দেব।'

'লিভারপুল বলছেন কি জনাব, টাকা দিলে চীনেই পৌঁছে দিতে পারি। যত্তসব ঝামেলা! জাহাজ থেকে নামুন জনাব। আমি এখন বোর্দো যাব। ঝামেলা করবেন না, নেমে যান।'

'প্রচুর টাকা ভাড়া দেব।'

'বললাম তো হবে না!'

'নেহাতই যদি ভাড়া না দেন, বিক্রি করুন কিনে নিচ্ছি।'

'জাহাজ কিনেছি কি বিক্রি করার জন্য নাকি? নামুন জাহাজ থেকে।'

ফগ নাছোড়বান্দা, তাঁকে যে লিভারপুল যেতেই হবে। তিনি ঠাণ্ডা মাথায় তেমনি অনুরোধের সুরে বললেন, 'ক্যাপ্টেন, এক কাজ করুন, আমাকে তবে বোর্দোতেই পৌঁছে দিন। আমি ৫০০ পাউন্ড দেব।'

ক্যাপ্টেন এবার যেন একটু নরম হলেন—'মাথাপিছু ৫০০ কি?'

'হ্যাঁ, মাথাপিছু ৫০০ দেব।'

দুই হাজার পাউন্ডের লোভ সামলানো ক্যাপ্টেনের পক্ষে সম্ভব হল না। তাছাড়া জাহাজ তো এমনিতেই বোর্দো যাচ্ছে। একটা কানাকড়িও খরচ নেই। তিনি এবার বললেন—'তবে তাড়াতাড়ি চলে আসুন! ঠিক নয়টায় জাহাজ ছাড়বে।'

ঘড়ি ধরে কাঁটায় কাঁটায় নয়টায় জাহাজ ছাড়ল। জাহাজে উঠে ফিক্স বোর্দোর কথা শুনে অবাক হলেন। ভাবলেন, এ কী পাগলের পাল্লায় পড়লাম রে বাবা! কোথায় রইল লিভারপুল, আর আমরা চলেছি বোর্দো! দেখাই যাক, ফিলিয়াস ফগ-এর দৌড় কতদূর।

জাহাজ ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিলিয়াস ফগ বুঝে নিলেন, জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের বড় একটা সদ্ভাব নেই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি নাবিকদের হাতের মুঠোয় নিয়ে এলেন। তবে এর জন্য তাঁকে কিছু খসাতে হয়েছে, মিথ্যে নয়। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে করেই হোক তাঁকে লিভারপুলে পৌঁছাতেই হবে। একেবারে দেউলে হতে হলেও পিছোবেন না। নাবিকদের সাহায্যে তিনি ক্যাপ্টেনকে একটা ক্যাবিনে বন্দি করে ফেললেন। নাবিকরা এবার লিভারপুলের দিকে জাহাজ ছুটিয়ে দিল।

ফগের কাণ্ড দেখে ফিক্স-এর চোখ ছানাবড়া। ফগ ক্যাপ্টেনের অভাব পূরণ করছেন। নাবিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশাদিও দিতে লাগলেন। ফিক্স স্পষ্ট বুঝে নিলেন, এ কাজে ফগ রীতিমতো দক্ষ।

১৬ ডিসেম্বর। পঁচাত্তর দিন কেটে গেছে। আর মাত্র পাঁচ দিন হাতে রয়েছে। দুর্ভাগ্য ফগ-এর পিছন ছাড়ার নয়। জাহাজের ইঞ্জিনম্যান এসে দুঃসংবাদ দিল—'কয়লা ফুরিয়ে গেছে। বোর্দো যাওয়ার মতো কয়লা জাহাজে নেওয়া ছিল, লিভারপুর যাবে কেন?'

ফগ বললেন—'যতক্ষণ কয়লা আছে জোরসে জাহাজ চালিয়ে যাও! আমি ভেবে দেখি, কী ব্যবস্থা করা যায়।'

আঠার তারিখে ইঞ্জিনম্যান জানাল, কয়লা শেষ, জাহাজ আর যাবে না।'

ফগ পাসোপার্তুকে বললেন—'এক কাজ করো, ক্যাবিন খুলে ক্যাপ্টেনকে বের করে নিয়ে এসো।'

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন এসেই ফগকে বললেন—'আমরা এখন কোথায় আছি, বলুন তো?'

ফগ বললেন, 'লিভারপুল থেকে ৭৭০ মাইল দূরে।'

ক্যাপ্টেন উন্মাদের মত গর্জে উঠলেন,—'ডাকাত কোথাকার। শয়তানি করার আর জায়গা পাওনি।'

'ওসব বাজে কথা রেখে জাহাজটা আমার কাছে বিক্রি করে দিন। বলুন কত দাম নেবেন? আর যদি নেহাতই বিক্রী না করেন জাহাজের কাঠ ভেঙে বয়লারের কাজে লাগাতে হবে। কয়লা ফুরিয়ে গেছে, জাহাজ আর এগোবে না।'

'জাহাজ কিনবেন? পাগল হয়েছেন নাকি! পাঁচ হাজার পাউন্ড দাম দিতে পারবেন?'

'এই নিন, আপনার পাঁচ হাজার পাউন্ড।' কথা বলতে বলতে ফগ একগোছা নোট ক্যাপ্টেনের হাতে গুঁজে দিলেন। নোটের গোছাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে ক্যাপ্টেন বললেন, 'কিন্তু জাহাজের খোল আর ইঞ্জিনটা তো আমারই রয়ে যাবে?'

'ঠিক আছে খোল আর ইঞ্জিন আপনারই প্রাপ্য।'

ব্যাস, আর কথা নেই। নাবিকরা জাহাজের কাঠ ভেঙে ভেঙে ব্যবহার করতে লাগল।

এত করেও শেষ রক্ষা করা গেল না। দূরে উজ্জ্বল আলো দেখতে পেয়ে ক্যাপ্টেন বললেন—'কাঠও ফুরিয়ে গেল। অথচ সবে কুইন্স টাউন দেখা যাচ্ছে। এখনও অনেকটা পথ বাকি। তিনটের আগে কিছুতেই লিভারপুল পৌঁছোতে পারবেন না। এখন জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।'

ফগ তবু বিচলতি হলেন না। নির্বিকারভাবেই ক্যাপ্টেনকে বললেন, 'উপায় যখন নেই, বাধ্য হয়েই জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। দেখাই যাক না, হতাশায় ভেঙে পড়লে চলবে কেন?'

কপাল যখন মন্দ হয়

একটা দ্রুতগামী ট্রেন আমেরিকার ডাক কুইন্স টাউনে থামে। সেই ডাক ডাবলিনে পাঠানো হয়। লিভারপুলগামী একটা জাহাজ সে-ডাক নেবার জন্য তৈরি হয়ে থাকে। ফগ হিসেব করে দেখলেন এতে গেলে নির্দিষ্ট সময়ের বারো ঘণ্টা আগেই লিভারপুল পৌঁছে যাওয়া যাবে। ফলে আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে লন্ডন পৌঁছতে বেগ পেতে হবে না।

হেনরিয়েটা কুইন্স টাউনে যখন নোঙর করল তখন রাত একটা। ছুটতে ছুটতে গিয়ে ট্রেনে উঠলেন। পরদিন বেলা এগারটায় লিভারপুল নামলেন।

লন্ডন আর মাত্র ছয় ঘণ্টার পথ। সেখান থেকে ঘন ঘন ট্রেন ছাড়ে। তিনি ভাবলেন, আর চিন্তা নেই, বাজি জিতবেনই। ঠিক সে-সময় ফিক্স প্রমাদ ঘটালেন। ফগ-এর হাত চেপে ধরে বললেন—'মি. ফগ, রাজার নামে, চুরির অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।' ফিক্স ক্যাপ্টেন হাউসের একটা ঘরে বন্দি করে রাখলেন তাঁকে।

পাসোপার্তুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম। সে দুহাতে নিজের চুল ছিড়তে লাগলেন—'হায়! এ কী করলাম আমি! শয়তানটার দুরভিসন্দির কথা যদি আগে প্রভুকে জানাতাম তিনি সতর্ক হতে পারতেন। এ কী সর্বনাশ করলাম আমি।'

ফগ অদৃষ্ট সম্বল করে ঘরে বন্দি হয়ে রইলেন। সবাই দেখল, তিনি অপলক চোখে ঘড়িরটার দিকে তাকিয়ে প্রতিটা সেকেন্ড মিনিট লক্ষ করছেন। এরকম একটা অভাবনীয়

www.pathagar.com

ঘটনাতেও তাঁকে এতটুকু বিচলিত মনে হল না। পকেট থেকে দিনলিপিটা বের করে চোখ রাখলেন—'শনিবার। একুশে ডিসেম্বর—লিভারপুল। তারই কি নিচে একছত্র লিখলেন—বেলা এগারটা চল্লিশ-মিনিট।'

কাস্টম হাউসের ঘড়িতে ঢং করে শব্দ হল—বেলা একটা বাজল। এক সময় দুটো বাজল। ফগ নিজের ঘড়ির দিকে তাকালেন। দেখলেন নিজের ঘড়ি দুমিনিট এগিয়ে চলছে। তিনি ভাবলেন, ছাড়া পেলে এখনও এক্সপ্রেস ট্রেনটা পাওয়া যেত। জয়মাল্য লাভ সম্ভব হত অবশ্যই। কিন্তু হায়! কে, কাকে ছাড়ে! পনের মিনিট গেল, কুড়ি মিনিট গেল, আধঘণ্টাও পার হয়ে গেল। ব্যস, সব গেল—আর কোনো আশা নেই।

আচমকা দরজা খুলে গেল। বিষণ্নমুখে ফিক্স ঘরে ঢুকলেন। অনুতাপের সুরে বললেন—'মি. ফগ, বড় ভুল হয়ে গেছে। চিনতে না পেরে ভুল করে আপনাকে গ্রেপ্তার করে ফেলেছি। আসল চোর ধরা পড়ে গেছে, আপনাদের উভয়ের চেহারার সাদৃশ্য থাকায় ভুলটা হয়েছে। আপনি মুক্ত। আশা করি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিটুক ক্ষমা করে দেবেন।'

নষ্ট করার মতো সময় ফগের হাতে নেই। আউদা ও পাসোপার্তু ঘরের দরজায়ই দাঁড়িয়েছিলেন। কোনো কথা না বলে ফগ সোজা বড় রাস্তায় গিয়ে তাদের নিয়ে ট্যাক্সিতে বসলেন।

ভাগ্য মন্দ। স্টেশনে পা দিইে শুনলেন দুটো পাঁচ মিনিটে লন্ডনগামী ট্রেন ছেড়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেন নেই শুনে ফগ প্রচুর টাকার বিনিময়ে স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করলেন। পুরস্কারের লোভে ড্রাইভার সাধ্যাতীত চেষ্টা করল। দুর্ভাগ্যবশত লন্ডন স্টেশনে তিনি যখন পা দিলেন, ঘড়িতে তখন আটটা পঞ্চাশ। এতকিছু করেও তিনি শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। পৃথিবী চক্কর মেরে লন্ডন পৌঁছাতে তাঁর পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেল। কথা ছিল, আটটা পঁয়তাল্লিশের মধ্যে ফিরে আসবেন।

আউদার কাহিনী

ফিলিয়াস ফগ লন্ডনে পৌঁছেই সরাসরি বাড়ি চলে এলেন, ক্লাবমুখো আর হলেন না। এমন কোনো একটা প্রতিযোগিতামূলক ভ্রমণে সম্পূর্ণ হেরে যাওয়া যে কী মর্মান্তিক ব্যাপার তা বুঝিয়ে বলা দুষ্কর। মিঃ ফগের যথাসর্বস্ব তখন বোরিং অরদিতে জমা পড়ে রয়েছে—সেই তিন লাখ টাকা এখন রিফর্ম ক্লাবের সভ্যদের সম্পত্তি। এতকিছু সত্ত্বেও ফগ কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বিকার এতটুকুও মুষড়ে পড়েন নি। দুনিয়া চক্কর মারতে গিয়ে যা খরচ হয়েছে তা বাদ দিয়ে যেটুকু হাতে রয়েছে তাতেই কোনোরকমে চালাতে হবে।

আউদা শেষপর্যন্ত তাঁর বাড়িতেই উঠলেন। উপায় নেই, তাঁকে নিজের বাড়ির একটা ঘর ছেড়ে দিতে হল।

পাসোপার্তুর মনে শান্তি নেই। সে ভাবল, অপমান ও দুর্দশায় হতাশ হয়ে মনিব শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করে না বসেন। তাই সে সর্বক্ষণ তাকে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করতে লাগল। সে সারাটা রাত মনিবের শোবার ঘরের দরজায় জেগে পাহারা দিল।

সকাল হল। ফিলিয়াস ফগ পাসোপার্তুকে ডেকে বললেন, 'মিসেস আউদার প্রাতরাশের ব্যবস্থা করো। মনে রাখবে, তাঁর যেন কোনো অসুবিধা না হয়। ভালো কথা, তাঁকে জানাবে, আজ সন্ধ্যায় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

www.pathagar.com

সারাটা দিন ফিলিয়াস ফগ রিফর্ম ক্লাবে গেলেন না। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। বরং ঘরে বসে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাক। দরজা বন্ধ করে ঘরেই বসে থাকলেন। আর পাসোপার্তু দরজায় বসে ভেতরের দিকে কান খাড়া করে রাখল। কিছু একটা ঘটতে কতক্ষণ?

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ফগ আউদার ঘরে এলেন। চুল্লির কাছে একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন—'আপনাকে ইংল্যান্ডে টেনে আনা খুবই ভুল হয়ে গেছে। সে জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ব্যাপার হচ্ছে, যখন আপনাকে ইংল্যান্ডে আসতে বলি তখন আমি ছিলাম অঢেল টাকার মালিক। ভেবেছিলাম, তার অর্ধেক আপনার জন্য খরচ করব। আপনি স্বাধীনভাবে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবেন। এখন আমি ভিখারীর চেয়েও অধম, জানেনই তো।'

যে ব্যক্তি তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছেন তিনি ক্ষমা চাইতে আসায় আউদার চোখে জল দেখা গেল। তিনি ছলছল চোখে কোনো রকমে উচ্চারণ করলেন, 'মি. ফগ, কিছুই আমার অজানা নয়। আসলে আপনার বোঝা হয়ে এখানে আসাই আমার ভুল হয়েছে। আপনার দুর্বার গতিপথে আমি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম মিথ্যে নয়।'

'এটা কিন্তু আপনার ভুল ধারণা। আপনার জন্য হয়ত কিছু অতিরিক্ত অর্থব্যয় হয়েছে, দেরি কিন্তু এক মুহূর্তও হয় নি।'

'আপনি মহৎ—উদার, তাই নিজের বিপদকে অগ্রাহ্য করে আমাকে উদ্ধার করেছিলেন। আমার স্বাধীন জীবনের চিন্তা করেছিলেন।'

'সত্য বটে, কিন্তু পারলাম কই? যাক, এখন আমার যেটুকু অবশিষ্ট আছে সবই আপনার হাতে তুলে দিতে চাচ্ছি।'

'কিন্তু আপনার কী গতি হবে?'

'আমার কোনো অভাব বোধ নেই বলে বর্তমানের মতো ভবিষ্যতও আমার কাছে সমান। আমার কোনো আত্মীয়পরিজন নেই, তেমন কোনো বন্ধুবান্ধবও নেই যে, ভাবতে বসবে।'

আউদা কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছলেন। চেয়ার ছেড়ে ফগের দিকে দুপা এগিয়ে তার হাত দুটো চেপে ধরে বললেন, 'মি. ফগ, আমি যদি আপনার দুঃখের ভাগীদার হতে চাই তবে কি আপত্তি আছে? আপনি কি আমাকে স্ত্রীর সম্মান দিয়ে কাছে টেনে নিতে পারবেন?'

ফগের সর্বাঙ্গে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক বইতে লাগল। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় কোনোরকমে উচ্চারণ করলেন, 'পাসোপার্তু! পাসোপার্তু!

পাসোপার্তু দরজার কাছেই গোপনে অপেক্ষা করছিল। প্রভুর ডাকে ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল।

ফগ বললেন, 'এক্ষুনি একবারটি গির্জায় গিয়ে বিশপকে বিয়ের খবর দাও। রাত বেশি হয় নি। তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে যাও।'

পাসোপার্তু মুচকি হেসে বলল, 'স্যার, এর জন্য আবার খবর দেবার কী আছে? কাল সোমবার। কালই বিয়ে হবে, বাধা কী?'

ফগ আউদার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। তিনি লজ্জাবনত মুখে উচ্চারণ করলেন, 'তবে কালই হোক।'

www.pathagar.com

সতেরই ডিসেম্বর এডিনবরার আসল চোর ধরা পড়েছিল। ব্যাপারটা বাতাসের আগে রাষ্ট্র হয়ে গেল। এতদিন ফগই ডাকাত বলে পরিচিত হয়ে পড়েছিলেন। সেই কলঙ্ক এবার ধুয়ে মুছে গেল। আবার ফিলিয়াস ফগের নাম লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আবার আশি দিনে পৃথিবী চক্কর মারার ব্যাপারটা নিয়ে বাজি ধরাধরি হয়ে গেল। খবরের কাগজগুলো আবার ফগের ব্যাপার নিয়ে মুখর হয়ে উঠল।

একুশে ডিসেম্বর। শনিবার। সেদিন সেদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই রিফর্ম ক্লাবের সামনে হাজার হাজার লোক এসে জড়ো হল। সবার মুখে মুখে একই কথা, 'আজ ফিলিয়াস ফগের ফিরে আসার কথা।' লোকের ভিড়ে যানবাহন পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হল। চারদিকে পুলিশ পাহারা দিতে লাগল গণ্ডগোল যাতে না হয়।

রিফর্ম ক্লাবের সভ্যদের মধ্যেও কম উত্তেজনা লক্ষিত হয় নি? তাঁরাও সন্ধে হতেই এক এক করে ক্লাবঘরে জমা হতে লাগলেন, আঁদ্রে স্টুয়ার্ট বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'কী ব্যাপার! মি. ফগ তো এখনও এলেন না! নির্দিষ্ট সময়ের আর তো মাত্র পঁচিশ মিনিট বাকি!'

র্যালফ বললেন, 'লিভারপুলের শেষ ট্রেন সাতটা তেইশ মিনিটে লন্ডন আসে। তার পরের ট্রেন রাত বারোটার আগে আসে না। সাতটা তেইশের ট্রেনেই তাঁকে আসতে হবে।'

'মনে হচ্ছে, বাজিটায় আমারই জিত হল। তিনি সাতটা তেইশের ট্রেনে এলে এর মধ্যেই এখানে পৌঁছে যেতেন', স্টুয়ার্ট বললেন। ফলেস্টিন ধমকের সুরে বললেন, 'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? মি. ফগকে তোমরা এতদিন চিনলে না। তিনি সব কাজই ঘড়ি ধরে করেন। শেষ মুহূর্তে এসে হাজির হওয়াটাও আশ্চর্যের নয়।'

'আসলে প্রস্তাবটাই পাগলের মতো ছিল। ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করলে কী হবে? পথের বিপদের কথা কে বলতে পারে, বলুন?' ফ্ল্যানাগেন আগ বাড়িয়ে মন্তব্য করলেন।

'যাক, দেরি করে কী লাভ? কালই বোরিং-এর গদি থেকে টাকাগুলো নিয়ে আসা দরকার।' ধৈর্যচ্যুত র্যালফ বললেন।

স্টুয়ার্ট বললেন, 'আর মাত্র পাঁচ মিনিট। তারপরেই বাজি জিত।'

সবাই যখন অপলক চোখে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে, ঠিক তখনই বাইরে জনসমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠল। গলা ফাটানো চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

সলিভান উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বললেন, 'মাত্র এক মিনিট বাকি!' এক-দুই-তিন-চার—ত্রিশ সেকেন্ডেও চলে গেল। ফিলিয়াস ফগের পাত্তা নেই! চল্লিশ সেকেন্ড গেল। চলে গেল পঞ্চাশ সেকেন্ড। কোথায় ফিলিয়াস ফগ! তাঁর যে টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। মাত্র দশ সেকেন্ড আর বাকি। এক-দুই-তিন-সাত সেকেন্ডও চলে গেল!

বাইরের চিৎকার চেঁচামেচি তুমুল রূপ নিল। আচমকা ক্লাব-ঘরের দরজাটা সশব্দে খুলে গেল। উত্তাল-উদ্দাম জনতার আগে আগে ফগ ঘরে ঢুকলেন। তিনি হাত দুটো মাথার ওপর সোজাভাবে তুলে নিয়ে সোল্লাসে বললেন, 'আমি এসে গেছি।'

এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ! সেদিন রাত আটটা পাঁচ মিনিটে পোসাপার্তু চার্চে গিয়ে বিশপের সঙ্গে দেখা করে। তাঁকে মি. ফগ-এর বিয়ের কথা বলতেই তিনি বললেন, 'দুঃখিত! কাল বিয়ে হবে কী করে? কাল যে রোববার।'

www.pathagar.com

'না, কাল সোমবার।'

'আজ শনিবার। অতএব কাল রোববার হবে না?'

ব্যস, আর কথা নেই। বিশপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাসোপার্তু ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসে ফগকে বলল, 'স্যার, আমাদের মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে! বিশপ বললেন, আজ রোববার নয়, শনিবার। আর মাত্র দশ মিনিট সময় হাতে। তাড়াতাড়ি চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।'

মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা রাস্তায় নেমে এলেন। ট্যাক্সিতে উঠে সোজা রিফর্ম ক্লাবের দিকে ছুটলেন। হাজার টাকা বকশিসের লোভে ড্রাইভার মরিয়া হয়ে গাড়ি চালিয়ে গেল।

কী ব্যাপার? ফগের তো এমন ভুল হবার কথা নয়। তাঁর মতো লোক দিন তারিখ ভুল করলেন, এ যে বিশ্বাসই করা যায় না। আসলে ব্যাপারটা কী খুবই সাধারণ। নিজের অজান্তে ফগ একটু একটু করে চব্বিশ ঘন্টা সময় এগিয়ে গিয়েছিলেন। লন্ডন থেকে রওনা দিয়ে তিনি সর্বদা পূর্ব দিকে এগোলে একদিন পিছিয়ে পড়তেন! পূর্ব দিকে যাওয়ায় প্রতি ডিগ্রিতে চার মিনিট করে দিন ছোট হচ্ছিল। তাই এভাবে ৩৬০ ডিগ্রিতে মোট ষাট ঘন্টা ছোট হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা আরো সোজাসুজি ব্যাখ্যা করতে গেলে বলতে হয়, তিনি পূর্ব দিকে ক্রমান্বয়ে এগোতে এগোতে আশিবার সূর্যকে দেখেছিলেন। আর লন্ডনে বসে তাঁর রিফর্ম ক্লাবের বন্ধুরা উন আশিবার দেখেছিলেন। আসল গণ্ডগোলটাই এখানে।

এতকিছুর পরও দেখা গেল, ভাগ্যলক্ষ্মী ফগের ওপর সুপ্রসন্ন। তিনিই বাজি জিতলেন, জয়মাল্য গলায় পরলেন।

---

www.pathagar.com

জার্নি টু দ্য সেন্টার অব দ্য আর্থ

সেটা ছিল ১৮৬৩ সালের ২৪ মে।

এ কী ব্যাপার! এরই মধ্যে কাকা বাড়ি ফিরছেন! বেলা দুটোও যে বাজে নি। মহা মুশকিলেই পড়ল মার্থা। কাকা এরকম কাণ্ড করে বসবেন, স্বপ্নেও ভাবে নি সে।

সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী মার্থা। সব ব্যাপার তাকেই সামলাতে হয়। খুঁটিনাটি ব্যাপার স্যাপার কোথায় কী হয়েছে, কী করতে হবে, তাকেই খেয়াল রাখতে হয়।

কাকা বাড়ি ফিরছেন, অথচ কিছুই তৈরি নেই। এমনকি জলটুকু পর্যন্ত গরম হয় নি এখনো। এমনিতেই যা তিড়িক্কি মেজাজের মানুষ, পান থেকে চুনটি খসলেই রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন।

ওই তো কাকা লম্বা লম্বা পায়ে কোনিগসস্ট্রাস ধরে হাঁটছেন। কিন্তু আর মাত্র আধঘন্টা পরে এলেই, মার্থার কিছু ভাবনার ছিল না। মার্থা ভীতসন্ত্রস্ত পায়ে জানালার দিকে আরো দুপা এগিয়ে গেল। পিছনদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় কোনোরকমে উচ্চারণ করল, 'দাদা এসে পড়লেন যে!' এবার আমার কাছে এসে বলল, 'তুমি কাকাকে একটু সামলে নাও। আমার হয়ে একটু বুঝিয়ে বলবে কিন্তু, কথা কটা কোনোরকমে আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে একদৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

কাকে বুঝিয়ে বলব? কাকাকে? তবেই হয়েছে! মার্থা এতদিন পরেও তাঁকে চিনতে পারল না! নইলে বুঝিয়ে বলার কথা সে মুখে উচ্চারণ করতে পারত না।

আমার প্রাতঃস্মরণীয় কাকা এই অটো লিড়েনব্রক লোকটি রীতিমতো খিটমিটে মেজাজের। বদ মেজাজি বলেও পরিচিত মহলে তাঁর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। এক কথায় লোকটি একটি বারুদের স্তূপ। নিয়মে একটু ব্যতিক্রম হলেই দপ করে জ্বলে ওঠেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় হাতপা ছোঁড়াছুঁড়ি ও তর্জন গর্জন। মার্থা তো কচি খুকি, আমি তাঁর বিষয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভয়ে সর্বদা কেঁচো হয়ে থাকি।

বাড়ি ঢুকেই কাকা খাওয়ার টেবিলের দিকে ছোটেন, আর সেটি যদি খালি দেখেন? এমন হম্বিতম্বি জুড়ে দেবেন যে, ছাদটাই হয়ত ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আমিও মার্থার পথ বেছে নেব কি না, ভাবতে লাগলাম। ইচ্ছা থাকলেও তা আর হয়ে উঠল না।

কাঁটামারা বুটে ঘন ও গম্ভীর আওয়াজ তুলে কাকা বাড়ি ঢুকলেন। ব্যস, আর কথা নয় সোজা হলঘরের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

হল ঘরে ঢুকে টুপিটা ছুঁড়ে দিলেন হুকের দিকে, হাতের ছড়িটি ছুঁড়ে দিলেন কোনের দিকে। এবার তেমনি লম্বা লম্বা পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ঘরে ঢুকে কাকা গা থেকে কোটটা খুলে চৌকির দিকে ছুড়ে দিতে গিয়ে গলাফাটানো চীৎকার জুড়লেন—'এ্যাক্সেল শিগগির শুনে যা!'

এবার ব্যাপার পরিষ্কার হল, কাকা খেতে আসেন নি। মার্থা তবে এ যাত্রা বেঁচেই গেল। খেতে এলে সোজা মার্থার রান্নাঘরে হাজির হতেন, যাকে শুদ্ধভাষায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি 'উদর পূর্তি ল্যাবরেটরি' নাম দিয়েছেন।

www.pathagar.com

মার্থা স্বস্তি পেল বটে, আমি কিন্তু মহাসমস্যায় পড়ে গেলাম। এই ভর দুপুরবেলা যদি খনিবিজ্ঞান বা ভূবিদ্যা নিয়ে মজে যান তবে আমার একেবারে সাড়ে সর্বনাশ! আর তাঁর মজে যাওয়া যা তা ব্যাপার নয়, একটানা ছয় সাত ঘণ্টা বকবক করবেন। আর আমার অবস্থা? আহার নিদ্রার প্রয়োজন সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন থাকা সত্ত্বেও জোর করে ভুলে থাকতে হয়। তাঁর বক্তব্যের প্রতি আগ্রহের ভান করে বার বার ঘাড় কাত করতে হয়। ব্যাপারটা খোলসা করে বলছি, আমি কেবল অপুত্রক কাকার বংশধর এবং উত্তরাধিকারীই নই, তার গবেষণার সহকারীও বটে। তিনি একজন পৃথিবীর খ্যাতনামা অধ্যাপক। হামবুর্গ শহরের বিখ্যাত সেন্টপলস কলেজে অধ্যাপনা করেন। ভূতত্ত্ব সম্পর্কীয় তাঁর সুচিন্তিত মতামত পৃথিবীর সব দেশের পণ্ডিতজনের কাছে সমাদৃত! আর আমি? তাঁর এই সুমহান কর্মযজ্ঞে আমার বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী তাঁকে সাহায্য করে থাকি।

আমাকে ভুল বুঝবেন না। আত্মপ্রচার করচি না। এক্সেল নামধারী এই অধমটার বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। তবে এটুকু বলতে পারি, সুপণ্ডিত কাকাটি বিজ্ঞানের যে-সব শাখায় প্রভূত জ্ঞান ধারণ করেন, সে-সব বিষয়ে আমিও কম পড়াশুনা করি নি। এ-কথা বলার অর্থ এই নয় যে, আমি তাঁর একজন সুযোগ্য ভাইপো। তবে এটা তো মিথ্যে নয়, আমি তাঁরই হাতে গড়া ছাত্র। তাঁর চিন্তাধারা ও প্রদত্ত যুক্তিগুলোর অর্থ বোঝার মতো ক্ষমতা অন্তত আমার হয়েছে। আর এরই জন্য আমাকে কম দুর্ভোগ ভুগতে হয় না। আজকের দুর্ভোগের কথাই ধরুন না, স্নানাহার শিকেয় তুলে তাঁর পাশে বসে, ঘাড় নেড়ে যেতে হবে।

ভীতসন্ত্রস্ত মনে গুটিগুটি কাকার ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে পা দিলাম। ঘর বললে হয়ত ঠিক বলা হবে না—আস্তাকুঁড়ে।

বইয়ের তাকগুলো দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সত্য। কিন্তু স্তূপাকৃতি বই, অগণিত যন্ত্রপাতি ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাদের কোনটা বন্ধ, কোনটা আবার খোলা অবস্থায়ই দেখা যাচ্ছে। এরকমই প্রচলিত ব্যবস্থা। জ্ঞানগম্যি হওয়ার আগে এগুলোকে গোছগাছ করে রাখার চেষ্টা করতাম। ব্যস, আর যাবে কোথায়, সঙ্গে সঙ্গে দাঁত খিঁচুনি। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতেন, ওগুলো ছোঁয়ার অধিকার আমাকে মোটেই দেয়া হয় নি।

আজ ভয়ে ভয়ে কাকার ঘরে পা দিয়েই দেখলাম, তিনি টেবিলে বসে। সামনে মোটা একটা বই খোলা অবস্থায় রয়েছে। সেটার বয়স এত বেশি যে, হাত দেয়ামাত্র পাতাগুলো শুকনো তামাকপাতার মতো গুঁড়ো হয়ে পড়ছে। পাতা উল্টে দেখার আঘাত তো একটু লাগছিলই, মিথ্যে নয়। তিনি বইয়ের মধ্যে বিভোর হয়ে ডুবেছিলেন অন্য কোনোদিকে খেয়ালমাত্র ছিল না।

আমি তাঁর টেবিলের পাশে কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে একসময় বই খুললাম—বইটা খুবই পুরনো দেখা যাচ্ছে। ছাপা কোন ভাষায়?

আমার কথা কানে যেতেই কাকা আঁতকে উঠলেন। মুখ তুলে আমার দিকে এমন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকালেন যে, অকস্মাৎ মনটা বিষিয়ে উঠল। তিনি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, 'কে বললে ছাপা? কে বললে এটা ছাপা বই? হাতে লেখা! বইয়ের পাণ্ডুলিপি এটা।'

www.pathagar.com

আমি কয়েকবার ঢোক গিলে কোনোরকমে উচ্চারণ করলাম, 'তাই নাকি পাণ্ডুলিপি এটা? কোথায় পেলেন? হলই বা হাতে লেখা, কোন ভাষা এটা?' সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে এরই মধ্যে আমি একবারটি চোখ বুলিয়ে নিলাম। দেখেও চিনতে পারি নি। আর পারি নি বলেই আমার মধ্যে কেমন যেন একটা উত্তেজনা ভর করল। কাকার মতো বহু ভাষার দখল না থাকলেও জার্মান, স্পেনিস, ফরাসি, ইতালীয়, ল্যাতিন ও গ্রিক প্রভৃতি পাঁচ ছয়টা ভাষায় একটু-আধটু দখল আমার রয়েছে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে এগুলোর মধ্যে কোনোটিকেই ব্যবহার করা হয় নি।

আমার মনোভাব বুঝতে পেরে কাকা কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্যটুকু বজায় রেখেই বললেন, 'রিউনিক! আইসল্যান্ডের প্রাচীন ভাষা। তোমাকে কী আর দোষ দেব? আসলে তো আমিও এ ভাষা জানিনে! সত্য বলতে কি, পৃথিবীতে আজ আর কেউই হয়ত নেই যে এটা জানার মতো করে জানে। লন্ডনের কোনো কোনো প্রকাশকের সঙ্গে আমার ব্যবস্থা রয়েছে দুষ্প্রাপ্য কোনো পাণ্ডুলিপি হাতে পড়লেই সোজা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তাই উডবার্ন হ্যাসার-স্মিথ এটা পাঠিয়েছে। কিন্তু এই অমূল্য সম্পদের কী সদগতি যে করতে পারব, জানি নে।'

'বাস্তবিকই যে এটা অমূল্য সম্পদ কী করে বুঝলেন? পোকায় কাটা কয়টা পাণ্ডুলিপি হলেই যে সর্বজ্ঞানের আধার হবে তারই কি যুক্তি রয়েছে?'

তিনি ধমকের সুরে বললেন, 'অপদার্থ কোথাকার! পোকায় কাটা বলেই যে মূল্যবান মনে করছি, মোটেই তা নয়। এমন একজন লোকের লেখা এ-পাণ্ডুলিপিটা—'

কথা শেষ না করেই ব্যস্ত হয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় এসে থমকে গেলেন। হলদে পার্চমেন্টের ওপর একটা কালির দাগের ওপর আঙুল দিলেন। পুরোপুরি কালি ছিটানো নয়, কালো কালির ওপর এলোমেলো সাদা সাদা আঁচড়কাটা। আমি যার একবিন্দু মর্মও উদ্ধার করতে পারলাম না। কাকা রীতিমতো বিজয়ী বীরের মতো বলে উঠলেন, 'অন্ধ অপদার্থ, বলছি শোন। এই দুর্বোধ্য বইটা হাতে পেয়ে অহেতুক আমার মধ্যে উচ্ছ্বাস জেগে ওঠে নি। যাঁর লেখা এটা, তিনি ছিলেন, ষোল শতকের ইউরোপের অতুলনীয় পণ্ডিত। তিনি ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক, আবিষ্কারক ও দার্শনিক। এই যে কালির ওপর সাদা সাদা আঁচড়কাটা দেখছ, তাঁর স্বাক্ষর। নইলে পার, স্বাক্ষরের মধ্য দিয়েও আত্মগোপনের চেষ্টা। জানই তো, দর্শন, বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্বে নতুনতর চিন্তাধারার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে সেকালে বহু পণ্ডিতজনকে রাজার কোপে পড়তে হয়েছে, শাস্তি পেতে হয়েছে। অন্য কারো কথা না জানলে গ্যালিলিওর কথা শুনেছ নিশ্চয়? নতুন মতবাদ ও চিন্তাধারার জন্য এই আর্নে স্যাকনুসেমকেও শাস্তি পেতে হয়েছিল। আর এই যে সে কালি ছিটানোর ওপর সাদা সাদা আঁচড়, এতে তাঁর নামটাই লেখা রয়েছে—আর্নে স্যাকনুসেম। নাম লেখা আছে বটে, কিন্তু খুব কম লোকই তা পড়তে পারবে। কী মজার ব্যাপার লক্ষ করেছ? আমি নেহাতই ভাগ্যবান বলেই রিউনিক হরফে যৎসামান্য জ্ঞান পেয়েও পাঠ করতে সক্ষম হচ্ছি না।'

আর্নে স্যাকনুসেম! আর্নে স্যাকনুসেম! স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। নামটি শুনে আমার মধ্যে কিন্তু কাকার মতো আবেগ উচ্ছ্বাস জাগল না। শুধু দার্শনিক বা ধর্মতত্ত্ববিদ হলেও তবু না হয় চলত, আবার বৈজ্ঞানিকও বটে। লোহাকে সোনা বানানোর কায়দা হয়ত তাঁর রপ্ত ছিল। রাজার কোপদৃষ্টি? এ রকম কিছু একটি দাবি করে থাকলে তো রাজার কোপদৃষ্টিতে পড়তে হবে। পড়বে নাই বা কেন।

www.pathagar.com

এর বেশি ভাবতে পারলাম না আমি। আসলে চিন্তা করার সময় না দিয়েই কাকা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। কলেজে ছাত্র পড়ানোর কায়দায় বক্তৃতা জুড়ে দিলেন—চেষ্টা থাকলে, সাধনা থাকলে সাফল্য অবশ্যই আসবে। তবে কাজের আঁট থাকা চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্যাকনুসেম-এর মতো একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি আজেবাজে কথায় পাতা ভরেন নি, যা লিখে গেছেন, তা মানুষের হিতার্থেই লিখেছেন সন্দেহ নেই। এটা যে দীর্ঘ যুগ মানুষের চোখের আড়ালে রয়ে গেছে, নেহাতই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। তবে শিগগিরই সে-দুর্ভাগ্যের অবসানের সময় আসছে। আমাদের কাছে যখন পাণ্ডুলিপিটা পৌঁছে গেছে, তখন অবশ্যই আশা করা যেতে পারে বিহিত হবেই।

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিটুকু তাঁর নজর এড়ায় নি। আমাকে কিছু বলতে হল না। তিনিই আবার বললেন, 'কী? ভাষার কথা বলছ তো। বলছিই তো রিউনিক ভাষায় আমার ভালো দখল নেই! আমার সমসাময়িক কোনো ভাষা-তত্ত্ববিদ-এরও জানা নেই। কিন্তু জানি, চেষ্টা করলে অবশ্যই জানতে পারব। সাধনায় লিপ্ত থাকলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী!'

কাকা আবেগবশত জীর্ণ পাণ্ডুলিপিটি টেবিল থেকে হাত তুলে নিয়ে পর-মুহূর্তেই আবার সেখানেই রেখেদিলেন। কলেজের ছাত্র পড়ানোর সময়ও এমনটিই করে থাকেন নতুন কিছু নয়।

এরকমটা আশা করা হয় নি। পাণ্ডুলিপির গোছার ভেতর থেকে একটি পাতা খসে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। পার্চমেন্টেরই পাতা। রং দেখে বোঝা গেল, পাণ্ডুলিপির পার্চমেন্টের চেয়ে এর বয়স বড় একটা কম নয়। আর লেখা দেখেও একই সিদ্ধান্তে আসা যায়। কিন্তু মিলিয়ে দেবার সুযোগ কোথায়?

কাকা আলগা কাগজের টুকরোটা টেবিলের ওপর রেখে তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন, মুখে টু শব্দটি পর্যন্ত নেই। আমি গুটিগুটি এগিয়ে সাহসে ভর করে টেবিলের ওপর ঝুঁকলাম। ব্যর্থ প্রয়াস! টুকরোটাতে যা লেখা সবই রিউনিকে। বিদ্যে যা, তাতে এটার পাঠোদ্ধার একেবারেই অসম্ভব। একটি অক্ষরও উদ্ধার করতে পারলাম না।

আমার অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও কাকার তো রয়েছে। তিনি ক্ষিপ্রহাতে এক টুকরো কাগজ নিয়ে একের পর এক জার্মান অক্ষর বসাতে লাগলেন।

কয়েক মুহূর্ত পর আমার দিকে মুখ তুলে বললেন, 'যা বাব্বা! এ কী দাঁড়াল!' আপন মনে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'এ কেমন হল? ওতে রিউনিকে যা লেখা রয়েছে, তার আক্ষরিক আকার তো এরকমই হওয়ার কথা। কিন্তু কই অর্থ কিছু দাঁড়াচ্ছে নাতো! কিছুতো অর্থ করতে পারছি না!'

কাগজটার দিকে চোখ রেখে আমি মনে মনে পড়তে লাগলাম, 'বেরপাতেহ তনিপউনেমাঝমা কঠি রকেল গো নিরধয়মসক এ দিথ কথা তেধে মেনে রেভিগ লতয় কেথে রভিগ নেথাই সে—'

কী ব্যাপার! এটি কী হল? ধাঁধাঁ নাকি। কোনো অর্থবোধই হচ্ছে না যে!

কাকা আবারও গোড়া থেকে পুরোটা পড়লেন। শেষপর্যন্ত আমি হতাশ হয়ে উচ্চারণ করলাম, 'ভাষার সৃষ্টি যদি হয়ই মনের ভাব গোপন করার জন্যই হয়েছে। আর তাই যদি সত্য হয় তবে এই লেখাটাকে অবশ্যই ভাষায় বলতে হবে।'

'ভাষা? না, বরং একে ভাষা না বলে ভাষার বিকৃতিই আখ্যা দিতে পারি। স্পষ্টই অনুমান করা যাচ্ছে এই ছকের মধ্যে স্যাকনুসেম কিছু অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে রেখে

www.pathagar.com

গেছে। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় ঠেকছে, মিথ্যে নয়। এই অক্ষরগুলোর মধ্যে সে রহস্যের সমাধান গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। আমরা যাকে কিপ্টোগ্রাম আখ্যা দিয়ে থাকি। প্রকৃত ব্যাপারকে বিকৃতরূপে প্রকাশ করা! এমনটা তো হামেশাই দেখা যায়।'

মার্থা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ভেতরের দিকে গলা বাড়িয়ে বলল, 'দুটো তো বেজে গেছে, খাবার দেব কি?'

মার্থার কথায় কান দেয়ার মতো সময় ও মানসিক অবস্থা কাকার তখন নেই। মার্থার কথা শুনতেই পেলেন না। আমি তার হয়ে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালাম। মার্থা বিদায় নিল।

কিছুক্ষণ পরে কাকা আমার দিকে চোখ ফেরাতেই বললাম, 'আপনার মধ্যাহ্নভোজনের সময় হয়েছে। মার্থা বলে গেল, খাবার তৈরি।'

আচমকা বাজখাই গলায় গর্জে উঠলেন, 'কী? কী হয়েছে? খাবার? না, এই জটিল রহস্যের কুল কিনারা না করা অবধি খাবারের কথা উচ্চারণ করবে কে? এখন ওসমব রেখে দাও। আমি এখন লাইব্রেরিতে যাচ্ছি। ক্রিপ্টোগ্রাম সমাধানের কী কী উপায় বইপত্র লেখা আছে দেখতে হবে! একে একে সবরকম প্রক্রিয়াই তো অবলম্বন করে দেখতে হবে।' ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। কাগজের টুকরোটা টেবিলের ওপর রেখেই গটমট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হলঘর থেকে টুপি আর লাঠিটা তুলে নিয়ে তিনি একেবারে বড় রাস্তায় গিয়ে উঠলেন।

ব্যাপারটা আমার কাছে বড় একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কাকা না খেয়ে বেরিয়ে গেছেন, আমার খেতে বসা সঙ্গত হবে কি না ভাবছি। এদিকে পেটের মধ্যে ছুঁচো ডিগবাজি খাচ্ছে। আগেও অনেকবার তাঁকে এরকম করতে দেখা গেছে। যখন গুরুতর কোনো ব্যাপার মাথায় চাপে তখন একনাগাড়ে দুই তিনদিন মুখে কুটোটি পর্যন্ত কাটেন নি। কিছু বলতে গেলে এমন ড্যাবা চোক করে তাকিয়েছেন, লেজ গুটিয়ে পালিয়ে বেঁচেছি।

হ্যাঁ, ব্যাপার খুবই বেগতিক। আর পারা যাচ্ছে না। নিজের উদরদেবতাটিকে আগে ঠাণ্ডা করাই উচিত। নইলে কপালে আটচল্লিশ না বাহাত্তর ঘণ্টা নিরম্বু উপবাস লেখা আছে, কে জানে? কর্তব্য স্থির করে উঠে দাঁড়ালাম।

কিন্তু খেতে যে যাচ্ছি, কাকার ক্রিপ্টোগ্রামটা যে টেবিলে পড়ে আছে? সবকিছুতেই তাঁর খামখেয়ালি, কাগজটি যে একটি কিছু চাপা দিয়ে রাখা দরকার ছিল খেয়ালই হয় নি। দুর্ঘটনা কোন পথ দিয়ে, কী রূপ নিয়ে দেখা দেবে, কে বলতে পারে।

আমি টেবিলের কোণা থেকে একটা নুড়ি পাথর তুলে নিয়ে পার্চমেন্টটাকে অনায়াসেই চাপা দিতে পারতাম। কিন্তু সে চেষ্টা না করে কেন যে পার্চমেন্টটাকেই হাতে তুলে নিলাম, বলতে পারব না। শুধু তুলে নেয়াই নয়, তার উল্টো পিঠটাও দেখা যেন একান্ত দরকার আমার। কী যেন কী ভেবে কাগজটা উল্টে ধরলাম।

ব্যাস, অমনি ভোজবাজি শুরু হয়ে গেল। খোলা জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। আচমকা কাগজটি আলোতে যেতেই অক্ষরগুলো আমার সামনে উল্টো হয়ে ভেসে উঠল।

শেষ শব্দটিই যে স্পষ্ট বোঝা গেল, 'স্নেফেলস'।

সেই থেকে শব্দটি আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল—স্নেফেলস।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, মনে পড়েছে, স্নেফেলস নামে তো একটা পাহাড় আছে, শুনেছি।

ব্যস, আর মুহূর্ত দেরি না করে এক নিশ্বাসে পরের লেখাটিই পড়ে ফেললাম, যেখান থেকে স্নেফেলস পাহাড়ের আগুন নির্গত হত, সেখান থেকে ক্রমে অতল গহ্বরে নেমে যাও, একসময় পৃথিবী-গোলকের ঠিক কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে যেতে পারবে।

পার্চমেন্টটার ওপর বারবার চোখ বোলাতে লাগলাম।

স্নেফেলস! স্নেফেলস! স্নেফেলস!

আমি আজ পর্যন্ত ভূতত্ত্ব বিষয়ে যেটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি, তাতে করে জেনেছি, স্নেফেলস পাহাড় আইসল্যান্ড দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। আর এটা একটা মৃত আগ্নেয়গিরি। গত পাঁচশো বছরের মধ্যে এ-পাহাড়টা অগ্নি উদগীরণ করে নি, ভবিষ্যতেও করবে বলে আশঙ্কা করেন না ভূতত্ত্ববিদরা। উচ্চতা বড় কমই বা বলি কী করে, পাঁচ হাজার ফুটেরও বেশি। খুবই দুরারোহ পর্বত এটা। তাই পর্যটক বা পর্বত আরোহীরা সচরাচর এ পথ মাড়ায় না।

একটু আধটু জানা আছে বটে। কিন্তু কেবল এটুকুই জানা ছিল না যে, মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে নেমে পড়লে পাতাল দর্শনের পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ব্যস, এইটুকুই কেবল অজানা ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, স্যাকনুসেমে তত্ত্ব জানলেন কী করে? মনে করতে হয়, সে পথ দিয়ে তিনি পাতালে নেমে গিয়েছিলেন। নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার! যদি সত্যিই নেমে থাকেন তবে আবার কী করেই বা ওপরে উঠে এলেন? ওপর থেকে নেমে যাওয়ার বহু ফন্দি ফিকির বের করে ফেলা যায় কিন্তু ফিরে আসার ফিকির? সিঁড়ির ব্যবস্থা নেই, সঙ্গীসাথিও কেউ নেই যে, দড়িটড়ি ধরে টেনে তুলবে। আর লাফিয়ে তো খুব বেশি হলেও আর ফুট খানেক ওঠা সম্ভব। কিন্তু স্নেফেলস যে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু! যা তা কথা নয়, পাঁচ হাজার ফুট।

সত্য বলতে কি ক্ষিদে তেষ্টা মাথায় উঠে গেছে। মার্থাকে দেখেই সে বোধটি আবার ফিরে এল। যা খুশি হোক গে, আগে উদর-দেবতাটিকে তো ঠাণ্ডা করি। মার্থাকে অনুসরণ করলাম।

কাবার ঘরে গিয়ে মার্থা জিজ্ঞেস করল, 'স্যার কি চলেই গেলেন?'

'হ্যাঁ।'

'সে কী! চলে গেলেন, খাবেন না?'

'না। চলে গেলে কী হবে, তাঁর আর আমার দুজনের খাবার আমিই খাব। গতিক সুবিধের নয়, স্যাকনুসেমের দৌলতে হঠাৎ আমাদের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। সময়-সুযোগ থাকতে উদর পূরণ করে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

আমি খাবার টেবিল থেকে ওঠার বেশকিছু সময় বাদে কাকা ফিরে এলেন। মাথা রুক্ষ, চোখে ক্লান্তির ছাপ, গাল দুটো রোদে ঝলসে গেছে। ক্লান্তি আর অবসাদ যেন তার দেহ মনে ভর করেছে। হতাশ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে করুণস্বরে কোনোরকমে উচ্চারণ করলেন, 'না, কোনোই খোঁজ পাওয়া গেল না! ওটা আবার লাইব্রেরি নাকি, একেবারে যাচ্ছেতাই! দরকারি খবর যদি নাই দিতে পারে তবে কী হবে ওটাকে রেখে! আমি কিন্তু এত সহজে দমছি না। সে পাত্রই নয় এই অটোলিডেনব্রক। যে করেই হোক ক্রিপ্টোগ্রাম আমি উদ্ধার করবই! পড়ে তবে ছাড়ব। ঈশ্বর সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি, ওটা না পড়া অবধি জলটুকু পর্যন্ত ছোঁব না।'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ, যে-রকমটা আশঙ্কা করেছিলাম কার্যতও হল তাই। তিনি যদি না-ই খান, বাড়িতে চুলা জ্বালার সম্ভাবনা নেই। মার্থা কোন মুখে হেঁসেলে যাবে? সে যাই হোক পরে দেখা যাবে। এখন ব্যাপারটা তবে প্রথম থেকেই বলছি। খাবার টেবিলে বসে আমি ভেবে নিয়েছি, এই যে চিঠির বয়ালটা আমি উদ্ধার করলাম, সেটা নিয়ে এই মুহূর্তে কী কর্তব্য, সেই কথাই এতক্ষণ ধরে ভেবেছি। প্রশ্নটা হচ্ছে, কী করা উচিত?

অনেকে হয়ত শুনেই বলবেন, এটা কোন সমস্যার মধ্যেই পড়ে না। যেহেতু পাণ্ডুলিপির পাতাটায় স্বাধিকারী প্রফেসর লিডেনব্রক, আর যেহেতু আমি চব্বিশ বছরের নাবালক এ্যাক্সেনা তাঁরই আশ্রয়ে দিন কাটাচ্ছি ও পোষ্য। আমি তাঁর সহকারী ছাড়া কিছুই নই। অতএব আমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য উক্ত চাবিকাঠি আমার কাকাটির হাতে তুলে দেয়া। তার বিনিময়ে তিনি যদি একটিবার মাত্র আমার পিঠ চাপড় দেন তবেই এই অধম বর্তে যায়।

ঠিকই তো, অনেকেই হয়ত এ কথা বলবেন। তারা তো আর প্রফেসর অটো লিডেনব্রক-কে চেনেন না। তাই তাঁদের পক্ষে তো এটা বলাই স্বাভাবিক। আমি কিন্তু চিনি। কি ব্যাপার? কেমন চিনি? নেহাত যদি জানতে চান তবে বলছি শুনুন, কিন্তু স্নেফেলসের লেখনীর অর্থ জানতে পারলে আর রক্ষে নেই, কেলেঙ্কারী করে ছাড়বেন। তার অর্থ জানামাত্র তিনি দারুণ ক্ষেপে উঠবেন, স্নেফেলস ছুটতে হবে, পাতালে নেমে যেতে হবে। ফলে কী হবে? এই পৃথিবীতে অবিস্মরণীয় কীর্তি প্রতিষ্ঠা করে যেতে হবে। আর্কিমিডিস, গ্যালিলিও ও কোপারনিকাসের সমকক্ষ হয়ে চিরস্মরণীয় হতে হবে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, যদি প্রত্যাবর্তন সম্ভব নাই হয়? প্রফেসর এটা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে সম্মত হবেন না। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠবেন, এটা কেমন কথা হে? ফিরে আসা কেন সম্ভব হবে না? নেহাতই যদি না যায় তাতেই বা হয়েছে কী! পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই আসল কথা নাকি হে? কীর্তিহীন জীবনের কতটুকুই বা মূল্য, বল তো?'

স্নেফেলসের দুর্বোধ্য লেখনিটা সামনে মেলে রেখে নির্বাক চাহনি মেলে কাকা সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন। মাথাগুঁজে বসে আকাশপাতাল ভেবেই চলেছেন। সারা বাড়িটাই যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। মার্থা মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে, কাকার সামনে আমি মুখে কলুপ এঁটে বসে রয়েছি। কার সাহস, তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে যাবে! ক্রোধানলে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে হবে যে!

সারাদিন পার হয়ে গেল। ক্রমে রাত্রিটাও গেল। কাকা নির্জলা উপবাসে কাটিয়ে দিলেন। মুহূর্তের জন্যও চোখের পাতা দুটো এক করেন নি। আমাকেও রাত্রিটা পেটে খিল মেরে কাটাতে হয়েছে। মার্থারও কেটেছে উপবাসেই। তবে মার্থা দেয়ালে হেলান দিয়ে একটু আধটু ঘুমিয়ে নিয়েছে। আমি কিন্তু এক মিনিটও চোখের পাতা দুটো এক করে রাখতে পারি নি। বারবার ঘুম চটে গেছে। বিবেক মানল না।

আমার কাজের জন্য নিজের প্রতি ধিক্কার এল—এটা করছি কী আমি! বৃদ্ধ কাকা দগ্ধে মরছেন বুঝেও আমি মুখ বুঝে রয়েছি! দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায় তিনি যে একেবারে শেষ হয়ে যাবেন! আর আমি সব জেনে, সব বুঝেও মুখ বুজে তামাসা দেখছি! এতবড় পৃথিবীটায় আমার আত্মজন বলতে তো আজ তিনি একটাই টিকে আছেন।

রাত্রিটা এভাবেই কাটল। পুব আকাশে দেখা দিল রক্তিম আভা। সকাল হল। এক পেয়ালা কফি নিয়ে মার্থা দরজায় এসে দাঁড়াল। সে চোকাঠের ওপারে দাঁড়িয়েই পর পর

www.pathagar.com

দুতিনবার প্রভুকে ডাকল। কা কস্য পরিবেদনা! সে গলা চড়িয়ে আবারও ডাকল। ব্যস, কাকা একেবারে উন্মাদের মতো গর্জে উঠলেন। ভীতসন্ত্রস্ত মার্থার হাত থেকে পেয়ালাটা ছিটকে পড়ল।

কাকা আবার ধ্যানে বসলেন। কাগজের টুকরোটার দিকে আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

আমার মন বড়ই দুর্বল হয়ে পড়ল। স্নেফেলস—পাতালপুরী ফিরে আসা সম্ভব নয়—মৃত্যু অবধারিত—যাবতীয় আশঙ্কাই চকিতে আমার মন থেকে উঠে গেল। মুহূর্তে মনস্থির করে ডাকলাম—'কাকা। কাকা।'

কপালের লিখন ঠেকায় সাধ্য কার! হ্যাঁ, যা হবার তাই হল শেষপর্যন্ত।

কাকা এমনিতেই ব্যস্তবাগীশ। এ ব্যাপারে আরো ব্যস্ততা লক্ষিত হল। একমাস যেতে না যেতেই বাড়ি-ঘরের দায়দায়িত্ব মার্থার হাতে তুলে দিলেন। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমাকে নিয়ে সোজা আইসল্যান্ডে পা দিলেন।

পুরো একটা মাস হাড়ভাঙা খাটুনি নিজে খেটেছেন। আমাকেও কম খাটান নি। লম্বা কাছি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কোদাল, হাতুড়ি, খন্তা, কুড়োল, তিনজন লোকের ছ'মাসের মত খাবারদাবার সবই কেনাকাটা করতে হয়েছে। এতেও ক্ষান্ত দেন নি। দুটো পিস্তল, দুটো বন্দুক আর সে সঙ্গে স্তূপাকৃতি বারুদ কিনতেও ভুল করেন নি। তিনজনের খাদ্য কেন? কাকা আর আমি তো রয়েছিই, আর একজন সঙ্গীও তো নিতান্ত দরকার।

পথপ্রদর্শক না নিয়ে চলাফেরা করাই তো দায়। যে সে পথপ্রদর্শককে সঙ্গে নেয়া হবে না, আইসল্যান্ড থেকেই জোগাড় করা হবে।

এতেই ঝক্কি মিটল নাকি? পাসপোর্টেরও ব্যবস্থা হয়েছে। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে আইসল্যান্ডের ক্ষমতাসীনদের নামে কয়েকটা চিঠি নিতে হয়েছে। প্রস্তুতিপর্বের ঠেলায় ভিরমি খাওয়ার উপক্রম। কাকার কর্মক্ষমতা আর ভবিষ্যৎদৃষ্টি। আমাকে বাস্তবিকই অবাক করে দিল। এতদিন আমি তো তাঁকে বইয়ের পোকা বলেই জেনে এসেছি। কিন্তু এই দুঃসাহসিক অভিযানের কর্মপদ্ধতির ছক দেখে মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম। জায়গা মত গিয়ে কোনো জিনিসের জন্য পস্তাবেন, তাঁর কাজে সে রকম কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছি না।

একের পর এক সুপারিশ ডিঙিয়ে আমরা এসে যাঁর কাছে পৌঁছলাম তিনি আইসল্যান্ডের রাজধানী রেগজিয়াভিগের এক কলেজের অধ্যাপক। নাম তাঁর ফ্রেডারিকসন। দারুণ চমৎকার লোক! সততায় একনিষ্ঠ একজন। বয়সে প্রৌঢ়, নিঃসঙ্গ। ভদ্রলোক আমাদের সেবার কাজে পুরোপুরি নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

আমি খুবই সতর্কতার সঙ্গে ভদ্রলোককে এড়িয়ে চলতে লাগলাম। বলা তো যায় না, কখন মুখ ফসকে আমাদের উদ্দেশ্যের কথা বেরিয়ে যায়।

গোপন? হ্যাঁ, গোপন তো নিশ্চয়ই! আমি স্যাকনুসেমের প্রচ্ছন্ন বার্তার অর্থ যে মুহূর্তে উদ্ধার করেছিলাম, তখন থেকেই কাকা বারবার আমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন, সাবধান, আমরা কোথায় চলছি কেনই বা চলেছি, কোনোক্রমেই যেন ফাঁস না করি।

প্রথম প্রথম আমি বিস্ময়ে প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করতাম, 'কেন? যদি ফাঁস হয়েই যায়, অসুবিধা কী?' কাকা রীতিমতো দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে ওঠেন, 'গর্দভ কোথাকার! বুঝতে পারছ না, কী ক্ষতি? খবরটা জানাজানি হয়ে গেলে পৃথিবী জুড়ে ছুটোছুটি শুরু

www.pathagar.com

হয়ে যাবে। কে, কার আগে হাজির হতে পারে, রীতিমতো প্রতিযোগিতায় মাতবে সবাই। এমনও তো হতে পারে, হুটোপাটা করেও আমরাই হয়ত স্নেফেলসে সবার আগে গিয়ে হাজির হতে পারব না। আমাদের এ মেহনতের আবিষ্কারের মুনাফা লুঠবে, হয় ফরাসি বিজ্ঞানী, নয়ত ইংরেজ।'

আমি তাঁকে কথায় সামান্য অবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেই ফেলেছিলাম, 'এত ঝুট ঝামেলায় যাওয়ার মতো বেশি লোক পৃথিবীতে আছে কী? কার এত মাথাব্যথা—'

ব্যাস, আর যাবে কোথায়! কাকা একেবারে অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছিলেন, 'তুমি তো আর বিজ্ঞানী নও, কী করে বুঝবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নেশায় মানুষ কেমন পাগল হয়ে উঠতে পারে? আমার দিকে চোখ মেলে তাকাও, সেটা বুঝতে চেষ্টা করো। একটু চিন্তা করলেই ছবির মতো সব স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠবে—কলেজের চেয়ার আর আরামদায়ক বিছানাটার মোহ ছেড়ে ষাট বছর বয়সে ছুটে চলেছি স্নেফেলস পাহাড়ে! পাতালে নামার জন্য পাগল হয়েছি। এটুকু হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতাও তোমার নেই?

মাথা নিচু করতে আমি বাধ্য হলাম। তাতেও রেহাই নেই। বেশ কড়া সুরেই তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের আসল উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে পড়লে মহা সর্বনাশ হবে! বিজ্ঞানীরা মিছিল করে ছুটবে। সাবধান! দারোগায় ডিম খেয়ে নেবে কিন্তু। লক্ষ রাখবে, কিছুতেই যেন সেটা না হয়ে যায়।'

তারপর থেকেই আমি মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছি। ফ্রেডারিকসনই পথপ্রদর্শক জোগাড় করে দিলেন। লোকটার নাম হ্যান্স। রেগজিয়াভিগ ও স্নেফেলস-এর মাঝামাঝি জায়গায় তার বাড়ি। বাড়ি আছে বটে, কিন্তু ত্রিসংসারে তার কেউই নেই। ভালোই তো হল। সংসারে যার পিছুটান রয়েছে এমন লোককে সঙ্গে নেয়া ঠিক নয়। বেশ শক্তসাবুত, কথাও কম বলে। কথা না বলতে হলেই খুশি।

হ্যানসের সঙ্গে পাকাপাকি কথা হয়ে গেল। পারিশ্রমিক সম্বন্ধেও রফা হল। আর স্নেফেলস পর্যন্ত তো আমাদের সঙ্গে যাবেই, তারপর যদি আর কোথাও যাই, সঙ্গে যেতে বাধ্য।

কানের কাছে মুখ এনে প্রায় ফিসফিসিয়ে ফ্রেডারিকসন বললেন, 'অনেক দিনের পরিচয়। তবে পথ প্রদর্শকের কাজ তার পেশা নয়। এতে পয়সা কোথায়? আইসল্যান্ডে কজন পর্যটকই বা আসে যে পেট চলবে? তাঁর পেশা ইডার পাখির পালক কুড়ানো। প্রচুর পয়সা এতে।'

আমি আগ্রহ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাজটা কী জাতীয়, বলবেন কি?'

এক জাতের পাখির নাম ইডার। খুব বড় হয়। পাহাড়ের ওপর, গাছের মগডালে বাসা বেঁধে থাকে। তারা বাসা যা দিয়েই করুক না কেন, নিজেদের বুকের নরম লোম দিয়ে ভেতরের দিকটা ঢেকে দেয়। বাচ্চাদের গায়ে যাতে শক্ত জিনিসের খোঁচা না লাগে, তাই এই কায়দা করে দেয়। মেয়ে পাখির পালক বেশি নরম বলে বাসা তৈরির ভার তাদের ওপরই বর্তায়। এদিক হ্যানসের মতো শিকারিরা সুযোগের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। তৈরির কাজ শেষ হয়েছে বুঝতে পেরে বাসাটা ভেঙে নিয়ে যায়। তারা আবার নতুন করে আর একটা বাসা তৈরি করে। আবারও শিকারিরা নিয়ে যায়। এভাবে বাসা তৈরি আর চুরি হতে হতে মেয়ে পাখিটার বুকে আর লোমই থাকে না। তাই বলে বাসা ছাড়া

www.pathagar.com

ত আর থাকা যায় না। এবার পুরুষ পাখি বাসা তৈরির দায়িত্ব নেয়। কিন্তু এদের লোমের রং টংও তেমন নয়, মোলায়েমও নয়। শিকারিরা এগুলো নেয় না। আসলে বাজারে চাহিদা নেই যে, কিনবে কে? এবার বাসাটিতে যায়, ডিম পাড়ে, বাচ্চা হয় বংশ রক্ষা হয়। আবার মেয়ে পাখিটা বাসা বাঁধে, ব্যবসা শুরু হয়।'

আমি তন্ময় হয়ে তার গল্প শুনছিলাম। ভালোই লাগল, কিন্তু পালক চোর হ্যানসই যে আজ চুরি হয়ে যেতে বসেছে, সে খোঁজ কে রাখে! একে চুরি বলাই ঠিক। কাকা সুযোগ বুঝে তার জীবনটাকেই চুরি করেছেন, কথাটা তো আর মিথ্যে নয়।

হ্যানসের সহায়তায় আমরা স্নেফেলসে গিয়ে হাজির হলাম। রেগজিয়াভিগ থেকে নৌকায় আসতে পারলে তিন চারদিনের বেশি সময় ল্যাগে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নৌকা জোগাড় করতে না পারায় পৌঁছাতে সময় বেশি লেগে গেল। জেলেরা নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে গেছে। মাছের মরশুম। নৌকা খালি পাওয়াই দুষ্কর।

এখন জুন মাস। সেপ্টেম্বরের আগে কিছুতেই নৌকা পাওয়া যাবে না। কী ঝকমারি যে করেছি বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে-কথা কাকেই বা বুঝাই! কাকাকে কতবার কতভাবে যে সতর্ক করেছিলাম, সে কথা আজ বড্ডবেশি করে মনে পড়ছে।—পৃথিবীর এই কঠিন বহিরাবরণটা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছপালা ইত্যাদি নিয়ে চারকোটির মত মানুষ আমরা, নিরাপদে জীবনযাপন করছি সেটা মাত্র মাইল পঞ্চাশেক পুরু। তার তলাকার ভূগোলকটা আগুনের কুণ্ড। অনবরত দাউ দাউ করে জ্বলছে। তার দাহিকা শক্তি এতই প্রখর যে, গ্রানাইট ছাড়া আর সব পাথর তার উত্তাপে গলে যাচ্ছে। ফুটতে ফুটতে এক সময় লাভার রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসছে ভূত্বক ছিঁড়ে। সেই আগুনের সমুদ্রে ডুব দিয়ে ভূকেন্দ্র স্পর্শ করা কি আর দেহধারী মানুষের কাজ? এ অসম্ভবকে সম্ভব করা মানুষের সাধ্য কী?

কাকা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন, 'এটা যে সম্ভব সে কথা তো স্যাকনুসেমই বলে গেছেন! নিজে পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ না হলে তথ্যটা অবশ্যই প্রচার করতেন না। আর যদি সর্ববাদীসম্মতই বল, তারা ঘরে বসে হিসাব মিলিয়েছেন। আর স্যাকনুসেম? তিনি নিজে পৃথিবীর উদরে নেমে গিয়েছিলেন। সব জায়গায় যে আগুন নেই তা স্যাকনুসেম সশরীরে ভূকেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে প্রমাণ করে গেছেন।'

'সক্ষম? আসলে সক্ষম হয়েছিলেন কি না—'

কাকা কথাটা আমাকে শেষ করতেই দেন নি। বাজখাই গলায় গর্জে উঠেছিলেন, 'তবে কি তুমি বলতে চাচ্ছ, স্যাকনুসেম যা লিখে গেছেন, সবই মিথ্যা!'

সে-মুহূর্তে আমার ঠোঁটের কাছে এর যে-উত্তর এসে পড়েছিল, প্রকাশ করি নি। কৃতবিদ্য বিজ্ঞানী জেনে শুনে মিথ্যার হিড়িক তোলার জন্যই কি এমন একটা কুকর্মের আশ্রয় নেবেন? কিন্তু সে অপবাদ তো স্যাকনুসেম-এর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া যাবে না। আসলে কথাটা তো তিনি প্রকাশ করতেই চান নি। তারপরেও বলব, দুর্বোধ্য ক্রিপ্টোগ্রামের আড়ালে তথ্যটাকে তো গোপনই রাখতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

বাড়িতে বসে তাঁর সঙ্গে মোটেই আমি তর্ক করি নি, করেছিলাম হামবুর্গে বসেই। এখন তাঁর আজ্ঞাবহ সৈনিকের ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছি। তর্ক ছেড়ে, মৃত্যুপণ করে, আদেশ পালন করে চলেছি।

www.pathagar.com

যাক, যে-কথা বলেছিলাম, রেগজিয়াভিগ থেকে নৌকা জোগাড় করা সম্ভব হল না। হ্যানস তিনটি নাদুস নদুস ঘোড়া এনে হাজির করল। দুটো আমাদের বইবে, তৃতীয়টা মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবে। সে নিজে হেঁটেই যাবে। কাকা তাঁর জন্যও একটি ঘোড়া নিতে বললেন। রাজি হল না। হেঁটেই যাবে বলল। কার্যত দেখা গেল ঘোড়ার সঙ্গে পা মিলিয়ে সে সমান তালেই হেঁটে গিয়েছিল।

আমাদের আগে আগে হ্যানস হেঁটে চলল। তার পিছনে আমি, কাকা আমার পিছনে। সবার শেষে মালবাহী ঘোড়াই চলছিল। এভাবে সমুদ্রের ধার দিয়ে আমরা পথ পাড়ি দিচ্ছিলাম। কারণ খুবই সাধারণ। এ পথে কেউ যাতায়াত করে না। স্নেফেলস তাঁরই মতো চরিত্রের কেউ ছাড়া কে আর আগ্নেয়গিরি দেশে যাবে? কী করতেই বা যাবে? জেলেদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ।

লোকগুলো ভালোই বলতে হবে, অতিথিদের জামাই আদরে রাখে। তবে এটাও প্রত্যাশা করে যে, বিদায় নেয়ার সময় অতিথি নিজে থেকেই খাদ্য ও আশ্রয়ের ন্যায্য দাম চুকিয়ে দিয়ে যাবে। অবশ্য ব্যতিক্রম যে থাকে না তাও নয়। এক যাজকের বাড়িতে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। হ্যানস পরিচয় করিয়ে না দিলে যাজক বলে চিনবে কার সাধ্য। আমরা তাঁর উঠানে পা দিয়ে দেখি, ঘোড়ার পায়ে নাল পরাতে তিনি ব্যস্ত। পরনে চাষাভূষাদের মতোই পোশাক। তা হোকগে, পোশাক দিয়ে কী হবে? আমাদের কাছে যেটুকু খারাপ লাগল তা হচ্ছে তিনি আচার ব্যবহারে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, আমাদের উপস্থিতিতে তিনি মোটে খুশি নন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ধারে কাছে বাড়িও নেই যে, অন্য কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেব। বাধ্য হয়ে চোখ-কান বুঝে রাতটা কাটিয়ে দিতেই হল।

সকাল হল। আমাদের বিদায় নেয়ার পালা। এবার দাবি মেটাতে হবে। ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিতে ভরসা পাচ্ছিলেন না তিনি। একটা বেশ লম্বা বিল এনে সামনে ধরলেন। তার দাবিও কম নয়। কাকা চোখ দুটো কপালে তুলে আমার দিকে তাকালেন। উপায় নেই, মুখে কৃত্রিম হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বিল মেটাতে হল। আশ্রয় ও খাদ্য পরিবেশনের জন্য ধন্যবাদও জানাতে হল বৃদ্ধ যাজককে।

অনেক ঘটনা দুর্ঘটনা ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা স্নেফেলসে পৌঁছলাম।

আমি বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভাবতে লাগলাম—এই সেই আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্নেফেলস? যার জ্বালামুখ দিয়ে অতল গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়লে পরলোকগত স্যাকনুসেম-এর শত ভূগোলকের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে যেতে পারব? কথাটা মনে হতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল—হায় সর্বনাশ! ঝাঁপ দিতে গিয়ে হাড় মাংস দলা পাকিয়ে যাবে না? ঝাঁপিয়ে পড়লে অদৃশ্য কোনো আগুনের সমুদ্রে পড়ে জ্বলেপুড়ে খাঁক হয়ে যাব না? দম আটকে মরতে হবে না? পৃথিবীপূজ্য অধ্যাপক লিডেনব্রক এসব কথাকে আমলই দেন না। অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞান করেন। অদৃষ্ট মন্দ হলে কনিগস্ট্রাসের বাড়িতে শুয়েও তো আমরা মারা যেতে পারে। অনিবার্য মৃত্যুকে ঠেকাবে সাধ্য কার?

আমি হ্যানসের ওপর খুবই আশা রেখেছিলাম। গত তেরো দিনের সফরে সে মুখ বুজে কর্তব্য সম্পাদন করেছে। তার সুখ্যাতি না করে উপায় নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, এবার কী করবে? শর্ত ছিল, স্নেফেলস পর্যন্ত যাবেই, তার পরেও আমরা কোথাও যেতে চাইলে সে সঙ্গে যেতে বাধ্য। তবে এটা অবশ্যই ভাবা যায় না যে, অতল গহ্বরে যাওয়ার প্রসঙ্গটাও ঐ শর্তের মধ্যে ছিল।

www.pathagar.com

তাই আমরা যখন স্নেফেলসের চূড়ায় উঠে বিমর্ষ মুখে তার গহ্বরে নেমে যেতে চাইব, স্বাভাবিকভাবেই হ্যানস তখন খুবই ঘাবড়ে যাবে। শর্তটর্ত সব বাতিল করে দিয়ে বলবে, যে পর্যন্ত এসেছি এই যথেষ্ট। রইল আপনার শর্ত, আমি চললাম। সে যদি এ কথা বলে তবে কাকার মতো তিরিক্কি মেজাজি ও একগুঁয়ে লোকও তার ওপর জোর করতে পারবেন না। বক্তব্যকে অন্যায় আখ্যা দিতেও পারবেন না। তাকে তো পথ প্রদর্শনের জন্য নিয়েছেন। সে নিজে কোনোদিন যায় নি, অন্যকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে কী করে?

মিথ্যে বলব না, এমন একটা ভরসা আমি গোপনে পোষণ করেছি। শেষ-মুহূর্তে হ্যানস যদি বেঁকে বসে, কাজে ইস্তফা দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়, এমন একটা পরিস্থিতি দেখা যায়, লিডেনব্রকের মতো অত্যুগ্র উদ্ভাবনী শক্তির আধারও তাল হারিয়ে ফেলবেন। পাতালের পথ তাঁর অজানা। পথপ্রদর্শকও কেউ নেই, তার ওপর গাদাখানেক মালপত্র বয়ে নেয়ার মতো হাতির বলও কাকার বা আমার কারোর গায়েই নেই।

কাকা বললেন, 'হ্যানস আমরা এর চূড়ায় উঠব।'

হ্যানস মুখে কিছু বলল না। ঘাড় তুলে চূড়া পর্যন্ত পুরো পাহাড়টার একবারটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুখ খুলল, 'হুজুর আজ আমার কাজের দ্বিতীয় সপ্তাহ পূর্ণ হল। আমার প্রাপ্য দয়া করে শোধ করে দিন।'

তার কথায় আমরা যেন একেবারে হকচকিয়ে গেলাম এমনি একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সামান্য প্রাপ্যের কথা বলছে। কাকা কিন্তু ব্যাপারটাকে মোটেই আমল দিলেন না। মুহূর্তের মধ্যেই পকেট থেকে নোট বের করে হ্যানসের দিকে এগিয়ে দিলেন।

হ্যানস আমাকে অবাক করে দিল। নিঃশব্দে নোটগুলো নিয়ে পকেটে রাখল। ঘোড়ার পিঠ থেকে মালপত্র নামাল এক-এক করে। ঘোড়াগুলো নিয়ে পিছন ফিরে হাঁটতে লাগল। পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার দায় পড়ে নি তার। আর এটাও তো ঠিকই, ঘোড়াগুলো পাহাড়ে উঠবে কী করে? যাত্রী নিয়ে স্নেফেলস পাহাড়েও উঠতে পারবে না।

আমি হতাশ দৃষ্টিতে কাকার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'হ্যানস তো বেগতিক দেখে কেটে পড়ল। এবার আমাদের কী কর্তব্য, বলুন?'

আমার দীর্ঘশ্বাসটুকু প্রবীণ অধ্যাপক লিডেনব্রক-এর নজর এড়ায় নি। তিনি মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'ঘাবড়িও না বাছা, আমি জানি, হ্যানস শুধু ঘোড়াগুলোর ব্যবস্থা করতে গেছে। কাছেই হয়ত কোনো জনবসতি রয়েছে, রেগজিয়াভিগের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে ফিরে এল বলে।'

আমি চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বললাম, 'আবার আপনার কাছেই ফিরে আসবে, বিশ্বাস করেন?'

'করি, অবশ্যই ফিরে আসবে। নইলে বুঝব, এই ষাট বছর বয়সেও আমি মনুষ্যচরিত্র বোঝার ক্ষমতা অর্জন করি নি। একটা কথা জানবে, যারা কথা কম বলে, চরিত্রবল তাদের খুবই বেশি! আর সে এই বলে বলিয়ান যে, বিপন্নকে ফেলে রেখে নিজে বাঁচার চেষ্টা করে না।'

আমি আর কথা বাড়ালাম না। তবে আমি নিঃসন্দেহ, কাকাকে শেষপর্যন্ত ফিরতে হবে। দু-চার দিন এখানে ঘোরাফেরা করে ফিরবেন এই যা। তা যদি নাও হয়, পাহাড়টার চূড়া পর্যন্ত কোনোরকমে উঠবেন, এদিক-ওদিক চক্কর মারবেন। গহ্বরটার

www.pathagar.com

ভেতরের দিকে উঁকিও মারবেন হয়ত। কিন্তু এইটুকুই, এবার হতাশ মনে বাড়ি ফেরার পালা। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এতসব লটবহর নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা দুঃসাধ্য। আবার বেশ কিছুদিনের খাবারদাবার না নিয়ে গহ্বরে নামার অর্থই হচ্ছে উপোস করে শুকিয়ে তিলে তিলে মরা। আবার মনোমিটার, কম্পাস ও ব্যারোমিটার ইত্যাদি সঙ্গে না নিলে স্বর্গ মর্ত পাতাল কোথাও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা তো ভাবাও যায় না। আর আত্মরক্ষার উপকরণ? বন্দুক, পিস্তল, গোলা বারুদ সঙ্গে নিতে হবে না? তবে?

হঠাৎ পাহাড়ের অনেকটা নিচে কালোমতো কী একটা সচল বস্তু আমার নজরে পড়ল। আপন মনেই বলে উঠলাম, 'কে ওটা? হ্যানস নাকি? উঠে আসছে কে? কয়েকবার এদিক-ওদিক হেলে-বেঁকে নিঃসন্দেহ হলাম। হ্যাঁ, হ্যানস-ই তো বটে।' সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল তিনটি ঘোড়া, ফিরে এল তিনটে গাট্টাগোট্টা মানুষ নিয়ে। আমার কাকার মনুষ্যচরিত্র জ্ঞানের উদ্দেশ্যে মাথা নোয়ালাম।

হ্যানস ফিরে এল। কাকা কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, সেও কিছু বলল না। সে গাঁটরি খুলে কম্বল বের করল। একটা কাকার হাতে দিল, আমাকে দিল একটা। আর একটা নিজে। সে তিনজন দেশওয়ালীকে নিয়ে পাহাড়ের কোনো একটা গর্তে বসে শীতের রাত্রি কাটিয়ে দেবে। খাবার ভাগ হওয়ার কথা ছিল, আমরা কাকা-ভাইপো আর হ্যানসের মধ্যে। আমি ইশারায় জিজ্ঞেস করলাম, 'তাদের খাবারের ব্যবস্থা কী হবে?' সে দূরের কোনো জায়গা দেখিয়ে দিল। অনুমানে ধরে নিলাম ওদিকে বাড়ি। বাড়ি থেকে সবাই খেয়ে এসেছে। তাদের জন্য ভাবতে হবে না।

আমাদের এ অভিযানে ছেদ পড়ার যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, হ্যানস ফিরে আসায় সে সম্ভাবনায় ছেদ পড়ল। অতএব বাড়ি ফেরার চিন্তা ছাড়তেই হল।

পথশ্রমে ক্লান্ত দেহটা একবার কোনোরকমে কম্বলমুড়ি দিতেই সকাল হয়ে গেল। পাহাড়িয়া পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। সকালে সূর্যের সতেজ আলোর সুউচ্চ স্নেফেলস চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। না, আমার ভুলই হয়েছে। সকাল হয়নি। এটা নিশীথ সূর্যের অত্যুজ্জ্বল আলো। ভুলেই গিয়েছিলাম, আইসল্যান্ডের উত্তর দিকটায় সূর্য বছরে ছয় মাস অস্ত যায় না। পুরো ছয়টা মাস একটানা দিন।

একসময় আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরলাম। কী খেয়াল হল ঘড়িটা তুলে নিলাম। ছয়টা বেজে গেছে। কম্বল ফেলে উঠে পড়লাম। সকাল হয়েছে। সত্যিকারের সকাল।

*　　*　　*

আমাদের স্নেফেলস আরোহণপর্ব শুরু হল। অমানুষিক কষ্টের মধ্য দিয়ে ঘন ঘন চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে এগোতে হচ্ছে। মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হলে আর রক্ষা নেই, নিশ্চিত অপঘাতে মৃত্যু। আমাদের আগে আগে হাঁটছে হ্যানস। এটা যেন তার কাছে সমতল ভূমির ওপর দিয়ে চলার মতই স্বাভাবিক। পথ চলতে চলতে আমরা তার থেকে বেশিরকম পিছিয়ে পড়ায় সে পিছন ফিরে আমাদের অপেক্ষা করতে লাগল। তার একটা কাজের প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হল। পথের ধারে সে এক এক জায়গায় কতকগুলো করে পাথর জড়ো করে রাখতে লাগল। ফেরার পথে যাতে পথ ভুল না হয়। আমি তো ভালোভাবেই জানি, আমরা আর ফিরছিও না, ওগুলোও কোনো কাজে লাগবে না। আমাদের ভাগ্য বিড়ম্বনার সঙ্গে বাধ্য হয়েই হ্যানসকেও জড়াচ্ছি। দোষটা পুরোপুরি

www.pathagar.com

আমাদের না! তারপর দোষ কম না। আমাদের পিছুন নেবার জন্য তারও যথেষ্ট আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি। সপ্তাহে তিন রিগসডলার-এর দাম যে এত বেশি, জানতাম না।

ঘণ্টা চারেক হাঁটার পর হ্যান্‌স প্রায় সমতল একটা জায়গা দেখতে পেয়ে ইশারায় আমাদের দাঁড়াতে বলল।

আমরা তার নির্দেশ পালন করলাম। সে খাবারের পুঁটলিটা খুলে ভাগ করতে বসল।

কাকা বুঝেই নিয়েছেন, পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে প্রচুর সময় লেগে যাবে, ধকলও সইতে হবে খুবই। তাই বিনা বাক্যব্যয়ে গোগ্রাসে যতটা সম্ভব খাবার উদরের মধ্যে ভরে নিলেন।

খাওয়াদাওয়া মিটলেই কাকা আবার হাঁটার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। হ্যানস কিন্তু পুরো একটা ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে তবে যাত্রার উদ্যোগ করল।

আমি এতক্ষণে বুঝেছি, কম কথা বলা এখানকার মানুষগুলোর বৈশিষ্ট্য। কারণ, সঙ্গে করে নিয়ে আসা সেই তিনজন লোকও হ্যানসের মতোই কম কথা বলে।

আবার শুরু হল হাঁটা। আশ্চর্য ব্যাপার! ওপর দিকে তাকালেই মনে হয়, এই তো নাগালের মধ্যেই চূড়াটা। অনেক আগে থেকেই এমনটা মনে হচ্ছিল। এবার বুঝলাম, অনেক পাহাড়েই নাকি এমন বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়।

আরো কিছুটা উঠেই থমকে দাঁড়াতে হল। এখানটায় পাহাড়টা খুবই খাড়া, ঢালুও খুব কম। সোজা উঠে যাওয়া অসাধ্য। হ্যানস সমস্যার সমাধান করে দিল, কোনাকুনি ওঠার পরামর্শ দিল। তাতেও কি আর কষ্ট কম! লোহার ফলা লাগানো লাঠিতে ভর দিয়ে আমরা অনেক কষ্টে উপরে উঠতে লাগলাম। কাকা আমাকে সবসময় চোখে চোখে রেখে পথ পাড়ি দিচ্ছেন। প্রয়োজনে হাত ধরে ওপরে তুলেও নিচ্ছেন মাঝে মধ্যে। আমি তো জানিই, যতই তিনি বকাবকি করুন, নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন আমাকে।

আমি অবাক হচ্ছি, একবারের জন্যও তাঁর পা হড়কে যাচ্ছে না! কই, পাহাড় পর্বতে ওঠার অভিজ্ঞতা তাঁর আছে, আগে কোনোদিন শুনিনি তো। আসলে কার ভেতরে কী আছে সারা জীবন ঘর করেও অন্যের তা জানা সম্ভব নয়।

আমি ওপরের দিকে হতাশদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছি। কষ্টের পরিমাণ না বাড়লেও চূড়ায় ওঠা সম্ভব কি না সন্দেহ! কাকা বারবারই আমাকে টেনে-হিচড়ে তুলে নিয়ে সমস্যার সমাধান করে দিতে লাগলেন! একসময় ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে বরফ প্রাঙ্গণে হাজির হলাম। বরফের মাঝখান দিয়ে সিঁড়ির মতো উঠে গিয়েছে, আর অসুবিধা কী?

'এই যে প্রাকৃতিক সিঁড়িমতো দেখছ, আইসল্যান্ডের ভাষায় এর নাম স্টিনা। অগ্ন্যুৎপাতের সময় যদি ভূগর্ভ থেকে অসংখ্য পাথরের টুকরো বেরিয়ে আসতে থাকে আর পাহাড়ের গায়ে যদি আটকে যায়, তবেই এরকম পাথরের সিঁড়ি তৈরি হওয়া সম্ভব।' কাকা আমাকে লক্ষ করে বললেন।

সিঁড়িগুলো থাকায় আমাদের বড় উপকার হল। জ্যামিতির ভাষায় যাকে লম্ব বলা হয়, পাহাড়টা ক্রমশ সে আকার নিচ্ছে। একের পর এক সিঁড়ি টপকে আমরা ক্রমেই ওপরে উঠতে লাগলাম। মোটেই কষ্ট হচ্ছে না। উপরে! ধরতে গেলে বিনা ক্লেশেই আমরা দ্রুত উপরে উঠতে লাগলাম।

সিঁড়ির শেষধাপের উপর যখন আমরা উঠে দাঁড়ালাম তখন সন্ধে সাতটা! কিছু না হলেও দুহাজার ধাপ ডিঙিয়ে এসেছি, সন্দেহ নেই। শেষ ধাপটা খুবই প্রশস্ত, বস্তুতা

www.pathagar.com

মঞ্চের মতো। পাহাড়ের চূড়াটা সুবিশাল একটা পাথরের শঙ্কুর আকৃতি বিশিষ্ট। তারই মুখবিবর দিয়ে স্নেফেলস-এর উত্তপ্ত গলিত লাভা বেরিয়ে আসত! ৩২০০ ফুট নিচে রয়েছে সমুদ্র। চিরতুষারের রেখা ডিঙিয়ে এসেছি। আইসল্যান্ড এমনকিছু উঁচুতে নয় যে তুষার জমবে। চির আর্দ্র আবহাওয়ার জন্যই এমনটা হয়েছে, কাকা বললেন।

আমার অধ্যাপক কাকা বুঝলেন, আমি পথশ্রমে বড় ক্লান্ত, নইলে কখনই বলতেন না, 'এসো, আজ রাতের মতো এখানে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করা যাক।'

মাথা গোঁজার কথা শুনেই হ্যানস কয়েকবার ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, 'না, অবভানকোর! মিস্তৌর! মিস্তৌর!' তার চোখ-মুখের আতঙ্কটুকু আমাদের নজর এড়াল না।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে কাকার মুখের দিকে তাকালাম।

কাকা বললেন, 'অব্‌ভানকোর—মানে আরও উঠতে হবে। আর মিস্তৌর? তর্জনি নির্দেশ করে বললেন, 'দেখ, ওই দেখ!'

আমি ব্যস্ত হয়ে ঘাড় ফেরালাম, সুবিশাল ধূসর বর্ণ একটা স্তম্ভ, চক্কর খেতে খেতে ওপরে উঠছে। ঠিক যেন সমুদ্রের বুকের জলস্তম্ভ। কিছুক্ষণ লক্ষ করার পর বুঝলাম—সূক্ষ্ম পাথরচূর্ণ, বালি আর ধুলো প্রভৃতি মিলে ওই ভয়ঙ্করকে গড়ে তুলেছে। হাওয়ার বেগে স্নেফেলস-এর চূড়ার দিকে উঠে আসছে! এই মহাপ্রলয়ঙ্কর ধুলো-বালির স্তম্ভ পাহাড়ের উপর উঠে এলে, মহা আক্রোশে ভেঙে পড়লে বীভৎস ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হবে। ব্যস, আর দেখতে হবে না আমরা কাগজের ঠোঙার মতো চক্কর খেতে খেতে শূন্যে, মহাশূন্যে ভেসে যাব। আইসল্যান্ডবাসীরা একে মিস্তৌরি বলে। হিমবাহের উপর দিয়ে ঝড় তীব্র বেগে বয়ে যাবার সময় প্রায়ই এই প্রলয়ঙ্কর মিস্তৌর সৃষ্টি হয়।

ব্যস, আর কথা নেই, হ্যানস মরিয়া হয়ে ছুটতে লাগল। আর বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে উচ্চারণ করল, 'হেস্টাজই!' আমি শব্দটার অর্থ বুঝতে না পারলেও অনুমানে ধরে নিলাম, তাড়াতাড়ি ছুটতে বলছে। আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে ক্ষিপ্রগতিতে তাকে অনুসরণ করলাম।

হ্যানস পাথুরে শঙ্কুটাকে বেড় দিয়ে তার আড়াল দিয়ে কোনাকুনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে।

বেশি দূরে নয়। আমাদের কাছাকাছিই স্তম্ভটা পাহাড়ের ওপর আছড়ে পড়ল। বিকট শব্দ হল, কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম। পাহাড়টা রীতিমতো কেঁপে কেঁপে উঠল। লাভা উদ্‌গীরণের সময় নাকি ঠিক এমনটা হয়। কপাল ভালো, ইতমধ্যেই আমরা শঙ্কুটার বিপরীত দিকে পৌঁছতে পারলাম।

এবারকার মতো বিপদ কেটে গেছে। তবু হ্যানস এখানে আমাদের রাতের আস্তানা গড়তে দিল না। সে অনবরতই আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আরো ওপরে নাকি উঠে যাওয়া দরকার। ঘুরিয়ে পৌঁছিয়ে কম হলেও দশ মাইল পথ আমাদের পাড়ি দিতে হয়েছে।

একদিকে শীতের নির্মম নিষ্ঠুর আক্রমণ। অন্যদিকে পেটের মধ্যে আগুনের দাপাদাপিতে শরীর ক্লান্ত। পা দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইছে। তারপর এ-অঞ্চলে বাতাস খুবই পাতলা, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

রাত প্রায় এগারটা আমরা স্নেফেলসের চূড়ায় উঠে গেলাম। কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে শরীর ও মন সতেজ করে নিলাম।

www.pathagar.com

এদিক ওদিক তাকিয়ে বুঝলাম, মৃত আগ্নেয়গিরির মুখবিবর এখানেই ছিল।

খাওয়া দাওয়ার চিন্তা শিকেয় উঠে গেছে। শরীরের যা অবস্থা, সেদিকে মন দেয়ার মতো সুযোগও ছিল না। সমতল জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম ভেঙে গেল। মধ্য রাত্রির কনকনে ঠাণ্ডায় কম্বল আর কতটা শীত রুখতে পারে? পা দুটো যেন বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মুখের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে কাকা খোলা আকাশের দিকে তাকালেন। সূর্যটাকেও সে মুহূর্তে কেমন যেন ঠাণ্ডা, অতিবৃদ্ধ ও চলচ্ছক্তি রহিত বলেই মনে হয়। অতি শ্লথ তার গতি। একটু একটু করে নিচের দিকে নামছে।

মুখের ওপর থেকে কম্বলটা সরাতেই কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া সুতীক্ষ্ণ সূঁচের মতো চামড়ায় আঘাত করতে লাগল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ হাজার ফুট ওপরে বলে এমনটা মনে হচ্ছে। তার ওপর আইসল্যান্ড, এমনিতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

সকাল হল। কম্বল ফেলে উঠে পড়লাম। গত রাতের ক্লান্ত অবসন্ন ভাবটা কেটে গিয়ে দেহ-মন চাঙা হয়ে উঠল।

কাকা কখন এসে যে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন, টের পাইনি। তাঁর গলা শুনে চমকে ঘাড় ঘোরালাম। তিনি তর্জনি উঁচিয়ে বললেন, 'ওই দেখ, গ্রিনল্যান্ড দেখা যাচ্ছে! গ্রিনল্যান্ড! গ্রিনল্যান্ড!'

আমি বিস্ময়ভরা চোখে তাঁর তর্জনি বরাবর তাকিয়ে বললাম—'গ্রিনল্যান্ড! গ্রিনল্যান্ড ওটা?'

'হ্যাঁ, দূরত্ব ১০০ মাইল থেকে সামান্য বেশি। বরফ গলে জলধারা এদিকে ধেয়ে আসার সময় দু-একটা মেরুভল্লুকও এই দ্বীপে বয়ে নিয়ে আসে।

আমি তো রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। এইরে, কাকা বুঝি অধ্যাপকসুলভ ভাষণ শুরু করে দিলেন। মুহূর্তেই আমার ধারণা পাল্টে দিয়ে তিনি এবার বললেন, 'এবার আমাদের গতি নিচের দিকে। পাহাড়ের বাইরের দিক দিয়ে নিচে নামব না, ভেতরের দিক দিয়ে। ভাবে মনে হল, কথাটা তিনি হ্যানসকে লক্ষ করেই বললেন।

কথাটা কানে যেতেই হ্যান্‌স আঁতকে কাকার মুখের দিকে তাকাল। আশ্চর্য! মুখে টুঁ শব্দটা পর্যন্ত করল না।

স্নেফেলস-এর গহ্বরের ভেতর দিকটা? একটা মৌচাককে উল্টে দিলে যেমন দেখায় অনেকটা সেরকম মনে হল যেন। তার মুখ-বিবরের ব্যাস কত হবে? গভীরতাই বা কত? উপুড় হয়ে ভেতরের দিকে ঝুঁকলে যা অনুমান করা যায় কিছু না হলেও দুহাজার ফুট তো বটেই। এই সুবিশাল পাত্রটা থেকে যখন গলিত টগবগে লাভা তীব্র আক্রোশে বেরিয়ে আসত সে দৃশ্য কল্পনা করতে গেলে মাথা ঝিমঝিম করে। মুখ-গহ্বরের নিচে ফাঁপা জায়গাটা ৫০০ ফুটের কম হবে না ধরে নেয়া যায়। এর গা বেয়ে নামার কথা চিন্তা করা মাত্র গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সব কয়টা স্নায়ু যেন এক সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল। গহ্বরটার গা দিয়ে সিঁড়িমতো থাকলে তবুও সম্ভব হত। নইলে?—ভাবতে পারছি না, মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যাবার উপক্রম হলাম।

আমাদের নিচে নামার চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা নয় নামতেই হবে। কাকার মুখের ওপর কে সাহস করে বলবে, নামব না।

অনন্যোপায়। নামতে শুরু করতেই হল শেষপর্যন্ত। নামতে বেশি কষ্ট যাতে না হয় সে জন্য ডিম্বাকৃতি একটা পথ হ্যান্‌স কল্পনা করে নিল! অনবরত নিচের দিকে নেমে

www.pathagar.com

যেতে হবে, কিন্তু কিভাবে? সবসময় কোনাকুনিভাবে নামতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে, কোথায় পা রাখার মত পাথর উঁকি মারছে। সন্তর্পণে পা দিয়ে এক দাপ নামতে হবে। আবার ধৈর্য ধরে পা রাখার মত আর একটা পাথর খোঁজার চেষ্টা করতে হবে। বেরিয়ে থাকা পাথরগুলো সব কয়টা আবার সমান শক্ত নয়, চাপ দিতেই আলগা হয়ে অতল গহ্বরে গিয়ে পড়বে। কেউ যাতে পা হড়কে পড়ে যেতে না পারে তাই দড়ি দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে নিলাম। একজন বেকায়দায় পড়ে বিপদগ্রস্ত হলেও জীবনহানী ঘটবে না।

৫০০ বছর ধরে গহ্বরের গায়ে আগুনের ছোঁয়া না-লাগায় পাথরগুলো বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। কোথাও-বা জমাটবাঁধা বরফের চাঁই। বরফ কতটা শক্ত একজন মানুষের ভার সইতে পারবে কি না, আগেই পরীক্ষা করে নিতে হবে। আমাদের লাঠিগুলোর মাথায় আগেভাগেই একটা করে ইস্পাতের শূল গেঁথে নিয়েছিলাম। আমাদের চেয়ে অনেকাংশে অভিজ্ঞ দেখলাম হ্যানসকে। পা দেয়ার আগে শূলটা গেঁথে বরফের গভীরতা পরীক্ষা করে নিচ্ছে। সম্ভাব্য সবরকম সতর্কতার জন্য আমরা নিরাপদে নেমে যেতে পারলাম। নিরাপদে? একরকম নিরাপদেই তো বলব! ক্ষতি যেটুকু হয়েছে তা হচ্ছে মালবাহীদের কাঁধ থেকে একগোছা দড়ি নিচে পড়ে গিয়েছিল। সেটা গড়াতে গড়াতে কোথায় গিয়ে যে থেমেছে বলা মুশকিল।

ঠিক দুপুরবেলা আমরা তলদেশে হাজির হলাম। সাফল্য আমার মনে কর্মপ্রেরণা এনে দিয়েছে, মিথ্যে নয়। আমি উল্লসিত হয়ে ওপরের দিকে তাকালাম। শুধু নীল আকাশের ছোট একটা টুকরো নজরে পড়ল। গহ্বরের ভেতরটা যেন যক্ষপুরী। সঙ্গে আলো না থাকলে নিজের হাতটাও দেখা যেত না।

গহ্বরের তলদেশে দাঁড়িয়ে আমি বারবার এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আবিষ্কার করলাম, পাহাড়টার তিনটে জ্বালামুখ। একটা সোজা নিচের দিকে নেমে গেছে, অন্য দুটো দুপাশ থেকে প্রায় আড়াআড়িভাবে নেমে গেছে।

এবারই দেখা দিল আসল সমস্যা। কোন গহ্বর দিয়ে নেমে গেলে ভূগোলকের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছনো যাবে, বেছে নেয়া দুষ্কর। মুখগুলো যেন আমাদের গ্রাস করার জন্যই গ্রীবা বিস্তার করে রেখেছে। আমরা তো স্বেচ্ছায়ই ঢুকতে চাচ্ছি। কিন্তু কোনটায় আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, কে জানে? মুখে গহ্বরের বিস্তার কিছু না হলেও একশ ফুট তো হবেই।

কাকাকে নির্বাক দেখে মনে হল তিনি নির্ঘাত স্যাকনুসেমের সেই ধাঁধাটা স্মরণ করার চেষ্টা করছেন। আবিষ্কারকদের পথের হদিস দিতে তিনি কি কোনো নির্দেশই রেখে যান নি? আমার কাকা আপনমনে কর্তব্য স্থির করার চিন্তায় বেশ কিছুক্ষণ আত্মমগ্ন রইলেন।

বুঝতেই পারলাম কাকার মনে হতাশার ছাপ পড়েছে! একসময় সোজা হয়ে উঠে তিনি দাঁড়ালেন। পথের উদ্দেশ্যে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন। একসময় হাঁটতে হাঁটতে আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

এদিকে আমি একটা পাথরের চাঁইয়ে বসে ভবিষ্যতের চিন্তায় অস্থির হচ্ছি। আচমকা কাকার কণ্ঠস্বর কানে এল—'আর্নে স্যাকনুসেম। আর্নে স্যাকনুসেম!' আমি একলাফে উঠে পড়লাম। তড়িৎগতিতে কাকার কাছে পৌঁছলাম। সমতল একটা পাথরের দিকে

www.pathagar.com

কাকাকে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম। পাথরের বুকে অস্পষ্ট প্রায় লেখনী। পরিষ্কার বোঝা না গেলেও একেবারে মিলিয়ে যায় নি, এখনও পড়া যাচ্ছে—'আর্নে স্যাকনুসেম'।

'আমরা তবে নিশ্চিন্ত হলাম। নিঃসন্দেহও হলাম বটে, স্যাকনুসেম এ-জ্বালামুখ নিয়েই নিচে নেমেছিলেন'—কাকা মুখে স্বস্তির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন।

কাকা স্বস্তি পেলেন বটে, কিন্তু আমার অস্বস্তি যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম, এতেই রেহাই পাব। এবার বুঝলাম, অতল গহ্বরে নামতে হবে, রেহাই অবশ্যই নেই।

পরমেশ্বর নামে অদৃশ্য দেবতাকে আগে কোনোদিন এমন করে স্মরণ করি নি। কতদূর নামতে হবে, কেমন করে নামতে হবে, কোথায় গিয়ে শেষ হবে সেই পরমপিতা ছাড়া কে জানবে? এমন সুন্দর পৃথিবীটাকে আর কোনো দিন কি দুচোখ ভরে দেখার সৌভাগ্য হবে? মুক্ত বাতাসে ফুসফুস দুটোকেও কোনোদিন ভরিয়ে দিতে পারব না। মুহূর্তের মধ্যে মনটা মারাত্মক বিষিয়ে উঠল।

একসময় কাকার ডাকে চমক ভাঙল, 'এ্যাক্সেল! এ্যাক্সেল!' আমি তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকালাম। ইতিমধ্যে আমাদের দলটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে জানতেই পারি নি। হ্যানস ছাড়া বাকি সাহায্যকারী তিনজন প্রাপ্য বুঝে নিয়ে কেটে পড়েছে। সবাই তো আর আমাদের মতো পিছুনটানহীন নয়, ঘর সংসার রয়েছে। পথপ্রদর্শক হ্যানস আমাদের সঙ্গেই রয়ে গেল। হয়ত আমাদের পর্যটনের শেষ দেখার অত্যুগ্র ইচ্ছা তার।

আমরা নতুন পথে পা বাড়ালাম। গহ্বরটা যেন ক্রমেই বেশ অন্ধকার হয়ে আসছে। কাকা মুহূর্তের জন্য উপরের দিকে তাকিয়েই গর্জে উঠলেন, 'আকাশটাও যেন আমাদের সঙ্গে ঘোরতর শত্রুতা শুরু করে দিয়েছে। আকাশের যে টুকরোটা আবছা দেখা যাচ্ছে তাতে ঘন মেঘ জমেছে, চিড়িক্ মিড়িক্ করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বৃষ্টি নামার পূর্বলক্ষণ। কোথায় ঝকঝকে রোদ উঠবে, ভেতরে হাল্কা আলো ছিটকে আসবে, তা না করে মুখ গোমড়া করে রেখেছে। যত্তসব!'

কাকার কথায় আমি সমর্থন বা প্রতিবাদ কোনোটাই করলাম না। আসলে আমার মন অনেক আগেই চিপসে গেছে। জ্বালামুখটার ব্যাস যখন একশ ফুটের কাছাকাছি তখন পরিধি অবশ্যই তিনশ ফুটের বেশিই হবে। আমি ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরের দিকে উঁকি দিলাম। যা দেখলাম, পিলে চমকে যাবার উপক্রম। আগে শুনেছিলাম, গভীর খাদ দেখলে মানুষের মধ্যে লাফিয়ে পড়ার একটা প্রেরণা জেগে ওঠে। কার্যত ঘটলও তাই। আমি পড়েই যাচ্ছিলাম, কে যেন আচমকা আমাকে ধরে ফেলল। শুধু এটুকুই বুঝেছিলাম, আমার রক্ষাকর্তা হ্যানস।

ভেতরের দিকে উঁকি মেরে খুব সামান্যই দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু যত সামান্যই হোক, আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম। সুড়ঙ্গটার পাশগুলো খাড়াভাবে নিচে নেমে গেছে। পাশ থেকে দুই চারটে পাথরের মাথা বেরিয়ে আছে বটে। দাঁড়ানো যাবে ঠিকই। কিন্তু ধরব কী? একটা কাজ অবশ্য করা যেতে পারে, ওপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে দিলে ধরে ধরে নামা সম্ভব। সমস্যাও আছে যথেষ্ট। দড়ি ঝুলিয়ে নেমে তো যাব, কিন্তু দড়িটা নামাব কি করে? ওপরের প্রান্ত যে বাঁধা থাকবে।

www.pathagar.com

কাকা ইতিমধ্যেই কর্তব্য স্থির করে নিয়েছেন। আঙুলের মতো মোটা একটা দড়ি বেছে নিলেন। দৈর্ঘ্য ৪০০ ফুট। তার মাঝামাঝি অংশটা তুলে দিলেন শক্ত একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর। তারপর দড়ির মাথা দুটো ঝুলিয়ে দিলেন নিচের দিকে। আমি কৌতূহলী চোখে তার কাজ দেখছি। তিনি কাজের ঝোঁকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'বোকারাম কোথাকার! নিচে নেমে গিয়ে দড়ির একটা মাথা ধরে টান দিলে পুরো দড়িটাই তোমার হাতে চলে যাবে না?'

আমি ঠোঁটের কোণে সলজ্জ হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে ঘাড় কাত করলাম। নিজের বোকামির জন্য বাস্তবিকই লজ্জা হল। খুবই সামান্য ব্যাপার, অথচ কিছুতেই আমার মাথায় এল না।

আমি আবারও বোকামির পরিচয় দিলাম, 'কিন্তু গর্তের দৈর্ঘ্য তো ৪০০ ফুটের বেশিও হতে পারে—তখন?'

কাকা রীতিমতো ধমক দিয়ে উঠলেন, 'তুমি এমনতর বোকা তা তো জানতাম না হে! কেন? এই ফন্দি তো বারবারই খাটানো যেতে পারে। আর খুঁজে বের করতে হবে কোন পাথরটা বাইরের দিকে খুব বেশি বেরিয়ে আছে। ব্যস, কাজ হাসিল।

নামার ব্যবস্থা পাকা করে কাকা মালপত্রগুলোকে বিশেষ করে খাবারদাবার তিন ভাগ করে ফেললেন। একভাগ নিজের পিঠে বেঁধে নিলেন, দুই ভাগ দিলেন হ্যানস আর আমাকে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—বিছানাপত্র আর দড়িদাড়া?

ধমকের সুরে বললেন, 'সে বুদ্ধি তোমার নেই জানি। সবই নেমে যাবে।' তাঁর নির্দেশে হ্যান্স আগেভাগেই অভঙ্গুর জিনিসগুলো, বিছানাপত্র, দড়ি, শাবল, কুড়োল, গাইত প্রভৃতি ফেলেছিল।

কাকা আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তাকিয়ে দেখ, এগুলো কি করে নিচে নেমে যায়!' কথা শেষ হবার আগেই বিরাট সেই গাঁটরিটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিলেন। এবার বললেন—দেখলে, আমাদের আগেই কেমন নিচে পৌঁছে গেল?'

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলো কিন্তু হ্যানস বা আমাকে—কাউকেই দিলেন না। নিজের পিঠে বেঁধে নিলেন।

আমাদের প্রস্তুতিপর্ব মিটলে কাকা বললেন, 'চলো, এবার নামা যাক।'

এখানেও আগে আগে নামছে হ্যানস, তারপর কাকা, শেষে আমি।

আধঘন্টা লড়াই করে আমরা একটা সমতল ও চওড়া পাথরে গিয়ে দাঁড়ালাম। খুবই মসৃণ, রাজমিস্ত্রি যেন যত্ন করে তৈরি করেছে। কাকার নির্দেশে হ্যানস দড়িটার একটা প্রান্ত ধরে টান দিল। অপর প্রান্ত একটু একটু করে ওপরে উঠে একসময় দপ করে আমাদের পায়ের কাছে পড়ে গেল। চাতালটায় দাঁড়িয়ে নিচের দিকে উঁকি দিলাম, গর্তটার তলার চিহ্ন এখান থেকেও দেখা গেল না।

হ্যান্স আবার দড়ির ফাঁস দিল! আবার নামা শুরু হল। আরও দশ ফুট নেমে আবার চওড়া একটা চাতালে পৌঁছলাম। আঙুলের মতো মোটা একটা দড়ির ওপর আমাদের তিন তিনটে জীবন নির্ভর করছে। চালে সামান্য ভুল হলেই অতল গহ্বরে পড়ে গিয়ে একেবারে ফেটে ফুটে ধপাস। কতরকম মাটিই যে চোখে পড়ছে, বলে শেষ করা যাবে না। ভূতত্ত্ববিদ কেউ এলে উপকৃত হতেন। কিন্তু আমার কাকার মতো মাথার দোষ তো আর কারও নেই, দড়ি ধরে মরণ-কুয়োয় নামতে যাবে।

www.pathagar.com

কাকা পাশের দেয়াল থেকে এক টুকরো মাটি তুলে এনে পরখ করে দেখে বললেন, 'শোন বলছি, এটা প্রাইমর্ডিয়াল! এই মাটি জলের সংস্পর্শে এলেই এর ধাতব অংশে তাপের সঞ্চার হয়, আগুন জ্বলে ওঠে। আর কিছুই নয়, এই মাটির জন্যেই অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। হামফ্রে ডেভির সঙ্গে আমি একমত। ভূকেন্দ্রে কেবলই আগুন, এ-মতটা সর্বৈব ভুল। অথচ এটাই প্রচলিত। তাই বলছিলাম কি, ভূকেন্দ্রে গিয়ে হাজির হলে আমরা জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যাব—কথাটা ঠিক না।

আমরা কতবার জায়গা বদল করেছি। কতবার দড়ির ফাঁদ পড়িয়েছি, মোট কত ফুট নেমেছি, সবই হিসেব রেখেছি আমি। চৌদ্দবার দড়ির ফাঁস পড়িয়েছি দড়িটার দৈর্ঘ্য ৪০০ ফুট। সেটা দুই ভাজ করে ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব প্রতিবারে দুশো ফুট নেমেছি। চৌদ্দবারে নেমেছি মোট ২৮০০ ফুট।

আবার নামতে আরম্ভ করলাম।

একসময় হ্যানস চেঁচিয়ে ওঠে—'থামুন!' সর্বনাশ! আর একটু হলেই কাকার মাথায় পা দিয়ে বসতাম। কাকা বললেন, 'আমরা পৌঁছে গেছি। চিমনির তলদেশে পৌঁছেছি! ডানদিকে একটা পথমতো দেখা যাচ্ছে বটে। কাল পরীক্ষা করে দেখব। আজকের জন্য কেবল আহার নিদ্রার কাজ বাকি।'

কাকার নির্দেশে হ্যানস মুহূর্তের মধ্যে খাবারের পুটুলি খুলে ভাগ করতে বসে গেল।

চাতালের ওপরই আধশোয়া অবস্থায় রাত্রি কাটালাম। বেলা আটটায় ঘুম ভাঙল।

কাকা আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'কি হে, কেমন লাগছে পাতালের দিকে এগোতে।'

'এখন পর্যন্ত ত নির্বিঘ্নেই কাটল। প্রতি মুহূর্তে ভয়—'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কাকা বললেন, 'ভয় বস্তুর কি এ্যাক্সেল! এখনও তো আমরা ভূত্বকের নিচে এক ইঞ্চিও প্রবেশ করি নি। অর্থাৎ কি না আমরা সবে দ্বীপের গড় উচ্চতায় নেমেছি। এ জায়গাটা সমুদ্র বক্ষের সমস্তরে। ব্যারোমিটার রয়েছে, পরীক্ষা করে দেখতে পার।'

আমি আর পরীক্ষা পথে গেলাম না। হাজারো মালপত্র বেঁধে যে পুটুলিটা ফেলে দিয়েছিলাম, সেটার গতি কী হল, ভাবছি। কিন্তু সেটা তো এখানে এসে পড়ার কথা।

হ্যানস এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে এক সময় সোল্লাসে ওপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। ঘাড় ঘুরিয়ে ওপরে তাকাতেই দেকি, প্রায় একশো ফুট উপরের ঝুলন্ত পাথরে আটকা পড়ে রয়েছে। বেড়ালের মত আঁচড়ে আঁচড়ে ওপরে উঠে গিয়ে বিশালায়তন আটকা পড়ে রয়েছে। বেড়ালের মতো আঁচড়ে আঁচড়ে ওপরে উঠে গিয়ে বিশালায়তন পুঁটুলিটা ঠেলে ধাক্কিয়ে নিচে ফেলে দিল।

কাকা এবার বললেন, 'শোন এ্যাক্সেল, এবার সত্যি সত্যি ভূকেন্দ্র আবিষ্কারের অভিযান শুরু হবে।' কাকা আমার গলায় যে রামকোরক—ব্যাটারি ঝোলান ছিল তাতে তার সংযোগ করে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেড় উজ্জ্বল আলো ঠিকরে বেরল।

কাকা বললেন, 'ব্যাস, এবার চলো, যাওয়া যাক। এই পুঁটুলিটা গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে যাবে।'

www.pathagar.com

১২২৯ খ্রিস্টাব্দের কথা। সে বছর শেষবারের মতো অগ্নিবমন করেছিল স্নেফেলস। তখন উত্তপ্ত গলিত লাভার সুতীব্র স্রোত পাহাড় ফুটো করে এ-পথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। ভেতরটা নিচের দিকে বড্ড বেশি রকম ঢালু একটু অসতর্ক হয়ে পা চালালেই ছিটকে পড়তে হবে। হ্যানসের সুবিধেই হল এতে। বিশালায়তন পুঁটুলিটা অনায়াসে গড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

পাশের দেয়ালের ওপর উজ্জ্বল আলোটা পড়ে মুক্তোর মত চকচক করতে লাগল। বিস্ময়ভরা চোখে সে দিকে ফিরেই বললাম, 'কাকা, কী চমৎকার দৃশ্য, দেখুন!'

কাকা ঠোঁটের কোণে হাসি রেখা ফুটিয়ে তুললেন। আলতো করে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'এতেই আশ্চর্য হচ্ছ? চলো এগিয়ে চলো, আরো কত সব আশ্চর্য জিনিস মনকে দোলা দেবে দেখবে।'

এবার হ্যানস নয়, কাকাই আমাদের থামতে বললেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন মনে হল। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে বললেন, 'হ্যান্‌স, এক বোতল জল দাও তো।'

হ্যানস একটা বোতল তাঁর হাতে দিয়ে বলল, 'আর মাত্র ছয় বোতল জল রয়েছে কর্তা।'

'জলের জন্য ভেবো না। আর সামান্য এগোলেই অফুরন্ত জল পেয়ে যাবে।'

কাকা হিসেব করে বললেন, 'আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার ফুটেরও বেশি নেমেছি। আমাদের সঙ্গে সব কটা যন্ত্রপাতিও একই কথা বলছে।'

আসল সমস্যা হচ্ছে, নিয়ম অনুযায়ী মাটির নিচে যত নামব তাপের পরিমাণও ততই বেড়ে যাবে! প্রতি ১০০ ফুটে মোটামুটি এক ডিগ্রি তাপ বাড়বে। আমরা বর্তমানে যেখানে রয়েছি, তার উত্তাপ হওয়ার কথা ছিল একাশি ডিগ্রি। কার্যত রয়েছে কিন্তু পনের ডিগ্রিরও কম। তবে কি সত্যিই ও-কেন্দ্রে আগুনের একাধিপত্য নেই? স্যাকনুসেম যদি সেখানে পৌঁছেই থাকেন তবে বলতেই হবে পণ্ডিতজনদের দেয়া আগুনের হিসেব সেখানে মিলবে না।

কাকার এদিকে নজর দেয়ার সময় নেই। তিনি সুড়ঙ্গ-পথটা পরীক্ষা করার কাজেই আত্মমগ্ন। এক সময় বললেন, 'এ্যাক্সেল, এতক্ষণে আমরা সবে চিমনিটার কাছে পৌঁছেছি। এবার আমাদের পুবদিকে যেতে হবে।'

টিলেমি করার সময় এটা নয়। তার নির্দেশে আমরা পূর্বদিকের সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লাম। তবে তিনি যে আন্দাজেই ঢিলটা ছুড়েছেন, বুঝতে পেরেছি। লাভামণ্ডল পেরিয়ে না গেলে জল পাওয়া যাবে না! এবারের পথটা ঢালু নয়। আরও কিছুটা এগিয়ে দেখলাম, গ্রানাইট পাথরের কতগুলো থাম্বা ছাদটাকে ধরে রেখেছে। আরও কিছুটা এগিয়েই দেখা গেল, সুড়ঙ্গের প্রকৃতি অন্যরকম। আর উত্তাপ প্রায় একইরকম চলেছে! একটা প্রসঙ্গ কল্পনা করতে গিয়ে শরীরে ঘাম দেখা গেল। এই পর্বতটা যখন উত্তপ্ত গলিতে লাভা উদ্গীরণ করত তখন এখানকার উত্তাপের পরিমাণ কী ছিল? উত্তপ্ত গলিত লাভার স্রোত কি এখান দিয়ে বইত?

ব্যাপারটা কল্পনা করতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে, মনে মনে বললাম, 'প্রাচীন আগ্নেয়গিরিটার যদি আবার অগ্নিবমন করার সাধ জেগে ওঠে? চোখের পলকে পুড়ে কয়লা হয়ে যেতে হবে।'

www.pathagar.com

ঘড়িতে তখন ছয়টা বাজে। সন্ধ্যা ছয়টা। সোজা পথে ছয় মাইল এগিয়েছিল, সে অনুপাতে মোটেই এগোতে পারি নি? খুব বেশি হলেও সিকি মাইল হতে পারে।

'এবার থামা যাক, কী বলো? রাতটা এখানে কাটিয়ে খুব ভোরে আবার হাঁটা শুরু করা যাবে।' কাকা বললেন

সকাল হল। কম্বল গুটিয়ে আবার পুঁটুলি বাঁধা হল। শুরু হল হাঁটা। কী আশ্চর্য! বরাবর একই সমতল বজায় রেখে রাস্তাটা চলেছে। নিচের দিকে এক ইঞ্চিও নামছি না তো! কোথাও আবার ওপরের দিকে উঠছে। নইলে হাঁটতে এমন কষ্ট হবে কেন? সুড়ঙ্গের এদিকটার দেয়ালে আর লাভার প্রলেপ দেখা যাচ্ছে না। কঠিন কঠোর পাথর। ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তুলল। আমরা কি তবে পথ ভুল করেছি? ভাবলাম, কাকা ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছেন না? হয়ত পেরেছেন। পথটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, দেখতে চাচ্ছেন। আবিষ্কারকের মোহই তাঁকে পেয়ে বসেছে। তা হোক। কিন্তু মোহের পরিমাণ তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্বনাশ ঘটায়। সঙ্গে যা খাবার রয়েছে তাতে আরো কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত। কিন্তু জল? সমস্যা তো জল নিয়েই। বোতল তিনেক জল আছে বটে, কালই নিঃশেষ হয়ে যাবে। সুড়ঙ্গপথের শেষ মাথায় পৌঁছবার আগেই জলতেষ্টায় মারা যাব না তো? আবার বাইরে বেরোবার ব্যবস্থা যদি নাই থাকে? তখন উপায়? কাকা কেন যে পশ্চিমের সুড়ঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে পুবেরটাকে আঁকড়ে ধরলেন বুঝতে পারছি না।

জলের প্রসঙ্গটা কাকার কাছে উত্থাপন করায় তিনি তাচ্ছিল্যের সুরেই ব্যক্ত করলেন, 'আরে, ভাবছ কেন? জল পাওয়া যাবেই। যতক্ষণ না পাওয়া যায়, খরচ কম করবে।'

সামান্য এগিয়েই আমাদের থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। কালো একটা পাথরের দেয়াল আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। তিনজনে ক্রমাগত ধাক্কাধাক্কি করলাম। কোনো ফলই হল না।

কাকা মোটেই ভেঙে পড়লেন না। অবলীলাক্রমে বলে ফেললেন, 'কি আর করা যাবে, ফিরেই চল। ক্রমাগত ছয় দিন হাঁটাহাঁটি করে এ-পর্যন্ত এসেছি। ফিরতে কদিন লাগবে, ঠিকঠিকানা আছে? আসার সময় উৎসাহ ছিল, এখন তো জমাটবাঁধা নৈরাশ্য! তখন সঙ্গে জল ছিল। এখন সব কটা বোতলই শূন্য। তেষ্টায় কলজে ফেটে যাবে।'

হ্যানস কাকার নির্দেশে পেছন ফিরে আবার হাঁটা জুড়ল। একদিন কাটল। এক ফোঁটাও জল নেই। দ্বিতীয় দিন রাতে বুকের মধ্যে মরুভূমির হাহাকার। তৃতীয় দিন আমার অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠল। বিকেলের দিকে হাঁটার সময় আমি হঠাৎ পড়ে গেলাম। ঠোঁট দুটো ফুলে গেছে, ফাটল ধরেছে। জিভটা কুঁকড়ে গেছে। বাকশক্তি হারিয়ে ফেললাম। শ্বাস নেয়ার মতো সামান্য ক্ষমতাও হারিয়ে ফেললাম। কাকা আমার মাথাটা কোলে নিয়ে বসলেন। নিজের জন্য রক্ষিত জলের বোতলটা আমার মুখে নিঃশেষে ঢেলে দিলেন।

কাকার ব্যবহারে অবাক হতেই হল। নিজের বুকফাটা তৃষ্ণা সহ্য করে বিপদের মুহূর্তের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। আবার চরম সঙ্কট মুহূর্তে অমূল্য অমৃতটুকু ব্যয় করলেন।

এক ঢোক জল ফুসফুসে যেতেই হৃত বল ফিরে পেলাম। দীর্ঘপথ সামনে পড়ে রয়েছে। পূর্ণ উদ্যমে আবার পথ চলা শুরু হল। পূর্বকথিত মাথায় পৌঁছতে কষ্ট হল বটে, কিন্তু পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে। তেরদিন আগে এখান থেকে ভুল পথে চলা শুরু হয়েছিল। এবার পশ্চিমের সুড়ঙ্গপথ ধরলাম আমরা। দ্রুত পায়ে শুধুই পথচলা।

www.pathagar.com

এই মুহূর্তে আমরা যে জিনিসটার অভাব বেশি করে অনুভব করছি সেটা হল জীবনদায়িনী অমৃত বারি। তেষ্টা মেটাবার জন্য এক ফোঁটা জল। পথের দুধারে আগের মতোই পাথরের বিচিত্র সমারোহ। কঠিন পাথরে জল কী করে আসবে?

নতুন সুড়ঙ্গটায় দুই তিনদিন কেটে গেল। আগের মতোই আবার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসল। একদিন ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়লাম আমি। সেদিন তাঁর সঙ্গে জল ছিল, আজ কিছুই নেই।

কাকা আমার মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'বড় ভুল করে ফেলেছি। নিজে তো মরলামই, লিডেন বংশের শিবরাত্রির পলতে তোকেও মারলাম।'

এক-একবার উঠে বসার চেষ্টা করলাম, পারলাম না, নেতিয়ে পড়লাম পর-মুহূর্তেই। পাথরে মাথা দিয়ে শুয়ে রয়েছি, চোখ বন্ধ করে হঠাৎ চমকে উঠলাম। ডান কানটাকে জোরে পাথরের ওপর ঠেসে ধরলাম। কী যেন একটা অবিশ্বাস্য শব্দ কানে এল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে লক্ষ করে শব্দটা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলাম। কুলকুল করে তরল পদার্থের ধারা বয়ে চলেছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, জল! জলনা হলে কুল কুল শব্দ কেন?

কাকাকে বললাম ব্যাপারটা। কান পাতলেন। আশায় তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কাকার ধারণা মিথ্যে নয়। লাভা অঞ্চল পার হলেই, জল পাওয়া যাবে, আগেই বলেছিলেন।

রইলই বা জল, আমরা পাব কী করে? বেশ পুরু একটা গ্রানাইট পাথর তাকে যে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এখন উপায়? হ্যানস ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। জল আছে, বুঝতে যখন পারল তখনই বড় পুঁটুলিটা খুলে মুহূর্তের মধ্যে শাবলটা বের করে ফেলল। চলল গ্রানাইট পাথরের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রাম।

আমি প্রথমটায় তাকে পাগলের কাণ্ড বলেই উড়িয়ে দিলাম। একে তো গ্রানাইট লোহার মতো শক্ত, তার ওপর স্তরটা কতখানি পুরু তাই বা কে জানে?

কাকা আশ্বাস দিলেন, গ্রানাইটের স্তরটা খুব পুরু হলে এখন শব্দটা এত স্পষ্ট শোনা যেত না।'

অমিত শক্তির আধার আইসল্যান্ডের কঠোর পরিশ্রমী জোয়ান হ্যানসের শাবলের কাছে গ্রানাইটও হার মানল! পাথর ফুটো হলে জল বেরিয়ে এল। আমি মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে গলা পর্যন্ত জল ভরে নিলাম।

হ্যানসের প্রশংসা করতেই হয়। সত্যিই পথপ্রদর্শক হবার যোগ্য বটে সে। জলধারাটার নাম হ্যানসব্যাশ। স্থানীয় ভাষায় 'ব্যাশ' শব্দটির অর্থ ছোট নদী। সারা সুড়ঙ্গ জুড়ে দুই ফুট গভীর হ্যানসব্যাশের ধারা বইতে লাগল। জলটা গরম। কাছে কোনো আগ্নেয়গিরি আছে নিশ্চয়ই! শরীরের পক্ষে উপকারী সন্দেহ নেই, সুস্বাদ নাই-বা হল। জলধারাটা আমাদের গতিপথেই এগিয়ে গেল। ভালোই হল। একবার যে জীবনদায়িনীর দেখা পেয়েছি, তাকে ছাড়ছি না।

হ্যানসব্যাশই এখন আমাদের পথের দিশারী। তার পথ ধরেই এগিয়ে যাব, বরাতে যা থাকে।

সে আমাদের নিয়ে এখন একটা অপ্রত্যাশিত জায়গায় গেল যা আমার অধ্যাপক ও ভূতত্ত্ববিদ কাকাও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন—এর অস্তিত্ব ভূত্বকের দশ হাজার ফুট

www.pathagar.com

তলায় সম্ভব। এর আগে কেউ তাঁকে এ কথা বললে মাথা খারাপ বলে তাড়িয়ে দিতেন। হ্যানসব্যাশকে অনুসরণ করে আমরা যেখানে পৌঁছলাম সেটা একটা সমুদ্র। আঁতকে ওঠার মতো কথাই বটে। হ্যাঁ, সমুদ্রই বটে। সামনে অনন্ত জলরাশি। হ্যানসব্যাম-এর মতো আরো অনেক জলধারা উন্মাদের মতো ছুটে এসে এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারও কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। কোন অদৃশ্য পথ ধরে আলো এসে পুরো জায়গাটা আলোকিত করে দিচ্ছে। আমার অধ্যাপক কাকা বলে উঠলেন, 'নিশ্চয় বৈদ্যুতিক আলো। সে-বিদ্যুতের উৎপত্তি দেখতে হবে খুঁজে।'

কিন্তু এই আলোর উৎস সন্ধানে যাওয়া তার এই মুহূর্তে ইচ্ছা নেই। তবে এটাই প্রথম ও প্রধান কাজ? হ্যাঁ, কাজ শুরু হয়ে গেছে। তাঁর নির্দেশে হ্যানস সে-কাজ শুরু করে দিয়েছে। কুড়োল দিয়ে অনবরত আঘাত হানতে লাগল। তবে এবার আর গ্রানাইট পাথরের ওপর নয়। শিলায় পরিণত হয়ে যাওয়া প্রাগৈতিহাসিক গাছের ওপর।

অমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে কিছু দূরে একটা অরণ্যমতো মনে হল যেন। অরণ্য? হতেও পারে। সমুদ্র থাকলে অরণ্য থাকার বাধা কোথায়? কাকা পায়ে পায়ে এগোতে লাগলেন। আমিও কিছু নিলাম। গাছ,—শিলীভূত গাছ। অমিত শক্তির আধার হ্যানস ধারালো কুড়োল দিয়ে কয়েক মিনিটেই এক একটা গাছ কাত করে দিচ্ছে।

আমি ব্যাপার দেখে কাকার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকালাম। সঙ্কোচ ত্যাগ করে বলেই ফেললাম, 'কী ব্যাপার কাকা, জাহাজ তৈরি করবে নাকি?'

কাকা হেসে বললেন—'জাহাজ নয়। জাহাজ তৈরির উপায় তো নেই।' হ্যানস বলল, 'একটা নৌকা তৈরি করবে। আসলে যা হবে তা হচ্ছে, ভেলা।'

'সে কী! ভেলা দিয়ে সমুদ্রটা পাড়ি দেবার চিন্তা করছ নাকি?' আমি বললাম।

'দূর পাগল কোথাকার! সমুদ্র কে বলল? এটা তো একটা খাড়ি। বেশি হলেও আমাদের ইংলিশ চ্যানেলের দ্বিগুণ হবে। বড় জোর চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল বিস্তার। শোন বলছি, হিসেব করে দেখেছি, আমরা আজ পর্যন্ত দশ হাজার ফুট মতো নিচে নেমেছি। আর দূরত্ব হিসেব করলে, সাত-আট শো মাইল। এখানকার ওপরে থেকে হিসেব করলে আমরা ফ্রান্সের মাঝামাঝি রয়েছি। মাইল পঞ্চাশেক পরে ভূমধ্যসাগর।

সেখানে—সেই পাতাল সাগরের সৌন্দর্যে নেমেই আমরা দুটো দিন কাটিয়ে দিলাম। আর হ্যানস নৌকা তৈরি কাজে ব্যস্ত!'

হ্যানসের নৌকা তৈরির কাজ শেষ হল। শিলীভূত গাছের অনেক গুণ, জলে ভাসবে, গলবে না। আগুনের সাধ্য কি স্পর্শ করে।

উপায় নেই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নৌকায় উঠতেই হল। কাকার হাতের কাছেই রয়েছে থার্মোমিটার, মনোমিটার আর ব্যারোমিটার ও কম্পাস প্রভৃতি। একটুকরো কাগজে কিছু সংখ্যা লিখে কী যেন করছেন। হিসেব টিসেব হবে হয়ত।

হ্যানস ইস্পাতের তার দিয়ে বড়শি তৈরি করল। তার বিশ্বাস, জল থাকলে মাছ থাকবেই।

হ্যাঁ, কাজ হয়েছে, বড়শিতে মাছ গেঁথেছে হ্যানস। অনেকটা স্টার্জিয়ন-এর মত। কিন্তু তফাত আছে স্টার্জিয়নের মাথা একদম গোল ও চ্যাপ্টা হয় না! কাকা পরীক্ষা

www.pathagar.com

নিরীক্ষার পর মন্তব্য করলেন, 'এ জাতের মাছ পৃথিবীতে এখন আর নেই। তবে শিলীভূত কয়েকটা মাছ পাওয়া গেছে, এইমাত্র।'

কাকার নির্দেশে হ্যানস মাছধরা ফেলে সমুদ্রের গভীরতা মাপতে ব্যস্ত হল। ৪০০ ফুট লম্বা দড়ি অনেকগুলোই সঙ্গে রয়েছে। মাথায় মাবল বেঁধে ছেড়ে দিলে কোথাও না কোথাও গিয়ে থামবেই! যত বেশি বা কম গভীরতাই হোক, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা বিশেষ একটা অঙ্গ।

এ ব্যাপারে আমার উৎসাহ কমই ছিল। কিন্তু চতুর্থ দিনে শাবলটা জল থেকে তুলতেই আমার সেই ভাঁটাপড়া উৎসাহটা হঠাৎ বেড়ে গেল। থার্মোমিটারের পারা ১০০ ডিগ্রিতে ছিল, ২০০ ডিগ্রি উঠে গেল। লোহার মোটা শাবলটা বেঁকে দুমড়ে গেছে দেখলাম।

আমি বিস্ময়ভরা চোখে দোমড়ানো শাবলটার দিকে তাকিয়ে ভাবছি, এ কার ক্ষমতা? লোহার শাবলটাকেও দুমড়ে দিয়েছে।

কাকা শাবলটা নিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাতে ফেরাতে একসময় চমকে গিয়ে বললেন, 'কাণ্ড দেখেছ। শাবলের গায়ে এই যে গর্তগুলো দেখছ, কিসের বলত? দাঁতের দাগ।' খুবই নীচুগলায় কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

আমি চোখের মণি দুটো কপালে তুলে বললাম, 'দাঁত? কার দাঁত? কার বলুন তো? বর্তমান পৃথিবীতে এমন কোনো জীব আছে বলে তো আমার অন্তত মনে হয় না!'

'আসল জায়গায়ই তো ভুল করছ বাছা। আমরা এই মুহূর্তে যেখানে বাস করছি, আমাদের পরিচিত পৃথিবীর বাইরে এটা। আর এটাই তিন লক্ষ বছর আগেকার পৃথিবী। ভূত্বকের ওপরের অংশে যা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, প্রাগৈতিহাসিক জন্তুজানোয়ার নিয়ে আরো একটা পৃথিবীর অস্তিত্ব রয়েছে।'

আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল, দাঁতের মালিক সেই বিশালায়তন জন্তুটা যদি চোখের সামনে ভেসে ওঠে? আমাদের এই ছোট ডিঙিটার কী গতি হবে? আর আমরা? আর ভাবতে পারলাম না। গায়ে কাঁটা দিল।

আমি হতাশ চোখে ডিঙির কোণায় পড়ে থাকা অস্ত্রগুলোর দিকে তাকালাম। ওই দাঁতগুলোর মালিক, অমিত শক্তির আঁধার বিশালায়তন জানোয়ারটার চামড়া ঘায়েল করবে কি না, ভাবতে বসলাম!

আমরা পাহারার ব্যবস্থা করলাম। দেখে শুনে যা মনে হচ্ছে, এই সমুদ্র নিরাপদ নয় বলেই বিশ্বাস। দাঁতগুলোর মালিক কখনও, কী রূপ নিয়ে হাজির হবে, কে জানে?

আজ আমার পাহারার পালা। চারদিকে সজাগদৃষ্টি রেখে হাল ধরে থাকতে হবে। আচমকা ডিঙিটা মারাত্মকরকম কেঁপে উঠল! কেঁপে নয়, দুলে উঠল। আশ্চর্য ব্যাপার! কিছুই ত চোখে পড়ল না। কিন্তু আমার যে স্পষ্ট মনে হল, কে যেন তলা থেকে সজোরে ঠেলে দিল। চোখের পলকে অন্তত ১০০ ফুট দূরে নৌকাসহ আমাদের ছুড়ে দিল।

কাকার ঘুম ভেঙে গেল। হ্যানসও উঠে বসল। সে জলরাশির ওপর একবারটি চোখ বুলিয়েই আঙুল উঁচিয়ে প্রায় হাজার ফুট দূরের কী যেন দেখালাম, বিশালদেহধারী কী যেন একটা লাফিয়ে শূন্যে উঠছে। কখনও বা জলের নিচে চলে যাচ্ছে। আমি আপন মনে বলে উঠলাম, 'শুশুক নাকি? বিশালায়তন—'

www.pathagar.com

কাকা আমাকে সমর্থ করলেন, 'হ্যাঁ, শুশুকই বটে। কিন্তু তারা তো এমন হিংস্র নয়! এদের মধ্যে বিশালায়তন সরীসৃপের আচরণ লক্ষ করছি।'

তার পিছনে ওটা কী? অতিকায় কুমীর? বাব্বা! চোয়ালটা কত বড়? নৌকাটাকেই যেন গিলে ফেলতে পারবে। দাঁতগুলোও পিলে চমকে দেয়। আমাদের যতদূতটা ডুব দিল। কাকা জলের ওপর চোখ রেখেই আবার বললেন, 'ওই—ওই যে তিমি। কত বড় বড় পাখনা, এক একটা জাহাজের পালের মতো। মুখ দিয়ে কী পরিমাণ জল ছাড়ছে দেখ।'

দুটো জলস্তম্ভ সবেগে ওপরে উঠে আবার দুম করে ভেঙে পড়ছে। এ কোন দানবের দরবারে এলাম রে বাবা! সর্বশক্তি প্রয়োগের দরকার পড়বে না, আমাদের নৌকাটা গুঁড়িয়ে দিতে একটা দাঁতই যথেষ্ট। হ্যানসের ইচ্ছা, নৌকাটাকে এই যমপুরী থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। হ্যানস নৌকার মুখ ঘোরাতে গিয়েও আবার হঠাৎ থেমে গেল। পালিয়ে যাবে কোথায়? পিছনেও শত্রুপক্ষের শিবির। বিশাল একটা কচ্ছপ, চল্লিশ ফুটের কম হবে না। পঞ্চাশ ফুট একটা সাপকে তাড়া করে আমাদের দিকেই এগোচ্ছে। চারদিকে শত্রু, পালাবার চেষ্টা বৃথা। আমাদের উপস্থিতিই হয়ত তাদের এই অভিযানের কারণ। আমাদের ডিঙিটাকে কেন্দ্র করে তারা বৃত্তাকারে চক্কর মারছে। বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়িয়েছি বটে, কিন্তু গুলি চালিয়ে হয়ত হতাশই হতে হবে! এত মোটা চামড়া ভেদ করে গুলি পৌঁছাতে পারবে না হয়ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড নজরে পড়ল। অতিকায় সাপ ও বিশালায়তন কচ্ছপটা ছাড়া সবাই জলের নিচে চলে গেল, কিছুটা স্বস্তি পেলাম। নিজেদের মধ্যেই তারা শক্তিপরীক্ষায় মেতেছে। আমাদের দিকে নজর দেয়ার সময় কোথায় তাদের?

কাকা চোখে দূরবীণ লাগিয়ে বসে। যুদ্ধোন্মত্ত জানোয়ার দুটোর ওপর নজর রাখছেন। একসময় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইখথিয়োসোরাস! পেলসিয়োসোরাস! পরস্পরের সঙ্গে সাপে নেউলে সম্পর্ক। কে বলবে পেলসিয়োসোরাস একটা সাপ? গায়ে তার বেশ পুরু ও শক্ত খোলা, কচ্ছপের যেমন থাকে। আর ইখথিয়োসোরাস দেখতে শুশুকের মতো। গলাটা তার সরীসৃপের মতো, কুমীরের মতো বড় বড় দাঁত। প্রাগৈতিহাসিক জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র।

কী মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে বিশালায়তন ও অদ্ভুতদর্শন জন্তু দুটো! পুরো দুই ঘন্টা ধরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে! আমি বন্দুকটা ধরেই রেখেছি। হঠাৎ জলের ওপর তুমুল একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে তারা কোথায় যেন অদৃশ হয়ে গেল। এবার হয়ত তারা জলের নিচেই লড়াই চালাবে। আচমকা জলের ওপর বিরাট একটা মাথা ভেসে উঠল। সেই পেলসিয়োসোরাসটার মাথা। তার চারদিকের জল লাল হয়ে গেছে। মারাত্মক রকম জখম হয়েছে। গলগল করে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। জলের ওপর ওঠার সময় খাড়াভাবেই সে উঠেছিল। এখন গলাটা এলিয়ে পড়েছে। উঠতে চেষ্টা করল, পারল না। কাত হয়ে পড়ে গেল। মৃত্যুযন্ত্রণায় দাপাচ্ছে। বারবার পাক খেয়ে কিছুটা উঠেই সে আবার পড়ে যাচ্ছে দেখলাম। একসময় যন্ত্রণার হাত থেকে চিরতরে রেহাই পেয়ে গেল জানোয়ারটা।

এবারের মতো বিপদ কাটল বটে। দমকা হাওয়ায় নৌকা ঘন্টায় ২০০ মাইল বেগে ছুটছে।

www.pathagar.com

দুপুরের দিকে আবার মনটা বিষিয়ে উঠল। একটা রহস্যজনক শব্দ কানে এল। কাকা বললেন, 'আমরা পাড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি। তীরের কাছে ছুটে গিয়ে ঢেউগুলো সশব্দে ভেঙে যাচ্ছে। নির্ঘাত সেই ঢেউ ভাঙার শব্দই এটা।'

আমি মনে মনে বললাম, 'তাহলে তো কোনো কথাই নেই।' হ্যানস অনুমানের ওপর নির্ভর করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার পাত্র নয়। সে দ্রুত ছোট্ট মাস্তুলটার ওপর উঠে ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করল। সমুদ্রের উপরিভাগে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না! তবে অবাঞ্ছিত শব্দটার উৎস কোথায়?

প্রায় তিন ঘণ্টা পরে শব্দটাকে জলপ্রপাতের শব্দ বলে মনে হল। আমার বিশ্বাস দৃঢ়তর হল! ভাবছি, সমুদ্রটাই গড়াতে গড়াতে গিয়ে হঠাৎ কোনো নিম্নতলে পড়ছে না ত? তাই যদি হয়, আমরাও নৌকোসহ গড়িয়ে গিয়ে পড়ব—উঃ! ভাবতে পারছি না, মাথা ঝিমঝিম করছে!

এইভাবে যদি পাতালে গিয়ে পড়তে পারি কাকা হয়তো খুশিই হবেন, তাঁর বাঞ্ছিত জায়গায় পৌঁছে গেছেন বলে।

শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। আমি ভীতসন্ত্রস্ত মনে ভাবছি, শব্দের উৎপত্তি আকাশে নয়, সমুদ্রে। তাই যদি হয় তবে চক্রবালরেখা? সেখানে তো বিন্দুমাত্র কুয়াশাও নেই। অতএব সমুদ্রটা নির্ঘাত কোনো নিম্নস্তরে লাফিয়ে পড়ছে। বিকেলের দিকে হ্যানস আবার মাস্তুলে উঠে চারদিকে দেখতে গিয়ে এক জায়গায় দৃষ্টি স্থির করল। কিন্তু কী দেখছে অমন করে? মুহূর্তের মধ্যে সে নেমে এসে দক্ষিণ দিকে তর্জনী নির্দেশ করল। নিঃশব্দে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল।

আমি চকিতে ঘাড় ঘুরালাম। দেখলাম—সাগরের বুক চিরে বিশাল একটা ফোয়ারা বহু ওপরে উঠে যাচ্ছে। কী ব্যাপার? আবার কি অতিকায় কোনো সামুদ্রিক জানোয়ারের আবির্ভাব ঘটল? আমি বিপদের আশঙ্কায় হ্যানসকে বললাম, নৌকোর মাথা ঘুরিয়ে দিক পরিবর্তন করতে।

কাকা বাগড়া বাঁধালেন, 'ভয়ে মোটেই আমাদের পথ পরিবর্তন করব না। যেদিকে যাচ্ছি, সেদিকেই চলো।'

আমাদের যাত্রাপথ অপরিবর্তিতই রইল। জন্তুটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা। অতিকায় দেহটা দেখতে কিম্ভূতকিমাকার। কালো তার গায়ে রঙ, পিঠে বিরাট কুঁজ তাকে আরো বিশ্রী করে তুলেছে। তবে কি এটা তিমিঙ্গিল? তিমিকে যারা গিলে খেতে পারে, তাদেরই তিমিঙ্গিল বলে। নিশ্চল-নিথরভাবে পড়ে রয়েছে। ঢেউগুলো তীব্র আক্রোশে তার গায়ে আছড়ে পড়ছে। তবুও তার ঘুম ভাঙছে না। শ্বাসপ্রশ্বাসের আকারে জলের ফোয়ারা সবেগে ৫০০ ফুট মতো ওপরে উঠে যাচ্ছে। তারই গায়ে আবার বৃষ্টির মতো মুষলধারে পড়ছে। তার দৈর্ঘ্য কিছু না হলেও ৫০০০ ফুট। তারই দিকে এগিয়ে যাওয়ায় ব্যাপারটাকে আমি নিছক পাগলের বলে মনে করলাম। ৫০০ তিমি যে গিলে খেতে পারে তার কাছে আমরা তিনজন তো এক টিপ নস্যের চেয়েও নগণ্য।

ধরেই নিয়েছি, বিক্ষোভ বিদ্রোহ ছাড়া কাকাকে সোজা করা যাবে না। আমি গর্জে উঠলাম, 'এটা কী করছেন, কাকা! শেষপর্যন্ত হাতে ধরে প্রাণটা দেবেন, নাকি?'

www.pathagar.com

কাকা তেমনি নির্বাক। অপলক চোখে জলজ জানোয়ারটার দিকে তাকিয়ে রইলেন! আরো কিছু সময় কাটিয়ে একসময় সোল্লাসে বলে উঠলেন, 'দ্বীপ! দ্বীপ! জন্তু-জানোর নয়, দ্বীপ!'

আমি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কিন্তু অতিকায় যমদূত? জলের ফোয়ারা? সবই কি ভুল।'

'হ্যাঁ। সম্পূর্ণ ভুল। আইসল্যান্ডের জেইসির নাম শোনো নি? পৃথিবী বিখ্যাত ফোয়ারা! এটাও সে-রকমই একটা ফোয়ারা। তবে এটা তার চেয়ে অনেক বড় সন্দেহ নেই।'

লুকানো আগ্নেয়গিরি থাকার জন্যই জল তীব্র বেগে এত ওপরে উঠতে পারছে। নিজের আগলে থেকে চাবিকাঠি নাড়াচ্ছে।

ফোয়ারাটার কাছে গিয়ে দেখার সাধ থাকলেও সাধ্য আমার অন্তত নেই। জলের ওপর যা তাণ্ডব চলছে, যে-কোনো সময় আমাদের ডিঙিটা উল্টে যেতে পারে।

দ্বীপের গায়ে নিয়ে গিয়ে হ্যানস ডিঙিটা দাঁড় করাল। জলে ঘুরে ঘুরে আমাদের ডাঙার মোহ পেয়ে বসল। আমি লাফিয়ে দ্বীপে নামলাম। মাটিতে পা দিয়ে চমকে গেলাম, এ কী ব্যাপার! গ্রানাইট পাথর, অথচ পাকা আমের মতো তুলতুলে নরম! লাভাস্তর। আগুনের মতো না হলেও খুবই গরম। কাকাকে পূর্ব মন্তব্য স্মরণ করতে গিয়ে বললাম, 'কী কাকা, ভূকেন্দ্রে তরল আগুনের অস্তিত্ব নেই, বলছিলেন যে? ভূকেন্দ্রে পা দেবার আগেই যতি এত আগুন, জায়গামতো কী হতে পারে, বোঝাই যাচ্ছে।'

কাকা নির্বাক।

নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই। আবার ডিঙি ছাড়লাম। হিসেব নিয়ে বসলাম। সমুদ্রের ওপর দিয়েই ৮০০ মাইল পাড়ি দিয়েছি। আইসল্যান্ড থেকে ২০০০ মাইলের কম নয়। এও সিদ্ধান্ত নেয়া যায়, এই মুহূর্তে আমাদের মাথায় ওপর রয়েছে ইংল্যান্ড।

কাকা নির্বাক। চোখের তারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। তবে ভয়ে মুষড়ে পড়ার অবস্থা এ নয়, এটা ঠিকই। কিন্তু এই দুশ্চিন্তার কারণ কী? বাতাসে ঝড়ের পূর্বাভাস সুনিশ্চিত। আমাদের পরিচিত মেঘের মতো এখানকার মেঘ কালো নয়, জলপাই-এর রঙ।

মাস্তুলে পাল টাঙানো রয়েছে সত্য। বাতাস থাকলে বড়ই উপকারে আসে। কিন্তু ঝড়ের সময় নৌকোকে মারাত্মক বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। আমি ধমকের সুরে হ্যানসকে বললাম, 'করছ কী! তাড়াতাড়ি পাল নামাও। সম্ভব হলে মাস্তুলটাও।'

কাকা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না? ঝড় উঠুক! ঝড় তুফানে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে তীরে আছড়ে ফেলুক। অপয়া সমুদ্রটাই আমার সব পরিকল্পনার বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মুহূর্তে একমাত্র চিন্তা, যে-কোন অবস্থায় সমুদ্রটা পার হওয়া। পরিণাম পরে ভাবা যাবে।'

আমার হিসাবটিসাব শিকেয় উঠল। চোখের পলকে প্রলয়ঙ্কর ঝড় উঠল। সে কী গর্জন! বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা রীতিমতো দাপাদাপি শুরু করে দিল।

মাস্তুলটা অনবরত দোল খাচ্ছে। কোনোকরমে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে এখনও। আর পালটা? হাওয়া ভরা বেলুনের মতো ফুলে উঠেছে। ফাটে—ফাটে অবস্থা।

www.pathagar.com

আমি গলা ফাটিয়ে চেঁচাই, 'পাল নামাও! মাস্তুল খোলো!'

কাকা ততোধিক গলা চড়িয়ে বলেন, 'না। পাল নামাবে না!'

ডিঙিটা মোচার খোলার মতোই হাল্কাভাবে দোল খাচ্ছে! কাত হচ্ছে! যে-কোনো মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে।

কড়কড় শব্দে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সে সঙ্গে বৃষ্টির দাপাদাপি ত রয়েছেই। আমি মরিয়া হয়ে মাস্তুলটা জাপটে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আচমকা ভেঙে পড়লেই সর্বনাশের চূড়ান্ত করে ছাড়বে। ডিঙিটা কাঁপছে—দুলছে—কাত হচ্ছে।

নৌকোটা ঝড়ের দাপটে তীরবেগে ছুটে চলেছে। আমরা কোথায় চলেছি? কোথায়ই বা এর শেষ?

কাকা টানটান হয়ে গলুইয়ের ওপর শুয়ে পড়লেন। অসহ্য গরম! গায়ে ফোস্কা পড়ার উপক্রম।

থার্মোমিটারের দিকে তাকিয়ে আমার তো চক্ষুস্থির। পারা অবিশ্বাস্যরকম উঠে গেছে। এ কেমন হল রে বাবা!

আমিও কাকার মতোই হাল ছেড়ে দিলাম। খুবই হতাশ হয়ে পড়লাম। একমাত্র হ্যান্‌সই দৃঢ় রয়েছে। তাই ডিঙিটা তলিয়ে যায় নি এখনও।

দুপুরের দিকে ঝড় আরও রুদ্ররূপ ধারণ করল। তিনদিন আমাদের কথা বন্ধ। ইচ্ছে করে কথা বন্ধ করিনি। চেঁচিয়ে কথা বললেন শোনা যায় না। ঠোঁট নড়ে, শব্দ বেরোয় না। কাকা হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'এ যাত্রায় আর রেহাই নেই! দেখা যাক, শেষ, কোথায় এর?'

আমি আবারও পাল নামিয়ে নিতে অনুরোধ করলাম! কাকা এবারে কিন্তু মোটেই আপত্তি করলেন না। ঘাড় কাত করে সম্মতি দিলেন।

চেষ্টা করেও ফল হল না। মুহূর্তের মধ্যে একটা আগুনের গোলা হঠাৎ আমাদের নৌকোর ওপর এসে পড়ল। চোখের পলকে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল। মাস্তুলটা টুকরো টুকরো করে দিল। আর পাল? ছিঁড়ে ছিঁড়ে একাকার! আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম! আগুনের গোলাটার রঙ সত্যিই বিচিত্র। অর্ধেক সবুজ, বাকি অর্ধেক সাদা। আকারে দশ ইঞ্চি বোমা যেন একটা। নৌকার খোলের মধ্যে অনবরত চক্কর মারছে। আমি তো প্রমাদ গুণলাম, বারুদের বস্তার ওপর গেলেই কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত করে ছাড়বে। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমাদেরও শোলার মতো উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আতঙ্কে আমার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল। বাতাস ভারী। নাইট্রাস গ্যাসের ধর্মই এটা। শ্বাসনালি দিয়ে ফুসফুসে যাচ্ছে, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। নিজের পা, তাঁর ওপরও কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছি। টানার চেষ্টা করছি, কিছুতে পারছি না। কে যেন সজোরে টেনে রেখেছে পা দুটোকে।

একসময় সে আগুনের গোলাটা আপনা থেকেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। চোখে মুখে তার তাপ এসে ঝলসে দিল। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম। তবে আমি কতক্ষণ যে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলাম, বলতে পারব না। আমাদের ডিঙিটা সজোরে একটা ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়েছে। আমি অথৈ জলে ছিটকে পড়লাম। মুহূর্তেই হৃতজ্ঞান ফিরে পেলাম। হ্যানস ছিল বলে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনে হিচড়ে আমাকে ডিঙিতে উঠিয়ে নিল। ঢেউয়ের নাগালের বাইরে, বালির ওপর নিরাপদ স্থানে শুইয়ে দিল।

www.pathagar.com

এবার মালপত্র তুলে আনতে সে সমুদ্রে নামল। বার বার ডুবসাঁতার দিয়ে একে একে সবগুলো টেনে তুলতে লাগল।

একসময় বৃষ্টি নামল। ঝড়ের বেগ কমে গেল। আমি আর কাকা পাহাড়ের বিপরীত পীঠে আশ্রয় নিলাম।

আমি ডিঙিতে বসে ঝড়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত হিসাব করেছিলাম, আমরা স্নেফেলস থেকে রওনা দিয়ে আটলান্টিকের অংশবিশেষ, তারপর স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ইংলিশ চ্যানেল ও ফ্রান্স এসব জলভাগড় ও স্থলভাগের তলা দিয়ে ইতালির তলায় হাজির হয়েছি। ঝড়টা যদি আর সামান্য পুবদিকে ঠেলে নিয়ে যেত তবে দক্ষিণ ফ্রান্সের পরিবর্তে জার্মান এলাকার মাটির তলা দিয়ে ভেসে আসতে পারতাম। হায়রে অল্পের জন্য আমাদের বাঞ্ছিত স্থানের কানে পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছি।

আমি আপন মনে কত কি ভাবছি। কাকা আমার গাম্ভীর্যটুকু লক্ষ করে বললেন—'কি খোকা, ভাবছ কী?'

আচমকা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল 'কাকা, আমাদের বাড়ি ফেরার উপায় কী?'

কাকা ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে বললেন, 'সে কী হে! পৌঁছে নাও তো আগে, তারপর ফেরার চিন্তা।'

'চিন্তার ব্যাপার নয়। জানতে কৌতূহল হয়, তাই জিজ্ঞেস করলাম। আসলে উপায় কিছু মাথায় আসছে না।'

'আছে। একটা নয়, দুটো উপায়। প্রথমত নতুন কোনো রাস্তা আবিষ্কার করে ফেলতে পারি, দ্বিতীয়ত পথ তো জানাই আছে, যে পথে এসেছি! এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই তো।'

হ্যানস নৌকোটাকে সারাই বলতে লাগল। কাকা আমাকে বললেন, 'হ্যানস, নৌকো সারাই করতে করতে, চলো দেশটা একটু ঘুরে দেখে আসি।'

আমি কাকার প্রস্তাবে রাজি হলাম। ঘুরতে বেরোলাম, তবে আমি হাতে নয়, বন্দুক ও পিস্তল সঙ্গে নিয়ে নিলাম। কাকার ত ভয় ডর কিছুই নেই। এখানে ঘুরতে ঘুরতে একটা মজার ব্যাপার নজরে পড়ল, ছায়া বলে এখানে কিছু নেই। কারণ, যাকে আমরা আলো বলে দেখছি, নির্দিষ্ট কোনো উৎস তো তার নেই। কুয়াশা বা মেঘেরও অস্তিত্ব তো নেই এখানে। যে আলো আমাদের চোখে এসে পড়ছে তা সর্বত্র সমভাবে বিকীর্ণ।'

মাইলখানেক পথ পেরিয়ে আমরা এক জায়গায় পাইন, পাম, ইঙ, সাইপ্রেস প্রভৃতি গাছের সমারোহ দেখতে পেলাম। তবে ওপরের পৃথিবীর গাছের আকারের সঙ্গে এদের যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য রয়েছে। গাছগুলো কেমন যেন বেটে বেটে। সূর্যালোক থেকে যে রঙের উৎপত্তি হয়, এখানে তার অভাব। এখানকার গাছ-লতা-পাতা সবই কেমন যেন ধূসর রঙ বিশিষ্ট। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয়, পুরো বনটাই বুঝি শুকিয়ে গেছে।

একসময় আমাকে থমকে দাঁড়াতে হল। অনন্যোপায় হয়ে কাকার হাত ধরে নিঃশব্দে টেনে ধরলাম। একদল বিশালাকার স্থলজ জানোয়ারই আমার এই আকস্মিক আতঙ্কের কারণ। একদল হাতিকে দূর থেকে এগিয়ে যেতে দেখলাম। ওপরের পৃথিবীতে হাতী ত অনেকই দেখেছি। কিন্তু এরা যে আকারের, তা পৃথিবীর ওপরের হাতির চেয়ে অনেক গুণ বড়। ছোটখাটো একটা পাহাড়ের মতো বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না। আমাদের থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরের একটা প্রাণীল দিকে কাকা অঙ্গুলি নির্দেশ

www.pathagar.com

করলেন। সেদিকে তাকাতেই আমার চক্ষুস্থির। প্রাণীটা অতিকায় একটা মানুষের মতো দেখতে। মানুষের মতো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবই রয়েছে বটে। কিন্তু পৃথিবীর ওপরের মানুষের চেয়ে আকারে পাঁচ-ছয় গুণ ত হবেই। লম্বায় বার ফুটের চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়।

ভয়ে আমার হাত পা পেটের মধ্যে সিঁধিয়ে যাবার উপক্রম। সে আমাদের দেখে ফেললে নির্ঘাত তেড়ে আসবে। প্রাণভয়ে বন্দুক পিস্তল ব্যবহার করতেই হয়ত ভুলে যাব।

আমি পালিয়ে যাবার চিন্তা করলাম। কাকাও আপত্তি করলেন না। দৈত্যটার হাতে প্রাণ দিলে, বাঞ্ছিত কাজ হাসিল করবে কে এটাই হয়ত ভাবলেন।

মুহূর্তও দেরি না করে আমরা পিছন ফিরে ছুটতে শুরু করলাম। হাঁপিয়ে গেছি! কাকাও ক্লান্ত। সমুদ্রের কাছাকাছি নিরাপদ স্থানে বিশ্রামের জন্য দাঁড়ালাম। কাকা সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। আমি পায়চারি করতে করতে একজায়গায় থমকে দাঁড়ালাম। বড় একটা পাথরের গায়ে কী যেন গভীরভাবে খোদাই করে লেখা দেখলাম। সেটার দিকে কাকার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। রিউনিক ভাষায় দুটোমাত্র অক্ষর লেখা রয়েছে। 'এ, এস।' আর্নে স্যাকনুসেম নামের দুই অংশের আদ্যক্ষর, কী বলো?' কাকা আমাকে লক্ষ করে বললেন।

আমি মুচকি হেসে তাঁকে সমর্থন করলাম।

আমরা নিঃসন্দেহ হলাম, আর্নে স্যাকনুসেম তবে এ-পর্যন্ত এসেছিলেন। আর এটাও সত্য। এ-পর্যন্ত এসে অবশ্যই ফিরে যান নি। অতএব তার গতিপথের চিহ্ন ধারে কাছে কোথাও পাওয়া যাবে, সন্দেহ নেই। শুরু হল তল্লাশি পর্ব। অক্ষর দুটো যেখানে লেখা তারই পাশে একটা গুহামুখ পাওয়া গেল। এ গুহা দিয়ে কোথায় যাওয়া যাবে? ভূকেন্দ্রে কি? দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়লাম।

আমাদের শরীরে কেমন একটা উত্তেজনা ভর করছে। কাকার চোখে মুখে যুদ্ধজয়ের হাসি—'আমরা তো ভূকেন্দ্রের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি!'

গুহার ভিতরটা প্রায় অন্ধকার। খুবই হাল্কা আলো। কোনরকমে পা টিপে টিপে চলা যায়। দশ ফুটের কাছাকাছি যেতেই থমকে দাঁড়াতে হল। গুহাতল থেকে ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে একটা পাষাণ প্রাচীর। মহা সমস্যায় পড়লাম। ভাবলাম, স্যাকনুসেম এ পথে এলে এই প্রাচীর টপকালেন কী করে? তবে কি স্যাকনুসেম ফিরে যাবার পর পাহাড়ের ধ্বস নামার ফলে পাথরটা এসে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে? প্রাচীর ভাঙতে হবে।

হ্যানস কী বলে, জানা দরকার। আমরা ক্ষিপ্র পায়ে তার কাছে গিয়ে পৌছলাম। নৌকো মেরামত সেরে সে আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে, দেখলাম। মালপত্র নৌকোয় তুলে আমরা আধঘণ্টার মধ্যেই সেই জায়গাটায় নৌকো ভেড়ালাম, যেখানে পাথরের গায়ে আর্নে স্যাকনুসেমের স্বাক্ষরযুক্ত পাথরটা দেখে গিয়েছিলাম। আমাদের পথনির্দেশ দেয়ার জন্য সে কতগুলো বছর আমাদেরই প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে, কে জানে। কঠিন কঠোর সেই বাধার প্রাচীরটা হ্যানসকে দেখালাম। সে পাথরটার গায়ে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল, কিছু শোনা যায় কিনা? না, কোনো শব্দই কানে এল না।

প্রাচীর ভাঙতেই হবে। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে হ্যানস কুড়োল দিয়ে একের পর এক আঘাত হানতে লাগল। তার পেশীবহুল হাত দুটো হাতির বল ধরে। কিন্তু হায়! গ্রানাইটের গা থেকে একটা টুকরাও খসাতে পারল না সে। সেই মুহূর্তে ভূকেন্দ্রে নামার

www.pathagar.com

তিলমাত্র উৎসাহও আমার মনে জাগাতে পারল না। এখন ভাবছি, স্যাকনুসেমের স্বাক্ষরটা না দেখলেই বরং ভালো ছিল। অনুতাপের সময় এটা নয়। কাকা আমার মতো উদ্যম হারালেন না। পাথরটাকে বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত হলেন। আমি আমচকা বলে উঠলাম—'কুড়োল-শাবলে যখন হলই না, এক কাজ করলে কেমন হয়? বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া যাক।' আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই কাকা সোল্লাসে এক লাফ দিয়ে বললেন, 'বাঃ! চমৎকার বুদ্ধি তো! সত্যি চমৎকার বলেছ!'

কাকার নির্দেশে হ্যানস আর আমি শাবল দিয়ে প্রাচীরটার তলায় খোঁড়ার কাজে লেগে গেলাম। কপালগুণে এখানকার পাথর বেশ নরম দেখলাম। বালি ও কাঁকর মেশানো। আমাদের সেই ভাবনাটাই হয়ত ঠিক। স্যাকনুসেম যখন এসেছিলেন তখন পাথরটা এখানে ছিল না। পরে যে-কোনো প্রাকৃতিক কারণে এটা হড়কে এসে পথরোধ করেছে। আমাদের উভয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ শেষ হল। এবার পেট্রোলে সলতে ভিজিয়ে বসিয়ে দেয়া হল। সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে বারুদ ঠেসে দেয়া হল। কাকার ইচ্ছে, নিজে হাতে পলতেটাতে আগুন দেবেন। আমি কিন্তু দাবি ছাড়লাম না। পরিকল্পনাটা আমার, সুড়ঙ্গও আমি খুঁড়েছি। বাকি কাজটুকু অন্য কাউকেই করতে দিতে আমি রাজি হলাম না।

আমি মৃত্যুর জন্য তৈরি হচ্ছি। সলতেটাতে আগুন দেয়ার সময় যতই সতর্ক হই না কেন, বিস্ফোরণের সময় দুর্ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ! যদিও পলতেটার একটা প্রান্ত বারুদের গাদায় ঠেসে দিয়ে অন্য প্রান্তটা সমুদ্রতীরে অন্তত একশো ফুট দূরে। শলতে বেয়ে বারুদ পর্যন্ত আগুন যেতে দশ মিনিট সময় ত লাগবেই। ইতোমধ্যে আমরা তিনটে দাঁড় টেনে সমুদ্রতীরে থেকে অনেকটা দূরে পৌঁছাতে পারব।

সলতেটার প্রান্তে অগ্নিসংযোগ করেই আমি এক লাফে নৌকোয় গিয়ে উঠে গেলাম। হ্যানস ও কাকা দাঁড় ধরে বসেই ছিলেন। কাকা দাঁড় টানছেন বটে, চোখ কিন্তু তার ব্যারোমিটারের ওপর। প্রতিটা সেকেন্ড ও মিনিটের ওপর কড়া নজর রাখছেন।

আমরা অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনছি। আশ্চর্য! বিস্ফোরণের শব্দ কানে গেল না মোটেই। দেখলাম, চোখ ছানাবড়া হবার উপক্রম। মুহূর্তে পাহাড়টার চেহারাটাই গেল বদলে! দুটো পাশে ফাঁটল দেখা দিল। শোলার মত একটা অংশ ওপরে উঠে গেল। পর মুহূর্তেই আবার বিটক আওয়াজ করে নিচে পড়ে গেল। ফাটলের জায়গায় প্রশস্ত একটা রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। আর সমুদ্র ভীষণ ক্ষেপে গেল? আকাশছোঁয়া ঢেউ, পিলে চমকানো তর্জন গর্জন। মুহূর্তে আমাদের ডিঙিটাকে তালগাছ সমান উঁচুতে তুলে নিল। পর মুহূর্তেই মনে হল সেটা যেন সোজা পাতালের দিকে নেমে যাচ্ছে। বিস্ফোরণের ফলে প্রশস্ত একটা প্রণালী তৈরি হয়ে গেল। সেই বাধার প্রাচীরটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে জলের সঙ্গে ভেসে যেতে লাগল। আমাদের ডিঙিটাও জলের টানে দ্রুত গতিতে ছুটে চলল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, স্যাকনুসেম এপথেই পাতাল নেমেছিলেন। তিনি কিন্তু একাই নেমেছিলেন। আর আমরা! পুরো সমুদ্রটাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটেছি উল্কার বেগে। আমাদের খাবার দাবার, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও লোটাকম্বল সব জলের টানে কোথায় তলিয়ে আছে, কে জানে? এই মুহূর্তে সেগুলো তো আমাদের কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন। মৃত্যু যাদের শিয়রে তাদের তো কোন কিছুই দরকার থাকার কথা নয়।

www.pathagar.com

কিন্তু এ কেমন হল? আমাদের নিম্নগতি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল যে! ডিঙিটা যে নিশ্চল নিথরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে! মনে কত প্রশ্নই জাগল—এই কি সেই ভূকেন্দ্র? এতকাল কি শুকনো খটখটে ছিল? আমাদের বোকামির ফলেই কি এখানে জলরাশি সঞ্চিত হয়েছে!

কাকাকে প্রশ্ন করতে যাব, অমনি অবিশ্বাস্য কাণ্ড শুরু হয়ে গেল আমাদের ডিঙির তলা। সেখানকার জল টগবগ করে ফুটতে লাগল। উত্তপ্ত জল সোজা উপরে উঠে আমাদের ডিঙিটাকে আঘাত করতে লাগল। দু-চারটে পাথরও নৌকোর তলায় ঘা মারছে মনে হল। আমি বিড় বিড় করে বললাম, 'ভূমিকম্প শুরু হ'ল নাকি!'

কাকা কথাটা ঠিকই লক্ষ করেছেন। তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আরে ভূমিকম্প বলছ কি! নিশ্চয়ই এটা কোন সক্রিয় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতেরই ফল। বড়ই আপশোস রয়ে গেল এ্যাক্সেল, ভূকেন্দ্রের এত কাছে পৌঁছে ও তাকে স্পর্শ করার সৌভাগ্য তেকে বঞ্চিত হলাম! আচমকা জলের স্পর্শ পেয়ে আগ্নেয়গিরিটা গলিত লাভা উদগীরণ করতে শুরু করেছে! জল আগুনের মতো গরম, বাতাসও গরম। গায়ে ফোস্কা পড়ার উপক্রম। তিন দিন তিন রাত্রি আগুনের কুণ্ডে দগ্ধ হয়ে একসময় নৌকাসহ আমাদের উড়িয়ে নিয়ে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এক টিলার ওপর ফেলল। একসময় সংজ্ঞা ফিরে পেলাম। গিরিশৃঙ্গের প্রায় মাঝামাঝি গড়াতে গড়াতে এলাম। এক মেষপালককে জিজ্ঞেস করে জানলাম, আগ্নেয়গিরিটার নাম স্ট্রম্বোলি।

---

www.pathagar.com

দ্য লাইট হাউস এ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড

উত্তাল উদ্দাম ইগোর উপসাগর। উপসাগরের বুকে একটি বিশালায়তন জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে। জাহাজের নাম 'সাঁতা-ফি'।

জাহাজের ডেকে কয়েকজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে কী করছে লোকগুলো? ব্যাপার কিছু অনুমান করার আগেই পর পর তিন বার কামান গর্জন করে উঠল। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যেই মাস্তুলের ডগায় উঠে গেল আমেরিকান রি-পাবলিকের জাতীয় পতাকা।

জাহাজ থেকে কামানের তীব্র গর্জন বাতাসে ছড়িয়ে যেতেই বাতিঘরের বন্দুক গর্জে উঠল। দুজন আলোকরক্ষী অত্যুজ্জ্বল আলো হাতে সমুদ্র সৈকতে এসে দাঁড়াল। অভিনন্দন জানাল তাদের হাত উঁচিয়ে।

আবার দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল স্টটেন আইল্যান্ড দ্বীপের বুকে। তিনজন আলোকরক্ষীই দ্বীপে ছিল। একজনের ওপর বাতিঘর আগলানোর দায়িত্ব। অন্য দুজন উজ্জ্বল আলো হাতে সমুদ্রসৈকত ধরে পায়চারি করছে। তাদের মধ্যে একজনের নাম ভ্যাসকুয়েজ, অন্যজন ফিলিপ।

ভ্যাসকুয়েজকে লক্ষ করে ফিলিপ বলল, 'আগামীকাল সাঁতা-ফি নোঙর তুলছে।'

ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'আমি। আমার বিশ্বাস সাঁতা-ফি নিরাপদেই দেশে ফিরে যাবে। তুমি কি বলো, ফিলিপ?'

আসলে এটা আমাদের ধারণা। মানুষ যা খুশি ভাবতে পারে, ফলাফল অনিশ্চিতই থেকে যায়। সমুদ্রের এ-অঞ্চলে এমন কোনো নিরাপদ আশ্রয় নেই যেখানে ঝড়ের মুখে পড়ে বিপদগ্রস্ত জাহাজ আত্মরক্ষা করতে পারে! নাবিকরা এ-অঞ্চলের প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের কথা ভালোই জানে। তা ছাড়া হর্ন অন্তরীপের আত্মগোপনকারী পাথরের প্রাচীরের কথাই বা কার না জানা আছে? অসতর্ক মুহূর্তে ধাক্কা লেগে অনেক জাহাজই তো সাগরের বুকে আশ্রয় নিয়েছে, টুকরো টুকরো হয়ে সাগরের তলদেশে জমা হয়েছে। তবে সে-সব দিন আজ আর নেই। স্টটেন আইল্যান্ডে এখন বাতিঘর বসানো হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা। ঘূর্ণিঝড় যত প্রবল রূপ নিয়েই দেখা দিক না কেন, আলো নেভার সম্ভাবনা নেই। জাহাজগুলোকে আলো দেখিয়ে সেন্ট-দীগম অন্তরীপ, সেন্ট-জি অন্তরীপ, বাফ্যালোস অন্তরীপের মতো মরণফাঁদের হাত থেকে জাহাজগুলোকে আজ বাঁচাতে পারবে।

ফিলিপ যখন প্রথম এই দ্বীপে চাকরি নিয়ে এল, জনমানবশূন্য এই দ্বীপে দিন কাটাতে হবে জেনে রীতিমতো ভেঙে পড়েছিল। বিবর্ণ মুখে সবসময় গুম হয়ে বসে থাকত। পরে অবশ্য বাকি দুজন সঙ্গী আসায় হতাশা ভাবটা অনেকাংশে লাঘব হয়েছে।

'বলছি শোনো, চল্লিশটা বছর তো জাহাজের বিভিন্ন কাজে জলের ওপরই কাটিয়ে দিয়েছি। আজ বয়স হয়েছে, বুড়োর পর্যায়ে পড়েছি। অবসর নেয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। লাইট হাউসের রক্ষীর কাজ ছাড়া কী-ইবা করার আছে, বলো তো ফিলিপ?

www.pathagar.com

আর যে সে বাতিঘর তো নয়, পৃথিবীর একেবারে শেষ সীমানার 'বাতিঘর'। বুড়ো ভ্যাসকুয়েজ সহকর্মী যুবক ফিলিপকে উৎসাহ দিতে গিয়ে কথাগুলো বলল। আটলান্টিক মহাসাগরের জোয়ারের খ্যাতির কথা যে-কোন দেশের নাবিকমাত্রের জানা আছে। কী তার উন্মাদনা! কী তার গগনবিদারী গর্জন! জলের গতিবেগও নাবিকদের মনে ভীতির সঞ্চার করে সন্দেহ নেই।

১৬০ অশ্বশক্তিতে বলীয়ান আর্জেন্টিনা নৌবাহিনীর জাহাজ সাঁতা-ফি। ২০০ টন মাল অনায়াসে বহন করতে পারে জাহাজটি। ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ এবং ফেলটান্যান্ট রিগাল তো সর্বময় কর্তৃত্বে রয়েছেনই। পঞ্চাশজন নাবিকও জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত। লেময়র প্রণালীর প্রবেশমুখে নির্মীয়মাণ বাতিঘরের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি সরবরাহের জন্য এই জাহাজের ওপর আর্জেন্টিনা সরকার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাই তাকে বারবার স্টটেন আইল্যান্ডে যাতায়াত করতে হয়েছিল। বাতিঘর তৈরির কাজ ভালোভাবেই শেষ হল। প্রায় সপ্তাহ তিনেক আগে সাঁতা-ফি এ-দ্বীপে নোঙর করেছে। বাতিঘরের তিনজন কর্মীর চার মাসের উপযোগী যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করে এবার বিদায় নেয়ার জন্য প্রস্তুত।

পৃথিবীর শেষসীমানার বাতিঘরটার এখন দায়িত্বে রয়েছে মরিস, ফিলিপ ও ভ্যাসকুয়েজ। ৩ ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি—তিন মাস বাতিঘরটার দায়িত্বে থাকবে। মার্চের শুরুতেই নতুন আলোকরক্ষী কাজে বহাল হবে।

মিনারের নিচেই আলোকস্তম্ভের দরজায় উঠে যাওয়া যায়। অপ্রশস্ত একটা সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে গেছে। সিঁড়িপথ অন্ধকার নয়। গোটা দশেক লুপহোল দিয়ে সূর্যের আলো এসে তাকে মোটামুটি আলোকিত করে। দেয়ালসংলগ্ন গ্যালারি। এতে বসে চারদিকের সমুদ্র দেখতে অসুবিধা হয় না। আলোকরক্ষীরা এখানে বসেই কর্তব্য সম্পাদন করে থাকে।

পরদিন বিকেলে জাহাজ ছাড়বে। সকাল থেকেই নাবিকরা তৎপর হয়ে উঠল। গতরাত্রে 'সাঁতা-ফি'র ডেক থেকে কামান দাগার সঙ্গে সঙ্গেই বাতিঘরের আলোটা প্রথম জ্বলেছিল। বাতিরক্ষক ভ্যাসকুয়েজ ক্যাপ্টেন লাফায়েৎকে আশ্বস্ত করল, 'হুজুর বাতিটা ভালোভাবেই কাজ করছে, চিন্তা করবেন না।'

নির্জন-নিরালা দ্বীপে তিনজন বাতিরক্ষককে দিন কাটাতে হয়। কাজটা কিন্তু খুব সোজা নয়। তবে আলোকরক্ষীদের মধ্যে প্রত্যেকেই সমুদ্র সম্বন্ধে খুবই অভিজ্ঞ। একদিক থেকে বিচার করলে জাহাজে গাধার খাটুনির তুলনায় কায়িক পরিশ্রম কম, স্বীকার করতেই হবে। তিনটা মাস টানা বিশ্রাম, এই আর কি।

আলোকরক্ষক তিনজন বিকেলের দিকে সমুদ্র-সৈকতে গিয়ে দাঁড়াল। একটু পরেই সাঁতা-ফি নোঙর তুলবে।

এক সময় সাঁতা-ফি'র বয়লার গর্জে উঠল। ঘড়িতে তখন বিকেল পাঁচটা। লম্বা চোঙ দিয়ে কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। সিটির আওয়াজ বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে বহু দূরে ছড়িয়ে পড়ল। জোয়ার এলে নাবিকরা নোঙরা তুলে দিল। বিশালায়তন জাহাজ সাঁতা-ফি হেলেদুলে এগিয়ে চলল দূর সমুদ্রের দিকে। হাত নেড়ে বিদায় অভিনন্দন জানাল আলোকরক্ষী তিনজন। আটটা বাজলে সাঁতা-ফি বিশাল সমুদ্রের বুকে পৌঁছে গেল। এবার সে সাঁ জুয়া অন্তরীপটা পাশ কাটিয়ে, পশ্চিমে রেখে

www.pathagar.com

এগিয়ে চলেছে। পৃথিবীর শেষ প্রান্তের বাতিঘরটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। সাঁতা-ফি'র ডেক থেকে কেবল তার আলোটাকে মিট মিট করে জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। আলোকরক্ষীরা সামান্যতম আভাসও পেল না, তাদের জীবনে কী ভয়ানক বিপর্যয় অচিরেই নেমে আসবে।

আমেরিকার একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত আইল্যান্ডকে কেউ কেউ 'স্টটেনল্যান্ড' নামে চিহ্নিত করে। দ্বীপটাকে হর্ন অন্তরীপ দিয়ে এগিয়ে যাওয়া জাহাজ থেকে ছোট একটা কালো বিন্দু বলে মনে হয়।

এ-অঞ্চলে লেময়র প্রণালী নামে একটা প্রণালী আছে। এই প্রণালীই স্টটেন আইল্যান্ড এবং দ্যেল ফুগো দ্বীপ দুটোকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তাদের উভয়ের মধ্যে দূরত্ব পনের-বিশ মাইল। স্টটেন আইল্যান্ডের পূর্বদিকে কেম্প ও সেন্ট অ্যানথনি অন্তরীপ দুটো অবস্থিত। পূর্ব-থেকে পশ্চিমে দ্বীপটার বিস্তার উনচল্লিশ মাইল, উত্তর-দক্ষিণে এগার মাইল। এর আশেপাশে প্রচুর সংখ্যক ডুবো পাহাড়ের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তাই এদের দৌলতে প্রায়ই জাহাজডুবি হয়। সমুদ্র উপকূলের ধারে কাছেও বহু পাহাড় পর্বত আত্মগোপন করে রয়েছে।

নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কয় মাস স্টটেন আইল্যান্ডের গ্রীষ্মকাল! এ সময়ে মানুষ অবশ্য এখানে বাস করতেপারে। গ্রীষ্মকাল হলেও হাড়কাঁপানো শীত। দ্বীপটার এখানে ওখানে গভীর অরণ্যের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। গুয়নাকো নামে এক বিশেষ জাতের হরিণ এখানকার অরণ্যে দেখা যায়। শরৎকালে গাছগাছালী বরফে চাপা পড়ে গেলেও তারা পাতা, মূল প্রভৃতি টেনে হিঁচড়ে তুলে এনে সেগুলো খেয়ে বেঁচে থাকে। এভাবে বরফের রাজ্যেও হরিণগুলো অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে।

আসল দ্বীপটাকে দেখতে অনেকটা পাথরের টিলার মতো। এখানে প্রাণী বলতে স্থলভাগে কয়েক রকম পাখি ও রয়েছে জলে বিভিন্ন আকার ও রঙ বিশিষ্ট মাছ। দ্বীপটার স্বত্বাধিকারী হল রিপাবলিক অব-আর্জেনটিনা আর চিলি। পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তে বাতিঘরটা তৈরি করে দিয়ে আর্জেনটিনা সরকার পৃথিবীবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

এখানকার সমুদ্রে জাহাজের ছড়াছড়ি, কিন্তু ধ্বংসাত্মক ঝড়ের দাপাদাপি। এই মরণ-সমুদ্রে স্টটেন আইল্যান্ডের বাতিঘরটা নাবিকদের বড়ই উপকারে আসবে সন্দেহ নেই।

দ্বীপটার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তার মাঝখান থেকে চারদিকে কিছুদূর পর্যন্ত মরুভূমি ছড়িয়ে পড়েছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই তিলে তিলে এটা গড়ে উঠেছে। এর সমতল অংশের প্রকৃতি অনেকটা তুন্দ্রা অঞ্চলের মতো। শীতকালে বরফের পুরু আস্তরণ জমে। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ? ঝড় বজ্রপাত, বৃষ্টির উৎসব সারা বছর লেগেই থাকে। সমুদ্রের তীরে সুউচ্চ পাহাড় মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। কোনো নদী বা ঝর্ণার অস্তিত্ব এখানে নেই। গ্রীষ্মে বরফ গলে। বরফ গলা জলখানা খন্দে জমে গিয়ে বিস্তীর্ণ জলাশয় সৃষ্টি করে। জনমানবহীন এ দ্বীপে এসে একদল দস্যু আস্তানা গাড়বে, কেউ কোনোদিন ভাবতে পেরেছে; নাকি বললেও বিশ্বাস করবে?

বিশালায়তন জাহাজ সাঁতা-ফি স্টটেন আইল্যান্ড থেকে বিদায় নেবার পর তেমন কোনো লক্ষণীয় ঘটনাই ঘটে নি।

www.pathagar.com

একদিন বিদায়ী সূর্য শেষ রক্তিম আভাটুকু নিঃশেষে পশ্চিম আকাশের গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দেবার জন্য উন্মুখ। দ্বীপের সর্বত্র আলো-আঁধারের খেলা শুরু হল! বাতিঘরের সমতল চাতালের ওপর বসে গল্প করছে ফিলিপ, মরিস আর ভ্যাসকুয়েজ—সান্ধ্য-মজলিসে মেতেছে। কথার ফাঁকে ভ্যাসকুয়েজ এক সময় বলল, 'কি হে, এই দ্বীপটা তোমাদের কাছে কেমন লাগছে বল তো?'

ফিলিপ ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে বলল, 'সবে তো কয়েকদিন হল। ক্লান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার মতো সময় এখনো আসে নি। যাক না আরো কয়েকদিন, তার আগে নয়।'

মরিস তাকে সমর্থন করল—'হ্যাঁ, ঠিকই তো। মাত্র তো তিন মাস, চোখের পলকে কেটে যাবে। জাহাজের পাল যেমন চোখের আড়ালে চলে যায়, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

ফিলিপ কপালের চামড়ায় কয়েকটা ভাঁজ ফেলে বলল, 'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি এ ক'দিনে একটা জাহাজও এ-পথে যেতে দেখলাম না!'

ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'সবুরে মেওয়া ফলে। অচিরেই জাহাজ দেখতে পাবে। জাহাজই যদি না চলাচল করে তবে মিছে এ-বাতিঘরটা তৈরি করতে যাবে কেন, বল তো? তাছাড়া বাতিঘরটার কথা প্রচার হওয়াও তো দরকার।'

'সাঁতা-ফি বুয়নস এরিয়সে না পৌঁছনো পর্যন্ত কেউ এর কথা জানতে পারবে না। তারপরই দেখতে দেখতে খবরটা বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে।' ফিলিপ বলল!

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। ক্যাপ্টেন লাফায়েৎর মুখে খবরটা শোনামাত্র কর্তৃপক্ষ খবরটা চাউর করে দেবে, ধরে নিতে পার।' ফিলিপকে সমর্থন করতে গিয়ে ভ্যাসকুয়েজ বলল!

মরিস বলল, 'পাঁচদিন হল সাঁতা-ফি নোঙর তুলেছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে।'

দ্বীপবাসী বাতিঘরের কর্মী তিনজনের মধ্যে বেশ কিছুদিন সাঁতা-ফি'র কথাই শুধু আলোচনা হচ্ছে, হবেও আরো কয়েকদিন।

ষোলোই ডিসেম্বর। সে তারিখে রাত ছয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত বাতিঘরের আলো জ্বলছে কিনা, দেখার দায়িত্ব বর্তাল মরিস-এর ওপর। পাঁচ-ছয় মাইল দূরে সমুদ্রের বুকে একটা হালকা আলোর বিন্দু ফুটে উঠল। খুলে বলার দরকার হবে না, ওটা নির্ঘাত একটা জাহাজ। বাতিঘর তৈরি হবার পর এটাই প্রথম জাহাজ।

মরিস তার সহকর্মী ভ্যাসকুয়েজ ও ফিলিপকে তাড়াতাড়ি ডাকতে গেল। উদ্দেশ্য—এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা তাদেরও দেখাবে। দ্বীপজীবনের প্রথম জাহাজ কি না।

মরিস-এর ডাকে ফিলিপ ও ভ্যাসকুয়েজ ছুটে এল। সবাই পূর্বদিকের জানালার কাছে গেল, চোখে টেলিস্কোপ লাগিয়ে সমুদ্রের ওপর চোখ রাখল।

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'আলোটা সাদা! স্টিমারের আলো বলেই মনে হচ্ছে।'

স্টিমারটা সাঁ জুঁয় অন্তরীপ দিয়ে এগোচ্ছে। বাতিঘরটা দক্ষিণ-পশ্চিমে রেখে ওটা লেময়র প্রণালীতে এগোতে লাগল। এক সময় সাদা আলোটা অধিকতর উজ্জ্বল হল লাল হয়ে দেখা দিল টেলিস্কোপ-এর কাঁচের গায়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা তাদের চোখের আড়ালে চলে গেল।

www.pathagar.com

'পৃথিবীর শেষ প্রান্তের বাতিঘরের সীমানায়-পড়া প্রথম জাহাজ এটা।' ফিলিপ সদম্ভে বলল।

'প্রথম বটে, তবে শেষ জাহাজ অবশ্যই নয়।' ভ্যাসকুয়েজ মন্তব্য করল!

সে-দিন এ পর্যন্তই। পরদিন বিকেলে ফিলিপ পালতোলা বড় একটা জাহাজ দেখতে পেল। কুয়াশা থাকা সত্ত্বেও জাহাজটাকে দেখতে অসুবিধা হয় নি। সে সহকর্মী মরিস ও ভ্যাসকুয়েজকে বাতিঘরে নিয়ে গেল, উঁকি মারল জানালা দিয়ে। জাহাজটা এগিয়ে আসছে বটে, কিন্তু কোনদিকে বোঝা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারটা নিয়ে তারা তিনজন তর্কে লিপ্ত হল। শেষপর্যন্ত দেখা গেল মরিসই ঠিক বলেছে। সে দৃঢ়তার সঙ্গেই মন্তব্য করেছিল—'আমেরিকায় তৈরি দ্রুতগতি সম্পন্ন জাহাজ এটা। আয়তন বিশাল। আঠারো শ' টন মাল তো বইবেই। অবশ্যই এটা প্রণালী মুখে আসবে না।'

ভ্যাসকুয়েজ তার কথা মানতে রাজি নয়। সে বেশ গলা ছেড়েই বলল—'রাখ হে, তোমার আমেরিকা। জাহাজটা ন্যু ইংলন্ডের যদি না হয় আমার টেলিস্কোপটা ছুঁড়ে ফেলে দেব, কথা দিচ্ছি।'

আলোকরক্ষীদের তর্কের অবসান ঘটিয়ে জাহাজটা সংকেত-পতাকা উড়িয়ে দিল। জানা গেল তার নাম মন্ডাংক। আমেরিকার ন্যু-ইংলন্ডস্থ্ বোস্টন বন্দর থেকে এসেছে।

আলোকরক্ষীরাও আর্জেন্টিনার পতাকা উড়িয়ে স্বাগত জানাল। জাহাজটা ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগল।

সমুদ্র আবার নির্জন। দূর সমুদ্রে দু-একটা পাল কেবল নজরে পড়েছিল, এই মাত্র। সবাই আমেরিকান বন্দরে গিয়ে নোঙর করবে। ভ্যাসকুয়েজ বলল—'তারা আন্টার্কটিকা যাচ্ছে, মাছ ধরবে। বাতিঘরটাকে বেশ কয়েক মাইল দূরে রেখে আরো কয়েকটা জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরের উদ্দেশ্যে চলে গেল।'

দেখতে দেখতে চলে এল বিশে ডিসেম্বর। এই কয়দিনের মধ্যে খাতায় টুকে রাখার মতো উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না। তবে আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে দেখা গেল। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে বাতাস বইতে লাগল! একুশে ডিসেম্বর সকালের দিকে ফিলিপ সমুদ্রের ধার দিয়ে পায়চারি করছিল। সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী ঝোপে একটা জানোয়ার দেখতে গিয়েছিল। প্রথম দর্শনেই সে চিনে ফেলল, 'বেশ বড়সড় একটা গুয়ানাকো! চোখের সামনে সুস্বাদু খাবার দেখতে পেলে কার না জিভে জল আসে? সে নিঃশব্দে বাতিঘরে গিয়ে সঙ্গীদের ডেকে আনল। কোনোরকমে শিকারটাকে বাগেড় আনতে পারলে অন্তত কয়েকদিনের জন্য নিশ্চিন্ত। জিভটাকে সুস্বাদু মাংসে একটু তৃপ্ত করা যাবে খেয়ে। টিনের খাবার খেয়ে খেয়ে বিতৃষ্ণা এসে গেছে।

তিনজনে পরামর্শ করে ঠিক করল, ফিলিপ তৈরি হয়ে উপসাগরের পথে ওৎ পেতে থাকবে। আর মরিস বন্দুক নিয়ে পেছন থেকে তাকে তাড়া করবে।

তাদের সতর্ক করে দিতে গিয়ে ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'খুব সন্তর্পণে কাজ করতে হবে কিন্তু। মনে থাকে যেন, এসব জানোয়ারের ইন্দ্রিয়গুলো খুবই সজাগ। কোনোরকমে শিকারীর গন্ধ পেলেই হল, এমন ছুট দেবে যে, গুলি করে সাধ্য কার?'

ফিলিপ আর ভ্যাসকুয়েজ টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে গুয়ানাকোটাকে নজরে নজরে রাখতে লাগল। মরিস গাছের ফাঁক দিয়ে তাদের প্রস্তুতিপর্ব করতে লাগল। গুয়নাকোটা তখনো নিশ্চিন্তে নিশ্চল নিথরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। হতভাগা জানোয়ারটার বরাত নেহাৎই

www.pathagar.com

মন্দ! কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার তো! মরিস তখনো গুলি চালাচ্ছে না কেন? ব্যাপারটা আরো অবাক করে দিল! একসময় গুয়নাকোটা বিকট আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। টেলিস্কোপ চোখে রেখেই তারা বলাবলি করল—'কেমন হল, বন্দুকের আওয়াজ নেই, অথচ গুয়ানাকোটা হঠাৎ লুটিয়ে পড়ল যে!'

মরিস মুহূর্তের মধ্যে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল! নিশ্চল গুয়ানাকোটার দিকে মুহূর্তকাল অপলক চোখে তাকিয়ে থাকার পর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল। বাতিঘরের কাছাকাছি এসে সে গলা ছেড়ে সঙ্গীদের ডাকল।

মরিস-এর কাণ্ড দেখে ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'ফিলিপ, নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে, নইলে মরিস এমন উত্তেজিত হবে কেন!' কথা বলতে বলতে সে ফিলিপকে নিয়ে মরিস-এর কাছে হাজির হল। বিস্ময় প্রকাশ করে সে বলল, 'মরিস, কি হয়েছে বল তো? তোমাকে এমন উত্তেজিত দেখাচ্ছে কেন? সেই গুয়ানাকোটারই বা কি হল?'

মরিস সংক্ষেপে জবাব দিল, 'চল। সেখানে গেলেই সব দেখতে পাবে।'

মরিস তাদের নিয়ে সেই মৃত গুয়ানাকোটার কাছে গেল। ব্যাপার দেখে তো আলোকরক্ষীদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম। গুয়ানাকোটার গায়ে গুলির দাগ! ক্ষতস্থান থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে।

ভ্যাসকুয়েজ কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ প্রকাশ করে কোনোরকমে উচ্চারণ করল। তবে আমি ছাড়া এখানে আরো শিকারী রয়েছে?

* * *

স্টটেন আইল্যান্ডের পশ্চিম প্রান্তের উপকূলরেখা রীতিমতো স্বতন্ত্র প্রকৃতির। মরিস, ফিলিপ ও ভ্যাসকুয়েজ এদিকটা মোটেই মাড়ায় নি, কিছু জানেও না। জল ভেদ করে সমুদ্র থেকেই পাহাড় সোজা উঠে গেছে। এই অংশে সমুদ্র উত্তাল-উদ্দাম। পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য গুহা। কোনোটা বা উপরে গ্রিবা বিস্তার করে রেখে পাতাল পর্যন্ত নেমে গেছে। দ্বীপের কেন্দ্রস্থলের সমতল ভূমিতে যেতে হলে অন্তত দু-হাজার ফুট উঁচু পাহাড় ডিঙিয়ে মাইল পনের পেরিয়ে তবে সমতলভূমির দেখা পাওয়া যায়। দ্বীপের এদিকটা এমনই ভয়ংকর যে, একটা বাতিঘর এখানেও তৈরি করা একান্ত দরকার। আর্জেন্টিনা সরকারের দেখাদেখি চিলি সরকারও হয়তো অদূর ভবিষ্যতে একটি বাতিঘর করলে করতেও পারেন।

অসুবিধা? হ্যাঁ, কারো কারো অসুবিধা তো নিশ্চয়ই রয়েছে। একই দ্বীপের দু-প্রান্তে দুটো বাতিঘর তৈরি করলে ডাকাত-দলের বেকায়দায় পড়তে হবে বৈকি। এখানকার ডাকাতদের উৎপাতের কথা তো নাবিকদের ভালোই জানা আছে।

এই তো কয়েক বছর আগের কথা। ইগোর উপসাগরের প্রবেশ মুখে এ ডাকাতের দলটা এখানে এসে আস্তানা গাড়ে। প্রয়োজনে লুকিয়ে থাকার উপযুক্ত একটা গুহাও আবিষ্কার করে নিয়েছিল। স্টটেন আইল্যান্ডে কোনো জাহাজ দাঁড়ায় না, উৎপাত মোটেই নেই। তাই জায়গাটাকেই নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বেছে নিল। দলপতির নাম কংগ্রি। দশ-বারজন ডাকাত নিয়ে তার দল। তাদের মধ্যে সারসাঁতে নামে এক অসীম সাহসী ও বলিষ্ঠ যুবক তার পার্শ্বচর, তার সব ব্যাপারে পরামর্শদাতা, সহায়ক। প্রায় সবাই দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী, আর্জেনটিনার মাত্র চার-পাঁচজন। কংগ্রির দলে ভিড়ে

www.pathagar.com

সবাই জলদস্যুতে পরিণত হয়েছে। আর সারসাঁতে? চিলির অধিবাসী। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। দেহে হাতির শক্তি ধরে, গাধার মতো খাটতেও পারে। এমন কোনো অপরাধ নেই যা তার দ্বারা সম্ভব নয়।

জলদস্যু দলের মাতব্বরের পূর্ব পরিচয়? তার সম্বন্ধে, বিন্দু-বিসর্গও কেউ জানে না। তার নাম কংগ্রি কিনা নিশ্চিত করে বলা কঠিন।

কুখ্যাত জলদস্যু কংগ্রির কথা জানে না এমন লোক এ অঞ্চলে কেউ আছে বলে সন্দেহ।

এবার অল্পকথায় সেরে নিচ্ছি, কংগ্রি কি করে সাকরেদদের নিয়ে এখানে এসে ঘাটি গেড়েছে। ফাঁসির দড়িতে ঝুলবার মতো বহু কুকাজ করে কংগ্রি ও তার সাকরেদ সারসাঁতে ম্যাগেলান প্রণালীর প্রধান বন্দর থেকে পালিয়ে চ্যিরা দ্যোস ফুগোয় গিয়ে উঠেছিল। সেখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকার সময় এ-অঞ্চলের ঘন ঘন জাহাজডুবির কথা শোনে। স্টটেন আইল্যান্ডের ধারে কাছে প্রচুর জাহাজডুবি হয়েছে, আর সেই সব জাহাজের মূল্যবান সম্পদ নির্ঘাৎ সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত রয়েছে। এরকম চিন্তা করে কংগ্রি আর সারসাঁতে স্থানীয় কিছু গুণ্ডা প্রকৃতির লোক নিয়ে জলদস্যু দল গড়ে তুলল।

ছোট একটা নৌকো নিয়ে স্টটেন আইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে সদলবলে রওনা দিল কংগ্রি! বিধি বাম! লেময়র প্রণালী পাড়ি দেবার সময় কলনেট অন্তরীপে পৌঁছেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ল দলটা। কোনোরকমে ধাক্কা মেরে সেই ছোট্ট নৌকোটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কোনোরকমে পিতৃদত্ত প্রাণটুকু রক্ষা পেল। এবার শুরু হল পায়ে হাঁটার পালা। হাঁটতে হাঁটতে কংগ্রি শেষপর্যন্ত ইগোর উপসাগরের তীরে পৌঁছে গেল। সাঁ জুয়া অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার সমুদ্রতল থেকে যাবতীয় সম্পদ তারা উদ্ধার করল। অগণিত সোনারুপার পিণ্ড, মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্র, বন্দুক, পিস্তল, বাক্স বাক্স গুলি বারুদ প্রভৃতি লাভ করে তারা সহজেই দলটাকে শক্তিশালী করে তুলতে সক্ষম হল।

আসলে স্টটেন আইল্যান্ডের ধ্বংসাশ্রয় ঝড়ের কথা বহু নাবিকের জানা ছিল না। যে কয়টা জাহাজ এ-মুখো হয়েছে, কেউ অব্যাহতি পায় নি। চোরাপাহাড়ের ধাক্কা খেয়ে নির্মমভাবে ধ্বংস হয়েছে। কংগ্রি সাকরেদদের নিয়ে উপসাগরের মাঝখানে আশ্রয় না নিয়ে সাঁ জুর্য অন্তরীপের ওপর নজর রাখার জন্য প্রবেশপথের কাছাকাছি ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে থাকে। বিশাল গুহার ভেতরে তাদের যাবতীয় মালপত্র জমা করে রাখল। কংগ্রিক ইচ্ছা ছিল কোনোরকমে একটা জাহাজ দখল করা। সম্ভব হলে মালপত্র ও সাকরেদদের নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটি দ্বীপে গিয়ে ঘাঁটি গাড়বে। সুযোগের অভাবে আজো স্টটেন আইল্যান্ডেই পড়ে রয়েছে।

দু-দুটো বছর ধরে লুঠতরাজ চালিয়ে তারা অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছে। জাহাজডুবির ফলে কম সম্পদ হাতায় নি কংগ্রি। কিন্তু এত চেষ্টা করেও তারা একটা জাহাজও দখল করতে পারল না। তাই অনন্যোপায় হয়েই তাকে স্টটেন আইল্যান্ডে পড়ে থাকতে হচ্ছে। নিত্যকারের মতো সেদিনও সে সারসাঁতেকে বিষণ্ন মুখে বলল, 'সারসাঁতে, যেমন করেই হোক, এ-জায়গা আমাদের ছাড়তেই হবে।'

সারসাঁতে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল, 'সে তো বুঝলাম, কিন্তু কি করে, বলবে কি?'

www.pathagar.com

এর জবাব কংগ্রির জানা নেই। সে গোমড়ামুখে বসে রইল।

দলপতি নীরব দেখে সারসাঁতে এবার বলল, 'কিন্তু সমস্যা হয়তো দেখা দেবে রসদ নিয়ে। দ্বীপের মাছ আর শিকার আজ না হোক কাল ফুরবেই। তার ওপর শীত আসছে। হাড়-কাঁপানো শীতে হয়তো জমে বরফই হয়ে যেতে হবে।

কংগ্রি তবুও নিরুত্তর রইল।

এ কাহিনী শুরু হবার বছর দেড়েক আগের কথা। সেটা ছিল আঠারো শ' আটান্ন খ্রিস্টাব্দ। সে বছর অক্টোবরের প্রথম দিকে দ্বীপে একটি জাহাজ এসে নোঙর করল। আর্জেন্টিনার পতাকা মাস্তুলে উড়ছিল। কংগ্রি ও তার সাকরেদরা এটাকে যুদ্ধ-জাহাজ ভাবল। তাই ভীত-সন্ত্রস্ত মনে তাড়াতাড়ি গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল। জাহাজটা ফিরে না যাওয়া অবধি গুহা থেকে বেরুনোর প্রশ্নই ওঠে না। আশা করি না বললেও চলবে, জাহাজটা ছিল সাঁত-ফি। দ্বীপে বাতিঘর তৈরির উদ্দেশ্যেই তার আগমন। প্রারম্ভিক কাজটুকু সেরে জাহাজ এখান থেকে বিদায় নিল। কংগ্রি তার সাকরেদদের নিয়ে ধরা ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেল। একদিন রাতের অন্ধকারে সারসাঁতে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে জাহাজটার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। লোকজনদের কথাবার্তা যেটুকু কানে গিয়েছিল তাতে এটুকুই বুঝেছে, এখানে একটা বাতিঘর তৈরি হতে চলেছে।

সারসাঁতের মুখে বাতিঘর তৈরির কথা শুনে কংগ্রি রীতিমতো আৎকে উঠল। সে বুঝে নিল, এখান থেকে পাততাড়ি গুটাতেই হবে। কিন্তু যাবেই বা কোথায়? সামনে উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্র প্রতিনিয়ত ফুঁসছে। গত্যন্তর না দেখে সে সাকরেদদের নিয়ে আইল্যান্ডের পশ্চিমদিকের গুহায় গিয়ে মাথা গুঁজল। মালপত্র সব সঙ্গে করে নেওয়ার সুযোগ না পাওয়ায় তখনকার মতো গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে গেল।

কয়েকদিন পর আবার সাঁতা-ফি বাতিঘর তৈরির সাজ সরঞ্জাম ও লোকজন নিয়ে দ্বীপে হাজির হল। গড়ে উঠল আকাশচুম্বী বাতিঘর।

গুহার ভেতরে বসে কংগ্রি অপেক্ষা করতে লাগল, কবে বাতিঘর তৈরির কাজ সেরে সাঁতা-ফি নোঙর তুলবে। তারপরেই সে নিজ মূর্তি ধারণ করবে।

কংগ্রি মোটামুটি একটা হিসাব করে নিল, বাতিঘর তৈরির কাজ ডিসেম্বর মাসের দিকে শেষ হবে। কাজ সেরে সাঁতা-ফি বন্দর ছেড়ে গেলে আলোকরক্ষীরা একা হয়ে পড়বে। নয়ই ডিসেম্বর সারসাঁতে খবর নিয়ে গুহায় ঢুকল—সাঁতা-ফি বন্দর ছেড়ে গেছে।

তারপরই সেই শিকারের ঘটনা। সারসাঁতে সেদিন গুয়ানাকোটাকে গুলির ঘায়ে আহত করল। আহত জানোয়ারটা কাৎরাতে কাৎরাতে এসে ধরাশায়ী হল। এটাকে দেখেই সেদিন ভ্যাসকুয়েজ ও অন্যান্যরা নিঃসন্দেহ হয়েছিল, দ্বীপে তারা ছাড়াও মানুষ বাস করে।

কংগ্রি সিদ্ধান্ত নিল, সাকরেদদের নিয়ে বাইশে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রওনা হবে। চব্বিশে সন্ধ্যায় বাতিঘর দখল করবে। ব্যস, পূর্বগুহায় মালপত্র স্থানান্তরিত করার কোনো সমস্যাই থাকবে না।

এদিকে সাঁতা-ফি ফিরে গিয়ে অবশ্যই বাতিঘর তৈরি হয়ে গেছে, প্রচার করবে। অতএব একটা জাহাজ পাওয়া আর অসুবিধা হবে না। জাহাজ পেলে আর এখানে পড়ে থাকতে যাবে কে? সটান প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো দ্বীপে গিয়ে হাজির হবে। পর মুহূর্তে এ-ও ভাবল, যদি কিছুদিনের মধ্যে কোনো জাহাজ না ভিড়ে? সাঁতা-ফি যদি ইতিমধ্যে ফিরে আসে? বাধ্য হয়ে গুটি গুটি এ গুহায়ই ফিরে আসতে হবে।

www.pathagar.com

কংগ্রি তার সাকরেদদের নিয়ে বাইশে ডিসেম্বর বাতিঘর দখলের উদ্দেশ্যে রওনা দেবার পূর্ব মুহূর্তে দূর সমুদ্রে একটা কালো মতো কি যেন দেখতে পেল।

সারসাঁতে সমুদ্রের বুকে ভাসমান বস্তুটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। এক সময় আপন মনে বলে উঠল—'জাহাজ! নির্ঘাৎ ওটা একটা জাহাজ! কয়েক মুহূর্তে পরে আবার বলল, 'একটা স্কুনারের মতো মনে হচ্ছে। এদিকেই তো এগোচ্ছে।'

কংগ্রি বলল, 'হ্যাঁ, স্কুনারই বটে! দেড়-দু-শ' টনের একটা স্কুনার। তোমরা শোন, কিছুতেই এ-সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। যেন তেন প্রকারে স্কুনারটা দখল করা চাই। আর একটা কথা, রাত্রির অন্ধকারে ওটা প্রণালীর ভেতর ঢুকতে পারবে না। আমাদেরও সকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হবে।'

পাখির ডাকে সকাল হল। কংগ্রি গুহার বাইরে বেরিয়ে দেখল, বার্থোলোমিউ অন্তরীপের পাহাড়ের পাদদেশে স্কুনারটা দাঁড়িয়ে।

কংগ্রির জাহাজ সম্বন্ধে খুবই অভিজ্ঞতা আছে। আর তার পার্শ্বচর সারসাঁতে? সেও একাজে অনেকদিন ধরে একটু একটু করে হাত পাকিয়েছে। তারা উভয়েই একই সঙ্গে জাহাজের কাজ নেয়, দস্যুবৃত্তিও শুরু করে একই সঙ্গে।

কংগ্রি বুঝল, স্কুনারটা বালির চড়ায় আটকা পড়ে গেছে। বাতাসের গতি পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত স্থবিরের মতো এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তবে রাতের আগে আর তা হবার নয়।

জাহাজের ক্যাপটেন একসময় দেখলেন, জাহাজটা হাওয়ার টানে পাহাড়ের দিকে ছুটে চলেছে। উপায়ান্তর না দেখে তিনি নৌকো নামিয়ে দিয়ে যাত্রীদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই যাত্রী বোঝাই নৌকাটাকে সমুদ্রের উত্তর-পূর্ব কোণে ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করতে দেখা গেল। অথচ যাত্রীরা জাহাজে থাকলে হয়তো নিরাপদেই থাকত। নিয়তিই তাদের জাহাজ থেকে নামিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে পাঠিয়েছে। ফ্রাংকলিন উপসাগরের দিকে তীরবেগে ছুটে চলেছে নৌকোটা।

কংগ্রির দল স্কুনার-এর দিকে এগোতে লাগল। পূর্ণ জোয়ার, অসুবিধার কিছু নেই। মাত্র তো আধ মাইল খানেক পথ, কয়েকটা মাত্র টিলা পার হতে হবে। কংগ্রি সদলবলে স্কুনার-এর কাছে হাজির হল। সে জাহাজটার দিকে তাকিয়ে সোল্লাসে বলল, 'এটার তলায় যদি ছিদ্র না হয়ে থাকে তবে এতে ভালোভাবেই আমাদের কাজ মিটবে। তবে দু-একটা ছিদ্র হলেও সারিয়ে নেওয়া যাবে, বেশি কিছু হলেই সমস্যা।' জাহাজটা ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বলল, 'না' আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই, দেখছি। যাক, বাঁচা গেল।'

কংগ্রি অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর সদলবলে কাৎ হয়ে থাকা জাহাজটায় চুপিচুপি উঠে পড়ল। সে সটান ক্যাপ্টেনের ঘরে গিয়ে জাহাজ সম্পর্কিত কাগজপত্র হাত করল।

ভ্যালপারসিয়োর চিলির একটি স্কুনার এটা—এর নাম মউল। জাহাজটা তেইশে নভেম্বর ফকল্যান্ড আইল্যান্ডে যাচ্ছিল। হর্ণ অন্তরীপ পেরিয়ে লেমিয়র প্রণালীতে ঢুকতে গিয়ে স্টটেন আইল্যান্ডের বালিয়াড়িতে আটকা পড়ে যায়। মউল-এর সাহায্যে কোনোরকমে এখান থেকে পাড়ি দিতে পারলেই কংগ্রির ইচ্ছা পূরণ হবে।

www.pathagar.com

কংগ্রি সারসাঁতেকে লক্ষ্য করে বলল, 'জাহাজের ক্যাপ্টেনসহ নৌকো নিয়ে সবাই অথৈ সাগরে পাড়ি দেওয়া ভালোই হল। খালি জাহাজটাই পেলাম আমরা।'

সারসাঁতে সোল্লাসে বলল, 'এবার আমাদের একমাত্র চিন্তা, পূর্ণ জোয়ার কখন আসবে। কিন্তু জোয়ার এলে আমাদের প্রথম কাজ কি হবে বলত?'

কংগ্রি বলল, 'নিয়ে যাব গুহাটার কাছে। ধনরত্ন যা কিছু আছে, সবই জাহাজে তুলে নেব।'

জোয়ার শুরু হয়েছে। আড়াই ঘণ্টা পরে পূর্ণ জোয়ার আসায় মোচার খোলের মতো জাহাজটা জলের ওপর ভেসে উঠল। ব্যস, আর কথা নেই, কংগ্রি সোল্লাসে নোঙর তোলার হুকুম দিল। সারসাঁতে জাহাজ চালাতে ওস্তাদ, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। জাহাজ কেঁপে উঠল। বালিয়াড়ি থেকে বেরিয়ে এল বিশালায়তন জাহাজ মউল।

বেশি সময় লাগল না। আধঘণ্টার মধ্যেই জাহাজটাকে সে গুহার কাছে গিয়ে ভেড়াল।

কংগ্রি এবার জাহাজটাকে ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যস্ত হল। বলা যায় না, কোনোরকম মেরামতের দরকার হতে পারে। এখনই সেরে নেওয়া দরকার। ছোটখাট ত্রুটি দেখা গেল। মেরামত করতে দিন সাতেক তো লাগবেই। ঠিকমত মেরামত না করলে মউলকে নিয়ে অথৈ সাগর পাড়ি দেবার চিন্তা পাগলের খেয়াল মাত্র। সাকরেদদের মধ্যে একজন বলল, 'হুজুর, সামান্য যা ত্রুটি রয়েছে, অসুবিধা হবে না। এখানে জাহাজ সারানো অসুবিধা; উপযুক্ত স্থান না হলে—'

কংগ্রি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'ইগোর উপসাগরে। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাতে আটচল্লিশ ঘন্টা সময় লেগে যাবে। তোমরা মনে রেখ, আমরা শুধুমাত্র দ্বীপের অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেবার বদলে সোজা সমুদ্র-পথে পাড়ি জমাচ্ছি।'

কংগ্রি যাত্রার প্রস্তুতির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মালপত্র তোলার কাজ ইতিমধ্যেই মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল সমুদ্রের বুকে। ধীর-মন্থর গতিতে মউল এগিয়ে চলল। দশ মিনিটের মধ্যেই খাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুনার সমুদ্রে ঢুকল। অনুকূল হাওয়ায় বার্থোলোমিউর পাহাড় ঘুরে পূর্বদিকে চলল সে। কংগ্রি হয়তো সন্ধ্যার আগেই ইগোর উপসাগরের প্রবেশ-পথে পৌঁছে যেতে পারবে।

পথে কোনো জাহাজই দেখতে পেল না জলদস্যুরা। সন্ধ্যার দিতে তারা ওয়েবস্টার অন্তরীপের পূর্ব দিকে পৌঁছল। কংগ্রির নির্দেশে উপকূল থেকে কিছুটা দূরে স্কুনারটা দাঁড় করাল সাকরেদরা। পূব আকাশে দেখা দিল রক্তিম ছোপ। জাহাজের নোঙর তোলার ব্যবস্থা করল! জোয়ারের টানে তরতর করে এগিয়ে চলল বিশালায়তন জাহাজ মউল।

তারা ব্লজম উপসাগরের মুখে যখন পৌঁছল তখন ঘড়িতে দশটা বাজে। বিকাল চাটে নাগাদ কংগ্রি দেখল, জাহাজটা লক্ষ্যস্থল পেরিয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে গেল। সর্বনাশ; জাহাজের মুখ ঘোরাতে হয় যে! ইগোর উপসাগরের দিকে জাহাজ চালাতে হুকুম দিল কংগ্রি।

জাহাজের ক্যাপ্টেনের ঘরে কংগ্রি একটা টেলিস্কোপ পেয়েছিল। সে সেটাকে চোখে লাগিয়ে পৃথিবীর শেষ প্রান্তের বাতি-ঘরটার দিকে চোখ রাখল। টেলিস্কোপে ধরা পড়ল, আলোকরক্ষীদের একজন। আলোকরক্ষীরাও অভ্যাসমত টেলিস্কোপের সাহায্যে সমুদ্রের

www.pathagar.com

ওপর নজর রাখতে গিয়ে মউলকে দেখতে পেল। তারা ধরে নিল, জাহাজটা ফকল্যান্ড দ্বীপের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। স্টটেন আইল্যান্ডই তার গন্তব্যস্থল। আলোকরক্ষীরা মউলকে দেখতে পেল কিনা, এ নিয়ে তার তিলমাত্রও চিন্তা নেই। দেখতে পেলেই বা কি? তারা যে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এতক্ষণ মউল নির্বিঘ্নেই পথ পাড়ি দিচ্ছিল। কিন্তু এখন? পদে পদে বিপদের ইঙ্গিত। চোরা-পাহাড় চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যে-কোনো সময় পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজ ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে পারে। যে কথা, সেই কাজ। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার পূর্ব মুহূর্তে দস্যুদের একজন চেঁচিয়ে উঠল—'জাহাজ ফুটো হয়ে গেছে! জল উঠছে!'

হ্যাঁ, ফুটো হয়েছে ঠিকই। কিন্তু খুবই ছোট একটা ফুটো হয়েছে। সহজেই মেরামত করে ফেলা গেল।

মউল সন্ধ্যা ছয়টায় ইগোর উপসাগরের প্রবেশ-পথে এসে পৌঁছল। সাড়ে ছয়টায় বাতিঘরের আলো জ্বলে উঠল।

বাতিঘরের নিশানা লক্ষ্য করে মউল মন্থর গতিতে তীরের দিকে এগিয়ে চলল।

সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন হাত নেড়ে স্বাগত জানাল মউলকে। এরা কারা? আলোকরক্ষী মরিস ও ফিলিপ। নোঙর পড়তেই তারা তরতর করে জাহাজে উঠে গেল। কংগ্রি চোখ টিপে ইঙ্গিত করতেই জলদস্যুদের একজন পিছন থেকে মরিস-এর ঘাড়ে কুড়োল দিয়ে আঘাত করল। ফিলিপ ব্যাপারটা বোঝার আগেই বিকট আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল। পিস্তলের গুলিতে প্রাণ দিল সে।

লণ্ঠন-ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে ভ্যাসকুয়েজ পিস্তলের শব্দ শুনতে পেল উৎকণ্ঠার সঙ্গে বাইরের দিকে চোখ ফেরাল। সহকর্মীদের চরম পরিণতির দৃশ্য দেখে আৎকে উঠল সে। কর্তব্য স্থির করতে না পেরে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার সংজ্ঞা ফিরে এল। মনস্থির করে ফেলল, যে-কোনো ভাবে জলদস্যুদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতেই হবে। কিন্তু টাও তো মিথ্যে নয়, জাহাজটা নোঙর করার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতরা অবশ্যই বাতিঘরের দিকে ছুটবে। তার উপস্থিতি তারা হয়তো এখনো বুঝতে পারে নি। তাই সে মুহূর্তমাত্র দেরি না করে সিঁড়ি দিয়ে বাতিঘরের নিচে নেমে এল। চোখের পলকে দুটো পিস্তল জামার তলায় গুঁজে নিল। এখন তার একমাত্র চিন্তা, কি করে জলসদ্যুদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে?

স্টটেন আইল্যান্ডের বুকে নেমে এল এক জমাটবাঁধা কুয়াশাবরা রাত্রির অন্ধকার। সর্বত্র কেমন যেন একটা থমথমে ভাব, ঠিক যেন যক্ষপুরী ভয়ংকর একটা রাত্রি নেমে এল ভ্যাসকুয়েজ-এর সামনে। আজ সহকর্মীদের হারিয়ে বড়ই নিঃসঙ্গবোধ করছে। অদৃষ্টবিড়ম্বিত সহকর্মীদের রক্তাপ্লুত মৃতদেহ উত্তাল সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে। তারা একসঙ্গে বাতিঘরের কাজ নিয়ে স্টটেন আইল্যান্ডে এসেছিল, একই সঙ্গে মিলেমিশে কাটিয়েছে বেশ কয়েকটা দিন। আর এখন? এই যমপুরীতে সে একা, একেবারেই একা।

ভ্যাসকুয়েজ বিষণ্ন মনে ভাবছে, স্কুনারটা কাদের? স্টটেন আইল্যান্ড-এ কেনই বা সে ভিড়ল? জলদস্যুরা কি চায়? বাতিঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়ার পিছনেই বা তাদের কি দুরভিসন্ধি রয়েছে? কোনো জাহাজ যাতে তাদের তাড়া করতে না পারে, এটাই কি উদ্দেশ্য তাদের? ভ্যাসকুয়েজ-এর মাথা ঝিমঝিম করছে, আর ভাবতে পারছে না। না,

www.pathagar.com

সে তাদের কাছাকাছি যাবে না। একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে সে। ব্যস্ততার জন্য বাতিঘরের নথিপত্রগুলো নিয়ে আসতে পারে নি। সেগুলো দিয়েই জলদস্যুরা সহজেই তার উপস্থিতি অনুমান করে ফেলবে। না, আর ভাবতে পারছে না। মাথা ঘুরছে, চোখে অন্ধকার দেখছে!

বাতিঘর থেকে জলদস্যুদের চেঁচামেচি ভ্যাসকুয়েজ-এর কানে আসছে। হাল্কা আলোও দেখা যাচ্ছে। রাত দশটায় আলোটুকু নিভে গেল। অন্ধকারে তলিয়ে গেল আকাশচুম্বী বাতিঘরটাও। দিনের আলো ফুটে উঠলেই আত্মগোপন করার সুযোগ টুকু থেকেও বঞ্চিত হবে সে। তখন জলদস্যুদের হাতে ধরা পড়তেই হবে। পাষণ্ডগুলোর কাছ থেকে সামান্যতম দয়াও আশা করা যায় না। কিন্তু হাল ছেড়ে, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। যে করেই হোক নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে হবে, পিতৃদত্ত প্রাণটুকু। দ্বীপের গোপন অন্তরালে লুকিয়ে থাকতে হবে সাঁতা-ফি-র পুনরাগমনের অধীর প্রতীক্ষায়। সমস্যা বহু। মাত্র দিন তিনেকের রসদ রয়েছে। মাছ ধরার চেষ্টা করা যাবে না। আগুন জ্বালার চেষ্টা করলেও ধরা পড়ে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা। অনেক ভেবেচিন্তে মনস্থির করল, রাতটা তো কাটুক, সকাল হলে যা হোক করা যাবে।

ভ্যাসকুয়েজ প্রাণের দায়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার টিলার নিচ দিয়ে নিঃশব্দে উত্তর দিকে চলতে শুরু করল। রাত এগারটায় অন্তরীপের শেষ প্রান্তে সমতল একটা জায়গায় শুয়ে পড়ল।

ভোরের আলো ফোটার আগেই ভ্যাসকুয়েজ-এর ঘুম ভেঙে গেল। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে রইল। কোনো নৌকাও দেখা গেল না। আলোকরক্ষীদের নৌকা মউল-এর নিজস্ব নৌকা সবই তো জলদস্যুদের কব্জায়। সে সমতল একটা পাহাড়ের ওপর বসে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। না, সাঁতা-ফি ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই করার নেই। এখনো পুরো দুটো মাস বাকি। জলদস্যুদের হাতে ধরা যদি না-ই পড়ে, বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনাও তো নেই। খাবে কী? শীতের মধ্যে থাকবে কোথায়? সর্বাগ্রে একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার। বাঁচার অত্যুগ্র বাসনা নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। আশ্রয়ের সন্ধানে হাঁটতে লাগল। বেশি বেগ পেতে হল না, কিছুদূর গিয়েই ছোট্ট একটা গুহা তার নজরে পড়ল। সুরক্ষিতই বলা চলে। জোয়ারের জল বা ঝড়ের আক্রমণের সম্ভাবনা নেই। দেখল কাছেই একটা পুকুর মতো রয়েছে। বরফগলা জলে পুষ্ট। পানীয় জলের অভাবও নেই। আর খাদ্য? আপাততঃ দিন তিনেকের ব্যবস্থা তো সঙ্গেই রয়েছে, পরে যা হয় দেখা যাবে।

ভ্যাসকুয়েজ গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। দূরে কয়েকজনের কথাবার্তা কানে এল। সে ভাবল, শয়তানগুলো হয়তো বা তারই খোঁজে দ্বীপ তোলপাড় করছে। গুহার মুখে লুকিয়ে থেকেই সে বাইরের দিকে উঁকি দিল। সমুদ্রের তীর ঘেঁষে একটা নৌকাকে এগিয়ে আসতে দেখল। নৌকা চারজন ষণ্ডামার্কা লোক বসে। স্কুনারের নিজস্ব নৌকা এটা। বাতিঘরের নয়। যে লোকটা নৌকা চালাচ্ছে, বেশ দক্ষ বলেই মনে হল। হয়তো স্কুনারটার ক্যাপ্টেন সে। নৌকাটা তীরে ভিড়ল।

ব্যাস, আর নয়। ভ্যাসকুয়েজ গুহার ভেতরে ঢুকে গেল। সেখানে বসেই তাদের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। কে একজন বলল—'কি হে, এ জায়গাটাই তো?'

'হ্যাঁ। পাহাড়টার বাঁকের কাছে।'

www.pathagar.com

'বরাত ভালো বলতে হবে, আলোকরক্ষীরা আমাদের গুহাটার খোঁজ পায় নি।'

'শুধু আলোকরক্ষীদের কথাই বা বলি কেন? দেড় বছর ধরে যারা বাতিঘর তৈরি করল, তারাও খোঁজ পায় নি এটার। আসলে গুহার মুখটা যেভাবে পাথর দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে, খোঁজ পাওয়ার কথাও তো নয়।'

গাট্টাগোট্টা মাতব্বর লোকটা তাদের ডেকে নিয়ে বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। তারা কিছুটা এগোতেই ভ্যাসকুয়েজ আবার গুহার মুখে এসে তাদের গতিবিধির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগল।

ভ্যাসকুয়েজ ভাবল, তবে কাছাকাছি তাদের একটা গুহা রয়েছে? এবার ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হল—জলদস্যুরা বাতিঘর তৈরির আগে থেকেই এই দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। গুহার মধ্যে দীর্ঘদিনের লুঠতরাজের মালপত্রগুলো লুকিয়ে রেখেছে। তবে কি এবার তাদের স্কুনারে করে মালপত্র পাচার করার ইচ্ছে?

ভ্যাসকুয়েজ-এর মাথায় একটা মতলব এল, গুহায় লুকানো রসদগুলো সে অনায়াসেই হাতাতে পারে। বেঁচে থাকতে গেলে সেগুলো তার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। সে করজোড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল, সাঁতা-ফি ফিরে না আসা পর্যন্ত দস্যুরা যেন এ-দ্বীপ ছেড়ে না যায়। তারপর তাদের শক্তির পরীক্ষা নেওয়া যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে জলদস্যুরা হাসিমুখে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে একজন ঠোঁটের কোণে হাসির রেখাটুকু বজায় রেখেই মন্তব্য করল—'আলোকরক্ষীরা ভালো ছিল, বলতেই হবে। আমাদের মালপত্রগুলো স্পর্শও করে নি। অন্য আর একজন বলল—'ঠিকই বলেছ। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের প্যাসিফিক আইল্যান্ডে পৌঁছবার আগে বেশি খাবার-দাবার ব্যবহার করা ঠিক হবে না। অনেকটা পথ খাবার ফুরিয়ে গেলেই কেলেঙ্কারীর একশেষ হবে।'

জলদস্যুদের মধ্যে একজন উন্মাদের মতো হেসে বলে উঠল—'পৃথিবীর শেষ প্রান্তের বাতিঘর তবে আমরা অন্ধকার করে ছাড়লাম, তাই না?'

ষণ্ডামার্কা সেই মাতব্বর প্রথম মুখ খুলল—'আমরা বিদায় নেবার আগেই চোরা-পাহাড়গুলোতে ধাক্কা খেয়ে দু-একটা জাহাজ গুঁড়িয়ে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস, আর এরই ফলে আমাদের আরো কিছু প্রাপ্তিযোগের নিশ্চিত সম্ভাবনা।'

'হ্যাঁ, বরাত আমাদের ভালো, বলতেই হবে। স্কুনারটাকে ফাঁকাই, রক্তপাত না ঘটিয়েই ওটাকে পাওয়া গেল। পুরো ব্যাপারটাই যেন স্বপ্নের মতো ঘটে যাচ্ছে, কি বল?'

গুহার মুখে লুকিয়ে থেকে আলোকরক্ষক ভ্যাসকুয়েজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। তার বুঝতে অসুবিধে হল না, জলদস্যুরা কি করে জাহাজটাকে হাতিয়েছে।

'এবার তবে আমাদের কর্তব্য কি, কংগ্রি?'

ভ্যাসকুয়েজ যাকে এতক্ষণ জলদস্যুদের মাতব্বর বলে ধরে নিয়েছিল, সেই গাট্টাগোট্টা লোকটা জবাব দিল—'মউলে ফিরে যাব। গুহার জিনিসপত্র এভাবেই থাকবে। জাহাজ মেরামতির কাজ শেষ হলে চিন্তা করা যাবে তখন। তবে মেরামতি কাজের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি দরকার, নৌকোয় তুলে নাও।'

জলদস্যুরা অত্যাবশ্যকীয় কিছু জিনিসপত্র নৌকায় তুলে হৈ হৈ করতে করতে চলে গেল!

www.pathagar.com

জলদস্যুরা বিদায় নিলে ভ্যাসকুয়েজ ভাবল, আর কিছু না হোক, গুহামুখের পাথরটা সরিয়ে অন্তত কিছুদিনের মতো রসদ বের করে নিতে হবে।

কংগ্রির নির্দেশে তার সাকরেদরা জাহাজ মেরামতির কাজে লেগে গেল। আর কংগ্রি নিজে? সে বাতিঘরের লেজার খাতাটায় চোখ রাখল। লেজার লেখা রয়েছে,—'প্রতি তিন মাস অন্তর বাতিঘরের সাহায্যে জাহাজ আসবে।' সে হিসাব করে দেখল, সবে একমাস মাত্র হয়েছে, দু-মাস এখনো বাকি। অতএব প্রচুর সময় হাতে রয়েছে। সে নিশ্চিন্ত হল। খাতা দেখে আলোকরক্ষী তিনজনের নামও জেনেছে—মরিস, ফিলিপ আর ভ্যাসকুয়েজ! দুজন মারা গেছে চোখের সামনেই। অতএব একজন দ্বীপের কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তবে তাকে নিয়ে তেমন কিছু চিন্তার নেই। সে একা আর কি করতে পারবে? দ্বীপে পালিয়ে পালিয়ে বাঁচবে কতদিন? না খেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরতে হবে শেষপর্যন্ত।

তেসরা জানুয়ারি রাত্রের দিকে আবহাওয়া আকস্মিকভাবে বদলে গেল। আকাশের দক্ষিণে দেখা দিল জমাটবাঁধা কালো মেঘ। ষোল ডিগ্রি তাপমাত্রা দেখতে দেখতে বেড়ে গেল। সুরু হল ঝড়ের তুমুল তাণ্ডব। সমুদ্র রুদ্ররূপ ধারণ করল। প্রচণ্ড আক্রোশে মাথা-সমান ঢেউ তীরে এসে আছড়ে পড়তে লাগল। কপালের জোর না থাকলে জলদস্যুরা মউলকে রক্ষা করতে পারত না। কংগ্রি বাড়তি একটা নোঙর ব্যবহার করে জাহাজটাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করল। তবু বলতে হবে বরাতের জোরেই জাহাজটা রক্ষ পেয়েছে। নইলে সেটা এক আছাড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেত চোখের সামনে।

পুরো একটা সপ্তাহ ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করেই জলদস্যুদের কেটে গেল! শেষপর্যন্ত বারই জানুয়ারি তারিখে ঝড়ের তাণ্ডব কিছুটা স্তিমিত হল। ইতিমধ্যে একটামাত্র জাহাজ ঝড়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে স্টেটেন আইল্যান্ড-এর ধার দিয়ে গেছে। তিন মাইল দূর দিয়ে যাচ্ছিল বলে বাতিঘর সক্রীয়, কিনা বুঝতে পারল না জাহাজের আরোহীরা। ভ্যাসকুয়েজ হাত নেড়ে সংকেত দেবার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু হায়! এতদূর থেকে কিছু দেখতে পায় নি, বুঝতেও পারে নি। অনন্যোপায় হয়ে হতাশ মনে তাকে হাত নামিয়ে নিতে হল।

ঝড়ের তাণ্ডব মউল-এর খুবই ক্ষতি করে দিয়ে গেছে। বারই জানুয়ারি কংগ্রি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখে বুঝল, মেরামতের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে, সময় তো কম লাগবে না। সে আরো বুঝল, জাহাজটাকে চড়ায় না তুললে মেরামত অসম্ভব। বাধ্য হয়েই জোয়ারের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

কংগ্রি এবার সারসাঁতেকে নিয়ে সেই পুরনো গুহাটায় গেল। জোয়ারের জন্য যখন কয়েকদিন অপেক্ষা করতেই হবে, ইতিমধ্যে নৌকো করে গুহা থেকে সোনা রূপা, আর মূল্যবান জিনিস যা কিছু আছে, নিয়ে এসে কাজ কমিয়ে রাখা যাক। নৌকোয় বসে কংগ্রি চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখল। বলা তো যায় না, আত্মগোপনকারী তৃতীয় আলোকরক্ষী পাহাড়ের আড়ালে কোথাও ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে। পিস্তলের দুটোমাত্র গুলিই তাদের দুজনকে ঘায়েল করার পক্ষে যথেষ্ট। না, কোথায় কাউকে দেখা গেল না। বেলা প্রায় এগারটায় তারা গুহার মুখে পৌঁছল। পাথরটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল তারা। বাঃ চমৎকার! সব ঠিকঠাকই আছে দেখতে পেল। গুহাটা ছিল মালপত্রে একেবারে ঠাসা। ছোটখাট আলো জ্বেলেও বোঝার সাধ্য কি কেউ কিছু সরিয়েছে কিনা?

www.pathagar.com

মালপত্র তুলে ডিঙি বোঝাই করে সেখান থেকে রওনা দেবার পূর্ব-মুহূর্তে কংগ্রি তাড়াতাড়ি পাহাড়ের ওপর উঠে গেল। চূড়োয় দাঁড়িয়ে চারদিকে ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগল ধারে কাছে কাউকে দেখা যায়, কি না? আসলে সে তৃতীয় আলোকরক্ষীর খোঁজ করছে। সন্দেহজনক কিছু দেখতে না পেয়ে সে নেমে এল। তিনটের কাছাকাছি মউল-এর কাছে পৌঁছল তারা।

ষোলোই জানুয়ারি জোয়ার এল। জলদস্যুরা পূর্ণ উদ্যমে জাহাজ মেরামতির কাজে লেগে গেল। পনের দিন একটানা কাজ চলল। মাঝে মধ্যে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও আবহাওয়া তেমন একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নি।

কয়দিনের মধ্যে স্টটেন আইল্যান্ডে দুটো মাত্র জাহাজ চোখে পড়েছে। তার মধ্যে প্রথম জাহাজটা ছিল ইংরেজদের। সে দুপুর বেলা এ-অঞ্চল অতিক্রম করেছে। অতএব বাতিঘরের দিকে তাকাবার দরকার পড়েনি। আর দ্বিতীয়টা? রাতের অন্ধকারে বোঝা যায় নি, কোন দেশের জাহাজ। জাহাজটা হয়তো কয়েক মাস ধরে সমুদ্রে ঘুরছে, হয়তো বাতিঘর তৈরির কথা জানেই না। ঘুটঘুটে অন্ধকার থাকায় ভ্যাসকুয়েজ কোনোরকম সঙ্কেত দেবার প্রয়োজন বোধ করে নি। লাভও তো ছিল না কিছু, কে দেখতে পেত তাকে। দূর সমুদ্র দিয়ে আরো কয়েকটা জাহাজ এ-অঞ্চল দিয়ে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এত দূর দিয়ে চলে গেছে, হিসেবের মধ্যেই পড়ে না।

স্কুনার-এর মেরামতির কাজ প্রায় শেষ হল। একত্রিশে জানুয়ারি আবার আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন ঘটল। আবার ঝড়, মুষলধারে বৃষ্টি, মেঘের সুতীব্র গর্জন। কংগ্রি ও তার সাকরেদরা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করল, জাহাজটাকে রক্ষা করতে। শেষপর্যন্ত করলও তাই।

কংগ্রি ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার তাদের সেই পুরনো গুহায় যাতায়াত করে মালপত্র এনে জাহাজে তুলেছে। গুহার ভেতরে মালপত্রের সঙ্গে কয়েকটা রঙ-এর টিনও ছিল। সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে দিল সে। সাকরেদদের লাগিয়ে দিল জাহাজের নামটা বদলানোর কাজ। বড় বড় হরফে নতুন নাম লেখা হল 'সারসাঁতে'।

চৌদ্দই ফেব্রুয়ারি ভরা জোয়ারে সারসাঁতের নোঙর তোলার চেষ্টা চলছে। আর দেরি নেই সমুদ্রে কাঁপিয়ে সে এগিয়ে যাবে দূর দূরান্তের উদ্দেশ্যে। কংগ্রির এতদিনের স্বপ্ন আজ সত্যি সত্যি বাস্তবরূপ নিতে চলেছে।

স্কুনারটা স্টটেন আইল্যান্ডে নোঙর করার পর থেকেই ভ্যাসকুয়েজ গুহার গোপন আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছে। ইচ্ছে করলে সে অনায়াসেই দ্বীপের ভেতরের দিকে চলে যেতে পারত। কিন্তু সে-চেষ্টা সে করে নি। মনে তার প্রতিশোধের সুতীক্ষ্ণ আগুন ধিক ধিক করে জ্বলছে। আর ক্ষীণ আশার আলো যে সে মনের গভীরে পোষণ করে নি, তা নয়। তার কাছাকাছি দিয়ে কোনো জাহাজ গেলে হাতের ইশারা করে দাঁড় করাবে। জাহাজে উঠে ক্যাপ্টেনকে জলদস্যুদের ব্যাপারটা খুলে বলবে। এভাবে প্রতিশোধ নিতে না পারা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। নিজের জীবনের জন্য সে মোটেই ভাবিত নয়। জলসদ্যুদের গুহা থেকে রসদ এনে নিজের গুহায় জমা রেখেছে, উপোষ করে অন্তত মরতে হবে না তাকে।

সে জানে পুরো দু-মাস পরে সাঁতা-ফি এখানে আসবে। কিন্তু এর মধ্যেই জাহাজটা হয়তো বা প্যাসিফিক আইল্যান্ড-এর দিকে রওনা হয়ে যাবে। আর তা-ই যদি হয় তার

www.pathagar.com

পক্ষে তখন আর কিছুই করার থাকবে না। জলদস্যুদের গুহা থেকে তার গুহাটা খুবই কাছে। যে-কোনো সময় তারা তার খোঁজ পেয়ে যেতে পারে। মুহূর্তের মধ্যেই তার সব আশায় ছাই পড়বে। খোঁজাখুঁজি করে সামান্য দূরে সে আর একটা নিরাপদ গুহার খোঁজ পেল। রাতের অন্ধকারে মজুত খাবার দাবারগুলো নিয়ে নতুন গুহাটায় চলে গেল।

সারাদিন ভ্যাসকুয়েজকে প্রায় অন্ধকার গুহায় কাটাতে হয়। সন্ধ্যায় জলদস্যুদের আসার সম্ভাবনা থাকে না। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে গুহা থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে। তার মাথায় সর্বক্ষণ একটা মাত্র চিন্তাই অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে, কি করে জলদস্যুদের নৃশংস অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে? অপরাধীদের প্রাপ্য শাস্তি দিতেই হবে তাকে।

কিন্তু কি করে প্রতিশোধ নেবে সে? জলদস্যুরা বাতিঘরের লেজার খাতা থেকে অবশ্যই জেনে নিয়েছে। দু-মাসের আগে সাঁতা-ফি এদিকে আসছে না। অতএব যত অসুবিধাই থাক, এর আগেই তারা জাহাজ নিয়ে এখান থেকে চম্পট দেবেই।

সেটা ছিল ষোলোই ফেব্রুয়ারি। সেদিন ভ্যাসকুয়েজ-এর অস্থিরতা দারুণভাবে বেড়ে গেল। সময় চলে যাচ্ছে। কি করবে সে? কাকে ডাকবে? কার সাহায্য নেবে, জলদস্যুদের জঘন্য কাজের প্রতিশোধ নিতে? অস্থিরচিত্ত ভ্যাসকুয়েজ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল বাতিঘর-এর দিকে। চারদিকে ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার কারো সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা ছিল না। পুরো তিন মাইল হাঁটলে তবে বাতিঘর। রাত নয়টায় বাতিঘর-এর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। স্কুনারটাকে দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে। জলদস্যুরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সে মনে মনে বলে উঠল—'জাহাজটায় আগুন ধরিয়ে দিতে পারলে হত!'

সকাল হল। খাবার ফুরিয়ে গেছে। জলদস্যুদের গুহায় গেল খাবার সংগ্রহ করতে। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে লাগল। দস্যুরা মালপত্র নিয়ে যেতে গুহায় আসতে পারে। ধরা পড়ে গেলে কেলেঙ্কারী! প্রাণ যাক, কিন্তু প্রতিশোধ যে নেওয়া হবে না তার। খাবার খুঁজতে গিয়ে হতাশ হতে হল তাকে। ঠেলাঠেলি করে গুহার মুখ থেকে পাথরটা সরিয়ে দিয়ে ভেতরে গেল। মালপত্র কিছু আছে বটে, খাবারগুলো জাহাজে নিয়ে গেলে ভ্যাসকুয়েজ-এর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম হবে। মাত্র তিন-চারদিনের খাবার তার কাছে রয়েছে। তারপর শুরু হবে বিরম্বু উপবাস।

ইতিমধ্যে গুহার বাইরে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে ভ্যাসকুয়েজ রীতিমতো আৎকে উঠল। এখন উপায়? গুহা থেকে পালাবার পথ বন্ধ। সে উপায়ন্তর না দেখে গুহার একেবারে শেষপ্রান্তে চলে গেল, মালপত্রের আড়াল লুকিয়ে থাকল। সেখানে বসে সে মনস্থির করে নিল, ধরা যদি পড়ে-ই সহজে মৃত্যুবরণ করবে না। দু-একটাকে অন্তত সঙ্গে নিয়ে যাবে। কোমর থেকে পিস্তলটা তুলে তৈরি হয়ে বসল। সারসাঁতে হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে গুটিগুটি গুহার ভেতরে ঢুকে গেল। তার পিছন পিছন গেল ভ্যার্গাস নামে অন্য এক দস্যু। মালপত্র বের করতে গিয়ে তারা বলাবলি করছে—'আজ সতেরই ফেব্রুয়ারি। আর নয়, এবার এখান থেকে চম্পট দিতে হবে।'

সারসাঁতে বলল—'আবহাওয়া জাহাজ চালানোর অনুকূল থাকলে কালই আমরা এখান থেকে রওনা দিচ্ছি। কিন্তু বরাত খারাপ হলে, দিন সাতেক এখানে পড়ে থাকতে হলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে সাঁতা-ফি ভিড়ে যাবে।'

www.pathagar.com

কথা বলতে বলতে সারসাঁতে আর ভ্যার্গাস লণ্ঠনহাতে এদিক ওদিক দেখে বুঝল, তেমন কোনো দরকারি জিনিস আর নেই। একসময় তারা প্রায় ভ্যাসকুয়েজ-এর গা ঘেঁষে চলে গেল। পিস্তলটা ব্যবহার করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। সামান্য কিছু দরকারি মালপত্র নিয়ে তারা গুহা থেকে বেরিয়ে গেল। ভ্যাসকুয়েজ এবার নিরাপদ। গুঁটি গুঁটি জলদস্যুদের গুহা থেকে বেরিয়ে নিজের গুহায় চলে গেল। এই মুহূর্তে তার একমাত্র চিন্তা, মাত্র দু-দিন পরে তার আর এক কণাও খাবার থাকবে না। আর বাতিঘরে? জলদস্যুরা কি আর সেগুলো রেখে যাচ্ছে? অতএব একটানা বিরম্বু উপবাস।

আকাশে একটু একটু ক'রে মেঘ জমতে শুরু করেছে। বাতাসে পড়ে গেছে। সন্ধ্যার দিকে আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখে কংগ্রি ও তার সাকরেদদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম। শুরু হল ঝড়! সমুদ্র উত্তাল রূপ ধারণ করল। পরিস্থিতি এভাবে উত্তরোত্তর পরিবর্তন হতে থাকলে জাহাজ ছাড়বে কী করে?

ভ্যাসকুয়েজ-এর মুখ্যে হাসির রেখা ফুটে উঠল। সে ঝড়ের মধ্যেই গুহার বাইরে এসে দাঁড়াল। উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের দিকে তাকাল। সমুদ্রের বুকে কি যেন কালো মতো একটা তার নজরে পড়ল। জাহাজ! হ্যাঁ, জাহাজ! একটা জাহাজ! এই দ্বীপের দিকেই এগোচ্ছে বটে।

দেখতে দেখতে ঝড়ের তাণ্ডব প্রচণ্ড রকম শুরু হয়ে গেছে। ঘূর্ণিঝড়! কী কেলেঙ্কারী ব্যাপার! জলদস্যুরা বাতি ঘরটা অন্ধকার করে রেখেছে। জাহাজটা নির্ঘাৎ বাতি-ঘরের আলো খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা জানতেও পারবে না, কয়েক মাইলের মধ্যে যে একটা দ্বীপ রয়েছে। ঝড়ের মুখে পড়ে উল্কার বেগে ছুটে আসছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই চোরাপাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে গুড়োগুড়ো হয়ে যাবে।

জাহাজটার দিকে নিষ্পলক চোখে ভ্যাসকুয়েজ তাকিয়ে রইল। সে অসহ্য উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগল। কিন্তু জাহাজটার পরিণতির কথা বুঝেও কি-ই বা করতে পারে সে? হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধি খেলল—জাহাজের লোকজন কোনোক্রমে যদি জানতে পারে এখানে স্থল আছে, অবশ্যই গতিপথ পাল্টে দেবে। দু-দিন ধরে তুমুল ঝড় হচ্ছে বটে, বৃষ্টি হয় নি এক ফোঁটাও। তাই শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করতে অসুবিধা হল না। এবার সে আগুন জেলে জাহাজকে বিপদ-সংকেত দিল।

কিন্তু হায়! ভ্যাসকুয়েজ-এর এত চেষ্টা সবই বিফলে গেল। বড়ই দেরি হয়ে গেছে। সমুদ্রতীর থেকে সামান্য দূরে জাহাজটা বার কয়েক ঘুরপাক খেয়ে চোরা পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ল। ব্যস, সব শেষ! মুহূর্তের মধ্যে এতবড় জাহাজটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল!

সকাল হল। ঝড়ের তাণ্ডব একই রকম রয়েছে। সমুদ্রের ওপর দিয়ে সুতীব্র গর্জন করে ছুটোছুটি দাপাদাপি শুরু করে দিল। ঝড়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমুদ্রও উন্মাদনায় মাতল।

ভ্যাসকুয়েজ ভাবল, স্কুনারটার সকালে নোঙর তোলার কথা ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে সেটা আর সম্ভব হয় নি হয়তো! সে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। সমুদ্রের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, গতরাতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজটাকে। জাহাজটার ভাঙা টুকরোগুলোর কিছু কিছু কাৎ হয়ে পড়ে থাকতে দেখল সে। ভাবল, তবে কি জলদস্যুরা

www.pathagar.com

এ-ব্যাপারটা এখনো জানে না? নইলে এতক্ষণে লুঠতরাজ শুরু করে দিত। সাহসে ভর করে সে সমুদ্রের তীর ধরে জাহাজটার আরো কাছে গেল। কাৎ হয়ে থাকা জাহাজটার গায়ে লেখা দেখল—'সেঞ্চুরি' মবিল। 'সেঞ্চুরি'? হ্যাঁ, আমেরিকান জাহাজ। যুক্তরাষ্ট্রের আলবা প্রদেশের রাজধানীর জাহাজ এই 'সেঞ্চুরি'। জাহাজের কেউই প্রাণে বাঁচে নি।

ভ্যাসকুয়েজ জীবনের মায়া তুচ্ছ করে অতি কষ্টে জাহাজে গিয়ে উঠে পড়ল। কোনোরকমে হাঁটাচলা করল কিছুটা। একটাও মৃতদেহ দেখতে পেল না। হতভাগ্যগুলো স্রোতের টানে কোথায় ভেসে গেছে, কে বলতে পারে।

জলদস্যুরা হয়তো ব্যাপারটা জানে না। নিজেদের জাহাজ রক্ষা করতেই তারা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছে রাতভর। এ-পরিস্থিতিতে অন্যের জাহাজ লুট করার চিন্তা তো মাথায় আসার কথা নয়। ঘোরাফেরা করতে করতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল সে। এই মুহূর্তে তার সবচেয়ে বেশি করে যা দরকার সেই খাদ্য বস্তু প্রচুর পড়ে রয়েছে, দেখল। কয়েকটা শুকনো মাংসের টিন, ও বেশ কয়েকটা বিস্কুটের টিন দেখে খুশিতে তার মনটা ভরে উঠল। কিছু না হলেও দু-মাসের জন্য সে নিশ্চিত হল। কোনোরকম চিন্তা না করেই খাবার টিন কটা নিজের গুহায় রাখতে গেল। গুহার কাছাকাছি গিয়ে সে কার যেন করুণ আর্তনাদ শুনতে পেল। খাবারের টিনগুলো কাঁধ থেকে নামিয়ে আর্তনাদের উৎস সন্ধানে ছুটল। কাছে গিয়ে দেখল, বছর চল্লিশের একজন অচেনা মানুষ মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। তার গায়ে কোনো ক্ষতের চিহ্ন নেই। পোশাকে রক্তের দাগও চোখে পড়ল না। সে ভাবল, লোকটা হয়তো 'সেঞ্চুরির' একমাত্র জীবিত ব্যক্তি।

ভ্যাসকুয়েজ নিচু হয়ে যন্ত্রণাকাতর লোকটার কাঁধে হাত রাখতেই সে উঠে বসার চেষ্টা করল, পারল না। ভ্যাসকুয়েজ তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলল, 'ভয় নেই বন্ধু। আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।' কথা কটা শেষ করেই সে লোকটাকে কাঁধে তুলে নিল, নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করে তুলবে বলে। জলদস্যুরা এসে পড়লে একূল-ওকূল দু-কূলই যাবে। সে লোকটাকে নিয়ে নিজের গুহায় হাজির হল। সাবধানে শুইয়ে দিল পাথরের ওপর। বেশ কিছুক্ষণ পরে লোকটা কিছুটা সুস্থ হল। চোখ মেলে তাকাল। ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করল—'জল! একটু জল দিতে পার?'

ভ্যাসকুয়েজ তাড়াতাড়ি জল এনে তার মুখে দিল। লোকটা কোনোরকমে উঠে বসল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ভ্যাসকুয়েজ-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি এখন কোথায়! তুমি কে? আমি এখানে কি করে এলাম?'

'তুমি নিরাপদ আশ্রয়েই আছ। ভয় নেই। সেঞ্চুরি দুর্ঘটনায় পড়লে তুমি তীরে এসে পড়েছিলে।'

'সেঞ্চুরি? আমাদের সেঞ্চুরি কোথায়?'

'তোমার নাম কি? তুমিই কি সেঞ্চুরির ক্যাপ্টেন ছিলে?'

'আমার নাম জন ডেভিস। জাহাজের ক্যাপ্টেন নয়, মেট ছিলাম আমি। আমাদের জাহাজের আর সবাই কোথায়?'

'নেই। সবাই জাহাজ দুর্ঘটনায় মারা গেছে।'

মর্মান্তিক খবরটা শোনামাত্র জন ডেভিস মুষড়ে পড়ল। ভ্যাসকুয়েজ কিছু ব্রান্ডির সঙ্গে ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে তার মুখের কাছে ধরল। সে ঢকঢক করে সবটুকু জল খেয়ে নিল। এখন কিছুটা সুস্থ বোধ করছে, মনে হল। এবার সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে লাগল

www.pathagar.com

'সাড়ে পাঁচ শ' টন ভারবাহী জাহাজ। সেঞ্চুরি মবিল বন্দর থেকে তিন সপ্তাহ আগে যাত্রা করেছিল। জাহাজটা ছিল ক্যাপটেন হেনরির কর্তৃত্বাধীন। হেনরি ও জন ডেভিস ছাড়া আরো বারজন নাবিক কর্মরত ছিল। স্টটেন আইল্যান্ডের কাছাকাছি জাহাজ পরিচালনা করা নাবিকদের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। ভীষণ ঝড়ই এর একমাত্র কারণ। ক্যাপ্টেন আশা করেছিলেন, অন্তত দশ মাইল দূর থেকে বাতির সংকেত দেখতে পাবেন। কিন্তু কার্যত কোনো আলো না দেখে তিনি ভাবলেন, স্টটেন আইল্যান্ড থেকে অনেক দূরে রয়েছেন। আচমকা জাহাজটা সমুদ্রতীরের শক্ত পাথরের আছড়ে পড়ল। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল।'

কথা কয়টা কোনোরকমে শেষ করে ডেভিস একটু দম নেবার জন্য থামল। এক সময় আবার বলল, 'এটা কোন জায়গা? আমি এখন কোথায়?'

ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'স্টটেন আইল্যান্ড।'

'তাই যদি হয় তবে বাতিঘরটা কোথায়?'

'বাতিঘর আছে ঠিকই। কিন্তু আলো জ্বালা হয় নি।'

ভ্যাসকুয়েজ তখন জলদস্যুদের কাণ্ড কারখানার কথা বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। জন ডেভিস তার কথা শুনে রীতিমতো আৎকে উঠল, 'কী কেলেঙ্কারী কারবার! জলদস্যুরাই তবে বাতিঘর দখল করেছে! তারাই ইচ্ছাকৃত বাতিঘরের আলো জ্বালে নি। তাদেরই জন্য সেঞ্চুরি ধ্বংস হল?'

এবার ভ্যাসকুয়েজ জলদস্যুদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর কথা ব্যক্ত করল। তারা সে অবাধ লুঠতরাজের জন্য প্যাসিফিক আইল্যান্ডকে বেছে নিয়েছে সে-কথাও বলল! এরকম ঝড়-তুফানে জাহাজ এক সপ্তাহের মধ্যে নোঙর তুলতে পারবে না, দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল।

ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়ে জন ডেভিস বলল, 'তারা যতক্ষণ এখানে থাকবে ততক্ষণ অবশ্যই বাতিঘরের আলোর সঙ্কেত দেওয়া হবে না। সেঞ্চুরির মতো বহু জাহাজই তবে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই যদি হয় অন্য জাহাজকে এ-অঞ্চলে দেখামাত্র সাবধান করে দিতে হবে, কি বল?'

'সে তো নিশ্চয়। সেঞ্চুরিকে সাবধান করে দিতে আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি বন্ধু। বাতাস এমন জোরে বইতে লাগল যে, আগুন জ্বালতেই পারলাম না।'

'তুমি একা পেরে ওঠোনি। কিন্তু আমাদের দু-জনের চেষ্টায় নিশ্চয়ই তা সম্ভব হবে। সেঞ্চুরির ভাঙা টুকরোগুলো তো রয়েছেই, আগুন জ্বালাতে অসুবিধা হবে না। জলদস্যুরা যতদিন এখানে থাকবে ততদিন চেষ্টা করব আগুন না জ্বালাতে।'

'ভালো কথা। আবহাওয়ার একটু পরিবর্তন হলে কংগ্রি তার দলবল নিয়ে এখানে থেকে কেটে পড়বে! কারণ, তারা ভালোই জানে, বাতিঘর রক্ষীদের ছুটি দিয়ে অন্য লোক নিয়োগ করতে, কয়েক দিনের মধ্যেই সাঁতা-ফি এখানে আসছে।'

'তবে কয়েকদিনের মধ্যেই একটা জাহাজ স্টটেন আইল্যান্ডে ভিড়বেই, তাই না?'

'হ্যাঁ, ভিড়বে। ব্যুয়নস-এরিয়স থেকে যাত্রা করে মার্চের দশ তারিখের কাছাকাছি এখানে নোঙর করবে।'

'ঈশ্বর সহায় হলে জলদস্যুদের উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব! এ-কটা দিন ঈশ্বর যেন আবহাওয়া এর চেয়ে খারাপ করেই রাখেন। সাঁতা-ফি কোনোরকমে পৌঁছে গেলেই কাজ হাসিল, জলদস্যুগুলোকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ছাড়ব।'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ, বন্ধু, আমিও ঈশ্বরের কাছে দিনের পর দিন এ প্রার্থনাই করছি। এত করে ডাকছি, কিছুতেই মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারবেন না।'

কংগ্রি মহা সমস্যায় পড়ল। ঝড়ের তাণ্ডব যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমুদ্রের উম্মাদনাও বাড়ছে বৈ এতটুকুও কমছে না। ঝড়ের গতিবিধি দেখে কংগ্রি ধরেই নিয়েছে, এক মাসের আগে আবহাওয়া পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। কপালে যা লেখা আছে কেউ তা খণ্ডন করতে পারবে না। তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজটার কাছ থেকে একবারটি ঘুরেই আসি। মূল্যবান জিনিসপত্র পেলে সাকরেদদের দিয়ে জাহাজে এখানে তুলে নেওয়া যাবে।

কংগ্রি একটু চেষ্টা করলে বাতিঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে জাহাজটাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারত। কিন্তু কি লাভ হত তাদের। বরং ধ্বংস হলে কিছু না কিছু তাদের ভাণ্ডারে উঠবেই।

একটা ডিঙি নিয়ে কংগ্রি সদলবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজটার কাছে গেল। ব্যাপারটা জন ডেভিস আর ভ্যাসকুয়েজ-এর নজর এড়ায় নি। তারা গুহার মুখে দাঁড়িয়ে কংগ্রি-র নৌকোটাকে ভাঙা জাহাজটার দিকে এগোতে দেখল। এক সময় তারা দেখল, জলদস্যুরা হেলে পড়া জাহাজটায় উঠছে। ভ্যাসকুয়েজ জলদস্যুদের মাতব্বর কংগ্রি ও তার পার্শ্বচর সারসাঁতের দিকে তর্জনি তুলে জন ডেভিসকে দেখাল।

জন ডেভিস তীব্র ক্রোধে গর্জে উঠল—'একবার নাগালের মধ্যে পেলে টুকরো টুকরো করে কেটে নচ্ছার দুটোর গায়ে নুন ছিটিয়ে ছাড়ব।'

ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'কী লোভ দেখেছ বন্ধু! সোনা-রূপার খোঁজে পিশাচগুলো এ পর্যন্ত ধাওয়া করেছে।'

'সোনা-রূপা কোথা থেকে পাবে শুনি? জাহাজ হলেই বুঝি মূল্যবান সম্পদে ঠাসা থাকে? ঠিক আছে, আবহাওয়া আর কয়েকটা দিন খারাপ থাকলে তাদের নগদ পাওয়া মিটিয়ে দেব।'

জলদস্যুরা হন্যে হয়ে মূল্যবান সম্পদ খুঁজে বেড়াল। ব্যর্থ হল। শেষপর্যন্ত বড় বড় কুড়োল দিয়ে জাহাজটাকে টুকরো টুকরো করতে লাগল।

চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে ভ্যাসকুয়েজ জন ডেভিস-এর দিকে তাকাল।

জন ডেভিস বলল, 'তারা জাহাজটাকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইছে। সেঞ্চুরি নামে কোনো জাহাজ এখানে এসে বাতিঘরের আলোর অভাবে ধ্বংস হয়েছে, তার কোনো চিহ্ন রাখতে চাইছে না।'

হ্যাঁ, ডেভিস-এর কথাই ঠিক। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সারসাঁতে ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে একটা আমেরিকার জাতীয় পতাকা নিয়ে বাইরে এল। টুকরো টুকরো করে কেটে বাতাসে ছড়িয়ে দিল।

রাগে-দুঃখে-অপমানে জন ডেভিস-এর সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'দস্যুরা আমার দেশের জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলল, অপমান করল!'

বিপদের সম্ভাবনায় ভ্যাসকুয়েজ তার মুখে চেপে ধরল। তাকে থামিয়ে দিয়ে সে বলল, 'এ কী করছ বন্ধু! আমরা যে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছি। আমাদের অস্তিত্ব জানতে পারলে আর রক্ষা নেই! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুযোগ আমরা পাবই। কয়েকদিনের

www.pathagar.com

মধ্যে ঝড় থামবে না, সমুদ্রও শান্ত হচ্ছে না। সাঁতা-ফি কোনোরকমে পৌঁছাতে পারলেই—'

'মার্চের গোড়ার দিকে ছাড়া সাঁতা-ফি ফিরছে না, তুমিই তো বলেছ।'

'বলেছি, মিথ্যে নয়। কিন্তু তার আগেও তো এসে যেতে পারে। বরাত ভালো থাকলে সবই সম্ভব।

বিকেল চারটে বাজল। কংগ্রি সেঞ্চুরি নিশ্চিহ্ন করে, প্রচুর মালপত্র নিয়ে সেখান থেকে নৌকো ছাড়ল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই ঝড়ের বেগ অনেকাংশে বেড়ে গেল। ভ্যাসকুয়েজ ও জন ডেভিস গুহার বাইরে যেতে পারল না। রাত বাড়তেই আবহাওয়া প্রলয়রূপ ধারণ করল। সমুদ্র উম্মাদের মতো তীরে আছড়ে পড়তে লাগল। সমুদ্রের এরকম রুদ্ররূপে সচরাচর দেখা যায় না।

ক্রোধোম্মত্ত জন ডেভিস বলে উঠল, 'তোমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ ঈশ্বর! জলদস্যুদের জাহাজটা যেন ঝড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।'

পাগলা ঝড় সারারাত ধরে দাপাদাপি করে বেড়াল। সে সঙ্গে চলল সমুদ্রের সুগভীর গর্জন। উত্তাল সমুদ্র সেঞ্চুরির ভাঙা টুকরোগুলো ভাসিয়ে কোথায় নিয়ে চলে গেল, কে জানে। সেঞ্চুরি থেকে প্রচুর খাবারদাবার সংগ্রহ করতে পেরেছিল বলে ভ্যাসকুয়েজ কিছুটা নিশ্চিন্ত। সেগুলো ফুরোতে ফুরোতে সাঁতা-ফি অবশ্যই স্টেটেন আইল্যান্ডে পৌঁছে যাবে।

জন ডেভিস বলল, 'মনে রেখো বন্ধু, ঈশ্বর অবশ্যই জলদস্যুদের পাপের শাস্তি দেবেন। মর্তভূমিতেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে শয়তানগুলোকে।'

দেখতে দেখতে একুশে ফেব্রুয়ারি চলে গেল। বাইশ তারিখেও ঝড়ের তাণ্ডব এতটুকুও কমল না। সমুদ্র উত্তাল। আকাশছোঁয়া সফেন ঢেউ তীব্র আর্তনাদ করে তীরের পাথরে আছড়ে পড়তে লাগল।

সকাল হল। তেইশে ফেব্রুয়ারির সকাল। আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তন লক্ষিত হল বটে। কিন্তু সে আর কতটুকু? ঝড়ের বেগ তেমনই রইল, বৃষ্টিটা কেবল একটু কমল। সমুদ্র আগের মতোই ভয়ঙ্কর রয়ে গেল।

তিন তিনটে দিন গুহার ভেতরে কাটিয়ে তেইশ তারিখ সকালে দুজনে বাইরে বেরল। গুহা থেকে সামান্য দূরে যেতেই মাটিতে প্রোথিত কি যেন একটা জিনিসে হোঁচট খেয়ে জন ডেভিস পড়ে গেল, কোনোরকমে উঠে দাঁড়াল। পিছনে ফিরে ব্যাপারটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখে একটা ধাতুর বাক্স। গোলা বারুদে বোঝাই বাক্সটা। তার গায়ে বড় বড় হরফে 'সেঞ্চুরি' লেখাটা চোখে পড়ল। সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'গোলা-বারুদগুলো আমাদের কাজে লাগাতে হবে। শয়তানগুলোর ওপর প্রয়োগড় করব। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি জলদস্যুদের জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারতাম, গায়ের ঝাল মিটত।'

কথা বলতে বলতে তারা সমুদ্রের তীর ধরে আরও কিছুটা এগিয়েই ভ্যাসকুয়েজ থমকে দাঁড়াল। সমুদ্রের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'সমুদ্রের জলে কামানের মতো কী একটা দেখা যাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, সেরকম তো মনে হচ্ছে। চলো এগিয়ে গিয়ে দেখি, ব্যাপারটা কী? মুহূর্তমাত্র দেরি না করে তারা দৌড়ে ওটার কাছে গিয়ে নিঃসন্দেহ হল। হ্যাঁ, কামানই বটে।

www.pathagar.com

সমুদ্রের তীর ঘেঁষে ওটা পড়ে রয়েছে। সেখানে মাত্র হাত দুই জল হবে। ভ্যাসকুয়েজ জলে নেমে গেল তরতর করে। জন ডেভিসও আর নিশ্চিন্তে তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ভ্যাসকুয়েজ কামানটার বিপরীত দিকে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'সেঞ্চুরি! সেঞ্চুরি-র নাম লেখা রয়েছে।' সে ডেভিসকে লক্ষ্য করে বলল, 'বন্ধু এটা তোমার সম্পত্তি।'

'হ্যাঁ, তা-ই তো দেখা যাচ্ছে। কামান দেখে আমরা সঙ্কেত করতাম! গোলাবারুদ আর কামান, দুই-ই যখন পাওয়া গেছে অবশ্যই কাজে লাগাচ্ছি।'

'আমার বিশ্বাস, সে সুযোগ আমরা পাব না। তবে আর কিছু না পারি কামান দেগে বিপন্ন কোনো জাহাজকে তো সতর্ক করে দিতে পারবই।'

'ভালো কথা! কিন্তু এতেই কি তুমি সন্তুষ্ট?'

'হ্যাঁ, সন্তুষ্ট। কামান-দাগলে জলদস্যুরা আমাদের উপস্থিতি বুঝে ফেলবে, নির্মমভাবে হত্যা করতে পারে। তবু একটা জাহাজকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছি, অন্তত একটুকু সান্ত্বনা নিয়ে তো মরতে পারব!'

কথা বলতে বলতে অমানুষিক পরিশ্রম করে তারা ঠেলে-ধাক্কে কামানটাকে ওপরে তুলে আনল। গোলা বারুদের বাক্সটাকেও নিয়ে গেল নিরাপদ জায়গায়।

রাত্রে শুয়ে জন ডেভিস বলল, 'বন্ধু, একটা কথা বলছি শোন, তুমি আমার জীবনরক্ষা করেছ। তাই তারই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজই আমি করব না। মাথায় একটা মতলব এসেছে। শুনে বলবে সেটা অনুমোদনযোগ্য কি না?'

'শুনি তোমার মতলবটা কি?'

'আবহাওয়ার পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, দ্রুত পরিবর্তনের পথে। শীঘ্রই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঝড় যাবে থেমে, সমুদ্রও শান্ত হবে। জলদস্যুরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। জাহাজ ছেড়ে দেবে আর তাই-যদি হয় তবে তোমার সঙ্গীদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া হবে না। আর 'সেঞ্চুরিটা' ধ্বংস করার জন্য কোনো শাস্তিই তারা পাবে না।'

'কি বন্ধু, তোমার মতলবটা কি, তা তো বললে না।'

'বলছি শোন, এই মুহূর্তে আমাদের সামনে একটামাত্র পথই খোলা। জলদস্যুরা দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার আগে স্কুনারটাকে গুঁড়িয়ে দিতে চাচ্ছি! আমাদের কামান আর গোলাবারুদ সবই বৃথা যাবে না কি? আমাদের যত কষ্টই হোক, কোনোরকমে কামানটাকে ঠেলে-ধাক্কে টিলার ওপর তুলে নেব। ঠেসে ঠেসে বারুদ ভরে দেব। জলদস্যুদের জাহাজটা যখন টিলার কাছ দিয়ে যাবে, সেই মুহূর্তে কামান দেগে তাকে গুঁড়িয়ে দেব। আশাকরি তখন আর তার দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার মতো অবস্থা থাকবে না। ব্যস, কয়দিনের জন্য এখানেই আটকা পড়ে থাকবে। মেরামত করতে অন্তত দু-সপ্তাহ সময় লেগে যাবে। এর মধ্যে সাঁতা-ফি নিশ্চয়ই এসে যাবে।'

ডেভিস-এর মন্তব্যে ভ্যাসকুয়েজ-এর বুকের মধ্যে দীর্ঘদিন পুষে রাখা প্রতিহিংসার আগুনটা হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল।

সেটা ছিল পঁচিশে ফেব্রুয়ারি। দ্বীপের বুকে ফুটে উঠল ভোরের রক্তিম আভা। শেষ রাত থেকেই আবহাওয়ার দারুণ পরিবর্তন দেখা গেল। আকাশে মেঘ নেই, ঝড়ের তাণ্ডব নেই বললেই চলে। উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্র শান্ত সৌমভাব ধারণ করল। কংগ্রি কেবিন থেকে বেরিয়ে ডেকে এসে দাঁড়াল। মনে তার অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা।

www.pathagar.com

সাকরেদদের ডেকে বলল, 'প্রকৃতি এতদিন পরে মুখ তুলে তাকিয়েছে। আর দেরি নয় আজই নোঙর তুলতে হবে! জোয়ার থাকতে থাকতে কাজ হাসিল করতে হবে। সন্ধ্যার দিকে আবার আবহাওয়া বদলে যেতে পারে। সবাই তৈরি হও। বিকেলের আগেই আমরা রওনা দিচ্ছি।'

সাকরেদরা ঘাড় কাৎ করে জাহাজ ছাড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে যার কাজে চলে গেল।

সারসাঁতে পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। সবাই চলে গেলে সে এবার মুখ খুলল, 'মাঝরাতে যদি দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে? ঘন অন্ধকারে সমুদ্র ডুবে থাকবে, তখন যদি—'

কংগ্রি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'কী বাজে বকছ! রাতের মধ্যেই আমরা অনেক দূর চলে যাব। কাল সকালেই আমরা সেন্ট বার্থোলোমিউকে পিছনে রেখে সমুদ্রে পৌঁছে যাবে আশা রাখি।'

'এখানে কিছুদিন থাকায় আমাদের খুবই লাভ হল তাই না? ভালো কথা। সেই তৃতীয় আলোকরক্ষীটা কোথায় ডুব দিল? তার যে-কোনো হদিসই পাওয়া গেল না! দু-মাস না খেতে পেয়ে সে শুকিয়ে শুটকি লেগেছে হয়তো।'

'মরুকগে হতচ্ছাড়াটা! সাঁতা-ফি আসার আগেই আমরা যে এখান থেকে কেটে পড়তে পারছি, আমাদের পিতৃপুরুষের ভাগ্য বলতে হবে!'

'বাড়িঘরের কাগজপত্র যা বলছে, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সাঁতা-ফি পৌঁছে যাবে। বাতিঘরে গিয়ে উঁচু থেকে একবার সমুদ্রটাকে দেখে আসা দরকার। যদি সমুদ্রে কোনো জাহাজ—'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কংগ্রি ধমকের সুরে বলল, 'জাহাজ আসলে আসুক। আমরা আর কেউ কাউকে পরোয়া করি না। সারসাঁতের নথিপত্র সবই ঠিকঠাক আছে। প্রশান্ত মহাসাগর আর আটলান্টিক মহাসাগর তো সবার কাছেই উন্মুক্ত। অতএব নির্ভয়ে অন্য যে-কোনো জাহাজকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারব আমরা।

একটু বেশ বেলা হবার পর সারসাঁতে বাতিঘরে গিয়ে হাজির হল। জানালা দিয়ে বার বার দূর সমুদ্রের ওপর চোখ বোলাতে লাগল সে। দেখতে দেখতে প্রায় দুঘণ্টা কেটে গেল। না, কোনো জাহাজই নজরে পড়ল না। উঠে আসতে গিয়েও আরো কিছুক্ষণ দেখা দরকার মনে করে আবার বসে পড়ল। আবার অপলক চোখে তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। আরো কিছুক্ষণ পরে দূরের, বহু দূরের একটা কালো বিন্দুর ওপর তার দৃষ্টি স্থির হল। টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে। কিছুক্ষণ পরে সেটা আরো স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। জাহাজ! কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে স্টেটেন আইল্যান্ডের দিকেই ছুটে আসছে জাহাজটা। সারসাঁতের মধ্যে কেমন চাঞ্চল্য দেখা দিল। তার শরীরের সবগুলো স্নায়ু একসঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল, কী ব্যাপার! সাঁতা-ফি নয় তো? কিন্তু ৩ মার্চের গোড়ার দিকে তো তার আসার কথা। আজ তো সবে ফেব্রুয়ারির পঁচিশ। তবে কি জাহাজটা আগেভাগেই যাত্রা করেছিল? বাতিঘর থেকে সারসাঁতের দিকে তাকাল সে। হ্যাঁ, যাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছে। বয়লারে আগুন পড়ে গেছে। কালো ধোঁয়া ছাড়ছে আকাশচুম্বি চোঙটা। কিন্তু যাই করা যাক, স্টিমারটা আসার আগে নোঙর তোলা যাবে না।

www.pathagar.com

সারসাঁতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় বাতিঘরের জানালায় বসেই রইল। কিছুই যখন করার নেই, মিছে কংগ্রিকে বিরক্ত করে কী হবে? জাহাজটা উল্কার বেগে ছুটে আসছে। তার মন ক্রমেই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল। জাহাজটা আরও কিছুটা এগিয়ে আসতেই সে কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। জাহাজটা ছোট। 'সাঁতা-ফি' এত ছোট নয়। এই তো মাস তিনেক আগে তাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি অনেকদিন। আরো কিছুক্ষণ বাদে তার উৎকণ্ঠা দূর হল। জাহাজটাকে এবার বাঁক ঘুরে কলনেট অন্তরীপের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল।

নিরুদ্বেগ মনে সারসাঁতে বাতিঘর থেকে নেমে এল।

কংগ্রিরা নির্দেশে তার সাকরেদরা সারসাঁতের নোঙর তোলার জন্য তৈরি হল। নোঙর তুললেই জাহাজটা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলবে।

ছয়টায় কংগ্রি সদলবলে জাহাজে উঠল। জোয়ারের ঢেউ জাহাজের গায়ে সশব্দে আঘাত হানতে লাগল। নোঙর উঠল। হাওয়া পেয়ে ফুলে উঠল পালটা। সাড়ে ছয়টায় অন্তরীপের শেষপ্রান্তে পৌঁছল সারসাঁতে।

কংগ্রি সোল্লাসে বলে উঠল, 'আমরা তবে সত্যি সত্যি উপসাগর ছাড়িয়ে এলাম। মিনিট কুড়ির মধ্যেই সাঁজুয়া অন্তরীপকেও ছেড়ে যাব।'

এমন সময় জলদস্যুদের একজন ব্যস্ত হয়ে কংগ্রির কাছে এসে বলল, 'হুজুর, সামনে তাকান। বলুন, এখন কী কর্তব্য?' জাহাজটা তখন জলদস্যুদের সেই গুহাটার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। পাশেই সেই জাহাজটার বড় বড় কতকগুলো টুকরো ভাসছে। সেগুলো না সরিয়ে জাহাজ নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। উপায়ান্তর না দেখে কংগ্রি জাহাজটাকে একেবারে তীরের কাছে নিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা বিস্ফোরণের ফলে জাহাজটা ভীষণরকম কেঁপে উঠল। কংগ্রি গর্জে উঠল, 'কী ব্যাপার! আমাদের লক্ষ করে কামানদাগা হয়েছে'।

কংগ্রি যেখানে কামানের গোলাটা এসে লেগেছে সেদিকে ছুটে গেল। সারসাঁতে তাকে অনুকরণ করল। জলরেখা থেকে দুই ফুটমতো উঁচুতে জাহাজের খোল ফেটে বড় একটা গর্ত হয়ে গেছে। গোলাটা আর একটু নিচে আঘাত করলেই কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত করে ছাড়ত। আবার একটা কামানের গোলা গর্জন করতে করতে এসে জাহাজের উপর আছড়ে পড়ল। এবারে গোলাটা আগেরটা থেকে কয়েক ইঞ্চি নিচেই আঘাত করল। কংগ্রি মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে লাগল জাহাজটাকে কামানের গোলার আওতার বাইরে নিয়ে যেতে। ব্যস নিশ্চিন্ত। জাহাজ এখন পাহাড়ের আড়ালে চলে এসেছে।

এবার জাহাজের ক্ষতির পরিমাণ পরীক্ষা করে দেখা দরকার। জাহাজ থেকে ডিঙিটাকে নামিয়ে দেখা হল। কংগ্রি সারসাঁতেকে নিয়ে জাহাজের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। মারাত্মক ক্ষতি না হলে এটাকে নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়ার কথা ভাবা যায় না। জল ঢুকতে শুরু করলে গুষ্টিশুদ্ধ ডুবে মরতে হবে। মেরামত করতেই হবে।

কংগ্রি গর্জে উঠল, 'এটা বোধহয় সেই তৃতীয় আলোকরক্ষীর কাজ। আর সেঞ্চুরির কোন লোককে হয়ত সে উদ্ধার করেছে। উভয়ের মিলিত প্রয়াসেই আমাদের উপর এই আক্রমণ। কামানটাও সেঞ্চুরিতেই ছিল। যাক, সে যা হয় পরে ভাবা যাবে। এই মুহূর্তে আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য জাহাজটা মেরামত করে ফেলা।'

www.pathagar.com

কংগ্রি তার বিশ্বস্ত সারসাঁতের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করল, সেই পুরনো জায়গাই ফিরে যাবে। জাহাজ মেরামতের প্রশস্ত জায়গা সেটা। কিন্তু জোয়ারের বিপরীত দিকে জাহাজ চালানো অসম্ভব ভেবে সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগল। মাঝরাতে জোয়ারের টান কমে আসায় জাহাজটাকে বাঞ্ছিত জায়গায় এনে নোঙর করল।

জলদস্যুরা গুলিখাওয়া বাঘের মত ক্ষেপে উঠল। তাদের এতদিনের সাধ্য-সাধনা মুহূর্তের মধ্যে নস্যাৎ করে দিল! এদিকে সাঁতা-ফ্রির জন্যও তারা কম ভাবিত নয়। চার পাঁচদিনের মধ্যেই যমদূত এখানে পৌঁছে যাবার কথা। রাগে দুঃখে অপমানে কাঁপতে লাগল জলদস্যু কংগ্রি।

জাহাজটার ক্ষতির পরিমাণ যদি সামান্য হত তবে কংগ্রি অবশ্যই তাকে এখানে এনে ফেলত না। অন্য কোথাও দাঁড় করিয়ে মেরামত করে নিত। জাহাজ নোঙর করামাত্র সারসাঁতে গর্জে উঠল, 'সবার আগে আমরা আমাদের চরমতম শত্রুর খোঁজ করব। কংগ্রি বাধা দিল। তারা সংখ্যায় কতজন অস্ত্রশস্ত্রই কী পরিমাণ আছে কে জানে। অতএব সবদিক বিচার বিবেচনা করে ব্যাপারটা চেপে যাওযাই বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানে মনে দ্বীপ ছেড়ে চম্পট দেওয়া। কংগ্রি জাহাজ মেরামতের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল।

আমরা আবার ভ্যাসকুয়েজ ও জন ডেভিসের খোঁজ করি। তারা কামানটাকে অতি কষ্টে, বার বার বিশ্রাম করে করে টিলার ওপর তুলে নিয়ে স্কুনারটার জন্য অধীর অপেক্ষায় রইল। জন ডেভিস ঠিক করেছিল স্কুনারটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করবে না। জাহাজ ডুবে গেলে জলদস্যুরা সাঁতরে দ্বীপে উঠে আসবে। তাদের খুঁজে বের করে নির্মমভাবে হত্যা করবে। কিন্তু সামান্য ক্ষতি করলে মেরামতের চেষ্টা করবে। ইতোমধ্যে কয়েকদিন কেটে যাবে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে সাঁতা-ফি এসে গেলে তো কথাই নেই।

জন ডেভিসের পরিকল্পনার কথা শুনে ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'তুমি তবে বলতে চাচ্ছ, কাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে জাহাজ না ডোবে, অথচ জাহাজের ক্ষতি হয়? মেরামত করতে গিয়ে জলদস্যুদের কয়েকটা দিন ব্যয় হয়, এই তো? ঠিক আছে, তাই হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী জন ডেভিস ও ভ্যাসকুয়েজ চূড়ায় বসে স্কুনারের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রইল।

কামান দাগার ঘটনা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। স্কুনারটা মেরামতের জন্য নোঙর করার পর থেকে জন ডেভিস ও ভ্যাসকুয়েজ টিলার চূড়ায় বসে গোপনে জলদস্যুদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল। একসময় ভাবল, জলদস্যুরা উত্তেজিত হয়ে তাদের খোঁজ করতে বেরোলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তারা উপযুক্ত আশ্রয়ের আশায় দ্বীপের গভীরে চলে গেল। ছোট একটা গুহায় তারা আশ্রয় নিল। গুহার মুখে বসলেই সমুদ্রের অনেকটা অংশ দেখা যায়। এ-অঞ্চলে কোন জাহাজ এলে অনায়াসেই দেখতে পাবে।

উভয়ে পালা করে গুহার মুখে বসে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগল। জলদস্যুরা খুঁজতে খুঁজতে এ পর্যন্ত ধাওয়া করলেও অবাক হবার কিছু নেই।

সেটা ছিল মার্চ মাসের প্রথম দিন। স্কুনার মেরামতের কাজ পুরোদমে চলেছে। জন ডেভিস ও ভ্যাসকুয়েজ সারাটা দিন গুহার মুখে কাটাল। পরের দিনও কাটল একইভাবে। একদিকে জলদস্যুদের জাহাজ মেরামতি, অন্য দিকে ডেভিস ও ভ্যাসকুয়েজের প্রহরা চলল।

www.pathagar.com

ডেভিস সাহসে ভর করে গুহা থেকে বেরিয়ে সামনের সমতল চত্বরে পায়চারি করতে লাগল। চোখ দুটো নিবদ্ধ রাখল সমুদ্রের দিকে কিছুক্ষণ পরে আবার সঙ্গীর কাছে ফিরে গিয়ে বলল, 'আমরা গুঁটি গুটি গিয়ে জলদস্যুদের জাহাজ মেরামতের ব্যাপারটা দেখে এলে কেমন হয়। এই জোয়ারে রওনা দেবে, কি না জানা যাবে।

ভ্যাসকুয়েজ চমকে উঠে বলল, 'সে কি? জলদস্যুদের আড্ডার কাছে গিয়ে প্রাণ দেবে, নাকি?'

'ঠিক আছে। তুমি তবে এখানেই থাক, আমি বাতিঘরে যাচ্ছি। এক জায়গায় এমন করে অথর্বের মত বসে থাকতে ধৈর্য ধরছে না আমার। তুমি কিন্তু সমুদ্রের দিকে নজর রাখবে। আমি সন্ধ্যায়ই ফিরে আসছি।'

শেষপর্যন্ত স্থির হল উভয়েই সেখানে যাবে। জন ডেভিসকে কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে বলে ভ্যাসকুয়েজ গুহার ভেতরে গেল। জামা ছিঁড়ে পাকিয়ে পাকিয়ে একটা দড়ির মতো তৈরি করল। কোমরের একদিকে একটা সুতীক্ষ্ণ ছোরা আর অন্য দিকে পাশাপাশি দুটো পিস্তল গুঁজে নিল। ফিরে এসে সে একটা পিস্তল জন ডেভিসকে দিল। কোমরের দড়িটা দেখিয়ে জন ডেভিস ভ্যাসকুয়েজকে ব্যাপার জিজ্ঞেস করল।

ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'সন্ধ্যায় ভালো করে বুঝিয়ে দেবখন। সেখানে থেকে বাতিঘরের দূরত্ব তিন মাইলের কম নয়। তারা পাথরের আড়াল দিয়ে পথ চলতে লাগল। ফাঁকা জায়গায় হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে চলল। সন্ধ্যা ছয়টার কাছাকাছি তারা বাতিঘরের সামনে পৌছল। চুপিচুপি বাতিঘরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। সেখান থেকে জলদস্যুদের জাহাজ মেরামতির কাজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তারা পুরোদমে কাজ করে চলেছে।

একসময় ডেভিস আচমকা ভ্যাসকুয়েজের হাত চেপে ধরে প্রায় ফিস-ফিসিয়ে বলল, 'জোয়ার আসছে! শোনো, ওই শোনো শব্দ!'

ভ্যাসকুয়েজ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে একটা পাথর তুলে নিল। ব্যস, একটা গহ্বর সৃষ্টি হ'য়ে গেল। দুজন কোনোরকমে গর্তটায় ঢুকতে পারে। ভ্যাসকুয়েজ জন ডেভিসকে গর্তে ঢুকিয়ে বলল, 'তুমি অপেক্ষা করো এখানে, কাজ সেরে আমি কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরছি। জলদস্যুরা যাতে দ্বীপ ছেড়ে যেতে না পারে সে-ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি আমি।'

কথা বলতে বলতে ভ্যাসকুয়েজ পকেট থেকে দুটো মোড়ক বের করল। তারপর মোড়ক দুটো জন ডেভিসকে দেখিয়ে বলল, 'বারুদ দিয়ে ডিনামাইটের মত দুটো বিস্ফোরক তৈরি করেছি! আর জামা ছিঁড়ে তৈরি করা দড়িটা পলতে হিসেবে ব্যবহার করব। মোড়ক দুটো মাথায় বেঁধে অন্ধকারে সাঁতার কেটে জাহাজে যাব। মাস্তুলের কাছে মোড়ক দুটো রেখে সলতেতে আগুন জ্বেলে পালিয়ে আসব।'

জন ডেভিস তার কাঁধ চাপড়ে বলল, 'আঃ! বেড়ে বুদ্ধি তো! কিন্তু এরকম বিপদজনক কাজে তোমাকে একা ছাড়ব না। আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

ভ্যাসকুয়েজ তাকে সঙ্গে নিতে রাজি হল না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল সে একাই যাবে।

জাহাজটা ঘুটঘুটে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভ্যাসকুয়েজ খালি গায়ে বিস্ফোরক পদার্থগুলো মাথায় বেঁধে জলে নামল। কোনোরকম শব্দ না করে, খুবই সাবধানে সাঁতরে জাহাজটার কাছে গেল। নোঙর ধরে উপরে ওঠার চেষ্টা করল। ঝাঁকুনি খেয়ে শিকলটা ঝনঝনিয়ে উঠল। জাহাজের গায়ের সঙ্গে মিশে শেকল বেয়ে একটু একটু করে উঠে পড়ল। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে মাস্তুলের কাছে গেল। ডেকের ওপর মাস্তুলের একেবারে

www.pathagar.com

গা-ঘেঁষে বিস্ফোরকের মোড়ক দুটো রাখল। দুটো সলতে লাগিয়ে দিল সেগুলোতে। এখন সমস্যা দেশলাইটা ভিজে গেছে কি না না, তবু রক্ষে—ভেজে নি। খুব সাবধানে যতটা সম্ভব কম শব্দ করে দেশলাই জ্বালাল। সলতে দুটোয় অগ্নি সংযোগ করল। ব্যস, কাজ হাসিল। শেকল বেয়ে আগের মতোই সাবধানে জলে নেমে এল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ভয়ঙ্কর দু-দুটো বিস্ফোরণ ঘটল। সে কী শব্দ! ঘুমন্ত জলদস্যুরা হকচকিয়ে উঠল।

জলদস্যুরা যখন হৈ হট্টগোলের মধ্যে আকস্মিক ঘটনাটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা করছে, ঠিক তখনই নিঃশব্দে জল থেকে উঠে এল একটা লোক। হাঁপাতে হাঁপাতে জন ডেভিস এর কাছে এল, গুহায় ঢুকে পড়ল। গুহার মুখে পাথরটাকে এমনভাবে রাখল যাতে হঠাৎ করে বাইরে থেকে গুহা বলে মনে না হয়।

জন ডেভিস-এর কৌতূহল দূর করতে গিয়ে ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'মনে হচ্ছে কাজ হয়েছে। তবে ক্ষতির পরিমাণ বুঝতে পারছি না। ঈশ্বর যেন শয়তানগুলোকে আরও একমাস দ্বীপে ফেলে রাখেন।'

জলদস্যুরা বুঝতে পারল, এটা তৃতীয় আলোকরক্ষীটার কাজ। তারা দলবেঁধে আঁততায়ীর খোঁজে ঘুরে বেড়াল হাতে হাতে বন্দুক নিয়ে। ব্যর্থ প্রয়াস। সকালের দিকেও তাদের গুহার আশেপাশে জলদস্যুদের পায়ের ছাপ ও টুকরো টুকরো কথাবার্তা শুনতে পেয়েছে। না, কোথাও তাদের খুঁজে পেল না। বাধ্য হয়ে হতাম মনেই তাদের জাহাজে ফিরতে হল।

ভ্যাসকুয়েজ নির্দিষ্ট লক্ষে আঘাত হানতে পারে নি। আর একটু হলেই জাহাজটা টুকরো টুকরো হয়ে যেত। নেহাত ভাগ্য ভালো, অল্পের ওপর দিয়েই গেছে। ডেকের সামান্য অংশ ভেঙে দুমড়ে গেছে। তেমন কোনো ব্যাপার নয়।

ভ্যাসকুয়েজ ও জন ডেভিস গুহায় বসে জলদস্যুদের একটা কথা শুনতে পেল তাতে বুঝে নিল এত প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। জীবনের মায়া তুচ্ছ করে সে যে ঝুঁকি নিয়েছিল তাতে জলদস্যুদের কতটুকু ক্ষতিই বা করতে পারল? মাত্র কয়েক ঘণ্টা দেরি হয়েছে মাত্র, কালই অনায়াসে নোঙর তুলে দ্বীপ ছেড়ে যাবে।

জলদস্যুরা জোয়ারের অপেক্ষায় রয়েছে।

অস্থিরচিত্ত ভ্যাসকুয়েজ আর গুহার মধ্যে থাকতে পারল না। সে পাথরটা সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে যথা সম্ভব নিজেকে লুকিয়ে রেখে জলদস্যুদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল। উত্তেজনায় সে ফেটে পড়ছে যেন।

জলদস্যুরা কংগ্রির নির্দেশে জাহাজে উঠে পড়ল। কংগ্রি পার্শ্বচর সারসাঁতেকে নিয়ে বাতিঘরটা দেখতে গেল। ভ্যাসকুয়েজ দূর থেকে দেখতে পেয়ে জন ডেভিসকে বলল, 'সাবধান তারা দুজন বাতিঘরের দিকে আসছে।' উপায়ান্তর না দেখে সেও গুহায় ঢুকে পড়ল।

গুহা থেকে উঁকি দিয়ে তারা দেখল, 'সারসাঁতে বাতিঘরের জানালায় সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে, চোখে তার টেলিস্কোপ। সমুদ্রে কোন জাহাজ দেখা যায় কি না খুঁজছে। সারসাঁতে টেলিস্কোপের মুখটা বার বার এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে খুঁজল! না, সমুদ্রের বুকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারল না সে। যন্ত্রটা চোখে লাগিয়েই

www.pathagar.com

রাখল। বেশ কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে একসময় আচমকা বাঘ দেখার মত চেঁচিয়ে উঠল, 'সর্বনাশ! সর্বনাশ হতে চলেছে। সাঁতা-ফি! সাঁতা-ফি আসছে? আতঙ্কে তার সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল। হাত থেকে পড়ে গেল টেলিস্কোপটা। কংগ্রি ছুটে এল। জানালা দিয়ে উঁকি মারল। উল্কার বেগে ছুটে আসছে সাঁতা-ফি। কংগ্রির শরীরের সব কটা স্নায়ু সমস্বরে ঝনঝনিয়ে উঠল। রক্তের গতি হল দ্রুততর।

সুবিশাল জাহাজ সাঁতা-ফি উল্কার বেগে ছুটে আসছে, উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের বুকে আলোড়ন সৃষ্টি করে! বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে কংগ্রি। সারসাঁতে বলল, 'সাঁতা-ফি এসে পড়ল বলে! এখন উপায়?'

কংগ্রি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'নির্মম অভিশাপ জড়িয়ে রয়েছে আমাদের প্রতি পদক্ষেপে। ঐ শয়তান দুটো দু-দুবার আমাদের ওপর আঘাত না হানলে আজ আমাদের এমন দুর্ভোগে পড়তে হত না।'

সারসাঁতে বলল, 'গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন কী কর্তব্য বলো?'

'কর্তব্য একটাই। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে নোঙর তুলতে হবে।'

'আমরা বেশি দূর এগোতেও পারব না, সাঁতা-ফি এসে পড়বে।'

'অসম্ভব? বাতিঘরের আলো না জ্বললে জাহাজের ক্যাপ্টেন এখানে আসতে ইতস্তত করবে।'

ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ অন্ধকারে যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে সেটা ভ্যাসকুয়েজ আর জন ডেভিসও বুঝতে পেরেছে। কেন বাতিঘরের আলো জ্বলছে না, ভেবে হয়ত জাহাজ দাঁড় করিয়ে রাখবে দূর সমুদ্রে। আর তা যদি না হয় তবে সেঞ্চুরির মতো তীরে এসে আঁছড়ে পড়বে, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'বন্ধু, চলো আমরা ছুটে বাতিঘরে যাই, আলো জ্বেলে 'সাঁতা-ফি'কে দ্বীপের অবস্থিতি জানাই।'

'সে সময় নেই। আমরা পৌঁছবার আগেই হয়ত দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। অতএব এখানেই অপেক্ষা করতে হবে।'

কংগ্রি সাকরেদদের জাহাজের নোঙর তুলতে বলল। তড়িঘড়ি কাজ হল। বিকট আওয়াজ তুলে জাহাজ এগিয়ে চলল। একসঙ্গে সব কটা পাল তুলে দেওয়ায় উপসাগরে পৌঁছতে সময় লাগল না তার।

বিধি বাম! হঠাৎ হাওয়া পড়ে গেল। জাহাজের গতি গেল কমে। স্রোতের বেগ কম। হাওয়াও নেই। জাহাজের ক্ষমতা কী যে আগের মতো ছুটবে? জোয়ারের জন্য অপেক্ষা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ধীরমন্থর গতিতে জাহাজ ইগোর উপসাগরের দক্ষিণ উপকূলের দিকে এগোচ্ছে। এদিককার উপকূল 'জাহাজবিধ্বংসী' নামে পরিচিত। বহু জাহাজ ধ্বংস করে এ-উপকূল গায়ে কলঙ্ক মেখেছে।

কংগ্রি ও তার সাকরেদরা কঠোর পরিশ্রম করে জাহাজটাকে কোনরকমে মাঝসমুদ্রে নিয়ে ফেললে। কিন্তু জোয়ার? জোয়ার এলেই বা কী লাভ? এখান থেকে জোয়ারের সাহায্য পাওয়াও দুরাশা। তবে এখন উপায়? তারা জাহাজের নোঙর ফেলতে বাধ্য হল।

ভ্যাসকুয়েজ আর জন ডেভিস শেষ পর্যন্ত একমত হল। দ্রুতপায়ে বাতিঘরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

www.pathagar.com

জলদস্যুদের একজন আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'আলো! আলো! বাতিঘরে আলো জ্বলছে!'

সারসাঁতে উন্মাদের মতো গলা ছাড়ল, 'আলো! শয়তানগুলো বাতিঘরের আলো জ্বেলে দিয়েছে! সর্বনাশ করেছে!'

কংগ্রি গর্জে উঠল—'ভেড়াও! জাহাজ তীরে ভেড়াও!'

সারসাঁতে জিজ্ঞেস করল, 'কেন? তীরে ভেড়াবে কেন?'

'শয়তানগুলোকে হত্যা করে বাতিঘরের আলো নেভাতে হবে। দেরি নয়, জাহাজ তীরে ভেড়াও।'

'কিন্তু ইতিমধ্যে সাঁতা-ফি যদি পৌঁছে যায়?'

হুঁ, কথাটা তো ঠিকই! সাঁতা-ফি পৌঁছে গেলে একেবারে কেলেঙ্কারীর একশেষ করে ছাড়বে। কংগ্রি দমে গেল।

নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। জাহাজ তীরে ভেড়ালে যখন বিপদের আশঙ্কা, জাহাজ থাক। নৌকা করে চলল তারা বাতিঘরের দিকে। যে করেই হোক, বাতিঘরের আলো নেভাতেই হবে। সঙ্গে করে বন্দুক, পিস্তল আর গুলিগোলা নিতে ভুলল না তারা। মিনিট পনেরর মধ্যেই প্রায় দেড় মাইল-রাস্তা অতিক্রম করে এল কংগ্রি। ঘড়িঘরের দরজার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল কংগ্রিকে। এ কেমন হল। উন্মত্ত প্রায় কংগ্রি গর্জে উঠল, 'ভেঙে ফেল! দরজা ভেঙে ফেল! কিন্তু হায়! ইস্পাতের চাঁদর দিয়ে তৈরি দরোজা ভাঙবে কী করে? তবু কুড়োল দিয়ে চেষ্টা করল বহুক্ষণ না, অসম্ভব। সারসাঁতে বল্টু খোলার চেষ্টা করল। ব্যস, ওই পর্যন্তই। বল্টগুলো ভেতর থেকে আটকানো। এখন উপায়? মিনারে ওঠার একটামাত্রই পথ। সর্বনাশ! সাঁতা-ফি যে এসে পড়ল!

কংগ্রি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। সারসাঁতে কোত্থেকে একটা লোহার বড় মই টানতে টানতে নিয়ে এল। কংগ্রির মনে আবার উৎসাহ জেগে উঠল।

মই বেয়ে তারা ওপরে উঠতে লাগল! সবার আগে আগে উঠছে দলের মাতব্বর কংগ্রি, তারপর সারসাঁতে ও অন্য দু-তিনজন জলদস্যু! আচমকা পিস্তলের শব্দ গর্জে উঠল। একবার দুবার নয়, পরপর কয়েকবারই পিস্তল গর্জে উঠল। ভ্যাসকুয়েজ ও জন ডেভিস পিস্তল নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। সারসাঁতে ও অন্য এক জলদস্যু গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

'সাঁতা-ফি'র সিটি শোনা যাচ্ছে। কাছে—একেবারে তীরের কাছাকাছি চলে এসেছে।

কংগ্রি প্রমাদ গুণল! সব শেষ? পালাবার সুযোগ পর্যন্ত বন্ধ। পালিয়ে যাবেই বা কতদূর? মৃত্যু মাথার ওপরে। সাঁতা ফি নোঙর ফেলেছে! শেকলের ঝনঝন আওয়াজ ভ্যাসকুয়েজ ও জন ডেভিসের মনে আশায় সঞ্চার করল।

ভ্যাসকুয়েজ ও জন ডেভিস ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ-এর কামরায় ঢুকল। ক্যাপ্টেনই তলব করেছেন তাদের। কর্তব্যে অবহেলা। দেরি করে আলো জ্বালার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে।

ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'স্যার, নয় সপ্তাহ পরে আজই প্রথম আলো জ্বলল।'

'কেন? ফিলিপ কোথায়? মরিস কী করছে?'

www.pathagar.com

'সাঁতা-ফি এখান থেকে নোঙর তোলার তিন সপ্তাহ পরে তারা নির্মমভাবে নিহত হয়েছে স্যার।'

ভ্যাসকুয়েজ এক এক করে বলল, কী করে ফিলিপ আর মরিস নিহত হয়েছে। বিশালায়তন জাহাজ সেঞ্চুরির দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির কথাও বিস্তারিত বিবরণ দিল।

জন ডেভিস জানাল, বাতিঘরে আলো জ্বালবার উদ্যোগে ভ্যাসকুয়েজই নিয়েছিল। তারই অটুট মনোবলের জন্যই বাতিঘরের আলো জ্বেলে সাঁতা-ফি-কে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে এ-কথা বলতে ভোলে নি। আর আলো না জ্বাললে জলদস্যুরা জাহাজ নিয়ে পালিয়ে যেত।

ভালোভাবে সকাল হয় নি তখনো। দ্বীপের সর্বত্র আলো-আঁধারীর খেলা চলছে। জলদস্যুদের জাহাজটা দখল করার জন্য একদল সশস্ত্র যুবক-নাবিক গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেল। ফিলিপ ও মরিসের হত্যার প্রতিশোধ নিতে ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

গত রাতে অবশ্য সারসাঁতে ও অন্য একজন নাবিক ভ্যাসকুয়েজের হাতে প্রাণ দিয়েছে। বাকি শয়তানগুলো কোথায় গিয়ে ঘাপটি মেরে রয়েছে, কে জানে? বিশালায়তন দ্বীপে পাহাড়, গুহা ও খানাখন্দ ছড়িয়ে রয়েছে। এ অবস্থায় লুকিয়ে থাকলে খুঁজে বের করা বাস্তবিকই সাধ্যাতীত। ক্যাপ্টেন লাফায়েত তবু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার লোক নয়। তাদের খাবার দাবার পড়ে রয়েছে। উপোস করে কদিন টিকে থাকবে? এদিকে সকাল হতে না হতেই ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ ভ্যাসকুয়েজ ও জন ডেভিসকে নিয়ে জলদস্যুদের গুহার দিকে রওনা দিল। সঙ্গে রয়েছে বন্দুক ও পিস্তল। গুহার ভেতর ঢুকে তাদের হতাশই হতে হল। গুহা শূন্য, জনপ্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তবে গুহায় যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র জমা রয়েছে তাতে মনে হচ্ছে তাদের তেমন কিছু অস্ত্রও নেই। অতএব আশা করা যাচ্ছে, না খেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরার চেয়ে আত্মসমর্পণ করাকেই শ্রেয় মনে করবে দস্যুরা।

জলদস্যুরা আত্মসমর্পণ করলেও অবাক হবার কিছু নেই ঠিকই। কিন্তু সে আশায় তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ-এর নির্দেশে নাবিকরা প্রায় সম্পূর্ণ দ্বীপটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু কোথায় তাদের টিকির নাগালও পাওয়া গেল না।

১০ মার্চ। সকালের দিকে কয়েকটা ফুজিয়ান বাতিঘরে ঢুকল! ক্লান্ত—অবসন্ন তাদের দেহ। খিদে-তেষ্টায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল তারা। কিন্তু দলের মাতব্বর সেই কংগ্রি? হ্যাঁ, সেও ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ-এর কাছে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। পা টলছে, কথা বলার শক্তি পর্যন্তও নেই তার। তার সেই তেজ, সেই দর্প কোথায় কর্পূরের মতো নিঃশেষে উবে গেছে।

কিন্তু কংগ্রি কেন ধরা দিল? তার তো ভালোই জানা আছে, অনেক দুষ্কর্মের জন্য তাকে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতেই হবে।

না, নিষ্ঠুর জলদস্যু সর্দার কংগ্রি তার কাজের জন্য অনুতপ্ত নয়। কিন্তু হাতকড়া পড়াবার সুযোগ না দিয়ে সে চকিতে কোমর থেকে পিস্তলটা টেনে নিল। পিস্তলের মুখটা নিজের কপালে ঠেকিয়ে গুলি ছুড়ল। শেষ! মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ সঙ্গে করে তিনজন নতুন আলোকরক্ষী নিয়ে এসেছিল। ৩ মার্চ তারা বাতিঘরের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করল। বাতিঘরের আলো আবার জ্বলল। মাত্র সাতজন জলদস্যু জীবিত রয়েছে। 'সাঁতা-ফি'র বন্ধ ঘরে বসে তারা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে।

ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ নবনিযুক্ত আলোকরক্ষীদের তিন মাসের প্রয়োজনীয় খাবারদাবার ও অস্ত্রশস্ত্র বুঝিয়ে দিল। 'সাঁতা-ফি'র এবার নোঙর তোলার পালা ভ্যাসকুয়েজ আর জন ডেভিসও জাহাজে উঠল। স্টেটন আইল্যান্ডকে চিরদিনের মতো বিদায় জানিয়ে স্বদেশে ফিরে চলেছে।

সেটা ছিল ১৮ মার্চ। পশ্চিম আকাশে তখন বিদায়ী সূর্যের শেষ রক্তিম আভার মেলা বসেছে। ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ-এর নির্দেশে নোঙর তোলা হয়। সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে তালে হেলে-দুলে মাঝ-দরিয়ার দিকে এগিয়ে চলল সাঁতা-ফি। বাতিঘরের অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা তাকে জানাল বিদায়-সম্ভাষণ।

---

www.pathagar.com

মাইকেল ভস্ট্র গফ

মহামান্য জার-এর ভোজসভা!

ক্রেমলিন প্রাসাদের ভোজকক্ষে আমন্ত্রিত অতিথিরা এক-এক করে উপস্থিত হচ্ছেন। আমন্ত্রিতদের মধ্যে রয়েছেন, দেশ বিদেশের রাজদূত, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী আর মস্কোর বহু ধনকুবের।

আর যাঁরা এসেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রখ্যাত সাংবাদিকও রয়েছেন। বিশ্ববিখ্যাত এ-ক্রেমলিন প্রাসাদে তাঁদের আগমনের কারণ, মহামান্য জারের ভোজসভার তথ্য সংগ্রহ করা।

আয়োজনের ত্রুটি নেই এতটুকুও। পানাহারের ব্যবস্থা তো রয়েছেই, সে সঙ্গে গান ও নাচের মাধ্যমে অতিথিদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও রয়েছে পছন্দমাফিক।

মহামান্য জার প্রতিনিয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, প্রতিটি টেবিলে। কথা বলছেন, প্রতিটি অতিথির সঙ্গে, তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দীর্ঘাকৃতি চেহারা। শরীরে বলও ধরেন অসাধারণ।

পূর্ণ উদ্যমে পানাহার ও নাচ-গান চলছে। অকস্মাৎ অবিশ্বাস্য স্তব্ধতা নেমে এল ক্রেমলিন প্রাসাদের ভোজকক্ষে। অতিথিরা সন্ত্রস্ত-মনে তাকালেন সদর দরোজার দিকে, চোখের তারায় জিজ্ঞাসার চাপ। কাঁটামারা বুটের গম্ভীর আওয়াজ তুলে অখণ্ড নীরবতা ভঙ্গ করে প্রধান সেনাপতি মহামান্য জারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

প্রধান সেনাপতির আকস্মিক আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন জার, 'কী সংবাদ সেনাপতি? কোনো দুঃসংবাদ—'

প্রধান সেনাপতি হাতে ইশারা করলেন, 'এখানে নয় সম্রাট! দয়া করে বাইরে আসুন, সবই বলছি।'

জার বাইরে গেলেন না। প্রধান সেনাপতিকে ভোজকক্ষের একপাশে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার? হয়েছে কী?'

প্রধান সেনাপতি অপেক্ষাকৃত নীচুগলায় নিবেদন করলেন, 'সম্রাট, টমস্ক থেকে এইমাত্র টেলিগ্রাম এসেছে।'

'টমস্ক থেকে? কেন, কী হয়েছে? সে অঞ্চলের লাইনও কাটা গেছে কি? যোগাযোগ ব্যবস্থা—'

প্রধান সেনাপতি কিসোভ তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। আর এরই ফলে টমস্কর বাইরে খবর পাঠানো সম্ভব নয়।'

'সে কী। ইরকুটস্কে খবর পাঠান হয়েছে কী?'

'হ্যাঁ, পাঠিয়েছি। আমার বিশ্বাস, ইতিমধ্যে গ্র্যান্ড ডিউকের হাতে আমাদের টেলিগ্রাম পৌঁছে গেছে।'

'কোনো খবর? তিনি কি কোনো খবর পাঠিয়েছেন?'

www.pathagar.com

'না। এখন পর্যন্ত পাই নি।'

'কিন্তু এটাও তো সম্ভব, আমাদের টেলিগ্রামটা, তাঁর হাতে নয়, পৌঁছেছে বিদ্রোহীদের হাতে। আপনার কী মনে হয় সেনাপতি?'

'সম্রাট, আমিও সেরকমই আশঙ্কা করছি।'

'তবে? বিদ্রোহ দমনের জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন সেনাপতি?'

'সম্রাট, আমি ইতিমধ্যেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছি, ইরকুটস্ক, আমুর ও ট্রান্সবল্কন রাজ্যের সেনাদের ইরকুটস্কের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে জার এবার বললেন, 'ওগারেফ? জানেন কি, ওগারেফ এখন কোথায় রয়েছে?'

'চেষ্টা করেছি, কোনো খবর পাই নি। পুলিস-দপ্তর তার সম্বন্ধে কোনো তথ্যই সংগ্রহ করতে পারেনি।'

'পুলিস দপ্তরের কথা নয়। আপনি কতটুকু তথ্য সংগ্রহ করেছেন, বলুন?'

অপরাধীর স্বরে প্রধান সেনাপতি ব্যক্ত করলেন, 'সম্রাট, বাস্তবিকই ছাড়া পাওয়ার পরই লোকটা যেন কর্পূরের মতো হাওয়ায় উড়ে গেল। বহু চেষ্টা করেছি, হতাশই হতে হয়েছে।'

'সে আমার অজানা নয়। হুকুম জারি নয়, কাজও করতে হয়। এখন এক কাজ করুন, যে ঘাঁটিতে টেলিগ্রাম-যোগাযোগ করা সম্ভব, সর্বত্র বিশ্বাসঘাতকের চেহারার বিবরণ দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিন। বিশেষ করে বলে দেবেন, দেখামাত্রই যেন গ্রেপ্তার করে তাকে। আর খুব সাবধান, কাকপক্ষীও যেন টের না পায়।'

'একটা কথা, আপনার কি বিশ্বাস, ওগারেফ এ-ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত?'

'শুধু সন্দেহই নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওগারেফই এই বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। সে যা হয়, পরে দেখা যাবে, এখন আপনি বরং বিশ্বস্ত সংবাদবাহককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। যান, দেরি করবেন না। আর মনে রাখবেন, যাকে পাঠাবেন, সে যেন কেবল বিশ্বাসীই নয়, সুচতুর ও অসম সাহসীও হয়। গ্র্যান্ড ডিউকের কাছে পাঠাব তাকে।'

'ইরকুটস্কে পাঠাবেন?'

'হ্যাঁ, যান আর দেরি করবেন না।'

মহামান্য জার যখন তাঁর প্রধান সেনাপতির সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনায় রত, ঠিক সেই সময়ে দুজন বিদেশী-সাংবাদিক প্রায় ফিসফিসিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। সাংবাদিকদের মধ্যে একজনের নাম অল সাইট জুলিভেট আর অন্যজনের নাম হ্যারি ব্লাউন্ট। প্রথম জন ফরাসি। বছর ত্রিশেক বয়স। সাংবাদিকতা তাঁর পেশা নয়, সখ। পৃথিবী ঘুরে খবর সংগ্রহ করে ফরাসির বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পাঠিয়েই তিনি তৃপ্ত। তবে বিনা পয়সায় নয়, মোটা টাকার বিনিময়ে। আর দ্বিতীয় জন? ইংরেজ, লন্ডনের বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা, ডেলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক। ইনিও যুবক। বড়জোর পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে।

জুলিভেট একসময় ব্লাউন্টের দিকে ঝুঁকে নীচু গলায় বললেন, 'ভোজসভায় তথ্য সংগ্রহ করতে এলেন, কিছু পেলেন কি?'

'দেখা যাক শেষপর্যন্ত। আপনি তথ্য—'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ, সংগ্রহ করে নিয়েছি। জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবকক্ষে আচমকা কেমন যেন থমথমে ভাব। অশুভ ইঙ্গিতটুকু কিন্তু আমার নজর এড়ায়নি।'

'তাই নাকি জনাব! কই, আমি তো কিছুই অনুমান করতে পারছি না।' ব্লাউন্ট যে সবকিছু বুঝেও না বোঝার ভান করছেন, জুলিভেট বুঝতে পেরেছেন। তিনি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে বললেন, 'দেখা যাবে, ডেলি টেলিগ্রাফে কী ছাপা হয়।'

ব্লাউন্ট মন খোলসা করে কথা বলছেন না দেখে জুলিভেট আলোচনার মোড় ঘোরালেন, 'ভালো কথা, জাক্রেভের ঘটনা আপনার মনে আছে? মানে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের কথা, মনে নেই?'

'কেন থাকবে না! সবকিছু যেন আজও ছবির মতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি।'

'তবে তো আপনার ভালোই জানা আছে, সেদিনও এমনই একটা ব্যাপার সেখানে ঘটতে দেখা গিয়েছিল। সেদিনও এমনই এক ভোজসভায় বসে সম্রাট আলোকজান্ডার নেপোলিয়নের আক্রমণের দুঃসংবাদ পেয়েছিলেন। সম্রাট যখন শুনলেন নেপোলিয়ন সৈন্য নিয়ে নির্মল নদী অতিক্রম করে এসেছেন তখন তাঁকেও এমনই বিচলিত হতে দেখা গিয়েছিল। চোখের তারায় লক্ষিত হয়েছিল বিষাদের কালোছায়া।

'হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই। আজকের এই ভোজসভাতেও ঠিক একই দৃশ্যের অবতারণা নজরে পড়ছে। প্রধান সেনাপতি এসে মহামান্য জারকে খবরটা দিলে তাকেও ঠিক তেমনি নির্বিকার দেখা গেছে।'

'তবে ব্যাপারটা আপনার নজরেও পড়েছে, কী বলেন!'

'হ্যাঁ, সাংবাদিকের চোখ, নজরে পড়াটাই স্বাভাবিক।'

'কিন্তু এদিকে যে সমস্যা, জনাব। প্রধান সেনাপতিকে নিয়ে জার তো ভোজসভা ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা আর বসে বসে মাছি মারি কেন? চলুন, আমরাও উঠি। সংবাদ সংগ্রহের আশু কোনো সম্ভাবনা না থাকায় ব্লাউন্ট ও জুলিভেট ভোজকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মহামান্য জার ভোজকক্ষ ত্যাগ করলে উপস্থিত অতিথিরাও সেখানে আর অপেক্ষা করা নিরর্থক জ্ঞানে একে একে বিদায় নিলেন।

প্রাসাদের গোপন পরামর্শকক্ষে জারকে দেখা যাচ্ছে। গভীর রাত। প্রাসাদে ও বাইরে সর্বত্র স্তব্ধতা বিরাজ করছে। অস্থিরচিত্ত জারের চোখে ঘুম নেই। ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। একসময় তাঁর দেহরক্ষী ঘরে ঢুকে যথোচিত অভিবাদন করে সামনে দাঁড়ালেন। জার পদচারণা থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী? কোনো সংবাদ?'

'স্যার, পুলিশ-বিভাগের অধ্যক্ষ দর্শনপ্রার্থী, বাইরে অপেক্ষা করছেন।'

'ভেতরে নিয়ে এসো।'

কয়েক মুহূর্ত পরেই এক সুদর্শন যুবক ও পুলিশ-বিভাগের অধ্যক্ষ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন, অভিবাদন করে দাঁড়ালেন। জার বললেন, 'কী খবর?'

'স্যার, জেনারেল কিসোভ বললেন—আপনি আমাকে দেখা করতে নির্দেশ দিয়েছেন'

'হ্যাঁ, আইভান ওগারেফ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কি?'

'তেমন কিছু নয়, তবে লোকটা খুবই ধূর্ত শুনেছি।'

'তিনিই তো কোনো একসময় আমার সেনাবিভাগের কর্নেল ছিলেন, তাই না?'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ। সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন, সুনামও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে তাঁকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেয়া হয়। মহামান্য গ্র্যান্ডডিউক এই নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন।'

'তারপর কী হয়েছিল?'

'সম্রাট নিজেই তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলেন। শাস্তিদানের দু বছর পর সে মুক্তি পায়।'

'তারপর? ভালো কথা, সে ঘটনার পরও কি তিনি সাইবেরিয়ায় গিয়েছিলেন?'

'সে খবর আমি সঠিক বলতে পারব না। আসলে তাঁর সম্বন্ধে আর কোনো খবর পাই নি। গত মার্চ মাসে তার সম্বন্ধে শেষ-খবর যা পেয়েছি তাতে জেনেছি, তিনি পাম প্রদেশে অবস্থান করেছেন। ব্যস, এইটুকুমাত্র।'

'তবে আমার মুখ থেকেই শুনে যান, রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ইদানিং যে গোলযোগ দেখা দিয়েছে তার হোতা এ লোকটিই। আপনাদের যা জানা উচিত ছিল, সে-খবর দিলাম আমি।'

'তবে কি আপনার বিশ্বাস, তাতার বিদ্রোহের পিছনে তারই কালো হাত রয়েছে?'

'শুধু বিশ্বাসই বা বলি কী করে, নিশ্চিত করেই বলতে পারি। আমার অজানা নয়, পাম থেকে পালিয়ে সাইবেরিয়ায় আশ্রয় নেয় সে। সেখানকার যাযাবর শ্রেণীর লোকগুলোকে বিদ্রোহের প্ররোচনা দেয়, তাতিয়ে তোলে। এবার খুমন্দ বোমারা ও কন্দুজ প্রভৃতি রাজ্যে যায়। মিষ্টি কথায় ধূর্ত লোকটা সে-সব দেশের রাজাদের আস্থাভাজন হয়ে বিদ্রোহের বীজ তাদের মধ্যে বপন করতে থাকে। সে যাই হোক, বিদ্রোহ দমনের জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য থাকবে বিদ্রোহের নায়ককে বন্দি করা।'

দেহরক্ষীকে আবার দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে দেখা গেল। তিনি অভিবাদন সেরে জানালেন, জেনারেল কিসোভ বাইরে অপেক্ষা করছেন, সঙ্গে এক যুবকও এসেছে।

পুলিশ-দপ্তরের অধ্যক্ষর সঙ্গে জারের আলোচনা সেখানেই স্থগিত রইল। তিনি জারকে যথোচিত অভিবাদন সেরে বিদায় নিলেন।

দেহরক্ষী জেনারেল কিসোভ এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। জার জিজ্ঞেস করলেন, 'জেনারেল, কে এই যুবক?'

'সংবাদবাহক স্যার।'

যুবকটি এতক্ষণ অপলক চোখে মহামান্য জারের দিকে তাকিয়েছিলেন। জেনারেলের কথায় যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। জারকে অভিবাদন করার কথা মনেই ছিল না তাঁর। এবার অভিবাদনপর্ব সারলেন।

জার যুবকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমার নাম কী?'

যুবকটি পরিষ্কার গলায় উচ্চারণ করলেন, 'মাইকেল স্ট্রগফ।'

'তোমার পেশা?'

'সংবাদ-সংগ্রহ! সংবাদ সংগ্রাহক দলের অধিনায়ক আমি।'

'উত্তম! সাইবেরিয়ার রাস্তাঘাট তোমার পরিচিত?'

'হ্যাঁ, আমি সাইবেরিয়ার লোক। এটিই আমার দেশ, আমার জন্মভূমি। ওমস্ক শহরে বাড়ি। এ সংসারে নিজের বলতে একমাত্র মাই রয়েছেন।'

'তাই নাকি? তুমি কি অবিবাহিত?'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ।'

দৃঢ়চেতা যুবকটি অত্যুজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে জার এবার প্রশ্ন করলেন, 'গ্র্যান্ড ডিউকের হাতে তোমাকে একটি চিঠি পৌঁছে দিতে হবে, পারবে? কথা বলতে বলতে জার পকেট থেকে একটি খাম বের করে বললেন, এই যে এ-চিঠিটা। ইরকুটস্কে পৌঁছে দিতে হবে, পারবে?'

যুবকটি নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করলেন, 'অবশ্যই পারব সম্রাট।'

'ভালো। সাইবেরিয়ায় বিদ্রোহ শুরু হয়েছে, জান কি? বিদ্রোহীদের অঞ্চলের ওপর দিয়ে তোমাকে যেতে হবে, পারবে?'

'আমি চেষ্টা করব যাতে বিদ্রোহীদের মুখোমুখি হতে না হয়।'

'আর একটি কথা জিজ্ঞেস করছি। আইভান ওগারেফকে চেন তুমি?'

'চাক্ষুস দেখিনি, নাম শুনেছি।'

'বিদ্রোহীদের নেতা তিনি। তার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, তখন?'

'আমি তো বলেছি সম্রাট, যাতে দেখা না হয়, সে চেষ্টাই আমি করব।'

'তোমাকে ওমস্ক হয়েই যেতে হবে, তাই তো? কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে, তোমার মার সঙ্গে দেখা করতে যাবে না, রাজি?'

'হ্যাঁ, রাজি।'

'এবার প্রতিজ্ঞা করো, কাউকেই তোমার পরিচয় দেবে না।'

'প্রতিজ্ঞা করছি, সম্রাট, গ্র্যান্ড ডিউক ছাড়া কারো কাছেই আমার পরিচয় প্রকাশ করব না।'

'চমৎকার! এই নাও চিঠি। ভুলে যেও না, এ-চিঠির ওপরই সাইবেরিয়ার নিরাপত্তা নির্ভর করছে, বিশেষ করে গ্র্যান্ড ডিউকের জীবনও এরই ওপর নির্ভর, মনে থাকে যেন। পথে যতই বিপদের সম্মুখে পড় না কেন, এ চিঠি যেন কিছুতেই বেহাত না হয়।'

'শরীরে প্রাণ থাকতে কর্তব্যচ্যুত হব না, কথা দিচ্ছি।'

মাইকেলের কথায় জার আশ্বস্ত হলেন।

মাইকেল বিদায় নেয়ার পূর্ব মুহূর্তে জার বললেন, 'মাইকেল, তুমি তবে যাত্রার জন্য তৈরি হও। তোমার নামে একটি ছাড়পত্র তৈরি করে আমি জেনারেল কিসোভের অফিসে কালই পাঠিয়ে দেব। আর তাতে যে নামটি উল্লেখ করা হবে সে নতুন নামেই তুমি পরিচিত হবে। যাও, তৈরি হওগে। কালই যাত্রা করতে হবে।

মাইকেল অভিবাদন করে বিদায় নিলেন।

মাইকেল যাত্রার জন্য তৈরি হলেন। দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে, প্রস্তুতির ব্যাপার তো থাকবেই। পথে যে-কোনো সময় বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য সে সঙ্গে একটি পিস্তল ও একটি ছোরা নিতেও ভুলল না। জার ছাড়পত্রে তার নাম উল্লেখ করলেন। নিকোলাস কোর্পানফ। পেশা ব্যবসা। বাড়ি ইরকুটস্ক। আর ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখলেন, 'নিজের বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। সাধারণভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ছাড়পত্রটির গুরুত্ব তেমন কিছু নয়। কিন্তু জারের স্বাক্ষরযুক্ত হওয়ায় তার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। জার বিশেষ মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন, 'এই ছাপড়পত্রের মালিক ইচ্ছা করলে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে। আর কোনো অবস্থাতেই এই ছাড়পত্র অগ্রাহ্য করা যাবে না।'

www.pathagar.com

মাইকেল জারের দেয়া ছাড়পত্রটি সম্বল করেই দীর্ঘপথ পাড়ি দেবার জন্য তৈরি হল। রাশিয়ায় তখন ঘোড়ার সাহায্যে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা ছিল। ডাকগাড়ি চলাচলের সুবিধার্থে পথের জায়গায় জায়গায় পোস্টিং স্টেশন থাকত। সে সব স্টেশনে থেকে পরবর্তী স্টেশনে যাওয়ার জন্য ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যেত। এক টাকা জমা দিলেই গাড়ি পেতে অসুবিধা হত না। তাই মাইকেল ইচ্ছা করলে অনায়াসেই ঘোড়া বা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া নিয়ে তাঁর পক্ষে ভ্রমণ করা সম্ভব হত। কিন্তু তিনি সে চেষ্টা না করে ট্রেনে ভ্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বলা তো যায় না, ছাড়পত্র দেখিয়ে সুবিধা নিতে গেলে আসল পরিচয় ফাঁস হয়ে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আর পরিচয় গোপন রাখাই তাঁর এ-কাজের বড় সহায়ক।

সেটা ছিল ষোলই জুলাই। মাইকেল মস্কো স্টেশনে গাড়িতে উঠলেন। দশ ঘণ্টা পরে নিজনি নভোজাস স্টেশনে নামবেন। সেখানে পৌঁছে বিদ্রোহের গতিবিধি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে তবে কর্তব্য নির্ধারণ করা সাব্যস্ত করবেন ভাবলেন।

গাড়ির কামরায় অন্যান্য যাত্রীদের দিকে এক নজর দেখে নিয়েই মাইকেল বুঝে নিলেন, যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যবসায়ী। তাদের অধিকাংশই নিজ নিজ ব্যবসাসংক্রান্ত আলাপ আলোচনায় লিপ্ত ছিল। তবে এক কোণার দিকে দু-তিনজন অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে মেতেছিল। তাদের একজন বলল যুদ্ধ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। এশিয়ার খবর পাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্য এক যাত্রী বললেন, 'ঘিরখিজরাও তাতারদের সঙ্গেড় হাত মিলিয়েছে, শুনলাম।'

আর একজন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এবার আর নিজনির মেলা বোধহয় আগের মতো জমজমাট হচ্ছে না। বরাতে ব্যবসার কথা কি লেখা আছে, তাই বা কে বলতে পারে?'

প্রথম বক্তার গলা শোনা গেল, 'জনাব, আগে প্রাণ তো বাঁচান, তারপর ব্যবসার কথা ভাববেন।'

গাড়ির কামরায় যখন ব্যবসায়ীরা ব্যবসাসংক্রান্ত আলোচনায় মগ্ন তখন সে কামরারই অন্য এক কোণে বসে এক যুবক নোট বইতে কী সব টোকাটুকি করছেন। কে এ-যুবক? আমাদের পরিচিত সেই দুজন সাংবাদিকের মধ্যে ফরাসি সাংবাদিক জুলিভেট। কাজের ফাঁকে তিনি দু-একজন যাত্রীকে প্রশ্ন করে আসল খবর বের করে নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। জুলিভেটের সব কিছু লিখে নেয়ার ব্যাপার দেখে যাত্রীরা কেমন মিইয়ে গেল। তারা যুদ্ধের ব্যাপারে আর কোনো কথাই বলল না। আবার অন্য কামরায় বসে 'ডেলি টেলিগ্রাফ'-এর রিপোর্টার যাত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদকালে বিদ্রোহ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে নিয়েছেন।

বিদ্রোহের ফলে রাশিয়ার সর্বত্র কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে! পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের লোকেরা আইভান ওগারেফকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। নিজনি-নভগ্রাদের মেলাতেও গোয়েন্দাদের ছড়াছড়ি।

প্রতিটি স্টেশনেও বসেছে কাড় পাহারা। গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে সি. আই. ডি. আর পুলিসের লোকেরা কামরায়-কামরায় উঠে যাত্রীদের পরীক্ষা করছেন। সামান্যতম সন্দেহ হলেই জোর তল্লাশি শুরু করে দিচ্ছেন!

www.pathagar.com

রাশিয়ার প্রাচীন রাজধানী ভলদিমির স্টেশনে গাড়ি থামল। বড় স্টেশন বলে গাড়ি একটু বেশি সময় এখানে দাঁড়ায়। গাড়ি থামামাত্র মাইকেল স্ট্রগফ যে কামরায় ছিলেন তাতে ষোল-সতের বছরের এক মেয়ে উঠল। মাইকেল-এর পাশে জায়গা রয়েছে দেখে বসে পড়ল। হাতের চামড়ার ব্যাগটি বেঞ্চের তলায় রেখে দিল সে। গাড়ি স্টেশন ছেড়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ মাইকেল দেখলেন, মেয়েটির অন্য পাশের লোকটি ঝিমোচ্ছে বার বার মেয়েটির ঘাড়ে পড়ছে। ব্যাপারটা মাইকেলের চোখে শোভনীয় ঠেকল না। তিনি লোকটির কাঁধে আলতো করে ঝাঁকুনি দিয়ে সতর্ক করে দিতে গেলেই বাঁধল গণ্ডগোল। লোকটি প্রথমটায় মাইকেলের ওপর রীতিমতো চটে উঠল। কিন্তু তাঁর পেশীবহুল সুদৃঢ় শরীরটির মুখে ফুটে উঠল মাইকেলের প্রতি কৃতজ্ঞতার ছাপ। ঘণ্টাখানেক একটানা ছুটে এক স্টেশনে এসে গাড়ি থামল। গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে একদল পুলিশ উঠে এল। মাইকেল দরজার কাছেই বসেছিল। তাকে তল্লাশি করার পর পরিচয়পত্র দেখতে চাইল। সে পকেট থেকে ছাড়পত্রটি বের করে দেখালেন। সন্দেহজনক কিছু না পেয়ে ছাড়পত্রটি তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে গেল পুলিশ অফিসারটি।

এবার মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদের পালা। পুলিশ অফিসারটি তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন?'

মেয়েটি স্বাভাবিক স্বরেই জবাব দিল, 'ইরকুটস্ক যাচ্ছি।'

চোখে বিস্ময়ের ছাপ এঁকে পুলিশ অফিসারটি বলল, 'কোথায়? ইরকুটস্ক? সঙ্গে ছাড়পত্র আছে?'

'নেই। তবে একটি হুকুমনামা রয়েছে। এই দেখুন।' কথা বলতে বলতে মেয়েটি একটি ভাঁজ করা কাগজ তার দিকে বাড়িয়ে দিল।

পুলিশদের মধ্যে বয়স্ক একজন হুকুমনামাটি পরীক্ষা করে তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এক কাজ করবেন, এখানকার কোনো উচ্চপদস্থ পুলিশ-অফিসারকে দিয়ে হুকুমনামাটি সই করিয়ে নেবেন।'

মেয়েটি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালেন।

গাড়ি ছেড়ে দিল। পরের স্টেশনে গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের মধ্যে নামার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। মেয়েটি বেঞ্চের তলা থেকে ব্যাগটি টেনে হাতে নিল। মাইকেলও নামার প্রস্তুত নিতে লাগলেন।

গাড়ি থেকে নামার পর মাইকের আর মেয়েটিকে দেখতে পেলেন না। প্লাটফর্মে জনসমুদ্র। ভিড়ের মধ্যে সে কোথায় মিলিয়ে গেছে, কে জানে।

বন্দর। নিজনি-নভগ্রাদ। ভলগা আর ওক নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই বিখ্যাত বন্দরটি। মেলা উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ লোক এসে জড়ো হয়েছে এখানে। নদীর দুই পাশে শহর। মজবুত একটি সেতু দিয়ে উভয় তীরের সংযোগ সাধন করা হয়েছে। মাইকেল স্টিমার-ঘাটে গিয়ে শুনলেন পরদিন সকালে পাম যাবার স্টিমার ছাড়বে। খুবই দেরি হয়ে যাবার সম্ভাবনায় প্রথমে ভাবলেন, ঘোড়ায় চড়ে গেলে অনেক সময় বেঁচে যাবে। ঘোড়ায় গেলে আবার বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। তাই অনন্যোপায় হয়ে তাকে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। রাত্রিটুকু হোটেলেই কাটাবেন সাব্যস্ত করলেন।

www.pathagar.com

মালপত্র হোটেলে রেখে সন্ধ্যার দিকে শহরটা একটু ঘুরে দেখতে বেরোলেন।

ঠিক অমনি সময়ে কে একজন কুদর্শন লোক পিছন থেকে তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'কেগো, তুমি? অন্ধকারে একা একা বসে যে, মতলব কি?'

চমকে উঠে মাইকেল বললেন, 'মতলবের কি দেখলেন? জায়গাটা নিরিবিলি, তাই একটু বিশ্রাম করছি।'

'বিশ্রাম, নাকি অন্য ধান্ধা? এখানেই রাত কাটাবার মতলব নেই তো? লজ্জার কি আছে বাবা বল।'

লোকটির ধরণ ধারণ ও কথাবার্তা মাইকেল-এর ভালো ঠেকল না। এ ধরনের লোকেরা স্ত্রী-পুরুষ মিলে ঘুরে বেড়ায়, সুযোগ পেলে চুরি-ডাকাতি করে। টাকার জন্য মানুষ খুন করতেও তারা দ্বিধা করে না। মাইকেল সেখান থেকে সরে পড়াই সঙ্গত মনে করলেন। এমন সময় ঘটে গেল এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার! একটি মেয়ে অন্ধকারে এগিয়ে এসে ধমকের সুরে লোকটিকে বলল, 'লোকটিকে বিরক্ত করছ কেন?'

লোকটি মুচকি হেসে বলল, 'বিরক্ত করতে যাব কেন, এর পকেটে মালকড়ি আছে হয়তো তাই—'

'দরকার নেই মালকড়িতে। লোকটি গুপ্তচরও তো হতে পারে চল, ভেতরে চল।' আর কোনো কথা নেই, লোকটি পোষা কুকুরের মত সুরসুর করে ভেতরের দিকে পা বাড়াল। মাইকেল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে তিনি হাঁটা শুরু করলেন।

কাক-ডাকা সকালে মাইকেল-এর ঘুম ভাঙল। জাহাজ ছাড়তে বেশ কয়েক ঘণ্টা দেরি। জামা-প্যান্ট পরে মেলার দিকে পা বাড়ালেন।

সেতুর ওপারে এক প্রশস্ত সমতল জায়গায় প্রসিদ্ধ নিজনি নভগ্রাদ-এর মেলা বসেছে। ভলগার সেতু, দু-ধারেই ঘোড়াসওয়ার, সৈন্যরা পাহারায় রত। দোকানীরা দেশ-বিদেশ থেকে এসে জড়ো হয়েছে দুটো পয়সা রোজগারের আশায়। সকাল হতে দোকানে-দোকানে ক্রেতার ভিড়। আমোদ-প্রমোদের জায়গাগুলোতেও উৎসাহী দর্শকদের সমাবেশে জমজমাট। মাইকেল কৌতূহলী চোখে সবকিছু দেখতে দেখতে এগোতে গিয়ে শুনলেন, কে একজন তার সঙ্গীকে বলছে, 'পুলিশের যেমন দাপাদাপি দেখছি মেলা না জানি বন্ধ হয়ে যায়।'

'হ্যাঁ, সেরকমই তো মনে হচ্ছে ভায়া। বিদ্রোহীরা হয়ত বা টমস্ক শহরে হামলা শুরু করে দিয়েছে! বিদ্রোহের আগুন—'

লোকটির মুখের কথা শেষ হতে না হতেই আচমকা পুলিশের ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। মেলা প্রাঙ্গণেরই একটি উঁচু বেদীমতো জায়গায় পুলিসের বড়কর্তা দাঁড়িয়ে পড়লেন। হাতে তাঁর একটি কাগজ। তিনি গলা-ছেড়ে কাগজটা পড়তে লাগলেন, "নিজনি নভগ্রাদের মহামান্য গভর্নর জেনারেল এতদ্বারা ঘোষণা করছেন যে, আজ থেকে রাশিয়া সরকারের কোনো নাগরিক কোনো কারণেই দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। সরকারের এই আদেশ কেউ অমান্য করলে তাঁকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। বিদেশীর ব্যাপারে এই আদেশ প্রযোজ্য নয়। তবে বিদেশীদের প্রতি এ আদেশ জারি করা হচ্ছে যে, তারা যেন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ রাজ্য ছেড়ে চলে যান। আদেশ অমান্যকারীকে

www.pathagar.com

কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। আর এ আদেশ বলেই আজ থেকে মেলা ভেঙে দেওয়ার নিদের্শ দেওয়া হচ্ছে।"

পুলিশের বড়কর্তা ঘোষণাপত্রটি পড়া শেষ করা মাত্র চাদিকে চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। এ-আদেশের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীরা জার-এর কাছে আবেদনের মারফৎ প্রতিবাদ জানাবে।

জনগণের চাপা ক্রোধটুকু অগ্রাহ্য করেই পুলিশের কর্তাব্যক্তিটি মেলা ভেঙে দেওয়ার আদেশ জারি করলেন। ব্যস, আর কথা নেই, দুমদাম তাবু তোলা শুরু হয়ে গেল।

ঘোষণা-বাণীটি মাইকেল-এর মনে ভীতির সঞ্চার করল। তিনি দ্রুতপায়ে হোটেলের দিকে চলতে আরম্ভ করলেন। হাঁটতে হাঁটতে ভাবলেন, ট্রেনের সেই মেয়েটি সঙ্গে থাকলে ঝামেলা অনেক কম হত। জার-এর ছাড়পত্রে তো একজন সঙ্গী নিয়ে যাওয়া যাবে, লেখাই রয়েছে। তার ওপর স্ত্রীলোক দেখলে বিদ্রোহীরা তাঁর দিকে তেমন নজর দেবে না, ভুলেও সংবাদবাহক মনে করবে না। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে মেয়েটিকে?'

জাহাজ ছাড়তে আরও ঘণ্টা তিনেক দেরি। কিন্তু গাড়ির সে মেয়েটিকে কোথায় পাচ্ছে, তার আশা ছাড়তেই হল। যদিও জার-এর আদেশনামা সঙ্গে রয়েছে, পুলিস দপ্তরকে হিসেব করে চলতেই হবে। তাই আদেশনামাটিতে পুলিসের বড়কর্তার স্বাক্ষর নিয়ে নেবার জন্য তাঁর অফিসে গেলেন। সেখানে পৌঁছেই তাঁর চক্ষুস্থির। অফিসের সামনে জনসমুদ্র।

টাকায় বোবাও কথা বলে। মাইকেল পকেট থেকে দুটো রুবল বের করে এক পুলিশের হাতে গুঁজে দিতেই ভোজবাজির মত কাজ হয়ে গেল। ভিড় ঠেলে সে মাইকেলকে সোজা বড়কর্তার কাছে নিয়ে হাজির করল। দরজার কাছে যেতেই তিনি চমকে উঠলেন গাড়িতে দেখা সেই মেয়েটি দরজায় দাঁড়িয়ে। একই উদ্দেশ্যে সেও অপেক্ষা করছে। মাইকেল তার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু পুলিসটি তাঁকে সে সুযোগ না দিয়ে বড়কর্তার ঘরে ঢুকিয়ে দিল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আদেশনামায় স্বাক্ষর করিয়ে মাইকেল মেয়েটির কাছে ফিরে এলেন। ছোট্ট করে বললেন, আমার তো ইরকুটস্ক যাবার আদেশনামা রয়েছেই। তাতে সঙ্গে একজন নিয়ে যাবার কথা উল্লেখও রয়েছে। ইচ্ছে করলে আপনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন।

উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে মেয়েটি বলল, এ তো আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। আপনার সঙ্গে যেতে পারলে—কী শর্তে যাব আমি?

মাইকেল আর কথা বাড়ালেন না। মেয়েটিকে নিয়ে সোজা হোটেলে ফিরলেন। স্টিমার ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। জিনিসপত্র গোছগাছ করে তাঁরা এলেন জাহাজঘাটে।

নদীর জল তোলপাড় করতে করতে স্টিমার এগিয়ে চলল।

স্টিমারের সুসজ্জিত কেবিনে বসে মাইকেল ও মেয়েটি গল্পে মাতলেন। মেয়েটি এক সময় বলল, 'আপনি তো ইরকুটস্ক যাচ্ছেন, তাই তো বললেন?'

'হ্যাঁ, সেজন্যই তো আপনাকে সঙ্গে নেয়া সম্ভব হল।'

'দয়া করে সঙ্গেই যখন নিয়ে যাচ্ছেন, সুযোগ মতো আমার সব কথাই আপনাকে বলব শুনতে হবে কিন্তু।'

www.pathagar.com

'সে যা হয় পরে হবে। অনেক রাত হয়ে গেছে, নিজের কেবিনে যান, শুয়ে পড় ন গে।'

মেয়েটি আর এগোতে সাহস করল না। মাইকেল-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের কেবিনের দিকে পা বাড়াল।

মেয়েটি চলে গেলে মাইকেল নিজেকে একটু হালকা বোধ করলেন। রাত্রের হিমেল হাওয়ার লোভে সিঁড়ি-বেয়ে ডেকে উঠে গেলেন। পায়চারি করতে করতে মোটা চোঙটির কাছে যেতেই কাদের যেন নিচু গলার কথা বলতে শুনলেন। বড়ই কৌতূহল হল। গুটিগুটি এগিয়ে গিয়ে চোঙটির বিপরীত দিকে গিয়ে দাঁড়ালেন। কানখাড়া রেখে ধৈর্য ধরে তাদের আলোচনা শোনার চেষ্টা করলেন। কণ্ঠস্বর বলে দিচ্ছে, তাদের মধ্যে একজন পুরুষ ও অপরজন মহিলা।

মহিলাটি বলল, 'একজন নাকি মস্কো থেকে গোপন খবর নিয়ে ইরকুটস্কে যাচ্ছে, এ-স্টিমারেই পাড়ি দিচ্ছে।'

পুরুষটি বলল, 'হ্যাঁ, আমিও খবরটি শুনেছি।'

মহিলাটি দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'কিন্তু তার পক্ষে কাজটি সম্ভব হবে কি?'

পুরুষটি এবার একটু ধমকের সুরেই বলল, 'থাক, সে যা হয় পরে দেখা যাবে। এসব প্রসঙ্গ নিয়ে এখানে আলোচনা করা সঙ্গত নয়।'

মাইকেল আর সেখানে অপেক্ষা করলেন না বলা তো যায় না তাদের নজরে পড়ে যেতে কতক্ষণ। ধরা পড়লে কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত করে ছাড়বে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মাইকেল ভাবলেন, 'কী সর্বনাশ। খবরটি জানল কী করে তারা! তারাও কি তবে বিদ্রোহের সঙ্গে লিপ্ত!'

সকাল হল। মেয়েটি নিজের কেবিন ছেড়ে মাইকেল-এর কেবিনে এল। স্টিমার কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এক যুবক তাদের দুজনের জন্য সকালের জলখাবার রেখে গেল। চায়ের কাপটি ঠোঁট থেকে নামিয়ে মেয়েটি বলল, 'কাল যা বলা হয় নি, শুনুন। আমরা নাম নাডিয়া ফেডর। বাবার নাম ছিল, ডা. ওয়াসিলি ফেডর। শহরে তাঁর খুবই নামডাক ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর যোগসাজোস রয়েছে সন্দেহে সরকার তাকে নির্বাসন দণ্ড দিলেন। সাইবেরিয়ায় চলে যেতে হয়েছিল তাঁকে। ইদানীং তিনি ইরকুটস্কে আছেন শুনে এখানে ছুটে চলেছি। আমার আপন বলতে আর কেউ নেই। বাবার নির্বাসনের আঠারো মাস পর মা ইহলোক ছেড়ে যান। সরকারের অনুমতি পাওয়া মাত্র আমি টেলিগ্রাম মারফৎ বাবাকে জানিয়ে দিয়েছি, আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। প্রায় দর্পদকশূন্য অবস্থাতেই আমি দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে চলেছি।'

'কিন্তু সাইবেরিয়া জুড়ে এখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে, এ অশুভ মুহূর্তে আপনার এ-ঝুঁকি নেওয়াটা কি উচিত হয়েছে?'

'কিন্তু আমার অবস্থায় পড়লে আপনিও হয়তো এ-কথা বলতে পারতেন না। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আপনার সাহচর্য না পেলে হয়তো বাধ্য হয়েই ফিরতে হত আমাকে।'

তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মাইকেল বললেন, 'আমাকে নিয়ে আপনার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের কারণ নেই। তা ছাড়া আমার পকেট ভারী, দশজনকেও ইরকুটস্ক পর্যন্ত নিয়ে

www.pathagar.com

যেতে পারব। আপনাকে যখন নিজেই ডেকে নিয়েছি তখন নিজের বোনের মতোই দেখব সন্দেহ নেই!'

'ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকলে এমনটা হবে কেন, বলুন, মেয়েটি কৃতজ্ঞতার সুরে কথা কয়টি উচ্চারণ করল।'

বেলা প্রায় দশটা। স্টিমারটি হেলেদুলে এগিয়ে ঘাটে এসে নোঙর করল। যাত্রীদের তল্লাসীই তাদের উদ্দেশ্য। মাইকেল দেখলেন, অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে তাদের পূর্ব পরিচিত সেই দুজন জিপসি দম্পতিও নেমে যাচ্ছে।

প্রায় এক ঘন্টাকাল তল্লাসী চালাবার পর পুলিস পুনরায় স্টিমার ছাড়ার অনুমতি দিল। স্টিমারের নোঙর তোলা হল। কাঠের পাটাতন তোলার চেষ্টা চলছে। ঠিক তখনই একজন হাঁপাতে হাঁপাতে স্টিমারে এসে উঠলেন। তিনি এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, ভেতরে ঢোকার সময় একজনকে তো ধাক্কা দিয়ে ফেলেই দিলেন। হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ তিনি সোল্লাসে বলে উঠলেন, 'আরে জুলিভেট যে!'

জুলিভেটও বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'আরে ব্লাউন্ট তুমি কোত্থেকে?' আর আমার কথা জিজ্ঞেস কর কেন। তাতার বিদ্রোহের খবর সংগ্রহ করে দেবার জন্য প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে লাফিয়ে স্টিমারে উঠতে হল। কিছু কিছু খবর ইতিমধ্যেই টেলিগ্রাম করে পাঠিয়ে দিয়েছি। খবরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। খবরটি হচ্ছে, বোখারার আমির ফেওফার খাঁ স্বয়ং তাতার বাহিনীর নেতা। এখন আমিরের সৈন্যরা ইরতিস নদীর পাড় দরে বীরবিক্রমে এগোচ্ছে।

জুলিভেটে-এর কথা শুনে ব্লাউন্ট তো দারুণ মনমরা হয়ে গেলেন। জুলিভেট-এর খবর আগামীকাল সকালে প্যারিসের পত্রিকাগুলো ফলাও করে ছেপে দেবে। কিন্তু তাঁর ডেলি টেলিগ্রাফের পাতায় বস্তাপচা খবর দিয়ে পাতা ভরাতে হবে।

সেটা ছিল উনিশে জুলাই। পাম বন্দরে স্টিমার এসে ভিড়ল। জলপথে এটিই সেই বন্দর—সাইবেরিয়া থেকে রাশিয়া যাবার একমাত্র স্টিমার ঘাট। এখানে সস্তায় ঘোড়ার গাড়ি কিনতে পাওয়া যায়। মাইকেল ভাবলেন, সস্তাদামের একটি গাড়ি কিনে নিজেই চালিয়ে গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু সাধ পূর্ণ হল না। সরকারি হিসেবে বিদেশীরা পাম ছেড়ে যাবার সময় এক-এক করে সব গাড়িই বিক্রি করে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মাইকেল একটি ভাঙ্গা নড়বড়ে গাড়ি পেলেও মালিক তার গরজ বুঝে দশগুণ দাম হেঁকে বসল। দর কষাকষি করলে হয়তো দাম কিছু কমত। কিন্তু সময় নষ্ট না করে তিনি গাড়িটি কিনেই ফেললেন। গাড়িটি দেখতে অনেকটা টাঙার মতো। সে-অঞ্চলের লোকের কাছে এটি টেলটা নামে পরিচিত। গাড়ি তো পাওয়া গেল, কিন্তু ঘোড়া? ঘোড়া জোগাড় হল। সস্তায় বেশ তাগড়া একটি ঘোড়া কিনল। গাড়ি ছাড়ার জন্য তৈরি হলেন মাইকেল। কিন্তু নাডিয়া। নাডিয়া গেল কোথায়! কিছুক্ষণের মধ্যে কিছু জল আর খাবার যোগাড় করে সে ফিরে এল। নাডিয়া তো ভালোই জানে, এ পথে সঙ্গে জল ও উপযুক্ত খাবার না থাকলে বড়ই বেকায়দায় পড়তে হয়। এক গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করে মাইকেল জেনে নিলেন—আকাশের অবস্থা ভাল থাকলে নাকি সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাওয়া যাবে।

চাবুকের ঘা খেয়েই ঘোড়া ছুটে চলল।

www.pathagar.com

কিছুদূর যেতে না যেতেই মাইকেল-এর গলা শুকিয়ে যাবার উপক্রম। দেখতে দেখতে ঘন মেঘ আকাশ ছেঁয়ে ফেলল। ঘোড়ার পিঠে ঘন-ঘন চাবুকের ঘা পড়তে লাগল! বৃষ্টি নামার আগে কোনোরকমে পৌঁছতে পারলেই বাঁচোয়া নইলে কপালে অশেষ দুর্গতি। বিধি বাম! বিকেলের দিকে বাতাস বন্ধ হয়ে গেল। অসহ্য গুমোট গরম। ঘোড়াটি ধুঁকতে লাগল। কিন্তু তাকে বিশ্রাম করতে দিলেও বিপদ। আকাশের যা অবস্থা, সন্ধ্যের দিকে ঝড় ওঠার সম্ভাবনা। একে তো পাহাড়ী রাস্তা, গাড়ি চালানো কষ্টসাধ্য, তার উপর ঝড় উঠলে একেবারে সোনায় সোহাগা। ঘোড়ার পিঠে ঘন ঘন চাবুক পড়তে লাগল। উরাল পর্বত বহু দূরে দেখা যাচ্ছে। আরো কিছুদূর এগিয়ে সামনের দিকে আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে পর্বতটি। জোরে—আরো জোরে গাড়ি ছুটিয়ে দেয়া হল। কিন্তু মাইকেল অধৈর্য হলে কি হবে, ঘোড়াটির দেহে কত সইবে। তিনি ভাবলেন, সামনে কোনো পোস্টিং স্টেশন পেলে ঘোড়াটি বদলে নেবেন।

এক পোস্টিং স্টেশনে মাইকেল গাড়ি দাঁড় করালেন। এক গাড়োয়ানকে কিছু নগদ অর্থ ও তাঁর নিজের ঘোড়াটির পরিবর্তে বেশ শক্তসমর্থ একটি ঘোড়া নিলেন।

নতুন ঘোড়া নিয়ে নতুন করে যাত্রা শুরু হল। সন্ধ্যে হতে না হতেই ঝড় উঠল। সে কী ঝড়! যেমন গর্জন তেমন তার দাপাদাপি। পাহাড়ী রাস্তায় ঝড়ের মধ্যে গাড়ি চালান খুবই দুঃসাহসের ব্যাপার। যে-কোনো সময় পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর পড়ে গাড়ি চুরমার হয়ে যেতে পারে। মাইকেল পথের বিপদ অগ্রাহ্য করে কপাল ঠুকে গাড়ি চালিয়ে দিলেন। এক সময় গাড়িটি মারাত্মক রকম দুলে একেবারে স্থির হল। আর একটু হলেই কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত হয়ে যেত। ঘোড়ার পা ফসকে গিয়েছিল। নিচে পড়তে পড়তে কোনোরকমে টাল সামলে নিয়েছে। মাইকেল সজোরে লাগাম টেনে গাড়িকে বাঁচালেন। ঝড়ের বেগ ক্রমেই বেড়ে চলল। ঘূর্ণি ঝড়! যে কোনো সময় গাড়ি সমেত উড়িয়ে কোনো খানাখন্দে নিয়ে আছড়ে ফেলবে।

আচমকা কার যেন আর্তস্বর মাইকেল-এর কানে এল। তিনি ভাবলেন, দু-পা এগিয়ে গিয়ে দেখবেন, কে দুর্দশায় পড়েছেন? কিন্তু ঝড়ের যা বেগ, গাড়ি নিয়ে যাওয়ার চিন্তা পাগলের খেয়াল। তাই মাইকেল ঠিক করলেন, পায়ে হেঁটেই এগিয়ে যাবেন আর্তস্বর লক্ষ্য করে। কিছুদূরে এগিয়ে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'কে? কে ওখানে?'

গাড়ি থেকে আর্তস্বর ভেবে এল—'আমরা সাংবাদিক। তাতার বিদ্রোহের খবর সংগ্রহ করতে যাচ্ছিলাম, পথে এ-দুর্ভোগ! কিন্তু আপনি কে? কোথেকে এসেছেন, কোথায় যাচ্ছেন?'

'নিকোলাস কোর্পানয় আমার নাম। ইরকুটস্ক-এ বাড়ি। সেখানেই যাচ্ছি। কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি, বলুন?'

'একটি গাড়ি দিয়ে সাহায্য করলে বড়ই উপকার হয় আমাদের। একটরেসবার্গ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে, পারবেন?'

'কেন পারব না? বিপদাপন্নকে সাহায্য করাই তো মানুষের ধর্ম!'

ইতিমধ্যে তাঁরা কোনোরকমে মাইকেল এর কাছ এলেন। মাইকেল বললেন, 'আপনারা ভাববেন না, আমার গাড়িতে দু'জনেরই জায়গা হয়ে যাবে। কাছেই রাত্রিবাসের জন্য ঘরভাড়া পাওয়া যাবে। দুর্যোগের রাতে আর গাড়িতে না-ই বা উঠলেন। চলুন, রাতটুকু কাটিয়ে সকালে আবার রওনা দেওয়া যাবে।'

www.pathagar.com

মাইকেল সাংবাদিক হ্যারি ব্লাউন্ট ও অলসাইট জুলিভেটকে নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে একটি গুহা পেলেন। ব্লাউন্ট মুচকি হেসে জুলিভেট-এর হাত ধরে হাল্কা টান দিয়ে বললেন, 'ভালোই হল, এক রাত্রির জন্য গুহাবাস খারাপ লাগবে না।'

মাইকেল বললেন, 'আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন, কাছেই আমার বোন গাড়িতে অপেক্ষা করছে, নিয়ে আসি।'

সাংবাদিক দুজন বললেন, 'অপেক্ষা করার কি আছে? চলুন, ওনাকে নিয়ে এক সঙ্গেই ফিরে আসা যাবে।'

অনন্যোপায় হয়ে মাইকেল তাঁদের সঙ্গে নিয়েই গাড়ির কাছে গেলেন। নাডিয়াকে নিয়ে তাঁরা আবার সেই গুহার দিকে এগোতে লাগলেন। মাইকেল ব্লাউন্টকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আশা করি আপনারা ওমস্ক হয়েই যেতে চাচ্ছেন, তাই না?'

ব্লাউন্ট নয়, জুলিভেট উত্তর দিলেন, 'আগে ইসিম পর্যন্ত তো যাই, তারপর যা হয় ভেবে ঠিক করা যাবে।'

গুহার কাছাকাছি পৌঁছে মাইকেল নাডিয়াকে গুহার ভেতরে যেতে বললেন। ঘোড়াটিকে গাড়ি থেকে খুলে পাশের একটি গাছে বাঁধার জন্য এগোলেন। সাংবাদিক দুজন তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন। হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজ শুনে তাঁরা চমকে উঠলেন। আওয়াজটি গুহার দিক থেকেই এসেছে। মাইকেল নাডিয়ার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে গুহার দিকে ছুটতে লাগলেন। নাডিয়া চেঁচাতে লাগলেন, 'ভালুক। ভালুক।'

ঠিক তখনই বিরাট একটি ভালুককে গুহা থেকে বেরিয়ে নাডিয়ার দিকে এগোতে দেখলেন মাইকেল। নাডিয়ার কোমরে পিস্তল ছিল। তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে গুলি করল। তেমন অভ্যস্ত নয়, ভালুকটির গায়ে গুলি লাগে নি। গুহাটি ভালুকটির দীর্ঘদিনের বাসস্থান। মানুষের অনাধিকার প্রবেশ বরদাস্ত করবে কেন? ভালুকটি ক্রমেই এগিয়ে আসছে দেখে নাডিয়া আবার গুলি চালাল। কিন্তু এবারেও একই ফল হল। কয়েক হাত দূর থেকে গুলিটি বেরিয়ে গেল। সে আবার ট্রিগার টিপল খট করে আওয়াজ হল, গুলি বেরোল না। পিস্তলে আর গুলিই নেই, বেরোবে কোত্থেকে?

ইতিমধ্যে মাইকেল এসে গেছেন ঘটনাস্থলে। তিনি মুহূর্ত মাত্র সময় নষ্ট না করে খালি হাতেই ভালুকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শুরু হল দুই মল্লবীরের ধস্তাধস্তি। মানুষ আর পশুতে কুস্তি চলল অনেকক্ষণ ধরে। এক সময় মাইকেল ভালুকটিকে বেকায়দায় পেয়ে তার বুকের ওপর চেপে বসলেন। বাঁ-হাত দিয়ে ভালুকটির গলা টিপে ধরে ডান হাত দিয়ে এক হেচকা টানে কোমর থেকে ছোরাটা বের করে নিলেন। চোখের পলকে সুতীক্ষ্ণ ছোরাটি আমূল ভালুকটির বুকে গেঁথে দিলেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। বিকট আর্তনাদ করে জানোয়ারটি বার কয়েক পাগুলো ছোড়াছুড়ি করল, একসময় নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

মাইকেলের অনন্যসাধারণ সাহস ও শক্তি জুলিভেটকে মুগ্ধ করল। নাডিয়া অপলক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখের তারায় কৃতজ্ঞতার ছাপ।

সকাল হল। ঝড় থামে নি, বৃষ্টিও সমান তালেই পড়ছে। দুর্যোগের সকাল স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সুদিনের আশায় বসে থাকা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়। অহেতুক সময় নষ্ট।

শুরু হল আবার পথচলা। এবার আর গাড়িতে যাত্রী দুজন নয়, দ্বিগুণ।

www.pathagar.com

কয়েক ঘণ্টার পর তারা এক টেরেসবাগে পৌঁছলেন!

একটি গাড়িতে চার-চারটে লোক, অসুবিধা তো একটু হবেই। কি দরকার, আর একটি গাড়ি কিনে নিলেই তো সমস্যা চুকে যায়। তাই সাংবাদিকরা শহর থেকে একটি গাড়ি কিনে আনলেন। হোটেলে ঢুকে তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে নিলেন সবাই। দুপুরের আগেই ইসিম শহরের উদ্দেশ্যে তাঁরা রওনা হয়ে গেলেন। কয়েক মাইল পরেই উঁচু নিচু পাহাড়ী রাস্তা শেষ হল, শুরু হল সমতল প্রান্তর। গরম কাল। মরুভূমির ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে পথ অতিক্রম করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নামে ধূ ধূ প্রান্তরে। তারপর শুরু ঘনকালো-রাত্রি। গাড়ি সমান তালেই এগিয়ে চলেছে। পূব আকাশে দেখা দিল রক্তিম আভা, সকাল হল।

মাইকেল এক সময় দেখলেন, তাঁদের আগে আগে একটি গাড়ি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। তিনি ভাবলেন, ওই গাড়িটার আগে ইসিম-এ পৌঁছাতে না পারলে সেখানে গাড়ি জোগাড় করা কষ্টকর হয়ে পড়বে। ঘোড়ার পিঠে ঘন ঘন চাবুক পড়তে লাগল। উল্কার বেগে ছুটল পক্ষিরাজ। মিনিট পনেরর মধ্যেই সে গাড়িটাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলল মাইকল-এর গাড়িটি। গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতায় সাংবাদিকরাও যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরাও মাইকেল-এর গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগলেন। ইসিম শহরে যখন পৌঁছালেন তখন রাত্রি হয়ে গেছে, আটটা বাজে। একে-ওকে জিজ্ঞেস করে তাঁরা জানতে পারলেন, বিদ্রোহ চরম রূপ নিয়েছে। শুধু কি তা-ই? ওমস্ক শহর বিদ্রোহীদের দখলে চলে গেছে। মাইকেল কথাটি অবিশ্বাস করতে পারলেন না। কারণ, এরই মধ্যে যাবতীয় সরকারি দপ্তর ইসিম শহর থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, দেখলেন।

মাইকেল ব্যস্ত হয়ে ঘোড়া জোগাড় করে নিয়ে এলেন। আর দেরি নয়, বেরিয়ে পড়া দরকার। সাংবাদিকরা ইসিম-এ রাত কাটিয়ে সকালের দিকে রওনা হবেন, ঠিক করলেন। মাইকেল ওমস্ক শহরে দেখা হবার প্রতিশ্রুতিতে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবেন, এমন সময় ঘটল এক বিপর্যয়। পিছনের সেই গাড়িটি মাইকেল-এর ঠিক পিছনে এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন মাঝবয়েসী এক সৈনিক। গায়ে সৈনিকের পোষাক কোমরে তরবারি, হাতে একটি চাবুক।

গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমেই লোকটি পোস্ট মাস্টারের কাছে ঘোড়া দাবি করলেন। ঘোড়া কোথায় যে দেবে? সৈনিকটি কোনো কথাই শুনতে রাজি নয়। এবার গমনোদ্যত মাইকেল-এর ঘোড়াটি দেখিয়ে দাবি করলেন। কিন্তু আগে ভাগেই সেটা ভাড়া হয়ে গেছে, দাবি করলেই বা পোস্ট মাস্টার কি করে সেটা দেবেন? মাইকেল সৈনিকটির জুলুম বরদাস্ত করতে না পেরে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। ব্যস, আর যাবে কোথায়! সরাসরি দাবি করে বসলেন, 'তোমার ঘোড়াটি দিতেই হবে বুঝলে ছোঁড়া?'

লোকটির অশিষ্ট আচরণে মাইকেলের মাথায় রক্ত ওঠার উপক্রম। তিনি বেশ কড়া সুরেই বললেন, 'ভদ্র ভাষায় কথা বলবেন, বলে দিচ্ছি মশায়।'

সৈনিকটি সঙ্গে সঙ্গে হাতের চাবুকটি উঁচিয়ে রুখে দাঁড়াল। তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই ঝপাৎ করে চাবুক চালিয়ে দিল তার গায়ে। মাইকেল মুখ বুজে জঘন্য অত্যাচারটি হজম করে নিলেন। সাংবাদিকরা বিস্ময়ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভাবতে লাগলেন যে লোকটি সাক্ষাৎ ভালুকটির সঙ্গে নির্দ্বিধায় যুদ্ধে লিপ্ত

www.pathagar.com

হয়েছিলেন, তিনিই সামান্য একটি মানুষের কাছে অমন অবিশ্বাস্যভাবে মাথা নত করলেন।

সৈনিকটি বিনা বাক্য ব্যয়ে মাইকেল-এর গাড়িটি নিয়ে চলে গেল। মাইকেল তার ফেলে-যাওয়া পথের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। নিজের অজান্তে চোখের কোণে জলের বিন্দু এসে ভিড় করল।

নাডিয়া ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এসে মাইকেল-এর কাঁধে হাত রেখে সহানুভূতির সুরে বলল, 'অমন করে ভেঙে পড়ার কি আছে, বলুন তো? সকাল হলে গাড়ি ঠিকই যোগাড় হয়ে যাবে। কিন্তু একটা কথা আপনার মতো লোক এতবড় অপমান মুখ বুজে হজম করল, বিশ্বাসই করতে পারছি না।'

মাইকেল বললেন, 'কারণ আছে বোন। গুরুত্বপূর্ণ কোনো কারণ না থাকলে জানোয়ারটির টুটি চেপে ধরতাম, মিথ্যে নয়।'

নাডিয়া আর কথা বাড়াল না। মাইকেল-এর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, 'এমন কি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের বোঝা মাথায় নিয়ে চলেছেন যে, প্রতিবাদ করার ক্ষমতা থাকলেও এতবড় অপমান মুখ বুঝে হজম করে নিলেন।'

সকাল হল। মাইকেল সকালেই রওনা দিলেন। নাডিয়াকে নিয়ে তিনি ইরতিস নদীর তীরে এলেন। নৌকো ভাড়া করে স্রোতস্বিনী নদীটি পার হতে লাগলেন। মাঝ নদীতে যেতেই কয়েকটি ডিঙি নৌকো তাঁদের দিকে তেড়ে আসতে দেখা গেল। তীরবেগে ছুটছে ডিঙিগুলো। মাঝিরা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল, 'তাতার। তাতার আসছে, কত্তা!'

অবস্থা সঙ্গীন দেখে মাইকেল নাডিয়াকে সতর্ক করে দিতে গিয়ে বললেন, 'শয়তানগুলোর হাতে ধরা পড়ার আগে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ-ছাড়া আত্মরক্ষার উপায় নেই।'

মাইকেল-এর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই সে ডিঙি থেকে তর্জন গর্জন ভেসে এল, 'খবরদার! নৌকো থামাও!' মাইকেল মাঝিকে বললেন, 'মোটা টাকা পুরস্কার পাবে, চালাও জোরে! জোরে—আরো জোরে নৌকো চালাও।'

নৌকোর লোকগুলো গুলি খাওয়া বাঘের মতো ক্ষেপে উঠল। তাদের আদেশ অমান্য করবে, এতবড় বুকের পাটা! সামনের ছিপে বেশ লম্বা চওড়া একটি লোক দাঁড়িয়েছিল। সে অপমানে ফুঁসতে ফুঁসতে কোমর থেকে পিস্তল বের করে গুলি চালাতে লাগল। চীৎকার করে অন্য ছিপের লোকগুলোকে মাইকেল-এর নৌকোটিকে ঘিরে ফেলতে নির্দেশ দিল।

মাইকেল ভাবছেন, এ-মুহূর্তে কি কর্তব্য? কর্তব্য স্থির করার আগেই তাতারদের ডিঙি থেকে একটি বর্শা ছুটে এসে তাঁর মাথায় আঘাত করল। চোখের পলকে ঝুপ করে জলে পড়ে গেলেন তিনি। কিন্তু নাডিয়া? না, মাইকেল-এর নির্দেশ মতো জলে ঝাঁপ দেবার চেষ্টা ব্যর্থ হল। তাতাররা ধরে ফেলল তাকে।

মাইকেল ডুবসাঁতার দিয়ে ভাঁটির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। মিনিট চারেক পরে অনেকটা দূরে গিয়ে মাথা তুললেন। দেখতে পেলেন, তাতাররা নাডিয়াকে জোর করে ডিঙিতে তুলে নিচ্ছে। বেশিক্ষণ মাথা উঁচু করে মাথার উপায় নেই। তাতাররা দেখে

www.pathagar.com

ফেললে শেষ রক্ষা করতে পারবেন না! তীরের কাছাকাছি এসে সাঁতার কাটতে কাটতেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিলেন তাতাররা তাঁর পিছন নিয়েছে কি-না? না, তেমন সম্ভাবনা নেই। মাইকেল-এর প্রাণে জল এল। আরো কিছু সময় দুর্বল শরীরে জলের সঙ্গে লড়াই করে এক সময় পায়ের তলায় মাটির খোঁজ পেলেন।

মাইকেল জ্ঞান ফিরে পেলেন। চোখ মেলে তাকালেন। দেখলেন, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ঘরে শুয়ে। শিয়রে এক যুবক বসে। মাইকেল প্রথম মুখ খুললেন—আমার জামা-প্যান্ট কোথায়? প্যান্টের পকেটে যেসব জিনিস ছিল কোথায়?

'কিছুই নষ্ট হয় নি। একটি টাকার থলি ও একটি চিঠি, দরকারি মনে আপনার বালিশের তলায় রেখে দিয়েছি।'

মাইকেল ব্যস্ত হয়ে বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে চিঠিটি বের করে পরীক্ষা করলেন। না, অক্ষতই রয়েছে। চিঠির খামটি বিশেষ ধরনের চামড়া দিয়ে তৈরি বলে জলে ক্ষতি করতে পারে নি। মাইকেল এতক্ষণ নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এবার মনে পড়ল রক্ষাকর্তা যুবকটিকে সামান্য ধন্যবাদও জানান হল না। তিনি চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ এঁকে বললেন, 'আমার উচিত ছিল, অনেক আগেই আপনাকে ধন্যবাদ জানানো, কৃতজ্ঞতাটুকু স্বীকার করা।'

'আপনার জীবন রক্ষা করতে পেরেছি, এতেই আমি ধন্য। নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আপনাকে দেখতে পাই।'

'একটা কথা, ওমস্ক শহর কত দূরে এখান থেকে?'

'কাছেই, কিন্তু যাবেন কি করে?'

'একটি ঘোড়া যোগাড় করে দিতে পার?'

'ঘোড়া পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ওমস্ক ছাড়া ঘোড়া পাবেন না। কিন্তু আপনার শরীরের যা অবস্থা, কিছুতেই একা ছাড়ছি না। নেহাৎই যদি যেতে চান তবে আমিও সঙ্গে যাব।'

'ঠিক আছে। খুবই জরুরি ব্যাপার না থাকলে তোমাকে অবশ্যই কষ্ট দিতাম না।'

মাইকেল ওমস্ক শহরে পৌঁছে প্রথমেই গেলেন, পোস্টিং স্টেশনের দিকে। কিছু দূর গিয়েই বন্দুকের ঘন ঘন আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালেন। সঙ্গী-যুবকটিকে নিয়ে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল তাতার সৈন্য বন্দুক উঁচিয়ে দৌড়ে গেল। সৈন্যদের আগে যে লোকটি ছুটে যাচ্ছিল তাঁকে দেখিয়ে যুবকটি বলল ওই-ওই লোকটিই আইভান ওগারেফ।

মাইকেল আপন মনে বলে উঠলেন, 'এই ওগারেফ? আমাকে তবে ইসিমে এ-ই অপমান করেছে!'

তাতার সৈন্য চলে গেলে মাইকেল সোজা পোস্টিং স্টেশনে গিয়ে হাজির হলেন।

পোস্ট মাস্টার জানালেন, 'ঘোড়া আছে, কিন্তু দেওয়া যাবে না। কর্নেল ওগারেফ-এর চিঠি ছাড়া ঘোড়া দেওয়া যাবে না।'

মাইকেলকে যে ঘোড়া পেতেই হবে। মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে একটি ঘোড়া বাগিয়ে নিলেন। ঘোড়া নিয়ে রওনা দেবার পূর্ব মুহূর্তে ঘটল এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। পাশের

www.pathagar.com

বিশ্রামাগার থেকে মাইকেল-এর মা ছুটে এসে বললেন, 'মাইকেল, খোকা আমার কখন এলি?'

মাইকেল দেখলেন এ যে দেখছি, কর্তব্যচ্যুত হওয়ার যোগাড়। তিনি উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে বললেন, 'কে, কাকে খোকা বলছেন আপনি? আমি তো আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না, বুড়িমা।'

নিজের পেটের সন্তানের কাছ থেকে এমন অভাবনীয় আচরণ পেয়ে বৃদ্ধার চোখে জল দেখা দিল। তিনি কান্না থামিয়ে কোনোরকমে উচ্চারণ করলেন, 'আমি তোর মা! আমাকে চিনতে পারলি নে খোকা?'

'আপনার ছেলে হয়তো আমার মতোই দেখতে কেউ হবেন। আমার নাম, নিকোলাস কোর্পানফ। আমি একজন বণিক।'

বৃদ্ধা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কি জানি, তবে হয়তো আমারই ভুল। কত লোকই তো একরকম দেখতে হয়। বয়স হয়েছে, চোখেও ভাল দেখি না।'

মাইকেল মুহূর্তমাত্র সেখানে আর না দাঁড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাইকেল চলে যাবার পরই একজন সৈন্য এসে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নামই কি মার্ফা স্ট্রগফ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবা।'

'আপনাকে একবারটি কর্নেল ওগারেফ-এর কাছে যেতে হবে।'

'এই বুড়িটাকে টানাটানি না করে যখন ছাড়বে না, চল তবে।'

সৈন্যটি বৃদ্ধাকে নিয়ে কর্নেল-অফিসে হাজির হলে ওগারেফ বললেন, 'তোমার ছেলে রাশিয়ার জার-এর অধীনে সংবাদবাহকের কাজ করে, আশাকরি তোমার অজানা নয়? এখনো সত্যি করে বলত, তোমার ছেলেটি কোথায়?'

'সঠিক জানা নেই, সম্ভবত মস্কোতে কাজ করছে।'

'বাজে কথা রাখ! একটু আগেই তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল। কোথায় সে?'

'আপনি ভুল করছেন। তাকে আমি ভুল করে মাইকেল ভেবেছিলাম। এর আগেও আমি এরকম ভুল করেছি।'

বৃদ্ধা মার্ফার কথা বিশ্বাস করলেন না ওগারেফ। তাকে কনসেনট্রেশন-রুমে পাঠিয়ে দিলেন। আপন মনেই গর্জে উঠলেন, 'যেখানে থাক, পাতালের ভেতর লুকিয়ে থাকলেও যুবকটিকে আমি চাই।'

মাইকেলকে জ্যান্ত অথবা মৃত যে-কোনো অবস্থাতেই হোক ধরে আনার জন্য ওগারেফ হুকুম জারি করলেন। সৈন্যরা ঘোড়া নিয়ে চারদিকে ছুটোছুটি দাপাদাপি শুরু করে দিল।

পোস্টিং স্টেশনে মার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মাইকেল-এর মনে সন্দেহ জেগেছিল, নিশ্চয়ই তাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা শুরু হয়ে যাবে। তাই তিনিও মরিয়া হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। সৈন্যরা বাধ্য হয়ে হতাশ মনে ক্যাম্পে ফিরে গেল।

বিকেল পাঁচটায় মাইকেল এ্যালামস্ক শহরে পৌঁছলেন। হোটেলে রাত কাটিয়ে ভোর হতে না হতেই আবার তিনি ঘোড়ার পিঠে উঠলেন। দুপুরের দিকে ঘোড়াটি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। মুখ দিয়ে গেঁজলা বেরোতে লাগল। বাধ্য হয়ে মাইকেল ঘোড়ার লাগাম ধরে হেঁটে পথ পাড়ি দিতে লাগলেন। দুপুরের পর তিনি ক্লান্ত দেহে ওমস্ক-এ পৌঁছলেন।

www.pathagar.com

শরীর আর চলে না। একটি হোটেল-এ উঠলেন। আহারাদি সেরে ঘুমিয়ে শরীরটা চাঙ্গা করে নিলেন। রাতটুকু সেখানে কাটিয়ে আবার শুরু করলেন পথ চলা। পথে জলাভূমি থাকায় খুবই কষ্ট হল তার। একদিনের পথ তিনদিন ধরে আমানুষিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে পাড়ি দিয়ে এক সকালে ওবিনস্ক শহরে হাজির হলেন। মস্কো থেকে রওনা দেবার পর কুড়িটি দিন তাকে পথে পথেই কাটাতে হয়েছে। আর ইরকুটস্ক-এ পৌঁছতে আরো অনেক দিনই লেগে যাবে। পূব আকাশে আবার রক্তিম ছাপ দেখা দিতেই মাইকেল ওবিনস্ক শহরকে বিদায় জানালেন। শহরের বাইরে যেতেই তার নজরে পড়ল, কারা যেন গম ক্ষেতের ওপর দিয়ে ঘোড়া নিয়ে গেছে। গমের কচি চারাগুলো নষ্ট করে দিয়েছে। মাইকেল আরো কিছুদূর গিয়ে দেখলেন, কালো ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। তাতার সৈন্যরা গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছ। রাস্তার দু-ধারে যেসব বাড়ি অক্ষত রয়েছে তাতেও লোক নেই। সবাই প্রাণ ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। গ্রামের শেষ প্রান্তে এক অমতিপর বৃদ্ধের মুখে শুনলো, 'দু-দশজন নয়, রীতিমতো একটি বাহিনী গ্রামের ওপর চড়াও হয়েছিল। বোমারির আমির ফেওফর খাঁ নাকি একের পর এক গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাঁক করে দিয়ে গেছে। তবে কলিভান গ্রামের ওপর নাকি এখনো তাদের কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হয় নি।

মাইকেল ওবি নদীর তীরে যখন পৌঁছলেন, ঘড়িতে তখন রাত্রি দশটা। কলিভান শহরে যেতে গেলে নদী পার না হলে সম্ভব নয়। নৌকোর জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি। এমন সময় ঘোড়ার ক্ষুরের ঘন ঘন আওয়াজ তার কানে গেল। প্রমাদ গুনলেন তিনি। কী সর্বনাশ! তাতার সৈন্য এসে পড়ল নাকি! নদীর তীরের একটি ঝোপে ঢুকে ঘাপটি মেরে বসে রইলেন। এ আর এক মহাবিপদ। সৈন্যরা ঝোপের ধারেই বিশ্রাম করতে বসল। বিশ্রাম মানে তো আর এক ঘুম দিয়ে নেওয়া নয়। কিছুক্ষণ ছায়ায় বসে একটু দম নিয়ে নেওয়া। তারা পরস্পরের সঙ্গে গল্পে মেতে গেল। ঝোপের মধ্যে বসে মাইকেল ভাবলেন—আপদগুলো কতক্ষণ বসবে তা-ই বা কে জানে? কোনোক্রমে তাঁর উপস্থিতি বুঝতে পারলেই কেলেঙ্কারী করে ছাড়বে। সাত-পাঁচ চিন্তা করে তিনি গুটিগুটি ঝোপ থেকে বেরিয়ে ঘোড়াটিকে কিছুটা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে গেল। এক সময় নিরাপদ ভেবে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। চাবুকের ঘা দিতেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল তেজী ঘোড়াটি। সৈন্যদের মধ্যে এক একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'ঘোড়া! ওই যে ঘোড়া হাঁকিয়ে কে পালাচ্ছে!'

ব্যস, আর কথা নেই। চোখের পলকে সৈন্যরা টপাটপ ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়ল। তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, মাইকেল-এর পিছু নিল।

মাইকেল নদীর তীরে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে জলে ঝাঁপ দিলেন। একের পর এক ডুব সাঁতার দিয়ে ওপারে গিয়ে উঠলেন। নদীর ওপারে ঘন ঝোপঝাড়। কে আর তাঁর টিকির নাগাল পায়। অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর মাইকেল কলিভান শহরে পৌঁছলেন। শহর প্রায় জনমানব শূন্য। তাতার সৈন্যদের আক্রমণের ভয়ে সবাই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। এক সময় ঘন বন্দুকের আওয়াজ কানে এল তার। কাছে—খুবই কাছ থেকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে বলেই মনে হল। তিনি ভাবলেন—তবে কি রাশিয়ান সৈন্যদের সঙ্গে তাতারদের মুখোমুখি লড়াই বেঁধেছে! এখনো তবে রাশিয়ান সৈন্য এখানে রয়েছে!

হ্যাঁ, রাশিয়ান সৈন্যরাই তাতারদের পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। সংখ্যায় খুবই অল্প বলে তাতারদের সঙ্গে বেশিক্ষণ টিকতে পারল না তারা। এবার তাতাররা উম্মাদের মতো

www.pathagar.com

শহরের দিকে ধাওয়া করল। মাইকেল ভাবলেন, আত্মগোপন করতে না পারলে পিতৃদত্ত প্রাণটুকু দিতে হবে। ছুটতে ছুটতে কিছুদূর গিয়ে একটি ভাঙা বাড়ি দেখে ঢুকে পড়লেন। কাঁটামারা বুটে গুরুগম্ভীর আওয়াজ তুলে সৈন্যরা ভাঙা বাড়িটির পাশ দিয়ে ছুটে গেল।

মাইকেল ভাঙা-বাড়িটায় থেকে যখন সৈন্যদের চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন, ঠিক তখনই সেই সাংবাদিক জুলিভেট ও ব্লাউন্ট তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাদের বাক্য বিনিময়ের সুযোগ না দিয়েই কয়েকজন সৈন্য হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে গেল।

বিস্তীর্ণ এক প্রান্তরে আমির ফেওফর খাঁ তাঁবু ফেলেছেন। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরাও করা বেশ বড়সড় একটি জায়গায় বন্দিদের রাখা হয়েছে রাশিয়ার স্ত্রী-পুরুষদের সঙ্গে মাইকেলও বন্দি হয়েছেন। আর সাংবাদিক দুজন? তাঁরাও রেহাই পান নি। বন্দিদের মাথার ওপর কোনো ছাউনি না থাকায় রোদ বৃষ্টিতে খুবই কষ্টভোগ করতে হচ্ছে বন্দিদের। উপায় নেই, শয়তানের হাতে যখন পড়েছেন প্রতিবাদ করে লাভ কি?

তৃতীয় দিন সকালে সেনাবাহিনী নিয়ে ওগারেফ এসে হাজির হলেন।

আমির তার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। খবর পেয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন।

ওগারেফ সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে বলেন, 'আপনার দর্শনলাভে নিজেকে ধন্য মনে করছি।'

মুচকি হেসে আমির বললেন, 'আপনাকে কাছে পেয়ে আমিও কম আনন্দিত হইনি। আপনার ভরসাতেই আমি জার-এর সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে সাহসী হয়েছি।'

'ইসিম থেকে ইরতিস নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল আমার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। আমি মনে করি আমাদের এবার লক্ষ্য হওয়া উচিত ইরকুটস্ক। ইরকুটস্ককে কব্জা করতে পারলে বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট হবেন আপনি।'

'কিন্তু ইরকুটস্ক অভিযানের কোনো পরিকল্পনা—'

'করেছি। শহরটাকে প্রথমে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে হবে। এমন ভাবে প্রাচীর গড়ে তুলতে হবে যাতে বাইরে থেকে সামান্যতম খাবারও ভেতরে ঢুকতে না পারে। মাসখানেক পর রাশিয়ান বাহিনী আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য হবে। তখনই তাদের মুরগির মতো জবাই করতে শুরু করব।'

'কিন্তু পেছন থেকে যদি জারের বাহিনী—'

'সে কথাও আমি যে ভাবি নি তা নয়। বিদ্রোহের গোড়াতেই আমি টেলিগ্রাফের তার কেটে ইরকুটস্ক-এর সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। আমার বিশ্বাস, বাইরে থেকে সাহায্যের হাত বাড়াবার আগেই আমাদের কাজ হাসিল হয়ে যাবে, ইরকুটস্ক আমাদের মুঠোয় চলে আসবে।

ওগারেফ আমির-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বন্দিদের কাঁটাতারে ঘেরা জায়গার কাছাকাছি আসতেই কয়েকজন রক্ষী হঠাৎ হই হই করে উঠল। ওগারেফ দাঁড়িয়ে পড়লেন। রক্ষীদের একজন ছুটে এসে তাঁকে জানালেন, দুজন বন্দি জোর করে তাঁর দিকে ছুটে আসতে চেষ্টা করছে। তিনি তাদের নিয়ে আসতে বললেন। কয়েকজন রক্ষী তাদের ধরে নিয়ে এল।

www.pathagar.com

ওগারেফ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা অমন বেয়াদপি করছিলে কেন? কি চাও তোমরা, মুক্তি?'

'হ্যাঁ, স্যার মুক্তি। আমরা দুজনেই সাংবাদিক। আমাদের কাছে পরিচয়পত্র রয়েছে। এই যে, দেখুন।' কথা বলতে বলতে তারা পকেট থেকে পরিচয়পত্র বের করে ওগারেফ-এর দিকে এগিয়ে দিলেন।

পরিচয়পত্র দুটো পরীক্ষা করে ওগারেফ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার! আপনারা সাংবাদিক, বন্দি করল কোনো আহাম্মক!'

'আমরা পরিচয়পত্র দেখাতে চেয়েছিলাম, আপনার সৈন্যরা পাত্তাই দিল না। আমাদের ধরে এনে গারদে ভরে দিল।'

'ঠিক আছে, আপনাদের মুক্তি দিচ্ছি। কিন্তু মনে থাকে যেন, আপনাদের এই মুক্তির খবরটা যেন ডেলি টেলিগ্রাফ-এর পাতায় দেখতে পাই।'

মুক্তি পেয়ে জুলিভেট বললেন, 'আর যা-ই হোক, কর্নেল-এর জন্যই প্রাণে বেঁচে গেছি।'

মাইকেল কিন্তু অন্যান্য বন্দিদের সঙ্গে আটকা পড়েই রইলেন। তার পরের দিন ছাউনি ওঠাবার ব্যবস্থা হল। বন্দিদের গরু-ভেড়ার মতো তাড়িয়ে নিয়ে চলল নতুন গারদের উদ্দেশ্যে। আবার ওগারেফ-এর সৈন্যরাও আর একদল বন্দিদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল। তাদের মধ্যে মাইকেল-এর মা মার্ফা স্ট্রগফ ও নাডিয়াও রয়েছে। গারদে একত্রে বেশ কিছুদিন থাকায় উভয়ের পরিচয় হৃদ্যতা ইতিমধ্যে জন্মে গেছে। পথে চলতে চলতে বৃদ্ধার কাছে নাডিয়া তার দুঃখ দুর্দশার গল্প করতে লাগল। মাইকেল-এর সঙ্গে এতদিন পথ চলেছে বটে, কিন্তু তাঁর আসল নাম জানত না, দাদা বলে সম্বোধন করেছে। বৃদ্ধা কিন্তু নাডিয়া-র মুখে তাঁর বিবরণ শুনে ধরেই নিলেন, সে তার ছেলের কথাই বলছে। বৃদ্ধা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তার বাড়ি কোথায়, বলেছিল কিছু?'

'ওমস্ক শহরের না, বলেছিলেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, মায়ের সঙ্গে নাকি দেখা করবেন না।'

কথাটি শোনামাত্র বৃদ্ধার চোখের কোণে জল দেখা দিল।

সৈন্যরা গরু-ছাগলের মতো তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে বন্দিদের। মাথার ওপর সূর্য রক্তচক্ষু মেলে শাসাচ্ছে। পায়ের তলায় বালি আগুনের মতো গরম। পায়ে ফোস্কা পড়ার উপক্রম। জায়গাটির নাম জাবেদিয়ারো। মাইকেল ছিলেন প্রথম দলে। ক্লান্ত পা দুটোকে কোনোরকমে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

পথের পাশে হঠাৎ জলাশয় দেখতে পেয়ে বন্দিরা উন্মাদের মতো হয়ে গেল। এক ফোঁটা জলের জন্য সবাই ছটফট করছে। বন্দিদের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে সৈন্যরা নির্মমভাবে চাবুক চালাতে লাগল। এক সময় বাধ্য হয়ে কড়া পাহারায় জলপানের ব্যবস্থা করল। জলাশয়ের অন্য দিকে মাইকেল-এর মা মার্ফা ও নাডিয়া জল-পান করছে। দূর থেকে মাইকেলকে দেখে বৃদ্ধা মা মার্ফার মধ্যে কেমন চাঞ্চল্য ফুটে উঠল। ব্যাপারটি সৈনিকদের মধ্যে কোনো একজনের নজরে পড়ল। সে তার সহকর্মীকে বলল, 'দেখ হে, ওমস্কের সেই বুড়ির ছেলে বন্দিদের দলে রয়েছে। বুড়ি আর তার সঙ্গের মেয়েটির ভাবগতিক দেখেই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে।

www.pathagar.com

'তুমি ছেলেটিকে চিনতে পেরেছ?'

'চিনতে পারি নি ঠিকই। কিন্তু বুড়িটিকে দিয়েই কাজ হাসিল করব।'

এক জিপসি মেয়ে তখন ওগারেফ-এর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'আমার কাজ উদ্ধার হলেই পুরস্কার দিতে হবে। কিন্তু ভাবছি তোমার সিংহাসনে বসার মুখে আমির যদি পথরোধ করে দাঁড়ায়?'

ওগারেফ তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গেলে যে কেলেঙ্কারী।

সকাল হল। ওগারেফ জিপসি মেয়েটিকে সঙ্গে করে মার্ফার কাছে গেলেন। বৃদ্ধা মার্ফা ধরেই নিলেন, আজ চরম পরীক্ষা দিতে হবে।

জিপসি মেয়েটি বলল, 'এই বুড়ী, তোমার ছেলে এই বন্দিদের মধ্যে রয়েছে, তাই না?'

মার্ফা জবাব দিলেন, 'কই না তো!'

'মিথ্যে বলে লাভ নেই। আমি জেনেছি, বন্দিদের মধ্যে তোমার ছেলেও রয়েছে। তাকে দেখিয়ে দিতে হবে।'

'এখানে সে নেই। থাকলেও আমি ধরিয়ে দেব না তাকে।'

'ঠিক আছে আমরা তবে যা ভালো বুঝছি, করছি। দেখি তুমি কতক্ষণ চুপ করে থাক।'

ওগারেফ এর নির্দেশে বন্দিদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হল। দুজন সৈনিক বৃদ্ধার গলায় একটি চাবুক বেঁধে মরা কুকুরের মতো রাস্তা দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল। মাইকেল-এর পাশ দিয়ে নিয়ে যাবার সময় তার গায়ের রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল। কিন্তু তিনি ধৈর্যচ্যুত হলেন না, অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখলেন।

ওগারেফ-এর কৌশল ব্যর্থ হল। তিনি এবার নতুন পথ ধরলেন। দুজন সৈনিক বৃদ্ধাকে বুটের লাথি মারতে মারতে আবার বন্দিদের সামনে নিয়ে এল। সজোরে একটি বুটের লাথি মেরে তাকে বসিয়ে দেওয়া হল। এবার শুরু হল পাশবিক অত্যাচার। দুজন ষণ্ডামার্কা সৈনিক অশতিপর বৃদ্ধার ওপর নির্মমভাবে চাবুক চালাতে লাগল। সে কি আওয়াজ! ঘন ঘন হিঁস হিঁস শব্দে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাবার যোগাড়। মাইকেল-এর পক্ষে এবার ধৈর্য ধরা সম্ভব হল না। এক সময় তিনি উম্মাদের মতো ছুটে এসে তাতার সৈন্যটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তার ডান হাতটি ভেঙে দু-টুকরো করে দিলেন।

ওগারেফ-এর মুখে হাসি ফুটে উঠল। কাঁটামারা বুটে কয়েকবার গম্ভীর শব্দ তুলে মাইকেল-এর সামনে এসে বললেন, 'বুঝেছি, তুমিই তবে মাইকেল স্ট্রগফ?' তার মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়েই ওগারেফ আবার বলে উঠলেন, 'একী! এযে দেখছি ইসিম স্টেশনের সেই যুবকটি!'

'হ্যাঁ, সেদিন যাকে বর্বরের মতো চাবুক মেরেছিলেন, আমিই সেই লোক।' কথা কয়টা কোনোরকমে ছুঁড়ে দিয়ে চোখের পলকে ওগারেফ-এর ওপর চাবুকের আঘাত হেনে বললেন, 'সেদিনের শোধ আজ নিলাম শয়তান।'

ভিড়ের মধ্য থেকে এক অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'চমৎকার। বাঃ বেশ করেছ।'

www.pathagar.com

মুহূর্তের মধ্যে ওগারেফ-এর দেহরক্ষী তলোয়ার হাতে মাইকেলকে ঘিরে ফেলল। ওগারেফ-এর নির্দেশে তারা তার দেহ তল্লাসী করে জার-এর সেই চিঠিটি বের করে ফেলল। ওগারেফ সেটি আদ্যোপান্ত পড়ে বললেন, 'এ চিঠিটিকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করব।'

মাইকেলকে পিঠমোড়া করে বেঁধে বিচারসভায় আনা হল।

বিচারক আমির আসনে বসে। পাশেই রয়েছেন ওগারেফ। পাশের টেবিলে পবিত্র কোরআন শরীফ রাখা আছে।

আমির কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কর্নেল, এই বন্দির অপরাধ কি?'

'এই বন্দি জারের গুপ্তচর। আমাদের খবর সংগ্রহ করছিল। জারের দেওয়া একটা চিঠিও তার পকেট থেকে পাওয়া গেছে। এই দেখুন সে-চিঠি।'

আমির এক নজরে চিঠিটি পড়ে নিয়ে তর্জ্জনীর সাহায্যে কোরান শরীফ-এর একটি শ্লোক নির্দেশ করলেন। বংশ পরম্পরায় চলেছে এই বিচার-পদ্ধতি। শ্লোকটিতে বলা হয়েছে, 'পৃথিবীর আলো তার চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে যাবে। সৃষ্টিকর্তার কোনো কিছুই তার দেখার অধিকার থাকবে না।' শ্লোকটি পাঠ শেষ করে তিনি এক প্রহরীকে তর্জনীর সাহায্যে ইশারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের দামামার মতো বিকট স্বরে বাজনা বেজে উঠল।

মাইকেল দেখছেন জ্বলন্ত উনুনে তলোয়ারের ফলাটি টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। এবার আমিরের নির্দেশে একটি সৈনিক টকটকে লাল তলোয়ারের ফলাটি তুলে আনল। মাইকেল-এর চোখের কাছ থেকে ফলাটি ঘুরিয়ে নেওয়া হল। মাইকেল যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করলেন।

আমির চলে গেলেন। ওগারেফ এগিয়ে গেলেন সেই চিঠিটি নিয়ে মাইকেল-এর চোখে সামনে সেটি মেলে ধরে বললেন, 'শেষবারের মতো জারের চিঠিটা পড়ে নাও। চোখ চলে গেলেও ইরকুটস্ক-এ পৌঁছে গ্র্যান্ড ডিউককে খবরটি পৌঁছে দিতে পারবে।' এবার আসল কথা বলছি শোন, 'আজ থেকে জারের পত্রবাহক তুমি নও, আমি নিজে।'

আচমকা তুর্যধ্বনি শোনা গেল। ছাউনি তোলার নির্দেশ দিয়েছেন, আমির।'

চারদিকে তাঁবু তোলার হিড়িক পড়ে গেল। বন্দিদের দিকে নজর দেওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত নেই। পুত্রের সর্বনাশকালে মার্ফা বাধা দিতে গিয়ে ক্রোধোন্মত্ত সৈনিক-এর হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন। তার মৃতদেহটিও অবেহলিতভাবে পড়ে রয়েছে।

বন্দিদের দিকে কারো নজর নেই দেখে নাডিয়া দুর্দশাগ্রস্ত মাইকেল-এর কাছে ছুটে এল। তার হাত ধরে টানতে টানতে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেল। মার আকস্মিক মৃত্যুতে মাইকেল ব্যথিত-মর্মাহত হলেন।

নাডিয়া রাতের অন্ধকারে মাইকেল-এর হাত ধরে টম নদীর তীর দিয়ে হেঁটে চলেছে। সারারাত হেঁটে পরদিন সকালে তারা সেমিলস্কেট শহরে হাজির হল। শহরে সারিবদ্ধ বাড়িগুলো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। বাড়ি আছে, মানুষজন নেই। সবাই প্রাণভয়ে শহর ছেড়ে পালিয়েছে। নাডিয়া বলল, 'অনেক পরিশ্রম হয়েছে, একটি বিশ্রাম করে নেওয়া যাক।' কথা বলতে বলতে সে মাইকেল-এর হাত ধরে পাশের একটি বাড়ির

www.pathagar.com

বারান্দায় উঠল। মাইকেল দু-হাতে হাতড়ে বসার জায়গাটা পরীক্ষা করে নিয়ে বসে পড়লেন।

মাইকেল এক সময় চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'নাডিয়া, শয়তানরা আমার চোখ দুটি তো নিলই, টাকার থলিটিও নিয়ে নিয়েছে। এখন ভাবছি, ইরকুটস্কে যাব কি করে?'

নাডিয়া তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলল, 'অমন মুষড়ে পড়লে চলবে কেন! প্রয়োজনে ভিক্ষে করে অর্থ সংগ্রহ করব, আপনাকে ইরকুটস্কে পৌঁছে দেব। আগে দেখি তো কতটা পায়ে হেঁটে যেতে পারি। পরে না হয় চিন্তা করে দেখা যাবে।

হাঁটা শুরু করলেন তাঁরা।

নাডিয়া মাইকেল-এর হাত ধরে হাঁটছে। মাথার ওপরে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড খুবই কষ্ট হচ্ছে, মিথ্যে নয়। এমন সময় ঈশ্বর মুখ তুলে তাকালেন! পিছন দিক থেকে একটি গাড়ি এসে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাঁরা হেঁটে ইরকুটস্ক যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন শুনে গাড়ির মালিকের দয়া হল। তাদের গাড়িতে তুলে নিল। বিশ্রাম করে তারা আটদিনে ত্রেসেনোয়ার্স শহরে পৌঁছল। সকালে নদী তীরের রাস্তা ধরে গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। মাইকেল কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বলেন, 'পাশেই কোনো নদী আছে মনে হচ্ছে। তাই কি? গাড়ির মালিক বলল, 'হ্যাঁ নদীই বটে। জেনিসি নদী এটি।'

নৌকো পাওয়া গেল না। চারটি বড়সড় পিপে গড়াতে গড়াতে নিয়ে এল। নদীর পার থেকে শক্ত ঘাস তুলে এনে মোটা মোটা দড়ি পাকিয়ে ফেলল ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এবার পিপে চারটে বেঁধে সুন্দর একটি ভেলা তৈরি করে নেওয়া হল। তারা নির্বিবাদে গাড়ি সমতে নদীটি পার হয়ে গেল।

নদীটা অতিক্রম করে তাঁরা আবার পথে নামলেন। অন্ধ মাইকেলকে হাত ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখে পথচারী দু-চারজন সঙ্গী রসিকতা করতেও ছাড়ল না। মাইকেল বা নাডিয়া কেউ-ই ব্যাপারটিকে গায়ে মাখলেন না। সময় নষ্ট করে আসল উদ্দেশ্য ভণ্ডুল করা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। আরো কিছুদূর এগোতেই নতুন করে বিপদের সম্মুখীন হলেন তাঁরা একদল তাতার সৈন্য পথ রোধ করে দাঁড়াল। কোনো কথা জিজ্ঞেস না করে তিনজনকেই তারা বন্দি করল। অন্ধ মাইকেলকে টেনে হিঁচড়ে নিতে যাওয়ায় পাশের একটি ডোবার গড়িয়ে পড়লেন তিনি। জল তেমন নেই, শুধুই কাদা। মাইকেলকে পড়ে যেতে দেখে নাডিয়া এক হেঁচকা টানে নিজেকে মুক্ত করে সেই ডোবায় ঝাঁপ দিল। দুজন সৈনিক ডোবার ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কর্তব্য চিন্তা করলেন। ব্যাপারটি দলপতি জানতেন না। তিনি সৈনিকদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য ধমক দিতেই ডোবার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিক-দুটোও মাইকেল ও নাডিয়াকে ছেড়ে দলে ভিড়ে গেল। হতভাগ্য সেই গাড়ির মালিক কিন্তু ছাড়া পেল না।

প্রায় দু-ঘণ্টা পরে নিরাপদ ভেবে ডোবা থেকে উঠে মাইকেল ও নাডিয়া আবার হাঁটা জুড়লেন। তাতার সৈন্যরা তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় একটি ঝাঁকড়া গাছের তলায় তাঁরা বিশ্রাম করতে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে মাইকেল নাডিয়াকে বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো? কার যেন আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে?'

নাডিয়া কয়েক মুহূর্ত উৎকর্ণ হয়ে ব্যাপারটি লক্ষ্য করে বলল, 'হ্যাঁ চলুন তো. এগিয়ে গিয়ে দেখেই আসি, ব্যাপার কী?'

www.pathagar.com

নাডিয়া মাইকেলকে নিয়ে একটি ঝোপের আড়ালে গেল আর্তনাদটির উৎসের সন্ধানে সামনের দিকে উঁকি দিতেই তার চক্ষুস্থির! তাদের সঙ্গের সেই গাড়ির মালিকের দুর্দশা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। জ্যান্ত লোকটিকে নিষ্ঠুর সৈন্যরা মাটিতে গলা পর্যন্ত পুঁতে রেখে গেছে। শুধুমাত্র মুণ্ডটি ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে। আর সেটিকে ছিন্ন মুণ্ডু মনে করে এক ঝাঁক শকুন মাথার ওপর চক্কর মারছে। শুধু কি তাই? কেউ কেউ তীরবেগে নিচে নেমে এসে ঠোকরও মারতে ছাড়ছে না। নাডিয়া এ-করুণ দৃশ্যটি মাইকেলকে বলল। মাইকেলের পরামর্শে সে পাশের ঝোপ থেকে তাড়াতাড়ি দুটো বড় দেখে ডাল ভেঙে আনলেন। ডাল দুটো দুজনে শক্ত করে ধরে বার বার মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে দুর্দশাগ্রস্ত চালকটির কাছে গেলেন। এবারের কাজ আরও কঠিন। মাইকেল লোকটির কাছে দাঁড়িয়ে দুহাতে ডাল দুটোকে মাথার ওপর ঘোরাতে লাগলেন, আর নাডিয়া একটি ডালের গোড়া থেকে আগেভাগেই ভেঙে রাখা একটু টুকরো দিয়ে মাটি খুঁড়ে লোকটিকে উদ্ধার করার কাজে ব্যস্ত হলেন। এক সময় মাইকেলকেও হাত লাগাতে হল। এবং চেষ্টা বিফলে গেল। হতভাগাটিকে যখন টেনে তোলা হয়, দেখা গেল, সে মারা গেছে। ব্যথিত-মর্মাহত মাইকেল ও নাডিয়া চোখের জল ফেলতে ফেলতে সেই গর্তেই তাকে কবর দিলেন।

মাইকেল ও নাডিয়া যখন যাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, ঠিক তখনই দূরে একদল তাতার সৈন্যকে ছুটে আসতে দেখতে পেলেন। অনন্যোপায় হয়ে তারা নদীর দিকে ছুটলেন। পাশেই ছিল মজে যাওয়া ডিনকা নদী। তারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কচুরিপানার মধ্যে নাক পর্যন্ত ডুবিয়ে লুকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে সৈন্যরা কাঁটামারা বুটের ঘনঘন আওয়াজ তুলে সেখান দিয়ে এগিয়ে গেল।

ভালোই হল! অবিশ্রান্ত হাঁটা। দুদিন দুরাত হেঁটে ক্লান্ত শরীরে তাঁরা একটি অনুচ্চ পাহাড়ের ধারে এসে পৌঁছলেন। নাডিয়া খুবই কাহিল হয়ে পড়েছে। উপযুক্ত বিশ্রাম না নিয়ে সে পাহাড়টি পার হবার চিন্তাই করতে পারছে না। সেদিন দুপুরের পর থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে অখণ্ড বিশ্রাম নিলেন তাঁরা। 'বাঃ! শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়েছে তো!' নাডিয়া বললেন।

এবার তারা কঠিন কঠোর পরিশ্রমের পথে পা বাড়ালেন। বার ঘণ্টা অমানুষিক ধকল সহ্য করে শেষপর্যন্ত পাহাড়টি পেরোতে পারলেন। পথ যেন আর শেষ হতে চায় না। আবার শুরু হল পথচলা। এবার তারা হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলেন সুবিশাল একটি হ্রদের ধারে। এটি পৃথিবী বিখ্যাত বৈকাল হ্রদ। ওপারেই তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত ইরকুটস্ক। শেষ পরীক্ষা। মাইকেল ও নাডিয়া উভয়ের মনেই অদম্য উৎসাহ। পরীক্ষায় জয়ী তাঁরা হবেনই।

বৈকাল হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি নদীর মোহনা। মাইকেল ও নাডিয়া সেখানে পৌঁছে গেলেন। নদীর মোহনটি এবার পার হতে হবে।

গোঁদের ওপর বিষফোঁড়া। হঠাৎ হৈ হট্টগোল শোনা গেল। আবার তাতার-সৈন্যের মুখোমুখি হবার আশঙ্কায় নাডিয়া তো মূর্ছা যাবার উপক্রম। কয়েক মুহূর্ত পরে সে-ই আবার মাইকেলকে আশ্বাস দিল, 'না, তাতার সৈন্য নয়, রাশিয়ান।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকগুলো পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা বলতে বলতে তাদের কাছে হাজির হল। মাইকেল তাদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, তাতার সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা ইরকুটস্ক যাচ্ছে। মাইকেল এতে খুবই খুশি হলেন।

www.pathagar.com

এবারে সবার কাছেই হ্রদ পার হবার সমস্যা। রাশিয়ানরা হ্রদের তীর ধরে হাঁটাহাঁটি করে বিরাট ভেলাটি দেখতে পেল। ভেলাটি খুবই বিরাট। শ' খানেক লোক অনায়াসে পারাপার করতে পারে। তাতার সৈন্যরা হয়ত বা হ্রদ পার হয়ে ভেলাটি নোঙর করে রেখে গেছে। স্বয়ং ঈশ্বরই যেন ভেলাটি এ অদৃষ্ট বিড়ম্বিতদের মুশকিল আসান করতে এখানে রেখে দিয়েছেন। সবাই হৈ হৈ করে ভেলায় উঠল। নাডিয়াও মাইকেলের হাত ধরে সাবধানে ভেলায় উঠলেন। রাশিয়ানদের ভিড়ে আমাদের পূর্ব পরিচিত সাংবাদিক দুজনও রয়েছে। মাইকেলকে দেখে তারা চিনতে পারলেন। তার চোখ দুটো হারানোর খবর তারা অনেক আগেই পেয়েছেন।

সাংবাদিকরা মাইকেলের পাশে গিয়ে বসলেন। তার দুরবস্থার জন্য আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করলেন। সুযোগমতো মাইকেল প্রায় ফিসফিসিয়ে তাঁদের কাছে অনুরোধ রাখলেন, ভেলার যাত্রীরা যেন তাদের পরিচয় জানতে না পারে। সাংবাদিকরা আশ্বাস দিলেন।

সূর্যদেব ইতোমধ্যে পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। আলো আঁধারীর খেলা এক্ষুনি শুরু হবে। ভেলাটি নদীতে এসে পড়ল। ক্রমে নদীর বুকে নেমে এল রাত্রির অন্ধকার। এক সময় নদীর ওপারে আগুন জ্বলে উঠতে দেখা গেল।

বুঝতে অসুবিধা হল না, তাতার সৈন্যদের ক্রোধানল—গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ভেলাটি তীব্র বেগে এগিয়ে চলেছে। সাংবাদিকরা হঠাৎ একটি নতুন জিনিস আবিষ্কার করল। বিপজ্জনক জিনিস। কী ভেবে নদীর জলে হাত দিলেন, বুঝলেন জলের ওপর তেলের মত কি যেন ভাসছে। কৌতূহলবশত নাকের কাছে হাত নিতেই রীতিমতো আঁতকে উঠলেন, 'কী সর্বনাশা কাণ্ড! জলের ওপর ন্যাপথা ভাসছে! কোনোরকমে আগুনের ছোঁয়া পেলেই নদীময় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে। অন্যরা ভয় পেয়ে যাবে, আশঙ্কায় সাংবাদিকরা ব্যাপারটি চেপে গেলেন। মাঝরাতে দেখা দিল আর এক ঘোরতর সমস্যা। মানুষের গন্ধ পেয়ে একপাল নেকড়ে সাঁতার কেটে ভেলার দিকে এগোচ্ছে পিস্তল ব্যবহার করার উপায় নেই। আওয়াজ পেলেই ধরা কাছে তাতার সৈন্য থাকলে ছুটে আসার সম্ভাবনা। ভরসা এটুকু যে, নেকড়েগুলো সাঁতারে যখন আসছে লগি ও বৈঠা দিয়ে দু-একটিকে ঘায়েল করতে পারলেই বাকিগুলো ভয়ে পালাবে। কার্যত হলও তাই। পরপর দু-তিনটি নেকড়ে মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠামাত্র বাকিগুলো পিছন ফিরে উর্ধ্বশ্বাসে সাঁতার কাটতে লাগল।

তখন প্রায় তিনটে বাজে। ঘণ্টাখানেক বাদেই পুব আকাশে ফরসা হতে শুরু করবে। নাডিয়া দূরে অনেকগুলো উজ্জ্বল আলো দেখে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে মাইকেলকে বললেন, 'আলো! ওই যে অনেকগুলো উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে।'

মাইকেলের ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন, 'ওটাই ইরকুটস্ক! তারই আলো আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে।' কিছুক্ষণ পরে সবার বহু আকাঙ্ক্ষিত ইরকুটস্কের মাটিতে পা দিলেন।

ইরকুটস্ক। সাইবেরিয়ার রাজধানী ইতিহাস প্রসিদ্ধ এ-শহর। গভর্নর জেনারেলের বাসস্থান এটি! সাইবেরিয়ার শাসনভার তাঁর ওপর ন্যস্ত। সৈন্যবাহিনীর একটি বড় ভগ্নাংশ এখানে রাখা হয়েছিল। রাশিয়ার পূর্বাংশের শাসনকার্য এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়। গ্র্যান্ড ডিউক মধ্য এশিয়া সফল সেরে ফেরার পথে পূর্ব সাইবেরিয়ার গভর্নর

www.pathagar.com

জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাতারদের বিদ্রোহের কথা এখানে বসেই শোনন তিনি। মস্কো থেকে টেলিগ্রাম মারফত তাঁকে এখান থেকে রওনা দিতে বারণ করা হয়! তার পরই মস্কোর সঙ্গে ইরকুটস্কের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় তাতার-বাহিনী। গ্র্যান্ড ডিউকের নির্দেশেই বিদ্রোহ অধ্যুষিত অঞ্চলের অধিবাসীরা টাকা-পয়সা খাবার-দাবার নিয়ে ইরকুটস্কে আশ্রয় নেয়। বিদ্রোহীরা যেন একদানা খাবারও না পায় নির্দেশ দেয়া হল। এবার তিনি সেনাবাহিনীর দিকে নজর দিলেন দিলেন। ভেবে দেখলেন, সামান্য কিছু সৈন্য নিয়ে তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে নিশ্চিত পরাজয়। গ্রামবাসীরা প্রচুর খাবার-দাবার সঙ্গে আনায় শহরে মোটেই খাদ্যাভাব দেখা দিল না। গ্র্যান্ড ডিউক বিরাট এক রক্ষীদল গঠন করলেন। করলেন। তাদের অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ করে তোলা হল। শহরের চারদিকে সুউচ্চ প্রাচীর গাঁথা হল। গ্রামবাসীদের সাহায্যে প্রাচীরের বাইরে গভীর পরিখা খনন করে শহরটিকে সুরক্ষিত করা হল। নদীর দিকে মুখ করে দেওয়া হল সারিবদ্ধভাবে কামান বসিয়ে।

বিদ্রোহীরা আসছে। ইরকুটস্ট নদীর ওপরের সেতুটি গ্র্যান্ড ডিউকের নির্দেশে ভেঙে দেয়া হয়েছে। আমীর ও ওগারেফের বাহিনী সংঘবদ্ধভাবে এগোচ্ছে ইরকুটস্ক শহরের দিকে। আরও একটি বিশাল বাহিনী আগেভাগেই জেমেনি নদীর তীরে ছাউনি ফেলে এদের জন্য অপেক্ষা করছে দুদিন ধরে। আমির আর ওগারেফ পঁচিশে ডিসেম্বর সৈন্য নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। ওগারেফ অনেক ভেবে চিন্তে স্থির করলেন, শহরের পিছন দিক থেকে নদী পেরিয়ে আক্রমণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। করলেনও তাই। এবার আর এক সমস্যা! পরিখা ডিঙিয়ে প্রাচীর ভাঙতে হবে। দেখা গেল, প্রাচীরের গায়ে হাজার হাজার ছিদ্র রয়েছে। নালা পার হতে চেষ্টা করামাত্র ভেতর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বেরিয়ে আসবে। বাধ্য হয়েই তাঁদের থমকে দাঁড়াতে হল। কোনো বুদ্ধি কাজে লাগল না। ওগারেফ ভাবলেন, জারের সেই চিঠিটি নিয়ে গ্র্যান্ড ডিউকের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। নিজেকে মাইকেল স্ট্রগফ বলে পরিচয় দেবেন। তার উদ্দেশ্য, ওদিককার প্রতিরোধ ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি আছে কিনা জানা। সেই ত্রুটিটিকে কাজে লাগাবেন, আক্রমণ করবেন। আমীর তাঁর বুদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করলেন, সানন্দে সমর্থন করলেন তাঁকে।

গ্র্যান্ড ডিউক জরুরি সভা আহ্বান করেছেন। ২ অক্টোবর সভা বসল। সভাপতি গ্র্যান্ড ডিউক জেনারেল, পুলিশের অধ্যক্ষ ও মেয়র প্রভৃতি দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা সভায় উপস্থিত হয়েছেন। গভর্নর জেনারেল অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন, 'ইরকুটস্কবাসী প্রতিটি সক্ষম পুরুষ যুদ্ধে সামিল হয়েছেন। প্রয়োজনে মেয়েরাও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে।'

মেয়র বললেন, 'আমি ইরকুটস্ক রক্ষার সার্বিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি! সে-প্রসঙ্গে নাগরিকদের পক্ষ থেকে মহামান্য গ্র্যান্ড ডিউকের কাছে একটি প্রশ্ন রাখছি, ইরকুটস্ক রক্ষার জন্য রাশিয়ার অন্য কোথাও থেকে সৈন্য এসেছে?'

নাগরিকদের প্রশ্ন খুবই সংগত, স্বীকার করে গ্র্যান্ড ডিউক বললেন, 'আমি খবর পেয়েছি, পঞ্চাশ হাজার সৈন্য, গোলাবারুদ ও প্রচুর রসদ নিয়ে জেনারেল কিসোভ আসছেন। নামুর প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চল থেকেও সাহায্য আসছে শুনেছি।'

www.pathagar.com

গ্র্যান্ড ডিউকের বক্তব্য শেষ হতে না হতেই পলিটিক্যাল অফিসার নিবেদন রাখলেন, 'সাইবেরিয়ার রাজবন্দিরাও জানিয়েছেন যুদ্ধে নামতে অত্যুগ্র আগ্রহী।'

'রাজবন্দিদের বিশ্বাস করা সমীচিন নয়!' পুলিশের অধ্যক্ষ বললেন।

গ্র্যান্ড ডিউক তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখুন, রাজবন্দিদের মধ্যে বহু দেশপ্রেমিক রয়েছে। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের অনুরোধ মেনে নিচ্ছি। সেই বাহিনীর অধিনায়ক কে হবেন, চিন্তার ব্যাপার।'

'ডক্টর ওয়াসিলি ফেডরকে তারা আগেভাগেই অধিনায়ক সাব্যস্ত করে রেখেছে। ইনি বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন।'

গ্র্যান্ড ডিউকের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল—কে? কে এ ওয়াসিলি ফেডর? নামটি কেমন চেনা মনে হচ্ছে! বিখ্যাত চিকিৎসক? হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। এবার তিনি পলিটিক্যাল অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'উনি এখানে কতদিন আছেন বলুন তো?'

'পাঁচ বছর, সে ছিল অতি ভদ্র। পাঁচ বছরের মধ্যে কোনোদিন আইনভঙ্গ করেন নি। বাইরে অপেক্ষা করছেন যদি আজ্ঞা হয়।'

'ঠিক আছে। তাঁকে সভায় হাজির করুন।'

ডক্টর ফেডর ঘরে ঢুকে গ্র্যান্ড ডিউককে অভিবাদন করে দাঁড়ালেন। গ্র্যান্ড ডিউক বললেন, 'শুনলাম, রাজবন্দিরা আপনার নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী গড়তে আগ্রহী, তাই কি?'

'হ্যাঁ স্যার। দেশরক্ষায় শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্তব্যজ্ঞান এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'ভালো কথা। এই মুহূর্ত থেকে আপনাকে অধিনায়কের পদে নিযুক্ত করলাম। আর সে সঙ্গে আপনার মুক্তির আদেশ দিলাম।'

'মুক্তি? কার মুক্তি? আমার একার মুক্তি? আমার বন্ধুদের মুক্তি না দিলে আমার একার মুক্তি চাই না স্যার।'

'আপনার দেশপ্রেম ও বন্ধুপ্রীতি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি আদেশ দিচ্ছি আজ থেকে ইরকুটস্ক-এর নির্বাসিত বন্দি বলে কেউ থাকবে না। সবাই মুক্ত। আর শুনুন সেনাপতি ফেডর, আজ থেকে ইরকুটস্ক-এর অস্ত্রাগার মুক্ত। প্রয়োজনে আপনি এর যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারেন।' গ্র্যান্ড ডিউক-এর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই প্রহরী অভিবাদন করে নিবেদন করল, 'মহামান্য জারের পত্রবাহক বাইরে অপেক্ষা করছেন।'

উপস্থিত পদস্থ অফিসারদের দিকে তাকিয়ে গ্র্যান্ড ডিউক বলেন, 'মহামান্য জারের পত্রটি গোপনে পড়তে চাই। তবে কথা দিচ্ছি, তেমন কোনো গোপন তথ্য না থাকলে পত্রের মর্মার্থ কালই আপনাদের কাছে ব্যক্ত করব।'

মহামান্য গ্র্যান্ড ডিউকের অনুরোধে সবাই যথোচিত অভিবাদনসহ সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন।

এবার জারের পত্রবাহক ভেতরে ঢুকে গ্র্যান্ড ডিউককে অভিবাদন করে দাঁড়ালেন। গ্র্যান্ড ডিউক বিস্ময়ভরা চোখে তার দিকে তাকালেন। লোকটিকে এক নজরে দেখলে মনে হয়, শীর্ণ দেহ, রুক্ষ-রুষ্ট এক চাষী। পোশাক-পরিচ্ছদ ছেঁড়া ও ময়লা, মাথায় ছেঁড়া একটি রাশিয়ান টুপি। গাল দুটিতে বড় বড় দুটো কাটা দাগ। পায়ের জুতোজোড়া খুবই ছেঁড়া। অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে বোঝা যায়।

গ্র্যান্ড ডিউক বললেন, 'তোমার নাম কি? কোত্থেকে এসেছ?'

www.pathagar.com

'স্যার, নাম আমার মাইকেল স্ট্রগফ। এসেছি মস্কো থেকে। পনের জুলাই রওনা দিয়েছি। মহামান্য জার এ পত্রটি—'

'দেখি, কি ব্যাপার? হাত বাড়িয়ে চিঠিটি নিয়ে প্রশ্ন করলেন—'

'পত্রটি কি তিনি এ-অবস্থাতেই তোমাকে দিয়েছিলেন?'

'না, স্যার। পথে তাত্যররা যদি কেড়ে নেয় এ-আশঙ্কায় আমি আগে ভাগেই খুলে এর বক্তব্য জেনে নিয়েছিলাম। চিঠি না থাকলেও মহামান্য জারের বক্তব্য যাতে আপনার কাছে পৌঁছে দিতে পারি তাই—'

'তুমি কি তাতারদের হাতে বন্দি হয়েছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। তাই আসতে এত দেরি হল।'

'তুমি কি জানো. বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্য পাঠিয়েছি?'

'জানি। কিন্তু বিদ্রোহীদের সৈন্য-সংখ্যা চার লাখের ওপর। তাদের সামনে আপনার সৈন্য দাঁড়াতেই পারবে না—এ-মিথ্যা বক্তব্যটি প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর চোখে মুখে ভাবান্তর দেখা দিল। কিন্তু মিথ্যা সংবাদ সরবরাহ করতেই তো ওগারেফ মাইকেল স্ট্রগফের ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন।

চোখে মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ একে গ্র্যান্ড ডিউক বললেন, 'তাতার সৈন্যদের সঙ্গে আমাদের সৈন্যের কোথাও যুদ্ধ হয়েছিল বলে শুনেছ?'

'শুনেছি স্যার। টমস্কো ও কলিভানে যুদ্ধ হয়েছিল। আর হয়েছিল ক্রেসেনেয়ার্কসে। সব জায়গাতেই আমাদের সৈন্যরা মার খেয়েছে।'

'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তবু আর একটি কথার উত্তর দাও—ওগারেফকে দেখছ কোনোদিন?'

'খুব কাছ থেকেই দেখেছি স্যার। আপনি নাকি তাকে একবার নির্বাসন দিয়েছিলেন? তাই আপনার ওপর খুবই খাপ্পা দেখলাম।'

'তোমার বক্তব্য তোমার মুগ্ধ করেছে, বৎস। আমার কাছে তোমার কোনো প্রার্থনা আছে?'

'স্যার, আমি নিজের জন্য কিছুই চাইনা। তবে আপনার হয়ে যুদ্ধ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব।'

'উত্তম! তোমাকে আজ থেকে আমার দেহরক্ষী নিযুক্ত করলাম, খুশি তো?'

ওগারেফ গ্র্যান্ড ডিউককে অভিবাদন করে হাত কচলে নিবেদন করলেন, 'স্যার দয়ার অবতার!'

এবার শুরু হল ওগারেফের কূটচালকে বাস্তবায়িত করা। গ্রান্ড ডিউকের দেহরক্ষী হয়ে ইরকুটস্কের সর্বত্র তাঁর গতি? সংবাদ সংগ্রহের অপূর্ব সুযোগ পেতে লাগলেন। বলশয় প্রাসাদের ওপর তার কড়া নজর। প্রাসাদের কাজে লাগাতে লাগলেন! প্রতিদিনের সংগৃহীত খবরাখবর ছোট্ট কাগজে লিখে পুটুলি পাকিয়ে বাইরে ছুড়ে, দেন, আমিরকে জানান। একদিন কাগজটি একটু বড়ই হল, বক্তব্য অনেক। তিনি আমিরকে লিখলেন, "আক্রমণ করতে হবে পাঁচই অক্টোবর রাত বারোটায়। তখন বলশয় প্রাসাদের পিছনের দরোজা খুলে রাখব।"

অক্টোবরের চার তারিখে তাতার সৈন্যদের কর্মতৎপরতা অনেকাংশে বেড়ে গেল। পরদিন রাত বারোটায় আক্রমণ করতে হবে। সময় বেশি নেই।

www.pathagar.com

বহু আকাঙ্ক্ষিত রাত এল! তাতার সৈন্যরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অধীর অপেক্ষায় রয়েছে। গ্রান্ড ডিউকের বুঝতে দেরি হল না তাতারবাহিনী আক্রমণ করল বলে! তিনি ব্যস্ত হয়ে মাইকেল-এর খোঁজ করলেন। বহু খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে পাওয়া গেল না। তিনি অনন্যোপায় হয়ে বিপদ সংকেত দিতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে পাগলা ঘন্টা বেজে উঠল। তাতারবাহিনীকে প্রতিরোদ করার জন্য সাজো সাজো রব পড়ে গেল।

ওগারেফ অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে গোপনে প্রাসাদের একটি ঘরে নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। একসময় উন্মাদিনীর মতো ছুটতে ছুটতে একটি মেয়ে তাঁর ঘরে ঢুকল। এই সেই নাডিয়া। তারা নদী পেরিয়ে তীরে উঠেই বুঝতে পারে তাতারবাহিনী প্রাসাদ আক্রমণ করতে উদ্যত। বিপদের মুহূর্তে শহরবাসীদের জন্য প্রাসাদের সদর-দরোজা খুলে দেয়া হয়েছে। নাডিয়া সে দরজা দিয়ে ছুটতে ছুটতে প্রাসাদে ঢুকে পড়ে। ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলির জন্য অন্ধ মাইকেল তার হাত থেকে ফসকে যায়, হারিয়ে যায়। উন্মাদিনীর মতো তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে ওগারেফের ঘরে ঢুকে পড়ে। ওগারেফ তার পরিচিত, তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে—'আইভান ওগারেফ।' সামনে বাঘ দেখার মতো আঁতকে ওঠে নাডিয়া।

বিপদ আসন্ন, হাতেনাতে ধরা পড়ে যাওয়ার উপক্রম দেখে ওগারেফ কোমর থেকে ছোরা বের করে নাডিয়াকে আঘাত করতে এগিয়ে যান! নাডিয়া সচকিত হয়ে পিছন দিকে সরতে সরতে চেঁচিয়ে উঠল, 'মাইকেল। মাইকেল, কোথায় তুমি? আমার কী বিপদ দেখো!'

ওগারেফ ছোরা হাতে এগোতে এগোতে বললেন, 'খবরদার! চেঁচাবে না বলে দিচ্ছি!'

মৃত্যুভয়ে ভীত নাডিয়া আরও গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'মাইকেল কোথায় তুমি? শয়তানটা আমাকে খুন করে ফেলল। মাইকেল তুমি কোথায়—'

নাডিয়ার কথা শেষ হওয়ার আগেই মাইকেল তার কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে, দেয়াল ধরে ধরে সেখানে হাজির হলেন। কোমর থেকে পিস্তল বের করে তিনি ওগারেফকে গুলি করতে যাবেন, ঠিক তখনই কয়েকজন সৈন্যসহ গ্র্যান্ড ডিউক ভোজবাজির মতো সেখানে হাজির হলেন। তিনি কিছু বলার আগেই মাইকেল পিস্তলের ট্রিগার টিপে দিলেন। ওগারেফের শরীর থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। বিকট আর্তনাদ করে মৃত্যুপথযাত্রী ওগারেফ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

গ্র্যান্ড ডিউক ঘরে ঢুকে গর্জে উঠলেন, 'কে? একে হত্যা করেছে কে?'

মাইকেল দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'আমি, আমিই হত্যা করেছি। কিন্তু এ কে জানেন কি? কী এর নাম, কী-ইবা জানেন?'

'মাইকেল স্ট্রগফ!'

'না, মিথ্যে কথা। এর নাম আইভান ওগারেফ। মাইকেল স্ট্রগফ আমার নাম। বিশ্বাসঘাতক এ শয়তানটি জারের চিঠিটি জোর করে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল।'

'সে কী কথা!'

'হ্যাঁ, স্যার।' এবার মাইকেল ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে গ্র্যান্ড ডিউকের কাছে ব্যক্ত করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, উত্তপ্ত তরবারিটি তাঁর চোখের সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে

www.pathagar.com

নেয়ার সময় তিনি অন্ধ হন নি। এতদিন তিনি অন্ধের অভিনয় করে সবার সাহায্য সহযোগিতা কুড়িয়েছেন। আসল ব্যাপারটি নাডিয়ার কাছেও প্রকাশ করেন নি। মাইকেল একসময় লোহা-ঢালাইয়ের কারখানায় কাজ করতেন। তাই দীর্ঘদিন তাপ সহ্য করে তাঁর চোখের মণি দুটো অস্বাভাবিক তাপনিরোধক ক্ষমতা পায়। তাই তখন উত্তপ্ত তরবারির ফলার তাপ সে চোখ দুটো অনায়াসেই সহ্য করে নিয়েছিল।

মাইকেল গ্র্যান্ড ডিউকের কাছে পথের বিপদের উল্লেখ করতে গিয়ে নাডিয়ার অকুণ্ঠ সাহায্য, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার কথাও বলেন।

নাডিয়া তাঁর বন্দি-বাবার পরিচয় দিতে গিয়ে ডক্টর ওয়াসিলি ফেডর নাম উল্লেখ করলেন।

গ্র্যান্ড ডিউক উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে তাঁর হাত দুটো সস্নেহে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'মা, তুমি বন্দির মেয়ে নও। আজ তুমি মুক্ত। তোমার বাবা ফেডরও মুক্ত।'

তিনি মাইকেলের হাতটি টেনে নিয়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড করে বসলেন। উভয়ের হাত দুটো মিলিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, 'পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করি, তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হোক।'

তার পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। ডক্টর ফেডর রাতের অন্ধকারে অস্ত্রহাতে প্রাসাদের চারদিকে চক্কর মারতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন, প্রাসাদের পিছন দিকের দরজাটা খোলা সম্পূর্ণ অরক্ষিত। আর এই পরিলক্ষিত ব্যবস্থাকে কাজে লাগাতে হাজার হাজার তাতার সৈন্য অন্ধকারে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। ডক্টর ফেডর তাড়াতাড়ি দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে সমূহবিপদের হাত থেকে প্রাসাদটি রক্ষা করেন।

আমির ফেওফার খাঁ আইভান ওগারেফের মৃত্যুসংবাদ শুনে খুবই দমে গেলেন। দ্বিতীয়বার প্রাসাদ আক্রমণের চিন্তা তাঁকে ত্যাগ করতেই হল। তিনি সৈন্যদের ছাউনি তোলার আদেশ দিলেন। শেয়ালের মতো পালিয়ে গেলেন হতোদ্যম আমির। রাশিয়ান সৈন্যরা পিছন থেকে তাড়া করতে গিয়ে কয়েক হাজার তাতার সৈন্যের প্রাণ নিল। তাতার বিদ্রোহের অবসান হল।

সাংবাদিক হ্যারি ব্লাউন্ট ও অলসাইট জুলিভেট রাশিয়ান বাহিনী তাতারদের তাড়িয়ে ফিরে আসার সময় তাদের সঙ্গ নিলেন। মাইকেল ও নাডিয়ার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় তাঁরা যারপরনাই খুশি হলেন। তাঁরা আরো খুশি হলেন, যখন শুনলেন, মাইকেল সত্যি সত্যি অন্ধ হন নি, প্রয়োজনের তাগিদে তিনি অন্ধের ভূমিকা নিয়েছিলেন।

ডক্টর ফেডর আজ সবচেয়ে বেশি খুশি। বন্দি ফেডর আজ মুক্ত। অনেকদিন পর একমাত্র মেয়েকে বুকে পেয়েছেন তিনি। শুধু কি এই? মাইকেল স্ট্রগফ-এর মতো জামাই পাওয়াও কম ভাগ্যের কথা নয়!

ডক্টর ফেডর ঘটা করে একমাত্র মেয়ে নাডিয়ার বিয়ে দিলেন। মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে গ্র্যান্ড ডিউকের সেই কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন, 'পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি, তোমাদের ভবিষ্যৎজীবন সুখের হোক।'

---

www.pathagar.com

অ্যাডভেঞ্চার্স অফ ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস

১৮৬০-এর ৫ এপ্রিল।

সেদিন সকালের লিভারপুল হ্যারল্ড পত্রিকার পাতায় খবরটা প্রকাশিত হল। ব্যস, আর দেরি নয়, পরের দিন ভোর হতে না হতেই ফরোয়ার্ড নামক জাহাজটা অজ্ঞাত দেশের উদ্দেশ্যে নোঙর তুলল।

প্রতিদিন চার মাইল দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট নিউ প্রিন্স বন্দর থেকে কত জাহাজই তো ছাড়ে, ভেড়েও কত জাহাজ, কে তার খবর রাখে। কিন্তু ৬ এপ্রিলের ব্যাপারটা একেবারেই স্বতন্ত্র। কাকডাকা সকাল থেকেই কৌতূহলী মানুষ দলে দলে কাতারে কাতারে এসে জমা হতে লাগল, একমাত্র 'ফরোয়ার্ড' নামের জাহাজটির সমুদ্রযাত্রার দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার অত্যুগ্র বাসনা নিয়ে।

সত্যই অত্যাশ্চর্য অবিশ্বাস্য গঠন নৈপুণ্যের অধিকারী অত্যাধুনিক জাহাজ এই ফরোয়ার্ড। এটা ইঞ্জিনের সাহায্যে তো চলেই, পালের দ্বারাও অনায়াসে পথ পাড়ি দিতে পারে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জাহাজটার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নিজেদের মধ্যে জল্পনা কল্পনায় লিপ্ত হয়েছে, এটা নির্ঘাত উত্তর মেরুর দিকে চলেছে। বিশেষ করে পালটার আকার তাদের এরকম ধারণা করতে উৎসাহিত করছে। আর জাহাজে বোঝাই করা হয়েছে, পাঁচ-ছয় বছর চলার মতো খাদ্যসামগ্রী, সিলমাছের চামড়ার পোশাক আশাক আর, বস্তা বস্তা উল আর ওষুধপত্র দিয়ে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, জাহাজের নাবিক ও লস্কররা জানে না জাহাজটাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে। কাড়ি কাড়ি টাকা বেতন পাওয়ায় সবাই মুখে কুলুপ এঁটে মহানন্দে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে চলেছে।

ফরোয়ার্ড জাহাজের ক্যাপ্টেনের পদে নিযুক্ত যিনি হয়েছেন তিনি নিপাত্তা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্যানডন নামে লোকটা ক্যাপ্টেন হবার সবদিক থেকে যোগ্য। আর তাকেই কি না করা হয়েছে জাহাজের মেট। এর চেয়ে হাস্যকর ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার আর কী-ই বা হতে পারে? ক্যাপ্টেনকে মুহূর্তের জন্যও কেউ চোখে দেখে নি। গন্তব্যস্থল কোনদিকে, কোথায়, কিছুই জানা নেই। সবচেয়ে বেশি কৌতূহল সঞ্চার করেছে কুকুরটার খবর প্রচার হওয়ার পর থেকে।

একটা কুকুর নাকি ফরোয়ার্ড জাহাজের ক্যাপ্টেনের পদে বহাল হয়েছে। এমন একটা অবিশ্বাস্য কথা প্রচার হলে শহরবাসীদের মনে কৌতূহলের সঞ্চার তো হবেই। জাহাজের মালিক ও সৃষ্টিকর্তা রিচার্ড শ্যানডন। দুহাতে টাকা খরচ করে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশালায়তন জাহাজটাকে গড়ে তুলেছেন। নিউ ক্যাসলের এক কারখানা ১২০ হর্সপাওয়ার-বিশিষ্ট ইঞ্জিন তৈরি করে দিয়েছেন। ডেকের ওপর ষোল পাউন্ড কামান রাখা হয়েছে। কামান আর বন্দুকের সংখ্যা বেশি না রাখলে কী হবে বস্তা বস্তা বারুদ কিন্তু তোলা হয়েছে। এসব ছাড়া আর যা কিছু নেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সিগন্যাস-ল্যাম্প, সহস্রাধিক রকেট, বিচিত্রদর্শন সব যন্ত্রপাতি আর বিশালায়তন কয়েকটা করাত।

www.pathagar.com

রিচার্ড শ্যানডনের হাতে আটমাস আগে অ্যাবারডন থেকে ১৮৫৯-এর ২ আগস্ট তারিখে লেখা অদ্ভুত একটা চিঠি এসেছিল। চিঠিটার লেখক ফরোয়ার্ড জাহাজের ক্যাপ্টেন কে. জেড। তিনি লিভারপুলে বসে ওই চিঠিটা হাতে পান। চিঠিটার লেখক জানিয়েছেন, ম্যাকুয়ার্ট কোম্পানির ব্যাঙ্কে ষোল হাজার পাউন্ড মজুত রেখেছেন। নিজের স্বাক্ষরযুক্ত বেশ কিছুসংখ্যক চেকও চিঠিটার সঙ্গেই তিনি পাঠিয়েছেন। তিনি যেন ব্যাঙ্ক থেকে ইচ্ছামত প্রয়োজনীয় অর্থ তুলে নেন। আর এও লিখেছেন, রিচার্ড শ্যানডন চিঠির লেখক কে, জেডকে চেনেন না বটে, তবে তিনি তাঁকে চেনেন। ব্যস, এর বেশি কিছু দরকার নেই। তাঁকে ৫০০ পাউন্ড বেতনের বিনিময়ে ফরোয়ার্ড জাহাজের প্রধান কার্যনির্বাহকের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আর বছর বছর পঞ্চাশ পাউন্ড করে বেতন বৃদ্ধি করা হবে। তবে এও লিখতে বাদ দেন নি যে, অভিযানটা দীর্ঘদিনের আর বিপদ ও ঝুঁকিবহুলও বটে। চিঠির সঙ্গে জাহাজের নকশাটাও পাঠিয়ে দিয়েছেন। কারণ জাহাজটা তৈরির কাজ এখনও আরম্ভবই করা হয় নি। নকশা অনুযায়ী মজবুত একটা জাহাজ যেন তিনি তৈরি করে নেন। জাহাজ তৈরির কাজ মিটে গেলে পছন্দমাফিক পনের জন কর্মচারী যেন বহাল করেন। চিঠির লেখক এবং রিচার্ড শ্যানডনকে নিয়ে তা দাঁড়াবে সতের জনে।

ডা. ক্লবোনি নামে আর একজন সময়মতো হাজির হবেন। তবে একটা শর্ত, নাবিকরা সবাই যেন অবশ্যই ইংরেজ হয়। আর সবাইকে অবিবাহিত এবং সন্তানসন্ততিহীন হতেই হবে। সবার দৈহিক গঠন সুদৃঢ় এবং মদাসক্তহীন হতে হবে। পাঁচ গুণ বেতন তাদের জন্য বরাদ্দ করা হবে। প্রতিবছর শতকরা দশভাগ করে বেতন বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা থাকবে। অভিযানের পাট মিটে গেলে প্রত্যেক কর্মীকে অতিরিক্ত ৫০০ পাউন্ড দেয়া হবে। আর তাঁকে অর্থাৎ রিচার্ড শ্যানডনকে দেওয়া হবে অতিরিক্ত ২০০০ পাউন্ড। চিঠিটার শেষের দিকে লিখেছেন, রিচার্ড শ্যানডন যদি উপরোক্ত প্রস্তাব মেনে কাজ করতে সম্মত থাকেন তবে যেন কে. জেডকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন। ঠিকানা দেয়া আছে—পোস্ট রেস্তানডে, গোটবর্গ, সুইডেন।

তিনি আবার লিখেছেন, ১৫ ফেব্রুয়ারি অতিকায় একটা ড্যানিশ কুকুরকে রিচার্ড শ্যানডনের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তার দেখভালের দায়িত্ব তাঁর ওপরই বর্তাবে। কুকুরটার প্রাপ্তিসংবাদ ইতালির পোস্টমাস্টারকে যেন চিঠির মারফত জানিয়ে দেন। প্রয়োজন হলেই ফরোয়ার্ড জাহাজের ক্যাপ্টেন হাজির হবেন। নইলে তাঁকে ছাড়াই লিখিত নির্দেশ মেনে রিচার্ড শ্যানডনকেই ফরোয়ার্ড জাহাজকে চালাতে হবে। চিঠির বক্তব্য এ পর্যন্তই।

রিচার্ড শ্যানডন রহস্য সঞ্চারকারী চিঠিটা হাতেপাওয়ার পর অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে একাধিকবার সেটাকে পড়লেন। কিন্তু কিছুতেই রহস্যভেদ করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হল না। ব্যাপারটা তাঁর কাছে কুয়াশাচ্ছন্নই রয়ে গেল। কিন্তু কোনোরকম উত্তেজনার লেশমাত্রও তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেল না। তিনি একজন ঝানু নাবিক। সুমেরু প্রদেশে দীর্ঘদিন শিকারে ব্যস্ত ছিলেন। সংসারের পাট নেই। বিয়ে করেন নি। সন্তানসন্তদির প্রশ্নই ওঠে না।

রহস্যজনক চিঠিটা পাওয়ার পরই ঠাণ্ডা মাথায় সোজা ম্যাকুয়ার্ট ব্যাঙ্কে হাজির হলেন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, সত্যিই তার নামে ১৬,০০০ পাউন্ড ব্যাঙ্কে জমা

www.pathagar.com

পড়েছে। ব্যাস, আর এক মুহূর্তও দেরি না করে সেখানেই তিনি চিঠি লিখতে বসে গেলেন। কে. জেড. নামক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিটিকে তাঁর সম্মতির কথা জানিয়ে দিলেন।

রিচার্ড শ্যানডন ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে সোজা জাহাজ নির্মাণ কারখানায় হাজির হলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শুরু হয়ে গেল 'ফরোয়ার্ড' জাহাজটা তৈরির কাজ।

রিচার্ড শ্যানডনের বয়স চল্লিশ। অকৃতদার। কঠোর পরিশ্রমী। একটা কথা তো অক্ষরে অক্ষরে সত্য, কে. জেড. নামক ব্যক্তিটি যতই অদ্ভুত প্রকৃতির হোন না কেন, তিনি তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে এতগুলো অর্থ তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, গন্তব্যস্থলের কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেন নি, সত্য বটে। তিনি তার বিশ্বাসের মর্যাদা এতটুকুও ক্ষুণ্ন করবেন না। আর গন্তব্যস্থল সম্পর্কে পীড়াপীড়ি ও করবেন না কিছুতেই।

তিনি এবার বছর ত্রিশেক বয়স্ক জেমস ওয়ান নামে এক যুবককে সেকেন্ড মেট অফিসারের পদে বহাল করলেন। দক্ষ নাবিক। অনেকবার উত্তরাঞ্চলে গিয়েছে। তারপর ডেক নাবিকদের তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত করা হল জনসনকে। এবার তিনজনে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী সুঠামদেহী নাবিক জোগাড় করলেন। এদিকে উল্টানো তিমি মাছের মতো পাখনাওয়ালা হাড়গোড় বের করা ফরোয়ার্ড জাহাজ তৈরির কাজ জোর-কদমে চলতে লাগল। রিচার্ড শ্যানডন মাঝে-মধ্যেই এসে কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে যান।

কর্মী সংগ্রহের পাট চুকে গেলে রিচার্ড শ্যানডন খাদ্যবস্তুসমূহ, পোশাকপরিচ্ছদ, ওষুধপত্র এবং যন্ত্রপাতি কেনাকাটার কাজ শুরু করলেন।

২৩ জানুয়ারি। অন্যদিনের মতোই রিচার্ড শ্যানডন দেরি না করে নৌকায় চেপে জাহাজ কারখানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি হঠাৎ এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। আগন্তুক বেটেখাটো ও মোটাসোটা, চোখে মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ সুস্পষ্ট। ব্যবহার খুবই সাদাসিদে ও হাসিখুশি। একনাগাড়ে কতা বলতে অভ্যস্ত। তবে এত তাড়াতাড়ি কথা বলেন যে, রিচার্ড শ্যানডন তার একটা শব্দও হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। আগন্তুক ভদ্রলোক দম নেয়ার জন্য মুহূর্তের জন্য থামতেই রিচার্ড শ্যানডন আচমকা প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন, 'আমি কি ডা. ক্লবোনির সঙ্গে কথা বলছি?'

'তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। একটানা পনের মিনিট আপনার খোঁজ করছি কমান্ডার। তবে আর মিনিট পাঁচেক খোঁজাখুঁজির পর মনে করতাম কমান্ডার রিচার্ড শ্যানডন নামে কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। এবার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সোল্লাসে বলে উঠলেন, 'করমর্দন করুন জনাব! হাত বাড়ান, করমর্দন করুন!'

করমর্দন সেরে ডা. কবোনি অনর্গল বলতে শুরু করলেন, 'দেখুন জনাব, ফরোয়ার্ড হবে কেবল দুজনেরই অভিযান। তবে হুঁশিয়ার! কোনো অজুহাতেই কিন্তু ফেরা সম্ভব হবে না। অবশ্য আপনি একজন সুদক্ষ ও পাকাপোক্ত নাবিক। আপনাকে নিয়ে আমার কিছুমাত্রও আশঙ্কার কারণ নেই। আর সাহসিকতাও অতুলনীয়। আর উপযুক্ত অফিসারই আপনি নিযুক্ত করেছেন জনাব!'

অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা চালিয়ে শেষপর্যন্ত রিচার্ড শ্যানডন মুখ খোলার সুযোগ পেলেন, 'ডা. ক্লবোনি, এরকম একটা অভিযানে আপনি কীভাবে মাতলেন, দয়া করে বলবেন কি?'

www.pathagar.com

কোটের পকেট থেকে একটা চিঠি বের করতে করতে ডা. ক্লবোনি বললেন, 'এইযে, এভাবে।'

চিঠিটা রিচার্ড শ্যানডনের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'নিন, চিঠিটা পড়ে দেখুন।'

খুবই ছোট্ট, মাত্র দুছত্রের একটা চিঠি। ইনভারনেস থেকে আঠার শো ষাটের বাইশে জানুয়ারি লিভারপুলের ঠিকানায় ডা. ক্লবোনিকে চিঠিটা লেখা হয়েছে। লিখেছেন ফরোয়ার্ড জাহাজের ক্যাপ্টেন কে. জেড.।

তিনি লিখেছেন—ডা. ক্লবোনি যদি ফরোয়ার্ড জাহাজে করে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার আগ্রহী হন তবে যেন কমাণ্ডার রিচার্ড শ্যানডনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

রিচার্ড শ্যানডন চিঠিটা পড়া শেষ করে মুখ তুলতেই ডা. ক্লবোনি বললেন, 'একটু আগেই চিঠিটা হাতে পেয়েছি।'

'কিন্তু কোথায় যাবেন জানা আছে কি?'

'তা জেনেই বা কী লাভ, বলুন তো? সবাই আমাকে একজন অতি বিজ্ঞ লোক বলে জানলেও আসলে কিন্তু আমার পক্ষে কিছুই জানা হয়ে ওঠে নি। কয়েকটা বই লিখেছি বটে। কাটতিও খুব মন্দ হয় নি। তবু স্বীকার করি কিছুই জানা হয়ে ওঠেনি। তাই তো সুযোগ পেলেই জানার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। শল্যবিদ্যা, ওষুধপত্রাদি, ভূবিদ্যা, ইতিবৃত্ত, খনিজবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, মহাকাশবিদ্যা, শঙ্খবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে একটু-আধটু জ্ঞান যা অর্জন করেছি সেগুলোকে একটু নাড়াচাড়া দিতেই সমুদ্রে ভাসতে আগ্রহী। যেদিকে, যেদেশে গেলে জানা যাবে, শেখা যাবে সেদিকে যেতেই আমি উৎসাহী।'

রিচার্ড শ্যানডন মুচকি হেসে বললেন, 'তবু সেটা কোনদিকে বলুন তো?'

'যতটা শুনেছি তাতে বুঝেছি, উত্তরদিকে।'

'ক্যাপ্টেন কে, জানেন কি?'

'না, তা জানি না বটে। তবে তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু জানতে পেরেছি, খুবই সদাশয় ব্যক্তি।'

কথা বলতে বলতে উভয়ে জাহাজ নির্মাণ কারখানায় হাজির হলেন। চিৎ হয়ে পড়ে থাকা হাড়গোড়া বের করা ফরোয়ার্ড জাহাজটাকে দেখামাত্র ডা. ক্লবোনি আবেগে উচ্ছ্বাসে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি জাহাজে চিকিৎসকের পদে বহাল হয়েছেন। বছর চল্লিশেক বয়স। জ্ঞানপিপাসু।

৫ ফেব্রুয়ারি ফরোয়ার্ড জাহাজ নোঙর তুললো।

পনেরোই মার্চ একটা ড্যানিশ কুকুর এডিনবরা থেকে জাহাজে উঠল। রিচার্ড শ্যানডন সেটাকে জাহাজে তুলে নিয়েছেন।

* * *

জাহাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কেবিন সাজিয়ে গুছিয়ে নিলেন।

ফরোয়ার্ড জাহাজটার ৫ এপ্রিল নোঙর তোলার কথা। রিচার্ড শ্যানডনের যেন আর তর সইছে না। অস্থিরচিত্ত রিচার্ড শ্যানডন পারলে যেন এখনই নোঙর তুলে জাহাজকে দূর সমুদ্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। এর পিছনে কারণও রয়েছে যথেষ্টই। এত সাধ্যসাধনা করে যাদের জোগার করা হয়েছে তারা দেরি দেখলে গুটিগুটি সরেও পড়তে পারে।

www.pathagar.com

আশ্চর্য ব্যাপার! রহস্যজনক ক্যাপ্টেনের কেবিনের দরজা তালাবন্ধ। কেবিনটার জানালার গায়ের ঘরটা বরাদ্দ করা হয়েছে কুকুরের জন্য। সত্যই বিচিত্র তার হাবভাব। সে ঘরে থাকার চেয়ে বাইরে ঘুরতেই বেশি আগ্রহী। এমন গম্ভীর মুখে, দুলকি চালে জাহাজে ঘুরে বেড়ায় যে, হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় জাহাজের ক্যাপ্টেনই বুঝি ঘুরে ঘুরে কাজের তদারকিতে লিপ্ত। আর তার হাবভাবে এও স্পষ্ট বোঝা যায়, সমুদ্রযাত্রায় সে খুবই পটু। তবে মাঝেমধ্যে এমন ঝকমারি শুরু করে দেয় যা বাস্তবিকই অসহনীয়। কারো বাগে আসতেই রাজি নয়। ডা. ক্লবোনি জঙ্গলের হিংস্র বাঘকেও বাগে আনতে পারেন, কিন্তু বেয়াদপ কুকুরটাকে কব্জা করতে পারলেন না। নাবিকদের কেউ কেউ তো তাকে শয়তানের পার্শ্বচর বলেও আখ্যা দিতে ছাড়ল না।

সময়মতো নাকি সে মনুষ্যরূপ পরিগ্রহ করে জাহাজের কর্মীদের ওপর হুকুম চালাবে। এক নাবিক তাকে আঘাত করতে গিয়ে নিজেই মাথা ফাটিয়ে রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল। ব্যস, এবার থেকে রহস্য সঞ্চারকারী কুকুরটা সম্বন্ধে জাহাজের কর্মীদের মনে ভয় আরও প্রগাঢ় হয়ে উঠল।

ডা. ক্লবোনি অবুঝ শিশুর মতোই সহজ-সরল প্রকৃতির লোক। নিজের কেবিনটাকে তিনি বইপত্র দিয়ে রীতিমতো একটা গ্রন্থাগারে পরিণত করে তুলেছেন। তাকে বৃটিশ মিউজিয়াম বললেও কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হবে না।

রহস্যজনক অদৃশ্য ক্যাপ্টেনের শেষ নির্দেশ, তিনি পত্রমারফত আদেশ না দেয়া পর্যন্ত জাহাজের নোঙর তোলা হবে না। কিন্তু নাবিকদের হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাদের অনবরত ফোঁসলাচ্ছে জাহাজের চাকরি ছেড়ে কেটে পড়ার জন্য। এমন হতচ্ছাড়া অভিযানে যাওয়ার দরকারই বা কী? জাহাজের গন্তব্যস্থল কোথায় কারোরই যে জানা নেই।

নাবিকরা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রিচার্ড শ্যানডন খুবই ভীত হয়ে পড়েছেন। আগামীকাল চিঠি যদি নাও আসে তিনি জাহাজ ছাড়তে বদ্ধপরিকর।

রাত গিয়ে ভোর হল। চিঠি এল না। এগারোটা বাজল তবু চিঠি আসার নামও নেই। বারোটার ডাকেও বাঞ্ছিত চিঠি এল না। একটায় ভাঁটা শুরু হয়ে গেলে আর জাহাজ ছাড়া সম্ভব হবে না।

অস্থিরচিত্ত রিচার্ড শ্যানডন উপায়ন্তর না দেখে জাহাজ ছাড়ার আদেশ দিতে বাধ্য হলেন। ঠিক সে মুহূর্তেই একটা খাম দাঁতে চেপে রহস্য সঞ্চারকারী কুকুরটা চাপা গর্জন করতে করতে সেখানে হাজির হল। চিঠি এসেছে! বহু প্রতিক্ষিত চিঠি এসেছে।

ডা. ক্লবোনি চিঠিটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়াতেই কুকুরটা অদ্ভুত কৌশলে তাকে ডিঙিয়ে গেল। রিচার্ড শ্যানডনের কাছে গিয়ে তার পায়ের কাছে চিঠিটা ফেলে দিল। তারপর গম্ভীর স্বরে পর পর তিনবার ডেকে উঠল।

রিচার্ড শ্যানডন ব্যস্তহাতে চিঠিটা তুলে নিয়ে খামটার গায়ে চোক বুলিয়ে দেখলেন, কেবল রিচার্ড শ্যানডনের নাম লেখা। কোনো তারিখ বা ডাকঘরের সিলমোহর নেই।

খামের মুখটা ছিঁড়তেই ভেতর থেকে এক চিলতে কাগজ উঁকি মারল। তাতে কে. জেডের নির্দেশ—জাহাজের নোঙর তুলুন। ফেরাওয়েল অন্তরীফ অভিমুকে জাহাজ চালান।

২০ এপ্রিল সে-বন্দরে জাহাজ ভেড়াবেন। সেখানেও যদি ক্যাপ্টেন হাজির না হন তবে ডেভিস প্রণালী ডিঙিয়ে কফিন উপসাগরে পড়বেন। তারপর সেখান থেকে মেলভিল উপসাগর দিয়ে জাহাজ চালাবেন। চিঠির শেষে কে. জেডের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর।

www.pathagar.com

রিচার্ড শ্যানডন এবার স্বস্তি পেলেন। জাহাজ ছাড়ার আর কোনো বাধাই রইল না।

নোঙর তুলে জাহাজ গভীর সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলে নাবিকদের মধ্যে ক্রমে স্বাভাবিকতা ফিরে আসতে লাগল।

সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে তালে নেচে নেচে হেলে দুলে এগিয়ে চলল অতিকায় জাহাজ ফরোয়ার্ড।

ডা. ক্লবোনি পায়রার চেয়ে সামান্য বড় একটা পাফিন পাখিগুলি করে মারলেন। সামুদ্রিক পাখি খেতে মোটেই সুস্বাদু নয়। আঁশটে গন্ধ। কিন্তু তিনি নিজ হাতে হরেক রকম মশলাসহযোগে এমন ঝোল রান্না করলেন যা খেয়ে সিম্পসন হাত না চেটে পারল না।

১৪ এপ্রিল। সেদিন ফরোয়ার্ড জাহাজ গলফ স্টীমে হাজির হল। এখান থেকে প্রায় দুশো মাইল দূরে গ্রিনল্যান্ডের সঙ্কীর্ণ প্রান্তটা অবস্থিত।

জাহাজ তরতর করে এগিয়ে চলল। এক সময় জলের ওপর বরফের চাঁই ভাসতে দেখা গেল।

রিচার্ড শ্যানডনের কপালের চামড়ায় বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠল। এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! উত্তর মেরু রইল সেই কোন প্রান্তে পড়ে আর এখনই জলের ওপর বরফ ভেসে বেড়াচ্ছে!

রিচার্ড শ্যানডনের বিস্ময়ের কারণ জানতে পেরে ডা. ক্লবোনি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে কয়েকটা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সমুদ্র অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে সাল তারিখসহ ব্যক্ত করলেন, সুমেরু থেকে চল্লিশ বিয়াল্লিশ ডিগ্রি দূরবর্তী অঞ্চলে কবে, কোনস্থানে ভাসমান হিমশৈল লক্ষিত হয়েছিল। অতএব সমুদ্রের জলে ভাসমান বরফের চাঁই দেখে চমকে যাবার কোনোই কারণ নেই।

ডা. ক্লবোনির অগাধ পাণ্ডিত্যে রিচার্ড শ্যানডন বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারলেন না।

সমুদ্রের একটা বিশেষ রহস্যভেদ করতে কিন্তু ডা. ক্লবোনিও ব্যর্থ হলেন। তিমি শিকারী হারপুনবীর সিম্পসনের চোখেও ঘটনাটা ধরা পড়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে সমুদ্রের ওপর দিয়ে হাওয়া প্রবাহিত হওয়ার বেগ কমে গেলে সমুদ্রের বুকে আকাশচুম্বি ঢেউয়ের উদ্ভব হয়। আবার যখন মুষলধারে বৃষ্টি ঝরতে থাকে তখন সমুদ্র শান্ত সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করে। রহস্যটা কী?

হাওয়ার বেগ বেড়েই চলেছে। কেবল পালের ওপর নির্ভর করলে বিশে এপ্রিল ফেয়ারওয়েল অন্তরীপে ফরোয়ার্ডকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র বাষ্প তৈরি করে ইঞ্জিন চালালেই তা সম্ভব হতে পারে।

রিচার্ড শ্যানডন ওয়ারেনকে হুকুম দিলেন বয়লারে কয়লা জোগান দেওয়ার জন্য। পর্যাপ্ত বাষ্প সৃষ্টি করা হল। ইঞ্জিন চালু হল। তীব্রগতিতে ব্রেড ঘুরতে লাগল। ব্যস, উল্কার বেগে জাহাজ এগিয়ে চলল ফেয়ারওয়েল অন্তরীপের দিকে।

নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ বিশে এপ্রিল ফরোয়ার্ড জাহাজ ফেয়ারওয়েল অন্তরীপে হাজির হল।

চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখার চেষ্টা করতেই গ্রিনল্যান্ডকে অস্পষ্ট দেখা গেল। ডা. ক্লবোনি রং-তুলি দিয়ে চমৎকার একটা বরফ পাহাড়ের স্কেচ ক্যানভাসের গায়ে ফুটিয়ে

www.pathagar.com

তুললেন। অদ্ভুতদর্শন এ-বরফের পাহাড়টাকে পূর্ববর্তী অভিযাত্রীরাও চাক্ষুষ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ডা. ক্লবোনি ডেকের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে স্যার জন ফ্রাঙ্কলিন ডিস্কোর দ্বীপ অতিক্রম করে এ-রহস্যাবৃত অঞ্চলে উপস্থিত হয়েই দু-দুটো জাহাজসহ যেন কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিলেন। রহস্য গভীর রহস্যজনক ব্যাপারই বটে।

২১ এপ্রিল। সেদিন কুয়াশা যেন একেবারে জমাট বেঁধে রয়েছে। তারই মধ্যে দিয়ে কেপ ডেজোলেসনকে অস্পষ্ট হলেও দেখা গেল বটে। সারা বছরের মধ্যে মাত্র কয়েকটা সপ্তাহ এখানে সবুজ একটা আভা লক্ষিত হয়। ব্যস, তারপর বছরের বাকি দিনগুলো কেবল বরফের একাধিপত্য চলে।

ডা. ক্লবোনি বললেন, 'দশ শতকে গ্রিনল্যান্ড সত্য সত্যই 'গ্রিন' ছিল বটে। আইল্যান্ডের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আট বা নয় শতকে এখানে মানুষের বাস ছিল। আদিকাল থেকে শুরু করে আজ অবধি কতই-না অভিযাত্রী এখানে এসেছে। বাস্তবিকই দুঃখ-যন্ত্রণা-মৃত্যুরহস্য কত এখানে লুকিয়ে রয়েছে তাঁর শেষ নেই। এখানকার প্রত্যেকটা নামের সঙ্গে ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। এবার বিরাট একটা নামের তালিকা যেন এক নিঃশ্বাসে ভদ্রলোক আওড়ে গেলেন। আবার প্রত্যেকটা নামের তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে ভুললেন না।

এরপর কদিন ধরে এমন দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে তাদের চলতে হল যা বুঝিয়ে বলা সত্যই দুঃসাধ্য। ইয়া বড় সব বরফের চাঁই তাদের জাহাজ ফরোয়ার্ডকে ঘিরে ফেলল। ক্রমে এগিয়ে আসতে শুরু করল। কোনোক্রমে পাশ কাটিয়ে জাহাজটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হল। অবশেষে পরিস্থিতি এমন সঙ্গীন হয়ে উঠল যে, ভাসমান বরফের চাঁইকে লগি দিয়ে ঠেলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে না দিলে আর রক্ষা ছিল না। কোনোক্রমে ধাক্কা লেগে গেলে সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যেত।

২৭ এপ্রিল। মেরুবৃত্ত তখনো অনেক দূরে। এদিকে অনবরত হিমশৈলের সঙ্গে লড়াই করে করে নাবিকরা কাহিল হয়ে পড়ল। মানুষের শরীর তো বটে। দিনরাত্রি এমন অমানুষিক পরিশ্রম, শরীর আর কতক্ষণ বরদাস্ত করতে পারে?

ডা. ক্লবোনির পাণ্ডিত্য একটা ব্যাপারে ভোঁতা প্রমাণিত হল। সমুদ্রেরজলে ভাসমান হিমশৈলের দূরত্ব নির্ণয় করতে তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ হলেন। একটা হিমশৈলকে দেখলে মনে হয় খুবই কাছে রয়েছে। সামান্য এগিয়ে গেলেই বুঝি হাতের নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে। আসলে কিন্তু তার দূরত্ব কম করেও দশ-বারো মাইল। এটাকে একপ্রকার মরিচিকা ছাড়া আর কী-ই বা আখ্যা দেয়া যেতে পারে? শুধু কি এই? সেই সঙ্গে চোখ-ধাঁধানো আলোকচ্ছটা তো রয়েছেই। অত্যুজ্জ্বল আলোকোচ্ছটায় চোখের সমস্যা দেখা দেয়ার আশঙ্কায় ড. ক্লবোনি চোখে সবুজ কাচের চশমা ব্যবহার করতে লাগলেন।

পরিস্থিতি ক্রমে আরো খারাপ হয়ে আসতে লাগল। বরফের চাঁইগুলো একত্রিম হয়ে ফরোয়ার্ডের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। ব্যাপার দেখে নাবকিদের নার্ভ শিথিল হয়ে আসার জোগার হল। কতসব গুজব উঠতে লাগল। ক্যাপ্টেন এখনও চোখের আড়ালেই রয়ে গেছেন। কোথায় যাওয়া হচ্ছে, এও কারোরই জানা নেই। কিন্তু জাহাজ ঠিকই এগিয়ে চলেছে—কিন্তু কোন লক্ষে?

www.pathagar.com

নাবিকদের মধ্যে জটলার শেষ নেই। কেউ বলতে লাগল, ক্যাপ্টেন আছে, অবশ্যই আছে, নিজের বন্ধ কেবিনেই অবস্থান করেছেন। দুম করে একদিন কেবিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে হয়ত বলবেন, এই যে, 'এই তো আমি।' কেউ বা মন্তব্য করল, 'ওই কুকুরটাই ক্যাপ্টেন। গম্ভীর মুখে, দুলকি চালে সে কেমন জাহাজের বুকে চক্কর মারে, কল্পনা করা যায়!' একদিন তো হালের চাকা ধরে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল যে, হঠাৎ করে দেখলে কে বলবে, ওই ক্যাপ্টেন নয়?

রহস্য সঞ্চারকারী কুকুরটাকে নিয়ে কুসংস্কারে অন্ধ নাবিকদের মধ্যে জটলার শেষ নেই। এমন সব অত্যাশ্চর্য অবিশ্বাস্য ঘটনা তাদের স্মৃতিতে এক-এক করে ভেসে উঠতে লাগল যার কিনারা করা সম্ভব হয় নি। কুকুরটাকে খাবার দিলে তেমনি পড়ে থাকে। সে কোত্থেকে আসে খায়ই বা কী? তবে—?

আর প্রায়ই জাহাজ থেকে নেমে বরফের চাঁইয়ের ওপর দিয়ে চক্কর মেরে আসে, উদ্দেশ্য কি? ভালুকের কবলে পড়ার ভয়ডরও কি নেই? আর কেনই-বা সে বহু দূরবর্তী অঞ্চল থেকে হঠাৎ রহস্যজনক স্বরে ডাকাডাকি করে? এসব নিয়ে অন্ধ অজ্ঞ মানুষগুলোর মন ক্রমেই গভীর আতঙ্কের মধ্যে প্রতিটা মুহূর্ত কাটতে লাগল।

ইতিমধ্যে বরফের চাঁইগুলো অক্টোপাশের মতো ফরোয়ার্ড জাহাজটাকে যেমন করে আঁকড়ে ধরছে মনে একটু বাদেই বুঝি এটাকে চিঁড়ে চ্যাপটা করে ফেলবে। কিন্তু অসহায়ভাবে মরা সম্ভব নয়। বরফ কাটার করাত নিয়ে নাবিকরা তৈরি হল। সুতীক্ষ্ণ লোহার লগি দিয়েই বরফের চাইকে কাবু করা গেল না। অনন্যোপায় হয়ে রাত্রে নোঙর করা হল।

শনিবার। পূর্বদিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হতে শুরু করলে তাপমাত্রা আরো নেমে গেল। সকাল সাতটায় '৮'-তে নেমে গেল।

মধ্যরাত্রে স্থলভূমি থেকে মাইল ত্রিশেক দূরবর্তী অঞ্চলে ফরোয়ার্ড পৌঁছে গেল। এবার বিপদ নতুনতর রূপ নিয়ে দেখা দিল। বরফের চাইগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ভাসতে লাগল। যে-কোনো সময় ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা। পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে জাহাজ চালানোর কাজে সবচেয়ে অভিজ্ঞ গ্যারি হালের চাকা শক্ত করে ধরল। সংঘর্ষ এড়িয়ে কোনরকমে জাহাজ তিরতির করে এগোতে লাগল।

আরো কিছুটা পথ যেতে না যেতেই বিশালায়তন হিমশৈল দুদিক থেকে ফরোয়ার্ডকে ঘিরে ধরল। সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে জাহাজটা কোনোরকমে গা বাঁচিয়ে বেরিয়ে যেতে পারল। ঠিক তখনই বিশালায়তন একটা হিমশৈল পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুধু কি এই? থেকে থেকে তার গা থেকে বরফের চাঁই বিকট আওয়াজ করে আছাড় খেয়ে জলে পড়তে লাগল। সর্বনাশ এখন উপায়? এগিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ। ধার দিয়ে কেটে পড়ার চিন্তা পাগলের খেয়াল ছাড়া কিছু নয়। শ-খানেক ফুট বরফের একটা চাঙড় জাহাজের ওপর ভেঙে পড়ার জোগার হল। নাবিকদের মধ্যে আর্তস্বর শুরু হয়ে গেল। অকস্মাৎ গম্ভীর স্বরে কে যেন গর্জে উঠে—'খবরদার! একটা কথাও নয়!'

গ্যারি নিজেকে সংযত রাখল। হাত মুঠো করে হালের চাকা চেপে ধরে রইল। সে যেন ভাঙবে তবু মচকাবে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে ভোজবাজির খেলার মতোই অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে গেল। ভাসমান বরফের চাঁই উধাও হয়ে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল রৌদ্রোজ্জ্বল সমুদ্র, ঝলমল করতে লাগল।

www.pathagar.com

ডেক নাবিকদের অফিসার জনসন চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বলে উঠলেন, 'ডা. ক্লবোনি এ কেমন ব্যাপার হল?'

ডা. ক্লবোনি মুচকি হেসে জবাব দিলেন, 'খুবই সহজ সরল ব্যাপার। বরফের পাহাড় থেকে বরফের চাঙর ভাঙতে ভাঙতে পরিস্থিতি এমন হয়ে গেল যে, ভারকেন্দ্র ক্রমেই সরে আসতে লাগল। অবশেষে এমন হল যে বরফের পাহাড়ের পক্ষে মাথা খাড়া রাখা সম্ভব হল না। দুম করে উল্টে গেল। ব্যস, ব্যাপারটা এই। তবে কাত হয়ে পড়তে আর মিনিট দুই দেরি করলেই আমাদের নিশ্চিত সলিল সমাধি হত, কেউ ঠেকাতে পারত না।' কথা বলতে বলতে তিনি চোখের মণি দুটোকে অত্যুজ্জ্বল সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। ফরোয়ার্ড জাহাজ এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

* * *

ফরোয়ার্ড জাহাজ হাজার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, জাহাজের উর্দ্ধতন কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ নাবিক পর্যন্ত কেউই এখনও জানে না তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়? কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে তারা এমন বিপদসঙ্কুল অভিযানে চলেছে।

ফরোয়ার্ড জাহাজ এগোচ্ছে তো এগোচ্ছেই। কোথায় এ চলার শেষ? একসময় ফরোয়ার্ড মেরুবৃত্ত অতিক্রম করল। এ অঞ্চলের সমুদ্রে বরফের লেশমাত্রও নেই।

৩০ এপ্রিল। সকাল ছয়টা। রিচার্ড শ্যানডন একটা চিঠি পেলেন। খামের ওপরে বড় বড় হরফে তাঁর নাম লেখা। প্রেরকের নামধাম বা ডাকঘরের সীলমোহর কিছুই নেই। ডা. ক্লবোনি ও ডেক নাবিকদের অফিসার জনসনকে সদ্য প্রাপ্ত চিঠিটা দেখালেন। খামটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই জনসন গম্ভীরমুখে বলে উঠলেন, 'রহস্য কিন্তু ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতরই হয়ে উঠছে।' ডা. ক্লবোনি নির্বিকার। তিনি সোল্লাসেই বলে উঠলেন, 'বাঃ! বেশ! বেশ!'

খামটার মুখ ছিঁড়ে ভেতর থেকে এক চিলতে কাগজ বের করে আনা হল। ত্রিশে এপ্রিলের তারিখে ফরোয়ার্ডের ক্যাপ্টেন কে. জেডে.র লেখা কয়েক ছত্রের একটা চিঠি। তিনি লিখেছেন, ফরোয়ার্ড জাহাজের ক্যাপ্টেন নাকি নাবিক ও অফিসারদের সাহস দেখে অভিভূত। তিনি যেন নাবিকদের কাছে ক্যাপ্টেনের শুভেচ্ছা ধন্যবাদটুকু পৌঁছে দেন। আরো উত্তরে এগিয়ে মেলভিল উপসাগরের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেখানে পৌঁছে যেন স্মিথ সাউন্ডে প্রবেশ করার প্রয়াস চালানো হয়।

চিঠির বক্তব্য শোনার পর সবার মুখেই দুশ্চিন্তা ও গাম্ভীর্যের ছাপ ফুটে উঠল। তবে সবাই নিঃসন্দেহ যে, ক্যাপ্টেন পদাধিকারী অদৃশ্য প্রাণীটি জাহাজেই অবস্থান করছে, কিন্তু একজন বাদে। তিনি হচ্ছেন, রিচার্ড শ্যানডন। কারণ, জাহাজের প্রতিটি কর্মী তাঁর খুবই চেনা। তাই যদি হয় তবে চলন্ত জাহাজে চিঠিটি এলই বা কী করে?

রিচার্ড শ্যানডন নাবিকদের ডেকে ক্যাপ্টেনের সন্তুষ্টির কথা এবং তার শুভেচ্ছা জানিয়ে দিলেন।

আশ্চর্য ব্যাপার! ক্যাপ্টেন খুশি হয়ে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন শুনেও তারা গুণ গুণ করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল. 'এ কার কর্ম? কে লিখেছে রহস্য সঞ্চারকারী চিঠিটা? কুকুরটার কাজ নয় তো?'

www.pathagar.com

রাত্রের আবছা অন্ধকারে বহু দূরবর্তী ডিস্কো দ্বীপের আকাশচুম্বি পাহাড়কে ছায়ামূর্তির মতো নজরে পড়ল। ডিস্কো দ্বীপ 'তিমি দ্বীপ' নামেও কারো কারো কাছে পরিচিত। আঠারো শো পঁয়তাল্লিশের ১২ জুলাই স্যার জন ফ্রাঙ্কলিন এখান থেকেই তাঁর শেষ চিঠিটা লিখেছিলেন।

৩ মে। ডা. ক্লবোনি এই প্রথম লক্ষ করলেন, সূর্য আর অস্তমিত হচ্ছে না। দিগন্তরেখা বরাবর একধারে সরে যাচ্ছে।

৩১ জানুয়ারি। এখন থেকে দিন পলে পলে বড় হচ্ছে। এখন সূর্য মোটেই ডুবে যাচ্ছে না। একনাগাড়ে দিন দেখে সবাই প্রথম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়তে লাগল। শেষপর্যন্ত চোখে নেমে এল ক্লান্তি—অবসাদ। এবার তাদের কাছে একটা ব্যাপার একেবারে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। অন্ধকারের অস্তিত্বের জন্য আলোকে এমন মধুর বোধ হয়। অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মি অনবরত বরফে প্রতিফলিত হয়ে চোখে এসে এমন আঘাত হানলে কতক্ষণই বা বরদাস্ত করা সম্ভব?

৬ মে। সর্বাধিক উত্তর সীমান্তবর্তী ড্যানিম উপনিবেশে ফরোয়ার্ড জাহাজ হাজির হল। জাহাজ নোঙর করতেই রিচার্ড শ্যানডন, ডা. ক্লবোনি আর কয়েকজন নাবিককে সঙ্গে করে নেমে গেলেন। এস্কিমো-গভর্নর সহধর্মিণী ও পাঁচটি পুত্র কন্যাকে নিয়ে এগিয়ে এলেন তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে।

একমাত্র গভর্নরের আবাসস্থলটি কাঠের তৈরি আর বাকি সবই ইগলু বরফের তৈরি গম্বুজাকৃতি বাসগৃহ। ঘরের ভেতরে সিলমাছের মাংসের, মাছের আর মানুষের গায়ের আঁসটে গন্ধ মিলে অস্বাভাবিক উৎকট গন্ধের সৃষ্টি করেছে।

আমাদের ফরোয়ার্ড জাহাজের দোভাষী অত্যাবশ্যক কুড়িটা এস্কিমো শব্দ রপ্ত করেছে। সেগুলো ব্যবহার করে কোনোরকমে তাদের সঙ্গে মনের ভাব আদান-প্রদান করা সম্ভব হল।

এস্কিমোদের সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে জানা গেল, আজ পর্যন্ত কেউ-ই এখানে আসে নি। এমন কি কোনো তিমি শিকারের জাহাজও এখানে ভুলেও কোনোদিন ঢু-মারে নি।

সন্ধ্যার কিছু আগে স্টং খুঁজে পেতে কয়েকটা আইডার হাঁসের ডিম নিয়ে এল। লবণ-জড়ানো মাংস খেয়ে খেয়ে অভক্তি ধরে গেছে। ডিমের ওমলেট দিয়ে জিভটাকে একটু ঝালিয়ে নেওয়া গেল।

৮ মে। ফরোয়ার্ড জাহাজের পালে বাতাস লেগে ফুলে ফেঁপে উঠল। ধীরমন্থর গতিতে এগিয়ে চলল আমাদের সাধের জাহাজটা।

বরফের ওপর প্রতিফলিত অত্যুজ্জ্বল সূর্যরশ্মি অনবরত চোখে এসে আঘাত হানায় জাহাজের অনেকেরই চোখের ব্যামো দেখা দিল। ডা. ক্লবোনি সবুজ কোনো বস্তু দিয়ে চোখ ঢেকে রাখতে পরামর্শ দিলেন।

রিচার্ড শ্যানডন এস্কিমোদের কাছ থেকে বিশটা লোমশ কুকুর আর একটা স্লেজগাড়ি কিনে জাহাজে তুলে নিয়েছিলেন।

এবার থেকেই আমরা আবার বরফবন্দি হয়ে পড়লাম। চারদিকের জল জমে বরফে পরিণত হয়ে গেছে। সামনে তো দূরের ব্যাপার, পিছনে বা ডাইনে বাঁয়ে যাওয়ার পথও

www.pathagar.com

বন্ধ। আগামী বসন্তের আগে বরফগলার কোনো সম্ভাবনা নেই। আবার দাঁড়িয়ে পড়লেও বিপদ চরম রূপ নিয়ে দেখা দেবে।

জাহাজের কর্মীদের মনে প্রথমে হতাশা, পরে তা অসন্তোষের রূপ নিল। আসলে কুসংস্কারই তাদের বেশি করে উত্তেজিত করে তুলেছে। ছ-সাত ফুট পুরু বরফ। করাত চালিয়ে টুকরো করা সম্ভব হল না। কোনোরকমে গুণ টেনে তিলে তিলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল ফরোয়ার্ডকে।

১৬ মে। প্রাণান্ত পরিশ্রম করে ইতিমধ্যে মাত্র দুমাইল উত্তরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া গেছে বিশালায়তন জাহাজটাকে।

ডা. ক্লবোনি জাহাজ থেকে নেমে পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে আঁচ করে নেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বরফের ওপর আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে যে মায়াজাল সৃষ্টি করেছে তার দৌলতে তিনি কয়েকবার দমাদম আছাড় খেয়ে কোনোরকমে জাহাজে উঠে এলেন। ফিরে এসে তিনি অদ্ভুত এক কথা শোনালেন, 'বৈজ্ঞানিকগণের বোধগম্য হচ্ছে না এখানে যুগযুগান্তর ধরে কী সব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে চলেছে। আঠারো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে বরফের একাধিপত্য ছিল। অকস্মাৎ এক অভাবনীয় প্রলয় কাণ্ডে বরফ স্থানচ্যুত হয়। তিমি শিকারিরা তৎপর হয়ে ওঠে। গত বছর থেকে আবার বরফ জমতে আরম্ভ করে। নতুন করে হিমযুগের সূত্রপাত ঘটে।'

রিচার্ড শ্যানডন পড়লেন মহা ফাঁপড়ে। এত কষ্ট স্বীকার করে এতদূর এসে তবে কি ফিরেই যেতে হবে? নাবিকদের মধ্য থেকে গ্যারি তাকে আশ্বাস দিল, যে করেই হোক জাহাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবেই।

গ্যারির দৃঢ় মনোবোল রিচার্ড শ্যানডনের মনে আশার সঞ্চার করল। তিনি এবার ডা. ক্লবোনি ও গ্যারিকে নিয়ে বরফের পরিস্থিতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য জাহাজ ছেড়ে নেমে পড়লেন।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন নাবিকরা দেখল এই সুযোগ। তারা খুঁজে খুঁজে অপয়া কুকুরটাকে বের করল। বেচারা তার কামরায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। ফলে তাকে বেকায়দায় ফেলে কব্জা করতে অসুবিধা হল না। তার মুখ ও পাগুলো চেপে ধরে কামরার বাইরে নিয়ে এল। সিলমাছ বরফ ভেদ করে ওপরে উঠে এসেছে এমন একটা গর্ত আগেই তারা দেখে রেখেছিল। কুকুরটাকে সে গর্তটার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বরফ চাপা দিয়ে সমাধিস্থ করে দিল।

রিচার্ড শ্যানডন তো দূরের কথা এমন কি ডেকের নাবিকদের অফিসার জনসন পর্যন্ত কুকুরের সমাধির ব্যাপারটার বিন্দু বিসর্গও জানত পারল না।

রিচার্ড শ্যানডান দেখলেন, নাবিকদের মন থেকে হঠাৎ অসন্তোষ নিশ্চিহ্ন দূর হয়ে গেছে। তারা নিজে থেকে কোমর বেঁধে কুড় ল, শাবল ও গাঁইতি প্রভৃতি নিয়ে বরফ কেটে রাস্তা তৈরি করতে লেগে গেল। রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। এর মধ্যে ফুট পাঁচেক বরফ কাটতেই নাবিকদের জিভ বেরিয়ে যাওয়ার জোগার হল।

১৮ মে। কুয়াশায় মোড়া বরফের রাজ্যে পাহাড়ের অদ্ভুত দর্শন একটা চূড়া সবার নজরে পড়ল। তারা এটার নামকরণ করলেন শয়তানের বৃদ্ধাঙ্গুলি। সত্যই সেটা এমনই কুদর্শন যে, দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে।

www.pathagar.com

শনিবার ভোর হতে না হতেই জাহাজের প্রায় সবাই আর্তনাদ শুরু করে দিল, 'শয়তানের বৃদ্ধাঙ্গুলি জাহাজের ওপর আছাড়ি খেয়ে পড়ল বটে! পাহাড়টার চূড়ার ওই ঝুলন্ত বরফের চাঁইটা হুড়মুড় করে জাহাজের ওপর পড়লে এক সঙ্গে সবার বরফ-সমাধি হয়ে যাবে!'

ডা. ক্লবোনি অনুসন্ধিৎসু নজরে ঝুলন্ত বরফের চাঁইটাকে দেখে নিয়ে চিল্লিয়ে বলতে লাগলেন, 'চুপ করুন, ক্ষান্ত হোন সবাই। আমি বলছি, ভয়ের কিছু নেই। ওটা নিছকই বরফের ওপর আলোর প্রতিসরণের ব্যাপার। আমার কথা বিশ্বাস করুন—চুপ করুন!'

আবার পুরোদমে বরফ কাটার কাজ শুরু হল। বরফের ওপর ঘন ঘন কুড় ল, শাবল আর গাইতি আঘাত হানতে লাগল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? এক সময় আবার হৈ হট্টগোল চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। আতঙ্কিত চোখে নাবিকদের অঙ্গুলি-নির্দেশিত পথে তাকানো মাত্র সবাই কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'ভালুক! শ্বেত ভালুক! না, ড্রাগন—অতিকায় ড্রাগন!'

পরমুহূর্তেই এতগুলো লোককে বেকুব বানিয়ে কুয়াশা ভেদ করে সবার চোখের সামনে অতিকায় একটা কুকুরের ছায়ামূর্তি ভেসে উঠল। হ্যাঁ, সেই কুকুরটাই বটে। বরফের গর্তে নাবিকেরা যাকে সমাধিস্থ করে এসেছিল সেই কুকুরটা বরফের ওপর দিয়ে দিব্যি হেঁটে আসছে। আলোর প্রতিসরণের জন্যই কুকুরটা অতিকায় ডাইনোসর বলে ভ্রম হয়েছিল।

কুকুরটাকে দেখেই কুসংস্কারে বিশ্বাসী নাবিকরা আৎকে উঠে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল কুকুররূপী সাক্ষাৎ শয়তানটা আবার আমাদের কাঁধে চাপল! তার ওপর অশুভ শয়তানের বৃদ্ধাঙ্গুলির ব্যাপারটা তো রইলই। সর্বনাশের চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত এদের হাত থেকে আর নিস্তার নেই।

ফরোয়ার্ড জাহাজ এবার বরফের ছোট ছোট টুকরোগুলোকে দুধারে সরিয়ে দিয়ে বাষ্পশক্তির সাহায্যে এগিয়ে চলল।

নাবিকদের মধ্যে আতঙ্ক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল। কুকুরটা তখনো জাহাজের দিকে ছুটছে। কে যেন শিষ দিচ্ছে। আর শিসের স্বর অনুসরণ করে কুকুরটা এগোচ্ছে তো এগোচ্ছেই। কিন্তু কে যে শিস দিচ্ছে তাকে খুঁজে বের করা কিছুতেই সম্ভব হল না।

ব্যস, নাবিকদের অসন্তোষ চরম রূপ নিল। অজানা অচেনা স্থানে, মৃত্যুর আশঙ্কা থাকায় আর এক কদমও এগোতে তারা রাজি নয়।

নাবিকরা যখন বিদ্রোহে সোচ্চার ঠিক সে-মুহূর্তেই আঠারো শো ফুট ব্যাসের অতিকায় একটা হিমশৈলে ফরোয়ার্ড জাহাজ বন্দি হয়ে পড়তে লাগল। অস্থিরচিত্ত রিচার্ড শ্যানডন কয়েদখানা থেকে অব্যাহতি পাবার পথ খুঁজে বের করতে সবে দূরবীণটাকে চোখের কাছে তুলে নিয়েছেন ঠিক তখনই নাবিক বোস্টন তার পিছনে এসে দাঁড়াল। শ্লেষ্মাজড়িত ভাঙা গলায় উচ্চারণ করল, 'কমান্ডার, আমরা আর এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতে নারাজ। আমাদের সবার এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।'

হাতের দূরবীণটা ঝট করে চোখের সামনে তেকে নামিয়ে এনে রিচার্ড শ্যানডন রাগে ফেটে পড়ার জোগার হলেন। ঠিক সে মুহূর্তেই ব্যস্তপায়ে কাছে আসতে আসতে সেকেন্ড মেট জেমস উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—'স্যার, আর এক মিনিট দেরি করলেই

www.pathagar.com

চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘটে যাবে। আমাদের পক্ষে কয়েদখানা থেকে মুক্তি পাওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না।' কথা বলতে বলতে আকাশচুম্বী হিমশৈলটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

গুলিবিদ্ধ বাঘের মত গর্জে উঠলেন রিচার্ড শ্যানডন. 'তোমরা নিজের নিজের কাজে যাও। ঝামেলা বাঁধাবার শাস্তি সময় মতো দেয়া হবে।'

ফরোয়ার্ড জাহাজ এবার সোজা দক্ষিণ দিকে ধেয়ে চলল। না, ফয়দা কিছুই হল না। এর চেয়ে তীব্রবেগে ছুটে গিয়ে হিমশৈলটা বেরোবার পথটাকে আগলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রিচার্ড শ্যানডন হতাশায় নিজের হাত নিজেই কামড়াতে লাগলেন।

নাবিকরা সমস্বরে বলে উঠল. 'পথ পুরোপুরি বন্ধ। সব রাস্তা বন্ধ। দেরি নয়, ঝটপট নৌকো নামিয়ে দাও। গুদাম লুঠ করে সব মদের বোতল লুট করে নিয়ে এসো সব শেষ!'

মুহূর্তে হৈ হট্টগোল, রীতিমতো ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হয়ে গেল।

ব্যাপার দেখে রিচার্ড শ্যানডনের মাথায় তো আকাশ ভেঙে পড়ার জোগার হল। অকস্মাৎ বাকশক্তি যেন হারিয়ে ফেললেন। নাবিকরা হঠাৎ এমন করে ভরাডুবি করে দেবে এ যে স্বপ্নেরও অতীত। ডা. ক্লবোনিও বাজপড়া রোগীর মত নীরবে পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন।

এতগুলো লোকের চিৎকার চেঁচামেচি ভেদ করে এক গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'সবাই নিজের নিজের কাজে যাও। ফরোয়ার্ডের মুখ ঘোরাও।'

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর কানে যেতেই ডেক নাবিকদের অফিসার জনসন শরীরের সর্বশক্তি নিঙড়ে দিয়ে হালের চাকা ঘোরাতে লাগলেন। ব্যস, জাহাজের মুখ ঘুরতে ঘুরতে কোনরকমে চরমতম বিপদটাকে এড়াতে পারল। আর একটু দেরি হলেই পাথরের মতশক্ত হিমশৈলের গায়ে আছড়ে পড়ে ফরোয়ার্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত।

মুহূর্তের মধ্যেই ক্যাপ্টেনের কেবিনের দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন সুঠামদেহী এক যুবাপুরুষ। পোশাক আশাকে রীতিমত ফিটফাট। হ্যাঁ, সন্দেহের কিছুমাত্র কারণ নেই। ইনিই ক্যাপ্টেন. ফরোয়ার্ডের সর্বময় কর্তৃত্ব এরই ওপর ন্যস্ত। তিনি দুটো আঙুল মুখের ভেতরে চালান দিয়ে শিস দিতেই কুকুরটা ছুটে এসে তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে লেজা লাড়তে লাগল।

রিচার্ড শ্যানডন আকস্মিক পরিস্থিতিতে রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। আচমকা কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন. 'স্যার'। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠলেন—'এ কী গ্যারি—নাবিক গ্যারি!'

হ্যাঁ, রিচার্ড শ্যানডন ঠিকই চিনতে পেরেছেন। গ্যারিই বটে। এতদিন মাথার কোঁকড়ানো, লম্বা চুলগুলো দিয়ে তিনি কপাল ও মুখের বেশ কিছুটা অংশ ঢেকে রেখেছিলেন.। তাঁর সুগঠিত চেহারা ও বুদ্ধিদীপ্ত মুখই প্রমাণ দেয়, হুকুম পালন নয়, হুকুম দিতেই সে অভ্যস্ত। গ্যারি এ জাহাজের ক্যাপ্টেন, জাহাজের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই ওপর ন্যস্ত।

অকস্মাৎ নাবিকদের মধ্যে খুশির জোয়ার বয়ে গেল। তারা উল্লসিত হয়ে ক্যাপ্টেন গ্যারির নাম ধরে বার বার জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন গ্যারি এবার জাহাজের সবাইকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'আপনারা সবাই শুনুন, আপনি জাতিতে একজন ইংরেজ। তাই আমি এমন এক জায়গায় পদচিহ্ন আঁকতে চাই যেখানে ইতিমধ্যে কেউ পদার্পণ করে নি। আমার একমাত্র দৃঢ় সঙ্কল্প, আমার হাতের এই স্বদেশের পতাকাটাকেসবার আগে সুমেরুতে গেঁথে আসব। আমার অগাধ টাকা আছে, অভাব কাকে বলে আমার জানা নেই। কথা দিচ্ছি, এখন থেকে প্রতি ডিগ্রি উত্তরে অগ্রসর হওয়ার জন্য আপনাদের এক হাজার পাউণ্ড করে পুরস্কার প্রদান করব। তবে এও খুবই সত্য বটে, কেবল টাকার জোরে সব কাজ উদ্ধার করা সম্ভব হয় না. এর জন্য অকৃত্রিম দেশপ্রেম অপরিহার্য, এ ব্যাপারে আমার নামেই কার্য সিদ্ধি হবে। কারণ. আমি আমি ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস। আর একটা কথা সবার জানা দরকার, আমরা এ মুহূর্তে বাহাত্তর ডিগ্রিতে অবস্থান করছি।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস। হ্যাঁ, যে-কোনো ইংরেজ ও নামটার সঙ্গে পরিচিত। নতুন করে তাঁর পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ইংরেজদের সবার কাছে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস, সুপরিচিত হলেও কে তিনি? তাঁর সম্পূর্ণ নাম জন হ্যাটেরাস। টাকার কুমীর। অভিযান প্রিয় এক নির্ভীক ইংরেজ পুরুষ। তাঁর বাবা ছিলেন লণ্ডনের নামকরা এক মদ্য ব্যবসায়ী। ছেলের জন্য নগদ ষাট লক্ষ পাউন্ড গচ্ছিত রেখে পরলোক গমন করেন। তারপর থেকে অকুতোভয় জন হ্যাটেরাস বিভিন্ন দুঃসাহসিক অভিযানে দুহাতে ডলার ব্যয় করেছেন। তাঁর একমাত্র বাঞ্ছা, ইংরেজরা অজ্ঞাত স্থান আবিষ্কারের ব্যাপারে অন্যান্যদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে, সে কলঙ্ক ঘুচাতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করে জগতে অনন্যকীর্তি স্থাপন করে গেছেন। কিন্তু তিনি জাতিতে 'জিওনিজ'। ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষ আবিষ্কার করে খ্যাত হয়েছেন। তিনি জাতিতে ছিলেন পর্তুগিজ। চীন দেশের আবিষ্কারক ফার্ণাণ্ডো দ্য আনড্রাডা, জাতিতে 'পর্তুগিজ', কানাডা আবিষ্কার করেন জ্যাকুইজ কার্টিয়ার। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের অধিবাসী। ইংরেজরা এরকম কোন মহৎ কীর্তি স্থাপন করতে পারে নি। কেবল কব্জির জোরে তারা ভারত, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকায় ছড়ি ঘুরিয়ে চলেছে।

ইতোপূর্বে হ্যাটেরাস বহুবার দক্ষিণ সাগরে অভিযান করেন। অবশেষে আঠারো শো ছেচল্লিশে বাফিন উপসাগরে যাওয়ার জন্য হ্যালিফেক্স জাহাজে করে অভিযান করেছিলেন। নাবিকদের অমানুষিক কষ্টভোগ করতে হয়েছিল। ব্যাস, তারপর থেকে নাবিকরা ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের অভিযানের কথা শুনলে দূর থেকে অভিবাদন করে।

এতকিছুর পরও অভিযানপ্রিয় দুর্ধর্ষ হ্যাটেরাস আটারো শো পঞ্চাশে ফেয়ারওয়েল জাহাজ নিয়ে উত্তরাঞ্চলের দিকে রওনা হন। ডা. ক্লবোনি সঙ্গদান করতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু স্থানাভাবে তাঁকে হতাশ হতে হয়েছিল।

দীর্ঘপথ পাড়ি দেয়ার পর, ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে করতে এক সময় তিনি চরম বিপদে পড়লেন। বরফ সাগরে ফেয়ারওয়েল ধ্বংস হয়ে গেল। তার সঙ্গী সাথীরা নির্মমভাবে প্রাণ হারাল। অনন্যোপায় নিঃসঙ্গ হ্যাটেরাস জমাটবাঁধা বরফের ওপর দিয়ে দুশো মাইল পথ পাড়ি দিলেন। শেষপর্যন্ত একটা তিমি শিকারের ড্যানিশ জাহাজে চেপে নিজের দেশে ফিরতে পেরেছিলেন।

www.pathagar.com

এবার নিজের নাম গোপন করে নাবিকের পরিচয়ে লিভারপুলে দুবছর কাটালেন। রিচার্ড শ্যানডনের সঙ্গে পরিচয় হল। মনে ধরে গেল তাকে। ছদ্মনামে চিঠি লিখে তাঁকে দিয়ে বিশালায়তন 'ফরোয়ার্ড' নামক জাহাজটাকে তৈরি করালেন। তখনই মনস্থ করেছিলেন, চরম সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করবেন না। ইতোমধ্যে ফরোয়ার্ডের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় ঝাপ্টা গেছে, নাবিকরা বেঁকে বসেছে। তবু ধৈর্য ধরে নিজেকে গোপনই রেখেছেন, আত্মপ্রকাশ করেন নি। এখন পরিস্থিতি চরমতম হয়ে ওঠায় অনন্যোপায় হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন।

* * *

এতদিন যে গ্যারি সামান্য নাবিকের কাজে ফরোয়ার্ড জাহাজে কাজে লিপ্ত ছিলেন এখন তিনিই ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের পরিচয়ে সর্বজন-সমক্ষে হাজির হলেন। এতে জাহাজের কর্মীদের কেউ যারপরনাই খুশি হল, কেউ-বা মুখ ব্যাজার করে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁকে সবাই রগচটা একগুঁয়ে লোক বলেই জানে। প্রতিবাদ করা বা তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে নিজের পায়ে কুড় ল মারা।

পরদিনটা ছিল রবিবার। ছুটির দিন। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস, রিচার্ড শ্যানডন, ড. ক্লবোনি, জনসন প্রভৃতিকে নিয়ে উদ্ভুত সমস্যা থেকে উত্তোরণের উপায় নির্ধারণের জন্য সভায় বসলেন। ক্যাপ্টেন বললেন, পূর্ববর্তী অভিযানকারীরা উত্তর মেরুর অভ্যন্তরভাগে হাজির হতে না পারলেও বরফমুক্ত চমৎকার সমুদ্র দেখে এসেছেন। প্রসঙ্গক্রমে ক্যাপ্টেন নামধা, খ্রিস্টাব্দ ও তারিখ পর্যন্ত গড়গড় করে বলে দিলেন। সুমেরুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছে তাঁর কথিত বরফ মুক্ত সমুদ্রটা।'

এত কিছু শোনার পরেও রিচার্ড শ্যানডন গম্ভীরমুখে বললেন, 'আমি কিন্তু বলব এটা কেবলমাত্র অনুমান নির্ভর তথ্য। অতএব এতে কতখানি নির্ভর করা চলে বুঝছি না।'

ডা. ক্লবোনি চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে তুলে বললেন, পৃথিবীর মধ্যে শীতলতম স্থান হিসেবে যে স্থানদুটোকে চিহ্নিত করা হয় তাদের একটা এশিয়ার (৭৩°—৩″ উত্তর ও ১২০° পূর্ব) আর দ্বিতীয়টা আমেরিকায় (৭৮° উত্তর ও ৯৭° পশ্চিম) অবস্থিত। সম্প্রতি আমরা অবস্থান করছি মেরুবিন্দু থেকে ১২০ নিচে। অতএব এ-অঞ্চলে বরফমুক্ত সমুদ্রের অবস্থান কেন অসম্ভব, বলতে পারেন? তাই স্বীকার না করে উপায় নেই যে, সুমেরুর ঠিক কেন্দ্রস্থলে বরফমুক্ত সমুদ্র বিরাজ করছে।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস মুচকি হেসে বললেন, 'তারপরও আমি বলব, বরফমুক্ত সমুদ্র যতি না-ই পাই তবে আমরা না হয় ২০০ মাইল বরফাবৃত পথ স্লেজগাড়ি চেপে অতিক্রম করে ফেলব।'

২০০ মাইল বরফের ওপর দিয়ে অতিক্রম করার কথা শুনে রিচার্ড শ্যানডন যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠলেন, 'বলছেন কী ক্যাপ্টেন, ২০০ মাইল পাড়ি দেবেন গুরুগুর করে স্লেজগাড়িতে চেপে!'

ডা. ক্লবোনি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বললেন, 'কেন? অ্যালেক্সি মারকফ নামে এক কশাক কি স্লেজ গাড়িতে ৮০০ মাইল পাড়ি দেয় নি?'

সকাল হল। ক্যাপ্টেন জাহাজ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে বরফের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দেখে এলেন। এবার কর্মীদের উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন মাইন পোঁতার নির্দেশ দিলেন। তার পলতেটাকে তুলে আনা হল জাহাজের ওপর। পরের দিন কাকডাকা সকালে দেওয়া হল

www.pathagar.com

পলতেতে আগুন ধরিয়ে। আধঘন্টা বাদে দূর থেকে চাপা একটা শব্দ ভেসে এল। বরফের চাই জাহাজের ধারে কাছেও ছিটকে এল। কিন্তু জাহাজ যাওয়ার মতো পথ তৈরি হল না।

এবার ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ঠেসে ঠেসে বারুদ পুরে কামান দাগলেন। বিচ্ছিন্ন বরফের টুকরোগুলো চারদিকে সরে গিয়ে চমৎকার রাস্তা করে দিল। ব্যস, দুর্বার গতিতে ফরোয়ার্ড জাহাজ এগিয়ে চলল। কিছু দূর যেতেই আবার তাঁকে থমকে যেতে হল। জাহাজ থামিয়ে দুশ্চিন্তার জট ছাড়াতে লাগলেন। বরফের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে করতে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ফরোয়ার্ড জাহাজকে নিয়ে সাতাশে মে রবিবার লিওপোল্ড বন্দরে হাজির হলেন। জাহাজ থেকে নেমে হাঁটাহাটি করতে গিয়ে পূর্বসূরী অভিযাত্রীদের বহু নিদর্শন দেখতে পেলেন। বরফের তলায় অভিযাত্রীদের সমাধিস্ত করা হয়েছে এমন ছয়টা সমাধিক্ষেত্র চাক্ষুষ করলেন। উপস্থিত হলেন জেমস রসের তৈরি শরণার্থী শিবিরে। ঘুরে ঘুরে দেখলেন। ভবিষ্যতে কোন অভিযাত্রী বা অভিযাত্রীদল এখানে এলে তাদের জন্য খাবারদাবার, ওষুধপত্র এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী এখানে রাখা আছে। অভিযাত্রী ফ্রাঙ্কলিন এপর্যন্ত আসতে পারেন নি। এলে তিনি সদলবলে প্রাণে বেঁচে যেতে পারতেন।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস এখান থেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী জাহাজে তুলে নিলেন। ডা. ক্লবোনির অত্যুগ্র আগ্রহ ছিল এখানে তাদের অভিযানের কোন নজীর রেখে যান। কিন্তু ক্যাপ্টেনের আপত্তি থাকায় তার সে সাধ পূরণ করা সম্ভব হল না। কারণ, এতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপকার হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই। ফরোয়ার্ড জাহাজ আবার এগিয়ে চলল। এবার অদ্ভুত একটা নতুনতর ঘটবার মুখোমুখি হল তাঁরা। দেখলেন, অদ্ভুত একটা অত্যুজ্জ্বল বলয় সূর্যকে ঘিরে অবস্থান করছে। নকল সূর্য ভাবলেও ভুল হবে না। জ্যোতির্বলয়টির চমৎকার একটা বর্ণনা দিয়েছেন টমাস ইয়ং। তিনি বলেন, বরফ প্রিজম যখন মেঘের আকারে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে তখনই সূর্যালোকের ম্যাজিক চোখে পড়ে।

এবার ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস বাস্তবিকই প্রমাদ গুণলেন। বুঝলেন, জাহাজের সাধারণ নাবিক থেকে শুরু করে অফিসাররা অবধি সবাই তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ। তাদের ক্ষোভের সবচেয়ে বড় কারণ তার একগুঁয়েমী।

এগিয়ে চলার সবরকম পথ বন্ধ। তবু তিনি থামতে নারাজ। যে করেই হোক এগিয়ে তিনি যাবেনই।

বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ফরোয়ার্ড জাহাজকে টেনে হিঁচড়ে ভুঠিয়াল্যাণ্ডে হাজির হলেন। জেমস রস এখানেই চুম্বক পাহাড়ের হদিস পেয়েছিলেন। ডা. ক্লবোনিও লক্ষ করলেন, কম্পাস যন্ত্রের কাঁটা এখানে কিছুতেই ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল থাকছে না। লম্বভাবে অবস্থান করছে। তবে? তবে চুম্বক পাহাড় সম্বন্ধে এতদিন যত গল্পকথা রচিত হয়েছে সবই ভুঁয়ো, কল্পনামাত্র? তার গায়ে জাহাজ গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, জাহাজের গা থেকে দমাদম পেরেক খুলে তীরের ফলার মত ছুটে যায় প্রভৃতি যে সব কাহিনী এতদিন মানুষকে মুগ্ধ করেছে, সবই কি তবে উর্বর মস্তিষ্কের কল্পিত কাহিনী? এক মাইল প্রশস্ত এ চুম্বক পাহাড় থাকায় নাবিকদের কম্পাসের কাঁটা সর্বদা উত্তর দিকে মুখ করে অবস্থান করে—এ কথা তো তবে নিছকই কল্পনা।

www.pathagar.com

মুষলধারে বৃষ্টি আর প্রবল ঝড়ের বাঁধা অগ্রাহ্য করে ফরোয়ার্ড জাহাজ মেলভিল উপসাগরে পড়ল।

ডা. ক্লবোনি লক্ষ করলেন, এ সমুদ্রের নীল জলে কোথায় যেন সবুজ আভা উঁকি দিচ্ছে। তিনি হারপুনবীর সিম্পসনকে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, 'নীল জলে জেলিফিস না থাকায় এমনটা হয়।'

সিম্পসন বলল, 'কেবল জেলিফিসের জন্যই নয়, একটু আগেড় এখান দিয়ে তিনি চলে গেছে বলে এমনটা হয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত পরে মাস্তুলের ডগা থেকে জানান দেওয়া হল, দূরে তিমি নজরে আসছে। তিমি! অতিকায় তিমি!

ব্যস, আর দেরি নয়। জাহাজ থেকে নৌকো নামিয়ে অভিযাত্রীরা তিমি শিকারে রওনা হল। মাত্র মুহূর্তের জন্য সবার প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। অতিকায় দুটো বরফের চাঁই ভেসে এসে প্রায় একশো ত্রিশফুট লম্বা তিমিটাকে একেবারে থেঁতলে দিল।

৩ জুলাই। ফরোয়ার্ড বিচি দ্বীপে নোঙর করল। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ব্যস্ত পায়ে নেমে গেলেন।

আঠারো শো তিপ্পান্নতে জাহাজ বোঝাই করে খাবার দাবার ও জ্বালানী এনে জড়ো করে রাখা হয়েছিল। মরু অভিযাত্রীরা যাতে অনাহারে শুকিয়ে না মরে তারই জন্য এ আয়োজন। বরফের রাজ্যে খাবার পচার আশঙ্কা নেই।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের কয়েকম বছরের খাবার মজুদ আছে। কিন্তু চাই জ্বালানী। তিনি একটা কালো পাথরের স্মৃতিসৌধ দেখতে পেলেন। ফ্রাঙ্কলিন আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে সদলবলে এখানেই বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিলেন। পাথরটার গায়ে সে কথাই খোদাই করা রয়েছে। এর মাধ্যমে পরবর্তী অভিযাত্রীরা ফ্যাঙ্কলিনের অমর কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। কয়লা আর খাবার খোঁজ করতে গিয়ে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ফ্রাঙ্কলিনের তিন সহযোগীর সমাধি আবিষ্কার করলেন। কিন্তু বাঞ্ছিত বস্তুগুলোর হদিস পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি অনুমান করলেন, সঞ্চিত মহামূল্য দ্রব্যসামগ্রীর সন্ধান পেয়ে এস্কিমোরা সেগুলো আত্মসাত করেছে।

কিন্তু জাহাজে যে পরিমাণ কয়লা রয়েছে তা দিয়ে টেনেটুনে মাত্র দুমাস চলতে পারে।

২৪ জুলাই। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস থার্মোমিটারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, পারদ বাইশ ডিগ্রিতে নেমে গেছে। সমুদ্রের বুকে বরফ উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে। সমুদ্রের জল জমে গেলে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে, পুরো শীতকালটা এখানে পড়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। জাহাজের অফিসার আর নাবিকরা প্রভৃতি চৌদ্দজনই ক্ষুব্ধ। কেবল ডা. ক্লবোনি, কাঠমিস্ত্রী বেল আর নাবিকদের অফিসার জনসন ক্যাপ্টেনের দলে।

শীতের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার আগেই উত্তরদিকে যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে হবে। ক্ষুব্ধ কর্মীদের দাঁড় টানানোর কাজে রাজি করানো যাবে না। অতএব বাষ্পশক্তিকেই কাজে লাগাতে হবে।

কয়লা খরচ করে বাষ্প তৈরির কথা শুনে নাবিকদের তো মাথায় হাত। গুতামে যেটুকু কয়লা রয়েছে তা দিয়ে কোনোরকমে দুমাস কাজ চালানো সম্ভব। অতএব এরকম চিন্তা নিছকই পাগলামি।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস চিফ ইঞ্জিনিয়ার ব্রানটনকে আগুন বাষ্প তৈরির হুকুম দিলেন। তাঁর কথাটা শেষ হতে না হতেই নাবিক পেন প্রতিবাদ করে উঠল, 'না, আগুন জ্বালা হবে না। আমরা আর উত্তরদিকে কিছুতেই এগোতে রাজি নই।'

সামান্য এক নাবিকের এমন স্পর্ধা দেখে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন। আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'একে খাঁচায় ঢোকাও। কয়েদখানার অন্ধকারে পড়ে কাতরে মরুকগে। নিয়ে যাও, খাঁচায় পুরে দাও একে।'

আমতা আমতা করে রিচার্ড শ্যানডন বললেন, 'কথা হচ্ছে কি ক্যাপ্টেন, ব্রানটন যা বলছে—'

ততোধিক কর্কশ স্বরে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস গর্জে উঠলেন, 'দেখুন মি. শ্যানডন, প্রয়োজন হলে আপনাকেও খাঁচায় পুরতে দ্বিধা করব না।'

নাবিক পেন একটা লোহার দণ্ড মাথার ওপর তুলে তীব্র গতিতে, ঘোরাতে ঘোরাতে গলা ছেড়ে চেঁচাতে লাগল, 'হুশিয়ার! হুঁশিয়ার বলে দিচ্ছি!' অন্যান্য নাবিক বেল, সিম্পসন প্রভৃতি তাকে সমর্থন করে তীব্রস্বরে চেঁচাতে লাগল।

ক্রোধোন্মত্ত ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ঝট করে কোটের পকেট থেকে পিস্তল বের করে বুক কাঁপানো স্বরে গর্জে উঠলেন, 'হাত থেকে রড ফেল, নইলে গুলি চালাতে বাধ্য হব, বলে দিচ্ছি।'

পেন থতমত খেয়ে হাতের লোহার দণ্ডটা ফেলে দিয়ে অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। নাবিকরা তাকে ধরে জাহাজের খোলে নিয়ে চলে গেল।

পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে বয়লারে আগুন জ্বলল। তৈরি হল পর্যাপ্ত বাষ্প। জাহাজ আবার চলতে আরম্ভ করল। এক নাগাড়ে দুদিন জাহাজ চালিয়ে বিচ পয়েন্টে পৌঁছনো গেল। কিন্তু বরফমুক্ত সমুদ্রের দেখা মিলল না। ক্যাপ্টেন নিজে মাস্তুলের ওপর উঠে দূরবীন দিয়ে কি যেন দেখলেন। ব্যাজারমুখে নেমে এলেন। নির্বাক রইলেন।

এল ষোলই অক্টোবর। সেদিন সূর্য প্রথম অস্ত গেল। এক নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে দিনের আলোর উপস্থিতির অবসান ঘটল।

আরও দুদিন কাটার পর এল আঠারো তারিখ। এবার ব্রিটানিয়া পাহাড়কে ছায়ামূর্তির মতো দেখা যেতে লাগল।

উনিশে অক্টোবর বরফবন্দি হয়ে ফরোয়ার্ড থমকে দাঁড়িয়ে রইল।

স্যার এডোয়ার্ড বেলচাল এখানে অত্যন্ত এক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এর দক্ষিণ পূর্বদিকে বরফের একাধিপত্য, উত্তর পশ্চিমে দিগন্ত প্রসারিত উন্মুক্ত সমুদ্র বিরাজ করছে লক্ষ করেছিলেন।

২০ আগস্ট ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস হতাশ হয়ে পড়লেন, কই, স্যার এডোয়ার্ড বেলচারের উন্মুক্ত সমুদ্রের চিহ্নও তো নজরে পড়ছে না। তিনি একটু মুষড়েই পড়লেন। যেদিকে তাকানো যায় শুধুই বরফের আস্ফালন দেখলে কার না বুকে কাঁপন ধরে।

ক্যাপ্টেন জাহাজের নোঙর তোলার নির্দেশ দিলেন। প্রতিবাদ করা বা আদেশ অমান্য করার মত বুকের পাটা কারই বা আছে। ধীর গতিতে জাহাজ এগিয়ে পেনী প্রণালীতে পৌঁছল। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার নাবিকদের নজরে পড়ল—দক্ষিণদিকের চেয়ে বরং উত্তর দিকের সমুদ্রের পরিস্থিতিই জাহাজ চালানোর পক্ষে অনুকূল।

www.pathagar.com

নাবিক পেনের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ধিক ধিক করে জ্বলতেই থাকল। সে তাব প্রতিশোধস্পৃহার কথা একদিন তো রিচার্ড শ্যানডনের কাছে বলেই ফেলল।

এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও জাহাজের গতি সব মিলিয়ে আশাপ্রদই বটে। পূর্বসূরীরা যে পথ পাড়ি দিতে দুতিন বছর লাগিয়ে ছিল ফরোয়ার্ড তাই মাত্র পাঁচ মাসে অতিক্রম করেছে।

সেদিনটা ছিল আটই সেপ্টেম্বর। জমাটবাঁধা বরফ করাত দিয়ে কাটতে গিয়ে হতাশ হয়ে শেষপর্যন্ত বারুদ চোঙ ফাটিয়ে বরফ সরাতে হল।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রির অন্ধকার নেমে আসতেই তুমুল ঝড় উঠল। ঝড়ের ধাক্কায় বিশালায়তন একটা হিমশৈল এগিয়ে এসে ফরোয়ার্ডের গায়ে ধাক্কা মারার উপক্রম করল। আতঙ্কে নাবিকদের বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবার জোগার হল। হিমশৈলটা ভাসতে ভাসতে এসে আচমকা গলুইয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

এমন ভয়ঙ্কর বিপদেও ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলেন দেখে সবাই যারপরনাই অবাক হল। এবার বিকট আওয়াজ তুলে ইয়া পেল্লাই পেল্লাই বরফের চাঙড় জাহাজের মাথার ওপর আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। ভারে জাহাজটা ডুবে যাওয়ার জোগাড় হল। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস প্রায় আতঙ্কিত হলেন। জাহাজ বরফচাপা হয়ে পড়ে রইল। বেরনোর কোনো উপায়ই নেই। হঠাৎ পরিস্থিতির উন্নতি হতে দেখা গেল। ভারকেন্দ্র অকস্মাৎ স্থানান্তরিত হওয়ায় হিমশৈলও ক্রমেই সরতে লাগল। দুম করে জাহাজটা জলের ওপর ভেসে উঠল। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ব্যস্তপায়ে ঘুরে ঘুরে দেখলেন, জাহাজের কোন ক্ষতিই হয় নি।

১৫ সেপ্টেম্বর ফরোয়ার্ড জাহাজ পৃথিবীর শীতলতম স্থানে উপস্থিত হল। ভূগোলবিদগণ এখানে আসতে সক্ষম না হওয়ায় অনুমানের ওপর নির্ভর করেই এ স্থানটিকে মানচিত্রের গায়ে শিতলতম স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেই সন্তুষ্ট থেকেছেন।

শীতঋতু দুয়ারে আঘাত হানতে চলেছে। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস এ অঞ্চলের শীতকাল সম্বন্ধে অভিহিত। ডেক নাবিকদের অফিসার জনসনেরও এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা কিছু কম নয়। তাই উভয়ে শীতের কোমাবিলার জন্য তৈরি হতে লাগলেন। এস্কিমোদের বাসস্থল ইগলুর মতো জাহাজটাকে বরফের চাঙড় ঘিরে দেয়া হল। তাবু খাটিয়ে দেওয়া হল ডেকের ওপর। কেবল বরফের ছাদে একটা ছিদ্র রাখা হল। বড় একটা স্টোভ দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা বরফের ঘরের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হল।

* * *

১০ অক্টোবরের মধ্যে শীতের সঙ্গে মোকাবেলার প্রস্তুতি সেরে নেয়া হল।

খাবার জোগাড়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। উনিশে অক্টোবর নয় ফুট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বুলডগের মতো ইয়া লম্বা দাঁত ওয়ালা একটা তিমি মাছকে সিম্পসন গুলি করে ঘায়েল করলেন। ডা. ক্লবোনি সেটাকে বরফের গর্তে ঢুকিয়ে রাখলেন। উদ্দেশ্য ওটার চামড়া আর মাথাটাকে নিজের সংগ্রহশালায় রেখে দেবেন। আটদিনের মধ্যেই ওর গা থেকে চামড়া আর মাথা আলাদা করে ফেলতে পারলেন।

একসময় মাস্তুলটার অগ্রভাগ পর্যন্ত ফরোয়ার্ড জাহাজ বরফের তলার চাপা পড়ে গেল।

www.pathagar.com

কড়া সাবধানতার মধ্যেও ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের প্রতি নাবিকদের ক্ষোভ ঘৃণা ভেতরে ভেতরে ঠিকই জাগ্রত রইল।

একদিন ভালুক শিকার করতে বেরিয়ে জাহাজের কর্মীরা অদ্ভুত একটা শেয়ালকে ঘায়েল করল। তার গলায় একটা কলার ঝুলছে। তাতে অস্পষ্ট হরফে কি যেন লেখা রয়েছে। কলারের ব্যাপারটা ডা. ক্লবোনির জানা আছে। জেমস রস নাকি আঠারো শো আটচল্লিশে কয়েকটা শেয়ালের গলায় কলার বেঁধে দিয়েছিলেন। আজ রস আর পৃথিবীতে নেই—কিন্তু বারো বছর পর শেয়ালদের একটা ঠিকই ধরা পড়ল।

শীত ক্রমে জেঁকে পড়ল। শীতের প্রকোপে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাবার জোগার হল। ডা. ক্লবোনি কিন্তু শীতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মহা স্ফূর্তিতেই দিন কাটাচ্ছেন। শেয়াল শিকার করতে গিয়ে উল্কাপাতের অত্যাশ্চর্য দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য দেখে চোখ ও মনকে তৃপ্ত করলেন। মেরুজ্যোতির অবর্ণনীয় সৌন্দর্য তাঁকে যারপরনাই মুগ্ধ করল। এ মনোরম দৃশ্য যে নিজের চোখে দেখে নি তাকে প্রকৃতির ও শোভা বলে বুঝানো সম্ভব নয়। আর চাঁদ? আধমরা চাঁদের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। বরফের রাজ্যে একটা চাঁদ হয়ে যায় অগণিত নকল চাঁদ।

নাবিক পেন আর অন্যান্য নাবিকরা ইদানিং ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের হুকুম ঠিকঠিক পালন করছে না। তারা সারাদিন বুকে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে থাকায় সবাই কঠিন স্কার্ভি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল। এমন মর্মান্তিক দৃশ্য কারোর পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। সর্বাঙ্গে নীল কালো দাগ আর হাতপা ফুল ঢোল হয়ে গেল সবার।

৮ ডিসেম্বর। এমন অকল্পনীয় কষ্টের মধ্যে লক্ষ করা হল, ভয়ানক ঠাণ্ডায় থার্মোমিটারের পারদ পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা শূন্য ডিগ্রি তাপাঙ্কের চুয়াল্লিশ ডিগ্রি নিচে নেমে যাওয়ায় ডা. ক্লবোনিও মুষড়ে পড়লেন।

বিশে ডিসেম্বর। পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর রূপ নিল। অতিকায় স্টোভটা নিভে গেল। ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মত নাবিকরা ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসকে নিয়ে পড়ল। ব্যস্তপায়ে এগিয়ে এসে রিচার্ড শ্যানডন ক্যাপ্টেনকে জানালেন, কয়লা ফুরিয়ে গেছে।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল-নিথরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। নাবিক পেন বলল, জাহাজের কাঠ দিয়ে বয়লার চালাতে। তার কথা শোনামাত্র ক্যাপ্টেনের মাথায় রক্ত উঠে যাবার জোগার হল। তিনি ক্রোধোন্মত্ত বাঘের মত কুড় লটা টেনে নিয়ে পেনের মাথা বরাবর চালিয়ে দিলেন। ডা. ক্লবোনি তাঁকে আচমকা ধাক্কা মারায় পেনের মাথায় না লেগে কুড়োলটা কাঠের গায়ে সজোরে আছড়ে পড়ল।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস কোনোক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মদ! জাহাজে পিপা পিপা মদ রয়েছে। তা জ্বেলে বয়লার চালাও, বাষ্প তৈরি কর।' নাবিকরা মহানন্দে ছুটোছুটি করে গুদাম থেকে পিপা পিপা মদ বের করে নিয়ে এল।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস কাউকেই বিশ্বাস করেন না। সতর্কতাস্বরূপ কোমরে রিভলভার ঝুলিয়ে জাহাজে পায়চারি করতে লাগলেন। কুকুরটা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী।

২৫ ডিসেম্বর ডা. ক্লবোনি কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালার পরামর্শ দিলেন। তা না হলে সবার প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা।

www.pathagar.com

ক্রোধোন্মত্ত ক্যাপ্টেন গর্জে উঠল, 'আমি এতে মত দিতে পারব না। আপনারা যা ভালো মনে করেন করতে পারেন।'

ব্যস, আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে নাবিকরা হৈ হৈ করে কুড় ল শাবল আর ইতি নিয়ে ছুটল জাহাজের পাটাতন ভেঙে বয়লার দেবার জন্য।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস নিষ্পলক চোখে উল্লসিত নাবিকদের কাণ্ডকারখানা দেখতে গলেন। তার চোখ দুটো জলে ছলছল করতে লাগল।

জানুয়ারির প্রথম দিন। ডা. ক্লবোনি স্যার বেলচারের লেখা একটা বই নিয়ে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের কেবিনে ছুটে এলেন। বইয়ের কয়েকটা ছত্রের দিকে অঙ্গুলি র্দেশ করে বললেন, 'দেখুন, এখানে লেখা, এখান থেকে একশো মাইল উত্তরে কয়লা রয়েছে। সভ্য মানুষরা সে কয়লা লুকিয়ে রেখেছে। স্যার বেলচার তা নিজের চোখে দেখতে পেয়েছেন।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের মুখে হাল্কা হাসির রেখাও ফুটে উঠল না। ফ্যাকাশে মুখে, গলা নামিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা ফাঁস করবেন না। বরফ প্রান্তর আগের চেয়ে দুই ডিগ্রি উত্তরে চলে এসেছে। আর অন্তত তিন শ' মাইল দূরে রয়েছে কয়লা।' কথাটা শেষ করার পর তিনি কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবলেন। ক্রমে তাঁর মুখে নেমে এল হাল্কা হাসির ছোপ। এই প্রথম তাঁর মুখে হাসি দেখা গেল।

জাহাজ ধীরগতিতে এগোতে এগোতে আরো কিছুটা পথ অতিক্রম করল। কয়লার স্তূপ এখনও প্রায় আড়াই শো মাইল দূরে। স্লেজগাড়িতে সেখানে পৌঁছাতে চল্লিশ দিনের মত লাগবে।

ডক নাবিকদের অফিসার জনসনের নেতৃত্বে চব্বিশ ফুট লম্বা এবং পঁয়ত্রিশ ইঞ্চি চওড়া স্লেজ গাড়িতে খাবার দাবার মদ, বন্দুক ও বারুদ, ওষুধপত্র, ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী তুলে নেওয়া হল। ছয়টা কুকুর গাড়িটা টানবে। দুহাজার পাউন্ড ওজনে টেনে নেয়া তাদের পক্ষে কোনো সমস্যাই নয়।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের চিন্তা সম্পূর্ণ অন্য। যারা সঙ্গে যাচ্ছে তাদের জন্য নয়, যারা ফরোয়ার্ডে থেকে যাচ্ছে তাদের নিয়ে তাঁর চিন্তার শেষ নেই। তাঁর অনুপস্থিতিতে তারা যে কী কেলেঙ্কারী কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে তাই বা কেন জানে? তাই একান্ত বিশ্বস্ত জনসনকে জাহাজের পুরো দায়িত্বে রেখে গেলেন। যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাঁকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বললেন, 'তোমাকে অধিকার দিলাম, আমার প্রতিনিধি হয়ে তুমি জাহাজের কর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবে। চার পাঁচ সপ্তাহ পরেও যদি আমি ফিরে না আসি তবে তুমি জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে ইংল্যান্ডের দিকে যাত্রা করবে।

জনসন ঘাড় কাত করে তাঁর কথায় সম্মতি জানাল।

ছয় তারিখে স্লেজ গাড়ি যাত্রা করল। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের সঙ্গী হলেন ডা. ক্লবোনি, হারপুনবীর সিম্পসন ও কাঠমিস্ত্রী বেল। আর তাঁর সর্বক্ষণের কুকুর ডাক তো থাকছেই।

স্লেজগাড়ি প্রথম দিন বিশ মাইল রাস্তা অতিক্রম করল। বরফের চাঙড় তৈরি করে ইগলুর মত গম্বুজাকৃতি ঘর তৈরি করে মাথা গোঁজা হল। সকাল হতেই আবার যাত্রা শুরু হল। গাড়ির তলায় ফসাফরাসের অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মি ঝকমক করতে লাগল। তারই ফুলকি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক যেন স্বর্গীয় শোভার সৃষ্টি করতে লাগল।

www.pathagar.com

১৫ জানুয়ারি আবহাওয়া মোটামুটি স্বচ্ছই দেখা গেল। অভিযাত্রীরা এক মাইল পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হলেন। সেদিনই অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড অভিযাত্রীদের চোখের সামনে ঘটে গেল। হঠাৎ বরফ থেকে বরফ বাষ্প প্রবল বেগে আকাশের দিকে উঠে গেল, প্রায় নব্বইয় ফুট ঊর্ধ্বাকাশে উঠে নিশ্চল নিথর হয়ে গেল। হাতের নাগালের মধ্যে যে রয়েছে তাকেও দেখা যাচ্ছে না। বিস্ময় বিমূঢ় চারজনই একে অন্যের নাম ধরে ডাকাডাকি করতে লাগলেন। কেউ শুনতেও পেলেন না। আসলে রহস্যসঞ্চারকারী বাষ্প সে শব্দতরঙ্গও বহন করছে না, তাই তো কারো কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

প্রায় পাঁচ মিনিট নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে ডা. ক্লবোনি আচমকা বন্দুকের ঘোড়ায় চাপ দিলেন। কামানের গর্জনের মত শব্দটা বার বার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আর এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। বুঝা গেল পায়ের নিচের বরফ যেন ক্রমে ওপরে উঠে যাচ্ছে। অভিযাত্রীরা সবিস্ময়ে ভাবলেন, হিমশৈলের ওপরে উঠে যাচ্ছেন। তাঁরা আশি ফুট ওপরে উঠে যেতেই একে অন্যকে দেখতে পেলেন। আর আশি ফুট তলা থেকে কুকুরেরা ডাক দিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করতে লাগল। অন্য কুকুরগুলোও ডাকাডাকি করতে লাগল। মনে হল তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

একটু বাদে ঘন বাষ্প আরও নিচের দিকেনামতে লাগল। এবার পাঁচটা ভালুক ও শেয়াল মিলে প্রায় ত্রিশটা জন্তুকে আমাদের খাবার দাবার লুট করে খেতে দেখা গেল। ব্যাপার দেখে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস পিস্তল থেকে গুলি ছুড়ে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। ক্ষুধার্ত হতচ্ছাড়া শেয়ালগুলো মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটেই খাবারদাবার খেয়ে যে সর্বনাশ করল তাতেই ক্যাপ্টেনের মাথায় বজ্রাঘাত হবার জোগাড় হল।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস এক অদ্ভুত ধাতের মানুষ। ভাঙবেন তবু মচকাবেন না।

আঠারোই জানুয়ারি অভিযাত্রীরা সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে মাত্র ফুট দশেক স্লেজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন। শরীর ক্লান্ত, ইগলু তৈরি করে রাত্রি কাটানোর ব্যবস্থা করার মত শরীর ও মন কারোরই সতেজ নয়। বাধ্য হয়ে মোষের চামড়ার তাবু টাঙিয়ে সবাই রাত্রি কাটিয়ে দিলেন।

ডা. ক্লবোনি থার্মোমিটারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, পারদ আবার শূন্য তাপাঙ্কের চুয়াল্লিশ ডিগ্রি নিচে গেছে। পারদ আর তরল নয়, কঠিন পদার্থের রূপ নিয়েছে।

বিশে জানুয়ারি সকালেই প্রকৃতি আরও রুদ্ররূপ ধারণ করল। স্লেজ গাড়িটা ঝড়ের দাপটে পাথরের মত কঠিন বরফের গায়ে গায়ে ধাক্কা মারল। সেটার সামনের অংশ তুবড়ে—গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। সারাই করে সেটাকে ব্যবহারোপযোগী করে তুলতে কেটে গেল বেশকিছু সময়।

সিম্পসনের স্কার্ভি রোগ চরম রূপ নিল। ডা. ক্লবোনি তার শিয়রে বসে সারারাত তার সেবায় লিপ্ত রইলেন।

সিম্পসন তার একার জন্য এতগুলো লোক যাতে চরমতম বিপদে না পড়ে সেজন্য ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করল তাকে বরফের ওপর ফেলে চলে যেতে। এতে সেও শান্তিতে মরতে পারবে, এতগুলো লোকের প্রাণও বাঁচবে।

ক্যাপ্টেন তার প্রস্তাবে রাজি হতে পারলেন না। তাকে স্লেজে গাড়িতে তুলে নিয়ে আবার এগোতো লাগলেন।

www.pathagar.com

এক সময় কুকুরের ডাক শুনে ছুটে গিয়ে একটা বরফের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে চেঁচাতে লাগল। গাঁইতি আর শাবল দিয়ে স্তূপটা ভাঙতেই তার ভেতর থেকে পাওয়া গেল ভিজে ন্যাতা হয়ে যাওয়া এক চিলতে কাগজ। তার গায়ে একটামাত্র ছত্র লেখা 'অ্যালটাস—পরপয়েজ—তেরোই ডিসেম্বর ১২৬০˙১২° লঙ্গি—৮—৩৫ মিনিট ল্যাটি—'

কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে ডা. ক্লবোনি প্রায় স্বগতোক্তি করলেন, 'কই, পরপয়েজ নামে কোন জাহাজের নাম ইতিপূর্বে শুনেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'ডা. ক্লবোনি, আপনি শোনেন নি বটে, কিন্তু মাস দুই আগে যে জাহাজটা ডুবে গেছে, এপথেই সেটা পাড়ি দিয়েছিল।

এদিকে সিম্পসনের পরিস্থিতি ক্রমে সঙ্গীন হয়ে পড়তে লাগল। আবার স্লেজগাড়িটাকে কাঁধে নিয়ে অভিযাত্রীদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দেড় হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে চড়ে যেতে হল। সবাই ক্লান্ত। শরীর আর চলতে চায় না।

মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে ইগলুর ছাদ ধ্বসে পড়ে কেউ কেউ চোট পেল। তবে তেমন জখমটখম হল না। পরদিনও ঝড়ের তাণ্ডব সমানভাবে চলল।

২৬ জানুয়ারি বরফের ওপর একটা বন্দুক পাওয়া গেল। ২৭ জানুয়ারি একটা ফ্লাস্ক আর সেক্সটেন্ট পড়ে থাকতে দেখা গেল। এসব দিকে ক্যাপ্টেনের মোটেই খেয়াল নেই। তাঁর মুখে কেবলমাত্র এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ। সন্ধ্যার পর দেখা গেল বেচারা সিম্পসনের আত্মাটা ধড় ছেড়ে বেরিয়ে যাবার মুহূর্ত আগত প্রায়। তার পর মুহূর্তেই ঝড় অধিকতর রুদ্ররূপ ধারণ করল। তিন তিনবার তাঁবু কাটাবার চেষ্টা করে হতাশ হতে হল। প্রতিবারেই তাঁবু উড়ে গেল। অনন্যোপায় হয়ে খোলা আকাশের গায়ে, বরফের ওপর মৃত্যুপথযাত্রী সিম্পনসনকে সারারাত্রি শুইয়ে রাখতে হল। গভীর রাতে সে মুহূর্তের জন্য ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের দিকে তর্জনিটা তুলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময় সে যেন ইঙ্গিতে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসকেই দায়ী করে গেল। আঠারো জনের একজন দল ছেড়ে চিরদিনের মত চলে গেল। পাথরের মত কঠিন হৃদয় ক্যাপ্টেনের চোখের কোল বেয়ে একফোটা জল বরফের ওপর পড়ল।

সকাল হল। দুর্যোগ কেটে গিয়ে সূর্যের আলো বরফের ওপর পড়ে প্রতিফলিত হতে লাগল। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস বিষণ্নমুখে বললেন, 'বন্ধুগণ, কয়লার স্তূপ এখান থেকে আরও ষাট মাইল দক্ষিণে রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে আর এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার অর্থই স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া। উপায় নেই, ফিরেই যাওয়া যাক।

ডা. ক্লবোনি এতে খুশিই হলেন। তবে দুদিন বিশ্রাম করে ফিরে যেতে চাইলেন। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস তার প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

ত্রিশে জানুয়ারি সকালে কুকুরটাকে খুবই অস্থিরভাবে চেঁচামেচি করতে দেখা গেল। ছুটে গিয়ে দেখা গেল সে সিম্পসনের মৃতদেহের গায়ে বসে অনবরত চেঁচাচ্ছে। সবাই ধরেই নিল মৃত সিম্পসনকে কবরস্থ করার জন্যই তার এমন অস্থিরতা।

ডা. ক্লবোনি গাঁইতি চালিয়ে বরফ খোঁড়ার চেষ্টা করতেই ঠুং করে একটা গম্ভীর আওয়াজ হল। ব্যস্ত-হাতে বরফ সরিয়ে তিনি একটা বোতল বের করে আনলেন। এবার বেশ বড় একটা থলে তুলে আনলেন। থলেটাকে বিস্কুট বোঝাই। তিনি স্বগতোক্তি করলেন 'হায় ঈশ্বর! খাবারের লুকানো গুদামের খোঁজ দিল!'

www.pathagar.com

এবার ব্যস্ত-হাতে গাঁইতি চালাতে লাগলেন। কয়েক ঘা মেরে কিছু বরফ সরাতেই মানুষের এক জোড়া পা উঁকি দিল। বেশ টানাটানি করে বছর ত্রিশেক বয়সের এক যুবকের মৃতদেহ ওপরে উঠে এল। আর একটা মৃতদেহ উদ্ধার করা হল। এবারেরটার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। উভয়ের গায়েই মেরু অভিযাত্রী পোশাক। কিছুক্ষণ পরে আরও একটা উদ্ধার করা সম্ভব হল। মরে নি তখনো। প্রাণের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। তার জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা খাম পাওয়া গেল। আধগোড়া। তার গায়ের লেখা যেটুক পড়া যাচ্ছে—ট্যামন্ট পয়েজ ইয়র্ক—আলটামন্ট-পরপয়েজ—নিউইয়র্ক!

ডা. ক্লবোনি খামের গায়ের শব্দগুলো পড়ে উচ্ছ্বাসে প্রকাশ করলেন, 'তবে দেখা যাচ্ছে, নিউইয়র্কের পরজয়েজ জাহাজের আলটামন্ট! কী আশ্চর্য ব্যাপার!'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস গম্ভীর মুখে শুধু বললেন, 'লোকটা তবে আমেরিকান।'

'হ্যাঁ, যে দেশেরই হোক, আমেরিকান হলেও আমি একে বাঁচিয়ে তুলতে চাই।'

অভিযাত্রীরা আমেরিকান আলটামন্টকে স্লেজে তুলে নিলেন। তার জায়গায় মৃত সিম্পসনকে সমাধিস্থ করে আবার এগিয়ে চললেন।

অভিযাত্রীরা উনিশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই পথ পাড়ি দিলেন।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস চব্বিশে ফেব্রুয়ারি লক্ষ করলেন, আকাশের একপ্রান্ত টকটকে লাল, তার ভেতর থেকে ঘন কালো ধোঁয়া উঠছে। ক্যাপ্টেন কাঁপা কাঁপা গলায় আর্তনাদ করে উঠলেন—আগুন! ধোঁয়া! হতচ্ছাড়ারা ফরোয়ার্ডের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দাউ দাউ করে ফরোয়ার্ড পুড়ছে!'

সত্যিই ক্ষুব্ধ নাবিকরা ফরোয়ার্ড জাহাজটাকে পুড়িয়ে ফেলল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জাহাজের বারুদঘরে প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করে বিস্ফোরণ ঘটল। ব্যস, সব শেষ। আগুনের তাপে বরফ পর্যন্ত গলে যেতে লাগল।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস এবার বিষণ্ণমুখে বললেন, 'ফরোয়ার্ড ধ্বংস হয়ে গেছে বটে, কিন্তু আমরা তো এখনও শেষ হই নি। আমাদের মনোবল অটুট। ডা. ক্লবোনির ভেতরে রয়েছে বিজ্ঞান মনস্কতা, আর আমার রয়েছে অন্তহীন সাহস আর আত্মবিশ্বাস। আমরা যে কজন রয়েছি সবাই মিলে দৃঢ় মনোবল নিয়ে চলুন সুমেরুর দিকে এগিয়ে যাই। অন্তহীন সাহস, অটুট মনোবল, ধৈর্য আর অধ্যবসায়ই আমাদের এনে দেবে সাফল্য। চলুন, এগিয়ে যাই।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস সহ-অভিযাত্রীদের নিয়ে সোজা উত্তরদিকে এগিয়ে চলেছেন। পথের বাঁধা-বিঘ্ন তাঁর অটুট মনোবলকে এতটুকুও নরম করতে পারে নি কোনদিন—আজও নয়। সুমেরুর অজানা-অচেনা সমুদ্র আবিষ্কার করে পৃথিবীতে একন নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। দু-হাতে পাউন্ড খরচ করে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর স্বপ্ন সাধের জাহাজ ফরোয়ার্ডকে। পথের কোনো বাধাই তাঁর পথ রোধ করতে পারে নি। চরমতম বিপদের মুহূর্তেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে দৃঢ় মনোবল ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তিনি প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন। কিন্তু হায় বিক্ষুব্ধ নাবিকরা তাঁর একমাত্র অবলম্বন ফরোয়ার্ড জাহাজকে ধ্বংস করে দিয়ে তার আশা-আকাঙ্ক্ষায় নিষ্ঠুর কুঠারাঘাত করেছে। আঠারোজন মিলে যে-অভিযান তিনি শুরু করেছিলেন আজ অবশিষ্ট রয়েছে

www.pathagar.com

মাত্র চারজন। একজন বরফের তলায় পরম শান্তিতে চিরনিদ্রায় সমাহিত। দীর্ঘ নয় মাস ধরে চলেছে বন্ধুর পথচলা আর প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মরণপণ লড়াই। এতকিছু সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস আজও অন্তরের অন্তঃস্থলে দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করেন, সাফল্যলাভ তিনি করবেনই।

স্বদেশ থেকে পঁচিশ হাজার মাইল দূরে আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন—নিঃসম্বল ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস বরফ সমুদ্রের ওপর দিয়ে মাত্র তিনজন সঙ্গী নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

এদিকে ডেক নাবিকদের অফিসার জনসন ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে হতাশা জর্জরিত মন নিয়ে নির্বাক নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কয়েক শো গজ বরফের এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ফরোয়ার্ড জাহাজের আধ-পোড়া, ভাঙা টুকরো। আর এখানে-ওখানে পড়ে থাকা পোড়া কাঠের গা থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে। বিক্ষুব্ধ বিশ্বাসঘাতক নাবিকরা জাহাজের একমাত্র নৌকাটাকেও পালিয়ে যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। বরফের ওপর অতিকায় কামানটা মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে।

জনসন সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছিলেন বিক্ষুব্ধ নাবিকদের নিরস্ত করতে। কিন্তু পারেন নি। তার ব্যর্থতার বড় কারণ বিশ্বাসঘাতক রিচার্ড শ্যানডন। তাঁর উস্কানিতেই নাবিকরা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছতে সাহস পেয়েছে।

একসময় ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস সদলবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজটার কাছে হাজির হলেন। সিম্পসন আর ইহলোকে নেই। তার পরিবর্তে একজন আমেরিকানকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা হয়েছে। নাম তার আলটামন্ট। যার জন্য এতকিছু সেই কয়লাও আনা সম্ভব হয় নি। জাহাজ ধ্বংস হয়েছে। কয়লা পাওয়া যায় নি—ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার চিন্তা পাগলের খেয়াল ছাড়া কিছুই নয়।

জনসনের মনোবল এখনও অটুট রয়েছে। সবাইকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন সদ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ থেকে কী কী উদ্ধার করা যায় সে আশা বুকে নিয়ে।

এদিকে স্লেজগাড়িতে আল্টামন্ট এখনো সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এলিয়ে পড়ে রয়েছে।

ডা. ক্লবোনি হাঁটাহাঁটি করতে করতে ধ্বংসক্ষেত্র থেকে একটা স্টোভ উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। অক্ষত। তেলও রয়েছে ট্যাঙ্কারে। ইতিমধ্যেই বেল আর জনসন বরফের চাঁই সাজিয়ে সাজিয়ে ছোট্ট একটা ইগল বানিয়ে ফেলেছে। তার ভেতরে স্টোভটা জ্বালিয়ে দেয়া হল।

ডা. ক্লবোনি আবার জনসনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ধ্বংসস্তূপে ঘুরে ঘুরে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে। সেখানে পৌঁছে হাঁটাহাঁটি করতে গিয়ে দেখলেন, ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে কিছুই অক্ষত নেই। প্রপেলার, ব্লেড, ইঞ্জিন, বয়লার কিছুই ব্যবহারোপযোগী নেই। খুজে পেতে খাদ্যবস্তু কিছু পেলেন। হিসেব করে দেখলেন জনা পাঁচেক লোকের কোনরকমে তিন সপ্তাহ চালিয়ে নেয়া যাবে, তারপর দেখা যাক, পরিস্থিতি কীরকম থাকে।

রাত বেড়ে চলল। আটটার কাছাকাছি আকাশ একটু পরিষ্কার হয়ে এল।

সকাল হল। আবার দমকা বাতাস আর তুষারবৃষ্টি শুরু হল। সকালে কফি পান করতে করতে জনসন বললেন, আত্মম্ভরী স্বাধীনচেতা ও ক্ষমতালোভী রিচার্ড শ্যানডন কীভাবে বিক্ষুব্ধ নাবিকদের ধ্বংসলীলায় উৎসাহিত করে তুলেছিলেন।

www.pathagar.com

সেটা ছিল ২২ ফেব্রুয়ারি। জাহাজ থেকে নৌকাটা নামিয়ে নিয়ে সবাই জাহাজ ছাড়ল। এবার দুর্ধর্ষ নাবিক পেন নিজেহাতে ক্যাপ্তেন হ্যাটেরাসের স্বপ্ন সাধের জাহাজ ফরোয়ার্ডের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল। দেখতে দেখতে আগুনের শিখা সম্পূর্ণ জাহাজে ছড়িয়ে পড়ল। বারুদের গুদামে আগুন লাগতেই প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল। পুরো দুদিন ধরে আগুন জ্বলেছে।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস যখন হাজির হয়েছেন তার আগেই সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে গেছে। তবে এও ঠিক তিনি আগে না আসায় খুবই মঙ্গল হয়েছে। সে মুহূর্তে তাঁকে কাছে পেলে বিক্ষুব্ধরা তাঁকে হয়ত খুনই করে ফেলত।

বিক্ষুব্ধ নাবিকদের সর্বনেশে কাণ্ডের কথা শেষ করে জনসন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, তাঁরা একন সমুদ্র থেকে ৬০০ মাইল দূরে অবস্থান করছেন। আর সেটা পশ্চিমদিকে।

ডা. ক্লবোনি পশ্চিমে রয়েছেন শুনে, উত্তরে না গিয়ে পশ্চিমদিকে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু পথ একেবারেই অজানা অচেনা বলে পশ্চিমে অগ্রসর হতে ক্যাপ্টেন রাজি হলেন না।

ডা. ক্লবোনি যুক্তি দেখালেন, সঙ্গে স্লেজগাড়ি রয়েছে। ৬০০ মাইল পাড়ি দেওয়া কষ্টকর হলেও অসম্ভব নয়। প্রতি দিন কুড়ি মাইল পথ যেতে পারলে ২৬ মার্চের মধ্যে সমুদ্রের পাড়ে হাজির হয়ে যাওয়া যাবে। জনসনও ডা. ক্লবোনির কথায় সম্মতি দিলেন।

কিন্তু ক্যাপ্টেন আরো অন্তত একটা দিন সেখানে অবস্থান করতে চাইলেন। এর কারণ কী, তিনি নিজেও জানেন না।

ডা. ক্লবোনি তাঁর কথা শুনে বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই বলে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার আপনার! মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে আর একটা দিনও এখানে কাটাতে আমি উৎসাহী হতে পারছি না।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস সামান্যতম উত্তেজনা প্রকাশ না করেই বললেন, 'ডা. ক্লবোনি, মাথা ঠাণ্ডা করুন। এত সহজে ভেঙে পড়লে বিপদ আমাদের চারদিক থেকে অক্টোপাসের মত আঁকড়ে ধরবে।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বললেন, 'আমি নিঃসন্দেহ যে, উত্তরদিকে যেতে বললে আপনারা কেউই সম্মত হবেন না। কিন্তু উত্তরেই আমাদের বাঁচার উপায় রয়েছে। আরও অনেক, অনেক উত্তরে এস্কিমোরা বেঁচে রয়েছে। সেদিকে স্মিথ প্রণালী আর বরফমুক্ত সমুদ্র অবস্থান করছে। প্রকৃতিকে নির্মম নিষ্ঠুর ভাবলে তার প্রতি অবিচারই করা হবে। শীতের প্রকোপ হ্রাস পেলে আবার প্রকৃতির কোলে সবুজ গাছপালা গজাবে, হবে আমাদের বাঁচার উপায়।

ডা. ক্লবোনি তাঁর কতায় গম্ভীর হয়ে গেলেন। ডেক নাবিকদের অফিসার জনসনও আশান্বিত হতে না পেরে নাবিক বেলকে নিয়ে স্লেজের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'জনসন, তুমিও—আমাকে ফেলে চলে যেতে চাইছ?

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের শেষ সম্বল কুকুর ডাক তাঁর পায়ের কাছে শুয়ে মুখে কুঁৎ কুঁৎ আওয়াজ করে লেজ নাড়তে লাগল।

ইতিমধ্যে আলটামন্ট স্লেজগাড়ি থেকে নেমে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে পিছনদিক তেকে জনসনের একটা হাত চেপে ধরল। জনসন অতর্কিতে ঘাড় ঘুরিয়ে

www.pathagar.com

দেখল, তার ঠোঁট দুটো তিরতির করে কাঁপছে। কিছু সে বলতে চাইছে, সামর্থে কুলোচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়ে সে কোনোরকমে একটা মাত্র শব্দই উচ্চারণ করতে সক্ষম হল, 'পরপয়েজ!'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ব্যস্তপায়ে তার কাছে এগিয়ে এসে অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পরপয়েজ? কোথায় পরপয়েজ? ঠিকানা জানা আছে আপনার?'

আলটামন্ট ঘাড় কাত করে তাঁর কথার জবাব দিল। ক্যাপ্টেন ততোধিক আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন, 'ঠিক আছে, কথা বলতে কষ্ট হলে আপনি ঘাড় কাৎ করে বা ঝাঁকিয়েই আমার কথার জবাব দেবেন। আমি অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমারেখা বলে যাচ্ছি আপনি ঘাড় কাত করে বা ঘাড় ঝাঁকিয়ে জবাব দেবেন কোনটা ঠিক।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটোরাস বহু চেষ্টার মাধ্যমে আলটামন্টের কাছ থেকে পরপয়েজের অবস্থান জানতে পারলেন। তার কথায় ক্যাপ্টেনের মুখে হাসি না ফুটে বরং বিষাদের কালোছায়াই নেমে এল। কারণ, পরপয়েজ আরও তিন ডিগ্রি উত্তরে পৌঁছতে পেরেছে। কিন্তু তিনি সে পর্যন্ত যেতেই পারেন নি। একটা প্রশ্ন তাঁর বুকের মধ্যে বার বার চক্কর মারতে লাগল, পরপয়েজের উদ্দেশ্য কী ছিল? কেন জাহাজের ক্যাপ্টেন এত কষ্ট স্বীকার করে সেখানে হাজির হয়েছিল? কী ছিল তার প্রকৃত উদ্দেশ্য?

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস হিসাব কষে দেখলেন, পরপয়েজ জাহাজটা যেখানে অবস্থান করছে সেখানে যেতে কম হলেও ৪০০ মাইল বরফ পথ পাড়ি দিতে হবে।

আলটামন্টকে জিজ্ঞাসা করে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস এও জানতে পারলেন, পরপয়েজ নামক জাহাজটা আমেরিকা থেকে এসেছে। আর এও জানতে পারলেন, পরপয়েজ নিজের ইচ্ছাতে সেখানে যায় নি। ভাসমান হিমশৈলের কয়েদ হয়েই সেখানে যেতে বাধ্য হয়েছে। স্মিথ প্রণালীর দিকে প্রায় দুই মাস আগে আলটামন্ট সঙ্গীদের নিয়ে যাত্রা করেছিল। সবাই এক-এক করে পরপাড়ে পাড়ি জমিয়েছে।

আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ডা. ক্লোবোন বললেন, 'আগামীকাল ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি আমরা পরপয়েজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে ১৫ মার্চ পৌঁছে যেতে পারব। তা না হলে সদলবলে বরফরাজ্যে প্রাণ দিতে হবে।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস আমতা আমতা করে হলেও তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে এবার বললেন, 'কিন্তু একটা কথা, পরপয়েজ যদি সত্যই হিমশৈলের চাপে পড়ে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে থাকে তবে কি সেটা এখনও সেখানে অবস্থান করছে? একইরকমভাবে আরও এগিয়ে যায় নি তো? এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তই নেয়া যাচ্ছে না।

আলটামন্ট ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'না, এগিয়ে সে যেতে পারে না, এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। কারণ, জাহাজটা পাথুরে জমিতে কাত হয়ে পড়েছে। আটকা পড়ে রয়েছে।'

ক্যাপ্টেন এবার প্রশ্ন করলেন, 'আর একটা কথা, তিরাশি ডিগ্রিতে কি উন্মুক্ত সমুদ্র আপনার চোখে পড়েছিল?'

'না।' আলটামন্টের সংক্ষিপ্ত জবাব।

পরের দিন অভিযাত্রীরা পরপয়েজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। তারা দশদিন ধরে অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করে পথ পাড়ি দিল। সবচেয়ে বড় কথা, নয় দিন তুষারবৃষ্টি মাথায়

www.pathagar.com

নিয়েই পথ চলতে হয়েছে। আবার অন্তত ত্রিশ চল্লিশ ফুট পুরু বরফের ওপর দিয়ে হাঁটাহাঁটি করেছে।

৫ মার্চ। সেদিন একটা অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আকাশ পরিষ্কার, আকাশ জুড়ে তারার মেলা বসেছে, তবু প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে অনবরত তুষারবৃষ্টি হল কেন? অভিযাত্রীরা এর কারণ কিছুই বুঝতে পারলেন না।

আমেরিকান আলটামন্টের সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের নজর থেকে সন্দেহ কিছুতেই দূর হচ্ছে না। সে এতগুলো লোককে বিপথে চালনা করে পরম বিপদের মুখে ঠেলে দেবে না তো? এ ভাবনা তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৪ মার্চ এল। এখনও একশো মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে। শরীর অবশ। বন্দুকের গুলিও শেষ। ছয়টা মাত্র গুলি, আর যে পরিমাণ বারুদ আছে তা দিয়ে বড় জোর বন্দুক সাতবার ছোড়া যাবে। আধপেটা খেয়ে কি আর পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব? কয়েকটা খরগোস আর শেয়ার দেখা গেলেও গুলি করে ঘায়েল করতে পারা গেল না।

১৫ মার্চ ডা. ক্লবোনি বরফের ওপর একটা সিলমাছ দেখতে পেলেন। গুলি করে ঘায়েল করলেন বটে। কিন্তু তার সামান্য মাংস এতগুলো লোকের ক্ষুধা নিবৃত্ত হল না। এস্কিমোরা অবশ্য সিলমাছের তেল খায়। কিন্তু এদের পক্ষে তা সম্ভব হল না। ডা. ক্লবোনি সিলের চামড়াটাকে স্লেজ গাড়িতে চাপিয়ে দিলেন।

পরের দিন শনিবার। অভিযাত্রীরা আবার যাত্রা শুরু করলেন। খাবার শেষ। ডা. ক্লবোনি বন্দুক নিয়ে চারদিকে হন্যে হয়ে ঘুরে এলেন। শিকার জুটল না। কাজ যেটুকু হল আলোর প্রতিসরণ দেখে বিভ্রান্তিবশত এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে কটা গুলি বৃথাই খরচ হল।

ডা. ক্লবোনিকে খালি হাতে ফিরে আসতে দেখে সহযাত্রীরা বিষণ্ন মনে চুপটি করে শুয়ে পড়লেন। কেউ কোনো কথাই বললেন না। সামান্য খাবার আছে, আধপেটা খেলেও দুদিনের বেশি চলবে না। সবার মনেই একই হতাশা।

পরের দিন পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন হয়ে পড়ল। কুকুরগুলো সিলমাছের নাড়িভুড়িগুলি পর্যন্ত খেয়ে সাবাড় হয়ে দিয়েছে। এখন চামড়াটা কামড়ে চলেছে। দু-একটা শেয়াল দেখা গেলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় গুলিটা খরচ করতে ডা. ক্লবোনি উৎসাহী হলেন না।

রবিবার রাতে শেষবারের মতো তারা খাওয়া দাওয়া সেরে নিল। ডা. ক্লবোনি ছাড়া অন্য সবাই হতাশায় ভেঙে পড়েছেন।

রাত্রে জনসন ফাঁদ পাতল। কিন্তু তাতে একটা শেয়ালও পড়ল না। তবে শেষরাত্রে একটা বিশালাকায় ভালুককে স্লেজগাড়িটা শুকতে দেখা গেল। হাতে গ্লাভস। ট্রিগারে টিপতে অসুবিধা হচ্ছে। ঝট করে দস্তানাটা খুলে ফেলে ট্রিগার চাপ দিতে গিয়ে জনসন বিকট আর্তনাদ করে উঠল। ডা. ক্লাবোনি দৌড়ে গিয়ে তাকে নিয়ে এলেন। জল গরম করে জনসনের আঙুলটাকে ডুবিয়ে দিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার আঙুলের ছোঁয়া লাগামাত্র জল জমে বরফে পরিণত হয়ে গেল। ডা. ক্লবোনি বললেন, 'আর একটু দেরি হলেই কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত হয়ে যেত! আঙুলটা কেটে বাদ দেয়া ছাড়া উপায় থাকত না। আসলে বন্দুকের লোহার ট্রিগার আঙুলের চামড়ায় ঠেকামাত্র ঠাণ্ডায় আঙুলটা অসাড় হয়ে ট্রিগার আটকে যায়।

www.pathagar.com

ডা. ক্লবোনি গরম জল থেকে আঙুলটাকে তুলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ডলাডলি করে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে তুললেন। জনসনের বোকামির জন্যই বুলেটটা বৃথা ব্যয় হয়ে গেল। এদিকে ক্ষিধেয় পেটে জ্বালা ধরে গেছে। এ পরিস্থিতিতে ডা. ক্লোবোনিই একমাত্র ভরসা। সবাই ধুঁকতে ধুঁকতে পথ পাড়ি দিতে লাগলেন।

সারাদিন হেঁটে মাত্র তিন মাইল পাড়ি দেওয়া গেল। নিরম্বু উপবাসের মধ্যে রাত্রি কাটল। ক্ষিধের জ্বালায় কুকুরগুলো পর্যন্ত কাতরাতে লাগল।

মঙ্গলবারের সকাল। আবার শুরু হল দুঃসহ অভিযান। এ অক্ষরেখায় গলা পর্যন্ত খাবার ঠেসে না রাখলে মানুষের পক্ষে জীবন ধারণা সম্ভব নয়। কিন্তু দীর্ঘ ছত্রিশ ঘণ্টায় কারো পেটে এক টুকরো খাবারও পড়ে নি। দুঘণ্টা মতো হাঁটতে না হাঁটতে পেটে হাত দিয়ে সবাই বরফের ওপর ধপাস করে বসে পড়লেন।

ক্যাপ্টেন হ্যাটোরাসের এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও সহযাত্রীদের পরিস্থিতি দেখে তিনি দমে গেলেন। বাধ্য হয়ে জনসনের সহযোগিতায় ইগলু তৈরি করে ফেললেন। ব্যাপারটা যেন সবার জন্য কবর তৈরি করলেন। পাঁচ পাঁচটা মানুষ দিনভর মরার মত ইগলুটার মধ্যে কাটালেন।

রাত্রে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে জনসন, 'ভালুক! ভালুক!' বলে চিৎকার করে উঠলেন। ঘুম ভাঙলে ডা. ক্লবোনিকে বললেন, 'একটা ভালুক নাকি দুদিন ধরে তাদের অনুসনণ করে চলেছে।' কথাটা শুনে ডা. ক্লবোনি আক্ষেপ করে বললেন, 'ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলে কেন? বন্দুকের গুলি ফুরিয়েছে তাতে হয়েছে কী? সিসা তো সঙ্গে রয়েছে। গুলি তৈরি করে নেয়া যেত। কালই ভালুকটাকে আমি এটা দিয়ে শেষ করব।'

ডা. ক্লবোনির কথায় সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালেন।

ডা. ক্লবোনি হাতের থার্মোমিটারটাকে বাইরে, বরফের ওপর রেখে এলেন। ইগলুর বাইরের তাপমাত্রা তখন শূন্য ডিগ্রি তাপাঙ্কের পঞ্চাশ ডিগ্রি নিচে অবস্থান করছে। সে জন্য মুহূর্তের মধ্যেই শার্মোমিটারের পারা জমে শক্ত হয়ে গেল।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই ডা. ক্লবোনি থার্মোমিটারটা ভেঙে পারদটুকু বের করে বন্দুকে পুরতে পুরতে বললেন, 'জনসন ক্যাপ্টেন রস মেরু অভিযানে বেরিয়ে জমাটবাঁধা পারদের বুলেট বানিয়ে কাঠ ফুটো করেছিলেন। জমাটবাঁধা বাদাম তেলের বুলেট দিয়েও তিনি কাঠ ফুটো করেছিলেন। কাঠের তক্তা ফুটো হয়ে ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। আর বুলেটটা ছিটকে পড়েছিল। আস্তই রয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাসযোগ্য না হলেও ঘটনাটা একদম সত্য।

এখন সমস্যা হচ্ছে, ভালুকের কাছাকাছি না যেতে পারলে বুলেটটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে। এবার সে সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস সিলমাছের চামড়াকে গায়ে জড়িয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলেন। ভালুক সিলমাছ দেখলে ভয়ে পালায় না। ভালুকটা সিলমাছটাকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে সাবধানে এগোতে লাগলেন। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান যখন মাত্র তিন হাত ঠিক সে মুহূর্তেই ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস দিলেন বন্দুকের ট্রিগার টিপে। ব্যস, কাজ হাসিল। অতিকায় ভালুকটা বরফের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। গলগল করে রক্ত ঝরল। বার কয়েক পাগুলো ছোড়াছুড়ি

www.pathagar.com

করে একসময় নিশ্চল নিথরভাবে এলিয়ে পড়ল। ইয়া তাগড়াই ভালুকটা নয় ফুট লম্বা আর পেটের পরিধি ছয় ফুট। কাটাকাটির পর তার পেট থেকে গলগলিয়ে জল বের হল। বেচারা কদিন কেবল জল দিয়ে পেটের জ্বালা জুড়িয়েছে। আজ তারই মাংসে অভিযাত্রীরা পেটের জ্বালা নেই। অভিযাত্রীরা কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। ডা. ক্লবোনি কোনোরকমে তাদের ঠেকিয়ে রাখলেন। মাংস না সেঁকে খাওয়া কিছুতেই উচিত নয়।

হায় অদৃষ্ট! মাংস সেঁকবেন কী করে? ভালুক শিকার নিয়ে সবাই মেতে থাকায় তেলের অভাবে স্টোভটা নিভে গেছে। জনসন নিজের চুল নিজেই ছিঁড়তে লাগলেন। তারই জন্য এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা ঘটে গেছে।

ডা. ক্লবোনি পকেট হাতড়ে চকমকি পাথরটা বের করলেন। জনসন ইস্পাতের টুকরোর খোঁজে সবগুলো পকেট হাতাল। এ কী, সেটা গেল কোথায়? কখন যে পকেট থেকে সেটা পড়ে গেছে টেরও পান নি। ইগলুর ভেতরে হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি করেও সেটার হদিস মিলল না।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস বললেন, 'আমাদের সঙ্গে টেলিস্কোপ তো দূরের ব্যাপার লেন্সের কোন যন্ত্রও নেই। একটা লেন্স হলেই আগুন জ্বেলে নেয়া যেত।'

শেষপর্যন্ত কাঁচা মাংস খাওয়াই স্থির হল। ডা. ক্লবোনি কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে কী যেন ভেবে চলেছেন। হঠাৎ মুখ খুললেন, 'লেন্স? লেন্স নাই বা থাকল। একটা লেন্স তৈরি করে নিলেই কাজ মিটে যেতে পারে।'

জনসন চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠলেন 'সে কী! লেন্স তৈরি করে নেবেন? কী দিয়ে লেন্স তৈরি করতে চাচ্ছেন?'

ডা. ক্লবোনি ইতিমধ্যেই বরফ কাটতে শুরু করে দিয়েছেন। কাজ করতে করতে তিনি বললেন, 'সূক্ষ্ম কৃস্ট্যাল হলেই রৌদ্রকে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব। বরফের টুকরো দিয়েও সে কাজ হাসিল করা যেতে পারে। তবে হ্যাঁ, বরফে লবণ থাকলে কিছুতেই লেন্স তৈরি সম্ভব নয়।

ডা. ক্লবোনি কুড় ল দিয়ে বরফের টুকরো কেটে কেটে তাকে লেন্সের আকারে নিয়ে এলেন। এবার সেটাকে ছুরি দিয়ে খুবই সতর্কতার সঙ্গে মসৃণ ও চকচকে করে নিলেন। শেষপর্যন্ত সেটা যেন স্বচ্ছ একটা কৃষ্টালে পরিণত হয়ে গেল।

সদ্য তৈরি বরফের লেন্সটাকে রৌদ্রে পাতলা কাঠের টুকরোর ওপর ধরতেই সূর্যালোক কেন্দ্রীভূত হয়ে একসময় সেটা অদ্ভুতভাবে জ্বলে উঠল। সৃষ্টি হল আগুন। স্টোভটিকে ধরিয়ে ক্ষুধার্ত অভিযাত্রীরা এবার ব্যস্তহাতে ভল্লুকের মাংসগুলো সেঁকে নিতে লাগল।

ভাল্লুকের মাংস দিয়ে পেটের জ্বালা নেভাতে নেভাতে আলটামন্ট বলল, আর দুদিন কষ্ট করে হাঁটতে পারলেই আমরা পরপয়েজ পৌঁছে যেতে পারব। আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউই আজ পর্যন্ত সেখানে যেতে পারে নি।

ডা. ক্লবোনি কদিন ধরে বিশেষ একটা ভাবনার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। আসলে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের হাবভাব দেখেই তার মধ্যে ভাবনাটার উদয় হয়েছে। তিনি বাধ্য হয়ে জনসনকে ডেকে গোপনে বললেন, 'হ্যাটেরাস আর আলটামন্টকে নিয়ে আমাদের সমস্যা দেখা দিতে পারে। হয়ত নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, তাদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন তাকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারছেন না। আলটামন্ট মেরুর এত কাছে গিয়েছিল কোন উদ্দেশ্যে বলতে পারেন? অবশ্য বলেছে হিমশৈল ঠেলে ধাক্কে পরপয়েজ কে সেখানে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু সেটা ডাঁহা মিথ্যা কথা।'

'তবে, তবে কেন আলটামন্ট বরফরাজ্যে আসতে উৎসাহী হয়েছে? এ ব্যাপারে আপনার কী ধারণা?'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলটামন্ট অবশ্যই মেরু অভিযানে বেরিয়েছে। তাই তারা একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের সংঘাত কী করে যে ঠেকানো যাবে, ভেবে পাচ্ছি না।'

পথে আর কোনো সমস্যা দেখা দিল না। শনিবার সকালে চোখে পড়ল, ভূমির চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। স্বাদু জলের বরফও দেখা গেল। কাছাকাছি উপকূল আছে বলেই মনে হল। ডা. ক্লবোনি আর ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস—উভয়ের মনেই আনন্দের জোয়ার বয়ে চলল।

পরের দিন আলটামন্ট আচমকা স্লেজগাড়িটার ওপর লাফিয়ে উঠে পড়ল। চোখের কাছে হাত নিয়ে চারদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে এক সময় সোল্লাসে বলে উঠল, 'পরপয়েজ! পরপয়েজ! ওই যে পরপয়েজ!'

২৪ মার্চ। এদিনটা ইউরোপবাসীদের কাছে উৎসবের দিন। বাড়িঘর, পথঘাট ফুল পাতা দিয়ে সাজানো হয়। গির্জায় ঘন্টা বাজে। জনসমাগম হয়। আজ সেই শুভ চব্বিশে মার্চ। বরফরাজ্যে হাড়কাঁপানো শীতেও অভিযাত্রীরা প্রাণোচ্ছ্বাসে লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে চললেন।

পরপয়েজ। হ্যাঁ, পরপয়েজের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন সবাই। বরফে সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়ে গেছে বিশালায়তন জাহাজটা। আচমকা দেখলে এটাকে হিমশৈল বলে মনে হয়। কাৎ হয়ে পড়ে থাকা বরফের পাহাড়। কুড় ল, শাবল আর গাঁইতি দিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে বরফ কাটা চলতে লাগল। জাহাজের তলাটা ফেঁসে গেছে। জনসন আর ডা. ক্লবোনি কোনোরকমে ভেতরে ঢুকে গেলেন। গেলেন ভাঁড়ারে। জ্বালানী আর খাবারদাবারের পরিমাণ যথেষ্টই রয়েছে। অন্তত বছর দুই তো চলবেই। তবে তলা ফাঁসা জাহাজে বাস করা সম্ভব নয়। বড়সড় একটা ইগলু তৈরি করে নিতে হবে। পাঁচদিন ধরে বরফ সরিয়ে গ্রানাইট পাথরের স্তর বের করা হল। সেখানেই তৈরি করা হল প্রাসাদের কায়দায় বিশাল এক ইগলু। পরপয়েজ জাহাজ থেকে আসবাসপত্র নিয়ে আসা হল। ধারে কাছে এক্সিমোদের বাস নেই। এঁরা পাঁচজনই এখানে প্রথম পদচিহ্ন আঁকলেন।

আলটামন্ট আর হ্যাটেরাস দুজন সম্পূর্ণ আলাদা ধাতের মানুষ। আলটামন্ট কথা বেশি বলে। কাজের চেয়ে অকাজের কথাই বেশি বলে। আর ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস কথা খুবই কম বলেন। কাজের কথা ছাড়া তিনি মুখই খোলেন না। আর যা বলেন, সবই অন্তর থেকেই বলেন।

আমেরিকানদের আচার-ব্যবহার ও চরিত্র সম্বন্ধে ডা. ক্লবোনির খুবই ভালো ধারণা রয়েছে। তাই তো আলটামন্টের আচরণে তিনি মোটেই অবাক হন নি। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছেন, আলটামন্ট এ পর্যন্ত যা কিছু বলেছে সবই সত্য নয়। তার বক্তব্যে আসলের চেয়ে খাদই বেশি। আমেরিকার কয়েকজন বিত্তবান নাকি তাকে পরপয়েজ জাহাজে সমুদ্র-অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের বিশ্বাস কিন্তু অন্যরকম। সে দুর্গম মেরু-অভিযানে বেরিয়েছে।

www.pathagar.com

তারা উভয়েই জাহাজের ক্যাপ্টেন। কেউ কারো ধার ধারে না। এখন একজন জাহাজের মালিক, অন্যজন জনবলে বলীয়ান। ডা. ক্লবোনি দুই ক্যাপ্টেনের মধ্যে সংঘাতের সঙ্কেত দেখতে পেয়েছেন। যে-কোনো দিন, যে-কোনো মুহূর্তে তারা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পারে।

১৪ এপ্রিল। ডা. ক্লবোনির ধারণাই বাস্তব রূপ নিল। ব্যাপারটার সূত্রপাত হল জায়গাটার নামকরণ করতে গিয়ে। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস বললেন, এখানে এর আগে কোন মানুষের পদচিহ্ন পড়ে নি। অতএব এর নাম দেয়া হোক—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আলটামন্ট বলে উঠল, 'এ জায়গার নাম আগেই ঠিক করা হয়ে গেছে। আমিই নামকরণটা করেছি। স্বীকার করতেই হবে, আমি ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসে-র আগেই এখানে এসেছি।'

'হতে পারে। কিন্তু আমি দলবল নিয়ে না এলে আপনার পরপয়েজ যে বিশফুট বরফচাপা হয়ে এখনও পড়ে থাকত, মানছেন তো জনাব?'

ডা. ক্লবোনি পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ছে দেখে জট করে উভয়ে মাঝখানে হাজির হলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, কথাটা তো মিথ্যে নয়। ইনি জায়গাটার নামকরণ করে থাকলে মেনে নিতে আপত্তির কীই বা থাকতে পারে! বলুন তে, আপনি এর কোনো নামকরণ করেছেন?'

'নিউ আমেরিকা।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ইনি কেবল দেশটার নামকরণ করেছেন 'নিউ আমেরিকা। আমি ওই উপসাগরটার নামকরণ করছি 'ভিক্টোরিয়া উপসাগর'।

ডা. ক্লবোনি বললেন, 'ভালো কথা, ওই অন্তরীপটার নাম দিচ্ছি, 'ওয়াশিংটন অন্তরীপ'। আর ওই দ্বীপটার নামকরণ করছি 'জনসন দ্বীপ'। আর 'বেলমাউন্ট' নাম দিচ্ছি ওই পশ্চিমের পাহাড়টার।

এভাবে কথা কাটাকাটি আর মন কষাকষির মধ্য দিয়ে নামকরণ পর্ব কোনোরকমে সম্পন্ন হল।

ডা. ক্লবোনি একদিন পাহাড়ের ওপরে উঠে দেখলেন, তার চূড়াটা মোটামুটি সমতল। সেখানে একটা লাইট হাউস তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন। এর ফলে দূর থেকে আলো দেখে ইগলুতে ফিরে আসা সহজ হবে। তেল বা কয়লা দিয়ে আলো জ্বালাবেন না। পরপয়েজ জাহাজে বুনসেন ব্যাটারি রয়েছে। তা দিয়ে লাইট হাউসের আলো জ্বালানো হবে। পাহাড়টার চূড়ায় একটা লণ্ঠন বসিয়ে দিলেন। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় যাতে অ্যাসিড জমে যেতে না পারে সেজন্য ইগলুর ভেতরে ব্যাটারি রেখে তারের মাধ্যমে লণ্ঠন আর ব্যাটারির সংযোগ সাধন করা হল। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই লণ্ঠনের কালি পেন্সিল দুটো পরস্পরের সান্নিধ্যে আনতেই লণ্ঠনটা জ্বলে উঠল। আলোকের শিস বরফের ওপরে বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। বহু দূর থেকে সেটাকে দেখা যেতে লাগল। তিন শো গ্যাস জেট বা তিন হাজার মোমবাতি জ্বেলে এ পরিমাণ আলো সৃষ্টি করা সম্ভব।

ডা. ক্লবোনি তিনজনকে নিয়ে শিকারে বেরোলেন। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস উপকূলের পরিস্থিতি দেখার জন্য একাই বেরিয়ে পড়লেন।

www.pathagar.com

ডা. ক্লবোনি তিন ঘণ্টা হেঁটে পনেরো মাইল পথ পাড়ি দিলেন। শেয়াল বা খরগোস কিছুই নজরে পড়ল না। জমাটবাঁধা বরফের ছিদ্র দিয়ে সীলমাছ বাইরে বেরিয়ে এসে নিশ্বাস নিয়ে আবার একই পথে ভেতরে ঢুকে গেছে, বরফের ওপর পায়ের ছাপ দেখে বুঝতে পারলেন। ইউরোপিয়ানরা চামড়া আর চর্বির জন্য সিলমাছ মারে। আর এস্কিমোরা দুর্গন্ধযুক্ত হলেও এর মাংস খায়। তারা প্রত্যেকে প্রতিদিন পনেরো পাউন্ড মাংস অনায়াসে খেয়ে ফেলে। মেরু অঞ্চলে বেশি পরিমাণ না খেলে শরীর গরম থাকে না। স্যার জন রস লিখেছেন, বুটিয়াল্যান্ডের অধিবাসী গাইডরা নাকি ষাঁড়ের মাংস টুকরো টুকরো করে কাটত আর অল্প অল্প করে মাংস মুখে ঠেসে দিত। অজগর যেমন অল্প অল্প করে ষাঁড়কে গেলে, ব্যাপারটা প্রায় সেরকমই। অবশিষ্ট মাংস বরফের ওপর ঝুলিয়ে রাখত।'

হঠাৎ বরফের ওপর কী যেন একটা সচল বস্তুকে দেখা গেল। সিন্ধুঘোটক। হ্যাঁ, সিন্ধুঘোটকই বটে। আচমকা তিনজনই একসঙ্গে গুলি ছুড়লেন। গুলিবিদ্ধ সিন্ধুঘোটকটা গর্জন করতে করতে ছুটতে লাগল। শিকারিরা তিনদিক থেকে ধেয়ে গেল। আলটামন্ট হাতের কুড় ল দিয়ে তার ডানা দুটোকে ধড় থেকে আলাদা করে দিল। ব্যস, হতভাগ্য জানোয়ারটা বরফের ওপর পড়ে কাতরাতে লাগল। পনেরো ফুট লম্বা সেটা। ডা. ক্লবোনি কুড় ল আর ছুরি দিয়ে আর গা থেকে মাংসটুকু আলাদা করে পোটলা বেঁধে নিলেন। তার চর্বি, চামড়া ও হাড়গোড় দাড় কাকের জন্য বরফের ওপরে ফেলে রাখলেন।

প্রকৃতির বুকে রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে। লাইট হাউসের আলোর নিশানা অনুকরণ করে অভিযাত্রীরা তাদের ইগলুতে ফিরে এলেন।

ডা. ক্লবোনি নিজ-হাতে মাংস রান্না করলেন। চমৎকার তার স্বাদ হয়েছে। খাওয়া শেষ হলে তিনি প্রত্যেকের কাপে ফুটন্ত কফি ঢেলে দিলেন। তাঁর কাণ্ড দেখে আলটামন্ট তো অবাক। তার মনের কথা বুঝতে পেরে ডা. ক্লবোনি বললেন, 'আপনাদের হয়ত জানা নেই, তালু ও জিভের চেয়ে হাতের অনুভূতিশক্তি বেশি। এমন মানুষের অভাব নেই যে এক শো ত্রিশ ডিগ্রি গরম কফি দিব্যি চুমুক দিয়ে খেতে পারে।' কথা বলতে বলতে তিনি ফুটন্ত কফির ভেতরে থার্মোমিটার ডুবিয়ে দিয়ে দেখেন একশো একত্রিশ ডিগ্রিতে পারা পৌঁছেছে। এবার কফিন কাপে চুমুক দিলেন।

আলটামন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বেশি কতা উত্তাপ সহ্য করা সম্ভব?'

ডা. ক্লবোনি বললেন, 'কয়েকটা ঘটনা বলছি তবেই তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে। ফরাসিদের এক পাঁউরুটির কারখানায় এক মেয়ে-কর্মী একশো ত্রিশ ডিগ্রি উত্তাপে দশ মিনিট কাল দিব্যি দাঁড়িয়েছিল। একশো ত্রিশ ডিগ্রি মানে জলের স্ফুটনাঙ্কের চেয়ে উননব্বই ডিগ্রি বেশি। মাংস আর আপেল আশেপাশে সিদ্ধ হয়ে গেছে।

এবার বলছি, সতের শো চুয়ারত্তর সালের এক ঘটনা। আমরাই মত কয়েকজন অভিযাত্রী সে বছর দুশো পঁচানব্বই ডিগ্রি উত্তাপ সহ্য করে দেহ অক্ষত রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাদের পাশে রক্ষিত মাংস ও ডিম একেবারে ঝলসে যায়।

এবার বলছি, জন্তু জানোয়ারদের কথা। তাদের মধ্যে পাখিরাই সবচেয়ে বেশি উত্তাপ সহ্য করতে সক্ষম। একশো দশ ডিগ্রি দেহতাপ থাকে মুরগী ও হাঁসে। পেঁচার দেহ কিন্তু একশো দশ ডিগ্রির বেশি নয়। মানুষের দেহতাপ একশো এক ডিগ্রি, অন্যান্য

www.pathagar.com

স্তন্যপায়ীদের দেহতাপ মানুষের চেয়ে কিছু বেশি। মানুষের দেহতাপের প্রায় কাছাকাছি ঘোড়া, বাঘ, হাতি, শুশুক এবং খরগোসের দেহতাপ। আবার একশো তিন ডিগ্রি দেহতাপ ধারণ করে ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বানর, বেড়াল, প্যান্থার, ইঁদুর, কাঠবিড়ালি প্রভৃতি। এবং একশো চার ডিগ্রি দেহতাপ শূয়োরের। জলচর প্রাণীদের দেহতাপ জলের প্রকৃতি অনুসারে কম-বেশি হয়। যেমন—ব্যাঙের সত্তর ডিগ্রি, সাপের ছিয়াশি ডিগ্রিরও কম, সাড়ে আটষট্টি ডিগ্রি দেহতাপ হাঙরের। জলজ কীটের দেহতাপ জলের দেহতাপে মোটামুটি সমান থাকে।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস এবার মুখ খুললেন, 'ডা. ক্লবোনি, গরমের ব্যাপারে তো অনেক কিছুই শোনালেন। এবার ঠাণ্ডার কথা কিছু বলুন তো।'

'শুনুন, থর্মোমিটারের পারদ কোনো সময়েই শূন্য ডিগ্রি তাপাঙ্কের নিচে নামে না। আজ পর্যন্ত যা কোনো মানুষের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব হয় নি আমরা তাই করেছি—সত্তর ডিগ্রি তাপমাত্রা পর্যন্ত আমরা সহ্য করেছি। একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে, অত্যধিক শৈতে হাত-পা একেবারে শীতল হয়ে গেলেও আগুনের আঁচের সাহায্য নেয়া উচিত নয়, বরফের টুকরো দিয়ে ঘষলে ফল পাওয়া যায়। আগুনের আঁচে হাতপা পুড়ে যায়। কিছু বোঝাই যাবে না। সে অবস্থায় পোড়া অংশ কেটে বাদ দেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

* * *

বরফের মুল্লুকে কাজকর্ম তেমন নেই। অধিকাংশ সময়েই হাতপা গুটিয়ে স্থবিরের মতো বসে থাকতে হয়।

এদিকে এলোমেলো বাতাসে জাহাজটা অল্প অল্প করে ভেঙে পড়তে লাগল। ভাগ্য ভালো যে, জাহাজের জিনিসপত্র আগেভাগেই বের করে আনা হয়েছিল। মায় তক্তাগুলো পর্যন্ত বের করে এনে এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে। ডা. ক্লবোনির ইচ্ছা শীতের প্রকোপ কমলে সেগুলো জোড়াতালি দিয়ে বড়সড় একটা নৌকা তৈরি করে ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করবেন।

এদিকে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস এবং আলটামন্ট এর দ্বন্দ্ব চরমরূপ নিতে চলেছে। ডা. ক্লবোনি বুঝতে পারছেন, অচিরেই তারা একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। পাশাপাশি দু-দুজন ক্যাপ্টেন—মানে এক মনে দু-সিংহের বাস।

তাছাড়া একজন আমেরিকার আর অন্যজন ইউরোপের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। ইংরেজ আর আমেরিকার মধ্যে জাত্যাভিমান ও বিদ্বেষ, এ তো আর আজ নতুন নয়।

একদিন ডা. ক্লবোনি আলটামন্টকে পরামর্শ দিলেন সংবাদপত্র প্রকাশ করতে, না হয় নাটক অভিনয়ে মন দিতে। এতে এক ঘেয়েমি কেটে মন প্রফুল্ল হবে। পূর্ববর্তী অভিযাত্রীরা চটকদার সংবাদ সম্বলিত সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন। আর প্রায়ই নাটক অভিনয়ে মেতে যেত। আল্টামন্ট তাঁর কথাটার গুরুত্ব না দিয়ে ঘুমোতে যাওয়ার অজুহাতে সেখান থেকে কেটে পড়ল।

চব্বিশে আর ছাব্বিশে এপ্রিল জড়ের তাণ্ডব অস্বাভাবিক রূপ নিয়ে দেখা দিল। সে কী গর্জন! ডা. ক্লবোনির মনে আনন্দের জোয়ার। আর বড় জোর মাস দেড়েক পরেই শীত বিদায় নিয়ে বসন্তের জন্য জায়গা ছেড়ে দেবে।

www.pathagar.com

এদিকে অবিরাম তুষারবৃষ্টি হয়েই চলেছে। ভাঁড়ার থেকে ঝটপট কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসা হল। কিছু কাঁচামাংস জোগাড় না করলেই নয়।

ডা. ক্লবোনি তাই আলটামন্ট ও বেলকে নিয়ে শিকারে বেরোলেন। পর পর দুদিন বরফের ওপর দিয়ে হন্যে হয়ে ঘোরাফেরা করেও ভাল্লুকের দেখাও পেলেন না। হতাশ হয়ে ফিরে আসতেই হল।

এদিকে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস সহযাত্রীদের নিয়ে গ্রানাইট হাউসে হাজির হলেন। আমেরিকান আলটামন্টের অনুপস্থিতির সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে নিতে চাইলেন। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হল উত্তরেই যাওয়া হবে। এবার ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস তাঁর আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেন, 'হতচ্ছাড়া আমেরিকানটা যদি আমার কর্তৃত্ব মেনে নিতে না চায়? তবে?' এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হল ভবিষ্যতে পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আর এও স্থির হল, পরপয়েজের তক্তা দিয়ে নৌকা তৈরি করে উপকূল ঘেঁসে অগ্রসর হওয়া যাবে। কিন্তু এতে প্রবল আপত্তি তুললেন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস। আমেরিকান জাহাজের কাঠ দিয়ে নৌকা তৈরি করে কিছুতেই অভিযানে যাওয়া হবেনা। এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই আলটামন্ট সেখানে এসে যাওয়ায় তখনকার মতো আলোচনা স্থগিত রইল।

পরের দিন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস, বেল এবং আলটামন্ট বন্দুক নিয়ে শিকার করতে বেরোলেন। কিছুক্ষণ পরেই দমাদম বন্দুকের আওয়াজ বাতাস বাহিত হয়ে ইগলুতে অবস্থানকারী জনসনের কানে এল। প্রথমে সে খুশিই হল। ভাবল, আজ ভল্লুকের কাঁচামাংসে জিভটাকে পাল্টো নেয়া যাবে। খুশিতে ডগমড হয়ে তিনি লম্বা লম্বা পায়ে পাহাড়ের শিখরে উঠে গেলেন। ব্যাপার দেখেই তার কলিজা শুকিয়ে যাওয়ার জোগার হল। দেখলেন, শিকারিরা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছেন আর থেকে থেকে পিছন ফিরে গুলি চালাচ্ছেন। আর তাঁদের তাড়িয়ে নিয়ে আসছে পাঁচটা অতিকায় হিংস্র ভাল্লুক।

একটু বাদেই শিকারিরা ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে ইগলুর মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন। জনসন দুম্ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ব্যস, নিরাপদ। মুহূর্তের মধ্যেই ক্রোধোন্মত্ত পাঁচ-পাঁচটা ভাল্লুক ইগলুর দেয়ালের বাইরের দেয়ালে থাবা দিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে আর আক্রোশে গর্জন করতে লাগল।

এখন সবচেয়ে বেশি ভয় হচ্ছে ডা. ক্লবোনিকে নিয়ে। তিনি দ্বীপে গেছেন। আগে থেকে সতর্ক না হলে হিংস্র ভাল্লুকগুলো তাঁকে ছিঁড়ে-ফেড়ে ছাড়বে। আশ্চর্য ব্যাপার! ভাল্লুকগুলো দরজায় টহল দিতে দিতে হরদম তর্জন গর্জন করেই চলেছে।

দুঘণ্টা কেটে গেল। হতচ্ছাড়া ভাল্লুকগুলো তবুও দরজা ছেড়ে নড়ল না।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের পরিকল্পনা অনুযায়ী লোহার লম্বা শিক আগুনে তাতিয়ে টকটকে লাল করে আনা হল। বরফের দেওয়াল ফুটো করে সেটার একটা প্রান্ত বাইরে বের করে দেয়া হল।

হ্যাঁ, মতলব অনুযায়ীই কাজ হয়েছে বটে। তীব্র আক্রোশে ভাল্লুকেরা গরম শিকটাকে জাপ্টে ধরতেই বিকট আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে দমাদম বন্দুকের গুলি ছুড়তে লাগল। পরমুহূর্তেই ভাল্লুকরা অত্যাশ্চর্য অবিশ্বস্য এক কাজ

www.pathagar.com

করে বসল। বরফ দিয়ে ইগলুর দেওয়ালের ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিল। তা দিয়ে বন্দুকের গুলিও বাইরে যেতে পারল না।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস স্থির করলেন, রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে ইগলুর ছাদ ফুটো করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। দরকার হলে সামনাসামনি লড়াই করবেন।

ক্রমে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। হতচ্ছাড়া ভাল্লুকগুলোর তড়পানি সমান তালেই চলতে লাগল। এদিকে অভিযাত্রীরা ইগলুর ছাদ ফুটো করার কাজে লেগে গেলেন। কেউ বা শুরু করলেন বন্দুকে গুলি বারুদ ভরে তৈরি হয়ে নিতে।

একটু বাদেই শোবার ঘরে কিসের যেন খসখস আওয়াজ হতে লাগল। জনসন ছুটে গিয়ে দেখলেন, ভাল্লুকগুলো যুদ্ধের কৌশল পাল্টেছে। সুতীক্ষ্ণ নখ দিয়ে তারা বরফের দেওয়াল ফুটো করছে। অস্থিরচিত্ত ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস কুড় ল আর ছুরি হাতে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সে সঙ্গে কাঁধে বন্দুক তো রয়েছেই আল্টামন্টও তৈরি হয়ে পড়লেন।

একটু বাদে আলটামন্ট হাতের কুড় লটা বাগিয়ে ধরে যেই না কোপ বসাতে যাবেন, অমনি ডা. ক্লবোনি চিল্লিয়ে উঠলেন, 'আরে, করছেন কী জনাব! করছেন কী! আমি—আমি ডা. ক্লবোনি!'

ডা. ক্লবোনি পরপয়েজের ধ্বংসাবশেষের কাছে পৌঁছেই বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। দ্রুত টিলার ওপরে উঠে ভাল্লুকদের দেখতে পান। স্বাদু মাংসের লোভে তারা ইগলুর দরজায় টহল দিচ্ছে। এবার টিলা থেকে নেমে গুদামে ঢুকে একটা ছুরি নিয়ে এলেন। তারপর দরজার বিপরীত প্রান্তের দেয়াল কাটতে লেগে গেলেন। তিন ঘণ্টা ধরে একনাগাড়ে বরফ কেটে ভেতরে ঢুকতে পারলেন।

ডা. ক্লবোনি সক্রোধে বললেন, 'নচ্ছাড় ভাল্লুকগুলো দেখছি আমাদের পিছনে এঁটুলির মতো লেগে রয়েছে। উচিত শিক্ষা না দিলে দেখছি আর চলছে না। এখনি বোমা ফাটিয়ে হতচ্ছাড়াদের যমের দক্ষিণ দুয়ারে পাঠিয়ে ছাড়ব। তাই তো আমি গুদামঘর হতে বারুদ নিয়ে এসেছি। রাত্রের মধ্যে একশো ফুট সুড়ঙ্গ কেটে টোপ দিয়ে হিংস্র ভাল্লুকগুলোকে কাছে টেনে আনব। কথা বলতে বলতে সুড়ঙ্গপথে একটা মরা শেয়াল টানাটানি করে ভেতরে আনতে গিয়ে বললেন, 'এটাকেই টোপ হিসেবে ব্যবহার করব।'

সবাই মিলে ঘণ্টা দশেকের মধ্যে একশো ফুট সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফেললেন। এবার সুড়ঙ্গের মুখে মরা শেয়ালটাকে রেখে দিলেন। আর তারই ঠিক তলায় রাখলেন বারুদের স্তূপ। একশো পাউন্ড বারুদ। বারুদের স্তূপ থেকে পলতে নয়, একশো ফুট বৈদ্যুতিক তার টেনে আনা হল। বারুদের মধ্যে রইল তার দুটোর এক প্রান্তের মুখ দুটো। স্পার্ক হওয়ামাত্র বারুদে আগুন লেগে যাবে। তার দুটোর অন্য প্রান্ত বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। ডা. ক্লবোনি ব্যাটারির বিদ্যুৎপ্রবাহ চালু করে দিলেন। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল। বারুদের আগুন চারদিকে ছিটকে পড়ল। ক্ষত বিক্ষত দেহে ভাল্লুকগুলো বিকট স্বরে আর্তনাদ করতে করতে পালাতে লাগল। ডাক ও অন্যান্য কুকুরগুলো তর্জন গর্জন করতে করতে তাদের পিছু নিলেন।

পরের দিন আচমকা পারদস্তম্ভ পনের ডিগ্রি ওপরে উঠে গেল। কয়েক দিন ধরে পারদস্তম্ভ একই জায়গায় স্থির হয়ে রইল। মেরু বসন্ত এসে গেল। বরফ গলতে শুরু করেছে। জানা অজানা পাখি ডাকাডাকি করতে লাগল। জলে প্রাণীর চাঞ্চল্য, জমির

www.pathagar.com

ওপরেও বিভিন্ন আকৃতি আর বর্ণের প্রাণীরা চলাফেরা করতে শুরু করল। নিরীহ নম্র প্রাণীদের ওপর নেকড়েরা আক্রমণ চালাতে লাগল। অভিযাত্রীরা সাবধানতা অবলম্বন করলেন। ক্যাপ্টেন প্রিয় কুকুর ডাকও নিজের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে ফেলল।

টাটকা মাংসের অভাব নেই। একটু চেষ্টা করতেই জন্তু-জানোয়ার ঘায়েল করা যায়। পনের দিন ধরে সবাই গলা পর্যন্ত ঠেসে মাংস খেয়ে জিভকে তুষ্ট করতে সক্ষম হলেন।

আশ্চর্য ব্যাপার! হঠাৎ করে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি তাপমাত্রা থেকে আট ডিগ্রি নিচে নেমে গেল। যাদুমন্ত্রের মতো পশু পাখিরা বেপাত্তা হয়ে গেল। ডা. ক্লবোনি ব্যাপারটা অভিযাত্রীদের বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বললেন. 'এর জন্য আতঙ্কের কোন কারণই নেই।' প্রতি বছর এগারো, বারো এবং তেরোই মে দ্রুত শীত ফিরে আসে। তারপর আবার চলেও যায়। এমনই হঠাৎ করেই।

২৫ মে পর্যন্ত কনকনে ঠাণ্ডা বিরাজ করল। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ডা. ক্লবোনিকে আমেরিকান জাহাজের তক্তা ব্যবহার করে নৌকা তৈরি করার অনুমতি দিলেন।

মে মাসের শেষের দিকে তাপমাত্রা বেড়ে আবার শুন্য ডিগ্রির ওপরে উঠে গেল। আবার বরফের গায়ে ফাটল দেখা দিল। বরফ গলতে শুরু হয়ে গেল। পশু-পাখির দল আবার ঘুরে বেড়াতে লাগল।

অভিযান প্রসঙ্গে কথা উঠতেই আলটামন্ট মন্তব্য করলেন—'আমাদের গতি যেদিকে, যেকানেই হোক না কেন ফিরে আসার ব্যাপারটাকেও মাথায় রাখতে হবে।'

'কিন্তু কোথায় চলেছি?' ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস বলে উঠলেন।

'আমাদের পক্ষে, কিন্তু ফিরতে হবে নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ অবলম্বন করে। সেটা আজ অবধি অনাবষ্কিৃতই রয়ে গেছে।'

তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলেন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস, 'যা জানা নেই তা নিয়ে আগ বাড়িয়ে কথা বলার দরকার কী, বুঝছি না তো!'

'আপনিই জানেন না জনাব। আরো শুনে রাখুন, যে নর্থওয়েস্ট প্যাসেজে আজ পর্যন্ত কেউই যেতে পারে নি একমাত্র আমিই সেখানে যেতে সক্ষম হব। শুনে রাখুন জনাব!' ক্রমেই উভয়ের বক্তব্য উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। আলটামন্ট ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের বক্তব্যকে আমল না দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

২৯ মার্চ। জনসন আর বেল ডা. ক্লবোনির তত্ত্বাবধানে জোর কদমে নৌকো তৈরির কাজ করে চলেছেন। আর সুযোগ পেলেই জনসন এস্কিমোদের কায়দায় বল্গা হরিণ শিকারে মেতে যায়। এক অনাস্বাদিত আনন্দের মধ্যে ডুবে রইলেন অভিযাত্রীরা।

একসকালে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস, ডা. ক্লবোনি এবং আলটামন্ট বন্দুক নিয়ে শিকারে বের হলেন, সামান্য এগোতেই দুটো কস্তুরী হরিণ দেখেন। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় বুঝি-বা হরিণ আর ষাঁড়ের সংমিশ্রণে এদের সৃষ্টি। যেমন দেখতে অতিকায়, স্বভাবও খুবই হিংস্র। শিকারি তিনজন পরামর্শ করে তিনদিক থেকে আক্রমণ করে তাদের ঘায়েল করার চেষ্টা করলেন। কার্যত ফল হল বিপরীত। কস্তুরী হরিণ দুটোর একটা হ্যাটেরাসকে সামনে দেখে ভাবল, একটামাত্রই মানুষ রয়েছে। তাই সে ঘাড় কাত করে, শিং বাঁকিয়ে তাঁর দিকে তেড়ে গেল। হ্যাটেরাস গুলি করলেন। হিংস্র জানোয়ারটা গুলিবিদ্ধ হল।

www.pathagar.com

এবার অধিকতর আক্রোশে তাঁর দিকে ধেয়ে যেতে লাগল। গুলির আওয়াজ শোনামাত্র দ্বিতীয় কস্তুরী হরিণটাও তার দিকে ক্রোধে তর্জন গর্জন করতে করতে এগোতে লাগল। সেটা হ্যাটেরাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎ করে ফেলে দিয়ে শিং বাগিয়ে আঘাত হানার জন্য তৈরি হয়ে গেল।

আলটামন্ট ঝট করে একপাশে সরে গিয়ে ভাবতে লাগল, আমার চরমতম শত্রু যদি নিপাত যায়, ক্ষতি কী?

পরমুহূর্তেই তিনি মনের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া সেরে বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল ঠেকিয়ে দিলেন টান। ব্যস, চোখের পলকে বন্দুক থেকে গুলি ছুটে গিয়ে একটা হিংস্র জানোয়ারকে ঘায়েল করে দিল। আর একটু হলেই সেটা ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের ভুঁড়িতে শিং গেঁথে দিত।

আকস্মিক ভীতিটুকু কাটিয়ে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস হাত বাড়িয়ে করমর্দন করতে করতে আল্টামন্টকে বললেন, 'জনাব, আপনার জন্যই আজ আমার প্রাণরক্ষা হল।'

ডা. ক্লবোনি ছুটে এসে বললেন, 'ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস, আল্টামন্ট আপনারই মতো এক নির্ভীক ও বিবেকবান পুরুষ।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস আবেগে অভিভূত হয়ে বলে উঠলেন, 'তিনিও আমার মতোই একই পথের যাত্রী। একই গৌরবের অংশীদারও বটে।'

'একই পথের? একই গৌরবের অংশীদার? কিসের গৌরবের ইঙ্গিত দিচ্ছেন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস? আপনি কি সুমেরু অভিযানের কথা বলতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ, সুমেরু অভিযানের কথাই বটে।'

'তবে তো আমি ঠিকই অনুমান করেছিলাম দেখছি! আমি কিন্তু নর্থ ওয়েস্ট প্যাসেজের খোঁজে ছুটে চলেছি।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস করমর্দন করতে করতে বললেন, 'ভাই, বন্ধু আলটামন্ট জনাব, আসুন আমরা মনের গ্লানিটুকু মুছে ফেলে একই সঙ্গে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুমেরু অভিযানে যাই। উভয়ে বিজয় গৌরবটুকু ভাগাভাগি করে নিই।'

আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূত ডা. ক্লবোনি বললেন, 'হ্যাঁ, এই তো বাঞ্ছনীয়। ইংরেজ আর আমেরিকান বিভেদটুকু মন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলে চলুন আমরা অসম সাহস আর অটুট মনোবল নিয়ে এগিয়ে যাই অজানাকে জানতে, অচেনাকে চিনতে আর অসম্ভবকে সম্ভাবনাময় করে তুলতে।'

সেরাত্রে আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে সবাই মিলে কস্তুরী হরিণের মাংস দিয়ে ভোজ সারলেন। একজন আমেরিকান ও একজন ইংরেজকে দু-পাশে বসিয়ে ডা. ক্লবোনি ভোজের আনন্দটুকু পুরোপুরি আস্বাদন করলেন।

এদিকে নৌকা তৈরির কাজ সম্পূর্ণ। ২৫ জুন নতুন করে যাত্রা করার দিন ধার্য হল। স্লেজগাড়িটাকে সারাই করে তাতে অত্যাবশ্যক সামগ্রী দিয়ে বোঝাই করা হল। চারটে কুকুর বোঝাসহ স্লেজটাকে টানবে। প্রতিদিন বারো মাইল হিসাবে ৩৬০ ষাট মাইল যেতে এক মাস লেগে যাবে।

২৫ জুনের জন্য অপেক্ষা না করে চব্বিশে জুন কাকডাকা ভোরে অভিযাত্রীরা পথে নামলেন।

www.pathagar.com

সমতল পথ ও আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে ডা. ক্লবোনি অদ্ভুত একটা ব্যবস্থার মাধ্যমে বার বার দিকদর্শন যন্ত্রটা ব্যবহারের ঝামেলা এড়াতে লাগলেন। উত্তরের দূরবর্তী কোনো একটি বিশেষ বস্তুকে একবার দেখে নিয়ে তারপর সেটাকে নজরে নজরে রেখে পথ পাড়ি দিতে লাগলেন।

দুদিন পথ চলার পর তৃতীয় দিনে একটা হ্রদ পথে পড়ল। এখানকার বরফ বছরের মধ্যে কোনোদিনই গলে না। এখানকার ভূপ্রকৃতি দেখে ডা. ক্লবোনি নিঃসন্দেহ হলেন, নিউ আমেরিকা একটা দ্বীপমাত্র। এটা অবশ্যই মেরুবিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। আর ক্রমে ঢালু হয়ে গেছে। আঠাশে জুন থার্মোমিটারের পারদ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিতে উঠে স্থির হল। এবার প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল।

২৯ জুনও আবহাওয়া অপরিবর্তিত রইল। ত্রিশে জুন প্রবল তুফান উঠল। বরফ টুকরো টুকরো হয়ে সচল হয়ে উঠল। আশ্চর্য ব্যাপার এত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও কোনো অঘটন তো ঘটলই না এমনকি অভিযাত্রীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার পর্যন্ত হল না।

৩ জুলাই বরফের রং দেখে অভিযাত্রীরা স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। এমন টকটকে লাল বরফ যে কল্পনাতীত ব্যাপার। ডা. ক্লবোনি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে নিতে গিয়ে বললেন—'প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার বরফে প্রায় তেতাল্লিশ হাজার বিশেষ প্রজাতির ছত্রাকের উপস্থিতির জন্য বরফ এমন রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। কয়েক মাইল অঞ্চল জুড়ে সিঁদুরের মতো লাল বরফের বিচিত্র সমারোহ ঘটেছে।

৬ জুলাই পর্যন্ত প্রকৃতি বিরুদ্ধাচারণ করেছে। পুরো অঞ্চলটা ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এবার কুয়াশার দাপট নিশ্চিহ্ন হয়ে পরিবেশ স্বচ্ছ হয়ে উঠল। ডা. ক্লবোনি হিসেব করে বুঝলেন, প্রতিদিন আট মাইলের বেশি পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব হয় নি। কুয়াশাই এর জন্য দায়ী।

পথ চলতে চলতে বেল আর আলটামন্ট আচমকা উপুড় হয়ে ভূমিতে কী যেন দেখলেন। ডা. ক্লবোনি সেটা লক্ষ করে সেখানে ছুটে গেলেন। তিনি যা দেখলেন তাতেই তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবার জোগাড় হল। ভূমিতে একজোড়া বুটের ছাপের সারি। ইউরোপীয় বুটের ছাপ। ব্যাপার দেখে ব্যাটেরাস আপন মনে বলতে লাগলেন, 'এমন নির্জন-নিরালা প্রান্তরে বুটের ছাপ! আমার আগে কে এখানে এসেছে?' ব্যাপারটা অন্যান্য অভিযাত্রীদের যারপরনাই বিস্ময়ের কারণ হল। বুটের ছাপগুলো অনুসরণ করে অগ্রসর হতে হতে প্রায় এক মাইল এগিয়ে এক সময় সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখলেন, বুটের ছাপ এবার পশ্চিমদিকে এগিয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সামনে, সামনের দিকে এগিয়ে চলুন। সোজা উত্তরমুখো অগ্রসর হলেন।

আরও কয়েক পা এগিয়েই ডা. ক্লবোনি চিৎকার করে উঠলেন, 'এ কী অবিশ্বাস্য ব্যাপার! একটা পকেট দূরবীনের লেন্স বরফের ওপর পড়ে রয়েছে!'

জনসন কণ্ঠস্বরে হতাশার ছাপ ফুটিয়ে বলে উঠলেন, 'আমরা মেরুবিন্দুতে পৌঁছে হয়ত দেখতে পাব আর কেউ আমাদের আগেই সেখানে বসে রয়েছে। এ কী অবিশ্বাস্য কাণ্ডরে বাবা।'

এবার পথ চলার গতি অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই অভিযাত্রীরা উন্মুক্ত সমুদ্রের তীরে হাজির হলেন। একেবারেই উম্মুক্ত সমুদ্র। দ্বীপ বা স্থলভূমির নামগন্ধও দূর দিগন্তে নজরে পড়ছে না। উত্তরদিকে যতদূর চোখ যায় নজরে পড়ে কেবল

www.pathagar.com

জল আর জল। গামলার মত গহ্বর সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। ডান আর বাঁয়ে দুটো অন্তরীপ অবস্থান করছে। ক্রমে সরু হয়ে সমুদ্রে পড়ে অস্তিত্ব হারিয়েছে। অন্তরীপ দুটোর মধ্যবর্তী অংশের জলনিস্তরঙ্গ। মনে হল একটা উপসাগর ছাড়া কিছু নয়।

অভিযাত্রীদের নৌকাটাকে জলে ভাসাতে সারাটা দিন কেটে গেল। স্লেজ গাড়িটাকেও নৌকোয় তুলে নেওয়া হল। প্রকৃতি সৃষ্ট পাথরের জেটিটার নামকরণ করা হল, 'আলটামন্ট বন্দর'।

পরের দিন সকাল আটটায় ডা. ক্লবোনি টিলার ওপরে উঠে কুড়িয়ে পাওয়া পকেট দূরবীনের লেন্সটা চোখের সামনে ধরেই চিৎকার করে উঠলেন, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস! ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস!' টিলা থেকে তরতর করে নেমে এসে কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, 'ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস, কদিন আগে আমরা যে পকেট দূরবীনের লেন্স আর বুটের ছাপ দেখেছিলাম, মনে আছে তো। আসলে বুটটা বেলের আর পকেট-দূরবীণের লেন্সটা আমার নিজের। আসলে কুয়াশার মধ্যে পথ হারিয়ে আমরাই বরফের ওপর দিয়ে এক পাক মেরে এসেছিলাম। তখনই আমার পকেট-দূরবীণের লেন্সটা অসতর্কতার জন্য খসে পড়ে আর বেলের বুটের ছাপ পড়ে বরফের ওপর।' কথাটা বলেই তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন।

১০ জুলাই। অভিযাত্রীরা যেখানে অবস্থান করছেন সেখান থেকে মেরুবিন্দু ১৭৫ মাইল দূরে।

নৌকার নোঙর তোলা হল। এখানকার সমুদ্র ছোট হলে কি হবে তার রূপ অতুলনীয়।

নৌকার ওপর দিয়ে অতিকায় পেঙ্গুইন ও অ্যালবেট্রস উড়ে যেতে দেখা গেল। তারপর তারা জল থেকে ঠুকরে ঠুকরে খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জেলিফিস খেতে লাগল। আর অসংখ্য তিমির মাথার ছিদ্র দিয়ে থেকে থেকে ফোয়ারা ছুটতে লাগল। সব মিলিয়ে সে এক অত্যাশ্চর্য শোভা সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযাত্রীদের নৌকা এগিয়ে চলেছে তো চলেছেই। পরের দিন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস চোখে দূরবীণ লাগিয়ে নৌকার গলুইয়ে দাঁড়িয়ে উত্তরদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেকে চলতে লাগলেন। এক সময় তিনি ডাঙা ডাঙা বলে চেঁচিয়ে উঠলেন।

ডা. ক্লবোনি চোখের সামনে দূরবীণটা ধরে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন—'এ কী সর্বনাশ ব্যাপার! ডাঙা নয়। আগ্নেয়গিরি। তারই ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে!'

চোখের সামনে থেকে দূরবীণটা নামিয়ে রেখে তিনি এবার বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই তো। জেমস রস তো কুমেরুতে গিয়ে টেরর ও এরেবাস নামক দুটো আগ্নেয়গিরি, আবিষ্কার করেছিলেন বটে।

সারারাত জেগে থাকার প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকলেও ডা. ক্লবোনি ও অন্যান্যরা শেষপর্যন্ত এক এক করে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে প্রবল ঝড় তুফান শুরু হয়ে গেল। সারাদিন ধরে চলল জল ঝড়ের তাণ্ডব। বুক কাঁপানো তর্জন গর্জন। সন্ধ্যার কিছু পরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। অত্যাশ্চর্য এক আলোকরশ্মির উদ্ভব হল। আসলে এ ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র হওয়ার জন্যই হয়ত-বা এখানে সমুদ্রে এমন আলোর বন্যা বয়ে চলেছে। সমুদ্রের সে উন্মাদনা অনুপস্থিত।

www.pathagar.com

বাতাস কমে গেছে। পাল অকেজো হয়ে পড়ায় অভিযাত্রীরা দাঁড় টেনে নৌকাটাকে আরো উত্তরে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। একটু বাদেই আবার ঝড় উঠল। পাল ফুলে উঠে নৌকাটাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। দাঁড় টানা বন্ধ হল।

কুয়াশার আড়াল দিয়ে লকলকে অগ্নিশিখা মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যেই আবার কুয়াশায় সবকিছু ঢাকা পড়ে গেল।

উপকূলের চিহ্ন এবার নজরে পড়ল। হঠাৎ ভয়ংকর একটা দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে অভিযাত্রীদের বুক কেঁপে উঠল। প্রায় এক হাজার ফ্যাদম দূরের একটা হিমশৈলই তাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। সেটা ঢেউয়ের তালে তালে অনবরত নাচছে, দুলছে, ওঠানামা করছে বারবার। যে-কোনো সময় নৌকাটাকে ধাক্কা মেরে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতে পারে। হিমশৈলটাকে দেখে অভিযাত্রীরা যত না ভীত হয়েছে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি আতঙ্কিত হয়েছে তার মাথায় অবস্থানরত একদল ভাল্লুককে দেখে। তাদের তর্জন গর্জন ঝড়ের গর্জনকেও ছাপিয়ে গেছে। হিমশৈলটা আচমকা নৌকাটাকে ধাক্কা না মেরে ডুবে গেলেও সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে। ক্রোধোন্মত্ত ক্ষুধার্ত ভাল্লুকেরা দল সাঁতরে নৌকায় উঠে আসবে। তার পরের দৃশ্য ভাবলেই অভিযাত্রীদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে উঠতে লাগল।

এক-এক সময় হিমশৈলটা নাচতে নাচতে নৌকার এত কাছে চলে আসতে লাগল যে গর্জনরত ভালুকগুলো বুঝি লাফ দিয়ে নৌকোয় পড়বে। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের প্রিয় কুকুর ডাক ছাড়া গ্রিনল্যান্ডের কুকুরগুলো পর্যন্ত বয়ে জড়োসড়ো হয়ে এককোণে পড়ে রইল। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে চলল এমন ভয়ংকর ব্যাপার, বুক কাঁপাকাঁপি ব্যাপার।

একসময় আতঙ্কের আধার হিমশৈলটা অল্প অল্প করে অভিযাত্রীদের নৌকোটার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। অভিযাত্রীরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

প্রকৃতির এমন বিরুদ্ধতা, একের পর এক এমন প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে কাহাতক স্নায়ু শক্ত রেখে লড়াই করে অস্তিত্ব রক্ষা করে যায়? মুহূর্তের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় উঠল। সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে পড়ে নৌকাটা লাট্টুর মতো চক্কর খেতে লাগল। নৌকাটা এত জোরে পাক খাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে অতল গহ্বর থেকে প্রবলতম একটা শক্তি যেন অভিযাত্রীসহ নৌকাটাকে ক্রমেই ডুবিয়ে দিচ্ছে। নৌকোটা বন বন করে ঘুরতে ঘুরতে আচমকা কেন্দ্র থেকে কামানের গোলার মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল। ডা. ক্লবোনি, আল্টামন্ট, বেল আর জনসন দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়লেন। দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হল। স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে দেখলেন, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস পাশে নেই। রাত্রি তখন দুটোর কাছাকাছি। অন্ধকারে ক্যাপ্টেনের হদিস করা সম্ভব নয়।

বিধাতার এ কী নির্মম পরিহাস! বছরের পর বছর নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম, কষ্ট, আতঙ্ক আর হতাশার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে শেষপর্যন্ত এত কাছে, ধরতে গেলে হাতের নাগালের মধ্যে এসে বেচারা ক্যাপ্টেন জলে তলিয়ে গেলেন। সহযাত্রীরা তাঁর নাম ধরে গলা ছেড়ে ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু ঢেউ আর ঝড়ের গর্জনে তাঁদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। প্রভুভক্ত কুকুর ডাকও কম চিল্লাচিল্লি করল না।

অনন্যোপায় হয়ে ডা. ক্লবোনি বন্দুক ছুড়ে আওয়াজ করলেন। না, কোনো প্রত্যুত্তরই পেলেন না। সবার মনেই বিষাদের কালো ছায়া নেমে এল।

দলপতি ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের কোনো হদিসই পাওয়া গেল না।

www.pathagar.com

১১ জুলাই। সেদিন সকাল পাঁচটা। প্রায় তিন মাইল দূরে নতুন দেশ চোখের সামনে ভেসে উঠল। না, এটাকে দেশ ভেবে ভুলই করেছেন অভিযাত্রীরা। বড়সড় একটা দ্বীপ। দ্বীপ যদি নাও হয় তবে আগ্নেয়গিরিও হতে পারে। সমুদ্র থেকে ঠেলে উঠে এসেছে আগ্নেয়গিরিটা। উত্তাল-উদ্দাম জলরাশির ওপর সদম্ভে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অতিকায় দৈত্যের মতো অনবরত আগুনের হল্কা আর উত্তপ্ত বায়ু সবেগে ওপরে ছুড়ে দিচ্ছে। উত্তপ্ত গলিত লাভা পাহাড়টার গা বেয়ে নেমে আসছে। অনেকগুলো লাভাস্রোত একসঙ্গে মিলিত হয়ে সবেগে সমুদ্রে গিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। উত্তপ্ত লাভাস্রোতের ছোঁয়া পেয়ে সমুদ্রের জল অনবরত টগবগ করে ফুটছে। আকাশের গায়েও লাল আর কালোর সংমিশ্রণে অত্যাশ্চর্য এক দৃশ্যের অবতারণা করেছে আগ্নেয়গিরির প্রাণোচ্ছ্বাস। দ্বীপটার আয়তন খুব বেশি হলেও দশ বর্গমাইল। হয়তো বা উত্তর মেরুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এই আগ্নেয় পাহাড়টা ভূগোলকের অক্ষরেখা ছেদ করে ওপরে উঠে গেছে।

নৌকাটাকে পাহাড়ের দিকে আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হল। ব্যস, আর দেরি নয়। কুকুর ডাক ঝপাং করে লাফিয়ে ডাঙায় নেমেই বিকট চিৎকার করে ভেতরের দিকে ছুটে চলল। অভিযাত্রীদের অনেক আকাঙ্ক্ষিত উত্তর মেরুতে সবার আগে পদচিহ্ন আঁকল ডাক।

এবার অভিযাত্রীরা এক এক করে লাফিয়ে তীরে নেমে ডাকের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। দূর থেকে ঢাকের কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল। তবে সে এখন আর কর্কশ স্বরে ডাকাডাকি করছে না। কেমন একটা অস্ফুট প্রায় কুঁৎকুঁৎ শব্দ শোনা যেতে লাগল। অভিযাত্রীরা তার কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন। কিছুটা পথ পাড়ি দিয়ে তারা আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একেবারেই অপ্রত্যাশিত দৃশ্যটার মুখোমুখি হয়ে তারা রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। বাকশক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছেন। অভিযাত্রীরা এমন কি দেখলেন যার ফলে অভিযাত্রীরা এমন বিস্মিত? দেখলেন, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের সংজ্ঞাহীন শরীর পাথরের ওপর এলিয়ে পড়ে রয়েছে। আর তার শিয়রে বসে অস্থির চিত্ত ডাক অনবরত কুঁই কুঁই করছে।

ডা. ক্লবোনি ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের দেহটা স্পর্শ করেই সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন—আছে! শরীরে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস এখনও জীবিত।

ডা. ক্লবোনির সেবাযত্নে কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ধীরে ধীরে চোখ দুটো মেললেন। ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'হ্যাঁ, বেঁচে আছি বটে। তবে শুধু যে বেঁচে আছি তাই নয়, আমিই উত্তর মেরুতে পদচিহ্ন এঁকেছি ডা. ক্লবোনি।

সত্যই, একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপারই বটে। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস কি করে অক্ষত দেহে দ্বীপে হাজির হলেন? ব্যাপারটা একরম—ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস নৌকো থেকে আছাড় খেয়ে জলে পড়ামাত্র ঘূর্ণিজলের টানে ঝট করে তলিয়ে গেলেন। পরমুহূর্তেই জলের চাপে আবার ভুস্ করে উঠলেন ভেসে। এভাবে পালা করে ডোবা-ভাসার মাধ্যমে চলতে চলতে আচমকা একটা পাথরের খাঁজ তাঁর হাতে ঠেকল। সজোরে আঁকড়ে ধরলেন সেটাকে। সামান্য বিশ্রাম নেবার পর ধীরে ধীরে নিরাপদ আশ্রয়ে উঠে এলেন তিনি। অনাবিল আনন্দ-উচ্ছ্বাস সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা হারিয়ে এলিয়ে পড়লেন।

www.pathagar.com

ডা. ক্লবোনি ব্যস্ত হাতে অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি বের করে মাপজোক শুরু করলেন। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, প্রায় পৌনে এক মাইল দূরবর্তী আগ্নেয়গিরিটার জ্বালামুখের ভেতর দিয়েই গেছে অক্ষরেখা, নব্বই ডিগ্রি। বিবরণটাকে ডা. ক্লবোনি সঙ্গে সঙ্গে লিখে পাহাড়টায় গায়ে আটকে দিলেন। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস বিবরণপত্রে স্বাক্ষর করে উত্তরকালের অভিযাত্রীদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ সেটাকে রেখে দিলেন। আশ্চর্য! অত্যাশ্চর্য—অবিশ্বাস্যও বটে।

* * *

অভিযাত্রীরা অভাবনীয় দুঃখ কষ্ট স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত ভাষা হারিয়ে যেন একেবারে বোবা হয়ে গেছেন। কিন্তু ডা. ক্লবোনি পক্ষে দীর্ঘ সময় মুখ বুজে থাকা সম্ভব হল না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে তিনি সাধ্যমত জ্ঞানদানে ব্রতী হলেন। তিনি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'জনসন একটা মজার ব্যাপার কী জান? তুমি কিন্তু এখন আর ঘুরছ না, নড়ছও না। পৃথিবীটা তো অনবরত লাট্টুর মতো চক্কর খাচ্ছে। তার সঙ্গে পৃথিবীবাসী ও অন্যান্য সবকিছুও ঘুরছে, ঠিক কি না? তবে এখানকার সবকিছু ছাড়া। এর কারণ কি জানো? কারণ একটাই, পৃথিবীটা এখানে মোটেই চক্কর খাচ্ছে না।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস আগ বাড়িয়ে বলে উঠলেন, 'আমরা না ঘুরলেও সামান্য নড়ছি বটে। একেবারে উত্তরমেরু বলতে যে জায়গাতে বুঝায় তা এখান থেকে পৌনে এক মাইল দূরে।'

ডা. ক্লবোনি বললেন, 'হ্যাঁ, কথা প্রায় একই। কেউ কেউ বলতেন, দক্ষিণ মেরু আর উত্তর মেরুতে দুটো দণ্ড রেখে পৃথিবীটাকে ঘোরানো সম্ভব, হচ্ছেও নাই। আবার প্লেটো যে আটলান্টিকাবাসীদের কথা বলেছেন, তারা নকি এখানকারই বাসিন্দা। আবার কেউ এমন কথাও বলেছেন, মেরুবিন্দুতে বিশালায়তন ছিদ্র রয়েছে, যা দিয়েই মেরুজ্যোতি আবির্ভূত হয়। আবার কারো কারো মতে মেরুবিন্দুর ছিদ্রপথ ধরে নাকি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে হাজির হয়ে যাওয়া যায়। আর পথে পড়বে প্রোসারপিন ও প্লটো নামে দুটো গ্রহ।' মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, 'উত্তর ও দক্ষিণ উভয় মেরুবিন্দুই ভেতরের দিকে সামান্য চাপা, পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে পাঁচ লিগ এগিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ কিনা, নিরক্ষ রেখার বরাবর কেন্দ্রের দিকে এগোতে থাকলে পাঁচ লিগ বেশি পথ অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু যদি এখান দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায় তবে পাঁচ লিগ কম হাঁটতে হবে।'

সকাল হল। অভিযাত্রীরা দেখলেন, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস অনুপস্থিত। তাঁরা ব্যাপারটা নিয়ে বড়ই ভাবিত হয়ে পড়লেন। বাইরে বেরিয়ে আসতেই তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। তিনি আগ্নেয়গিরিটার জ্বালামুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে। গভীর ভাবনায় ডুবে রয়েছেন তিনি।

ডা. ক্লবোনির ডাকে এক সময় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস বললেন, 'বন্ধুগণ, আপনারা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আজকের এ অভাবনীয় জয়ের গৌরব আপনাদেরও প্রাপ্য, স্বীকার না করে উপায় নেই। শুধু কি আপনারাই। না, যারা আমাদের ছেড়ে গেছে তারাও। তারা যদি ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে পারে তেব

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের পাওনা টাকা অবশ্যই দিয়ে দেওয়া হবে।' মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, 'বন্ধুগণ, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আমরা মেরুদ্বীপে হাজির হয়েছি, অবস্থান করছি খুবই সত্য বটে। কিন্তু এখনও আমাদের পক্ষে মেরুবিন্দুতে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি। ইংল্যান্ড ছেড়ে বেরোবার মুহূর্তে সঙ্কল্প ছিল একজন ইংরেজ পৃথিবীর মেরু বিন্দুতে প্রথম পদচিহ্ন আঁকবে। আজ অবধি তা কিন্তু সম্ভব হয় নি। এখান থেকে দূরে রয়েছে আমার সে বাঞ্ছিত স্থান। সেটা যে দেখতে কেমন তা এখনও আমার কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। তাই আমাকে সেখানে পদচিহ্ন আঁকতেই হবে। বাধা যতই কঠিন কঠোর হোক, আমি যাবই—যেতে আমাকে হবেই।'

ডা. ক্লবোনি তাকে বহুভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, 'কিন্তু সে যে একেবারেই অলীক কল্পনামাত্র। ভালো কথা, বলুন তো, আপনি পদচিহ্ন কোথায় আঁকবেন আগ্নেয়গিরির শীর্ষদেশে? সে পাহাড়ে ওঠাও সম্ভব নয়। লাভাস্রোত বইছে তার গা-বেয়ে। আর জ্বালামুখ দিয়ে লেলিহান আগুনের শিখা প্রতিনিয়ত নির্গত হচ্ছে, চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছেন।'

ডা. ক্লবোনি বুঝলেন, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের মধ্যে উত্তেজনা চরমরূপ নিয়ে চেপে বসেছে। তাকে এখন শান্ত করার চেষ্টা পাগলের খেয়াল ছাড়া কিছুই নয়। তাই অনন্যোপায় হয়ে অভীযাত্রীরা তাঁর কথায় সম্মত হল।

অভিযাত্রীরা পাহাড়ে উঠতে লাগলেন। সবার সামনো কুকুর ডাক এগিয়ে চলেছে। আর অন্য সবাই ধীর-পায়ে তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। ডাকের প্রায় পা-ঘেঁষে হাটছেন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস। ভূতত্ত্ববিদরা পাহাড়টাকে এক নজরে দেখেই বলে দিতেন, এটা একটা নবীন পাহাড়। এর গায়ে গাছগাছালি তো দূরের ব্যাপার, সামান্য ঘাস বা শ্যাওলার অস্তিত্বও নেই। কীটপতঙ্গের কথা তো ভাবাই যায় না। জল ও মাছ আর কীটহীন। জলের হাইড্রোজের সঙ্গে আগ্নেয় পর্বত নিঃসৃত কার্বন ডাই-অক্সাইডের মিলন অথবা মেঘের অ্যামোনিয়ার মিলনের মাধ্যমে, সূর্যরশ্মির সহযোগিতায় জৈব পদার্থের সৃষ্টি অবশ্যই হতে পারত। হয়ত সে সময় পায় নি। পৃথিবীর ওপর যত পর্বতের অবস্থিতি দেখা যায় তাদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। ভূ-অভ্যন্তরের গলিত লাভা ও গ্যাস কোনো ফাটল দিয়ে নির্গত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে সেগুলো সঞ্চিত হয়ে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়। মাউন্ট এটনা থেকে দীর্ঘদিন ধরে যে পরিমাণ লাভা নির্গত হয়েছিল তার আয়তন মাউন্ট এটনা থেকেও বেশি। কেবলমাত্র লাভার ছাই জমে জমে নেপলসের নিকটবর্তী মনুয়োভার সৃষ্টি হয়। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস আগেই মেরু দ্বীপের 'রানার দ্বীপ' নামকরণ করেছেন।

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ একটা ফুটন্ত সমুদ্র বিশেষ। গলিত লাভা ও উত্তপ্ত বাষ্প নিরবচ্ছিন্নভাবে ভূত্বকের ওপর ভেতর থেকে ওপরের দিকে চাপ দিচ্ছে। ভূত্বকের দুর্বল স্থান সে চাপ সহ্য করতে না পারার ফলে এক সময় বিদীর্ণ হয়ে ফুটন্ত গলিত লাভা ও উত্তপ্ত বাষ্প ওপরে উত্থিত হয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যেত। লাভা ও বাষ্প নির্গমণের মুখগুলিই আগ্নে পর্বত নামে পরিচিত। লাভা ও বাষ্পের ঘাটতি পড়লে মুখ বন্ধ হয়ে যায়,

www.pathagar.com

আগ্নে পাহাড় যায় নিবে। আবার অন্য এক জায়গায় গড়ে ওঠে আগ্নেয় পাহাড়। মেরু অঞ্চলে বাষ্পের চাপে আগ্নেয় পাহাড় সৃষ্টি স্বাভাবিক হওয়ার কারণ হচ্ছে এখানকার ভূত্বক সবই পাতলা।

রানার দ্বীপের জন্মও অতি সাম্প্রতিক কালেই ঘটেছে। সেজন্যই এখানে মাটির স্তর অনুপস্থিত। এমনকি জলের অস্তিত্বও নেই। এর বয়স কয়েকশো বছর হলে অবশ্যই গরম জলের ফোয়ারা দেখা যেত। আগ্নেয় পাহাড়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে এমন ফোয়ারা ভূত্বক ভেদ করে উঠে আসে। এখানে তার নামগন্ধও নেই। শুধু কি এই? তরল লাভাস্রোতের ওপরে ভাসমান বাষ্পের মধ্যে জলের চিহ্নমাত্রও নেই। ডা. ক্লবোনি পাহাড় বেয়ে উঠতে উঠতে এমন বহু ব্যাপার স্যাপার সম্বন্ধে আপন মনে ভেবে চললেন।

পর্বতারোহণ ক্রমেই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠতে লাগল। সে সঙ্গে এঁকেবেঁকে নেমে আসা লাভা স্রোত তো রয়েছেই। পথের বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করেই ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস সাধ্যাতীত চেষ্টা চালিয়ে ক্রমে ওপরে উঠতে লাগলেন।

কাছে—খুবই কাছে মেরুবিন্দু—মাত্র আর ৬০০ ফুট দূরে। আসলে সেখানে যেতে হলে ১৫ ফুট চড়াই অতিক্রম করতে হবে।

ডা. ক্লবোনি নিঃসন্দেহ যে, আগুনে ঘেরা, লাভায় ঢাকা মেরু বিন্দুতে পৌঁছনো সম্ভব নয়। তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ফিরে যেতেই হবে। তিন ঘণ্টা ধরে পথ অতিক্রম করার সময় তিনি ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসকে একথা যতবারই বুঝাতে চেষ্টা করেছেন ততবারই ক্যাপ্টেন পাগলের মতো অস্থিরতা প্রকাশ করে তাঁকে দমিয়ে দিয়েছেন।

ডা. ক্লবোনির সঙ্গে কথা আর বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস সজোরে একলাফ দিয়ে লাভা স্রোতটা পাড় হলেন। ব্যস্তপায়ে সঙ্গীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুহূর্তের মধ্যে তাঁদের চোখের আড়ালে চলে গেলেন। প্রিয় কুকুর ডাক তাকে অনুসরণ করতে লাগল। অন্য অভিযাত্রীদের পক্ষে তাঁর পিছন নেয়া সম্ভব হল না। একে আগুনের উত্তাপ তার ওপর লাভাস্রোত তো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেই।

ডা. ক্লবোনি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস! ক্যাপ্টেন—ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস!' কোনো উত্তরই পেলেন না। বিধ্বংসী ধোঁয়া আর তুষারের মতো অনবরত ঝরেপড়া ছাইয়ের আড়ালে হারিয়ে গেলেন তিনি।

সম্পূর্ণ পাহাড়টা বিশালায়তন চুল্লির মতো তিরতির করে কাঁপছে আর চাপা গর্জন করে অনবরত ফুঁসে চলেছে।

যে লাঠিটায় ভর দিয়ে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস পাহাড়ে উঠে চলেছেন তার মাথায় ইংল্যান্ডের পতাকা বাঁধা।

অমানুষিক কষ্ট আর পরিশ্রমের মাধ্যমে এক সময় ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস পৌঁছে গেলেন পাহাড়টার শীর্ষদেশে—আগ্নেয় পাহাড়টার জ্বালামুখে। তার প্রায় গাঘেঁষে অগণিত জ্বলন্ত শিলা পড়ছে। অকুতোভয় উন্মাদপ্রায় ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস তবু ঝুলন্ত একটা পাথর বেয়ে এগিয়ে চলেছেন। গাণিতিক মেরুবিন্দু সম্বন্ধে তার মনে এখনও সন্দেহ দ্বিধা, ঠিক যে স্থানটায় দ্রাঘিমার মিলনস্থল, বহু আকাঙ্ক্ষিত বিন্দুটা যেন এখনও তাঁর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। তাইতো টলতে টলতে অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে তিনি

www.pathagar.com

সে-বিন্দুটার ওপর পদচিহ্ন আঁকতে এগোচ্ছেন। তাঁর শরীর টলছে। পা দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইছে। প্রচণ্ড উত্তাপে তাঁর চোখ-মুখ—সর্বাঙ্গ ঝলসে গেছে। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে পা হড়কে পড়ে যাচ্ছেন। সর্বনাশা কাণ্ডটা প্রত্যক্ষ করামাত্র ডা. ক্লবোনির চোখ দুটো আতঙ্কে বন্ধ হয়ে এল। কাঁপা কাঁপা গলায় কোনোরকমে উচ্চারণ করলেন—'ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস! ক্যাপ্টেন—ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস! ব্যস, সব শেষ। চোখের পলকে সব শেষ হয়ে গেল।'

আতঙ্কিত চোখ দুটোকে মেলে ওপরের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই ডা. ক্লবোনির চোখের সামনে ভেসে উঠল. একেবারেই অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের কোটের এক প্রান্ত আলটামন্ট মুঠো করে ধরে আছে আর অন্য প্রান্তটা তাঁর প্রিয় কুকুর ডাক দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রেখেছে।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস সংজ্ঞা হারিয়ে উত্তপ্ত পাথরের ওপর এলিয়ে পড়লেন। সংজ্ঞা ফিরে এলে দেখা গেল তাঁর চোখের মণি আর চোখের পাতা পাতা নিশ্চল। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। পাগল!—হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস পাগলই হয়ে গেছেন।

তিন ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করে অভিযাত্রীরা পাগল ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসকে নিয়ে পর্বতগুহায় ফিরে এলেন।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস যেখানে সমুদ্র থেকে পাহাড়ের গায়ে নেমেছিলেন ঠিক সেখানেই তৈরি করা হল একটি ঢিবি। তার গায়ে খোদাই করে দেওয়া হল—"জন হ্যাটেরাস'। আঠারো শ' একষট্টি"। ঢিবিটার ভেতরে একটা টিনের বাক্স রেখে দেওয়া হল যার ভেতরে রক্ষিত মেরু বিজয়ের পূর্ণ বর্ণনা।

১৩ জুলাই। অভিযাত্রীরা পাগল হ্যাটেরাসকে নিয়ে নৌকোয় চড়ে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আলটামন্ট বন্দরে হাজির হলেন। মাত্র সাত দিনের মধ্যে পনেরো দিনের পথ অতিক্রম করে তারা ভিক্টোরিয়া উপসাগরে পাড়লেন।

দৈবদুর্গে পৌছেই তাঁদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড় হল। ডক্টর হাউস, গুদামঘর, যাদুঘর, সব বরফ গলে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হিংস্র জন্তুর জানোয়ার আর পাখিরা সব ভাগ বাঁটোয়ারা করে আত্মসাৎ করেছে। এখন বাঁচার ফিকির কি করা যাবে?

২৪ জুলাই অভিযাত্রীরা আবার নৌকা ছাড়লেন। তাপমাত্রা কমতে লাগল। জল জমে বরফে পরিণত হল। নৌকা গুঁড়িয়ে যাবার উপক্রম হল। কোনোরকমে রক্ষা করলেন নৌকাটাকে।

পনেরোই আগস্ট। শ্লেপ গাড়িতে চেপে সবাই এগিয়ে চললেন। পথের ধারে বীভৎস দৃশ্য দেখে সবাই চমকে উঠলেন। দেখলেন, রিচার্ড শ্যানডন, পেন আর অকৃতজ্ঞ সঙ্গীদের মৃতদেহ বরফের ওপর পড়ে রয়েছে।

৯ সেপ্টেম্বর। অভিযাত্রীরা ডেভন দ্বীপের কিনারায় হাজির হলেন। আর কিছুটা পথ পাড়ি দিলেই বাফিন উপসাগর।

পরের দিন আল্টামন্ট দূরসমুদ্রে একটা জাহাজকে দেখতে পেলেন। অভিযাত্রীরা ব্যস্তপায়ে বরফের ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করে সমুদ্রের পাড়ে হাজির হলেন। ডা. ক্লবোনি হাত তুলে ডাকাডাকি করলেন। কিন্তু হায় জাহাজটা ক্রমেই দূরে চলে যেতে লাগল।

www.pathagar.com

অনন্যোপায় হয়ে একটা হিমশৈলে চেপে গেলেন সবাই। শ্লেজ গাড়ির লোহার পাত খুলে হিমশৈলের মাথায় মাস্তুলের মতো গেঁথে দিলেন। তাঁবুর টুকরো দিয়ে বানিয়ে নিলেন পাল। পালে হাওয়া লাগায় হিমশৈলটা এগিয়ে চলল নৌকোর মতো। এক সময় সেটা গিয়ে পড়ল সমুদ্রে।

একনাগাড়ে দুঘন্টা অমানুষিক পরিশ্রমের মাধ্যমে অভিযাত্রীরা এক ড্যানিশ জাহাজে উঠতে পারলেন।

অভিযাত্রীরা লন্ডনে ফিরতে পারলেন তেরো দিন পর। ডা. ক্লবোনি সবার আগে রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে গেলেন। সেখানে দুর্ধর্ষ ক্যাপ্টেন জন হ্যাটেরাসের সুমেরুতে পদক্ষেপের বর্ণনা দিলেন।

ক্যাপ্টেন জন হ্যাটেরাস কেবলমাত্র পাগলই হন নি, বাক্‌শক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন। ডা. ক্লবোনি তাঁকে লিভারপুলের এক মানসিক চিকিৎসালয়ে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর প্রিয়সঙ্গী ডাক সর্বক্ষণ তাঁর কাছে কাছেই থাকে। ক্যাপ্টেন রোজ গলির মোড়ে গিয়ে আবার একটু বাদেই ফিরে আসনে। আর আকাশের দিকে আঙুল তুলে কি যন দেখান। ডা. ক্লবোনি একদিন এর রহস্যভেদ করতে সক্ষম হলেন, চুম্বকের আকর্ষণে লোহা যেমন ছুটে যায় ঠিক তেমনি ক্যাপ্টেন জন হ্যাটেরাস যেন আজও উত্তর দিকেই চলেছেন।

---

www.pathagar.com

ক্লিপার অব দ্য ক্লাউডস

মাঠে একটা গরু পরম তৃপ্তিতে ঘাস খাচ্ছে। আচমকা পিস্তল গর্জে উঠল—দ্রুরুম! দ্রুরুম! মাত্র গজ পঞ্চাশেক দূর থেকে পিস্তলের সিসার গুলি ছুটে এসে অসহায় নিরাপরাধ গরুটার গায়ে আঘাত করল। একটা নয়. দু-দুটো গুলির আঘাত তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভ হল না। বিকট আর্তনাদ করে অসহায় জীবটা মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। তার রক্তমাখা দেহটা বার-কয়েক মাটিতে আছাড়ি-পিছাড়ি করে এক সময় নিথরভাবে শাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ব্যস। সব শেষ।

কিন্তু কে গুলি ছুঁড়ল? কেন? কেনই বা অসহায় নিরাপরাধ গরুটাকে অকালে প্রাণ হারাতে হল? কে? কারা এরা?

হ্যাঁ, একজন তো নয়। দুজন। ওই তো ক্রোধোন্মত্ত দুজন যুবককে দেখা যাচ্ছে। কারা এরা? কি-ই বা এদের পরিচয়? হ্যাঁ, পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে আপাতত চেহারা দেখে যেটুকু অনুমান করা যাচ্ছে এদের একজন ইংরেজ যুবক আর দ্বিতীয়জন আমেরিকান।

নায়েগ্রা জলপ্রপাতের বাঁ-পাড়ে দুই ভিনদেশী যুবকের মধ্যে এ গুলি বিনিময়-গুলিযুদ্ধ। যে সেতুটা আমেরিকা আর কানাডার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষ করছে তারই কাছাকাছি এ-দ্বন্দ্ব-গুলিযুদ্ধ। জায়গাটা নায়েগ্রা জলপ্রপাত থেকে খুব বেশি হলেও মাইল তিনে দুরে। ক্রোধোম্মত্ত ইংরেজ যুবকটা আমেরিকান ভদ্রলোকের দিয়ে এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। কর্কশ স্বরে উচ্চারণ করল, 'পরোয়া নেই—গুলি ফসকেছে বলে পরোয়া করি না। আর একটু অন্তত জেনে রাখুন মশাই—এটা যে-সে পিস্তল নয়। আসলি মাল! 'রুল ব্রিটানিয়া'।'

'আরে রাখুন সাহেব। এটাও কোনো অংশে কমতি নয়। 'ইয়াঙ্কি ডুডল'। পিস্তলের রাজা।'

বাকযুদ্ধ চলতে চলতে আবার গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয় আর কি।

মুহূর্তের মেধ্যে যুদ্ধোম্মাদদের সহযোগীদের মধ্যে একজন পরিণাম সম্বন্ধে আঁচ করতে পেরে আৎকে উঠে বলল, 'কেন ঝুটমুট দ্বন্দ্বের মধ্যে যাচ্ছেন। তার চেয়ে বরং মেনে নিন, 'রুল ব্রিটানিয়া' আর 'ইয়াঙ্কি ডুডল' দুই সমান। কেউ কারো চেয়ে কমতি নয়।'

হ্যাঁ, প্রস্তাবটা তো চমৎকারই বটে। চমৎকার শান্তিপ্রস্তাব। এতে তো আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন উভয়েরই সম্মান অক্ষুণ্ন থাকছে। আর অবসান ঘটছে রক্তক্ষয়? গুলিযুদ্ধের।

যোদ্ধারা যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে গেল।

সবই তো হল। যুদ্ধ মিটল। দু-দুটো তাজা প্রাণনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পেল।

www.pathagar.com

যুদ্ধের কারণটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি তা নাই হবে তবে দু-দল এমন ভয়ঙ্কর মুখোমুখি সংগ্রামে লিপ্ত হবে কেন? তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় তাদের মারণাস্ত্র নিয়ে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার আড়ালে একটা গভীর রহস্য অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা এমন কি রহস্যজনক যার ফলে আকাশটা এমন তোলপাড় হচ্ছে? আর এরই ফলে বারুদের উগ্র গন্ধে আকাশ-বাতাস বিষময় হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর বুকে মানুষের প্রথম আবির্ভাব তো আর আজ হয় নি। সেই আদ্যিকাল থেকে আজ পর্যন্ত দলে দলে কাতারে কাতারে মানুষ তো কোনোদিনই এমন করে আকাশের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে নি। কেন? এর পিছনে এমন কোনো রহস্য লুকিয়ে রয়েছে?

রহস্যজনক ব্যাপারটা বেশিদিন আগে ঘটে নি। গত রাত্রে-গতরাত্রেই, চব্বিশ ঘণ্টা পেরোয় নি এখনো। রাতের অন্ধকার আকাশ থেকে ট্রাম্পেস্ট সংগীতলহরি ভেসে আসতে শোনা গেছে। অত্যাশ্চর্য সংগীত।

রাত্রির অন্ধকারে খোলা-আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে কৌতূহলী মানুষ উৎকর্ণ হয়ে লক্ষ্য করেছে, সেটা কি আদৌ ট্রাম্পেস্ট সংগীতলহরি, না কি অন্য কোনো রহস্যজনক শব্দ তাদের বিভ্রান্ত করেছে? শোনার ভুল না, শোনার ভুল অবশ্যই নয়। হাজার হাজার মানুষ তো আর ভুল শুনতে পারে না। তারা স্পষ্ট শুনেছে, লেক ওন্টারিয়ো ও লেক হুরির মধ্যবর্তী অঞ্চলের আকাশ থেকে ভেসে এসেছে অত্যাশ্চর্য সে সংগীতলহরি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দুই যোদ্ধার মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল কি নিয়ে? দ্বন্দ্বের কারণ, সংগীতটা কোন দেশের?

তখনকার মতো কোনোরকমে ধামা চাপা দিয়ে দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করা গেছে, সত্য বটে। কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে দ্বন্দ্বের রেশ কিন্তু থেকেই গেল।

আসল রহস্যটা কি? কিসের শব্দ অন্ধকার আকাশ থেকে বাতাস বাহিত হয়ে হাজার হাজার মানুষের অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে! তবে কি অন্ধকার উর্দ্ধাকাশে কোনো নভোচারি গানের মজলিশ বসিয়েছেন ?

না, তেমন কিছু তো মনে হয় নি। অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে চারদিকে তাকিয়ে কোনো বেলুনচারিকেই তো দেখা যায় নি। তবে?

সত্যই ব্যাপারটা খুবই বিচিত্র, একেবারেই অবিশ্বাস্য।

ওই-আবার ওই শোনা যাচ্ছে অত্যাশ্চর্য সে সংগীতলহরি। ওই-ওই যে শোনা যাচ্ছে। আটচল্লিশ ঘণ্টা পর রহস্য সঞ্চারকারী অত্যাশ্চর্য সংগীতলহরি আবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে! সে মিষ্টি মধুর-সুর ইউরোপের আকাশ-বাতাস মুখরিত করে চলেছে। ওই যে—ওই স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

সপ্তাহ খানেক কেটে গেল। এ সপ্তাহ পরে আবার রহস্যজনক সংগীতলহরিটা শুনতে পেল এশিয়াবাসীরা। বাস্তবিকই অত্যাশ্চর্য সংগীতই বটে।

ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়াবাসীরাই কেবল নয়, ক্রমে সমগ্র পৃথিবীর আকাশ জুড়ে রহস্য সঞ্চার করে বেড়াল অত্যাশ্চর্য অবিশ্বাস্য সে সংগীত। অতি প্রাকৃতিক গানের সুর। সমগ্র বিশ্বে অভাবনীয়, একেবারেই অবিশ্বাস্য আলোড়ন সৃষ্টি করল অতি প্রাকৃতিক সে আকাশ-সংগীত।

www.pathagar.com

পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ আজ কৌতূহলের শিকার হয়ে পড়েছে। এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড দিনের পর দিন মাথার ওপর ঘটতে থাকলে মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে কৌতূহলের উদ্রেক তো ঘটতে বাধ্য।

ব্যাপারটা আরো অত্যাশ্চর্য যে, বাতাস কম থাকলে অতি প্রাকৃতিক সে সংগীতলহরি আর শোনা যায় না। বাতাস-তরঙ্গের দ্বারা শব্দপ্রবাহ স্থানান্তরিত হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দু-মাইল অঞ্চল জুড়ে বায়ুস্তরের বিস্তৃতি। অতএব সংগীতলহরি বাতাস বাহিত হয়ে আমাদের কানে আছে অবশ্যই উক্ত দু-মাইলের মধ্যস্থ কোনো না কোনো উৎস থেকে। মহাশূন্য থেকে অবশ্যই তা আসা সম্ভব নয়। এই যদি সত্য হয় তবে রহস্যজনক উৎসটা কেনই বা কারো নজরে আসছে না?

খবরের কাগজওয়ালাদের এটা রীতিমতো মওকা। এমন আকর্ষণীয় চটকদারী একটা খবর পেয়ে মহাউল্লাসে তারা খবরের কাগজের পাতা ভরতে মেতে গেল শুধু কি এই। আসলের সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত খাদ মিশিয়ে কেউ কেউ বাজার মাৎ করতেও ছাড়ল না।

খবরের কাগজের পাতায় বড় বড় হরফে ছাপা হল, মানমন্দিরগুলো করছে কি? পৃথিবী জুড়ে এমন তোলপাড় হচ্ছে আর তারা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে নাকি? তাদের প্রথম ও প্রধান কাজই তো হচ্ছে দেশবাসীর কাছে আকাশ-রহস্যের খবর পৌঁছে দেওয়া। এতে যদি তারা ব্যর্থ হয় তবে আর তাদের দরকারই বা কি?

মানমন্দিরের কথাই বা শুধু বলি কেন? প্রখ্যাত সব জ্যোতির্বিদ? তারাই বা কোন চুলোয় গেছে। একেবারে যাচ্ছে তাই ব্যাপার! ধ্যুৎ, জাহান্নামে যাক সব।

জিওডেটিক? জিওডেটিক সংক্রান্ত বিষয়ে যারা লিপ্ত, তাঁরা? তাঁদের অবশ্য আকাশে কিছু চোখে পড়ে নি। আবহাওয়া দপ্তরও একই বক্তব্য প্রকাশ করল।

তবে হ্যাঁ, নিজেদের মুখ রক্ষা করতে প্যারিস মানমন্দির শেষমেশ মতামত ব্যক্ত করল—তাদের গণিত বিভাগ অপ্রয়োজনীয় বোধে আকাশের রহস্যের ব্যাপার-স্যাপার মাথামাথিতে উৎসাহী হয় নি।

এবার যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান থেকে যেসব খবর এসে পৌঁছেছে সে সবের মূল বক্তব্য মোটামুটি একই। মে মাসের পাঁচ তারিখের গভীর রাত্রে একটা হাল্কা আলোকরশ্মিকে ফ্লাশ লাইটের মতো জ্বলে উঠতে দেখা গিয়েছিল। রহস্যজনক অত্যাশ্চর্য আলোকরশ্মিটার অস্তিত্ব মাত্র বিশ সেকেন্ড ছিল।

নয়ই বা দশই মে কি পিক ডুর লক্ষ লক্ষ মানুষ বিচিত্র সে অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মিটা চাক্ষুস করেছিল?

আশ্চর্য! সত্যই ব্যাপারটা আশ্চর্যজনকই বটে। এতগুলো মানুষের দেখা ব্যাপারটাকে তো আর কাল্পনিক বা খোসগল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

আর একটা ব্যাপার, সবাই নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করল, অন্তত ঘন্টায় একশ' মাইল বেগে রহস্য সঞ্চারকারী অত্যাশ্চর্য আলোটা ছুটে গিয়েছিল।

আলোরশ্মির ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে গ্রেট বৃটেনে রীতিমতো বিতর্কের ঝড় বয়ে যেতে লাগল। গ্রিনউইচ পত্রিকা যে মন্তব্য করল তার ঠিক বিপরীত মন্তব্য করে বসল অক্সফোর্ড। তবে শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা হল সবই ভূঁয়ো ভোঁ ভাঁ। মানুষের চোখের ভ্রম ছাড়া এটা কিছুই নয়।

www.pathagar.com

না, এত সহজে কিন্তু ঝড় থামল না। বার্লিন আর ভিয়েনা মানমন্দির এমনই তৎপর হয়ে উঠল যে, তাদের উৎসাহে ঘটনাটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে হাজির করা হল। পৃথিবীবাসী ব্যাপারটা নিয়ে যারপরনাই বিভ্রান্ত, আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত।

শেষপর্যন্ত রাশিয়া আর দূরে সরে থাকতে পারল না, ব্যাপারটায় নাক গলাতে হলই। তারা মধ্যস্থতা করার জন্য তৎপর হল। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী উভয় পক্ষের পিঠ চাপড়ে মন্তব্য করল, 'উভয় পক্ষের উক্তিই ঠিক। ব্যাপারটা সম্বন্ধে কল্পনা করা না গেলেও বাস্তবে সম্ভব হতে পারে।'

এবার উৎসাহিত সুবিধা করতে না পেরে মুখ গোমড়া করে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। তারা ব্যাপারটাকে খেয়ালী প্রকৃতির রহস্য বলে চাউর করে দিলেন। আর এ পথ অবলম্বন করে তাঁরা পৃথিবীকে উৎকণ্ঠা মুক্ত করতে প্রয়াসী হলেন।

যখন এমন দোটানায় পড়ে সবাই রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠল তখন স্পিট বার্জেন আর ফিনমার্কের মানমন্দিরদ ঘোষণা করল—ছাব্বিশ, সাতাশ, আঠাশ এবং উনত্রিশে মে—এই চারদিন মেরুজ্যোতির মধ্যে আকাশের গায়ে অতিকায় একটা পাখির ছায়ামূর্তি দেখা গেছে। প্রাণীটাকে ভালোভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব না হলেও তার দেহ থেকে অগণিত আলোকবিন্দু ছিটকে এসে ভয়ঙ্কর শব্দ করে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। আরে ব্যস! কী সাংঘাতিক খবর রে বাবা! পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করে ছাড়ল!

নরওয়ে ও সুইডেনের জ্যোতির্বিদ ও উল্কাবিদগণের এরকম অবিশ্বাস্য মন্তব্য শুনে ইউরোপের পণ্ডিতগণ মোটেই অবাক হন নি। কোনো প্রসঙ্গেই যে দুটো দেশ কোনোদিনই ঐক্যমত পোষণ করতে পারে নি আজ তারা একই মত ব্যক্ত করছে, এটাই সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হয়ে দাঁড়াল।

অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার সবগুলো মানমন্দির তাদের মন্তব্যটা শুনে ঠোঁট টিপে হেসে পরিহাস-করল।

আকাশে সংগীতলহরির ব্যাপারটা নিয়ে তর্কবিতর্ক ইউরোপের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রেই বেশি হতে লাগল। কেন এমন তর্কবির্তকের উদ্ভব? সংগীতলহরি বা বাদ্যকরদের নিয়ে? না, অবশ্যই নয়। তবে? যত তর্কবিতর্কের উদ্ভব সবই সমস্যাটা নিয়ে। উভয় দেশের মানুষ নাকি একই সময়ে রহস্য সৃষ্টিকারী আকাশচারীকে চাক্ষুস করেছে।

এ কী অদ্ভুত কথা রে বাবা! নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে কলম্বিয়া আবার ম্যাসাচুসেটস থেকে আরম্ভ করে মিচিগান পর্যন্ত যাবতীয় অঞ্চলের মানুষ একই সময় আকাশে অত্যুজ্জ্বল আলোটাকে দেখেছে এবং আকাশ বাদ্যকরদের সংগীতলহরি শুনেছে। ধ্যুৎ, যত্তসব আজগুবি গপ্প!

ব্যাপারটা নিয়ে মিলিটারি একাডেমিও কম মাথা ঘামায় নি। তারা দীর্ঘ নিরলস গবেষণা চালিয়ে বলল, 'আসলে বিসমিল্লায়ই গলদ। আমাদের হিসেবটাই ভুল হয়েছে। ভুল হিসেব প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্তির মুখে ঠেলে দিয়েছে।'

তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীরা এবার গবেষণায় মত্ত হলেন। গবেষণার ফল প্রচার করতে গিয়ে তাঁরা মন্তব্য করলেন, 'বস্তুটা মুলত এ্যারোলাইট অর্থাৎ সিলিকেটের সমন্বয়ে গঠিত একটা উল্কা পাথর ছাড়া কিছুই নয়।' বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে মাঝ-পথে থেমে গিয়ে আবার বলল, 'কিন্তু আকাশবাদ্য? উল্কা-পাথরের পক্ষে ট্রাম্পেস্ট বাজানো কি করে সম্ভব? একে যে পাগলের প্রলাপ ছাড়া অন্য কোনো আখ্যাই দেওয়া যায় না। ধ্যুৎ, পুরো ব্যাপারটাই গোলমেলে।'

www.pathagar.com

পরিস্থিতি ক্রমে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠতে লাগল। এক সময় দেখা গেল, ইয়েল্ড কলেজের ও শেফিল্ড বিজ্ঞান স্কুলের কিছু অত্যুৎসাহী ছাত্র মিলে আকাশ-সংগীতটার স্বরলিপি পর্যন্ত তৈরি করে ফেলল। বাজার ক্রমেই গরম হতে লাগল। বয়ে চলল আলোড়নের তুমুল ঝড়। বারই এবং তেরোই মে অমারাত্রির অন্ধকারে সুরলোকের সংগীতলহরির মতো সদ্য তৈরি করা স্বরলিপির মাধ্যমে বাজাতে লাগল উৎসাহী ছাত্রের দল। শেষমেষ মিলিয়ে দেখা গেল, সেটা ডি. মেজরের কোরাস ছাড়া কিছুই নয়।

এক জাত ইয়াঙ্কি স্পষ্ট ভাষায় বলল, 'ফ্রেঞ্চ ব্রেনের কাজ ছাড়া অন্য কিছুই এটা হতে পারে না। ফরাসিরা দলে দলে আকাশে উঠে গিয়ে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে মেতে গেছে।'

এবার বোস্টন মানমন্দির মুখ না খুলে আর পারল না। বলল, 'ঠাট্টা তামাশার সময় এটা নয়। ব্যাপারটা খুবই জঠিল ও গুরুত্বপূর্ণ।'

সিনসিনটি মানমন্দিরের অধ্যক্ষ মি. কিলগোর অনেক ভেবে চিন্তে বললেন 'হ্যাঁ, ঠিকই তো। আকাশের গায়ে অস্পষ্ট কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে!'

তিনি মাইক্রোমিটারের সাহায্যে নক্ষত্র পরিমাপ করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন।

বেগম রাগিমারার দুই উত্তরাধিকারীর শত্রুতার ব্যাপারটা অবশ্যই জনগণের মধ্যে থেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায় নি। স্টিলটাউন ও ফ্রাঙ্কভিল নামে বিচিত্র এই শহর দুটোর মধ্যে যে শত্রুতা তার কথা বলতে চাইছি। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সারাসিন, যিনি ফ্রাঙ্কভিল শহরের প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিচিত আর জার্মান ইঞ্জিনিয়ার হেরসুলেৎস, স্টিল টাউনের প্রতিষ্ঠাতা তাদের সে স্বার্থগৃধ্ন মনোভাব ও জঘন্য ঘটনার কথা কি এত সহজে মন থেকে ঝেড়ে ফেলা সম্ভব? হবেই বা কি করে? উভয়ের শত্রুতার ফলে একসময় যে তুমুল লড়াইয়ের উপক্রম হয়ে গিয়েছিল।

জার্মান ইঞ্জিনিয়ার হের সুলেৎস ভয়ঙ্কর একটা ইঞ্জিন আবিষ্কারও করে ফেলেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, সেটা দিয়ে ফ্রাঙ্কভিল শহরকে উড়িয়ে দেবেন। সেটার প্রাথমিক গতি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক, অনেক বেশিই হয়ে পড়েছিল। আসলে হিসাবের ভুলের জন্য দানবাকৃতি কামানটা থেকে সাধারণ গোলার চেয়ে ষোলোগুণ বেশি গতিবেগ প্রাপ্ত হয়। তাই কামান থেকে চার শ' মাইল বেগে বেরিয়ে আসা গোলাটা আর ভূমিতে পড়তে পারল না। উল্কা-পাথরের মতো অনন্ত কাল ধরে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে বলে মহাশূন্যে উড়ে গেছে।

কি ব্যাপার? ওই গোলাটাই আকাশ-রহস্যের মূলে কাজ করে পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করছে না তো? নিউইয়র্ক হেরল্ড পত্রিকা এভাবেই তার গালগপ্প জনসাধারণকে উপহার দিল। এটা তো নিছকই একটা কল্পনার ব্যাপার। কল্পনা আর বাস্তবে যে বিস্তর ফারাক। কল্পনা কোনোদিনই বাস্তবে পরিণত হয় না। যদি হয়ও তবে বলতেই হয়—ওই কামানের গোলাটার গায়ে কি ট্রাম্পেস্ট আটকে দেওয়া ছিল?

ডিন আর কতদিন মুখ বুজে থাকতে পারে? একজন হোমড়া চোমড়া চীনাম্যান মোদ্দা কথাটা বলে ফেললেন, 'অবাক হবার মতো ব্যাপার মোটেই নয়। হয়তো বা বস্তুটা একটা ব্যোমযান-ফ্লাইং মেশিন।' মন্তব্যটা জি. কাবের ডিরেকটরের মুখ থেকে না বেরিয়ে অন্য যে কেউ বললে তাকে সবাই মাথায় তুলে নাচত।

জল অনেকেই ঘোলা হয় বটে। কিন্তু আসলে পাকা কোনো সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা গেল না। কাজ যা হল-একের পর এক উল্টোপাল্টা মন্তব্য আর কথার ফুলঝুরির মাধ্যমে মনের ঝাল মিটিয়ে নেবার ব্যাপারটা চলতে লাগল।

www.pathagar.com

দিন কয়েক নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটার পর এল দোসরা জুন। দোসরা থেকে নয়ই জুনের মধ্যে এমন এক অবিশ্বাস্য-অকল্পনীয় ব্যাপার ঘটল যাতে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তুরস্কের সেন্ট সোফিয়া মিনারের চূড়ায়, হামবুর্গ সেন্ট মাইকেল টাওয়ারের মাথায়, ট্রান্সবার্গের আশ্রমের মাথায়, রোমের গির্জার ধাতবদণ্ডে, বোস্টনের বাঙ্কার হিলমনুমেন্টের চুঁড়ায়, আমেরিকার লিবার্টি মূর্তির মাথায়, চীনমুল্লুকের ফোর হানড্রেড জেনি মন্দিরের মাথায়, তাঞ্জোরের মন্দির পিরামিডের ষোলো তলায়, লন্ডনের সেন্ট পলসের ক্রুশে, রোমের সেন্টপিটারের ক্রশে, মিশরের পিরামিডের চূড়ায়, আঠারো শ' উননব্বই-এ বিশ্বমেলা উপলক্ষে তৈরি সুউচ্চলোহার টাওয়ারের মাথায়-কমসে কম এক হাজার ফুট উচ্চাকাশ দিয়ে একই রকমের পতাকাকে দ্রুতবেগে উড়ে যেতে দেখা গেল।

হ্যাঁ, একই রকমের কালো একটা পতাকা। তার কালো কাপড়ের ওপর অসংখ্য তারা আর ঠিক মাঝখানে সোনালি রং দিয়ে সূর্য আঁকা ছিল। অকল্পনীয় ব্যাপারটা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করল। একেবারে পৃথিবীর তোলপাড় হতে লাগর উদ্ভুত ব্যাপারটাকে নিয়ে। কিন্তু বাকযদ্ধ, লাফালাফি দাপাদাপি ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হল না। উদ্ভুত সমস্যাটার সমাধান? না, কিছু হল না।

ফিলাডেলফিয়ার বিখ্যাত ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের হলঘরে সভ্যদের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ বাকযুদ্ধের তুমুল ঝড় বয়ে চলল। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু বেলুনের গতিপথ।

কেবলমাত্র তর্কাতর্কির মাধ্যমেই উদ্ভুত সমস্যাটার সমাধান হল না। শেষপর্যন্ত হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। তারা শখের বেলুন বাজমাত্র। হ্যাঁ, তারা যদি ইঞ্জিনিয়ার হত তবু ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক বলে মনে নেওয়া চলত।

বাতাসের চেয়ে ভারি কোনো বস্তুকে শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। উড়ন্ত কোনো যন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে। আকাশে আসতে সক্ষম এমন কোনো যন্ত্রকে কল্পনার সমগ্রী না ভেবে তা যে বাস্তবে পরিণত হতে পারে—এরকম কোনো বক্তব্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করা মাত্র হলঘরে উপস্থিত শ'খানেক সদস্য যেন যন্ত্রচালিতের মতো লাফিয়ে উঠে তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল। প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল।

ক্লাবের সভাপতি আঙ্কল প্রুডেন্ট খুবই বদরাগী হলেও বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে পারেন। আর বুদ্ধিও রাখেন যথেষ্টই। বুদ্ধি খরচ করে, বহু কায়দা কসরতের মাধ্যমে তিনি সভ্যদের কোনোরকমে সংযত রাখলেন।

সভাপতি আঙ্কল প্রুডেন্ট একজন টাকার কুমীর। জলস্রোত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তিনি বছরে ত্রিশ কোটি টাকা মুনাফা অর্জনের পরিকল্পনা করেছেন। তাঁর নায়েগ্রা জলপ্রপাতের বড় শেয়ার রয়েছে। অকৃতদার তিনি। অতএব পোষ্যের পিছনে খরচাপাতির প্রশ্নই ওঠে না। পৃথিবীটা কিসের বশ? টাকার। টাকা থাকলে বন্ধু-বান্ধব চারদিকে ঘুরঘুর করে। আঙ্কল প্রুডেন্টের ক্ষেত্রেও এর কিছুমাত্রও ব্যতিক্রম হতে দেখা যায় নি। তবে হ্যাঁ, কেবলমাত্র বন্ধুই নয়, তার শত্রুর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। তার শত্রুদের মধ্যে পহেলা নম্বরের হচ্ছেন ধনকুবের ফিল ইভান্স। হুইলটন ঘড়ি কোম্পানির ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত।

www.pathagar.com

আঙ্কেল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভান্সের মধ্যে সবচেয়ে চারিত্রিক বিভেদ মাত্র একটা ব্যাপারে। ব্যাপারটা হচ্ছে, আঙ্কল প্রুডেন্ট অতিমাত্রায় বদমেজাজী আর ফিল ইভান্স একজন অভাবনীয় ঠাণ্ডা মাথার মানুষ।

মেজাজ মর্জির ব্যাপারটুকু ছেড়ে দিলে দেখা যাবে তারা উভয়েই সমান। কেউ কারো চেয়ে কোনোদিক থেকে কমতি নন। এই যদি সত্য হয় তবে ফিল ইভান্সের সভাপতি হওয়ার অন্তরায় কোন জায়গায়?

সভাপতি পদের জন্য নির্বাচন হল। এবারও এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। উভয়েই সমান সংখ্যক ভোট পেলেন। সর্বনাশ! এখন উপায়? অচলাবস্থার সমাধান কি করে সম্ভব? ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ জেম চিপ তৎপর হলেন। তিনি অভিনব একটা পন্থা অবলম্বন করে সঙ্কট মুক্তির ব্যবস্থা করে ফেললেন। সাদা বোর্ড নিয়ে তাদের উভয়ের কেন্দ্রস্থলে একটা করে কালো সরলরেখা টেনে দিলেন। আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্স উভয়েরই হাতে একটা করে সূঁচ দিলেন। এবার উভয়কেই বললেন নিজ নিজ বোর্ডের কালো সরলরেখাটার ওপরে প্রথমবারেই যিনি সূঁচ ফোঁটাতে সক্ষম হবেন তিনিই বিজয়ী হবে, সভাপতির পদ লাভ করবেন।

হায়! সমস্যা যে রয়েই গেল! অচলাবস্থার অবসান তো এতেও ঘটল না। উভয়েই প্রথমবারেই একই জায়গায় সূঁচ গেঁথে দিলেন।

সদস্যরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এখন উপায়? সঙ্কট থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় কি? না, হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে তো আর এমনি এমনি সমস্যার সমাধান হবে না। অচলাবস্থা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য এবার নিয়ে আসা হল মাইক্রোমিটার যন্তর। এর সাহায্যে এক মিলিমিটারের দেড় হাজার ভাগের এক ভাগও পরিমাপ করা সম্ভব। এবার যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ ও হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে গেল। ব্যস, জিতে গেছেন। আঙ্কল প্রুডেন্ট জিতে গেছেন তার সূঁচটা দেড় হাজার ভাগের ছয় ভাগ দূরে এবং ফিল ইভান্সের সূঁচটা নয় ভাগ দূরে গাঁথা রয়েছে দেখা গেল, অভিনব এ-বিচারের মাধ্যমে আঙ্কল প্রুডেন্ট সভাপতি এবং ফিল ইভান্সকে সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হতে হলেন। ব্যস, ফিল ইভান্স সে ঘটনার পর থেকেই আঙ্কল প্রুডেন্টের ওপর ভেতরে ভেতরে দারুণ চটে রয়েছেন।

উনিশ শতকের শেষার্ধে, বিশেষ করে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে আকাশে ওড়ার ব্যাপারে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষ চলেছে। বেলুনে মেশিন লাগিয়ে সেটাকে আকাশে ওড়ানো সম্ভব কিনা তা নিয়ে কম চেষ্টা করা হয় নি।

আঠারো শো বাহান্ন সালে দোলনার সঙ্গে প্রপেলার লাগিয়ে আকাশে ওড়ার চেষ্টা করেন হেনরি গিফার্ড। আঠারো শো বাহাত্তর সালে একই প্রয়াসে লিপ্ত হন লোমে।

আঠারো শ' তিরাশি সালে তিনসানদিয়ার ব্রাদার্স বেলুনের সাহয্যে আকাশে ওড়ার ব্যাপারে সাধ্যাতীত প্রয়াস চালান।

এবার এল আঠারো শ' চুরাশি সাল। সে বছর রেনার্ড এবং ক্যাপ্টেন ক্রেবস অত্যাশ্চর্য এক যন্ত্র তৈরি করে অন্য যেসব বেলুনবাজ আকাশে ওড়ার ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লিপ্ত ছিলেন তাঁদের একেবারে তাক লাগিয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

সদ্য আবিষ্কৃত এসব যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে বাতাসের প্রতিকূলে উড়ে গিয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসাও সম্ভব হয়। তবে হ্যাঁ, ঝড়ের মুখে পড়লে অবশ্য পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে যেত। তখন বেলুনটা খড়-কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে দূরবর্তী স্থানের উদ্দেশ্যে উড়ে যেত।

ঘূর্ণিঝড়, অথবা ঝড় যখন ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রলয়ঙ্করের মতো রূপ নিত তখন বেলুনটা ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটে যেত। এলোমেলো ঝড়ের প্রকোপে বেলুন সমেত যন্ত্রটা তুবড়ে-ভেঙে একাকার হয়ে যেত। তাই বেলুন চেপে আকাশে ওড়ার ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে যা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে সবই ভেস্তে গেল। হতাশা আর হাহাকারই কেবল সম্বল হল।

তবে বেলুন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে লাভ যে কিছুই হয় নি এরকম কথা অতিবড় শত্রুও বলতে পারবে না। লোমের আবিষ্কৃত যন্ত্র এবং হেনরি গিফার্ডের তৈরি ইঞ্জিনের কথা বাদ দিলে নব আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক মোটর আশার সঞ্চার করেছে, অস্বীকার করা যাবে না।

তিনসানদিয়ার ব্রাদার্স যে পটাসিয়াম বাইক্রোমেট ব্যাটারি আবিষ্কার করেছেন সেটা ব্যবহার করে সেকেন্ডে চার গজ পর্যন্ত ওপরে বেলুন তোলা সম্ভব হয়েছে। রেনার্ড এবং ক্যাপ্টেন ক্রেবসের তৈরি ডায়নামো-বৈদ্যুতিক যন্ত্র বারো অশ্বশক্তি সম্পন্ন। সেটা ব্যবহারের মাধ্যমে সেকেন্ডে সাড়ে বারো গজ গতিবেগেও বেলুন চালানো সম্ভব হয়েছে।

এবার ইঞ্জিনিয়ার ও ইলেকট্রিসিয়ানরা দীর্ঘ নিরলস গবেষণায় লিপ্ত থেকে এমন এক যন্ত্র উদ্ভাবন করে ফেললেন যেটা ডায়নামো-বৈদ্যুতিক যন্ত্রের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। বেলুনে চেপে আকাশে ওড়ার ব্যাপার নিয়ে এত গবেষণা এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এত উন্নতি সত্ত্বেও অতিকায় একটা বেলুনের পক্ষে আকাশে ওড়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। অতিকায় বেলুনটার ওপর বাতাস অবশ্যই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এত বাধা দূর করে বেলুনের অগ্রগতি রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার।

এবার আসরে নামলেন, বোস্টনের এক অজ্ঞাতনামা রসায়নবিদ। বেলুন-যন্ত্র তৈরি করে তিনি অন্য সবার মুখ একেবারে চুণ করে দেন। আশ্চর্য এক ডায়ানামো-বৈদ্যুতিক যন্ত্র তৈরি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন।

এবার বেলুনবাজ পাইলের আবিষ্কৃত বেলুনটা প্রতি সেকেন্ডে বিশ থেকে বাইশ গজ গতিতে উড়ে গিয়ে বিস্ময় উৎপাদন করল। তাঁর অবিশ্বাস্য আবিষ্কারের দিকে আঙ্কল প্রুডেন্টের নজর পড়ল। সেটাকে ঝট করে এক লক্ষ ডলারের বিনিময়ে তিনি কিনে নিলেন। মাত্র একলক্ষ ডলার দিকে এমন অবিশ্বাস্য একটা আবিষ্কার কিনতে পারায় অনেকেই বিস্মিত হলেন।

এবার ওয়েলডন ইনস্টিটিউশনের সভ্যরা আদা-জল খেয়ে লেগে গেলেন। মহৎ প্রয়াস সার্থক করতে অর্থের অভাব হয় না। এক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হল না। চারদিক থেকে অর্থ সাহায্য আসতে লাগল। দেখতে দেখতে তহবিলে তিন লক্ষ ডলার জমা পড়ে গেল। এরকম একটা মহৎ প্রচেষ্টাকে সার্থকতায় পরিপূর্ণ করার জন্য হেনরি টিন্ডার নামে এক নভোচারিকেও অনায়াসেই জোগাড় করা সম্ভব হল। তার কীর্তি হচ্ছে, সর্বপ্রথম ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বারো হাজার ফুট ওপরে ভ্রমণ। তিনি নিউইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকো পর্যন্ত বেলুনে চেপে আকাশ পথে উড়ে গিয়ে বিস্ময়ের কারণ হয়েছেন।

www.pathagar.com

ওয়াইজ কেবলমাত্র সাড়ে এগারো শ' মাইল অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।

এ তো গেল দ্বিতীয় কীর্তির কথা। তৃতীয় কীর্তিটা সত্যই অবিশ্বাস্য বটে। সেটা হচ্ছে, পনের শ' ফুট ওপর থেকে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে প্রাণে বেঁচে যাওয়া। কিন্তু রোজিয়ার বেলুনবাজ মাত্র সাত ফুট ওপর থেকে আছাড় খেয়ে পড়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছিলেন।

ওয়েলডন ইনস্টিটিউশনের বেলুনবাজদের বেলুনটা বিশালায়তনই বটে। সেটার মোট আয়তন চল্লিশ হাজার কিউবিক মিটার। অবিশ্বাস্য ব্যাপারই বটে। এর আগের, নাদারের বেলুনটার আয়তন ছিল দু' হাজার কিউবিক মিটার। ফিয়ার্ডের বেলুনটা ছিল পঁচিশ হাজার কিউবিক মিটার এবং বিশ হাজার কিউবিক মিটার ছিল জন ওয়াইজের বেলুনটার আয়তন।

হ্যাঁ, বিশালায়তন বেলুনটার খুটিনাটি যেটুকু কাজ বাকি ছিল তাও প্রায় সেরে ফেলা হয়েছে। আর মাত্র হপ্তা দুয়ের মধ্যেই সেটা অভিযান শুরু করবে।

সব প্রায় শেষ করেও জরুরি কাজটা এখনো বাকি রয়ে গেল যে! প্রপেলার। কোন মাপের প্রপেলার এতে ব্যবহার করা হবে? দীর্ঘ আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে প্রপেলারের আয়তনের ব্যাপারটা তো কোনোরকমে নিষ্পত্তি করা গেল, কিন্তু সেটাকে সামনে, নাকি পিছনে বসানো হবে তা নিয়ে নতুন বাক্‌বিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল। একশজন বেলুনবাজ পরিস্থিতিটাকে এমন ঘোলা করে তুললেন যে, শেষপর্যন্ত হাতাহাতির পর্যায়ে চলে গেল। ক্লাবের সদস্যরা ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে দুটো দলে বিভক্ত হয়ে গেলেন। আঙ্কল প্রুডেন্টের পক্ষে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটানো কি করেই বা সম্ভব? কারণ, তিনি নিজেও যে একটা দলের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন।

ব্যস, মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি চরম রূপ নিয়ে নিল। ঘন ঘন পিস্তল গর্জে উঠতে লাগল। তবে কেউ-ই হতাহত হল না। সবই ফাঁকা আওয়াজ একটুকুই যা ভরসা।

ঠিক সে মুহূর্তেই ক্লাবের দারোয়ান একটা ভিজিটিং কার্ড এনে সভাপতি প্রুডেন্টের হাতে দিল। উদ্দেশ্য অজ্ঞাত পরিচয় এক আগান্তুক সভায় যোগ দিতে ইচ্ছুক। গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার সম্বন্ধে ক্লাবের সদস্যদের অবহিত করাই তাঁর ইচ্ছা।

আগন্তুকের নাম রোবার।

সভাপতির অনুমতি পেয়ে আগন্তুক হলঘরে ঢুকলেন। তিনি ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের প্রিয় নাগরিকরা, দয়া করে আমার কথা শুনুন, আমার নাম রোবার। আমার চেহারা দেখে আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন, অসীম শক্তির অধিকারী আমি। আর সাহসও আমার কম নয়। বলতে পারেন আমি এক অকুতোভয়া পুরুষ আর আমার ইচ্ছাশক্তি তেমনই প্রবল। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে আপনাদের কাছে ব্যক্ত করছি, পৃথিবীর কোনো শক্তিই আমার পথ রোধ করতে পারবে না। আপনারা যদি মনে করে থাকেন, আত্মপ্রচারই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য তাতেও আমার আক্ষেপের কিছু নেই। আর যদি আন্তরিক ইচ্ছা থাকে তবে আমার বক্তব্য ধৈর্য ধরে শুনুন। আমি যা কিছু বললাম ও বলব সবকিছু অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন।'

আগন্তুক পূর্বস্বর অনুসরণ করেই আবার বলতে লাগলেন, 'ধৈর্য ধরে, মন দিয়ে শুনুন—দীর্ঘ এক শ' বছর ধরে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছি। এর জন্য ধৈর্য, সময়

www.pathagar.com

ও অর্থও কম ব্যয় হয় নি। আজ আমি মানসিক বিকারের শিকার হয়ে পড়েছি। আজকের যুগেও মানুষ অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করে চলেছে, প্রপেলার ব্যবহার করে আকাশে বেলুন ওড়ানো সম্ভব! এখানে আপনারা প্রায় এক শ' জন বেলুনবাজ উপস্থিত রয়েছেন, আমার কথা শুনে রাখুন, এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে না—কিছুতেই না। আপনারা মরীচিকার পিছনে ছুটতে গিয়ে হাজার হাজার ডলার জলে নয়, শূন্যে-মহাশূন্যে উড়িয়ে দিচ্ছেন। ধৈর্য, সময়ও অর্থ ঢেলে ঢেলে নিঃস্ব-নিক্ত হয়ে পড়ছেন। দয়া করে একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলেই আমার বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

কি. বেলুনে চেপে বাতাসের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা! দু-পাউন্ড ওজনের কোনো বস্তুকে যেখানে এক কিউবিক গ্যাস প্রয়োগ করতে হয়, বাতাসের ওপর ভর দিয়ে যাকে শূন্যে ভাসতে হয়, তার পক্ষে কি করে বাতাসের বিরুদ্ধে চলা সম্ভব? সামান্য বাতাস নৌকার পালে যে চাপ প্রয়োগ করে থাকে তার শক্তি চার শ' অশ্বশক্তির সমান। আমাদের কি স্মরণ নেই 'টে ব্রিজ দুর্ঘটনা'র সময় বাতাস প্রতি বর্গগজে যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করেছিল তা ছিল এইট হানড্রেড ওয়েটের সমান। তাই এখন বলতেই হয়, বেলুনের ক্ষমতা কি খেয়ালির প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যেতে পারবে? তাই বলছি. শূন্যে ভেসে বেড়াতে হলে অবশ্যই একজোড়া ডানার প্রয়োজন রয়েছে।

এত কথার পরও আপনাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগছে, আমরা কী তবে আকাশে ওড়ার চিন্তাকে মাথা থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দেব? আমি বলব, না অবশ্যই না। আমরা কি চাকা, প্রপেলার, দাঁড় আর পাল ব্যবহারের মাধ্যমে চমৎকার একটা জলযান জাহাজ তৈরি করি নি? করেছি। ঠিক সেরকমই আমরা আকাশেও অবশ্যই উড়তে পারব। এর জন্য চাই বাতাসের চেয়ে ভারি অথচ অধিকতর শক্তিশালী কোনোকিছু, যা বাতাসকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অনায়াসে উড়ে যেতে পারেব।

মুহূর্তের জন্য উপস্থিত সবার মুখের ওপর একবারটি চোখেরমণি দুটো বুলিয়ে নিয়ে আগন্তুক রোবার এবার বললেন, 'আমার বক্তব্য-এ-মুহূর্তে হাস্যকর মনে হলেও এতে সম্পূর্ণ বাস্তবতার ছোঁয়া রয়েছে।'

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙায় উপস্থিত বেলুনবাজরা উত্তেজনায় সমস্বরে গর্জে উঠলেন।

অকুতোভয় রোবার কিন্তু এতগুলো লোকের আস্ফালনেও এতটুকু ঘাবড়ালেন না। এবং নিজ কর্তব্যে অবিচল থেকে এবার বললেন, 'আপনারা যাই ভাবুন না কেন, অদূর ভবিষ্যতে কিন্তু 'ফ্লাইং মেশিন'-ই আসছে। আচ্ছা, আপনারাই বলুন তো, পাখি কি করে আকাশে উড়ে বেড়ায়? আমি বলব, বেলুন নয় বলেই। তারা প্রত্যেকেই এক একটা যন্ত্রবিশেষ। আর মানুষের মধ্যে এই যে আকাশে ওড়ার প্রেরণা জেগেছে তা কিন্তু পাখিদের ওড়া দেখেই। প্রকৃতির যন্ত্রবিদ্যাকে অনুকরণ করেই আপনাদের আকাশে উড়তে হবে। তাই আমি বলছি কি, অসম্ভবকে সম্ভব করার অবাস্তব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিয়ে বাস্তবকে আঁকড়ে ধরুন। অতিকায় অ্যালবেট্রস প্রতি মিনিটে দশবার ডানা ঝাপটায়, পেলিক্যান প্রতি মিনিটে সত্তরবার। আর মৌমাছি? তারা মিনিটে এক' শ' বিরানব্বইবার আর মাছি ডানা ঝাপটায় মিনিটে তিন শ' ত্রিশবার। আরো আছে, লুসি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, একটা ফড়িং-এর ওজন মাত্র দু-গ্রাম হলেও সে কিন্তু অনায়াসেই চারগ্রাম ওজন বয়ে নিয়ে উড়ে যেতে পারে। এবার আপনারই বলুন তো. শূন্যে ওড়ার সমস্যার সমাধান কি সেদিনই হয়ে যায় নি? আর

www.pathagar.com

আমাদের জানাই আছে, ডানার দৈর্ঘ্য প্রস্থ যা হবে সে অনুপাতে জীবটার আয়তন কম হবেই। এই হচ্ছে প্রকৃতির কলকব্জা, প্রকৃতির সৃষ্ট ব্যবস্থা, ঠিক কিনা?'

'আবার আমি বলছি এ প্রকৃতি বিশিষ্ট যন্ত্রই হচ্ছে, অর্থটাস, স্ট্রিওফোর্স আর হেলিকপটর্স।'

এবার পেলড কী প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, বলছি, অবিকল স্প্রিংয়ের মতোই পাখি লাফিয়ে ওঠে, হেলিকপটরের মতোই খাড়াভাবে লাফিয়ে ওঠে। আমাদের ভুললে চলবে না। কেবল আমেরিকাই নয় বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারগণও একের পর এক ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলোকে লক্ষ করে শূন্যে ওড়ার পরিকল্পনাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে।

এবার কী বলছি শুনুন, বেলুনে চেপে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে অন্তত দশ বছর সময় লেগে যাবে। আর কেবল একসপ্তাহে উড়ন্ত যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীটাকে একবার চক্কর মেরে আসা সম্ভব।'

ক্লাবের সেক্রেটারি ইভান্স এবার আর মুখ না খুলে পারলেন না। তিনি কণ্ঠস্বরে উষ্মা প্রকাশ করেই বললেন, 'আকাশযান নিয়ে তো অনেক বক্তৃতা ঝাড়লেন। এখন জিজ্ঞাসা, আসলে কী সেটা কোনোদিন চাক্ষুষ করেছেন? নাকি কোনোদিন তাতে চেপেছেন? আকাশ জয় করেছেন কি জনাব?' আপন সিদ্ধান্তে অবিচল থেকেই রোবার এবার ম্লান হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, চেপেছি? আকাশযানে অবশ্যই আমি চেপেছি। আর আকাশজয়? তাও আমি অবশ্যই করব!'

উপস্থিত সদস্যগণসমস্বরে বলে উঠলেন 'সাবাস রোবার! জয় আকাশ বিজয়ী রোবারের জয়!'

'হ্যাঁ, একদম ঠিক কথা বলেছেন, 'আকাশ-বিজয়ী'। 'আকাশ-বিজয়ী' যথাযোগ্য উপাধিই বটে।'

রোবার সরবে বিদ্রূপাত্মক হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে তুলে এবার বললেন, 'ছিঃ! আপনারা না নিজেদের আমেরিকান বলে গর্ব করেন।'

রোবার তাঁর পিস্তল দুটো থেকে পর পর পাঁচ-ছয়টা ফাঁকা আওয়াজ করলেন। কেউ হতাহত হলেন না বটে, কিন্তু দোঁয়ায় ঘরটা প্রায় ঢেকে গেল।

হলঘরের সবাই যখন পরিস্থিতিটার মোকাবেলা করতে, দোঁয়ার কবল থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালাচ্ছেন ঠিক তখনই রোবার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ফেললেন। চোখের পলকে সেখান থেকে গা ঢাকা দিয়ে দিলেন। কী করে যে কী ঘটে গেল সদস্যদের কেউ টেরও পেলেন না।

বেলুনবাজগণ আজই প্রথম যে হামলা হুজ্জতি করছে তাই নয়। বরং তাদের নিত্য নিয়ত হৈ হুল্লোড়ের ফলে পথচারীরা মহা সমস্যায় পড়ে গেল। যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হল। প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দিতে বাধ্য হল। পুলিশ লাঠিচার্জ করে তবে শান্তি ফিরিয়ে আনে।

ক্লাবের সম্পাদক রীতিমতো তড়পাতে লাগলেন, 'যত্তসব বে-আক্কেলি কাজ। আমি ক্লাবের সভাপতি হলে এমন ন্যাক্কারজনক একটা কাজ কিছুতেই হতে দিতাম না। উটকো একটা ভুঁইফোড় আপদ এসে এতগুলো শিক্ষিত লোকের মাথার ওপর বেমালুম ছড়ি ঘুরিয়ে গেল। আর আমরা তা মুখবুজে হজম করলাম!'

'হতচ্ছাড়া শয়তানটাকে মুখই খুলতে দিতাম না।'

www.pathagar.com

তর্কাতর্কি করতে করতে তাঁরা দুজনে পথ পাড়ি দিতে লাগলেন। তাঁদের সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল আঙ্কল প্রুডেন্টের ভৃত্য ফ্রাইকোলিন। তাঁরা বেঁহুস হয়ে বিবাদ করতে করতে বাড়ি ফিরছেন। ফ্রাইকোলিন আচমকা পিছন ফিরে তাকাতেই রীতিমতো চমকে উঠল। দেখল, পাঁচ-পাঁচটা ছায়ামূর্তি তাঁদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সে ব্যাপারটা দেখে আতঙ্কিত হলেও বিবাদে লিপ্ত প্রভুকে কিছু বলার সুযোগই পেল না। তবুও সে বিপদাশঙ্কায় তার প্রভুকে ছায়ামূর্তির মতো মানুষগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে। তাঁদের তর্কাতর্কি তখন তুঙ্গে উঠে গেছে। ছায়ামূর্তিগুলো ক্রমেই এগিয়ে আসছে। উভয় দলের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে। ফ্রাইকোলিন প্রমাদ গুণল। অনিশ্চিত ভয়ে তার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে আসতে লাগল।

অস্থিরচিত্ত ফ্রাইকোলিন কাঁপা কাঁপা গলায় কোনোরকমে উচ্চারণ করল, 'মাস্টার আঙ্কল! মাস্টার আঙ্কল!'

আঙ্কল প্রুডেন্ট গর্জে উঠলেন, 'এ কী বেয়াদপি! ষাঁড়ের মতো এমন চিল্লাচিল্লি—'

কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না তিনি। অকস্মাৎ ঘাড় ঘুরাতেই পিছনে সার্চ লাইটের আলোয় তাঁর চোখ ঝলসে যাবার অবস্থা। আর সঙ্গে সঙ্গে পাশের মাঠ থেকে বাঁশি বেজে উঠল। বাঁশি আর সার্চ লাইটের মধ্যে ইঙ্গিতে কিসের যেন একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল মনে হল।

মুহূর্তের মধ্যেই ষণ্ডামার্কা ছয় জন লোক তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা তাঁদের মুখে কাপড় চাপা দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলল। এবার পাল্লা আঁটা ছোট ছোট তিনটা আলমারির মধ্যে তাদের ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে ছিটকিনি এঁটে দেয়া হল।

তাঁরা কিছুই বুঝতে পারলেন না, বন্দি করে কোথায় তাঁদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ফিলাডেলফিয়া শহর তোলপাড় করে নিখোঁজ ক্লাব সভাপতি আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং সম্পাদক ফিল ইভান্সের খোঁজ করা হল। না, কোনো হদিসই মিলল না। ব্যাপারটা রহস্যজনকই বটে।

এদিকে চোখ মুখ ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অদৃষ্টবিড়ম্বিত তিনটি প্রাণী প্রায় অন্ধকার একটা কামরার মেঝেতে পড়ে গোঙাচ্ছেন। ফ্রাইকোলিন তো এমনিতেই আধমরা হয়ে পড়েছিল। তার ওপর এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পড়ায় কোনোরকমে তার ধড়ে প্রাণটুকু আছে। ব্যস, এটুকুই।

ফিল ইভান্স কিন্তু এত সহজে অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে রাজি নন। তিনি হামাগুড়ি দিয়ে আলগা করার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালাতে লাগলেন। দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি হাত দুটোকে বাঁধন মুক্ত করতে সক্ষম হলেন। এবার চোখ ও মুখের বাঁধন খুলতে দেরি হল না। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দেওয়ালের তাকে একটা ছুরি খুঁজে পেলেন। ব্যস, পায়ের বাঁধন কেটে তিনি নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত করে নিলেন।

এবার তিনি চির প্রতিদ্বন্দ্বী সভাপতি সাহেবেরও যাবতীয় বাঁধন কেটে মুক্ত করে দিলেন। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিবাদ বটে, কিন্তু তাঁকে জব্দ করার বা শত্রুতাচরণ করার সময় এটা নয়।

বাঁধনমুক্ত হয়ে আঙ্কল প্রুডেন্ট যন্ত্রচালিতের মতো একলাফে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফিল ইভান্সকে বুকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ধন্যবাদ,

www.pathagar.com

ধন্যবাদ ফিল ইভান্স! আমরা কিন্তু এ মুহূর্তে আর ওয়েলডন ইনস্টিটিউশনের সভাপতি আর সম্পাদক নই। এখন আমাদের একমাত্র পরিচয় অজ্ঞাত শত্রুর হাতে উভয়ে বন্দি। এ শত্রু আমাদের চরমতম শত্রু!'

'রোবার! রোবার! আমাদের চরমতম শত্রু অজ্ঞাত পরিচয় সেই রোবার!' ফিল ইভান্স দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠলেন।

আঙ্কল প্রুডেন্ট অপেক্ষাকৃত গলা নামিয়ে এবার বললেন, 'মি. ইভান্স, আগে আমাদের জরুরি কথাগুলো সেরে নেয়া দরকার। প্রাণে বাঁচার চিন্তা! অসম্ভবকে সম্ভাবনাময় করার পরিকল্পনা করে নিতে হবে।'

'আমরা যখন ভাগ্যগুণে বাঁধনমুক্ত হতে পেরেছি তখন আর এখানে, বাঘের খপ্পরে পড়ে না থেকে চলুন, পালাবার পথ খুঁজি।' ফিল ইভান্স বললেন।

ফিল ইভান্স ব্যস্তহাতে ফ্রাইকোলিনের বাঁধন খুলে দিলেন। এবার দরজা খুলে পালানোর চেষ্টা করলেন। ব্যর্থ প্রয়াস। বাইরে থেকে তালা দেয়া। এবার ছুরির ফলাটা দিয়ে দেয়ালে দাগ কেটে পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে আঁচ করে নিতে চেষ্টা করলেন। এবারও হতাশ হতে হল। দেয়াল-কাটা বা ছিদ্র হওয়া তো দূরের ব্যাপার সামান্য আঁচড় পর্যন্ত পড়ল না।

চাপা আর্তস্বরে ফিল ইভান্স এবার বলে উঠলেন, 'হায় ঈশ্বর। এ কি বিপাকে ফেললে! আমাদের কোথায় এনে বন্দি করলে!'

আঙ্কল প্রুডেন্ট হতাশার স্বরে বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার তো! তবে কিলোহার চাদর দিয়ে দেয়ালটা—'

'লোহার চাদর হলে অবশ্যই ঠকঠক আওয়াজ হত। লোহা বা কাঠ কোনোটাই নয়। ইস্পাতও এর কাছে হার মানতে বাধ্য।'

আঙ্কল প্রুডেন্ট উন্মাদের মতো দেয়ালটার গায়ে অনবরত কিল চড় লাথি মেরে চাপা গর্জন করতে লাগলেন।

ফিল ইভান্স এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাতটা চেপে ধরে বললেন, 'এ কী করছেন মি. প্রুডেন্ট। মাথা গরম করার সময় এটা নয়। মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমাদের পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে।'

আঙ্কল প্রুডেন্ট এবার ফিল ইভান্সের হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে উন্মাদের মতো কয়েকবার দাগ কেটে হতাশার স্বরে বললেন, 'মি. ইভান্স, আজব ব্যাপার তো! দেয়ালটা কৃস্টালের তৈরি নাকি?'

ফ্রাইকোলিনের পক্ষে মাথা ঠাণ্ডা রাখা সম্ভব হল না। সে গলা ছেড়ে রোবারের পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করতে লাগল। সে যেন রীতিমতো ক্ষেপা কুকুরের মতো দাপাদাপি জুড়ে দিল।

আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ফিল ইভন্স উভয়েই নিঃসন্দেহ হলেন, দরজা দিয়ে বেরোনো ছাড়া কয়েদখানা থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছুমাত্রও সম্ভাবনা নেই। কারণ, কেবল দেয়ালই নয় এমনকি কামরার মেঝেটাও এমন অদ্ভুত একটা ধাতু দিয়ে তৈরি তাও তাঁরা বুঝতে পারলেন না। বার কয়েক পা ঠুকে আরো বুঝলেন, মেঝেটা ফাঁপা। ধপধপ আওয়াজ হচ্ছে। আর বিচ্ছিন্ন শব্দগুলো মেঝে ও দেয়ালের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপারটা তাঁদের কাছে আরো রহস্যজনক মনে হতে লাগল। মনে হল, কয়েদখানা যেন এখন আর আগের মতো নিশ্চল নিথর নয়—চলমান।

আঙ্কল প্রুডেন্ট ফুসফুস নিঙড়ে ঘরময় দীর্ঘশ্বাস চড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'মি. ইভান্স, মনে হচ্ছে, কামরাবন্দি অবস্থায় আমরা চরতে শুরু করেছি। আপনি কিছু বুঝতে পারছেন না? তবে কি আমাদের শয়তান রোবারের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

ফ্রাইকোলিনের কাঁধে চেপে জায়গাটা সম্বন্ধে আঁচ করে নেয়ার চেষ্টা করলেন। একঝলক দেখে নিয়েই তিনি বলে উঠলেন, 'মি. প্রুডেন্ট এ যে সাধারণ ব্যাপার নয়! জাহাজের পোর্টহোলে পেট মোটা যে বিশেষ কৌশলে তৈরি কাচ ব্যবহার করা হয়, দেখলাম সে-রকম কাচ এতে ব্যবহার করা হয়েছে।'

ফিল ইভান্স ছুরির বাঁট দিয়ে কাচটার গায়ে আঘাত করতে লাগলেন। বৃথা চেষ্টা। সেটা ভাঙা বা চিড় খাওয়া তো দূরের ব্যাপার তার গায়ে সামান্য আঁচড় পর্যন্ত লাগল না। কেবল কয়েকবার খটখট আওয়াজ হল। এ যেন সিমেন্ট পদ্ধতিতে তৈরি বিচিত্র ধরনের কাচ।

ফিল ইভান্স এবার কাচের ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন, 'মি. প্রুডেন্ট, কী আশ্চর্য ব্যাপার! ক্রমেই যে আমরা রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছি! এটা দিয়ে যে বাইরের কোন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হতচ্ছাড়াটা আমাদের যে-কোনো ভাগাড়ে এনে ফেলেছে ঈশ্বরই জানেন!'

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই সশব্দে দরজা খুলে বিশালদেহী এ পুরুষমূর্তি কামরার দরজা আগলে দাঁড়াল। নির্বাক নিস্পন্দ ও নিশ্চল-নিথর পুরুষমূর্তিটার চোখ মুখের গাম্ভীর্যের ছাপটুকু আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ফিল ইভান্সের নজরে এড়াল না।

আঙ্কল প্রুডেন্ট আঁতকে উঠে বললেন, 'রোবার! হ্যাঁ, রোবারই তো!'

রোবারের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মাননীয় বেলুনবাজরা, অনুগ্রহ করে শুনুন, আপনারা মুক্ত। যেখানে খুশি যেতে পারেন। কিন্তু মনে রাখবেন, অ্যালবেট্রস ছেড়ে যাবার চেষ্টা অবশ্যই যেন করবেন না। অবশ্য এর বাইরে যাবার চেষ্টা করে লাভ কিছুই হবে না। হতাশ হাওয়া ছাড়া—'

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই আঙ্কল প্রুডেন্ট সোল্লাসে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'মুক্ত! আমরা মুক্ত!'

উল্লাস করতে করতে তাঁরা তিন বন্দি ছুটোছুটি করে কামরাটা থেকে বাইরে বেরিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

আঙ্কল প্রুডেন্ট ভীতসন্ত্রস্ত মুখে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্ছারণ করলেন, 'হায় ঈশ্বর! রোবার আমাদের এ কোথায় এনে ফেলেছেন। এ যে মনে হচ্ছে, সমতল ভূমি থেকে অন্তত চার হাজার ফুট উঁচু কোনো এক অজানা অচেনা অঞ্চলে নিয়ে এসেছেন।'

একসময় বিজ্ঞানী ক্যামিল ফ্লাম্যালিওন প্রশ্ন করেছিলেন, 'মানুষ কবে পৃথিবীর বুকে এমন করে হামাগুড়ি দেয়া ছেড়ে আকাশের বুকে শান্তিতে বিচরণ করতে পারবে, বলুন তো?'

তিনি প্রশ্নটার উত্তর শুনেছিলেন, 'যেদিন মানুষ যন্ত্রবিদ্যার ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করে শূন্যে ওড়ার বিদ্যা আয়ত্তে আনতে পারবে, সেদিন।'

www.pathagar.com

১৭৮৩ সাল। সে বছর ম্যালফিয়ের ব্রাদার্সের আবিষ্কৃত ফায়ার বেলুন শূন্যে ওড়ার অনেক আগেই চালর্স নামে এক চিকিৎসক পাখির মতো শূন্যে উড়ে বেড়াতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এটাকেই প্রথম যান্ত্রিক প্রচেষ্টা বলে স্বীকার করা হয়েছে।

এ পৌরাণিক কাহিনীর ব্যাপার। সম্প্রতিকালে পেরুগিয়ার দান্তে, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ও উইডট্রি শূন্যে ওড়ার ব্যাপারে যান্ত্রিক সহায়তা গ্রহণ করেন।

এরও আগে ষোলো শো বিরানব্বই সালে মার্কুইস দ্য ব্যাকুইভিল পাখা লাগিয়ে সিমের ওপর দিয়ে ওড়ার চেষ্টা করে হাত-পা ভাঙেন।

সতের শো আটষট্টি সালে পকট্রন দুটো প্রপেলার যুক্ত একটা যন্ত্রের পরিকল্পনা করলেন। তাদের একটার কাজ হবে শূন্যে ভাসতে সাহায্য করা আর দ্বিতীয়টা আকাশযানটাকে সামনে পিছনে নিয়ে যাবে।

সেটা ছিল সতের শো একাশি খ্রিস্টাব্দ। সে বছর প্রিন্স অব ব্রঅডেনের মি. বেন অত্যাধুনিক ও অবিশ্বাস্য ধরনের আকাশযান গড়ে তুললেন।

সতের শো চুরাশিতে বেনভেনু এবং মলয় উদ্ভাবন করলেন হেলিকপ্টার।

তারপর আঠারো শো আট সালে অস্ট্রেলিয়ার জ্যাকুইস ডেগেন আকাশে ওড়ার প্রয়াসে লিপ্ত হন। আঠারো শো দশে বাতাসের চেয়ে ভারি যন্ত্র বাতাসে ওড়াবার সূত্র ব্যাখ্যা করে ইস্তাহার ছাপিয়ে প্রচার করেন নামাতেনের ভেলে।

এর পর আঠারো শো দশ সাল থেকে শুরু করে আঠারো শো চল্লিশ পর্যন্ত কয়েক বছরের মধ্যে বহুকীর্তির স্বাক্ষর রাখেন ডারব্লিনগার, ডুগেটেট, ভিন্ডায়াল আর সার্তিকা গনিয়ার্ড দ্র ল্যাটুর।

আঠারো শো বিয়াল্লিশে বাষ্পচালিত প্রপেলারের সাহায্যে শূন্যে ওড়ার কাজে মাতলেন ইংল্যান্ডের হেসনস।

বিজ্ঞানী কমাস প্রপেলার উদ্ভাবন করেন আঠারো শো পঁয়তাল্লিশ সালে।

আঠারো শ' সাতচল্লিশে ব্যামিল ভঁাট অবিকল পাখির ডানার মতো ডানাযুক্ত হেলিকপ্টর তৈরি করে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন।

১৮৫২ সালে দুদুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। ল্যাটুর যন্ত্রচালিত প্যারাসুটে চেপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে আত্মাহুতি দিলেন। আর চারটে ঘূর্ণায়মান ডানা সম্বলিত যন্ত্রের ওপর নির্ভর করে শূন্যে ভ্রমণে প্রয়াসী হলেন।

এবার প্রয়াসী হলেন রোবার। তিনি অ্যালবেট্রেসের মতো একটা অত্যাশ্চর্য ওড়ার ইঞ্জিন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এটা কেবল বাতাসের অনুকূলেই নয়, প্রতিকূলেও অনায়াসেই যেতে পারে। দীর্ঘগবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—(ক) হেলিকপ্টার বা স্পাইরালিফারের প্রপেলার দণ্ডের ওপর নির্ভর করে ঘুরবে; (খ) অরথপ্টার-পাখির মতো শূন্যে ওড়ার এক যন্ত্র বিশেষ এবং (গ) এরাপ্লেন প্রপেলারের শক্তির ওপর নির্ভর করে চ্যাপটা এমন একটা যন্ত্র যার সাহায্যে শূন্যে উড়বে।

দীর্ঘ নিরলস ভাবনা চিন্তার ফলস্বরূপ রোবার প্রথম দুটো যন্ত্র মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেন। নিঃসন্দেহ হলেন, এদের পক্ষে আকাশে ওড়া সম্ভব নয়।

খুবই সত্য বটে—এরোপ্লেনের সুবিধা যথেষ্ট। প্রপেলারকে হাওয়ায় কাত করে ঘোরাতে পারলেই কাজ হাসিল। ব্যাস, এবার বাতাসই তার গায়ে চাপ প্রয়োগ করে তাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

সহজ পন্থা অবলম্বন করলেন রোবার। দুই সিরিজ প্রপেলার এতে ব্যহার করেছেন। একটা আকাশযানটাকে স্বাভাবিক গতিবেগে চালিয়ে নিয়ে চলেছে আর অন্যটা অ্যালব্রেটসকে শূন্যে ভেসে থাকতে সাহায্য করছে।

রোবার তার অত্যাশ্চর্য ওড়ার যন্ত্রটাকে তৈরি করতে গিয়ে দুটো কৌশল প্রয়োগ করেছেন—পাখির মতো ডানা মেলে অ্যালবেট্রস আকাশে উড়ছে। আর হেলিকপ্টার ডানার সাহায্যে কোণাকুনি বাতাস কেটে শূন্যে উড়ছে।

সত্যি বলতে কি, অ্যালবেট্রস যন্ত্রবিজ্ঞানের এক অবিশ্বাস্য আবিষ্কার। যন্ত্রটা মোটামুটি তিনটি অংশে বিভক্ত। কলকব্জা, প্লাটফর্ম ও ভেসে থাকা ও চলার যন্ত্র।

কিছু স্প্রিং খোলের নিচে সারিবদ্ধভাবে আটকে দেয়া হয়েছে। এদের কাজ হচ্ছে ভূমি স্পর্শ করার সময় যেন খুব আটকানো রয়েছে। ডেকের সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রপেলারগুলো অনবরত ঘুরে চলেছে। এক-একদিকে এক-একটা খুঁটির জোড়ায় প্রপেলার ঘুরছে। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই, সংঘর্ষের প্রশ্নই ওঠে না।' এ ডেকে চুয়াত্তরটা প্রপেলার পুরোদমে হরদম ঘুরেই চলেছে। সামনে পিছনে অ্যালবেট্রসকে নিয়ে যাওয়ার জন্য টেবিলপাখার মতো ঘুরছে।

রোবার তাঁর তিনজন পূর্বসুরী লানডেলি, পকট্রন এবং কমাসের পদ্ধতির একত্র সমাবেশ ঘটিয়ে অ্যালবেট্রসকে তৈরি করেছেন। তিনি অতিকায় এ-যন্ত্রটাকে বিদ্যুতের সাহায্যে চালাচ্ছেন। অবাক হাবার মতো ব্যাপারই বটে। অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন বিদ্যুৎই শিল্পজগতের প্রাণস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। ইলেকট্রোমোটরের সাহায্যে রোবার তার প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ তৈরি করে নিয়েছেন। তিনি এমন কিছু ব্যাটারি ও অ্যাকুমুলেটর তৈরি করেছেন যার গোপন রহস্য তিনি কারোর কাছেই ফাঁস করেন নি। অমিত শক্তিশালী ব্যাটারিতে তিনি কোনো অ্যাসিড ব্যবহার করেছেন, আর অ্যাকুমুলেটের পজিটিভ ও নেগেটিভ প্লেটে কোনো ধাতু ব্যবহার করেছেন—কোনো তথ্যই কারোর কাছে ব্যক্ত করেন নি।

ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও সম্পাদক যদি বিদ্যুৎ তৈরি রহস্য উদ্ঘাটক করতে না পারেন তবে অত্যাশ্চর্য এ আবিষ্কারের পদ্ধতি চিরদিন গোপন অন্তরালেই থেকে যাবে।

এমন কোনো ধাতব প্লেট ব্যবহার করে রোবার তাঁর অ্যালবেট্রসকে গড়েছেন যে, পিল ইভান্সের ইস্পাতের ছুরির ফলা পর্যন্ত দুমড়ে মুচড়ে একেবারে ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেল। তবে কি সেটা ধাতু না, কাগজ? কয়েক বছর ধরে তো বিজ্ঞানীগণ ইস্পাতের চেয়ে সুদৃঢ় কাগজ তৈরির জন্য নিরলস গবেষণায় লিপ্ত। তবে কি তাঁদের প্রয়াস সার্থক হয়েছে? সে-রকম অবিশ্বাস্য কাগজ তৈরি করে ফেলেছেন? তাঁরা কি তবে ছেঁড়া-ফাটা টুকরো টুকরো কাগজ স্টার্চ আর ডেক্সট্রিন দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে, জলের চাপে নিঙড়ে নিয়ে ইস্পাতের চেয়েও সুদৃঢ় কাগজ তৈরি করে বিস্ময়ের কারণ হয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রোবার তাঁর আকাশ যানটাকে তৈরি করতে এরকম অত্যাশ্চর্য জিনিস কেন ব্যবহার করলেন? এর একটাই উত্তর—হাল্কা ও অধিকতর সুদৃঢ় বলে। সত্যিই আবিষ্কারটা অত্যাশ্চর্যই বটে। এটা এমনই এক জিনিস যা ভাঙা বা কাটা তো যায়ই না, এমনকি আগুনেও পোড়ে না। শুধু কি এই? প্রপেলারের বিভিন্ন অংশ আর ইঞ্জিন পর্যন্ত জিলেটিন মিশ্রিত ধাতু দিয়ে তৈরি। খুব বেশি চাপ প্রয়োগ করলে বেঁকে

www.pathagar.com

দুমড়ে যাবে কিন্তু ভাঙবে না কিছুতেই। তরল কোনো পদার্থ বা গ্যাস, এমনকি এসেন্স বা অ্যাসিডও একে গলিয়ে দিতে সক্ষম নয়। এটা প্রথম শ্রেণীর বিদ্যুৎরোধক অন্তরায়।

উড়োজাহাজ অ্যালবেট্রসে মাত্র আটজন যাত্রী। রোবার নিজে, তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী মেট টম টার্নার, একজন ইঞ্জিনিয়ার, দুজন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, দুজন চালক এবং একজন পাচক।

যুদ্ধের জন্য যে-সব অস্ত্রশস্ত্র দরকার অ্যালবেট্রসে সবকিছুরই ব্যবস্থা রয়েছে। বৈদ্যুতিক বাতি, স্যাক্সটান্ট, কম্পাস, স্ট্র-গ্লাস, শার্তোমিটার, ব্যারোমিটার, মাছ ধরার সরঞ্জামাদি, টেলিস্কোপ, ছাপাখানা, তিন ইঞ্জিন বিশিষ্ট কামান, ডিনামাইট, কার্তুজ, গোলাবারুদ, বৈদ্যুতিক উনুন আর কয়েকমাস চলার মতো খাবারদাবার জমা করে রাখা হয়েছে। আর? আছে বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র ট্রাম্পেস্ট।

কোনো আকস্মিক কারণে যদি একটা প্রপেলার ভেঙে পড়ে বা বিকল হয়ে যায় তবু অ্যালবেট্রস মুখ থুবড়ে পড়বে না। অনায়াসে শূন্যে ভেসে থাকতে সক্ষম হবে। এগিয়ে চলার কাজও অব্যাহত থাকবে।

অতিথিদের কাছে সবকিছু খোলাখুলি আলোচনা করতে গিয়ে রোবার বললেন, 'শুনুন, সুবিশাল বায়ুসমুদ্রে রয়েছে আমার একাধিপত্য। পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ জুড়ে রয়েছে ইকারিয়ান বায়ুস্তর। এখানকার অধিপতি আমিই। আর আমার অ্যালবেট্রস, আমার পক্ষীরাজ—আমার নির্ভরযোগ্য বাহন।'

অ্যালবেট্রস ঘন্টায় এগার 'নট' গতিতে ধেয়ে চলেছে। পায়ের তলার মরু নদীটাকে মনে হচ্ছে ফিতের মতো সরু একটা বস্তু। সূর্যের কিরণ পড়ে হ্রদটার জল চকচক করছে। পাহাড়ের সারি দ্রুত ছুটে গিয়ে দিগন্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

ফিল ইভান্স বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে পাহাড়ের সারির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বললেন, 'মি. রোবার আমরা কি পৃথিবী প্রদক্ষিণে লিপ্ত?'

ম্লান হেসে রোবার জবাব দিলেন, 'তার চেয়েও বেশি কিছু মনে করতে পারেন।'

কপালের চামড়ায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ এঁকে আঙ্কল প্রুডেন্ট বললেন, 'আপনার উদ্দেশ্যটা কী? আমাদের যদি ভালো না লাগে তবুও কি আপনার সঙ্গে যেতে হবে?'

'ভালো লাগছে না! ভালো না লাগলেও যেতেই হবে, কোনোই উপায় নেই।'

রোবার মুখে তাঁদের অতিথি বলে সম্বোধন করেছেন সত্য, কিন্তু কার্যত তাঁদের সঙ্গে কয়েদির মতো আচরণ করে চলেছেন।

কয়েকমুহূর্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে এক সময় ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপাত্মক হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'এখন কী বুঝছেন? বাতাসের চেয়ে ভারী কোনো যন্ত্রকে কি শূন্যে ওড়ানো সম্ভব?'

অ্যালবেট্রস এবার মন্ট্রিয়েল শহর অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। একটু আগেই কুইবেক শহর ছাড়িয়ে এসেছে। এখন এর গতি ঘন্টায় পঁচাত্তর মাইল।

মন্ট্রিয়েল শহর চোখের আড়ালে চলে গেলে ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগল ওটাল জলপ্রপাত। সফেন জলপ্রপাতটাকে এত উঁচু থেকে দেখে মনে হতে লাগল, কড়াইয়ে বুঝি টগবগ করে জল ফুটছে।

পার্লামেন্ট হাউস, যার পলিক্রোম স্থাপত্য উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে।

www.pathagar.com

এবার অ্যালবেট্রস মুখ ঘুরিয়ে উল্কার বেগে ছুটে চলল। অধিকতর দ্রুতগতিতে ঘুরতে লাগল। এমন অবিশ্বাস্য গতির কথা আকাশচারীরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। এখন তার গতিবেগ ঘণ্টায় বাইশ নট।

রেলগাড়ির গতিবেগ ঘণ্টায় পঁয়ষট্টি থেকে আশি মাইল। এবং জার্সিসিটির লোকোমোটিভ ঘণ্টায় চুরাশি মাইল পর্যন্ত ছুটতে পারে। ট্রেনটন-এর গতিবেগও এরই সমান। আর আইসবোট ছুটতে পারে ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে।

বাস্তবিকই রোবারের অহঙ্কার করা অসঙ্গত নয়।

৬০০ মাইল বেগে ছুটে অ্যালবেট্রস আটদিনেরও কম সময়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার ক্ষমতা রাখে, যে-সে ব্যাপার নয়।

রোবারের সহযোগী মেট টম টার্নার পৃথিবীবাসীকে ট্রাম্পেস্ট শুনিয়ে আনন্দদান করছে। রোবারের কীর্তিও কম নয়। তিনি আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার মনুমেন্টগুলোর শীর্ষে পতাকা উড়িয়েছেন।

রোবার এতদিন সবার অলক্ষ্যে নিজেকে, নিজের সৃষ্ট অ্যালবেট্রসকে রেখেছেন। দিনে মেঘের আড়ালে চলেছেন, রাত্রে আলো না জ্বালিয়ে আত্মগোপন করে রয়েছেন। কিন্তু এখন তো আর এর দরকার নেই। কারণ, ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের বেলুনবাজদের সঙ্গে বাজিধরা আর সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে টেক্কা দেয়ার চেষ্টায় ব্রতী হওয়া একই কথা।

রোবার এবার আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্সের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমি বাতাসে ভর দিতে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম, পেরেছি কি না নিজের চোখের সামনেই তো আপনারা দেখলেন। আর এও স্বীকার করতে দ্বিধা থাকার কথা নয় যে, বাতাসের চেয়ে হাল্কা বস্তুর পক্ষে আকাশে ওড়া সম্ভব নয়, কী বলেন?

এবার দেখুন, অ্যালবেট্রস বেলুনের মতো সোজা ওপরে উঠে আপনাদের নতুন করে চমক লাগিয়ে দিচ্ছে।

রোবারের কথা শেষ হতে না হতেই অ্যালবেট্রস বিকট আওয়াজ করে সোজা ওপরের দিকে উঠতে লাগল। চোখের পলকেই যেন সেটা ৮,৭০০ ফুট ওপরে উঠে গেল। ব্যারোমিটারের পারদ ৪৮০ মিলিমিটার নেমে গেল।

রোবার বেশিক্ষণ এত ওপরে থাকার ঝুঁকি নিতে উৎসাহী হলেন না। কারণ বেশি ওপরে অক্সিজেনের অভাব।

অ্যালবেট্রস নিচে নেমে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণাকুনি ধেয়ে চলল।

কয়েকবার ঢোক গিলে একটু শক্তি সঞ্চয় করে বেশ একটু রাগতস্বরেই আঙ্কল প্রুডেন্ট বললেন, 'ইঞ্জিনিয়ার রোবার আপনি কোন বিশেষ তত্ত্বের প্রতি আগ্রহী তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। তবে কোন অধিকারে আপনি আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিলেন? কোনো অধিকারেই বা আমাদের এখানে কয়েদ করে রেখেছেন, জানতে পারি কি?'

'আপনারাই বা কোন অধিকারে আপনাদের ক্লাবের হলঘরে সবাই মিলে আমাকে আক্রমণ করেছিলেন, দয়া করে বলবেন কি?'

ফিল ইভান্স এবার মুখ খুললেন, 'আমরা আপনার কাছ থেকে আমাদের প্রশ্নের জবাব চেয়েছি। পাল্টা প্রশ্ন অবশ্যই নয়! কোন অধিকারে আপনি আমাদের ওপর একের পর এক জুলুম চালাচ্ছেন, জবাব দিন?'

www.pathagar.com

'জবাব? জবাব চাচ্ছেন? আমি যদি বলি বলপূর্বক, তবে ?'

'বল? এ তো রীতিমতো মানববিদ্বেষের ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, এরকম মনে করলেও আপানাদের অনুমানকে নিছক ভ্রান্ত বলে উড়িয়ে দিতে পারব না সম্পাদক সাহেব।'

অস্থিরচিত্ত আঙ্কল প্রুডেন্ট বলে উঠলেন, 'আপনার বল দেখছি জুলুমের ব্যাপার! আপনার অধিকারটা আর কতক্ষণ আমাদের ওপর চালাবেন, দয়া করে বলবেন কি?'

তাঁর কথাটা শেষ হতে না হতেই অকস্মাৎ বুক কাঁপানো গর্জন শোনা গেল। আচমকা প্রবল ঝড় উঠলে যেমন তীব্র গর্জন হতে থাকে ঠিক তেমনি একটা শব্দ কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবার জোগাড় করল। পায়ের তলায় শুধুই জল আর জল। এ জলের যেন কূলকিনারা নেই।

জলপ্রপাত। জলপ্রপাতের ওপরে তিন মাইল লম্বা সেতু। তার ওপর দিয়ে সরীসৃপের মতো রেলগাড়ি চলেছে কানাডা থেকে আমেরিকার তীরে।

ফিল ইভান্স উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ওই নায়েগ্রা!—নায়েগ্রা জলপ্রপাত!'

দানবাকৃতি আকাশযানটা উল্কার বেগে বাতাস কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে।

আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ফিল ইভান্সের মনে একই ভাবনা বারবার উঁকি দিচ্ছে, 'রোবারের প্রকৃত ইচ্ছাটা কী? তাদের দিয়ে কী করাতে চাচ্ছেন?'

১৪ জুন। অ্যালবেট্রস আকাশচুম্বী পাহাড়ের ওপর দিয়ে ধেয়ে চলেছে। এবার আকাশযানটা বিশালায়তন একটা সরোবরের দক্ষিণ তীর অতিক্রম করল।

রাতের অন্ধকারে ইরি পেরিয়ে এবার লেকমিচিগান ডিঙিয়ে শিকাগো শহরের ওপরে হাজির হয়েছে।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আঙ্কল প্রুডেন্ট বললেন, 'মি. ইভান্স, ওটা যদি শিকাগো শহরই হয়ে থাকে তবে আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের এমন এক জায়গায় টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যাতে আমরা সহজে সেখান থেকে ফিরে আসতে না পারি।'

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! দীর্ঘসময় রোবারের দেখা নেই। কোথায় তিনি? কাজে ব্যস্ত, নাকি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন?

অ্যালবেট্রস ছুটছে তো ছুটছেই। প্রতি সত্তর মিটার ওপরে উঠলে তাপমাত্রা একডিগ্রি করে কমতে থাকে। প্রায় দু-ঘণ্টার মধ্যেই অ্যালবেট্রস ওহামার ওপর দিয়ে উল্কার বেগে উড়ে গেল। পেসিফিক রেলপথের সদর কার্যালয় ওহামা। সাড়ে চার হাজার মাইল রেলপথ নিইউয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকো পর্যন্ত বিস্তৃত। অদ্ভুতদর্শন আকাশযান অ্যালবেট্রসকে দেখে ওহামাবাসীরা তাজ্জব বনে গেল। অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কত জল্পনা কল্পনাই করল।

ব্যস, আর কথা নয়। আমেরিকার খবরের কাগজওয়ালারা উঠে পড়ে লেগে গেল। এতদিন তাদের কাছে অ্যালবেট্রস ছিল প্রহেলিকামাত্র। আজ চোখের সামনে তাকে দেখতে পেয়ে কৌতূহলের অবসান ঘটে গেল। তাঁরা ব্যাপারটাকে ফলাও করে খবরের কাগজের পাতায় ছাপাল।

প্যারিস রেলপথ চোখের সামনে ভেসে ওঠামাত্র আঙ্কল প্রুডেন্ট আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। তাঁর মাথায় খুন চাপার জোগাড় হল। তিনি রাগে ফোঁস

www.pathagar.com

ফোঁস করতে করতে ফিল ইভান্সকে বললেন, 'শয়তান রোবারের স্পর্ধা তো কম নয় দেখছি। আমাদের কয়েদ করে কোন মুল্লুকে নিয়ে চলেছন! অ্যালবেট্রস যে একেবারে বিপরীত মুখে ছুটে চলেছে!'

ফিল ইভান্সও বেশ রাগতস্বরেই বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার তো! আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো দামই তিনি দিচ্ছেন না!'

বিকাল পাঁচটা। ব্ল্যাকমাউন্টেনের ওপর দিয়ে অ্যালবেট্রস দ্রুতগতিতে ছুটে চলল।

রাত্রিটা নির্বিঘ্নেই কেটে গেল।

অ্যালবেট্রস এবার পুরো আড়াই ঘণ্টা উড়ে রকি পর্বতমালা অতিক্রম করল। এখন ঘণ্টায় বাষট্টি মাইল বেগে আকাশযানটা সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ বরাবর চলেছে।

আমাদের পায়ের তলায় তীব্রগতিতে একটা ট্রেনকে ছুটে যেতে দেখলাম। অ্যালবেট্রস এবার বিচিত্র এক খেয়ালে মেতে গেল।

নিচে নেমে গিয়ে ট্রেনটার সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগল।

ট্রেনের যাত্রীরা জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে কৌতূহলমিশ্রিত যে-সব কথাবার্তা বলছে তাও অ্যালবেট্রস থেকে শানা যেতে লাগল।

বেলুনবাজরা এমন অপূর্ব একটা সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ। তারা গলা ছেড়ে বলতে লাগলেন, 'আমি ফিলাডেলফিয়ার আঙ্কল প্রুডেন্ট।'

'আমিফিল ইভান্স ফিল ইভান্স।'

কিন্তু ব্যর্থপ্রয়াস। গলা ফাটানো চেঁচামেচিই সার হল। ট্রেন যাত্রীদের উল্লাসে তাঁদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল।

মুহূর্তকাল পরেই অ্যালবেট্রস গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। এবার শুঁয়োপোকার মতো অগ্রসরমান ট্রেনটা ক্রমেই দূরে সরে গিয়ে একসময় নজরের বাইরে চলে গেল।

এবার আমরা মনোরম রাজধানী সল্টলেক সিটির ওপর দিয়ে উড়ে গেলাম। আমাদের যা সবচেয়ে বেশি বিস্ময় উৎপাদন করল তা হল অবতল কাচের তৈরি গম্বুজযুক্ত ট্যাবপুন্নাকানের ছাদ।

অ্যালবেট্রস এবার ১৮০ মাইল রেললাইন পেরিয়ে কালিফোর্নিয়ার রাজধানী সানফ্রান্সিসকোর ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল।

এবার অকস্মাৎ রোবারের আবির্ভাব ঘটল। তাঁকে দেখেই আঙ্কল প্রুভেন্ট উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলে উঠলেন, 'ইঞ্জিনিয়ার! এ কী রসিকতায় মেতেছেন, বলুন তো! এবার আপনার রসিকতা ক্ষান্ত দিলে হয় না?'

রোবার কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে বললেন, 'দেখুন জনাব রঙ্গ রসিকতার ধার আমি ধারি না। যখন যা করছি মুখ বুজে দেখাই আপনাদের একমাত্র কাজ বলে আমি মনে করি।' কথাটা আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ফিল ইভান্সের উদ্দেশ্যে ছুড়ে দিয়ে গটগট করে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অ্যালবেট্রস দ্রুত নিচে নামতে শুরু করল। একসময় সেটা সামান্য দুলে ভূমি স্পর্শ করল।

রোবার আগেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থাস্বরূপ অতিথিদের কামরাবন্দি করে রাখলেন। শত চেষ্টা করেও যাতে তাঁরা উড়োজাহাজটা থেকে বাইরে বেরোতে বা চম্পট দিতে না পারে।

www.pathagar.com

আঙ্কেল প্রুডেন্ট ও ফিল ইভান্স ভেতরে ভেতরে গজরাতে লাগলেন। তাঁদের একটাই চিন্তা, যে-কোনো উপায়েই এ মরণফাঁদ থেকে পালাতেই হবে।

অ্যালবেট্রস এবার উত্তর মহাসাগরের ওপর দিকে ছুটতে লাগল। বিচিত্র আবার রাত্রিহীন অঞ্চল। দিন এখানে দীর্ঘস্থায়ী। প্রকৃতির বিচিত্র সব খেয়াল মানুষের বোধগম্যের বাইরে।

রোবার ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে আপনমনে চুরুট টেনে চলেছেন। বেলুনবাজরা কামরাবন্দি অবস্থাতেই প্রহর গুণে চলেছেন।

রোবারের নির্দেশে অ্যালবেট্রসের অধিকাংশ প্রপেলার বন্ধ করে দেয়া হল। ফলে আকাশযানটার গতি অনেকাংশে মন্থর হয়ে এল।

অ্যালবেট্রস এবার ধীরগতি যানের মতো প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে সমুদ্রের ওপর দিয়ে এগোতে লাগল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের সমুদ্র দানবদের মতো অতিকায় তিমিরা দলে দলে নাক উঁচিয়ে জলের ওপর অলসভাবে ভেসে বেড়াতে লাগল। অ্যালবেট্রসে তিমি শিকারের হারপুন ও বর্শা সবই রয়েছে।

রোবার যদিও অহেতুক প্রাণী নিধনের পক্ষপাতী নন, তবুও অ্যালবেট্রসে ক্ষমতার পরিচয় দিতে গিয়ে হারপুনবিদ্ধ করে তিমি মারার হুকুম জারি করলেন।

তিমির নাকের সুবিশাল ছিদ্র পথে ফোয়ার মতো তীব্র বেগে জল ওপরে উঠে যেতে লাগল।

অ্যালবেট্রস থেকে ছুড়ে দেয়া দড়ির প্রান্তে বেঁধে দেওয়া হুকের সঙ্গে একটা তিমি আশ্চর্যরকমভাবে গেঁথে গেল। এবার আরো মজার ব্যাপার শুরু হয়ে গেল। তিমিটা ছুটোছুটি দাপাদাপি শুরু করে দিল। অ্যালবেট্রসও তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেড়াতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অবিশ্বাস্য এককাণ্ড ঘটে গেল। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত তিমিটা ঝট করে উল্টে একেবারে কাছাকাছি চলে গেল। পরমহূর্তেই দানবটা জলে ডুব দিল। আধঘণ্টায় ছয় মাইল বেগে ছুটে চলল। অ্যালবেট্রসও তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগল। সে এক রোমহর্ষক ব্যাপার!

একসময় পরিশ্রান্ত তিমিটা এলিয়ে পড়ল। রোবার এবার দড়িটাকে গোটাবার নির্দেশ দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় নিস্তেজ তিমিটা অ্যালবেট্রসের কাছাকাছি, প্রায় পঁচিশ ফুট তলায় চলে এল। এবার আচমকা তিমিটা ডিগবাজি খাওয়ায় অ্যালবেট্রসে অস্বাভাবিকরকম ঝাঁকুনি খেল। বাধ্য হয়ে দড়িটাকে কেটে দেয়া হল। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেলে অ্যালবেট্রস এক ধাক্কায় অনেকখানি ওপরে উঠে গেল। মৃত তিমিটা ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে লাগল।

১৭ জুন। অ্যালবেট্রস এবার অ্যালুইসিয়ান ও আলাস্কা দ্বীপপুঞ্জের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল। এখানে আমেরিকানরা সিলমাছের কারবার ফেঁদেছে। ছয় সাত ফুট সিলের চামড়া তিন চারশো পাউন্ড দামে বিক্রি হয়।

আকাশযান অ্যালবেট্রস একনাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা ছুটে ১২০০ মাইল পথ পাড়ি দিল। এবার কামচাটকা উপদ্বীপের ওপর দিয়ে ধেয়ে চলল।

রোবারের অতিথি বেলুনবাজরা ভাবলেন, রোবার বুঝি চীন ও জাপানের পথে চলেছেন।

www.pathagar.com

১৮ জানুয়ারি আকাশযানটা অ্যালবেট্রস কামচাটকা উপদ্বীপ পেরিয়ে ক্লুটসু আগ্নেগিরির দিকে ধেয়ে চলল।

১৯ তারিখ আকাশযান উত্তর ও দক্ষিণ জাপানের মধ্যবর্তী উপত্যকা অতিক্রম করে চলল। এবার সাইবেরিয়ার আমুর নদী আকাশচারী বেলুনবাজদের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

এবার অ্যালবেট্রস এক মহাসমস্যার সম্মুখীন হয়। ১৩০০ ফুট ঘনকুয়াশার স্তরের মধ্যে হাজির হয়েছে। বহু চেষ্টা চরিত্রের পর কোনোরকমে কুয়াশার স্তরটা অতিক্রম করতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল ঝলমলে রোদের কিরণ।

বেলুনবাজগণ যাও পালাবার ক্ষীণ আশা পোষণ করছিলেন এখন তা মন থেকে নিঃশেষে মুছে না ফেলার উপায় দেখলেন না।

রোবার বিদ্রূপাত্মক স্বরেই উচ্চারণ করলেন, 'মি. প্রুডেন্ট, কী বুঝলেন? দেখলেন তো, আমার পঙ্খীরাজ অ্যালবেট্রস কেমন কুয়াশার ঘন আস্তরণকে তছনছ করে অনায়াসে উপরে উঠে এল? এর গতিরোধ করার ক্ষমতা কার আছে, বলুন?'

রোবার বিদ্রূপাত্মক মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বিদায় নিতেই ফিল ইভান্স দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলেন, 'হতচ্ছাড়াটার দম্ভ আস্ফালন অসহ্য। তাঁর সবকিছুর মধ্যেই বেপরোয়াভাব প্রকাশ পায়!'

আঙ্কল প্রুডেন্টও ফোঁস করে উঠনে, 'পরিস্থিতি শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় দেখাই যাক না মি. ইভান্স।'

আরো কিছু দূর এগোতেই আচমকা উৎকট একটা গন্ধ নাকে এল। নাড়িভুড়ি—অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে রে বাবা!

উৎকট গন্ধটাই শহরটার নাম স্মরণ করিয়ে দেয়, টোকিও জাপানের রাজধানী।

রোবার রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আপনমনে চুরুট টেনে চলেছেন। একসময় ঠোঁট থেকে চুরুটটা নামিয়ে, বিতৃষ্ণায় চোখ মুখ বিকৃত করে আচমকা বলে উঠলেন, 'আরে বাবা, ব্যাপারটাকে চেপে রাখার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে কী-ই বা লাভ, মাথায় আসছে না।'

বিশালায়তন আকাশযান অ্যালবেট্রস এবার সোজা পূর্বমুখী ধেয়ে চলল।

আকাশচারীরা হঠাৎ প্রমাদ গুণলেন। ঝড়, প্রলয়ঙ্কর ঝড় আসছে। ঘূর্ণিঝড়, টাইফুন। পৃথিবীটাকে যেন চোখের পলকে দলে, মুচড়ে পিষে একাকার করে ছাড়বে।

ব্যারোমিটারের পাদর চোঁ চোঁ করে নিচের দিকে নামতে শুরু করল।

ভাগ্যের জোর ভালো। টাইফুন সোজা দক্ষিণ দিকে হামলা হুজ্জতি চালাবার জন্য ধেয়ে চলল। তবে হ্যাঁ, টাইফুন আকাশচারীদের স্নায়ুর ওপর কিছু সময়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করলেও তার পরিবর্তে কিছু সুবিধা অবশ্যই দিয়ে গেল। কুয়াশার স্তরটাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আকাশকে নির্মল, একেবারে স্বচ্ছ করে দিয়ে গেল।

বাইশ চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত তিনদিনে অ্যালবেট্রস এক-এক করে পিহো উপত্যকা ও পিটিলি উপসাগর অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে সিলসটিয়াল এম্পায়ারের দিকে এগিয়ে চলল।

মাঞ্চু নগরের কেন্দ্রস্থলে আঠারো শো একর অর্থাৎ তিন মাইল এলাকা জুড়ে পীত শহরটা আকাশচারীদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল।

www.pathagar.com

আকাশ জুড়ে কয়েক শো ঘুড়ি উড়তে দেখা গেল। তালপাতার ঘুড়ি। প্রত্যেকের মাথায় একটা করে মিহি কঞ্চি দিয়ে ঘুড়ি বাঁধা। ঘুড়ি যত ওপরে উঠছে ধনুকগুলো ততই বাঁশির মতো বিচিত্র সুর সৃষ্টি করে চলেছে। ব্যাপারটা এমন মনে হল, ঘুড়িগুলো যেন নির্মল অক্সিজেন সেবন করে মনের সুখে গলা ছেড়ে গান গাইছে।

রোবারের মাথায় হঠাৎ কী যেন এক কৌতূহল চাপল। অ্যালবেট্রসকে সোজা নিচের দিকে নামিয়ে ঘুড়িগুলোর কাছাকাছি এনে স্থির রাখলেন।

ব্যস, আর দেখতে হল না। শহরবাসীরা হঠাৎ একেবারে ক্ষেপে যাওয়ার জোগাড় হল। মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার বন্দুকের নল ঊর্ধ্বমুখী হয়ে দমাদম গুলি ছুড়তে মেতে গেল। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আকাশযানটাকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যই তাদের এত তোড়জোড়।

ব্যাপারটা এবার চৈনিক জ্যোতির্বিদগণের কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। এতদিনে রহস্যসৃষ্টিকারী সশরীরে হাজির হয়েছে। এতদিন তবে এ হতচ্ছাড়াটাই পৃথিবীবাসীগণকে ধোঁকা দিচ্ছিল। আর এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত বিস্ময়! জনসাধারণের দোষই বা কী? বাঘা বাঘা রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত ফ্যাকাশে মুখে ভেবেছেন, আকাশপথে এক অলুক্ষণে উপদেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। কী সর্বনেশে কাণ্ডরে বাবা। ঈশ্বর বুদ্ধের দেশে এ কী অপদেবতার নিরবচ্ছিন্ন তাণ্ডব শুরু হয়েছে। চারদিকে মারমার রব উঠল, 'বন্দুকের গুলি ছোড়ো! কামান দাগো! শিগগিরই আপদটাকে দেশের সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দাও।!'

নিচে অবস্থানরত মানুষগুলোর কাণ্ডকারখানা নিয়ে আকাশচারীরা মোটেই ভাবিত নন। তাঁরা কৌতূহলবশত অ্যালবেট্রসকে বারবার নামা ওঠা করিয়ে, গোঁত্তা মারিয়ে ঘুড়িগুলোর সুতো কাটার কাজে মেতে গেলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আকাশ ঘুড়ি মুক্ত হল। তাদের বাজনা গেল থেমে। এবার ট্র্যাম্পেস্ট বাজনায় আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

কয়েক মিনেটের মধ্যেই বিকট আওয়াজ তুলে কামানের একটা গোলা ঊর্ধ্বাকাশের দিকে উঠে গেল। রোবার আর বিপদের ঝুঁকি নিতে নারাজ। আচমকা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তার সাধের অ্যালবেট্রসকে সোজা ওপরে, অনেক ওপরে তুলে নিল।

অ্যালবেট্রস ক্রমেই দাক্ষিণ পশ্চিম দিকে ধেয়ে চলল। বেলুনবাজদের বুঝতে অসুবিধা হল না, রোবার এবার ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

অ্যালবেট্রস উল্কার বেগে পিকিং শহরকে অতিক্রম করে চীনের ইতিহাস বিজড়িত প্রাচীরটাকে ডিঙিয়ে তিব্বতের সীমান্তে হাজির হল। চারদিকে শুভ্র সমুজ্জ্বল পাহাড়ের চূড়া ও তিব্বতের সমভূমি বেলুনবাজগণের চোখ ও মনকে তৃপ্ত করল।

ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের দিকে চোখ পড়তেই বোঝা গেল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় তেরো হাজার ফুট ওপর দিয়ে অ্যালবেট্রস ধেয়ে চলেছে। তাপমাত্রা ক্রমেই নামতে লাগল। আর একটু নামলেই জল জমে বরফ হয়ে যাবে।

শীত একেবারে হাড়ে গিয়ে আঘাত হানছে। বেগতিক দেখে বেলুনবাজগণ ব্যস্তপায়ে কেবিনে ঢুকে গেলেন।

এ অঞ্চলে বাতাসের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। ফলে প্রপেলারগুলোর ঘূর্ণনগতি অস্বাভাবিকরকম বাড়িয়ে দিতেই ফল।

www.pathagar.com

২৬ জুন। আকাশচুম্বী একটা বাঁধার প্রাচীর বেলুনবাজগণের চোখের সামনে ভেসে উঠল। সফেন দুধের মতো সাদা বরফে ঢাকা পর্বতচূড়া, এভারেস্ট তাঁদের চোখ ও মনের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল।

২৮ জুন অ্যালবেট্রস জাগু প্রদেশের মাথায় হাজির হল। একদিকে নেপালের সারিবদ্ধ পাহাড়ের চূড়া আর অন্যদিকে ভারতবর্ষের প্রবেশপথ। দুটো পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথ ব্যবহার করে অ্যাবেট্রস বাতাস কেটে কেটে অগ্রসর হচ্ছে।

আঙ্কল প্রুডেন্ট বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছেন, দুশো বা বেশিসংখ্যক পর্বত যেন কাঁধ ধরাধরি করে সদম্ভে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে সতেরটা চূড়া একেবারে আকাশছোঁয়া, উচ্চতা পঁচিশ হাজারেরও বেশি ছাড়া কম নয়। আর মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা উনত্রিশ হাজারেরও বেশি। তারই ডানদিকে সদম্ভে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ধবধবে সাধা ধবলগিরি। উচ্চতার বিচারে এভারেস্টের পরেই এর স্থান—ছাব্বিশ হাজার আট শো ফুট।

রোবার কিন্তু মোটেই অপরিণামদর্শী খামখেয়ালি প্রকৃতির নন। পর্বতগুলো ডিঙোবার পথেও গেলেন না। তিনি অ্যালবেট্রসকে বাইশ হাজার ফুট উঁচু ইবাগানিম গিরিপথ ধরে উড়িয়ে নিয়ে চললেন। এখন এর গতিবেগ অবিশ্বাস্য। বাতাস কেটে কেটে তেইশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে রোবারের পঙ্খীরাজ উড়ে চলেছে।

একসময় রোবার এসে মুচকি হেসে বেলুনবাজগণের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বললেন, 'মাননীয় অতিথিগণ, এবার রূপসী ভারতবর্ষকে চাক্ষুষ করে চোখ ও মনকে তৃপ্ত করুন।'

রোবারের কিন্তু রূপ সৌন্দর্যের আকর হিন্দুস্থানের প্রতি কোনো আকর্ষণই নেই। তাই যদি সত্য হয় তবে কি অহেতুকই আকশচুম্বী হিমালয়কে ডিঙোবার ঝুঁকি নিতেন? নাকি তাঁর সৃষ্ট বাতাসের চেয়ে ভারী আকাশযান অ্যালবেট্রসের কৃতিত্ব প্রদর্শনই একমাত্র উদ্দেশ্য? তবে? তবে তার অক্লান্ত পরিশ্রম প্রয়াস মাঠে মারা যাচ্ছে না তো? কারণ, এত দিনের মধ্যে বেলুনবাজরা কিন্তু একটিবারের জন্যও মুখ ফুটে তার কৃতিত্ব, তাঁর আকাশযান অ্যালবেট্রসের প্রশংসা করলেন না। তবে হ্যাঁ, মনে মনে তাঁরা প্রশংসা করছেন কিনা তা অবশ্য রোবারের জানা নেই। করবেনই বা কী করে? যাঁরা আকাশযানটা থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য প্রতিনিয়ত ব্যস্ত তাঁদের মুখ থেকে তাঁর অনন্য কীর্তির প্রশংসা পাওয়া পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়।

অ্যালবেট্রস এবার পাঞ্জাবের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চীন ও তুর্কিস্থানের মধ্যবর্তী আকাশপথে সেটা ধেয়ে চলল।

২৯ জুন। বেলুনবাজগণ রূপসী তন্বী যুবতী ভূস্বর্গ কাশ্মীরের রূপসৌন্দর্য দেখে যারপরনাই মুগ্ধ হলেন। এ যেন পাহাড়ে ঢাকা, সবুজে মোড়া একটা স্বর্গোদ্যান।

এবার কলকল্লোলিনী হিড্যাসলেম নদীর ক্ষীণরেখা আকাশচারীদের চোখের সামনে ফুটে উঠল। একসময় গ্রিকদেশ আর ভারতবর্ষ এ অববাহিকায় তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। দুর্ধর্ষ যুদ্ধোন্মাদ গ্রিকবীর আলেকজান্ডার আর স্বাধীনতাপূজারী দেশমাতৃকার সুযোগ্য সন্তান পুরুরাজ একসময় এখানেই সম্মুখসমরে লিপ্ত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ম্যাসিডোনিয়ারাজ যে দুটো বিজয়নগরী স্থাপন করেছিলেন আজ তারা নিশ্চিহ্ন। তারা আজ ইতিহাস।

সকাল আটটার কাছাকাছি অ্যালবেট্রস শ্রীনগরের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলল।

বেলুনবাজগণ পালাবার ধান্ধায় যতই মশগুল হয়ে থাকুন না কেন, রূপসী কাশ্মীর যে তাঁদের চোখ ও মনকে মুগ্ধ করেছে এতে কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। নইলে ফিল ইভান্স আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে কিছুতেই বলতে পারতেন না, 'শ্রীনগর আর ভেনিস যেন একই ছাঁচে গড়া! দুটো পৃথক স্থান হলেও উভয়ের মধ্যে মিল বাস্তবিকই অবিশ্বাস্য!'

এবার একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা বেলুনবাজগণের চোখের সামনে ফুটে উঠল।

তারা লক্ষ করলেন, টম টার্নার ইয়া লম্বা একটা রবারের নলকে নিচের দিকে, একেবারে নদীর জল পর্যন্ত নামিয়ে দিয়েছে। তখন অবশ্য নদী আর অ্যালবেট্রসের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ফুট ত্রিশেক।

ব্যাপারটা এবার বেলুনবাজদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বৈদ্যুতিক পাম্প চালিয়ে নদী থেকে অ্যালবেট্রসে জল তোলা হচ্ছে।

আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভান্সের মধ্যে আশার আলো উঁকি মারল। ত্রিশ ফুট উচ্চতা কোনো সমস্যাই নয়। কোনোরকমে ইষ্টনাম স্মরণ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলেই হল। ব্যস, চিরদিনের মতো কারামুক্তি।

মুক্তির চিন্তা বেলুনবাজদের অস্থির করে তুলল। অত্যুগ্র আশা নিয়ে তারা তিনজনই রেলিঙের দিকে ছুটে গেলেন। কিন্তু হায়! মনের অদম্য আশাকে বাস্তব রূপ দেয়া কিছুতেই সম্ভব হল না। চোখ বন্ধ করে আঙ্কল প্রুডেন্ট যেই না জলে ঝাঁপ দিতে যাবেন অমনি পিছন দিক থেকে দুটো সুদৃঢ় হাত অতর্কিতে তাকে জাপ্টে ধরে ফেলল।

কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে রোবার এতক্ষণ ব্যাপারটা লক্ষ করছিলেন। এবার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বিদ্রূপাত্মক স্বরে উচ্চারণ করলেন, 'মহামান্য অতিথিগণ, আপনারা কি জানতেন না আট জোড়া চোখ প্রতিনিয়ত আপনাদের গতিবিধির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে?'

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে রোবার আবার একই স্বরে বলতে শুরু করলেন, 'মি. প্রুডেন্ট, আমাকে 'আকাশরাজা' উপাধিটা কে দিয়েছে বলুন তো? আপনারা। হ্যাঁ, আপনাদেরই দেয়া এ উপাধিটা। শুনে রাখুন, যে একবার আকাশরাজার সঙ্গে ভ্রমণের সুযোগ পায় তাকে আমৃত্যু এখানে, এ আকাশযানেই কাটাতে হয়। ইচ্ছা করলেই কিন্তু এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।'

রোবারের কথায় আঙ্কল প্রুডেন্ট গুলিবিদ্ধ পশুর মতো গর্জে উঠতে চাইলেন। তাঁর পরিণাম চিন্তা করে ফিল ইভান্স তাঁকে জাপ্টে ধরে ফেললেন। অনেক কায়দা কসরত করে তাঁকে সে মুহূর্তের জন্য অন্তত শান্ত করলেন।

জল সংগ্রহের কাজ মিটিয়ে অ্যালবেট্রস আবার সোজা ওপরে উঠে গেল। এবার তার গতি পশ্চিমমুখী।

ভূস্বর্গ কাশ্মীরকে পিছনে ফেলে অ্যালবেট্রস এবার কাবুলিস্তানকেও অতিক্রম করল।

ভারতবর্ষ অফুরন্ত সম্পদের আকর। তাই তো ক্ষমতা ও অর্থলোভী ইংরেজরা জবরদখল করে এখানে ঘাঁটি গেড়েছে।

www.pathagar.com

বাতাসবাহিত দূরাগত কামানের বিকট আওয়াজ আকাশচারীদের কানে বাজতে লাগল। এসব ব্যাপার স্যাপার নিয়ে রোবার মোটেই ভাবিত নন। তাঁর সময়ই বা কোথায়? সবচেয়ে বড় কথা, যার সঙ্গে তাঁর নিজের আত্মমর্যাদা বা মানবিকতার তিলমাত্র সম্পর্কও নেই, আর আকাশকেই যিনি চিরদিনের মতো একমাত্র অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছেন তিনি মর্তের ভালো মন্দ নিয়ে ভেবে শরীর ও মন খারাপ করতে যাবেনই বা কেন? অতএব কোন্ দেশ ইংরেজদের পদানত বা রাশিয়ার কুক্ষিগত হলে তাতে তার কী-ই বা থাকতে পারে?

চোখের পলকে বালির ঝড় শুরু হয়ে গেল। প্রবল ঝড়। শুধুই বালি আর বালি প্রকৃতির বুকে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়ে দিল। স্থানীয় অধিবাসীরা একে 'তেবাদ' বলে।

অকস্মাৎ উদ্ভূত সমস্যাটা নিয়ে অ্যালবেট্রসের কর্তা রোবারও কম ভাবিত নন। বালির অত্যাচারের কবল থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তিনি অ্যালবেট্রসকে বিপদসীমার ওপরে তুলে নিয়ে গেলেন।

অ্যালবেট্রস এবার দুহাজার ফুট ওপর দিয়ে দুর্বার গতিতে উড়ে যেতে লাগল।

এবার আকাশযানের গতিবেগ অনেকাংশে কমিয়ে নেয়া হল। এবার এটা পারস্যসীমানা ডিঙিয়ে গেল। ২২,০০০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এলবুর্জ পর্বতের চূড়া ও তার পাদভূমি অতিক্রম করে অ্যালবেট্রস এগিয়ে চলল?

২ জুলাই। আকাশচারীরা এবার পায়ের তলার সুবিশাল ও ইতিহাস বিজড়িত শাহ প্রাসাদটা চাক্ষুষ করে চোখ ও মনকে তৃপ্ত করল।

আকাশযান অ্যালবেট্রসের মুখ এখন উত্তর দিকে। আকাশচারীরা এবার পারস্য সীমান্তের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে দ্বিধা বিভক্তকারী কাস্পিয়ান সাগরের অফুরন্ত সৌন্দর্যরাশিকে নয়ন ভরে দেখতে লাগলেন।

রোবারের মতিগতি আদৌ সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না তো। চোখের পলকে ঘুড়ির মত গোত্তা মেরে একেবারে সমুদ্রজলের কাছাকাছি নেমে এল। পর মুহূর্তেই সন্ধ্যার আলো-আঁধারীর মধ্য দিয়ে উপকূলবর্তী অঞ্চল দিয়ে উড়ে চলল। পায়ের তলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলটা এতদিন তুর্কিস্তানের কব্জায় ছিল। সম্প্রতি এটা রাশিয়ার দখলে।

সেটা ছিল ৩ জুলাই। সেদিন আকাশযান অ্যালবেট্রস কাস্পিয়ান সাগরের প্রায় ৩০০ ফুট ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে। এটা ২০০ মাইল দীর্ঘ এবং ২০০ মাইল প্রশস্ত।

এবার কারামুক্তির জন্য ফিল ইভান্স হন্যে হয়ে লেগে গেলেন। তিনি পা টিপে টিপে আঙ্কল প্রুডেন্টের কাছে হাজির হলেন।সাধ্যমত গলা নামিয়ে তিনি বললেন, 'মি. প্রুডেন্ট রোবারের আন্তরিক ইচ্ছার কথা তো আর আমার অজানা নয়। আমৃত্যু আকাশযানেই আমাদের বন্দি করে রাখবেন। যাকে বলা চলে নিষ্ঠুর নির্বাসন দণ্ড। তাই বুঝতেই পারছেন, আমাদের স্বাভাবিক মুক্তি দুরাশা ছাড়া কিছুই নয়। তাই বলছি, এখান থেকে মুক্তির উপায় আমাদের করতেই হবে। আর এখনই আমাদের তৎপর হতে হবে।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আঙ্কল প্রুডেন্ট বললেন, 'মি. ইভান্স, আমিও যে তার মনোভাবের কথা বুঝতে পারছিনা তা নয়। কিন্তু দীর্ঘ পর্যালোচনার মাধ্যমে নিঃসন্দেহ হয়েছি, আমাদের মুক্তি নিতান্তই তাঁর ব্যাপার। আর পরিস্থিতি বলছে, রোবার কাস্পিয়ান সাগর ডিঙিয়ে উত্তর রাশিয়ার ভেতর দিয়ে নয়তো দক্ষিণ দেশ ডিঙিয়ে ইউরোপ

www.pathagar.com

মহাদেশে হাজির হবেন। আমাদের যদি পালাতেই হয় তবে অ্যালবেট্রস আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে হাজির হওয়ার আগেই পরিকল্পনাটাকে বাস্তব রূপ দিতে হবে। ডেকে দড়ি পাঁজা করে রাখা দেখছি। আমরা দড়ি ধরে ঝুলে নিচে নেবে যাব, পরিকল্পনাটা গ্রহণযোগ্য তো, কী বলেন?'

'চমৎকার পরিকল্পনা? কিন্তু রাতের অন্ধকারেও আমাদের ওপরে নজরদারি করার জন্য একজন গাট্টাগোট্টা লোককে নিযুক্ত করা হয়েছে, জানেন অবশ্যই?'

'জানি। কার্যোদ্ধার করতে গেলে একটু-আধটু ঝুঁকি তো নিতেই হবে।'

এদিকে নিগ্রো সন্তান ফ্রাইকোলিন মুক্তির জন্য বদ্ধপাগল হয়ে গেছে। সে মনিব আঙ্কল প্রুডেন্টের পায়ের কাছে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছে। আকাশযান থেকে যে-কোনো মূল্যে মুক্তি পেয়ে মাটির ছোঁয়া পাওয়ার জন্য সে প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়েছে।

ফ্রাইকোলিনের ব্যাপার স্যাপার রোবারের নজর এড়াল না। তিনি ক্ষেপে গিয়ে যে পন্থা অবলম্বন করলেন তাতে কেবল নিগ্রো সন্তান ফ্রাইকোলিনই নয়, তার মনিব আঙ্কল প্রুডেন্ট, পিল ইভান্স পযন্ত কেউ-ই খুশি হতে পারলেন না। তাকে ছোট্ট একটা কামরায় ঢুকিয়ে তালাবদ্ধ করে রাখলেন।

এবার অ্যালবেট্রস উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়তে লাগল। রোবারের নির্দেশে এটাকে জল থেকে মাত্র বিশ ফুট উপরে রাখা হল। সমুদ্রের বুকে কয়েকটা জাহাজ ধীরমন্থর গতিতে গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছে। মাথার ওপরে এমন একটা কিম্ভূতকিমারকার, একবারে অত্যাশ্চর্য সামগ্রীকে উড়ে যেতে দেখে জাহাজের নাবিকদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবার জোগাড় হল। ক্যাপ্টেন দ্রুতগতিতে জাহাজ ছুটিয়ে দিরেন। বলা তো যায় না, দানবাকৃতি বস্তুটা কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মাথার ওপরে রহস্যজনকভাবে চক্কর মেরে বেড়াচ্ছে।

অ্যালবেট্রসকে নিচে নামানোর আগেই রোবার তার সহকর্মীদের ওপর কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, কয়েদিদের ওপর যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

আর একটা অপূর্ব সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ফিল ইভান্স রাগে-দুঃখে নিজেদের চুল নিজেরাই ছিঁড়তে লাগলেন। আর নিগ্রো সন্তান ফ্রাইকোলিন তো মাটিতে পড়ে বাক চাপড়াতে লাগল।

ভূতত্ত্ববিদগণের মতে আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের ফলে কাস্পিয়ান সাগরের সৃষ্টি হয়েছে। আর ভল্গা, উড়াল, কৌর এবং কৌমার প্রাকৃতিক জলরাশি এর সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজ নিজ অস্তিত্ব হারিয়ে বসেছে। দক্ষিণ দিকের প্রস্রবণের প্রচুর পরিমাণ জলরাশি এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে বলে জলের স্বাদ খুব তেতো।

অ্যালবেট্রস আবার গতিবেগ বাড়িয়ে সোজা উত্তর দিকে এগিয়ে চলল।

ক্রোধোন্মত্ত নিগ্রো সন্তানফ্রাইকোলিন তালাবন্ধ ছোট্ট কামরাটার মেঝেতে পড়ে রীতিমতো দাপাদাপি করতে লাগল। আর অবোধ্য ভাষায় রোবারের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে লাগল।

ফ্রাইকোলিনের চিৎকার চেঁচামেচি ও লাফালাফি দাপাদাপিতে রোবারের মত ঠাণ্ডামাথার মানুষেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটার জোগাড় হল। তিনি আর তিষ্ঠোতে না পেরে বিরক্তিভরে বলে উঠলেন, হতচ্ছাড়াটাকে কয়েদ করেও তো দেখছি মহা ফাঁপড়ে পড়া গেল।'

www.pathagar.com

রোবার এবার গুলিখাওয়া বাঘের মতো গর্জে উঠলেন, 'দাও, ঝুলিয়ে দাও!'

ব্যাস, তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই টম টার্নার রাগে গজগজ করতে করতে দরজা খুলে ফ্রাইকোলিনকে জন্তু জানোয়ারের মতো টেনে হিঁচড়ে কমরাটার বাইরে নিয়ে এর। বড় একটা গামলাল তাকে বসিয়ে দেয়া হল। এবার দড়ি দিয়ে বেঁধে গামলাসমেত তাকে একশো ফুট নিচে নামিয়ে দিল। ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে অ্যালবেট্রেস উড়ে চলেছে আর গামলাটা স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী পিছনের দিকে হেলে ঝুলতে লাগল।

মৃত্যুভয়ে ভীত, ফ্রাইকোলিন যে এ-অবস্থায় হার্টফেল করে নি এটাই আশ্চর্য ব্যাপার।

জখমি বিষধর সাপের মত আঙ্কল প্রুডেন্ট গর্জে উঠলেন, 'রোবার, আপনার এ বর্বরোচিত কাজের প্রতিশোধ আমি নেবই নেব। এ কী পাশবিক অত্যাচার শুরু করেছেন আপনি! সুযোগ পেলে আমি এর প্রতিশোধ...'

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ঠোটের কোণে বিদ্রূপাত্মক হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে রোবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'তাই বুঝি? প্রতিশোধ? আপনি যখন খুশি প্রতিশোধ নিতে পারেন, আমি প্রস্তুত।'

ফিল ইভান্স অনেক ভুঝিয়ে শুনিয়ে তাঁকে শান্ত করলেন।

রোবার কণ্ঠস্বরে রীতিমতো উষ্মা প্রকাশ করে বলে উঠলেন, 'মি. প্রুডেন্ট, আপনার ঔদ্ধত্যে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমার শেষ কথা শুনে রাখুন, যদি বেশি হুজ্জতি পাকানোর চেষ্টা করেন তবে আপনার চাকরের সঙ্গে আপনাকেও ঝুলিয়ে দিতে বাধ্য হব।'

আঙ্কল প্রুডেন্ট রাগে কাঁপতে কাঁপতে কী যেন বলার চেষ্টা করলেন। মুখ খোলার সুযোগ না দিয়েই ফিল ইভান্স তাঁকে জাপটে ধরে কেবিনে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

অকস্মাৎ বায়ুমণ্ডল থমথমে হয়ে গলে। ইথারে চাপা অস্থিরতা লক্ষিত হতে লাগল। আকাশচারীগণের বুঝতে দেরি হল না, নির্ঘাত ঝড়ের সঙ্কেত।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিদ্যুতের অকল্পনীয় খেলা শুরু হয়ে গেল। একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এমন অদ্ভুত দৃশ্য ইতিপূর্বে আর কেউ প্রত্যক্ষ করেছেন বলে জানা যায় নি। রহস্যময় অত্যাশ্চর্য এক বাষ্প কুণ্ডলী পাকিয়ে কুমোরের চাকার মতো চক্কর খেতে খেতে মহাশূন্যের দিকে উঠে গেল। আকাশে ঘন মেঘে ঘর্ষণজনিত কারণে ইলেকট্রিক চার্জ হচ্ছে। উদ্ভূত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ দ্রুতগতিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ধেয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেন আকাশের গায়ে আলোর প্রদর্শনী চলছে।

আকাশযান অ্যালবেট্রেসকে এবার প্রবল ঝড়ের মুখোমুখি হতে হল। রোবার থেকে শুরু করে অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দেখা দিল। সবাই যারপরনাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এদিকে ঝড়ের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সমুদ্রও উত্তাল-উদ্দাম রূপ ধারণ করেছে। যেন প্রচণ্ড আক্রোশে অনবরত ফুঁসে চলেছে।

অদৃষ্টবিড়ম্বিত ফ্রাইকোলিন প্রাকৃতিক তাণ্ডবের মধ্যে গামলাটায় বসে দড়ির দোলনায় ঝুলছে। কী মর্মান্তিক পরিস্থিতির মধ্যে বেচারাকে প্রতিটা মুহূর্ত কাটাতে হচ্ছে, ভাবলে গয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। হৃদপিণ্ড শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার জোগাড়।

www.pathagar.com

হায়! এ কী সর্বনাশা কাণ্ড! ডেকে আগুন লেগে গেছে! বাতাস পেয়ে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বেচারা ফ্রাইকোলিনের অবস্থা অনুমান করে তিনি লম্বা লম্বা পায়ে রোবারের কেবিনে ছুটে গেলেন। ফ্রাইকোলিনকে ওপরে তুলে আনার জন্য বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঁচ পেয়েই রোবার তাঁর কর্মচারীদের আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। তারা দ্রুত দড়ি গুটিয়ে মৃতপ্রায় ফ্রাইকোলিনকে ওপরে তুলে নিল।

হায়! এ যে আবার এক নতুন উপদ্রব রে বাবা! হঠাৎ প্রপেলারের ঘূর্ণনগতি অনেকাংশে লাঘব হয়ে এল যে। এ কী কেলেঙ্কারী কাণ্ড! একটা বা দুটো নয়। একসঙ্গে চুয়াত্তরটা প্রপেলারই বিশ্বাঘাতকতা করছে। সেগুলো মুমূর্ষুরোগীর মতো ধুঁকছে। নেহাত চরতে হবে বলেই যেন তিরতির করে ঘুরে চলেছে।

পাওয়ার দরকার। প্রচুর পাওয়ার না হলে অ্যালবেট্রসকে কিছুতেই ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

এদিকে পাওয়ার বৃদ্ধি কী করে সম্ভব? পর্যাপ্ত পরিমাণ কারেন্ট কোথায় যে পাওয়ার বৃদ্ধি করা যাবে?

হায়! এবার সর্বনাশ চরম রূপ নিল। অ্যালবেট্রস দ্রুত নিচে নেমে যেতে লাগল। যে-কোনো মুহূর্তে অ্যালবেট্রস ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

রোবার শত বিপদেও মাথা গরম করার বা মুষড়ে পড়ার পাত্র নন। তিনি কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন, 'ঘাবড়াবে না! দৃঢ় মানোবল নিয়ে যন্ত্র চালনা করো। যত শীঘ্র সম্ভব অ্যালবেট্রসকে বৈদ্যুতিক সীমানা অতিক্রম করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো।'

ডেকের গায়ে কোনো অদৃশ্য হাত যেন অনবরত আতসবাজি জ্বালাচ্ছে। সে যে কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি নিজের চোখে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।

একের পর এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে চলেছে। চোখের পলকে ফুটো বেলুনের মতো অ্যালবেট্রস কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অনেক নিচে নেমে এসেছে। পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া তো দূরের ব্যাপার বরং দ্রুত অবনতি হয়ে চলেছে। পায়ের তলায় ক্রোধোন্মত্ত অনবরত ফুঁসছে। আর অ্যালবেট্রস দ্রুত সমুদ্রের দিকেই নেমে আসছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হয়তো অতিকায় আকাশযানটা সমুদ্রের বুকে আচাড় কেয়ে পড়বে। কোনোক্রমে ইঞ্জিনে জল ঢুকলে তাকে সহসা আর সক্রিয় করে তোলা সম্ভব নয়। ফলে সলিল সমাধি ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

অকস্মাৎ আকাশের গায়ে, একেবারে অ্যালবেট্রসের মাথার ওপরে বৈদ্যুতিক মেঘের কুণ্ডলীর আবির্ভাব ঘটল।

এদিকে আবার অ্যালবেট্রস ক্রমে নিচে নামতে নামতে সমুদ্র থেকে মাত্র ষাট ফুট ওপরে নেমে এল। আর একটু হলেই ডেকটা আর একটু হলেই ডেকটা জলের তলায় তলিয়ে যাবে। ব্যস, সর্বনাশের চূড়ান্ত ঘটে যাবে।

রোবার কিন্তু এতটুকুও মাথা গরম করলেন না, মুষড়ে পড়ে হাত ছেড়ে দিলেন না। তিনি একলাফে এগিয়ে গিয়ে দৃঢ়হাতে লিভার চেপে ধরলেন। এতক্ষণ ইলেকট্রিক চার্জের জন্য অ্যাকুমুলেটর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল।

হ্যাঁ, এবার অত্যাশ্চর্য এককাণ্ড ঘটে গেল। এতক্ষণ যে বৈদ্যুতিক মেঘ আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাই এখন প্রাণরক্ষক হয়ে দাঁড়াল। অ্যাকুমুলেটর যেন অকস্মাৎ

www.pathagar.com

জীবনীশক্তি ফিরে পেল। রেবার লিভারের চাপ প্রয়োগ করামাত্র তীব্রবেগে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে লগাল। ব্যস, অ্যালবেট্রসের নিম্নমুখী গতি বন্ধ হয়ে গেল। এবার চোখের পলকে সেটা জড়ের এলাকার বাইরে চলে গেল।

৪ জুলাই। এদিন কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর সীমানা ডিঙিয়ে অ্যালবেট্রস দ্রুত এগিয়ে চলল।

রোবার ভালোই জানেন, বেলুনবাজগণ একটু সুযোগ পেলেই চম্পট দেবেন। তবুও দিনের পর দিন তিন তিনজন লোকের উপর শ্যেনদৃষ্টি রাখা সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়েই তাদের ওপর থেকে পাহারার ব্যাপারটাকে অনেকাংশে শিথিল করে নিলেন।

বেলুনবাজগণ পালিয়ে যাবার জন্য উদগ্রীব খুবই সত্য। কিন্তু চাইলেই কি আর তা যাওয়া সম্ভব? এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ মাইল। সেটা থেকে লাফ দেবার চিন্তা করলেই ফুসফুসের গত স্তব্ধ হয়ে আসার জোগাড় হয়। আর অ্যালবেট্রসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১২০ মাইলের বেশি। অতএব এটা থেকে পালাবার ধান্দা তো পাগলের খেয়ালমাত্র।

এখন অ্যালবেট্রসের গতিবেগ সোয়ালো পাখির গতিবেগের চেয়েও অনেক বেশি। সোয়ালো পাখি ঘণ্টায় একশো বারো মাইল আর অ্যালবেট্রস এখন ছুটেছে সোয়ালো পাখির চেয়ে বেশি গতিবেগে। এরকম প্রচণ্ড গতিবেগের মধ্যেও বেলুনবাজগণ ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখে চালক চমকে উঠে অ্যালার্মের তাঁদের সচেতন করে দিলেন। তবু তাঁদের কেবিনে যাওয়ার নামটি নেই দেখে কজন কর্মচারী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে তাঁদের ঠেলে ধাক্কিয়ে কেবিনে ঢুকিয়ে দিল।

এমন দানবাকৃতি একটা যন্ত্র যা উল্কার বেগে ছুটতে সক্ষম, তার দেহখাঁচাটা যে অবশ্যই ঠুনকো কোন বস্তু দিয়ে তৈরি নয় তা তো আর কাউকে বলে বোঝাতে হবে না। তাই সঙ্গত কারণেই ঝড় যত তীব্রই হোক অ্যালবেট্রসের কোনো ক্ষতিই করতে পারল না।

কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর তীরে দৃষ্টিনন্দন প্রাচীন শহর আস্ত্রামান শহর চোখে পড়ল। কেউ কেউ একে 'মরু নক্ষত্র' নামেও অভিহিত করে। ঐতিহাসিকগণের মতে এটা পৃথিবীর প্রাচীনতম শহরের সম্মানলাভের অধিকারী।

এবার বেলুনবাজগনের চোখের সামনে ভেসে উঠল ফিতার মতো ভল্গা নদী। সেটি এঁকেবেঁকে হেলেদুলে চলেছে। সাগরে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আসলে ভল্গা নদীটা এক মাইলেরও বেশি চওড়া।

অ্যালবেট্রস, এবার মস্কো শহরকে পিছনে ফেলে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে তো চলেছেই।

মস্কো থেকে শুরু করে প্রায় সাড়ে ৭০০ মাইল বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করছে সেন্ট পিটার্সবার্গ রেলপথ।

পুরো আটদিনের যাত্রাপথ পাড়ি দিয়ে আকাশযান অ্যালবেট্রস সেন্ট পিটার্সবার্গে হাজির হল।

নরওয়েতে পৌঁছে অবশ্য অ্যালবেট্রস এক অকস্মাৎ থমকে যেতে হয়েছিল। তার গতি মন্থর করার কারণ ছিল একটাই, টেলারমার কেনেরগোস্টা পর্বতের আকাশছোঁয়া

www.pathagar.com

চূড়া নিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা। বার কয়েক এদিক ওদিক গোত্তা মেরে এবং ওপরের দিকে ওঠাওঠি করে সে তার চরার পথ ঠিক বের করে নিল।

মুক্তিপাগল নিগ্রো সন্তান ফ্রাইকোলিন কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো ফুলিয়ে ঢোল করে পেলেছে।

এদিকে আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং পিল ইভান্স এবার নিঃসন্দেহ হয়েছেন, শতচেষ্টা করেও রোবারের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে অ্যালবেট্রেস থেকে পালিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাঁরা বহু ভাবনা চিন্তার পর চমৎকার একটা মতলব বের করলেন। ভাবলেন, যে-কোনোক্রমে পৃথিবীবাসীর কাছে তাদের বিড়ম্বিত অদৃষ্টের কথা জানাবেনই। কিন্তু উপায়? কোন দুরাচার বেলুনবাজগণকে হাফিস করেছেন, পৃথিবীবাসীদের জানাবার উপায় কী? জাহাজ হলে না হয় যাবতীয় বৃত্তান্ত লিখে বোতলের ভেতরে ঢুকিয়ে, ছিপি এঁটে জলে ভাসিয়ে দেয়া যেন। আর একদিন না একদিন বোতলটা কারো নজরে পড়তই। তবে এত ভাবনা চিন্তাকে ফলপ্রসূ করার উপায়? আবার পাথরে বা শক্ত মাটিতে পাছাড় খেয়ে বোতল যাবে ভেঙে। ভেতরের চিঠিটা ভাসতে ভাসতে একেবারে বেপাত্তা হয়ে যাবে।

আঙ্কল প্রুডেন্ট অন্যমনস্কভাবে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়েই আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, 'পেয়েছি! পেয়েছি!'

আঙ্কল প্রুডেন্টের চুরুট এবং নস্য দুরকম নেশাই রয়েছে। নস্য ফুরিয়ে গেছে সেই কবে। কিন্তু কৌটাটা ফেলতে তাঁর মন সরে নি। তাই খালি কৌটাটা পকেটের কোণাতেই পড়ে রয়েছে। তিনি নিজেদের বিড়ম্বিত অদৃষ্ট, রোবার এবং তাঁর অত্যাশ্চর্য আকাশযান অ্যালবেট্রেসের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করে লম্বা একটা চিঠি লিখে ফেললেন। এবার সেটাকে দুমড়ে মুচড়ে নস্যার কৌটাটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। সবশেষে এ-ও লিখতে ভুললেন না, চিঠিটা যার হাতেই পড় ক না কেন দয়া করে যেন সেটাকে চিঠিতে বর্ণিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন।

অ্যালবেট্রস এবার ফরাসি উপকূল পেরিয়ে প্যারিসের স্থলভূমির ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। এর আগে কৌটাটাকে ফেলতে গিয়েও আঙ্কল প্রুডেন্ট থমকে গেছেন। দু-দুবারই পায়ের তলায় সমুদ্র ছিল। কৌটাটা জলে পড়লে এত পরিকল্পনা ও প্রয়াস ভেস্তে যেত যে। এবার নিচে বিস্তীর্ণ সমভূমি দেখে তিনি আশান্বিত হয়ে কপালে ঠুকে দিলেন হাতের কৌটাটা শূন্যে ফেলে।

প্যারিস শহরে কৌটাটা ফেলে দিতে পেরে আঙ্কল প্রুডেন্ট যেন পরম স্বস্তি পেলেন। শহরবাসীর যার হাতেই চিঠি সমেত কৌটোটা পড় ক না কেন পুলিশের কাছে আর ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সদস্যদের কাছে খবরট পৌছাবেই।

সকাল প্রায় ছয়টায় অ্যালবেট্রেস সম্পূর্ণ ফ্রান্সের এলাকা ডিঙিয়ে গেল। নয়টায় হাজির হল রোমের আকাশে। আকাশযান অনেকক্ষণ ধরেই মাটির কাছাকাছি দিয়ে উড়ে চলেছে। ফলেসেন্ট পিটার্স গির্জার ছাদে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী বেশ কয়েক জোড়া চোখ আকশদানবের অবিশ্বাস্য কাণ্ড দেখতে লাগল।

আকাশযানকে নেলসন উপসাগর পাড়ি দিতে আরো দুই ঘন্টা সময় লেগে গেল। এবার মুহূর্তের জন্য বিসুবিয়াস আগ্নেয়গিরি আকাশচারীগণের চোখের সামনে ভেসে উঠল। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই আবার সেটা মিলিয়েও গেল। এবার সেটা

www.pathagar.com

ভূমধ্য সাগরকে আড়া আড়িভাবে ডিঙিয়ে হাজির হল তিউনিসিয়ার উপকূলের আকাশে।

অ্যালবেট্রস আমেরিকা, এশিয়া এবং ইউরোপ মহাদেশের আকাশপথে যখন উড়ে যাচ্ছিল তখন তেইশ দিন ক্রমাগত উড়ান হয়ে গেছে। আর সে পাড়ি দিয়েছে মোট আঠারো শো হাজার মাইলেরও বেশি পথ।

এদিকে আঙ্কল প্রুডেন্টের মাথায় এমন একটা চিন্তাই দানা বেঁধেছে। চিঠিসহ ফেলা নস্যর কৌটোটার কী গতি হল? সেটা কি আদৌ কারো হাতে পড়েছে, নাকি অভাবিত উপায়ে নষ্ট হয়ে গেছে?

পাওয়া গেছে! হ্যাঁ, পাওয়া গেছে। চিঠি সমেত নস্যর কৌটোটা দুশো নম্বর বাড়ির সামনের পাকা রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে। আর বরাত খুবই ভালো যে, সেটা একেবারে দারোগা সাহেবের হাতেই পড়েছে।

প্রবীণ দারোগা কৌতূহলবশত ব্যস্ত-হাতে দোমড়ানো কৌটা খুলে চিরকুটটা বের করে চোখের সামনে ধরতেই তাঁর চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে যাওয়ার জোগাড় হল। কপালের চামড়ায় পর পর কয়েকটা চিন্তার ভাঁজ এঁকে দুতিনবার চিঠিটার বক্তব্য পড়লেন। একসময় চমকে উঠে বলে উঠলেন, 'হায় ঈশ্বর! ফিলাডেলফিয়ার ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং সম্পাদক ফিল ইভান্স কারাবন্দি আকাশকারায় বন্দি। ইঞ্জিনিয়ার রোবার তাঁর আকাশযান অ্যালবেট্রস এ উভয়কে বন্দি করে রেখেছেন।' এ কী অবিশ্বাস্য কাণ্ড!

চিঠির শেষে বিশেষ অনুরোধ রাখা হয়েছে, খবরটা যেন তাঁদের বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত মহলে পৌঁছে দেয়া হয়। চিঠির শেষে আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ফিল ইভান্সের স্পষ্টাক্ষরে স্বাক্ষরে রয়েছে।

আরে ব্বাস! মানমন্দিরে কর্মরত বৈজ্ঞানিকগণ আর মহাকাশবিজ্ঞানীগণের দুশ্চিন্তার অবসান ঘটল। দীর্ঘদিনের জমাটবাঁধা আকাশ রহস্যের সমাধান ঘটল এক সম্পূর্ণ অভাবিত উপায়ে। তাদের অবস্থিতির কথা জানতে পেরে সবাই কিছুটা শান্তি পেলেও পুরোপুরি স্বস্তি পাওয়া গেল না। সবার মনেই একটামাত্র প্রশ্নই চক্কর মারতে লাগলকে? কে এ মহাকাশচারী রোবার? কোন দেশীয়? কী-ই বা তাঁর প্রকৃত পরিচয়? আর তাঁর বছরের পর বছর ধরে আকাশবিহারে উদ্দেশ্যই বা কী? তিনি কি আমৃত্যু আকাশপথেই কাটিয়ে দিতে ইচ্ছুক?

রোবার কি তবে তাঁর আকাশযান অ্যালবেট্রসে চেপে নিশ্চিন্তে নিরালায় বিশ্রাম গ্রহণে মগ্ন? কিন্তু যত কৃতী আকাশচারী হোন না কেন, জরুরি প্রয়োজনের তাগিদে মাঝে মধ্যে তো ভূপৃষ্ঠে নামার দরকার অবশ্যই পড়ার কথা। কিন্তু বছরের পর বছর মাটির সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করে অসম্ভব! পাখিরা যে ডানা মেলে আকাশে উড়ে বেড়ায় তাদেরও খাবার সংগ্রহের জন্য ভূপৃষ্ঠে এবং ক্লান্তি দূর করার জন্য রাত্রে বাসায় ফেরে। আর যান্ত্রিক ডানাধারী অ্যালবেট্রসেরও তো কম-বেশি বিশ্রামের প্রয়োজন অবশ্যই থাকার কথা। তবে? এই 'তবে'র উত্তর বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিকগণ মাথা খাটিয়ে বের করতে পারলেন না।

হাজারো জল্পনা কল্পনার পর আর একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সবার মধ্যে স্থায়ী আসনলাভ করল। রোবার কী করে ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি এবং সম্পাদককে তাঁর মহাকাশযান অ্যালবেট্রসে নিয়ে গিয়ে কামরাবন্দি করলেন? আর এ কাজে তাঁর

www.pathagar.com

প্রকৃতি উদ্দেশ্যই বা কী? তাঁদের দিনের পর দিন কয়েদ করে রেখে তিনি কোনো ফায়দা লুটতে চাচ্ছেন? তবে কি এটাই বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত হতে হবে অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ, ভারত ও ফ্রান্স প্রভৃতি অঞ্চল আর আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও পৃথিবীর আকাশচুম্বী পর্বত চূড়াগুলো রোবার তাঁদের চাক্ষুষ করিয়ে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিতেই এরকম একটা অবিশ্বাসী কাজে উৎসাহী হয়েছেন?

আকাশযান অ্যালবেট্রস এবার উল্কার বেগে সাহারা মরুভূমির ওপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। মরুসুন্দরী সাহারা। বালির ওপর সূর্যের অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মি পড়ে তাকে বাস্তবিকই এক রূপসী তন্বী যুবতীর মতো সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

বেলুনবাজদের চোখের সমানে মরুদ্বীপ ওয়েসিস তার রূপ সৌন্দর্যের ডালি মেলে ধরল।

হায়! এ কী সর্বনাশা কাণ্ডরে বাবা! অকস্মাৎ এ কী অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। চোখের পলকে কয়েক শো ইয়া দশাসই চেহারাধারী শকুন অ্যালবেট্রসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কারণ কী? কারণ অবশ্যই আছে। আকাশ তাদের একাধিপত্য। অন্যের উপস্থিতি তাদের কাছে অবশ্যই কাম্য নয়। রোবার কর্মীদের হুকুম দিলেন বন্দুক ছুড়ে অ্যালবেট্রসের গতিপথ কণ্টকমুক্ত করতে। ব্যস, দ্রুম দ্রুম দ্রুম করে বন্দুক ও কামান গর্জে উঠতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে কিছুসংখ্যক শকুনগুলিতে প্রাণ দিল আর কিছু প্রাণ ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে বাঁচল।

অ্যালবেট্রস এবার নিরক্ষীয় অঞ্চলের ওপর দিয়ে উল্কার বেগে এগিয়ে চলেছে। সাহারা মরুভূমির উত্তর সীমান্ত প্রায় ৬০০ মাইল ভিতরের এক স্থানে ১৮৪৬ সালে মেজর লেইভ প্রাণ দেন।

সমস্যা! আবারও সমস্যার সম্মুখীন হল অ্যালবেট্রস। রীতিমতো কঠিন সমস্যা! লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পঙ্গপাল আকাশের গায়ে যেন কৃত্রিম মেঘের সৃষ্টি করে ফেলেছে। অ্যালবেট্রসের সাধ্য কি তাদের বাধা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যায়। উপায়ন্তর না দেখে রোবারের নির্দেশে বিষাক্ত গ্রাস ছেড়ে হতচ্ছাড়া পঙ্গপালগুলো কবল থেকে কোনোরকমে অব্যাহতি পাওয়া গেল।

সুদানের উত্তর সীমান্তে অ্যালবেট্রস এবার হাজির হল। এবার সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে নাইসার নদী আকাশচারীগণের চোখে ধরা দিল। টিমবাকটু শহরও কম মুগ্ধ করল না। অদূর অতীতে শিল্পবিজ্ঞান সাধনার কেন্দ্র হিসাবে এর পৃথিবী জোড়া খ্যাতি ছিল।

আঙ্কল প্রুডেন্ট হটাৎ ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'ইঞ্জিনিয়ার রোবার আপনার হয়তো জানা নেই মুক্তির পথে আমরা অনেকখানি এগিয়ে গেছি। ইউরোপের পথে আপনা আকাশযান যখন খুবই নিচু দিয়ে, ধীর মন্থর গতিতে এগোচ্ছিল তখন চিঠি ফেলা কি খুবই সমস্যার ব্যাপার ছিল? আর নস্যর কৌটোয় করে আমি সে কাজ সেরেও রেখেছি, শুনে রাখুন।'

আঘাত প্রাপ্ত বিষধরের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে রোবার বললেন, 'সে কী মশাই! এবার সন্যর কৌটোর মতো আপনার ব্যবস্থাও যদি করে দেওয়া হয়, তবে?'

www.pathagar.com

'আপনার হাতে পুতুল বনে গিয়ে ধুঁকছি, জানেনই তো? আপনি এখন আমাদের যা খুশি করতে পারেন। আপনার কোনো কাজেই অবাক হবার কিচ্ছু নেই মশাই।'

ক্রোধে অপমানে রোবার ভেতরে ভেতরে ফুলতে লাগলেন। তার ইচ্ছা হচ্ছে, সত্য সত্যই হাজার কয়েক শো ফুট ওপর থেকে বেলুনবাজদের ছুড়ে ফেলে দেন। তবু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

১১ তারিখের ভোর। অ্যালবেট্রস এবার উত্তর গিনি উপকূল অঞ্চলের ওপর দিয়ে উল্কার বেগে উড়ে চলল। অদূরবর্তী দাহোমের রাজ্যকে ঝাঁপসা দেখা যেতে লাগল। রোবার নির্ঘাত আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করতে চাইছেন। নইলে আকাশযানটাকে সেই থেকে সোজা উত্তরমুখী চালাবেন কেন? ছোট্ট রাজ্য দাহোমে নরবলি দেয়ার প্রথা প্রচলন রয়েছে। কর্তিত রক্তমাখা নরমুণ্ড রাজা ও রাজকর্মচারীদের উপঢৌকনস্বরূপ পাঠিয়ে দেয়া হয়। নতুন রাজার সম্মানার্থে নরবলি দেয়ার প্রথাও বহুদিনের।

আকাশযান অ্যালবেট্রস যখন দাহোম রাজ্যের আকাশের ওপর দিয়ে পথ পাড়ি দিচ্ছে ঠিক তখন রাজ্যের বৃদ্ধ রাজা পরলোক গমন করলেন। নতুন রাজার অভিষেকের চিন্তা ভাবনা চলতে লাগল। মাত্র কয়েকদিন আগেই এ লুটেরার দলকে ধরে এনে কয়েদ করে রাখা হয়েছিল। আজ তাদের বলি দিয়েই নতুন রাজার অভিষেকপর্ব সম্পন্ন করা হবে।

কয়েদিদের বধ্যভূমিতে এনে হাজির করা হল। অচিরেই বধ্যভূমি মানুষের তাজা রক্তে রাঙা হয়ে উঠল। একজন মানুষের রক্তপাতের মাধ্যমে দেশের রাজারা অভিষেক হবে। কী অমানবিক কাণ্ড! কী নৃশংস ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে! এমন মর্মান্তিক প্রথার কথা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। হৃদপিণ্ড শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসার জোগাড়।

মুহূর্তের মধ্যেই এক অবভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। দ্রুম... দ্রুম! কামান গর্জে উঠল। অ্যালবেট্রস থেকে কামানের গোলা নিচের দিকে ছুটে চলল। আর দেরি নয়, চোখের পলকে বিচারপতি মিঙ্গানের ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহের রক্তাপ্লুত টুকরো মাটিতে আছড়ে পড়তে লাগল। রোবার তাঁর গোলন্দাজকে কৃতিত্বের জন্য বারবার পিঠ চাপড়ে ধন্যবাদ জানালেন।

বেলুনবাজরা এতক্ষণ যা আশঙ্কা করেছিলেন রোবার কার্যত করলেনও তাই। তিনি এবার অ্যালবেট্রসকে সত্যসত্যই আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চললেন।

বেলুনবাজরা চোখ দুটো কপালে তুলে আটলান্টিকের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন, 'হতচ্ছাড়া রোবারের উদ্দেশ্যটা কী? তিনি একবার অবশ্য বলে ফেলেছিলেন, পৃথিবী প্রদক্ষিণের চেয়েও বড় কিছু অ্যালবেট্রসের পক্ষে করা সম্ভব। কিন্তু তার সে বড় কিছু কী? কোনো কোনোদিন রোবারকে তো মাটিতে নামতে হয়েছিলই। পানীয় জল, খাবারদাবার, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি গোলাবারুদ প্রভৃতি সংগ্রহ তো তাঁকে করতেই হয়েছে। তিনি তবে কোথায় নেমেছেন, বা নামেন? কোথায়ই বা তাঁর সে গোপন আস্তানা? কোন কারণে রোবার মানব সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আকাশপথকে আঁকড়ে ধরতে পারেন সত্য, কিন্তু মাটির সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। অতএব তাঁর গোপন আস্তানাটা কোথায়, কোন দেশে?'

www.pathagar.com

রোবারকে কোনো প্রশ্ন করে লাভ নেই। কোনো উত্তরই তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না। তবে কি তার রহস্যজনক কাণ্ডকারখানার কথা কোনোদিনই সভ্যসমাজের কাছে ফাঁস হবে না।

বেলুনবাজরা রোবারের রহস্যজনক কার্যকলাপের উদ্দেশ্য জানার জন্য সাধ্যাতীত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। এ অনিশ্চিত যাত্রাপথ কোথায়, কবে শেষ হবে এটা জানাই এখন তাদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

পৃথিবীর মোট আয়তনের একটা বড় ভগ্নাংশই জল। এ বিপুল জলরাশি অতিক্রম করতে যে অমিতশক্তির প্রয়োজন তা অ্যালবেট্রসের কোথায়?

অ্যালবেট্রস যখন ইউরোপ মহাদেশ অতিক্রম করে তখন তার গতিবেগ ছিল মিনিটে দুই মাইল। এখন গতিবেগ মিনিটে এক মাইলে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার এ নিয়ে রোবারের কোন উৎকণ্ঠা বা ব্যস্ততা কোনোটাই নেই।.কেন? কেন তাঁর এমন অদ্ভুত আচরণ? কেউ, কোনোদিনই এ রহস্যভেদ করতে পারবে না?

১৮ জুলাই। সমুদ্রের বুকে অকল্পনীয়, একেবারে অবিশ্বাস্য একদৃশ্য লক্ষিত হল। আলোকরশ্মি বিজরিত ঢেউ ষাট মাইল বেগে ধেয়ে যেতে দেখা গেল। প্রায় আশি ফুট দূর থেকে আর একটা ঢেউ যেন তাকে তাড়া করছে। ব্যাপারটা এমন মনে হয় দুটো সচল অত্যুজ্জ্বল পরিখা সমুদ্রের বুকে বিরাজ করছে। এমন অবিশ্বাস্য দৃশ্য রোবারও এর আগে কোনোদিনই দেখেন নি। ফসফরাসের আলোকচ্ছটা সমুদ্রের বুকে আলোক সৃষ্টি করে সত্য। কিন্তু তার আলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের।

অ্যালবেট্রস সাতচল্লিশ সমাক্ষ রেখা অতিক্রম করলে দিনের দৈর্ঘ্য কমে মাত্র সাত ঘণ্টায় দাঁড়াল। ফলে রাত্রি অবশ্যই সুদীর্ঘ। মেরু অঞ্চলে আরো অবাক হতে হবে। কারণ, সেখানে দিন আরো ছোট।

দুপুর একটা। সূর্য মাথার ওপরে অবস্থান করছে। অ্যালবেট্রস আর সমুদ্রের মধ্যে ব্যবধান মাত্র এক শো ফুট। সমুদ্রক্রমে অশান্ত হতে হতে একসময় যেন রুদ্রমূর্তি ধারণ করল। অকস্মাৎ এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। মনে হল অ্যালবেট্রস বুঝি সমুদ্রের ঢেউয়ে তলিয়ে গেছে।

অ্যালবেট্রস সত্যিই অমিত ক্ষমতার অধিকারী। তার ৭৪ প্রপেলার তীব্র বেগে হরদম পাক খেয়ে চলেছে।

একসময় রোবার উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কামান! কামান! কামান দাগ! ঘন ঘন কামান দাগ!'

তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই অভিজ্ঞ গোলন্দাজ মুহুর্মুহু কামান দাগতে লাগল।

পর পর কয়েকবার কামান দাগার পর অবিশ্বাস্য এক ঘটনার মুখোমুখি হলেন আকাশচারীরা। কামানের গোলার আঘাতে পর্বতপ্রমাণ ঢেউগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে লাগল।

স্বীকার না করে উপায় নেই, অ্যালবেট্রস অমিত শক্তিধর অফুরন্ত শক্তির অধিকারী। তার গঠন প্রণালী অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক মজবুত।

থার্মোমিটার, ক্রনোমিটার এবং ব্যারোমিটার অধিকাংশ সময়েই রোবারের হাতের কাছে মজুত থাকে। আর একটা মানচিত্র তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। এদের সাহায্যে তিনি যে

www.pathagar.com

কোনো বিরুদ্ধ প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে তাঁর পক্ষীরাজটাকে দুর্বার গতিতে সঠিক পথে পরিচালনা করতে সক্ষম হন।

~ ফ্রাইকোলিন পালিয়ে অব্যাহতি পাবার জন্য সাধ্যমত সবরকম প্রয়াস চালিয়ে যেতে লাগল। শেষপর্যন্ত সে প্রবীণ পাচকের শরণাপন্ন হতেও দ্বিধা করল না। সে পাঁচকের সামনে দাঁড়িয়ে রোবারের ব্যাপারে বহু অবান্তর কথা বলতে লাগল।

পাচকও কম বুদ্ধি রাখে না। সেও গিলের মতো অসংলগ্ন কথার ফুলঝুরি ফোটাতে লাগল, 'রোবার সাহেব নাকি একসময় আর্জেন্টিনা গণতন্ত্রের মন্ত্রী ছিলেন। তবে আসলে কি জান ভায়া, তিনি নৌবাহিনীর একজন জাঁদরেল সেনাপতি ছিলেন।'

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্যে দিয়ে ফ্রাইকোলিনের মুখের ভাব বুঝে নিয়ে পাচক বলল, 'রোবার সাহেব আসলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ছিলেন।' এরকম পরস্পর বিরোধী ও অসংলগ্ন কথাবার্তায় ফ্রাইকোলিনের উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হলই না, বরং আরো বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে সে রীতিমতো মুষড়ে পড়ল।

কয়েক মুহূর্ত পরে পাচক নিজে থেকেই আবার বলতে শুরু করল, 'টাকার কুমীর ভাই, টাকার কুমীর! রোবার সাহেব একজন সত্যিকারের টাকার কুমীর। অগাধ ধন দৌলৎ না থাকলে কারো পক্ষে এমন একটা আকাশযান তৈরি করা সম্ভব, তুমিই বল? দেশ বিদেশে টাকার পাহাড় তৈরি করে রেখেছেন। প্রয়োজনের সময় কেবল হাত বাড়িয়ে নিতে পারলেই হল। তবে অ্যালবেট্রেসকে তৈরি করতে এবং দিনের পর দিন এর খরচ যোগাতে মি. রোবার এখন প্রায় নিস্ব হয়ে পড়েছেন। পাওনাদাররা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। মাটিতে পা দেয়া-মাত্র সবাই পঙ্গপালের মতো একেবারে ছেঁকে ধরবে। তবে হ্যাঁ, মাটির ছোঁয়া পেতে মন উতলা হয়ে উঠলে চাঁদের মাটিতে নেমে সে—সাধ পূরণ করতে পারেন।'

পাচকের মুখে এসব কথাবার্তা মুনে ফ্রাইকোলিন ছুটতে ছুটতে তার প্রভু আঙ্কল প্রুডেন্টের কাছে হাজির হল। পাচকের মুখে শোনা কথাগুলো হুবহু ব্যক্ত করল।

অ্যালবেট্রেস ছেড়ে পালিয়ে মুক্তি পাওয়ার চিন্তা বেলুনবাজরা মাথাথেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। আবার রোবার স্বেচ্ছায় তাঁদের কোনোদিন মুক্তি দেবেন, এরকম আশা অনেক আগেই তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন। এ মুহূর্তে তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, নিজেদের জান যদি যায়ও যে-করেই হোক অ্যালবেট্রেসকে ধ্বংস করে দেবেন। তবে মতলবটা ফ্রাইকোলিনের কাছে তাঁরা খুবই সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখলেন।

তাপমাত্রা দ্রুত নামতে শুরু করল। একসময় দুই ডিগ্রিরও নিচে নেমে গেল।

অ্যালবেট্রেস এবার পোর্ট ফেমিনকে অতিক্রম করে হাজির হল 'আগুন দেশ' অর্থাৎ ফুরেগেতে।

আরো দুমাসে অ্যালবেট্রেস পাহাড় পর্বত, নদী-নালা আর বন-জঙ্গল ডিঙিয়ে হাজির হল গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে।

অ্যালবেট্রেস এবার ক্রমাগত উত্তরদিকে এগিয়ে উলাসটন দ্বীপকে পিছনে ফেলে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলের ওপর দিয়ে উড়ে চলল। এরপর রূপ-সৌন্দর্যের আকর হর্ন অন্তরীপের আকাশ পাড়ি দিতে লাগল।

২৪ জুলাই। দক্ষিণ গোলার্ধে যখন চব্বিশে জুলাই তখন উত্তর গোলার্ধে হয় চব্বিশে জানুয়ারি। দিনের বেরায় উত্তাপ ও আলো ক্রমে কমতে কমতে সন্ধ্যার অন্ধকার এগিয়ে আসতে লাগল আর ঠাণ্ডাও বেড়ে চলল।

www.pathagar.com

অ্যালবেট্রসের কামরাগুলোকে যান্ত্রিক উপায়ে গরম রাখার ব্যবস্থা করা হল।

বেলুনবাজরা আতকে উঠলেন, 'রোবার এ কী কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটাতে চলেছেন! শীতে দক্ষিণ মেরুতে যাওয়া আর যমপুরীর দক্ষিণ দুয়ারে হাজির হওয়া যে একই ব্যাপার। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।'

তবে আঙ্কল প্রুডেন্টের মনে এটুকুই আশা যে, রোবার ইতিমধ্যে দু-তিন দিনে কয়েকবার ভাড়ারের খাবারদাবারের খোঁজ নিয়েছেন। অতএব তিনি আশা করছেন, খাদ্যবস্তু জোগাড় করতে তিনি অচিরেই কোথাও না কোথাও নামবেন। ব্যস, তখন সুযোগ বুঝে কয়েদিরা চম্পট দেবেন।

এবার মনে হল রোবারের গোপন আস্তানা আর খুব দূরে নয়। কারণ, তিনি অ্যালবেট্রসকে মন্থর গতিতে পশ্চিম দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মনে হল প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো এক অখ্যাত অজ্ঞাত দ্বীপের দিকে তাঁর নজর।

এবার দুধ সাগর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। এর জল দুধের মতো ধবধবে সাদা। এর গোপন রহস্য, কোটি কোটি দ্যুতিময় সূক্ষ্ম কণিকার একত্র সমাবেশ ঘটেছে এ সাগরের জলে।

বেলা বারোটায় টম টার্নার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে রোবারকে জিজ্ঞাসা করল, 'আশ্চর্য ব্যাপার তো। ওই ওই ওটা কী? ওই যে সমুদ্রের বুকে কালো বিন্দুর মতো কী একটা দেখা যাচ্ছে, ওটা কি পাহাড়, নাকি অন্য কিছু?'

রোবার স্বাভাবিকস্বরেই তার প্রশ্নের জবাব দিলেন, 'না, পাহাড় নয়। ওদিকে ডাঙার চিহ্নমাত্রও নেই। একটা ডিঙি নৌকাকেই তুমি পাহাড় বা ডাঙা বলে ভুল করছ। জাহাজডুবি নৌকা। জাহাজ ডুবে যাওয়ায় নাবিকরা নৌকায় আশ্রয় নিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মরণপণ লাড়ই করে চলেছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আকাশযান নিচে নামতে নামতে সমুদ্রের কাছাকাছি চলে গেল।

হ্যাঁয়, একটা ডিঙি নৌকায় ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর কয়েকজন অদৃষ্ট বিড়ম্বিত নাবিককে শুয়ে বসে ধুঁকতে দেখা গেল। এখন নৌকা আর অ্যালবেট্রসের মধ্যে ব্যবধান মাত্র আশি ফুট।

টম টার্নার চিৎকার করে নৌকারোহীদের ডাকাডাকি করল। কিন্তু নৌকারোহীরা নির্বিকার।

রোবার এবার কামানের সাহায্যে ফাঁকা আওয়াজ করার নির্দেশ দিলেন। একবার কামান দাগতেই ফল পাওয়া গেল। মুমূর্ষু নাবিকরা নড়ে চড়ে উঠল। আচমকা বাঘ দেখার ভাব নিয়ে তারা কোটরেবসা চোখের মণি দুটোকে তুলে ওপরের দিকে তাকাল।

নৌকা থেকে বাতাসবাহিত অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'সবাই জাঁনেত জাহাজের নাবিক। আমি এদের মেট। জল আর খাবার দুইয়ের অভাবেই আমরা মরণাপন্ন। দয়া করে আমাদের প্রাণে বাঁচান।'

নৌকারোহীরা সবাই হাত দুটো ওপরে তুলে কাতর মিনতি জানাতে লাগল 'বাঁচান! আমাদের বাঁচান। জল আর খাবার দিয়ে আমাদের প্রাণ বাঁচান।'

আকাশচারীর কর্মীরা রোবারের নির্দেশে দড়ি দিয়ে জলের বালতি আর খাবারের প্যাকেট নৌকাটায় নামিয়ে দিল। গোগ্রাসে খাবারগুলোর সদ্ব্যবহার করে নৌকারোহীরা

www.pathagar.com

যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল। তাদের একজন গলা ছেড়ে চিৎকার করে বলল, 'ধন্যবাদ! আমরা এখন কোথায়, দয়া করে বলবেন কি?'

রোবার তেমনি তারস্বরে জবাব দিলেন, 'কোনেস ও চিলি দ্বীপুঞ্জের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। ভাববেন না, আমি গুণ টেনে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি।'

রোবার নৌকারোহীদের কাছে নিজের পরিচয় গোপন রেখে গুণ টেনে নৌকাটাকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। কোনেস দ্বীপপুঞ্জের তীরে নৌকাটাকে পৌঁছে দিয়ে দড়ির বাঁধন আলগা করে দিলেন।

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কয়েকজন হতভাগার প্রাণ বাঁচিয়ে রোবার তাঁর পঙ্খীরাজ অ্যালবেট্রসকে এবার দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে চললেন।

মাঝরাত সবে পেরিয়েছে। এমন সময় তুমুল ঝড় উঠল। প্রলয়ঙ্কর ঝড়। সৃষ্টি ধ্বংস করে দেয়ার জন্য প্রকৃতি দেবী বদ্ধপরিকর। সামুদ্রিক ঝড়কে পৃথিবীর এক-এক অঞ্চলের মানুষ আলাদা আলাদা নামে অভিহিত করে। চীন সাগরের ঝড় 'টাইফুন' নামে পরিচিত। আটলান্টিকের ঝড়কে বলে 'হ্যারিকেন'। সাহারা মরুভূমিতে একেই বলে 'সিমুম' আর 'টর্নেডো' বলে পশ্চিম উপকূলের ঝড়কে। যে নামেই সম্বোধন করা হোক, আসলে সবার চরিত্র মূলত একই।

মৃত্যু শিয়রে। তাই আর একমুহূর্ত দেরি না করে রোবার তার আকাশযানকে দ্রুত ওপরে, একেবারে ঘূর্ণিঝড়ের এক্তিয়ারের বাইরে নিয়ে চলে গেলেন।

আচমকা ব্যারোমিটারের পারদ নামতে নামতে একেবারে নিচে নেমে গেল। ব্যস, অ্যালবেট্রসও একদম থমকে গেল। চুয়াত্তরটা প্রপেলার একই সঙ্গে দ্রুততম গতিতে ঘুরতে লাগল। দমকা হাওয়া তার গতিরুদ্ধ করল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঘূর্ণিঝড়ের দাপট কি অ্যালবেট্রস কাটিয়ে উঠতে পারবে?

হ্যাঁ, যেই কথা সেই কাজ। অ্যালবেট্রস চরমতম সঙ্কটের সম্মুখীন হল। অবাধ্য ঝড় সেটাকে প্রবল শক্তিবলে দ্রুত ধ্বংসের মুখে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। ঝড়ের গতি যদি একই হারে ক্রমে বেড়েই চলে তবে যে-কোনো সময় কেলেঙ্কারী ঘটে যেতে পারে।

আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভান্স ঝড়ের ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত তো নন, বরং খুশিতে ভরপুর। কারণ, তাদের বাঞ্ছা অনুযায়ী অ্যালবেট্রস যদি ধ্বংস হয়ে যায় যাক।

এ মুহূর্তে রোবার ভাবছেন, অ্যালবেট্রসকে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে যেতে না পারলে ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু কাজটা খুবই সমস্যাসঙ্কুল।

আর এক সমস্যা নতুনতর রূপ নিয়ে দেখা দিল। ঘন-কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। রোবার ভেবে পাচ্ছেন না, হঠাৎ প্রকৃতি কেন এমন বিরুদ্ধ রূপ ধারণ করল? সাইক্লোন জাতীয় ঝড়ের তাণ্ডব অধিকাংশ ক্ষেত্রে দক্ষিণ অক্ষাংশের ছাব্বিশ সমাক্ষ রেখা ও উত্তর অক্ষাংশের ত্রিশ সমাক্ষ রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এমন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। কিন্তু এ তো সে এলাকার একেবারেই বহির্ভূত, তবে? কেন তবে প্রকৃতি হঠাৎ এমন রুদ্র রূপ ধারণ করল?

এ পরিস্থিতির কবল থেকে অ্যালবেট্রসকে রক্ষা করার দুটোমাত্র পথই খোলা। হয় সেটাকে আলতোভাবে ঝড়ের সঙ্গে ভেসে বেড়ানোর জন্য বরাত ঠুকে ছেড়ে দিতে হবে, নতুবা প্রচণ্ড বেগে চালিয়ে যত দ্রুত সম্ভব ঝড়ের এলাকার বাইরে নিয়ে চলে যেতে হবে। ব্যস, এর বেশি কোনোরকম পায়তারা কষতে গেলে ধ্বংস অনিবার্য।

www.pathagar.com

উপায়ন্তর না দেখে রোবার অ্যালবেট্রসকে আলতোভাবে বাতাসে ভাসিয়ে দিলেন। যে দক্ষিণ মেরু পেরিয়ে এসেছেন ঝড়ের খেয়ালে তাঁকে আবার সেদিকেই দ্রুত এগোতে হচ্ছে।

রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে এক সময় ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। অ্যালবেট্রস হর্ন অন্তরীপের পনেরো ডিগ্রি নিচে হাজির হয়ে গেল।

এখানে জুলাই মাসে দিনে সাড়ে উনিশ ঘণ্টা রাত।

আর মাত্র ১২০০ মাইল এগোতে পারলেই অ্যালবেট্রস দক্ষিণ মেরু বলয় ডিঙিয়ে যাবে।

রোবারের পক্ষীরাজকে এখানে খুব হাল্কা বলে মনে হতে লাগল। এর কারণ, দক্ষিণ মেরু কমলালেবুর মতো সামান্য চাপা। এ পরিস্থিতিতে সব কটা, অর্থাৎ চুয়াত্তরটা প্রপেলারকেই চালাতে হল না।

দক্ষিণ মেরু কমলাবেবুর মতো সামান্য চাপা, স্বীকার করলাম। কিন্তু সে জায়গাটা আসলে কেমন? আসলেই কি সেটা একটা মহাদেশ, নাকি আদ্যিকালের কোনো সমুদ্র? এ কী অদ্ভুত দেশ রে বাবা! প্রচণ্ড গরমের দিনেও সেখানকার বরফ গলে জল হয়ে যায় না! কেবল এটুকুই আজ পর্যন্ত জানা গেছে উত্তর মেরুর চেয়ে সেখানে শৈত্যের প্রাবল্য বেশি। এদিকটা বিবেচনা করেই হয়তো উত্তর মেরুর নামকরণ করা হয়েছে সুমেরু আর দক্ষিণ মেরুকে কুমেরু নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। উত্তর মেরুর ভাগ্যে জুটেছে 'সু' আর দক্ষিণ মেরুর বরাতে 'কু'।

ক্রমেই রাত বড় আর দিন ছোট হয়ে আসতে লাগল। ফলে রাতের আকাশে চাঁদ আর মেরুজ্যোতি ছাড়া আলোর সঙ্কেত দেয়ার মতো কোনো মাধ্যমের অস্তিত্বই এ অঞ্চলে নেই। আবার এখানে চাঁদ খুবই সরু। এটা এমনই এক অভিশপ্ত স্থান যেখানে আজ পর্যন্ত মানুষের পদচিহ্ন পড়ে নি।

নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের জন্য দক্ষিণ মেরুর ওপর দিয়ে অ্যালবেট্রস উড়ে গেলেও এখানকার ভূপ্রকৃতিকে চাক্ষুষ করা ভাগ্যে জুটছে না।

তখনো মাঝরাত পেরোয় নি। তখনই অপরূপ রূপ সৌন্দর্য নিয়ে বরফের রাজ্য দক্ষিণমেরু আকাশচারীদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। জমাটবাঁধা অন্ধকার ভেদ করে মেরুজ্যোতি উঁকি দিল। চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেওয়ার জোগাড়। শুভ্র সমুজ্জ্বল রুপালি আলোকচ্ছটায় সাদার্ন ক্রসের চারটে অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র অধিকতর ঝলমলিয়ে উঠল। এমন স্বর্গশোভা চোখ ও মনকে সমানভাবে আনন্দ দিতে লাগল।

এ কী ঝকমারিতেই না পড়া গেল! দক্ষিণ মেরুর কেন্দ্রবিন্দু যত এগিয়ে আসছে কম্পাসের কাঁটা ততই বাগড়া বাঁধাতে শুরু করেছে! এ কী হেঁয়ালিতে মেতেছে! ফলে অ্যালবেট্রস যে কোন্‌দিকে, কোনপথে ধেয়ে চলেছে তা বোঝাই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দীর্ঘ সময় ধরে কাগজ পেন্সিল নিয়ে আঁক কষে আর অঙ্ক কষে রোবার একসময় উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে চিল্লিয়ে উঠলেন, 'এগোচ্ছি! আমরা দক্ষিণ মেরুর কেন্দ্রবিন্দুর দিকেই এগোচ্ছি!'

www.pathagar.com

আঙ্ক প্রুডেন্ট আর ফিল ইভান্স ভাবছেন, এ সুযোগে আপদ অ্যালবেট্রেসটাকে ধ্বংস করে দিতে পারলে গায়ের জ্বালা জুড়োতো।

আবার রোবারের মুখ শুকিয়ে গেল। চোখে মুখে হতাশার কালো ছায়া নেমে এল। অ্যালবেট্রেস মূল মধ্যরেখা অতিক্রম করে পূর্বদিকে মোড় ঘুরলেই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা খুবই বেশি। সামনেই দু-দুটো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ হাঁ করে রয়েছে। যে শত সহস্র আগুনের শিখা লকলক করে জ্বলতে দেখেছে অ্যালবেট্রেস বুঝি তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যাবে, আত্মাহুতি দেবে।

না, ভাগ্য খুবই ভালো। অ্যালবেট্রেস নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেল। ঘূর্ণিঝড়-হ্যাঁর, ঘূর্ণিঝড়ই অ্যালবেট্রেসকে এবারের মতো রক্ষা করল। আর এতগুলো প্রাণীও নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে অব্যাহতি পেল।

অ্যালবেট্রেস এবার এক অদ্ভুত জায়গার ওপর দিয়ে ধেয়ে চলল। রাত দুটোর সময় ডিসকভারি ল্যান্ডের পার্শ্ববর্তী কলোনি দ্বীপের কাছে হাজির হল। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জমাটবাঁধা বরফ সংযোগস্থাপন করে রেখেছে বলে সনাক্ত করাই সম্ভব হল না, কোনটা দ্বীপ আর কোনটা মেইন ল্যান্ড।

অ্যালবেট্রেস ছুটছে তো ছুটছেই। একসময় সেটা মেরুবৃত্ত ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল। এবার তার গতি উত্তরমুখী। প্রপেলার আবার পূর্ণশক্তিতে ঘোরার মত সামর্থ্য ফিরে পেয়েছে।

অ্যাবেট্রেস দক্ষিণ মেরু ডিঙাবার সময় তিন মাইল বেগে ছুটেছে।

অ্যালবেট্রেস ঝড়ের কবলে পড়ে এখন প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে হাজির হয়েছে। এরকম দিকভ্রম হওয়ার কারণও রয়েছে যথেষ্টই। ম্যাগনেটিক সোলের ওপর দিয়ে আসার সময় কম্পাস কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে বলেই এমনটা ঘটে গেছে। দিকভ্রম হয়েছে।

আরো এক বিপত্তি ঘটেছে। যে দুটো প্রপেলারের ওপর নির্ভর করে অ্যালবেট্রেস সামনে আর পিছনে যেতে পারে সে দুটোই অকেজো হয়ে পড়েছে। ঝড়ের তাণ্ডবে দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে গেছে।

রোবার অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন। শূন্যে ভাসমান অবস্থাতেই প্রপেলার দুটোকে মেরামত করে ফেললেন।

২৭ জুলাই। উত্তরদিকে কালো-মতো কী দেখা গেল। ডাঙার চিহ্ন। ওটা কি কোনো দ্বীপ, নাকি মহাদেশ? আরো কিছুটা এগোতেই বোঝা গেল, মহাদেশ নয়, দ্বীপ। বেশ বড়সড় একটা দ্বীপ। আর রয়েছে পাহাড়ের সারি। দ্বীপটার দক্ষিণ পশ্চিম দিকের এক জায়গার ওপর দিয়ে অ্যালবেট্রেস যাওয়ার সময় বেলুনবাজরা রোবার আর টম টার্নারের কথোপকথন শুনতে পেলেন। টম টার্নার বলল, 'স্যার,আমরা কি কাছাকাছি পৌঁছে গেছি?'

রোবার মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বললেন, 'হ্যাঁ, পৌঁছে তো গেছিই, আমরা এখন এক্স আয়ারল্যান্ড থেকে মাত্র ছেচল্লিশ ডিগ্রি দক্ষিণে অবস্থান করছি। মাত্র আটাশ মাইল পাড়ি দিলেই..'

'খাবার প্রায় নিঃশেষ।'

www.pathagar.com

আঙ্কল প্রুডেন্ট, ফিল ইভান্স আর ফ্রাইকোলিনের প্রসঙ্গ উঠলে রোবার টম টার্নারকে বললেন, 'ওরাও আমাদের সঙ্গেই যাবেন। তাছাড়া উপায়ও তো কিছু নেই।'

এদিকে বেলুনবাজরা গোপন পরামর্শে লিপ্ত হলেন। মুক্তির আশা তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন। যে-কোনো উপায়ে অ্যালবেট্রসকে ধ্বংস করে ফেলাই তাঁদের এমুহূর্তে একমাত্র লক্ষ্য। রাতের আঁধার কাটার আগেই কাজ সেরে ফেলার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। কিছুতেই ভোর হতে দিতে রাজি নন। জখম হওয়া অ্যালবেট্রসকে নিয়ে রোবার ও তাঁর শিষ্যরা যখন ব্যস্ত থাকেবন, তখনই ফিল ইভান্স গুটিগুটি বারুদখানায় ঢুকে মতলবটাকে কাজে লাগিয়ে ফেলবেন। ডিনামাইটের একটা কার্তুজ তো ইতিমধ্যেই সরিয়ে ফেলেছেন। চিন্তা কী?

ষড়যন্ত্র! সর্বনাশা ষড়যন্ত্র! আত্মঘাতী ষড়যন্ত্রও একেবলা চলে।

বারুদখানায় বিস্ফোরণের যা-কিছু প্রস্তুতি সবই সেরে ফেলা হয়েছে।

আঙ্কল প্রুডেন্ট রীতিমতো আর্তনাদ করে উঠলেন, 'মি. ইভান্স, আসল ব্যাপারটা যে আমাদেরই কারো মাথায় আসে নি! পলতে? পলতে কোথায়? পলতে ছাড়া ডিনামাইট চার্জ কী করে সম্ভব?

হ্যাঁ, ফ্রাইকোলিন পলতের ব্যবস্থা করে ফেলল। পলতেতে অগ্নি সংযোগও করা হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, রোবার এখনো মেরামতি কাজ শেষ করতে পারেন নি। চারদিকে তাঁর নজর। এ অবস্থার তাঁদের হাত গুটিয়ে বসে হা পিত্যেশ করতেই হল।

এবার তারা ডিনামাইট চার্জ করে অ্যালবেট্রসকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ধান্ধা করলেন। একশো গজেরও কম। দড়ি বেয়ে নেমে যেতে পারবেন। তবে সমস্যা হচ্ছে রোবারকে নিয়ে। ঈশ্বরের চোখে ধুলো দেয়া যায় কিন্তু তাঁর চোখে ধুলো দেয়া কঠিন ব্যাপার। বেলুনবাজরা অনেক শলাপরামর্শের পর স্থির করলেন, রোবারকে খুন করে হলেও চম্পট দেবেন।

ফ্রাইকোলিন একটু আগেও তাঁদের পিছনেই বসেছিল। কিন্তু এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না। তাঁরা ছুটতে ছুটতে কামরায় গেলেন। না, এখানেও নেই। তবে? তবে কি এরই মধ্যে মুক্তিপাগল ফ্রাইকোলিন চম্পট দিয়েছে। তাই হয়তো হবে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ওপরে, অ্যালবেট্রসের সবাই হৈ হট্টগোল চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে, বেলুনবাজদের কানে এল। তবে কি তাঁদের অতর্কিতে পলায়নের ব্যাপারটা তাদের নজরে পড়ে গেছে?

রোবার উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটে শুরু করে দিলেন। নিচের দিককার সার্চ লাইট জ্বেলে বেলুনবাজদের জোর তল্লাশি চালাতে লাগলেন।

আলো চারদিকে অস্থিরভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে থমকে গেল। আকাশচারীরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওই-ওই যে কালো, সচল ছায়ার্মর্তির মতো কী দেখা যাচ্ছে।'

অ্যালবেট্রস এবার তিরতির করে নিচে নামতে লাগল।

ফিল ইভান্স হাত নেড়ে গলা ছেড়ে বলতে লাগলেন, 'মি. রোবার, এ দ্বীপে আমাদের মুক্তি দিয়ে যান। আমাদের কয়েদ করে রেখে দয়া করে নিজের সর্বনাশের প্রথ প্রশস্ত করবেন না। আমাদের বাঁচতে দিন, আর নিজেরাও প্রাণে বাঁচুন।' রোবার গুলিবিদ্ধ পশুর মতো ফুঁসতে লাগলেন।

www.pathagar.com

দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য আঙ্কল প্রুডেন্ট দড়িটার কাছে ছুটে গেলেন। এটা দিয়ে রোবার অ্যালবেট্রসকে একসময় বেঁধে রেখেছিলেন। কোমর থেকে হেঁচকা টানে ছোরাটা বের করে তিনি দড়িটা কেটে দিলেন। সূতো ছেঁড়া গুড়িতে দমকা বাতাস লাগলে যেমন হয় ঠিক তেমনিভাবে অ্যালবেট্রস ঝট করে অনেক খানি ওপরে উঠে গেল।

অ্যালবেট্রস থেকে মুহুর্মুহু বন্দুকের গুলি ছুটে আসতে লাগল। ইতিমধ্যে বেলুনবাজরা বিশালায়তন একটা পাথরের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে দিতে পেরেছেন।

অত্যাচারী পরপীড়নকারী নিষ্ঠুর রোবারের কবল থেকে বেলুনবাজরা আজ মুক্ত। জনমানবশূন্য দ্বীপের ভীতির চেয়ে মুক্তির আনন্দ এ মুহূর্তে তাঁদের কাছে অনেক অনেক বেশি।

ক্রোধোন্মত্ত রোবার ডেকের ওপর অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে মতলব ভাজতে লাগলেন। বেলুনবাজদের পাকড়াও করে আবার কামরাবন্দি করার আশা এখনো তিনি ছাড়তে পারেন নি। উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পালাবে? রোবারের কবল থেকে পারিয়ে বাঁচবে—অসম্ভব! সুযোগ মতো আবার তোমাদের পিছনের কয়েদখানায় ঢুকিয়ে তবে আমার নিস্তার। নির্জন-নিরালা পিট আয়ারল্যান্ড থেকে পালিয়ে যাবে কোথায়? ধরা তোমাদের দিতে হবেই। তোমাদের বন্দি আমি করবই করব।'

অ্যালবেট্রস মাটি থেকে অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। রোবার প্রপেলার মেরামত করে আবার পিট আয়ালন্ডের দিকে ছুটবেন মনস্থ করলেন।

সকাল হল। বেলুনবাজরা পাথেরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁরা হায় হায় করতে লাগলেন, পলতের আগুন তিরতির করে এগিয়ে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কীভাবে অ্যালবেট্রসকে ধ্বংস করে, চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়—সে দৃশ্যটা চোখে দেখতে পেলেন না বলে তাদের আক্ষেপের সীমা নেই।

ডিনামাইট সংলগ্ন পলতের গা বেয়ে আগুন গুটিগুটি এগিয়ে চলেছে। আকাশচারীদের চোখের আড়ালে ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক কাজটা ঘটে চলেছে। সবাই প্রপেলার মেরামতের কাজে ডুবে না থাকলে হয়তো ব্যাপারটা কারো না কারো চোখে পড়ে যেত। এতগুলো লোক অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচত, আকাশযান অ্যালবেট্রসও রক্ষা পেয়ে যেত। পলতের গা থেকে মৃদু পটপট আওয়াজ হচ্ছে বটে, হাল্কা গন্ধও বেরোচ্ছে। কিন্তু রোবার ও তাঁর সহকর্মীদের এদিকে মন কোথায় যে, শব্দ ও গন্ধ অনুভব করবে? যত শীঘ্র সম্ভব অ্যালবেট্রসকে মেরামতি করে নিয়ে তার পিট আয়ারল্যান্ডের দিকে ঘোরাতেই হবে। পলাতক বেলুনবাজদের মুক্তির সঙ্গে রোবার এর চূড়ান্ত সর্বনাশ জড়িয়ে রয়েছে। পিট আয়ারল্যান্ডেই পলাতকদের আবার কয়েদ করতে হবে।

এমন সময় বাতাসবাহিত বারুদের গন্ধ নাকে এল। উগ্র গন্ধ। আকাশচারীরা উন্মাদের মতো ছুটোছুটি দাপাদাপি শুরু করে দিল। টম টার্নার চেঁচিয়ে উঠল, 'সর্বনাশা কাণ্ড! হতচ্ছাড়া বেলুনবাজরা বারুদের গুদামে আগুন ধরিয়ে দেয় নি তো?'

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই আকস্মিক আকাশ কাঁপানো শব্দে সবকিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাওয়ার জোগাড় হল। বিকট শব্দে কেবিনটা ভেঙে গুঁড়েগুঁড়ো হয়ে গেল। চোখের পলকে বৈদ্যুতিক বাতিগুলো গেল নিভে। ডেকের পিছনের দিকে, যেখানে প্রপেলারের ইঞ্জিন থাকে সেদিক থেকেই ধ্বংসাত্মক কাজটা শুরু হল। প্রপেলারগুলোও ঘূর্ণন বন্ধ করে থেমে গেল।

www.pathagar.com

আকাশযান অ্যালবেট্রেস তীব্র গতিতে নিচের দিকে নামতে লাগল। আশ্চর্য, ডেকটার বেশ বড় একটা ভগ্নাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে শুকনো পাতার মত বাতাসে ভাসতে লাগল।

রোবার থেকে শুরু করে আকাশচারীদের সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ়। যারপরনাই হতভম্ব। রোবার শক্তহাতে লিভার চেপে ধরে তাঁর সাধের অ্যালবেট্রেসকে রক্ষা করা জন্য মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করতে লাগলেন।

না, রোবারের এত চেষ্টা বিফলে গেল। এক সময় বিকট আওয়াজ হল। ব্যস, উত্তাল, উদ্দাম সমুদ্রের বুকে অ্যালবেট্রেসের ধ্বংসাব শেষটুকু মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। শেষ! সব শেষ! ইঞ্জিনিয়ার রোবার এবং তাঁর অনন্যা সৃষ্টি একই সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেল।

সেদিনটা ছিল ১৩ জুন। ফিলাডেলফিয়া শহরে তুমুল কাণ্ড ঘটে চলেছে। সবার মুখে মুখে ঘুরতে লাগল ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের অবিশ্বাস্য কাণ্ডটার কথা। এমন একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড যে কোনোদিন ঘটতে পারে তা তো কারোর ধারণা করার কথাও নয়।

রোবার নামধারী এক অজ্ঞা পরিচয় লোক নাকি ইঞ্জিনিয়ার বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তিনিই নাকি এমন অভাবনীয় কাণ্ডটার নায়ক।

ব্যাপারটা ছেলে বুড়ো সবার মধ্যেই গভীর আতঙ্কের সঞ্চার করল।

দেখতে দেখতে পুরো একটা সপ্তাহ চলে গেল। চারদিকে চিরুনি চল্লাশি চালিয়েও ইনস্টিটিউটের সভাপতি, সম্পাদক ও ফ্রাইকোলিনের খোঁজ পাওয়া গেল না। তাঁদের নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে যে আকাশ রহেস্যের কিছুমাত্র সম্পর্ক রয়েছে এমন কথা স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারেন নি।

ব্যাপারটা অচিরেই সবার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। আকাশ রহেস্যের সঙ্গে গ্রহ নক্ষত্রের কোনোই যোগসাজোশ নেই। আসলে ওটা কোনো প্রাকৃতিক ব্যাপারই নয়। যান্ত্রিকশক্তির কাঁধে ভর করে কোনো কিছু আকাশপথে রহস্য সঞ্চার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভালো কথা, তবে অবিশ্বাস্য যন্ত্রটার আবিষ্কর্তা কে? তবেই কি সে লোকটাই যে মাত্র কদিন আগে ভুঁইফোঁড়ের মতো ওয়েলডন ইনস্টিটিউটে হাজির হয়ে হুজ্জতি পাকিয়ে কেটে পড়েছিল? রহস্যা সঞ্চারকারী ব্যক্তিটাই কি রোবার নামে পরিচিত? তবে ক্লাবের তিনজনের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার সঙ্গে রোবারের কিছুমাত্র হাত থাকতে পারে, একথা কেউ কল্পনাও করতে পারলেন না।

একদিন আচমকা একটা টেলিগ্রাম পেয়ে ক্লাবের সদস্যরা রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেল। আঙ্কল প্রুডেন্ট নস্যর কৌটোয় ভরে অ্যালবেট্রেস থেকে যে চিঠিটা ফেলে দিয়েছিলেন টেলিগ্রামে সে-সব কথাই লেখা রয়েছে। ১৩ জুলাই। ঘড়িতে তখন সকাল ১১.৩৭।

এতদিন ধরে যে যন্ত্রণায় ক্লাবের সদস্যরা ভুগছিলেন, যে রহস্যের জালে জড়িয়ে ছটফট করছিলেন, আজ আঙ্কল প্রুডেন্টই মুহূর্তের মধ্যে সবকিছুর অবসান ঘটিয়ে দিলেন।

একেবারেই অপ্রত্যাশিত ও অবিশ্বাস্য খবরটা বাতাসে শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

শহরের মানুষ কিন্তু এমন একটা ব্যাপারকে কিছুতেই সত্য বলে মেনে নিতে নারাজ। কী করেই বা বিশ্বাস করবে? এমন কোনো যন্ত্র থাকতে পারে যে তিন তিনজন মানুষকে তুলে নিয়ে চোখের পলকে একেবারে বেপাত্তা হয়ে যাবে?

www.pathagar.com

মাত্র সাতদিন-সাতদিনের মধ্যে অবিশ্বাসীদের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। ফরাসি জাহাজ ডাক 'ওয়েলডন ইনস্টিটিউট'-এনস্যার কৌটাটা পৌছে দিল। এর মালিক যে আঙ্কল প্রুডেন্ট অনেকেই জানে, বহুবারই তাঁর হাতে দেখেছে।

মিস ম্যাট এবং মিস ডল কৌটোটা দেখেই মূর্চ্ছা যাওয়ার জোগাড় হলেন। আর টুকরো টুকরো কাগজে লেখা হলেও, এ যে আঙ্কল প্রুডেন্টেরই লেখা তা তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই। তিনি নায়েগ্রা জলপ্রপাত কোম্পানির বড় অংশীদার।

জুলাই চলে গেল। আগস্টও শেষ হল।

সেপ্টেম্বরের ২৮ তারিখে বেলুনবাজরা বাড়ি ফিরে এলেন। কিন্তু রোবার বা তাঁর অ্যালবেট্রস এবং পালিয়ে পিট আয়ারল্যান্ডের দিন যাপন, তারপর সেখান থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে তারা কোনো কথাই বললেন না।

সন্ধ্যায় ওয়েলডন ইনস্টিটিউটে সভা বসল।

পলতের সাহায্যে ডিনামাইটে অগ্নি সংযোগ করে বেলুনবাজরা দড়ি বেয়ে দ্বীপের মাটিতে নেমেছিলেন। দ্বীপটা আসলে জনমানবহীন নয়। অদ্ভুত দর্শন আকাশযান থেকে তিনজনকে নামতে দেখে জনা পঞ্চাশেক দ্বীপবাসী ছুটোছুটি করে কাছে এর। তাদের দেবজ্ঞানে ভক্তি ও আদর যত্ন করতে লাগল। তাদের আশ্রয় ও খাবার দাবার দিল।

এদিকে ডিনামাইট বিস্ফোরণে আকাশযান অ্যালবেট্রস টুকরো টুকরো হয়ে সমুদ্রের জলে পড়ে মোচার খোলার মতো ভাসতে লাগল। সে দ্বীপ দিয়ে কদাচিত জাহাজ যাওয়া আসা করে। দ্বীপবাসীদের আতিথ্য গ্রহণ করে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে দেওয়ার পর একদিন সত্য সত্যই জাহাজ ভিড়ল। বেলুনবাজদের দুর্ভাগ্যের কথা শুনে জাহাজের ক্যাপ্টেনের দয়া হল। তিনি তাদের নিউজিল্যান্ডে পৌছে দিলেন। তারপর সেখান থেকে তাঁরা নিজের দেশ সানফ্রান্সিসকোতে হাজির হল।

১৯ এপ্রিল। আঙ্কল প্রুডেন্ট ও ফিল উভান্স ফিরে আসার পর সাত মাস পেরিয়ে গেছে।

ফিলাডেলফিয়া শহর জুড়ে আনন্দের জোয়ার বইছে। দীর্ঘদিনের প্রয়াস এতদিনে পূর্ণ হতে চলেছে। অতিকায় গ্রাস বেলুনটা আজ আকাশে উড়বে। মর্তের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সেটা শূন্যে ভেসে চলবে। একমাত্র হ্যারিটিডেন্ট নামে এক ব্যক্তি বেলুনের সঙ্গে আকাশে উড়বেন। না, তিনিই একমাত্র নন, সভাপতি ও সম্পাদকও অবশ্যই সঙ্গে থাকছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য, 'গো-এহেডের' চেয়ে উন্নত কোনো যন্ত্র যে হতে পারে তা পৃথিবীবাসীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। তার আগেই যদি রোবারের আবিষ্কৃত আকাশযান অ্যালবেট্রসের কথা সবাই জেনে যায় তবে তাদের আবিষ্কৃত বেলুনটাকে কেউ গুরুত্ব দেবে না। তাই রোবার এর ব্যাপার স্যাপার ইচ্ছাকরেই বেলুনবাজরা অতিকষ্টে হলেও চেপে গেছেন। আর সুযোগও তো যথেষ্টই রয়েছেন। কত দিন রাত গুণে আবিষ্কার অ্যালবেট্রসও ধ্বংস হয়ে গেছে। অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি এমন বিশালায়তন একটা বেলুন 'গো এহেড', যাকে যথোচিত সম্মান না দিয়ে উপায় নেই। অদ্ভুত কৌশলে তৈরি বেলুনটা ইঞ্জিনের সঙ্গে আটকানো প্রপেলারের সাহায্যে চলবে।

ইঞ্জিনের শক্তিতে প্রপেলার ঘুরে ঘুরে বেলুনটাকে সামনে পিছনে নিয়ে যেতেও সাহায্য করবে। আর ডাইনে বাঁয়েও ঘোরানো যাবে। আর তাকে শক্তি যোগাবে উচ্চ

www.pathagar.com

শক্তিসম্পন্ন অ্যাকুমুলেটর ও ব্যাটারি। এবার সবচেয়ে হাল্কা গ্যাস নিয়ে গো-এহেডকে পূর্ণ করে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলা হল। বিশেষ গ্রাসটার নাম হাইড্রোজেন। বৈজ্ঞানিক হেনরি গ্রিফোর্ড এ গ্রাস তৈরির পদ্ধতির আবিষ্কারক।

সেদিনটা ছিল ২৯ এপ্রিল। ফেয়ারমেন্ট পার্কের সুবিশাল প্রান্তরে কৌতূহলী জনতার মেলা বসে গেছে। আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভান্স মঞ্চে উঠে আমেরিকার পতাকা উড়িয়ে দিলেন।

এগারোটা বেজে বিশ। তোপধ্বনি হল। দ্বিতীয় তোপধ্বনি হল এগারোটা পঁচিশে।

আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্স বাঁ হাত বুকে রাখলেন। আর ডান হাত মাথার ওপর দিয়ে আকাশের দিকে সোজাভাবে তুলে নিলেন।

'গো এহেড' এবার হেলেদুলে আকাশের দিকে উঠে যেতে লাগল।

আঠাশ ফুট উঠেই গো-এহেড থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।' ব্যাপার দেখেসবার তো চক্ষু স্থির। 'গো-এহেড' বিকল হয়ে যায় নি তো? না, কিছুই হয় নি। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে যাতায়াত করে বেলুনটার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দেয়ার উদ্দেশ্যেই আচমকা এমন থমকে যাওয়া, যাকে বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়ার ধাক্কা।

সত্যই বেলুনটার গঠন প্রণালী অত্যাশ্চর্য। দরকার হলে ভালব খুলে দিয়ে অনায়াসেই মাটিতেও নামিয়ে আনা সম্ভব।

ওপরে উঠতে উঠতে বেলুনটা একসময় হাজার ফুট ওপরে উঠে গেল। ঠিক যেন একটা সচল বিন্দু। ক্রমেই বিন্দুটা অস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

অকস্মাৎ একেবারেই অপ্রত্যাশিত একটা দৃশ্য জনতার চোখে পড়ল। অন্য আর একটা কালো বিন্দু যেন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। অবিশ্বাস্য তার গতিবেগ। সবাই ভাবছে, তবে কি অন্য একটা বেলুন দ্রুত এগিয়ে আসছে।

রহস্য সঞ্চারকারী কালো বস্তুটা অচিরেই জনতার মাথার ওপরে হাজির হল।

এবার রহস্যসঞ্চারকারী আগন্তুককে গো-এহেডের অবস্থানরত আকাশচারীরাও দেখতে পেলেন।'

উদ্বেগও উৎকণ্ঠিত জনতার মধ্য থেকে একজন কাঁপা কাঁপা গলায় চিল্লিয়ে উঠল, 'অ্যালবেট্রস! অ্যালবেট্রস!'

ধারণা সম্পূর্ণ সত্য। হ্যাঁ, মাথার ওপরে অ্যালবেট্রসই ভেসে বেড়াচ্ছে বটে।

রোবার। ইঞ্জিনিয়ার রোবারের প্রতিশোধস্পৃহা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। প্রচণ্ড আক্রোশে তিনি বেলুনটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আঙ্কল প্রুডেন্ট আর ফিল ইভান্সের ওপর প্রতিশোধ না নিতে পারলে যেন তিনি মরেও শান্তি পাবেন না।

কিন্তু একেবারেই অসম্ভব একটা ব্যাপার কি করে সম্ভাবনাময় হলে উঠল। মাত্র নয় মাস আগে তাঁর স্বপ্ন, সাধের অ্যালবেট্রসের শেষ ভাঙা অংশটুকু প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। রোবার প্রশান্ত মহাসাগর থেকে কি করে জীবন ফিরে পেয়ে আবার আকাশপথে উড়তে পারলেন?

রোবার এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একটা জাহাজ তাঁদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। ক্যাপ্টেন মৃত্যুপথযাত্রীদের জাহাজে তুলে নিলেন। আর খুঁজে খুঁজে অ্যালবেট্রসের টুকরোগুলোকেও সাধ্যমত উদ্ধার করলেন।

www.pathagar.com

সেই জাহাজে চেপেই রোবার অস্ট্রেলিয়ায় হাজির হলেন। অ্যালবেট্রসের ধ্বংসাবশেষ তাঁর সঙ্গেই রয়েছে। আলমারি থেকে নোটের বান্ডিল নিয়ে আবার এক্স আয়ার্ল্যান্ডে হাজির হলেন। এক নাগাড়ে আটমাস কঠোর পরিশ্রমের ফলে অ্যালবেট্রসকে নতুন করে গড়ে নিলেন। আবার আকাশে উড়লেন। জ্বলন্ত আক্রোশ আর প্রতিশোধস্পৃহা বুকে নিয়ে হাজির হলেন উত্তর আমেরিকায়। খোঁজ খবর নিয়ে গো-এহেডের বৃত্তান্ত জানতে পারলেন। আর জানতে পারলেন, তাঁর চরমতম শত্রু আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্সও রয়েছেন বেলুনে। আকাশে উড়ছেন। ব্যস, আর এক মুহূর্তও নয়। দুর্বার গতিতে অ্যালবেট্রসকে ছুটিয়ে দিলেন। 'গো-এহেড'কে ধরাশায়ী করার জন্য।

'গো-এহেডে'র যাত্রী আঙ্কল প্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্সের বুঝতে দেরি হল না যে অগ্রসরমান কালো বিন্দুটা কি হতে পারে। তাঁরা এবার মরিয়া হয়ে গো-এহেডের গতি সাধ্যমত বাড়িয়ে দিলেন।

'গো-এহেডকে কেন্দ্র করে অ্যালবেট্রস দ্রুত চক্কর মারতে লাগল।

গো-এহেডের ধ্বংস অনিবার্য।

এক সময় গো-এহেডের গ্যাস ফুরিয়ে গেল। ব্যস, চোখের পলকে একটা ঝাঁকড়া গাছের ওপর সেটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

রোবার চোখেমুখে বিদ্রুপের হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'মি. প্রুডেন্ট ও মি. ইভান্স, আপনাদের আবার কয়েদ খানায় ফের যন্ত্রণা দেওয়ার ক্ষমতা আমার যে আছে আশা কিরি তা অবশ্যই অনুমান করতে পারছেন। তবে আমি অবশ্যই তা করব না। বিদায় নেবার আগে আপনাদের একটা কথাই শুধু বলে যাচ্ছি, বিপ্লবাত্মক আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে আকাশ-বিহার সম্পন্ন হবে। আশা করি আপনারা উভয়েই নিজেদের মনকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী করে তৈরি করে নেবেন।'

বিদায় নেবার পূর্ব মুহূর্তে রোবার এবার আমেরিকার জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমরা এখনো হাজার বছর পিছিয়ে রয়েছি। অন্ধকারের অতল গহ্বরে তলিয়ে থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে অস্বীকার করছি। আমার আবিষ্কার, গোপন রহস্য আমার অন্তরের অন্তঃস্থলেই জমা থাকবে। আমি সে শুভ মুহূর্তের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকব, যেদিন পৃথিবীর মানুষ বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে হাসিমুখে স্বাগত জানাতে উৎসাহী হবে।'

---

www.pathagar.com

সিক্রেট অব উইলহেম স্টোরিজ

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের চৌঠা এপ্রিল আমার সহোদর ভাইমার্ক ডাইডাল এর লেখা একটা চিঠি পেলাম। লিখেছে, সে আমার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে। আমি যেন পত্র পাওয়ামাত্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার ওখানে চলে যাই। জায়গাটা অতি মনোরম। মনকে দোলা দেয়। সে জেলায় এমন বহু সম্পদ রয়েছে যা যে-কোনো ইঞ্জিনিয়ারকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে। কেবল এটুকু বিচার বিবেচনা করলেই নাকি পথশ্রম মোটেই আমার কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। আর হ্যা পিত্যেশও করতে হবে না। এভাবেই চিঠিটা শেষ করা হয়েছে। আসলে এরকম কোনো আকস্মিক চিঠির জন্য আমি মনের দিক থেকে আদৌ তৈরি ছিলাম না।

সত্য বলতে কি, চিঠিটা খোলার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমার মনপ্রাণ বাস্তবিকই শান্ত ছিল। ঠাণ্ডা মাথায়ই শুরু থেকে শেষপর্যন্ত চিঠিটা পড়েও ছিলাম। এমন কি শেষ লাইনকটা পড়ার সময়ও আমার সামান্যতম চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে নি। কিন্তু এ শেষ ছত্র কটার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল অসাধারণ ব্যাপার স্যাপারের বীজ যার সঙ্গে দুদিন বাদেই আমি নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলতে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছিলাম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এমন বিদঘুটে একটা কাহিনী বিশ্বাস করতে কেউ উৎসাহী হবে কি?

ভাগ্য ঠুকে ঝুলে তো পড়ি। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপারটা তো পুরোপুরি আপনার ওপর নির্ভর করছে।

আমার অনুজ মার্ক-এর বয়স তখন আঠাশ চলছে। এ বয়সেই সে যে-কোনো মানুষকে সামনে বসিয়ে ছবি আঁকার ব্যাপারে খুবই খ্যাতি অর্জন করে ফেলেছে। মার্ক আমার চেয়ে বয়সে আট বছরের ছোট। আমাদের উভয়ের মধ্যে খুবই সম্প্রীতি। খুবই অল্প বয়সে আমাদের মা-বাবাকে হারাতে হয়। ফলে সেই থেকেই ছোট ভাইয়ের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বভার আমাকেই বইতে হয়। তখনই তার ছবি আঁকার ব্যাপারে অসামান্য প্রবণতা লক্ষ্য করে আমি তাকে তাতেই প্রেরণা দান করি। ফল তো হাতে নাতেই পাওয়া গেছে। ছবি আঁকাতেই তার অর্থ ও খ্যাতি সবই আসবে, আমি নিঃসন্দেহ।

দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ হাঙ্গেরির নাম করা রাগ শহরে মার্ক বাস করছে। ইদানীং কিছুদিন ধরে তার মাথায় বিয়ের পোকা ঢুকেছে। একেবারে আদাজল খেয়ে লেগেছে। সেখানকার প্রতিষ্ঠিত পরিবারগুলির মধ্যে সবার আগে ডা. রোডরিখ-এর নাম করতে হয়। হাঙ্গেরিতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন দাঁতের ডাক্তার খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি তাদেরই একজন। পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া অগাধ ধন-সম্পদ তো ছিলই, তার ওপর কেবলমাত্র চিকিৎসার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। প্রতি বছরই দেশভ্রমণে যেতেন। তখন ধনকুবের অথচ অথর্ব পঙ্গু লোকেরা তাঁর ফিরে আসার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকত, তার অবর্তমানে কেবলমাত্র ধনকুবেররাই নয়, পথের ভিখারীরাও

www.pathagar.com

মনমরা হয়ে পড়তো। কারণ রোগীর পকেটে একটা ফুটো পয়সা না থাকলেও ডা. রোডরিখ কাউকে হতাশ করে ফিরিয়ে দিতেন না। তার ওপর অমায়িক ব্যবহারের তো তুলনাই হয় না।

ডা. রোডরিখ-এর স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান। তার পুত্রের নাম ক্যাপ্টেন হারালান আর কন্যা মায়রা। আমার অনুজ মার্ক ডাক্তারের বাড়িতে যতবার গেছে যুবতী মায়রার রূপ সৌন্দর্য দেখে যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছে। আবার আদর যত্ন পেয়েছে যথেষ্টই। তাই রাগ শহর ছেড়ে আসা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয় নি। তবে মায়রার রূপে মার্ক যেমন মজে গেছে তেমনি মায়রাও তার প্রতি কম আকৃষ্ট হয়ে পড়ে নি। এমনটা ঘটা কিছুমাত্রও বিচিত্র নয়। আসলে মার্ক-এর মতো আকর্ষনীয় রূপবান যুবক তো সচরাচর চোখে পড়ে না। আর তার মিশুকে স্বভাবও যে অতুলনীয়। অল্পেতেই কথাবার্তার মাধ্যমে মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌছে যেতে তার জুড়ি নেই। মোদ্দা কথা, একজন শিল্পীর পক্ষে যা দরকার, সে রূপ-সৌন্দর্যের পূজা করার প্রবণতাটুকু তার মধ্যে উপস্থিত।

রূপসী মায়রাকে একবারটি চাক্ষুষ করার জন্য আমি নিজেই মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করছিলাম। মায়রার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য আমার অনুজ মার্কও কম উদ্বিগ্ন ছিল না। দায়িত্ব নিয়ে বিয়ের পাট চুকিয়ে দেবার জন্য আমি যেন অন্তত এক মাসের জন্য রাগ শহরে গিয়ে মাথা গুঁজি। আমি গেলে তবেই বিয়ের তারিখ পাকা করা হবে। তবে তার আগে মায়রা নাকি তার ভাবী ভাসুরকে একবারটি চাক্ষুষ করতেও আগ্রহী। কারণ, আমার সম্বন্ধে সে নাকি খুবই উঁচু ধারণা পোষণ করে। মার্কের চিঠিপত্রের মাধ্যমেই আমি মায়রার সম্বন্ধে যে টুকু জানা দরকার ও সম্ভব জেনে নিয়েছিলাম। আরও ভালো হত আমার ভাইটি যদি তার প্রিয়তমার একটা প্রতিকৃতি এঁকে পাঠিয়ে দিত। সে নামি মায়রাকে ছবি আঁকার মডেল হয়ে বসার জন্য প্রস্তাবও দিয়েছিল। সে সম্মত হয় নি। মার্ক-এর চিঠিতে জানতে পেরেছি, মায়রা নাকি আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাকে চমকে দিতে আগ্রহী, ছবিতে নয়।

অনন্যোপায় হয়ে রাগ শহরে যাত্রা করার জন্য মন স্থির করে ফেললাম।

এপ্রিলের তেরো তারিখ। সেদিন যাত্রা করার কথা। সেদিনই সন্ধ্যার দিকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে পুলিশ লেফটেন্যান্ট-এর দপ্তরে গেলাম। আর আমার পাশপোর্টটাও নিয়ে আসার ইচ্ছা। পুলিশ-লেফটেন্যান্ট আমার বন্ধু। পাশপোর্টটা আমার হাতে তুলে দিতে দিতে তিনি আমার অনুজের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে পড়লেন। কারণ, আমার অনুজকে তিনি বহুদিন ধরেই চেনেন।

পুলিশ লেফটেন্যান্ট বন্ধু সংক্ষেপে শুভ বার্তাদি বিনিময়ের পর কি যেন বলতে গিয়ে আমতা আমতা করতে লাগলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে সুবিধার মনে হল না। আমি জোর করে চেপে ধরলে সে যা বলল তা মোটামুটি এরকম—আমার অনুজ মার্ক রাগ শহরে পৌছোনোর কয়েক মাস আগেকার কথা। তাঁর বিশ্বাস, মার্ক হয়তোবা ব্যাপারটা জানে আর তাঁর মতে মিস মায়রা যেমন রূপে অনন্যা, গুণের দিকে থেকেও জুড়ি পাওয়া বার। অতএব তার বিয়ের জন্য সুপাত্রের অভাব হবে না, খুবই স্বাভাবিক। একটা লোক নাকি তার ভালোবাসা পাবার জন্য, বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতার জন্য কিছুদিন হন্যে হয়ে ঘোরাফেরা করেছে। লোকটা কিন্তু তেমন সুবিধার নয়। সপ্তাহ পাঁচ আগে ব্যাপারটা ঘটেছিল। আমার লেফটেন্যান্ট বন্ধুবর তার এক অফিসার বন্ধুর মুখে ঘটনাটা

www.pathagar.com

শুনেছিলেন। তিনি এও বললেন ডা. রোডরিখ নাকি তাকে যাচ্ছেতাই বলে অপমান করে বাড়ি থেকে বেরও করে দিয়েছেন। তবে এও ভাবা দরকার, মিস মায়রাকে বিয়ে করতে অত্যুৎসাহী সে যুবকটাকে কেন্দ্র করে শহরের মানুষ যেভাবে নানা জল্পনা-কল্পনা ও রঙ্গ রসিকতায় মেতেছে, তাকে তো আর হেসে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

আমি তবুও ব্যাপারটাকে পাত্তা না দিয়ে বললাম—'ব্যাপারটা জানতে পারায় একদিক থেকে ভালোই হল। আর এও ঠিক গুজব নিয়ে মাথা না ঘামানোই উচিত।'

আমার মুখে 'গুজব' শব্দটা শোনামাত্র বন্ধুবর লেফটেন্যান্ট সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—'আরে ভাই গুজব বলে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবেন না। ব্যাপারটা বাস্তবিকই গুরুত্বপূর্ণ।'

আমি দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে আচমকা হোঁচট খেয়ে চৌকাঠের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘাড় ঘুড়িয়ে বললাম—'ভালো কথা, আমার ভাই মার্ক-এর প্রতিদ্বন্দ্বী সে যুবকের নামটাই তো শোনা হল না। কি নাম তার, বলুন তো?'

উইলহেম স্টোরিজ। তার বাবা—'

আমি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলাম—'তবে যাঁকে কেমিস্টের পরিবর্তে 'আলকেমিস্ট বলে সম্বোধন করা উচিত, তাঁর ছেলে কি? তিনি মস্তবড় এক রসায়নবিদ। আবিষ্কার কম করেন নি তিনি, নামডাকও খুবই।'

'অবশ্যই। সমগ্র জার্মান জাতির তিনি গর্ব ছিলেন। বছর কয়েক আগে তিনি পৃথিবী ছেড়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর সুযোগ্য পুত্রটি আজও পৃথিবীর বুকে রয়ে গেছেন। মুহূর্তকাল নীরবে থেকে তিনি এবার অপেক্ষাকৃত গলা নামিয়ে বললেন—'বন্ধু, ভাই ভালো উইলহেম স্টোরিজ ছেলেটা কিন্তু একেবারেই সুবিধের নয়। মোদ্দা কথা, অন্য দশটা ছেলে সাধারণত যেমন হয়ে থাকে উইলিয়ম স্টোরিজ মোটেই সে ধরনের নয়। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, তার ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকলে লাভ ছাড়া ক্ষতির তো কিছুই থাকতে পারে না।'

আমি তার হাত চেপে ধরে করমর্দন সারতে সারতে বললাম—'আপনার আন্তরিক ও সৎ পরামর্শের কথা অবশ্যই মনে রাখব। মিস মায়রা যতদিন না আমার ভ্রাতৃবধূ হয়ে ঘরে আসছে ততদিন অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবই।' কথা বলতে বলতে আমি পুলিশ লেফটেন্যান্ট-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নামলাম।

দশই এপ্রিলের কথা। সেদিন আমি প্যারিস থেকে যাত্রা করলাম। অস্ট্রিয়ার রাজধানীতে পৌঁছাতে দশদিন লেগে গেল। তারপর অল্প সময়েই বুদাপেস্ট শহরে হাজির হলাম। সেখানে দিন কয়েক থেকে পথশ্রম দূর করে একটু চাঙা হয়ে নিলাম। সেখান থেকে যাত্রা করার আগের সন্ধ্যায় এক নামকরা রেস্তোরায় বসে দেশী মদের সদ্ব্যবহার করতে করতে সংবাদপত্রের পাতায় অলসভাবে চোখ বুলাতে গিয়ে এক জায়গায় আচমকা থমকে গেলাম। দেখি, বড় বড় হরফে 'স্টোরিজ বার্ষিকী উদ্‌যাপন' শব্দে তিনটি ছাপা রয়েছে।

আচমকা যেন একটা হোঁচট খেলাম। স্মৃতির পাতা উল্টে নিঃসন্দেহ হলাম, 'স্টোরিজ' নামটাই বন্ধুবর পুলিশ লেফটেন্যান্টের মুখে শুনেছিলাম। হ্যাঁ, ইনিই তবে সেই জার্মান যুবক যিনি মায়রা রোডরিখকে বিয়ে করার জন্য অত্যুগ্র আগ্রহী। সংবাদপত্রের বক্তব্যটুকু এক নিঃশ্বাসে পড়ে নিঃসন্দেহ হলাম। সংবাদপত্রের বক্তব্য আর প্রায় তিন

www.pathagar.com

সপ্তাহের ভেতরে মে-র পঁচিশ তারিখে স্প্রেমবার্গে অটোস্টোরিজ এর বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন করা হবে। এ উপলক্ষে এখানে, পণ্ডিত প্রবরের জন্মস্থানে বিপুল জনসমাগম প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

অনন্যাসাধারণ এ বৈজ্ঞানিকের মহামূল্য আবিষ্কার জার্মানের মুখ উজ্জ্বল করেছে, আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথকেও প্রশস্ত করেছে।

না, প্রবন্ধকার একতিলও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলেন নি। অটোস্টোরিজ-এর বার্ষিকী উৎসব বৈজ্ঞানিক মহলে এমন করেই উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে, খুবই সত্য বটে।

প্রাবন্ধিক মহাশয়ের পরের বক্তব্যটুকু আমাকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। তার বক্তব্য মোটামুটি এরকম অটোস্টোরিজ-এর জীবদ্দশায় সবাই তাকে যে একজন কৃতী যাদুকর বলে ভাবত, তা কার না জানা আছে? তবে হ্যাঁ, এরকম ধারণায় যারা আস্থাভাজন তারা অলৌকিক ও অতি প্রাকৃত ব্যাপারেও খুবই বিশ্বাসী ছিল। যদি দু-এক শতক আগে হত, তাঁকে এ অপরাধের জন্য গারদে পোরা হত আর বাজারের খোলা প্রান্তরে জ্যান্ত পুড়িয়ে কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হত। আরও বলা যায়, অটোস্টোরিজ পরলোক গমন করলেও এ ব্যাপারটা অনেকের মধ্যে বেশি পাকা হয়েছে যারা অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপারের প্রতি খুবই আস্থাশীল। সেজন্য বলতেই হয় অটোস্টোরিজ যে কেবলমাত্র একজন যাদুকর তা-ই নন, অলৌকিক ক্ষমতাবান। তিনি কিন্তু তাঁর যাদুমন্ত্র এবং অতি প্রাকৃত ক্ষমতা কাউকে দান করে যান নি। তাই তাঁর গুণগ্রাহী অনুরাগীরা কিছুটা অন্ততঃ নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। তিনি লব্ধ বিদ্যা নিয়ে সমাধিস্থ হওয়ার পরও তার অনুরাগীদের অন্তরের অন্তঃস্থলে একজন কুহক মন্ত্রের গুরু এবং যাদুকর হিসেবে চিরজাগরুক থাকবেন।

সংবাদপত্রের পাতায় এ খবরটা দেখে অন্য যে যা-ই মনে করুক আমি কেবলমাত্র একটা ব্যাপারই ভাবছি, বরাত খুবই ভালো যে ডা. রোডরিখ অটোস্টোরিজ-এর গুণবান ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। নইলে খবরটা পড়তে গিয়েই আমার গায়ের রক্ত হিম হতে শুরু করত।

শেষের দিকটা এভাবে শেষ করা হয়েছে—তাই সমাধি প্রাঙ্গণে যে দলে দলে লোক এসে জড়ো হবে এতে কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। অন্যান্য বার্ষিকী উৎসবে যা ঘটে এক্ষেত্রেও তা-ই ঘটবে। আসলে অটোস্টোরিজ-এর হিতাকাঙ্ক্ষী ও অনুগামীরা সংখ্যায় কম নয়। তাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি তার অত্যাশ্চর্য ও বিচিত্র কার্যকলাপের মধ্যে এখনও জীবিত রয়েছেন। এতে আরও একটা চিন্তা মনে জাগা কিছুমাত্রও আশ্চর্যের নয়। চিন্তাটা হচ্ছে স্প্রেমবার্গের কুসংস্কারাশ্রয়ী মানুষগুলোর জন্য।

বার্ষিকী উৎসবের দিন তারা আশায় আশায় থাকবে খুবই অদ্ভুত কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য। শহরের পথে-ঘাটে, হোটেলে-রেস্তোরায় অনেক জল্পনা-কল্পনাই হয়ে চলেছে। একেবারে অত্যাশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য কিছু ঘটনা নাকি সমাধি প্রাঙ্গনেই ঘটতে দেখা যাবে। সবাইকে চমকে দিয়ে অকস্মাৎ সমাধির পাথর ঠেলেঠুলে বিজ্ঞ ব্যক্তিটি যদি মানবদেহ নিয়ে ওপরে উঠে আসেন, আবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন, তবে মনে হয় না কেউ তেমন অবাক হবেন।

কেউ কেউ এমনও মনে করেন, অটোস্টোরিজ-এর মৃত্যু হয় নি, কিছুতেই তিনি মরতে পারেন না। তাঁর কবরটারও পারলৌকিক কার্যাদি নাকি স্রেফ একটা ধাপ্পাবাজি।

www.pathagar.com

বাজে ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে ঝুটমুট সময় নষ্ট করার তিলমাত্র ইচ্ছাও তাদের নেই। কুসংস্কারকে তো আর যুক্তি বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে আগলে রাখা সম্ভব নয়, ডাঁহা মিথ্যা কথা। ব্যাপারটা এতই মিথ্যা যে, এ নিয়ে ভাবনা চিন্তার অর্থই হচ্ছে সময়ের অপব্যবহার করা। তবে এও ঠিক যে, বাপের মৃত্যু হয়েছে এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য, ছেলের বেঁচে থাকার ব্যাপারটা। হ্যাঁ, তাঁর ছেলে উইলিয়াম স্টোরিজ বেঁচে রয়েছেন। বাপ অটোস্টোরিজ মরে পরপারে চলে গেছেন বটে, কিন্তু তাঁর গুণধর ছেলেটা তো মর্ত্যলোকেই রয়ে গেছে। আর তাকেই তার বাবা পইপই করে বারণ করে গেছে সে যেন ভুলেও রোডরিখ পরিবারের বাড়ির ত্রি-সীমানায় না যায়। যত ভয় তো এজন্যই। ক্রোধ আর হিংসার শিকার হয়ে তিনি মার্ক-এর সর্বনাশ করবে না তো? বিয়েটা ভেঙে দেবে না তো? ক্রোধ আর হিংসার যে অসাধ্য কিছুই নেই। তবে? তা-ই যদি হয়-তবে?

ব্যস, আর দেরি নয়। অনুজ মার্ককে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম পরের দিনই বুদাপেস্ট থেকে আমি রওনা হচ্ছি। এক শ' পঁচানব্বই মাইল দূরবর্তী রাগ শহরে এগারোই মে বিকালে পৌঁছে যাব।

পরেরদিন সকাল আটটায় 'রোথি' জাহাজ বন্দর ছেড়ে গভীর সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল। অস্ট্রিয়ার রাজধানী থেকে একেবারে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত যাবে মাত্র পাঁচ-ছ-জন। তাদের মধ্যে একজন ইংরেজ যাত্রীও চলেছেন ডেকের ওপর একজন বিচিত্র দর্শন লোকের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। তার বয়েস পঁয়ত্রিশ তো হবেই। রুক্ষ-রুষ্ট লিকলিকে চেহারা। কণ্ঠস্বরও রীতিমতো কর্কশ। তার চালচলন কথাবার্তার মাধ্যমে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জাহাজের যাত্রীদের ব্যাপারে তিলমাত্র আগ্রহ বা কৌতূহলও তার নেই। সে আমাকে আকর্ষণ করেছিল বলেই তার সম্বন্ধে আমার মনে নানা ভাবনার উদয় হচ্ছিল। ভাবলাম, লোকটা কোন জাতের? চেহারার ছিরি দেখে তো মনে হচ্ছে জার্মান। প্রুশিয়ার অধিবাসী হওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশি।

এবার খুবই সাধারণ একটা ঘটনা ঘটল। আমার বাক্সটার কাছে তখন আমি দাঁড়িয়ে। আমার নাম, ঠিকানা ও পদমর্যাদা লেখা কাগজ বাক্সটার গায়ে সাঁটা রয়েছে। আমি রেলিঙে ভর দিয়ে দূরের পাহাড় ও গাছগাছালির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এ সময় হঠাৎ মনে হল কে যেন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে ঝট করে পিছন ফিরতেই অবাক হতে হল। কাউকেই দেখতে পেলাম না। তবে আমাকে চোখে চোখে রাখার ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। তাই পিছনে কাউকে দেখতে না পেয়ে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসার জোগড় হল। স্তম্ভিত আমি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। একসময় লক্ষ্য করলাম, সবচেয়ে কাছের লোকটার সঙ্গে আমার ব্যবধান কম হলেও হাত চল্লিশেক তো হবেই। নিজের ব্যবহারের জন্য নিজেকেই দায়ী করতেই হল। নিজের ভীত প্রকৃতির জন্য অবাকও কম হলাম না। এমন অতি সামান্য একটা ব্যাপার মনের কোণে গেঁথে রাখার মতোও নয়। তাই সহজেই সেটাকে মন থেকে ঝেড়ে দিয়ে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনলাম। ব্যাপার যতই তুচ্ছ হোক না কেন, মনে গেঁথেই রইল। কারণ, এরপর যা ঘটল তা আমি ভুলেও ভাবতে পারি নি।

পরের দিন আমাকে কোনো ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় নি।

নয়ই মে সকাল নয়টার কাছাকাছি ঘটনাটা ঘটল। আমি কেবিনে ঢুকছি ঠিক তখনই জার্মান সহযাত্রীটা কেবিনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। উভয়ের সামনা-সামনি ধাক্কা

www.pathagar.com

লাগার জোগাড়। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে পাশ কাটানো সম্ভব হল। লোকটার চাহনি বাস্তবিকই অস্বাভাবিক। তার চোখের মণি দুটোতে জ্বলন্ত ঘৃণার ছাপটুকু আমার নজড় এড়ায় নি। এই প্রথম আমি তার সামনা-সামনি হয়েছি।

আমি তো তার হাবভাব দেখে রীতিমতো স্তম্ভিত। আমার ওপর তার এত ক্ষোভ কেন? এত ঘৃণারই বা কি থাকতে পারে? তবে কি আমি ফরাসি বলেই তার এত ক্ষোভ ও বিদ্বেষ? আমার বাক্সটার গায়ে লেখা নাম-ঠিকানা দেখেই কি সে এমন রেগে মেগে লাল হয়ে উঠেছে?

দশই মে। সেদিন লোকটা পর পর বেশ কয়েকবারই আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। প্রত্যেকবারই এমন চোখ গরম করে তাকিয়ে চলে গেল যাতে আমার মেজাজ একেবারে পঞ্চমে চড়ে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার! তার কোনো বক্তব্য থাকলে সামনা-সামনি বলে ফেললেই তো ল্যাটা চুকে যায়। ফরাসি ভাষা সে যদি না-ও জানে কোনো সমস্যা নেই। জার্মান ভাষাও তো আমার ভালোই রপ্ত রয়েছে।

আমি মনস্থ করে ফেললাম বাক্যালাপের সুযোগ আসুক আর না-ই আসুক সবার আগে আমাকে টিউটন লোকটা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে হবে। আমি সরাসরি জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করায় ভুরু কুঁচকে বললেন, তিনি নাকি তাকে এ-জাহাজে এবারই প্রথম দেখছেন। লোকটা জার্মান, এছাড়া তার সম্বন্ধে আর কোনোই উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হল না।

আমাদের জাহাজ ডরোথি, ভুকোভার বন্দরে নোঙর তোলার পর অদ্ভুত চরিত্রের লোকটাকে আর নজরে পড়ল না। তাই ধরেই নিলাম, সে ভুকোভার বন্দরেই নেমে গেছে। যাক, বাঁচা গেল। আমার দিকে বড় বড় চোখ করে, ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাবার ব্যাপারটা নিয়ে আর কথা বা জিজ্ঞাসাবাদ করার দরকার পড়ল না। তখন বিকাল পাঁচটার কাছাকাছি। কতগুলো গির্জার চূড়া আমার বাঁ দিকে উঁকি দিল। রাগ শহরের গির্জা। এবার পুরো শহরটাই চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর দেখা দিল হাঙ্গেরির ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন কেল্লা।

জাহাজ জেটি স্পর্শ করল। ব্যস, ঠিক সে মুহূর্তেই ঘটে গেল দ্বিতীয় ঘটনাটা। নৌকায় ওঠা-নামার পথেরপাশে ঘাটের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আমি দাঁড়িয়ে। কিছু লোক জেটির শেষ প্রান্তে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। আমার অনুজ মার্ক যে তাদেরই একজন এতে কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি এদিক-ওদিক হেলেদুলে তার মুখটা খুঁজে চলেছি। ঠিক তখনই আমার ঠিক পিছন থেকে কণ্ঠস্বরটা ভেসে এল—'মার্ক যদি মায়রাকে বিয়ে করে তবে তার সর্বনাশ অনিবার্য, জেনে রাখবেন।'

অতর্কিতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। দেখি, ভোঁ-ভাঁ, ফাঁকা। পিছনে তো দূরের কথা ধারে কাছেও কেউ নেই। আমি একদম একা। তবু কে যেন আমাকে সতর্ক করে দিয়ে গেল। কণ্ঠস্বরটা মোটেই আমার অপরিচিত নয়, ও অশ্রুতপূর্ব নয়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! আমার কাছাকাছি কেউ-ই নেই। হক চকিয়ে গেলাম। চোখের মণি দুটোকে চারদিকে শেষবারের মতো বুলিয়ে নিলাম। অনন্যোপায় হয়ে পাড়ে নেমে যাওয়ার চেষ্টায় মন দিতেই হল। একে-ওকে গোত্তা মেরে, বার কয়েক ঠেলাধাক্কা খেয়ে মার্ক-এর দিকে এগিয়ে চললাম।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, আমার অনুমান অভ্রান্ত। দেখি, অনুজ মার্ক আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছটফট করছে।

মার্ক-এর ঠিক পিছনে, প্রায় গা-ঘেঁষে সৈনিকের পোশাকে সজ্জিত এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

মার্ক তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। তার ভাবী শ্যালক। বয়স বেশি হলেও আটাশ। মিলিটারি অফিসার, ক্যাপ্টেন। তার চোখ-মুখের গাম্ভীর্য ও হাবভাব দেখলে স্পষ্ট মনে হয়, যেন হুকুম তামিল করা নয়, হুকুম করার জন্যই তার জন্ম। পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে মার্ক বলল—'ইনি ক্যাপ্টেন হারালান রোভলিস। আমার ভাবী শ্যালক।'

সে করমর্দন সারতে সারতে বলল—'আপনাকে কাছে পেয়ে আমার পরিবারের সবাই খুবই খুশি হবে। সত্য বলতে কি, সবাই আপনার প্রতীক্ষায় বসে।'

সামান্য আলাপ পরিচয়ের মাধ্যমেই জানতে পারলাম, ক্যাপ্টেন হারালান ফরাসি ভাষায় কথা বলতে খুবই পটু। তার পরিবারের সবার এ ভাষাটা রপ্ত করা আছে। ফ্রান্সে তারা গেছেও বেশ কয়েক বার। আর আমার এবং অনুজ মার্ক-এরও জার্মান ভাষা ভালো রপ্ত রয়েছে। ঠেকা কাজ চালানোর মতো হাঙ্গেরিও একটু আধটু জানা আছে।

গাড়িতে পথ পাড়ি দিতে গিয়ে মার্ক এক সময় বলল, প্যারিস ছেড়ে আসার পর সে কীভাবে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এ শহরে এসে নোঙর ফেলেছে। স্প্রেমবার্গ আর ভিয়েনাতে চিত্র শিল্পী হিসেবে সে আকাশছোঁয়া সম্মান খাতির পেয়েছে। মোদ্দা কথা, তার মুখে যা কিছু শুনলাম তাতে আমি মোটেই অবাক হই নি। তার স্বাক্ষর যুক্ত শিল্পকর্ম নিয়ে ধনকুবের ম্যাগিয়ার আর অস্ট্রিয়ানরা যে কাড়াকাড়ি করবে এ বিশ্বাসটুকু আমার রয়েছে। তার মুখ থেকে এও শুনলাম, চারদিক থেকে এত বায়না আসছে যে, কিছুতেই সে চাহিদা মিটিয়ে উঠতে পারছে না। সে নিজের কাজের অগ্রগতির কথা এক নিঃশ্বাসে বলে যেতে লাগল।

আমি একসময় দুম্ করে বলেই ফেললাম—'ভাই, বিয়েটা কবে হচ্ছে, বল তো?'

কথাটা শেষ হতে না হতেই গাড়িটা সজোরে একধাক্কা দিয়ে থেমে গেল।

আহারাদি সেরে চুরুট মুখে দুভাই দানিয়ুব নদীর দিকে হাঁটতে লাগলাম। একটু বাদেই নদীর পাড়ে হাজির হলাম। নদীর পাড় বরাবর হাঁটতে হাঁটতে ডরোথি জাহাজ থেকে নৌকায় নামার পূর্বমুহূর্তে যে সতর্ক বাণীটা শুনে ছিলাম সেটা আমার বুকের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। ব্যাপারটাকে আমি এখনও নিছকই ভ্রান্ত ধারণা বলে মনে করছি। আর যদি সত্যতা কিছু থেকেই থাকে তবে কার ওপর দোষারোপ করব? যে আত্মম্ভরী জার্মান যুবক বুদা পেস্ট থেকে জাহাজে উঠে ভুকোভারে নেমে গিয়েছিলেন তার ওপর? হ্যাঁ, করলেও করা যেতে পারে বটে। সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে একটা গাঁজাখুরি ব্যাপার বলেই মনে হল। তাই আমার অনুজ মার্ক-এর কাছে ব্যাপারটা চেপেই গেলাম। ঠিক করলাম, তার চেয়ে বরং উইলহেম স্টোরিজ সম্বন্ধে দু-চার কথা যা শুনেছি সে প্রসঙ্গেই কিছু আলোচনা করি।

মার্ক খুবই হাল্কাভাবে বলল—'লোকটার ব্যাপারে হারালান-এর মুখে আমি আগেই কিছু কিছু শুনেছি। সে নাকি সর্বজন পরিচিত সুপণ্ডিত অটো স্টোরিজ-এর একমাত্র পুত্র। জার্মানের সবার কাছে অটোস্টোরিজ-এর পরিচয় একজন কৃতী যাদুকর। তা ছাড়া পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যাতে খুবই মূল্যবান কিছু আবিষ্কার করে তিনি আলোড়ন সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেছেন।' মুহূর্তকাল থেমে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে এবার বলল—'তবুও তাঁর একমাত্র ছেলেটাকে রোডরিখ পরিবার প্রত্যাখ্যান করেছে।'

এবার মার্ক যা বলল তা হল—'রোডরিখ পরিবার তার প্রস্তাবকে স্বীকৃতি দানের চার-পাঁচ বছর আগেই বৈজ্ঞানিক অটোস্টোরিজ-এর ছেলের প্রস্তাবকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। উভয় ঘটনার মধ্যে কিছুমাত্র সম্পর্কও নেই। মিস মায়রা হয়তো জানতই না যে. উইলহেম স্টোরিজ তাকে বিয়ে করার জন্য ঘুরঘুর করছে। কোনো আশাই নেই নিঃসন্দেহ হাওয়ায় উইলহেম জল ঘোলা না করে মুখ বুজে ব্যাপারটাকে হজম করে নিয়েছিল।'

আমি অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বললাম—'আশা নেই? কেন? আশা না থাকার কারণ কি. জান কিছু?'

'কারণ একটাই,উইলহেম স্টোরিজ আসলে একবিচিত্র চরিত্রের যুবক। কারো সামনেই যায় না। কেউ দেখা করতে চাইলেও তার দেখা পায় না। বুলেভার্ড টেকেলির নির্জন-নিরালা বাড়িতে সে বাস করে। পাড়া ছাড়িয়ে বাড়িটা। ভুলেও কেউ সে পথে যায় না। আর একটা কথা, জাতিতে জার্মান তাকে ডা. রোডরিখ যে দুচোখ পেতে দেখতে পারবেন না, আশ্চর্য কি? আসলে টিউটনিক জাতিকে হাঙ্গেরিয়ানরা মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না। আমি দু-চার-দিন উইলহেমকে দেখেছিমাত্র। ব্যস, একটু-ই। তবে সে আমাকে দেখতে পায় নি। ক্যাপ্টেন হারালান আমাকে একদিন দূর থেকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

আমি আগ্রহান্বিত হয়ে বললাম—'আর একটা কথা. উইলহেম কি এখনও রাগ শহরে অবস্থান করছে?'

'বলা মুশকিল। তবে দু-তিন সপ্তাহ তাকে চোখে পড়ে নি।' এবার রীতিমতো দৃঢ়তার সঙ্গে মার্ক বলল—'আমার কথা শোন, উইলহেম যেখানেই থাক না কেন সে কোনোদিনই মায়রাকে সহধর্মিনী হিসেবে পাবেনা, নিশ্চিত জেনো।'

আমি জেটির ওপর দিয়ে হাঁটাচলা চালিয়ে যেতে লাগলাম। উদ্দেশ্য বিহীনভাবে অবশ্যই নয়। একটু বাদেই একটা রহস্যজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাকে হতেই হল। আমার স্পষ্ট মনে হল, কে যেন আমাদের পিছন পিছন হাঁটাচলা করছে। নীরবে অনুসরণ করে চলেছে। আমাদের মধ্যে সন্দেহজনক কোনো কথা আলোচনা করছি কিনা জানার জন্যই তার এ তৎপরতা।

আমার মানসিক পরিস্থিতির কথা মার্ক-এর কাছে সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখতে গিয়ে বললাম—'তোমার বিয়ের জন্য অত্যাবশ্যক যা কিছু কাগজপত্রের কথা লিখেছিলে সবই আমি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি।'

টুকরো টুকরো আরও কিছু কথা বলতে বলতে আমরা হোটেলের সদর-দরজায় ফিরে এলাম। হোটেলে ঢোকার মুখে ভাবলাম. কে যেন আমার পিছন পিছন এতক্ষণ হেঁটে এসে আমার প্রায় গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে আমার পিছনে এঁটুলির মতো লেগে রয়েছে। ঝট করে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন ফিরলাম। না, রাস্তা একেবারেই ভোঁ-ভোঁ-জন মানব শূন্য। একটা কাকপক্ষীও চোখে পড়ল না।

আমি আর অনুজ মার্ক নৈশভোজ সেরে শুয়ে পড়লাম। আমি দু-চোখের পাতা এক করতে না পারায় বিছানায় শুনে নিরবচ্ছিন্ন অস্থিরতার মধ্য দিয়ে রাত্রি কাটাতে লাগলাম।

www.pathagar.com

জাহাজ থেকে নামার পূর্ব মুহূর্তে ডেকের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মার্ক-এর খোঁজ করার সময় যে ভাষায় ও স্বরে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল আচমকা ঠিক তা-ই শুনতে পেলাম। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় হুবহু সেই একই কথা আমার কানে এল। বাকি রাত্রিটুকু আর দুচোখের পাতা এক রাখতে পারলাম না।

সকাল হল। বিছানা ছেড়ে ওঠে পড়লাম। সেদিন সকালেই রোডরিখ-এর সঙ্গে আমার আনুষ্ঠানিক আলাপ পরিচয় ঘটল।

আমি অনুজ মার্ক-এর সঙ্গে গ্যালারির ধার দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখি, একটা ইজেলে অসমাপ্ত একটা প্রতিকৃতি। মিস মায়রার প্রতিকৃতি। তার তলায় আমার অনুজের স্বাক্ষরটা জ্বলজ্বল করছে।

ডা. রোডরিখ-এর সঙ্গে মার্ক আমার পরিচয় করিয়ে দিল। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চালচলন ও চেহারা দেখলে কিন্তু এত বয়স মনেই হয় না। আর মিসেস রোডরিখ? তার বয়স পঁয়তাল্লিশ হবে হয়তো। একজন আদর্শ ঘরণীর যা কিছু গুণ থাকা বাঞ্ছনীয় সবগুলিই তাঁর মধ্যে বর্তমান।

স্বীকার করতে বাধ্য হলাম, মার্ক মায়রার রূপলাবণ্যের ব্যাপারে যা বলেছিল এক বিন্দুও বাড়িয়ে বলেনি। একটু আগে ক্যানভাসের গায়ে আঁকা তার প্রতিকৃতি দেখে রূপ-সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম। এখন চাক্ষুস করেও একইভাবে প্রশংসা না করে পারলাম না।

তখন ক্যাপ্টেন হারালানও সেখানে উপস্থিত ছিল। হাত বাড়িয়ে ভ্রাতৃভাবে করমর্দন করল। একে একে পুরো পরিবারটার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। গড়ে উঠল হৃদ্যতার সম্পর্ক। রাত্রে এক টেবিলে বসে আমরা ভোজ সারলাম। মায়রা মিষ্টি-মধুর গলায় হাঙ্গেরিয়ান সঙ্গীত পরিবেশন করে আমাকে আপ্যায়ন করল।

হোটেলে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত্রি হয়ে গেল। মার্ক আমার ঘরে এসে মুচকি হেসে বলল—'মায়রার রূপ লাবণ্যের ব্যাপারে যে বলেছিলাম, হুবহু মিলে গেছে তো? পৃথিবী ঘুরে এলে তার জুড়ি আর কাউকে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় কি?'

'কী বলছ তুমি! জুড়িদার? অসম্ভব।'

পাখির ডাকে সকাল হল। ক্যাপ্টেন হারালান হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। চা-পর্ব সেরে সে আমাকে রাগ শহর দেখাতে নিয়ে গেল।

জাহাজের জেটিতে এবং রাত্রে ঘুমের ঘোরে শোনা সতর্ক বাণীর কথা অনুজ মার্ককে বললেও তার ভাবী শ্যালক হারালানকে কিছুই বলি নি।

রাগ শহরের বিভিন্ন দ্রষ্টব্যস্থান দেখতে দেখতে এক সময় হারালান আমাকে নিয়ে বিশালায়তন একটা বাড়ির সদর দরজায় হাজির হল। সেটা প্যালেস। তিন সপ্তাহের ভেতরে মার্ক আর মায়রাকে আসতে হবে। এখানে গভর্নরের কাছ থেকে বিয়ের অনুমতি নিয়ে তবে গির্জায় যেতে হবে বিয়ের পাট মেটাতে। এটা বহু পুরনো প্রচলিত স্থানীয় প্রথা। তার অনুমতি না পেলে বিয়ে কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়। এখন সমস্যা হচ্ছে, গভর্নর যদি কোনো কারণে বেঁকে দাঁড়ান তবে তাদের কেউ অন্য কাউকেও বিয়ে করতে পারবে না।

বিয়ের অবিশ্বাস্য প্রথার কথা শোনাতে শোনাতে ক্যাপ্টেন হারালান সেন্ট মাইকেল গির্জার দিকে যেতে গিয়ে বাজারের ধারে পৌছেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখলাম, এক

www.pathagar.com

জায়গায় বেশ কিছু লোক জড়ো হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম, এক সব্জি বিক্রেতা বুড়ো আচমকা একজনের ঘাড়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এ-ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে হৈ হট্টগোল। বুড়োটা বার বার কাঁদো কাঁদো স্বরে বলছে—আমি নিজের ইচ্ছাতে তার ঘাড়ে পড়ি নি। কে যেন আমচকা আমাকে এমন এক ধাক্কা মেরেছে যার ফলে আমি নিজেকে সামাল দিতে না পেরে তার ঘাড়ে পড়তে বাধ্য হয়েছি।'

ক্যাপ্টেন হারালান এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে বুড়োটার মুখ থেকে যা শুনল তা বাস্তবিকই রহস্যজনক এক ঘটনা। বুড়োটা ধাক্কা খেয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে পিছনে অনুসন্ধিৎসু নজরে দৃষ্টিপাত করে ধারে-কাছে কাউকেই নাকি দেখতে পায় নি। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কিন্তু কি করে এমন একটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটা সম্ভব? দুটো কারণে বুড়োটা হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে। হয় নির্ঘাৎ কেউ না কেউ তাকে ধাক্কা মেরেছে, নতুবা ঝড়ো বাতাসের চাপ সহ্য করতে পারে নি। কিন্তু ঝড় তো দূরের ব্যাপার, দমকা বাতাস পর্যন্ত ছিল না যখন বুড়োটা হুমড়ি খেয়ে লোকটার ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে। এমনও তো হতে পারে বুড়োটা যে কাহিনীর অবতারণা করছে তাতে আসলের চেয়ে খাদের পরিমাণই বেশি। আবার চাষিটা এও স্বীকার করছে না যে, সে মদ বা অন্য কোনো মাদক দ্রব্য সেবন করে এরকম কাণ্ডটা বাঁধিয়েছে। রহস্যজনক ব্যাপারটার নিষ্পত্তি কিছুতেই হল না।

আমি ক্যাপ্টেন হারালান-এর পাশাপাশি আবার হাঁটতে শুরু করলাম। সে আমাকে পূর্ব প্রসঙ্গ, তাদের দেশের প্রচলিত বিয়ে প্রথার ব্যাপারটা বোঝাতে লাগল। তারপর প্রসঙ্গান্তরে যেতে গিয়ে বলল—'আমাদের দেশের মানুষ খুবই কুসংস্কারের প্রতি আস্থাবান। ভূত-প্রেত ও দৈত্য-দানো প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপারে খুবই বিশ্বাসী। এসব ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে অত্যাশ্চর্য ও মুখরোচক বহুকাহিনী এখানকার মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়।'

আমি তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম। মনে মনে বললাম—'এ যে কী দুর্বলত, কতখানি মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তা আমি নিজেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি!' আমরা হাঁটতে হাঁটতে আরও কিছুটা পথ অতিক্রম করে বাগানের ধারের একটা নির্জন-নিরালা বাড়ির সামনে হাজির হলাম। এক নজর দেকলেই মনে হয় বাড়িটা নির্ঘাৎ পরিত্যক্ত।

হারালান বলল—'অদ্ভুত একটা লোকের বাড়ি ওটা। এক জার্মান ভদ্রলোক এর মালিক। প্রুশিয়ান।'

হঠাৎ বাড়িটার দরজা খুলে দুজন লোক বাইরে এসে দাঁড়াল। তাদের একজনের বয়স ষাট, আর দ্বিতীয় জনের অনেক কম। তাদের দেখেই ক্যাপ্টেন হারালান বলে উঠল—'এ কেমন হল! আমি ভেবেছিলাম, লোকটা এখান থেকে কেটে পড়েছে!' দ্বিতীয় ব্যক্তিটা উঠোন পেরিয়ে মুখ তুলে তাকানো মাত্র মনে হল সে এবং ক্যাপ্টেন হারালান পরস্পরের পরিচিত। লোকটাকে দেখে আমিও চিনে ফেললাম। বুদাপেস্ট থেকে আসার সময় ডরোথি জাহাজে তাকে দেখে ছিলাম বটে।

ক্যাপ্টেন হারালান বলল—'লোকটা এখানে না থাকলে খুব ভালো হত। আমার সঙ্গে তার সাপে-নেউলে সম্পর্ক। তার স্পর্ধা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। আমার বোনকে

www.pathagar.com

সে বিয়ে করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছিল। আমি আর বাবা ধরতে গেলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলাম।'

আমি আপনমনে সবিস্ময়ে বললাম-'হ্যাঁ, সে লোকটাই তো বটে! এর নাম উইলহেম স্টোরিজ। স্প্রেমবার্গে বাড়ি। বিখ্যাত কেমিস্ট অটোস্টোরিজ-এর গুণধর পুত্র।' জানতে পারলাম, হারমান নামে তার একটা ভৃত্য আছে।

এবার আমার মনে ধারণাটা পাকা হল, নদীর ধারে বেড়ানোর সময় এ লোকটাই আমার পিছু নিয়েছিল। রাগ শহরে যেদিন পা দিলাম সেদিনই ঘটনাটা ঘটেছিল।

আমি মনস্থির করে ফেললাম, উইলহেম স্টোরিজ-এর সঙ্গে আমার আর হারালান-এর সাক্ষাতের ব্যাপারটা আমার অনুজ মার্ক-এর কাছে ফাঁস করব না। হোটেলে ফিরে গেলাম। অন্য বহু প্রসঙ্গ নিয়ে মার্ক-এর সঙ্গে কথা হল। কিন্তু ভুলেও উইলহেম স্টোরিজ-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম না।

সকালে সবে চায়ের টেবিলে বসেছি, ঠিক তখনই ক্যাপ্টেন হারালান এসে জানাল, তার বাবা বাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমি তাঁর মুখোমুখি হতেই ডা. রোডরিখ বললেন—'আমার ছেলে হারালান এর সামনেই আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। আপনার ভাই আর আমার মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে। যে-কথা আমি বলতে চাইছি তা আমার স্ত্রী, আমার কন্যা এবং আপনার অনুজ কিছুই জানেন না। সবকিছু শুনলে বিচার বুদ্ধি দিয়ে আপনিই পুরো ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে এবং আমার বক্তব্যের সত্যাসত্যও যাচাই করতে পারবেন।'

তাঁর কথার ধাঁচ দেখে বুঝলাম, টেকেনিতে উইলহেম-এর সঙ্গে আমার আর ক্যাপ্টেন হারালান-এর সংঘর্ষের সম্পর্ক বিদ্যমান।

ডা. রোডরিখ যা বললেন তা হল—গতকাল বিকালে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা বেড়াতে বেরিয়েছিল। তিনি নিজে রোগী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। চাকর এসে জানাল, এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি ঘরে ঢুকেই নমস্কার জানিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। উইলহেম স্টোরিজ তাঁর নাম।

আমি বললাম—'হ্যাঁ, নামটা আমার পূর্বপরিচিত।'

ডা. রোডরিখ এবার বললেন—'গত মাস ছয় আগে উইলহেম স্টোরিজ যে আমার কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছিল এও অবশ্যই জানেন, কি বলেন? আপনার অনুজ আমার কন্যা মায়রাকে বিয়ে করার আগ্রহ প্রকাশ করার আগেই ব্যাপারটা ঘটেছিল, আমার স্ত্রী ও পুত্র উইলহেমকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না ফলে তাকে পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিলাম। সে ইদানীং আবার নতুন করে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এর। এবারও আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি।'

আমি বললাম—'আমার অনুজ মার্ক তো এখানে এসেছে উইলহেম স্টোরিজ প্রথমবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর। অতএব মার্ককে হাতের কাছে পেয়ে উইলহেম স্টোরিজকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে একরম মনে করার কিছুমাত্র অবকাশ নেই।'

ডা. রোডরিখ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন—'অবশ্যই। মার্ক এর মাঝখানে না এলেও এ-বিয়ে কিছুতেই হত না। তবে উইলহেম-এর সামাজিক অবস্থা উল্লেখযোগ্য। উত্তরাধিকারসূত্রে ধন-দৌলতও কম পায় নি। সেসব আবিষ্কার সমাজসেবামূলক কার্যোপযোগী হওয়ায় অগাধ অর্থ প্রাপ্তি যে ঘটবে তাতে আর আশ্চর্য কি?'

www.pathagar.com

এবার ডা. রোডরিখকে ডরোথি জাহাজে আমার সঙ্গে উইলহেম স্টৌরিজ-এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হওয়ার কথা বললাম।—'ক্যাপ্টেন হারালানকে নিয়ে কাল বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। এক ঝলক দেখেই চিনে ফেললাম, এই উইলহেম স্টৌরিজ।'

ক্যাপ্টেন হারালান আগ বাড়িয়ে বলল—'ক-দিন সে শহরে ছিল না বলেই তো ডরোথি জাহাজে তাকে দেখতে পেয়েছিলেন। আবার শহরে ফিরে এসেছে।'

ডা. রোডরিখ বিতৃষ্ণার সঙ্গে এবার বললেন—'উইলহেম স্টৌরিজ-এর সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা তো সবই শুনলেন। কিন্তু আয় উপার্জনের ব্যাপারটা কতখানি সত্য আর কতখানি খাদ মেশানো তা স্বয়ং ঈশ্বরও বুঝি বলতে পারবেন না। আমি বলব, সে সভ্যসমাজ বহির্ভূত অদ্ভুত চরিত্রের এক মানুষ। আর তার বংশ পরিচয়ই তো রীতিমতো বিদঘুটে জনাব! তার বাবা ছিলেন একজন যাদুকর, অলৌকিক শক্তির পূজারী।' আমি মুচকি হেসে বললাম—'ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলছেন না তো?'

'হ্যাঁ, তা একটু-আধটু হয়েও যেতে পারে। তার বাবা অটোস্টৌরিজ-এর কাণ্ডকারখানার কথা বুদাপেস্ট থেকে প্রকাশিত এক সংবাদপত্রের পাতায় পড়লাম।'

'দেখুন জনাব, অটোস্টৌরিজ-এর এত খ্যাতিই যদি বুদাপেস্টের মানুষের কাছে থেকে, থাকে তবে এ-শহর রাগ-এ তার ছেলে উইলহেম-এর কী অবস্থা আপনি ভাবতেও পারবেন না! ভাবলে আপনার গায়ে জ্বালা ধরে যাবে। এ-নচ্ছারটাই আমার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য বায়না ধরেছিল! শেষমেশ এসে রীতিমতো শাসিয়ে গেছে, আমার মেয়েকে যেন তেন প্রকারে বিয়ে সে করবেই। বলিহারি আব্দার!'

এবার আমার মুখের দিকে অধিকক্ষণ তাকিয়ে হারালান দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—'শুনুন জনাব, মোদ্দা কথা বলছি—তার সুখ্যাতি যা কিছু শুনেছি সব যদি মিথ্যাও হয় তবু আমি নচ্ছারটার হাতে আমার বোনকে তুলে দিচ্ছি না।'

আমার বুঝতে অসুবিধা হল না, জার্মান-বিদ্বেষ বশতই ক্যাপ্টেন হারালান অন্তরে এমন প্রকট বিদ্বেষ পোষণ করছেন।

ডা. রোডরিখ, বললেন, 'হতচ্ছাড়াটা কালও এসে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, বললামই তো। কাল এমন শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি যে ভুলেও সে আর কোনোদিন আমার বাড়িমুখো হবে না। তবে কিছু একটা সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে আশঙ্কায় আমি আর বেশি চটাচটি করি নি। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজটা সারতে হয়েছে।'

উইলহেম স্টৌরিজ বদমেজাজি। খুবই তিরিক্ষি মেজাজের মানুষ। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সে বলে গেছে, সে যদি মিস মায়রাকে স্ত্রী হিসেবে নাই পায় তবে অন্য কারো গলায় তাকে বরমাল্য পরাতে দেবে না।

ডা.রোডরিখ-এর শেষ কথাটা শোনামাত্র আমার মাথায় যেন রক্ত উঠে যাওয়ার উপক্রম হল। কণ্ঠস্বরে রীতিমতো উষ্মা প্রকাশ করে জবাব দিলাম, 'বিয়ে যখন পাকা হয়েছে তখন কয়েক দিনের মধ্যেই। এ-বিয়ে হবে।'

রোডরিখ বলে চললেন—'নচ্ছারটা ততোধিক গলা চড়িয়ে আমার কথার সাফ জবাব দিল—'কয়েকদিনের মধ্যে তো হবেই না এমনকি কোনোদিনই এ-বিয়ে হবে না।' সে এমন চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল যে, আমার পক্ষে ইজ্জৎ রাখাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। তবু বরাত ভালো যে, আমার স্ত্রী ও কন্যা তখন বাড়ির বাইরে ছিল। শেষমেষ

www.pathagar.com

অবশ্য বিদায় নিতেই হল নচ্ছারটাকে। ঘর ছেড়ে যাবার আগে এমন হুমকি সে আমাকে দিয়ে গেল যাতে আমি মনের দিকে থেকে একটু দুর্বলই হয়ে পড়েছি। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, চোখে-মুখে হতাশার ছাপ এঁকে তিনি এবার বললেন—'শুনুন, আমি এখন বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার ভাই মার্ক আর মায়রার বিয়ে হবার নয়। এমন কঠিন-কঠোর বাধা আসবে যে বিয়ে হবেই না। মাঝখান থেকে সবাইকে নাজেহাল হতে হবে। স্টোরিজ পরিবার এমন অদ্ভুত সব কায়দা কৌশল অবলম্বন করবে যার জন্য পুরো রোডরিখ পরিবারকেই হয়রান হতে হবে।'

আমি গম্ভীর স্বরে বললাম—'আপনি আগেই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এসব কথা যেন আপনার স্ত্রী, মিস মায়রা আর আমার অনুজের কাছে ফাঁস না করি। ভালো কথা, আমি কারো কাছেই মুখ খুলব না। কিন্তু নচ্ছারটা যদি আমার বা আমার ভাই মার্ক-এর ওপর হামলা হুজ্জতি শুরু করে, তবে?'

উইলহেম যতই শাসাক না কেন, তার কি করার হিম্মৎ আছে? মার্ক আর মায়রার বিয়ে বন্ধ করে দেবে কিন্তু কোনো উপায় অবলম্বন করে? গায়ের জোরে? মার্ককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবে? তাকে অপমান অপদস্থ করবে? যে বাড়ির ত্রি-সীমানায় তার যাওয়া বারণ সেখানে গায়ের জোরে ঢুকতে গেলে ডা. রোডরিখ নিশ্চয়ই তাকে ছেড়ে কথা বলবেন না। ওপর মহলে জানিয়ে নচ্ছার জার্মানকে কী করে শায়েস্তা করতে হয় তা তাঁর ভালোই জানা আছে।

সারাদিন হোটেলেই কাটালাম। বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়ে আমি একটু গম্ভীরভাবেই পথ চলছিলাম। আসলে উইলহেম ডা. রোডরিখকে হুমকি দিয়ে গেছে সে কথাটাই আমার মনে বার বার উঁকি দিতে লাগল। আবার তার সঙ্গে পথে দেখা হয়ে যাওয়ার ভয়ও আমাকে কম আতঙ্কিত করে তোলে নি। আবার ডা. রোডরিখ যে বললেন স্টোরিজ পরিবার এমনকৌশল জানে যা মানুষের পক্ষে কিছুতেই প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এতে কি বোঝাতে চাচ্ছেন তিনি? মনস্থ করলাম, ডা. রোডরিখকে কখনও নিভৃতে পেলে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলব।

পর পর দুদিন পেরিয়ে গেল। উইলহেম স্টোরিজকে শহরের কোথাও আর নজরে পড়ল না। বাড়িতে আছে বলেও মনে হল না। তবে হারমান নামে তার চাকরটাকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখা দিয়েছিল। শেষমেশ একদিন ডা. রোডরিখ-এর বাড়ির কাছাকাছি মুহূর্তের জন্য দেখা গিয়েছিল।

সতেরোই মে। সে দিনই ঘটনাটা ঘটল। গির্জার দরজা বন্ধ ছিল। মার্ক আর মায়রার বিয়ের বিজ্ঞপ্তিটা কে যেন বোর্ড থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল। অন্যান্য বিয়ের বিজ্ঞপ্তিগুলো যথারীতি টাঙানো রয়েছে।

আবার আর একটা বিয়ের বিজ্ঞপ্তি আগের জায়গাতেই টাঙিয়ে দেয়া হল। এক ঘণ্টা পেরোবার আগেই এটারও আগের বিজ্ঞপ্তিটার মতো অবস্থা হল। দিনের আলোতেই ব্যাপারটা ঘটে গেল।

আঠারোই মে। সেদিন পরপর তিনবার মার্ক আর মায়রার বিয়ের নোটিশ টাঙানো হল। তিনবারই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। কিন্তু বদমাইশটার হদিসও পাওয়া গেল না। বিজ্ঞপ্তি ছেঁড়ার ব্যাপারটা নিয়ে শহরের আনাচে কানাচে বহু জল্পনা-কল্পনা ও রহস্য জনক গল্প পরিবেশিত হল। ব্যস, তারপরই ব্যাপারটা সবার মন থেকে মুছে গেল।

www.pathagar.com

ডা. রোডরিখ, তাঁর পুত্র ক্যাপ্টেন হারালান আর আমি কিন্তু বিজ্ঞপ্তি ছেঁড়ার ঘটনাটাকে এত সহজে মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না। কারণ, সে যেভাবে শাসিয়ে গেছে তা-তো এত সহজে ভুলবার নয়।

বিজ্ঞপ্তি ছেঁড়ার রহস্যভেদ করা সম্ভব হল না। কিন্তু কোনো দৃষ্কৃতকারীর দ্বারা যে এমন নক্কারজনক কাজটা হয়েছে তা বুঝতে বাকি রইল না। তবে কি এটাই রোডরিখ পরিবারে ওপর তার প্রথম হামলা? ডা. রোডরিখ ব্যাপারটা শুনে রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। তিনি সাব্যস্ত করলেন, যে করেই হোক হতচ্ছাড়াটার এরকম জঘন্যতম কাজ বন্ধ করতেই হবে।

ক্যাপ্টেন হারালান রীতিমতো হম্বিতম্বি শুরু করে দিল। সে তাকে খুন করে পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলার জন্য হম্বিতম্বি শুরু করে দিল। আমি তাকে নিরস্ত করতে গিয়ে বলল—'ক্যাপ্টেন, মা আর বোনের কথা ভেবে হঠাৎ করে বড় রকমের কিছু না করাই ভালো। প্রয়োজনে পুলিশের সাহায্য নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

'পুলিশ? গির্জার বোর্ড থেকে বার বার নোটিশ ছিঁড়ে ফেলার ব্যাপারটা পুলিশের কানে যাবে না?'

'নির্বিঘ্নে বিয়েটা মিটিয়ে ফেলাই এ মুহূর্তে আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ক্যাপ্টেন।'

'বিয়ে হবে? ভালো কথা, বিয়ের পাট চুকিয়ে ফেলার আগেই যদি বড় রকমের কোনো অঘটন ঘটিয়ে দেয়, তখন?'

বিয়ের কাজ যথারীতি এগিয়ে চলল। সেদিনই বিয়ের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দেওয়া হবে।

মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে ডা. রোডরিখ প্রচুর লোককে নিমন্ত্রণ করলেন।

সারাদিন ধরে বিয়ের আয়োজন চলল। বিকালে প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন হল।

মহিলারা তখনও বিশ্রাম করছেন। আমি রাস্তার দিকে মুখ করে জানালায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ উইলহেম স্টোরিজকে দেখে আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। সে আচমকা ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। তার চোখ দুটো দিয়ে যেন প্রতিহিংসার আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

আমার অনুজ মার্ক ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল। জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সে বলল—'ওই নচ্ছারটাই উইলহেম স্টোরিজ। তোমাকে ওর কথাই বলেছিলাম। আমার তো ধারণা ছিল ও রাগ শহর ছেড়ে পালিয়েছে। গেলেও আবার ফিরে এসে ঘুর ঘুর শুরু করেছে।'

রাত্রি হল। ক্রমে নটা বাজল। ডা. রোডরিখ-এর বাড়ির সদর-দরজায় এক এক করে ঘোড়ার গাড়ি ভিড়তে লাগল। বিয়ের বাজনা বেজে উঠল।

এদিকে বিয়ের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করানোর প্রস্তুতি চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয় পক্ষেরই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা হয়ে গেল। শুভ কাজ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল।

সবাই যখন কথাবার্তা গল্পগুজবে মশগুল ঠিক তখনই গ্যালারির দিক থেকে অবাঞ্ছিত কণ্ঠস্বরটা ভেসে এল। কোনো হাঁক ডাক বা তড়পানি নয়, গান। কে যেন বিদঘুটে, একেবারেই কর্কশ সুরে অর্থহীন গান গাইছে।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন কণ্ঠস্বরে উষ্মা প্রকাশ করে আমার দিকে উত্তরটা ছুঁড়ে দিল—'কি জানি। কোনো হতচ্ছাড়ার এমন উদ্ভট খেয়ালে মেতেছে, বুঝছি না তো?' মনে হল, যে গান গাইছে সে বাগানের দিকে থেকে গ্যালারির দিকে এগিয়ে আসছে।

আমি আর ক্যাপ্টেন ব্যস্ত-পায়ে গ্যালারির দিকে ছুটে গেলাম। না, কাউকেই দেখতে পেলাম না। রহস্যজনক ব্যাপারটা আমাদের রীতিমতো স্তম্ভিত করে দিল। ক্রমে ডা. রোডরিখ ও তাঁর স্ত্রী আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। আশ্চর্য ব্যাপারই বটে। উদ্ভট গানটা তখনও শোনা যাচ্ছে কিন্তু কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। আর সেটা ক্রমে কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসতে লাগল।

ক্যাপ্টেন হারালান হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে বলল—'ঠিক আছে, আমিই দেখছি কোনো হতচ্ছাড়া এমন বে-রসিকের মতো কাজে মেতেছে?'

ডা. রোডরিখ তাকে অনুসরণ করলেন। কয়েকজন চাকর বাকরকে সঙ্গে নিয়ে আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। বাগানে গিয়ে সবাই মিলে চিরুনি তল্লাশি চালালাম। না কাউকেই নজরে পড়ল না।

অনন্যোপায় হয়ে আবার গ্যালারিতে ফিরে এলাম।

আবার! আবারও হেড়ে গলার গান শুরু হল। এবারও সেই একই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। উদভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি দাপাদাপি করেও কে যে গাইছে হদিস পাওয়া গেল না। ব্যাপারটা আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যেও আতঙ্কের সৃষ্টি করল। ক্ষোভ আর বিতৃষ্ণায় মন ভরে উঠল। গানটা হচ্ছে-জ্বলন্ত ঘৃণা বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ—'হিম অব হেট'।

এবার বৈঠকখানার ঠিক মাঝখান থেকে গানটা ভেসে আসতে লাগল। এবারও কেউই গায়কের হদিস পেল না। এমন কি তার কায়া তো দূরের ব্যাপার তার ছায়া পর্যন্ত কারো নজরে ধরা পড়ল না। মেয়েরা তো অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কা ও আতঙ্কে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে রইল। উদভ্রান্তের মতো ক্যাপ্টেন হারালান বৈঠকখানায় ঢুকে বার কয়েক ছুটোছুটি দাপাদাপি করে যাকে মোটেই নজরে পড়ছে না এমন একজনকে দু-হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল। কিন্তু কাকে ধরবে? সব যে ভোঁ-ভাঁ। অস্থিরচিত্ত ক্যাপ্টেন নিজের কাজের জন্য ক্ষুব্ধ হলেন।

এবার কেবল আমিই নই, বৈঠকখানায় প্রায় একশ' লোক একই অবিশ্বাস্য দৃশ্য চোখের সামনে দেখলেন। ফুলের তোড়াটা আচমকা কোনো অদৃশ্য হাতের টানে যেন শূন্যে উঠে গেল। মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ল। ঘরময় ফুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল। সবশেষে কে যেন পা দিয়ে সেগুলো পিষে দিয়ে গেল। পর মুহূর্তে বর-কনের স্বাক্ষর সম্বলিত বিয়ের চুক্তিপত্রটা হঠাৎ উড়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। অথচ বাতাস তেমন নেই।

আতঙ্কে বুকের ভেতরে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। ভয়ে আঁৎকে উঠে সবাই বৈঠকখানা ছেড়ে পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি নিজের মনকে জিজ্ঞেস করলাম—এই যে একের পর এক রহস্যজনক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে চলেছে তা কি আমি বিশ্বাস করি, নাকি করা উচিত?

অস্থিরচিত্ত ক্যাপ্টেন হারালান লম্বা লম্বা পায়ে আমার কাছে আসতে আসতে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল—'নির্ঘাৎ নচ্ছার উইলহেম স্টোরিজ এসেছে। এটা তারই কাজ। এমন ন্যক্কারজনক কাজ কিছুতেই আর বরদাস্ত করা যায় না। আমি স্পষ্ট

www.pathagar.com

দেখলাম, কনের মুকুটটা শুন্যে উঠে গেল। তারপর বৈঠকখানা হয়ে বাগানে গিয়ে কর্পূরের মতো বাতাসে মিলিয়ে গেল। একী ভুতুড়ে কাণ্ড-রে বাবা! না, আর বরদাস্ত করা যায় না!' কথা বলতে বলতে দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে সোজা বুলেভার্ড টেকেলির দিকে যেতে লাগল।

আমি তাকে অনুসরণ করলাম। প্রায় ছুটতে ছুটতে আমরা উইলহেম স্টোরিজ-এর বাড়ির সদর-দরজায় হাজির হলাম। ওপরের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখি একটা জানালা খোলা। ভেতরে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। উভয়ে এবার সদর দরজাটা খোলার চেষ্টা করলাম। এক চুলও নাড়াতে পারলাম না। অবাক হতেই হল।

আমরা যখন দরজা খুলতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে একসার হচ্ছি ঠিক তখনই উইলহেম স্টোরিজ নিজে দরজাটা খুলে আমাদের সামনে দাঁড়াল। নিজের কাজের জন্য লজ্জিত হলাম। শুধু শুধু লোকটার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছি।

নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্ক ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে রাত্রি কাটল। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই গতরাত্রে অপ্রত্যাশিত ও অবিশ্বাস্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হল। হ্যাঁ, আমার আশঙ্কাই সত্য। শহরবাসীরা ব্যাপারটাকে নিছক এক মামুলি ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে পারল না। আমি কিন্তু নিঃসন্দেহ যা কিছু ঘটেছে সবই লৌকিক, অলৌকিক অবশ্যই নয়। তবে এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ডের বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যাও তো অবশ্যই চাই।

ব্যাপারটা নিয়ে মার্ক আর মায়রাও কম উদ্বিগ্ন হল না। বিয়ের পূর্ব মুহূর্তে একের পর এক এমন রহস্যজনক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটলে উদভ্রান্ত হবারই তো কথা।

সকাল আটটায় ডা. রোডরিখ আর ক্যাপ্টেন হারালানকে নিয়ে অনুজ মার্ক আমার ঘরে এল। মায়রারও তার মায়ের সামনে এসব কথা আলোচনা সঙ্গত না ভেবেই তারা আমার এখানে ছুটে এসেছে। প্রয়োজনে প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

আমার ভাইয়ের অবস্থা দেখে আমি রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। মাথার চুল উসকো-খুসকো, চোখ দুটো লাল, চোখের মণি দুটো গর্তে ঢুকে গেছে। গত সন্ধ্যার সে হাসিখুশি ভাব অন্তর্হিত, দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা তার ভেতরটাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে, তার চোখ-মুখই তার প্রমাণ দিচ্ছে।

ডা. রোডরিখ নিজেকে সামলে রেখে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন—'জনাব, ব্যাপারটা সম্বন্দে আপনার কি ধারণা বলুন শুনি?'

আমি নাস্তিকের অভিনয় করাই মনস্থ করলাম। ব্যাপারটা যেন নিছকই মামুলি এমন ভান করে বললাম—'কাল রাত্রে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে নি যা নিয়ে আমাদের সময় নষ্ট করতে হবে। ব্যাপারটা তো এমনও হতে পারে যে, কেউ হাল্কা রসিকতায় লিপ্ত হয়েছে। যারা লোকের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে উৎসাহী এমন কেউ হয়তো বিয়ের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। অনাবিল আনন্দের মধ্যে যাদুমন্ত্র তুকতাক প্রভৃতির মাধ্যমে আর একটু-আধটু আনন্দ দান করে গেছে।

ক্যাপ্টেন হারালান কণ্ঠস্বরে একটু উষ্মা প্রকাশ করেই বলে উঠলেন—'শুনুন, ছেলেভুলানো স্তোকবাক্য শুনতে আমরা এখানে ছুটে আসিনি। যাদুমন্ত্র বা তুকতাকের প্রতি আমার তিলমাত্র আস্থাও নেই।'

www.pathagar.com

'কিন্তু ডাক্তারবাবু, অন্য কোনো কিছু যে আমি ভাবতে উৎসাহ পাচ্ছিনে। অলৌকিক কাণ্ড, এরকম বিশ্বাসকে যে আমি মন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি।'

ক্যাপ্টেন হারালান সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—'না জনাব, অলৌকিক অবশ্যই নয়, তার চেয়ে বরং বলুন সম্পূর্ণ লৌকিক ব্যাপার। কিন্তু এতে অত্যন্ত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে যা আমাদের মাথায় কিছুতেই আসছে না। ফলে আমি গোড়া থেকে ব্যাপারটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছি।'

আমি জেদ ধরেই রইলাম। বললাম—'কাল রাত্রে যে গান শুনেছি, তা মানুষের কণ্ঠস্বর ছাড়া অলৌকিক কোনো ব্যাপার অবশ্যই নয়। অতএব তা যাদুমন্ত্র তুকতাক হওয়ার কারণ কি, বলুন?'

যাদুমন্ত্র বা অলৌকিক কাণ্ডকারখানার প্রতি ডা. রোডরিখ-এর কিছুমাত্রও বিশ্বাস নেই তার কথাবার্তায় এবং হাবভাবে স্পষ্ট বুঝা গেল।

আমি পূর্ব বক্তব্যের সমর্থনে আবার বললাম—'শুনুন উৎসব-অনুষ্ঠানের বাড়ি ভিড়ের মধ্যে কোনো উদ্ভট লোকের ঢুকে পড়া কিছুমাত্রও আশ্চর্যের নয়।'

ডা. রোডরিখ খোলা-মনের মানুষ। মন খোলসা করেই জবাব দিলেন—'আপনার বক্তব্যকে স্বীকার করে নিলেও কিন্তু রহস্যটা একইরকম রহস্যজনক থেকেই যাচ্ছে। কে গান গাইল? ফুলের তোড়া কে ছিঁড়ে পায়ে পিষল আর কে-ইবা ফুলের মুকুটটা উড়িয়ে একান্তে নিয়ে গিয়ে বাতাসে মিলিয়ে দিল? বিয়ের চুক্তিপত্র উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকেও কি আপনি সস্তা ভেলকি বলতে চাইছেন? নাকি আপনার অভিমত, এতগুলো লোকের সবারই চোখের ভুল? আর যাদুমন্ত্র, ভেলকি বা তুকতাক যা-ই বলুন না কেন—মেনে নিয়ে ভয়ে সবাই কুঁকড়ে রয়েছি।'

ডা. রোডরিখ এবার আরও খোলসা করে বললেন—'দেখুন, ব্যাপারগুলো যে দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করুন না কেন—আমি কিন্তু বলব, আমার সঙ্গে চরমতম শত্রতা করতে গিয়ে কেউ না কেউ বিভিন্ন অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটিয়েছে। বলতে পারেন প্রতিশোধ নিয়ে গেছে।'

মার্ক এবার মুখ খুলল—'প্রতিশোধ? শত্রুতা? কার শত্রু ডা. রোডরিখ? সে কী আপনার পরিচিত?'

'অবশ্যই। উইলহেম স্টোরিজ তার নাম।'

এবার মার্ক-এর কাছে আর কিছু গোপন না রেখে সবই খোলসা করে বলা হ'ল। সব কিছু শুনে সে-ও নিশ্চিত হ'ল, অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলোর সঙ্গে উইলহেম স্টোরিজ-এর যোগসাজোস থাকা খুবই স্বাভাবিক। তবে ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য মার্ক খুবই ক্ষোভ ও উত্তেজনা প্রকাশ করল।

শেষপর্যন্ত সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল টাউন হলে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা পুলিশ-প্রধানের কানে দেওয়া হবে। তার কাছে আদ্যোপান্ত খোলসা করে বলা দরকার। আর সে যে বিয়ে ভণ্ডুল করার জন্য শাসিয়ে গেছে তা-ও তাঁর কানে তোলা হবে। সব কিছু শোনার পর তিনি যা প্রয়োজনবোধ করবেন সে ব্যবস্থাই গ্রহণ করবেন।

মার্ককে ডা. রোডরিখ-এর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে আমি, ডা. রোডরিখ ও তাঁর ছেলে ক্যাপ্টেন হারালান গেলাম টাউন হলে পুলিশ প্রধান স্টোপার্ক-এর সঙ্গে দেখা করতে।

www.pathagar.com

ডা. রোডরিখ-এর মুখে উইলহেম স্টোরিজ-এর নামটা শুনে পুলিশ প্রধান কিন্তু অবাক তো হলেনই না, বরং এমন একটা ভাব করলেন, যেন ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক।

পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক এবার মুখ খুললেন—'দেখুন, লোকটার বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করলেও আমরা তাকে নানা কারণে সন্দেহ করছি। নজরও রাখছি। সে সবার অগোচরে লুকিয়ে চুরিয়ে চলাফেরা করে। তার জন্মস্থল স্প্রেমবার্গ। সেখান থেকে কেন যে এখানে এসে মাথা গুঁজেছে ভাববার বিষয়ই বটে। এখানে তার দেশওয়ালি ভাইরা তাকে মোটেই সুনজরে দেখে না, ধারে-কাছেও যায় না। তার বুলেভার্ড টেকেলির বাড়ির দরজা-জানালা সর্বক্ষণ কেনই বা বন্ধ থাকে? তার বাড়ির ত্রি-সীমানায়ও কেউ যায় না কেন? মোদ্দা কথা, তার প্রতিটা কাজকর্মই সন্দেহের উদ্রেক করে।'

ক্যাপ্টেন হারালান বলল, 'মি. স্টোপার্ক এখন বলুন, আপনি কোনো পথ নিতে চাইছেন?'

'ভাবছি তার বাড়িতে এখনই, আচমকা হানা দিলে নিশচয়ই কিছু দলিল দস্তাবেজ, কিছু না কিছু সূত্র মিলবেই।'

ডা. রোডরিখ বললেন—'এর জন্য তো গভর্নরের অনুমতি চাই, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য চাই। তবে আপনাকে বাড়ি গিয়ে শাসিয়ে এসেছে, গভর্নরের অনুমতি পেতে অসুবিধে হবে না বলেই মনে করি।'

পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক আধ ঘণ্টার মধ্যেই গভর্নরের আদেশপত্র নিয়ে ফিরে এলেন। তারপর সবাইকে নিয়ে চললেন উইলহেম স্টোরিজ-এর বুলেভার্ড টেকেলির বাড়ির দিকে। একজনকে দেখা গেল, নিজের বাড়ির প্রধান ফটকের সামনে নির্বিকারচিত্তে পায়াচারি করছে, এমন ভাব যেন ভাজা মাছটাও উল্টে খেতে জানে না।

মুহূর্তের মধ্যে সাদাপোষাকে ছ'জন পুলিশ সেখানে হাজির হল।

বাড়িটার দরজা-জানালা বন্ধ। মনে হল ভেতরে কেউ-ই নেই। না-ই বা থাকল, চাকরটা থাকলেও কাজ চলে যাবে।

পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক-এর নির্দেশে পুলিশরা সদর-দরজার তালাটা ভেঙে ফেলল। আমি পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক এবং ক্যাপ্টেন হারালান ব্যস্ত-পায়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম। পুলিশ প্রধান হাতের ছড়িটা দিয়ে একটা ঘরের বন্ধ দরজায় বার-কয়েক ঠুকলেন। ভেতরে থেকে কোনো সাড়াই এল না। এবার তাঁর নির্দেশে পুলিশরা চাবির গোছা থেকে চাবি বের করে তালার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিলে সবগুলো ঘরের তালা খুলে ফেলল। পুলিশ প্রধান ব্যস্ত-পায়ে গলির পথ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। আমি তাঁর পিছন পিছন চললাম। একজন পুলিশ সিঁড়িটা পাহারা দিতে লাগল।

পুলিশ-প্রধান চিৎকার করে বললেন—'ভেতরে কে আছেন? কে আছেন ভেতরে, সাড়া দিন?' কিন্তু হায়! কোনো সাড়াই এল না। তবে আচমকা কি যেন একটা বস্তু এদিক থেকে ওদিকে চলে গেল। তবে চোখ বা কানের ভুল হওয়াও অসম্ভব নয়।

আমরা বাড়ি ছেড়ে বাগানের পথ ধরলাম। পথের ওপর কার যেন সদ্য হেঁটে যাওয়া পায়ের ছাপ নজরে পড়ল। কিন্তু বাগানটায় চিরুনি তল্লাশি চালিয়েও কারো টিকির নাগাল পাওয়া গেল না।

বাড়ির চিমনিটা দিয়ে তিরতির করে ধোঁয়া বেরোতে দেখা গেল। আমি পুলিশ প্রধান স্টোপার্ককে বললাম—'চিমনি দিয়ে ধোঁয়া যখন বেরোচ্ছে, তখন নির্ঘাৎ কোথাও আগুন জ্বালানো হয়েছে।'

www.pathagar.com

আগুনের উৎস স্থলটা খোঁজা শুরু হল। এবার রান্নাঘরে থেকে তল্লাশি শুরু করা হল। খুবই সামান্য বাসনকোসন আর আসবাবপত্র রান্নাঘরে দেখা গেল। রান্না করা খাবার রয়েছে বটে। কিন্তু পাচক নেই। ঘরের একদিকের দেওয়ালে জানলার দিকে মুখ করে একটা ছবি টাঙানো। আর জড়িয়ে রাখা একটা কাগজে বঁড় বড় হরফে লেখা 'অটোস্টোরিজ'। ছবিটাও অটোস্টোরিজ-এরই। তাঁর বলিষ্ঠ চেহারা আর গম্ভীর মুখ আমার অন্তরে গেঁথে গেল। অটোস্টোরিজ আর তাঁর পুত্র উইলহেম স্টোরিজ-এর মুখের অবিকল ঢঙ দেখে পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক তো রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে এবার তিনি মুখ খুললেন—'জনাব, আশ্চর্য ব্যাপার তো। বাপের পৈশাচিক মুখের আদল ছেলেরও মুখেও লক্ষিত হচ্ছে।'

পাশের ঘরে গিয়ে দেখা গেল, খাটের ওপর বিছানাপত্র অগোছাল অবস্থায় পড়ে।তবে দেখে মনে হল রাত্রে কেউ না কেউ এখানে শুয়েছে। এবার প্রসাধন টেবিল পরীক্ষা করে পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক আমাকে বললেন—'বেসিনে জল আর সাবানের বুদবুদ দেখে নিঃসন্দেহে বলা যাচ্ছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কেউ না কেউ এটা ব্যবহার করেছে। চব্বিশ ঘণ্টা পরে সাবানের বুদবুদ আশা করা যায় না। তাই ভাবতেই হচ্ছে, লোকটা বাড়ি থেকে সরে পড়ার আগে বেসিনে সাবান দিয়ে মুখ ধুয়েছে। তবে মনে হয় না সে নিজে থেকে ধরা দেবে।'

ঠিক তখনই পাশের ঘর থেকে রহস্যজনক একটা মচমচ আওয়াজ ভেসে এল। কাঠের পাটাতনের ওপর দিকে কেউ হেঁটে গেলে যেমন আওয়াজ হয় এটাও ঠিক সেরকমই। এক ছুট্টে পাশের ঘরে গেলাম। কিন্তু ভোঁ-ভাঁ! কেউ-ই নেই। হতাশ হয়েই ঘর ছেড়ে বাইরে আসতে হল। এবার যে ঘরটায় গেলাম সেটায় চাকর হারমান থাকে। জামাকাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র যেরকম ছিল সেরকমই রয়েছে মনে হল।

আমি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'মি. স্টোপার্ক, আমাদের হানা দেওয়ার কথা হতচ্ছাড়াটা আগেভাগেই জেনে যায় নি তো?'

'অসম্ভব! আমি গভর্নরের সঙ্গে আলোচনা করার সময় যথা সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম। তৃতীয় কোনো ব্যক্তির পক্ষে এসব কথা কিছুতেই শোনা সম্ভব নয়।'

এমন সময় একটা চাপা শব্দ কানে এল। মনে হল কে যেন সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে পড়ল। দৌড়ে গেলাম আমরা। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পুলিশটা যা বলল তাতে পড়ে যাওয়ার কারণটা কেমন যেন সন্দেহজনক বলেই মনে হল। অকারণে কেউ কি পড়ে যেতে পারে?

ব্যাপারটাতে পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক-এর চোখে মুখে কেমন যেন গাম্ভীর্যের ছাপ ফুটে উঠল।

বাড়িটার ছাড় থেকে উঠোন অবধি একটা দড়ি ঝুলে থাকতে দেখা গেল। পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক দড়ি বেয়ে চিলে কোঠায় উঠে গেলেন। ক্যাপ্টেন হারালান আর আমি তাকে অনুসরণ করে চিলে কোঠায় গেলাম। সেখানে গিয়েও হতাশ হতে হল। কেউ লুকিয়ে নেই। এবার একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। খোলা-দরজার পাল্লাটা হাওয়ায় বারবার ধাক্কা খাচ্ছে, খুলছে-বন্ধ হচ্ছে। এবার বুঝলাম, একটু আগে তবে এরই শব্দ হচ্ছিল।

www.pathagar.com

না, রহস্যের কোনো সমাধানই করা সম্ভব হল না। পুরো ব্যাপারটা আগের মতো ঘোলাটেই রয়ে গেল।

আমরা যখন চিলেকোঠা ছেড়ে বেরিয়ে আসার চিন্তা করছি ঠিক তখনই বিকট একটা চিৎকার শুনে আমরা রীতিমতো থতমত খেয়ে গলাম। স্পষ্ট মনে হল ক্ষোভ আর বিস্ময় মিশ্রিত সে চিৎকার। তখন ক্যাপ্টেন হারালান তাক থেকে একটা ছোট্ট কাঠের বাক্স খুলছিল। ডালাটা খুলতেই বেরিয়ে এল গতরাত্রে ডা. রোডরিখ-এর বাড়ি থেকে হাফিস হয়ে যাওয়া কনের মুকুট যেটা চেপেচুপে ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে।

ব্যস, পুরো ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। উইলহেম স্টোরিজ-ই যে রহস্যজনক ব্যাপারগুলোর নায়ক এতে সন্দেহের আর কোনো অবকাশই রইল না।

আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নামলাম। পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক-এর নির্দেশে বাড়িটার সদর-দরজায় তালা দিয়ে একেবারে সীলমোহর করে দেওয়া হল। দুজন পুলিশকে সেখানে পাহারায় নিযুক্ত করে আমরা হাঁটতে লাগলাম।

আমরা পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক-এর দপ্তরে যাওয়ার পর থেকে যা কিছু ঘটেছে ডা. রোডরিখ-এর কাছে তুলে ধরলাম। সবকিছু শুনে তিনিও ক্যাপ্টেন হারালান-এর মতোই কেসটা আদালতে ওঠার আগে উইলহেম স্টোরিজকে ছারপোকার মতো পিষে মারতে চাইলেন।

ক্ষোভে-উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন, ব্যাপারটা তিনি রাগ শহরের লাটসাহেবের কানে তুলবেন। সবকিছু শুনে তিনি অবশ্যই বিদেশি উইলহেম স্টোরিজকে দেশছাড়া করতে দেরি করবেন না। আর আমাদের সতর্ক করে দিলেন, তাঁর স্ত্রী আর কা ন্যা মায়রা যেন এসবের বিন্দু বিসর্গও জানতে না পারে।

আমরা আবার টাউন হলে গিয়ে পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক-এর কাছ থেকে কনের মুকুটটা চেয়ে নিয়ে এলাম।

সে রাত্রেই মার্ক মুকুটটাকে কৌশলে মায়রার কাছে নিয়ে গেল। তাকে বলল, বাগানে ঝোপের আড়ালে পড়েছিল। কেউ হয়তো রসিকতা করে একাজ করেছে। মায়রা মুকুটটা ফিরে পেয়ে যারপরনাই খুশি হল। মার্ক কিন্তু ভুলেও আসল ব্যাপারটা, উইলহেম স্টোরিজ-এর কাণ্ডকারখানার কথা তার কাছে ফাঁস করল না।

তারপর কদিন আর কোনো ঘটনাই ঘটল না।

এদিকে পঁচিশে মে মহাধূমধামের মধ্য দিয়ে অটোস্টোরিজ-এর মৃত্যুবার্ষিকী স্প্রেমবার্গে উদযাপিত হয়ে গেল। শহরের হাজার হাজার মানুষ রহস্যজনক ভোজবাজির খেল দেখার আশা নিয়ে সেখানে জড়ো হল। কবর থেকে মহাপণ্ডিত অটোস্টোরিজ উঠে আসেন নি বা এমন কোনো রহস্যজনক ঘটনা ঘটল না যা সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করার অত্যুগ্র আশা নিয়ে কবরখানায় জড়ো হয়েছিল। আরও অত্যাশ্চর্য ব্যাপার হল তার গুণধর পুত্র উইলহেম স্টোরিজ পর্যন্ত উৎসবস্থলে উপস্থিত হল না। এতে সবার মনে বদ্ধমূল ধারণা হল, সে অবশ্যই রাগ শহরে নেই।

দুপুরের দিকে পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করে রোডরিখ-পরিবারের সমস্যার কথা তাঁর কানে তুলে দিলেন এবং এর পিছনে উইলহেম স্টোরিজ-এর কালো হাত যে কাজ করছে একথা বলতেও ভুল করলেন না।

www.pathagar.com

সবকিছু শুনে গভর্নর উত্তেজিত হয়ে বললেন—'কেবলমাত্র রাগ শহর থেকেই নয়, জনাব শয়তানটাকে একবারে অস্ট্রোহাঙ্গারি থেকে বহিষ্কারের হুকুম জারি করে দিচ্ছি। সেই মুহূর্তেই আদেশনামা লিখে তাতে স্বাক্ষর করে সেটা গভর্নর পুলিশ-প্রধানের হাতে দিয়ে বললেন— 'সীমান্ত রক্ষীদের হাতে আদেশপত্রটা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন।' ডা. রোডরিখ ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার জন্যই এ-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। কিন্তু অবিশ্বাস্য কাণ্ডগুলোর রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হল না, গোপন অন্তরালেই রয়ে গেল।

তারপর যা ঘটল তা আমরা এ-মুহূর্তে ভাবতেও পারছি না। সে যে কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, ভাবলে এখনও গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

পয়লা জুন বিয়ের দিন পাকা হয়ে গেল। সবাইকে সামলে সুমলে রাখাই এ মুহূর্তে সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আর আমার মনই অশান্ত, অন্যকে প্রবোধ দেব কি করে? আর আমার যে কী হয়েছে ছাই রোজই একবার করে বুলেভার্ড টেকেলিতে চক্কর না মারলে নিদারুণ মানসিক অস্বস্তি বোধ করি।

এদিকে রাগ শহরের মানুষের মন থেকে অলৌকিক ব্যাপারস্যাপারের আতঙ্ক ক্রমে মুছে যেতে লাগল। কিন্তু আমাদের, অর্থাৎ ডা. রোডরিখ, ক্যাপ্টেন হারালান, আমার অনুজ মার্ক আর আমার মধ্যে আতঙ্ক দিন দিন উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। আমার অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে উইলহেম-এর প্রেত বুঝি প্রতিনিয়ত আমার পিছনে ধাওয়া করছে। মে-র ত্রিশ তারিখ বিকালের দিকে আমরা ডা. রোডরিখ-এর বাড়ির বৈঠকখানায় উপস্থিত হলাম। ঘোড়ার গাড়িতে চেপে গভর্নরের বাড়িতে যাওয়ার কথা। সেদিন বিয়ে হবে না। বিয়ে হবে তার পরের দিন। বলা যেতে পারে প্রাক বিয়ে। বিয়ের প্রস্তুতি পর্বের অনুষ্ঠান সেটা। আক্ষরিক অর্থে বিয়ে না হলেও, উভয়ের মাধ্যমে বন্ধন গড়ে উঠবে তাতে করে কোনো কারণে বিয়ে যদি না-ও হয় তবে উভয়কে সারাজীবন অবিবাহিত থাকতে হবে।

যথা সময়ে গভর্নর উৎসব-প্রাঙ্গনে হাজির হলেন। তিনি প্রথা অনুযায়ী মায়রার বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মার্ক-এর সঙ্গে তাঁদের মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি আছেন কিনা। তাঁদের সম্মতি পাওয়ার পর মার্ক শপথ করলেন মায়রারকে সহধর্মিণী হিসেবে গ্রহণ করবে। মায়রাও শপথ করল মার্ককে পতি হিসেবে গ্রহণ করবে।

এবার গভর্নর সর্বজন সমক্ষে মার্ক ও মায়রার বিয়ের লাইনেন্স প্রদান করলেন। এবার তিনি উভয় পক্ষকে নির্দেশ দিলেন, আগামী কালই যেন গির্জায় গিয়ে পাদরি সাহেবের তত্ত্বাবধানে শুভকাজ সম্পন্ন করে ফেলা হয়।

সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল।

উপস্থিত সবাই বলাবলি করতে লাগল গভর্নরের উপস্থিতিতে বর-কনে বিয়ের যে দলিলে স্বাক্ষর দান করেছে সেটা কেউ কেড়ে নিল না। অতএব উইলহেম স্টোরিজ অবশ্যই রাগ শহরে উপস্থিত নেই। আর যদি কোনোদিন সে ফিরে এসে ঝামেলা বাধায় তবু সে আর মায়রাকে বিয়ে করতে পারছে না।

পয়লা জুন। মার্ক আর মায়রার বিয়ের তারিখে উভয় পক্ষের আত্মীয়-বান্ধবদের নিয়ে সুজজ্জিত গাড়িতে চেপে গির্জায় হাজির হল। এখানেই পাদরি সাহেবের তত্ত্বাবধানে তাদের শুভবিবাহ সম্পন্ন হবে।

পাদরি সাহেব যথাসময়ে বিয়ের আসরে উপস্থিত হলেন। এবার মার্ককে বললেন।

www.pathagar.com

'তুমি বল, আমি মার্ক ডাইডাল, আমি মায়রা রোডরিখকে সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করতে রাজি আছি।'

মার্ক এবার পাদরি সাহেবে শেখানো বুলি গড়গড় করে আওড়ে গেল। তারপর মায়রা পাদরি সাহেবের শেখানো বুলি আওড়াল—'আমি মায়রা রোডরিখ, মার্ক ডাইডালকে স্বেচ্ছায় স্বামীরূপে বরণ করে নিচ্ছি।'

মায়রার শপথবাক্য পাঠ সম্পন্ন হতে না হতেই এক বিকট চিৎকারে গির্জাটাও যেন থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

চোখের পলকে পাদরি সাহেবের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। আতঙ্কে চোখেরমণি দুটো অস্থির হয়ে উঠল। তাঁর ভাব দেখে মনে হল তিনি বুঝি প্রেতের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু করেছেন। কেউ, কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার অনুজ মার্ক আর তার স্ত্রী মায়রা চোখমুখ বিকৃত করে মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ল। আমি যখন দুরু দুরু বুকে পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে ভাবছি ঠিক তখনই বিরাশি শিক্কার একটা ঘুষি আমার মুখে এসে লাগল। মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

ব্যস, মুহূর্তের মধ্যে বুক-কাঁপানো কণ্ঠ আমি এবং উপস্থিত সবাই শুনল। উইলহেম স্টৌরিজ-এর কর্কশ কণ্ঠ-'জাহান্নামে যাক! নবদম্পতি জাহান্নামে যাক! উচ্ছন্নে যাক!' কণ্ঠস্বরটার সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত।

কণ্ঠস্বরটা শোনামাত্র এক ঘর লোক ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে বসল। কে যে কোনদিকে ছুটে পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারবে তা ঠিক করে উঠতে না পেরে রীতিমতো ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি শুরু করে দিল। ফলে কারোর পক্ষেই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। গির্জার তুলকালাম কাণ্ড আর দু'চারদিন আগে ঘটনা রোডরিখ ভবনের অঘটনের মধ্যে কিছুমাত্রও পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রেই উইলহেম স্টৌরিজ-এর কালো হাত অন্তরাল থেকে কাজ করে চলেছে সন্দেহ নেই।কিন্তু একের পর এক ঘটে যাওয়া ঘটনার সবগুলোকেই যাদুমন্ত্র বা তুকতাকের ব্যাপার বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আমার দৃঢ়বিশ্বাস হতচ্ছাড়া জার্মানিটা নির্ঘাৎ তার বাপের কাছ থেকে শেখা বৈজ্ঞানিক গুপ্তবিদ্যা রপ্ত করেছে যার রহস্য আজও আমাদের কাছে অন্ধকারের অতল গহ্বরেই রয়েছে। এ বিদ্যা প্রয়োগ করে চোখের পলকে হাজার লোকের মাঝখান থেকে নিজেকে হাফিস করে দেওয়া সম্ভব। এটা নিছক এমন অত্যাশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য আবিষ্কার যার উপায় ও ফল আজও মানুষের কাছে অজ্ঞাত। ভাবলাম এ-কী উল্টোপাল্টা ভেবে আমি নিজের মনকে দুর্বল করে তুলছি।

মায়রা সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে এলিয়ে পড়ে রয়েছে। এ-অবস্থাতেই তাকে ধরাধরি করে রোডরিখ ভবনে নিয়ে যাওয়া হল। শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তারকে নিয়ে আশা হল। ভদ্রলোক নিজের বিদ্যা-অভিজ্ঞতা নিঃশেষে নিঙড়ে তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। বৃথা চেষ্টা। কিছুতেই তার সংজ্ঞা ফিরল না। তবে শ্বাসক্রিয়া অব্যাহত রইল। ডা. রোডরিখ-এর বহু বন্ধু-ডাক্তার ছুটোছুটি করে এলেন। সবাই মিলে ফ্যাকাশে মুখে পরামর্শ করলেন রোগীর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

আমার উৎকণ্ঠিত ভাই মার্ক তাঁর প্রাণপ্রতীমার নাম ধরে বহু ডাকাডাকি করল। কিন্তু সে জবাব দেওয়া তো দূরের ব্যাপার, চোখ পর্যন্ত খুলল না।

www.pathagar.com

এক সময় মায়রা যদিও চোখ মেলে তাকাল কিন্তু তার চোখের মণি দুটো স্থির, দৃষ্টি শূন্য। মার্ক-এর পক্ষে এরকম চাহনির অর্থ বুঝা অসম্ভব হল না। উম্মাদ-উম্মাদদশা প্রাপ্ত হলে মানুষের দৃষ্টি এমন হয়।

এবার পাগলের ডাক্তাররা মায়রার চিকিৎসার জন্য এক এক করে আসতে লাগল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হরেকরকম বিধানও দিলেন। কিন্তু ফলাফল শূন্য। বরং মায়রার উম্মাদদশা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল।

ক্যাপ্টেন হারালান তো রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল।

আসলে শিক্ষিত সমাজ যারা অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপারে বিশ্বাসী নয় তারা রাসায়নিক বা পদার্থবিদ্যা বিষয়ের নতুন কোনো আবিষ্কার আখ্যা দেবেন। কিন্তু অশিক্ষিত মানুষরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলবে, এটা নির্ঘাৎ শয়তানের কারসাজি। আর সে শয়তান উইলহেম স্টোরিজ নিজে।

ডা. রোডরিখ পরিবারের ঘটে যাওয়া আকস্মিক ঘটনাটাকে নিয়ে রাগ শহরে তোলপাড় হতে লাগল। হাটে-বাজারে, অফিসে-আদালতে আর হোটেলে-রেঁস্তোরায় একই ঘটনা নিয়ে মানুষ মেতে রইল। আসলের সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত খাদ মিশিয়ে ঘটনাটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অধিকতর রহস্যজনক ও রসসিক্ত করে তুলতেও কেউ কেউ দ্বিধা করল না। তবে একটা ব্যাপার সবার মধ্যেই লক্ষিত হতে লাগল সীমাহীন ঘৃণা ও ক্রোধে সবাই যেন ফেটে পড়তে চাইল। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা বুকে নিয়ে দলে দলে কাতারে কাতারে মানুষ ছুটে চলল বুলেভার্ড অঞ্চলে উইলহেম স্টোরিজের জীর্ণ বাড়িটার দিকে। সবার মধ্যেই যেন প্রতিশোধ নেওয়ার তীব্র বাসনা বদ্ধমূল।

ব্যাপারটা রীতিমতো রহস্যজনকই বটে। উইলহেম স্টোরিজ শহরে অবস্থান করছে অথচ কেউ তাকে দেখতে পায় না। প্লেটো তার লিখিত 'রিপাবলিক' গ্রন্থের এক জায়গায় চমৎকার এক ঘটনার অবতারণা করেছেন। জিজিস নামে এক রাখাল ছেলে এক দৈত্যের কবল থেকে একটা আংটি পায়। সেটা হাতে নিয়ে ঘোরালে ফেরালেই একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায়। সে উপায়ে অদৃশ্য হয়ে জিজিস রাজা ক্যানডলকে হত্যা করে নিজে ক্ষমতা হাতিয়ে নেয়। জিজিস-এর মতো ক্ষমতার অধিকারী সত্যসত্যই যদি কেউ হতে পারে তবে মানুষের নিরাপত্তা একেবারে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে।

উইলহেম স্টোরিজ নির্ঘাৎ গুপ্তবিদ্যাটা তার বাপের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। এ বিদ্যা প্রয়োগ করে যে-কোনো বাড়িতে যখন তখন ঢুকে মানুষের জীবনদুর্বিষহ করে তুলতে পারে। এমন জঘন্যতম অন্যায় অত্যাচার বন্ধ করার উপায় কি? কেউ-ই জোর গলায় বলতে পারবে না তার বাড়ি, যে ঘরে সে বসে আছে সে ঘরেই কেউ ঘাপটি মেরে নেই, আড়িপেতে সবকিছু শুনছে ও দেখছে না আর সর্বক্ষণ অদৃশ্য অবয়ব তাকে সর্বক্ষণ অনুসরণ করছে একথা কারো পক্ষে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। হামলা হুজ্জতি প্রতিরোধের উপায় কি? ঠিক তখনই আমার মনের কোণে ভেসে উঠল বাজারের সে-ভয়ঙ্কর দৃশ্যটার কথা, আচমকা একটা লোক অহেতুক হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল! কোনো অদৃশ্য শক্তি নাকি তাকে সজোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল। কারো মুখ থেকে শোনা কথা না, আমি আর হারালান চোখের সামনে অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটতে দেখেছিলাম। তাই আতঙ্কিত হতেই হচ্ছে, যত সতর্কতা অবলম্বনই করি না কেন, অদৃশ্য দেহের গুঁতো খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই হবে। আর

www.pathagar.com

কত সব অত্যাশ্চর্য, একেবারে অবিশ্বাস্য ঘটনা আমার মন-প্রাণকে বিষিয়ে তুলতে লাগল-গির্জার বোর্ড থেকে বিজ্ঞপ্তি ছেড়া, বিয়ের আংটি হাফিস হয়ে যাওয়া, গির্জার ঘর তছনছ করা, মায়রার মুকুট হাফিস এবং নচ্ছার উইলহেম স্টোরিজ-এর ঘর থেকে সেটা উদ্ধার করা, তার বাড়ির পাশের ঘরে মানুষের চলাফেরা করার আওয়াজ শোনা, বিনা কারণে একটা শিশি পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া, উনুনে আগুন, বেসিনে সাবান জলের বুদবুদ আবার একই শক্তিবলে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া। তারও আগে ডরোথি জাহাজ থেকে নচ্ছারটা নেমে গেছে ভেবেছিলাম, আসলে সে অদৃশ্য অবয়ব নিয়ে জাহাজেই ছিল। যাদুকর যেমন যাদুবলে অদৃশ্য হতে পারে ঠিক তেমনি করেই উইলহেম স্টোরিজও যে-কোনো সময় সেখানে অবস্থান করেও লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে পারে।

এতকিছু সত্ত্বেও আমি কিন্তু ব্যাপারগুলোকে যাদুর কারসাজি বা ভোজবাজির খেলা বলে মেনে নিতে মনের দিক থেকে উৎসাহ পাচ্ছি না। সবই বস্তুজগতের আওতায় পড়ে। তবে কোন্ সে শক্তি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উইলহেম স্টোরিজ এমন কোনো রসায়নের সূত্র আবিষ্কার করেছে বা সন্ধান পেয়েছে যার সাহায্যে সে নিজেকে যে-কোনো মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষের কাছে অদৃশ্য করে তুলতে সক্ষম। কোনো কোনো তরল পদার্থ মিশিয়ে এমন একটা অত্যাশ্চার্য মিশ্রণ তৈরি করা সম্ভব আমরা তা জানি না, হয়তো বা কোনোদিন জানা সম্ভবও হবে না।

কোনো অবয়ব অদৃশ্য এবং ধরা ছোঁয়ার বাইরে কখন হয়, যখন ভৌতিক দেহ ধারণ করে।

কোনোক্রমে যদি তার হাত, পা, গর্দান বা মাথার চুল চেপে ধরা সম্ভব হয় তবে অদৃশ্য হলেও তাকে জাপটে ধরে রাখা তো সম্ভব হবেই। কয়েদখানার গারদ ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার মতো শক্তি সামর্থ্য তার অবশ্যই নেই।

কিন্তু মনকে যত প্রবোধ দিই, যতই নিজেকে শক্ত করার অপচেষ্টা চালাই না কেন বুকের ভেতরে ধুকপুকানি ঠিকই আছে, অস্বীকার করলে সত্য গোপন করাই হবে।

ডা. রোডরিখ-এর বাড়িতে জোরদার পুলিশী পাহারা চলছে। কিন্তু অদৃশ্য শক্তিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাদের কোথায়? আমাদের শত্রু এখন কোথায় জানা না থাকলেও পরপর দুটো ভয়ঙ্কর ঘটনার মাধ্যমে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, হতচ্ছাড়াটা শহরেই অবস্থান করছে। কিন্তু ধরা-ছোঁয়া বা শাস্তি বহির্ভূত।

জুনের চার তারিখের ভয়ঙ্কর ঘটনা দুটোর মধ্যে একটা-আমার ভাই ও রোডরিখ পরিবারের সবাই যখন গাড়ি-বারান্দায় বসে গল্পগুজবে মগ্ন ঠিক তখনই কে যেন আমাদের একেবারে কানের কাছে বিকট শব্দ করে হেসে উঠল। শয়তানের হাসি যেভাবে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ার জোগাড় হয় ঠিক তেমনি বিশ্রী স্বরেই হাসি। ঠিক তখনই সুতীক্ষ্ম একটা ছুরির ফলা ঝলমলিয়ে উঠল। এগিয়ে গেল অনুজ মার্ক এর দিকে। ক্যাপ্টেন হারালান তাকে জাপটে ধরে ফেলল। আমিও ছুটে গেলাম। ঠিক তখনই ক্রোধোম্মত্ত তীব্র একটা গর্জন কানে এল—'মায়রা কোনোদিনই মার্ক এর স্ত্রী হতে পারবে না। কোনোদিনই নয়।' ব্যস, মোমবাতির শিখাটা কাঁপতে লাগল। আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কেটে পড়ল বুঝতে পারলাম।

www.pathagar.com

চৌদ্দপুরুষের বরাতের জোরে ছুরিটা আমার অনুজের পিঠের হাড় ছুঁয়ে নেমে গেছে। রক্তক্ষরণ ঘটছে। আর একটু হলেই বোধহয় তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত। তখন শত চেষ্টা করেও কিছুই দেখতে পাই নি। কেবল ঘরময় রজনপোড়া গন্ধ আর একটা নিভে-যাওয়া মশাল মেঝেতে পড়েছি।

বলতে লজ্জা বা দ্বিধার কিছুই নেই, আমরা তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেও এক তিলও সফল হই নি। বুঝা গেল, দাহ্যপদার্থ ব্যবহার করে পুরো বাড়িটাকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাঁক করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। বুদ্ধি দিয়ে তার কাণ্ডকারখানার বিচার করে মীমাংসায় আসা সম্ভব হল না।

পরের দিন ৫ জুন। সেদিন আরও ভয়ঙ্কর একটা অবিশ্বাস্য ঘটনার মাধ্যমে শহরবাসীর মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হল। ঘড়িতে তখন ঠিক সাড়ে দশটা বাজে। আচমকা এক সঙ্গে অনেকগুলো ঘন্টা সজোরে বেজে উঠল। নারকীয় ঘণ্টাধ্বনি শুনে সবার বুকের মধ্যে কাঁপন ধরে গেল। মৃতদেহ গোর দেওয়ার সময় এমন সুর করে ঘণ্টা বাজানো হয়।

এবারের ব্যাপারটা আরও বেশি রহস্য সৃষ্টি করল। এতগুলো ঘণ্টা একজনের পক্ষে একই সঙ্গে বাজানো সম্ভব নয়। নারকীয় কাণ্ডগুলোর নায়ক উইলহেম স্টোরিজ হলেও সম্পূর্ণ কাজটা সে একা সম্পন্ন করছে না। তবে তো সে একা নয়। তবে?

মুহূর্তমাত্র দেরি না করে কৌতূহলী ও সাহসী কিছু যুবক দৌড়োদৌড়ি করে টাওয়ারের ওপরে, ঘন্টা-ঘরে হাজির হল। কিন্তু ভোঁ-ভা। কারো টিকির নাগালও পেল না।

নচ্ছার উইলহেম স্টোরিজ তবে শহরেই অবস্থান করছে? তার ছুরির ফলাটা ফসকে গেলেও সে অবশ্যই হাল ছেড়ে দেবে না। নতুন পথে পরবর্তী হামলা হুজ্জতি করবে, ধরে নেওয়া চলে। শয়তানটাকে প্রতিরোধ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে লাগলাম।

পরের দিন ছয়ই জুন ডা. রোডরিখ-এর বাড়িতে, মায়রার ঠিক পাশের ঘরেই অনুজ মার্ক-এর থাকার ব্যবস্থা করলাম। এবার আমার পরিকল্পনাটাকে বাস্তবায়িত করতে প্রয়াসী হলাম। বাড়িটার সর্বত্র, এমন কি আনাচে কানাচে পর্যন্ত চিরুনি তল্লাশি চালালাম। তারপর সব কটা ঘরে ইয়া বড় বড় তালা ঝুলিয়ে দিলাম। চাবিগুলো নিজের কোটের পকেটে রেখে দিলাম। এবার থেকে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হলেই আমি ডা. রোডরিখ ও মার্ক এক সঙ্গে ব্যস্ত পায়ে ছুটে যাই। আমাদের পরিচিত লোক ছাড়া কাকপক্ষীকেও ঢুকতে দিই না। বাড়ি তো নয় ঠিক যেন একটা দুর্গে আমরা বাস করছি।

অটোস্টোরিজ খুব সম্ভবত শক্তিশালী আলোকরশ্মির আবিষ্কারক। আর তার সঙ্গে এমন রসায়নের ফরমূলা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন যা জীবিত প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলে তা বেরিয়ে চামড়ার ওপর হাজির হয়ে সৌর বর্ণালীর রশ্মিগুলোর ধর্মকে পরিবর্তিত করে ফেলে।

সে দেহাভ্যন্তরে এমন সব রশ্মি প্রবেশ করেছে আর তা চামড়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। বাইরের আলোকরশ্মি সে দেহের সংস্পর্শে আসা মাত্র ভেঙে গিয়ে উপরোক্ত অজ্ঞাত রশ্মিতে পরিণত হবে এবং সেগুলো অস্বচ্ছ দেহের মধ্য দিয়ে অনায়াসে গলে যাবে। আর দেহের অন্যদিক দিয়ে ফুঁড়ে বেরোবে। ঠিক তখনই এক সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্বের আলোকে পরিণত হবে। এরই ফলে অস্বচ্ছ দেহটাকে আর চোখে দেখা যাবে না। একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

এখন একটা ব্যাপার আমার কাছে একেবারেই বিস্ময়কর বলে মনে হতে লাগল। উইলহেম স্টৌরিজ-এর দেহ বা পোশাক পরিচ্ছদ কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু তার হাতের অস্ত্রশস্ত্র বা অন্যান্য দ্রব্য পরিষ্কার দেখা যায়। কেন? ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যের আড়ালেই রয়ে যায়। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে অত্যাশ্চর্য রসায়ণ পদার্থটার নামটা কিছুতেই জানতে পারলাম না। যদি কোনোক্রমে নামটা জানতে পারতাম তবে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে হতচ্ছাড়া উইলহেম-এর সঙ্গে এক চোট ধাক্কা ধাক্কি করে নিতাম। অজ্ঞাত রসায়ন পদার্থটির নাম যা-ই হোক না কেন তার ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী, নাকি দীর্ঘস্থায়ী তা-ও জানতে পারলাম না। তবে কি একটু বাদে বাদেই উইলহেম স্টৌরিজকে বিশেষ রসায়ন পদার্থ খেতে হয়? আর যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবুও হ্যাপা কম নয়। অদৃশ্য দেহকে প্রয়োজনবোধে দৃশ্য করতে হলে ফের অন্য কোনো রসায়ন পদার্থ খেতে হবে। আবার বেশি পরিমাণে, রসায়ণ পদার্থ সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে বেড়ানোও খুবই সমস্যার ব্যাপার। এটুকু না হয় জোড়াতাপ্পি দিয়ে কোনোরকমে দাঁড় করানো গেল। কিন্তু দুটো ব্যাপার, ঘণ্টাধ্বনি আর মশালের নাচনকোদন? এগুলো কি করে সম্ভব হল? নিজের মনের কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য কোনো উত্তর পেলাম না।

আমি এলোমেলো চিন্তা মাথায় নিয়ে পুলিশ প্রধান স্টোপার্ক-এর দপ্তরে গেলাম। দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, উইলহেম স্টৌরিজ-এর বুলেভার্ড টেকেলির বাড়িটাকে সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে ঘেরাও করে রাখা হবে। হতচ্ছাড়া উইলহেম স্টৌরিজ যেন কিছুতেই বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। ফলে সে তার অত্যাশ্চর্য রসায়ণ পদার্থের ভাণ্ডার থেকে তা সংগ্রহ করতে পারবে না। এর ফলে তাকে হয় রসায়ণ পদার্থের গুণ ফুরিয়ে গেলে দৃশ্যমান হতেই হবে নতুবা সর্বদা অদৃশ্যই থেকে যেতেই হবে। বাছাধনকে এর মাধ্যমেই জব্দ করা সম্ভব হবে। আর যদি তার মস্তিষ্ক বিকৃতির ব্যাপার থেকেই থাকে তবে কিছুতেই বাড়িতে ঢুকতে না পারায় বদ্ধ উম্মাদ হয়ে যাবে। তখন আর তাকে গারদে পোরার কাজটা মোটেই সমস্যার হবে না।

আমাদের পরিকল্পনামাফিক পুলিশপ্রধান স্টোপার্ক উইলহেম স্টৌরিজ-এর বাড়ির চারদিকে পুলিশ মোতায়েন করলেন।

উইলহেম স্টৌরিজ-এর অসাধ্য কিছুই নেই। সে নিজেই তো সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে রাগ শহর ছেড়ে যায় নি, শহরের বুকেই সে বুকে টোকা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এদিকে মায়রার পরিস্থিতি অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। মুখে কোনো কথা নেই। শূন্য দৃষ্টি। কাউকেই দেখতে পায় না। কানেও শোনে না। তার মা বা মার্ক-কে পর্যন্ত সে চিনতেই পারে না। মিসেস রোডরিখ প্রায়ই স্বপ্ন দেখে গুমড়ে ওঠেন। চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পান উইলহেম স্টৌরিজ পাহারাদারদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে।

শহরের নামকরা চিকিৎসক রোজ এসে মায়রাকে পরীক্ষা করে বিধান দিয়ে যান। ক্রমে তার রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের ব্যাপারে তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন।

তিনদিন এক নাগাড়ে বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকার পর আমার অনুজ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। এবার থেকে সে সর্বক্ষণ মায়রার মাথার কাছে বিমর্ষমুখে বসে থাকে।

www.pathagar.com

পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক-এর মুখে শুনলাম, শহরের মানুষগুলো নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কের মধ্য দিয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

এদিকে ক্যাপ্টেন হারালান একদম একা রাগ শহরে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। তাঁর কাজে ব্যাঘাত ঘটাবার আশঙ্কায় আমাকে পর্যন্ত সঙ্গে নেয় না। তার একটাই উদ্দেশ্য নচ্ছার উইলহেম স্টোরিজকে খুঁজে বেড়ানো আর শহরবাসী কেউ দেখে থাকলে সবার আগে তাকে ধরে ফেলা।

এগারোই জুন। সেদিন বিকালের দিকে অনুজ মার্ক-এর সঙ্গে দীর্ঘসময় ধরে কথা বলে আমি যারপরনাই আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। তার শরীর ক্রমে অবনতির দিকে যাচ্ছে। ভাবলাম, কিছুদিনের জন্য পাহাড় বা সমুদ্রের ধার থেকে ঘুরিয়ে আনতে পারলে হয়তো উপকার পাওয়া যাবে। কিন্তু তাকে মায়রার কাছ ছাড়া করা সম্ভব নয়। এও ভাবলাম, কেবলমাত্র মার্ক-ই নয়, রোডরিখ পরিবারের সবাইকে কিছুদিনের জন্য ঘুরিয়ে নিয়ে এলেই বা মন্দ কি?

আমার অনুজ মার্ক-এর মানসিক অবস্থা এমন হয়েছে যে, সে যেন প্রতিমুহূর্তেই শয়তান উইলহেম স্টোরিজ-এর পদধ্বনি শুনতে পায়। সর্বক্ষণ আতঙ্কে জড়োসড়ো হয়ে থাকে। ভয় তার নিজের জন্য নয়, মায়রার জন্যই তার যত ভয়। আসলে মায়রার জন্য তেমন ভয়ের কিছু নেই। আজ না হোক কাল সে স্বাভাবিকতা ফিরে পাবেই। অন্ততঃ প্রাণনাশের সম্ভাবনা নেই।

একটা কথা মাঝে-মধ্যেই আমার মনে জাগে, অটোস্টোরিজ কেন এমন একটা অশুভ আবিষ্কারে উৎসাহী হয়েছিলেন। আবার কেনই বা অশুভ কৌশলটা তাঁর বংশধরকে দিয়ে গেলেন?

তবে কদিনের মধ্যে নতুন কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনাই ঘটে নি। তবু শহরবাসী যেন ভুতুড়ে উৎপাতের আশঙ্কায় নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কের মধ্যে প্রতিটা মুহূর্ত কাটাচ্ছে। শহরবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক কীভাবে কাজ করে চলেছে এরকম প্রায় এক শ' ঘটনার মধ্যে একটা ঘটনার কথা বললেই কিছুটা অন্ততঃ ধারণা করা যাবে।

সেদিনটা ছিল বারো তারিখ। সকালে আমি ব্যস্ত হয়ে পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক এর কাছে যাচ্ছিলাম। পথে ক্যাপ্টেন হারালান-এর সঙ্গে দেখা। আমার সঙ্গে সে যাবে কি না জানতে চাইলাম। কোনো জবাব না দিয়ে বিষণ্নমুখে সে আমাকে অনুসরণ করতে লাগল। আচমকা পিলে-কাঁপানো চিৎকার শোনা গেল। ব্যস, পথচারীরা ছুটোছুটি দাপাদাপি জুড়ে দিল। যে, যেদিকে পারল ছুটে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করতে লাগল। টিক তখনই একটা ঘোড়ার গাড়িকে বাতাসের বেগে ছুটে আসতে দেখা গেল। পথচারীদের কি করে যে বিশ্বাস হল ঘোড়ার গাড়িটার লড়োয়া এটাই স্বয়ং উইলহেম স্টোরিজ, মাথায় এল না। তাই পথচারীরা পালাবার সময় গলা ছেড়ে আর্তনাদ করছিল- 'উইলহেম স্টোরিজ! উইলহেম স্টোরি!'

ব্যাপারটা ঘটামাত্র ক্যাপ্টেন হারালান ঘোড়ার গাড়িটার দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। বুঝলাম, তার মোকাবেলা করার তীব্র বাসনা নিয়েই তার এরকম অত্যুগ্র আগ্রহ।

পথচারীদের উত্তেজনা যে চরম রূপ নিয়েছে তা পরিষ্কার হল পর পর ক'বার গাদা বন্দুক গর্জে ওঠার ফলে। ক্যাপ্টেন হারালান-কে এগিয়ে যেতে দেখে কয়েকজন যুবক সাহসে ভর করে তার পিছু নিল। সবাই মিলে হৈ হৈ করে এগিয়ে গিয়ে গাড়িটার ওপর

www.pathagar.com

হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কয়েকজোড়া হাত এগিয়ে গেল গাড়োয়ান উইলহেম স্টোরিজকে ধরার জন্য, কিন্তু কার্যত দেখা গেল সবাই নিজের নিজের হাত দুটো ঠোকাঠুকি করছে। অদৃশ্য বাতাস ছাড়া কিছুই ধরা পড়ল না। তার আগেই গাড়িটা উল্টে পড়েছিল। পরে আসল রহস্য জানা গেল। কৃষক গাড়োয়ান রাস্তার ধারে গাড়িটা রেখে ব্যস্ত হয়ে বাজারে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে উৎপাতের সময় তার গোড়া নিজেকে মুক্ত করে দৌড়ে পালিয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমরা দৌড়ে মাঝখানে গিয়ে না দাঁড়ালে বেচারা গাড়োয়ানকে উত্তেজিত জনতা হয়তো ছিঁড়ে-ফেঁড়েই ফেলত।

১৪ জুন। বেলা এগারোটার কাছাকাছি নদীর দিকে হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ সমবেত আর্তনাদ শুনতে পেলাম—'হায়! ফিরে এসেছে! শয়তানটা ফিরে এসেছে!'

কে ফিরে এসেছে জানতে চাইলে ভিড়ের মধ্য থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় কে যেন বলল—'ধোঁয়া! ওই যে, চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে!'

অন্য একজন আগ বাড়িয়ে বলল—'পর্দার আড়াল থেকে তার মুখ অবধি দেখা গেছে!'

লম্বা লম্বা পায়ে বুলেভার্ড টেকেলিতে গিয়ে দেখি, হাজার খানেক লোক বাড়িটাকে ঘেরাও করে উত্তেজনা প্রকাশ করছে। সবার একই বক্তব্য, একদল অদৃশ্য সাকরেদকে নিয়ে নচ্ছারটা বাড়ির মধ্যে ঘাপটি মেরে রয়েছে। পুলিশ হন্যে হয়ে উত্তেজিত জনতাকে ঠেকাতে বৃথা চেষ্টা করে চলেছে।

উত্তেজিত জনতা যেভাবে বাড়িটাকে ঘিরে পাহারা দিচ্ছে একটা মাছিও বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না। বাড়িটার আনাচে কানাচে-সর্বত্র তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। বাড়ির যাবতীয় জিনিষপত্র লণ্ডভণ্ড করেও তার টিকির নাগাল পাওয়া গেল না। এমন কি আগুন ধরিয়ে বাড়িটার দেওয়াল কটা ছাড়া দরজা-জানালা ও আসবাবপত্র যা কিছু ছিল পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হল। এবার জনতার উত্তেজনা স্তিমিত হল।

শহরবাসীরা এবার একটু আশ্বস্ত হল। সবারই দৃঢ় বিশ্বাস, বাড়িটায় আগুন দেওয়ার সময় চরমতম শত্রু উইলহেম স্টোরিজ বাড়ির ভেতরেই ছিল। সে আগুনে পুড়েই নচ্ছারটা ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু ধ্বংসস্তূপের ছাই পর্যন্ত ওলট পালট করেও ভস্মীভূত মানুষের সামান্যতম চিহ্নও পাওয়া গেল না।

শহরের মানুষের মনে কিছুটা অন্ততঃ স্বস্তি ফিরে এলেও রোডরিখ-ভবনের পরিস্থিতি প্রায় অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। মায়রার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা না থাকলেও সর্বক্ষণ বিছানা আঁকড়েই পড়ে থাকে। চেতনা এখনও লুপ্ত। মুখে রা নেই। দৃষ্টি শূন্য। থেকে থেকে আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

জুনের ১৬ তারিখ। সে দিন বিকালের দিকে আমি এবং পুলিশপ্রধান হাঁটতে হাঁটতে সেতুটা পেরিয়ে দানিয়ুব নদীর বিপরীত তীরে হাজির হলাম। সাড়ে আটটার কাছাকাছি আবার সেতুটার ওপরে ফিরে এলাম। তার মাঝামাঝি এসে আমরা দ্বীপটায় নেমে গেলাম। হেঁটে দ্বীপের উত্তরদিকে গেলাম। কুঁড়ে ঘরগুলোর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। হেঁটে ফেরার সময় টুকরো টুকরো কয়েকটা কথা কানে এল, স্টোপার্ক-এর হাত চেপে ধরে দাঁড় করালাম। বললাম—'মনে হচ্ছে উইলহেম স্টোরিজ-এর কণ্ঠস্বর। কার সঙ্গে যেন

www.pathagar.com

কথা বলছে। হয়তো তার চাকরটা সঙ্গে রয়েছে।' আমরা একটা মোটাসোটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। কণ্ঠস্বরটা আমাদের খুবই কাছে চলে এল। তাদের কথোপকথনের মূল বক্তব্য—'আমরা কালই সেখানে যাচ্ছি তো? কাল সকালে রাগ শহরে ফিরব। ভুয়ো একটা নামে বাড়িটা ভাড়া নেওয়া হয়েছে। সে বাড়িতে আমাদের কেউ চিনতেও পারবে না।' আমার মনটা বিষিয়ে উঠল এজন্য যে, উইলহেম কোন্ শহরে গিয়ে আত্মগোপন করছে, জানতে পারলাম না। তবে এটুকুই আশ্বাস পেলাম, উইলহেম মনুষ্যরূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে।

আবার কণ্ঠস্বর কানে এল। মনে হল উইলহেম-এর চাকর হারমান এবার কথা বলছে—'এ ছদ্মনাম ধারণ করলে রাগ শহরের পুলিশ আমাদের টিকির নাগালও পাবে না।'

কণ্ঠস্বরটা দূরে সরে গেল। পুলিশ-প্রধান বলে উঠলেন—'এখন সবার আগে আমাদের কাজ হবে কোন্ শহরে এবং কোন্ ছদ্মনাম ধারণ করে উইলহেম বাস করতে চাইছে বের করা।'

আবার। আবার উইলহেম-এর কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে এল—'স্প্রেমবার্গে না গেলে চলবেই না। সেখানকার ব্যাঙ্কে টাকা জমা রয়েছে। অবশ্য এখানকার ব্যাঙ্কেও টাকা রয়েছে। কিন্তু মনুষ্যদেহ ধারণ করার উপায় যে নেই। চেহারাটা অন্তত না দেখতে পেলে কে টাকা দেবে! কি যে করি ভেবে পাচ্ছিনে। নচ্ছারগুলো আমার রসায়ণগারটা ধ্বংস করে দিয়েছে। তাতে অত্যাবশ্যক দু'নম্বর দ্রবণটাও বরবাদ হয়ে গেছে। তবু দেখছি, বরাতের জোর আছে। বাগানের গোপন জায়গাটার প্রতি নচ্ছারগুলোর চোখ যায় নি। আগামী পরশু দশটার সময় এসে বাগানের ওই বিশেষ জায়গাটা পরিষ্কার করতে হবে। কালই যেতাম। কিন্তু কাল আর একটা ভেলকি দেখাবার পরিকল্পনা নিয়েছি। মতলবটা আমাদের পরিচিত একজনের কাছে আকর্ষণীয় হবে কি না জানে? আমার সাফ কথা শোন, রাগ শহর কিছুতেই ছেড়ে যাচ্ছি না। মায়রার সঙ্গে ওই হতচ্ছাড়া ফরাসিটা যতদিন থাকবে ততদিন ওই পরিবারটার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়।'

এবার চাকর হারমান-এর কণ্ঠ শোনা গেল—'রাগ শহরেই ছোট-বড় প্রতিটা মানুষই জেনে গেছে অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা আমাদের কব্জা করা আছে। তবে কীভাবে তা সম্ভব করি তার হদিস আজ অবধি কেউ-ই পায় নি।'

'পাবেও না কোনোদিন। রাগ শহরে সবে তো উৎপাত শুরু করেছি। চূড়ান্ত পর্যায়ে না নিয়ে কিছুতেই আমি ক্ষান্ত দিচ্ছিনে। মূর্খের দল ভেবেছে, আমার বাড়ি পুড়িয়ে ছারখার করেই আমার সর্বস্ব ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি তার সর্বনাশ না করে রেহাই দিচ্ছি না, কিছুতেই না।' শয়তান উইলহেম গর্জে উঠল।

পুলিশ-প্রধান উন্মাদের মতো ছুটে গিয়ে হাত বাড়িয়ে জাপ্টে ধরার ভঙ্গিমা করে চিৎকার করে উঠলেন 'মি. ডাইডাল, একটা শয়তানকে ধরে ফেলেছি! অন্যটাকে আপনি ধরুন আচ্ছা করে!' হ্যাঁ, কোনো একটা দেহের ওপর পুলিশ-প্রধানের হাত পড়েছিল ঠিকই।

আমার ধারণা ছিল, অদৃশ্য শক্তি আমাদের ওপর জোর হুজ্জতি শুরু করবে। কিন্তু বিকট স্বরে বুক-কাঁপানো হাসি ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

www.pathagar.com

পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক একটা ব্যাপারে অন্তত নিঃসন্দেহ হলেন, চেষ্টা করলে অদৃশ্য দেহকেও জড়িয়ে ধরা সম্ভব। তাদের প্রায় কব্জির মধ্যে পেয়ে গেছি। আগামী পরশু তাদের পোড়া বাড়িটাতে আসতেই হবে। দুটোকে, দুটোকে সম্ভব না হলেও অন্ততঃ একজনকে হলেও ধরার মওকা পাওয়া যাবে।'

বাড়ি ফিরে ডা. রোডরিখকে নিয়ে গোপন-আলোচনায় বসলাম। দ্বীপে যা কিছু ঘটেছে, যা-যা শুনেছি সবিস্তারে তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। রোডরিখ-পরিবারের প্রতি শয়তান উইলহেম স্টোরিজ-এর ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার কথা এবং প্রতিশোধ নিতে সে যে বদ্ধপরিকর তা-ও বলতে বাদ দিলাম না।

আলোচনার মাধ্যমে স্থির হল, রাগ শহর ছেড়ে রোডরিখ পরিবার গোপনে এমন এক জায়গায় চলে যাবে যার খোঁজ উইলহেম পাবে না। ক্যাপ্টেন হারালানও প্রস্তাবে সম্মত হল। কিন্তু সে নিজে রাগ শহর ছেড়ে অন্যত্র যেতে কিছুতেই রাজি নয়। আসলে উইলহেম স্টোরিজের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্যই তার এরকম সিদ্ধান্ত।

সকাল আটটার কাছাকাছি দুটো গাড়ি এল। ঠিক হল, একটা গাড়িতে আমি অনুজ মার্ককে নিয়ে একটা পথে যাব আর অন্য গাড়িতে থাকবেন ডা. রোডরিখ ও তার স্ত্রী-কন্যা। গাড়ি দুটো আলাদা আলাদা পথ ধরে এগোলো কেউ ব্যাপারটা নিয়ে কৌতূহলী হবে না।

অবিশ্বাস্য, রীতিমতো রোমহর্ষক ব্যাপারটা তখনই ঘটে গেল। ডাক্তার আমার অনুজ মার্ককে নিয়ে মায়রার ঘরে গেলেন তাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসার জন্য। ঘরের চৌকাঠে পা দিয়েই উভয়ে থমকে গেলেন। উভয়ের শরীরের সব কটা স্নায়ু যেন এক সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল। গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসার জোগাড়। খাট ফাঁকা। মায়রা বিছানায় নেই।

আধ ঘন্টা আগেও ডা. রোডরিখ ও তাঁর স্ত্রী মায়রার ঘরে ছিলেন। মায়রাকে ভালো পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মার্ক নিজ হাতে জলখাবার খাইয়ে দিয়ে গেছে। ডা. রোডরিখকে নিয়ে তাকে গাড়িতে তোলার জন্য ঘর থেকে বের করতে গিয়েই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটার মুখোমুখি হল। সে এবার উদ্ভ্রান্তের মতো সারা বাড়ি ছুটোছুটি করতে করতে মায়রার নাম ধরে ডাকতে লাগল। না, কেউ-ই জবাব দিল না। মায়রা বাড়ির ত্রি-সীমানায় থাকলে তো জবাব দেবে!

অপ্রত্যাশিত খবরটা শুনে মিসেস রোডরিখ সংজ্ঞা হারিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। ক্যাপ্টেন হারালান-এর মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে। চোখের তারা লাল। শূন্যদৃষ্টি।

ক্যাপ্টেন হারালান-এর কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমরা পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় পাহারা একটু-আধটু শিথিল করে দিয়েছিলাম। এই সুযোগে শয়তানটা চুপিসারে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছে। সে নির্ঘাৎ বহুদিন যাবৎ এর জন্য সুযোগের সন্ধানে ছিল।

সবই না হয় স্বীকার করলাম। কিন্তু মায়রা হঠাৎ কোথায় ও কীভাবে উধাও হল, মাথায় আসছে না। দরজার সামনে, গাড়ির কাছে আমি মোতায়েন ছিলাম। আমার চোখে ধুলো দিয়ে কি করে মায়রা হাফিস হয়ে গেল? মেনে নিচ্ছি উইলহেম স্টোরিজ অদৃশ্য। কিন্তু মায়রা? সে তো আর বাতাসে মিলিয়ে গিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে যেতে পারে নি।

www.pathagar.com

বাড়ির সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। বাগানটাও বাদ দিলাম না। ভোঁ-ভাঁ। অনুজ মার্ক-এর কাছে গিয়ে দেখি, কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল করে ফেলেছে।

টাউন হলে গিয়ে পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ককে পুরো ব্যাপারটা খুলে বললাম। সবকিছু শুনে তিনি সার্জেনকে এক ব্রাটেলিয়ান পুলিশ দিয়ে ডা. রোডরিখ-এর বাড়ি ঘেরাও করে রাখার হুকুম দিলেন। তারপর তিনি নিজে গাড়ি নিয়ে সেখানে এলেন। পুলিশ দিয়ে এবং পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক নিজে পুরো বাড়িটায় তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালালেন। বৃথা চেষ্টা, ভস্মে ঘি ঢালা ছাড়া কিছুই হল না। চিলেকোঠার দিক থেকে আসতে গিয়ে মি. স্টোপার্ক হঠাৎ থমকে গিয়ে মুহূর্তকাল নীরবে লক্ষ্য করে বললেন—'কিসের একটা উৎকট গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না? উইলহেম স্টোরিজ-এর রসায়নাগারে এরকম উৎকট গন্ধ পেয়েছিলাম, মনে পড়ছে? একটা শিশি ভেঙে তরল পদার্থ মেঝেতে পড়ে গিয়ে সে গন্ধটা বেরোচ্ছিল।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম—'তবে শয়তানটা মায়রাকে একই রাসায়নিক তরল পদার্থ খাইয়ে অদৃশ্য করে নিয়েছে। তারপরই আমার চোখের সামনে দিয়ে তাকে নিয়ে হাফিস হয়ে গেছে।'

মিসেস, রোডরিখ আর মার্ককে নিয়ে এক অভিজ্ঞ ডাক্তার, ডাক্তার রোডরিখ নিজে, ক্যাপ্টেন হারালান এবং আমি নিদারুণ অস্থিরতার মধ্য দিয়ে রাত্রি কাটালাম। আর পুলিশ-প্রধান আর সার্জেন তাঁদের নবাহিনী নিয়ে পাহারায় নিযুক্ত রইলেন।

সকালে পুলিশ-প্রধান রেসিডেন্সিতে রিপোর্ট করার জন্য যাওয়ার আগে আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে, প্রায় ফিসফিসিয়ে এমন এক কথা বললেন যার তাৎপর্য আমার কাছে পরিষ্কার হল না। একেবারে দুর্বোধ্যই বলা চলে। তিনি বললেন—আমার কাজে যদি ফাঁক না থাকে, বড় রকম ভুল না হয়ে থাকে তবে হয়তো শীঘ্রই আপনাদের ওপর থেকে সবর্নাশা মেঘ কেটে যাবে।'

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে বোকার মতো বড় বড় চোখ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এবার যা ঘটল তার পরিপূর্ণ বিবরণ দেওয়ার ভাষা আমার নেই।

সকাল নয়টার কিছু আগে লেফটেন্যান্ট আর্মগার্ড ডা. রোডরিখ-এর বাড়িতে এলেন। ক্যাপ্টেন-বন্ধুকে সাহায্য করতে চাইলেন।

অফিসার দু-জন ঝটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল। আমি তাদের পিছু নিলাম। সেদিন দ্বীপে উইলহেম আর তার ভৃত্যের আলোচনার মাধ্যমে জেনেছিলাম, সকাল দশটায় উইলহেম রাসায়নিক তরল পদার্থের খোঁজে তার বুলেভাডের পোড়াবাড়িতে আসবে। তাই প্রায় দশটায় আমরা তিনজন তার বাড়ির এককোণে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। তিনজোড়া চোখ ধ্বংসস্তূপের দিকে নিবদ্ধ রাখলাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা। ব্যাপারটা এক পলকে দেখেই গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসার জোগাড় হল। আমরা এমন একদৃশ্যের মুখোমুখি হলাম যার জন্য মুহূর্তের মধ্যে আমাদের এমন অবভাবনীয় ভাবান্তর ঘটল, তাই না। দেখলাম, কোনো হাতের ছোঁয়া নেই, এমন কি প্রবল বাতাসও নেই-অথচ ধ্বংসস্তূপের ছাই এবং পোড়াকাঠ প্রভৃতি ঘাটাঘাটি হচ্ছে। ঠিক যেন কেউ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে হন্যে হয়ে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর

www.pathagar.com

পাথর, কাঠ ও লোহালক্করগুলো যেন কোনো অদৃশ্য হাত এক পাশে সরিয়ে সরিয়ে রাখছে।

আমরা দুরু দুরু বুকে, আতঙ্কিত চোখে একে অন্যের মুখের দিকে নীরব চাহনি মেলে তাকাতে লাগলাম। মুহূর্তে আমাদের সবার মুখের রক্ত যেন নিঃশেষে উধাও হয়ে গেছে। আর চোখের মণিগুলো কোটরে ঢুকে গেছে।

শয়তান উইলহেম স্টোরিজ-এরই কাজ আমাদের বুঝতে দেরি হল না। কাজের নায়ক অদৃশ্য বটে। কিন্তু কাজ পুরোদমে ঘটে চলেছে।

আচমকা বিকট একটা আর্তনাদে আমার বুকের ভেতরে কলিজাটা দারুণভাবে নাচানাচি দাপাদাপি শুরু করে দিল। এক সময় ক্যাপ্টেন হারালান-এর কণ্ঠস্বর কানে এল। গলা ছেড়ে আমাদের ডাকাডাকি করছে। আমি ও আর্মিগার্ড দৌড়ে তার কাছে গেলাম। মুহূর্তকাল আগে সে আচমকা এক হোঁচট খেয়েছে। অদৃশ্য দেহের সঙ্গে ধাক্কা লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ার জোগাড় হয়েছিল। তারপরই সে ঝট করে জাপটে ধরেছে অদৃশ্য দেহটাকে। আমাদের বলছে, শয়তানটাকে অক্টোপাশের মতো আঁকড়ে ধরে তাকে সাহায্য করার জন্য?

পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক ঠিকই বলেছিলেন, অদৃশ্য হলেও দেহ খাঁচাটা তো আর বাতাসে মিলিয়ে যাবে না, সেটার অস্তিত্ব থাকবেই।

আমি অদৃশ্য দেহ খাঁচাটাকে আঁকড়ে ধরবার জন্য হাত বাড়াতেই আচমকা এক ধাক্কা খেয়ে ছাইয়ের গাদায় হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। হ্যাঁ,আমাদের পরিকল্পনা মাফিকই কাজ হল। আমি আর ক্যাপ্টেন হারালান একটা হাত চেপে ধরলাম আর অন্য হাতটা আর্মগার্ড সাঁড়াশির মতো আঁকড়ে ধরলেন। ব্যস, বাছাধন খাঁচাকলে আটকা পড়ে গেল। শয়তানটা কিন্তু অনবরত মোঁচড়ামুঁচড়ি দিয়ে মুক্তি পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে লাগল।

ক্যাপ্টেন হারালান তীব্র ক্রোধে বার বার তর্জন গর্জন করতে লাগল—'মায়রা কোথায়? বল শয়তান, মায়রা কোথায়?

বার-কয়েক হাতে মোঁচড় মেরে মেরে হম্বিতম্বি করার পর শেষপর্যন্ত শুনতে পেলাম—'বলব না। কিছুতেই বলব না।'

পর মুহূর্তেই চোখের পলকে আর্মগাড ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলে। শয়তানটা একটা হাত ছাড়া পেয়ে গেল। ব্যস, এবার আমি আচমকা এমন একটা ধাক্কা খেলাম যে, টাল সামলাতে না পেরে কয়েক হাত দূরে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লাম। ঠিক তখনই ক্যাপ্টেন হারালান-এর মুখের ওপর আচমকা এক থাপ্পর পড়ল। সে মাটিতে পড়ে চিল্লিয়ে উঠল—'পালাচ্ছে! পালাচ্ছে! শয়তানটা পালিয়ে যাচ্ছে!'

ইতিমধ্যে প্রায় একশো লোক হৈ হৈ করতে করতে পাঁচিল টপকে স্টোরিজ ভবনে ঢুকে গেল। ক্যাপ্টেন হারালান-ই এ ব্যবস্থা করে রেখেছিল। তারা বাড়ির ভেতরে ঢুকে ঝটপট একটা বৃত্ত তৈরি করে ফেলল। আমি উল্লসিত হলাম। শয়তান উইলহেম স্টোরিজ এবার ইঁদুরের মতো খাঁচাকলে আটকা পড়েছে। বাছাধনকে এবার ধরা দিতেই হবে।

এমন সময় চোখের পলকে একটা রীতিমতো অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে গেল। বেচারা আর্মগার্ড কোমরে হাত দিয়ে, চোখ-মুখ বিকৃত করে কোনো রকমে খাড়া হবার চেষ্টা

www.pathagar.com

করছেন, ঠিক তখনই অদৃশ্য একটা হাত তাঁর কোমর থেকে তরবারিটা হেঁচটা টানে খুলে নিয়ে বনবন করে শূন্যে ঘোরাতে লাগল।

এমন একটা অভাবনীয় কাণ্ড দেখে ক্যাপ্টেন হারালান মুষড়ে না পড়ে নিজের তরবারিটাকে কোষমুক্ত করে সামনের দিকে ছুটে গেল। ব্যস, শুরু হয়ে গেল দৃশ্য আর অদৃশ্য হাতের তরবারির দ্বন্দ্বযুদ্ধ-তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ-অবিশ্বাস্য দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

একসময় পর্বত প্রমাণ দশাসই একলাশ মাটিতে আছাড় খেয়ে ধরাশায়ী হল। তার বুকের ওপর চেপে বসে ক্যাপ্টেন হারালন গর্জে চলেছে—'মায়রা কোথায়? আমার বোন মায়রা কোথায়? বল শয়তান, মায়রাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস?'

কোনো জবাব নেই। ধ্বংসস্তূপের ওপর এলিয়ে পড়ে রইল নিশ্চল একটা লাশ। উইলহেম স্টোরিজ-এর লাশ। তার মুখটা যারপরনাই বিকৃত। ইয়া বড় বড় চোখের মণিদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সব মিলিয়ে সেটা এক পলকে দেখলেই বুকের ভেতর ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে যায়।

গেল! সব গেল! মায়রাকে উদ্ধার করার সব আশা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। হতচ্ছাড়াটা বেঁচে থাকলে তাকে উদ্ধার করার যে ক্ষীণ আশাটুকু ছিল এখন তা-ও গেল। ইতিমধ্যে পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক সেখানে পৌঁছে গেছেন। তিনি অপলক চোখে এক সময়ে মূর্তিমান আতঙ্ক উইলহেম স্টোরিজ-এর নিঃসার দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখের তারায় বিস্ময়, মুখে টু-শব্দটিও নেই। তার পিতার সমাধির অশুভ শক্তি তাকে শেষপর্যন্ত রক্ষা করতে পারল না।

পুলিশপ্রধান স্টোপার্ক-এর হুকুমে তাঁর বাহিনী ধ্বংস্তূপ ঘাটাঘাটি করতে করতে ছোট্ট একটি ধাতব পাত আবিষ্কার করল। সেটা তুলে ফেলতেই সঙ্কীর্ণ সিঁড়িটার পর পর কয়েকটা ধাপ চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি সবে পা-বাড়াতে যাব অমনি কে যেন আচমকা আমার একটা হাত চেপে ধরল। করুন স্বরে প্রার্থনা জানাতে লাগল 'অনুগ্রহ করে রক্ষা করুন! একটু অনুগ্রহ করুন!'

কার কণ্ঠস্বর বুঝতে পারলাম না। তাই হতাশ মনে খালি হাতটা দিয়ে শূন্যে হাতড়াতে লাগলাম। ভেজা একটা মুখ হাতে ঠেকল। চোখের জলে ভেজামুখ। আমার পায়ের কাছে হাঁটুগেড়ে বসে অদৃশ্য এক মানুষ অঝোরে কেঁদে চলেছে বুঝতে পালাম। কাঁদো কাঁদো স্বরে সে এবার বলল—'আমি হারমান। উইলহেম স্টোরিজ-এর চাকর।'

পুলিশ প্রধান স্টোপার্ক একটু আগে যে বলেছেন, ভূগর্ভে যা কিছু আছে সবই আমি ধ্বংস করে দেব তা শুনেই হারমান-এর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগার হয়েছে। কারণ, তার মনুষ্যদেহ ফিরে পাওয়ার আশা চিরদিনের মতো নস্যাৎ হয়ে গেলে লোকালয় থেকে দূরে, বহুদূরে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাটাতে হবে।

স্টোপার্ক তাকে রক্ষা করার ভরসা দিয়ে বলল—'আমাকে সঙ্গে করে পাতাল পুরীতে গিয়ে আগে সবকিছু দেখিয়ে দিতে হবে। তারপর তোমার কাজে আমি সন্তুষ্ট হলে তবেই তুমি মুক্তি পাবে।'

হারমান এবার স্টোপার্ককে নিয়ে সিঁড়িভেঙে পাতাল পুরীতে হাজির হল। তাক থেকে 'এক' নম্বর লেবেলযুক্ত একটা বড়সড় শিশি, 'বি' লেবেলযুক্ত একটা মাঝারি শিশি, আর 'দুই' নম্বর লেবেল লাগানো একটা শিশি নামিয়ে হারমান যন্ত্রচালিতের মতো একটা

www.pathagar.com

শিশির ছিপি খুলে ঢক ঢক করে ভেতরের রাসায়নিক পদার্থটুকু পান করে ফেল। এবার অদ্ভুতভাবে শূন্যের মধ্য দিয়ে হারমান-এর অদৃশ্যদেহ ক্রমে দৃশ্য হয়ে উঠতে লাগল।

স্টোপার্ক-এর নির্দেশে বাকি শিশি কটা ভেঙে ভেতরের রাসায়নিক পদার্থটুকু মাটিতে ফেলে দেওয়া হল।

আমরা এবার উইলহেম স্টৌরিজ-এর লাশটার সদগতির কথা ভাবতে লাগলাম। কথা উঠতেই আমি বললাম—'ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মধ্যযুগে যাদুকর, ডাকিনী সাধক প্রভৃতির লাশ কবরস্থ না করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রে শয়তান উইলহেম স্টৌরিজ-এর লাশটা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হোক।'

আমি ডা. রোডরিখ-এর বাড়ি ফিরে এলাম। আর পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক সদ্য মনুষ্যদেহ লাভ করা হারমানকে নিয়ে টাউন হলের দিকে যাত্রা করলেন।

আমার আগেই ক্যাপ্টেন হারালান বাড়ি পৌছে তার বাবা ডা. রোডরিখ-এর কাছে বিস্তারিত ভাবে শয়তান উইলহেম স্টৌরিজকে হত্যা এবং তার চাকর হারমানকে বন্দি করার কাহিনী ব্যক্ত করেছে।

মার্ক উইলহেম স্টৌরিজ-এর মৃত্যু সংবাদ শুনে খুশি তো হতেই পার না, বরং তার মুখে নেমে এল বিষণ্নতার কালো ছায়া। সে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'আমাদের নিজেদের স্বার্থের তাগিদেই শয়তানটাকে জিইয়ে রাখা দরকার ছিল। সে জীবিত থাকলে মায়রার খোঁজ পাওয়ার তবুও কিছুটা অন্ততঃ আশা ছিল। এখন তাকে পাওয়ার আশা আমাদের মন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে হবে। আমি বললাম—'উইলহেম স্টৌরিজ-এর চাকর হারমান এখনও জীবিত। তার মুখ থেকে মায়রার হদিস মিলতে পারে। সে অবশ্যই মায়রার খোঁজ জানে। ছলে-বলে কৌশলে আমরা তার মুখ থেকে মায়রার খবর বের করবই।'

পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক-এর একান্ত আগ্রহে উইলহেম স্টৌরিজ-এর মৃতদেহ শহরের সর্বত্র মিছিল করে ঘোরানো হল।

এদিকে ক্যাপ্টেন হারালান টাউন হল থেকে ফিরে এল। তার চোখে-মুখে হতাশার ছাপ, বুকে ব্যর্থতার জ্বালা। কিসের ব্যর্থতা? হতাশাই বা কেন? সে উইলহেম স্টৌরিজ-এর চাকর হারমান-এর সঙ্গে দেখা করেছিল। তাকে অনুরোধ করে, ভয় দেখিয়ে এবং সবশেষে মারধোর করতেও দ্বিধা করে নি তার মুখ থেকে মায়রার খোঁজ পাওয়ার জন্য। কিন্তু কোনো ওষুধেই কাজ হয় নি। তার শয়তান প্রভুটি নাকি এ ব্যাপারে ভুলেও মুখ খোলে নি।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। ডা. রোডরিখ, আমি, মার্ক আর দুজন অফিসার বৈঠকখানায় বসে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে গভীর আলোচনায় মগ্ন। ঠিক তখনই অবাঞ্ছিত ঘটনাটা ঘটে গেল। অভাবিত উপায়ে গ্যালারির দরজাটা দুম করে খুলে গেল। আমরা এতগুলো প্রাণী আরও অবাক হলাম যখন দেখলাম, দরজাটা আবার আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক তখনই এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা ঘটে গেল যা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমার বুকে গাঁথা থাকবে। পরিষ্কার শুনলাম—'আমি মায়রা, মায়রা রোডরিখ বলছি।

মার্ক চিৎকার করে উঠল—'মায়রা, আমার প্রাণাধিকা মায়রা সুস্থ হয়ে উঠেছে!' পরিষ্কার তার কণ্ঠস্বর। কোনোরকম জড়তা নেই তার কণ্ঠস্বরে। মায়রা স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে।

www.pathagar.com

কিন্তু কোথায় মায়রা? সে যে আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে-অদৃশ্য।

হ্যাঁ, শয়তান উইলহেম স্টোরিজ রসায়ন পদার্থ সেবন করিয়ে তাকে অদৃশ্য করে রেখে দিয়েছে। সে আমাদের মাঝে অবস্থান করে চলাফেরা করছে, কথা বলছে। কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না।

মায়রা নিজে তার অবস্থা সম্বন্ধে মোটেই অবহিত নয়। তাই সে সবিস্ময়ে বলল, 'কী ব্যাপার তোমাদের, বল দেখি? তোমরা সবাই কাঠের পুতলের মতো বসে রয়েছ যে বড়! সবাই মুখে কলুপ এঁটে বসে, ব্যাপার কী!' মার্ককে লক্ষ করে বলল, 'কী ব্যাপার বল তো? এমন অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছো, হয়েছে কি তোমার, বল তো?'

মার্ক এবার দুহাত বাড়িয়ে মায়রার একটা হাত ধরে ফেলে। নিজের মুখোমুখি চেয়ারে বসালো। কিন্তু যে অদৃশ্য। হাতের স্পর্শে বুঝতে পারল, মায়রা তার সামনে বসে।

মায়রার অদৃশ্য শরীরকে দৃশ্য করতে যে পারত কেবলমাত্র সে হচ্ছে স্বয়ং উইলহেম স্টোরিজ। কিন্তু সে তো অনেক আগেই পরপারে পৌঁছে গেছে। তার চাকর মোটেই গুপ্তরহস্য অবহিত নয়, থাকার কথাও নয়। কারণ, চাকর যতই বিশ্বস্ত হোক না কেন তার কাছে গুপ্তরহস্য ফাঁস করে না। কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে তার পক্ষে কারামুক্তিও সম্ভব হল না। কারারক্ষী তাকে খালাস করতে এসে দেখল, মরে সে একেবারে শক্ত কাঠ হয়ে রয়েছে। পরবর্তী কালে ময়না তদন্তের ফলে জানা যায়, তার শিরায় রক্ত অকস্মাৎ জমাট বেঁধে যাওয়াই তার মৃত্যু ঘটেছে।

মায়রা সম্বন্ধে যেটুকু ক্ষীণ আশা ছিল তা-ও অদৃষ্ট বিড়ম্বিত হারমান-এর মৃত্যুর ফলে নিঃশেষ হয়ে গেল। উইলহেম স্টোরিজ-এর অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা চিরকালের জন্য রহস্যবৃতই রয়ে গেল।

স্টোরিজ-ভবন থেকে যেসব কাগজপত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেও রাসায়নিক তরল পদার্থের ফরমুলার সন্ধান মিলল না।

২০ জুন। সেদিন সকালে আমার সঙ্গে অনুজ মার্ক দেখা করতে এল। তাকে বেশ শান্তই মনে হল। তার কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম, সে বলতে চাইছে তাদের বিয়েতে ধর্মীয় অনুশাসনের ফাঁকটা থেকে গেছে। মন্ত্রপাঠ তো এখনও হয় নি। মায়রার মুখের দিকে তাকিয়ে ও সে নিরবচ্ছিন্ন অস্থিরতার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে আগ্রহী।

গির্জায় গিয়ে আমরা পাদরি সাহেবকে সব খুলে বললাম। সবকিছু শুনে তিনি মতামত ব্যক্ত করলেন—'এতে আপত্তির কিছু নেই। হলই বা মায়রা অদৃশ্য। কিন্তু সে তো কথা বলতে সক্ষম। অতএব বিয়ের মন্ত্রপাঠও সে করতে পারবে।'

পরের দিন সকালে আমি, মার্ক আর রোডরিখ-দম্পতি গির্জার প্রধান পাদরির সামনে হাজির হলাম। ব্যাপারটা মায়রাকে আগে ভাগেই জানিয়ে রাখা হয়েছিল।

ফলে সে অদৃশ্য অবয়ব নিয়েই সেখানে উপস্থিত হল। সেখানে প্রধান পাদরি শুভ বিবাহের পবিত্র বিধি অনুযায়ী তাদের আনুষ্ঠানিক বিয়ের ব্যাপারটা সম্পন্ন করলেন। মায়রা যে-হাতে বিয়ের দলিলে স্বাক্ষর দান করল তা আর কোনোদিনই কারো দৃষ্টিগোচর হবে না, আজও হয় নি।

www.pathagar.com

আমার অনুজ মার্ক-এর বিয়ের ব্যাপারটা মিটে গেল। তারপরও পুরো একটা সপ্তাহ আমি রাগ শহরে অবস্থান করেছিলাম।

জানুয়ারি মাস পড়ল।

একটা ব্যাপার কয়েকদিন ধরেই আমার মাথায় চক্কর মারছে। উইলহেম স্টোরিজ-এর মৃত্যুর কথা বলতে চাইছি। ক্যাপ্টেন হারালানের তরবারির আঘাতে তার দেহে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। রক্তের সঙ্গে তার দেহের রাসায়নিক তরল পদার্থটুকু দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আর এরই ফলে তার অদৃশ্য দেহ দৃশ্য হয়ে উঠেছিল। অতএব মায়রার অদৃশ্য দেহকেও তো একই উপায়ে দৃশ্য করে তোলা সম্ভব। এর জন্য চাই কেবলমাত্র কিছু রক্তপাত। মায়রার দেহ থেকে কিছুটা রক্ত বের করে দেয়া। চিকিৎসকের অস্ত্রের দ্বারাই তা অনায়াসে সম্ভব।

আমি যখন অনুজ মার্ককে চিঠি লিখে সবকিছু জানাতে যাব ঠিক তখনই তার একটা চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, "মায়রা মা হতে চলেছে।" অতএব এ পরিস্থিতিতে তার দেহ থেকে সামান্যতম রক্তও বের করা সমীচিন নয়। তাই অনন্যোপায় হয়ে তখনকার মতো ব্যাপারটা চেপেই যেতে হল।

চিকিৎসকের মতে মায়রার প্রসবের সময় নির্দ্ধারিত হয়েছিল মে মাসের শেষের দিকে। তাই পনেরো তারিখে আমি রাগ শহরে উপস্থিত হলাম।

২৭ মে। সেদিনের স্মৃতি আমৃত্যু আমার অন্তরে চির জাগরুক থাকবে। অবিশ্বাস্য দৈব ঘটনাটা সেদিনই ঘটল। মায়রা যেন ল্যাজারস-এর মতো অকস্মাৎ সমাধি ভেদ করে উঠে এল। দু-দুটো প্রাণীর জন্ম হল সবার চোখের সামনে। তাদের একটা আমার ভাই-ঝি আর দ্বিতীয়টা তার গর্বধারিণী মায়রার। দীর্ঘদিন আমাদের চোখের আড়ালে অদৃশ্য থাকার জন্যই হয়তো বা তাকে আরও বেশি সুন্দর লাগছিল।

---

www.pathagar.com

ভিলেজ ইন দ্য ট্রি টপস

ছয়টা ষাঁড় অক্লান্ত পরিশ্রম করে পাথরের চার চাকাওয়ালা গাড়িটাকে একনাগাড়ে টেনে নিয়ে চলেছে। এবড়োখেবড়ো পথ। কখনও খানাখন্দ পেরিয়ে, আবার কখনো বা প্রায় সমতল পথে এগোতে হচ্ছে বোবা, প্রাণী ছয়টাকে। ইতিমধ্যেই তিন মাস কেটেছে। আরো নয়-দশ সপ্তাহ গাড়ি চেপে পথ পাড়ি দিতে হবে। গাড়িটার দুটো কামরা। প্রথমটায় রয়েছে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক শক্ত সাবুত এক পর্তুগিজ বণিক। নাম তাঁর উর্দা। তাঁর সঙ্গে রয়েছে বছর পঁয়ত্রিশেক বয়স্ক নিগ্রো ঘামিশ। তার কাজ চলার পথে গাছগাছালি ঝোপঝাড় পড়লে কেটে কুটে পরিষ্কার করে গাড়ি চালাবার মতো জায়গা করে দেওয়া। আর দ্বিতীয় কামরাটায় যাত্রী দুজন যুবক। উভয়েরই বছর পঁচিশেক বয়স। তাদের একজন ম্যাক্স হিউবার নামে এক ফরাসি, আর অন্যজন জন কর্ট, আমেরিকান।

ফরাসি কঙ্গোর রাজধানী লিভারভিল থেকে তিনমাস আগে এরা যাত্রা শুরু করেছে। হাতি শিকার করা এদের উদ্দেশ্য। প্রচুর হাতি ইতিমধ্যেই ঘায়েল করেছে। হাতির দাঁতই তাদের কাম্য। সারা পৃথিবীর পিয়ানোর রীড তা দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। হাতির দাঁতের বোঝা-মাথায় একজন গাট্টাগোট্টা লোক তাঁদের অনুসরণ করে চলেছে। তাদের সঙ্গে আনন্দ করতে করতে চলেছে লাঙ্গা নামে প্রায় দশ বছরের এক বালক। একে জন আর ম্যাক্স-এর পোষ্যপুত্র জ্ঞান করা যেতে পারে। জঙ্গলি মানুষখেকোদের হাত থেকে তাকে জোর করে ছিনিয়ে আনা হয়েছিল। কেবলমাত্র যে মানুষখেকোই তাই নয়, শিশুখেকোও বটে। নিজের শিশুকে দিয়েও পেটের জ্বালা এরা নেভাতে ইতস্তত করে না। যেদিন শিশু না জোটে সেদিন বড়দের গায়ে হাত দেয়। এমনই ভয়ঙ্কর সে-জাত।

শিকার করে হাতির দাঁত অনেকই জোগাড় হয়েছে। এবার ফেরার চিন্তা। বাড়ি ফিরতে আরও অন্তত ন-দশ সপ্তাহ লেগে যাবে।

ফেরার পথে এক জঙ্গল পড়ল। পর্তুগিজ বণিক উর্দা বললেন—'জঙ্গলের মাঝ বরাবর যাওয়া ঠিক হবে না। জঙ্গলের ধার দিয়ে দিয়ে আমাদের যেতে হবে।'

ফরাসি যুবক ম্যাক্স সবিস্ময়ে প্রতিবাদ করে উঠল—'একী অদ্ভুত কথা বলছেন। মাঝ বরাবর গেলে পথ অনেক কম হবে। শীঘ্র পৌঁছে যাওয়া যাবে। তবুও যেতে চাইছেন না?'

'যাওয়া সম্ভব নয় বলেই তো আপত্তি করছি। আজ অবধি ওখান দিয়ে কেউ যায়ও নি। মোদ্দা কথা হচ্ছে, গাছগাছালি এমন ঘন, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে, তাদের ফাঁক দিয়ে চলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।'

আমেরিকান যুবক জন কর্ট উর্দাকে সমর্থন করতে গিয়ে বলল, 'গাছগাছালির চক্করে গিয়ে হয়রান হওয়ার দরকারই বা কী? বাদ দিন তো—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ম্যাক্স বলে উঠল, 'সে কী! জঙ্গলটার ভেতরে কি রয়েছে জানার আগ্রহও নেই?'

জন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল, ' জেনে কী-ই বা লাভ? জঙ্গলের ভেতরে অবশ্যই বিচিত্র শহর, দুর্গ আর অদ্ভুত দর্শন মানুষ ও জানোয়ার নেই।'

www.pathagar.com

ব্যস, ব্যাপারটা নিয়ে তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। আসলে ম্যাক্স-এর বক্তব্য হচ্ছে, এতদিন বনে ঘোরাঘুরি করে নতুন কিছুরই দর্শন মিলল না। ব্যাপারটা অবশ্যই পরিতাপের। আশ্চর্য কিছু আবিষ্কার না হলে মন ভরবে কেন, বল তো?'

একে পথ কম হবে, নতুনতর কোনোকিছু চাক্ষুষ করা যাবে, উপরি পাওনা অভিজ্ঞতালাভ হবে। এ লোভের বশবর্তী হয়েই ম্যাক্স বনের মাঝ বরাবর পাড়ি দিতে আগ্রহী। উর্দা কিন্তু এতে নিতান্তই অনাগ্রহী। আবার জন কর্টও যেতে চাইল না।

কথা কাটাকাটি করতে করতেই রাত্রি সাতটা বেজে গেল। ফলে সেদিন আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল না। অনন্যোপায় হয়ে রাত্রিটা তাদের সেখানেই কাটাতে হল।

রাত্রি তখন দশটার কাছাকাছি। গভীর বনে কতগুলো আগুন জ্বলে উঠল। অভিযাত্রীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ব্যাপারটা তারা কেউ টেরও পেল না।

রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে দশটা। হঠাৎ নিগ্রো বালক লাঙ্গার ঘুম ভেঙে গেল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট আলোক-বিন্দু তার নজরে পড়ল। অনুসন্ধিৎসু নজরে আলোটার দিকে তাকিয়ে নিঃসন্দেহ হবার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, হেলেদুলে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে কতগুলা আলো। ভাবল, মশাল নাকি? দূরত্ব দেড় মাইল হবে হয়ত। ব্যাপারটা লাঙ্গার সুবিধের মনে হল না। আপন মনে বলে উঠল—'মানুষখেকো জঙ্গলিরা নয় তো? আফ্রিকার গভীর বনে এদের চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছুই নেই। সাউথ সী আইল্যান্ড অথবা অস্ট্রেলিয়ার মানুষখেকোরা এদের কাছে নিছকই শিশু। দশ-পনের বছরের বালক বা কিশোরের মাংস পেলে তো আর কতাই নেই। দলপতির নির্দেশে সামান্য কারণেই ভৃত্যদের গর্দান নেওয়া হয়। তারপর তাদের মাংস দিয়ে—উঃ! লাঙ্গা আর ভাবতে পারছে না। অনিশ্চিত আতঙ্কে তার শরীরের স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে আসতে লাগল। পরমুহূর্তেই নিজের মনকে শক্ত করে আবার তাকাল চলন্ত আগুনের শিখার দিকে। তাদের সংখ্যা খুব বেশিনয় বটে। দশটা তো হবেই। প্রায় দুশো গজ দূরে এবার সেগুলো কাছাকাছি গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল। লাঙ্গা ভাবল, এরা সকালের আলোর অপেক্ষায় রয়েছে।

লাঙ্গা এবার খুবই সতর্কতার সঙ্গে, সামান্যতমও শব্দ না করে প্রথম গাড়িটার ওপরে উঠে গিয়ে পর্তুগিজ প্রৌঢ় উর্দাকে ডেকে তুলল।

লাঙ্গা-র ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে উর্দা হুড়মুড় করে ঘুম থেকে উঠে চলন্ত আগুনের শিখা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলন। অন্যান্যরাও ইতিমধ্যে ঘুম থেকে উঠে রহস্যসঞ্চারকালী আগুনের শিখাগুলো দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। কারোর মুখে টু-শব্দটিও নেই। একটা বা দুটো নয় গোটা পঞ্চাশেক আগুনের শিখা অনবরত চলছে -দুলছে-নাচছে।

জন কর্ট নিঃসন্দেহ, সেগুলো অবশ্যই আলেয়ার আলো বা মেঘের বিদ্যুতের ঝলকানি নয়। রজন ব্যবহার করে আগুন জ্বালানো হয়েছে।

গাড়িতে দশ-বারোটা রাইফেল রয়েছে। কার্তুজ ও বারুদও প্রচুরই মজুদ রয়েছে। সবাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। যে বা যারাই আক্রমণ করুন না কেন অন্তত মোকাবেলা তো করতে পারবে।

উত্তর ও পূর্ব-পশ্চিমে বিরাজ করছে জমাটবাঁধা অন্ধকার। কেবলমাত্র দক্ষিণ দিকে রয়েছে রহস্যসঞ্চারকারী আগুনের শিখাগুলো।

www.pathagar.com

রাত্রি প্রায় এগারোটা বাজে। এমন অন্তঃহীন ও অনিশ্চিত আতঙ্কের মধ্যে আর কতক্ষণ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা সম্ভব? অনন্যোপায় হয়ে অস্থিরচিত্তে ম্যাক্স এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসতে চাইল। দু-চার কথার মাধ্যমে স্থির হল ম্যাক্স নিগ্রো সন্তান ঘামিশ-কে নিয়ে ঘাস আর ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা কি দেখে আসবে। রাইফেল আর গোলাবারুদ সঙ্গেই নিয়ে যাবে।

কিছুদূর যেতে না যেতেই ম্যাক্স দেখতে পেল, নিগ্রো বালক লাঙ্গাও গুটিগুটি তাদের সঙ্গে চলেছে। সে মনে মনে বলল—'লাঙ্গা সঙ্গে থাকলে উপকারই হবে। সে রাতের অন্ধকারে বেড়ালের মতো দেখতে পায়।'

চলন্ত আগুনের শিখাগুলির কখনও ঝোপের আড়ালে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনও বা একেবারে স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সেগুলো অনবরত চলাফেরা করছে, দুলছে, নাচছে এবং লাফাচ্ছে। তারা এক পা দু-পা করে আরও কাছে, প্রায় দু-শ' গজদূর থেকেও কিছুই দেখতে পেল না। আগুনের শিখাগুলো আগের মতোই চলছে, দুলছে আর লাফালাফি করছে বটে। কিন্তু অভিযাত্রীরা আগুনের শিখাগুলোর উৎসের সন্ধান কিছুতেই পেল না। কারা যে ওগুলো নিয়ে এমন ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে তা অনুমানও করতে পারল না।

অস্থিরচিত্ত ম্যাক্স আরও এগিয়ে গিয়ে রহস্যটা আবিষ্কার করার আগ্রহ প্রকাশ করল। খামিশ আর লাঙ্গা তাকে বাধা দিল, পথ আগলে দাঁড়াল। হঠাৎ পরিস্থিতি অধিকতর রহস্যজনক হয়ে উঠল। আগের মশালগুলো তো নাচানাচি করছেই, আরও প্রায় কুড়িটা মশাল নতুন করে আবির্ভূত হল। সেগুলো আর মাটির ওপরে বা মাটির কাছাকাছি রইল না। প্রায় শ' দেড়েক ফুট লম্বা গাছের ডগায় নাচন কোদন জুড়ে দিল। ব্যাপারটা আরও রহস্যের উদ্রেক ঘটাল যখন দেখা গেল, গাছের মাথায় অবস্থানরত মশালগুলো কাৎ হয়ে, হেলেদুলে নিচের মশালগুলোকে কি যেন বলতে চাইছে।

না, অস্থিরচিত্ত ম্যাক্সকে আর দমিয়ে রাখাসম্ভব হল না। সে এক ঝটকায় ঘামিশ আর লাঙ্গা-র কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ব্যস্ত পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ম্যাক্স সামান্য এগিয়ে যেতেই কে যেন ফুঁ দিয়ে ঝটপট মশালগুলো নিভিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যেই জমাটবাঁধা অন্ধকারে তলিয়ে গেল সমগ্র বনভূমি। ঠিক তখনই রহস্যজনক গর্জন শোনা গেল। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন কেউ ঘোৎ-ঘোৎ করে নাক ডাকলে যেমন চাপা গর্জন সৃষ্টি হয় ঠিক তেমনই আওয়াজ বহু দূর থেকে ভেষে আসতে লাগল। ম্যাক্স উৎকর্ণ হয়ে আওয়াজটা লক্ষ্য করে নিঃসন্দেহ হল, ঝড়ের গর্জন এটা নয়। আকাশ নির্মেঘ। মেঘের গর্জনও অবশ্যই নয়। সবেচেয় বড় কথা, আওয়াজটা ভেসে আসছে মাটির কাছাকাছি কোনো না কোনো স্থান থেকে। আর সেটা যেন ক্রমশ তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

ঘামিশ কণ্ঠস্বরে আতঙ্কমিশ্রিত ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলে—'হুজুর, এখনও সময় আছে, পালান!'

হ্যাঁ, অনুমান অভ্রান্ত। দূর থেকে যেন মাদলের আওয়াজ ক্রমেই তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে— আরও কাছে এগিয়ে এল রহস্যজনক আওয়াজটা।

www.pathagar.com

ব্যস, আর দেরি নয়, ঘামিশ মুহূর্তে পিছন ফিরে ছুটতে ছুটতে বলল—'হুজুর, যদি প্রাণে বাঁচতে চান পালান! এখনও সময় আছে, পালান!'

ম্যাক্স আর নিগ্রো বালক লাঙ্গা ঘামিশকে অনুসরণ করতে লাগল। গাড়ির কাছাকাছি এসে বণিক উর্দার সঙ্গে দেখা। তিনিও উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলেন।

মালবাহী কুলিরা আগেই চম্পট দিয়েছে। হাতে সময় আর মোটেই নেই। বড়জোর পনের মিনিট। এরই মধ্যে তারা এসে পড়ল বলে। মাইল দেড়েক দূরে তাদের আসতে দেখা গেল। তারা সংখ্যায় পাঁচ শ'—সাত শ'—নাকি এক হাজার কিছুই অনুমান করা গেল না। হাতি, হ্যাঁ? হাতির পায়ের আঘাতে বনভূমির মাটি থরথরিয়ে কাঁপছে। ষাঁড়গুলো পরিস্থিতি সঙ্গীন অনুমান করে অনেক আগেই বাঁধন ছিড়ে চম্পট দিয়েছে। অদূরবর্তী অন্ধকার থেকে একটা ষাঁড়ের অন্তিম আর্তস্বর ভেসে আসছে। হয়ত বা হাতির পায়ের তলায় পড়ে থেঁৎলে মরেছে। গাড়িটাকে লুকিয়ে রাখার জন্য উর্দা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কে, কার গাড়ি লুকোবে? নিজের নিজের জান রক্ষার তাগিদে সবাই ঝটপট গাছে উঠে পড়ল। তবে হ্যাঁ, গুলি আর রাইফেল সঙ্গে নিতে ভুলল না।

অভিযাত্রীরা গাছে উঠতে না উঠতেই হাতির পাল সেখানে হাজির হয়ে গেল। চোখের পলকে গাড়িটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। এবার পুরো দলটা গাছের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু ত্রিশ ফুট ওপরের মগডালে অবস্থানরত উর্দা, ম্যাক্স, ঘামিশ ও লাঙ্গাকে শুঁড় দিয়ে নাগাল পেল না।

উর্দা যেন আর মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। তিনি হাতির পালের ওপর দমাদম গুলি চালাতে লাগলেন। ঘামিশ তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল। বৃথা চেষ্টা, উর্দা উম্মাদের মতো গুলি ছুঁড়েই চললেন। এদিকে পর্বতপ্রমাণ হাতিগুলো তীব্র আক্রোশে গাছটার গুঁড়িতে অনবরত ধাক্কা মারতে লাগল। সে যে কী আক্রোশ আর গগনভেদী গর্জন বলে বুঝানো সম্ভব নয়। ইয়া মোটা গাছটা আর বেশিক্ষণ খাড়াভাবে থাকতে পারল না। একটু একটু করে হেলে পড়তে লাগল। ইতিমধ্যেই ম্যাক্স হিউবার, জন কর্ট, ঘামিশ ও লাঙ্গাকে নিয়ে গাছের ডাল বেয়ে বেয়ে অন্য একটা অপেক্ষাকৃত মোটা গাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। উম্মত্তপ্রায় হাতির দল এবার এ-গাছটার ওপর চড়াও হল। গায়ের সর্বশক্তি নিয়োগ করে তারা একের পর এক ধাক্কা মরতে লাগল গাছটার গায়ে। গাছটা হেলে পড়তেই ম্যাক্স লাঙ্গাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গভীর জঙ্গলের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। জন কর্ট ও ঘামিশ তাকে অনুসরণ করতে লাগল। হাতিগুলোও উম্মাদের মতো তাদের পিছন পিছন ছুটতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দাঁতাল একটা হাতি ম্যাক্স—এর একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেল। এমন কি নিঃশ্বাসও যেন তার গায়ে লাগতে লাগল। চোখের পলকে বন্দুক উঁচিয়ে ধরে ক্রোধোম্মত্ত হাতিটার দুচোখের মাঝখানে গুলি করল। বিকট আর্তনাদ তুলে সেটা দুম করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। সুযোগ বুঝে অভিযাত্রীরা গভীর বনে ঢুকে গেল। এমন ঘন বন যে কোনোরকমে মানুষ যাতায়াত করতে পারে বটে, কিন্তু হাতির পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। ফলে উপায়ন্তর না দেখে হাতির দল হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

কিন্তু মশালবাহী মানুষখেকোদের চিহ্নও আর দেখা গেল না।

রীতিমতো এক আতঙ্কের ব্যাপারই বটে। জঙ্গলের কিনারায় ক্রোধোম্মত্ত হাতির দল আর জঙ্গলের ভেতরে মশালবাহী হিংস্র মানুষখেকোর দাপাদাপি। অধীর প্রতীক্ষা ও

www.pathagar.com

নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কের মধ্যে অভিযাত্রীদের সারাটা রাত্রি কাটল। রাতজাগা মানুষখেকো মশালবাহীরা কোথায়? তারা কি ঝোপঝাড় বা গাছের গুঁড়ির আড়ালে ঘাপটি মেরে রয়েছে, নাকি গাছের ওপরে উঠে গেছে তাই বা কে জানে।

পূর্ব-আকাশে ভোরের আলো উঁকি দিল। ভোর হল। অভিযাত্রীরা গাছের তলায় পোড়াকাঠ ও ছাই দেখে নিঃসন্দেহ হল, হিংস্র মানুষখেকো জঙ্গলিরা এখানেই রাত কাটিয়েছে। এখন তারা ধারে কাছে নেই, কিন্তু এখন তারা কোথায়? হয়ত বা হাতির ভয়ে নিজেদের ঝুপড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। হাতির দল কিন্তু এ তল্লাট ছেড়ে যায় নি। তীব্র আক্রোশে ধারে কাছেই ঘুরঘুর করছে।

ম্যাক্স ভাবছে,একবারটি গাড়িটার কাছে যাওয়া দরকার। উর্দার পরিস্থিতি যে কি হল দেখতে হয়। আর কিছু কার্তুজ ও বারুদ নিয়ে আসাও একান্ত দরকার। বণিক উর্দার হয়ে হাতির দাঁতের খোঁজে এরা বাড়িঘর ছেড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়েচ্ছে। তিনিই এখন কাছে নেই। কুলিরা হাতির দাঁতের বোঝা নিয়ে ভয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে পালাতেই তাঁর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হবার জোগার হয়েছিল। তা না হলে এমন কোনো পাগল আছে যে হাতির পালের ওপর গুলি চালিয়ে তাদের প্রতিরোধ করতে উৎসাহী হয়?

ম্যাক্স আর জন-এর বাবারা লিভারপুলের এক আমেরিকান কারখানার অংশীদার। ফলে এদের সময় ও অর্থ দু-ই অঢেল। তাই তিন মাস আগে অভিযাত্রীর দল হাতির দাঁতের খোঁজে উবাঙ্গীর জঙ্গলে যাচ্ছে শুনে পিছু নিয়েছিল। ম্যাক্স আর জন এমনিতে অভিন্নহৃদয় বন্ধু হলেও প্রকৃতিগতভাবে তারা সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর। জন বাস্তববাদী, কল্পনা-টল্পনার প্রতি নামমাত্র উৎসাহও তার নেই। ম্যাক্স ঠিক তার বিপরীতধর্মী, কল্পনার জাল বুনতেই তার যত উৎসাহ। জন-এর জন্ম বোস্টনে বটে। ভূ-বিদ্যা ও নৃতত্ত্ব বিদ্যার দিকে তার প্রবণতা খুবই বেশি। ম্যাক্স যে ফরাসি। বাস্তবের চেয়ে কল্পনার জাল বোনার সুযোগ পেলে আর কথা নেই।

উর্দা কিন্তু জঙ্গলে ঢোকার ব্যাপারে গোড়া থেকেই আপত্তি করেছিলেন। অভিযানের লোভে অজনা-অচেনা জঙ্গলে ঢুকে কোন ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়তে হবে, কে জানে। তাই তো প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আড়াআড়ি পথ পাড়ি দিতে।

ফ্রেঞ্চ-কঙ্গোর দক্ষিণে অবস্থিত জঙ্গলটা আয়তনে নেহাৎ কম নয়। অন্যান্যরা কিন্তু জঙ্গলের বাইরের ঘুরপথে না গিয়ে তাড়াতাড়ি হওয়ার অজুহাতে উর্দাকে জঙ্গলের ভেতরের আড়াআড়ি পথ পাড়ি দিতে বাধ্য করে। সবাই এমন কথাও বলেছিল, জঙ্গলিরা এ-জঙ্গলে ঢোকে না। আসলে তারা সাহসই পায় না। অতএব ভয়ের কি থাকতে পারে ? আবার এরকম যুক্তি তারা দেখিয়েছে, এমন বিশাল জঙ্গলে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো নদী পাওয়া যাবেই। আর সেটা অবশ্যই উবাঙ্গীতে গিয়ে মিশেছে। সোজা দাক্ষিণদিকে অগ্রসর হতে থাকলে, পথে নদী পড়লে অল্প সময়ের মধ্যেই উবাঙ্গীতে পৌঁছনো যাবে।

নদী আর নৌকোর কথা শুনেই জন কর্ট তীব্র প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেছিল—'আরে ব্বাস! আফ্রিকার নদীতে নৌকো! কার এমন দুঃসাহস যে এখানকার জলে নৌকো নামাতে যাবে।'

কিন্তু অন্যান্যদের অত্যুগ্র আগ্রহের কাছে জন-এর কোনো যুক্তিই টেকেনি। বাধ্য হয়ে সে-ও মতো দিয়েছিল।

www.pathagar.com

ক্ষিদেতে পেটের ভেতরে জ্বালা করতে শুরু করেছে। যা হোক কিছু পেটে না দিলে এ-জ্বালা নেভার নয়। তাই অভিযাত্রীরা কায়দা কসরৎ করে কোনোরকমে একটা হরিণ শিকার করল। আগুনে ঝলসে তা দিয়ে এতগুলো প্রাণী উদরপূর্তি করল।

জঙ্গলের বুকে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। সবাই অতিকায় দুটো গাছের আড়ালে শুয়ে পড়ল। স্থির হল পালা করে এক এক জন জেগে পাহারা দেবে। প্রথম প্রহরে ম্যাক্স-এর পালা পড়ল। বন্দুক নিয়ে টহল দিতে গিয়ে সে কত কল্পনাই না করতে লাগল। প্রখ্যাত পর্যটক স্ট্যানলি আফ্রিকার গভীর অরণ্যে তিন ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পিগমি নামক উপজাতির দেখা পেয়েছিলেন। আর ওজন ? আশি পাউন্ড মাত্র। বুদ্ধিমত্তা ও শক্তি সামর্থ্যে সভ্য মানুষদের চেয়ে কোনোদিক থেকেই পিছিয়ে নেই তারা। তা সত্ত্বেও গাছের উঁচু ডালে ঝুপড়ি তৈরি করে তারা বাস করে। ম্যাক্স ভাবছে, তাদের মতো জীবন হলে কী মজাটাই না হবে। অজানা-অচেনা এ গভীর বনে যদি ল্যাজওয়ালা মানুষ, হাতির শুঁড়ের মতো নাকযুক্ত বিচিত্র কোনো প্রাণী অথবা পৌরাণিক কাহিনীর সাইক্লোপদের মতো এক চোখওয়ালা প্রাণীর দেখা পেলে সভ্যভব্য মানুষদের মধ্যে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হ'ত।

ম্যাক্স গভীর ভাবনায় তলিয়ে গিয়ে পাহারা দেবার কর্তব্যের কথা ভুলে যায়। ব্যস, আচমকা পিছন দিক থেকে কাঁধে হাতের ছোঁয়া পাওয়া মাত্র ভূত দেখার মতো ভড়কে গিয়ে সে তোৎলাতে তোৎলাতে বলে উঠল—'কে? কে? কে তুমি?'

জন কর্ট সরবে হেসে বলল, 'এবার তুমি ঘুমোও গে ম্যাক্স। এবার আমার পালা, জেগে পাহারা দেব।'

সকাল হল। ১১ মার্চের সকাল। অভিযাত্রীরা ঝলসানো হরিণের মাংস দিয়ে উদর পূর্তি করে আবার হাঁটতে শুরু করল।

পথ পাড়ি দিতে গিয়ে এখনও কোনো নদী তাদের সামনে পড়ে নি। সূর্যই পথের নিশানা স্থির করার একমাত্র অবলম্বন। চারজন দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছে। গাছের ডালে বিচিত্র রঙ ও ঢঙের বহু বানর চোখে পড়ল। তাদের কারোর গায়ের রঙ আরবদের মতো হলুদ, কারোর বা রেড ইন্ডিয়ানদের মতো লালচে আবার কারোর গায়ের রঙ আফ্রিকানদের মতো কুচকুচে কালো।

রাত্রি গভীর হলে জলহস্তীর ডাকাডাকি কানে এল। তবে কি ধারে-কাছে নদী বা অন্য কোনো বড়সড় জলাশয় রয়েছে? ক'দিন বৃষ্টির নামগন্ধও নেই। পাথরের গর্তে বা গাছের কোটরে জমে থাকা জল দিয়ে কোনোরকমে তৃষ্ণা নিবারণ করা হচ্ছে। তবে আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে সমস্যারই সম্মুখীন হতে হচ্ছে না।

অভিযাত্রীরা হঠাৎ দুটো গণ্ডারের খপ্পড়ে পড়ল। সামনেই পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটা বাওবাব গাছে চড়ে যাওয়া সম্ভব হল। মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু পরমপিতা সহায় বলে কোনোরকমে তাদের প্রাণ বাঁচল। আচমকা ক্রোধোন্মত্ত গণ্ডারের খাড়া খড়্গ বাওবাব গাছের গুঁড়িতে গেঁথে গেল। তীব্র আক্রোশে ঠেলাধাক্কা করতে করতে খড়্গ আরও বেশি করে গুঁড়িতে ঢুকে গেল।

ঘামিশ-এর পরামর্শে অভিযাত্রী চারজন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। এক নাগাড়ে দীর্ঘ সময় ধরে ছুটে তারা একটা নদীর কিনারায় হাজির হল। নদীটা বেশ চওড়া। স্রোতও যথেষ্টই দেখা যাচ্ছে। অভিযাত্রীরা ভাবল, বড়সড় একটা ভেলা তৈরি করে নিতে পারলেই

www.pathagar.com

কাজ হাসিল করে ফেলা যাবে। অনায়াসেই তারা উবাঙ্গীতে পৌঁছে যেতে পারবে। জলহস্তী আর কুমীরের উপদ্রব থাকতেই পারে। আফ্রিকার সব নদীনালায় তাদের দৌরাত্ম খুবই বেশি। জলপথে যাতায়াত করা সম্ভব না?

সন্ধ্যার অন্ধকার একটু একটু করে নামতে শুরু করেছে। ঘামিশ খোঁজাখুজি করে রাত্রি কাটানোর উপযোগী একটা গুহা বের করে ফেলল।

সামান্য কিছু খাবারে উদরকে কোনোরকমে বুঝ দিয়ে গুহাটার ভেতরে অভিযাত্রী চারজনই শুয়ে পড়ল। জন বন্দুক কাঁধে একা রাত্রি জেগে পাহারা দিতে লাগল।

রাত্রি ক্রমে গভীর হল। অত্যাশ্চর্য এক কণ্ঠস্বর জন-এর কানে এল। কে যেন 'অ্যাংগোরা—অ্যাংগোরা' বলে সম্বোধন করে কাকে ডাকছে। প্রথমে ভাবল, এটা নির্ঘাৎ দুর্বল মনের ব্যাপার-স্যাপার ছাড়া কিছু নয়। উৎকর্ণ হয়ে কয়েক মুহূর্ত শুনে নিঃসন্দেহ হল। হ্যাঁ, কোনো শিশুর কণ্ঠস্বর। এখানকার জঙ্গলিরা মাকে 'অ্যাংগোরা' বলে সম্বোধন করে। কোনো শিশু যেন আকুল হয়ে তার মা-কে ডাকাডাকি করছে। কিন্তু যে জঙ্গলে কোনোদিন মানুষের পায়ের ছাপ পড়ে নি সেখানে কে এমন আকুল হয়ে অ্যাংগোরা অর্থাৎ মা-কে ডাকবে?

সকাল হল। অভিযাত্রীরা ভাবল, গুহাটায় বেশ নিশ্চিন্তেই ভেলা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ক'দিন কাটিয়ে দেওয়া যাবে। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই জন কর্ট একা কিছুটা পথ হাঁটাহাঁটি করে দেখে এল। না, গত রাত্রে যে 'অ্যাংগোরা' অর্থাৎ মা মা বলে ডাকাডাকি করেছিল তার দেখা পেল না। ভাবল, তবে নির্ঘাৎ মনের ভুল। এবার আরও কিছুটা এগিয়ে নদীটাকে ভালভাবে দেখে নিতে লাগল।

খাবার ফুরিয়ে গেছে। ম্যাক্স বন্দুক-কাঁধে লাঙ্গাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ল শিকারের খোঁজে। জন কর্ট ও ঘামিশ ভেলা তৈরির উপকরণ খুঁজতে লাগল। কিছু শুকনো ডালপালা হলেই নৌকো তৈরির কাজে লেগে যেতে পারবে। একটা কুড় ল আর বড়সড় কয়েকটা ছুরি সম্বল। কুড় ল দিয়ে মোটামোটা গুঁড়ি কাটা সম্ভব হলেও চেড়াইয়ের সমস্যা মিটবে কি দিয়ে? তবে ভেলা একটা তৈরি করতে পারলে অনায়াসে আড়াই মাইল পথ পাড়ি দিয়ে উবাঙ্গীতে পৌঁছে যাওয়া কোনো সমস্যাই নয়। তারা যখন শুকনো কাঠ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ঠিক তখনই দুম করে বন্দুক গর্জে উঠল। ম্যাক্স-এর কাজ। নির্ঘাৎ শিকার পেয়েছে। বন্দুকের গুলির আওয়াজটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই হঠাৎ বাতাসবাহিত চেঁচামেচির শব্দ তাদের কানে এল। ম্যাক্স আর লাঙ্গার কণ্ঠস্বর। তবে এটুকু বুঝল, কণ্ঠস্বর অবশ্যই ভয়ার্ত নয়। হঠাৎ কোনো কিছু দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলে কণ্ঠস্বর ঠিক যেমনটি হয় এ যেন ঠিক সেরকমই।

জন কর্ট আর ঘামিশ কণ্ঠস্বরটা অনুসরণ করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে তাদের কাছে যেতেই ম্যাক্স সোল্লাসে বলে উঠল, 'তোমাদের আর অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে ভেলা তৈরি করতে হবে না। ভেলা পেয়েছি।'

জন কর্ট সচকিত হয়ে নজর ফেরাতেই জলে বেশ বড়সড় একটা ভেলা দেখতে পেল।সচকিত হয়ে সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ম্যাক্স-এর মুখের দিকে তাকাল। তারা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিঃসন্দেহ হল, কেউ না কেউ এ জঙ্গলে এসেছিল। তারা ব্যস্ত-পায়ে এগিয়ে গিয়ে দেখল, একটা খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা ভাঙাচোরা একটা ভেলা। দড়ির অবস্থাও সঙ্গীন। কাঠগুলো পচে গেছে। জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে।

নিগ্রো বালক লাঙ্গা আনন্দে নাচতে নাচতে নদীর পাড় বরাবর কিছুটা চলে গিয়েছিল। এক সময় মাটি থেকে একটা তালা কুড়িয়ে নিয়ে গলা ছেড়ে চেঁচাতে লাগল। জং পড়া তালা। কাজের অনুপযুক্ত। ব্যাপারটা অভিযাত্রীদের রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল। অজানা-অচেনা গভীর অরণ্যে ভেলা আর তালা দেখলে তো অবাক হবারই কথা। তাদের মনে প্রশ্ন জাগল—'তবে কি এখানে কোনো সভ্য মানুষের আগমন ঘটেছে?'

অভিযাত্রীরা ভেলাটায় চেপে এবার এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে ধারণা করে নিতে প্রয়াসী হল। কিছুদুর যেতেই ম্যাক্স একটা খাঁচা দেখে চমকে উঠল। ছোটখাটো একটা ঘরের মতো দেখতে খাঁচাটা কাঠের দেওয়াল, সামনের দিকের দেওয়ালে লোহার শিক লাগানো। খাঁচার দরজার গায়েই ঘরের দরজা। ম্যাক্স দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখল, ছোঁড়া ও পোকায় কাটা একটা তেলচিটে পড়া কম্বল, কালিঝুলি মাখা সামান্য কিছু বাসনপত্র, একটা ছেঁড়াফাঁটা কাপড়ের গাট্রি, জংপড়া একটা কুড় ল চশমার খাপ আর কয়েকটা খালি বোতল এখানে-ওখানে পড়ে রয়েছে। আর ঘরের এক ধারে একটা ডালা লাগানো তামার বাক্স। ডালার ফাঁক দিয়ে একটা ছুরির ডগা ঢুকিয়ে জোরে চাপ দিতেই সেটা খুলে গেল। বাক্সের ভেতর থেকে একটা খাতা বের করে সে চোখের সামনে ধরল। খাতাটার মলাটে একটা নাম লেখা 'ড. জোহৌসেন'।

ড. জোহৌসেন-এর নামটা কানে যেতেই জন কর্ট, ম্যাক্স আর ঘামিশ উল্লসিত হল। খুবই পরিচিত এ-নামটা। তাঁর নামটার সঙ্গে একটা ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে।

অধ্যাপক গার্নার ছিলেন একজন আমেরিকান। তাঁর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল, যারা স্তন্যপায়ী তারা অবশ্যই কথা বলতে সক্ষম। এ বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে তিনি ওয়াশিংটন চিড়িয়াখানার বানরের খাঁচার ভেতরে একটা ফোনোগ্রাফ যন্ত্র বসিয়ে রাখেন। এভাবে তিনি বানরের কথা রেকর্ড করেন।

দীর্ঘ গবেষণায় লিপ্ত থেকে তিনি সিদ্ধান্তে পৌছান, বানর ও কুকুরের স্বরযন্ত্র প্রায় মানুষের স্বরযন্ত্রের মতোই। মানুষই ভাবনাচিন্তা করতে পারে বলে অনর্গল কথা বলতে সক্ষম। কিন্তু জন্তু-জানোয়ারদের ভাবনা চিন্তার ক্ষমতা নেই বলে তারা বাক্যালাপে অক্ষম। মনের ভাবনা-চিন্তাই তো কথা বলার প্রেরণা যোগায়। ভাবনার প্রকাশ করার তাগিদেই মানুষ ভাষার সৃষ্টি করতে উৎসাহী হয়েছিল। জন্তু-জানোয়ারদের সৃষ্টিকর্তা চিন্তাশক্তি দান করেন নি। কাকাতুয়ার পক্ষে নিজের ইচ্ছামত মনের ভাব ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। শেখানো বুলিই সে কেবল বলে থাকে।

অধ্যাপক গার্নার ভাবলেন, আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে গিয়ে বানরের কাছাকাছি বাস করবেন। শিম্পাঞ্জি আর গরিলার কথাবার্তা লিখে নেবেন। তারপর আমেরিকায় ফিরে 'বানরভাষা'-র একটা অভিধান আর ব্যাকরণ লিখে প্রকাশ করবেন।

অধ্যাপক গার্নার আঠারো শ' বিরানব্বইয়ে আমেরিকা থেকে কঙ্গোতে হাজির হলেন। সেখান থেকে লিভারপুলের কারখানা-বাড়ি হয়ে, জাহাজে চেপে হাজির হলেন বনের ভেতরের ক্যাথেলিক মাঠে। সঙ্গে করে একটা বড়সড় লোহার খাঁচা নিয়ে আসেন। খাঁচাটার ভেতরে কয়েক রাত্রি বাস করেই পালিয়ে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইয়া বড় বড় মশার সঙ্গে সমঝোতা করা কিছুতেই সম্ভব হল না। ব্যস, বানরভাষার অভিধান লেখার কাজ শিকেয় উঠল। তবে যে কয়দিন তিনি সেখানে ছিলেন তাতেই বানরদের ব্যবহৃত কয়েকটা শব্দ জানতে পেরেছিলেন। শব্দ বলা ঠিক হবে না, হরেকরকম উচ্চারণ

www.pathagar.com

বলাই সঙ্গত। মানুষের পূর্বপুরুষরা নাকি এভাবেই মনের ভাব প্রকাশ করত। ব্যস, এখানেই তাঁর গবেষণার ইতি হল, অসম্পূর্ণ রইল।

আবার ড. জোহৌসেন উৎসাহী হলেন। কাজে লিপ্ত হলেন। বৈজ্ঞানিক, জীব বিজ্ঞানী, ফরাসি ও ইংরেজি ভাষাতেও মাতৃভাষার মতো চোস্ত। টাকার কুমীর, অকৃতদার। তার অর্থ ভোগ-বিলাসের মাধ্যমে ব্যয় করার মতো বলতে কেউ-ই নেই। আত্মীয় পরিজনও কেউ নেই। কেবলমাত্র একটা নিগ্রো-যুবক সর্বদা তাঁর কাছে কাছে থাকে।

জার্মান থেকে একটা পোক্ত খাঁ তৈরি করিয়ে বহু হাঙ্গামা সহ্য করে সেখানাকে উবাঙ্গীর পড়ে এনে হাজির করলেন। স্থানীয় লোকজনকে নিয়ে একটা ভেলা তৈরি করে একমাত্র সঙ্গীকে নিয়ে নদী বেয়ে চলতে লাগলেন। ব্যস, তারপরই একেবারে বে-পাত্তা। তাঁর হদিস কারোরই জানা নেই। তাঁরই নামটা খাতার মলাটের গায়ে-জন কর্ট, ম্যাকস ও ঘামিশ যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। তারা ড. জোহৌসেন-এর কথা এ পর্যন্তই জানে। তারপর এখানে তাঁর হদিশ মিলল। জানা গেছে। তিনি এখানে খাঁচাটা বসিয়ে বানরদের ভাষা কিছু রপ্ত করার চেষ্টা করেন। আর এ-ও জানা গেছে ড. জোহৌসেন-এর মাথার কলকজা নাকি একটু ঢিলে। তা হোক গে, খাঁচাটা ফেলে পালিয়ে যাওয়ার মতো পাগল অবশ্যই তিনি নন।

ড. জোহৌসেন-এর দিনলিপির সামনের দিককার কয়েকটা পাতায় লেখাঝোকা রয়েছে বটে। অবশিষ্ট পাতাগুলো একেবারে সাদা।

আঠারো শ' ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দের উনত্রিশে জুলাই থেকে দিনলিপিটা লেখা আরম্ভ করেছেন, শেষ করেছেন পঁচিশে আগস্ট। ভেলা তৈরি, জলে ভাসানো, সাতদিন চলার পর পছন্দ মাফিক জায়গায় ভেলা বাঁধা, শিম্পাঞ্জি, গরিলা আর বানরের মেলা। নদীর জলে মাছের প্রাচুর্য। খাবারও প্রচুর। অসভ্য জঙ্গলিরা মোটেই নেই। পঁচিশে আগস্টে লেখা হয়েছে জলহস্তী ও প্রচুর বানর, তাদের নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করতে দেখা গেল। তারা যেন সত্যই কথা বলতে সক্ষম। অ্যাংগোরা শব্দটার অর্থ পরিষ্কার বোঝা গেল। মা-কে এদের ভাষায় 'অ্যাংগোরা' বলে।

'অ্যাংগোরা' শব্দটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই জন সচকিত হয়ে ভাবতে লাগল, গতরাত্রে সে তো অ্যাংগোরা শব্দটাই স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল।

খাঁচাটার ধারে-কাছে তন্নতন্ন করে ডা. জোহৌসেন-এর কঙ্কাল বা হাড়গোড় খোঁজাখুঁজি করা হল। বৃথা চেষ্টা হাড়ের একটা টুকরোও পাওয়া গেল না।

খাঁচাটার ভেতরে, মাটির তলা থেকে একটা টিনের বাক্স উদ্ধার করা হল। সবাই আশান্বিত, ড. জোহৌসেন-এর রহস্য হারিয়ে যাওয়ায় তা অবশ্যই টিনের বাক্সবন্দি করে রাখা হয়েছে। ঘামিশ তড়িঘড়ি বাক্সটা ভাঙতেই ভেতর থেকে এক শ'টা বন্দুকের গুলি বেরিয়ে এল। এটা অভিযাত্রীদের কাছে কম লাভের ব্যাপার নয়। তাদের মজুদ গুলি বারুদ আজ না হোক কাল ফুরোবেই। তখন এগুলো অশেষ উপকারে লাগবে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত সবাই মিলে হাত চালিয়ে কাজ করে কোনোরকমে ভাঙাচোরা ভেলাটাকে সারাই করে ব্যবহারোপযোগী করে তুলল।

সদ্য প্রাপ্ত সসপ্যানে করে মাংস সিদ্ধ করা হল। এতদিনঝলসানো মাংসে উদরপূর্তি করে করে অভিযাত্রীদের অভক্তি জন্মে গেছে। আজ সিদ্ধ মাংসে জিভটাকে একটু পাল্টে

www.pathagar.com

নেওয়া গেল।মহানন্দে ভোজ সেরে তারা ড. জোহৌসেন-এর নামটাকে অমর করে রাখার উদ্দেশ্যে নদীটার নামকরণ করল 'রিও জোহৌসেন'।

পরের দিন ভোর হতে না হতেই অভিযাত্রীরা সদ্য মেরামত করা ভেলাটার ওপর সসপ্যান, গুলি বারুদের বাক্স, বন্দুক, কাপ, মগ ও অন্যান্য খুটিনাটি কিছু জিনিস তুলে নিয়ে রিও জোহৌসেন নদীপথ ধরে চলতে আরম্ভ করল। ভেলার গতিবেগ ঘণ্টায় আধ মাইল। এভাবে চলতে পারলে কুড়ি থেকে ত্রিশ দিনে দু-শ' পঞ্চাশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে দেওয়া যাবে। নদীর দু-ধারে বন। শিকারের অভাব নেই। নদীতে মাছও আছে প্রচুর।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই ভেলা থামানো হল। রান্নাবান্না শুরু করল। নৈশভোজ সেরে ঘুমিয়ে ক্লান্তি অপনোদনে মগ্ন হল তারা। একজন করে পালা করে প্রহরায় নিযুক্ত রইল।

ভোর হতেই অভিযাত্রীরা আবার ভেলার বাঁধন খুলে নতুন করে যাত্রা শুরু করল। কিছু দূর এগোতেই নদীটাকে ক্রমে সরু হয়ে যেতে দেখা গেল। তবে নদীর দু-ধারের দৃশ্য ধরতে গেলে অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। এখানকার বনভূমির গাছগাছালি অপেক্ষাকৃত লম্বা, ঝাঁকড়াও বটে। ডালগুলো নদীর ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। বানরের সংখ্যাই যে এখানে বেড়েছে তা-ই নয়, তাদের আকৃতি-প্রকৃতিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র্য ধরণের। বানর ছাড়া প্রচুর সংখ্যক গরিলা, শিম্পাঞ্জি, গিবন ও বেবুন প্রভৃতি জানোয়ারও দলবেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখা গেল। মধ্য আফ্রিকা ছাড়া এত বানর অন্য কোথাও বাস করে বলে জানা নেই।

বানরগুলোর চিৎকার চেঁচামেচি আর দাপাদাপি দেখে ঘামিশ আতঙ্কিত হয়ে সবাইকে সতর্ক করে দিল। অভিযাত্রীদের কোনোরকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ না দিয়েই হতচ্ছাড়া বানরগুলো আচমকা তীব্র আক্রমণ শুরু করল। হাতের কাছে যা পেল তা-ই দেয় ভেলাটা লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল পাথর, মাটির ঢেলা আর গাছের ফল। অনবরত ভেলাটার ওপর ছুঁড়ে মেরে তারা অভিযাত্রীদের একেবারে নাজেহাল করে দিতে লাগল।

উপায়ন্তর না দেখে ম্যাক্স এলোপাথারি গুলি চালাতে লাগল। গুলিবিদ্ধ হয়ে একটা রক্তাপ্লুত বানর বিকট স্বরে আর্তনাদ করতে করতে গাছ থেকে দড়াম করে আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, গুলির তুলনায় বানরের সংখ্যা অনেক, অনেক বেশি। এক সময় গুলি শেষ হয়ে যাবে, বানর কিন্তু খতম হবেনা।

নদী এখানে চওড়ায় অনেক কম। গাছগুলো যেন দু'দিক থেকে হুমড়ি খেয়ে নদীর ওপর পড়েছে। ব্যাপারটা নজরে পড়তেই গায়ের রোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল। দেখা গেল, ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে তিনটা যমরাজের দূত ইয়া তাগড়াই তিনটা শিম্পাঞ্জি ভেলাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ওৎপেতে রয়েছে।

ব্যস, আর একমুহূর্তও দেরি নয়। তিনটা বন্দুক থেকে তিন-তিনটা উত্তপ্ত সীসার গুলি বেরিয়ে তিনটা গরিলাকেই কুপোকাৎ করল। বিকট আর্তনাদ করে ছিটকে গিয়ে পড়ল নদীর জলে। বার কয়েক আছাড়ি পিছাড়ি করতে করতে জল তোলপাড় করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সব খতম হয়ে গেল। ব্যাপার দেখে আরও গোটা কুড়ি গরিলা তর্জন গর্জন করতে করতে গাছের ডাল বেয়ে তেড়ে এলো প্রায় মাটির কাছাকাছি। তাদের লড়াকু ভাব দেখে অভিযাত্রীদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসার জোগাড় হল।

www.pathagar.com

আবার তিনটে বন্দুক বার বার গর্জে উঠতে লাগল। গুলিবিদ্ধ হয়ে রক্তাপ্লুত অবস্থায় কয়েকটা লাশ জলে আছাড় খেয়ে পড়ল। বাকিরা পড়ি কি মরি করে জান নিয়ে পালাল।

এদিকে বিপদ নতুনতর রূপ নিয়ে দেখা দিল। নদীর জল ঘূর্ণিপাকের মতো বার বার চক্কর খাচ্ছে। এর মধ্যে ভেলাটা পড়লে আর দেখতে হবে না। মুহূর্তের মধ্যে গোত্তা খেয়ে অতলে তলিয়ে যাবে লোকজন আর জিনিসপত্র নিয়ে। অভিযাত্রীদের মাথায় বজ্রাঘাত হবার জোগাড়। জলে আপদ ঘূর্ণিপাক আর বনে হতচ্ছাড়া বানরের উৎপাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলল। ঘামিশ অভিজ্ঞ হাতে লগি দিয়ে ঠেলে ধাক্কে ভেলাটাকে ঘূর্ণিপাক থেকে দূরে রাখার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়ে যেতে লাগল।

অকস্মাৎ আকাশ থেকে মেঘের গুরগুর শব্দ ভেসে আসতে লাগল। মেঘের ডাক কানে যাওয়া মাত্র বন্য জন্তু-জানোয়াররা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে হন্যে হয়ে ছুটে যায়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নদীর পাড়ের গাছগুলি ফাঁকা হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ভেলাটা ঘূর্ণিপাকের এলাকা ছাড়িয়ে দূরে সরে গেছে, জন্তু-জানোয়ারের উৎপাতও কমে গেছে। অভিযাত্রীরা এবার নিশ্চিন্তে ভেলাটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

রাত্রি তিনটার কাছাকাছি ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব কমল। এবার অভিযাত্রীরা ভেলাটাকে তীরে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে বাকি রাত্রিটুকু কাটাল।

ভোর হল। এখন আর বানরদের চিহ্নও নজরে পড়ল না। বাঁধন খুলে অভিযাত্রীরা আবার যাত্রা শুরু করল। মাংস ফুরিয়ে যাওয়ায় হরিণ শিকার করা হল। অভিযান যতই বিপদ সঙ্কুল হোক না কেন পেটে তো কিছু দিতে হবেই।

এ আবার কোন উৎপাত রে বাবা! হঠাৎ দেখা গেল, নদীর জলকণা শূন্যে উঠে হাওয়ার টানে উড়ে যাচ্ছে। অভিযাত্রীরা আবার ঘূর্ণির চক্করে পড়েছে ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। ঘামিশ বলল, এটা ঘূর্ণির ব্যাপার অবশ্যই নয়। চোখের পলকে দশফুট উঁচুতে দুটো জলের ফোয়ারাকে উঠে যেতে দেখে তারা এবার ধরে নিল এটা নির্ঘাৎ তিমির কাণ্ড। কিন্তু আফ্রিকার নদীতে তিমি ? এ যে নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার! পর মুহূর্তেই তাদের ভুল ভেঙে গেল। জলভেদ করে ইয়া পেল্লাই হাঁ করা একটা মুখ, মূলোর মতো দাঁতের সারি, জলের ওপরে ভেসে উঠল।

জলের আতঙ্ক এবার অভিযাত্রীদের মনে নতুন করে আতঙ্কের সঞ্চার করল। তারা নিরীহ-নম্র সন্দেহ নেই, কিন্তু চটে গেলে জান খতম করে ছাড়ে।

ঘামিশ-এর পরামর্শে সবাই ভেলার ওপর এমনভাবে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল যাতে জলহস্তীরা তাদের মোটেই দেখতে না পায়। এছাড়া তো উপায়ও কিছু নেই। বন্দুক নিয়ে কেরামতি দেখাতে গেলে অবশ্যম্ভাবী সলিল সমাধি।

জলহস্তীরা খেলায় মেতেই রইল। ভেলা বা অভিযাত্রীদের দিকে তাদের সামান্যতম খেয়ালও নেই।

সন্ধ্যা সাতটা। অভিযাত্রীরা গাছের সঙ্গে ভেলা বেঁধে শোবার বন্দোবস্ত করতে লাগল। এমন সময় এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড তাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল। গত দিনের ঝড়ে ভেঙেপড়া একটা ডাল স্রোতের টানে এগিয়ে চলেছে। তারই ডালপালার ফাঁক থেকে কার যেন আর্তস্বর ভেসে আসতে লাগল। ঠিক যেন মানব শিশুর কান্না। পরমুহূর্তেই ছোট্ট একটা প্রাণী গাছের ডালটা থেকে লাফিয়ে ঝপ্ করে জলে পড়ল।

www.pathagar.com

লাফিয়ে ডাঙায় পড়ার চেষ্টাই সে করেছিল, পারে নি। সে ডুবছে—ভাসছে। আবার ডুবছে—ভাসছে।

নিগ্রো বালক লাঙ্গা চেঁচিয়ে উঠল—'ছেলে! একটা ছেলে! ডুবে যাচ্ছে!'

ছেলে? আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে ছেলে? এখানে ছেলে আসবে কোত্থেকে? অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা নিয়ে অভিযাত্রীরা রীতিমতো বিস্মিত হল। ইতিমধ্যে লাঙ্গা ঝপ্ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে এল। আলোর সামনে ধরতেই দেখা গেল, মানুষের নয়, বানরের বাচ্চা একটা।

লাঙ্গা কিছুতেই সেটাকে কোল থেকে নামাল না। রাত্রি এগারোটা নাগাদ বানরের বাচ্চাটা অস্ফুট স্বরে বলে উঠল—'অ্যাংগোরা! অ্যাংগোরা!' বুঝা গেল বানরের বাচ্চাটা আকুল হয়ে তার মাকে খুঁজছে।

লাঙ্গা ব্যাপারটা কারো কাছেই ফাঁস করল না। এমনও হতে পারে, সে ভুল শুনছে বা ভুল বুঝছে। বানরের পক্ষে কথা বলা বাস্তবিকই সম্ভব কিনা নিশ্চিত না হয়ে কারো কাছে মুখ না খোলাই সঙ্গত।

পরের দিন ভোর হতেই ভেলার বাঁধন খুলে অভিযাত্রীরা আবার যাত্রা শুরু করল। লাঙ্গা জ্বরে বিভোর বানরের বাচ্চাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে এক ধারে চুপটি করে বসে থাকল। জলে ঘাস চুবিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল মাঝে মাঝে তার মুখে দিতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেবাযত্ন করার পর বানরের বাচ্চাটা একটু সুস্থ হল। এবার সে আবার একই স্বরে 'অ্যাংগোরা—অ্যাংগোরা' বলে ডাকাডাকি জুড়ে দিল। না, লাঙ্গার এবার আর শুনতে বা বুঝতে ভুল হল না। বানরের বাচ্চাটা সত্য সত্যই কথা বলছে।

ম্যাক্স একটু পরে বানরের বাচ্চাটার খবর জানতে চাইলে লাঙ্গা বলল—'কাল রাত্রি থেকে এ আকুল হয়ে মাকে ডাকডাকি করছে।'

ম্যাক্স তার দিকে সবিস্ময়ে তাকাল।

লাঙ্গা এবার বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল—'হ্যাঁ, 'অ্যাংগোরা—অ্যাংগোরা' বলে ডাকাডাকি করছে।

'অ্যাংগোরা শব্দটা কানে যেতেই জন সচকিত হয়ে সোজা হয়ে বসে পড়ল। এ শব্দটা তার পূর্ব পরিচিত। ব্যাপারটা জন আর ম্যাক্স-এর মধ্যে কৌতূহলের উদ্রেক করল। তারা উভয়েই অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে বানরের বাচ্চাটাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। সেটাকে এক পলকে দেখেই তারা চমকে উঠল। এক কোন জাতের বানর রে বাবা! কানের লতি দুটো মনে হল রীতিমতো মাংসল, তুলতুলে। নাকটাও মানুষের নাকের মতোই। মাথায় কাফ্রিদের চুলের মতো কোঁকড়ানো এক রাশ চুল। মুখ মসৃণ। লোমের লেশমাত্রও নেই। উরু আর বুকের লোমের সমারোহ। পায়ের পাতা দুটোও বানরের পায়ের পাতার সঙ্গে সাদৃশ্য নেই, বরং মানুষের পায়ের মতোই দেখতে। পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে হাঁটাচলা করে। আর বয়স বেশি হলেও পাঁচ-ছয় বছর। দেহের আদল কিছুমাত্রও বানরের মতো নয়। কিন্তু চোখ দুটো বন্ধ বলে চোখের তারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ আদৌ আছে কিনা বুঝা গেল না। আর বুঝা গেল না সে মানুষের মতো ভাবনা চিন্তার ক্ষমতার অধিকারী কিনা। তার গলায় সূতোদিয়ে বাঁধা একটা নিকেল করা পদকের মতো বস্তু দেখে জন আরও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। পদকের গায়ে ড. জোহৌসেন-এর নাম লেখা।

www.pathagar.com

জন যখন পদকের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা চিন্তায় মগ্ন ঠিক তখনই বানরের বাচ্চাটা আবার 'অ্যাংগোরা—অ্যাংগোরা' বলে গুঙিয়ে উঠল।

জন আর ম্যাক্স রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেল। কাজটা কে করেছে? ড. জোহৌসেন, নাকি কথা-বলা বানরের দ্বারাই কাজটা ঘটেছে? পরিত্যক্ত খাঁচাটা থেকে জোহৌসেন-এর পদকটা লুট করা সহজ বটে। কিন্তু সেটাকেসূতো দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া?

হঠাৎ দুর্বার বেগে জল ছুটে আসার আওয়াজ শোনা গেল। অতর্কিতে ভেলাটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে পাথরে সজোরে আছাড় মারল। চোখের পলকে ভেলাটা জলের তোড়ে ভেসে গেল। পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে ঘামিশ বন্দুক আর গোলা বারুদের বাক্সটা কোনোক্রমে রক্ষা করে পাথরের ওপর ছুড়ে মারল। ব্যস, অভিযাত্রীদের নিয়েই নৌকাটা তরতর করে এগিয়ে চলল। লাঙ্গা কিন্তু বানরের বাচ্চাটাকে বুক থেকে এক চুলও সরতে দিল না।

জমাটবাঁধা অন্ধকারে ঘাসের বিছানার ওপর টান টান হয়ে পড়ে রয়েছে ম্যাক্স, জন আর ঘামিশ। প্রায় সংজ্ঞাহীন। গতদিনে তারা একটা মোষ মেরেছিল গুলি করে। তারই কিছু মাংস তাদের শিয়রে, ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে। বন্দুক, গোলা বারুদের বাক্স বা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই নেই। লাঙ্গা বা তার বানরের বাচ্চাটা কেউ-ই নেই। লাঙ্গা কি জলে ডুবেই গেল? তাই যদি হয় তবে এরা তিনজন কি করে প্রাণে বাঁচল? সামনে-পিছনে চারদিকে জমাটবাঁধা অন্ধকার। এখন কি সত্যই রাত্রি? দিন বা রাত্রি যা-ই হোক না কেন বনের ভেতরে এমন সূচিভেদ্য অন্ধকারই বা কি করে সম্ভব?

জন সবার আগে চোখ মেলে তাকাল। দেখল, আগুন নিভে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে তাতে শুকনো ঘাস-পাতা ফেলে আগুনটাকে জিঁইয়ে রাখার ব্যবস্থা করল। ডালপালা পোড়ার পটপট আওয়াজে ঘুম ভেঙে যাওয়া দু-জনও ব্যস্ত হয়ে উঠে বসল। জ্বলন্ত আগুনের আলোয় দেখতে পেল মাথার ওপরে প্রায় দেড়শ ফুট উঁচু ছাদ। গাছের ওপরের ডালপালা গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে। ব্যাপার দেখে তারা তিনজনই রীতিমতো স্তম্ভিত। একে অন্যের মুখের দিকে নীরবে বিস্ময় মাখানো জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। সবার মনেই একই জিজ্ঞাসা, এ আবার কোন রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়া গেল রে বাবা! এরা যে কতক্ষণ, কতদিন ঘুমিয়েছে বুঝতে পারছে না। ভেলাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে। লাঙ্গা? লাঙ্গা কি তবে বানরের বাচ্চাটাকে নিয়ে জলেই তলিয়ে গেল ? তবে তাদেরই বা জল থেকে উদ্ধার করে কে এখানে ফেলে গেছে?

জন কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে বলল—'আমি জলে একেবারে তলিয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে দশ-বারোটা ছায়ামূর্তিকে নদীর পাড়ে দেখতে পেয়েছিলাম। হাত নেড়ে নেড়ে কি সব বলাবলি করতে করতে তিন-চারজন ঝপ্ করে জলে পড়ে গেল। ব্যস, তারপরের ঘটনা কিছু আমি আর বলতে পারব না।'

ম্যাক্স তার কথা সমর্থন করে বলল, সেও নাকি কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেয়েছিল। তারা জল থেকে উদ্ধার করে নদী থেকে কতদূরে যে এদের এনে ফেলে রেখেছে তাই বা কে জানে? আগুন জ্বেলে হাত-পায়ে সেঁক দিয়ে সুস্থ করে তুলেছে। ক্ষিদে নিবৃত্ত করার জন্য ঘাসের ওপর মোষের মাংস রেখে গেছে। উপকারের বিনিময়ে প্রত্যুপকার চায় না বলেই তারা সে জায়গা ছেড়ে নিজেদের কাজে চলে গেছে। এবার

www.pathagar.com

তারা ভাগাভাগি করে কিছু মাংস খেয়ে পেটের জ্বালা নেভাল। বন্দুক সঙ্গে নেই। কেবলমাত্র কুড় ল আর ছুরি তেমনি কোমরেই বাঁধা রয়েছে। বুনো জন্তু-জানোয়ারের মাংস জোগাড় করা সম্ভব নয়। ফলমূলই একমাত্র সম্বল। কিন্তু জল? নদী বা ঝর্ণা ছাড়া জল পাওয়া সম্ভব নয়। নদী যে কতদূরে এবং কোনদিকে কিছুই তাদের জানা নেই।

ঘামিশ ইতিমধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ধার-কাছ দিয়ে এক চক্কর মেরে এসেছে। আবছা আলোয় এক-পেয়ে রাস্তা একটা আবিষ্কার করতে পেরেছে। জন আর ম্যাক্স-এর কাছে ব্যাপারটা বলল। তারা হাত-পা গুটিয়ে এখানে পড়ে না থেকে এক পেয়ে পথটা ধরে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। এমন সময় হঠাৎ দূরবর্তী একটা আলোর দিকে তাদের নজর পড়ল। চমকে উঠে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, ঐটা কি সত্যি-কারের আগুন? অসভ্য হিংস্র জঙ্গলিদের আলো, নাকি আলেয়ার আলো তাদের বিভ্রান্তিতে ফেলেছে?

শেষপর্যন্ত অকুতোভয় ঘামিশ সাহস দেওয়ায় জন ও ম্যাক্স এগিয়ে চলতে লাগল। আশ্চর্য ব্যাপার তো! তাদের সঙ্গে সঙ্গে আলোটাও সচল হয়ে উঠল। একই দূরত্ব বজায় রেখে সেটাও এগিয়ে চলতে লাগল। তারা থামলে আলোটাও থেমে যায়। আবার তারা এগোতে আরম্ভ করলে আলোটাও সচল হয়ে পড়ে।

অভিযাত্রীদের কাছে ব্যাপারটাকে এমন মনে হল,অজ্ঞাত আলোটা যেন পথপ্রদর্শকের মতো আগে আগে চলে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। জন জোর করে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—'ব্যাপারটা মন্দ নয়। জঙ্গলিদের বা আলেয়ার আলো যা-ই হোক না কেন এমনও তো হতে পারে আলোটা পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো আমাদের পথ দেখিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিচ্ছে।

রাত্রির অন্ধকার নেমে আসতেই রহস্য সৃষ্টিকারী আলোটা হঠাৎ নিভে গেল। অভিযাত্রীরা ভাবল, আলোটা তাদের বিশ্রাম করে নেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। ক্লান্ত-অবসন্ন দেহ। গাছের তলায়, শুকনো পাতার বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সবাই।

যখন ঘুম ভাঙল তখন জঙ্গলের জমাটবাঁধা অন্ধকার কেটে গিয়ে অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। জন কর্ট সবার আগে হুড়মুড় করে উঠে দেখল, ম্যাক্স আর ঘামিশ নাক ডাকিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আচমকা তাদের শিয়রের দিকে চোখ যেতেই তার নজরে পড়ল, কিছু হরিণের মাংস আর এক পাত্র জল কে যেন রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি রেখে গেছে। তার বুঝতে দেরি হল না, এ নির্ঘাৎ হিতাকাঙ্খী মশালবাহীরই কাজ। সে ব্যস্ত হয়ে ঠেলেধাক্কে ম্যাক্স আর ঘামিশকে তুলল। তারাও হরিণের মাংস আর জলপূর্ণ পাত্রটা দেখে কম অবাক হল না।

অভিযাত্রীরা ঝলসানো হরিণের মাংস আর জল দিয়ে উদরপূর্তি করে নিল।

আহার সম্পন্ন হতে না হতেই রহস্যজনক আলোটা আবার জ্বলে উঠল। এগিয়ে যেতে গিয়ে অভিযাত্রীদের নির্দেশ করল তাকে অনুসরণ করতে।

তিনদিন পথ পাড়ি দেবার পর অভিযাত্রীরা হিসাব করে দেখল, ইতিমধ্যে তারা রিও জোহৌসেন নদী থেকে তিনদিনে প্রায় মোট চল্লিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে। এতক্ষণ তারা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু যাওয়ার কথা দক্ষিণদিকে। এদিককার গাছগাছালির আগেকার ঠাসা বুনন আর নেই। অনেক হালকা। পাতার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো আকাশ নজরে পড়ছে।

www.pathagar.com

—রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। মশালের আলো এবার অদৃশ্য হয়ে গেল। অভিযাত্রীরা ক্লান্ত-দেহে গাছের তলায় শুতেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই অভিযাত্রীরা অত্যাশ্চর্য, একেবারেই অবিশ্বাস্য এক দৃশ্যের মুখোমুখি হল। ডালে, প্রায় এক শ' ফুট ওপরে একটা মাচা দেখতে পেল। তলা থেকে নিচের মাচা আর লতাপাতা ছাউনির সামান্যমাত্র অংশ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। আর মাচাটার দিক থেকে একটু বাদে বাদে কেমন যেন গম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসছে। ব্যাপারটা অভিযাত্রীদের মধ্যে রহস্যের সঞ্চার করল।

অভিযাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে ভাবতে লাগল, এ কোথায় এলাম রে বাবা! রহস্যজনক আলোটাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। খাবার বা জলও নেই। তবে কি এবার অনাহারে শুকিয়ে মরার পালা? ব্যাপারটা ম্যাক্স-কে খুবই ভাবিয়ে তুলল, হতাশায় ভেঙে পড়ল।

ঘামিশ তাকে অভয় দিতে গিয়ে বলল—'হুজুর,এমন করে ভেঙে পড়বেন না। মশালধারী আমাদের যেখানে নিয়ে আসতে চেয়েছে আমরা ঠিক সে জায়গাটাতেই পৌঁছে গেছি।'

ব্যাপারটা খোলসা হল না। একনাগারে ষাট ঘণ্টা হাঁটিয়ে মশালধারী তাদের কোথায় নিয়ে এসেছে? কেনই বা তাদের এখানে এনেছে?

ভোরের মৃদু আলোয় ছায়ামূর্তির মতো একটা খর্বাকায় প্রাণীকে আচমকা দেখতে পেয়ে ঘামিশ হকচকিয়ে গেল। ছায়ামূর্তিটা এদিকি-ওদিক ছুটোছুটি করছে। তবে কি লাঙ্গা জীবিত? আর তার বুকে জড়িয়ে ধরে রাখা প্রাণী কি সেই বানরের বাচ্চাটা?

ব্যাপারটার দিকে জন-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সে সামান্য এগিয়ে নিঃসন্দেহ হল, লাঙ্গা আর বানরের বাচ্চাটাই বটে। তার মধ্যে একটা মতলব এল। ভেলায় থাকাকালে বানরের বাচ্চাটার গলায় সূতোবাঁধা পদকটা দেখেই টুক করে সেটাকে কেটে নিজের কোটের পকেটে চালান দিয়ে দিয়েছিল। সেটাকে বের করে আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সূতো ধরে দোলাতে লাগল। সেটার দিকে নজর পরতেই ঠিক যেন মানুষের বাচ্চার মতো বানরের বাচ্চাটা দৌড়ে তার কাছে চলে এল।

জন খপ করে তার হাত চেপে ধরতেই আর্তনাদ করে উঠল—'লি-মাঙ্গ! লি-মাঙ্গ! অ্যাংগোরা! অথ্যাগোরা!'

জন শব্দগুলোর অর্থ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে থাকলে চোখের পলকে আরও কয়েকটা অস্থিরচিত্ত বানর ছুটে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের আকৃতি একই রকম হলেও অনেক বড়। মুহূর্তে অভিযাত্রীদের জাপ্টে ধরে ঠেলে ধাক্কিয়ে টেনে হিঁচড়ে সামনের দিকে নিয়ে চলল। এবার এমন এক জায়গায় তাদের নিয়ে গেল যেখানে গাছের ডালগুলো হাত খানেক ব্যবধানে সিঁড়ির ধাপের মতো ওপরের দিকে উঠে গেছে। বানরগুলো অভিযাত্রীদের নিয়ে প্রাকৃতিক সিঁড়ির ধাপগুলো অতিক্রম করে করে প্রায় এক শ' ফুট ওপরে উঠে গেল। সেখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ডালপালা দিয়ে প্রায় সমতল ক্ষেত্র গড়ে তোলা হয়েছে। আর প্রায় একই আয়তন ও আকৃতি বিশিষ্ট পাশাপাশি অনেকগুলো ঝুপড়ি ঘর তৈরি করে ছোটখাটো একটা পাড়া গড়ে তোলা হয়েছে। অনেকগুলো বানর সেখানে ঘোরাফেরা করছে। অবিকল মানুষের মতো তাদের হাঁটার ধরণ, বানরের মতো মোটেই নয়। ড. ইউবিন ডুবয় জাভার গভীর অরণ্যে 'পিথিকানথ্রোপাস'-কে দেখে তার নামকরণ করেছিলেন 'ইরেকটাস'।

www.pathagar.com

ড. ইউবিন ডুবয়-এর বক্তব্য শুনে জীববিজ্ঞানীরা তখন তাঁর কথার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছিলেন, বিজ্ঞানী ডারউইন-এর তত্ত্বের মাধ্যমে জানা যায় না, মানুষ আর বানরের মাঝখানে আর কেউ কোনদিন ছিল কিনা। এখন জানা গেল মানুষ আর বানরের মধ্যবর্তী প্রাণী পিথিকানথ্রোপাস।

জন, ম্যাক্স আর ঘামিশ—তিনটে দু-পেয়ে প্রাণীর আকস্মিক আগমনের ব্যাপারটা বানরগুলোর মধ্যে কিছুমাত্রও কৌতূহলের উদ্রেক ঘটিয়েছে বলে মনে হল না। আসলে তাদের ঔদাসিন্যই মানুষ তিনজনকে এরকম ভাবতে উৎসাহী করছে।

এখানকার বানরগুলো সাধারণ বানরের চেয়ে আকারে অনেক বড়। শিম্পাঞ্জি, বেনিওর ওরাং এবং গ্রাবুনেরা গরিলার চেয়ে অনেক, অনেক উন্নত প্রাণী এরা। গ্রাম গড়ে বসবাস, আগুনের ব্যবহার এবং কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করতে এরা জানে। এবার সে মশালের রহস্যভেদ করা সম্ভব হল। হাতির জন্য এ আয়োজন। তারপর হাতি দেখামাত্র লেজ তুলে চোঁ-চোঁ দৌড় দিয়েছে।

ওরাং বলতে বুঝায় মানুষ—বনমানুষ। এ নামটা কেবলমাত্র এদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এক সময় দুম্ করে দরজা খুলে নিগ্রো বালক লাঙ্গা রীতিমতো উল্লাসে লাফাতে লাফাতে এসে আগন্তুক তিনজনের সামনে দাঁড়াল। লাঙ্গা যা বলল তাতে করে বুঝা গেল, এরা জন্তু-জানোয়ার অবশ্যই নয়—মানুষ। এদের 'ওয়াগদিস' বলা হয়। আর গাছের ওপরে গড়ে তোলা গ্রামটার নামকরণ করা হয়েছে আঙ্গালা। আর সে বানরের বাচ্চাটার নাম লি-মাঈ। লি-মাঈ দলছাড়া হয়ে জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিল। আর গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক তার তল্লাশে বেরিয়েছিল। জলের স্রোতে ভেসে যেতে দেখে গ্রামবাসীরা তাকে উদ্ধার করে। লাঙ্গাকে অতিথি জ্ঞানে সেবাযত্ন করে।

লাঙ্গা-র সঙ্গে কথাবার্তা বলে অভিযাত্রীরা জানতে পারল, সে-পাড়ায় অনেক ওয়াগদিস-এর বাস। অবোধ্য ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে। ফলমূল সংগ্রহের জন্য গাছের আস্তানা ছেড়ে মাঝে মধ্যে জমিতে নেমে আসে। পাড়ার মোড়লও একজন আছে। তার নাম মসেলো ট্যালা ট্যালা। নামটা কানে যেতেই ঘামিশ চমকে উঠে বল্ল—'সে কী! এ যে আমাদের মুল্লুকের ভাষা! 'মসেলো ট্যালা ট্যালা'-র অর্থ 'ফাদার লুকিং গ্লাস'। কঙ্গোবাসীরা চশমাধারীদের এ নামেই সম্বোধন করে।'

অত্যাশ্চর্য কোনো কিছু আবিষ্কার করার জন্য ম্যাক্স যাত্রার শুরু থেকেই ছোঁক ছোঁক করছিল। এবার তার সে সাধ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হল। সে যে জাতিতে ফরাসি। একটু বেশি মাত্রায়ই কল্পনাবিলাসী। রহস্যময় উবাঙ্গীর বনে নতুন ধরণের মনুষ্যজাতি, অত্যাশ্চর্য-অদ্ভুত কোনো প্রাণীর মুখোমুখি হওয়ার অদম্য আগ্রহ তার মধ্যে ছিল, তারা ওয়াদিসদের দলপতি মসেলো ট্যাম্প ট্যালার পল্লীতে এসে। এত কিছুর পর অভিযাত্রীরা বুঝতে পারল না, তারা কি মুক্ত, নাকি খাঁচায় বন্দি অবস্থায় রয়েছে। যদি মুক্তই হয়ে থাকে তবে তো ওয়াদিসদের পল্লীটা ঘুরে ঘুরে দেখে কৌতূহল সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করা সম্ভব। হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। সেনাপতি মসেলো ট্যালা ট্যালা যেন তাদের মনের কথা বুঝতে পেরেই খাঁচার দরজা খুলে তাদের মুক্ত করে দিতে হুকুম দিয়েছে।

www.pathagar.com

দরজা খুলতে ম্যাক্স সঙ্গীদের নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলে। কৌতূহলমিশ্রিত অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে পল্লীর চারদিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার তাদের পাত্তা দেওয়া তো দূরের কথা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কেউ তাদের দিকে তাকাল না পর্যন্ত। গ্রামটা চতুর্ভূজাকৃতি গাছের ডালের ওপরের মাচা, যার ওপরে গ্রামটা বেড়ে উঠেছে সেটা সবই মজবুত। গ্রামবাসীরা দূরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল। আবোধ্য তাদের ভাষা। তবে কথাবার্তায় মাঝে-মধ্যে 'অ্যাংগোরা' শব্দটা ব্যবহার করতে শোনা গেল। আর কয়েকটা জার্মান শব্দ আর বঙ্গো শব্দও তারা ব্যবহার করল। যেমন 'ভ্যাটার' শব্দ যার মানে 'বাবা' সেটাও কয়েকবারই তারা উচ্চারণ করল। বানরের মুখে নিজের দেশের, জার্মান শব্দ শুনে জন তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাওয়ার জোগাড় হল।

আরও কিছু ব্যাপার অভিযাত্রীদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করল, তারা কেউ-ই উলঙ্গ নয়। কয়েদীদের মতো গাছের ছাল ঝুলিয়ে দিয়ে লজ্জা নিবারণ করেছে। তাদের মাথার কুলি আকারে ছোট হলেও গড়ন অনেকটা মানুষের মাথার খুলির মতোই। আচমকা মুখের দিকে তাকালে মানুষ বলেই মনে হয়, অধিকাংশ বানরের মতো ভুরু নয়। চিবুকে দাড়ির মতো রোম রয়েছে। আফ্রিকান কাফ্রিদের মতোই এদের গায়েও খুব লোম রয়েছে। পায়ের পাতাও বানরের মতো নয়। বরং মানুষের পায়ের পাতার মতোই দেখতে, বানররা পায়ের পাতা মাটিতে সমানভাবে পেতে চলতে পারে না। সেগুলোর গড়ন গাছের ডাল আঁকড়ে ধরার উপযোগী। তাই শিম্পাঞ্জি, ওরাং ওটাং ও গরিলারা আঙুলের ওপর ভর দিয়ে তারা দুলকি চালে চলে। কিন্তু ওয়াগদিসরা যেন একেবারে মানুষের মতো হাঁটছে। আর? এমনকি অন্যান্য বানরের মতো এদের লেজও নেই, তবে উন্নত শ্রেণীর বানরদের সঙ্গে ওয়াগদিসদের সাদৃশ্য আছে যতেষ্টই। সে-সব বানর মেরুদণ্ড সোজা করে হাঁটে, কথা কম বলে। খুবই গম্ভীর প্রকৃতির। ওয়াগদিসরাও ঠিক সেরকমই, চলাফেরা, ভাবভঙ্গিমা, সবকিছুতেই গাম্ভীর্য লক্ষিত হয়।

জীববিজ্ঞানী ভট—এর মতে মানুষের পূর্বপুরুষ হচ্ছে নিগ্রিটাস। গরিলারা শ্বেতাঙ্গদের পূর্বপুরুষ। আর নিগ্রোদের পূর্বপুরুষ হচ্ছে শিম্পাঞ্জি ও ওরাং ওটারা। কিন্তু জীববিজ্ঞানী ভট—এর এমন আশ্চর্য তত্ত্বকে অনেকেই স্বীকৃতি দিতে উৎসাহী হন নি। মানুষের মগজ এক কোটি বিশ লক্ষ কোষের সমন্বয়ে গঠিত। বানরের মগজে এত কোষের উপস্থিতি অবশ্যই নেই, ওয়াদিসদের মগজে মানুষের মতো এত বেশি কোষ না থাকলেও মানুষের মগজের গড়নের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। তারা শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতিতে মানুষের সমগোত্রীয় না হলেও তাদের একেবারে দূরে ঠেলে ফেলা যায় না।

ওয়াগদিসদের মস্তিষ্ক বর্তমান। তাতে স্মৃতিগাঁথা থাকে! সঞ্চিত স্মৃতি নির্ভর করেই কথার সৃষ্টি।

অভিযাত্রীরা হাঁটতে হাঁটতে পল্লীর একান্তে একটা বেশ বড়সড় ও সুদৃশ্য ঝুপড়ির সামনে হাজির হল। ম্যাক্স দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার উদ্যোগ নিতেই লি-মাঙ্গ একলাফে এগিয়ে এসে তার দুপথ আগলে দাঁড়াল। আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠল—'মসেলো ট্যালা ট্যালা! মসেলো ট্যালা ট্যালা! মসেলো ট্যালা ট্যালা!'

বুঝতে অসুবিধা হল না, ওয়াগদিসদের দলপতির প্রাসাদ এটা। সঙ্গে সঙ্গে দু'দিক থেকে দু-জন প্রহরী এগিয়ে এসে পথরোধ করে দাঁড়াল।

www.pathagar.com

অভিযাত্রীরা আবার আরও কয়েকটা ঝুপড়ি ডিঙিয়ে অন্য একটাতে হাজির হল। দরজা থেকে ভেতরে উঁকি দিতেই একজন বানর-মানব ও বানর-মানবী ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল। লি—মাঙ্গ আনন্দে—উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল—'লো-মাঙ্গ! অ্যাংগোরা! অ্যাংগোরা! লো—মাঙ্গ।' সে বলতে চাইছে আমার মা-বাবা। জন আর ম্যাক্স অত্যুগ্র কৌতূহলের সঙ্গে লি-মাঙ্গ-এর মা-বাবাকে দেখতে লাগল। উভয়ের গলাই শোভা পাচ্ছে ড. জোহৌসেন-এর নাম ও মূর্তি খোদাই করা একটা করে পদক।

জন তাদের সঙ্গে একটু আলাপ জমাতে চেষ্টা করল। সুবিধা করতে পারল না। আসলে তাদের কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারল না, আলাপ জমবে কি করে ?

বেশ কিছু সংখ্যক জার্মান ও কঙ্গো শব্দ আর আমুগ, আঙগা ও আম্‌স তিনটা ধ্বনি সহযোগে তাদের সম্পূর্ণ ভাষা গঠিত।

মিনিট পনের অবস্থান করার পর অভিযাত্রীরা লি-মাঙ্গ-এর মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিল।

ম্যাক্স-এর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। এখানে আর একদণ্ড ও থাকতে রাজি নয়। এখানে বানর-মানবদের সঙ্গে যদি বাকি জীবটা কাটাতে হয় তবে সবকিছু বরবাদ হয়ে যাবে। আবিষ্কারের মোহ তার টুটে গেছে। কিন্তু জন এত সহজে এ-পল্লী ছেড়ে যেতে রাজি নয়। তাদের সান্নিধ্যে আরও কিছু দিন থেকে তাদের জীবনযাত্রার সবকিছু ভালভাবে দেখে যেতে চায়। ম্যাক্স-এর ওই এক কথা—'আমরা তো আর জীববিজ্ঞানী গার্নার বা জোহৌসেন নই। তবে আমরা কেন খাঁচায় বন্দি হয়ে জীবন কাটাব?'

হ্যাঁ, ওয়াগদিসরা তাদের খাঁচায় বন্দি করে রেখেছে খুবই সত্য বটে। তবে তারা তাদের বন্দুক আর গুলি—বারুদের বাক্সটা ফিরিয়ে দিয়েছে। জলের ধাক্কায় ভেলাটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পূর্বমুহূর্তে বন্দুক আর গুলি বারুদের বাক্সটা পাথরের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিল। ওয়াগদিসরা সেগুলো কুড়িয়ে এনে রেখে দিয়েছিল। অভিযাত্রীদের এখানে নিয়ে আসার পর তারা তাদের জিনিস ফিরিয়ে দেয়।

একের পর এক দিন পেরিয়ে যেতে লাগল, অভিযাত্রীরা পালাবার ধান্দায় রয়েছে। কিন্তু ইয়া তাগড়াই এক ওয়াগদিস তার চেলাচামুণ্ডাদের নিয়ে খাঁচার দরজায় মোতায়েন। কড়া পাহারা দিচ্ছে। পুরো পল্লীটার পাহারার দায়িত্ব তার ওপরেই পরেছে।

ওয়াগদিসরা চাষাবাদের সঙ্গে পরিচিত নয়। বনের ফল-মূলই তাদের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন, আবার কখনও বা শিকারে বেরিয়ে মাছ-মাংস সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। দুটো চকমকি পাথর ঠুকে ঠুকে আগুন জ্বালে। মাছ-মাংস কখন ঝলসে আবার কখন বা জলে সিদ্ধ করে নেয়। একদিন বেড়াতে বেরিয়ে মহল্লার এক প্রান্তে, বনের ধারে একটা নদী দেখেছিল ম্যাক্স আর ঘামিশ। পাহারাদার ষণ্ডামার্কা র‍্যাকি না থাকলে একবার চেষ্টা করে দেখত কোনোক্রমে পালিয়ে গিয়ে নদী দিয়ে আপদগুলোর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় কিনা।

একদিন অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড ঘটে গেল। পাহারাদার র‍্যাকি তার চেলাচামুণ্ডাদের নিয়ে সর সর করে নিচে নেমে গেল। দূর থেকে কুড় ল আর টাঙ্গি দিয়ে চোখের পলকে রক্তনদী বইয়ে দিতে লাগল। পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে জলজ প্রাণীরা ঝপাঝপ জলে পড়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

www.pathagar.com

জন ভাবল, একবার গুলি বারুদের খেল দেখায়, কিন্তু বন্দুকের ঘোড়া টিপতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। আগ্নেয়াস্ত্রের খেল এখন নয়, দেখাবে শেষ। ম্যাক্স তাকে সমর্থন করল। চরম মুহূর্তে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে দলপতি মসেলা ট্যালা ট্যালা ও তার সাগরেদদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া করে দেবার জন্য। এপ্রিলের পনের তারিখ। সেদিন বিকালের দিকে লি-মাঈ তার মা-বাবাকে নিয়ে অভিযাত্রীদের খাঁচার দরজায় এসে দাঁড়াল। ম্যাক্স জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকানো মাত্র সে সোল্লাসে বলে উঠল—' মসেলো ট্যালা ট্যালা। মসেলো ট্যালা ট্যালা।' সে বুঝাতে চাইছে, তাদের নিয়ে দলপতি মসেলো ট্যালা ট্যালা-র প্রাসাদে যাবে। পরিচয় করিয়ে দেবে তাঁর সঙ্গে। চশমাওয়ালা আজ তাদের দর্শন দিতে চেয়েছে। তাদের কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝা যায় না। ব্যাপার কি ? প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ডারউইন-এর তত্ত্ব অনুযায়ী বুঝা গেছে, বানর আর মানুষের মাঝামাঝি এক প্রাণী ওয়াগদিসরা, একথা সভ্যবভ্য মানুষের কাছে পৌছে দিতে হলে লিভারপুলে যেতে হবে।

ওয়াগদিসরা উৎসবে মেতেছে। দলপতি আজ দর্শন দেবে, ভাগ্যের ব্যপার। মহল্লার নারী, পুরুষ ও শিশু কেউ আর ঘরের কোণে নেই। সবাই এসে জড়ো হয়েছে দলপতির প্রসাদের সামনে। গেঁজিয়ে ওঠা রসের সঙ্গে ট্যামারিস্ক গাছের রস মিশিয়ে মদের মতো তরল পদার্থ তৈরি করে সবাই গলা পর্যন্ত পান করেছে। নেশায় মাতোয়ারা। মাটির পাত্রের মুখে চামড়া এঁটে ঢোল তৈরি করেছে। দু-হাতের আঙুল-দিয়ে চাটি মেরে মেরে অদ্ভুত বাজনা বাজাচ্ছে কয়েক জন মিলে। আর কিছু ওয়াগদিস নারী-পুরুষ কোমর ধরে, সামনে-পিছনে হেলেদুলে বাজনার তালে তালে নাচছে। আবার কেউ বা ফাঁপা একটা নলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে সানাইয়ের মতো সুর করে বাঁশি বাজাচ্ছে। এবার একজন অর্গান বাজাতে লাগল, জানা গেল এটা নাকি জোহৌসেন-এর ছিল।

বাজনার আওয়াজ ভেদকরে ওয়াগদিসরা সমবেত কণ্ঠে সোল্লাসে চিল্লিয়ে উঠল—'মসেলো ট্যালা।' মসেলো ট্যালা, মুহূর্তের মধ্যেই ঝুপড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সুন্দর একটা সিংহাসন। তার ওপর গম্ভীর মুখে দলপতি বসে। সিংহাসন বাহকরা অভিযাত্রীদের সামনে দিয়ে দলপতিকে নিয়ে এগিয়ে গেল। তাদের প্রতি দলপতির কিছুমাত্রও আগ্রহ বা কৌতূহল লক্ষিত হল না। চারজন মানব সন্তান যে তার এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে এ-কথা অবশ্যই তার অজানা নয়। তবু তাকে নির্বিকারই দেখা দেল।

দলপতির উপেক্ষায় ম্যাক্স রেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেল, তাকে থামিয়ে দিয়ে জন গর্জে উঠল, 'তখন কী করছিলে? বোকা হাঁদা, তিনিই তো ডা. জোহৌসেন, চিনতে পার নি? যখন আমাদের সামনে দিয়ে গেলেন তখন কি চোখে ঠুলি পড়ে ছিলে নাকি?'

হ্যাঁ, জনের কথাই ঠিক। সে ড. জোহৌসেন-কে ঠিকই চিনতে পেরেছে। আসলে তাঁর সঙ্গে জন-এর পরিচয় ছিল। ব্যাপারটা এখন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল, দিনলিপির পাতায় চব্বিশে আগষ্ট পর্যন্ত বিবরণ লেখা রয়েছে। তারপর? খাঁচা ছেড়ে তিনি কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেলেন, এতদিনে রহস্যটা জানা গেল। তিনি ওয়াগদিসদের হাতে পড়ে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর তাঁর নিত্যসঙ্গী চাকরটা ? সে সুযোগ বুঝে গা-ঢাকা দিতে পেরেছিল। তা নইলে সে নির্ঘাৎ দলপতির প্রধান পার্শ্বচর হিসাবে পাশে পাশে থাকত। অভিযাত্রীরা রিও জোহৌসেন নদীতে ভ্রমণ করার সময় রহস্য

www.pathagar.com

সঞ্চারকারী মশালগুলো দেখতে পেয়েছিল সেগুলো সে ওয়াগদিসদেরই কারসাজি এখন আর তা বুঝতে কারো বাকি নেই। ড. জেহৌসেনকে তারাই ধরে এনে নিজেদের মহল্লায় বন্দি করে রেখেছিল। তাঁর কাছ থেকেই তারা থালা-বাসন তৈরির কায়দা, অর্গান বাজানোর কৌশল, আর কিছু জার্মান ও কঙ্গো শব্দ আয়ত্ত করেছে।

জন বেশ একটু অভিমান প্রকাশ করেই বলল, 'আমরা যে এখানে রয়েছি তা তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। তাঁর অবশ্যই উচিত ছিল, আমাদের ডেকে নিয়ে কথাবার্তা বলা।'

ঘামিশ বলল, 'আমার কিন্তু বিশ্বাস, আমাদের কথা তাঁকে জানানোই হয় নি।'

'হ্যাঁ, এ-ও অসম্ভব নয়। আমাদের কথা হতচ্ছাড়ারা তার কাছে নির্ঘাত চেপে গেছে।'

অভিযাত্রীরা পরামর্শ করে পথে নামল। তারা আজ রাত্রেই তাঁর প্রাসাদে হাজির হবে। বন্দুক আর গুলি সঙ্গেই রয়েছে। তারা দরজা ঠেলে ভেতরে যেতেই দেখতে পেল ড. জোহৌসেন কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বসে।'

তাদের পায়ের শব্দে ড. জোহৌসেন চোখ মেলে তাকালেন। অভিযাত্রীরা তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বলল—'ড. জোহৌসেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আমরা পরদেশী। আমাদের ধরে এনে আঙ্গলা গ্রামে কয়েদ করে রাখা হয়েছে।'

ড. জোহৌসেন নির্বিকার। হ্যাঁ-হুঁ বা ভাল-মন্দ কিছুই বললেন না। তাঁর ব্যাপার দেখে ম্যাক্স-এর মাথার রক্ত ওঠার উপক্রম হল। সে নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে ড. জোহৌসেনের ওপর ঝাঁপিয়ে পরে তার কাঁধ ধরে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিল।

ড. জোহৌসেন জিভ বের করে, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ভেঙচি কাটলেন। কিন্তু কোনো কথাই বললেন না।

জন কর্ট হকচকিয়ে গেল। আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠল 'ব্যাপার কী? ভদ্রলোক পাগল হয়ে গেলেন, নাকি বানরের সঙ্গে বাস করার ফলে বানরের স্বভাব তাঁর মধ্যে ভর করেছে।'

অভিযাত্রীরা আলোচনার মাধ্যমে স্থির করল, ড. জোহৌসেন-কে সঙ্গে নিয়ে তবে পালাবে। শেষপর্যন্ত করলও তা-ই। তাঁকে জাপ্টে ধরে জোর করে বাইরে নিয়ে এল। বরাতের জোর আছে বটে। দলপতির রক্ষীরা ধারে-কাছে কেউ ছিল না। ড. জোহৌসেন-কে নিয়ে তারা পালাতে গিয়ে নামার সিঁড়ি না পেয়ে নাজেহাল হতে লাগল, টিক তখনই ছুটতে ছুটতে সেখানে হাজির হল লো-মাঙ্গ ও লি-মাঈ। তারা অভিযাত্রীদের নিয়ে সিঁড়ির কাছাকাছি যেতেই ষণ্ডামার্কা প্রহরী র‍্যাকিকে তেড়ে আসতে দেখল। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ম্যাক্স তাকে গুলি করে কুপোকাৎ করে দিল। অভিযাত্রীরা গাছের ডাল টপকে টপকে জমিনে নামল। ছুটল নদীর দিকে। লো-মাঙ্গ আর লি-মাঈ তাদের পথ দেখিয়ে আগে আগে চলল। বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনে ওয়াগদিসরা মশাল জ্বেলে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসতে লাগল। জন আর ম্যাক্স টপাটপ গুলি করে দুটোকে ধরাশায়ী করে দিল। নদীর ঘাটে একটা ক্যানো বাঁধা দেখতে পেয়ে অভিযাত্রীরা তাতে চেপেই দড়ির বাঁধন খুলে দাঁড় বাইতে লাগল। লো-মাঙ্গ ছেলের হাত ধরে পাড়ে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে অতিথিদের বিদায় সম্ভাষণ জানাল। বিদায় মুহূর্তে লাঙ্গা লি-মাঈ-কে জড়িয়ে ধরে

www.pathagar.com

চুমু খেলে সে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলেছিল, 'অ্যাংগোরা! অ্যাংগোরা।' অর্থাৎ আঙ্গালা পল্লীতে যে আমার মা রয়েছেন। আমাকে তার কাছে ফিরে যেতে হবে। তাদের মূর্তি এক সময় অভিযাত্রীদের চোখের আড়াল হয়ে গেল।

২০ মে, সেদিন অভিযাত্রীরা ড. জোহৌসেনকে নিয়ে লিভারপুর কারখানায় ফিরে এল। এমনও তো হতে পারে জার্মানিরা একদিন ডা. জোহৌসেন-এর নিজে হাতে গড়া আঙ্গালা পল্লীর দখল নিয়ে নেবে। কিন্তু ইংরেজরা? তারা হয়ত এত সহজে পরাজয় স্বীকার করে নির্বিবাদে ব্যাপারটাকে মেনে নেবে না।

---

www.pathagar.com

প্রপেলার আইল্যান্ড

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে পাহাড়ের চূড়ায়, পাদদেশে আর জঙ্গলে—সর্বত্র। পাহাড়ের গা-বেয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে চলতে গিয়ে বাদ্যকরদের ঘোড়ার গাড়িটা আচমকা গড়িয়ে পড়ল।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে সেটা গড়ালে ভাগ্যে যে কী ঘটত তা আর বলার না।

ভাগ্যের জোরে একটুর জন্য রক্ষা পাওয়া গেছে। ঘোড়া দুটোর অবস্থা সঙ্গীন, গাড়োয়ান বেচারাও ওঠার ক্ষমতা হারিয়ে বসেছে।

তবে বাদ্যকর চারজন তেমন জখম হয়নি।

একদিন বাদেই তাদের সানডিয়েগোতে গানের আসরে যোগদান করার কথা। প্যারিসের বাদ্যকররা কালিফোর্নিয়ার সংগীতরসিকদের বাজনা শোনাবে। খইয়ের মতো ডলার ছিটিয়ে শহরবাসীরা রুচি পাল্টাবার জন্য পৃথিবীর নামকরা বাদ্যকরদের তলব করে নিয়ে আসছে নিজেদের শহরে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে চার বাদ্যকর সেই কালিফোর্নিয়া থেকে ছুটে এসেছে। চারজন বাদ্যকরেরই চেম্বার মিউজিকে বেশ নামডাক হয়েছে। অর্কেস্ট্রার বাজনা শুনে শুনে যখন মানুষের মনপ্রাণ অস্থির হওয়ার জোগাড় হয়েছে, ঠিক তখনই এরা আসরে নামার জন্য কোমর বাঁধতে লেগেছে।

বাদ্যকর চারজনের মধ্যে দলের পাণ্ডা পঞ্চাশ বছর বয়স্ক সিবাস্টিয়ান জর্ন। সে ভায়োলেনসেলো বাজানোতেও খুবই দক্ষ। তাদের মধ্যে কনিষ্ঠতম পিঞ্চিনাট। সাতাশ বছরের যুবকমাত্র। ভায়োলেনসেলোও তার হাত খুবই ভালো। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। অবশিষ্ট দুজনের মধ্যে একজন বত্রিশ বছর বয়স্ক ইভারনেস ফার্স্ট। ভায়োলিনে পটু। আর অন্যজন তিরিশ বছর বয়স্ক ফ্রাসকোলিন। সে সেকেন্ড ভায়োলিন বাজায়। তার একটা পরিচয়ও রয়েছে—কোষাধ্যক্ষ। খুবই হিসেবি বলেই তার ভাগ্যে এ পদটা জুটেছে। আর সে সদাহাস্যময় আর মিশুকও বটে।

গাড়ি ভেঙে পড়ামাত্র তারা চারদিকে ছিটকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে গাঝাড়া দিয়ে উঠে বাজনাগুলো অক্ষত আছে কি না দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

না, বাজনাগুলোর কোনো ক্ষতিই হয় নি।

গাড়িটার পরিস্থিতি দেখে সবাই যারপরনাই ভাবিত। এখন উপায়? গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আশানুরূপ কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

বাদ্যকররা তখন শহর থেকে দূরে পার্বত্য এলাকায় অবস্থান করছে। জায়গাটা ফ্রেসচেল থেকে মাইলপাঁচেক দূরে। এমনকি কাছে পিঠে কোনো রেলস্টেশন পর্যন্ত নেই। সমুদ্রের পাড়ে লোকবসতি রয়েছে। হোটেল রেস্তোরাঁও সেখানে আছে।

গাড়োয়ানের সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে বাদ্যকররা এও জানতে পারল, গ্রামটায় গেলে চার-চাকার গাড়ি মিলে যাবে। আর মালবাহী দুচাকার গাড়িও পাওয়া যাবে।

গাড়োয়ান নিরুপায়। তাকে সেখানেই পড়ে থাকতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি আর জখমি ঘোড়া দুটোকে ফেলে তার পক্ষে অন্য কোথাও যাওয়া কী করে সম্ভব, তার ওপর

www.pathagar.com

নিজেও চোট পেয়েছে। সে তাদের অনুরোধ করল, গ্রামে পৌঁছে যেন লোকজন জোগাড় করে পাঠিয়ে দেয়।

বাদ্যকররা ফ্লাস্ক থেকে সামান্য মদ গাড়োয়ানের গলায় ঢেলে দিয়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

কালিফোর্নিয়ার জঙ্গল বড়ই বিপদসঙ্কুল। অন্তত পিস্তল ছাড়া খালি হাতে জঙ্গলের পথে হাঁটতে যাওয়া মোটেই উচিত নয়। কিন্তু বাজনাদার চারজনের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রগুলো ছাড়া অস্ত্র বলতে কিছুই নেই।

বাদ্যযন্ত্র কাঁধে নিয়ে জঙ্গলের পথে কিছুদূর যেতে না যেতেই কালোমতো একটা চলমান ছায়া দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। গা যেন কেমন ভারী হয়ে আসতে লাগল। পথের ধারে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে ছায়াটা তাদের অনুসরণ করে চলল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেটা তাদের পিছনে, মাত্র দশ বারো গজ ব্যবধানে চলে এল। তার মতলব মোটেই সুবিধের মনে হল না। এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কালো ছায়ামূর্তিটা অতিকায় নাদুসনুদুস একটা ভালুক। লম্বা লম্বা পায়ে সেটা বাদ্যকরদের অনুসরণ করে চলেছে।

ব্যাপার দেখে বাদ্যকরদের তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়। দৌড়ে পালাবার চিন্তা পাগলের খেয়ালমাত্র। গাছে উঠলেও রেহাই পাওয়া যাবে না। হতচ্ছাড়াটা সেখানেও হামলা হুজ্জতি চালাবে।

এমন ভয়ংকর বিপদের মুহূর্তে বেহালার মিষ্টি-মধুর সুর মনকে উতলা করে তুলল। ইভারনেসের মাথা থেকে চমৎকার এ মতলবটা ঝট করে বেরিয়ে এসেছে। ব্যাস, আর মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সে বাক্স থেকে বেহালাটা বের করে উন্মাদের মতো ছড় টেনে চলেছে। পাকা বাদ্যকরের বেহালার সুর ভালুকটার মধ্যে ভাবোন্মাদনার সঞ্চার করল। এতক্ষণ সে এগোচ্ছিল নখের ধার আর কব্জির জোর পরীক্ষা করে দেখতে। এখন বেহালার সুর তাকে টেনে আনছে।

বেহালার সুরের তালে তালে হেলেদুলে নাচতে নাচতে বনের একেবারে কিনারায় এসে ভালুকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েকবার সামনের দুপায়ের থাবা দুটো দিয়ে করতালি দিয়ে বাদ্যকরদের বিদায় সম্ভাষণ জানাল।

বনের এলাকা ছেড়ে বাইরে আসতেই পিঞ্চিনাটের মাথায় একটা দুর্বুদ্ধি ভর করল। সে বলল, 'ভায়া, এক কাজ করো, জোরে জোরে ছড় টেনে ভালুক-নাচানোর সুর বাজাও।'

ব্যাস, আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ইভারনেস অভিজ্ঞ হাতে বেহালায় ভালুকনাচানো সুর তুলে চলল। আর যাবে কোথায়! ভালুকমশাই কোমর দুলিয়ে, শরীর বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে বাজনার তালে তালে নাচতে শুরু করল।

ভালুকটা যখন নাচে একেবারে বিভোর হয়ে পড়ল তখন সুযোগ বুঝে বাজনদাররা চোখের পলকে গা ঢাকা দিয়ে দিল।

চার বাদ্যকর যখন ফ্রেসচেল গ্রামে হাজির হল তখন ঘড়িতে রাত নটা বাজে। এরই মধ্যে চারদিকে অন্ধকার, অখণ্ড নীরবতা নেমে এসেছে দেখে তারা খুবই অবাক হল। তারা এ দরজায় ও-দরজায় কয়েকবার ঝাঁকুনি দিল। ধাক্কাধাক্কি করল। নিষ্ফল প্রয়াস। দরজা খোলা তো দূরের ব্যাপার। সামান্য সাড়াও দিল না কেউ।

www.pathagar.com

ব্যাপার দেখে ইভারনেস রেগেমেগে বলল, 'ধুর ছাই! এ কি গ্রাম, নাকি গোরস্থানে হাজির হয়েছি! বাড়ি তো নয়, যেন কবরখানা!'

পিঞ্চিনাটের মাথায় আর একটা বেড়ে মতলব খেলে গেল। সে বলে উঠল, 'বাজাও বাজাও বাজনা। বাজনা শুনিয়ে কবরখানার ভূতের ভেতরেও উন্মাদনা সৃষ্টি করা সম্ভব। অতএব বাজাও বাজনা।'

এমন মিষ্টিমধুর সুরে বাজনা বাজাতে লাগল যা শুনলে ভূতও কবর ছেড়ে বেরিয়ে আসত, মড়াও খিলখিলিয়ে হেসে উঠত। এমনকি কঙ্কালও কোমর দুলিয়ে নাচানাচিতে মেতে যেত।

হায়! এমন চমৎকার পরিকল্পনা, এত কায়দা কসরত করে বাজনা বাজানো বিলকুল ভেস্তে গেল। গ্রামের কোনো দরজা খোলা তো দূরের ব্যাপার, কেউ দরজা সামান্য ফাঁকও পর্যন্ত করল না। রাগে জর্নের মাথায় রক্ত উঠে যাওয়ার জোগাড়। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যে তুমুল বাজনা শুরু হয়ে গেল। সমস্বরে চার চারটে বাদ্যযন্ত্র জোরসে বেজে উঠল।

হ্যাঁ, কাজ হয়েছে বটে। অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে গ্রামবাসীরা একে একে বিছানা ছেড়ে উঠে আলো জ্বালতে লেগে গেল।

এদিকে বাদ্যকররা অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসল। ঘরে ঘরে ঝটপট আলো জ্বলে উঠতে দেখামাত্র তারা সঙ্গে সঙ্গে বাজনার সুর দিল বদলে। আগের মতোই মিষ্টি মধুর সুর বেরোতে লাগল বাদ্যযন্ত্রগুলো দিয়ে।

গ্রামবাসীদের একজন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, 'সাহেব, আপনাদের তাল সুর মাত্রাহীন বাজনা শুনেই আপনাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আঁচ করে নিতে পেরেছি। আশ্রয়ের প্রত্যাশী, ঠিক না? আপনাদের মুশকিল আসান করার জন্যই আমি হন্তদন্ত হয়ে হাজির হয়েছি। ভালো কথা, আপনারাই তো আমেরিকার সে নামকরা বাদ্যকর, ঠিক বলি নি?'

অস্থিরচিত্ত পিঞ্চিনাট কোনোরকম ভনিতা না করেই গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, 'সাহেব, সুখ্যাতি শোনার মতো শরীর ও মন কোনোটাই সুস্থ নয়। এখন তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন তো, আমরা কোথায় রাত কাটাব?'

গ্রামবাসীরা বলল, 'এখান থেকে দু-মাইল দূরে একটা শহর আছে।'

চোখ দুটো কপালে তুলে পিঞ্চিনাট এবার বলে উঠল, 'সে কী সাহেব, শহর বলছেন কী! তার চেয়ে বরং বলুন সমুদ্রের ধারে একটা গ্রাম। গাড়োয়ান তো এরকমই বলে দিয়েছে।'

'ঠিক বলে নি। আমার সঙ্গে চলুন, দেখবেন আপনাদের মতো কৃতী সংগীতজ্ঞদের আদর যত্ন ঠিকঠাক করতে পারি কি না।'

'আমাদের যে রবিবারই মধ্যাহ্নের শো-তে সানডিয়াগোতে বাজানোর কথা। রবিবার থেকেই আমাদের বাজনার শো শুরু হচ্ছে।'

রবিবার যথা সময়ে সানডিয়াগোতে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রামবাসীটা তাদের চার বাদ্যকরকে গাড়িতে চাপিয়ে যাত্রা করল। ফ্রেসচেল গ্রামবাসীরাও আবার নিশ্চিন্তে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

মিনিট পনের পরেই বাদ্যকরদের নিয়ে এক জলাশয়ের ধারে গাড়িটা দাঁড়াল। একটা নদী। নদীর ওপারেই সে শহর।'

www.pathagar.com

গাড়িসহ যাত্রীরা একটা ফেরি নৌকায় চেপে নদী পেরিয়ে গেল। আবার গাড়ি ছুটল উল্কার বেগে। একসময় বাগানের সরু একফালি রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে একটা হোটেলের সামনে গাড়িটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হোটেলের চৌপায়ায় শুয়ে বাদ্যকররা গভীর ঘুমের মধ্য দিয়ে রাত কাটাল। সারারাত ঘুম ভাঙা তো দূরের ব্যাপার সামান্য হুঁশ পর্যন্ত কারো ছিল না।

*   *   *

সকাল সাতটা বাজতে না বাজতেই পিঙ্কিনাট বাজখাই গলায় চিল্লাচিল্লি জুড়ে দিল, 'আরে, তোমরা এখনো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছ যে বড়! ঝটপট, শহরটা আজ দুপুরের মধ্যে দেখে নিতে হবে। কালই সানডিয়াগোতে পৌঁছতে হবে যে—উঠে পড়ো।'

বাথরুমে ঢুকতেই ব্যবস্থাদি দেখে বাদ্যকর চারজনের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবার জোগাড়। ঠাণ্ডা জলের ফোয়ারা আর গরম জলের ঝর্নাসহ চমৎকার সব ব্যবস্থা। সবকিছুই যন্ত্রের দ্বারা চলছে।

বাথরুমের কাজকর্ম সেরে ঘরে ঢুকতেই ক্রিং-ক্রিং করে ফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। গতরাতের সে অদ্ভুত লোকটার কণ্ঠস্বর টেলিফোনের তার বেয়ে ভেসে এল। তাঁর নামটা জানা গেল, ক্যালিস্টার মুনবার। সুপ্রভাত জানিয়ে সে এক্সেলসিয়ার হোটেলে প্রাতরাশের আমন্ত্রণ জানাল।

প্রাতরাশের পাট চুকলেই অদ্ভুত সে লোকটা বাদ্যকর চারজনকে নিয়ে শহরটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য পথে নামল।

শহরটাকে বাস্তবিকই পরিকল্পনামাফিক গড়ে তোলা হয়েছে। রাস্তার দুধারে চওড়া ফুটপাত। আর বাড়িগুলোও একই ঢঙে তৈরি দেখলে সে চোখ ও মন হাঁপিয়ে ওঠে। একটার আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে অন্যটার কিছুমাত্রও সাদৃশ্য নেই।

বাদ্যকরদের নিয়ে প্রায় বিশ মিনিট ধরে হাঁটার পর ক্যারিস্টার মুনবার মুখ খুলল, 'এটা ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র, এখানকার থার্ড এভিনিউ। এরকম ত্রিশ ত্রিশটা এভিনিউ এ-শহরে রয়েছে।'

এখানকার ব্যবসা বাণিজ্য চলেছে টেলেটোগ্রাফের মাধ্যমে। বুঝতে পারলেন না তো? এ যন্ত্রের মাধ্যমে হাতের লেখাকে দূরে পাঠানো সম্ভব হয়। মুখের ভাষা পৌঁছে দেয় টেলিফোন, টরে টক্কার মাধ্যমে টেলিগ্রাফ বার্তা পাঠায়, মুখ ও হাতনাড়া ধরা পড়ে সিনেমাটোগ্রাফ যন্ত্রে, আর আপনার ছবি পাঠিয়ে দেয় টেলিপ্রিন্টার, আরো আছে টেলেটোগ্রাফ যন্ত্রের মাধ্যমে আপনার হাতের লেখাকে যেখানে খুশি পাঠিয়ে দিতে পারবেন। কেবল একটা সুইচ টেপার মামলা। টেলোটোগ্রাফই আপনার জিনিসপত্তর খরিদ করার ব্যবস্থা মিটিয়ে দেয়। এমনকি বিয়ের ব্যবস্থাপত্তর অবধি চুকিয়ে দিতে পারে এ যন্ত্রটা।'

আরো কিছুটা পথ পাড়ি দিয়ে উনিশ নম্বর এভিনিউতে কেবল ধনীদের বাড়ি। অ্যালুমিনিয়ামের রেলিং লাগানো চোখধাঁধানো সব বাড়িগুলো দেখে বাদ্যকর চারজনই বিস্ময়ে ভিমরি খাওয়ার জোগাড়।

ক্যালিস্টার বলল, 'এটাই হচ্ছে শহরের সবচেয়ে ধনীর আবাস। ট্যাঙ্কারডন তাঁর নাম। ইলিনয়ের বেশকিছু তেলের খনির মালিক। কোটি কোটি টাকার বিষয়সম্পত্তি তাঁর রয়েছে। এখানকার মানুষগুলোও কম ধনী নয়। তাই তো ছোটখাটো ব্যবসায়ীদের

www.pathagar.com

রমরমা অবস্থা। কোনো কারখানা নেই, পাইকারি ব্যবসাও কাউকে করতে দেয়া হয় না। কুলিমজুরের দরকার হলে বাইরে থেকে আনিয়ে নেয়া হয়। কাজ মিটে গেলে আবার যে যার জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এখানকার আর একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। ভিখারির দেখা এ শহরে মিলবে না। চোর-ঠগবাজ-ছিনতাইকারীও এখানে নেই। কয়েকদখানা নেই, গর্দান দেয়ার ব্যাপার-স্যাপারও নেই। ওসব যুক্তরাষ্ট্রে পাবেন। এখানে নেই।

'আপনার কথা শুনে মালুম হচ্ছে, আমরা যেন আমেরিকাতে রয়েছি', বাদ্যকর সেবাস্টিয়ান সবিস্ময়ে বলল।

'আজ নয়। কাল অবশ্যই ছিলেন, আজ নয়। পৃথিবীর একটা স্বাধীন শহরে আপনারা আজ অবস্থান করছেন—যুক্তরাষ্ট্রের খবরদারি এখানে ঘটে না সাহেব।'

'শহরটার নাম বলবেন কি?'

'অবশ্যই। তবে এখন নয়, পরে বলব। এখানকার সবকিছু দেশাশোনা হয়ে গেলে তবে বলব।'

বিচিত্র উত্তরটা শুনে বাদ্যকর চারজন আর কথা না বাড়িয়ে তার পিছন পিছন এবার গরিবদের মহল্লায় হাজির হল। বাড়িঘর তেমন বড় নয়। অধিবাসীদের উপার্জন নাকি মাত্র এককোটি ডলার। বাদ্যকর পিঞ্চিনাট বিদ্রূপের স্বরে বলল, 'তবে ভিখারি বলা চলে, কী বলেন?'

ক্যালিস্টার মুনবার বলল, 'হ্যাঁ, ভিখারিই বলতে পারেন। দশকোটি উপার্জন, তার কাছে দশলাখ উপার্জনকারী ভিখারি ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে।'

এ পাড়াতেই প্রোটেস্ট্যান্টদের সাধারণ গির্জাটা চোখে পড়ল।

এগারোটার কাছাকাছি সবাই ক্ষিদেয় কাতর হয়ে পড়ল। ট্রাম ধরে মিনিট কয়েকের মধ্যেই তারা হোটেল ফিরে এল।

খাবার টেবিলে বসেও লোকটার বকবকানি থামল না। কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে লোকের মনকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে বটে। কোনো ফন্দি কি আঁটছে? সানডিয়াগোর ট্রেন মিস করিয়ে দেয়ার ধান্ধায় আছে নাকি?

আহারান্তে প্লেটে চাটনি দেয়ার সময় আচমকা টেবিলের বাসনপত্র তিরতির করে কেঁপে উঠল। মনে হল, কোথাও বিস্ফোরণ ঘটেছে।

বাদ্যকরদের মনের ভাব বুঝতে পেরে ক্যালিস্টার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ভয়ের কিছু নেই। মানমন্দিরে কামান দাগা হয়েছে। তারই আওয়াজ।'

বাদ্যকর জর্ন বেশ রাগতস্বরেই বলে উঠল, 'সানডিয়েগোর ট্রেন কয়টায়, খোলসা করে বলুন তো শুনি?'

'আরে সাহেব, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, বলুন তো? শহরের অর্ধেকটা তো এখনো দেখার বাকি রয়ে গেছে।'

চার বাদ্যকরকে সঙ্গে করে আবার রহস্যজনক লোকটা পথ চলতে শুরু করল। পথ চলতে গিয়ে সবারই মনে হল ফুটপাত যেন তিরতির করে কাঁপছে। কিন্তু এতো আর চলন্ত ফুটপাত নয়! ব্যাপার কী?

শহরের বাকি অর্ধেক যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। রাস্তাঘাট, বাজার, দোকান সবজায়গায় লোকে গিজগিজ করছে। এটা যেন একেবারেই অন্য একটা শহর।

www.pathagar.com

সামনে বিশালায়তন একটা বাড়ির দিকে আঙুল-নির্দিশ করে ক্যালিস্টার মুনবার বলল, 'ওইটা ন্যাট কোভারলির প্রাসাদ। জেম ট্যাঙ্কারডনের মতোই ধনকুবের। উভয়েরই একান্ত ইচ্ছা একাই এ শহরের ওপর ছড়ি ঘোরাবেন।'

প্রায় দুঘন্টা বাদে তারা শহরের শেষপ্রান্তে পৌঁছতে পারল।

এখানে অত্যাশ্চর্য একটা ব্যাপার ফ্রাসকোলিনের নজরে পড়ল। মুখ ফুটে কারো কাছেই কিছু বলল না। বেলা তখন দুটো। এখন দক্ষিণ পশ্চিম আকাশে সূর্যের অবস্থান হওয়ার কথা নয়। অথচ দক্ষিণ পশ্চিমে সূর্য অবস্থান করছে।

ফ্রাসকোলিন অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার চেষ্টা করামাত্র ক্যালিস্টার তাড়া দিয়ে উঠল, 'ট্রাম! শিগগির ট্রামে উঠুন। এখন আপনাদের বন্দর দেখাতে নিয়ে যাব।'

বাগান আর চাষের জমির ভেতর দিয়ে ট্রাম ছুটে চলল। ক্যালিস্টার মুনবারের বকবকানি আবার শুরু হল, 'শুনুন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের তাগিদে কারখানাটা গড়ে তোলা হয়েছে। শহরের যাবতীয় টেলিফোন, টেলিগ্রাম, আলো, যন্ত্রপাতি, রান্না আর আলুমিনিয়ম চাঁদ এবং জলেল তলার ডুবোতার চালু রাখতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় সবই এ-কারখানা সরবরাহ করে। আর কারখানাটা তৈলশক্তির সাহায্যে চলে।'

ফ্রাসকোলিন কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে বলল, 'ডুবো তার? ডুবো তার বলতে কী বোঝাচ্ছে খোলসা করে বলুন তো সাহেব?'

'ডুবো তারের মাধ্যমে আমেরিকার উপকূলগুলোর সঙ্গে শহরের যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে।'

ফ্রাসকোলিন এখানে আর একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার চাক্ষুষ করল যার রহস্যটার কিনারা করতে পারল না। ব্যাপারটা হচ্ছে, চলন্ত জাহাজের গা-বেয়ে জলস্রোত ধেয়ে চলেছে।

আবার সানডিয়েগোর ট্রেন ধরার ব্যাপারটা জর্নের মাথায় এল। রহস্যজনক লোকটার কাছে প্রসঙ্গটা পাড়তেই এমন এক জবাব পেল যাতে চার বাদ্যকর রীতিমতো ধন্ধে পড়ে গেল। লোকটা তার কথার জবাবে বলল, 'বলছি তো, আপনি যেখানে রয়েছেন কাল ভোরে আর সেখানে থাকছেন না।

তার কাছ থেকে সদুত্তর পাওয়া যাবে না অনুমান করে সে মুখে কলুপ এঁটে দিল।

ক্যালিস্টার মুনবার সবাইকে নিয়ে ঝট করে আর একটা ট্রামে চেপে পড়ল। কোটের পকেট থেকে ঘড়ি বের করে বোতামে টিপ দিতেই ঘড়িটা কথা বলে উঠল, 'চারটা বেজে তেরো মিনিট।' ট্রামটা ছুটেই চলেছে।

ট্রামটা দেড় শো ফুট উঁচু একটা টাওয়ারের ধারে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অতিকায় একটা ঘড়ি টাওয়ারটার মাথায় তার চারদিকে মানমন্দিরের আকাশচুম্বী সব বাড়ি।

ক্যালিস্টার মুনবার চারজনকে নিয়ে লিফটে চাপল। বাদ্যকর চারজন মুখে কলুপ এঁটে দিয়েছে। লিফটা পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড বাদে চূড়ায় পৌঁছে থেমে গেল। বিশালায়তন একটা পতাকা বাতাসে পতপত করে উড়ছে। বোধহয় আমেরিকার পতাকা। তবে সাতষট্টিটা তারার পরিবর্তে তাতে একটামাত্র বিশাল সোনার তারা আঁকা রয়েছে দেখা গেল। সমগ্র আমেরিকা যেন একাকার হয়ে গেছে। পতাকটা তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

যেদিকে তাকানো যায় কেবলই জল আর জল। ডাঙার চিহ্নমাত্রও নজরে পড়ল না। বাদ্যকর চারজন একটা দ্বীপে দাঁড়িয়ে, টাওয়ারটার চূড়ায়।

www.pathagar.com

কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে, গতরাতে ফ্রেসচেল গ্রাম থেকে এখানে আসতে তারা দুমাইলের বেশি পথ পাড়ি দেয় নি। নদী ডিঙিয়েই শহরে ঢুকেছে। তবুও ষোলো মাইলের ভেতরে ডাঙার চিহ্নও নেই, ব্যাপার কী? একটা রেকাবির মতো বিশাল ভূভাগটা সাগরের জলে ভাসছে।

ফ্রাসকোলিন রেগে মেগে বলে উঠল—'সাহেব, সত্যি করে বলুন তো, এটা কি একটা দ্বীপ, নাকি? যদি তাই হয় কী এর নাম?'

'হ্যাঁ, দ্বীপই বটে। এর নাম স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড। আর শহরটার নাম মিলিয়ার্ড সিটি।'

* * *

প্রপেলারের সাহায্যে জাহাজ চলে। স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডও চলছে প্রপেলারের সাহায্যেই। যেহেতু লাখপতি ছাড়া এ শহরে বাস করার সুযোগ পায় না তাই শহরটার নামকরণ করা হয়েছে 'মিলিয়ার্ড সিটি'। এ শহরে রথচাইল্ডের মতো ধনকুবের অসংখ্য রয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ার আর লোহার কারিগররা অসম্ভবকে সম্ভাবনাময় করে তুলেছে। দ্বীপটা যে কেবল নকল তাই নয়, চলন্তও বটে।

উনিশ শতকের শেষের দিকের আমেরিকার বেশ কিছুসংখ্যক টাকার কুমীরের মাথায় খেয়াল চাপল সমুদ্রে ভাসমান হোটেল রেস্টুরেন্টে খানাপিনা সারবে। মঙ্গরঞ্চে নাটক দেখবে, ক্লাবে চুটিয়ে আড্ডা দেবে, ভ্রমণার্থীরা একঘেয়েমির হাত থেকে অব্যাহতি পাবে। অবশ্য ভেলার মতো বিশালায়তন কিছু তৈরি করে নিলেই তো আশা পূরণ করা যেতে। কিন্তু আমেরিকানরা চিরদিনই সবকিছু বড়সড় মাপেরই করতে আগ্রহী। সেজন্যই তো শেষেমেষ মনস্থ করল, ভাসমান দ্বীপটাকে চলন্তও করে তুলতে হবে। মোদ্দা ব্যাপার, চলন্ত একটা দীপ গড়ে তুলতে হবে। সচল দ্বীপ।

ব্যস, কাজ শুরু করে দেয়া হল। চার বছর পর কাজটা শেষ হল। ইয়াংসিকিয়াংয়ে ভাসমান গ্রাম নজরে পড়ে। দানিয়ুব আর আমাজনের বুকেও গ্রামকে ভেসে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু সে তো অস্থায়ী গ্রাম। অতিকায় কাঠের ওপরে তৈরি গ্রাম ভাসতে ভাসতে এক জায়গা থেকে অন্যত্র গিয়ে হাজির হয়। তারপর ভেলা ভেঙে বাড়িগুলোকে পাড়ে তুলে আনে। এটা আসলে এরকম কোনো দ্বীপ নয়। স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড নামে দ্বীপের কাঠামোটাকে এমনভাবে তৈরি করা হল যাতে স্থায়ীভাবে জলে ভাসমান অবস্থায় থাকতে পারে। খাঁটি ইস্পাত ব্যবহার করে সেটাকে তৈরি করা হল। মূল দ্বীপটাকে গড়ে তোলা হল দু লক্ষ সত্তর হাজার জলনিরুদ্ধ কামরাকে পাশাপাশি সাজিয়ে। প্রতিটা কামরার আয়তন দশ গজ দৈর্ঘ্য, দশ গজ প্রস্থ আর আঠারো গজ উচ্চতাবিশিষ্ট। তবে দাঁড়াচ্ছে—প্রতিটি কামরার ওপরের দিকের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ শো বর্গগজ। নাটবল্টু রিভেটের সাহায্যে কামরাগুলোকে জুড়ে দেয়া দুই কোটি সত্তর লক্ষ বর্গগজবিশিষ্ট একটা ভাসমান দ্বীপ গড়ে উঠল। ডিম্বাকৃতি একটা দ্বীপ। দৈর্ঘ্যে সাড়ে চার মাইল আর প্রস্থে তিন মাইল। কিনারা ধরে একপাক মেরে এলে হবে এগারো মাইল।

দ্বীপটা জলে ভাসমান অবস্থায় ত্রিশ ফুট জলের নিচে তলিয়ে থাকে। জলের ওপরে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে বিশ ফুট। ম্যাডেলান উপসাগরে দ্বীপটাকে গড়ে তোলা হয়েছে। মেরামতির যন্ত্রপাতি এতে থাকে।

www.pathagar.com

এবার লোহার দ্বীপটাকে মাটি চাপা দিয়ে ঢেকে দেয়ার বন্দোবস্ত করা হল। মাটিতে চাষ করা হল শাকসব্জি ও ফলমূল প্রভৃতি। ইলেকট্রো কালচারের ব্যবস্থাপনায় গাছগাছালি দ্রুত বেড়ে যেতে লাগল।

দ্বীপের মাটিতে গম চাষের ব্যবস্থা করা হল না।

মোট আয়তনের সতের ভাগের একভাগে গড়ে তোলা হল অবিশ্বাস্য এই মিলিয়ার্ড শহরকে। আমেরিকার অন্তর্গত অন্যসব শহরে যান্ত্রিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রচুর থাকলেও কেবল শিল্প দিয়ে চোখ ও মনকে আনন্দ দেয়ার নেই। মিলিয়ার্ড শহরে এসবের কিছুমাত্রও ঘাটতি নেই। ডিম্বাকৃতি শহরের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে ফার্স্ট এভিনিউ। একধারে শহর আর অন্য ধারে রয়েছে মানমন্দির। আর এখানের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে স্কুল, হাসপাতাল, পুলিশ দপ্তর, কাস্টম অফিস, কবরখানা আর বিজ্ঞান ও চারুশিল্পের কেন্দ্র।

মোট দশ হাজার মানুষের বসতি স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড। সবাই আমেরিকান নাগরিক।

আইল্যান্ড কোম্পানিই চলন্ত দ্বীপের সবকিছুর মালিক। বাড়িঘর জায়গা জমি কলকারখানা সবকিছুর মালিকানাস্বত্ব কোম্পানিরই ওপর। কোম্পানির মূল আয় হচ্ছে ভাড়ার টাকা।

এখানে ডাক্তারের প্রয়োজন হয়ই না। কারণ সামুদ্রিক আবহাওয়া এমন সুন্দর যে রোগব্যাধির প্রশ্নই ওঠে না। রোগ জীবাণুই নেই, রোগ কী করে? জরাগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত মরতে চাওয়ার প্রশ্নই তো ওঠে না।

সমুদ্রের জলসদ্যুদের ঠেকানোর জন্য কর্নেল স্টুয়ার্ট পাঁচ শো সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে দিন রাত দ্বীপটাকে কড়া পাহারা দিয়ে আগলে রাখেন। এক একজন সেনানী ইউরোপের যে-কোনো সৈন্যাধ্যক্ষের সমান বেতন পায়। আভ্যন্তরীণ ব্যাপার-স্যাপারের জন্য পুলিশও কম নিযুক্ত নেই।

চলন্ত দ্বীপটা কিন্তু অকারণে, উদ্দেশ্যহীনভাবে সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়ায় না। আইল্যান্ড কোম্পানির আবহাওয়া দপ্তর পরামর্শ দেবে কখন, সমুদ্রের কোন অঞ্চল দিয়ে সমুদ্র অতিক্রম করবে।

আইল্যান্ড সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়ালেও পানযোগ্য মিষ্টি জলের অভাব এখানে হয় না। কারণ সমুদ্রের জলের লবণটুকু আলাদা করে নিয়ে তবে মিষ্টি জল শহরের সর্বত্র সরবরাহ করা হয়। পাইপের মাধ্যমে চালান দেয়া হয় শহরের সর্বত্র। এমনকি চাষের ক্ষেতেও।

কয়েকটা দানবাকৃতি জেনারেটর এবং বৈদ্যুতিক কারখানার কয়েকটা বয়লার থেকে দু হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের দু-ধারে দুটো বন্দর অবস্থান করছে। তাদের একটার নাম 'পারবোর্ড' আর দ্বিতীয়টার নাম 'স্টারবোর্ড'। তাদের প্রত্যেকটাতে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন দুটো ইঞ্জিন আছে। প্রত্যেকটা পঞ্চাশ অশ্বশক্তি সম্পন্ন। কারখানার উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে নকল চাঁদ থেক শুরু করে প্রতিটা যন্ত্রপাতি পর্যন্ত চলছে। এক একটা নকল চাঁদ পাঁচ হাজার মোমবাতির সমান আলো দানের ক্ষমতা সম্পন্ন।

অত্যাশ্চর্য দ্বীপটার অন্য আর একটা নামকরণ করা হয়েছে—'প্রশান্তের মুক্তা'। প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বীপটার এখন দ্বিতীয় সফল চলছে।

www.pathagar.com

বাদ্যকর চারজনকে তুলে নেয়ার জন্যই গতরাতে কালিফার্নিয়ার উপকূলের কাছে নোঙর করেছিল। ক্যালিস্টার মুনবার একজন পয়লা নম্বরের ধাপ্পাবাজ। আমেরিকার স্থলভূমি থেকে চলন্ত দ্বীপে আসার সময় সমুদ্রের খাড়িকে নদী বলে ধাপ্পা দিয়েছে।

* * *

এদিকে ক্যালিস্টার মুনবারের কথাবার্তা ও রকম-সকম দেখে বাদ্যকর চারজন তো তার ওপর রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। তারা জেল ফাঁসির বন্দোবস্ত করার কথা বলাবলি করে ক্রোধ প্রকাশ করতেও ছাড়ল না।

কিন্তু কোথায় ক্যালিস্টার মুনবার? কাকে জেলে ঢোকাবে? কাকেই বা ফাঁসিকাঠে ঝুলাবে বাদ্যকররা? সুচতুর লোকটা তাদের ছাড়ের ওপর রেখে অনেক আগেই লিফটে চেপে সোজা নিচে চম্পট দিয়েছে। অতএব তাদের ফাঁকা ছাদে দাঁড়িয়ে হম্বিতম্বি করাই সার হল। নিচে নামার কোনো ফিরিকই নেই। পথ বন্ধ। সিঁড়ির ব্যবস্থাও নেই। সেটা বেয়ে অতি কষ্টে হলেও কোনোরকমে তারা নিচে নামতে পারত। গুলিবিদ্ধ ক্রোধোন্মত্ত বাঘের মতো বাদ্যকর চারজন ফুঁসতে লাগল।

জর্ন অল্পেতেই মাথাগরম করে ফেলে। সে কোমর থেকে হেঁচকা টানে ছুরিটা হাতে নিয়ে উড়ন্ত পতাকাটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলার জন্য উদ্যত হল। অনেক কায়দা কসরত করে তাকে কোনোরকমে সামলে সুমলে রাখা হল। তারই দ্বীপে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের পায়ে কুড় ল মারা, নিতান্তই বোকামি।

অনন্যোপায় হয়েছে ক্রোধমিশ্রিত হতাশায় জর্জরিত চার বাদ্যকর বন্ধু রেলিঙ ধরে ঝুঁকে দেড় শো ফুট নিচে অবস্থানরত মানুষদের গলা ছেড়ে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি জুড়ে দিল।

হ্যাঁ, শুনেছে, অনেকেই তাদের কণ্ঠস্বর শুনেছে বটে। কিন্তু এ পর্যন্তই তারা বিভিন্ন কথার মাধ্যমে কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞেস করল। ব্যস, আর কোনোই ফল হল না। ব্যাপারটা এমন হল, তাদের কাছে যেন এটা নিছক একটা তামাশামাত্র। তারা রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। হতচ্ছাড়া মুনবার শয়তানের শিরোমণি। চারজনকে ছাদে তুলে দিয়ে লিফটটা নিয়ে বেমালুম চম্পট দিয়েছে। এদিকে ক্ষিদেতে তাদের পেটে জ্বালা শুরু হয়ে গেছে।

আচমকা গুড়গুড় আওয়াজ শোনা গেল। হ্যাঁ, লিফটই উঠে এসেছে। বাদ্যকর চারজন ব্যস্ত পায়ে ভেতরে দিয়ে দাঁড়ানো মাত্র সেটা নিজে থেকেই নিচে নামতে লাগল।

লিফটের খাঁচা থেকে বেরিয়েই তারা সামনে সোজা রাস্তা পেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। যাকে বলে একেবারে উন্মাদের মতো ছোটা। মনে হল পথে ভ্রমণার্থীদের সংখ্যাই বেশি। অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষিত হল। তাদের এভাবে উন্মাদের মতো ছুটতে দেখে কেউ এতটুকুও অবাক হল না।

ছুটতে ছুটতে বাদ্যকর চারজনেরই কেমন সন্দেহ হল ক্যালিস্টার মুনবার বুঝি তাদের ওপর কড়া নজর রেখে চলেছে।

তারা উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে ফার্স্ট এভিনিউতে একটা রেস্টুরেন্ট দেখে ঝটপট ভেতরে ঢুকে গেল। আহারন্তে তারা বিল মেটাতে যাবে ঠিক সে মুহূর্তেই পিছনর থেকে

www.pathagar.com

কার যেন কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, 'ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের কিছুই দেবার দরকার নেই।

চার বাদ্যকর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে ক্যালিস্টার মুনবার দাঁড়িয়ে।

ব্যস, যন্ত্রচালিতের মতো চার বাদ্যকর চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্রোধোন্মত্ত জর্ন গর্জে উঠল, 'বাছাধন, এতক্ষণে তোমাকে বাগে পেয়েছি! বদলা নিয়ে ছাড়ব! সুদে আসলে আদায় করে ছাড়ব। তোমার গর্দান নিয়ে—'

'তার চেয়ে বরং বলুন, বিপরীত কাজই করবেন। কোটের পকেট থেকে চুরুট বের করে অগ্নিসংযোগ করলেন। একগাল ধোঁয়া ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে শুরু করলেন নিজের অত্যাশ্চর্য অবিশ্বাস্য কাহিনী—

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমার নাম তো আপনারা আগেই জেনেছেন। এ দ্বীপের কলা বিভাগের অধ্যক্ষ আমি। ছবি আঁকা ও মূর্তি তৈরি প্রভৃতি ব্যাপার স্যাপার নিয়ে চর্চায় লিপ্ত থাকাই আমার কর্তব্য। আমি কেবল বাজনার ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব। যন্ত্রসংগীত শুনে শুনে দ্বীপের মানুষগুলোর কান ঝালাপালা হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে। ধ্যুৎ, ফোনোগ্রাফের বাজনাকে আবার বাজানোর পর্যায়ে ফেলা যায় নাকি!'

'তাজা মাছ আর কৌটার শুঁটকি মাছের মধ্যে যে পার্থক্য, কানে শোনা আর চোখে দেখা বাজনার সঙ্গে ফোনোগ্রাফের একই পার্থক্য।' বাদ্যকর ইভারনেস বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলে উঠল।

আমাদের ফোনোগ্রাফের নামকরণ করেছি 'থিয়েট্রোফোম'। সে যে কী জিনিস আপনারা অনুমানও করতে পারছেন না সাহেব! ইউরোপ বা আমেরিকার যে-কোনো মঞ্চে বসে বাজনা বাজান আমাদের 'ক্যাসিনো' এখানে বসে হুবহু তাই শোনাভে। ম্যাডেনলিন উপসাগরে ডুবোজাহাজের একটা প্রান্ত রক্ষিত আছে। আর প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বিভিন্ন জায়গায় বয়ার মাধ্যমে সে তারের মুখ ভাসিয়ে রাখা আছে। যে-কোনো একটা তারের মুখের সঙ্গে আমাদের তারের সংযোগ সাধন করে আমরা আপনাদের বাজনা দিব্যি শুনতে পাই। আর বাজনার তালে তালে আমাদের করতালি-ধ্বনি ওই ডুবোতারের মাধ্যমেই আপনাদের মঞ্চে পাঠিয়ে দেই। কিন্তু তারবাহিত বাজনা যন্ত্রের মাধ্যমে শুনে শুনে মিলিয়ার্ড শহরের মানুষগুলোর অভক্তি ধরে গেছে। তাই তো আপনাদের চার বন্ধুর বাজনা শুনতে ও চাক্ষুষ করার জন্য তারা উদগ্রীব। আপনারাই প্রথম এখানে তাদের বাজনা শোনাতে এলেন। তবে বলপূর্বক অবশ্যই নয়।' কথা বলতে বলতে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে এবার বলল, 'বারো মাসের কন্ট্রাক্ট ফর্ম। চারজনই স্বাক্ষর করলেই ল্যাটা চুকে যাবে। ঠিক বারোমাস পরে এ-দ্বীপটা ম্যাডেলিন উপসাগরে হাজির হবে। ব্যস, সেখান থেকে আপনারা সানডিয়েগোতে চলে যাবেন। ভালো কথা, আপনাদের দক্ষিণার ব্যাপারটাও কন্ট্রাক্ট ফর্মে উল্লেখ করা আছে-বারো মাসে মাথাপিছু দু লক্ষ ডলার। তিন মাসের অর্থ অগ্রিম হিসেবে পেয়ে যাবেন। কণ্ঠস্বরে বেশ একটু উষ্মা প্রকাশ করেই জর্ন বলে উঠল, 'আরে সাহেব, এখানকার জিনিসপত্রের দাম যেমন আকাশছোঁয়া তাতে তো আপনার ডলারগুলো খইয়ের মতো উড়ে যাবে!'

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে ক্যালিস্টার মুনবার বলে উঠলেন, 'সাহেব, কী যে বলেন, এখানে আপনাদের অর্থ ব্যয় করতে দেয়া হবে ভেবেছেন! ভাগ্য ভালো যে, আপনাদের কাছে পেয়েছি।'

www.pathagar.com

চার বাদ্যকর বন্ধুর রাগ-দ্বেষ মুহূর্তের মধ্যে কর্পূরের মতো উবে গেল। সবার ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে দেখা দিল হাসির প্রলেপ। এরপর আর কারোর ভেতরে ক্ষোভের লেশমাত্র থাকারও কথা নয়।

বৈদ্যুতিক হরফে চার বাদ্যকর বন্ধুর অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা হল। প্রতি টিকিটের দাম দুশো ডলার। তাও টিকিট পাওয়া দুষ্কর। হবে নাই বা কেন? আসন সংখ্যা যে মাত্র একশো। বাস্তবিকই থিয়েট্রোফোম আর ফোনোগ্রাফ মানুষের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। নইলে এত দামের টিকিট নিয়ে এমন কাড়াকাড়ি পড়ে কখনো। চার বাদ্যকরের প্রাপ্য মিটিয়েও আইল্যান্ড কোম্পানির প্রচুর লাভ থেকে গেল।

সেটা ছিল ১১ জুন। চার বাদ্যকর সেদিনই প্রথম শহরবাসীদের বাজনা শোনাল। বাজনা শোনার জন্য গভর্নরও ক্যাসিনোতে হাজির হয়েছিলেন। ফার্স্ট এভিনিউর দুধারে দলে দলে কাতারে কাতারে কৌতূহলী মানুষ তাদের একবারটি চোখে দেখে জীবন সার্থক করার জন্য ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল।

৯ জুলাই। সেদিনই স্যান্ডউইচ আইল্যান্ডের আসল রূপ চোখে পড়ল। সশস্ত্র সৈন্যসামন্ত নিয়ে কর্নেল স্টুয়ার্ট তৈরি। চলন্ত দ্বীপের সর্বত্র হৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। দ্বীপটা ওয়াহু থেকে প্রায় একশো গজ দূরে থমকে দাঁড়িয়ে রইল। এটা ইতিপূর্বে আরো একবার হনলুলুতে এসেছিল। এবার এখানে চলন্ত দ্বীপটা দশ দিন অবস্থান করল। দ্বীপের ধনকুবের অধিবাসীরা দ্বীপের বাইরে গিয়ে আনন্দ স্ফূর্তি রঙ্গ তামাশা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। স্থলভূমি থেকে নৌকো চেপে কাতারে কাতারে কৌতূহলী মানুষ দ্বীপে উঠে আসার জন্য এগিয়ে এল। কাস্টম পুলিশ পথ রুখে দাঁড়াল, কাউকেই ওপরে উঠতে দিল না।

ঠিক তখনই বিচিত্র ধরনের একটা নৌকাকে দেখা গেল। দ্বীপের চারদিকে সেটা চক্কর মেরে বেড়াচ্ছে। বারোজন মাঝিমাল্লা মিলে ছোট্ট নৌকাটাকে অনবরত চালিয়ে নিয়ে চলেছে। নৌকার প্রধান মাঝি যেন অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে বারবার দ্বীপটাকে দেখেছে। দ্বীপের বন্দোবস্তের দিকেই ছিল তার কড়া নজর। রহস্যজনক নৌকা। নৌকার লোকগুলোর হাবভাব তেমন সুবিধার নয় বুঝেও কেউ সেটাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার মনে করল না।

একমাত্র ধনকুবেররাই স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডে থাকে।

ধনীদের মধ্যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে জেম ট্যাঙ্কারডন। কিছুসংখ্যক অন্যান্য বিত্তবান তাকে সমর্থন করছে। তাদের বক্তব্য, এমন সুন্দর একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বৃথা যাচ্ছে। অহেতুক সাগরের বুকে চক্কর মারছে। তার চেয়ে বরং মাল আমদানি রপ্তানি করলে প্রচুর অর্থাগম হত। জেম ট্যাঙ্কারডনের জোয়ান ছেলের নাম ওয়াল্টার ট্যাঙ্কারডন।

ন্যাট কোভারলি তেলের কারবারি না হলেও ধনসম্পদের দিক থেকে ট্যাঙ্কারডন থেকে কোনো অংশে কমতি নয়। শিল্প ও ব্যাঙ্ক ব্যবসা তার অর্থাগমের উৎস। তবে তার বক্তব্য হচ্ছে, হাতে প্রচুর ধনসম্পদ এসে যাওয়ার পর অর্থোপার্জনের লালসা ত্যাগ করাই ভালো। ধনকুবের ন্যাট কোভারলির ডায়না নামে বছর বিশের এক মেয়ে আছে। রূপে গুণে অনন্যা। তবে সে ছাড়া আর দুটো মেয়েও আছে। ডায়না বড়। দ্বীপের যুবকরা তার এক টুকরো মুচকি হাসি দেখার জন্য পাগল। আর কোনোক্রমে তার সঙ্গে যদি কথা বলতে পারে তবে যেন আকাশের চাঁদকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেল।

www.pathagar.com

দ্বীপের অধিবাসীদের অনেকেরই ধারণা, ওয়াল্টার ট্যাঙ্কারডনের সঙ্গে রূপসী যুবতী ডায়নার বিয়ে হলে চমৎকার মানাত। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? তারা উভয়ে উভয়কে মনে মনে কামনা করলেও আজ পর্যন্ত বাক্যালাপ পর্যন্তও হয় নি। কাছে আসতে পর্যন্ত সাহসে কুলোয় নি। দূর থেকে একে অন্যকে দেখাই সার।

কয়েকদিন পর দ্বীপ জুড়ে গানবাজনা আর আনন্দ স্ফূর্তির জোয়ার বয়ে চলল। দ্বীপের বাসিন্দারা কেন এমন অনাবিল আনন্দে মেতেছে? কারণ একটাই—সেদিন রাত্রি দশটা পঁয়ত্রিশ চলন্ত নিরক্ষবৃত্ত অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে। এ কাল্পনিক রেখাটাই ভূগোলককে সমদ্বিখণ্ডিত করেছে। দ্বীপের কিনারা ঘেঁসে একটা কামান বসানো হয়েছে। একটা বৈদ্যুতিক বোতাম তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আগেভাগেই ঠিক করে রাখা হয়েছে শহরের সবচেয়ে প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ঘড়িতে ঠিক দশটা পঁয়ত্রিশ বাজলে বোতাম টিপে তূর্যধ্বনি করবে।

সমস্যা কামানের বোতাম টেপার ব্যাপারটা নিয়েই জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হল। বোতাম টেপার সময় হতেই দুজনেই বোতামের দিকে হাত এগিয়ে দিলেন। ব্যাস, তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই বিপরীত দিক থেকে সমুদ্রের বুকে বিকটস্বরে কামান গর্জে উঠল। পরমুহূর্তেই বন্দর থেকে টেলিগ্রাম এল। দ্বীপ থেকে দূরে একটা জাহাজ ডুবে যাচ্ছে। কামান দেগে সাহায্য প্রার্থনা করছে। ব্যাস, স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড থেকে একটা লঞ্চ ছুটে গেল ডুবন্ত জাহাজটার দিকে। হৈ হট্টগোলের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড নিরক্ষবৃত্ত পেরিয়ে গেল। চলন্ত দ্বীপে লঞ্চটা সে জাহাজটার অসহায় মানুষগুলোকে নিয়ে দ্বীপে ফিরে এল। সবাই জাহাজ ছাড়তে না ছাড়তেই জাহাজটা সমুদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল।

রহস্যজনক যে মালয় নৌকাটাকে স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জে দ্বীপটাকে চক্কর মারতে দেখা গিয়েছিল সেটা এইমাত্র ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্রের বুকে তলিয়ে গেল। নৌকার লোকগুলো কোনোরকমে সাঁতরে চলন্ত দ্বীপে উঠে আসতে পারল।

এদিকে কোন্দল নতুন রূপ নিল। লোকের মুখে মুখে ঘুরছে, লারবোর্ডের ধনকুবেররা শুয়োরের মাংসের কারখানা খুলতে চায়। শুয়োর কেটে লবণ মাখিয়ে টাটকা রেখে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে আগ্রহী।

ডুবে যাওয়া জাহাজটার ক্যাপ্টেন স্যারোল এবং তাঁর মালয় লস্কররা স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের গুরুত্বপূর্ণ ও দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। তাদের গতিবিধি দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন ভেতরে ভেতরে কিসের মতলব এঁটে চলেছে। এখানে যে-সব জিনিস দেখছে সবকিছু সম্বন্ধে পাকা ধারণা করে নিতেই তারা অত্যুগ্র আগ্রহী।

বাদ্যকরদের হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার গোড়ার দিকে ব্যাপারটা নিয়ে আমেরিকার মানুষগুলো দুশ্চিন্তায় পড়েছিল। পরে অবশ্য খবরটা কানাঘুষোর মাধ্যমে প্রচার হয়ে যাওয়ার উদ্বেগের অবসান ঘটেছে। বাদ্যকররাও ফরাসি দেশের বন্ধুবনান্ধবদের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। এতেও পুরো ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেছে।

পোসোতু দ্বীপপুঞ্জ প্রায় ৭০০ ছোট বড় দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। কমাডোর ঠিক করলেন, দ্বীপপুঞ্জের মাঝখান দিয়ে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডকে নিয়ে যাবেন। কাজটা খুবই ঝুঁকির, বিপদ পায়ে পায়ে। দ্বীপের লোহার কাঠামো চোরা পাহাড়ে লেগে ঘায়েল হলেই সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

এখানকার সমুদ্র সম্বন্ধে কমাডোরের ধারণা পাকা। ছোট ছোট দ্বীপগুলোকে সতর্কতার সঙ্গে পাশ কাটিয়ে চলন্ত দ্বীপটাকে নির্বিবাদে এগিয়ে নিয়ে চললেন।

স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড সাতাশে সেপ্টেম্বর অ্যানা নামে একটা দ্বীপ ঘেঁসে যাবার সময় দাঁড়িয়ে পড়ল। হুড়মুড় করে অনেকেই নেমে গেল দ্বীপটাতে। দ্বীপের মাটিতে আনন্দে লাফালাফি ছুটোছুটি করল অনেকক্ষণ ধরে। বাদ্যকররা দ্বীপটার নরম সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে থেকে আনন্দ উপভোগ করল।

* * *

গতবারের মতো এবারও তাহিতি দ্বীপপুঞ্জের পাপেতি দ্বীপে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড দাঁড়াল। কোভারলি আর ট্যাঙ্কারডন পরিবারের বাড়ি এখানেই। ফলে অন্যান্যদের সঙ্গে তারাও পাপেতি দ্বীপে নেমে গেল। কয়েকদিন তারা এখানেই কাটাবে।

কোভারলির বাড়িতে গানবাজনার মজলিশ পুরোদমে জমে উঠেছে। মিসেস কোভারলি চমৎকার পিয়ানো বাজালেন। ডায়না উদাত্ত কণ্ঠে গান জুড়ল। তার সঙ্গে ইভারনেসও গলা মেলাল।

পিঞ্চিনাট বলল, 'আজ সকালে একটা ব্যাপার নজরে পড়ল। ওয়াল্টারকে দেখলাম, এবাড়ির আশপাশ দিয়ে ঘুরঘুর করছে।'

১৫ নভেম্বর। সেদিন চলন্ত দ্বীপে ভারী একটা ঘটনা ঘটে গেল। তাহিতির রাজা রানীকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য পার্ক আর টাউন হলে খানাপিনা ও নাচগানের আয়োজন করল ক্যালিস্টার মুনবার। খানাপিনা, নাচগান, বাজি পোড়ানো আরও কত কী মজার ব্যাপার যে হল তার শেষ নেই।

তাহিতি দ্বীপে দুদিন কাটানোর পর স্টান্ডার্ড আইল্যান্ড আবার যাত্রা শুরু করল। এবার তার গতি দক্ষিণ পশ্চিম কোণ বরাবর।

স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এবার কুক দ্বীপপুঞ্জে হাজির হল। ক্যালিস্টার মুনবার মহা ধড়িবাজ লোক! ওয়াল্টার আর ডায়ানাকে পরস্পরের কাছে এনে দিয়ে নিজে টুক করে সরে পড়লেন। চলে গেলেন আড়ালে। তারই গোপন মতলব চিরশত্রু পরিবার দুটোকে কাছাকাছি এনে দিল। তাঁদের ছেলে আর বড় মেয়েকে কেন্দ্র করেই তার পক্ষে এমন একটা কাজকে বাস্তবায়িত করতে অসুবিধা হয় নি।

এবার থেকে ডায়না বা তার মা মিসেস কোভারলির মুখোমুখি হলেই বিনম্র বিনয়ের সঙ্গে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানায়। মা মেয়েও মুচকি হেসে অভিবাদনের জবাব দেয়।

এবার উভয় পক্ষই ছেলে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তৎপর হল। ডায়না মেয়ে হিসেবেও যথেষ্ট ভালই। রূপসৌন্দর্যও অতুলনীয়। তার ওপর অর্থকড়ির দিক থেকেও জেম ট্যাঙ্কারডন এবং কোভারলি কেউই কোনো অংশে কমতি নয়। গোড়ার দিকে অবশ্য উভয় পরিবারই বিয়ের ব্যাপারটায় একটু আধটু অমত করেছিল। দীর্ঘদিনের বিবাদ বিসম্বাদই এর একমাত্র কারণ। শেষপর্যন্ত পাত্রপাত্রীর আগ্রহের কাছে তাদের বাবা মায়ের ওজর আপত্তি ধোপে টিকল না।

এদিকে নতুন দ্বীপটাকে ঘুরে ফিরে দেখতে গিয়ে বাদ্যকরদের সময় দ্রুত কেটে যেতে লাগল।

www.pathagar.com

স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড কোম্পানির আলোচনা-সভা বসল। আলোচ্য বিষয়—চলন্ত দ্বীপের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ। এবার নতুন পথ ধরে এগোবে, নাকি পুরনো পথই ধরবে?

ব্যাপারটা নিয়ে ক্যাপ্টেন স্যারোল খুবই ভাবিত। কারণ, পুরনো পথ ধরলে কয়েক মাসের মধ্যেই চলন্ত দ্বীপটা নিউ হেব্রাইড দ্বীপে পৌছে যাবে। ডুবে যাওয়া জাহাজের লোকজনদের নিয়ে সে দ্বীপে ওঠার পর তাকে কথা দেওয়া হয়েছিল তাদের নিউ হেব্রাইড দ্বীপে পৌছে দেবে। কিন্তু অন্য পথ ধরলে পথে নিউ হেব্রাইড দ্বীপ পড়বে না। তার ভাবনাটা এখানেই। তাইতো কাপ্তেন স্যারোলকে নিরবচ্ছিন্ন উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটাতে হচ্ছে।

শেষপর্যন্ত তার উৎকণ্ঠার অবসান ঘটল। আশ্বস্ত হল। দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হল স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডকে পুরনো পথেই নিয়ে যাওয়া হবে। অতএব নিউ হেব্রাইড দ্বীপ হয়েই যাচ্ছে।

বিনা পয়সায় এমন সুন্দর একটা দ্বীপে থাকার, ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পেয়েও কাপ্তেন স্যারোল এতদিন ওই একটা ব্যাপারেই মনমরা হয়ে কাটিয়েছে। আজ তার মুখে দেখা দিল হাসির রেখা।

* * *

কাপ্তেন স্যারোল কি সত্যই বিপদে পড়ে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডে আশ্রয় নিয়েছে?

কে এই কাপ্তেন স্যারোল? কীই বা তার প্রকৃত পরিচয়? না, বিপদে পড়ে অবশ্যই নয়। বরং বলা চলে ইচ্ছাকৃতভাবে বিপদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কাপ্তেন স্যারোল আসলে একজন মালয় জলদস্যু। উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই সে চলন্ত-দ্বীপে উঠে এসেছে। ইতিপূর্বে একাধিক বার প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম অঞ্চলে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে। জাহাজ লুঠ করে বিস্তর ধন সম্পদ হাতিয়েছে। আর তার দুই মাস্তুলের জাহাজটা নিয়ে চলন্ত দ্বীপটাকে কেন্দ্র করে অহেতুক সে রহস্যজনকভাবে বার বার চক্কর মারে নি। বরং বলা চলে তার এ কাজের মধ্যে গভীর চক্রান্ত রয়েছে। কাজ করে চলেছে পরিকল্পনা মাপিক রীতিমতো ছক কষে। চলন্ত দ্বীপটার চারদিকে চক্কর মেরে দ্বীপের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কতখানি জোরদার যাচাই করে নিয়েছে। তারপর যখন কোভারলি এবং ট্যাঙ্কারডন কামানের বোতাম টেপার ব্যাপার নিয়ে কোন্দল শুরু করে দেয় ঠিক তখনই কাপ্তেন স্যারোল তার জাহাজ থেকে দুম করে কামান দেগে ফেলল। ব্যস, এবার পরিকল্পনামাফিক জাহাজটাকে ডুবিয়ে দেয়ার বন্দোবস্ত করল। তারপরের ব্যাপারটাও পরিকল্পনা মাফিকই হল। চলন্ত দ্বীপ থেকে নৌকা ছুটে গিয়ে তাকে এবং তার সাকরেদদের দ্বীপে নিয়ে এল। এমন পরিস্থিতিতে তার গোপন চক্রান্ত সম্বন্ধে কারো পক্ষে কিছুমাত্রও সন্দেহ করা কি সম্ভব, নাকি উচিত?

জলদস্যু স্যারোলের ষড়যন্ত্রের প্রথম পর্ব নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। না, এ-পথ অবলম্বন করা ছাড়া তার আর কোনো গত্যন্তরই ছিল না।

এবার ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় পর্বের কাজ জলদস্যু স্যারোল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সম্পন্ন করে চলেছে। এখন তার প্রথম ও প্রধান কাজ স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো সেম্বন্দে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেনে নেয়া। তারপর? ষড়যন্ত্রের তৃতীয় বা শেষপর্ব ধ্বংস—ধ্বংসের কাজে মেতে ওঠা। আর তা সে সম্পন্ন করতে চাইছে হেব্রাইড

দ্বীপপুঞ্জে। চলন্ত দ্বীপটাকে অসভ্য জঙ্গলি আর ভয়ঙ্কর হিংস্র মানুষগুলো হুড়মুড় করে চলন্ত দ্বীপে উঠে নির্বিচারে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়বে। দেখতে দেখতে দ্বীপবাসীদের কচুকাটা করে সাবাড় করে দেবে। দ্বীপের ধনদৌলত লুঠ হয়ে যাবে চোখের পলকে। চলমান কুবেরের ধন ভাণ্ডার লুঠ করার এমন চমৎকার পরিকল্পনা এর আগে কারো মগজে আসে নি।

জলদস্যু স্যারোল চারমাস ধরে দ্বীপে অবস্থান করে সংগোপনে তার পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেয়ার মতলব ভাঁজতে লাগল।

২৬ ডিসেম্বর। সেদিন চলন্ত দ্বীপ স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের খবরের কাগজের পাতায় চমৎকার একটা খবর ছাপা হল। ম্যালকালির রাজা নাকি টাউন হয়ে গিয়ে দ্বীপের গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এ যে একেবারেই অভিশ্বাস্য ব্যাপার। যিনি মুহূর্তের জন্যও বাড়ির ত্রিসীমানা ছেড়ে বেরোন না তিনিই কি না গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছেন !

এবার আসল ব্যাপারটা জানা গেল। ম্যালকালির রাজা গভর্নরের সঙ্গে দেখা করে মানমন্দিরের জ্যোতির্বিদের চাকরিটা পাকা করেছেন।

রাজার চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে সবাই খুশিই হয়েছে। মানুষ হিসেবে তাঁর তুলনাই হয় না। ইউরোপের ছোট্ট একটা ভূখণ্ডের অধিপতি ছিলেন তিনি। তাঁর কোনো সন্তানসন্ততি হয় নি।

রাজার দূরদর্শিতাও অতুলনীয়। তিনি অনেক আগেই যেন দিব্যচোখে দেখতে পেয়েছিলেন দেশে রাজার যুগের অবসান হতে চলেছে। এবার প্রজারাই হয়ে উঠবে দেশের সর্বময় কর্তা। তাই সময় থাকতে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলেন।

হাসিমুখে প্রজাদের হাতে রাজ্য রাজধানী তুলে দিয়ে রানীর হাত ধরে রাজ্য ছেড়ে চলে এলেন, রক্তপাতের তো প্রশ্নই উঠে না।

বাদ্যকর চারজান খেয়ারের বশীভূত। মাথায় একবার যে খেয়াল চাপে অবলীলাক্রমে তাই তারা করে বসবে। সেদিন খেয়ালের শিকার হয়ে তারা বৃদ্ধা রানীকে বাজনা শোনাতে গেল।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে বাদ্যকররা রাজারর সঙ্গে দেখা করল। চেহারা ও পোশাক কোনোদিন থেকেই রাজাসুলভ জৌলুস নেই। যেন কোন তপস্বীর মুখোমুখি তারা দাঁড়িয়ে। রানীও গাঢ় রঙের একটা চাদর মুড়ি দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জানালায় বসে।

রাজা একগাল হেসে বাদ্যকরদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন, 'একটা কথা কি জানেন? চেম্বার মিউজিক বড়ই সূক্ষ্ম বাজনা। একদঙ্গল লোকের হৈ হট্টগোলের মধ্যে বসে উপভোগ করবার মতো বাজনা এটা নয়।'

বাদ্যকর চারজান বাড়ি বয়ে বাজনা শোনাতে এসেছে শুনে রাজা ও রানী যারপরনাই খুশি হলেন।

বাদ্যকর চারজন এবার মনপ্রাণ ঢেলে বাজনা বাজাতে শুরু করল। মনের সুখে দীর্ঘ সময় ধরে বাজনা বাজিয়েও যেন তারা পুরোপুরি তৃপ্ত হতে পারল না।

www.pathagar.com

৩০ ডিসেম্বর। সেদিন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাতের অন্ধকার নামতে না নামতেই নতুনতর এক হাঙ্গামা দেখা দিল। কেমন যেন একটা রহস্যজনক চাপা শব্দ আকাশের এক কোণ থেকে ভেসে আসতে লাগল। দীর্ঘসময় ধরে একটু বাদে বাদে রহস্যজনক শব্দ চলন্ত দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার করল। একসময় ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। সবাই নিঃসন্দেহ হল, কামান দাগা হচ্ছে। রাত দুটোর কাছাকাছি বিকট শব্দ ভেসে এর। মনে হল খুবই কাছে কোথাও শক্তিশালী বোমা ফাটানো হচ্ছে।

সকাল হলেও কামানের গর্জন বন্ধ হল না, কমোডোর সিসকো মানমন্দিরের শীর্ষে উঠে ব্যাপারটা সম্বন্ধে ধারণা নেয়ার চেষ্টা করলেন। নিষ্ফল প্রয়াস। লক্ষণীয় কিছুই তাঁর নজরে পড়ল না। রাত হলে পরিস্থিতি নতুনতর রূপ নিল। বুক-কাঁপানো গর্জনের সঙ্গে আগুনের হল্কা ও জমাটবাঁধা কালো ধোঁয়া বাতাসে ভর দিয়ে চলন্ত দ্বীপে ভাসতে লাগল।

দ্বীপবাসীরা বিভিন্ন প্রান্তে জমায়েত হয়ে রহস্য সঞ্চারকারী ব্যাপারটা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে সাধ্যমতো চেষ্টায় মগ্ন হল। কিন্তু এ পর্যন্ত আসল ব্যাপারটার ধারে কাছেও কারো কল্পনা পৌঁছতে পারল না।

চলন্ত দ্বীপের এতগুলো মুনষের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাতে ম্যালকালির রাজা এবার তৎপর হলেন। তিনি রহস্যটা ভেদ করতে গিয়ে মন্তব্য করলেন, কোথাও না কোথাও আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত করছে। তারই বিকট আওয়াজ ভেসে আসছে।

হ্যাঁ, রাজার কথাটা বিশ্বাসযোগ্যই বটে। টোঙ্গা দ্বীপের এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ডের কথা কারোরই অজানা নয়। কাকাতোয়া আর তুফায়ার ভয়ঙ্কর কাণ্ডের কথাও জানা নেই এমন লোক খুব কমই মেলে।

সকাল হল। দিনভর মুহুর্মুহু বুক কাঁপানো গর্জন আর অগ্নিবৃষ্টি অব্যাহতই রইল। বিকেল চারটের কাছাকাছি দ্বীপময় নেমে এল জমাটবাঁধা অন্ধকার।

রাত তিনটা বাজল। আবছা অন্ধকারে হারা উদ্দেশ্যে এগোতে এগোতে আচমকা গিয়ে অতিকায় কোনো বস্তুর গায়ে মারল সজোরে এক ধাক্কা।

গভর্নর ছুটে গিয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে খোঁজ নিলেন। স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড বিশালায়তন একটা জাহাজের গায়ে ধাক্কা মেরেছে। বহুভাবে সতর্ক করেও জাহাজটাকে রক্ষা করা যায় নি। চলন্ত দ্বীপের গায়ে কাঁটার আঁচড়ও লাগে নি। আর এস জাহাজটার যে কী সর্বনাশ হয়েছে তার কিছুই জানা সম্ভব হল না।

রাত গিয়ে আবার সকাল হল। নববর্ষের সকাল।

স্ট্যান্ডার্ড দ্বীপ থেকে নৌকা নামিয়ে সাগরের বুকে জাহাজটাকে বের করার জন্য চিরুনি তল্লাশি চালানো হল। না, সেটার কোনো হদিসই পাওয়া গেল না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। তবু খোঁজাখুঁজির বিরাম নেই। হঠাৎ দূর সমুদ্রের বুকে হাল্কা ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখা গেল। মুহূর্ত কয়েকের মধ্যে চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা জাহাজ। চলন্ত দ্বীপকে লক্ষ করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছে।

এবার ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়ে গেল, অগ্রসরমান জাহাজটা ব্রিটিশ জাহাজ। ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ।

উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে দ্বীপবাসীদের রাত কাটল। সকাল হতে না হতেই যুদ্ধজাহাজটা থেকে একটা নৌকা এসে ভিড়ল চলন্ত দ্বীপের বুকে। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে মাতব্বরগোছের একজন লোক নৌকা থেকে নেমে দ্বীপে উঠে এসে বলল, 'আমার নাম কাপ্তেন টার্নার। জরুরি দরকারে গভর্নরের সঙ্গে এখনই দেখা করতে চাই।'

www.pathagar.com

গভর্নরের মুখোমুখি হতেই কাপ্তেন এক নিশ্বাসে ইয়া লম্বা একটা মাত্র বাক্য উচ্চারণ করল। দাড়ি, কমা ও যদি চিহ্ন প্রভৃতি বালাই নেই। তিন শো শব্দের সমন্বয়ে তার ব্যবহৃত বাক্যটি গঠিত।

কাপ্তেনের মূল বক্তব্য—গতরাত্রে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড একটা ব্রিটিশ মালবাহী জাহাজকে সমুদ্রে তলিয়ে দিয়েছে। জাহাজটায় আলো থাকা সত্ত্বেও তাকে ধাক্কা মেরেছে। তাই ষাট লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করছে। অনাদায়ে বলপূর্বক ক্ষতির অর্থ আদায় করে নেয়া হবে। হুমকিও দিল।

কাপ্তেন টার্নারের বক্তব্যকে সামান্যমাত্রও পাত্তা না দিয়েই গভর্নর জানালেন স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডেও পর্যাপ্ত আলো ছিল। কিন্তু আগ্নেয়গিরির ভস্মচূর্ণ চারদিক ছেয়ে রেখেছিল। তাই পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পায় নি। অতএব ক্ষতিপূরণের কোনো ব্যাপারই এর মধ্যে আসতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা আইল্যান্ড কোম্পানির নির্দেশ ছাড়া তাঁর পক্ষে কোনোরকম দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতিই দেয়া সম্ভব নয়।

কাপ্তেন টার্নার বললেন, 'আমার সাফ কথা শুনে রাখুন, আপনাদের চলন্ত দ্বীপ ভ্রাম্যমাণ যান। এর কোনো নির্দিষ্ট ঠিক ঠিকানা নেই। সমুদ্রের বুকে যে-কোনো সময় এটা ভয়ঙ্কর সব দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে। আপনার হয়ত জানা আছে, বৃটিশরা গোড়া থেকেই এর বিরুদ্ধাচারণ করে আসছে। আর এও জেনে রাখুন, জাহাজকে ধাক্কা মারলে কোনোই ক্ষমা নেই। তারপর এটাকে কোনোমতেই জাহাজের পর্যায়ে ফেলা যায় না। তাই বলছি কি, ক্ষতিপূরণ না দিলে হাঙ্গামা বাঁধবেই।'

গভর্নর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হাঙ্গামা হুজ্জতির কথায় পাত্তা না দিয়ে কাপ্তেন টার্নারকে বিদায় দিলেন।

কাপ্তেন টার্নার রাগে গজগজ করতে করতে চলন্ত দ্বীপ ছেড়ে নৌকায় উঠল। বেলা পোনে দশটায় স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডকে লক্ষ্য করে যুদ্ধজাহাজ থেকে কামান দাগা হল। একটা গোলা ছিটকে এসে দ্বীপের কাছাকাছি সমুদ্রের বুকে আছাড় খেয়ে পড়ল।

প্রথম—হ্যাঁ, এই প্রথম ন্যাট কোভারলি আর জেম ট্যাঙ্কারডন একমত হতে পারলেন। অনন্যোপায় হয়ে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজের কাপ্তেন টার্নারকে ডেকে আনা হল। ক্ষতিপূরণের পাই পয়সা পর্যন্ত বুঝে নিয়ে টার্নার সমুদ্রের বুকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড এগিয়ে চলল তার নির্দিষ্ট পথে।

* * *

পথের দুধারে ছোট বড় বহু দ্বীপকে পাশ কাটিয়ে বহু দ্বীপে থামতে থামতে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড এগিয়ে চলেছে তো চলেইছে। তার এ চলার শেষ কোথায়, কে জানে? একসময় বেশ বড়সড় দ্বীপের গায়ে চলন্ত দ্বীপটা ভিড়ল।

সকাল হল। জলদস্যু স্যারোল গভর্নরের কাছে হাজির হল। নাকে কান্না কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমার শতেকখানেক মালয়বন্ধু এ-দ্বীপে আটকা পড়ে রয়েছে। কোনোরকমে জানে টিকে রয়েছে। অনুগ্রহ করে তাদের যদি এ দ্বীপে তুলে নেয়ার হুকুম দেন তবে খুবই উপকৃত হব। বিপদগ্রস্ত অসহায় মানুষগুলোর জীবনরক্ষা হতে পারে। তাছাড়া মাত্র পাঁচ সপ্তাহ পরেই তো স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড নিউ হেব্রাইডে অ্যারোম্যানগাতে পৌঁছে যাচ্ছে। ব্যস, সবাই সেখানে নেমে পড়বে। মাত্র তো কয়েকটা দিনের ব্যাপার—'

www.pathagar.com

গভর্নর তার প্রার্থনাটাকে তলিয়ে দেখার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করলেন না। তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, এত করে যখন বলছেন তবে তুলেই নিন।'

গভর্নর ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারলেন না, তাঁর এ অনুমতিদানের মাধ্যমে কী সর্বনাশই না করে ফেলেছেন। কুচক্রী জলদস্যু স্যারোল অচিরেই চলন্ত দ্বীপের বুকে রক্তবন্যা বইয়ে দেয়ার জন্য তলে তলে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

টোঙ্গা ট্যাবো দ্বীপে একদিন ভারী মজার একটা ঘটনা ঘটে গেল। আধা জঙ্গলিরা কোমর ধরাধরি করে মনের সুখে নাচের আসর বসিয়েছে। মজার ঠিক বলা চলে না, বরং অত্যাশ্চর্য কাণ্ডটা এবারই ঘটে গেল। নাচ থামিয়ে জঙ্গীদের একজন গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠল, 'ট্যাবো—ট্যাবো—ট্যাবো!' ব্যস, পরমুহূর্তেই জর্ন-এর চেলোটা কেড়ে নিয়ে কয়েকজনের মাথার ওপর দিয়ে একলাফ দিল। তার পরেই 'ট্যাবো— ট্যাবো—ট্যাবো!' রব করে চিল্লাতে চিল্লাতে গভীর জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

'ট্যাবো' পলিনেশিয়ান শব্দ। এর অর্থ 'পবিত্র বস্তু'। সবার সামনে এর ব্যবহার অসঙ্গত।

বাদ্যযন্ত্র চেলো নিয়ে ভেগে যাবে মামদোবাজি নাকি? জর্ন তার পিছনে ধাওয়া করল। চোখের পলকে সে একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল।

ক্রোধোন্মত্ত জর্ন গভর্নরের শরণাপন্ন হল। টোঙ্গদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তাব দিল। ইতিহাসে নজির আছে, চেলোর চেয়েও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুর জন্য যুদ্ধ হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে যুদ্ধ না হওয়ারই বা কী কারণ থাকতে পারে?

চলন্ত দ্বীপের কর্তৃপক্ষ চেষ্টাচরিত্র করে জঙ্গলিদের সর্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জর্নকে তার বাদ্যযন্ত্র চেলোটা ফিরিয়ে দিলেন। ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধ উভয় পক্ষের বোঝাপড়ার মাধ্যমে এড়ানো গেল।

ব্যাপারটার ফয়সালা কিন্তু এত সহজে হল না। ট্যাবো ভাঙার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ চলন্ত দ্বীপের কর্তৃপক্ষকে কিছু অনুষ্ঠান করতেই হল। তবে তেমন কিছু নয়। একপাল শুয়োরকে জবাই করে রান্না করা হল। রান্না করা মাংস রাখা হল একটা পাথরভর্তি গর্তে। সবাই মৌজ করে খেল। জঙ্গলিরা খুশিতে ডগমগ হয়ে ট্যাবো তুলে নিল।

এতে জর্ন মোটেই খুশি হতে পারল না।

আইল্যান্ডের গতি এবার ফিজি দ্বীপপুঞ্জের অভিমুখে।

জলদস্যু স্যারোল তার একশো জন সাগরেদকে চলন্ত দ্বীপে তুলে নিয়েছে। চলন্ত দ্বীপের দুধারের বন্দর দুটোতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গির্জার বুড়ো পাদরী একশো জন মালয়ীকে খ্রিস্টান করে নেয়ার জন্য উৎসাহী হয়ে গভর্নরের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি কিছুতেই মত দিলেন না।

চলন্ত দ্বীপবাসীরা তো ঘুণাক্ষরেও টের পাচ্ছে না, যাদের খাইয়ে দাইয়ে গায়ে গতরে চর্বি জমিয়ে তুলেছে তারাই বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়ার সুযোগের সন্ধানে রয়েছে। তারা যে প্রশান্ত মহাসাগরের ভয়ঙ্কর জলদস্যু। মানুষের রক্তের জন্য আট প্রহর ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়।

১৫ জানুয়ারি। স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে। বিকেলের দিকে সমুদ্রের বুকে, দক্ষিণ পূর্ব কোণে অতিকায় একটা জাহাজ দেখা গেল। জাহাজের মাথায়

www.pathagar.com

পাতাকা না থাকায় কোন দেশের জাহাজ বোঝা গেল না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই জাহাজটা উধাও হয়ে গেল।

রাত এগারোটা। ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেলল। চাঁদের আলো যেটুকু পাওয়া যাচ্ছিল মেঘের দৌলতে তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

রাত তিনটে। বেশ কয়েকবার চলন্ত দ্বীপের চারদিক থেকে চাপা গর্জন ভেসে এল।

সকাল হল। শহর জুড়ে আতঙ্কের ছায়া নেমে এল। অত্যাশ্চর্য খবর মুখে মুখে শহরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ল। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠার মতো খবরই বটে।

গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসার মতো ঘটনাই বটে। এ কী অবিশ্বাস্য কাণ্ড! মিলিয়ার্ড শহরে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার এল কোত্থেকে। কিন্তু রাত্রে অন্ধকারে তারা কোত্থেকে এসে হানা দিল! এমন এক নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়ে দিয়ে গেল। তবে কি টোঙ্গা ট্যাবো দ্বীপের গায়ে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড অবস্থান করার সময়ে দ্বীপ থেকে সাঁতরে তারা এসে উঠে গিয়েছিল?'

অদ্ভুত সব খবর আসতে লাগল। মাঠে ময়দানে নাকি দলে দলে সিংহ, বাঘ, চিতা ও বুনো শুয়োর প্রভৃতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে অঞ্চলের লোকজন প্রাণভয়ে ছুটোছুটি দাপাদাপি শুরু করে দিল।

মিলিটারি নামিয়ে দেয়া হল।

সবার মনেই একই প্রশ্ন, এত সব হিংস্র জানোয়ার কোত্থেকে, কীভাবে এসে দ্বীপে জড়ো হয়েছে?

ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা নিয়ে দ্বীপের কর্তৃপক্ষ জরুরি সভা ডাকলেন। গভর্নর রীতিমত চিন্তিত। যে করেই হোক যতশীঘ্র সম্ভব এর একটা বিহিত করতেই হবে।

সভার শেষের দিকে এক ফরাসি ভদ্রলোক আসল ব্যাপারটা প্রকাশ করলেন।

জন্তু জানোয়ারের আসল রহস্যটা হচ্ছে, গতকাল বিকেলে অজানা অচেনা একটা জাহাজের দেখা মিলেছিল। এমনকি তাতে পতাকাও ছিল না যার সাহায্যে বোঝা যেতে পারত কোন দেশের জাহাজ। সেই গোপনে জন্তু জানোয়ারগুলোকে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডে নামিয়ে দিয়ে জাহাজ নিয়ে চম্পট দিয়েছিল।

এ কী রসিকতা, নাকি শত্রুতারই অদ্ভুত একটা পন্থা?

কে? কে এই রহস্যজনক লোক যে চলন্ত দ্বীপটাকে হিংস্র জন্তু জানোয়ারে ভরে ফেলার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে? হ্যাঁ, জানা গেছে, তার নামও জানা গেছে। এক ইংরেজ। জন বুল তার নাম। হতচ্ছাড়া ইংরেজটা প্রথম থেকেই স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের বিরুদ্ধে কলকাঠি নেড়ে চলেছে। এখন সরাসরি শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছে। চলন্ত দ্বীপের লোকজন যাতে প্রাণভয়ে দ্বীপ ছেড়ে পালায় সেই অভিসন্ধিতেই এমন কাজটা করেছে।

ফরাসিদের সঙ্গে ইংরেজদের শত্রুতা আজ প্রথম নয়। ফরাসি ভদ্রলোক বললেন—ইংরেজরা ফরাসিদের প্রতি এমন জঘন্য আচরণ আগেও করেছে। তারা ফ্রান্সের হাতে অ্যানটিলসকে তুলে দেয়ার আগে সেখানে অসংখ্য বিষধর সাপ ছেড়ে দিয়েছিল। যেখানে আগে কোনদিন সাপের চিহ্নও দেখা যায় নি আজ সেখানে বিষধর সাপ কিলবিল করছে।'

সকাল হতে জলদস্যু স্যারোল তার সাগরেদদের নিয়ে দুটো কুমিরকে ঘায়েল করার জন্য আদা জল খেয়ে লেগে পড়ল। অনেক তল্লাশি চালিয়ে দুটো জায়গায় বারোটা ইয়া পেল্লাই কুমিরের দেখা মিলল।

www.pathagar.com

দ্বীপবাসীরা চারদিকে বন্দুক হাতে ছুটোছুটি করতে লাগল। হিংস্র জন্তুগুলো মারাও পড়ল কম না।

ওয়াল্টার একটা বাঘের কবলে পড়ে জান খোয়াতে বসেছিল।

জেম ট্যাঙ্কারডন জখমি ক্রোধোন্মত্ত বাঘটাকে লক্ষ করে গুলি ছুড়ল। ব্যস, চোখের পলকে সেটা তীব্র আর্তনাদ করে শূন্যে এক চক্কর খেল। তারপর মাটিতে পড়ে কয়েকবার আছাড়ি পিছাড়ি করে শেষপর্যন্ত এলিয়ে পড়ল।

কেবল বাঘটাই যে ঘায়েল হল তাই নয়, অভাবনীয় একটা ফলও হল। ন্যাট কোভারলি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসায় তার বাবা জেম ট্যাঙ্কারডনের হাত দুটো চেপে ধরে বারবার ধন্যবাদ জানাতে লাগল। আর এ ঘটনার মাধ্যমেই উভয় পরিবারের দর্ঘিদিনের বিবাদ বিসম্বাদের অবসান ঘটে হৃদ্যতার সম্পার্ক গড়ে উঠল।

বিলিয়ার্ড শহরের যাদুঘরে মরা বাঘটার পেটে খড় ভরে সাজিয়ে রাখা হল।

* * *

স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড কেরো সাগরের বুকের ওপর দিয়ে ধীরমন্থর গতিতে চলতে লাগল। কয়েকদিনের মধ্যেই ঘটে গেল অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা। একদিন ন্যাট কোভারলির বাড়ি জেম ট্যাঙ্কারডন হাজির হলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাছে রূপসী ডায়নাকে পুত্রবধূ করে ঘরে নেয়ার প্রস্তাব রাখলেন। ন্যাট কোভারলিও নিজের মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করেত গিয়ে বললেন, 'আমারও ইচ্ছা আপনার ছেলে ওয়াল্টারকে জামাই হিসেবে পাই।'

উভয়ে সোল্লাসে উভয়ের প্রস্তাবকে স্বাগত জানালো। বিয়ের পাওনাগণ্ডার কথাবার্তাও পাকা হয়ে গেল। ওয়াল্টার ও ডায়না উভয়েই বিশ ডলার করে পাবে। গভর্নরও এতে কম খুশি হলেন না।

ছাব্বিশে জানুয়ারি। স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড ভিটি-লেবু দ্বীপের গায়ে থামল। বাদ্যকর চারজন দ্বীপে নামল। পিঞ্চিনাটের অনেক দিনের শখ সত্যিকারের মানুষখেকো জঙ্গলি দেখে জীবন সার্থক করবে। তারা দ্বীপের কাঠ লতা পাতার ঝুপড়িগুলোতে তন্নতন্ন করে মানুষখেকো হিংস্র মানুষগুলোর খোঁজ করল। কিন্তু ঝুপড়িগুলো চামচিকে, আরশোলা, উইপোকা আর মশা, মাছির ঘাঁটি। এরকম ব্যাপার দেখে তারা চোঁ-চাঁ দৌড় দিল।

* * *

স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডে পাহাড় নেই বলে চলন্ত দ্বীপের বাসিন্দারা ফিজি দ্বীপপুঞ্জের গায়ে পৌছেই হুড়মুড় করে পাহাড় দেখতে ছুটল। ট্যাঙ্কারডন আর কোভারলি পরিবারও ব্যস্ত হয়ে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড থেকে নেমে গেলেন। ওয়াল্টার আর ডায়নাও নতুন কিছু দেখে চোখ ও মনকে তৃপ্ত করার জন্য সবার পিছু নিল। ব্যাপার দেখে ক্যালিস্টার মুনবার বিষণ্ন মনে ভাবতে লাগল, 'সবাই নতুনতর কিছুর জন্য পাগল।' বহুৎ আচ্ছা—স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডে একটা পাহাড় বসিয়ে সবার সাধ পূরণ করব।'

নিছকই একটা সাধারণ পাহাড় বা পর্বত নয়। আগ্নেয়পর্বত। বাইরের দিকটা গড়া হবে অ্যালুমিনিয়াম আর ইস্পাত দিয়ে। ভেতরে রেখে দেয়া হবে তুবড়ি বাজির মশলা।

জলদস্যু স্যারোল ফিজি দ্বীপের পাহাড় দেখতে গেল না। সাকরেদদের নিয়ে চলন্ত দ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো দেখার কাজ সেরে নেয়ার জন্য ব্যস্ত রইল। বাদ্যকর চারজনের সঙ্গেও তার কম ভাব জমে নি।

www.pathagar.com

গভর্নর বাদ্যকরদের ইচ্ছা পূরণ করতে একটা বৈদ্যুতিক লঞ্চের ব্যবস্থা করে দিলেন। সেটায় চেপে তারা রেওয়া নদী ধরে ফিজি দ্বীপপুঞ্জের ভেতরের দিকটা ভালো করে দেখে নেয়ার জন্য রওনা হল।

কিছুদূর যাওয়ার পর লঞ্চের ফিজি পাইলট নদীর ধারে একটা গাছের দিকে বাদ্যকরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর চেষ্টা করল। সেদিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বলল, 'গাছের গুঁড়িতে ওই যে কতগুলো দাগ দেখতে পাচ্ছেন, ওগুলো কী বলতে পারেন? গুঁড়ির গায়ে মানুষ বেঁধে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটার চিহ্ন ওগুলো। যতগুলো দাগ দেখতে পাচ্ছেন ততগুলো মানুষকে কুপিয়ে কাটা হয়েছে। গাছের তলাতেই তাদের ঝলসে খাওয়া হয়েছে। এখানকার জঙ্গলি নরখাদকেরা গরু, শুয়োর বা ভেড়ার মাংসের চেয়ে মানুষের মাংসই বেশি তৃপ্তি করে খায়। তাদের এক সর্দার ছিল রা আন্দ্রেনুদ। সে সারা জীবনে নাকি আট শো বাইশটা মানুষ জবাই করে মাংস খেয়েছিল। কী নৃশংস ব্যাপার। শুনলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়।'

বেলা দশটার কাছাকাছি নাইলিলি গির্জার পাদরির সঙ্গে বাদ্যকরদের দেখা হল। পাদরি সাহেব তাদের পইপই করে সতর্ক করে দিলেন। অসভ্য জঙ্গলিদের বিশ্বাস করলে তাদের হাতে নির্ঘাত জান খোয়াতে হবে।

দুপুরের দিকে সবাই হৈ হৈ করে টেমপু গাঁ দেখতে গেল। গ্রামের সর্দার আগন্তুকদের দেখেই হোঁচট খেয়ে পড়ার জোগাড় হল। গাঁয়ের লোক ধারে কাছে যত ছিল সবাই ধুম্‌ধুম্ করে শুয়ে পড়ল। এ না করলে সর্দারকে নাকি অসম্মান করা হবে।

ফিজি পাইলট আগন্তুকদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে সর্দারকে বলল, 'পরদেশী মেহমানরা তোমাদের গাঁ দেখতে এসেছেন। এঁদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবকিছু দেখালে খুশি হবে।'

সর্দার ওজর আপত্তি করল না। আবার তেমন উৎসাহও প্রদর্শনও করল না। শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে তার তিলমাত্র উৎসাহও নেই। নিঃশব্দে নিজের কামরায় ঢুকে গেল।

তার চোখ মুখের ভাব দেখে মনে হল, আগন্তুকদের দেখে সে মোটেই খুশি নয়।

এবার পিঞ্চিনাট বাদে বাকি তিন বাদ্যকর ভাঙা একটা মন্দির দেখতে এগিয়ে গেল। একা গেল পাশের কলাবাগানটা দেখতে। ব্যস, সে আর ফিরল না।

বাদ্যকর তিনজন পিঞ্চিনাটের অপেক্ষায় কলাবাগানের ধারকাছ দিয়ে বেশ কয়েকবার চক্কর মেরে মেরে হন্যে হয়ে তার খোঁজ করল। না, তার কোনো হদিশই পেল না। অনন্যোপায় হয়ে তারা অস্থির হয়ে গভর্নরের শরণাপন্ন হল। ব্যাপারটা তার কানে দিল। গভর্নর জঙ্গলিরা সর্দারকে ব্যাপারটা জানালেন। সর্দারজি নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতে অসহায়ভাবে জানাল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি সর্দার বটে। কিন্তু টেমপু গাঁয়ের জঙ্গলি আমাকে পাত্তা দেয় না। হুকুম টুকুম গ্রহ্যিই করে না।'

গভর্নরের হুকুমে কর্নেল স্টুয়ার্ট এবার সৈন্যসমান্ত নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। বীরদর্পে সৈন্যরা সামান্য এগোতেই কলাগাছের ফাঁক দিয়ে আগুন দেখতে পেল। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যেতেই তারা ভয়ঙ্কর দৃশ্যটার মুখোমুখি হল।

তারা ভয়ালদর্শন জঙ্গলি-সর্দারকে ঝকঝকে কুড় ল কাঁধে এগিয়ে যেতে দেখল। গাছের তলায় লকলকে আগুন জ্বলছে। তাতে কড়াই চাপানো। টগবগ করে তেল ফুটছে।

www.pathagar.com

উলঙ্গ পিঞ্চিনাট গাছের সঙ্গে পিঠমোড়া করে বাঁধা। অসহায় দৃষ্টি মেলে কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে দিকে তাকিয়ে।

শুধু শুধু গুলি খরচ করতে হল না। সৈন্যরা তীব্র হুঙ্কার ছাড়তেই জঙ্গলিরা মুহূর্তের মধ্যেই পড়ি কি মরি করে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

কর্নেল স্টুয়ার্ট পিঞ্চিনাটকে উদ্ধার করে সৈন্য সামন্তসহ স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডে ফিরে এল।

স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড আবার সমুদ্রের বুকে ভেসে চলল। এবার তার গন্তব্যস্থল হেব্রাইড দ্বীপ।

জলদস্যু স্যারোলের দীর্ঘদিনের বাসনা এবার পূর্ণ প্রাপ্ত হতে চলেছে।

এদিকে ওয়াল্টার ডায়নার বিয়ের তারিখ পাকা হয়ে গেছে। জাহাজে করে হীরা জহরতের গহনাপত্র থেকে শুরু করে পৃথিবীর সেরা সেরা দানসামগ্রী আসবে।

১০ ফেব্রুয়ারি। দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে অর্ধনমিত পতাকাসহ একটা জাহাজ এসে ভিড়ল চলন্ত দ্বীপের বন্দরে। পতাকাটকে অর্ধনমিত দেখে সবাই প্রমাদ গুনল, জাহাজটা নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কোনো দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে।

এক পদস্থ অফিসার জাহাজ থেকে নেমে সোজা টাউন হলে গিয়ে উঠলেন। কাউন্সিলের সদস্যদের জরুরি তলব দিলেন।

ঘড়িতে তখন আটটা বিশ বাজে। আগন্তুক অফিসার ভদ্রলোক গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করলেন, 'আপনারা শুনুন, স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড কোম্পানি দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে। পাওনাদারদের যাবতীয় প্রাপ্য পরিশোধ করোর জন্য লিকুইডেটর বসেছে। আমার নাম উইলিয়ম পোমেরে। আমি লিকুইডেটর হয়ে এখানে হাজির হয়েছি। মূল্যবান সম্পদ যা কিছু আছে সব বিক্রিবাটা করে দেনার অর্থ শোধ করার জন্য আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।'

ব্যাপারটা ফয়সালা হতে দেরি হল না। রাত নয়টা সাতচল্লিশ মিনিটে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড কোম্পানির মালিকানা হস্তান্তর হয়ে গেল। ন্যাট কোভারলির এবং জেম ট্যাঙ্কারডন নগদ অর্থের বিনিময়ে আইল্যান্ড কোম্পানির মালিকানা ক্রয় করে নিল। উইলিয়ম পোমেরে প্রাপ্য অর্থ ট্যাঁকে গুজে আবার জাহাজে উঠল।

চলন্ত দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে চলল। এতদিনে সত্যিকারের স্বাধীনতায় শান্তি সুখ পাওয়া গেল।

ম্যাডেলিন উপসাগরের সঙ্গে একমাত্র ডুবোতারের মাধ্যমে এতদিন যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছিল। এখন সেটাকে কেটে যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হল।

দ্বীপের অধিবাসীরা পঞ্চমুখে কোভারলি ও ট্যাঙ্কারডন পরিবারের জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

এত আনন্দের মধ্যেও ক্যাভারলি ও ট্যাঙ্কারডন পরিবারের মানুষগুলোর মনে শান্তি বা স্বস্তি কিছুই নেই। গহনাগাটি ও বহুমূল্য আসবাবপত্র নিয়ে যে জাহাজটার আসার কথা ছিল তার কোনো পাত্তাই নেই। এদিকে বিয়ের দিন ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

১৯ ফেব্রুয়ারি। তখন সকাল নয়টা বাজে। বহু আকাঙ্ক্ষিত জাহাজটা চলন্ত দ্বীপের বন্দরে নোঙর করল। উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অবসান ঘটল। দলে দলে কাতারে কাতারে কৌতূহলী দ্বীপবাসী বন্দরে ছুটে এল বিয়ের দানসামগ্রী দেখে চোখ ও মনকে তৃপ্ত করার প্রত্যাশা নিয়ে।

www.pathagar.com

স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের মালিকানা হস্তান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে বহু পরিবর্তন ঘটল। জলদস্যু স্যারোলের ওপর চলন্ত দ্বীপটাকে চালাবার দায়িত্ব দেয়া হল। এখানকার সমুদ্রের চরিত্র তার নখদর্পণে।

চলন্ত দ্বীপটা ধীর-মন্থর গতিতে, সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে নাচতে দুলকি চালে এগিয়ে চলেছে।

দ্বীপের চলার গতি কমিয়ে দেয়ায় পিছনে যথেষ্ট যুক্তি যে নেই তাও নয়। ওয়াল্টার আর ডায়নার বিয়ের তারিখ সাতাশে ফেব্রুয়ারি। বিয়েতে সবাই যাতে চুটিয়ে আনন্দ স্ফূর্তি করতে পারে সে জন্য পুলিশ বিভাগের পর্যন্ত ছুটি থাকবে। জলদস্যু স্যারোলের শিষ্যরা তখন আদিম উল্লাসে মেতে উঠবে। দ্বীপের মানুষগুলোকে কচুকাটা করে রক্তনদী বইয়ে দেবে। অনেকদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটবে,পূর্ণ হবে সাধ।

বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ তুমুল হৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। সবাই উৎকর্ণ হয়ে লক্ষ করল—বন্দরের দিক থেকে আওয়াজটা ভেসে আসছে। মুহূর্তের মধ্যেই শোভাযাত্রার পাশ দিয়ে বিকট আর্তনাদ করতে করতে জখম, রক্তাপ্লুত কয়েকজন অফিসার ও জোয়ান দৌড়ে গেল।

গভর্নর উদ্বেগ উৎকণ্ঠাটুকু কোনোরকমে সামলে নিয়ে কমাডোর সিমকোকে জরুরি তলব পাঠালেন।

কমাডোর হন্দদন্ত হয়ে ছুটে এসে গভর্নরকে আকস্মিক রাক্তারক্তি কাণ্ডের কারণ সম্বন্ধে জানাতে গিয়ে বলল, 'স্যার, তিন চার হাজার ভয়ঙ্কর প্রকৃতির দ্বীপবাসী চলন্ত দ্বীপে উঠে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে ভয়ঙ্কর কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছে। নাটের গুরু কাপ্তেন স্যারোল। তারই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হয়েছে।'

* * *

ভয়ঙ্কর সে জাহাজডুবির পর জলদস্যু স্যারোল 'ক্যাপ্তেন স্যারোল' পরিচয় দিয়ে তার শিষ্যদের নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডে আশ্রয় নিয়েছিল। এখন সে ডাকাতি করে তাদের ধন সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য বল্গাহীন তাণ্ডব চালাচ্ছে। বেইমানি আর কাকে বলে।

জলদস্যু স্যারোলের ব্যাপার-স্যাপারে মিলিয়ার্ড শহরের ধনকুবেররা যারপরনাই বিস্মিত।

নিউ হেব্রাইড দ্বিপপুঞ্জের আধা জঙ্গলিদের মধ্যে দক্ষিণের চেয়ে উত্তরের লোকগুলো অপেক্ষাকৃত সভ্য। দক্ষিণের লোকগুলোর মধ্যে বিবেক মানবিকতা তিলমাত্রও নেই।

দশ হাজার লোক অ্যারোম্যানগোতো বাস করে। এদের অর্ধেক খ্রিস্টান। বাকিরাই আতঙ্কের কারণ। জলদস্যু স্যারোল অমানুষ ও নির্মম প্রকৃতির এসব লোকদের কব্জা করে কৌশলে দল তৈরি করেছে। ধনসম্পদের লোভে দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে নির্মম নিষ্ঠুর প্রকৃতির অসভ্যগুলো জলদস্যু স্যারোলের দলে নাম লিখিয়েছিল। দ্বীপপুঞ্জের উত্তরাঞ্চলের মধ্য আপি দ্বীপে আঠারো হাজার অসভ্য জঙ্গলি বাস করত। কয়েদিদের ঝলসানো মাংসের ওপর তাদের খুবই লোভ।

চলন্ত দ্বীপটা অ্যারোম্যানগোর কাছাকাছি যেতেই জলদস্যু স্যারোল তার শিষ্যদের তৈরি হতে বলেছিল।

ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। বর্বর জঙ্গলিগুলো বর্শা আর বিষমখা তীর নিয়ে মিলিয়ার্ড শহরের বুকে তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা স্লাইডার বন্দুকও সঙ্গে রয়েছে। সেখানকার দশ হাজার মানুষকে খতম করতে মোটেই সময় লাগবে না।

www.pathagar.com

বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের সবাই মিলিয়ার্ড শহরে এসে ভিড় জমিয়েছে। বাইরে থেকে কেউ যাতে শহরে ঢুকতে না পারে, তাই শহরের প্রধান ফটকটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

কর্নেল স্টুয়ার্ট পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে ইতিমধ্যেই সৈন্যদের তৈরি করে নিয়েছেন। ম্যালকালির রাজাও তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

এরই মধ্যে বিদ্যুৎ কারখানার কর্মচারীরা প্রাণভয়ে পালিয়ে যাওয়ায় টাউন হলসহ পুরো শহরটাই অন্ধকার যক্ষপুরীতে পরিণত হয়ে গেছে। জলদস্যু স্যারোল খুবই অভিজ্ঞ। গোড়াতেই ইঞ্জিনঘর বিকল করে দিয়েছে।

এবার স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড যদি নিজে থেকেই এরোম্যানগোর দিকে ভেসে যায় তবে তো জলদস্যু স্যারোলের ভাগ্য খুলে যাবে।

সবে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। ভোর চারটে, কমাডোর সিমকো সেনাদল নিয়ে তৈরি হয়ে সার্ভে অবস্থান করছে। হঠাৎ হামলা শুরু হয়ে গেল। ঝাঁকেঝাঁকে গুলি বিনিময় হতে লাগল। জেম ট্যাঙ্কারডন আহত হল। ম্যালকার্লির রাজা জলদস্যু স্যারোলকে ঘায়েল করার চেষ্টা করলেন। ব্যর্থ হলেন।

শেষ লড়াই। টাউন হল থেকে এবার লড়াই। কামাডোর সিমকো লড়াই চালাতে লাগলেন।

জলদস্যু স্যারোল দু-ঘণ্টা লড়াই চালিয়েও টাউন হলে ঢুকতে পারল না। ঝাঁকে ঝাঁকে বন্দুকের গুলির মধ্যেও তার গায়ে সামান্য কাঁটার আঁচড়ও লাগল না।

এবার উন্মাদের মতো জঙ্গলিরা টাউনহলের দরজাগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

উদ্ভুত পরিস্থিতি ম্যালকার্লির রাজার মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে তুলল। তিনি আচমকা দরজা খুলে গুলি আর বর্শা বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বরাত ঠুকে জলদস্যু ঘায়েল হয়েছে। বিকট আর্তনাদ করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। আহত বাঘের মতো আছাড়িপিছাড়ি করতে লাগল রক্তাপ্লুত দেহটা।

ফার্স্ট এভিনিউর দিক থেকে ঘন ঘন বন্দুক আর কামানের গর্জন ভেসে আসতে লাগল। গোলন্দাজরা কি তবে জঙ্গলিদের তাড়া করেছে?

হঠাৎ ক্যালিস্টার মুনবারের গলা শোনা গেল, 'ওই-ওই বর্বর শয়তান জঙ্গলিগুলো পালাচ্ছে! পালাচ্ছে—ওই পালাচ্ছে! হাতভাতেগুলো জান নিয়ে পালাচ্ছে!'

বেকায়দায় পড়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। এখন তাদের একমাত্র চিন্তা জান নিয়ে পালিয়ে বাঁচা।

জলদস্যু স্যারোলের শিষ্যরা ইঞ্জিন বিকল করে দেয়ার পর স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে এরোম্যানগোর দিকে না গিয়ে ফরাসি উপনিবেশের দিকে ধেয়ে চলল।

চলন্ত দ্বীপটা ফরাসি অধ্যুষিত অঞ্চলের কাছাকাছি পৌঁছতেই হাজারখানেক সশস্ত্র রক্ষী হুড়মুড় করে চলন্তদ্বীপে উঠে এল। মাত্র ঘণ্টা দু-একের মধ্যেই অসভ্য জঙ্গলিরা ঝাড়েবংশে খতম হয়ে গেল।

নতুনতর সঙ্কটজনক এক পরিস্থিতির উদ্ভব হল। নির্বাচনের মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের নতুন কর্ণধার নিযুক্ত করতে হবে।

চলন্ত দ্বীপ স্যান্ডউইচ দ্বীপের গায়ে কদিন অবস্থান করার পর ৩ মার্চ আবার স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডে যাত্রা শুরু করল।

www.pathagar.com

এদিকে গভর্নর নির্বাচনের কাজ জোর কদমে চলতে লাগল।

গভর্নরের পদের জন্য প্রার্থী মাত্র দুজন। তাদের একজন ন্যাট কোভারলি আর দ্বিতীয়জন জেম ট্যাঙ্কারডন। তারা ছাড়া আর আছেই বা কে?

স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডে ভোটের উত্তেজনা ক্রমে বেড়ে চলল। উভয় পক্ষই জোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে গভর্নরের পদটা লাভ করার জন্য। রেষারেষিও কম হতে লাগল না।

চলন্ত দ্বীপের পরিস্থিতি যখন তুঙ্গে ঠিক তখনই অবিশ্বাস্য খবরটা শুনে দ্বীপবাসীরা স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। ওয়াল্টার আর ডায়নার বিয়ে ভেঙে গেছে। এতদূর এগিয়েও তাদের বাবা দুম করে এমন একটা অবিশ্বাস্য সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। ব্যাপারটায় দ্বীপের মানুষগুলো মোটেই খুশি হতে পারল না।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দ্বীপের উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে চলল। স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার মহৎ উদ্দেশ্যে তারা ম্যালকালির রাজাকে গভর্নরের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করলেন।

অনেক উত্তেজনা, রেষারেষির পর শেষপর্যন্ত ১৫ মার্চ কোনোরকমে গভর্নর নির্বাচনের পাট চুকানো গেল। ভোটদান পর্ব মিটল বটে। কিন্তু সমস্যার কিনারা হল না। উভয়েই সমানসংখ্যক ভোট পেলেন। অতএব পুরো ব্যাপারটাই বাতিল হয়ে গেল।

পিঞ্চিনাট অচলাবস্থার অবসান ঘটাবার অদ্ভুত একটা ফিকির বাতলে দিল স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডকে দু-টুকরো করে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। তার কথা শুনে সবাই তো হেসে অস্থির। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল তার কথাই বাস্তব রূপ নিতে চলেছে।

এল ১৯ মার্চ। কমাডোর সিমকো একই সঙ্গে দুটো টেলিফোন পেল। সে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডকে মন্থরগতিতে ম্যানেলিন উপসাগরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ টেলিফোনে ট্যাঙ্কারডনের হুকুম হল চলন্ত দ্বীপকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যেতে। তার ইচ্ছা, চলন্ত দ্বীপকে ব্যবসায় খাটানোর চেষ্টা করবে। কোভারলির আদেশ, একে গিলবার্ট আইল্যান্ডে নিয়ে যেতে হবে।

কমাডোর সিমকো ম্যালকালির রাজার সঙ্গে শলাপরামর্শ করে মতামত উভয়কে জানিয়ে দিল, তাদের কারো হুকুম তামিল করাই তার পক্ষে সম্ভব নয়। চলন্ত দ্বীপ যেদিকে চলেছে, সেদিকেই যাবে।

ব্যাস, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কোনো দিক থেকেই আর কোনো উচ্চবাচ্য এল না। কর্তাব্যক্তিরা যেন হুকুম তামিল না হওয়ার জন্য থমকে গেছে।

ট্যাঙ্কারডন এবং কোভারলি লারবোর্ড বন্দর আর স্টারবোর্ড বন্দরের ইঞ্জিনিয়ারদের হুকুম দিল চলন্ত আইল্যান্ডটাকে দুদিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে। ব্যাস, দ্বিধাবিভক্ত আইল্যান্ডের টুকরো দুটো দুদিকে ছোটার চেষ্টা করল। আচমকা হেঁচকা টান সামলাতে না পেরে সে দুটো চাকার মত বনবন করে চক্কর মারতে লাগল।

শহরের লোকজন কিছুই টের পেল না, কী কেলেঙ্কারী ব্যাপার ঘটতে চলেছে। সাতদিন অনবরত চক্কর মারতে মারতে ইয়া বড় বড় নাটবল্টুগুলো খুলে গেল। লোহার পাতগুলো খুলে গেল। রীতিমত প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড।

বিপদ মাথার ওপরে বুঝে ওয়াল্টার ডায়নাকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে চলেছে।

এত চাপ সহ্য করতে না পেরে লারবোর্ড বন্দরের বয়লারটা বিকট আওয়াজ তুলে ফেটে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আধখানা দ্বীপে জমাটবাঁধা অন্ধকার নেমে এল।

www.pathagar.com

হায়! দু-দুটো ডায়নামো বিকল হয়ে গেছে।

শিরে সংক্রান্তি বুঝে বিবাদ বিসম্বাদ ভুলে ন্যাট কোভারলি আর জেম ট্যাঙ্কারডন জরুরি আলোচনায় বসেছে। প্রাণই যদি না বাঁচে, তবে কে, কার সঙ্গে বিবাদ করবে!

আলোচনার মাধ্যমে তারা স্থির করল, এবার থেকে কমাডোর সিমকোর ওপর দ্বীপের যাবতীয় ভার অপর্ণ করা হবে। কারিগরদের লাগিয়ে দেয়া হবে বিকল স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেরামত করে কাজ চালাবার উপযোগী করে তোলার জন্য।

৩ এপ্রিল। প্রকৃতি রুদ্ররূপ ধারণ করল। হঠাৎ ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়ে গেল। প্রলয়ঙ্কর ঝড়। কিছু বাড়ি ঘর ধসে পড়ল। কিছু কাত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য উন্মুখ। বন্দরের দিকটায় আইল্যান্ডের ওপর আরো একফুট জল উঠে এসেছে। স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের অবস্থা ডুবুডুবু হয়ে পড়ছে।

চলন্ত দ্বীপের পরিস্থিতি আরো সঙ্গীন হয়ে পড়ল রাত বারোটার কাছাকাছি। ঝড়ের তাণ্ডব ভয়ঙ্কর রূপ নিল। বিকট আওয়াজ করে স্টিলের কাঠামো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল। চলন্ত দ্বীপের তলদেশ ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে পরিষ্কার বোঝা যেতে লাগল স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের বিশালায়তন একটা টুকরো, প্রায় অর্ধেকটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে সমুদ্রের বুকে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। কাঠামোটা পর্যন্ত টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কাঠামের টুকরোগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে নারী, পুরুষ ও শিশু প্রাণভয়ে আর্তনাদ করতে লাগল।

এমন কয়েকটা ছোট বড় টুকরো ছাড়া স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ঝড়ের তাণ্ডব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তিন হাজার ধনকুবের বড়সড় একটা টুকরোর ওপর দাঁড়িয়ে অনবরত আর্তনাদ করে চলেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার তো! ওয়াল্টার আর ডায়না কোথায়? তাদের তো কোনো দ্বীপেই দেখা যাচ্ছে না। স্টারবোর্ডের টুকরোগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও দূরে সরে যায় নি। বরং স্টারবোর্ড আবার ফিরে আসছে।

পাকা কারিগর স্টারবোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার। ইতিমধ্যে বিকল হয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতি মেরামত করে সেটাকে নিয়ে এগিয়ে আসছে দুর্দশাগ্রস্ত লোকগুলোকে উদ্ধার করার জন্য।

সমস্যা নতুনতর রূপ নিয়ে দেখা দিল। জায়গা তো মাত্র আধমাইলখানেক। এর মধ্যে এতগুলো লোকের স্থান সঙ্কুলান কী করে সম্ভব? ম্যালকালির রাজার পরামর্শে শেকল দিয়ে বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলোকে জুড়ে দেয়া হল।

৫ এপ্রিল সামনে মাটি দেখা গেল। নিউজিল্যান্ডের মাটি।

সবাই আইল্যান্ড দ্বীপে আশ্রয় নিল। ওয়াল্টার তাদের বিয়ের ব্যাপারটাকে আর ঝুলিয়ে রাখতে রাজি নয়। এবার বিনা আড়ম্বরেই ডায়নার সঙ্গে তার বিয়ের পাটটা চুকিয়ে ফেলল। ধনকুবের ন্যাট কোভারলি এবং জেম ট্যাঙ্কারডন-এর মতো ব্যক্তিদের খুব সামান্য অর্থই স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের ধ্বংসের মাধ্যমে ব্যয় হয়েছে। আমেরিকার ব্যাঙ্কে তাদের যে অগাধ অর্থ সঞ্চিত রয়েছে তা খরচ করে জীবনের বাকি দিনগুলো সুখ স্বাচ্ছন্দের মধ্য দিয়ে জীবনকে উপভোগ করার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এবার বাদ্যকর চারজন খুশিমনে গন্তব্যস্থল সানডিয়াগোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

www.pathagar.com

কার্পেথিয়ান ক্যাসল

উনিশ শতকের শেষের দিককার কথা। সে সময়ে এমন কিছু অত্যাশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছিল যেগুলো ছিল রীতিমতো বাস্তবতায় ভরপুর।

ট্রানসিলভেনিয়া। সেই আদ্যিকাল থেকে কতই না অলৌকিক ঘটনার কথা এখানকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। সত্যি বলতে কি, ট্রানসিলভেনিয়া কুসংস্কারের অন্যতম একটা কেন্দ্র। গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসার মতো কত কাল্পনিক কাহিনীই না এখানকার মানুষের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

সেদিনটা ছিল উনত্রিশে মে। সুবিস্তীর্ণ মালভূমিতে ভেড়াগুলোকে চড়তে দিয়ে মেষপালক গাছের ছায়ায় বিশ্রামরত। উপত্যকাটার শেষ প্রান্তে আকাশচুম্বী পাহাড় সদম্ভে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

উপত্যকাটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বেশ উঁচু ও খোলামেলা। তুফান উঠলে গাছগাছালি তোলপাড় করে, ভেঙে-চুরে একসার করে দিয়ে যায়।

মেষপালকের নাম ফ্রিক। পাহাড়ের গায়ে বার্স্ট নামে ছোট্ট একটা বস্তিতে তার মাথা গোঁজার স্থান। ঘর বা কুঁড়েঘর কিছুই নেই তার। পাহাড়ের একটা গুহামত জায়গায় ভেড়াগুলোকে নিয়ে কোনরকমে রাত্রি কাটায়। আর তেলচিটেপড়া, ছেঁড়া একটা পোশাক তার লজ্জা নিবারণের একমাত্র সম্বল।

ভেড়াগুলোকে চড়তে দিয়ে রস নিজে মাঠের ঘাসের বিছানায় শুয়ে পরমানন্দে পাইপ টানে। গালভর্তি ধোঁয়া ছড়িয়ে দেয় মাঠের ফুরফুরে বাতাসে। সর্বক্ষণ তার দৃষ্টি কিন্তু ভেড়ার পালের ওপর নিবদ্ধ থাকে। ঘাসে মুখ ঢুকিয়ে কোন ভেড়া এগোতে এগোতে দলছাড়া হয়ে পড়লে ফ্রিক শিস দিয়ে তাকে কাছে ডাকে, তেমন বুঝলে তীব্র শিস দিয়ে কুকুর লেলিয়ে দেয় দলছুট ভোড়াকে দলে ফিরিয়ে আনার জন্য। প্রয়োজনে সুতীব্র স্বরে শিঙাটায় ফুঁ দেয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য।

তখন বিকাল চারটা। সূর্য পশ্চিম-আকাশের গায়ে হেলে পড়েছে। দক্ষিণ—পশ্চিমের প্রাচীরের মতো এগিয়ে যাওয়া পাহাড়ের গায়ের ফাঁকা জায়গা দুটো দিয়ে বিকালের বিদায়ী সূর্যের-রক্তিম ছোপের কিছুটা অংশ ঢুকে এসেছে।

পর্বত আর পাবর্ত্য ঘন বনের অবস্থানের জন্য ট্রানসিলভেনিয়ার অংশ বিশেষ খুব দুর্গম। কোলোসভার পাহাড়টাও সেখানেই রয়েছে। হাঙ্গারিয়ান, জিগানিস, স্যাক্সন, জেকলার এবং রুমানিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন জাত ও ভাষাভাষীর মানুষ পাহাড়ের গায়ে ঝুপড়ি বেঁধে বাস করে। ফ্রিক? ফ্রিক কোন জাতের? ভিনিসিয়ান কিনা তা-ই বা কে জানে? কদর্য চেহারার এ লোকটার বয়স যে কত, তাও নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। তবে বোধ হয় পঁয়ষট্টি বা তার কিছু কম-বেশি হতে পারে।

পশ্চিমের পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে বিকালের রক্তিম আলো কুয়াশার পর্দা ভেদ করে উপত্যাকাটায় ঢুকে এসেছে। সে সবে মুখের সামনে হাত দুটো জোড়া করে শিঙে ফোঁকার মতো আওয়াজ করে হাত দুটোকে নামিয়ে এনেছে, এবার সে হাত দুটো দিয়ে

www.pathagar.com

দূরবীণের নলের মতো তৈরি করে অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে কি যেন দেখছে, লক্ষ্য করছে।

তার চোখের সামনে ভেসে উঠল কতকগুলো দুর্গ। প্রাসাদ-দুর্গ। ওরগাল প্লেটোর উচ্চতম দুর্গ। আশ্চর্য তার দৃষ্টিশক্তি। নইলে এতদূর থেকে সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাওয়া তো আর যে সে কথা নয়।

চোখের কাছ থেকে হাত দুটো নামিয়ে এনে মেষপালক ফ্রিক গলা ছেড়ে চিল্লিয়ে উঠল—'প্রাচীন দুর্গ! প্রাচীন দুর্গ! তোমার দিন খতম। আর মাত্র তিনটে বছর তোমার পরমায়ু! বিচগাছটার মাত্র আর তিনটে ডাল ঝড়ে পড়লেই তার সব খতম হয়ে যাবে, অস্তত্ব মাটিতে মিলিয়ে যাবে।'

দুর্গটার কোণে, গম্বুজটার গায়ে কে, কবে যেন একটা বিচ গাছের চারা লাগিয়েছিল। আর সেটাই আজ আকাশের দিকে সদম্ভে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। এত দূরবর্তী অঞ্চলে, অবস্থিত হলেও ফ্রিক-এর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সেটা ঠিক ধরা পড়েছে। গাছটার অবশিষ্ট তিনটে ডাল নিয়ে আজ সে বড়ই ভাবিত। কালও চারটে ডাল ছিল, পুরনো দুর্গটার গায়ে গম্বুজটার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা বিচ গাছটাতে। রাত্রির মধ্যেই একটা ডাল ভেঙে পড়ায় এখন অবশিষ্ট রয়েছে তিনটে। আগামী তিন বছরে তিনটে ডাল গাছটা হারাবে। বুড়ো দুর্গ, তখনই তোমার পাথুরে দেহ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে। আর মাত্র তিনটে বছর—তোমার পরমায়ু। ব্যস, তারপরই সব খতম। অন্য সব পার্বত্য অধিবাসীদের মতোই ফ্রিক- এর মনও কুসংস্কারে ভরপুর। সে তাদের ভাষা বুঝতে পারে। তারাও বুঝতে পারে তার কথা। হঠাৎ কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে সে গ্রহ-উপগ্রহদের সঙ্গে বুদ্ধি পরামর্শে মাতে। আকাশ দেখেই ভবিষ্যৎ বাৎলে দিতে পারে। তবে প্রকৃতপক্ষে বোকা হাঁদা ফ্রিক-এর বুদ্ধিশুদ্ধি বা জ্ঞানবোধের লেশমাত্রও নেই। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। সে যা-ই বলুক না কেন পার্বত্য অঞ্চলের মানুষগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কথা শোনে। বেদবাক্য মনে করে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ফ্রিক নাকি যাদুটাদু জানে। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী সে। তাই আসলে সে যা নয় তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু মনে করে তাকে মাথায় তুলে রেখেছে পর্বতবাসী সহজ-সরল মানুষগুলো। ফ্রিক কিন্তু এ সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করছে। ঝাড়-ফুঁক আর তাবিজ-কবজ বেচে দু-পয়সা রোজগার করে নিচ্ছে। এমনও দেখা যায় যে মন্ত্রপূত পাথার ছুঁড়ে বন্ধা জমিকে আবাদি আবার আবাদি জমিকে বন্ধা করে দিতেও সে সিদ্ধহস্ত। আবার এমনও দেখা যায় সে বিশেষ দৃষ্টিতে ভেড়ার দিকে তাকালেই ভেড়া বাচ্চা প্রসব করে ফেলে। কুসংস্কার! হ্যাঁ, কুসংস্কারই তাকে অন্য দশজন থেকে আলাদা করে রেখেছে। কুসংস্কার মানুষের মন থেকে যাবার নয়। মেষ পালকের অভিশাপের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই সাধারণ মানুষ তাকে মনে-প্রাণে ভালো না বাসলেও সমঝে চলে। পাস্টর নামে কেউ সম্বোধন করলেই সে হাসিমুখে তার টুপি স্পর্শ করে ঠোঁট নেড়ে কি সব আশীর্বাদ করে। ব্যস, তাকে আর পথ চলতে গিয়ে বিপদের মুখোমুখি হতে হয় না।

এ-অঞ্চলের সবার বিশ্বাস, ফ্রিক নাকি যাদু জানে। সে চাইলে ভূত-প্রেতকে দিয়ে চাকরের মতো কাজ করিয়ে নিতে পারে। এমন রক্তচোষা-পিশাচরাও তার হুকুমের দাস। তবে যখন-তখন তার দেখা মেলে না। মাঝ-রাত্রে চাঁদ ডুবে গেলে তবেই তার দেখা মেলে।

www.pathagar.com

ময়দা পেষাই করার কলের অতিকায় যে ডানা থাকে তার ওপর, মাটি থেকে অনেক উঁচুতে বসে সে কখনও নেকড়েদের সঙ্গে গল্পে মাতে আবার কখনও বা স্বপ্নে নক্ষত্রদের নিয়ে মশগুল হয়ে থাকে।

ফ্রিককে নিয়ে লোকের কতই না জল্পনা-কল্পনা। এসব ব্যাপারে ফ্রিক মোটেই ওজর আপত্তি করেনা। আর করবেই বা কেন ? তাকে নিয়ে লোকে যত আজগুবি গল্প ফাঁদবে তার তো ততই লাভ। এতে তার ঝাড়ফুঁকের কদর বেড়ে যাবে, হুরহুর করে তাবিজ-কবজ বিক্রি হবে। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, ফ্রিক নিজেও এসবের ওপর কম আস্থাশীল নয়। নিজের মন্ত্রতন্ত্রের ওপর আস্থা থাক আর না-ই থাক, প্রচলিত কুসংস্কারের ওপর তার বিশ্বাস পুরো দস্তুর।

অবাক হবার মতো ব্যাপার মোটেই নয়। পৃথিবীর সব দেশেরই গ্রাম গঞ্জের মানুষই কুসংস্কারাশ্রয়ী। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেই ফ্রিক আজ চুটিয়ে কারবার চালিয়ে যাচ্ছে।

ফ্রিক-এর মুখ থেকে শুনেই মানুষ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে পুরনো গির্জার আয়ুষ্কাল নির্ভর করছে বিচ গাছটার ডালের সংখ্যার ওপর। গাছটার ডালের সংখ্যা যত তার পরমায়ুও ঠিক তত বছর। এখন সব গিয়ে বিচগাছটার ডালের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র তিনটেতে। অতএব আর তিন বছর বাদেই কার্পেথিয়ান দুর্গটা ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়বে। এ কথাটা গ্রামের মানুষগুলোর কাছে পৌছে দেওয়ার জন্যই ফ্রিক উঠেপড়ে লেগেছে। কাঠের শিঙাটা ঠোঁটের সঙ্গে লাগিয়ে সজোরে ফুঁ দিতেই বিকট শব্দটা বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তার সঙ্গী শ-খানেক ভেড়া আর কুকুরগুলোকে নিয়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল। ভেড়া বা কুকুর কারোই মালিক সে নয়। এগুলোকে দেখভালের দায়িত্ব তার ওপর বর্তেছে। গ্রামের ধর্মযাজক বিরো কোলজ এদের মালিক। ভেড়াগুলো ছাড়াও বিস্তর জমি জিরাতেরও মালিক তিনি।

এক শ' ভেড়া হুটোপাটি করতে করতে এগিয়ে চলেছে কুকুর দুটোর তত্ত্বাবধানে। ঘাসের জমি ছাড়িয়ে এবার সে গম ক্ষেতের আল বরাবর এগিয়ে চলেছে তার ভেড়ার পালকে নিয়ে। আধো আলো—আধো অন্ধকারে আরও কিছুটা পথ এগোলে সামনে সিল নদী পড়ল।

ভেড়ার পাল আর কুকুর দুটোকে নিয়ে ফ্রিক সিল নদীর দক্ষিণ পাড়ে হাজির হল। ফ্রিক যেখানে হাজির হয়েছে সেখান থেকে বাস্ট গ্রাম আর মাত্র তিন 'গানশট' দূরে। একটা বন্দুকের গুলি যতদূর যেতে পারে গ্রামের লোকেরা তাকেই এক গানশট বলে। আবাদি উইলো গাছের বন ভলক্যান পাহাড় পর্যন্ত চলে গেছে। পাহাড়টার পাদদেশের বসতিই ভলক্যান গ্রাম নামে পরিচিত।

নদীর জলে ভেড়া আর কুকুরগুলোর তৃষ্ণা-নিবারণ করিয়ে ফ্রিক উপত্যকার পথে যেই না পা বাড়তে যাবে, অমনি একেবারে অপ্রত্যাশিত এক দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নদীর পাড়ে, মাত্র পঞ্চাশ গজ মতো দূরে একটা ছায়ামূর্তি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। এক নজরে দেখে ফ্রিক বুঝে নিল ছায়ামূর্তিটা কোন এক ফেরিওয়ালা গোছের লোক। সে অনুসন্ধিৎসু নজরে তার দিকে তাকাতেই ছায়ামূর্তিটা বলে উঠল—'কি সমাচার দোস্ত ?'

লোকটার চেহারা লিকলিকে। মুখে এক রাশ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চেহারা দেখে সব ক্ষেত্রে দেশ ও জাতি ধরা সম্ভব নয়। সে ইহুদি। পোল্যান্ডবাসী।

www.pathagar.com

ফেরিওয়ালা। কাঁধের ঝোলায় থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, দূরবীক্ষণ আর সাধারণ ঘড়ি প্রভৃতি নিয়ে ফেরি করে বেড়ানোই তার পেশা। তবে সব কিছু ঝোলার ভেতরে ঢোকানো সম্ভব নয়। তাই সেগুলোকে সে সূতো দিয়ে গলা আর কোমরে ঝুলিয়ে নেয়। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় একটা চলন্ত দোকান। ছোটখাটো একটা দোকান বুঝি পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। ইহুদি সংবাদ জিজ্ঞাসা করল। আসলে ফ্রিককে নয় তার মন্ত্রটন্ত্রকেই সমীহ করে সে তার সঙ্গে গায়ে পড়ে একটু আধটু আলাপ করতে উৎসাহী হচ্ছে।

ফেরিওয়ালার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ফ্রিক বলল—'হ্যাঁ, সমাচার ভালোই বটে। আজ আবহাওয়া ভালো তাই ভালো আছি। কাল আর ভালো থাকবে না। কাল বৃষ্টি হচ্ছে।'

বৃষ্টির কথায় ইহুদি ফেরিওয়ালা সচকিত হলে একবার আকাশের গায়ে চোখের মণি দুটোকে বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠল—'বৃষ্টি হবে বলছ কিহে! তোমার মুল্লুকে বিনা মেঘে বুঝি বৃষ্টি হয়?'

'বিনা মেঘে বৃষ্টি হতে যাবে কেন? রাত্রে মেঘ করবে। রাত্রির অন্ধকার নেমে এলেই ওই পাহাড়টার দিক থেকে মেঘ ধেয়ে আসবে। ভেড়ার লোমগুলো শুকিয়ে শুকনো চামড়ার মতো শক্ত কাঠি কাঠি হয়ে গেছে। তা দেখেই আমি বৃষ্টির কথা জোর দিয়ে বলতে পারছি।'

'বলছ কী তুমি! বৃষ্টি নামলে পথেই যাদের বাস তাদের যে দুর্গতির সীমা থাকবে না। ভেড়ার পাল আর কুকুর নিয়ে তোমাকেও তো—?'

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই ফ্রিক প্রশ্ন করল—

'বালবাচ্চা ক'টা?'

'মোটেই নেই?'

'বিয়ে থা করেছ কি?'

'না।'

'ভালো—ভালো। আসছ কোত্থেকে হে? যাবেই বা কোথায়?'

'ট্রানসিলভেনিয়ার বর্ধিষ্ণু গ্রাম হারমাঙ্গটাড থেকে আসছি আর যাব কোরোসভার। সময় আর আবহাওয়ার যন্ত্রপাতির ব্যাপারী। আবহাওয়ার ব্যাপারী। আবহাওয়ার গোপন তত্ত্ব প্রকাশের ক্ষমতা রাখে তার যন্ত্রপাতি। মোদ্দাকথা আবহাওয়ার কারবারী।

কাঁধে ইয়া পেল্লাই ঝোলা, গলায় আর কোমরে ঝুলছে বিচিত্র সব যন্ত্রপাতি যাতে সব মিলিয়ে কুদর্শন লোকটাকে আরও অদ্ভুত করে তুলেছে। ফ্রিক বিস্ময় মাখানো দৃষ্টি মেলে লোকটাকে বারবার দেখতে লাগল। আসলে এসব অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রপাতি এর আগে কোনদিন দেখে নি সে। কোনটার কোন ভূমিকা তা জানার তো প্রশ্নই ওঠে না।

ফেরিওয়ালার বিচিত্র জিনিসপত্রগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ফ্রিক বলল, 'কি গো, তোমার কোমরে ওসব কি, মড়ার হাড়গোড় নাকি?'

'না। অনেক দামি জিনিস এগুলো। এসব জিনিস কাজে লাগে না এমন কোন লোক নেই।'

'সবার কাজে লাগে? মেষ পালকদেরও কাজে লাগে নাকি?'

www.pathagar.com

'অবশ্যই।'

'ওগুলো কি বল তো? কোন কাজে লাগে?'

ফেরিওয়ালা একটা থার্মোমিটার ফ্রিক-এর চোখের সামনে মেলে ধরে বলল, 'এটার সাহায্যে কোন জিনিস ঠাণ্ডা, কি গরম জানতে পারা যায়।'

'ধ্যুৎ! এ আর এমন কি ব্যাপার! ফিনফিনে জামা, গায়ে দিয়েও কেন ঘেমে নেয়ে যাই, আর ওভারকোট গায়ে দিয়ে কেন হরদম কাঁপি তা-তো আমিও বলে দিতে পারি হে।'

বিজ্ঞানের ব্যাপার স্যাপার মেষপালক কিছু জানে না। কে, কি আর কেন এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর একমাত্র বিজ্ঞানেরই দেয়া সম্ভব।

একটা যন্ত্রের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে মেষপালক জিজ্ঞাসা করল—'এটা কি হে ? ঘড়ি তো? বিরাট একটা কাঁটা—এ আবার কেমন ঘড়ি হে!'

মুচকি হেসে ফেরিওয়ালা বলল—'কে বলল এটা ঘড়ি। আদৌ ঘড়ি নয় এটা। আজ বৃষ্টি হবে, নাকি আবহাওয়া ভালো যাবে এ-যন্ত্রটাই তোমাকে বাৎলে দেবে।'

'তোমার যন্ত্র তোমার কাছেই থাক। আমার কাছে এর কোন দামই নেই। আমি আকাশের দিকে এক নজর তাকিয়েই বলে দিতে পারি আজ বৃষ্টি হবে, নাকি ঝলমলে রোদ উঠবে। পাহাড়ের মাথায় মেঘ জমলে, মাঠের ওপর দিয়ে মেঘ আনাগোনা করলেই আমি বুঝতে পারি আজ, কাল আর পরশু আবহাওয়া কেমন যাবে। চেয়ে দেখ, মাটি থেকে কুয়াশা উঠেছে। এটা পূর্বাভাস দিচ্ছে আগামীকাল বৃষ্টি হবে।'

খুবই সত্য বটে। প্রকৃতির রহস্য ফ্রিক-এর নখদর্পণে। ব্যারোমিটার ব্যবহারের মাধ্যমে তাকে আর আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে হয় না। আর ঘড়ি? সময় জানতে হলে মাথার ওপরের সূর্যই যথেষ্ট। কেবলমাত্র সে-ই নয়, এমন কি ভেড়া আর কুকুরগুলোও সূর্যের অবস্থান দেখে সময় সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে।

এবার ফেরিওয়ালার কোমরের ঝুলন্ত একটা যন্ত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ফ্রিক বলল—'ওই নলটা কিসের? ঘোড়া-পিস্তল নাকি হে?'

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে ফেরিওয়ালা জবাব দিল—'এটা নল হতে যাবে কেন হে ? এটা তো দূরবীণ। দূরবীক্ষণ যন্ত্র। দূরের জিনিসকে পাঁচ-ছয় গুণ বাড়িয়ে ততখানি কাছে নিয়ে আসার যন্ত্র—দূরবীণ। এতে বহু দূরবর্তী জিনিসকে দেখা সম্ভব হয়।'

'ধ্যুৎ! দূরের জিনিসকে দেখার জন্য আবার যন্ত্র দরকার হয় নাকি হে? আমার একজোড়া চোখই একাজের পক্ষে যথেষ্ট। আকাশ নির্মেঘ থাকলে সবচেয়ে দূরবর্তী পাহাড়ের চূড়া থেকে শুরু করে ভলক্যান উপত্যকার গাছগাছালি পর্যন্ত আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। আসলে সারারাত্রি খোলা-আকাশের তলায় শুয়ে কাটাই। রাত্রের শিশির চোখ পরিষ্কার করে, চোখের জ্যোতি বাড়ায়, জান কিছু ?'

হঠাৎ চমকে উঠে ফেরিওয়ালা বলল—'বলছ কি হে! রোজ শিশিরের মধ্যে একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো নষ্ট করতে চাচ্ছ নাকি ?'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে ফ্রিক বলল—'ধ্যুৎ! মেষ পালকের চোখ কোনদিন নষ্ট হয় না, অন্ধ হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

www.pathagar.com

'ভালো কথা। কিন্তু তোমার দৃষ্টিশক্তি যতই প্রখর হোক না কেন,আমি দূরবীণের সাহায্যে তোমার চেয়ে ঢের দূরের জিনিস অনেক স্পষ্ট দেখতে পাব।' কথা বলতে বলতে ফেরিওয়ালা দূরবীণটা তার দিকে এগিয়ে দিল।

ফ্রিক বাঁ চোখ বন্ধ করে ডান চোখে দূরবীণটা ধরতে ধরতে বলল—'দেখো ভাই, আবার পয়সা টয়সা চেয়ো না যেন।' ফ্রিক এবার আগে ভলক্যান পাহাড়টার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। তারপর পাহাড়ের ওপর দিয়ে দৃষ্টিকে চালান করে দিল। সে সচকিত হয়ে বলতে লাগল—'এ কী আজব ব্যাপার হে বাবা? খালিচোখে যা দেখা যায় না এখন তা একেবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওই তো বনের পাহারাদার নিককে পিঠে থলে আর কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে টহল দেওয়া সেরে বাড়ি ফিরতে দেখা যাচ্ছে।' আর? 'আর লালচে পেটিকোট গায়ে চাপিয়ে কোলজ-এর বাড়ি থেকে একটা মেয়েকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওই তো মেরিওটাকেও দেখা যাচ্ছে। সে তার ভাবী বরের কাছে লুকিয়ে দেখা করতে এসেছে। আমার চোখে তুমি ধরা পড়ে গেছ মেরিওটা। বিয়ের আগে চুপিচুপি দেখা করার পরিণাম কি অচিরেই জানতে পারবে।' এবার চোখ থেকে দূরবীণটা নামিয়ে এনে ফেরিওয়ালার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল— 'হায় ভগবান! ভাইরে, একটা মাত্র নলের যে এমন কেরামতি কি করে জানব! এটা দিয়ে যে এতদূরে নজর চালান দেওয়া যায় কি করেই বা মালুম হবে?'

আসলে তার বাসস্থল বার্স্ট গ্রামটা একেবারেই এক গণ্ডগ্রাম। সভ্যতার আলো, সুযোগ সুবিধা এ পর্যন্ত পৌঁছায় নি। তাই তো দূরবীণটা চোখে লাগাতেই সে ভিড়মি খাওয়ার জোগাড় হল।

ফেরিওয়ালার অনুরোধে ফ্রিক আবার দূরবীণটা চোখের সামনে ধরে আরও দূরবর্তী স্থানের দিকে নলটাকে তুলে ধরে নতুন করে চমকে উঠল—'আরেব্বাস! ওই যে হাঙ্গেরিয়ান মিল, লিভাড জলের ঘড়ি-গুমটি, চূড়োর ক্রসটা হাতলভাঙা, দেখেই চিনতে পারছি, পেট্রোসিনের মিনারটা অবধি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মিনারের চূড়ায় বসিয়ে রাখা টিনের হাঁ করা মোরগটা যেন চিল্লিয়ে কিছু বলতে চাইছে।' এবার আরও দূরবর্তী দৃশ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে তেমনি সবিস্ময়ে বলতে লাগল—'বনের মাঝখানের পেট্রিলা টাওয়ারটাও যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।' এবার ফেরিওয়ালার দিকে ফিরে বলল—'ফেরিওয়ালা ভাই, তোমার যন্ত্রটার একদর তো হে?'

ফেরিওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—'হ্যাঁ—হ্যাঁ, একদরই বটে।'

ফ্রিক আবার দূরবীণের নলটাকে ঘুরিয়ে প্লেসার ঢালু অঞ্চলটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। তারপর বহুদূরবর্তী অরণ্যে ঘেরা প্রাসাদ-দুর্গটাকে দেখতে পেয়ে যারপরনাই বিস্মিত হল। হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ওক গাছটার ভাঙা-ডালটা মাটিতে পড়ে রয়েছে। গাছটায় অবশিষ্ট রয়েছে আর মাত্র তিনটে ডাল। ওই ভাঙা ডালটাকে কুড়িয়ে নিয়ে যায় এমন হিম্মৎ কারোরই নেই, আমারও না। তবে হ্যাঁ, নরকের আগুন জ্বালতে শয়তান চর্ট আজ রাত্রেই সেটাকে নিয়ে যাবে। মানুষ লোভের শিকার হয়ে ওটার দিকে হাত বাড়ালে একদম খতম হয়ে যাবে। হুঁশিয়ার সবাই!'

ফ্রিক-এর খাপছাড়া এলোমেলো কথা শুনে বেচারা ফেরিওয়ালা তো রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেল।

www.pathagar.com

ফ্রিক চোখের সামনে দূরবীণটা ধরে রেখে বকবক করে চলেছেই—'একী আশ্চর্য ব্যাপার। দুর্গের আশ্রয়—নিবাস থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে যে! আসলে ওগুলো ধোঁয়া নাকি কুয়াশা? কয়েক বছর যাবৎ দুর্গের চিমনি দিয়ে তো ধোঁয়া বেরোয় নি। একী তবে আমার দেখার ভুল?'

ফেরিওয়ালা আগ বাড়িয়ে বলল—'ধোঁয়া যদি হয়েই থাকে তবে তো ধোঁয়াই দেখছ বটে, অন্য কিছু অবশ্যই নয়।'

'ফেরিওয়ালা ভাই, তোমার যন্তরের কাঁচে ময়লা জমে নি তো?'

'সন্দেহ থাকলে সাফ করে নিয়ে আবার চোখের সামনে ধর।

জামা দিয়ে দূরবীণের কাঁচটাকে ভালো করে মুছে নিয়ে ফ্রিক আবার সেটাকে চোখের সামনে ধরল। হ্যাঁ, ধোঁয়াই বটে। চোখের ভুল অবশ্যই নয়। চিমনির মুখ থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে ওরগাল প্লেটোর সমতল ভূমিতে পড়েছে কার্পেথিয়ান দুর্গের ছায়া।!' বিস্ময়ে অভিভূত ফ্রিক যেন হঠাৎ বাকশক্তি হারিয়ে বসল।

কোনরকম দাম দস্তুর না করে দেড় ফ্লোরিনের বিনিময়ে সেটা তার মনিব ধর্মযাজক কোলজয়-এর জন্য খরিদ করে নিল। তার আশা, মনিবের কাছ থেকে এর জন্য অন্তত দু-ফ্লোরিন বা কিছু বেশি দাম পাবে।

এবার জিভের তলায় আঙুল দুটো চালান দিয়ে শিস দিতেই কুকুর দুটো ভেড়ার পালকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল সিল নদীর দক্ষিণ পাড় বরাবর।

কার্পেথিয়ান! সেই আদ্যিকালের তৈরি প্রাসাদ দুর্গ কার্পেথিয়ান। কোথায় ওরগাল প্লেটোর শেষ আর কোথায়ই বা দুর্গটা শুরু হয়েছে, বুঝার উপায় নেই। লোকের মুখে মুখে ঘোরে দুর্গটার সৃষ্টিকর্তা মানুষ নয়, প্রকৃতি। প্রাসাদের আকাশচুম্বী চূড়াটা নাকি পাথরের একটা টিলা আর সুউচ্চ প্রাচীরগুলি নাকি খাড়া পাহাড় ছাড়া অন্য কিছুই নয়। আসলে পুরো ব্যাপারটাই তো চোখের ভুল—ধাঁধা! এতই ঝাপসা যে, কিছুতেই একে বাস্তবের পর্যায়ে ফেলা যায় না। তাই তো পর্যটকরা গোলক ধাঁধার চক্কর খেয়ে খেয়ে বলতে বাধ্য হয় কার্পেথিয়ান বলে কোন দুর্গ আদৌ নেই গ্রামবাসীদের আতঙ্কের ফসল ছাড়া সেটা অন্য কিছুই নয়।

ফ্রিক সাধারণ একটা দূরবীণে যেটুকু দেখতে পেয়েছে তার বদলে শক্তিশালী কোন দূরবীণ দিয়ে দেখলে বোধহয় সবকিছু আরও স্পষ্ট দেখা যেত। সে যেটুকু দেখেছে, রহস্য সঞ্চারকারী ছাই রঙের একটা পুরনো প্রাসাদ। চার কোণে দাঁড়িয়ে থাকা চারটে গম্বুজের একটার গোড়া থেকে বিচগাছটা জন্মেছে। বেড়ে উঠেছে সেই বিখ্যাত বিচগাছটা। আর গির্জার ঘন্টাটা অনেকদিন আগেই ফেলে চৌচির হয়ে গেছে। একটু দমকা বাতাস বইলেই ঘন্টাটা অনবরত বাজতে থাকে। ভূতুড়ে ঘন্টার মতো শব্দটা শুনে গ্রামের মানুষ ভয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে পড়ে। কেন্দ্রস্থলে সৈনিকদের অতিকায় একটা বাসস্থল। জংপড়া জানালা-দরজাগুলো খসে পড়েছে দক্ষিণ—পূর্বদিকটা তো জং পড়ে পড়ে একেবারে খাঁ-খাঁ করছে।

দুর্গটার ভেতরে আদৌ মানুষ থাকে কিনা তাই বা কে বলতে পারে? টানাসেতু বা পিছনের দরজা দিয়ে মানুষ ঢুকতে পারে কিনা তা-ও জানা নেই। বহু, বহু বছর ধরে কেউ-ই এদিকটায় আসে না। কামান বা অন্য কোন আগ্নেয় অস্ত্র থাক আর নাই থাক

www.pathagar.com

জমাটবাঁধা আতঙ্কের জন্যই কেউ ভুলেও সাহস করে এদিকে আসত না। অন্তহীন আতঙ্কই ইদানিং প্রাসাদটাকে বুকে করে রেখেছে। গ্রামের মানুষগুলো অন্ধ কুসংস্কারের বশ। তাই কার্পেথিয়ান প্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে যাওয়ার মতো বুকের পাটা কারোর নেই। গ্রামের মানুষ যতই আতঙ্ক-জ্বরে ভুগুক না কেন কার্পেথিয়ান দুর্গ কিন্তু পর্যটকদের কাছে একটা বিশেষ আকর্ষণীয় স্থান। দুর্গটার সামনে ভলক্যান পাহাড়ের বেড়া আর পিছনে সুবিস্তীর্ণ উপত্যকা। আর মধ্য ট্রানসিলভেনিয়ার আল্পস পাহাড়টা ধরতে গেলে নজরের বাইরে কুয়াশার চাদরে মোড়া ঝাপসা একটা রেখার মতো দেখায়।

কার্পেথিয়ান দুর্গ-প্রাসাদটা খ্রিস্টিয় বার বা তেরো শতকে তৈরি করা হয়েছিল। তখনকার দিনে দুর্গ, প্রাসাদ, গির্জা আর মঠ প্রভৃতিকে প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হ'ত।

কার্পেথিয়ান দুর্গটাকে তৈরি করিয়েছিলেন তা আজ আর জানার উপায় নেই। কোন্ বাস্তুকারই বা এর নির্মাণকর্তা তা-ও আজ স্মৃতির আড়ালে চলে গেছে। ওয়ালাচিয়ান পৌরাণিক কাহিনী গৌরব-গাথা থেকে রুমানিয়ান ম্যানেলির নামটা জানা যায়। তিনিই নির্মাণ করেছিলেন রুডলফ দ্য ব্ল্যাক-এর খ্যাতনামা দুর্গ আর কোর্ট দ্য আর্জিজ।

স্থানীয় অধিবাসীরা জানে সুদূর অতীত থেকে এ অঞ্চলের শাসক গর্তস ব্যারনরা। তারা এর অধিকার অব্যাহত রাখতে বহু যুদ্ধে সামিল হয়েছিলেন, রক্তে পিচ্ছিল করেছেন ট্রানসিলভেনিয়ার মাটি। স্যাকসন, সেকলার আর হাঙ্গারিয়ান প্রভৃতি দুর্ধর্ষ জাতির সঙ্গেও তাঁরা যুদ্ধ করতে দ্বিধা করেন নি। দুর্ধর্ষ রোমান বীরদের বংশধর গর্তস ব্যারনরা। স্বাধীনতার জন্য তারা অকাতরে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছেন। তবুও—বিদেশীদের অমিত শৌর্যবীর্যের অধিকারী রোমানদের কাছে মাথা নত করতে হয়েছিল। এবার বল্গাহীন অন্যায় অত্যাচার আর জুলুমের তাণ্ডব শুরু হল দেশবাসীর ওপর। ওয়ালাচিয়ানরাও কিন্তু এত সহজে দমবার পাত্র নয়। বিদেশী উৎপীড়ক শাসকদের দেশ থেকে উৎখাত করার জন্য সুযোগের সন্ধানে রইল।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ব্যারন রুডলফ নামে একজনই গর্তস বংশের শেষ সলতে হিসাবে রইলেন। শৈশবে দুরন্তপনার দিনগুলো থেকেই তিনি আত্মীয়-স্বজনদের এক এক করে পৃথিবী থেকে সরে যেতে দেখেছেন। তার বয়স যখন বছর বাইশেক তখনই তাঁর আত্মজন বলতে কেউ আর অবশিষ্ট রইল না। তাঁর পক্ষে একেবারে এমন একটা যমপুরীর মতো দুর্গ প্রাসাদে থাকা আর সম্ভব হল না। তর কাজকর্ম ও রুচি প্রভৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু জানা না থাকলেও তিনি যে খুবই সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এটা অন্তত সবার জানা আছে।

ব্যারন রুডলফ হঠাৎ একদিন প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া দুর্গ প্রাসাদের ভার ভৃত্যদের হাতে তুলে দিয়ে দেশ ছাড়লেন। তিনি বদ্ধ পাগল না হলে একটু আধটু ছিটেল যে ছিলেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কেউ কেউ বলে, তিনি তাঁর বিত্ত সম্পদ ইউরোপের বহু গান-বাজনার কেন্দ্র, জার্মানি, ইটালি, আর ফ্রান্সের নাট্যসংস্থায় দান করে দেন। তার মস্তিষ্ক বিকৃতি সম্বন্ধে ভাববার পিছনে অন্যান্য কাজকর্মের সঙ্গে এসবও কারণ বটে।

দেশত্যাগী হলেও ব্যারন রুডলফ মাতৃভূমিকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। তাই তো রুমানিয়ান কৃষকরা হাঙ্গারিয়ান শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলে তিনি

www.pathagar.com

তাদের পাশে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়েছিলেন। লাভ কিছুই হল না। কৃষকরা পরাজিত হল। তাঁর জন্মভূমিকে বিজয়ী সেনারা সোল্লাসে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। অন্তহীন ক্ষোভ ও অনুতাপজ্বালায় জর্জরিত হয়ে ব্যারন চিরদিনের মতো দেশ ছেড়ে গেলেন।

মনিব বিদায় নিলে চাকরবাকররাও কার্পেথিয়ান দুর্গ প্রাসাদ ছেড়ে এক এক করে কেটে পড়ল। প্রাসাদ একেবারেই অসংরক্ষিত হয়ে পড়ল। প্রাসাদের এক একটা করে অংশ ভেঙে পড়তে লাগল।

এদিকে ব্যারন রুডলফ সম্বন্ধে নানা গুজব ছড়াতে লাগল। সবচেয়ে জোরদার গুজব হচ্ছে, তিনি নাকি দুর্ধর্ষ ডাকাত রোসজা স্যানডরের দলে ভিড়ে ডাকাতি শুরু করেন। এ-ও শোনা যায় ব্যারন নাকি ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এখন জেলের গানি টানছেন। আবার এ-ও শোনা যায়, শুল্ক অফিসারদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ব্যারন রুডলফ বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারান। এটা আসলেই গুজব, নাকি এতে সত্যতা কিছু আছে সঠিক জানা যায় না। তবে তখন থেকেই কার্পেথিয়ান দুর্গের মালিক ব্যারন রুডলফ আর ফিরে আসেন নি। তাই মনে করা হচ্ছে, তিনি আর ইহলোকে নেই।

এবার থেকে বার্স্ট গ্রামের ধর্মযাজক ও স্কুল শিক্ষক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলের মুখে মুখে ভূতপ্রেতের নানা চটকদার গল্প ঘুরে বেড়াতে লাগল। লেখাপড়া আর ধর্মাচরণ উঠল শিকেয়। কেবলই ভূতপ্রেতের কিসসা রসান দিয়ে দিয়ে পরিবেশন হতে লাগল। গল্পের সত্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে হাজারো নজির, শিক্ষক ও ধর্মযাজকরা তুলে ধরতে লাগলেন। তারা বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে এমন কথাও প্রচার করতে দ্বিধা করলেন না যে, পিশাচ-নেকড়েদের নাকি মাঠে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পর্যন্ত দেখেছেন। গভীর রাত্রে রক্তপিপাসু পিশাচররা নাকি কবর থেকে উঠে এসে মানুষের টুটিতে ইয়া লম্বা লম্বা দাঁত বসিয়ে রক্ত চুষে নিচ্ছে। স্টাফিরা প্রতিরাত্রে গ্রামবাসীদের বাড়িতে গুটি গুটি হানা দিচ্ছে। আর অশুভ আত্মা পরীর রূপ ধারণ করে যখন-তখন, যেখানে-সেখানে হামলা হুজ্জতি করে মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার ঘটছে বুধ আর শুক্রবার। দানবাকৃতি ড্রাগন বেলেরিয়ার বনে রীতিমতো তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে। সুবিশাল ডানাওয়ালা জেমি নামদারী ভূতেরা সম্ভ্রান্ত বংশের যুবতী মেয়েকে বাগে পেলেই টুক করে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে সাধারণ ঘরের মেয়েদের নিস্কৃতি নেই। আবার এমন গল্পও শোনা যায়, ভীত চাষীরা চুল্লীর পিছনে সাপ-ভূতপ্রেতদের নাকি দুধের বাটি দিয়ে দিয়ে বশ করে রাখছে।

প্রচলিত কাহিনীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে, ভূত-প্রেতেরা নাকি দলবেঁধে কার্পেথিয়ান দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে। একে জনমানবশূন্য, তার ওপর ভাঙাচোরা দুর্গ পেয়ে তারা নিশ্চিন্তে ঘাঁটি গেড়েছে। সুযোগ বুঝে গর্তস পরিবারের ব্যারন-ভূতপ্রেতরাও নাকি কবর ছেড়ে দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে। এসব রোমহর্ষক, বুকের রক্ত হিম হয়ে আসা গল্প শুনে এখন কেউ আর ভূতের রাজ্য দুর্গটার ধারে কাছেও যায় না।

সে সময় থেকেই বিচগাছটা নিয়ে ভূতুড়ে কাহিনী শুরু হয়। এ-ও প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে একটা যে, ব্যারন রুডলফের দুর্গ ছাড়ার পর থেকেই নাকি প্রতি বছর একটা করে বিচগাছের ডাল অকারণে পড়ে যাচ্ছে। এক সময় এর ডালের সংখ্যা ছিল আঠারো, এখন মাত্র তিনটাতে এসে ঠেকেছে। এক এক করে বাকি তিনটা ডাল পড়ে গিয়ে ডাল নিঃশেষ হলে ভূতপ্রেতদের আশ্রয়স্থল দুর্গটা হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়বে। ব্যস, সব খতম হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

প্রতি বছর এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা যে ঘটছে তা কেউ দেখেছে কি? আদৌ সত্য কি? ফ্রিক সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—'আমি—আমি সাক্ষী। আমি দেখেছি। রোজ বেড়াগুলোকে চড়তে দিয়ে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকি বিচগাছটার দিকে। আর শেষের সে ভয়ংকর দিনের জন্য—'

দূরবীণটা হাতে করে ফ্রিক লম্বা লম্বা পায়ে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলেছে। এতদিন খালি চোখে যে দৃশ্য নজরে পড়ে নি আজ দূরবীণে তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ধোঁয়া উঠছে। কুয়াশা বা বাষ্প মোটেই নয়। তবে কি দুর্গের ভেতর মানুষ আস্তানা গেড়েছে, নাকি এটা প্রেতাত্মাদের আবাসস্থল তাই বা কে জানে?

ব্যস্ত পায়ে ফ্রিক গ্রামে ঢুকল। পথে একজন সুপ্রভাত জানাল, কান দিল না। লোকটা ভাবল, ফ্রিক এমন গম্ভীর হয়ে গেল, তবে কি খারাপ কোন—

ফ্রিক ধর্মযাজক কোলজ-এর কাছাকাছি পৌছেই চেঁচিয়ে বলতে লাগল—'স্যার, দুর্গে আগুন জ্বলছে! চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে!'

ধর্মযাজক কোলজ প্রায় ধমকের স্বরে বলে উঠলেন—'কী সব বাজে কথা বলছ! পাথরের মধ্য থেকে আগুন আর ধোঁয়া কি করে সম্ভব! কুয়াশা টুয়াশা হবে হয়ত।'

'না, কুয়াশা অবশ্যই নয়। ধোঁয়া। আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। আমার সঙ্গে মালভূমির ওপর চলুন, নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।'

তারা মালভূমির ওপর হাজির হলে ফ্রিক দূরবীণটা কোলজ-এর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—'এর নাম দূরবীণ। দু ফ্লোরিনের বিনিময়ে এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিনেছি। চোখে লাগিয়ে দুর্গটার দিকে তাকান তবেই আমার কথার সত্যতা যাচাই হয়ে যাবে।'

কোলজ দূরবীণটা চোখে লাগিয়েই চমকে উঠলেন—'ধোঁয়া! সত্যই তো চিমনি দিয়ে তিরতির করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে!'

ইতিমধ্যে কয়েকজন চাষী সেখানে হাজির হয়েছে। দুর্গ থেকে ধোঁয়া উঠছে শুনেই তারা চমকে উঠল। তাদের কাছে ব্যাপারটা একেবারেই অবিশ্বাস্য মনে হল। তারা বলল—'বাজ পড়ে নি তো? কিসের ধোঁয়া?'

ফ্রিক বলল—'বাজ? বাজ পড়বে কি করে? সাতদিনের মধ্যে ঝড়-বৃষ্টির লেশমাত্রও নেই, বাজ পড়বে!'

ভীতসন্ত্রস্ত চাষীরা বাজপড়া রোগীর মতো স্তম্ভিত হয়ে ফ্রিক-এর দিকে তাকিয়ে রইল।

* * *

বার্স্ট গ্রামটা মোটেই উল্লেখযোগ্য কোনো গ্রাম নয়। চওড়া একটা পথ ক্রমে উঁচু হতে হতে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেছে। ওয়াশাচিয়ান ও ট্রানসিলভেনিয়া সীমানা অতিক্রম করতে হলে এ-পথটাই একমাত্র অবলম্বন। ভ্রমণার্থীরাও এ-পথই ব্যবহার করে।

গ্রাম থেকে মাত্র আধমাইল দূরে ভলক্যান গ্রামে ধর্মযাজক বাস করেন। দু গ্রামেই তাঁর যজমান।

এ-গ্রামে বাইরের সভ্যতার আলোক পৌছায় নি। কি করেই বা পৌছবে? কেউ গ্রামের বাইরে গেলে তবে তো বাইরের সভ্যতার আলোকের সঙ্গে পরিচিত হবে। এ গ্রামেই তাদের জন্ম আর এখানকার কবরেই আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই কোলোসভাব

www.pathagar.com

অঞ্চলের গ্রামগুলোর মধ্যে সভ্যতার দিক থেকে বার্স্ট গ্রামই সবচেয়ে অনুন্নত গ্রাম। যতই অনুন্নত গ্রাম হোক না কেন বার্স্টগ্রামে একজন স্কুল শিক্ষক এবং একজন বিচারপতিও আছেন।

গ্রামের প্রধান বিচারপতির নাম হারমড-আগেই বলা আছে। আর শিক্ষক ও ধর্মযাজকের বয়স পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে। সদাহাস্যময় এক পুরুষ। রাগটাগ কাকে বলে তাঁর জানা নেই। গ্রামের মানুষে বিবাদ-বিসম্বাদ মেটানো তার কাজের মধ্যে পড়ে বটে, কিন্তু বর্তমানে তাঁর আসল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে কর আদায় করা।

ধর্মযাজক কোলজ-এর সংসারে খাইয়ে মাত্র দু-জন। তিনি নিজে আর তাঁর বছর কুড়ি বয়সের রূপের আকর চনমনে মেয়ে মেরিওটা। ট্রানসিলভেনিয়ায় প্রচলিত কিংবদন্তি, রূপকথা যেমন—'ড্রাগনের গুহা', 'বজ্রের করতালি' রসান দিয়ে দিয়ে পরিবেশন করতে তার জুড়ি নেই।

এমন রূপবতী ও গুণবতী মেয়ের বিয়ের পাত্রের অভাব হবার কথা নয়। তার সঙ্গে বছর পঁচিশেক বয়স্ক সুঠামদেহী নিক ডেক-এর বিয়ের কথা পাকা হয়ে রয়েছে। তাদের বিয়ের আর মাত্র পনের দিন মতো বাকি।

বার্স্ট গ্রামে আরও দু-জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাস করেন। তাঁদের একজন প্রধান বিচারপতি হারমড। ইয়া দশাসই চেহারা। গোঁফকামানো মুখ। নাকের ডগায় সর্বদা চশমা এঁটে রাখেন। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক।

আর অন্যজন ডা. প্যাটাক। গ্রামের চিকিৎসক। নাদুস নুদুস বেঁটেখাটো চেহারা। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশেক।

হরদম বকবক করেন। তাই ফ্রিক-এর মতোই গ্রামবাসীদের ওপর মাতব্বরি ফলায়। রোগ নির্ণয়, ওষুধ আর জ্ঞানদান একই সঙ্গে চলে। কুসংস্কার তাঁর কাছে পাত্তা পায় না। ভূতপ্রেত ও ডাইনি প্রভৃতির কাহিনীকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেন। কার্পেথিয়ান দুর্গ ভূতপ্রেতের আখড়া, তিনি তিলমাত্রও আমল দেন না। কেউ বাজি ধরলে তিনি অনায়াসে দুর্গটা থেকে চক্কর মেরে আসতে রাজি আছেন। তবে এ-ও সত্য যে, আজ অবধি কেউ তার সঙ্গে এ-ব্যাপারে বাজি ধরেন নি। তাকেও কষ্ট করে দুর্গের প্রাচীর ডিঙিয়ে বাহাদুরি দেখাবার জন্য কসরৎ করতে হয় নি।

কার্পেথিয়ান প্রাসাদ-দুর্গে আগুন জ্বলছে, চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, এ-খবরটা বাতাসে ভর দিয়ে গ্রামের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

ভাবী জামাতা নিক ডেক, কন্যা মেরিওটাকে নিয়ে কোলজ দূরবীণটা হাতে করে বেরিয়ে পড়লেন।

জনা কুড়ি গ্রামবাসী আর যাযাবরের কাছে ফ্রিক রসান দিয়ে দিয়ে গপ্প ফেঁদে বসল। সে বলল—'কার্পেথিয়ান প্রাসাদ-দুর্গে চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দুর্গের পরমায়ু খতম হয়ে এসেছে।এবার দুর্গের পাথরগুলো খসে খসে পড়তে শুরু করবে। শয়তান চর্ট নিজেহাতে এ আগুন জ্বেলেছে। সে কেবল আগুন জ্বালতে সক্ষম, নেভাতে নয়।'

ফ্রিক-এর মুখে এ পর্যন্ত শুনেই ভীত-সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা চোখের তারায় আতঙ্কের ছাপ এঁকে কার্পেথিয়ান দুর্গটার দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু এত দূরবর্তী ধোঁয়া দেখা যাবে কেন? তবু আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা নাকি কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া দেখতে পেল। একে বহু গল্পকথার মাধ্যমে কার্পেথিয়ান দুর্গের ভূতপ্রেতের দৌরাত্ম্যের কথা শুনে শুনে তারা

www.pathagar.com

শক্ত কাঠ হয়ে গেছে। তার ওপর আগুন আর ধোঁয়া দেখে তাদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসার জোগাড় হল।

গ্রামে একটা মাত্র সরাইখানা। জোনাস নামে এক ইহুদি এর মালিক। তার বয়স ষাট বছরে কাছাকাছি।

সন্ত জোনাস-এর সরাইখানা 'কিং ম্যাথিয়াস' নামে পরিচিত। মালভূমির দিকে বিশালায়তন একটা কাঁচের দরজা এর প্রবেশ পথ। জানালা দিয়ে ভলক্যান উপত্যকা দেখা যায়।

উনত্রিশে মে-র রাত্রি। রাত্রি সাড়ে আটটার কাছাকাছি বার্স্ট গ্রামের স্বনামধন্য ব্যক্তিরা সরাইখানায় মিলিত হয়েছেন। প্রধান বিচারপতি হারমড, ধর্মযাজক কোলজ, বনের পাহারাদার নিক ডেক আর গ্রামের দু-চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আর ফ্রিক উপস্থিত হয়েছেন। বর্তমানে ফ্রিক গ্রামের একজন মাতব্বর হয়ে উঠেছে। গ্রামের এক বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায়। ডা. প্যাটাক তার শিয়রে বসে থাকায় কেবল তিনিই সরাইখানায় উপস্থিত হতে পারেন নি। রোগীটা পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে তাঁর এখানে হাজির হবার কথা।

সরাইখানার মালিক জোনাস আগন্তুক অতিথিদের চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করতে লাগল। সন্ধ্যার অন্ধকার নামার আগে থেকেই একটা ব্যাপার নিয়ে কচলাকচলি আর তার ফয়সালা হতে হতে রাত্রি সাড়ে আটটা বেজে গেল। আলোচ্য বিষয় কার্পেথিয়ান প্রাসাদ-দুর্গ। কাপের্থিয়ান সম্বন্ধে আতঙ্ক যদি এমন করে বেড়েই চলে তবে বাইরে থেকে পর্যটকরা এখানে আসা বন্ধ করে দেবে। শুধু কি এ-ই ? বার্স্ট গ্রামের বাসিন্দারাও নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কের কবল থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য এক এক করে গ্রাম ছেড়ে কেটে পড়বে। আর বাইরের লোক যদি এ মুখো না হয় তবে ক্ষতি সবারই। ধর্মযাজক কোলজ-এর কর আদায়ে ঘাটতি পড়বে। জোনাস-এর আয়ে ভাঁটা পড়বে আর সরাইখানায় যাত্রী পাবে না, চাষিরা জমি কেনার লোক জোগাড় করতে পারবে না। বছরের পর বছর একই হাল চলতে থাকলে বার্স্ট গ্রাম কবরখানায় পরিণত হয়ে যাবে।

আলোচনা যখন ঝিমিয়ে পড়তে লাগল, সমস্যা থেকে উত্তরণের কোন সূত্রই যখন পাওয়া যাচ্ছে না ঠিক তখনই ফ্রিক প্রস্তাব দিল—কার্পেথিয়ান প্রাসাদ-দুর্গে গিয়ে আসল ব্যাপারটা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিত হবার জন্য।

ফ্রিক-এর প্রস্তাব শুনেই উপস্থিত সবার মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

কার্পেথিয়ান প্রাসাদ দুর্গে আগুন-ধোঁয়া! এ যে লৌকিক ব্যাপার মোটেই নয়। অলৌকিক কিছু না হলে আগুন বা ধোঁয়া আসবে কোত্থেকে ? এর পিছনে কার কালো হাত কাজ করছে তা রহস্যের আড়ালেই রয়ে গেল।

জোনাস বললেন—'ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে, ব্যারন রুডলফ বে-পাত্তা হওয়ার পর থেকেই পরিত্যক্ত দুর্গটা থেকে ধোঁয়া বেরুতে শুরু করেছে।'

কোলজ বলে উঠলেন—'ব্যারন রুডলফ এর অন্তর্ধানের পর অর্থাৎ এখনই প্রথম ধোঁয়া বেরোচ্ছে কিনা তারই বা নিশ্চয়তা কোথায় ? এতদিন তো আর দূরবীণ ছিল না যে, দেখার সুযোগ ছিল।'

কুসংস্কারে পুরোপুরি আচ্ছন্ন হারমড বললেন—'হতে পারে না। কিছুতেই হতে পারে না। মানুষ কিছুতেই কার্পেথিয়ান প্রাসাদ-দুর্গে প্রবেশ করতে পারে না,একেবারেই

www.pathagar.com

অসম্ভব। কি করে ঢুকবে ? আর কেনই বা ঢুকবে? নির্ঘাৎ ভূতপ্রেত দত্যি দানোর বা পিশাচের কারসাজি। আগুন বা ধোঁয়া যা-ই বলা যাক না কেন, কাজটা তাদেরই কেউ না কেউ করছে।'

প্রধান বিচারপতি হারমড-এর মুখে এমন কথা শোনামাত্র সবাই যেন আতঙ্কে কুঁকড়ে যাওয়ার জোগাড় হল। বার কয়েক ঢোক গিলে ড্যাবা ড্যাবা চোখে সবাই দুর্গের চিমনির দিকে তাকাতে লাগল।

প্রধান বিচারপতি হারমড বলে চললেন—'আরে, এতো খুবই সহজ ব্যাপার। তুকতাকের মাধ্যমে লোকের সর্বনাশ করতে হলে আগুন জ্বেলেই তো হরেক রকম আরক বানাতে হয়।'

নিক ডেক অসম সাহসী। কার্পেথিয়ান প্রাসাদ-দুর্গটা সম্বন্ধে তার বহুদিনের কৌতূহল। গ্রামবাসীদের আতঙ্কের আধার দুর্গটার ভেতরে কি রয়েছে জানার অদম্য আগ্রহ তার। এতদিন বাদে মওকাটা পেয়ে হাতছাড়া করতে কিছুতেই সে রাজি নয়।

অনেক কথা কাটাকাটি তর্কাতর্কির পর নিক ডেক রীতিমতো দৃঢ়তার সঙ্গে বলল—'যাব। আমিই যাব। কেউ যদি আমার সঙ্গে যেতে রাজি না-ই হয় তবে আমি একাই যাব। দেখি, ভূতপ্রেত দত্যিদানো আর জিনপরি আমার কি করে।'

শেষপর্যন্ত স্থির হল ভোরের আলো ফুটতেই নিক ডেক কার্পেথিয়ান প্রাসাদ-দুর্গের উদ্দেশ্যে পা-বাড়াবে।

নিক ডেক-এর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শুনে ঘরময় এক নীরবতা নেমে এল। ঠিক তখনই কার যেন কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'ডেক। নিক ডেক খবরদার কার্পেথিয়ান প্রাসাদ দুর্গে ভুলেও যেও না। আর যদি যাও-ই তবে জেনে রেখো তোমার সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে। খবরদার যেও না।'

কণ্ঠস্বরটা কানে যেতেই ঘরের এতগুলো প্রাণী ফ্যাকাসে মুখে আর আতঙ্কিত চোখে ঘরের সর্বত্র দৃষ্টি ফেরাতে লাগলেন। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। কোথায় কণ্ঠস্বরের মালিক ? কে সে ? কোথায়ই বা সে?

নিক ডেক সত্যই অকুতোভয়। সে মুষড়ে পড়া তো দূরের ব্যাপার এতটুকুও ভয়ডর তাকে কাবু করতে পারল না। সে যন্ত্রচালিতের মতো তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক লাফে আলমারির কাছে গিয়ে ঝট করে ডালাটা খুলে ফেলল। আলমারি ফাঁকা। কেউ-ই নেই। এবার এক লাফে ঘরের বাইরে চলে গেল। না, রাস্তাও তো ফাঁকাই বটে। তবে ?

ধর্মযাজক কোলজ তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিলেন। অলৌকিক কণ্ঠস্বরের ব্যাপারটা বার্স্ট গ্রামের আনাচে কানাচে পর্যন্ত বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ঝপাঝপ ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিল। কেউ বা তালা ঝুলিয়ে অধিকতর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করল। শত দরকারেও গ্রামের মানুষগুলো ঘর থেকে বের হলো না। এক সময় চরমতম আতঙ্কের রাত্রির অবসান হল। দরজা-বন্ধ ঘরের মধ্যেই শক্ত কাঠ হয়ে সকলে ইষ্টনাম স্মরণ করতে লাগল।

সকাল হল। এত কিছু সত্ত্বেও নিক ডেক কিন্তু নির্বিকার। আপন সিদ্ধান্তে অটল। সে কার্পেথিয়ান প্রাসাদ-দুর্গের উদ্দেশ্যে রওনা হবার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল। সে যতই

www.pathagar.com

জেদ ধরুক তার বাগদত্তা মেরিওটা তাকে মৃত্যুপুরীতে গিয়ে জান খোয়াতে দেবে কেন? গ্রামের এতগুলো গণ্যমান্য ব্যক্তি সবাই শুনেছেন, বজ্রগম্ভীর স্বরে অদৃশ্য কণ্ঠের সতর্কবাণী। তার সর্বনাশের কথা, প্রাণনাশের হুমকী দিয়েছে। তাই মেরিওটা তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে। কিন্তু কোন ওষুধেই কাজ হল না। হিতাকাঙ্ক্ষীদের শত অনুরোধ উপরোধ ও মেরিওটার চোখের জল অগ্রাহ্য করে সে এগিয়ে চলল মৃত্যুপুরী কার্পেথিয়ান প্রাসাদ-দুর্গের উদ্দেশ্যে।

বেচারা প্যাটাক! কী কুক্ষণে যে কার্পেথিয়ান প্রাসাদ-দুর্গে যেতে রাজি বলে হম্বিতম্বি করেছিলেন। নিক ডেক সত্য সত্যই যে 'মৃত্যুপুরীর' উদ্দেশ্যে পা-বাড়াবে তা-ও কি ছাই জানতেন তিনি? দুরু দুরু বুকে হলেও আগের মতোই হম্বিতম্বি করতে করতে সবার সামনে দিয়ে নিক ডেককে অনুসরণ করতে লাগলেন। তিনি মনে মনে করেই রেখেছেন, সুযোগ বুঝে মাঝ-পথ থেকে টুক করে কেটে পড়বেন। গ্রামের শেষ প্রান্ত অবধি ধর্মযাজক কোলজ তাদের সঙ্গদান করলেন। দূরবীণটা সূতোর সাহায্যে কোমরের সঙ্গে বাঁধা। সেটাকে চোখের সামনে ধরে তিনি বলে উঠলেন—'একী কোথায় আগুন—কোথায়ই বা ধোঁয়া?'

তবে? তবে কি কার্পেথিয়ান প্রাসাদ-দুর্গের আশ্রিতরা চম্পট দিয়েছে? তবে তো নিক ডেক নির্বিঘ্নে দুর্গটা থেকে ঘুরে আসতে পারবে? আশ্বস্ত হলেন ধর্মযাজক কোলজ।

আগুন বা ধোঁয়া নিয়ে নিক ডেক মাথা ঘামিয়ে অহেতুক সময় নষ্ট করতে রাজি নয়। সে প্যাটাককে এক রকম টানতে টানতেই নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে লাগল। সে জঙ্গলের পাহারাদার। বন্দুক ছুঁড়তে ওস্তাদ। তার হাতের গুলি ফসকেছে এমন ঘটনা শোনা যায় নি। ভূতপ্রেত, দৈত্যদানো বা চোর-ডাকাত কেউ তার হাত থেকে রেহাই পাবে না।

ডা. প্যাটাক মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। পায়ে লোহা লাগানো ইয়া ভারি জুতো। বিপদে পড়লে দৌড়ে পালাবে কি করে সেটাই এমুহূর্তে সবচেয়ে বড় ভাবনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উভয়েই পিঠে খাবারদাবারের বোঝা নিয়ে ঘন ঘন খাড়াই-উৎরাই পথে এগিয়ে চলেছে। বলা তো যায় না পাহাড়, জঙ্গল আর কার্পেথিয়ান প্রাসাদ-দুর্গে রাত কাটাতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে তারা এক সময় পাহাড়ের ঢাল বেয়ে চলতে লাগল। আকাশচুম্বী গাছগুলো মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কার্পেথিয়ান দুর্গটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না। গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সামনে এমন কোনই নিশানা নেই যাকে নজরে নজরে রেখে এগিয়ে যাবে। এখন দিক নির্ণয়ের একমাত্র অবলম্বন মাথার ওপরের সূর্যটা।

সামনে এগুবার মতো রাস্তা না দেখে ডা. প্যাটাক বিস্ময় মিশ্রিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিক ডেক-এর দিকে তাকালেন।

নিক ডেক তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল—'রাস্তা নেই তো কি আছে, বানিয়ে নেব।' কথা বলতে বলতে সে জঙ্গলের দিকে হেঁটেই চলল।

চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে ডা. প্যাটাক রাগে গস গস করতে করতে বললেন—'সে কী হে, তোমার গোয়ার্তুমি এখনও একই রকম রয়েছে দেখছি! শেষপর্যন্ত তুমি না গিয়ে ছাড়বে না!' ডা. প্যাটাক-এর মনের অবস্থা এমন যে একটু মওকা বুঝলেই পিছন ফিরে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড় শুরু করবেন।

www.pathagar.com

নিক ডেক ডা. প্যাটাক-এর ভাবগতিক দেখে ভাবল, তিনি বেশি ঘ্যানর ঘ্যানর করলে তাঁকে জঙ্গলে ফেলে রেখেই এগিয়ে যাবে।

জঙ্গল ক্রমেই ঘন থেকে ঘনতর হয়ে আসতে লাগল। এগিয়ে চলা দুষ্কর হয়ে আসছে। পাইন, স্প্রুস আর বার্চ গাছ গা ঘেঁষাঘেঁষি আর জড়াজড়ি করে এমন ঘন হয়ে আছে মনে হচ্ছে যে মাথার ওপরে যেন ছাতা ধরে রাখা হয়েছে। সূর্যের আলো মাটি পর্যন্ত পৌঁছোতে পারছে না। অন্ধকার বিরাজ করছে। কাঁটাঝোপের ফাঁক দিয়ে গাছের ডালের তলা দিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে হচ্ছে। কাঁটার আঁচড়ে গা দিয়ে রক্ত ঝরছে।

নিক ডেক হাতের সুতীক্ষ্ম ছুরির ফলাটা দিয়ে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে সমানে লতাপাতা ঝোপঝাড় কেটে এগিয়ে চলার মতো রাস্তা করে নিতে লাগল। এ মুহূর্তে তার একমাত্র চিন্তা বিকালের আগে যদি কার্পেথিয়ান প্রাসাদ-দুর্গে পৌছতে না পারে তবে রাত্রে গ্রামে ফেরা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

ডা. প্যাটাক পড়েছেন মহা ফাঁপড়ে। থেকে থেকে কাঁটায় জামা আটকে যাচ্ছে আর তিনি চমকে চমকে উঠছেন—'ভূত-প্রেতে জামা টেনে ধরছে না তো! হায় বেচারি ডাক্তার। কথায় বলে সাহসী ভয়ে মরে মাত্র একবার আর কাপুরুষরা মরে বারবার। পালিয়ে যাওয়া তো দূরের ব্যাপার আতঙ্কে এমন মুষড়ে পড়েছেন যে, নিক ডেক-এর চেয়ে বেশি পিছনে পড়ে গেলেই সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসে। তাই হাঁপাতে হাঁপাতে নিক ডেক অনুসরণ করে চলেছেন।

এক সময় মিশকালো দুটো বক ডানা ঝটপট করতে করতে এক ডাল ছেড়ে অন্য ডালে গিয়ে বসল। তারা যেন অবাক হয়ে ভাবছে, হতচ্ছাড়া দুটো এখানে কোন উৎপাত করতে এসেছে।

আচমকা একটা হোঁচট খেয়ে ডা. প্যাটাক প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন—'এ কোথায় নিয়ে এলে নিক ডেক! আমার হাত-পা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে যে!'

নিক ডেক ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে রসিকতা করে বলল—'ভাঙলে ক্ষতি কি? আপনি তো ডাক্তার। অনায়াসেই আবার জোড়া দিয়ে নিতে পারবেন।'

—'রসিকতা রাখ। মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা কর। অসম্ভবের সঙ্গে লড়াই করা যায় না।'

ইতিমধ্যে নিক ডেক অনেকখানি এগিয়ে গেছে দেখে লম্বা লম্বা পায়ে থপ থপ আওয়াজ তুলে এগোতে লাগলেন।

সামনে নিয়াড নদী। পাথরের ফাঁক দিয়ে আবার নদীটা উঁকি দিচ্ছে।

নদীর পাড়ে গিয়ে নিক ডেক পা ছড়িয়ে বসল।

ডা. প্যাটাক তার গা-ঘেঁষে বসলেন। তিনি ভাবলেন, নিক ডেক এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে এবার গ্রামের দিকে হাঁটবে। নিক ডেক তাঁতে হতাশ করে দিয়ে বলল—'না, গ্রামের দিকে নয়, কার্পেথিয়ান প্রাসাদ দুর্গের দিকে এগুব।'

'কিন্তু, দু-ঘন্টা ধরে অনবরত হেঁটে চলেছি। হিসাব মতো অর্ধেক পথও পাড়ি দিতে পারি নি। দুর্গে পৌছতে বেশ রাত্রি হয়ে যাবে। তবে গ্রামে ফিরবে কখন?'

'ফিরব না। ফেরা সম্ভব নয়।' নির্বিকারভাবে নিক ডেক জবাব দিল।

'তবে? মাঝ রাত্রে দুর্গে গিয়ে তুমি কি করতে চাইছ?'

'সকালের জন্য অপেক্ষা।'

www.pathagar.com

'কী সব পাগলের মতো বকছ! শরীর আর সইতে পারছে না। কোথায় খেয়েদেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুম দেব, আর আমরা কিনা শীতের মধ্যে জঙ্গলে-পাহাড়ে দাবড়ে বেড়াচ্ছি!'

'দুর্গে ঢোকার রাস্তার হদিস না পেলে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া উপায়ও তো কিছু নেই। যদি নেহাৎ না-ই পাই তবে ডোনজোন-এর ঘরেই ঘুমিয়ে রাত্রি কাবার করে দেব।'

চমকে উঠে সোজা হয়ে বসে পড়ে ডা. প্যাটাক কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করলেন—'বলছ কী তুমি! ডোনজোন-এর ঘরে ঘুমিয়ে রাত্রি কাটাবে!'

মুচকি হেসে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নিক ডেক জবাব দিল—'নেহাৎই যদি ঘরের ভেতরে ঘুমোতে না চান তবে না হয় আপনি বাইরেই থেকে যাবেন।'

'একী কথা বলছ তুমি! বেড়োবার আগে আমরা শর্ত করেছিলাম, আমরা কেউ, কারো কাছ থেকে দূরে সরে যাব না।'

'হ্যাঁ, আপনি আমার পিছনে সর্বদা লেগে থাকবেন। তাই থাকুন।'

'অবশ্যই থাকব। তোমাকে প্রাসাদ-দুর্গে ঢুকতে দিচ্ছি না, আমিও ঢুকব না।'

'না, এমন কথা তো ছিল না। আমি দুর্গের ব্যাপারস্যাপার দেখব। আর আপনি আমার সঙ্গে, পিছনে থাকবেন।'

'দেখবে ? কিন্তু কি দেখতে চাইছ ? দেখার আছেই বা কি, আমার মাথায় আসছে না। সেখানে কোন ব্যাপারস্যাপার চলছে বুঝছ না ? কিছুই কি তোমার জানা নেই ?'

'না, জানা নেই। জানা নেই বলেই তো সেখানে চলেছি।'

'তুমি কি বুঝছ না, সেখানে পৌঁছাতে পৌছোতে গভীর রাত্রি হয়ে যাবে! পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে যাওয়া কি, যে-সে কথা। তা ছাড়া প্লেটো জঙ্গলে ভল্লুকের উৎপাত, তুমিই তো বলছিলে। বন্দুক-পিস্তল থাকলেও ব্যবহার করার সুযোগ কোথায় ? রাত্রি অন্ধকারে দেখবে কি করে ?'

'এখন তো পথ প্রদর্শক পেয়ে গেছি, ভয়ের কিছু নেই।' নিয়াড নদীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে এবার বলল—'এর কথা বলছি। এর পাড় বরাবর এগোলেই কার্পেথিয়ান প্রাসাদ দুর্গে পৌঁছে যাওয়া যাবে। বড় জোর আর দু-ঘণ্টার মামলা।'

'দু-ঘন্টা! এখন থেকে দু-ঘণ্টা মানে তো সন্ধ্যা ছ'টা হে।'

নিক ডেক উঠতে উঠতে বলল—'ক' মিনিট জিরিয়ে আধ ঘণ্টার বলশক্তি ফিরে পেয়েছেন। চলুন, আবার হাঁটা শুরু করা যাক।'

ডা. প্যাটাক প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে, পা ফুলে গেছে, শরীর সীসার মতো ভারি হয়ে উঠেছে, শরীর কাঁপছে প্রভৃতি যুক্তি দেখিয়ে আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে চইলেন।

তার কথাকে পাত্তা না দিয়ে নিক ডেক সোজা হাঁটতে শুরু করল। ডা. প্যাটাক অনন্যোপায় হয়ে প্রায় কাৎরাতে কাৎরাতে তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। আর গোঙানির সুরে বলে চলেন—'বাজে কথা নয়, কাজের কথাই বলছি, কার্পেথিয়ান প্রাসাদ দুর্গে রাত্রি না কাটিয়ে জঙ্গলে থাকলে হয় না ? আমি কিন্তু কিছুতেই দুর্গে রাত্রি কাটাতে দিচ্ছি না তোমাকে। টেনে হিঁড়ে নিয়ে আসব তোমাকে। পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেব বলে দিচ্ছি! পায়ের ব্যথায় আমি কাৎরাচ্ছি! শরীরে কি দয়া-মায়ার লেশমাত্রও নেই তোমার!'

আসলে ডা. প্যাটাক ভয়ে এমনই মুষড়ে পড়েছেন যে, কি বলছেন সে বোধটুকুও যেন হারিয়ে বসেছেন। বকবক করতে করতে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে এগুতে লাগলেন।

www.pathagar.com

বিকাল চারটে। পশ্চিম-আকাশের গায়ে বিদায়ী সূর্য রক্তিম ছোপ এঁকে দিয়েছে। পাথর ডিঙিয়ে ডিঙয়ে সিকি মাইল পথ পাড়ি দিতেই ডা. প্যাটাক কামারের হাঁপড়ের মতো ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাতে লাগলেন। একরম পথে চলতে হলে দরকার গায়ে হাতির শক্তি, অটুটু মনোবল আর মনে দুর্জয় সাহস। এগুলোর সব কটারই অভাব তাঁর। কিন্তু পিছনটান না থেকে নিক ডেক একা হলে অনায়াসেই বাকি পথটুকু এক ঘন্টার মধ্যে পাড়ি দিয়ে দিত। কিন্তু লেগে গেল পুরো তিনটে ঘন্টা।

এদিকে ডা. প্যাটাক-এর শরীর টলছে, হাঁটু দুটো অক্ষমতা প্রকাশ করছে আর আতঙ্কে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে। আবার নিক ডেক থেকে বেশি পিছিয়ে পড়লে হয়ত কার্পেথিয়ান দুর্গে পৌছনোর আগেই প্রাণটা ধড় ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। গাছের পাঁক ফোঁকড় দিয়ে বহুদূরবর্তী পর্বত শ্রেনীকে আবছা অন্ধকারে ভূতের মতো দেখাচ্ছে। গা ছমছম করছে।

ডা. প্যাটাক-এর শরীরের শক্তি নিঃশেষ প্রায়। নিক ডেক তাঁকে টেনে হিঁচড়ে কোনরকমে প্লেটোর ওপরে তুলে নিল। ডাক্তার মুখ থুবড়ে পাথরের ওপর পড়ে গেলেন। হাত-পা ছড়িয়ে মড়ার মতো নিথরভাবে পড়ে রইলেন। আর কুড়ি গজও এগুবার ক্ষমতা তাঁর নেই।

নিক ডেক-এর এতটুকুও হাঁপ ধরে নি। অপলক চোখে কার্পেথিয়ান প্রাসাদ দুর্গটার দিকে তাকিয়ে রইল। বহু আতঙ্ক বহু গল্পের কেন্দ্রবিন্দু কার্পেথিয়ানকে এই প্রথম এত কাছ থেকে সে দেখছে। সুউচ্চ দুর্গটা তার দৃষ্টিকে পুরোপুরি বাধা দিয়ে রেখেছে। প্রাচীরের একধারে সুপ্রশস্ত ও সুগভীর নালা। টানাসেতুটা পাথরের সদর দরজার গায়ে তুলে রাখা হয়েছে। চারদিকে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে। ওরগাল প্লেটো নিস্তব্ধ। ডোনজোনের ছাদে মানুষ তো দূরের কথা কোন প্রাণীর লেশমাত্রও নেই। চিমনি দিয়ে ছিটেফোঁটা ধোঁয়াও বেরোচ্ছে না। প্রাচীরের ওপর কোন ছায়ামূর্তিই নজরে পড়ছে না। আবছা অন্ধকারে মূর্তিমান আতঙ্ক কার্পেথিয়ান প্রাসাদ-দুর্গটা ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ডা. প্যাটাক কাঁপা কাঁপা ক্ষীণকণ্ঠে কোনরকমে উচ্চারণ করলেন—'নিক ডেক, টানা সেতুটা যে তোলা রয়েছে, নালাটা কি করে ডিঙোবে, ফটকটাই বা কি করে ডিঙোবে ?'

নিক ডেক নির্বাক। সে ভাবছে, সকাল হওয়ার আগে নালা পেরিয়ে, ফটকটা ডিঙিয়ে দুর্গের ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা পাগলের খেয়াল ছাড়া কিছুই নয়।

নিক ডেক-এর সিদ্ধান্তে ডা. প্যাটাক-এর আত্মায় যেন জল এল।

রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই কার্পেথিয়ান প্রাসাদ দুর্গটা চাপা পড়ে গেল।

রাত্রি বেড়ে চলেছে। অন্ধকার জমাট বাঁধছে। আর ঠাণ্ডাও ক্রমেই যেন জাঁকিয়ে পড়ছে।

ডা. প্যাটাক আপন মনে বিড়বিড় করতে লাগল। বেশ তো ঘরের কোণে কম্বল মুড়ি দিয়ে সুখে রাত্রি কাটাতে। সুখ সহ্য হল না। বরাতে যে আরো কত দুর্ভোগ লেখা রয়েছে ঈশ্বরই জানেন!

ঠাণ্ডা বাতাস হাড়ে এসে বিঁধতে লাগল। সবার আগে দক্ষিণের কনকনে বাতাসকে রুখতে পারে এমন একটা পাথরের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিতে না পারলে ঠাণ্ডায় হাড়ের

www.pathagar.com

কাঁপুনি ক্রমেই বাড়তে থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা বেচারা ডা. প্যাটাক যেমন ঠকঠক করে কাঁপছেন তা দেখে নিক ডেক-এর বড়ই মায়া হল। হন্যে হয়ে খুঁজে সে একটা চ্যাপ্টা পাথর বের করল। পাথরটার একধারে গ্রাণাইট পাথরের একটা স্তম্ভ। তার শীর্ষে এক সময় ক্রস ঝুলত। এখন অনুপস্থিত।

ডা. প্যাটাক ধর্মটর্ম মানেন না। অতএব পবিত্র ক্রসের কাছে রাত্রিবাস করতে পারলে কোন বিপদই হবে না এরকম বিশ্বাস তার আদৌ নেই। তবে ঈশ্বর বিশ্বাসী না হলেও কিছু মানুষের ভূতপ্রেত বা দত্যি-দানোর ওপর আস্থা পুরোমাত্রায় থাকে। ডাক্তারও তাদেরই দলের। তাঁর বিশ্বাস, চার্চ আর শয়তানে বেশি দূরে তো নয়ই বরং ধারে কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে রয়েছে। দুর্গ ছেড়ে বাইরে আসতে হলে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়। উফ! কী মহা সমস্যায় পড়া গেল রে বাবা! অনিশ্চিত ভয় ভীতিতে শীতের রাত্রে ডা. প্যাটাক-এর সর্বাঙ্গ দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল।

ডা. প্যাটাক বার বার জমাটবাঁধা অন্ধকারে এদিক-ওদিক নজর ফিরিয়ে ঢ্যাবা ঢ্যাবা চোখে কি যেন দেখতে চাইছেন। কিন্তু কি যে দেখতে চাইছেন তিনি তা নিজেও জানেন না। কি চাইছেন, কাকে খুঁজছেন, কি দেখতে চাইছেন, আর কি-ই বা দেখার জন্য তাঁর এমন নিরবচ্ছিন্ন অস্থিরতা, তা-ও তার অজানা। অন্ধকারের কালো চাদর মুড়ি দিয়ে দুর্গটা ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থেকে রহস্য সঞ্চার করছে। আর প্লেটোর কালো পাথরের খণ্ডগুলো অলৌকিক সান্ত্রীর মতো যেন কুচকাওয়াজে ব্যস্ত। যন্ত্রচালিতের মতো ঝট করে বসে পড়লেন তিনি। আতঙ্কে সেদিক থেকে নজর ফিরিয়ে আনলেন। বুকের ভেতরে ফুসফুসের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই ভাবলেন, চোখের ভুল নয় তো ?

চারদিকে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা। আবছা অন্ধকার ভেদ করে কিসের যেন একটা রহস্যময় শব্দ ভেসে আসতে লাগল। উৎকর্ণ হয়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য করতে লাগলেন। অদ্ভুত রহস্যময় শব্দই বটে। কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলছে ফুসফুস নিঙড়ে। মুহূর্তের মধ্যে ডা. প্যাটাক-এর হাঁটু দুটো অবশ হয়ে আসতে লাগল। সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল, গায়ের রোমগুলি খাড়া হয়ে উঠল।

হায়! রাত্রিটা কী তবে অধিকতর দীর্ঘ হয়ে উঠেছে। এর কি শেষ নেই। রাত্রি কি আর শেষ হবে না ! এক একটা ঘণ্টা এক একটা মিনিট যে এত দীর্ঘ হতে পারে তা-তো ডা. প্যাটাক-এর আগে জানা ছিল না। দু-চারটে কথাবার্তা বলতে পারলে হয়ত ভয়টা কাটত, কিছুটা অন্তত স্বাভাবিকতা ফিরে পেতেন। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলবেন ? নিক ডেক নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। সে থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান।

মাঝরাত্রি। বোধ হয় ঘড়িতে বারোটার কাছাকাছি বাজল। তাকে নালা ডিঙোতে হবে না, টানাসেতুটা নামিয়ে ব্যবহার করতে হবে না,আর প্রাচীর ডিঙোবারও দরকার পড়বে না। শূন্যে উড়তে উড়তে এসে ঘাড় মটকে রক্তপান করে চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে খোলা আকাশের নিচে রাত্রিবাস মোটেই নিরাপদ নয়। এমন সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ভয়ঙ্কর একটা কথা তার মনের কোণে উঁকি দিয়ে উঠল। গ্রাম থেকে যাত্রা করার পর থেকে একবারও ব্যাপারটা তাঁর মনে পড়ে নি। আজ যে মঙ্গলবারের রাত্রি। গ্রামের মানুষরা মঙ্গলবার রাত্রি ভুলেও কেউ পথে পা দেয় না। মঙ্গলবার রাত্রির অন্ধকার নেমে আসতেই ভূতপ্রেতরা প্রেতলোক ছেড়ে দলে

www.pathagar.com

দলে কাতারে কাতারে মর্ত্যে নেমে আসে। প্রতি মঙ্গলবার রাত্রেই এরকম ঘটনা ঘটে। কথাটা মনে পড়তেই ডাক্তারের গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসতে লাগল। আতঙ্কের আধার কার্পেথিয়ান দুর্গ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভীতি সঞ্চার করছে। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ডা. প্যাটারকে যদি রাত্রিবাস করতে হয় তবে ভূতপ্রেতরা কি লোভ সম্বরণ করে তাকে রেহাই দেবে ? রক্ত চোষারা হয়ত ইয়া লম্বা ঝকঝকে চকচকে দাঁত বের করে তাঁর রক্ত পান করতে এগিয়ে আসবে।

নিক ডেক কিন্তু নির্বিকার। সে ঝোলা থেকে খাবার বের করে আপন মনে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করে চলেছে। খাওয়া সেরে সে পাথরের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল—'একটু ঘুমিয়ে শরীরটা একটু চাঙা করে নিন।' কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

ডা. প্যাটাক-এর চোখে ঘুম নেই। বহু চেষ্টা করেও তিনি দু-চোখের পাতা এক করতে পারছেন না। তবে? তিনি এখন কি করবেন ? নিদারুণ অস্বস্তির মধ্যে তাঁর প্রতিটা মুহূর্ত কাটতে লাগল। কিছুক্ষণ অন্তত ঘুমোতে পারলে স্বস্তি পেতেন, ভয়ঙ্কর ভয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেতেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বা নির্ঘুম রাত্রি কাটালে নাকি বিচিত্র সব শব্দ শুনতে পায়, গা ছমছম করা অদ্ভুত ছায়ামূর্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। প্রতিটা মুহূর্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির ভূতপ্রেত আর দত্যিদানোদের অশুভ শক্তির মহানন্দের সময় এটা। এ সময়েই লক্ষ লক্ষ অশরীরীদের অট্টহাসি আর দাপাদাপি করতে দেখা যায়। রাত্রি বারোটা, অশুভ, আত্মাদের হাসি মানুষের গায়ের রক্ত হিম করে দেয়। কলিজাকে দেয় স্তব্ধ করে।

ডা. প্যাটাক দুরুদুরু বুকে ভাবতে লাগেলন, এবার না জানি কী ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে। তিনি নিজের গায়ে হাত বুলালেন, আবার উঠে দাঁড়ালেন।, আপনমনে বললেন—'স্বপ্ন দেখছি না তো? কান দুটো ভুল শুনছে না তো ? কিন্তু আমি তো জেগে, একেবারেই জেগে। জেগে কি আর স্বপ্ন দেখা সম্ভব ?'

ডা. প্যাটাক-এর চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে উঠল পৌরাণিক কাহিনীর দৈত্য, পক্ষীরাজের মতো শরীর আর ঈগল পাখির মতো মাথা বিশিষ্ট ভয়ালদর্শন 'হিপোগ্রিফ'। সুতীক্ষ্ম ও সুদীর্ঘ দাঁত বিশিষ্ট ড্রাগন, পবর্তপ্রমাণ দেহধারী রক্তচোষা। দাঁত খিঁচিয়ে, নখযুক্ত থাবা মেলে তারা যেন ডা. প্যাটাক-এর দিকে একযোগে ধেয়ে আসতে লাগল। তিনি আতঙ্কে চোখ দুটো বন্ধ করে দিলেন।

ঘণ্টাধ্বনি! ঘণ্টা! হ্যাঁ, ঘণ্টাধ্বনিই বটে। কার্পেথিয়ান প্রাসাদ-দুর্গ থেকে ভেসে আসছে ঘণ্টাধ্বনি! বহুদিন পরে গির্জার ইয়া পেল্লাই ঘণ্টাটা আবার বাজছে। অতিবৃদ্ধ গির্জাটা যেন সবাইকে জানাতে চাইছে, 'আমি আছি—আমি বেঁচে আছি'।

ডা. প্যাটাক উৎকর্ণ হয়ে ঘণ্টাধ্বনির উৎসস্থলটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে অকস্মাৎ শিউরে উঠলেন। এ কী, এ তবে কিশের শব্দ ? ভলক্যান গির্জাটার ঘণ্টাধ্বনি হতে পারে না। বাতাস যে ওই দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এদিকে শব্দ কি করে ভেসে আসবে ? তবে ? তবে রহস্যসঞ্চারকারী শব্দটা কিসের ? শুধু কি এ-ই ? হঠাৎ ঘণ্টাধ্বনির তাল বেড়ে গেল। তবে কি ঘণ্টাধ্বনির মাধ্যমে প্রেতলোকের বাসিন্দাদের আহ্বান করা হচ্ছে ? নাকি কবর থেকে উঠে আসার জন্য ডাকাডাকি করা হচ্ছে ঘণ্টাধ্বনির মাধ্যমে ? জমাটবাঁধা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা ডা.

www.pathagar.com

প্যাটাক-এর রোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। ঘাড়ের কাছ থেকে একটা হিমেল স্রোত শিরদাড়া বেয়ে দ্রুত নিচের দিকে নেমে গেল। এমনিতেই ভূতপ্রেতে তাঁর পুরোপুরি বিশ্বাস। তার ওপর এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি ভয়ে শক্ত কাঠ হয়ে গেলেন।

আচমকা নিক ডেক-এর ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে যন্ত্রচালিতের মতো ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নির্বাক, চঞ্চল তার চোখের মণি দুটো। অপলক চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ বিকট আওয়াজ হল। যেন ফগহর্ণ বেজে উঠল। জমাটবাধা কুয়াশায় জাহাজ পথ হারিয়ে ফেললে বন্দরে প্রবেশ করার সময় এমন বিকট স্বরে ভোঁ বাজাতে থাকে। নরকবাসী অশরীরীদেহকে ডাকাডাকি করছে যেন ফগহর্ণের ভোঁ-এর মতো বিকট আওয়াজ করে।

আলো! আলো! অত্যুজ্জ্বল একটা আলো মর্ধবর্তী ডোনজোন শীর্ষ থেকে। অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করে আলোটা যেন অশরীরীদের পথ দেখানোর কাজে লিপ্ত। কিন্তু কিসের আলোক ওইটা। নরকাগ্নি? নরকাগ্নিই কি তবে মর্ত্যলোকে নেমে এসেছে?

কাতর স্বরে গুঙিয়ে উঠলেন ডা. প্যাটাক—'নিক ডেক! নিক ডেক, তোমারই মতো আমিও কি মরে গেছি, মড়া হয়ে গেছি?

হ্যাঁ, খুবই সত্য বটে। অত্যুজ্জ্বল সে রহস্যজনক আলোটা যেন তাদের উভয়েরই মুখমণ্ডল দুটোকে বদলে দিয়েছে। মুখের রক্ত যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়েছে। মুখ ফ্যাকাসে। কেউ, কাউকে চিনতে পারছে না। এ কী অদ্ভুত চেহারা হয়ে গেছে। গর্তে বসা চোখের মণিদুটো উধাও, শূন্য কোটর, গাল দুটো পাংশুটে, দেহ ধূসর বর্ণের-সব মিলিয়ে তাদের অবয়ব দুটোর এমন পরিবর্তন হয়ে গেল যে, ফাঁসিকাঠে যেন তারা সবে প্রাণ খুইয়েছে।

নিক ডেক রীতিমতো স্তম্ভিত। তবে কি শ্রবণযন্ত্রও তাদের বিকল, নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে? এ কী অলৌকিক কাণ্ডরে বাবা!

ডা. প্যাটাক ভয় পেয়ে পেয়ে এখন মোটামুটি ধাতস্থ হয়ে পড়েছেন। সত্য বলতে কি তিনি এখন ভয়ডরের উর্দ্ধে চলে গেছেন। তাঁর সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট, মন নির্লিপ্ত, চোখের মণি দুটো বিস্ময়ে ইয়া বড় বড় আর নিঃশ্বাসে বুঝি আতঙ্ক প্রকাশ পাচ্ছে।

মাত্র মিনিট খানেক নারকিয় আলোকচ্ছটা স্থায়ী হল। ব্যস, তাঁর পরই সেটা মিলিয়ে গেল গাঢ় অন্ধকারের অতল গহ্বরে।

ডা. প্যাটাক এখন কি করবেন? ঘুমের প্রশ্নই ওঠে না। মোহাচ্ছন্নের মতো ঠায় বসে রইলেন। আর নিক ডেক নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল ভোরের নীরব প্রতীক্ষায়। সে কি করতে চাইছে? স্বচক্ষে ডোনজোন-এর রহস্য প্রত্যক্ষ করবে বলে পাহাড়-বন আর খানাখন্দ পেরিয়ে এসে হাজির হয়েছে কার্পেথিয়ান প্রাসাদ দুর্গের একেবারে গা-ঘেঁষে। কিন্তু এখানে আসতে না আসতে একী রোমহর্ষক দৃশ্য আর নারকিয় কাণ্ডকারখানার মুখোমুখি হল। তবে কি দুই মানুষের উপস্থিতি শয়তানের মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধের সঞ্চার করেছে?

সবেমাত্র অত্যাশ্চর্য অবিশ্বাস্য কাণ্ডের মুখোমুখি হল, এর পর কি আর এগিয়ে যাওয়া সঙ্গত হবে? সমস্যা হচ্ছে গ্রামে গিয়ে বলতেই হবে, ভূতপ্রেতের আস্ফালন দেখে ভয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। তবে যে লজ্জায় মুখ দেখানোই দায় হয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

নিক ডেক যখন কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তায় মগ্ন ঠিক তখনই ডা. প্যাটাক আচমকা তার একটা হাত জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠল—'নিক ডেক, যেও না! তুমি যেও না! যেও না নিক ডেক!'

নিক ডেক জোরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল—'না!' আচমকা ঝাঁকুনি খাওয়ায় ডা. প্যাটাক এর ঘোর কেটে গেল।

সারাটা রাত্রি যে তাদের কীভাবে কাটল তা স্মরণ রাখার মতো মানসিক পরিস্থিতি ডা. প্যাটাক বা নিক ডেক—কারোরই ছিল না।

নিক ডেক ভোরের হাল্কা আলোয় কার্পেথিয়ান প্রাসাদ দুর্গের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। দুর্গের কিনারার বিচগাছাটা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

স্বচ্ছ। চারদিকে ধোঁয়ার লেশমাত্রও নেই। টানাসেতুটা আগের মতোই তোলা দেখা যাচ্ছে। আর সদর দরজার মাথায় গর্তস ব্যারনদের বংশের প্রতীকটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নিক ডেক-এর পক্ষে ফিরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। সরাইখানার ঘরে অদৃশ্য কণ্ঠের হুমকি তাকে এতটুকুও দমাতে পারে নি। আর তো মাত্র ঘণ্টা খানেকের ব্যাপার। কষ্ট করে প্রাচীরটা ডিঙোতে পারলেই দুর্গের ভেতরে ঢুকে যেতে পারবে। ব্যস, দুর্গের বেতরে এক চক্কর মেরে নিজের চোখে সবকিছু দেখে বার্স্ট গ্রামে ফিরে যাবে।

ডা. প্যাটাক নিজস্ব মতামত যেন হারিয়ে বসেছেন। নিক ডেক যদি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় আপত্তি নেই। আর যদি ফেলে রেখে চলে যায় তবে এখানেই পড়ে থাকবেন। নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্ক তার স্নায়ুর ওপর অনবরত চাপ সৃষ্টি করে করে তাঁকে একেবারে অথর্বের মতো করে দিয়েছে। নিক ডেক তাঁর হাত ধরে টান দিতেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কোনরকম ওজর আপত্তি না করেই নিক ডেক-এর পিছন পিছন হাঁটতে লাগলেন।

দুর্গের ভেতরে ঢুকতে গিয়েই নিক ডেক মহা সমস্যায় পড়ল। টানাসেতুটা তুলে ভেতরের দিকে রেখে দেওয়া হয়েছে। চল্লিশ ফুট উঁচু প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতরে যাওয়া আরও কঠিন সমস্যা। প্রাচীরের গায়ে গর্ত বা ফাটল থাকলে না হয় একবার চেষ্টা করা যেত। তবে কি দুর্গের পাদদেশে পৌঁছেও হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে?

বরাতের জোর আছে বলতেই হবে। পিছন দিককার দরজার ওপরে একটা গর্ত দেখা গেল। এক সময় এটা দিয়ে কামানের নল বের করে রাখা হ'ত। তারই গা বেয়ে টানা-সেতুটার শেকল নেমে এসেছে। শেকল বেয়ে গর্তটা পর্যন্ত উঠে যাওয়া সমস্যাই নয়। গর্তটার বিপরীত দিকে দরজাটা যদি খিল বা ছিটকিনি আটা না থাকে তবে দুর্গের ভেতরে ঢুকে যাওয়া কোন সমস্যার ব্যাপারই নয়।

ডা. প্যাটাককে প্রায় টেনেহিঁচড়ে প্রাচীরের ধার দিয়ে দিয়ে গজ কুড়ি এগুবার পর নিক ডেক গর্তের গা-বেয়ে নেমে আসা শেকলটার তলায় হাজির হল।

ডা. প্যাটাক প্রায় সংজ্ঞাহীন। তাঁকে প্রাচীর পর্যন্ত টেনে তোলা সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই তাকে সেখানে রেখে একাই প্রাচীরে ওঠার জন্য তৈরি হয়ে নিল। আর তাঁকে বিশেষ করে সতর্ক করে দিল। ভয়ডর পেলেও যেন নালাটায় নামার চেষ্টা না করেন।

নিক ডেক এবার শেকলটাকে মুঠো করে ধরে বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ছেলেবেলা থেকেই সে পাহাড়ে উঠতে অভ্যস্ত। অতএব পেশীবহুল হাত দুটোর সাহায্যে

www.pathagar.com

সে তরতর করে টিকটিকির মতো প্রাচীর বেয়ে উঠতে লাগল। চোখের পলকে সে বারো ফুট ওপরে উঠে গেল।

ডা. প্যাটাক আতঙ্কিত কণ্ঠে ডাকতে লাগলেন—'নিক ডেক, যেও না! নেমে এসো! নেমে এসো! তুমি না নামলে আমি চলে যাব বলছি!'

'ঠিক আছে, তাই যান।' নিক ডেক বারো ফুট ওপর থেকে গলা ছেড়ে জবাব দিল।

ডা. প্যাটাক আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। আকস্মিক আতঙ্কে তিনি যেন বদ্ধ উন্মাদদশা প্রাপ্ত হতে চলেছেন। আপন মনে বলে উঠলেন—'খুব হয়েছে আর নয়।' আচমকা থমকে গেলেন। কে যেন জোর করে তার পা দুটোকে মাটির সঙ্গে চেপে ধরেছে। এ কী ঝকমারিতেই না পড়া গেল! আতঙ্কে আতঙ্কে কি সত্যই তার মাথা খারাপ হয়ে গেল? অন্য পা-টা তুলতে গিয়েও তাকে থমকে যেতে হল। সর্বাঙ্গ দিয়ে গলগল করে ঘাম ঝরতে লাগল। শরীরের রোম, এমন কি মাথার চুল পর্যন্ত সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে গেল। হ্যাঁ, অনুমান অভ্রান্ত বটে। জুতোটাই কে যেন চেপে ধরেছে।

এদিকে নিক ডেক আর এক রহস্যজনক ঘটনার মুখোমুখি হল। শেকল দিয়ে টানাসেতুটাকে দেয়ালের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে। শেকল বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠে সে যেই না টানা পুলটার একটা প্রান্ত হাত দিয়ে স্পর্শ করল অমনি অসহ্য যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে উঠল। ঝট করে হাতটা দূরে সরে গেল। আকস্মিক আতঙ্কে সংজ্ঞা লোপ পাওয়ার জোগাড় হলেও শেকলটাকে কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়ল না। দীর্ঘ সময় হাতের মুঠো শক্ত রাখতে পারল না। সামান্য শিথিল হতেই শিকল পিছলে গিয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল।

গড়াতে গড়াতে একেবারে নালার তলদেশে চলে গেল। সংজ্ঞা পুরোপুরি লোপ পাওয়ার আগে নিক ডেক কেবলমাত্র একটা কথাই ভাবতে পারল—'সরাইখানায় অদৃশ্য কণ্ঠস্বরের বক্তব্য মিথ্যে হয় নি। আমার সর্বনাশের চূড়ান্ত করে ছাড়ল।'

এদিকে নিরবচ্ছিন্ন উত্তেজনা ও আতঙ্কের মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীরা মঙ্গলবারের রাত্রিটা কাটাল। ধর্মযাজক কোলজ তো দূরবীণ হাতে সারাটা রাত্রি উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে কাটালেন। একে নির্ঘুম, তার ওপর এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকায় তার চোখ দুটো ব্যথায় ফেটে পড়ার জোগাড় হল। কিন্তু দুর্গের মাথা থেকে আগুন বা ধোঁয়া কিছুই বেরুতে দেখতে পেলেন না। হারমডও মাঝে মধ্যে দূরবীণটা চোখে লাগিয়েছিলেন। তিনিও কম উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে সারাটা রাত্রি কাটান নি।

মেষপালক ফ্রিক দুপুর বারোটায় ভেড়াগুলোকে নিয়ে মাঠ থেকে ফিরে এল। কোলজ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন কাউকে দেখতে পেয়েছে কিনা। সে ঘাড় ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল, কাউকেই সে দেখতে পায় নি।

এদিকে সরাইখানার মালিক জোনাস একদম মুষড়ে পড়েছে। হতচ্ছাড়া ভূতটা সে-রাত্রে চিল্লিয়ে-মিলিয়ে সতর্কবাণী আওড়ানোর পর থেকে আতঙ্কে কেউ-ই তার সরাইখানার ত্রি-সীমানায় ঘেঁষে নি। ব্যবসা লাটে ওঠার জোগাড় হয়েছে।

এদিকে সবচেয়ে ভেঙে পড়েছে নিক ডেক-এর বাগদত্তা মেরিওটা। বিয়ের দিন পর্যন্ত ধার্য হয়ে গেছে। আর এরই মধ্যে কিনা ঘটে গেল সর্বনাশা কাণ্ডটা। সারারাত্রি কেঁদে বালিশ ভেজাল। ঘুমানো তো দূরের ব্যাপার চোখের পাতা পর্যন্ত এক করতে পারল না।

www.pathagar.com

নিক ডেক যাবার সময় মেরিওটাকে কথা দিয়ে গিয়েছিল, সন্ধ্যার কাছাকাছি ফিরে আসবে। তাই সে বিকাল হতে না হতেই বাবাকে নিয়ে গ্রামের শেষ প্রান্ত গিয়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়েছিল।

নিরবচ্ছিন্ন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে বেলা দুটোর কাছাকাছি গাছের ডালের মাচার ওপর একজনকে শুইয়ে নিয়ে ডা. প্যাটাক ফিরলেন। নিস্তব্ধ নিথর বেহুঁস একটা দেহ। উন্মাদিনির মতো বিলাপ পাড়তে পাড়তে মেরিওটা ছুটতে ছুটতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লে নিক ডেক-এর সংজ্ঞাহীন দেহটার ওপরে। ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

নিক ডেককে সমেত মাচাটাকে কোলজ-এর বাড়ির দরজায় নামানো হল। নিক ডেক সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করল। পারল না। পারবেই বা কি করে? তার শরীরের একটা ধার যে নিঃসার হয়ে পড়েছে।

কেন? নিক ডেক-এর এমন শোচনীয় পরিণতি কেন হল? কি হয়েছিল তার যে উঠে বসার সামান্যতম ক্ষমতাও সে হারিয়ে ফেলেছে? এ প্রশ্নের উত্তর কেবলমাত্র একজনই দিতে পারেন—তিনি ডা. প্যাটাক।

নিক ডেক প্রায় সংজ্ঞহীন। ডা. প্যাটাক ছাড়া অন্য কারো মুখ থেকেই কার্পেথিয়ান দুর্গের রহস্য জানার উপায় নেই। গ্রামবাসীরা চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ডা. প্যাটাককে পীড়াপীড়ি করতে লাগল দুর্গটার ব্যাপারে কিছু বলার জন্য।

ডা. প্যাটাক এক সময় বলে উঠলেন—'কী? কী বলব? কী শুনতে চাইছেন আপনারা?

'আপনি কি কার্পেথিয়ান দুর্গটার ভেতরে গিয়েছিলেন?'

ডাক্তার প্যাটাক প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন—'না! না! না! চর্ট, চর্ট-এর ভয়ে। নিক ডেককে পই পই করে বারণ করলাম। কিছুতেই গায়ে মাখল না। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। সে খোলা আকাশের তলায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। সামনেই কার্পেথিয়ান দুর্গ।'

গ্রামবাসীরা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাবার জোগাড় হল। অপলক চোখে ডা. প্যাটাক-এর মুখের দিকে তাকিয়ে ঘটনার পরবর্তী অংশটুকু শোনার জন্য অধীর-প্রতীক্ষায় রইল।

ডা. প্যাটাক একটু দম নিয়ে আবার ক্ষীণকণ্ঠে বলতে লাগলেন—'নিক ডেক অকাতরে ঘুমোচ্ছে আর আমি নির্ঘুম রাত্রি কাটাচ্ছি, দত্যিদানো আর জিন-পরিরা দল বেঁধে দাপাদাপি জুড়ে দিল। তারপর ঘণ্টা বাজতে শুরু হল। রহস্যজনক ঘণ্টা। ভূতের ঘণ্টা। একবার বাজ পড়ল। হাজার হাজার বাজ পড়ল। তবে শব্দ মোটেই শোনা গেল না। আলো, কেবল চোখ ধাঁধানো আলো দেখা গেল। এবার স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আমি আর নিক ডেক যেন মরে গেছি, ধড়ে প্রাণ থাকলেও বাজপড়া মড়ার মতো নিশ্চল নিথরভাবে বসে রয়েছি।

গ্রামবাসীরা আৎকে উঠে বলল—'ওরে ব্বাস! ডা. প্যাটাক তবে মরে গেছেন! মড়া। ভূতে ধরা প্যাটাক। শয়তান কিতবে ডা. প্যাটাক-এর রূপ ধরে গ্রামে হাজির হয়েছে?'

ডা. প্যাটাক আবার ক্ষীণকণ্ঠে বলতে লাগলেন—'তারপর কি হল বলছি শোন, রাত্রি গিয়ে ভোর হল। নিক ডেককে আমি কত করে বারন করলাম, পাত্তাই দিল না। আমাকে টেনে হিঁচড়ে দুর্গের পাদদেশে নিয়ে গেল। আমাকে আধ-মড়া অবস্থায় ফেলে রেখে নালা পেরিয়ে শেকল বেয়ে প্রাচীরের ওপরে উঠতে লাগল। হাত দিয়ে একটা লোহার পাত

www.pathagar.com

স্পর্শ করামাত্র বিকট আর্তনাদ করে উঠল। ব্যস, শিকল বেয়ে তরতর করে নিচে নামতে শুরু করল। ধপাস করে নালার মধ্যে পড়ে গেল।'

একটু দম নিয়ে ডা. প্যাটাক আবার বলতে শুরু করলেন—'মওকা বুঝে আমি পালাতে চেষ্টা করলাম। ভূত আমার পা চেপে ধরেছিল। নিক ডেক আছাড় খেয়ে পড়তেই হতচ্ছাড়া ভূতটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে চম্পট দিল। কিন্তু পা দুটো এমন ভারি হয়ে উঠলো যে, পা তোলা তো দূরের ব্যাপার নাড়ানোই দায় হয়ে পড়ল। আমার বাঁ-দিকটা নচ্ছাড় ভূতটা একেবারে অসাড় পঙ্গু করে দিল। পক্ষাঘাতে আমি পঙ্গু হয়ে গেছি। এ রোগের চিকিৎসা আজ পর্যন্ত বেরোয় নি। আপনাদের দেখে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলাম। নইলে বাস্তবিকই আমার দ্বারা অর্দ্ধ-মূর্ছিত নিক ডেককে নিয়ে গ্রামে আসা কিছুতেই সম্ভব হত না।

অস্থিরচিত্ত কোলজ ডা. প্যাটাক-কে ঝাঁকুনি দিয়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন—'ডাক্তার! আমার একী সর্বনাশ হল ডাক্তার! আমার নিক ডেক সেরে উঠবে কি না বল?'

—'ভূত ওর কাঁধে চেপেছে। একমাত্র ভূতই ওর রোগ নিরাময় করতে পারবে। আমার হিম্মতে কুলোবে না। ডাক্তার-বদ্যি কাজ নয়।'

ডা. প্যাটাক-এর কথা শুনে মেরিওটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সরাইখানায় শয়তান তবে অহেতুক শাসায় নি। নিক ডেককে বার বার সাবধান করে দিয়েছিল। সে কিছুতেই কান দেয় নি। ফয়দা কি হল? দেহের অর্দ্ধেকটা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেল। তবুও তো বরাত ভালো যে, প্রাচীরের বাইরে থাকতেই শয়তান ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। কোনক্রমে ভেতরে ঢুকে গেলে প্রাণটাই হয়ত খোয়াতে হ'ত।

হ্যাঁ, নিক ডেক তার বোকামি আর গোয়ার্তুমির যোগ্য পুরস্কারই পেয়েছে। ভূতপ্রেতকে অগ্রাহ্য করলে তার পরিণাম এমনই হয়। সবাই সমস্বরে বলল—'খুব হয়েছে আর নয়। কাপের্থিয়ান দুর্গে ভুলেও আর যাওয়া নেই। যে ওমুখো হবে সে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না। ভূত কারো হম্বিতম্বি সহ্য করবে না।

বার্স্ট গ্রামের প্রতিটা মানুষই কেবল নয়, আশে পাশের গ্রামেও কার্পেথিয়ান দুর্গের ভূতের উৎপাতের খবরটা বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। মার বলতে যা বুঝায় তা অবশ্যই দেয় নি, কেবল আলতো করে একটা ধাক্কা দিয়েছে। ব্যস, এতেই নিক ডেক-এর শরীরের অর্দ্ধেকটা অসাড় হয়ে গেছে। সে একদম পৌনে মড়া হয়ে গেছে। এখন ডা. প্যাটাকও মরো-মরো হয়ে পড়েছেন। অর্দ্ধ-উম্মাদ।

বার্স্ট গ্রামে কয়েকটা যাযাবর ছিল। তারা ভূতের রাজ্যে আর এক মুহূর্তও থাকতে নারাজ। তল্পিতল্পা গুটিয়ে সেখান থেকে চম্পট দিল। এমন একটা জমজমাট গ্রাম ক্রমে জনশূন্য হয়ে পড়তে লাগল। তবে কি এবার পথেঘাটে, হাটেবাজারে, সরাইখানায় আর পাড়ায় পাড়ায় চলবে কেবল ভূতের তাণ্ডব নৃত্য? অভিশপ্ত কার্পেথিয়ান দুর্গটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, দুর্গটা ভেঙে ফেললেই কি আর ভূতপ্রেতের দৌরাত্ম বন্ধ হবে? শয়তান ভয়ে চম্পট দেবে? নাকি ক্ষেপে গিয়ে বিপরীত ফল দেখা দেবে, প্রলয় তাণ্ডব শুরু করবে?

www.pathagar.com

প্রথম সপ্তাহটা গ্রামের সবাই ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে রইল। ঘরের দরজা-জানালা পর্যন্ত বন্ধ করে অনবরত ফিসফিস করে নানা জল্পনা কল্পনায় মেতে রইল। কাজকর্ম একদম বন্ধ করে হাত-পা গুটিয়ে ঘরে শুয়ে-বসে কাটাতে লাগল সবাই। ঘরে বন্দি থেকেও স্বস্তি নেই। বলা তো যায় না, যদি মেঝে ভেদ করে পাতালপুরীর ভূতপ্রেত বেরিয়ে আসে। অন্য সবাই তো দূরের কথা, মেষপালক ফ্রিকও তার ভেড়ার পাল নিয়ে মাঠে যেতে সাহস পেল না।

ধর্মযাজক কোলজ-এর সমস্যা আরও বেশি। ভয়ডর তো রয়েছেই সে সঙ্গে গ্রামের মোড়ল হয়ে উদ্ভূত সমস্যার প্রতিকার না করতে পারার জ্বালায় জ্বলতে লাগলেন তিনি। দুর্গের মাথা দিয়ে এখনো ধোঁয়া বেরুতে দেখা যাচ্ছে। আর আগুন? হ্যাঁ, দূরবীণের সাহায্যে কেবল ধোঁয়া নয়, আগুনও বেরুতে দেখা যাচ্ছে। কার্পেথিয়ান দুর্গে যেন নরকের আগুন অনবরত জ্বলেই চলেছে। আর রহস্যসঞ্চারকারী শব্দ? গ্রামের অনেকেই নাকি গম্ভীর শব্দ শুনতে পেয়েছে। মনে হচ্ছে তিরতির করে মাটি কাঁপছে। তবে? তবে কি ওয়ালাচিয়ান আগ্নেয় পর্বতের সঙ্গে শয়তানের যোগসাজোস রয়েছে? মৃত আগ্নেয় পর্বতকেও নতুন করে জাগিয়ে তোলার হিম্মৎ শয়তানের আছে নাকি? এমন অদ্ভুতুড়ে কাহিনী শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে গ্রামের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

দূরবীণের সাহায্যে সামান্যমাত্র ধোঁয়া আর আগুন দেখা গেলেও গ্রামবাসীদের মুখে মুখে তা বাড়তে বাড়তে আগ্নেয় পর্বতের অগ্নুৎপাতকেও ছড়িয়ে গেল।

বেচারা জোনাস-এর অবস্থা যারপরনাই সঙ্গীন হয়ে পড়ল। ভুলেও কেউ তার সাধের সরাইখানা 'কিং ম্যাথিয়াস'-এর ধারে কাছে যায় না।

ন-ই জুন রাত্রি আটটায় এক মজার ঘটনা ঘটল কিং ম্যাথিয়াস সরাইখানায়। জোনাস তখন ওপরতলায়। হঠাৎ একতলার সদর-দরজার কড়া নড়ে উঠল। জোনাস ভাবল, নির্ঘাৎ ভূতের কারবার। ভয়ে তার হাত-পা পেটের মধ্যে সিঁধিয়ে যাবার জোগাড় হল। কড়া নাড়ার অবাঞ্ছিত শব্দটা আবারও ঘন ঘন হতে লাগল। অনন্যোপায় হয়ে জোনাস ওপর তলা থেকে কাঁপা কাঁপা, প্রায় গোঙানির স্বরে বলল—'কে? কে কড়া নাড়ছ?

দরজার বাইরে থেকে জবাব এল—'আমরা। আমরা দু-জন পর্যটক।'

'পর্যটক? তা ভালো, কিন্তু জ্যান্ত, নাকি মড়া?'

'জ্যান্ত, এক্কেবারে জ্যান্ত।'

'জ্যান্ত? নিশ্চিত তো?'

'কী মুশকিলেই না পড়া গেল! জ্যান্ত থাকার আবার নিশ্চিত অনিশ্চিতের কি আছে বুঝছি না তো! তবে একে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা তার ওপর ক্ষিধে তেষ্টায় এমন কাতর যে, আর বেশিক্ষণ জ্যান্ত থাকতে পারব বলে মনে হয় না।'

ছিটকিনি খুলে দিতেই দু-জন মানুষই ঘরে ঢুকল।

জোনাস অনুসন্ধিৎসু নজরে আগন্তুকদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। হ্যাঁ, সত্যিকারের মানুষই বটে। সে আশান্বিত হল, তার সরাইখানা কিং ম্যাথিয়াস-এ তবে আবার যাত্রীর আনাগোনা শুরু হবে।

সরাইখানার খাতায় আগন্তুকদের নামধাম লিখতে গিয়ে জোনাস জানতে পারল তারা ক্রাজোয়ার অধিবাসী। ট্রানসিলভেনিয়ার প্রতিবেশী শহর ক্রাজোয়া। রুমানিয়ারই

www.pathagar.com

অন্তগর্ত। তাদের একজন কাউন্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক। বছর চল্লিশেক বয়স। পোষাক ও সঙ্গের জিনিসপত্রই বলে দিচ্ছে একজন সত্যিকারের পর্যটক। আর দ্বিতীয়জন রোজকো। কাউন্টের সঙ্গী। ফ্রিক এদেরই দিন দশেক আগে রিট্রিয়াট পাহাড়ের দিকে যেতে দেখেছিল। কাউন্ট বার্স্ট গ্রামে একটু-আধটু বিশ্রাম নিয়ে সিল নদীর অববাহিকা দেখতে যাবেন। কার্লসবার্গ ও প্রেট্রোসেনির মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে কোলোসভারে যাবেন।

কাউন্ট খাবার-দাবারের অর্ডার দিতে দিতে বললেন—'একটা কথা, আপনার সরাইখানা ফাঁকা, রাস্তায়ও লোকজন দেখলাম না। ব্যাপার কি বলুন তো মশাই!'

এরকম আকস্মিক প্রশ্নের জন্য জোনাস তৈরি ছিল না। সত্য গোপন করে, আমতা আমতা করে আগন্তুকের প্রশ্নের জবাব দিল—'মানে আজ শনিবার তো কাল রবিবার ছুটির দিন—তাই সবাই বাড়িতেই কাজকর্ম নিয়ে মেতে রয়েছে হয়ত।

ব্যাপারটা নিয়ে কাউন্ট আর অগ্রসর হলেন না। জোনাস যেন দম ফেলার সুযোগ পেল।

জোনাস ভাবল, খাবার টেবিলে বসে কাউন্ট নিশ্চিয়ই এমন কিছু বলবে যার মাধ্যমে তাঁর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে। কিন্তু তাকে হতাশ করে দিয়ে নীরবে খাদ্যবস্তুর সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন। আসলে তিনি কথাই কম বলেন। আবার তাঁর চেয়েও কম কথা বলে তার সঙ্গী রোজকো নামে লোকটা। ফলে বিস্ময়ভরা চোখে তাদের দিকে নীরব দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় কিছুই রইল না।

জোনাস-এর মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থাকলেও রাত্রিটা কিন্তু নির্বিঘ্নেই কাটল। কোন উৎপাতই হল না।

সকাল হল। মুখে মুখে সারা গ্রামে প্রচার হয়ে গেল ভূতুড়ে কিং ম্যাথিয়াস সরাইখানায় দু-জন পর্যটক এসেছে। রাত্রিবাস করেছে। ব্যাপারটা সবার কাছে অবিশ্বাসই মনে হল। তারা দুরু দরু বুকে সরাইখানার বাইরে ঘুরঘুর করতে লাগল। কাউন্ট আর তাঁর সঙ্গে রোজকো তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। গ্রামবাসীদের সঙ্গে ধর্মযাজক কোলজও এসেছেন। কিন্তু ডা. প্যাটাক কিছুতেই এলেন না। নগদ দু-ফ্লোরিন বকশিস দিলেও তিনি নাকি অভিশপ্ত সরাইখানায় আসতে রাজি নন।

পর্যটকদের কাছ থেকে ধর্মযাজক কোলজ তাঁর প্রাপ্য ট্যাক্স আদায় করলেন। প্রাপ্য আদায় করা ছাড়াও তার উপরি লাভ এটাই হয়েছে যে, আগন্তুক নিছকই রক্ত মাংসে গড়া সত্যিকারের একজন বটে। আদৌ ভূতপ্রেত নন।

কাউন্ট কথায় কথায় বললেন, তিনি নাকি কালসবার্গ যাবেন। তার মুখ থেকে কালসবার্গ-এর নামটা শুনেই সরাইখানার মালিক জোনস থেকে শুরু করে কোলজ, হারমড এবং ফ্রিক প্রভৃতি সবাই চমকে উঠলেন। কালসবার্গ মানে তো কার্পেথিয়ান দুর্গ। মরণফাঁদ কার্পেথিয়ান দুর্গ।

কাউন্ট বুদ্ধিমান লোক। তাঁর বুঝতে বাকি রইল না এ গ্রামে এমন একটা রহস্য রয়েছে যা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁর কাছে গোপন করা হচ্ছে। শেষপর্যন্ত তাঁর পীড়াপীড়িতে কোলজ কার্পেথিয়ান দুর্গের অলৌকিক কাণ্ডকারখানার কথা না বলে পারলেন না।

কোলজ-এর মুখে ভূতড়ে কাণ্ডকারখানার কথা শুনে পযর্টক কাউন্ট তো রীতিমতো হেসে খুন হওয়ার জোগাড়। তিনি হাসি থামিয়ে এক সময় যা বললেন তাতে তার প্রখর

www.pathagar.com

বুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি মন্তব্য করলেন—'কার্পেথিয়ান দুর্গের আগুন বা ধোঁয়া আর ঘণ্টাধ্বনি উভয় ঘটনার মূলেই মানুষের হাত থাকা সম্ভব। আসলে আতঙ্কে মানুষ এমন অনেক কিছু দেখে ও শোনে।'

কাউন্টের কথার প্রতিবাদ করতে গিয়ে কোলজ বললেন—'এ ছাড়াও আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে যা শুনলে গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে। ভূতপ্রেত তো ডা. প্যাটাক-এর পা-ই চেপে ধরেছিল।

কাউন্ট তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বলল—'আতঙ্ক। স্রেফ আতঙ্কের জন্যই এরকম ঘটনা ঘটেছিল। আর ডা. প্যাটাক-এর জুতোর তলায় কাঁটামারা ছিল। সেগুলো মাটিতে গেঁথে যাওয়ায় মনে হয়েছিল নির্ঘাৎ ভূতপ্রেত দত্যিদানো পা চেপে ধরেছে। আসলে পুরো ব্যাপারটাই মানুষের কারসাজি, ভূতটুতের কোন ব্যাপারই নয়।'

কাউন্টের কথায় উপস্থিত সবাই তো বিস্ময়ে একেবারে হতবাক।

কাউন্ট বলে চললেন—'আমি নিঃসন্দেহ যে, কার্পেথিয়ান দুর্গে কিছু মানুষ, গুণ্ডা বদমাস ঘাঁটি গেড়েছে। কি যে বলেন আপনারা! ভূত প্রেতের দায় পড়েছে এখানে এসে রঙ্গ তামাশা করার জন্য। গ্রামের মানুষের কুসংস্কারের কথা জানে বলেই কিছু অসৎ লোক সুযোগটার সদ্ব্যবহার করছে।' কাউন্ট এমনও বললেন—'আমার হাতে সময় থাকলে আপনাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতাম আমার কথাই পুরোপুরি ঠিক। পুরো ব্যাপারটাই আসলে দুর্বল মনের খেয়াল, কানের ভুল।'

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে কাউন্ট এবার বললেন—'আপনাদের মনের যা অবস্থা দেখছি তাতে করে আমার সাহায্য অবশ্যই দরকার মনে হচ্ছে। পুলিশ দেখলেই মানুষ-ভূতদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবার জোগাড় হবে।'

সে-ও তো কথা বটে, পুলিশ দিয়ে ভূত-প্রেতকে শায়েস্তা করতে গেলে শেষপর্যন্ত ফল উল্টো না হয়।

কাউন্ট জানতেন না, কার্পেথিয়ান দুর্গটার মালিক কে বা কারা। কিন্তু যখন শুনলেন এর মালিক গর্তস পরিবার তখন যেন আচমকা কেন্নোর মতো নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। আচমকা মিইয়ে গিয়ে বললেন—'গর্তস পরিবার মানে তো ব্যারন রুডলফ এর পরিবার, তাই না? ভালো কথা, ব্যারন রুডলফ এখন কোথায়, বলতে পারেন?'

তাঁর কথার সদুত্তর উপস্থিত কেউ-ই দিতে পারলেন না। রুডলফ-এর কথা শুনে কাউন্ট যারপরনাই মিইয়ে গেলেন, চোখ-মুখ মুহূর্তে ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গেল। প্রায় অস্ফুট উচ্চারণ করলেন—'ব্যারন রুডলফ! রুডলফ ডি গর্তস।

টেলেকের কাউন্ট পরিবার রুমানিয়ার সবেচেয়ে প্রাচীন ও খ্যাতনামা বংশ। রুমানিয়া ষোল শতকের প্রথমের দিকে স্বাধীনতা লাভ করে। তার আগ পর্যন্ত এ-পরিবারের খুবই খ্যাতি ছিল। এ-বংশের শেষ প্রদীপশিখা এই কাউন্ট, কাউন্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক।

পিতৃ বিয়োগের দু-বছর বাদে অর্থাৎ তেইশ বছর বয়সে কাউন্ট দেশ পর্যটনে বেরিয়ে পড়েন। রোজকো নামে এক প্রাক্তন সৈনিককে সঙ্গী হিসাবে নিয়ে নিলেন। অগাধ অর্থের মালিক তিনি। অতএব চোখ-কান বুজে কোনরকমে বেরিয়ে পড়তে পারলেই হল। করলেনও তা-ই।

www.pathagar.com

পূর্ব পুরুষের ক্রাজোয়া দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে প্রথমে গেলেন ইটালিতে। সেখানে চার বছর ঘুরে ঘুরে কাটালেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ঠিক পূর্বে শেষবারের মতো নেপলস-এ গেলেন। সেখানে পা দিতেই তার পরিকল্পনা পুরোপুরি ভেস্তে গেল। সেখানে রূপসী যুবতী বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও অভিনেত্রী লা স্টিলার গান শুনে কাউন্ট মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ব্যস, তার গান শোনা ও অভিনয় দেখার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে কাউন্ট ইটালির থিয়েটারে টুপি দিয়ে মুখ ঢেকে প্রথম সারিতে বসে থাকেন। অনুষ্ঠান শেষ হতে না হতেই যন্ত্রচালিতের মতো তিনি অতর্কিতে হল ছেড়ে বেরিয়ে যান। তিনি বক্সে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসে থাকলেও তার একজন নিত্যসহচর হলেন বাইরে অপেক্ষা করে।

সে অদ্ভুতদর্শন একটা লোক বটে। কাটখোট্টা চেহারা। চোয়াল বসা। চোখ দুটো কোটরে ঢুকানো। তার ওপর বাঁ চোখে সবুজ চশমা আর ডান চোখে ঠুলি লাগানো। চেহারা দেখে তার বয়স সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব নয়। সব সময় বকবক করতেই থাকে। মস্ত এক পণ্ডিত। সবাই বলে, রসায়ন ও পাদার্থ বিজ্ঞানের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে সে নাকি ডান চোখটা খুইয়েছে। বিচিত্র চরিত্রের এ বৈজ্ঞানিকের নাম অরফানিক। অরফানিক-এর সহচরের নামধাম জানার জন্য রূপসী লা স্টিলা বহুবার বহুভাবে চেষ্টা করেছিলেন। তার নামধাম, পেশা, বংশ আর কোন পরিবেশে ঘোরাফেরা করে কিছুই জানতে পারে নি। ফলে তাকে রোজই নিদারুণ অস্থিরতার মধ্যে কাটাতে হয়। রহস্যসঞ্চারকারি লোকটা সব থিয়েটারেই সামনের বক্সে বসে। মঞ্চ থেকে তাকে ভালো দেখা না গেলেও স্পষ্ট অনুমান করা যায়, আবছা অন্ধকার থেকে দুটো চোখ তার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। মন খুলে অভিনয় করা বা গলা ছেড়ে গান করা তার পক্ষে এখন আর সম্ভব হয় না। সে চাহনি আজ পর্যন্ত তিনি দেখেন নি, কেবলমাত্র অনুভব করেছেন তারই ভয়ে তিনি যেন কুঁকড়ে যান।

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মাইকেল গ্রিগেরিও একবার লা স্টিলার ভারি সুন্দর একটা প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন। রহস্যজনক লোকটা সেটাকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কিনে নিয়েছিলেন। আরফানিক আর এ-অদ্ভুত লোকটাকে নিয়ে ইটালিতে, প্রতিটা থিয়েটারে নানা কথা হ'ত। সাংবাদিকরাও এঁটুলির মতো লেগে থেকেও সুবিধা করতে পারে নি। প্রাকশ্যে তার নাম উচ্চারণ করার মতো বুকের পাটা কারোর ছিল না। কানঘুষোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। রহস্যময় লোকটার নাম যে 'ব্যারন রুডলফ ডি গর্তস' —এভাবেই কাউন্ট তার নামধাম সবকিছু জানতে পারে।

ফ্রাঞ্জ পুরো দু-দুটো মাস ইতালির থিয়েটার হলগুলোতে চক্কর মেরে বেড়ালেন। দু-মাস শেষের মুখে হঠাৎ লা স্টিলার ভক্তদের মুখে শোনা গেল, 'তিনি নাকি গানবাজনা আর অভিনয় জগৎ থেকে সরে যাচ্ছেন। গুজবটা ছড়িয়ে পড়া মাত্র রহস্যময় ব্যারন উম্মাদের মতো হয়ে গেলেন। এবার তিনি আরফানিককে সঙ্গে নিয়ে থিয়েটারে হাজির হলেন লা স্টিলার শেষ অভিনয় দেখার জন্য। লা স্টিলা শেষ অভিনয়ে নিজেকে উজার করে ঢেলে দিলেন।

এদিকে কাউন্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক পর্দার আড়ালে অস্থিরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অভিনয় যখন পুরোদমে জমে উঠেছে ঠিক তখনই বক্সের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলেন ব্যারন রুডলফ ডি গর্তস। চোখের পলকে সর্বনাশা কাণ্ডটা ঘটে গেল। বিভীষিকার মতো তাঁর মুখমণ্ডল দেখেই লা স্টিলা আতঙ্কে হাত দিয়ে চোখ দুটো চাপা

www.pathagar.com

দিয়ে দিলেন। চোখ দুটো কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে টকটকে লাল তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। লা স্টিলা মারা গেলেন। বুকের শিরা ছিঁড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। কাউন্ট ফ্রাঞ্জ সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

লা স্টিলার নশ্বর দেহ কবরস্থ করা হ'ল। মাঝরাত্রে ধীর-পায়ে একটা ছায়ামূর্তি কবরস্থানে হাজির হল। তিনি ব্যারন রুডলফ ডি গর্তস। সে রাত্রেই তিনি অরফানিককে নিয়ে নিরুদ্দেশ হলেন।

সকালে কাউন্ট ফ্রাঞ্জ একটা চিঠি পেলেন। তাতে লেখা—"কাউন্ট ডি টেলেক, লা স্টিলার মৃত্যুর জন্য তুমিই দায়ী। তুমিই তাকে মেরেছ। তোমার সর্বনাশ অনিবার্য! ইতি—রুডলাফ ডি গর্তস।"

তাই এ মুহূর্তে ব্যারন রুডলফ ডি গর্তস-এর নামটা শোনামাত্র ফ্রাঞ্জ ডি টেলকে আঁৎকে উঠলেন।

কার্পেথিয়ান দুর্গের মালিক ব্যারন রুডলফ।

লা স্টিলার মৃত্যুর পর কাউণ্ঠ ফ্রাঞ্জ শয্যা নিলেন। অবর্ণনীয় মানসিক আঘাত সহ্য করতে না পেরে পঙ্গু হয়ে পড়লেন। কাউকেই চিনতে পারেন না। এমন কি তার নিত্যসহচর রোজকোকেও না।

কিন্তু কাউন্টের মধ্যে লা স্টিলার ব্যাপারটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল। জ্বরের ঘোরে বার বার তার নাম ধরে ডাকাডাকি প্রলাপ বকতে লাগলেন। তবে কি তিনি পাগল হয়ে গেলেন? তার সুদৃঢ় স্বাস্থ্য ও রোজকোর সেবার জন্যই পাগল হতে হতে তিনি বেঁচে গেলেন, তবে মানুষের সংস্রব সহ্য করতে পারেন না। চার-চারটে বছর নিজের কামরায় বন্দি হয়ে রইলেন। তারপর মানসিক চাপ সহ্য করতে পাহাড়ে জঙ্গলে একা একা ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত রোজকোর পরামর্শেই দেশ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। আর রোজকো সর্বক্ষণ ছায়ার মতো তার সঙ্গে থাকে। বহু স্থান ঘুরে শেষপর্যন্ত কিং ম্যাথিয়াস সরাইখানায় এসে কার্পেথিয়ান দুর্গের রহস্যের কথা শুনলেন। তার চোখে-মুখে আবার অস্বাভাবিকতার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। রোজকোর চোখের সামনে যেন চার বছর আগেকার সে কাউন্টের চেহারা ভেসে উঠল। কোলজ তাঁর কাছে যে কার্পেথিয়ান প্রাসাদের ভয়ঙ্করতার কথা বলেছেন সে জন্য রোজকো তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হল।

কোলজ ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা কাউন্টের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সরাইখানা ত্যাগ করলেন।

সেদিনই দুপুর তিনটের কাছাকাছি কাউন্ট রোজকোকে নিয়ে কোলজ-এর বাড়ি হাজির হলেন। তাঁর উদ্দেশ্য নিক ডেক-এর সঙ্গে একবারটি দেখা করেন।

নিক ডেক তখন একটা আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে নিস্তর-নিথর পাথরের মূর্তির মতো বসে। শয়তানের ধাক্কায় পঙ্গু হয়ে যাওয়া বাঁ দিকটা সে এখন বেশ নাড়াতে চাড়াতে পারে। অনেকটা সামলে নিয়েছে।

নিক ডেক-এর মুখ থেকে কার্পেথিয়ান দুর্গের রহস্যের কথা শুনে কাউন্ট বললেন—'তবে আপনি বিশ্বাস করছেন যে, কার্পেথিয়ান দুর্গে ভূত-প্রেত রয়েছে। ভালো কথা, ভূতেরাই যে আপনাকে প্রাচীর টপকাতে না দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে এরকম কথা আপনার মনে জাগল কেন?'

www.pathagar.com

তাঁর কথার জবাব দিতে গিয়ে নিক ডেক যা বলল তা আগেই কিং ম্যাথিয়াস সরাইখানায় বসে গ্রামবাসীদের মুখ থেকে শুনে নিয়েছেন। তাদের বক্তব্য শুনে কাউন্ট বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, ঘটনাগুলোর পিছনে মানুষের হাত রয়েছে। অলৌকিক কাণ্ড বলে যাকে ভয় পাওয়া হয়েছে বা হচ্ছে তা চোর-গুণ্ডা মানুষের পক্ষে ঘটানো মোটেই অসাধ্য নয়। আর ডা. প্যাটাক-এর পা চেপে ধরার ব্যাপারটা নিছক আতঙ্কের ফল। জুতোর কাঁটা মাটিতে বসে যাওয়াকেই আতঙ্কের ফলে ডা. প্যাটাক ধরেই নিয়েছেন নির্ঘাৎ কেউ না কেউ তাঁর পা চেপে ধরেছে। নতুবা লতাপাতা বা পাথরের খাঁজে পা আটকে গিয়েছিল।

অস্থিরচিত্ত নিক ডেক বলে উঠল—'ডা. প্যাটাক-এর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু আমাকে ধাক্কা মারার ব্যাপারটা ? সেটাও কি আতঙ্ক বা মনের দুর্বলতা ? আমি যে কারো গায়ের ছোঁয়া স্পষ্ট অনুভব করেছি।'

কাউন্ট বললেন—'জানোয়ার টানোয়ারের মতো কেউ না কেউ আপনাকে যে ধাক্কা মেরেছে এটা সত্য বটে। এটাকে আতঙ্ক বা মনের ভুল মনে করা যাবে না।'

'জানোয়ার বলছেন কী সাহেব! তার চেয়ে বরং বলুন শয়তান, শয়তানই ধাক্কা মেরেছিল আমাকে।'

'ঠিক আছে, আজ না হোককাল আমি প্রমাণ করে দেব ব্যাপারটা খুবই সাধারণ ও পুরোপুরি লৌকিক। ভূতপ্রেত বা অলৌকিক কাণ্ড কিছুই এর পিছনে নেই।'

কাউন্টের প্রশ্নের জবাবে নিক ডেক জানাল, 'কার্পেথিয়ান দুর্গ গর্তস পরিবারের সম্পত্তি। তাদের সর্বশেষ বংশধর এখন যে কোথায়, কারোর জানা নেই। আদৌ জীবিত আছেন কিনা তা-ইবা কে জানে ? বিশ বছর তিনি নিরুদ্দেশ। তবে প্রতিবেশীদের বিশ্বাস, তিনি আর ইহলোকে নেই।'

কাউন্ট প্রতিবাদ করলেন—'ভুল, সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কাউন্ট পরলোকে নয়, অবশ্যই ইহলোকেই রয়েছেন। বছর পাঁচেক আগেও তাঁকে দেখা গেছে। ইটালির নেপলসে আমি তাঁকে নিজের চোখে দেখেছি। তিনিই হয়ত কার্পেথিয়ান দুর্গে ফিরে এসে আত্মগোপন করে বসেছেন। আসলে লোকটা ছিটেল। নির্জন-নিরালা পছন্দ করেন। তাই লোকজনের সংস্রব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে গিয়ে কৌশলে ভূতপ্রেতের উৎপাতসৃষ্টি করে মানুষকে দূরে রাখতে উৎসাহী হয়েছেন। আসলে ব্যারন রুডলফের শয়তানির পরিচয় তিনি তো নিজের চোখেই ইটালিতে থাকাকালীন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। অহেতুক সে ঘটনার কথা আর নিক ডেক বা বার্স্ট গ্রামের মানুষের কাছে ব্যক্ত করলেন না।

কাউন্টের মুখে সবকিছু শুনে নিক ডেক বলল—'কার্পেথিয়ান দুর্গে ব্যারন রুডলফ যদি সত্যই ঘাপটি মেরে থাকে তবে তিনি এখন সাক্ষাৎ শয়তান ছাড়া কিছু নন। শয়তান ছাড়া কেউ-ই আমাকে অমন করে ধাক্কা মেরে প্রাচীরের ওপর থেকে ফেলে দিতে পারে না।'

কাউন্টে এবার যা বললেন তা হল বৃথা কার্পেথিয়ান দুর্গে গিয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার দরকার নেই। তার চেয়ে বরং কার্লসবার্গে গিয়ে ব্যাপারটা পুলিশের কানে দেবে। ব্যবস্থা যা করার তারাই করবে।

কাউন্ট এবার নিক ডেক-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সরাইখানায় ফিরে এলেন।

www.pathagar.com

সামান্য কিছু আহার করে সরাইখানার ঘরে গিয়ে একাকী আরাম কেদারায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে চুরুট টানতে টানতে বছর পাঁচেক আগেকার ঘটনা ভাবতে লাগলেন—থিয়েটার হলে লা স্টিলার শেষ গানটার সময় তিনি রুডলফ ডি গর্তসকে প্রথম দেখেন। অন্ধকার বক্স থেকে ভয়ঙ্কর একটা মুখ, বিভৎস একটা মুণ্ডু বেরিয়ে এসেছিল, গর্তে বসা চোখের মণি দুটো জ্বলজ্বল করছিল। তা যেন লা স্টিরাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে চাচ্ছিল। আর চোখের সামনে যেন স্পষ্ট ভেসে উঠল, ব্যারন রুডলফ-এর লেখা সে চিঠিটা যাতে লেখাছিল, কাউন্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক-ই নাকি লা স্টিলার মৃত্যুর কারণ। তিনিই তাকে মেরে ফেলেছেন। ঠিক তখনই কাউন্টের কানে সুরেলা কণ্ঠের মিষ্টি-মধুর গানেরসুর ভেসে এল। স্টিফানোর লেখা গান।—'যাই, চল যাই—হাজার ফুলের বাগিচায়।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাউন্ট সঙ্গীত লহরী শুনতে লাগলেন। এক সময় আচমকা তার সম্বিৎ ফিরে এল। ব্যাস, গান থেমে গেল।

স্বপ্ন! কিন্তু একী স্বপ্ন দেখলেন কাউন্ট। আরাম-কেদারায় শুয়েই রাত্রি কাটিয়ে দিলেন, আশ্চর্য!

সকাল হতে না হতেই যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে নিলেন। সবার আগে লিভাডজেল আর পেট্রাসনি শহরে যাবেন। সেখান থেকে কার্লসবার্গে গিয়ে একটা দিন বিশ্রাম নেবেন।

কিং ম্যাথিয়াস সরাইখানা থেকে যাত্রা করে কাউন্ট হাজির হলেন ওরগাল প্লেটোর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। কালো পাতরের আতঙ্কের আধার কার্পেথিয়ান দুর্গের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। ভাবলেন, কার্লসবার্গে পৌছে সত্যই কি কার্পেথিয়ান রহস্যের ব্যাপারটা পুলিশের কানে দিয়ে তাদের পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন? গ্রামবাসীদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন, যে করেই হোক ভূতপ্রেতের উৎপাত, নাকি গুণ্ডা বদমাশরা আস্তানা গেড়েছে পুরনো ও পরিত্যক্ত দুর্গটায়! তিনি কি তখন ঘুণাক্ষরেও জানতেন, দুর্গটার মালিক ব্যারন রুডলফ? কথাটা শোনার পর থেকে দুর্গের ব্যাপার স্যাপারটাকে আর নিছক গুণ্ডা বদমাশদের কাজ বলে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারছেন না।

এক-এক করে পাঁচটা বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে ব্যারন রুডলফ-এর কোন খোঁজই কাউন্ট পান নি। তবে এ-ও সত্য বটে খোঁজ পাবার চেষ্টাও তিনি করেন নি। এর-ওর মুখে শুনেছেন, নেপলস থেকে গা-ঢাকা দেবার পর তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কেউ তো তাঁর মৃত্যু বা মৃতদেহ দেখে নি। তবে? তবে তার পূর্বসূরীদের তৈরি কার্পেথিয়ান দুর্গে এসে গোপনে ঘাপটি মেরে থাকাও আশ্চর্যের কিছু নেই। নির্জন-নিরালা দুর্গ। একমাত্র সহচর কানা ও প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক অরফানিককে নিয়ে এখানে আশ্রয় নেওয়া অসম্ভব নয়। কথায় বলে কানা-খোঁড়া বদমাসের ধাড়ি। তাই কানা অরফানিককেই ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানার নায়ক হওয়াও কিছুমাত্র আশ্চর্যের নয়। হতে পারে তারই সৃজনশীল প্রতিভার প্রকাশ ওই সব অত্যাশ্চর্য অবিশ্বাস্য কলজে-কাঁপানো কাণ্ডকারখানা।

সবচেয়ে বড় কথা, উভয়েই নির্জনতাপ্রিয়। তা-ই যদি হয়, তবে তো তাদের শান্তি বিঘ্নিত করার অধিকার কাউন্টের নেই। তার ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে উৎসাহী হওয়া অনধিকার চর্চা। তাঁর সহচর রোজকোরও একই মতো। ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানার নায়ক রুড়লফ ছাড়া আর কেউ-ই নন। তবে অহেতুক তাঁকে উত্যক্ত করা মোটেই উচিত নয়। গ্রামের লোকের ব্যাপার তারা নিজেরাই যা হোক ব্যবস্থা করুক।

www.pathagar.com

কাউন্ট বললেন—'হ্যাঁ, পুলিশে খবর দিতে হলে তারা নিজেরাই দিক। এ নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই।'

এরকম আলোচনার শেষে কাউন্ট মনস্থ করলেন, সিলা উপত্যাকায় যাবার আগে কিছুক্ষণের জন্য কার্পেথিয়ান দুর্গের প্রাচীরে একবারটি চক্কর মেরে যাবেন। তাঁর মন বড্ড টানছে। লা স্টিলার শেষ গানের শেষ কলিটা এখনও যেন তাঁর মনে গেঁথে রয়েছে। এতগুলো বছর বাদে তার স্মৃতি কাউন্টের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। নিক ডেক তাকে বারবার সতর্ক করে দিয়েছে, ভুলেও যেন তিনি কার্পেথিয়ান দুর্গমুখো না হন। পাত্তা দিলেন না তিনি। সামনে মরণফাঁদ জেনেও উদভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছেন। বৃথা চেষ্টা জেনে রোজকো তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করল না।

কাউন্ট যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো অনবরত হেঁটেই চলেছেন। একনাগাড়ে দু-ঘণ্টা হাঁটার পর কিছুক্ষণের জন্য পাথরের ওপর বসে জিরিয়ে নিলেন। ইচ্ছা করেই ঘুরপথে যাচ্ছেন। তবু লম্বা লম্বা কদমে হাঁটলে সূর্যের আলো থাকতে থাকতে কার্পেথিয়ান দুর্গের প্রাচীরের ধারে পৌঁছে যেতে পারবেন। তারপর রাত্রেই পৌঁছোতে পারবেন লিভাডজেল শহরে।

ঝোপঝাড় খানাখন্দ প্রভৃতি দুর্গম পথ অতিক্রম করে ভলক্যান, পথে পৌঁছতেই বিকাল পাঁচটা বেজে গেল। পথ মাঝে মাঝে ছোট-বড় পাথর, না হয় ইয়া বড় বড় গর্ত। যে কোন সময় পা হড়কে গিয়ে মৃত্যু হতে পারে। ভাবতে গেলে স্বীকার করতেই হবে এরা কার্পেথিয়ান দুর্গের প্রহরীর ভূমিকা পালন করছে। এমন বন্ধুর, দুর্গম ও ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে কোন দুর্গ থাকতে পারে ভাবাই যায় না।

কাউন্ট দুর্গের ভেতরে যাওয়ার উৎসাহী নন। এমন কুমতি তাঁর আদৌ নেই। ভবিষ্যতেও হবে না।

হ্যাঁ, বিচগাছটার মাত্র তিনটে ডালই এখন অবশিষ্ট রয়েছে বটে। গাছটার পরমায়ু মাত্র আর তিন বছর।

কাউন্ট আর তাঁর সহচর রোজকো অপলক চোখে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকা, রহস্য সঞ্চরকারি কার্পেথিয়ান দুর্গটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, দুর্গের তলদেশে কোন সুড়ঙ্গের অস্তিত্ব নেই তো? তা যদি না-ই হয় তবে অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ ব্যারন রুডলফ কেনই বা এখানে ঘাঁটি গাড়তে আসবেন ? সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার কাছাকাছি কাউন্ট ওরগাল প্লেটোর শেষ প্রান্তে হাজির হলেন। বাঁ দিকে অতিকায় প্রাচীর। সেটা সোজা এগিয়ে গিয়ে বাঁক নিয়ে আবার এগিয়ে গেছে। চারদিকে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা বিরাজ করছে।

রোজকো এবার মুখ না খুলে পারল না—'হুজুর, আটটা যে বাজে। এখন ফিরে চলুন। তা না হলে লিভাডজেল সরাইখানায় আশ্রয় পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে যে। অন্তত এক ঘন্টা সময় লাগবে এখান থেকে ফিরে যেতে।

কাউন্ট নির্বাক-নিস্পন্দ। তখন থেকে একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ইচ্ছা করেই হাঁটাচলা করছেন না, নাকি ডা. প্যাটাক-এর মতো পাথরের খাঁজে পা আটকে গেছে ? তবে কি কেউ ডা. প্যাটাক-এর মতোই তাঁর পা-টা অদৃশ্য শক্তি দিয়ে মাটির সঙ্গে ঠেসে ধরেছে ?

বহু চেষ্টা চরিত্রের পর কাউন্ট যেই না পিছন ফিরতে যাবেন অমনি অবাঞ্ছিত, একেবারে অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা ঘটে গেল। বিচগাছটার নিচে ইয়া দশাসই একটা ছায়ামূর্তি

www.pathagar.com

আবছা অন্ধকারে ভেসে উঠল। তিনি সেদিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। নারীমূর্তি—হ্যাঁ, নারীমূর্তিই বটে। অস্পষ্ট একটা নারীমূর্তি ধীর পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। দুধের মতো একটা আলখাল্লায় তার গলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা। থিয়েটার হলে লা স্টিলাকে যে যে পোষাকে, যে-সাজে কাউন্ট দেখেছিলেন আজ এমুহূর্তে নরকের আলোতে যেন ঠিক সে দৃশ্যই চাক্ষুষ করছেন। 'লা স্টিলা! লা স্টিলা!' বলতে বলতে কাউন্ট উম্মাদের মতো এগিয়ে যাবার জন্য পা-বাড়ালেন। রোজকো ঝট করে তাকে ধরে না ফেললে দুর্গের বাইরে নালায় পড়ে বেঘোরে প্রাণ দিতে হ'ত। ছায়ামূর্তিটা হঠাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

কাউন্ট উম্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন—'লা স্টিলা! লা স্টিলা জীবিত ? আজও সে জীবিত ? লা স্টিলা কি সত্যি জীবিত ?' কিন্তু কি করে এমন একটা অবাস্তব ব্যাপার সম্ভব হতে পারে ? কাউন্ট যাকে মৃত বলে জেনে এসেছেন, এমন কি চোখের সামনে মারা যেতে দেখে এসেছেন, তিনি জীবিত ? একী ভোজবাজির খেলা রে বাবা! কিন্তু তিনি তো এইমাত্রই চোখের সামনে দেখা দিয়ে আবার চোখের সামনেই অদৃশ্য হেয় গেলেন। তবে কি চোখের ভুল ? চোখের ভুল বলেই বা তাকে কি করে মেনে নেওয়া সম্ভব ? কাউন্ট একই নন, রোজকো-ও দেখেছে।

কাউন্টের চোখের সামনে এমন একটা রহস্যময় ঘটনা ঘটে গেল যাকে কিছুতেই আতঙ্কিত চোখ বা দুর্বল মনের ব্যাপার বলে মেনে নিতেও তিনি তিলমাত্র উৎসাহও পাচ্ছেন না। শুধু মাত্র লা স্টিলাকে মারা যেতেই দেখেন নি, তার সমাধিক্ষেত্রও কাউন্ট নিজের চোখেই দেখে এসেছেন। তবে ? তবে তাঁকে জীবিত বলেও তো মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

না, রূপসী যুবতী লা স্টিলা মরেন নি। অসুস্থা লা স্টিলাকে ব্যারন রুডলফ কার্পেথিয়ান দুর্গে পাচার করে দিয়েছিলেন। তাই তো কাউন্ট চোখের সামনে জীবন্ত লা স্টিলাকে হাঁটাচলা করতে দেখতে পেলেন।

অস্থিরচিত্ত কাউন্ট তাঁর পার্শ্বচর রোজকোর দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে বললেন—'রোজকো, আমার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। আমি কি তবে পাগল হয়ে যাচ্ছি ? বদ্ধ উম্মাদ হয়ে যাব আমি ?'

মুহূর্তকাল স্থির দৃষ্টিতে, অপলক চোখে কাপের্থিয়ান দুর্গের গম্বুজটার দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় অস্থিরভাবে বললেন—'রোজকো, লা স্টিলা, আমার স্বপ্নসাধের লা স্টিলা, আমার ভাবী স্ত্রী লা স্টিলা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমি যাই-আমি যাই রোজকো। আমাকে যেতেই হবে, আজ রাত্রেই আমাতে যেতে হবে আমার প্রেয়সীকে দুর্গ কারা থেকে মুক্তি দিতেই হবে।'

রোজকো কাউন্টের হাত দুটো চেপে ধরে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল—'স্যার, শান্ত হোন, মাথা ঠাণ্ডা করুন। যেতেই হয় কাল ভোরে যাবেন, আজ রাত্রে নয়।'

'চুপ কর! আজ—এখনই আমাকে যেতে হবে। আমি নিজের চোখে লা স্টিলাকে দেখেছি, সে-ও দেখেছে আমাকে। আমি যাবই, আর আমি একাই যাব।'

'কিন্তু স্যার, নিক ডেক যেখানে ঢুকতে পারেনি সেখানে আপনি একা কি করে যাবেন! আর যদি নেহাৎই আপনি একা যান তবে কি আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করব ?'

www.pathagar.com

'না, তোমাকে এখানে শুধু শুধু থাকতে হবে না। তুমি বার্স্টগ্রামে—না বার্স্ট গ্রামে নয়, কার্লসবার্গে যাবে। সকাল হলেই আমি যদি না ফিরি তবে তুমি সোজা কার্লসবার্গে গিয়ে এখানে আজ এবং আগে যা কিছু ঘটেছে পুলিশকে জানাবে। পুলিশ এনে, দরকার হলে গোলা-বারুদসহ সেনাবাহিনী নিয়ে এসে লা স্টিলার বন্দিনীদশা ঘুচিয়ে তাকে মুক্ত করতে হবেই।'

কাউন্ট এবার নালার কাছে পৌছে প্রাচীরের গা ধরে ধরে এগিয়ে চললেন বুরুজের দিকে। দক্ষিণে, প্রাচীরটার গায়েই তুলে রাখা হয়েছে টানা সেতুটা। নালার পাড় ধরে এগুবার পথ প্রায় বন্ধ। ছোট-বড় পাথর আর খানাখন্দ যেখানে সেখানে। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে কাউন্ট একটা পাথরের চাঙড় ডিঙিয়ে, ছুরির মতো তীক্ষ্ম একটা পাথরের টুকরোকে মুঠো করে ধরেই চাপা আর্তনাদ করে উঠলেন।!—'রক্ত' হ্যাঁ, হাতের তালু কেটে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, হোক গে। আর কাঁটার ঘায়ে জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেঁসে গেছে। কোনদিকেই আর সামনান্যতমও ভ্রূক্ষেপ তাঁর নেই।

কাউন্ট পথ হারিয়ে ভাবছেন, এখন যদি গির্জার ঘন্টাটা বেজে ওঠে তবে ঘন্টাধ্বনির মাধ্যমে লক্ষস্থল সম্বন্ধে ধারণা করে নিতে পারতেন। নিক ডেক আর ডা. প্যাটাক তো বরাতগুণে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। তা নইলে ভূতুড়ে আলোকশিখাটা জ্বললেও তো হতো। কাউন্ট ভাবলেন, পথ হারিয়েই ফেলেছেন। কোনদিকে যাচ্ছেন, টানাসেতুটা কি পেরিয়ে এসেছেন ? ধ্যুৎ ছাই। কিছুই বুঝতে পারছেন না।

কাউন্ট অকস্মাৎ করুণ আর্তনাদ করে উঠরেন—'লা স্টিলা! লা স্টিলা! আমি এসেছি লা স্টিলা।'

হঠাৎ একটা অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মি কাউন্টের চোখের সামনে ভেসে উঠল। তবে সেটা অনেক উঁচুতে অবস্থিত। সেখান থেকেই যেন সেটা কাউন্টকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

উচ্ছ্বাসে-উত্তেজনায় কাউন্ট খুবই অস্থির হয়ে পড়েছেন। লা স্টিলা, তাঁর ডাক শুনে সাড়া দিয়েছেন। এখন তবে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আলো নিয়ে এসেছেন।

কাউন্ট মুহূর্তমাত্র দেরি না করে আলোটা লক্ষ্য করে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলেন। কিন্তু দৌড়েই বা লাভ কি? সামনে যে পঞ্চাশ ফুট উঁচু প্রাচীর। সেটা ডিঙোবেন কি করে ? সদর-দরজা বন্ধ। টানাসেতুটা তুলে রাখা আছে।

পরে যা হয় দেখা যাবে। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সচকিত হয়ে ভাবলেন, একী টানাসেতুটাকে নালার ওপর পেতে রাখা হয়েছে। কাউন্টের ভাববার মতো সময়-সুযোগ নেই। এমন কি সে মানসিকতাও তার নেই। সেতুটা পেরিয়ে লম্বা-লম্বা পায়ে বন্ধ সদর-দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। অন্ধকারে উম্মাদের মতো দশ-বারো হাত যেতে না যেতেই অবিশ্বাস্য উপায়ে টানাসেতুটা ঝট করে উঠে গেল। ব্যস, কাউন্ট রহস্যসঞ্চারকারি কার্পেথিয়ান দুর্গে বন্দি হয়ে পড়লেন। দূর থেকে দূর্গটাকে একটা ভগ্নস্তূপ বলে মনে হলেও আসলে মোটেই তা নয়। দুর্গের ভেতরের সবকিছুই অক্ষত-অটুট। কাউন্টের একমাত্র ইচ্ছা ছিল একবারটি দুর্গটার ভেতরে ঢোকা। তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। টানাসেতুটা নালার ওপর পাতা রয়েছে। বন্ধ সদর-দরজাটা খুলে গেল। কাউন্ট ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতে টানাসেতুটা যন্ত্রচালিতের মতো ঝট করে উঠে প্রাচীরের গায়ে আটকে গেল, সদর-দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

www.pathagar.com

বাইরে বেরুবার পথ বন্ধ হয়ে গেল। এসব ব্যাপার নিয়ে ভেবে আকুল হবার মতো মানসিকতা ও সময় কোনটাই তাঁর নেই। ব্যারন রুডলফ যেখানে মাথা গুঁজেছেন, লা স্টিলা সেখানে বন্দিনী হয়ে রয়েছেন। সে ভয়ঙ্কর রহস্যজনক দুর্গে আসার অত্যুগ্র আগ্রহ তাঁর ছিল— এসেছেন, ব্যস, এর বেশি আর কী চাই ?

অন্ধকারে দেওয়াল ধরে ধরে কাউন্ট হাঁটতে লাগলেন। এবড়ো-খেবড়ো পথে কতবার যে হোঁচট খেয়েছেন, ইয়ত্তা নেই। প্রায় দু-শ' গজ সোজা এগিয়ে যাওয়ার পর বুঝলেন, পথটা বাঁ-দিকে মোড় নিয়েছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ব্যাপারটা কি জানতে উৎসাহী হলেন। তিনি কি আবার সদর-দরজার দিকেই চলেছেন ? কিছু জানতে বা বুঝতে পারলেন না। গোলকধাঁধার মতো কতবার যে সরুগলি দিয়ে পাক খেতে হল ইয়ত্তা নেই।

মেঝেতে ফাঁদ পাতা আছে কিনা তা-ই বা কে জানে ? তাই অন্ধকারে বার বার মেঝেতে বুট ঠুকে কাউন্ট পরীক্ষা করে করে এগোতে লাগলেন। কই তিনি তো ছাদে ওঠেন নি বা নিচেও নামেন নি। তবে? তবে কেন বার বার চক্কর খেতে হচ্ছে ? সদর-দরজার বিপরীত দিকে অবশ্য একটা দরজা ছিল, গেল কোথায় ? তবে কি ব্যারন রুডলফ সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন ? জমাটবাঁধা অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে পুরো একটা ঘণ্টা হাঁটাচলা করে কাউন্ট হাঁপিয়ে উঠেছেন।

শরীর টলছে। কাউন্ট আর চলতে পারছেন না। কেবলমাত্র অটুট মনোবলই তাঁকে এতক্ষণ চালিয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। তখন রাত্রি প্রায় ন'টা। কাউন্ট হঠাৎ পা ফেলতে গিয়ে পায়ের তলায় মাটি পেলেন না। সিঁড়ি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো একের পর এক ধাপ নিচে নেমে যেতে লাগলেন। এক-দুই-তিন সত্তরটা ধাপ নামার পর সিঁড়িটা শেষ হল। আবার একটা গলি ধরে হাঁটতে লাগলেন। এক নাগাড়ে এক ঘণ্টা হাঁটার পর রীতিমতো হাঁপ ধরে গেল।

ঠিক তখনই কাউন্ট অস্পষ্ট একটা আলোক দেখতে পেলেন। দূরে, বহুদূরে থাকার জন্য আলোটা অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কে ? লা স্টিলা তাঁকে আলোর সঙ্কেত দেখিয়ে সঠিক পথে চালিত করার জন্য এসেছেন ? আলোটাকে লক্ষ্য করে ক্লান্ত পা দুটোকে টেনে টেনে এগুতে লাগলেন। হাজির হলেন ভূগর্ভের একটা বিশালায়তন কামরায়। তার ব্যস বার ফুট, উচ্চতাও বার ফুট। কামরাটার ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটা কাঁচের ফানুস।

কাউন্ট কি পাতালপুরীর কামরায় অতিথি, নাকি কয়েদি হয়ে রয়েছেন ? এখন কি করবেন তিনি ? বাকি রাত্রিটুকু কোথাও শুয়ে-বসে বিশ্রাম করবেন। নাকি রাত্রেই কার্পেথিয়ান দুর্গের রহস্যভেদে ব্রতী হবেন ? দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করাও চলে।

মুহূর্তের মধ্যে কাউন্ট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, আর একটা সেকেন্ডও সময় নষ্ট করবেন না। রাত্রের মধ্যেই আবার ডোনজোনে পৌছবেন।

হঠাৎ কাঁচের ফানুসের আলোটা নিভে গেল। নিঃসীমা অন্ধকারে তলিয়ে গেল সবকিছু। হুড়মুড় করে উঠতে চেয়েও কাউন্ট পারলেন না। তার দম যেন একেবারেই ফুরিয়ে এসেছে। ঘুমে ঢলে পড়লেন। কিন্তু এ কী স্বভাবিক ঘুম, নাকি মোহাচ্ছন্ন—সংজ্ঞালোপ পাওয়া—নিজের সত্ত্বা হারিয়ে ফেলা। মন বা দেহ কোনটাই যেন আর তার বশ নয়।

www.pathagar.com

কাউন্ট গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। কতক্ষণ যে তিনি ঘুমিয়েছেন সে হিসাবও জানা নেই। চোখ মেলতেই ওপরের সে কাঁচের ফানুসের আলোটাকে দেখতে পেলেন।

কাউন্ট দৌড়ে দরজার দিকে এগুলেন। এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! তবে কি তিনি নিদ্রাচ্ছন্ন থাকার সময় কেউ ঘরে ঢুকেছিল? অবশ্যই ঢুকেছিল। নইলে জল আর খাবার কে রেখে গেছে? ব্যারন রুডলফ। তবে কি তিনি জেনে গেছেন, তাঁর সাধের কার্পেথিয়ান দুর্গে পুরনো শত্রু কাউন্ট হানা দিয়েছে?

তবে তো কাউন্ট এখন ব্যারন রুডলফ-এর হাতের পুতুল হয়ে নেচে বেড়াচ্ছেন। সারারাত্রি তাকে নাচিয়ে নিয়ে বেরিয়েছেন। খাবার দিয়ে জান রক্ষা করছেন, ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে তাকে খাঁচায় পুরে আড়াল থেকে মজা দেখছেন। কিন্তু কাউন্টের মতো লোককে কয়েদ করে রাখা এত সহজ নয়। ইচ্ছা করলে তিনি একনই কয়েদখানা থেকে পালিয়ে যেতে পারেন।

কিন্তু কাউন্ট ফিরবেনই বা কি করে? নালার ওপরের টানাসেতুটা তো উঠে গেছে। কিন্তু লা স্টিলাকে না দেখে, তার সঙ্গে কথা না বলে, তাকে না নিয়েই পালিয়ে যাবেন? অসম্ভব।

আচমকা একটা অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা গেল। দরজায় কান পেতে উৎকর্ণ হয়ে কাউন্ট আওয়াজটা লক্ষ্য করার চেষ্টা করলেন। বন্ধ দরজার পিছনে কার যেন পায়ের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলেন। এবার পায়ের শব্দটা যেন সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করে ওপরে উঠে আসছে। তবে খুবই সন্তর্পনে পা ফেলছে হয়তো উঠানে যাওযার সিঁড়ি দিয়ে উঠছে।

কাউন্টের শরীরের সব ক'টা স্নায়ু এক সঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠল। কোমর থেকে ছুরিটা ঝট করে টেনে নিয়ে হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে তৈরি হয়ে নিলেন। ব্যারণের পরিচারক হলে ছুরির ফলা গায়ে ঠেকিয়ে ধরে চাবিটা ছিনিয়ে নিয়ে ডোনজোনে যাবেন। আর যদি স্বয়ং ব্যারন হন? তবে চোখের পলকে তাঁর বুকে ছুরির ফলাটা গেঁথে দেবেন। ফুসফুসটা দু-টুকরো করে ছাড়বেন।

পায়ের শব্দটা চাতালের কাছে এসে থেমে গেল। কে যেন চাতালটায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। কে এ আগন্তুক? কি-ই বা চায়?

হঠাৎ সুরেলা কণ্ঠের সঙ্গীত-লহরী অস্থিরচিত্ত কাউন্টের কানে ভেসে এল। মেয়েলি কণ্ঠ। কে? কার কণ্ঠস্বর? লা স্টিলা? হ্যাঁ, লা স্টিরার কণ্ঠই বটে। বহুশ্রুত এ-কণ্ঠ। গানটাও তিনি আগে শুনেছেন। গান তো নয়, গানের মাধ্যমে যেন কাতর আহ্বান। লা স্টিলা তাকে ডাকছেন, কাতর আহ্বান জানাচ্ছেন। কিন্তু কাউন্ট যাবেন কি করে? দরজা যে বন্ধ। তিনি যে কয়েদখানায় আটকা পড়ে রয়েছেন।

অস্থিরচিত্ত কাউন্ট দরজার পাল্লায় বারবার মাথা ঠুকে বলতে লাগলেন—'লা স্টিলা! লা স্টিলা, আমি এখানে! আমি এখানে বন্দি স্টিলা।'

গানটা আবার ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে লাগল। কাউন্টের মধ্যে নিদারুণ অস্থিরতা ভর করল। হতাশায় জর্জরিত হয়ে পড়লেন। দরজার পাল্লা দুটোকে নখ দিয়ে খামচে উপড়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলেন। লোহার কব্জা বেঁকিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। দরজার পাল্লা দুটার সংযোগস্থলে মুখ ঠেকিয়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন—'স্টিলা! আমি এখানে স্টিলা—আমি এখানে বন্দি হয়ে রয়েছি!'

www.pathagar.com

কিন্তু হায় ! স্টিলা দাঁড়ালেন না। তাঁর কণ্ঠস্বর ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল। এক সময় তাঁর কান্নাঝরা গান মিলিয়ে গেল।

অকস্মাৎ কাউন্ট ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়লেন। তবে ? তবে কি লা স্টিলার-মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে ? তিনি কি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছেন ? দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে তিনি এখানে বন্দিনী হয়ে দিন কাটাচ্ছেন ? ব্যারন রুডলফ-এর অত্যাচার, অন্যায় জুলুম সয়ে সয়েই কি তাঁর মাথাটা গেছে ?

অতর্কিতে যন্ত্রচালিতের মতো ঝট করে সোজা ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন কাউন্ট। হাত দুটো মাথায় চালান দিয়ে সামনে চুল ছিঁড়তে লাগলেন। মাথায় নিদারুণ অস্থিরতা। শিরাগুলো দপদপ করছে। তবে কি কাউন্টও পাগল হয়ে যাচ্ছেন ? পাগল হয়ে যাওয়ার আগেই তাকে যে করেই হোক কার্পেথিয়ান দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। নইলে অচিরেই বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবেন তিনি। অস্থিরভাবে দরজার পাল্লা ধরে টানাটানি করতে লাগলেন। দরজা যে বন্ধ সে হুঁসও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। গান শুনে যখন মোহমুগ্ধের মতো ছিলেন তখন পিছনের দরজাটাও কে যেন নিঃশব্দে বন্ধ করে দিয়েছে। হায়! কাউন্ট পুরোপুরি বন্দি হয়ে পড়লেন।

কাউন্ট দুর্গে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজাটা দুম করে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন পাতালপুরীর দরজাটাও গেল বন্ধ হয়ে। সম্পূর্ণরূপে বন্দি হয়ে পড়লেন তিনি।

কাউন্টের সবকিছু যেন এলোমেলো, গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সুস্থিরভাবে ভাবনা চিন্তার শক্তি একেবারেই তাঁর লোপ পেয়ে গেছে। একমাত্র লা স্টিলার চিন্তাই তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার স্টিলা দুর্গের ভেতরেই রয়েছেন। কাউন্ট কতবার, কতভাবে তাঁকে আকুল হয়ে ডাকাডাকি করেছেন, সাড়া দেন নি।

তবে কি শোনার ভুল? কাউন্ট শুনতে-বুঝতে ভুল করেছেন। কিন্তু তা-ই বা কি করে সম্ভব ? মাত্র এক হাত মাথার ওপর থেকে যিনি গান গেয়েছেন তিনি কাউন্টের এত জোরে চিল্লিয়ে ডাকাডাকি শুনতে পান নি ? অসম্ভব! এ কিছুতেই হতে পারে না। ভাবতে ভাবতে কাউন্টের মাথায় রক্ত উঠে যাওয়ার জোগার হল। তিনি যেন বদ্ধ উন্মাদের মতো হয়ে গেলেন। এক ঘুষি মেরে, নয় তো সজোরে এক লাথি মেরে দরজাটা ভেঙে ফেলার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

পর মুহূর্তেই কাউন্ট নিজেকে সংযত করে নিলেন। নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগলেন। লা স্টিলা যদি পাগলই হয়ে যান তবু তো ব্যাপারটা নিয়ে ভেঙে পড়ার কিছুই নেই। একবার কোনক্রমে ক্রাজোয়ায় নিয়ে যেতে পারলে সুচিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবার মাধ্যমে তাকে অনায়াসেই সুস্থ-স্বাভাবিক করে তোলা সম্ভব।

সবার আগে কাউন্টকে পাতাল-কারা থেকে বেরুতে হবে। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? দু-দুটো দরজাই বন্ধ। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল ঘুমের কথা। ঘুমে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। ঘুম এমন গভীরও হতে পারে ভাবাই যায় না। তবে কি তাঁর খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কাউন্ট মনস্থির করে ফেললেন, এখানকার খাবার ও জল তিনি আর স্পর্শও করবেন না।আর তিনি চোখ বন্ধ করে ঘাপটি মেরে মড়ার মতো পড়ে থাকবেন। যে-ই খাবার আজ জল নিয়ে আসবে তার ওপর অতর্কিতে ঝাপিয়ে পড়ে বেধড়ক পিটুনি দেবেন। কিন্তু ক'টা বাজে ? এখন দিন, নাকি রাত্রি তাই বুঝা যাচ্ছে। না। দম দেওয়ার খেয়াল না থাকায় ঘড়িটাও বন্ধ হয়ে গেছে। মহাসমস্যায় পড়লেন কাউন্ট।

www.pathagar.com

এক সময় কেমন যেন ঠাণ্ডা-বাতাস কাউন্টের গায়ে এসে লাগল। তবে কি কোন গুপ্ত-দরজা দিয়ে বাতাস আসছে ? গুপ্ত-দরজা খুলে গেছে ? ঠাণ্ডা-বাতাসের প্রবেশ পথের দিকে পা টিপে টিপে এগোতে লাগলেন। সুড়ঙ্গ পথ ধরে এগোতে এগোতে তিনি এক সময় একটা বৃত্তাকার প্রাঙ্গণে পৌছোলেন। প্রায় এক শ' ফুট উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তবে কি এটা একটা কুয়ো বা ইঁদারা ? ইঁদারার ওপরের দিকে তাকানো মাত্র কাউন্টের চোখের ওপরে আকাশ ভেসে উঠল। তারাহীন আকাশ। সূর্য একদিকে হেলে পড়েছে। তবে কি এখন বিকাল পাঁচটা। তবে তো হিসাব মতো দেখা যাচ্ছে এক নাগাড়ে চল্লিশ ঘণ্টা কাউন্ট ঘুমিয়েছেন। নির্ঘাৎ তার খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। নইলে চল্লিশঘণ্টা টানা ঘুমের কথা ভাবা যায়, রোজকোকে নিয়ে কাউন্ট এগারোই জুন সরাইখানা থেকে যাত্রা করেছিলেন। তবে হিসাবমতো আজ তেরই জুন।

কাউন্ট এবার দরজা দুটো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। পিছনের দরজাটা খুবই মজবুত। ইয়া পেল্লাই দুটো পাথর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বন্ধ দরজাটার গায়ে। আর যে দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি লা স্টিলার গান শুনেছিলেন সিটা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। জলে ভিজে ভিজে কব্জা লাগানো জায়গাগুলো পচে গেছে। কাঠ একদম নরম। এবার ছুরির ফলা দিয়ে সে জায়গাগুলো চাঁছতে লাগলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা এক নাগাড়ে পরিশ্রম করার পর কব্জা ও পাল্লা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। ছুরিটা কোমরে গুঁজে ঝট করে তিনি দরজার বাইরে বেরিয়ে এলেন। ব্যস্ত-পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। একনাগাড়ে ষাট ধাপ ওঠার পর সিঁড়িটা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তিনি তো সাতাত্তরটা ধাপ নেমে পাতালপুরীর কামরায় হাজির হয়েছিলেন। তবে তিনি মূল চত্বর থেকে এখনও আট ফুট নিচে রয়েছেন।

হাত দুটোকে দু-দিকে ছড়িয়ে দিলেন। পুরোপুরি, টান টান করে ছড়াতে পারলেন না। দেওয়ালে হাত ঠেকে যাচ্ছে। সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ-পথ। অন্ধকারে বিড়ালের মতো গুটিগুটি এগিয়ে চলেছেন তিনি। কিন্তু চলেছেন তো চলেছেন। কে জানে এ চলার শেষ কোথায় ? প্রতি পদক্ষেপে আশা করছেন, এই বুঝি পথ শেষ হয়ে আসছে।

হঠাৎ দেওয়ালে হাত ঠেকল। কাউন্ট হাত দুটো দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুঝলেন, পথ শেষ। মাথায় হাত দিয়ে বুকফাটা আর্তনাদ করে মেঝেতে বসে পড়লেন। এত পরিশ্রম, এত আশার এই কি পরিণতি ? অদৃষ্টে কি-এ লেখা ছিল!

কাউন্ট তবু নিজেকে সামলে নিলেন। আশায় আশায় পাশের দেওয়ালে হাত বুলাতে বুলাতে একসময় কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন—'পেয়েছি! পেয়েছি!' মাঝের কাছাকাছি পাথরের দেওয়ালের গায়ে একটা ফাটল খুঁজে পেয়েছেন। পাথরের টুকরো আলগা, নড়বড়ে। পরিশ্রান্ত কুকুরের মতো জিভ বের করে কাউন্ট হাঁপাতে লাগলেন। কাঁপা কাঁপা হাতে একটার পর একটা পাথরের ইট খুলে আনতে আনতে এক সময় থমকে গেলেন। ক্ষীণ একটা আলো তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঝাঁপসা আলোয় বিশালায়তন একটা ঘর দেখতে পেলেন। লম্বা একটা দড়ি ঝুলছে। একটা অতিকায় ঘণ্টার সঙ্গে দড়িটা বাঁধা। কাউন্ট বুঝতে পারলেন, পুরনো গির্জার ভাঙাচোরা ঘণ্টা-ঘর এটা। এবার এ-ও বুঝলেন, সেদিন ঝোড়ো বাতাসে বেজে ওঠা এ ঘণ্টার ধ্বনিই শুনে গ্রামবাসীরা আতঙ্কে জড়োসড়ো হয়ে পড়েছিল। কাউন্ট ভাবলেন—'অসময়ে দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত এ উপাসনাগারে কে এল ?'

www.pathagar.com

একটু বাদেই মুখে লনঠনের আলো পড়তেই কাউন্ট চিনে ফেললেন, ব্যারন রুডলফ-এর রহস্যময় পার্শ্বচর অরফানিক। সে নাকি প্রখ্যাত এক বৈজ্ঞানিক। তার বিজ্ঞান-প্রতিভার ব্যাপারটা মানুষ আজও ধরতে পারে নি। সে চাইলেই নাকি রাক্ষসের মতো ভয়ালদর্শন অবয়বধারীকে তৈরি করে ফেলতে পারে। নির্বাক অরফানিক লণ্টন হাতে গির্জার উপাসনাগারে ঢুকে এল।

এতদিন কাউন্ট যে সন্দেহ করেছিলেন আজ তা-ই বাস্তবে পরিণত হল। গভীর রাত্রে ভাঙাচোরা পোড়ো গির্জায় অরফানিক-এর আগমনের উদ্দেশ্য কি ? ঘরের এক কোণা থেকে একটা কার্টিস টেনে এনে তা থেকে তার খুলে, পড়ে থাকা কয়েকটা সিলিন্ডারের গায়ে জড়াতে লাগল। কাউন্ট ভাবলেন, পাথর খুলে দেওয়ালের ফোঁকড়টাকে আরও বড় করে সেখানে দিয়ে উপাসনাগারে ঢুকে গিয়ে পিছন থেকে অতর্কিতে তার গলাটা টিপে ধরে সাক্ষাৎ শয়তানটাকে একেবারে খতম করে দেন। পরমুহূর্তেই তাঁর মধ্যে বিপরীত ভাবনার উদয় হল, যদি ব্যর্থ হন তবে সে তাকে নির্ঘাৎ যমের দরবারে পাঠিয়ে দেবে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল আরও অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড। ব্যারন রুডলফ ধীর পায়ে অরফানিক-এর পাশে এসে দাঁড়ালেন। এতগুলো বছর ইতিমধ্যে পেরিয়ে গেছে তবুও তার মুখমণ্ডল একতিলও পাল্টায় নি। আগের মতোই গর্তে বসা একজোড়া চোখ থেকে যেন লকলকে আগুনের-শিখা ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। কাউন্ট কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে পার্শ্বচর অরফানিক-এর কাজ দেখলেন। এবার তাদের বাক্যালাপ শুরু হল।

অরফানিক কাজের ফাঁকে জানাল—গির্জায় তার পাতার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বুরুজ আর ডোনজোনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। ভলক্যান পাহাড় অবধি সুড়ঙ্গটা পরিষ্কার। জেনারেটরের কারেন্ট চালু হয়ে গেলে বেরিয়ে পড়ার মতো যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে।

ব্যারন এবার চোখে-মুখে শয়তানের হাসি ফুটিয়ে তুলে বিড়বিড় করে বললেন—'পুরনো জীর্ণ দুর্গ, কাপের্থিয়ান দুর্গকে দেখার আগ্রহ নিয়ে যে বা যারাই আসুক না কেন কৃতকর্মের মাশুল অবশ্যই দিতে হবে। বোমা মেরে প্রাচীর উড়িয়ে দেবে ? পাগলের প্রলাপ।' এবার অরফানিক-এর দিকে ফিরে বললেন—'বার্স্ট গ্রামের মানুষের শলাপরামর্শ কিছু শুনতে পারলে কি ?'

অরফানিক কাজের মধ্যে ডুবে থেকে বলল—'কিছু বলছেন কি! সবই শুনেছি। কিং ম্যাথিয়াস সরাইখানায় মিলিত হয়ে তারা ষড়যন্ত্র করেছে, আজ রাত্রি নয়, ভোরের আলো ফুটলেই তারা নাকি দুর্গের ওপর চড়াও হচ্ছে। তারের ভেতর দিয়ে এ বার্তাই আমার কাছে পৌঁছেছে। আর রোজকো বার্স্ট গ্রামে ঘণ্টা দুই আগে হাজির হয়েছে। সে সঙ্গে করে কোলসবার্গের একদল পুলিশ নিয়ে এসেছে।'

'অরফানিক, তোমাকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। পুরনো দুর্গটার পক্ষে আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা না-ই বা থাকল, কাউন্ট আর তার সাকরেদদের মাথার ওপরে অন্তত হুড়মুড় করে ভেঙে তো পড়তে পারবে। হতচ্ছাড়াগুলো পাথর চাপা পড়ে মরুক।'

কাপের্থিয়ান দুর্গ আশপাশের মানুষের মধ্যে দিনের পর দিন কম রহস্য ছড়ায় নি। আজ সবই রহস্য ভেদ করা সম্ভব হবে।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বৈদ্যুতিক শক্তিকে বশ করে অবিশ্বাস্য সব কাণ্ড করেছেন। চারদিকে কেবলমাত্র বৈদ্যুতিক শক্তিরই জয়ধ্বনি।

www.pathagar.com

উনিশ শতকের প্রথমের দিকে বার্স্ট গ্রামে এরকম অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। টেলিফোন ব্যবস্থার এত উন্নতি হয়েছে, ডায়াফ্রাম এত শক্তিশালী করা গেছে যে, ইয়ারফোন কানে না লাগিয়েই তারবাহিত কাথাবার্তা স্পষ্ট শোনা সম্ভব হচ্ছে। কয়েক হাজার লীগ দূরবর্তী অঞ্চল থেকে কথা বললেও মনে হয় এই তো এখান থেকেই বুঝি কথা বলা হচ্ছে।

চারদিকে বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়ে পুরোদমে কাজকর্ম চলছে। আবিষ্কার করা হচ্ছে নানা অত্যাশ্চার্য দ্রব্য সামগ্রী। অরফানিকও দীর্ঘ নিরলস গবেষণার মাধ্যমে কম অবিশ্বাস্য বস্তু আবিষ্কার করে নি। কিন্তু বরাত মন্দ। নাম যশ তার জুটল না। বৈজ্ঞানিকদের পাশে তার পাত পড়ল না। ঠিক এমন-এক মুহূর্তে তার সঙ্গে ব্যারন রুডলফ-এর আলাপ-পরিচয় হল। অরফানিক-এর তখন খাবার জোটে না। ব্যারন রুডলফ তার ভরণপোষণ ও গবেষণার ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। শর্ত একটাই, তার আবিষ্কার একমাত্র ব্যারণের কুক্ষিগত হবে। তার নিজের ভোগে লাগবে না। অন্য কেউ তার একতিলও জানতে না পারে।

ব্যারন রুডলফ আর বৈজ্ঞানিক অরফানিক-এর মধ্যে একটা ব্যাপারে যথেষ্ট মিল রয়েছে। উভয়েই ছিটেল। বিকারগ্রস্ত, একরোখা আর গোঁয়ারগোবিন্দ। তাই তো অতি সহজেই ব্যারন রুডলফ আর অরফানিক-এর মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। দু-জন কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত কাজের মধ্যে ডুবে রইলেন। গান-পাগল ব্যারন সুললিত কণ্ঠের গানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেন। আর বিজ্ঞানমনস্ক অরফানিক মজে রইলেন বিজ্ঞান আর আবিষ্কারের মধ্যে।

এদিকে থিয়েটার হলে লা স্টিলার শিল্পী-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটার পর কেউ জানতে পারল না ব্যারন রুডলফ আর অরফানিক কোথায় উধাও হয়ে গেছেন। গোপনে পূর্বপুরুষের কার্পেথিয়ান দুর্গে ব্যারন হাজির হলেন। পার্শ্বচর অরফানিক-ও তার সঙ্গে এল। একটা গোপন সুড়ঙ্গপথে বাইরে থেকে খাদ্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রী এক বুড়ো চাকর পৌঁছে দেয়।

পাগলা বৈজ্ঞানিক অরফানিক এমন কিছু অবিশ্বাস্য আবিষ্কার করতে চায় যা প্রত্যক্ষ করে গ্রামবাসীরা রীতিমতো ভড়কে যায়। আর আতঙ্কে কেউ যেন ভুলেও দুর্গ মুখো না হয়।

ব্যারন রুডলফ-এরও একই ইচ্ছা। ব্যস, অরফানিক ঝটপট কয়েকটা অদ্ভুত বস্তু আবিষ্কার করে ফেলল যা প্রত্যক্ষ করে গ্রামবাসী মানুষের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। তারা এগুলোকে ভৌতিক কাণ্ডকারখানা জ্ঞান করে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কার্পেথিয়ান দুর্গকে এড়িয়ে চলতে লাগল। ব্যারন রুডলফ ও অরফানিক-এর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। বার্স্টগ্রামের প্রাত্যহিক খবর সংগ্রহের জন্য অরফানিক গোপনে টেলিফোনের তার বসাল কিং ম্যাথিয়াস সরাইখানা পর্যন্ত। কারণ, সেখানেই তো প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামের মাতব্বরদের আড্ডা বসে। তারটা পেতেছে নিয়াড নদীর তলা দিয়ে সরাইখানার হলঘরের পিছনের ঝোপ পর্যন্ত। সেখানে বসিয়ে দিয়েছে শক্তিশালী টেলিফোনিক যন্ত্র। হলঘরের ভেতরে অনুচ্চকণ্ঠে কথা বললেও গ্রাহকযন্ত্রটা তাকে ধরে নিয়ে তামার তারের মধ্যেমে কার্পেথিয়ান দুর্গে চালান দিয়ে দেয়। সেখানে বসে গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যায়। আবার হলঘরের কাউকে শাসাতে হলে দুর্গ থেকে কথা বলে

www.pathagar.com

সরাইখানার মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া সম্ভব হয়। এভাবেই ব্যারন রুডলফ সেদিন সন্ধ্যায় সভাচলাকালিন উপস্থিত সবাইকে, বিশেষ করে নিক ডেককে শাসিয়েছিলেন। সবাই ভাবল,সেটা অলৌকিক কণ্ঠস্বরেরই শাসানি—একই যন্ত্রে দু-দুটো উদ্দেশ্যসাধন।

অদৃশ্য কণ্ঠস্বরের শাসানিতে উপস্থিত সবাই বয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কেবলমাত্র নিক ডেক-ই ভয় পায় নি। ব্যারন রাগে ফেটে পড়ার জোগাড় হলেন। তাই নিক ডেককে এমন শাস্তি দিলেন যা দেখে সবার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবার জোগাড় হল। ব্যারন রুডলফ-এর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল টানাসেতুটার কব্জার সঙ্গেও বৈদ্যুতিক তার লাগানো হল।.নালার পাড়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লোহার পাত লুকিয়ে রাখা হল। বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালু হওয়া মাত্র লোহার পাতটা চুম্বকে পরিণত হয়। ডা. প্যাটাক লোহার নাল ও পেরেকের জুতো পরে লোহার পাতটা স্পর্শ করেছিলেন বলে তাঁর পা চুম্বকে আটকে গিয়েছিল। আর তিনি তাকে ভূতের কারসাজি ভেবে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়েছিলেন। আর নিক ডেক টানাপুলটার কব্জায় হাত ছোঁয়াতেই শক লাগায় আছাড় খেয়ে পড়ে। কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে যায়। ভয়ঙ্কর ব্যাপার স্বীকার করতেই হয়। এসব ঘটনার পর বার্স্ট গ্রামের মানুষ সহজে দুর্গের ত্রিসীমানায় আসতে সাহসী হবার তো কথা নয়।

যাক ব্যারন রুডলফ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। এবার কাউন্ট ডি টেলেক বার্স্ট গ্রামে হাজির হলেন। তবে গোড়াতে তার মধ্যে কার্পেথিয়ান দুর্গের ব্যাপারে কোনরকম আগ্রহ ছিল না। ব্যারন রুডলফ টেলিফোন যন্ত্রের মাধ্যমে গ্রামবাসী ও কাউন্টের কথোপকথক শুনতে পেয়েছিলেন। বুঝতে পারলেন, কাউন্ট কার্পেথিয়ান দুর্গের ভৌতিক ব্যাপার স্যপার ও আতঙ্ককে নস্যাৎ করতে চলেছেন। তাঁর দৃঢ় মন্তব্য, সেখানে ভূতপ্রেত নেই। পুরোটাই গ্রামবাসীদের কুসংস্কারের ব্যাপার। তিনি সেখানে গিয়ে স্বচক্ষে সবকিছু দেখার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। আর স্থির করলেন, প্রয়োজন হলে কার্লসবার্গে গিয়ে পুলিশের সাহায্য নেবেন। ব্যারন এতে ক্ষেপে একেবারে অগ্নিশর্মা হেয় গেলেন। তাঁর নির্জনবাসকে নিয়ে গায়ে পড়ে এমন ষড়যন্ত্র তো বরদাস্ত করারও নয়। তখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন যে কোনভাবে কাউন্টকে খাঁচায় বন্দি করে তার অভিযানের শ্রম চিরদিনের মতো ঘুচিয়ে ছাড়বেন। তার ওপর যখন শুনলেন, কাউন্টের পার্শ্বচর রোজকো কার্লসবার্গ থেকে পুলিশ ডেকে এনেছে তখন তিনি রাগে দুঃখে অপমানে রীতিমতো গুলি খাওয়া বাঘের মতো হয়ে গেলেন। ব্যস, কাউন্টকে দিলেন খাঁচায় পুরে। নিক ডেক, ডা. প্যাটাক আর কাউন্টকে সহজেই কব্জা করা গেছে বটে। কিন্তু বিশাল-পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই ? অসম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা, পুলিশরা ভূতপ্রেত বা শয়তানকে মোটেই পাত্তা দেয় না। অতএব বিপদ মাথার উপরে। এরকম চিন্তা করে ব্যারন রুডলফ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন—বহু কাহিনীর কেন্দ্র কার্পেথিয়ান দুর্গকে ধ্বংস করে দেবেনই। গির্জা, ডোনজোন আর বুরুজের তলায় শক্তিশালী ডিনামাইট পুঁতে দিলেন। এখন কেবল মাত্র অধীর-প্রতীক্ষা। ব্যারন ও অরফানিক ডিনামাইটে বৈদ্যুতিক তার দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গোপন সুড়ঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যাবেন। পুলিশ যখন হৈ হৈ করে প্রাচীর টপকে ভেতরে ঢুকবে ঠিক তখনই ডিনামাইট প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাবে। ব্যস, চোখের পলকে বহু কিংবদন্তির কেন্দ্র, ইতিহাস মণ্ডিত কার্পেথিয়ান দুর্গ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যাবে।

ব্যারন রুডলফ ও অরফানিক-এর আলোচনার মাধ্যমে কাউন্ট তাদের ভয়ঙ্কর পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে গেছেন। গোপন-পরিকল্পনা আর গোপন রইল না। তিনি

www.pathagar.com

ভাবলেন বিস্ফোরণ ঘটার আগেই ব্যারন রুডলফ তার সুড়ঙ্গ পথে লা স্টিলাকে নিয়ে চম্পট দেবেন। কিন্তু কীভাবে তিনি ব্যারণের পরিকল্পনাকে বানচাল করবেন। দু-জনের সঙ্গে একা লড়াই করে কাজ হাসিল করতে পারবেন ? না। এতবড় ঝুঁকি নেওয়ার অর্থই হচ্ছে নিজের পায়ে কুড়াল মারা। তার চেয়ে বরং কাল বৈজ্ঞানিককে নিয়ে ব্যারন আগে হলঘরটা থেকে বেরিয়ে যাক। তারপর শেয়ালের মতো গুটিগুটি গিয়ে গির্জার তার খুলে দিয়ে বিস্ফোরণকে রোধ করবেন। তার পরের ধাপ হবে শয়তান দুটোকে শায়েস্তা করা।

হলঘরটা ছেড়ে বেরুবার আগে ব্যারন রুডলফ আর অরফানিক-এর মধ্যে যা কিছু টুকরো টুকরো কথা হল কাউন্ট তা থেকে এটুকুই বুঝতে পারলেন পূর্বপুরুষের বহু সাধের কার্পেথিয়ান গির্জা ছেড়ে বেরুবার আগে শেষবারের মতো স্টিলার গান শুনতে চান।

বিপদ শিয়রে। আসন্ন নিশ্চিত বিপদের হাত থেকে অব্যহতি পেতে হলে মরার আগে, যতশীঘ্র সম্ভব ব্যারন রুডলফকে হত্যা করতে হবে, কাউন্ট ভাবলেন।

ভাঙা-দেওয়ালের ফোঁকড় দিয়ে কাউন্ট কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। বিড়ালের মতো পা টিপে টিপে খুবই সন্তর্পণে এগিয়ে গেলেন। সামনে একটা দরজা পড়ল। দরজার ঠিক গা থেকে এক সুড়ঙ্গ শুরু। অন্ধকার সুড়ঙ্গ ধরে এগুতে এগুতে এক সময় ঘুলগুলি দিয়ে অদূরে কয়েকটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেলেন। পুলিশ। রোজকোর নিয়ে আসা পুলিশ। তোড়জোড় চলছে। ভোরের আলো ফুটলেই আক্রমণ শুরু করবে। উঁকি দিয়ে দেখলেন, ছায়ামূর্তিগুলো এখনও ঘুরঘুর করছে। দুর্গের দিকে আসার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

একতলা যমপুরীর মতো নিস্তব্ধ। দোতলাও যেন অন্ধকার যক্ষপুরী। তিনতলায় পৌছোতেই সিঁড়ি শেষ হয়ে গেল। পথও এখানেই শেষ। দেওয়ালের ছিদ্র দিয়ে দেখতে পেলেন, ডানদিকে ঘুটঘুট্টে অন্ধকার, বাঁদিকে অত্যুজ্জ্বল-আলো। বিশালায়তন একটা ঘর। ঘরটা পুরো তিনতলাটা জুড়ে রয়েছে। ঘরটার এক ধারে জমাটবাঁধা অন্ধকার আর অন্যদিকে আলো ঝলমল করছে। যে যন্ত্র থেকে আলো আসছে সেটাকে দেখা যাচ্ছে না। কাউন্ট গুটি গুটি ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলেন চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে একটা মনুষ্যমূর্তি নিশ্চল-নিথর ভাবে বসে। মাথাটা পিছনের দিকে হেলে পড়েছে। ডানহাতটা টেবিলের ওপর রক্ষিত। চোখ দুটো বন্ধ। কে ? কে ওটা ? ব্যারন রুডলফ ডি গর্তস। কাউন্ট চমকে উঠলেন। কিন্তু এঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সুড়ঙ্গ পথে ধাওয়া করেছে ? কিন্তু ব্যারন রুডলফ যে বলেছিলেন, দুর্গ ছেড়ে দেওয়ার আগে, দুর্গটা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে লা স্টিলার গান শুনবেন ? কোথায় লা স্টিলা ? সেজন্যই হয়ত তিনি তিনতলার এ হলঘরে হাজির হয়েছেন। প্রতিরাত্রেই হয়ত এখানে বসেই গানশোনেন। গান শেষ করে লা স্টিলা হয়ত বা প্রাসাদের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু হলঘরে ব্যারন রুডলফ চোখ বন্ধ করে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসে। লা স্টিরা কোথায় ? তিনি যে অনুপস্থিত। মুহূর্তে কাউন্ট মনকে শক্ত করে নিলেন। ভাবলেন, লা স্টিলার খোঁজ পরে করা যাবে। এমন মওকা আর পাওয়া যাবেনা। ব্যারন একদম একা। তাও আবার চোখবন্ধ করে বসে। চমৎকার সুযোগ।শয়তান ব্যারন তাঁকে ধরে এনে পাগল করে দিয়েছেন। অতএব

www.pathagar.com

একেই আগে খতম করে গায়ের ঝাল মিটিয়ে ফেলার জন্য ছুরিহাতে এগিয়ে গেলেন। ছুরির ফলাটা ব্যারণের বুকে গেঁথে দেওয়ার জন্য হাতটা তুলতেই অতর্কিতে সেখানে লা স্টিলা হাজির হলেন। কাউন্টের হাত থেকে ছুরিটা সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল।

লা স্টিলা এলোচুলে অদূরে দাঁড়িয়ে সেদিন ওরল্যান্ডো গীতিনাট্যের শেষ দৃশ্যে যে সাদা পোশাক পরে গান করেছিলেন সে পোশাক তাঁর গায়ে। কাউন্টের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে। কাউন্টকে দেখছেন বটে কিন্তু হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছেন না, কথাও বলছেন না। তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। উম্মাদিনী—কথা তো বলাও সম্ভব নয়। এক সময় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে মিষ্টি মধুর সুরে গাণ শুরু করলেন। যে গান দীর্ঘ পাঁচ বছর আগে ব্যারন ও কাউন্ট উভয়কেই মোহিত করেছিলন আজ তা-ই আবার নতনু করে উম্মাদনা জাগিয়ে তুলল। ভয়ঙ্কর শেষ নাট্যানুষ্ঠানের সর্বশেষ গান।

গান শুনতে শুনতে কাউন্ট পাঁচ বছর আগেকার মতোই আত্মাহারা হয়ে পড়লেন। যে গান গাইতে গাইতে সেদিন তিনি মঞ্চের ওপরই লুটিয়ে পড়েছিলেন আজ আর লুণ্ঠিত হলেন না। কাউন্টের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে করুণ সুরে একের পর এক গানের কলি গেয়ে চলেছেন। কাউন্টের দিকে তাঁর দৃষ্টি স্থির।

ব্যারন রুডলফ ইতিমধ্যেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। মুখোমুখি দাঁড়ালেন দুই চরমতম শত্রু—কাউন্ট আর ব্যারন। অতর্কিতে কাউন্টের হাত থেকে খসে-পড়া ছুরিটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে চোখের পলকে লা স্টিলার বুকে গেঁথে দিলেন। কাউন্ট বাধা দিতে গিয়েও পারলেন না। হঠাৎ কাঁচভাঙার ঝনঝন আওয়াজ হল। লা স্টিলা কর্পুরের মতো যেন বাতাসে মিলিয়ে গেলেন। অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কাউন্ট স্থবিরের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। যেন হতচকিত। ঠিক যেন একটা পাথরের মূর্তি দাঁড়িয়ে। তবে ? তবে কি লা স্টিলার মতো কাউন্টও পাগল হয়ে গেলেন

ব্যারন-এর ভয়ঙ্কর আর্তনাদে কাউন্টের সম্বিৎ ফিরে এল। ব্যারন চেঁচিয়ে উঠলেন—'লা স্টিলা উধাও হয়েছে বটে। কিন্তু তার সুরেলা কণ্ঠ আমার কাছে চিরদিনই থাকবে। তার গরা-সুরেলা কণ্ঠ আমার, একমাত্র আমার।'

ব্যারণের টুঁটি টিপে ধরার জন্য কাউন্ট লাফিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু পারলেন না, তাঁর স্নায়ুগুলো ক্রমেই শিথিল হয়ে আসছে। সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন।

ব্যারন সেদিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র না করে টেবিল থেকে প্রায় চৌকোণা একটা বাক্স হাতে তুলে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। এমন সময় রাইফেলের গর্জন শোনা গেল। রাইফেলের গুলি ব্যারনকে স্পর্শ করলনা বটে। কিন্তু বাক্সটা গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিল। ব্যারন আর্তনাদ করে উঠলেন—'গেল ! লা স্টিলার প্রাণপাখি উড়ে গেল। তার গানের গলা গেল!' উম্মাদের মতো ছুটতে ছুটতে ব্যারন অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এদিকে পুলিশের অপেক্ষায় আর সময় নষ্ট না করে রোজকো আর নিক ডেক দুর্গের প্রাচীরে উঠতে লাগল। অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে চারদিক থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। সমগ্র প্লেটোয় যেন প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। কার্পেথিয়ান দুর্গ হুড়মুড় করে ভেঙে গেল।

www.pathagar.com

পরিকল্পনা ছিল, ব্যারন রুডলফ দুর্গ ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর ডিনামাইট ফাটবে। তবে ? তবে তার ব্যতিক্রম হল কেন ? দুর্গের ভেতরে অবস্থান করার সময়েই ভয়ঙ্কর-বিস্ফোরণটা ঘটে গেল কেন ? আসলে ব্যারণের মাথা ঠিক ছিল না। কোন সময়ে যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রটা চালু করতে হবে খেয়ালই ছিল না। তবে কি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ডিনামাইট ফাটিয়ে শত্রুকে খতম করতে চেয়েছিলেন ?

বিস্ফোরণ ঘটার ফলে পুলিশের হাঙ্গামা অনেকাংশে লাঘব হল। অনায়াসেই দুর্গের ধ্বংসস্তূপে পৌঁছে যেতে পারল। গজ পঞ্চাশেক এগোতেই ব্যারন রুডলফ-এর নিষ্প্রাণ দেহটাকে এলিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল। কিন্তু কাউন্ট? তাঁকে তো কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজির পর রোজকো ও নিক ডেক একটা ইয়া মোটা কড়িকাঠের ফাঁকে পড়ে থাকতে দেখল কাউন্টকে। জীবিত, অক্ষত। তবে সংজ্ঞাহীন তাঁর দেহ।

সংজ্ঞা ফিরে আসতেই তিনি লা স্টিলার শেষ গানের কলিগুলি গুণগুণ করে গাইতে লাগলেন। রোজকো আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠল—'প্রভু—আমার প্রভু কাউন্ট ফ্রাঞ্জ ডি টেলেক কি সত্যি পাগল হয়ে গেলেন!' হ্যাঁ, তিনি পাগলই হয়ে গেছেন। তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটার ফলে কার্পেথিয়ান দুর্গের রহস্য সবার অগোচরেই রয়ে গেল। কারণ, তিনি ছাড়া অন্য কেউ-ই তো দুর্গের রহস্যভেদ করতে পারে নি। তবে কানা বৈজ্ঞানিক অরফানিক—এর কাছ থেকে রহস্যের কিছু কিছু জানা গেল। বিসব্রিজে ব্যারণের জন্য তাঁর অপেক্ষা করার কথা ছিল। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল। ব্যারন সেখানে গেলেন না। ধৈর্য্যচ্যুত হলেন। আতঙ্কিতও কম হলেন না। বিস্ফোরণের ফলে তিনি মারা গেছেন আশঙ্কা করে ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গের কাছে আসতেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল। তার মুখ থেকে শোনা গেল, ইটালিতে অভিনয় কালেই লা স্টিলা মারা গিয়েছিলেন, কথাটা সত্যি। তাঁকে কবরস্থ করা হয়েছিল এ-ও সত্যি। নেপলসের ক্যাম্পো সন্তো নুয়োভো করবস্থলিতে মাটির তলায় এখনও তার কঙ্কাল পাওয়া যাবে। তখনই গ্রামোফোনের গানের উন্নতি হচ্ছে। অরফানিকের তৈরি ফোনোগ্রামে লা স্টিলার গান রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল। রেকর্ডটাসহ গ্রামোফোন নিয়ে ব্যারন রুডলফ কার্পেথিয়ান দুর্গে ফিরে এলেন। রেকর্ড বাজিয়ে লা স্টিলার গান তন্ময় হয়ে শুনতেন। গান শুরু হলেই এলোচুলে লা স্টিলা তার সামনে এসে দাঁড়াতেন। এ-ও ভোজবাজির খেল ছাড়া আদৌ ভৌতিক ব্যাপার কিছুই নয়। ব্যারন লা স্টিলা-একটা বড়সড় ছবি কিনে রেখেছিলেন। সাদা পোশাক পরিহিতা, আলুথালু চুল। বিশেষ এক ধরনের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে রাখলে সেটা যেন জীবন্ত হয়ে উঠত। প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মাধ্যমেই এটা সম্ভব হ'ত। অন্ধকার রাত্রে সিনেমার মতো কাচের পর্দায় এ ভোজবাজি দেখিয়েই অরফানিক কাউন্টকে মোহিত করেছিল। এত কাছ থেকে দেখেও কাউন্ট ভেল্কিটা ধরতে পারেন নি। রাইফেলের গুলিতে কাঁচটা ভেঙে যেতেই লা স্টিলার মূর্তি হাফিস হয়ে গিয়েছিল। অরফানিক তার কীর্তির কথা বড়াই করে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলল—'ভূতপ্রেতের ব্যাপারটা স্রেফ তার হাতের কারসাজি। এভাবেই বার্স্ট গ্রামের লোকগুলো ভূত ভূত করে নেচেছে, কাউন্ট পাগল হয়ে গেছেন, নিক ডেক মৃত্যুর হাত থেকে কোনরকমে ফিরেছে।

www.pathagar.com

সবই বুঝা গেল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কাপের্থিয়ান দুর্গটা ব্যারন রুডলফ-এর মাথায় ভেঙে পড়ল কেন ? আসলে তিনি আত্মহত্যা করলেন। লা স্টিলার গানের রেকর্ড আর বিশেষ ধরণের আয়নাটা ভেঙে যেতেই তাঁর বাঁচার সাধ মন থেকে উবে যায়। তিনি আর এক মুহূর্ত বাঁচতে চান নি। কার্পেথিয়ান দুর্গেই ব্যারন রুডলফ-কে সমাধিস্থ করা হল। রোজকো পাগল কাউন্টকে ক্রাজোয়া দুর্গে নিয়ে গেল। অরফানিক লা স্টিলার অবশিষ্ট গ্রামোফোনের রেকর্ডগুলো উপহার দিলেন। সেগুলো তাঁকে দিন-রাত বাজিয়ে শোনানো হল।

কার্পেথিয়ান দুর্গধ্বংস হওয়ার সাত দিন বাদে নিক ডেক ও মেরিওটার বিয়ে হয়ে গেল। তবে গ্রামবাসীর মন থেকে ভূত-প্রেতের আতঙ্ক দূর হতে সময় লাগবে। কুসংস্কার আর ভূতপ্রেত যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ডা. প্যাটাক বুক ফুলিয়ে বলতে লাগলেন—'দুর্গে ভূতপ্রেত কিছুই নেই, আমি তো আগেই বলেছিলাম।'

---

www.pathagar.com

স্টিম হাউস

দেয়ালে সাঁটা পোস্টারটাকে এক হেঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বিচিত্র চরিত্রের এক ফেরারি-ফকির ভিড়ের মধ্যে মিশে মুহূর্তে একেবারে বে-পাত্তা হয়ে গেল।

গাট্টাগোট্টা তার দৈহিক গঠন। গায়ে হাতির শক্তি ধরে। বয়স বছর চল্লিশেক। তাকে হঠাৎ করে চেনার একটাই উপায়, বাঁ-হাতের একটা আঙুল অনুপস্থিত। কাটা গেছে। এরকম বেশ কিছু সংখ্যক পোস্টার ঔরাঙ্গাবাদের সব কটা পথের ধারে ধারে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। পথের বাঁকে বাঁকে ঢোল পিটিয়ে পোস্টারের বক্তব্য জনগণের মধ্যে প্রচার করা হয়েছে। ব্যবস্থার কোনোই ত্রুটি নেই। নানা সাহেবকে যে বা যারা ধরিয়ে দিতে পারবে, মোটা পুরস্কার প্রদান করা হবে। জীবিত বা মৃত যে কোনো অবস্থাতে তাকে ধরিয়ে দিতে পারলেই এ পুরস্কার দেওয়া হবে।

পোস্টারের বক্তব্য নিয়ে হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে এবং নদীর ঘাটে সর্বত্র একই আলোচনা চলতে লাগল। পুরস্কারের অর্থের লোভটাই আসল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আঠারো শ' সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর পুরো দশ দশটা বছর কেটে গেল। সিপাহী বিদ্রোহের কর্ণধার নাকি নেপালে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল। এখন ঔরঙ্গাবাদেই এসে মাথা গুঁজেছে, নানাসহেব। ইংরেজদের চোখে ধূলো দিয়ে তিনি অশরীরী ছায়ামূর্তির মতোই এ-বিশাল উপমহাদেশের পথে-প্রান্তরে, আনাচে-কানাচে দিব্যি চলাফেরা করছেন। শত্রু নিপাত করাই বিদেশী শাসকের একান্ত ইচ্ছা। বলা তো যায় না, চীনের সঙ্গে জোট বেঁধে হয়তো আবার দেশের বুকে বিদ্রোহের জোয়ার বইয়ে দিতেও পারে।

পথ চলতে গিয়ে কিছু লোককে পথের ধারে ভিড় করে কথাবার্তা বলতে দেখে ফকির থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, কে একজন হম্বি-তম্বি করে কি সব বলছে। দীঘদিন সে নানা সাহেবের শিবিরে বন্দি ছিল। সে সুবাদে নানা সাহেব তার পরিচিত। এখন বাদলা নেবার সুযোগ এসেছে। যে করেই হোক, নানা সাহেবকে ধরে ইংরেজদের হাতে সে তুলে দেবেই।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন মন্তব্য করল, নানা সাহেব খতম হয়ে গেছে। আঙুল-কাটা একটা মৃতদেহও পাওয়া গেছে। তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল বদলা নিতে ইচ্ছুক সেই লোকটা—না, অবশ্যই না। একটা মৃতদেহের আঙুল কেটে বাদ দিয়ে পুলিশের দরবারে আনা হয়েছিল। নানা সাহেব জীবিত, অবশ্যই জীবিত। প্রমাণ সে করবেই করবে।

কথাটা কানে যেতেই সচকিত হয়ে ফকির ঝট করে তার কাটা-আঙুল সমেত হাতটাকে আলখাল্লার ভেতরে চালান দিয়ে দিলেন। ক্রোধে ফেটে পড়ার জোগাড় হল। তবে লুকোবার চেষ্টা না করে লোকটার প্রতি সর্তক দৃষ্টি রাখতে লাগলেন। দেখতে পেলেন, সে নদীর ধারে গিয়ে একটা নৌকায় উঠে পড়ল। ওইটাই তার মাথাগোঁজার অবলম্বন।

www.pathagar.com

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই ফকির হঠাৎ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতের ছুরিটাকে তার বুকে গেঁথে দিলেন। মুহূর্তে সব শেষ হয়ে গেল। তার দেহ থেকে আত্মাটা বেরিয়ে যাবার ঠিক আগে সে ফকিরকে চিনতে পারল।

ফকির এবার শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার জন্য তৎপর হলেন। শহরের প্রধান ফটকে পাহারা জোরদার করা হয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় এসে তিনি থমকে দাড়িয়ে পড়লেন। একটা বটগাছের ঝুরি বেয়ে তিনি দ্রুত প্রাচীরের ওপর উঠে গেলেন। প্রায় ফুট ত্রিশেক তলায় জমিন। গাছের ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে তিনি এগুতে লাগলেন।

অকস্মাৎ পর পর কয়েকটা বন্দুকের গুলি এসে গাছের ডালটাকে ভেঙে দিল। ডালটা সমেত এত উঁচু থেকে আছাড় খেয়ে জমিনে পড়েও তিনি মোটেই আহত হলেন না। অত্যাশ্চর্য এক কায়দায় মাটিতে পড়েই ইংরেজ সৈন্যদের শিবিরের পাশ দিয়ে কায়দা-কসরৎ করে এগিয়ে গিয়ে জমাটবাঁধা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে দিলেন। ঔরঙ্গাবাদ ছেড়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চললেন।

মঁসিয়ে মক্রের ডাইরির ছেড়া পাতায় লেখা রয়েছে—ইঞ্জিনিয়ার ব্যাঙ্কস-এর সাহচর্যে কয়েকদিন কাটিয়ে গল্পগুজব করে কাটানোর উদ্দেশ্যেই আমার ভারতে আসা। প্যারিসে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তারপর ভারতে রেলপথ স্থাপনের কাজের দায়িত্ব নিয়ে সে এদেশে চলে আসেন।

আঠারো শ' সাতষট্টিতে আমার ভারতে আসার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তাঁর সাহচর্যে কয়েকদিন থেকে চুটিয়ে ঘুরে বেড়াব আর মজলিশ করে কাটিয়ে দেব। আর ভারতের পুরনো শহরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখার সাধও কম ছিল না। আমি ভারতে বেড়াতে আসছি শুনে ব্যাঙ্কস তো খুশিতে একেবারে ডগমগ। কলকাতায় পা দিতেই তার কয়েকজন অভিন্নহৃদয় বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। তাঁদের মধ্যে সবার আগে কর্নেল মুনরো আর ক্যাপ্টেন হুড-এর নাম করতে হয়।

কলকাতার একান্তে নিরিবিলি এক ফিরিঙ্গি পাড়ায় কর্নেল মুনরোর বাসস্থল।

তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ম্যাকনিল তার সমবয়স্ক। তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। একই সঙ্গে সেনা বিভাগ থেকে অবসর নিয়ে একই বাড়িতে বাস করছে। এক সঙ্গেই যুদ্ধও করেছে। কাজ থেকে অবসর নেবার পর আর নিজের দেশে চলে যেতে কারোরই মন সরে নি। তবে বিশেষ এক কারণে সে দেশে ফেরে নি। স্যার হেকটর মুনরো নামে তার এক নিষ্ঠুর ও রগচটা পূর্বসূরী এক শ' বছর আগে ভারতে এসেছিলেন। তিনি এক বিদ্রোহ দমন করার সময় কামান দেগে জনা ত্রিশেক বিদ্রোহীকে ঘায়েল করেন।

কর্নেল মুনরো তাঁর উত্তরসুরী। সিপাহী বিদ্রোহে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তুমুল যুদ্ধ করেন। কিন্তু কানপুরে এসে তাঁকে স্ত্রীকে হারাতে হয়। বিদ্রোহী সিপাইরা তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করে। তারপর থেকেই নানাসাহেবের নামটা কানে যেতেই কর্নেল মুনরোর মাথায় রক্ত উঠে যায়। তল্লাশী চালিয়ে নানাসাহেবকে বের করে তাঁকে নিজ হাতে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই তিনি সেনাবিভাগ থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। নানাসাহেব সবার চোখে ধূলো দিয়ে দিব্যি টিকে রইলেন। শেষমেষ একদিন খবর এল নানাসাহেব নেপালে খুন হয়েছেন। ব্যস, এবার তার কলিজা ঠাণ্ডা হল। এতেও তার রাগ কমল না। নানাসাহেব বা সিপাহী বিদ্রোহের নাম শুনলেই তিনি দপ করে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। তাই কেউ ভুলেও তাঁর সামনে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে না। শুধু কি

www.pathagar.com

এ-ই? নানাসাহেব যে বোম্বাইয়ে হাজির হয়েছেন এ খবরটাও তাঁর কাছে খুবই সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখা হয়েছে।

এমন চরিত্রের কর্নেল মুনরোর কলকাতার বাসস্থলে এক সন্ধ্যায় আমরা, ক্যাপ্টেন হুড, কর্নেল মুনরো, ব্যাঙ্কস এবং আমি চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। ক্যাপ্টেন হুড কম বয়স্ক। ঝানু শিকারী। বাঘ মারায় একেবারে সিদ্ধহস্ত। আমাদের গল্পের বিয়বস্তু দেশভ্রমণ। কথা প্রসঙ্গে কর্নেল মুনরো বললেন— 'নিজের বাড়িতে অবস্থান করে দেশভ্রমণের আনন্দ কিন্তু অন্য কোনো কিছুতেই নেই।'

একেবারেই উদ্ভট মন্তব্য। যারপরনাই আজব প্রস্তাব। উপস্থিত সবাই সররে হেসে তাঁর উদ্ভট প্রস্তাবটাকে উপভোগ করলেন। বাড়িতে অবস্থান করেই দেশভ্রমণ? বাড়িটাকে কি গরু, নাকি ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যাবে?

ব্যাঙ্কস একজন ঘাঘু ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার। বলল, 'এর চেয়ে বাষ্পিয় হাতি জুড়ে দিলে কেমন হয়? তাতে বহুদিক থেকে সুবিধে। খাওয়াবার সমস্যা নেই, স্নান করানোর হাঙ্গামাও পোহাতে হবে না, অন্যান্য যত্নআত্তির তো বালাই-ই নেই। জঙ্গলি জানোয়ারের ভয়েও কুঁকুড়ে থাকতে হবে না। যন্ত্রটাকে সচল রাখতে কেবলমাত্র কিছু তেল আর কয়লা বা কাঠ, এ তো ভারতের জঙ্গল থেকেই প্রচুর জোগাড় হয়ে যাবে।'

হুড তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বললেন—'বাষ্পিয় হাতি। সে না হয় আর পঞ্চাশ বছর পরে—'

ব্যাঙ্কস বলল—'ধ্যুৎ, পঞ্চাশ বছর বলছেন কি মশাই! আমি বাষ্প-হাতি তৈরি করেই ফেলেছি। এবার ভাবছি, চলন্ত বাড়িতে বসেই ভারত-দর্শনে বেরুবোই। কর্নেল মুনরোকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া যাবে কিনা জানতে চাইলেন।'

নেহাৎই সহজ সরল শান্ত সৌম্য প্রকৃতির নিরীহ গোবেচারা, ফকিরের ভেকধারী দুর্ধর্ষ নানাসাহেব রাত্রির অন্ধকারে সবার নজর এগিয়ে এগিয়ে চলেছেন। মারাঠা রাজপরিবারের জ্বলন্ত-অগ্নিশিখা, অকুতোভয় নানাসাহেব। শিবাজীর মতো তাঁর চোখেও স্বপ্ন জড়িয়ে রয়েছে। বিদ্রোহকে এবার কেবলমাত্র সিপাহীদের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ভারতের সব শ্রেণীর মানুষ এতে কাঁধে কাঁধ মেলাবে। সমগ্র ভারতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেবার অত্যুগ্র বাসনাকে চরিতার্থ করতেই তো নানাসাহেব নেপাল থেকে গা-ঢাকা দিয়ে বোম্বাইয়ে হাজির হয়েছেন। দেশের রাজা আর সিপাহীদেরকে পরদেশী জানোয়ারগুলো নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে, তাদের নিজের হাতে খতম না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। কর্নেল মুনরো তাদেরই দলের। তার বুকের রক্তে হাত ধুতে নানাসাহেব কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া করতেও দ্বিধা করবেন না।

নানাসাহেব এক সময় রাত্রির অন্ধকারে ইলোরার পর্বতগুহায় হাজির হলেন। গভীর জঙ্গলে জনমানবহীন পরিত্যক্ত এক মন্দির। মুখে দুটো আঙুল চালান দিয়ে সজোরে সিটি বাজাতেই নানাসাহেব-এর ভাই ও একান্ত সহচর দূর থেকে আলোর নিশানা দিলেন। ত্রস্তপায়ে ছুটে কাছে এলেন।

গুহায় বসে দু ভাই অনুচ্ছকণ্ঠে পরামর্শ সেরে নিলেন। গুহা থেকে বেরিয়ে উভয়ে জঙ্গলের ধারে হাজির হলেন। সেখানে নানাসাহেব-এর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত কালাগনি ঘোড়া নিয়ে অধীর-প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

www.pathagar.com

উল্কার বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁরা হাজির হলেন অজন্তার প্রসিদ্ধ পার্বত্য উপত্যকায়। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়ামাত্র কালো ছায়ামূর্তির মতো বহু মানুষ অস্ত্রপাতি সহ গাছের ডাল থেকে ঝপাঝপ লাফিয়ে মাটিতে পড়ল।

নানাসাহেব গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিলেন—'চল। এগিয়ে চল।' তাদের সংখ্যা বেশি না হলেও তিনি নিশ্চিত যে, হাসিমুখে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে অকুতোভয় মানুষগুলো কুণ্ঠিত নয়।

মঁসিয়ে মক্রের ডাইরির ছেঁড়া পাতয় লেখা রয়েছে—যন্ত্রহাতিটানা গাড়িটাকে সদর রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে দেখে কলকাতার কৌতূহলসম্পন্ন মানুষগুলো রাস্তার দু-ধারে ভিড় করে বিস্মিত হল। অদ্ভুত ও অতিকায় এক যন্ত্রহাতি দিব্যি দু-দুটো বাড়িকে টেনে নিয়ে চলেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই চলন্ত বাড়ি দুটো কলকাতার সীমানা পেরিয়ে এগিয়ে চলল ফরাসি-শাসিত নগর চন্দননগর অভিমুখে।

যন্ত্র-হাতিটার গঠনপ্রণালী সত্যই অদ্ভুত। দোদুল্যমান শুঁড়টা দিয়ে অনর্গল গলগলিয়ে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এটা শুঁড়ের আকৃতির বিশিষ্ট একটা চিমনি মাত্র। এর বিশালায়তন পিঠে গম্বুজাকৃতি আকৃতিতে গড়া কাচের জানালাযুক্ত একটা ঘরকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বসে যন্ত্র-হাতির চালক শকটটাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। যন্ত্র-হাতি চালাতে মাহুত লাগবে কেন? কাঁচের হাওয়া ঘরে বসে বোতাম টেপা মাত্র হাতির পেটে রাখা যন্ত্রপাতি সক্রিয় হয়ে কাজ করতে লেগে যাবে। কয়লা বা কাঠ জ্বলবে, বয়লারে জল টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করবে, পাম্প বিকট আওয়াজ তুলে কর্তব্য পালনে রত হবে, পিস্টন সশব্দে চলতে থাকবে। ব্যস, এবার বয়লারের সৃষ্ট বাষ্প সিলিন্ডারে গিয়ে ভিড় জমাবে। এর স্টিম ইঞ্জিন কম শক্তিশালী নয়। প্রায় দেড়শ' অশ্বশক্তি তো হবেই। উদ্ভুত বাষ্প যতই চাপ প্রয়োগ করুক না কেন ইস্পাতের পাতে তৈরি শকটটার ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা কিছুমাত্রও নেই।

বাষ্প ইঞ্জিনের টানে চাকা লাগানো, শেকলে বাঁধা বাড়ি দুটো দিব্যি গুড়গুড় করে এগিয়ে যাবে। দু-দুটো বাড়ির গঠন বৈচিত্র্য অনেকটা মন্দিরের মতো। সামনে ও পিছনে, উভয় দিকে দুটো চওড়া বারান্দা। যাত্রীরা অনায়াসে এখানে দাঁড়িয়ে পথের ধারের দৃশ্য দিব্যি প্রত্যক্ষ করতে পারে।

ব্যাঙ্কস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার। কেবলমাত্র ডাঙাতেই নয় যন্ত্র-হাতিটা জলেও দিব্যি চলতে পারে। জলে নামলে স্টিমারের প্রপেলারের মতো এর পা-চাকা বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে বাড়ি দুটো সমেত যন্ত্র-হাতিটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আর তার নিচে যেন নৌকো বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যার ওপর নির্ভর করে অনায়াসে জলের ওপর ভাসতে পারবে।

ইঞ্জিনিয়ার ব্যাঙ্কস এমন একটা শকট তৈরি করতে উৎসাহী হলেন। কেবলমাত্র খেয়ালের শিকার হয়েই কি তিনি এমন একটা পরিকল্পনাকে মাথা থেকে বের করেছেন? না, এটা নিছকই একটা খেয়ালের ব্যাপার অবশ্যই নয়। পরিকল্পনাটা ঠিক তাঁর মাথা থেকে বেরোয় নি। ভুটানের রাজা মাথা খাটিয়ে এটাকে বের করেছেন। তার ঝোঁক চেপেছিল যন্ত্র-হাতিতে চেপে শিকার করবেন। এদিকে ব্যাঙ্কস-ও নতুনতত্ব কিছু করার জন্য সর্বদা অস্থির থাকেন। ভুটানের রাজামশাইয়ের কাছ থেকে নির্দেশটা পেয়ে তিনি যেন বর্তে গেলেন। ব্যস, ইঞ্জিনিয়ার ব্যাঙ্কস এবার আদাজল খেয়ে, মাথার ঘাম পায়ে

www.pathagar.com

ফেলে লেগে গেলেন যন্ত্র-হাতিটার কাজ সম্পন্ন করতে। বারবার কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েও তিনি হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেন নি। বরং অধিকতর নিষ্ঠা, উদ্যোগ ও উৎসাহ সম্বল করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে ব্রতী হয়েছেন।

যন্ত্র-হাতিটা তৈরির কাজ সম্পন্ন হতে না হতেই ভুটানরাজ দেহ রাখলেন। ব্যস, রাজপুত্ররা অপয়া হাতিটাকে রাজবাড়িতে ঢোকাতে দিলেন না। ফলে ইঞ্জিনিয়ার ব্যাঙ্কস খুবই সামান্য অর্থে কর্নেল মুনরোর নামে যন্ত্র হাতিটাকে কিনে নেন। এখন কর্নেলই এর একমাত্র সত্ত্বাধিকারী।

কর্নেল মুনরো গাড়িটাকে দেখে পত্নী-বিয়োগের শোকও দিব্যি মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন।

যন্ত্র-হাতিটা চলতে শুরু করার পূর্ব মুহূর্তে কর্নেল মুনরো সামনের বাড়িটায় চড়লেন। আমি, হুড আর ব্যাঙ্কস তাঁকে সঙ্গদান করার জন্য একই বাড়িতে চড়ে বসলাম।

স্টার বসল হাওয়াঘরে। ইঞ্জিন চালানোর দায়িত্ব তার ওপরই বর্তাল।

দ্বিতীয় অর্থাৎ পিছনের বাড়িটায় চড়লেন সার্জেন্ট ম্যাকনিল। তাকে দেখ ভালো করার জন্য সেখানে রইল ভারতীয় ফায়ারম্যান ক্যালোথ। আর ফরাসি পাচক পঁয়াজার্ড ও কর্নেল মুনরোর পরিচারক গৌমি তো রইলই।

যন্ত্র-হাতিটার চমৎকার এক নামকরণ করা হয়েছে—'বেহেমথ'। শুনতেও ভালো লাগে। নামটা সত্যই শ্রুতিমধুর।

নিজের বাড়িতে অবস্থানকালে যেটুকু আরাম বা সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় বেহেমথ-এ চেপে ভ্রমণে বেরিয়েও তার কোনো অংশে কম আরাম উপভোগ হয় না। খাবার ঘর, শোবার ঘর আর লাইব্রেরি কোনোটারই অভাব ছিল না। এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা ভাবতেও পারি নি কোনোদিন। খাওয়াদাওয়া, ঘুমনো আর বইপড়া প্রভৃতি সবই চলন্ত অবস্থায় দিব্যি চলতে লাগল।

আমরাও আয়েশের মধ্যে গুড় গুড় করে চলতে চলতে হাজির হলাম বর্ধমান শহরে।

যন্ত্র-হাতিটা আমাদের নিয়ে আরো কিছুটা এগুতেই কর্নেল মুনরো মুখে কুলুপ এঁটে দিলেন। সার্জেন্ট ম্যাকনিলও ধীরে ধীরে কথা বলা কমিয়ে গম্ভীর হয়ে পড়লেন। ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হল না। দশ বছর আগেকার স্মৃতি ক্যাপ্টেন মুনরো ও তার পরিচারকের স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছে। সিপাহী বিদ্রোহ যেখানেই সবচেয়ে ভয়ংকর রূপ নিয়েছিল বেহেমথের গতি সেদিকেই।

বেহেমথ গয়া শহরে পৌঁছতেই আমরা উদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলাম। উঁকি দিতেই চোখে পড়ল, বেহেমথ-এর সামনে, পথের ওপর দলে দলে সাধুসন্তরা শুয়ে পড়েছে। পুণ্যার্থীরা হত্যা দিয়েছে। তাদের এরকম আচরণের কারণ ব্যাখ্যা করে দিল হুড। ইতিপূর্বে তারা যে হাতি দেখেছে তাদের তুলনায় বেহেমথ ঢেড় ঢেড় বড়। তাই তাদের বিশ্বাস, এমন অতিকায় হাতি নির্ঘাৎ স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। তাই তো পুণ্যলাভের প্রত্যাশায় হত্যা দিয়েছে।

ব্যাপারটা ব্যাঙ্কস-এর মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার করল। দীর্ঘ সময় এভাবে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকলেই সমস্যা, বেহেমথকে স্থবিরের মতো দাঁড়িয়েই থাকতে হবে। আবার সাধুসন্তদের গায়ে আঘাত লাগলেও প্রমাদ ঘটে যাবে। এরকম চিন্তা করে তিনি

www.pathagar.com

ফায়ারম্যান কলৌথকে নির্দেশ দিলেন, বয়লারে ঠেসে ঠেসে কাঠ দিয়ে বেশি পরিমাণে বাষ্প তৈরি করতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাষ্পের পরিমাণ এত বেড়ে গেল যে, যন্ত্র-হাতিটা থর থর করে কাঁপতে লাগল। খুবই সতর্কতার সঙ্গে বেহেমথকে বাধা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবে কারো গায়ে একটা কাঁটার আঁচড়ও লাগলে চলবে না। লাগলে কারো গর্দানে আর মুণ্ড থাকবে না।

ব্যাঙ্কস অকস্মাৎ গলা ছেড়ে চিল্লাচিল্লি জুড়ে দিল—'সর! সর! তাড়াতাড়ি সরে যাও! নিষ্ফল প্রয়াস! তার নির্দেশ কারো কর্ণে গেছে বলেও মনে হল না। এবার বেহেমথ তীব্র গর্জন করে সিটি দিল। প্রপেলার বিকট আওয়াজ তুলল। বনবন করে চাকা ঘুরল, শুঁড় দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরলো।

ফায়দা যেটুকু হল সাধুসন্তরা জয়ধ্বনি দিয়ে আকাশ-বাতাস মথিত করল। হায় ঈশ্বর! এরা যে হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে আত্মাহুতি দিতে চায়।

সাধুসন্তদের কাণ্ড দেখে হুড একেবারে ক্ষেপে অগ্নিশর্মা হয়ে গিয়ে বললেন—'হতচ্ছাড়াদের কী অদ্ভুত খেয়াল। স্বর্গের হাতি তো, পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে সশরীরে স্বর্গে যেতে চায়!'

ব্যাঙ্কস অনন্যোপায় হয়ে বেহমথ-এর পেটের তলদেশের অতিরিক্ত নলগুলো দিয়ে গলগল করে গরম বাষ্প ছেড়ে দিল। কাজ হয়েছে। বোধহয় তারা ভেবেছে, হাতির পায়ের তলায় জান দিলে পুণ্য সঞ্চয় ও স্বর্গপ্রাপ্তি প্রভৃতির সম্ভাবনা থাকলেও গরম বাষ্পে শরীরটা ঝলসে গেলে কিছুমাত্রও ফায়দা হবার নয়। এই গরম-বাষ্পে অতিষ্ঠ হয়ে সবাই গুড়গুড় করে উঠে, যে যেদিকে পারল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। বেহেমথ সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। তীব্র গতিতে ছুটে চলল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই একেবারে সাধুবাবাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল।

কাশীতে পৌঁছেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আমাদের পিছনে টিকটিকি লেগেছে। এঁটুলির মতো আমাদের পিছনে ধাওয়া করছে। ব্যাপারটা হল—কাশী ভারতের প্রাচীন নগর। দেবতার-পীঠস্থান। বহু পুরনো মন্দির, মসজিদ, কাশীর পবিত্র গঙ্গার ঘাট, আর অলিগলি ঘুরে দেখতে গিয়ে সময় যে কি করে কেটে গেল টেরই পেলাম না। সার্জেন্ট ম্যাকনিলকে নিয়ে কর্নেল মুনরো গঙ্গার পাড়ে হাওয়া খেতে ব্যস্ত, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে হুড চলে গেলেন। অতএব আমি অনন্যোপায় হয়ে ব্যাঙ্কসকে নিয়ে শহর ধেকে বেড়াতে লাগলাম।

একটা মোড়ে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বার কয়েক কর্নেল মুনরোর নামটা জোরে জোরেই উচ্চারণ করে ফেলেছিলাম। ব্যস, তাঁর নামটা কানে যেতেই অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোককে হঠাৎ সচকিত হয়ে পড়তে লক্ষ্য করলাম। চেহারা ও বেশভূষায় জানান দিচ্ছিল, লোকটা বাঙালি।

অদ্ভুত লোকটার রহস্যভেদ করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। কেন সে অকস্মাৎ এমন সচকিত হয়ে উঠল? কি তার উদ্দেশ্যে? কর্নেল মুনরোর হদিস কেন জানতে চায়? কেনই বা সে আমাদের পিছন নিয়েছে?

ব্যাপারটা ব্যাঙ্কস-এরও নজর এড়ায়নি। তবে তাকে ভালো করে দেখার সুযোগ আমাদের হয়নি। লম্বা লম্বা পায়ে ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে সে ডিঙিতে উঠে পড়ল। মুহূর্তে নৌকা আর ডিঙির ভিড়ে হাফিস হয়ে গেল।

www.pathagar.com

সন্ধ্যার অন্ধকার নামার মুখে আমরা বেহেমথ-এ ফিরে এলাম। ব্যাপারটা সম্বন্ধে সার্জেন্ট ম্যাকনিলকে সতর্ক করে দিলাম। লোকটার উদ্দেশ্য কি তা-ই বা কে বলতে পারে? সবচেয়ে বড় কথা, কর্নেল মুনরোর নাম শুনে লোকটা কেন এমন করে আঁৎকে উঠেছিল?

বেহেমথ এলাহাবাদে পৌঁছল। এখানে আর একটা ঘটনার মুখোমুখি আমাদের হতে হল।

আমরা প্রত্যেকে, যে যার মতো ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। কর্নেল মুনরো সার্জেন্ট ম্যাকনিলকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন। ফিরে এসে দেখি, তার চোখে-মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ। মুখের হাসি একেবারেই নির্বাসিত। খুব দরকারি কথা কিছু জিজ্ঞেস করলে খুবই সংক্ষেপে জবাব দিয়ে দায় সারেন।

খাবার টেবিল থেকে উঠে কর্নেল মুনরো একটা ব্যাপার দেখাবেন বলে আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে পথের ধারে অবস্থিত পিলারের গায়ে সাঁটা একটা পোস্টারের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাতে লেখা ইংরেজ সরকার নানাসাহেব-এর মাথার জন্য প্রচুর ইনাম ঘোষণা করেছেন।

পোস্টারটা দেখে আমরা আৎকে উঠি নি দেখে তিনি ধরে নিলে ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমারা অনেক আগে থেকেই ওয়াকিবহাল। আর আমরা সতর্কতার সঙ্গে তাঁর কাছে তা গোপন রেখেছি। বার বার জিজ্ঞাসাবাদ করার ফলে স্বীকার না করে পারলাম না।

আমার কথা শুনে কর্নেল মুনরোর মধ্যে অভাবনীয় গাম্ভীর্য নেমে এল। এক সময় গম্ভীর স্বরেই বললেন—'ম্যাকনিল গভর্নরের সঙ্গে কথা বলতে গেছেন। সত্য সত্যই নানাসাহেব বোম্বাই এসেছে কিনা, অবস্থান করছে কিনা এবং যদি সেখানে থাকে তবে আজ রাত্রের ট্রেন ধরেই আমি যেন বোম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।'

তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ম্যাকনিল এসে একটা সংবাদপত্র বাড়িয়ে ধরে বললেন—'বোম্বাইয়ে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। গভর্নর এটা আমাকে পড়তে বলেছেন।

আমরা সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বুলাতেই দেখতে পেলাম লেখা রয়েছে—'ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে সাতপুরার অদূরবর্তী কোনো স্থানে আঙুলকাটা নানাসাহেব প্রাণ দিয়েছেন।'

আমাদের বাষ্পিয় শকট বেহেমথ কানপুরে হাজির হল। কর্নেল মুনরো পুরো দিনটা দুটো ভগ্নস্তূপের আশপাশ দিয়ে বার বার চক্কর মেরে কাটিয়ে দিলেন। তাদের একটায় তার মৃত স্ত্রীর শৈশব কেটেছিল। আর অন্যটাকে সিপাইরা ইংরেজ শিশু আর মহিলাদের কয়েদ করে রেখেছিল। কয়দিন পর কর্নেল মুনরো কানপুরে এসেই কয়েদখানায় গিয়ে তাঁর স্ত্রীর আর শাশুড়ির পাত্তা লাগান। সেখানে তাঁদের পেলেন না।

তখন থেকে প্রতিহিংসার আগুন বুকে নিয়ে কর্নেল মুনরো হন্যে হয়ে নানাসাহেবের তল্লাশ করছেন। বদলা তাঁকে নিতেই হবে। আমরা কোনোরকমে অস্থিরচিত্ত মুনরোকে বেহেমথ-এ ফিরিয়ে নিয়ে আসি। মনস্থ করলাম, যত শীঘ্র সম্ভব কানপুর ছেড়ে চলে যাব।

হুড সবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে গৌমিকে আর কালৌথকে নিয়ে জঙ্গলে গেল শিকার করতে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল তবু হুড তাদের নিয়ে বেহেমথে

www.pathagar.com

ফিরল না। এদিকে মুহূর্তের মধ্যে জমাটবাঁধা কালোমেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। দেখতে দেখতে প্রচণ্ড ঝড় উঠল। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে আমরা বারান্দায় জঙ্গলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঝড়ের বেগ ক্রমশ বাড়তে বাড়তে তা ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিল। কড়াৎ কাড়ৎ শব্দে বাজ পড়তে লাগল। একটা তো প্রায় আমাদের যন্ত্র-হাতি বেহেমথকে ছুঁড়ে কাছের একটা গাছের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। গাছটায় আগুন লেগেছে। ক্রমে সে আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের রূপ নিল। একটু বাদেই আতঙ্কে শিউরে উঠতে হল। ঝড়ের তাণ্ডবে দাবানল ক্রমেই বেহেমথ-এর দিকে ধেয়ে আসছে।

আমরা প্রমাদ গুণলাম কোথায় গেল হুড আর তার সহযাত্রীরা। তাদের ফিরে আসার নামটিও নেই। এদিকে দাবানলের অগ্রগতি লক্ষ্য করে ব্যাঙ্কস হাওয়া ঘরে গেল। স্টারও সেখানে ঢুকল। স্থির হল, ঘড়ি ধরে তিন মিনিট হুড ও অন্যান্যদের জন্য অপেক্ষা করা হবে। এর মধ্যে দাবানল বেহেমথ অবধি ধেয়ে এলেও পালিয়ে যেতে অসুবিধা হবে না।

ব্যাঙ্কস তীব্র স্বরে ঘন ঘন সিটি দিল। না, কারো ফেরার নামটিও নেই। হাতির চোখে লাগানো সার্চ লাইটের আলো ছড়িয়ে দেওয়া হল। না, তবু হুড ফিরল না।

ব্যাঙ্কস বাষ্প ছাড়ার জন্য বোতামের দিকে হাত বাড়াল। এমন সময় দেখা গেল, উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে হুড ও অন্য দুজন ঝোড়ো কাকের মতো ধুঁকতে ধুঁকতে বেহেমত—এর দিকে আসছে।

বেহেমথ থেকে তীব্রস্বরে সিটি না বাজালে অবশ্যই তাদের আর ফিরে পাওয়া যেত না।

এবার প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে বেহেমথ ছুটন্ত আগুনের বিপরীত দিকে ধেয়ে চলল। বেহেমত ছুটছে, দাবানল তাকে তাড়া করছে। যন্ত্র-হাতি বেহেমথ আর দাবানলের দৌড় প্রতিযোগিতা যেন পুরোদমে চলেছে।

এবার একটা ব্যাপার আমার মনের কোণে উঁকি দিল। একটা বাজ যেন আমাদের যন্ত্র-হাতিটার দিকে ওপরেই পড়ল। কিন্তু তারপর? তারপর সেটার পরিণতি কি হল? ব্যাপারটা সহজেই পরিষ্কার হয়ে গেল। যন্ত্র-হাতি বেহেমথ-এর কান দুটো, এমনকি পুরো দেহটাই ইস্পাতের পাত দিয়ে মোড়া ছিল। ইস্পাতের সেই কান দুটো বাজটাকে টেনে নিয়ে ইস্পাতের দেহের মাধ্যমে ঝট করে মাটিতে চালান করে দিয়েছে।

এক সময় হিমেল বাতাস সর্বাঙ্গে লেগে মনে পুলকের সঞ্চার করল। বুঝলাম, বেহেমথ জঙ্গল ছেড়ে, জ্বলন্ত ফার্নেসের এলাকা পেরিয়ে এসেছে। এবারের মতো কোনোরকমে আমাদের পিতৃদত্ত প্রাণটা রক্ষা পেয়ে গেল।

বেহেমথ রেওয়ার দিকে যাওয়ার সময় রোমহর্ষক হলেও মজার একটা ঘটনা ঘটে গেল। যন্ত্র-হাতিটার ওপরে অতর্কিতে একটা চিতাবাঘ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ল। আদতে হাতি মনে করে বারবার তার গায়ে নখরযুক্ত থাবা মারতে লাগল। বার কয়েক তীব্র আক্রোশে থাবা মেরে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ইস্পাতের কান ধরে ঝুলে পড়ে তীব্র আক্রোশে রীতিমত ফুঁসতে লাগল।

শিকারপ্রিয় হুড নিজেকে সামাল দিতে না পেরে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল। ঠিক তখনই ফক্স একটা বন্দুক এনে আমার হাতে তুলে দিল। ব্যস, চোখের পলকে দিলাম বন্দুকের ঘোড়া টিপে। তীব্র আক্রোশে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে হিংস্র জানোয়ারটা জঙ্গলের দিকে চোঁ-চাঁ দৌড় দিল। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

www.pathagar.com

হুড নিজেকে সামাল দিতে না পেরে বন্দুক হাতে দুম করে বেহেমথ থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়ল। জানোয়ারটার তল্লাশে জঙ্গলের দিকে ছুটতে লাগল।

ফক্সই সর্বনাশটা করেছিল। বন্দুকের গুলি না ঢুকিয়ে ছররা পুরে দিয়েছিল। ছররায় কি আর বাঘকে ঘায়েল করা যায়।

এবারই রোমাঞ্চকর-মজার অথচ ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটল। পাচক জানাল ভাঁড়ার শূন্য। খাদ্য আহরণ করতে হুড এবার আমাকে ও গৌমিকে নিয়ে বন্দুক হাতে জঙ্গলে ঢুকল। শিকার করে মাংস না নিয়ে এলে এতগুলো প্রাণীকে উপোষ করে কাটাতে হবে।

পাখি মারার ছররা নিয়ে তিন জোড়া চোখ গাছের ডালে ডালে চক্কর মারতে লাগল। একটা ঝোপের ধারে যেতেই একেবারে বাঘের মুখোমুখি হতে হল। ইয়া দশাসই তার চেহারা। তার হিংস্র চোখের মণি দুটো দিয়ে আক্রোশ প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু কোনোরকম উত্তেজনা প্রকাশ না করে দুলকি চালে হুড-এর দিকে এগুতে লাগল।

উপায়ন্তর না দেকে হুড হাতের ছররা ভরা বন্দুকটাকে বাঘটার দিকে উঁচিয়ে ধরল। তার উদ্দেশ্য বাঘটার চোখ দুটোকে ঘায়েল করে দেওয়া। নইলে ছররা দিয়ে ভাগ কাবু করা সম্ভব নয়।

হ্যাঁ, হুড-এর স্নায়ু আর কলিজা অস্বাভাবিক শক্ত বটে। বাঘ আর তার মাঝখানে আর মাত্র হাত তিনেকের দূরত্ব। কোনোরকম কাঁপুনি তো দূরের ব্যাপার, সে বরং বাঘটার দিকে এক পা এগিয়েই গেল। বাঘটা হয়তো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হুড-এর সঙ্গে একটু রসিকতা করতে চাইল।

ব্যস, আর দেরি নয়, হুড বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিল। আরো একবার। ইয়া দশাসই চেহারাটা নিয়ে বিকট হুঙ্কার তুলে বাঘটা বার কয়েক শূন্যে চক্কর খেয়ে মাটিতে পড়ে আছাড়ি-পিছাড়ি করতে লাগল। ব্যাপারটা ঝট করে হুড-এর মাথায় গেল না। পরমুহূর্তেই সে সোল্লাসে চিল্লিয়ে উঠল—বরাত ভালো যে ফক্স ভুল করে ছররার পরিবর্তে সিসার গুলি পুরে দিয়েছিল। নইলে আমাদের আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হত না।

হুড ফক্সকে একটা সোনার গিনি দিয়ে বলল—'আগে একটা ভুল করেছিলে, আজ আবার করলে আর একটা ভুল। দুটো ভুলের জন্য এটা তোমাকে পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হল।

যন্ত্র-হাতি বেহেমথ এবার নেপালের দিকে ধেয়ে চলল। পথের দু-ধারে এখন পাহাড় আর জঙ্গলে বিচিত্র সমাবেশ, এমন দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যাবলি ভারত ছাড়া অন্য কোনো দেশে আশাই করা যায় না।

পার্বত্য বনভূমির ভেতর দিয়ে চলতে গিয়ে আর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। জঙ্গল থেকে ইয়া পেল্লাই তিনটে রক্ত-মাংসে গড়া হাতি লম্বা লম্বা পায়ে বেরিয়ে এসে যন্ত্র-হাতি বেহেমথ-এর সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগল।

পথের ধারে এক সরাইখানায় এক বণিক মাথা গুঁজেছে। গুরু সিং নামে এক রাজপুত্রও সরাইখানায় বিশ্রাম গ্রহণের জন্য আশ্রয় নিয়েছেন। হাতি, ঘোড়া ও উট ছাড়াও কয়েকজন পার্শ্বচর তাঁর সঙ্গে রয়েছে।

এক সময় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বেহেমথ-এর গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। আত্মম্ভরী রাজকুমার গুরু সিং-ও তাদের সঙ্গে রয়েছেন। ইংরেজ-টিংরেজকেও পাত্তা দেয় না। তিনি যন্ত্র-হাতি আর ভুটানের রাজার বিচিত্র খেয়ালের ব্যাপার নিয়ে রসিকতা করতে

www.pathagar.com

লাগলেন। প্রাণবন্ত হাতির মতো অমিত শক্তি যখন বেহেমথ ধরে না, তখন অহেতুক ধাতুর পাত আর কলকব্জা জুড়ে জুড়ে এমন অতিকায় একটা যন্ত্র-হাতি সৃষ্টির প্রয়োজন কি ছিল?

আত্মম্ভরী রাজপুত্রের কথায় তীব্র প্রতিবাদ করতে গিয়ে ব্যাঙ্কস বলল—'জ্যান্ত, রক্তমাংসে গড়া হাতিকে কুপোকাৎ করার হিম্মৎ যন্ত্র-হাতি বেহেমথ-এর অবশ্যই আছে।'

ব্যস, আর দেরি নয়, আত্মম্ভরী রাজপুত্র ঝট করে বাজি ধরে বসলেন। কর্নেল মুনরোও বাজিতে মত দিয়ে বসলেন।

পাহাড় সমান তিনটে হাতিকে ঘটনাস্থলে হাজির করা হল। ব্যস, ঠেলাধাক্কা শুরু হয়ে গেল। ব্যাঙ্কস ব্রেক কষে বেহেমথকে মাটি কামড়ে ধরার ব্যবস্থা করল। রাজপুত্রের অমিত শক্তির আধার হাতি তিনটে বেহেমথকে আছাড় মারা বা কাৎ করে ফেলে দেওয়া তো দূরের ব্যাপার সামান্য নড়াতে পর্যন্ত পারল না। হাতি তিনটে যেন ক্ষেপে গিয়ে বিকট স্বরে ডাকাডাকি করতে করতে দমাদম আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। বৃথা হয়রানি।

বেহেমথ এবার সক্রিয় হয়ে উঠল। হঠাৎ ধাক্কা খাওয়ায় টাল সামলাতে না পেরে পাহাড়ের মতো দুটো হাতি হুমড়ি খেয়ে পথের ওপর পড়ে গিয়ে অসহায়ভাবে কাৎরাতে লাগল। রাজপুত্র গুরু সিং চোখের ওপর এ দৃশ্য দেখতে না পেরে ইয়ার দোস্তদের নিয়ে সরাইখানায় গিয়ে আশ্রয় নিল। রাজাকে পকেট থেকে কড়কড়ে নোট বের করে কর্নেল মুনরোকে বাজির টাকা মেটাতে হল। কর্নেল টাকাগুলো পকেটে না ঢুকিয়ে রাজকুমারের পার্ষদদের দিকে বকশিসস্বরূপ ছুঁড়ে দিয়ে হনহন করে বেহেমথ-এর দিকে এগিয়ে গেলেন।

বেহেমথ আবার সচল হল। আমরা ধবলগিরির পাদদেশে হাজির হলাম। সামনে নেপালের সীমানা, গভীর পার্বত্য বনভূমি। নানাসাহেবকে ধরাই একমাত্র লক্ষ্য।

মঁসিয়ে মক্লের ডাইরির বক্তব্য এখানেই শেষ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাত্রির জমাটবাঁধা অন্ধকারে ঘোড়া হাঁকিয়ে নানাসাহেব-এর সঙ্গে যে পাগলিটা সাতপুরা পর্বতের দিকে যাচ্ছিল, কে সে? তাঁর অনুজ বালাজি রাও আর ভৃত্য কালাগনিও সঙ্গে ছিল। নানাসাহেব যাঁর সঙ্গে ইলোরা পর্বতের গুহায় গিয়ে দেখা করেছিলেন, তিনিই বালাজি রাও।

তীব্র বেগে সারা রাত্রি ঘোড়া হাঁকিয়ে নানাসাহেব বিন্ধ্য পবর্তের নিরালা-নিরাপদ আশ্রয়ে হাজির হলেন। তাঁর উদ্দেশ্য, স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার করে আবার বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তোলা।

শেষেমেশ ভূপালে এসে পথের ধারে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের মিছিল দেখতে গিয়ে এক অকুতোভয় দুর্ধর্ষ প্রকৃতির বাঙালির দেখা পেলাম। কর্নেল মুনরো যে কাশীতে অবস্থান করছিলেন সে গোপন খবরই সে বয়ে এনেছে। নানাসাহেব উত্তেজনায় ক্ষেপে বাঘের মতো হয়ে উঠেছেন। কর্নেল মুনরোকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। কালাগনিকে পাঠিয়ে দিলেন, ছলে-বলে কৌশলে কর্নেল মুনরোর দলে ভিড়ে যাওয়ার জন্য।

www.pathagar.com

নানাসাহেব লুকিয়ে, নিজেকে সামলে-সুমলে অনুগতদের নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। ছোট্ট একটা নদীর পাড়ে পৌঁছতেই হঠাৎ বন্দুক গর্জে উঠল। ইংরেজ সৈন্য ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়তে লাগল। মুহূর্তে কয়েকজন বিকট আর্তনাদ করে রক্তাপ্লুত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অন্যান্যরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একজন গলা ছেড়ে ইংরেজ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে তর্জনগর্জন করতে লাগল।

দুজন ইংরেজ সৈন্য নানাসাহেবকে চিনিয়ে দিল।

এমন সময় ঝোপের ভেতর থেকে ঝট করে পাগলি বেরিয়ে এল। কেউ তার প্রকৃত পরিচয় জানে না। তার অতীত-জীবন কেমন ছিল, সে যে আজ জ্বলন্ত একটা মশাল হাতে করে মাঠে-ময়দানে, ঝোপেঝাড়ে ছুটে বেড়ায়? কেন? কেন সে অনবরত নানাসাহেব-এর নাম করতে করতে ছুটে চলেছে তো চলেছেই?

পাগলি ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে পথের ধারে এলিয়ে পড়ে থাকা প্রাণহীন দেহটার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি দেখছে? ব্যস্তহাতে তাঁর বুকের রক্ত আঙুলে করে তুলে নিয়ে নিজের গায়ে মেখে নিল। পরমুহূর্তেই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গভীর জঙ্গলের দিকে ছুটে গেল। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই সে চোখের আড়ালে চলে গেল।

স্থানীয় আদিবাসীরা তার চমৎকার ও মানানসই একটা নামকরণ করল—'চলমান অগ্নিশিখা।'

আবার মঁসিয়ে মক্রের ডাইরির পাতার ওপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক ধবলগিরির পার্বত্য বনে যন্ত্র-হাতি বেহেমথ দাঁড়িয়ে পড়ল। অদ্ভুত একটা ব্যাপার নজরে পড়ল। যে বেহেমথকে এতদিন পবর্তপ্রমাণ মনে হত আজ হিমালয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সামান্য একটা মাছি বলে মনে হল। কর্নেল মুনরো উভয়ের দিকে চোখের মণি দুটো মুহূর্তের জন্য বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন—'মনে হচ্ছে, গির্জার গায়ে বুঝি মাছি বসেছে।'

চমৎকার—চমৎকার উপমা! সৃষ্টিকর্তার নিজের হাতে সৃষ্ট পর্বতমালা যেন তাঁরই উপাসনাগার। তার পাশে কদর্য বেহেমথ, নিছক একটা মাছির মতোই বটে।

একনাগাড়ে দুমাস চলার পর বেহেমথ এই প্রথম বিশ্রামের জন্য দাঁড়িয়েছে। এর আগে মাঝে-মধ্যে দাঁড়ালেও বড় জোর ঘণ্টা দু-এর জন্য। রাত্রের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

ব্যাঙ্কস এবার হুডকে শিকারের কাজ মিটিয়ে আসতে বলল।

কলকাতা থেকে যাত্রা করার পর কলকব্জাগুলোর সঙ্গে আর তেলের সম্পর্ক ঘটেনি। এখন স্টার আর কলৌথ-এর ওপর সে দায়িত্ব বর্তাল। অন্য সবাই শিকারে বা বেড়াতে, যার যেখানে খুশি যেতে পারে।

হুড আর ফক্স বাঘ শিকারের প্রসঙ্গ নিয়ে জোর আলোচনা করতে লাগল। ফক্স বলল—'এবার তবে আমাদের আটচল্লিশ নম্বর বাঘটাকে ঘায়েল করতে পারব।'

জঙ্গলে গিয়ে বাঘের পিছনে ধাওয়া করার জন্য তাদের যেন আর তর সইছে না। তাদের আগ্রহে আমরা বন্দুক নিয়ে ঝপাঝপ বেহেমথ থেকে নেমে গেলাম।

গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে আমাদের আচমকা দাঁড়িয়ে পড়তেই হল। গাছের স্থূলকায় কিছু কাণ্ড সাজিয়ে ঠিক যেন মাচার মতো একটা বস্তু গড়ে তোলা হয়েছে। হাতলের মতো লম্বা একটা গুঁড়ি ছাদ থেকে নিচের দিকে নেমে এসেছে। মাচাটার ছাদে আর হাতলের মাথায় শক্ত লতা জড়িয়ে রাখা হয়েছে।

www.pathagar.com

হুডকে জঙ্গলের পোকাও বলা চলে। অতি সন্তর্পণে পা চালিয়ে কাছে যেতেই ব্যাঙ্কস সরবে হেসে বলল—'আরে এই জানোয়ার ধরার খাঁচাকল। ইঁদুর ধরার ফাঁদের কায়দায় তৈরি। ওই দেখ, ভেতরে লতার এক প্রান্তে খাবার ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, অন্যপ্রান্তে পাথর দিয়ে ওজন ঝুলিয়ে দেওয়া আছে। খাবার খেতে গিয়ে কাঠের দণ্ডে টান পড়লেই হুডকোটা পড়ে গিয়ে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যস, জানোয়ার বাবাজি ফাঁদে আটকে গিয়ে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে থাকবে।

সেটা আমরাও বুঝতে পারলাম এবং নিজেদের বোকামির জন্য না হেসে পারলাম না। ইঁদুর ধরার ফাঁদেরই মতো একটা বড়সড় রূপ।

ফাঁদের দরজাটা বন্ধ দেখলাম। ভেতরে কোনো জন্তু জানোয়ার আটকা পড়েছে কি না দেখার জন্য আমাদের কৌতূহল হল। গৌমি লাফিয়ে মাচাকৃতি বস্তুটার মাথায় উঠে পড়ল। ফাঁদটার দৈর্ঘ্য বারো ফুট, আর প্রস্থ ছয় ফুট। লতার প্রান্তটা টানাটানি করে কাঠের দণ্ডটা সামান্য উঁচু করার জন্য আমি, কর্নেল মুনরো, ব্যাঙ্কস আর ফক্স শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে লতাটা ধরে টানতে লাগলাম। আর হুড বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল লাগিয়ে তৈরি হয়ে শুভমুহূর্তের অপেক্ষায় রয়েছে।

ফাঁদের পাল্লাটা ফুট খানেক উঠেছে। ভেতরে বাঘ থাকলে বেরিয়ে না আসলেও নির্ঘাৎ মুখ বাড়িয়ে হাঁক-ডাক জুড়ে দিত। কিন্তু কিছুই বেরুতে দেখা গেল না। তবে অদ্ভুত একটা চাপা আওয়াজ ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। অস্থিরচিত্ত হুড বন্দুকের নলটাকে দরজা বরাবর বাগিয়ে ধরল। দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিতেই আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। পরিষ্কার দেখতে পেলাম, কি যেন নড়াচড়া করছে।

ঠিক তখনই মনুষ্যকণ্ঠ কানে এল—'গুলি করবেন না! গুলি করবেন না স্যার! আমি জন্তু-জানোয়ার নই, মানুষ! আমি মানুষ! দয়া করে গুলি করবেন না।'

কিম্ভূতকিমাকার একটা লোক প্রায় শুয়ে শুয়ে ফাঁদের আধ-খোলা দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে এল।

ব্যাঙ্কস নাম জানতে চাইলেন। সে বলল—'স্যার, আমি প্রকৃতিবিদ ম্যাথিয়াস ভ্যান গুইট। এবার যন্ত্রচালিতের মতো বেশ কয়েকটা প্রতিষ্ঠান ও জন্তু-জানোয়ারের নাম আওড়ে গেল। হামবুর্গ আর লন্ডন শহরে তার জ্যান্ত জন্তু-জানোয়ার বিক্রির প্রতিষ্ঠান।

নিজের কথা বলতে গিয়ে ম্যাথিয়াস বলল—'স্যার, এক সময় শিক্ষকতা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখে ছাত্ররা পিছনে লাগত। ফলে শিক্ষকতা ছেড়ে জন্তু-জানোয়ার জঙ্গল থেকে জ্যান্ত ধরে চিড়িয়াখানায় চালান দিচ্ছি।' ব্যক্তিগত ব্যবসা নয়, তবে ইউরোপের দুটো প্রতিষ্ঠানের হয়ে সে কাজ করছে।

গতকাল ফাঁদে বাঘ পড়েছে কি না দেখতে এসেছিলাম। বাইরে বেরিয়ে আসার সময় আচমকা তার একটা হাত ওপরে উঠে যাওয়ায় দণ্ডের বিপরীত প্রান্তে ওজন সরে গিয়ে দুম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। জন্তু-জানোয়ারের পরিবর্তে সে নিজেই ফাঁদে আটকা পড়ে গেল। ব্যস, হা-হুতাশ করতে করতে সে এক সময় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

আচমকা তীব্র আর্তনাদ কানে এল। ছুটে গিয়ে দেখি একটা ইয়া লম্বা বিষধর সাপ একটা জঙ্গলির বুকে সজোরে কামড়ে ধরে রয়েছে। মরণ-যন্ত্রণায় লোকটা হরদম চিল্লিয়ে চলেছে।

www.pathagar.com

মুহূর্তের মধ্যেই ম্যাথিয়াস-এর এক সাকরেদ উল্কার বেগে ছুটে এল। একটা কুড় ল দিয়ে চোখের পলকে সাপটাকে দু-টুকরো করে ফেলল। লোকটা ভারতীয় হিন্দু। নাম তার কালাগনি।

ম্যাথিয়াস আমাদের নিমন্ত্রণ করে তার ডেরায় নিয়ে গেল।

কালাগনির জঙ্গলের ব্যাপার-স্যাপার সম্বন্ধে খুবই অভিজ্ঞা। জন্তু জানোয়ারের পায়ের ছাপ দেখে তাদের সনাক্তকরণ তো সামান্য ব্যাপার, পায়ের ছাপ দেখে সে পরিষ্কার বলে দেয় কার গতিবেগ ঘণ্টায় কত, কোন উদ্দেশ্যে চলেছে আর কোথায়ই বা চলেছে।

না, তরাই বনভূমিতে আরো কিছু সময় থাকার সাধ থাকলেও মনের দিক থেকে মোটেই উৎসাহ পেলাম না। এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুবই বেশি। প্রকৃতিবিদ ম্যাথিয়াস-এর সঙ্গে হয়তো ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহনকারী মশাগুলোর সাথে বোঝাপড়া রয়েছে। আমরা ব্যস্ত পায়ে বেহেমথে ফিরে এলাম।

ছাব্বিশে জুন। বেহেমথ আবার সচল হল। তার পর তিন-তিনটে দিন আমরা আর মাটি স্পর্শ করতে পারলাম না। এক নাগাড়ে পিটপিট করে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। আকাশ পরিষ্কার হল ত্রিশে জুন। বেলা একটু বাড়লে, বাষ্পিয় শকট বেহেমথকে দেখার জন্য কয়েকজন কৌতূহলী তিব্বতী চারদিকে ভিড় করল। কর্নেল মুনরো তিব্বতিদের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন। তাই তাদের আদর করে বসতে দিলেন। কথা প্রসঙ্গে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাসাহেব-এর খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তিব্বতিরা আমাদের মতো শোনা-খবর ছাড়া কিছুই জানে না। নানাসাহেব ইহলোক ত্যাগ করেছেন এরকম খবর তারাও শুনেছে বটে। ব্যস, এর বেশি কিছু নয়। আসলে তিনি সত্যি মারা গেছেন, নাকি তিব্বতেরই কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘাপটি মেরে রয়েছেন, নিশ্চিত করে কারো পক্ষে কিছু বলা সম্ভব হল না।

তেইশে জুলাই কয়েকজন পাহাড়ি আমাদের কাছে এল। একটা বাঘিনী নাকি গাঁয়ে জোর উৎপাত চালাচ্ছে। তাই সাহেবরা যদি হিংস্র জানোয়ারটাকে মেরে বিপদের হাত থেকে তাদের অব্যাহতি দেন, সে ভরসাতেই তারা ছুটে এসেছে।

বাঘিনীর খবরটা শোনামাত্র হুড তো বন্দুক-হাতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

কর্নেল মুনরো, ম্যাকনিল আর গৌমিকে স্টিম হাউস রক্ষণাবেক্ষণের কাজে রেখে আমরা ঝপপট তৈরি হয়ে পাহাড়িদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। কালাগনিকেও সঙ্গে নিলাম। তা ছাড়া আরো তিজন শিকারী আমাদের সঙ্গদান করতে চলল।

রোমহর্ষক সে অভিজ্ঞতাটা এখানেই ঘটল। খবর পেলাম, জঙ্গলের ধারে একটা আধ-খাওয়া মোষকে পাওয়া গেছে। সবাইএকমত হলাম, বাঘটা সময়-সুযোগ মতো মোষটার বাকি অর্দ্ধেকটা খাওয়ার জন্য আবার এখানে আসবেই। আমরা ঝোপের ভেতরে গা-ঢাকা দিয়ে রইলাম। দূর থেকে তাকে তর্জন-গর্জন করতে শুনলাম। কিন্তু তাকে চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য আমাদের হল না।

অভিজ্ঞ কালাগনি বলল—'স্যার, আগুন জ্বাললে, ধোঁয়া দিলে জানোয়ারটা বেরুতে পারে বটে। তা নইলে সে কিছুতেই বাইরে আসবে না। আগুন জ্বালানো হল। লতাপাতা দিয়ে গলগলে ধোঁয়া সৃষ্টি করা হল। আমাদেরই দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় আবার ঝোপের ভেতর থেকে গলা খেঁকিয়ে বাঘিনীটা নিজের উপস্থিতির কথা জানান দিল।

www.pathagar.com

বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব হল না। অস্থির হয়ে সুবিশাল বপুটা এক লাফে ঝোপের বাইরে বেরিয়ে এল।

দশটা বন্দুক এক সঙ্গে গর্জে উঠল। দশ-দশটা তপ্ত সিসার গুলি একসঙ্গে দশদিকে ছুটে গেল। হায়! ক্রোধোন্মত্ত বাঘিনীটার গায়ে লাগল না।

সব শেষে ক্যাপ্টেন হুড বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিল। গুলিটা তার কাঁধে আঘাত হানল। সে আচমকা এক লাফ দিয়ে হুড-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হুড-এর পাঁজর লক্ষ্য করে হিংস্র জানোয়ারটা থাবা তুলতেই কালাগনি তার ওপর লাফিয়ে পড়ে এক হাতে সজোরে তার টুটিটা চেপে ধরে অন্য হাতের ছুরিটা বুকে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করতেই বাঘিনী এক ঝটকায় ছুরিসমেত তাকে ছিটকে ফেলে দিল। হুড এক লাফে এগিয়ে গিয়ে ছুরিটা তুলে এনে চোখের পলকে জানোয়ারটার বুকে আমূল গেঁথে দিল।

বাঘিনীর নখের সামান্য আঁচড় লাগায় কালাগনির কাঁধ থেকে তিরতির করে রক্ত ঝরতে লাগল। চারদিন পর আমরা সদবলে বেহেমথ-এ ফিরে এলাম। কর্নেল মুনরো একটা চিঠি লিখে রেখে ম্যাকনিলকে সঙ্গে করে নেপাল সীমান্তে গেছেন। নানাসাহেব-এর মৃত্যু সংবাদের সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে খবরাখবর নেওয়ার অত্যুগ্র আগ্রহেই তিনি বেহেমথ ছেড়ে গেছেন।

আমরা কর্নেল মুনরোর চিঠি ও নানাসাহেব-এর কথাবার্তা শুরু করতেই কালাগনির মুখের অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। চোখে-মুখে কেমন যেন হতাশা আর হাহাকারের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। কিন্তু কেন? বাঘ শিকারের মোহে মুগ্ধ হয়ে আমরা তার ব্যাপার-স্যাপার ভুলে গেছি। নানাসাহেব-এর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা আমরা একেবারে ভুলে গেছি।

আগস্ট মাসের পনের তারিখ এসে গেল। কর্নেল মুনরো এখনো ফিরে এলেন না।

আগস্ট মাস শেষ হতে চলল। মাসের শেষের দিকে ভয়ংকর একটা ঘটনা ঘটে গেল। সে রাত্রে চাঁদের-আলোয় শিকারে বেরুবার পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম।

আচমকা খাঁচাবন্দি জানোয়ারগুলো এক সঙ্গে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। পর মুহূর্তেই কলিজা-কাপানো গর্জন বাইরে থেকে ভেসে এল। বাঘের পাল যেন তর্জন গর্জন করছে। সবার ঘুম ছুটে গেল। কালাগনি উঁচুতে উঠে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বলল—'স্যার, দশটা বাঘ আর বারোটা চিতা বাঘ হানা দিয়েছে।'

কথাটা কানে যেতেই আমাদের কলিজা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। যাদের শিকার করতে যাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি তারাই যে আমাদের ওপর হানা দিয়েছে।

চোখের পলকে ক্রাল-এর দরজাটা খুলে গেল। এ কী ভৌতিক কাণ্ড রে বাবা! কালাগনি নিজে হাতে দরজাটা বন্ধ করেছিল। আর সেটা আপনা থেকেই খুলে গেল কি করে? এ কী রহস্য!

আমাদের কিছুমাত্র ভাববার অবসর না দিয়েই বাইশটা হিংস্র জানোয়ার তীব্র গর্জন করে ক্রাল-এর মধ্যে ঢুকে এল।

আমরাও পড়ি কি মরি করে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলাম। আমি আর হুড দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে খালি-খাঁচাটার ভেতরে ঢুকে ছিটকিনি এঁটে দিলাম। কালাগনি সুড় সুড় করে গাছে চড়ল আর কুটিরের মাথায় আশ্রয় নিল ম্যাথিয়াস।

www.pathagar.com

হায় ঈশ্বর! এ কী নৃশংস হত্যাকাণ্ড! তিনজন পাহাড়ি প্রাণ খোয়াল। বাঘের কামড়ে প্রাণ দিল পাঁচ পাঁচটা মোষ। বাকি মোষগুলো উর্দ্ধশ্বাসে জঙ্গলে পালাবার সময় আমাদের খাঁচাটাকে উল্টে দিয়ে গেল। আমাদের নিয়েই সেটা দু-তিনটে পাক খেল। বরাত ভালো যে, দরজাটা খুলে যায় নি।

হুড-এর বাহাদুরি আছে বটে। খাঁচার ভেতরে অবস্থান করেই সে একটা বাঘকে ঘায়েল করে দিল। কুটিরের ভেতর থেকে শিকারীরা গুলির ঘায়ে একটা বাঘ আর দু-দুটো চিতাবাঘকে চিৎ পটাং করে দিল। মাত্র পনের মিনিটে রক্তনদী বইয়ে দিয়ে হিংস্র বাঘ আর চিতা বাঘের দল ক্রাল ছেড়ে বেরিয়ে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাতাশে আগস্ট সকাল হতে না হতেই চিল্লাচিল্লিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আসলে কর্নেল মুনরো ফিরে আসায় সবাই উল্লসিত। বিমর্ষমুখে তিনি ফিরে এসেছেন। নানাসাহেব-এর দেখা পাওয়া তো প্রশ্নই ওঠে না। কোনো খোঁজখবরও পান নি। ব্যস, এর বেশি কিছু বলতে তিনি নারাজ।

তেসরা সেপ্টেম্বর আমাদের বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে যাত্রা করার পরিকল্পনা নেওয়া হল। এ-ও ঠিক করা হল পথে আর কোথাও বেহেমথকে থামানো হবে না। আসলে যেসব জায়গায় সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটেছিল সেখানে থাকলে বা ঘোরাফেরা করলে কর্নেল মুনরো খুবই মনমরা হয়ে পড়েন।

ম্যাথিয়াস এবার কর্নেল মুনরোকে অনুরোধ করে বললেন, বেহেমথকে দিয়ে তাঁর জানোয়ার খাঁচাগুলোকে স্টেশনে পৌছে দেবার জন্য। আসলে জানোয়ারগুলোকে বিশে সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে পৌছে দেবার কথা। মাঝে আর মাত্র আঠারোটা দিন বাকি। কর্নেল আমতা আমতা করে হলেও শেষপর্যন্ত খাঁচাগুলোকে স্টেশনে পৌছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

দশই সেপ্টেম্বর জানোয়ারের খাঁচাগুলো মালগাড়ির ওয়াগনে চাপল। এবার কালাগনির চাকরিটা গেল। জানোয়ার নেই, তার চাকরিও নেই। কর্নেল মুনরো তাঁর সঙ্গে বোম্বাইয়ে যাবার প্রস্তাব দিতেই কালাগনি রাজি হয়ে গেল।

বেহেমথ ফের সচল হল। প্রাণীতত্ত্ববিদ ম্যাথিয়াস ভ্যান গুইট হাত নেড়ে নেড়ে আমাদের বিদায়-অভিনন্দন জানালেন।

আঠারোই সেপ্টেম্বর। দুপুরে আহারাদি সেরে বিশ্রাম নেওয়ার সময় কর্নেল তার কামরায় কালাগনিকে ডেকে পাঠালেন।

কর্নেল মুনরো কথা প্রসঙ্গে কালাগনির কাছে জানতে চাইলেন, এ সব অঞ্চলের পথঘাটের সঙ্গে তার এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় কি করে হল? কালগনি জানায় যে বহুবার যাতায়াত করতে করতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পথঘাট তার নখদর্পণ হয়ে গেছে।

কালাগনি নানাসাহেব-এর মৃত্যু-সংবাদ পায় নি। খবরটা যেদিন পেল সেদিন তার মুখটা শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেলে।

এক সময়, কালাগনি ব্যাঙ্কসকে লক্ষ্য করে বলল—'স্যার, একটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না। দেশের যেসব জায়গায় স্বাধীনতার লড়াই হয়েছে সে সব জায়গাগুলো আপনারা এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন?

www.pathagar.com

ব্যাঙ্কস কর্নেল মুনরোর মানসিক পরিস্থিতির কথা পাড়তেই সে বাধা দিয়ে বলল—'স্যার, আপনারা মিছেই ভয়ে এমন কুঁকড়ে যাচ্ছেন। আসলে নানাসাহেব ভারতেই নেই।'

ব্যাঙ্কস মুচকি হেসে বললেন—'তুমি কোনো খবরই রাখনা কালাগনি! চারমাস আগে পঁচিশে মে নানাসাহেব সাতপুরা পর্বতে মারা গেছেন তুমি কি কিছুই শোন নি!'

নানাসাহেব-এর মৃত্যু সংবাদ কালাগনির মুখে যেন অকস্মাৎ কালি ঢেলে দিল। অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে নানাসাহেব-এর প্রসঙ্গে কয়েকটা জরুরি প্রশ্ন করল। উত্তরে যা শুনল, খুশি হতে পারল না বোঝা গেল।

কালাগনির আচরণ আমার মধ্যে রহস্যের-সঞ্চার করল। ভাবলাম, সে কী তবে সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে লিপ্ত ছিল? আর 'সিপাহী বিদ্রোহকে সে স্বাধীনতার যুদ্ধই বা কেন বলবে? আর নানাসাহেব-এর মৃত্যু সংবাদ শুনে সে আঁৎকেই বা উঠেছে কেন?

তেইশে সেপ্টেম্বর আমাদের যন্ত্র-হাতি বেহেমথ ঝাঁসি পেরিয়ে এগিয়ে চলল। রাণী লক্ষ্মী বাঈ-এর সঙ্গে কর্নেল মুনরোর সঙ্গে ভয়ংকর লড়াই হয়েছিল। তারপর থেকে নানাসাহেবের ওপর একেবারে হাড়ে চটা।

পঁচিশে সেপ্টেম্বর আমাদের যন্ত্র-হাতি জঙ্গলের পথে এগিয়ে চলল। সে রাত্রে চাঁদের আলোয় আমরা অত্যাশ্চর্য এক ব্যাপারের মুখোমুখি হলাম। দেখলাম, পথের বৃষ্টিভেজা মাটিতে পরপর কিছু পদচিহ্ন রয়েছে। মানুষের পদচিহ্ন। আচমকা কারা যেন চক করে ঝোপের আড়ালে চলে গেল দেখলাম। সরারাত্রি কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলল।

সকাল হতেই আমরা নদী পেরোবার উদ্যোগ নিলাম। ঠিক তখনই গতরাত্রের রহস্য সৃষ্টিকারীদের দেখা গেল। তারা সংখ্যায় কম সে কম শ' খানেক তো হবেই। ইয়া গোদা গোদা হনুমান। মুখপোড়া হনুমান। তারা বেহেমথকে যেতে দেখেই ঝপাঝপ গাছ থেকে লাফিয়ে পথে নামল। বেহেমথ নদীতে নামামাত্র তারা লাফালাফি করে তার মাথায় পিঠে আর শুঁড়ের ওপর চেপে বসল। বেহেমথ হিম্মৎ রাখে বটে। নিজের এবং আমাদের ওজন ছাড়াও একশ'টা হনুমানের অতিরিক্ত ওজন নিয়েও সেটা দিব্যি নৌকার মতো জল অতিক্রম করে চলল।

হনুমান হিন্দুদের কাছে ভগবান। রামচন্দ্রের ভক্ত। তাদের হত্যা করতে আমরাও উৎসাহী হলাম না। কম-বেশি অত্যাচার তো তারা আমাদের ওপর করলই না। তবু উত্তেজিত হয়ে কারো গায়ে হাত দিলাম না।

উনত্রিশে সেপ্টেম্বর। বেহেমথ বুন্দেলখণ্ডের সবচেয়ে খারাপ জায়গা দিয়ে কোনোরকমে পথ পাড়ি দিতে লাগল।

পাহাড় আর জঙ্গল একাকার হয়ে গেছে এখানে। কালাগনি বারবার নেমে নেমে রাস্তার অবস্থা দেখে এসে চালককে বলছে, তবেই বেহেমথকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তবে একটা কথা খুবই সত্য যে, এখন পর্যন্ত আমাদের ওপর ডাকাতদের হামলা হুজ্জতি হয় নি। এখানকার ডাকাতরা সারা ভারতের আতঙ্ক।

আমরা অবশ্য যে কোনো পরিস্থিতির মোবাকেলা করার জন্যই তৈরি। বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সবই মজুদ আছে। প্রয়োজনে ব্যবহার করব।

কিন্তু ত্রিশে ডিসেম্বর আমাদের অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা হল। ডাকাতদের পরিবর্তে অন্য ধরনের আক্রমণ। সত্যই খুবই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। দুটো পর্বত প্রমাণ হাতি

www.pathagar.com

আমাদের বেহেমথ-এর পিছন পিছন চলতে লাগল। একটু বাদেই আর একটা হাতি তাদের দলে মিলিত হল। এবার একটা একটা করে হাতি দলে বাড়তেই লাগল। তারা যে পিছন পিছন চলতে চলতে কি ফন্দি আঁটছে তা-ই বা কে জানে? হঠাৎ করে সবাই যন্ত্র-হাতি বেহেমথ-এর সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়ালেই সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে। হুড, হাতিদের বুদ্ধির প্রশংসায় একেবারে গদগদ হয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। হাতিগুলো তবু বেহেমথ-এর পিছন ছাড়ল না। এমন সময় আচমকা একটা বিচিত্র আওয়াজ শোনা গেল। একেবারেই অত্যাশ্চর্য সে আওয়াজটা। গম্ভীর আওয়াজ। একমাত্র মেঘের ডাকের সঙ্গেই আরে তুলনা চলতে পারে।

কালাগনির চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল। সে প্রায় কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—'সর্বনাশ! হাতিগুলো যন্ত্র-পাতি বেহেমথকে চরমতম শত্রু জ্ঞান করছে! শত্রুর মুখোমুখি হলে তারা এমন গম্ভীর অদ্ভুত আওয়াজ করে হাঁক দেয়।

আতঙ্কে আমাদের গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার উপক্রম হল।

কয়েক মুহূর্ত পরে তারা ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি থামিয়ে চুপ হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সার্চ লাইট জ্বেলে দেওয়া হল। তীব্র আলোয় দেখতে পেলাম, হাতির দল বেহেমথকে ঘিরে শুয়ে পড়েছে। আলো জ্বলতেই তারা সমস্বরে তীব্র তর্জন-গর্জন জুড়ে দিল। সে কী গর্জন, কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার জোগাড়।

হায়! এ পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি পাবার উপায়?

সকালে বেহেমথ-এর শুঁড় দিয়ে গলগল করে কালো ধোঁয়া ছাড়লে তো আরো প্রমাদ ঘটবে। তারা ক্ষেপে গিয়ে কী যে কেলেঙ্কারি ঘটাবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। গুচ্ছের খানেক দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে সার্চ লাইটের আলো নিভিয়ে, অদৃষ্ট সম্বল করে আমরা শুয়ে পড়লাম।

আমরা যদি কোনো সুযোগে পালিয়ে যাই এ আশঙ্কায় হাতির দল সারারাত্রি আমাদের পাহারা দিল।

সকাল হতেই আমরা মরিয়া হয়ে উঠলাম। এবার যে করেই হোক এ জায়গা ছেড়ে এগুতেই হবে।

গল গল করে গরম বাষ্প আর কানে তালালাগা ঘন ঘন সিটি মারায় কয়েকটা হাতি হকচকিয়ে পথ থেকে উঠে সরে দাঁড়াল। ব্যস, ব্যাঙ্কস সুযোগের সদ্ব্যবহারে মেতে গেল। বেহেমথ দ্রুত ছুটে চলল। হাতির দলও তাকে অনুসরণ করতে লাগল। তাদের মধ্যে ব্যস্ততা নেই। ক্ষোভের বর্হিপ্রকাশ নেই। মোদ্দা কথা, সামান্য ডাকাডাকিও করল না।

আমাদের যন্ত্র-হাতি বেহেমথ লেক পুটুয়ারির কাছাকাছি এগুতেই চরম সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম। দু-ধারে পাহাড় মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। পর্বত প্রমাণ একটা রক্ত-মাংস গড়া হাতি পথ আগলে দাঁড়িয়ে অনবরত শুঁড়টাকে নাচিয়ে চলেছে। দাঁতহীন হাতি।

আচমকা কালাগনি চিল্লিয়ে উঠল—'খবরদার! খবরদার ওর গায়ে আঘাত হানবেন না। গণেশ! ওটা গণেশ!'

এদেশের মানুষ এক দাঁতওয়ালা হাতিকে গণেশ জ্ঞানে সমীহ করে। এক কথায় ডাকাতে হাতি। অসীম সাহসী। অমিত শক্তিধরও বটে।

www.pathagar.com

ব্যাঙ্কস তবু দমল না। আচমকা তীব্রগতিতে বেহেমথকে ছুটিয়ে দিল। গণেশ বিকট আওয়াজ তুলে ধড়াস করে খাদের মধ্যে গিয়ে পড়ল। যুদ্ধ। তুমুল যুদ্ধ বেঁধে গেল। যন্ত্র-হাতি আর রক্ত-মাংসের হাতির মধ্যে এমন যুদ্ধ বাঁধল যে, কেউ তা কল্পনাও করতে পারবে না। এবার শুরু হয়ে গেল দশ-দশটা বন্দুকের গর্জন। হুড পরামর্শ দিল হাতির কপালে গুলি চালাবার জন্য।

বিপদ এবার নতুনতর রূপ নিয়ে দেখা দিল। হঠাৎ বেহেমথ-এর পিছনের বাড়িটা থেকে আর্তনাদ শুরু হয়ে গেল। কয়েকটা হাতি ক্ষেপে গিয়ে সে বাড়িটাকে পাহাড়ের গায়ে ঠেসে ধরে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

এবার শেকল খুলে পিছনের বাড়িটাকে বেহেমথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল। ব্যস, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই উন্মত্তপ্রায় হাতিগুলো শুঁড় আর পায়ের চাপে দুমড়ে মুঁচড়ে একাকার করে দিল বাড়িটাকে।

বেহেমথ এবার ডাঙা ছেড়ে লেক পুটুয়ারির জলে ঝাঁপ দিল। সঙ্গে কয়েকটা হাতিও ঝপাঝপ জলে পড়ে গেল। কিন্তু বন্দুকের গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তারা রক্তাপ্লুত দেহে কোনোরকমে পাড়ে উঠে জান বাঁচাল।

সমস্যা! আমরা একের পর এক সমস্যার মুখোমুখি হতে লাগলাম। বয়লার বন্ধ। স্টিম ফুরিয়ে গেছে। বেহেমথ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গুদামে কাঠ নেই, বয়লার চলবে কি দিয়ে?

অনন্যোপায় হয়ে ব্যাঙ্কস বেহেমথকে দাঁড় করিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে রইল।

জায়গাটার খুবই অখ্যাতি রয়েছে। বুন্দেলখণ্ডের সবচেয়ে ভয়ংকর জায়গা এটা। তাই ঝপাঝপ বেহেমথ-এর সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। কেউ যেন আমাদের উপস্থিতির কথা টের না পায়, তাই এ-পথ অবলম্বন করা।

ব্যাঙ্কস কালাগনিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারল, এখান থেকে জব্বলপুর প্রায় দেড় মাইল। কালাগনি জমাটবাঁধা কুয়াশা আর কনকনে ঠাণ্ডা জলে সাঁতার কেটে জব্বলপুরে গিয়ে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী জোগাড় করে নিয়ে আসতে রাজি হল। ব্যাঙ্কস থেকে শুরু করে কর্নেল মুনরো পর্যন্ত সবাই তার কথায় চমকে উঠলেও শেষপর্যন্ত সম্মতি দিতে বাধ্য হলেন। গৌমিও সাঁতারে পটু। কর্নেল মুনরোর নির্দেশে সে-ও কালাগনির সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিল।

আমিও তক্কে তক্কে ছিলাম। কর্নেল মুনরোকে একা পেয়ে আমি কোনোরকমে ভনিতা না করেই সরাসরি প্রশ্ন করলাম—'একটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না। কালাগনিকে আপনি কিছুতেই একা জব্বলপুরে যেতে দিতে চাইলেন না কেন, দয়া করে বলবেন?'

কর্নেল মুনরো নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন—'আমার মনে হয় তার কথাবার্তায় সত্যতার অভাব যথেষ্টই রয়েছে।'

আমি কপালের চামড়ায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বলে উঠলাম, 'একী বলছেন আপনি! যে লোকটা দু-দুবার আপনাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছে, তাকে অবিশ্বাস করছেন! এমন কি হুড-কেও তো সে একবার বাঘের কবল থেকে ছিনিয়ে—'

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কর্নেল মুনরো আবার বলতে লাগলেন—'মানুষের মুখেই তার মনের ছবি ফুটে ওঠে। মিথ্যে কথা বলার সময় কালো

www.pathagar.com

ভারতীয়দের মুখ আরো অনেক বেশি কালো হয়ে যায়। সৈন্য বিভাগে কাজ করার সময় আমি সিপাইদের সত্য-মিথ্যার যাচাই এভাবেই করতাম। কোনো ক্ষেত্রেই আমার ভুল হয় নি। কালাগনির শেষ কথাটাকেও আমি একই পদ্ধতি অনুসরণ করে বিশ্বাস করতে পারলাম না, তাই তো আগেভাগে একটু সতর্কতা অবলম্বন করলাম। ব্যস, এর বেশি কিছু নয়।'

কর্নেল মুনরোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে বিছানা আশ্রয় করলাম। দূরের জঙ্গল থেকে বাঘের-হুঙ্কার কানে আসতে লাগল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পঞ্চাশ নম্বর বাঘটাকে খতম করার জন্য হুড অস্থির হয়ে পড়লেও কার্যত কিছুই করার ছিল না। হাঁকডাক শোনা ছাড়া লাভ কিছুই হল না।

সকাল হল। ছয়টার কাছাকাছি বাতাসে ভাসতে ভাসতে বেহেমথ লেকের তীরের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেল। আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাড়ে নামার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রইলাম। লেকের ধারে-কাছেই প্রচুর শুকনো কাঠ দেখা যাচ্ছে।

বেহেমথ তীরের দিকে আরো কিছুটা এগিয়ে যেতেই আমরা ঝপাঝপ লাফিয়ে নেমে গেলাম।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইয়া মোটা মোটা শুকনো ডাল টানাটানি করে বেহেমথ এ তুলে নিলাম। বাষ্প তৈরি না করলে বেহেমথ থামের মতো পায়ে ভর দিয়ে জল থেকে উঠে আসবে কি করে?

বাষ্প তৈরি করা হল। বাষ্পের বাপ বৃদ্ধি পেল। ব্যস, বেহেমথ গুড়গুড় করে লেকের জল ছেড়ে ডাঙার পাথুরে মাটিতে উঠে এল।

বেহেমথ ডাঙায় উঠতে না উঠতেই চোখের পলকে অবিশ্বাস্য একটা কাণ্ড ঘটে গেল। একদল ভারতীয় অস্ত্র হাতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। সবাই সশস্ত্র। কুড় ল, বর্শা আর শাবল নিয়ে তারা আমাদের মন্দিরাকৃতি বাড়িটার ওপর সক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমরা কিছু বোঝার আগেই দমাদম কুড় লের আঘাত হেনে বাড়িটাকে খণ্ডখণ্ড করে আগুন জ্বালিয়ে দিল।

দৈত্যাকৃতি মানুষগুলো শরীরের শক্তি নিঃশেষে নিঙড়ে যন্ত্র-হাতি বেহেমথ-এর গায়ে ঘন ঘন কুড় ল আর শাবলের ঘা মারতে লাগল। কিন্তু অচিরেই তাদের হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে হল। বেহেমথ-এর ইস্পাতের পাতের গায়ে সজোরে আঘাত লাগায় তাদের অস্ত্রগুলো দুমড়ে-মুচড়ে গেল।

দৈত্যাকৃতি মানুষগুলো যখন হতাশ হয়ে বেহেমথকে ধ্বংস করার আশা ছেড়ে দিয়ে কিংবর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে ঠিক তখনই তীব্র-হুংকার দিয়ে দুজন ষণ্ডামার্কা লোক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। তাদের দেখেই দৈত্যাকৃতি লোকগুলো তাঁর সামনে সারিবদ্ধভাবে মাথা নিচু করে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই দ্বিতীয় জনের ওপর চোখ পড়তেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আর কোনো জিজ্ঞাসা থাকল না।

সে দৃঢ় পায়ে কর্নেল মুনরোর দিকে সামান্য এগিয়ে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে উঠল—'এর কথাই বলছিলাম। এ-ই সেই লোক।'

ব্যস, মুহূর্তের মধ্যে দৈত্যাকৃতি একশত ডাকাত সমস্বরে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে কর্নেল মুনরোকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেল।

www.pathagar.com

ব্যাপার কি? কর্নেল মুনরোর ওপর কালাগনির এমন জ্বলন্ত ক্রোধের কারণ কি? তবে কি সে নানাসাহেব-এর হুকুম তামিল করতেই এমন ভয়ংকর একটা ঘটনা ঘটাতে উৎসাহী হয়েছে?

মঁসিয়ে মক্রের ডাইরির পাতায় এর পরের ঘটনা কিছুই লেখাজোকা নেই। তবে ঘটনাগুলোকে একত্রিত করলে উপসংহার হিসেবে আরো কিছু না বললে বক্তব্য অসমাপ্ত রয়ে যায়।

ঠগী-ডাকাতদের তীর্থক্ষেত্র, নিশ্চিন্ত কর্মক্ষেত্র ভারতভূমি। তবে হ্যাঁ, এরা কালীর উপাসক। শক্তির উপাসক। ভবতারিণীকে খুশি করার জন্য পাঁঠাবলির মতো এরা গলায় দড়ির ফাঁস দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে পরপারে পাঠিয়েছে।

তবে ব্যাপারটা কি? কালাগনি কি তবে প্রথম থেকেই নীরবে মতলব আঁটছিল? এখন সুযোগ হাতে পেয়ে সদ্ব্যবহার করেছে? পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে সে কানপুর থেকেই যন্ত্র-হাতি বেহেমথ-এর আশপাশ দিয়ে ঘুর ঘুর করেছে। একই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ম্যাথিয়াস-এর এবং কার্ল-এ জানোয়ারগুলোর পরিচর্যার দায়িত্ব নিয়েছে? তারপর নিজের জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়েও তাঁদের আস্থাভাজন হতে দু' দু-বার কর্নেল মুনরোর জীবন রক্ষা করেছে।

কালাগনি মতলব এঁটেছিল যে করেই হোক কোনো এক বিপদের মুহূর্তে যন্ত্র-হাতি বেহেমথ-এর রক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। তবেই লোকগুলোকে নিজের কব্জির মধ্যে নিয়ে আসতে পারবে। তাই তো অভিজ্ঞ অভিনেতার মতো প্রতি মুহূর্তে সে এতগুলো শিক্ষিত লোকের সঙ্গে অভিনয় করে গেছে।

নানাসাহেব-এর মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্র তার চোখে-মুখে নেমে এসেছিল বিষাদের কালোছায়া। তবু হতাশ হয়ে সে হাল ছাড়ে নি কিছুতেই। শেষপর্যন্ত পথ দেখিয়ে বেহেমথকে এনে হাজির করেছে বিশালায়তন পুটুরিয়ার হ্রদে।

এবারের কাজও তার পরিকল্পনা মাফিকই হয়েছে। গৌমিকে নিয়ে লেকের বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে দেড় মাইল খানেক সাঁতরে গিয়ে এগিয়ে চলল পাড়ের উদ্দেশ্যে। পাড়ের কাছাকাছি গিয়ে কোমার থেকে ঝকঝকে ছুরির ফলাটা বের করে তার বুকে যেই না গেঁথে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে অমনি জঙ্গলের দিক থেকে গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল—'কে গো, কালাগনি? কালাগনি এসেছ?'

'হ্যাঁ, আমি কালাগনিই বটে। নাসিম, আমি এসে গেছি।' ব্যস, এবার হাত দুটোকে মুখের কাছে তুলে নিয়ে সে ভয়ংকর চিৎকারে বনবাদাড় কাঁপিয়ে তুলল।

সুযোগ বুঝে গৌমি অন্ধকারে গা-ঢাকা দিল। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। কর্নেল মুনরো বা যন্ত্র-হাতি বেহেমথ-এর কথা ভেবেই সে চম্পট দিল।

কালাগনি আর নাসিম ডাকাডাকি হাকাহাকি করে ডাকাতদের তলব করল। দেখতে দেখতে দেড়শ ডাকাত কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জড়ো হয়ে গেল। গৌমির খোঁজ করল। পেল না।

তারপরের ঘটনা তো আমাদের অবশ্যই জানা আছে।

www.pathagar.com

সকাল ছয়টায় কর্নেল মুনরো ডাকাতদের হাতে ধরা পড়লেন। নাসিম তাঁকে নিয়ে রায়পুর দুর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। দুর্গটা বিন্ধ্যা পর্বতের একধারে। সাতপুরা পাহাড় থেকে প্রায় দু'শ মাইল দূরবর্তী এক স্থানে।

এক সময় রায়পুর দুর্গের খুবই খ্যাতি ছিল। সারি সারি কামান ছিল দুর্গের চারিদিকে। এখন একটা মাত্র সম্বল। আসলে আয়তন ও ওজন এতই বেশি যে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় নি। শোনা যায় ভিলসার বিখ্যাত ব্রোঞ্জ কামানের চেয়েও নাকি এটা অনেক বড়। এমন কি বিজাপুরের কামানও এর কাছে শিশু। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে এটাকে তৈরি করা হয়।

ষণ্ডামার্কা লোকটা গম্ভীর মুখে এগিয়ে আসতেই কালাগনি দু-পা এগিয়ে তাকে নতজানু হয়ে প্রণাম করল। বোঝা গেল, লোকটা তার মনিব—দলপতি।

সঙ্গত কারণেই মনে প্রশ্নের উদয় হল—লোকটা কে? নানাসাহেব? না, তা তো হতে পারে না। নানাসাহেব তো কবেই মরে ভূত হয়ে গেছেন। তবে এ কে?

ক্রোধোম্মত্ত বাঘ যেমন শিকারের দিকে এগিয়ে যায় ঠিক তেমনি বীরদর্পে লোকটা এক পা-দু-পা করে এগুতে লাগল। চোখে তার প্রতিশোধের আগুন জ্বল জ্বল করছে।

আরো কিছুটা এগিয়ে আসতেই কর্নেল মুনরো সবিস্ময়ে বলে উঠলেন—'আরে, এ যে বালাও রাও!'

দলপতি গোছের লোকটা এবার মুখ খুললেন—'ভালো করে তাকিয়ে দেখুন তো, চিনতে পারেন কি না?'

'তবে? তবে কি নানাসাহেব।' সচকিত হয়ে ঝট করে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন কর্নেল মুনরো। আগের মতো বিস্ময়ের সঙ্গে এবার বললেন—'নানাসাহেব! তিনি তবে আজো জীবিত? কিন্তু সাতপুরা পাহাড়ে কে মারা গিয়েছিল?'

'সাতপুরায় মারা গিয়েছিল নানাসাহেবের অনুজ। উভয়ে একই রকম দেখতে। যেন একই ছাঁচে গড়া দুটো মানুষ। কানপুর আর লক্ষ্ণৌয়ের সৈন্যরা একই ভুল করেছিল। ইংরেজ সরকার ভুল করেছে। নানাসাহেব তাদের সে ভুল ভাঙান নি। কর্নেল মুনরোর প্রতীক্ষায় তিনি চার-চারটে মাস অধীর প্রতীক্ষায় কাটিয়েছেন।

নানাসাহেব-এর ভয় একটাই ছিল, তাঁর মৃত্যুর ভুঁয়া খবরটা ছড়িয়ে পড়লে তা শুনে কালাগনি মুষড়ে পড়ে হাল ছেড়ে না দেয়। তাই নাসিমকে পাঠিয়েছিলেন গোপনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে আসল ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে। নাসিমই কালাগনিকে জানিয়েছিল, রায়পুর দুর্গে নানাসাহেব তারই জন্য অধীর-প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

কর্নেল মুনরো অপলক চোখে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর স্ত্রী লেডি মুনরোর মুখটা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। অতর্কিতে কানপুরের ইংরেজ নিধনকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। নানাসাহেব নীরবে খুবই ক্ষীপ্রতার সঙ্গে দু-পা পিছিয়ে গেলেন।

ব্যস, চোখের পলকে নানাসাহেব-এর অনুগামীরা ক্রোধোম্মত্ত বাঘের মতো চারদিক থেকে ঝাঁপয়ে পড়ল। নানাসাহেব তাদের নিরস্ত না করলে তাকে মুহূর্তে টুকরো টুকরোই করে ফেলত।

বজ্রগম্ভীর স্বরে নানাসাহেব উচ্চারণ করলেন-'কর্নেল মুনরো, মনে পড়ে আপনি পেশোয়ারে এক শ' বিশজন কয়েদিকে কামান দেগে হত্যা করেছিলেন? পরবর্তীকালে আবার বার শ' সিপাইকেও কামানের মুখেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আপনার অনুগত

www.pathagar.com

সৈন্যরা নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে সিপাইদের খতম করেছিল। দিল্লি দখল করার পর আপনার উল্লসিত সৈন্যরা তিনজন রাজপুত্র সমেত রাজপরিবারের উনত্রিশজনকে হত্যা করে রক্তনদী বইয়ে দিয়েছিল, ঠিক কিনা? পাঞ্জাবে খতম করেছিল তিন হাজার আর লক্ষ্ণৌতে ছয় হাজার, মনে পড়ে? আপনারা স্বাধীনতার-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার অপরাধে এক লক্ষ বিশ হাজার সিপাই আর দুই লক্ষ ভারতবাসীকে নির্মমভাবে খুন করেছিলেন। সত্য তো?'

নানাসাহেব-এর অনুগামীরা জিগির দিয়ে উঠল 'খুনকা বদলা খুন! রক্তের বদলে রক্ত চাই।'

নানাসাহেব হাত তুলে অনুগামীদের থামিয়ে দিয়ে আবার বলতে লাগলেন—'ঝাঁসীর রাণী আমার অভিন্নহৃদয় বান্ধবী। আপনার নিষ্ঠুরতার বলি হতে হয়েছিল তাঁকে। নিজেহাতে খুন করেছিলেন আপনি। তার বদলা আজো নেওয়া হয় নি। মাস চারেক আগে আপনি আমার অনুজ বালাও রাও-এর বুকের রক্তে আপনার হাতকে রাঙিয়ে ছিলেন, তার বদলাও তো নেওয়া হয় ওঠে নি।'

তাঁর অনুগামীরা সমস্বরে সক্রোধে গর্জে উঠল। নানাসাহেব গর্জে উঠে তাদের দমন করলেন। আবার প্রতিহিংসার আগুন ঝলসে উঠল—'কর্নেল মুনরো, আপনার পূর্বসুরী ছিলেন হেক্টর মুনরো। তিনি মানুষকে হত্যা করার অদ্ভুত একটা উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। আঠারো শ সাতান্নর যুদ্ধে যে-কৌশল অবলম্বন করে আপনি জ্যান্ত মানুষকে পিঠমোড়া করে বেঁধে কামান দেগে হাসিমুখে হত্যা করেছিলেন, সত্য তো? আপনাকেও ঠিক একই উপায়ে খতম করা হবে। ভোর হলেই আপনাকেও কামানের গোলার সঙ্গে উড়ে যেতে হবে, শুনে রাখুন।'

আশ্চর্য ব্যাপার! কর্নেল মুনরোর শরীরের স্নায়ুগুলো এতই সবল যে, তিনি হাসিমুখে কামানের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন, নির্ভিক কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—'বহুৎ আচ্ছা! তবে তা-ই হোক।'

ব্যস, চোখের পলকে নানাসাহেব-এর অনুচররা তাঁকে ঝটপট বেঁধে ফেলল।

রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। মহা উল্লাসে ডাকাতরা ব্যস্ত-পায়ে দুর্গে ফিরে গেল। ভোরের আলো ফুটে উঠলেই কামান গর্জে উঠবে। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে কর্নেল মুনরোর মৃত্যু সংবাদ।

নিঃসঙ্গ কর্নেল মুনরো কামানের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় মৃত্যুর-প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে লাগলেন।

এদিকে অতিরিক্ত পানাহারের জন্য সৈন্যরা প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় রাত্রি কাটাতে লাগল।

কর্নেল মুনরো বাস্তবিকই অসম সাহসী। ভয় কাকে বলে তাঁর আদৌ জানা নেই। অবিশ্বাস্য তাঁর মনোবল। তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে বার বার ভেসে উঠতে লাগল তার সহধর্মিণী লেডি মুনরোর স্মৃতি।

নানাসাহেব। তিনি ছিলেন একাধিক মানুষ নৃশংস নিধন যজ্ঞের নায়ক। দু-শ' শ্বেতাঙ্গ নারী-পুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে ইঁদারার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সে কী মর্মান্তিক দৃশ্য!

কর্নেল যাঁর খোঁজে কলকাতা ছেড়ে বেড়িয়ে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল চষে ফেলেছেন তিনি আজ তার হাতের নাগালের মধ্যে। মাত্র কয়েক-গজ দূরে দুর্গের ভেতরে গভীর

www.pathagar.com

নিদ্রায় আচ্ছন্ন। চরমতম শক্রকে এত কাছে পেয়েও তিনি প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পারছেন না। তিনি নিতান্তই অসহায়, হাত-পা বাঁধা।

পূব আকাশের গায়ে রক্তিম ছোপ উঁকি দিল। ভোরের পূর্বাভাস। দুর্গের প্রহরী সকাল চারটের ঘন্টা বাজাল। এমন সময় এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যের মুখোমুখি হলেন ক্যাপ্টেন মুনরো। জ্বল জ্বলে একটা আলোক শিখা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। নিশ্চল নিথর ভাবে আলোকশিখাটা কিন্তু দাঁড়িয়ে নেই। চলমান আলোকশিখা। চারমাস আগে সাতপুরা পাহাড়ের গায়ে যে আলোকশিখাটাকে দেখা গিয়েছিল তাই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বিন্ধ্য পর্বতের গা-বেয়ে আজ রায়পুর দুর্গে হাজির হয়েছে। কেউ তার পথ আগলে দাঁড়ায় নি। নানাসাহেবও তার গতিপথে বাধা হয়ে দাঁড়ান নি। আসলে তিনি তো জানতেন না একে অনুসরণ করেই ইংরেজ সৈন্য সাতপুরা পাহাড়ে গিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে। চলমান এ-অগ্নিশিখার কথা কর্নেল মুনরোও কোনোদিন শোনেন নি। তাই তো বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তিনি চলমান অগ্নিশিখাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেটা এগুতে এগুতে এক সময় কামানটার গা-ঘেঁষে দাঁড়াল। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বোরখার মতো লম্বা জামায় মোড়া। ওড়নার মতো কাপড় দিয়ে মুখটাকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। পাগলি মশাল-হাতে চলমান পাগলি। আচমকা তার মুখের কাপড়টা খসে পড়ল। শূন্য দৃষ্টিতে সে কর্নেল মুনরোর দিকে তাকিয়ে রইল। নিষ্পলক তার চাহনি।

'পরিচিত মুখ। খুবই পরিচিত। দীর্ঘ নয় বছরেও এ মুখটা তার স্মৃতি থেকে এতটুকুও ম্লান হয়নি। তিনি চাপা আর্তনাদ করে উঠলেন—'তুমি লরা! লরা! তুমি এসেছ! তুমি আজো বেঁচে আছ লরা?'

লরাই বটে। তিনি ঠিকই চিনতে পেরেছেন। চরম সঙ্কটের মুহূর্তে তাঁর স্ত্রী লরাই এসেছেন আলোকশিখা হাতে।

না, কানপুরের সে-নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তিনি মরা যান নি। নানাসাহেবের সিপাইরা অন্যান্য হতাহতদের সঙ্গে তাঁকে ইঁদারায় নিক্ষেপ করেছিল। সেখানে আধো আলো আধো অন্ধকারে লাশের স্তূপের মধ্যে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়েছিলেন তিনি। ব্যস, সেই থেকে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। তখন থেকেই তিনি প্রজ্জ্বলিত আলোকশিখা হাতে পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে আর মাঠে-ময়দানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

নির্বাক লরা এবার কয়েক পা এগিয়ে কামানের গায়ে হাতের জ্বলন্ত অগ্নিশিখাটা বুলিয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে কি যেন দেখতে লাগলেন।

তাঁর ব্যাপার-স্যাপার দেখে কর্নেল মুনরো চমকে উঠলেন। আগুনের একটা ফুলকি ছিটকে পড়লে সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে। কামান বিকট আওয়াজ তুলে গর্জে উঠবে। কর্নেল মুনরো আর্তনাদ করে উঠলেন—'হায় ঈশ্বর তবে কি স্ত্রীর হাতেই আমার মৃত্যু লিখে রেখেছ! আর সে জন্যই কি অতীতে এত বিপদের হাত থেকে আমাকে এতদিন টিকিয়ে রেখেছিলে?'

এমন সময় কামানের ভেতর থেকে, মৃত্যু-গহ্বর থেকে দুটো হাত ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। কর্নেল মুনরো আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। পরমুহূর্তেই হাত দুটোর মালিকের সম্পূর্ণ দেহটা তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কর্নেল গলা নামিয়ে সোল্লাসে বলে উঠলেন—'গৌমি! গৌমি, তুমি কি করে এখানে, কামানের নলের মধ্যে এলে?'

www.pathagar.com

গৌমি সেদিন কালাগনির সঙ্গে সাঁতরে হ্রদ পেরিয়ে ডাঙায় উঠেছিল। কালাগনি তার কাছ থেকে সরে গিয়ে ডাকাতদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। পরিস্থিতি অনুকূল নয় বুঝতে পেরে সে অন্ধকারে গা-ঢাকা দেয়। ঝোপের আড়াল থেকে ডাকাতদের পরিকল্পনা শুনতে পায়। তার প্রভু কর্নেল মুনরোকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে শুনে সে গোপনে এখানে ছুটে আসে। সবার অগোচরে কামানের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। কর্নেল মুনরোকে যদি সে রক্ষা করতে পারে তবে তো কথাই নেই, নইলে নিজেই তোপের মুখে উড়ে যাবে।

কর্নেল মুনরো বললেন—'গৌমি ভোরের আলো ফুটে উঠতে আর দেরি নেই। লরাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।'

আর এক মুহূর্তও নষ্ট করার মতো সময় নেই। কারণ, হঠাৎ মশালের আলো থেকে এক টুকরো আগুন কামানের পলতের গায়ে পড়েছে। সলতেটা তিরতির করে পুড়তে পুড়তে ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিকট আওয়াজ তুলে গর্জে উঠবে। পুরো বিন্ধ্যপর্বতটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠবে। চমকে উঠবে মানুষগুলো।

হ্যাঁ, ঘটলও তা-ই। কামান গর্জে ওঠা মাত্র লেডি মুনরো স্বামীর বুকে আছাড় খেয়ে পড়লেন।

আওয়াজে প্রহরীর ঘুম ভেঙে গেল। সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলে গৌমি হাতের ছোরাটা অতর্কিতে তার বুকে গেঁথে দিল।

আর এক মুহূর্তও দেরি না করে গৌমি কর্নেল মুনরো আর লেডি মুনরোকে নিয়ে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ ধরে দ্রুত নিচে নেমে যেতে লাগল।

কিন্তু হায়! একী সর্বনেশে কাণ্ড! সশস্ত্র ডাকাতরা তাদের পিছু নিয়েছে। সামনের দিকে তাকিয়ে কর্নেল মুনরো আরো অবাক হলেন। স্বয়ং নানাসাহেব পথ আগলে দাঁড়িয়ে। সামনে-পিছনে মৃত্যুদূত, আর তিনজন অসহায় মানুষ। গৌমি ছুটে গিয়ে ছুরিটা নানাসাহেব-এর বুকে গেঁথে দেবার জন্য হাত তুলতেই তিনি এক ঝটকায় সেটাকে ছিটকে ফেলে দিলেন। গৌমি এবার দু-হাতে তাঁকে জাপ্টে ধরে ফেলল। মনিবকে চিল্লিয়ে বলল—'স্যার, আপনি আর এক মুহূর্তও দেরি না করে পালিয়ে যান। আমি—'

তার মুখের কথা শেষ না হতেই মাত্র কয়েক হাত দূর থেকে সমবেত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'কর্নেল মুনরো। কর্নেল মুনরো। আমরা এসে গেছি। এই যে—হৈ যে আমরা।'

কর্নেল মুনরো অতর্কিতে ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখলেন—'হুড, মক্লে, ব্যাঙ্কস, ফক্স ও ম্যাকনিল প্রভৃতি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে তাঁর দিকেই এগোচ্ছেন। আর তাদেরই পিছনে যন্ত্র-হাতি বেহেমথ দাঁড়িয়ে। ডাকাতরা বেহেমথকে ধ্বংস করতে পারে নি। বাড়ি দুটো ধ্বংস করেছে বটে, কিন্তু যন্ত্র-হাতি বেহেমথকে অক্ষত রেখেই পালিয়ে গিয়েছিল।

জব্বলপুর ক্যান্টনমেন্টের দিকে যন্ত্র-হাতি বেহেমথ তীব্র গতিতে ছুটে চলল।

কিছুদূর এগুতেই সমস্যা বাঁধল। সামনে খাড়া পার্বত্য পথ। আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ডাকাতরা দূর থেকে বেহেমথ-এর সমস্যার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গুলিগোলা নিয়ে ছুটে গেল। শুরু হয়ে গেল গুলিবৃষ্টি।

কালাগনি ভালোই জানে, বেহেমথ-এর আরোহীদের গুলির সংখ্যা সীমিত। লড়াইকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারলেই জয় অবশ্যম্ভাবী। তাই কয়েকজন ডাকাত গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেও সে মাথা ঠাণ্ডা রেখেই লড়াই চালাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ কী যে দুর্বুদ্ধি তার

www.pathagar.com

মাথায় চেপেছিল নিজেই জানত না। নইলে সে আচমকা এক লাফে সামনে এগিয়ে আসতে যাবে কেন? সে সামনে এগুতেই হুড-এর বন্দুক থেকে একটা গুলি ছিটকে বেরিয়ে এসে তার বুকে গেঁথে গেল। ব্যস, সব শেষ। কালাগনির রক্তাপ্লুত দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মুহূর্তে এরিয়ে পড়ল।

হায়! বেহেমথ যে অক্ষমতা ঘোষণা করছে। তিরতির করে অনবরত কাঁপছে। তার দম বুঝি নিঃশেষ।

অনন্যোপায় হয়ে সবাই ঝটপট বেহেমথ থেকে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। দৌড়ে ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি যেতে পারলেই কোনোরকমে তাদের জান রক্ষা হতে পারে।

বেহেমথ কাৎড়াতে কাৎড়াতে আরো কিছুটা পথ পাড়ি দিয়ে এক সময় পাহাড়ের গায়ে হেলে পড়ল। বাষ্পের চাপ চরমে উঠে গেছে। এদিকে গতিরুদ্ধ হওয়ায় সে চাপ গেল আরো বেড়ে। ব্যস, চোখের পলকে বিকট আওয়াজ করে বয়লারটা ফেলে গেল। সে কী আওয়াজ! পাহাড়টাও যেন থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

বেহেমথ-এর বয়লার ফাঁটার পূর্ব মুহূর্তে নানাসাহেবকে মুক্ত করার জন্য জনা পাঁচেক ডাকাত তার ছাদে লাফিয়ে উঠে পড়েছিল। কিন্তু আচমকা বয়লার ফেটে যাওয়ায় তারাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

সাবাস! সাবাস বেহেমথ। নিজে ধ্বংস হয়েও সে স্রষ্টাদের প্রাণে বাঁচিয়ে গেল।

বেহেমথ-এর বয়লার ফাটার বিকট আওয়াজ শুনে ক্যান্টনমেন্ট থেকে গোরা সৈন্যরা ছুটোছুটি করে বেরিয়ে এল। তাদের দেখে ডাকাতরা পড়ি কি মরি করে জানি নিয়ে সেখানে থেকে চম্পট দিল।

জব্বলপুর শহরের সেরা চিকিৎসক কর্নেল মুনরোর স্ত্রীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরামর্শ দিলেন, বোম্বাইয়ে নিয়ে গিয়ে বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে।

পরের দিন চৌঠা অক্টোবর।

কর্নেল মুনরো স্ত্রীকে নিয়ে বোম্বাই যাত্রা করার আগে শেষ বারের মতো বেহেমথকে—বেহেমথ-এর ধ্বংসাবশেষ দেখার জন্য সদলবলে ঘটনাস্থলে হাজির হলেন। সেখানে গোটা পাঁচেক লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেল। কিন্তু নানাসাহেব-এর লাশ পাওয়া গেল না।

মধ্য ভারতের মানুষ কানাঘুষো করতে লাগল, তবে নানাসাহেব এখনো জীবিত। তিনি বহাল তবিয়তেই আছেন!

কর্নেল মুনরো স্ত্রীকে বোম্বাইয়ে নিয়ে গিয়ে প্রখ্যাত এক চিকিৎসককে দিয়ে তাঁর চিকিৎসা করালেন। স্বাভাবিকতা ফিরে পেলেন তিনি। স্বামীকে চিনতে পেরে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

কর্নেল মুনরো স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসে নতুন করে সংসার পাতলেন। ক্যাপ্টেন হুড মাদ্রাজে ফিরে গেলেন।

কলকাতা ছাড়ার মুহূর্তে কর্নেল মুনরো রসিকতা করে বললেন—'আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণ হল না ক্যাপ্টেন। উনপঞ্চাশটা বাঘ মেরেই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হল, কি বলেন? পঞ্চাশ নম্বরটা আর মারা হল না।'

চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে ক্যাপ্টেন হুড তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন 'কেন? পঞ্চাশ নম্বর যে মারলাম তার সাক্ষী তো আপনি নিজেই। আমার সে পঞ্চাশ নম্বর বাঘ তো কালাগনিই। মানুষ-বাঘ। কেন, মারি নি তাকে?'

www.pathagar.com

অ্যাড্রিফট ইন দ্য প্যাসিফিক

উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের বুকে মোচার খোলার মতো একটা কেনো ঢেউয়ের তালে তালে ভেসে চলেছে। কেনোর যাত্রীদের মধ্যে বয়স্ক একজনও নেই, সবার বয়সই কম। কেনোটা আচমকা একটা দ্বীপের গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। সর্বনাশ! এখন উপায়?

মাত্র জনাকয়েক অল্প বয়স্ক ছেলে দুটো মাস্তুলযুক্ত কেনোটাকে চালাচ্ছে। ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্রের ঢেউয়ের চাপে কেনোটা বারবার ডুবে যেতে গিয়েও বারবার ভেসে উঠেছে। জাহাজের চালকরা অল্পবয়স্ক মাওয়ালী ছেলে। মাওয়ালীদের ডাঙার চেয়ে উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গেই বেশি মিতালি। যে পিছনে শক্তভাবে মুঠো করে হাল ধরে বসে সেও বছর তেরোর এক মাওয়ালী ছেলে। নাম তার মোকো। নিউজিল্যান্ডে বাড়ি।

কেনোর সামনের দিকে যে তিনটে ছেলে চোখের তারায় হতাশার ছাপ এঁকে বিবর্ণ মুখে বসে রয়েছে তাদের মধ্যে বেশি বয়স্ক তার বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর, নাম ব্রান্ট। আর বাকি দুজনের একজন ডোনাগান অন্য জনের নাম গর্ডন।

মাথা সমান এক একটা ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে কেনোটার গায়ে পড়ছে, তাই চোখের পলকে চারজনই ডেকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল। মোকো কিন্তু কিছুতেই হাল থেকে হাত সরাচ্ছে না, হাতের-মুঠো শিথিল পর্যন্তও করছে না। দাঁতে দাঁত চেপে হাল ধরে রেখে মরিয়া হয়ে কেনোটাকে রক্ষা করে চলেছে। একমাত্র তার আন্তরিক প্রয়াসের জন্যই কেনোটা এমন অক্ষত রয়েছে আর চার-চারটে ছেলেও প্রাণে বেঁচে রয়েছে। কেনোটা ডুবু ডুবু হয়েও বারবারই রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে।

আকাশছোঁয়া প্রকাণ্ড একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় ডেকের কামরার একটা দরজা দুম্ করে খুলে গেল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে একটা কুকুর গর্জে উঠল। আতঙ্কে সবার কলিজা শুকিয়ে যাওয়ার জোগাড় হল। ধমকে-ধামকে ব্রান্ট আবার তাকে কামরার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

এবার আচমকা আর একটা দরজা খুলে একটা ছেলে বেরিয়ে এসে ব্রান্টের কাছে বলল, 'আমি কি তোমার কোন সাহায্যে লাগতে পারি?'

'না, তোমাকে এদিকে কিছুই করতে হবে না। তুমি বাচ্চাকাচ্চাগুলোকে দেখাশোনা কর। আশ্চর্য ব্যাপার তো—ওয়েব, সার্ভিস আর ক্রম করছে কি! তারা থাকতে বাচ্চাগুলো কেঁদে সারা হচ্ছে, ব্যাপার কী?

ব্রান্ট সবাইকে ধমকে ও ঠেলে ধাক্কিয়ে কামরার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। আগের চারজনই কেবল বাইরে, ডেকে থেকে গেল।

এবার আর একটা প্রকাণ্ড-ঢেউ এসে কেনোটাকে একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিল। একটা মাস্তুলও হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সমুদ্রের জলে। তার পালটা ছিঁড়ে একেবারে ফাঁসাফাঁসা হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই ছোট মাস্তুলটার পালও ছিঁড়ে গেল। চরম সঙ্কট। কেনোটা আরো অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল।

আবার একটা ঢেউ তীব্র-গর্জন করতে করতে কেনোটার গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। এমন সময়, তীব্র আর্তনাদ শুনে ব্রান্ট হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল। দেখল, মোকো

www.pathagar.com

জাহাজের সামনের গলুইয়ের ফাঁকে, অতিকায় একটা পিপের তলায় পড়ে কাৎড়াচ্ছে। বেরিয়ে আসার সাধ্য তার নেই।

মোকোকে টানাটানি করে বের করে আনা হল। সারা রাত্রি ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্রের সঙ্গে চারটে ছেলে মরিয়া হয়ে লড়াই করে কোনোরকমে কেনোটাকে রক্ষা করতে পারল।

পূর্ব-আকাশে ফুটে উঠল ভোরের আলো। সে আলোকরশ্মি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেই দূরে, বহুদূরে অস্পষ্ট একটা কালো রেখা দেখা গেল। ছেলে চারটের বুঝতে ভুল হল না, ডাঙা দেখা যাচ্ছে।

হায়! এ কী হল। এত চেষ্টা-চরিত্র সবই বিফলে যাবে নাকি! ডাঙার সিকি মাইল দুরে বালির চরায় কেনোটা আটকে গেল।

ছেলেদের দলের পাণ্ডা ব্রান্ট। সেই বয়সে সবার চেয়ে বড়। ব্রান্ট আর তার ভাই জ্যাক ফরাসি। আর অন্য সবাই ইংরেজ। তারা সংখ্যায় পনেরো জন। তবে গর্ডন ছাড়া, সে আমেরিকান।

ডোনাগানের নেতৃত্বে একদল ছেলে কেনোর একমাত্র ডিঙিটা নিয়ে জলে নামার উদ্যোগ নিতে লাগল। ব্রান্টের খবরদারির ধার তারা ধারে না। আসলে ইংরেজ বলেই ফরাসি কিশোর ব্রান্টের কর্তৃত্ব বরদাস্ত করতে নারাজ। শেষপর্যন্ত ব্রান্ট ধমক-ধামক দিয়ে সবাইকে নিরস্ত করল।

ব্রান্ট উপায়ন্তর না দেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোমরে রশি বেঁধে তীরের দিকে সাঁতরে ডাঙায় ওঠার চেষ্টা করল। তার পরিকল্পনা, ডাঙায় উঠে রশি টেনে কেনোটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে নাজেহাল হয়ে সে কোনোরকমে কেনোতে উঠে আসতে বাধ্য হল।

বরাত ভালো যে, কেনোটার তলা ফেঁসে যায় নি। বালির ওপর চোরাপাথরের ফাঁকে আটকা পড়ে গেছে, বেশি কিছু নয়।

কেনোর সবাই দ্বীপটার দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এত কাছে এসেও ডাঙা স্পর্শ করতে পারছে না, কম আপশোষের কথা?

আচমকা আকাশচুম্বী একটা ঢেউ এসে অবিশ্বাস্য একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলল। চোখের পলকে মোচার খোলার মতো কেনোটাকে শূন্যে তুলে নিয়ে দ্বীপের ওপর আছাড় মেলে ফেলে দিল।

এতগুলো ছেলে একটা কেনোয় চেপে উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রে এলই বা কি করে? আচমকা জাহাজের দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায়ই তাদের এ বিপত্তি। ছেলেরা সবাই স্কুলের পড়ুয়া। স্কুলের দীর্ঘ অবকাশে ছেলেরা কেনো নিয়ে সমুদ্র-ভ্রমণে বেরোনোর পরিকল্পনা করেছিল। তাদের বাবাদেরও সঙ্গে থাকার কথা ছিল। কাপ্তেন ও লস্কর প্রভৃতি যা কিছু দরকার সবই থাকার কথা ছিল। বিধাতার নির্মম পরিহাসের ফলেই আচমকা অভাবনীয় ব্যাপারট ঘটে গেল। অত্যুৎসাহী ছেলের দল আগের রাত্রে কেনোতে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে জাহাজ ছাড়ার কথা। রাত্রি একটু গভীর হলে প্রচণ্ড ঝড় উঠল। দমকা ঝড়ের বেগ সামলাতে না পেরে নোঙরের দড়ি ছিঁড়ে গিয়ে সেটা উল্কার বেগে মাঝ সমুদ্রের দিকে ধেয়ে চলল। ছেলেদের বাবারা ও কাপ্তেন প্রভৃতি কেউ-ই কেনোতে ওঠার সুযোগ পেল না।

www.pathagar.com

ঝড়ের-তাণ্ডব বাড়তেই কেনোটা অস্বাভাবিক রকম দোল খেতে লাগল। হঠাৎ মোকোর ঘুম ভেঙে গেল। ব্যাপার দেখে তার আত্মারাম কাঁচাছাড়া হবার জোগাড় হল। সে ব্যস্ত হয়ে ডাকাডাকি করে অন্যান্যদের ঘুম ভাঙাল।

পরিস্থিতি দেখে ব্রান্টের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম হল। তাদের পরিকল্পনা ছিল কেনোটা নিয়ে নিউজিল্যান্ডের ধার কাছ দিয়ে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু এ যে দেখাচ্ছে তারা প্রায় মাঝ দলিয়ায় হাজির হয়েছে। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখা ব্রান্টের মস্ত বড় একটা ক্ষমতা। সে ঝটপট একটা চিঠি লিখে ফেলল। এবার সেটাকে একটা বোতলে ভরে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিল। উত্তাল সমুদ্রের বুকে ফেলে-দেওয়া বোতলটা কোনোদিন কারো হাতে পড়বে কিনা তার কিছুমাত্রও নিশ্চলতা নেই। তবুও চেষ্টা করতেই হবে।

শেষপর্যন্ত সারারাত্রি বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে মোকাবেলা করে কেনোটা এক সময় অজানা-অচেনা একটা দ্বীপের কাছে এসে বালির ওপর আটকা পড়ে গেল। দ্বীপের পাহাড়-বন সবই দেখা যাচ্ছে।

বালির চরাটা পেরোলেই নদীর-মোহনা। দ্বীপই বটে। কিন্তু কেনোয় দাঁড়িয়ে দারা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দ্বীপটার যত দূরে দৃষ্টি যায় খুঁজে দেখতে লাগল মানুষজন কাউকে দেখা যায় কিনা। না, মানুষের চিহ্নও নজরে পড়ল না।

ছেলের দল এবার সতর্ক হল। অজানা দ্বীপে হঠাৎ করে নেমে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। দরকার হলে কেনোতেই থাকতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, জল আর খাবার-দাবার কোনো কিছুরই অভাব নেই। সেগুলো খেয়ে কাৎ হয়ে তাদের কেনোতেই পড়ে থাকতে হবে ভাগ্যের চাকা না ঘোরা পর্যন্ত।

মোকো রান্নার দায়িত্ব নিল। আহারাদিও মিটল। রাত্রিটা কেনোতেই তারা কাটিয়ে দিল।

ব্রান্টের পরামর্শে ছেলেরা মজুদ খাবার-দাবার খরচ না করার সিদ্ধান্ত নিল। আগে থেকে সাবধান হওয়া ভালো। বরাতে কি লেখা আছে কে জানে? সমুদ্রের পাড় থেকে ঝিনুক কুড়িয়ে এনে ঝোল রান্না করে খেল। আর সামুদ্রিক মাছ তো আছেই। ছিপ-বড়শি কেনোতেই রয়েছে। সমস্যা কিছুই নেই।

ডোনাগান, ব্রান্ট আর গর্ডন অন্যদের চেয়ে বয়সে একটু বড়। তারা সবাইকে সামলে-সুমলে রাখতে লাগল।

ছেলের দল দ্বীপে নেমে প্রতিদিন খাবারের খোঁজে বেরোয়।

একটা ব্যাপার ছেলেদের মাথায় কিছুতেই আসছে না। গভীর রহস্যের ব্যাপার তাদের মনের কোণে দানা বাদল। আসলে তারা এখন কোথায় অবস্থান করছে? কোন মহাদেশ, নাকি কোনো একটা বিশালায়তন দ্বীপে? যদি দ্বীপই হয় তবে খুবই সমস্যা। তবে তো এর চারদিক জলদ্বারা বেষ্টিত থাকবে। তবে এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আর যদি মহাদেশই হয়ে থাকে তবে মুশকিল কিছুই নেই।

ছেলেরা মনস্থ করল, পাহাড়টার উঁচুতে, চূড়োয় উঠে দেখে আসবে আসলে এটা একটা দ্বীপ, নাকি মহাদেশ।

এবার একটা মজার ব্যাপার ঘটাল ছেলেরা। তারা নদীতে মাছ ধরছিল। হঠাৎ অতিকায় একটা কচ্ছপ দেখে কোস্টার ও ইভারসন টপ করে তার পিঠে চাপল। অন্য

www.pathagar.com

সবাই তার মুখের দু-ধারে রশি বেঁধে টেনে ধরে রাখল। অবিশ্বাস্য শক্তিধর সামুদ্রিক প্রাণীটা। তাদের টেনে হিঁচড়ে নিয়েই জলের দিকে এগোতে লাগল। সার্ভিস আর মেকো কেনো থেকে লাঠি নিয়ে এলে ব্রান্ট সেটা দিয়ে চাড় দিয়ে কচ্ছপটাকে দিল উল্টে। ব্যাস, তার সব কেরামতি খতম হয়ে গেল।

এবার কচ্ছপটাকে খুঁচিয়ে নুন মাখিয়ে এক কোণে রেখে দিল। বেশ কয়েকদিন ধরে তার মাংস দিয়ে উদরপূর্তি করল।

এপ্রিলের প্রথম দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ব্রান্ট, ডোনাগান, উইলকক্স ও সার্ভিস বন্দুককাঁধে অভিযানে বেরিয়ে পড়ল। তাদের প্রিয় কুকুর ফ্রানকেও সঙ্গে নিয়ে নিল। কিছু কচ্ছপের মাংস নিল উদরপূর্তি জন্য।

জঙ্গল দিয়ে সামান্য এগোতেই সামনে নদী পড়ল। জল হাঁটুর তলায়। অদ্ভুত ব্যাপর তো! নদী পেরোবার সুবিধার জন্য কে যেন গুচ্ছের খানে পাথরকে পাশাপাশি, প্রায় গা-ঘেঁষাঘেষি করে সাজিয়ে রেখেছে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক ভাবেই ছেলেদের মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার করল। এমনটা হওয়ার তো কথা নয়। কাজটা নির্ঘাৎ কোনো না কোনো মানুষ করেছে?

কচ্ছপের মাংসে উদরপূর্তি করে অভিযাত্রী ছেলের দল গাছের ফাঁকে, একটা লতাপাতায় ঢাকা জায়গায় রাত্রি কাটাল। ভোরে চোখ মেলে তাকিয়েই সার্ভিস চমকে উঠল, কী আশ্চর্য ব্যাপার! এ যে রীতিমতো একটা ঝুপড়ি ঘর!

সার্ভিসের ডাকে বাকিরা হুড়মুড় করে ঘুম থেকে উঠে ব্যাপারটা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাওয়ার জোগাড় হল। ঝুপড়ি ঘরই বটে। আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের ঝুপড়ির কায়দায় তৈরি। তারা একে 'এ্যাজুপা' বলে। বেড়া বা দেওয়াল থাকে না। কেবল একটা চালকে গাছের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়।

অভিযাত্রী ছেলেরা ব্যাপারটা দেখে যারপরনাই অবাক হল। ঝুপড়ি যখন রয়েছে তবে মানুষও অবশ্যই আছে।

দ্বীপটায় এক চক্কর মেরে তারা নিঃসন্দেহ হল, এটা সত্যই একটা দ্বীপ বটে। আর চারদিকে সমুদ্র বেষ্টিত।

ব্যাপারটা তাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। খাবার খাওয়া হলে ফ্যান আশ্চর্যজনক একটা কাজ করল। এক ছুটে সমুদ্রে গেল। গণ্ডুষ ভরে জল খেল। সে অবাক না হয়ে পারল না। এ যে রীতিমতো স্বাদু জল। সমুদ্রের জল হলে তো অবশ্যই নোনতা হত। তবে?

এটা আসলে সমুদ্র নয়, বিশালায়তন একটা হ্রদ। আর এটা এমনই বিশালায়তন যে, সমুদ্র বলে ভ্রম হওয়াই স্বাভাবিক।

সকাল হলে অভিযাত্রীরা একটা ভাঙাচোরা নৌকো দেখতে পেল। এটাকে নৌকো না বলে নৌকোর কয়েকটা টুকরো বলাই ভালো। নৌকোটা তাদের মনে আরো কৌতূহল মিশ্রিত বিস্ময়ের সঞ্চার করল। নৌকো আছে, কিন্তু নৌকোর মালিক?

আর দু-পা এগোতেই তারা অতিকায় একটা বিচগাছের গায়ে ইংরেজি দুটো বর্ণ ও চারটে সংখ্যা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাছটার গুঁড়িতে লেখা রয়েছে, 'এফ. বি. ১৮২৭'।

www.pathagar.com

এবার অভিযাত্রী ছেলেদের, বিশেষ করে ফ্যানের মাথায় পোকা ঢুকল। সে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি আর ডাকডাকি হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিল।

হ্যাঁ, ছুটোছুটিতে কাজ হয়েছে বটে। তারা একটা গুহার খোঁজ পেল। গুহাটার ভেতরে একটা কাঠের চৌপায়া, অতিকায় একটা কাঠের সিন্দুকে ছেড়া-ফাঁটা ও ময়লা কিছু জামাকাপড়, আর কিছু বাসনকোসন দেখতে পেল। চৌপায়াটায় বিছানা-চাদর পাতা আছে বটে, কিন্তু মানুষটাই শুধু নেই।

এবার ফ্যান একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। সে ঘেউ ঘেউ করতে করতে মনিবকে একটা ওক গাছের তলায় নিয়ে গেল।

গাছের গুঁড়িটার দিকে চোখ পড়তেই চার অভিযাত্রী সচকিত হয়ে আৎকে উঠল। একটা মানুষের-কঙ্কাল চার হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। দাঁতগুলো বের করা। আর হাড়গোড় ধবধবে সাদা।

তবে? তবে গুহা আর তার ভেতরের জিনিসপত্রের মালিক এ লোকটাই ছিল ? নৌকটার মালিকও এই ছিল। গাছের গায়ে খোদাই করা অক্ষর ও সংখ্যাগুলো বলে দিচ্ছে ত্রিশ বছর আগেও অভাগাটা জীবিত ছিল।

কে? কে সে? কি তার নাম ? বাড়িই বা কোন্ মুল্লুকে ছিল?

অভিযাত্রী চারজন এবার গুহার ভেতরে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে এক এক করে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর জানতে পেরে গেল।

সিন্দুকের ভেতরে সোনার কাঁটাযুক্ত রূপোর একটা ঘড়ি পাওয়া গেল। তার ঢাকনার ভেতরের দিকে এক ফরাসি ঘড়ি বিক্রেতার নাম খোদাই করা। এবার হাতড়ে হাতড়ে একটা ছেঁড়া ডাইরি বের করল। তার ছেঁড়াপাতার গায়ে স্পষ্টক্ষরে নাম লেখা, 'ফ্রাঁসোয়া বাঁদোয়া'।

লোকটা তবে ফরাসি। জাহাজডুবির ফলে এ দ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। আর মাথা গোঁজার জায়গা হিসাবে বেছে নিয়েছিল এ-গুহাটাকে।

ফ্রাঁসোয়ার আঁকা খুবই বাজে ধরনের একটা মানচিত্র সিন্দুক থেকে বের করা হল। পাতার কষ দিয়ে গাছের ছালের গায়ে কোনোরকমে আঁকা কষে কষে মানচিত্রটা তৈরি করা হয়েছে। সেটা থেকে জানা গেল প্রায় পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ এটি একটি দ্বীপ। আর প্রস্থ পঁচিশ মাইলের কাছাকাছি। দ্বীপটার কেন্দ্রস্থলে বিশালায়তন, প্রায় পনের মাইল দীর্ঘ একটা হ্রদ রয়েছে। আর, প্রস্থ সাত-আট মাইল হবে। এর আয়তন এমন বিশাল বলেই একে সমুদ্র বলে ভ্রম হয়।

মানচিত্র দেখে ধারণা করা সম্ভব হল না, দ্বীপটা কোথায় অবস্থিত। তবে-তবে দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত নয় তো? কোথায়? কোন্ মহাদেশে এটা সম্ভত জলের ওপরে মাথা-উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ?

একটা ছুরি। ব্যস, সিন্দুকে অস্ত্র বলতে আর কিছুরই হদিস মিলল না। বন্দুক পিস্তলের তো প্রশ্নই ওঠে না।

বিচিত্র দুটো বস্তু ব্যবহার করে বন্দুকের কাজ চমৎকার চালিয়ে নিল। একটা লম্বা রশির দু-প্রান্তে দুটো লোহার গোলক বাঁধা। এরকম গোলক নিক্ষেপ করে আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান জঙ্গলি জানোয়ারকে বন্দি করে ফেলে। আর ল্যাসো নামে রশির ফাঁস হচ্ছে দ্বিতীয় বস্তুটা। আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা শিকার ধরতে এটাকেও ব্যবহার করে থাকে।

www.pathagar.com

গাছের তলায় মাটি খুঁড়ে ফাঁসোয়াকে গোর দিয়ে তারা কেনোতে ফিরে এল।

ব্রান্ট পরামর্শ দিল শীতের প্রকোপ শুরু হওয়ার আগেই কেনো ছেড়ে কোনো গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে।

এখন সমস্যা হচ্ছে কেনোর পর্বত প্রমাণ লটবহর বয়ে গুহায় নিয়ে যাওয়া। এ তো আর দু-চারটে জিনিস নয় যে, সবাই মিলে হাতাহাতি বয়ে নিয়ে যাবে।

বহু আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হল কেনো থেকে তক্তা খুলে বড়সড় একটা ভেলা তৈরি করে নেমে গেলে মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। ব্যস, যে কথা সেই কাজ। ছেলের দল কেনোটা থেকে তক্তা খোলার জন্য প্রাণান্ত-প্রয়াস চালাতে লাগল।

এপ্রিল মাসের শেষের দিকে তুমুল ঝড় উঠল। যাকে বলে প্রলয়ঙ্কর ঝড়। বরাত ভালো যে, কেনো ভাঙার সুবিধার জন্য ছেলের দল আগে ভাগেই তাঁবু খাটিয়ে ডাঙায় উঠে গিয়েছিল। সারাদিন কেনোটা ভেঙে ভেলা তৈরির কাজে মেতে থাকত, আর রাত্রি কাটাত তাঁবুর তলায়।

সকাল হল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে ছেলের দল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাওয়ার জোগাড়। দেখল, ঝড়ের তাণ্ডবে কেনোটা টুকরো টুকরো হয়ে বালির ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। ঝড়ের সময় সবাই জাহাজে থাকলে কি কেলেঙ্কারীই না ঘটে যেত।

কয়েক দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তারা ত্রিশ ফুট লম্বা ও পনের ফুট চওড়া চমৎকার একটা ভেলা তৈরি করে ফেলল। এবার লটবহর যা ছিল সব তাতে চাপিয়ে অনায়াসে গুহায় নিয়ে এল। একজন ফরাসি নাবিক এখানে জান খুইয়েছেন বলে গুহাটার নামকরণ করা হল 'ফরাসি-গুহা'।

দূর-সমুদ্র দিয়ে জাহাজ যাওয়ার সময় যাতে দেখতে পায় সে উদ্দেশ্যে সমুদ্র-সৈকতে কেনোর মাস্তুল পুঁতে তার মাথায় পতাকাটা বেঁধে দেওয়া হল।

ছেলেরা দ্বীপের মধ্যে গুহা-জীবন মহানন্দে কাটাতে লাগল। একঘেয়েমি থেকে এমন খোলামেলা বন্য পরিবেশ তো খারাপ লাগার কথাও নয়। এ যে রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপার।

একদিন দ্বীপে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে ছেলেরা অত্যাশ্চর্য একটা দৃশ্যের মুখোমুখি হল। এক জন্তু ফাঁদে আটকা পড়েছিল কোনো এক সময়ে। ফাঁদে আটকাপড়া অবস্থায় খাদ্যের অভাবে সে প্রাণ দিয়েছে। তার দাঁতগুলোর দিকে নজর পড়লেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কঙ্কালটা এখনো ফাঁদে আটকা পড়ে রয়েছে।

কঙ্কালটাকে ফাঁদ থেকে খুলে দূরে ফেলে দিয়ে ছেলের দল আবার শিকারের প্রত্যাশায় ফাঁদ পেতে রাখল। পরদিন একটা পাখিকে ফাঁদে আটকা পড়ে থাকতে দেখা গেল। এমু পাখি। সেটা অনেকটা উটপাখির মতো দেখতে। অতিকায় মুরগির মতো মুখ। আর গায়ে অসীম শক্তি ধরে।

উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে সার্ভিস বলে উঠল, 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন' নামক বই পড়ে উটপাখির বিষয়ে জানতে পেরেছি। খুবই তাড়াতাড়ি এরা পোষ মানে। আমি একে পুষব। পোষ মানিয়ে এর পিঠে চেপে আমিও ঘুরে ঘুরে বেড়াব।'

উইলকক্স এক লাফে গর্তটার ভেতর নেমে গা থেকে কোট খুলে এমু পাখিটার মুখে চাপা দেওয়া মাত্র সে থমকে গেল। এবার গলা আর পায়ে দড়ির ফাঁস পরিয়ে টানটানি করে গুহায় তাকে এনে হাজির করা হল।

www.pathagar.com

কয়েকদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল গুহাটায় এতগুলো ছেলের ঠিকমত স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। তাই ছুরি দিয়ে চূর্ণাপাথরের দেওয়াল কেটে জায়গা বাড়ানোর চেষ্টা পুরোদমে চলতে লাগল।

কদিন যেতে না যেতেই দেখা দিল নতুনতর সমস্যা। ভূতের উৎপাত শুরু হল। গুহাটার ফুট চারেক দৈর্ঘ্য বাড়ানো গেল। কাজ সমান তালেই চলেছে। ব্রান্ট গাঁইতি চালাতে চালাতে আচমকা থমকে গেল। গায়ে রক্ত হিম হয়ে আসার জোগাড় বিচিত্র এক কান্নার স্বর শুনে গায়ের রোমগুলো কাঁটা দিয়ে উঠল। অবিশ্বাস্য কাণ্ড! দেওয়ালের ভেতরে কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। গুহায় ঢুকে উৎকর্ণ হয়ে লক্ষ্য করল তারা। হ্যাঁ, দেওয়ালের ভেতরে কে যেন কাঁদছে। ফ্যাকাসে-বিবর্ণমুখে এক ছুটে তারা বাইরে বেরিয়ে এল।

দলের পনেরোটা ছেলের সবাই সে-কান্নার স্বর স্পষ্ট শুনতে পেল। সবার বুকের ভেতরে অনবরত কে যেন হাতুড়ি পিটতে লাগল। সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নির্ঘুম রাত্রি কাটাল। অত্যাশ্চর্য–একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার যেন। রাত্রি বাড়তে ভূতগুলোও যেন ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। সকাল হতে না হতেই আবার কঁকিয়ে কঁকিয়ে কান্না জুড়ে দিল। এ কী রহস্যজনক, রোমহর্ষক ব্যাপার রে বাবা !

গর্ডনের পরামর্শে সবাই ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে পাহাড়টার গায়ে কোন ফাটলটাটল আছে কিনা খুঁজে দেখে এল। কোনরকম ফাঁক-ফোঁকড় বা ঝর্ণাও নজরে এল না।

বিকেলের দিকে ফিরে এসে দেখা গেল, ফ্যান বে-পাত্তা। রাত্রি দুটো। দেওয়ালের ভেতর থেকে আবার কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ব্যস, পরমুহূর্তেই কান্না বন্ধ। একেবারে নিঃঝুম-নিস্তব্ধ। দলের সবার গায়ের লোম, মাথার চুল কাড়া হয়ে গেল গভীর রাত্রের সে কান্নার স্বর শুনে।

ভোর হতেই ব্রান্ট শাবল দিয়ে গুহাটা বাড়ানোর কাজে লেগে গেল। আচমকা বিরাট একটা পাথরের টুকরো দুম করে দেওয়াল থেকে খসে পড়র।

ব্রান্ট এক লাফে দুকদম সরে গেল। শাবলটা হাত থেকে খসে ছিদ্রপথে গলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে দেওয়ালের খোঁদল থেকে একটা জানোয়ার বেরিয়ে এল। বাচ্চারা সমস্বরে গলা ছেড়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিল।

এদিকে জানোয়ারটা এক লাফে খোঁদল থেকে বেরিয়ে এসে জলের পাত্র থেকে চোঁ চোঁ করে জল খেতে লেগে গেল।

জানোয়ারটাকে এতক্ষণে চেনা গেল। আরে এ যে তাদেরই কুকুর ফ্যান। ব্যাপারটা সবার মধ্যে বিস্ময়ের সঞ্চার করল।

হায়! এ কী গভীর রহস্যরে বাবা! ফ্যান দেওয়াল ভেদ করে কি করে ভেতরে ঢুকে গেল। তবে কি এখানে কোনো গোপন সুড়ঙ্গ রয়েছে ? নাইলে—

ব্রান্ট লণ্ঠন জ্বেলে খোদলটার ভেতরে ঢুকল। অন্যসব ছেলেরা দুরু দুরু বুকে তাকে অনুসরণ করল। উইলকক্স আচমকা যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা মৃত দেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সে সচকিত হয়ে পা-টা এক ঝটকায় সরিয়ে নিল। লণ্ঠনটা কাছে নিয়ে দেখা গেল একটা মরা শেয়াল। টুটিটা ছিঁড়ে ফেড়ে একাকার করে দেওয়া হয়েছে। শক্ত কাঠ। বরফের মতো ঠাণ্ডা তার গা। দেওয়ালের ভেতর থেকে ভেসে আসা কঁকিয়ে কঁকিয়ে কান্নার সে রহস্যটা এতক্ষণে ভেদ করা গেল।

www.pathagar.com

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে শেষমেশ নিশ্চিত হওয়া গে, সুড়ঙ্গটা থেকে যাতায়াতের কোন না কোন পথ অবশ্যই রয়েছে। সেদিক দিয়েই বাতাস আসছে। সেজন্যই লণ্ঠনটা সহজেই জ্বলতে পারছে। আর যদি বিষাক্ত গ্যাস থাকত তবে সেটা অবশ্যই নিভে যেত। বাইরের দমকা বাতাস সুড়ঙ্গপথে ঢুকে বাঁশির মতো শব্দ সৃষ্টি করত। আর সেটাই দেয়ালের বাইরে থেকে ভূতের কান্না বলে ভ্রম হত। এ সুড়ঙ্গটা দিয়ে ফ্যান এসে রাত দুটো নাগাদ এখানে ঢুকে শেয়ালটার টুটি ছিড়ে হত্যা করেছে। ব্যস, আর বাইরে আসতে পারে নি। হয়ত-বা বেরোবার রাস্তাটা পাথরচাপা পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। তেষ্টায় তার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তাই তো মুক্তি পাওয়ার পর জলের গামলায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল।

খোঁজাখুঁজি করে দেখা গেল একটা লতাপাতার ঝোপের আড়ালে সুড়ঙ্গের মুখটা। ঠিকই, পাথরচাপা পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে।

সার্ভিস উটপাখিটার পিঠে চড়ে শখ মেটাবার চেষ্টা করতে গিয়েই ঝামেলা বাঁধাল। সেটা উল্কার বেগে চোঁ চাঁ দৌড় জুড়ল। দুম করে ছিটকে পড়ল সার্ভিস। হাত পা ভাঙেনি বটে। চোট যা পেয়েছে তাতেই দীর্ঘদিন তাকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে হয়েছে।

নভেম্বর মাস এসে গেল। রবারের একটা ফোল্ডিং নৌকা নিয়ে পাঁচজন দ্বীপটাকে ঘুরে ঘুরে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়ল। ছোরা, বন্দুক ছাড়াও রেড ইন্ডিয়ানদের অদ্ভুত অস্ত্র ল্যাসো আর বোলা তারা সঙ্গে নিয়ে নিল।

খুব করে পাহাড় জঙ্গলে ঘুরে বেরিয়ে দুটো পাহাড়ী ছাগলছানা আর একটা গুয়োনাকো নামে ঘোড়ার মতো শান্তশিষ্ট একটা জানোয়ার তারা বন্দি করে নিয়ে এল।

দিনের পর দিন শিকার করতে গিয়ে বন্দুক ব্যবহার করা হচ্ছে। বারুদ ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তারা এবার কয়েকটা তীর-ধনুক বানিয়ে ফেল।

শীতকাল দুয়ারে হানা দিল বলে। প্রদীপ জ্বেলে গুহা গরম রাখতে হবে। প্রচুর তেল দরকার। ব্যাপারটা প্রথম ডোনাগানেরর মাথায় এল। কাঠ দিয়ে চমৎকার একটা গাড়ি তৈরি করে ফেলল। চারটে চাকাও লাগিয়ে দেওয়া হল তাতে। গুয়োনাকোর দ্বারা টানা সেই গাড়িটা দিব্যি সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল। উপসাগরের তীরে এক দল বিশালায়তন সিল মাছ রোদে পিঠ দিয়ে বালির ওপর পড়েছিল। বন্দুক আর পিস্তলের গুলিতে ত্রিশটা সিল মাছ ঘায়েল হল। বাকিরা ঝপাঝপ জলে পড়ে হাফিস হয়ে গেল।

সিল মাছগুলো থেকে বারো পিপে তেল বের করা সম্ভব হল। শীতের তোয়াক্কা আর কে করে, লড়াই করার মতো অস্ত্র তো প্রচুরই মজুদ।

ডিসেম্বর মাস এলে। ক্রমে একদিন-দুদিন করে মাস প্রায় শেষ হল। বড়দিন এল। দশ দশটা মাস ছেলেরা দ্বীপে কাটিয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। এতদিনের মধ্যে একটা জাহাজের চিহ্নও নজরে পড়ল না। ভবিষ্যতেও কোনোদিন আসবে কিনা তাই বা কে জানে ?

শীত জাঁকিয়ে আসার আগে ব্রান্ট গর্ডনের কাছে বলল, 'ফ্যাসোয়ার ম্যাপে দেখা যায় পূর্বদিক জুড়ে সমুদ্র রয়েছে। আমি চাই নিজের চোখে ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করতে। তোমার মত আছে তো?'

ব্রান্টের প্রস্তাবে গর্ডন সোল্লাসে মত দিয়ে দিল। ব্যস, আর দেরি নয়। ফেব্রুয়ারির প্রথম হপ্তায় মোকো ও তার ভাই জ্যাককে নিয়ে নৌকা চেপে কিছুটা এগিয়েই হ্রদে

www.pathagar.com

হাজির হল। তারপর পূর্বদিকে এগিয়ে আর একটা নদীতে গিয়ে পড়ল। এবার হাজির হল উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রে। সমুদ্রের গা-ঘেঁষে সারিবদ্ধ বেশ কয়েকটা গুহা তাদের নজরে পড়ল। পাহাড় আর চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা ছোট-বড় পাথরের চাঁই ছাড়া এদিকে আর কিছু দেখতে পেল না।

চারদিকে চোখের মণি দুটোকে বুলোতে গিয়ে এক সময় জ্যাকের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। আচমকা চিল্লিয়ে উঠল, 'ধোঁয়া! ধোঁয়া।'

ব্রান্ট সচকিত হয়ে দূরবীণটাকে চোখের সমনে ধরে রেখেই বলল, 'আকাশ আর সমুদ্র যেখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে সেখানে ধোঁয়ার মতোই কিছু একটা দেখা যাচ্ছে বটে। তবে ধোঁয়া অবশ্যই নয়।

রাতের আহার কোনোরকমে সারা হল। কিন্তু দুভাইকে ধারে কাছে দেখা গেল না। মোকোর মনটা মোঁচড় মেরে উঠল। হঠাৎ কার যেন কান্নার স্বর শোনা গেল। কে যেন কেঁদে আকুল হচ্ছে। সে সন্তর্পণে এগিয়ে একটা গাছের কাছাকাছি যেতেই থমকে গেল। দেখল গাছটার তলায় বসে ব্রান্ট বিষণ্ন মুখে বসে। আর জ্যাক তার পায়ের কাছে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে।

সামান্য কথোপকথনের মাধ্যমে কান্নার রহস্যটা উদ্ধার করা গেল। মেকো আবার তেমনি সন্তর্পণে নিজের জায়গায় ফিরে এল।

ওরা দুজনে ফিরে এলে মোকো এবার ব্রান্টের কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'তোমাদের কথোপকথন আমি শুনতে পেয়েছি। জ্যাককে মার্জনা করে দাও ব্রান্ট।

ব্রান্ট সচকিত হয়ে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আমি যদি মার্জনা করিই তবু অন্যরা তো মার্জনা করবে না মোকো।'

'কাউকে না জানালেই তো হল। আমি কারো কাছে মুখ খুলব না, কথা দিচ্ছি।'

দ্বীপবাসী ছেলেদের মধ্যে এবার দলাদলির সূত্রপাত হল। একজনকে নেতা না বানালে তো আর চলছে না। ভোটাভুটি হল। ডোনাগান মাত্র তিনজনের সমর্থন পেল। সে তলে তলে ফুঁসতে লাগল। ব্যস, এবার থেকে সে তিনজনকে নিয়ে দল থেকে সটকে পড়ার মতলব আটতে লাগল। কারণ-অকারণে ব্রান্টের সঙ্গে তার খিটিরমিটির চলতেই থাকল।

এবার দ্বীপে ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে গেল। শীত রীতিমতো জাঁকিয়ে পড়েছে। পুরো দ্বীপটা বরফে ডেকে গেল। যেদিকেই তাকানো যায় কেবল বরফ আর বরফ। কেনোতে স্টেটিংয়ের জিনিসপত্র ছিল। এ খেলায় জ্যাকই সবচেয়ে দক্ষ। ডোনাগান আর ক্রসও কোনো অংশে কমতি নয়। স্টেটিং খেলা শুরু হল। ছুটোছুটি করতে করতে ডোনাগান, ক্রস আর জ্যাক জমাটবাঁধা কুয়াশার অন্ধকারে বে-পাত্তা হয়ে গেল। বুনো হাঁস কোঁজ করার জন্য ডোনাগান কিছুটা এগিয়ে ক্রসকে বিপরীত দিকে টানাটানি করে নিয়ে অন্ধকারে হাফিস হয়ে গেল। জাগুয়ার কবলে পড়ে প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও সে দমল না।

কিছুক্ষণ পর জ্যাক একা ফিরে এল। ডোনাগান আর ক্রোসের হদিস নেই। তাদের কাউকে না দেখে জ্যাক বাঁশি বাজাতে বাজাতে আবার তাদের খোঁজে ছুটতে লাগল।

www.pathagar.com

ব্যাপারটা সবার মধ্যেই আতঙ্কের সঞ্চার করল। কামান দাগা হল। নিষ্ফল প্রয়াস। কেউ-ই ফিরল না। মিনিট দশেক বাদে আবার কামান দাগা হল। বিপরীত দিক থেকে বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ বাতাসে ভেসে এল। একটু বাদই ক্রস আর ডোনাগান ফিরে এল। জ্যাক? জ্যাকের পাত্তা নেই। ছোট ভাই জ্যাককে খুঁজতে যাওয়ার জন্য ব্রান্ট ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গর্ডন তার পথ রুখে দাঁড়াল। সে আগুন জ্বেলে দিল তাদের উপস্থিতি জানানোর জন্য।

একটু বাদেই দেখা গেল, জ্যাক উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে আসছে আগুনের নিশানাটা লক্ষ্য করে। আর তার ঠিক পিছনে জানেয়ারের মতো কি যেন দুটো প্রাণী তেড়ে আসছে।

জাগুয়ার? না ভালুক। বিশাল দেহী একটা ভালুক তাকে তাড়া করেছে। ডোনাগান উল্কার-বেগে ধেয়ে গিয়ে পিস্তলের দুটো গুলিতেই হিংস্র জানোয়ার দুটোকে ঘায়েল করে দিল।

ছোট ভাইয়ের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ব্রান্ট তাকে বার বার ধন্যবাদ জানাল।

ব্যস, এবারই তার চারজন দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ডোনাগনের বহুদিনের গোপন পরিকল্পনা এটা। আজ বাস্তবে পরিণত করল। সে ইতিমধ্যে চুপিচুপি ফ্রাঁসোয়ার মানচিত্রটাকে নকল করে কোটের ভেতরে পকেটে সযত্নে রেখে দিয়েছিল।

৯ অক্টোবর ভালুকের তাড়া খাওয়ার পরই তারা চারজন দল ছেড়ে দিল। পরিকল্পনা আগেই করে রাখা হয়েছিল। দ্বীপটার পূর্ব প্রান্তে ডোনাগান ওয়েব, ক্রস ও ইউলবার বসাবাস করবে। নদীর পাড়ের জঙ্গলে শিকারের অভাব হবে না। অসময়ে বনের ফলমূল দিয়েও প্রয়োজনে দু-চারদিন ক্ষিদে মেটানো যাবে। সেদিকেই আমেরিকা। এ পথে জাহাজ যাওয়াও বিচিত্র নয়। আর জাহাজ দেখলেই কায়দা কৌশলের মাধ্যমে তাদের উপস্থিতির কথা জানান দিতে পারবে।

ফরাসি গুহায় আশ্রয় নেবার পর ছেলেরা দ্বীপের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামকরণ করেছিল। পূর্বদিকের নদী ইস্ট রিভার, পশ্চিম দিকের নদী জিল্যান্ড রিভার আর হ্রদটার নামকরণ করেছিল ফ্যামিলি হ্রদ। আর সম্পূর্ণ দ্বীপটার নামকরণ করেছিল 'চারম্যান আইল্যান্ড'। কারণ, তারা যে চারম্যান বিদ্যালয়েই অধ্যায়ন করত।

বিকালের দিকে তারা সমুদ্রের কিনারা ঘেঁষে এগোবার সময় ভয়ঙ্কর ঝড় উঠল। সে সঙ্গে মেঘের কড়কড়ানি আর বৃষ্টি তো রয়েছেই।

বিদ্যুৎ ঝলসে উঠতে তার আলোয় অতিকায় একটা জানোয়ারকে জল থেকে তীরের দিকে আসতে দেখা গেল। প্রথমে তারা ভেবেছিল সমুদ্রের কোনো দানবটানব হবে হয়তো। শেষমেশ তাদের ভুল ভাঙল। দৈত্য-দানব নয়, বিশালায়তন একটা নৌকো। প্রবল ভড় আর জলোচ্ছ্বাসে ডাঙায় উঠে এসেছে। একটু বাদেই ফের বিদ্যুৎ চমকালে দেখল, নৌকোটার একধারে দুটো মড়া মানুষ পড়ে রয়েছে। তারা ব্যাপারটা নিয়ে কিছু ভাবার অবসর পেল না। বিকট আওয়াজে বাজ পড়ল। আওয়াজ শুনে সবার কলিজার ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেল। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে উর্দ্ধশ্বাশে ছুটতে লাগল।

সকালের দিকে প্রলয়ঙ্কর তুফানের তান্ডব বন্ধ হল। প্রকৃতি শান্ত হল। ছেলেরা দল লম্বা লম্বা পায়ে নৌকোটার কাছে ফিরে এর। ভাবল, লাশ দুটোকে কবর দেবে।

নৌকোটার কাছে এসেই তারা থমকে গেল। হায়! কোথায় মড়া! মড়া দুটো যে হাফিস হয়ে গেছে!

www.pathagar.com

নৌকার ভেতরে একটা পেতলের ফলকের গায়ের লেখা পড়ে ডোনাগার আৎকে উঠল। আপন মনে বলল এটা আমেরিকান নৌকো। সানফ্রান্সিসকো থেকে জলে ভেসেছিল। হতভাগা দুটো কি জীবিত, নাকি সমুদ্রের জলে ভেসে গেছে ?

ডোনাগান দলত্যাগ করে যাওয়ায় ব্রান্ট আর গর্ডন উভয়েই মুষড়ে পড়েছে। ব্রান্ট নিজেকে কোনোরকমে সামলে রেখে গর্ডনকে প্রবোধ দিল, দুদিন বাদেই ডোনাগান ফিরে আসতে বাধ্য হবে।

এদিকে ব্রান্ট সমুদ্রগামী জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বালিতে মাস্তুল গেঁথে তার মাথায় পতাকা বেঁধে দিল। তারপর আরো আকর্ষণীয় ব্যবস্থা করল পতাকার পাশাপাশি একটা বেলুন বেঁধে দিয়ে। সবশেষে একই উদ্দেশ্যে একটা ঘুড়িও বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থা করল। কেনোতে ক্যানভাস ছিল। জঙ্গল থেকে পাকা বেত এনে বিশালায়তন একটা ঘুড়ি বানিয়ে মাস্তুলটার ডগায় বাঁধতেই শুধু বাকি।

কুকুর ফ্যান হঠাৎ তীব্র স্বরে ডাকডাকি শুরু করে দিল। তার কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে ছেলেরা পড়ি কিমরি করে ছুটে গিয়ে দেখল, একটা গাছের তলায় এক মহিলা বালির ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। তার মাথার কাছে বসে ফ্যান অনবরত চিল্লাচ্ছে। সংজ্ঞাহীন মহিলা। তবে দেহে প্রাণের-অস্তিত্ব রয়েছে বটে।

সবাই মিলে অকৃত্রিম সেবাযত্নের মাধ্যমে মহিলাটির সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনল। আমেরিকান, নাম তাঁর কেট। জাহাজে করে সানফ্রান্সিসকো থেকে চিলি যাচ্ছিলেন। হঠাৎ জাহাজেরই আট জনজলদস্যু যাত্রী কাপ্তেনকে খুন করে জাহাজটাকে কজা করে ফেলল। তাদের দলের পাণ্ডা দুর্ধর্ষ ওয়ালস্টোন। কেট ছাড়া বাকি সবাইকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করল। আর জাহাজ চালাবার জন্য ইভান্সকেও বাঁচিয়ে রাখল। নইলে জাহাজ যে অচল হয়ে যাবে। আফ্রিকার জাহাজ নিয়ে গিয়ে চড়া দামে বিক্রি করে দু-হাতে পয়সা রোজগার করাই ছিল দস্যুগুলোর উদ্দেশ্য।

মাঝপথে যেতে না যেতেই প্রলয়ঙ্কর ঝড় উঠল। আচমকা জাহাজে আগুন লেগে গেল। উপায়ন্তর না দেখে জলদস্যুরা নৌকা নামিয়ে কেটকে নিয়ে তাতে চেপে বসল।

ঢেউ আর ঢেউয়ের তাণ্ডব সহ্য করতে না পেরে চোরা-পাথরে ধাক্কা লেগে নৌকোর আটজনের পাঁচজন জলে ছিটকে পড়ল। একজনকে হাঙরে টেনে নিয়ে গিয়ে ছিঁড়ে ফেঁড়ে খেয়ে ফেলল। এখন বাকি রইল দুজন জলদস্যু। তারা আছাড় খেয়ে ডাঙায় পড়ল। উল্টে-নৌকার আড়ালে পড়ল কেট। ব্যস, সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে জানতে পারল, সাতজন জলদস্যু দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। তারা ইভান্সকে বে-কায়দায় পেয়ে বন্দি করেছে। তাদের সঙ্গে বন্দুক, পিস্তল আর গোলাবরুদ যা কিছু ছিল, কোনো কিছুই নষ্ট হতে দেয় নি। সুযোগ বুঝে কেট সরে পড়েছে।

কেটের মুখে ভয়ঙ্কর খবরটা শুনেই ব্রান্ট মোকোকে নিয়ে ছুটল ডোনাগানদের তল্লাসে।

হ্রদের জল দিয়ে নৌকো ছুটল। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রের অন্ধকার নামতেই তারা ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে আগুন-জ্বলতে দেখল।

ব্রান্ট নৌকা থেকে সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে দেখল, আগুনের ধারে কম্বল জড়িয়ে কে যেন শুয়ে। অতিকায় একটা জাগুয়ার লকলকে জিব বের করে সেদিকেই হেঁটে যাচ্ছে।

ব্রান্ট উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে কুড় ল দিয়ে পেছন থেকে হিংস্র জানোয়ারটার মাথায় সজোরে আঘাত হানল।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে অন্ধকার বন থেকে বেরিয়ে এসেছে ওয়েব, উইলকক্স আর ক্রস। কম্বলে মোড়া লোকটা এবার লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে হচ্ছে ডোনাগান।

ডোনাগান এবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে অন্যান্যদের নিয়ে ব্রান্টের সঙ্গে ফরাসি গুহায় ফিরে এল।

ব্রান্ট বুদ্ধি করে মাস্তুলের মাথা থেকে বেলুনটাকে নামিয়ে আনল। বলা যায় না, বেলুনের নিশানা অনুযায়ী জলদস্যুরা এসে তাদের ওপর হামলা চালাতে পারে।

ব্রান্ট এবার অদ্ভুত একটা মতলব আটল। অতিকায় ঘুড়িটার সঙ্গে একটা ঝুড়ি বেঁধে শূন্যে, অনেক উঁচুতে উঠে জলদস্যুদের দেখা যায় কিনা দেখবে। সে শুনেছে, কোনো ইংরেজ যুবতী নাকি ঝুড়িতে বসে, ঘুড়ির সাহায্যে আকাশে উড়েছিল। তাই যদি হয় তবে সেই বা পারবে না কেন?

ব্রান্টের ব্যাপার-স্যাপার দেখে তার ছোট ভাই জ্যাক হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, তারই জন্য—একমাত্র তারই জন্য, এতগুলো ছেলেকে দুবছর ধরে এ দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে। সে রাত্রে ঝড়ের সময় মজা দেখার জন্য কৌতূহল বশত সেই জাহাজের কাছি কেটে দিয়েছিল। তারপরই অঘটনটা ঘটেছিল। তখন থেকেই এতগুলো ছেলের জীবনে নেমে এল চরমতম দুর্ভোগ। ব্যাপারটা এতদিন সে সতর্কতার সঙ্গে গোপন রেখেছিল। আজ তার দাদাকে এমন একটা ভয়ঙ্কর কাজ করতে দেখে সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না।

যা হাবার তা তো হয়েই গেছে। এটা নিয়ে এখন আর অন্তর্জ্বালায় দগ্ধে মরা নিছকই পাগলামি—ডোনাগান জ্যাককে প্রবোধ দিল।

ব্রান্ট ঝুড়িতে বসে ঘুড়ির টানে অনেক উঁচুতে উঠে গেল। এক সময় কি যেন দেখে সে তীব্র স্বরে চিল্লিয়ে উঠল, 'আছে! আছে! জলদস্যুরা দ্বীপেই আছে!'

ব্রান্টসহ ঘুড়িটাকে নিচে নামিয়ে আনতে গিয়েই ঘটে গেল ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা। তারটা ছিঁড়ে গিয়ে ঘুড়ি ব্রান্টকে নিয়ে উড়ে গেল। এক সময় সেটা গিয়ে পড়ল হ্রদের জলে। অনেক কষ্টে সাঁতরে সে পাড়ে উঠতে পারল।

এক সকালে ফরাসি-গুহার কাছাকাছি এক জায়গায় একটা তামাক খাওয়ার পাইপ দেখতে পেয়ে দ্বীপবাসী ছেলেরা চমকে উঠল। জলদস্যুরা তাবে কাছাকাছিই ঘুর ঘুর করছে।

২৭ নভেম্বর। প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়ে গেল। ছেলেরা গুহার দরজা বন্ধ করে ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে রইল। হঠাৎ বাইরে ঘনঘন বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেল। ভয়ে তাদের আত্মারাম-খাঁচাছাড়া হয়ে যাওয়ার জোগার হল।

জলদস্যুরা গুহার ওপর চড়াও হয়েছে। পরিস্থিতি সঙ্গীন অনুমান করে ব্রান্ট দরজার আড়ালে বন্দুক-হাতে তৈরি দাঁড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ কে যেন দমাদম দরজায় ধাক্কা মেরে আর্তনাদ করতে লাগল, 'বাঁচাও! বাঁচাও? ভেতরে কে আছ—বাঁচাও!'

কেট উৎকর্ণ হয়ে আর্তস্বরটা শুনেই ছেলেদের দরজা খুলে দিতে বলল।

দরজা খুলতেই বিধ্বস্ত এক ফরাসি ভেতরে ঢুকে গেল। ফরাসি নাবিক। কেট যে জাহাজে ছিল তারই ফার্স্ট মেট ছিল লোকটা। নাম তার ইভান্স।

www.pathagar.com

ইভান্স একটু দম নিয়ে তার চমকপ্রদ প্ররিস্থিতির কথা বলল। দ্বীপের পূর্বদিকের একটা গুহায় জলদস্যুরা তাকে কয়েদ করে রেখেছিল।

জলদস্যুদের ভয়ে ছেলেরা কুঁকড়ে গেল। ধরা পড়ে জান খোয়াবার আশঙ্কায় তারা জঙ্গলে বেরোনো পর্যন্ত বন্ধ করে দিল। বন্দুক ছোড়াও বন্ধ। আওয়াজ অনুসরণ করে ফরাসি-গুহায় তাদের হানা দেবের সম্ভাবনা তো রয়েছেই। এত সতর্কতা সত্ত্বেও হ্রদের ধারের একটা গাছের ডালে বিচিত্র একটা ঘুড়িকে লটকে থাকতে দেখে তারা আশান্বিত হল।

ওয়ালস্টোন একটা সাক্ষাৎ নরপিশাচ। সে ছেলেদের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে ফরাসি-গুহার দরজার ফাঁক দিয়ে মৃদু আলোর রেখা দেখে অদূরবর্তী জঙ্গলে বসে তাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছিল।

শয়তান ওয়ালস্টোন পনেরোটা কচি ছেলেকে খুন করে তাদের যন্ত্রপাতিও অন্যান্য জিনিসপত্র হাতানোর চেষ্টায় রয়েছে।

গর্ডন এবার নৌকাটা মেরামত করার কথা ভাবল। ইভান্স ছেলেদের আশান্বিত করল। পূর্বদিকে মাইল-ত্রিশেক পাড়ি দিতে পারলেই দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছে যাওয়া যাবে। আর এও বলল, তারা যেখানে আছে সেটা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অগণিত দ্বীপের মধ্যে একটা। এর নাম হ্যানোভার আইল্যান্ড। সে এও বলল, সে আর কেট যে ছেলেদের আশ্রয়ে রয়েছে তা জলদস্যুরা জানে না।

ছেলেরা কিন্তু ইভান্সকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না। তাই কেট আর তাকে দক্ষিণ দিকের একটা গুহায় থাকতে দিল। আর সামনের ফরাসি-গুহায় বাকি দুজনের থাকার ব্যবস্থা করা হল।

ছেলেরা অনুমান করেছিল, জলদস্যুরা ধারে-কাছের জঙ্গলেই লুকিয়ে রয়েছে। সুযোগ বুঝে বন্দুক ছুঁড়তে আরম্ভ করবে। কার্যত করলেও তাই।

বন্দুকের আওয়াজ শুনে ছেলেরা আড়ষ্ট হয়ে গুহার ভেতর পড়ে রইল। ভোরে গুটিগুটি বাইরে বেরিয়ে ঝোপের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখল, এক জায়গায় একটা কাঠের টুকরো ধিক্‌ধিক্ করে জ্বলছে। তারা বুঝল, জলদস্যুরা এখানে রাত্রি কাটিয়েছে। ছেলেদের কথাবার্তা শুনে চম্পট দিয়েছে।

আচমকা বন্দুক গর্জে উঠল। একটা গুলি তো ব্রান্টের একেবারে কানে ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। বন্দুকের আওয়াজ লক্ষ্য করে ডোনাগান উন্মাদের মতো ছুটতে ছুটতে অনবরত বন্দুক ছুঁড়তে লাগল। তার গুলির আঘাতে একজন জলদস্যু প্রাণ খোয়াল।

ব্রান্ট প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে পিছন দিক থেকে আচমকা একটা জলদস্যুকে দুহাতে অক্টোপাশের মতো আঁকড়ে ধরে ফেলল। এক ঝটকায় ব্রান্টকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের ওপর চেপে বসে জলদস্যুটা তার বুকে ছুরি গেঁথে দিতে উদ্যত হল। ডোনাগান ব্রান্টের সাহায্যার্থে ছুটে গেল। জলদস্যুটা ব্রান্টকে ছেড়ে আচমকা ডোনাগানের পিঠে হাতের ছুরিটা গেঁথে দিল।

ইভান্স দৌড়ে আসতেই জলদস্যুটা ঝোপের ভেতরে ঢুকে মুহূর্তে হাফিস হয়ে গেল।

আহত ডোনাগানকে ধরাধরি করে সবাই ফরাসি গুহার কাছাকাছি আনতেই তারা ভয়ঙ্কর একটা ঘটনার মুখোমুখি হল। এ কী সর্বনেশে কাণ্ড! দুজন গাট্টাগোট্টা জলদস্যুকে নিয়ে ওয়ালস্টোন ফরাসি-গুহার ওপর চড়াও হয়েছে। দেখা গেল, কোস্টার আর জ্যাকের

www.pathagar.com

গর্দান চেপে ধরে দুজন জলদস্যু গুহা থেকে বের করে আনছে। আর অন্য এক জলদস্যু নৌকো নিয়ে তৈরি। তাদের নৌকোয় চাপিয়ে দ্বীপের পূর্বদিকে নিয়ে গিয়ে তারা অত্যাচার চালাবে।

ছেলেরা এবার নৌকোর দিকে ছুটল। এমন সময় তাদের পোষা কুকুর ফ্যান গর্জন করতে করতে জলদস্যুটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গর্দানে সজোরে কামড় বসাল। ওয়ালস্টোন বেগতিক দেখে কোস্টার ও জ্যাককে ছেড়ে দিয়ে ফ্যানকে নিরস্ত করতে ছুটে গেল। ব্রান্ট, ইভান্স ও অন্যান্যরা, কোস্টার ও জ্যাক আহত হতে পারে ভেবে বন্দুক থাকা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য হয়েছিল। এবার তারা বেধড়ক গুলি চালাতে লাগল। ঠিক তখনই ফরাসি-গুহা থেকে জলদস্যু ফোবর্স দৌড়ে বেরিয়ে এল। সে একেবারে অপ্রত্যাশিত এক কাজ করে বস। জলদস্যু হয়েও সে তার সহকর্মী ওয়ালস্টোনকে সাহান্যনা করে বরং তার ওপরই চড়াও হল। তাকে দমাদম কিল-চড়-লাথি মেরে ঘায়েল করে জ্যাককে উদ্ধার করল। জলদস্যু হলেও তার মধ্যে মমত্ববোধ মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠেছে।

ফোবর্সের ব্যাপার-স্যাপার দেখে জলদস্যু ওয়ালস্টোন প্রথমটায় একটু থতমত খেল। এত সহজে সে যে তার সঙ্গে বেইমানী করবে ভাবতেই পারে নি। সে ঝট করে কোমর থেকে ছুরিটা টেনে নিয়ে ফোবর্সের বুকে গেঁথে দিয়ে বেইমানের প্রতিশোধ নিল।

জ্যাক এবার পিস্তু চালিয়ে ওয়ালস্টোনকে ভূপতিত করল।

ইতিমধ্যে জলদস্যুরা নৌকোয় উঠে পড়েছিল। ওয়ালস্টোন ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে কাৎড়ে কাৎড়ে নৌকোয় উঠতেই তারা নৌকো ছেড়ে দিল।

চোখের পরকে কামান গর্জে উঠল। থরথরিয়ে কেঁপে উঠল সমগ্র দ্বীপটা। একের পর এক কামানের গোলা চলল। নৌকাটার কাছাকাছি গোলাগুলি পড়ল। জল লাফিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই নৌকাটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তিন-তিনজন জলদস্যু নির্মমভাবে প্রাণ খোয়াল।

চারম্যন আইল্যান্ড থেকে মোকো এবার একাই কামান দেগে চরমতম শত্রুদের খতম করে দিল।

ভয়ানক আহত ডোনাগান ও ফোবর্সকে ফরাসি গুহায় নিয়ে একে শুশ্রূষা শুরু করা হল। ডোনাগানকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হল। ফোবর্স চিরবিদায় গ্রহণ করল। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে নিজের কৃতকর্মের জন্য সবার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে গেল।

রকের অন্তর্ধানের রহস্যটা দুদিন বাদেই জানা গেল। তার নশ্বর দেহটা জানোয়ারদের ধরার জন্য পাতা ফাঁদে পাওয়া গেল। গুলিবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে গিয়ে সে ফাঁদের মধ্যে পড়ে আটকে গিয়েছিল।

দ্বীপের পূর্বদিক থেকে জলদস্যুদের নিয়ে আসা সুবিশাল নৌকাটার মেরামতির কাজে ইভান্স মেতে গেল।

নৌকাটার মেরামতির কাজ মিটলে ফরাসি-গুহা থেকে যাবতীয় জিনিসপত্র, মায় খোয়াড়ের জন্তু-জানোয়ারদের পর্যন্ত নৌকায় তোলা হল।

এতদিনের বাসস্থল ফরাসি গুহা ও দ্বীপটাকে ছেড়ে যেতে ছেলেদের কলিজা ফেটে যাওয়ার জোগাড় হল।

www.pathagar.com

কয়েকদিনের মধ্যেই সমুদ্রের বুকে বহু দূরে একটা কালো মতো কী যেন দেখা দিল। আরো এগিয়ে আসতে বোঝা গেল সেটা একটা জাহাজ। ছেলের দল পতাকা নেড়ে, কেউ-বা হাত নেড়ে জাহাজের লোকজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। আরো কিছুটা এগিয়ে আসতেই জাহাজের লোকজন নৌকারোহী ছেলেদের দেখে মোটেই অবাক হয় নি। দু-বছর আগে ঘটে যাওয়া অত্যাশ্চর্য সে কাহিনী কাপ্তেন খুব ভালোই জানতেন। খবরের কাগজগুলোর পাতায়ও ছেলেদের নিখোঁজের ব্যাপার নিয়ে কম লেখালেখি হয় নি।

জাহাজটা এগিয়ে এসে সতেরো জন আরোহীকে তুলে নিল। এবার এতগুলো ছেলের নিখোঁজের রহস্যটার কিনারা করা সম্ভব হল।

---

www.pathagar.com

এ ফ্লোটিং সিটি

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মার্চ।

লিভারপুলে গিয়ে গ্রেট ইস্টার্ন জাহাজের একটা বার্থ বুক করে ফেললাম। আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা কয়েকদিনের মধ্যেই পূর্ণ হতে চলেছে। জাহাজে করে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে পৌঁছে যাব নিউইয়র্ক সিটিতে।

সত্যি বলতে কি, গ্রেট ইস্টার্ন যে নিছকই একটা জাহাজমাত্র, তা তো নয়। বরং একে ছোটখাটো একটা পৃথিবী বলা চলে। দূর থেকে দেখলে একে রীতিমতো সমুদ্রের বুকে ভাসমান একটা দ্বীপ বলে মনে হয়।

জাহাজ ছাড়ার পূর্বমুহূর্তের চাঞ্চল্যটুকু চাক্ষুষ করার জন্য ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করে জাহাজ ছাড়ার একদিন আগে অর্থাৎ উনিশে মার্চ, জাহাজে চাপার ব্যবস্থা করলাম। পরদিন, অর্থাৎ বিশে মার্চে জাহাজ ছাড়বে।

মালপত্র নিয়ে জেটিতে পা দিতেই এক যুবকের মুখোমুখি হলাম। ভদ্রলোকের মুখটা খুবই পরিচিত মনে হল। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আমার এক দোস্ত আছে। সেও ঠিক এরকমই দেখতে। এখন সে বোম্বাইয়ে। আর সে তো খুবই আমুদে প্রকৃতির। কিন্তু এ ভদ্রলোকটিকে খুবই মনমরা দেখাচ্ছে। মনে হয়ে শোক জ্বালায় জর্জরিত।

শেষপর্যন্ত ভাসমান শহর গ্রেট ইস্টার্নে পৌঁছতে পারলাম জেটি থেকে তিন মাইল পথ নৌকায় পাড়ি দিয়ে।

মালপত্র লটবহরসহ জাহাজে উঠে গেলাম। জাহাজে ওঠার পর চুপটি করে বসে থাকা সম্ভব হল না। জাহাজে উঠে গিয়ে প্যাডল-বাক্সটাকে দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। বার ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট কেবলমাত্র প্যাডল-বাক্সটারই ওজন নব্বই টন, ভাবা যায়!

জাহাজের ভেতরের অবিশ্বাস্য ব্যাপারস্যাপর দেখে তো আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবার জোগাড় হল। মায় ইঞ্জিন ঘরের লাগোয়া একটা হোটেল পর্যন্ত রয়েছে দেখতে পেলাম।

জানতে পারলাম, বিশে মার্চ গ্রেট ইস্টার্ন-এর নোঙর তোলার কথা থাকলেও ছাড়তে কিছু দেরি হবে। জোর কদমে সারাইয়ের কাজকর্ম চলছে।

গ্রেট ইস্টার্ন মোট বিশবার আটলান্টিক অতিক্রম করেছে। কিন্তু শেষের দিকে ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনার ফলে জাহাজটা বাতিল হয়ে যায়। এটা যাত্রীবাহী জাহাজ হলেও এতে আর পা দিতে কেউ উৎসাহী হত না। শেষ অবধি পরিস্থিতি এমন হল যে, এমন বিশালায়তন একটা জাহাজ নষ্ট হয়ে যাবার জোগার হল।

সে সময়ে আটলান্টিকের তলদেশ দিয়ে টেলিগ্রাফের তার টানার ব্যাপার নিয়ে মহা মুশকিল দেখা দিল। ছোট জাহাজে তার পাততেই ইঞ্জিনিয়াররা রীতিমতো ফাঁপড়ে পড়ে যায়। কিন্তু গ্রেট ইস্টার্নকে অন্য সব কাজ থেকে বাতিল করে দেওয়ার পর দেখা গেল একাজে এটাই অতুলনীয়। একুশ শ' মাইল দীর্ঘ এবং পঁয়তাল্লিশ শ' টন ওজন বিশিষ্ট ধাতব তার গ্রেট ইস্টার্ন ছাড়া আর কোনো জাহাজই বা বইতে সক্ষম?

www.pathagar.com

এমন বিপুল পরিমাণ ওজন বইতে হলে বিশেষ বন্দোবস্ত করতেই হবে। সে জন্যই তো বিশালায়তন তিনটে ফানেলের মধ্য থেকে একটাকে, অতিকায় ছ'টা বয়লারের মধ্য থেকে দুটোকে তুলে নেওয়া হল। সেখানে একটা জলের ট্যাঙ্ককে স্থান দেওয়া হল। জলীয় বাষ্প যাতে তারগুলোকে বরবাদ করে না দেয় সে জন্য সেগুলোকে ট্যাঙ্কের জলে ডুবিয়ে রাখা হল।

তার পাতার কাজ মিটে গেলে বিশালায়তন জাহাজটা বন্দরে পড়ে রইল। ফ্রান্সের একটা প্রতিষ্ঠান এবার এতে উৎসাহী হল। তারা কাড়িকাড়ি অর্থ ব্যয় করে গ্রেট ইস্টার্নকে যাত্রী বহনযোগ্য করে তোলার মতলব আঁটল। লিভারপুলের একটা প্রতিষ্ঠানকে কনট্রাক্ট দিল, কাজ সম্পন্ন করার জন্য অন্য একটা প্রতিষ্ঠানের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল। তাই তো পূর্ব নির্দ্ধারিত সময়ে জাহাজ নোঙর তুলতে পারছে না।

দিনরাত পুরোদমে কাজ করে ঠিক হল গ্রেট ইস্টার্ন ছাব্বিশে মার্চ ফের নোঙর তুলবে।

খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলাম, জাহাজে বার শ' থেকে তেরো শ' যাত্রী যাত্রা করবে।

ভাসমান-শহরটার অত্যাশ্চর্য ব্যাপার-স্যাপার, মেরামতি কাজকর্ম অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে দেখে বেড়াতে লাগলাম।

তাকে দেখে এবার ঠিকই চিনতে পারলাম। জেটিতে সেদিন একেই দেখেছিলাম বটে। তার নাম ফেবিয়ান। আমেরিকা চলেছে এক মাসের ছুটির দিনগুলো উপভোগ করতে। ভারত থেকেই এসেছে। গোদাবরি জাহাজে চেপে এ পর্যন্ত পৌছেছে।

আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিষণ্ন মুখে ফেবিয়ান কথাটা ছুঁড়ে দিল, 'মনটাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখার জন্য দেশ পর্যটনে বেরোতেই হল।

নোঙর তুলেতে গিয়েই প্রথম দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। এ কাজের জন্য জাহাজের গলুইতে ছেষট্টি অশ্বশক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিন বসানো ছিল। সিলিন্ডারের মাধ্যমে বয়লার থেকে বাষ্প চালান দিলে তার চাপে তীব্র গতিতে সেটা ঘুরতে আরম্ভ করে। চাকার গায়ে শেকল জড়িয়ে নোঙরটাকে দিব্যি তুলে আনে। সমায় মতো দেখা গেল, ইঞ্জিনটা কর্তব্য পালন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করল। তাই অনন্যোপায় হয়ে পঞ্চাশজন খালাসি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাতে চাকাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নোঙরটাকে তুলে আনতে লাগল।

ধীরগতিতে কাজ হচ্ছে দেখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মাঝ-বয়সী একজন লোক ঠাট্টা তামাশা করতে লাগল। মোদ্দা কথা, পথচলার সঙ্গী হিসেবে ভদ্রলোকটিকে আমার খারাপ মনে হল না।

আচমকা চারদিকে হৈ হৈ শুরু হয়ে গেল। যাকে বলে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড বেধে গেল। যারা যারা ক্যাস্টানবার ধরেছিল তারা সবাই দমাদম ছিটকে জলে পড়ে যেতে লাগল। আসলে যন্ত্রের একটা দণ্ড হঠাৎ ভেঙে টুকরো হয়ে গিয়েই এ-প্রমাদ ঘটেছে। ফলে চাকাটা বিপরীত দিকে চক্কর মারতে শুরু করেছে।' আর ক্যাস্টানটাকে শেকলের ভারে দমিয়ে রাখতে পারছে না। ফলে দণ্ডটার আঘাতে কেউ মারা গেল, কারোর মাথা ফাটল, হাত-পা ভাঙল আর কেউ হুমড়ি খেয়ে জলে গিয়ে পড়ল।

তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা সহযাত্রীটা বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলে উঠল, 'সমুদ্রযাত্রায় শুরুটা দেখছি চমৎকারই হল!'

www.pathagar.com

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, বলেছেন ঠিকই, খুব খারাপই বটে। চোখ তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে এবার বললাম, 'আপনার নামটা—'

'ড. পিটফার্জ।'

আঠাশে মার্চ। সেদিন সাকালে ক্যাপ্টেন ফেবিয়ান-এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে আর একজন সৈন্যবিভাগের অফিসারও রয়েছেন। পেটা চেহারা। ইয়া লম্বা গোঁফ। চোখে-মুখে সাহসিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। ফেবিয়ান পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, 'ইনি ক্যাপ্টেন কর্শিকান। আমার বন্ধু। ভারতীয় সৈনিক।'

গ্রেট ইস্টার্নকে দেখে আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হয়েছিলাম। এর খোলটা তৈরি করতেই দশ হাজার টন লোহা ব্যবহার করা হয়েছে। জল-নিরোধক কামরা রয়েছে ভেতরে ও সামনের দিকে। জল বা আগুন কোনো কিছুই এটার ক্ষতি করতে পারবে না। ত্রিশ লাখ নাটবল্টু ব্যবহার করে লোহার পাতগুলোকে জোড়া হয়েছে। দশ হাজার যাত্রী বহন করাও এর পক্ষে সমস্যা নয়।

সর্বমোট ছ'টা মাস্তুল আর পাঁচটা ফানেল ডেকের ওপর বসানো রয়েছে। পালটা তৈরি করতে পাঁচ হাজার চারশ' বর্গফুট ক্যানভাস ব্যবহার করা হয়েছে। দু-শ' সাত ফুট লম্বা মাস্তুলটা খাড়াভাবে অবস্থান করছে। আকাশচুম্বী এ-মাস্তুলটার তুলনায় নোটরডামের বিখ্যাত গির্জাটাও যেন অনুচ্ছ, স্বীকার করতেই হবে।

গ্রেট ইস্টার্ন অনবরত চলার পর ক্ষুব্ধ সমুদ্র এক সময় শান্ত হয়ে এল। বিশালায়তন জাহাজটাও সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রকোপে মোচার-খোলার মতো দুলতে লাগল। চোখের সামনে দূরবীণ লাগিয়েও কোনো ফল পাওয়া গেল না। প্রয়াস একেবারেই নিষ্ফল হল। ডাঙার চিহ্নমাত্রও নজরে প'ড়ল না।

দূরবীণ হাতে ডেকের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় ড. পিটফার্জ ফ্যাকাশে-বিবর্ণমুখে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন ভীতি ও অস্থিরতাটুকু লক্ষ্য করে বলে উঠলাম, 'ড. পিটফার্জ। এতই যখন ভয় তবে খামাখা এলেন কেন?'

বিষণ্নমুখেই ড. পিটফার্জ জবাব দিলেন, 'জাহাজডুবি দেখার শখ মেটাতে। এর আগেও বেশ কয়েকবার এতে চেপেছি। গ্রেট ইস্টার্ন-এর ধ্বংস স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্যই বারবার এতে চাপছি।'

'কম হলেও বিশবার তো হবেই এই জাহাজটা আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করেছে। আরও অনেকবারই পারাপার করার ক্ষমতাও এর আছে।'

ড. পিটফার্জ দৃঢ়তার সঙ্গেই মন্তব্য করলেন, 'বাদ দিন তো মশাই! এ জাহাজের ওপর অভিশাপ রয়েছে। নোঙর তোলা থেকে কেমন হ্যাপা পোহাতে হচ্ছে, দেখেছেন তো? এর সৃষ্টিকর্তা ব্রানেল ও ইঞ্জিনিয়ারকেও মর্মান্তিক-মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। আর এর মালিকানা লাভ করে বেশ কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের মালিককে সর্বস্ব খোয়াতে হয়েছে। উদ্বাস্তুদের অস্ট্রেলিয়ার পার করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে একে তৈরি করা হয়েছিল। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, আজ অবধি এটা অস্ট্রেলিয়ার বন্দরের মুখ দেখতে পায়নি। গতিবেগের কথা যদি বলেন তবে আমি বলব, অন্য জাহাজের তুলনায় এর গতি নিছকই খুব নগন্য। একজন সুদক্ষ ক্যাপ্টেন এর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরই নিষ্ঠুর মৃত্যুর শিকার হয়ে পড়েন। বহু চটকদার গল্পকথা গ্রেট ইস্টার্নকে কেন্দ্র করে লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। এমন কথাও শোনা যায়, যে লোক কোনোদিন আমেরিকার বনবাদাড়ে পথ

www.pathagar.com

হারায় নি সে গ্রেট ইস্টার্ণে উঠে পথ হারিয়ে নাজেহাল হয়েছে। মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে সবার আগ্রহ সম্বন্ধে অনুমান করে নিয়ে পুনরায় বললেন, 'এমন কথাও শোনা যায় গ্রেট ইস্টার্ন-এর বয়লারে নাকি এক ইঞ্জিনিয়ার পড়ে গিয়ে সেদ্ধ হয়েছিলেন। লিভারপুল থেকে নিউ ইয়র্কের দিকে যাওয়ার সময় এমন ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটেছিল। সেটা ছিল এর উনিশতম যাত্রা।'

'তাই বুঝি! কই, শুনিনি তো!'

ডা. পিটফার্জ এবার এমন ভয়ঙ্কর এক কাহিনীর অবতারণা করলেন যা শোনার সময় গায়ের রোমগুলো খাড়া হয়ে যায়, রক্ত হিম হয়ে আসে। একদিন প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের কবলে পড়ে কোনোরকমে নিশ্চিন্ত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। আসলে প্যাডেল বেঁকে গিয়েই এমন বিপত্তিটা ঘটতে চলেছিল।

জাহাজ প্রচণ্ড দোল খাওয়ায় তিন টন ওজন বিশিষ্ট একটা ট্যাঙ্ক স্থানচ্যুত হয়ে রেলিংটা একেবারে ভেঙেচুরে একসার হয়ে গিয়েছিল। মাস্তুল টুকরো টুকরো হয়ে যায়। পাল ছিঁড়ে ফেঁসে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ইঞ্জিনটাও ঘায়েল হয়। আরও কত যে অঘটন ঘটেছিল তা বলে শেষ করা যাবে না। সাতদিন ধরে অনবরত একের পর এক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

মোদ্দা কথা, ড. পিটফার্জ রসিকতা করুন আর যা-ই করুন না কেন গ্রেট ইস্টার্ণের ধ্বংস সম্বন্ধে তাঁর মনে এতটুকুও দ্বিধা আছে বলে মনে হল না। অবাক হবার মতো ব্যাপারই বটে।

সকাল হল। কিন্তু তবুও সমুদ্র শান্ত হল না। সকাল ন'টার কাছাকাছি সমুদ্রের বুকে মাইল তিন-চার দূরে কালো মতো কি যেন একটা দেখা গেল। জাহাজ? নাকি কোনো মরা তিমি জলের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। এমন কি ডুবে-যাওয়া কোনো জাহাজের তলদেশ হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ব্যাপারটা নিয়ে গ্রেট ইস্টার্ণের যাত্রীদের মধ্যে বাজি ধরার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

গ্রেট ইস্টার্ন তার কাছাকাছি যেতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল, যে কালো বস্তুটাকে নিয়ে এত জল্পনাকল্পনা সেটা আসলে একটা উল্টানো জাহাজের তলদেশ।

ড. পিটফার্জ-এর বক্তব্য থেকে গ্রেট ইস্টার্ন-এর বহু অদ্ভুত যাত্রীর কথা জানতে পারলাম। এক রসায়নবিদ নাকি একটা গরুর দেহের যাবতীয় পুষ্টিটুকু নিঙড়ে নিয়ে চমৎকার একটা মাংস-বড়ি তৈরি ফর্মূলা বের করেছেন। মাত্র পাঁচটা শিলিং-এর বিনিময়ে একটা বড়ি কিনতে পাওয়া যায়। অন্য আর একজন একটা বাষ্পীয় ঘোড়া তৈরি করেছেন। ঘোড়াটার কলকব্জা নাকি ঘোড়ার ডালার ভেতরে রক্ষিত থাকবে। চাবি ঘুরিয়ে দম দেওয়া মাত্র চলতে আরম্ভ করবে। আর এক ফরাসি ভদ্রলোক এমন বিশেষ এক ধরনের ত্রিশ হাজার পুতুল নিয়ে আমেরিকায় চলেছেন, যে ইয়াঙ্কি ভাষায় 'বাবা' কথাটাকে স্পষ্ট ও মিষ্টি-মধুর স্বরে উচ্চারণ করতে পারে।

চব্বিশ ঘণ্টায় তিন শ' মাইল পথ যে-কোনো জাহাজই অতিক্রম করতে সক্ষম। কিন্তু গ্রেট ইস্টার্ন? ছত্রিশ ঘণ্টায় মাত্র তিনশ বিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে।

আমি ড. পিটফার্জ-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফেবিয়ান-এর কাছে এলাম। ডেকে দাঁড়িয়ে তিনি সমুদ্রের ঢেউ দেখছেন। আমি বিরক্ত না করে পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে তাঁকে দেখতে লাগলাম।

www.pathagar.com

এক সময় সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই তিনি বললেন, 'লক্ষ্য করে দেখ, ঢেউগুলো যেন ঠিক ইংরেজি 'এল' আর 'ই'-এর মতো দেখতে।'

আমি তার কথার মাথামুণ্ড কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না। সে কেন যে হঠাৎ এমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছে আমার বোধগম্য হল না।

আমি সহানুভূতির স্বরে বললাম, 'ফেবিয়ান, তোমার কি হয়েছে, বল তো?'

'বুকের ব্যামো। বাঁচার কোনো উপায়ই নেই। এ ব্যামো সারাবার মতো ওষুধ আজও আবিষ্কার হয় নি'। প্রসঙ্গটাকে আর অগ্রসর হতে না দিয়ে সে গুটিগুটি নিজের কেবিনের দিকে হাঁটতে লাগল।

পরদিন ছিল ত্রিশে মার্চ। সেদিন সন্ধ্যায় কাপ্তেন কর্সিকান-এর সঙ্গে কথা বলে ফেবিয়ান-এর বুকের ব্যামোর ব্যাপারটা জানতে পারলাম। খুবই মর্মান্তিক কাহিনী। বোম্বাইয়ে এলে হজেস নামে এক যুবতীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। উভয়েরই ইচ্ছে ছিল বিয়ে-থা করে সংসার করে। কিন্তু মেয়েটার বাবা কলকাতার এক ব্যবসায়ীর ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে পাকা করে ফেলে। এর ফলে নাকি তার ব্যবসার ক্ষেত্রে নানা সুযোগ সুবিধে হবে। তাই মেয়ের মতামতের কোনো মূল্যই দিল না। ব্যস, ফেবিয়ান তারপর আর কোনোদিন মিস হজেসকে দেখতে পায় নি।

'এলেন হজেস? হয়তো সেজন্যই সমুদ্রের ঢেউগুলোর মধ্যে সে 'ই' আর 'এল'-এর কল্পনা করছিল। ভালো কথা, এলেন—এর স্বামীর নাম কি, বলুন তো?' আমি কাপ্তেনকে প্রশ্ন করলাম।

'তাঁর স্বামীর নাম হ্যারি—হ্যারি ড্রেক।'

'হ্যারি ড্রেক? আরে সে তো এ জাহাজেরই যাত্রী!' কাপ্তেন কর্সিকান আৎকে উঠে বললেন, 'সে কী! বলছেন কী মশাই!'

তাঁর মুখের কথাশেষ হবার আগেই আমাদের সামনে দিয়ে হ্যারি ড্রেককে যেতে দেখলাম। আমি তার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে দেখিয়ে দিতেই কাপ্তেন কর্সিকানের চোখ দুটো হঠাৎ জ্বল-জ্বল করে উঠল। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'লক্ষ্য রাখতে হবে তারা কেউ যেন কাউকে চিনতে না পারে। চিনে ফেললেই কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে কিন্তু। হ্যারির-ওপরে পাগলা কুকুরের মতো ফেবিয়ান জাঁপিয়ে প'ড়বে। খুন করে তবে ছাড়বে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হ্যারি-র মৃত্যু অবধারিত। এ তো আর আপনার অজানা নয়, মেয়েরা স্বামীকে যতই ঘৃণা করুক না কেন স্বামীর হত্যাকারীকে কখনই বিয়ে করে ঘরসংসার পাততে রাজি হয় না।'

পরদিন ড. পিটফার্জের সঙ্গে কাপ্তেন কর্সিকান-এর আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলাম। পেটফার্জের মুখ থেকে গ্রেট ইষ্টার্ণ-এর প্রসঙ্গ-কাহিনী কাপ্তেন কর্সিকানকেও শুনতে হল।

কথা প্রসঙ্গে বেশ রাগত স্বরেই ড. পিটফার্জ বলে উঠলেন, 'কাপ্তেন, এ জাহাজে যে প্রতি রাত্রি ভূত ঘুরে বেড়ায় আপনার জানা আছে কি?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কাপ্তেন জবাব দিলেন, 'কি বললেন, ভূত? আপনি কি ভূত-প্রেত বিশ্বাস করেন?'

'করি। অবশ্যই বিশ্বাস করি। এতগুলো লোক কি আর মিথ্যা কথা বলছে মশাই? অফিসার থেকে খালাসি পর্যন্ত সবাই দেখেছে। অন্ধকার নেমে এলেই জাহাজে একটা ছায়ামূর্তি চলাফেরা করে। এক সময় হঠাৎ হাফিস হয়ে যায়। ব্যস, আর দেখা যায় না।'

www.pathagar.com

কাপ্তেন কর্সিকান উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, আজ রাত্রেই তবে ভূত দেখা যাক, কি বলেন?'

পরদিন পয়লা এপ্রিল। কাপ্তেন কর্সিকান-এর মুখে শুনতে পেলাম—গত রাত্রি ড. পিটফাজকে হতাশ হতে হয়েছে। ভূত দেখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভূত দেখা দেয় নি। তিনি একদম অপ্রস্তুতে পড়ে গেছেন।

হতাশার প্রতিমূর্তি ফেবিয়ানকে ডেকের ওপর পায়চারি করতে দেখলাম। শূন্য দৃষ্টি। মুখে টু-শব্দটিও নেই। তার ভাবনার ছেদ না ঘটিয়ে মুখবুজে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম।

ঠিক তখনই হ্যারি ড্রেককে বার কয়েক পাশ দিয়ে ঘুরে যেতে দেখলাম। জানি না আমার দেখার ভুল কি না, হ্যারি ড্রেক যেন প্রতিবারেই ফেবিয়ান-এর দিকে বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেল।

হ্যারি ড্রেক-এর চাহনির বিশেষত্বটুকু ফেবিয়ান-এরও নজর এড়ায় নি। তাই সে আর একবার তার দিকে চোখের মণি দুটোকে ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে বলল, 'লোকটা কে, বলতে পারেন ? চাহনি মোটেই ভালো লাগল না।'

আমি তাকে চিনি না বলে কথাটাকে চাপা দিয়ে দিলাম।

তেসরা এপ্রিল। আমি আর কাপ্তেন কর্সিকান ডেকের ওপর পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম। হ্যারি আর ফেবিয়ান-এর মধ্যে বিবাদ তখনও শুরু হয় নি। কাপ্তেনের সঙ্গে এ-প্রসঙ্গটা নিয়ে কথা বলতে বলতে তাঁর জাহাজ চালানোর সতর্কতার ব্যাপারস্যাপার গুলো লক্ষ্য করতে লাগলাম। কয়েকদিন আগেই ভাসমান হিমশৈলের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে একটা জাহাজ মারাত্মক রকম ঘায়েল হয়েছে। তাই প্রতি আধঘণ্টা বাদে বাদে সমুদ্র থেকে বালতি দিয়ে জল তুলে তুলে তাপমাত্রা মেপে চলেছেন। জলের তাপমাত্রা যদি এক ডিগ্রিও কমে যায় তবে পথ পাল্টে তিনি অন্য পথ ধরবেন।

এবার জাহাজের পিছন দিকে, অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তিকে রেলিঙের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। চেহারা দেখেই কাপ্তেন কর্সিকান ঠিক চিনে ফেললেন। বললেন, 'ফেবিয়ান'।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি তাঁর ধরণা অভ্রান্ত। জাহাজের ওপরের ডেকের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে তিনি। আমি তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর নাম ধরে ডাকলাম। নিরুত্তর। আমার ডাক তাঁর কানে গেল না।

কাপ্তেন কর্সিকান ডাক দিল।

ফেবিয়ান চমকে উঠে মুখের কাছে আঙুল নিয়ে গলা নামিয়ে বলে উঠল 'চুপ! চুপ করুন!' কথাটা বলতে বলতে ওপরের ডেকের একান্তে অস্পষ্ট চলন্ত ছায়ামূর্তির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বলল, 'ব্ল্যাক লেডি! ওই দেখুন ব্ল্যাক লেডি।'

মুখ তুলে ছায়ামূর্তিটার দিকে চোখ ফিরিয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে, অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিটা দেখেই বুঝতে পারলাম, এক মহিলা। বোরখার কায়দায় তৈরি একটা জামা তার পরনে, ওড়নার মতো এক টুকরো কাপড় দিয়ে মুখটা ঢেকে রাখা।

ফেবিয়ান অনুচ্চকণ্ঠে এবার বলল, 'পাগল! পাগল ছাড়া কিছু নয়!' সে আগের মতোই আগ্রহী-নজর মেলে অগ্রসরমান ছায়ামূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল। সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মহিলাটির দিকে এক পা দু-পা করে এগিয়ে যেতে লাগল।

www.pathagar.com

ব্ল্যাক লেডি অত্যুজ্জ্বল চোখের-মণি দুটো মেলে ফেবিয়ান-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অকস্মাৎ নিজের বুকের ওপর একটা হাত রাখল। মনে হল হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করে নিল। পর মুহূর্তেই ঘুরে দাঁড়াল। লম্বা-লম্বা পায়ে এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ফেবিয়ান আবেগ-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'এসেছে! সে এসেছে! এসেছে....এসছে!' পরমুহূর্তেই সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে উঠল, 'ভুল! বিলকুল ভুল ! দেখার ভুল!"

কাপ্তেন কর্সিকান তাকে জাপ্টে ধরে সেখান থেকে নিয়ে চলে গেলেন।

হ্যাঁ, ফেবিয়ান ঠিকই দেখেছে। এতটুকুও দেখার ভুল তার হয়নি। বরাতগুণে তারা উভয়ে, ফেবিয়ান ও এলেন আবার কাছাকাছি এসেছে। সে আর একটা কথা একদম ঠিক বলেছে, এলেন-এর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। সে এখন রীতিমতো এক উম্মাদিনী। লম্পট চরিত্রহীন হ্যারি ড্রেক-এর গৃহিণী হওয়ার পর নিরবচ্ছিন্ন হাহাকার আর দুঃখ-যন্ত্রণা তার মনের ওপর কঠোর আঘাত হেনেছে। আজ সে একজন বিকৃত মস্তিষ্ক ছাড়া কিছুই নয়।

আমরা উভয়ে ফেবিয়ানকে খুব করে বোঝালাম। তারপর সিদ্ধান্ত নিলাম, তাকে আর এলেন-এর কাছাকাছি যেতে দেওয়া হবে না।

কিন্তু আমাদের কথায় ভগবান বোধ হয় নির্ভৃত আড়াল থেকে মুচকি হাসলেন। আমাদের পরিকল্পনাকে ভেঙে দিয়ে যা আশঙ্কা করেছিলাম বাস্তবে ঘটলও তা-ই।

বিকেল চারটেতে ডেকের ওপর এক নকল রেসের ব্যবস্থা করা হল। জাহাজের বারজনের মতো নকল ঘোড়া সেজে দৌড়োতে আগ্রহ প্রকাশ করল। তাদের বারজনের ওপর বাজি। বাজিও ধরল অনেকেই। আমি লক্ষ্য করলাম, হ্যারি ড্রেক অনর্গল অপ্রয়োজনীয় কথা বলে চলেছে। তাকে কিন্তু কেউ মোটেই আমল দিচ্ছে না। বাজি ফেবিয়ানও ধরেছে। তবে নিতান্তই নিস্পৃহ-নির্লিপ্তভাবে।

রেস হল। এক স্কচ খালাসি জয়ী হল।

রেস শেষ হতেই হ্যারি ড্রেক চিল্লিয়ে উঠল, 'না,এ কিছুতেই মানা যায় না, রেস ঠিকঠাক হয় নি। রেস আবার হোক।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই ফেবিয়ান ঠাণ্ডা মাথায় স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল, 'না, রেস আর হবে না, কিছুতেই হবে না। রেসে কোনোরকম কারচুপি ছিল না। পরাজিত আমিও। তবুও—'

'আপনি ? আগ বাড়িয়ে মাতব্বরি করতে এসেছেন, রেস কাকে বলে আমাকে শেখাতে চাইছেন ?'

তাদের বিবাদ ক্রমেই তুমুল থেকে তুমুলতর হতে চলেছে। ঠিক সে মুহূর্তেই কাপ্তেন কর্সিকান উভয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ফেবিয়ানকে জাপ্টে ধরে সেখান থেকে নিয়ে যেতে লাগলেন। যেতে যেতে সে তর্জন-গর্জন করতে লাগল, 'সুযোগ একবার যদি পাই, তোমার সব কয়টা দাঁত ফেলে তবে আমি ক্ষান্ত হব।'

পাঁচই এপ্রিল। সকালে আমি ফেবিয়ান-এর কেবিনে গেলাম। সে নেই। আচমকা যেন একটা হোঁচট খেলাম। ভাবলাম, এলেন-এর কাছে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এক এক করে সব কয়টা কেবিনের সামনে দিয়ে চক্কর মারলাম। না, কোনো কেবিনের

www.pathagar.com

দরজার গায়েই হ্যারি ড্রেক-এর নাম লেখা দেখতে পেলাম না। খুবই হতাশ হলাম। স্টুয়ার্টকে জিজ্ঞেস করেও হ্যারি ড্রেক-এর ঠিকানা জানা সম্ভব হল না। আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে সিঁড়ির ধার দিয়ে এগোতে গিয়ে একটা ছোট্ট কেবিন দেখে ভাবলাম, এলেনকে লুকিয়ে রাখার উপযুক্ত জায়গাই বটে। এখানে তাকে পাওয়া যাবেই।

সিঁড়ি-বেয়ে নামতে গিয়ে গানের মিষ্টি-মধুর কলি কানে এল। আমি ঝট করে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে গানটা শুনতে লাগলাম। পরক্ষণেই মনটা বিষিয়ে উঠল। ভাবলাম, হ্যারি ড্রেক একজন পাষণ্ড ও চরম নিষ্ঠুর ব্যক্তি। আড়াল থেকে তার গৃহিণীর গান শুনছি, কোনোক্রমে তার কানে গেলে একেবারে জ্যান্ত কবর দিয়ে ছাড়বে।

একটু বাদেই ফেবিয়ানকে হাঁটতে হাঁটতে উৎকর্ণ হয়ে গানটা শুনতে দেখলাম। সে এক পা-দু-পা করে দরজার বাইরে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়েই নীরবে গান শুনতে লাগল। এলেন-এর কেবিনের দরজা সেটা। কি চায় সে ? মহিলাটির কেবিনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে চায় নাকি?

আমি ত্রস্তপায়ে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে হেঁচকা টান দিতেই সে শূন্য দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'কার গান বলতে পার?' সেই যে পাগলিনী, তার গান। তার পাগলামি সারাবার দাওয়াই আমার ভালোই জানা আছে। এক টুকরো প্রেম-ভালোবাসা পেলেই সে ফের সুস্থ-স্বাভাবিকতা ফিরে পাবে।'

তার হাত ধরে ডেকে নিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড় করালাম।

রাত্রি একটু বাড়তেই, তুফান-তুমুল তুফান আরম্ভ হল। আমাদের ভাসমান শহরটা ঢেউয়ের তালে তালে মোচার খোলার মতো অনবরত দুলতে লাগল।

সারারাত্রি তুফান আর ঢেউয়ের সম্মিলিত দাপাদাপি চলল। সকাল হতেই রেলিং ধরে ধরে বহু কষ্টে কোনোরকমে ডেকে গিয়ে দেখি ড. পিটফার্জ দাঁড়িয়ে। তাঁর কাছে যেতেই তিনি তুফানের আওয়াজ থেকেও তীব্রতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কি মশাই, কেমন বুঝছেন? আমার কথার সত্যতা এখন পাচ্ছেন তো ? আগেই তো বলেছিলাম, গ্রেট ইস্টার্ন একটা অভিশপ্ত জাহাজ, বলি নি ? এখন তীরে এসে তরী ডোবে কি না শুধু দেখে যান। ঘূর্ণিঝড় ভয়ঙ্কর জিনিস। এ পরিস্থিতি থেকে উতরাবার মাত্র দুটো উপায়ই রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, কাপ্তেন তাদের কোনোটাকেই অবলম্বন করবেন না।'

আমি কপালের চামড়ায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ এঁকে বললাম, 'কেন ? কেন করবেন না তিনি, জানতে পারি কি ?'

'আসলে সামনেই একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতি, কপালের লিখন রয়েছে যে মশাই!'

ঝড়ের দৌলতে জাহাজের অবস্থা একবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। পুরো জাহাজটা জলে থই থই করছে। পাম্প চালিয়ে জল বের করার প্রাণান্ত-প্রয়াস চালানো হচ্ছে। বাইরে থেকেই আমি চিৎকার চেঁচামেচি আর দারুণ হই-চই শুনতে পেলাম। বুঝতে অসুবিধা হল না, হ্যারি আর ফেবিয়ান গলাছেড়ে বাকযুদ্ধে লিপ্ত। দৌড়ে ভেতরে যেতেই দেখলাম, কর্সিকান ইতিমধ্যেই হাজির হয়ে গেছেন। উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মরিয়া হয়ে পরিস্থিতিটা সামাল দেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ক্রোধোন্মত্ত হ্যারি ড্রেক কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে তার সামনে মেলে ধরে গর্জে উঠল, 'এই যে আমার কার্ড। যদি হিম্মত থাকে—'

কার্ডটার দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে ফেবিয়ান বলে উঠল, 'আপনি হ্যারি ড্রেক? আপনিই—আপনিই হ্যারি ড্রেক!'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ। আমিই হ্যারি ড্রেক। কাপ্তেন ফেবিয়ান, আমার নামই হ্যারি ড্রেক।'

ব্যাপারটা এবার ফাঁস হয়ে গেল। জাহাজে উঠেই হ্যারি ড্রেক জানতে পেরেছিল কাপ্তেন ফেবিয়ান এ-জাহাজেই উঠেছে। তখন থেকেই পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে ডুয়েল লড়ার ধান্ধায় সে ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছিল।

পরদিন হ্যারি ড্রেক-এর এক দোস্ত এসে বলল, 'ডুয়েল লড়া ছাড়া যখন গত্যন্তর নেই তখন ঝুটমুট ব্যাপারটাকে ঝুলিয়ে না রেখে ফয়সালা করে নেওয়াই সঙ্গত। হ্যারি ড্রেক নিউ ইয়র্কে পৌছনো অবধি ধৈর্য ধরতে উৎসাহী নয়।' যাবার সময় সে বলে গেল, সেদিনই বিকালে ওপরের ডেকের পিছনে তরবারি নিয়ে কাপ্তেন ফেবিয়ান-এর জন্য অপেক্ষা করবে।

বিকাল পাঁচটা দশ। আমি, ড. পিটফার্জ আর কাপ্তেন কর্সিকান ওপরের ডেকের পিছন দিকে ফেবিয়ানকে নিয়ে হাজির হলাম।

তার মিনিট দশেক পর হ্যারি ড্রেক এক জিগরী দোস্তকে নিয়ে সেখানে হাজির হল।

কাপ্তেন কর্সিকান দুটো তরবারি থেকে একটা বেছে নিতেই ফেবিয়ান সেটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়াল। হ্যারি ড্রেক দ্বিতীয় তরবারিটা ঝট করে হাতে নিয়ে ক্রোধোম্মত্ত বাঘের মতো তার সামনে লাফিয়ে পড়ল।

শুরু হল দ্বন্দ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের পরিস্থিতি যখন তুঙ্গে উঠেছে ঠিক তখনই আচমকা ফেবিয়ান-এর হাত থেকে তরবারিটা ফসকে মেঝেতে পড়ে গেল। সে বিপরীত দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। ঘাড় ঘুরিয়ে তার দৃষ্টি অনুসরণ করতেই আমার চোখে পড়ল, ব্ল্যাক লেডিকে। আগের মতোই বোরখার মতো জামা গায়ে, মুখ ঢাকা এলেন। হ্যাঁ, এলেন ধীর-পায়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ স্থলের দিকে এগোচ্ছে।

হ্যারি গর্জে উঠল, 'কি ব্যাপার এলেন। তুমি যে এখানে! কেন এখানে এলে এলেন?'

আমি হঠাৎ পা হড়কে পড়ে যাবার জোগার হলাম। বিস্ময়ের ঘোরটুকু কাটতেই বাতাসবাহিত উগ্র গন্ধকের গন্ধ আমার নাকে এল। এলেন এগিয়ে গিয়ে ফেবিয়ান এর প্রায় গা-ঘেঁষে দাঁড়াল। পর মুহূর্তেই সেখান থেকে হ্যারি-র দিকে পা-বাড়াল। হ্যারি হাতের সুতীক্ষ্ম তরবারিটা মাথার ওপরে তুলেই থমকে গেল। এলেন এগিয়ে তার কাঁধটা ছুঁতে না ছুঁতেই দুর্বল আতঙ্কিত হ্যারি মুখ থুবড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। ব্যস, খতম।

গ্রেট ইস্টার্ন নয়ই এপ্রিল নোঙর করল। ষোলোই এপ্রিল নোঙর তুলে ফের যাত্রা করবে। এখানে কয়দিন থেকে জাহাজের মেরামতি কাজ সেরে নেওয়া হবে।

বিকাল তিনটায় নিউইয়র্কে নামলাম। ছোট জাহাজ ভাড়া করে শহর দেখলাম। ফেবিয়ার আর এলেনকে নিয়ে কর্সিকান কয়দিন আগে যাত্রা করেছেন।

নায়েগ্রা বন্দরে গেলাম বারই এপ্রিল। তেরোই এপ্রিল ড. পিটফার্জ-কে নিয়ে কানাডায় পৌছোতে পারলাম। পথে আচমকা কর্সিকান-এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। তাঁর মুখ থেকে জানতে পারলাম এলেন এখনও তার প্রেমিক ফেবিয়ান কে চিনতে পারে নি।

নায়েগ্রা জলপ্রপাতের কাছাকাছি একটা সমতল পাথরের ওপর এলেনকে বিমর্ষমুখে বসে থাকতে দেখলাম। আর তারই পিছনে, সামান্য তফাতে ফেবিয়ান দাঁড়িয়ে, অপলক চোখে সে এলেন-এর দিকে তাকিয়ে।

www.pathagar.com

নায়েগ্রা শব্দটার অভিধানগত অর্থ বজ্রধ্বনি। একনাগাড়ে লক্ষ লক্ষ বজ্র যেন গর্জেই চলেছে। পাথর ক্ষয় হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। ভূগোলবিদগণের মতে প্রতি বছর নাকি নায়েগ্রা জলপ্রপাত এক গজ করে পিছিয়ে আসছে। অনন্ত রূপ-সৌন্দর্যের আধার নায়েগ্রার দিকে এলেন-এর অপলক চাহনি স্থির হয়ে গেছে। হঠাৎ দুর্বল পা দুটোর ওপর ভর দিয়ে সে কোনোরকমে দাঁড়াল। পা দুটোকে টেনে টেনে হাঁটতে লাগল। এবারই অবিশ্বাস্য নাটকীয় ঘটনাটা ধরতে গেলে চোখের পলকেই ঘটে গেল।

নায়েগ্রার দিকে এলেন গুটি গুটি এগিয়ে যেতে থাকলে ফেবিয়ান গোপনে, পা টিপে টিপে তাকে অনুসরণ করতে লাগল। এলেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে ফেবিয়ানকে দেখা মাত্র অন্ধকারে কে যেন তার চোখের সামনে অত্যুজ্জ্বল আলো জ্বেলে দিল। উন্মাদিনীর মতো সে ছুটে গিয়ে ফেবিয়ান-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার বুকে মুখ লুকিয়ে আবেগে-উচ্ছ্বাসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। পরমুহূর্তেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। দীর্ঘ ঘুমের মাধ্যমে সে প্রায় স্বাভাবিকতা ফিরে পেল।

টিকিট কাটতে গিয়ে ড. পিটফার্জকে দেখে চমকে উঠলাম। তিনি স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দিলেন, 'গ্রেট ইস্টার্ন-এর ধ্বংসটা যে দেখতেই হবে।'

---

www.pathagar.com

বেগমস ফরচুন

ব্রাইটন হোটেলের বৈঠকখানায় ডক্টর সারাসিন আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে একটা খবরের কাগজের ওপর চোখ বুলাচ্ছেন। 'রক্তকণিকার গণকযন্ত্র' নামে তাঁর লেখা একটা প্রবন্ধ খবরের কাগজটার পাতায় ছাপা হয়েছে। সেটার ওপরেই তিনি আগ্রহ ভরে চোখের মণি দুটো বুলাচ্ছেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এক নজরে দেখলেই মনে হয় তিনি মানুষ হিসাবে একদম সাচ্চা।

রক্তকণিকার গণকযন্ত্র ড. সারাসিন-এরই সদ্য আবিষ্কৃত একটা যন্ত্র।

ড. সারাসিন যখন খবরের কাগজের পাতায় মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে তন্ময় হয়ে আছেন ঠিক তখনই হোটেলের এক বয় এসে তাঁর হাতে একটা ভিজিটিং কার্ড দিল। কার্ডটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। তাতে ছাপা রয়েছে, 'ডব্লিউ. এইচ. শার্প জুনিয়র, সলিসিটর, চুরানব্বই সাদামটন রো, লন্ডন।'

ড. সারাসিন-এর অনুমতি পেয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এক তরুণ ঘরে ঢুকে নমস্কার জানাল। শীর্ণ চেহারা। এক কথায় বলা চলে চলন্ত একটা কঙ্কাল ঘরে ঢুকল। আগন্তুক তরুণ নমস্কার জানিয়ে মাথার টুপি আর হাতের ব্যাগটা মেঝেতে রাখল। ড. সারাসিন বসতে বলার আগেই সে চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল। কোনোরকম ভূমিকার অবতারণা না করেই তার বক্তব্য শুরু করল, 'আমার নাম উইলিয়ম হেনরি শার্প জুনিয়র। বিলোজ গ্রিন শার্প অ্যান্ড কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা বলতে এসেছি। ভালো কথা, আমি ডা. ফ্রাঁসোয়া সারাসিন-এর সঙ্গেই কথা বলছি তো? আর আপনি তো দোয়াই-এর অধিবাসী, ঠিক কিনা?'

ড. সারাসিন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, দু-ই সত্য। আমিই ডা. সারাসিন।'

'আর আপনার বাবা ইসিদোর সারাসিন, ঠিক কিনা?'

'হ্যাঁ, এ-ও ঠিক।'

আগন্তুক উইলিয়ম হেনরি কোটের ভেতরের পকেট থেকে এক চিলতে কাগজ বের করে গলা ছেড়ে পড়তে লাগল—'আঠারো শ' সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে ইসিদোর সারাসিন 'ইকোডেস' নামে প্যারিসের এক হোটেলে মারা গিয়েছিলেন। সে হোটেলটা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেনাবিভাগে ছিলেন অ্যারোনডিসেমেন্ট, রু-টাবানি, নম্বর চুয়ান্ন।"

ড. সারাসিন হকচকিয়ে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, একদম ঠিক বটে। অনুগ্রহ করে বলুন তো—'

আগন্তুক তরুণ উইলিয়ম হেনরি তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে পড়ে চলল, 'জাঁ জ্যাকুইস ল্যাঙ্গেভল ছিল আপনার পিতামহীর ভ্রাতার নাম। ড্রাম মেজর ছিলেন সেনাবিভাগের ছত্রিশ নম্বর লাইট—'

তাঁকে ছত্রটা শেষ করতে না দিয়েই ড. সারাসিন বলে উঠলেন, 'মশাই আমার বাপ-ঠাকুরদার নাম আপনি যা কিছু জানেন আমার তা-ও জানা নেই। কেবলমাত্র একটুকুই জানি যে, আমার ঠাকুরমার বংশের পদবী 'ল্যাঙ্গেভল' ছিল।'

www.pathagar.com

উইলিয়ম হেনরি পড়ে চললেন, 'আপনার মাতামহী আঠারো শ' সাত খ্রিস্টাব্দে আপনার পিতামহকে নিয়ে বালিদুক নগরে ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সতের শ' নিরানব্বই-এ জাঁ সারাসিন-এর সঙ্গে আপনার পিতামহীর বিয়ে হয়। মেলুন নগরে আপনার পিতামহ টিনের মিস্ত্রীর কাজ আরম্ভ করেন। সে নগরেই আঠারো শ' এগারোতে আপানার পিতা ইসিদোর সারাসিনকে রেখে আপনার পিতামহী পরলোক গমন করেন। তার পর থেকেই আপনার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত কোনো খবরই পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই ড. সারাসিন বললেন, 'আমার কাছ থেকে খবরটা শুনুন। 'বংশপঞ্জীর নির্ভুল বক্তব্য শুনে চমকে ওঠা সত্ত্বেও বলতে লাগলেন, 'আমার পিতামহ আমার পিতাকে চিকিৎসাবিদ্যা পড়াবার সুবাদে প্যারিসে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি আঠারো শ' বত্রিশে পরলোক গমন করেন। আমার বাবার ডাক্তারি ব্যবসা রমরমা হয়ে উঠল। তার মৃত্যুস্থান, প্যালেসু নগরে। আঠারো শ' বাইশে আমি সেখানেই জন্মগ্রহণ করি।'

উইলিয়ম হেনরি বললেন, আমি আপনার সন্ধানই করছি। আপনার কোনো ভাই-বোন—'

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই ড. সারাসিন বলে উঠলেন, 'না, কেউ-ই নেই। মা বাবার একমাত্র সন্তান আমি। আমি দু-বছরের তখনই মা স্বর্গে চলে যান।' মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে উইলিয়ম হেনরি বললেন 'আপনাকে খুঁজে পাওয়ায় আমি খুবই খুশি হয়েছি। আপনাকে অভিনন্দন জানাতেই হচ্ছে।'

ড. সারাসিন ভাবলেন, আগন্তুক নির্ঘাৎ ছিটগ্রস্ত। এরকম চোয়ালভাঙা কাঠখোট্টা মানুষগুলো একটু-আধটু ছিটেলেই হয়ে থাকে।

সলিসিটর উইলিয়ম হেনরি যেন ডাক্তারের মুখ দেখেই তাঁর মনের কথা বুঝে নিলেন। হাসিমাখা মুখেই বললেন, 'মশাই আমি আদৌ পাগল বা ছিটেল-টিটেল নই। রাজা ব্রায়া জবাহির মথুরানাথ—রাজা উপাধির একমাত্র উত্তরাধিকারী আপনিই। আঠারো শ' উনিশে আপনার পিতামহীর ভ্রাতা জাঁ জ্যাকুইল ল্যাঙ্গেভল বৃটিশ নাগরিকত্ব লাভের পর এ-উপাধি লাভ করেছিলেন। আঠারো শ' চৌদ্দতে তাঁর স্ত্রী বেগম গোকুল পরলোক গমন করেন। তাঁদের একমাত্র সন্তান অল্পবুদ্ধি পুত্র পরোপারে চলে যান আঠারো শ' উনসত্তরে। তাই বাংলার গভর্ণর জেনারেল আপনার পিতামহীর ভ্রাতা রাজা জাঁ জ্যাকুইস ল্যাঙ্গেভলকে বেগম গোকুল-এর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন। গত ত্রিশ বছরে সে-সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে পঞ্চাশ পাউন্ড স্টার্লিং-এ পরিণত হয়েছে। আর তা বিশেষ হেফাজতে রাখা হয় এবং তা সুদে মূলে বৃদ্ধি পেয়ে তার মূল্য প্রচুর হয়ে ওঠে, আর তা হয় জাঁ জ্যাকুইস ল্যাঙ্গেভল-এর অল্পবুদ্ধি পুত্র জীবিত থাকাকালীনই।

আঠারো শ' সত্তরে সম্পত্তির মোট মূল্য হয় দুকোটি দশ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং, ফ্রাঁ-র হিসাবে বাহান্ন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ।

আগ্রা কোর্টের আদেশে, দিল্লির স্বাক্ষর নিয়ে প্রিভি কাউন্সিলের অনুমতি পেয়ে যাবতীয় স্থাবর-আস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডে জমা রাখা হয়। বর্তমানে মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে বাহান্ন কোটি সত্তর লক্ষ ফ্রাঁ। আপনি যে জাঁ জ্যাকুইস ল্যাঙ্গেভেল-এর একমাত্র বংশধর ও উত্তরাধিকারী তা কোর্ট অব চান্সারিতে প্রমাণ করে

www.pathagar.com

দিয়ে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিতে পারেন। আর এর মধ্যে যদি আপনার আগাম অর্থ প্রয়োজন হয় তাতেও কোনোই অসুবিধে নেই, পেয়ে যাবেন। ব্যাঙ্কার মেসার্স টল্ল, স্মিথ অ্যান্ড কোম্পানি আমার ওপর সে ক্ষমতা অর্পণ করে রেখেছে।

দীর্ঘ সময় ধরে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে নীরবে কাটিয়ে ডা. সারাসীন এক সময় ভাবলেন—চমৎকার কাহনী বটে! তবে একেবারেই অবাস্তব।

এক সময় স্বাভাবিক কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'প্রামাণ কি, বলুন তো? আমাকে সনাক্তই বা কি করে করবে বলুন তো মশাই ?'

'প্রমাণ?' পাশে রক্ষিত ব্যাগটার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে সলিসিটার উইলিয়ম হেনরি দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, 'প্রমাণ এর মধ্যেই রয়েছে। মশাই, আপনাকে সনাক্ত করা তো কোনো সমাস্যাই নয়, খুবই সহজ। যে কোম্পানির ওপর বৃটিশ সাম্রাজ্যের অগণিত বে-ওয়ারিশ সম্পত্তির ওয়ারিশ তল্লাশ বের করার দায়িত্ব বর্তেছে, আমি তাদের হয়ে পাঁচ-পাঁচটা বছর আপনার তল্লাশে লিপ্ত রয়েছি। হাজার হাজার পরিবারের বংশপঞ্জী নাড়াচাড়া করেছিল। কিন্তু ইসিদোর সারাসিন-এর সন্ধান পেলাম না। শেষপর্যন্ত যখন নিশ্চিন্ত হলাম ফরাসি দেশে এ নামে কোনো ব্যক্তির অস্তিত্বই নেই ঠিক তখনই 'ডেইলি নিউজ' সংবাদপত্রের পাতায় একটা সংবাদের দিকে চোখ পড়ল। গতকালের সংবাদপত্রের পাতায় স্বাস্থ্য-সংস্থার যে বিবরণী ছাপা হয়, তাতে সদস্যদের নামের তালিকাও ছাপা হয়। তাতে অন্যান্যদের সঙ্গে ড. সারাসিন-এর নাম দেখলাম, যা এর আগে কোনোদিনই শুনিনি বা কোথাও চোখেও পড়ে নি।

ব্যস, আমি এবার দলিলপত্র নিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলাম। হাজার হাজার সারাসিন বংশের বংশপঞ্জী ঘাটতে ঘাটতে এক সময় স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, যখন দেখলাম, এত পরিশ্রম করেছি কিন্তু উল্লেখযোগ্য আমাদের নজরে পড়ে নি।

সত্যি এবার খোঁজ পাওয়া গেল। ব্যস, ব্রাইটনের ট্রেন ধরলাম।

সভার শেষে আপনাকে দরজা দিয়ে বেরোতে চাক্ষুষ করে বুঝতে পারলাম, আমাদের এতদিনের খোঁজাখুর্জির পাট চুকে গেছে। আপনি-ই যে আপনার পূর্বপুরুষের ল্যাঙ্গেভল বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী তাতে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশও আর রইল। না। ভারতীয়-চিত্রশিল্পীর আঁকা একটা প্রতিকৃতি আমার কাছে রয়েছে। তাই আপনাকে দেখেই সনাক্ত করে ফেলেছি। এতটুকুও ভুল আমার হয় নি।' কথা বলতে বলতে সলিসিটর উইলিয়ম হেনরি ডা. সারাসিন-এর হাতে একটা প্রতিকৃতি তুলে দিল।

রাজবেশে ভূষিত দীর্ঘদেহী পুরুষের প্রতিকৃতি। গলাপর্যন্ত চমৎকার দাড়ি তার মুখমণ্ডলে। সেনাপতির গাম্ভীর্য নিয়ে চেয়ারে উপবিষ্ট। আর পিছনে যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য। অস্পষ্ট কিছু অশ্বারোহী সৈন্যও দেখা যাচ্ছে।

উইলিয়ম হেনরি কিছু কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দয়া করে এগুলো পড় ন। আমার মুখের কথার চেয়ে ঢেড় বেশি তত্ত্ব এগুলোর মধ্যে পেয়ে যাবেন। দু-ঘন্টা বাদে আমি ফের আসব। আপনার আদেশ পালন করার জন্য।' কিছু ছাপানো ও কিছু পাণ্ডুলিপির বান্ডিলটা ডা. সারাসিন-এর হাতে দিয়ে সলিসিটর উইলিয়ম হেনরি চৌকাঠ ডিঙিয়ে বারান্দায় পা দিল। বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'রাজা ব্রায়া জবাহির মথুরানাথকে শুভেচ্ছা জানাতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি।'

www.pathagar.com

ড. সারাসিন দরিলপত্রের বান্ডিলটা হাতে নিয়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে লাগলেন। ধীরে ধীরে কাগজগুলো খুলে চোখ বুলাতে গিয়ে নিঃসন্দেহ হলেন। হাতে লেখা ও ছাপানো কাগজগুলোতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, সলিসিটর উইলিয়ম হেনরি সামান্যতম মিথ্যা বা মনগড়া কাথা বলে নি। ছাপানো একটা দলিলে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ রয়েছে, 'আঠারো শ' সত্তরের পাঁচই জানুয়ারি মহারাণী প্রিভি কাউন্সিলের মহামান্য লর্ডদের সামনে বেগম গোকুল-এর ওয়ারিশ সম্পর্কিত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা হয়। তিনি বাংলা মুল্লুকের রাগিনারার বেগম। প্রচুর পরিমাণে জমি, বহু অট্টালিকা, বহু গ্রাম, বহু ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, অগাধ ধনসম্পত্তি ও অস্ত্রপাতি প্রভৃতি তাঁর সম্পত্তি।

দিল্লি আর আগ্রার কোর্টে প্রমাণিত হয়েছে যে, বেগম গোকুল রাজা লক্ষ্মী সুর-এর বিধবা স্ত্রী। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রচুর সম্পত্তির মালিকানা লাভের পর তিনি জাঁ জ্যাকুইস ল্যাঙ্গেভল নামে এক ফরাসিকে বিয়ে করে নতুন করে সংসার পাতেন।

জাঁ জ্যাকুইস ল্যাঙ্গেভল ফরাসি অশ্বারোহীর বাহিনীর ড্রাম মেজর হিসাবে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি নানতেস থেকে ফরাসি বাণিজ্য-জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কলকাতায় হাজির হন। এবার তিনি রাজা লক্ষ্মী সুর-এর দেশীয় সৈন্যবিভাগের সামরিক উপদেষ্টার পদ লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। রাজা পরলোক গমন করলে তাঁর বিধবা বেগমকে বিয়ে করেন। আগ্রাতে অবস্থানকারী বহু ইংরেজ ল্যাঙ্গেভল-এর দ্বারা উপকৃত হন। তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বৃটিশ সরকার তাঁকে বৃটিশ নাগরিকত্ব প্রদান করেন। আর তাঁকে 'রাজা' উপাধি প্রদানে ভূষিত করেন।

আঠারো শ' উনচল্লিশে বেগম পরলোক গমন করেন। তাঁরই দু-বছর বাদে ল্যাঙ্গেভল পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

উত্তরাধিকার বলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাদের অল্পবুদ্ধি, বোকাহাঁদা একমাত্র পুত্র, জম্মাবধিই একরকম ছিল। তাই বিষয়-সম্পত্তির দেখ ভালো করার জন্য অছি নিযুক্ত হল। বোকাহাঁদা ছেলেটা আঠারো শ' উনসত্তরে মারা যায়। এবার অগাধ সম্পত্তি বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে। দিল্লি ও আগ্রা আদালতের হুকুমনামা অনুযায়ী এবং স্থানীয় সরকারের অনুমোদন লাভের মাধ্যমে প্রিভি কাউন্সিলের কাছে যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বেঁচে দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করা হচ্ছে।

দিল্লি ও আগ্রা আদালতের কাগজপত্র, বিক্রির দলিলদস্তাবেজ আর উত্তরাধিকার খোঁজ করতে গিয়ে সমগ্র ফরাসি মুল্লুক চষে ফেলা হয়েছে। এ সমস্ত বিস্ময়কর বিবরণ পড়ার পর ড. সারাসিন-এর মধ্যে সামান্যতম সন্দেহও অবশিষ্ট থাকল না।

ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের স্ট্রংরুমে বাহান্ন কোটি সত্তর লক্ষ ফ্রাঁ সঞ্চিত আছে। কয়েকটা মাত্র জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেখাতে পারলেই তাঁর হাতে ফ্রাঁর-র পাহাড় এসে যাবে। বরাত এভাবে হঠাৎ ঘুরে গেলে যে কোনো মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগার হবে। ডা. সারাসিন-এর মধ্যে অস্থিরতা ভর করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে স্বাভাবিক করে তুললেন। চেয়ারে বসে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। যেন একটা সৎ ও মহৎ চিন্তা তাঁর মধ্যে ভর করল। ভাবনায় তলিয়ে গেলেন তিনি।

তিনি যখন আপন ভাবনায় বিভোর হয়ে পড়েছেন ঠিক তখনই দরজার কড়া প্রচণ্ড শব্দে বেজে উঠল। সলিসিটর উইলিয়ম হেনরি ফিরে এসেছেন।

www.pathagar.com

দরজা খুলেই ড. সারাসিন অনুশোচনার স্বরে বললেন, 'মি. শার্প, আপনার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করেছ বলে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার মন থেকে সন্দেহ নিঃশেষে উবে গেছে। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ এই জন্য যে, আমাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য অনেক কষ্ট আপনাকে ভোগ করতে হয়েছে।'

'একী বলছেন। এটা যে আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আশা করব, মহামান্য রাজা সাহেবও আমাদের মক্কেল থাকছেন ?'

'একী আর স্বীকারের অপেক্ষা রাখে মি, শার্প। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ব্যবস্থাদি করার ভার আপনাদের ওপরই অর্পণ করলাম। তবে আমার একটা মাত্রই অনুরোধ থাকছে, অনুগ্রহ করে আমাকে ওই 'অদ্ভুত উপাধি'-তে সম্বোধন করবেন না।'

'সে কী! দু-কোটি পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যের উপাধিকে আপনি 'অদ্ভুত' বলছেন!'

উইলিয়ম হেনরি যাবতীয় কাগজপত্র ড. সারাসিন-এর কাছে রেখেই লন্ডনের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। তার কাছে এগুলোর নকল রয়েছে, অসুবিধা হবে না।

উইলিয়ম হেনরি কাজের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে বিদায় নিলে ড. সারাসিন হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে লাগলেন। ব্রাইটন, আটাশে অক্টোবর, আঠারো শ' একাত্তর সালের তারিখ উল্লেখ করে চিঠি লেখা শুরু করলেন চিঠির শুরুতেই তিনি লিখলেন পরম স্নেহভাজনেষু—

আমি সবে মাত্র অবিশ্বাস্য রকমের অগাধ ধনসম্পদের অধিকারী হয়ে গেলাম। তাই বলে মনে করো না আমার মাথার দোষ দেখা দিয়েছে। ছাপানো কাগজপত্র সঙ্গেই দিয়ে দিলাম। এগুলো পড়লেই বুঝতে পারবে যে, আমি ভারতীয় একটা উপাধির উত্তরাধিকারী হয়েছি। আর ইংল্যান্ডের ব্যাঙ্কে আমার নামে বহুকোটি ফ্রাঁ সঞ্চিত আছে।

খবরটা শোনার পর তোমার মানসিক পরিস্থিতি কেমন হবে সে ব্যাপারে সহজেই অনুমান করতে পারছি। তবে স্মরণ রেখো, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ায় আমাদের ওপর অনেক কর্তব্য বর্তে গেল। আর তার সঙ্গে অনেক বিপদও সামনে অপেক্ষা করছে। ওই বিপুল অর্থের সদ্ব্যবহার করতে না পারলেই বিপদ আমাদের আষ্টেপৃষ্টে চেপে ধরবে। প্রায় এক ঘণ্টা আগে আমি ব্যাপারটা জানতে পেরেছি। গোড়াতে আনন্দে মনটা নাচানাচিই করছিল। বিরাট দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে চাপছে ভেবে আনন্দটুকু ক্রমেই মিইয়ে আসছে। এ ধনসম্পদ আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন না করে দুর্ভাগ্যের মুখেও ঠেলে দিতে পারে। এ অগাধ অর্থ যদি আমাদের হাতে শক্তিশালী যন্ত্রে রূপান্তরিত হয় তবে সভ্যতাকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। সভ্যতার অগ্রগতিতে অতিকায় যন্ত্ররূপে অর্থ যদি নিযুক্ত হয় তবেই চরম সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে বিশদভাবে আলোচনা করব। পত্র মারফৎ তোমার মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা আমাকে জানাবে। এ খবরটা তোমার মাকে তুমি জানাবে। তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। আমি জানি, তিনি অবশ্যই বিচলিত হয়ে পড়বেন না।

ম্যাক্সকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাবে। ভবিষ্যৎ কালের জন্য যা কিছু পরিকল্পনাই করি না কেন, সব কিছুর সঙ্গেই ম্যাক্স জড়িয়ে থাকবে।

ইতি—

তোমার শুভানুধ্যায়ী পিতা

ফ্রাঁসোয়া সারাসিন

www.pathagar.com

প্রাপকের ঠিকানা লেখা হল—

মঁসিয়ে অক্টোভিয়াস সারাসিন

ছাত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

বত্রিশ, রু ডু রয় সিসিলি, প্যারিস।

চিঠিটা লেখা শেষ করেই ডা. সারাসিন সম্মেলনের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন। মিনিট পনেরর মধ্যেই অগাধ অর্থসম্পদের কথা ভুলে গেলেন।

ঠিক ন্যাকাবোকা বলতে যা বুঝায় ড. সারাসিন-এর ছেলে অক্টোভিয়াস আদৌ তা নয়। সে বাকা হাঁদা নয়, আবার চালাকচতুর বলতে যা বুঝায় তা-ও নয়। আর চেহারা ছবি ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেখেলেই অনুমান করা যায় মাধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গোড়ার দিকটা বিফলে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ফল করতে না পারলেও কোনোরকমে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

সে এমনই এক চরিত্রের ছেলে যে, হঠাৎ করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। ড. সারাসিন ছেলের চরিত্র সম্বন্ধে যদি সম্পূর্ণ অবহিত থাকতেন তবে এমন চিঠি লিখতে উৎসাহী হতেন না। আর ছেলের নিজের চেষ্টায় কিছু করার ক্ষমতার অভাব আছে বলে মনে করতেন। তবে চিঠিটা লেখার আগে অবশ্যই একটু ভেবে নিতেন। কিন্তু এমনও তো দেখা যায় পুত্র স্নেহে জ্ঞানী-বুদ্ধিমান পিতাও অন্ধ হয়ে পড়েন। ডা. সারাসিনও তার ব্যতিক্রম নয়।

একদিক থেকে বিচার করলে অক্টোভিয়াস-এর বরাত খুব ভালো। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় সে এমন এক দুষ্টের সংস্রবে এসে পড়েছিল যার শাসন নির্মমভাবেই করা হয়েছিল। তবে তার হিতসাধনের জন্যই সেটা করা হয়েছিল। তার বন্ধুটার নাম ম্যাক্স ব্রাকম্যান। বয়সের দিক থেকে সে অক্টোভিয়াস-এর এক বছরের ছোট। কিন্তু তার বিদ্যা ও জ্ঞান-বুদ্ধিএমন কি দৈহিক শক্তি প্রভৃতিও ছিল অনেক বেশি।

বার বছর বয়সে ম্যাক্স অনাথ হয়। তখন থেকে সে ডা. সারাসিন-এর বাড়িতে আশ্রয় নেয় ও ছেলের মতো হয়ে যায়। সে আগে অ্যালসেশ-এ থাকত। সে ড. সারাসিন ও তাঁর সহধর্মিনীকে দেবজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করত। তাঁদের ফুলের মতো টুকটুকে মেয়েটাকে সে ভালোবাসত। কলেজে পড়তে গিয়ে পড়াশুনা ও খেলাধুলায় প্রথম স্থান লাভ করা তার কাছে সাধারণ ব্যাপার হয়ে ওঠে। প্রতি বছর একগাধা করে পুরস্কার না আনতে পারলে সে জীবনের সার্থকতাই যেন খুঁজে পেত না। অক্টোভিয়াস যে বছর কলেজে ভর্তি হয় ম্যাক্সও সে বছরেই কলেজে পা দেয়। ম্যাক্সই সর্বক্ষণ পিছনে লেগে থাকে। ঠেলে ধাক্কিয়ে বন্ধুকে সাফল্য লাভের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে।

আঠারো শ' সত্তরে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। তাখন তারা পড়াশুনার পাট সবে শেষ করেছে। ম্যাক্স দেশপ্রেমের তাগিদে সামরিক বাহিনীর খাতায় নাম লেখাল। তার সঙ্গে অক্টোভিয়াসও যুদ্ধে যোগদান করল।

যুদ্ধ মিটে গেল দুই বন্ধু আবার লেখাপড়া আরম্ভ করল। কলেজের লাগোয়া একটা সাধারণ ঘর ভাড়া করে পড়াশুনায় মেতে গেল। এখানেও ম্যাক্স বন্ধুর পিছনে লেগে থেকে তাকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে চেষ্টার ত্রুটি করল না।

সেদিনটা ছিল আঠারো শ' একাত্তরের উনত্রিশে অক্টোবর। সেদিন সন্ধ্যা সাতটায় দুই বন্ধু একই টেবিলের দু-দিকে বসে ব্যবহারিক গণিতের কঠিন একটা সমস্যার সমাধানে ডুবেছিল। ঠিক সে মুহূর্তেই দরজার কড়া নড়ে উঠল। ডাক-পিওন একটা চিঠি

www.pathagar.com

দিয়ে গেল। খামের ওপরে মঁসিয়ে অক্টোভিয়াস সারাসিন-এর নাম লেখা। চিঠিটার ওপরে একবার মাত্র চোখ বুলাতেই তার মুখে বিষণ্ণতার কালো ছায়া নেমে এল। চিঠিটা ও খামের ভেতরের ছাপানো দলিলগুলো ম্যাক্স-এর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'বাবার চিঠি। নাও, পড়ে দেখ।'

ম্যাক্স ব্যস্ত চোখের মণি দুটোকে চিঠিটা ও দলিলগুলোর ওপর বুলিয়ে নিল।

অক্টোভিয়াস জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ম্যাক্স-এর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই কি ব্যাপারটার মধ্যে সত্যতার আভাস পাচ্ছিস?'

'সত্যি মানে, সম্পূর্ণ সত্যি। তোর বাবা খুবই বুদ্ধি রাখেন। হঠাৎ করে এমন একটা চিঠি লেখার মানুষ তিনি অবশ্যই নন।'

পাথরের মূর্তির মতো বসে থেকে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে অক্টোভিয়াস কেটে কেটে উচ্চারণ করল, 'কিন্তু ম্যাক্স, এ একেবারেই অসম্ভব—অবাস্তব! এত কোটি ফ্রাঁ—ভাবাই যে সম্ভব নয়।'

'কথাটা ঠিকই বটে। এত কোটি ফ্রাঁ-র মালিক ফ্রান্সে একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইংল্যান্ডে সর্বসাকুল্যে পাঁচ-ছ' জন আর আমেরিকায় কয়েকজন মাত্র রয়েছেন। সারা পৃথিবীতে পনের-বিশজনের বেশি কিছুতেই নেই।'

'আরে ভাই, কেবলমাত্র অর্থই তো নয়, অর্থের উপরিস্বরূপ উপাধিও মিলেছে। বিদেশী উপাধি, কি যেন বলে? হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে 'রাজা'। একবারটি ভেবে দেখ তো শুধুমাত্র 'সারাসিন'-এর বদলে 'রাজা সারাসিন' শুনতে কত ভালো শোনাচ্ছে, ভেবে দেখ তো?'

ম্যাক্স অন্যমনস্কভাবে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'ধ্যুৎ! ভালো না ছাই!'

'উত্তরাধিকার সূত্রে যদি ভারতবর্ষের রাজা-বাদশার সম্মান যদি মেলে—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ম্যাক্স আগের মতোই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠল—'ধ্যুৎ! ধ্যুৎ!' কথাটা অক্টোভিয়াস-এর দিকে ছুঁড়ে দিয়েই সে আবার অঙ্ক খাতায় মুখ গুঁজল।

এদিকে অক্টোভিয়াস-এর মন-প্রাণ জুড়ে বসল ফ্রাঁ-র চিন্তা। তার অস্থিরতাটুকু লক্ষ্য করে ম্যাক্স মুচকি হেসে বলল, 'বাইরে গিয়ে মুক্ত বাতাসে একটু পায়চারি করে আয়। অস্থিরতাটুকু কাটবে। মাথা ঠাণ্ডা হবে।'

অক্টোভিয়াস জামাটা গায়ে চাপাতে চাপাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পথের ধারের গ্যাসের আলোয় তার বাবার চিঠিটার ওপর আর একবার চোখ বুলালো। পড়া শেষ করে আপন মনে বলে উঠল, 'স্বপ্ন মোটেই নয়! বরং সম্পূর্ণ সত্যি! —পঞ্চাশ কোটি ফ্রাঁ! তা থেকে সুদ মিলবে আড়াই কোটি। তা থেকে আমাকে দশ লক্ষ দিলেই তো রাজা-বাদশার মেজাজে দিন কাটানো যাবে।'

ভাবতে ভাবতে অক্টোভিয়াস জমকালো অঞ্চল বুলেভার্ডে হাজির হল। পকেট ফাঁকা বলে এতদিন সেসব বহুমূল্য জিনিসের দিকে ভুলেও মুহূর্তের জন্যও তাকায় নি। এখন সেগুলোই দেখে ভাবছে অনায়াসেই সেগুলো খরিদ করে মালিক বনে যাওয়া সম্ভব। চাইলেই পুরো প্যারিসটাই আমার হয়ে যেতে পারে। তবে কি দোয়াহি যাত্রা করব? কিন্তু কলেজে যাওয়ার ব্যাপারটা যে থেকে যাচ্ছে। ধ্যুৎ! জাহান্নামে যাক কলেজ। কলেজে যাওয়ার আর দরকারই বা কি?

www.pathagar.com

তবে হ্যাঁ, ম্যাক্সকে খবরটা দেওয়া দরকার। তাকে জানানো দরকার, এ পরিস্থিতিতে আমি নিজেকে সামলে সুমলে রাখতে না পেরে মা-বোনকে সুখবরটা পৌঁছে দিতে চললাম।

পোস্ট-অফিসে ঢুকে অক্টোভিয়াস ঝটপট একটা টেলিগ্রাম করে দিল, কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরব। ব্যস, এবার একটা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে সোজা রেল স্টেশনের দিকে ছুটল।

অদ্ভুত চিন্তাটা মাথায় নিয়ে রাত্রি দুটোয় বাড়ি পৌঁছাল। দীর্ঘ সময় ধরে কড়া নাড়ানাড়ি করে তবে সদর-দরজা খোলাতে পারল।

গভীর রাত্রে অক্টোভিয়াস বাড়িতে ফেরায় তার মা-বোন যারপরনাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। চিঠিটা পড়ার পর তাদের ব্যাপারটা পরিষ্কার হল।

চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে তার মা মিসেস সারাসিন হতভম্ব হয়ে পড়লেন। ফলে মা ওদেশে পঞ্চাশ কোটি ফ্রাঁ-এর চিন্তায় রাত্রিটুকু মেতে রইল।

মায়ের প্রশ্নের উত্তরে অক্টোভিয়াস বলল, 'ম্যাক্স চিঠিটা পড়ে তেমন উৎসাহই দেখায় নি। দার্শনিকের মতো ভালো-মন্দ আর সুখ-দুঃখ সবই তার কাছে সমান। তার মতে এরকম অগাধ অর্থের মালিক হলে আমাদের সর্বনাশই হয়ে যাবে।'

'হয়তো বা ম্যাক্স-এর কথাই ঠিক। হঠাৎ কাঁড়ি কাঁড়ি ফ্রাঁ হাতে এলে খারাপ অনেক কিছু কাঁধে চাপে।'

মিসেস সারাসিন-এর কথাটা শেষ হতে না হতেই তাঁর মেয়ে জেনেট-এর ঘুম চটে গেল। সে মায়ের ঘরের দরজায় এসে ঘুমজড়িত গলায় বলতে লাগল, 'মা একদিন তুমিই তো বলেছিলে, ম্যাক্স কোনো ব্যাপারেই ভুল করে না। ম্যাক্স-এর বক্তব্য আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি।' এই কথা বলে সে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

এদিকে অদ্ভুত একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন ড. সারাসিন। স্বাস্থ্য সম্মেলনে উপস্থিত হয়েই তিনি লক্ষ্য করলেন, উপস্থিত সবাই তাকে একটু বেশি রকমই তোয়াজ করতে শুরু করেছে। সম্মেলনের যে প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান রাইট লর্ড গ্ল্যানডোভার ইতিপূর্বে তাকে মোটেই আমল দিতেন না, তিনিই আজ ডাক্তারকে খোসামোদ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। মোদ্দা কথা, এক সময় যিনি ছিলেন খুবই নগন্য, আজ তিনিই যেন বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন

আকস্মিক উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ড. সারাসিন রীতিমতো হকচকিয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, এতদিন পর তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্মেলনের সভ্যরা সচেতন হয়েছেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই লর্ড গ্ল্যানডোভার-এর বক্তব্য শোনার পর তাঁর ধারণা পাল্টে গেল। তিনি ড. সারাসিন-এর দিকে ঝুঁকে, কানের কাছে মুখ এনে প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, 'খবরটা শুনেছি। এখন থেকে আপনার দাম দুকোটি দশ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং। চমৎকার! চমৎকার খবর!'

ড. সারাসিন যেন আচমকা আকাশ থেকে প'ড়লেন। এমন কি গত সভায়ও তিনি কারো কাছে বলেন নি যে, তিনি অগাধ অর্থের মালিক। তাঁর পকেট ফাঁকা বলেই তো কেউ তাঁকে পাত্তা দিত না। কিন্তু খবরটা কে ছড়াল?

তখনই বার্লিনের অধিবাসী ড. ওভিভিয়াস ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'আপনি তো রথচাইল্ডদের সমকক্ষ হয়ে গেলেন মশাই, ডেইলি টেলিগ্রাফ

www.pathagar.com

চমৎকার লিখেছে। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।' কথা বলতে বলতে ডেইলি টেলিগ্রাফ সংবাদপত্রটা ড. সারাসিন-এর দিকে এগিয়ে দিলেন।

ড. সারাসিন সংবাদটুকুর ওপর একবার মাত্র চোখ বুলিয়েই রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সাংবাদিক খুটিনাটি কোনো কিছুই বাদ দেন নি দেখা যাচ্ছে।

ব্যাপারটা সবার জানাজানি হয়ে যাওয়ায় তাঁর মনটা অস্বাভাবিক রকম বিষিয়ে উঠল। ভাবলেন, এখন থেকে প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক হিসাবে নয়, ধনকুবের রূপেই সবাই সমীহ করবে তাঁকে। কথাটা মনে জাগতেই তিনি একদম ভেঙে পড়লেন। অচিরেই তাঁর মনের কোণে উঁকি মারল, কোটি কোটি ফ্রাঁ-কে কাজে লাগানোর যে পরিকল্পনা তিনি করে ফেলেছেন।

গ্লাসগোর ড. স্টিভেনসন তখন তাঁর গবেষণার বক্তব্য পাঠ করে চলেছেন।

এবার ড. সারাসিন অল্প কথায় বহু কোটি ফ্রাঁ-এর মালিক। আইনবলে এ অর্থের মালিক আমি হলেও আসলে আমি একজন বাহকমাত্র। মনে করতে পারেন, বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য এ-অর্থ ব্যয় করার ভার আমার ওপর দেওয়া হয়েছে। এই অর্থের মালিক আমি নই, মানুষের কল্যাণের জন্য আমি এই অগাধ অর্থ উৎসর্গ করেছি।' তাঁর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই সভাকক্ষ যেন সদস্যদের হাসি, উচ্ছ্বাস আর করতালিতে ফেটে পড়তে লাগল।'

ড. সারাসিন চোখে-মুখে বিতৃষ্ণার ছাপ ফুটিয়ে তুলে বলে উঠলেন, 'আমাকে করতালি দিয়ে মিথ্যা সম্ভাষণের প্রয়োজন নেই আমি না হয়ে অন্য যে কোনো বিজ্ঞানমনস্ক ও বিজ্ঞানপ্রেমী হলেও এ-পথই অবলম্বন করতেন। আমি নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করছি, এ-অর্থ আমার নয়, বিজ্ঞানের। এর যথাযথ ব্যবহারের দায়িত্বভার আপনারা কি গ্রহণ করতে আগ্রহী বলুন ? এরকম অগাধ অর্থের ব্যাপারে আমি আমার নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল নই। তাই আপনাদের অছিরূপে নিযুক্ত করেত আগ্রহী। এ-অগাধ অর্থকে কীভাবে ব্যয় করবেন আপনারাই সাব্যস্ত করুন।'

তাঁর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই ঘনঘন করতালি আর হর্ষধ্বনিতে হলঘরটা যেন ফেটে পড়তে লাগল। নেপলসের ড. সিকোনগনার আর গ্লাসগোর প্রফেসর টার্ণবুল তো উল্লাসে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলার মতোন হলেন। কেবলমাত্র গ্র্যানডোভারই স্বাভাবিকতা বজায় রেখে অবিচল রইলেন। কারণ, তাঁর বিশ্বাস, ড. সারাসিন রসিকতায় মেতেছেন।

ড. সারাসিন আবার বক্তব্য শুরু করলেন, 'আমি একটা পরিকল্পনা নিয়ে রেখেছি। আপনারা তো জানেন, রোগ-ব্যাধি প্রভৃতি অনেক কারণেই মানুষের মৃত্যু হয়ে থাকে। সবচেয়ে আগে যে ব্যাপারে আমাদের চিন্তা ভাবনা করা উচিত তা হচ্ছে নগর পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যবিধির ব্যবস্থার অভাব। জল ও বাতাসের অব্যবস্থার জন্যই লক্ষ লক্ষ নগরবাসী ব্যাধির শিকার হচ্ছে, সংক্রামক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিছানা নিচ্ছে। যারা জীবিত তারাও অথর্ব-পঙ্গু হয়ে সমাজের সমস্যা হয়ে উঠছে। কেন মানুষের এমন ভোগান্তি ? আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, স্বাস্থ্যবিধির অপপ্রয়োগই এর একমাত্র কারণ। সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে মুক্তবায়ু এবং বিশুদ্ধ জল একান্ত অপরিহার্য। আসুন, আমরা এগিয়ে গিয়ে সবার আগে নগরের মানুষের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ব্রতী হই।'

তাঁর বক্তব্যের মাঝখানেই উপস্থিত সদস্যরা তাঁকে বার বার বাহবা দিতে লাগলেন।

www.pathagar.com

ড. সারাসিন বলে চললেন, 'আসুন, আমাদের সবার মিলিত প্রয়াসে এমন একটা আদর্শ নগর গড়ে তুলি, যার চারদিকে অনুরূপ নগর প্রতিষ্ঠায় সবাইকে অনুপ্রেরণা জোগাবে।'

উপস্থিত সবাই করতালির মাধ্যমে তাঁকে এমন সাধুবাদ জানাতে লাগলেন যে হলঘরটা যেন ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা হল।

পরিস্থিতি শান্ত হলে ড. সারাসিন আবার বক্তব্য শুরু করলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আদর্শ নগরীর ছবি কল্পনা করা খুব সমস্যার ব্যাপার নয়, আর সে কল্পনা অদূর ভবিষ্যতে বাস্তব রূপ নেবে। আদর্শ নগরীতে থাকবে শান্তি, সুখ, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি। আদর্শ নগরীর বর্ণনা পৃথিবীর সব ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রচারিত হবে। পৃথিবীর সব অঞ্চলের, সব শ্রেণীর মানুষকে সাদর আহ্বান জানাব আদর্শ নগরীতে। পৃথিবীর বহু অঞ্চলের মানুষের মাথা গোঁজার জায়গা মেলে না, সেসব জায়গায় কোটি কোটি মানুষ গিজগিজ করছে। সেসব অদৃষ্ট বিড়ম্বিত মানুষ বিদেশী শত্রুর আক্রমণে পরাজিত হয়ে নির্বাসিত হয়েছে তারাও এসে আশ্রয় নিক আদর্শ নগরীতে। তাদের কেবলমাত্র মাথা গোঁজার ঠাঁই-ই নয়, কর্মসংস্থানও করে দেব। তাদের বলশক্তি আর বিদ্যাবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আদর্শ নগরীকে যথাযথভাবে গড়ে তুলব। তাদের বুদ্ধিমত্তাকে ঠিকঠাকভাবে কাজে লাগাব। এসব মানুষের আত্মজ্ঞান ও আত্মশক্তি সোনা-রূপা আর হীরে জহরতের চেয়ে ঢেড়, ঢেড় বেশি দামি।

এ নগরীর বুকে আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলব। দেশের যুবসমাজকে প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান করব, তাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চার করব। তাদের উত্তরসূরীরা যাতে অথর্ব পঙ্গু না হয় সেভাবে তাদের দেহ-সত্তা ও বুদ্ধিসত্তার বিকাশ সাধন করব।'

ড. সারাসিন-এর সারগর্ভ উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ শেষ হতে না হতেই হর্ষধ্বনি ও করতালিতে হলঘরটা মুখরিত হয়ে উঠল।

মিনিট পনের ধরে চলল করতালি আর হর্ষধ্বনি। পরিস্থিতি শান্ত হলে লর্ড গ্ল্যানডোভার তাঁর দিকে ঝুঁকে, কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, 'মশাই, বেড়ে মতলব এঁটেছেন! বাড়িভাড়ার ব্যাপারটা একবারটি ভেবে দেখুন তো! ভালো কথা, আমাকে একটা ভালো বাড়ি দিতে হবে কিন্তু, মনে থাকে যেন।'

হায় ড. সারাসিন! তাঁর এমন আদর্শ চিন্তাধারাকে কেউ স্বার্থপরতার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করবেন, এ যে তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি।

মানবদরদী ড. সারাসিন-এর পরিল্পনাকে সাধুবাদ জানাতে গিয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়িয়ে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, 'এরকম উচ্চাদর্শ ও মহৎ পরিকল্পনার জন্য অনন্তকাল ধরে ব্রাইটন সম্মেলন সম্মানিত হল। কী অবাক কাণ্ড, এতদিন আমাদের কারোর মাথায় এমন একটা ভাবাদর্শের কথা উদিতই হয় নি!

রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আর বিপদে কোটি কোটি মুদ্রার অপচয় ঘটছে। সেগুলোকে যদি এরকম মানব কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা হত তবে কি মানব সভ্যতার আরও উন্নতি হত না? এ কী কম আনন্দের কথা, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য টাকা ব্যয় না করে মানুষের হিতকর কাজের জন্য এই প্রথম পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ ব্যয় হতে চলেছে!' সবশেষে তিনি অধিকতর ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, 'মানব কল্যাণকর যে আদর্শ নগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা আমরা করছি তার নামকরণ করা হোক, 'সারাসিন নগরী'।'

www.pathagar.com

প্রস্তাবটা করতালি ও হর্ষধ্বনির মাধ্যমে গৃহীত হওয়ার আগেই ড. সারাসিন প্রবল আপত্তি জানাতে গিয়ে বলে উঠলেন, 'অসম্ভব! কিছুতেই হতে পারে না। পরিকল্পনার সঙ্গে আমার নামটাকে ব্যবহার করা চলবে না। গ্রীক বা ল্যাটিন পুরাণের কোনো নামকেও আমরা ব্যবহার করব না। নতুন ভাবাদর্শে গঠিত আদর্শ নগরীর নামকরণ করা হোক আমার দেশের নামানুসারে 'ফ্রাঙ্কভিল' নগরী।'

উপস্থিত সবাই ড. সারাসিন- এর প্রস্তাবটি এক বাক্যে মেনে নিলেন। সবাই এবার আদর্শ নগরীটির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনায় মন দিলেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে, 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত সংবাদটা অনূদিত হয়ে ছাপা হতে লাগল।

তেসরা নভেম্বর। জেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক সুলৎস-এর কাছে সংবাদটা পৌছলো। তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ কি ছেচল্লিশ। উঁচু লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা। তবে চোখ, মুখ, দাঁত ও চুল প্রভৃতি মিলে তাঁর চেহারাটা প্রথম দর্শনেই মনে বিরক্তি সঞ্চার করে।

অধ্যাপক সুলৎস লেখার টেবিলে বসে ঘড়িটার দিকে মুহূর্তের জন্য চোখের মণি দুটোকে ঘুরিয়ে বিরক্তিভরে স্বগতোক্তি করলেন, 'ছয়টা পঞ্চান্ন! খবরের কাগজ আর চিঠিপত্র আসার কথা ছিল ছ'টা ত্রিশে। পঁচিশ মিনিট দেরি করে ফেলেছে! আবারও যদি দেরি করে তবে ভাগিয়ে দেব। ঠিক সাড়ে ছ'টায় আমার চিঠিপত্র আর খবরের কাগজ চাই-ই চাই।'

আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে কাগজ-কলম নিয়ে মেতে গেলেন। 'ফিজিওলজিক্যাল রেকর্ড' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধটা লেখার কাজে। পরের দিনের পত্রিকার পাতাতেই এটা চাপা হবে। উক্ত প্রবন্ধটার শিরোনাম হবে, 'প্রত্যেক ফরাসির ভেতরেই বিভিন্ন পরিমাণে পরুষানুক্রমিক অবক্ষয় কেন হয়ে চলেছে?'

প্রবন্ধটা লেখা শেষ হতে মাঝরাত্রি পেরিয়ে গেল।

খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে অধ্যাপক মশাই শুয়ে পড়লেন। ঘুম জড়ানো চোখের মণিদুটোকে আলতোভাবে খবরের কাগজটার গায়ে বুলাতে লাগলেন। কয়েকটা শব্দের ওপর তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ হল—'সোনার খনির উত্তরাধিকারী' এবং 'ল্যাঙ্গেভল'। 'ল্যাঙ্গেভল' নামটা বিদেশী হলেও তাঁর কাছে কেমন যেন পরিচিত বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে না পারায় হাতের কাগজটা রেখে, আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

অধ্যাপক সুলৎস স্বপ্নের মধ্যেও 'ল্যাঙ্গেভল' নামটা দেখতে পেলেন ও গভীরভাবে ভাবলেন।

সকাল হল। ঘুম থেকে উঠেও অধ্যাপক সাহেব 'ল্যাঙ্গেভল' নামটা আপন মনে বার বার উচ্চারণ করে চললেন।

আচমকা সংবাদপত্রটা টেনে নিয়ে গতরাত্রের প্রবন্ধটাকে বার বার প'ড়লেন। মানসিক চাঞ্চল্য জেগে উঠল। এক লাফে দেওয়াল থেকে ছোট্ট প্রতিকৃতিটা নামিয়ে আনলেন। তার পিছনের দিককার ধুলোর আস্তরণ মুছে ফেলতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল ফরাসি ভাষায় লেখা একটা ছত্র। যার তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'থেরেসা সুলৎস (ল্যাঙ্গেভল)।'

ব্যস, আর এক মুহূর্ত দেরি না করে সন্ধ্যার ট্রেন ধরেই অধ্যাপক সুলৎস যাত্রা করলেন।

চলন্ত ট্রেনের কামরায় বসেও 'ল্যাঙ্গেভল' শব্দটা অধ্যাপক মশাইয়ের মাথায় বার বার চক্কর মারতে লাগল।

* * *

৬ নভেম্বর। সকাল সাতটায় শ্যারিংক্রস স্টেশনে ট্রেন থামল। অধ্যাপক সুলৎস ট্রেন থেকে নামলেন।

চুরানব্বই নম্বর সামামটন রো-তে পৌঁছোতে দুপুর হয়ে এল।

সলিসিটর উইলিয়ম হেনরি নিজের পড়ার গরের টেবিলে বসে জরুরি কিছু কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছেন।

অধ্যাপক সুলৎস দরজায় দাঁড়িয়ে নীরব চাহনি মেলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। উইলিয়ম হেনরি কাজের ফাঁকে বললেন, 'আমার হাতে প্রচুর কাজ জমে রয়েছে, খুবই ব্যস্ত। সময়ের অভাব। আপনার যা কিছু বক্তব্য সংক্ষেপে বলুন।'

অধ্যাপক সুলৎস বললেন, 'সময়ের অভাব হলেও আমি যে কথা বলতে এসেছি তা যদি শোনেন তবে আরও কয়েক মিনিট শোনার জন্য আপনাকে কিন্তু উদগ্রীব হতেই হবে।'

যন্ত্রচালিতের মতো মুখ তুলে আগন্তুক অধ্যাপক সুলৎস-এর দিকে তাকিয়ে আগের মতোই ব্যস্ততা প্রকাশ করে সলিসিটর উইলিয়ম হেনরি বলে উঠলেন, 'বলুন, যা বলবার সংক্ষেপে বলুন।'

'বালিডুক জাঁ জ্যাকুইস ল্যাঙ্গেভল-এর উত্তরাধিকারের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি। আমি তাঁর বড় বোন থ্যারেসা ল্যাঙ্গেভল-এর নাতি। সতের শ' বিরানব্বইয়ে আমার দাদু মার্টিন সুলৎস-এর সঙ্গে আমার দিদিমা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। আমার দাদু তখন ব্রামউইক-এর সামরিক বাহিনীতে সার্জেনের পদে চাকরি করতেন। আঠারো শ' চৌদ্দতে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার দিদিমাকে তাঁর ভাই যে তিনটে চিঠি লিখেছিলেন তা আমার জিম্মায় এখনও রয়েছে। আর আমার জন্ম আর বংশপঞ্জী সম্পর্কেও বহু আইনসিদ্ধ দলিল আমার কাছে রয়েছে।'

অধ্যাপক মশাইয়ের বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু জার্মান জাতি যে সবার মাথায় অবস্থান করছে তা প্রমাণ করা। একজন ফরাসি এমন বিপুল অর্থ নিয়ে গিয়ে নিজের দেশের উন্নতি বিধানে ব্রতী হবে এটা তো কিছুতেই বরদাস্ত করা চলে না। বিপুল অর্থের দাবিদার কোনো একজন জার্মান হলে তিনি মোটেই ফোঁ-ফাঁ করতেন না। তাই বলে একজন ফরাসি ? কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না।

হিসাব অনুযায়ী ড. সারাসিন ল্যাঙ্গেভল-এর অনেক কাছের আত্মীয়। সে দিক থেকে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা রয়েছে অধ্যাপক সুলৎস-এর সঙ্গে। তাই তাঁর দাবি তেমন জোড়ালো নয়। ঘাঘু সলিসিটর উইলিয়ম হেনরি সহজেই ব্যাপারটা উপলব্ধি করে নিলেন। তবে মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর মাথায় চমৎকার একটা ফন্দি খেলে গেল। দাবিদার দুজনের কাছ থেকে কায়দাকানুন করে দু-পয়সা বেশি খিঁচে নেওয়া কোনো সমস্যাই নয়। তাই কৌশলে ফন্দি মাফিক বক্তব্য রাখলেন, অধ্যাপক মশাই যদি তাঁর দাবিকে সঙ্গত প্রমাণ করার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হন তবে আদালত অবশ্যই তা নস্যাৎ করে দেবে।

www.pathagar.com

উইলিয়ম হেনরির কথার মারপ্যাঁচ বোঝার মতো বুদ্ধি, বিবেচনাশক্তি অধ্যাপক মশাইয়ের যথেষ্টই আছে। তাই মুচকি হেসে বললেন, 'মিছে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার দরকার কিছু আছে কি ? আপনি একজন বিচক্ষণ সলিসিটর। আপনি একটু আধটু কৌশল অবলম্বন করলেই তো অনায়াসেই সমস্যাটার সমাধান হয়ে যেতে পারে।'

সলিসিটর উইলিয়ম হেনরি অপক্ষোকৃত সহানুভূতির স্বরে বললেন যে সময় সুযোগ মতো সে অধ্যাপক সুলৎস-এর ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন।

অধ্যাপক সুলৎস বিদায় নিলেন। সলিসিটার উইলিয়ম হেনরি পরের দিনই ড. সারাসিনকে জরুরি তলব দিয়ে টেলিগ্রাম করলেন। ছুটে এলেন তিনি। আলোচনা হল। ড. ব্যাপারটা নির্দ্বিধায় মেনে নিলেন। উইলিয়ম হেনরি তাঁর বক্তব্য শুনে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ড. সারাসিন-এর স্পষ্ট মনে আছে, তাঁর বংশের দু-এক পুরুষ আগেকার একজন জার্মান মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তবে এ মুহূর্তে তাঁর নামটা মনে করতে পারছেন না।

বিপুল অর্থের নিজে একজন দাবিদার হয়ে অন্য একজনের দাবিকে অনায়াসে মেনে নেওয়ায় সলিসিটর উইলিয়ম হেনরি যারপরনাই বিস্মিত হলেন। ঘাঘু সলিসিটর তবু হাল ছাড়লেন না। তিনি তাঁকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, জার্মান দাবিদার যদি আদালতের শরণাপন্ন হয় তবে তার পরিণাম কী ভয়ঙ্করই না হতে পারে। এর নজীর হিসাবে বললেন, 'এরকম একটা মামলা ত্রিশ বছর চলেছিল। তবু নিষ্পত্তি হয় নি। শেষপর্যন্ত টাকার অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মামলার ব্যয়ভার বহন করতে পুরো সম্পত্তিটাই জলের দামে বিক্রি হয়ে যায়। আর এ মোকদ্দমাও তো কম হলেও বছর দশেক চলবেই। ইতিমধ্যে কোটি কোটি ফ্রাঁ ব্যাঙ্কে পড়ে থাকবে।'

সলিসিটর উইলিয়ম হেনরির বক্তব্য শুনে ড. সারাসিন মনের দিক থেকে একেবারে মুষড়ে পড়লেন। ভাবলেন, শেষপর্যন্ত তাঁর আদর্শ নগরী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বুঝি ভেস্তে যেতে বসেছে।

ড. সারাসিন বিষণ্নমুখে সলিসিটরের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। তিনি সার কথা বুঝলেন—তাঁর সামনে দুটো মাত্র পথ খোলা রয়েছে। আদালতের শরণাপন্ন হওয়া নতুবা আদর্শ নগরী পত্তনের পরিকল্পনাকে মাথা থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলতে হবে।

ড. সারাসিন বিদায় নিলে সলিসিটর উইলিয়ম হেনরি অধ্যাপক সুলৎসকে ডাকিয়ে আনালেন। তাঁর কাছে সত্য-মিথ্যা মিলে পাঁচালি জুড়ে দিলেন। সব শেষে বললেন, 'আরে মশাই, ড. সারাসিন তো সরাসরি বলেই ফেললেন, আপনার দিদিমাকে চেনা তো দূরের কথা, তাঁর নামই নাকি তিনি কোনোদিন শোনেন নি।'

অধ্যাপক সুলৎস বিচক্ষণ ব্যক্তি আর বুদ্ধিও রাখেন যথেষ্ট। তিনি কোনোরকম ভূমিকা না করেই সরাসরি বললেন, 'ব্যাপারটা একটু খোলাসা করে বলুন তো মশাই। ফরাসি ডক্টরেট সারাসিন-এর সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে গেলে আমাকে ট্যাঁক থেকে কত খসাতে হবে ?'

সলিসিটর তখনকার মতো নিজেকে সামলে রাখলেন। তাঁর প্রস্তাবের জাবাবে কিছুই বললেন না। অধ্যাপক বিদায় নেবার মুহূর্তে বুঝে নিলেন, দাবি তেমন জোরদার নয়।

www.pathagar.com

তবে এ-ও নিঃসন্দেহ যে, সলিসিটর উইলয়ম-এর ওপরই তার পাওনার ব্যাপারটা নির্ভর করছে।

আবার খবর পেয়ে ড. সারাসিন ছুটে এলেন। তার ফ্যাকাসে মুখ দেখে সলিসিটর ভড়কে গেলেন। ভাবলেন, চাপাচাপি করতে গিয়ে বুঝি ব্যাপারটা ভেস্তে যায়। তাই কোনোরকম ভণিতা না করেই সরাসরি বললেন, 'ডক্টর সারাসিন, জার্মান অধ্যাপক সমঝোতায় আসতে রাজি হয়েছেন। আপনি যদি রাজি থাকেন তবে বলুন।'

'আপনি যা ভালো বুঝবেন, করতে পারেন। আপনার ওপরই পুরো দায়িত্ব অর্পণ করছি।' ড. সারাসিন এদিন এরকমই চিন্তা করেছেন, সলিসিটর নির্ঘাৎ রফার প্রস্তাব দেবেন।

সলিসিটর উইলিয়ম হেনরিও তো মনে মনে এরকমটাই চাচ্ছিলেন। উল্লসিত হয়ে তিনি তখনই ব্যাপারটা ফয়সালা করলেন না। আরও সাতদিন ড. সারাসিন আর অধ্যাপক সুলৎসকে নাচিয়ে নিয়ে নিজের দাম আরও একটু চড়িয়ে নিলেন। দিন সাতেক পরে মওকা বুঝে ড. সারাসিনকে পত্রমারফৎ জানালেন অধ্যাপক সুলসৎ সমঝোতায় আসতে রাজি হয়েছেন।

শেষমেষ ষ্টিবলিং নামক একজন ব্যাঙ্কারকে খবর দিয়ে আনলেন। সে উভয় দাবিদারের প্রত্যেককে এক কোটি পাউন্ড স্টার্লিং করে দিতে সম্মত হল। অতিরিক্ত দশ লক্ষ রেখে দিল নিজের দালালি বাবদ।

উভয় দাবিদার সইসাবুত করে এক কোটি ফ্রাঁ-এর এক-একটা করে চেক পেয়ে গেলেন।

ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হল বটে, কিন্তু উইলিয়ম হেনরির অন্তরঙ্গ বন্ধু ষ্টিবলিং কিন্তু এতে খুশি হতে পারল না। মোদ্দা ব্যাপারটা হল, আশানুরূপ অর্থ আদায় করতে না পারার জন্য বন্ধুবর উইলিয়ম হেনরির ওপর সে ক্ষুণ্ণ। তার বক্তব্য হচ্ছে, এমন অপূর্ব সুযোগ হাতের মুঠোয় পেয়ে ড. সারাসিনকে ছেড়ে দেওয়া মোটেই বুদ্ধমানের কাজ হয় নি।

এদিকে ড. সারাসিন-এর আদর্শ নগরী পত্তনের অদ্ভুত পরিকল্পনার কথা অধ্যাপক ইতিমধ্যেই শুনেছেন। তাঁর মতো হচ্ছে এরকম একটা নগরীর কথা কল্পনা করা সহজ বটে, কিন্তু তাকে বাস্তব রূপ দেওয়া একেবারেই অলীক কল্পনা।

অধ্যাপক সুলৎস একজন কৃতি রসায়নবিদ। তিনি ইতিমধ্যেই বহু প্রবন্ধের মাধ্যমে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, জার্মানরা বিশ্বের অন্য সব ছোট ছোট দেশ ও জাতিকে গ্রাস করে ফেলবে। তার দিদিমার সঙ্গে দাদুর বিয়ের ব্যাপারটা দিয়েই তার বক্তব্যের ইঙ্গিত নজরে পড়েছিল। অর্থাৎ ফরাসি ও জার্মানরা ভবিষ্যতে ড. সারাসিন ও অধ্যাপক সুলৎস-এর মাধ্যমে মুখোমুখি হবে। ফরাসিদের জার্মানরা একেবারে ধ্বংস করে ছাড়বে। ড. সারাসিন-এর অর্ধেক অর্থ হাতিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। এখন তা দিয়েই তার সর্বনাশ সাধন শুরু করা যাক।

অধ্যাপক সুলৎস এবার থেকে ড. সারাসিন-এর পিছন পিছন ঘুরঘুর শুরু করলেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্যটা জানার জন্য তাঁর সব কয়টা অধিবেশনেই তিনি উপস্থিত হতে লাগলেন।

www.pathagar.com

একদিন অধিবেশনের শেষে ড. সারাসিন হলঘর থেকে অন্যান্যদের সঙ্গে বেরিয়ে আসার সময় অধ্যাপক ভয়ঙ্কর একটা পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করলেন, উদ্ভট নগরী ফ্রাঙ্কভিল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও এমন একটা আদর্শ ও দুর্ভেদ্য নগরীর পত্তন করবেন যা ড. সারাসিন-এর নগরীকে ধূলিস্যাৎ করে দেবে। অধ্যাপকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নতুন এক নজীর সৃষ্টি করবে।

ড. সারাসিন যথার্থই একজন বিশ্বপ্রেমিক। তবে এ-ও জানেন তার সতীর্থদের মধ্যে বিশ্বপ্রেম ছিঁটেফোঁটাও নেই। তাই তো অধ্যাপকের চোখ-রাঙানিকে তিনি মন থেকে মুছলেন না।

ড. সারাসিন কয়দিন বাদে ম্যাক্সকে একটা চিঠি লিখে অধ্যাপকের হুমকির কথা জানালেন। তাঁর চেহারা ও চরিত্র সম্বন্ধেও সাধ্যমত লিখলেন। সব শেষে তিনি এ-ও লিখলেন, শুধুমাত্র আদর্শ নগরী প্রতিষ্ঠা করলেই চলবে না। তাকে রক্ষা করার জন্যও অসমসাহসী, অমিত শক্তিধর এবং বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন কিছু যুবকের প্রয়োজন।

ম্যাক্স চিঠিটা পড়ে বুঝল, অধ্যাপক মশাইয়ের হুমকিটা নেহাৎই ফাঁকা আওয়াজ নয়। বিরুদ্ধ শক্তি ভয়ঙ্করই বটে। তাই চিঠির জবাবে ড. সারাসিনকে জানাল, এ মুহূর্তে তাঁকে সাহায্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সে অধ্যাপক সুলৎসকে সর্বদা নজরে নজরে রাখবে। আর দীর্ঘদিন তার দেখা বা খোঁজখবর না পেলেও যেন তিনি ব্যস্ত হয়ে না পড়েন। সে চিরদিনই তাঁর অনুগত থাকবে এবং যথা সময়ে ঠিক হাজির হয়ে যাবে।

* * *

এদিকে বেগম গোকুল-এর অগাধ ধন সম্পদ দুই উত্তরাধিকারীর মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার পর পাঁচ-পাঁচটা বছর পেরিয়ে গেল। পাহাড়ে ঘেরা, সবুজে ঢাকা অঞ্চলটা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অরিগাঁও-এর উত্তর দিকে অবস্থিত। আল্পস পর্বতের শীর্ষদেশে মনে হলেও এখানকার মাটির নিচে রয়েছে কেবল লোহা আর কয়লার আস্তরণ। পথের ধারে কোথাও কয়লার স্তূপ, আবার কোথাও বা জমানো রয়েছে ধাতুর গাঁদ, পাহাড় সমান উঁচু করে ফেলে রাখা হয়েছে।

গত পাঁচ বছরের মধ্যেই অনুর্বর এ অঞ্চলে এক-এক আঠারোটা গ্রাম গড়ে উঠেছে। বাড়িগুলো কাঠ দিয়ে তৈরি। শিকাগোতে তৈরি করে এখানে এনে খনি-শ্রমিকদের বসবাসের জন্য বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গ্রামগুলোর কেন্দ্রস্থলে কতকগুলো অতিকায় অট্টালিকা তৈরি করা হয়েছে। কতকগুলো আকাশচুম্বী চিমনি তাদের ঘিরে রেখেছে। তাদের প্রত্যেকটার মুখ দিয়ে অনবরত ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আর মাঝে মাঝে আগুনের শিখা বেরিয়ে চারদিক আলোকিত করে দিচ্ছে। তাছাড়া অনবরত বিকট শব্দ তো রয়েছেই। হঠাৎ করে শুনলে মনে হয় বঝি দূরে কোথাও মেঘ ডাকছে।

এ-ই হচ্ছে অধ্যাপক সুলৎস-এর ব্যক্তিগত সম্পত্তি 'ইস্পাত নগরী'। কারো কারো কাছে এটা 'জার্মান সিটি' নামেও পরিচিত। জেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রসায়নের অধ্যাপক, বেগম গোকুল-এর অর্ধেক সম্পত্তিকে লোহার কারখানায় নিয়োগ করেছিলেন।

কয়েক বছরের মধ্যে এখানকার তৈরি কামান সারা পৃথিবীতে নিজের স্থান করে নিয়েছে। জাপান, রাশিয়া, তুরস্ক, চীন, ইতালি, রুমানিয়া এবং বিশেষ করে জার্মানিতে

www.pathagar.com

বিভিন্ন আকৃতির কামান এখান থেকে সরবরাহ করা হয়। অধ্যাপক নিজের খনি থেকে লোহা আর কয়লা তুলে নিয়ে আগে কারখানায় ইস্পাত তৈরি করেন। তারপর তা দিয়ে বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট কামান তৈরি করেন।

অধ্যাপক কামান তৈরির এমন কিছু গুপ্ত কৌশল আয়ত্ব করে প্রয়োগ করেছেন যা অন্যের পক্ষে ভাবাও সম্ভব নয়। অতএব তিনি একচেটিয়া কারবার ফাঁদবেন, আশ্চর্য কি? তার কামান তৈরির গোপন বিদ্যাটাকে রাত্রি-দিন প্রতিটা মুহূর্ত কড়া পাহারার মাধ্যমে আগলে আগলে রাখা হয়। ইস্পাত নগরীর আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে শ্রমিক বা উর্ধ্বতন কর্মী কারোর কোনো স্বাধীনতা নেই। পুরো শহরটার চারদিকে নালা কেটে দেওয়া হয়েছে। তার ওপরে সর্বক্ষণ কড়া পাহারা। তাদের জেরা-তল্লাশির পর ছাড়া পেলে শিলমোহর ও দস্তখৎ সমেত হুকুমনামা প্রদর্শন করাতে হবে।

তখন নভেম্বর মাস চলছে। এক ভোরে এক যুবক শ্রমিক ইস্পাত নগরীর সদর-দরজায় এসে দাঁড়াল। নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যা কিছু দরকার এক এক করে সবই প্রধান রক্ষীর সামনে মেলে ধরল। সন্তুষ্ট হয়ে প্রধানরক্ষী তাকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিল। আর গম্ভীর স্বরে বলল, 'সেকশন 'কে', নয় নম্বর পথ, সাতশ' তেতাল্লিশ নম্বর কারখানা। সেখানে ফোরম্যান সেলিগম্যানের সঙ্গে দেখা করবে। খেয়াল থাকে যেন, নিজের সেকশন ছাড়া অন্য কোনো সেকশনে হাজির হলে কিন্তু ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে।'

প্রধানরক্ষীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি পেয়ে যুবক শ্রমিক এগিয়ে চলল ভেতরের দিকে।

সাতশ' তেতাল্লিশ নম্বর কারখানার ফোরম্যানের দপ্তরের দরজায় যুবক শ্রমিকটি গিয়ে দাঁড়াল ফোরম্যান সেলিগম্যান।

ফোরম্যানের ইঙ্গিত পেয়ে সে গুটিগুটি গিয়ে তার টেবিলের সামনে দাঁড়াল। ফোরম্যান তার হাত থেকে অনুমতি-পত্রটি নিয়ে শিলমোহর ও স্বাক্ষর প্রভৃতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। বুঝল, আগন্তুক যুবক সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী। এবার অনুমতিপত্র থেকে জোহান নামটা লিখে নিল। তারপর তার হাতে ধরিয়ে দিল একটা নীল কার্ড। তার গায়ে নাম এবং ক্রমিক সংখ্যা পাঁচ হাজার ন' শ' আটত্রিশ সংখ্যাটা লিখে দিল। সব শেষে বলল, 'তোমার কাজ হবে লোহাপেটা।'

জোহান সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'হোক না। সাত মাস ধরে লোহা পেটার পর সন্তুষ্ট হয়ে তবেই তো নিউইয়র্কের হেড ওভারসিয়ার সার্টিফিকেট দিয়েছেন। আমার কাজের ব্যাপারে আপনাকে কিছুই ভাবতে হবে না স্যার।'

ফোরম্যান সেলিগম্যান মুচকি হেসে তাকে তখনকার মতো তার দপ্তরে পাঠিয়ে দিল।

দরজা দিয়ে বেরোবার সময় পিছন ফিরে যুবকটা বলল, 'স্যার, আমি শহরেই থাকব তো?'

'না বাইরে কোথাও মাথাগোঁজার জায়গা করে নিও।'

যুবক শ্রমিকটা ফোরম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

যুবক-শ্রমিকটার সকালে খাওয়া হয়ে ওঠেনি। অথবা প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনার জন্য ঘণ্টা দু-তিনের মধ্যেই সে কাহিল হয়ে পড়ল। সর্দার চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে ব্যাপারটা জানাল। একটু বাদেই তাঁর ঘরে ডাক পড়ল।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার তার কাগজপত্র নতুন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল।

বার কয়েক ঢোক গিলে যুবক শ্রমিকটা এবার বলল, 'স্যার, তবে সত্যি কথাটাই বলছি—ক্রুকলিনে আমি ঢালাইয়ের কাজে নিযুক্ত ছিলাম। এখানে বেশি বেতনের লোভে পাডলারের কাজ নিয়েছিলাম।'

'পয়ঁত্রিশ বছরেও যে কাজ করার মতো হিম্মৎ হয় না, তা কি তুমি পঁচিশ বছর বয়সে করতে পারবে ? ঢালাইয়ের কাজ কিছু জান কি ?'

'ফার্স্ট ক্লাসে দু-মাস কাজ করেছিলাম।'

'ঠিক আছে, এখানে থার্ড ক্লাশ থেকে আরম্ভ কর। তোমার তো বরাত ভালো হে, সহজেই সেকশান পাল্টে ফেলতে পারলে।'

চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবার তার অনুমতিপত্রের ওপর কয়েক ছত্র লিখে টেলিফোন করে দিল। একটু বাদে টেলিফোনে কথা সেরে বলল, 'শোন, তুমি 'কে' সেকশন থেকে 'ও' সেকশনে চলে গেছে।' অনুমতি পত্রটা তার হাতে তুলে দিয়ে এবার বলল, 'ওখানে ছোট্ট কামান তৈরি করা হয়। ফার্স্ট ক্লাশ শ্রমিকরা বড় বড় কামান ঢালাই করে। এটা নিয়ে 'ও' সেকশনে ইঞ্জিনিয়ারকে দেখালেই তোমাকে কাজে লাগিয়ে দেবে।'

যুবক-শ্রমিকটি এবার 'ও' সেকশনে হাজির হল। সেখানে মাত্র দু-তিন ঘণ্টা কাজ করতে না করতেই ছুটি পেয়ে গেল।

ছুটির পর সহজেই মাথা গোঁজার জায়গা পেয়ে গেল। রাত্রে আহারাদি সেরে দরজা বন্ধ করে কোটের পকেট থেকে এক টুকরো লোহা বের করল। কারখানা থেকে নিয়ে এসেছে। সেটাকে লণ্ঠনের আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। এবার ঝোলা থেকে একটা খাতা বের করল। তার অর্ধেকটাই অঙ্ক আর বিভিন্ন সূত্র লিখে বোঝাই করা। সে এবার সাঙ্কেতিক হরফে দিনপঞ্জী লিখতে আরম্ভ করল—দশই নভেম্বর, স্টিল টাউন। পাডলিঙের বৈশিষ্ট্য কিছুমাত্রও নেই। কেবলমাত্র দুরকম তাপমাত্রা ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যস, এর বেশি কিছুই নয়। তবে ঢালাইয়ের ব্যাপারে চমৎকার ক্রুপ-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এখন অবধি রহস্যসঞ্চারকারী কোনো কিছুই নজরে পড়ে নি। লোহার টুকরোটা খুবই সাধারণ। যে কোনো ভালো কারখানাই এমন লোহা তৈরি করতে সক্ষম। এতে অতি মিহি কয়লায় ধাতব গুণ বর্তমান। তবু এর মধ্যে রহস্যসঞ্চারকারী কিছুই নেই, স্বীকার করতেই হয়।

তবে একটা ব্যাপারে সামান্যতমও সন্দেহের অবকাশ নেই, এ-কারখানায় যে-কোন আকরিক ধাতুকে সম্পূর্ণরূপে শোধন করে নেওয়া হয়। বারি রহস্যটা উদঘাটন করতে হলে আমাকে সবার আগে জানতে হবে যে বিশেষ ধরনের মাটি দিয়ে ফানেল তৈরি করা হয়েছে তা কোনো কোনো উপাদানের মিশ্রণ। এটা জানা সম্ভব হলেই শ্রমিকদের তৈরি এখানকার গুণসম্পন্ন লোহা আমরাও অনায়াসেই তৈরি করে ফেলতে পারব। তবে এ-ও সত্য যে, ছাব্বিশটা সেকশনের মধ্যে আমার সবে তো মাত্র দুটো দেখা সম্ভব হয়েছে।

www.pathagar.com

এখনও চব্বিশটা বাকিই রয়ে গেছে। গুপ্ত-গহ্বরে যে কি রকম বিপজ্জনক মন্ত্রণা প্রতি মুহূর্তে দানা বাঁধছে তা-ই বা কে জানে! অধ্যাপক সুলৎস, যিনি বেগম গোকুল-এর অর্ধেক ধনসম্পদের মালিক হয়ে শাসিয়েছিলেন, তাঁর আয়োজন সম্পন্ন হল কি না তা-ই বা কে জানে?" ব্যাস, সেদিন এ পর্যন্ত লিখে যুবক-শ্রমিকটা লণ্ঠন নিভিয়ে শুনে পড়ল।

মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে অলসভাবে পা নাচাতে নাচাতে এক সময় সে স্বগতোক্তি করল, 'মানুষ তো দূরের কথা, মূর্তিমান শয়তান পথ আগলে দাঁড়ালেও আমি অধ্যাপক সুলৎস-এর কামান তৈরির গোপন রহস্য আয়ত্ত করবই করব। আর রক্ষা করব আদর্শ নগর ফ্রাঙ্কভিলকে।'

* * *

ম্যাক্স নিরলস কর্মী। উপস্থিত বুদ্ধি ও কর্মকুশলতা সম্বল করে সে কারখানার কাজে দ্রুত পদোন্নতি করতে লাগল। তিন মাসের মধ্যে সে থার্ড ক্লাশ থেকে সেকেন্ড ক্লাশ এবং তারপর ফার্স্ট ক্লাশ শ্রমিকের পদে উন্নীত হয়ে গেল। ইঞ্জিনিয়ার তার সম্বন্ধে লিখতে বাধ্য হলেন, ছাব্বিশ বছরের যুবক ফার্স্ট ক্লাশ ঢালাই শ্রমিক। তাকে পরিচালক মণ্ডলীর নজরে আনতে চাই। পুঁথিগত বিদ্যা, হাতে কলমে কাজের দক্ষতা এবং সৃজনমূলক প্রতিভা—তিন-তিনটি দিক দিয়েই যুবকটা অন্য শ্রমিকদের তুলনায় অনেক, অনেক উর্ধ্বে।

তবে এতেই পরিচালকমণ্ডলীর সুনজরে আসা সম্ভব নয়। আরও কিছু গুণাবলী তাকে প্রদর্শন করতেই হবে। তা-ও অচিরেই সম্ভব হয়ে গেল। তবে তাকে তা সম্ভব করতে হল এক মর্মন্তুদ ঘটনার মাধ্যমে।

সেদিনটা ছিল রবিবার। সাপ্তাহিক ছুটি। ম্যাক্স-এর বিধবা বাড়িউলির একমাত্র যুবক ছেলে কার্লকে না দেখে সে তার মায়ের কাছে খোঁজ নিতে গেল। দু-ঘণ্টা আগেই তার খনি থেকে ফেরার সময় পেরিয়ে গেছে।

বেলা তখন দশটা। কার্ল-এর মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ম্যাক্স বিষণ্নমনে খনির প্রবেশ-পথের দিকে হাঁটতে লাগল। পথে এর-ওর কাছে জিজ্ঞাসা করেও কোনোই ফল হল না।

ম্যাক্স আলব্রেক খনির মুখে যখন পৌঁছল তখন বেলা এগারোটা। ওভারসিয়ারকে সমস্যাটার কথা জানাল। ভদ্রলোকের মধ্যে দয়ামায়া রয়েছে। তিনি ম্যাক্সকে নিয়ে খনি-গহ্বরে গিয়ে কার্ল-এর খোঁজ করতে যেতে রাজি হলেন। তারা পিঠে বাতাসে থলি বেঁধে নিল। যেখানে শ্বাসক্রিয়া চালাবার মতো বাতাসের অভাব সেখানে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি অক্সিজেন ব্যবহার করতে হয়।

ওভারসিয়ার ও ম্যাক্স অত্যাবশ্যক সাজসরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে খাঁচায় চাপল। দু-ঘণ্টা ধরে খনি-গহ্বরে কার্ল-এর খোঁজ করা হল। ইতিমধ্যে তাদের সঙ্গে দুজন পাহারাদারও যোগ দিয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে এবার তারা এমন এক জায়গায় হাজির হল যেখানে পা দিতেই তাদের গা বমিবমি আর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। ওভারসিয়রের নির্দেশে ম্যাক্স দেশলাই জ্বালল। চোখের পলকে কাঠিটা নিভে গেল।

ওভারসিয়ার বললেন, 'হ্যাঁ, অনুমান অভ্রান্তই বটে। আমাদের পায়ের কাছাকাছি বাতাসের চেয়ে ভারি গ্যাসটা জমে রয়েছে। যাদের সঙ্গে গিলবার্ট অ্যাপারেটাস নেই, খবরদার তারা এগিও না।'

www.pathagar.com

ঘাড় ঘুরিয়েই ম্যাক্স দেখতে পেল দূরবর্তী একটা জায়গায় মিটমিট করে বৈদ্যুতিক লণ্ঠন জ্বলছে। লণ্ঠনের আলোটা লক্ষ্য করে তারা দুজনে ছুটল। কাছে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ম্যাক্স। দেখল, কার্ল-এর নিঃসাড় দেহটা এলিয়ে পড়ে রয়েছে। ঠোঁট দুটো নীল। চোখের মণি দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। কার্ল-এর আত্মা বহু আগেই দেহখাঁচা ছেড়ে গেছে। চোক ড্যাম্প তার শ্বাসরুদ্ধ করে দিয়ে এ হাল করেছে।

* * *

প্রায় দশ ঘণ্টা পরের ঘটনা। ম্যাক্স ব্যারাকে পৌঁছে তার টোকেন নিতে গিয়ে দেখতে পেল, টোকেনের সঙ্গে একটা আদেশনামাও ঝুলছে। সে ব্যস্ত হয়ে তার গায়ে চোখটা বুলোতে লাগল। তাতে লেখা রয়েছে, 'জোহান, আজ দশটায় ডিরেক্টর জেনারেলের দপ্তরে উপস্থিত হবে। কেন্দ্রীয় ভবন—'এ' ফটক, 'এ' পথ।"

ম্যাক্স ছত্র দুটো পড়ে ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারল না। এর পরিণতি ভালো, নাকি মন্দ কিছুই অনুমানও করতে পারল না। তবুও ওপরওয়ালার হুকুম শিরোধার্যজ্ঞানে সে দুরু দুরু বুকে ঠিকানা অনুযায়ী ডিরেক্টর জেনারেলের দপ্তরে হাজির হল।

ম্যাক্স ঘরে ঢুকতেই দুজন সুপুরুষ অন্য দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। তাদের একজন কোনোরকম ভণিতা না করেই সরাসরি ম্যাক্সকে লক্ষ্য করে বলল, 'শোন, কোনো ক্ষমতা বলে তুমি দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হচ্ছ তা যাচাই করার জন্যই তোমাকে এখানে তলব করা হয়েছে। তুমি যদি বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারছ তবে তোমাকে মডেল ডিভিশনে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে।'

দু-দুজন পরীক্ষক এবার তাকে পর্যায়ক্রমে জ্যামিতি, বীজগণিত এবং রসায়ন-শাস্ত্রের বহু সমস্যার সমাধান করতে বললেন। আশ্চর্য ব্যাপার! ম্যাক্স এক-এক করে সব কয়টা প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করল।

এবার তারা তাকে একটা ডিজাইন দিয়ে দু-ঘণ্টার মধ্যে এঁকে দিতে বললেন।—সেটা হচ্ছে স্টিম-ইঞ্জিনের জটিল একটা ডিজাইন।

ম্যাক্স এবারও অসাধ্য সাধন করে পরীক্ষকদের তাক লাগিয়ে দিয়ে। তারা বলতে বাধ্য হলেন, এমন ডিজাইনার আমাদের মধ্যে দ্বিতীয় আর একজনও নেই।

ম্যাক্সকে এবার ডিরেক্টর জেনারেলের সামনে হাজির করা হল। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি আজ থেকে মডেল ডিভিশনের স্টুডিওতে বহাল হলে। তবে অন্য কোথাও যাওয়া চলবে না। স্টুডিওর ভেতরেই তোমাকে সর্বক্ষণ থাকতে হবে।আর মনে রাখবে, এ-ডিভিশনের কথা কারো কাছেই ফাঁস করতে পারবে না। আরও আছে, তুমি যেসব চিঠি দেবে বা যেসব চিঠি তোমার কাছে আসবে সবই খুলে পরীক্ষা করা হবে। একমাত্র আত্মজনের কাছে চিঠি লিখতে পারবে। আর তাদের চিঠি এলে তবেই তোমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে, অন্য কারোরই নয়।'

ম্যাক্স মুচকি হেসে বলল, 'মোদ্দা কথা, আমাকে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই তো? তবে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনার কথিত নিয়মকানুন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব।'

ডিরেক্টর জেনারেল এবার বললেন, 'তোমাকে আর মালপত্র আনার জন্য বাইরে যেতে হবে না। রক্ষীদের কাউকে পাঠিয়ে এখানে আনানোর ব্যবস্থা করছি।'

www.pathagar.com

ম্যাক্স আপন মনে বলে উঠল, 'বরাতের জোর আছে বটে! সাঙ্কেতিক ভাষায় দিনলিপি না লিখলে আমার যে কি গতি হত তা এখন অনুমানও করতে পারছি না।'

ম্যাক্স সারা শীতকালটা কাজ আর লেখাপড়ার মধ্যে ডুবে রইল। প্রত্যেকটা ব্যাপারে জানার অত্যুগ্র আগ্রহ এবং অন্যান্য অগ্রগতি দেখে তার সহকর্মীরাও এক বাক্যে স্বীকার করে নিল, তার মতো ডিজাইনার সমগ্র ইস্পাত নগরীতে দ্বিতীয় আর একজনও নেই।

ম্যাক্স মডেল ডিভিশনে কাজ করতে এসে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে সত্য। কিন্তু তার মনে এতটুকুও শান্তি নেই। কারণ, ইস্পাত নগরীর আসল রহস্যের সন্ধান পাওয়া যে তার পক্ষে আজও সম্ভব হল না।

ম্যাক্স স্টিম-ইঞ্জিনের নকসা আঁকা ছাড়া প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার এমন সুযোগ অন্য কোথাও পেত না। কামান, যুদ্ধজাহাজ, বিভিন্ন রকম মেশিনপত্র এবং ছাপাখানা প্রভৃতি অনেক কিছুরই নক্সা ম্যাক্স নিখুঁতভাবে এঁকে দিতে লাগল।

সেকশন 'এ'-তে ম্যাক্স চারমাস কাজে নিযুক্ত থাকল। কিন্তু ইস্পাত নগরীর নক্সা সম্পর্কে তার পক্ষে নতুন কিছুই জানা সম্ভব হল না। ডিভিশনের মধ্যে কয়েদির মতো আটকা পড়ে থাকলে সম্পূর্ণ ইস্পাত নগরীর রহস্য কি করে সে ভেদ করবে? তবে ক্যান্টিনে খেতে বসে এর-ওর মুখে টুকরো টুকরো যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে তাহল ইস্পাত নগরীর ঠিক কেন্দ্রস্থলে এক গুপ্তকক্ষে স্বয়ং অধ্যাপক হের সুলৎস অবস্থান করছেন। কক্ষটা এমন কৌশলে তৈরি যে, বাইরে থেকে কোনো শক্তি, এমন কি আগুন দিয়েও তার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। ইস্পাত নগরীর প্রায় সবাই জানে, অধ্যাপক হের সুলৎস ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধ-ইঞ্জিন তৈরির কাজে ব্যস্ত। এ-অস্ত্রটা অকল্পনীয় শক্তির আধার হয়ে উঠবে যার ফলে সমগ্র পৃথিবী জার্মানির বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

ম্যাক্স বহুবার ভেবেছে, গোপনে তাঁর গুপ্তকক্ষে হানা দেবে। ছদ্মবেশ ধারণ করে কাজ হাসিল করার মতলবও এঁটেছিল। কিন্তু সুউচ্চ ও মজবুত প্রাচীরের গায়ে সশস্ত্র প্রহরী সর্বদা মোতায়েন থাকে। তাই ভেতরে ঢুকে মূল রহস্য ভেদ করা ম্যাক্স-এর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

মার্চ মাস। ম্যাক্স অন্য বহু বারের মতো সেদিন সকালেও গুপ্ত-শপথ উচ্চারণ করেছে। এমন সময় এক কর্মচারী এসে তাকে ডিরেক্টর জেনারেলের দপ্তরে ডেকে নিয়ে গেল। ম্যাক্স হাজির হতেই তিনি বললেন, 'অধ্যাপক হের সুলৎস সবচেয়ে ভালো ডিজাইনারকে তলব করেছেন। এক কাজ কর, তুমি-ই যাও। আজ থেকে তুমি লেফটেন্যান্ট পদে বহাল হলে। তোমার পদোন্নতি হল।'

ম্যাক্স-এর বুকের ভেতরে আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। তার এতদিনের অধীর প্রতীক্ষা আজ তবে বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

ম্যাক্স তার ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়ে গুপ্তকক্ষের দরজায় হাজির হল। বিস্ময়ভরা চোখে সে চারদিকে তাকিয়ে সবকিছু দেখতে লাগল। এক রক্ষী তাকে নিয়ে কক্ষের ভেতরে দাঁড় করাল। ইস্পাত সম্রাট হের সুলৎস বজ্রগম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করলেন, 'তুমিই কি সেই ডিজাইনার? তোমার আঁকা নক্সা আমি দেখেছি। চমৎকার! ভালো কথা, স্টিম-ইঞ্জিন ছাড়া আর কোনো কিছুর নক্সা মাথায় নেই বুঝি?'

www.pathagar.com

ম্যাক্স হাত কচলে নিবেদন করল, 'আর কিছু আঁকার সুযোগ আসেনি।'

'ক্ষেপণাস্ত্র! ক্ষেপণাস্ত্র সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে কি ?'

'সামান্য। অবসর সময়ে একটু-আধটু পড়াশোনা করেছিলাম। ব্যস, এর বেশি কিছু নয়।'

'কামানের নক্সা! বড়সড় কামানের নক্সা আঁকতে পারবে তো? যত চেষ্টাই কর না কেন শোন-এর সমকক্ষ হতে পারবে না। সে সত্যিকারের একজন কৃতী কর্মী ছিল বটে। ডিনামাইট নিয়ে ছেলেমানুষী করতে গিয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। আর একটু হলেই বাড়িসুদ্ধ সবাই উড়ে যেত। আহাম্মক কাহিকা! জাহান্নামে গেছে!'

তাঁর কথাবার্তার ধরন দেখে রাগে ম্যাক্স-এর পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বালা ধরে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার! একটা লোক মারা গেল, অথচ কণ্ঠে সহমর্মিতার লেশমাত্রও নেই!

ম্যাক্স সুচতুর। সে অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি ধরে। ফলে সহজেই হের সুলৎস-এর মন জয় করে ফেলল। হের সুলৎস-এর বক্তব্য, এমন সহকারী ইতিপূর্বে তাঁর মুখ থেকে বেরোবার আগেই সে বুঝে ফেলে। তাই তো হের সুলৎস তার ওপর যারপরনাই সন্তুষ্ট।

প্রকৃত ব্যাপারটা হল, ম্যাক্স সুচতুর অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে আসল রহস্যটা হচ্ছে, সে তার ভয়ঙ্কর মনিবের চরিত্রটাকে অন্তরের অন্তঃস্থলে ছবির মতো এঁকে নিতে পেরেছে। সে তাঁর চরিত্রের বিশেষ দিকটা, আত্মম্ভরী-এটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে নিতে সক্ষম হয়েছে। তাই তাঁর অহঙ্কারকে উস্কে দেওয়ার মতলব সে এঁটেছিল।

হ্যাঁ, ম্যাক্স-এর মতলব বাস্তবায়িত হতে চলেছে। মনিবকে মাত্রাতিরিক্ত তোয়াজ করে করে সে অচিরেই তার একেবারে কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছে।

ম্যাক্স-এর কৌশলটা এরকম—সে মনিবের ফরমাশ মাফিক কোনো কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করলেও দু-এক জায়গায় একটু-আধটু খুঁত রেখে দেয়। ব্যস, হের সুলৎস কাজের ভুল ধরতে পেরে উল্লসিত হয়ে ওঠেন। একটা বছর পেরিয়ে গেল। মনিবের সঙ্গে এত মেলামেশা,এমন গভীর হৃদ্যতার সম্পর্ক, তবু ম্যাক্স আসল রহস্যটা উদ্ধার করতে পারছে না। হের সুলৎস মন খোলাসা করে অন্যসব কথা বলেন কিন্তু ইস্পাত নগরীর গুপ্ত রহস্যটা কিছুতেই ভাঙেন না। অতি শক্তিশালী ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধাস্ত্র তিনি আবিষ্কার করেছেন। অত্যাশ্চর্য, অভিনব এ দৈত্যাকৃতি মারণাস্ত্রটাই বুল-টাওয়ারের একমাত্র গুপ্ত রহস্য।

এল পাঁচই সেপ্টেম্বর। নৈশভোজ সারতে সারতে ম্যাক্স উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে ফেলল।

আহার শেষ করে গ্লাসে বিয়ার ঢালতে ঢালতে হের সুলৎস প্রসঙ্গক্রমে বলে ফেললেন, 'আমি ভাবছি, জার্মানির কাছাকাছি দু-একটা দ্বীপ নিয়ে নিতে পারলেই ইয়া লম্বা লাফ দিয়ে পুরো পৃথিবীটাকে চক্কর মেরে আসতে পারব। তবে হ্যাঁ, 'পৃথিবী জয়' কথাটার ওপর আমার আস্থা কিন্তু তিলমাত্রও নেই। ভালো কথা, জার্মানদের পৃথিবী জয়ের ব্যাপারটাকে তুমি কি বিশ্বাস কর না ?'

ম্যাক্স নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করল, 'না, মোটেই না।'

'তাই বুঝি ? আশ্চর্য ব্যাপার তো! তোমার এমন সংশয়ের কারণ বলবে কি?'

'শেষমেশ দেখা যাবে ফরাসি যুদ্ধবাজরা জার্মানদের পিটিয়ে ভূমিস্যাৎ করে দেবে বলে। আঠারো শ' সত্তরে তারা যে-শিক্ষা পেয়েছে যুগ-যুগান্তর ধরে মনে থাকবে।

www.pathagar.com

বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দেবে যাদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছে তাদেরই কি করে ঘায়েল করতে হয়।'

ম্যাক্স-এর কথাটা শোনামত্র হের সুলৎস-এর চোখ-মুখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠল। তিনি পারলে তাকে যেন চিবিয়ে খান। তবু নিজেকে সংযত রাখলেন।

ম্যাক্স কথার মোড় ঘুরাতে গিয়ে বলল, 'দেখুন, কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য বটে। আপনার কি ধরণা শত্রুপক্ষ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে? গত যুদ্ধের পর তারা আজ অবধি কিছুই আবিষ্কার করে নি? আমরা কেবল কামানের ওজন ও দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে ভাবছি বিরাট কিছু করে ফেলেছি। ওদিকে শত্রুপক্ষ হয়ত এমন মারাত্মক কোনো অস্ত্র তৈরি করে ফেলেছে যা প্রয়োগ করলে আমাদের জীবন সংশয় হয়ে উঠবে।'

'নতুন কোনো অস্ত্র? মারাত্মক কোনো অস্ত্র?' ক্ষোভে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে হের সুলৎস এবার বললেন, 'ওহে আমরাও হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই, শুনে রাখ।'

ম্যাক্স বুঝল, ওষুধে কাজ হতে শুরু করেছে। সে আগের মতোই তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বলল, 'আসলে কামানের সাইজ ও পাল্লাকে দ্বিগুণ করতে পেরেই আমরা উল্লসিত। ভাবছি, মারাত্মক কিছু করে ফেলেছি।'

'সে কী হে, দ্বিগুণ বলছ কি! দ্বিগুণের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি—'

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ম্যাক্স বলতে লাগল—'মোদ্দা কথা, আমরা চুরিবিদ্যাটা খুবই ভালো রপ্ত করেছি। অন্যের জিনিস দেখে সঙ্গে সঙ্গে সেটা বানিয়ে ফেলি। মৌলিক কোনো কিছু আবিষ্কারের দিকে আমাদের প্রবণতা নেই, বললেই চলে। ফরাসিরা কিন্তু অনবরত নতুন অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করছে। আরও নতুনতর কিছু তৈরি করার জন্যও তারা নিরলস গভেষণায় লিপ্ত।'

হের সুলৎস গুলি-খাওয়া বাঘের মতো গর্জে উঠলেন, 'তুমি বলছ কী হে! হের সুলৎস-এর মৌলিক কোনো কিছু আবিষ্কারের হিম্মৎ নেই!' যন্ত্রচালিতের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে এবার বললেন, 'চল, হের সুলৎস-এর মৌলিক প্রতিভার দৌড় চাক্ষুষ করবে?'

ম্যাক্স-এর ভেতরটা খুশিতে সমুদ্রের মতো উথালপাথাল করতে লাগল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল, যাতে তার ভেতরের কথা হের সুলৎস কিছুই টের না পান।

ইস্পাত-সম্রাট হের সুলৎস আলমারি খুলে ছোট্ট একটা চাবি বের করে কোটের পকেটে চালান করে দিলেন। ব্যাপারটা দেখেই অনুমান করা গেল, কিছুতেই চাবিটাকে তিনি হাত ছাড়া করবেন না। এবার ম্যাক্সকে নিয়ে তিনি পর পর তিনটে দরজা পেরিয়ে একটা লোহার সিঁড়ির সামনে হাজির হলেন। সিঁড়িটার শ' দুই ধাপ ডিঙিয়ে ছাদে হাজির হলেন। সেখানে কামান সাজানোর বিশালায়তন একটা কামারা। এমন কৌশলে তৈরি এর দেওয়ালগুলো যে কামান দেগেও ভাঙা তো দূরের ব্যাপার সামান্যতম ফাঁটল ধরানোও সম্ভব নয়। কামরাটার ঠিক মাঝখানে একটা ইস্পাতের তৈরি কামান রক্ষিত আছে।

কামানটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হের সুলৎস বললেন, 'ওটার দিকে তাকাও, বুঝতে পারবে কী জিনিস আমি তৈরি করেছি।'

এত বড় কামান হতে পারে ম্যাক্স স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবতে পারে নি। এর ওজন অন্তত তিন শ'টন তো হবেই। ব্যস পাঁচ ফুট। ইয়া বড় তার মুখের ফাঁকটা। ইস্পাতের

www.pathagar.com

গাড়ির ওপর সেটাকে বসানো। ইস্পাতের লাইনের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা। দানবিক কামানটা দাগার পর পিছনে যাতে প্রচণ্ড ধাক্কা না মারতে পারে তার জন্য মজবুত একটা স্প্রিং লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হের সুলৎস এবার গর্ব ভরে বলতে লাগলেন, 'এর ঘায়েল করার ক্ষমতার কথা শুনলে তোমার পিলে চমকে যাবে। কুড়ি হাজার গজ দূরে থেকে গোলা নিক্ষেপ করলে চল্লিশ ইঞ্চি মোটা ইস্পাতের পাতকেও তা অনায়াসে ছেঁদা করে দেবে। একটু আগেই তো তুমি বলছিলে, আদ্যিকালের কামানের কাছে দাঁড়ানোর হিম্মৎ আমার কামানের নেই, ঠিক কিনা ? শোন, এটার পাল্লা ত্রিশ মাইল। গোলা সামান্য দিক পরিবর্তন না করে সোজা গিয়ে লক্ষস্থলে আঘাত হানে।

ত্রিশ মাইল পাল্লার কথা শুনে ম্যাক্স রীতিমতো চমকে উঠল। শোন, তোমাকে যখন এখানে নিয়েই এসেছি তখন আর আমার আবিষ্কারের রহস্য তোমার কাছে গোপন থাকবে না। বড় দানার গান-পাউডারের দিন গেছে। এখন বারুদ তৈরি করতে আমি মিহি দানার গান-পাউডার ব্যবহার করেছি, যা কিনা সাধারণ বারুদের চেয়ে চারগুণ ক্ষমতা রাখে। দশভাগের আট ভাগ হিসাবে নাইট্রেট অব পটাশ মিশিয়ে আমি সে-চারগুণ ক্ষমতাকে আরও চারগুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছি।'

'কিন্তু আপনার কামনটা থেকে পাঁচবারের বেশি গোলা নিক্ষেপ করা সম্ভব নয়, কি বলেন ?'

'পাঁচবারেরই বা দরকার কি ? একটামাত্র গোলা নিক্ষেপ করতে পারলেই তো যথেষ্ট হে। এর জন্য দশলক্ষ মুদ্রা খরচ পড়বে। কামানটারও মূল্য ঠিক তা-ই দাঁড়িয়েছে। একটা গোলা ব্যবহারের মাধ্যমে যদি দশ লক্ষের হাজার গুণ মানুষও নিহত করা সম্ভব হয় তবে তো আর খরচটা বেশি বলে মনে হবে না।'

অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রটার ক্ষমতার কথা শুনে আতঙ্কে ম্যাক্স-এর হৃদপিণ্ডটা স্তব্ধ হয়ে আসার জোগাড় হল। অনেক কষ্টে হের সুলৎস-এর কাছ থেকে সে নিজেকে গোপন রেখে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল, 'কামান আগেও ছিল। আপনি তার সংস্কার করে শক্তি বাড়িয়েছেন। এর বেশি কিছু নয়। এটাকে কিন্তু আবিষ্কারের পর্যায়ে ফেলা যায় না।'

'আবিষ্কারের পর্যায়ে ফেলা যায় না। আমার যা কিছু গোপন সবই তোমাকে আজ দেখাব বলে এখানে নিয়ে এসেছি। আমার সঙ্গে চল।' কথা বলতে বলতে তিনি ম্যাক্সকে নিয়ে জলচাপে চালিত লিফটে চেপে নিচের তলায় হাজির হলেন। সেখানে রাশিকৃত ক্ষেপণাস্ত্র সাজানো। দেখতে যেন অবিকল চোঙা এক-একটা কামানের গোলা। এক একটা ছয় ফুট দৈর্ঘ্য, ব্যস তিন ফুট। বন্দুকের টোটার মতো সারা গায়ে সিসার আস্তরণ। সামনে ইস্পাতের টুপি। আঘাত পেলেই যাতে বারুদ জ্বলে যায় সেরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। পিছনে রয়েছে ইস্পাতের পাত।

ম্যাক্স আমতা আমতা করে বলল, 'কামানের গোলাকে এমন দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ও ভারি করে তোলার কোনো দরকার ছিল কি ? শুধু শুধু—'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হের সুলৎস বললেন, 'সাধারণ লোককে ধোঁকা দেবার জন্য। এ মাপের একটা সাধারণ গোলার যে ওজন এর ওজনও ঠিক তা-ই। মোদ্দা ব্যাপার হচ্ছে একটা কাঁচের খোলস আর বাইরের দিকে ওক কাঠের ঢাকনা। কাঁচের খোলসে তরল কার্বন ডাই-অক্সাইড ভর্তি। তাকে বায়ুর সাধারণ চাপের সত্তর গুণ বেশি

www.pathagar.com

চাপ প্রয়োগ করে কাঁচের খোলসটাতে ভরা হয়েছে। আঘাত পেলেই কাঁচের খোলস ফেটে কাঠের ঢাকনা ভেদ করে তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের আকারে সবেগে বেরিয়ে আসবে। প্রচুর পরিমাণে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস বাতাস দ্বারা বাহিত হবে। ফলে তাপমাত্রা শূন্য তাপাঙ্কের এক শ' ডিগ্রি নিচে নেমে যাবে। এতে বিস্ফোরণের স্থান থেকে ত্রিশ গজের মধ্যে প্রতিটা মানুষ বা অন্য যে কোনো জীবন্ত প্রাণী মুহূর্তের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে। ত্রিশ গজের কথা কিন্তু কমিয়েই বললাম। আসলে তা এক শ' গজ এমন কি দু শ' ও হতে পারে। আর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, দীর্ঘসময়ধরে এর দ্বারা মানুষ মারা যাবে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দীর্ঘ সময় পরেও যে আসবে তারও প্রাণান্ত ঘটবে। আমার পরিকল্পনা জখম অর্থাৎ পঙ্গু করা নয়, প্রাণে মেরে ফেলবে আমার আবিষ্কৃত গোলাটা। এরকম হাজার খানেক কামানের বৈদ্যুতিক স্যুইচ টিপলেই সাড়ে সাত হাজার বিঘের একটা শহরকে অনায়াসেই ধ্বংস করে দেবে। কার্বনিক-অ্যাসিড-সমুদ্র সৃষ্টি হবে সমগ্র শহরটা জুড়ে। পরিকল্পনাটা আমার মাথায় কি করে এল, ভাবছ ? একবার ডাক্তারের রিপোর্টে জানতে পেরেছিলাম, আলব্রেক খনিতে একটা শিশু কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসে নাক ঢুকিয়ে প্রাণ খুইয়েছে। তবে নেপলসের ডগ গ্রটো নামক জায়গাটা দেখার পর থেকেই ব্যাপারটা আমার মাথায় চক্কর মারছিল। মতলব এল, কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে ছড়িয়ে দিতে পারলেই কাজ হাসিল। বায়ুতে যদি তার এক পঞ্চমাংশও মিশে যায় তবেই বাজিমাৎ।' মুহূর্তকাল নীরবে থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'একটা সমস্যার সমাধান কিছুতেই করতে পারছি না। এর আওয়াজ সাধারণ কামানের চেয়ে ঢের বেশি। আওয়াজটা সাধারণ কামানের মতো বা শব্দহীন করতে পারলে শহরশুদ্ধ মানুষকে নিঃশব্দে মারা সম্ভব হত।'

ম্যাক্স জোর করে নিজেকে সংযত রেখেই এবার বলল, 'তবু আমি বলব, কার্বন-ডাই-অক্সাইড পূর্ণ কামানের গোলা কিন্তু মোটেই নতুন কিছু নয়। দম বন্ধ করে মারার জন্য এর আগেও ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করা হত। আর আপনার কামানের গোলাটা কিন্তু নিখুঁত নয় মোটেই। যে বিশাল বপু এর ত্রিশ মাইলও—'

'না। ওটা যাবে দু-মাইল। আর ওই ইস্পাতের গোলাটা ত্রিশ মাইল তো যাবেই। এর ভেতরে একশ'টা ছোট্ট ছোট্ট কামান ঢুকিয়ে রাখা আছে যারা শূন্য পথে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নামার আগে ঘন ঘন গোলাবর্ষণ করতে আরম্ভ করবে। শহরের সর্বত্র আগুন-বোমা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে। তাতে সমগ্র শহরে লঙ্কাকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে। শুরু হবে মৃত্যুলীলা। মাত্র কয়দিনের মধ্যেই উড়ন্ত কামানের মহড়া দেব, স্থির করেছি। ইচ্ছে করলে নিজের চোখেই দেখে আসতে পারবে কেমন দলে দলে কাতারে কাতারে মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। লাশ সরিয়ে সরিয়ে পাহাড় সাজানোর কাজেও নিজেকে লিপ্ত করতে পারবে', কথাগুলো শেষ করেই হের সুলৎস পিশাচের মতো বিকট হাসিতে ফেটে পড়ার উপক্রম হলেন। তাঁর পৈশাচিক মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে ম্যাক্স-এর ইচ্ছা করছে শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে তার মুখে একটা ঘুষি মেরে দাঁত কয়টা ফেলে দেয়।

মুখের বিকট হাসি থামিয়ে এবার বলল, 'বুঝলে হে, মনস্থ করেছি আমার অদ্ভুত ক্ষেপণাস্ত্রটার মহড়া দেব। যাবে নাকি দেখতে ? কাসকেড পাহাড়টার পিছনে একটা শহর আছে। এখান থেকে পাক্কা ত্রিশ মাইল পথ। কামানের গোলাটা ওই পাহাড়টা ডিঙিয়ে শহরটার ওপর আছড়ে পড়ে রীতিমতো নারকীয় দৃশ্য সৃষ্টি করবে। কবে ? কখন,

www.pathagar.com

তাই না? আজ তো পাঁচই সেপ্টেম্বর। তের তারিখে রাত্রি পৌনে বারটায় ফ্রাঙ্কভিল নগরটা আমেরিকার মানচিত্র থেকে চিরদিনের মতো মুছে যাবে।'

কথাটা শোনামাত্র ম্যাক্স—এর কলিজা স্তব্দ হয়ে যাবার যোগাড় হল।

অধ্যাপক সুলৎস এবার প্রায় স্বাভাবিক কণ্ঠেই উচ্চারণ করলেন, 'একটা কথা কি জান ? ফ্রাঙ্কভিল নগরের ড. সারাসিন আর আমার পথ সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি চান মানুষের জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে আর আমার একান্ত ইচ্ছা তাকে কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে কমিয়ে আনা। তবে এ-ও সত্য যে, আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে সহজতর করতে আমারই গণ্ডীর মধ্যে ফ্রাঙ্কভিল নগরটাকে গড়ে তোলা হয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে ড. সারাসিনকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়।'

ম্যাক্স বার-কয়েক ঢোক গিলে কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল, 'কিন্তু ফ্রাঙ্কভিল নগরের অধিবাসীরা তো আপনার সামান্যতম অনিষ্টও করেনি। আমার এ-ও জানা আছে, তাদের সঙ্গে আপনার কিছুমাত্রও বিবাদ বিসম্বাদ—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বললেন, 'শুনে রাখ, পাপ-পূণ্য আর ন্যায়-অন্যায় নিছকই ছেদো কথা। আসল হচ্ছে প্রাণে বাঁচা। আগে নিজে বাঁচা। বিপরীত চিন্তা নিছকই বোকামি। তাই তো মনস্থ করেছি, সারাসিন-এর পরিকল্পনা, স্বপ্নসাধকে ধ্বংস করতে ফ্রাঙ্কভিল নগরটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেব। এটাই নিয়মবিধির বিধান।'

অধ্যাপক সুলৎস গুপ্তকক্ষের দরজা বন্ধ করে ম্যাক্সকে নিয়ে খাবার ঘরে হাজির হলেন।

ম্যাক্স দুরু দুরু বুকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'আপনি এতক্ষণ যা কিছু বললেন, কার্যতও তা-ই করবেন নাকি ?'

'অবশ্যই। ফ্রাঙ্কভিল নগরের দ্রাঘিমা আর লঘিমা আমার জানা আছে। সেপ্টেম্বরের তেরো তারিখে রাত্রি পৌনে বারটায় পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ফ্রাঙ্কভিল নামটা চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে।'

'তাই যদি সত্য হয় তবে কিন্তু পরিকল্পনাটা গোপন রাখাই উচিত ছিল।'

সুলৎস ম্লান হেসে জবাব দিলেন, 'তাই তো মনটা বিষিয়ে উঠছে, যে তোমার মতো একজন অল্পবয়স্ক যুবকের মৃত্যু আমাকে চোখের সামনে দেখতে হবে।'

কথাটা কানে যেতেই ম্যাক্স-এর শরীরের সব কয়টা স্নায়ু এক সঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠল। 'তুমি কি মোটেই বুঝতে পার নি আমি যার কাছে গুপ্তরহস্য ব্যক্ত করি—চিরদিনের মতো তার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থাও অবশ্যই করি।'

তার মুখের কথা শেষ হতেই কর্কশ আওয়াজ তুলে ঘণ্টা বেজে উঠল। সিগিমার ও আর্মিনিয়াস নামে দুজন ষণ্ডামার্কা লোক এসে দরজায় দাঁড়াল।

অধ্যাপক সুলৎস গম্ভীর স্বরে বললেন, 'গুপ্ততত্ত্ব জানতে আগ্রহী ছিলে, জানতে পেরেছ! এবার তোমার জন্য একটামাত্রই পথ খোলা রয়েছে, সেটা হচ্ছে মৃত্যু—নির্মম নিষ্ঠুর মৃত্যু।'

ম্যাক্স পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছোট্ট করে উচ্চারণ করল, 'কখন আর কীভাবে আমার মৃত্যু হবে?'

'হবে, শীঘ্রই হবে। তবে কথা দিচ্ছি মৃত্যু যন্ত্রণা তোমাকে ভোগ করতে দেব না। একদিন ভোরে তোমার আর ঘুম ভাঙবেনা। ব্যস, খতম হয়ে যাবে।'

www.pathagar.com

ম্যাক্স নিজের মৃত্যুর জন্য যে মোটেই ভাবিত বা ভীত কোনোটাই নয়। ফ্রাঙ্ক নগরটাকে কীভাবে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায় সে চিন্তাতেই তার মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হল।

দানবাকৃতি পাহারাদার দুজন ম্যাক্সকে সর্বক্ষণ নজরে নজরে রাখে। তাদের প্রত্যেকের কোমরে একটা করে ছুরি আর পিস্তল গুলিভরা। তবে তারা দুজনই বোবা! কোনো কথাই বলতে পারে না। এক নাগাড়ে পনেরটা ঘন্টা ষণ্ডামার্কা লোক দুটোকে দেখে ম্যাক্স তাদের বিশেষ একটা দুর্বলতা ধরে ফেলল। একটু বাদে বাদেই তামাক টানে। ম্যাক্স ভাবতে লাগল এদের তামাকের নেশাটাকেই কাজে লাগিয়েই তাদের ঘায়েল করার কথা ভাবতে লাগল।

পরের দিন ভোরে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে তামাকের মতো মাদক শ্রেণীর একটা গাছকে ঝোপের মধ্যে দেখতে পেল। সে উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে কিছুদিন পড়াশুনা করেছিল। ফলে সেটাকে সনাক্ত করতে অসুবিধা হল না। সর্বাধিক সক্রিয় মাদক বেলেডোনা।

ম্যাক্স এবার হাঁটতে হাঁটতে একটা লেকের ধারে হাজির হল। তারই গায়ে একটা জলপ্রপাত। জল বাইরে যাচ্ছে। অতএব কোনো না কোনো পথ আছেই। চেষ্টা করলে কোনোরকমে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব। এখন সমস্যা হচ্ছে ষণ্ডামার্কা প্রহরী দুজনকে নিয়ে। আচমকা বিদ্যুৎচমকের মতো একটা চমৎকার মতলব তার মাথায় খেলে গেল।

ম্যাক্স হাঁটতে হাঁটতে আবার বেলেডোনার ঝোপটার কাছে এল। ষণ্ডামার্কা বোকাহাঁদা প্রহরী দুটোকে দেখিয়ে সে বেলেডোনার পাতা ছিঁড়ে জামার পকেট বোঝাই করল।

আরও ছ'টা দিন পেরিয়ে গেল। এক—দুই—তিন করে তার পরমায়ু বাড়াতে লাগল।

এক ভোরে ম্যাক্স কৌশলে দানব দুটোকে বেলেডোনা মেশানো তামাক খাইয়ে নেশায় বুঁদ করে দিল। ম্যাক্স খাইয়েছে বললে ঠিক বলা হবে না, তারা নিজেরাই বেলেডোনা পাতার গুঁড়ো মেশানো তামাক খেয়ে নেশায় এলিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, পরিকল্পনা মাফিকই কাজটা হয়েছে।

ম্যাক্স এবার লম্বা লম্বা পায়ে কারখানায় গেল। যন্ত্রপাতির তাক থেকে ছোট্ট একটা ইস্পাতের করাত কোটের তলায় ঢুকিয়ে নিল। এটা লোহা কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়। এবার কিছু সংখ্যক কাঠের মডেল আর ডিজাইনের কাগজ জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিল। মিউজিয়ামটা দাহ্য পাদার্থে ঠাসা। আগুন ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। দেখতে দেখতে পুরো বাড়িটাই আগুনের কবলে দাউ দাউ করে জ্বলে গেল। বেজে উঠল পাগলা ঘন্টা। বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে আগুন লাগার খবর সমগ্র ইস্পাত নগরীতে ছড়িয়ে পড়ল। দমকল বাহিনী গাড়ি নিয়ে হাজির হল।

শয়তানের পার্শ্বচর অধ্যাপক সুলৎস উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলেন। মিউজিয়ামের মডেলগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে আশঙ্কা করে আতঙ্কিত সুলৎস উম্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তিন হাজার এক শ' পঁচাত্তর মডেলটা যে উদ্ধার করে আনতে পারবে তাকে দশ হাজার ডলার পুরস্কার দেব। মডেলটা ঘরের মাঝখানে কাঁচের আলমারির মধ্যে রয়েছে।'

অধ্যাপক সুলৎস-এর বুকের পাঁজরের সমান কামানটার মডেল সেটা। যে কোনো উপায়ে সেটাকে রক্ষা তাকে করতেই হবে। কিন্তু ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে কে যাবে দশ হাজার ডলারের লোভে প্রাণ দিতে?

উপস্থিত সবার মধ্যে কেবলমাত্র একজনই প্রাণের মায়া অগ্রাহ্য করে ভিড় ঠেলে অধ্যাপক সুলৎস-এর সামনে এগিয়ে এল। ম্যাক্স। ম্যাক্সকে দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

মুহূর্তের মধ্যেই কয়েকটা গ্রালিবার্ট অ্যাপারেটাস এসে গেল। এগুলো আগুন, বিশেষ করে ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়া কাজে বিশেষ সহায়ক। এক বছর আগে অ্যালব্রেক খনি থেকে কিশোর কার্ল-এর মৃতুদেহ আবিষ্কার করতে ম্যাক্স ব্যবহার করেছিল। ফলে এদের ব্যবহার পদ্ধতি তার জানা। ম্যাক্স পিঠে বায়ু থলি বেঁধে বাতাসবাহী নলটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আগুন আর ধোঁয়ার কুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ম্যাক্স ধোঁয়ার সমুদ্রো ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে ভেবে নিল, মাত্র পনের মিনিট সময়। এর মধ্যে যা কিছু সেরে ফেলতে হবে। এর বাতাস পনের মিনিট থাকবে।

মডেল আনার ব্যাপারটা ম্যাক্স-এর একটা অজুহাত মাত্র। মডেলের জন্য সে মোটেই ভাবিত নয়।

ধোঁয়ার সমুদ্রের ভেতর দিয়ে সাধ্যাতীত দ্রুতবেগে ছুটে ম্যাক্স প্রশস্ত আঙ্গিনায় হাজির হল। এবার উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে হাজির হল লেকটার ধারে। পাশেই তীব্রবেগে জলপ্রপাতের জল পড়ছে। লেকের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডুব দিয়ে সাত-আট ফুট জলের তলায় চলে গেল। সামনেই একটা ইয়া মোটা জলের পাইপ। ম্যাক্স মুহূর্তের জন্য ভেবে নিল। পাইপটা কত লম্বা কে জানে? পনের মিনিটের মধ্যে যদি এর অন্য প্রান্তে বেরনো না যায় তবে বাতাস ফুরিয়ে যাবে, দম বন্ধ হয়ে মরতে হবে।

ম্যাক্স মন শক্ত করল। ঢুকে গেল পাইপটার ভেতরে। স্রোতের টানে সে দ্রুত এগিয়ে চলল।

ইতিমধ্যে দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। তবু সে স্রোতের টানে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ সে একটা কঠিন বাধার মুখোমুখি হল। জল যাচ্ছে বটে, কিন্তু সে আটকা পড়ে গেছে। হাতড়ে হাতড়ে বুঝল, পাইপের মুখ লোহার শিক দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। একটা পাল্লা। ছোট্ট দুটো কজা দিয়ে আটকানো। বিপরীত লোহাটা কাটতে লাগল। প্রায় পাঁচ মিনিট জোরে জোরে করাত চালিয়েও সে শিটকিনির লোহাটা কেটে খতম করতে পারল না।

ম্যাক্স-এর শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়ে গেছে। বুঝল অচিরেই সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে। বরাত আরও মন্দ। করাতটা হাত ফস্কে জলে পড়ে গেল। উপায়ন্তর না দেখে সে এবার শরীরের সবটুকুশক্তি নিঃমেষে নিঙড়ে পাল্লাটাকে দরে উম্মাদের মতো টানাটানি করতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পাল্লাটা আলগা হয়ে গেল। আধ-কাটা শিটকিনিটা ভেঙে গেছে।

এদিকে সারারাত্রি ধরে ইস্পাত-নগরীর মিউজিয়ামে আগুন জ্বলল। বেলা বাড়লে অধ্যাপক লোকজন নিয়ে ধ্বংসস্তূপ সরালেন। কিন্তু হায়! ম্যাক্স-এর মৃতদেহ পেলেন না। নিঃসন্দেহ হলেন, অপদার্থটা হাড়গোড় পুড়ে একেবারে ছাইয়ের সঙ্গে মিশে গেছে।

www.pathagar.com

অধ্যাপক সুলৎস-এর বুকের পাঁজরের সমান মডেলটা ধ্বংস হয়ে গেছে। আতঙ্কের কিছুই নেই। যে মডেলের রহস্য, গুপ্ততত্ব জানত সে-ও তো মডেলের সঙ্গেই পরপারে চলে গেছে। অধ্যাপক সুলৎস হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর গুপ্ততত্ত্ব ফাঁস হবার কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ রইল না।

এদিকে প্রায় একমাস আগেকার কথা। তখন জার্মান সাময়িক পত্রিকায় 'এ শতকে' নাম দিয়ে 'ফ্রাঙ্কভিল' নগরকে কেন্দ্র করে একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। সেটার বক্তব্য—কোন যাদুকরের যাদুকাঠির ছোঁয়ায় যেন প্রশান্ত মহাসাগেরর উপকূলে একটা দৃষ্টিনন্দন নগর গড়ে উঠেছে। অদ্ভুত এ নগরটা নাকি এক জার্মান গড়ে তোলেন। তিনি নাকি ইস্পাত-সম্রাট সুলৎস-এর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। শিরা-উপশিরায় যদি জার্মান-রক্ত প্রবাহিত হয় তবে অবিশ্বাস্য কোনো কাণ্ড ঘটাতে পারেন। অবাক হবার কিছু নেই। পৃথিবীতে নতুনত্ব যা কিছু হয়েছে সব তাতেই তো জার্মানদের হাতের ছোঁয়া রয়েছে।

সমুদ্রের একেবারে গা-ঘেঁষে নগরটা গড়ে তোলা হয়েছে। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পর্বতশ্রেণী। ছোট্ট একটা নদী সাগরে এসে মিলিত হয়েছে। চমৎকার একটা প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়ও আছে। মধ্যে বহু ধাতুর খনি রয়েছে যেখান থেকে বহু মূল্যবান আকরিক উত্তোলন করা সম্ভব। কেওলিন আর শ্বেত পাথরের স্তর রয়েছেই। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে, ফ্রাঙ্কভিল নগর সুস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত। নগরের প্রতিষ্ঠাতা তাই লিখেছেন, যদিও খুব বেশি আশা রাখি না, তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ মিটে গেলে অভূতপূর্ব ফলাফল নাকি পাওয়া যাবে। এখানকার গাছপালা ও জীবজন্তুর মতোই মানুষও নাকি নব্বই থেকে এক শ' বছর পরমায়ু পাবে। একমাত্র বার্ধক্য পা দিলেই মৃত্যুর শিকার হবে। গত এক বছরে এখানে মৃত্যু হয়েছে শতকরা সোওয়া এক ভাগ। কিন্তু আমেরিকা ও ইউরোপে প্রতি বছর শতকরা তিন ভাগ লোক মারা যায়। পরিকল্পনাটা সফল হবে আশা করা যেতে পারে। তবে একটা ত্রুটি লক্ষণীয় যে, কমিটিতে যারা রয়েছেন সবাই ফরাসি, একজনও জার্মান নেই। কিন্তু পৃথিবীর যেখানেই কোনো মৌলিক জিনিস সৃষ্টি হয়েছে দেখা গেছে সেখানেই জার্মানদের হাতের ছোঁয়া রয়েছে। ফ্রাঙ্কভিল নগরের মাতব্বরদেরও একদিন না একদিন মরে যেতে হবে। আমেরিকাতে যদি না-ও হয় যুদ্ধক্ষেত্রে তো অবশ্যই। যথার্থ নগরী বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু সেদিনই গড়ে উঠবে।

* * *

তেরোই সেপ্টেম্বর এল। মাত্র আর কয়ঘণ্টা বাদেই অধ্যাপক সুলৎস-এর উড়ন্ত কামান উড়ে এসে ফ্রাঙ্কভিল নগরের ওপর আছাড় খেয়ে পড়বে। ফ্রাঙ্কভিল নগরের গভর্ণর থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত কেউ-ই ভুলেও ভাবতে পারে নি যে, নগরটার পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে, ভয়ঙ্কর বিপদ আছাড় খেয়ে পড়ছে নগরের ওপর।

ড. সারাসিন খবরের কাগজের প্রথম পাতার প্রথম অনুচ্ছেদে চোখ বোলাতে বোলাতে এক জায়গায় এসে থমকে গেলেন। জ্বলন্ত ঘৃণা আর বিতৃষ্ণায় তার মন-প্রাণ ভরে উঠল। খবরের কাগজের বক্তব্য মোটামুটি এরকম—বিশেষ সূত্রে জানা গেছে ফরাসি প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা ফ্রাঙ্কভিল নগরের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা নিয়ে ইস্পাত নগরের ভয়ঙ্কর তোড়জোড় চলছে। স্যাক্সন ও ল্যাটিনদের এ-যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এগিয়ে আসবেন কিনা ঠিক বলা যাচ্ছে না, তবে যে কোনো

www.pathagar.com

সুবিবেচক মানুষের সঙ্গে আমরাও বলব ক্ষমতার এ কী অপব্যবহার! কী জঘন্য মানসিকতা। এখনও সময়-সুযোগ আছে, ফ্রাঙ্কভিল যেন প্রতিরক্ষার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে।

অধ্যাপক সুলৎস ড. সারাসিনকে ভয়ানক বিদ্বেষ আর ঘৃণা করেন তা আজ আর কারোরই অজানা নয়। ইস্পাত নগরী যে ফ্রাঙ্কভিল-এর প্রতিদ্বন্দ্বী নগর সবাই ভালোই জানে। কিন্তু ইস্পাত নগরী যে সুখ-শান্তির নীড় একটা নগরে রক্তনদী বইয়ে দেওয়ার জন্য তলেতলে প্রস্তুতি নিয়ে চলেছে কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। নিউইয়র্ক হেরল্ড পত্রিকার প্রবন্ধ পড়ার পর এ-ব্যাপারে আর কারোর মনে এতটুকুও সন্দেহ রইল না। সংবাদদাতা সবাইকে সতর্ক করে দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'পরিস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর একটা ঘণ্টাও নষ্ট করা সঙ্গত নয়।'

ড. সারাসিন কাউন্সিলের জরুরি সভা ডাকার চিন্তা করলেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ডাকাডাকি করে অল্প সময়ের মধ্যে সবাইকে একত্রিত করা সম্ভব নয়। তাই অনন্যোপায় হয়ে তিনি অভিনব এক পন্থা গ্রহণ করলেন। টেলিফোনের মাধ্যমে কাউন্সিলের সভা সেরে ফেললেন। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, আক্রমণের জন্য অপেক্ষা না করে যাতে মোটেই আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে সচেষ্ট হতে হবে। শত্রুপক্ষ যদি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে হানা দেয় তবে টর্পেডো দিয়ে তাকে ঘায়েল করা হবে। হিসাব করে দেখা গেল, প্রতিরক্ষার জন্য দেড় থেকে দুকোটি ডলার ব্যয় হবে। আর এ ব্যাপারটা নাগরিক সংঘকে যত শীঘ্র সম্ভব জানাতে হবে। আর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া—হল বাঘা বাঘা গোলন্দাজ ও রসায়নবিদদের অবগত করা হবে, কর্ণেল হেনডন-এর পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য কী? সন্ধ্য সাড়ে সাতটায় কাউন্সিলের মাত্র আঠারো মিনিটের এ-সভা শেষ হল।

ড. সারাসিন কাউন্সিলের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত টাউন হলে ঘোষণা করে দিলেন। পার্কের সুউচ্চ থাম্বার মাথায় অবস্থিত বৈদ্যুতিক ঘণ্টাগুলো এক-সঙ্গে বেজে উঠে জনসাধারণকে জরুরি তলব জানাল। আর থাম্বাগুলোর প্রত্যেকটার মাথায় ঘণ্টার পাশে ডায়াল প্লেটের কাঁটা সাড়ে আটটার ঘরে দাঁড়িয়েছিল। অতএব বুঝতে অসুবিধা হল না, সাড়ে আটটায় টাউন হলে সবাইকে জমায়েত হতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

ড. সারাসিন তাঁর বিশেষ আসনে উপবিষ্ট। তাঁকে ঘিরে বসেছেন কাউন্সিলের সদস্যরা। সভার উদ্দেশ্যের কথা অধিকাংশ নাগরিকই ইতিমধ্যে জেনে গেছে। আর টেলিফোনে সব কয়টা দৈনিক পত্রিকার দপ্তরে খবরটা জানিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার বিশেষ সংস্করণ ছাপা হয়ে যায় আর সেগুলো শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে সেঁটে দেওয়া হয়।

সভাপতি ড. সারাসিন ঠিক সাড়ে আটটায় ঘণ্টাধ্বনির মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করলেন। সভার শুরুতে কর্ণেল হেডন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। তিনি জনসধারণকে আহ্বান জানালেন, 'যে সুমহান উদ্দেশ্য নিয়ে এ নগরীকে গড়ে তোলা হয়েছে সে আদর্শকে রক্ষা করার ব্রত পালন করতে সবাইকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।'

ড. সারাসিন প্রস্তাব দিলেন, শীঘ্রই একটা প্রতিরক্ষা কমিটি গঠন করার জন্য আর ওই কমিটির ওপরই সামরিক ব্যবস্থার যাবতীয় ভার অর্পণ করার প্রস্তাবও দিলেন। উপস্থিত সবাই তাঁর প্রস্তাবকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করলেন। প্রাথমিক প্রস্তুতির জন্য

www.pathagar.com

পঞ্চাশ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করার জন্য সদস্যদের একজন প্রস্তাব দিলেন। এ-প্রস্তাবও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

ঘড়িতে তখন দশটা পঁচিশ। সভার কাজ সাঙ্গ করা হল। সভাকক্ষ ছেড়ে সবাই যখন বেরোবার উদ্যোগ নিচ্ছে ঠিক তখনই একেবারে অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটে গেল। একেবারেই কুদর্শণ একজন লোক দুম করে মঞ্চে উঠে এল। তার চোখ-মুখ কিন্তু খুবই শান্ত। ভাবভঙ্গি সংযত। তার পোশাক-পরিচ্ছদ ছেঁড়া ফাঁটা, কালিঝুলি ও কাদামাখা। আর কপাল থেকে রক্ত ঝরছে। একনজরে দেখেই অনুমান করা যায়, খুবই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাকে আসতে হয়েছে। আগন্তুক দেখেই ঘরশুদ্ধ সবাই হকচকিয়ে গেল আর পরিচয় কি, কোত্থেকে ও কেন এখানে ছুটে এসেছে, তা জিজ্ঞাসা করার মতো বুকের পাটা কারোর নেই। এমনকি ড. সারাসিনও ঘাবড়ে গিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইলেন।

অদ্ভুত দর্শণ লোকটা বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে উঠল, 'আমি একটু আগেই ইস্পাত নগরী-থেকে পালিয়ে এসেছি। হের সুলৎস আমাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের অশেষ করুণা, এ-নগরের মানুষগুলো রক্ষা করার জন্যই আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। আমার এরকম পোশাক-পরিচ্ছদ, রক্ত ও কাদামাখা গা দেখে আপনারা আমাকে চিনতে পারছেন না বটে, তবে আসলে কিন্তু আমি আপনাদের অনেকেরই পরিচিত। তবে ম্যাক্স ব্রাকমান-এর ওপর তাঁর আস্থা এখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে, সম্পূর্ণ সত্য।

আগন্তুকের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ড. সারাসিন আর অ্যাক্টোভিয়াস সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ম্যাক্স! ম্যাক্স ব্রাকমান!'

ম্যাক্স ব্রাকমান-ই টাউনহলে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়েছে। জলের তলদেশের পাইপের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে প্রায় সঙ্গীহীন অবস্থায় ইস্পাত নগরীর বাইরে এসে পড়ে। তিলমাত্র বাতাস অবশিষ্ট থাকায় প্রাণে মরতে মরতে সে বেঁচে গেছে। তারপর ক্লান্ত-আসন্ন দেহে পাহাড় ডিঙিয়ে, মরুভূমি পেরিয়ে কোনোরকমে ফ্রাঙ্কভিল নগরে হাজির হতে পেরেছে। ফ্রাঙ্কভিল নগর ও জনগণকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করাই তার একমাত্র স্বপ্ন। তাই তো আধমড়া অবস্থায়ও সে ত্রিশ মাইল পথ পাড়ি দিতে পেরেছে। রাত্রি দশটায় সে এখানে হাজির হয়েছে।

ম্যাক্স আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করতে গিয়ে বলল, 'মাত্রা আর ঘন্টা কয়েকের মধ্যেই প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড শুরু হয়ে যাবে। আকাশ থেকে শহরের বুকে বৃষ্টির মতো লোহা আর আগুন ঝড়তে শুরু করবে। শয়তানের সাক্ষাৎ চর সুলৎস এমন ভয়ঙ্কর একটা মারণাস্ত্র তৈরি করেছেন যা আমাদের ফ্রাঙ্কভিল শহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উম্মুখ, নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে। ভয়ঙ্কর সে মারণাস্ত্রটাকে আমি স্বচক্ষে চাক্ষুষ করে এসেছি। আগুন নেভানোর জন্য যতশীঘ্র সম্ভব প্রস্তুতি নিন। শয়তান সুলৎস যে কী ভয়ঙ্কর ক্ষমতার অধিকারী তা আপনাদের জানা নেই। তাঁর পরিকল্পনা মাফিক কাজ যদি নিখুঁতভাবে বাস্তবায়িত হয় তবে নগরের বুকে এক শ'টা আগুনের গোলা ছড়িয়ে পড়বে। তাই আগুন নেভানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা করে আমাদের সবচেয়ে প্রধান কাজ হবে জনগণকে রক্ষা করা।

ম্যাক্স যদি এরকম বক্তব্য ইউরোপে রাখত তবে তাকে বদ্ধ পাগল আখ্যা দেওয়া হত। কিন্তু আবিষ্কারকে কিছুতেই হেয়জ্ঞান করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। ড. সারাসিন-

www.pathagar.com

এর পরামর্শে সবাই ম্যাক্স-এর বক্তব্যকে সত্য বলে মেনে নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিল।

জনগণ মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে বাড়ির নিচের পাতাল-কক্ষে আশ্রয় নেওয়ার জন্য তৎপর হল। কারণ, বোমা যত শক্তিশালীই হোক না কেন মাটির নিচে ধ্বংসের তাণ্ডব চালাতে পারবে না। আবার কেউ কেউ দলবেঁধে কাসকেড পাহাড়ের দিকে ধাওয়া করল। যদি অগ্নিবৃষ্টিও শুরু হয় তবে জল, পাথর আর বালি দিয়ে তার মোকাবেলা করতে পারবে।

এদিকে নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা টাউন হলে উপস্থিত থেকে নানা জল্পনা কল্পনা ও পরিকল্পনায় মগ্ন রইলেন।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলল। রাত্রি পৌনে বারটা বাজল। ভয়ঙ্কর এক আবিষ্কারের মাধ্যমে শয়তান সুলৎস কি সত্যই এতবড় একটা শহরকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হবে ?

ম্যাক্স হঠাৎ কোটের পকেট থেকে ছোট্ট একটা খাতা বের করে কয়েক মুহূর্ত নিবিষ্ট মনে অঙ্ক কষতে লাগল। তারপর মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল, 'হায়! সমাধানটা এক মুহূর্ত আগে আমার মাথার এল না! এত বড় একটা বৈজ্ঞানিক এমন একটা ভুল করতে পারেন স্বপ্নেও যে ভাবা যায় নি! তাঁর কামানের শক্তিশালী গোলা ফ্রাঙ্কভিল নগরের মাথার ওপর দিয়ে ধেয়ে যাবে। মোটেই ফাটবে না। আর যদি ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে তবে তা আজ নয় ঘটবে ভবিষ্যতে।

ড. সারাসিন ও অন্যান্যরা বিস্ময়মিশ্রিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ম্যাক্স-এর মুখের দিকে তাকাল। ম্যাক্স খাতাটা এগিয়ে ধরে সদ্য-কষা অঙ্কটা দেখিয়ে বলল, 'মারণাস্ত্রটা কেবলমাত্র ফ্রাঙ্কভিল নগরকেই নয়, বিশ্বের কোনো অঞ্চলের গায়েই আঁচড় কাটতে পারবে না। মহাশূন্য চিরদিনের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

ড. সারাসিন কয়েক মুহূর্ত খাতার পাতার অঙ্কটার দিকে তাকিয়ে নিঃসন্দেহ হলেন, সেটা সম্পূর্ণ নির্ভুল।

তিন মিনিট, মাত্র আর তিন মিনিট বাকি। কার ভুল, হের সুলৎস নাকি ম্যাক্স-এর ভুল তা আর তিন মিনিট বাদেই হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়া যাবে।

রুদ্ধশ্বাসে সবাই প্রতীক্ষা করতে লাগল। ঘড়ির কাঁটা এগোতে এগোতে পৌনে বারটা সূচিত করল। আকাশের একটা গোলা বিদ্যুৎ গতিতে মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই সেটা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। সোঁ সোঁ শব্দটাও অচিরে মিলিয়ে গেল।

সোল্লাসে ম্যাক্স বলে উঠল, 'ওর যাত্রা শুভ হোক, এভাবে যদি গোলাটা ধেয়ে যায় তবে কোনোদিনই সেটা আর পৃথিবীর বুকে ফিরে আসছে না।'

ঠিক দু-মিনিট বাদে দূর থকে বাতাসে ভর দিয়ে চাপা অথচ গম্ভীর শব্দ ভেসে এল। ক্ষেপণাস্ত্রটা ঘণ্টায় সাড়ে চারশ' মাইল বেগে ধেয়ে গিয়ে মহাশূন্যে হারিয়ে যাওয়ার পর এক শতেরো সেকন্ড বাদে ফ্রাঙ্কভিল নগরে ভেসে এল।

চৌদ্দই সেপ্টেম্বরের তারিখসহ ফ্রাঙ্কভিল থেকে ম্যাক্স ব্রাকমান ইস্পাত নগরের অধ্যপক সুলৎসকে চিঠি লিখতে লাগল। সে লিখল, 'খবরটা ইস্পাত-সম্রাটকে দেওয়া প্রয়োজনবোধ করায় এ চিঠি লিখতেই হচ্ছে। জ্বলন্ত আগুণ থেকে মডেলটা উদ্ধার করার

www.pathagar.com

চেয়ে আমার প্রাণের দাম ঢেড় ঢেড় বেশি ছিল। তাই গত পরশু রাত্রি অন্ধকারে আমি তার এলাকা ছেড়ে এসেছি। আমার পরিচয় অর্থাৎ আমি কে সে পরিচয় আপনার কাছে প্রকাশ করা আমি কর্তব্য বলে মনে করেছি। ভাববেন না, আমার গোপন পরিচয় জানার অপরাধে আপনার গর্দান নেওয়ার আদেশ দেব না। আমার প্রকৃত নাম 'জোহান' না। আমি জাতিতে 'সুইশ' না। অ্যালসেশে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি। ম্যাক্স ব্রাকমান আমার নাম।

একটা কথা, আপনার বক্তব্যকে সমর্থন করলে বলতে হয়, আমি একজন ভালো প্রযুক্তিবিদ। তবে আমি তো ফরাসি। আমার দেশ ও দেশবাসীর কাছে আপনি চরমতম শত্রু। আমাদের ধ্বংস করাই আপনার লক্ষ্য। আপনার কুমতলব আমি জানতে, আমি জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হই নি। আর তা ভেস্তে দিতে আমি আবারও প্রাণের মায়া তুচ্ছ করতে দ্বিধা করব না।

সবার আগে বলছি, আপনার কামানের গোলার কৌশল তেমন উৎকৃষ্ট নয়। কামানটা অবশ্য উৎকৃষ্ট বটে। কিন্তু সেটা থেকে উৎক্ষিপ্ত গোলা কোনোদিনই কারো সামান্যতম ক্ষতিও করতে সক্ষম হবে না। আগেই তার কারিগরী ক্ষমতা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। এখন কোনোই সন্দেহ রইল না। চমৎকার এমন একটা কামান সৃষ্টি করেছেন যা থেকে কারো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। আপনি শুনে আনন্দিত হতে পারেন যে, রাত্রি এগারোটা পয়ঁতাল্লিশ মিনিট চার সেকেন্ডে শহরের ওপর দিয়ে কামানের গোলাটাকে উড়ে যেতে দেখা গেছে, সেটা পশ্চিমদিকে গিয়ে ভূ-প্রদক্ষিণ করতে লেগেছে। সৃষ্টির অন্তিম মুহূর্ত অবধি অনবরত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেই চলবে, কারোর ওপরেই আছাড় খেয়ে পড়বে না। যার প্রাথমিক গতিবেগ সেকেন্ডে দশ হাজার গজ সে-ক্ষেপনাস্ত্র কার মাথায়ই পড়বে না, পড়তে পারে না। পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি এ-গতিবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাই তো আপনার সৃষ্ট কামানের গোলাটার বরাতে ছিল ভূ-প্রদক্ষিণ করা। এ তথ্যটা আপনার জানা উচিত ছিল বৈ কি।

হ্যাঁ, দু-লক্ষ ডলার ব্যয় করে যদি গ্রহলোকে নতুন একটা নক্ষত্র সংযোজন সম্ভব হয়, আর পৃথিবীকে দ্বিতীয় একটা উপগ্রহ উপহার স্বরূপ দান করা সম্ভব তবে এর চেয়ে ভালো আর কি-ই বা হতে পারে ?

হ্যাঁ, ম্যাক্স-এর বক্তব্যই ঠিক, কামানের উড়ন্ত গোলাটা পৃথিবীর মাটিকে কোনোদিনই ছোঁবে না। আর একটা বার মাত্র কামান দাগার পরই অধ্যাপক সুলৎস-এর অতিকায় অস্ত্রটা নষ্ট হয়ে যায়।

ম্যাক্স-এর চিঠিটা পড়ে সুলৎস বড়ই অস্বস্তিতে ভুগতে লাগলেন। যুবকটা তার অহঙ্কারে মারাত্মক ঘা মেরেছে। স্বাভাবিকতা ফিরে পাওয়ার পর প্রহরী সিগিমার আর আর্মিনিয়াস-এর ওপর যারপরনাই হম্বিতম্বি করতে লাগলেন।

না, পরাজয়স্বীকার করা সুলৎস-এর পক্ষে সম্ভব নয়। ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না। এবার থেকে আমৃত্যু ম্যাক্স-এর সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকবে। তাঁর অস্ত্রাগারে তো প্রচুর সংখ্যক কার্বন-ডাই-অক্সাইড পূর্ণ গোলা মজুত আছে। তিনি আবার কাজে মেতে গেলেন। মনে হচ্ছে, ফ্রাঙ্কভিল নগরকে কিছুতেই রেহাই দেবেন না। যেন তেন প্রকারে তার ধ্বংস অনিবার্য।

* * *

www.pathagar.com

ম্যাক্স ড. সারাসিন ও তাঁর সঙ্গীদের বুঝিয়ে বলল, সাময়িকভাবে দুর্যোগের মেঘ কেটে গেলেও পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক সুলৎস-এর ভয়ঙ্কর যন্ত্রগুলোর গঠন ও কার্যকারিতা যা কিছু নিজের চোখে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে এসেছে, তা প্রতিরক্ষা কমিটির কাছে ব্যক্ত করল।

ফ্রাঙ্কভিল নগরকে ধ্বংস করার জন্য অধ্যাপক সুলৎস যে কার্মকাণ্ড শুরু করেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা শুনে সেদিন প্রতিরক্ষা কমিটি জরুরি সভায় মিলিত হল। তাঁর ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনাকে বানচাল করা না গেলেও কীভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব তার পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য দীর্ঘ আলোচনা হল। তবে সবকিছুই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখা হল। কেবলমাত্র সভায় গৃহীত মূল সিদ্ধান্ত ও উদ্দেশ্যটা সংবাদপত্রের পাতায় ছেপে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। তবে কারো জানতে বাকি নেই, ম্যাক্সই পর্দার আড়ালে থেকে পুরো ব্যাপারটাকে পরিচালনা করে চলেছে।

ম্যাক্স নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বলল, 'সুলৎস-এর কামানের আকৃতি, গঠনবৈচিত্র্য এবং ক্ষমতা, সবই আমি জেনে এসেছি। অতএব সেসব দিক বিবেচনা করে আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য তৈরি হওয়া উচিত।'

সিদ্ধান্ত নেওয়া হল স্থল আর জলপথে সুলৎস-এর অস্ত্র যাতে ফ্রাঙ্কভিলের ধারের কাছেও ঘেঁষতে না পারে সেরকমই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পুরোদমে কাজশুরু হয়ে গেল। পর্যাপ্ত কয়লা ও লোহা সংগ্রহ করা হল। দু-বছরের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু মজুদ করা হল।

ফ্রাঙ্কভিল নগরের যুবকদের নিয়ে সেনাদল গঠন করা হল। বন্দুক কাঁধে কুচকাওয়াজ চলতে লাগল মাঠে-ময়দানে। মাটির পুরু ও উঁচু দেওয়াল তোলা হল গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়গুলোতে। আর পথের ধারে ধারে সুগভীর পরিখা খনন করা হল।

জানা গেছে সুলৎস নাকি কামান বহন করে নিয়ে আসার জন্য জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে কথা বলেছেন। এমনও শোনা গেল, তাঁর যুদ্ধ-জাহাজ ফ্রাঙ্কভিল-এর উপকূলের কাছাকাছি চলে এসেছে। গুজব! গুজব! চারদিকে এমন গুজব শোনা গেল শূণ্যপথে এসে নাকি স্যাকরামেন্টো রেলপথকে অবধি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গুজব বেশি করে ছড়াল খবরের কাগজওয়ালারা। আবার এমনও শোনা গেল,ইস্পাত-নগরী আদৌ অক্ষত আছে বলে সন্দেহ রয়েছে। আসলে এমন কর্মচঞ্চল নগরীটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে। আর সুলৎস সর্বস্ব খুইয়ে সত্য সত্যই গা-ঢাকা দিয়েছে

এক সময় মনে হল যেন ফ্রাঙ্কভিল নগরের আকাশ থেকে দুর্যোগের মেঘ কেটে গেছে। জনগণ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। অন্য সবাই যা-ই ভাবুন না কেন, ম্যাক্স কিন্তু কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারল না। ইস্পাত নগরীতে গিয়ে নিজের চোখে সবকিছু না দেখা অবধি সে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। রহস্যের শেষ দেখে তবেই সে ফিরবে।

ড. সারাসিন বললেন, 'কাজটা ভয়ঙ্কর বিপদজনক, বাঘের গলায় মাথা গলাতে গিয়ে নতুন করে বিপদে জড়িয়ে পড়রার সম্ভাবনাই বেশি। সুলৎস মরণ-কামড় না দিয়ে কিছুতেই সরে যাবে না।'

সকাল হল। নীরব-নিস্তব্ধ গ্রামের ভেতর দিয়ে উল্কার বেগে ছুটে গেল একটা জীপগাড়ি। সেটা থেকে ম্যাক্স আর অক্টোভিয়াস নেমে এল। উভয়ের মনেই কঠিন প্রতিজ্ঞা—রহস্য ভেদ না করা অবধি ফিরবে না।

www.pathagar.com

ইস্পাত নগরী যেন শ্মশানে পরিণত হয়ে গেছে। মানুষের চিহ্নও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সবাই পালিয়েছে। এক সময় যেসব অঞ্চল মানুষের ভিড়ে গম গম করত, আজ সেসব অঞ্চলে বিরাজ করছে শ্মশানের নিস্তব্ধতা!

কিছুদূর এগিয়ে ম্যাক্স আর অক্টোভিয়াস ডিনামাইট বসানোর কাজে মেতে গেল। কাজ সেরে পলতেতে আগুন দিয়ে তারা দ্রুত তফাতে চলে গেল। অকস্মাৎ যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল। সে কী বিকট আওয়াজ করে ডিনামাইটটা ফাটল! বাড়ি-ঘর আর কারখানা হুড়মুড়িয়ে পড়তে লাগল। আর প্রাচীরগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ম্যাক্স একদিন সুলৎস-এর যে স্টুডিও দেখে বিস্ময়ে হতবাক হওয়ার জোগার হয়েছিল, আজ তা-ই ধ্বংস্তূপে পরিণত হল।

অমিত মনোবলে ম্যাক্স আর অক্টোভিয়াস এবার একের পর এক দরজা ভেঙে এগোতে লাগল। আর একটামাত্র দরজা ভাঙতে পারলেই সুলৎস-এর কামরা। এর জন্য আর ডিনামাইট খরচ না করে কুড় লের আঘাতেই কাজ হাসিল করে ফেলল। এবার দরজা দিয়ে ভেতরের দিকে পা বাড়াতেই আচমকা গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কে? কে যাচ্ছ?'

এমন কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনার মুখোমুখি হয়ে ম্যাক্স ও অক্টোভিয়াস উভয়েই রীতিমতো ভড়কে গেল।

আবার। আবারও সে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কে? কে যাচ্ছ? জোহান? জোহান নাকি? ফিরে এসেছ?'

ব্যাপারটা এমন মনে হল যে, তার পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে ফিরে আসার ব্যাপারটা সুলৎসকে আরও অনেক বেশি আতঙ্কিতও বিস্মিত করেছে।

সিগিমার ম্যাক্স-এর পথ আগলে দাঁড়াল। মনিবের হুকুম ছাড়া তাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে সে নারাজ। ম্যাক্স বলল, 'ঠিক আছে। তাকে আমার আগমনবার্তা পৌঁছে দাও। তবেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।'

সিগিমার তাতেও যেন খুশি নয়। অক্টোভিয়াস জোর করে ভেতরে ঢোকার পরামর্শ দিল। ঠিক তখনই গম্ভীর ও অদৃশ্য কণ্ঠ শোনা গেল, 'কে? কে যাচ্ছ?'

আর্মিনিয়াস। আর্মিনিয়াস-এর কণ্ঠস্বর। ম্যাক্স গলা চড়িয়েই বলে উঠল, 'আর্মিনিয়াস, মোদ্দা কথা শুনতে চাই, আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে, কিনা?' তার দিক থেকে আশাব্যঞ্জক কোনো সাড়া না পেয়ে সে ডিনামাইট চার্য করার সিদ্ধান্ত নিল। তার আগেই বন্দুক গর্জে উঠল। এক লাফে জঙ্গলে ঢুকে গিয়ে দুই বন্ধু প্রাণ বাঁচাল। আবারও গুলি চালাবার আশঙ্কা নিয়ে তারা ঝটপট নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেল।

ম্যাক্স অনুচ্চকণ্ঠে অক্টোভিয়াসকে বলল, 'এক কাজ কর, অনবরত গুলি চালিয়ে যা। ফলে তারা তোর দিকেই নজর রাখবে। আর আমি ঝোপের আড়াল দিয়ে পিছন দিকে গিয়ে আক্রমণ করব।'

ম্যাক্স অনবরত গুলি চালাতে লাগল। বিপরীত দিক থেকেও সমান তালে গুলি আসতে লাগল। একনাগাড়ে বিশটা গুলি বিনিময়ের পর গুলির আওয়াজ থেমে গেল।

কাচের জানালা দিয়ে অক্টোভিয়াস ঘরের ভেতর লাফিয়ে পড়েই দেখল, ম্যাক্স আর সিগিমার মল্লযুদ্ধে লিপ্ত। মরণপণ লড়াই। অক্টোভিয়াস এবার ম্যাক্সকে সাহায্য করতে লাগল। সিগিমার অমিত শক্তিধর হলেও উভয়ের মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করতে না

www.pathagar.com

দীর্ঘ দিন একনাগাড়ে ঝড়ের তাণ্ডব চলল আমাদের ওপরে।

উনিশে আগস্ট। আকাশ পরিষ্কার হল। রোদ দেখা দেওয়ামাত্র কাপ্তেন কম্পাস হাতে নিয়ে বসে গেলেন। দ্রাঘিমা নির্ণয় করার পর ফ্যাকাসে মুখে যে—কথা উচ্চরণ করলেন তা শুনেই আমাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। এক সময় যেখানে পিকিং শহর ছিল জাহাজ এখন সেখানেই অবস্থান করছে।

ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার হয়ে গেল,এশিয়ার হাল আমেরিকার মতোই হয়ে গেছে। দু-দুটো মহাদেশই অতল জলে তলিয়ে গেছে। আরো দক্ষিণে জাহাজ এগোতেই হাতে নাতে প্রমাণ পেলাম, হিমালয়, তিব্বত ও ভারত সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আমরা এগিয়েই চলেছি। কোনো প্রত্যাশা যে বুকে নিয়ে এগিয়ে চলেছি তার ঠিক নেই। একের পর এক মহাদেশের সলিল সমাধি দেখেও এখন আর বিস্মিত হচ্ছি না। উরাল পর্বতমালার চিহ্নও নেই, আফ্রিকা মহাদেশও অতলে তলিয়ে গেছে। একের পর এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখে এখন আর মোটেই অবাক হই না। আসলে এখন চোখ ও মন সব কিছুকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে অব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে স্বাভাবিক কণ্ঠেই ক্রমে ক্রমে বলতে লাগলাম—এখানে মস্কো—ওয়ারশ—বার্লিন—ভিয়েনা—রোম—ত্রিস্বাকুই—সেন্টুলুই—মাদ্রিদ—এখানেই তো ছিল! সমগ্র ইউরোপ মহাদেশটা অতল জলে তলিয়ে গেলেই বা ক্ষতি কি? তারপর আমার মাতৃভূমি প্যারিসও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে লক্ষ্য করলাম।

এবার চারদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চলতে গিয়ে চারদিন বাদে লক্ষ্য করলাম এডিনবরা—লন্ডন—সবই অনন্ত জলরাশি গ্রাস করেছে।

ব্যস, জাহাজে খাবার আর নেই। এমন কি বিস্কুটও ফুরিয়ে গেছে। এবার থেকে পেটে কিল মেরে দিন কাটানো শুরু করলাম। খিদের জ্বালা যে কী মর্মান্তিক তা এই প্রথম মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। জাহাজের সবাই গা ছেড়ে দিয়েছে।

সেদিনটা হয়তো আটই জানুয়ারি ছিল। হঠাৎ ডাঙার মতো ঝাপসা কিছু একটা দেখতে পেলাম।

আচমকা করুণ আর্তনাদ শুনে আধমরা মানুষগুলো যন্ত্রচালিতের মতো ঝট করে লাফিয়ে ডেকের ধারে গিয়ে চমকে উঠলাম। একী অদ্ভুত দৃশ্য। আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে তো ডাঙার চিহ্নও কোনোদিন ছিল না। তবে স্থলভূমি এল কোত্থেকে!

হ্যাঁ, স্থলভূমিই বটে। তবে কোনো প্রাণীর অস্তিত্বও নজরে পড়ল না। কালো পাথরের ন্যাড়া পাহাড়। গাছাগাছালি তো দূরের ব্যাপার সামান্য ঘাস বা শ্যাওলা পর্যন্ত নেই। জাহাজ ভিড়ল। আমরা ঝট করে নেমে গেলাম। স্বাদু জলের হ্রদ কোথাও পেলাম না। কেবলই লোনা জল। জমির শুকনো কাঁদা-মাটি দেখে নিঃসন্দেহ হলাম, এক সময় স্থলভূমিটা আটলান্টিকের অতলে ছিল। পাথরের খানা-গহ্বরে কচ্ছপ, শামুক, কাঁকড়া আর মাছ প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রাণী প্রচুর সংখ্যকই নজরে পড়ল। এটুকুই ভরসা, উপোষ করে অন্তত মরতে হচ্ছে না।

একনাগাড়ে আট-আটটা মাস জলে ভাসার পর জাহাজ ডাঙার খোঁজ পেয়েছে। নোঙর করতে পারল। আমরা মাত্র কয়জন নতুন করে বাঁচার লড়াই শুরু করলাম। স্বল্প

www.pathagar.com

কেটে তুলে নেওয়া হয়েছে। আবার পিছন দিক থেকে জল কিন্তু সমান তালে ধেয়ে আসছেই।

না, জল আর উঠছে না। তবে আর জ্যন্ত সলিল সমাধিও হচ্ছে না। সামনের দিকে খাদ, আর পিছনে জল। উভয়ের মাঝখানে পড়ে রয়েছি আমরা জনা কয়েক প্রাণী। বুঝতে পারলাম, ভূভাগ নিচে নামতে নামতে কোথাও ধাক্কা খেয়ে থমকে গেছে। তাই সমুদ্র স্থির হয়ে গেছে। ঘাসের ওপর শুয়ে অপেক্ষা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, বুঝতেই পারি নি। বরাতে যে কি আছে ইষ্ট দেবতাই জানেন।

বিকট আওয়াজ কানে যেতেই ঘুম চটে গেল। রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে জলোচ্ছ্বাসের শব্দ কানে এল। ছিটকে আসা জলে সর্বশরীর ভিজিয়ে জবজবে করে দিচ্ছে। তারপর ক্রমে সব স্তব্ধ হয়ে গেল। আকাশ নির্মেঘ হয়ে উঠল। পূর্ব-আকাশে রক্তিম ছোপ ফুটে উঠল।

পঁচিশে জুনের ভোর। আলোর ছোপ ফুটে উঠতেই বুঝতে পারলাম আমরা একটা দ্বীপে বন্দী হয়ে পড়েছি। দ্বীপটার দৈর্ঘ্য দেড় হাজার গজ আর প্রস্থ পঁচিশ গজ। এক সময় উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং দক্ষিণ দিকে পাহাড় ছাড়া কিছুই নজরে পড়ত না। আর এখন দেখা যাচ্ছে কেবল জল আর জল। গতকালও পূর্বদিকে পাহাড়ের দিকে মেক্সিকোকে দেখতে পেয়েছিলাম, এখন তা একেবারে ধুয়ে-মুছে গেছে। এখন কেবল শুধু জলের বিচিত্র সমাবেশ।

ক্ষিদে-তেষ্টায় কাতর হয়ে পড়েছিলাম। এখন হতাশা-মন প্রাণ জুড়ে বসেছে। আবার তেষ্টার জল নেই। বাঁচার পথ রুদ্ধ। তবে পিতৃদত্ত প্রাণটা যাবেই!

চৌঠা জুলাই-এ ভার্জিনিয়ার ডেকে দাঁড়িয়ে। প্রায় এক মাস আগে ভার্জিনিয়া জাহাজটা মেলবোর্ণ থেকে নোঙর তুলেছিল। চব্বিশে মে কেবলমাত্র আকাশ ছোঁয়া ঢেউ আর ঝড়ের তাণ্ডব কাপ্তেন দেখতে পেলেন। ব্যস, এটুকুই। ঠিক সে মুহূর্তে পৃথিবী জুড়ে কী যে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল তিনি তিলমাত্রও অনুমান করতে পারেন নি। জাহাজ মেক্সিকোর কাছাকাছি পৌঁছোলে দেখতে পেলেন জলের মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ মাথা চাড়া দিয়ে রয়েছে। এ জলের যেন শেষ নেই, নেই তল বলে কিছু।

এগিয়ে যেতেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, ছোট্ট দ্বীপটার ওপর এলিয়ে পড়ে রয়েছে এগারোটা নিস্তর-নিথর দেহ। ক্ষিদে আর তেষ্টায় কাতর হয়ে দুজনের দেহাবসান ঘটে। আর বাকি নয় জন ধুঁকছে, মরো মরো অবস্থা। এ দশটা দিন যে আমাদের কি করে কেটেছে একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন। একমাত্র পরমায়ু ছিল বলে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। ভার্জিনিয়া জাহাজের কাপ্তেন আমাদের তুলে নেন।

আট-আটটা মাস জলে ভেসে চলেছি। বার-তারিখ সময়ের হিসাব ভুলে গেছি। জানুয়ারি, নাকি ফেব্রুয়ারি তার হিসেব জেনেই বা ফায়দা কি? আমাদের জাহাজে তুলে নিয়ে কাপ্তেন মেক্সিকোর খোঁজে জাহাজ চালাচ্ছিলেন। কিন্তু হায়! একনাগাড়ে দীর্ঘদিন জাহাজ চালিয়েও ডাঙা নজরে পড়ল না। জল ছাড়া কিছু নজরে এল না। তবু জাহাজ এগিয়েই চলেছে। চৌদ্দই জুন কয়লা ফুরিয়ে যাওয়ায় পাল তোলা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। খাবারের ভাড়ারে টান পড়েছে। নামমাত্র খাবারে দিন কাটাতে হচ্ছে।

তুমুল ঝড় উঠলো। জাহাজ এবার তুমুল ঝড়ের মোকাবেলা করতে লাগল।

www.pathagar.com

ড. বামুর্স্ট তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'হতেই পারে না মশাই। সাম্প্রতিককালের সভ্যতার কথাই যদি ধরা যায় তবে বলব, সমগ্র পৃথিবীটা জলের নিচের চলে গেলেও কোনোদিনই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। সভ্যতার কোনো না কোনো নজির থেকেই যাবে। অতীতে এরকম সভ্যতার অস্তিত্ব থাকলে, কোনো না কোনো নিদর্শন অবশ্যই থাকত।'

সভাপতি মেনডোজ ভাঙবেন, কিন্তু মচকাবেন না। গলা চড়িয়ে এবার জবাব দিলেন, 'কেউ কি বলতে পারে যে সমগ্র পৃথিবীটাই অকস্মাৎ জলে তলিয়ে যাবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো অসম্ভবও সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে।'

আমরা এক সঙ্গে চিল্লিয়ে ওঠলাম, 'ধ্যুৎ! বাজে কথা!—বাজে কথা!'

আমাদের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই জমি তির তির করে কাঁপতে লাগল। বাড়িটা অবধি কেঁপে কেঁপে উঠল। ব্যস, আমরা কিছু বুঝতে না বুঝতেই চোখের পলকে বাড়িটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। সভাপতি মেনডোজা এবং আমার ভৃত্য জার্মেন পাথরও লোহালক্করের ভিতর চাপা পড়ে গেল।

ঝট করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই ভয়ঙ্কর সে দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল সমুদ্র বাগানে চলে এসেছে। এ কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য রে বাবা! হতভম্ব হয়ে গেলাম। প্রবল বিক্রমে ফুঁসতে ফুঁসতে সমুদ্র ক্রমেই এগোচ্ছে।

ব্যাপার কি? সমুদ্র কি সত্যি সত্যিই উঠে আসছে? মুহূর্তে আমার ভুল ভেঙে গেল। সমুদ্র তো ঠিক জায়গাতেই রয়েছে। তবে? আসলে বাগানটাই দ্রুত জলের তলায় চলে যাচ্ছে। কী যে সর্বনাশ ঘটতে চলেছে বুঝতে বাকি রইল না। সমুদ্র ওপরে উঠছে না, ভূভাগ জলের ভিতর নেমে যাচ্ছে। প্রতি সেকেন্ডে ছয় ফুট বা ঘণ্টায় ছয় মাইল করে জল এগোচ্ছে। মাত্র তিন মিনিটের মধ্যেই আমাদের ওপর জলরাশি আছাড় খেয়ে পড়বে।

মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে নিয়ে চিল্লিয়ে উঠলাম, 'গাড়ি। শীঘ্র গাড়ি বের কর।'

চোখের পলকে গাড়ি বের করা হল। ব্যস্ত-হাতে পেট্রোল পুরে ফেললাম। উল্কার বেগে গাড়ি ছুটে চলল। ভৃত্য র‍্যালে গেটটা খুলে দিয়েই সে এক লাফে স্প্রিং ধরে ঝুলে পড়ল।

এবার শুরু হল জল আর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা। জল আমাদের ধরার জন্য তৎপর, আর আমরা তৎপরতার সঙ্গে জলের এলাকা ছাড়িয়ে যেতে। গাড়িটা এত দ্রুত ছুটছে তবু মনে হচ্ছে ওটা বুঝি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। আসলে সমুদ্রের গতিবেগ যে তার সমান। দামি গাড়ি না হলে এতগুলো লোক নিয়ে ওপরে ওঠা সহজ হত না। হঠাৎ গাড়িটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পুরো একটা ঘণ্টা একনাগাড়ে ছোটা কী যে সে ব্যাপার? মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির ঠিক পিছনে জল চলে এল। পর মুহূর্তেই অর্ধেকটা চাকা জলের তলায় চলে গেল। ভাবলাম, ব্যস—খতম। আচমকা গাড়িটা ঝপাং করে লাফিয়ে ওপরে উঠে গেল। ভৃত্যের বৌ অ্যানের—চেঁচামেচি শুনে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। র‍্যালে পেছন থেকে ঝপাং করে জলে পড়ে গেছে। আচমকা ওজন হ্রাস পাওয়ায় গাড়িটা তিড়িং করে লাফিয়ে আবার ছুটতে শুরু করেছে। সিমোনাট অভিজ্ঞ চালক। এভাবে আরো ঘণ্টাখানেক ছুটতে পারলে পাহাড়ের শীর্ষে পৌঁছে যাওয়া যাবে। হঠাৎ সজোরে একটা ধাক্কা খেয়ে গাড়িটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সিমোনাট তর্জনি তুলে দেখার, দশ গজ মতো সামনে রাস্তার চিহ্নও নেই। ছুরি চালিয়ে আলতো করে যেন সামনের জমি

www.pathagar.com

আমি ফরাসি। অর্থোপার্জনের তাগিদে ম্যাক্সিকোতে এসে মাথা গুঁজেছি। আমি একটা রূপোর খনির স্বত্বাধিকারী, একমাত্র মালিক। অর্থের পাহাড় গড়ে তুলেছি। ঠিক করে রেখেছি, শেষ বয়সে অর্থের পাহাড় নিয়ে নিজের দেশের মাটিতে বসবাস করে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেব।

সমুদ্রের লাগোয়া রোজারিও জায়গাটার অবস্থান। আমার অপূর্ব সুন্দর বাড়িটা পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত। পাহাড়ের গা-বেয়ে সমুদ্রের কিনারা অবধি আমার আঙুর ক্ষেতটা নেমে গেছে। ওপর থেকে এক শ' গজ নিচের উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রকে দেখতে চমৎকার লাগে। পাহাড়ের দেড় হাজার ফুট ওপরের চূঁড়া পর্যন্ত পাকা রাস্তা। পুরোদমে মোটরগাড়ি চালিয়ে চূঁড়ায় যে কতবার উঠেছি তার ইয়ত্তা নেই। পঁয়ত্রিশ অশ্বশক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিন বসানো দামি মোটর গাড়ি। ফ্রেঞ্চ মোটরগাড়ি। এতে চড়ার মজাই আলাদা।

আমার পঁচিশ বছর বয়স্ক পুত্র জাঁ, পালিতা কন্যা হেলেন আর পরিচারক পরিচারিকা নিয়ে বাড়িটাতে বাস করি। সাধ ছিল, যথা সময়ে হেলেনকে পুত্রবধূ করে নেব।

চব্বিশে জুন। সেদিন ইলেক্ট্রোজেনিক আলোর নিচে কয়েকজন মেক্সিকান ও কয়েকজন অ্যাংলো স্যাকসন—মোট পাঁচজন অতিথি অভ্যাগতকে নিয়ে বাগানে বসে গল্পগুজব করছিলাম।

ড. বামুর্স্ট অ্যাংলো স্যাক্সন আর ড. মোরেনো মেক্সিকান। উভয়ের মনে মিল যথেষ্ট থাকলেও মতের মিল মোটেই নেই। সেদিন দুই পণ্ডিত ঘোরতর তর্কযুদ্ধে মেতেছিলেন। ড. বামুর্স্ট একজন মহাধার্মিক ব্যক্তি। তিনি বললেন, ঈশ্বর আদম আর ইভকে সৃষ্টি করেছেন। ঐ দুজন থেকেই বাকি মানুষ সৃষ্টি হয়েছে।

বন্ধুর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের কথা শুনে ড. মোরেনো ঠাট্টা করতে ছাড়লেন না।

ড. বামুর্স্ট রেগেমেগে বলে উঠলেন, 'বিজ্ঞানের অগ্রগতি যতই হোক না কেন, মহানশক্তিকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তবে আদম আর ইভ আজকের পৃথিবীকে দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেত। সান্ধ্য মজলিশটা মাঠে মারা যাওয়ার আশঙ্কায় আমি প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতির কথা পাড়লাম। বিজ্ঞান যে এমন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হবে সৃষ্টির গোড়াতে মানুষ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। হয়তো একেই উন্নতির চরম শিখর বুঝায়!'

সভাপতি মেনডোজা বলে উঠলেন, 'না, বক্তব্যটা সত্য নয়। ইতিপূর্বেও চরম উন্নতি হয়েছিল। তবে তা লোপ পেয়ে গেছে। ব্যাবিলন। ব্যাবিলনের সভ্যতার কথা বলতে চাইছি।'

উপস্থিত সবাই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে উঠলেন, 'কী যে বলেন, বিশ শতকের সভ্যতার সঙ্গে ব্যাবিলনের সভ্যতার তুলনা ? অসম্ভব—একেবারেই অবান্তর।'

সভাপতি মশাই দমবার পাত্র নন। তিনি তেমনি দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন, 'মিশরিয়রাও কোনো অংশে কমতি ছিল না।' আমাদের হাসাহাসিকে আমল না দিয়ে তিনি বলে চললেন, 'আটলান্টিয়ানদের কাহিনীকে কিন্তু রূপকথার কাহিনী বলে নস্যাৎ করে দেওয়াটা সঙ্গত নয়। আটলান্টিস সভ্যতা যেমন চরম শিখরে আরোহণ করে এক সময় তা আটলান্টিকের অতল গহ্বরে চলে যায়।' অন্য আর কোনো কোনো সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেও মাটির নিচে চাপা পড়ে গেছে কিনা কে তার হদিস রাখে ? আমাদের অজানা বলেই কি তার অতীত কাহিনীকে অস্বীকার করতে হবে ?'

www.pathagar.com

এমন কত অত্যাশ্চর্য-অবিশ্বাস্য ব্যাপারই না মাটি খোড়াখুড়ির ফলে পাওয়া গেছে। সামুদ্রিক মাটির নিচের বিস্ময় জারটগদের চমকে দিয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন বিস্ময়ের নিদর্শণ মাটির তলা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এরকমটা কি করে হতে পারে? একই স্থানে এতগুলো সভ্যতার ভাঙা-গড়া কি করে হতে পারে ? বিশ হাজার থেকে শুরু করে চল্লিশ হাজার বছর আগে তবে এ মাটির ওপরেই মানুষ সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু এ দেশ তো জলের নিচে অবস্থান করছিল। তবে ?

ব্যাপারটা নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবনায় তলিয়ে থাকায় জারটগ-এর মধ্যে নিদারুণ অস্থিরতা ভর করল। চিন্তার জট ছাড়াতে ছাড়াতে সে বাগানের পিছন দিকে হাজির হল। এখানটায় মাটি খোঁড়া হচ্ছে। এখানে বিশাল অট্টালিকা গড়ে তোলা হবে। এখন যে ল্যাবরেটরিটা রয়েছে তার দ্বিগুণ একটা ল্যাবরেটরি এ বাড়িতে তৈরি করা হবে।

হাঁটাহাঁটি করতে গিয়ে জারটগ বিশাল একটা গর্ত দেখতে পেলেন। তিনি অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হলেন। গর্তটা দেখে অবশ্যই তাঁর মধ্যে এমন আগ্রহের সঞ্চার ঘটে নি। গর্তের ভেতরে অবস্থানরত অর্ধেকটায় বিচিত্র বস্তু দেখতে পাওয়ার ফলেই তিনি এমন আগ্রহান্বিত হলেন। ব্যস্ত-হাতে তিনি বস্তুটাকে গর্তটার ভেতর থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনলেন। অদ্ভুত ধাতু দিয়ে তৈরি একটা পাত্র। ইতিপূর্বে এরকম ধাতু আর চোখে দেখেন নি। ছাই রঙের পাত্রটা। দীর্ঘদিন মাটির সংস্পর্শে থাকায় তেমন ঝকঝকে ভাব আজ আর নেই। পাত্রটার এক জায়গায় ফেঁটে গেছে। ফাঁটা জায়গা দিয়ে ভেতরে আর একটা পাত্র নজরে পড়ছে। বড় একটা পাত্রের ভেতরে অপেক্ষাকৃত ছোট পাত্র ঢুকিয়ে রাখলে যেমনটা দেখা যায়। গায়ের জোরে পাত্রটা খুলতে গিয়ে তিনি সেটাকে গুঁড়োগুঁড়ো করে ফেললেন। বহু পুরনো। তার ওপর মাটির সংস্পর্শে দীর্ঘদিন থাকায় তার ধাতুত্ব বলে কিছু ছিল না। ভেতরের পাত্রটা থেকে অদ্ভুত, কদাকার একটা বস্তু বেরিয়ে এল। পাত্রটার মধ্যে থেকে থেকে বস্তুটা অক্ষতই রয়ে গেছে। বেশ কিছু সংখ্যক পাতলা বস্তু গুটিয়ে রাখা হয়েছে। ছোট্ট ছোট্ট হরফের দ্বারা আঁকাজোঁকা করা রয়েছে পাত্রটার গায়ে। জারটগ ভাবলেন আজে বাজে আকিজুকি নয়, কিছু একটা লেখা। এমন বিচিত্র ধরনের হরফ তিনি এর আগে দেখেন নি কোনোদিন।

আবিষ্কারের আনন্দে-উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে জারটগ বহুমূল্য বস্তুটাকে নিয়ে ল্যাবরেটরিতে হাজির হলেন। এক-দুই করে অনেকগুলো বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। তার একনিষ্ঠ প্রয়াস ব্যর্থ হল না। অতীতের ভাষার সূত্র। সূত্রটা তিনি ধরতে সক্ষম হলেন। এবার দলিলটা পড়তে তাঁকে আর মোটেই বেগ বেতে হল না। সে রোমাঞ্চকর কাহিনীটাকে নিজের ভাষায় অনুবাদ করে ফেললেন।

কাহিনটা হল—

চব্বিশে মে, দুই-সাল, রোজারিও—ঘটনাটা কীভাবে আরম্ভ করব ভেবে ঠিক করতে পারছি না। আসলে তো অনেক আগেই শুরু করেছি। এতদিন মাথায় এলোমেলোভাবে ছিল। এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি লিখে রাখব। কিন্তু কীভাবে লিখব ? তবে এক কাজ করা যাক, ডাইরি লেখার পদ্ধতি অনুসরণ করি। আর কোনো ভাষা ব্যবহার করব ? স্প্যানিস আর ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলতে পারি বটে। তবে মাতৃভাষা মানে ফরাসি ভাষাতেই কাহিনীটা লিখতে শ্রেয় জ্ঞান করছি।

www.pathagar.com

ভূতত্ত্ববিদরা ভূত্বক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন পৃথিবীর বয়স চার শ' হাজার বছর। চার সাগরে ঘেরা এদেশ, মহাদেশ বললেও অত্যুক্তি হবে না। গোড়াতে এটা জলের নিচে অবস্থান করছিল। এর মাটির প্রকৃতিই বলে দিচ্ছে এদেশ জলের নিচ থেকে উঠে এসেছে। সে না হয় হল, কিন্তু কি করে তা সম্ভব হয়েছে ? এত বড় একটা দেশকে কোনো শক্তি ঠেলে ওপরে তুলে দিয়েছে? পাহাড় সংলগ্ন সামুদ্রিক পলিমাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এমন অনেক তত্ত্ব জানা সম্ভব হয়েছে। মানুষ, পশু, পাখি প্রভৃতি কি সমুদ্রের বুক থেকে উঠে এসেছে ? তবে এদের উৎপত্তি কীভাবে সম্ভব হল ? মানুষের উত্তরসূরীদের নিয়েই তো সে-জিজ্ঞাসা।

ভূতত্ত্ববিদদের মতে বিশ্ব সংসারের যাবতীয় স্থলভূমিই এক সময় জলের নিচে ছিল। সবই জল থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

তবে ? তবে বিচিত্র এসব মাথার খুলিগুলো কোত্থেকে এল? তাদের অবস্থানও কি জলের নিচেই ছিল ? জারটগ মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করার সময় খুলিগুলো উদ্ধার করেছেন। এগুলো যে মানুষেরই মাথার খুলি কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এগুলো বিভিন্ন মাপের। ছোট-বড়-মাঝারি বিভিন্ন রকম। ছোট খুলিগুলো দু-তিন বছর আগেকার, সে তুলনায় শরীরের হাড়ের কাঠামোটা অনেক বড়। আরো পিছিয়ে গেলে, অতীতের খুলির মাপ ক্রমেই বড় হয়ে গেছে। অর্থাৎ মস্তিষ্কের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কি আজকের মানুষের তুলনায় অতীতের মানুষ খুবই বেশি বুদ্ধিমান ছিল। অবশ্যই না, সন্দেহের নামমাত্র অবকাশও নেই। অতীতের মানুষ অনেক বেশি বুদ্ধিমান ছিল ? তাদের কাছে জারটগদের শিশু বললেও কিছুমাত্রও বাড়িয়ে বলা হবে না।

এ তো অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যাচ্ছে, বিবর্তনবাদ কি তবে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়ে যাবে? পুরানো খুলিগুলো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও হিসাব-নিকাশ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেগুলো বিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরেরও আগের খুলি। তখনকার মানুষের মধ্যে সভ্যতার আলো কতখানি বিস্তার লাভ করেছিল তা-তো কোথাও লেখা-ঝোখা নেই। বিশ হাজার বছর পুরনো কথা ভাবলেও রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়।

বিশ হাজার বছর আগের মানুষ জারটগদের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে ঢের উন্নত ছিল একথা শুনলেও লোকের হাসির উদ্রেক ঘটবে। তবে কোথায় সে সভ্যতা ? চল্লিশ হাজার বছর আগে যারা পৃথিবী জুড়ে আধিপত্য ঘটিয়েছিল, কোথায় কীভাবে মিলিয়ে গেল তাদের কীর্তির নিদর্শন ? কোথায় সে অট্টালিকা, যন্ত্রপাতি আর অন্যান্য উন্নত সভ্যতার নিদর্শন ? সবই কি নিশ্চিহ্ন হয়েছে ? তাইতে কি জারটগদের পূর্বসূরীরা নতুন করে লিখতে শিখেছে, বাষ্পীয় শকট উদ্ভাবন করেছে, কারখানায় বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেছে ? আর সেদিন থেকেই কি নতুন করে সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছে ?

অত্যাশ্চর্য! একেবারেই অবিশ্বাস্য! তার চেয়ে সহজে অলৌকিক শক্তিতত্ত্ব বিশ্বাস করা সম্ভব।

যে মারাত্মক শক্তির বশ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ষাট হাজার বছর আগে প্রথম পুরুষ 'হেডম' আর নারী 'হিভা'কে সৃষ্টি করেছিল। আজ পৃথিবীর বাসিন্দা তাদেরই উত্তরসূরীরা। কিন্তু জারটগদের ভাষায় তো 'হেডম' ও 'হিভা' শব্দ দুটোর উল্লেখ তো দেখা যায় না। তবে তারা কীভাবে এল ?

www.pathagar.com

ইটারন্যাল অ্যাডাম

জারটগ।

মাথার ভেতরে জটপাকানো চিন্তা নিয়ে অস্থিরচিত্ত জারটগ একা পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। কিসের চিন্তা? মনুষ্যজাতির অতীতের কথা নিয়ে তিনি ভাবনায় ডুবে রয়েছেন। তিনি একজন মহা পণ্ডিত। পৃথিবীর ইতিহাস তাঁর নখদর্পণে। তা ছাড়াও বহু বিষয়েই তার পাণ্ডিত্য রয়েছে। এতকিছু সত্ত্বেও বহু বিষয়ের রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন ভদ্রলোক।

তাঁর সমসাময়িককালের ইতিহাস তিনি খুব ভালোই রপ্ত করেছেন। আট হাজার বছরের অতীত কাহিনীর কথা বলতে চাইছি। কিছু সংখ্যক মানুষের নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করে মরার ইতিহাস। ছোট্ট এক এক চিলতে জায়গায় অনেক মানুষ বসবাস করতে গেলে যা হয় সে কথা বলতে চাইছি। কেপহর্ণ ও বার্লিনের মধ্যবর্তী ছোট্ট ভূখণ্ডটুকুকে কেন্দ্র করে আট হাজার বছর ধরে কম মারামারি কাটাকাটি হয়নি, কম রক্তপাত ঘটে নি। কেবলমাত্র এ অংশটুকুই ভূখণ্ড, অবশিষ্টাংশে তো কেবল জল আর জল। সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জল বেষ্টন করে রেখেছে। তাই তো আট হাজার বছরের ইতিহাসের পাতায় কেবল রক্ত আর রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে। জারটগ যে সাম্রাজ্যের নাগরিক তার এক শ' পঁচানব্বইতম বার্ষিকী উৎসব, এই তো সবে উদযাপন করা হল। সাম্রাজ্যটার বিচিত্র এক নামকরণ করা হয়েছে।

এর চারদিকে সমুদ্র অবস্থান করছে বলে এর নামকরণ করা হয়েছে 'চার সাগরের দেশ।' আট-আটটা হাজার বছর ধরে এখানকার মানুষ অনবরত লড়াই-ই করে এসেছে। আট হাজার বছরের লড়াইয়ের কাহিনীকে চারটে ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। শেষের দিকে তিনটে সম্প্রদায় একটু বেশি করে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করেছিল। শেষপর্যন্ত দুটো সম্প্রদায়কে পরাজিত করে একটা সম্প্রদায় চাঙা হয়ে উঠল।

প্রায় দু-শ' বছর আগে এক ভয়ঙ্কর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে ছোট্ট একটা ভূখণ্ডে জারটগদের সাম্রাজ্য 'চার সমুদ্রের দেশে'র জন্ম হয়।

আট হাজার বছর ধরে মানুষ হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রথমে তারা শিখল লিখতে। তারপর একরকম লেখার ছাঁচ তৈরি করল। তা থেকে বহু সংখ্যক কপি করার পদ্ধতি মাথা খাটিয়ে বের করল। একজনের চিন্তা-ভাবনাকে অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উপায় রপ্ত করল।

এবার এক এক করে কয়লা, বাষ্পশক্তি ও যান্ত্রিকশক্তি উদ্ভাবন করা হল। মাত্র পাঁচ শ' বছর আগে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। জারটগদের পূর্বপুরুষরা আকাশের বিদ্যুৎকে নিজ বশে নিয়ে এল।

আসল প্রশ্ন তো এটা নয়। তার সমাধানতো এখনো হল না। এ দুনিয়ার মালিক যে মানুষ, তার প্রকৃত পরিচয় কি ? কে এই মানুষ? কোথা থেকে আসে এ-মানুষ ? যায়-ই বা কোথায় ?

www.pathagar.com

ম্যাক্স ও অক্টোভিয়াস ঘণ্টা খানেক বাদে সিগমার-এর বাঁধন খুলে মুক্তি দিল। কিন্তু এ-স্বাধীনতা যে তার কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন। এ-স্বাধীনতাকে সে কীভাবে কাজে লাগাবে জানে না। আদৌ কোনো কাজে লাগবে কিনা তা-ই বা কে জানে?

সেদিনই সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে না নামতে ম্যাক্স ও অক্টোভিয়াস ফ্রাঙ্কভিল নগরে গিয়ে অধ্যাপক হের সুলৎস-এর মৃত্যু-সংবাদটা দিল। আর বলল, 'যে গোলা বিস্ফোরণের মাধ্যমে আমাদের ধ্বংস করার হুকুম দিয়েছিলেন ভয়ঙ্কর সে-গোলাটাই আপনা থেকে ফেটে গিয়ে স্বাক্ষরটা সম্পূর্ণ করার আগেই তাঁকে পরোপারে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে একটু দম নিয়ে ম্যাক্স এবার বলল, 'ড. সারাসিন, অধ্যাপক হের সুলৎসের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে একমাত্র আপনিই আজ ইহলোকে রয়েছেন। শিল্প-নগরীকে পুনর্জীবন দান করার দায়িত্বভার আমার ওপর অর্পণ করুন। আমি এ-মহান ব্রত উদযাপনে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই।'

এদিকে ফ্রাঙ্কভিল নগরের দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। আর সেটা পরিণত হতে লাগল এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-সুখের নীড়ে। কিন্তু ইস্পাত-নগর? ভয়ঙ্কর এক অস্ত্র তৈরি কারখানায় পরিণত হল। এতে ম্যাক্স ব্রাকমান-এর অবদান্ অপরিমিত। এক বছর আগে ম্যাক্স আর জেনেট-এর বিয়ে হয়েছিল। জেনেট আজ এক সন্তানের জননী। ম্যাক্স ও জেনেট সন্তানকে নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করতে লাগল।

---

www.pathagar.com

সে দেখল, কামরাটায় নিশ্চয়-নিথর এক মনুষ্যমূর্তি চেয়ারে উপবিষ্ট। লেন্সের প্রতিসরণের কৌশলে তাকে মার্বেল পাথরের একটা টুকরো বলেই মনে হচ্ছে। এক নজরে দেখেই ম্যাক্স নিঃসন্দেহ হল, নিজেরই আবিষ্কৃত বিস্ফোরক পদার্থে তিনি প্রাণদিয়েছেন। ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী গোলা নিজে থেকেই ফেঁটে গিয়ে তাঁকে যমের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে। গোলার বারুদ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিণত হয়ে নিদারুণ শৈত্যের সৃষ্টি করেছে। তাতেই হের সুলৎস জমে কাঠ হয়ে গেছেন। দুই বন্ধু কাঁচের জানালা দিয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখতে লাগল। কাঁচের জানালা না থাকলে তারা ইতিমধ্যেই ঘরে ঢুকে যেত। ব্যস, শৈত্যে জমে মার্বেল পাথরের মূর্তি বনে যেত।

কাঁচের খোলসটাকে তৈরি করা হত এমন পদ্ধতিতে যা সাধারণ কাঁচের চেয়েও দশগুণ পোক্তা এবং সহজে যাতে ভেঙে না যায়। একরম সতর্কতা অবলম্বনে তৈরি মারণাস্ত্রটারও কিছু দোষত্রুটি রয়ে গিয়েছিল যার ফলে তা ফেঁটে গিয়ে প্রমাদ ঘটিয়েছে। ত্রুটিটুকু হের সুলৎস নিজে জানতেন না বলেই তো এমনটা ঘটতে পেরেছে। হয়ত বা বাতাসের চেয়েও বহুগুণ বেশি চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইড কাঁচের খোলসে ভরে রাখায় অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে, যা খোলসটার পক্ষে সহ্য করা কিছুতেই সম্ভব হয় নি। আর তা নিমেষের মধ্যে শূন্য ডিগ্রি তাপমাত্রার নিচে নেমে গিয়ে শয়তান অধ্যাপক সুলৎসকে পাথরের মূর্তির মতো জমিয়ে দিয়েছে।

ম্যাক্স অনুসন্ধিৎ সুনজর মেলে তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারল, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে অধ্যাপক কি যেন লিখতে ব্যস্ত ছিলেন। কি? কি লিখছিলেন জানার জন্য সে অবর্ণনীয় মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করতে লাগল। কিন্তু কি করে তা সম্ভব? কাঁচের জানালা ভেঙে কামরাটায় ঢোকার চিন্তা পাগলেও করতে পারবে না। ভেতরে ঢোকা তো দূরের ব্যাপার। মাথা গলাতে না গলাতেই মারণগ্যাস ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ করে দেবে। ম্যাক্স লেখাটা পড়ার জন্য যারপরনাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কনভেক্স লেন্সে হরফগুলোকে অনেকাংশে বড় করে চোখের সামনে হাজির করায় তার প্রয়াস সার্থক হল।

নির্দেশ নয়, হুকুম। ইস্পাত-সম্রাট হের সুলৎস নির্দেশ নয়, হুকুম দিতেই ব্যস্ত ছিলেন। তার হুকুমনামাটা হচ্ছে, পনের দিনের মধ্যে যেন ফ্রাঙ্কভিল নগরের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিযান শুরু করা হয়—আমার হুকুম হস্তগত হলেই আমার উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুযায়ী সংগ্রহের কাজে লেগে যাও। এবার আর ভুল ত্রুটি হচ্ছে না, কারোর প্রাণই রক্ষা পাবে না। আমার হুকুমের যেন সামান্যতমও এদিক-ওদিক না হয়। আমি চাই, ফ্রাঙ্কভিলে কোনো প্রাণীই যেন জীবন্ত না থাকে। আর তা করতে হবে এক পক্ষকালের মধ্যেই

ড. সারাসিন ও ম্যাক্স ব্রাকমান-এর মৃতদেহ দুটো আমার চাই-ই চাই, পাঠিয়ে দিতে যেন ভুল না হয়।

স্বাক্ষরটা পরিপূর্ণ নয়। শেষ-টানটা দেওয়ার আগেই নিষ্ঠুর মৃত্যু এসে তাঁকে নিশ্চল-নিথর পাথরের মূর্তি করে দিয়েছে।

না, আর এক মুহূর্তও দেরি করা সঙ্গত না ভেবে বন্ধু দুজন ইস্পাতের মইটা বেয়ে নিচের কামরায় নেমে গেল। অচিরেই বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গিয়ে অধ্যাপক হের সুলৎস-এর নিষ্প্রাণ দেহকে ঘিরে ধরবে। মনে হবে যেন মিশরের ফ্যারাওরা হাজার হাজার বছরের মমিরূপে সমাধি-কক্ষের প্রহরায় নিযুক্ত।

www.pathagar.com

পেরে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। দুই বন্ধু এবার দড়ি দিয়ে পিঠমোড় করে বেঁধে তাকে মেঝেতে ফেলে রাখল। আর এক শত্রু আর্মিনিয়াস রক্তাপ্লুত অবস্থায় বারান্দার বেঞ্চে এলিয়ে পড়ে। অক্টোভিয়াস-এর গুলিতে আগেই সে প্রাণ দিয়েছে।

ম্যাক্স উল্লাস প্রকাশ করে বলল, 'ব্যস, এখন আমরাই এখানকার সবকিছুর মালিক।' দুই বন্ধু এবার আনন্দে ডগমগ হয়ে হের সুলৎস-এর ব্যক্তিগত কামরার দিকে এগিয়ে চলল।

ম্যাক্স ভেবেছিল, কামরায় ঢুকে অত্যাশ্চর্য কিছু চাক্ষুস করবে। কিন্তু কার্যত যা দেখল তাতেই তার চক্ষুস্থির। দেখল, কামরার সর্বত্র রাশি রাশি চিঠি ছড়িয়ে পরে রয়েছে। কেবল চিঠি আর চিঠি-চিঠির পাহাড়। পার্কের চিঠির বাক্সে যত চিঠি ছিল সবই ষণ্ডামার্কা লোকদুটো এনে ঘরময় ছড়িয়ে দিয়েছে। কোনোটাই খোলা হয় নি। কে খুলবে? কতসব অসহায় মানুষের চোখের জল যে এদের গায়ে লেখা রয়েছে ঠিক ঠিকানা নেই।

সেখানে আর সময় নষ্ট না করে ম্যাক্স এবার অক্টোভিয়াসকে নিয়ে ল্যাবরেটরির গুপ্তদরজার জন্য হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। ম্যাক্স নিশ্চিত ছিল স্তূপাকৃতি বইয়ের আড়ালে গুপ্তদরজাটা পাবে। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করে দুই বন্ধু পর্বতপ্রমাণ বই সরিয়ে হতাশ হয়ে পড়ল। সেখানে দরজার কোনো চিহ্ন নেই। ম্যাক্স ভাবল, শয়তান হের সুলৎস হয়ত বা দেওয়ালের সঙ্গে সুড়ঙ্গের দরজাটাকে মিশিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু আর্মিনিয়াস সিগমার প্রতিদিন যে চিঠির পাঁজা বয়ে আনত সেগুলো পড়তে তিনি নির্ঘাৎ গুপ্তকক্ষ থেকে এ-ঘরটায় আসতেন। কিন্তু কোনো দিক দিয়ে, কোনো পথে ? ম্যাক্স এবার ভাবল, গুপ্তদরজাটা হয়ত বা কার্পেটের তলায় রয়েছে। কঠোর পরিশ্রম করে সে কার্পেটের পেরেক খুলে খুলে কার্পেটটাকে সরিয়ে ফেলল। কিন্তু এবারও তাকে হতাশ হতে হল।

এবার বাকি কামরার ছাদটা দেখা গেল। ছাদের কড়িকাঠ হাতাতে হাতাতে ম্যাক্স এবার কড়িকাঠের গায়ের একটা টুকরো দরে হেঁচকা টান দিতেই ইস্পাতের একটা পাতলা ও হাল্কা সিঁড়ি সুড় সুড় করে নেমে এল।

ইস্পাতের সিঁড়িটার বিপরীত প্রান্তটা দিয়ে ম্যাক্স ঝটপট মই বেয়ে বৃত্তাকার একটা কামরায় হাজির হল। লেন্সের মতো পুরু কাঁচ দিয়ে বৃত্তাকার কামরাটায় আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাইরে থেকে কোনোরকম শব্দ কামরার ভেতরে আসার উপায় নেই, আবার ভেতরের শব্দও বাইরে যেতে পারে না। সেই কামরাটার ভেতরে শ্মশানের স্তব্ধতা বিরাজ করছে।

কামরাটার ভেতরে হাঁটাহাঁটি করতে করতে এক সময় ম্যাক্স থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একেবারেই অপ্রত্যাশিত ও অবিশ্বাস্য দৃশ্যের মুখোমুখি হল সে। ঘরের মেঝেতে সাধারণ কাঁচ নয়, আতস কাঁচ, কনভেক্স লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে। কাঁচের ভেতর দিয়ে নিচের কামরাটার দিকে এক নজরে তাকিয়েই সে একেবারে হকচকিয়ে গেল। হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। যে-রহস্য উদঘাটন করার জন্য দীর্ঘদিন সে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়িয়েছে তা আজ তার হাতের মুঠোয়। হের সলিৎস-এর গবেষণাগার-তার গুপ্তগবেষণাগার। কামানের গোলার ভাঙা টুকরো ইতস্তত ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

www.pathagar.com

পরিসর ডাঙায় শেষপর্যন্ত টিকে থাকা সম্ভব কিনা, কিছুই জানা নেই। তবু উত্তরসূরীদের জন্য আমার যা কিছু কথা লিখে রাখছি। আর এও জানি না, কোনোদিন তারা এটা পাবে কিনা।

ধাতুর পাত্রে দিনের পর দিন থাকার পর পাণ্ডুলিপিটার-এর পরের কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। তবে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ যা উদ্ধার করা গেছে তো মোটামুটি এরকম—ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। জনমানবহীন মুলুকে কয়দিন পড়ে রয়েছি, জানা নেই।

ড. মোরেনো কপালের চামড়ায় ভাঁজ এঁকে বললেন, 'এখানে আমরা অন্তত ছয় মাস তো কাটিয়েছিই। ছয়টা মাস কেবল পেটের জোগাড়ের ধান্ধায় কাটাতে হয়েছে। জাহাজের পাল নামিয়ে এনে তাঁবু খাটিয়ে নিয়েছি। প্রচুর মাছ থাকলেও ধরার সমস্যা। ফলে কচ্ছপের ডিম আর সামুদ্রিক গাছগাছালির ওপরই বেশি করে নির্ভর করতে হল।'

তবে কখন কখনও বন্দুক দিয়ে দু-চারটে পাখিও শিকার করা যায়।

বরাতের জোর আছে বলতে হবে। জাহাজের খোলে পাত্তা লাগিয়ে এক বস্তা গম পাওয়া গেল। অনেকেরই ইচ্ছা ছিল, সব গমই পেষাই করে রুটি তৈরি করে খেয়ে নেবে। আমরা কয়জন বেগড়া দিলাম। অর্ধেক বস্তা গম ছিটিয়ে চাষ করলাম। আর বাকি অর্ধেক দিয়ে পেটের জ্বালা নেভালাম। গোড়ার দিকে জমি খুবই লবণাক্ত ছিল সত্য। কিন্তু দিনের পর দিন বৃষ্টির জল লবণ অনেকাংশে ধুয়ে নিয়ে গেছে। ফলে গমের ফলন খারাপ হবার কথা নয়। আবার বৃষ্টির জলে জমে জমে স্বাদু জলের অভাব মিটছে। বছর পেরিয়ে গেল। গম ভালোই ফলছে। পাখিরাও খাবার পেয়ে সংখ্যা বাড়াতে লাগল। দুটো খরগোসও একদিন চোখে পড়ল।

আগেই বলেছি, আমাদের কয়জন সহযাত্রী মারা গেছে। তবে আমরা সংখ্যায় কিন্তু কমি নি, বেড়ে গেছে। কীভাবে, তাই না? আমার ছেলে আর হেলেন—এর ছেলে-মেয়ে মিলেই তো তিনজন বেড়ে গেছে। আমরা ছাড়া আরো তিনটে পরিবারের ছেলে-মেয়ের সংখ্যা একই রকম।

এক-দুই করে দশ-দশটা বছর কেটে গেছে। কিন্তু নতুন মহাদেশটা আদৌ চোখে দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। আমাদের মধ্যে অভিযানের পিপাসা উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। ক্যাপ্তেনও এবার এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহী হয়ে পড়লেন। জাহাজ মেরামত করা হল। এবার বেরিয়ে পড়লাম নতুন মহাদেশটা দেখার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে।

ভেবেছিলাম ভেতরের দিকে এগিয়ে গেলে অবশ্যই আগ্নেয়গিরি চোখে পড়বে। কিন্তু হতাশ হতে হল। মাডিয়া ও অ্যাজোরস কোনো এক সময়ে কম সমস্যার করণ ছিল না। অগ্নি উদ্গিরন করে আটলান্টিক মহাসাগরকে একেবারে তছনছ করে ছাড়ত। সাগরের জল উঠে আসার ফলে তাদের দেখতে পাব আশা ছিল। আশা পূরণ হল না। লাভার স্তর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। আগ্নেয়গিরি নিশ্চিহ্ন। আগ্নেয়শিলা ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই। এক নজরে দেখলেই মালুম হয় এক সময় আগ্নেয়গিরির উৎপাত খুবই ছিল।

বাস্তবিকই এখানেই চরমতম বিস্ময়ের মুখোমুখি হয়েছিলাম। অত্যাশ্চর্য অবিশ্বাস্য এক আবিষ্কার সম্ভব হল। ইয়া মোটা মোটা পিলার, থালা-বাটি আর কিছু পাথরের মূর্তি ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে স্তম্ভিত না হয়ে পারলাম না। এখানে তবে অতীত সভ্যতা লোপ পেয়েছে। আমাদের আমলের সভ্যতার চেয়ে অনেক, অনেক প্রাচীন এ সভ্যতা।

www.pathagar.com

লস্ট আটলান্টিস। বহু প্রাচীন সভ্যতা। ড. মোরেনোর অনুমান অভ্রান্ত। সুদূর অতীতের মহাদেশ আটলান্টিস বাস্তবিকই অত্যাশ্চর্য সভ্যতা হিসাবে গড়ে উঠেছিল আর তার পরবর্তীকালে সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আজ তাই আবার চাপের ফলে সাগরের তলদেশ থেকে ওপরে উঠে এসেছে। একই স্থানে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সভ্যতার সৃষ্টি, ভাবলে অবাক হতেই হয়।

আটলান্টিস সভ্যতা সম্বন্ধে যেসব কাহিনী শোনা তবে তা অবশ্যই রূপকথার গল্পের মতো কাল্পনিক কাহিনী নয়। অ্যাজোরেস-এর অগ্নি উদ্গিরন ফলে আজ আবার তা জলের নিচ থেকে ওপরে উঠে এসেছে।

অতীতের কথা ভেবে শুধু সময় নষ্ট করার ইচ্ছা নেই, উচিতও নেই। এমন একটা চিন্তাই আমাদের সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে—বাঁচার চিন্তা। বোধ করি পাখিরা ফল খেয়ে বীজ এনে দ্বীপে ফেলেছে, তা থেকে দ্বীপটা ক্রমেই সবুজ হয়ে উঠছে। বৃষ্টির জল জমে জমে মিষ্টি জলের জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। দ্বীপের পরিবর্তনটা খুবই দ্রুত তালে হয়ে চলেছে। কেবলমাত্র পশু-পাখিই নয়, মাছের মধ্যেও পরিবর্তনের জোয়ার বইছে। আজ বহু উড় ক্কু মাছ ডাঙায় উঠে আসছে। তাদের কি মাছই বলবো ? না, তার চেয়ে বরং প্রাণী বললেই যথার্থ আখ্যা দেওয়া হবে।

আমরা যারা দ্বীপের প্রথম মানুষ বলে গণ্য হই, তারা সবাই আজ বুড়োর খাতায় নাম লিখিয়েছি। আজই কাপ্তেন মরিস দেহত্যাগ করলেন। আমরাও দিন গুণে চলেছি। আমার বয়স এখন আটষট্টি। ড. বামুর্স্টের পয়ষট্টি, ড. মোরেনোর ষাট বছর চলছে। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে জরুরি কিছু কাজ সেরে যেতে চাই। যেকোন উপায়েই হোক আমাকে তা করতেই হবে।

কিন্তু এসব লিখে ফায়দা কি হবে ? কার জন্য লিখব ? কে পড়বে ? উত্তরসূরীরা ?

হায় ঈশ্বর! এরকম দৃশ্যও চোখের সামনে দেখতে হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। ছেলে-মেয়ে মিলে একেবারে গিসগিস করছে। মুক্ত বায়ু। স্বাস্থ্যকর স্থান। হিংস্রপ্রাণীর উৎপাত নেই। অতএব জরা ছাড়া রোগ ব্যাধিতেও মৃত্যু নাই। ফলে দ্বীপের জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলল।

আমরা জনা কয়েকই শিক্ষিত মানুষ। মানে আমি ও আমার ছেলে, ড. মোরেনো আর ড. বামুর্স্ট। আমরা যারা বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তাকে টিকিয়ে রাখতে চাচ্ছি তাদের মধ্যে কাপ্তেন মরিস তো আগেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। পেটের চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা আমাদের নেই। সভ্য-শিক্ষিত মনুষ্য শ্রেণীর মধ্যে আমরা কয়েকজন টিকে আছি। কিন্তু আমরাও যে ক্রমে মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুর স্বভাব লাভ করছি। পশু থেকে মানুষের উদ্ভব। এখন ঠিক উল্টোটা ঘটতে চলেছে। মানুষ থেকে পশুত্ব লাভ করছি। আসলে মানুসিক চর্চা আমাদের ঘুচে গেছে। নাবিকদের কথা তো একেবারেই আলাদা। তারা চিরদিনই রুক্ষ, রুষ্ট ও পাশবিক প্রকৃতির। তাদেরই বা বলি কি, আমাদেরই মস্তিষ্কের অপমৃত্যু ঘটছে ধীরে ধীরে—সজীব আছে কেবলমাত্র উদর। ড. বামুর্স্ট ও মোরেনো মস্কিষ্ককে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছেন।

তবুও ভালো যে, বেশ কয়েক বছর আগে মাহদেশ ঘুরে বেড়িয়ে এসেছিলাম। এখন সে মনের জোর অন্তর্হিত, খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমাদের জাহাজ ভার্জিনিয়াও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

আমাদের সঙ্গে যেসব পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল অনেক আগেই সেসব ছিঁড়ে গেছে। তারপর থেকে সামুদ্রিক শ্যাওলা জুড়ে জুড়ে লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা করেছি। এখন তাও বাদ দিয়ে দিয়েছি, মন চায় না। নির্বিকারচিত্তে একেবারে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াই। অসভ্য-জঙ্গলি-বর্বররা যা করে।

আজ আমাদের একমাত্র কাজ খাওয়া। জীবনের লক্ষ্যও একটাই—উদরকে ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা করা। তবে দু-এক জনের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসা এখনো ছিটেফোঁটা রয়েছে। জন আমার ছেলে এখন নাতি-নাতনি নিয়ে সুখেই আছে। আমাকে সে এখনো বাবার সম্মান দেয়। আর সম্মান খাতির করে সিমোনাট, আমার প্রিয় পুরনো ড্রাইভার।

মেদ্দা কথা, আমাদের মধ্য থেকে ক্রমেই মনুষ্যত্ব অন্তর্হিত হচ্ছে। এখনই যদি এই হয় তবে তো উত্তরসূরীরা পুরোপুরি পাশবিক প্রবৃত্তি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করবে। শিশুদের তো দেখছিই, জঙ্গলিদের মতো বেড়ে উঠছে। লেখাপড়া তো জানেই না। ভালোভাবে গুছিয়ে কথা বলতেও অক্ষম। আসলে খাওয়া ছাড়া কিছু জানে না, বোঝে না। পশুত্ব প্রাপ্তির ঠিক পূর্বাবস্থা যাকে বলে। চিন্তাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি বলে কিছু থাকবে না। কেউ-ই জানতে পারবে না তাদের পূর্বসূরীরা পৃথিবীতে বিজ্ঞানের কতই না ভোজবাজির খেল দেখিয়েছে। তাদের গা ভর্তি লোম গজাবে, ইয়া লম্বা লম্বা লোম। কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। মস্তিষ্ক হ্রাস পাবে। জঙ্গলে জঙ্গলে খাবারে খোঁজে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। আমরা, বুড়োরা ? আমরা চেষ্টা করব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এ লিপি রেখে যাওয়ার। আমাদের কথা তাদের কাছে তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করব। আমাদের মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার আগেই মানবজাতির ইতিকথা, অগ্রগতির ইতিকথা আর বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ইতিকথা লিপিবদ্ধ করে ফেলব। তাই তো এ কাজে প্রয়াসী হয়েছি। জাহাজ ছেড়ে আসার সময় অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সঙ্গে কাগজ, কলম আর কালিও নিয়ে এসেছিলাম। সেগুলোর সাহায্যেই এই—পাণ্ডুলিপিটা লেখা সম্ভব হয়েছে।

* * *

ইতিমধ্যে দীর্ঘ পনেরটা বছর পেরিয়ে গেছে। ড. মোরেনো ইহলোক ছেড়ে গেছেন। ড. বামুর্স্টও আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। আমি একা, একদম একা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে রয়েছি। হাত-পা নিস্তেজ হতে চলেছে। সময় আর বেশি নেই। তবু যে কয়দিন আছি—

জাহাজ ছেড়ে আসার সময় একটা লোহার সিন্দুক নিয়ে এসেছিলাম। মাটি গর্ত করে লুকিয়ে রেখেছিলাম। মানুষের যাবতীয় লব্ধ জ্ঞান সবকিছু লিপিবদ্ধ করে তার মধ্যে গচ্ছিত রেখেছি। একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রের মধ্যে এ পাণ্ডুলিপিটা পুরে সিন্দুকটার পাশেই মাটির তলায় রেখে দেব। বিদায়! মনুষ্যজাতি বিদায় ! বিদায়!

* * *

বাড়ির ভিত খোঁড়ার সময় জারটগ মিস্ত্রিদের দিয়ে মাটি ওলটপালট করালেন। না, বাঞ্ছিত সে সিন্দুকটার হদিশ কিছুতেই পাওয়া গেল না। হয়তো দীর্ঘদিন মাটি চাপা পড়ে থাকায় মরচে পড়ে লোহা ক্ষয় হতে হতে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। মনুষ্যজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতির ইতিকথা—অমূল্য সম্পদও ধ্বংস হয়ে গেছে।

তবে? পাণ্ডুলিপির পাত্রটা? অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি বলে পাত্রটা নষ্ট হতে পারে নি। জারটগ গালে হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগলেন, বহু বহু বছর আগে যারা এসব

www.pathagar.com

থাম, পাকাবাড়ি আর পাথরের মূর্তি তৈরি করেছিলে তারা অবশ্যই সভ্য মানুষ ছিল। তাদের পরিচয় তো পাণ্ডুলিপিটাতেই লেখা রয়েছে। আটলান্টিয়ান। সমুদ্রের বুকে তলিয়ে যাওয়া মহাদেশ আটলান্টিসের মানুষ, সভ্য মানুষ তারা।

বর্তমানে সেখানেই জারটগদের পল্লী গড়ে উঠেছে। একদিন এখানেই অতল জলে তলিয়ে যাওয়া সভ্যতার অবশিষ্ট মানুষগুলো জাহাজ থেকে নেমেছিলেন। আজ 'হেদম' নামের রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হল। 'এদেম' হচ্ছে 'হেদমে'র উৎস। আর 'এদেমে'র উৎস 'আদম'। অর্থাৎ আদম থেকে এদেম এসেছে।

অতল জলে তলিয়ে যাওয়া প্রথম মানব—আদম। আবার এমনটাও তো হতে পারে ঠিক তার পূর্ববর্তী অতল জলে তলিয়ে সভ্যতা থেকে 'আদম' নামটা এসেছে। হয়তো সে সভ্যতার প্রথম মানুষের নাম ছিল 'উদম'। তার আগেও যে কোনো সভ্যতা জলের তলায় তলিয়ে যায় নি তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? ডোবা-ভাসা, সৃষ্টি-ধ্বংসের খেলার চক্করে পড়ে কি তবে একদিন জারটগদের 'চার সমুদ্রের দেশ' ও একদিন জলের নিচে চলে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? সে সঙ্গে একটা ইতিহাসও জলের তলায় তলিয়ে যাবে? পাণ্ডুলিপির লেখকদের সভ্যতা যদি জলের তলায় চলে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে তবে জারটগরাই বা কেন হবে না?

---

www.pathagar.com

ফ্রম দ্য আর্থ টু দ্য মুন

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তখন তুমুল গৃহযুদ্ধ চলছে। ঠিক তখনই মেরিল্যান্ডের অন্তর্গত বাল্টিমোর শহরের বুকে একটা নতুন ধরনের গান-ক্লাব গজিয়ে উঠল। আমেরিকানরা কোনোক্রমে একবার যুদ্ধের খবর পেলে আর মাথা ঠিক রাখতে পারে না। যুদ্ধ সম্বন্ধে যন্ত্রবিদ থেকে শুরু করে কারবারী ও জাহাজ-ব্যবসায়ী পর্যন্ত সবাই সমান উৎসাহী। দু-হাতে অর্থ ব্যয় করে গোলা-বারুদের উন্নতি সাধনের ব্যাপারে সে-মুলুকের সবারই সমান উৎসাহ।

আমেরিকানরা একটা ব্যাপারে ইউরোপিয়ানদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কামান, বন্দুক তৈরির শিল্পে তারা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। তবে কামান-বন্দুক ছোঁড়ার ব্যাপারে ইংরেজ, ফরাসি আর প্রুশিয়ানদের নতুন করে আর কিছুই প্রশিক্ষণ নেবার দরকার ছিল না। তবে হ্যাঁ, তাদের তৈরি কামান, মর্টার ও হাউটজার আমেরিকানদের তৈরি আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে নিতান্তই খেলনা-পিস্তলের সামিল।

তবে হ্যাঁ, এতে বিস্ময়াভিভূত হবার কোনোই কারণ নেই। কারণ, আমেরিকানরা যে পৃথিবীর সেরা কারিগর এ তো আর অস্বীকার করা যাবে না। তারা জন্মসূত্রেই যন্ত্রবিদ। তাই তারা নিজেদের কারিগরী-প্রতিভাকে কামান তৈরির কাজে নিয়োগ করবে এতে তো অবাক হবার কিছুই নেই।

কোনোক্রমে কোনো আমেরিকানের মাথায় নতুন কোনো পরিকল্পনা দেখা দিলে, আর কোনোক্রমে তিনজন আমেরিকান এ-ব্যাপারে একমত হতে পারলেই একটা ক্লাব গজিয়ে উঠবে। তাঁদের একজন হবেন প্রেসিডেন্ট ও অন্য দুজন সেক্রেটারি বনে যাবেন। বাল্টিমোরের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হল না। এক মাসের মধ্যেই ক্লাবের সদস্য সংখ্যা হয়ে গেল আঠারো শ' তেত্রিশজন। আর ত্রিশ হাজার পাঁচ শ' পয়ঁষট্টি জন ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে লাগল।

কামানের নক্সা আবিষ্কারের ক্ষমতা থাকলে তবেই ক্লাবের সদস্য হওয়া যাবে—এ একটাই শর্ত। তবে অন্য কোনো যন্ত্রাংশ আবিষ্কারের ক্ষমতা থাকলেও সুযোগ পাবে। কিন্তু পিস্তলের মতো ছোট্ট ও মামুলি অস্ত্রশস্ত্র এ হিসাবে আসবে না।

তেসরা অক্টোবর সন্ধ্যায় আমেরিকার নামকরা সেই গান-ক্লাবের বিশালায়তন হলঘরে কয়েকজন জড়ো হল। সবাই কোনো না কোনোদিন থেকে অঙ্গহীন। হাত-পা-চোখ প্রভৃতি সবকটা অঙ্গই বর্তমান, এমন কেউই সভাকক্ষে উপস্থিত নেই।

গান-ক্লাবের সদস্যদের একটাই কাজ, বন্দুক, কামান আর গোলাবারুদ তৈরি করা। তাই তো সংস্থাটার 'গান-ক্লাব' নামকরণ হয়েছে। সবাই এক-একজন ঘাঘু গোলন্দাজ। এজন্যই তো তাদের কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। গান-ক্লাবের প্রতিটা সদস্যের একটামাত্রই চিন্তা—কীভাবে দুরপাল্লার, উন্নত মানের কামান তৈরি করে সবকিছু ছারখার করে দেওয়া যায়, আর হজার হাজার মানুষকে পরপাড়ে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। এরকম নিত্যনতুন ধ্বংসাত্মক চিন্তা মাঝে-মধ্যেই তাদের মাথায় আসত। আর তার বাস্তব রূপদান করতে পারলেই তারা যেন বর্তে যেত, জীবন ধন্য জ্ঞান করত।

www.pathagar.com

হায়! গান-ক্লাবের সদস্যদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার যোগাড় হল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব টুকরো টুকরো লড়াই চলছিল সেগুলো হঠাৎ এক এক করে থেমে গেল। এ কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। গান-ক্লাবের সদস্যদের বরাতে এ কী দুঃসময় নেমে এল! আমেরিকার মানুষ লড়াই করে, রক্ত ঝরিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই তো দেশের মানুষের মুখে আজ একই কথা, 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।' অদ্ভুত ব্যাপার তো! সত্যসত্যই একদিন সবরকম শক্তি পরীক্ষা থেমে গিয়ে দেশে শান্তি নেমে এল। এতে গান-ক্লাবের সদস্যদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড় হল। এবার থেকে আর শোনা গেল না, তারা নতুন কোনো অস্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে। ক্লাবে সদস্যদের আনাগোনাও দিন দিন কমতে লাগল। দরকারই বা কী?

হান্টার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বরাত খুবই মন্দ দেখছি! একদিন কামানের গর্জন শুনে আমরা শয্যাত্যগ করতাম। আর আজ কী দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে!'

'হ্যাঁ, অতীতের সেসব দিন আজ আমাদের কাছে নিছকই স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। কামান তৈরি, আর পাল্লার পরীক্ষা প্রভৃতি কতই না আমাদের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করত! কোনো কামান যদি কোনোদিন বেশি সংখ্যক মানুষকে যমের দুয়ারে পাঠাতে পারত তবে সেদিন আমাদের উল্লাস আর দেখে কে। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিলসবি বলে উঠলেন, 'হায়! সেদিন কি আর আমাদের বরাতে ফিরে আসবে! না, কোনোদিনই আসবে না।'

ম্যাসটনের একটা হাত ইস্পাত দিয়ে তৈরি। তিনি তাঁদের বক্তব্য শুনে, সেটা খুলে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'ভবিষ্যতে কোনোদিন যে আবার যুদ্ধ বাঁধবে, সেরকম কোনো লক্ষণই তো আমার নজরে পড়ছে না। যে কয়দিন অলস ভাবে দিন কাটাচ্ছিলাম, তখন অদ্ভুত একেবারে নতুন একটা কামানের নক্সা আমি তৈরি করেছি। ওজন, আকৃতি প্রভৃতি সবই একদম তৈরি। কোনো লড়াই-এ এটাকে ব্যবহার করা গেলে তবে যুদ্ধের প্রকৃতিই একদম বদলে যেত।'

ম্যাসটনের বক্তব্য শুনতে শুনতে হান্টার অতীত স্মৃতি মন্থন করতে লাগলেন। ম্যাসটনের একটামাত্র আবিষ্কৃত কামান ব্যবহার করে পরীক্ষার দিনই তিন শ' সাঁইত্রিশ জনকে পরলোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ম্যাসটন বললেন, 'এত কষ্ট, সময় ও ধৈর্যের বিনিময়ে নতুন আবিষ্কার করেই বা ফায়দা কি? নয়া-পৃথিবী যে শান্তির চিন্তায় ডুবে রয়েছে। কিন্তু ট্রিবিউন পত্রিকার পাতায় ছাপা হয়েছে, জনসংখ্যা যদি এ-হারে বাড়তেই থাকে তবে সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে। ফলে অচিরেই ভয়ঙ্কর এক সমস্যার উদ্ভব হবে।'

কর্ণেল ব্লুমসবি এবার মুখ খুললেন, 'চলুন সাহেব, আমরা আমেরিকার মাটি ছেড়ে ইংল্যান্ডে পালিয়ে যাই। সেখানে তাদের উস্কানি দিয়ে কোনোক্রমে চটিয়ে দিতে পারলেই কাজ হাসিল। ব্যস, যুদ্ধে মেতে উঠবে।'

বিলসবি প্রায় ধমকের স্বরে বলে উঠলেন, 'কী সব আবোল তাবোল বকছেন সাহেব! আমেরিকান হয়ে কি না বিদেশীদের জন্য কামান বানাব!'

'ক্ষেপছেন কেন সাহেব! হাত-পা গুটিয়ে নিষ্কর্মা হয়ে দিন কাটানোর চেয়ে তো এটা ঢের ভালো। যেটুকু জানতাম অলস হয়ে দিন কাটাতে গিয়ে তাও আজ ভুলে যাচ্ছি।'

www.pathagar.com

'বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছাটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিন। আর ইউরোপে তো অবশ্যই নয়। ইউরোপ আর আমেরিকার মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক কোনোদিনই গড়ে উঠবার নয়। তারা বিশ্বাস করে, আগে কিছুদিন পতাকাবহন না করে সেনাপতি হওয়া সম্ভব নয়।'

একটু বেশ রাগত স্বরেই হান্টার বললেন,'হাসালেন সাহেব! তবে তো আর কথাই নেই। চলুন, তামাকের চাষে কোমরবেঁধে লেগে পড়ি, নয়তো তিমি শিকার করে চর্বি জ্বাল দেওয়ার কাজ শুরু করি।'

'আরে ক্ষেপছেন কেন সাহেব! আপনার কি বিশ্বাস, এদেশের মানুষ চিরটা কাল শান্তির বুলিই আওড়াবে? ধ্যুৎ! কয়টা দিন অপেক্ষার করুন না। যুদ্ধের দামামা বাজল বলে। আর কিছু না-ই বা হল। ফরাসিরা কি ভুল করে হলেও আমাদের দুটো জাহাজ ডুবিয়ে দেবে না? ইংল্যান্ড কি দু-চারটে খুনি আমেরিকানের গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দেবে না? কেবলমাত্র অছিলা দরকার। ব্যস, তুমুল যুদ্ধে দু-দেশ এবার মাতল বলে।'

ব্লুমসবি বলে উঠলেন,'আসলে আমেরিকানদের চেতনাশক্তি লোপ পেয়ে গেছে। একটু-আধটু চৈতন্য টৈতন্য থাকলে কবেই তুমুল যুদ্ধ বেঁধে যেত।'

ম্যাসটন এবার বললেন,'ভালো কথা, আমেরিকা কি এক সময় ইংরেজদের দখলে ছিল?

'হ্যাঁ, তা-তো ছিলই।'

'তাই যদি হয়ে থাকে তবে ইংল্যান্ডেই বা আমাদের আধিপত্য বিস্তার করতে বাধা কোথায়।'

রাগে গস গস করতে করতে বিলসবি বলে উঠলেন, 'জানেন সাহেব, প্রেসিডেন্টের কানে কথাটা একবার তুলেই দেখুন গে। বুঝবেন, ঠ্যালা কাকে বলে।'

শেষমেশ গান-ক্লাবের সদস্যরা রেগে গিয়ে সিদ্ধান্তই নিয়ে নিলেন, আমেরিকার তদানিন্তন প্রেসিডেন্টকে আর ভোট দেবেন না।

একজন বললেন, 'আমার সাফ কথা শুনে রাখুন সাহেব, আমার নতুন মর্টার যদি যুদ্ধক্ষেত্রে দেখাবার সুযোগ না-ই পাই, তবে কিন্তু আমি সব ছেড়ে দিয়ে চাষের কাজে লেগে যাব।'

সবাই তাঁরই পথ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

পরিস্থিতি এমন হয়ে গেল যে, গান-ক্লাব উঠে যাওয়ারই জোগাড় হল। কিন্তু হঠাৎ অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটায় ক্লাবটা উঠতে গিয়েও কোনোরকমে থেমে গেল।

ক্লাবের সদস্যরা যখন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতাশাব্যঞ্জক আলোচনায় মগ্ন ঠিক তখনই তাঁদের হাতে একটা বিজ্ঞপ্তি এল। তাতে স্থান ও তারিখের জায়গায় লেখা রয়েছে—বাল্টিমোর, তেসরা অক্টোবর।

বিজ্ঞপ্তির বক্তব্য—সবার অবগতির জন্য গান-ক্লাবের সভাপতি লিখছেন যে, "আগামী পাঁচই অক্টোবর রাত্রি আটটায় তিনি ক্লাবের সদস্যদের অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য একটা খবর শোনাবেন। আশা করা যাচ্ছে যে, সেদিন নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য যেন অন্যান্য কাজকর্ম ফেলে সভাকক্ষে উপস্থিত থাকেন। প্রত্যেককে আবারও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, সেদিনের উপরোক্ত সভাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।" বিজ্ঞপ্তিটার শেষে স্বাক্ষর রয়েছে—ইম্পে বার্বিকেন। প্রেসিডেন্ট গান-ক্লাব।

www.pathagar.com

দেখতে দেখতে পাঁচই অক্টোবর এসে গেল। সভাকক্ষ লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই। গান-ক্লাবের ত্রিশ হাজারেরও বেশি সদস্য। তাই সুবিশাল সভাকক্ষেও সবার স্থান সঙ্কুলাণ না হওয়ায় অধিকাংশ সদস্যই বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সংস্থার সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন প্রতিটা কাজ ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে করেন। যাকে বলে ক্রনোমিটারের কাঁটার মতো কাজ করা। ঘড়িতে তখনো আটটা বাজতে দেড় মিনিট বাকি। সভাপতি বার্বিকেন মঞ্চে উঠে এলেন। ঘড়িতে আটটার ঘণ্টা বাজামাত্র তিনি দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুরু করলেন, 'আমার বীর সহকর্মীগণ, আজ গান—ক্লাবের সব নামজাদা সদস্যরা যে অসহনীয় কর্মহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তা সত্যি বড়ই দুঃসহ, পীড়াদায়ক। কে-ই বা জানবে বলুন, অকস্মাত সব লড়াই থেমে গিয়ে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হবে? আবার তা যে এতদিন স্থায়িত্ব লাভ করবে এও যে ভাবাই যায় না। নতুন লড়াইয়ের খবরের জন্য আমরা প্রতিটা মুহূর্ত উৎকর্ণ হয়ে অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছি। ব্যর্থ হয়েছি। হয়েছি হতাশায় জর্জরিত। আর নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, লড়াই বাঁধার আর কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই বলে আমরা নাকে তেল দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে কাটাবো? কামান-বন্দুক আর গোলা-গুলির কোনো উন্নতিই কি আর হওয়ার দরকার নেই? আপনারাই বিচার করে বলুন, লড়াই যদি আর না-ই বাঁধল তবে কি আমরা অলসভাবে শুয়ে-বসে কাটিয়ে প্রমাণ করব যে, আমরা উনিশ শতকের অযোগ্য-অকর্মণ্য মানুষ? পৃথিবী জুড়ে যে গান-ক্লাবের প্রচার ও সম্মান-খাতির, তারা তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কোনোভাবেই প্রয়াসী হতে পারবে না?'

সদস্যদের সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হল, 'গান-ক্লাব নতুনতর কিছু করতে আগ্রহী।'

বার্বিকেন বলে চললেন, 'বন্ধুগণ, আমাদের এমন কিছু করতে হবে যা কেবলমাত্র আমাদের সংস্থারই নয়, সমগ্র আমেরিকার মর্যাদা যাতে অক্ষুণ্ন থাকে। আমাদের এমন কোনো কাজ করতে হবে যা শুনে বিশ্ববাসীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়বে। কি সে কাজ, তাই না? পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদকে তো আপনারা সবাই দেখেছেন। যদি না-ও দেখে থাকেন তবে চাঁদের কথা অন্তত শুনেছেন, ঠিক কিনা? আমাদের এবারের অভিযান হবে সেই চাঁদের মুল্লুকেই। চন্দ্রলোক আবিষ্কারের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কলম্বাস বনে যেতে আগ্রহী। সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ছত্রিশটি রাজ্য আছে। আমি নিঃসন্দেহ, যে চাঁদ মুল্লুকটা আমাদের অধিকারে আসবেই আসবে।'

উপস্থিত সদস্যরা সমবেত কণ্ঠে সভাপতিকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন।

বার্বিকেন পূর্ব বক্তব্যের জের টেনে ফের বলতে লাগলেন, 'বন্ধুগণ, চাঁদ মুল্লুকটাকে নিয়ে যে বহু কল্পনার জাল বোনা হচ্ছে তা-তো আর আপনাদের অজানা নয়। তার প্রকৃত আকৃতি, ওজন, ঘনত্ব আর গতিবেগ প্রভৃতি সবই আমরা জানি। সৌরমণ্ডলে চাঁদের ভূমিকা কি আমরা যে তা জানি না তাও নয়। চাঁদে পাড়ি জমানোর কাজটা বাস্তবিকই দুষ্কর। এ-দুষ্কর কাজে কেউ-ই আজ অবধি সাহসে ভর করে নামতে পারে নি। তাই তো চাঁদ আজও অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে। আর রয়ে গেছে কল্পনার ব্যাপার হয়ে।

কল্পকথার মাধ্যমে যাঁরা আমাদের এ-উপগ্রহটার রহস্য উম্মোচন করতে প্রয়াসী হয়েছেন তাদের মধ্যে সতের শতকের ডেভিড ফেব্রিসিয়াস-এর নাম করতেই হয়। তিনি অহমিকা প্রকাশ করে প্রচার করেছেন, চাঁদের অধিবাসীদের নাকি চাক্ষুষ করেছেন।

www.pathagar.com

জাঁ বোদোই নামধারী এক ফরাসি তেরো শো উনপঞ্চাশে' ডোমিনগো গোনজালেজের পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে চন্দ্রে অভিযান' নাম দিয়ে একটা গল্প ছেপেছেন। ডোমিনগো নাকি স্পেনের একজন দুঃসাহসী নওজোয়ান।

সমসাময়িক কালেই 'জার্নিস ইন দ্যা মুন' নামে সিয়ালে ডি বারজাক একটা গল্প লিখলেন। এরই অব্যবহতিকাল পরে ফনটেনেলি নামে আর এক ফরাসি চাঁদ মুলুকটাকে নিয়ে কৌতূহল সঞ্চারকারী আর একটা গল্প ফাঁদলেন।

'নিউইয়র্ক আমেরিকান' পত্রিকায় আঠারো শ' পয়ঁত্রিশে একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। উত্তমাশা অন্তরীপে গিয়ে স্যার জন হার্সচ্যাল এক অভিনব দূরবীক্ষণ ব্যবহার করে চাঁদকে নাকি মাত্র আটগজের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছেন, অতিকায় গুহার মধ্যে দলবেঁধে হিপোপটেমাসরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঠে ময়দানে চরে বেড়াচ্ছে ইয়া লম্বা শিংওয়ালা ভেড়ার দল, শ্বেত হরিণ ছুটোছুটি করছে। আর চাঁদের যথাসর্বস্বের মালিক বাদুড়ের মতো ডানাওয়ালা জীবদেরও তিনি নাকি দেখতে পেয়েছেন।

আপনাদের কাছে আরো একটা কাহিনীর অবতারণা করছি—হ্যান্স ফাল নামে রোটারডাম-এর এক অধিবাসী বেলুনে চেপে শূন্যে উড়েছিলেন। নাইট্রোজেন থেকে নিষ্কাশন করা, হাইড্রোজেন থেকে সাঁইত্রিশগুণ হাল্কা এক বিশেষ ধরনের গ্যাস তিনি এতে ব্যবহার করেছিলেন। তাই তো মাত্র উনত্রিশ ঘণ্টায় বেলুনটা চাঁদে হাজির হয়ে গিয়েছিল। বিচিত্র এ-কাহিনীটা নিছকই কল্পনাপ্রসূত সন্দেহ নেই। আর এর লেখক আমেরিকার এডগার এ্যালান পো।'

মুহূর্তের জন্য নীরবে একটু দম নিয়ে বার্বিকেন পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে আবার বলতে লাগলেন, 'এতক্ষণ কাগজ-কলমে পরীক্ষার ব্যাপার-স্যাপার বললাম। এবার বাস্তবের ব্যাপার কিছু বলছি। কয়েক বছর আগে জার্মানির এক জ্যামিতিবিদ সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ পতিত অঞ্চল থেকে এক বৈজ্ঞানিক অভিযানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। উন্মুক্ত প্রান্তরে এমন এক অদ্ভুত কৌশলে জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কণ করা হবে যার ওপর আলো প্রতিফলিত হলে তা আরো অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠবে। চাঁদে যদি বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব থেকেই থাকে তবে অনুরূপ নক্সার মাধ্যমে তারা এর জবাব দেবে। এ-পদ্ধতিতে জ্যামিতিক চিত্রের মাধ্যমে পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে মনের ভাবের আদান-প্রদান করা সম্ভব হবে। তবে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তব রূপ নেয় নি। আর আজ অবধি চাঁদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। আমরা, আমেরিকানরা আমাদের বাস্তব জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে এতদিনের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করতে আগ্রহী। এটাই আমার বক্তব্যের সারমর্ম। আপনারা কেউ কেউ হয়তো ভেবে থাকতে পারেন অসম্ভব ব্যাপার নিয়ে আমি আপনাদের সামনে কথার ফুলঝুরি ছোটাচ্ছি। আসলে কিন্তু অভিযানটা খুবই সহজ হয়ে উঠবে। একটা কথা, গত কয়েক বছরের মধ্যে কামানের পাল্লার কতখানি উন্নতি হয়েছে, কামান থেকে নিক্ষিপ্ত গোলা কতটা উঁচু অবধি ছুটে যেতে সক্ষম আশা করি আপনাদের কারোরই আজ আর অজানা নয়। এসব দিক বিচার-বিবেচনা করে আমাদের কামান থেকে একটা গোলাকে চাঁদের বুকে যদি ফেলা সম্ভবই হয় আপত্তির কি থাকতে পারে? এতে দু-দিক থেকে ফায়দা হবে। যেমন আমাদের কামানের পাল্লাটা যাচাই করে নেওয়া যাবে আর চাঁদে অধিকার বিস্তারও হয়ে উঠবে অধিকতকর সহজ, ঠিক কিনা?'

www.pathagar.com

বার্বিকেনের প্রস্তাব শুনে সদস্যরা সোল্লাসে তাঁকে বহুভাবে অভিনন্দন জানাতে লাগল।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বার্বিকেন আবার মুখ খুললেন, 'আমি হিসাবনিকাশ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি—সেকেন্ডে বারো হাজার গজ গতিবেগ সম্পন্ন কোনো গোলাকে যদি চাঁদকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা যায় তবে তা চাঁদের বুকে পৌঁছাবেই পৌঁছাবে। তাই এ-ব্যাপারটা নিয়ে সামান্য একটু চিন্তা ভাবনা করতে আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখছি।'

সভাপতি বার্বিকেনের বক্তব্য শেষ হতে না হতেই উপস্থিত সদস্যরা করতালি ও জয়ধ্বনির মাধ্যমে তাঁকে বারবার অভিনন্দন জানাতে লাগল। সে যেন রীতিমতো এক হুলুস্থুল কাণ্ড। সভাপতি বার্বিকেনের ইচ্ছা ছিল আরো কিছু বক্তব্য রাখেন। কিন্তু সদস্যদের আনন্দ-উল্লাস এমন চরমে উঠল যে, তিনি বার বার হাত তুলে থামতে অনুরোধ করলেন, ঘণ্টাধ্বনি করলেন। কিন্তু সবই ব্যর্থ তাঁকে কাধে তুলে নাচতে নাচতে সভাকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আমেরিকানরা বাড়িঘর ছেড়ে হৈ হুল্লোড় করতে করতে পথে নেমে এল। ইতিমধ্যে আকাশের গায়ে রূপালি চাঁদ আবির্ভূত হয়ে গেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সবাই অপলক চোখে তাকে দেখতে লাগল। চাঁদ দেখবার আতস কাঁচ বিক্রি করেই একজান চশমার দোকানি দু-হাতে অর্থোপার্জন করে ধনী বনে গেল।

মাঝ রাত্রিতেও মানুষের আনন্দ-স্ফূর্তিতে এতটুকুও ভাঁটা পড়ল না।

আমেরিকার দৈনিক পত্রিকাগুলো ফলাও করে চাঁদে গোলা পাঠাবার পরিকল্পনার কথা ছাপল। বার্বিকেনের চমক সৃষ্টিকারী অভিনব প্রস্তাবটা নিয়ে বিভিন্ন মহলের মানুষের মধ্যে আলোচনা ও হরেক রকম জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল। সবার মুখেই এক কথা, "বার্বিকেন যা বলেছেন তা মোটেই অসম্ভব নয়। আমেরিকানদের কাছে অসম্ভব বলে কোনো কাজই নেই। আর এখানেই তো ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকার পার্থক্য।"

রাত্রি দুটোর কাছাকাছি জনতার উল্লাস স্তিমিত হল। ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দেহে বার্বিকেন বাড়ি ফিরলেন। তার পরের দিন টেলিগ্রাফের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচ শ' সংবাদপত্র এবং সাময়িকীতে খবরটা ছাপা হল। এবার দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, দ্বি-মাসিক এবং ত্রি-মাসিক প্রভৃতি সবরকম কাগজের পাতাতেই বার্বিকেনের প্রস্তাব শিরোনামায় স্থান পেল। ফলও পাওয়া গেল হাতে নাতে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গান-ক্লাবে অভিনন্দনসহ আর্থিক এবং অন্যান্য সাহায্য-সহযোগিতার প্রস্তাব আসতে লাগল।

ব্যস, ইম্পে বার্বিকেন এবার যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে খ্যাতনামা ও সম্মানীয় ব্যক্তি বনে গেলেন।

আমেরিকানরা যখন নানা জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে চাঁদে যাওয়ার ব্যাপারে অভিনব সব পরিকল্পনা আটঁছে, তখন বার্বিকেন বিজ্ঞানীদের মুখোমুখি বসে আর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চাঁদে পাড়ি জমানোর ব্যাপারটাকে সহজতর করতে প্রয়াসী হতে লাগলেন।

তিনি সবার আগে গান-ক্লাবের বোর্ডরুমে সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন, গোড়াতেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের মতামত নিতে হবে। তারপর ভাবলেন, যান্ত্রিক সমস্যার ব্যাপর স্যাপার নিয়ে।

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে প্রাচীন মানমন্দির রয়েছে ম্যাসাচুসেটসের। কয়েকটা প্রশ্ন সম্বলিত একটা চিঠি তিনি কেমব্রিজ মানমন্দিরে পাঠিয়ে দিলেন। দু-দিন পরেই চিঠির উত্তর এসে গেল। চিঠিটা মোটামুটি এরকম—

'কেমব্রিজ মানমন্দিরের অধিকর্তা গান-ক্লাবের সভাপতিকে লিখছেন।

কেমব্রিজ, সাতই অক্টোবর

আপনি ছয়টা প্রশ্ন রেখেছেন। যেমন—

১. চাঁদে কি গোলা নিক্ষেপ করা সম্ভব ?

২. পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে প্রকৃত ব্যবধান কত ?

৩. গোলাটা কতদিনে চাঁদে পৌঁছতে পারবে ? কামান দাগতে হবে কখন ?

৪. চাঁদ কখন খুব কাছাকাছি অবস্থান করবে যাতে গোলাটার পক্ষে সহজেই সেখানে পৌঁছনো সম্ভব হবে?

৫. আকাশের কোনোদিকে তাক করে গোলাটাকে ছুঁড়তে হবে ?

৬. গোলাটা যাত্রা করার মুহূর্তে চাঁদ কোনো অবস্থায় অবস্থান করবে ?

১ প্রশ্ন। চাঁদে কি গোলা নিক্ষেপ করা সম্ভব ?

উত্তর : হ্যাঁ, সম্ভব।

কোনো কামানের গোলা যদি প্রতি সেকেন্ডে বারো হাজার গজ পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয় তবে তা অনায়াসে চাঁদে পৌঁছে যাবে। তখন কামানের গোলাটা মহাকর্ষকে অতি সহজেই নস্যাৎ করে দিতে পারবে। অভিকর্ষজ বল তার পর কোনো প্রভাবই ফেলতে সক্ষম হবে না। আর তাকে আবার আকর্ষণ করে পৃথিবীর বুকে নামিয়ে আনতে পারবে না। ধেয়ে যেতে যেতে গোলাটা এমন এক জায়গায় গিয়ে হাজির হবে যেখানে গোলাটার ওপর পৃথিবীর চেয়ে চাঁদের আকর্ষণ অনেক, অনেক বেশি হবে। সে জন্য গোলার গতি যাবে বেড়ে। তখন আরো তীব্র বেগে চাঁদের দিকে ছুটে যাবে। সর্বদা সেকেন্ডে বারো হাজার গজ ছুটতে পারলে তার চাঁদে যেতে ঘণ্টা কয়েকের বেশি সময় লাগার কথা নয়। কিন্তু তা যে হবার নয়। বায়ুর বাধা এবং মহাকর্ষের পিছন টান তো কার্যকরী হবেই। তাতে গোলাটার গতি ক্রমে কমতেই থাকবে। দীর্ঘ সময় ধরে অঙ্ক কষে, হিসাব নিকাশ করে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তের কথা ব্যক্ত করলেন, পৃথিবীর টান যেখানে শেষ হয়েছে, চাঁদের একমাত্র আকর্ষণেই গোলাটা তিরাশি ঘণ্টা কুড়ি মিনিটে সেখানে যেতে পারবে। সেখান থেকে আরো তেরো ঘণ্টা তিপ্পান্ন মিনিট কুড়ি সেকেন্ড লাগবে চাঁদের বুকে হাজির হতে। তবে হিসাব মতো, যখন চাঁদের বুকে গোলাটাকে ফেলার ইচ্ছা তার চেয়ে সাত ঘণ্টা তেরো মিনিট কুড়ি সেকেন্ড আগে কামান দাগা দরকার।

২ প্রশ্নটা। হচ্ছে—পৃথিবীর ও চাঁদের মধ্যে প্রকৃত ব্যবধান কত ?

উত্তর : আপনাদের তো জানাই আছে যে, চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে চক্কর মারছে। কিন্তু বৃত্তাকার পথে ঘুরছে না। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় চাঁদ পৃথিবী থেকে বেশ কিছুটা দূরে চলে যায়। তখন চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব হয় দুলক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচ শ' বাহান্ন মাইল। ফের কাছে চলে আসার সময় উভয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকে দুলক্ষ আঠারো হাজার দু-শ' সাতান্ন মাইল। তাই তো কামান দাগতে হবে চাঁদ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে চলে আসে।

www.pathagar.com

৩ প্রশ্ন। গোলাটা কতদিনে চাঁদে পৌছতে পারবে ? কামান দাগতে হবে কখন ?
উত্তর : প্রথম প্রশ্নের উত্তরের শেষ কয়েকটা ছত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করুন।
৪ প্রশ্ন। চাঁদ কখন খুব কাছাকাছি অবস্থান করবে যাতে গোলাটার পক্ষে সহজেই সেখানে পৌছানো সম্ভব ?
উত্তর : পৃথিবী ও চাঁদ প্রত্যেক মাসে একবার করে পরস্পরের খুবই কাছাকাছি চলে আসে। কিন্তু প্রত্যেক মাসে জেনিথ অতিক্রম করে না। একটা রেখা যদি পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু থেকে টানা হয় তবে সেটা মাথার ওপরের আকাশকে যেখানে স্পর্শ করবে তাকেই জেনিথ বলে। বহু বছর বাদে বাদে চাঁদ এভাবে একবার করে পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসে। আগামী মাসে চৌঠা ডিসেম্বর বহু বছর বাদে চাঁদ এ-অবস্থানে আসবে।

৫ এবং ৬ প্রশ্ন। আকাশের কোনোদিকে তাক করে গোলাটাকে ছুঁড়তে হবে ? গোলাটা যাত্রা করার মুহূর্তে চাঁদ কোনো অবস্থায় অবস্থান করবে ?
উত্তর : পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর দেখুন। তারপর শুনুন—এ অবস্থায় উপনীত হওয়ার আগেই ডিসেম্বরের এক তারিখে রাত্রি দশটা ছেচল্লিশ মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ডে চাঁদকে লক্ষ্য করে কামান দাগতে হবে। তখন নাকি পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে ব্যবধান আরো অনেকাংশে হ্রাস পেয়ে যাবে। সে-সময়টার সদ্ব্যবহার করতে না পারলে পরবর্তী আঠারো বছর এগারো দিন অবশ্যই নিশ্চেষ্ট হয়ে অপেক্ষায় থাকতে হবে। কোথা কামানের গোলা ছুঁড়তে হবে, তাই না ? উত্তর এবং দক্ষিণ অক্ষরেখার শূন্য ডিগ্রি ও আঠাশ ডিগ্রির মধ্যবর্তী কোনো অংশ থেকে গোলা ছুঁড়তে হবে। অন্য কোনো জায়গা থেকে কামান দাগা হলে গোলাটা ক্রমে বেঁকে গিয়ে চাঁদ থেকে দূরে সরে যাবে। দূরে, বহু দূরে সরে যাবে। বিজ্ঞানীদের মতে চাঁদ প্রতিদিন তেরো ডিগ্রি দশ মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেন্ডে পথ অতিক্রম করে। চাঁদ যখন সু-বিন্দু থেকে চৌষট্টি ডিগ্রি দূরবর্তীস্থানে অবস্থান করবে ঠিক তখনই চাঁদকে তাক করে গোলাটা ছুঁড়ে দিতে হবে।
শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

ইতি—
জে. এম. বেলফাস্ট ; অধিকর্তা,
কেমব্রিজ মানমন্দির।'

* * *

বার্বিকেনের ঘোষণার পর থেকে চাঁদকে নিয়ে চারদিকে কতই না জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হল। সমগ্র আমেরিকার মানুষ যেন চাঁদ-চাঁদ করে মেতে উঠেছে।

বিজ্ঞান-পত্রিকার পাতায় কেমব্রিজ মানমন্দিরের অধিকর্তার চিঠিটা ছেপে দেওয়া হল। তাঁর বক্তব্যকে সবাই নির্দ্বিধায় মেনে নিল। চারদিকে বাহবা-বাহবা শুরু হয়ে গেল।

জানা গেল, পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব দুলক্ষ চৌত্রিশ হাজার তিনশ' সাতচল্লিশ মাইল তো হবেই, তবে সত্তর মাইল কম-বেশি হওয়াও অসম্ভব নয়। পৃথিবীর দিকে চাঁদের একটা দিক অবস্থান করে। মনে হয় সেখানে চৌদ্দটা চাঁদের দ্যুতি বুঝি পুঞ্জীভূত হয়েছে। নক্ষত্রের আলোয় আলোকিত চাঁদের অন্য প্রান্তটা,—সেদিকটা কোনোদিনই মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব হয় নি।

www.pathagar.com

চাঁদ অধিবৃত্তাকারে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার ফলে সেটা একবার পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসে। ক্রমে আবার দূরে চলে যায়। কারো কারো মতে কোনো এক সময় চাঁদ নাকি ধূমকেতু ছিল। সৌরমণ্ডলে প্রবেশ করামাত্র, পৃথিবীর নিকটবর্তী হয়ে যাওয়া মাত্র পৃথিবীর টানে আটকা পড়ে গেছে। তাই তো চাঁদের গায়ে কালো কালো দাগ নজরে পড়ে।

অন্য আর একদল বৈজ্ঞানিক তাঁদের বক্তব্যকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে মন্তব্য করেন। ধূমকেতুতে বায়ুমণ্ডল অস্থান করে। চাঁদে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব নেই। যদি থাকেও তবে তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

আবার কেউ কেউ মন্তব্য করলেন—খলিফাদের আমলে নাকি প্রচার হয়েছিল, চাঁদের গতিবেগ ক্রমে অল্প অল্প করে হ্রাস পাচ্ছে। যদি তা-ই হয়ে থাকে তবে চাঁদ একদিন না একদিন গতিবেগ শূন্য হয়ে ধপাস করে পৃথিবীতে পড়ে যাবে। অন্য দল উপহাসের মাধ্যমে এ মতবাদকে নস্যাৎ করে দিলেন।

আবার কুসংস্কারে বিশ্বাসীরা বলেছে, চাঁদ নাকি প্রত্যেক পৃথিবীবাসীর প্রাণশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। প্রত্যেক পৃথিবীবাসী ও প্রত্যেকটা চাঁদের মানুষ নাকি সম্প্রীতির ডোরে আবদ্ধ। মানুষের অদৃষ্ট এ-গুপ্তরহস্যের ওপরই নির্ভরশীল।

* * *

কেমব্রিজ মানমন্দিরের চিঠির বক্তব্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বক্তব্যে ভরপুর। তখন অবধি যান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের উপায় বের হয় নি।

প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন সময় নষ্ট করতে নারাজ। একটা কার্যকরী কমিটি গঠন করে কামান, কামানের গোলা নির্মাণ ও বারুদ তৈরির কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব তাঁদের ওপর অর্পণ করলেন।

বার্বিকেন, মেজর এলফিনস্টোন, জেনারেল মরগ্যান আর জে. সি. ম্যাসটনকে নিয়ে কমিটিটা গঠিত হল। ম্যাসটনকে কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হল।

কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, লোহার ঢালাই গোলা ব্যবহার করা যাবে না। অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে গোলা তৈরি করা হলে ওজন হাল্কা হবে। গোলাটার ব্যাস রাখতে হবে এক শ' আশি ইঞ্চি। এর চেয়ে ছোট করা হলে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও সেটা ধরা দেবে না। আর গোলার ভেতরটা হবে ফাঁপা। নয় ফুট ব্যাস যুক্ত গোলাটার ওজন হবে উনিশ হাজার দু-শ' পঞ্চাশ পাউন্ড। অ্যালুমিনিয়ামের বদলে লোহার গোলা হলে তার ওজন হবে সাতষট্টি হাজার চার শ' চল্লিশ পাউন্ড। সেজন্যই অ্যালুমিনিয়ামের গোলা তৈরির ব্যাপারে সবাই সম্মতি প্রদান করলেন। অঙ্ক কষে, দেখা গেল গোলাটা নির্মাণ করতে প্রায় তিয়াত্তর হাজার পঞ্চাশ ডলার ব্যয় হবে। আর গোলাটার অ্যালুমিনিয়ামের চাদরটা বারো ইঞ্চি পুরু থাকবে। অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহারের সুবিধা অনেক—লোহার সমান মজবুত, রূপোর মতো ঝকঝকে সাদা, সোনার মতো ক্ষয়হীন, কাঁচের মতো হাল্কা আর পিতলের মতোই দ্রাব্য। প্রেসিডেন্ট আরো যুক্তি দেখালেন, লোহার তিন ভাগের এক ভাগ হাল্কা আর ছাঁচের সাহায্যে ঢালাইয়ের সুবিধাও যথেষ্ট।

গান-ক্লাবের বাইরের মানুষ শুনল, চাঁদের উদ্দেশে কুড়ি হাজার পাউন্ড গোলা নিক্ষেপ করা হবে। এরকম কথা শুনে সবাই তো মূর্চ্ছা যাবার জোগাড় হল। আরে ব্বাস! সে মাপের একটা কামান তৈরি সম্ভব হবে তো?

www.pathagar.com

এবার কামান তৈরির ব্যাপারটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কমিটির সভা বসল। গোলার ওজন, আয়তন সবই যখন নির্ধারণ করা হয়ে গেছে তখন নয় ফুট ব্যাস বিশিষ্ট বিশালায়তন গোলাটা নিক্ষেপ করার ক্ষমতা সম্পন্ন কামানটার আকৃতি কেমন হবে এটাই এবারের আলোচ্য বিষয়। আর কীভাবে গোলাটার গতিবেগ সেকেন্ডে বারো হাজার গজ করা যাবে তাও আলোচনায় স্থান পেল।

গোলা নিক্ষেপ করার সময় তার ওপর তিনটে শক্তি ক্রিয়াশীল হয়। পৃথিবীর আকর্ষণ, প্রক্ষেপণের ধাক্কা আর বাতাসের প্রদত্ত চাপ। বিষয়গুলোকে এরকম দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যাক—গোলা ছোঁড়ার পর শূন্যে চলতে গিয়ে বায়ু আর মহাকর্ষ থেকে বাধা পায়। তবুও বারুদের প্রদত্ত শক্তি সব বাধাকে নস্যাৎ করে দিয়ে গোলাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে চল্লিশ মাইল ওপরে উঠে গেলে সেখানে বায়ুস্তর অনুপস্থিত। তাই তো গোলাটা সেকেন্ডে বারো হাজার গজ অতিক্রম করতে করতে অল্প কিছু সময়েই বায়ুস্তর অতিক্রম করে ফেলবে। এবার মহাকর্ষের নিয়ম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তলিয়ে দেখা যাক। কোনো বস্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে যত ওপরে উঠতে থাকবে তার ওজনও ততই হ্রাস পেতে থাকবে। আর সেটা হবে দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাতে। অতএব গোলাটার গতিবেগ সেরকমভাবে বৃদ্ধি পেলেই মাধ্যাকর্ষণকে সহজেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এর জন্য কামানের চোঙ ও বারুদের শক্তির দিকটা বিচার বিবেচনা করা নিতান্তই দরকার। কারণ, এদের ওপরই গতিবেগ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অতএব কামানের চোঙটাকে নয় শ' ফুট দৈর্ঘ্য ও নয় ফুট ব্যাস বিশিষ্ট করে তৈরি করতে হবে। আর তার জন্য ব্যবহার করা হবে ঢালাই লোহা। এটাকে সহজেই প্রয়োজন অনুযায়ী ঢালাই করা যাবে এবং দামও ব্রোঞ্জের চেয়ে এক দশমাংশ কম।

ঢালাই লোহা ভঙ্গুর হলেও এর সেক্রেটারি ম্যাসটন কামানটার ওজনের ব্যাপারে হিসাব-নিকাশ করতে বসলেন। বীজগণিতের সূত্র ধরে তিনি সহজেই হিসাব করে ফেললেন। এবার তিনি মুখ খুললেন, 'কামানটার ওজন বলছি শুনুন—আটষট্টি হাজার চল্লিশ টন হবে সেটার ওজন। আর দাম ? প্রতি পাউন্ডের জন্য দু-সেন্ট হিসাবে মোটা দাম হবে, পঁচিশ লক্ষ দশ হাজার সাত শ' এক ডলার। অর্থের অঙ্কটা শুনে উপস্থিত সবাই আঁৎকে উঠলে বার্বিকেন মুচকি হেসে বললেন, 'অর্থের জন্য ভাবতে হবে না। সময়মত অর্থ ঠিকই এসে যাবে। এবার সভা ভঙ্গ করা হল।'

এখন বাকি রইল বারুদের সমস্যার সমাধান করা। জনসাধারণ সবারই একই চিন্তা, এমন পেল্লাই একটা কামানে কী বিপুল পরিমাণ বারুদ প্রয়োজন।

বারুদের ব্যাপারটা ফয়সালা করার জন্য আবার সভা বসল। আলোচনার শুরুতেই হিসাব-নিকাশ করে বার্বিকেন বললেন, 'এর জন্য ষোলো লক্ষ পাউন্ড বারুদ প্রয়োজন।' কথাটা শোনামাত্র সবার তো চক্ষু স্থির। কারণ, ষোলো লক্ষ পাউন্ড বারুদের জন্য লাগবে বাইশ হাজার ঘনফুট জায়গা। তছাড়াও চাই গোলাটা রাখার জায়গা আর বারুদ জ্বলে যে গ্যাস সৃষ্টি হবে তার জন্যও জায়গা চাই। এরকম গাদাগাদি অবস্থা হলে গোলাটা কি করে ছুটবে, মাথায় আসছে না।

'অবশ্যই। ষোলো লক্ষ পাউন্ড বারুদ পুড়লে গ্যাস তৈরি হবে ষাট কোটি লিটার। গাছগাছালির কোষ থাকে, এ-কথা তো আর আপনাদের অজানা নয়। তবে তুলোয় থাকে

www.pathagar.com

সবচেয়ে বিশুদ্ধ কোষ উপাদান। তুলোকে ঠাণ্ডা নাইট্রিক অ্যাসিডে কিছু সময় ধরে ভিজিয়ে রেখে তারপর তাকে শুকিয়ে নিলে যে বিস্ফোরক তৈরি হয় তা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী বিস্ফোরক। বারুদ জ্বলতে থাকাকালীন তার তাপমাত্রা থাকে দু-শ' চল্লিশ ডিগ্রী। কিন্তু মাত্র এক শ' সত্তর ডিগ্রি উষ্ণতায় বিস্ফোরক তুলো জ্বলবে। ওই তুলোর মধ্যে সাধারণ বারুদের চারগুণ শক্তি লুকিয়ে থাকবে।'

এখন হিসেবে দেখা যাচ্ছে: ষোলো লক্ষ পাউন্ড বারুদের পরিবর্তে মাত্র চার লক্ষ পাউন্ড তুলোকে খুব চেপে চেপে রাখতে পারলেই মাত্র সাতাশ ঘনফুট পাঁচশো পাউন্ড বারুদ রেখে দেওয়া সম্ভব। অতএব মোট তুলোর জন্য আমাদের চাই এক শ' আশি ঘনফুট জায়গা। তবে নয় শ' ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কামানে যে পরিমাণ গ্যাস প্রয়োজন তার অভাব মোটেই হবে না। অতএব ষাট কোটি লিটার গ্যাসের জন্য সাত শ' ঘনফুট জায়গা পাওয়া যাবে। আর একটা কথা, তুলো দিয়ে তৈরি করে নেওয়া বিস্ফোরকটা কিন্তু অনেক গুণে গুণান্বিত। 'ফালমিনেটিং' কটন এর নাম। এ-বারুদ আর্দ্রতার সংস্পর্শে মিইয়ে যায় না বলে দীর্ঘ দিন কামানে ঠেসে রাখলেও এর গুণ অক্ষুণ্ন থাকবে।'

যাবতীয় সমস্যা মিটে গেলে সভা ভঙ্গ করা হল।

* * *

প্রেসিডেন্ট বার্বিকেনের অত্যাশ্চর্য অভিযানের প্রস্তুতিপর্ব নিয়ে সমগ্র আমেরিকা যখন তোলপাড় হচ্ছে ঠিক তখনই ঘটল ঘটনাটা। ব্যাপারটা হল—বার্বিকেন সারা দুনিয়ার কেবলমাত্র একজনের সমালোচনার জন্য ভাবিত। তাছাড় আর কে কি বলল আর না বলল মোটেই তিনি তার ধার ধারেন না। এ লোকটার সঙ্গে বার্বিকেনের চিরদিনই আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। তবে তিনি তাঁরই মতো আত্মবিশ্বাসী, নির্ভিক, দৃঢ়চেতা এবং কঠোর পরিশ্রমী। সে ব্যক্তিটি হচ্ছেন, ক্যাপ্টেন নিকল। বার্বিকেনকে নিয়ে যখন সমগ্র আমেরিকা তোলপাড় হচ্ছে তখন ক্যাপ্টেন নিকল ফিলাডেলাফিয়ায় অবস্থান করছেন। লোক মুখে আর খবরের কাগজে বার্বিকেনের প্রশস্তি শুনে তার কলিজায় জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে গেল।

ইস্পে বার্বিকেন ও ক্যাপ্টেন নিকল পরস্পরের পরিচিত তো নন-ই, এমন কি কেউ কাউকে দেখেন নি পর্যন্ত। তবুও বার্বিকেন কোনো ব্যাপারে ব্যর্থ হলে নিকল এর বুকটা আনন্দে নেচে ওঠে। বার্বিকেন যদি কোনো অত্যাধুনিক ও অতি শক্তিশালী কামান তৈরি করে ফেলেন তবে ক্যাপ্টেন নিকল আদাজল খেয়ে লেগে যান তার চেয়েও দৃঢ় কোনো বর্ম তৈরির কাজে। সেটা তৈরি করে তবে তাঁর স্বস্তি। অর্থাৎ বার্বিকেনের পরিকল্পনাকে যেন-তেন প্রকারণে ভেস্তে দেওয়াই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তবে এর ফলে কামান আর বর্ম উভয়েরই পর্বত প্রমাণ উন্নতি হয়েছিল। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করা সম্ভব না হলেও নির্দ্বিধায় বলা চলে তাঁরা পরস্পরের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

যেদিন দুম করে যুদ্ধ থেমে গেল ঠিক সেদিনই ক্যাপ্টেন নিকল চমৎকার একটা বর্ম তৈরির কাজ শেষ করেছিলেন। ইস্পাতের সে-পাতটা ফুটো করা বার্বিকেনের হিম্মতে কুলোতো না।

যুদ্ধ থেমে গেলে বার্বিকেন যখন নয় শ' ফুট কামান তৈরির জন্য তোড়জোড় শুরু করলেন তখন সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ালেও, একজন—ক্যাপ্টেন নিকল কেবল মুখ ঘুরিয়ে অপমান ও ক্ষোভে ফুঁসতে লাগলেন। তিনি হতাশায় এমন ভেঙে পড়লেন, যে হঠাৎ করে কর্তব্য স্থির করাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। শেষমেশ মনকে

www.pathagar.com

দৃঢ় করে ভাবতে লাগলেন, অমিত শক্তিশালী একটা বর্ম তৈরি করে তাঁর পরিকল্পনাটাকে বানচাল করে দেওয়া সম্ভব কিনা ? ব্যস, তবেই তাঁর চন্দ্রলোকে যাত্রার শখ মিটিয়ে দেওয়া যাবে। শেষপর্যন্ত তিনি নিঃসন্দেহ হলেন, আমৃত্যু গবেষণায় লিপ্ত থেকেও তাঁর গোলার গতিরোধ করা মোটেই সম্ভব নয়।

শেষপর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে তিনি অঙ্ক কষে প্রচার করলেন, বার্বিকেনের উদ্ভট পরিকল্পনাটা পাগলের খোয়াব মাত্র। ব্যস, তাঁর বক্তব্য শুনে বার্বিকেন তাঁর পরিকল্পনাটাকে বাস্তবায়িত করতে আদাজল খেয়ে লেগে গেলেন। বার্বিকেনের উৎসাহে যখন এতেও ভাঁটা পড়ল না তখন গভর্নমেন্টকে জানালেন, বার্বিকেন আইন বিরুদ্ধ কাজ করে চলেছেন। কামান দাগার পর কোনোক্রমে নলটা ফেটে গেলে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আর যেখানে কামানটা ফাটবে সে-বিস্তীর্ণ অঞ্চলটা ধ্বংস হয়ে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আবার চন্দ্রাভিযানের অজুহাতে তিনি দেশের শান্তি বিঘ্নিত করার দুরভিসন্ধি নিয়ে এমন অতিকায় একটা কামান তৈরি করছেন।

ক্যাপ্টেন নিকলকে গভর্নমেন্ট কিন্তু তিলমাত্রও পাত্তা দিলেন না। ব্যাপারটা চেপে যাওয়ায় অর্থ দাঁড়াল বার্বিকেনকেই সমর্থন করছে। কোনো ওষুধেই যখন ধরল না তখন অনন্যোপায় হয়ে ক্যাপ্টেন নিকল রিচমণ্ডের একটা পত্রিকার মারফৎ বার্বিকেনের সঙ্গে সরাসরি বাজি ধরে বসলেন। বাজির ব্যাপারটা হল—

(ক) গান-ক্লাব-এর অত্যাশ্চর্য পরিকল্পনাটাকে বাস্তবায়িত করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা কোনোদিনই জোগাড় হবে না। বাজির ডলারের পরিমাণ—এক হাজার।

(খ) নয় শ' ফুট লম্বা কামান ঢালাই একেবারেই অসম্ভব। বাজির ডলারের পরিমাণ—দু-হাজার।

(গ) বাঁধাগুলোর পরও যদি কামান তৈরি সম্ভবই হয়, তাতে কিছুতেই বারুদ ঠাসা সম্ভব নয়। বাজির ডলারের পরিমাণ—তিন হাজার।

(ঘ) বারুদে অগ্নি সংযোগ করামাত্র পুরো কামানটাই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বাজির ডলারের পরিমাণ—চার হাজার।

(ঙ) যদি কামানটা নেহাৎই টুকরো টুকরো না হয় তবে চাঁদের বুকে হাজির হওয়া তো যেমন তেমন, দু-মাইল পথও কামানের গোলাটা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। বাজির ডলারের পরিমাণ—পাঁচ হাজার।

অর্থাৎ দু-মাইল পথও যদি কামানের গোলাটা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় তবেই আমি ইম্পে বার্বিকেনকে আইন সঙ্গতভাবেই বাজির পনের হাজার ডলার দিতে বাধ্য থাকব।

পত্রিকার পাতায় বাজির ব্যাপারটা ছাপা হবার কয়দিন বাদেই ক্যাপ্টেন নিকল একটা চিঠি পেলেন। খামটার ওপরে গান-ক্লাবের সীলমোহর অঙ্কিত।

তিনি খামটার মুখ ছিঁড়ে তার ভেতর থেকে এক চিলতে কাগজ বের করলেন তাতেমাত্র একটা ছত্রের চিঠি—

"আমি বাজি ধরছি।

বাল্টিমোর, উনিশে অক্টোবর
বার্বিকেন,
সভাপতি, গান-ক্লাব।"

www.pathagar.com

কেমব্রিজ মানমন্দিরের নির্দেশ অনুযায়ী কামান স্থাপনের স্থান নির্ধারণ করতে হবে।

কামান স্থাপনের স্থান নির্ধারণ করার উদ্দেশ্য বার্বিকেন বিশে অক্টোবর তারিখে গান-ক্লাবের সাধারণ সভা ডাকলেন।

আমেরিকার সুবিশাল মানচিত্র সামনে খুলে নিয়ে আলোচনা শুরু হল। দীর্ঘ আলোচনা ও কথা কাটাকাটির পর ঠিক হল, টেক্সাস ও ফ্লোরিডার যেকোন একটা স্থান থেকে কামান দাগা হবে। ব্যস, টেক্সাস আর ফ্লোরিডার মধ্যে তুমুল বিবাদ শুরু হয়ে গেল। চন্দ্রলোকে প্রথম গোলা ফেলার কৃতিত্বটুকু কেউ-ই ছাড়তে নারাজ। না, কিছুতেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হল না। উদ্ভূত বিবাদের মীমাংসা করার জন্য বার্বিকেন দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'ফ্লোরিডায় মাত্র একটা শহর রয়েছে। আরে টেক্সাসে রয়েছে এগারোটা শহর। তাদের কোনো একটাতে কামান দাগার জন্য নির্বাচন করামাত্র এগারোটা শহরের মধ্যে 'রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ' বেধে যাবে। কেউ-ই নিজ নিজ দাবী থেকে সরে যেতে রাজি হবে না।'

কামান দাগার স্থান নির্বাচনের ব্যাপারটার ফয়সালা তো কোনোরকমে করা গেল। এবার অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারটা নিয়ে বার্বিকেন তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। তিনদিন পরে হিসাব করে দেখা গেল, কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরাই চাঁদাস্বরূপ চল্লিশ লক্ষ ডলার পাঠিয়েছে। কেবলমাত্র ইংল্যান্ডই একটা কানাকড়িও দিল না ইংল্যান্ড বাদে অন্যান্য দেশ থেকে এসেছে চৌদ্দ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দু-শ' পঁচাত্তর ডলার। সর্ব সাকুল্যে গান-ক্লাবের হাতে এসেছে চুয়ান্ন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দু-শ' পাঁচাত্তর ডলার।

আগামী পনরোই অক্টোবরের মধ্যে কামান ঢালাই করতে হবে এ-শর্তে নিউইয়র্কের গোল্ডস্প্রিং কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হল।

ক্যাপ্টেন নিকল তাঁর প্রথম বাজি হেরে গেলেন।

অ্যালুমিনিয়ামের গোলা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হল আলবানির এক প্রতিষ্ঠানের ওপর। আর দূর পাল্লার একটা দূরবীক্ষণ তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হল কেমব্রিজ মানমন্দিরকে।

বার্বিকেন এবার এল, ফ্লিস্টোন, ম্যাসটন ও গোল্ডস্প্রিং কোম্পানির ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে ফ্লোরিডায় হাজির হলেন কামান দাগার স্থান নির্বাচনের জন্য। সেখানের ট্যাম্পা শহর থেকে পনের মাইল দূরবর্তী, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আঠারো শ' ফুট উঁচু স্টোনসহিল নামক স্থানটাকে নির্বাচন করলেন। সেখানে একনাগাড়ে তিন মাস ধরে কঠোর পরিশ্রম করে তিন শ' ছত্রিশ ফুট গভীর একটা খাদ কাটা হল। দশই জুন কুঁয়োটার গভীরতা দাঁড়াল নয় শ' ফুট।

খাদ তো কাটা হল। এবার শুরু হল ঢালাইয়ের কাজ। পাথরের কুঁয়োটার ঠিক কেন্দ্রস্থলে নয় শ' ফুট লম্বা ও নয় ফুট ব্যাসযুক্ত কামানের নলটা তৈরির কাজ শুরু হল। বালি, মাটি, কাদা আর খড় ব্যবহার করা হল এ কাজের জন্য।

দুপুর বারোটায় বার্বিকেন একটা উঁচু জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে কামান তৈরির ব্যাপারটা দেখতে লাগলেন।

আটষট্টি হাজার টন কয়লা পুড়িয়ে ষাট হাজার টন লোহাকে গলিয়ে ফেলা হল। গলিত ধাতু নয় শ' ফুট গভীরে পড়তে লাগল। ব্যস, ঢালাইয়ের কাজ মিটে গেল। এখন চিন্তা হচ্ছে, কামানটা যদি নিখুঁত না হয় তবে পুরো পরিকল্পনাটাই বরবাদ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

মোদ্দা ব্যাপার হচ্ছে, আগামী আঠারো বছরের মধ্যে যে চাঁদ পৃথিবীর এত কাছে আসবে না।

বাইশে সেপ্টেম্বর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেল, কামানটা গোলা নিক্ষেপ করার উপযুক্ত হয়েছে বটে। খবরটা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি যেন বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ব্যাপারটা ক্যাপ্টেন নিকলের কানে পৌঁছতেও দেরি হল না।

ক্যাপ্টেন নিকল দ্বিতীয় বাজিটাও হেরে যাওয়ায় মিইয়ে গেলেন।

বাইশে সেপ্টেম্বর প্রধান ফটক থেকে প্রহরীদের সরিয়ে নেওয়ায় কৌতূহলী জনতা দলবেঁধে অদ্ভুত কামানটাকে দেখতে এল। মাথাপিছু পাঁচ ডলার হিসাবে টিকিট বিক্রি হতে লাগল কামানটাকে দেখার জন্য। এতে গান-ক্লাবের তহবিলে পাঁচ লক্ষ ডলার জমা পড়ল। উল্লসিত দর্শকরা কামানটা দেখে সমবেত কণ্ঠে গান ক্লাব আর বার্বিকেনের নাম ধরে বার বার জয়ধ্বনি দিয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল।

ত্রিশে সেপ্টেম্বর বার্বিকেন একটা টেলিগ্রাম পেলেন। টেলিগ্রামটা এসেছে প্যারিস থেকে। ত্রিশে সেপ্টেম্বর ভোরেই সেটা করা হয়েছে।

টেলিগ্রামটার ওপরে লেখা—ইম্পে বার্বিকেন। ট্যাম্পো। ফ্লোরিডা। যুক্তরাষ্ট্র।

টেলিগ্রামের বক্তব্য—

"আপনি যে-গোলাটাকে চাঁদে পাঠাবার উদ্দেশ্যে বানাতে চলেছেন, সেটাকে গোলাকার না করে দয়া করে ছুঁচল চোঙার মতো ফাঁপা করে বানান। আমি এতে চেপে চাঁদে যেতে চাই। আমি আসছি। এস. এস. আটলান্টা জাহাজে আজই লিভারপুর থেকে রওনা হচ্ছি।—মাইকেল আঁর্দা।"

এবারও খবরটা বাতাসের বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শহরের সর্বত্র, সবার মুখে একই কথা চাঁদে মানুষ যাবে। কেউ খবরটাকে বিশ্বাস করল, আবার কেউ বা নিছক পাগলামি বলেই প্রসঙ্গটাকে উড়িয়ে দিল। তাদের মতে এটা নাকি ফরাসিদের নতুনতর একটা পাগলামি। পৃথিবী ছেড়ে কারো পক্ষে কি চাঁদে পাড়ি দেওয়া সম্ভব। চাঁদে কি বাতাস আছে যে নিঃশ্বাস নিতে পারবে? গোলার ভেতরে বসে গোলারই আগুনে লোকটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে। যদি কোনোক্রমে চাঁদে যেতেই পারে তবে ফিরেই বা আসবে কীভাবে?

এসব নিয়ে বার্বিকেনের মাথাব্যথা নেই। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লিভারপুলের জাহাজঘাটে টেলিগ্রাম করে জানতে পারলেন, আটলান্টা জাহাজটা প্রায় একঘণ্টা আগে লিভারপুর বন্দর ছেড়ে ট্যাম্পার দিকে যাত্রা করেছে। আর যাত্রীদের তালিকায় বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মাইকেল আঁর্দার নাম রয়েছে।

উল্লসিত বার্বিকেন গোলা তৈরির কারখানায় খবর পাঠালেন। নতুন করে খবর না দেওয়া অবধি গোলা তৈরির কাজ যেন বন্ধ রাখা হয়।

* * *

আমেরিকার কেউ কেউ এমন কথাও বলতে লাগল, এতবড় একজন বৈজ্ঞানিকের কি তবে সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেল? বার্বিকেনও পাগল হয়ে গেলেন নাকি? নইলে হঠাৎ গোলা তৈরির কাজ বন্ধ করতে যাবেনই বা কেন?

www.pathagar.com

বিশে অক্টোবর আটলান্টা জাহাজ ট্যাম্পা বন্দরে নোঙর করল। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী মাইকেল আঁর্দাকে দেখার জন্য বন্দরে কয়েক হাজার উৎসাহী মানুষ ভিড় জমাল।

বার্বিকেন ইতিপূর্বে বিজ্ঞানী মাইকেল আঁর্দাকে দেখেন নি। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে সাদাসিধে সহজ-সরল মাটির মানুষটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিজের পরিচয় দিতে তাঁর সাথে করমর্দন করলেন।

কথা প্রসঙ্গে বার্বিকেন উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আপনি অনুগ্রহ করে আমার পাশে এসে যে দাঁড়িয়েছেন তার জন্য আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি। আর আপনার টেলিগ্রামটা পাওয়ামাত্র আমি গোলা তৈরির কাজও বন্ধ রেখেছি।'

'ধন্যবাদ। আপনি চন্দ্রলোকে গোলা পাঠাবার উদ্যোগ-আয়োজন করছেন শোনামাত্র ভাবলাম, এ-সুযোগে একবারটি চাঁদ থেকে ঘুরে এলে মন্দ হয় না। ব্যাপারটা এমন কিছু মারাত্মক নয় যে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর একবার যখন ঠিক করেছি যাব তখন আমি অবশ্যই যাচ্ছে। ভালো কথা, আমার পরিকল্পনার কথা সবাইকে আলাদা আলাদাভাবে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তার চেয়ে বরং একটা সভা ডাকুন, সেখানেই আমি আমার পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করব।'

মাইকেল আঁর্দাকে নিয়ে বার্বিকেন তাঁর বাসায় এলেন। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে চাঁদে যাওয়ার ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা হল।

ট্যাম্পর জাহাজ ঘাটের কাছে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে জনসভার আয়োজন করা হল। তিন লক্ষাধিক শ্রোতার উপস্থিতিতে মাইকেল আঁর্দা এবার ভাষণ দিতে উঠলেন। উপস্থিত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, 'আমি কীভাবে চাঁদে পাড়ি জমাতে চাচ্ছি সে কথাই আজ আপনাদের কাছে ব্যক্ত করছি। আমার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, শীঘ্র চাঁদে পাড়ি জমানোর একটা সুব্যবস্থা হবেই হবে। এ জগৎ পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানসাধকদের মতে পরিবর্তনশীল জগতের একমাত্র লক্ষ্যই হচ্ছে প্রগতি। মানুষের ক্ষমতা অসীম। সে নিজের বুদ্ধি সল করে জগতের অনেক কিছুকেই বুঝিয়ে দিতে সক্ষম। তবে এমন অনেক ব্যাপার আছে বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা আজও মানুষ করে উঠতে পারে নি। আমার এও প্রত্যয় রয়েছে, যত অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি তাদের সবার মূলেই রয়েছে মানুষের অসীম বুদ্ধির ছোঁয়া। উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্যটাকে আরো সহজতর করে দিচ্ছি। বনের পশুকে দিয়ে মানুষ প্রথমে যানবাহনের অভাব মিটিয়েছিল। পরবর্তীকালে এল যন্ত্র। প্রথমে এল গরুর গাড়ি, তারপর ঘোড়ার গাড়ি, তারপর এল মোটর গাড়ি ও ট্রেন। এল দাঁড় ও পালের নৌকা। তারপর এল জাহাজ। আমার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে, কামানের গোলায় চেপে যাতায়াত আগামী দিনের মানুষের কাছে খুবই সুবিধাজনক হয়ে উঠবে। এতে সময় লাগবে কম, কষ্টও তেমন হবে না। আপনাদের মধ্যে হয়তো বা ভাবনার সঞ্চার হচ্ছে, উল্কার বেগে ধেয়ে যাওয়া কামানের গোলার মধ্যে অবস্থান করাটাই তো সমস্যা সৃষ্টি করবে। আমি বলতে চাই, এরকম ভাবনা কি যুক্তিসঙ্গত? আজ সমগ্র পৃথিবীর ওপরে মানুষ আধিপত্য বিস্তার করেছে। অথচ মহাকাশে পৃথিবীটার গতিবেগ তো ঘণ্টায় ত্রিশ হাজার মাইল। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো বলবেন, পৃথিবীর বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা মানুষের কোথায়? গ্রহান্তরে যাওয়ার হিম্মত সে কোনোদিনই অর্জন করতে পারবে না। সত্যি ধারণাটা একেবারেই ভ্রান্ত। আজ তো আমরা দিব্যি মহাসাগর

www.pathagar.com

পাড়ি দিয়ে যাচ্ছ। আমি যেন দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি, মানুষ নীল আকাশের ওপরও আধিপত্য বিস্তার করে ফেলছে। এ-গ্রহের অর্ধেক মানুষ বায়ু পরিবর্তনের জন্য চাঁদ নামক মুল্লুকে বেড়াতে যাচ্ছে। আমরা অদূর ভবিষ্যতে ক্ষেপণ-বাহনে চেপেই গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ধেয়ে যাব। এক্সপ্রেস ট্রেনে করে চাঁদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে কয়দিন লাগবে, বলতে পারেন ? পৃথিবীকে তিনবার চক্কর মেরে আসার যদি সম্ভব হতে পারে তবে মাত্র সাতানব্বই ঘণ্টার যাত্রাপথের ব্যাপারটাকে অসম্ভব কি করে ভাবতে পারি ?

আর 'দূরত্ব' শব্দটা কিন্তু মূলত একেবারেই অর্থহীন। কোনো ধাতুতে অসংখ্য অণু যেমন পাশাপাশি অবস্থান করে সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলোও ঠিক তেমনই পাশাপাশি রয়েছে। আসলে সৌরমণ্ডলটা একটা অখণ্ড জগৎ। অণুতে অণুতে ব্যবধানের মতোই এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহের ব্যবধান।

আমার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে ব্যবধান তেমন বেশি কিছু নয়। আজ থেকে কুড়ি বছর বাদে পৃথিবীর মানুষ যদি চাঁদ থেকে ঘুরে আসে তবুও আমি বিস্ময়াভিভূত হব না।'

মাইকেল আঁর্দা থামতে না থামতেই বার্বিকেন প্রশ্ন করলেন, 'একটা কথা, অন্য সব গ্রহে কি জীবের অস্তিত্ব রয়েছে ?'

'আছে ? অবশ্যই আছে। পৃথিবী নিজেও একটা গ্রহ। এখানে যে কতরকম প্রাণী রয়েছে আজ পর্যন্ত তারই হিসাব কি আমরা করতে পেরেছি ? সুইডেনবর্গ, বার্নাডিন এবং প্লুটার্ন প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ কিন্তু স্পষ্ট করে বলেছেন, সব গ্রহেই জন্তু জানোয়ারের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে আমি বলব, এ-ব্যাপারে আমার মতো লোকের মন্তব্য করা মানায় না। তবে একটা কথা কি, আছে, কি নেই তা জানার, দেখার উদ্দেশ্যেই তো আমাদের চাঁদে পাড়ি জমানো।'

শ্রোতাদের একজন বলে উঠল, 'অন্যান্য গ্রহে বসবাস করা সম্ভব, কি অসম্ভব এ-ব্যাপারে বিরুদ্ধ মতো যথেষ্টই রয়েছে। ভীষণ ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া বা মারাত্মক গরমে ঝলসে যাওয়াও তো সম্ভব।'

'প্রকৃতিবিদরা কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশে বসবাসের অগণিত মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। মাছ যে পরিবেশে শ্বাসক্রিয়া চালায় তা কিন্তু অন্য প্রাণীর পক্ষে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। উভচর প্রাণীদের জলে ও ডাঙায় টিকে থাকার প্রসঙ্গটা কিন্তু খুবই কঠিন। জলের এত গভীরে কোনো কোনো সামুদ্রিক জীব বাস করে সেখানে অন্য প্রাণীরা চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যেত। আর একটা ব্যাপার জলচর প্রাণীরা মেরু অঞ্চলের গরম জলে যেমন থাকতে পারে ঠিক তেমনি উষ্ণ প্রস্রবনেও টিকে থাকতে সক্ষম।'

'আর একটা কথা, আমি রসায়নবিদ হলে বলতাম, উল্কার গায়ে কার্বনের খোঁজ পাওয়া গেছে। উল্কার সৃষ্টি কিন্তু পৃথিবীর বাইরে। এতে মনে করা যেতে পারে কোনো এক সময় সেখানে জীব বাস করত। বিজ্ঞানী রাইকেনবাস এটা প্রমাণ করে দিয়ে আমাদের ধন্দ মিটিয়েছেন।

ব্রহ্মজ্ঞরা তো বলেছেনই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রাণীর অস্তিত্ব বর্তমান। ভবিষ্যতেও থাকবে।

আমি কিন্তু রসায়নবিদ, প্রকৃতিবিদ বা ব্রহ্মজ্ঞ কোনোটিই নই। তাইতে অনিশ্চিত জানি না পৃথিবীর বাইরে জীবের অস্তিত্ব আছে, কি নেই।'

www.pathagar.com

মাইকেল আঁর্দা এবার বললেন, 'গ্রহ-উপগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণই রয়েছে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কি, আমি কিন্তু আদৌ তা প্রমাণ করতে এখানে ছুটে আসি নি। কেউ কেউ মন্তব্য করতে পারেন, সৌরমণ্ডল মনুষ্যবাসের একেবারেই অনুপযুক্ত। পৃথিবীটা যে মনুষ্যবাসের খুবই উপযুক্ত তার কোনো প্রমাণ তাঁরা হাজির করবেন ? চাঁদ পৃথিবীরই একটা উপগ্রহ, আমরা তো সেখানেই যাওয়ার উদ্যোগ আয়োজন করছি। উপগ্রহের সংখ্যা একের চেয়ে বেশি এমন গ্রহের কিন্তু অভাব নেই। তবু সে সব গ্রহে জীবের বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ নেই, কেবলমাত্র পৃথিবীতেই জীবের অস্তিত্ব রয়েছে, কি করে বিশ্বাস করা সম্ভব—আপনারাই বলুন তো? পৃথিবীর বুকে যে অগণিত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় এসব কিন্তু একটা কারণেই সম্ভব তা হল পৃথিবী অক্ষরেখার ওপর বেঁকে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। বৃহস্পতি গ্রহের কথা একবারটি বিবেচনা করে দেখুন তো ? সে মেরুদণ্ডের ওপর সামান্য বেঁকে অবস্থান করছে। এ-বক্রতা এতই কম যে, সেখানে ঋতু বৈচিত্র্য বলে কোনো কিছুই নেই। রোগ-ব্যাধিও খুবই কম। কিন্তু বিবেচনা করলে স্বীকার করতেই হবে, বৃহস্পতি পৃথিবীর চেয়ে ঢের ঢের ভালো। পৃথিবীও যদি এত বেশি বেঁকে না থাকত তবে দিন-রাত্রির পার্থক্য, ঋতু বৈচিত্র্য ও অত রোগ ব্যাধি মোটেই থাকত না। আমার ক্ষমতা থাকলে অক্ষরেখাকে সোজা করে দিয়ে পৃথিবীর হাল পাল্টে ফেলতাম।'

তিন লক্ষ শ্রোতার মধ্য থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'সাহেব, অনেক কিছুই তো শোনা হল, এবার একটু ঝেড়ে কাসুন তো। আসল কথাটা বলুন। এমন কিছু বলুন যাতে বাস্তবের ছোঁয়া রয়েছে। আমরা পৃথিবীর কথা নয়, চাঁদের কথা বলতে ও শুনতে এসেছি।'

মাইকেল আঁর্দা বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই তো। খেই হারিয়ে আমরা অন্য পথে চলে গিয়েছিলাম। এবার চাঁদের কথায় আসা যাক।'

জনতার মধ্য থেকে আবার সে-কণ্ঠস্বরটা ভেসে এল, 'তবে আপনার মতে চাঁদে প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে, তাই তো ? যদি থেকেই থাকে তবে তাদের শ্বাসক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। কারণ, চাঁদে তো বাতাস নেই।'

'চাঁদে যে বাতাস নেই এ-কথা কি করে জানলেন ?'

'পণ্ডিত ব্যক্তিরা তো এ-কথাই বলেন।'

'যাঁরা কিছু জেনে মন্তব্য করেন আমার কাছে তাঁরাই পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ বলে শ্রদ্ধা করি। আর যারা না জেনে জানার ভান করে তাদের শ্রদ্ধার পরিবর্তে অশ্রদ্ধাই বেশি করি।'

'চাঁদে যে বাতাস নেই এ-ব্যপারে আমি নিঃসন্দেহ। প্রমাণও যথেষ্টই আছে। সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে আসার সময় বেঁকে যায়। কোনো নক্ষত্রকে চাঁদ যখন ঢেকে রাখে তখন চাঁদের পাশ দিয়ে নক্ষত্রটার আলো বেঁকে না গিয়ে বেরিয়ে আসে। চাঁদে যে বায়ুর অস্তিত্ব নেই এ-ই তো যথেষ্ট প্রমাণ।'

'হ্যাঁ, আপনার বক্তব্যকে মেনে নেওয়া সম্ভব হত যদি চাঁদের কৌণিক ব্যাস আমরা জানতাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে তা জানা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এবার বলুন তো, চাঁদে যে মানুষ আছে তা মানেন তো ? আজ না থাকলেও এক সময় তো ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, অতীতে ছিল বটে। তখন শ্বাসক্রিয়ার অত্যাবশ্যক অক্সিজেন আগ্নেয়গিরিই যোগান দিত। চাঁদে যে বায়ু ছিল এটাই তো যথেষ্ট প্রমাণ।'

www.pathagar.com

'প্রমাণের ব্যাপারে আলোচনা হোক। বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী হেলি ও লুভিলে সতের শ' পঁয়ত্রিশের তেসরা মে চন্দ্রগ্রহণ দেখার সময় অত্যাশ্চর্য এক আলোক রশ্মি চাক্ষুষ করেন। চাঁদের বুকে যেন বজ্রের ঝলকানি আর তুফানের তাণ্ডব চলছিল। তাঁরা উল্কার আলোকেই চাঁদের আলো ধরে নিয়েছিলেন। আরো আছে, মদলার আর বিয়রের মতো এত বড় বিজ্ঞানীরা নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছেন, চাঁদে বাতাসের অস্তিত্ব নেই।'

মাইকেল আঁর্দা চোখে-মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ এঁকে বললেন, 'মঁসিয়ে লসেদত—এর মতো এতবড় বিজ্ঞানী চাঁদে বাতাস নেই একথা তো মোটেই বলেন নি। বরং দৃঢ় বিশ্বাসই পোষণ করেন যে, চাঁদে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব রয়েছে।'

'থাকলেও থাকতে পারে তবে খুবই সামান্য।'

'কম হলেও তা একজনের শ্বাসক্রিয়ার পক্ষে তো যথেষ্ট। চাঁদে বাতাসের অস্তিত্বের কথা যখন মেনেই নিচ্ছেন তখন আশা করি এও মেনে নেবেন, চাঁদে জলও আছে। জলই যদি না থাকে তবে বাতাস থাকা কি করে সম্ভব?

লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ সমস্বরে বলে উঠল, 'বাচাল! কেবলই কথার ফুলঝুরি! ঘা কতক দিয়ে হতচ্ছাড়াটাকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক।'

মাইকেল আঁর্দা এতে না চটে বা ক্ষুণ্ন না হয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললেন, 'আপনার আর কোনো বক্তব্য আছে কি?'

'বেশি আর দরকার পড়বে না। কামান দাগামাত্রই তো আপনার হাড়গোড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। গোলাটা বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বে যাওয়ামাত্র বায়ুর ঘর্ষণের মাধ্যমে যে প্রচণ্ড তাপের উদ্ভব হবে—'

'প্রচণ্ড সে-তাপে আমি জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাব, ঠিক কিনা? একরম আশঙ্কা করলে কিন্তু মারাত্মক ভুলই করবেন মশাই। গোলাটার আস্তরণ খুবই পুরু করা হবে। তা ছাড়া বায়ুমণ্ডলে পাড়ি দিতে কয় সেকেন্ডই বা লাগবে? চারদিন। চাঁদে পৌঁছতে বড়জোর চারদিন লাগবে। এক বছরের খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে থাকবে। আর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় শ্বাসকার্যের অক্সিজেন তৈরি করে নেব।'

'ভালো কথা, গোলাটা যদি চাঁদে পৌঁছায় তবে তীব্র গতিবেগে চাঁদের বুকে হুমড়ি খেয়ে পড়বে?'

'দেখুন, চাঁদের পরিবর্তে যদি ওভাবে পৃথিবীতে পড়তাম তাতে যে-আঘাত পেতাম তার চেয়ে অন্তত ছয় গুণ কম চাঁদে আঘাত লাগবে। তা ছাড়া আমি চাইলেই গোলাটার গতিবেগ কমিয়ে নিতে সক্ষম হব। কীভাবে, তাই না? আমি সঙ্গে করে কয়েকটা শক্তিশালী হাউই নিয়ে যাচ্ছি। হাউই ছেড়ে বিপরীত দিকে গতিবেগ সৃষ্টি করে গোলাটার গতিবেগ অনায়াসে হ্রাস করে নিয়ে তবেই চাঁদের বুকে পড়ব।'

'মনে করা যাক, বহাল তবিয়তেই আপনি চাঁদের বুকে হাজির হলেন। ব্যস, তারপর সেখান থেকে ফিরবেন কি করে জানতে পারি কি?'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে আঁর্দা জবাব দিলেন, 'আমি যে ফিরবই অর্থাৎ ফিরে আসতে আগ্রহী আপনি কোথায় শুনেছেন? চাঁদের বুকে ইয়া বড় বড় পাথরের হরফ তৈরি করে পৃথিবীতে খবর পাঠাব। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আপনারা তা পড়বেন, বুঝেছেন?'

'আর একটা ব্যাপার, এত বড় একটা গোলাকে নয় শ' ফুট লম্বা কামানের ভেতর থেকে যখন চাঁদের দিকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ছুঁড়ে দেবে তখন যে ধাক্কা লাগবে তাতেই হাড়-মাংস একাকার হয়ে একটা পিণ্ডে পরিণত হয়ে যাবেন, ভেবেছেন?'

www.pathagar.com

'দেখুন, তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ইচ্ছা আর সময় কোনোটাই আমার নেই গান-ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ইম্পে বার্বিকেন সাহেব আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবেন।'

প্রশ্নকর্তা উজবুক লোকটার ঘ্যানঘ্যানানিতে বার্বিকেন এতক্ষণ রাগে কাঁপছিলেন। তিনি এবার রীতিমতো কাঁপতে কাঁপতে তাকে দরার জন্য পা-বাড়ালেন। ইতিমধ্যেই শ্রোতাদের মধ্যে থেকে বেশ কিছুসংখ্যক লোক হৈ হৈ করতে করতে মঞ্চের দিকে এগিয়ে এসেছে। চোখের পলকে তারা মানুষগুলোসহ মঞ্চটাকে কাঁদে করে জাহাজ ঘাটের দিকে জয়ধ্বনিসহ হৈ হৈ করতে করতে রওনা দির। এতকিছু সত্ত্বেও প্রশ্নকর্তা কিন্তু গা-ঢাকা দেন নি।

বার্বিকেন ভিড় ঠেলে অজ্ঞাত পরিচয় লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর নাম-পরিচয় জেনে নিলেন।

অদ্ভুত সে লোকটার নাম ক্যাপ্টেন নিকল। কথা প্রসঙ্গে ক্যাপ্টেন নিকল বললেন 'আমি ইচ্ছে করেই এতসব প্রশ্নের অবতারণা করেছি। মনে করতে পারেন, অপমান করেছি। আর ইচ্ছে করেই সবার সামনেই তা করেছি।'

বার্বিকেন রাগে গস গস করতে করতে বললেন, 'আমি এ-অপমানের বদলা নিয়ে ছাড়ব সাহেব! আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নামতে হবে।'

ক্যাপ্টেন নিকল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে মতো দিলেন। পরের দিন ভোর পাঁচটায় দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সময় ঠিক হয়ে গেল। আর স্থান ? ট্যাম্পা থেকে মাইল তিনেক দূরবর্তী বনভূমি।

বার্বিকেন নিশ্চিন্ত মনেই বাড়ি ফিরলেন। দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ব্যাপারটা নিয়ে তিনি মোটেই ভাবিত নন। তাঁর মাথায় তখন একটা চিন্তাই বার বার চক্কর মারছে।

বাইশে অক্টোবর। সেদিন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাস্টন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে, বার্বিকেন একটু বাদেই যে ক্যাপ্টেন নিকলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চলেছেন, আঁর্দাকে খবরটা দিলেন। তাঁকে এও বললেন, বার্বিকেন নাকি বলেছেন, পৃথিবীটা এতই ছোট যে, ক্যাপ্টেন নিকল আর তাঁর পক্ষে এক সঙ্গে এখানে থাকা সম্ভব নয়। যে কোনো একজনকে পৃথিবী ছাড়তেই হবে। ম্যাস্টন কিছুতেই বার্বিকেনকে হারাতে রাজি নয়। তাই তো অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় মাইকেল আঁর্দাকে নিয়ে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য নির্ধারিত স্থানে হাজির হলেন।

বনের পথ ধরে ভেতরের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হতেই মাইকেল আঁর্দা গাছের ফাঁক দিয়ে ক্যাপ্টেন নিকলকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য নির্ধারিত স্থানের দিকে অগ্রসর হতে দেখলেন। লম্বা লম্বা পায়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন, 'ক্যাপ্টেন নিকল, আমি আপনাদের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ছুটে এসেছি। অহেতুক এমন ভয়ঙ্কর একটা কাজে আপনারা বিচক্ষণ লোক হয়েও কেন যে পা বাড়াচ্ছেন মাথায় আসছে না। এর পরিণাম তো আপনাদের মধ্যে কোনো না কোনো একজনের মৃত্যু সুনিশ্চিত। জেনে শুনে কেন তবে দু-একটা অমূল্য প্রাণনাশের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন, বলুন তো ?' মুহূর্তের জন্য থেমে মাইকেল আঁর্দা এবার বললেন, 'আপনাকে একটা উত্তম প্রস্তাব দেওয়ার জন্য আমি এখানে ছুটে এসেছি। তবে প্রস্তাবটা আমি বার্বিকেনের সামনেই দেব। চলুন, তাকে আগে খুঁজে বের করি।'

www.pathagar.com

সামান্য খোঁজাখুঁজির পরই তাঁরা বার্বিকেনকে খুঁজে বের করতে পারলেন। দেখলেন, বনের একান্তে একটা ফাঁকা জায়গায় বন্দুকটা সামনের জমিনে রেখে নিজেরই আঁকা কয়েকটা জ্যামিতির নক্সার ওপর ঝুঁকে নির্ণিমেষ চোখে তাকিয়ে রয়েছেন। কোনোদিকে সামান্যতম খেয়ালও তাঁর নেই।

মাইকেল আঁর্দা এগিয়ে গিয়ে বার্বিকেনের কাঁধে আলতো করে চাপ দিতেই তিনি ঘাড় ঘুরিয়েই সোল্লাসে বলে উঠলেন, 'চমৎকার! চমৎকার! পেয়ে গেছি! আমার সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছি। কামানের নল থেকে আচমকা গোলাটা বেরিয়ে যাওয়ার সময় যে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগবে তা সামলাবার উপায় বের করে ফেলেছি। জলকে স্প্রিং-এর ভূমিকায় ব্যবহার করলেই ল্যাটা চুকে যাবে। তার ওপরেই রাখতে হবে বসার আসনটা।

মাইকেল আঁর্দা মুচকি হেসে বললেন, 'তবে তো ব্যাপারটার ফয়সালা হয়েই গেছে যাক, ক্যাপ্টেন নিকল অপেক্ষা করছেন।'

বার্বিকেন ক্যাপ্টেন নিকলকে দেখেই লজ্জা-বিনত স্বরে বলে উঠলেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন ক্যাপ্টেন। আরোহীকে রক্ষা করে কীভাবে চাঁদে গোলা পাঠানো যাবে তা নিয়ে আত্মমগ্ন থাকায় আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনার সময় নষ্ট করার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। চলুন এবার—'

মাইকেল আঁর্দা তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আমি উপস্থিত থাকতে অন্তত আপনাদের রক্তারক্তি করে প্রাণনাশ করতে দিচ্ছি না। সামান্য খামখেয়ালির জন্য দুদুটো অমূল্য প্রাণ, অনন্য প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাবে, তাও কি হতে দেওয়া যায়? আরে সাহেব, তর্কাতর্কি আর রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে না মেতে আপনারা উভয়েই চলুন না। চাঁদে পাড়ি জমানো বাস্তবিকই সম্ভব, নাকি একেবারে অসম্ভব হাতেনাতে প্রমাণ নেবেন। আমি আবারও বলছি, কামান দাগার সময়ে কারোরই হাড়-মাংস একাকার হবে না। আর মারা যাবার প্রশ্নই তো ওঠে না।'

ক্যাপ্টেন ও বার্বিকেন আঁর্দা মতবিরোধ ভুলে, দ্বন্দ্ব মিটিয়ে পরস্পর বন্ধুত্বের ডোরে বাঁধা পড়ার খবরটা সংবাদপত্র এবং অন্যন্যা প্রচার-মাধ্যমের সাহায্যে সমগ্র আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে কাতারে কাতারে ইয়াঙ্কিরা এসে মাইকেল আঁর্দাকে শুভেচ্ছা জানাতে লাগল।

মাইকেল আঁর্দা এবার কথা প্রসঙ্গে বার্বিকেনকে বললেন, 'একটা কথা, আমাদের পৃথিবীর বুকে এই যে হাজারো রোগ-ব্যাধি বিস্তার লাভ করছে তার মূলে রয়েছে চাঁদের, প্রভাব, কথাটা বিশ্বাস করার মতো কি?'

'না। আমি তো অন্তত করি না।'

আমিও বিশ্বাস করি না। ইতিহাসে অবশ্য এর ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। ষোলো শ' তিরানব্বই-এর চন্দ্রগ্রহণে বহু লোকের প্রাণনাশ হয়েছিল। চন্দ্রগ্রহণ চলাকালীন বহু লোক থেকে থেকে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলত। প্রমাণ আছে সতের শ' উনচল্লিশে রাজা ষষ্ঠ চার্লস পূর্ণিমা ও অমাবস্যা আসতেই দু-বার উন্মাদ হয়ে পড়তেন। শুক্লপক্ষে মাসে দুবার করে তার উন্মাদদশা বৃদ্ধি পেত। জ্বর, সর্দি, কাশি, ঘাম আর পাগলামির ওপর চাঁদের প্রভাব নাকি খুবই রয়েছে। প্লুটার্চও একই মতো পোষণ করতেন।'

এবার আমেরিকার মেয়েদের মধ্যে এক নতুন ধরণের পাগলামি দেখা দিয়েছে। মাইকেল আঁর্দার একটা ছবি পাবার জন্য তারা একেবারে পাগল। আর তাঁর স্ত্রী হয়ে চাঁদে

www.pathagar.com

যাওয়ার জন্য মাঝবয়সী ও অবিবাহিতাদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

কামান দাগার সময় যে ধাক্কার সৃষ্টি হবে সেটা তাঁরা সামাল দিতে পারবেন তো!—বার্বিকেনের মাথায় একই চিন্তা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে রয়েছে

মানুষের সন্দেহ ঘুচাবার জন্য বার্বিকেন একটা বত্রিশ ইঞ্চি কামান সংগ্রহ করলেন। তার ভেতরে কুশান দিয়ে স্প্রিং এর একটা গোলা তৈরি করলেন। একটা কাঠবিড়ালী ও একটা বিড়ালকে তার ভেতরে রেখে স্ক্রু দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিলেন। এবার নলটার ভেতরে ঠেসে ঠেসে এক শ' ষাট পাউন্ড গান-পাউডার ঢুকিয়ে দিলেন। এবার বারুদে অগ্নি সংযোগ করে গোলাটাকে নিক্ষেপ করা হল। সেটা শূন্যে হাজার খানেক ফুট উঠে সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। গোলার মুখ খুলে দেখা গেল, বিড়াল আর কাঠবিড়ালী উভয়েই অক্ষত রয়েছে।

পরীক্ষা—নিরীক্ষার ব্যাপারে সবাই তো আনন্দে ডগমগ। এবার ম্যাস্টন উল্লসিত হয়ে তাকেও চাঁদে নিয়ে যাওয়ার জন্য বার্বিকেনের কাছে আব্দার জানাল। গোলার ভেতরে এলে লোকের স্থান সঙ্কুলান হবে না বলে তিনি তার আব্দার রক্ষা করতে রাজি হতে পারলেন না।

এদিকে নতুন একটা বিপদের ব্যাপারে আঁর্দা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তার কাছে হাজার হাজার চিঠি আসতে লাগল। কেউ বা সামনা-সামনি ওই একই আব্দার করতে লাগল। চাঁদে নিয়ে যেতে হবে। স্থানাভাবের যুক্তি দেখিয়ে সবাইকে হতাশ করতেই হল।

দশই নভেম্বর। বহু প্রতীক্ষিত দিনটি এল। যে প্রতিষ্ঠান গোলা তৈরির অর্ডার নিয়েছিল তারা বার্বিকেনের কাছে সেটা পৌঁছে দিয়ে গেল।

গোলা তৈরির কাজ মিটেছে খবরটা কাগজে ছাপা হতেই দলে দলে কাতারে কাতারে লোক গোলাটাকে দেখার জন্য ছুটে আসতে লাগল।

বার্বিকেন নিঃসন্দেহ যে, ইস্পাতের স্প্রিং যত ভালোই হোক না কেন, গোলাটার পক্ষে সেটা মোটেই উপকারে আসবে না। তাই তিনি তিন ফুট জলের আধারের ওপর একটা পাটাতনকে এমন কৌশলে স্থাপন করলেন যেন প্রয়োজনের সময় ঝট করে সেটা খুলে ফেলা সম্ভব হয়। পাটাতনটার ওপরেই তৈরি করা হল অভিযাত্রীদের বসার আসন। আর পাটাতনটার ওপরে বসিয়ে দেওয়া হল শক্তিশালী একটা স্প্রিং। এর ফলে গোলা নিক্ষেপ করামাত্র যে-ধাক্কার সৃষ্টি হবে তা আরোহীরা সামলে উঠতে পারবেন।

বার্বিকেনের ব্যবস্থা দেখে মাইকেল আঁর্দা উল্লসিত হয়ে বললেন, 'এর পরও যদি ধাক্কা লেগে হাড় মাস থেৎলে একাকার হয়ে যায়, যাক।'

গোলাটার ওপরের দিকটা ক্রমেই সরু করে তৈরি করা হয়েছে। আর সেদিকেই দরজাটা রাখা হয়েছে। সেটা খোলা ও বন্ধ করার জন্য বৈদ্যুতিক সুইচ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর স্প্রিং-এর আসনের ঠিক নিচে চারটে কাচের জানালা। বাইরের দৃশ্য, মহাকাশ, ফেলে যাওয়া পৃথিবী, সম্মুখবর্তী চাঁদ, আর তারকামণ্ডলী প্রভৃতি দেখার জন্যই এ-ব্যবস্থা সঙ্গে করে গোলাটার ভেতরে প্রচুর গ্যাস নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা আছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যই এ-ব্যবস্থা। আর নেওয়া হল জল ও খাবার দাবার। স্থানাভাব তা নইলে মাইকেল আঁর্দা পৃথিবীর সব রকম শিল্পকর্মের নিদর্শনও সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন।

www.pathagar.com

বার্বিকেনের সঙ্গে তাঁর প্রিয় কুকুরটাকেও নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হল। তাই পাঁচ-পাঁচটি প্রাণীর শ্বাস ক্রিয়ার জন্য চব্বিশ ঘণ্টায় তিন কেজি অক্সিজেন লাগবে। একুশ ভাগ অক্সিজেন ও উনআশি ভাগ নাইট্রোজেন মিলিত করলে বাতাস সৃষ্টি হয়। শ্বাসক্রিয়া চালানোর ফলে বাতাসের অক্সিজেন নিঃশেষ হয়ে গিয়ে কার্বনিক গ্যাসের উদ্ভব ঘটে। প্রয়োজনীয় অক্সিজেন তৈরি করে নেওয়ার পর জমে ওঠা কার্বানিক গ্যাস নষ্ট করে দিতে পারলে গোলাটার ভেতরে বাতাসের আর অভাব ঘটবে না।

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কষ্টিক পটাশ ও পটাশিয়াম-ক্লোরেট দিয়ে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হল। পটাশিয়াম ক্লোরেট চার শ' ডিগ্রি উত্তাপে পরিবর্তিত হয়ে গেল ক্লোরিন পটাশে। পটাশিয়াম ক্লোরেটের অক্সিজেন বাইরে বেরিয়ে এল। নয় কেজি পটাশিয়াম ক্লোরেট থেকে সাড়ে তিন কেজি অক্সিজেন তৈরি হয়। তা দিয়েই একজনের চব্বিশ ঘণ্টা শ্বাসক্রিয়া চলে যায়। গোলার ভেতরে প্রচুর পরিমাণে কষ্টিক ও পটাশিয়াম ক্লোরেট নিয়ে নেওয়া হল। কারণ, পটাশিয়াম ক্লোরেট বাতাসের কার্বনিক গ্যাস শুষে নিতে পারে।

ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ ঠিকঠাক হবে কিনা পরীক্ষা করার জন্যম্যাসটন-কে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে রাখা হল। সাতদিন পরে দরজা খুলে দেখা গেল, সে সুস্থই আছে। শুধু কি এ-ই ? কয়দিনে তার ওজনও কিছু বেড়ে গেছে।

*　*　*

বিডউইল কোম্পানির ওপর নতুন নক্সা অনুযায়ী প্রোজেকটাই অর্থাৎ গোলা তৈরির দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। যথা সময়ে তারা স্টোনস হিলে সেটা পাঠিয়ে দিল।

জল, স্প্রিং আর কাঠের পাটাতন প্রভৃতি ব্যবহার করে প্রাথমিক ধাক্কা সামলাবার ব্যবস্থা তো আগেভাগেই করে রাখা হয়েছে। জাহাজি পোর্টহোলের অনুকরণে চরটে গোলাকার জানলার ব্যস্থাও করা আছে। তাতে ব্যবহার করা হয়েছে পুরু কাঁচ। কামান দাগলে যাতে গুঁড়ো হয়ে না যায়। আলো ও আগুনের জন্য গ্যাসের ব্যবস্থাও করা হল। সুইচ টিপলে এক নাগাড়ে ছয় ঘণ্টা উননু জ্বলবে, গোলার ভেতরটা উষ্ণ থাকবে আর আলো তো পাওয়া যাবেই। আর বাতাস ? সে ব্যবস্থা তো আগেই করে নেওয়া আছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাটও চুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। বাতাস নিঃশেষ হয়ে গেলে আবার বাতাস তৈরির ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ করা গেল।

সাদা রঙ বিশিষ্ট এক বিশেষ ধরনের কৃষ্টাল হচ্ছে পটাশিয়াম ক্লোরাইড। তাতে চার শ' ডিগ্রি তাপমাত্রা প্রয়োগ করলে কৃষ্টালগুলো ভেঙে সৃষ্টি হয় পটাশিয়াম ক্লোরাইড। তখন ভেতরের সম্পূর্ণ অক্সিজেন বেরিয়ে আসে। সাত পাউন্ড অক্সিজেনের জন্য আটাশ পাউন্ড ক্লোরেট প্রয়োজন। অর্থাৎ অভিযাত্রীদের যে পরিমাণ অক্সিজেন দরকার—আড়াই হাজার লিটার অক্সিজেন পাওয়া যায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড কষ্টিক পটাশের সংস্পর্শে যাওয়া মাত্র তাকে শুষে নেয়। তখন পড়ে থাকে পটাশিয়াম বাইকার্বোনেট। এদুটোই দুষিত বায়ুকে শোধন করার ক্ষমতা রাখে।

ম্যাস্টন বায়না ধরল, তাকে যখন চন্দ্র-অভিযানে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে না তখন তাকে গোলাটার মধ্যে সাতদিন থাকার সুযোগ দেওয়া হোক।

তার আব্দার রক্ষা করা হল। গোলাটার ভেতরে খাবার, জল, পটাস এবং পটাশিয়াম ক্লোরেট রাখা হল। বারোই নভেম্বর সকাল ছয়টায় সবার সঙ্গে করমর্দন সেরে ম্যাস্টন

www.pathagar.com

গোলার ভেতরে ঢুকল। গোলাটার ভেতরে ঢোকার আগে সে সবাইকে বারবার বলে গেলে, বিশে নভেম্বর সন্ধ্যা ছয়টার আগে কেউ যেন সেটার দরজার না খোলে।

বিশে নভেম্বর সন্ধ্যা ছয়টায় গোলাটার দরজা খুলে দেখা গেল, ম্যাস্টন বহাল তবিয়তেই রয়েছে। বরং তার স্বাস্থ্যের উন্নতিই হয়েছে। এতে ম্যাস্টন নিজেও কম অবাক হয় নি।

গোলাটাকে চাঁদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করার পর সেটাকে যাতে পৃথিবীর থেকে দেখার অসুবিধা না হয় বিজ্ঞানীরা সে-ব্যবস্থারও ত্রুটি রাখলেন না।

চাঁদ যদি মাত্র উনচল্লিশ মাইল দূরে থাকত তবে তাকে খালি চোখে যেমন দেখাত, যে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তাকে ঠিক সেরকম দেখায় এমন দূরবীণ যন্ত্র পর্যন্ত আজ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মহাকাশের বুক চিরে ধেয়ে -যাওয়া গোলাটাকে দেখা যায় এরকম আরো শক্তিশালী একটা দূরবীণ যন্ত্র তৈরি করা হল। এটার শক্তি আগের দূরবীণের চেয়ে আটচল্লিশ হাজার গুণ বেশি। এর চোঙটাই দু-শ' আশি ফুট লম্বা। দূরের জিনিসকে কাছে ও বড় দেখার জন্য ষোলো ফুট ব্যসযুক্ত একটা কাঁচ এতে ব্যবহার করা হল। সদ্য তৈরী দূরবীক্ষণ যন্ত্রটাকে রকি পর্বতের সুউচ্চ চূড়ায় স্থাপন করা হল। স্থানটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার ফুট উঁচু। ত্রিশ হাজার পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট কাঁচটাকে ওপরে তুলতে এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রটাকে যথাস্থানে স্থাপন করতে চার লক্ষ ডলার ব্যয় হল।

দেখতে দেখতে নভেম্বরের বাইশ তারিখ এসে গেল। চাঁদের উদ্দেশে যাত্রা করার আর মাত্র দশটা দিন মাঝখানে রয়েছে। এবারের সাঙ্ঘাতিক কাজটার ওপরেই ক্যাপ্টেন নিকল তৃতীয় বাজি ধরেছেন। ব্যাপারটা হচ্ছে কোলাম্বিয়াডের নলে চার লক্ষ পাউন্ড গান-কটন পোরার ব্যাপারটার কথা বলা হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে পাইরোক্সিল দিয়ে কামান ঠাসার সময় হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি ঠাসা যায়ও খুবই ভারি প্রোজেকটাইলটা বারুদের ওপর চাপামাত্র প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে।

বার্বিকেন এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করলেন। অতি সন্তর্পণে পাইরোক্সিলের বস্তাগুলোকে স্টোনহিলে আনালেন। এবার ট্রেনে করে ট্যাম্পা শহর থেকে নিয়ে এসে কুলির মাথায় চাপিয়ে যথাস্থানে তোলা হল। সবশেষে কপিকলের সাহায্যে বস্তাগুলোকে কামানের নলের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হল। কামানের দু-মাইলের মধ্যে কোনোরকম আগুন জ্বালা নিষিদ্ধ করা হল। বার্বিকেন রুমকর্প যন্ত্রের সাহায্যে আলো জ্বেলে রাত্রির অন্ধকারে কাজ করার ব্যবস্থা করলেন। এতে বিস্ফোরণ ঘটার আর সম্ভাবনা রইল না।

সেদিনটা ছিল আঠাশে নভেম্বর। কামানে আট শ' কার্তুজ ঠাসা হল। বার্বিকেন প্রতিটা মুহূর্ত আতঙ্কের মধ্যে কাটাতে লাগলেন। এমন বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে ধূমপান পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হল। শেষপর্যন্ত নির্বিঘ্নেই কামানের নলে গান-কটন ভরার কাজটাকে মিটিয়ে ফেলা সম্ভব হল।

এবার কিছু সংখ্যক ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি গোলাটার মধ্যে তোলা হল। আর চাঁদকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখার জন্য একটা বোর মোলারের মানচিত্রও গোলায় তোলা হল। এটাকে সবাই 'ম্যাপা-সে-লেনোগ্রাফিকা' নামে জানে। এর গায়ে চাঁদের দৃশ্যাবলি, যেমন—পাহাড়-পর্বত, আগুন-পাহাড়ের জ্বালমুখ, খাদ, হ্রদ ও উপত্যাকা প্রভৃতি বিষদভাবে আঁকা রয়েছে। তা ছাড়া তিনটে বন্দুক, বহু বুলেট ও

www.pathagar.com

প্রচুর পরিমাণে বারুদও গোলায় তোলা হল।

মাইকেল আঁর্দার ইচ্ছা ছিল পৃথিবীর বহু জন্তু-জানোয়ার চাঁদে নিয়ে যান। কিন্তু স্থানাভাবের জন্য কেবলমাত্র দুটো কুকুর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। আর পৃথিবীতে যেসব গাছ জন্মায় কিছু কিছু করে তাদের বেশ কয়েকরকম বীজও সঙ্গে নিয়ে নিলেন। সঙ্গে খাবার-দাবার নিতেও ভুললেন না। তবে আঁর্দার অবশ্য এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কারণ, তাঁর কথা হচ্ছে, একবার চাঁদের বুকে পৌঁছতে পারলে খাবার দাবারের যা হোক একটা হিল্লে হয়ে যাবেই।

যাবতীয় বন্দোবস্ত হয়ে গেলে নতুনতর এক সমস্যা দেখা দিল। সমস্যাটা হচ্ছে, কামানের ভেতরে গোলাটাকে ঢোকানো নিয়ে। কাজটায় বিপদের ঝুঁকি তো রয়েইছে আর অসুবিধাও কম নয়।

কপিকলের সাহায্যে অতিকায় গোলাটাকে স্টোনসহিলের মাথায় তোলা হল। যা আশঙ্কা করা হয়েছিল সেরকম কোনো দুর্ঘটনাই ঘটল না। তারপর নির্বিঘ্নেই পাইরোক্সিলের গদির ওপর সেটাকে রাখাও অনায়াসেই সম্ভব হল।

কাজ নির্বিঘ্নে মিটিয়ে বার্বিকেন পিছন ফিরতেই দেখলেন, বাজির টাকা হাতে ক্যাপ্টেন নিকল সলজ্জমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মুচকি হেসে বার্বিকেন বললেন, 'এ কী করছেন সাহেব! বাজির টাকা কি আপনার কাছ থেকে নেওয়া চলে, বলুন ? আরে সাহেব, আপনি তো এখন আমাদেরই একজন হয়ে গেছেন।'

মাইকেল আঁর্দা মুচকি হেসে বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলি— আপনার যে দুটো বাজি এখনো বাকি রয়েছে তাও আপনি হেরে যান। তাই যদি হয় তবে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে, নির্বিঘ্নে আমরা চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাতে পারি।'

ক্যাপ্টেন নিকল সোল্লাসে হেসে করমর্দনের জন্য মাইকেল আঁর্দার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

* * *

পয়লা ডিসেম্বর। ভোরের আলো ফুটে উঠল। বহু প্রতীক্ষিত দিনটা এল। রাত্রি দশটা ছেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ডে কামান দেগে প্রোজেকটাইলকে মহাকাশে নিক্ষেপ করা হবে।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই হাজার হাজার কৌতুহলী-উৎসাহী দর্শক স্টোনস হিল এবং তার আশেপাশে ভিড় জমাতে লাগল। ট্যাম্পা টাউন অবজারভারের পাতায় খবরটা ছাপা হল—ফ্লোরিডা শহরে পঞ্চাশ হাজার কৌতূহলী দর্শক নাকি জমা হয়।

সন্ধ্যা সাতটার কাছাকাছি আকাশের বুকে চাঁদ উঁকি মারার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে চাঁদের নাম ধরে বার বার জয়ধ্বনি হতে লাগল।

যথা সময়ে অকুতোভয় বার্বিকেন, আঁর্দা আর নিকল কামানটার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাদের পিছন পিছন সেখানে হাজির হলেন, ইউরোপে সবগুলো মানমন্দিরের প্রতিনিধি এবং গান-ক্লাবের সদস্যরাও এলেন।

ঘড়ির কাঁটা টিক টিক করে এগিয়ে চলল। রাত্রি দশটা ছেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড। নির্দেশ অনুযায়ী মার্চিসন বৈদ্যুতিক ব্যাটারির বোতাম টিপে দিল।

www.pathagar.com

সে কী প্রলয়ঙ্কর পরিস্থিতি! লক্ষ লক্ষ বজ্র যেন এক সঙ্গে গর্জে উঠল। সুপ্ত কোনো আগ্নেয়গিরি আকমকা লাভা উদ্গিরন শুরু করলেও বুঝি এমন বিকট আওয়াজ সৃষ্টি হয় না। আর অত্যুজ্জ্বল আগুনের হল্কা লাফিয়ে যেন আকাশ পর্যন্ত উঠে গেল। ফ্লোরিডার আকাশে যেন নতুন এক সূর্য আচমকা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। দশটা ছেচল্লিশ মিনিটে মাত্র কয়েকজন শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখতে পেল বিশালায়তন প্রোজেকটাইলটা আগুন আর ধোঁয়ার জাল ভেদ করে দ্রুত ওপরে উঠে যাচ্ছে।

সমুদ্রের বুকে ভাসমান বেশ কিছু সংখ্যক জাহাজের ক্যাপ্টেন তাদের লগবুকের পাতায় লিখেলেন, "আকাশের গায়ে অতিকায় একটা উল্কাপিণ্ড দেখা গেছে।"

কামানের আকস্মিক গর্জনে সমগ্র ফ্লোরিডা শহর থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। কিছু লোক তো তাল সামলাতে না পেরে ছিটকেই পড়ল। ব্যস, এবার শুরু হয়ে গেল হুটোপাটা। ছুটোছুটি করে পালাতে গিয়ে কতলোক যে পায়ের তলায় পড়ে আহত হল তার ইয়ত্তা নেই। কত লোক তো মারাই পড়ল। প্রায় তিনলক্ষ লোক প্রচণ্ড শব্দ সহ্য করতে না পেরে কালা হয়ে পড়ল। আর মোহাচ্ছন্ন হয়ে রইল বেশ কিছু লোক।

প্রোজেকটাইলটার চৌঠা ডিসেম্বর চাঁদে পৌছোবার কথা। ততদিন হাত-পা গুটিয়ে অধীর প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রবল বেগে ধেয়ে যাওয়া গোলাটাকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পাওয়ার কথা ভাবাই যে নিছক পাগলামি।

চৌঠা ডিসেম্বর থেকে ছয় তারিখ পর্যন্ত আকাশ মেঘলা হয়েই রইল। সাত তারিখে আকাশের গোমড়া ভাব একটু কাটল। নয় তারিখে সূর্যকে আবছা দেখা গেল। ব্যস, আবারও মেঘের দাপট শুরু হয়ে গেল। দশ তারিখেও আকাশের অবস্থা অপরিবর্তিত রয়ে গেল। এগারো তারিখে যেন আচমকা এক ঝড়ের দাপটে মেঘ উড়ে গিয়ে আকাশ স্বচ্ছ হয়ে উঠল। এবার চন্দ্রযান প্রোজেকটাইল লঙস পিকের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ল। খবরটা টেলিগ্রাম মারফত পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। লঙস পিক থেকে কেমব্রিজ মানমন্দিরের অধিকর্তার কাছে টেলিগ্রাম এল। বারোই ডিসেম্বর টেলিগ্রামটা করা হয়েছে। মানমন্দিরের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে লেখা। তার বক্তব্য মোটামুটি এরকম—মি. ম্যাসটন এবং মি. বেলফাস্ট আজ রাত্রি আটটা সাতচল্লিশে স্টোনসহিলের কোলাম্বিয়াড থেকে নিক্ষিপ প্রোজেকটাইলটাকে দেখতে সক্ষম হয়েছেন। গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারেনি। চাঁদের দিকে চলে গেছে। কিন্তু চাঁদের আকর্ষণের আওতায়ই রয়ে গেছে। ডিম্বাকৃতি কক্ষপথে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। অভিযাত্রীরা সাফল্য লাভ করবেন।

তবে এতে দুটো ব্যাপার ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে (ক) প্রোজেকটাইল চাঁদের আকর্ষণে চাঁদের বুকে নেমে যাবে। অভিযাত্রীরা সাফল্য লাভ করবেন। নইলে (খ) অনাদি অনন্ত কাল ধরে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতেই থাকবে। টেলিগ্রামটা করেছেন জে. বেলফাস্ট।

অভিযাত্রীদের চিন্তায় সারা পৃথিবী অস্থির হয়ে পড়ল। খাদ্যবস্তু, জল আর যে পরিমাণ বাতাস তাদের সঙ্গে রয়েছে তাতে দুমাস চলে যাবে। তারপর তাঁদের কি গতি হবে?

সবাই নানারকম ভাবনা চিন্তায় ডুবে থাকলেও ম্যাসটন কিন্তু নির্বিকার ভাবেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটাকে চোখে লাগিয়ে তিন বন্দুকে বহনকারী প্রোজেকটাইলকে চোখে চোখে রাখতে রাগল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, তারা বিজ্ঞান, চারুবিদ্যা আর প্রযুক্তি বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে বিপদকে অগ্রাহ্য করে একদিন না একদিন সাফল্যলাভ করবেনই।

www.pathagar.com

দশটা। মাইকেল আঁর্দা, নিকল ও ক্যাপ্টেন বার্বিকেন পৃথিবীর বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। চাঁদের বুকে কুকুরজাতটার প্রচার করার উদ্দেশ্যে প্রোজেকটাইলের মধ্যে আগেভাগেই কুকুর দুটোকে রাখা হয়েছে।

লোহার বিশালায়তন পাইপটার মুখের কাছে তিনজন গিয়ে দাঁড়ালেন। এবার কপিকলের সাহায্যে তাঁদেরকে পাইপটার গোলাকার মুখটা দিয়ে ভেতরে নামিয়ে দেওয়া হল। পাইপের ভেতর থেকে দূরবর্তী বৃত্তাকার আকাশটাকে স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। নিকল পাইপের প্রবেশ পথটা ধাতুর পাত দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। ব্যস, তিনজন অভিযাত্রী ধাতব-কারাগারে কয়েদ হয়ে গেলেন।

অকুতোভয় মাইকেল আঁর্দা কামরাটাকে গোছগাছ করতে গিয়ে জুতোর শুকতলায় দেশলাইয়ের কাঠি ঘষে কোল গ্যাসের বাতিটা জ্বালালেন। উচ্চচাপে রক্ষিত এ-গ্যাস এক শ' চুয়াল্লিশ ঘন্টা আলো দান করতে পারে। আর সে সঙ্গে প্রোজেকটাইলটাকেও গরম রাখা সম্ভব হবে।

যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র আর বাসনপত্র সবই প্যাড দিয়ে আটকে দেওয়া আছে। বলা তো যায় না যাত্রার শুরুতে প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাতে না পেরে স্থানচ্যুত হয়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে পারে। গ্যাসবাতির আলোয় সবকিছু খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে তিনি যারপরনাই খুশি হলেন, কিছুই স্থানচ্যুত হয় নি।

এদিকে বার্বিকেন এবং নিকল যাত্রারম্ভের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়ার কাজে মেতে রইলেন। মুহূর্তকাল পরে বার্বিকেন ইঞ্জিনিয়ার মার্চিসন-এর ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে রাখা নিকলের এনোমিটার ঘড়িটা হাতে তুলে দেখে নিয়ে বললেন, 'দশটা কুড়ি। মার্চিসন দশটা সাতচল্লিশে বৈদ্যুতিক স্পার্কের মাধ্যমে কলম্বিয়াডের বারুদে অগ্নি সংযোগ করবেন। অর্থাৎ পৃথিবীর মাটির সঙ্গে প্রাজেকটাইল-এর সম্পর্ক ছিন্ন করতে আর মাত্র সাত মিনিট বাকি রয়েছে।

নিকল বললেন, 'ছাব্বিশ মিনিট তেরো সেকেন্ড'।

উল্লসিত হয়ে আঁর্দা বললেন, 'ছাব্বিশ মিনিট! ছাব্বিশ মিনিট সময় কিন্তু কম নয়! ছাব্বিশটা বছরে যা করা সম্ভব নয়, ছাব্বিশ মিনটে তা মিটিয়ে নেওয়া যায়।' ক্রনোমিটারটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই তিনি এবার বললেন, 'আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি আছে।'

দশটা সাতচল্লিশ মিনিটে ক্যাপ্টেন অন্যান্যদের দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

ইতিমধ্যেই নিকল ও মাইকেল আঁর্দা কেন্দ্রস্থলে রাখা আরাম কেদারায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছেন। বার্বিকেন তাড়াতাড়ি গ্যাসবাতিটা নিভিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'মাত্র বিশ সেকেন্ড আর বাকি, কথাটা বলেই তিনিও সহযাত্রী দুজনের পাশে শুয়ে পড়লেন।

মুহূর্তের মধ্যে হঠাৎ ভয়ানক একটা ধাক্কা সবাই অনুভব করলেন। প্রোজেকটাইলটা ১,০০০,০০০,০০০ লিটার পোড়া-বারুদের গ্যাসের ভীষণ এক ধাক্কায় মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত

www.pathagar.com

হল। প্রচণ্ড ধাক্কাটার পর কী ঘটল ? অভিযাত্রীরা কি প্রচণ্ড ধাক্কায় সেকেন্ডে বারো হাজার গজ শূন্যে উঠে আসার চাপ সামলাতে পেরেছে ? পৃথিবীবাসীদের মাথা থেকে অভিযানের উদ্দেশ্যটা ধুয়ে মুছে গেছে। এসব প্রশ্নের মীমাংসা করতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

জমাটবাঁধা অন্ধকারে দৃষ্টি বাধা পড়ে যায়। কিছুই নজরে পড়ছে না। হ্যাঁ, শঙ্কুর মতো অগ্রভাগ ছুঁচলো পাইপটা ভয়ঙ্কর ধাক্কাটাকে সহ্য করে নিয়েছে। ভাঙা বা টোল খাওয়া তো দূরের ব্যাপার সামান্যতম চিরও খায় নি। অনেকেই যে আশঙ্কা করেছিলেন —খুবই তীব্র রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটার ফলেও প্রজেকটাইলটা গরম হয়ে লাল হয়ে পড়েনি, ফেটে গিয়ে অ্যালুমিনিয়াম গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বাতাসে উড়ে যায় নি। তেমন কোনো দক্ষযজ্ঞও বাঁধে নি। কয়েকটা জিনিস আছাড় খেয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল—ব্যস। মোদ্দা কথা, প্রোজেক্টাইলটার কোনোই অনিষ্ট হয় নি। কাঠামোটা পর্যন্ত অক্ষতই আছে।

পার্টিসনটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ায় আর জলনল দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে গোলার একেবারে তলদেশে কাঠের চাকতিটা লেগে গিয়েছে। নিশ্চল-নিথর তিনটে দেহ তার ওপর এলিয়ে পড়ে। মনে হচ্ছে কারো দেহেই বুঝি প্রাণের চিহ্নমাত্রও নেই। আঁর্দা, বার্বিকেন আর নিকলের শ্বাসক্রিয়া চলছে তো ? নাকি প্রোজেকটাইলটা উড্ডীয়মান কফিনে পরিণত হয়ে তিনটে লাশ বয়ে নিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছে। যাত্রা শুরুর মিনিট কয়েক পরে একটা দেহ একটু নড়ে উঠল হাত নাড়াচাড়া করল। মাথা উঁচু করল। হাঁটুতে ভর দিয়ে কোনোরকমে উঠে বসল উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন ফরাসি বৈজ্ঞানিক আঁর্দা। পারলেন না। মাথা ঝিমঝিম করছে, সর্বাঙ্গ টলছে। শরীরের সবটুকু রক্ত যেন নিঃশেষে মাথায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

দুর্বল হাতে কপাল মুছতে মুছতে তিনি ডাক দিলেন—'নিকল! বার্বিকেন!' না, কোনো সাড়াই পেলেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলেও তো মনে করতে পারতেন, দুজনের একজনের দেহে অন্তত প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। মাইকেল আঁর্দা আবারও গলাছেড়ে ডাকলেন। না, এবারও কোনোই সাড়া পেলেন না।

আঁর্দা এবার একটু একটু করে জীবনীশক্তি ফিরে পেতে লাগলেন। মাতালের মতো টলতে টলতে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালেন। রক্তের গতি ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কোটের পকেট থেকে দেশলাই বের করে গ্যাসবাতি জ্বাললেন। চারদিকে অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, বার্নারে মোটেই আঘাত লাগে নি। গ্যাসজারটাও অক্ষতই রয়েছে। নইলে গ্যাসের গন্ধে জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত। আর দেশলাই জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে ঘরভর্তি গ্যাস হঠাৎ করে জ্বলে উঠে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়ত।

গ্যাসের আলোয় আঁর্দা মেঝেতে এলিয়ে পড়ে-থাকা সহযাত্রী দুজনের কাছে এসে বসলেন। লক্ষ্য করলেন, বার্বিকেনের নিশ্চল-নিথর দেহের ওপর নিকল মড়ার মতো পড়ে। উভয়েই অচৈতন্য, সামান্যতম হুঁসও নেই।

আঁর্দা সহযাত্রীদের সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হলেন। নানাভাবে সেবা শুশ্রুষার মাধ্যমে প্রথম নিকলের এবং তারপর প্রেসিডেন্ট বার্বিকেনের সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনলেন। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকিয়েই প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন নিকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা ছুটে চলেছি তো ?'

www.pathagar.com

প্রজেকটাইলটার কথা এতক্ষণ কারো স্মরণই ছিল না। নিকল বার-কয়েক এদিক-ওদিক নজর ফিরিয়ে বলে উঠলেন, 'তাও তো বটে! আমরা কি উঠছি, নাকি ফ্লোরিডার মাটিতেই এখনো পড়ে রয়েছি?'

তাঁর মুখের কথাটা শেষ হতে না হতেই আঁর্দা বলে উঠলেন, 'কী ব্যাপার! আমরা মেক্সিকো উপসাগরের জলে তলিয়ে যাই নি তো! কিছুই তো মালুম হচ্ছে না!'

প্রেসিডেন্ট সবিস্ময়ে বলছেন, 'আপনাদের মুখে তো রীতিমতো আজব কথা শুনছি সাহেব!'

কথাটাকে একেবারে তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। সামান্য উঠেই প্রেজেকটাইলটা আছাড় খেয়ে হুড়মুড়িয়ে সুমদ্রে পড়ে যেতে পারে, ভূমিতে ফিরে আসাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আবার সত্য সত্যই মহাশূন্য বরাবর ছুটে যেতে পারে। কোনোটা ঠিক কথা?'

হঠাৎ তাপমাত্রা খুবই বেশি অনুভূত হওয়ায় বার্বিকেন চমকে উঠে থার্মোমিটারের দিকে চোখ ফেরাতেই লক্ষ্য করলেন—পারদস্তম্ভ আশি ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠে গেছে। এবার তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'বন্ধুগণ, আমরা সত্যি ছুটে চলেছি। বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে প্রোজেকটাইলের বাইরের দিকটা খুবই উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে। তার কিছুটা উত্তাপ ভেতরেও ঢুকে পড়েছে। তবে এখনই তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে নিদারুণ ঠাণ্ডা শুরু হয়ে যাবে।'

মাইকেল আঁর্দা অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে বলে উঠলেন, 'তবে কি আমরা বায়ুমণ্ডলের এলাকা অতিক্রম করে এসেছি?'

'অবশ্যই। এখন বাজে দশটা পঞ্চান্ন। প্রোজেকটাইল আট মিনিট ধরে একনাগাড়ে ছুটে চলেছে। বাতাসের ঘর্ষণ জনিত বাধা না থাকলে দুমিনিটের মধ্যেই অনায়াসে চল্লিশ মাইল পুরু বায়ুমণ্ডলের স্তর অতিক্রম করে ফেলা যেত।'

নিকল জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাতাসের ঘর্ষণের ফলে গতিবেগ কতখানি হ্রাসপ্রাপ্ত হবে বলে মনে করছেন?'

'এক তৃতীয়াংশ। প্রতি সেকেন্ডে বারো হাজার গজ গতিবেগে যাত্রারম্ভ করে থাকলে প্রোজেকটাইলটা অবশেষে সেকেন্ডে নয় হাজার এক শ' পঁয়ষট্টি গজ গতিবেগ পাবে।'

আঁর্দা এবার সোল্লাসে বলে উঠলেন, 'তবে হিসেব মতো দেখা যাচ্ছে বন্ধু নিকল আরো দু-দুটো বাজি হারলেন। তাদের একটা, কামানটা ফেটে না যাওয়ার জন্য চার হাজার ডলার আর দ্বিতীয়টা ছয় মাইলেরও বেশি উর্ধ্বাকাশে উঠে যাওয়ার জন্য পাঁচ হাজার ডলার হারলেন।'

'আমি বাজি হারতে পারি, অসম্ভব কিছু নয়, তবে এখন কিন্তু আর একটা সমস্যার উদয় হয়েছে যে। এমনও হতে পারে গান-কটনে আদৌ আগুনই ধরে নি, আমরা যাত্রারম্ভই করে উঠতে পারিনি।'

বিস্ময়-বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আঁর্দা বলে উঠলেন, 'এ কী বলছেন ক্যাপ্টেন! আমার মতোই আপনিও যে বকবকানি জুড়ে দিলেন? যাত্রারম্ভই যদি না করে থাকি তবে বার্বিকেনের কাঁধে রক্তের ছোপ কোত্থেকে এল, বলুন দেখি?'

কণ্ঠস্বরে অস্থিরতা প্রকাশ করে নিকল এবার বললেন, 'কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটল, আমরা ছুটতে লাগলাম। ভালো কথা —কিন্তু বিস্ফোরণের আওয়াজ কেউ শুনতে পেয়েছেন কি?'

www.pathagar.com

বার্বিকেন ভুরু কুঁচকে বললেন, 'অতি অত্যাশ্চর্য অবিশ্বাস্য কাণ্ড তো? বিস্ফোরণে আওয়াজ তো কানে আসল না ! এমনটা হবার কারণ কি?' কথা বলতে তিনি এবার স্ক্রু ঢিলা করে একটা জানালার প্যানেট টেনে সরিয়ে ফেললেন। নজরে পড়ল পোর্ট হোলের মতো ফ্রেমের গায়ে সাঁটা লেন্স ধরনের একটা কাঁচ। বিপরীত দিকের দেওয়ালের গায়ে দ্বিতীয় জানালাটা আটকানো। আর গম্বুজাকৃতি ছাদে লাগিয়ে দেওয়া আছে তৃতীয়টা। চতুর্থটা রয়েছে মেঝেতে। চারদিকে জানালা দিয়েই মহাকাশ নিরীক্ষণ করা সম্ভব, পৃথিবী আর চাঁদও।

'অভিযাত্রীরা খোলা-জানালার ধারে দৌড়ে গেলেন। কিন্তু নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই তাদের নজরে পড়ল না। এক ছিটা আলোও না।

মহাশূন্য। অন্ধকারের অর্থই হচ্ছে মহাশূন্য। পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থান করলে চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত পৃথিবীটাকে নজরে পড়ত। এমন জমাটবাঁধা অন্ধকারের অর্থ তাঁরা বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে এসেছেন।

ক্যাপ্টেন নিকল এবার নয় হাজার ডলারের থলে বের করে প্রেসিডেন্ট-এর হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, 'আমি হেরে গেছি।'

বার্বিকেন প্রাপ্তি স্বীকার করে রসিদ লিখে দিলেন। মহাশূন্যে দুই আমেরিকানের কাণ্ডকারখানা দেখে ফরাসি আঁর্দা তো থ বনে গেলেন।

চাঁদ দেখার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে অন্য একটা জানালার ঢাকনা সরাতে গিয়ে বার্বিকেন অতিকায় একটা চাকতি দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার অত্যুজ্জ্বল দিকটা পৃথিবীর দিকে ফেরানো রয়েছে। ব্যাপারটা এমন যে, একটা শিশু-চাঁদ তাঁর জননী-চাঁদের কিরণকে নিজের বুকে প্রতিফলিত করছে বলেই এমনটা দেখাচ্ছে। পৃথিবীর চারদিকে স্বীয় কক্ষপথে পরিক্রমন করতে করতে উড়ন্ত চাকতিটা যেন দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। প্রোজেকটাইল তার কক্ষপথ ধরেই এগোচ্ছে। অতএব শেষপর্যন্ত সংগর্ষ বাঁধবেই।

মাইকেল আঁর্দা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, 'ব্যাপার কি ? ওটা কি অন্য আর একটা প্রোজেকটাইল ?'

প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন নির্বাক। তাঁর চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। প্রোজেকটাইল ওই উড়ন্ত চাকতিটার গায়ে ধাক্কা মারলে তাঁদের অভিযানের শখ জন্মের মতো ঘুচে যাবে। আর তা যদি না-ও হয় চাকতিটার আকর্ষণে এটা তার চারদিকে ভোঁ ভোঁ করে চক্কর মারতে লেগে যাবে। নতুবা এটা আবার ভূ-পৃষ্ঠে আছাড় খেয়ে পড়বে।

পাগল! এই বুঝি উড়ন্ত চাকতিটার সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধল। কোনো উপায়ই নেই শুনে আঁর্দা ফ্যাকাসে মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'মৃত্যুর নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা ভেবে মুষড়ে পড়ে লাভই বা কি ? আমরা তো বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য জান খোয়াতে বসেছি। তাই তো বিষাদ নয়, আমাদের উচিত প্রাণ খুলে আনন্দ করা।' এ-কথা মুখে বললেও তিনি যে মৃত্যুর দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে যেতে ভেতরে ভেতরে খুশি হয়েছেন অন্য দুজনের কাছে তা মোটেই মনে হল না।

বরাতের জোর আছে। সংঘর্ষ বাঁধতে গিয়েও বাঁধল না। অতিকায় গ্রহাণুটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে তলিয়ে গেল।

আঁর্দা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বার্বিকেন বললেন, 'এটা একটা উল্কা। পৃথিবীর আকর্ষণে এটা তার উপগ্রহে পরিণত হয়ে পড়েছে।'

www.pathagar.com

'এ কী অদ্ভুত কথা! এটা কি করে সম্ভব ? তবে কি নেপচুনের মতো পৃথিবীর দুটো চাঁদ আছে ?'

'অবশ্যই। দুটো চাঁদই বটে। পৃথিবীর চাঁদের সংখ্যা মাত্র একটা মনে করা হলেও দ্বিতীয় চাঁদটা এত ছোট আর গতিবেগ এতই প্রবল যে, সেটা পৃথিবীর মানুষের নজরেই আসে না। এম. পোটিট নামে এক ফরাসি মহাকাশ-বিজ্ঞানী দ্বিতীয় চাঁদটা আবিষ্কার করেন। ছোট্ট চাঁদটা পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে মাত্র তিন ঘণ্টা কুড়ি মিনিটে-বহু হিসাব নিকাশ করে তিনি সিদ্ধান্তে পৌছতে পেরেছিলেন। অতএব ভেবে দেখুন, ছোট্ট চাঁদটা কী প্রবল বেগে চক্কর মেরে চলেছে! তবে দ্বিতীয় চাঁদের অস্তিত্বের কথা সব জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে নেন নি। তবে আমাদের মতো চাক্ষুষ করলে স্বীকার করতেন।' মুহূর্তকাল পরে আবার বললেন, 'ছোট্ট চাঁদটা কিন্তু আমাদের হিত সাধনই করেছে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আমরা এখন কত ওপরে রয়েছে, জানতে পারছি। আসলে ছোট্ট চাঁদটার দূরত্ব আমাদের জানা থাকায় এটা সম্ভব হচ্ছে। আমরা যখন সেটার মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিলাম তখন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আমাদের দূরত্ব ছিল চার হাজার ছয় শ' পঞ্চাশ মাইল।'

ক্যাপ্টেন নিকল ঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমরা আমেরিকার মাটি ছেড়ে এসেছি তেরো মিনিট আগে। প্রতি সেকেন্ডে বারো হাজার গজ ব্যবধান হ্রাস না পেলে তবে প্রতি ঘণ্টায় কুড়ি হাজার মাইল বেগে ধেয়ে যাওয়া যেত।'

বার্বিকেন চোখে-মুখে জিজ্ঞাসার ছাপ এঁকে বললেন, 'সে না হয় হল। কিন্তু আসল সমস্যা কামানের গর্জনটা কেন আমরা শুনতে পাই নি ?'

ক্যাপ্টেন নিকল গ্যাসবাতিটা নিভিয়ে দিল। অকারণে গ্যাস পোড়াতে সে রাজি নয়। এবার আর একটা জানালার পাল্লা খুলে দিতেই চাঁদের আলোয় ভেতরটা ঝলমলিয়ে উঠল। বায়ুস্তরে আলোর প্রতিসরণ ঘটে না। প্রতিফলন নেই বলেই ঝকঝকে রূপোর মতো চাঁদের কিরণ অপূর্ব সৌন্দর্যরাশি নিয়ে তাদের চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এটা চাঁদ তো নয়, যেন প্লাটিনামের থালা। কিন্তু হায়! পৃথিবী? পৃথিবী কোথায় গেল? এ যে অতি ক্ষুদ্র এক রূপোলি গ্রহ।

বার্বিকেন বললেন, 'ওইটাই হচ্ছে পৃথিবী।' এবার ব্যাপারটা খোলসা করে বুঝিয়ে দিলেন। চারদিন বাদে তাঁরা চাঁদে হাজির হবেন। পৃথিবী তখন ছোট্ট আকৃতি নিয়ে দেখা দেবে। তারপর কিছুদিন জমাট বাঁধা অন্ধকারে ঢাকা থাকবে।

বিস্ময় মাখানো নীরব চাহনি মেলে অভিযাত্রীরা পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু রূপ চাক্ষুষ করতে লাগলেন। ঠিক তখনই গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কা পড়তে লাগল পৃথিবীর ওপর। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নাকি হিসাব নিকাশ করে জানতে পেরেছেন, ডিসেম্বর মাসে ঘণ্টায় চব্বিশ হাজার উল্কা পৃথিবীর আকাশে খসে পড়ে।

দীর্ঘসময় ধরে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকায় অভিযাত্রী তিনজনের চোখেই ক্লান্তি আর অবসাদ ভর করল। তাই ক্লান্তি অপনোদনের জন্য তাঁরা পাশাপাশি শুয়ে পড়লেন। ব্যস, মুহূর্তে গভীর ঘুমে ডুবে গেলেন।

একসময় বার্বিকেন দুই বন্ধুকে ডাকাডাকি করে তুলে সোল্লাসে বলে উঠলেন, 'পেয়েছি! পেয়েছি!'

যন্ত্রচালিতের মতো লাফিয়ে উঠে আঁর্দা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ? কি পেয়েছেন ?'

www.pathagar.com

'কামানের আওয়াজ না শোনার কারণ খুঁজে পেয়েছি। প্রোজেকটাইল শব্দের চেয়ে দ্রুততর গতিতে ছুটে চলেছে বলেই এমনটা হয়েছে।'

যুক্তিটা অদ্ভুত হলেও সত্যি। তিন বন্ধু আবার ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

সকাল সাতটার কাছাকাছি গোলাটার ভেতরে অভাবনীয় শব্দটা না হলে তাঁরা যে কতক্ষণ ঘুমাতেন, পরিণামে কী যে ঘটত বলা মুশকিল।

সেদিনটা ছিল দোসরা ডিসেম্বর। যাত্রা শুরু আট ঘন্টা পরের ব্যাপার। অভাবনীয় শব্দটা কুকুরের কণ্ঠস্বর।

বার্বিকেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গেল কুকুরগুলো ?

এখানে-ওখানে খোঁজাখুঁজির পর সোফার তলায় একটা কুকুরের হদিস মিলল। কামানের ধাক্কার ফলে আতঙ্কে এককোণে ঘাপটি মেরে পড়েছিল। এখন খিদেতে কাতর হয়ে হাঁকডাক জুড়ে দিয়েছে। অনেক ডাকাডাকির পর যখন সেটা বেরিয়ে এল দেখা গেল সে কুত্তী, ডায়না তার নাম। বার্বিকেন বললেন, 'ইভ-এর হদিস তো মিলল। কিন্তু আদম গেল কোথায়?'

না, অনেক ডাকাডাকি করেও স্যাটেলাইট-এর হদিস মিলল না। কোথায় গেল ? শুরু হল জোর তল্লাশি। শেষপর্যন্ত প্রোজেকটাইলের মাচার ওপরে তার দর্শন পাওয়া গেল। ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি সামলাতে না পেরে সে ছিটকে পড়ে চোট পেয়েছে। অবস্থা সঙ্গীন। মারাত্মক অবস্থা। ধরাধরি করে তাকে নামিয়ে এনে একটা গদির ওপর শুইয়ে দেওয়ার পর মৃত্যু পথযাত্রী বেচারা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অভিযাত্রীরা আবার পৃথিবী ও চাঁদ পর্যবেক্ষণে ডুবে গেলেন। পৃথিবীটাকে যেন মেঘঢাকা একটা গোলাকার চাকতির মতো মনে হচ্ছে। আর চাঁদ? চাঁদটা এখন আরো বড় আকার ধারণ করছে।

মাইকেল আক্ষেপের সুরে বললেন, 'সূর্যের বিপরীত দিকে যখন পৃথিবীটা পৌঁছতো তখন যাত্রা করলেই বরং ভালো হত। পৃথিবীর মেরু অঞ্চলটা চাক্ষুষ করতে পারতাম, যা আজ পর্যন্ত কারোর পক্ষেই দেখা সম্ভব হয় নি।' অভিযাত্রীরা রীতিমতো মস্করা শুরু করে দিলেন। তবে সবই নিজ নিজ বিজ্ঞান সম্মত মতামত। কথা বলতে বলতে তাঁরা প্রাতঃরাশ সারতে লাগলেন।

এরই মধ্যে প্রোজেকটাইল পৃথিবীর ছায়ার গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তাই তো অভিযাত্রীদের পক্ষে এখন সূর্যকে দেখা সম্ভব হল।

প্রোজেকটাইল এবার ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। মাথার ওপরে চাঁদ আর নিচে সূর্য। গোলাটা যেন অগ্নিকুণ্ডের ভেতরে দিয়ে ধেয়ে চলল। মাইকেল আঁর্দা গম্ভীর মুখে বলে উঠলেন, 'উত্তাপ বেড়েই চললে প্রোজেকটাইলের ওপরের আবরণটা আবার গলে না যায়।'

তাঁকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে বার্বিকেন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে আসার সময় প্রোজেকটাইল অবশ্যই জ্বলন্ত উল্কায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ফ্লোরিডার মানুষরা অন্তত সেরকমই দেখতে পেয়েছিল। তাতেও যখন এর কিছুই হয় নি তখন আর আতঙ্কের কোনো কারণই নেই মি. আঁর্দা।'

কথাটা বলেই বার্বিকেন কামরাটাকে গোছ গাছ করার কাজে ডুবে গেলেন। তার ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হল, জীবনের বাকি দিনগুলো তিনি এখানেই কাটিয়ে দেবেন।

www.pathagar.com

দেখা গেল, কামান দাগার ফলে খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় জল কোনোটাই নষ্ট হয় নি। সেগুলো দিয়ে অনায়াসে দু-মাস চালিয়ে নেওয়া যাবে। আর, দু-মাস পটাসিয়াম ক্লোরেট দিয়ে অক্সিজেনও তৈরি করে নেওয়া সম্ভব হবে। বারো ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই গোলার ভেতরে বিষাক্ত কার্বনিক গ্যাস জমে গেছে। এটা বাতাসের চেয়েও ওজনে ভারি। ফলে মেঝেতে জমে থেকে সবার ভয়ানক শ্বাসকষ্টের উদ্রেক ঘটাল। পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরেই নিকল পটাশিয়াম ক্লোরেটের পাত্রটার মুখ খুলে মেঝের ওপর ধরলেন। ক্লোরেট মুহূর্তের মধ্যে র্কাবন ডাই-অক্সাইড টেনে নিয়ে বাতাস পরিষ্কার করে দিল।

দেখা গেল একটা থার্মোমিটার ছাড়া আর কোনো যন্ত্রপাতি ভাঙে নি।

গোলার বাইরের দৃশ্যের এতটুকুও পরিবর্তন হয় নি। আকাশের সর্বত্র তারার ঝকমকানি। একদিকে রূপালী চাঁদ আর অন্যদিকে অত্যুজ্জ্বল সূর্য বিরাজ করছে। আর সুবিশালায়তন বৃত্তাকার পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছে। আর নীহারিকামণ্ডল তারার মতো এখানে ওখানে মিটমিট করছে, ক্ষুদে ক্ষুদে অসংখ্য নক্ষত্র ছায়াপথ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এমন অভূতপূর্ব দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বারো ঘণ্টার হিসাবেই একটা দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। অভিযাত্রীদের সারাটা দিন নির্বিঘ্নেই কাটল। প্রোজেকটাইল প্রবল গতিতে ছুটতে থাকল। আর তার গতিবেগ ক্রমেই হ্রাস পেতে লাগল।

* * *

প্রোজেকটাইলের ভেতরে অবস্থানরত অভিযাত্রীদের এখন মনে হতে লাগল ধাতব কামরাটা বুঝি মহাশূন্যে নিশ্চল নিথরভাবে ভেসে রয়েছে।

আসলে তো মোটেই তা নয়। গোলা প্রবল বেগে ধেয়ে চলেছে। সে জন্যই তো চাঁদের আকার ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তেসরা ডিসেম্বর। মোরগের ডাকে অভিযাত্রীদের ঘুম ভাঙল।

মাইকেল আঁর্দা যন্ত্রচালিতের মতো উঠে মাচায় গিয়ে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। একটা খোপের ঝাপ বন্ধ করতে গিয়ে ধমক ধামক জুড়ে দিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে অন্য দুজন অভিযাত্রীর ঘুম ভেঙে গেল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে, এবার বীজগণিত আর সমীকরণ নিয়ে তিনজন তর্কাতর্কি জুড়ে দিলেন। মাইকেল জানতে চাইলেন, বীজগণিতের অঙ্ক করে প্রোজেকটাইলের বর্তমান গতিবেগ বের করা যাবে কিনা। ব্যস, নিকল অঙ্ক করতে লেগে গেল। দীর্ঘ সময় ধরে অঙ্ক নিয়ে মেতে থেকে এক সময় মুখ খুললেন, 'বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করার পর মহাকাশের যেখানে পৃথিবী ও চাঁদের আকর্ষণ সমান হচ্ছে সেখানে যেতে প্রোজেকটাইলকে সেকেন্ডে বারো হাজার গজ হিসাবে পথ পাড়ি দিতে হবে।'

মাইকেল আঁর্দা আৎকে উঠে বললেন, 'এ যে কেলেঙ্কারী কাণ্ড! প্রোজেকটাইলের গতিবেগ যদি ঘর্ষণের ফলে এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েই থাকে তবে এর গতিবেগ হওয়ার দরকার ছিল সতের হাজার গজ। কেমব্রিজ মানমন্দির কিন্তু বলেছে, বারো হাজার গজ গতিবেগ দিয়েই যাত্রা আরম্ভ করা সম্ভব। আমরা সে-গতিবেগেই ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যাত্রা করেছি। এখন বুঝতে পারছি তা যথেষ্ট নয়। তাই যদি হয় তবে চাঁদ আর পৃথিবীর আকর্ষণ যেখানে সমান, সেখানে কোনোদিনই আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। এমন কি তার অর্ধেক পথও যেতে পারব না।'

www.pathagar.com

ফ্যাকাসে মুখে প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন উচ্চারণ করলেন, 'তবে ? আমরা কি তবে পৃথিবীর বুকেই আছাড় খেয়ে পড়ব?'

অভিযাত্রীরা মুষড়ে পড়ার জোগাড় হলেন।

অকস্মাৎ ক্যাপ্টেনের মাথায় একটা ব্যাপার খেলে গেল। তিনি বললেন, 'ঘড়িতে এখন সকাল সাতটা বাজে। আমরা ইতিমধ্যেই দুই তৃতীয়াংশ পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছি। কই, মনে তো হচ্ছে না আমরা পৃথিবীর দিকে নেমে যাচ্ছি। কথাটা বলেই তিনি কাঁটাকম্পাসটা হাতে তুলে নিলেন। হিসাব কষতে গিয়ে তাঁর গা দিয়ে দড়দড় করে ঘাম ঝরতে লাগল।

প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন এক সময় সোল্লাসে বলে উঠলেন, 'চমৎকার! শুভ সংবাদ! আমরা পৃথিবীর দিকে নামছি না, এগিয়েই চলেছি। পৃথিবী ছেড়ে পঞ্চাশ হাজার লিগ উঠে এসেছি। আমাদের গোলাটার গতিবেগ যদি সেকেন্ডে বারো হাজার গজ হত তবে আমাদের নিশ্চয় নিথরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। আমরা সে স্থান অতিক্রম করে এসেছি।'

'অতএব মনে করা যাচ্ছে, চার লক্ষ পাউন্ড গান-কটনের শক্তি যে গতিবেগ সৃষ্টি করেছে তা সেকেন্ডে বারো হাজার গজের চেয়ে ঢের বেশি ছিল। তাই তো কামান দাগার মাত্র তেরো মিনিট বাদে উঠে এসে দ্বিতীয় উপগ্রহটাকে দেখতে পেয়েছিলাম।' নিকল বললেন।

'এরও কারণ রয়েছে। পার্টিসন ভেঙে জল বেরিয়ে গেলে প্রোজেকটাইল হাল্কা হয়ে যায়। সেজন্যই এমন তীব্র বেগে আকাশের দিকে উঠে গিয়েছিল।' বার্বিকেন বললেন, 'বাস্তবিকই আশার সঞ্চার ঘটাল।'

আহারাদি সেরে অভিযাত্রীরা দাবা, তাস আর ডেমিনোরের মধ্যে কিছু একটা খেলার কথা ভাবতে লাগলেন। আঁর্দার ইচ্ছা, চাঁদের বাসিন্দাদের এসব খেলাধুলা শিখিয়ে দেবেন। খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম পৃথিবী থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

বার্বিকেন হেসে বললেন, 'বন্ধু, চাঁদে যদি সত্যি সত্যি জীবের অস্তিত্ব থাকে তবে তারা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির বহু আগে থেকেই সেখানে রাজত্ব করছে। অতএব আমাদের কাছ থেকে তাদের কিছুই শেখার নেই। আমাদের বরং তাদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শেখার রয়েছে।'

মাইকেল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমাদের র‍্যাফেল ও মাইকেল এঞ্জেলোর মতো চিত্রশিল্পী আর মিলটন, হোমার, হুগো, ম্যাসারটিন ও ভার্জিলের মতো কবিও তাদের আছে কি ? কান্ট, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতো দার্শনিক? আর নিউটন, ইউক্লিড, আর্কিমিডিস ও প্যাসকলের মতো বৈজ্ঞানিক তাদের আছে কি ? শুধু কি এ-ই! অ্যারনল-এর মতো রস-সাহিত্যিক আর নাদার-এর সমতুল্য ফটোগ্রাফার তাদের আছে ?'

বার্বিকেন ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'আছে—আছে বন্ধু অবশ্যই আছে।'

মাইকেল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'যদি তাই হয় তবে তারা পৃথিবীতে প্রোজেকটাইল কেন পাঠায় নি ?'

'পাঠায় নি যে তা-ই বা কি করে বুঝলেন ?

'দুটো দিক থেকে চাঁদ থেকে গোলা পাঠানো সহজ। প্রথমেই বলতে হয় পৃথিবীর চাঁদে পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ আকর্ষণ। আর চাঁদ থেকে গোলা ছুঁড়তে যে শক্তি প্রয়োগ

www.pathagar.com

করতে হবে সে তুলনায় পৃথিবী থেকে তার দশগুণ শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে।' নিকল বললেন।

মাইকেল পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরতে গিয়ে বললেন, 'উত্তম! ইতিমধ্যে চাঁদ থেকে কেউ পৃথিবীতে না আসার কারণ কি?'

'আসে নি যে সে ব্যাপারে আপনি কি করে নিশ্চিত হচ্ছেন? পৃথিবীর বুকে মানুষের আবির্ভাবের বহু হাজার বছর আগে পাঠাতেও তো পারে?'

'তাই যদি মনে করি তবে প্রোজেকটাইলটা গেল কোথায়?'

'পৃথিবীর দু-ভাগের পাঁচ ভাগই তো জুড়ে রয়েছে সমুদ্র। চাঁদ থেকে যদি কোনোদিন পৃথিবীতে চন্দ্রযান পাঠানোই হয়ে থাকে তবে তা ভূ-পৃষ্ঠের তরল অবস্থার কোনো গহ্বরে বা সমুদ্রের বুকে পড়তেও তো পারে।'

'আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পারি চাঁদের মানুষ আর যা-ই করুক গান-পাউডার অবশ্যই আবিষ্কার করতে পারে নি।

তাঁদের আলোচনার ফাঁকে কুকুর ডায়না ডাকাডাকি জুড়ে দেওয়ায় প্রসঙ্গ অন্যদিকে মোড় নিল। মাইকেল আঁর্দা বললেন—চাঁদের বুকে গুরু, মোষ, ঘোড়া নাকি গাধা নিয়ে গেলে বেশি উপকারে আসত? তা নিয়ে এবার তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল।

ঠিক তখনই স্যাটেলাইট-এর করুণ আর্তনাদ শুনে সবাই সচকিত হয়ে উঠলেন। সবাই হুটোপাটা করে গিয়ে দেখেন, স্যাটেলাইট-এর মৃতদেহের পাশে বসে ডায়না বিলাপ করে চলেছে। স্যাটেলাইট মারা গেছে। এর ফলে চাঁদে কুকুর বংশ প্রতিষ্ঠার আশায় ছেদ পড়ল।

এখন স্যাটেলাই-এর মৃতদেহ ফেলা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। জানালার পাল্লা খুলে সেটা ফেলতে হলে দুটো ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। জানালা খুলতেই অতিরিক্ত পরিমাণে বাতাস গোলার ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে না যেতে পারে। আবার বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ভেতরে ঢুকে আসার সম্ভাবনাও রয়েছে। সূর্য আছে সত্য। কিন্তু তার পক্ষে তো আর বায়ুশূন্য মহাশূন্যকে উত্তপ্ত করা সম্ভব নয়। সূর্যের অস্তিত্ব না থাকলে পৃথিবীও জলে বরফে পরিণত হয়ে যেত।

মাইকেল বললেন, 'আঠারো শ' একষট্টিতে সেরকমই কিছু ঘটতে চলেছিল। তখন পৃথিবীকে একটা ধূমকেতুর পুচ্ছের ভেতর দিয়ে পাড়ি দিতে হয়। পৃথিবী ধূমকেতুর আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেই ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না ঠিক কিনা?'

প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন বললেন, 'মারাত্মক কিছু হত না। কারণ, তখন ঠাণ্ডা আর গরম সমপরিমাণ হয়ে যেত। সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে সূর্যের কাছাকাছি দিয়ে পাড়ি দেওয়ার সময় পৃথিবীর তাপমাত্রা যেত বেড়ে। গ্রীষ্মের তাপমাত্রার আটাশ হাজার গুণ বেড়ে যেত। উত্তাপ সমুদ্রে জলকে বাষ্পে পরিণত করে ওপরে তুলে আনত। জমাটবাঁধা মেঘের সৃষ্টি হয়ে সূর্যের উত্তাপকে বাধা দিত।'

আর মহাশূন্যের তাপমাত্রা সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কারো মতে শূন্য তাপাঙ্কের ছিয়াত্তর ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে এমন মতামতও কেউ ব্যক্ত করেন।

এবার একদিকের জানালা খুলে সঙ্গে সঙ্গে স্যাটেলাইট-এর মৃতদেহ গলিয়ে দেওয়া হল। পুরো ব্যাপারটা এমন ঝটপট সেরে নেওয়া হল যে, খুব সামান্য বাতাসই বেরিয়ে যেতে পারল।

www.pathagar.com

*   *   *

ডিসেম্বরের চার তারিখ। অভিযাত্রীরা হিসাব নিকাশ করে দেখলেন, তাঁরা ক্রমাগত চুয়ান্ন ঘন্টা উড়ে চলে সাত দশমাংশ পথ পাড়ি দিয়ে দিয়েছেন। জানালা দিয়ে পৃথিবীকে এখন আর ছোট্ট বা মেঘে ঢাকা ঝাপসা আলোর মতো দেখা যাচ্ছে না। গাঢ়, ঠিক যেন গাঢ় অন্ধকারে মোড়া একটা বৃত্তাকার বস্তু।

বার্বিকেন আচমকা অত্যাশ্চর্য একটা প্রশ্ন করলেন, 'প্রোজেকটাই প্রবল বেগে উড়ে যেতে যেতে হঠাৎ যদি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তবে?'

বার্বিকেন তার প্রশ্নের জবাব দিলেন, 'জ্বলে-পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যাব। কারণ, উত্তাপ গতির অন্য আর এক রূপ। জলে উত্তাপ প্রয়োগ করলে, জলের অণু-পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে পড়ে। মোদ্দা ব্যাপার, উত্তাপের অর্থই হচ্ছে পরমাণুর গতিশীলতা। নড়াচড়া-লাফালাফি। ট্রেনের ব্রেকের গায়ে তাই তো তৈলাক্ত পদার্থ মাখিয়ে দেওয়া থাকে। আচমকা বন্ধ হয়ে যাওয়া গতি থেকেই তো উত্তাপের সৃষ্টি। ঠিক তেমনি পৃথিবীটা সম আয়তনের ষোলো হাজার কয়লার পিণ্ড পোড়ালে যে পরিমাণ উত্তাপের উদ্ভব ঘটবে সূর্যের ওপর পৃথিবী গিয়ে পড়লে ঠিক সে পরিমাণ উত্তাপই এতে সৃষ্টি হবে। হ্যাঁ, যে-কোনো গতিকে আচমকা স্তব্ধ করে দেওয়া মাত্রই উত্তাপ সৃষ্টি হবে।

হিসাব নিকাশ করে জানা গেছে, সূর্যের ওপর উল্কার পতন ঘটলেও উত্তাপ ঠিকরে বেরিয়ে আসে। একটা উল্কা তার সম আয়তনের চার হাজার গুন কয়লা পোড়ানোর উত্তাপ সৃষ্টি করছে, মনে রাখবেন।'

মাইকেল আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন, 'চাঁদ যে আসলে একটা বৃহদায়তন ধূমকেতু ছাড়া কিছুই নয়, কথাটা বার্বিকেন কি মানেন?'

'হ্যাঁ, এ-কথাও শোনা যায় সত্য। আর্কেডিয়ানরা মনে করে, চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহে পরিণত হওয়ার আগে থেকে তাদের পূর্বপুরুষরা পৃথিবীতে বাস করছে। তখন থেকেই বিশ্বাস করছে চাঁদ একটা ধূমকেতু ছাড়া কিছু নয়। মহাশূন্যে ছোটার সময় পৃথিবীর আকর্ষণে আটকা পড়ে গেছে। অবশ্য এর কোনো প্রমাণ মেলে না। প্রত্যেক ধূমকেতু যেমন গ্যাসের আবরণে আবৃত থাকে চাঁদের সেরকম কিছু অনুপস্থিত।'

নিকল বললেন, 'এও তো অসম্ভব নয়, চাঁদ নামধারী ধূমকেতুটা পৃথিবীর আকর্ষণে বাঁধা পড়ার আগে সূর্যের একদম কাছাকাছি স্থান দিয়ে অতিক্রম করে এসেছিল। তখনই গ্যাসের আস্তরণটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।'

ঠিক তখনই মাইকেল-এর চিৎকার চেঁচামেচি কানে আসায় প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন ছুটে গিয়ে জানালা দিয়ে দেখলেন মাত্র গজ কয়েক দূরে চ্যাপ্টা একটা ঝোলার মতো কি যেন একটা জিনিস শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। সেটা যেন প্রোজেকটাইলের মতোই গতিশূন্য—নিশ্চল নিথর। অর্থাৎ জিনিসটা অদ্ভুত গতিবেগে চাঁদের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে।

অগ্রসরমান বস্তুটাকে নিয়ে তিনজনের মধ্যে জোর তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। এক সময় মাইকেল সেটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলে উঠল, 'ওটা গ্রহাণুপুঞ্জ বা উল্কা কোনোটাই নয়। ভাগ্যাহত স্যাটেলাইট-এর মৃতুদেহ প্রোজেকটাইলের আকর্ষণে এর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে। তার প্রাণহীন দেহটা চিপসে, দুমড়ে মুচড়ে এরকম আকৃতি ধারণ করেছে। বৃহদাকার কোনো বস্তু ক্ষুদ্রাকার কিছুকে আকর্ষণ করবে মহাশূন্যের এ-নিয়ম অনুযায়ী-ই কুকুরের মৃতদেহটাকে প্রোজেকটাইলের বাইরে ছুঁড়ে দেওয়া মাত্র তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

www.pathagar.com

*   *   *

ভোর হল। অর্থাৎ পাঁচই নভেম্বরের ভোর। হিসাব যদি মিলে যায় তবে সেদিনই রাত্রি বারোটায় চাঁদে হাজির হওয়ার কথা। জানালার কাঁচ দিয়ে নক্ষত্রে পরিপূর্ণ মহাকাশে শুভ্র সমুজ্জ্বল চাঁদটাকে ক্রমে বড় হয়ে আসতে দেখা গেল।

বার্বিকেনের মাথায় একটা ব্যাপার ঘুরপাক খেতে লাগল। হিসাব অনুযায়ী প্রোজেকটাইলের চাঁদের একেবারে কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু তা না করে সেটা সামান্য সরে গিয়ে উত্তরদিকে ধেয়ে চলল। গতিপথ পরিবর্তন করেছে। সেটা যদি চাঁদের একেবারে কাছাকাছি কোনো জায়গা দিয়ে অতিক্রম করে তবেই সর্বনাশের চূড়ান্ত। লক্ষ্যচ্যুত হওয়া মাত্রই তার মহাশূন্যের পথ হারিয়ে ফেলা ছাড়া কোনো গত্যন্তরই থাকবে না। বার্বিকেন কিছুতেই বুঝতে পারলেন না প্রোজেকটাইল কেন গতিপথ পরিবর্তন করেছে। তবে ব্যাপারটা নিজের মনেই রাখলেন। সঙ্গীদের কাছেও প্রকাশ করলেন না। আর একটু বাঁকলেই চাঁদকে পাশ কাটিয়ে সেটাকে আন্তর্গ্রহে হাজির হতে হবে।

প্রবল ঝড় উঠেছে চাঁদের বুকে। পাহাড় পর্বত, উপত্যকা আর খানাখন্দের জন্য চাঁদকে যে ঝাপসা মানুষের মুখের মতো দেখা যায় এখন তা অনেকটা পষ্কার হয়ে উঠেছে।

মাইকেল প্রাতরাশের আয়োজনে ব্যস্ত হলেন। এদিকে যন্ত্রপাতিগুলো যথাযথ কাজ করছে কিনা, একবারটি চোখ বুলিয়ে নেওয়া হল। রেনল্টস আর রেইসেট যন্ত্র, কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরমাণুগুলিকে পটাশ ঠিকভাবে শুষে নিচ্ছে।

অভিযাত্রীরা চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পেরে আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে যাবার জোগাড় হলেন। তাদের সবারই প্রায় একই বক্তব্য, চাঁদের বুকে অবশ্যই নামছেন। কিন্তু সেখান থেকে আর পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। বার্বিকেনের বক্তব্য—প্রোজেকটাইলটা তো সেখানে থেকে যাচ্ছে, একটা কামান ও গোলা বারুদ তৈরি করে নেবেন। চাঁদের বুকে সোরা, কয়লা অবশ্যই পাওয়া যাবে। অতএব এটা কোনো সমস্যাই নয়। কারণ চাঁদের থেকে আট হাজার লিগ মাত্র ওপরে উঠলেই পৃথিবী তাঁদের আকর্ষণ করে নেবে। তবে চাঁদের আকর্ষণে আসতে পৃথিবী থেকে তার দশগুণ পথ তাঁদের উঠে যেতে হয়েছে।

মাইকেল আচমকা সোল্লাসে বলে উঠলেন, 'অন্য আর একটা গোলায় চেপে গান-ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে ম্যাসটন ফ্লোরিডা থেকে চাঁদে চলে আসবেন।' আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে অভিযাত্রীরা এমন হরেক রকম মন্তব্য করতে লাগলেন কিন্তু কেন এ-উচ্ছ্বাস, এমন অন্তহীন উত্তেজনা ? তিনজনের কেউ-ই জানেন না কেন তাঁদের মধ্যে এমন অভাবনীয় উত্তেজনা ভর করেছে ?

নিকল দুম করে বার্বিকেনকে প্রশ্ন করে বসলেন, 'চাঁদ থেকে যদি আমরা না-ই ফিরি তবে সেখানে আমরা কি করব, বলুন ?'

বার্বিকেন স্পষ্ট জবাব দিলেন, 'আমি জানি না।'

মাইকেল বললেন, 'কিন্তু আমি জানি। তবে জানলেও আমি বলব না।'

বার্বিকেন সক্রোধে গর্জে উঠলেন, 'বলবেন না বললে রেহাই নেই। বলুন, বলতে হবে আপনাকে। আপনার কথায় বিশ্বাস করে আমরা এতবড় একটা ঝুঁকি মাথায় নিয়েছি। আর এখন কিনা আপনিই ধানাই-পানাই জুড়ে দিয়েছেন!'

www.pathagar.com

মাইকেল এবার বলে উঠলেন, 'চাঁদের বুকে নতুন একটা কলোনি গড়ে তুলব সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে পৃথিবীর শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটাব।'

কণ্ঠস্বরে রীতিমতো উষ্মা প্রকাশ করে নিকল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'চাঁদের বুকে যদি জীবের অস্তিত্ব না-ই থাকে তবে কাদের পৃথিবীর শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন, শুনি?'

বার্বিকেন ধমকের স্বরে বলে উঠলেন, 'চুপ করুন তো সাহেব! চাঁদের বুকে মানুষের অস্তিত্ব না-ই বা থাকল। সেখানে আমরাই সভ্যতা বিস্তার করব।'

মাইকেল বললেন, 'আমরা চাঁদের বুকে কংগ্রেস গড়ে তুলব। বার্বিকেনকে প্রেসিডেন্ট করব।'

সবাই সমস্বরে উল্লাস প্রকাশ করলেন। তারপর শুরু করলেন উদ্দাম নৃত্য। পরস্পরের কোমর ধরাধরি করে, হেলদুলে সে কী নাচ! কিছুক্ষণ যেন একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

তাঁরা কেন হটাৎ এমন পাগলের মতো আচরণে মেতে উঠলেন, এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মাইকেল।

বরাতের জোর আছে। সময় পেরোবার আগেই নিকলের মাথায় ব্যাপারটা এসে গিয়েছিল। তা না হলে কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত হয়ে যেত। ক্যাপ্টেন বেশ কিছুক্ষণ অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইলেন। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তিনি খিদের জ্বালায় ছটফট করতে লাগলেন। মাত্র কয়েক মিনিট আগেই তো গলা পর্যন্ত ঠেসে প্রাতঃরাশ সেরেছেন। তবে এরই মধ্যে খিদেয় এমন কাতর হয়ে পড়লেন কেন ? সে সঙ্গে মাথার স্নায়ুগুলোও দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে কারণ কী?

মাইকেলও খুবই ক্লান্ত অবসন্ন। অনন্যোপায় হয়ে তিনি নিজেই স্টোভ ধরিয়ে খাবার তৈরি করতে লাগলেন। দেশলাই জ্বেলেই তিনি থমকে গেলেন। তীব্র দ্যুতি নিয়ে কাঠিটা জ্বলে উঠল। গ্যাসের উনুনে যে শিখা উঠছে তাও অত্যুজ্জ্বল দ্যুতিময়। সঙ্গে সঙ্গে নিকল বুঝে নিলেন, কেন তাঁদের মধ্যে এমন আকস্মিক উম্মত্ততার জোয়ার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। খোঁজ করে দেখলেন, মাইকেল ভুল করে অক্সিজেনের সিলিন্ডারের মুখ পুরোপুরি খুলে দিয়েছিলেন। অক্সিজেনের অভাব আমাদের জীবন যেমন সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি মাত্রাতিরিক্ত অক্সিজেনও আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনে।

নিকল ব্যস্ত-হাতে সিলিন্ডারের চাবিটা ঘুরিয়ে গ্যাস নির্গমণের পথ বন্ধ করে দিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বার্বিকেন ও মাইকেল স্বাভাবিকতা ফিরে পেলেন। মাইকেল নিজের কাজের জন্য অনুতপ্ত না হয়ে বরং মুচকি হেসে বললেন, 'মন্দ কি, যাত্রাপথের একঘেয়েমি থেকে কিছুটা পরিবর্তন তো এতে এল। আরো যুক্তি আছে, মুমূর্ষু রোগীকে অক্সিজেন প্রয়োগ করে কায়েক ঘণ্টার জন্য হলেও তাকে জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদ দান করা সম্ভব। অক্সিজেনপূর্ণ নাট্যশালায় দর্শকদের প্রাণচাঞ্চল্যের কথা ভাবা যায়! যে জাতির জবিনীশক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে অক্সিজেন প্রয়োগের মধ্যেমে তাদের অনায়াসেই চাঙা করে তোলা সম্ভব। কেবলমাত্র অক্সিজেন প্রয়োগের মাধ্যমেই ইউরোপের রাষ্ট্রে হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

এবার প্রোজেকটাইলের এলোমেলো জিনিস কয়টা গোছগাছ করতে অভিযাত্রীরা নতুন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন। ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে আসার পর থেকেই

www.pathagar.com

প্রোজেকটাইলটার ওজন। ভেতরে জিনিসপত্রের ওজন এমন কি তাদের নিজেদের ওজনও ক্রমেই হ্রাস পেতে শুরু করেছে। তবে তুলাদণ্ডে ওজন হ্রাস পাওয়ার ব্যাপারটা ধরা পড়বে না। কারণ যা দিয়ে ওজন নির্ধরণ করা হবে তার ওজনও তো সে অনুপাতেই হ্রাস পাচ্ছে। তবে একমাত্র স্প্রিং ব্যালেন্সের মাধ্যমেই এ-পরিস্থিতিতে যথাযথ ওজন পাওয়া সম্ভব।

আকর্ষণকে অন্য এক নামে অভিহিত করা হয়—আমরা যাকে ওজন বলে থাকি। কোনো জিনিসের ঘনাঙ্ক বেড়ে গেলে আকর্ষণ বেড়ে যায়। আবার দুটো জিনিসের মধ্যে ব্যবধান বাড়লে আকর্ষণ কমে যায়। তাই মহাশূন্যে ধাবমান প্রোজেকটাইলকেও এক সময় ওজন একেবারে হারিয়ে ফেলতেই হবে। গ্রহ ও নক্ষত্ররাজির কিছু না কিছু আকর্ষণ তো আছেই। আর চাঁদের আকর্ষণ প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। সে জন্য প্রোজেকটাইল পৃথিবী আর চাঁদের মধ্যবর্তী কোনো এক স্থানে পৌঁছে গেলে তার ভেতরের দ্রব্য সামগ্রীর ওজন শূন্য হবেই হবে। পৃথিবী ও চাঁদের ঘনত্ব সমান হলে সে বিশেষ জায়গাটা হত উভয়ের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে। কিন্তু উভয়ের ঘনত্ব সমান না হওয়ার জন্য সে-জায়গাটার অবস্থান হবে পৃথিবী থেকে আটাত্তর হাজার পাঁচ শ' চৌদ্দ লগি দূরবর্তী স্থানে। এখানে কোনো কিছু হাজির হলে তাকে অনাদি অনন্তকাল ধরে নিশ্চল-নিথরভাবে ভেসে থাকতে হবে। কারণ, সেখানে যে পৃথিবী ও চাঁদ উভয়ের আকর্ষণই একেবারে সমান। যদি হিসাব নিকাশ ঠিক থাকে তবে প্রোজেকটাইল সেখানে হাজির হলে তাকে অবশ্যই তিনটি ব্যাপারের মুখোমুখি হতে হবে। প্রথমত—সামান্য গতিবেগ থাকলেও প্রোজেকটাইল উপরোক্ত বিপজ্জনক এলাকা অতিক্রম করে চাঁদের আকর্ষণের আওতায় হাজির হওয়ার জন্য সে চাঁদের দিকে নামতে থাকবে। দ্বিতীয়ত—নইলে এটা যদি সেখানে হাজির হওয়ার আগেই গতিবেগশূন্য হয়ে পড়ে তবে পৃথিবী তাঁকে নিজের কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষন করবে। তখন পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকবে। আর তৃতীয়ত—নইলে কোনোরকমে সেখানে হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি এটা গতিবেগ শূন্য হয়ে পড়ে তবে উভয়ের আকর্ষণের মাঝখানে পরে অনাদি অনন্তকাল ধরে শূন্যে ঝুলতে থাকবে।

বার্বিকেন পুরো প্রসঙ্গটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলে বেলা এগারোটার কাছাকাছি ওজন-শূন্যতার ভয়ঙ্করতার প্রমাণ হাতেনাতেই পাওয়া গেল। নিকলের হাত থেকে একটা গ্লাস পড়ে গিয়ে শূন্যে দিব্যি ভাসতে লাগল। ভোজবাজির খেল দেখে মাইকেল তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ার জোগাড় হলেন। এবার কৌতূহল বশত বোতল, বন্দুক ও অন্যান্য বস্তু শূন্যে রেখে দিয়ে তারা মজা দেখতে লাগলেন।

মাইকেল এবার ডায়নাকেও শূন্যে রেখে দিয়ে তামাশা দেখায় মেতে গেলেন। অভিযাত্রীরা বিজ্ঞানের অদ্ভুত এ কাণ্ডের ব্যাখ্যার ব্যাপারে মোটেই অজ্ঞ নন। সবকিছু সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁরা যেন অলৌকিক ব্যাপারটাকে চাক্ষুষ করে রীতিমতো থ বনে গেলেন। আকস্মিক ভয়-ভীতি যেন তাঁদের মধ্যে ভর করেছে। তাদের হাত-পায়ের কিছুমাত্র ওজনও আছে বলেও তাদের মনে হল না।

আনন্দে ডগমগ হয়ে তারা তিনজনই আচমকা লাফিয়ে সামান্য ওপরে উঠে দিব্যি শূন্যে ভাসতে লাগলেন। বিস্ময় বিস্ফোরিত চোখে মাইকেল বলে উঠলেন, 'অবিশ্বাস্য! রীতিমতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার!'

বার্বিকেন বললেন, 'নিউট্রাল জোন অতিক্রম করা মাত্রই চাঁদের আকর্ষণ কার্যকরী হতে আরম্ভ হয়ে যাবে। তখন আমরা আবার শূন্য থেকে মেঝেতে পড়ে যাব।'

www.pathagar.com

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ায় অভিযাত্রীরা নিজ নিজ ওজন ফিরে পেতে লাগলেন।

'একটা কথা, পৃথিবীতে আমাদের যে ওজন ছিল তার এক ষষ্ঠাংশ ওজন হবে চাঁদে।'

বার্বিকেন বললেন, 'হ্যাঁ, এতে তাঁদের দৈহিক কোনো পরিবর্তন হবে না। শক্তিও কমবে না। চাঁদের আয়তনের অনুপাত অনুযায়ী, বেঁটে। এক ফুট উচ্চতাও হতে পারে।'

মজাদার লোক আচমকা সোল্লাসে উঠলেন, 'কি মজা! লিলিপুট! তবে আমি সেখানে গ্যালিভার সেজে অভিনয় করব। পৃথিবী ছেড়ে গ্রহান্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো যে কী মজা একবারটি ভেবে দেখুন তো!'

'গ্যালিভার ? গ্যালিভার সাজার এতই যদি শখ তবে মঙ্গল, বুধ বা শুক্র গৃহে গেলেই তো পারেন। আর শনি, বৃহস্পতি, নেপচুন আর ইউরেনাস গ্রহে গেলে কিন্তু ফল হবে বিপরীত। সেখানে আপনাকে লিলিপুটের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। জানেন ?'

'ধ্যুৎ! সে সব গ্রহে থোড়াই যাব। যেতেই যদি হয় তবে সূর্যেই যাব।'

'সূর্যে ? সেখানে গেলে পৃথিবীর সাতগুণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনুভব করবেন। সূর্যের অধিবাসীরা সে অনুপাতে কম করেও দু-শ' ফুট লম্বা তো হবেই।' বার্বিকেন বলে চললেন, 'পৃথিবীতে যার ওজন এক শ' চল্লিশ পাউন্ড, সূর্যে তিন শ' ষাট পাউন্ড হবে তার ওজন। আর আপনার ওজন হবে পাঁচ হাজার পাউন্ড। বলেন কী এমন বিশাল ওজনের বপু নিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে খাড়াই তো হতে পারবেন না!'

'আরে ব্বাস! তবে তো সঙ্গে একটা কপিকল নিয়ে যেতে হবে। এ যে ভাবতে গেলেও মাথা ঝিম ঝিম করে।' মাইকেল আঁর্দা চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠলেন।

* * *

এতক্ষণ বার্বিকেন নিশ্চিন্ত হতে পারলেন। প্রোজেকটাইল ইতিমধ্যেই বিপজ্জনক অঞ্চল অতিক্রম করে চাঁদের সীমানায় হাজির হয়ে গেছে। পৃথিবীর আকর্ষণে ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। আবার শূন্যেও ঝুলে থাকার ভয় নেই। এ মুহূর্তে চিন্তা একটাই। প্রোজেকটাইল চাঁদের কোনো অঞ্চলে নামবে। পৃথিবীর তুলনায় এক ষষ্ঠাংশ সেখানে ওজন হতে পারে। কিন্তু আট হাজার দু-শ, ছিয়ানব্বই লিগ ওপর থেকে ধপাস করে পড়া যে ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার। এ ভয়ঙ্করতাকে ঠেকাতে হলে দুটো উপায় অবলম্বন করতে হবে। পতনের গতিবেগকে কমাতে হবে এবং আছাড় খেয়ে পড়া পরিস্থিতিটাকে সামাল দিতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন এবার আছড়ে পড়লে কীভাবে সামাল দেবেন তারই ব্যবস্থা করতে মেতে গেলেন।

প্রোজেকটাইল চাঁদের এলাকায় হাজির হয়েই উল্টে গিয়ে বিপরীতমুখী হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সরু মুখটা নিচে পৃথিবীর দিকে আর নিচের দিককার ভারি অংশটা উঠে গেছে সোজা ওপরের দিকে, অর্থাৎ চাঁদের বরাবর। স্টিলের প্লাগের ওপর কাঠের পার্টিশনগুলো আটকে দেওয়া হল। সে সঙ্গে চাকতিটাকে স্ক্রু দিয়ে এঁটে দেওয়া হল। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে স্টিল প্লাগটা যেন পায়ার ওপর একটা টেবিল দাঁড়িয়ে। ধাক্কা লাগলে প্রথম চোটটা লাগবে স্টিলের পায়ার ওপরেই। আছাড় খেয়ে পড়ার বাকি ঝাঁকুনিটুকু চাকতি আর কাঠের পার্টিশন সামলে দেবে।

www.pathagar.com

চাঁদটাকে এবার স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। নিচে পড়ার গতিবেগ স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে। চাঁদের দিকে লম্বভাবে না পড়ে চন্দ্রপৃষ্ঠের সমান্তরাল রেখায় মহাকাশযানটা তীব্র বেগে অগ্রসর হচ্ছে। ব্যাপার দেখে অভিযাত্রীরা ঘাবড়ে গেলেন। এমন পতনের কথা যে ভাবাই যায় না।

নিকলের মধ্যে প্রশ্ন জাগল, 'চাঁদে পৌঁছনো যাবে তো?'

চাঁদে পৌঁছতে পারবেন ধরে নিয়েই তিনি প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

ছোট ছোট ইস্পাতের কামানের ভেতরে অতিকায় রকেটগুলোকে রাখা আছে। তলদেশে প্রত্যেকটা কামানের আঠারো ইঞ্চি মতো বের করা রয়েছে। বৃত্তাকারে এরকম কুড়িটা কামান সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পিছন দিককার ধাতব চাকতি খুলে পলতের গায়ে অগ্নি সংযোগ করা মাত্র চাকতি বন্ধ করে দিলেই চাঁদের দিকে দারুণ বেগে হাউইগুলো জ্বলে উঠবে। ব্যস, এতে পতনের বেগকে থামিয়ে দেবে।

বার্বিকেনের মধ্যে নতুন চিন্তা এসে ভরে করল। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রোজেকটাইলের ওপর কোনো ক্রিয়া করছে না দেখেই তাঁর মধ্যে আকস্মিক চিন্তার উদয় হল। তাঁর মধ্যে তিনটি বিজ্ঞানসম্মত আশঙ্কা আগে থাকতেই ছিল—নিউট্রাল জোনে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকা, চাঁদের দিকে নেমে যাওয়া, আর তা যদি না-ই হয় তবে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাওয়া। এরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার হিম্মৎ কেবলমাত্র এ তিনজন দৃঢ়চেতা অকুতো-ভয় অভিযাত্রীদেরই রয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে আন্তঃগ্রহ পরিভ্রমণ। এর চেয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার মোকাবেলা করার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কি-ই বা থাকতে পারে?

এ-ব্যাপারটা নিয়ে এবার তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হতে লাগল। 'আমরা তবে চাঁদের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে সরে গিয়েছি, তাই না? কিন্তু কেন?'—মাইকেল বললেন।

তার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নিকল চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বললেন, 'হয়তো বা কলম্বিয়াড কামানের নল যথাযথভাবে তাগ করা হয়ে ওঠে নি।'

'না, এটা ঠিক কারণ নয়। কামান ঠিকই চাঁদকে তাগ করা হয়েছিল। কারণটা রয়েছে অন্য জায়গায়।' বার্বিকেন তাদের কথার মাঝখানে বলে উঠলেন।

প্রোজেকটাইল কাৎ হয়ে ধেয়ে যাওয়ার জন্য তার মধ্যে চাঁদের বুকে খাড়াভাবে আছাড় খেয়ে পড়ার কোনো ভাবই পরিলক্ষিত হল না।

তিন অভিযাত্রী রাত্রি আটটা অবধি জানালার ধারেই অবস্থান করলেন। গোলার ভেতরে আলোর বন্যা বয়ে চলেছে। একদিকে সূর্য আর অন্যদিকে চাঁদ। বার্বিকেন অঙ্ক কষে বের করলেন। তখন তাঁরা চাঁদ থেকে মাত্র সাত হাজার লিগ ওপরে অবস্থান করছেন। প্রোজেকটাইল প্রতি সেকেন্ডে প্রায় দু-শ' গজ বেগে ধেয়ে চলেছে। এর ওপর কেন্দ্রগিত আর কেন্দ্রাভিগ দু-দুটো গতি ক্রিয়া করে চলেছে। এর গতিপথ যে-কোনো সময় পরিবর্তিত হয়ে আর সোজাসুজি না থেকে আঁকাবাঁকা হয়ে যেতে পারে। শেষপর্যন্ত পরিণতি যে কি হবে বলা মুশকিল। ছুটন্ত গোলাটা চাঁদের দিকের পরিবর্তে মহাশূন্যের দিকে ধেয়ে গিয়ে হারিয়ে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা ভাবনা করেও বার্বিকেন সমস্যা থেকে উত্তোরণের কোনো উপায়ই মাথা থেকে বের করতে পারলেন না। চাঁদের কাছাকাছি চলে গিয়েও চাঁদে ঢুকছে না। কোনোদিনই সম্ভব হবে না। আকর্ষণ আর বিকর্ষণের চক্করে পড়ে তার গতিপথ বাঁক নিয়ে নিয়েছে।

www.pathagar.com

বার্বিকেন ফ্যাকাসে মুখে ভাবনায় ডুবে থেকে এক সময় বলে উঠলেন, 'বুঝেছি, ওই যে গ্রহাণুটা, ওটাই প্রোজেকটাইলের গতিপথকে বাঁকিয়ে অন্য পথে চালান দিয়ে দিয়েছে। সেটা আমাদের গোলাটার আয়তনের তুলনায় ঢের, ঢের বড় ছিল। তার টানে এটা গতিপথ বদলে ফেলবে, অবাক হবার কি আছে ?' তার টান সামান্য হলেও সামান্যতম সরে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে চুরাশি হাজার লিগ পথ অতিক্রম করার পর চাঁদকে পাশে ফেলে মহাশূন্যে বে-পাত্তা হয়ে যাওয়া। নিকল, এজন্যই আমাদের পক্ষে চাঁদে পৌঁছনো সম্ভব হচ্ছে না।'

* * *

হ্যাঁ, বার্বিকেনের কথাই ঠিক। চলন্ত উল্কাটাই প্রোজেকটাইলকে তার গতিপথ থেকে সামান্য সরিয়ে দিয়েছিল। তাই চাঁদে নামা সম্ভব হচ্ছে না। চাঁদে না গেলেও তার গাঁ-ঘেঁষে অতিক্রম করলেও তো চাঁদের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলো চাক্ষুষ করা যেত।

অভিযাত্রীরা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেন নি, তাঁদের বরাতে অত্যাশ্চর্য এক ব্যাপার অপেক্ষা করছে। মহাশূন্যে হারিয়ে যাওয়ার পর চরমতম দুরবস্থার মুখোমুখি হতে হবে। বাতাস, জল আর খাবার দাবার নিঃশেষ হয়ে যাবে। অনাহারে, নিদারুণ তৃষ্ণা নিয়ে বাতাসের অভাবে দম বন্ধ হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর শিকার হতে হবে।

দু-শ' লিগ ওপর থেকে চাঁদকে পরিষ্কার নজরে আনা সম্ভব হল না। কিন্তু পৃথিবীর বুক থেকে লঙ পিকের দূরবীক্ষন যন্ত্র চোখে লাগালে মনে হয় চাঁদে বুঝি মাত্র দু-লিগ দূরে এসে গেছে।

মাইকেল লক্ষ্য করল, প্রোজেকটাইল চাঁদের দিকে তির্যকভাবে ধেয়ে চলেছে। ফলে তাঁর ধারণা জন্মাল, চাঁদের বুকে নামতে পারবেনই।

বার্বিকেনের প্রতিটা যুক্তি বার বার তাঁর আমাকে খান খান করে দিচ্ছে। তাঁর বক্তব্য—গোলাটাকে কেন্দ্রাভিগ শক্তিকেন্দ্র চাঁদ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ফলে চাঁদ থেকে দূরে সরে যেতে হবেই।

বার্বিকেন এবার চাঁদের নক্সাটা খুলে চোখের সামনে ধরলেন। মধ্যরাত্রি। চলন্ত উল্কাটা ঝামেলা না বাঁধালে এখন প্রোজেকটাইলের চন্দ্রপৃষ্ঠে নামার কথা ছিল। কিন্তু এখন সে আশা স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়। তাই তাঁরা হতাশাজর্জরিত চোখে চাঁদকে দেখতে লাগলেন। ভূ-গোলার্ধের তেরো ভাগের এক ভাগ চন্দ্র-গোলার্ধ। তবু জ্যোতির্বিদরা এ সামান্য জায়গাটুকুতেই পনের হাজার জ্বালা-মুখ বের করেছেন।

বার্বিকেন হিসাব কষে দেখলেন, প্রোজেকটাইল চন্দ্রপৃষ্ঠের সাত শ' পঞ্চাশ মাইল ওপর দিয়ে উত্তর গোলার্ধের দিকে ধেয়ে চলেছে। দূরবীক্ষণের নল চোখে লাগিয়ে এমন কিছু দৃশ্য চাক্ষুষ করা গেল যা ইতিপূর্বে পর্যবেক্ষকদের চোখে মোটেই ধরা পড়ে নি।

অভিযাত্রীরা মিলার অ্যাক বোর-এর 'ম্যাপা সেলেনোগ্রাফিকা' নক্সাটা সামনে মেলে ধরে চোখে দূরবীন লাগালেন। এবার তাঁদের পক্ষে চন্দ্রপৃষ্ঠের অনেক কিছু সনাক্ত করা সম্ভব হল। দেখলেন মেঘ-সমুদ্র। আসলে সেটা সত্যি বালির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র কিনা এত দূর থেকে সনাক্ত করে উঠতে পারলেন না। বিজ্ঞানী রু-র মতে মেঘ-সমুদ্র আসলে গভীর জঙ্গল। তবে তিনি মন্তব্য করেছেন, চাঁদে খুবই ঘন একটা বায়ুমণ্ডল অবস্থান করছে। প্রমাণ নেওয়া যাক কোনোটা প্রকৃত ব্যাপার। মহাকাশবিজ্ঞানীদের মতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলটা নাকি লাভার স্তর। ডানদিকে অবস্থিত আগ্নেয়গিরিই নাকি ওই লাভার উৎস। মুহূর্তকাল

www.pathagar.com

পরে নজরে পড়ল মেঘ-সমুদ্রের উত্তরে সুউচ্চ একটা পাহাড় মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। অত্যুজ্জ্বল সূর্যরশ্মির ছোঁয়া পেয়ে সেটা অবর্ণনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এর নাম কোপারনিকাস পাহাড়। উচ্চতা দশ হাজার ছয় শ' ত্রিশ ফুট। এটাকে পৃথিবী থেকে দেখা যায়। রাত্রি একটায় প্রোজেকটাইল পাহাড়টার ঠিক মাথার ওপরে উঠে গেল। প্রায় বাইশ লিগ বৃত্তাকার প্রান্তর ছাই রঙ বিশিষ্ট। কিছু সংখ্যক আগ্নেয় শিলা বৃত্তাকার প্রান্তরটায় বহুমূল্য মণিমুক্তোর মতো ঝলমল করছে। দক্ষিণ দিকে পাহাড় বা উঁচু টিলা কিছুই নেই। উত্তরদিকে তার ঠিক বিপরীত দৃশ্য। অনেকটা ঢেউ খেলানো বন্ধুর প্রান্তরের মতো। সবকিছু ডিঙিয়ে আলোকরশ্মি কোপারনিকাসে এসে জড়ো হয়েছে।

বার্বিকেন ওই রশ্মির উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করলেন, 'হার্সেল বলেছেন, রশ্মিরেখাগুলো নাকি ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধা লাভার স্তর। সূর্যের কিরণ পড়ায় এমন চকচক করছে।'

রাত্রি দেড়টার কাছাকাছি অভিযাত্রীদের চোখের সামনে আর একটা পাহাড় ভেসে উঠল। বার্বিকেন নক্সার এক জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললেন—এর নাম 'ইরাটোসথেন্স'। নয় হাজার ফুট উঁচু। প্রখ্যাত গণিতবিদ কেপলারের মতে এরকম জ্বালামুখ নাকি মানুষ তৈরি করেছে। ক্রমান্বয়ে পনের দিন ধরে সূর্যের তেজের প্রকোপ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য চাঁদের মানুষরা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে এরকমটা তৈরি করেছে।

নিকল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'কেপলার-এর ধারণা ভ্রান্ত। খর্বাকৃতি চাঁদের মানুষের পক্ষে এমন বিশালায়তন একটা গর্ত খোঁড়া কি করে সম্ভব হতে পারে, বলুন ? চাঁদের ওপরের ওজন পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ হলেও তো সেখানকার মানুষগুলোও ছয়গুণ খর্বাকৃতি।'

রাত্রি দুটো বার্বিকেন লক্ষ্য করলেন, প্রোজেকটাইল চাঁদের ছয় শ' মাইল ওপরে হাজির হয়েছে। আর তার এগিয়ে চলা অব্যাহতই রয়েছে।

* * *

ঘড়িতে তখন রাত্রি আড়াইটা। এখন চাঁদের পাঁচ শ' মাইল ওপর দিয়ে সমাক্ষ রেখা বরাবর প্রোজেকটাইল ধেয়ে চলেছে। এর গতিবেগ কমছেও না, বাড়ছেও না দেখে বার্বিকেন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। পাঁচ শ' মাইল দূরবর্তী অঞ্চল থেকেই গোলার গতিবেগ বেড়ে যাওয়ার কথা। অভিযাত্রীরা চাঁদের প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তিত দৃশ্য দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন। চাঁদের বুকে হাজারো রঙের মেলা। চাঁদের গায়ে লাঙলের আঁচড়ের মতো দাগ দেখে নিকল সচকিত হলেন।

বার্বিকেন ব্যাপারটা খোলসা করে দিতে গিয়ে বললেন, ওগুলো আসলে চাঁদের গায়ের ফাটল। প্রত্যেকটা ফাটলের দৈর্ঘ্য চারশ' থেকে পাঁচ শ' লিগ। আর প্রস্থ এক হাজার থেকে দেড় হাজার গজ। ব্যস, তাঁর জ্ঞান এ-পর্যন্তই। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ফাটলগুলোকে দুর্গের প্রাচীরের মতো দেখাচ্ছে। এক সময় এদের নিয়ে মহাকাশবিজ্ঞানীরা অনেক রকম কল্পনার জাল বুনেছেন।

সতের শ' উননব্বই খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী স্ক্রোটার গণনা করে মোট সত্তরটা ফাটরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন নি। সেগুলো দুর্গ বা নদী-খাত কোনোটাই নয়।

www.pathagar.com

এখন চাঁদের দূরত্ব মাত্র চার শ' মাইল। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে সেটা মাত্র চার মাইল দূরে মনে হচ্ছে। এক হাজার পাঁচ শ' কুড়ি মাইল নিচে মাউন্ট হ্যালিক্যানকে দেখা যাচ্ছে।

চাঁদে প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কিনা প্রসঙ্গটার সমাধান করতে গিয়ে বার্বিকেন এবার দ্বন্দ্বে পড়লেন। কিন্তু এতক্ষণ পাহাড় আর বিস্তীর্ণ প্রান্তরই কেবল দেখেছেন। প্রাণীর অস্তিত্বের চিহ্নমাত্রও তো চোখে পড়ে নি। মানুষ, জন্তু জানোয়ার এমন কি গাছ-গাছালিরও চিহ্ন নজরে পড়ে নি। পৃথিবীতে রয়েছে খনির রাজ্য, জলের রাজ্য আর জীবের রাজ্য। কিন্তু চাঁদে রয়েছে কেবলমাত্র খনির রাজ্য—খনিজ পদার্থের একাধিপত্য।

হঠাৎ তীব্র ঠাণ্ডায় অভিযাত্রীরা জমে যাবার জোগাড় হলেন। জানালার কাচে বরফ থাকতে দেখা গেল। থার্মোমিটারের পারা শূন্য তাপাঙ্কের সতের ডিগ্রি নিচে নেমে গেছে। বার্বিকেন উপায়ান্তর না দেখে কামরাটা গরম করার জন্য গ্যাস খরচ করে আগুন জ্বালাতে বাধ্য হলেন। তা না হলে মৃত্যুর সম্ভাবনা সুনিশ্চিত।

নিকল বাইরের তাপাঙ্ক সম্বন্ধে উৎসাহী হলেন। এত ঠাণ্ডায় সাধারণ থার্মোমিটারে পারদ জমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় বার্বিকেন স্পিরিট থার্মোমিটার ব্যবহার করলেন। এখন সমস্যা হচ্ছে, বাইরে হাত বাড়িয়ে তাপাঙ্ক মাপতে গেলে হাতের রক্ত-মাংস জমে যাওয়ার আশঙ্কায় সুতো বেঁধে থার্মোমিটারটাকে বার্বিকেন জানালা ফাঁক করে বাইরে ঝুলিয়ে দিলেন। আধ ঘণ্টা পরে থার্মোমিটারটাকে টেনে নিয়ে দেখা গেল, স্পিরিট শূন্য ডিগ্রির চেয়েও এক শ' চল্লিশ ডিগ্রি নিচে নেমে গেছে।

দেখা গেল, ফোরিয়ার-এর হিসাব সঠিক নয়, পাইলেট-ই ঠিককথা বলেছেন। কেবলমাত্র মহাকাশ জুড়েই প্রবল শৈত্য বিরাজ করছে না, সূর্যের তেজহীন চাঁদের অন্ধকার রাজ্যেরও একই হাল।

সেদিনটা ছিল পৃথিবীর হিসাব অনুযায়ী ছয়-ই ডিসেম্বর। চলন্ত যান প্রোজেকটাইল এর ওপর অভিযাত্রীদের এখন আর কোনো আধিপত্যই নেই। যানটার গতিমুখ পরিবর্তন করা বা গতি কমানো-বাড়ানো কোনোকিছুরই ক্ষমতা তাঁদের নেই। তবুও বার্বিকেন আর নিকল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে ধারণা করার জন্য অঙ্ক কষতে মেতে রইলেন।

এক সময় মাইকেল বললেন, 'বোধ হয় আমাদের যানটা একসময় চাঁদের বুকে আছাড় খেয়ে পড়বে।'

তাঁকে পুরোপুরি সমর্থন করতে না পেরে বার্বিকেন মন্তব্য করলেন, 'একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। পৃথিবীর বুকে যত উল্কাপাত হয় তার চেয়ে ঢের, ঢের বেশি উল্কা বায়ুমণ্ডলে জ্বলতে জ্বলতে মাইল চল্লিশেক ওপর দিয়ে ছুটে মহাশূন্যে হারিয়ে যায়। আমাদের গোলাটারও যে সে হাল হবে না তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?'

অঙ্ক কষে কষে বার্বিকেন দুটো পথের হদিস পেলেন। অধিবৃত্ত, না হয় পরাবৃত্তের দিকে চন্দ্রযানটা ধেয়ে যাবে।

বার্বিকেন এবার মুখ খুললেন, 'প্রোজেকটাইল যে-পথ অবলম্বনই করুক না কেন, আমাদের পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়, চাঁদের বুকেও নামা যাবে না।'

সকাল পাঁচটায় অদ্ভুত একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। চাঁদের দিকে প্রোজেকটাইলের তলদেশ বেঁকে গেছে। চাঁদে পড়ছে না। লাল একটা বিন্দু দেখে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। অগ্রসরমান অত্যুজ্জ্বল লাল আলো নজরে পড়ল। আর চন্দ্রযানটা বৃত্তাকারে ছুটে চলেছে। সে জন্য লাল আলোটার তির্যক রেখা ক্রমে অগ্রসর হয়েছে, কাছে এসে পড়েছে।

www.pathagar.com

নিকল আচমকা 'আগ্নেয়গিরি! আগ্নেয়গিরি' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। চাঁদের বুকেও তবে আগুন জ্বলছে! চাঁদ তবে এখনো মরে যায় নি।

'বাতাস। হ্যাঁ, তবে চাঁদে বাতাসের অস্তিত্বও নির্ঘাৎ রয়েছে। বাতাস না থাকলে আগুন জ্বলা তো সম্ভব নয়।' মাইকেল বললেন।

বার্বিকেন তাঁদের উৎসাহে জল ছিটিয়ে দিলেন, 'আগ্নেয়গিরির আগুনের জন্য আলাদা অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। সে আগুন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেই অক্সিজেন তৈরি করে নেয়। তাই চাঁদের বুকে বাতাস আছেই এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়।'

বার্বিকেন সহ-অভিযাত্রীদের ভুল ভাঙিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, 'ওটা কিন্তু চাঁদ নয়, উল্কা। মহাশূন্যে জ্বলন্ত একটা উল্কাপিণ্ড।'

জমাটবাঁধা অন্ধকারে, প্রায় দুশো গজই হবে। সেকেন্ডে দেড় মাইল বেগে ধেয়ে আসছে। ক্রমেই সেটার আকার বড় হয়ে উঠতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রোজেকটাইলের সঙ্গে সেটার ধাক্কা লাগার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

নির্ভিক অভিযাত্রীরাও আতঙ্কে কুঁকড়ে যাওয়ার জোগার হলেন। জ্বলন্ত আগুনের গোলাটা কাছে, আরো কাছে এগিয়ে আসছে। ধেয়ে আসছে তাঁদের চন্দ্রযানটার দিকে। তাঁরা অসহায়। চন্দ্রযানটার গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়া তাঁদের সাধ্যাতীত। মাইকেল ও নিকল ব্যাপার দেখে মূর্চ্ছা যাবার জোগাড় হলেন। বার্বিকেন তাঁদের জাপ্টে ধরে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনজনেরই একই আশঙ্কা, আগুনে জ্বলে পুড়েই তাঁদের খাঁক হতে হবে। চন্দ্রাভিযানের শখ এখানেই মিটে যাবে।

দুটো শতকের মতো দুমিনিট কোনোক্রমে কাটল। এবার অত্যুজ্জ্বল সাদা গোলাটা প্রোজেকটাইল-এ উপর আছড়ে পড়ল বলে। হঠাৎ অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটে গেল। সাদা গোলাটা বিস্ফারিত হল। কোনো আওয়াজ হল না। বাতাসের অভাবে শব্দ শোনা যায় না। কেবলমাত্র অতিকায় গোলাটা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। হাজার হাজার আলোর টুকরো অন্ধকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। না, সবই সাদা নয়— লাল, নীল, হলুদ ও ছাই রঙের অত্যুজ্জ্বল টুকরোতে চারদিক ছেয়ে ফেলল।

কয়েকটা আগুনের টুকরো সবেগে ধেয়ে এসে প্রোজেকটাইলের ওপর পড়ল। প্রবল ধাক্কায় জানালার একটা কাচে চিঁ ধরল।

অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় চাঁদটা আমাদের চোখের সামনে অদ্ভুতরূপ নিয়ে ফুটে উঠল। মাইকেল আনন্দ-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওই—ওই যে অদৃশ্য চাঁদ দৃশ্য হয়ে উঠেছে!'

অত্যুজ্জ্বল সে-দ্যূতিটা মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়েছিল। এরই মধ্যে অভিযাত্রীর চাঁদের রহস্যাবৃত বিপরীত দিকটাকে দেখে জীবন সার্থক করে নিতে পারলেন। পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে আজ পর্যন্ত কেউ চাঁদের এ-অঞ্চলটা দেখার সুযোগ পায় নি। মেঘমালা, পাহাড়-পর্বত, জ্বালামুখ আর হাজারো প্রাকৃতিক বিস্ময়। সমুদ্র—হ্যাঁ, বহুদূর বিস্তৃত সমুদ্রপৃষ্ঠে শুরু হয়েছে চোখ ধাঁধানো আলোর ভোজবাজির খেল। সবার শেষে চোখের সামনে ফুটে উঠল কুচকুচে কালো মহাদেশ আর গভীর বনানী যা অত্যুজ্জ্বল আলোর দ্যুতিতে মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে ভেসে উঠল।

www.pathagar.com

কি দেখলাম? নিমেষের মধ্যে যা কিছু দেখলাম তা কি বাস্তব, নাকি সবই মরিচিকার মায়া? চোখের ধাঁধা? এত কিছু দেখার পর চাঁদে মানুষের উপস্থিতির ব্যাপারটা যে সত্য নয়, কল্পনামাত্র—এরকম কথা এখন আর অভিযাত্রী তিনজনের পক্ষে জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়।

তীব্র সে আলোরদ্যুতি ক্রমে স্তিমিত হতে হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর ইথার জুড়ে জমাটবাঁধা অন্ধকার নেমে এল। চন্দ্রপৃষ্ঠ আবার অন্ধকারে ডুব দিল। অন্ধকার! যেদিকে তাকানো যায় কেবল নিঃসীম অন্ধকার আর অন্ধকার।

* * *

বরাতের জোর আছে বটে। মারাত্মক রকমের এক বিপদের কবল থেকে প্রোজেকটাইলটা অব্যাহতি পেয়ে গেল। বিপদটা অভাবনীয় হলেও মহাকাশে এরকম ঘটনা মোটেই বিরল নয়। জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে ধাক্কা লাগার ব্যাপারস্যাপার অভিযাত্রীদের মাথায়ই আসে নি। মহাকাশযাত্রীদের সবচেয়ে বড় শত্রু হতচ্ছাড়া উল্কাগুলো একবার কোনোক্রমে ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে নিমেষে ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে। এর জন্য অভিযাত্রীদের কিন্তু তিলমাত্র আক্ষেপ নেই। আচমকা মহাকাশ অত্যুজ্জ্বল আলো দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল বলেই না চাঁদের বিপরীত পৃষ্ঠের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে চোখ ও মনকে সার্থক করে তুলতে পেরেছেন।

একটা রহস্য এখনো অন্ধকারের অতল গহ্বরেই রয়ে গেল। মহাদেশ, সমুদ্র আর বন জঙ্গল যদি থাকে তবে চাঁদে বাতাসের অস্তিত্ব আছে কি? সাড়ে তিনটায় এব্যাপারটা ঘটল।

বিকালে মাংস-রুটি চিবোতে চিবোতে নিকল কতগুলো কাঁপাকাঁপা আলোকবিন্দু দেখতে পেলেন, উল্কা নয়, আগ্নেয়গিরির আলোও নয় এগুলো। সূর্য। হ্যাঁ, সূর্যের অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় চাঁদের দক্ষিণ দিকটা ঝলমলিয়ে উঠেছে।

অভিযাত্রীদের মন থেকে অধিবৃত্ত ও পরাবৃত্তের ভয়-ভীতি কেটে গেছে। তাঁরা এবার উত্তর মেরু অতিক্রম করে দক্ষিণ মেরুতে উপস্থিত হয়েছে। তাঁরা এখন উপবৃত্তাকার পথে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে চলেছেন। প্রোজেকটাইল এখন চাঁদের উপগ্রহের ভূমিকা পালন করছে।

সকাল দুটা। প্রোজেকটাইল দক্ষিণ মেরুর চল্লিশ মাইল ওপর দিয়ে ধেয়ে গেল। পথ এখনো উপবৃত্তাকারই আছে। উত্তর মেরু থেকেও প্রোজেকটাইল চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থান করছে।

আবারও চোখের সামনে সূর্য ভেসে উঠল, আলো উত্তাপ উভয়ই প্রচণ্ড। প্রোজেকটাইলের কামরা ক্রমে উষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। গ্যাসের আগুন নিভিয়ে দেওয়া হল।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চাঁদের দক্ষিণাঞ্চল স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। চাঁদটা যেন চার শ' পঞ্চাশ মাইল কাছে এগিয়ে এসেছে।

সূর্যের আলোয় লিবনিজ পাহাড় তার ডোরফেল পাহাড় ঝলমল করতে লাগল, আলো এতই উজ্জ্বল যে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে। দক্ষিণ মেরুর এই অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা নিয়ে পৃথিবীর মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা কত মতবিরোধ, তর্ক-বিতর্কেই না লিপ্ত

www.pathagar.com

হয়েছেন। এখন বার্বিকেন কিন্তু ওই শুভ্র সমুজ্জ্বল আলোকচ্ছটাটাকে সনাক্ত করতে পারলেন। বরফ। বরফের ওপর সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হয়ে চোখে এসে লাগছে।

বরফ। হ্যাঁ, বরফ যখন আছে তখন চাঁদে জলও আছে। জল থাকলে বাতাসও অবশ্যই আছে। খুব সামান্য থাকলেও আছে, থাকতেই হবে। বাতাস যে আছে এটাকে অলীক কল্পনা বলে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

পায়ের তলায় বিস্তীর্ণ ফাঁকা প্রান্তর। গাছ গাছালি, পাহাড়-পর্বত-টিলা, বাড়ি বা প্রাণীর অস্তিত্ব কিছুই নেই। মৃত্যুর চিহ্ন চারিদিকে বিরাজ করছে। উপগ্রহটার মৃত্যু হয়েছে। চাঁদের মৃতদেহ এটা।

প্রোজেকটাইল দীর্ঘপথ পাড়ি দিলে একুশ হাজার তিন শ' ফুট উঁচু নিউটন পাহাড় চোখের সামনে ফুটে উঠল। তার জ্বালামুখটা যেন একেবারে পাতালে গিয়ে ঠেকেছে। সূর্যের আলোর সেখানে প্রবেশাধিকার নেই।

এবার ক্লেভিয়াস পর্বতের সুবিশাল জ্বালামুখ দেখা গেল। মৃত আগ্নেয়গিরি। এক সময় কী বিপুল পরিমাণ লাভা উদ্গিরন করত। বিশালায়তন ওই জ্বালামুখ দিয়ে, তা কল্পনাও করা যায় না।

চাঁদের বুকের সবচেয়ে উজ্জ্বল পাহাড় টাইকো অভিযাত্রীদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। টাইকো পাহাড়টা ড্যানিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। টাইকোই হচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধের উজ্জ্বলতম অঞ্চল। এটা এতই উজ্জ্বল যে পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে দূরবীন ছাড়াই একে দেখা যায়। তবে সহজেই অনুমেয় যে, মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে ও তাকে কী অস্বাভাবিক উজ্জ্বলই না দেখাচ্ছে। এর চারদিকে আগ্নেয়গিরির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে। এর পঞ্চাশ মাইল বিস্তৃত ডিম্বাকৃতি জ্বালামুখটা ঠিক কেন্দ্রে অবস্থান করছে।

বিশালায়তন সে মুক্ত প্রান্তরে দশটা প্রাচীন নগর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

প্রোজেকটাইল টাইকো পর্বত আর তার সুবিশাল প্রান্তর ছাড়িয়ে এল। তখনও তার কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি চারিদিক উদ্ভাসিত করে রেখেছে। টাইকোর জ্বালামুখ থেকে রশ্মিরেখা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রশ্মিরেখাগুলোর উৎপত্তির কারণ আজও রহস্যের আড়ালে রয়ে গেছে। বিজ্ঞানী হার্সেল এ-ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন, উত্তপ্ত লাভাস্রোত অত্যাধিক শৈত্যে জমে গিয়ে শক্ত হয়ে পড়ায় এমন অত্যুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যাটাকে অন্যান্য জ্যোতির্বিদরা মেনে নিতে উৎসাহ পান নি। তাই তো রহস্যটা আজও পর্দার আড়ালেই রয়ে গেছে। ব্যাপারটা নিয়ে অভিযাত্রীরাও কম মাথা ঘামালেন না। তাই তিনি যা কিছু বললেন—সবই কল্পনার ব্যাপার।

চাঁদ থেকে মাত্র পাঁচ শ' গজ দূরে অবস্থান করেও অভিযাত্রীরা চাঁদের বুকে কোনো প্রাণের চিহ্ন দেখতে পেলেন না। জীবন্ত প্রাণীর ধর্মই হচ্ছে চলাফেরা করা, বিশেষ করে নড়াচড়া করা। তবে ? এমনও হতে পারে চাঁদের প্রাণীরা খোদল কেটে তাতে সিঁধিয়ে রয়েছে। তা হলেও তো চাঁদের বুকে চন্দ্রমানবদের গড়া কোনো না কোনো ধ্বংসস্তূপ নজরে পড়ত।

অভিযাত্রীরা সবাই একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, চাঁদের বুকে মানুষের অস্তিত্ব নেই। সেদিনটা ছিল ছয়-ই ডিসেম্বর। বার্বিকেন তার দিনলিপির পাতায় সিদ্ধান্তটা লিখে নিলেন।

www.pathagar.com

অভিযাত্রীদের এবারের আলোচ্য বিষয়—সম্প্রতি চাঁদে মানুষ বাস করে না বটে। কিন্তু অতীতে কোনোদিন সেখানে মানুষ ছিল কি? দীর্ঘ আলোচনার পর এরও মীমাংসা হল—এক সময় চাঁদে মানুষের অস্তিত্ব ছিল। এখন লোপ পেয়েছে।

মাইকেল প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, 'তবে কি চাঁদের বয়স পৃথিবীর চেয়ে বেশি ? পৃথিবীর আগেই চাঁদের সৃষ্টি?'

বার্বিকেন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'সে কী! তা কি করে সম্ভব? চাঁদ ও পৃথিবী উভয়েই প্রথম অবস্থায় ছিল গ্যাসীয় পিণ্ড মাত্র। পৃথিবীর আগে চাঁদ ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়েছে। তাইতো চাঁদের বুকে আগে জীবের আবির্ভাব ঘটেছে। পৃথিবীতে জীব এসেছে তারও পরে।'

নিকল প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'চাঁদে জীবের আবির্ভাব তো সম্ভব নয়। তিন শ' চুয়ান্ন ঘণ্টা একনাগাড়ে যেখানে দিন বা রাত্রি সেখানে জীব—অসম্ভব!'

মাইকেল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে ? সেখানেও তো একটানা ছয় মাস দিন।

বার্বিকেন বললেন, 'কথাটা উদ্ভট হলেও বলছি, চাঁদের বুকে যখন মানুষের অস্তিত্ব ছিল তখন সেখানে এক নাগাড়ে তিন শ' চুয়ান্ন ঘণ্টা দিন বা রাত্রি ছিল না। চাঁদের কেন্দ্রে তখন তরল পদার্থ ছিল, মেঘ আর বাতাস সবই ছিল। মোদ্দা কথা তখনকার চাঁদ ছিল অন্য রূপে, অন্য অবস্থায়। সে সবই এখন অনুপস্থিত। মহাজাগতিক কিরণের ফলে চন্দ্রপৃষ্ঠ এখন ক্ষত-বিক্ষত রূপ ধারণ করেছে। আর চাঁদের আবর্তন ও ঘূর্ণন গতিবেগও তখন সমান ছিল না। পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে গতিবেগ সমান হয়েছে। চাঁদের আবর্তন ও ঘূর্ণন গতিবেগ দুটো যখন অসমান ছিল তখন পৃথিবী ছিল তরল অবস্থায়। তখন পৃথিবীর আকর্ষণ অত্যধিক ছিল বলেই হয়তো বা চাঁদের ঘূর্ণন বেগ স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল।' মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে তিনি আবার বলতে লাগলেন, 'আসল ব্যাপার হচ্ছে, বিবর্তন ও ঘূর্ণনবেগের মধ্যে পার্থক্য থাকার জন্যই চাঁদে দিন ও রাত্রি বিরাজ করত। আর অন্যান্য পরিস্থিতিও জীবন ধারণের অনুকূল ছিল, সন্দেহ নেই। পরিস্থিতি যতদিন অনুকূল ছিল ততদিন, বহু লক্ষ্য শতক ধরে চাঁদের বুকে মানব সভ্যতা অব্যাহত ছিল। আজ বায়ুমণ্ডল একেবারে স্তিমিত হয়ে পড়ায় জীবের বেঁচে থাকার অনুকূল অবস্থা অন্তর্হিত হয়েছে। পৃথিবীও শীতল হতে হতে একদিন এ-অবস্থা ধারণ করবে। আজ আমরা মরা-চাঁদ, মরা-উপগ্রহকে দেখতে পাচ্ছি।'

মাইকেল অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'পৃথিবী কবে নিষ্প্রাণ হবে, হিসাব নিকাশ করে জানা সম্ভব হয়েছে কি ?'

'অবশ্যই। আমাদের জানা আছে, এক শ' বছরে পৃথিবীর উত্তাপ কি পরিমাণে হ্রাস পায় তা আমাদের জানা আছে। তার ওপর নির্ভর করে অঙ্ক কষে সিদ্ধান্তে পৌছানো গেছে, চার লক্ষ বছর পরে পৃথিবী একেবারে শীতল হয়ে শূন্য তাপাঙ্কে পৌছে যাবে।'

মাইকেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, 'বাঁচালেন সাহেব, আমি তো মনে করেছিলাম আমাদের পৃথিবীর পরমায়ু আর মাত্র পঞ্চাশ হাজার বছর।'

অভিযাত্রীরা যখন চাঁদে মানুষের অস্তিত্ব কোনোদিন ছিল কিনা আর বর্তমানে আছে কিনা প্রসঙ্গটা নিয়ে মেতে রয়েছে তখনই উপগ্রহটা ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল।

www.pathagar.com

অভিযাত্রীরা বিষাদক্লিষ্ট চাহনি মেলে ক্রমে দূরে সরে যাওয়া অস্পষ্ট চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল। এত আশা নিয়ে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এতটা পথ পাড়ি দিয়েও চাঁদে নামতে না পারার দুঃখ তাদের মনে অবর্ণনীয় হতাশার সঞ্চার করল।

এখন পৃথিবীর দিকে মোড় নিয়েছে প্রোজেকটাইলের তলদেশ। বার্বিকেন এতে বিস্মিত হলেন, উপবৃত্তটার ডিম্বাকৃতি কক্ষ পথে থাকলে চন্দ্রযানের ভারি দিকটা তো চাঁদের দিকেই থাকার কথা। কিন্তু কেন পৃথিবীর দিকে ঘুরে গেছে?

চন্দ্রযান যে-পথ ধরে চাঁদে এসেছিল ফিরেও যাচ্ছে একই পথে। অতএব উপবৃত্ত হলে সেটা অবশ্যই দৈর্ঘ্যে খুবই বেশি। পৃথিবীর আকর্ষণ যেখানে আরম্ভ হয়েছে চাঁদের আকর্ষণ সেখানে শেষ হয়েছে। সে উদাসীন অঞ্চল পর্যন্ত সুদীর্ঘ উপবৃত্তটা বিস্তার লাভ করেছে।

বার্বিকেনের মতে, উদাসীন অঞ্চলটায় প্রোজেকটাইল পৌঁছানোর পর দুটো ব্যাপার ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। তার গতিবেগ বেশি না থাকলে উভয় আকর্ষণের মাঝামাঝি গিয়ে সেটা নিশ্চল-নিথর অবস্থায় অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। আর একটা হতে পারে তার গতিবেগ যথেষ্ট না থাকার জন্য উপবৃত্তটার কক্ষপথে চন্দ্রযানটা অনন্তকাল ধরে চাঁদকে আবর্তন করতে থাকবে।

মাইকেল চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ এঁকে বলে উঠলেন, 'আমাদের এভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার অর্থই হচ্ছে অদৃষ্টের হাতে নিজেদের সঁপে দেওয়া। যে-গতিবেগে আমরা চাঁদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি তাকে প্রশমিত করতে পারলে—'

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই বার্বিকেন বলে উঠলেন, 'অসম্ভব! একেবারেই অবাস্তব চিন্তা। প্রোজেকটাইলকে অন্য পথে চালানো বা গতিবেগ কমানো কোনোটাই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

প্রোজেকটাইল এখন চাঁদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সত্য। কিন্তু তার গতিবেগও কমে আসছে। ক্রমে কমতে কমতে এক সময় গতিবেগ শূন্য হয়ে পড়বে উপবৃত্তের অন্যদিকে যখন এটা হাজির হবে। এক চক্কর মেরে এলে, চাঁদের দিকে অগ্রসর হবার সময় গতিবেগ বেড়ে যাবে।

বার্বিকেন এবার ভাবতে লাগলেন, প্রোজেকটাইল চাঁদের বিপরীত প্রান্তে যখন গতিবেগ শূন্য হয়ে পড়বে তখন কিছু একটা করা সম্ভব কি না?

মাইকেল ঠিক তখনই আক্ষেপসূচক শব্দ উচ্চারণ করে বলে উঠলেন, 'প্রোজেকটাইলের গতি রোধ করার সহজ পন্থাটাকে ব্যবহার না করে আমরা চরমতম বোকামি করছি। হাউইয়ের বিপরীত ধাক্কাটাকে ব্যবহার করলেই সমস্যার সমাধান করে ফেলা সম্ভব।'

'ভালো কথা। সময়মত রকেটগুলো ছোঁড়া যাবে। কিন্তু বর্তমানে প্রোজেকটাইল যেভাবে হেলে রয়েছে তাতে করে রকেটের পিছন দিককার ধাক্কায় আমাদের চাঁদ থেকে দূরে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। এখন তার মুখ পৃথিবীর দিকে। আশা করা যাচ্ছে, উদাসীন অঞ্চলে হাজির হলে এর মুখ চাঁদের দিকে ঘুরে যাবে। তখন রকেট ছুঁড়লে ধাক্কার ফলে আবার চাঁদের দিকে ধেয়ে যেতে পারবে। সাতই ডিসেম্বর রাত্রি একটায় উদাসীন অঞ্চলে এটা হাজির হবে।'

আলোচনা আর বেশি দূর অগ্রসর হল না। অভিযাত্রী-তিনজনই শুয়ে পড়লেন।

www.pathagar.com

সকাল সাতটায় তিনজনই এক এক করে শয্যা ত্যাগ করলেন। দেখা গেল, প্রোজেকটাইল তখনো ক্রমেই চাঁদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আর তার শঙ্কুর মতো মাথাটা চাঁদের দিকে ক্রমে হেলে পড়ছে। অদ্ভুত ব্যাপারই বটে। দেখা গেল, বার্বিকেনের ইচ্ছানুযায়ীই কাজ হচ্ছে। চন্দ্রযানটা রকেট ছোঁড়ার উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চলেছে।

মাত্র আর সাত ঘণ্টা বাকি। ব্যস, তারপরই রকেটগুলো হাইয়ের মতো আগুন ছড়িয়ে তীব্রবেগে ছুটে যাবে। অধীর প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে অভিযাত্রীরা সারাটা দিন কাটালেন। রাত্রি বারোটা। আর মাত্র এক ঘণ্টার ব্যাপার। তারপরেই চন্দ্রযানটা গতিবেগ নিঃশেষে হারিয়ে ফেলবে। বার্বিকেনের হিসাব অনুযায়ী রাত্রি ঠিক একটায় প্রোজেকটাইল গতিশূন্য হয়ে পড়বে। ব্যস, তখনই শুরু করা হবে রকেট ছোঁড়ার কাজ।

একটা বাজতে মাত্র আর পাঁচ মিনিট বাকি। প্রোজেকটাইল ইতিমধ্যেই উদাসীন অঞ্চলে পৌঁছে গেছে। অভিযাত্রীরা এতে পালকের মতো হাল্কা হয়ে পড়েছেন।

ঠিক একটা। রকেটের সলতেতে বার্বিকেন অগ্নিসংযোগ করে দিলেন। প্রোজেকটাইল বিরাট একটা ধাক্কা খেল, সবাই স্পষ্ট অনুভব করল।

বার্বিকেনের মুখে বিষাদের কালো ছায়া-নেমে এল। তিনি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমরা পড়ে যাচ্ছি! পড়ছি! তবে চাঁদের বুকে নয়, পৃথিবীর ওপর!'

মহাশূন্য থেকে ভূপৃষ্ঠে পতন শুরু হল। রকেট ছুঁড়েও তার মোড় ঘুরানো, পতন রোধ করা সম্ভব হল না। এক লক্ষ ষাট হাজার মাইল ঊর্দ্ধাকাশ থেকে উল্কাপিণ্ডের মতো নিচে পড়া যে-সে কথা নয়! প্রোজেকটাইল কামান থেকে যে গতিবেগ নিয়ে উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সে গতিবেগেই পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়বে। সেকেন্ডে সেই ১৬০০ গজ গতিবেগেই পৃথিবীর বুকে ধপাস করে পড়বে।

* * *

সামকুইথানা জাহাজের লেফটেন্যান্ট আর কাপ্তেন জল মাপার কাজে ব্যস্ত। আমেরিকার উপকূল থেকে দু-মাইল দূরবর্তী সমুদ্রে তিন হাজার পাঁচ শ' আট ফাদম পর্যন্ত দড়ি ছেড়েও তারা তলের হদিস পাচ্ছেন না দেখে বিস্মিত হলেন। ঠিক তখনই জাহাজ জুড়ে হৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল, তিন হাজার ২২৭ ফাদম জলের তলায় সিসার গোলা ঠেকেছে। কাপ্তেন নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের কেবিনে শুতে চলে গেলেন।

এগারোই ডিসেম্বর। রাত্রি দশটা। জাহাজের ডেকে চন্দ্রাভিযানের ব্যাপারটা নিয়ে জোর আলোচনা চলতে লাগল।

একজন অফিসার বলে উঠলেন, 'আজ সেই এগারোই ডিসেম্বর। অনেক আগেই প্রোজেকটাইল চাঁদের বুকে পদার্পন করেছে। পাঁচ তারিখের মধ্যরাত্রে তার চাঁদের মাটি স্পর্শ করার কথা ছিল। আলোচনা চলতে চলতে রাত্রি এগারোটা বেজে গেল। তখনো দড়ি তোলার কাজ মেটে নি।

রাত্রে একটা সতেরো মিনিটে লেফটেন্যান্ট নিজের কেবিনে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এমন সময় তিনি সমুদ্রের বুক থেকে হুস হুস শব্দ ভেসে আসতে শুনলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন, কোথাও না কোথাও দিয়ে বাষ্প বেরিয়ে যাচ্ছে। পরমুহূর্তেই বুঝলেন, জল থেকে নয়, অবাঞ্ছিত শব্দটা দূরবর্তী আকাশ থেকে। অকস্মাৎ একটা উল্কাপিণ্ড তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। বাতাসে ঘর্ষণ লেগে লেগে সেটা হু-হু করে জ্বলছে

www.pathagar.com

আর প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি করছে। চোখের পলকে সেটা প্রবল বেগে জাহাজের এক প্রান্তে আছাড় খেয়ে পড়ল। ব্যাস, জাহাজের গলুইটা মুহূর্তে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে জলে পড়ে গেল। মাত্র আর ফুট কয়েক কাছে পড়লেই পুরো জাহাজটা ভেঙেচুরে একসার হয়ে যেত।

'ব্যাপার কী? ব্যাপার কী?' বলতে বলতে বিবস্ত্রপ্রায় কাপ্তেন ছুটে এলেন।

ব্যাপারটা কারোর আর বুঝতে বাকি রইল না। গান-ক্লাবের চন্দ্রযান প্রোজেকটাইল ফিরে এসেছে। অভিযাত্রীরা জীবিত, নাকি মৃত অবস্থাতে ফিরেছেন জানার জন্য সবাই উৎকণ্ঠিত। তবে সবাই একমত, আগে তাঁদের জল থেকে উদ্ধার করতে হবে। তারপর বিবেচনা করা যাবে জীবিত, নাকি মৃত?

কি করে এমন সুবিশাল একটা গোলাকে জল থেকে উদ্ধার করা যাবে? জাহাজে সেরকম পাকা ডুবুরি আর সরঞ্জামাদিই বা কোথায়? উপায়ান্তর না দেখে নিকটতম বন্দরের দিকে সামকুইথানা ছুটে চলল। রাত্রি একটা দশ মিনিটে ছত্রিশ ঘন্টা একনাগাড়ে ছুটে সাড়ে চার শ' মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ভাঙা জাহাজটা সানফ্রান্সিসকো উপসাগরে হাজির হল। নৌ-বিভাগের সেক্রেটারি, গান-ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট, কেমব্রিজ মানমন্দির আর ম্যাসটনের কাছে চারটে টেলিগ্রাম করা হল। টেলিগ্রামের বক্তব্য, 'এগারোই ডিসেম্বর রাত্রি একটা সতের মিনিটে ২০ৼ উত্তর আর ৪১৩ৼ পশ্চিমে কোলাম্বিয়াডের প্রোজেকটাইল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে পড়েছে। নির্দেশ পাঠিয়ে দিন।'

খবরটা মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সমগ্র সানফ্রান্সিসকোতে ছড়িয়ে পড়ল। তারপরই ব্যাপারটা পৃথিবী জুড়ে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করল।

কেমব্রিজ মানমন্দিরের সদস্যরা জানতে পেরেছিলেন, প্রোকেকটাইল চাঁদে উপগ্রহ হয়ে চক্কর খাচ্ছে। পাঁচই ডিসেম্বর সেটাকে চাঁদের বিপরীত দিকে হারিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল। ব্যস তারপর থেকেই একেবারে অদৃশ্য।

আর ম্যাস্টন তো পাহাড়ের শীর্ষদেশে দূরবীক্ষণ যন্ত্র বসিয়ে তাতে চোখ লাগিয়েই রয়েছেন।

উল্কাপিণ্ড আর প্রোজেকটাইলকে নিয়ে চারদিকে কতই না জল্পনাকল্পনা চলতে লাগল।

গান-ক্লাবের সদস্যরা বলাবলি করতে লাগলেন, সমুদ্রে পড়েছে উল্কা নয়, তাদের প্রোজেকটাইল-ই বটে। পাঁচ তারিখের পর প্রোজেকটাইল তো আর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে নি। অতএব সেটা প্রোজেকটাইল না হয়েই যায় না।

ম্যাস্টন থেকে শুরু করে গান-ক্লাবের সদস্য পর্যন্ত অনেকেই প্রোজেকটাইলকে উদ্ধার করার জন্য তৎপর হলেন। ইঞ্জিনিয়ার মার্চিসন সানফ্রান্সিসকোতে ছুটলেন অর্ডার দিয়ে বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট স্বয়ংক্রিয় আঁকশি, ডুবুরির পোশাক ও সাজসরঞ্জাম এবং একটা ডাইভিং বেলও কিনে নিলেন। এর অত্যাশ্চর্য কামরাগুলোতে প্রয়োজন মতো জল ঢুকিয়ে জলের যত তলায় খুশি নেমে যাওয়া সম্ভব হয়। আবার কাজ মিটে গেলে বাতাস ঢুকিয়ে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সে জলকে বাইরে বের করে ডুবোকামরা গুলোকে ওপরে তুলে আনা যাবে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, প্রোজেকটাইল যদি বিশ হাজার ফুট জলের তলায় চলে গিয়ে থাকে তবে সেটা জলের চাপে অক্ষত থাকবে কি না কে জানে?

www.pathagar.com

একুশে ডিসেম্বর রাত্রি আটটায় মার্চিসন, ম্যাসটন এবং গান-ক্লাবের প্রতিনিধিরা অত্যাবশ্যক সাজসরঞ্জামসহ জাহাজে রওনা হয়ে গেলেন।

তেইশে ডিসেম্বর সকাল আটটায় জাহাজ ভিড়ল। বেলা বারোটা সাতচল্লিশ মিনিটে হাজির হল ঘটনাস্থলে, বয়াটার ধারে।

একটা পঁচিশ মিনিটে ডাইভিং-বেল ধীরে ধীরে জলে তলিয়ে গেল। ম্যাসটন, মার্চিসন আর ব্রুমসবেরি তার ভেতরে আছেন। প্রতিফলকের সাহায্যে আলো আরো তীব্রতর করে তল্লাশি চালিয়েও প্রোজেকটাইলের হদিস পাওয়া গেল না। সন্ধ্যা পর্যন্ত মাইলের পর মাইল তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু না পেয়ে, হতাশ হয়ে ডুবো প্রকোষ্ঠকে ওপরে তুলে আনা হল।

আঠাশ তারিখে সবাই মনমরা হয়ে পড়লেন। সবার মধ্যেই বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল, ওপর থেকে প্রবল বেগে আছাড় খেয়ে পড়ায় প্রোজেকটাইল নির্ঘাত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বে-পাত্তা হয়ে গেছে।

একমাত্র ম্যাসটন হতাশ হয়ে পিছিয়ে গেলেন না।

উনত্রিশ তারিখ জাহাজে সানফ্রান্সিসকোর দিকে রওনা হয়ে গেল। সকাল দশটায় এক নাবিক আচমকা চিল্লিয়ে উঠল, 'ওই—ওই যে বয়া ভাসছে! ছুঁচল শীর্ষদেশে, জলের উপর-তল থেকে পঁচিশ ফুট ওপরে পতাকা উড়ছে। আমেরিকার পতাকা। অদ্ভুত ব্যাপার। এতগুলো বিজ্ঞ লোকের মধ্যে কারো মাথায় এল না, এত উঁচু থেকে পড়ার জন্য প্রোজেকটাইল তখনকার মতো জলে তলিয়ে গেলেও এক সময় ভেসে উঠবেই। ফাঁপা, গোলকের পক্ষে জলে তলিয়ে থাকা সম্ভব নয়।

ব্যস, আর দেরি নয়। ম্যাসটন সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে নৌকা নিয়ে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, প্রোজেকটাইলের একটা জানালার কাঁচ ভাঙা। আর জানালাটা জল থেকে পাঁচ ফুট ওপরে।

ভাঙা-জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে ম্যাসটন দেখলেন, বার্বিকেন, মাইকেল আঁর্দা ও নিকল ডোমিনো খেলায় মগ্ন।

ব্যাস বার্বিকেন, মাইকেল আঁর্দা এবং নিকল মুহূর্তে দেবতা বনে গেলেন। বাল্টিমোরে ফেরার পর তাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হল। নিউইয়র্ক হেরল্ড পত্রিকা বার্বিকেনের দিনলিপিটাকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কিনে নিল। আর 'চন্দ্রাভিযান' নাম নিয়ে কাহিনী ছাপা হতেই পত্রিকাটার বিক্রির সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষতে পৌঁছে গেল। এ কাহিনী প্রকাশ হবার পর চাঁদ সম্বন্ধে মানুষ এতদিন যা কিছু জানত সবই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়ে গেল। যারা মাত্র পঁচিশ মাইল ওপর থেকে চাঁদকে চাক্ষুস করেছে তাদের কথাকে নস্যাৎ করার সাহস কারোই বা আছে?

এখন কথা হচ্ছে, অকল্পনীয় এ-অভিযানের পরিণতি কি হতে পারে? এখানেই কি এর যবনিকা পতন ঘটে যাবে? নাকি, এ দুঃসাহসিক অভিযানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতের অভিযাত্রীরা সৌরমণ্ডলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন? গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে আর নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিজয় নিশান উড়িয়ে দেবে?

ভবিষ্যতে প্রেসিডেন্ট বার্বিকেনের প্রয়াসকে আমেরিকানরা যদি কাজে লাগান তবে আশ্চর্য হবারই বা কি থাকতে পারে।

---

www.pathagar.com

ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাস। রয়্যাল ভৌগোলিক সমিতির সভাকক্ষ। সমিতির সদস্যরা জরুরি এক সভায় মিলিত হয়েছেন। সভাপতির ভাষণ শেষ হতেই করতালিতে সভাকক্ষ মুখরিত হতে লাগল। তিনি আসন গ্রহণ করার পূর্ব মুহূর্তে বললেন, 'ইংল্যান্ড ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। ইংল্যান্ডের সে খ্যাতি ড. ফারগুসন বৃদ্ধি করতে চলেছেন। তিনি যদি সাফল্য লাভ করেন—'

তাঁর কথার ফাঁকে শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলেন, 'অবশ্যই সাফল্য লাভ করবেন।'

পূর্ব কথার জের টেনে সভাপতি বলে চললেন—'হ্যাঁ, তিনি সাফল্য লাভ করলে আফ্রিকার অসম্পূর্ণ মানচিত্রকে সম্পূর্ণ করে তোলা সম্ভব হবে। আর যদি ব্যর্থ হন তবে প্রমাণিত হবে, মানুষ যে কেবলমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী তাই নন, সাহসিকতার দিক থেকেও তার সমকক্ষ কেউ নেই।'

তাঁর ভাষণ শেষ হতে না হতেই আবার ঘন ঘন করতালি শুরু হয়ে গেল। ব্যস, চাঁদ ওঠা শুরু হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর অভিযান উপলক্ষ্যে সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচ শো পাউন্ড জোগাড় হয়ে গেল।

ডা. ফারগুসন তখন সভাকক্ষে অনুপস্থিত। উপস্থিত সদস্যরা তাঁকে একবারটি চক্ষুষ দেখার জন্য বায়না ধরল। কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করল, আসলে ফারগুসন নামে নাকি কারোর অস্তিত্বই নেই। পুরো ব্যাপারটাই ভাঁওতা।

সভাপতির অনুরোধে গম্ভীর প্রকৃতির মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

আগন্তুক মঞ্চে উঠতেই সবাই লক্ষ্য করল, তিনি পেশীবহুল দীর্ঘাকৃতি একজন সুপুরুষ। পা দুটোর দিকে এক নজরে তাকালেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, তিনি দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে সক্ষম।

আগন্তুক ডান হাতের তর্জনি উঁচিয়ে গুরু গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করলেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!'

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে করতালিতে সভাকক্ষ মুখরিত হয়ে উঠল। মুহূর্তে তিনি উপস্থিত হাজার হাজার শ্রোতার অন্তরের অন্তঃস্থলে স্থায়ী আসন লাভ করে ফেললেন।

ফারগুসনের পিতা ছিলেন, ইংরেজ নৌ-সেনাবিভাগের একজন দুঃসাহসী সেনাপতি। বালক ফারগুসনকে সঙ্গে করে তিনি সাগরে-সাগরে ঘুরে বেড়াতেন, যুদ্ধের সময়েও কাছে কাছে রাখতেন। বিপদ যত কঠিনই হোক না কেন কিছুতেই তাকে কাছছাড়া করতেন না। বাল্যের সে দিনগুলো থেকেই বিপদকে পায়ের ভৃত্য করতে শিখে ফেললেন। বয়স আর একটু বাড়লে ভ্রমণ কাহিনী পাঠে মন দিলেন। ছেলের ইচ্ছার কথা বুঝতে পেরে তাঁর বাবা তাঁকে পদার্থবিজ্ঞান, বলবিদ্যা, জলবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা এবং ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানবান করে তোলার জন্য শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করলেন।

www.pathagar.com

বাবা মারা গেলে ফারগুসন সেনাবিভাগে যোগ দিয়ে বাংলাদেশে হাজির হলেন। কিন্তু যুদ্ধের দামামা তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে পড়ায় তিনি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে ভারতবর্ষ পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন। কলকাতা থেকে সুরাটের উদ্দেশ্যে তিনি পায়ে হেঁটে যাত্রা করলেন। তারপর এক এক করে রাশিয়া, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ সেরে এলেন।

ফারগুসন সভা-সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার চেয়ে 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় নিয়মিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, লিখতেনও। তাই তাঁর নামটার সঙ্গে সবাই পরিচিতি ছিল। আর সভা-সমাবেশে বৃথা সময় নষ্ট না করে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে মেতে থাকাকেই তিনি বেশি পছন্দ করতেন।

ডেইলি টেলিগ্রাফের পাতায় একদিন ছাপা হল—আফ্রিকার মৌনব্রত এবার ভঙ্গ হতে চলেছে। দু হাজার বছরেও যে-দেশ অজ্ঞাত রয়ে গেছে তার রহস্য আজ উদ্ঘাটিত হবে। নীলনদের উৎসস্থল আবিষ্কার এতদিন অসম্ভব বিবেচিত হত। দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রয়াসে রহস্যাবৃত আফ্রিকার তিনটি প্রবেশপথ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে।

ক্লাপার্টন আর ডেনহামের আবিষ্কৃত পথ ধরে ড. বার্থ সুদানে হাজির হন। ড. লিভিংস্টোন বহু কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে জাম্বেসি অবধি গিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন স্পিক আর ক্যাপ্টেন গ্রান্ট আলাদা পথে অগ্রসর হয়ে ক'টা হ্রদ আবিষ্কার করেন। এ-পথ তিনটের মিলনস্থলই আফ্রিকার কেন্দ্রবিন্দু। ফারগুসন শীঘ্রই আফ্রিকার সে-কেন্দ্রবিন্দুর উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাবেন। আকাশযানে চেপে আফ্রিকার পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছবেন। জাম্বিয়া দ্বীপ থেকে বেলুনের সাহায্যে পশ্চিমদিকে পাড়ি জমাবেন মনস্থ করেছেন। তাঁর এ যাত্রা কোথায় এবং কীভাবে শেষ হবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।'

ড. ফারগুসনের খবরটা ডেইলি টেলিগ্রাফের পাতায় ছাপা হতেই দেশজুড়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হল। উড়ো জাহাজ তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। কেউ কেউ বলতে লাগল—বেলুনে চেপে এমন দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কেউ বা বলল, 'আসলে ফারগুসন বলে কারোর কোনো অস্তিত্বই নেই। এটা ডেইলি টেলিগ্রাফ-এর কারসাজি। ইংল্যান্ডের মানুষগুলোকে বোকা বানানোই তাদের মতলব। আবার ডেইলি টেলিগ্রাফকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে অন্যান্য খবরের কাগজগুলো ফলাও করে লেখা ছাপতে লাগল। ব্যাস, ফারগুসন একেবারে চিপসে গেলেন।'

কদিন বাদে শোনা গেল ফারগুসনের বাঞ্ছিত বেলুন তৈরি করে দিতে লায়ন কোম্পানি রাজি হয়েছে। 'রেজলিউট' নামে একটা জাহাজ দিয়ে সাহায্য করেছেন ইংরেজ সরকার। এবার-সবার মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল। চারদিকে আবার হৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে গেল।

এবার দেখা দিল এক নতুনতর সমস্যা, অনেকেই ফারগুসনকে ধরেছে সহযাত্রী হিসাবে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য! তিনি সম্মত হলেন না।

ডিক কেনেডি নামে ড. ফারগুসনের এক অভিন্নহৃদয় বন্ধু রয়েছেন। তিনি তিব্বত ভ্রমণ সেরে দু বছর বাড়িতে থিতু হয়েছেন দেখে ডিক কেনেডি খুবই আনন্দিত হলেন। ভাবলেন, বন্ধুবরের দেশভ্রমণের পোকা বুঝি মাথা থেকে নেমে গেছে। তাঁর মুখোমুখি হয়েই তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'বন্ধু, বিজ্ঞানের কল্যাণের জন্য তো অনেক কিছুই করলে, পরিশ্রমও কম কর নি। এবার মন দিয়ে সংসার কর।'

www.pathagar.com

ফারগুসন বন্ধুর কথার জবাব না দিয়ে কেবল নীরবে মুচকি হাসলেন।

ফারগুসন সবর্দা গম্ভীরমুখে আপন মনে কি যেন তন্ময় হয়ে ভাবেন।

ডিক কেনেডি একদিন একটা টেলিগ্রাম পেয়ে যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। আপন মনে তড়পাতে লাগলেন, 'মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! মাথার দোষ দেখা না দিলে কেউ বেলুনে চেপে আফ্রিকা অভিযানে বেরোয় ? দু বছর ঘরে বসে তবে সে এ-মতলবই ভেজেছে ?'

ডিক কেনেডি সে রাত্রেই লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বাড়ি ছেড়ে বেরোবার পূর্ব মুহূর্তে তাঁর সর্বক্ষণের ভৃত্য সঙ্গীকে বললেন, 'আমি চললাম। ও বড্ড একগুঁয়ে, আমি হাড়ে হাড়ে ওকে চিনি। আমি রুখে না দাঁড়ালে কোনোদিন হয়ত ফারগুসন চাঁদের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করবে।'

হঠাৎ ডিক কেনেডিকে দেখে ফারগুসন যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। ডিক কেনেডি হাতের টেলিগ্রাফটা বাড়িয়ে ধরে, কণ্ঠস্বরে বেশ একটু উষ্মা প্রকাশ করেই বলে উঠলেন, 'এর মানে কি? তুমি কি সত্যি বেলুনে চেপে—'

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ফারগুসন বললেন, 'সত্যি। শতকরা এক শো ভাগই সত্যি। যাবার পাকাপাকি বন্দোবস্তও করে ফেলেছি।'

'রাখ তো তোমার বন্দোবস্ত। আসলে কাজের ঝামেলার জন্যই তোমাকে আগেভাগে কিছু জানানো সম্ভব হয় নি। তবে তোমাকে না জানিয়ে অবশ্যই যেতাম না জানিয়ে অবশ্যই যেতাম না, এটুকু অন্ততঃ বিশ্বাস করতে পার বন্ধু।'

'সাব্বাস! চমৎকার কথা শোনালে! তোমার কথায় বোঝাচ্ছে, এ জন্যই আমি উষ্মা প্রকাশ করছি।'

'এ কথা বলছ কেন বন্ধু? আসলে যে তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হচ্ছে।'

'আমাকে ? আমাকে তোমার সঙ্গে—মানে সহযাত্রী হতে হবে ?' ডিক কেনেডি যেন আচমকা একটা হোঁচট খেলেন।

ব্যস, এবার উভয়ের জোর কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। কথা প্রসঙ্গে ফারগুসন বললেন, 'বন্ধু, ভাগ্যকে আমি মানি। শুধুমাত্র এটুকুই বুঝি, ভাগ্যে যা আছে কেউই রুখতে পারবে না।'

'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু এমন একটা অদ্ভুত খেয়াল তোমার মাথায় ভর করল কেন, মালুম হচ্ছে না তো ? যদি যেতেই চাও তবে সবাই যে-পথে আফ্রিকায় যায়, সে পথে যেতে আপত্তি কোথায় ?'

'অন্য সবাই যে পথ অবলম্বন করে তাতে কি আজ পর্যন্ত কেউ সফল হয়েছে, তুমিই বল? আমি তো বলব, সফল হয়নি। মঙ্গোপার্ক থেকে শুরু করে ভোগেল পর্যন্ত কেউ যেতে পারে নি। মঙ্গোপার্ক নাইজারের তীরে গিয়ে নিষ্ঠুরভাবে খুন হয়। নতুবা ভোগেল ওয়াদেই-এর জলে ডুবে প্রাণ হারায়।

ক্যাপটেন সাকাটুতে প্রাণ দেন, মুর্মুরে প্রাণ হারান আউদনি। অসভ্য জঙ্গলিরা নৃশংসভাবে মৈজান-এর গর্দান নেয়। রোসার আর মেজর ল্যাংও একইভাবে প্রাণ হারান। আরও কত শত অভিযাত্রী যে আফ্রিকায় গিয়ে নিমর্মভাবে জান খুইয়েছে গোনাগাঁথা নেই কারোর মৃত্যু হয়েছে ক্ষিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে, তীব্র শীতে কেউ মারা গেছে, মারাত্মক জ্বরে ভুগে ভুগে কারোর ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। আবার হিংস্র জানোয়ারের

www.pathagar.com

চেয়েও ভয়ঙ্কর প্রকৃতির জঙ্গলিদের বিষমাখা তীরে কারোর প্রাণ গেছে। যে, যে-পথ অবলম্বন করেছে কোনো পথেই নির্মম নিষ্ঠর সত্যকে এড়াতে পারেনি। তাই বলছি কি, সে-সব পথ এড়িয়ে চলাটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয় বন্ধু? তাই তো আমি জল, জমিন আর জঙ্গল এগিয়ে শূন্যে ভেসে যাওয়ার মতলব এঁটেছি।'

বন্ধু, তুমি যদি ভেবে থাক, বেলুনটা পড়ে যাবে, ভুলই করবে। আফ্রিকার পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত না গিয়ে আমার বেলুনটা পড়বে না, কিছুতেই পড়বে না। বাতাসের উষ্ণতা বাড়লে বেলুন ওপরে উঠে যাবে, শৈত্যে নিচে নেমে যাবে, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত আর জঙ্গল অনায়াসে পাড়ি দিয়ে দেবে। ভ্রমণের ক্লান্তি না থাকার জন্য বিশ্রামের প্রয়োজনও থাকবে না। পায়ের তলায় অজানা-অচেনা আফ্রিকার ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য ধীরে ধীরে পিছনে চলে যাবে।'

বিস্ময়ে আতঙ্কে অভিভূত ডিক কেনেডি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, 'আসমানে ওড়ার যন্ত্র তো এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। তুমি কি তবে বেলুন চালানোর কোনো যন্ত্র উদ্ভাবন করে ফেলেছ নাকি বন্ধু ?'

'সে কী বেলুনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যে নিছকই স্বপ্নের ব্যাপার! বাণিজ্যবায়ু আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবল বেগে ধেয়ে চলেছে। আমি তাকেই কাজে লাগিয়ে বেলুনের সাহায্যে ভেসে যাব। ইংরেজ সরকার একটা জাহাজ দান করেছেন। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে তিন-চারটে জাহাজ আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। সম্ভবত তিন মাসের ভেতরেই জাঞ্জিবারে পৌঁছে যেতে পারব। সেখান থেকেই গ্যাস বেলুনে চেপে আমরা যাত্রা করব।'

সচকিত হয়ে ডিক কেনেডি বলে উঠলেন, 'আমরা? আমরা বলতে—তুমি আর কে?'

'আমি আর তুমি। কেন? কোনো আপত্তি আছে নাকি তোমার।'

'অবশ্যই। আপত্তিতো এক শো বারই আছে। আর কথা হচ্ছে, দেশ দেখতে হলে তো তোমাকে বহুবার উঠতে নামতে হবে। বেলুনকে নামাতে গেলে গ্যাস ছাড়তেই হবে। এভাবে বার-কয়েক নামা-ওঠা করতে হলেই কর্ম ফতে, গ্যাস ফুরিয়ে যাবে।'

'না বন্ধু। গ্যাস না ছেড়েই আমি বেলুনকে নামিয়ে নেব। এটাই তো আমার গোপন পরিকল্পনা, কৌশল তো এটাই। আমার ওপর আস্থা রাখতে পার বন্ধু। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

'ভালো কথা। ঈশ্বরের ইচ্ছাই তবে পূর্ণ হোক।'

তখনকার মতো প্রসঙ্গটা চাপা পড়ল বটে। কিন্তু কেনেডি মনের দিক থেকে পিছিয়ে গেলেন না। সময় সুযোগ পেলেই ফারগুসনকে তাঁর চিন্তা ভাবনা থেকে ফেরাবার প্রয়াস চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই ফারগুসনকে কব্জা করতে পারলেন না।

বেলুনের আতঙ্ক কিন্তু ডিক কেনেডির মাথা থেকে নামল না। বেলুন থেকে দুম করে পড়ে গেছেন এমন স্বপ্নও দেখতে লাগলেন। একদিন তো পালঙ্ক থেকে দুম করে পড়েই গেলেন।

বন্ধুবরের স্বপ্ন দেখার হিড়িক ও খাট থেকে পড়ে যাওয়ার কথা শুনে ফারগুসন হাসতে হাসতে বললেন, 'আরে ধ্যুৎ! এমন করে মুষড়ে পড়ার কী আছে! তুমি নির্ভয়ে যাত্রা করতে পার। পড়বে না, কিছুতেই পড়বে না?'

www.pathagar.com

'সে না হয় হল। কিন্তু নীলনদের উৎসস্থল আবিষ্কার করে আমাদের ফায়দা কি হবে, বলতে পার?'

'যাঁরা আফ্রিকা অভিযানে যাবেন আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে তাদের অনেক উপকার হবে।' কথা বলতে বলতে আফ্রিকার একটা মানচিত্র খুলে বন্ধুবরের সামনে মেলে ধরে এবার বললেন, 'কম্পাসটা হাতে নাও। এর একটা কাঁটা গানাডোকোরার ওপর ধর। আর একটা কাটা রাখ জাঞ্জিবারের ওপর। এবার হিসাব করে দেখ, উভয়ের মধ্যে দূরত্ব কতটা। তার আগে আউকেরিউ হ্রদ খুঁজে বের কর। এর উত্তর দিক থেকে একটা জলস্রোত নির্গত হয়ে নীলনদে গিয়ে পড়েছে। কম্পাস বসিয়ে দেখ, ব্যবধান দু ডিগ্রি। দু ডিগ্রি মানে দেড় শো মাইলেরও কম। আরও বলছি শোন, ভৌগোলিক সমিতির মতে এ হ্রদটায় অভিযান চালানো খুবই দরকার। সম্প্রতি এ-কাজে লেগেছেন ক্যাপ্টেন গ্রান্ট এবং ক্যাপ্টেন স্পোক। একটা স্টিমারে চেপে তাঁরা ঘাটুস থেকে গানডোকোরা পর্যন্ত যাবেন। সেটা তাদের নামিয়ে দিয়ে গান ডোকোরাতেই অপেক্ষা করবে। আর তারা যাবেন হ্রদটার খোঁজে। তাই বলছি কি বন্ধু, তাঁদের এ অভিযানে সাহায্য করতে হলে যত শীঘ্র সম্ভব আমাদেরও রওনা হতে হবে।'

ডিক কেনেডি আমতা আমতা করে বললেন, 'একটা কথা, অনেকেই যখন যাচ্ছেন তখন আমাদের না গেলেই বা এমন কি ক্ষতি বৃদ্ধি হবে, ভেবে পাচ্ছিনে?'

ফারগুসন নিরুত্তর। তাঁর নীরবতা ডিক কেনেডির আতঙ্ক আরও হাজারগুণ বাড়িয়ে দিল।

জো নামে ফারগুসনের এক ভৃত্য রয়েছে। ভৃত্য না বলে তাকে বরং বাড়ির কর্তা বলাই ভাল। সে ডিক কেনেডিকে বলল, 'মিচেলের কারখানায় বেলুনটা তৈরি হচ্ছে। আপনি সঙ্গে যাচ্ছেন তো স্যার?'

'তাঁকে নিবৃত্ত না করা বা ফিরিয়ে না আনা অবধি তো তার সঙ্গে থাকতেই হবে। এ কী বদখেয়াল, একবারটি ভেবে দেখ তো জো!'

এমন সময় ফারগুসন সেখানে এসে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, 'মি. কেনেডি, জোকে নিয়ে একবারটি আমার সঙ্গে আসুন তো। আপনাদের ওজন নেওয়া হবে।'

মিচেলের কারখানার তুলাদণ্ডে পর পর তিনজনের ওজন নেওয়া হল। ফারগুসনের ওজন হল এক শো পঁয়ত্রিশ পাউন্ড, ডিক কেনেডির এক শো তিপ্পান্ন পাউন্ড আর জোর এক শো কুড়ি পাউন্ড। এবার তিনজনের ওজন যোগ করে দাঁড়াল চার শো পাউন্ডের কিছু বেশি। ফারগুসন নিশ্চিন্ত হলেন।

ফারগুসন দেখলেন, চারশ পাউন্ড ভার বইতে হলে বেলুনে হাইড্রোজেন গ্যাস বোঝাই করতে হবে। তাতে দু শো ছিয়াত্তর পাউন্ড গ্যাস ভরা যাবে। কিন্তু চার শো পাউন্ড বিশিষ্ট তিনজনকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে হলে চুয়াল্লিশ হাজার আট শো সাতচল্লিশ ঘনফুট বায়ুর ওজন চার হাজার পাউন্ড। অথচ সমপরিমাণ হাইড্রোজেনের ওজন দু শো ছিয়াত্তর পাউন্ড মাত্র। কিন্তু এ পরিমাণ গ্যাস বোঝাই বেলুনটা সম্পূর্ণরূপে ফুলে ফেঁপে ওঠার পর সেটা যতই ওপরে উঠবে বায়ুমণ্ডলের চাপ ততই হ্রাস পেতে থাকবে। বেলুনটার মধ্যে তখন নিজের ধর্ম অনুযায়ী ক্রমে সম্প্রসারিত হবার প্রবণতা দেখা যাবে। ব্যস, তখনই সেটা ফেটে গিয়ে গ্যাস বেরিয়ে যাবে। এরকম বিবেচনা করে ফারগুসন বেলুনে অর্ধে গ্যাস ভরে নিলেন। ড. ডিক কেনেডি আর একটা চমৎকার ফন্দি করলেন।

www.pathagar.com

বেলুনটার মধ্যে আর একটা অপেক্ষাকৃত ছোট বেলুন গ্যাসে ভাসিয়ে রাখলেন। এতে দু-দুটো সুবিধা—একটা বেলুন কোনোক্রমে ফেঁসে গেলে অন্যটা অবলম্বন করে শূন্যে ভেসে যাওয়া সম্ভব হবে। আর বড় বেলুনটার মধ্যে ছোট বেলুনের গ্যাস চালান দিয়ে দিলে নামা ওঠা করতে গিয়ে গ্যাস নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকবে না।

লোহার পাত, বেত আর নল দিয়ে তৈরি ফারগুসন বেলুনের সঙ্গে একটা দোলনা লাগিয়ে দিলেন আরোহীদের থাকার জন্য। আর জুড়ে দিলেন চারটে বাক্স। তাদের একটায় জল, আর বাকি তিনটায় একটা পঞ্চাশ ফুট লম্বা সিল্কের দড়ি, তিনটি নোঙর, থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার ও ক্রণোমিটার, বন্দুক, গোলা-বারুদ প্রভৃতি ভরে দেওয়া হল। তবে খাবারদাবারের মধ্যে নোনতা মাংস, চা, কফি, বিস্কুট আর কয়েক বোতল ব্রান্ডিও নিয়ে নিলেন। একটা তাঁবু ও কম্বল নিতেও ফারগুসন ভুল করলেন না। সব মিলে ওজন দাঁড়াল চার শো পাউন্ড। মোদ্দা কথা, ফারগুসন-এ অত্যাশ্চর্য বেলুনটাকে চার শো পাউন্ড ওজন বয়ে নিয়ে শূন্যে ভেসে যেতে হবে।

*　*　*

ষোলোই ফেব্রুয়ারি। সেদিন কাক-ডাকা সকালে ইংরেজ সরকারের রেজলিউট জাহাজ নোঙর তুলে জাঞ্জিবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। বেলুনটাকে জাহাজে তুলে নেওয়া হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে লোহা আর সালফিউরিক অ্যাসিডও সঙ্গে নেওয়া হয়েছে, হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করে বেলুনে ভরার জন্য।

জাহাজ এগিয়ে চলল। ড. ফারগুসন মাঝে মধ্যে গল্পচ্ছলে নাবিকদের কাছে পূর্বসূরী অভিযাত্রীদের অভিযানের কাহিনী রসান দিয়ে দিয়ে শোনাতে লাগলেন।

কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি বললেন, 'জাঞ্জিবার আর মেনেগালের মধ্যে দূরত্ব খুব বেশি হলেও হাজার চারেক মাইল। বেলুনের সাহায্যে আকাশপথে পাড়ি দিতে সাতদিনের বেশি লাগবে না।'

ক্যাপ্টেন মুচকি হেসে বললেন, হ্যাঁ, বেলুনটা ওপরে উঠে গেলে দমকা বাতাস পেয়ে যাবে। বাতাস নাকি দু শো চল্লিশ মাইল অর্থাৎ ঝড়ের বেগে প্রবাহিত হয়। কিন্তু এমন প্রবল ঝড়ে আপনার বেলুন আবার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে তো?'

'অবশ্যই পারবে। আঠারো শো চার-এ নেপোলিয়নের সিংহাসন লাভের সময় এক ঘটনা ঘটে। প্যারি থেকে অভিযাত্রী ভার্নোরিন রাত্রি এগারোটায় বেলুনের রশি কাটেন। পরেরদিন ভোরে বেলুনটা ব্রাসিয়ানা হ্রদে গিয়ে পড়ে।'

'প্রবলবেগে দোল খেয়ে বেলুন অক্ষত থাকলেও মানুষের হাড়-মাংস তো একাকার হয়ে যাবে।' ভীত-সন্ত্রস্ত ডিক কেনেডি কোনরকমে উচ্চারণ করলেন।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দুই মাস চলার মতো খাবারদাবার তো আছেই। তাই তাড়াতাড়ি আমরা যাব না, দরকারও নেই।'

এদিকে জো নাবিকদের সঙ্গে বেশ ভাব করে নিয়েছে। কথা প্রসঙ্গে বলল, 'চাঁদে যাওয়ার ব্যাপারটা তেমন কিছু কঠিন ব্যাপারই নয়। বোতলে করে বাতাস আর জল নিয়ে নিলেই তো ল্যাটা চুকে যাবে।

নাবিকরা যখন শুনল চাঁদে জিন মানে মদটদও মেলে না তখন তারা চাঁদের বদলে তারার মুল্লুকে যাওয়ার জন্যই বেশি আগ্রহ প্রকাশ করল।

www.pathagar.com

তারার মুল্লুকের দিকে জোর আগ্রহ নেই। তাই সে বলল, 'ভাবছি, শনিগ্রহটা থেকে একটা চক্কর মেরে আসব। শনি গ্রহ হচ্ছে, যার চারদিকে আংটির মতো বলয় রয়েছে। যাকে আমরা শনির বিয়ের আংটি বলে জানি। তবে তার সহধর্মিনীর হদিস আজ অবধি মেলে নি।'

নাবিকটা এবার বলল, 'আরে ব্যস! এত উঁচুতে—ভালো কথা, শনিগ্রহ থেকে আর কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে?'

'সেখান থেকে একবার বৃহস্পতি গ্রহে যাব ভেবে রেখেছি। চমৎকার, সে দেশটার দিনগুলোর দৈর্ঘ্য মোট সাড়ে নয় ঘন্টা। আর রাত্রি দীর্ঘ। কী মজা! খাও দাও আর বাকি সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দাও। আমাদের বারোটা বছরের সমান তাদের মাত্র এক বছর। পৃথিবীতে যাদের দুমাসের মধ্যে মৃত্যু হবে বৃহস্পতি গ্রহে গেলে আর কিছুদিন টিকে থাকবে। অতএব সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, তোমাদের এখন যেমন ডাগর ডোগর দেখা যাচ্ছে বৃহস্পতি গ্রহে গেলে এখনও বহুদিন শৈশব-অবস্থায় কাটাতে হবে। এখন পঞ্চাশ বছরে পৌঢ় বৃহস্পতি গ্রহে গেলে তিন-চার বছরের শিশু বনে যাবে। বৃহস্পতি গ্রহ থেকে একটা চক্কর মেরে এলেই আমার কথার সত্যতা যাচাই হয়ে যাবে।'

তার কথায় নাবিকটা মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়ে তুলেছে বুঝতে পেরে জো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল,'নেপচুন গ্রহের কথা তোমরা শোন নি বোধ হয়? সেখানে নাবিকদের খুবই খাতির। মঙ্গল গ্রহে গেলে আবার দেখবে সৈন্যরা বেশি খাতির পায়। সে যানে চোর-ডাকাতদের একাধিপত্য। হাঙ্গামা, রাহাজানি লেগেই রয়েছে। চোর আর বণিকরা ধরতে গেলে প্রায় সমগোত্রীয়।'

জো যখন সহজ-সরল নাবিকদের কাছে আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসেছে ঠিক তখনই ড. ফারগুসন বেলুনের ওঠানামার অদ্ভুত ব্যাপারটা জাহাজের অফিসারদের কাছে ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত। তিনি বলতে লাগলেন, 'আমি বেলুনের নিচের দিককার মুখটা এমন অদ্ভুত কৌশলে বন্ধ করে দিয়েছি যাতে এক ছিটা বাতাসও তার ভেতরে যেতে পারবে না। দুটো নলের মধ্যে হাইড্রোজেনের ওপরের অংশে একটা মুখ খোলা রয়েছে। আর অন্যটা রয়েছে নিচের অংশে। দুটো নলই বেলুনের বাইরে অবস্থিত একটা বাক্সের ওপরের ডালার সঙ্গে আটকে দেওয়া। বাক্সটা আসলে গ্যাস গরম করার একটা যন্ত্র বিশেষ। আরও খোলসা করে বলছি, যে নলটা বেলুনের ওপর থেকে বাক্সে নেমে এসেছে সেটা বাক্সটার মধ্য দিয়ে স্পিংয়ের মতো পাক খেতে খেতে তার তলদেশে হাজির হয়েছে। পরে সেটাই প্লাটিনামের আস্তরণের ভেতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে নলটার ভেতরের হাইড্রোজের গ্যাসকে উত্তপ্ত করলেই গ্যাসের ধর্ম অনুযায়ী হাল্কা হয়ে যাবে এবং ওপরে উঠতে থাকবে। তখনই ওপরে ঠাণ্ডা ও ভারি গ্যাস নিচে নেমে আসবে। নলের মুখের কাছে আসামাত্র সেটাই আবার গরম হয়ে ওপরে উঠে যাবে। আবার ঠাণ্ডা বাতাস নিচে নেমে আসবে। এভাবে গরম-ঠাণ্ডা গ্যাস চক্রাকারে বেলুনের মধ্যে যাবে ও বেরোবে। এবার গ্যাসের ধর্মের কথা বলছি, 'মাত্র এক ডিগ্রি তাপেই চার শো আশি ভাগের এক ভাগ বিস্তার লাভ করাই গ্যাসের ধর্ম। কথাটাকে আরও সহজ করে বললে—গ্যাসে আঠারো ডিগ্রি তাপ প্রয়োগ করলে বেলুনের ভেতরের গ্যাস চার শো আশি ভাগের আঠারো ভাগ বেশি সম্প্রসারিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ তার আয়তন এক

www.pathagar.com

হাজার দু শো চুয়াত্তর ঘনফুট বৃদ্ধি পাবে। তাই বেলুনও সম্প্রসারিত হয়ে ততখানি স্থান দখল করবে। ব্যস, বেলুনটা তখন দ্রুত ওপরে উঠতে থাকবে।' মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে তিনি আবার মুখ খুললেন, 'দেখুন, বেলুনের ওজন না কমিয়ে, গ্যাস নষ্ট না করে কিভাবে বেলুন প্রয়োজন অনুযায়ী ওঠানো-নামানো সম্ভব হয় তার প্রয়াস বহুদিন আগে থেকেই চলছে। ইতিপূর্বে বেলজিয়ামের অধিবাসী এক ফরাসি বৈজ্ঞানিক সে-প্রয়াস চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। আমি সে পথে না গিয়ে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। খুব দরকার না হলে সামান্য ওজনের যা কিছু থাকবে তাদের কিছুই বেলুন থেকে ফেলে দেব না।'

জাহাজের অফিসারদের মধ্য থেকে একজন চোখদুটো কপালে তুলে বলে উঠলেন, 'এটা যে একটা বিরাট আবিষ্কার দেখছি !'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে ফারগুসন এবার বললেন, 'এটা মোটেই তেমন কোনো আশ্চর্যজনক ব্যাপারই নয়। বেলুনের গ্যাসকেই আমি তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে হাল্কা করে আয়তন বৃদ্ধি করে নেব। গ্যাস যখন ঠাণ্ডা হয়ে ঘন হবে তখনই বেলুনটা ভারি হবে। আর এরই ফলে ক্রমে নিচে নামতে থাকবে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে, তাই না ? বাক্সগুলোর একটায় জল থাকবে। জলে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করলেই তো অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হয়ে যাবে। জলে কিছু পরিমাণ সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে দিলেই তো হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ সমান হবে। একটা বাক্সে গ্যাস তৈরি হয়ে নল বেয়ে অন্য দুটো বাক্সে গিয়ে জমতে থাকবে। অন্য একটা খালি বাক্সে দু প্রকার গ্যাস নিয়ে এসে মিশিয়ে দেব। ইংল্যান্ডের মানুষ এ-পদ্ধতি অবলম্বন করে ঘর গরম রাখে। বেলুনের ভেতরের গ্যাসে এক শো আশি ডিগ্রি উত্তাপ প্রয়োগ করলে তা চর শো আশি ভাগের এক শো আশি ভাগ বেশি সম্প্রসারিত হবে। সে জন্য সম্প্রসারিত গ্যাস বেলুনটা ফুলে ফেঁপে ষোলো হাজার সাত শো চল্লিশ ঘনফুট বায়ুর স্থান জুড়ে অবস্থান করবে। ফলে এতে বেলুনটা ওপরে উঠে যাবে, কারণ বেলুনটা অনেক হাল্কা হয়ে যাবে। কতখানি, এই তো? বেলুন থেকে তেরো শো পাউন্ড মাল ফেলে দিলে যতখানি হাল্কা হওয়ার কথা। আর এতে যত দ্রুত ওপরে উঠবার কথা বেলুনটা ঠিক তত দ্রুতই ওপরে উঠবে। আমি তো আগেই বলেছি, বেলুনটার অর্দ্ধাংশ গ্যাস দিয়ে বোঝাই করব। তাই তো গ্যাস উত্তপ্ত না করলে বেলুন কিছুতেই ওপরে উঠবে না, বায়ুমণ্ডলে ভাসবে। ঠিক তেমনি উত্তাপ হ্রাস করলেই বেলুনটা ক্রমে নিচে নামতে থাকবে। এভাবেই বেলুনটাকে ওঠানো-নামানো করানো হবে।'

জাঞ্জিবার বন্দরে রেজলিউট জাহাজ ভিড়ল। জাহাজ ভিড়তে না ভিড়তেই চারদিকে খবরটা চাউর হয়ে গেল, খ্রিস্টানরা আসমানে উঠে সূর্য আর চাঁদের অনিষ্ট সাধন করার মতলব এঁটেছে। ব্যস, এতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাফ্রিদের ধর্মবিশ্বাসে ঘা লাগল। চটে গেল। এটাই তো স্বাভাবিক। সূর্য আর চাঁদ যে তাদের উপাস্য। তারা সাব্যস্ত করল, ছলে বলে কৌশলে তাদের অভিযান বানচাল করবেই করবে। অনন্যোপায় হয়ে বেলুনটাকে কুম্বেনি দ্বীপে সরিয়ে নিয়ে গ্যাস ভরে যাত্রার উপযোগী করে তোলা হল। বেলুন বাতাসে ভাসতে শুরু করলে তা দেখে কাফ্রিরা তো রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। কিন্তু প্রহরীদের সতর্কতার জন্য তারা বেলুনটার কোনো ক্ষতিই করতে পারল না।

www.pathagar.com

ডিক কেনেডি শেষবারের মতো ফারগুসনকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেও হতাশ হলেন। ফলে বাধ্য হয়ে বেলুন তাঁকে সহযাত্রী হতে সম্মত হতেই হল।

বেলুনের বায়ু উত্তপ্ত করে তোলায় সেটা ফুলে বিশালায়তন ধারণ করল। বেলুনটা শূন্যে ভাসতে লাগল।

যাত্রার পূর্বমুহূর্তে ফারগুসন সহ-অভিযাত্রীদের উপস্থিতিতে বেলুনটার নামকরণ করলেন 'ভিক্টোরিয়া'। নাবিকরা বেলুনের দড়ির বাঁধন খুলে দিতেই আচমকা এক হেঁচকা টানে সেটা শূন্যে অনেকখানি ওপরে উঠে গেল। রেজলিউট জাহাজ থেকে পরপর চারবার কামান দেগে অভিযাত্রীদের বিদায় সম্ভাষণ জানানো হল।

ভিক্টোরিয়া শোঁ শোঁ করে শূন্যে উঠে যেতে লাগল। একটু বাদেই সেটা পনের শো ফুট ওপরে উঠে শীতল বায়ুর কাঁধে ভর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

ক্রমে ওপরে উঠতে উঠতে ভিক্টোরিয়া পঁচিশ হাজার ফুট ওপরে উঠে গেল। পায়ের তলায় বিশালায়তন রেজলিউট জাহাজটাকে ছোট্ট একটা ডিঙি নৌকোর মতো দেখা যেতে লাগল।

বেলুন দুঘণ্টা পথ পাড়ি দিয়ে আফ্রিকার সমুদ্র-উপকূলের বরাবর পৌঁছে গেল। আকাশপথে অত্যাশ্চর্য একটা বস্তুকে উড়ে যেতে দেখে গ্রামবাসীরা প্রথমে আতঙ্কিত ও পরে ক্ষুব্ধ হয়ে সেটাকে লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে বিষমাখা তীর ছুড়ঁতে লাগল। বৃথা চেষ্টা বেলুনের গায়ে আঘাত হানা তো দূরের কথা তীরগুলো বেলুনের কাছাকাছিও যেতে পারল না।

অভিযাত্রীদের পায়ের তলার দৃশ্যাবলী এবার ঘনঘন বদলাতে লাগল। কখনও দৃষ্টিনন্দন সবুজ শস্যক্ষেত্র আর বনভূমি, আবার কখনও বা রুক্ষ-রুষ্ট পাহাড়, অভিযাত্রীদের চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। দুপুরের কাছাকাছি তাঁরা আউরিজামো রাজ্য অতিক্রম করলেন।

চোখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে ড. ফারগুসন আউরিজারা পর্বতমালাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। সামনেই ডুথুসি পাহাড়। আরও পাঁচ-ছ হাজার ফুট। ওপরে ভিক্টোরিয়াকে তুলে না নিলে পাহাড়টাকে ডিঙোনো সম্ভব নয়। তাই তাঁরা ডুথুসির ওপরেই রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

ভিক্টোরিয়া এবার বাওবাব গাছের বনের ওপর দিয়ে এগোতে লাগল। এক-একটা গাছ এমন উঁচু ও ঝাঁকড়া যে, দশ-বারোটা গাছ কাছাকাছি থাকলেই বিশাল একটা বন বলে মনে হয়। গাছের গুঁড়ি কমসে কম এক শোফুট ব্যাসযুক্ত তো হবেই। এবার দূরবর্তী জিলামোরা গ্রামটাকে দেখা গেল। আঠার শো পয়ঁতাল্লিশে ফরাসি পর্যটক সেইজান একা সেখানে যেতে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়েন। গ্রামের মোড়ল তাঁকে বাওবাব গাছের গুঁড়ির সঙ্গে পিঠমোড়া করে বেঁধে কণ্ঠনালী কেটে ফেলে, গর্দান থেকে মুণ্ড কেটে নামিয়ে দেয়। আর দেহটাকে কুচিকুচি করে কেটে ফেলে। কী বীভৎস আর নারকীয় হত্যা! হতভাগ্য সেইজানকে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে এমন নৃশংস হত্যার শিকার হতে হয়।

ডা. ফারগুসন গ্যাস উত্তপ্ত করে ভিক্টোরিয়াকে চোখের পলকে হাজার আটেক ফুট ওপরে তুলে নেন। এবার অভিযাত্রীরা অনায়াসে পাহাড়টা ডিঙিয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

ভুখুসি পাহাড়ের ওপরে গিয়ে ভিক্টোরিয়াকে নিচে নামিয়ে ড. ফারগুসন নোঙর ছুঁড়ে দিয়ে একটা গাছের মোটা ডালের সঙ্গে বেঁধে ফেললেন। সেখানেই তাঁরা রাত্রিবাস করলেন।

সকাল হল। ডিক কেনেডির গায়ে জ্বর। জ্বর দেখতে দেখতে বেশ বেড়ে গেল। এবার নোঙর খুলে দেওয়ায় ভিক্টোরিয়া জাঙ্গেমোরো গ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে চলল। ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল। একটু বাদেই অভিযাত্রীদের নাকে উৎকট গন্ধ ভেসে এল। এখানকার বায়ু এতই বিষাক্ত যে, অনভ্যস্থ ব্যক্তি মাত্রেরই গায়ে জ্বর দেখা দেয়। আসলে জঙ্গলের এখানে-ওখানে মানুষ মরে পড়ে রয়েছে। সেগুলো পচেগলে বায়ুকে বিষাক্ত করে তুলেছে। ওপরে উঠে বিষাক্ত বায়ুর এলাকা ডিঙিয়ে যেতে না যেতেই ডিক কেনেডির জ্বর কমতে শুরু করল।

ভিক্টোরিয়া এবার আকাশ ছোঁয়া রুবেহো পর্বতমালার কাছাকাছি হাজির হল। স্থানীয় লোকেরা তাদের ভাষায় রুবেহোকে বাতাসের গতি বলে। পাহাড়টা সদম্ভে এত উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যে, প্রবাহিত বায়ু এর গায়ে ধাক্কা খেয়ে অন্যদিকে ধেয়ে যেতে থাকে।

রুবেহো পর্বত পেরিয়ে ড. ফারগুসন ভিক্টোরিয়াকে মরুভূমির কাছে একটা গাছের ডালের সঙ্গে নোঙর করলেন।

ডিক কেনেডি আর জো সঙ্গে সঙ্গে গাছ বেয়ে নেমে অদূরবর্তী বনের দিকে চললেন, শিকারের আশা নিয়ে। অল্প আয়াসেই বন্দুকের গুলিতে একটা হরিণকে ধরাশায়ী করে দিল। মহা উল্লাসে জো সেটার ছাল ছাড়িয়ে মাংস ঝলসাতে লেগে গেল।

আচমকা ড. ফারগুসন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে বিপদ সঙ্কেত দিলেন। ব্যস, মুহূর্তমাত্র দেরি না করে জো আর ডিক কেনেডি ব্যস্ত-হাতে ঝলাসানো মাংসগুলো গোছগাছ করে নিয়ে ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে ছুটতে লাগল। কাছাকাছি এসেই তারা প্রমাদ গুনল অসভ্য কাফ্রিরা বেলুন আক্রমণ করেছে। কেউ গাছ বেয়ে ওপরে উঠছে আবার কেউ বা ভিক্টোরিয়ার দড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে। ড. ফরগুসন একজনকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়লেন। সে গুলিবিদ্ধ হল বটে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! হতচ্ছাড়াটা গুলি খেয়েও মাটিতে পড়ল না! লেজ দিয়ে গাছের ডাল জড়িয়ে লটকে রইল। ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল, আক্রমণকারীরা আসলে কাফ্রি টাফ্রি নয়, হনুমান। এবার ঘন ঘন বন্দুক আর পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ করতেই হনুমানগুলো জান নিয়ে পালাল।

আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। ফারগুসন নোঙর খুলে ভিক্টোরিয়াকে ওপরে তুলে নিলেন।

ভিক্টোরিয়া বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে জিহোলামোরা পর্বতমালার পশ্চিমে হাজির হল। অভিযাত্রীরা সেখানেই রাত্রিবাস করলেন।

ভোর হতে না হতেই ভিক্টোরিয়া আবার যাত্রা শুরু করল। ড. ফারগুসন আফ্রিকার মানচিত্র খুলে দেখলেন সেখান থেকে প্রায় এক শো মাইল দূরে 'কাজে' শহর।

* * *

'কাজে' মধ্য আফ্রিকার অন্তর্গত এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর। সওদাগরদের অন্যতম ব্যবসাকেন্দ্র। হাতির দাঁত, তূলো আর কাঁচের দ্রব্যসামগ্রী ব্যবসায়িরা বন্দরে পসরা সাজিয়ে বসে। আর ক্রীতদাসের ব্যবসাও এখানে খুবই রমরমা। বড় বড় সওদাগররা

www.pathagar.com

এখান থেকে হাতির দাঁত খরিদ করে আরব মুল্লুকে নিয়ে গিয়ে প্রচুর মুনাফা লোটে। 'কাজে' শহরে অকস্মাৎ ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। আকাশ থেকে কিম্ভুতকিমাকার একটা বস্তু নেমে আসতে দেখেই শহরবাসীদের মধ্যে নিদারুণ উত্তেজনা ও আতঙ্কের সৃষ্টি হল। কেউ করজোড়ে প্রণাম জানাতে লাগল, কেউবা দুহাত তুলে স্তুতিপাঠ করতে শুরু করল। আবার কেউ হাত তুলে সম্মান প্রদর্শন করতে লাগল।

এক যাদুকর আরবি ভাষায় অনেক কিছু বকে ফেলল।

ড. ফারগুসন আরবি ভাষা কিছু কিছু বোঝেন। তিনি সহ-অভিযাত্রীদের কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে বললেন, 'এখানকার মানুষরা আমাদের বেলুন ভিক্টোরিয়াকে চাঁদ ঠাওরেছে। আর আমাদের মনে করছে, চাঁদের তিনটি সন্তান। সূর্যের মুল্লুকে চাঁদের আগমনে তারা নিজেদের ভাগ্যবান ভাবছে। সূর্য এদের আরাধ্য।'

যাদুকর গলা ছেড়ে চিল্লিয়ে বলতে লাগল, 'আমাদের মহামান্য সুলতান দীর্ঘদিন রোগে ভুগছেন। আপনারা অনুগ্রহ করে নেমে এসে তাঁর রোগ নিরাময় করুন।'

ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরি না করে ড. ফারগুসন নোঙরের দড়ি বেয়ে ওষুধের বাক্সসহ নেমে গেলেন। বেলা তিনটের কাছাকাছি তিনি সুলতানের কুটিরতুল্য প্রাসাদের দরজায় হাজির হলেন। দলে দলে কাতারে কাতারে ধর্মভীরু পুণ্যলোভাতুর মানুষগুলো পথে টান টান হয়ে শুয়ে তাকে প্রণাম ও স্বাগত জানাল। সুলতানের কামরার পাশেই একটা কামরার ভেতরে দু-দুটা রূপসী যুবতী ফুরৎ ফুরুৎ শব্দে তামাক খাচ্ছে। সুলতান পরলোক গমন করলে এঁদেরও তাঁর সঙ্গে কবরস্থ করা হবে। মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়ে সুলতানের যেন সেবাযত্নের কোনো ত্রুটি না হয়, তিনি যাতে অতৃপ্ত না থাকেন সেজন্যই তো এদের জীবন্ত সমাধিস্থ করা হবে।

ড. ফারগুসন দেখলেন মৃত্যুপথযাত্রী সুলতানের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান এবং অকথ্য অত্যাচারে তার জীবনীশক্তি লোপ পেতে চলেছে। তিনি বাক্স খুলে এক দাগ ওষুধ তাঁর মুখে ঢেলে দিলেন। একটু সুস্থ হলেন বটে। কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহ, অচিরেই রোগীর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে।

সুলতানের ছেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি লম্বা লম্বা পায়ে সহযাত্রীদের কাছে ফিরে এলেন। ব্যস্ত-হাতে নোঙর খোলার চেষ্টা করতেই সুলতানের প্রাসাদের দিক থেকে মরাকান্নার স্বর ভেসে আসতে শুনলেন। ড. ফারগুসন নিঃসন্দেহ হলেন। সুলতান অক্কা পেয়েছেন। পরক্ষণেই হৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। মনে হল কিছুলোক দল বেঁধে চেঁচামেচি করতে করতে তাঁদের দিকেই ধেয়ে আসছে।

ফারগুসন মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ভিক্টোরিয়ায় চেপে গেলেন। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে নোঙরটা দিলেন খুলে। মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে ভিক্টোরিয়া এক লাফে অনেকটা ওপরে উঠে গেল। এতক্ষণ যারা বিভিন্নভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করতে এগোচ্ছিল তারা যাদুকরের কাণ্ডকারখানা দেখে একদম থ বনে গিয়ে অপলক চোখে চলমান বেলুনটার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিক্টোরিয়া বেলুনটা 'কাজে' শহরের সীমানা অতিক্রম করে গেল। এবার ধীরে ধীরে উত্তাপ কমিয়ে সেটাকে নিচে নামিয়ে আনলেন। যাদুকর চলন্ত বেলুন থেকে লাফিয়ে 'কাজে' শহরের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল।

www.pathagar.com

বাতাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে লাগল। ভিক্টোরিয়া বাতাসের চাপে উল্কার বেগে ধেয়ে চলল ফারগুসন কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'আমরা কিন্তু এখন চন্দ্ররাজ্যেই অবস্থান করছি। এখানকার মানুষ চাঁদকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করে বলে এর এমন নামকরণ হয়েছে। একদিন হয়ত এখানকার অসভ্য মানুষগুলো তাদের রাজ্যকে এমন সুন্দর করে গড়ে তুলবে যা পৃথিবীতে এক নতুন নজির সৃষ্টি করবে। ইতিহাসে কিন্তু এরকম নিদর্শন ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। এক সময় এশিয়া মহাদেশ সমগ্র মনুষ্যজাতির আদি বাসভূমি ছিল। এশিয়া কি চার শো হাজার বছর ব্যাপি নিজের সন্তানের মতো মনুষ্যজাতিকে লালন পালন করেনি, বলুন মি. কেনেডি? তারপর ক্রমে এশিয়ার রূপ বদলাতে লাগল। এশিয়ার মানুষ নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের দিকে ধেয়ে চলল। এখন এশিয়ার মতো ইউরোপের জীবনী শক্তিও ক্ষীণ হয়ে আসছে। মানুষের এবার লক্ষ্য আমেরিকা। একদিন না একদিন এ-মাহাদেশও অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়বে। আমেরিকার মানুষ আবার ছুটে চলবে আফ্রিকার দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে। জঙ্গল কেটে গড়ে তোলা হবে নগর, বন্দর আর প্রাসাদোপম সব অট্টালিকা। হয়ত একদিন এখানে এমন সব বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব ঘটবে, যার কাছে আমাদের আজকের আবিষ্কার ছেলের হাতের খেলনায় পরিণত হবে।'

এ-মুলুকে ঝড়-তুফান ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দেখা দেয়। গাছে ভিক্টোরিয়াকে নোঙর করলে ক্রমাগত আছাড় খেয়ে খেয়ে একদম অকেজো হয়ে পড়বে।

হ্যাঁ, ড. ফারগুসনের অনুমানই সত্যে পরিণত হল। বেলুনটা নিশ্চল-নিথরভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রকৃতির এমন অবর্ণনীয় থমথমে ভাব দেখে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল, ঝড়ের আবির্ভাবের পূর্বলক্ষণ। মুহূর্তে প্রলয়ঙ্কর ঝড় শুরু হয়ে গেল। আকাশের গায়ে কোনো অদৃশ্য হাত যেন বোতল বোতল কালি ছিটিয়ে দিয়েছে। সে যে কী গাঢ় অন্ধকারে চারদিক ছেয়ে গেল তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

ড. ফারগুসন প্রমাদ গুণলেন। মুর্হূতমাত্র দেরি না করে তিনি গ্যাস পাইপে তাপ প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই—কড় কড়াৎ—শব্দে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। নামল মুষলধারে বৃষ্টি। ফারগুসন আতঙ্কিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আমাদের উচিত ছিল আরও আগেই ওপরে উঠে যাওয়া। এখন তো আকাশ জুড়ে আগুনের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। ভিক্টোরিয়াও দাহ্য পদার্থে কানায় কানায় ভর্তি। যে কোনো পরিস্থিতিতে আগুন লেগে সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যেতে পারে।'

বাতাসের বেগ ক্রমে প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল। বাতাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেলুনটা বারবার ওঠানামা করতে লাগল। পরিস্থিতি এমন সঙ্গীন হয়ে পড়তে লাগল যে, যে কোনো মুহূর্তে বেলুনটার সিল্কের কাপড়ের আস্তরনটা ফেঁসে গিয়ে ধ্বংস করে দেওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ব্যস, এবার শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

ড. ফারগুসনও হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। তিনি ব্যস্ত-হাতে গ্যাসপাইপে উত্তাপ প্রয়োগ করতে লেগে গেলেন। কড় কড় রবে বাজ দশদিক কাঁপিয়ে তুলছে। বেলুনটার চারদিকে হু হু করে আগুন জ্বলতে লাগল। ফারগুসন বার বার ঈশ্বরের নাম নিতে লাগলেন। এমন প্রলয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ডিক কেনেডি আর জো যেন অকস্মাৎ বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল। শিলাবৃষ্টির ভেতর দিয়ে ভিক্টোরিয়া দ্রুত ওপরে উঠে যেতে লাগল। পনের মিনিট ধরে ক্রমাগত ওপরে উঠতে উঠতে ভিক্টোরিয়া অনায়াসেই

www.pathagar.com

ঝড়ের এলাকা অতিক্রম করে গেল। ঝড়-বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় মাথার ওপরের আকাশ ঝকঝকে চকচকে হয়ে উঠল। চাঁদের কিরণে চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিন অভিযাত্রী নিশ্চল-নিথর পাথরের মূর্তির মতো বসে অভাবনীয় দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলেন।

রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে একটু একটু করে দিনের আলো উঁকি দিতে লাগল। বায়ুর চাপে ভিক্টোরিয়া প্রবল বেগে ধেয়ে চলেছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল। উত্তাপ কমিয়ে ভিক্টোরিয়াকে বার-কয়েক গাছের ডালে নোঙর করানো হয়েছে। ডিক কেনেডি চাপা উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগলেন। হাতের কাছে শিকারের এমন ঢালাও সুযোগ পেয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বেলুনে বসে থাকতে কাহাতক মন চায়। কেবল শিকারই তো নয়, খাবার জলও তো সংগ্রহ করা দরকার। আর এখন ড. ফারগুসনের নোঙর আটকাবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

অভিযাত্রীরা আচমকা একটা ধাক্কা অনুভব করলেন। পাহাড়ে নোঙর লেগেছে ভেবে ডিক কেনেডি উল্লসিত হয়ে জোকে তাড়াতাড়ি মই আটকাতে বললেন।

না, জো মই নামাতে গিয়েও থেমে গেল। পর মুহূর্তেই নোঙরসহ বেলুনটা ছুটে চলল। মনে হল বেলুনটাকে নিয়েই পুরো পাহাড়টাই বুঝি ছুটে চলেছে। নিচের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই অভিযাত্রীদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসার জোগার হল। পায়ের তলায় কি যেন বারবার নড়াচড়া করছে।

অতিকায় কোনো সাপ ভেবে ডিক কেনেডি গুলি করার জন্য বন্দুকটাকে হাতে নিয়ে নিলেন।

ফারগুসন বলে উঠলেন, 'খবরদার! গুলি করবে না। সাপ নয়, ওটা হাতি। নোঙরের দড়িটাকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে পর্বতপ্রমাণ হাতিটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। তবু বরাত ভাল যে, অভিযাত্রীরা যেদিকে যেতে চাচ্ছে হাতিটাও নোঙরসমেত বেলুনটাকে নিয়ে সেদিকেই ছুটছে। এবার তীব্র আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে অতিকায় দাঁতালো হাতিটা ছুটছে তো ছুটছেই। আসলে তার দাঁত দুটোর ফাঁকে নোঙরটা আটকে গেছে। সাপের গলায় ব্যাঙ আটকালে যা হয়। বেলুনসমেত নোঙরটাকে নিয়ে তার পক্ষে আর ছুটোছুটি করা সম্ভব নয়, আবার নোঙরটাকেও খুলতে পারছে না। তাইতো সে আস্ফালন, লম্ফঝম্প আর দাপাদাপির চূড়ান্ত করে বেড়াচ্ছে।

ড. ফারগুসন কিন্তু হাতির ব্যাপারটা নিয়ে মোটেই উৎকণ্ঠিত নন। কুড় ল হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেগতিক দেখলেই নোঙরের দড়ি কেটে দিয়ে হাতির কবল থেকে ভিক্টোরিয়াকে মুক্ত করে নেবেন।

বেলুনটাকে নিয়ে প্রায় দেড় ঘন্টা একনাগাড়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলল দৈত্যাকৃতি হাতিটা। এবার ডিক কেনেডি আর জোর হাতের বন্দুক এক সঙ্গে গর্জে উঠল। দু-দুটো তাজা গুলি হাতির পেটের দুপাশে বিঁধল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। সে তখন যন্ত্রণায় তীব্র আর্তনাদ করতে করতে উম্মাদের মতো ছুটতে লাগল।

ড. ফারগুসন প্রমাদ গুনলেন। হাতিটা যেভাবে পাগলের মতো ছুটোছুটি দাপাদাপি করছে তাতে যে-কোনো সময় গাছের ডালে লেগে বেলুনটা ফেঁসে যেতে পারে। তাই ডিক কেনেডি ও জোকে দমাদম গুলি চালাতে বললেন।

www.pathagar.com

যন্ত্রণাকাতর হাতিটা ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগল। দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। শুঁড় আর দাঁত দুটো সমেত তার মাথাটার দাপাদাপি দেখে মনে হল, বেলুনের দোলনা বুঝি ছিঁড়ে গেল। মিনিট দু-তিনের মধ্যেই তার দাঁত দুটো ভেঙে গেল। পর্বত প্রমাণ হাতিটা এবার চার পা ছড়িয়ে এলিয়ে পড়ল। ব্যস, সব শেষ।

অভিযাত্রীরা এবার মই-বেয়ে বেলুন থেকে নেমে হাতির শুঁড়ের নরম মাংস শুকনো লতাপাতা দিয়ে ঝলসে নিয়ে পরম তৃপ্তিতে ভোজ সারলেন।

* * *

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ফারগুসন পাইপের উত্তাপ বাড়িয়ে ভিক্টোরিয়াকে শূন্যে উড়িয়ে দিলেন। বেলুনটা এবার ঘণ্টায় আঠারো মাইল গতিতে ছুটতে লাগল।

ভিক্টোরিয়া এবার কুমেরি পাহাড়ের চূড়া অতিক্রম করে কারগোরা পর্বতশ্রেণীর পাহাড় টেঙ্গার কাছে হাজির হল। নীল হ্রদের প্রথম অংশটুকু টেঙ্গা পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে যে আত্মগোপন করে রয়েছে আগেই ড. ফারগুসনের জানা ছিল।

ভিক্টোরিয়া ভাসতে ভাসতে পৃথিবীর বিখ্যাত আউকেরিউ হ্রদের ওপর দিয়ে উড়ে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেলুনটা কারাগোরার প্রধান শহরের ওপর হাজির হল। হ্যাঁ, শহরই বটে। কয়েকটা লতাপাতার কুঁড়েঘর এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শহরের মানুষগুলো চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে অতিকায় উড়ন্ত দানব ভিক্টোরিয়াকে দেখতে লাগল। এখানকার মেয়েরা এমন মোটাসোটা যে, হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় মাংস আর চর্বির অতিকায় একটা পিণ্ড বুঝি পড়ে রয়েছে। ড. ফারগুসন নিচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বললেন, 'মি. কেনেডি, এ-দেশের মেয়েদের সৌন্দর্যের বিচার হয় দৈহিক আয়তন দিয়ে। অর্থাৎ যে যত মোটা, তত সুন্দর বলে বিবেচিত হয়। আর মোটা হওয়ার জন্য শৈশব থেকেই এদেরকে বিশেষ ধরনের ঘোল খাওয়ায়।'

ভিক্টোরিয়া নায়াঞ্জা হ্রদের দিকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল। দুদিকে কেবল ছোট-বড় গাছের বিচিত্র সমারোহ। গভীর জঙ্গল। মনুষ্য বসতির চিহ্নমাত্রও নেই। হ্রদের জলে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে মনের আনন্দে সিন্ধুঘোটকরা খেলায় মেতে রয়েছে।

আরও কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর সন্ধ্যার কাছাকাছি ছোট্ট একটা দ্বীপে পক্ষীরাজ ভিক্টোরিয়ারকে নোঙর করা হল। চারদিকে যত দ্বীপ নজরে পড়ছে সবগুলোই আসলে ডুবো পহাড়ের শীর্ষদেশ। এমন একটা দ্বীপে ভিক্টোরিয়াকে নোঙর করার সুযোগ পাওয়ায় তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করলেন। কারণ, হ্রদের তীরবর্তী জঙ্গলে অসভ্য জঙ্গলিদের আস্তানা। খুবই হিংস্র। নরখাদক বলে তাদের সুখ্যাতি কম নয়।

বাড়িঘর ছেড়ে, এত কষ্ট স্বীকার করে, প্রাণটাকে হাতের মুঠোয় করে যে অপূর্ব সুন্দর দৃশ্যকে চাক্ষুষ করার জন্য চরমতম বিপদের ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে সেই নীলনদের উৎসস্থল প্রায় হাতের নাগালের মধ্যে চলে এসেছে।

এ নিয়ে কিন্তু ডিক কেনেডি বা জোর এতটুকুও উৎসাহ বা কৌতূহল নেই। তাই তারা নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

তখন ভোর চারটে বাজতে চলেছে। ড. ফারগুসন নোঙর তুলে ভিক্টোরিয়াকে আবার সচল করলেন। তীব্র বাতাসের কাঁধে চেপে ভিক্টোরিয়া এবার ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে ছুটতে লাগল। বেলা ন'টার কাছাকাছি অভিযাত্রীরা নায়াঞ্জা হ্রদের পশ্চিম পাড়ে

www.pathagar.com

পৌঁছে গেলেন। আকাশচুম্বী গাছের গভীর জঙ্গল আর অদূরবর্তী মরুভূমি ছাড়া এ-অঞ্চলে আর কিছুই নজরে পড়ল না।

ভিক্টোরিয়া আরও কিছুটা অগ্রসর হতেই ড. ফারগুসন উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন, 'মি. কেনেডি, আরবদের কথাই দেখা যাচ্ছে শতকরা এক শো ভাগ সত্যি। তারা বলেছে, একটা নদী দিয়ে বিশালায়তন আউকেরিও হ্রদের জল কুলকুল করে বয়ে চলেছে। ওই—ওই যে সেই নদী। আর ওটাই হল আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত নীলনদ।'

'নীলনদ! নীলনদ ওটা! দেখি দেখি—' কথা বলতে বলতে ডিক কেনেডি নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে নদীটাকে দেখতে লাগলেন।

নীলনদের ওপর দিয়ে ভিক্টোরিয়া বাতাসের টানে নেচে নেচে হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে। পাহাড়ের গায়ে বারবার ধাক্কা খাওয়ার তার সে কী ভয়ঙ্কর তর্জন গর্জন, অভিযাত্রীদের কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগার হল। নদীর জল গতির স্বাভাবিকতা বার বার হারিয়ে ফেলায় ফুলে ফেঁপে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে।

চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপটুকু অব্যাহত রেখেই ডক কেনেডি বলে উঠলেন, 'ড. ফারগুসন, এটাই যে নীলনদ এ-ব্যাপারে আপনি কি করে নিঃসন্দেহ হলেন? আপনার ধারণাই যে সত্যতারই বা প্রমাণ কি?'

'নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তো রয়েছেই। কিন্তু জোরদার প্রমাণ দিতে গেলে নীলনদের পাড়ে নামতে হয়। কিন্তু এখানকার মানুষগুলো যেমন হিংস্র ও নরমাংস লোভী, ভাবলেই কলজে চিপসে যায়। দেখছেন না মশাই, আমাদের দেখেই সোল্লাসে কেমন লাফালাফি জুড়ে দিয়েছে। আর তাদের তর্জন গর্জন আশা করি কিছু না কিছু কানে আসছে।'

ডিক কেনেডি বললেন, 'আমি এখানে নামব। আমাকে যে নামতেই হবে।'

'নামলে আর জান নিয়ে ফিরতে হবে না, স্মরণ থাকে যেন।'

'তবুও নামব। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে তাদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করে, তাড়িয়ে হলেও আমাকে নামতেই হবে ড. ফারগুসন।'

বাতাস উত্তপ্ত করে ফারগুসন বেলুনটাকে ওপরে তুলে নিলেন। আড়াই হাজার ফুট ওপর থেকে অভিযাত্রীরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো চারদিক থেকে সূতোর মতো নদী নীলনদে মিশে যে স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা করেছে তা মন-প্রাণ ভরে উপভোগ করতে লাগলেন।

একটু বাদেই ড. ফারগুসন সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পর্যটক ডিবোনা যে জল-প্রপাতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন সেই জলপ্রপাত আজ আমাদের চোখের সামনে, ভাবা যায়।'

ড. ফারগুসন আফ্রিকার মানচিত্রটা চোখের সামনে মেলে ধরে ভাবতে লাগলেন, 'যারা উত্তর দিক থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন তাদের আবিষ্কৃত জায়গায় তাঁরা পৌঁছোতে পারেন নি। আরও নব্বই মাইল অগ্রসর হতে পারলে তবে গণডোকোরা মিলতে পারে। তিনি এবার ভিক্টোরিয়াকে ক্রমে নিচে নামাতে লাগলেন। এখানে নীলনদ মাত্র সাত-আট হাত। কিন্তু পার্বত্য গতিপথের জন্য স্রোত খুবই বেশি।'

বেলুনটা যতই এগিয়ে চলেছে নদীও ক্রমেই চওড়া হচ্ছে। কয়েকটা কাফ্রি বিষমাখা তীর-হাতে চলন্ত ভিক্টোরিয়ার দিকে তাকিয়ে জোর হম্বিতম্বি করতে লাগল। ডিক কেনেডি বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে তাদের তাড়িয়ে দিলেন।

www.pathagar.com

ড. ফারগুসন একটু বাদে ভিক্টোরিয়াকে ছোট্ট একটা দ্বীপে নামাতে চেষ্টা করলেন। গাছের ডালে নোঙর করার উদ্যোগ নিতেই দ্বীপের প্রায় কুড়িজন কাফ্রি গাছের ছালের তৈরি টুপি নাড়িয়ে নাচানাচি জুড়ে দিল। ডিক কেনেডি বন্দুকের গুলিতে একজনের মাথার টুপি উড়িয়ে দিতেই সবাই প্রাণ ভয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিল। ঝপাঝপ নীলনদের জলে পড়তে লাগল।

অভিযাত্রীরা বেলুন থেকে নামলেন। কয়েক পা এগিয়ে পাথরের গায়ে কিসব উৎকীর্ণ দেখে সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দুটোমাত্র ইংরেজি অক্ষর 'এ' এবং 'ডি' লেখা। তিনি এবার মুখ খুললেন, 'মি. কেনেডি, 'এ' অর্থ বুঝাচ্ছে 'আন্দ্রিয়া' আর 'ডি' বুঝাচ্ছে, 'ডিবোনা'। আন্দ্রিয়া ডিবোনোই নীলনদের সবচেয়ে উত্তরসীমা পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন।'

সোল্লাসে দুই বন্ধু আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

* * *

অভিযাত্রীরা তীর্থক্ষেত্র নীলনদের উৎসস্থল দেখার পর মহানন্দে আবার ভিক্টোরিয়ায় চাপলেন। দুদিন এক নাগাড়ে চলার পর তাঁরা একটা আকাশচুম্বী গাছের দিকে তাকিয়েই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, গাছের ডালে ডালে অসংখ্য সাদা সাদা নরকঙ্কাল ঝুলছে।

এরা সবাই কোনো না কোনো কারণে পরিবার ও সমাজের চোখে অপরাধী বিবেচিত হয়েছিল। অপরাধীদের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের আহারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর তাদের কঙ্কাল এখানে এনে ঝুলিয়ে রেখে, সমাজের মানুষদের অপরাধ সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়ার জন্যই এ-ব্যবস্থা। আফ্রিকার দক্ষিণাংশের প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে, অপরাধী ও তার বৌ-ছেলে-মেয়েদের একটা ঘরে ঢুকিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে তারা তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করে।

এমন নৃশংস নারকীয় বিধানের কথা শুনে ডিক কেনেডি আঁৎকে উঠলেন।

একটু বাদে গাছের ডালে ইয়া পেল্লাই কয়েকটা ঈগল পাখি দেখে জো আতঙ্কে কাঁপতে লাগল। যে-কোনো সময় একটা মানুষকে নিয়ে এরা আকাশপথে উড়ে যেতে পারে। এমন সাক্ষাৎ যমদূতকে সামনা-সামনি দেখলে ভয়ে গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়ার কথাই তো বটে।

ভিক্টোরিয়া ধীর-মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। এমন সময় পায়ের তলায় এক অভাবনীয় দৃশ্যের দিকে অভিযাত্রীদের নজর পড়ল। দুটো দল পরস্পরের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে মেতেছে। আকাশের গায়ে শুধুই বিষমাখা তীরের আনাগোনা। মাথার ওপরে চলমান ভিক্টোরিয়াকে দেখে যুদ্ধবাজরা কর্তব্য স্থির করতে না পেরে গলা ছেড়ে হাত নেড়ে নেড়ে চেঁচাতে লাগল।

গ্যাসে তাপ প্রয়োগ করে ফারগুসন মুহূর্তের মধ্যেই বেলুনটাকে ওপরে তুলে নিলেন। পায়ের তলায় তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগল। ডিক কেনেডি অবশ্য তাদের যুদ্ধে বাধা দান করতে চেয়েছিলেন। বিপদের আশঙ্কায় ফারগুসন বেলুনটাকে যুদ্ধবাজ অসভ্য-নৃশংস জঙ্গলিদের বিষমাখা তীরের পাল্লার বাইরে নিয়ে চলে গেলেন।

www.pathagar.com

কোনো কোনো যুদ্ধবাজ শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করে তার বাহু থেকে কামড়ে কামড়ে মাংস খেতে লাগল। চোখের সামনে এমন বীভৎস নারকীয় দৃশ্য দেখে ডিক কেনেডি আঁৎকে উঠে বললেন, 'দেখছেন! দেখছেন ড. ফারগুসন, জঙ্গলিগুলো কেমন রাক্ষসের মতো মানুষের মাংস চিবোচ্ছে! পিশাচ! একেই বলে নরপিশাচ!'

কথা বলতে বলতে মাংস ভক্ষণরত লোকটাকে তাক করে ডিক কেনেডি তীব্র আক্রোশে বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়লেন।

অব্যর্থ লক্ষ্য। এক গুলিতে নরখাদকদের পিশাচ-সর্দারটা বিকট আর্তনাদ করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। মাটিতে পড়ে বার-কয়েক আছাড়ি পিছাড়ি করেই সে এলিয়ে পড়ল। ব্যস, যত হম্বিতম্বি সব খতম। এবার যোদ্ধারা নেতাহীন হয়ে পড়ায় হতাশ হয়ে পালাতে লাগল। অন্য পক্ষ নরমাংসের ভাগ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে দিল।

* * *

গাছের ডালে ভিক্টোরিয়াকে নোঙর করে অভিযাত্রীরা রাত্রি কাটাতে লাগলেন। জমাটবাঁধা অন্ধকারের জন্য তারা বুঝতে পারছেন না, কোথায় অবস্থান করছেন। অতএব সতর্কতা অবলম্বন করতেই হল। তাঁরা পালা করে ঘুমোতে লাগলেন।

ডিক কেনেডি বন্দুক-হাতে রাত্রি জেগে প্রহরায় নিযুক্ত। ড. ফারগুসন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এমন সময় ডিক কেনেডির চোকের সামনে অনুজ্জ্বল একটা আলোকরশ্মি ভেসে উঠল। পর মুহূর্তেই সেটা আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কেনেডি ভাবলেন, একী মরুভূমির মরীচিকা, নাকি অন্য কোনো অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার? এবার তাঁর মনে হল, কে যেন বাঁশি বাজাচ্ছে। চাঁদের মৃদু আলোয় অকস্মাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল কয়েকটা ছায়ামূর্তি। রহস্যজনক ছায়ামূর্তিগুলো কিন্তু নিশ্চল নয়, বরং চঞ্চল—হরদম নড়াচড়া করছে।

ব্যস্তকণ্ঠে ফারগুসন আর জোকে ডেকে তুললেন। ঝট করে বন্দুকটা হাতে করে সাধ্যমত কম শব্দ করে জোকে নিয়ে গাছের ডালে গিয়ে বসলেন।

কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই খসখস শব্দ কানে গেল। অবাঞ্ছিত সে-শব্দটা ক্রমে ওপরে, তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। সাপ, নাকি জন্তু-জানোয়ার?

জো অতর্কিতে গাছের গুঁড়ির দিকে বন্দুক তাক করল। তাতক্ষণে আরও ওপরে উঠে যাওয়ায় দেখতে পেলেন, কয়েকজন কাফ্রি সন্তর্পণে গাছে উঠছে। আর অনুচ্চ কণ্ঠে কি যেন বলছে।

ব্যস, আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে জো-এর হাতের বন্দুক গর্জে উঠল। বিকট আর্তনাদ কানে এল। কাফ্রিরা তীব্র হুঙ্কারে রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করতে লাগল। এমন সময় কোলাহল ভেদ করে যেন কার কণ্ঠ শোনা গেল। ফরাসি ভাষায় কে যেন আর্তনাদ করছে—'বাঁচাও। বাঁচাও! কে, কোথায় আছ বাঁচাও'। আকুল আবেদনে অভিযাত্রীদের রক্ত হিম হয়ে আসার জোগাড় হল।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে তিন অভিযাত্রী মিলিত হলেন। ডিক কেনেডি অন্ধকার ও অনিশ্চিত বিপদকে অগ্রাহ্য করে বিপদাপন্ন অজ্ঞাতপরিচয় ফরাসি ভদ্রলোকটিকে উদ্ধার করার জন্য যাত্রার উদ্যোগ নিলেন নইলে রাত্রির অন্ধকারেই জঙ্গলিরা তাকে হত্যা করে

www.pathagar.com

ফেলবে। বাধা দিয়ে ড. ফারগুসন বললেন, 'না, এরকমটা কিছুতেই হতে পারে না। কারণ, তাঁরা দিনের আলো ছাড়া কাউকেই হত্যা করে না। আমরা বরং বেলুনটাকে ফরাসি ভদ্রলোকটার কাছে নিয়ে যাই। তাকে এতে তুলে নিই। অনাহারে আর নির্যাতনে তাঁর ওজন অবশ্যই ষাট কেজির বেশি হবে না। বেলুন থেকে সে পরিমাণ ওজনের দ্রব্যসামগ্রী ফেলে দিলেই আমাদের চারজনকে নিয়ে এটা দিব্যি শূন্যে উড়ে যেতে পারবে।'

ড. ফারগুসনের কথায় সবাই সম্মত হলেন। এবার বেলুনের সামান্য গ্যাস ছেড়ে দিয়ে সেটাকে নিচে নামানো হল সার্চ লাইটের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে ফেলে বিপদগ্রস্ত ফরাসি ভদ্রলোক খোঁজ করতে গিয়ে অত্যাশ্চর্য এক দৃশ্য তাঁরা দেখতে পেলেন, গোটা চল্লিশেক কুঁড়েঘর, চারদিকে আখক্ষেত। কুঁড়েঘর গুলোর মাঝখানে একমাঠের মধ্যে শূল পোঁতা। শূলের গোড়ায় একটা দেহ পড়ে রয়েছে। প্রায় উলঙ্গ এক ফরাসি পাদরি। বুকের ওপর একটা ক্রুশ ধরে রেখেছে। আর শূলটাকে ঘিরে অগণিত কাফ্রি দাঁড়িয়ে। সবার চোখেই আতঙ্ক মিশ্রিত কৌতূহলের ছাপ। অদৃষ্ট বিড়ম্বিত পাদরির শরীর ক্ষত বিক্ষত। চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত ঝরছে।

ঠিক তখনই অত্যাশ্চর্য,একেবারে অবিশ্বাস্য একদৃশ্য দেখে কাফ্রিরা রীতিমতো আতঙ্কিত ও স্তম্ভিত হয়ে গেল। দেখল, আকাশ থেকে একটা অতিকায় ধূমকেতু নেমে আসছে। তারা পড়ি কি মরি করে ছুটে পালিয়ে প্রাণ বাঁচার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ল। এ সুযোগে অভিযাত্রীরা মুমূর্ষু ফরাসি পাদরিকে বেলুনে তুলে নিলেন।

ড. ফারগুসন ঝটপট বেলুনের গ্যাস উত্তপ্ত করে বেলুনটাকে শূন্যে ওঠার ব্যবস্থা করলেন। না, তবুও বেলুনটা উঠল না, বার-কয়েক নাড়াচাড়া করল মাত্র। একজন কাফ্রি বেলুনটাকে নিচে থেকে টেনে ধরে রেখেছে। ড. ফারগুসনের নির্দেশে জরের বাক্সটা ফেলে দিতেই আচমকা বেলুনটা লাফিয়ে, এক ঝটকায় প্রায় তিন শো ফুট ওপরে উঠে গেল। দুঃসাহসী কাফ্রিটা হাতের বাঁধন আলগা করে দিয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। হাড়গোড় বেঙ্গে একেবারে থেৎলে গেল।

হতভাগা কাফ্রিটা বেলুন ছেড়ে দিতেই সেটা আচমকা এক পাশে হেলে পড়ল। পর মুহূর্তেই আবার সোজা হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। ড. ফারগুসন এবার বৈদ্যুতিক তার বিচ্ছিন্ন করে সার্চ লাইটের আলোটা নিভিয়ে দিলেন।

কাফ্রিদের কাছ থেকে উদ্ধার করেও অদৃষ্টবিড়ম্বিত ফরাসি পাদরিকে যমের কবল থেকে উদ্ধার করা গেল না। তিনি শূন্যে, চলন্ত বেলুনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে ফরাসি পাদরি তাঁর অদৃষ্টের বিড়ম্বনার কথা যা বলেছিলেন। তা মোটামুটি এরকম, 'তাঁর বাড়ি ব্রিটানি প্রদেশের অখ্যাত-অবজ্ঞাত আবাভান গ্রামে। খুবই গরিব। কুড়ি বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুদূর এ-আফ্রিকায় হাজির হন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও পথ শ্রম অগ্রাহ্য করে রোজ সাধ্য মতো পথ পাড়ি দিয়ে দিয়ে শেষপর্যন্ত আফ্রিকার মাটিতে পা দিতে সক্ষম হন। ন্যামবরা জাতের কাফ্রিরা খুবই নির্মম প্রকৃতির। স্নেহ-মায়া-মমতা কি জিনিস তা তাদের অজ্ঞাত। তাদের নিষ্ঠুরতায় তিনি যে কতভাবে নির্যাতিত হয়েছেন তা বলে শেষ করা যাবে না। তিনি অবশ্য এদেশ ছেড়ে ফিরেও যেতে পারতেন। কিন্তু ধর্ম প্রচারের ব্রত নিয়ে একবার যখন দেশ ছেড়েছেন তখন আর ফেরা সম্ভব নয়। এগিয়েই চললেন। কাফ্রিরা তাকে বদ্ধ পাগল

www.pathagar.com

বলে ঠাওরাল। এরকম বিশ্বাস যতদিন তাদের মধ্যে ছিল ততদিন তিনি নিরাপদেই ছিলেন। ন্যাম্বরা জাতের মধ্য সবচেয়ে নিষ্ঠুর প্রকৃতি বারাফ্রি সম্প্রদায়ের জঙ্গলিরা। তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন তিনি কাটান। ক'দিন বাদে তাদের সর্দারের মৃত্যু হয়। তাদের বিশ্বাস, পাদরির তুকতাকের ফলেই তার মৃত্যু হয়েছে। তাই রাত্রের অন্ধকার থাকতে থাকতে তাকে শুলে চড়িয়ে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। তারপরই ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ অভিযাত্রীরা সেখানে উপস্থিত হন এবং হিংস্র আর নৃশংস বারাফ্রিদের কবল থেকে তাকে উদ্ধার করেন।'

ভিক্টোরিয়া আবার বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল। সন্ধ্যা হতে না হতেই অভিযাত্রীরা দেখলেন, পশ্চিম-আকাশের গায়ে আগুনের হল্কা।

ড. ফারগুসন কাঁপ কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন, 'আগুন! আগুন-পাহাড়! আগুন-পাহাড়ের আগুন!'

ডিক কেনেডি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'হায়!' একী সর্বনেশে কাণ্ড হতে চলেছে। বাতাস যে বেলুনটাকে আগ্নেয়গিরিটার দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'

ড. ফারগুসন তাঁকে আশ্বাস দিলেন, আগুন-পাহাড়টার ওপর দিয়েই ভিক্টোরিয়া তাদের নিরাপদে নিয়ে যাবে।

ঘন্টা তিনেক বাদে ভিক্টোরিয়া আগুন-পাহাড়টার কাছাকাছি যেতেই ফারগুসন বাতাসের উত্তাপ বাড়িয়ে সেটাকে দু হাজার ফুট ওপরে তুলে নিলেন। ব্যস, দিব্যি নিরাপদে তাঁরা আগুন-পাহাড়টাকে ডিঙিয়ে গেলেন।

রাত্রির অন্ধকার কেটে পূব-আকাশে ভোরের আলো উঁকি দিল। সকাল গড়িয়ে দুপুর হল। ভিক্টোরিয়া প্রথমে একটা পর্বত-চূড়া তারপর মরা-আগুন পাহাড়ের জ্বালামুখ, শুকনো নদীখাত, আর অতিকায় বহু পাথরের টুকরো অতিক্রম করে এগিয়ে চলল।

সকাল গড়িয়ে দুপুর আসতেই ফারগুসন গ্যাসের উত্তাপ কমাতে শুরু করলেন। উদ্দেশ্য ভিক্টোরিয়াকে নিচে নামিয়ে নিয়ে ফরাসি পাদরির মৃতদেহটা সমাধিস্থ করবেন।

ভিক্টোরিয়াকে নোঙর করে অভিযাত্রী তিনজন ঝপপট ফরাসি পাদরির মৃতদেহটা সমাধিস্থ করে ফেললেন। জায়গাটা একটা সোনার খনি। চারদিকে বহু পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছে অমূল্য খনিজপদার্থ—সোনা।

জো কিছু সোনা সঙ্গে নিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ড. ফারগুসন তার পিঠ চাপড়ে মুচখি হেসে বললেন, 'কেন মিছে ব্যস্ত হচ্ছ জো? ফরাসি পাদরির কথা ভেবেও কি বুঝছ না, সঙ্গে কিছুই যাবে না।' আর আমরা তো আর অর্থের তল্লাশে বেরোই নি। সবচেয়ে বড় কথা পকেট দুটোতে কত সোনাই বা নিয়ে যাওয়া যাবে, বল তো? তার চেয়ে বরং জায়গাটার অবিস্থিতি ভাল করে লক্ষ্য করে নাও। ইংল্যান্ডে গিয়ে সোনার কথা চাউর করে দিও। যার দরকার এখানে এসে বস্তা বোঝাই করে সোনা নিয়ে যাবে।'

জোর পীড়াপীড়িতে শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বালির বস্তা ফেলে দিয়ে তার জায়গায় সোনা তুলে নেওয়া হবে। ব্যস, আর দেরি নয় জো ঝটপট সোনা দিয়ে পাটাতনটা বোঝাই করে ফেলল।

গ্যাস গরম করা হল। বেলুন কিন্তু এতটুকুও নড়ল না। সোনার ঢেলা ফেলতে ফেলতে বেশ কিছু পরিমাণ সোনা ফেলে দিয়ে তবে ভিক্টোরিয়াকে সচল করা গেল। কিন্তু

www.pathagar.com

তার গতি খুবই মন্থর। দশদিন ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে ভিক্টোরিয়া মাত্র অর্ধেক পাড়ি দিয়েছে। সোনর পাহাড় থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল আসতে পেরেছে। অথচ সংগ্রহে থাকা, জলের পরিমাণ মাত্র ত্রিশ গ্যালন। তা থেকে ভবিষ্যতের জন্য গ্যালন পাঁচেক জল সরিয়ে রেখে যন্ত্রের জন্য রাখলেন বাকিটুকু। দুগ্যালন জল দিয়ে চার শো আশি ফুট গ্যাস, তৈরি করা যায়। প্রতি ঘণ্টার জন্য ভিক্টোরিয়ার চাই ন' ঘনফুট গ্যাস। আর মাত্র চুয়ান্ন ঘণ্টা কোনোরকমে চালিয়ে নেওয়া যাবে। জল চাই-ই চাই। কিন্তু রাত্রে আর এগোলে নদী বা ঝরণা নজরে পড়বে না। আর পানের জন্যও এখন থেকে যত কম সম্ভব জল খরচ করা দরকার।

রাত্রিটা নিরাপদে কাটিয়ে আবার বেলুনটাকে শূন্যে ওড়ানো হল। সূর্যের তেজ খুবই। ড. ফারগুসন ইচ্ছা করলে বেলুনটাকে অনেক ওপরে তুলে নিতে পারতেন। কিন্তু প্রচুর গ্যাস খরচের সম্ভাবনায় তা আর করলেন না। দুপুর পর্যন্ত মাত্র মাইল বারো পথ পাড়ি দিতে পারল বেলুনটা।

ফরাসি পাদরির জান বাঁচাতে গিয়ে এক পাউন্ড জল ফেলে না দিলে সূর্যের উত্তাপেই হাইড্রোজেন গ্যাস ফুলে উঠে বেলুনটাকে ওপরে নিয়ে যেতে পারত। দিনের শেষে সূর্য অস্ত গেরে দেখা গেল মাত্র কুড়ি মাইল পথ অভিযাত্রীরা পাড়ি দিতে পেরেছেন।

সকাল হতেই আবার প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে সূর্য পূর্ব-আকাশে উদয় হল। পায়ের তলার বালিতে সূর্যের কিরণ পড়ায় সেগুলো হীরার মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল।

এক সময় আবার রাত্রির অন্ধকার চারদিক ঢেকে ফেলল।

ড. ফারগসুন-এর মনে হতাশা জেগে উঠল। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতে লাগলেন, "মি. কেনেডি আর জোকে কেন যে সঙ্গী করতে গেলাম। এদের অকাল মৃত্যু আমিই ডেকে আনলাম। ভুল! চরম ভুল করেছি।"

সকাল হলে ড. ফারগুসন দেখলেন, জলের পরিমাণ আর মাত্র পাঁচ পাউন্ড অবশিষ্ট রয়েছে। পাঁচ শো ফুট ওপরে বেলুনটা উঠে গেলেও দেখা গেল বাতাস নেই। ওপরে বা নিচে কোথাও বাতাসের লেশমাত্র নেই।

ড. ফারগুসন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমরা এখন মরুভূমির ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছি। আফ্রিকার এক প্রান্তে জঙ্গল, শষ্যক্ষেত্র, আর খাল আর অন্যদিকে বিস্তীর্ণ মরুভূমি। প্রকৃতি দেবীর কী অদ্ভুত খেয়াল!'

এমন সময় হঠাৎ ঈশান কোণে এক টুকরো মেঘ উঁকি দিল। কিন্তু এ-মেঘের ওপর ভরসা করা যায় না। ডিক কেনেডির পরামর্শে ড. ফারগুসন ভিক্টোরিয়াকে মেঘের কাছকাছি নিয়ে গেলেন। আশ্চর্য ব্যাপার। সেখানেও বাতাসের লেশমাত্রও নেই। আসলে মেঘের মধ্যে এক ফোঁটা জলও নেই।

এমন সময় জো দূরবর্তী একটা ভাসমান বস্তুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল—'ওই—ওই যে আর একটা বেলুন শূন্যে ভেসে চলেছে!'

ড. ফারগুসন প্রথমে ওটাকে মরীচিকা, চোখের ভুল বলে উড়িয়ে দেন। কিন্তু জো এমন দৃঢ়তার সঙ্গে সেটাকে একটা বেলুন বলে দাবি করতে লাগল যার ফলে তিনি তাকে পতাকা-সঙ্কেত জানাতে বলতে বাধ্য হলেন।

ডিক কেনেডি পতাকা নেড়ে বেলুনটার উদ্দেশ্যে সঙ্কেত করতেই বিপরীত দিককার বেলুনযাত্রীরা পতাকা নেড়ে জবাব দিল।

www.pathagar.com

ড. ফারগুসন এবার মুচকি হেসে বললেন, 'মি. কেনেডি, এবার বিশ্বাস হচ্ছে তো, ওটা বেলুন নয় মরীচিকাই বটে। ওটা আসলে আমাদের বেলুনেরই ছায়া ছাড়া কিছুই নয়।'

এবার হাত নেড়ে ইশারা করে দেখা গেল বিপরীত দিককার বেলুন থেকেও একই রকম ইশারা করছে।

জো, এমন কি ডিক কেনেডি পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, ওটা মরীচিকাই বটে।

ড. ফারগুসন বললেন, 'আসলে বাতাস কমে গেলে মরুভূমিতে এমন কত ভেল্কিই যে দেখা যায় তার ইয়ত্তা নেই।'

এমন সময় এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে অভিযাত্রীরা চমকে উঠলেন। যতদূর নজর চলে কেবল মানুষের কঙ্কাল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। কয়েকটা কঙ্কাল একটা পাতকুঁয়োর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

ড. ফারগুসন চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'জলের খোঁজে মানুষ হন্যে হয়ে ছুটে আসে শুকনো পাতকুঁয়াটার ধারে। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে জল না পেয়ে তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করে। আর যারা পাতকুঁয়োটা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি তারা পথেই মারা গেছে।'

না, জল পাওয়া গেল না। সকাল হলে ফারগুসন আবার ভিক্টোরিয়াকে শূন্যে ওড়ালেন। ফারগুসন বললেন, 'সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমাদের পক্ষে আর মাত্র ছ'ঘণ্টা যাওয়া সম্ভব হবে তারপরই সব খতম হয়ে যাবে।' থার্মোমিটারে দেখা গেল, উত্তাপ এক শো তেরো ডিগ্রি। হতাশ হয়ে জো আর কেনেডি শুয়ে পড়লেন। বাঁচার আশা যখন নেই-ই তখন শেষ সময়টুকু আরাম আয়েশের মধ্যেই কাটানো যাক।

বেলা যত বাড়ছে, রোদের তেজও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই বেড়ে চলেছে। ফলে থার্মোমিটারের পারদ চোঁ-চোঁ করে বাড়তে লাগল। তৃষ্ণায় অভিযাত্রীদের কলিজা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল। পায়ের তলায় চলছে মরুভূমির নিরবচ্ছিন্ন চোখ রাঙানি। সম্বলমাত্র দু বোতল গরম জল। তবুও তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অভিযাত্রীরা অসহায়ভাবে জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো চাটতে লাগল। প্রাণ গেলেও সে জলটুকুতে হাত দেওয়ার উপায় নেই।

ড. ফারগুসন অনুশোচনায় দগ্ধে মরতে লাগ হলেন। গ্যাস তৈরি করতে গিয়ে যে-জলটুকু খরচ করেছেন তা না করলেই ভাল হত। এতে ষাট মাইল আসা গেছে বটে। কিন্তু তা না করলে আরও ন' দিন দিব্যি চলে যেত। মেঘের সঙ্গে দৌড়-প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে গিয়েই তিনি প্রমাদটা ঘটিয়েছেন।

ড. ফারগুসন শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে মেশিনে উত্তাপ সৃষ্টি করে বেলুনটাকে তুলে নিতে লাগলেন। ক্রমে সেটা বহু ওপরে উঠে গেল বটে, কিন্তু বাঞ্ছিত বায়ু পেলেন না।

শেষ! জল শেষ! মরুভূমির একমাত্র ভরসা জল, নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল। ভিক্টোরিয়া ক্রমে নামতে নামতে যেখান থেকে উঠেছিল সেটা আবার সেখানেই নেমে এল।

সূর্য তখন ঠিক মাথার ওপরে। দুপুর। সেখান থেকে ড. ফারগুসন হিসাব নিকাশ করে দেখলেন, এখান থেকে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের দূরত্ব প্রায় চার শো মাইল আর চ্যাড হ্রদ পাঁচ শো মাইলের কাছাকাছি।

www.pathagar.com

ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ভিক্টোরিয়া মরুভূমির বালি স্পর্শ করা মাত্র জো আর ডিক কেনেডির তন্দ্রা কেটে গেল। সঙ্গে বিস্কুট রয়েছে বটে। কিন্তু সেগুলো স্পর্শও করলেন না কেউ। কেবলমাত্র এক ঢোক করে জল দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিলেন।

সকাল হল। ফারগুসন দেখলেন. পানের জন্য ব্যয় করার মতো মাত্র আধ সের খানেক জল রয়েছে। সেটুকু আড়ালে সরিয়ে রাখলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে উত্তাপ বেড়ে এক শো চল্লিশ ডিগ্রিতে দাঁড়াল। জো আকুলি-বিকুলি শুরু করে দিল, 'জ্বলে গেল! গায়ে ফোস্কা পড়ে গেল!'

ডা. ফারগুসন অভয় দিতে গিয়ে বললেন, 'আরে, এত মুষড়ে পড়লে চলবে কেন! মরুভূমিতে এত গরম পড়ার লক্ষণ হচ্ছে, বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

না, তাঁর মিথ্যা প্রবোধে কোনো কাজই হল না। ডিক কেনেডি আর জো কাউকেই তিনি চাঙ্গা করতে পারলেন না। বরং কেনেডির মধ্যে অল্প অল্প করে বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল।

দিনের আলো নিভে এল। রাত্রির অন্ধকার চারদিক ছেয়ে ফেললে ড. ফারগুসন বহুভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন ডিক কেনেডি আর জোকে একটু হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়াতে। তাঁর ধারণা, এতে ডিক কেনেডির বিকারদশা কিছুটা কাটতে পারে। বৃথা চেষ্টা তাঁরা উভয়েই এলিয়ে পড়ে রইলেন। শেষপর্যন্ত ড. ফারগুসন একাই বালির ওপর দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে লাগলেন। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? একটু বাদেই তিনি বালির ওপর দুম করে আছাড় খেয়ে পড়লেন। ব্যস মুহূর্তে সংজ্ঞা লোপ পাওয়ায় চার হাত-পা ছড়িয়ে বালির ওপর পড়ে রইলেন।

সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তিনি দেখলেন, জো তার মাথার কাছে বসে। বিষণ্ন মুখে তাঁর ওপর ঝুঁকে বসে রয়েছে। সে প্রস্তাব দিল, কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে জলের খোঁজে যেতে আগ্রহী। যদি জল পায় তবেই ফিরে আসবে, নতুবা আর কোনোদিনই ফিরবে না। কিন্তু ড. ফারগুসন তার প্রস্তাবে সম্মত হলেন না।

সকাল হল। ব্যারোমিটারের দিকে দৃষ্টিপাত করে ফারগুসন দেখলেন, বায়ুচাপমানযন্ত্র ঝড়ের কোনো পূর্বাভাসই দিচ্ছে না। সূর্য তেমনি রক্তচক্ষু মেলে রয়েছে। বালিও তেমনি উত্তপ্ত, আর আকাশে মেঘের লেশমাত্রও নেই।

ডিক কেনেডি এক ঢোক জলের জন্য যারপরনাই কাতর হয়ে পড়লেন। নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে আচমকা নিজেরই একটা আঙুল কামড়ে ধরলেন। হাতের কাছে ছুরি থাকলে হয়ত শিরা কেটেই রক্ত পান করে তৃষ্ণা মেটাতে ইতস্তত করতেন না। কেবলমাত্র ডিক কেনেডিই নন, ড. ফারগুসন আর জোয়ের মধ্যেও অল্প-বিস্তর উন্মত্ততা লক্ষিত হল। ডিক কেনেডি ঝিমিয়ে পড়লেন। তাঁর পাশে ড. ফারগুসনও শুয়ে চোখ বন্ধ করে নিঃসাড় অবস্থায় পড়ে রইলেন। সুযোগ বুঝে জো এক লাফে এগিয়ে গিয়ে জলের বোতলটা বের করে গলায় ঢালার চেষ্ট করলেন। ঠিক সেমুহূর্তে ডিক কেনেডি চোখ মেললেন। বিকট আর্তনাদ করে উঠলেন, 'জল! একটু জল দাও! তৃষ্ণায় আমার কলিজাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

জো তাঁর হাতে বোতলটা তুলে দিল। দুচোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

www.pathagar.com

তিনজনই অচৈতন্য অবস্থায় সারাটা রাত্রি বেলুনের ওপর এলিয়ে পড়ে রইলেন। ভোর হল। গনগনে আগুনের পিণ্ড সূর্যটা আগুনের হল্কা ছড়াতে ছড়াতে আকাশের গায়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল। জো আর কেনেডির সংজ্ঞা ফিরে এল।

ডা. ফারগুসন নিশ্চল-নিথরভাবে বসে। দৃষ্টি দূরে, বহু দূরে—লক্ষ্যহীন।

ডিক কেনেডি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। আচমকা বন্দুকটা তুলে নিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো তার নলটা নিজের মুখে ঢুকিয়ে দিলেন। ট্রিগারে আঙুল রাখতেই জো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর হাতটা চেপে ধরল। এবার দুজনের জাপ্টাজাপ্টি শুরু হয়ে গেল।

ড. ফারগুসন তখনও পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল নিথর ও নির্বিকার।

ডিক কেনেডির হাত থেকে হঠাৎ বন্দুকটা পড়ে যেতেই বিকট আওয়াজ করে গুলিটা বেরিয়ে গেল।

ঠিক তখনই দূর দিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ড. ফারগুসন বলে উঠলেন, 'ওই —ওই দেখ, ঝড় আসছে! প্রবল বেগে ঝড় ছুটে আসছে!'

কিছু সোনা ফেলে বেলুনের ওজন কমানো হল। চোখের পলকে সূর্যটা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। কালো মেঘে দ্রুত আকাশটা ছেয়ে গেল।

ঝড় উঠল। প্রলয়ঙ্কর ঝড়। ঝড়ের দাপটে বেলুনটা এক লাফে অনেকটা ওপরে উঠে গেল। ছুটে চলল উল্কার বেগে।

তখন বেলা তিনটের কাছাকাছি। ঝড়ের বেগ কমে গেছে। অভিযাত্রীরা লক্ষ্য করলেন, পায়ের তলায় বালির পরিবর্তে এখন সবুজ বনভূমি বিরাজ করছে। মরুঝড়ের বাহাদুরি আছে বটে। বেলুনটাকে চার ঘণ্টায় দু শো চল্লিশ মাইল পথ নিয়ে চলে গেছে।

ড. ফারগুসন বেলুনটাকে নামিয়ে নিয়ে এলেন। একটা গাছে সেটাকে নোঙর করলেন। ডিক কেনেডি আর জো গাছ বেয়ে নিচে নেমে এলেন। জলের খোঁজে উম্মাদের মতো ছুটতে লাগলেন। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ, জিভ ক্ষতবিক্ষত। মাটির ওপরের ইয়া পেল্লাই বহু পায়ের ছাপ। এদিকে নজর দেওয়ার মতো মানসিকতা তাদের নেই।

হঠাৎ কিসের যেন গম্ভীর গর্জনে বনভূমি কেঁপে উঠল। একবার নয়, বেশ কয়েকবারই ভয়ঙ্কর সে গর্জনটা শোনা গেল। হ্যাঁ, অনুমান অভ্রান্তই বটে। আরও সামান্য এগোতেই তাঁরা অতিকায় একটা সিংহকে ঘন ঘন লেজ নাড়তে দেখতে পেলেন।

ডিক কেনেডি যন্ত্রচালিতের মতো বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে ট্রিগারে চাপ দিতেই সিসার গুলিটা ক্রোধোম্মত্ত সিংহটার গায়ে আঘাত হানল। বিকট আওয়াজ তুলে দশাসই সিংহটা মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। বার-কয়েক আছাড়ি পিছাড়ি করেই হিংসা জানোয়ারটা নিশ্চল-নিথর হয়ে গেল।

সামনেই একটা জলাশয় দেখে ডিক কেনেডি এক লাফে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঢক ঢক করে গলা পর্যন্ত জল পান করলেন। পরম শান্তিতে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। তাঁর মনে হল এত স্বস্তি বুঝি জীবনে আর কোনোদিন পান নি। তিনি হাতের বোতলটায় জল ভর্তি করে নিয়ে উঠে এলেন।

এমন সময় একটা সিংহী প্রবল হুঙ্কার দিয়ে তাঁদের ঠিক মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেটা ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নেওয়ার আগেই ডিক কেনেডি তাকে গুলিবিদ্ধ করলেন। একটা নয়। পর পর তিন-তিনটা সিসার গুলি ক্রোধোম্মত্ত সিংহীটার গায়ে

www.pathagar.com

গেঁথে দিলেন। সিংহীটা এসেছিল তার সঙ্গী সিংহটার হত্যার বদলা নিতে। কিন্তু তাকেও প্রাণ হারাতে হল।

ডিক কেনেডি আর জো মুহূর্তমাত্র দেরি না করে, ছুটতে ছুটতে বেলুনটার কাছে ফিরে এলেন। জলভর্তি বোতলটা ড. ফারগুসনের হাতে তুলে দিলেন।

বহু আকাঙ্ক্ষিত জল পেয়ে অভিযাত্রীরা অনেকটা সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। সকাল হল। না অভিযাত্রীরা উপযুক্ত বাতাস না পাওয়ায় বেলুনটাকে হাল্কা করার জন্য আরও কিছু সোনা ফেলে দিতে বাধ্য হলেন।

পরের দিন ভোর হতে না হতেই আবার প্রবল ঝড় উঠল। ঝড়ের দাপটে বেলুনটা এক লাফে অনেকখানি ওপরে উঠে গেল। মরুভূমি ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল। সুবিশাল একটা হ্রদের ওপর দিয়ে ভিক্টোরিয়া উঠে যেতে লাগল।

সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ড. ফারগুসন একটা গাছের সঙ্গে ভিক্টোরিয়াকে নোঙর করলেন। ভোর হতেই আবার নোঙর খুলে নতুন করে যাত্রা শুরু করলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ভিক্টোরিয়া মোসাইয়া শহরের ওপরে হাজির হল। অতি মনোরম শহর মোসাইয়া। শহরের দুদিকে পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে যেন শহরটার প্রহরায় নিযুক্ত। প্রধান শেখকে পথ দিয়ে শোভাযাত্রা করে যেতে দেখা গেল। ড. ফারগুসন কৌতূহল বশত শোভাযাত্রার ওপর ভিক্টোরিয়াকে নামিয়ে আনলেন। মাথার ওপরে কিম্ভূতকিমাকার বেলুনটাকে দেখে আতঙ্কে শেখের অনুগামীরা যে যেদিকে পারল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করল। শেখ সাহেব কিন্তু পালাল না। পথের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে—'খোদা মেহেরবান! খোদা মেহেরবান! বলে আকুলি বিকুলি করতে লাগল। তাঁর বিশ্বাস,এটা নির্ঘাৎ খোদাতাল্লাই ব্যাপার স্যাপার।

ড. ফারগুসন সহ-অভিযাত্রীদের লক্ষ্য করে বললেন, 'এক সময় মেজর ডেনহ্যাম এ-দেশে এসেছিলেন। তার সর্বস্ব লুট হয়ে গিয়েছিল। কোনোরকমে পিতৃদত্ত প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে পেরেছিলেন তিনি। এবার আমাদের গতি বার্মিমি রাজ্যের দিকে। কেউ কেউ বলে সে-দেশে এক সময় তিনি নাকি সেখানেই খুন হয়েছিলেন। আবার কারো কারো মতে তিনি সেখানে আমৃত্যু বন্দী জীবন-যাপন করেছিলেন।

ভিক্টোরিয়া এবার 'সারি' নদীর ওপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। সামনেই কার্ণাক শহর। এখানে পর্যটক টুলির গর্দান নেওয়া হয়। কেউ কেউ একে 'ইউরোপের সামাধিক্ষেত্র' বলে।

শহরের এক বিশাল প্রান্তরে ক্রীতদাসের বাজার দেখা গেল। ক্রীতদাস কেনাবেচা চলছে।

ড. ফারগুসন বেলুনটাকে বেশ কিছুটা নিচে নামিয়ে আনলেন। সেটাকে দেখেই নগরপাল অস্ত্রহাতে তর্জন গর্জন করতে করতে প্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। উদ্দেশ্য, বেলুনের সঙ্গে এক হাত লড়াই করে শক্তির পরিচয় দেবেন। ড. ফারগুসন বুঝলেন, এরকম যুদ্ধবাজ শয়তানদের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। বাতাস কোথায় যে, বেলুনটাকে ওপরে তুলে নেবেন। মাটি থেকে কিছু ওপরে সেটা নিশ্চল-নিথর ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। নিচে দাঁড়িয়ে ক্রোধোম্মত্ত নিগ্রোরা হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার চেঁচামেচির মাধ্যমে আস্ফালন করতে লাগল। এত

লম্ফঝম্পেও যখন বেলুনটা পালাল না তখন তীর—ধনুক হাতে একদল নিগ্রো ছুটে এসে সেটাকে তাক করে তীর ছোঁড়ার উদ্যোগ নিতে লাগল।

ড. ফারগুসন গ্যাস গরম করে খুবই ধীর গতিতে বেলুনটাকে ওপরে তুলে নিতে লাগলেন। নগরপাল কর্তব্যস্থির করতে না পেরে একটা বন্দুক নিয়ে এসে বেলুনটার দিকে তাক করে গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরি হলেন। ঠিক সে-মুহূর্তেই ডিক কেনেডির বন্দুক থেকে একটা গুলি ছুটে এসে তার হাতের বন্দুকটাকে দিল বেঙে। ব্যাস, নিগ্রোরা এবার প্রাণের মায়ায় পড়ি কি মরি করে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটতে লাগল।

মাঝ-রাত্রে অত্যাশ্চর্য এক দৃশ্য দেখা গেল। রাশি রাশি আগুনের গোলা যেন ভিক্টোরিয়ার দিকে ধেয়ে আসতে দেখা গেল। মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। নিগ্রোরা অসংখ্য শাদা পায়রার লেজে আগুন ধরিয়ে ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিয়েছে। উদ্দেশ্য, আকাশ-দানবদের আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলা।

কিন্তু পায়রাগুলো যমদূতাকৃতি অতিকায় বেলুনটাকে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ফারগুসন বিপদ বুঝে তৎক্ষণাৎ কিছু ওজন ফেলে দিয়ে বেলুনটাকে দ্রুত গতিতে আরও ওপরে তুলে নিলেন। পায়রাগুলো ঘন্টা দুই এলোমেলোভাবে আকাশে দাবড়ে বেড়িয়ে এক সময় দলবেঁধে নিচে নেমে গেল। বেলুনযাত্রীরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

ড. ফারগুসন ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'মি. কেনেডি, আমরা আঠারোই এপ্রিল জাঞ্জিবার থেকে যাত্রা করেছি। আজ বারোই মে। আশা করছি, আর দশ দিনের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যেতে পারব।'

অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে ডিক কেনেডি বললেন, 'দশ দিনের মধ্যে? কিন্তু কোথায় পৌঁছে যাবার কথা বলছেন?'

ড. ফারগুসন বললেন, 'তা-তো জানি না।'

বেলা ন'টার কাছাকাছি সারি নদীর ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে ভিক্টোরিয়া চ্যাড হ্রদের দক্ষিণ পাড়ে উপস্থিত হল। সেটার এগিয়ে চলা অব্যাহত রইল। দুপুর একটার কাছাকাছি কৌফা শহরের কাছে হাজির হল। বেলুন এবার চ্যাড হ্রদের ওপর দিয়ে উঠে চলতে লাগল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অতিকায় এক ঝাঁক বিশেষ জাতের বাজপাখি ভিক্টোরিয়ার কাছাকাছি চলে এল। ডিক কেনেডি বন্দুক বাগিয়ে গুলি করার জন্য তৈরি হয়ে পড়লেন।

ড. ফারগুসন বললেন, 'মি. কেনেডি, লড়াই করার জন্য তাদের বন্দুকের দরকার পড়ে না। কী কদর্য আর অতিকায় চেহারা দেখেছেন! ঠোঁটগুলো এত লম্বা আর তীক্ষ্ম যে, লড়াই করার জন্য সেগুলোই যথেষ্ট।' ক্রোধোন্মত্ত পাখির দল ফুঁসতে ফুঁসতে ভিক্টোরিয়াকে ঘিরে বৃত্তাকারে এগোতে লাগল।

ড. ফারগুসন বেলুনটাকে আরও ওপরে তুলে নিলেন। আশ্চর্য! পাখিগুলোও সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল।'

ডিক কেনেডি বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল রাখতেই ড. ফারগুসন তার হাত চেপে ধরে বলে উঠলেন, 'ক'টাকে মারবেন মশাই! চৌদ্দটা পাখির মধ্যে একটাও যদি সুতীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে বেলুনের গায়ে আঘাত হানে তবে সিল্কের কাপড়টাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে এক মিনিটও সময় লাগবে না। তবে পরিণামে কি ঘটবে একবারটি ভেবে দেখেছেন কি?'

www.pathagar.com

ড. ফারগুসন—এর কথা শেষ হতে না হতেই একটা পাখি ভিক্টোরিয়ার দিকে তেড়ে এল। অনন্যোপায় হতে তিনি গুলি চালাবার হুকুম দিতে বাধ্য হলেন। সেটা গুলিবিদ্ধ হয়ে বিকট আর্তনাদ করতে করতে, শূন্যে পাক খেতে খেতে নিচে পড়ে গেল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে পড়ল। ক্রোধোন্মত্ত পাখিরা ঠোঁট দিয়ে বেলুনটাকে ফাঁসিয়ে দিল। সেটা চোখের পলকে নিচে নামতে লাগল। সর্বনাশ ঘটতে চলেছে। অভিযাত্রীরা বেলুন থেকে দমাদম ওজন ফেলে দিতে লাগলেন। কিন্তু এতেও বেলুনটার নিম্নগতি রোধ করা সম্ভব হল না।

জো হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাজ করে বসল। অতর্কিতে বেলুন থেকে লাফিয়ে পড়েই উর্দ্ধশ্বাসে হ্রদের দিকে ছুটতে লাগল। জো বেলুন ছাড়তেই হাল্কা হাওয়ায় সেটা তড়াক করে লাফিয়ে প্রায় এক হাজার ফুট উঠে গেল। বেলুনের ছেঁড়া রেশমের ভেতর দিয়ে বাতাস ঢুকে সেটাকে উল্কার বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলল।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডিক কেনেডি বললেন, 'প্রভুভক্ত ভৃত্য জো আমাদের বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।'

জোর জন্য ড. ফারগুসন কাতর হয়ে পড়লেন। তাকে ফিরে পাবার জন্য তাঁর মধ্যে নিদারুণ অস্থিরতা দেখা দিল। কিন্তু তাকে তো আর ফিরে পাবার উপায় নেই। সে যে সেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছে।

* * *

ভিক্টোরিয়া দমকা বাতসের টানে ঘন্টায় ষাট মাইল উড়ে এসে হ্রদের উত্তর পাড়ে হাজির হল। ফারগুসন বহু কায়দা কসরৎ করে একটা গাছের সঙ্গে সেটাকে নোঙর করলেন।

সকালের আলো ফুটলে দেখা গেল বহুদূর পর্যন্ত শুধুই কাদা ছড়িয়ে রয়েছে।

দিগন্ত বিস্তৃত হ্রদের জলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ডিক কেনেডি বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন, 'ড. ফারগুসন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জো মরে নি, নিশ্চয়ই সে বেঁচে আছে। সে আমাদের কাছে ফিরে আসবেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ড. ফারগুসন বললেন, 'ঈশ্বর যেন তাই করেন। তাকে ফেলে রেখে, বেলুনটাকে হাল্কা করে ওপরে তুলে বাঁচতে আমি চাই না। মরতে হয় তিনজন এক সঙ্গেই মরব।'

এবার তাঁরা দীর্ঘ চারঘন্টা একনাগাড়ে কঠোর পরিশ্রম করে ভিক্টোরিয়ার গা থেকে সিল্কের আবরণটা খুলে ফেললেন। ফলে সাড়ে ছয় শো পাউন্ড ওজন কমে গেল। দেখা গেল হতচ্ছাড়া পাখিগুলো সিল্কের কাপড়টা ফাঁসিয়েছে বটে। কিন্তু বেলুনটা অক্ষতই রয়েছে। এবার দিনের অবিশষ্ট সময়টুকু দুই বন্ধু বিশ্রাম আর জো-এর চিন্তায় ডুবে রইলেন।

সকাল হল। বরাত ভাল, বাতাস হ্রদের দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে। অতএব ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে আবার হ্রদটার দক্ষিণ তীরে, যেখানে জো তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, তাঁরা সেখানে হাজির হলেন। উভয়েরই বিশ্বাস, বেলুনটাকে দেখতে পেলে ছুটে আসবেই। এবার সেটাকে অল্প উঁচুতে রেখে বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করতে লাগলেন। কিন্তু না, বেচারা জোয়ের দেখা তাঁরা পেলেন না।

www.pathagar.com

দমকা বাতাস পেয়ে কারম দ্বীপের ওপরে ভিক্টোরিয়া হাজির হল। এখানেও বার-কয়েক বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে তাঁরা হতাশ হলেন জোয়ের ফেরার কোনো লক্ষণই দেখতে পেলেন না।

দুপুর গড়িয়ে গেল। দুটো বেজে গেছে। তবুও বাতাসের গতি পরিবর্তিত না হওয়ায় ড. ফারগুসন মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। ভাবলেন, তবে কি আবার সেই মরণ-ফাঁদ মরুভূমিতে গিয়ে পড়তে হবে। বেলুনটাকে তুলতে তুলতে তিনি প্রায় হাজার ফুট ওপরে নিয়ে গেলেন।

রাত্রির অন্ধকার নামার আগে এক বাঁশ ঝাড়ের মাথায় বেলুনটাকে নোঙর করলেন। রাত্রি তিনটার কাছাকাছি দমকা বাতাস বইতে লাগল। ফলে বারবার বাঁশগাছের ওপরেই বেলুনটা আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। ব্যাপার দেখে ড. ফারগুসনের রক্ত হিম হয়ে আসার উপক্রম। সিল্কের কাপড়ের আবরণহীন বেলুনটার যে কোনো সময় বাঁশের কঞ্চির আঘাতে ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যস, তবেই সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

ড. ফারগুসনের নির্দেশে ডিক কেনেডি বেলুনের নোঙর খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় সেটা প্রায় তিন শো ফুট ওপরে উঠে গেল। বাতাসের গতির বিপরীত দিকে সেটাকে সামান্যতমও ফেরানোর ক্ষমতা ড. ফারগুসনের নেই। বাধ্য হয়েই তিনি হাত গুটিয়ে বসে রইলেন।

বেলুনটা ঝোড়ো হাওয়ায় তীরের মতো উড়ে চলল। উড়তে উড়তে এসে হাজির হল বোনাদ-উল জেরিদ মরুভূমির ওপরে।

সাহারা মরুভূমি। ভিক্টোরিয়াকে আর নোঙর করার উপায় নেই। অকস্মাত ভয়ঙ্কর এক দৃশ্যের মুখোমুখি হলেন অভিযাত্রী দুজন। বিশাল এলাকা জুড়ে মরুভূমির বালি পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ঘূর্ণিবাত্যা। একদল মরুযাত্রী ঘূর্ণিবাত্যার কবলে পড়ে নাস্তানাবুদ হতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটতে লাগল এক মর্মান্তিক কাণ্ড। বায়ুর দ্বারা সৃষ্টি টিবির মধ্যে বেচারা মরু-পথিকদের জীবন্ত সমাধি হতে লাগল। মর্মান্তিক দৃশ্যটা চাক্ষুষ করে দুই বন্ধু বার বার আঁৎকে উঠতে লাগলেন।

মরণফাঁদ সাহারার ওপর দিয়ে বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে অনবরত চক্কর খেতে খেতে বেলুনটা এগিয়ে যেতে লাগল।

ড. ফারগুসন উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এ কী! যা আশা করেছিলাম, কার্যত তাই যে ঘটতে চলেছে! যে দেশে কোনোদিন যাব না ভেবেছিলাম সেদিকেই যে আমরা এগিয়ে চলেছি! তবে কি ঈশ্বর সত্যই আমদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন? জোকে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেবার জন্যই সেখানে আবার নিয়ে চলেছেন।

*　*　*

এদিকে জো বেলুন থেকে লাফিয়ে নেমে চ্যাড হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। জল থেকে মাথা তুলে দেখল, ভিক্টোরিয়া তড়াক করে লাফিয়ে ওপরে উঠে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছে। খুশীতে তার মনটা নেচে উঠল। প্রভুকে প্রাণে বাঁচাতে পেরে নিজের জীবন ধন্য জ্ঞান করল সে।

এবার জো জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড সূর্যটার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার চিন্তা করতে লাগল। একটু আগে বেলুন থেকে যে-দ্বীপটাকে সে দেখতে পেয়েছিল সেদিকেই উম্মাদের মতো সাঁতার কাটতে লাগল। প্রায় দেড় ঘণ্টা জলের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই করে সে দ্বীপটার

www.pathagar.com

কাছে আসতে পারল। বেলুন থেকে গাছের গুঁড়ির মতো কয়েকটা কুমিরকে দ্বীপের গায়ে শুয়ে থাকতে দেখেছিল। সেগুলোর ভয় এখন তাকে পেয়ে বসল। হঠাৎ কি যেন একটা জলে আলোড়ন সৃষ্টি করে তার গা-ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। কুমির? হ্যাঁ, কুমিরই বটে। সে সেটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল।

জো দুরু দুরু বুকে উন্মাদের মতো সাঁতার কাটতে লাগল। হটাৎ মনে হল কে যেন তার পা দরে টানছে। ভয়ে কাঠ হয়ে যাবার জোগার হল। ভাবল, নির্ঘাৎ কুমিরের কবলে পড়েছে। মৃত্যু অনিবার্য। মরার আগে মৃত্যুদূতকে একবারটি চাক্ষুস করার জন্য চোখ দুটোকে সামান্য ফাঁক করতেই সে চমকে উঠল। দেখল, গাট্টাগোট্টা কুচকুচে কালো দুটো নিগ্রো তাকে তীরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

নিগ্রো দুটো জোকে তাদের পল্লীতে নিয়ে গেল। বাঁশ-কাঠের তৈরি একটা কুঁড়ে ঘরে কয়েদ করে রাখল। দীর্ঘ সময় ধরে অমানুষিক পরিশ্রম আর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় তার শরীর এলিয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমে বিভোর হয়ে পড়ল। মাঝরাত্রে বরফের মতো ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়ায় তার ঘুম ভেঙে গেল। চোখের পলকে কুঁড়েঘরটা জলে ভরে গেল। মরিয়া হয়ে জো বেড়া ভাঙতে লাগল। অমিত শক্তি যেন তার শরীরে ভর করেছে। বেড়াটা ভেঙে উন্মাদের মতো সাঁতার দিতে লাগল। সামান্য গিয়েই সে গাছের সঙ্গে বাঁধা একটা ডিঙি দেখতে পেল। ভাবল, ঈশ্বরই বুঝি তার জন্য এটাকে এখানে রেখে দিয়েছে। ডিঙিটার বাঁধন খুলতেই প্রবলবেগে হ্রদের দিকে এগিয়ে চলল।

জো প্রমাদ গুনলো। কোনোক্রমে হ্রদের জলে গিয়ে পড়লে জলোচ্ছ্বাসের ফলে চোখের পলকে নৌকা শুদ্ধ সে জলে তলিয়ে যাবে। সাঁতার কাটার সুযোগই পাবে না। ভাসতে ভাসতে একটা গাছের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে ঝট করে সেটাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে ফেলল। ঝটপট তার ওপরে উঠে গেল।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই জো-এর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবার উপক্রম হল। ওপরের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখল, যে-গাছের ডালে সে বসে আছে তার ডালপালা জুড়ে সাপের মেলা। রাত্রের অন্ধকারেও হিস হিস শব্দ শুনতে পেয়েছিল। এখন বুঝল, ব্যাপারটা কি? কেবল সাপই নয়। হাজারে হাজারে লালে লাখে ইয়া পেল্লাই পেল্লাই জোঁকও কিলবিল করছে। কয়েকটা সাপ ফণা তুলে তার দিকে এগোতে চেষ্টা করতেই সে বরাত ঠুকে নিচে লাফিয়ে পড়ল। না, চোখ তেমন লাগেনি। এবার সে চোঁ-চাঁ দৌড় জুড়ল।

সামান্য এগিয়েই জো সতর্ক হয়ে পড়ল। অজানা-অচেনা বন। কোথায়, কোন্ বিপদ ঘাপটি মেরে রয়েছে তাই বা কে জানে?

রাত্রির অন্ধকার নেমে আসতেই হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের তর্জন-গর্জন শুরু হয়ে গেল। সাহস করে জো আবার একটা গাছে উঠে রাত্রি কাটাল।

ভোরের আলো ফুটতেই জো হাঁটা জুড়ল। কিছু দূর যেতেই একটা ঝোপের ফাঁক দিয়ে কয়েকটা নিগ্রোকে তার দিকে বিষমাখা তীর বাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। তার বুকের ভেতরে কোনো অদৃশ্য হাত যেন ঘন ঘন হাতুড়ি পিটতে শুরু করল। আশ্চর্য ব্যাপার! কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিগ্রোগুলো কি যেন ভেবে সেখান থেকে গুটিগুটি সরে পড়ল।

www.pathagar.com

এদিকে চ্যাড হ্রদের মাত্র সত্তর-আশি হাত ওপরে আকাশযান ভিক্টোরিয়া অবস্থান করতে লাগল। সেখান থেকে ড. ফারগুসন আর ডিক কেনেডি অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে জোর খোঁজ করে চলেছেন।

ভিক্টোরিয়া বাতাসের চাপে ধীর মন্থর গতিতে পূর্বদিকে এগিয়ে চলেছে। জো সেটাকে দেখেই গলা ছেড়ে চিৎকার করতে করতে সেটার দিকে নজর রেখেই হরদম ছুটতে লাগল। কিন্তু হায়! বেলুনের আরোহীরা তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন না। তাকে নজরেও পড়ল না।

এদিকে ব্যস্ততা আর অন্যমনস্কতার জন্য তার আর কোনোদিকে খেয়াল নেই। কখন যে সে হ্রদের কাদার মধ্য দিয়ে ছুটতে শুরু করেছে বুঝতেই পারে নি। মুহূর্তের মধ্যেই হাঁটু অবধি কাদার মধ্যে ঢুকে গেল। পরমুহূর্তেই কোমর পর্যন্ত সিঁধিয়ে গেল। মৃত্যু সুনিশ্চিত ভেবে জো গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দিল। কেউ-ই তার কান্না শুনে ছুটে আসা তো দূরের ব্যাপার, সাড়া পর্যন্ত দিল না।

এদিকে ভিক্টোরিয়া প্রবল বাতাসের চাপে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই হ্রদ-অঞ্চল ছাড়িয়ে মরুভূমির ওপরে চলে এসেছে। বেলুনযাত্রীরা দেখলেন, আট-ন' মাইল দূরে একদল ঘোড়সওয়ার অন্য একজন ঘোড়সওয়ারকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। না, তাড়িয়ে নিয়ে নয়, তার পিছু নিয়েছে। তারা সংখ্যায় কম হলেও জনা পঞ্চাশেক তো হবেই।

ড. ফারগুসন বেলুনটাকে নিচে নামিয়ে আনতেই চমকে উঠলেন। আতঙ্কে তাঁর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। দেখলেন, সবার আগে আগে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে তাঁর ভৃত্য ও সহ-অভিযাত্রী জো। বেদুইন দস্যুরা তাকে তাড়া করেছে। তিনি ঝটপট গ্যাসের তাপ কমিয়ে দিয়ে বেলুনটাকে আরও নিচে নামিয়ে আনলেন। ডিক বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতেই বেদুইন দস্যুরা থমকে গেল। আতঙ্কে ওপরের দিকে ঘাড়-ঘুরিয়ে তাকিয়েই কিম্ভূতকিমাকার বেলুনটাকে দেখেই সবাই ভড়কে গিয়ে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পালাতে লাগল।

ড. ফারগুসন বেলুন থেকে দড়ির মই নামিয়ে দিলেন। জো ঘোড়ার পিঠে বসেই মইটাকে আঁকড়ে ধরল। সাধ্যমত ব্যস্ততার সঙ্গে মই-বেয়ে তড়তড় করে ওপরে উঠতে লাগল।

জোর সর্বাঙ্গে অসংখ্য ক্ষত। কোনো কোনোটা থেকে এখনো চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত ঝরছে। প্রায় উলঙ্গ দেহে সে প্রভুর সামনে হাজির হল।

জো কোমর সমান কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিল ঠিক তখনই একটা গাছের শেকড়কে ঝুলে থাকতে দেখল। হাত বাড়িয়ে সেটাকে কোনোরকমে আঁকড়ে ধরে গাছটায় উঠে গেল। তার কয়েকটা ডাল হ্রদের জল-কাদা থেকে অনকেটা দূর অবধি ছড়িয়ে ছিল। জো একটা ডাল বেয়ে বেয়ে কাদার এলাকার বাইরে গিয়ে নেমে পড়ল। এবার সে পুনরায় হাঁটতে লাগল। কিছুদূর যেতেই কয়েকটা ঘোড়াকে ঘাস খেতে দেখে এক লাফে তাদের একটার পিঠে চেপে বসল। ব্যস, দিল ঘোড়া হাঁকিয়ে। ঘোড়া চুরি করে পালাতে দেখে বেদুইন দস্যুরা দলবেঁধে তার পিছু নিল।

ভিক্টোরিয়া আবার এগিয়ে চলল। দুতিন দিন এক নাগাড়ে চলার পর অভিযাত্রীরা টিম্বাকটু শহরের ওপরে হাজির হল। পর্যটক বার্থ-এর আঁকা মানচিত্রটা বের করে ড. ফারগুসন শহরটার সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন। ত্রিভুজাকৃতি শহরটা বাস্তবিকই ভারি সুন্দর তিনটে সুদৃশ্য মসজিদও তাঁরা দেখতে পেলেন।

www.pathagar.com

ড. ফারগুসন বললেন, 'টিম্বাকটু এক সময় খুবই সমৃদ্ধশালী শহর ছিল। এগারো শতক থেকে বহু শক্তিমান শাসক একে দখল করে নিজের অধীনে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। আজও সে চেষ্টার বিরাম নেই। এ-অঞ্চল সবচেয়ে উন্নতি করেছিল ষোলো শতকে। প্রমাণ পাওয়া গেছে, সে-আমলের আহম্মদ বালার গ্রন্থাগারে ষোলো শোর বেশি হাতে-লেখা পুঁথি ছিল। আজ সে টিম্বাকটু শহর ধ্বংসস্তূপের সামিল।'

অত্যধিক গরমের জন্য বেলুনটার জায়গায় জায়গায় সামান্য গলে গেছে। তাই তিরতির করে গ্যাস বেরোচ্ছে।

তাই বেলুনের কিছু জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে হাল্কা করে নেওয়া হল। তবু সেটাকে বেশি ওপরে নিয়ে যাওয়া গেল না। গ্যাস অনবরত বেরিয়েই চলেছে।

ভোরবেলা ভিক্টোরিয়া টিম্বাকটু শহর থেকে ষাট মাইল দূরবর্তী নাইজার নদীর ধারে হাজির হল। এবার কিছু দরকারি জিনিসও বেলুনটা থেকে ফেলে না দিয়ে পারা গেল না। আবার কিছুটা ওপরে উঠে দুচারটে পাহাড় ডিঙিয়ে সেটা অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল।

বেলুনটা আবার কেবলই নিচে নামতে লাগল। ডিক কেনেডি আতঙ্কিত হলেন। বেলুনটা বুঝি ফুটোই হয়ে গেছে। তার ওজন আরও কমিয়ে ফেলার জন্য তাঁবুটাকেও ফেলে দেওয়া হল। বেলুনটাকে নামানোর উপায়ও নেই। এখানকার মানুষগুলো জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও হিংস্র।

সামনে আকাশছোঁয়া এক পাহাড়। যে-কোনোভাবে সেটাকে ডিঙোতেই হবে। ফলে বাধ্য হয়ে একদিন চলার মতো জল রেখে বাকি সবটুকু জল ফেলে বেলুনটাকে আরও হাল্কা করে ফেলা হল। সামান্য ওপরে ওঠা গেল বটে। বটে। কিন্তু আরও পঞ্চাশ-ষাট ফুট ওঠা দরকার। অনন্যোপায় হয়ে মেশিনের ভেতরের জলটুকুও ফেলে দেওয়া হল। এখন পানীয় জলের পাত্রগুলোকেও এক-এক করে ফেলে দেওয়া হল।

না, এতকিছু করেও বুঝি পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়া থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। বেলুনটা গিয়ে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ল বলে।

কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে জো অতর্কিতে বেলুন থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু এবার সে বেলুনের দোলনাটা ছাড়ল না, শক্ত করে ধরে ঝুলতে ঝুলতে বেলুনের সঙ্গেই এগোতে লাগল। অভিযাত্রীরা কোনোরকমে পাহাড়টা ডিঙোতে পারলেন। জো বেলুনে উঠে এল।

সামনেই একটা নদী। নদীটা পেরোতে হলে বেলুনের ওজন আরও অনেক কমাতে হবে। উপায়ন্তর না দেখে সাড়ে ন' শো পাউন্ড গ্যাস গরম করার যন্ত্রটাকেই তারা ফেলে দিতে বাধ্য হলেন।

নদীটা পেরিয়ে ভিক্টোরিয়া এবার এক গভীর জঙ্গলের গাছের ওপর নোঙর করছে।

রাত্রি তখন দুটোর কাছাকাছি। ড. ফারগুসন ও জো একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছেন। ডিক কেনেডি বন্দুহাতে প্রহরায় নিযুক্ত। হঠাৎ তিনি দেখলেন, পায়ের নিচের জঙ্গল দাউদাউ করে জ্বলছে। তাঁর বুঝতে অসুবিধা হল না, স্থানীয় অসভ্য জঙ্গলিরা তাঁদের পুড়িয়ে মারার মতলব এঁটেছে।

www.pathagar.com

ডিক কেনেডি ব্যস্ত হয়ে ড. ফারগুসনকে ঘুম থেকে তুললেন। চোখ মেলে তাকিয়েই তিনি ব্যাপারটা সম্বন্ধে আঁচ করে নিতে পারলেন। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে নোঙর তুলে দিয়ে বেলুনটাকে ওপরে নিয়ে চলে গেলেন।

বেলা বেড়েই চলেছে। দস্যুরা কিন্তু তখনও বেলুনটাকে নজরে রেখে রেখে ছুটতে লাগল।

ডিক কেনেডি বন্দুকহাতে জঙ্গলিদের দিকে তাক করে বলে রইলেন। বেলুনটা আর একটু নেমে বন্দুকের আওতার মধ্যে এলেই বরাত ঠুকে দমাদম গুলি চালিয়ে দেবেন। শেষপর্যন্ত করতেও হল তাই। দু-চারটে জঙ্গলিকে খতম করতেই বাকিরা প্রাণভয়ে পড়ি কি মরি করে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগল।

ভিক্টোরিয়া এবার গুইল জলপ্রপাতের ওপর এসে পড়ল। পাহাড়ের গা-বেয়ে বিপুল জলরাশি এগিয়ে এসে আচমকা বহু নিচে অবস্থিত খাদে আছাড় খেয়ে পড়ছে। জলের সে কী গর্জন! অভিযাত্রীদের কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগার হল।

ড. ফাগুসন কোটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট ছুরি বের করে বেলুনটার তলদেশে একটা ফুটো করে দিলেন। ব্যস, তার ভেতরে যেটুকু গ্যাস অবশিষ্ট ছিল তাও ভুস ভুস আওয়াজ করে বেরিয়ে গেল। এবার শুকনো ঘাসপাতা দিয়ে আগুন জ্বাললে গরম বাতাস হুর হুর করে তার ভেতরে ঢুকে সেটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলল।

বিপদ পায়ে পায়ে। জঙ্গলের মধ্যে দস্যুর দল হাঁকডাক করতে লাগল তারা কাছে আসার আগেই আগুনসৃষ্ট গরম বাতাসে বেলুনটা পূর্ণ হয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। অভিযাত্রীরা দড়ির মই বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে গেলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বেলুনটা তাঁদের নিয়ে বেশ কিছুটা ওপরে, ডাকাতদের একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল। বরাতের জোর আছে বটে। নইলে নির্ঘাৎ দুর্ধর্ষ ডাকাতদের হাতে তিন-তিনজন অভিযাত্রীকেই অসহায়ভাবে প্রাণ খোয়াতে হত। মিনিট দশেকের মধ্যেই বেলুনটা কোনোরকেম জলপ্রপাতটাকে ডিঙিয়ে এল। এবার পাহাড়ের গা-বেয়ে নেমে আসা জলের কাছাকাছি আসতেই বেলুনটা আলতোভাবে দোল খেতে খেতে জলে নামতে লাগল। ঠিক সে মুহূর্তেই অভিযাত্রীরা তাঁদের বহুদিনের আশ্রয়স্থল বেলুনটা থেকে লাফিয়ে নেমে গেলেন। বেলুনটা ঝপ করে জলে আছড়ে পড়ল। চোখের পলকে এগিয়ে গিয়ে সেটা জলপ্রপাতে হারিয়ে গেল।

কয়েকজন ফরাসি সৈন্য পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে বিস্ময়ভরা চোখে অভিযাত্রীদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। এবার ব্যস্তপায়ে তারা পাহাড় বেয়ে করর্মদনের জন্য ফারগুসনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি কি ড. ফারগুসনের সঙ্গেকথা বলছি?'

ডা. ফারগুসন করমর্দন সারতে সারতে মুচকি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ,আপনার অনুমান অভ্রান্তই বটে। আমিই ড. ফারগুসন।' এবার সহঅভিযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওনারা আমার বেলুন ভিক্টোরিয়ার সঙ্গী।'

'অনুগ্রহ করে দূর্গে চলুন। খবরের কাগজের পাতায় আপনাদের অভিযানের কথা আমি আগেই পড়েছি।'

ড. ফারগুসন সহ অভিযাত্রীদের নিয়ে লেফটেন্যান্টের সঙ্গে ফরাসি দূর্গের দিকে পা বাড়ালেন।

www.pathagar.com

অফ অন এ কমেট

ক্যাপ্টেন হেক্টর সারভাদক ফরাসি সৈন্যবাহিনীর অফিসার পদে লিপ্ত। তিনি আলজিরিয়ার অন্তর্গত মোস্টাগানেম অঞ্চলে অবস্থানের সময় এক নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সে নারীর নাম মাদাম দ্য এল। একে সে রূপ-সৌন্দর্যের আকর, তার ওপর অভিজাত পরিবারে মেয়ে। অতএব তাঁর পাণিগ্রহণের জন্য উপযুক্ত পাত্রের অভাব থাকার কথা নয়। অভাব ছিলও না। ফলে তাঁর রূপের মোহে পাগল হয়ে ক্যাপ্টেন সারভাদক ও কাউন্ট টিমাসচেফ নামে দুই সুপুরুষ দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হন। উভয়েই ম্যাডাম দ্য এলকে বিয়ে করার জন্য অত্যুগ্র আগ্রহী। তাঁরা উভয়েই সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভুত এবং সুপুরুষ। আর বীরত্বের দিক থেকেও কেউ কারো থেকে কোনো অংশে কমতি নন।

একদিন সমুদ্র তীরবর্তী এক নির্জন নিরালা স্থানে কাউন্ট টিমাসচেফ ক্যাপ্টেন সারভাদককে অনুরোধ করলেন তাঁর পথ আগলে না থেকে মাদাম দ্য এল-এর কাছ থেকে সরে গিয়ে তাঁকে পথ করে দিতে। ক্যাপ্টেন তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। যেকোন উপায়ে তিনিই মাদাম দ্য এলকে বিয়ে করে পত্নীরূপে পেতে চান। পেতে তাঁকে হবেই, পাবেনও।

ক্রোধোন্মত্ত কাউন্ট গস গস করতে করতে বললেন, 'বহুৎ আচ্ছা! তবে তরবারির মুখোমুখি হয়ে আপনি পথ ছেড়ে দেন কিনা দেখাই যাক।'

স্থির হল আগামীকাল, পয়লা জানুয়ারি সকাল নটায় উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হবেন। রক্তপাতের মাধ্যমেই উভয়ের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হবে।

ক্যাপ্টেন এবার ঘোড়া নিয়ে নিজের বাসস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছে অধঃস্তন কর্মী বেনজুফ। ক্যাপ্টেন তার সঙ্গে কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে করতে পথ চলতে গিয়ে লক্ষ্যই করেন নি যে, আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন কবিতা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আস্তানায় হাজির হলেন। একটা কুঁড়ে ঘর—তাঁর মাথাগোঁজার জায়গা। আঞ্চলিক ভাষায় একে 'গারবি' বলে।

ক্যাপ্টেন সারভাদক তাঁর প্রেয়সীকে নিয়ে কবিতা রচনা করে চলেছেন। ব্যস, প্রলয়ঙ্কর ঝড় শুরু হয়ে গেল। প্রবল ঝড়ে গারবিটা ভেঙে চুড়ে ভূমিস্যাৎ হয়ে গেল। আর ক্যাপ্টেন ও বেনজুফ মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। কয়েক ঘন্টা উভয়েই নিশ্চল-নিথরভাবে এলিয়ে পড়ে রইল।

প্রভুর আর ভৃত্য যখন সংজ্ঞা ফিরে পেল তখন সূর্য উঠছে। ক্যাপ্টেন বললেন, 'হ্যাঁ রে বেনজুফ, এ কেমন ব্যাপার হল! সূর্য কি আজকাল পশ্চিমদিকে ওঠে নাকি রে?'

বার-কয়েক এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বেনজুফ দ্বিধা জড়িত গলায় বলল, 'হ্যাঁ, কথাটা তো ঠিকই বলেছেন কত্তা। এ কেমন হল!'

আসলে আছাড় খেয়ে পড়ার জন্য উভয়েরই মাথায় ভয়ানক আঘাত লেগেছিল। তবে কি আঘাতজনিত কারণে উভয়েই পাগল হয়ে গেছে? তা যদি নাই হবে তবে উভয়েই একই সঙ্গে এরকম অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখবে কেন?

www.pathagar.com

হ্যাঁ, সূর্য যে উদিত হচ্ছে এতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নেই। কিন্তু পূর্বে, নাকি পশ্চিমে এটাই বুঝে ওঠা সমস্যা।

অভাবনীয় কাহিনীর সূত্রপাত এভাবেই হল।

ক্যাপ্টেন সারভাদক আশ্চর্য ধাতের মানুষ বটে। তা না হলে অবিশ্বাস্য সূর্যোদয় চাক্ষুষ করার পরও তাঁর মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের শখ অব্যাহত কি করে থাকা সম্ভব ? তিনি কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালেন। তরবারি হাতে এগিয়ে চললেন দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য নির্দ্ধারিত স্থানের উদ্দেশ্যে। ভৃত্য বেনজুফ নীরবে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল।

কিছুদূর যেতে না যেতেই তাঁরা একেবারেই অবিশ্বাস্য এক ঘটনার মুখোমুখি হলেন। যা ঘটল তা দেখে প্রভু-ভৃত্য উভয়েরই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবার জোগাড় হল।

উভয়ে পা-চালিয়ে এগিয়ে চলেছে। অবিশ্বাস্য তুলকালাম কাণ্ডের ফলে ঘোড়া দুটো রশি ছিঁড়ে চম্পট দিয়েছে। অতএব তাদের হেঁটেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য নির্দ্ধারিত স্থানটার উদ্দেশ্যে যেতে হবে।

এ কী অবিশ্বাস্য কাণ্ড রে বাবা! অভাবনীয় এক অনুভূতিতে উভয়েরই শরীরের সব ক'টা স্নায়ু এক সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল। রোমগুলো খাড়া হয়ে গেল। একী-ব্যাপার, শরীরটা অস্বাভাবিক হাল্কা মনে হচ্ছে যে! গ্যাস-বেলুনের মতো শরীরটা বুঝি হাল্কা হয়ে গেছে। তাদের শরীর দুটো বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে, কেবলমাত্র মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে চলেছে। এ কী অলৌকিক কাণ্ডরে বাবা!

কিছুদূর যেতে না যেতেই তাদের সামনে একটা ডোবা পড়ল। উভয়ে এক লাফ দিয়েই সেটা পার হতে পারবে ভেবে ছোট্ট করে একটা লাফ দিল। ব্যাপার দেখে তারা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সামান্য লাফ দিয়েই তারা যেন প্রায় ত্রিশ ফুট ওপরে উঠে গেল।

বেনজুফ চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বলল, 'কত্তা, এ কী অদ্ভুত কাণ্ড বলুন তো !'

ক্যাপ্টেন তার প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'সত্যই আমরা যে অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছি! আমরা উভয়েই কি তবে পাগল হয়ে গেলাম! নাকি ঘুমিয়ে আবোল তাবোল স্বপ্ন দেখছি ?'

ভৃত্য বেনজুফ অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল, 'হ্যাঁ, যা হোক কিছু যে ঘটছে এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। তবে পাগল হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।' এবার অতি সন্তর্পণে ক্যাপ্টেন পাহাড়টার ওপর পৌঁছোলেন।

কাউন্ট ? কই কাউন্ট তো এখনও এলেন না। কিন্তু কাউন্ট তো কাপুরুষ নন। ভয়-ডর কাকে বলে তাঁর জানা নেই। মৃত্যুভয় তাকে কোনোদিনই কাবু করতে পারেন নি। আজ পর্যন্ত কারোর সঙ্গে কথার খেলাপ করেন নি। তবু তিনি কেন যে এলেন না ক্যাপ্টেন ভেবে পেলেন না। পর মুহূর্তেই তিনি ভাবলেন, কাউন্ট নির্ঘাৎ কোনো না কোনো আকস্মিক বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন। এরকম চিন্তা করে ক্যাপ্টেন কিছু সময় সেখানে অপেক্ষা করাই সাব্যস্ত করলেন।

বৃথা আশা। শেষপর্যন্ত ক্যাপ্টেন তাঁর সঙ্গী বেনজুফকে নিয়ে আশ্রয়স্থল গারবিতে ফিরে এলেন।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন এবার বেনজুফকে নিয়ে ঘোড়া দুটোর তল্লাশি করতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে বেনজুফ বলল, 'কত্তা, এ কী আজব কাণ্ড, বলুন তো! সূর্যটা গেল কোথায় ? সকাল থেকে সেটা একী রসিকতা শুরু করল!'

ক্যাপ্টেন পশ্চিম-আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে বুঝলেন, সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। তিনি যেন নিজের চোখ দুটোর ওপরও ভরসা করতে পারছেন না। মাত্র তো ছ' ঘণ্টা আগেই সূর্যোদয় হয়েছে। এরই মধ্যে সূর্যাস্ত? একী সর্বনাশা কাণ্ড ! দিনের দৈর্ঘ্য কি তবে আজ থেকে হঠাৎ করে এত কমে গেল!

ছয় ঘণ্টা বাদে আবার সূর্যোদয় হল। অবিশ্বাস্য! একেবারেই অবিশ্বাস্য কাণ্ড!

বেনজুফ ঘোড়া দুটোকে ধরে নিয়ে এল। তাঁরা ঘোড়া হাঁকিয়ে শেলিফ নদীর পাড়ে উপস্থিত হলেন।

হায়! শেলিফ নদীটাই বা গেল কোথায়। এটা যে সমুদ্র। দিগন্ত প্রসারিত সমুদ্র। আকস্মিক ভাবে আবির্ভূত একেবারে এক নতুন সমুদ্রের পাড়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে।

চোখের তারায় জমাটবাঁধা বিস্ময়ের ছাপ এঁকে সদ্য গজিয়ে ওঠা সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বেনজুফ ভাবতে লাগল, একী যাদুর খেলা, নাকি ডাইনির কারসাজি ? তবে কি চোখের ভুল, নাকি এটা উম্মাদদশা? সে এবার প্রভু ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কত্তা, এ কী কাণ্ড! নদীর ওপারের বাড়িঘর, পুরো শহরটাই তবে জলের তলায়, কি বলেন?'

ক্যাপ্টেন কোনো জবাব না দিয়ে আকস্মিক উদ্ভুত পরিস্থিতিটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে সমুদ্রের বরাবর এগিয়ে চললেন। ভৃত্য বেনজুফ তাঁকে অনুসরণ করে চলল। দুই অশ্বারোহী এগিয়ে চলল সমুদ্রের তীর ঘেঁষে।

ক্যাপ্টেন ও বেনজুফ যত দেখছে, ততই বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়ছে। বাড়িঘর আর জনমানবের চিহ্নও কোথাও নেই। সমুদ্রের বুকে জলযানের চিহ্নও নেই। অন্যান্য প্রাণীরও নামগন্ধ নেই। আর যাদুকরের যাদুকাঠির দৌলতে সূর্য পশ্চিমদিকে উদিত হচ্ছে, পূর্ব দিকে অস্ত যাচ্ছে ? কোন যাদুবলে নদী সমুদ্রে পরিণত হয়ে যাচ্ছে?

সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ক্যাপ্টেন বললেন, 'বেনজুফ ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, আমরা ছাড়া আর একজনও আজ জীবিত নেই।'

অনন্যোপায় হয়ে সমুদ্রের তীর বরাবর তাঁরা দিনের পর দিন ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে চললেন। জঙ্গল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে উদর পূর্তি আর গাছের তলায় শুয়ে রাত্রি যাপন করতে লাগলেন। মনুষ্য বসতির চিহ্নও কোথাও নজরে পড়ে নি। কদিন বাদে এক ঝুপড়ি ঘর দেখে তাঁরা ঘোড়া থেকে নামলেন। কয়েক পা এগিয়েই থমকে গেলেন। সবিস্ময়ে ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন, 'এ কী, এ যে আমাদেরই ঝুপড়িটা!'

ব্যাপার দেখে বেনজুফ তো রীতিমতো ভড়কে গেল। ভাবল, আলেয়া বা ভূতের পাল্লায় পড়ে নি তো! তাদের পাল্লায় পড়লে অনবরত একই জায়গায় চক্কর মারতে হয়। তা যদি নাই হবে তবে বিপরীত দিকে ঘোড়া ছুটিয়েও আবার একই জায়গায় কি করেই বা পৌছল ?

আসল রহস্যটা এবার ক্যাপ্টেনের চোখে ধরা পড়ল। তিনি বুঝলেন, দ্বীপের মধ্যে তাঁরা বন্দী হয়ে পড়েছেন। আর তাঁরা, প্রভু-ভৃত্য ছাড়া দ্বীপে আর তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই।

www.pathagar.com

অস্থিরচিত্ত বেনজুফ চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কত্তা, এ যে মহাসমস্যার কথা হল! এ পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় কি বলুন তো ?'

'বেনজুফ,এত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে কেন ? ধৈর্য ধর, মনকে শক্ত করে বাঁধ। এ ছাড়া অন্য কোনো পথও তো আমাদের সামনে খোলা নেই। আজ না হোক কাল জাহাজের দেখা মিলবেই। আমরাও মুক্তি পেয়ে যাব।'

জানুয়ারি মাস এল। চনমনে রোদ। সূর্যের তেজ গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। জানুয়ারি মাসে অসময়ে সূর্যের এত তেজ ক্যাপ্টেনকে বিস্মিত করল।

বেনজুফ দূরবীণটা চোখের সামনে ধরে রেখেই বলল, 'কত্তা, আমি কিন্তু বলব, আমরা সূর্যের দিকে এগোচ্ছি। তাই সূর্যের তেজ গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে।'

ক্যাপ্টেন এক মুহূর্ত নীরব চাহনি মেলে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'তোমার কথাই ঠিক বেনজুফ। আমরা ইতিমধ্যেই সূর্যের অনেক কাছে চলে এসেছি। আমার মনে হচ্ছে, আমরা আসলে শুক্র গ্রহের দিকেই এগিয়ে চলেছি। কাল রাত্রি লক্ষ্য করেছিলাম, শুক্রগ্রহ যেন ক্রমেই বড় হয়ে আসছে।'

বেনজুফ এবার আর দূরবীণটাকে চোখের সামনে থেকে না সরিয়ে পারল না। চোখ দুটো কাপালে তুলে সে বলে উঠল, 'এ কী ভয়ঙ্কর কথা বলছেন কত্তা! আমরা কি তবে শুক্রগ্রহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ব নাকি?'

'কিছুমাত্রও অসম্ভব নয়। শেষ মেশ আর একটা মহা প্রলয়ের মুখোমুখি আমাদের হতে হচ্ছে।'

কার্যত কিন্তু তা ঘটল না। মহাশূন্য অতিক্রম করে তাঁরা শুক্রগ্রহ থেকে কুড়ি লক্ষ মাইল দূরে হাজির হল। কক্ষপথ স্পর্শ না করে, এমন কি সেদিকে অগ্রসর না হয়ে উড়ন্ত ভূখণ্ডটা ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল। ধাক্কা লাগার আর কোনো সম্ভাবনাই থাকল না। এক সময় শুক্রগ্রহটা রইল পিছনে পড়ে।

দুদিন বাদে বেনজুফ সমুদ্র পর্যবেক্ষণের কাজে মেতে গেল। এক সময় সে চেঁচিয়ে উঠল, 'কত্তা! কত্তা! ওই দেখুন—জাহাজ! জাহাজ এগিয়ে আসছে!'

ক্যাপ্টেন এতক্ষণ গম্ভীর মুখে বসেছিলেন। জাহাজের কথা কানে যেতেই যন্ত্রচালিতের মতো তড়াক করে লাফিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দূরবীণটাকে চোখে লাগিয়ে রেখেই বললেন, 'বেনজুফ, জাহাজটাকে আমি চিনি। খুবই পরিচিত। ওটার নাম 'ডোব্রিয়ানা'। কাউন্ট চিমাসচফ ওটার মালিক।'

ডোব্রিয়ানা ক্রমে এগোতে এগোতে এক সময় নোঙর করল। জাহাজ থেকে নেমে এল একটা ডিঙি। কাউন্ট চিমাসচফ সিঁড়ি বেয়ে ডিঙিতে নামলেন। কাউন্ট ডিঙি চেপে এ দ্বীপে এসে নামলেন। লেফটেন্যান্ট প্রোকোপও তাঁর সঙ্গেই দ্বীপের মাটিতে পা রাখলেন।

দ্বীপে অকুতোভয় ক্যাপ্টেন সারভাদাককে দেখেই তিনি বিস্মিত হলেন। মুহূর্তের মধ্যেই বিস্ময়ের ঘোরটুকু কাটিয়ে বললেন, 'ক্যাপ্টেন, আমার অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত—ক্ষমা প্রার্থী।

এতক্ষণে দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা ক্যাপ্টেনের মনে পড়ল। তবু তিনি ব্যাপারটাকে চাপা দিয়ে ব্যস্ত ভরে বলে উঠলেন, 'কাউন্ট ও-প্রসঙ্গ এখন চাপা থাক। আগে বলুন দেখি, আমাদের হয়েছেটা কি ?'

www.pathagar.com

কপালের চামড়ায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ এঁকে কাউন্ট বললেন, 'ব্যাপারটা যে কি ঘটেছিল তা আমিও বুঝে উঠতে পারছি না। তবে যেটুকু জানি, একত্রিশে ডিসেম্বর রাত্রি ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে আমার জাহাজ ডোব্রিয়ানা ডুবু ডুবু হয়ে পড়েছিল। অবিশ্বাস্য ভুতুড়ে কাণ্ডও একে আখ্যা দেওয়া চলে। একমাত্র পরমায়ু ছিল বলেই পিতৃদত্ত জীবনটা রক্ষা পেয়েছে, মনে করতে পারেন। তবে অতি প্রাকৃতিক বা অলৌকিক কোনো ব্যাপার-স্যাপারও একে বলতে পারেন। তারপর থেকেই অনবরত ভেসেই চলেছি। জনবসতি তো দূরের ব্যাপার। কোনো দ্বীপ, মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীই এখনো অবধি চোখে পড়ে নি। এইদ্বীপ আর আপনাদেরকেই আমি প্রথম দেখি।'

ক্যাপ্টেন এবার কাউন্টকে নিয়ে সাগরে টহল দিতে বেরোলেন। উদ্দেশ্য, যদি কেউ কোথাও জলবন্দী হয়ে থাকে তবে উদ্ধার করা।

এদিকে বেনজুফ দ্বীপটার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রইল। যদি আর কোনো জাহাজ আসে তবে খবরাখবর লেনদেনের দায়িত্ব তার ওপর বর্তেছে।

ডোব্রিয়ানা জাহাজটা সারভাদাককে নিয়ে এগিয়ে চলল গভীর সমুদ্রের দিকে। প্রতি ছ' ঘণ্টা অন্তর সূর্য উদিত হচ্ছে, আবার অস্তও যাচ্ছে ছ-ঘণ্টা অন্তরই। এভাবে পর্যায়ক্রমে দিন-রাত্রির মধ্য দিয়ে জাহাজটা এগিয়ে চলল অকূল সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে।

একদিন ক্যাপ্টেন সবিস্ময়ে বললেন, 'বলুন তো কাউন্ট, ব্যাপারটা কেমন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে না ? আলজিরিয়া দেশটা গেল কোথায় ?'

চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে কাউন্ট বললেন, 'কেবল আলজিরিয়ার কথাই বা বলছেন কেন? আমার বিশ্বাস, পুরো আফ্রিকাটাই বুঝি সমুদ্র গহ্বরে তলিয়ে গেছে।'

একটা মহাদেশ পুরোপুরি জলে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কার কথা শুনে ক্যাপ্টেনের চোখ তো ছানাবড়া হয়ে যাবার জোগার হল।

ক্যাপ্টেন প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'গেছে, সব গেছে! সব তলিয়ে গেছে! পৃথিবীর প্রলয়ঙ্কর দৃশ্য, ধ্বংসস্তূপ দেখে হা-পিত্যেশ করার জন্য কেবলমাত্র আমাদের জিইয়ে রাখা হয়েছে।'

এক ভোরে জাহাজের কাপ্তেন সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল, 'ডাঙা! ডাঙা! ডাঙা দেখা যাচ্ছে! ওই-ওই যে ডাঙা।'

কাউন্ট হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে যে-দৃশ্যের মুখোমুখি হলেন তাতেই তাঁর চক্ষু স্থির। মহাদেশটা জলে তলিয়ে গিয়ে, নিশ্চিহ্ন হয়ে নতুন এক ভূখণ্ড আত্মপ্রকাশ করেছে। পাহাড়ের একটা চূড়া জলের তলদেশ থেকে ক্রমে মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠছে। একী অবিশ্বাস্য কাণ্ডরে বাবা!'

ডোব্রিয়ানা এগিয়ে চলেছে। অকস্মাৎ প্রবল ঝড় উঠল। সমুদ্র উত্তাল-উদ্দাম। যেন মুহূর্তের মধ্যে মহাপ্রলয় শুরু হয়ে যাবে। ডোব্রিয়ানা-র যাত্রীরা ঈশ্বরের নাম করতে লাগল।

কাপ্তেন কর্তব্য স্থির করতে না পেরে জাহাজটাকে সাধ্যমত তীব্র বেগে ছুটিয়ে দিলেন। যমদূতের মতো একটা পাহাড় সমুদ্রের বুকে সদম্ভে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। কয়েক মুহূর্তে জাহাজটা তার গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। অস্থিরচিত্ত কাউন্ট অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে তাকিয়ে দেখলেন, পাহাড়টার গায়ে কিছুটা ফাঁক রয়েছে। একটা জাহাজ গলে যাওয়ার মতো জায়গা। তিনি ভাবলেন, প্রবল ঝড়ের

www.pathagar.com

মুহূর্তে এরকম সঙ্কীর্ণ ফাঁকা জায়গা দিয়ে জাহাজ চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা বিপজ্জনক ব্যাপার। তবে কোনোক্রমে জাহাজটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিতে পারলে ঝড় ও ঢেউ উভয়ের হাত থেকেই অব্যাহতি পাওয়া যাবে।

অভিজ্ঞ লেফটেন্যান্ট খুবই কৌশলে ও সন্তর্পণে পাহাড়ের ফাঁক টুকুর ভেতর দিয়ে জাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। জল এখানে শান্ত, ঝড়ের তাণ্ডব নেই বললেই চলে। আর নেই অলৌকিক শক্তির বৃথাই আস্ফালন। খাড়ির ভেতরে তাদের প্রবেশাধিকার নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড়-জল থেমে গেল। রোদ দেখা দিল—ঝলমলে রোদ।

অকস্মাৎ কে যেন সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল, 'দ্বীপ! দ্বীপ! ওই যে, দ্বীপ দেখা যাচ্ছে!'

লেফটেন্যান্ট জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে দ্বীপটার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। একটু বাদেই জাহাজ থেকে একটা নৌকো নেমে গেল। কাউন্ট আর সারভাদাক নৌকায় নেমে গেলেন। জাহাজটা নোঙর করে দাঁড়িয়ে রইল।

ক্যাপ্টেন নৌকা ছেড়ে পারে পা দিতেই দেখলেন, বৃটিশ সেনাবিভাগের দুজন অফিসার সামনে দাঁড়িয়ে। পিছনে পাহাড়ের শীর্ষ দেশে একটা দুর্গ। আর সমুদ্রের দিকে মুখ করে একটা অতিকায় কামান বসানো।

ক্যাপ্টেন সারভাদাকও একজন সেনাবিভাগের অফিসার। সেনাবিভাগের পোশাক তার গায়ে। তাই বৃটিশ সেনাবিভাগের অফিসার দুজন তাঁকে অভিবাদন করলেন। করমর্দন সারতে সারতে ক্যাপ্টেন বললেন, 'সমপদাধিকারীর সঙ্গে করমর্দনের আনন্দ যে এত, তা আগে জানতাম না! যাক গে, বলুন তো শুনি, কোনো খবর আছে কি?'

এবার তিনি তাঁদের কাছে কাউন্ট চিমাসচেফ-এর পরিচয় দিলেন।

বৃটিশ অফিসার নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে সঙ্গী অফিসারটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'উনি মেজর স্যার জন টেম্পল অলিফান্ট আর আমি নিজে কর্নেল হেলেজ ফিঞ্চ মফি।'

কাউন্ট চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'গত জানুয়ারি থেকে একটার পর একটা অলৌকিক ঘটনা যে ঘটে চলেছে তা আপনাদেরও অজানা নয়। এমন অত্যাশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য ঘটনা বা বিপদ পৃথিবীতে এর আগে আর কোনোদিনই ঘটে নি। এক কথায় পৃথিবীর ইতিহাসে এটা বিরল ঘটনা। আসলে প্রলয়ঙ্করের কিছু কিছু ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ব্যস, তার পর থেকেই আমরা জাহাজ নিয়ে অনবরত চক্কর মেরে চলেছি। মানুষ আছে এরকম স্থলভূমি এই প্রথম আমাদের চোখে পড়ল।'

ক্যাপ্টেন সারভাদাক অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে বললেন, 'ইউরোপ, লণ্ডন শহরের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ রয়েছে কি, বলুন তো?'

'না। মোটেই না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি শীঘ্রই লণ্ডন থেকে জাহাজ এসে এখানে নোঙর করবে।'

চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে ক্যাপ্টেন সারভাদাক এবার বললেন, 'ইংল্যাণ্ডের অস্তিত্ব আদৌ আছে কি?'

'আছে। অবশ্যই আছে। আপনি তো এখন ইংল্যাণ্ডের ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে। এটা জিব্রাল্টার।'

www.pathagar.com

চোখ দুটো কপালে তুলে ক্যাপ্টেন সারভাদাক বলে উঠলেন, 'জিব্রাল্টার! এটা জিব্রাল্টার! জিব্রাল্টার তো ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকে অবস্থিত! কিন্তু আমরা যে পশ্চিমদিক বরাবর জাহাজ চালিয়েছিলাম!'

আবারও গভীর রহস্যের জালে তাঁরা জড়িয়ে পড়লেন। কি করে এ রহস্যভেদ করবেন?

কাউন্ট জাহাজের অফিসারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলেন, সব মিলিয়ে প্রায় চৌদ্দ শো মাইল পথ তাঁরা অতিক্রম করে এসেছেন। কাউন্ট এবার সারভাদাককে বললেন, 'আশা করি ব্যাপারটা মাথায় গেছে? আমরা আলজিরিয়া থেকে পূর্বদিকে যাত্রা করেছিলাম। সুয়েজ খাল, লোহিত সাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর আমাদের যাত্রাপথে পড়া উচিত ছিল। এতকিছু ডিঙিয়ে আসার পর তবেই জিব্রাল্টার পড়ার কথা ছিল। কিন্তু কার্যত দেখছি, আমরা ফিরে এসেছি ভুমধ্যসগারে। তা-ও চৌদ্দশ মাইল মাত্র পথ অতিক্রম করার পর।'

সারভাদাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বলে উঠলেন, 'বলছেন কি সাহেব! চৌদ্দ শো মাইল মাত্র অতিক্রম করেই আমরা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ফেললাম।

'হ্যাঁ সে রকমই তো দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীটা কি তবে ছোট হয়ে গেল নাকি? তবে কি পৃথিবীর পনের অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে মাত্র এক অংশ অবশিষ্ট রয়েছে?'

'সে তো অবশ্যই। তা না হলে মাত্র চৌদ্দ শো মাইলে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার কথা কি স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবা গেছে!'

এবার লেফটেন্যান্ট একটা জব্বর কথা বললেন, 'যে গ্রহটাকে আমরা পৃথিবী বলে জানি, আমরা আসলে তার ওপরে মোটেই অবস্থান করছি না। পৃথিবীর একটা টুকরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আর সেটা সৌরমণ্ডলের ভেতর দিয়ে নতুন কক্ষপথে ছুটে চলেছে।'

এমন একটা অদ্ভুত সম্ভাবনার কথা কারো মাথায় আসে নি। এরকম যুক্তি অন্য কেউ শুনলে হয়ত হেসে মাটিতে গড়াগড়ি যেত। তবে পূর্বদিকের সূর্য পশ্চিমে উদিত হওয়ার ব্যাপারটা যখন বাস্তবায়িতই হয়েছে, তবে চমৎকার এ কথাটাই বা সত্য কেন হবে না?

ডোব্রিয়ান দিনের পর দিন জলপথে ছুটে চলেছে। যাত্রীদের মাথায় একই চিন্তা, সবুজ পৃথিবীটার এমন চরম দুর্গতির জন্য দায়ী কে?

ঠিক এমনি সময়ে জলের ওপর দিয়ে একটা বোতলকে ভেসে যেতে দেখা গেল। কাউন্ট সেটাকে তুলে এনে দেখলেন, সেটা বোতল নয়, একটা টেলিস্কোপের খালি বাক্স। তার ভেতরে এক চিলতে কাগজ। কাগজটা বের করে চোখের সামনে ধরে কাউন্ট লক্ষ্য করলেন, চার চারটে ভাষায় লেখা চিঠিটা—ইংরেজি, ফরাসি, লাতিন আর ইতালিয়ান ভাষায়। কেবলমাত্র 'গ্যালিয়া' শব্দটা লেখা। তার তলায় একটা ছত্র, 'পনেরোই ফেব্রুয়ারি সূর্য থেকে আমাদের ব্যবধান।'

কাউন্ট চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ এঁকে বলে উঠলেন, 'মনে হচ্ছে আমাদের নতুন ও ছোট্ট এ-গ্রহটার নাম 'গ্যালিয়া'।' এবার স্বগতোক্তি করলেন, 'কিন্তু চার চারটে ভাষা যাঁর রপ্ত রয়েছে সে-লোকটি কোথায়?' আর জ্যোতির্বিদ্যায় যিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন তাঁর নামধাম যদি জানা থাকত তবে, 'কথাটা তিনি আর শেষ করলেন না।'

www.pathagar.com

ডোব্রিয়ানা জাহাজটা একের পর এক দিন আর রাত্রি তার এগিয়ে চলা অব্যাহত রাখল।

এক সকালে আচমকা একটা দ্বীপ তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। দ্বীপটার অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা হিসাব করে দেখা গেল, তাঁরা সারডিয়ানা-র নিকটবর্তী অঞ্চলে পৌঁছে গেছেন। জাহাজ দ্বীপটার গায়ে এগিয়ে যেতেই কাউন্ট ও সারভাদাক লম্বা এক লাফ দিয়ে দ্বীপে পড়লেন। দু-চার পা এগোতেই একটা ছাগলকে হেঁটে যেতে দেখে তাঁরা কৌতূহলবশত সেটার পিছু নিলেন। ছাগলটার সঙ্গে তাঁরা একটা গুহার মুখে হাজির হলেন। ঠিক তখনই গুহা থেকে ছোট্ট ফুটফুটে একটা মেয়ে বেরিয়ে এল। ছেঁড়া পোশাকে নিজেকে কোনোরকমে ঢেকে রেখেছে। মুখে দুঃখ-কষ্টের ছাপ সুস্পষ্ট। মাথার চুল পর্যন্ত রুক্ষ। আগন্তুকদের দেখে ভয়ে যেন একেবারে কুঁকড়ে গেছে।

সারভাদাক তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন—তার নাম নিনা। ছাগলটা তারই। মার্জি সেটার নাম। প্রবল তুফানে একদিন সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। তারপর থেকে সে তার একমাত্র সঙ্গী ছাগলটাকে নিয়ে এখানে আছে। সারভাদাক তাদের নিয়ে জাহাজে ফিরে এলেন। বেনজুফ যে দ্বীপে অবস্থান করছে জাহাজটা এবার সেদিকেই ছুটে চলল। ঠিক সময়েই জাহাজ দ্বীপটার কাছে নোঙর করল। সারভাদক নৌকো নিয়ে দ্বীপে গিয়ে বেনজুফকে খুঁজে বের করলেন। সে বন্দুক-হাতে পাখির ঝাঁকের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখিরা কোথাও খাবার না পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে এখানে এসে জড়ো হয়েছে। আর বেনজুফকে একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তাইতেই সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বন্দুক-হাতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

এক সময় পাখিগুলোর দিক থেকে চোখ ও মনকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে সে সারভাদাককে জিজ্ঞাসা করল, 'ক্যাপ্টেন, পুরনো পৃথিবীর খবর কি বলুন তো?'

'এখন, এখান থেকে সেটা লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে।' এবার তিনি বেনজুফকে বুঝিয়ে দিলেন, ছোট্ট একটা ভূভাগ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সৌরমণ্ডলে কক্ষপথে যাচ্ছে।'

'ধ্যুৎ! কী যা- তা বলছেন! এ হতেই পারে না, কিছুতেই হতে পারে না।'

'শোন বেনজুফ, সত্যকে অস্বীকার করে ফায়দা কিছুই নেই। আমরা আর আগেকার সে-পৃথিবীতে অবস্থান করছি না। কিছুতেই যখন ফিরে যাওয়ার উপায় নেই তখন আমরা বরং এ-দ্বীপটাকেই সাজিয়ে গুছিয়ে মনের মতো করে গড়ে তুলি। মোট এগারোজন হবে দ্বীপের অধিবাসী। তুমি, আমি, কাউন্ট, নিনা আর জাহাজের কর্মকর্তারা মিলে দ্বীপেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেব।'

'আরে সাহেব আমরাই তো বাইশজন। আপনি বিদায় নেবার পর এক বাণিজ্য জাহাজ দ্বীপে হাজির হয়েছিল। সেটা ছিল 'হ্যামসা' নামে স্পেনের এক জাহাজ। তার মালিকের নাম অ্যালগর হ্যাকাবুট। নামকরা এক সওদাগর। জাহাজে দশজন ছিল। একজন তো বালক। দ্বীপের বিপরীত প্রান্তে তারা চাষাবাদ করছে।'

'হোক না মোট বাইশজন। চাষাবাদ করলে পেটের জোগাড় ঠিক হয়ে যাবে। ভাবনার কিছু নেই।'

'যথেষ্টই হবে। তার ওপরও হ্যাকাবুট-এর জাহাজে প্রচুর চিনি, কফি, যন্ত্রপাতি আর গোলাবারুদ জমা আছে। পোশাক-পরিচ্ছদও কম নেই।'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ, খাবারদাবার আর পোশাক-পরিচ্ছদের অভাব হবে না ঠিকই। কিন্তু আসল সমস্যাটা তো অন্য জায়গায়, কাউন্ট মুখ খুললেন, 'আসলে আমরা যে সূর্যের কাছ থেকে ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছি। যত দূরে সরছি ঠাণ্ডা ততই বেড়েই চলেছে। অচিরেই পরিস্থিতি এমন হয়ে যাবে যে, প্রাণের অস্তিত্ব অব্যাহত রাখাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। অসহনীয় সে ঠাণ্ডার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার কোনো উপায় করতে যদি পারেন তবে বলুন।'

'মাটিতে খোদল তৈরি করে শীতকালটা কি কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না?'

কাউন্ট সোল্লাসে বলে উঠলেন, 'চমৎকার মতলব তো!'

ব্যাস, পরদিন ভোর হতে না হতেই সবাই মিলে মাটিতে খোদল তৈরির কাজে লেগে গেল। কিন্তু সামান্য কাটার পরই লোহার মতো শক্ত পাথর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। গাঁইতি আর কোদালের ঘায়ে আগুন ঠিকরে বেরোতে লাগল। অনন্যোপায় হয়ে সরে গেল।

ইতিমধ্যে থার্মোমিটারের পারা নামতে নামতে শূন্য তাপাঙ্কের ছ-ডিগ্রি নিচে নেমে গেল।

তারা হন্যে হয়ে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ কোনো স্থানের সন্ধান করতে লাগল। বৃথা চেষ্টা শত চেষ্টা করেও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে সমুদ্রের তীরেই তারা রাত্রি কাটিয়ে দিয়ে লাগল।

একদিন রাত্রির অন্ধকার নেমে আসার কিছু পরেই লেফটেন্যান্ট উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'আলো! আলো! সমুদ্রের বুকে ওই যে আলো দেখা যাচ্ছে!'

জাহাজ? কিন্তু আলোটাকে যে অনবরত কাঁপতে দেখা যাচ্ছে!' ব্যাপার কী? আগ্নেয়গিরির আগুন নয় তো? আগ্নেয়গিরি ছাড়া বাতাসকে এমন করে কাঁপাবার ক্ষমতা কারোর তো নেই।

সারভাদাক এবার সোল্লাসে বলে উঠলেন, 'আমাদের দুর্ভাগ্যের দিন তবে ফুরিয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা কত পড়বে, পড় ক। আগ্নেয়গিরির আগুন ঠাণ্ডা সব শুষে নেবে।

সকাল হল। অভিযাত্রীরা আলোটার উৎসের খোঁজে যাত্রা করলেন। কিছুদূর যেতে না যেতেই অতিকায় আগ্নেয়গিরিটা তাঁদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। জ্বালামুখ দিয়ে ফোয়ারার মতো আগুন বেরোচ্ছে আর লাভার স্রোত গড়িয়ে নিচে নামছে।

লাভার স্রোত বিপরীত দিকে বইছে। ফলে জলের দিকটা নিরাপদ ভেবে অভিযাত্রীরা নৌকা থেকে পাড়ে নামলেন।

আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে অনবরত আগুনের হল্‌কা বোরোচ্ছে। আশ্চর্য ব্যাপার তো! এ আগ্নেয়গিরির ভয়ঙ্করতা একেবারেই অনুপস্থিত। বিকট কোনো আওয়াজই নেই। পাথরের টুকরো ছিটকে ওপরে উঠছে না, বিস্ফোরণ তো নেই-ই।

অভিযাত্রীরা পর্বতের গা-বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে এক জায়গায় গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একটা বিশালায়তন গুহা। লাইম কার্বোনেটের সুতো ছাদ থেকে ঝুলছে। গুহার ভেতরে বেশ উষ্ণ।

অভিযাত্রীরা ভেতরে ঢুকে বুঝলেন,এটা আসলে গুহা নয়। সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গপথে হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা অন্য আর একটা সুড়ঙ্গে পা দিলেন।

সুড়ঙ্গটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা হামাগুড়ি দিতে দিতে এসে থেমে গেছে। লাভার ওপর দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। তার রক্তিম আভা অন্ধকার গুহাটার বহুদূর অবধি আলোকিত করে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

কোন দৈত্য যেন লক্ষ লক্ষ উনুন এক সঙ্গে জ্বেলে দিয়েছে।

কাউন্ট, ক্যাপ্টেন এবং লেফটেন্যান্ট বিস্ময়-বিস্ফোরিত চোখে জ্বলন্ত চুল্লিগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন। সেখানে দাঁড়িয়েই তাঁরা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ করে ফেললেন। আরামদায়ক উষ্ণ এ-গুহাটায় কলোনির মানুষগুলোকে নিয়ে আসবেন।

মালপত্র জাহাজে তুলে অভিযাত্রীরা আগ্নেয়গিরির কবোষ্ণ গুহায় নিয়ে এলেন। আরামদায়ক আশ্রয়স্থল এই গুহটাটার নামকরণ করা হল 'নিনা থাইভ'।

ক্যাপ্টেন, কাউন্ট আর লেফটেন্যান্ট সমুদ্রের ধারেই অধিকাংশ সময় ঘোরাফেরা করে কাটিয়ে দেন। তাদের উচ্ছা,পুরনে দ্বীপটায় গিয়ে কিছু খাবার-দাবার জোগাড় করে আনেন। কিন্তু সমুদ্রের জল ইতিমধ্যেই ঠাণ্ডায় জমে বরফে পরিণত হয়ে গেছে। তাপমাত্রা ক্রমেই কমতে লাগল। আর লক্ষ্য করে দেখা গেল, তাপমাত্রা প্রতিদিন সমান হারে কমছে। সবকিছু বরফাবৃত হয়ে গেল। সবচেয়ে বিপদের সম্মুখীন হল পাখিরা। সবাই তো বরফে ছেয়ে গেছে। খাবার কোথায় যে, পাখিরা পেটের জ্বালা নেভাবে? উপায়ান্তর না দেখে বুভুক্ষু পাখির দল গুহায় হানা দিল। দানবাকৃতি এক-একটা অ্যালবেট্রস। তারা যা পাচ্ছে তাই ছিনিয়ে খেতে লাগল। শুরু হল মহা উপদ্রব। সুড়ঙ্গবাসী মানুষগুলো পাখির বয়ে রীতিমতো কুঁকড়ে গেল। হবে নাই বা কেন? ডানা মেললে এক-একটা পাখি প্রায় দুশ ফুট জায়গা জুড়ে নেয়। আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে এগিয়ে এলে অতি বড় পালোয়ানেরও আতঙ্কে কলিজা পর্যন্ত শুকিয়ে যাবার ব্যাপারই তো বটে।

নিনা একটা পায়রাকে সুড়ঙ্গের ভেতরে হাঁটাচলা করতে দেখে গুটিগুটি এগিয়ে গেল। তার গলায় একটা ছোট্ট ঝোলা বাঁধা। ব্যাপারটা তার মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার করল। সে এগিয়ে গেল পায়রাটার দিকে। আশ্চর্য ব্যাপার পায়রা কিন্তু উড়ে যাওয়া তো দূরের কথা পালিয়ে যাবারও সামান্য চেষ্টা করল না। নিনা সহজেই তাকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরল।

নিনা পায়রাটাকে বুকে তুলে নিতেই একটা দানবাকৃতি অ্যালবেট্রস তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেনজুফ ছুটে এসে কোনোরকমে তাকে অ্যালবেট্রসটার কবল থেকে মুক্ত করে সারভাদাকের কাছে নিয়ে গেলেন। সারভাদাক পায়রার গলার ঝোলাটার ভেতর থেকে এক চিলতে কাগজ বের করলেন। একটা চিঠি। সারভাদাক অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে চিঠিটা পড়ে বক্তব্য শোনাতে লাগলেন—পড়া শেষ করে বললেন, 'চিঠিটার মাধ্যমে অজ্ঞাত পরিচয় হিতাকাঙ্ক্ষী আমাদের জানিয়েছেন, পয়লা এপ্রিল সূর্য আমাদের কাছ থেকে কতদূরে অবস্থান করছিল। খাদ্য নিঃশেষ।'

চিঠিটার অবিশিষ্টাংশ পাখিটা ঠোঁট দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে। তার ঠিকানা না জানতে পারলে তাকে সাহায্য করার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই।

এবার হঠাৎ পায়রার ডানায় একটা ডাক টিকিটের ছাপ দেখতে পেয়ে সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। ফোরমেনটেরা ডাকঘরের সিলমোহর আঁকা।

ফোরমেনটেরা নামটা শোনামাত্র কাউন্ট বলে উঠলেন, 'জায়গাটা আমার পরিচিত। স্পেনের অদূরবর্তী ব্যালিয়াটিক দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বিখ্যাত দ্বীপ 'ফোরমেনটেরা'। এখান থেকে তার দূরত্ব তিন শো ষাট মাইলের কাছাকাছি।'

সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ফোরমেনটেরা দ্বীপে গিয়ে অজ্ঞাত পরিচয় হিতাকাঙ্ক্ষীটির খোঁজ করবেন। কিন্তু এতে বিস্তর সমস্যা।

www.pathagar.com

অভিযাত্রীরা ছোট্ট একটা নৌকা তৈরি করে তার তলায় লোহার রেল ও ওপরে পাল খাটিয়ে নিলেন। প্রয়োজনে সেটা জলে ও ডাঙা অর্থাৎ বরফ উভয় পরিবেশেই চলতে পারবে। অদ্ভুত যানটায় চেপে অভিযাত্রীরা ফোরমেনটেরা দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

বরফের ওপর দিয়ে নৌকোটা সারাদিন আর সারারাত্রি ধরে পথ পাড়ি দিল। কাকডাকা ভোরে নৌকোটা ফোরমেনটেরা দ্বীপে হাজির হল। সামান্য খোঁজাখুঁজিতে অভিযাত্রীরা একটা ভাঙাচোরা কুঁড়েঘর দেখতে পেলেন। এতবড় একটা দ্বীপে একটামাত্রই কুঁড়েঘর। নড়বড়ে একটা মাঁচার ওপর এক বৃদ্ধ নিশ্চল-নিথরভাবে শুয়ে। অতিবৃদ্ধ। রুক্ষ-রুষ্ট চেহারা, মলিন বেশভূষা। মৃত প্রায়। কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল, দেহে এখনও প্রাণের লক্ষণ বর্তমান।

মুহূর্তমাত্রও সময় নষ্ট না করে তাঁরা ধরাধরি করে মৃতপ্রায় বৃদ্ধকে নৌকোয় তুলে নিলেন। গুহায় ফিরে চাতালের ওপর তাকে শুইয়ে দিলেন।

সারভাদাক বৃদ্ধের মুখের দিকে মুহূর্তকাল এক নজরে তাকিয়ে থেকে আপন মনে বলে উঠলেন, 'একে যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, কোথায় যেন দেখেছেন।'

সারভাদাক মুখ খোলার আগেই বৃদ্ধ চোখ মেলে তাকালেন। প্রায় অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলেন, 'সারভাদাক। কালই কিন্তু অন্তত পাঁচশোটা ছত্র লিখে আনা চাই।'

সারভাদাক সচকিত হয়ে আবার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! ইনি যে অধ্যাপক পালমিরিন রোসেট্টি! আমার জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক! স্যার-স্যার, এই যে আমি। আমি সারভাদাক।'

সারভাদাকের মুখের কথা শেষ হবার আগেই বৃদ্ধ আবার চোখ দুটো বন্ধ করে বে-হুঁস অবস্থায় পড়ে রইলেন।

সারারাত্রি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কাটিয়ে ভোরের দিকে অধ্যাপক চোখ মেলে তাকালেন। প্রায় অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলেন, 'তোমরা গ্যালিয়া সম্বন্ধে কিছু জান কি?'

সারভাদাক বললেন, 'গ্যালিয়া? স্যার, আপনি এখন যেখানে অবস্থান করছেন এর 'গ্যালিয়া' নামকরণ বুঝি আপনিই দিয়েছেন?'

'না। আমি যার পিঠে চেপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্যটনে বেরিয়েছি তারই নাম গ্যালিয়া। গ্যালিয়া একটা ধূমকেতু। পৃথিবীর সঙ্গে ধাক্কা লাগার অনেক আগে তেকেই আমি তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছিলোম। তাই তো একত্রিশে ডিসেম্বরের রাত্রি কি ঘটেছে আমি ভালই জানি। পৃথিবীর একটা বড় ভগ্নাংশ ধূমকেতুর ধাক্কায় ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে। ধূমকেতু গ্যালিয়া পৃথিবীর ওই ভাঙা টুকরোটা বয়ে নিয়ে মহাশূন্যের পথে ছুটে চলেছে। ওটা পিরিয়ডিক জাতের ধূমকেতু। আর এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নির্দিষ্ট সময় বাদে বাদে একই জায়গায় ফিরে আসে।'

সারভাদাক বিস্ময়-বিস্ফোরিত চোখে অধ্যাপকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'তবে আপনি বলতে চাইছেন, আমাদের বাহন ধূমকেতুটাও একদিন না একদিন পৃথিবীর বুকে ফিরে যাবেই।'

'যাবে। আলবৎ যাবে। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ঠিক দুবছর বাদেই এটা ফের পৃথিবীর কাছে ফিরে যাবেই।'

'তবে তো আর মাত্র বছর খানেকের মধ্যেই আমরা পৃথিবীতে ফিরছি!'

www.pathagar.com

জানুয়ারির প্রথম দিনটিতে অভিযাত্রীরা অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধূমকেতুর পিঠে চাপার প্রথম বার্ষিকী উদযাপন করলেন।

রাত্রের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে প্রোকোপ-এর মনে একটা খটকা লাগল। লক্ষ করলেন, অন্ধকার যা হওয়ার কথা ছিল আসলে অন্ধকার তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি।

পাহাড়ের সুড়ঙ্গে প্রবেশ করার পর ধূমকেতু-আরোহীরা রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাই আচমকা অন্ধকার এমন গাঢ় হয়ে দেখা দিয়েছে। আগ্নেয়গিরির আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে।

অভিযাত্রীরা মহাসমস্যায় পড়ে গেলেন। আগ্নেয়গিরির উত্তাপের ভরসাতেই তাঁরা সুড়ঙ্গটার ভেতরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেটাই অসম্ভব শৈত্যকে বাধা দিয়ে রেখেছিল।

কাউন্ট এত সহজে হতাস হাবার পাত্র নন। তার দৃঢ় বিশ্বাস, আগ্নেয়গিরিটা নিভে গেলেও এখনও এর ভেতরটা পুরোপুরি ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি। তিনি দলবল নিয়ে আগ্নেয়গিরির আরও গভীরের কোনো সুড়ঙ্গের সন্ধানে বেরোলেন যেখানে এখনও কিছু উত্তাপ বিরাজ করছে। নইলে শৈত্যের প্রকোপে রক্ত-মাংস জমে বরফ হয়ে যাবে যে।

আগ্নেয়গিরিটার সুবিশাল দেওয়ালের গা থেকে অনেক সুড়ঙ্গ পাতালের দিকে নেমে গেছে। তাদের একটা সুড়ঙ্গ-বেয়ে কিছুটা পথ অতিক্রম করতেই তাঁরা এবার বেশ উত্তাপ বোধ করতে লাগলেন। ক্যাপ্টেন ভাবলেন ব্যাপার কী? সুড়ঙ্গটার দেয়ালের ওপারেই কি তবে ফুরিয়ে আসা লাভাস্রোতটুকু রয়েছে?

শাবল-গাঁইতি নিয়ে সবাই লেগে গেলেন দেওয়ালটা ভেঙে উষ্ণ স্থানটার কাছে পৌছনোর অদম্য উৎসাহ নিয়ে। না, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও তাঁদের পক্ষে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সম্ভব হল না।

অনন্যোপায় হয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন, বারুদ ব্যবহার করে পাথরের দেওয়ালটাকে উড়িয়ে দেবেন।

এবার গাঁইতির আঘাতে পাথর ফুটো করতে লেগে গেল। উপযুক্ত ফুটো তৈরি করতে না পারলে বারুদ গেঁথে বিস্ফোরণ ঘটানো যে সম্ভব নয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে একটা গর্ত তৈরি করা সম্ভব হল। এবার তাতে বারুদ ঠেসে দিয়ে আগুন লাগানো হল।

বারুদে আগুন জ্বেলে তাঁরা দূরে সরতে না সরতেই প্রচণ্ড আওয়াজ করে ফেটে গেল পাথরের দেওয়ালটা।

অভিযাত্রীরা এবার মশাল জ্বেলে নতুন পর্বত-গহ্বরে হাজির হলেন। মেঝেটা প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে পাতালপুরীর দিকে নেমে গেছে। আধঘণ্টা হাঁটাহাঁটি করে তাঁরা পৌছোলেন পাতালপুরীর পঁচিশ ফুট তলায়। এখানে উষ্ণতা বেশ বেড়ে গেছে। হাওয়ার স্রোতও বইছে। অতএব শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবার সম্ভাবনা নেই।

তাঁরা নামতে নামতে প্রায় ন' শো ফুট গভীরে নেমে গেলেন।

সারভাদাক বললেন, 'আর বেশি নিচে নামা মনে হয় নিরাপদ নয়। আগ্নেয়গিরির তলদেশে কোন বিপদ ঘাপটি মেরে রয়েছে তাই বা কে জানে? তা ছাড়া এখানকার তাপমাত্রা বেশ সহনীয়।'

এবার সামান্য হাঁটাহাঁটি করে অভিযাত্রীরা চমৎকার একটা গুহা আবিষ্কার করে ফেললেন। বেশ বড়সড়। তাপমাত্রাও মোটামুটি আরামদায়ক। হুটোপাট করে তাঁরা পুরনো গুহাটা থেকে জিনিসপত্র নিয়ে এসে নতুন করে সংসার পাতলেন।

www.pathagar.com

এক-দুই-তিন করে অভিযাত্রীরা নতুন গুহায় দীর্ঘ ন'টা মাস মৃত আগ্নেয়গিরির উদরে কাটিয়ে দিলেন।

ঠাণ্ডার প্রকোপ ক্রমেই কমে আসতে লাগল। নদীর বরফ গলে জল টলমলিয়ে উঠল।

নদীর ধারে পায়চারি করতে করতে সারভাদাককে কাউন্ট বললেন, 'ধূমকেতু যদি পৃথিবীর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে তবে যে আমাদের গুঁড়িয়ে যেতে হবে।'

'আমরা যেদিকে আছি ধূমকেতুটা যে সেদিকেই পড়বে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? আর যদি পড়েই তবে আমাদের দফারফা হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। আর যদি আমাদের বিপরীত দিকে পড়ে তবে কিন্তু—'

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই কাউন্ট বলে উঠলেন, 'আপনার ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। ধূমকেতু যেদিকেই পড় ক না কেন সর্বত্রই সমান ঝাঁকুনি লাগবে। সে-ধাক্কা সামাল দেওয়া মানুষের সাধ্যাতীত। আবার টেম্পারেচারের ব্যাপারটাও উড়িয়ে দেওয়ার নয়। ধূমকেতু ছুটতে গিয়ে আচমকা বাধা পেলে তার গা থেকে যে উত্তাপ ঠিকরে বেরিয়ে আসে তাতে অসহায়ভাবে পুড়ে মরা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।'

বেনজুফ এবার মুখ খুললেন, 'আরে ব্বাস! ঝাঁকুনিতে প্রাণ যাওয়ার আগেই যদি আমরা আকাশে উড়ে যাই, তবে?'

লেফটেন্যান্ট প্রোকোপ বললেন, হ্যাঁ, বেনজুফ ঠিকই বলেছে। শূন্যে ভেসে থাকা মোটেই কঠিন সমস্যা নয়। খুব বড় একটা বেলুন তৈরি করে নিলেই কাজ মিটে যেতে পারে। ধাক্কা লাগার সময় বা তার পরও পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া অবধি আমরা বেলুনে চেপে শূন্যে ভেসে থাকব।'

যে কথা সেই কাজ। ডোব্রিয়ানার পাল দিয়ে বিশালায়তন একটা বেলুন তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেল। ঠিক হল, তার ভেতরে গরম বাতাস ভরে দেওয়া হবে শূন্যে ভাসার জন্য।

সবই তো হল, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ধূমকেতু ঠিক কখন পৃথিবীর ওপর আছাড় খেয়ে পড়বে, কখন শূন্যে ভেসে থাকতে হবে তা জানার উপায় কি?

সারভাদাক বললেন, 'এর জন্য ভাবতে হবে না। অধ্যাপক রোসেট্টি হিসাব কষে সময়টা বের করে ফেলবেন।'

প্রসঙ্গটা অধ্যাপক রোসেট্টি-র কাছে কিভাবে পাড়বেন ভাবতে গিয়ে সারভাদাক আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বাইরে যান! সবাই বাইরে চলে যান! পাহাড়ের বাইরে চলে যান!'

সবাই ব্যস্ত-পায়ে সুড়ঙ্গটা ছেড়ে বাইরে, নলি আকাশের তলায় এসে দাঁড়াতেই মহাশূন্যে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখতে পেলেন। দেখলেন, অতিকায় নীল একটা গোলা। তার পিছনে ইয়া লম্বা একটা ধূম্রপুচ্ছ আকাশের গায়ে ছুটে চলেছে। প্রবল তার গতিবেগ। সেটা ক্রমে নীল আকাশের গায়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অদ্ভুত গোলাটার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রেখেই সারভাদাক চিল্লিয়ে বলতে লাগলেন 'নতুন—নতুন এক ধূমকেতু!'

অধ্যাপক রোসেট্টি সারভাদাকের পিছনে দাঁড়িয়ে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে দাঁড়িয়ে। নতুন ধূমকেতুর কথা কানে যেতেই তিনি প্রতিবাদের

www.pathagar.com

স্বরে বলে উঠলেন, 'বাজে কথা! অপদার্থ কাহিকার! কে বললে ওটা ধূমকেতু? আসলেওটা গ্যালিয়ারই একটা টুকরো তার গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের নতুন কক্ষপথে চক্কর মেরে বেড়াচ্ছে।'

'কী সর্বনেশে কথা। তবে তো জিব্রাল্টার আর ইংরেজ সেনাবাহিনী সমেত বেশ কিছুটা অংশ তার পিঠে রয়ে গেছে। যা বুঝছি, আমাদের পক্ষে আর পৃথিবীর বুকে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।

অধ্যাপক রোসেট্টি এবার সারভাদাকের ওপরে আরও খেঁকিয়ে উঠলেন, 'মন দিয়ে শোন, আগামী পয়লা জানুয়ারি রাত্রি ঠিক দুটো বিয়াল্লিশ মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেণ্ড ছয় দশমাংশ সময়ে ধূমকেতুটা আছড়ে পড়বে।'

হাতে আর সময় বেশি নেই। অভিযাত্রীরা এবার বেলুন তৈরির অবশিষ্ট কাজটুকু মিটিয়ে ফেলার জন্য উঠেপড়ে লেগে গেলেন। বেলুন তৈরি হয়ে গেলে শুকনো ঘাস লতা-পাতা জ্বেলে গরম বাতাস তৈরি করে নেওয়াও সম্ভব হল।

৫ ডিসেম্বর সদ্য তৈরি বেলুনটাকে খুটিয়ে খুটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হল কোথাও খুঁত রয়ে গেছে কিনা। না, কাজে কোনো ত্রুটিই নেই।

পয়লা জানুয়ারি। বেলা দুটোয় পুরো কলোনিটা বেলুনের সঙ্গে যুক্ত দোলনায় এসে আশ্রয় নিল।

বৃদ্ধ অধ্যাপক রোসেট্টিকে নিয়ে দেখা দিল সমস্যা। তিনি কিছুতেই বেলুনের দোলনায় চাপতে রাজি নন। তিনি বললেন, 'আমি কোথাও যাব না। আমার ধূমকেতুতেই আমি সুখে-স্বস্তিতে আছি।' বেগতিক দেখে শেষপর্যন্ত সারভাদাকের গোপন নির্দেশে দুজন যুবক খালাসি বৃদ্ধ অধ্যাপককে জাপ্টে ধরে বেলুনের দোলনায় তুলে নিল।

ব্যস, আর দেরি নয়। এবার মাটি আর বেলুনের সম্পর্ক রক্ষাকারী দড়িটাকে কেটে দিয়ে বেলুনের ওড়ার সুযোগ করে দেওয়া হল। হেলে দুলে বেলুনটা ওপরে উঠে যেতে লাগল।

ওপর থেকে সবুজ পৃথিবীকে চমৎকার দেখা যেতে লাগল। আর অন্যদিকে ধূমকেতু পুচ্ছের আগুন আর আলো ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে চলেছে। গ্যালিয়া ছুটে চলেছে।

পৃথিবী! গ্যালিয়া পৃথিবীর কাছাকাছি এসে গেছে। ভয়-ভীতি আর উৎকণ্ঠায় দোলনার আরোহীরা দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে রইল। অকস্মাৎ এক প্রলয়ঙ্কর দৃশ্যের মুখোমুখি হল তারা। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ভীষণ তাপ সহ্য করতে পারল না দোলনার আরোহীরা। সবাই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর চোখ মেলে তাকিয়ে তারা দেখল, ঘাসের বিছানার ওপর সবাই শুয়ে। মাথার ওপরে নীল আকাশ। তারা বুঝল, মহাকাশ পর্যটন সেরে সবাই ধূমকেতুতে চেপে পৃথিবীর বুকে ফিরে এসেছে। বেনজুফ জায়গাটাও চিনতে পেরে গেছে। তারা আলজিরিয়ায় অবস্থান করেছে। ব্যাপারটা এতক্ষণে সবার কাছে পরিষ্কার হল গ্যালিয়া ধূমকেতুটা পৃথিবীর ওপর হুমড়ি খেয়ে না পড়ে পৃথিবীকে আচমকা এক আঁচড় মেরে চলে গেছে। আর সেজন্যই বেলুন-আরোহীরা আবহমণ্ডলের প্রলয়ঙ্কর দৃশ্যের মুখোমুখি হয়েছিল। তা সহ্য করতে না পেরে সবাই অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। গ্যালিয়া অন্ধকার রাত্রি পৃথিবীর একটা টুকরোকে টপ করে তুলে নিয়ে পালিয়ে

www.pathagar.com

গিয়েছিল। দু-দুটা বছর তাকে মহাশূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে পরে আবার ঠিক সে জায়গাতেই ফেলে দিয়ে গেছে।

দুবছর বাদে হঠাৎ সারভাদাককে দেখে সেনানিবাসে হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেল।

সারভাদাক এক পুরনো অফিসার বন্ধুকে একটু নিরিবিলিতে পেয়ে ম্যাডাম দ্য এল-এর খবর জানতে চাইলেন।

অফিসার বন্ধু ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'সে কী, কবেই তো তার বিয়ে হয়ে গেছে! সে তোমার অপেক্ষায় দুবছর তীর্থের কাকের মতো বসে থাকবে, ভাবলে কি করে?'

ঠিক তখনই কাউন্ট টিমাসচেফকে সেদিকে আসতে দেখে সারভাদাক মুচকি হেসে বললেন, 'কাউন্ট, আমাদের আর দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হতে হল না। বেঁচে গেলাম, তাই না?'

কাউন্টও মুচকি হেসে অভিবাদন জানিয়ে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, বাঁচালেন সাহেব।'

---

www.pathagar.com

দ্য পারচেজ অব দ্য নর্থ পোল

জে. টি. ম্যাসটন ও মিসেস স্করবিট তখন নারীর প্রতিভা নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত। ম্যাসটনের মতে পৃথিবীর কোনো কোনো নারী অঙ্কের প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন বটে, তবে রাশিয়ায় এরকম প্রতিভা সম্পন্ন নারীর অস্তিত্ব নেই। তারা আর যা-ই পারুক না কেন,উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একেবারেই অচল। কোনো নারীই কেপলার, লাপ্লেস বা ইউক্লিড-এর সমকক্ষ হওয়া তো দূরের ব্যাপার তাঁদের কাছাকাছিই যেতে পারেনি।

মিসেস স্করবিট কিন্তু ম্যাসটনের যুক্তি কিছুতেই মানতে নারাজ। তাঁর মতে অতীতের নারী সমাজের সঙ্গে আজকের নারী সমাজের তুলনা করতে বসলে ভুলই করা হবে। অতীতের মাপকাঠি দিয়ে ভবিষ্যতের বিচার করতে বসার অর্থই হচ্ছে চরমতম ভুলকে আঁকড়ে ধরে থাকা।

মিসেস স্করবিট নিজেকে অবলা ও দূর্বল ভাবতে কিছুতেই রাজি নন। তিনি আমেরিকান। দারুন একটা কঠিন ও সমস্যা সঙ্কুল ব্যাপারে তিনি উৎসাহী হয়েছেন। দুহাতে টাকা খরচ করে পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। তাঁর পরিকল্পনাটা মোটামুটি এরকম—

সেন্ট মার্টিন, মালটি ব্রান এবং রিক্লুজ প্রভৃতি ভূগোল-বিশারদদের মতে সুমেরু অঞ্চল ৭৮ অক্ষরেখার ওপর অবস্থিত। আর তার সাত লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জল ও চৌদ্দ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে রয়েছে স্থলভূমি।

একালের অকুতোভয় অভিযাত্রীরা ৮৪ অক্ষাংশের ওপরেই। কিন্তু ওই হিমশৈল অতিক্রম করার ক্ষমতা কারোরই নেই। সুমেরু অবধি ৬ অক্ষাংশে জল না স্থলভূমি বিরাজ করছে তা আজও মানুষের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার আঠারো শো খ্রিস্টাব্দে মনস্থ করলেন, সুমেরুর চারদিকে যে-অনাবিষ্কৃত অঞ্চল অবস্থান করছে তা নিলামে বিক্রি করে দেবেন। উত্তরমেরু অঞ্চল ক্রয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটা আমেরিকান সংস্থা আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল।

তবে এও সত্য যে, বার্লিনের এক বৈঠকে অন্যের জমিতে হানাদার বৃহৎ শক্তিগুলির জন্য, আলোচনার মাধ্যমে কিছু নিয়মকানুন তৈরি করা হয়। বৃহৎ শক্তিগুলি যেন উপনিবেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে সে সব শর্ত পালন করে এটাই ছিল বৈঠকের উদ্দেশ্য। কিন্তু বার্লিন-বৈঠকে বেশ কিছু সংখ্যক দেশ মোটেই আমল দেয় নি। তাদের মতে, উত্তরমেরুর জমি জায়গা কারোর অধিকারেই থাকতে পারে না, নেইও। সেখানে কোনো বসতিও নেই। অতএব সেখানে সবারই সমান অধিকার।

তাই সদ্য গড়ে ওঠা সংস্থা উত্তরমেরুর দখলই কেবল নয়, অন্যের দখলের প্রতিবন্ধকতাও করতে আগ্রহী।

আমেরিকা যুক্তারাষ্ট্রে কেউ কোনো মহৎ প্রয়াসে লিপ্ত হলে সেখানে টাকার অভাব হয় না। মাত্র কয়েক বছর আগে বাল্টিমোর গান-ক্লাব চাঁদের উদ্দেশ্যে এক প্রোজেকটাইল পাঠাতে গিয়ে হাতেনাতে এর প্রমাণ পেয়েছে। তাঁদের লক্ষ্য ছিল—চাঁদের

www.pathagar.com

সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা। অবিশ্বাস্য ঝুঁকিটি নেওয়ার জন্য গান-ক্লাবের সদস্যদের বাহ্‌বা দিতেই হয়।

সুমেরুকে নিলামে খরিদ করার পরিকল্পনাটা নিয়ে দেশজুড়ে নানারকম কথাবার্তা উঠল। চাঁদার খাতা না থাকার দরুন বিশেষ জটলার উদ্ভব হল। সংস্থাটি আগে থাকতে চাঁদা সংগ্রহের প্রয়োজন বোধ করে নি।

প্রচুর পরিমাণ নগদ অর্থ নিয়েই তারা নিলামে উত্তরমেরু ক্রয় করার ইচ্ছার কথা প্রচার করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে,উত্তরমেরু ক্রয় করে ফয়দা কী হবে? সেটা কোনো উপকারে আসবে কি? না। কোনো কিছুতেই কোনোদিক থেকে ফয়দা লোটা যাবে না। তাই পরিকল্পনার কথাটা শোনামাত্র সবাই বলে উঠল, 'কোন উর্বর মস্তিষ্ক ছাড়া কারো মাথায় এমন উদ্ভট খেয়াল কিছুতেই চাপতে পারে না।'

সংস্থার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার কাজে কিন্তু তিলমাত্রও গাফিলতি ছিল না। পৃথিবীর সব দেশের খবরের কাগজের পাতায় ছাপিয়ে দেওয়ার জন্য দুটো বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার খবরের কাগজের জন্য একটা আর অন্যটা ইউরোপের খবরের কাগজের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমেরিকার খবরের কাগজের পাতায় যে বিজ্ঞপ্তিটা ছাপা হয় তার বক্তব্য হচ্ছে—

"৮৪ ডিগ্রির ওপর অবস্থিত সুমেরু অঞ্চলটি অনাবিষ্কৃত থাকার জন্য এতদিন নিলামে তোলা হয় নি। ১৮৪৮ সালের জুলাইয়ে ৮২-৪৫´ পর্যন্ত ইংরেজ অভিযাত্রী প্যারি পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্পিটবার্গের পশ্চিম দিকে জায়গাটার অবস্থান। অভিযাত্রী স্যার জন জর্জেস নারেস ১৮৬৭-র মে মাসে ৮৩-২০´-২৮´´ পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। তার অবস্থান গ্রিনল্যান্ডের উত্তর দিকে। আমেরিকার অভিযাত্রীরা ১৮৮২-এর মে মাসে লেফটেন্যান্ট গ্রিলির অধিনায়কত্বে ৮৩-৩৫´ অক্ষাংশ পর্যন্ত যেতে পেরেছিলেন। নারেসল্যান্ডের পশ্চিমদিকে তার অবস্থান।

ব্যস, কোনো অভিযাত্রীর পক্ষেই এর বেশি অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। ৪৮-র পর ৬ পরিমাণ অঞ্চল সুমেরুবিন্দু পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও অখণ্ড এক অঞ্চল। তাই একরম একটা অঞ্চলকে নিলামে কিনে নিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্ভব নয়।

বিশাল অঞ্চলটা কারোর মালিকানাধীন না থাকার জন্য এখানে কোনো বসতি গড়ে ওঠে নি। সে কারণে যুক্তরাষ্ট সরকার সাব্যস্ত করেছে, একটা সিদ্ধান্তে এসে বিশাল অঞ্চলটাকে কাজে লাগাতে হবে। বাল্টিমোরে 'উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থা' নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তারা আইনের ভিত্তিতেই উত্তরমেরু ক্রয় করতে আগ্রহী। তবেই সেখানকার পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, দ্বীপ আর মহাদেশ প্রভৃতি সবকিছুর ওপর তাদের অধিকার বর্তাবে। আন্তর্জাতিক আইনের বলে এরকম মালিকানা নিয়ে ভবিষ্যতে কোনো হাঙ্গামা বাঁধার আশঙ্কা থাকবে না।

অতএব ৩রা ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বাল্টিমোর শহরের নিলামঘরে উপস্থিত থেকে নিলাম ডেকে যে-কোনো ব্যক্তি উত্তরমেরু ক্রয় করে নিতে পারবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থা'র অস্থায়ী প্রতিনিধি ডব্লিউ এস. ফস্টার-এর সঙ্গে পত্র মারফৎ যোগাযোগ করা যেতে পারে। তাঁর ঠিকানা—১৩, হাইস্ট্রিট, বাল্টিমোর।"

www.pathagar.com

খবরের কাগজের বিজ্ঞপ্তিটা পড়ে তো মানুষের চক্ষু স্থির। অধিকাংশ মানুষের বক্তব্য, এটা আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। একদম অবাস্তব একটা চিন্তা। আবার কেউ বা এটাকে বলল আমেরিকার বাহাদুরি, কেনাটা একটা চালমাত্র। কেউ কেউ আবার এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলল, 'উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থা তো অর্থের জন্য কারো কাছে চাঁদা বা সাহায্য কিছুই প্রত্যাশা করছে না। জনসাধারণের কাছে কেবলমাত্র অনুমতিই চেয়েছে। নিজেদের অর্থ দিয়েই কিনতে চাচ্ছে। ভাঁওতা দিয়ে টাকা তুলে আত্মসাৎ করার ধান্ধা আদৌ তাদের নেই। তবে এতসব বাহানা করারই বা কি দরকার ছিল? সুমেরু দখল করে বসতে বাধাই বা কোথায় ছিল?' সমঝদাররা এরকম মন্তব্য করলেন।

বাধা? হ্যাঁ, সরাসরি সুমেরুর দখল নিতে যাওয়ার বাধা তো অবশ্যই রয়েছে। সুমেরু যে তখনও সবার কাছেই নিষিদ্ধ বিবেচিত হচ্ছে। তাই তো উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এমন একটা দলিল প্রত্যাশা করছে, যার দ্বারা ভবিষ্যতে কেউ উত্তরমেরু দাবি করলে তারা সেটা নস্যাৎ করে দিতে পারবে।'

তবে বিজ্ঞপ্তির একটা অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে কোনো পরিবর্তনের ওপরই দাবি নির্ভর করবে না। অর্থাৎ সুমেরুর অবস্থান ও আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটলেও জায়গাটাই অধিকারের কোনোরকম পরিবর্তন হবে না। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুচ্ছেদটির এমন সব ব্যাখ্যা হতে লাগল যার ফলে পুরো ব্যাপারটাই জট পাকিয়ে গেল। সুমেরুর অবস্থান ও আবহাওয়ার পরিবর্তন বলতে আসলে কিসের ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে? এর সঙ্গে মালিকানা বা দাবির কি যোগসাজস থাকতে পারে? ধূর্ত লোকেরা অবশ্য বলাবলি করল, এরকম একটা অবাস্তব, একেবারেই অদ্ভুত পরিকল্পনার পিছনে নির্ঘাৎ কোনো না কোনো দুরভিসন্ধি রয়েছে।

ফিলাডেলফিয়ার একটা খবরের কাগজের পাতায় ছাপা হল—যারা সুমেরুর মালিকানা স্বত্ব লাভ করার স্বপ্ন দেখছে, তারা অবশ্যই জানতে পেরেছে, অচিরেই অতিকায় একটা শক্ত পাথরের ধূমকেতু পৃথিবীর বুকে আছাড় খেয়ে পড়বে। ফলে পৃথিবীর গঠন ও বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটে যাবে। তখন সুমেরু থেকে প্রচুর মুনাফা লাভ করতে পারবে।

বিজ্ঞ লোকেরা শক্ত পাথরের ধূমকেতুর কথা শুনে না হেসে পারলেন না। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল, সুমেরু ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিরা ভবিষ্যতে কিছু কামিয়ে নেবার ধান্ধায় রয়েছে। আসন্ন কোনো ঘটনার কথা তাদের অবশ্যই জানা রয়েছে।

নিউ অর্লিয়েন্সের একটা খবরের কাগজে ছাপা হল—সদ্য গজিয়ে ওঠা সংস্থার অবশ্যই ধারণা রয়েছে বিষুবরেখা এগিয়ে গিয়ে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাবে যার ফলে সুমেরুকে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। অন্য আর এক সাংবাদিক লিখলেন, অসম্ভব কি? বিষুবরেখা যদি স্থান পরিবর্তনই করে তবে এর-গোলকের অক্ষরেখারও তো পরিবর্তন ঘটবে।

প্যারিসের সায়েন্টিফিক রিভিউ-র পাতায় ছাপা হল—অ্যাডহেমার বলেছেন, বিষুবরেখা এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে যদি অক্ষরেখার পরিবর্তন যুক্ত হয়, তবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রারও পরিবর্তন ঘটবে। মেরু দুটোর জমাটবাঁধা বরফও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

এর প্রতিবাদ করে এডিনবরা রিভিউ বলে উঠল, এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ-পরিস্থিতির উদ্ভব হতে দশ হাজার বছর লেগে যাবে। আবহওয়ার পরিবর্তন তখনই ঘটবে যখন ভেগা ধ্রুবতারায় পরিবর্তিত হবে।

অ্যাডহেমার হয়তো ঠিকই বলেছেন। তবে নতুন সংস্থাটি হয়তো এরকম কোন চিন্তা করে নি। তবে তাদের অভিসন্ধিটা খবরের কাগজের লেখা পড়ে ধরা গেল না।

তবে হ্যাঁ, সংস্থার সম্পাদক বা সভাপতিকে ধরতে পারলে হয়তো বা ব্যাপারটা খোলসা হয়েই যেত। কিন্তু সংস্থার সম্পাদক, সভাপতি তো দূরের ব্যাপার, কোনো সদস্যের নামধামও কারোর জানা নেই। তবে এরকম উদ্ভট বিজ্ঞপ্তিটা কোত্থেকেই বা এল। ব্যাপারটা গভীর রহস্যের আড়ালেই রয়ে গেল।

উইলিয়াম এস. ফস্টার নামধারী বাল্টিমোরের এক কডমাছের ব্যাপারী কাগজে বিজ্ঞপ্তিটা ছাপিয়েছে। ব্যস, আর বাকি সব কিছুই রহস্যাবৃত।

সংস্থার সদস্যদের কাছে কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ হেঁয়ালি নয়। বিজ্ঞপ্তিটাতেই তাদের মনের কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জায়গার পরিমাণ মোটেই কম নয়। ৮৪ থেকে ৯০ পর্যন্ত—৬। প্রতি ডিগ্রিতে যদি ষাট মাইল হিসাব করা যায় তবে মোট জমির ব্যসার্ধ হয় ৩৬০ মাইল। আর ব্যাস হয় ৭২০ মাইল। হিসাবমত পরিধি দাঁড়ায় ২,২৬০ মাইল। আর দেখা যাচ্ছে, সমগ্র ইউরোপের দশ ভাগের এক ভাগ।

বিজ্ঞপ্তিটাতে তো খোলসা করেই বলা হয়েছে, জায়গাটা কারোরই মালিকানাধীন নয়। অতএব তার ওপর সবার সমানাধিকার। কারোর আয়ত্বে নেই, তাই যে কেউ অধিকারও করতে পারবে। আর সেখানে কেউ থাকে না বলে নিজের বলেও কেউ দাবি করতে পারবে না। আর অন্যান্য দেশের জমির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, তাই দখল নিতে আগ্রহী এমন কেউ নিলাম ডাকতে আসুক। নিলাম-ব্যবস্থায় কারো ওজর আপত্তি থাকার কথা নয়।

ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, হল্যান্ড, ডেনমার্ক আর সুইডেন-নরওয়ে প্রভৃতি ছ'টি রাষ্ট্রের অধিকার সম্বন্ধে কারোর আপত্তি থাকার তো কথাই নয়। আপত্তি উঠলও না।

কিন্তু জমিতে যাদের প্রকৃত অধিকার রয়েছে সেই অ্যাস্কিমো এবং অন্যান্য সুমেরুবাসীদের মতামত নেওয়ার কোনো দরকারই কেউ অনুভব করল না।

পৃথিবীর কী আশ্চর্য বিধান, কাজ কারবার! ব্যাপারটা অচিরেই পৃথিবীর সকলের সামনে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল, নতুন সংস্থা সুমেরুর মালিকানা লাভ করে ঘাঁটি গেড়ে বসলে তার সর্বেসর্বা হয়ে উঠবে আমেরিকা। প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলি মতলবটাকে সুনজরে দেখতে পারল না। আমেরিকা এমনিতেই আগ্রাসী নজর মেলে সবকিছুর দিকে তাকিয়ে। তার ওপর যদি সুমেরুটা কব্জা করে নেয় তবে ব্যাপারটা তো ভাববারই বটে।

আসলে কিন্তু দুশ্চিন্তার তিলমাত্র কারণও নেই। সুমেরু নিয়ে কারোর তেমন ফায়দা হচ্ছে কি? অবশ্যই নয়। এরকম চিন্তা করে সুমেরুর সঙ্গে যাদের জমি লাগোয়া নয় তারা উদাসীন রইল। তবে হ্যাঁ, ৮৪-র লাগোয়া যাদের ভূখণ্ড তারা মনস্থ করল অর্থদণ্ড হলেও আমেরিকাকে সরিয়ে দিয়ে জমির মালিকানাস্বত্ব রাখা চাই-ই চাই।

ইংরেজরা এমনিতেই বড্যারম্ভপ্রিয়। এতেও তারা অহমিকা প্রকাশে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হল্যান্ড, রাশিয়া, ডেনমার্ক ও সুইডেন-নরওয়ের প্রতিনিধিরাও বাল্টিমোর কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানাল।

www.pathagar.com

পৃথিবীর মেরু প্রদেশের মূল্য কত হওয়া উচিত, এটা নিয়ে সমস্যার উদ্ভব অবশ্যই হল। যারা নিলামে যোগ দিল তারা সবাই কোনো না কোনো দাবি জানাল। ডেনমার্ক জানাল, সুমেরুতে তাদের উপনিবেশ আছে। তাদের অধীনে আছে, বাফিন সাগরের বেশ কিছু অঞ্চল, ডিস্কো দ্বীপ আর গ্রিনল্যান্ডের পশ্চিম উকূল তাদের অধীনে আছে। সবচেয়ে বড় কথা, তাদের দেশেরই অভিযাত্রী জাঁমুঙ্ক আর বেরিং সুমেরু অঞ্চলের কাছাকাছি গিয়ে বিজয়-পতাকা উড়িয়ে এসেছে। অতএব ডেনমার্ক তো নিলামে উপস্থিত থাকবেই।

হল্যান্ডেরই মানুষ জাঁমেয়েন ৭২-র ঠিক নিচে একটা দ্বীপ দখল করেছিল। আর ৮৪-র কাছাকাছি হল্যান্ডের বহু অভিযাত্রী চলে গিয়েছিল। অতএব সুমেরুর ওপর হল্যান্ডের দাবি থাকা তো সঙ্গতই বটে। রাশিয়ার বহু অভিযাত্রীও সুমেরু-অভিযানে গিয়েছিল। উত্তর মহাসাগরের অর্ধেকটা তো তাদেরই শাসনাধীন। সুমেরু থেকে মাত্র ন' শো মাইল এলাকার মধ্যে ৭৫ অক্ষরেখার বহু দ্বীপ আর নিউ সাইবেরিয়ার বহু অঞ্চল তো আঠারো শতকের প্রথমে দিকে রাশিয়াই আবিষ্কার করেছে। তারপর থেকেই সেটাকে নিজেদের শাসনাধীন রেখেছে। উত্তর-অঞ্চলের ভেতর দিয়ে সরাসরি যাওয়ার রাস্তা বের করার জন্য বহুদিন আগে একজন রাশিয়ানই তো পথে নেমেছিলেন। উদ্দেশ্য, অল্প সময়ে যাতে দুই মহাদেশের মধ্যে যাতায়াত সম্ভব হয়।

আমেরিকানরা সুমেরুর মালিকানা লাভের জন্য একেবারে আদাজল খেয়ে লেগে গেছে। সুমেরু অভিযানে তাদের দেশের প্রচুর সংখ্যক অসমসাহসী অভিযাত্রী বার-বার পা বাড়িয়েছে। আবার ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বিচার করলে তাদের দেশ সুমেরুর ঠিক নিচে অবস্থান করছে—বেরিং সাগর থেকে হাডসন উপসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এছাড়াও নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া, ওয়াসটন, মেলভিল, প্রিন্স অ্যালবার্ট, কিং উইলিয়ম, বাফিন আর ব্যাঙ্কস প্রভৃতিদেশ আর দ্বীপগুলো ছড়িয়ে রয়েছে। তাই তো সুমেরু যদি কোনো দেশের অন্তর্ভূক্ত হয়ই তবে সে দেশ অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্র। অতএব দেখা যাচ্ছে, সবার আগে দাবি রয়েছে আমেরিকার। তারপর ইউরোপও এশিয়ার দাবি। অতএব আমেরিকান সংস্থার মাধ্যমে সুমেরুকে ক্রয় না করা অবধি যুক্তরাষ্ট্র সরকার দমবার নয়।

বিচার করে দেখলে, আমেরিকার নতুন দাবিটা সম্বন্ধে কারোরই দ্বিধা থাকা উচিত নয়। ইংল্যান্ডও তার দাবি থেকে একচুল সরতে নারাজ। উত্তরমেরু অঞ্চলের লাগোয়া বহু স্থানের মালিক তারাই, তাদের সাফ কথা। ম্যাকলুর আর উইলোবির মতো ইংরেজ অভিযাত্রীরাই তো সেখানকার বহুদ্বীপ আবিষ্কার করেছেন। আর বাফিন. ডেভিস, হাডসন, হল, নারেস, রস, কুক আর প্যারি প্রভৃতি অভিযাত্রীরাও জাতে অ্যাংলো-স্যাক্সন। অতএব তাদের নাবিকরা সে-অঞ্চলে এত ঘোরাঘুরি করেছে যে, সে দেশ তো তাদের এক্তিয়ারেই থাকা দরকার।

তাদের কথার জবাব দিতে গিয়ে আমেরিকার কালিফোর্নিয়া জার্নাল মন্তব্য করল, নাবিকদের অধিকারের ব্যাপারটা নিয়ে যদি এত লাফালাফি তবে এটা কি অস্বীকার করার যে, ইংরেজ অভিযাত্রী মারখাম ৮৩-২০´ অক্ষাংশ পর্যন্ত এগোতে পেরেছিলেন। আর আমেরিকান অভিযাত্রী ব্রেনার্ড ও লকউড এগিয়েছিলেন ৮৩-৩৫´ পর্যন্ত। তাই যদি হয় তবে কোন দেশ সুমেরুর কাছাকাছি যেতে সক্ষম হয়েছিল? আর কোন দেশের দাবি অগ্রগণ্য?

www.pathagar.com

ব্যাপারটা খোলসা হয়ে গেল, শেষপর্যন্ত লড়াই হবে ইংলিশ পাউন্ড-স্টারলিং আর আমেরিকান ডলারের মধ্যে।

বাল্টিমোরে তেসরা ডিসেম্বর নিলামের দিন ধার্য করা হল। নিলাম ডেকেও যারা সুমেরু কিনতে ব্যর্থ হবে তাদের মধ্যে নিলামের টাকা ভাগাভাগি হবে, স্থির হল। তারা টাকার ভাগ বুঝে পেয়ে ভবিষ্যতে সুমেরুর ওপর যাবতীয় স্বত্ব ত্যাগ করবে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন হল্যান্ডের ৫৩ বছর বয়স্ক জ্যাকুইম জ্যানসেন, ডেনমার্কের এরিক বলডেনিক, সুইডেন-নরওয়ের জাঁ হ্যারান্ড, রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন কর্ণেল বরিস কারকফ। ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন মেজর ডোনেলান আর তাঁর সচিব ডিন টুড্রিঙ্ক। ইনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছেন অর্থের লড়াইয়ে আমেরিকাকে কুপোকাৎ করে উত্তরমেরুর মালিকানা লাভ করবেনই। আর আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার ফর্সটার ছাড়া আর কেউ-ই তখন অবধি এসে পৌঁছান নি।

বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা নিজের দেশের জাহাজে করে আলাদা আলাদাভাবে হাজির হয়েছেন। সবাই একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী অতএব কেউ-ই কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় আর হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে নারাজ। কিন্তু বাল্টিমোর উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার দপ্তরের খোঁজ করতে গিয়ে সবার তো চক্ষু স্থির। তাদের দপ্তরটার হদিসই পেল না। বিজ্ঞপ্তিতে কডমাছের কারবারি যে-ফর্সটারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে তার মুখোমুখি হতেই সবাই হতাশ হয়ে পড়লেন। ব্যাপারটা সম্বন্ধে সে যা জানে পথের একটা কুলিও সেটুকু জানে। ব্যস, এর বেশি কিছু নয়। এবার উপায়ান্তর না দেখে বিভিন্ন মুলুকের প্রতিনিধিরা পরস্পরের মুখোমুখি না হয়ে আর পারলেন না। তাঁরা ভুয়ো বিজ্ঞপ্তিটা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা বললেন। প্রতিনিধির পাঁচজনের মধ্যে থেকে ডিন টুড্রিঙ্ক মন্তব্য করলেন, 'আদৎ ব্যাপার হচ্ছে, আমেরিকা কিছুটা জায়গার দখল নিতে চায়। আসুন আমরা মিলিতভাবে তার পথ আগলে দাঁড়াই, হাত মেলান। আমাদের সবার টাকা এক সাথে জড়ো করলে, আমেরিকার সাধ্য কি যে, আমাদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে আসবে। আমরা যৌথভাবে জায়গাটা খরিদ করার পর সবার সমান অধিকার থাকবে। নতুবা টাকা বুঝে পেয়ে একজনকে ছেড়ে দেওয়া যাবে। মোদ্দা কথা হল, আমেরিকাকে রুখে দেওয়া।'

তাঁর প্রস্তাবটা বাকি চারজন সানন্দে মেনে নিলেন। এবার কথা হল, কে কি পরিমাণ অর্থ যৌথ তহবিলে জমা দেবে? হল্যান্ডের প্রতিনিধি জানালেন তিনি খুব বেশি হলে পঞ্চাশটা রাইকস খেলার খরচ দিতে পারেন। ব্যস, এর বেশি কিছুতেই নয়। রাশিয়ার প্রতিনিধি জানালেন, তিনি পঁয়ত্রিশ রুবল পর্যন্ত উঠতে পারেন। ডেনমার্ক পনের ক্রোনেন দিতে রাজি হলেন। নরওয়ে-সুইডেন বিশ ক্রোনেনের কথা বললেন। আর ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি দেড় শিলিং-এর বেশি রাজি হলেন না। এভাবেই ইউরোপের প্রতিনিধিদের আলোচনা সাঙ্গ হল।

তেসরা ডিসেম্বরের নিলামে ব্যাপারটা নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গেল। যেখানে আসবাবপত্র ও ঘর-সংসারের দ্রব্য সামগ্রী ছাড়া কিছু বিক্রি হয় না সেখানে সুমেরুকে নিলামে ব্যবস্থা করার অর্থ কি? আর এরকম একটা বিক্রির ব্যবস্থা বিচারপতির সামনে হওয়াই সঙ্গত নয় কি? ভূ-গোলকের অংশ বিশেষ বিক্রির ব্যাপারটা পাবলিক

www.pathagar.com

নিলামওয়ালার মারফৎ হওয়ার কোনো দরকার আছে কি? পৃথিবীর একটা অংশ সুমেরুকে চেয়ার-টেবিলের পর্যায়ে ফেলা কি সঙ্গত হয়েছে? আবার বিক্রির ব্যবস্থায় এমন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে কেউ আর টু শব্দটি না করতে পারে। আসল ব্যাপারটা তবে কি? ব্যবহারিক সংস্থা কি এমন কোনো গোপন তথ্য অবগত হয়েছে যে, ভবিষ্যতে উত্তরমেরুকে আসবাবপত্রের মতো স্থানান্তরিক করা যাবে?

তবে হ্যাঁ, এই প্রথম নয়। ভূ-গোলকের অংশ বিক্রির জন্য ইতিপূর্বেও নিলাম ডাকা হয়েছিল। এক ধনকুবেরের কাছে নিলামে ভূ-পৃষ্ঠের কিছুটা অংশ বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। কয়েক বছর আগে সানফ্রান্সিসকোয় ব্যাপারটা ঘটেছিল। স্পেনসর নামে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা দ্বীপ আকাশছোঁয়া দামে বিক্রি হয়ে যায়। নগদ পাঁচ লক্ষ ডলার মিটিয়ে দিয়ে উইলিয়ম ডিব্লিউ কোল্ডরূপ তার প্রতিদ্বন্দ্বী আর টাস্কিনার-এর নাকে ঝামা ঘষে স্পেনসর দ্বীপের মালিকানা স্বত্ব লাভ করেন। দ্বীপটার জন্য তাঁর সর্বমোট চল্লিশ লক্ষ ডলার ব্যয় হয়। তবে সেটা উপকূল থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। মনুষ্য বসতি ছিল, চাষ-আবাদও হত।

তবে সুমেরুর অবস্থা অবশ্য স্বতন্ত্র। মনুষ্য বসতি নেই, চাষ-আবাদের সম্ভাবনা আদৌ নেই। অতএব আকাশছোঁয়া দামের প্রশ্নই ওঠে না। তবু নিলামের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উদ্বেগ-উত্তেজনা চড় চড় করে বেড়েই চলল।

নিলামের দর নিয়ে বাজি ধরা হতে লাগল। বাজির ব্যাপারটা কেবলমাত্র আমেরিকাতেই নয়, ইউরোপেও সংক্রামক রোগের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল যে, নিলামে ডেনমার্ক, নরওয়ে-সুইডেন, রাশিয়া মোটেই হালে পানি পাবে না। তবে ইংল্যান্ড সহজে দমবে না, জমির স্বত্ব নাকি তাদেরই। তারা আগ্রাসি নীতির বলে সবকিছু কুক্ষিগত করার ধান্ধায় ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে। তাদের টাকারও অভাব নেই। অতএব আসলে লড়াইটা লাগবে আমেরিকা আর গ্রেট বৃটেনের মধ্যে।

সকাল হতে না হতেই পিঁপড়ের মতো দলে দলে কাতারে কাতারে মানুষ এসে উপস্থিত হল নিলামের নির্দিষ্ট স্থানে। ঠিক বেলা বারোটায় নিলাম শুরু হবে। জানা গেছে গ্রেট বৃটেন নাকি মেজর জেনারেলকে ঢালাও হুকুম দিয়ে রেখেছে অর্থ যতই লাগুক সুমেরুর স্বত্ব কিনে নিতেই হবে। আবার ব্যবহারিক সংস্থার এত অর্থ না-ও থাকতে পারে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তো আছে। অতএব উত্তরমেরুর স্বত্ব তাদের চাই-ই-চাই।

সবাই যখন উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে তখন কেবলমাত্র একজন মাথা ঠাণ্ডা রেখে স্বস্তিতে রয়েছে। কোনোরকম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাই তার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে না। কে সে? ব্যবহারিক সংস্থার এজেন্ট উইলিয়ম এস ফর্সটার।

নিলাম প্রাঙ্গণে এক তিল জায়গাও নেই। লোক গিসগিস করছে। রেলিঙে ঘেরা প্রাঙ্গনের একধারে, রেলিঙ ঘেঁষে উত্তেজনা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে হারাল্ড, বলডেনাক, ডোনেলান, ট্রিড্রিঙ্ক, কারকফ আর জ্যানসেন। তাঁদের ভাবটা এমন যেন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকরা যুদ্ধারম্ভের হুকুমের অপেক্ষায় অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে। এদিকে কিন্তু আমেরিকার পক্ষ থেকে উপস্থিত জনতার ভিড়ে গিয়ে চুপচাপ বসে আছেন মিসেস স্করবিট আর ম্যাসটন। ধারে-কাছে গান-ক্লাবের কয়েকজন সদস্যও রয়েছে।

এবার নিলামওয়ালার পক্ষ থেকে একজন সক্রিয় হল। সে ভাষণের শুরুতে বলল, 'যাকে কেন্দ্র করে, যাকে নিলাম করার জন্য এখানে জনসমাগম হয়েছে তাকে অর্থাৎ উত্তরমেরুকে সবার সামনে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তার গুণাগুণ, আসল না নকল বা মেকী তা-ও দেখেশুনে বিচার করা সম্ভব নয়।'

'তবে হ্যাঁ, সুমেরু অঞ্চলকে প্রদর্শনের জন্য সবার সামনে তুলে ধরা সম্ভব না হলেও তার একটি ম্যাপ টেবিলের গায়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর তার গায়ের ৮৪ অক্ষরেখাটাকে লাল ও কালো কালি দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। বিক্রির জায়গাটুকু দেখিয়ে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। সেখানে জল, বরফ নাকি মাটি আছে তা নিয়ে ক্রেতারা মাথা ঘামাক। নিলামওয়ালা বিক্রির অঞ্চলটুকু চিহ্নিত করেই দায়মুক্ত।'

ঘড়ির কাঁটা দুটো বারোটার ঘরে গিয়ে মিলিত হতে না হতেই স্বয়ং নিলামওয়ালা মিস্টার গিলমোর মঞ্চে হাজির হলেন। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বক্তৃতা শুরু করলেন, 'উপস্থিত সুধীবৃন্দ, ৮৪ অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত ভূগোলকের সম্পূর্ণ অঞ্চলটা নিলামে বিক্রির উদ্দেশ্যে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। সেখানে জল, সাগর, মহাসাগর, উপসাগর, দ্বীপ-উপদ্বীপ বা হিমশৈল যা আছে তা আপনারা যাঁরা নিলামে খরিদ করতে আগ্রহী তাদের বিচার্যবিষয়। এবার মানচিত্রের বিশেষ একটি ক্ষেত্রফল ৪,০৭,০০০ বর্গ মাইল। নিলামের সুবিধার জন্য প্রতিবর্গ মাইলের জন্য এক সেন্ট হিসাবে মোট ৪,০৭,০০০ সেন্ট। আর যদি প্রতি বর্গমাইলের জন্য এক ডলার দাম নির্ধারণ করা হয় তবে এর দাম দাঁড়াবে ৪,০৭,০০০ ডলার।'

নিলামওয়ালার কথার ফাঁকে উপস্থিত কৌতূহলী দর্শকরা পরস্পরের সঙ্গে চাপা গলায় গুনগুনানি জুড়ে দিল। গুনগুনানি ছাপিয়ে ফ্লিন্ট গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন।

তাঁর কথায় কান না দিয়ে নিলামওয়ালা আবার তার বক্তৃতা শুরু করলেন, 'একটা কথাই আমার তরফ থেকে বলার আছে—৮৪ অক্ষরেখার ওপারে যা কিছু অবস্থান করছে, ক্রেতা সবকিছুরই মালিকানাস্বত্ব লাভ করবেন। ভবিষ্যতে তাঁর মালিকানা নিয়ে কারোরই ট্যাঁ-ফোঁ করার কোনোই অধিকার থাকবে না। ভূ-গোলক বা বায়ুমণ্ডল পরিবর্তিত হলেও সুমেরু অঞ্চল যতক্ষণ অবধি ৮৪ অক্ষরেখার বাইরে না আসছে ততক্ষণ এর সর্বস্বত্ব একমাত্র ক্রেতারই থাকবে।'

আবার উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে গুনগুনানি শুরু হয়ে গেল। এরই মধ্যেই নিলামওয়ালা হাঁক দিলেন, 'তবে প্রতি বর্গমাইলের জন্য দশ সেন্ট হিসেবে দর পাওয়া গেল।'

ব্যাপারটা বোঝা গেল না। আসলে দশ সেন্ট দাম কেউ হেঁকেছে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ব্যাপারটা ভাঁওতা কিনা বোঝা গেল না। তবে ব্যাপারটা নিয়ে কারো মাথাব্যথা আছে বলে মনেও হল না। প্রতিবর্গমাইলের জন্য দশ সেন্ট দাম হলে পুরো অঞ্চলটার মোট দাম দাঁড়ায় ৪০,৭০০০ ডলার। তা সত্ত্বেও ডেনমার্কের প্রতিনিধি হাঁক দিল 'কুড়ি সেন্ট।'

সুইডেন-নরওয়ে সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে উঠল, 'ত্রিশ সেন্ট।' রাশিয়া হাঁক দিল—'চল্লিশ সেন্ট।'

পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে মেজর ডোনেলার আর তাঁর দলের চারজন মিইয়ে গেলেন। আসলে এতেই তাদের পকেট ফাঁকা হয়ে গেছে।

www.pathagar.com

ইংল্যান্ড মোটেই মুখ খুলল না। আমেরিকাও মুখে কুলুপ এঁটে নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে বসে রয়েছে।

এদিকে নিলামওয়ালা গিলমোর প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রেতাদের আরও দর হাঁকার জন্য নানাভাবে উত্তেজিত করার চেষ্টায় মেতে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভাবনা চিন্তা করে ডেনমার্কের প্রতিনিধি পঞ্চাশ সেন্ট দর হাঁকলেন। আরও দশ সেন্ট বেশি হাঁকলেন হল্যান্ডের প্রতিনিধি। এতে পুরো অঞ্চলটার মোট দাম দাঁড়াল দুলক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার দুশ ডলার।

আবার নিলামওয়ালা গিলমোর ক্রেতাদের উৎসাহ দানের নামে উত্তেজিত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

জাঁ হারান্ড এবার গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন, 'সত্তর সেন্ট।' ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেল কারকফ আশি সেন্ট হেঁকে বসলেন।

আবারও নিলামওয়ালা গিলমোর প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রেতাদের উৎসাহিত করতে প্রয়াসী হলেন।

মেজর ডোনেলান এতক্ষণ ডিন টুড্রিঙ্কের ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিলেন। এবার ক্ষেপা বাঘের মতো তিনি গর্জে উঠলেন, 'এক শো-এক শো সেন্ট। এবার ইংল্যান্ডের এক ডাকে পুরো অঞ্চলটার দাম চার লক্ষ সাত হাজার ডলার দাম উঠে গেল।

ইংল্যান্ডের ব্যাপার দেখে আমেরিকার প্রতিনিধির মুখ চিপসে গেল। বরফ, জল আর তুহিনে ঢাকা একটা অঞ্চলের দাম ক্রমে এমন আকাশছোঁয়া হয়ে উঠতে থাকলে ব্যাপারটা তো ভাবনারই বটে।

নিলামওয়ালা গিলমোর আবার বক্তৃতা শুরু করল। রসিকতা আর টিটকারির মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিদের উত্তেজিত করে দর চড়াবার জোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল।

উইলিয়াম এস ফর্স্টার খবরের কাগজের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই হেঁকে উঠলেন, 'এক শো দশ সেন্ট। প্রতি বর্গমাইলের জন্য এক শো দশ সেন্ট।'

আমেরিকা সবাইকে ডিঙিয়ে ওপরে উঠে যাওয়ায় উপস্থিত দর্শকদের অধিকাংশের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা গেল। কারণ, এরা আমেরিকার ওপর বাজি ধরেছিল। অতএব এদের উচ্ছ্বাস-উল্লাস তো হবারই কথা।

ব্যাপার দেখে মেজর ডোনেলান তাজ্জব বনে গেলেন। চোখের তারায় উত্তেজনা মিশ্রিত বিস্ময়ের ছাপ এঁকে তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে উইলিয়াম এস ফর্স্টার-এর দিকে তাকালেন।

আমেরিকান প্রতিনিধি উইলিয়াম এস ফর্স্টার কিন্তু নির্বিকারচিত্তে খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মুখবুজে বসে রইলেন।

মেজর ডোনেলান উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে হাঁক দিলেন, 'আমার দর রইল এক শো চল্লিশ সেন্ট।'

উইলিয়াম এস ফর্স্টার হাঁকলেন—'আমার দর এক শো ষাট সেন্ট।'

মেজর ডোনেলান হাঁকলেন—'আমার এক শো আশি সেন্ট।'

'এক শো নব্বই সেন্ট' উইলিয়াম এস ফর্স্টার হেঁকে উঠলেন।

এক শো নিরানব্বই সেন্ট হেঁকে বসলেন গ্রেটবৃটেনের প্রতিনিধি। এর মানে পুরো অঞ্চলটার দাম দাঁড়াচ্ছে সাত লক্ষ তিরানব্বই হাজার ডলার। আরে ব্বাস! এ যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

www.pathagar.com

নিলামওয়ালা গিলমোর-এর গলা শোনা গেল—'তবে প্রতি বর্গমাইল এক শো নিরানব্বই সেন্ট হিসেবেই উত্তরমেরু বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।'

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই রীতিমতো ঠাণ্ডা মাথায়, নিচুগলায় ফর্স্টার বলে উঠলেন, 'আমার দর দু শো সেন্ট—পুরো দু শো সেন্ট।'

তাঁর কথাটা উচ্চারিত হওয়া মাত্র উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে একটা বড় ভগ্নাংশ উচ্ছ্বসিত আবাগের সঙ্গে সমস্বরে বলে উঠল, 'হিপ—হিপ—হুররে! হিপ—হিপ—হুররে!' হবে নাই বা কেন? এরা সবাই যে আমেরিকার ওপরেই বাজি ধরেছে। আমেরিকাই দাম হেঁকে সবাইকে টেক্কা দিয়ে উত্তরমেরুর স্বত্ব কিনে নেবে।

ব্যস, আমেরিকার উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থা তাদের এজেন্ট উইলিয়াম এস ফর্স্টার-এর মাধ্যমে সবোর্চ্চ দর হেঁকে ৮৪ অক্ষরেখার ওপারের যাবতীয় অঞ্চল কিনে নিতে চলেছে। আর কোনো দেশের প্রতিনিধিই ফোঁ-ফাঁ করলেন না। তাদের তহবিল যে অনেক আগেই ফাঁকা হয়ে গেছে।

* * *

উইলিয়াম এস ফর্স্টার পরদিন উত্তরমেরু খরিদের নির্ধারিত অর্থ জমা দিতে গিয়ে দলিলপত্রে নিজের নাম ইম্পে বার্বিকেন লেখালেন। আর প্রতিষ্টানের নাম লেখালেন 'বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানি'। বার্বিকেন—ইম্পে বার্বিকেন? তবে কি ইনি গান-ক্লাবের সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন? ইনিই কি বছর কয়েক আগে কামানের গোলায় চেপে চাঁদে চক্কর মেরে এসেছিলেন? ইনিই কি তবে সেই বার্বিকেন? হ্যাঁ, অনুমান অভ্রান্তই বটে। ইনিই গান-ক্লাবের সভাপতি সেই ইম্পে বার্বিকেন। এঁর সহযোগীও সহগামী ছিলেন, এঁরই প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাপ্টেন নিকল আর ফরাসি বৈজ্ঞানিক মাইকেল আঁর্দা। চাঁদের গায়ে চক্কর মেরে তিনজন অক্ষত শরীরে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ক্যাপ্টেন নিকল এবং ইম্পে বার্বিকেন নিলামের আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন। কারণ ফরাসি বৈজ্ঞানিক মাইকেল আঁর্দা পৃথিবীর বুকে ফিরে এসে দেদার অর্থ উপার্জন করে ফুলেফেঁপে একেবারে ঢোল হয়ে যান। ব্যাস, ফিরে যান নিজের দেশে। সেখানে কফির চাষে মেতে যান।

এদিকে কামান দাগার পর ইম্পে বার্বিকেন এবং ক্যাপ্টেন নিকল গোমড়া মন নিয়ে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। কারণ, হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আর কতদিন বসে থাকা সম্ভব! টাকার পাহাড় রয়েছে। কিন্তু করার কিছুই নেই। অথচ নতুনতর কিছু করার জন্য উভয়েই সর্বক্ষণ স্বপ্নে ডুবে রয়েছেন। চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানোর জন্য পঞ্চান্ন লক্ষ ডলার জোগাড় হয়েছিল। সম্পূর্ণ অর্থ তাতে ব্যয় হয় নি। দুলক্ষ ডলার হাতে রয়ে গেছে। আবার প্রোজেকটাইলটার দর্শনিস্বরূপ মোটা অর্থ কামিয়েছেন। এভাবে টাকার কুমির বনে গেছেন। ফলে বাকি জীবনটা তাঁরা দিব্যি বসে আয়েশ করে কাটিয়ে দিতে পারতেন। আসলে তাদের মাথায় যে নতুনতর কিছু করার জন্য প্রতিনিয়ত পোকায় কামড়ায়। সত্য বলতে কি আরাম-আয়েশ তাঁদের কাছে পীড়াদায়ক ব্যাপার। তাই তো যা হোক কিছু করার অছিলায় উত্তরমেরু কেনার জন্য অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছেন।

তবে হ্যাঁ, উত্তরমেরু খরিদ করার সম্পূর্ণ অর্থ জুগিয়েছেন মিসেস স্করবিট। একমাত্র তাঁর অর্থের জন্যই ইউরোপ আমেরিকার কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। চাঁদের বুকে চক্কর মেরে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসার পার ইম্পে বার্বিকেন ও ক্যাপ্টেন নিকরকে নিয়ে

www.pathagar.com

দেশের মানুষ মাতামাতি জুড়ে দেন। কিন্তু এঁরা দুজন ছাড়া আরও একজনের সম্মান পাওয়ার কথা ছিল। তিনি হচ্ছেন, জে. টি. ম্যাসটন। গান ক্লাবের সম্পাদক। তিনি অঙ্ক কষে, হিসাব নিকাশের মাধ্যমে চাঁদে গোলায় চেপে পাড়ি জমানোর ব্যাপারটাকে সুগম করে দিয়েছিলেন। তিনি সহযোগিতা না করলে 'পৃথিবী থেকে চাঁদে' কাহিনীটি কোনোদিনই সম্ভব হত না। ভয় ভীতির জন্য নয়, যুদ্ধে এমন ভয়ঙ্কর জখম হয়েছিলেন যে, চাঁদের মানুষ আচমকা তাঁর বিকলাঙ্গ চেহারাটিকে দেখলে চমকে উঠত। তার মাথার খুলির পরিবর্তে গাটাপার্চার খুলি আর হাড়-মাংসের হাতের পরিবর্তে লোহার পাত দেখলে চমকে যাওয়ার কথাই তো বটে। এতকিছু সত্ত্বেও তাঁর প্রতিভা কিন্তু এতটুকু মিইয়ে যায় নি। এমন একটি অনন্য প্রতিভাধরকে মিসেস স্করবিট পছন্দ করবেন এতে অবাক হবার কিছুই নেই। তিনি মনে করলেন জে. টি. ম্যাসটন কেবল একজন মানুষই নন, সত্যকারের একজন অতিমানব। তাই তিনি জে. টি. ম্যাসটনকে বিয়ে করার জন্য অত্যুগ্রী আগ্রহী।

মিসেস স্করবিট তরুণী নন। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স তাঁর। চুলে পাক ধরেছে। তবে সবগুলি দাঁত এখনও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে যথাস্থানে অবস্থান করছে। তার বিয়ে একবার হয়েছিল ঠিকই। কয়েক বছর বিবাহিত জীবন যাপন করতেই তার স্বামী পৃথিবী ছেড়ে চলে যান—স্করবিট বিধবা হন। ম্যাসটনকে বিয়ে করে স্বামীরূপে না পাওয়া অবধি তাঁর মন-প্রাণ কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। অর্থের অভাব তাঁর নেই। ভ্যানডার, বিল্ট, গোল্ডস আর ম্যাকেসের মতো ধনকুবের না হলেও তাঁকে অবশ্যই ধনীর পর্যায়ে ফেলা যায়। মিসেস কার্পারের মতো বিশ কোটি, মিসেস ক্রকারের মতো আটকোটি অথবা মিসেস স্টুয়ার্টের মতো ত্রিশ কোটি ডলারের মালিক তিনি নন। আবার মিসেস মাফিট, মিসেস হোট গ্রিন বা মিসেস মার্শালের মতো অগাদ ধন-সম্পদের মালিক তিনি নন বটে। তবে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার ছাড়া নিউ ইয়র্কের যে হোটেলটিতে কেউ প্রবেশাধিকার পায় না সে হোটেলে মিসেস স্করবিট হরদম যাতায়াত করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে চল্লিশ লক্ষ ডলার অর্থাৎ দু কোটি ফ্রাঁ তাঁর তহবিলে মজুদ আছে। মিস্টার জন পি স্করবিটের কাছ থেকে এ-বিপুল অর্থ তিনি পেয়েছেন। তাঁর যাবতীয় অর্থ তিনি ম্যাসটনের কাজে লাগাতে উৎসাহী আর বিনিময়ে তাঁকে পেতে চান নিজের করে।

তাই তো মিসেস স্করবিট যখন জানতে পারলেন, ম্যাসটনের কিছু টাকা দরকার তখন আনন্দ-আহ্লাদে ডগমগ হয়ে তিনি উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার হাতে তুলে দিলেন বিপুল অর্থ। এ-অর্থ কোন কাজে ব্যবহার করা হবে ভুলেও মুখ ফুটে জানতে চাইলেন না। তবে এটুকু বিশ্বাস তাঁর আছে যে, ম্যাসটন যে-সংস্থার সঙ্গে জড়িত সেখানে তার পড়ে থাকা অর্থ নির্ঘাৎ মহৎ কাজেই ব্যয় হবে।

এক সময় যখন জানতে পারলেন, প্রতিষ্ঠানটির 'বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানি' নামকরণ করা হয়েছে তখনও তিনি ঘাবড়ালেন না। তিনি তো নিঃসন্দেহ যে, প্রতিষ্ঠানটি সবচেয়ে বড় ভাগীদার যখন তিনি তখন সুমেরুর মালিকানার বড়ভাগীদারও তিনিই হবেন।

মিসেস স্করবিট এভাবেই ৮৪-এর গণ্ডীর ওপাশের তুষার রাজ্যের রাণী বনে গেলেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বরফের বরফ-রাজ্য নিয়ে কি ফায়দা হবে? অনুর্বর সুমেরু থেকে কি সংস্থাটি ফায়দা কিছু ওঠাতে পারবে? অবহেলিত বরফ-অঞ্চলটিকে নিয়ে সারা

www.pathagar.com

পৃথিবী কেনই বা এমন আগ্রহী হয়ে উঠেছে? মানুষের মনে কেন এমন করে হঠাৎ রহস্যের সঞ্চার হল? ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে পৃথিবীর মানুষ উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার পাগলামি দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে। অর্থের বিনিময়ে মিসেস স্করবিট এটাকেই সান্ত্বনা বলে মেনে নিয়েছেন।

তবে হ্যাঁ, সময়-সুযোগ মতো মাঝে-মধ্যে মিসেস স্করবিট মিস্টার ম্যাসটনকে প্রশ্ন করেছেন, 'উত্তরমেরু কিনে ফায়দা কি হল?' তবে এও সত্য তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে বার্বিকেন এবার চন্দ্রবিজয়ের অভিযানের গৌরবকেও ছাপিয়ে যাবেন। তিনি এমন এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড করবেন যা অতীতে ছিল না, বর্তমানে নেই আর ভবিষ্যতেও কোনোদিন ঘটবে না। এতকিছু বুঝেও ম্যাসটনকে প্রশ্নটা তিনি করেছিলেন।

ম্যাসটন—'অপেক্ষা করুন, ধৈর্য ধরুন" প্রভৃতি বলে প্রতিবারই তার প্রশ্নটাকে সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে গেছেন।

ইউরোপের মুখে ঝামা ঘষে আমেরিকা যখন জয়লাভ করে সুমেরুর মালিকানা স্বত্ব লাভ করল তখন মিসেস স্করবিট আবারও একই প্রশ্নের অবতারণা করে বলে উঠলেন, 'এখনও কি উদ্দেশ্যটা জানতে পারব না?'

ম্যাসটন আমেরিকান ভদ্রমহিলা মিসেস স্করবিটের সঙ্গে করমর্দন সারতে সারতে মুচকি হেসে জবাব দিলেন, 'জানবেন, অবশ্যই জানতে পারবেন।'

কয়েকদিনের মধ্যেই পৃথিবী জুড়ে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থা নিজেদের গোপন উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে টাকার জন্য আবেদন করল। পৃথিবীর মানুষ জানতে পারল নতুন সংস্থাটি উত্তরমেরুর বরফের তলা থেকে কয়লা তোলার ধান্ধায় সুমেরু কিনেছে।

সংস্থার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আবার পৃথিবীর মানুষ মুখ খুলল, 'কয়লা? সুমেরুতে কয়লা? কয়লা আছে কি সেখানে? সুমেরুতে কয়লা কোত্থেকে আসবে?'

আর একদল পাল্টা জবাব দিল, 'কেন থাকবে না? সারা পৃথিবী জুড়েই তো কয়লা রয়েছে, কার না জানা আছে? ইউরোপের বহু জায়গায় কয়লা আছে। আমেরিকাতেও কয়লা আছে। হয়তো বা আমেরিকাতে সর্বোৎকৃষ্ট কয়লা যা আছে, এত কয়লা পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। আর অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া ও আফ্রিকাতে কয়লাখনি আছে। যত দিন যাচ্ছে ততই নিত্য নতুন কয়লাখনি আবিষ্কৃত হচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীতে অন্তত এক শো বছরের মতো কয়লা সঞ্চিত আছে। কলকারখানার সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে কয়লা উত্তোলন বাড়তে থাকবে। বাষ্পের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার শুরু হলেও কয়লার চাহিদা হ্রাস পাবে না। তাই তো কয়লাকে আমাদের আগলে রাখতে হবেই। কয়লা যে কেবলমাত্র আমাদের রান্নার সমস্যা মেটায় তাই নয়। বহুভাবে বহুক্ষেত্রে আমরা কয়লাকে ব্যবহার করছি। বিজ্ঞান আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, কয়লাকে কতভাবে সমাজের মঙ্গল সাধনে লাগনো যেতে পারে। গবেষণার মাধ্যমে তাঁরা কয়লা থেকে উত্তাপ, আলো আর সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি করছেন। কদাকার কয়লাকে হীরে পালিশ করতেও ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই তো কয়লার সমাদর লোহার মতোই। হয়তো বাতার চেয়েও বেশি। আমাদের বরাতের জোর আছে যে, পৃথিবীর লোহা কোনোদিনই ফুরোবে না। আসলে পৃথিবীটা যে লোহা দিয়েই গড়া। আমাদের ভূ-গোলকটা যেন অতিকায় একটা লোহার পিণ্ড। তারপর জল আর পাথরের স্থান। তাই কয়লা একদিন

www.pathagar.com

না একদিন ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু লোহা কোনোদিনই ফুরোবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে সুমেরুতে কয়লা আসবে কোত্থেকে?'

বার্বিকেনের অন্ধ সমর্থকরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলল, 'থাকবে নাই বা কেন? ভূ-প্রকৃতি যখন গঠিত হতে চলেছিল তখন সূর্যের উত্তাপে হয়তো নিরক্ষীয় অঞ্চল আর মরু অঞ্চলে সমানভাবে বর্ষিত হত। মরু অঞ্চল গভীর অরণ্যাবৃত ছিল। পৃথিবীতে মানুষ এসেছে তারও অনেক পরে। তখনই শুরু হয়েছে শৈত্য, উত্তাপ আর আর্দ্রতার ভয়ঙ্কর সব খেলা। একের পর এক ভয়ঙ্কর সব পরিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবী বর্তমান রূপে পরিণত হওয়ার আগেই বিশালায়তন সুগভীর অরণ্য পৃথিবীর উত্তাপ ও নানা প্রাকৃতিক কারণে কয়লায় রূপান্তরিত হয়ে গেল।'

খবরের কাগজের পাতায় পাতায় যখন উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার বরফের তলা থেকে কয়লা তোলার উদ্দেশ্যের কথা ছাপা হতে লাগল ঠিক তখনই এক বিকেলে ডিন টুড্রিঙ্ক আর মেজর ডোনেলান এক রেঁস্তোরায় কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে প্রসঙ্গটা নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হলেন। কথা প্রসঙ্গে মেজর বললেন, 'সুমেরু পর্বত সম্পর্কিত গবেষণায় অধ্যাপক নোরডেনস্কিঅল বিভিন্ন পাথরের গায়ে প্রচুর সংখ্যক শিলীভূত উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করেছেন। তবে অনেকটা উত্তর দিক থেকে। অতএব কয়লার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করা সঙ্গত নয়। সেখানে এত কয়লা লুকিয়ে আছে যে, কেবল তুলে নিতে পারলেই হল।'

ডিন টুড্রিঙ্ক তাঁকে সমর্থন করলেন। তবে তিনি বললেন, 'আপনার কথা মানছি বটে। কিন্তু এর জন্য ইঞ্জিনিয়ার, অন্তত নৌ-অভিযাত্রী যদি উৎসাহী হত তবুও না হয় সঙ্গত বলা যেত, কিন্তু বন্দুকবাজরা এতে উৎসাহী হয়ে পড়লেন কেন?

কয়েকদিনের মধ্যেই পৃথিবীর সংবাদপত্রগুলি ব্যাপারটা নিয়ে তোলপাড় জুড়ে দিল। একটি মার্কিন সংবাদপত্র তো বার্বিকেনের সমর্থন করে লিখল, '১৮৭৫ এবং ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপেট নারেস ৮২° সমাক্ষরেখায় চক্কর মারার সময় হ্যাজেল পপলার, বিচগাছ ও বহু ফুলগাছ দেখতে পেয়েছিলেন। তাই যদি হয় তবে কয়লা না থাকার কারণ কী?'

নিউইয়র্কের এক সংবাদপত্র প্রায় একই রকম মন্তব্য করল, লেফটেন্যান্ট গ্রিলি লেডি ফ্রাঙ্কলিন উপসাগরে ১৮৮১ এবং ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে কয়লার স্তর আবিষ্কার করেন। সুমেরুতে প্রচুর কয়লা আছে এরকম উক্তি ডক্টর পেডিও করেছেন।

এরকম সব বক্তব্যকে বার্বিকেনের বিরুদ্ধপক্ষ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারল না। শেষমেশ তারাও মেনে নিতে বাধ্য হল, সুমেরুতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে অরণ্য ছিল আজ তা প্রচুর, প্রচুর কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে।

বার্বিকেনের প্রতিপক্ষ হেরে ভূত হয়ে গেলেও একেবারে মিইয়ে গেলেন না। একদিন গান-ক্লাবের এক মিটিং-এর শেষে মেজর ডোনেলান গলা ছেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ কয়লা আছে। মেনে নিচ্ছি, আপনাদের কিনে নেওয়া বরফ সাম্রাজ্যের জমাটবাঁধা বরফের তলায় বিস্তর কয়লা রয়েছে। তবে আর দেরি করছেন কেন মশাই, কাড়িকাড়ি কয়লা তুলে নিয়ে আসুন।'

মুচকি হেসে শান্ত গলায় বার্বিকেন জবাব দিলেন, 'আসব। অবশ্যই আসব। সে উদ্যোগ আয়োজনই তো করছি মশাই।'

www.pathagar.com

মেজর ডোনেলান বক্রোক্তি করলেন, 'স্বপ্ন দেখছেন নাকি মশাই! ৮৪ সমাক্ষ রেখার ওপারে, কোনো অভিযাত্রী আজ পর্যন্ত যেখানে যেতে পারেন নি সেখান থেকে আপনারা কয়লা তুলে আনবেন!'

'কেবলমাত্র সেখানেই নয়। আরও অনেক, অনেক ভেতরে যাব। উত্তরমেরুর একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবশ্যই হাজির হব, শুনে রাখুন মশাই।'

বার্বিকেন এমন শান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে কথাগুলো ব্যক্ত করলেন যেন এটা তাঁর কাছে একেবারেই মামুলি এক ব্যাপার।

পৃথিবীতে পরশ্রীকাতর মানুষের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। চারদিকে বার্বিকেনকে নিয়ে মাতামাতি করতে দেখে একদল লোক উঠে পড়ে লেগে গেল, রঙ্গ-রসিকতার মাধ্যমে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। সবচেয়ে বেশি করে তাঁর কেচ্ছা গাইতে লাগল ইংরেজরা। তারা বলে বেড়াতে লাগল—ইয়াঙ্কি বার্বিকেন নাকি যেখানে আজ পর্যন্ত মানুষ পদচিহ্ন আঁকতে পারে নি সেখানে প্রাসাদ তৈরি করে শহর গড়ে তুলবেন। শুধু কি এই, সেখানে দ্বিতীয় হোয়াইট হাউস গড়ে তুলে পৃথিবীতে অনন্য নজির সৃষ্টি করবেন।

শুধু কি এই? একটা কার্টুন ছবি ছাপিয়ে বিলি করল, যার বক্তব্য—'ইম্পে বার্বিকেন দুই সাহযোগী ম্যাসটন এবং নিকলকে নিয়ে বেলুনে চেপে সুমেরুর আকাঙ্ক্ষিত অঞ্চলটিতে বহু তল্লাশি চালিয়ে মাত্র আধ পাউন্ড ওজনের একটুকরো কয়লা পেয়েছেন।' এরকম বহু কার্টুন ছবি ছাপিয়ে ইংরেজরা বিলি করতে লাগল।

বার্বিকেন এমনিতেই ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তার ওপর কোনো প্ররোচনাতেই কান না দিয়ে নিজেকে পুরোপুরি সংযত রাখলেন। উত্তরমেরুর মালিকানাস্বত্ব লাভ করার পর থেকে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহের জন্য তৎপর হলেন। সর্বমোট দেড় কোটি ডলার তার চাই। বাজারে এক শো ডলার মুল্যের কোম্পানির কাগজ বাজারে ছাড়তে না ছাড়তেই আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে টাকা যেন উড়ে আসতে লাগল। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও বার্বিকেনের সাফল্য নিয়ে সামান্যতম সন্দেহও রইল না। প্রতিটি মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস, বার্বিকেনের সাফল্য অনিবার্য।

১৬ই ডিসেম্বর হিসাব করে দেখা গেল ইতিমধ্যেই তিন কোটি ডলার সংগৃহীত হয়ে গেছে। চাঁদে পাড়ি জমানোর ফলে গান ক্লাব যে পরিমাণ ডলার সংগ্রহ করে ছিল এটা তার তিনগুণ। বার্বিকেন অর্থ সংগ্রহের ব্যাপার আশাতীত সাফল্য লাভ করলেন।

* * *

গান-ক্লাবের সভাপতি নিঃসন্দেহ ছিলেন, সুমেরু জয় তিনি করবেনই করবেন। অর্থ সংগৃহীত হওয়ার ফলে বড় রকম একটি প্রতিবন্ধকতা তিনি কাটিয়ে উঠতে পারলেন।

অর্থ সংগ্রহের পর বার্বিকেন এবার প্রস্তুতি-পর্বে মন দিলেন। নারেস, কেন, ফ্রাঙ্কলিন ও গ্রিলি ডি-লঙ যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি তাতে সাফল্য লাভ করবেনই। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ৮৪° অক্ষরেখা অতিক্রম করে তিনি ভেতরে ঢুকতে সক্ষম হবেনই। কেবলমাত্র সেখানকার জমির মালিকানা বুঝে পেয়েই তিনি নিরস্ত হবেন না, আমেরিকার জাতীয় পতাকার উনচল্লিশতম তারকা হবে সুমেরু। একাজে তিনি সফল হবেনই। সাফল্য লাভ তাঁকে করতেই হবে।

এদিকে ইউরোপের মানুষ বার্বিকেনকে পয়লা নম্বর প্রতারক বলে ধিক্কার দিতে লাগল। এসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার অবকাশ তাঁর নেই।

www.pathagar.com

উত্তরমেরু বিজয়ের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটা জে. টি. ম্যাসটনের মাথা থেকে বেরিয়েছে। দিনের পর দিন অঙ্ক কষে কষে বহু জটিল সমস্যার জট ছাড়িয়ে তবেই তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে পেরেছেন। ম্যাসটনের তিলমাত্র ভুলও হয় নি। ভুল তার হতে পারে না, কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি ছাপানোর এক মাস আগে বন্ধুদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন উত্তরমেরু বিজয়ের গোপনসূত্র তিনি তাদের কাছে ব্যক্ত করবেন। তারপর তার ১৭৯নং ফ্রাঙ্কলিন স্ট্রিটের ব্যালিস্টিক কটেজের এক নিভৃত কক্ষে মাথা গুঁজে অঙ্ক নিয়ে মেতে গেলেন। ফায়ার-ফায়ার নামে তাঁর এক নিগ্রো চাকর ছাড়া তাঁর আর কোনো বাড়তি ব্যয়ের বোঝা নেই। তাই তাঁর টাকার দরকারও খুবই কম। গোলন্দাজ বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে তিনি কিছু ভাতা পান। আর গান-ক্লাবের সেক্রেটারি পদের জন্যও তাঁকে কিছু ভাতা দেওয়া হয়। তিনি আগ্রহী হলে দুহাতে টাকা কামাতে পারতেন। আর বিয়ে-থা করে অন্য দশজনের মতো দিব্যি ঘর-সংসার নিয়ে মেতে থাকারও কিছুমাত্র বাধা ছিল না। কিন্তু ঘরের নিভৃত কোণে বসে অঙ্কের ভেতরে ডুবে থাকতেই তাঁর যত আনন্দ, যত সুখ। তাঁর মাথা থেকে অঙ্কের এমন সব ভেল্কি বেরোয় যা দেখলে আইজ্যাক নিউটন, লা প্লেস আর ইউক্লিডও ঈর্ষান্বিত না হয়ে পারতেনই না।

ম্যাসটনের বাড়ির ঠিক বিপরীত বাড়িতে বাস করেন মিসেস স্করবিট। নিউপার্কের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বাড়ি সেটা। সবাই সেটাকে 'নিউপার্কের প্যালেস' বলে সম্বোধন করে। নিউপার্কের প্যালেস আর ব্যালিস্টিক কটেজের মধ্যে দূরত্ব মাত্র মাইল তিনেক। উভয় ভবনের মধ্যে প্রাইভেট টেলিফোনের লাইন পাতা হয়েছে। তাঁরা মুখোমুখি নাই বা হলেন, চোখের দেখা নাই বা দেখতে পেলেন, কথাবার্তার মাধ্যমে পরস্পরের খোঁজ-খবর তো নেওয়া যায়।

তেসরা ডিসেম্বর। ম্যাসটন বন্ধুদের সঙ্গে জরুরি কিছু আলোচনা সেরে বাড়ি ফিরে অঙ্ক নিয়ে বসার উদ্যোগ নিতে লাগলেন। সে অঙ্কের সমাধানের ওপর নির্ভর করছে বরফাবৃত সুমেরু অঞ্চলের বাঞ্ছিত যথোপযুক্ত ব্যবহার। সামান্য ভুলচুক হলেই পুরো ব্যাপারটা ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই ঠিক হল, সপ্তাহ খানেক কেউ তাঁর বাড়ি যাবেন না, অন্য কোনোভাবেও কেউ বিরক্ত করবেন না।

ম্যাসটন ঘরের কোণে কাগজ-কলম নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাথা গুঁজে অঙ্ক নিয়ে আঁকঝোক করার কাজে মেতে থাকার আয়োজন করলেন। চাকর ফায়ার-ফায়ার-এর ওপর কড়া হুকুম দিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এলেও যেন দরজা খুলে না দেয়।

গোড়ার দিকে পুরো দুটো দিন তিনি কাগজ-কলমে হাত না দিয়ে অঙ্ক নিয়ে কেবল ভাবনা-চিন্তায় ডুবে রইলেন। তাঁর ভাবনা-চিন্তা মোটামুটি এরকম ছিল, 'পৃথিবী অধিবৃত্তকার পথে পরিভ্রমণ করে চলেছে। তার সবচেয়ে বড় ব্যাসার্ধ তেষট্টি লক্ষ সাতাত্তর হাজার তিন শো আটানব্বই মিটার আর সবচেয়ে ছোট ব্যাসার্ধ তেষট্টি লক্ষ ছাপান্ন হাজার আশি মিটার। তার নিরক্ষরেখার বরাবর পৃথিবীর পরিধি হচ্ছে, চার কোটি কি. মি.। পৃথিবীপৃষ্ঠ প্রায় একান্ন কোটি ব. কিমি.। পৃথিবীর ঘনত্ব জলের ঘনত্বের প্রায় পাঁচগুণ বেশি। ম্যাসটন এ-তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে অঙ্ক আরম্ভ করবেন মনস্থ করলেন।

পাঁচই ডিসেম্বর বিকালে ম্যাসটন ব্ল্যাকবোর্ডের গায়ে বিশালায়তন একটি বৃত্ত আঁকলেন। পৃথিবীর প্রতিকৃতি। কেন্দ্রস্থল বরাবর একটা সরলরেখা টেনে তাকে

www.pathagar.com

দ্বিধাবিভক্ত করলেন। নিরক্ষরেখা—পরিধি। তার কাছকাছি বড় বড় হরফে লিখে রাখলেন পৃথিবীর পরিধির মাপ—৪০,০০০,০০০ মাইল।

ম্যাসটন এভাবে প্রথম ধাপ শেষ করলেন। এবার সমস্যার সমাধানে মন দিলেন। ডুবে গেলেন অঙ্কের মধ্যে।

এমন সময় কর্কশ স্বরে টেলিফোন বেজে উঠল। ম্যাসটনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ এঁটে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে কানের কাছে নিয়ে কর্কশ গলায় প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন, 'হ্যালো কে? হ্যালো কে কথা বলছেন?'

বিপরীত দিক থেকে মহিলার কণ্ঠ ভেসে এল, 'আমি মিসেস স্করবিট। আকাশে দারুণ মেঘ করেছে! ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে! ঘরের দরজা-জানালাগুলি বন্ধ করেছেন তো? বাজ পড়ছে। কেলেঙ্কারী ঘটে যেতে কতক্ষণ!'

মিসেস স্করবিটের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বিকট আওয়াজ করে 'ব্যালিস্টিক কটেজে'র কাছেই বাজ পড়ল। তড়িৎ প্রবাহ টেলিফোনের তারের মধ্য দিয়ে ছুটে এসে গণিত বিশারদ ম্যাসটনকে ঘরের কোণে ছিটকে ফেলে দিল। লোহার আঁকশিটা ঠেকেছে বলেই এরকম ফ্যাসাদ ঘটে গেল। ব্ল্যাকবোর্ডটি আছাড় খেয়ে পড়ল। তারপরই তড়িৎ প্রবাহ অন্যান্য জিনিসের মাধ্যমে মেঝে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ম্যাসটন কোনোরকমে উঠে ব্ল্যাকবোর্ডটি সোজা করতেই দেখলেন যে-অঙ্কটা নিয়ে এতক্ষণ ডুবেছিলে তার শেষের দিকের কিছু অংশ মুছে গেছে। হাতের চকটা বুলিয়ে আবার নতুন করে মুছে-যাওয়া অংশটুকু লেখার চেষ্টা করতেই আবার তেমনি বিশ্রী স্বরে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল।

রিসিভারটা তুলে কানের কাছে নিতেই মিসেস স্করবিটের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এল, 'কী ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে বাজ পড়ল। ব্যালিস্টিক হাউসে বাজ পড়ে নি তো? ব্যথাট্যাথা পান নি তো?'

অস্থিরচিত্ত ম্যাসটন গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন, 'ধন্যবাদ! আপনার আন্তরিকতা ছাড়া আর কিছুই আমাকে স্পর্শ করে নি। গুড ইভিনিং মিসেস স্করবিট!' এক নিঃশ্বাসে কথা ক'টি বলেই তিনি রিসিভারটি নামিয়ে রাখলেন। আপন মনে গস গস করতে লাগলেন, 'যত্তসব আপদ! জ্বালাতনের চূড়ান্ত করে ছাড়ল! আচমকা টেলিফোন না করলে আমাকে এমন আছাড় খেতে হত না, অঙ্কটিও মুছত না।'

ম্যাসটন আবার ব্ল্যাক বোর্ডে ফিরে গিয়ে অঙ্কের মধ্যে ডুবে গেলেন।

এক সপ্তাহ বাদে ম্যাসটন উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার কর্তাদের কাছে অঙ্কের ফলাফল পৌঁছে দিলেন। অঙ্কের হিসাবে সুমেরু বিজয়ের সূত্রের সন্ধান পেয়েছেন। ব্যস, আর চিন্তা নেই। বাঞ্ছিত সূত্র যখন পাওয়া গেছে তখন বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানির সাফল্যের পথে আর কোনো প্রতিবন্ধকতাই রইল না।

* * *

ডিসেম্বরের বাইশ তারিখে গান-ক্লাবের সভাকক্ষে বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদারদের এক সভা ডাকা হল।

নির্দিষ্ট দিনে সভাকক্ষে তিল ধরানোর জায়গা থাকল না। কোম্পানির অংশীদাররা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সভাকক্ষে জড়ো হয়েছে। ইউরোপিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীরাও এসেছেন। বার্বিকেন আজকের সভায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অর্থাৎ কীভাবে সুমেরু অঞ্চলের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থা যাত্রা করবেন, কীভাবেই বা বরফের রাজ্যের খনি থেকে কয়লা উত্তোলন করবে তা খোলাখুলি আলোচনা করবেন।

তখন রাত্রি আটটা। ইম্পে বার্বিকেন সাগরেদদের নিয়ে মঞ্চ আলো করে বসে। ইম্পে বার্বিকেন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন, 'উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, আজ সংস্থার পরিচালকমণ্ডলী আপনাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করবেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার উত্তরমেরুর মালিকানাস্বত্ব যে আমাদের দিয়েছেন তা আপনারা অবগত আছেন। আর সেখান থেকে কয়লা উত্তোলনের অর্থও চাঁদাস্বরূপ আপনারা দিয়েছেন। লভ্যাংশ হাতে পেলে অবশ্যই স্বীকার করবেন, এত বড় বাণিজ্যিক সাফল্যের নজির ইতিহাসে বিরল। আমরা এমন প্রমাণও দিতে চলেছি, কেবলমাত্র কয়লাই নয় সেখানে শিলীভূত হাতীর দাঁতও মিলতে পারে। আগামী পাঁচ শো বছর বাদে পৃথিবীতে কয়ালার অভাব দেখা দেবে। পরিচিত কয়লা খনির জঠরে আর কয়লা পাওয়া যাবে না। আবার এমনও হতে পারে উনিশ শতক শেষ হবার আগেই কয়লা ফুরিয়ে যেতে পারে। তাই বলছি কি এখনই উত্তরমেরুতে হানা দেওয়া যাক।'

মেজর ডোনেলান মাঝপথে গলা-ছেড়ে বলে উঠলেন, 'সে না হয় যাওয়া যাবে। কিন্তু কীভাবে, জল, স্থল নাকি শূন্য পথে?'

ইম্পে বার্বিকেন আবার মুখ খুললেন, 'মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করেও আমাদের পূর্বসূরি অভিযাত্রীরা ৮৪ অতিক্রম করতে সক্ষম হন নি। তাঁরা নৌকো নিয়ে হিমশৈলের ধারে হাজির হয়েছিলেন। তারপর শ্লেজগাড়ি চেপে শক্ত বরফের ওপর দিয়ে আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। আমাদেরও এভাবে পথ পাড়ি দিতে গিয়ে নির্ঘাৎ মৃত্যুর কবলে পড়তে হবে। তাই আমরা অন্যভাবে উত্তরমেরুতে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছি। আপনাদের জিজ্ঞাস, উত্তরমেরু অঞ্চল আসলে মহাসমুদ্র, নাকি মহাদেশ, তাই না? প্যালিওক্রিসকি মহাসমুদ্র বলে কমাণ্ডার নারেশ একে অভিহিত করেছিলেন। অর্থাৎ এটি একটি সুপ্রাচীন বরফ-সমুদ্র। আমার বিশ্বাস, তাঁর ধারণা ভ্রান্ত ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুমেরু অঞ্চল আসলে নিরেট একটা মহাদেশ। সেটা বরফসমুদ্র নয়। তাই আমি বেশ জোর দিয়েই বলছি, উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার টাকা নষ্ট হচ্ছে না। তাই আমি আবার বলছি, এ মহাদেশের ওপর ইউরোপের আর কোনো রকম অধিকারই রইল না।'

জনতার ভিড়ের মধ্য থেকে একজন গলা ছেড়ে বলে উঠল, 'বাজে কথা! পুরোপুরি একটি বুজরুকি! সেখানে কেবল জল আর জল। এবার বলুন, জল সেঁচে আপনি কয়লা কি করে তুলবেন?'

'আমি মানি না। সুমেরু, মহাদেশ ছাড়া কিছু নয়। আর সেটা গোবি মরুভূমির মতো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন-চার মিটার ওপরে অবস্থান করছে। সুমেরুর আশেপাশের জমিই আমার কথার সত্যতা প্রমাণ দেবে।

আর পেরি, নরডেনস্কয়েড আর মেইগাড-এর অভিযান সেরে যে মন্তব্য করেছিলেন তা হচ্ছে—গ্রিনল্যান্ড ক্রমে উঁচু হতে হতে আরো উত্তর দিকটা সুমেরুতে পরিণত হয়ে গেছে। তাঁরা সে-অভিযানে পাখি, হাতীর দাঁত ও গাছ-গাছালির নমুনা সঙ্গে করে এনে প্রমাণ করেছেন এক সময় সেখানে মনুষ্য বসতি ছিল। গাছগাছালি ও জন্তু-জানোয়ার যখন ছিল এতএব সেখানে কয়লাও অবশ্যই আছে। আপনারা শুনে রাখুন, সে-মহাদেশে অচিরেই আমেরিকার বিজয় পতাকা উড়বে। আর আপনারা যাকে অসম্ভব বলছেন,

www.pathagar.com

তাকেই আমি সম্ভব করব। আর এজন্যই তো উত্তরমেরু কিনে নিয়েছি। তবে সেখানে নৌকো বা শ্লেজগাড়ি চালানো অসম্ভব বটে। কিন্তু যাব কীভাবে, তাই না? সেখানকার জমাটবাঁধা বরফ আমরা গলিয়ে দেব। মানে বরফের বাধা নিজে থেকে অপসারিত হয়ে গিয়ে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা করে দেবে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে তার জন্য একটা মিনিটও আমাদের খরচ হবে না। আর একটা ডলারও লাগবে না। আর্কিমিডিস কেবলমাত্র অতিকায় একটা হ্যান্ডেল চেয়েছিলেন যার দ্বারা তিনি পৃথিবীটাকে চাড় মেরে উঁচু করে ফেলতে পারবেন বলেছিলেন। উত্তরমেরুকে সরিয়ে আনার হ্যান্ডেল ইতিমধ্যেই আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন কর্কশ গলায় বক্রোক্তি করে উঠল, 'আরে করেছেন কী মশাই! এমন একটা গূঢ় রহস্য, একেবারে গোপন কথা, সবার সামনে ফাঁস করে দিচ্ছেন!'

'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! তবে বলব না।' আসলে রহস্যটি ফাঁস করার সামান্যতম ইচ্ছাও বার্বিকেনের ছিল না। কৌশলে শ্রোতাদের দিয়েই এমন কথাটি তিনি বলিয়ে নিলেন। ব্যাপার দেখে ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বীরা রাগে ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে লাগল।

বার্বিকেন আবার মুখ খুললেন, 'এবার কি বলছি শুনুন—উত্তরমেরুর গোপন তত্ত্ব আবিষ্কারের সম্পূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী জে. টি. ম্যাসটনের। দীর্ঘদিন কঠিন-কঠিন গাণিতিক সূত্রের মধ্যে হ্যান্ডেল-রহস্য আত্মগোপন করেছিল।'

ম্যাসটনের প্রশংসা শুনে গর্বে মিসেস স্করবিটের বুক ফুলে উঠল। পুলকে তাঁর সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল। যাঁকে মন-প্রাণ সঁপে তিনি দেউলিয়া হয়ে পড়েছেন সভার মাঝখানে তাঁর ভূয়সী প্রসংশা শুনলে কার মধ্যেই না এমন পুলক-উচ্ছ্বাসের সঞ্চার না হয়।

বার্বিকেন আবার বক্তব্য শুরু করলেন, 'একটি কথা হয়তো আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে, চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানোর আগে জে. টি. ম্যাসটন বলেছিলেন, উত্তরমেরুকে সরিয়ে আনার যন্ত্র আমরা উদ্ভাবন করবই। ভূ-গোলকের কোথায় চাপ প্রয়োগ করলে পৃথিবীর সমাক্ষরেখাকে সোজা করা সম্ভব হবে তা আমরা বের করবই করব। শেষপর্যন্ত বাঞ্ছিত সে-যন্ত্রটা আমরা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছি। এর জন্য কোন জায়গায় চাপ প্রয়োগ করতে হবে তা-ও বের করে ফেলেছি। এখন কেবল বাকি হ্যান্ডেল ঢুকিয়ে চাপ প্রয়োগ করা।'

তার কথা শুনে উপস্থিত সবাই যেন বোবা বনে গেল। কারোর মুখেই রা সরল না।

অখণ্ড নীরবতার মধ্যে এক সময় মেজর ডোনেলান গলা ছেড়ে বলে উঠলেন, 'আপনার সাহসের তারিফ না করে পারছি না মশাই। ভূ-গোলকের অবস্থানের পরিবর্তন করতে চাইছেন!'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, চাই। অবশ্যই পাল্টে দিতে চাই। কিন্তু এতে পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগের কোনোই পরিবর্তন হবে না। এখন যা আছে, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। ৬৭ সমাক্ষরেখায় উত্তরমেরু সরে আসবে। বৃহস্পতি সমাক্ষ রেখার সঙ্গে সমকোণে অবস্থান করার ফলে তার অনেক, অনেক সুবিধে। আমরা যা করতে চলেছি তাতে পৃথিবীর অবস্থা হবে বৃহস্পতিরই মতো। উত্তরমেরুকে যদি ২৩—২৮´ সরিয়ে আনা সম্ভব হয় তবে দেখা যাবে বরফ গলে গিয়ে জলে পরিণত হতে আরম্ভ করেছে। চোখের পলকে হাজার বছর

www.pathagar.com

ধরে যে বরফ জমে পাথরের মতো হয়ে রয়েছে তা গলতে আরম্ভ করবে, ব্যাপারটা আপনাদের বোঝাতে পেরেছি কি?'

বার্বিকেনের কথায় শ্রোতারা, বিশেষ করে ইউরোপিয়ানরা তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। একী ভিল্কি নাকি? এত সহজে উত্তরমেরুকে গলানো যাবে? যে-অক্ষরেখার ওপর নির্ভর করে পৃথিবী লাট্টুর মতো চক্কর খাচ্ছে তা সামান্য হেলে আছে। তাকে লম্বাভাবে, সোজা করে দিলেই উত্তরমেরু সরে আসবে?

উত্তরমেরুর বরফকে সূর্যই গলিয়ে দেবে—বার্বিকেনের বক্তব্যের মুল কথা। ব্যস, বরফ গলতে আরম্ভ করবে, মানুষ এতদিন শত চেষ্টাতেও যার কাছে পৌঁছোতে পারে নি সেই উত্তরমেরু নিজে থেকে মানুষের কাছে এগিয়ে আসবে! একী অসম্ভব কথা শোনাচ্ছেন ভদ্রলোক! উত্তরমেরু সরে আসবে, এযে একবোরেই অলীক কল্পনা!

* * *

চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানোর পূর্বে একটা জনসভায় ম্যাসটন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন. ভূ-গোলকের মেরুদণ্ডকে ঠেলাঠেলি করে কোনোক্রমে সোজা করে দেওয়া সম্ভব হলে পৃথিবীর চেহারাটাই পাল্টে দেওয়া যাবে। ব্যস, তারপর থেকেই ব্যাপারটা তাঁর মাথায় জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে। অনেক ভেবেচিন্তে, অঙ্ককষে তার উপায়ও বের করে দিলেন। তাঁর চিন্তাকে বাস্তবায়িত করতে পারলেই পৃথিবী নতুনতর রূপ নিয়ে দেখা দেবে। তার আবহাওয়ারও পরিবর্তন ঘটবে। পৃথিবীর বুকে সারা বছর বিরাজ করবে, বৃহস্পতির মতোই একই রকম আবহাওয়া। দিন আর রাত্রি হয়ে যাবে সমান-সমান। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা দেবে 'ঋতুভেদ' বলে কিছু না থাকার জন্য হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা আর গায়ে জ্বালা ধরানো গরমও পৃথিবীর বুক থেকে উবে যাবে।

এমন এক জায়গায় ভূ-গোলকটি অবস্থান করছে যে স্থানের অধিবাসীরা সূর্যকে দু-দুবার টোরিড জোনে দেখে, আবার এমন স্থানের অস্তিত্বও রয়েছে যে, সূর্য বছরের মধ্যে কোনোদিনই সমানাকারে টোরিড জোনে পৌঁছাতে পারে না। মেরু অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে ছ'মাস দিন আর ছমাস রাত্রি লক্ষিত হয়। তবে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে কতই না বিচিত্র ঘটনা ঘটে চলেছে। এর মূলে রয়েছে ভূ-গোলকের ঝুঁকে-থাকা অবস্থান। গরম, ঠাণ্ডা, অতিবৃষ্টি আর অনাবৃষ্টি যেখানেই যে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় সবার মূলেই রয়েছে ভূ-গোলকের ঝুঁকে থাকা অবস্থান।

বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানি এরকম প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের অবসান ঘটিয়ে বারো ঘণ্টা দিন আর বারো ঘণ্টা রাত্রি বানাবার মতলবে রয়েছে। কারণ, সূর্য সারা বছর ধরেই নিরক্ষরেখার ওপরেই যে অবস্থান করবে। ফলে পৃথিবীর মানুষ ভালো-লাগা আবহাওয়া সারা বছর ধরেই ভোগ করার সুযোগ পাবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন পত্রিকার পাতায় পাতায় এরকম সব মন্তব্য ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ছাপা হতে লাগল। ব্যস, সবাই পঞ্চমুখে বার্বিকেনের প্রসংশা করতে লাগল। সবার মুখে একই কথা, বার্বিকেনের বাঞ্ছা পূর্ণত্ব লাভ করুক। সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক উত্তরমেরু সম্পর্কিত পরিকল্পনা।

বার্বিকেন মতলব এঁটেছেন, কৌশলে পৃথিবীর ঘূর্ণন বেগ অপরিবর্তিত রেখে রূপ বৈচিত্র্যের পরিবর্তন সাধন করবেন। আবার বছরের দিনের সংখ্যারও হেরফের হবে নাই কিন্তু কোন কৌশল অবলম্বন করে পৃথিবীর মেরুদণ্ডকে সোজা করে দেবেন? এ রহস্যটা

www.pathagar.com

সম্বন্ধে কিন্তু ইম্পে বার্বিকেন, ক্যাপ্টেন নিকল বা জে. টি. ম্যাসটন—কেউ-ই ভুলেও মুখ খুললেন না। সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধল। পৃথিবীর মানুষ হয়তো কোনোদিনই তাঁদের এ-গোপন রহস্যটির কথা এক তিলও জানতে পারবে না। সমালোচকরা খবরের কাগজের পাতায় বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখে মতামত ব্যক্ত করতে লাগল। হ্যাঁ, পৃথিবীটা যদি নিশ্চল-নিথরভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকত তবে ঠেলে-ধাক্কিয়ে তাকে না হয় কোনোক্রমে সোজা করে দেওয়া সম্ভব হত। শেষ অবধি তাঁদের কাজটা অসম্ভব না হয়ে যায়, পরিকল্পনাটিই ভেস্তে না যায়।

ঝুঁকে-থাকা পৃথিবীকে হঠাৎ খাড়া করে দিলর পৃথিবীর কি কি খারাপ হতে পারে সেদিকগুলি নিয়ে উদ্যোক্তারা মোটেই মাথা ঘামান নি। পৃথিবীবাসীর উপকার হবে ভাল কথা, কিন্তু তাদের কোন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তা-ও তো সর্বজনসমক্ষে বলা দরকার ছিল। ব্যস, প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপিয়ানরা ব্যাপারটাকে নিয়ে আদাজল খেয়ে লেগে গেল। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে ইংল্যান্ডের খবরের কাগজগুলি ফলাও করে উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার কথা ও তাদের কাজের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল।

উত্তরমেরু বেচা-কেনা নিয়ে ফরাসি দেশ মোটেই আগ্রহী নয়। তবে একজন ফরাসি প্রবীণ ব্যাপারটি নিয়ে যারপরনাই কৌতূহলাপন্ন হয়ে উঠলেন। তিনি খবরের কাগজের পাতায় উত্তরমেরুর খবরটি পড়ামাত্রই সোজা বাল্টিমোরে চলে আসেন। গান-ক্লাবের প্রতিটি কার্যকলাপের ওপর গোপনে নজর রেখে চলতে লাগলেন। ম্যাসটনের মতোই অঙ্ক-শাস্ত্রের উপর তাঁরও খুবই দখল। চোখের পলকে জটিল অঙ্কের সমাধান করতে পারেন। এ গণিতবিদের নাম অ্যালসিড পিয়েদোঁ। অকৃতদার। বিয়ে থা করে ঘর-সংসার পাতার ইচ্ছা যে কোনোদিনই ছিল না তা নয়। হাসিখুশি আনন্দোচ্ছল এক মেয়েকে তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু মেয়েটির বাবার বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি আশাহত হয়ে চিরকুমার থাকবেন প্রতিজ্ঞা করেন। আজও সে-প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করে চলেছেন। মেয়েটির বাবার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরই তিনি দেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। সম্প্রতি কৌতূহলবশত গান-ক্লাবের কার্যকলাপের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন। কেবলমাত্র একটি ব্যাপারের জন্য পৃথিবীর অক্ষরেখা সম্বন্ধে তাঁর মনে অদম্য আগ্রহের সঞ্চার ঘটেছে। পৃথিবীকে কীভাবে নাড়াচাড়া করা সম্ভব হবে, ব্যাপারটি তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে উঠেছে। পৃথিবী লাট্টুর মতো অনবরত ঘুরেই চলেছে। ইম্পে বার্বিকেন তাকে কীভাবে ধাক্কা দিয়ে সোজা করবেন? ম্যাসটন আর বার্বিকেনের আসল ফন্দিটা কি, এটা জানার জন্যই তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। আর কোন সূত্র প্রয়োগ করে তারা এমন একটি নিতান্ত অসম্ভবকে সম্ভাবনাময় করে তুলতে চাইছেন?

এদিকে সদ্য গঠিত প্রতিষ্টানের অংশীদারদের নিয়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এক মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। অক্ষরেখা পরিবর্তিত হলে কি কি সুবিধা হবে তা নিয়ে এখন আর কারোর কোনো উল্লাস নেই। তাতে কী কী সমস্যার উদ্ভব হবে তাই আজ মানুষের একমাত্র জল্পনা কল্পনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সবাই বলাবলি করছে, অক্ষরেখা যে—অবস্থায় রয়েছে তাকে সরাতে হলে প্রয়োজন প্রচণ্ড একটি ধাক্কা। আর তার ফলে পৃথিবীতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে, অথবা যে অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তা ভেবেই সবার কলিজা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার জোগার হল।

www.pathagar.com

ইউরোপিয় প্রতিনিধিরা মানুষকে উস্কে দিতে লাগল। বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানি যে-কাজ করতে চাচ্ছে তা যদি সম্ভব হয়, তবে যেটুকু উপকার তাতে হবে তার পুরোটাই পাবে এস্কিমোরা। আবহাওয়ার পরিবর্তন কি না করলেই নয়? তাতে পৃথিবীর যে লণ্ডভণ্ড অবস্থা হবে তা কি মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবে? এরকম বহু কুফলের কথা উল্লেখ করে ইউরোপিয়ান প্রতিনিধিরা জনসাধারণের ক্ষোভকে চরমে পৌঁছে দেওয়ার ধান্ধা চালাতে লাগল। তারা সাগরের তলা দিয়ে টেলিফোনের তারের মাধ্যমে খবরাখবর আদান-প্রদান করতে লাগল। কর্নেল বরিস কারকফ ডিন টুড্রিঙ্ক জাঁ হারাল্ড, মেজর ডোনেলান এবং জ্যাকুইস জনসব প্রভৃতিরা তারের মাধ্যমে যেসব কথাবার্তা আদান-প্রদান করলেন, তার মর্মার্থ হল—প্রচণ্ড একটি ধাক্কা দিয়ে অক্ষরেখাটিকে সোজা করে দিলে সমুদ্রে আচমকা জলোচ্ছ্বাস দেখা দেবে। সমুদ্রের জলরাশি ফুলে ফেঁপে স্থলভাগ তলিয়ে দেবে। আর আবহাওয়ার ঘনত্ব বেড়ে গেলে সর্বনাশ আরও চরম রূপ নিয়ে দেখা দেবে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরতে হবে। এক ধাক্কায় পুরো লন্ডন শহরটি উঠে যাবে পাহাড়ের ওপরে। সবচেয়ে বড় কথা, সমস্যাটি কেবলমাত্র ২৩—২৮ এরই নয়। ঠ্যালা-ধাক্কার চোটে মেরু অঞ্চল চ্যাপ্টা হাওয়া মাত্র সাগর আর মহাসাগরের আকৃতিরও পরির্বতন ঘটবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ওপর চাপ আসতে লাগল বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানির কর্মপন্থার প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য। প্রতিবাদে প্রতিবাদে সরকার একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল। প্রতিবাদের ভাষা আলাদা হলেও সবার বক্তব্য প্রায় একই রকম। এমন একটি ভয়ঙ্কর কাজে হাত না দেওয়াই ভাল। যে-কাজের পরিণাম পৃথিবীর অনিবার্য ধ্বংস সে-কাজ করতে এত উৎসাহ-উদ্দীপনা কেন?

অ্যালসিড পিয়েরদোঁ কিন্তু অন্য মতলবে ঘুর ঘুর করছেন। ম্যাসটন অঙ্ক কষে হিসাব নিকাশের মাধ্যমে ভূ-গোলককে আঘাত হানার জন্য যে জায়গাটিকে বেছে নিয়েছেন সেটা জানাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। কারণ সবচেয়ে বেশি আলোড়ন ও লণ্ডভণ্ড তো সে জায়গাটাই হবে।

ইউরোপের কেউ কেউ এরকম কথাও বলতে লাগল, 'ইম্পে বার্বিকেন আমেরিকান। তিনি অবশ্যই নিজের দেশকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করে তবেই পৃথিবীর অক্ষরেখার ওপর আঘাত হানার পরিকল্পনা করেছেন। আর তাঁর মাথা থেকেই চাঁদে পাড়ি জমানোর পরিকল্পনাটি বেরিয়েছিল। আমেরিকানরা পৃথিবীটিকে লণ্ডভণ্ড করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেবার ধান্ধায় আছে। তারা হয়তো মূল্যবান কোনো অঞ্চল কব্জা করে নিতেই এরকম একটি দুরভিসন্ধিতে মেতেছে।'

কেউ কেউ এরকম মন্তব্যও করল, 'ইম্পে বার্বিকেন তো আর ভগবান নন। কাজ করতে গিয়ে সামান্য ভুলভ্রান্তি করে ফেললেই কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত। সারা পৃথিবীর মানুষকে তাঁর ভুলের মাশুল দিতে হবে, হ্যাপা পোহাতে হবে।'

ইউরোপিয়ানরা তো খবরের কাগজের পাতায় নিত্য নতুন মন্তব্য পড়ে ক্রোধে আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার মতো ফুটতে শুরু করল। আর বার্বিকেন ও তাঁর সাগরেদদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে লাগল।

ক'দিনের মধ্যেই এমন কি আমেরিকাতেও পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল। কয়েকটি খবরের কাগজ পঞ্চমুখে উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার প্রশংসা

www.pathagar.com

করতে লাগল। আবার কয়েকটি কাগজ বেমালুম ইউরোপের খবরের কাগজের দলে ভিড়ে বার্বিকেন ও তাঁর সহযোগীদের মুণ্ডুপাতে মেতে গেল। মিসেস স্করবিট গোছা গোছা ডলার খরচ করে সাংবাদিকদের দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে খবরের কাগজের পাতায় ছাপাতে লাগলেন যাদের প্রত্যেকটির মূল বক্তব্য গণিতবিদ ম্যাসটনের কিছুতেই ভুলচুক হতে পারে না। ফলাফল কিন্তু শূন্য। ক্রমে আমেরিকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক-জ্বর সংক্রামক রোগের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। পৃথিবীর সব দেশের মানুষের মনে বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্মাল, বার্বিকেন ও ম্যাসটন উভয়েই ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক। সমগ্র পৃথিবীটিকে নিয়ে তাঁরা ছিনিমিনি খেলায় মেতেছেন। কিন্তু এমনটি তো হতে দেওয়া যায় না।

ইউরোপিয় দেশগুলি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল, পৃথিবীর সর্বনাশেচ্ছুক বার্বিকেন ও ম্যাসটনকে ডেকে সামনাসামনি জিজ্ঞাসা করা হোক, তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? সর্বজনসমক্ষে তাঁরা বলুন, কোনো পদ্ধতিতে তাঁরা পরিকল্পনাটিকে বাস্তবায়িত করতে চাচ্ছেন আর কোন অঞ্চলকে তাঁরা বদখেয়ালটি চরিতার্থ করার জন্য নির্বাচন করেছেন?

চাপে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার গণিতশাস্ত্র, ভূবিদ্যা ও কারুশিল্প প্রভৃতি বিভাগের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করলেন। ইম্পে বার্বিকেন যেহেতু সংস্থার সভাপতি তাই কমিশনের সামনে সবার আগে তাঁকেই হাজির হওয়ার নির্দেশ জারি করা হল। বার্বিকেন ব্যাপারটিকে আমলই দিলেন না। তাঁর বাড়িতে লোক পাঠানো হল। ভোঁ-ভাঁ—বাড়ি ফাঁকা। ক'দিন আগে এগারোই জানুয়ারি তিনি বাল্টিমোর ছেড়ে গেছেন। ক্যাপ্টেন নিকলকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন। কেউ তাঁদের খবর বলতে পারল না। নিঃসন্দেহ হল, নির্ঘাৎ সে গোপনে রহস্যজনক স্থানে গেছেন, যেখান থেকে পৃথিবীকে ধাক্কা মারার ধান্ধা করছেন।

অতএব তাঁদের দুরভিসন্ধিকে বানচাল করতে হলে সবার আগে সেই রহস্যজনক গোপন স্থানটির নাম জানতে হবে।

এদিকে ইম্পে বার্বিকেন ও ক্যাপ্টেন নিকলের নিরুদ্দেশের খবরটা বাতাসের কাঁধে ভর করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পৃথিবীর মানুষ ক্রোধোন্মত্ত বাঘের মতো তর্জন গর্জন শুরু করে দিল।

সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন তো বে-পাত্তা। কিন্তু সম্পাদক জে. টি. ম্যাসটন? আসন্ন পৃথিবী ধ্বংসের নায়ক ম্যাসটনের বাড়িতে লোক ছুটল। কমিশনের দূত দরজার কড়া নাড়তেই তাঁর চাকর ফায়ার-ফায়ার তেড়ে এল। তার হম্বিতম্বি শুনে স্বয়ং ম্যাসটনও এসে হাজির হলেন সদর-দরজায়।

কমিশনের দূত কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করল, 'সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন আর ক্যাপ্টেন নিকল কোথায়? তাঁদের উদ্যোগ-আয়োজন কি সম্পূর্ণ হয়েছে?'

ম্যাসটন নির্ভীক কণ্ঠে সাফ জবাব দিলেন, 'জানি, কিন্তু বলব না। উদ্যোগ-আয়োজনের কথাও বলব না। আমি এটা গোপন রাখতেই আগ্রহী।'

'আপনার কর্মপদ্ধতি ও প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা কি কমিশনের সামনে পেশ করতে রাজি আছেন?'

'অবশ্যই না। কাউকে কিছু যাচাই করতে দিতে আমি নারাজ। প্রয়োজনে সবকিছু ধ্বংস করে ফেলব তবু উদ্দেশ্য কারোর কাছে ফাঁস করব না। আমার পরিশ্রমের ফসল

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব। স্বাধীন আমেরিকার একজন নাগরিক হিসাবে এটুকু অধিকার আমার অবশ্যই আছে।'

'আপনার যেমন মুখ বন্ধ করার অধিকার আছে ঠিক তেমনি সারা যুক্তরাষ্ট্রেরও তো অধিকার আছে আপনার মুখ খোলানোর, স্বীকার করেন তো? কমিশন জানতে চাইছে, উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থা কীভাবে অক্ষরেখার পরিবর্তন ঘটানোর পরিকল্পনা করছেন?'

ম্যাসটন আর কোনো কথা না বলে গম্ভীরমুখে কমিশনের দূতের কাছ থেকে সরে গেলেন। অনন্যোপায় হয়ে আগন্তুক তাঁর বাড়ির দরজা ছেড়ে পথে নামল।

এদিকে ম্যাসটনের গোয়ার্তমির কথা শুনে দেশের মানুষ রেগে ব্যোম হয়ে গেল।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ওপর ক্রমেই জোরদার চাপ আসতে লাগল, যে-কোনো উপায়ে ম্যাসটনের কাছ থেকে গোপন তথ্যাদি বের করার চেষ্টা করা হোক।

এক সন্ধ্যায় ম্যাসটনের বাড়িতে একদল পুলিশ হানা দিল। তারা ম্যাসটনের খাতা-পত্র গোছগাছ করে পোটলা বাঁধতে লাগল। ম্যাসটন পিস্তল বের করে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করলেন। বৃথা চেষ্টা, পুলিশের লোকেরা তাঁর হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিল। উপায়ান্তর না দেখে তিনি এক লাফে এগিয়ে গিয়ে ঝট করে একটা খাতা হাতে নিয়ে তার শেষ-পাতাটি ছিঁড়ে নিলেন। কেউ কিছু বোঝার আগেই সেটি পুটুলি করে মুখে ঢুকিয়ে চোখের পলকে গিলেও ফেললেন।

পুলিশ ম্যাসটনকে পাকাড়াও করে নিয়ে এসে হাজতে পুরে দিল। কাজটি একদিক থেকে ভালই হয়েছে। নইলে উত্তিজিত জনতার হাতে তাঁর হাড়মাংস এক হয়ে যেত।

পুলিশের কর্তাব্যক্তি ম্যাসটনের গণিতের খাতাটির পাতা উল্টে দেখলেন, পরপর ত্রিশটি পাতা জুড়ে কেবল দুরুহ অঙ্ক আর অঙ্ক। তাঁদের বিন্দু বিসর্গও উদ্ধার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। তবে এটুকু উপলব্ধি করতে পারলেন, একটি অঙ্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চাঁদকে লক্ষ্য করে পৃথিবী থেকে কামান দাগা হয়েছিল এ-অঙ্কটির ওপর ভিত্তি করেই দেশের বাঘা বাঘা গণিত বিশারদদের তলব করা হল। তাঁরা দীর্ঘ গবেষণার পর মন্তব্য করলেন, অঙ্কগুলি অন্তত ভুল নয়। আর এগুলির ওপর ভিত্তি করে কাজ করলে পৃথিবীর হেলে-থাকা অক্ষরেখাকে সোজা করে দেওয়া সম্ভব।

কমিশন তদন্তের পর রিপোর্ট তৈরি করে খবরের কাগজে ছাপতে পাঠাল। রিপোর্টটির বক্তব্য—

'উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার ফন্দিটি জানা গেল। তাঁরা অক্ষরেখাকে হেলানো অবস্থা থেকে সোজা করার ফন্দি এঁটেছেন। কামানটিকে ভূ-অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দিলে গোলাটি বেরিয়ে যাবার সময় পিছনের দিকে প্রবল ধাক্কা মারবে। প্রবল সে ধাক্কার ভূ-অভ্যন্তরে প্রবল কম্পনের সৃষ্টি করবে। কিন্তু লম্বভাবে কামান দাগলে কোনো প্রতিক্রিয়াই হবে না। কিন্তু ভূমির সঙ্গে অনুভূমিকভাবে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে কামান দাগার ফলে অক্ষরেখা দূরে সরে যেতে বাধ্য। বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানি দক্ষিণদিকে কামান দাগার পরিকল্পনা করেছেন। কামানটিকে স্থাপন করা হবে পৃথিবীর কোনো এক স্থানে।

অ্যালসিড পিয়েদোঁও এরকমই একটি মন্তব্য আগেভাগে করে রেখেছিলেন। পৃথিবী নতুন এক অক্ষরেখার ওপর নির্ভর করে আবর্তিত হতে থাকবে। আর এরই ফলে পৃথিবী বৃহস্পতির অবস্থা প্রাপ্ত হবে।

www.pathagar.com

সাতাশ সেন্টিমিটার কামানের দুলক্ষ গুণ বৃহদাকার কোনো কামান থেকে যদি এক লক্ষ আশি হাজার ওজন বিশিষ্ট গোলাকে সেকেন্ডে আটাশ হাজার কিলোমিটার বেগে নিক্ষেপ করা যায় তবেই হেলে পড়া অক্ষরেখাটি খাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সেরকম তেজি বারুদ কোথায় পাওয়া যাবে ?

হ্যাঁ, সে-বারুদও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। মেলিমেনোলাইট নামে শক্তিশালী বারুদ আবিষ্কার করেছেন ক্যাপ্টেন নিকল। ম্যাসটনের খাতা ঘেঁটে ফর্মুলাটি পাওয়া না গেলেও এটুকু অন্তত বোঝা গেল অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং জৈব বস্তু সেলিমেনোর সংমিশ্রণে তিনি উচ্চশক্তিসম্পন্ন বারুদটি তৈরি করেছেন।

এবার জনসাধারণের জিজ্ঞাস, সাতাশ সেন্টিমিটার কামানের দশ লক্ষগুণ বড় কোনো কামান তৈরি করা কি যাবে? অবশ্যই নয়। অতএব বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানি লালবাতি জ্বলতে বাধ্য।

কিন্তু ইম্পে বার্বিকেন আর ক্যাপ্টেন নিকলের হদিস নেই। তাদের ঠিকানা জানতে না পারলে তাদের কাজটিকে বরবাদ করে দেওয়ার উপায়ই বা কি?

সবার ক্ষোভ জে. টি. ম্যাসটনের ওপর পড়ল। খাতার পাতাটায় নির্ঘাৎ তাঁদের ঠিকানা টোকা ছিল। বন্ধুদের ঠিকানা চেপে রাখার জন্য তিনি তো সেটি গিলে ফেলেছেন।

কামান দাগার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে বাইশে সেপ্টেম্বর। সবই জানতে পারা গেল। কেবল জানা গেল না তাঁদের বর্তমান ঠিকানা, যেখানে ভূ-অভ্যন্তরে অতিকায় কামান বসানোর কাজ জোর কদমে চলেছে।

কিন্তু বার্বিকেন ও নিকলের ঠিকানা জানতে না পারলে তো সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে। যদি তাঁরা কামান দেগেই দেন, তবে ভূ-পৃষ্ঠের কোন অঞ্চল দুম করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে আবার কোন অঞ্চল জলে তলিয়ে যাবে—এসব কথা ম্যাসটন ছাড়া কারোর জানা নেই। কিন্তু তার খাতায় এর কোনো উল্লেখ নেই। আট হাজার চা শো পনের মিটার ভেতরেই সমুদ্রপৃষ্ঠের সর্বোচ্চ পরিবর্তন ঘটবে। জলাভূমি হবে শুকনো ডাঙা আর ডাঙায় দেখা যাবে অথৈ জলরাশি। কামানদাগার স্থানটি জানা গেলেই বোঝা যেত ঠিক কোন অঞ্চলের এরকম সর্বনাশা পরিবর্তন ঘটবে।

অনন্যোপায় হয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত কামান ও বারুদ কারখানাগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হল, তারা যেন সন্দেহজনক কোনো ব্যক্তিকে দেখলেই বাল্টিমোরের তদন্ত কমিটিকে টেলিফোনে জানিয়ে দেন। তা যদি বাইশে সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয় তবে বাঁচোয়া। কারণ কামান দাগার জন্য এ-দিনটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খবরের কাগজের পাতায় ছাপা হল।

* * *

গান-ক্লাবের পাণ্ডারা পৃথিবী থেকে চাঁদে পাড়ি জমানোর কাজে কামান ব্যবহার করেছেন। এখন ভূ-গোলকের হেলেপড়া অক্ষরেখাকে খাড়া করার জন্যও তাঁরা কামান দাগার মতলব এঁটেছেন।

হায় ঈশ্বর! কামান-পাগল গুটি কয়েক মানুষের জন্যই কিভবে পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

বার্বিকেন ফ্লোরিডার কলম্বিয়া নামক কামানটি দাগার পর থেকেই আরও অনেক, অনেক বড় কামানের কথা ভাবছিলেন। কামান-নাটকের প্রথম দৃশ্যে চন্দ্রাভিযানের কাহিনী চাক্ষুষ করা গেছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যাবে হেলে-থাকা অক্ষরেখাকে খাড়া করার দৃশ্য। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যের কাহিনী সম্বন্ধেও ধারণা করা যাচ্ছে। পৃথিবীর এক শো চল্লিশ কোটি মানুষ তীব্র আক্রোশে বার্বিকেন আর তার সাগরেদদের তোপের মুখে উড়িয়ে দেবে।

একী অবিশ্বাস্য কাণ্ডরে বাবা! ইম্পে বার্বিকেন আর ক্যাপ্টেন নিকোল—দু-দুটো মানুষ কি কর্পূরের মত উবেই গেলেন! উভয়েই তো নামজাদা মানুষ! তবু তাদের হদিস কেউ-ই দিতে পারছে না! এ কী রহস্য রে বাবা!

আমেরিকা আর ইউরোপের সব কটি বারুদের কারখানায় খোঁজ নিয়ে জানা গেল কেউ-ই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বারুদ কেনে নি, বা কেনার জন্য বায়নাও দেয় নি।

ব্যস, জনসাধারণের যাবতীয় আক্রোশ গিয়ে পড়ল জে. টি. ম্যাসটনের ওপর। তিনি একা বাল্টিমোরের জেলে পড়ে ধুঁকছেন।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, কামান আর বারুদ তৈরি করতে যেসব উপকরণ অত্যাবশ্যক সেগুলি বহন করার জন্য কোনো জাহাজ বা রেলগাড়িও কারোর নজরে পড়ল না। তবে কি সেগুলি শূন্যপথে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? এ কী রহস্যজনক ব্যাপার রে বাবা!

এদিকে জেলখানার অন্ধকার খুপড়ির মধ্যে বসে ম্যাসটন ভাবছেন, বার্বিকেন কামান তৈরির কাজ বুঝি প্রায় চুকিয়ে ফেলেছেন। ক্যাপ্টেন নিকলের তৈরি অতীব তেজি বারুদ তাতে ঠাসা হচ্ছে। এবার গোলাটা দুনিয়া কাঁপিয়ে দুর্বার গতিতে শূন্যে ছুটে চলেছে। সেটা এখন কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হয়ে ছুটছে তো ছুটছেই। তিনি মিসেস স্করবিটের নামানুসারে গোলাটির নামকরণ করলেন 'স্করবেটা'।

ম্যাসটনের কাছ থেকে কথা বের করার জন্য তদন্ত কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা নিয়মিত জেলখানায় হামলা করছেন। কিন্তু ফলাফল শূন্য। ম্যাসটন কিছুতেই মুখ খুলছেন না।

তদন্ত কমিশন এবার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বাঁকা পথ ধরলেন। মিসেস স্করবিটকে দিয়ে ম্যাসটনের পেট থেকে কথা বের করার মতলব আঁটলেন। তাঁর মনে জব্বর ভয় ধরিয়ে দিল। বার্বিকেন তাঁর পরিকল্পনা বাতিল না করলে ক্রোধোম্মত্ত জনসাধারণ যাকে সামনে পাবে তাকেই কেটে কুচিকুচি করে ফেলবে। অতএব মিসেস স্করবিট ধরে-প্রাণে মারা যাচ্ছেন।

মিসেস স্করবিটও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ম্যাসটনের সঙ্গে স্বেচ্ছায় প্রাণ দেবেন তবু পরিকল্পনাটি বাতিল হোক এমন কোনো কাজ করতে রাজি হবেন না।

না। ভস্মে ঘি ঢালাই সার হল। মিসেস স্করবিটকে দিয়ে ম্যাসটনের পেট থেকে কোনো কথাই বের করা গেল না।

হায়! তবে কি পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব নয়? অক্ষরেখা পরিবর্তিত হবেই? মহাদেশ জলে তলিয়েই যাবে? কোটি কোটি নিরীহ-নিরপরাধ মানুষ মৃত্যুর শিকার হবেই?

পৃথিবীর সব ক'টি রাষ্ট্র জোট বেঁধে সাব্যস্ত করল বার্বিকেনের পরিকল্পনা বন্ধের ঘোষণা করা হবে। তবে আমেরিকা বহুভাবে বোঝাতে চেষ্টা করল। পৃথিবীর সব রাষ্ট্রকে

www.pathagar.com

অধিকার দিল বার্বিকেনকে গ্রেপ্তার করার জন্য। কোনো রাষ্ট্রই তার কথায় আমল দিল না। আর কেউ না থাক ম্যাসটন তো কব্জির মধ্যেই রয়েছেন। তার ওপর বলপ্রয়োগ করলে, কঠিন-কঠোর দৈহিক নির্যাতন চালালে বাপ বাপ করে ঠিকানা বাৎলে দেবে।

তবে মধ্যযুগীয় বর্বরতা উনিশ শতকে অবলম্বন করা সম্ভব নয়। অতএব ম্যাসটন জেলখানায় বহাল তবিয়েতেই দিন কাটাতে লাগলেন।

* * *

নিরক্ষ অঞ্চলের সর্বত্র মনুষ্য বসতি রয়েছে। অথচ ম্যাসটনের ডাইরির এক জায়গায় লেখা ছিল, নিরক্ষরেখার কোনো অঞ্চল থেকে কামানের গোলা ছুঁড়তে হবে। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি কোন অঞ্চলই যদি মনুষ্যবসতিশূন্য না হয় তবে এতবড় একটি কামান কোথায়, কীভাবে বা তৈরি করল। তবে কি বার্বিকেন কামানটিকে লোকচক্ষুর আড়ালে তৈরি করেছেন, নাকি হাজার হাজার লোক লাগিয়ে কামান তৈরির কাজটি সম্পন্ন করেছেন?

অ্যালসিড পিয়েৰ্দো আনন্দে আত্মহারা এই ভেবে যে, ম্যাসটনের অঙ্কে সামান্যতম ভুলচুকও নেই অতএব তার হিসাব অনুযায়ী কাজ করলে ঝুঁকে-থাকা অক্ষরেখা খাড়া হতে বাধ্য। তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে জলভূমি পরিণত হবে ভূখণ্ডে, ভূ-খণ্ড জুড়ে দেখা দেবে প্লাবন-জলোচ্ছ্বাস। আগ্নেয়পর্বত অগ্নি উদ্গিরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আগ্নেয় পর্বতের গহ্বরে সমুদ্রের জল প্রবেশ করে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাবে। পৃথিবী একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। তিনি আবার বিপরীত দিকটিও যে ভাবেন নি তা-ও নয়। হাঁটাচলা ও দাপাদপির ফলে পৃথিবী তো কেঁপে কেঁপে উঠছেই। তাতে যদি কিছু না হয় তবে একটিমাত্র কামানের গোলা নিক্ষেপ করেই পৃথিবীর ভয়ঙ্কর পরিবর্তন সাধন কি সম্ভব?

সম্ভব। অবশ্যই সম্ভব। অঙ্কের হিসাব অন্তত একথাই প্রমাণ দিচ্ছে।

এক বিজ্ঞজন মন্তব্য করলেন এক সালের প্রথম দিনেও পৃথিবী জুড়ে এমন ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। বাইবেল তো বলেই রেখেছে, হাজার বছরের শেষেই আছে অন্তিমের সে-দিনটি। কিন্তু কোনো প্রলয় কাণ্ডই ঘটে নি, মারা যায় নি একটি প্রাণীও। তবে বার্বিকেনের পরিকল্পনা মাফিক কাজ হলে ভয়ঙ্কর কিছু না ঘটে যাচ্ছে না।

পৃথিবীর মানুষের বুকের ভেতরে আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা টগবগ করে ফুটতে লাগল। তাদের রাগ গিয়ে পড়ল ম্যাসটনের ওপর। তারা দলে দলে কাতারে কাতারে গিয়ে জেলখানার সামনে গিয়ে দারুণ হম্বিতম্বি করতে লাগল। এমন ভাব, তাঁকে হাতের নাগালের মধ্যে পেলে কাঁচা চিবিয়ে খাবে।

পরিস্থিতি ক্রমে জটিল থেকে এমন জটিলতর হতে লাগল যে, মিসেস স্করবিট ভাবতে লাগলেন, ম্যাসটনের বিরোধিতা করবেন কিনা। তাঁদের পটিয়ে পাটিয়ে কোনোরকমে কামান দাগা থেকে বিরত করতে পারলেই হুজ্জতি ঝকমারি বন্ধ হয়ে যায়। জনগণের উত্তেজনার মূল কারণ যিনি সেই ম্যাসটন কিন্তু আগের মতোই নির্বিকার। ক্ষুব্ধ জনতাকে ঠেকানো পুলিসের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে গেল। আর এদিকে আগুনে ঘিয়ের ছিটা দিতে লাগল দেশের খবরের কাগজগুলি।

এদিকে ম্যাসটন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, পরিস্থিতি যত প্রতিকূলই হোক না কেন তিনি প্রাণ গেলেও ইম্পে বার্বিকেন এবং ক্যাপ্টেন নিকলের কাজে প্রতিবন্ধকতা করতে দেবেন না।

www.pathagar.com

এদিকে বিক্ষুব্ধ জনগণ নিজেদের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা ও শেষপর্যন্ত হাতহাতি শুরু করে দিল। জেলখানার বাইরে রীতিমতো তুলকালাম কাণ্ড জুড়ে দিল।

পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে দেখে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার প্রমাদ গুনলেন।

পাঁচই সেপ্টেম্বর বেলা এগারোটায় তদন্ত কমিশনের সভাপতি জন প্রেসটিস বাল্টিমোর জেলখানায় হাজির হলেন। মিসেস স্করবিটকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। তিনি ম্যাসটনের কাছে সরাসরি ইম্পে বার্বিকেনের ঠিকানা জানতে চাইলেন। হতাশ হতে হল তাঁকেও। কোথায় কামান দাগা হবে তারও সঠিক জবাব পেলেন না।

তদন্ত কমিশনের সভাপতি শেষপর্যন্ত ম্যাসটনকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন বলে শাসালেন। তাতেও ফল হল না। ফাঁসির ভয় দেখানো হল, তাতেও অকুতোভয় ম্যাসটনকে টলানো গেল না।

মিসেস স্করবিট আর মুখ বুজে থাকতে পরলেন না। ফাঁসির কথা শুনে তিনি আঁৎকে উঠে কাঁপাকাঁপা গলায় বলে উঠলেন, 'মি. ম্যাসটন, করছেন কি?'

ম্যাসটন ভুরুদুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'মিসেস স্করবিট, আপনিও শেষপর্যন্ত এদের দলে ভিড়ে গেলেন নাকি!'

মিসেস স্করবিট মিইয়ে গিয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সভাপতি মশাই বললেন, 'দেখুন, দুই+দুইয়ে চার হয় যেমন সত্য, ঠিক তেমনই সত্য আপনাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হচ্ছেই।'

'বাজে কথা, দুই+দুইয়ে যে চার হবেই এমন কোনো কথা নেই। অন্যান্য গণিতবিদরা যেমন বোজা কথা বলে এসেছেন আজ আপনিই দেখছি তাই বলছেন মশাই! আপনি বলতে চাইছেন দুটো সংখ্যা যোগ করলে তাদের একটির সমান হবে। যেমন বলছেন, দুই আর দুইয়ে হচ্ছে চার। তবে হ্যাঁ, যদি বলেন এক আর একে দুই হয়, স্বীকার করে নেব। কারণ, তখন তো সেটা সংজ্ঞায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে। উপপাদ্য থাকছে না।

সভাপতিমশাই পাটিগণিতে এররকম মোক্ষম শিক্ষা লাভের পর কারাকক্ষ ছেড়ে কোনোক্রমে পালিয়ে বাঁচলেন।

*   *   *

নেহাৎই বরাতের জোরে জাঞ্জিবার থেকে আমেরিকান কনসালের একটি টেলিগ্রাম এসে হাজির হল।

তেরোই ডিসেম্বর ও জাঞ্জিবারের স্থানীয় সময় সকাল পাঁচটা টেলিগ্রামটির মাথার ওপরে লেখা রয়েছে। টেলিগ্রামটির বক্তব্য মোটামুটি এরকম, 'কিলিমাঞ্জারো পর্বতমালার দক্ষিণে দারুণ কর্মকাণ্ড ঘটে চলেছে। সভাপতি বার্বিকেন, ক্যাপ্টেন নিকল গত পাঁচ মাস যাবৎ সুলতান বালিবালির কৃষ্ণকায় মানুষদের নিয়ে পুরোদমে কাজ করে চলেছেন।'

একেই জে. টি. ম্যাসটনের বরাতের জোর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানির গোপন তথ্য এভাবে ফাঁস হয়ে গেল। আর সে সঙ্গে ম্যাসটন ফাঁসিকাঠে ঝুলে প্রাণ দেওয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর জন্য কী নিদারুণ হতাশা আর হাহাকার সঙ্গোপনে অপেক্ষা করছে যদি তিনি ঘুণাক্ষরে জানতে পারতেন তবে কেবল ফাঁসি কাঠেই নয়, যে কোনো উপায়ে মৃত্যু এলেও তাকে সাদরে আলিঙ্গন করতেন।

www.pathagar.com

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবীর মানুষের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ইম্পে বার্বিকেন কি করে ক্যাপ্টেন নিকলকে নিয়ে কিলিমাঞ্জারোর পর্বতের পাদদেশে হাজির হলেন? কি করেই বা কামান ঢালাইয়ের এতবড় কারখানা গড়ে তুলতে পারলেন? গোলা বারুদ সংগহ,, এত কর্মী কি করে তাঁর পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব হল? এমন সব অভাবনীয় অবিশ্বাস্য কাজ ইম্পে বার্বিকেন এবং ক্যাপ্টেন নিকলের পক্ষে কি করে করা সম্ভব হল, তা পৃথিবীবাসীর কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল, থাকবেও চিরদিন।

ম্যাসটন মন্তব্য করলেন, এমন দুর্গম দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে কিলিমাঞ্জারো পর্বতের পাদদেশে হাজির হওয়ার কিছুতেই সম্ভব নয়। আর যদি এ কাজে সুলতানের স্বার্থ জড়িত না থাকত তবে অবশ্যই তাদের পক্ষে অসভ্য জঙ্গিলাদের বশ মানিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়াও কিছুতেই সম্ভব হত না।

জায়গাটির ভৌগোলিক অবস্থান যখন জানা সম্ভব হয়েছে তখন পৃথিবীর কোথায়, কেমন সর্বনাশা প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া কোনো সমস্যার ব্যাপারই নয়। পণ্ডিতরা হিসাব নিকাশ করতে বসে গেলেন। ভূ-গোলকের কোন জায়গায় কেমন পরিবর্তন ঘটবে তা চৌদ্দ থেকে ষোলোই সেপ্টেম্বরের মধ্যেই জানা সম্ভব হল। খবরের কাগজের পাতায় বিবৃতি ছাপা হওয়া মাত্র পৃথিবীর মানুষের মন আতঙ্কে চিপসে গেল।

সভাপতি বার্বিকেন এবং ক্যাপ্টেন নিকলের পরিকল্পনাটি মোটামুটি এরকম—সেপ্টেম্বরের বাইশ তারিখের মাঝরাত্রি সাতাশ সেন্টিমিটারের দশ লক্ষ গুণ বেশি বড় কামান থেকে এক লক্ষ আশি হাজার টন ওজন বিশিষ্ট একটি গোলা আটাশ হাজার কিলোমিটার গতিবেগে উর্ধ্বক্ষিপ্ত হবে। কামান থেকে গোলাটি বেরিয়ে যাবার সময় কামানটিকে যে প্রচণ্ড ধাক্কা মারবে তাতেই বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানির বাঞ্ছা পূরণ হবে। নিরক্ষ রেখার কিছু নিচে, প্যারিস দ্রাঘিমার পশ্চিম দিকে চৌত্রিশ ডিগ্রি অক্ষাংশ থেকে যদি দক্ষিণ দিকে কামান দাগা যায় তবে পিরছনদিকে যে ধাক্কা মারবে তার সঙ্গে পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগ যুক্ত হয়ে নতুন এক অক্ষরেখার উৎপত্তি হবে। এতে ম্যাসটনের গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী বর্তমান অক্ষরেখাটি ২৩—২৮´ সরে যাবে আর কক্ষপথের সঙ্গে সমকোণে অবস্থান করবে। নতুন সমাক্ষরেখা উত্তর অঞ্চলে গ্রিনল্যান্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চল বাফিন সাগর আর গ্রিনল্যান্ডে, দক্ষিণ অঞ্চলে অ্যাডেলিয়াল্যান্ডের পূর্বদিকে আবির্ভূত হবে। নতুন শূন্য ডিগ্রি দ্রাঘিমা কিলিমাঞ্জারো পর্বতমালার ওপরে সৃষ্টি হবে। ফলে নিরক্ষরেখারও স্থানান্তর ঘটবে। সদ্য সরে যাওয়া নিরক্ষরেখার ওপর সূর্য সারা বছর অবস্থান করবে। তার অবস্থান একতিলও সরবে না। কলকাতার সামান্য নিম্নাংশ, গোয়া আর কিলিমাঞ্জারো পর্বতমালা শ্যামের মান্দালয় আর চীনের হংকংয়ের ওপর দিয়ে নতুন বিষুবরেখা চলে যাবে। আর নতুন বিষুবরেখা প্রশান্ত মহাসাগরস্থ ওয়াকার দ্বীপের ওপরেও অবস্থান করবে।

নিরক্ষরেখা যখনই স্থানচ্যুত হবে সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রপ্রবাহের পরিবর্তন ঘটে যাবে। এ ব্যাপারে উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থা সভ্য-সমাজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন, স্বীকার না করে উপায় নেই। দক্ষিণ দিকের পরিবর্তে যদি দক্ষিণ-পূর্ব দিক লক্ষ্য করে কামানের গোলা নিক্ষেপ করা হয় তবে ঘন জনবসতিপূর্ণ সভ্য দেশগুলোর চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটবে। আর দক্ষিণদিকে রয়েছে বিরল জনবসতি। ফলে সর্বনাশ হবে কম।

www.pathagar.com

গণিত বিশারদ ম্যাসটনের হিসাব মতে মেরু প্রদেশের বরফ গলা জল এবং জলোচ্ছ্বাসের ফলে মহাসমুদ্র থেকে জল কিছু সংখ্যক স্থলভূমিকে ছাপিয়ে অন্য দেশের দিকে ধেয়ে যাবে। জলের সর্বোচ্চ উচ্চতা হয়ে যাবে আট হাজার চার শো পনের ফুট।

বিপর্যয়ের ফলে প্রশান্ত মহাসাগর জলশূন্য হয়ে পড়বে। বার্মুডা নিকটে স্থলভূমি দৃশ্য হবে। আর এরই ফলে আমেরিকা আর ইউরোপের মধ্যবর্তী এলাকার নতুন বিস্তীর্ণ অঞ্চল আবির্ভূত হবে। নিজেদের দেশের ভৌগোলিক অঞ্চলের সুবিধার দিক বিচার বিবেচনা করে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, স্পেন, পর্তুগাল ও ফ্রান্স সদ্য আবির্ভূত জমির দখল নেবার জন্য তৎপর হবে।

জল অপসারিত হয়ে যাওয়ার ফলে বাতাসের ঘনত্বের পরিবর্তন ঘটবে। বাতাসের অভাব দেখা দেবে বার্মুডা অঞ্চলে। সম্প্রতি আট হাজার মিটার উর্ধাকাশে যে শ্বাসকষ্ট অনুভূত হয় ঠিক তেমনি শ্বাসকষ্ট হবে বার্মুডায়। তাই সম্পূর্ণ অঞ্চল ছেড়ে মানুষ অন্যত্র পালাবে ভারত মহাসাগরে। প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু পরিমাণ জল অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ উপকূলে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়বে। সমুদ্র স্থানচ্যুত হওয়ার ফলে অসংখ্য জলমগ্ন পাহাড় ও নতুন নতুন দ্বীপের আবির্ভাব ঘটবে। চীন, রাশিয়া, ভারত, জাপান, বেরিং সাগরের সুবিশাল এলাকা এবং আলাস্কা অঞ্চল জলে তলিয়ে যাবে। মস্কো, কলিকাতা, সেন্টপিটার্সবাগ, পিকিং, হংকং ও ব্যাঙ্কক ভূ-গোলক থেকে চিরদিনের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর সেসব শহরের মানুষ সময় থাকতে অন্যত্র চলে না গেলে অথৈ জলে হাবুডুবু খেতে খেতে নিষ্ঠুর মৃত্যুর শিকার হবে।

কিলিমাঞ্জারো পর্বতের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত প্রশান্ত আর আটলান্টিকের জল ফুলে ফেঁপে আট হাজার চার শো পনের মিটার ওপরে উঠে গিয়ে চিলি, আর্জেন্টিনা, সেন্ট্রাল ব্রাজিল এবং উত্তমাশা অন্তরীপ জলে তলিয়ে যাবে।

অতএব বার্বিকেন অ্যান্ড, কোম্পানি, অর্থাৎ দুটো মানুষের অপরাধমূলক পরিকল্পনাকে বন্ধ করতে না পারলে পৃথিবীবাসীকে রক্ষা করার ক্ষমতা কারোরই নেই। পৃথিবীকে আসন্ন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির হাত থেকে কিছুতেই অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীরা বিচার-বিবেচনা করে যে আসন্ন ভয়ঙ্করতার কথা ব্যক্ত করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে মানুষ দুটো উপায়ে নিষ্ঠুর মৃত্যুর শিকার হবে—হয় অথৈ জলে তলিয়ে গিয়ে নতুবা শ্বাস বন্ধ হয়ে। বায়ুর অভাবে শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা যাবে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, স্পেন এবং ফ্রান্সের বহু অদৃষ্টবিড়ম্বিত মানুষ।

ফলে নতুন নতুন জমি লাভের সম্ভাবনা দেশের মানুষের মধ্যে পুলকের সঞ্চার করতে পারল না। প্যারিস নতুন কোনো জমি তো পাচ্ছেই না উপরন্তু সেখানকার মানুষ বাতাসের অভাবে ছটফট করবে। আর জলের তলায় তলিয়ে গিয়ে দম বন্ধ হওয়ার ফলে মারা যাবে কানাডা, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আমেরিকা, ভারতবর্ষ আর অস্ট্রেলিয়ার হতভাগ্য মানুষগুলো। বহু উন্নত ও লাভজনক উপনিবেশ গ্রেট বৃটেন হারাবে। যেসব দেশ রসাতলে যাবে তাদের মধ্যে অনুন্নত দেশের সংখ্যাই বেশি। অতএব উন্নত দেশগুলো মুখে কলুপ এঁটে রাখলেই তো পারত। অনুন্নত দেশগুলো যদি জাহান্নামে যায় ক্ষতি কি? কিন্তু কার্যত তা হল না। পৃথিবী জুড়ে তোলপাড় আরম্ভ হয়ে গেলে ইউরোপ নিরাপদ থাকবে, পূর্বাঞ্চল জলে তলিয়ে যাবে আর পশ্চিমাঞ্চল মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। ফলে একদিকে অথৈ জল আর অন্যদিকে বায়ুর অভাব শ্বাসকষ্ট। কী অসহনীয় যন্ত্রণার কারণ

www.pathagar.com

হয়ে দাঁড়াবে। ভূমধ্য সাগরের জল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সুয়েজ খাল হয়ে যাবে এক্কেবারে অকেজো।

মালটা, সাইপ্রাস ও জিব্রাল্টার যদি কর্পূরের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তবে ইংল্যান্ডের তো পুলকিত হবার কোনোই কারণ নেই। পাহাড়ের শীর্ষদেশে যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে যাবে কীভাবে? আটলান্টিক মহাসাগরের নতুন ভূখণ্ড উপরি পাওনা হচ্ছে সত্য। কিন্তু ইউরোপ যে-সব দেশ খোয়াবে তাকে ক্ষতি পূরণ হবে না।

পৃথিবীর ছোট-বড় সব দেশ সমস্বরে প্রতিবাদে মুখর হল। যেখানে যত খবরের কাগজ ছাপা হল সব ক'টি কাগজের সাংবাদিকরা একজোট হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে লাগল।

সবার ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়ে বর্ষিত হতে লাগল নাটের গুরু গণিতবিদ ম্যাসটনের ওপর। অবশেষে এল সেপ্টেম্বরের সতের তারিখ। ক্রোধোম্মত্ত জনতা কয়েদখানার ফটক ভেঙে বন্যার জলের মতো হুড়হুড় করে ভেতরে ঢুকে গেল। কিন্তু কোথায় ম্যাটসন? কারাকক্ষ যে শূন্য।

এবারও মিসেস স্করবিট টাকার ভেল্কি দেখালেন। কারারক্ষীকে গোছা গোছা নোট ঘুষ দিয়ে ম্যাসটনের জীবন রক্ষা করলেন।

আর মাত্র চারটি দিন বাকি। এই চারটি দিন কোনোরকমে ঝিম মেরে থাকতে পারলেই বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানির কামান তীব্র গর্জনে পৃথিবীর রূপ বদলে দেবে। ভয়ঙ্কর প্রলয়ের মধ্য দিয়ে পৃথিবী সম্পূর্ণ নতুন এক অবয়ব ধারণ করবে।

এদিকে বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানির কাজের প্রতিবাদ করে এমনসব মন্তব্য এক ইস্তাহারে ছেপে জনসাধারণের মধ্যে বিলি হতে লাগল যা পড়ে এতদিন যারা তাদের কেবলমাত্র ধাপ্পাবাজ বলেই সন্তুষ্ট ছিল এখন তারাও তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ার উপক্রম হল।

ব্যাস, আর কথা নেই, বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানির খেয়াল খুশির ফলে কোনো কোনো দেশ অতল জলে তলিয়ে যাবে, আর কোন কোন অঞ্চল মাথাচাড়া দিয়ে ওপরে উঠে আসবে এমন সব স্থানের উল্লেখ করে মানচিত্র সমেত ইস্তাহার পৃথিবীর সব দেশে বিলি হতে লাগল। এর পরিণাম হল মারাত্মক। দলে দলে মানুষ প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে দেশ ছেড়ে পালাতে লাগল। কিন্তু নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছোতে অন্তত একটি মাস সময় দরকার। কিন্তু এত সময় কোথায়? কোনো কোনো দেশ কামান দাগার স্থান ঘোষণা হবার পর নিশ্চিন্ত হল যে তাদের কোনোই সমস্যা নেই। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল তারা।

পৃথিবীর আপামর জনসাধারণ যখন নিদারুণ আতঙ্ক জ্বরে অস্থির, তখন একমাত্র অ্যালসিড পিয়েদোঁ ব্যাপারটিকে আমল না দিয়ে ভাবতে চলেছেন, সাতাশ সেন্টিমিটার কামানের চেয়ে দশগুণ কামান তৈরি করা কীভাবে সম্ভব! না, বার্বিকেন এমন একটি অবিশ্বাস্য কাজকে কি করে বাস্তবরূপ দেবেন? অস্থিরচিত্ত অ্যালসিড পিয়েদোঁ সর্বক্ষণ আপন ভাবনায় মগ্ন রইলেন।

* * *

বার্বিকেন ওয়ামাসাই জায়গাটিকে কামান দাগার জন্য নির্বাচিত করেছেন। সেটি আফ্রিকার পূর্বদিকে অবস্থিত। তার অবস্থান ভিক্টোরিয়া নিয়ানজা লেক আর জাঞ্জিবারের উপকূলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এখানকার শাসক সুলতান বালি-বালি। কিসোনগো তাঁর

www.pathagar.com

রাজধানী। ত্রিশ-থেকে চল্লিশ হাজার নিগ্রো তাঁর প্রজা। মধ্য এশিয়ার যেসব শাসক ইংরেজদের তোয়াক্কা না করে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করছেন সুলতান বালি-বালি তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। জানুয়ারি মাসে তারই রাজধানীতে বার্বিকেন হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন ক্যাপ্টেন নিকল আর অন্য ছ'জন অনুগত ব্যক্তি। কেবলমাত্র জে. টি. ম্যাসটন আর মিসেস স্করবিট ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের আর কেউ-ই তাদের গোপন অবস্থানের খবর জানে না। জাহাজ নিউইয়র্ক থেকে প্রথমে উত্তমাশা অন্তরীপ ও সেখান থেকে এসেছেন জাঞ্জিবারে। অভিযাত্রীরা গোপনে মোম্বামা থেকে এসেছেন সুলতানের ভাড়া করা জাহাজে চেপে। তারপর সুলতানের অনুচররা জঙ্গল-পথে তাঁদের রাজধানীতে নিয়ে এসেছে।

সুলতান বার্বিকেনকে জানেন। পৃথিবী থেকে চন্দ্র অভিযানের কর্ণধার হিসাবে করিতকর্মা এই-আমেরিকানের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সুলতান অত্যুগ্র উৎসাহী ছিলেন। বার্বিকেন তাঁর এ-দুর্বলতাটিকে পুরোপুরি কাজে লাগালেন।

বার্বিকেন সুলতানের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে তিন লক্ষ ডলার গুঁজে দিয়ে কিলিমাঞ্জারোর দক্ষিণ দিকটি ব্যবহার করার অনুমতি নিয়ে রাখলেন। সুলতান খুশি হয়ে বললেন, 'কোন চিন্তা নেই সাহেব, আমার প্রজারাই মজুরের কাজ করে সাহায্য করবে।'

উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন ডলার দিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলটির মালিকানা লাভকরে বসলেন।

বার্বিকেনের মতো একটি জ্ঞানী-গুণী কর্ম বিশারদ কোন কাজ সিদ্ধ করতে চান তা না বুঝে, না জেনেই সুলতান ব্যাপারটিকে খুবই গোপন রেখেছিলেন। প্রজাদেরও কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন কাজ যতদিন না মিটে যায় ততদিন কেউ রাজ্যের বাইরে যেতে পারবে না। হুকুম যে অমান্য করবে তার কপালে কঠিন শাস্তি জুটবে। এত সতর্কতা অবলম্বন করার পরও খবরটি শেষপর্যন্ত চাউর হয়ে গেল। খবরটি চাপা থাকার জন্যই আমেরিকা ও বৃটেনের বাঘা বাঘা গোয়েন্দারা বার্বিকেনের কোনো পাত্তাই পায় নি। কিন্তু নিগ্রোদের মধ্যেও বিশ্বাসঘাতকের অভাব নেই তাদেরই একজনের দ্বারা শেষপর্যন্ত খবরটি জাঞ্জিবারের কনসালের কানে গেল। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ইম্পে বার্বিকেনের দীর্ঘ আট মাসের প্রস্তুতি বরবাদ করার সম-সুযোগ আর নেই।

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে সভাপতি বার্বিকেন এ-জায়গাটিকেই কেনই বা কামান দাগার জন্য নির্বাচন করলেন?

এর উত্তর—ম্যাসটনের হিসাবে সঙ্গে ওয়ামাসাইয়ের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পূর্ণমিলে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা আফ্রিকার এ অখ্যাত অবজ্ঞাত স্থানটির খবর কারোরই জানা নেই। পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা এই-জায়গাটিতে ইতিপূর্বে কোনো অভিযাত্রীই আসেন নি। সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, কামান আর বারুদ তৈরির যা কিছু কাঁচামাল দরকার সবই এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

সুলতান বালি-বালি বার্বিকেনকে এক হাজার নিগ্রো প্রজা দিয়েছেন তাঁর ফরমাশ অনুযায়ী কাজ করার জন্য। তাদের নিয়ে তিনি তিনটি কারখানা গড়ে তুললেন। তিন জায়গায় আলাদা আলাদা ভাবে, কামান কামানের গোলা আর মেলিমেলোনাইট তৈরি করতে শুরু করলেন। কামান বলতে যে লোহার বিশালায়তন একটি চোঙ তৈরি করা হয় এক্ষেত্রে আসলে কিন্তু তা নয়। বার্বিকেন পাহাড় কেটে অতিকায় একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করে

www.pathagar.com

নিয়েছেন। এটি ফাটার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এতে ম্যাসটনের অঙ্কের হিসাব অনুসরণ দুমিটার পুরু লোহার আস্তরণের টুকরো অন্য এক কারখানায় তৈরি হল। সেগুলোকে টেনে এনে একের পর এক সুড়ঙ্গটির ভেতরে আটকে দেওয়া হতে লাগল। একলক্ষ আশি হাজার টন লোহাকে অন্য জায়গায় তুলে নিয়ে বসানোর সাধ্য কারোর নেই। তাই কারখানায় ছোট ছোট টুকরো ঢালাই করা হতে লাগল। প্রতিটি টুকরোর ওজন এক হাজার টন। কামানোর মধ্যে মেলিমেলোনাইট আগে থেকেই সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। এবার গোলার টুকরোগুলিকে এ-প্রকোষ্ঠের ওপরে সাজিয়ে বিশালায়তন গোলাটি তৈরি করা হল।

এদিকে বারুদ কারখানায় বিস্ফোরক তৈরির দায়িত্ব রয়েছেন ক্যাপ্টেন নিকল। কোন রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে কোন পর্দাথ মিশিয়ে বিস্ফোরক তৈরি করা হল তা কেউ টেরও পেল না।

সুলতান রোজ একবার করে এসে উৎসাহের সঙ্গে কারখানাগুলিতে ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখেন। তাঁর রাজ্যে এমন কর্মযজ্ঞ হচ্ছে এ যে উৎসাহেরই ব্যাপার।

বার্বিকেন একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁকে বলেছিলেন পৃথিবীর চেহারাটাই পাল্টে দেব। সুলতানের নাম এতেই স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। ব্যস, তারপর থেকে সুলতানের উৎসাহ আর দেখে কে!

আগস্টের উনত্রিশ তারিখে যাবতীয় কাজ মিটল।

সেপ্টেম্বরের বাইশ তারিখ। এদিকে ম্যাসটন ব্যালিস্টিক কটেজ ছেড়ে নিরাপদ অঞ্চলে আত্মগোপন করে রয়েছেন। উত্তেজিত জনসাধারণ কেবলমাত্র তাঁকেই নয়, ইম্পে বার্বিকেন এবং ক্যাপ্টেন নিকলকেও হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মাত্র আর কয়েক ঘণ্টা বাকি। ব্যস, তারপরই অতিকায় পাথর-কামান থেকে বিশালায়তন গোলাটি বায়ুর বেগে ধেয়ে যাবে।

ঠিক তখনই বাল্টিমোরের একনিরালা ঘরের কোণে বসে নিবিষ্ট মনে অঙ্ক কষতে কষতে অ্যালসিড পিয়েৰ্দো বিকট স্বরে চিল্লিয়ে উঠলেন, 'বোকা। ম্যাটসন একটি বোকার হদ্দ! এত বড় একটি ভুল ভদ্রলোক করলেন কিকরে! এতে যে বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানির পুরো পরিকল্পনাটিই বরবাদ হয়ে যাবে! কী কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটতে চলেছে!'

* * *

বহু প্রতীক্ষিত সেপ্টেম্বরের বাইশ তারিখ এল। পৃথিবীর মানুষ প্রতিটি মিনিট-সেকেন্ডের হিসাব কষতে কষতে দমবন্ধ হওয়া আতঙ্কের মধ্যে সময় অতিবাহিত করে চলেছে। যার সঙ্গে এক হাজার সালের প্রথম দিনটির সঙ্গে বার বার তুলনা করা হয়েছে আজই সে-ভয়ঙ্কর দিনটি। রাত্রি বারোটায় ক্যাপ্টেন নিকল কামান থেকে গোলা বর্ষণ করবেন। সময় যত ঘনিয়ে আসছে মানুষের আতঙ্ক ততই বেড়ে চলেছে।

ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা পাঁচটা চব্বিশ মিনিট। কামান থেকে মাইল তিনেক দূরে সুলতান বালিবালি বিরাট এক ভোজ-সভার আয়োজন করেছেন। ভোজপর্ব সম্পন্ন করে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে ইম্পে বার্বিকেন উঠে দাঁড়ালেন। হাতের ক্রনোমিটারটির ওপর মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়ে নিলেন।

ইম্পে বার্বিকেন ও ক্যাপ্টেন নিকল ব্যস্ত-পায়ে কামানটির কাছে গেলেন। ক্যাপ্টেন নিকল কামানের বোতামে হাত রাখলেন। ইম্পে বার্বিকেন নিষ্পলক চোখে ক্রনোমিটারের

www.pathagar.com

কাঁটার দিকে তাকিয়ে। বোতামে টিপ দেওয়ামাত্র এমন ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটবে যা পৃথিবীর চোখে দেখা তো দূরের ব্যাপার কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে নি।

গণিতবিদ ম্যাসটনের অঙ্কের হিসাব অনুযায়ী রাত্রি ঠিক বারোটায় সূর্য বিষুব রেখার ওপর অবস্থান করবে।

ক্রণোমিটারের চাকা তিরতির করে এগিয়ে চলেছে। বারোটা বাজতে পাঁচ-চার-তিন-দুই, আর মাত্র এক মিনিট বাকি। ক্যাপ্টেন নিকলের আঙুল বোতামের ওপর অনবরত কেঁপে চলেছে। বার্বিকেন এক-দুই-তিন, হ্যাঁ, তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বোতামে টিপ দিতে হবে।

ক্যাপ্টেন নিকলের আঙুল তির তির করে কাঁপছে। আর বুকের ভেতরে অনবরত চলছে হৃদপিণ্ডের লাফালাফি দাপাদাপি। এক সময় বার্বিকেন কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন, 'ফায়ার'!

ব্যাস, ক্যাপ্টেন নিকল সঙ্গে সঙ্গে বোতামের ওপর আঙ্গুলটি চেপে ধরলেন। প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। চারদিক জমাটবাঁধা ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল। আর আগুনের হল্কা ছড়াতে ছড়াতে অতিকায় গোলাটি উল্কার বেগে ধেয়ে চলল।

পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ চরম মুহূর্তের জন্য রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগল। একমাত্র অ্যালসিড পিয়েদোঁ-ই নির্বিকার। একেবারেই ভাবনা চিন্তাহীন।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার বাল্টিমোর, কনস্টান্টিনোপল, প্যারিস, লন্ডন প্রভৃতি অঞ্চলে সামান্যতম কম্পনও অনুভূত হল না। কয়লাখনির সিসমোগ্রাফেও সামান্যতম কম্পনের লক্ষণ লক্ষিত হল না।

ম্যাসটনের মধ্যে নিদারুণ অস্থিরতা ভর করল। হতাশও কম হলেন না। এক্সপেরিমেন্ট সফল হওয়ার কোনো খবর না পাওয়ার জন্যই তাঁর এ-উম্মাদনা। সেপ্টেম্বরের তেইশ তারিখেও কোথা থেকেও ভয়ঙ্কর কোনো খবর পাওয়া গেল না।

ম্যাসটনের মনে সন্দেহের উদ্রেক ঘটল। কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়েছে কিনা এরকম সন্দেহও তাঁর মনের কোণে উঁকি দিতে লাগল।

ইউরোপিয় প্রতিনিধিরা বহুমূল্য সব যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষায় মগ্ন থেকে এক সময় উল্লসিত হয়ে পড়লেন। কোনো পরিবর্তন লক্ষিত না হওয়ার জন্যই তাদের মনের এ উল্লাস। ম্যাসটন আর মিসেস স্করবিট কিন্তু হতাশা হতে লাগলেন। ভাবলেন, তবে কি অঙ্কের হিসেবে কোথাও কোনো ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব?

আমেরিকায় জাঞ্জিবারের কনসালের এক টেলিগ্রাফ এল। তাতে লেখা, জাঞ্জিবার, তেইশে সেপ্টেম্বর সকাল সাতটা পঁচিশ মিনিট তারিখ ও সময়ের উল্লেখ রয়েছে। আর টেলিগ্রামের বক্তব্য—কিলিমাঞ্জারোর দক্ষিণ সুড়ঙ্গের মধ্য থেকে গতকাল কামান থেকে গোলা বর্ষিত হয়েছে। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেছে। সমুদ্রের বুকে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হলেও ক্ষয়ক্ষতি কিছুই হয়নি। পৃথিবী থেকে চাঁদে গোলা বর্ষণের সময়েও এমন আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

টেলিগ্রামটি থেকে দুটো বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল—(ক) কিলিমাঞ্জারো পর্বতশ্রেণীর পাদদেশ থেকে কামান দাগা হয়েছিল, আর (খ) কামান থেকে গোলাবর্ষণ পূর্ব নির্দ্ধারিত বিধাতার সৃষ্ট সবকিছু আগের মতো যথাস্থানেই রয়েছে।

www.pathagar.com

মিসেস স্করবিট এতদিন ম্যাসটনকে কামরাবন্দি করে আগলে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি আর তাঁকে আগলে রাখতে পারলেন না। অস্থিরচিত্ত ম্যাসটন একদিন তাঁর বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করে পথে বেরিয়ে গেলেন। ব্যস, আর যাবে কোথায়! পথচারীরা চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে নানারকম টিটকিরি দিতে লাগল। উপায়ান্তর না দেখে ম্যাসটন জনতার হাত থেকে কোনোরকমে নিজেকে মুক্ত করে আবার মিসেস স্করবিটের প্রাসাদে ফিরে মান ও প্রাণ বাঁচালেন। কিন্তু বার্বিকেন আর নিকল কোথায় কি অবস্থা, যে আছেন কে জানে। মান-সম্মানের কথা না হয় পরে বিবেচনা করা যাবে, প্রাণে বেঁচে আছেন কি?

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বার্বিকেন স্বদেশের মাটিতে ফিরে এলেন। অক্টোবরের পনের তারিখে দুপুর বারোটায় তিনি গ্রিন পার্কের বাড়িতে গণিতবিদ জে. টি. ম্যাসটন এবং মিসস স্করবিটের কাছে হাজির হলেন।

ম্যাসটন তাঁদের মুখ থেকে সবকিছু শুনে, চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তবে আমাদের একটি সিদ্ধান্তে আসতে হয়। গোলাটির প্রাথমিক গতিবেগ বাঞ্ছিত সেই দুহাজার আটশো কিলোমিটর ওঠে নি। আসলে পিছন থেকে বারুদ যে ধাক্কা দিয়েছিল তা ছিল খুবই কম।

ইম্পে বার্বিকেন বললেন, এতে আমাদের পরস্পরের প্রতি দোষারোপই করা হবে। আমি বলব, ম্যাসটনের অঙ্কের হিসাবনিকাশ নির্ভূলই ছিল। আর ক্যাপ্টেন নিকলের বারুদও নির্ভেজাল ছিল। আমাদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের দক্ষতার অভাব।

সম্পূর্ণ অর্থই জলে গেল। কোম্পানির শেয়ারের মূল্য একটি কানাকড়িও আর রইল না। কোম্পানির লালবাতি জ্বলল। পৃথিবীর চারদিক থেকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বর্ষিত হতে লাগল বার্বিকেনকে লক্ষ্য করে।

টাইমস পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ ছাপা হল। পৃথিবীর সমাক্ষরেখাকে নতুন করে সৃষ্টির প্রয়াস সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হয়েছে। গণিতবিদ জে. টি. ম্যাসটন গোড়াতেই তো ভুল করে বসেছেন। তিনি অঙ্ক কষতে শুরু করেছিলেন পৃথিবীর পরিধি চল্লিশ হাজার মিটার ধরে। কিন্তু আসলে পরিধি চার কোটি মিটার। গোড়াতেই ভুল হওয়ায় পুরো অঙ্কটিই শেষপর্যন্ত ভুল রয়ে গেছে। এর কারণ হচ্ছে তিনি প্রথম তিনটি শূন্য বসাতে ভুল করেছিলেন। আর এরই জন্য সব শেষে গিয়ে বারোটি শূন্যের পার্থক্য হয়ে গেছে।

ম্যাসটনের ভুলের ব্যাপারটি খবরের কাগজ মারফৎ পৃথিবীর সবদেশে প্রচারিত হওয়ার পর চারদিক থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর কাছে টেলিগ্রাম আসতে লাগল। ব্যাপারটি এমন দাঁড়াল যে, তাঁর ভুলটুকুর জন্যই পৃথিবীর এক বিরাট ভগ্নাংশ নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেল। প্রাণ বাঁচল কোটি কোটি মানুষের।

ম্যাসটন কিন্তু কিছুতেই মানতে উৎসাহ পেলেন না যে, গোড়ার তিনটি শূন্যের ভুলের জন্য শেষমেশ বারোটি শূন্যের হেরফের হয়ে গেছে। তিনি কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলেন অঙ্কের সমাধানের জন্য।

ম্যাসটন ব্যালিস্টিক কটেজের দরজা-জানালা বন্ধ করে সবে ব্ল্যাকবোর্ডের গায়ে চল্লিশ লক্ষ সংখ্যাটি লিখলেন। ঠিক সেইমুহূর্তে কর্কশ আওয়াজ তুলে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠেছিল। ফোন করেছিলেন মিসেস স্করবিট। ফোনে সবে উভয়ের কথোপকথন শুরু হয়েছিল। ব্যস, বিকট আওয়াজ করে বাজ পড়ে। ম্যাসটন ছিটকে পড়লেন। ঘরের

www.pathagar.com

মেঝেতে পড়ে যাওয়ার সময় তার হাতের স্পর্শে অঙ্কটির অংশ বিশেষ মুছে যায়। আবার অঙ্ক শুরু করলেন, চল্লিশ হাজার পর্যন্ত লিখতেই আবার টেলিফোনের ঘন্টা ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং শব্দে বেজে উঠল। মিসেস স্করবিটের ফোন। তাঁর সঙ্গে কথা সেরে আবার তিনি অঙ্কটি কষতে শুরু করলেন? পৃথিবীর পরিধির সম্পূর্ণ মাপ লিখতে ভুলে গেলেন। অর্থাৎ শেষের শূন্য তিনটি বাদ-ই রয়ে গেল। মিসেস স্করবিট প্রথমবার ফোন না করলে ম্যাসটন বজ্রাঘাতে ছিটকে পড়তেন না। দ্বিতীয়বার ফোনটি না করলে শেষের শূন্য তিনটি বাদ পড়ার কোনো কারণই থাকত না। তিনি নিবিষ্টচিত্তে অঙ্ক নিয়েই মেতে থাকতে পারতেন। অঙ্কও নির্ভুল হত। মিসেস স্করবিটের জন্যই, নইলে আমৃত্যু এতবড় একজন গণিতবিদকে সমগ্র বিশ্বের কাছে এমন হেয় প্রতিপন্ন হতে হত না।

ম্যাসটনের মনোবল ভেঙে গেল। অঙ্কের জগৎ থেকে তিনি নিজেকে চিরদিনের জন্য সরিয়ে নিলেন। একটি বিশেষ শর্তে ম্যাসটন আর মিসেস স্করবিটের শুভপরিণয় সম্পন্ন হল যে, ম্যাসটন আর কোনোদিনই অঙ্ক কষবেন না। মিসেস স্করবিটও মনে মনে তাই চাচ্ছিলেন। কারণ, অঙ্ক দেখলেই তাঁর মেজাজ খিটমিটে হয়ে যায়।

এদিকে অ্যালসিড পিয়েদোঁ তাঁর যে-প্রেয়সীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে দেশ ছেড়ে এসেছিলেন তার বাবা খবরের কাগজের পাতার প্রবন্ধ পড়ে অনুতাপে জর্জরিত হতে লাগলেন। এমন একটি সুপাত্র হাতছাড়া হওয়ায় অনুতাপ তো হবারই কথা।

তাই একদিন তিনি পিয়েদোঁকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান।

---

www.pathagar.com

মাস্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড

কতকগুলো বিস্ময়কর ঘটনার সঙ্গে আমাকে লিপ্ত হতেই হয়েছিল। বিস্ময়কর বলে উল্লেখ করছি এজন্য যে, হয়তো বিশ শতকে আর এমন অতুলনীয় বিস্ময়ের উদ্ভব ঘটবে না। মাঝে মধ্যে নিজের মনেই প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে, সত্যিই কি এমন অত্যাশ্চর্য কোনো ঘটনা ঘটেছিল? আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে পটে আঁকা ছবির ঘটনাটা গেঁথে রয়েছে। বাল্যের সেই দুরন্ত দিনগুলো থেকেই অজ্ঞাত রহস্য ভেদ করার জন্য আমি ঔৎসুক্য বোধ করতাম। আর রহস্যাবৃত ঘটনা তখন থেকে চুম্বকের লোহাকে আকর্ষণ করার মতো আমাকেও দুর্নিবার আকর্ষণে টেনে নিয়ে যেত। আর তা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল বলেই আজ আমি ওয়াশিংটন ফেডারেল পুলিশ ডিপার্টমেন্টের চিফ ইন্সপেক্টরের পদ লাভ করতে সক্ষম হয়েছি।

কর্তব্য আর নেশা উভয়ের তাগিদে আমি মাঝে-মধ্যে এমন সব অদ্ভুত-অবিশ্বাস্য ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলি যা কখন সখন নিজের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার বলে মনে হয়। সরকার আমার মতো একজন অল্পবয়স্ক কর্মীর ওপর গোপন রহস্য ভেদ করার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন। আবার বহুরকম জটিল সমস্যার গোপন তদন্তের দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন। তাই এ বিস্ময়কর ঘটনার তদন্ত ও সমাধানের দায়িত্ব যে আমার উপরেই বর্তাবে তাতে আর অবাক হবার কি-ই বা থাকতে পারে। অবিশ্বাস্য অত্যাশ্চর্য ঘটনাটার তদন্ত করতে নেমে যেসব রহস্যাবৃত ঘটনার সঙ্গে আমাকে যুজতে হয়েছে তার আর দ্বিতীয় নজির আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।

অত্যাশ্চর্য-অবিশ্বাস্য এই ঘটনাটার কেন্দ্রস্থল আমেরিকাস্থ দক্ষিণ ক্যারোলিনার পশ্চিমের এক স্থান। ব্লু-রিজ পর্বতমালা আর গ্রেট আইরি পর্বতশিখরের মধ্যবর্তী স্থানেই অবস্থিত। পাহাড়টার গম্বুজাকৃতি চেহারাটা ক্যাট বা নদীর পাড়ে অবস্থিত মরগ্যাটন নামে পার্বত্য গ্রাম থেকে স্পষ্ট নজরে আসে। তবে প্লেজ্যান্ট গ্রামের মধ্যবর্তী পথ পাড়ি দেবার সময় পাহাড়টাকে আরও অনেক, অনেক স্পষ্ট দেখা যায়।

গ্রেট আইরির এরকম নামকরণ হয়েছে কেন, ভাববার মতো ব্যাপারই বটে। নইলে এত নাম থাকতে—আসলে স্থানীয় অধিবাসীদের কোনো নামই মনে ধরল না। হয়ত সদম্ভে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়টার কথা ভেবেই তাদের এমন মতি হয়েছে। তবে আমার পক্ষে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

গ্রেট আইরির চূড়াটা একেবারেই ন্যাড়া। যা-ই হোক এটা তো নিছক একটা পাহাড়ই বটে। আর এটা তো পাথর, নিছকই নিরেট পাথর মাত্র। তবে? এর দিকে চোখ পড়ামাত্রই বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। এর শীর্ষে আরোহন করার হিম্মত কারোরই নেই। বিশেষ বিশেষ আবহাওয়ায় পাহাড়টা নীল বর্ণ ধারণ করে।

নানারকম পাহাড়ী পাখির নামানুসারেই হয়তো বা পাহাড়টার নামকরণ করা হয়েছে। জানা-অজানা কতরকম অতিকায় সব পাখি যে পাহাড়টার গায়ে আশ্রয় নিয়েছে

www.pathagar.com

তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু গ্রেট আইরি এখন আর তাদের যেন আকৃষ্ট করতে পারছে না। তারা এখন পাহাড়টার শীর্ষদেশ বার-কয়েক চক্কর মেরে পরম বিতৃষ্ণায় অন্যদিকে চলে যায়।

তবে? গ্রেট আইরি নামটার অস্তিত্ব কি তবে অব্যাহত রয়ে গেল। তার চেয়ে বরং এর নাম আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ নামকরণ করলেই সঙ্গত হত। গম্বুজাকৃতি পাহাড়টার গায়ে অতিকায় কোন গহ্বর আছে কিনা তাই বা কে বলতে পারে? তা যদি না হয় তবে কোনো হ্রদ আছে কিনা তাই বা কে জানে? অ্যাপালাচিয়ান পর্বতমালার খানা খন্দে বৃষ্টি আর বরফগলা জল জমে জমে কিছু সংখ্যক উপহ্রদের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়।

আসলে গ্রেট আইরি একটা প্রাচীন আগ্নেয় পর্বত কি না, কারোর জানা নেই। দীর্ঘদিন সুপ্ত, অগ্নি উদগীরণ করে নি। তবে কি গ্রেট আইরি তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে আগ্নেয় পর্বত ক্রাকাটোয়া বা মঁপিলির মতো আবার ভেতরে ভেতরে ভয়ানক প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে? পাথরের ফাটল দিয়ে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভূগর্ভস্থ ফুটন্ত গলিত লাভার সংস্পর্শে গিয়ে বাষ্পীভূত হবে। ব্যস, তা বেরোবার উপযুক্ত পথ না পেয়ে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটাবে। চোখের পলকে গলিত লাভা, বিষাক্ত গ্যাস, পাথরে পাথরে ছেয়ে ফেলবে শান্তি-সুখের ক্যারোলিনা গ্রামটাকে। ঠিক এমনই ভয়ঙ্কর ঘটনা তো উনিশ শো দুই-এ মাটিনিকে ঘটেছিল, ঠিক কি না? এরকম সম্ভাবনার ইঙ্গিতই যেন এখন প্রকাশ পাচ্ছে। আর এসবই অগ্ন্যুৎপাতের ইঙ্গিতবাহী বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাদের একটা হচ্ছে, পাহাড়ে শীর্ষদেশে জমাটবাঁধা ধোঁয়া দেখা গেছে। আবার চাষীরা মাঠেঘাটে কাজ করতে যাওয়ার সময় পায়ের তলা থেকে চাপা আওয়াজ উঠতে শুনতে পেয়েছে। আবার এমনও দেখা গেছে গভীর রাত্রে পাহাড়ের ওপরের আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। বাতাসের কাঁধে ভর করে জমাটবাঁধা ধোঁয়া ভাসতে ভাসতে পূবের প্লেজান্ট গার্ডেনের দিকে দুলকি চালে এগিয়ে গেছে। রাশি রাশি ছাই নেমে এসেছে ভূমিতে। ব্যাপার দেখে গ্রামের বাসিন্দারা চমকে উঠেছে। তারা ভেবেছে পাহাড়টা বুঝি প্রলয়ঙ্কর কাণ্ডের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ধারে-কাছের মানুষের আতঙ্ক-মিশ্রিত কৌতূহলের সঞ্চার ঘটেছে। ক্যারোলিনার সব ক'টা খবরের কাগজ 'গ্রেট আইরির রহস্য' নাম দিয়ে খবর ছেপে বাজার গরম করতেও দেরি করল না। সবারই মোদ্দা কথা, গ্রেট আইরির কাছাকাছি বাসবাস করা কি সঙ্গত হবে? খবরের কাগজের বক্তব্য কারোর মধ্যে ভীতির সঞ্চার করল, আবার কারোর মধ্যে বা সঞ্চার করল অফুরন্ত কৌতূহল, আসলে তাদের বসতি যে বিপদ-সীমার বাইরে। তাই তো তাদের ভীতির বদলে কৌতূহলের সঞ্চারই বেশি হল। প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটলে ধারে কাছে চাষীভুষিগুলিই আগে খতম হবে। সবচেয়ে বেশি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল প্লেজ্যান্ট গার্ডেন ও মরগানটনের বাসিন্দা আর পাহাড়ের গা-ঘেঁষে বসতি গড়ে তোলা চাষীভুষিরা।

এ-মুহূর্তে গ্রামবাসীদের সবচেয়ে বড় আপসোস, এতদিন কেন পাহাড়ের গা-বেয়ে উঠে গ্রেট আইরি পাহাড়ের শিখর পর্যন্ত দেখা হয় নি? পর্বতারোহীদেরই দোষ দেওয়া যাবে কীভাবে? এমন মসৃণ-খাড়াই পাহাড়ের গা-বেয়ে শিখর অবধি উঠবেই বা কীভাবে? পাহাড়ের গায়ে ফাঁক-ফোকর থাকলে কি আর তারা আজও রহস্যটা ভেদ না করে নিশ্চিন্তে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকত? না, এখন তো আর নিশ্চিন্তে বসে থাকা সঙ্গত নয়।

www.pathagar.com

গ্রেট আইরিরি অভ্যন্তরে কোন প্রলয়ঙ্কর কাণ্ডের মহড়া চলছে তা যত শীঘ্র সম্ভব চাক্ষুষ করা দরকার।

সে বছরের সেপ্টেম্বরের প্রথমে দিকে মরগাটনে উইলকার হাজির হলেন। বেলুনবাজ হিসাবে তাঁর যথেষ্ট নামডাক রয়েছে। তাঁর সর্বসময়ের সম্বল বেলুনটা, সঙ্গেই রয়েছে। বাতাস পূর্বদিক থেকে বইছে। তাই সেদিক থেকেই তিনি বেলুনে চেপে গ্রেট আইরিরি শিখর ডিঙিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বহু উঁচু দিয়ে, তাঁর বা বেলুনের গায়ে যেন তাপ না লাগে এমন দূরত্ব দিয়ে বেলুনে পাড়ি জমাবেন। বেলুনের গায়ে তাপ লাগলে ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্টই রয়েছে। অক্ষত বেলুনে চেপে তিনি শক্তিশালী দূরবীণের সাহায্যে গ্রেট আইরিরি অনেকখানি ভেতর অবধি দেখে নেবেন। পাহাড়ের তলদেশ ফাটিয়ে আগ্নেয় পর্বত জেগে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে কিনা এটা দেখাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। আর অগ্নি উদগীরণ যদি করেই তবে কি তার দেরি আছে, নাকি শীঘ্রই করবে? এতেই গ্রামবাসীদের ভাগ্য সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যাবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ীই কাজ হল। উইলকারকে নিয়ে বেলুনটা শূন্যে উড়ল। তিনি চোখে দূরবীন লাগিয়ে তৈরি হয়ে দোলনায় দাঁড়িয়ে রইলেন। জমাটবাঁধা ধোঁয়া না থাকলে পাহাড়ের জঠরের অনেকখানি তিনি অবশ্যই দেখে নিতে পারবেন। বিষাক্ত গ্যাস থাকলে ধরতে পারবেন কোন জায়গা দিয়ে তিরতির করে বেরিয়ে আসছে।

বেলুনটা চোখের পলকে শূন্যে পনের ফুট উঠে গেল। পূবের হাওয়ার বেগ কম, তাই বেলুনটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবারই অঘটনটা ঘটে গেল। আচমকা হাওয়ার দাপটে বেলুনটা পূর্বদিকে উড়ে গিয়ে গ্রেট আইরি থেকে অনেকখানি দূরে সরে গেল। আকাশচারী বেলুনবাজ উইলকার প্রাণান্ত প্রয়াস চালালেন বিপথগামী বেলুনটাকে বাঞ্ছিত স্থানে ফিরিয়ে আনতে। ব্যর্থ প্রয়াস। বেলুনটা নিজপথেই ভাসতে ভাসতে চোখের আড়ালে চলে গেল। পরে শোনা গেছে, উত্তর ক্যারোলিনার রাজধানী ব্যালের কাছাকাছি এক জায়গায় উইলকার বেলুন নিয়ে মাটিতে নেমেছেন।

এই অবসরে আবার পাহাড়ের ভেতরের থেকে অবাঞ্ছিত যে চাপা আওয়াজটা শোনা গেছে। জ্বালামুখ দিয়ে রাশি রাশি জমাটবাধা ধোঁয়ার মেঘ উঠে এসে, আগ্নেয় পর্বতের রক্তিম আলোর সংস্পর্শে এসে তা আকাশের অনেকখানি জায়গাকে লাল করে তুলেছে। এ কী কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটতে চলেছে। অগ্নি উদ্গীরণের মুহূর্ত কি তবে ঘনিয়েই এসেছে? শুরু হবে, কি ভয়ঙ্কর-ধ্বংসাশ্রয়ী ভূমিকম্পও? আর সময় নষ্ট না করে আকাশপথে গ্রেট আইরির জ্বালামুখটার তদন্ত তো করতেই হয়।

এপ্রিলের শুরুতেই ভয়-ভীতি গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠল। সাংবাদিকরা খবরের কাগজের পাতায় পাতায় প্রবন্ধ ছেপে মরগাটনের মধ্যবর্তী অঞ্চলের মানুষগুলোর ভয়-ভীতিকে আর শতগুণ বাড়িয়ে দিল।

চৌঠা এপ্রিল। রাত্রির অন্ধকারে আকস্মিক বিকট আওয়াজে প্লেজ্যান্ট গার্ডেনের সাদাসিধে নিরীহ মানুষগুলোর ঘুম ভেঙে গেল। মৃত্যুভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষগুলো আর্তনাদ করতে করতে অন্ধকারে ছুটোছুটি দাপাদাপি শুরু করে দিল। অন্ধকারে হুটোপাটা করতে করতে তারা চিল্লিয়ে বলতে লাগল, 'ভূমিকম্প! অগ্নুৎপাত! গ্রেট আইরি অগ্নি উদগলিণ করছে।'

www.pathagar.com

মরগাটনের সর্বত্র চোখের পলকে দুঃসংবাদটা ছড়িয়ে পড়ল। চালাক-চতুর অধিবাসীরা একে গুজব বলেই উড়িয়ে দিল। অগ্ন্যুৎপাত যদি নেহাৎই ঘটত তবে গম গম আওয়াজটা অবশ্যই এত তাড়াতাড়ি থেমে যেত না, বাড়তেই থাকত। আগুনের শিখাকে আকাশের দিকে ঠেলে উঠে যেতে দেখা যেত। আওয়াজ, আগুন কিছুই নেই অথচ ভূমিকম্প? বাড়ি ঘরও ধ্বসে পড়ে নি। তবে কি পাহাড় থেকে অতিকায় কোন পাথরের ছাঁই খসে পড়েছে? তারই দাপটে কি মাটিতে কম্পনের সৃষ্টি হয়েছে?

ইতিমধ্যে এক ঘণ্টা কেটে গেল। নতুন কোনো ঘটনাই ঘটতে দেখা গেল না। উদ্ভূত ভয়ভীতি ক্রমে ক্রমে কমে আসায় সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতে শুরু করল।

রাত্রি তখন তিনটা। গ্রামবাসীদের কলিজা কেঁপে উঠল। গ্রেট আইরি শিখরের গহ্বর দিয়ে উল্কার বেগে লেলিহান অগ্নিশিখা আকাশের দিকে ধেয়ে গেল। আর থেকে থেকে ফট ফট আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসতে লাগল। তবে? তবে কি দাবানল। পাহাড়ের গায়ের শুকনো গাছপালা পুড়ছে? বজ্রপাতের ফলে আগুন লেগেছে। কিন্তু আকাশে তো মেঘের লেশমাত্র নেই, বিদ্যুৎ ও চমকাচ্ছে না। আর এ আগুন তো একটু-একটু করে বাড়েও নি। তবে কি দপ করেই জ্বলে উঠেছে?

হ্যাঁ, আগ্নেয় পর্বত জেগে উঠেছে। অগ্নি উদগীরণ শুরু হয়ে গেছে। চারদিক থেকে আতঙ্কিত মানুষের আর্তনাদ ভেসে আসতে লাগল। গ্রেট আইরি তবে সুপ্ত আগ্নেয় পর্বত? এতদিন থমকে থাকার পর সে আগুন-বমি শুরু করে দিয়েছে? এর পরই কি শুরু হবে পাথর-বৃষ্টি? আগুনের সঙ্গেই কি গলিত লাভা বেরিয়ে আসতে শুরু করবে? গ্রাম, বাড়িঘর আর খামার সবকিছুই কি আগুন গ্রাস করে ফেলবে?

আতঙ্ক এবার বাঁধনহারা হয়ে উঠল। কোলের শিশুকে বুকে জাপ্টে ধরে মায়েরা আতঙ্কে রাস্তা বরাবর ছুটতে লাগল। আর পুরুষরাও চুপ করে বসে রইল না। চোখের পলকে আগ্নেয় পর্বতের আগুন জলাশয়ে এসে পড়ে হয়তো যে কোনো মুহূর্তে জলকে টগবগ করে ফুটিয়ে তুলবে। ব্যস, তখনই জলাশয়ের পাড় ছাপিয়ে জল ধেয়ে চলবে, গ্রাম, মাঠ আর জঙ্গল ভাসিয়ে দেবে। তার ওপর গলিত লাভার স্রোত ধেয়ে এলে তো আর কথাই নেই। তখন? তারা পালিয়ে যাবে কোথায়?

গ্রামবাসীদের মধ্যে যাদের একটু সাহস আছে তারা পলায়নরত মানুষগুলোর পথ আগলে তাদের ঠেকাতে চেষ্টা করতে লাগল। মাইল খানেক দূর থেকে দেখতে পেল আগুনের দাপট ইতিমধ্যেই কমতে শুরু করেছে। আর অগ্নি উদগীরণের সম্ভাবনা নেই। সম্ভাব্য কোনোরকম ক্ষতিই হল না। তারা নিঃসন্দেহ হল যে, আর অগ্ন্যুৎপাতের কোনো সম্ভাবনাই নেই। ভবিষ্যতের লাভা উদগীরণ করে গ্রেট আইরি মনুষ্য বসতি জ্বালিয়ে পুরিয়ে খাঁক করবে এমন সম্ভাবনাও আর দেখা গেল না।

তখন সকাল পাঁচটার কাছাকাছি। আবার, আবারও অত্যাশ্চর্য একটা আওয়াজ হল। গ্রেট আইরি আবার নড়েচড়ে উঠল। বিচিত্র একটা আওয়াজ চারিদিক কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। পাহাড়ের চূড়ায় ঘুটঘুটে অন্ধকার বিরাজ না করলে হয়তো বা আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা দেখতে পেত অতিকায় একটা বাজপাখি গ্রেট আইরির জ্বালামুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে অন্ধকার আকাশে মিলিয়ে গেল। কিন্তু হায় তাদের আতঙ্ক ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল। এ অবস্থায় গ্রামবাসীদের দীর্ঘশ্বাস ফেলা আর অসহায়-ভাবে কপাল চাপড়ানো ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

www.pathagar.com

*　*　*

সাতাশে এপ্রিল। ওয়াশিংটন থেকে যাত্রা করে আমি উত্তর ক্যারোলিনার রাজধানী র‍্যালোতে হাজির হলাম। ফেডারেল পুলিশের বড় সাহেব আমাকে দুদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

আমাকে দেখেই অস্থিরচিত্ত পুলিশের বড় সাহেব, মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক, বলে উঠলেন, 'অতীতে বহুবার আপনার কর্মনিষ্ঠার প্রমাণ পেয়েছি। এমন কি কঠিনতম কাজও আপনি অনায়াসে সম্পন্ন করতে পারেন।'

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'মি. ওয়ার্ড, যে-কোনো কাজ বা, যে-কোনো রহস্যের কিনারা করতে যে পারবই এমন কথা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমার প্রয়াস ও নিষ্ঠার অভাব ঘটবে না এটুকু কথা অন্তত দিতে পারি।

পুলিশের বড় সাহেব মি. ওয়ার্ড অতীতে কয়েকটি জটিল সমস্যার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করে ফল পেয়েছেন, খুশি হয়েছেন। তাই আমার ওপর তাঁর বিশেষ আস্থা জন্মেছে।

'শুনুন, আসল কথায় আসা যাক, মর্গাটনের কাছাকাছি অবস্থিত ব্লুরিজ নামে ন্যাড়া পাহাড়টায় ইদানিং যা ঘটে চলেছে অবশ্যই শুনে থাকবেন। সেগুলোকে কেবলমাত্র অসাধারণ বললেই যথাযথ বলা হবে না, অত্যাশ্চর্য-অবিশ্বাস্য। আসল রহস্যটা আমাদের ভেদ করতে হবে। গ্রামের নিরীহ মানুষগুলোও খুবই মুষড়ে পড়েছে। অতএব ব্যাপারটার কিনারা করতেই হবে।'

'স্যার, কারণ ছাড়া তো অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে না। এতে ভীতির সঞ্চার হওয়া খুবই স্বাভাবিক।'

'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, পাহাড়ের ওপরে কী অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে চলেছে, রহস্যভেদ করা এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যদি সত্য সত্যই প্রকৃতি সক্রিয়, মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় তবে প্রতিকার করার কিছুই নেই। তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, মানে গ্রামবাসীদের সতর্ক করে দিতে হবে। অদূর ভবিষ্যতের বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে।'

'অবশ্যই। পাহাড়ের ভেতরে হঠাৎ এমন ধুন্ধুমার কাণ্ড কেন ঘটে চলেছে সে-রহস্য তো আমাদের ভেদ করতে হবে স্যার।'

'ঠিক বলেছেন। তবে কাজটা খুবই কঠিন সাধ্য। হাজারো সমস্যা রয়েছে এর পিছনে। পায়ে পায়ে বিপদ। সবাই একই কথা বলছে, ন্যাড়া পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে ওঠার সাধ্য কারোর নেই। আর তার ভেতরে প্রবেশ করা তো স্বপ্নাতীত ব্যাপার। তবে আজ অবধি কেউ তো অনুকূল পরিবেশের উপযোগী যন্ত্রপাতি নিয়ে গ্রেট আইরিতে আরোহণ করতে প্রয়াসীও হয় নি। তাই আমি নিঃসন্দেহ কেউ যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় পাহাড়টার চূঁড়ায় উঠবেই, সে সাফল্য লাভ করবেই করবে।'

'আমারও বিশ্বাস, পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। তবে অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারটাও তো অস্বীকার করা যায় না।'

'মি. স্ট্রক, এ-অঞ্চলের সব মানুষ ভয়ে যেমন কুঁকড়ে রয়েছে তা থেকে তাদের অব্যাহতি দিতে আমাদের যা কিছু করা দরকার তার কিছুমাত্রও ত্রুটি করব না। আমরা গ্রেট আইরিকে যতটা দুর্জ্ঞেয় মনে করছি আসলে ঠিক অতটা না-ও হতে পারে হয়তো।

www.pathagar.com

কাজে নামলে দেখা যাবে, তার গায়ে ভেতরে ঢোকার মতো খাঁজ-টাজ, সহজ পথ হয়ত আছে। কোনো দুষ্কৃতকারীর দল সে-পথের সন্ধান পেয়ে হয়তো ভেতরে ঘাপটি মেরে রয়েছে।'

'আপনি কি দস্যু-তস্করের ইঙ্গিত দিচ্ছেন?'

আমতা আমতা করে পুলিশের বড়সাহেব বলে উঠলেন, 'না, মানে আমার ভুলও হতে পারে। হ্যাঁ, এমনও হতে পারে, আলো ধোঁয়া আর বিচিত্র সব আওয়াজের পেছনে মানুষের হাত না-ও থাকতে পারে। হতে পারে সবই প্রকৃতিরই বিচিত্র খেয়াল, কারসাজি। প্রকৃত সত্যটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছি মি. স্ট্রক।'

'আমার একটা ছোট্ট জিজ্ঞাসা রয়েছে স্যার। প্রশ্নটা হচ্ছে, কোনোক্রমে গ্রেট আইরির উদরে প্রবেশ করে যদি দেখা যায় অগ্নি উদগীরণের প্রস্তুতি চলছে, তবে? তা থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় কি? প্রতিরোধ করব কীভাবে?'

'প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু বিপদের প্রকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা করা তো যাবে। মার্টিনিককে গলিত লাভা দিয়ে মাউন্ট পিল্লি আগ্নেয় পর্বত যেভাবে ঢেকে ফেলে দিয়েছিল, গ্রেট আইরির অগ্নুৎপাতের ফলে যদি সেরকম সম্ভাবনা থাকে তবে আগে থেকেই নিরীহ গ্রামবাসীদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাব। মি. স্ট্রক, আপনার ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। একমাত্র আপনিই গ্রেট আইরির উদরের প্রকৃত রহস্য ভেদ করতে পারবেন। আমি জানি পাহাড়ে আরোহণ করার জন্য পর্বতারোহীর দল জোগাড় করতে হবে। প্রচুর খরচ। অর্থের জন্য ভাববেন না। চাহিদা অনুযায়ী অর্থ আপনাকে অবশ্যই সরবরাহ করা হবে। তবে একটা কথা আগেই তো বলেছি যে সে-অঞ্চলের মানুষ প্রতিনিয়ত নিদারুণ আতঙ্কে ভুগছে। তাই রহস্যভেদের ব্যাপারে যা কিছু করবেন সবই সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখবেন। মানুষের আতঙ্ক যাতে আর না বাড়ে সে জন্যই গোপনীয়তা অবলম্বন করা। আর একটা কথা-মরগানটনের মেয়র আপনাকে সার্বিক সাহায্য করবেন। আবারও সতর্ক করে দিচ্ছি, নিজের পরিচয়, কি করতে চলেছেন সবকিছুই সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখবেন যদি অসুবিধা না থাকে তবে আগামীকালই ওয়াশিংটন থেকে মরগানটনের উদ্দেশে যাত্রা করুন। আগামী পরশু সেখানে পৌঁছে যাবেন।

'ঠিক আছে, আগামীকাল আমি বেরিয়ে পড়ছি।'

পুলিশের বড় সাহেবকে যথোচিত অভিবাদন সেরে বিদায় নিলাম। তখন কি ঘুণাক্ষরেও আমি জানতাম, গ্রেট আইরির উদরে কী অভাবনীয় বিস্ময় আমার জন্যে অপেক্ষা করছে!

যথা সময়ে মরগানটন রেলওয়ে স্টেশনে গাড়ি হাজির হল।

ছোট্ট সহর মরগানটান। সেখানে জুরাসিক আমলের কয়লা প্রচুর পরিমাণে উত্তোলন করা হয়। তাতে কাজ করে প্রচুর শ্রমিক। আর খনি অঞ্চল ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চাষের জমি আর খামারবাড়ি। তাই গ্রেট আইরি যদি সত্য সত্যই অগ্নি আর গলিত লাভা উদগীরণ করতে শুরু করে তবে কেবলমাত্র মানুষের চরমতম দুর্গতিই নয়, হাজার হাজার মানুষের জীবন সংশয় হতে বাধ্য।

মরগানটনের মেয়র ইলিয়াস স্মিথ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। প্রচুর নগদ অর্থ ও জমিজিরাতের মালিক। শিকারের ঝোঁক খুবই।

www.pathagar.com

আমি মরগানটনে পৌঁছে সোজা মি. স্মিথের বাড়ি হাজির হলাম। আমাকে দেখেই কোনোরকম ভনিতা না করেই মুচকি হেসে তিনি বললেন, 'আপনিই তো মি. স্ট্রক, তাই না? মি. ওয়ার্ড আমাকে টেলিগ্রাম মারফৎ আপনার আগমনবার্তা আগাম জানিয়ে রেখেছেন।'

ব্রান্ডি পানে আমাকে আপ্যায়িত করে মি. স্মিথ ঠোঁটের হাসিটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই বললেন, 'মি. স্ট্রক,এবার বলুন তো মি. ওয়ার্ড কোন ব্যাপারে ভাবিত, মানে দুশ্চিন্তার কথা বলছি।'

ব্যাপারটাকে খোলসা করে বলতে গিয়ে আমি মুখ খুললাম, 'আপনাদের বড় সহেব মি. ওয়ার্ড আমাকে পুরোপুরি ক্ষমতা দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন। আমার কাজ গ্রেট আইরি পর্বতের গর্ভে সত্যই আগুন আর গলিত লাভা আছে কিনা তদন্ত করা। আর তার দ্বারা সে-অঞ্চলের অধিবাসীদের বড় রকমের কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা তা জানার দায়িত্বও আমার ওপরে বর্তেছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মি. ওয়ার্ড-ই সরবরাহ করবেন।'

মি. স্মিথ আমার কথাগুলো এমন মনযোগ সহকারে শুনলেন যাতে করে ব্যাপারটা নিয়ে তিনিও যে খুবই ভাবিত বোঝা গেল। গ্রেট আইরির রহস্যের কিনারা করা যে কেবলমাত্র আমারই অত্যুগ্র আগ্রহ তাই নয়। তাঁর আগ্রহও কোনো অংশে কম নয়।

'মি. স্ট্রক, শুনে খুশি হলাম যে ব্যাপারটা ওয়াশিংটনের কর্তাব্যক্তিদেরও ভাবিয়ে তুলেছে। আপনি জানেন কিনা জানি না, আমি এখানকার কয়েকটা খামারের মালিক। তার ওপর এ-অঞ্চলের মেয়রও বটে। তাই ব্যাপারটা নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা একটু বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

'মি. স্মিথ, আপনি তবে এক ঢিলে দু-দুটো পাখি মারতে চাইছেন, তাই না? যাক,এবার বলুন তো গ্রেট আইরির যে-সহস্য আজ সবার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, তার কোনো ব্যাখ্যা কি আপনার বিচার-বুদ্ধিতে ধরা পড়েছে? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, গ্রেট আইরি সত্য সত্যই ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে?'

'এর ব্যাখ্যা করা বাস্তবিকই অসম্ভব। গ্রেট আইরি কিন্তু আগ্নেয়গিরি নয়।'

'এটা কি আপনার বিশ্বাস? তাই যদি হয় তবে পায়ের তলার মাটি কেন বার বার কেঁপে উঠছিল?'

'মি. স্মিথ প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন, 'আচ্ছা, মাটি কি সত্যই কেঁপে উঠেছিল? পাহাড়ের শিখর থেকে যখন লকলকে আগুন বেরোচ্ছিল আমি তখন মাইল খানেক দূরবর্তী খামারবাড়িতে ছিলাম। কই, মাটি কাঁপছিল বলে অনুভব করিনি।'

'মি. ওয়ার্ডের কাছে পাঠানো রির্পোটগুলিতে—'

'হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই বটে। প্রতিটা রিপোর্টেই মাটি কাঁপার উল্লেখ আছে, তাই তো। দেখুন, রিপোর্টগুলো তৈরি হয়েছে মানুষের আতঙ্কের ব্যাপার-স্যাপারের ওপর ভিত্তি করে। আমার রিপোর্টে কিন্তু মাটি কাঁপার উল্লেখ নেই।'

'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু পাহাড়ের শিখর ছাড়িয়ে অনেক উঁচু পর্যন্ত আগুন উঠেছিল, ঠিক কিনা? এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?'

'হ্যাঁ, এতক্ষণে জব্বর একটা প্রশ্ন করেছেন সাহেব। আমি নিজের চোখে জ্বলন্ত আগুনের শিখা দেখেছিলাম। শুধু কি তাই? আগুনের আলোয় আকাশে একটা বিরাট

অংশ লাল হয়ে গিয়েছিল। আগুন ছাড়া বিচিত্র একটা আওয়াজও হচ্ছিল থেকে থেকে। আর সেটা বেরোচ্ছিল পাহাড়টার গহ্বর থেকে। বিষধর সাপের ফোঁসফোঁসানির সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে।'

'চমৎকার! মি. স্মিথ মনে করে দেখুন তো, অত্যাশ্চর্য আওয়াজটা হওয়ার সময় ডানার ঝটপটানির মতো কোনো আওয়াজও কি শুনতে পেয়েছিলেন? খেয়াল রাখবেন, পাহাড়টা থেকে যত রকম শব্দ বেরিয়েছে এটা তাদের সবার চেয়ে অদ্ভুত ও গুরুত্বপূর্ণ।

'হ্যাঁ, আপনার কথাই সত্য। মনে হচ্ছে ডানার ঝটপটানি শুনেছিলাম বটে। তবে একটা কথা, আগুন নিভে গেলে উড়ে যায় সেরকম ভয়ঙ্কর শব্দ করে ডানা নাড়তে পারে তা-ও আমার অজানা। একটা কথা কি জানেন মি. স্ট্রক, অতিকায় কোনো পাখির অস্তিত্ব যদি থাকতই তবে অবশ্যই পাহাড়ের চূড়োর ধারে কাছে তাদের উড়তে দেখা যেত। গ্রামবাসীদের এমন কি আমার চোখেও অবশ্যই পড়ত। সত্য বলতে কি সাহেব, গ্রেট আইরির এত রহস্যের কিনারা করা সম্ভব নয়।'

'মি. স্মিথ, অসম্ভবকে সম্ভব, মানে রহস্যভেদ করব বলেই আমি এতটা পথ পাড়ি দিয়ে ছুটে এসেছি। কিন্তু আপনার সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে তো আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার নয়।'

'আমার সার্বিক সহযোগিতা আপনি প্রত্যাশা করতে পারেন। যদি সম্ভব হয় তবে চলুন না কাল থেকেই আমরা কাজে লেগে পড়ি।'

'অতি উত্তম প্রস্তাব! কালই তবে রহস্যভেদের কাজে লেগে পড়া যাবে।'

পরদিন প্রত্যুষেই যাতে বেরিয়ে পড়া যায় তার তোড়জোড় শুরু করে দিলাম।

আমাদের প্রথম কাজ দুজন পথ প্রদর্শক জোগার করে গ্রেট আইরির শিকরে আরোহণ করা। দুজন পাওয়াও গেল। ঐ দুজন মিস্টার মিচেল আর অন্যান্য অভিযাত্রীদের পবর্তারোহণের কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। কিন্তু দুর্লঙ্ঘ্য গ্রেট আইরির ব্যাপারে কেউ-ই উৎসাহী হন নি। খাড়া ও মসৃণ পাহাড়টার গা-বেয়ে ওঠার সাধ্য অন্য কোনো প্রাণীর থাকলেও মানুষের অন্তত নেই, তাই গ্রেট আইরির ব্যাপারে সামান্যতম উৎসাহও দেখা দেয়নি।

সকাল হতে না হতেই গাইড দুজনের পিছন পিছন আমরা হাঁটা জুড়লাম। পথে যেতে যেতে মি. স্মিথ যা শোনালেন তাতে কিছুটা আশান্বিত হয়ে উঠলাম। কিছুদিন আগে নাকি গ্রেট আইরির গা থেকে একটা পাথরের চাঁই হঠাৎ খসে পড়েছে। তার ফলে পাহাড়ে ওঠার এবং তা গহ্বর দিয়ে ভেতরে ঢোকা কিছুটা সহজ হতে পারে।

গাইড দুজনের মধ্যে একজনের নাম হ্যারি হর্ন। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। আর দ্বিতীয় জন বছর পঁয়ত্রিশের জেমস ব্রাক। উভয়েই স্থানীয় অধিবাসী।

* * *

আমাদের গাড়িটাকে জোর কদমে টেনে নিয়ে চলেছে দুটো তেজি ঘোড়া। এতে করেই গ্রেট আইরির পাদদেশে পৌছে দেবার কথা। দুপাশে গভীর পার্বত্যবন, তারই মাঝ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। সারাদিন ঘনঘন চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে খানাখন্দ ডিঙিয়ে তেজি ঘোড়া দুটো সন্ধ্যার কাছাকাছি আমাদের প্লেজ্যান্ট গার্ডেনে পৌছে দিল। টাউন মেয়রের খামার বাড়িতে আরাম আয়েসের মধ্য দিয়েই রাত কাটালাম। গৃহকর্তা মি. স্মিথের বন্ধু। সহৃদয় ব্যক্তি।

www.pathagar.com

আমার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে গৃহকর্তা ভদ্রলোক বললেন, 'এখান থেকে পাহাড়টার আগাগোড়া দেখা যায়। কিন্তু কোনো শব্দ আজ অবধি আমার কানে আসে নি। আর আগুনের গোলা? না, তাও দেখি নি। আর যদি বলেন ডাইনিটাইনি গ্রেট আইরির উদরে আশ্রয় নিয়েছিল, মন্ত্র আওড়ে ভূত-প্রেত নাচাচ্ছিল তবে মনে করতে পারেন তারা আজ বে-পাত্তা হয়ে গেছে। তাদের কাছে গ্রেট আইরির দরকার ফুরিয়ে গেছে।

'ডাইনি বা ভূত-প্রেত যা-ই হোক না কেন তাদের কাজকর্মের কিছু না কিছু উপকরণ সেখানে পড়ে থাকবেই।' মি. স্মিথ মুখ বিকৃত করে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন।

সকাল হল। পরের দিন। উনত্রিশে এপ্রিলের সকাল। পূব-আকাশ ফর্সা হতে না হতেই আমরা গ্রেট আইরির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়লাম। ভেবেছিলাম, সন্ধ্যার আগে আগে পাহাড়টার পাদদেশে পৌঁছে উইলডন খামার-বাড়িতে রাত্রিটুকু কাটিয়ে দেব। ঘন ঘন চড়াই-উৎরাই, জঙ্গল আর টুকরো টুকরো চাষের জমি ডিঙিয়ে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। বিকেলের দিকে ছয় মাইল দূরবর্তী ব্লু-রিজের পুরো পাহাড় শ্রেণী চোখের সামনে ভেসে উঠল। দেখলাম, হাজার সাতেক ফুট উঁচু ব্ল্যাকডোমের চূড়াটা মেঘের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে।'

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে মি. স্মিথকে প্রশ্ন করলাম, 'ওই চূঁড়োটায় কোনোদিন উঠেছেন কি?'

মি. স্মিথ ঘাড় ঝাঁকিয়ে জবাব দিলেন, 'বলেন কী সাহেব! যারা ওই চূঁড়োয় উঠেছে তাদেরই নাকি চূড়ান্ত দুর্ভোগ আর কষ্টভোগ করতে হয়েছে।'

'একটা কথা, ওই চূঁড়োয় দাঁড়ালে গ্রেট আইরির ভেতরের অংশ দেখা যায় না?'

'চমৎকার একটা প্রশ্ন করেছেন সাহেব! কিন্তু, 'তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে গাইড হ্যারি হর্ন বলে উঠল, 'আমি নিজেও কৌতূহলবশত চেষ্টা করেছিলাম। আসলে গ্রেট আইরির এত উঁচু প্রাচীর ডিঙিয়ে গর্তটার ভেতরে নজর যায় না।'

মি. স্মিথ গর্বভরে বলে উঠলেন, 'পা চালিয়ে চল তো! আজ পর্যন্ত কেউ যা পারে নি তাকেই আমি সম্ভব করব। কেউ যা দেখতে পায় নি তাই দেখব।'

উইলডন খামার-বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন ঘড়িতে পাঁচটা বাজে। সন্ধ্যা হতে তখনও ঢের দেরি।

সেখানে চাষিদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে একজন বলল, 'স্যার, গ্রেট আইরি অনেকদিন ঘুমের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কোনোরকম ফোঁসফাঁসই করছে না। আর কোনোদিন জাগবে বলেও মনে হয় না।'

প্রসঙ্গটাকে আর দীর্ঘ না করে নাকেমুখে কিছু খাবার গুঁজে শুয়ে পড়লাম।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই আমরা সদলবলে গ্রেট আইরির গা-বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। এর উচ্চতা বড়জোর হাজার পাঁচেক ফুট। অ্যালিখানির মানুষ পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের চূঁড়োয় হরদম ওঠানামা করে। আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার ফুট ওপরে তো রয়েছিই। তাই পাহাড়ে ওঠার ব্যাপারটা খুব বেশি কষ্টকর হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এ-ও সত্য যে, পথের বাঁধা প্রচুর। খানাখন্দ ডিঙিয়ে, ডাইনে-বাঁয়ে বেঁকে, গুরপথে হাজির হতে হবে বাঞ্ছিত সে পর্বতশিখরে। সবচেয়ে বড় কথা, পাহাড়টা খাড়াভাবে ওপরে উঠে গেছে। এগোতে গিয়ে যদি আঁকড়ে ধরার মতো কোনো কাঁজ না

www.pathagar.com

থেকে তবে ঘুরপথ অবলম্বন করতে হবে। মোদ্দা কথা, হাজারো ঝক্কি ঝামেলার মোকাবেলা করে তবেই একটু একটু করে নির্দিষ্ট লক্ষের দিকে অগ্রসর হতে হবে। পায়ে পায়ে এর গায়ে বহু অজ্ঞাত বিপদ ঘাপটি মেরে রয়েছে। আমাদের গাইড দুটোও গ্রেট আইরির ব্যাপার-স্যাপারে তেমন ওয়াকিবহাল নয়। পথের বিপদ কোনপথে, কোনরূপ নিয়ে দেখা দেবে কিছুমাত্রও ধারণা তাদের নেই। তবে হ্যাঁ, মি. স্মিথ একটা আশার কথা শুনিয়ে রেখেছিলেন, পাহাড়টা থেকে একটা বড়সড় পাথরের চাঁই খসে পড়েছে।

আমি পথ পাড়ি দিতে দিতে বললাম, 'মি. স্মিথ, যত কষ্টই হোক আর সময় যতই লাগুক না কেন এর হিল্লে আমাকে করতেই হবে। তাছাড়া ঈশ্বরের অভিপ্রায়ও নয় যে, আমি হতাশ হয়ে ফিরে যাই। ওদিকে মি. ওয়ার্ড গ্রেট আইরির প্রকৃত রহস্যটা কি তা শোনার জন্য অধীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন।'

'অবশ্যই-অবশ্যই। দেখুন মি. স্ট্রক, যদি পাহাড়ের শিখরদেশ দিয়ে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হই তবে পাহাড়ের ফাটল দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতেও দ্বিধা করব না, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি।' মি. স্মিথ বললেন।

'মি. স্মিথ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজকের দিনের মধ্যে আমরা অভিযান শেষ করতে পারছি না। খাবারের ঝোলাটা—'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মি. স্মিথ বললেন, 'মি. স্ট্রক, খাবারের জন্য চিন্তা নেই। বনে পশু-পাখি রয়েছে, শিকার করে নিলেই হল। আর অতিকায় উনুনের আঁচ তো—'

'উনুন? এখানে আবার উনুন কোথায় পেলেন মি. স্মিথ?'

'আরে সাহেব,এই তো সেদিন আগুনের শিখায় আকাশ রক্তিম হয়ে উঠেছিল। আপনার কি বিশ্বাস, সে আগুন একেবারে নিভে গেছে? তাই যদি হয় তবে তো বলতে হয় সেটা আগ্নেয় পর্বতই নয়। আমি কিন্তু জোর দিয়েই বলছি সাহেব, আগুন সেখানেআছে, অবশ্যই আছে। তার চূড়ায় আগুনের শিখা যখন দেখা গেছে তখন আগুন কখনও না থেকে পারে?'

এর আগে আমার মনে ভাব ছিল, নেহাৎ ওপরওয়ালার আদেশ পালন করতে চলেছি। অর্থাৎ একবারটি চেষ্টা করে দেখাই যাক না পাহাড়টার রহস্যটা কি। কিন্তু, এখন ধরতে গেলে প্রতিজ্ঞা করেই ফেললাম, গ্রেট আইরির উদরে কি রহস্য ঘাপটি মেরে রয়েছে তা আমাকে উদ্ঘাটন করতেই হবে।

আমরা গাইড দুজনকে অনুসরণ করে, বার বার বাঁক ঘুরে এগোতে লাগলাম। এবার পাহাড়ের গায়ের একটা ফাটল নজরে পড়ল। সেটা পাথরের গা-বেয়ে সোজা শিখরের দিকে উঠে গেছে। আমরা সেটাকে আঁকড়ে ধরে ধীর-মন্থর গতিতে ওপরে উঠে যেতে লাগলাম। মাঝে-মধ্যে পরিস্থিতি এমন হতে লাগল যে, হামাগুড়ি দিয়ে, এক ইঞ্চি করে করে এগোতে হচ্ছে। শীতের মধ্যেও গা দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল।

মি. স্মিথ একটু দম নিয়ে বললেন, 'এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল, কেন এতদিন গ্রেট আইরিতে উঠতে আগ্রহী হয়নি।'

'লাভই বা কী হত? কঠোর পরিশ্রম করে উঠে লাভই যদি কিছু না হবে, তবে কেনই বা উঠতে আগ্রহী হবে বলতে পারেন সাহেব? আর আমাদের কথা যদি বলেন তবে বলব, নিতান্ত দায়ে পড়ে—'

www.pathagar.com

'একেবারে ঠিক কথাই বলেছেন মি. স্ট্রক। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে কতবার ব্ল্যাকডোমের শিখরে উঠেছি। কিন্তু এমন ফ্যাসাদে কোনোদিনই পড়তে হয় নি।'—হ্যারি হর্ন বলল।

'একের পর এক বাধা যেভাবে হাজির হচ্ছে তাতে করে চূঁড়ো অবধি উঠতে পারব বলে তো নিঃসন্দেহ হতে পারছি নে।' জেমস তার কথা সমর্থন করতে গিয়ে বলল।

আমাদের চারজনের মধ্যে জেমস ব্রাক খুবই চটপটে, উপস্থিত বুদ্ধিও রাখে যথেষ্টই। তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে আমি আর মি. স্মিথ তো হয়রানির চূড়ান্ত হতে লাগলাম। রীতিমতো হাঁপ ধরে গেল।

আমি কিন্তু শত কষ্ট স্বীকার করেও এঁটুলির মতো তার গায়ে গায়ে লেগে রইলাম। আসলে এটা আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জেমস ব্রাক, যে পথে আর যখন যেখানে পৌঁছোচ্ছে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে আমি ঠিক সেখানে হাজির হয়ে যেতে লাগলাম। কয়েকবার তো পা হড়কে পড়ে যেতে যেতে কোনোক্রমে আত্মরক্ষা করতে পারলাম। কিন্তু মরগানটনের ফার্স্ট ম্যাজিস্ট্রেট নাদুসনুদুস মি. হলিয়াস স্মিথের জন্যই সে মুহূর্তে আমার যত ভাবনা। তবে তাঁর জন্য আমাদের গতি যাতে মন্থর না হয়ে পড়ে সে জন্য তিনি প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়ে যেতে লাগলেন।

তখন দুপুর হতে চলেছে। ঘড়িতে বেলা এগারোটা। হিসাব করে দেখলাম, খাড়া দেওয়ালটার কাছেই আমরা পৌঁছোতে পারি নি।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। বারোটা প্রায় বাজে। এখন কয়েক শো ফুট উঠলে তবে বাঞ্ছিত চূঁড়োটায় পৌঁছোতে পারব।

আমরা সবাই একমত হলাম, পেটে দানাপানি না দিলে আর চলছে না। আহারাদি সেরে আবার পূর্ণ উদ্যম গ্রেট আইরির সঙ্গে লড়াই শুরু করা হবে।

নাকেমুখে কিছু গুঁজে আবার পাহাড়ে ওঠার তোড়জোড় শুরু করলাম। মুহূর্তের জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে শিখরটা অবধি চোখ দুটো বুলিয়ে নিতে লাগলাম। বুকের মধ্যে কেমন ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। আপন মনে বলে উঠলাম, 'হায় ঈশ্বর! এত পরিশ্রম শেষপর্যন্ত পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে না তো? চারদিকে ছোট-বড় যেসব আলগা পাথর ছড়িয়ে রয়েছে অজান্তে তাদের একটাকে আঁকড়ে ধরলে বা পা রাখলে আর দেখতে হবে না, একেবারে খাদের ভেতরে আছাড় খেয়ে পড়তে হবে। পাহাড়ের এরকম গ্যাকে স্থানীয় অধিবাসীরা 'স্লাইড' বলে। স্লাইড মানে গড়াই। দেওয়ালটার মধ্য দিয়ে ওঠার আর কোনো পথই নেই।

ফ্যাকাশে মুখে হ্যারি তার বন্ধু জেমস ব্রাককে বলল, 'এবার কলিজা শুকিয়ে যাবার উপক্রম হবে!'

পাহাড়টার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই জেমস ব্রাক চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমিও তো তাই ভাবছি!'

তাদের সংক্ষিপ্ত কথোপকথনেই ভয়ে আমার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

এ যে সর্বনেশে কাণ্ড! তবে কি ফিরেই যেতে হবে? রহস্যের কিনারা করা তো দূরের ব্যাপার, পাহাড়টার শিখর অবধি উঠতেই পারি নি এমন কথা মি. ওয়ার্ডকে মুখ ফুটে বলতে হবে ভেবেই আমার শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগল। তার চেয়েও বড় কথা, আমার ভেতরের কৌতুহল নামক দৈত্যটা যে প্রতিনিয়ত আমাকে উত্তেজিত করে চলেছে, তাকে দমনই বা করব কি করে?

www.pathagar.com

দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগতে ভুগতে ভাঙা মন নিয়ে গাইডদের অনুসরণ করে চললাম। তাদের চোখে-মুখেও দ্বিধার ছাপ সুস্পষ্ট। আগের মনের সে দৃঢ়তা আর নেই। গ্রেট আইরির শিখরে আরোহনের সাফল্য নিয়ে সংশয় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠেছে।

আমরা মানসিক দৃঢ়তা হারালেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম না। হর্নকে অনুসরণ করতে লাগলাম। ব্ল্যাকডোম পর্বতশৃঙ্গটা এবার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সামনে এখনও বহু পথ পড়ে রয়েছে। পায়ের গাঁট দুটো ব্যথা করতে লাগল। শরীর আর চলতে চাইছে না। এমন পরিস্থিতিতে যে কি করে আরও দু শো ফুট পাড়ি দিলাম তা আমিই জানি। আর সে যে কী কষ্ট তা বলে বোঝাতে পারব না।

আরও সামান্য এগোতেই দেখলাম, পাথর ফেটে হাঁ হয়ে রয়েছে। গাঁইতি, শাবল বা কুড় ল দিয়ে ঘা মেরে পাহাড়ের গা থেকে পাথরের চাঁই যেন খাবলে তুলে নেওয়া হয়েছে।

জেমস ব্রাক এবড়ো খেবড়ো জায়গাটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই কেটে কেটে বলতে লাগল, 'এ পথে, হ্যাঁ এ পথেই গ্রেট আইরির গা থেকে পাথরের চাঁই আলগা হয়ে গড়িয়ে পড়েছিল।'

'হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই বটে। তবে পথ যখন তৈরি হয়েই রয়েছে তখন সে পথই অবলম্বন করা যাক।' শেষপর্যন্ত তারা করলও তাই।

এবার পর্বতারোহীদের গতি দ্রুততর হল। দুপুর গড়াতে না গড়াতেই তারা স্লাইড নামক অঞ্চলটার শেষ প্রান্তে উঠে গেল।

এবার আরও কিছুটা পর্বতারোহীরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল আরও শো খানেক ফুট ওঠা বাকি। এবার নতুনতর ও সর্বশেষ বাধা শুরু হল। একেবারে খাড়া প্রাচীর পুরো একশো ফুট ওপরে পর্যন্ত উঠে গেছে। মসৃণ একটা চোঙ যেন তাদের চোখের সামনে সদম্ভে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হ্যারি হর্ন আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'ব্যস, এ পর্যন্তই। আর কোনোদিক থেকেই ওঠা সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা, পাথরের চাঁইটা এদিক দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে নেমেছিল। অতএব যদি এদিক দিয়ে ওঠা সম্ভব নাই হয় তবে আর অন্য কোনো দিক দিয়ে ওঠা যাবে না।'

মিনিট দশেক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আমি একটু দম নিয়ে নিলাম। আবার শুরু হল পাহাড়ে ওঠা, হাড়ভাঙা পরিশ্রম। কোনোক্রমে পাথরের দেওয়ালটার গায়ে হাজির হতে পারলাম। গ্রেট আইরিকে এত কাছ থেকে দেখা সত্ত্বেও মনে হল যেন দারুণ কোনোকিছুকে দেখছি। এতে যেন বাস্তবতার ছোঁয়া নেই, একেবারেই কল্পনার সামগ্রীর মুখোমুখি আমি দাঁড়ায়ে।

খুবই সন্তর্পণে পা টিপে টিপে পাথরের খাড়া দেওয়ালটার চারদিকে এক চক্কর মেরে হতাশ মনে সে-জায়গায়ই ফিরে এলাম। না, পাথর বেয়ে ওঠার মতো, হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরার মতো সামান্য খাঁজও চোখে পড়ল না। পাহাড়ের গা যে এমন তেলতেলে মসৃণ হতে পারে, চোখে না দেখলে অনুমান করা সম্ভব নয়। আর সবদিকেই কেল্লার প্রাচীরের মতো উচ্চতা ঠিক এক শো ফুট।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মি. স্মিথ বলে উঠলেন, 'ধ্যুৎ! আগ্নেয়পর্বত-টর্বত বাজে কথা! আর ওটা জ্বালামুখও নয় মি. স্ট্রক।'

www.pathagar.com

'নাই বা হল আগ্নেয় পর্বত। হলেই বা কি আর না হলেই বা কি! এতটা সময় ধরে লড়াই করে চলেছে, আগুন তো দূরের কথা এক ছিঁটে ছাইও নজরে পড়ল না। কোনো আওয়াজও শুনতে পেলাম না। অতএব অগ্নুৎপাত বা লাভা উদগীরণের ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকার কোনোই কারণ দেখছি না মি. স্মিথ।'

আবার গোড়া থেকে পাহাড়টার শিখরদেশ পর্যন্ত চোখের মণি দুটোকে বুলিয়ে নিয়ে নিঃসন্দেহ হলাম, শিকরটার পরিধি বারো শো থেকে দেড় হাজার ফুটের মধ্যে। কিন্তু দেওয়ালটা কতখানি পুরু জানা সম্ভব হলে উদরের গহ্বরটার পরিধি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা অন্তত করে নিতে পারতাম।

মুহূর্তের জন্য ঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। তিনটে বাজে। মি. স্মিথ রীতিমতো ধমকের স্বরে বলে উঠলেন, 'মি. ট্রেক, শুধুশুধু হাঁ করে পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে থেকে সময় নষ্ট করে লাভ কি? উদ্দেশ্য সিদ্ধ যখন কিছুতেই হবার নয় তখন চলুন দিনের আলো থাকতে থাকতে ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে যাই। নইলে প্লেজ্যান্ট গার্ডেনে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।'

আমি তাঁর কথার কোনো জবাব না দিয়ে তেমনি স্থবিরের মতোই দাঁড়িয়ে রইলাম।

মি. স্মিথ এবার অধিকতর গলা চড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'সে কী সাহেব! কিছু বলছেন না যে! চলুন, নামা শুরু করা যাক! ঝুটমুট দেরি করে অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরতে হবে যে!'

আমি যে কি বলব, কি করব নিজেই ভেবে উঠতে পারলাম না। আসলে আমার অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে, লক্ষ্যে পৌঁছোতে না পেরে ফিরে যেতেই হবে! অথচ কৌতুহলরূপী দৈত্যটা ভেতর থেকে উস্কানি দিয়ে চলেছে। শিরা-উপশিরায় তাগিদ অনুভব করতে লাগলাম, অভীষ্টসিদ্ধ, রহস্যের কিনারা না করে কিছুতেই ফেরা সম্ভব নয়। কথায় আছে, ঝোঁক বাধার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলে। আমার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ঝোঁক চেপে গেলেও করার তো কিছু নেই। পাহাড়টাকে কুপোকাৎ করে ভেতরে উঁকি দেব নাকি? অসম্ভব! অবাস্তব! একেবারেই অকল্পনীয় কাজ। যা কিছুতেই সম্ভব নয় তা নিয়ে বৃথা কালক্ষয় করে কি-ই বা লাভ? অনন্যোপায় হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্রেট আইরির দুর্লঙ্ঘ্য শিখরটার দিকে শেষবারের মতো এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে সঙ্গীদের পিছন পিছন নামতে লাগলাম। পথ যেখানে নেই, সেখানে তো নামার সুবিধা আরও বেশি। মোটেই কষ্ট হল না। স্লাইড বেয়ে হড়হড় করে নেমে এলাম। পাঁচটার মধ্যেই পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেলাম।

আমাদের দেখে গ্রামের লোকজন অত্যুগ্র আগ্রহান্বিত হয়ে ছুটোছুটি করে চারদিকে ভিড় করে দাঁড়াল। সবাই সমস্বরে বলে উঠল, 'কেমন হল? পাহাড়টার উদরে ঢুকতে পারলেন না, এই তো?'

মি. স্মিৎ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'পাহাড়টার ভেতরে যে ঢুকবে সেখানে কিছু থাকা চাই তো! চাষাভুষোদের ব্যাপার স্যাপারই এরকম। কথা নেই বার্তা নেই. আগুন, ধোঁয়া আর ভূমিকম্প বলে জিগির তুলেছে!'

প্লেজ্যান্ট গার্ডেনের মেয়রের বাড়িতে রাত্রি কাটালাম। ঘুম কিছুতেই এল না। একবার ভাবলাম, পর্বতারোহীদের আর একটা দল জোগার করে ফের পাহাড়ে উঠব।

www.pathagar.com

মুহূর্তেই ভাবলাম, তাতে ফয়দাই বা কি? গ্রেট আইরির যে রূপ চাক্ষুষ করে এসেছি পাখি ছাড়া কারো হিম্মৎ নেই তার শিখরে ওঠে। অনেক ভেবেচিন্তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, এত ঝামেলায় দরকার নেই। ফিরে গিয়ে মি. ওয়ার্ডকে সবকিছু খোলসা করে বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। তিনি শেষপর্যন্ত কোন মতলব দেন, দেখা যাক।

উপায়ান্তর না দেখে পরের রাত্রে ওয়াশিংটনগামী ট্রেন ধরলাম।

* * *

গ্রেট আইরির রহস্যভেদ করা সম্ভব হল না। তবে? তবে কি রহস্যটা অনুদঘাটিতই থেকে যাবে। নাকি অভাবনীয় কোনো নতুন ঘটনার মাধ্যমে সে-রহস্যের জাল হঠাৎ করে সরে গিয়ে সত্য ঘটনাটা আচমকা উদঘাটিত হয়ে যাবে?

খুবই সত্য যে, উত্তর ক্যারোলিনার এতগুলো প্রাণীর জীবন অত্যাশ্চর্য ওই রহস্যটার ওপরই নির্ভর করছে।

আমার ওয়াশিংটনে ফিরে আসার প্রায় পনের দিন পরে নতুন একটা ঘটনার মাধ্যমে চারদিকে সোরগোল পড়ে গেল। তাকে অবশ্য একেবারে নতুন কোনো ঘটনা বলা যাবে না। তবে গ্রেট আইরির মতোই যে সমান গুরুত্বপূর্ণ একথা অস্বীকার করার নয়।

মের মাঝামাঝি খবরটা চারদিকে চাউর হয়ে গেল। পেনসিলভেনিয়ার সবগুলি সংবাদপত্রের পাতায় একটা ঘটনাই ছাপা হল। প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে কতকগুলো বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে।

যেসব পথ ফিলাডেলফিয়া থেকে চারদিকে চলে গেছে সেগুলোর ওপর দিয়ে উল্কার বেগে কি যেন দ্রুতবেগে ছুটে চলে যায়। কিন্তু সেটা কতবড় আর দেখতেই বা কেমন কেউ-ই তার সঠিক বর্ণনা দিতে পারে না। যন্ত্রযানটা এতই দ্রুত ধেয়ে যায়, যায় ফলে মনে হয় ধুলোর ঝড় চলেছে। আমতা আমতা করে সবাই বলল, 'যন্ত্রযানটা এক বিশেষ ধরনের মোটরগাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু জনগণের লাগামহীন কল্পনার মাধ্যমে সেটা অত্যাশ্চর্য অবিশ্বাস্য কোনো একটি বস্তুতে পরিণত হয়ে গেল।'

যখনকার ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে তখনও পেট্রোল, বিদ্যুৎ বা বাষ্পচালিত মোটরগাড়ি প্রভৃতি ষাট মাইলের বেশি গতিবেগে ছুটতে পারত না। এমন কি আমেরিকা ও ইউরোপের এক্সপ্রেস ট্রেনও এত জোরে চলতে পারত না। কিন্তু রহস্যজনক এ যানটা নাকি এর চেয়ে দ্বিগুণ জোরে ধেয়ে যায়।

আচমকা কোনো শকট যদি এত দ্রুতবেগে ধেয়ে যায় তবে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। ফলে কোনো পথই নিরাপদ থাকল না। তবে সেটা যে ধেয়ে আসছে তা তার গুর গুর আওয়াজের মাধ্যমেই অনুমান করা যেত। চলে যাওয়ার সময় ঘূর্ণিঝড় পিছনে ফেলে চোখের পলকে সেটা বে-পাত্তা হয়ে যেত। তার আওয়াজ পেয়েই মানুষ থেকে শুরু করে পশু-পাখি পর্যন্ত যে যেখানে থাকত সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে উর্দ্ধশ্বাসে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটতে। কিন্তু হাওয়ার টানে মানুষ ও পশু-পাখি কম মারাও যেত না।

অত্যাশ্চর্য কাহিনীটার সবচেয়ে অদ্ভুত অংশ হচ্ছে, এত দ্রুত ধেয়ে যাওয়া যন্ত্রযানটার সামান্যতম চাকার দাগ মাটিতে পড়ে না। কেন? এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার কি করে সম্ভব হয়? এ ব্যাপারটুকুকে খবরের কাগজওয়ালারা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন এক রোমহর্ষক পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করাতে লাগল যে, মানুষ ভয়ে রীতিমতো কুঁকড়ে যেতে লাগল।

www.pathagar.com

তবে হ্যাঁ, নিউইয়র্ক হেরল্ড পত্রিকা অবশ্য লিখল, কোনো বস্তু প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে যাওয়ার সময় তার ওজন অনেকাংশে লাঘব হয়ে যায়।

অবিশ্বাস্য এ-যন্ত্রযানটার ব্যাপার নিয়ে চারদিকে রীতিমতো হৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। বিপজ্জনক এ-যানটাকে বন্ধ করে দেওয়া হোক। ঠিক আছে বন্ধ না হয় করাই হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বন্ধ করবেটা কে? কাকে পাকড়াও করলে অদ্ভুত যানটা আর রাস্তায় হামলা হুজ্জতি করবে না? সেটার মালিকই বা কে? আর আসেই বা কোত্থেকে? গন্তব্যস্থলই বা কোথায়? চোখের পলকে ধেয়ে-যাওয়া শকটটা সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় কেমন যেন ঝাপসা দেখায়, যেন একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উল্কার বেগে ধেয়ে যাচ্ছে।

যন্ত্রযানটা কোন ইঞ্জিনের সাহায্যে ধেয়ে যায় তাই কেউ অনুমান করতে পারছে না।

বন্দুকের গুলি ব্যারেল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় যেমন পিছনে একরাশ ধোঁয়া ফেলে যায়, সেটাও যদি তেমনি মৃদু পেট্রোলের গন্ধ আর ধোঁয়া ছড়িয়ে নিমেষে উধাও হয়ে যেত, তবে অন্তত কোনো একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত। কিন্তু অত্যাশ্চর্য যানটা থেকে পেট্রোলের গন্ধ তো দূরের ব্যাপার অন্য কোনো তেলের গন্ধও পাওয়া যায় না। আবার ধোঁয়া বা বাষ্পও নির্গত হয় না। তবে? তবে কি সেটা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চলে? অজ্ঞাত কোনো অ্যাকুমুলেটরে নতুন কোনো কেমিকেল দিয়ে অতি শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ তৈরি করা হচ্ছে?

কথায় বলে, কল্পনার লাগাম থাকে না। তাই জনসাধারণের কল্পনা মাত্রা ছাড়াতে ছাড়াতে নিত্যনতুন মজাদার গল্প তৈরি হয়ে মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বিশ্বাসী-দের সংখ্যাও কম দেখা গেল না। সে-যন্ত্রটার মালিক ও চালক নাকি স্বয়ং শয়তান, এরকম গল্পও জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। আর তার যাত্রী নরকের ভূত-প্রেতরা। পরলোকের ব্যাপার-স্যাপার বলেই সেটা প্রেতচ্ছায়ার মতো মিলিয়ে যেতে পারে, নজরে আসে না। মানুষ এমন কি শক্তি ধরে যে সেটাকে রুখে দেবে?

হোক না শয়তানের ব্যাপার! শয়তান বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে নাকি? প্রচলিত আইন কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যা খুশি করে যাবে? যানটাকে পথে নামানোর আগে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া দরকার ছিল। পারমিট তো নেই-ই, এমন কি গাড়ির নম্বর আর লাইসেন্স কিছুই নেই। মামদোবাজি পেয়েছে নাকি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ঘণ্টায় শো দুই মাইল বেগে গাড়ি হাঁকানোর লাইসেন্স শয়তানকে তো দূরের ব্যাপার, কোনো মানুষকেই আজ অবধি দেওয়া হয় নি। তাই সরকারের ওপর চাপ দেওয়া হতে লাগল, মারাত্মক বেগে ধাবমান গাড়ির চালকের মুখোশ খুলে প্রকৃত ব্যাপারটা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হোক। জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে এ-কাজটা অবশ্যই করা উচিত।

না, রহস্যসঞ্চারকারী যানটা কেবলমাত্র ফিলাডেলফিয়া শহরেই নয় অন্যান্য অঞ্চলেও আচমকা দেখা দিয়ে আবার নিমেষে মিলিয়ে যেতে লাগল। উত্তেজনা, চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে লাগল একের পর এক অঞ্চলে। পুলিশের প্রতি অভিযোগ আসতে লাগল জেফারসনের অদূরবর্তী মিসৌরিতে, ফ্রাঙ্কফোর্টের নিকটবর্তী কেনটাকিতে, অ্যামভিলের অদূরবর্তী টেনেসিতে, শিকাগোর লাগোয়া ইলিশয়তে আর কোলামবাসের অদূরবর্তী ওহিওতে অত্যাশ্চর্য যন্ত্রযানটা রীতিমতো সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। আর এরই ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

চারদিকে হৈ হৈ রব উঠল, বাঁচাও! রক্ষা কর! একী উটকো আপদের আবির্ভাব ঘটল রে বাবা, নিরাপত্তা সম্পূর্ণ বিঘ্নিত। জনজীবন বিপর্যস্ত। একদল মতলব আঁটল, রাস্তায় রাস্তায় পাথর আর মাটির ঢেলা স্তূপাকার করে রেখে শয়তানটার জারিজুরি বন্ধ করে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দল সেটাকে হেসে উড়িয়ে দিল। কামানের গোলার মতো যন্ত্রটা ছুটে এসে সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে অনায়াসে নিজের রাস্তা করে নেওয়া তার পক্ষে কিছুমাত্রও অসম্ভব নয়। অন্য এক দল মন্তব্য করল, 'সামনে বাধা দেখলে সেটাকে ডিঙিয়ে যাওয়ার হিম্মৎ তার অবশ্যই আছে।' অন্য একদল তাদের সমর্থন করে বলল, 'অবশ্যই, শয়তানের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই।'

এরা আসলে বাক্যবাগীশ। মাথায় ঘিলুটিলু আছে বলে মনে হয় না। অজ্ঞাত বস্তুটা যে কি তা নিয়ে ভাববার মতো মানসিকতা, ধৈর্য ও সময় তাদের কোথায়?

চারদিক যখন পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তাল-উদ্দাম হয়ে উঠছে ঠিক তখনই, মে মাসের শেষ হপ্তায় ঘটে গেল একেবারেই অবিশ্বাস্য চাঞ্চল্যকর এক ঘটনা। এর মাধ্যমে এটুকু অন্তত পরিষ্কার হয়ে গেল যে পুরো যুক্তরাষ্ট্র অতিকায় ও অমিত শক্তিধর এক দানবের পাল্লায় পড়ে অস্থির হয়ে পড়েছে। শয়তানটা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এমন কি দৃষ্টির অগোচরে থেকে কল্পনাতীত উৎপাত চালিয়ে যাচ্ছে। আর তার প্রতিরোধ-প্রতিকার একেবারেই অসম্ভব।

সমগ্র আমেরিকা তোলপাড় করে হতচ্ছাড়াটা হয়ত বা এবার ইউরোপে হামলা হুজ্জতি জুড়ে দেবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সব ক'টা খবরের কাগজে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ব্যাপারটা নিয়ে ফলাও করে প্রচার করা হল। তাদের মূল বক্তব্য—উইসকনসিনের মোটর-ক্লাব এক মোটর রেসের ব্যবস্থা করেছিল। পশ্চিম দিকের প্রেঈরি-দু-চিয়েন থেকে যাত্রা শুরু হয়ে মিচিগান তীরস্থ মিলকি শহরের বাইরে গিয়ে রেসটা শেষ করা হয়। পৃথিবীর কোনো দেশেও এইরকম দীর্ঘ ও প্রশস্ত রাস্তা নেই। নামজাদা বহু মোটরগাড়ি এ-রেসে অংশগ্রহণ করেছিল। কেবলমাত্র মোটরগাড়িই নয়, মোটর সাইকেলও প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। হবে নাই বা কেন? পুরস্কার যে নগদ পঞ্চাশ লক্ষ ডলার। একমাত্র এতগুলো অর্থ পুরস্কারের লোভে মোটর চালকরা রীতিমতো ক্ষেপে গিয়েছিল। আর সর্বোচ্চ বেগের কীর্তির মাধ্যমে মান রাখতেই হবে। মনে করে নেওয়া হল সর্বোচ্চ গতিবেগ সম্পন্ন মোটরটা আশিমাইল বেগে ধেয়ে যাবে। অর্থাৎ দু শো মাইল পথ পাড়ি দেবে প্রায় তিন ঘণ্টায়। এই তিন ঘণ্টা যাতে পথে অন্য কোনো যান না থাকে কর্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থা করলেন। এ-ও বলা হল প্রতিযোগিতা চলাকালীন কেউ বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হলে কেউ দায়ী থাকবে না—এরকম সতর্কবাণীও ঘোষণা করা হল।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোটর রেস দেখার জন্য দলে দলে কাতারে কাতারে কৌতূহলী মানুষ ছুটে এসে পথের দু ধারে ভিড় জমাল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাঘা বাঘা ক্রীড়া-সাংবাদিকরাও ছুটে এলেন। আর এলেন দেশ-বিদেশের বহু স্পোর্টসম্যান। আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বহু জুয়াড়িও এসে ভিড় জমাল। মোটা অর্থ বাজি ধরা হতে লাগল এক-একটা গাড়ির পিছনে। মোদ্দা কথা, যেন যুক্তরাষ্ট্র রীতিমতো তোলপাড় হতে লাগল।

www.pathagar.com

সকাল ঠিক আটটায় মোটর রেস শুরু হবার কথা। এক সঙ্গে এতগুলো গাড়িকে ছাড়লে দুর্ঘটনা রোধ করার সাধ্য কারো থাকবে না। তাই অনেক ভেবে চিন্তে সাব্যস্ত করা হল দুমিনিট বাদে বাদে এক-একটা করে মোটরগাড়ি ছাড়া হবে।

প্রথম দলের দশটা গাড়িকে আটটা থেকে আটটা কুড়ির মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল। দুমিনিট বাদে বাদে এক-একটা করে মোটরগাড়ি ছাড়া হবে।

প্রথম দলের দশটা গাড়িকে আটটা থেকে আটটা কুড়ির মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল। কোনো রকম বিপর্যয় দুর্ঘটনা না ঘটলে তারা সবাই এগারোটার মধ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। এবার এক এক করে গাড়ি ছাড়া হল। সবশেষে দেখা গেল, মাত্র একজন প্রতিযোগী অবশিষ্ট রয়েছে। তাকেও ছেড়ে দেওয়া হল। তীরবেগে ছুটে চলেছে প্রতিটা গাড়ি। এত সতর্কতা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা যে হচ্ছে না তা-ও নয়। বহু গাড়ি পরস্পরের সঙ্গে গুঁতো-গুঁতি করে পথের ধারে হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল।

তখন প্রেঈরি-দু-চিয়েনের ঘড়ি-ঘরে সাড়ে নটা বাজে। ঠিক তখনই মাইল দুই দূর থেকে হঠাৎ একটা আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। আর থেকে থেকে জাহাজের সাইরেনের মতো একটা আওয়াজ তুলে সেটা রহস্য সৃষ্টি করছে।

ব্যস, আর যাবে কোথায়। দর্শকদের মধ্যে পালাও পালাও রব উঠল। হুড়মুড় করে চিল্লাচিল্লী করতে করতে সবাই বলতে লাগল, 'পালাও! পালাও! শয়তানটা গাড়ি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে! নরক থেকে সে নারকীয় যানটাকে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছে। এবার এক্কেবারে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে!

মুহূর্তে এমন ছুটোছুটি দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল যে, কে যে কার ঘাড়ে পড়ছে সে হুঁসও কারো রইল না। সবাই একই লক্ষ্য পিতৃদত্ত প্রাণটাকে রক্ষা করা।

সবাই শুধুমাত্র এটুকুই বুঝতে পারল কোনো একটা জিনিস অভাবনীয় গতিবেগে বুঝি বাতাসের চেয়েও দ্রুতবেগে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর তার গতিবেগ যত কমই হোক না কেন কিছুতেই দেড় শোমাইলের কম নয়।

রহস্যসঞ্চারকারী নরকের যানটা নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। পিছনে রেখে গেল কেবল এক রাশ ধোঁয়ার কুণ্ডলি। ব্যাপারটা দেখে মনে হল অতি শক্তিশালী ইঞ্জিনচালিত একটা স্থলযান। প্রতিযোগিদের দ্বিগুণ গতিবেগে ধেয়ে গিয়ে এক সময় এটা তাদের ধরে ফেলবে, তাদের সবাইকে পিছনে ফেলে অনায়াসে সবার আগেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে স্বাভাবিকতা ফিরে এল। তারা এবার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'শয়তান! সাক্ষাৎ শয়তানের কারসাজি। শয়তান না হলে এমন নারকীয় যান জোগার করল কীভাবে? তার চেয়েও তার যন্ত্রযানটা ঢের ঢের রহস্যসঞ্চারকারী।'

অন্য একজন আগ বাড়িয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন সাহেব। শয়তানটা পৃথিবীর একটা সুবিশাল অঞ্চলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শেষমেশ এখানে হাজির হয়েছে তার কেরামতি দেখাতে। পুলিশের হোমরাচোমরারা ভেবেছিলেন শয়তানটা তাদের ভয়ে তার অদ্ভুত যানটাকে নিয়ে পৃথিবী ছেড়ে ফের নরকে পাড়ি জমিয়েছে। তাঁদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে শয়তানটা দিব্যি পৃথিবীর বুকেই অবস্থান করছে। প্রমাণ তো হাতেনাতেই পাওয়া গেল সাহেব।'

www.pathagar.com

কয়েকজন ছুটোছুটি করে টেলিফোন বুথে গিয়ে অগ্রবর্তী প্রতিযোগিদের সতর্ক করতে শয়তান চালক ও তার নারকীয় যানটার কথা জানিয়ে দিল।

কয়েকজন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'শয়তানটা এ ব্যাপারে নিজেকে নিরাপদ ভেবেছে নাকি? সামনের কোনো গাড়ির সঙ্গে যদি ধাক্কা লাগে তবে কি সে নিজেকে নিরাপদ ভাবছে? সে নিজে কি দুর্ঘটনার শিকার হবে না?'

অন্য একজন আমতা আমতা করে বলল, 'কারো সঙ্গে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, খুবই ঘাঘু ড্রাইভার না হলে এমন তীরবেগে গাড়ি হাঁকাতে উৎসাহী হয়, নাকি হওয়া সম্ভব? তবে হ্যাঁ, শয়তান বা মানুষ যাই হোক না কেন, বুকের পাটা আছে স্বীকার করতেই হবে।'

সত্যি ব্যাপারটা ভাববার মতোই বটে। কর্তৃপক্ষ তো আগেভাগেই ফরমান জারি করে দিয়েছিল, একমাত্র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী গাড়িঘোড়া বা অন্য কোনো যানই প্রতিযোগিতা চলাকালীন এ-পথে যেখে পারবে না। তবে? কোন অধিকারে শয়তানটা নিষিদ্ধ পথে গাড়ি চালিয়ে কেরামতি দেখাতে গিয়ে হামলা হুজ্জতি জুড়ে দিয়েছে?

প্রতিযোগীরা টেলিফোনের মাধ্যমে আতঙ্ক সঞ্চারকারী নারকীয় যানটার খবর পেয়ে যথা সময়েই সতর্কতা অবলম্বন করেছিল। তাই চুরুটের মতো লম্বা একটা যান প্রবল গতিবেগে তীব্র আওয়াজ তুলে মুহূর্তের মধ্যেই সবাইকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। তবে তাকে অদৃশ্য বলাই ভাল। আর কোনোরকম ধোঁয়া কিন্তু কারোরই নজরে পড়ল না। একটু আগে যাকে ধোঁয়া বলে সবার ভ্রম হয়েছিল সেটা আদৌ ধোঁয়া নয়, ধুলোর মেঘ।

মিলকিতে টেলিফোন মারফৎ নারকীয় যানটার উপস্থিতির খবর পৌঁছে গেল। ব্যস, ব্যারিকেড তৈরির প্রস্তুতি চলতে লাগল। পাথরের চাঁই, গাছের গুঁড়ি, মাটির ঢেলা প্রভৃতি এনে রাস্তার ওপর জড়ো করতে লাগল। ব্যস, এবার কিছুটা অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এমন কোনো যানই নেই যা জল ও স্থল উভয় পরিবেশেই চলতে পারে। অতএব যত শক্তিশালী যানই হোক না কেন এবার বাছাধন ধরা দিতে বাধ্য।

আর মোটেই সময় নেই। নারকীয় যানটা চলে এলে বলে। পথের দুধারে অপেক্ষমান দর্শকরা দুরু দুরু বুকে চরম মুহূর্তটা চাক্ষুষ করার জন্যা অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে লাগল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হিস-হিস শব্দ শোনা গেল আর ধুলোর মেঘ সবার চোখে পড়ল। হায় ঈশ্বর! শয়তানটা গাড়ির গতি কমাচ্ছে না যে! দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে ছাড়বে না দেখা যাচ্ছে! নাকি চালক তার যানটাকে থামাতেই পারছে না? শেষপর্যন্ত রহস্যসঞ্চারকারী যানটা শোঁ করে মিলকি অতিক্রম করে বেরিয়ে গেল। চোখের পলকে একেবারে বে-পাত্তা হয়ে গেল। তবে কি সেটা মিচিগান হ্রদের বুকে আছাড় খেয়ে পড়বে?

* * *

খবরের কাগজের পাতা জুড়ে যখন এরকম গরম গরম খবর ছাপা হয়ে দেশে রীতিমতো আলোরন সৃষ্টি করে চলেছে ঠিক তখনই আমি ওয়াশিংটন শহরে ফিরে এলাম। বাড়ি না গিয়ে সোজা বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেখা না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল। তিনি দেশের বাড়ি গেছেন। তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি খবরের কাগজের দৌলতে অবশ্যই আমার ব্যর্থতার খবরটা পেয়ে গেছেন।

www.pathagar.com

আমার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত তা ঠিক করে উঠতে না পেরে নিদারুণ অস্থিরতার মধ্যে সময় কাটাতে লাগলাম। তবে কি গ্রেট আইরির রহস্যভেদের আশা মন থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দেবে? কিন্তু না, হাল ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। যদি আরও বারোবার গ্রেট আইরির চূঁড়োর তলা থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয় তবুও আমার পক্ষে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

আর যে কেউ বিশ্বাস করুক না কেন, আমি অন্তত মানতে রাজি নই যে, গ্রেট আইরির দেওয়ালের অপর দিকে যাওয়া মানুষের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আর কিছু না হোক চারদিকে ভাড়া বেঁধে হলেও চূড়োয় পৌঁছানো সম্ভব। তা যদি না-ও হয় তবে পাথর ফাটিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে তার উদরে প্রবেশ করাও একেবারে অলীক কল্পনা নয়। আজকের যুগের যন্ত্রবিদরা এর চেয়ে ঢেড় কঠিন বহু সমস্যার সমাধান করে ফেললেন। হ্যাঁ, একটা কথা থেকে যায়। এতে খরচের তুলনায় লাভের পরিমান যদি কম হয় তবে যাবতীয় অর্থ জলে ফেলার সামিল হবে বৈ কি। তখন ব্যাপারটা দাঁড়াবে, জনগণের আর আমার কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, তাই নয় কি?

আমার টেঁকের জোর খুবই সামান্য। তবে হ্যাঁ, মি. ওয়ার্ডের পক্ষে সরকারি অর্থ ব্যয় করা সম্ভব। কিন্তু তিনি তো অনুপস্থিত।

আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। উপায়ান্তর না দেখে আমি কয়েকজন টাকার কুমিরের শরণাপন্ন হলাম। এতেও সমস্যা দেখা গেল। সোনার খনি আছে এরকম কোনো সম্ভাবনা না থাকলে তারা ট্যাঁক থেকে অর্থ খসাতে উৎসাহই বা হবে কেন? কিন্তু অ্যাপ্পালাচিয়ান পর্বতশ্রেণী সোনার খনি-অঞ্চলের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয়। অস্ট্রেলিয়ার বা প্যাসিফিক মাউন্টের ট্রান্সভালের সোনার খনির লোভ দেখালে তা বিশ্বাস করার মতো ব্যাপার বটে।

পনেরই জুন মি. ওয়ার্ড অফিসে ফিরে এলেন। আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি জেনেও আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। আমার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বললেন।

আমি ব্যর্থতার কারণ বলতে গিয়ে ব্যক্ত করলাম, 'স্যার, আসলে গ্রেট আইরিকে জয় করার মতো উপযুক্ত সরঞ্জাম আমার সঙ্গে ছিল না। তাই অনন্যোপায় হয়ে, '

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'সবই আমার জানা আছে মি. স্ট্রক। গ্রেট আইরিকে জয় করতে গিয়ে আপনি শুধু মরতে বাকি রয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও কথা থেকে যাচ্ছে, মি. স্ট্রক শূন্য হাতে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছেন। গ্রেট আইরির উদরে যে কী কাণ্ড ঘটে চলেছে তার তিলমাত্র হদিসও করা সম্ভব হয় নি।'

আমি ফ্যাকাসে মুখে আমতা আমতা করে বললাম, 'স্যার, আগুন দেখা আমার পক্ষে সম্ভব তো হয়ই নি, কোনো আওয়াজ টাওয়াজও শুনতে পাইনি।'

'এত কিছু সত্ত্বেও কি আপনার বিশ্বাস যে গ্রেট আইরির উদরে আগুন, গলিত লাভা প্রভৃতি রয়েছে?'

'স্যার, তা কি করে বলা সম্ভব, আপনিই বলুন?'

'তবে আমার বিশ্বাস আগ্নেয় পর্বত হলেও চিরনিদ্রিত। তার ঘুম আর কোনোদিনই ভাঙবে না। সেরকম কিছু হলে এতদিন সেটা ঝিম মেরে থাকত না। লোকের মুখে মুখে যা কিছু ঘুরছে সবই মনগড়া কাল্পনিক গল্প ছাড়া কিছু নয়।'

'স্যার, সব কিছুকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলে হয়ত ভুলই করা হবে। আর প্রেজ্যান্ট গার্ডেনের মেয়র ও মরগানটন, এঁরা কিন্তু নিরক্ষর নির্বোধ নন। আর কিছু না হোক কাল্পনিক কাহিনীর পিছনে ছোটার পাত্র তাঁরা অন্তত নন। পাহাড়ের শিখরদেশ ছাড়িয়ে আগুনের হল্কা ঠিকই দেখা গিয়েছিল। অদ্ভুত আওয়াজও যে শোনা গিয়েছিল এ-ও খুবই সত্য। যা ঘটেছে ও রটেছে তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়।'

'তবে আপনি বলতে চাচ্ছেন গ্রেট আইরি আজও নিজেকে রহস্যাবৃতই রেখেছে?'

'স্যার, হুকুম পেলে আমি আজই ডিনামাইট আর গাঁইতি-শাবল নিয়ে গিয়ে গ্রেট আইরির উদরে ঢুকে যাচ্ছি। কিন্তু সমস্যা একটাই, মোটা অর্থের প্রয়োজন।'

'সবই বুঝলাম। কিন্তু কথা হচ্ছে গ্রেট আইরি মৃত। ভবিষ্যতে কোনোদিন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলে তখন দেখা যাবে। এমনও তো হতে পারে প্রকৃতি দেবী নিজে থেকেই একদিন গ্রেট আইরির রহস্য সবার সামনে তুলে ধরবেন।'

তাঁর কথায় আমার কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার মতন হল। কাতর স্বরে বললাম, 'স্যার, আপনার দেওয়া কাজটা হাসিল না করতে পারায় আমি অন্তর্জ্বালায় প্রতিনিয়ত জ্বলেপুড়ে খাঁক হচ্ছি। তবে আবার যদি ভাবেন, আমি অপরাধমূলক কাজে উৎসাহ দিচ্ছি তবে কিন্তু আমাকে বুঝতে ভুলই করবেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে, অপরাধীরা একটু-আধটু সামলে টামলে কাজকর্ম করুক। বেশি চাতুরি যেন না করে। আমার পরামর্শ কে-ই বা নেবে? তাই তো অপরাধীরা কাউকে তোয়াক্কা না করে তাদের কাজ করে চলেছে, আমরা তার কতটুকুই বা জানি বা জানার চেষ্টা করি?'

সম্পূর্ণ সত্য কথা। অপরাধীরা চালাকি করতে গিয়ে বোকামির পরিচয়ই বেশি দেয়। তাই তো রহস্যজনক মোটরগাড়িটা যে তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে তাকে পাকড়াও করা তো দূরের ব্যাপার, তার প্রকৃত পরিচয়ও আজ পর্যন্ত বাঘা বাঘা পুলিশ অফিসাররাও আবিষ্কার করতে পারলেন না। তবে সত্য বলতে কি স্যার, আপনার মতো আমিও ব্যাপারটা নিয়ে কম বিস্ময়ের দোলায় দুলছি না।'

'দেখুন মি. স্ট্রক, অদ্ভুত যানটার চালক শয়তানটাকে পাকড়াও করা তো দূরের ব্যাপার, তাকে অনুসরণও পর্যন্ত করা যাচ্ছে না। টেলিফোনে খবর পাওয়া মাত্র দলবল নিয়ে তৈরি হতে না হতেই হতচ্ছাড়াটা তার রহস্যজনক যানটাকে নিয়ে একেবারে বে-পাত্তা হয়ে যায়। বাঘা বাঘা পুলিশ অফিসার তাকে ধরতে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে। অসামান্য গতিবেগে এক একবার এক এক জায়গায় আবির্ভূত হয়ে ভেল্কি দেখিয়েই যেন কর্পূরের মতো উবে যাচ্ছে। একমাত্র মোটর রেসের সময়ই তার অবয়বটা একঝলক দেখা সম্ভব হয়েছিল। আশ্চর্য গতিবেগ, দেড় ঘণ্টায় দু শো মাইল পথ যন্ত্র-দানবটা অনায়াসেই পাড়ি দিয়ে দেয়।'

'ব্যস, অদ্ভুত যন্ত্রযানটা তারপর থেকেই একেবারে হাফিস হয়ে গেছে। দুরন্ত গতিবেগ সামলাতে না পেরে সেটা মিচিগান হ্রদে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গভীর জলে চিরনিদ্রায় সমাহিত হয়ে পড়ে নি তো? কেউ কেউ অবশ্য বলছে, শয়তানটা তার যন্ত্রদানবটাকে নিয়ে নির্ঘাৎ আবার কোনো না কোনো অঞ্চলে উদয় হবে।'

মি. ওয়ার্ড নির্দ্বিধায় অক্ষমতার কথা স্বীকার করতে গিয়ে বললেন, 'যন্ত্র-দানবের ব্যাপারটা আগাগোড়াই অত্যাশ্চর্য ও অদ্ভুত রহস্যজন। যদি শয়তানটা আর আবির্ভূত নাই হয় তবে ঘটনাকে অলৌকিক কাণ্ড আখ্যা দিয়ে চাপা দিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর

www.pathagar.com

থাকবে না। জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে যার কিনারা করা সম্ভব নয় পুলিশ সে রহস্যভেদ করবে কি করে? অসম্ভব। একেবারেই অবাস্তব চিন্তা।'

মুহূর্ত কাল অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়ে মি. ওয়ার্ড আবার মুখ খুললেন, 'এ ব্যাপারটার চেয়েও ঢের ঢের বেশি অত্যাশ্চর্য, অবিশ্বাস্যও রহস্যজনক আর একটা ঘটনা ইদানিং ঘটে চলেছে। ঘটনাটা ঘটে চলেছে কানেকটিকাট, ম্যাসাচুসেটস আর মেইনের লাগোয়া অঞ্চলে। সেখানে অদ্ভুত গতিবেগ সম্পন্ন ছুটন্ত একটা বস্তু দেখা যাচ্ছে। ব্যস, পরমুহূর্তে গোঁত্তা মেরে জলে পড়ে হাফিস হয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য ব্যাপার! টেলিস্কোপও তার অবয়ব ধরতে অক্ষম। রহস্যসঞ্চারকারী বস্তুটার আকৃতি অনেকটা চুরুটের মতো। ফুট ত্রিশেক লম্বা। সবজে রঙ। ফলে অনায়াসেই জলে মিলিয়ে যেতে পারে। নোভা-স্কোটিয়া আর কেভ গডের মধ্যবর্তী অঞ্চলে উড়ন্ত রহস্যটাকে মাঝে মাঝেই দেখা যায়। সেটাকে কাছ থেকে ভালভাবে প্রত্যক্ষ করার জন্য পোর্টসমাউথ, বোস্টন, পোর্টল্যাণ্ড আর প্রভিডেন্স থেকে মোটরবোট আর স্টিম লঞ্চ নিয়েও বহুবার চেষ্টা করা হয়। গোড়ায় ব্যাপারটাকে তিমির কারসাজি ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা কি করে ভেসে ওঠে। কিন্তু সেটা তো কখনও তিমির মতো মাথার ছিদ্রপথে জল নির্গত করে নি। শব্দকরা বা ভোস ভোস করে শ্বাসক্রিয়াও চালায় নি। যদি সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী নাই হয়ে থাকে তবে সাগর-দানবটার প্রকৃত পরিচয় কি? গল্প-কাহিনীর আদ্যিকালের দানবকৃতি সাগরনাগ, ক্রাকেম বা লেভিয়ানথান অক্টোপাস প্রভৃতির বাস গভীর জলে। সমুদ্রের উপরিতলে তাদের বিচরণ করতে দেখা যায় না। সামুদ্রিক দানবটার আবির্ভাব ঘটতেই জেলেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সমুদ্রে নামা বন্ধ করে দিয়েছে। জলের আতঙ্ক অতিকায় প্রাণীদের উদ্দেশ্যে তো কারো জানা নেই। যদি হিংস্র হয় আর তেড়ে এসে আক্রমণ করে? অমূল্য প্রাণ নিয়ে তো খামখেয়ালি করা চলে না। বিশালায়তন জাহাজের কোনোরকম বিপদের সম্ভাবনা অবশ্য নেই। কিন্তু তিমি বা সাগর-দানব যাই হোক না কেন আক্রমণ করে জাহাজকে ঘায়েল করার সাধ্য তাদের নেই। ইতিপূর্বে বহু জাহাজ থেকে বহুবার অতিকায় সাগর-দানবকে বহু দূরে দেখা গেছে। জাহাজের মাথা ঘুরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই প্রাণীটা উল্কার বেগে ধেয়ে উধাও হয়ে গেছে। কামান দেগে সেটাকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বোস্টন থেকে একটা গান-বোট এসেছিল। ব্যস, নিমেষে সেটা উধাও হয়ে গেল। অহেতুক কামানের গোলা খরচ না করে ক্যাপ্টেন হতাশ হয়ে বোস্টনে ফিরে গেল। এতে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল, সাগর-দানবটা যত শক্তিধরই হোক বা জলের ওপরে চক্কর মেরে বীরত্ব যত প্রকাশ করুক না কেন অন্তত আক্রমণাত্মক মনোভাব তার নেই।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আপনার কথা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এ-ও তো মনে করা যেতে পারে বড় জাহাজ দেখে সমুদ্র-দানবটা বয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু যদি নৌকো হত তবে কি ছেড়ে দিত, চড়াও হত না?'

'যদি সেটা কোনো সামুদ্রিক প্রাণী না হয়, তবে?'

'তবে আপনিই বা কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন?'

'মাছের মতোই অবয়বধারী অমিত শক্তির আধার কোনো জলযান নয় তো?'

'ভাল কথা, যদি তাই হয়ে থাকে, তবে তার ইঞ্জিনটাও তো খুবই শক্তিশালী, তাই নয় কি? এবার বলছি, এমনও তো হতে পারে প্রকৃত রহস্যটার কিনারা করার পরামর্শদানের পরিবর্তে সাংবাদিক-ভদ্রলোকের একমাত্র লক্ষ্য ব্যাপারটাকে নিয়ে বাজার

www.pathagar.com

গরম করা। আর পৃথিবীর নাবিকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে একটু-আধটু নামটাম কিনতে চাইছেন। আর যেটুকু লিখেছেন এতেই পৃথিবীর সবার কলিজা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট।'

তখন বিজ্ঞান জলযান নির্মাণের ব্যাপারে অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছিল। বিশালায়তন জাহাজ মাত্র পাঁচদিনে আটলান্টিক মহাসাগর ডিঙোতে সক্ষম। যন্ত্রবিদরা এতেও তৃপ্ত নন। তারা আরও শক্তিশালী, আরও দ্রুত গতি সম্পন্ন জলযান তৈরি করার জন্য অত্যুগ্র আগ্রহী। নৌ-বাহিনীও কম দক্ষতার পরিচয় দেয় নি। তাঁদের তৈরি যুদ্ধ-জাহাজ, মোটর বোট, টর্পেডো, টর্পেডো ধ্বংসক্ষম জাহাজ প্রভৃতি তাদের যন্ত্রবিদ্যার অগ্রগতির পরিচায়ক।

সাগরের বুকে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী জলযানটার প্রকৃত অবয়ব কেমন তা আজ অবধি জানা যায় নি। তার শক্তির উৎস কি তা-ও আমাদের অজ্ঞাত, জ্ঞান-বুদ্ধি বহির্ভূত। আর একটা কথা, জলযানটা পাল ব্যবহার করে না, বাতাসের বলে যে চলে না তাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নেই। আর বাষ্পচালিত ইঞ্জিন হলে অবশ্যই চোঙ থাকত, কম-বেশি ধোঁয়াও অবশ্যই দেখা যেত। তবে? তবে সেটা আসলে কি? কিসের সাহায্যে চলে?

খবরের কাগজের আতঙ্ক সৃষ্টিকারী প্রবন্ধটার এ পর্যন্ত পড়ার পরই আমাকে থমকে যেতে হল। আসলে আচমকা কেমন যেন একটা ধাক্কা খেলাম। মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে আমি মুখ খুললাম, 'স্যার, ওই অত্যাশ্চর্য স্থলযান মোটরগাড়িটাও একই রকম প্রচণ্ড গতিবেগ সম্পন্ন ছিল। জলযান ও স্থলযান কোনোটার ইঞ্জিন সম্বন্ধেও আমরা একেবারে অথৈ জলে। সে দুটো যে কিসের এবং কিসের শক্তিবলে চলে তাও অজ্ঞাত। স্থলযানটা মিচিগান হ্রদের জলে পড়ে উধাও হয়েছে। রহস্য সৃষ্টিকারী চালক বে-পাত্তা। আর সে স্থলযানটা অবশ্যই জলের তলগহ্বরে তলিয়ে গেছে। এমন ছুটন্ত এক জলযান নতুনতর রহস্যসৃষ্টি করে চলেছে, ঠিক কিনা? আমরা জলযানটাকে পাকড়াও করার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছি। কিন্তু অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য স্থলযান বা জলযানটার আবিষ্কারের খোঁজ করার জন্য কোনোরকম আগ্রহ আমাদের নেই। সবারই একই ভাবনা, স্থলযানটার মতো অদ্ভুত জলযানটা যদি বে-পাত্তা হয়ে যায় তবে অস্থিরভাবে হাত কামড়ানো ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য তার অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্রটাকে হাত করা। এমন একটা অবিশ্বাস্য আবিষ্কার কিনে নিতে কেবলমাত্র আমেরিকাই নয় পৃথিবীর যে-কোনো দেশই উৎসাহী হবে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই আবিষ্কারক আড়ালে থেকে তাদের আবিষ্কারের মাধ্যমে পৃথিবীবাসীর বিস্ময় উৎপাদনের আগ্রহী।'

আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার কেবল আমিই নই, মি. ওয়ার্ডও লক্ষ্য করেছেন, রহস্য সঞ্চারকারী স্থলযানটা বে-পাত্তা হতে না হতেই জলযানটার ভেল্কি শুরু হল। উভয় যানের যন্ত্রপাতিই অত্যাশ্চর্য। অসাধারণ তাদের গতি। আর উভয়ই মানুষের পক্ষে সমান বিপদের কারণ। দুটো যন্ত্র দানব যদি একই সঙ্গে পৃথিবীতে চক্কর মারতে শুরু করে তবে স্থল আর জল উভয় পরিবেশেরই নিরাপত্তা বলে আর কিছুই থাকবে না। ডাঙা ও জলে এরকম আতঙ্ক সৃষ্টিকারী ব্যাপারকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়। মি. ওয়ার্ড আমার কাছে আকস্মিক উদ্ভূত সঙ্কটজনক পরিস্থিতিটা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু সঙ্কটমুক্তির উপায় যে কি তা কেউ-ই উদ্ভাবন করতে পারল না।

www.pathagar.com

মি. ওয়ার্ড এবার বললেন, 'মি. স্ট্রক, একটা ব্যাপার হয়ত আপনার মাথায় আসে নি। স্থলযান মোটরগাড়ি আর জলযানটার গঠনগত সাদৃশ্য কিন্তু যথেষ্টই রয়েছে। আচ্ছা, উভয় যান আসলে একটাই হতে পারে কি?'

ব্যাপারটা আমার মাথায় জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসল।

মি. ওয়ার্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। তাঁর সর্বশেষ মন্তব্যটা বার বার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। আমি তখন ছুটিতে ছিলাম। দুমাসের ছুটি। ছুটির মধ্যেই বড় সাহেব তলব করেছিলেন। মাস দেড়েক ইতিমধ্যে কেটেছে। তখনও দিন পনের ছুটি বাকি। ভাবলাম, ছুটি বাতিল করে রহস্যের কিনারা করতে লেগে পড়ব কিনা। রহস্য তো আর একটা নয়, দু-দুটো। রহস্যভেদ না করা অবধি আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব না। কিন্তু কোন পথে অগ্রসর হ'ব সে-ও আর এক বড় সমস্যা।

প্রাতরাশ সেরে খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে আরাম কেদারায় বসলাম। অন্যমনস্কভাবে টুকরো টুকরো খবরের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে ভাবতে লাগলাম, মি. স্মিথকে তো বলে এসেছিলাম, গ্রেট আইরির অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই যেন টেলিগ্রাম মারফৎ আমাকে জানিয়ে দেন। কিন্তু আজ অবধি কোনো টেলিগ্রামই এল না। অতএব নির্ঘাৎ কোনো খবর নেই।

খবরের কাগজটা রেখে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। মি. ওয়ার্ডের শেষ কথাটাই আমার অস্থিরতা জাগিয়ে তুলেছে, 'যন্ত্রযান দুটোই আসলে এক-ই নয় তো?' অর্থাৎ স্থলে চলে আবার দিব্যি জলেও বিচরণ করতে পারে। আবার এমনও হতে পারে দুটো যন্ত্রযান আলাদা আলাদা হলেও একই হাতেই তৈরিও হতে পারে। তাই উভয় যন্ত্রযানকেই সমান দ্রুতগতিতে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে যে সর্বাধিক গতিবেগ সম্পন্ন যন্ত্র আবিষ্কার করেছে অজ্ঞাত আবিষ্কারক অনায়াসে তার দ্বিগুণ গতিবেগ সম্পন্ন যন্ত্র উদ্ভাবন করে ফেলেছেন।

আমার মাথায় ভাবনার পোকা কিলবিল করেই চলেছে—উভয় যন্ত্রের আবিষ্কারক কি তবে একই ব্যক্তি। কী আশ্চর্য ব্যাপার! ধারণাটা সত্য হতেও পারে। কারণ, যন্ত্রদানব দুটো ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় হলেও একই সঙ্গে দেখা দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বলে শোনা যায় নি। অতএব মি. ওয়ার্ডের সন্দেহটাকে তো অবজ্ঞাভরে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না। নিজের মনে বলেই উঠলাম, 'হায় ঈশ্বর! গ্রেট আইরির পাশাপাশি বোস্টন আর মিলকির রহস্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।'

গ্রেট আইরি যদি অগ্নিবমন শুরু করে, ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে দেয় তবে হাজার হাজার মানুষের ত্রাহি ডাক শুরু হয়ে যাবে। ব্লু-রিজে অগ্নিবমন আরম্ভ হলে সবাই কঠিন সঙ্কটের মুখে পড়বে। সে সঙ্গে অতি সম্প্রতিকালে নতুনতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। জনসাধারণের প্রাণ ছেলে খেলায় মেতেছে। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে যন্ত্রদানব উল্কার বেগে ধেয়ে এসে যানবাহন আর পথচারীকে পিষে মারবে। বিপদ স্থল থেকে এবার ধাওয়া করেছে জলে। লাগামহীন গতিবেগের শিকার হতে চলেছে নৌকো-জাহাজ প্রভৃতি জলযান। নিরপরাধ অসহায় মানুষ গতিবেগের উন্মত্ততার শিকার হতে চলেছে। খবরের কাগজগুলোর আর কিছু করার ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক বাজার গরম করে জনজীবনে চাঞ্চল্য আর হতাশার সঞ্চার করতে সিদ্ধহস্ত। যন্ত্র-দানবের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে এমনসব ভীতি সঞ্চারকারী গল্পকথা প্রচার করেছে যা পড়ে সাধারণ মানুষ তো ভয়ে সিঁটকে যাবার

www.pathagar.com

জোগাড়। জীবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। আমার বুড়ি-পরিচারিকার আধ মরা অবস্থা দেখেই অন্য দশজনের শোচনীয় অবস্থার আঁচ পাওয়া যায়। তা একদিন তো বলেই ফেলল, 'পুলিশ যদি যন্ত্র দানবের রহস্যভেদ নাই করতে পারে, শয়তান চালকটাকে কব্জা করতে নাই পারে, তবে কাঁড়িকাঁড়ি টাকা খরচ করে পুলিশ পুষে ফয়দাই বা কি?'

আমি চোখ-মুখে হতাশার ছাপ এঁকে বলতে বাধ্য হলাম, 'আসলে আমরা, পুলিশের লোকেরা কিছু করা তো দূরের ব্যাপার, তার কোনো হদিসই পাচ্ছি না।'

এমন বহু কথা টেলিফোনে, এমন কি সামনাসামনি অনেকেই বলে থাকে। গোড়াতে একটু-আধটু রাগটাগ করতাম সত্য। কিন্তু এখন গা-সহ্য হয়ে গেছে। ম্লান হেসে প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করি। তবে নিঃসন্দেহ হলাম, শয়তানের ব্যাপার-স্যাপার জনজীবনের অনেক গভীরে গিয়ে আঘাত করেছে। এখন সাধারণ মানুষের সাফ কথা, যন্ত্র-দানবটার চালককে পাকড়াও করতে পারলেই মানুষের মনে স্বস্তি ফিরে আসবে। হ্যাঁ, শয়তানের কারসাজি ছাড়া কি-ই বা হতে পারে। শয়তান। শয়তানই বটে। নইলে গ্রেট আইরির শিখরে আগুন নিয়ে হোলি খেলছে, ভেল্কি দেখাচ্ছে কে? শয়তান। উইসনের মোটর প্রতিযোগিতায় সবাইকে তাকে লাগিয়ে জয়ী হয়েছে কে? শয়তান। কানেকটিকাট আর ম্যাসাচুসেটসের উপকূলবর্তী সমুদ্রের আতঙ্ক সঞ্চার করে বেড়াচ্ছে কে? শয়তান। অতএব শয়তানই সর্বত্র তাণ্ডব চালাচ্ছে।

এখন ব্যাপার হচ্ছে—শয়তানের ওপর সব দোষ চাপিয়ে নিজেদের দায়িত্ব কিছুটা হাল্কা করা যায়, খুবই সত্য। কিন্তু এ-তো আর ঠেলাধাক্কার ব্যাপার নয়। আসলে বিপদ তো চূড়ান্ত রূপ নিয়ে একেবারে কাঁধে চেপে বসেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দু-দুটো যন্ত্র-দানবই কি চিরদিনের মতো হাফিস হয়ে গেছে, নাকি আবার রুদ্ররূপ ধারণ করে জনজীবনের শান্তি তছনছ করতে মেতে উঠবে? এক শো বছর বাদে আজকের যন্ত্র-দানবদের কাহিনী নিয়ে কত গল্পকথারই না জন্ম হবে।

বেশ কয়েক দিন ইউরোপ ও আমেরিকার খবরের কাগজগুলো যন্ত্রদানবের ব্যাপারস্যাপার নিয়েই মেতে রইল। ইউরোপবাসীরা আমেরিকার বরাতের ব্যাপার দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে খাক হতে লাগল। আর হবে নাই বা কেন? পৃথিবীতে ভোজবাজির খেল দেখাবার জন্যা শেষপর্যন্ত কিনা আমেরিকার মাটিকেই বেছে নিল। ইউরোপ তাদের কোন পাকাধানে মই দিয়েছেন যে তাদের নির্মমভাবে বঞ্চিত করল। তবে কি আমেরিকাই স্থল ও জল যন্ত্র-যানের আবিষ্কারক? তাই যদি হয় তবে তো চোখের পলকে আমেরিকা স্থল ও জল উভয় পথেই অন্যান্য রাষ্ট্রের সেনাদলকে কব্জা করে ফেলবে। আরে ব্যস, এযে সর্বনাশা কাণ্ড ঘটতে চলেছে!

জুনের দশ তারিখ। নিউ ইয়র্কের একটা দৈনিক পত্রিকার পাতায় একটা তথ্যসমৃদ্ধ লেখা ছাপা হল। তাতে প্রচলিত যন্ত্রযানের গতিবেগ ও আবির্ভূত যন্ত্রদানবের গতিবেগের তুলনা করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে, আমেরিকা যদি যন্ত্রদানবের অস্বাভাবিক গতিবেগের উপায় রপ্ত করে ফেলতে পারে তবে তাদের পক্ষে ইউরোপে পৌছতে মাত্র তিনদিন সময় দরকার হবে। কিন্তু ইউরোপ পাঁচদিনের আগে আমেরিকায় হাজির হতে পারবে না।

কেবলমাত্র আমেরিকার পুলিশের বাঘা বাঘা গুপ্তচররাই নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গুপ্তচররাও আদাজল খেয়ে যন্ত্রদানবের পাত্তা লাগানোর কাজে মেতে গেল। নইলে সব দেশকেই বিপদে পরতে হবে।

www.pathagar.com

মি. ওয়ার্ডের মুখোমুখি হওয়া মাত্র তিনি আমাকে গ্রেট আইরির ব্যর্থতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ছাড়লেন না। আমিও পাল্টা জবাব দিলাম, 'ডলার খরচ করুন, গ্রেট আইরির প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করে আপনার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছি।'

'বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু যদি জল আর স্থলের যন্ত্র-দানবের রহস্যের কিনারা করতে পারেন তবে আপনি আবারও জয়মাল্য লাভের অধিকারী হবেন। পৃথিবীর বাঘা বাঘা রহস্যভেদীরা আদাজল খেয়ে লেগেছেন। তাদের আগেই যদি আপনি রহস্যটার কিনারা করে ফেলতে পারেন তবে সবাই আপনাকে মাথা থেকে নামাতেই চাইবে না সাহেব! দুদিন অপেক্ষা করুন এ-রহস্যের কিনারা করার সার্বিক দায়িত্ব আপনার ওপরই অর্পণ করব, ঠিক করে রেখেছি।'

এরকম অবর্ণনীয় অস্থিরতার মধ্যে যখন আমার দিন কাটছে ঠিক তখনই পনেরোই জুনের রেজেস্ট্রি ডাকে একটা চিঠি পেলাম। আমার ঠিকানার পাশে মরগানটন পোস্ট অফিসের সিলমোহর আঁকা। আর তারিখ দুদিন আগেকার।

মরগানের সিলমোহর দেখেই নিঃসন্দেহ হলাম। মরগানের মেয়র মি. স্মিথের চিঠি।

খামটার মুখ ছিঁড়ে ভেতর থেকে চিঠিটা বের করতেই চমকে উঠলাম। কই, এটা তো স্মিথ লেখা নয়। স্বাক্ষরের জায়গায় তিনটে সুস্পষ্ট অক্ষর। এমন নামধারী কাউকে তো আমি চিনি না। তবে হাতের লেখা খুবই স্পষ্ট, বলা চলে একেবারে ঝকঝকে চকচক।

চিঠির ডানদিকে তরিখ ও প্রেরকের ঠেকানার জায়গায় লেখা, 'গ্রেট আইরি, ব্লু-রিজ মাউন্টেন—উত্তর ক্যারোলিনা, তেরোই জুন।' আর প্রাপককে সম্বোধন করে বক্তব্য লেখা হেয়েছে, 'মি. স্ট্রক, চিফ ইন্সপেক্টর অব পুলিশ। ৩৪, লঙ স্ট্রিট, ওয়াশিংটন, ডি. সি.। চিঠির বক্তব্য মোটামুটি এরকম—আপনার ওপর গ্রেট আইরির গোপন রহস্যভেদ করার দায়িত্ব বর্তেছিল। এপ্রিলের আঠাশ তারিখে আপনি মরগানটনের মেয়র ও দুজন গাইড নিয়ে গ্রেট আইরিতে এসেছিলেন। পর্বতের গা দিয়ে এক চক্কর মেরে পথের হদিস না পেয়ে হতাশ হয়ে পাথরের গায়ে ফাটলের খোঁজ মন দেন। তাতেও হতাশ হতে হয়েছে আপনাকে। মনে রাখবেন, গ্রেট আইরির উদরে কেউ মাথা গলায় না। আর যদি মাথা গলায়ও তবে সে আর জান নিয়ে ফিরে আসে না। আর কিন্তু ভুলেও সে চেষ্টা করবেন না। পরিণাম কিন্তু প্রথম বারের মতো হবে না, মনে রাখবেন। আর যদি নেহাৎই যান তবে কিন্তু অনুতপ্ত হতে হবে। সতর্ক করে দিলাম। যদি সুমতি হয়, আমার কথাটাকে আমল দেন তবে তো মঙ্গলই। আর যদি পাত্তা না দেন তবে কিন্তু বরাতে দুর্ভোগ আছেই আছে, মনে থাকে যেন। চিঠির প্রেরকের স্থানে গোটাগোটা অক্ষরে সাক্ষর করা হয়েছে—এম. ও. ডব্লিউ।'

চিঠিটা পড়ে আমি কয়েক মুহূর্ত শূন্যদৃষ্টিতে হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

* * *

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, চিঠিটা পড়ে আমি হতভম্ব হয়ে স্থবিরের মত তাকিয়ে রইলাম। পর মুহূর্তেই নিজের মনকে প্রবোধ দিলাম, নির্ঘাৎ কেউ সুযোগ বুঝে রসিকতায় লিপ্ত হয়েছে।

www.pathagar.com

আমার বুড়ি ঝি দারুণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সে চিঠিটা ডাকপিওনের কাছ থেকে নিয়ে আমার হাতে তুলে দিয়ে অনুসন্ধিৎসু নজরে আমার প্রতিটা মুহূর্তের মুখাবয়বের পরিবর্তনের ওপর নজর রেখে চলছিল। শেষ অবধি আমার চোখ-মুখের ঘনঘন পবিরর্তনটুকু দেখে তার পক্ষে আর নিজেকে সামাল দেওয়া সম্ভব হল না। আমি তার কৌতূহল নিবৃত্ত করেত গিয়ে রহস্যজনক চিঠিটার বক্তব্য খোলসা করে না বলে পারলাম না।

সবকিছু গভীর মনযোগ দিয়ে শুনে সে মুহূর্তকাল নীরবে কি যেন ভাবল। এক সময় কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল, 'কত্তা, মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের নয়। শয়তানের চিঠি নাই বা হল। শয়তানের সাকরেদদের কারো লেখা এ চিঠি! এসব ঝক্কি-ঝামেলায় যাওয়ার কি যে দরকার মাথায় আসছে না।'

বিড় বিড় করতে করতে বুড়ি ঝি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বুড়ি ঝি ঘর ছেড়ে যেতেই আমি আবার গ্রেট আইরির প্রসঙ্গে চিন্তা করতে লাগলাম। গ্রেট আইরির রহস্যভেদ করতে গিয়ে আমি যে নিদারুণ ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি তা-তো আর খবরের কাগজের দৌলতে পৃথিবীর কারোরই আজ অজানা নয়। তাই আমার ব্যর্থতা ও হতাশা নিয়ে আমেরিকারই কেউ আমার সঙ্গে রসিকতার লোভ সামলাতে না পেরে এমন একটা উড়ো চিঠি দিয়েও থাকতে পারে।

কিন্তু গ্রেট আইরি তো চোর-ডাকাত বা অন্য কোনোরকম সমাজ বিরোধীদেরও ঘাঁটি নয়। সমাজ বিরোধীরা সবার ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থাকতে উৎসাহী। নিজেদের গোপন ঘাঁটির খবর পুলিশকে অবশ্যই জানাতে উৎসাহী হয় না। উড়ো চিঠি দিয়ে হলেও তাদের ঘাঁটিতে প্রবেশ না করতে সতর্ক করে না। এ তো রীতিমতো পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ের আস্ফালন, চোখ রাঙানি। যদি তাই হয়, গ্রেট আইরিতে প্রবেশের পথ নাই থাকে তবে চোর-ডাকাত বা সমাজ বিরোধীরাই বা সেখানে গেল কি করে? তবে এমন কোনো গোপন সুড়ঙ্গ নির্ঘাৎ আছে যার হদিস আমরা পাই নি। পরমুহূর্তেই বিপরীত ভাবনায় ডুবে গেলাম, কেউ না কেউ রসিকতা করতে গিয়েই চিঠিটা আমার কাছে পাঠিয়েছে।

মি. ওয়ার্ডের কাছে উড়ো চিঠির ব্যাপারটা গোপন রাখলাম। ভাবলাম, ভবিষ্যতে আবার একরম মস্করা করলে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা যাবে।

কয়েকটা দিন ঘরে বসে শান্তিতেই কাটিয়ে দিলাম। তবে নিশ্চিত বলাটা ঠিক হল না। হঠাৎ কবে, কোত্থেকে যে ডাক আসবে, কে জানে? তবে পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি, গ্রেট আইরিতে ব্যঁথতার পর যদি আবার নতুন করে ব্যর্থতার জ্বালায় ভুগতে হয় তবে চাকরি-ই ছেড়ে দেব।

এ-দিকে রহস্যসঞ্চারকারী স্থলযানটার আর কোনোই খবর নেই। আমেরিকা ছাড়া অন্যান্য দেশের গুপ্তচররাও শ্যেন দৃষ্টিতে পথ-ঘাটের ওপর রাত্রি-দিন কড়া নজর রেখে-চলেছে। তবে একটা ব্যাপার, যন্ত্রদানবরা কিন্তু কোনো বারই নির্জন নিরালা স্থানে আবির্ভূত হয় নি। বরং জনবহুল স্থানেই ভোজবাজির খেল দেখাবার জন্য উৎসাহী হয়েছে। যদি হঠাৎ কেটে পড়ার ধান্ধা থেকেই তবে এরকম জায়গায় কায়দা-কসরৎ দেখাতে আসবে কেন? আর দীর্ঘদিন এমন নীরব দেখে মনে হচ্ছে এর মধ্যে নিশ্চয়ই

www.pathagar.com

চালকরা জান খুইয়েছে। আর যদি নেহাৎই বেঁচে থাকে তবে আর যেখানেই থাক অন্তত আমেরিকাতে নেই।

গোপন আস্তানা? কোথায় থাকতে পারে তার বা তাদের আস্তানা? তবে কি গ্রেট আইরিতে গিয়ে ঘাপটি মেরে রয়েছে। গোপন আস্তানার কথা মনে হতে গ্রেট আইরির কথাই মনের কোণে উঁকি দিয়ে উঠল। কিন্তু অমন খাড়া ও উঁচু পাহাড়ে মানুষ যখন উঠতে পারে না তখন যন্ত্রদানব মোটর কি করে উঠবে? চালক সাহেব যতই ভেল্কি দেখাক না কেন গ্রেট আইরির ওপর—অসম্ভব। ঈগল, বাজপাখি বা শকুন ছাড়া কারো পক্ষে সেখানে উঠে আশ্রয় নেওয়া সম্ভব নয়।

সেদিনটা ছিল উনিশে জুন। পুলিশ অফিসে যাবার জন্য সবে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। হঠাৎ থমকে যেতে হল। দেখি, দুজন লোক আমার দিকে তাকিয়ে। সতর্ক দৃষ্টি। কড়া নজর রাখা যাকে বলে। ব্যাপারটাকে তেমন আমল না দিয়ে নিজের পথে চলে গেলাম।

ব্যাপারটা সম্বন্ধে গভীরভাবে ভাবতে হল রাত্রে বাড়ি ফিরে বুড়ি ঝির কথা শোনার পর থেকে।

সে বলল, 'দুজন লোক নাকি কদিন ধরে আমার দিকে নজর রেখে চলেছে। আমি বাড়ি থেকে বেরোলেই পিছন নেয়। আজও নাকি সে একই দৃশ্য ঘটতে দেখেছে।'

আমি বুড়ি ঝিকে নানভাবে জেরা করলে সে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল—সে লোক দুটোকে ভাল ভাবেই দেখেছে। এক ঝলক দেখলেই সনাক্ত করতে পারবে এবং এ-কথাও বলল, আবার দেখতে পেলে আমাকে চিনিয়ে দেবে।

পর পর দুদিন কোনো ঘটনাই ঘটল না। বাড়ি ছেড়ে বেরোবার সময় কাউকেই দেখতে পেলাম না। ভাবলাম, ব্যাপারটা বুড়ির অস্বাভাবিক আতঙ্কের জন্যই ঘটেছে। সাধারণ পথচারীকেই গুপ্তচর ভেবে মিথ্যা আতঙ্কে ভুগছে।

বাইশে জুন। আমি বাড়ি থেকে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছে এমন সময় বুড়ি ঝি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল, 'স্যার, এসে গেছে, গুপ্তচর দুজন এসে গেছে। সদর দরজা থেকে কয়েক হাত দূরে, পথের একধারে দাঁড়িয়ে আমাদের বাড়ির দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে। সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।'

আমি ব্যস্ত পায়ে জানালার ধারে গেলাম। পাল্লা দুটো সামান্য ফাঁক করতেই দুজন লোককে আমার বাড়ির দিকে আড় চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম। উভয়েরই বয়স চল্লিশের কম। গাট্টাগোট্টা চেহারা। সুপুরুষ। শিকারি বিড়ালের মতো ঘাপটি মেরে রয়েছে।

নিঃসন্দেহ হলাম, বুড়ি ঝির কথা মিথ্যা নয়। মনস্থির করে ফেল্লাম, এসপাড় ওসপাড় কিছু একটা করে তবে নিরস্ত হ'ব। তবে নিজে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদ করলে ফয়দা কিছুই হবে না। আমাকে তারা চেনে। কিছুতেই মুখ খুলবে না। শেষপর্যন্ত ঠিক করলাম, তাদের পিছনে টিকটিকি লাগাব। তাদের প্রকৃত পরিচয় বের করে তবে ছাড়ান দেব।

আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুলিশ অফিসে যাব। তারা আমার পিছু নেবে। সেখানে গিয়ে বাছাধনদের হাজতে ঢুকিয়ে ঘা কতক দিয়ে আপ্যায়ণ করলেই পেট থেকে আসল ব্যাপারটা বেরিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

কিন্তু দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে আর লোক দুটোকে দেখতে পেলাম না। ভাবলাম, তারা ভুল করে আমার পিছু নিয়েছিল। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে কেটে পড়েছে।

ব্যস, গুপ্তচরদের কথা আমার মন থেকে উবে গেল। আর এম. ও. ডব্লিউ স্বাক্ষরিত উড়ো চিঠিটার কথা ক্রমেই ভুলে গেলাম।

সেদিনটা ছিল চব্বিশে জুন। সেদিন আর এক নতুন ঘটনা ঘটল। ওয়াশিংটনের ইভিনিং স্টার নামক কাগজে প্রথমে খবরটা ছাপা হল। পরদিন ভোরে সব কটা খবরের কাগজের পাতায় ছাপা হল—কিরডাল হ্রদ থেকে মাইল চল্লিশেক পশ্চিমে অখ্যাত-অবজ্ঞাত এক জায়গা রয়েছে। এবার থেকে জায়গাটা আর কারোর কাছেই অজানা-অচেনা থাকবে না। আজ কিরডাল হ্রদ মানুষের নজর কেড়েছে। সেখানে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে চলেছে। পাহাড়ে ঘেরা, সবুজে ঢাকা হ্রদটা থেকে জল বাইল বেরোবার উপায় নেই। হ্রদটার ক্ষেত্রফল প্রায় পঁচাত্তর বর্গমাইল। চারদিকে খাড়া পাহাড় আর মাঝখানে জলরাশি। অনেক, অনেক নিচে, গামলার তলায় জল পড়ে থাকার মতো একটা ব্যাপার মনে করা যেতে পারে। অনেক খাদ, সুড়ঙ্গ ও আঁকাবাঁকা খাদ ডিঙিয়ে তবে কোনোক্রমে হ্রদে পৌঁছনো যায়। হ্রদটাকে ঘিরে বেশ কয়েকটা গ্রাম গড়ে উঠেছে। আর জলে মাছ ধরার জন্য জেলেদের নৌকো হরদম চক্কর মেরে বেড়ায়। কিরডোল হ্রদের জলের গভীরতা পাহাড়ের কাছাকাছি পঞ্চাশ ফুট তো হবেই। পাহাড়ের কাছাকাছি বহু পাথরের টুকরো জল ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে। হ্রদের কেন্দ্রস্থলে জলের গভীরতা তিন শো ফুটের বেশি ছাড়া কম নয়।

কিরডাল হ্রদের মাছের ওপর নির্ভর করে হাজার কয়েক জেলে বেঁচে রয়েছে। আর হ্রদ পারাপারের জন্য কয়েকটা স্টিমার ও নৌকো হরদম জলের ওপর দাপিয়ে বেড়ায়। পাহাড়ের বাইরে দিয়ে রেলপথ চলে গেছে। কনসাল এবং অন্য কয়েকটা প্রদেশে রেলযোগে মাছ চালান দেওয়া হয়।

কিরডাল হ্রদের এসব বিবরণ জানা না থাকলে অবিশ্বাস্য ঘটনাটা সম্বন্ধে পুরোপুরি ধারণা করা সম্ভব নয়।

কিরডাল হ্রদের মুখবন্ধনের পর ইভিনিং স্টারের আসল বক্তব্যে কলিজা শুকিয়ে যাবার মতো ব্যাপারটা তুলে ধরেছে—জেলেরা বেশ কিছুদিন যাবৎ অত্যাশ্চর্য একটা ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছে। হ্রদের তলদেশ থেকে কি যেন একটা জলকে ঠেলে ধাক্কা দিয়ে ওপরে তুলে দিচ্ছে। হাওয়ার দাপট না থাকলেও জল ফেনার মতো হয়ে ফুলে-ফেঁপে উঠছে। শান্ত আবহাওয়ায় জল ফুলে ফেঁপে ওঠার ব্যাপারটা বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে। জল এমনভাবে ফুলে উঠলে ছোট ছোট নৌকোগুলো যে ভেসেই যাবে। জলের আস্ফালনে নৌকোগুলো জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। জেলে-নৌকোগুলো পর্যন্ত তাল রাখতে না পেরে যে যেদিকে পারে ছিটকে পড়ছে। যাকে বলে রীতিমতো ধুন্ধুমার কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, গভীর জলের তলদেশে নির্ঘাৎ এমন কিছু কাণ্ডকারখানা ঘটে চলেছে যার ফলে জল এমন অবিশ্বাস্য রকম ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এর অনেক রকম সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে। গোড়ার দিকে সবার বক্তব্য ছিল, ভূমিকম্পই এরকম অত্যাশ্চর্য কাণ্ডের জন্য দায়ী। তারপর দায়ী করা হল আগ্নেয়পর্বতকে। হঠাৎ কোথাও অগ্ন্যুৎপাত শুরু হলে জলে

www.pathagar.com

এমন তাণ্ডব দেখা যায়। কিন্তু জলস্ফীতি তো আর কোনো একটা বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সম্পূর্ণ হ্রদ জুড়েই তোলপাড় শুরু হয়েছে। কারো কারো মতে, জলের আতঙ্ক অবশ্যই কোনো দানবাকৃতি জলজপ্রাণী। অতিকায় প্রাণীটা অবশ্যই পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে হ্রদে হাজির হয় নি, কিন্তু কোনদিক থেকে সে আসতে পারে? সাগর বা মহাসাগর ধারে কাছে থাকলে না হয় মনে করা যেত ভূ-গর্ভস্থ সুড়ঙ্গ-পথে হ্রদ আর সাগরের সঙ্গে যোগসাজস রয়েছে। আর অতিকায় সামুদ্রিক দানবটা সে পথ ধরে কিরডাল হ্রদে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এত উঁচুতে তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। আসলের সঙ্গে খাদ মিলেমিশে প্রকৃত ব্যাপারটা ক্রমেই গভীর রহস্যাবৃত হয়ে পড়েছে।

আবার এমন কথাও কেউ কেউ ভাবছেন, হয়ত ডুবোজাহাজ নিয়ে কেউ জলের নিচে পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যস্ত। এরকম জলযান আজকের যুগে অবাস্তব নয়। কয়েক বছর আগেকার কথা। 'প্রোটেকটর' নামক একটি অদ্ভুত জলযান কানেকটিকাটের ব্রীজ পোর্টে চক্কর মেরে বেরিয়েছিল। প্রয়োজনে সেটা জলের তলায় তলিয়ে যেতে পারত। সেটার আবিষ্কারক ছিলেন বৈজ্ঞানিক লেক। তার উভচর যানটাতে দুটো মোটর ব্যবহার করেছিলেন যাদের একটা আড়াই শো হর্স পাওয়ার সম্পন্ন, পেট্রল চালিত। আর অন্যটা পঁচাত্তর হর্স পাওয়ার সম্বলিত, বিদ্যুৎচালিত। এক গজ ব্যাস বিশিষ্ট ছিল তার চাকাগুলো। ফলে ডুবোজাহাজ প্রোটেকটর জল ও স্থল উভয় পরিবেশেই অবাধে চলাচল করতে পারত।

ঠিক আছে। মনে করলাম, একটা ডুবোজাহাজ জলের তলদেশে তুলকালাম কাণ্ড করে চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পাহাড় বেষ্টিত কিরডাল হ্রদে ডুবোজাহাজের পক্ষে আসা কি করে সম্ভব? এ যে একেবারেই অবান্তর চিন্তা।

আশে পাশের জেলেদের, জলের তলদেশের রহস্যটা আতঙ্ক সঞ্চার করল। তারা এতই ভীত যে, কারুরই বোঝা সম্ভব হল না। আতঙ্ক সৃষ্টিকারী আসলে কোনো দৈত্য-দানো নাকি কোনো যন্ত্রযান।

জুন মাসের বিশ তারিখে সমস্যার সমাধান হল। মার্সেল নামে একটা পালতোলা জাহাজ চলতে চলতে এক সময় আচমকা বিরাট একটা ঝাঁকুনি খেল। জাহাজের তলদেশে কিসের সঙ্গে আচমকা ধাক্কা লেগেছে মনে হল। সেখানে জল আশি থেকে নব্বই ফুট গভীর। তাই চোরা পাহাড়ের কথা ভাবা যায় না। আঘাত পাওয়া মাত্র জাহাজটার গলুই প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ব্যস, ডেক অবধি জলে ভরে গেল। তবে মার্সেল ডুবল না। কোনোরকমে তীর পর্যন্ত আসতে পারল।

পাম্প করে জল বের করে ভাঙাচোরা জাহাজটাকে পাড়ে তুলে আনা হল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আঁৎকে উঠতে হল। অতিকায় একটা ছুঁচালো জিনিসের সঙ্গে জাহাজের সংঘর্ষ হয়েছিল, নিঃসন্দেহ হওয়া গেল।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল, নির্ঘাৎ কোনো ডুবোজাহাজ প্রবল বেগে যাওয়ার সময় মার্সেলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। তবে একটা ডুবোজাহাজ ধাক্কা দিয়ে একটা জাহাজের এ দশা যখন করেছে তখন সেটা নির্ঘাৎ অবিশ্বাস্য শক্তিরই অধিকারী।

ব্যাপারটা কেমন তালগোল পাকিয়ে যাওয়ার মতোই বটে। ডুবোজাহাজ—কিন্তু হ্রদের জলে সেটা এলই বা কি করে? আর এসে থাকলেও হ্রদের জলে এমন করে লুকিয়ে থেকে রহস্য সঞ্চারই বা করছে কেন? জলের ওপরে উঠে আসতেই বা তার অনীহার

www.pathagar.com

কারণ কি থাকতে পারে? ডুবোজাহাজটার মালিক কি চিরদিনই লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে চান? নাকি আরো কয়েকটা জাহাজকে ঘায়েল করার মতলব আঁটছেন?

এবার ইভিনিং স্টারের পাতায় ছাপা হল—রহস্যসঞ্চারকারী মোটরগাড়ির আবির্ভাবের পর আবির্ভূত হল ডুবোজাহাজ। তবে? তবে কী তিন তিনটে যন্ত্রযানই একই ব্যক্তির দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে? আর তিনটে ইঞ্জিনই কি আসলে একই? একই যন্ত্রের তিনটি রূপ আমাদের সামনে আলাদা আলাদা রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে?

এ-পত্রিকার সর্বশেষ বক্তব্য বিদগ্ধজনের মাথায় নতুনতর চিন্তা ঢুকিয়ে দিল। বক্তব্য খুবই স্পষ্ট—তিনটে যন্ত্রের আবিষ্কারক একই প্রতিভাধর ব্যক্তি। আর তিনটি যন্ত্র একই। ব্যাপারটা খোলসা হল না। এমনতর একটা অসম্ভব কাজ কি করে সম্ভাবনাময় হয়ে উঠল? একটা যন্ত্র সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির কাজ কি করে সম্পন্ন করতে পারে, কারোর মাথায়ই এল না। মোটরকে কি করে নৌকোরূপে ব্যবহার করা যাবে? আবার নৌকোকে দিয়ে কীভাবে ডুবোজাহাজের কাজ করানো যাবে? যন্ত্র যান যদি পাখির মতো শূন্যে উড়ে বেড়াতে পারত তবে ষোলকলা পূর্ণ হত। তিন-তিনটে যানেরই অস্বাভাবিক গতিবেগ দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে, যন্ত্র মূলত একটাই। বিভিন্ন বার বিভিন্ন রূপ নিয়ে জনজীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করছে।

খবরের কাগজগুলো সুযোগ বুঝে অন্য পথ ধরল। মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সঞ্চার করার বদলে আবিষ্কারের গুরুত্বের দিকটা নিয়ে ভাবতে লাগল, যন্ত্রের সংখ্যা যতই হোক না কেন ইঞ্জিনের অবিশ্বাস্য শক্তি দেখে পৃথিবীর মানুষের চোখ ট্যাঁড়া হয়ে গেছে। নজির তো যথেষ্টই পাওয়া গেছে। এবার যে-কোনো উপায়ে আবিষ্কারককে হাতের মুঠোয় আনাই প্রথম ও প্রধান কাজ। অর্থ যতই খসাতে হোক না কেন অবিশ্বাস্য আবিষ্কারটাকে কব্জা করতেই হবে। এ কাজে যুক্তরাষ্ট্র সরকার অবশ্যই অনুদার হবে না। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো তাদের সামরিক বাহিনীর হাত শক্ত করার জন্য দুহাতে পাউণ্ড ছড়াতেও দ্বিধা করবে না। এরকম অত্যাশ্চর্য যন্ত্র যারা করায়ত্ব করতে পারবে তাদের নৌ ও স্থলবাহিনী যে পৃথিবীতে একাধিপত্য বিস্তার করবে এ তো স্বাভাবিক কথা। যুক্তরাষ্ট্র সরকার লক্ষ লক্ষ ডলার ঢেলেও আবিষ্কারটাকে হাতের মুঠোয় নেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর। কিন্তু সমস্যা যে গোড়াতেই। যন্ত্রের মালিকের হদিস না পেলে সেটা কিনবেই বা কার কাছ থেকে?

জোর কদমে কাজ চলতে লাগল। খোঁজ করতে গিয়ে কিরডাল হ্রদের জল তোলপাড় করা হল। বৃথা চেষ্টা। অত্যাশ্চর্য জলযানটা কিতবে হ্রদ ছেড়ে চম্পট দিয়েছে। হ্রদে ঢোকা যেমন অসম্ভব ঠিক তেমনি বেরিয়ে যাওয়াও তো অসম্ভব। ডুবোজাহাজ পাহাড় ডিঙোবে কি করে? না, রহস্যের কিনারা করা বুঝি আর সম্ভব নয়।

ব্যস, সব চুপচাপ। ডুবো জাহাজটার উপস্থিতির আর কোনো খবরই পাওয়া গেল না। হ্রদের ধারে কাছের মানুষের কাছ থেকেও কোনো খবর এল না।

ইতিমধ্যে কয়েকবারই মি. ওয়ার্ডের সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়েছে। উদ্ভূত রহস্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু রহস্যভেদের ব্যাপারে এক তিলও এগোতে পারলাম না। আমাদের বাঘা বাঘা রহস্যভেদীরা যন্ত্রযান বা তার আবিষ্কারক কারোরই হদিস পেল না।

www.pathagar.com

সাতাশে জুন মি. ওয়ার্ড আমাকে ডেকে বললেন, 'মি. স্ট্রক, আপনার প্রতিশোধ নেবার অপূর্ব সুযোগ হাতের মুঠোয় এসে গেছে। গ্রেট আইরিতে আপনার ব্যর্থতার প্রতিশোধের কথা বলতে চাইছি। তিন কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রের আবিষ্কারককে পাকড়াও করতে আগ্রহী কি?'

'অবশ্যই আগ্রহী। আপনার আদেশ পেলেই আমি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কাজটা কঠিনসাধ্য হলেও বাধা যতই দুর্লঙ্ঘ্য হোক আমি ঠিক অতিক্রম করতে পারব, নিজের ওপর একটু আস্থা আমার আছে।'

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে মি. ওয়ার্ড এবার বললেন, 'গ্রেট আইরির অভিযানের চেয়ে ঢের ঢের বেশি কঠিন কাজ, খেয়াল রাখবেন। তবে, আপনার কর্মক্ষমতা ও নিষ্ঠার ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে বলেই তো আপনার ওপর কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে গ্রেট আইরির রহস্যভেদ সময় সুযোগ মতো পরেই না হয় করা যাবে। কিন্তু এখন যে কাজের দায়িত্ব আপনার ওপর বর্তেছে বাঘা রহস্যভেদী ছাড়া কিনারা করা সম্ভব নয়। অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের রহস্যজনক আবিষ্কারককে পাকড়াও করতে হবে। ডাক-সাইটে রহস্যভেদী ছাড়া এ কাজ হাসিল করা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। যুক্তি দিয়ে বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে লোকটা এখন কিরডাল হ্রদের অতলে ঘাপটি মেরে রয়েছে।'

'আমার বিশ্বাস, তিনি নিজে থেকে ধরা না দিলে তার হদিস পাওয়া সম্ভব নয়।'

'আমারও একই বিশ্বাস। আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়? লোকটাকে যদি মোটা অর্থের লোভ দেখানো হয়? টাকার লোভে এগিয়ে এসে তাঁর আবিষ্কারটা বেঁচে দিতে রাজি হবে। সরকার মোটা অর্থ ব্যয় করতে রাজি হয়েছেন। প্রচার করে দেওয়া হবে, সরকারের সামনাসামনি হয়ে দরদস্তুর পাকা করে নেবার জন্য। সরকারের ইচ্ছার কথা যন্ত্রযানের আবিষ্কারক জানতে পেরে উৎসাহী হবেনই।'

'মি. স্ট্রক, যন্ত্রটা যখন লোকটার কোনো কাজেই লাগবে না তখন দেশের কাজে বিক্রি করে দেওয়াই তো সঙ্গত। রাজি না হওয়ার তো কারণই নেই। তবে আবিষ্কারকের কোনো কুমতলব থাকলে অবশ্য বিক্রি করতে উৎসাহী হবে না।

মি. ওয়ার্ড এবার কত রকমভাবে আবিষ্কারককে পাকড়াও করার যে চেষ্টা চলছে সে কথা এক এক করে আমার কাছে ব্যক্ত করলেন। হয়ত বা আবিষ্কারক লোকটা ইতিমধ্যে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। তা হলেও ভাঙা-চোরা যন্ত্রাংশ তো কোথাও না কোথাও পড়ে থাকবেই। সেগুলো খুঁজে পেতে বের করতে পারলে ইঞ্জিনিয়ারদের অপরিসীম উপকারে লাগবে। আশ্চর্য ব্যাপার, মার্সেল জাহাজটাকে জখম করার পর যন্ত্রদানবটা একেবারে বে-পাত্তা হয়ে গেছে।

বে-পাত্তা ডুবোজাহাজটার কোনো খবর না পেয়ে মি. ওয়ার্ড বড়ই হতাশা ও অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এটাই তো সঙ্কট। জনগণকে আতঙ্ক মুক্ত রাখা তার বড় কর্তব্য। অথচ ভীতসন্ত্রস্ত জনগণের সামনে তাঁকে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। একেবারেই অবিশ্বাস্য গতিতে যে যন্ত্রযান ছুটে গিয়ে হাফিস হয়ে যাচ্ছে তার পিছনে ধাওয়া করবেন কীভাবে? এদিকে খবরের কাগজ ও অন্যান্য সমালোচকরা যেভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে তাতে ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে খাক হওয়া ছাড়া গত্যন্তরই বা কি? তাই সবার মধ্যে ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে কতগুলো নিষ্কর্মার ওপর দেশের সুরক্ষার

www.pathagar.com

দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাদের বসিয়ে বসিয়ে না খাইয়ে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিলেই বা ক্ষতি কি?

আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রায় পনের দিন আগে পাওয়া সতর্ক-পত্রটার কথা খচখচ করতে লাগল। তাতে আমার প্রাণহানিরও হুমকি দিতে ছাড়ে নি। দুজন গুপ্তচরের মুখ মনের কোণে উঁকি দিল, যারা আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিনিয়ত আমার গতিবিধির ওপর সতর্ক নজর রেখে চলছিল। মি. ওয়ার্ডকে এ-ব্যাপারটা সম্বন্ধে বলেই বা ফয়দা কি? উড়ো চিঠিটার সঙ্গে তো বর্তমান সমস্যার কোনোই যোগসাজস নেই। গ্রেট আইরির অগ্নি উদগীরণের সম্ভাবনা না থাকায় সরকার এ-মুহূর্তে সেটা নিয়ে ভাবিত নয়। তাই সদ্য উদ্ভুত সমস্যায় আমাকে কাজে লাগানোর কথা ভাবছে। তাই মনস্থ করলাম, পরে সময় সুযোগ মতো তাঁর কাছে ব্যক্ত করব। তখন যদি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন সহ্য করা যাবে, এখন পারব না। তাই তার কথার পৃষ্ঠে বললাম, 'স্যার, যন্ত্রযানের মালিকের সঙ্গে কথাবার্তার উপায় আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। তিনি লোকচক্ষুর বাইরে চলে গেলেও একদিন না একদিন ফের বেরিয়ে আসতে পারেন। তখন আমরা—'

আমার মুখের কথা ছিনিয়ে নিয়ে মি. ওয়ার্ড বলে উঠলেন, 'মি. স্ট্রক, খবরদার মুহূর্তের জন্য আপনি বাড়ি ছাড়বেন না। হতচ্ছাড়াটার আবির্ভাবের খবর পাওয়ামাত্র আপনাকে তার পিছু নিতে হবে। আর আপনার পছন্দ মাফিকদুজন রহস্যভেদীকে সঙ্গে নিয়ে নিন।'

'ধন্যবাদ! কিন্তু স্যার আজ না হোক কাল যন্ত্রযানের মালিকের মুখোমুখি হবই। তখন আমার করণীয় কি হবে?'

'গ্রেপ্তার। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করে টেলিগ্রাম মারফৎ আমাকে জানিয়ে দেবেন। তার পরের দায়িত্ব আমার। তার নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে।'

মি. ওয়ার্ডের কাছ থেকে গুরুদায়িত্ব নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। খবর পাওয়ামাত্র রওনা দেওয়ার মতো ব্যবস্থাদি সেরে ফেললাম।

সহজেই দুজন ঘাঘু রহস্যভেদী সহকারীও জোগার করে ফেললাম। আমার দপ্তরেরই কর্মী। আগে বহুবার আমার কাছাকাছি পাশাপাশি থেকে অসীম সাহস ও অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

ব্যস, এবার চলল নীরব প্রতীক্ষা। দু-দুটো খবর পেলাম। বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বুঝলাম, দুটো খবরই বিশ্বাস করার মতো। দু-জনেই নিজের চোখে দেখেছে। একজন জানিয়েছে, সুপিরিয়র হ্রদের কেন্দ্রস্থলে অদ্ভুত যন্ত্রযানটাকে চাক্ষুষ করেছে। আর অন্যজন দেখেছে, লিটল রকের নিকটবর্তী আরকানসাসে।

সমস্যা হচ্ছে, ঘটনা দুটোকে কিছুতেই মানিয়ে নেওয়া যাচ্ছে না। একজন ছাব্বিশে জুন বিকালে আরকানসাসে যন্ত্রযানটাকে চাক্ষুষ করেছে আর অন্যজন সে রাত্রেই সেটাকে সুপিরিয়র হ্রদে দেখেছে। উভয় স্থানের মধ্যে ব্যবধান প্রায় আটশো মাইল। যত জোরেই ছুটুক না কেন অত্যাধুনিক মোটরগাড়িটা লোকচক্ষুর আড়াল দিয়ে কি করে এতগুলো জনবসতি ডিঙিয়ে এমন দীর্ঘপথ পাড়ি দিল? সেটা আরকানসাস, মিসৌরি, আওয়া ও উইসকনসিনের এদিক দিয়ে ঢুকে বিপরীত দিক দিয়ে দিব্যি বেরিয়ে গেল আর সেটাকে আমাদের কোনো রহস্যভেদীই দেখতে পেল না। আশ্চর্য! টেলিফোন করে কেউ জানালও না! অদ্ভুত যন্ত্রযানটা পরপর দুবার দেখা দিয়ে আবার বেমালুম হাফিস হয়ে গেল!

www.pathagar.com

ব্যস, আবার ব্যাপারটা থিতিয়ে পড়ল। সবাই চুপচাপ। মি. ওয়ার্ড আমাকে উড়ো খবরের পিছনে ধাওয়া করতে দিতে উৎসাহী হলেন না। তাঁর আদেশের অপেক্ষায় আমরা উদ্গ্রীব হয়ে থাকলাম।

একটা কথা, অত্যাশ্চর্য যন্ত্রটা যে হাফিস হয়ে যায় নি তা আবির্ভূত না হলেও তার উপস্থিতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যের মাধ্যমে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

তেসরা জুলাই, যুক্তরাষ্ট্রের সবক'টা খবরের কাগজে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে যন্ত্রযানের মালিকের সঙ্গে যোগাযোগের প্রসঙ্গ ব্যক্ত করা হল। বিজ্ঞপ্তিটা ছয়টা ভাষায় ছাপা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটার বক্তব্য—এ বছর এপ্রিলে একটা মোটর পেনসিলভেনিয়া কেনটাকি, ওহিও, মিসৌরি, টেনেসি এবং ইলিনয়ের সদর রাস্তায় দেখা গেছে। তারপর আবার সাতাশে মে, আমেরিকান অটোমোবাইল ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় মোটর প্রতিযোগিতায় সেটাকে ফের দেখা গিয়েছিল। জুনের প্রথম সপ্তাহে নিউ ইংল্যান্ডের উপকূলে, বিশেষ করে বোস্টনের কাছে দুর্দান্ত গতিতে একটা নৌকাকে জলে ছুটে বেড়াতে দেখা গেছে। ব্যস, তারপরই একেবারে বে-পাত্তা ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে করা যেতে পারে, একই ব্যক্তিই তিন-তিনটে যন্ত্রযান নির্মান বা আবিষ্কার করেছেন। যন্ত্রযান তিনটে হলেও আসলে তা একটাই। এমন পদ্ধতিতে নির্মিত যাতে জল ও স্থল উভয় পরিবেশেই চলতে সক্ষম হয়।

যন্ত্রযানটার নির্মাতা-আবিষ্কারকের কাছ থেকে সেটার স্বত্ব লাভের জন্য তার কাছে প্রস্তাবগুলো রাখা হচ্ছে, 'সরকারের অনুরোধ তিনি যেন গুপ্তস্থান ছেড়ে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসেন। সরকারের হাতে যন্ত্রযানটার স্বত্ব তুলে দিয়ে আগ্রহী হলে তিনি যেন সরকারকে জানান। তাঁর কাছে আরও অনুরোধ রাখা হচ্ছে, তিনি যেন যতশীঘ্র সম্ভব ওয়াশিংটনের ফেডারেল পুলিশ বিভাগে এ-বিজ্ঞপ্তিটার জবাব পাঠান।'

সরকার পক্ষ থেকে কোনোরকম শর্ত আরোপ করা হয় নি। অতএব ধরে নেওয়া যাচ্ছে, বিজ্ঞপ্তি পড়ে যন্ত্রযানের আবিষ্কারক স্বত্বাধিকারী এগিয়ে আসতে উৎসাহী হবেন।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিটা ছাপা হতেই না হতে জনগণের কৌতূহল চরম পর্যায়ে পৌছে গেল। পুলিশ-বিভাগের অফিসের সামনে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যেন মেলা জমে রইল। সবার মনেই একই জিজ্ঞাসা, অজ্ঞাত পরিচয় যন্ত্রযানের আবিষ্কারক কি ধরা পড়েছে? বা কোনো খবর পাওয়া গেছে কি?

অজ্ঞাতনামা আবিষ্কারক সরকারের সঙ্গে যন্ত্রযানের স্বত্ব হস্তান্তর করার ব্যাপারে দর কষাকষি শুরু করেছে এরকম খবর যদি ছাপা হয় তবে মানুষের কৌতূহল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভাবা যায় না।

আমেরিকা এমন একটা দেশ যেখানে অত্যাশ্চর্য কোনো বস্তুর কদরও অত্যাশ্চর্য রকমই দেওয়া হয়ে থাকে। তবু আবিষ্কারকের দিক থেকে কোনো জবাবই এল না। বিজ্ঞপ্তিটা বেরোবার পর সকাল কেটে দুপুর এল, কোনো জবাব এল না। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হল। না, তবুও কোনো খবরই এল না। পুলিশ বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা অধীর প্রতীক্ষায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে লাগলেন। ক্রমে রাত্রি এল। না, তবুও কোনোই খবর নেই। সকালেও কোনো খবর এল না। তার পরের দিনও কাটল ব্যর্থ প্রতীক্ষায় তার পরের দিনও কাটল একই রকম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে।

www.pathagar.com

অন্য মহাদেশে বিজ্ঞপ্তিটার অন্যরকম এক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে টেলিগ্রাফের তারের মাধ্যমে খবর পৌঁছে গেল ইউরোপ মহাদেশে। আমেরিকার আগ্রহ দেখে প্রবীন মহাদেশের দেশনায়করা তো আর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারে না। আবিষ্কারকের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারটাকে কিনে নেওয়ার জন্য তাঁরাও যারপরনাই তৎপর হলেন। আর সেটার মালিকানা লাভের জন্য প্রয়োজন হলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতেও তারা পিছপাও নয়। প্রয়োজনে লক্ষ ডলার ঢালতে রাজি।

ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিও যন্ত্রটার মালিকানা স্বত্ব ক্রয়ের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লিপ্ত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া এবং ইটালি কেউ-ই পিছিয়ে রইল না। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের মতোই একটা বিজ্ঞপ্তি ইউরোপের খবরের কাগজগুলোও ছাপল। বলা হল তাদের প্রস্তাবে রাজি হলে অদ্ভুত যানের আবিষ্কারকও চালক রাতারাতি ধনকুবের বনে যাবে।

আশ্চর্য ব্যাপার, এতকিছু সত্ত্বেও যন্ত্রযানের আবিষ্কারকের দিক থেকে কোনো উৎসাহই লক্ষিত হল না। পৃথিবীর সবাই যেন তাঁকে টাকার লোভ দেখানোর প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল। এরকম ঘটনার নজির পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি আছে বলে জানা নেই। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস দর হাঁকল দুকোটি ডলার। ব্যস, এবার প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো ঝিমিয়ে পড়ল। তবে যুক্তরাষ্ট্রের কারোর মুখে টু-শব্দটিও শোনা গেল না, এতগুলো ডলারের বিনিময়ে যন্ত্রযানটা কেনা অর্থহীন। আর আমার মতো অন্যরকম, যন্ত্রটার দাম আসলে দুকোটি ডলারের চেয়ে ঢের, ঢের বেশি।

এক-দুই-তিন করে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। না, বাঞ্ছিত আবিষ্কারকের দিক থেকে কোনো জবাবই এল না। আমার বরাত যে মন্দ বুঝতে আর বাকি রইল না।

পনেরই জুন। সেদিন সকালে চিঠির বাক্স খুলতেই অত্যাশ্চর্য একটা চিঠি নজরে পড়ল। কর্তৃপক্ষ চিঠিটা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিংটনের খবরের কাগজগুলো দপ্তরে পাঠিয়ে দেন।

চিঠিটা টেররের ডেক থেকে পনেরই জুলাই-এ লেখা। আর বক্তব্য মোটামুটি এরকম—'পুরাতন ও নতুন পৃথিবীর উদ্দেশ্যে—ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু রকম প্রস্তাব পেয়েছি। সব শেষে যুক্তরাষ্ট্র সরকার একই রকম প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। উত্তর দিতে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে সাফ কথা জানিয়ে দিচ্ছি—আমার আবিষ্কারটা খরিদ করার জন্য যে দাম ধার্য হয়েছে তা আমি প্রত্যাখ্যান করছি। দাম যখন চাই-ই না তখন দরাদরির তো কথাই ওঠে না। আমার উদ্ভাবিত যন্ত্রটার স্বত্ব আমি হস্তান্তর করতে নারাজ, নেওয়ার অধিকারও কারো নেই। রাশিয়া, ফরাসি, জার্মানি, ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও আমেরিকা কারোরই সে অধিকার নেই। আমার আবিষ্কারের স্বত্ব আমারই থাকবে। মর্জি মাফিক তাকে আমি ব্যবহার করব। পৃথিবীকে আমি হাতের মুঠোর মধ্যে রাখব। কিন্তু আমাকে কব্জা করার হিম্মৎ কারোরই নেই। আমাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা একেবারেই বৃথা। একেবারেই অসম্ভব প্রয়াস। আমার গায়ে কেউ সামান্যতম আঘাত যদি হানে তবে তাকে ভয়ঙ্কর আঘাতের জন্য তৈরি থাকতে হবে। আমি কথা ও কাজের মধ্যে ফারাক রাখতে জানি না, মনে থাকে যেন।

আমি হাত বাড়ালেই যখন কোটি কোটি মুদ্রা পেয়ে যেতে পারি সেখানে সামান্য অর্থের জন্য আমার তো লালসা থাকার কথা নয়। পুরাতন ও নতুন পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়করা

www.pathagar.com

মনে রাখবেন, আমার সামান্যতম ক্ষতি করার হিম্মৎ আপনাদের অবশ্যই নেই। কিন্তু আপনাদের চরমতম সর্বনাশ করার ক্ষমতা আমি রাখি। আমার খেয়াল খুশিতে বাঁধা দেওয়ার ক্ষমতা পৃথিবীর কারোর নেই— কারোরই না।

সেভাবেই এ-চিঠিতে স্বাক্ষর করেছি।'

চিঠিটার শেষে স্বাক্ষর রয়েছে।—'মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লড।'

চিঠিটার বক্তব্য পাঠ করে সবাই তো রীতিমত স্তম্ভিত। চিঠিটার প্রতি ছত্রে যারপরনাই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা হয়েছে। আর যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে চোখ-রাঙানো চিঠিটা চিঠির বাক্সে কে যে ফেলে গেল তা-ও ধরা সম্ভব হল না। আরও আশ্চর্য ব্যাপার, পুলিশ-অফিসের সামনে সারারাত্রি সশস্ত্র প্রহরী টহল দিয়েছে। তার ওপরে দলে দলে কাতারে কাতারে কৌতূহলী মানুষের আনাগোনা লেগেই ছিল। হ্যাঁ, এটা অবশ্য হতে পারে মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে মূর্তিমান আতঙ্ক, যন্ত্রযানের উদ্ভাবক, চিঠির বাক্সে ঔদ্ধত্যপূর্ণ চিঠিটা ফেলে দিয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে, রাত্রির অন্ধকারে চিঠিটা বাক্সে ফেলে যাওয়া তেমন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

চিঠিটা পাওয়া মাত্র বেশ কয়েকটা ব্লক তৈরি করে দেশের সব ক'টা খবরের কাগজের দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরকম এটা চিঠি পড়ে নিছকই রসিকতা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আমিও এর আদ্যোপান্ত পাঠ করে ব্যাপারটাকে মোটেই আমল দিলাম না।

আসলে কিন্তু এ-চিঠিটার বেলায় বিপরীত প্রতিক্রিয়াই দেখা দিল। সবার একই মতো। এ-চিঠির লেখক নিছক রঙ্গ রসিকতার উদ্দেশ্য নিয়ে এটা লেখে নি। দু-চারজন বিপরীত মন্তব্য করতে গিয়ে সুবিধা করতে পারে নি। ফলে তারা শেষমেশ মুখে কলুপ এঁটে দিতে বাধ্য হল। যে-যন্ত্রটা সবার নাগালের বাইরে তার উদ্ভাবক ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে এরকম একটা চিঠি লেখার হিম্মতে কুলোতো না। একের পর এক বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে প্রথমে থেকেই স্পষ্ট বোঝা গেছে উদ্ভাবকের মানসিকতা অন্য সবার চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আজ অবধি যেসব ঘটনা ঘটেছে যাদের তল খুঁজে পাওয়া যায় নি। অথচ একটামাত্র চিঠির মধ্যেই লোকটার সম্বন্ধে ধারণা করে নেওয়া যাচ্ছে। সত্যি লোকটা বিচিত্র চরিত্রের। ব্যাপারটা সবার কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেল। উদ্ভাবক মনে-প্রাণে কি চাচ্ছে? তাঁর আত্মগোপন করে থাকার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভবিষ্যতে আরও কিছু ভেল্কি দেখিয়ে চমক সৃষ্টি করা। কোনো দুর্ঘটনায় তিনি অক্কা পান নি। পুলিশের অজ্ঞাত কোনো গোপন স্থানে ঘাপটি মেরে রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডাকবাক্সে না ফেলে চিঠির বাক্সে চিঠিটা ফেলতে উৎসাহী হলেন কেন? ডাক মারফৎ চিঠি এলে পুলিশ তার অবস্থিতির কথা, ঠিকানা ধরে ফেলতে পারত। আর সরকারের অনুরোধ ছিল, তিনি ওয়াশিংটনের পুলিশ-দপ্তরে এসে হাজির হয়ে যেন নিজের পরিচয় দান করেন। তিনি তো সেখানেই হাজির হয়েছেন। আর তাঁর হয়ত লক্ষ্য ছিল পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা। তাঁর সে বাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয়েছে।

খবরের কাগজে ব্লক করে ছাপানো চিঠিটা পড়ে দেশসুদ্ধ মানুষের মাথা ঘুরে যাবার জোগার হল। অন্যের কথা আর কি-ই বা বলব, আমারই তো চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল। খবরের কাগজটা চোখের সামনে ধরে রেখেই আমি আচমকা চিল্লিয়ে উঠলাম, 'আরে! মিলটুকু তো গোড়াতেই আমার চোখে ধরা পড়া উচিত ছিল। যে-পত্রের

www.pathagar.com

মাধ্যমে গ্রেট আইরির ব্যাপারে শাসানো হয়েছিল এটাও যে একই হাতের লেখা! কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার রে বাবা! দ্বিতীয় চিঠিটার ওপরে জায়গার নাম, অর্থাৎ কোথা থেকে লেখা হয়েছে উল্লেখ করেছে 'আতঙ্কর ডেক' থেকে। 'আতঙ্ক' তবে যন্ত্রযানটারই নাম। আর সে যানটার রহস্যসঞ্চারকারী ক্যাপ্টেনই তবে পত্রটা লিখেছেন? এম. ও. ডব্লিউর দ্বারা তারই উপাধি বুঝাতে চেয়েছেন? তিনিই তবে পত্র মারফৎ আমাকে শাসিয়ে ছিলেন আমি যেন গ্রেট আইরি মুখো না হই?

যন্ত্রচালিতের মতো উঠে ড্রয়ার টেনে তেরোই জুনের লেখা চিঠিটা বের করে খবরের কাগজে ছাপানো দ্বিতীয় চিঠিটার পাশে রাখলাম। আমার মনে আর তিলমাত্রও সন্দেহ রইল না, উভয় চিঠি একই লোকের, অত্যাশ্চর্য যন্ত্রের উদ্ভাবকের লেখা! ব্যস, আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, আমাকে হত্যার ভয় যিনি দেখিয়েছিলেন তিনিই 'আতঙ্ক' নামক যন্ত্রযানটার ক্যাপ্টেন। নিজের মনের সঙ্গে ঝট করে বোঝাপড়া সেরে নিলাম, এবার কি রহস্যভেদের ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে? চিঠি দুটোর মধ্যেই সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। যদি রহস্যভেদীদের কাজে লাগিয়ে দেই, তবে? এ-সূত্র অনুসরণ করে অগ্রসর হলে কি রহস্যভেদ করা খুবই দুষ্কর হবে?

মুহূর্তমাত্রও সময় নষ্ট না করে চিঠি দুটো নিয়ে ব্যস্ত-পায়ে পুলিশ দপ্তরে হাজির হলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে মি. ওয়ার্ডের ঘরে পা দিয়ে দেখি, তিনি চিঠিটার দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে। খবরের কাগজে ছাপানো চিঠিটা নয়, আসল চিঠি, যেটা থেকে ব্লক করে খবরের কাগজগুলিতে পাঠানো হয়েছে।

আমি ঝট করে পকেট থেকে প্রথম চিঠিটা বের করে টেবিলে, তাঁর সামনে রাখলাম। বললাম, চিঠির শেষে তিনটে অক্ষরের মাধ্যমে চিঠিটাতে স্বাক্ষর করা হয়েছে। উত্তর ক্যারোলিনার মরগানটন ডাকঘর থেকে ছাড়া হয়েছিল।'

মি. ওয়ার্ড বললেন, 'আপনি কবে এটা হাতে পেয়েছেন মি. স্ট্রক?'

'জুনের তেরো তারিখে, এক মাস আগে। তখন তো নিছক রসিকতা বলেই ধরে নিয়েছিলাম। চিঠিটা ভাল করে আদ্যোপান্ত পড়লেই ব্যাপারটা খোলসা হয়ে যাবে স্যার।'

চিঠিটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মি. ওয়ার্ড বললেন, 'স্বাক্ষরটা তিনটা অক্ষরে করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ স্যার। এম. ও. ডব্লিউ। অক্ষর তিনটে অক্ষরের মাধ্যমে। অর্থাৎ 'এম' দিয়ে 'মাস্টার', 'ও' দিয়ে অব, আর 'ডব্লিউ' দিয়ে 'ওয়ার্লড' বোঝানো হয়েছে। সব মিলে 'এম. ও. ডব্লিউ'র অর্থ দাঁড়াচ্ছে 'মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লড'।

'মি. স্ট্রক, উভয় চিঠিই একই হাতে লেখা, তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার, সে রকমই তো মনে হচ্ছে।'

'চিঠিতে প্রাণ নেওয়া হবে বলে শাসিয়েছে! আচ্ছা, এক মাস আগে চিঠিটা এসেছে অথচ আপনি আমাকে দেখান নি, কারণ কি বলুন তো মি. স্ট্রক?'

'আসলে ব্যাপারটাকে আমি আগে মোটেই আমল দিই নি। কিন্তু আজকে 'আতঙ্ক' ক্যাপ্টেনের চিঠিটা পড়ার পর আমার টনক নড়েছে। ব্যাপারটা যে ভয়ানক কিছু এখন বুঝতে পারছি।'

www.pathagar.com

'আপনার অনুমান অভ্রান্ত। চিঠিটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এ চিঠিটার সূত্র ধরে অগ্রসর হলে অদ্ভুত লোকটাকে পাকড়াও করা সম্ভব হবে। একটা কথা, 'গ্রেট আইরি' ও 'আতঙ্ক'র মধ্যে কোনো যোগসূত্র রয়েছে বলে আপনি মনে করছেন মি. স্ট্রক? আমার মন হয়, তা অবিশ্বাস্য বলে বোধ হলেও যোগসূত্র একটা আছেই। ব্যাপারটা হচ্ছে, 'আতঙ্ক'র উদ্ভাবক গ্রেট আইরির উপরে তার যন্ত্রপাতি রাখেন। সেখানেই যন্ত্রযান তৈরির কাজ সম্পন্ন করেন। আর এটাই—'

আমি তাঁর মুখের কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠলাম, 'না, এটা কিছুতেই হতে পারে না। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কোনোদিক দিয়ে নিয়ে যান? যন্ত্র তৈরির কাজ সেরে তাকে কোন পথেই বা গ্রেট আইরির বাইরে নিয়ে আসেন? আমি নিজের চোখে গ্রেট আইরির রূপ দেখে এসেছি। তাই বলছি কি, আপনার অনুমান কিছুতেই ঠিক নয়।'

'হত, যদি তাঁর অদ্ভুত যন্ত্রযানে দুটো পাখা লাগিয়ে—'

'তাই বা কি করে হতে পারে। আতঙ্ক নামক যে-যন্ত্রযান জল তোলপাড় করে বেরিয়েছে সেই আকাশে উড়ে বেড়াবে? স্যার, এসব আষাঢ়ে গল্পে আমার আস্থা নেই।'

মি. ওয়ার্ড-ও যে গাঁজাখুরি গপ্পে বিশ্বাসী নন তার মুখাবয়বেই সে প্রমাণ পেলাম।

মি. ওয়ার্ড আবারও চিঠি দুটো পাশাপাশি রেখে অনুসন্ধিৎসু নজরে দীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। স্বাক্ষর দুটো বেশি করে পরীক্ষা করলেন। শেষমেশ নিঃসন্দেহ হলেন, উভয় স্বাক্ষর একই লোকের। আর কেবলমাত্র একই হাত নয়, একই কলমও ব্যবহার করা হয়েছে।'

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্যে কাটিয়ে এক সময় মুখ খুললেন, 'মি. স্ট্রক, চিঠি দুটো আমার কাছে রাখছি। যদিও মাথায় আসছে না ঘটনা দুটোর মধ্যে কোনদিন থেকে যোগসূত্র রয়েছে। তবু আমার বিশ্বাস, ঘটনা দুটো স্বতন্ত্র প্রকৃতির হলেও কোথায় যেন অস্পষ্ট একটা মিল রয়েছে। আপনার কাজ হবে, মিলটার যোগসূত্রটা খুঁজে বের করা। তৈরি থাকবেন। যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো মুহূর্তে যাতে বেরিয়ে পড়তে পারেন তার জন্য তৈরি থাকবেন।'

এদিকে জনগণের উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে গেল।সবাই দাঁতে দাঁত চেপে ভাবতে লাগল, আবিষ্কর্তার এত দম্ভ এত দুঃসাহস! জনসাধারণের উত্তেজনা দেখে সরকার বড়ই দুর্ভাবনায় পড়ে গেলেন। হোয়াইট হাউস আর রাজধানীতে জনসাধারণের ক্ষোভ যেন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল। সবাই যখন উত্তেজনায় ফুটছে এখন আর কিছু না করে পারা যাবে না। কিন্তু কি করবেন, কোনোপথে অগ্রসর হবেন? দুনিয়াদারের ঠিকানা কি? ঠিকানা জোগার হলেও গ্রেপ্তার করার উপায়? তিনি নিশ্চয় মিথ্যা হম্বিতম্বি করছেন না। তাঁর হিম্মতের পরিচয় তো পাওয়া গেছে। এর চেয়ে বহুগুণ হয়ত করায়ত্ব রয়েছে যার পরিচয় জনসাধারণের আয়ত্ত্বের বাইরে। পাহাড় ডিঙিয়ে কারডাল হ্রদে কীভাবে হাজির হলেন? বেরোলেনই বা কোন উপায়ে? বহু গ্রাম-শহরের ওপর দিয়ে তিনি সুপিরিয়র হ্রদে হাজির হন, কারোর চোখেই পড়ে নি। এমন একটা অসম্ভব কীভাবে সম্ভব হয়ে উঠল?

ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবছি ততই যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। উদ্ভাবক লোকটা কোটি কোটি ডলার হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলিহারি সাহস বটে। অর্থের বিনিময়ে তার আবিষ্কারকে কেনা যায় না। এতেও তার ঔদ্ধত্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বহুৎ আচ্ছা, তবে শক্তির মাধ্যমেই তাঁর মোকাবেলা করা হবে। কারোর কোনো ক্ষতি

www.pathagar.com

করার আগেই সমাজের চরমতম শত্রুকে ঘায়েল করা যাক। যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী অক্কা পেয়েছেন ভেবে সরকার এতদিন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিলেন। এখন দেখছেন, শত্রু জীবিত, ইহলোকেই রয়েছেন। জনসাধারণের ক্ষোভ অগ্রাহ্য করতে না পেরে সরকার পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তিটার প্রচার করা হল, 'আতঙ্কর ক্যাপ্টেন যেহেতু তার আবিষ্কারকে কোনো মূল্যের বিনিময়েই বিক্রি করতে নারাজ তাঁর যন্ত্রটা জনসাধারণের মধ্যে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সঞ্চার করতে পারে, যাকে কিছুতেই রোখা সম্ভব নয়, সে কারণেই আতঙ্কর ক্যাপ্টেনকে জানানো হচ্ছে যে, দেশের আইন তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে অক্ষম। তাঁকে অথবা তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রকে বন্দি বা ধ্বংস করার যে-কোনো প্রয়াসকে সরকার অনুমতি দিচ্ছে আর পুরস্কারও প্রদান করা হবে।'

ব্যস, পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলল। বিভিন্ন পক্ষ থেকে একের পর এক পুরস্কার ঘোষণা করা হতে লাগল। যন্ত্রের আবিষ্কর্তা, যন্ত্র এবং যন্ত্র তৈরির কারখানার হদিস যে দিতে পারবে, দেশজোড়া আতঙ্ক সৃষ্টিকারীকে যে ধ্বংস করতে পারবে, বিপুল অর্থ দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে। জুলাইয়ের শেষ অর্ধাংশে পরিস্থিতি যখন এমন জটিল রূপ নিল তখন অনন্যোপায় হয়ে অদৃষ্টের ওপর সবকিছু ছেড়ে দিতেই হল। যে কোনো উপায়ে তাঁকে বন্দি করতেই হবে? কিন্তু কথাটা মুখে বলা যত সহজ কার্যক্ষেত্রে ততটা সহজ অবশ্যই নয়। তবে মোটর বা বোটে অবস্থান করলে তার কেশাগ্রও স্পর্শ করার হিম্মৎ কারোরই হবে না। অতএব সেটা প্রচণ্ড গতিবেগে বে-পাত্তা হওয়ার আগেই তাকে টপ করে বন্দি করে ফেলতে হবে।

আমি তৈরি হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। মি. ওয়ার্ডের কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত পেলেই কাজে লেগে যাব। কিন্তু আদেশ এল না। কি করেই বা আসবে? যাকে বন্দি করতে যাব, তিনি যে নিখোঁজ।

এদিকে জুলাই শেষ হতে চলেছে। খবরের কাগজগুলো গরম গরম খবর ছেপে জনসাধারণের মধ্যে ভয়-ভীতি অব্যাহত রেখে চলেছে। খবরের নামে নিছকই গুচ্ছের খানেক গুজব ছেপে উত্তেজনাকে জিইয়ে রাখার অদ্ভুত কৌশল যাকে বলে।

শেষপর্যন্ত উনত্রিশে জুলাই মি. ওয়ার্ড টেলিফোন মারফৎ আমাকে জরুরি তলব করলেন।

আমি যেতেই তিনি কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বললেন, 'মি. স্ট্রক। এক ঘণ্টার মধ্যেই টোলেডোর উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে। আতঙ্কর দেখা মিলেছে। আর সেখানে পৌঁছনোর পর চূড়ান্ত নির্দেশ পেয়ে যাবেন। অফিসের তরফ থেকে আপনার প্রতি আমার নির্দেশ রইল,এবার সাফল্য লাভ করতেই হবে। মি. ওয়ার্ডের নির্দেশ পেয়ে আমি অভিবাদন সেরে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

*   *   *

হ্যাঁ, বোঝা গেল, নাগালের বাইরে যে ক্যাপ্টেন তিনি তবে আবার ভুঁইফোড়ের মতো যুক্তরাষ্ট্রে আবির্ভূত হয়েছেন। একটা ব্যাপার, লোকটাকে কিন্তু কখনই ইউরোপের জলপথে বা স্থলপথে দেখতে পাওয়া যায় নি। তিনদিনের আটলান্টিক অতিক্রম করা সম্ভব। তবু সে চেষ্টা ভুলেও কোনোদিন তিনি করেন নি। তাঁর আসল ধান্ধাটা কি? কেবলমাত্র আমেরিকাতেই নিজের বিক্রম প্রদর্শন করা? তবে কি মনে করা যেতে পারে তিনি একজন আমেরিকানই বটে? চিন্তাটাকে মন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হল না।

www.pathagar.com

পুরাতন ও নতুন পৃথিবীর কোনো জাহাজেরই নেই। 'আতঙ্ক' জলের তলদেশ দিয়ে পথ পাড়ি দেবে, সাধারণ জাহাজের মতো তো তার গতি নয়। তাই আটলান্টিক মহাসাগর-নিরাপদে অতিক্রম করা একমাত্র সেটার পক্ষেই সম্ভব। ঝড় সেটাকে স্পর্শও করতে পারে না।

তবে? তবে কেন আবিষ্কারক আমেরিকা ছেড়ে ইউরোপে যেতে উৎসাহী হন নি? ওহিওর টোলেডো শহরে কেনই বা আবার আবির্ভূত হয়েছেন। আমেরিকাতেই কি তিনি বন্দি হতে উৎসাহী?

গুপ্তচরের দ্বারা পুলিশ-দপ্তরে খবরটা পৌঁছেছে বলেই হয়তো এবার ব্যাপারটা নিয়ে হৈ-হট্টগোল সৃষ্টি হল না। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য কড়া নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। আতঙ্ক সৃষ্টিকারী যান আতঙ্কর আবিষ্কারক ও চালকের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য আমি চলেছি। খবরের কাগজগুলোও খবরটা না পাওয়ায় দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারল না। তদন্ত শেষ না হওয়া অবধি গোপনীয়তা রক্ষা অবশ্যই করা হবে।

আমি মি. ওয়ার্ডের আদেশপত্র নিয়ে আর্থার ওয়েলসের কাছে চলেছি। তিনি আমার জন্য টোলেডো-তে অপেক্ষা করছেন। ওহিওর ওপর দিয়ে রাতভর ট্রেন ছুটে পরের দিন দুপুরের কাছাকাছি টোলেডো স্টেশনে হাজির হল।

ন্যাব ওয়াকার আর জন হার্টের মতোই গুলিভরা পিস্তল আর সাইডব্যাগ নিয়ে আমি প্লাটফর্মে পা দিলাম। আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার তাগিদে অস্ত্রের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। প্লাটফর্ম ধরে দুপা এগোতেই আর্থার ওয়েলসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিলাম আর তাঁর পরিচয়ও জেনে নিলাম।

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়টুকু সেরে আমি বললাম, 'মি. ওয়েলস, আমাকে কি এখানে রাত্রি বাস করতে হবে?'

মুচকি হেসে তিনি জবাব দিলেন, 'না, তবে সে তো আপনার ওপরই নির্ভর করছে মি. স্ট্রক।'

গেটের বাইরে ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছিল। আমরা উঠতে কোচোয়ান চাবুক হাঁকাল। প্রায় কুড়ি মাইল দূরবর্তী ব্ল্যাক রক ক্রিকে আমাদের যেতে হবে। স্টেশন চত্বর ছাড়িয়ে একটা হোটেলের জিম্মায় সাইড ব্যাগটা রেখে আবার গাড়িতে উঠলাম।

পথ চলতে চলতে আর্থার ওয়েলস বললেন, ব্ল্যাক রক ক্রিক জায়গাটা পাহাড়ে ঘেরা, সবুজে ঢাকা অদ্ভুত একটা পরিবেশে অবস্থিত। মনে হচ্ছে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অভিযান-পর্বটা চুকিয়ে ফেলা যাবে। ফলাফল দুরকমই হতে পারে। আতঙ্ক-র আবিষ্কারক ও স্বত্বাধিকারী বন্দিত্ব স্বীকার করবেন, নতুবা আমাকে ব্যর্থতার জ্বালা বুকে নিয়ে ফ্যাকাসে মুখে ফিরে যেতে হবে।

আর্থার ওয়েলসের বয়স বছর চল্লিশেক। গাট্টাগোট্টা চেহারা। গায়ে শক্তিও ধরেন যথেষ্টই। পুলিশ বিভাগের গুপ্তচর হিসেবে তাঁর নামডাক খুবই। অন্য এক কাজের তাগিদে টোলেডোতে গিয়ে বরাতের জোরে আতঙ্কর খবর পেয়ে গেছেন। আইরি হ্রদের তীর ধরে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমে গাড়িটা ছুটে চলল। আইরি হ্রদের আয়তন প্রায় দশ হাজার বর্গমাইল। মোদ্দা কথা এটা চমক সৃষ্টিকারী একটা হ্রদ। সুমেরুর অস্বাভাবিক শৈত্য নির্বিবাদে ধেয়ে এসে শীতকালে এর জল বরফে পরিণত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

নিউ ইয়র্ক রাজ্যের অন্তগর্ত জমকালো বাফেলো শহরের পূর্ব তীরে আর ওহিও রাজ্যের বর্ধিষ্ণু শহর টোলেডো শহর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। আর উভয় তীর ঘেঁসে রয়েছে ছোট বড় অগণিত শহর ও গ্রাম। সে অনুপাতে যানবাহনও সংখ্যায় প্রচুরই। প্রায় বিশ লক্ষ ডলার বছরে আয় হয়।

লেকের তীর বরাবর গাড়িটা ছুটে যাবার সময় আর্থার ওয়েলস কি দেখেছে, কি শুনেছে আর কি বুঝেছে আমার কাছে খোলসা করে ব্যক্ত করল।

তিনি দিন দুই আগে ঘোড়ায় চেপে জরুরি কাজের তাগিদে বনপথে হ্যালি নগরের দিকে যাবার সময় দেখলেন হ্রদের জলে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করে একটা ডুবোজাহাজ ভুস করে ভেসে উঠল। নাগাল টেনে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে, গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলেন, যন্ত্রযানটা অবস্বাভাবিক গতিতে ব্ল্যাক রক ক্রিকের মোহনায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাড়ের দিকে এগোতেই দুজন পুরুষ ডেকের ওপর এসে দাঁড়াল। একজন লাফিয়ে তীরে নামল। তবে কি ইনিই মাস্টার অ বদ্য ওয়ার্লডঃ আর এটাই রহস্যসঞ্চারকারী যন্ত্রযান 'আতঙ্ক'? দীর্ঘদিন গা-ঢাকা দিয়ে আসার পর আবার গভীর জল ভেদ করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে? 'আমি একেবারেই একা। নিদেন পক্ষে আপনারা তিনজনও যদি সঙ্গে থাকতেন তবে হতচ্ছারাটাকে ঠেসে ধরতাম। বাছাধনকে আর যন্ত্রযানে ফিরতে দিতাম না কিছুতেই। ডুবোজাহাজটাও দখল করে নিতাম।' আর্থার ওয়েলস চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মি. ওয়েলস, আমার আশঙ্কা একটাই, ইতিমধ্যে যদি অত্যদ্ভুত যন্ত্রযান আতঙ্ককে নিয়ে তার আবিষ্কর্তা মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লড চুপি চুপি কেটে পড়ে।

রাত্রির অন্ধকারেই আমি টোলেডোতে ফিরে এসে সোজা টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে ওয়াশিংটন শহরে টেলিগ্রাফ করে বাড়ি ফিরি। তারপরও আমি ব্ল্যাক রক ক্রিকে গিয়েছিলাম। ডুবোজাহাজটাকে একই জায়গায় ভেসে থাকতে দেখেছি। আর মানুষও দুজনই। ব্যাপার দেখে মনে হল দুর্ঘটনার ফলে যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গেছে, সারাচ্ছে। আমি বললাম, 'আমরা পৌঁছনো পর্যন্ত সেখানে থাকবে কিনা কে বলতে পারে।'

'থাকবে। মনে হচ্ছে, এখনও আছে। মেরামতি কাজ এর মধ্যে শেষ না হবারই কথা।'

'আপনি বললেন, তারা সংখ্যায় দুজন। মাত্র দুজনের পক্ষে এমন শক্তিশালী একটা যন্ত্রযানকে আয়ত্বে রাখা কি করে সম্ভব, ভাবছি।'

'আপনি বললেন, তারা সংখ্যায় দুজন। মাত্র দুজনের পক্ষে এমন শক্তিশালী একটা যন্ত্রযানকে আয়ত্বে রাখা কি করে সম্ভব, ভাবছি।'

'আমারও একই বিশ্বাস। কিন্তু দুজন ছাড়া তো কাউকে নজরেও পড়ে নি।'

'ভাল কথা, তাদের দুজনকে দেখলে আপনি চিনতে পারবেন তো মি. ওয়েলস?'

'অবশ্যই পারব। যাক যে কথা বলছিলাম, গতকাল আগের দিনের মতোই বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমি বন ছেড়ে এসেছিলাম। তখনই মি. ওয়ার্ডের টেলিগ্রাফটা হাতে পাই। আপনার আসার খবর পেয়ে যথাসময়ে স্টেশনে যাই। ট্রেন এল। যাত্রীদের মধ্যে থেকে আপনার চেহারা ও পোশাকের বর্ণনা অনুযায়ী আপনাকে খুঁজে বের করতে অসুবিধা হল না।'

www.pathagar.com

এতক্ষণ আমাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছে তার মূল বক্তব্য—ব্ল্যাক রক ক্রিকের মোহনায় প্রায় ঘন্টা চল্লিশেক আগে দুজনকে একটা ডুবোজাহাজ মেরামত করতে দেখা গিয়েছিল। আমরা এ-যন্ত্রটার তল্লাসেই হন্যে হয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছি কিনা তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? আর যন্ত্রপাতি বিকল না হলে সেটার ভেসে ওঠার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। তবে আশা করা যাচ্ছে, আমরা গিয়ে তাঁদের দেখা পাব। এখন সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা, যন্ত্রদানবটা আইরি হ্রদে কীভাবে ঢুকতে পারল? সবার শেষে সেটাকে সুপিরিয়র হ্রদে দেখা যায়। সেখান থেকে মিচিগানের পথ ধরে তাকে গ্রেট আইরিতে আসতে হবে। স্থলপথে মানুষের ভিড়, উৎপাত খুবই। তাই 'আতঙ্ক' জলপথ ধরেছে। অতএব কারোর নজরে পড়ার কথা নয়। আমরা যে-পথেই যাই না কেন, জায়গামতো পৌছে দেখব, আমাদের বাঞ্ছিত মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লড অনেক আগেই চম্পট দিয়েছে। তাকে অনুসরণ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে।

আইরি হ্রদের একেবারে শেষ প্রান্তে অবশ্য দুটো টর্পেডো ডেস্ট্রয়ার আছে। যাত্রার পূর্বমুহূর্তে মি. ওয়ার্ড আমাকে এরকমই বলে দিয়েছিলেন। তবে সেটা আতঙ্কর কাছে, মোচার খোলা, খেলনা-নৌকার সামিল। আর যদি সেটা টুপ করে জলে ডুব দেয় তবে তো আর কথাই নেই। আর আজ রাত্রে লড়াই করে যদি সফল না হই তবে অভিযান ব্যর্থ হবেই।

আমাদের গাড়ি জঙ্গল-পথ ধরতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। বরাত ভাল যে, আর্থার ওয়েলসের পথঘাট চেনা। হ্রদের কিনারা পর্যন্ত যাওয়ার চিন্তাই করা যায় না। বাঞ্ছিত প্রতিদ্বন্দ্বী দুজন আমাদের দেখেই চোখের পলকে সটকে পড়বে।

আরও কিছুটা এগিয়ে আর্থার ওয়েলস গভীর জঙ্গলে গাড়িটাকে রেখে আমাদের নিয়ে পায়ে হেঁটে অগ্রসর হতে লাগলেন। গাড়ির আওয়াজ শুনে শত্রুপক্ষ সর্তক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে আর্থার ওয়েলস বলল, 'রাত্রি একটু গভীর না হওয়া অবধি আমাদের অপেক্ষা করা উচিত'।

গাছের পাতায় ফাঁক দিয়ে উঁকি দেওয়া হাল্কা চাঁদের আলোয় দেখলাম, সাড়ে আটটা বাজে। আমাদের চারজনের নৈশ-অভিযান শুরু হল। আর্থার ওয়েলস পথপ্রদর্শক। আমি তার পিছনে। তারপর ন্যাব ওয়াকার ও জন হার্ট।

ব্ল্যাক রক ক্রিকের তীরে পৌছতে বেশি সময় লাগল। ভাবলাম, আতঙ্ক যদি এখনও থেকে থাকে তবে আছে কোনো বড়সড় পাথরের আড়ালে। কিন্তু সে কি আদৌ আছে? প্রশ্ন তো একটাই। তার বা তাদের দেখা পাব কি?

আমরা পা টিপে টিপে গাছের আড়াল দিয়ে এগোতে লাগলাম। কারো মুখে টু-শব্দটি ও নেই। নিঃশ্বাস নিতেও যেন সাবধানতা অবলম্বন করে চলেছি। যাকে বলে চরম মুহূর্ত। আর মাত্র দুশো ফুট অতিক্রম করলেই বাঞ্ছিত নদীর মোহনার ধারে পৌছে যাব। প্রায় দম বন্ধ করে মোহনার ধারের পাথরটার কাছে গিয়েই আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হায় ঈশ্বর! পাখি যে পালিয়েছে! ভোঁ-ভোঁ! যন্ত্রযান উধাও। আর্থার ওয়েলস আতঙ্ককে যেখানে দেখেছিল সে জায়গাটা ফাঁকা। কেবল নিঃসীম অন্ধকার সেখানে বিরাজ করছে। মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লড ব্ল্যাক রক ক্রিক ছেড়ে পালিয়েছেন। আর্থার ওয়েলস সত্যিই যন্ত্রযান ও তার মালিককে দেখেছিল যদি ধরে নেওয়া যায় তবে তারা

www.pathagar.com

কোথায় উধাও হয়ে গেল। তার কলকজা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। জলপথ বা স্থলপথে আতঙ্ক তার গোপন আস্তানায় তো যেতে পারেনি।

জন হার্ট ও ন্যাব ওয়াকার সাহসে ভর করে হ্রদের কিনারা বরাবর অনেকটা পথ হাঁটাহাঁটি করে দেখে এল। কিন্তু বাঞ্ছিত যন্ত্রযান বা তার কোনো ভাঙ্গা যন্ত্রাংশও দেখতে পেল না।

হঠাৎ হ্রদের জলে ঢেউ দেখা দিল। অনেকটা নৌকোর দ্বারা সৃষ্ট ঢেউয়ের মতোই ঢেউ। হয় জলের তলদেশ থেকে কিছু ঠেলে উঠে আসছে, নতুবা লেকের জলের ওপর দিয়ে যা হোক কিছু ক্রিক মোহনার দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা চার-চারটে প্রাণী চার জোড়া অপলক চোখে হ্রদের জলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলাম। সবাই নির্বাক, নিস্তব্ধ। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতেও কারো সাহসে কুলোচ্ছে না। জলোচ্ছ্বাস বাড়ছে বৈ কমছে না। আর প্রপেলারের পাখা ঘুরলে যেমন আওয়াজ হয় ঠিক সেরকম চাপা আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। সেটা যে বোটের শব্দ সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহই রইল না। আইরি হ্রদে হাঙর বা তিমি থাকলে না হয় অন্য রকম সন্দেহের কোনো কারণ থাকত না। তবে? সেটা বোটের শব্দই বটে। আর শব্দটা মোহনার দিকেই এগিয়ে আসছে।

আর্থার ওয়েল আমার দিকে ঝুঁকে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'মি. স্ট্রক, আমি যে-বোটের কথা আপনাকে বলেছিলাম সেটা যদি এ-বোটই হয় তবে নির্ঘাৎ তার আগের জায়গাতেই ফিরে আসবে।'

আমি ও আমার তিন সঙ্গী বালির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে নীরবে অন্ধকার আইরি হ্রদের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা আবছা বস্তুকে তীরের দিকে এগিয়ে আসতে দেখরাম। মন্থর তার গতি। এখনও ক্রিকের ভেতরে প্রবেশ করে নি। হ্রদের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে। জলযানটার ইঞ্জিনের চাপা আওয়াজও শোনা যেতে লাগল।

আর্থার ওয়েলস তেমনি অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'ক্রিকের আড়ালে রাত্রি কাটানোর ধান্ধায় যন্ত্রযানটা এগিয়ে আসছে।'

কথা হচ্ছে, আবার যদি আসবেই তবে নোঙড় তুলে জায়গাটা ছেড়ে চলে গিয়েছিলই বা কেন? তবে কি ইঞ্জিনটা আবার বেগড়বাই করছে? শক্তি কমে যাওয়ার কোনো ব্যাপার-স্যাপার দেখা দিয়েছে নাকি? আবার এমনও তো হতে পারে হঠাৎ কোনো বিপদের আশঙ্কায় আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল? মেরামতি কাজ যদি মিটেই থাকে তবে ফিরে না এসে ওহিওর সড়কপথে চম্পট দিলেই তো পারত। তবে মনে করা যেতে পারে 'আতঙ্ক' সম্প্রতি মোটর-স্থলযানে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে?-এরকম হাজারো প্রশ্ন আমার মাথার চারদিকে ভিড় করতে লাগল। আমি আর আর্থার ওয়েলস একই চিন্তায় তন্ময় হয়ে রইলাম, সত্যি কি 'আতঙ্ক' নামক ভয়ঙ্কর সে যন্ত্রটাকেই দেখছি তো? নাকি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বশত ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়ে অস্থিরতার মধ্যে প্রতিটা মুহূর্ত কাটাচ্ছি?

কালো সে সচল বস্তুটা ধীর মন্থর গতিতে ব্ল্যাক রক ক্রিকের দিকে এগিয়ে আসছে। চালকের আত্মবিশ্বাস এতই প্রবল যে, কেবিনে আলো পর্যন্ত জ্বালে নি।

মিনিট কয়েকের মধ্যে বোটটা জেটিতে ভিড়ল। প্রাকৃতিক জেটি।

www.pathagar.com

আর্থার ওয়েলস আমার দিকে ঝুঁকে, কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে খুবই অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'মি. স্ট্রক, আমার মনে হয় এখানে আর থাকা ঠিক হবে না। যে-কোনো সময় আমাদের দিকে তাঁর চোখ পড়ে যেতে পারে।'

'বালির ওপর টান টান হয়ে শুয়ে থাকতে হবে, নয় তো পালিয়ে গিয়ে পাথরের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকতে হবে। অন্ধকার বস্তুটা আরও এগিয়ে এসেছে। ওই—ওই দেখুন, ডেকের ওপরে দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে, আবছা, খুবই অস্পষ্ট দুটো মনুষ্যমূর্তি।'

হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেলাম। রহস্যময় লোকদুটো এবার আর আমাদের দেখতে পাবে না। আমরা কিন্তু তাদের কার্যকলাপ ঠিকই দেখতে পাব।

ডেকের ওপর দণ্ডায়মান ব্যক্তি দুজনের কথোপকথন অস্পষ্ট হলেও শুনতে পেলাম। ইংরেজেতে বাক্যলাপ করছে। বুঝতে দেরি হল না, তারা নোঙর ফেলার তোড়জোড় করছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে তার সামনে এসে ঝপাং করে আছাড় খেয়ে দড়িটা পড়ল। তারপরই শোনা গেল নোঙড়ের লোহা আর পাথরের ঘর্ষণের শব্দ। আর্থার ওয়েলস সামান্য কোমড় বাঁকিয়ে দেখল, নাবিক দুজনের মধ্যে একজন চাতালে লাফিয়ে উঠে দড়িটা চেপে ধরেছে। পর মুহূর্তেই ভেজা বালির ওপর পা ফেলে ফেলে জাহাজের আলোয় পথ দেখে দেখে জঙ্গলের দিকে এগোতে লাগল। তারা কোথায় যাচ্ছে? এ তল্লাটে মনুষ্য বসতি নেই। তবে কি এখানেই তারা খাবার-দাবার ও অন্যান্য সামগ্রী মজুত রাখে?

তারা তখন ফুট ত্রিশেক দূরে। একজন আমাদের দিকে আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

আমি হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম—আরে, একী! আমার ভুল হচ্ছে না তো? না। চোখের ভুল নয়। যে-দুজন আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখত এ যে তাদেরই একজন। না, ভুল অবশ্যই হয় নি। এ মুখ ভোলার নয়। তিলমাত্র সন্দেহও রইল না। তবে কি, মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লড 'আতঙ্ক'র ডেক থেকে হুমকি দিয়ে চিঠিটা লিখেছিল? আমি মেলাতে পালাম না, গ্রেট আইরির সঙ্গে এর কোন দিক থেকে যোগসাজস থাকতে পারে! নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে আর্থার ওয়েলসকে ফিসফিসিয়ে কথাটা বললাম।

আর্থার ওয়েলস নড়েচড়ে বসে অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে বলল, 'কী সাংঘাতিক ব্যাপার! বড়ই জটিল সমস্যা দেখছি!' এবার যেন একটু ভয়ে ভয়ে বলল, 'তারা যদি আমাদের উপস্থিতির কথা টের পেয়ে যায়, তবে? আর ঘোড়া দুটোও কোচোয়ানকে দেখে ফেলে?'

'ছুটে বোটের দিকে আসবে। আমরা কিছুতেই তাদের বোটে উঠতে দেব না।'

তারা জঙ্গলের দিকে উঠে গেলে আমরা পা টিপে টিপে নোঙরটার কাছে গেলাম। দড়িটার বিপরীত প্রান্ত আতঙ্কর সঙ্গে বাধা। আতঙ্ক জলে ভাসছে।

আর্থার ওয়েলস চাপা অথচ কাঁপা-কাঁপা স্বরে বলল, 'মি. স্ট্রক, বোট থেকে কেউ আমাদের ওপর নজর রাখছে না তো?'

এমন সময় লোক দুজন একটা কাঠের বোঝা নিয়ে জঙ্গল থেকে ফিরে এল। অন্ধকার থেকে কে একজন বলল, 'হ্যালো ক্যাপ্টেন।'

আর্থার ওয়েলস আমার কানে কানে বলল, 'কি বুঝছেন মি. স্ট্রক, তারা দুই নয়, সংখ্যায় তিনজন। চারজন হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।'

www.pathagar.com

'হ্যাঁ, চার কেন, পাঁচজন হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।'

পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। এত লোকের মোকাবেলা করা আমাদের চারজনের পক্ষে কি করে সম্ভব? কাজের গতিপ্রকৃতি, বুদ্ধির সামান্য অভাব, উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে সামান্য দেরি হলেই সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

তাদের মতিগতিও বুঝা যাচ্ছে না। কাঠগুলো তুলে আতঙ্ককে নিয়ে কেটে পড়ার ধান্ধায় আছে নাকি? না, ভোরের আলো দেখা দেওয়া অবধি এখানেই রয়ে যাবে? এখনি নোঙর তুললে তো ধরার প্রশ্নই ওঠে না। আইরির হ্রদ থেকে ডেট্রয়েট নদী পেরিয়ে হুরণ হ্রদে হাজির হবে। গ্রেফ ব্ল্যাক রক ক্রিকের মতো অপূর্ব সুযোগ কি আর কোথাও পাওয়া যাবে?'

আমি আক্রমণের সিদ্ধান্তই নিয়ে নিলাম। বললাম, 'আমরা চারজন মিলে যদি তাদের আচমকা আক্রমণ করে বসি তবে তারা ঘাবড়ে গিয়ে হাল ছেড়ে দিতে পারে। তারপর বরাতে যা আছে দেখা যাবে।'

বোট থেকে ক্যাপ্টেন বেশ একটু গলা চড়িয়েই বললেন, 'সব ঠিকঠাক আছে তো? আরও দুবোঝা কাঠ তো রয়ে গেছে, তাই না। বরং পা চালিয়ে গিয়ে সব এনে 'আতঙ্ক'র ডেকে তোল। ভোরের আলো ফুটলেই না হয় যাত্রা করব।'

ভাবলাম 'আতঙ্ক'তে মোট কজন আছে? মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লড আর কাঠবাহক দুজন—মোট তিনজন।

তাদের পরিকল্পনাটা ধরা গেল। বোটে কাঠ তুলে বাকি রাত্রিটুকু ঘুমিয়ে কাটাবে। চমৎকার। ঘুমন্ত অবস্থায় আচ্ছা বেঁধে ফেলা কঠিন সমস্যা হবে না। অস্ত্র হাতে নেওয়ার সুযোগও দেব না। দেখব, বাছাধনরা করে কি। আর্থার ওয়েলস ও আমার আর দুজন সঙ্গীকে আমার পরিকল্পনাটা বললাম। সবাই সোল্লাসে আমাকে সমর্থন করল।

তখন সাড়ে দশটা। কাঠবাহকরা আবার জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

আমরা আবার পাথরটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারা কাঠ নিয়ে ফেরার পরও অন্তত ঘণ্টা খানেক ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেওয়া যাবে না। একটু ভুলচুক হলেই মওকা হাতছাড়া হয়ে যাবে। দেখা যাবে, খাঁচা ফাঁকা, পাখি উধাও। তা যদি না-ও হয় আতঙ্ক ঝুপ করে জলে ডুব দেবে।

আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গার উপক্রম হল। নির্ঘাৎ কাঠ নিয়ে ফেরার সময় তারা কোনোরকম বাধার সম্মুখীন হয়েছে। নইলে ফিরতে এত দেরি হবে কেন? হঠাৎ হৈ হট্টগোল কানে এল। দুটো ঘোড়া হ্রদের তীর ঘেঁষে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই চমকে ওঠলাম। সর্বনাশ! এযে আমাদের গাড়িরই ঘোড়া দুটো। পরমুহূর্তেই কাঠ বাহক দুজনকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসতে দেখা গেল। আমরা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বুঝলাম তারা নির্ঘাৎ টের পেয়েছে। পুলিশ এসেছে।

আমি মরিয়া হয়ে হাঁক দিলাম, 'ধর! ধর! যেন পালাতে না পারে।'

ঝট করে কাঁধ থেকে কাঠের বোঝা ফেলে দিয়ে তারা পিস্তল টেনে হাতে নিয়ে নিল। এলোপাথারি গুলি চালাতে লাগল। জন হার্টের পায়ে গুলি লাগল।

www.pathagar.com

আমাদের পিস্তলও গর্জে উঠল। চলল উভয় পক্ষের গুলি বিনিময়। আমাদের গুলি তাদের কারো গায়ে আঘাত করতে পারল না। তারা দৌড়ে গিয়ে এক লাফে নোঙরের দড়ি ধরে ঝুলতে লাগল। নোঙর তোলার সুযোগ পেল না। আমি আর ন্যাব ওয়াকার অতিকায় কালো বস্তুটাকে আটকে রাখার জন্য শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে দড়িটাকে টেনে ধরে রাখলাম।

পরিস্থিতি জটিল দেখে ডেকের ওপর থেকে ক্যাপ্টেন অনবরত গুলি চালাতে লাগলেন। বরাত ভাল, অন্ধকারের বাধা থাকায় আমাদের কারোর গায়ে গুলি লাগল না। আমরা প্রাণপণে দড়ি টেনে বোটটাকে কাছে আনতে লাগলাম। কপলের ফের। টানাটানিতে আচমকা পাথরের খাঁজ থেকে নোঙর আলগা হয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল। নোঙরের হেঁচকা টানে আমি ঝপাং করে জলে পড়ে গেলাম।

নিমেষের মধ্যে আতঙ্ক অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল।

আমি যে কতক্ষণ জলের তলায় ছিলাম, বলতে পারব না। জল থেকে কীভাবে ওপরে উঠে এসেছি তা-ও আমার জানা নেই।

* * *

আমি এক সময় চোখ মেলে তাকালাম দেখি, ছোট্ট একটা কেবিনের চৌপায়ার ওপর শুয়ে। ধারে কাছে কেউ-ই নেই। কেবিনটার দরজা বন্ধ। সূর্যটা তখনও বেশি ওপরে ওঠে নি। ভাবলাম আমি তবে কোথায়? আতঙ্কর ডেকে? আমার সঙ্গীরা? তারা হয়ত আইরি হ্রদের জলে আমার মৃতদেহ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হ্যাঁ, আমি যে 'আতঙ্ক'র কেবিনে বন্দি রয়েছি এতে কোনো সন্দেহই রইল না। কিন্তু এটা এখন কোথায়? তবে তরল পদার্থের ওপর দিয়ে যে এটা পথ পাড়ি দিচ্ছে সে বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু যে-তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে 'আতঙ্ক' চলেছে তাকে তো জল বলে মনে হচ্ছে না। সূর্যের আলো পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। পোর্টহোল কি ডুবে গেছে? মোটরগাড়ির মতো যন্ত্রযানটা রাস্তা দিয়ে চললে কম-বেশী ঝাঁকুনি লাগতই। তবে? এর উত্তর জানার জন্য দরজা খোলার চেষ্টা করতে ভরসা হল না। তা ছাড়া বাইরে দিয়ে হয়ত তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মাথার ওপরের ঢাকনা চৌপায়ার ওপর দাঁড়িয়ে ওপরের ঢাকনা খুলে বাইরের দিকে চোখ ফেলতেই দেখি, চারদিকে জল আর জল, ডাঙার চিহ্নও নেই। বহুদূরে সাগর আর আকাশ মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। একী সমুদ্র, নাকি হ্রদ তা-ও বোঝার উপায় নেই।

দু-চার ফোঁটা জল ছিটকে আমার গায়ে এসে পড়তে লাগল। তারই এক ফোঁটা আঙুল দিয়ে তুলে জিভের সঙ্গে লাগাতেই বুঝে নিলাম, জল নোনতা নয়, তবে? তবে কি আতঙ্ক আইরি হ্রদের জলেই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে? ক্রিকের আস্তানা থেকে রওনা হবার পর ঘন্টা আটেক সময় পেরিয়ে গেছে। আজ তবে জুলাইয়ের আটত্রিশ তারিখ। আইরি হ্রদটা দুশো কুড়ি মাইল লম্বা। পঞ্চাশ মাইলের বেশি চওড়া। উত্তর-পশ্চিমের কানাডা এবং দক্ষিণ-পূর্বের যুক্তরাষ্ট্র কিছুই চোখে পড়ছে না।

দেখলাম, মাত্র দুজন ডেকে দাঁড়িয়ে। একজন পিছন দিকে রয়েছে আর অন্যজন গলুইয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে নজর রাখছে। একটু বাদে গলুইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। বেশ একটু গম্ভীর স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'ক্যাপ্টেন কোথায়?'

www.pathagar.com

লোকটা আমার কথা বুঝতে পারে নি এমন এক ভান করে তাকিয়ে রইল। কিন্তু বুঝতে না পারার তো কথা নয়। গতরাত্রি এদের ইংরেজিতে কথা বলতে শুনেছি। তব একটা ব্যাপার অবাক না হয়ে পারলাম না। আমি মাথার ওপরের ডালা তুলে কেবিন থেকে বেরাবার সময় লোকটা আমাকে দেখছে। কিন্তু টু শব্দটিও করে নি।

লোকটা আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হাতে ইশারা করল, দূরে সরে যাবার জন্য।

বাধ্য হয়ে তার কাছ থেকে চলে এলাম। পালানোই যখন যাবে না তখন যন্ত্রযান 'আতঙ্ক'কে ঘুরে ঘুরে দেখে নিতে লাগলাম।

দেখলাম, ডেকের ওপরে যেসব জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে সবই অজ্ঞাত কোনো ধাতু দিয়ে তৈরি। হাত দিয়ে ধরেও বুঝতে পারলাম না কোন ধাতু।

একটা ধাতব সিঁড়ি। নিচের মেশিনরুমে নেমে গেছে। সামনে একটা পেরিস্কোপের চূঁড়ো নজরে পড়ল। গলুইয়ে আর একটা ঢাকনা দেখতে পেলাম। তৃতীয় ঢাকনা। পিছিয়ে গিয়ে সামান্য এগিয়েই আরও একটা দেখা গেল। ঢাকনার নিচে দুটো কেবিন। ডেকের ওপরে যারা দাঁড়িয়ে তাদের থাকার জায়গা।

যে যন্ত্রটা আতঙ্ককে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সেটাকে খুঁজে পেলাম না। প্রপেলারও চোখে পড়ল না। যন্ত্রটা তীরবেগে ছুটে চলেছে। পিছনে সুদীর্ঘ জললেখা তৈরি হচ্ছে। জলযানটার গঠন প্রকৃতি ছবির মতো। অনায়াসে জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রেও এটা নির্বিবাদে চলতে সক্ষম। ঢেউয়ের ওপর বা তলা, কোনো জায়গা দিয়েই এর চলতে অসুবিধা হয় না।

আশ্চর্য ব্যাপার! এমন অতুলনীয় গতির উৎস কি জানা গেল না। মোটরগাড়ি বা ডুবোজাহাজে যে তেল ব্যবহার করা হয় সেরকম কোনো গন্ধই নাকে লাগল না। তবে নির্ঘাৎ বিদ্যুৎ শক্তির জোরেই জলযান 'আতঙ্ক' এমন তীরবেগে ছুটে যেতে পারে।

আর এর ভেতরেই বিদ্যুৎ তৈরি করা হচ্ছে। ব্যাটারি? অ্যাকুমুলেটর বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করছে? জল বা বায়ুমণ্ডল থেকে অজ্ঞাত কোনো উপায়ে বিদ্যুৎ শক্তি আহরণ করে নেওয়া হচ্ছে। আর তাকে যন্ত্রের ভেতরেই তৈরি করা হচ্ছে। হন্যে হয়ে সে-শক্তির উৎসের খোঁজ করলাম। না, হতাশ হতেই হল। পাইনি, কোনোদিন তার খোঁজ পাবও না। আমার পক্ষে কি কোনোদিন যান্ত্রিক শক্তির গোপন রহস্য ভেদ করা সম্ভব হবে?

ওদিকে মি. ওয়ার্ড আমার ব্যর্থতা ও চরম দুর্গতির কথা জানতে পেরে কি করছেন, ভাবনাটা মনের কোণে ভেসে উঠল। মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লড-ক কব্জা করার জন্য তিনি নতুন কোনো পথের কথা ভাবছেন কিনা তাই বা কে জানে। ক্যাপ্টেনের দেখা পাবার আশায় ডেকে দাঁড়িয়ে এমন বহু এলোমেলো কথা ভাবতে লাগলাম। না, ক্যাপ্টেনের দেখা মিলল না। তবে কি তিনি কোনোদিনই আমাকে দেখা দেবেন না? আর মুক্তি না দিয়ে আমৃত্যু এখানেই আটকে রাখবেন মনস্থ করেছেন? তবে? সুযোগ মত যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করব তারও উপায় নেই। অন্তহীন জলরাশি অতিক্রম করে কোনোদিনই ডাঙায় উঠতে পারব না। আরও এক চিন্তা মাথায় এল। ক্যাপ্টেন আমার মুখোমুখি হলে কেমন আচরণ করবেন, ভাববার বিষয় বটে।

না, পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, উচিত নয়। কারণ, যন্ত্রযান 'আতঙ্ক'র গুহ্য রহস্য না জেনে পালিয়ে গিয়ে লাভই বা কি? অভিযানে সামান্যতম অংশও সফল হই নি। রহস্যের জালের বাইরে ছিলাম। এখন তার ভেতরে অবস্থান করছি। ব্যস, এটুকুই এখন পর্যন্ত সান্ত্বনা।

www.pathagar.com

সূর্য মূল মধ্যরেখা অতিক্রম করে গেল। নির্মেঘ আকাশ। ঝলমলে রোদ চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। উভয় দিকে তীরের রেখা এখনও গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে আমেরিকা বা কানাডা কোনো তীরই এখনও নজরে পড়ছে না। ক্যাপ্টেনের ধান্ধাটাই তো এখনও বুঝতে পারছি না। তিনি আদৌ আমার মুখোমুখি হবেন না? কেন? সারাদিন আড়ালে থেকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে তিনি আড়ালে থেকেই আমাকে তীরে নামিয়ে দেবেন?

দুপুর দুটোয় আমাকে অবাক করে দিয়ে বহু আকাঙ্ক্ষিত ক্যাপ্টেন হঠাৎ আবির্ভূত হলেন। আমি আরও স্তম্ভিত হলাম যখন দেখলাম তিনি আমার দিকে না তাকিয়েই কাঁটামারা বুটে গম্ভীর আওয়াজ তুলে এগিয়ে গেলেন। তার সঙ্গে লোকটা ঢাকনা খুলে ডেকে নেমে গেল। ক্যাপ্টেন কম্পাসের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকালেন। কি যেন ভেবে যন্ত্রযান আতঙ্কর মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে দিলেন।

ক্যাপ্টেন আমাকে চিনতে পেরেছেন। আমিই যে গ্রেট আইরির রহস্যভেদের দায়িত্ব নিয়ে অভিযানে গিয়েছিলাম এব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ। আমারও আর কোনোই সন্দেহ রইল না, যে এ লোকটিই আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আমার ওপর কড়া নজর রাখতেন। আমার মনে হল, কথা বললে আমি যদি তাঁর কাছে মুক্তির জন্য আব্দার করে বসি। আর তাঁর সম্বন্ধে আমি যতটুকু জেনেছি বা বুঝেছি তা যদি সভ্য মানুষের কাছে ফাঁস করে দিই, সেজন্যই হয়ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আমাকে বন্দি করে রেখেছেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমি বুকে সাহস সঞ্চার করে দ্রুত-পায়ে ক্যাপ্টেনের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালাম। বেশ একটু রাগতস্বরেই বললাম, 'আপনিই তো এ জাহাজের ক্যাপ্টেন? আর এর নাম 'আতঙ্ক', ঠিক কি না?' ক্যাপ্টেন নীরব রইলেন। আমি তাঁর হাত ধরেতে চাইলাম। বিতৃষ্ণা ভরে আমার হাতটা সরিয়ে দিলেন।

আমি এবার কণ্ঠস্বরে রীতিমতো উষ্মা প্রকাশ করেই বললাম, 'আমাকে এখানে কয়েদ করে রাখার উদ্দেশ্য কি? আমাকে নিয়ে কি করতে চাইছেন, বলবেন কি?'

আমার এবারের প্রশ্নেরও কোনো জবাব না দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ঝট করে রেগুলেটরের মতো একটা যন্ত্রের হাতল ঘুরিয়ে দিলেন। ব্যস, আতঙ্কর গতি আরও বেড়ে গেল। উল্কার বেগে ছুটে চলল যন্ত্রযানটা।

ক্যাপ্টেনের আচরণে, তাঁর ঔদ্ধত্ব দেখে মাথায় খুন চেপে যাওয়ার জোগার হল। অনেক ক্যাপ্টেন নিজেকে সামলে নিলাম। এছাড়া উপায়ও তো নেই।

* * *

আতঙ্ক উল্কার বেগে ছুটে চলছে তো চলছেই। তার এ-চলার বুঝি বিরাম নেই, শেষও নেই। ক্যাপ্টেন আবার গোপন অন্তরালে চলে গেলেন। চালক আবার ডেকে ফিরে এল। বার বার এদিক-ওদিক নজর ফিরিয়ে দেখে নিচ্ছে, ইঞ্জিন ঠিক মতো কাজ করছে কিনা। আতঙ্কর গতিমুখ অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। মনে হল বাফেলোতেই গিয়ে থামবে। সত্যি কি তাই?

বাফেলোর মতো জনবহুল স্থানে ক্যাপ্টেন যাবে কি ? নইলে যেতে হয় নায়েগ্রা জলপ্রপাতে। সেখানে অবশ্যই যাবেন না। কারণ, নায়েগ্রার কাছে গায়ের জোর ও গোয়ারতুমি খাটবে না। আইরি হ্রদ থেকে পালাবার একমাত্র পথ ড্রেট্রয়েট নদী। কিন্তু আতঙ্ক যে সে পথ ছেড়ে ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন আবার রাত্রি নামলে পাড়ে

www.pathagar.com

নামার ধান্ধায় নেই তো? জলযান আতঙ্ককে স্থলযানে পরিণত করে তীরবেগে চালিয়ে নিয়ে যাবেন। তাই যদি হয় তবে ডাঙায় অবস্থান করার সময়েই আমাকে সুযোগ বুঝে কেটে পড়েত হবে। আইরি হ্রদের উত্তর পূর্বাঞ্চল আমার খুবই পরিচিতি জায়গা। তবে মনে হচ্ছে, আতঙ্ক নায়েগ্রার তীরভূমি পর্যন্ত যাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। সেখানে যাওয়ার অর্থ মরণফাঁদে মাথা গলিয়ে দেওয়া।

ব্যাপারটা আমার কাছে কিছুতেই খোলসা হচ্ছে না। ক্যাপ্টেন আমাকে শাসিয়ে এমন চিঠি কেন লিখতে গেলেন? কেনই বা আমার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে টিকটিকির মতো আর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন? কেনই বা আমার প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে সটকে পড়লেন? গ্রেট আইরির রহস্যজনক ঘটনার সঙ্গেই বা তাঁর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে? কিরডাল হ্রদের তলদেশ দিয়ে না হয় যাতায়াতের সুড়ঙ্গ রয়েছে। কিন্তু আইরির অজেয় চূড়া ডিঙিয়ে এলেন কীভাবে? তাই কি? তবে? তবে কি ক্যাপ্টেন বন্দরের দিকে না এগিয়ে পাশ কাটিয়ে সটকে পড়তে লাগলেন। আতঙ্ক এমন পাতলা, জলের সঙ্গে মিশে থাকে যে, এক মাইল দূর থেকেও এটা চোখে পড়ে না।

না, আতঙ্কর মুখ ঘুরিয়ে আবার ও বাফেলোর দিকেই ছুটে চলেছে। নাকি বন্দরের কাছাকাছি গিয়ে ঝট করে তাঁর জলযানের মুখ ঘুরিয়ে সটকে পড়বে। ক্যাপ্টেনের দৃঢ় বিশ্বাস, নৌকা বা অন্য কোনো স্থলযান তাকে আক্রমণ করলে চোখের পলকে সটকে পড়ার হিম্মৎ তার আছে।

একটু বাদেই আমি সচকিত হয়ে অগ্রসরমান অদূরবর্তী দুটো কালো বস্তুর দিকে অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকালাম। কালো বস্তু দুটো আতঙ্ককে লক্ষ্য করে দুদিন থেকে এগিয়ে আসছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে দুটো স্পষ্ট হয়ে ওঠায় চিনতে পারলাম, দুটোই টর্পেডো ডেস্ট্রয়ার। মি. ওয়ার্ড কি তবে এ দুটোর কথাই আমাকে বলেছিলেন?

ক্যাপ্টেন ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে নিজেই হালের চাকা ধরলেন। আর তাঁর সঙ্গী দুজন গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ডেকের সামনে আর পিছন দিকে। আর আমি, আমার গতি কি হবে? আমার অন্যত্র সরে পড়ার হুকুম আছে কিনা তাও তো জানা নেই। আসলে আমাকে নিয়ে কেউই ভাবিত নয়। টর্পেডো ডেস্ট্রয়ার দুটো ইতিমধ্যে কামানের গোলার আওতায় এনে ফেলেছে। এবার কামান দাগলেই কাজ হাসিল।

আশ্চর্য ব্যাপার! এমন চরম সঙ্কট মুহূর্তে ক্যাপ্টেনের মুখে সামান্যতম আতঙ্কের ছাপও দেখলাম না। তাঁর কাছে এটা যে খুবই মামুলি একটা ব্যাপার।

টর্পেডো ডেস্ট্রয়ার দুটো আরও এগিয়ে আসতেই যন্ত্রযান আতঙ্ক অদ্ভুত উপায়ে ইয়া লম্বা এক লাফ দিয়ে আনেকখানি এগিয়ে গেল। তারপর গতিবেগ বাড়িয়ে উল্কার বেগে ছুটে চলল। আমি বুঝে নিলাম, ক্যাপ্টেন টর্পেডো দুটোকে লেজে খেলিয়ে এক সময় টুপ করে আতঙ্ককে জলের তলায় নিয়ে যাওয়ার ধান্ধায় রয়েছে।

হ্যাঁ, আমার অনুমান অভ্রান্ত। যন্ত্রযান আতঙ্ক সত্যি সত্যি জলে ডুব দিল। আমরা অতল জলে তলিয়ে গেলাম। মিনিট দশেকের মধ্যেই ক্যাপ্টেন আর তাঁর সঙ্গীদের হতাশা মিশ্রিত উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তা কানে এল। তাদের বক্তব্য আতঙ্কর কোনো কোনো যন্ত্র ঠিকঠাক কাজ করছে না। ইঞ্জিন থেকেও অবাঞ্ছিত কর্কশ আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। নিঃসন্দেহ হলাম, যন্ত্রপাতি এমন বিগড়েছে যে, আতঙ্ককে ওপরে তুলে নেয়া ছাড়া গত্যান্তর নেই।

হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন তার সাধের আতঙ্ককে জলের ওপরে তুলেই নিলেন। আমি দেখলাম,

www.pathagar.com

মওকা হাতের মুঠোয়। হ্যাচের মুখ খোলা। সুযোগের সদ্ব্যবহার অনায়াসেই করা যেতে পারে। মই বেয়ে তরতর করে নেমে ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়া যেতে পারে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না।

ক্যাপ্টেন আতঙ্কর গতিবেগ বৃদ্ধি করলেন না। অবাক না হয়ে পারলাম না। তবে কি তিনি তার জলযানটাকে ডাঙায় তুলে স্থলযানে রূপান্তরিত করে চম্পট দেওয়ার ধান্ধা খুঁজছেন। এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? টেলিগ্রাম মারফৎ খবর ছড়িয়ে পড়বে। তার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াবে সেনা বিভাগের শক্তিশালী বহু স্থলযান। তখন?

আতঙ্ক ইতিমধ্যেই আইরি দুর্গ ছাড়িয়ে এসেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে গেল। আতঙ্কর পক্ষে আর পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ডেস্ট্রয়ার দুটো কামান বাগিয়ে দুদিক থেকে তেড়ে আসছে। তাদের কামান্ডাররা অবশ্য জানেন না যে, আতঙ্কর যন্ত্রপাতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

মর্জিমাফিক এটাকে ডুবোজাহাজে পরিণত করা সম্ভব নয়। তাই বাজপাখির মতো সতর্ক দৃষ্টি রেখে তারা এগিয়ে আসছে।

আতঙ্কর যন্ত্রপাতি যতই শক্তিশালী হোক না কেন জলপ্রপাতের ভয়ঙ্করতাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। জলপ্রপাত অনবরত তীব্রস্বরে গর্জন করে চলেছে। দুশো ফুট ওপর থেকে আছড়ে পড়া জলপ্রপাতের মধ্যে পড়লে আতঙ্ক নিমেষে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এখনও তীর ভূমিতে উঠে স্থলযান হয়ে কেটে পড়ার সময়-সুযোগ আছে। আমি তীব্র উত্তেজনায় থরথরিয়ে কাঁপতে লাগলাম। তবে কি আতঙ্ক নেভা আইল্যান্ড অবধি গেলে জলে জাঁপিয়ে পড়ে পাড়ে ওঠার চেষ্টা করব? আমি এ সুযোগেরও যদি সদ্ব্যবহার না করি তবে কি মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লড আমাকে কোনোদিন স্বেচ্ছায় মুক্তি দেবেন?

না, পালিয়ে যাওয়া বোধ হয় আর হয়ে উঠল না। আমাকে কেবিনে কয়েদ করে রাখে নি সত্য। কিন্তু নজরবন্দি যে রেখেছে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

একদিক থেকে জলপ্রপাতের সুতীব্র গর্জন আর অন্যদিক থেকে টর্পেডো ডেস্ট্রয়ারের গুরুগম্ভীর শব্দ আমার মধ্যে যে ভীতির সঞ্চার করেছে তা অস্বীকার করলে সত্য গোপন করাই হবে।

জলপ্রপাত থেকে ডেস্ট্রয়ার দুটোর ব্যবধান মাত্র দু শো ফুট। এবার শুরু হল ডেস্ট্রয়ার দুটো থেকে ঘন ঘন কামান দাগা। কামানের গোলাগুলো আতঙ্কর মাথার ওপর দিয়ে বিকট আওয়াজ তুলে ছুটে যেতে লাগল।

সামনেই থ্রি সিস্টার্স দ্বীপ। আমি বরাত ঠুকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলাম। না, হল না। আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। পিছন থেকে কে যেন আমাকে সাঁড়াশীর মতো আঁকড়ে ধরে ফেলল।

পর মুহূর্তেই অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আতঙ্কর দুপাশ থেকে দুটো ডানা বেরিয়ে এল। ব্যস, ডানা দুটোর ওপর ভর দিয়ে জলযান আতঙ্ক আকাশযানে পরিণত হয়ে শূন্যে উড়ে চলল।

* * *

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, আতঙ্ক নড়াচড়া করছে না, নিশ্চল নিথরভাবে যেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। ভাবলাম, তবে কি মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লড এমন কোনো গোপন ঘাটিতে যন্ত্রযানকে দাঁড় করিয়েছেন যার খোঁজ কারো পক্ষেই পাওয়া সম্ভব নয়। তবে কি এবার তাঁর গোপনতম রহস্য ভেদ করা সম্ভব হবে?

www.pathagar.com

একটা ব্যাপার, ভদ্রলোক কিন্তু আমাকে নিয়ে কিছুমাত্রও ভাবিত নন। কিন্তু আমার ঘুম দেখে আমি নিজেই কৌতূহল বোধ করতে লাগলাম। এত ঘুমও মানুষ ঘুমোতে পারেন? তবে কি আমার খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে? আকাশপথে কোনোদিকে ও কোথায় চলেছি তা যাতে আমি বুঝতে না পারি তার জন্যই হয়ত এ-পথ তিনি বেছে নিয়েছেন।

আমি যত দেখছি, ততই যেন অবাক হচ্ছি। একী যন্ত্রযান! জলে, স্থলে আর শূন্যে চলতে পারে এ যে চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে উৎসাহ পাওয়া যায় না। ক্যাপ্টেনের এ কী অবিশ্বাস্য আবিষ্কার। সামান্য একটা বোতাম টিপতে না টিপতে জলের মাছ আকাশের পাখি হয়ে বাতাসে ভর করে উড়ে যেতে পারে—এ কী যে-সে ব্যাপার নাকি! তবে নিজের চোখ দুটোকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না? এটাই তো তবে ক্যাঙারু হয়ে মোটর রেসে বাজিমাৎ করেছিল। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে অনেক কায়দা কসরৎ দেখেছি বটে। কিন্তু আসল রহস্যটা এখনও দেখার সৌভাগ্য হয় নি। তিনি কোথা থেকে, কোন শক্তি আহরণ করেছেন, যা দিয়ে যন্ত্রযানকে সচল রেখে ত্রিভুবন জয় করছেন। আর তার পরিচয় জানাও আজ অবধি সম্ভব হল না। আর কিসের প্রেরণাতেই বা তিনি এমন উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছেন তাও জানতে পারি নি। এত কীর্তির পর তিনি যদি মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লড খেতাব গ্রহণ করে থাকেন তবে অবাক হবার তো কিছুই থাকতে পারে না। পৃথিবীর কোনো মানুষ সে-যন্ত্রের আবিষ্কার তো দূরের ব্যাপার, ভাবতেও পারে নি যে তিনি কি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন? তাই তাঁর মতো এক শক্তিমান অর্থ বা সোনাদানায় বশীভূত হবেন তা যে ভাবাই যায় না। কোটি কোটি মুদ্রা থেকে নিজেকে দূরে রাখা একমাত্র তাঁর মতো মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

আমি রাত্রি-দিনের একটা বড় ভগ্নাংশই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকি। তাই আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, একত্রিশে জুলাই রাত্রে কোনোদিকে, কোনো পথে বাকি পথটুকু পাড়ি দিয়েছিলাম, শূন্যপথে হ্রদের জলের ওপর দিয়ে, নাকি আমেরিকার সড়কে মানুষের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলাম কিনা—কিছু আমি বুঝতে পারি নি। আমার বরাতে যে শেষপর্যন্ত কি আছে তা-ও আমার অজানা।

আমাকে যে জানতেই হবে, যন্ত্রযান কোথায় নেমেছে, কোথায়ই বা অবস্থান করছে? সচল যান কেন হঠাৎ নিশ্চল নিথর হয়ে পড়ল? ডেকে উঠে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেই হবে।

মই-বেয়ে উঠে ওপরের ঢাকনা খুলতে গিয়ে হতাশ হলাম। ওপর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেবিনের দরজা তো অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছে। বুঝলাম, আবার যাত্রা শুরু না করা পর্যন্ত আমাকে কয়েদ থাকতে হবেই। নিঃসন্দেহ হলাম, পালাতে পারছি না। আতঙ্ক চলমান থাকলে তো পালানোর প্রশ্নই ওঠে না।

প্রায় সোয়া ঘণ্টা পরে লোহার খিল খোলার আওয়াজ কানে এল। দেখলাম, কেবিনের ওপরের ঢাকনাটা খুলে যাচ্ছে। যন্ত্রচালিতের মতো লাফিয়ে কেবিনের বাইরে বেরিয়ে এলাম। লম্বা লম্বা পায়ে হাজির হলাম ডেকের ওপরে। দেখলাম, বৃত্তাকার একটা পর্বতগহ্বরে যন্ত্রযান আতঙ্ক চুপচাপ দাঁড়িয়ে। গহ্বরটার পরিধি প্রায় আঠারো শো ফুট। নিরেট পাথরের দেওয়া। গহ্বরটাকে বৃত্তাকার না বলে ডিম্বাকার বলাই উচিত।

আগস্টের পয়লা তারিখ। তবু কনকনে শীত। বুঝলাম, উত্তর মেরুতে অবস্থান করছি আমরা। আবার জায়গাটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে। তবে নতুন মহাদেশের

www.pathagar.com

বাইরে আসি নি। কিন্তু ঠিক কোনো অঞ্চলে আমরা অবস্থান করছি তা অনুমান করাও আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

এমন সময়ে ক্যাপ্টেন একটা গর্ত থেকে বেরিয়ে এলেন। ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমার মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল, মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লড মাঝে মধ্যেই এখানে এসে বিশ্রাম নেন।

একটু বাদেই ক্যাপ্টেন এবং তাঁর সঙ্গী দুজন আবার গর্তটার মধ্যে ঢুকে গেলেন। মাঝখানে দু-একদিন আমার ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছিল সত্য। কিন্তু এখন তো স্বাধীন। তার ওপর তাঁরা অন্তরালে চলে গেছেন। অতএব এ মওকায় যন্ত্রযান আতঙ্ককে ভাল করে দেখে নিলে কেমন হয়?

আমার কেবিনের ঢাকনা ছাড়া বাকিগুলো বন্ধ। অতএব আতঙ্কর ভেতরের কলকব্জা দেখা সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়ে প্রপেলারটাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিতে লাগলাম। কোন ধরনের প্রপেলার এমন শক্তিশালী যন্ত্রযানটাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, সেটাকেই দেখতে লাগলাম। যন্ত্রযানটার বহিরাকৃতি চুরুটের মতো লম্বাটে একথা তো আগেই বলে রেখেছি। পিছনের তুলনায় মুখের দিকটা বেশি মাত্রায় সরু। এলুমিনিয়ামের পাত দিয়ে তার বাইরের দিকটা মুড়ে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ডানা দুটো অন্য ধাতুর তৈরি। অজানা, অচেনা ধাতু। পুরো যন্ত্রযানটা চারটে চাকার ওপরে অবস্থান করছে। দুফুট ব্যাসযুক্ত বাতাসভর্তি রবারের চাকা। ঘুরন্ত কয়েকটা প্যাডেল জলে বা স্থলে চলার সময় যন্ত্রযানটাকে ঠেলে সামনের দিকে নিয়ে যায়। প্রপেলার নয়, চাকাগুলোই প্রধান ভূমিকা পালন করে। সামনে আর পিছনে দুটো শক্তিশালী টারবাইন ব্যবহার করা হয়েছে। এরাই প্রপেলার দুটোকে ঘোরায়। শূন্যে ওড়ার সময় ডানা দুটোকে ভাঁজ করে ডেকের ওপর রেখে দেওয়া হয়। আতঙ্কর উদ্ভাবক প্রমাণ করে দিয়েছেন, বাতাসের চেয়ে ভারি যন্ত্রকে বাতাসে বাসিয়ে রাখা সম্ভব। আর পাখির চেয়ে দ্রুতগতিতে উড়তেও পারে।

কোনো শক্তির বলে এরকম জটিল কলকব্জা চলে? অবশ্যই বিদ্যুতের সাহায্যে। সন্দেহের আর অবকাশ রইল না। বিদ্যুতের সাহায্যেই যন্ত্রযান আতঙ্ক জলে ও স্থলে ও অন্তরীক্ষে চলাচল করে। তাই যদি সত্য হয় তবে এত বিদ্যুৎশক্তি তিনি কোথায় পান? তবে কি ব্যাটারির সাহায্যে তিনি এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটান? কিন্তু অন্য কোনো গোপন অন্তরালে বিদ্যুতের কারখানা নেই তো? নাকি নতুন কোনো ধরনের ডায়নামো থেকে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করে নিচ্ছেন?

পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হল। আশা অনুযায়ী সব জানতে পারি নি। তিনটে মাত্র ব্যাপার জানতে পারলাম—যন্ত্রযানটা চাকার ওপর ভর দিয়ে স্থলে চলে, টারবাইন প্রপেলার দিয়ে জল কেটে কেটে, ডানার ওপর ভর করে শূন্যে ওড়ে। ব্যস, এর বেশি কিছু জানা সম্ভব হল না। আর জেনেই বা ফয়দা কি? আমি যে কয়েদ হয়ে রয়েছি। মুক্তি পেলে তবে তো অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারব। তবে মুক্তি আমাকে পেতেই হবে। পালাব। পালাতে আমাকে হবেই। কিন্তু উপায় কি? চলন্ত যান থেকে যা পারি নি তা বিশ্রামরত যান থেকে কি আর সক্ষম হব?

প্রথমে একটা ব্যাপারের ফয়সালা করা যাক। আমি এখন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অঞ্চলে অবস্থান করছি? গর্তটা কোনো দেশে? আকাশপথ ছাড়া বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কি সম্ভব? উড়ন্ত যান্ত্রযান ছাড়া কি গহ্বরটা থেকে বেরনো সম্ভব?

www.pathagar.com

যন্ত্রযান আতঙ্ক নির্ঘাৎ ডানার ওপর ভর দিয়ে কয়েক শো লিগ পাড়ি দিয়েছে। সে না হয় হল। তবে কোনোদিকে এসেছে?

আচমকা একটা আশঙ্কা আমার মাথায় খেলে গেল, গ্রেট আইরি পর্বত ছাড়া তো নিশ্চিন্ত ঘাটি আতঙ্কর পক্ষে অন্য কোনো জায়গাই থাকতে পারে না। পুলিশের পক্ষে যে জায়গা দুর্লঙ্ঘ সে জায়গায় যন্ত্রযান আতঙ্ক অনায়াসে পৌছে যেতে সক্ষম। অতএব মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লডের পক্ষে সে-জায়গা নির্বাচন করাই তো স্বাভাবিক। নায়েগ্রা জলপ্রপাত থেকে ব্লু রিজ মাউন্টেনের দূরত্ব সাড়ে চার শো মাইল। আতঙ্ক এক রাত্রেই পাড়ি দিতে সক্ষম। এখন আর কোনো ঘটনাই আমার কাছে অবিশ্বাস্য বোধ হচ্ছে না। গ্রেট আইরি পর্বতটাকে নিয়ে অনেক কথাই তো শুনেছি। গ্রেট আইরি সম্বন্ধে আমাকে শাসিয়ে লেখা চিঠিটার সঙ্গে আইরি হ্রদের ব্যাপার-স্যাপার সম্বন্ধে আর কোনো দ্বিধা থাকতে পারে কি? কেন আমার পিছনে টিকটিকি দুটো লেগেছিল? কেনই বা গ্রেট আইরি রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়ে উঠেছিল? সবকিছু আমার চোখের সামনে যেন ক্রমেই স্বচ্ছ হয়ে আসতে লাগল। সামান্য দ্বিধা থাকলেও বুঝতে পারছি, মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লড গ্রেট আইরির এ-গহ্বরটাতে বসেই আমাকে সতর্ক করে সে চিঠিটা লিখেছিলেন। আর আমি এখন সেখানেই অবস্থান করছি। এই সেই ভীতি ও রহস্যসঞ্চারকারী আইরি—গ্রেট আইরি।

বহু চেষ্টা করেও এক সময় যে পাহাড়ের উদরে ঢুকতে পারিনি, আজ কি সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে? যন্ত্রযান আতঙ্কর কাঁধে ভর না দিয়ে গহ্বর থেকে বেরনো সম্ভব হবে কি?

পাথরের প্রাচীরটাকে পরিক্রমা করতে গিয়ে দেখলাম, পাথরের গায়ে অসংখ্য ফটল আর গর্ত রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, গহ্বরটা কতখানি গভীর, পাথরের দেওয়ালের উচ্চতাই বা কত—কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না। হাতিয়ে হাতিয়ে বুঝলাম, দেওয়ালের গায়ের গর্তগুলো বেশি গভীর নয়। মানুষের জমানো আবর্জনায় ভর্তি। বালির ওপর মানুষের পায়ের ছাপ। নিঃসন্দেহ হলাম, এগুলো নির্ঘাৎ ক্যাপ্টেন আর তাঁর দুই সঙ্গীর পায়ের ছাপ। তবে কয়েক মাস আগেকার, টাটকা মনে হল না।

একটু বাদেই ক্যাপ্টেন ও তাঁর সঙ্গীরা একটা বোঝা নিয়ে ফিরে এলেন। মনে হল এবার এখান থেকে নোঙর তুলে যাত্রা করবেন।

আমি লক্ষ্য করলাম, গহ্বরটায় রাশিকৃত ছাই, পোড়াকাঠ আর কাঠের খুঁটিতে মরচে ধরা কিছু লোহার পাত লাগানো রয়েছে। আর মনে হল ছোট ছোট কিছু যন্ত্রপাতির ধ্বংসাবশেষ,আগুনে ধ্বংস হয়ে গেছে। অতীতে কোনো একসময় গহ্বরটায় আগুনের খেলা চলেছিল। তারই উত্তাপে যন্ত্রাংশগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। এ কি দুর্ঘটনা, নাকি ইচ্ছে করেই কাণ্ডটা করা হয়েছে বোঝা গেল না। এই হচ্ছে গ্রেট আইরির মাথার সেই-আগুনের রহস্য। এ আগুনের শিখা দেখেই গ্রামবাসীরা ভয়ে মিইয়ে গিয়েছিল। এসব যন্ত্রাংশ কোনো যন্ত্রের? কেনই বা ধ্বংস করে দেওয়া হল?

হঠাৎ সূর্যের আলো চোখে লাগল। ওপরের দিকে চোখ ফেরাতেই বুঝে নিলাম পাথরের প্রাচীরটা প্রায় এক শো ফুট উঁচু।

যন্ত্রযান আতঙ্ক যে এক রাত্রের মধ্যেই আইরি হ্রদ থেকে গ্রেট আইরি পর্বতে উড়ে এসেছে সে সম্বন্ধে আর কোনোই সন্দেহ রইল না। গ্রেট আইরির উদরেই সে আশ্রয় নিয়েছে। ক্যাপ্টেনের আবিষ্কৃত এটা অত্যাশ্চর্য ও অতিকায় পাখিটার উপযুক্ত আশ্রয়স্থলই

www.pathagar.com

বটে। তিনি হয়ত পায়ে হেঁটে গ্রেট আইরির বাইরে যাওয়ার পথও আবিষ্কার করে ফেলেছেন। আর সে পথেই দৈত্যাকৃতি পাখিটাকে রেখে হয়ত বা সঙ্গীদের নিয়ে লোকালয়ে যাতায়াত করেন। তিনি তো নিঃসন্দেহ, সেখানে ঢোকার হিম্মৎ কারোরই নেই।

আমি গ্রেট আইরির উদরে প্রবেশ-পথ আবিষ্কার করতে পারলে মাস্টার অব দ্য ওয়ালর্ডের জারিজুরি ফাঁস করে ছাড়তাম।

হঠাৎ আমার মধ্যে নিদারুণ অস্থিরতা ভর করল। ভাবলাম, যন্ত্রযান আতঙ্ককে ধ্বংস করার এই অপূর্ব সুযোগ। পৃথিবীর বুকে আর যাতে সন্ত্রাস সৃষ্টি না করতে পারে তার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করার এটাই উপযুক্ত সময়। .

এমন সময় যন্ত্রচালিতের মতো আমার সামনে এসে গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে পড়লেন দানবাকৃতি পাখিটার আবিষ্কর্তা ও স্বত্বাধিকারী। গম্ভীর স্বরে উচ্চরণ করলেন, 'ইন্সপেক্টর স্ট্রক!'

আমি দুরু দুরু বুকে কোনোরকমে উচ্চারণ করলাম, 'আপনি? আপনার পরিচয়? আপনিই কি মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লড?'

'মি. স্ট্রক, আমি তো কাজের মাধ্যমে অনেক আগেই প্রমাণ করেছি, পৃথিবীতে আমার চেয়ে শক্তিশালী দ্বিতীয় কেউ নেই। ভালো কথা, আপনি হয়ত এ-জায়গাটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে চাইছেন, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, এটাই দুনিয়ার আতঙ্কের আধার গ্রেট আইরি। আর আমিই সে মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লড রোবার! আশমানরাজ রোবার!

* * *

হ্যাঁ, রোবারের ছবিটাই আমার মনের কোনে বার বার উঁকি মারছিল। তেরোই জুন, ফিলাডেলফিয়ার ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভায় তার আকস্মিক আবির্ভাবের পরের দিনই বিস্ময়কর মানুষটার ছবিসহ চাঞ্চল্যকর বিবরণ খবরের কাগজের পাতায় পাতায় ছাপা হয়েছিল। তার আকৃতি মনের কাণে গেঁথে ছিল। সে চেহারা কোনোদিনই স্মৃতির পট থেকে মুছে যাবার নয়। এমন দশাসই চেহারার অধিকারী ক'জনই বা হতে পারে? মহাবলশালী রক্তমাংসের সে-রোবারই আমার সামনে।

রোবার কীভাবে রোবার দ্য কনকরারে পরিণত হয়েছিলেন, কীভাবে কিংবদন্তী হয়েছিলেন তাই সংক্ষেপে ব্যক্ত করছিল—ফিলাডেলফিয়ার ওয়েলডন ইনস্টিটিউট বেলুনবাজদের একটা নামকরা সংস্থা। যাঁরা বাতাসের চেয়ে হাল্কা বেলুনে চেপে আকাশপথে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্নে মশগুল সেটা তাদেরই সংস্থা। ফিল ইভান্স তার সম্পাদক, সভাপতির নাম আঙ্কল প্রুডেন্ট। এই দুই মাতব্বরের নেতৃত্বে সংস্থার সদস্যরা 'গো-অ্যাডেহ' নামে অতিকায় একটা বেলুন তৈরি করেছিলেন।

বেলুন নির্মাণের কৌশল নিয়ে সংস্থার সদস্যরা যখন বাকযুদ্ধে মত্ত ঠিক তখনই অজ্ঞাত পরিচয় রোবারের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে। সাফ কথা বললেন, আকাশে উড়তে হলে বাতাসের চেয়ে ভারি যন্ত্র চাই, বেলুনের সাহায্যে নয়। তিনি নিজেই নাকি এমন একটা যন্ত্রযান নির্মাণ করেছেন। তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করা তো দূরের ব্যাপার, সদস্যরা তাকে নিয়ে নানাভাবে রসিকতায় লিপ্ত হলেন। তাকে অভিহিত করলেন, রোবার দ্য কনকরার বলে। আরও কত কি বলে সবাই টিটকারি দিতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেল। সুযোগ বুঝে তিনি সেখান থেকে সটকে পড়লেন। 'অ্যালবেট্রেস'য়ে কয়েদ করে ফেললেন। বেলুনবাজ দুজনকে দেখিয়ে দিলেন বাতাসের চেয়েও ভারি যন্ত্র আকাশযান অ্যালবেট্রেস কী অসীম ক্ষমতা রাখে। আর তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই তাদের ধরে এনে কয়েদ করে রেখেছেন।

www.pathagar.com

পৃথিবীকে চক্কর মারার কাজ যখন প্রায় সম্পন্ন হয়ে গেছে ঠিক তখনই ফিল ইভান্স ও আঙ্কল প্রুডেন্ট সুযোগ বুঝে অ্যালবেট্রস থেকে কেটে পড়লেন। আর ডিনামাইট দিয়ে আকাশযানটাকে উড়িয়ে দিলেন। তার আবিষ্কর্তা প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আছাড় খেয়ে পড়লেন।

রোবার দ্য কনকরার প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত 'এক্স' নামক এক অজ্ঞাত দ্বীপে ছিলেন। অ্যালবেট্রসকে নির্মাণ করেন আর মেরামতের ঘাঁটিও সেটা। রোবার দ্য কনকরারের নির্ঘাৎ মৃত্যু হয়েছে অনুমান করে বেলুনবাজ দুজন সে-দ্বীপের খোঁজ না করে অ্যাহেড নামক বেলুন তৈরির কাজে ডুবে গেলেন। তাদের ইচ্ছা, প্রমাণ করে দেবেন, বাতাসের চেয়ে হাল্কা বেলুনে চেপেও আকাশ জয় করা সম্ভব। আর এটা অবশ্যই নিম্নমানের নয়।

বিশে এপ্রিল ফিলাডেলফিয়া উদ্যান থেকে হাজার হাজার কৌতূহলী দর্শকের উপস্থিতিতে অতিকায় বেলুন 'গো-অ্যাহেড' আকাশে উড়ল। একটু বাদেই আকাশে আর একটা আকাশযানকে দেখা গেল।

রোবার দ্য কনকরার মরেন নি। এক্স দ্বীপে গিয়ে আর একটা আকাশযান 'অ্যালবেট্রস' তৈরি করে আকাশে উড়েছেন। বেগতিক দেখে বেলুনবাজরা বিশ হাজার ফুট ওপরে বেলুনটাকে নিয়ে চলে গেলেন। অ্যালবেট্রসও সেখানে হাজির হল। দুর্ভাগ্য বশত বেলুনটা ফেটে গেল। এত ওপরে ওঠার জন্য সূর্যের তেজে বেলুনের গ্যাস প্রসারিত হয়ে সেটাকে ফাটিয়ে দিয়েছে। রোবার দ্য কনকরার পড়ন্ত বেলুনটা থেকে বেলুনবাজ দুজনকে তুলে নিলেন অ্যালবেট্রস-এ।

অ্যালবেট্রস ক্রমে নিচে নেমে এল। সেটা ছ'ফুট ওপরে অবস্থান করতে লাগল। রোবার দ্য কনকরারের কণ্ঠে ধ্বনিত হল—'যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা শুনুন, ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও সেক্রেটারি আমার হাতে বন্দি। তাঁরা আমার প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছেন। অতএব তাঁদের বন্দি করার অধিকার আমার রয়েছে। অ্যালবেট্রসের ক্ষমতা দেখে তাঁরা যেমন ঈর্ষান্বিত তাতে আমি নিঃসেন্দহ যে, তাঁদের আত্মশুদ্ধি এখনও হয় নি। বৈপ্লবিক আবিষ্কারের মাধ্যমে অচিরেই আকাশ-বিজয়ের কাজ সম্পন্ন হবে, আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও সেক্রেটারির মধ্যে এমন বৈপ্লবিক মনোভাব আদৌ দেখা দেয় নি। ফিল ইভান্স ও আঙ্কল প্রুডেন্ট শুনুন, আপনাদের মুক্তি দিলাম।....যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা, এবার কি বলছি শুনুন, আকাশ-বিজয়ের কাজ এখন সম্পন্ন। কিন্তু এখনই সে-আবিষ্কারটা আপনাদের সমর্পণ করছি না। সময়মত 'অ্যালবেট্রস' অবশ্যই জাতির মঙ্গলার্থে ব্যবহৃত হবে। তাই তো আমি আমার গোপন আবিষ্কারকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাচ্ছি। পৃথিবীর মানুষ একদিন না একদিন এ-আবিষ্কারের গোপন রহস্য অবশ্যই জানতে পারবে। আপনারা যেদিন এ-আবিষ্কারকে নিয়ে টিটকারি না করে খুশি মনে গ্রহণ করতে পারবেন সেদিনই এর অধিকার লাভ করবেন। আপনারা আমার বিদায় অভিনন্দন গ্রহণ করুন। বিদায়—বিদায় আমেরিকার নাগরিকবৃন্দ।'

পর মুহূর্তে অ্যালবেট্রসের চুয়াত্তরটা প্রপেলার বাতাসে কেটে কেটে সেটাকে তীরবেগে পূর্বদিকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

হ্যাঁ, তাঁর কথাবার্তায় মধ্যে অবর্ণনীয় দম্ভ আর আত্মবিশ্বাস স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

www.pathagar.com

তাঁর সে আত্মম্ভরিতাই ক্রমে বৃদ্ধি পেতে পেতে আশচুম্বী হয়ে উঠেছে। সমগ্র বিশ্বের মালিক হওয়ার বাসনা তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে দানা বাঁধতে শুরু করল। সবার সামনে তুলে-ধরা তাঁর চিঠির মাধ্যমে তাঁর এরকম অহমিকাই প্রকট হয়ে উঠেছে। বুঝতে অসুবিধা হল না আকাশ-রাজা এতদিন গোপন অন্তরালে থেকে আকাশ বিজয়ের পরিকল্পনাকেই বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়াস চালিয়েছেন।

তাঁর অন্তঃহীন আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে জলে, স্থলে ও শূন্যে বিচরণ করার যন্ত্রযান তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কারখানা কোথায় গড়ে তুলবেন? সুদূর এক্স দ্বীপের চেয়ে গ্রেট আইরির গহ্বরকেই তিনি কারখানা তৈরির জন্য বেছে নিলেন। অত্যুগ্র আগ্রহ, ধৈর্য কারিগরি প্রতিভা ও দক্ষতা সম্বল করে নির্মাণ করে ফেললেন অত্যাশ্চর্য অবিশ্বাস্য এক যন্ত্রযান 'আতঙ্ক'কে। এতে কাজে লাগালেন অ্যালবেট্রসের কলকব্জাগুলোকে। আইরি হ্রদে টর্পেডো ডেস্ট্রয়ারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে জলের তলায় উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনাটার মাধ্যমেই তার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেছে। এমন একটা যন্ত্রযানের আবিষ্কর্তার মধ্যে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পাওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু একটা ব্যাপার খুবই সত্য যে, রোবারের ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে গেছে। নিজেকে তিনি সত্যই 'মাস্টার অব দ্য ওয়ালর্ড' মনে করছেন।

আমার মনে একই চিন্তা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে, আমি কি কোনোদিন এখান থেকে মুক্তি পাব? তবে গ্রেট আইরির ব্যাপারে যেটুকু জানা দরকার জেনে ফেলেছি। এটা আদৌ আগ্নেয়গিরি নয়, এটা কোনোদিন অগ্নি উদগীরণ করেনি, ভবিষ্যতেও কোনোদিন করবে না। রোবার এবার খাদ্যবস্তু, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রীকে মজুদ করার জন্যই এ-স্থানকে নির্বাচন করেছেন। শূন্যপথে উড়ে যাবার সময় গ্রেট আইরির গঠন বৈচিত্র্য দেখেই হয়ত তিনি নিরিবিলি এ জায়গাটাকে নির্বাচন করেছিলেন।

না, এর বেশি কিছু আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয় নি। যন্ত্রযান আতঙ্কর যান্ত্রিক কলা-কৌশল দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। যন্ত্রটা যে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে চলে এ-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছি। কিন্তু বিদ্যুৎ তৈরির রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। রোবার জনসমক্ষে না এসে অন্তরালে থেকে কাজ হাসিল করতেই অধিকাতর উৎসাহী। তাঁর চিঠি পড়ে একথাই অনুমান করা যেতে পারে, পৃথিবীর মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল সাধনেই তাঁর উৎসাহ বেশি। অতীতে যেমন গোপন অন্তরালে ছিলেন, তেমনই ভবিষ্যতেও জনসমক্ষে আসবেন। না।

পৃথিবীর মানুষ তো আমার মুক্তির চিন্তা করছে না, করার কথাও নয়। কারণ, আমার মৃতদেহ যখন পাওয়া যায় নি তখন নির্ঘাৎ আমার মৃত্যু হয়েছে। যদি নাই করে তবে ধরে নেবে আমি আতঙ্কতে কয়েদ হয়েছি। গোড়াতে আমার মৃত্যুর ব্যাপারটাই প্রচার করা হবে। প্রচার করবে, জন স্ট্রক আর ইহলোকে নেই। রোবারকে আমার মুক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করব সে-সুযোগও পাচ্ছি না।

রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। গ্রেট আইরির উদরে আমার প্রথম রাত্রিবাস।

খাবার-দাবার ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র আতঙ্ক-এর বাঁড়ারে তোলা হতে লাগল। বুঝলাম, রোবার এবার বেশ কয়েকদিনের জন্য গ্রেট আইরির উদর ছেড়ে আকাশে উড়তে চাচ্ছেন।

www.pathagar.com

যন্ত্রযান আতঙ্কে কয়েদ হওয়ার পরই ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলাম। এবার নতুন করে সাহস সঞ্চয় করে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম, 'আমি আবারও আপনার কাছে জনতে চাইছি, আমাকে নিয়ে আপনি কি করতে চাচ্ছেন?'

রোবার এবার চোখ দুটো বিস্ফারিত করে এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন যে, ভয়ে আমার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার জোগার হল। মুহূর্তকাল নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে থেকে এক সময় কেবল হাতদুটো ভাঁজ করে বুকের কাছে তুলে নিলেন। মুখে টু-শব্দটিও করলেন না।

যন্ত্রযানে মালপত্র বোঝাইয়ের কাজ সম্পূর্ণ হল। রোবার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরেন। তিনি জানেন, ভবিষ্যতে কোনো না কোনো দিন গ্রেট আইরির উদরে মানুষ প্রবেশ করবেই, তিনি নিঃসন্দেহ। তাই গহ্বরটা ছেড়ে যাবার আগে আগুন দিয়ে এখানে তাঁর উপস্থিতির যাবতীয় চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার উদ্যোগ আয়োজন করলেন।

রাত্রি তখন ন'টা। তলার শুকনো কাঠকুটোয় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। আগুন ক্রমে লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে রোবার হালের চাকা ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন তাঁর সহযোগী টার্নার ঢুকে গেল মেশিনরুমে। রোবার রেগুলেটরের দিকেও নজর রাখতে লাগলেন। দুদুটো দায়িত্ব একা পালন করছেন। যন্ত্রযান 'আতঙ্ক' এবার গ্রেট আইরির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আকাশপথে উড়ে চলল।

কোথায়, কোনোদিকে, এমন কি কোনো সমুদ্রের ওপর দিয়ে আমরা উড়ে চলেছি কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না। আতঙ্ক প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় পাখির মতো অবলীলাক্রমে শূন্যে ভেসে চলল।

রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে রোবার আকাশযান আতঙ্ককে ডুবোজাহাজে পরিণত করে নিয়ে গেলেন গভীর জলের তালায়। আমি কখন যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, বুঝতেই পারি নি। যখন ঘুম ভাঙল চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি জলের তলা নয়, জলের ওপর দিয়ে আতঙ্ক তরতর করে এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠল। উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের আকাশছোঁয়া ঢেউ আতঙ্কর ওপর বার বার আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। পর্বত প্রমাণ ফেনা আমাদের ঢেকে ফেলার জোগার করল। বরাত ভাল যে, আমি শক্ত করে একটা আংটা ধরে রেখেছিলাম। নইলে এক ঝটকায় কোথায় গিয়ে যে পড়তাম তা স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন।

আমি নিঃসন্দেহ হলাম, বাঁচার রাস্তা একটাই, ডুবোজাহাজ হয়ে আবার সমুদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া।

রোবার যেন সম্পূর্ণ অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। ভয় কাকে বলে তাঁর জানা নেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি এমন এক আচরণ করলেন যা একেবারেই অপ্রত্যাশিত, অবিশ্বাস্য। আচমকা বিকট স্বরে হেসে উঠলেন তিনি। ঠিক যেন এক বদ্ধ পাগল হো-হো করে হেসে চলেছে। কি ব্যাপার, রোবার কি তবে সত্যি পাগল হয়ে গেলেন? এক সময় হাসি থামিয়ে তর্জন গর্জন শুরু করে দিলেন, 'আমি রোবার! রোবার! আমি 'মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লড!'

কথা বলতে বলতে তিনি দুই সহযোগীকে ইঙ্গিতে কি যেন বললেন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হুকুম তামিল করা হল। যন্ত্রযান আতঙ্কর গা থেকে দু পাশের অতিকায় ডানা দুটো খুলে ছড়িয়ে পড়ল। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যে যন্ত্রযান শূন্যে বাতাসে ভর দিয়ে উড়ে চলল। ঝড়ের তাণ্ডব অগ্রাহ্য করে সেটার গতি অব্যাহতই রাখল।

www.pathagar.com

পায়ের তলায় মেক্সিকো উপসাগরের তর্জন গর্জন সমান তালে চলতে লাগল।

অ্যালবেট্রস আর আতঙ্কর মধ্যে পার্থক্য অনেক। প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের কাছে অ্যালবেট্রস পরাজয় স্বীকার করলেও আতঙ্ক কিছুতেই নতি স্বীকার করবে না।

বিকালেও আতঙ্কর আকাশ পরিক্রমা অব্যাহত রইল। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে চলল। তবুও প্রকৃতি শান্ত হল না। তবে নতুন কোনো ঘটনার মুখোমুখিও আমাদের হতে হল না। আমার মনে হল রোবার রাত্রির অন্ধকারে নিকারাগুয়া আর গুয়াতেমালা পর্বত ডিঙিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাত-অবজ্ঞাত এক দ্বীপে হাজির হবেন।

আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি রোবার হালের চাকা ধরে চোখ-মুখ বিকৃত করে আপন মনে কি যেন বলছেন। ভয়ঙ্কর তাঁর মূর্তি। ক'দিনের মধ্যে তাঁর এরকম রুদ্ররূপ আর চোখে পড়েনি? কিন্তু কেন? কিরে আশঙ্কায়? বহু চেষ্টা করেও এর উপযুক্ত কারণ বের করতে পারলাম না।

এ মুহূর্তে আমার কর্তব্য কী? উন্মত্তপ্রায় ক্যাপ্টেন রোবারকে বাধ্য করব যন্ত্রযান আতঙ্ককে নিচে নামিয়ে নেবার জন্য? আগুন-পোকার মতো জ্বলে পুড়ে খাঁক হওয়ার আগেই তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব? জলের তলায় যে তাঁর একমাত্র বাঁচার রাস্তা উদ্ভ্রান্ত রোবার কি সামান্য একথাটাও ভুলে গেছেন?

আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। আরও একটা কথা আমার স্নায়ুগুলোকে চঞ্চল করে তুলল—একটা মাত্র মানুষ দেশের আইনকে, সরকারের নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজের জেদ বজায় রেখে চলেছে। আর আমি আইনের রক্ষক হয়েও দিনের পর দিন তার গোয়ার্তুমি বরদাস্ত করে চলেছি। আমি কোথায় আছি, তাদের তিনজনের কাছে আমি একা কত যে অসহায় তা-ও ভুলে গেলাম। এক লাফে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আচমকা গর্জে উঠল, 'আমি আইনের স্বার্থে আপনাকে—'

আমার মুখের কথা শেষ হবার আগেই আচমকা কি যে ঘটে গেল, ঝট করে আমার মাথায় এল না। মনে হল ব্যাটারির কেন্দ্রস্থলে বিদ্যুৎ আঘাত হেনেছে। ব্যস, আর দেরি হল না। চোখের পলকে আতঙ্কর ডানা দুটো সম্পূর্ণ দেহটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল—দাম্ভিক আত্মম্ভরী রোবারের জেদ খান খান হয়ে গেল। ডানা জোড়া উধাও হয়ে গেছে। প্রপেলার টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়েছে। আহত পাখির মতো আতঙ্ক ঝড়ের মুখে পড়ে পাক খেতে খেতে আছাড় খেয়ে পড়ল সমুদ্রের বুকে।

ব্যস, সব শেষ !

* * *

আমি কতক্ষণ যে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এলিয়ে পড়েছিলাম, কিছুই জানা নেই। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চোখ মেলতেই দেখি ছোট্ট একটা কেবিন। মেক্সিকো উপসাগরের বুকে ভাসমান 'ওটাবা' স্টিমারের কেবিনে আমি শুয়ে। আমার মুখে অবিশ্বাস্য কাহিনীটা শুনে নাবিকদের কেউ বিশ্বাস করল, আবার কেউ বা আড়ালে মুখ টিপে টিপে হাসল।

দশই আগস্ট অর্থাৎ পাঁচদিন পর আমাদের স্টিমার 'ওটাবা' বন্দরে পৌঁছল। উদ্ধারকারী সহৃদয় ক্যাপ্টেন ও নাবিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওয়াশিংটনগামী ট্রেন ধরলাম।

আমাকে আচমকা দরজায় দেখেই পুলিশের বড়কর্তা মি. ওয়ার্ড ঘাবড়ে গিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো সোজা হয়ে বসে পড়লেন। চোখের তারায় অবিশ্বাসের ছাপ এঁকে

www.pathagar.com

নীরবে আমার আপদামস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগেলন। তিনি শুনেছেন, আমার মৃত্যু হয়েছে। আইরি হ্রদের জলে ডুবে মরেছি।

আমি রোবার, মাস্টার অব দ্য ওয়ালর্ডের অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানার কথা মি. ওয়ার্ডের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। সবশেষে আমি বললাম, 'রোবার সত্যই মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লড উপাধি লাভের যোগ্য। তাঁর অনন্য প্রতিভা, উদ্ভাবনী আগ্রহ, ধৈর্য ও কর্মনিষ্ঠা সম্বল করে তিনি অত্যাশ্চর্য যন্ত্রযান আবিষ্কার করেছিলেন সেকথা বিবেচনা করে তাঁকে অনন্য সাধারণ প্রতিভাধর ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে অবশ্যই চিহ্নিত করা চলে। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিল তাঁর আত্মম্ভরিতা। পরমায়ু আর বরাতের জোরে আমার পিতৃদত্ত প্রাণটা কোনোরকেম রক্ষা পেয়েছে।'

আমার বক্তব্য শেষ হলে মি. ওয়ার্ড চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'মি. স্ট্রক, আপনি যে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছেন এটাই যথেষ্ট বলে মনে করছি। রোবার কুখ্যাতি অর্জন করেছেন। আর আপনি সুখ্যাতির শীর্ষে অবতীর্ণ হয়ে বিখ্যাত হতে চলেছেন। বরাতের কথা আমি বলব না। আপনার কর্তব্যবোধ ও কর্মনিষ্টাই আপনাকে সে জায়গায় পৌছে দিয়েছে।'

সেদিন সন্ধ্যায় দৈনিক পত্রিকার পাতায় আমার জল, স্থল ও আকাশপথে অভিযানের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা, মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লড 'রোবারে'র অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের কাহিনী সবিস্তারে ছাপা হল। খবরের কাগজের মূল বক্তব্য, "ইন্সপেক্টর স্ট্রক-এর কর্তব্যবোধ ও কর্মনিষ্ঠার জন্য আমেরিকান পুলিশ পৃথিবীর পুলিশবাহিনীর শীর্ষে আজও অবস্থান করছে। পৃথিবীর কোনো কোনো দেশের পুলিশবাহিনী স্থল আর জল পথে সামান্য সাফল্যলাভ করলেও আমেরিকান পুলিশ কিন্তু অপরাধীকে বন্দি করতে সাগর, মহাসাগর আর হ্রদের অতল গহ্বরে ডুব দিয়েছে। আর শূন্যপথেও ধাওয়া করেছে, অপরাধী, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক—মাস্টার অব দ্য ওয়ার্লডকে হাতকড়া পরাতে।"

--

দ্য গ্রিন ফ্ল্যাশ

স্যাম আর সিব অভিন্ন হৃদয় দুই ভাই। তাদের একজন পরিচারিকাকে বেটসি আর অন্যজন বেট্রি সম্বোধন করে ডাকাডাকি করতে লাগল। তাদের ডাক শুনে ভৃত্য প্যাট্রিজ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল হেলন্সবার হলঘরের দরজায়। বলল, 'স্যার, সে তো বাড়িতে নেই। ডেম বেস মিস হেলানার সঙ্গে বেরিয়েছে।'

সিব আর স্যামের আসল নাম যথাক্রমে সেবাস্টিয়ান ও স্যামুয়েল। তারা উভয়েই মিস ক্যাম্বেলের মামা। তাদের মধ্যে স্যাম সিবের চেয়ে বয়সে মাত্র পনের বছরের বড়। ভাগ্নী মিস হেলানা স্যাম আর সিবের মনপ্রাণ জুড়ে রয়েছে। তাদের বিধবা দিদি শিশু-কন্যাকে রেখে পরলোকে পাড়ি জমিয়েছিলেন। ব্যস, তারপর থেকেই দুই ভাইয়ের সর্বস্ব হয়ে দাড়িয়েছে মা-বাপহারা শিশু ভাগ্নীটি। আজও সেই স্নেহের বন্ধন এতটুকুও ম্লান হয়নি। এমন কি ভাগ্নীর কোনোরকম অযত্ন হয় ভেবে দুভাই বিয়ে-থা পর্যন্ত করেন নি। ভাগ্নী তাদেরই মা বাবা জ্ঞান করে। সে সিবকে মা আর স্যামকে বাবা সম্বোধন করে।

www.pathagar.com

সিব আর স্যাম একই কলেজে, একই ক্লাসে পড়াশুনা করেছে। তাদের চাল-চলন আচার-আচরণ আর ভাবনাচিন্তার মধ্যে সামান্যতম ফারাকও নেই। বলা চলে আলাদা অবয়বধারী হলেও আসলে এরা একই ব্যক্তি। কেবলমাত্র দৈহিক গড়নের দিক থেকে তাদের মধ্যে একটু-আধটু বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সাদাসিধে আচরণের মতোই পোশাক পরিচ্ছদের দিকেও তাদের ঔদাসিন্য দেখা যায়। কেবলমাত্র রঙের ব্যাপারে পছন্দের হেরফের হয় বটে। সিব যে-কোনো জিনিসে তামাটে লাল পছন্দ করে আর স্যামের পছন্দ গাঢ় নীল রঙ। তারা কোনো নেশারই বশীভূত নয়। সুঠামদেহীও বটে। তাই তারা বয়সে প্রবীণ হলেও মন কিন্তু আজও নবীন—কচিকাঁচাই রয়ে গেছে।

সিব আর স্যাম যে নিজেদের মধ্যে আমৃত্যু হৃদ্যতার সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে পারবে এতে তিলমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। আর একটা ব্যাপারে এ মানিকজোড়ের দারুণ মিল দেখা যায়—উভয়েই মুঠো মুঠো নস্যি ব্যবহার করে। তবে আলাদা আলাদা কৌটা থেকে আবশ্যই নয়, একই কৌটা থেকে তারা নস্যি নেয়। ইয়া পেল্লাই একটা কৌটা নিয়ে তার দিনভর লোফালুফি খেলে। ব্যবসায়িক বুদ্ধির অভাব তাদের। রাজনৈতিক জ্ঞান তো ছিটেফোঁটাও কারোর নেই।

ভাগ্নী হেলেনা বাড়ির বাইরে গেছে। পাঁচটা বাজে। দু-মামারই বিশ্বাস, সে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবে।

হেলেনা অষ্টাদশী। রূপসী তো বটেই, এমন কি বুদ্ধি সুদ্ধিও রবরয়ের নায়িকার মতোই প্রখর। ওয়েভারলির নায়িকার মতো তার চিন্তাধারা একেবারে মৌলিক। সর্বজনবন্দিত সাহিত্যিক দুজনের এবং আরও কয়েকটা বিশিষ্ট চরিত্রের সঙ্গে ভাগ্নীর তুলনা করতে যারপরনাই গর্ববোধ করত লাগল।

কচি গোলাপের চারার মতো হেলেনা দ্রুত বেড়েই চলছে। হ্যাঁ এবার তার একটা অবলম্বন দরকার। মনের মতো একটা বর আর ঘর। কেবলমাত্র পণ্ডিত হলেই তো হবে না, কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ও তো থাকা চাই। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ফ্যারাডের রসায়নে পাণ্ডিত্য আর টিনড্যালের মতো পদার্থবিদ্যায় দখল—জিভের ডগায় যাবতীয় প্রশ্নের জবাব থাকে—নামডাক আছে এমন ফাউফশায়ার পরিবারের সন্তান। কিন্তু এমন পণ্ডিত পাত্রকে কি হেলেনার পছন্দ হবে? ব্যাপারটা নিয়ে চিরকুমার ভাই দুজন মোটেই ভাবে নি। ভাবী বর হেলেনাকে দু-একবার দেখেছেও। কিন্তু হেলেনার রূপ-সৌন্দর্যতার মনে তেমন দাগ কাটতে পেরেছে বলে মনে হয়নি। দু-ভাই হেলেনার সঙ্গে প্রখ্যাত উপন্যাসের ডায়না ভারনামের সঙ্গে তুলনা করে বসল। কিন্তু তারা ভুলেও কেউ ভাবল না, ডায়না যার সঙ্গে গোড়া থেকে হৃদতার সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছিল শেষপর্যন্ত সে কিন্তু তার গলায় বরমাল্য দেয় নি।

দুভাই এবার এক প্রখ্যাত কবির কথা ভাবতে লাগল। তাদের ভাবী বর যদি হেলেনাকে পছন্দ করে, হেলেনাও যে তাকে ভালবেসে কাছে টেনে নেবে ওতে দুভাইয়ের কারোরই তিলমাত্র সন্দেহ নেই। এবার তারা শেক্সপিয়ারের কমেডি নাটক থেকে বাছা বাছা ক'টা উদ্ধৃতির আবতারণার মাধ্যেমে মনের ভাব বিনিময় করল।

হেলেনার বিয়ের ব্যাপারে সিব আর স্যাম ভাই দুজন নিশ্চিত হতে পারল। এখন প্রশ্ন একটাই বিয়েটা কোথায় হবে? তার গ্লাসগোতে তো আবশ্যই। কিন্তু সেন্টম্যাগনাস আর সেন্ট মুলগো চার্চে জায়গা খুবই কম। অন্তত সেন্ট জর্জ চার্চে যেতে পারলে ভালো হয়। ব্যস, ভোজের আসব কোথায় কীভাবে ব্যবস্থা করা হবে, কোনো পানীয় বিতরণ

www.pathagar.com

করা হবে, তাও সঙ্গে সঙ্গে তারা ঠিক করে ফেলল। ভাগ্নী ঘটা করে বিয়ে করতে রাজি না হলে তারা কিছুতেই তার ইচ্ছায় সম্মত হবে না।

দু-ভাই যখন ভাগ্নী হেলেনার বিয়ের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত তখনই সমস্বরে তাকে বলল, 'শোন, মি. অ্যারিসটোবিউলিসের সঙ্গে তো বিয়ে আমরা দেব মনস্থির করে ফেলেছি।'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে হেলেনা বলল আমি যতদিন না সবুজ রশ্মিকে দেখতে পাচ্ছি, ততদিন বিয়ের কথা ভাবতেই পারছি না।

* * *

ক্লাইভ নদীর ডানদিকে গয়ার লেক নামে চমৎকার একটা লেক রয়েছে। লেকের লাগোয়া একটা বাড়িতে অভিন্নহৃদয় দুই মামা বাস করে। গ্লাসগোর একটা পুরানো বাড়িতে তারা শীতের দু-মাস থাকে। হেলেনার মন চাইলে দুই মামা তাকে নিয়ে ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশে চক্কর মেরে বেড়ায়। হেলেনার মেজাজ মর্জি হলে সবাই ফিরে আসে গ্লাসগোর গয়ার লেকের ধারে বাড়িতে। মের তৃতীয় হপ্তায় গ্লাসগোর হৈ-হট্টগোল ছেড়ে নিরিবিলিতে থাকার জন্য ভাগ্নী অস্থির হয়ে পড়ে। ব্যস তল্পি-তল্পা গুটিয়ে মামারা তার ইচ্ছা পূরণের জন্য গয়ার লেক থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরের শান্ত উপদ্রবহীন একটা গ্রাম্য বাড়িতে এখন গ্রীষ্মের দিনগুলো কাটাচ্ছে। চাকর-বাকরগুলো সঙ্গেই এসেছে। তাদের মধ্যে দুজন তো বালক বয়স থেকেই ক্যাম্বেল পরিবারের সেবায় নিযুক্ত। তাদের একজনের নাম প্যাট্রিজ। আর অন্যজনের নাম এলিজাবেথ। সে হেলানাকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসে। সংসারের যাবতীয় বোঝা তারই কাঁধে। উবয়েই স্কটিশ।

হেলেনার চরিত্র বাস্তবিকই অদ্ভুত। এমনিতে তার মতো মেয়ে হয় না। শান্ত, অমায়িক ব্যবহার। কিন্তু মুহূর্তে রেগে একেবারে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। তার দুটো রূপ। সংসার আর কর্তব্যজ্ঞান যথেষ্ট। আর ব্যক্তিত্ব ও ভাবজগৎ নিয়ে ডুবে থাকাও তার চরিত্রের অন্য একটা দিক। কুসংস্কার আর কাল্পনিক গল্প-কাহিনীতে তার আস্থাও কম নয়। তার উভয় সত্তাকেই দুই মামাই পছন্দ করে। কিন্তু দ্বিতীয় সত্তাটার শিকার হয়ে তাদের ভাগ্নী এমন সব খামখেয়ালীপনা জুড়ে দেয় যেমন মামারা রীতিমতো চমকে ওঠে। বিয়ের প্রস্তাব তোল মাত্র ভাগ্নী যে আচরণ করলে, সে কথাই বলতে চাইছি। এ কী আজব কথা রে বাবা। সবুজরশ্মি না দেখা অবধি বিয়ের পিঁড়িতে বসবে না। সবুজরশ্মির ব্যাপারটা কি? এ কী উদ্ভট কথা বলছে তাদের সোহাগিনী ভাগ্নী।

* * *

মর্নিং পোস্ট নামক খবরের কাগজের পাতায় খবরটা ছাপা হয়েছিল—

সূর্যকে কখনো সমুদ্রের বুকে ডুব দিতে দেখেছেন? সূর্যের ওপরের প্রান্তটা আবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু শেষ আলোকরশ্মিটুকু বিচ্ছুরিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে অতুলনীয় প্রাকৃতিক বিস্ময়কর দৃশ্যটা চাক্ষুষ করেছেন কি? না, নিশ্চয়ই চাক্ষুষ করেন নি। সুযোগ এলে দেখে নেবেন। উজ্জ্বল লাল রশ্মি চোখে পড়বে ভেবে থাকলে ভুলই করছেন। বরং সবজে একটা আভা নজরে পড়বে। কোনো শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব নয় এমন সবুজ রশ্মি সৃষ্টি করা। গাছগাছালির আর সমুদ্রের হাজারো সবুজের মেলায় আত্যাশ্চর্য অবিশ্বাস্য সে সবুজের হদিশ মিলবেনা। স্বর্গে যদি সবুজের অস্তিত্ব থেকে থাকে তবে সে স্বর্গীয় সবুজ রশ্মিচ্ছটা নির্ভেজাল ও নিশ্চিন্ত আশার প্রতীক।

www.pathagar.com

মিস হেলানা সেই খবরের কাগজটা হাতে করে হলঘরে এসেছে। হল্যান্ডের প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদেরও সবুজ এ-রশ্মির কথা শুনেছে। মিস ক্যাম্বেল সেই প্রবাদের মর্মার্থ আজও উদ্ধার করতে পারেনি।

সবুজ রশ্মির অলৌকিক মহিমা সম্বন্ধে মিস হেলানা আগেই শুনেছিল বলেই খবরের কাগজের পাতার ছাপান নিবন্ধটা পড়ে এমন অস্থির হয়ে পড়েছেন।

ভাগ্নীর মুখে ব্যাপারটা শুনে তার দুই মামাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ জানালা খুলে স্যাম সবুজরশ্মি দেখার উদ্যোগ নিতেই মিস হেলানা তার হাত চেপে ধরল। বলল, 'এখন নয়, সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আগে সূর্য ডুবুক। তবে দিগন্ত নির্মেঘ—পরিষ্কার হতে হবে। আর এখান থেকে নয়, কাইড নদীরপাড়ে, টাওয়ারের ওপরে না উঠলে কিছু দেখা যাবে না। সমুদ্রের বুকে সূর্য ডুব না দিলে বাঞ্ছা পূরণ হবে না। তাড়াতাড়ি কর। দেরি হলে— ।'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে স্যাম বলে উঠল, 'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি তো অবশ্যই— মানে মি. অ্যারিসটোবিউলিস আরস্কিক্রোসের জন্য তাড়াতাড়ি করতে বলছিস তো?'

'হ্যাঁ, দেখবার পরই আমার বিয়ে। মানে মি. অ্যারিসটোবিউলিস আরসিক্রোসের ব্যাপারে কথা বলা যাবে।'

দু-ভাইয়ের চোখেই খুশির ঝলক ফুটে উঠেল। তারা পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল।

পশ্চিম দিগন্ত পরিষ্কার দেখা যায়, স্কটল্যান্ডের এমন কোনো সমুদ্র উপকূলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ভাগ্নীর আকাঙ্ক্ষিত সবুজরশ্মি চাক্ষুষ না করা অবধি তার প্রতি সন্ধ্যায় ধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করবে।

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তারা ওবানের সমুদ্র উপকূলকেই এ কাজের উপযুক্ত স্থান হিসাবে বিবেচনা করল। সেখানে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রবক্ষে ছিটেফোঁটাও মেঘ বা কুয়াশা থাকে না। ওবানের কথা উঠতেই স্যাম আর সিব সোল্লাসে, প্রায় সমস্বরেই বলে উঠল, 'তবে ওখানেই যাওয়া যাক। শুভস্য শীঘ্রম। ঝটপট তল্পিতল্পা গুছিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক।'

ওবানের ব্যাপারে তার মামারা কেন এমন উৎসাহী তা হেলেনার বুঝতে বাকি রইল না। কারণ, সেখানেই থাকে তার জন্য মামাদের নির্বাচিত পাত্র।

নতুনতর এক সমস্যা দেখা দিল। দুই মামারই ইচ্ছা স্থলপথে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে যাবে। কিন্তু ভাগ্নীর তাতে আপত্তি। তার ইচ্ছা সমুদ্র পথে যাবেন। আসলে সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে যাওয়ার সময় নজর রাখবে, ওখানে পা দেবার আগেই যদি আচমকা আকাঙ্খিত সবুজরশ্মি চোখে পড়ে যায়, তবে শুধু শুধু ওবান পর্যন্ত ধাওয়া করতে হবে না।

ভাগ্নীর অত্যুগ্র আগ্রহের কাছে মামাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার ইচ্ছা ত্যাগ করতেই হল। শেষপর্যন্ত সমুদ্রপথে যাওয়াই স্থির হল।

* * *

সকাল হতে না হতেই দুই মামা, ভাগ্নী হেলেনা আর পরিচারিকা বেস প্রেস্ট্রিজ কলম্বো জাহাজে চেপে বসল।

সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে তালে দোল খেতে খেতে কলম্বো এগিয়ে চলল গভীর সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের পাড় জুড়ে রয়েছে বাড়ি-ঘর, গাছগাছালি আর কলকারখানার

www.pathagar.com

চিমনির সারি। মামারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সবকিছু দেখতে লাগল। ভাগ্নী হেলেনার কিন্তু একই চিন্তা মন-প্রাণ জুড়ে রয়েছে, সবুজ রশ্মি। বহু আকাঙ্ক্ষিত সবুজ রশ্মি যদি চোখে পড়ে তবে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সে ভুলবে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য পশ্চিম-আকাশে হেলে পড়ল। হেলেনা অপলক চোখে বিদায়ী সূর্যের দিকে তাকিয়ে রইল। এমন সময় তার মামারা তাকে খেতে যাওয়ার জন্য ডাকাডাকি শুরু করে দিল। সে বিরক্ত হল। তবুও না গিয়ে পারল না।

ডেকে, যেখানে বসে তারা খাবার খাচ্ছে সেখান থেকে সূর্যটা, সমুদ্রের দিগন্ত নজরে আসছে না দেখে সে রেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেল। মামারা নিতান্ত অপরাধীর মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ভাবটা এমন যেন, যত দোষ তাদেরই।

গ্লাসগো। এখান থেকেও দুটো পথ ধরে ওবান যাওয়া যায়। জাহাজে অনেক ঘুরে যেতে হয়। পথ দীর্ঘ। কিন্তু স্থলপথে তাড়াতাড়ি গেলে সময় অনেক কম লাগে। পয়সা খরচও কম।

ভাগ্নীর ঐকান্তিক আগ্রহের মূল্য দিতে গিয়ে মামারা এবার আয়োনা জাহাজে উঠল। সময় ও অর্থ দুই বেশি লাগলেও তারা নিরুপায়। আসলে গত সন্ধ্যায় বিকেলে খাবার খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে তারা এমনিতেই তাকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। ডুবন্ত সূর্যের শেষ দৃশ্যটুকু তার দেখা হয়ে উঠে নি।

জাহাজ আবার দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। সন্ধা ছয়টার কাছাকাছি। আর ঘণ্টা তিনেক পরে সূর্য গা-ঢাকা দেবে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার আগেই আয়োনা ওবান বন্দরে ভিড়বে। আকাশে মেঘ বা কুয়াশা কিছুই নেই। অতএব সবুজ রশ্মি দেখা যাবেই। হেলেনা ব্যস্ত-পায়ে ডেকে পৌঁছে রেলিঙ ধরে দাঁড়াল। অপলক চোখে তাকিয়ে রইল বিদায়ী সূর্যের দিকে। মনে তার সবুজ রশ্মি দেখার অত্যুগ্র আগ্রহ।

জাহাজ বন্দরে নোঙর করার আগেই একেবারে অভাবনীয় অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা ঘটে গেল।

হেলেনা এগিয়ে গিয়ে কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল, অন্তরীপের একদিকে যে সুউচ্চ ঢেউয়ের মতো কি একটা যেন বার বার ওঠানামা করছে, সেটা আসলে একটা নৌকা। প্রবল ঘূর্ণির টানে বার বার ওঠানাম করতে করতে সেটা ডুবতে চলেছে। কাপ্তেন চোখে দূরবীণ লাগিয়ে ব্যাপারটার দিকে নজর রাখছেন।

হেলেনার মন থেকে সবুজ রশ্মির কথা উবে গেল। নৌকাটাকে উদ্ধার করার জন্য কাপ্তেনকে বার বার অনুরোধ করতে লাগল।

প্রবল ঘূর্ণির মধ্যে পড়লে জাহাজটাও যে বিপদে পড়তে পারে কাপ্তেন সে কথা বুঝেও রূপসী অষ্টাদশী হেলেনার অনুরোধ ফেলতে পারলেন না।

কাপ্তেন দূরবীণটাকে চোখে লাগিয়ে অনুসন্ধিৎসু নজরে আর একবার দেখে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। দেখলেন, ডুবন্ত নৌকাটাতে আরোহী মাত্র দুজন। দেখলেন একজন গলুইয়ের ওপর চিৎ হয়ে টান টান হয়ে শুয়ে। আর দ্বিতীয় জন দাঁতে দাঁত চেপে দড়ি টেনে ধরে নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে নৌকাটাকে রক্ষ করার চেষ্টা করছে। ছোট্ট জেলে নৌকা বলেই এখনো রক্ষ করতে পারছে।

কাপ্তেন স্টিম বাড়িয়ে নৌকাটার দিকে জাহাজ ছুটিয়ে দিলেন। উলকার বেগে ধেয়ে নৌকাটার কাছাকাছি যেতেই কাপ্তেন জাহাজের ডেকের ওপর থেকে একগাছি দড়ি নৌকাটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলেন। দড়িহাতে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটা শায়িত লোকটাকে

www.pathagar.com

যন্তচালিতের মতো কাঁধে তুলে নিয়ে অন্যহাতে জাহাজ থেকে নেমে আসা দড়িটাকে শক্ত করে ধরল। জাহাজের খালাসিরা টানাটানি করে তাদের ওপরে তুলে নিল। ইতিমধ্যে কাপ্তেন জাহাজটাকে ঘূর্ণির এলাকা থেকে অনেকখানি দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন।

প্রবীণ সঙ্গাহীন নৌকারোহীর মুখে সামান্য কড়া মদ ঢেলে দিতেই তার মধ্যে ধীরে ধীরে সংজ্ঞা ফিরে এল।

সে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'মি. অলিভার।'

যুবকটা মুখ কাচুমাচু করে বলল, আমি দুঃখিত। আমার জেদের জন্যই আপনার ভবলিলা সাঙ্গ হতে চলেছিল।' এবার কাপ্তেনের দিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ঘাড় ঘুরাতেই কাপ্তেন বললেন, 'সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাতে নয়, যাত্রীরা পীড়াপীড়ি করাতেই আমি জাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম।'

আসলে হেলেনা অপলক চোখে দিগন্ত রেখার দিকে তাকিয়ে না থাকলে নৌকাটা কারোর নজরেই পড়ত না। তার মাথায় যে সবুজ রশ্মি জগদ্দল পাথরের মতো চেপে রয়েছে। নৌকাটাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দিগন্ত রেখার দিকে সতর্কদৃষ্টি রাখার কথা কিছু সময়ের জন্য উবে গিয়েছিল। সূর্য অনেক আগেই সমুদ্রে ডুব দিয়েছে কিন্তু এবার সে আর কারোর ওপরে উষ্মা প্রকাশ করতে পারল না। আসলে এবার যে সম্পূর্ণ দোষ তার নিজের। তাই মুখ গোমড়া করে বসে রইল।

প্রৌঢ় মাঝি সুস্থ হয়ে নৌকা নিয়ে আবার সমুদ্রে ভাসল। অলিভার জাহাজেই রয়ে গেল। পর্যটকদের সঙ্গে ওবান বন্দরে এসে নামল। রাত্রির অন্ধকারে যাত্রীরা জাহাজ থেকে নামতে লাগল।

বহু পর্যটক ওবানে ছুটি কাটাতে এসেছে। দুচার দিন থেকে হাওয়া বদল করে শরীর ও মনকে একটু-আধটু চাঙা করে ফিরে যাবে। রাত্রির অন্ধকারেও জাহাজঘাটে মানুষের ভিড়।

* * *

ভিড় যতই থাক না কেন, অ্যারিসটোবিউলিস আরসিক্লোসকে খুঁজে বের করতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আঠাশ বছরের যুবক। তাকে দেখে কিন্তু তার বয়স সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব নয়। তার চেহারা ছবি ভালো নয়, খারাপও বলা চলে না। চোখ-মুখ কারোর নজর কাড়ার মতো নয়। মাথার চুল বড্ড সাদা। চোখে চশমা। চশমা ছাড়া মোটেই দেখতে পায় না। নাকটা অস্বাভাবিক ছোট। দাড়ি চিবুক পর্যন্ত নেমে এসেছেন। সব মিলিয়ে মুখটা যেন বাঁদরের মুখেরই মতো।

অ্যারিসটোবিউলিস আরসিক্লোসের বুদ্ধি আর অর্থ কোনোটারই ঘাটতি নেই। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা মগজ ধোলাই হলেও বাক্যবাণে মানুষকে ঘায়েল করার কায়দা-কৌশল তার অজ্ঞাত। রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা আর গণিতে যতটা পাণ্ডিত্য তার আছে, সাহিত্যে ততটা দখল তার নেই। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ফলাতে গিয়ে বোকামির পরিচয়ই বেশি দিয়ে ফেলে। তার আসল খেয়াল হচ্ছে, যাবতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া। এরই জন্য সে সবার চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। লোককে হাসাতে গিয়ে নিজেই হাসির খোরাক হয়ে ওঠে। কারোর কথা ধৈর্য ধরে শোনা তার ধাতে সয় না। নজর মেলে কিছু দেখার মতো মানসিকতাও তার নেই। সর্বক্ষণ বক বক করতে খুব ওস্তাদ।

এমন আজগুবি একটা লোককে দেখে হেলেনা যে ভাববিমুগ্ধ হয়ে উঠবে, এরকম কথা যেন কেউ স্বপ্নেও না ভাবেন।

www.pathagar.com

আশ্চর্য ব্যাপারই বটে। আদরের দুলালী ভাগ্নীকে পাত্রস্থ করার জন্য এমন বিদঘুটে চরিত্রের একটা যুবককে মামারা নির্বাচন করায় অবাক হাবার মতো ব্যাপারই বটে। হয়তো বা সে নিজেই মামাদের কাছে তাদের ভাগ্নীর বর হাবার জন্য অনুরোধ রেখেছে।

দু-ভাই এখন স্বীকার করছে, ভাগ্নীকে ব্যাপারটা না জানিয়ে এখানে নিয়ে আসাটা খুবই চালাকি করে ফেলেছে। তাদের বিশ্বাস, ভাগ্নীর মন থেকে সবুজ রশ্মি দেখার ঝোঁকটা কর্পূরের মতো উবে যাবে।

পরদিন ভোর হতে না হতেই দুভাই আনন্দে নাচতে নাচতে ক্যালিডোনিয়ান হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল। উদ্দেশ্য, অ্যারিসটোবিউলিস আরসিক্রোসকে-খুঁজে বের করা। ভাগ্নী হেলেনা তখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

দুই মামা খোঁজাখুঁজি করে অদ্ভুত জীবটাকে বের করতেই সে সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'আপনারা ওবানে, কি ব্যাপার বলুন তো। কবে এলেন?'

সংক্ষেপে কুশল সংবাদাদি আদান প্রদানের পর পণ্ডিত প্রবর সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'ভালো কথা, টেলিগ্রামের খবরটা শুনেছেন কি? আমিও সবেই খবরটা পেয়েছি।'

'আরে সাহেব, গ্লাডস্টোনের কোনো ব্যাপারই এটা নয়। আবহাওয়ার রিপোর্টের কথা বলছি। জানেন সাহেব, ব্যারোমিটারে এক ইঞ্চির অর্থ হচ্ছে, পঁচিশ মিলিমিটার পারদস্তম্ভ নেমে যাওয়া; আর তার জন্য নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। অচিরেই ঝলমলে আবহাওয়া বিদায় নেবে, আকাশ মেঘে ছেয়ে যাবে। আটলান্টিকের দিক থেকে প্রবল বাতাস বইতে থাকবে।

কথাটা শুনে দুই ভাই যারপরনাই খুশি হল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে সবুজরশ্মি আর দেখা যাবে না। ফলে মতলব সিদ্ধ করতে এখানে কয়েকটা দিন অন্তত থাকা যাবে।

অ্যারিসটোবিউলিস একটা চকমকি পাথর নিয়ে লোফালুফি খেলতে খেলতে দুই ভাইকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য দয়া করে বলবেন কি?'

সিব জবাব দিল, 'উদ্দেশ্য তেমন কিছুই নয়। দিন কয়েক থেকে মুক্ত বায়ু সেবন করা, এই আর কি।'

স্যাম বলল, 'আমাদের ভাগ্নী মিস হেলানাও এসেছে।'

'তাই বুঝি? যাক, আপনাদের সঙ্গে তবে আবার দেখা হচ্ছে, কি বলেন? আচ্ছা, কেবলমাত্র মুক্তবায়ু সেবনই কি আপনাদের উদ্দেশ্য? আমার তো মনে হয় আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটাকে নিবিড় করে তোলার উদ্দেশ্যেই আপনারা এখানে ছুটে এসেছেন ঠিক বলিনি?'

স্যাম স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দিল-'হ্যাঁ, এটাও একটা উদ্দেশ্য বটে।'

'যাক, কাজটা ভালোই করেছেন। এ সুযোগে তাঁকে সমুদ্রের ওঠানামা, তরঙ্গমালার উচ্চতা, বাতাসের গতিবিধি ও বেগ আর জোয়ার-ভাঁটার খেলা প্রভৃতি ব্যাপার সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওয়া যাবে।'

তার কথায় দুভাই যারপরনাই আনন্দিত হলেন। তাঁকে একবারটি হেলন্সবারের প্রাসাদে পদার্পণ করার জন্য নিমন্ত্রণ করে বসল।

'হ্যাঁ, আমাকে কিছুদিনের মধ্যেই একবারটি ওদিকে যেতেই হচ্ছে। বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন দিয়ে ক্লাইড নদীর জল বের করে দেওয়ার কাজেই আমাকে সেখানে যেতে হবে।'

তার কথায় দুই ভাই আনন্দে ডগমগ হয়ে গেল।

অ্যারিসটোবিউলিস মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে বললেন, 'আপনারা, আপনাদের ভাগ্নী নিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী উপভোগ করার জন্য এখানে ছুটে এসেছেন, তাইনা? এবার বলুন তো কোনো প্রাকৃতিকদৃশ্য হেলন্সবারায় অনুপস্থিত?'

www.pathagar.com

স্যাম সঙ্গে সঙ্গে জবাব ভেবে দিল, 'সবুজ রশ্মি। সবুজ রশ্মির দেখাপাওয়ার প্রত্যাশায়ই—'

ভুরু কুচঁকে মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে অ্যারিসটোবিউলিস বলে উঠল, 'কি বললেন? সবুজ রশ্মি? কই এমন কোনো ব্যাপার চাক্ষুষ করা তো দূরের ব্যাপার, কোনোদিন নাম শুনেছি বলেও তো মনে হচ্ছে না।'

দুই ভাই এবার মর্নিং পোষ্ট সংবাদপত্রের পাতায় সবুজ রশ্মির ব্যাপার যেটুকু জানতে পেরেছিলেন তার কাছে সবিস্তারে ব্যক্ত করল।

'ধ্যুৎ সাহেব, ধাপ্পা, স্রেফ ধাপ্পা। নিছকই ছেলেমানুষী ব্যাপার।' মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে বলল, 'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমিই তাকে সবুজ রশ্মি দেখিয়ে দেব। এরকম ছেলেমানুষী কারবার নিয়ে পদার্থবিজ্ঞান মাথা ঘামায় না।'

'আমাদের ভাগ্নীও তো আসলে নিছক ছেলেমানুষই বটে। বুদ্ধি পাকা হলে এমন একটা বিদঘুটে ব্যাপার, সবুজ রশ্মি নিয়ে এমন মাতামাতি করতে উৎসাহী হয়, বলুন? যাক, আপনি তাকে সবুজরশ্মি দেখানোর দায়িত্ব নিচ্ছেন শুনে আমরা দুই ভাই নিশ্চিন্ত হলাম।'

পথ চলতে চরতে অ্যারিসটোবিউলিস বলতে লাগল, 'একটা ব্যাপার হচ্ছে, পুরুষদের মগজের মতো মেয়েদের মগজের কোষ সুবিন্যস্ত নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, মগজটাকে তো আর নতুন করে সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু হতাশ হবার কিছু নেই। একটু-আধটু প্রশিক্ষণ দিয়ে দিলেই কাজ চালাবার মতো তৈরি করে নেওয়া যাবে। মেয়েরা সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত সময় ও ধৈর্য্য নষ্ট করে তা আর বলার নয়। তাই তো হার্ভে, এরিস্টটল, নিউটন, প্যাসকল, লাপ্লেস, এডিসন, অ্যারোগোডেভি ও অন্যান্য প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের মতো মেয়েদের মধ্যে থেকে আজ পর্যন্ত একজনও নাম করতে পারে নি।'

দুই ভাই তার কথার বিন্দু বিসর্গও বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

কথা বলতে বলতে তারা হোটেলে পৌছে গেল।

হোটেলে ঢুকেই অ্যারিসটোবিউলিস ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে হেলেনার ঘরে হাজির হল। হেলেনা তখন খোলা জানালা দিয়ে উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। তাকে অভিবাদন জানাতে গিয়ে অ্যারিসটোবিউলিস মুচকি হেসে বলল, 'মিস হেলানা, বরাতের জোরে আমাদের ওবানে দেখা হয়ে গেল।'

ভাইদের মধ্যে থেকে একজন অ্যারিসটোবিউলিসের দিকে আঙ্গুলি-নির্দেশ করে বলল, 'ইনি মি. আরসিক্রোস।

মামার কথার জবাব না দিয়েই হেলেনা বলে উঠল, 'মামা, আমরা কি সত্যিই ওবানে এসেছি?'

স্যাম বলল, 'অবশ্যই। এটা পশ্চিম উপকুল।'

'পশ্চিম উপকূল। না মামা, তবে আর এক মুহূর্তও আমাদের এখানে থাকা চলবে না। তোমাদের তো আমি স্পষ্টই বলেছি, যেখান থেকে সমুদ্রের পূর্ব উপকূল, পাহাড় আর আকাশচুম্বী গাছগাছালি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।'

* * *

দায়সারা গাছের অভিবাদন করে ভাগ্নী হেলেনা লম্বা লম্বা পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দুই মামা নিতান্ত অপরাধীর মতো মুখ কাচুমাচু করে তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

www.pathagar.com

হায়! ওবান যে এমন জায়গা, সূর্যাস্ত দেখা যায় না, ডুবন্ত সূর্যকে সমুদ্রের বুকে গা-ঢাকা দেবার দৃশ্য দেখা যায় না তাও কি ছাই কেউ জানত?

আগন্তুকরা হোটেল ছেড়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে জানতে পেরে হোটেলের ম্যানেজারের তো মাথায় হাত পড়ার জোগার। সমুদ্র, পশ্চিম দিগন্ত দেখা যায় না বলে হোটেল ছেড়ে, একেবারে ওবান শহর ছেড়ে যেতে হবে, একী আজগুবী কথা। এটা কোনো সমস্যা নাকি? ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে মাইল চার-পাঁচ দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলেই তো পশ্চিম দিগন্ত দেখার সাধ মিটতে পারে। সি আইল্যান্ডের ওপারে দাঁড়িয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপার দিয়ে পশ্চিম দিগন্তের তিন চতুর্থাংশ পরিষ্কার দেখে নেওয়া যেতে পারে। এরকম একটা সামান্য ব্যাপারের জন্য হোটেল ছেড়ে যাওয়াটা বিস্ময়কর ব্যাপারই তো বটে। তিনি বলে পাঠালেন, 'দেওয়ালে মানচিত্র টাঙানোই রয়েছে। মিস হেলানা ইচ্ছা করলে নিজের চোখে দেখে তাঁর বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করে নিতে পারে।'

হেলেনা মানচিত্রটার ওপর দীর্ঘ সময় ধরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আশ্বস্থ হল। শেষপর্যন্ত হোটেলে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিল। তার সিদ্ধান্ত পাল্টানোর জন্য দুই মামা যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল।

আকশে টুকরো টুকরো মেঘ। ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের উচ্চতা মোটেই বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তেসরা থেকে ৬ আগস্ট মামারা ওবান শহরের বুকেই ঘুরে ফিরে দিন কাটিয়ে দিতে লাগল। হেলেনা কিন্তু ভিড়ের মধ্যে গেল না। হোটেলের ঘরে বসে পাহাড় আর জঙ্গল দেখেই দিন ক'টা কাটিয়ে দিল। মামারা ভাবল, তাদের ভাগ্নী বুঝি পণ্ডিত প্রবর অ্যারিসটোবিউলিসের ভাবনায় আত্মমগ্ন।

হেলেনা কিন্তু ঘূর্ণির চক্করে পড়ে যে নৌকাটা অনবরত পাক খাচ্ছিল সে দৃশ্যটার কথাই বার বার ভেবে চলেছে।

নৌকার মাঝি আর নৌকাটার ভাবনায় অস্থির হয়ে না পড়লে সে নির্ঘাৎ সবুজ রশ্মি দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হত না। এখন আর এক অদ্ভুত ভাবনা প্রায়ই মাথায় চক্কর মারে। নৌকার সেই গাট্টাগোট্টা অকুতোভয় যুবকটার কথা। সবুজ রশ্মির চিন্তা মাথায় আসতেই তার চেহারাটা যেন ছবির মতো তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একী ঝকমারিতে পড়া গেল রে বাবা। পণ্ডিত প্রবর অ্যারিসটোবিউলিস কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। ইতিমধ্যে হেলেনার সঙ্গে তার বেশ কয়েকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। তার মগজে জ্ঞান-বুদ্ধি ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নি। মেঘ কত প্রকার, তাদের চরিত্র, তাপমাত্রা কমে গেলে মেঘ কেন ও কীভাবে ভূমির দিকে নেমে আসে এসব ব্যাপার তাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টার কসুর করে নি। কুয়াশার প্রকারভেদ ও তাদের চরিত্র কেমন তাও তার মগজে ঢুকিয়ে দিতে প্রয়াসী হয়েছে। পণ্ডিত প্রবর যখন এসব ব্যাপার স্যাপার নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বক বক করছে, তখন হেলেনা হয় দূরের পাহাড়ের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে নতুবা পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা ঘরের মেঝেতে আলতোভাবে বুলিয়ে চলছিল। পণ্ডিত প্রবরের সারগর্ভ বক্তব্যের কিছুই তার মগজে ঢোকেনি।

এভাবেই, এদখতে দেখতে আগস্টের ৬ তারিখ পেরিয়ে গেল।

আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে এবার একটু পরিষ্কার হল। ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভও উর্ধ্বমুখী হল। ব্যস, দুই মামা ব্যস্ততার সঙ্গে ভাগ্নী হেলেনা আর পরিচারিকা প্যাট্রিজকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে বসল।

www.pathagar.com

অ্যারিসটোটোবিউলিস তা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তদন্ত নিয়ে মেতে থাকায় তাদের এসব ব্যাপার-স্যাপার কিছুই জানতে পারল না।

সিআইল দ্বীপের কিনারায় গাড়ি এসে থামল। সামনে বিশাল সমুদ্র। দিগন্তের তিন চতুর্থাংশ স্পষ্ট নজরে পড়ছে।

এখানে আটটা বাজতে দশ মিনিট আগে সূর্যাস্ত হয়। বেচারা মামারা ঠায় বসে রইল। ভাগ্নী দিগন্তের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। সূর্য ক্রমেই সুমদ্রের ওপর ঝুঁকে পড়ছে। এবার বহু আকাঙ্ক্ষিত সবুজ রশ্মির খেল নিশ্চয়ই দেখা যাবে।

হায়! একী সর্বনাশা কাণ্ড অবাঞ্ছিত এক টুকরো ঘন কালো মেঘ দ্রুত ভেসে এসে সূর্যটাকে আড়াল করে দিল। গোলাকার সূর্যটাকে দ্বিধা বিভক্ত করে ফেলল। মুহূর্তের মধ্যে হতচ্ছাড়া মেঘটা সম্পূর্ণ সূর্যটাকে মুড়িয়ে ফেলে সমুদ্রের বুকে তলিয়ে যেতে লাগল। ব্যাস, সবুজরশ্মি দেখতে পাওয়ার আর প্রশ্নই ওঠে না।

অবাঞ্ছিত মেঘটাই হেলেনাকে সবুজরশ্মি দেখার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। তার চোখে ধুলো দিয়ে সেটা চুপি চুপি কেটে পড়ল।

*   *   *

মুখ গোমড়া করে হেলেনা হোটেলে ফিরে এল। দুই মামাই নিশ্চিন্ত। সবুজরশ্মি দেখতে না পাওয়ার জন্য ভাগ্নী তাদের অন্তত দোষারোপ করতে পারবে না।

সাব্যস্তহল। এখন কিছুদিন আর এত হাঙ্গামা করে সিআইল দ্বীপে গিয়ে ফায়দা কিছুই হবার নয়। থেকে থেকে আকাশে মেঘের উদয় হবেই। তবে হতাশ হবারও কিছু নেই। মাস দেড়েক পরে ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভ আবার উর্ধ্বমুখী হলে আবার গাড়ি নিয়ে সিআইল দ্বীপে হাজির হওয়া যাবে।

একদিন ডানোলি দুর্গ-প্রাসাদে বসে একথা সেকথা বলতে বলতে পরিচারিকা বলল, 'বাছা, তোমাদের ওই পণ্ডিত সাহেব লোকটা কিন্তু মোটেই সুবিধের নয় বলেই আমার বিশ্বাস। বড় বংশ আর ধনকুবের সত্য বটে।'

হেলেনা তার কথার জবাব না দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল, 'আচ্ছা, সে যুবকটাকে আয়োনা জাহাজে উঠিয়ে এনে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছিল, তার আর খোঁজ পাওয়া যায় নি?'

'ধ্যুৎ, ছোড়াটা একেবারে অকৃতজ্ঞ! তোমার জন্যই সে যমের দুয়ার থেকে ফিরে আসতে পেরেছে। কিন্তু জাহাজ ছেড়ে যাবার সময় সামান্য ধন্যবাদটুকু জানাবার দরকারও মনে করল না!'

'ধন্যবাদ যে জানাবে, আমার জন্যই যে যমের দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে তা কি সে জানতে পেরেছিল? যাকগে, ওখানে তাকে আর দেখা যায়নি?

'কেন দেখা যাবে না? ওই তো সেদিন সমুদ্রের ধারে হাওয়া খাচ্ছিল। আমাকে দেখে চিনতেই পারল না। তুমি কি বাছা, তাকে আচমকা দেখতে পেলে চিনতে পারবে?'

'কেন পারব না। আপনজনের মতো মধুর সম্ভাষণে কেউ যে কথা বলতে পারে, তাকে দেখার আগে পর্যন্ত আমার ধারণাই ছিল না। ভাড়া করা একটা নৌকামাত্র সম্বল।'

ব্যাস, এ পর্যন্তই। তাদের আলোচনা আর বেশিদূর এগোল না।

*   *   *

এদিকে দুই মামা কী ফাঁপড়েই না পড়েছে। ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভ ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। একটু আধটু নামলেও তিলমাত্রও ওপরে উঠল না। রোজ বেশ কয়েকবার করে

www.pathagar.com

তারা ব্যারোমিটারের ওপরে চোখ বুলিয়ে চলেছে। ফলে ভাগ্নীর মুখ ক্রমেই গোমড়া হয়ে চলেছে। পণ্ডিত প্রবরকেও ভাগ্নী মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। আবার মেঘের সঙ্গে বোঝাপড়া করে সবুজরশ্মিও রোজ লুকোচুরি খেলে চলেছে।

* * *

এডিনবরার এক নামকরা বংশের ছেলে অলিভার। অলিভার সিনক্লিয়ার। মা-বা বহু আগেই স্বর্গে গেছেন। কাকার তত্ত্বাবধানে মানুষ হয়েছে। উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। কবি হিসাবে তার খুবই নামডাক। শিল্পী হিসাবেও তার খ্যাতি কম নয়। নিজের আঁকা ছবি বিক্রি করেই গোছা গোছা ডলার রোজগার করতে পারে। অগাধ ধন-সম্পদের মালিক হয়ে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে সে ভূ-পর্যটনে বেরিয়েছিল। ভারতবর্ষ আর আমেরিকার জাঁকজমকপূর্ণ শহরগুলোতে মনের সুখে চক্কর মেরে বেরিয়েছে। অটুট মনোবল, অফুরন্ত উৎসাহ-উদ্যম আর সাহসও তার বুকভরা। এই করিভ্রিচান উপসাগরের সেই যুবক।

এদিকে পণ্ডিত প্রবর অ্যারিসটোবিউলিস দুই মামার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে ক্রোকি খেলায় মেতেছে। অদূরে অলিভার আপন মনে ছবি এঁকে চলেছে। ভাগ্নী হেলেনাও তাদের সঙ্গে খেলায় যোগদান করেছে। শেষপর্যন্ত অ্যারিসটোবিউলিস গো হারা হেরে গেল। বেচারা লজ্জায় মুখ দেখাতে না পেরে পালিয়ে বাঁচল। এমন কি অলিভার সিনক্লেয়ারের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকারও মনে করল না। ফ্যাকাসে মুখে হোটেলে ফিরে গেল।

খেলা বন্ধ হওয়ায় মামারা এবার যুবক শিল্পীর দিকে মন দিল। গুটি গুটি পায়ে তার কাছে এগিয়ে গেল। ভাগ্নী হেলেনা তাদের অনুসরণ করে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কথা প্রসঙ্গে হেলেনা তার কাছে সবুজরশ্মির প্রসঙ্গ পাড়ল।

সবুজরশ্মির কথা শুনে অলিভার ভ্রু কুঁচকে চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠল, 'সবুজরশ্মি! এর আগে তো এরকম কোনো কিছুর অস্তিত্বের কথা কোথাও শুনিনি। তবে তো আমাকেও দেখতে হয়। আর তা না দেখা অবধি আমি আর রঙ-তুলিতে হাত দিচ্ছি না।'

হেলেনা বলল, 'আমরা বরং এক সঙ্গে সবুজ রশ্মি দেখার চেষ্টা করি, আপত্তি আছে?'

'আপত্তি! এতো বরং আনন্দেরই কথা। আপত্তির তো কোনো কারণই থাকতে পারে না।' উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে অলিভার সিনক্লিয়ার জবাব দিল।

এবার থেকে প্রতিদিনই তাদের দেখা সাক্ষাত হতে লাগল। অলিভার জাহাজ থেকে বিদায় নিয়ে এখানে. ক্যালিডোনিয়ান হোটেলেই উঠেছিল।

এদিকে দুই মামা ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের ঊর্ধ্বগতি দেখতে না পেয়ে মনমরা হয়ে পড়লেন। আবহাওয়ার উন্নতি না হলে সিআইল দ্বীপে গিয়ে তো ফায়দা কিছুই হবার নয়।

পণ্ডিত প্রবর অ্যারিসটোবিউলিস ক্যালিডোনিয়ান হোটেলে নেই। ভূ-বিদ্যা বিষয়ক গবেষণার তাগিদে সুইং দ্বীপে গেছে।

১৬ আগস্ট। বরাত খুলল। ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভ দ্রুত ওপরের দিকে উঠতে লাগল। আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন ঘটল। সূর্য ঝকমকিয়ে উঠল। আকাশে মেঘের চিহ্ন ও নেই। দুই মামা ভাগ্নী হেলেনাকে নিয়ে সিআইল দ্বীপের প্রান্তে হাজির হল। শিল্পী অলিভার সিনক্লিয়ারও তাদের সঙ্গে রয়েছে।

www.pathagar.com

তারা দ্বীপের প্রান্তে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিগন্তের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। সূর্য পশ্চিম আকাশের গায়ে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়েছে। সমুদ্রের বুকে আত্মগোপন করার জন্য বিদায়ী সূর্যটা তার রক্তিম আভাটুকু নিয়ে উন্মুখ হয়ে পড়েছে।

অকস্মাৎ এক অভাবনীয় দৃশ্য তাদের চোখে পড়ল। একটা পালতোলা নৌকা যন্ত্রচালিতের মতো দ্বীপের পাশ থেকে বেরিয়ে এস দমকা হাওয়ার টানে ডুবন্ত রক্তিম সূর্যটার দিকে এগিয়ে চলল।

হেলেনা মনমরা হয়ে পড়ল। ইয়া পেল্লাই পাল নিয়ে নৌকাটা যদি এক ধারে সরে না যায় তবে আর সূর্যটাকে দেখা যাবে না। তার প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি শুরু করে দিল।

মামারা হাত নেড়ে, গলাফাটা চিৎকার করে নৌকারোহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। বৃথা চেষ্টা। নৌকাটা সূর্যকে আড়াল করেই তরতর করে এগিয়ে চলল। ঠিক সে সময়ে রক্তিম আভার গায়ে সবুজরশ্মি উদ্ভাসিত হওয়ার কথা তখনই হতচ্ছাড়া নৌকাটা তাকে আড়াল করে দিল! হেলেনা রীতিমতো ক্ষেপে গিয়ে সমানে কপাল চাপড়াতে লাগল।

দুই মামা আর ভাগ্নী সবাই একেবারে ক্ষেপে লাল। কেবলমাত্র শিল্পী সিনক্লিয়ার নির্বিকারচিত্তে অগ্রসরমান নৌকা ও পালটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তিম আভাটুকুর দিকে ভাবাপ্লুত চোখে তাকিয়ে রইল।

একটু বাদেই নৌকাটা সিআইল দ্বীপের পাড়ে এসে ভিড়ল। নৌকা থেকে যে লোকটা নেমে এল তাকে দেখেই সবাই রীতিমতো থ-বনে গেল। নৌকারোহী অ্যারিসটোবিউলিস। সুইং দ্বীপ থেকে ভূ-তত্ত্ববিষয়ক গবেষণা সেরে ফিরছে।

কোনরকম ভূমিকা না করেই মামাদের মধ্যে থেকে একজন চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'দেখুন সাহেব, অলিভার সিনক্লিয়ারকে সমুদ্রের বুক থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে প্রথমবার সবুজরশ্মি দেখার সুযোগ হাতছাড়া হয়েছিল। সিনক্লিয়ার এর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এবার বলল, 'তার জন্য ইনি বড়ই লজ্জিত। দ্বিতীয়বার বেরসিক নচ্ছার একটা মেঘ ঝট করে ডুবন্ত সূর্যটাকে ঢেকে ফেলে দিয়ে আমাদের প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়েছিল। আর তৃতীয়বার আমাদের সব চেষ্টা আপনার, মানে নৌকাটার জন্য ব্যর্থ হয়ে গেল।'

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে হেলেনা বলে উঠল, 'এরকম একটা অপকর্ম না করলেই কি আপনার চলছিল না সাহেব! আপনি কী যে সর্বনাশ করলেন বুঝতে পারছেন না! আমারও এমন কোনো ভাষা নেই যা দিয়ে আপনাকে আমার মনের অবস্থাটা বুঝাতে পারি।'

* * *

দুই মামা, ভাগ্নী আর অলিভার সিনক্লিয়ার সবুজরশ্মির চিন্তায় একেবারে আত্মমগ্ন হয়ে রইল। কিন্তু বারবার যেমন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে আর আকাশও নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাকে—কবে, কখন যে বহু আকাঙ্ক্ষিত সবুজরশ্মি অভাবনীয় রূপ নিয়ে দেখা দেবে তা ভগবানই জানেন। এসব বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ও উৎসাহ কোনোটাই অ্যারিসটোবিউলিসের নেই।

কেবলমাত্র হেলেনার অত্যুগ্র আগ্রহের ফলেই যে তার প্রাণটা রক্ষা পেয়েছিল একথা অলিভার সিনক্লিয়ার আজও জানে না। সে জেদ না ধরলে যে সমুদ্রের বুকে ঘূর্ণিপাকে পড়া অলিভারকে বাঁচানো যেতো না, একথা তাকে কেউ-ই বলে নি।

www.pathagar.com

অবশ্য হেলেনাই তার মামাদের এই কথা ফাঁস করতে বারণ করে দিয়েছিল।

সম্প্রতি এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখা দিয়েছে। সবুজরশ্মি—সবুজরশ্মি করে চারজন সবকিছুই সবুজ দেখতে শুরু করেছে। সমুদ্র, আকাশ, পাহাড়, বন এমন কি খাদ্যবস্তু পর্যন্ত তাদের চোখে সবুজ হয়ে উঠেছে। অভাবনীয় এ-সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় অলিভারই তাদের বলে দিল। এ জায়গাটা থেকে কোনোদিনই সূর্যাস্ত দেখা যাবে না। সিআইল দ্বীপ থেকেও নয়। আয়োনা গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাক।

হেলেনা উল্লসিত হয়ে বলল, 'চমৎকার! চমৎকার যুক্তি! কিন্তু সেখানে গিয়েও যদি হতাশ হতে হয়, সবুজরশ্মির দেখা পাওয়া না যায় তবে?'

'কুছ পরোয়া নেই। সারা পৃথিবীটাকে চক্কর মারব। কোথাও না কোথাও থেকে তো আমাদের বাঞ্ছা পূরণ হবেই।'

* * *

ব্যস, আর দেরি নয়। পরের দিন কাকডাকা ভোরে দুইমামা তাদের ভাগ্নী আর অলিভার সিনক্লিয়ারকে নিয়ে জাহাজে উঠল। দুই মামা হোটেল ছাড়ার পূর্বমুহূর্তে সৌজন্যর খাতিরে অ্যারিসটোবিউলিসকে তাদের যাত্রার কথা জানিয়ে এল।

অ্যারিসটোবিউলিস কিন্তু নিজের মতলবের কথা ভুলেও তাদের কাছে ফাঁস করল না।

স্টাফা আর আয়োনা চক্কর মেরে স্টিমারটা সন্ধ্যার আগেই ওবানার ফিরে আসবে।

হেলেনা আর অলিভার সিনক্লিয়ার ডেকে পাশাপাশি চেয়ারে বসে সমুদ্রের সৌন্দর্য দেখছে। 'সমুদ্র বাস্তবিকই চিরনতুন, চিরসুন্দর। সমুদ্র মানুষের মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে তোলে। আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন, কেবল অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের মিলনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে এমন অনিন্দসুন্দর সুমদ্রের। অবশ্য তাদের সঙ্গে মাত্র শতকরা আটভাগ সোডিয়াম রয়েছে।'

হেলেনা আর অলিভার সচকিত হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে তাদের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে অ্যারিসটোবিউলিস নির্বিকারভাবে তাদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলছে।

অ্যারিসটোবিউলিস অনেক আগেই তাদের অগোচরে স্টিমারে উঠেসেলুনে বসেছিল। স্টিমার আয়োনার কাছাকাছি আসতেই ডেকে এসে দাঁড়িয়েছে।

সমুদ্রের জলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতির কথা এর আগে হেলেনা এবং অলিভার কেউ-ই শোনে নি।

* * *

স্টিমার আয়োনা বন্দরে নোঙর করল। একটা মাত্র স্টিমারই পর্যটকদের নিয়ে যাতায়াত করে। নোঙর করার পর ঘণ্টা দুই পরে আবার স্টিমার ছাড়ে। এক সময় এ-দ্বীপ খুবই রমরমা ছিল। এখন ধ্বংসাবশেষটুকু অতীতের স্মৃতি বহন করছে।

দুই মামা ডানকান আর্মস নামে ভাঙাচোরা একটা বাড়িতে ভাগ্নী আর পরিচারিকাকে নিয়ে মাথা গুঁজল। আর অ্যারিটোবিউলিস আর অলিভার উঠল অন্য একটা ডেরায়। আয়োনা দ্বীপটায় চারশো ফুট পাহাড় ছাড়া দেখার মতো আর কিছুই নেই। আর তিন হাজার মাইল দূরবর্তী আমেরিকার উপকূল—ব্যস। তবুও আগন্তুকরা সর্বক্ষণ দ্বীপের বুকে চক্কর মেরে বেড়াতে লাগল।

৩০ আগস্ট মঠ আর গির্জায় গিয়ে মনটাকে একটু চাঙ্গা করে তোলার জন্য আগন্তুকরা পা বাড়াল।

www.pathagar.com

আগন্তুকরা যখন মনের আনন্দে ম্যাকনিলস ক্যাভারলির সমাধি ক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠিক তখনই নিতান্ত অবাঞ্ছিত অ্যারিসটোবিউলিস দাঁত বের করে হাসতে হাসতে সেখানে হাজির হল। তাদের আনন্দটাই একেবারে মাটি করে দিল। এক্কেবারেই উটকো ঝামেলা।

অলিভার কয়েক হাত দূরে আপন মনে ইজেলের গায়ে তুলি বুলিয়ে ছবি এঁকে চলেছে। এদিকে তার বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই।

কোনোরকম ভূমিকা না করেই অ্যারিসটোবিউলিস তার বিদ্যা জাহির করার কাজে মেতে গেল। তার বক্তব্য গির্জা আর মঠটার সৃষ্টির ইতিহাস।

হেলেনা চোখ-মুখে বিরক্তির ছাপ এঁকে গুটি গুটি সেখান থেকে সরে পড়ল। অলিভারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সে অলিভারকে নিয়ে সমাধি-প্রাঙ্গণের দিতে হাঁটা দিল। ছোট-বড় সমাধি সৌধগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই হেলেনা ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠল, 'অসংখ্য বিদেহী সত্তা এখানে পাথরচাপা হয়ে পড়ে রয়েছে। আমার ইচ্ছা করছে ডাকডাকি করে তাদের জাগিয়ে তুলি।'

ঠিক সে মুহূর্তেই পিছন দিক থেকে অ্যারিসটোবিউলিসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল 'সে কী মিস হেলানা, আপনি আত্মা-ভূতপ্রেত বিশ্বাস করেন!'

'করি। অবশ্যই বিশ্বাস করি।' স্মৃতিসৌধের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই হেলেনা দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল।

'আমি কিন্তু বলব এসব কথা পাগলের কথা—সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। ভালো কথা বিদেহী সত্তাকে দেখিয়ে আমার ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে পারেন?'

'আমার দেখিয়ে দিতে হবে না। দেখার মতো চোখ ও মন থাকলে আপনি নিজেই দেখতে পাবেন। সবকিছুর কথা বাদ দিলেও, সবুজরশ্মি—সবুজরশ্মি সুদূর দিগন্তের বুকে কেন মুহূর্তের জন্য উঁকি মারে বলুন তো?"

ঠোঁটের কোনে তাচ্ছিল্যের হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে অ্যারিসটোবিউলিস বলে উঠল, 'সবুজরশ্মি আসলে কি, জানেন? ডুবন্ত সূর্যের শেষ রশ্মিচ্ছটা সমুদ্রের ওপরের পাতলা জলের ভেতর দিয়ে আসতে গিয়ে রক্তিম আভাটুকু, মানে রঙটুকু শুষে নেয়। সূর্যের স্বাভাবিক প্রকাশই আপনার আকাঙ্খিত সবুজরশ্মি। তা চকিতে মিলিয়ে যায় সত্য। কিন্তু আমাদের চোখের রেটিনার গায়ে সবুজাভ ভাবটাকে ফুটিয়ে দিয়ে তবে সে অন্তর্হিত হয়। চক্ষু-বিজ্ঞানীদের মতে সবুজ রং লাল রঙের পরিপূরক। আপনার আকাঙ্খিত সবুজরশ্মি—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই হেলেনা মামাদের হাত ধরে টানতে টানতে সেখান থেকে সরে পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

* * *

হেলেনা পণ্ডিত প্রবর অ্যারিসটোবিউলিসের ওপর রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে রইল। যে লোক সবুজরশ্মিতে কবিত্ব উপলব্ধি করে না, আত্মা-পরমাত্মা আর শাস্ত্রকথাকে মস্তিষ্ক বিকৃতের প্রলাপ আখ্যা দিতে দ্বিধা করে না, অনন্ত সৌন্দর্যের আধার সুমদ্রের জলে কেবলমাত্র সোডিয়াম ক্লোরাইডের অস্তিত্বের কথা ভাবে আর সবকিছুকে বিজ্ঞানের নিরস কাঠগোড়ায় ফেলে বিচার-বিশ্লেষণ করে, তার নামটা শুনলেও হেলেনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে।

দুই মামা অ্যারিসটোবিউলিসের সঙ্গে ভাগ্নী হেলেনার বিয়ের চিন্তাকে মাথা থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিতে বাধ্য হল। তবে অ্যারিসটোবিউলিস কি হেরেনকে পাবার আশা

www.pathagar.com

ছাড়তে পেরেছে? তা যদি হত তবে তো সে অনেক আগেই আয়োনা দ্বীপ ছেড়ে চলে যেত।

অ্যারিসটোবিউলিস চরমতম বিপদে পড়ল। অলিভার না থাকলে তার যে কি গতি হত ভাবতে গেলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

পণ্ডিত প্রবর উঁচু একটা পাহাড়ের চূড়াঁয় উঠে যায়। গাছাগাছালি আর লতা ধরে ধীরে ধীরে কোনোরকমে চূঁড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। পাহাড়ের গা একেবারেই মসৃণ। খানাখন্দ তো দূরের কথা সামান্য খাঁজ বা ফাটল পর্যন্ত নেই।

পাহাড়টার গঠন বৈচিত্র্য দেখে অলিভার মুগ্ধ হল। রঙ-তুলি নিয়ে বসে গেল সেটার ছবি আঁকতে। ত্রিশ ফুট উঁচু গুহা। প্রস্থ পনের ফুট তো হবেই।

ছবি আঁকা শেষ করে তার তলায় লিখল, 'অলিভার সিনক্লিয়ারের পক্ষ থেকে মিস, হেলানাকে উপহার।' সব শেষে লিখল, 'স্টাফা, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।'

গুহাটায় স্থলপথে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। জলপথ ছাড়া সেটার মুখের কাছেই যাওয়া সম্ভব নয়। গুহাটার নাম 'ফিঙ্গলস গুহা।'

আগন্তুক দ্বীপবাসীরা পরের দিন গুহাটা দেখতে যাবে পরিকল্পনা করল।

এদিকে নিউইয়র্ক থেকে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা জরুরি বুলেটিন টেলিগ্রাম মারফৎ জাহাজের কাপ্তেনদের সতর্ক করে দিয়েছে, "উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রলয়ঙ্কর তুফান আসছে। প্রবল বিক্রমে স্কটল্যান্ড আর আয়ারল্যান্ডের ওপর আছাড় খেয়ে পড়বে। তারপর নরওয়ের উপকূলে গিয়ে তার দাপট কমবে।"

এদিকে ক্লোরিনডা স্টিমারের কাপ্তেন ব্যারোমিটারের খামখেয়ালি দেখেই নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন, প্রলয়ঙ্কর ঝড় ওঠার আর দেরি নেই। ব্যস্ত পায়ে দুই ভাইয়ের কাছে ঝড়ের পূর্বাভাসের দুঃসংবাদটা দিল। বলল, 'এই মুহূর্তে স্টাফা দ্বীপ ত্যাগ করা দরকার। দূরবর্তী আকনলাক্রেগ দ্বীপের পিছনে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া দরকার। সেখানে ঝড়ের দাপট কম থাকে কোনোক্রমে স্টিমারটা রক্ষা করা যাবে। ঝড় থামলে আবার এখানে ফেরা যাবে।

অকুতোভয় অলিভারের খেয়াল চাপল, ঝড়ের রুদ্ররূপ দেখবে। প্রায় ফিসফিসিয়ে তার অদ্ভুত খেয়ালটার কথা বলল।

ব্যস, তার কথায় হেলেনাও আনন্দে লাফিয়ে উঠল। দুই মামাকে রাজি করাতে দেরি হল না।

তাদের খাবার-দাবার ও জামাকাপড় নামিয়ে দিয়ে স্টিমারটা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চলে গেল। আগন্তুকরা ক্যাম-শেল গুহায় গিয়ে অশ্রয় নিল। তার নামকরণ করল 'মেলভিল হাউস'।

অভিযান পাগল অলিভার নৌকা নিয়ে পরিস্থিতিটা চাক্ষুষ করার লোভ সম্বরণ করতে পারল না। হেলেনাও তার সঙ্গে যেতে চাইল। শেষপর্যন্ত তার দুই মামাও নৌকায় উঠে বসল।

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের রূপ দেখার জন্য অত্যুৎসাহী অভিযাত্রীদের নৌকা ফিঙ্গালস গুহার দরজায় হাজির হল। অভিযাত্রীরা গুহার ভেতরে ঢুকেই তার ভেতরের অভাবনীয় দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। বাস্তবিকই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। প্রায় দেড়শো ফুট গভীর আর প্রস্থ প্রায় চুয়াল্লিশ ফুট। তার ভেতরের থামগুলোর কোনোটা প্রিজমের মতো ত্রিকোনা বিশিষ্ট। আবার কোনোটি বা তার চেয়েও দৃষ্টিনন্দন। গুহার মুখ দিয়ে আলো ঢুকে, থামগুলোর গায়ে প্রতিফলিত হয়ে শান্ত টলটলে জলের ওপর কমলা, লাল, হলুদ আর সবুজ

www.pathagar.com

রোশনাই লুটোপুটি খাচ্ছে। আর গুহার মুখ দিয়ে দমকা বাতাস ঢুকে অভাবনীয় এক শব্দলহরী সৃষ্টি করছে। এ যেন প্রাকৃতিক সংগীতলহরী সৃষ্টিকারী আ-না-ভাইন গুহা।

অভিযাত্রীরা বিস্ময়-বিস্ফোরিত চোখের মণিগুলো চারদিকে বুলাতে বুলাতে গুহাটার আরও ভেতরে ঢুকে গেল। সেখান থেকে গুহামুখ দিয়ে বাইরের মনোরম দৃশ্য দেখতে গেল।

ফিঙ্গালস গুহার সৌন্দর্য বুকে নিয়ে হেলেনা নিতান্ত অনিচ্ছায় অন্যান্যদের সঙ্গে ক্যাম-শেল গুহায় ফিরে এল।

৯ অক্টোবর বিকাল তিনটা থেকে হেলেনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছ'টার খাবার টেবিলেও সে হাজির হল না। সাতটা বাজল। অলিভার এবার দারুণ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল।

এদিকে ঝড়ের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। স্টাফা দ্বীপের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে কিছু থাকলে তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোথায় ফেলবে ভাবাই যায় না।

কিন্তু হেলেনা? কোথায় সে? সে কি তবে ফিঙ্গালস গুহায় গেছে? তা হলে তো এ-প্রলয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে তার পক্ষে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব নয়।

অস্থিরচিত্ত অলিভার একাই হেলেনার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে উদ্ভ্রান্তের মতো গুহামুখে গিয়ে হাজির হল। হেলেনার দুই মামাও নিশ্চিন্তে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারল না। সেখানে হাজির হল। ইতিমধ্যেই গুহামুখে ভয়ঙ্কর কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। ঝড়ের তাণ্ডবে সবকিছু বুঝি উড়িয়ে নিয়ে যাবে। হুর হুর করে জল ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে। একমাত্র চাতালটা এখনো ভেসে আছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গুহাটার ভেতর না ঢুকলে গুহামুখ জলে ভর্তি হয়ে যাবে। কি করবে তারা? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গুহার ভেতরে ঢুকলে ফায়দা কিছু হবে কি?

তবে হ্যাঁ, ইতিমধ্যে হেলেনার মুখে ফিঙ্গালস গুহার রূপ-সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা শোনা গিয়েছিল। সে যদি গুহাটার ভেতরে ঢুকে থাকে তবে অবশ্যই তার এখনো প্রাণে বেঁচে থাকার কথা।

দুই মামা হেলেনার নাম ধরে বুকফাটা আর্তনাদ জুড়ে দিল। না, ভেতর থেকে কোনো সাড়াই ভেসে এল না। অলিভার কম ডাকাডাকি করল না।

ঠিক সেই মুহূর্তেই গুহামুখ দিয়ে হেলেনার-চুলের ফিতাটা বেরিয়ে এল।

অলিভার বলল, 'হেলেনা এ-গুহার ভেতরেই আছে। আর সে নির্ঘাত জীবিতই আছে। নইলে কেবল ফিতেটাই নয়, হেলেনার মৃতুদেহটাও ঢেউয়ের টানে বেরিয়ে আসত।

অলিভার নৌকাটাকে কোনোরকমে গুহামুখে নিয়ে যেতেই জলের তোড়ে সেটা চোখের পলকে গুহার ভেতরে ঢুকে গেল। নৌকারোহী অলিভার একা। হেলেনার দুই মামা সঙ্গে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। অলিভার কিছুতেই রাজি হয় নি।

* * *

নৌকাটা এক ধাক্কায় ভেতরে ঢুকে যেতেই অলিভার আচমকা একটা পাথরকে ধরে ফেলল। সেটা ধরে ঝুলে রইল। পায়ের তলায় জলের দাপাদাপি সমানে চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার হাতের শিরা টনটন করতে লাগল। সে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, 'মিস হেলানা। মিস হেলানা!'

পরমুহূর্তেই হেলেনার প্রত্যুত্তর ভেসে এল, 'মি. সিনক্লিয়ার—মি. সিনক্লিয়ার, এই যে এখানে আমি।'

www.pathagar.com

অলিভার আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ার জোগার হল। বেঁচে আছে। হেলেনা তবে বেঁচে আছে।

হেলেনা বিপদাশঙ্কায় পাথরের একটা গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। তারই ভেতরে গুটিসুটি মেরে বসে রয়েছে। বুঝতে পেরেছিল বাইরে বেরোবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। অলিভার নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে হেলেনর কাছে এল। বলল, 'মিস হেলেনা আমি জানি আমি জানি মিস হেলেনা, করিভ্রিচান উপসাগরে ঘূর্ণিচক্রে পড়ার পর আপনার জন্যই আমার প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। অতএব এ মৃত্যুগুহা থেকে আপনাকে উদ্ধার করা আমার মানবিক কর্তব্য।' এদিকে থেকে থেকে জলের ঢেউ প্রবল বেগে গুহার মধ্যে ঢুকছে। তাদের দুজনকেই ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। অকুতোভয় অমিত শক্তিধর অলিভারকে দু-হাতে জাপ্টে ধরে হেলেনা উন্মত্ত ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। কিন্তু অলিভারই বা আর কতক্ষণ লড়াই করে টিকে থাকতে পারবে? হেলেনাকে কীভাবে বাঁচাবে, নিজেই বা কি করে আত্মরক্ষা করবে? মৃত্যু যে হাতের নাগালের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে তর্জন গর্জন করে চলেছে। জল ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সে শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে হেলেনাকে দু-হাতে উঁচু করে ধরল। হেলেনা সংজ্ঞা হারিয়ে তার কাঁধে এলিয়ে পড়ে রইল। ক্রমে গুহামুখ দিয়ে ক্ষীণ আলো ভেতরে উঁকি দিল। ভোরের আলো। আচমকা এক ঝটকায় জলে আছড়ে পড়ল অলিভার। হেলেনাকে কিন্তু শত বিপদেও কাঁধ থেকে নামাল না। যে কারণেই হোক তাকে বাঁচাবে। মরতেই যদি হয় উভয়ে একসাথে মরবে।

এদিকে দুই মামা পাথরের একটা উঁচু ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে নিদারুণ অস্থিরতার মধ্যে সারাটা রাত্রি কাটিয়েছে।

এক সময় অলিভার ধুঁকতে ধুঁকতে হেলেনাকে কাঁধে নিয়ে গুহামুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। দুই মামার হাতে তাদের আদরের ভাগ্নীকে তুলে দিল। পরমুহূর্তেই তার সংজ্ঞা লোপ পেল। পাথরের ঢিবির ওপর লুটিয়ে পড়ল।

* * *

ক্লাম-শেল গুহা। দুই মামার অক্লান্ত প্রয়াসে হেলেনা আর অলিভার সংজ্ঞা ফিরে পেল। উভয়ের চোখের তারায়ই আতঙ্কের সুস্পষ্ট ছাপ। ফিঙ্গালস গুহার সে আতঙ্ক।

বিকালে সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটাহাঁটি করার সময় দুই মামা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল, অলিভারের ঋণ কীভাবে শোধ করবে। আর এ দিকে অলিভার দ্বীপের মালভূমিতে একা একা অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করছে। আর হেলেনা? সে পরিচারিকাকে নিয়ে গুহার ভেতরে অবস্থান করছে। ক্লান্ত অবসন্ন তার দেহ। উঠে বসার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছে।

সূর্য পশ্চিম আকাশের গায়ে ঝুঁকে পড়েছে। তার রক্তিম আভাটুকু ছড়িয়ে পড়েছে সমুদ্রের জলে। অলিভার বিদায়ী সূর্যটার দিকে মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়েই ক্লাম-শেল গুহার দিকে ছুটতে লাগল। ভাবছে সবুজরশ্মি দেখার এমন অপূর্ব সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। অলিভার ব্যস্ত-পায়ে গুহায় ফিরে সবাইকে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। মালভূমিটার দিকে। সূর্য একটু একটু করে সমুদ্রের জল স্পর্শ করল। সবারই দৃষ্টি থালার মতো গোল রক্তিম সূর্যটার দিকে। এবার হয়তো সবুজরশ্মি দেখা যাবে।

হায়! একী কাণ্ড! একটা কালো মতো বস্তু ক্রমে সূর্যটাকে আড়াল করে ফেলল। স্টাফ দ্বীপের দিকে ধীরে মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে। হতচ্ছাড়া ওই কালো বস্তুটাকে

www.pathagar.com

এবার আর চিনতে বাকি রইল না। সেটা আরো কাছে এগিয়ে এলে সবাই চিনতে পারল অবাঞ্ছিত কালো বস্তুটা ক্লোরিডা স্টিমার। বাঁচা গেল! স্টিমারটা সূর্যালোক থেকে সরে গেল। এবার নির্ঘাত সবুজরশ্মি দেখা যাবে। সবাই চোখের তারায় অত্যুগ্রআগ্রহের ছাপ এঁকে দিগন্তের, ডুবন্ত রক্তিম সূর্যটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। কিন্তু কোথায় সবুজরশ্মি? লাল, হলুদ, নীল, গোলাপি প্রভৃতি অসংখ্য রঙের রশ্মি সাগরের বুকে ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যটা প্রায় তিন চতুর্থাংশ সমুদ্রের বুকে তলিয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় বহু আকাঙ্খিত সেই সবুজরশ্মি? একসময় বিদায়ী সূর্যের শেষ রশ্মিটুকুও অদৃশ্য হয়ে যেতে চলেছে। দুই মামা হঠাৎ সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'সবুজরশ্মি! সবজুরশ্মি! ওই-ওই যে সবুজরশ্মি!'

দুই মামা আর পরিচারিকা পেট্রিজ আর ভৃত্য ডেম বেস বহু আকাঙ্খিত সবুজরশ্মিকে দুচোখ ভরে দেখে জীবন ধন্য করল।

কিন্তু হেলেনা আর শিল্পী অলিভার? তারা কি তবে তাদের স্বপ্নসাধের সবুজরশ্মি দেখতে পেয়েছে? না, অবশ্যই না। তবে? সবুজরশ্মি যখন ক্ষণিকের জন্য ঝলসে উঠেছিল তখন তারা পরস্পরের চোখের কালো রশ্মির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে। না, কালো নয়—নীলরশ্মির দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো উভয়ে তাকিয়ে। কারোর মুখে কোনো কথা নেই। উভয়েই চোখের ভাষায় একে অন্যকে কাছে আসার আমন্ত্রণ জনাতে ব্যস্ত।

এক্সপেরিমেন্ট অব ড. অক্স

কুইকোয়েনডন নামক ছোট্ট শহরটার খোঁজ করতে গিয়ে যদি ফ্ল্যানডার্সের পুরনো বা নতুন যে-কোনো মানচিত্র চোখের সামনে ধরা যায় তবে হতাশ হতেই হবে। তবে? তবে কি এটাই মনে করতে হবে অন্য বহু শহরের মতোই কুইকোয়েনডন শহরটা হাফিস হয়ে গেছে অবশ্যই না। ভূগোলবিশাদরা যাই বলুন না কেন গত আট নশো বছর ধরে অবস্থান করছে। আর তার তিনশো নিরানব্বইজন বাসিন্দাও রয়েছে।

বার্গিস থেকে সোয়া কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং আডিনার্দে থেকে প্রায় সাড়ে তেরো কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অর্থাৎ ফ্লানডার্সের প্রায় কেন্দ্রস্থলে শহরটা অবস্থান করছে। শহরটার তিনটে সেতুর নিচ দিয়ে এসকটের শাখানদী কুলকুল রবে বয়ে গেছে। এগারোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে বসতিটির প্রথম প্রস্তর ফলক স্থাপিত হয়। ফলকটা স্থাপন করেছিলেন কাউন্ট বডইন। পরবর্তীকালে তিনি কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট হয়েছিলেন। এখানে ভূমি থেকে তিন শো সাতান্ন ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটা টাউনহলেরও অস্তিত্ব রয়েছে। প্রাচীরবেষ্টিত সুউচ্চ বুরুজে রয়েছে অতিকায় একটা ঘন্টা, যা বাস্তবিকই বিস্ময় উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে। প্রতিটা ঘন্টাধ্বনি এখান থেকে শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

কোন বিদেশী কুইকোয়েনডনে এলে টাউনহল না দেখে শহর ছাড়ে না। এখানে বারডনের আঁকা উইলিয়ম আব ন্যাশুর পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে। আর ষোলশতকের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য-নিদর্শন ম্যাগলয়ের গির্জার ছবিও এখানে রক্ষিত আছে। আর দেখা যাবে, প্লেসসেন্ট এরনাফের লোহা ঢালাইয়ের কুঁয়োর ছবি। যার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব চিত্রকর-কর্মকার কুয়েনটিন মেটসিসেরই প্রাপ্য। আর দেখা যাবে, চার্লস দ্য বোল্ডের মেয়ে ম্যারি অব বার্গান্ডির প্রাচীন সমাধি-মন্দিরের চিত্র। সম্প্রতিকালে তাঁর কফিন নেতারদামের বার্গিস গির্জায় সংরক্ষণ করা হচ্ছে। টাউন হলে এরকম আরও কত মূল্যবান শিল্পকর্ম যে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

দুগ্ধজাত দ্রব্য আর প্রচুর পরিমাণে যবের চিনি তৈরি কুইকোয়েনডনের প্রধান উৎপাদন শিল্প। বাবার পর শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করছেন তাঁর ছেলে। তারপর শাসনভার বর্তাচ্ছে তাঁর ছেলের উপর—এভাবে বংশপরম্পরায় শাসন-কার্য পরিচালনা করছে। এতকিছু সত্ত্বেও কুইকোয়েনডন শহরের নাম ফ্লানডার্সের মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্যাপার কি? ভূগোলবিশারদরা কি ইচ্ছে করেই কুইকোয়েনডনের নামটাকে বাদ দিয়েছেন, নাকি নামটার কথা ভুলেই গেছেন? আমার পক্ষে এটা বলা সম্ভব নয়। তবে এও ঠিক, ছবির মতো ছোট্ট শহর কুইকোয়েনডনের অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। সে কথাই এ কাহিনীতে ব্যক্ত করা হচ্ছে।

এ কাহিনীতে পশ্চিম ফ্লানডার্সের ফ্লেমিংদের ব্যাপারে কোনো বক্তব্যই স্থান পাবে না। তবে মানুষ হিসাবে তারা ভালো, স্বীকার করতেই হবে কারণ, তাঁরা যথার্থই জ্ঞানী, অতিথিবৎসল সামাজিক এবং ঠাণ্ডামাথার মানুষ। এমনকি মানসিক নীচতাকে তারা এড়িয়ে চলে। তবুও তাদের দেশেরই এমন একটা সার্বাধিক কৌতূহল সঞ্চারকারী নগরকে কেন যে আধুনিক মানচিত্রে স্থান দেওয়া হয় নি—এর স্বপক্ষে কোনো যুক্তি মেলে না। এর জন্য আমরা অবশ্যই মর্মাহত। কুইকোয়েনডনের নামের উল্লেখ কি ইতিহাসেও নেই? ঐতিহাসিকরা যদি ভুল করে থাকে, তবে আঞ্চলিক নিবন্ধে? তাও যদি ভুল করে থাকে, তবে দেশসমূহের ঐতিহ্যের তালিকায়? মানচিত্র, ইতিহাস আর ঐতিহ্যের তালিকা প্রভৃতি কোথাও ছোট্ট এ শহরটা স্থান পায়নি, এতে দেশের সওদাগরী কাম-কাজের ক্ষতি হবে? কুইকোয়েনডন শহরে কোনো শিল্প বা রমরমা ব্যবসা নেই যার জন্য চিন্তা ভাবনা করা দরকার। আর নেহাত যদি কিছু থাকে তবে নগরবাসীরা নিজেরাই তৎক্ষণাৎ তার ফয়সালা করে নেয়। দুগ্ধজাত দ্রব্য আর যবের ছাতু যা উৎপাদিত হয় তা নিজেদের প্রয়োজনেই লাগে, রপ্তানির প্রশ্নই ওঠে না। মোদ্দা কথা, কুইকোয়েনডনের অধিবাসীরা কারোরই ধার ধারে না। তাদের চাল-চলন সহজসরল আর চাহিদাও সীমিত। এসকর্ট ও উত্তর সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এরকম মানুষের আজও অস্তিত্ব রয়েছে।

* * *

একদিন কাউনসেলর নিকলসি ও বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি আলোচনায় লিপ্ত। কথা প্রসঙ্গে বার্গোমাস্টার বললেন, 'দেখুন মি. ট্রিকসি, হঠাৎ করে এমন কাজ করা মোটেই সঙ্গত হবে বলে আমি অন্তত মনে করি না।'

'কিন্তু গত দশ দশটা বছর ধরে আমরা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছি। কিন্তু আজ অবধি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না।

'কোন্ জায়গাটায় আপনার দ্বিধা তা আমি ভালোই বুঝতে পারছি। আর আমি আপনার দ্বিধার ভাগীদারও হচ্ছি। তবে ব্যাপারটা সম্বন্ধে আরও সতর্কতা অবলম্বন করে হৈ হট্টগোল জুড়ে না দেওয়াই আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

www.pathagar.com

'খুবই সত্য যে, কুইকোয়েনডনের মতো এমন একটা নিরুপদ্রব শান্তিপূর্ণ নগরের নগরপালের পদটা একেবারেই অনাবশ্যক'—কাউনসেলর নিকলসি ভ্যান ট্রিকসির কথার জবাব দিতে গিয়ে বললেন।

'আমাদের পূর্বসূরীরা এমন কথা ঘুণাক্ষরেও বলেন নি যে, কোনে কিছু সম্পূর্ণ নিশ্চিত। বলার সাহসেও কুলোয়নি তাদের। তারা বিশ্বাস করতেন যে, কোনো নিশ্চিত কাহিনীর দুর্ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে।'

ব্যস, উভয়েই নির্বাক। কারোর মুখে টু-শব্দটিও নেই। এক সময় নিকলসি বললেন, 'মি. ট্রিকসি, বলুন তো কুড়ি বছর আগে আর পূর্বসূরী কতোয়ালের এ অফিসটা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, ঠিক তো? ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই সাধারণ নয়। এ অফিসটার জন্য তেরোশো পঁচাত্তর ফ্রাঁ আর কয়েকটা সেনটাইম এ নগরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, এরকম চিন্তা করা হয়েছিল বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই এমন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণমানুষটা পৃথিবী ছেড়ে গেলেন। ফেরল মাত্র এ ব্যাপারটাই নয় শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত থেকে বঞ্চিত হল। তাঁর প্রদর্শিত পথেই আমাদের চলা উচিত নয় কি মি. নিকলসি? যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই দেহ রাখেন, তিনি অবশ্যই স্বর্গলাভের অধিকারী হন।'

কথা বলতে বলতে বার্গোমাস্টার হাত বাড়িয়ে একটা ঘন্টার বোতামে আঙুল রাখলেন। আলতো করে চাপ দিলেন। খুবই মৃদু শব্দের সৃষ্টি হল মুহূর্তের মধ্যে হাল্কা শব্দ করে দুটো পা এগিয়ে আসতে শোনা গেল। নিঃশব্দে দরজার পাল্লা দুটো খুলে গেল। রূপ-সৌন্দর্যের ডালি মেলে ঘরে প্রবেশ করলেন এক যুবতী। নাম তার সুজেল ভ্যান ট্রিকসি। বার্গোমাস্টারের একমাত্র আদরের দুলালী। সে একটা তামাকের পাইপ ও অঙ্গারের পাত্র বাবার দিকে বাড়িয়ে দিল। পর মুহূর্তেই তেমনি ধীর পায়ে, নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিচক্ষণ বার্গোমাস্টার মুখে পাইপটা তুলে আপন মনে টানতে লাগলেন। আর কাউন্সেলর নিকলসি গভীর চিন্তায় ডুবে রইলেন।

দুই খ্যাতিমান যে কামরাটায় বসে কুইকোয়েনডনের আলোচনায় মেতে রয়েছেন সেটা একটা সুদৃশ্য কারুকার্যমণ্ডিত বৈঠকখানা। ঘরের এক পাশে একটা অতিকায় চুল্লিতে আগুন জ্বলছে। এমনই বিশাল সেটা যে আস্ত একটা গাছকে তাতে ফেলে গোটা একটা ষাঁড়কে ঝলসে নেওয়া যেতে পারে। চুল্লিটার বিপরীত দিকের কাঁচের জানালা দিয়ে সূর্যের মৃদু কিরণ এসে ঘরের মেঝেতে লুটোপুটি খাচ্ছে। চিমনির ওপারে শোভা পাচ্ছে মেমলিং এর আঁকা একটা প্রতিকৃতি। নির্ঘাৎ এটা ভ্যান ট্রিকসের কোনো পূর্বসূরীর চিত্র। চৌদ্দশতকের এক পুরুষ, সেন ফ্রেমিংরা যখন হ্যাপস্‌বার্গের সম্রাট রুডলফের সঙ্গে আর গাই ড্যামপেরি যুদ্ধে মেতেছিলেন এ চিত্রটা সে সময়কার।

এ বৈঠকখানাটাই বার্গোমাস্টারের অট্টালিকার সবচেয়ে সেরা কামরা। কেবল এই নয়, কুইকোয়েনডনে যে ক'টা সবচেয়ে আরামদায়ক কামরা রয়েছে তাদের মধ্যে এটাই সবচেয়ে সেরা। কনভেন্ট বা মূক-বধিরদের বাসস্থলেও বুঝি এ প্রাসাদের চেয়ে কম নৈশব্দ বিরাজ করে না। এ বাড়িটায় শব্দের নামগন্ধও নেই। এখানকার মানুষ বুঝি হাঁটার পরিবর্তে তারা ফিসফিসিয়ে কাজ সারে। তবে এ-ও সত্য নয় যে, এ প্রাসাদে কোনো নারী থাকেন না। আছেন, অবশ্যই আছেন। বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসির সহধর্মিণী ব্রিগিটি ভ্যান ট্রিকসি আর তার দুলালী সুজেল ভ্যান ট্রিকসি। গৃহস্থলীর কাজকর্মের

www.pathagar.com

তদারকি করার জন্য লোচ জানসো আর হারমান্স বার্গোমাস্টারের বোনও রয়েছেন। হারমান্স প্রৌঢ়া, চিরকুমারী। বার্গোমাস্টারের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দোহারা চেহারা। তার চেহারা ছবি আর আচার-আচরণের মধ্যে কোনো কিছু মাত্রাতিরিক্ত কম বা বেশি নয়। তিনি সর্বদা ভালো পোশাকে সেজে গুজে থাকেন।

ইয়া পেল্লাই একটা টুপি ব্যবহার করেন। ফ্লানডার্স তখন ইংল্যান্ড থেকে আলাদা হয়েছিল এ টুপিটা তখনকার। অতএব এটার বয়সে কম হলেও চল্লিশ বছর এতে কোনো সন্দেহই নেই। এবার কোন্ সিদ্ধান্তে পৌছানো যেতে পারে? আবেগ, উচ্ছ্বাস আর উত্তেজনার মাধ্যমেই শারীরিক ও আত্মিক অবক্ষয় ঘটে থাকে। শরীর ও পোশাকের জীর্ণতা আসে। কিন্তু বার্গোমাস্টার কর্মভীতু, উৎসাহ উদ্যমহীন আর বিবাসী প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও আবেগ প্রবণ অবশ্যই নন। তাঁর অলস মনকে কোনো কিছুই উত্তেজিত করতে পারে না। তার ধ্যান—ধারনার ক্ষয় আর ব্যয় বলে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। তাই তো তিনি নিজেকে কুইকোয়েনডন ও তার শান্ত স্বভাবের নাগরিকদের শাসন করার উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করেন।

এ নগরের এ-প্রাসাদেই বার্গোমাস্টারকে জীবনে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কাটাতে হবে। তবে হ্যাঁ, চোখ বোজার আগে তাঁকে দেখে যেতে হবে, ষাট বছর সুখে সংসার-জীবন অতিবাহিত করার পর চিরশান্তিলাভের প্রত্যাশা নিয়ে তার আগেই তাঁর সহধর্মিণী ব্রিগিটি ভ্যান ট্রিকসি অনন্ত সুন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন।

ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করেই বলছি—ভ্যান ট্রিকসি-পরিবারে তেরোশো চৌত্রিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে একটা রীতি প্রচলিত রয়েছে। প্রচলিত রীতি হচ্ছে, এমন বয়স্কা এক যুবতীকে বিপত্নীক ভ্যান ট্রিকসি বিয়ে করবেন যার বয়স তাঁর তুলনায় খুবই কম। ভ্যান ট্রিকসির মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী আবার তাঁর চেয়ে খুবই কম বয়স্ক এক যুবককে বিয়ে করবেন। ফলে সমস্যাটা যুগযুগান্তর ধরে অব্যাহত থাকবে। সুদীর্ঘ দিন ধরে দিব্যি চলেও আসছে অদ্ভুত এ রীতিটা। এভাবেই ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসি বার্গোমাস্টারের ঘরণী হয়ে এসেছেন, ঘর-সংসার করছেন। স্বামীর চেয়ে তাঁর বয়স দশ বছর বেশি। তাই তাঁকে স্বামীর আগেই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে। অন্য এক যুবতীর জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। বার্গোমাস্টারও প্রচলিত পারিবারিক রীতি ভঙ্গ করতে উৎসাহী নন। তাই তো তিনি এতদিন এ-দিনটার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। এমন একটা হৈ-হট্টগোলহীন শান্তি-নীড়ে পত্নীর অধিকার নিয়ে ঘর করতে আসার লোভ রক্ত-মাংসের কোনো যুবতী তো দূরের ব্যাপার দেবী হারপোক্রেটিসও বোধ করি উৎসাহী হয়ে পড়তেন।

বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি আর কাউন্সেলার নিকলসির মধ্যে যখন উপরোক্ত কথোপকথন সাঙ্গ হল তখন ঠিক দুপুর তিনটে বাজে। পৌনে চারটের সময় ভ্যান ট্রিকসি পাইপটা ধরিয়ে দিয়ে গেলেন। পাঁচটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে তামাক সেবন সেরে পাইপটা হাত থেকে নামিয়ে রাখলেন।

দীর্ঘ সময় ধরে, তাঁরা অখণ্ড নীরবতার মধ্যে কাটালেন স্বভাব অনুযায়ী কাউন্সেলার নিকলসি মুখ না খুলে পারলেন না। তিনি আচমকা কথাটা ছুঁড়ে দিলেন, 'আমার তো মনে হচ্ছে, আপনার কথাই যুক্তিসঙ্গত।'

মি. নিকলসি, আরও কিছু তথ্যাদির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। তারপর না হয় নগরপালের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। তবে মাসখানেকের মধ্যে কোনো কিছু করতে হবে না বলেই আমি মনে করছি।'

www.pathagar.com

'মাসখানেক বলছেন কি মশাই। এক বছরের মধ্যেও আমাদের কিছু করতে হবে না বলে আমার বিশ্বাস।'

'হুম' বার্গোমাস্টার অস্ফুট উচ্চারণ করলেন। ব্যস, আবার বিশালায়তন হলঘরটায় নীরবতা নেমে এল। উভয়েই গম্ভীর মুখে আপন ভাবনায় তন্ময় হয়ে রইলেন।

লোচ আটটার কাছাকাছি কাঁচের জারে পানীয় লমকো ও দুটো গ্লাস নিয়ে এল। বার্গোমাস্টার আবার মুখ খুললেন, 'মি. নিকলসি, অডিনার্দে গেটের টাওয়ারটা নাকি ভেঙে পড়েছে শুনলাম।'

'সেটা পথচারীর মাথায় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লেও আশ্চর্য হবার নয়।'

'শুনুন, কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আগেই টাওয়ারটা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। তবে তার চেয়ে জরুরি ব্যাপার হচ্ছে চামড়ার বাজারের আগুনের ব্যাপারটা। আর একটা কথা, আপনি শোনেন নি, সেন্ট জেকুইসের অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গা জলে ডুবে যাওয়ার জোগার হয়েছে।'

'হ্যাঁ, আমিও শুনেছি বটে। তবে দুঃখজনক ব্যাপার যে, জলের স্রোত চামড়ার বাজারের দিকে ধাওয়া করে নি। তাহলে চামড়ার বাজারের আগুনের তাণ্ডবে একটু ভাঁটা পড়ত।'

'দেখুন, দুর্ঘটনা কোন বাঁধাধরা নিয়ম কানুন মেনে চলে না। তা যদি চলত তবে তো মশাই আমরা তো নিজেদের অনেক হাল্কা বোধ করতে পারতাম।'

কাউন্সেলার নিকলসি এবার বললেন, 'শহর আলোকিত করার সে বিরাট ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু আমরা এখনো কোনো আলোচনাই করি নি।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ বুঝেছি, আপনি ড. অক্সের শহরে আলো বসানোর ব্যাপারটার ইঙ্গিত দিচ্ছেন, তাই না? কিন্তু সে কাজ তো শুরু হয়ে গেছে। পুরোদমে কাজ এগিয়ে চলেছে। পাইপ পর্যন্ত বসানো হয়ে গেছে মশাই। ধরতে পারেন কাজটা শেষই হয়ে গেছে।'

'মি. বার্গোমাস্টার, কাজটা হয়তো আমরা একটু তাড়াতাড়ি সেরে ফেলেছি, তাই না?'

'তাই হয়তো হবে। এতে একটা যুক্তি দেখান যেতে পারে যে, ড. অক্স একটা এক্সপেরিমেন্টের পুরো খরচটাই একদম নিজের অর্থ দিয়ে করছেন।'

'হ্যাঁ, এটা তো বড় রকমের একটা যুক্তিই বটে। তবেই আমরা সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারব। দ্রুত উন্নতির ফলে এগিয়ে যেতে পারব। তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা যদি সফল হয় তবে ফ্লানডার্সের মধ্যে একমাত্র কুইকোয়েনডন নগরেই এমন এক বস্তুর সাহায্যে আলো জ্বলবে যার নাম অক্সিভালো কণা, গ্যাসটার নাম যেন কি?'

'অক্সিহাইড্রিক।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ! অক্সিহাইড্রিক গ্যাস।'

এমন সময় ভেতর থেকে বার্গোমাস্টারের ডাক পড়ল। নৈশভোজ সেরে নেওয়ার তাগিদ।

সব শেষে উভয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, কিছুদিন বাদে, সময় মতো প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের এক সভা ডাকা হবে। আলোচ্য বিষয় থাকবে, অডিনার্দে গেটের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সঙ্গত হবে কিনা।

এবার দুই শাসনকর্তা পরস্পরের বিপরীত দিকের দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

কাউন্সেলার নিকলসিকে বিদায় জানিয়ে বার্গোমাস্টার পিছন ফিরতেই বাইরে থেকে কেমন বিশ্রী একটা শব্দ ভেসে এল। সত্যি বিশ্রীই শুধু নয়, অবিশ্বাস্যও বটে। পনেরো শো তেরোতে স্পেনিয়ার্ডরা কেল্লা দখল করার পর এমন বিশ্রী শব্দ কুইকোয়েনডনে

www.pathagar.com

মুহূর্তের জন্যও কোনোদিন শোনা যায় নি। ভয়ঙ্কর শব্দটায় ভ্যান ট্রিকসির প্রাসাদটার দীর্ঘদিনের সুপ্ত প্রতিধ্বনি কেন অকস্মাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কাউন্সেলার নিকলসি দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে থমকে গেলেন।

ব্যাপারটা এমন মনে হল যে কেউ যেন বড়সড় কোনো বস্তু দিয়ে দরজায় সজোরে আঘাত আনছে। আর হরদম চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে। সব মিলিয়ে যেন ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

কাউন্সেলর নিকলসি এবং বার্গোমাস্টার এমন স্তম্ভিত হলেন যে, তেরোশো পঁচাশিতে যে-কামান দাগা হয়েছিল আচমকা কেউ যদি সেটাকে দেগে দিত তবুও এমন করে বিস্ময়াবিভূত হতেন না।

দরজায় দুম্ দুম্ করে আঘাত এবং চেঁচামেচি আরও বেড়ে গেলে লোচ বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় কোরকমে উচ্চরণ করলেন কে?—'কে ওখানে?'

বাইরে থেকে গম্ভীর স্বর ভেসে এল, 'আমি! আমি নগর পাল প্যাসফ!'

প্যাসফ! নগরের কর্তাব্যক্তিরা দশ বছরের জন্য যার অফিস বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন, ইনি সেই প্যাসফ। তবে কি চৌদ্দশতকের মতো বার্গান্ডিয়ানরা কুইকোয়েনডন নগরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে? নগরপাল প্যাসফ তো এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আতঙ্কিত হতে পারেন না।

ভ্যান ট্রিকসির ইঙ্গিতে দরজার শিটকিনি খুলে দেওয়া হল। উল্কার বেগে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই নগরপাল প্যাসফ দুম্ করে মেঝেতেই বসে পড়লেন। অন্য সবার পরিস্থিতি সঙ্গীন হলেও যুবতী লোচ মনে সাহস সঞ্চার করে বললেন, 'কি ব্যাপার নগর পাল? আপনাকে এমন উদ্ভ্রান্তে মতো—'

'আমি ড. অক্সের বাড়ি থেকে আসছি। তিনি নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা দিচ্ছেন। সেখানে আলোচনা হচ্ছে—গত এক শতকেও কুইকোয়েনডনে যা ঘটে নি সেরকমই ঘটতে চলেছে। ড. ডোমিনিক কাসটোস আর আইনজ্ঞ আঁদে সুট এমন উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে তাঁরা ডুয়েল না লড়ে ছাড়ছেন না। আপনারা তো জানেনেই ড. কাসটোস কেমন ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোক, যারপরনাই বিপজ্জনকও বটে। আপনারা অনুগ্রহ করে একবারটি চলুন।'

বার্গোমাস্টারের সঙ্গে কাউন্সেলর নিকলসি আর নগরপাল প্যাসফ বৈঠকখানায় হাজির হলেন।

*   *   *

কে এই ড. অক্স? কি-ই বা তাঁর প্রকৃত পরিচয়? বিজ্ঞান সাধকরা তাঁকে ভালোভাবেই চেনেন। ফিজিওলজিস্ট ডক্টর অক্সের নামে ইউরোপের শিক্ষিত ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন। ডালটন, মেনজিস, ডেভিস, ভিরডর্টস, বসটক্স আর গডুইন—এঁদের প্রত্যেকেই ফিজিওলজিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে গেছেন। ডক্টর অক্স এঁদের প্রত্যেককে প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করেন। তিনি কোন দেশের মানুষ। তাঁর বয়সই বা কত, কিছুই বলা সম্ভব নয়। এসবের খোঁজ করার দরকারও তো নেই। তিনি যে অত্যাশ্চর্য ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এটুকু বললেই যথেষ্ট। তাঁর আত্মপ্রত্যয়ও কুইকোয়েনডনের অন্যান্য নাগরিকদের থেকে তাঁকে আলাদা করে রাখে। কোথাও স্থির হয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যস্ততা যেন প্রতিনিয়ত তাঁকে খোঁচায়, অস্থির করে তোলে।

www.pathagar.com

তবে কি এটাই মনে করতে হবে, ডক্টর অক্স একজন টাকার কুমির। তা যদি না-ই হবেন তবে কেন নিজের ট্যাকের পয়সা দিয়ে পুরো কুইকোয়েনডন শহরকে আলোকিত করার উদ্ভট পরিকল্পনা মাথায় আনলেন? হয়তো এটাই ঠিক। নইলে এমন অভাবনীয় বিলাসে তাঁর মতি হল কেন?

ডক্টর অক্স মাত্র পাঁচ মাস আগে কুইকোয়েনডন শহরে এসে মাথা গুঁজেছেন। অমন সাজানো শহর ফ্রেমিং ছেড়ে নীরবতার প্রতিমূর্তি কুইকোয়েনডন নগরকেই বা তিনি কেন বেছে নিলেন? অভাবনীয় এক পদ্ধতিতে নগরটাকে আলোকিত করার পরিকল্পনাই বা কেন তিনি গ্রহণ করলেন? নাকি এটা তাঁর একটা বাহানামাত্র? নগরকে আলোকিত করার বাহনা নিয়ে নগরের প্রাণবন্ত মানুষকে নিয়ে ফিজিওলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্টের ধান্ধায় রয়েছে? মৌলিক চরিত্রের অধিকারী বিচিত্র এ-মানুষটা কোনো মতলবকে চরিতার্থ করার ধান্ধায় রয়েছেন?

তবে হ্যাঁ, ডক্টর অক্স যে নগরে আলো জ্বালার ব্যবস্থা করছেন এটা বাস্তবিকই অত্যাবশ্যক। এর সুবাদে গ্যাস তৈরির কারখানাও গড়ে তোলা হয়েছে। পুরোদমে কাজ চলছে।

সত্যি ডক্টর অক্সের আসল উদ্দেশ্যটা রহস্যাবৃতই রয়ে গেল। কারণ, সহকারি ইজিনি ছাড়া দ্বিতীয় কারোর কাছে এ-ব্যাপারে মুখই খোলেন না। যাই হোক শহরের সদর-রাস্তাগুলোতে আলো জ্বলবে এটাই বড় কথা। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বাড়িগুলো তাঁর অত্যাশ্চর্য আলো থেকে বঞ্চিত হবে না

একটু আগেই বার্গোমাস্টার আর কাউন্সিলার বলাবলি করছিলেন, নগরে আলো জ্বালার পরিকল্পনাটা এই প্রথম নয়। কারবোরেট অব হাইড্রোজেন পাওয়া যায় কয়লাকে পাতনের মাধ্যমে। কিন্তু এ-নগরে আলো জ্বালা হবে অন্তত বিশগুণ উজ্জ্বল গ্যাসের সাহায্যে। আর তা তৈরি করা হবে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মাধ্যমে। তার নাম অক্সিহাইড্রিক গ্যাস। গ্যাসমিটার তো রয়েছেই।

অভিজ্ঞ ফিজিওলজিস্ট ছাড়াও ডক্টর অক্স একজন বড় কেমিস্টও বটে। সাধারণ জল থেকে গ্যাস উৎপাদনের কৌশল তাঁর নখদর্পণে। তাই তো প্রথমে জলে অ্যাসিড মিশিয়ে নেন। তারপর নিজেরই উদ্ভাবিত কয়েকটি মেটালিক পদার্থের মিশ্রণের মাধ্যমে প্রচুর অক্সিহাইড্রিক গ্যাস তৈরি করে ফেলেন। জলভর্তি অতিকায় পাত্রের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করলেই অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন—জলের এ দুটো মৌলিক উপাদানে ভেঙে যায়। তাদের পৃথক পৃথক পাত্রে সংরক্ষণ করা হল। নইলে দুটো গ্যাসের মিশ্রণ ঘটলে তাতে কোনোক্রমে অগ্নি সংযোগ হয়ে গেলে প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে গিয়ে কারখানা পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। ব্যস, অত্যুজ্জ্বল আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আর এ-আলোকমালায় কুইকোয়েনডন নগর যে ঝলমলিয়ে উঠবে, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? কিন্তু এ নিয়ে ডক্টর অক্স আর তাঁর সহকারী যে মোটেই ভাবিত নন তা ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমেই প্রকাশ পাবে।

নগরপাল প্যাসফ যখন উদ্ভ্রান্তের মতো বার্গোমাস্টারের প্রাসাদে হাজি হন তখন ডক্টর অক্স আর তাঁর সহকারী ইজিনি পরীক্ষাগারে পরামর্শে মগ্ন।

কথাপ্রসঙ্গে ডক্টর অক্স বলেন, 'ইজিনি, কাল আমার সংবর্ধনা সভায় তো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলে ঠাণ্ডা মেজাজের কুইকোয়েনডন নগরের মানুষগুলোকে। আচ্ছা রকম দাওয়াই না দিলে মজাটা জমবে না, বুঝলে?'

www.pathagar.com

'একেবারেই সত্যি কথাটা বলেছেন স্যার। এক্সপেরিমেন্টের গোড়াতেই জব্বর ফল পাওয়া গেছে। তখন ফলটা বন্ধ করে না দিলে পরিণামে কি যে ঘটত তা অনুমানও করা যায় না।'

'দুটো দিন ধৈর্য ধর, দেখবে নগরবাসীদের কী অবস্থা করে ছাড়ি। আর মাত্র—'।

'স্যার, একটা কথা,আমাদের এক্সপেরিমেন্ট সফল করতে গিয়ে শহরের মানুষের শ্বাসকষ্ট, শ্বাসযন্ত্র বরবাদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কি নেই?'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য কম-বেশি আছে।' আমতা আমতা করে ডক্টর অক্স বললেন 'কিন্তু এটা তো বিজ্ঞানের কল্যাণেই আমরা করছি। এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে কুকুর-ব্যাঙকে চেঁরার জন্য ছুরি চালাতে গেলে তারা যদি আপত্তি করে তবে কি তুমি হাত থেকে ছুরিটা ফেলে দেবে, বল?'

'একী বলছেন স্যার! কুকুর-ব্যাঙ আর মানুষকে একই দাঁড়িপাল্লায় চাপাতে চাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, স্যার। ভুলটা আমারই হয়েছে। কুইকোয়েনডন শহর ছাড়া এমন নিরীহ গোবেচারা জীব আর কোথায়ই বা পাওয়া যেত। ভাল কথা, তাদের নাড়ী টিপে গড় গতি কত পেলেন।'

'মিনিটে পঞ্চাশেরও কম। তবেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছ। এখানকার নাগরিকরা এমনই মাটির ঢেলা বনে রয়েছে যে, কোনো ব্যাপারেই এদের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা আর উত্তেজনার সঞ্চার ঘটে না। এখানে একশো বছরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ তো দূরের ব্যাপার, রেগে গিয়ে কেউ, কাউকে একটা থাপ্পড় পর্যন্ত মারে নি। তাই তো একটা পরিবর্তন ঘটানোর পরিকল্পনা আমি গ্রহণ করেছি। শোন, যদি আমাদের পরিকল্পনা স্বার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তবে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে পৃথিবীর সংস্কার করা!' কথাটা বলেই বিজয়ী বীরের মতো ডক্টর অক্স সরবে হেসে উঠলেন।

* * *

বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি আর কাউন্সেলর নিকলসি নিরবচ্ছিন্ন দুর্বিষহ অস্থিরতার মধ্যে রাত্রি কাটালেন। ডক্টর অক্সের বাড়িতে কী যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে এ-ভাবনাটাই তাঁদের বিনিদ্র রাত্রি কাটানোর কারণ। তাঁদের মাথায় ভাবনার উদয় হল, এ-পরিস্থিতিতে কেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন? উভয়েই পৌরসভার প্রতিনিধি তবে কি ব্যাপারটা নিয়ে কিছু করতে কি তাঁরা বাধ্য হবেন? ভবিষ্যতে যাতে আর এরকম ন্যাক্কারজনক ঘটনা না ঘটে তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা কি সঙ্গত হবে? এরকম হাজারো প্রশ্ন নিয়ে উভয়ে সারা রাত্রি গভীর ভাবনায় ডুবে রইলেন। কিন্তু কোনো ফলই হল না।

সকাল হতে না হতেই বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি কাউন্সেলর নিকলসির বাড়ি হাজির হলেন। উভয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্থির করলেন ডক্টর অক্সের বাড়ি দেখা করতে যাবেন। উদ্দেশ্য স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে নতুন কোনো খবর সংগ্রহ করতে পারেন কিনা। তবে অক্সের কাছে ব্যাপারটা গোপন রাখা হবে।

তাঁরা সরাসরি ডক্টর অক্সের গবেষণাগারে হাজির হলেন। দেখলেন, তিনি সেখানে গবেষণায় ডুবে রয়েছেন।

এদিকে শহরের অধিবাসীদের মধ্যে এখানে-ওখানে সুট ও কাসটোসের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে জোর আলোচনা চলেছে। তবে এও সত্য বটে, কার পক্ষ নেওয়া সঙ্গত হবে কেউ ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। উকিল সুট আজ অবধি কোনো মামলায়ই হারেন

www.pathagar.com

নি। আসলে কোনো মামলাই তো তাঁকে পরিচালনা করতে হয় নি। অতএব হারা-জেতার প্রশ্নই তো ওঠে না। সত্য বলতে কি কুইকোয়েনডন শহরের উকিল মোক্তারদের কোনো কাজই নেই। মামলা-মোকদ্দমা করার মতো হামলা হুজ্জতির উদ্ভব হলে তবে তো কোর্ট-কাছারির শরণাপন্ন হবে। যদি না হয় তবে উকিল-মোক্তারদের থাকা আর না থাকা দুই সমান। আর ডক্টর কাসটোস? তার অবস্থাও একই রকম। অন্য সব ডাক্তাররা যা করে থাকেন তিনিও তাই করেন। যারা তাঁর কাছে রোগ নিরাময়ের জন্য যায় তাদের ছাড়া অন্য সবার রোগ নিরাময়ে তিনি সর্বদা নিজেকে ব্যস্ত রাখেন।

কাউন্সেলর আর বার্গোমাস্টার কেল্লার দিকে গেলেন বটে। তবে তার ধারে কাছেও গেলেন না। বলা তো যায় না, যে কোনো সময় মাথায় ভেঙে তো পড়তে পারে। দূর থেকে সেটার দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। তবে শক্ত কিছু দিয়ে প্যালা দিয়ে রাখলে সেটাকে রক্ষা করা যেতে পারে।

তাঁরা এবার ডক্টর অক্সের গবেষণাগারে হাজির হলেন। ডক্টর অক্স গবেষণায় ডুবে রয়েছেন। তাঁরা পাশের ঘরে অন্তত এক ঘণ্টা মুখে কলুপ এঁটে বসে রইলেন।

এক সময় ডক্টর অক্স সেখানে এসে তাঁদের দেখতে পেয়ে সলজ্জ বিনয়ে বললেন, 'আপনাদের এতক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে বলে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। গ্যাসমিটারের জন্যই আমার দেরি হয়েছে। কয়েকটা যন্ত্র বিকল হয়ে গিয়েছিল, মেরামত করতে হয়েছে। তবুও কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। অক্সিজেনের পাইপ বসানোর কাজও সেরে ফেলেছি। এবার দয়া করে বলুন তো, এত কষ্ট স্বীকার করে অধমের বাড়িতে আপনাদের আগমনের কারণ কি?'

'আপনাকে নিজের চোখে দেখার সখ ছিল, বলে এলাম।'

ডক্টর অক্স বুদ্ধিদীপ্ত চোখের মণি দুটো মেলে আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

স্বাভাববিরুদ্ধ হলেও বার্গোমাস্টারের চোখেমুখে উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠল। কারণ নিকলসিও উত্তেজনায় পা-দুটোকে অনবরত ঘষতে লাগলেন। বার্গোমাস্টার ডক্টর অক্সকে আক্রমণ করলে তিনি তাঁকে সাহায্য অর্থাৎ তাঁর হয়ে ডক্টর অক্সের সঙ্গে লড়াই করবেন।

বার্গোমাস্টার ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ড. অক্স, আপনার কাজ শেষ হতে আর ক'মাস লাগবে দয়া করে বলবেন কি?'

ডক্টর অক্স স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'তিন-চার মাস তো বটেই। কাজটা সম্পূর্ণ করতে এটুকু সময় অবশ্যই লাগবে। আসলে মজুর আনতে হয়েছে। কুইকোয়েনডন থেকে যেসব শ্রমিক আনিয়েছি, তারা ফরাসি শ্রমিকের তুলনায় অনেক বেশি ঢিলে, জানেন নিশ্চয়। এদের দশজনের কাজ একজন ফরাসি মুজর অনায়াসে করে ফেলবে। আসলে তারা যে আদৎ ফ্রেমিং।'

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বার্গোমাস্টার অনবরত ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'শুনুন ডক্টর অক্স, এরকম ইঙ্গিত আমি পছন্দ করি না। কুইকোয়েনডনের মজুররা পৃথিবীর যে-কোনো দেশের মজুরদের মতোই পরিশ্রমী ও নিপুণ। তাই ভাল শ্রমিকের খোঁজে পৃথিবী ঘুরে মরতে হবে না। শুনুন ড. অক্স। আর বেশিদিন আলোর অভাবে শহরটাকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু আট-নশো বছর তো অন্ধকারে দিব্যি—'

'কাটিয়ে দেওয়া গেছে, তাই না? এখন প্রগতির যুগ, অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে আমাদের চলতে হবে। আমরা পিছিয়ে পড়ি এটা আমার ইচ্ছা নয়। সাফ কথা শুনে

www.pathagar.com

রাখুন, এক মাসের মধ্যে শহরে আলো জ্বলছে দেখতে চাই। অন্যথায় আপনাকে মোটা অর্থ জরিমানাস্বরূপ দিতে হবে। রাস্তায় হঠাৎ কোনো হাঙ্গামা-হুজ্জত বেঁধে গেলে কী কেলেঙ্কারী ঘটে যাবে ভাবতে পারছেন? অল্পতেই ফ্লেমিংদের মাথায় খুন চেপে যায়, আশা করি আপনার অজানা নয়। নগরপাল প্যাসফ বললেন, আপনার বৈঠকখানায় একটা সভা বসেছিল। আর তাতে যে রাজনীতি সাংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে এ খবরটা কি মিথ্যা, বলুন ড. অক্স?'

ড. অক্স স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দিলেন, 'না, মিথ্যা নয়, অবশ্যই মিথ্যা নয়।'

'তবে আঁদ্রে সুট ও ডোমিনিক কাসটোসের মধ্যে জোর তর্কাতর্কি বেঁধে ছিল, খবরটা সত্য?'

'হ্যাঁ, সত্য বটে। তবে তেমন কোনো গুরুতর ব্যাপার নিয়ে তাদের মধ্যে বচসা হয় নি।'

'সে কী ড. অক্স! একজন আর একজনকে বলেছে 'কথাবার্তা মেপে বলুন মশাই'—এটা গুরুতর আলোচনার উক্তি নয় বলতে চাইছেন! কুইকোয়েনডন শহরের চরমতম সর্বনাশ ঘটাতে এর চেয়ে বেশি কিছুর দরকার নেই, হয়তো বুঝতেই পারছেন? আমাকে যদি আপনি নিজে বা অন্য কেউ এরকম উক্তি করতেন তবে—'

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে প্রধান যন্ত্রচালিতের মতো ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ক্রোধোন্মত্ত বার্গোমাস্টার বাজখাই গলায় বলে উঠলেন, 'ড. অক্স, আপনার বৈঠকখানায় যে-ঘটনা ঘটেছে তার জন্য আমি আপনাকেই দোষী সাব্যস্ত করছি। এ শহরের শান্তিরক্ষক আমি। শান্তি বিঘ্নিত হোক এটা আমার মোটেই মনঃপুত নয়। কাল রাত্রে যে-ঘটনা ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে।'

মারমুখী আগন্তুক দুজন উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ড. অক্স এত অপমানেও নিজেকে সংযতই রাখলেন।

পথ চলতে চলতে নিকলসির মেজাজ অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এল। তিনি নরম গলায়ই উচ্চারণ করলেন, 'আর যাই বলুন, ডক্টর অক্স কিন্তু একেবারে ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হলে আমি কিন্তু আনন্দিতই হল মি. বার্গোমাস্টার।'

বার্গোমাস্টার নীরবে পথ পাড়ি দিতে লাগলেন। ফ্রাঞ্জ! কাউন্সেলর নিকলসির ছেলে ফ্রাঞ্জ। আর সুজেল তার প্রেমিকা। বাগদত্তা। উভয়ের মধ্যে খুবই মিল। কেউ, কাউকে মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করতে পারে না।

এদেশে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়তে হলে অন্তত দশ বছর ধরে চলে পরস্পরকে যাচাই করা, চেনাচেনির পাট চুকাতে। দশ বছর ধরে বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিয়ে নামক ভয়ঙ্কর বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। এটাই এদেশের প্রচলিত প্রথা। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মাত্র দু-বছরের আলাপ পরিচয়ে এদেশে মাত্র একটা বিয়েই হতে দেখা গেছে। আর তারা মোটেই সুখে-শান্তিতে ঘর সংসার করতে পারে নি। ফ্রাঞ্জের বয়স বাইশ। যাকে বলে রীতিমতো সুদর্শন যুবক। আর সুজেল? রূপ সৌন্দর্যে সে অতুলনীয়া।

ফ্রাঞ্জ যখন নদীর পাড়ে বসে বড়শি দিয়ে মাছ ধরে সুজেলা তখন তার পাশে বসে উৎসাহ-উদ্দীপনা জোগায়। আর সর্বক্ষণ উভয়ের মধ্যে প্রেমালাপ চলে। পশ্চিম দিকে সূর্য ঢলে না পড়া পর্যন্ত তারা কাছাকাছি পাশাপাশি মহানন্দে কাটিয়ে দেয়। সারাদিনে মাছ তো ওঠে অষ্টরম্ভা। আসলে প্রেমালাপই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য মাছ ধরা পড়ে না, তারা ধরতে আগ্রহী নয়।

www.pathagar.com

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার আগেই প্রেমিক-প্রেমিকাদ্বয় পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে যে যার বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

* * *

এদিকে গ্যাস-পাইপ বসানোর কাজ দ্রুত তালে চলেছে। রাস্তা ও শহরের প্রাসাদোপম বাড়িগুলোতে অক্সিহাইড্রিক গ্যাস নিয়ে যাওয়ার কাজে এতটুকুও শৈথিল্য লক্ষিত হচ্ছে না। তবে বার্ণার বসানোর কাজ এখনো শুরু হয় নি। আসলে বার্ণার তৈরি করতে যে সূক্ষ্ম কারিগরি বিদ্যা দরকার এখানকার মানুষের মধ্যে তার অভাব রয়েছে। ডক্টর অক্স আর তার সহাকারী ইজিনি একটা মুহূর্তও বৃথা কালক্ষয় করতে নারাজ। গ্যাসমিটারের অত্যাবশ্যক ও জটিল যন্ত্রপাতি তৈরির কাজও মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে যে মৌলিক পাদার্থ চৌবাচ্চার জলকে বিশ্লিষ্ট করে চলেছে সে পদার্থকে দিনরাত্রি চব্বিশ ঘন্টা ধরে চৌবাচ্চাটার জলে বালতি বালতি ঢালা হতে লাগল। পাইপ বাসনোর কাজ শেষ করতে না পারলেও ডক্টর অক্স ইতিমধ্যেই গ্যাস উৎপাদন করতে লেগে গেছেন। শহরের নাট্যশালায় অচিরেই পিলে চমকাবার মতো একটা কাজ ডক্টর অক্স করে ফেলবেন। তার আবিষ্কারের উদ্বাধনের কথা বলা হচ্ছে।

কুইকোয়েনডন শহরের নাট্যশালাটা বাস্তবিকই নজর কাড়ার মতো। এটা তৈরি করতে সাতাশ বছর সময় লেগেছিল। যুগের সঙ্গে তালমিলিয়ে এর স্থাপত্য শিল্পের পরিবর্তন ঘটানো হয়। এ ঘন্টা ঘরটাও লক্ষ্য করার মতো। নাট্যশালাটাতে অক্সিহাইড্রিক গ্যাসের আলো জ্বালতে কোনো সমস্যাই দেখা দেওয়ার কথা নয়।

বিকাল চারটায় নাট্যশালার দরজা খোলা হয় আর অনুষ্ঠানের শেষে রাত্রি দশটায় দরজা বন্ধ করা হয়। এখানে প্রতিসপ্তাহে একদিন করে গানবাজনার ব্যবস্থা করা হয়।

একের পর এক শতক ধরে এখানে উপরোক্ত অনুষ্ঠান-সূচীই চলে আসছে

সেদিনটা ছিল রবিবার। নাটক মঞ্চস্থ করার কথা। নব আবিষ্কৃত আলোর উদ্বোধনের ব্যবস্থা নেই। এরকম কোনো কথাও ছিল না। পাইপ বসানোর কাজ অবশ্য মিটে গেছে। কিন্তু বার্ণারের সমস্যার জন্য নতুন আলোর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। তাই লম্বা লম্বা মোমবাতি সারিবদ্ধভাবে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাল্কা আলোয় রঙ্গমঞ্চের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে প্রেক্ষাগৃহ ভরে গেল। কোনো মানুষ তো দূরের কথা একটা মশা-মাছি ঢোকার মতো ফাঁক-ফোকড়ও নেই। দরজার বাইরেও উৎসাহী ভিড়, গিজগিজ করছে। রীতিমতো আকর্ষণীয় নাট্যানুষ্ঠানের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সেদিন ফ্রাঞ্জ আর সুজেল নাট্যানুষ্ঠান দেখতে যাবে। ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসি আর টাটানেমসেরও যাবার কথা। কাউন্সেলর আর বার্গোমাস্টার উভয়েই ফ্রাঞ্জ আর সুজেলের বিয়ের ব্যাপারে রাজি। অতএব তাদের মেলামেশা চলাফেরা নিয়ে কোনো পক্ষেরই কোনোই আপত্তি নেই। বিয়ে তাদের হচ্ছেই।

সন্ধ্যায় প্রথম সারির শিল্পী ফিয়োভারানটি মঞ্চে অভিনয় করতে নামবেন। তিনি হিউগুনটস অপেরাতে অভিনয় করেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ফিয়োভারানটি যে অসাধারণ অভিনয় করছেন এমন অভিনয় আঠারো শো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে হিউগুনটস প্রতিষ্ঠার পর আর কারোর কাছ থেকেই পাওয়া যায় নি। আজ সন্ধ্যায় হলভর্তি দর্শকের উপস্থিত আবার তাঁর অনন্য অভিনয় শুরু হবে।

চারটের সময় প্রেক্ষাগৃহে তিলধারনের জায়গা রইলনা। বক্স, অর্কেস্ট্রা আর প্যারাকেটে ঘরটা একেবারে ভর্তি।

www.pathagar.com

দর্শকদের ভিড়ে বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি, ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসি আর টাটানেমাসকে দেখা গেল। ফ্রাঞ্জ ও পরিবারের সবাইকে নিয়ে কাউন্সেলর নিকলসি কয়েক হাত দূরে বসে। আইনজ্ঞ সুট, ডক্টর কাসটোস, অ্যাকাডেমির কর্তা জেরোমরেশ, প্রধান বিচারপতি অনোর মিমট্যাক্স আর নগর কোতোয়াল প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও সপরিবারে প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন প্রান্তে বসে।

একটু বাদেই পর্দা ওঠার কথা। কিন্তু পর্দা ওঠার আগেই এক অভাবনীয়, একেবারেই অবিশ্বাস্য একটা কাণ্ড ঘটে গেল। যারা চিরদিনই নিরুদ্বেগতা বলে বিবেচিত হয় তাদের মধ্যেও অবর্ণনীয় চাঞ্চল্য দেখা গেল। আকস্মিক ব্যাপারটায় উপস্থিত সবাই রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেল। মোমবাতির সংখ্যা বাড়ানো হয় নি অথচ সম্পূর্ণ প্রেক্ষগৃহটা অত্যুজ্জ্বল আলোকরশ্মিতে ঝলমলিয়ে উঠল। এমন একটা অভাবনীয় ব্যাপারের মুখোমুখি হলে বিস্ময়ে অভিভূত তো হবার কথাই বটে।

উচ্ছ্বাস-উত্তেজনা ক্রমে থিতিয়ে এল। দর্শকরা দেখল, ভ্যালেনটাইন গলা ছেড়ে গান গাইছেন। কিন্তু সে গানের ছন্দ বড়ই দ্রুত।

গান থামলে মঞ্চে দেখা দিলেন রাওল। আশ্চর্য ব্যাপার তো! তাঁর মধ্যেও অস্বাভাবিক দ্রুততা লক্ষিত হচ্ছে যে! যে-অংশটুকু গাইতে কুইকোয়েনডন বাসীদের সাঁইত্রিশ মিনিট লাগা উচিত তা মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল তাতো অবাক হবার মতো ব্যাপারই বটে।

এবার দেখা গেল, নেভাস, নেষ্ট ব্রিশ, ক্যাথোলিক প্রধানরা ও ক্যাভানিস নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মঞ্চে হাজির হয়ে গেছে। আসলে সবকিছুর মধ্যেই যেন কেমন একটা অবর্ণনীয় ব্যস্ততা লক্ষিত হতে লাগল। নাটকের দৃশ্যাবলী উল্কার বেগে এগিয়ে যেতে লাগল।

দর্শকদের মধ্যেও দারুণ উত্তেজনা দেখা দিল। একসময় তারা সবাই আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল। সবাইকে ঠেলে-ধাক্কিয়ে এগিয়ে এলেন বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকস। দাঁড়িয়ে পড়লেন সবার সামনে গিয়ে।

রাওলের পর্দাটাকে আস্তে আস্তে তোলার কথা। কিন্তু সে এক হেঁচকা টানে পর্দাটাকে ছিড়ে ফেঁড়ে ভ্যালেনটাইনের সমনাসামনি হয়ে পড়ল। ব্যাপারটা এমন হল যে, অর্কেস্ট্রা যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে বাদ্যলহরী। বেহালার তার ছিঁড়ে গেল। বাদ্যযন্ত্রগুলো এক এক করে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল।

এদিকে দর্শকদের মধ্যেও যেন অস্বাভাবিক মত্ততা শুরু হয়ে গেল। সবার শিরা-উপশিরায় যেন আগুনের বন্যা বয়ে চলেছে। ঠেলা-ধাক্কা গুঁতোগুঁতি করে সবাই চায় সবার আগে বেরিয়ে যেতে। এ যেন রীতিমতো এক তুলকালাম কাণ্ড। কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব যেন হারিয়ে গেছে। বার্গোমাস্টার বলেও যেন কেউ আর নেই সবার মধ্যেই যেন এক নারকীয় উন্মাদনা ভর করেছে। গুঁতোগুঁতি, ধাক্কাধাক্কি, হাতাহাতি করে আর একে অন্যের পা মাড়িয়ে, লাথি গুঁতো মেরে বাইরে চলে আসে।

এক অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা নিয়ে দর্শকরা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে এল। অস্বাভাবিক? হ্যাঁ, অস্বাভাবিকই বটে। হিউগুনটস-এর চতুর্থ অঙ্ক শেষ হতে পুরো দু-ঘণ্টা সময় লেগে যেত। কিন্তু আজ সাড়ে চারটায় আরম্ভ হয়ে পাঁচটা বাজার বারো মিনিট আগেই শেষ হয়ে গেল। মাত্র আঠারো মিনিটের মধ্যেই এতগুলো দৃশ্যের অভিনয় শেষ

www.pathagar.com

হয়ে গেল। উল্কার চেয়েও দ্রুতগতিতে যে অভিনয় এগিয়ে গেছে। এ যে একেবারে অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

* * *

সকাল হল। কুইকোয়েনডন শহরের নাগরিকরা এক-এক করে বিছানা ছেড়ে উঠতে লাগল। গত সন্ধ্যায় নাট্যশালার কথা সবার মনের কোণে ভেসে উঠতে লাগল। সবাই মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে মেতে গিয়েছিল। শতাব্দীর অভ্যাস, ধৈর্য, শৈতিল্য আর সহনশিলতা সবাই হারিয়ে ফেলেছিল। আর এরই ফলে সবার মধ্যে আশ্রয় করেছিল অভাবনীয় ক্লান্তি। অবসাদে গা-ভাসিয়ে দিয়ে রাত্রিটা যে কোনোদিক দিয়ে, কীভাবে কেটে গেছে কারোর হুঁসই ছিল না। ঘুম ভাঙলে দেখা গেল কারোর জুতো হারিয়েছে, কারোর জামা ছিঁড়েছে আবার কারোর বা টুপি হয়েছে বে-পাত্তা। ব্যাপারটা সবচেয়ে অবাক করেছে নগরের প্রধান বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসিকে। নাগরিকদের এরকম আকস্মিক চারিত্রিক পরিবর্তনে চোখে সর্ষেফুল তো দেখার কথাই বটে। গালে হাত দিয়ে বসে তিনি ভাবতে লাগলেন, দেশে একী অশরীর উৎপাত শুরু হল রে বাবা! শহরের সব মানুষেরই কি একই সঙ্গে মস্তিষ্ক বিবৃত ঘটে গেল নাকি! পুরো কুইকোয়েনডন শহরটাই কি পাগলা গারদে পরিণত হয়ে গেছে নাকি! এরকম ভাববার কারণও তো রয়েছে যথেষ্টই। তিনি নিজেই তো কেবল নন। প্রধান বিচারপতি, কাউন্সেলর, উকিল, মোক্তার, শিক্ষক ও চিকিৎসক প্রভৃতি সবাই তো সেখানে ছিলেন। তবে কি মেনে নিতে হবে, শহরের এতগুলো গণ্যমান্য ব্যক্তির একই সঙ্গে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল? মারাত্মক ব্যামোটা সবাইকে ঘায়েল করে দিয়েছিল? এ শহরের মানুষ যতই নেশা করুক না কেন এরকম অভাবনীয় ব্যাপার তো কোনোদিনই ঘটে নি। তবে? এর পিছনে এমন একটা রহস্য কাজ করছে যা বাস্তবিকই তার জ্ঞান-বুদ্ধির বহির্ভূত। এ-রহস্য তাঁকে উদ্‌ঘাটন করতেই হবে। তাঁর ওপরেই যে শহরবাসীদের সার্বিক সুখ-সুবিধার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। অতএব উপযুক্ত তদন্ত করে এ রহস্যভেদ তাঁকে করতেই হবে।

অতএব পৌরসভার কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটার তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। দীর্ঘদিন তদন্ত চললও। কিন্তু এপর্যন্তই। কোনোই ফায়দা হল না। ব্যাপারটা রহস্যের আড়ালেই রয়ে গেল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই নাগরিকদের মন থেকে নাটক ও নাট্যশালার অভাবনীয় ব্যাপারটার কথা মুছে গেল। সাংবাদিকরাও ব্যাপারটা নিয়ে আর আলোড়ন সৃষ্টি করতে উৎসাহী হল না। কুইকোয়েনডন নাট্যশালার অনুষ্ঠানের যে মন্তব্য খবরের কাগজের পাতায় ছাপা হল তাতে দর্শকদের চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির কথা একদম ছেঁটে দেওয়া হয়েছে।

একটা পরিবর্তন ইদানিং লক্ষিত হতে লাগল, নাগরিকদের সামাজিক আচার আচরণ, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে হৃদ্যতার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারটাতে ঘাটতি হচ্ছে। ডাক্তার ডোমিনিক কাসটোস মন্তব্য করলেন, নাগরিকদের স্নায়বিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এবার রহস্যটা সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখা যাক। কয়েকটা পরিস্থিতিতে যে অদ্ভুত অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে এতে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশও নেই। নগরবাসীরা আগের মতোই নিরুদ্বেগ ও নিরুত্তাপ ভাব নিয়ে রাস্তাঘাটে বাজার-হাটে চলাফেরা করছে। পারিবারিক জীবনেও নিরুত্তাপ নিস্তব্ধতা আগের মতোই অব্যাহত রইল। কারোর মাথায়ও এতটুকু চাঞ্চল্য ভর করে নি। বাগবিতণ্ডা ঝগড়াঝাটির ধার কাছ দিয়েও

www.pathagar.com

কেউ যায় না। আর সবার নাড়ীর গতি আগের মতোই মিনিটে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল।

কুইকোয়েনডনের নাগরিকদের পারিবারিক আচার আচরণের কিছুমাত্র হেরফের না হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে আকাশ পাতাল পরিবর্তন যে ঘটেছে স্পষ্ট লক্ষিত হতে লাগল। এমন ভূতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার দেখলে প্রতিভাবান শরীরতত্ত্ববিদরাও হয়তো বা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নগরপাল প্যাসফ তো একদিন মন্তব্য করেই ফেললেন, কিছুসংখ্যক লোক মিলিত হয়ে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সবাই যেন কেমন বদলে যাচ্ছে! এমন কি কাউন্সিলের সভায় মুক্তাঙ্গনে, নাট্যশালায় আর বিভিন্ন কারণে জমায়েত ক্ষেত্রে কিছু লোক জড়ো হয়ে চোখের পলকে অদ্ভুত একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হতে লাগল। মানুষের মধ্যে থেকে সংযম নির্বাসিত হয়েছে। বাইরে থেকে বাড়ি ফেরার পর আবার আগেকার সেই স্বভাব ফিরে আসে। তাদের ধৈর্য আর সংযম আশ্রয় নেয়। এজন্যই কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা নিয়ে তেমনি উদাসীনই রয়ে গেলেন। কাউন্সিল তো ত্রিশ বছর ধরে মাইকেল প্যাসফের অফিস বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছেন। তিনি মন্তব্য করলেন, শহরের মানুষ যেখানে কোনো না কোনো কারণে দশ-বিশজন লোক জড়ো হয় সেখানেই হাঙ্গামা বাঁধে। কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরোপুরি শান্তি অব্যাহত রয়েছে। এর পরিণাম যে কী ভয়ঙ্কর তা ভাবলেও গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে। অচিরেই মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি করে মরবে। কুইকোয়েডন শহরটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মাইকেল প্যাসফ চমকে উঠলেন।

এক সন্ধ্যায় বাংকার কোলার্ট নিজের প্রাসাদে ফ্রেমিস নাচের আসর বসালেন। ধনকুবেরই বটে কোলার্ট। ফ্রেমিস নাচের বিশেষত্বই হচ্ছে, শান্তি শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখা। ধীর মন্থর গতিতে চলতে থাকে নাচ আর গান। আর নাচের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে মাত্র দু-বার ঘুরতে হয়। আর নাচের প্রয়োজনে হাত দুটোকে যতখানি ছড়িয়ে দেওয়া দিতে হয় ঠিক ততখানি ছড়িয়ে সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে ধরে। এটাই কুইকোয়েনডন শহরের প্রচলিত নাচের পদ্ধতি। কিন্তু কোলার্ট-এর বাড়ির নাচের আসরে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষিত হল। ধীর মন্থর নৃত্য দ্রুততর হয়ে উঠল এমন কি অর্কেস্ট্রার মধ্যেও সুর-তাল-লয় অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পেল। কেন? এমন রহস্যজনক দ্রুততার কারণ কি? কেনই বা মোমবাতিগুলো নাটকের দৃশ্যের মতোই অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য নিয়ে জ্বলে উঠল। কোলার্ট-এর বৈঠকখানায় বৈদ্যুতিক শক্তি কীভাবে আবির্ভূত হল? গ্রাম্য নাচই বা কীভাবে অবিশ্বাস্য দ্রুততর হয়ে উঠল? নাচের আসরে নগরপাল প্যাসফও উপস্থিত রয়েছেন। প্রলয়ঙ্কর ঝড় যে দরজায় কড়া নাড়ছে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি নাচের আসরে বসে নতুন করে উপলব্ধি করছেন। এ প্রহেলিকার উত্তর কোনো ইডিপাস এসে তাঁর কানে কানে বলে দেবে। তাঁর মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরা আর কোষে কোষে অদ্ভুত একটা মাদকতা যেন ভর করেছে। তার দৈহিক শক্তি চড়চড় করে বেড়ে যেতে লাগল আর প্রতিটা স্নায়ু অস্বাভাবিক উত্তেজনা ভর করল যে, তিনি বার বার মিষ্টি দ্রব্যের হাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টপাটপ মিষ্টি গালে পুরে চলেছেন। এমন একটা ভাব তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেল যেন দীর্ঘদিন পেটে দানাপানি পড়ে নি।

নাচতে নেমে সবাই যেন প্রাণচাঞ্চল্যে উদ্বেল হয়ে উঠল। সবার ফুসফুস নিঙড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল দীর্ঘ গুঞ্জন। রীতিমতো প্রাণখোলা, নাচের মতো নাচ সবাই নাচতে

www.pathagar.com

লাগল। পা গুলো যেন উন্মাদনায় ক্রমেই অস্থির থেকে অস্থিরতর হয়ে উঠতে লাগল। সবার মধ্যে জেগে উঠল স্নায়বিক উন্মাদনা। আর? অর্কেস্ট্রা? তুফানের বেগে শুরু হল আওয়াজ। এবারই প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডবনৃত্য গ্যালপ আরম্ভ হয়ে গেল। সে কী অবস্থা! হল জুড়ে যেন তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। এবার এক এক করে নিকলসি, প্রধান বিচারপতি, বার্গোমাস্টার, ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসি আর প্যাসফ পর্যন্ত কেউ-ই তাণ্ডবনৃত্য থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না। উন্মাদনা এমন পেয়ে বসেছিল যে, কে যে নৃত্যে তাঁর নৃত্যসঙ্গিনী হয়েছিল একথা প্যাসফ তো পরে আর স্মরণেই আনতে পারছিল না। কিন্তু একজনের অন্তরের অন্তঃস্থলে ব্যাপারটা যেন গেঁথে গিয়েছিল। পর পর ক'রাত তিনি অর্থাৎ টাটানেমান্স তো প্যাসফকে স্বপ্নের মধ্যে আলিঙ্গনই করে ফেললেন।

*　　*　　*

এদিকে ডক্টর অক্স আর তার সহকারী ইজিনির মধ্যে কথাবার্তা হল—পাইপ বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এবার সম্পূর্ণ নগরটার অধিবাসীদের ওপর ব্যাপক আকারে এক্সপেরিমেন্টটা সেরে ফেললেই হয়ে যায়।

এর পরের কয়েকমাস পরিস্থিতির উন্নতি তো দূরের ব্যাপার ক্রমাবনতিই ঘটতে লাগল।

হায় একী কাণ্ড! এতদিন রহস্যজনক শক্তি নীরবে প্রাণীকূলের ওপরেই প্রভাব বিস্তার করেই সন্তুষ্ট ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে উদ্ভিদ জগৎও দারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষিত হল পরভোজী উদ্ভিদদের মধ্যে। তারা তড়িঘড়ি ঠেলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। আবার বীজ পুঁততে না পুঁততেই গাছের চারাগুলো দ্রুতগতিতে বেড়ে মাত্রাতিরিক্ত উচ্চতাকে ছাড়িয়ে গেল। অ্যাসপারাগাস তো কয়েক ফুট লম্বাই হয়ে গেল। ওলকপি? এক একটা তরমুজের চেয়ে অনেক অনেক বেশি বড় হয়ে গেল। লাউয়ের চেয়ে বড় হয়ে উঠল এক একটা তরমুজ। আর লাউগুলো কুমড়োকেও ছাড়িয়ে গেল। আর গির্জার বেলফ্রি ঘণ্টাটার চেয়েও অতিকায় আকার ধারণ করল এক-একটা কুমড়ো। তাদের এক-একটার ব্যাস হয়ে গেল ন'ফুটের কাছাকাছি। একটা ফুলকপি যেন ইয়া বড় একটা ঝোপে পরিণত হল। আর ব্যাঙের ছাতা যেন আসল ছাতাকেও ছাড়িয়ে যেতে লাগল। কেবলমাত্র সব্জির কথাই বা বলি কেন? ফলের আকস্মিক অবিশ্বাস্য আকারও কম অবাক করল না। দুজন লোক ছাড়া একটা জামরুল খেয়ে শেষ করতে পারে না। চারজনে মিলে একটা নাসপাতি ভাগাভাগি করে খেলেও শেষ করতে যেন বেশ কষ্ট হয়। আবার ফুলের মধ্যে পরিবর্তনের জোয়ার এল। অতিকায় ভায়োলেটের গন্ধে চারদিক ছেয়ে যেতে লাগল। গোলাপের ঔজ্জ্বল্যে চোখ ধাঁধিয়ে যেতে লাগল। আর লিলি, ডালিয়াম, ডেইজি প্রভৃতি ফুলবাগানের পথ ছেয়ে ফেলার উপক্রম করল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল ইয়া পেল্লাই পেল্লাই রডোডেনড্রন। আর টিউলিপগুলো এমন অতিকায় হয়ে উঠল যে টিউলিপ-প্রেমিকরা তো তাদের এক-একটার আকার দেখে আনন্দে আত্মহারা হেয় পড়ার জোগাড় হল। তার একটা পাপড়ির বাটিতে রবিন পাখির পুরো একটা পরিবার অনায়াসেই বাসা বেঁধে বাস করতে পারে।

কিন্তু হায়! ফুল, ফল আর সব্জি যে অবিশ্বাস্য অতিকায়ত্ব লাভ করল, সবই স্বল্পকালের জন্য। অচিরেই সব ঝরে পড়েত লাগল। যে বাতাস নিজের উদরে ঢুকিয়ে সবাই ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠেছে সে বাতাসই আবার তাদের সাবাড় করে দিল। তাই তো তারা অত্যল্পকালের মধ্যে বিবর্ণ হয়ে, মরে বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়তে লাগল।

www.pathagar.com

অবিশ্বাস্য এ পরিবর্তনের জোয়ার থেকে গৃহপালিত পশুরাও বাদ গেল না। কুকুর, বিড়াল, শুয়োর, মুরগি আর ক্যানারির মধ্যে আকার ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন দেখা দিল। তারা যে কেবলমাত্র অতিকায়ত্ব লাভ করল তাই নয়, অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা লাভ করল, হিংস্রও হয়ে উঠল। এতদিন যারা মনিবের মতোই নির্জীব-নিরুত্তাপ ছিল আজ তারাই বদরাগী আর হিংস্র হয়ে উঠল। কুকুর-বিড়াল যে আঁচড়-কামড় দিতে পারে মানুষের জানা ছিল, আজ এ-স্বভাবই তাদের মধ্যে প্রকট হয়ে দেখা দিল। দু-চারটেকে মেরেও ফেলতে হল। ভেড়া যদি ঘোড়ার মতো দাঁত বের করে বিশ্রী স্বরে খেঁকিয়ে ওঠে তবে কার পিলে না চমকাবে।

শেষপর্যন্ত কুইকোয়েনডনের রাস্তাঘাটের পরিস্থিতি এমন সঙ্গীন হয়ে পড়ল যে, বার্গোমাস্টারকে পুলিশি আইন-কানুনের পরিবর্তন না করে উপায় থাকল না। তবে ক্ষেপা কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, গরু, ভেড়া প্রভৃতির দিকে নজর রেখেই নতুন আইন সৃষ্টি করা হল।

একী কেলেঙ্কারী কাণ্ড শুরু হয়ে গেল রে বাবা!

জন্তু জানোয়াররাই কেবল নয়, শহরের মানুষগুলোও যে রীতিমতো খ্যাপাটে হয়ে গেল। যে শহরে ছেলে-মেয়ে মানুষ করার কোনো সমস্যাই ছিল না, আজ সেখানে তাদের সামলে সুমলে রাখাই দায় হয়ে পড়ল। বিচারপতি সিমট্যাক্স এই প্রথম অন্যের ব্যাপারে ছড়ি ধরতে বাধ্য হলেন। শুধু কি এই? বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালে ঘেরা কামরার মধ্যে আটকা পড়ে থাকতে ছাত্র-ছাত্রীরা রাজি নয়। একই ছোঁয়াচে ব্যাধির কবলে পড়লেন শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। গাদাগাদা বাড়ির কাজ দিয়ে তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের কালঘাম ছুটিয়ে দিতে লাগলেন। কাজ না পেলেই তাদের বরাতে জুটত কঠিন-কঠোর শাস্তি।

সমস্যা হাজারো। যে কুইকোয়েনডনবাসীদের প্রধান খাদ্যবস্তু ছিল দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, তারা এখন মদ ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য ছাড়া এক মুহূর্তও স্বস্তি পায় না। আর? আর উদর তো নয় যেন এক-একটা জ্বালা মানুষের দেহে লুকিয়ে রয়েছে। ফলে শহরের খাদ্যবস্তুর চাহিদা বাড়তে বাড়তে তিনগুণ হয়ে গেল। দু-বারের পরিবর্তে সবাই ছ'বার করে খাদ্যবস্তু উদরে ঢোকাতে লাগল। এমন কি স্বয়ং কাউন্সেলরই খাওয়া-রোগের শিকার হয়ে পড়লেন।

পরিস্থিতি ক্রমেই সঙ্কটজনক হয়ে পড়তে লাগল। বেহেড মাতালের দল পথে-পথে গড়াগড়ি যেতে লাগল। তাদের মধ্যে অনেকেই শহরের গণ্যমান্য নাগরিক।

এদিকে ডাক্তার ডোমিনিক কাসটোসের ডাক্তাখানায় স্নায়বিক বিকার আর উদরের রোগীদের ভিড় জমে উঠল।

একদিন যে কুইকোয়েনডনের পথ প্রায় জনমানবশূন্য থাকত আজ সেখানে দলে দলে কাতারে কাতারে মানুষের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। আর পথের বাঁকে, গলির মুখে ক্রোধোম্মত্ত মানুষের আস্ফালন, বাক-বিতণ্ডা—এমনকি হাতাহাতি পর্যন্ত চলতে লাগল। ঘরের কোণে মুখ বুঁজে বসে থাকা কারোর পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না। পরিস্থিতি এমনই সঙ্গিন হয়ে পড়ল যে নতুন পুলিশবাহিনী নিয়োগ করা ছাড়া গত্যন্তরই রইল না। টাউন হলের একটা বড় ভগ্নাংশকে কয়েদখানায় পরিণত করতেই হল। কদিনের মধ্যে সে-জায়গা ঠাসাঠাসি গাদাগাদি অবস্থা হয়ে পড়ায় নগরপাল প্যাসফের চোখে-মুখে হতাশার ছাপ ফুটে উঠল।

www.pathagar.com

এ-শহরের এক শতকের মধ্যে যা কোনোদিন ঘটেনি আজ তাই ঘটে গেল। দু-মাসের মধ্যে, না দু-মাসও নয়, মাত্র সাতান্ন দিনের মধ্যেই বিয়ের পাট মিটে গেল। আগে বিয়ের কথাবার্তার পরও বছরের পর বছর কেটে যেত। মেয়ে সুজেল নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে বার্গোমাস্টার ব্যাপারটা সম্বন্দে নিঃসন্দেহ হলেন।

পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিল যখন দেখা গেল সামান্য বচসা থেকে একটা ব্যাপার ডুয়েল লড়াই পর্যন্ত গড়াল। পিস্তলের দ্বন্দ যুদ্ধ। আর তা হল নিরীহ নম্র গোবেচারা ফ্রাঞ্জ আর ধনকুবের বাংকারের ছেলে সাইমন কোলার্টের সঙ্গে। দ্বন্দযুদ্ধের কারণ? বার্গোমাস্টারের আদরের দুলালী। সুজেল ছাড়া সে কাউকে ভালবাসতে পারে না বুঝতে পেরে সাইমন দ্বন্দযুদ্ধের পথ বেছে নিল। তার সবচেয়ে বড়শত্রু, একমাত্র প্রতিদ্বন্দীকে লড়াইয়ে হারিয়ে রূপসী যুবতীকে লাভ করার জন্য বদ্ধপরিকর হল।

শহরের জীব-জন্তু থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটা স্তরের মানুষ যদি এমন অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়ে, ক্ষেপাটে হয়ে যায়, তবে পথঘাটের শান্তি অক্ষুণ্ন রাখা তো কঠিন সমস্যার ব্যাপার হয়ে পড়ারও ব্যাপারই বটে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হলে যে সরকারী সংগঠন ও শাসনব্যবস্থা দরকার এখানে তার নিতান্তই অনুপস্থিতির অভাব।

এদিকে বার্গোমাস্টারের সংসারের শান্তি অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তাঁর সহধর্মিনী তো সর্বদাই রেগে একেবারে কাঁই হয়ে থাকেন। চাকরবাকরেরা নাকি তাঁকে পদে পদে অপমান করছে। কথায় কথায় যা নয় তাই বলে গালমন্দও করে। ভ্যান ট্রিকসি কিন্তু কোনো কর্তব্যেই অবহেলা করছেন না। প্রয়োজনে অনেককে চাকরি থেকে তাড়িয়েও দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর সহধর্মিনী পানের থেকে চূণ খসলেই রণরঙ্গিনী হয়ে ওঠেন। ভ্যান ট্রিকসি মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তোলেন।

আগেই বলা হয়েছে, ভ্যান ট্রিকসি বংশের বিয়ের অদ্ভুত প্রথার উল্লেখ করা হয়েছে। বংশের পুরুষরা একের পর এক বিপত্নীক হবেন। আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন। বংশের এ-প্রচলিত প্রথা কোনোদিনই বঙ্গ হবে না।

ভ্যান ট্রিকসি পরিবারের, শহরের প্রতিটা মানুষের মনের যে অভাবনীয় পরিবর্তনের মধ্যে কয়েকটা আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া ঘটল তা অগ্রাহ্য করার নয়। মানুষের মধ্যে যে আকস্মিক উত্তেজনার উদ্ভব হয়েছে তা আমাদের একেবারেই অজ্ঞাত। আর এ উত্তেজনাই কয়েকটা দৈহিক পরিবর্তন নিয়ে এল। যে প্রতিভার সঙ্গে আদৌতেও পরিচয় ছিল না, আজ তাই হঠাৎ করে সবাইকে চমক লাগিয়ে দিল। রাজনীতিতেই কেবল নয়, সাহিত্যেও বিরল প্রতিভাধরের আবির্ভাব ঘটল। কুইকোয়েনডনে কয়েকটা সভা-সমিতি গজিয়ে উঠল। কুইকোয়েনডন ইম্পিরিয়াল, কুইকোয়েনডন র‍্যাডিক্যাল এবং কুইকোয়েনডন সিগন্যাল প্রভৃতি বিশটা খবরের কাগজের পাতায় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা নিয়ে বহু উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধ ছেপে জনগণের মধ্যে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করল।

প্রায় আট নয় শো বছর আগে কুইকোয়েনডনবাসীরা যুদ্ধ ঘোষণার একটা বিশেষ কারণকে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু আজ সে কারণটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কুইকোয়েনডন ও ভারগামেন শহর দুটো ক্যানভাসে পাশাপাশি অবস্থান করছে। অনেকেরই জানা রয়েছে।

এগারো শো পঁচাশিতে, কাউন্ট বড়ুইনের ক্রুসেড যাত্রার আগে একদিন ভারগামেন শহরের একটা পথের গরু কুইকোয়েনডনের এক মাঠে চলে যায়। তবে সে খুবই সামান্য ঘাস মুখে তুলতেও পারে নি। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধাবার একটা অবলম্বন পাওয়া গেল

www.pathagar.com

বটে। গরুটা বে-ওয়ারিস বটে। কিন্তু এদিকে প্রকৃত দোষী যে কে তাও অদ্ভুতভাবে নির্ণয় করা হয়ে গেল।

ক্রোধোম্মত্ত নাটালিস ভ্যান ট্রিকসি গর্জে উঠলেন, 'এ অন্যায়ের প্রতিশোধ একদিন না একদিন আমরা নেবই। এ কাহিনীতে যে ভ্যান ট্রিকসির কথা বলা হচ্ছে তিনি নাটালিস ভ্যান ট্রিকসি-পরিবারের বত্রিশতম উত্তরসূরি।

হ্যাঁ, ভিরগামেনের মানুষগুলোকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতেই হবে। কিছুতেই রেহাই নেই হতচ্ছাড়াগুলোর।

ভিরগামেন শহরের মানুষগুলোকে আগেভাগেই সতর্ক করে দেওয়া হল। ক্রমে মানসম্মান নষ্টের গাত্রদাহ মন থেকে মুছে যাবে। একদিন সবকিছু ভুলে উভয় শহরের মধ্যে আবারও হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

সুটের মধ্যে অপমানের জ্বালাটা চাঙা হয়ে উঠল। যে জাতির সামান্য আত্মসম্মান বোধ রয়েছে তাদের পক্ষে কুইকোয়েনডনের এরকম জঘন্যতম অপমান বরদাস্ত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ফলে ভিরগামেনের কিছু নাগরিক সুযোগ পেলেই কুইকোয়েনডনবাসীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমে তাতিয়ে তোলার চেষ্টার ত্রুটি করেনা। নাগরিকরা বহু শতাব্দী ধরে অপমানের জ্বালাকে নিছক রসিকতা ভেবে গায়ে না মেখে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কাহাতক এ ধরনের আচরণ বরদাস্ত করা যায়। আর নয়। সুট এবার তাদের মধ্যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করলেন। তিনি নাগরিকদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে সোচ্চার করে তুললেন। নাগরিকরা সমস্বরে গর্জে উঠল, 'প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিতেই হবে। যুদ্ধ চাই। যুদ্ধের মাধ্যমেই আমরা অপমানের প্রতিশোধ নেব।' আইনজ্ঞ সুট জীবনে এরকম সাফল্য আর কোনোদিন লাভ করেন নি। সাফল্যের আনন্দে তাঁর মন-প্রাণ নেচে উঠল।

কাউন্সেলর, বার্গোমাস্টার এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এক সভায় মিলিত হলেন। নাগরিকদের যুদ্ধের সুতীব্র দাবিকে অগ্রাহ্য করা কিছুতেই সম্ভব হল না। দেশের কর্ণধারদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলে নাগরিকদের ঐকান্তিক আগ্রহ- উৎসাহে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই হল।

কুইকোয়েনডনবাসীদের যুদ্ধের সিদ্ধান্তের কথা ভিরগামেনবাসীদের কাছে পৌছোতে দেরি হল না। তারা যুদ্ধের জন্য মোটেই প্রস্তুত নয়। দেশ জুড়ে হাহাকার পড়ে গেল। একমাত্র কেমিস্ট জোসি লিয়েট্রিঙ্কই মাথা ঠাণ্ডা রেখে কর্তব্যে অবিচল রইলেন। যুদ্ধ করতে গেলে কামান, বন্দুক আর গোলা-গুলি চাই, নাগরিকদের উত্তেজনাকে কিছুতেই প্রশমিত করা সম্ভব হল না। তাদের ওই একই কথা—যুদ্ধ! যুদ্ধ চাই।

এদিকে বার্গোমাস্টার নাগরিকদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে যুদ্ধের দাবি তুললেন, 'যুদ্ধ চাই! যুদ্ধ! তুমুল যুদ্ধে মাততে হবে। চলো ভিরগামেন। হাতিয়ার তুলে নাও। চল যুদ্ধে।'

বার্গোমাস্টার নিজেই সৈন্য পরিচালনার দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিলেন। তাঁর একই কথা, যুদ্ধে আমাদের জয় অনিবার্য।

এদিকে ডক্টর অক্স তার আপন কর্তব্যে অবিচল। তিনি কাজ করতে করতে তাঁর সহকারী ইজিনিকে বললেন, 'কি বুঝছ হে! আর বাকি কি থাকল? সমগ্র একটা জাতির কর্মচাঞ্চল্য, কর্তব্য সচেতনতা, প্রতিভার স্ফূরণ এবং রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ প্রভৃতি সবকিছুই সম্ভব হল। আর একমাত্র অনুদের কল্যাণে সবকিছুকে সম্ভব করে তোলা হয়েছে।'

www.pathagar.com

ইজিনি বলল, 'স্যার, সবই তো করলেন দয়া করে এবার একটু ভেবে দেখুন, নাগরিকদের মধ্যে আর উত্তেজনা সৃষ্টি করা কি ঠিক হবে?'

'অবশ্যই। ইজিনি, আমি এর শেষ দেখতে চাই। অলস আর প্রায় স্থবির মানুষগুলো মধ্যে উত্তেজনার হার কি পরিমাণে—'

'কিন্তু স্যার, আমাদের এক্সপেরিমেন্ট তো চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এবার কলটাকে বন্ধ করে দিলে—'

'অসম্ভব! এমন চিন্তাও কোরো না ইজিনি! যদি এ চেষ্টা কর আমিই তোমার গলা টিপে ধরব, সাবধান করে দিচ্ছি।' সহকারী ইজিনির পরামর্শে ডক্টর অক্স ঘোরতর আপত্তি জানালেন।

* * *

এদিকে আসন্ন যুদ্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে বার্গোমাস্টার এবং কাউন্সেলর গভীর আলোচনায় লিপ্ত হলেন। উভয়েই একমত যে, যে কোনো উপায়ে ভিরগামেনবাসীদের জব্দ না করলে কুইকোয়েনডনবাসীদের লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। আর দেরি করার অর্থই হচ্ছে ইজ্জৎ খুইয়ে অপমানের জ্বালাকে নীরবে হজম করা।

দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল—দু-দিনের মধ্যে কুইকোয়েনডনের সশস্ত্র সৈন্যরা শত্রু-দেশের দিকে অগ্রসর হবে। তীব্র আক্রমণ শুরু করবে।

বার্গোমাস্টার এবং নিকলসি উভয়ের উদ্দেশ্য লড়াই। লড়াইয়ের মাধ্যমে, কব্জির জোরে ভিরগামেন শহরবাসীকে জব্দ করা। তাঁদের একজনও যদি বিরুদ্ধ মতো পোষণ করতেন তবে হয়তো পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিত। অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধের কবল থেকে দুটো দেশ রেহাই পেয়ে যেত।

এবার তাঁরা বেলফ্রি টাওয়ারের উদ্দেশ্যে পা-বাড়ালেন।

ব্যাপার দেখে মনে হল এদিকে বিবাদমান দুই পক্ষ যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হতে চলেছেন। তাঁরাও আলোচনার মাধ্যমে আগেই স্থির করে রেখেছিলেন, টাউন হলে যাবেন। সেখানকার সুউচ্চ টাওয়ারের মাথায় উঠবেন। সেখান থেকে পুরো কুইকোয়েনডন শহরকে চোখের সামনে ছবির মতো স্পষ্ট দেখা যায়। তারা স্থির করলেন, সেখান থেকে সৈন্য পরিচালনা করবেন। ব্যাপারটা নিয়ে তাঁরা একমত হলেন হঠাৎ করে উভয়ের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেল। দুই নগর রক্ষকের ঝগড়া যেন নেহাৎই একটা মামুলি ব্যাপার বলে পথচারীদের কাছে মনে হল। তাই সবাই ব্যাপারটা মোটেই পাত্তা না দিয়ে নিজের নিজের কাজে চলে গেল।

কথা কাটাকাটি করতে করতে কাউন্সেলর এবং বার্গোমাস্টার টাওয়ারের পাদদেশে, সিঁড়ির কাছাকাছি পৌছোলেন। ব্যস, তখনই ঘটে গেল আরও বিস্ময়কর ব্যাপার। প্রধান বিচারপতি, শহরের সর্বাধিক সম্মানীয় ব্যক্তি ভ্যান ট্রিকসির সঙ্গে তাদের মুখোমুখি দেখা। তাঁকে তারা এমন এক ধাক্কা দিলেন যার ফলে ভদ্রলোক কয়েকহাত দূরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

এবার সিঁড়ি বেয়ে টাওয়ারের চূঁড়োয় ওঠার পালা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বিদমান দুই শত্রু পরস্পরের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে লাগলেন। এদিকে দীর্ঘসময় ধরে তর্কাতর্কি আর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে উভয়েরই দম প্রায় ফুরিয়ে এল। ক্রমে উভয়েরই গলা নেমে আসতে লাগল। দম ফুরিয়ে যাওয়াই কারণ কিনা বলা মুশকিল। তবে উভয়ের গলাই যে ক্রমে নেমে আসতে লাগল এতে কোনো ভুল নেই। ব্যস,

www.pathagar.com

উভয়ের উত্তেজনাই প্রশমিত হল। স্নায়ুও ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগল। মাথাও ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে এল। কিন্তু কারণ কি? এর কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনো মন্তব্য করা সম্ভব নয়। তবে বাস্তবে যা ঘটতে দেখা গেছে তা হল—টাওয়ারের দুশো ছেষট্টি ফুট উঁচুতে, চূড়োয় ওঠার পর উভয়েই সমতল একটা চাতালের ওপর ধপাস করে বসে পড়তে বাধ্য হলেন। প্রধান বিচারপতি তাদের অনুসরণ করলেন।

কাউন্সেলর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মশাই, ভাবা যায় হামবুর্গের সেন্ট মাইকেল চার্চের চৌদ্দ ফুট ওপরে আমরা উঠে এসেছি!'

'হ্যাঁ, জানি।'

সামান্য বিশ্রাম গ্রহণের পর উভয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন।

তিন শো চার নম্বর ধাপে এসে প্রধান বিচারপতি একেবারে দম হারিয়ে ধপাস করে বসে পড়লেন। নিকলসি বেগতিক দেখে তাঁকে হাত ধরে কোনোরকমে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চললেন। ভদ্রলোক অকৃতজ্ঞ নন। টাওয়ারের চূড়োয় পৌঁছে তিনি নিকলসিকে ধন্যবাদ জানাতে ভুললেন না। আর এও বললেন, 'ভবিষ্যতে আমার দিক থেকে এর মূল্য আপনি অবশ্যই পাবেন। বার্গোমাস্টার ও নিকলসি একটু আগে ছিলেন পরস্পরের শত্রু। কিন্তু চূড়োয় পৌঁছে দেখা গেল তাঁদের মধ্যে যারপরনাই মধুর সম্পর্ক বিরাজ করছে।

তাঁরা টাওয়ারের চূড়োর চাতালের ওপর দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে চারদিকের দৃশ্যাবলী নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

এক সময় ভ্যান ট্রিকসি চোখের তারায় জিজ্ঞাসার ছাপ এঁকে বললেন, 'বন্ধু নিকলসি, আমরা কেন এতগুলো সিঁড়ি বেয়ে টাওয়ারের চূড়োয় উঠে এসেছি, বলুন তো?'

বার্গোমাস্টরও একই প্রশ্নের অবতারণা করতে গিয়ে বললেন, 'তাই তো কি কারণে যে আমরা এখানে উঠেছি?'

নিকলসি মুচকি হেসে জবাব দিলেন, 'বিশুদ্ধ মুক্ত বাতাসে ফুসফুসটাকে একটু চাঙা করার জন্য আমাদের এত কষ্ট স্বীকার।'

ভ্যান ট্রিকসি উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'চমৎকার! চমৎকার! এবার তবে ধীরে ধীরে নামা যাক, কি বলেন?'

তাঁরা শেষ বারের মতো শহরের ওপর চোখের মণিগুলোকে বুলিয়ে নিয়ে প্রফুল্ল চিত্তে নামতে শুরু করলেন।

কয়েকটা ধাপ নামতে না নামতেই নিকলসিকে ভ্যান ট্রিকসি বলে উঠলেন, 'মশাই, এটা হচ্ছে কি শুনি! একটু ধীরে পা চালান সাহেব। বার বার এভাবে ঘাড়ের ওপর এসে পড়লে কাহাতক মেজাজ ঠিক রাখা যায়।'

বিশটা ধাপ নামার পর ভ্যান ট্রিকসি বাজখাই গলায় কাউন্সেলরকে দাঁড়াতে বললেন। উদ্দেশ্য, ইতিমধ্যে তিনি আর কয়েকটা ধাপ নেমে যাবেন। কাউন্সেলর সাফ জবাব দিলেন, বার্গোমাস্টারের জন্য তার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়।

ব্যস, আবার নিকলসি আর বার্গোমাস্টার-এর মধ্যে শুরু হয়ে গেল কথা কাটাকাটি। স্থান খুবই সঙ্কীর্ণ হওয়ার জন্য দুই প্রধানের মধ্যে জোর ধাক্কা লেগে গেল। ব্যস, উভয়েই গুলি খাওয়া বাঘের মতো তড়পাতে শুরু করলেন।

একটু বাদেই মনে হল দুটো দেহ গড়াতে গড়াতে নিচে নেমে আসছে। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে টাওয়ারের রক্ষী দরজা খুলে দিল। ব্যাস ঠিক তখনই দুই প্রধান জড়াজড়ি

www.pathagar.com

করে, হম্বিতম্বি করতে করতে খোলা-দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁরা একেবারে রক্ষীর সামনে হাজির হলেন। ব্যাপার দেখে রক্ষী ক্ষেপে লাল হয়ে উঠল। তার মধ্যেও হাতাহাতির ইচ্ছা হল। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল। সে হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে চিৎকার করতে লাগল, নিকলসি আর বার্গোমাস্টার শীঘ্রই ডুয়েল লড়তে চলেছেন।

পরিস্থিতি ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে পড়তে লাগল। এতেই অনুমান করা যাচ্ছে, কুইকোয়েনডনবাসীদের কতখানি উত্তেজিত করে তোলা হয়েছে, যার ফলে তাদের মেজাজ এমন খিটমিটে হয়ে গেছে আর কথায় কথায় মারমুখী হয়ে পড়ে। অত্যাশ্চর্য এ-উত্তেজনা মারমুখী মনোভাব গড়ে ওঠার আগে এ বন্ধু দুজন কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলেন যে কথায় কথায় তাঁরা কোনো দিন একে অন্যের ওপরে কারণে অকারণে এসে ক্ষেপে লাল হয়ে উঠবেন। কিন্তু টাওয়ারের চূড়ায় উঠে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য তাঁরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? মাত্র কয়েক ধাপ নেমেই আবার তাদের মধ্যে পরস্পরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা আর সহনশিলতা ফিরে এল।

শহরের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে বাঞ্ছিত মনোভাব গড়ে তুলতে পেরেছেন জানতে পেরে ডক্টর অক্সের মনে যেন আর আনন্দ ধরে না। শহরের অন্যান্য নাগরিকদের মত তাঁরা যে উগ্রস্বভাব লাভ করেছেন এ যে তার দারুণ সাফল্য।

এদিকে কুইকোয়েনডন শহরের পরিস্থিতি ক্রম অবনতি হচ্ছে দেখে ডক্টর অক্সের সহকর্মী ইজিনি যারপরনাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

এদিকে বার্গোমাস্টার আর কাউন্সিলের মধ্যে যে ডুয়েল লড়ার কথা ছিল তা ভিরগামেন সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রইল। দেশের এরকম সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে অহেতুক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার অধিকার আর যাদেরই থাক অন্তত দেশের কর্ণধার দুজনের নেই।

সবার আগে ভিরগামেনের সমস্যা সমাধানই একান্ত কর্তব্য। তবে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি না দিয়ে শত্রু পথের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াকে বার্গোমাস্টার নিতান্তই বোকামি বলে মনে করেন।

এগারোশো পঁচানব্বই-এর বার্গোমাস্টার ভিরগামেনের কৃত অপরাধের কাথা উল্লেখ করে সে দেশের কর্তৃপক্ষের কাছে এক চৌকিদারকে পাঠালেন। কথাটা শুনে ভিরগামেনের কর্তৃপক্ষ তো হেসেই খুন। চৌকিদারকে ধমক দিয়ে তিনি তাড়িয়ে দিলেন। এবার এক ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে দিয়ে এগারোশো পঁচানব্বইয়ে রক্ষিত দোষপত্রটা ভিরগামেনের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ফল একই হল। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটাকেও ঘাড় ধরে সীমানা পার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করল।

এবার বার্গোমাস্টার ভিরগামেনের কর্তৃপক্ষের কাছে এক চরমপত্র পাঠিয়ে বিবাদের কারণটা খোলাসা করে বুঝিয়ে দিলেন। আর সময় দেওয়া হল মাত্র 'চব্বিশ ঘন্টা'। ইতিমধ্যে ভিরগামেনের কর্তৃপক্ষ যদি অনুশোচনা প্রকাশ না করে তবে তাদের শহর অচিরেই ধ্বংস করে দেওয়া হবে, এরকম কথাও তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল। কর্তৃপক্ষ এবারও ব্যাপারটাকে আমল দিল না।

ভিরগামেনবাসীদের ঔদ্ধত্যে বার্গোমাস্টার যারপরনাই ক্ষুব্ধ হলেন। এবার আর তাদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া গত্যান্তর রইল না।

যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত প্রচার হতে না হতেই কুইকোয়েনডন শহরের দু-হাজার তিনশো নিরানব্বইজন অধিবাসীদের প্রত্যেকের বাড়ি থেকে একজন করে যোদ্ধা জোগাড় করা হল। তাদের মধ্যে যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ বালক সব বয়সী মানুষ রয়েছে।

www.pathagar.com

সবার হাতে যুদ্ধাস্ত্র—বন্দুক, বর্শা, বল্লম, লাঠি প্রভৃতি যা হোক একটা না একটা ধরিয়ে দেওয়া হল।

আদ্যিকালের কালভেরিন এনে গোলন্দাজ বাহিনী গড়ে তোলা হল। ষোলো শতকের মরচে পড়া একটা কামানকে ঝেড়ে মুছে পাঁচ শতকের ময়লা দূর করা হল। তেরোশো উনচল্লিশে কুইসনয়েদের আক্রমণের পর যে ক'বার কামান ব্যবহার করা হয়েছে তাদের মধ্যে এ ঘটনাটা উল্লেখযোগ্য।

যেসব যোদ্ধার ওপর কামান দাগার দায়িত্বভার অর্পণ করা হল তাদের হাতে গোলা বারুদ দেওয়া হল না। গোলা বারুদের দরকারই বা কি। কামানটা দেখিয়েই তো অবাধ্য শত্রুদের পিলে চমকে দেওয়া যায়। অত্যাধুনিক কামান আর মেশিনগানের পরিবর্তে অটুট মনোবল, অদম্য সাহস আর প্রতিশোধস্পৃহার ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হল সবচেয়ে বেশি।

সেনাদল তৈরি। শুরু হল কুচকাওয়াজ। সর্বাগ্রে রইলেন প্রধান বিচারপতি, বার্গোমাস্টার, কাউন্সেলর, নগরপাল, ব্যাংকার, শিক্ষক আর শহরের মাতব্বররা। আর ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসির নেতৃত্বে আরও একটা অদ্ভুত সৈন্যদল রইল সবার পিছনে।

যুদ্ধোম্মাদ সৈন্যদল যখন শহরের প্রাচীর টপকাবার জন্য তৎপরতা শুরু করেছে ঠিক তখনই একটা গাট্টাগোট্টা লোক তাদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গলা ছেড়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'আরে, রোসো! রোসো! তোমারা করছ কী! তোমাদের আকস্মিক উত্তেজনার মূলে রয়েছেন আমার প্রভু ডক্টর অক্স। তাঁরই দোষে তোমাদের ব্যবহারের এমন অবিশ্বাস্য পরিবর্তন। অক্সি-হাইড্রিক গ্যাস ব্যবহার করে শহরের বুকে আলো জ্বালাতে গিয়েই তিনি এ বিপর্যয়—'

ইজিনির মুখের কথা শেষ হবার আগেই, রহস্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে দেখে ডক্টর অক্স ক্রোধোম্মত্ত সিংহের মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তার ওপর এলোপাথারি কিল-চড়-লাথি চালাতে আরম্ভ করলেন। বেচারা ইজিনের আর কথা বলার ক্ষমতা রইল না।

ইজিন এবং ডক্টর অক্সের আকস্মিক আবির্ভাবে বার্গোমাস্টার, কাউন্সেলর প্রভৃতি উপস্থিতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভ্যান ট্রিকসিয়ের হুকুমে ডক্টর অক্স আর ইজিনিকে ধরে সৈনিকরা গোলা-বাড়িতে হাজির হল।

ঠিক তখনই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সমগ্র কুইকোয়েনডন শহরটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। আগুনের শিখা উল্কার বেগে মহাশূন্যের দিকে ধেয়ে গেল। কুইকোয়েনডন—এর বীরসৈন্যরা অস্ত্রহাতেই মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কয়েকজনের গায়ে সামান্য আঁচড় ছাড়া তেমন আঘাত লাগল না বটে। তবে কম-বেশি আঘাত পেয়েছে অনেকেই।

আশ্চর্য ব্যাপার! আকস্মিক বিস্ফোরণটার পরই কইকোয়েনডনবাসীর মধ্যে অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য পরিবর্তন লক্ষিত হল। তাদের মধ্যে আবার আগেকার ঢিলেমিভাব লক্ষিত হল। আর আশ্চর্য ব্যাপার, বিস্ফোরণের ফলেও নাগরিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তেজনা, হৈ-হট্টগোল লক্ষিত হল না। কাউন্সেলর, বার্গোমাস্টার, প্রধান বিচারপতি, নগরপাল আর অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, যে যার বাড়ির দিকে হাঁটা জুড়লেন। ডক্টর কাসটোস আর আইনজ্ঞ সুট গলা ধরাধরি করে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললেন।

কুইকোয়েনডন শহরের বুকে আবার বিরাজ করতে লাগল আগেকার সে অনাবিল আনন্দ। উত্তেজনা, চাঞ্চল্য আর ক্রোধপরায়ণতার স্মৃতি সবার মন থেকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

www.pathagar.com

এদিকে রূপসী যুবতী সুজেলকে ঘিরে ফ্রাঞ্জ আর সাইমন কোলার্টের মধ্যে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল নিমেষে তার অবসান ঘটল। সাইমন কোলার্ট আর ফ্রাঞ্জের পথের কাঁটা হয়ে থাকল না।

দশ বছরের মধ্যেই, যথা সময়ে ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসি দেহ রাখলেন। কম বয়স্কা খুড়তুতো বোন পেলাগি ভ্যান ট্রিকসিকে বিয়ে করে বার্গোমাস্টার আবার নতুন করে সংসার পাতলেন। বার্গোমাস্টার দেহ রাখলে সুঠামদেহী পেলাগি যে বৈধব্য গ্রহণ করবেন এরকম সম্ভাবনা অন্তর্হিত হল। চারদিকেই আগেকার সে ধীর ও ঢিলেমি ভাব বিরাজ করতে লাগল।

তবে? তবে কি ডক্টর অক্সই কুইকোয়েনডন শহরে রহস্যের জাল ছড়িয়ে ছিলেন? তার চমৎকার একটা এক্সপেরিমেন্টই আকস্মিক পরিবর্তনের আসল কারণ। শহরের বুকের রাস্তাঘাট, পাবলিক বিল্ডিং এবং শেষে গৃহস্থ বাড়িতে কেবলমাত্র প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ছড়িয়ে দিলেন। তবে হাইড্রোজেনের একটা কণাও ছড়ালেন না। বাতাসে স্বাদহীন গন্ধহীন এ অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে এ-গ্যাস প্রণীদেহে প্রবেশ করলে দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রতন্ত্রে দারুণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সম্ভাবনা ঘটে, কিন্তু সে ব্যক্তিই সাধারণ আবহাওয়ায় গিয়ে পড়লে মনের অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে—পূর্বেকার ধীর স্থির ও ঢিলেমি ভাব ফিরে আসে। কাউন্সেলর, বার্গোমাস্টারও ও নগরপাল প্রমুখরাও কিছু সময়ের জন্য হলেও পূর্বাবস্থা ফিরে পেয়েছিলেন। আবার সিঁড়ি বিয়ে নেমে মাত্রাতিরিক্ত অক্সিজেন অনুসিক্ত বাতাসের এলাকায় পা দিতেই আবার সে উত্তেজনা তাঁদের মধ্যে ফিরে এল। কারণ নিজের ওজনের জন্যই অক্সিজেন বাতাসের নিচের স্তরে জমতে শুরু করে। এরকম গ্যাস দীর্ঘ সময় শ্বাসক্রিয়ার ফলে মানুষের শারীরিক ক্ষমতার রূপান্তর ঘটে। উন্মাদের মতো ছটফট করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণটার মাধ্যমে কুইকোয়েনডনে অবস্থিত ডক্টর অক্সের গ্যাস কারখানাটা উড়ে গেল। তবে কি আমরা এ-সিদ্ধান্তই গ্রহণ করব, আমাদের চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, অটুট মনোবল, প্রতিভার ওপর মাত্রাতিরিক্ত অক্সিজেনের ক্ষমতা অসীম—ডক্টর অক্সের এক্সপেরিমেন্ট কি এই সাক্ষ্যই দেয়।

দ্য স্কুল ফর রবিনসন্স

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত ছোট্ট একটা দ্বীপ। ছোট্ট এ-দ্বীপটাকে কেন্দ্র করে যে এমন সোরগোল উঠবে তাই কে জানত। নির্জন-নিরালা দ্বীপটার ধারকাছ দিয়ে কোনো জাহাজ ভুলেও কোনোদিন যাতায়াত করে না। আসলে এটা মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী। এমন কি উল্লেখযোগ্য কোনো পশুও এখানকার জঙ্গলে দেখা যায় না।

এমন একটা অনাবশ্যক দ্বীপের মালিকানা স্বত্ব হাতে রেখে লাভই বা কী? যে-দ্বীপ আজ কোনোই উপকারে লাগল না, ভবিষ্যতেও লাগবে বলে সম্ভাবনা নেই—সেটা বেঁচে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। বিনিময়ে যে অর্থাগম হবে তা উপরি পাওনা বলেই মনে করা যেতে পারে। তাই মার্কিন সরকার নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় 'স্পেনসার আইল্যান্ড'কে নিলামে বেচে দেয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন।

www.pathagar.com

দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে খবরের কাগজের পাতায় স্পেনসার আইল্যান্ড সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ ছাপা হল। তবে এও লেখা হল দ্বীপটা যিনি কিনবেন তিনি কোনোদিক থেকেই লাভবান হবেন না।

আমেরিকায় ধনকুবেরের সংখ্যা কম নেই। সেরকম কারোর কাছে দ্বীপটাকে বেচে দিয়ে কিছু টাকা কামিয়ে নেওয়ার ধান্ধাতেই সরকার সেটাকে বেচার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নির্দিষ্ট দিনে নিলামঘর ক্রেতা ও কৌতূহলী মানুষের ভিড়ে রীতিমতো গমগম করতে লাগল। উপস্থিত অধিকাংশ মানুষের মুখেই একই প্রশ্ন—মানুষ নেই, এমন কি আগ্নেয়গিরি পর্যন্ত যে দ্বীপে নেই, এমন একটা দ্বীপ কিনতে কোনো আহাম্মক আগ্রহী হবে। উপস্থিত শ্রোতাদের টিটকিরি মস্করা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে সেখানে তিষ্ঠোয় কার সাধ্য! নিলামওয়ালা শেষপর্যন্ত হৈ-হট্টগোল থামাতে না পেরে তিতি-বিরক্ত হয়ে নিলাম বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন ঠিক তখনই এতগুলো মানুষের কণ্ঠ চাপিয়ে একজন বাজখাই গলায় দর হেঁকে বসলেন। ব্যাপারটা উপস্থিত সবার মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার করল। অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে তার খোঁজ করতে গিয়ে দেখল, সানফ্রান্সিসকোর ধনকুবের উইলিয়ম ডব্লিউ কোল্ডরূপ নিরুদ্বেগ মুখে এককোণে বসে রয়েছেন। হ্যাঁ, এঁর পক্ষে এতগুলো ডলার হাতের ময়লা মনে করে জলে ফেলে দেওয়া সম্ভব বটে। কোটি কোটি ডলারের মালিক ইনি। সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন ব্যবসা ফেঁদে রেখেছেন। এরকম ধনকুবের নিলাম হেঁকেছেন। ব্যস, উপস্থিত সবার মুখ শুকিয়ে গেল। এঁর ওপরে নিলাম হাঁকার সাধ বা সাধ্যি কোনোটাই কারোর নেই।

নিলামওয়ালা নানা কথার মারপ্যাচের মাধ্যমে নিলামের দর চড়াবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালাতে লাগল।

না, কারোর দিক থেকেই কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আসলে কোল্ডরূপের ওপরে দর হাঁকার মতো বুকের পাটা কারোর নেই, বুঝা গেল। কোনো বুদ্ধিই যখন খাটল না তখন নিলামওয়ালা বাধ্য হয়ে হাতুড়ির আঘাত হানল—এক-দুই-তিন বলার জন্য যেইনা মুখ খুলতে যাবে, অমনি ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে একজনকে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কোল্ডরূপের দরকে ছাড়িয়ে দর হাঁকাতে শোনা গেল। আবার কৌতূহলী চোখগুলো ব্যস্ত হয়ে নতুন কণ্ঠস্বরের মালিককে খুঁজতে লাগল। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। নতুন কণ্ঠস্বরের কোল্ডরূপের প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম টাসকিনার। কালিফোর্নিয়ার অধিবাসী। মোটাসোটা গোলগাল তার চেহারা।

কোল্ডরূপ আর টাসকিনারের মধ্যে দীর্ঘদিন দা-কুমড়ো সম্পর্ক। তাঁরা অর্থ, বুদ্ধি আর ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত। কেউ, কারোর নামটা পর্যন্ত শুনতে পারে না। তবে টাসকিনার মনে মনে কোল্ডরূপকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবলেও কোল্ডরূপ কিন্তু তাঁকে পাত্তাই দেন না। আর আজকের নিলাম হাঁকার পিছনেও টাসকিনার-এর উদ্দেশ্য একই—কোল্ডরূপকে একটু জব্দ করা।

কিন্তু কোল্ডরূপ এত সহজে মাথা নোয়াবার পাত্র নন। তিনি এক লাফে অনেকটা উঠে গেলেন। টাসকিনারও পাল্টা দর হাঁকলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোল্ডরূপকে বে-ইজ্জৎ করা তো দূরের কথা নিজেই ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন। মুখ গোমড়া করে নিলাম-ঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন।

www.pathagar.com

শেষপর্যন্ত সবচেয়ে বেশি দর হেঁকে কোল্ডরূপই স্পেনসার দ্বীপের মালিকানা স্বত্ব লাভ করলেন।

পরাজিত টাসকিনার রাগে গমগম করতে করতে নিলামঘর ছেড়ে যাবার সময় বলে গেলেন, 'এ অপমানের প্রতিশোধ আমি নেবই নেব!'

গডফ্রে নামে কোল্ডরূপের এক ভাগ্নে রয়েছে। তার বয়স বছর কুড়ি। আর ফেনা নামে পনের বছরের এক পালিতা কন্যা চোখের মণির মতো সর্বদা তাঁরা কাছাকাছি পাশাপাশি থাকে। কোল্ডরূপের ইচ্ছা গডফ্রে আর ফেনার বিয়েটা যতশীঘ্র সম্ভব মিটিয়ে দেবেন। তিনি চাইলেই তো আর বিয়ে হয়ে যাবে না। আসলে গডফ্রে যে সম্পূর্ণ অন্য ধাতের যুবক। এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে জোয়াল ঘাড়ে নিতে কিছুতেই সে রাজি নয়। তাঁর একান্ত ইচ্ছা পৃথিবীটাকে ঘুরে ফিরে দেখে তারপর বিয়ের শেকল পায়ে জড়াবেন।

ফেনারও ইচ্ছা অল্পবয়সী ন্যাকাবোকা স্বামীকে বিয়ে করে সারা জীবন পস্তানোর কোনো মানেই হয় না। তার চেয়ে গডফ্রে যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে একটু চালাক চতুর হয়ে আসে মন্দ কি?

পালিতা কন্যা ফেনা আর ভাগ্নে গডফ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করা কোল্ডরূপের পক্ষে সম্ভব হল না। উপায়ান্তর না দেখে ভাগ্নে গডফ্রেকে বিদেশ ভ্রমণে পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করলেন।

কোল্ডরূপ যেসব ব্যবসায় লিপ্ত তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জাহাজের ব্যবসা। বেশ কয়েকটা জাহাজের মালিক তিনি। তিনি পরের দিনই এক জাহাজের ক্যাপ্তেনকে ডেকে ভাগ্নে গডফ্রের বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছার কথা জানালেন। জাহাজে কোনো মালপত্র যাবে না। তবে পৃথিবীর যেসব বন্দর মারফৎ তাঁর ব্যবসা চলে সব বন্দরে যেন জাহাজ অবশ্যই ভেড়ানো হয়—ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দিলেন। সবশেষে তিনি ক্যাপ্টেনের কানে কানেও ইশারা ইঙ্গিতে এমন কিছু নির্দেশ দিলেন যা শুনে ক্যাপ্টেনের চোখ-মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

কোল্ডরূপ ভাগ্নেকে একা ছাড়তে ভরসা পেলেন না। তাই গডফ্রের নাচের মাস্টারকে ডেকে পাঠালেন।

কোল্ডরূপের ডাক পেয়ে নাচের মাস্টার ভদ্রলোক হাসিমাখা মুখে নাচতে নাচতে তাঁর ঘরে ঢুকল। উভয়ের মধ্যে কথোপকথনের পর নাচের মাস্টার যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তখন আর তার মুখে হাসি দেখা গেল না। আর নাচতে নাচতে যে লোক ঢুকেছিল সে বেরিয়ে এল হেঁটে, একেবারে ধীর মন্থর গতিতে। কোল্ডরূপের হুকুম, ভাগ্নে গডফ্রেরর সঙ্গে তাকে সমুদ্রযাত্রায় যেতে হবে।

এক সকালে ছোট্ট জাহাজটা বুক কাঁপানো ভোঁ দিয়ে বন্দর ছাড়ল। বিদায় মুহূর্তে গডফ্রের বুকে নতুন নতুন দেশ দেখার উচ্ছ্বাস। ফেনার মুখে বিষাদের ছাপ। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা লক্ষিত হল নাচের মাস্টারের মধ্যে। হবে না-ই বা কেন? এতদিন নেচে কুঁদে জমিন কাঁপিয়েছে এবার তাকেই নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবে উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের ঢেউ। নাচের বদলে তাকে দোদুল্যমান ডেকে নিশ্চল-নিথর থাকার সাধনায় লিপ্ত থাকতে হবে।

দুর্বার গতিতে সমুদ্রের বুক চিরে এগিয়ে চলল ছোট্ট জাহাজটা। অচিরেই আমেরিকার উপকূল চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। প্রথম দুটো দিন নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। জাহাজের গতি এবার নিউজিল্যান্ডের দিকে। ব্যস, এর বেশি কিছু গডফ্রে জানে না। জানতে চায়ও না। জাহাজের কলকব্জার ব্যাপার-স্যাপার কতটুকুই বা সে জানে যে ঝুটমুট মাথা ঘামাতে যাবে? তাই বিচিত্র, একেবারে অত্যাশ্চর্য একটা ব্যাপারের

www.pathagar.com

দিকে তার চোখই পড়ল না। রোজ সূর্য মাথার ওপরে উঠলেই জাহাজের ক্যাপ্টেন গুটিগুটি জাহাজ-অফিসারের কামরায় ঢোকেন। দুজনে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলাবলি করেন। ব্যস। প্রতি রাত্রেই জাহাজের গতিবেগ কমে যায়। দিনের আলো ফুটে উঠলেই আবার গতিবেগ বেড়ে যায়। জাহাজ তরতর করে এগিয়ে চলে।

জাহাজের গতিবেগ কমানো-বাড়ানোর ব্যাপারটা নিয়ে গডফ্রে মাথা না ঘামালেও মাঝি-মাল্লাদের কিন্তু নজর এড়াল না। তারা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করতে লাগল। কিন্তু ভুলেও কেউ ব্যাপারটা নিয়ে মুখ খুলল না।

একদিন জাহাজে তুমুল হৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। এক খালাসি চিল্লাতে চিল্লাতে ক্যাপ্টেনের কাছে ছুটে এল। জাহাজের খোলে নাকি এক চিনাম্যান লুকিয়ে আছে।

চিনাম্যানের কথা শুনেই ক্যাপ্টেন তো রেগেমেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেলেন। তাকে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার হুকুম দিলেন।

হুকুম তামিল করার জন্য খালাসিটা ছুটে গেল জাহাজের ক্যাপ্টেন গডফ্রে আর নাচের মাস্টারকে নিয়ে নেমে এলেন নিচে, খোলের ভেতরে। ক্যাপ্টেন রাগে গস গস করতে লাগলেন। কথা বলে জানা গেল, চিনাম্যানটা এক কৌতুকাভিনেতা। বিনা খরচে সাংহাই যাওয়ার ধান্ধায় জাহাজের খোলের মধ্যে সিঁধিয়েছে। তার বক্তব্য খোলটা তো খালিই পড়ে রয়েছে। একজন মানুষ যদি এখানে আশ্রয় নেয়ই ক্ষতি কি?

এতেও ক্যাপ্টেনের ক্রোধ প্রশমিত হল না। কড়া হুকুম দিলেন, 'ওসব ধান্ধা ছাড়। পকেটে পয়সা না থাকলে সাঁতরে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সাংহাই যাও।'

গডফ্রে এগিয়ে এসে পরিস্থিতিটাকে সামাল দেবার চেষ্টা করল, 'জাহাজের খাবারদাবারে যখন ভাগ বসাচ্ছে না, আর তার ভারে জাহাজ যখন ডুবেও যাবেনা তখন ঝুটমুট ঝামেলা করে কি হবে?'

তার কথায় ক্যাপ্টেন নরম হলেন।

দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল একটু বাদেই। দেখতে দেখতে ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। প্রলয়ঙ্কর ঝড় উঠল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। শান্ত সমুদ্র উত্তাল-উদ্দাম রূপ ধারণ করল। ঢেউয়ের দাপটে জাহাজটা মোচার খোলার মতো ঢেউয়ের তালে তালে বার বার ওঠানামা করতে লাগল। নাচের মাস্টারের তো কলিজা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল। কি যে দরকার ছিল এমন পৃথিবী পর্যটনের পোকা মাথায় ঢোকানো। পিতৃদত্ত প্রাণটা বুঝি এবার খোয়াতেই হবে।

গডফ্রের মন কিন্তু আতঙ্কের পরিবর্তে রোমাঞ্চতে ভরপুর হয়ে গেল। ঝড়-বৃষ্টি আর বিপদ-আপদ জড়িয়ে তার মধ্যেই তো অভিযানের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। এদিকে জাহাজটা ঝড় আর ঢেউয়ের দাপটে তলিয়ে যেতে যেতে কোনো রকমে কাৎরাতে কাৎরাতে এগিয়ে চলল।

একটা ব্যাপার গডফ্রের মাথায় এল। ব্যাপারটা কি, রোজ ভোরের আলো ফুটে উঠলেই জাহাজটার নাচানাচি লাফালাফি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার নেমে এলেই এটা ধীর স্থির হয়ে পড়ে। ব্যাপার কি?

হঠাৎ গডফ্রের নজরে পড়ল, চিমনির ধোঁয়া বাইরে বেরিয়েই বিপরীত দিকে ধেয়ে চলেছে। কিন্তু দিনের বেলায় তো এমন দৃশ্য কোনোদিনই নজরে পড়ে নি। এক রাত্রে ক্যাপ্টেন অদূরবর্তী ডেকের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। গডফ্রেকে দেখতে পান নি। তন্ময় হয়ে কি যেন ভেবে চলেছেন। হঠাৎ গডফ্রের ডাকে সচকিত হয়ে ঘাড় ঘুরালেন।

www.pathagar.com

গডফ্রে চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে বললেন, 'ক্যাপ্টেন ব্যাপারটা তো মোটেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না! জাহাজটা কি বিপরীত দিকে ধেয়ে চলেছে? পর পর করাত্রে লক্ষ করছি, চিমনির ধোঁয়া বিপরীত দিকে ধেয়ে যায়। আজও একই দৃশ্য, ব্যাপার কি বলুন তো?"

আমতা আমতা করে ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ মানে ঝড়ের কবল থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই আমাকে বিপরীত দিকে চালাতে হয়।'

'সে কী সাহেব, দেরি হয়ে যাবে যে! এটা করছেন কী সাহেব!'

'সে তো আমার ব্যাপার।' বেশ একটু রাগত স্বরেই ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন।

সামান্য ব্যাপারে ক্যাপ্টেন কেন যে এমন রেগে গেলেন তা গডফ্রের মাথায় এল না।

ক'দিন ধরেই ক্যাপ্টেন যে দিনের বেলায় জাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যান আর রাত্রির অন্ধকার নেমে আসতে আবার সমানে পিছাতে থাকে তা এর আগে গডফ্রের মাথায়ই আসে নি।

একদিন ঝড়-বৃষ্টির দাপট একেবারে কমে গেল। আকাশ একেবারে পরিষ্কার। ঢেউয়ের তাণ্ডবও নেই। গডফ্রে সকালের দিকে ক্যাপ্টেনের কেবিন এসে দেখে, কেবিন ফাঁকা। জাহাজ নাকি পথ হারিয়ে ফেলেছে। তাই বোট নিয়ে বেরিয়েছেন, ধারে কাছে ডাঙ্গা আছে কিনা খোঁজ করতে গেলেন।

একটু বাদেই ক্যাপ্টেন ফিরে এসে জানালেন, আতঙ্কের কোনো কারণই নেই। পথ ভুল হয়েছে ঠিকই। তবে শুধরে নেওয়া যাবে। আর যাকে ডাঙা মনে করা হয়েছিল আসলে তা নয়। ধারে কাছে ডাঙার কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না।

গডফ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যাপ্টেন জাহাজ-অফিসারের কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন। উভয়ে ফিস ফিসিয়ে কি যেন পরামর্শ করলেন।

হ্যাঁ, সে রাত্রেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। ক্যাপ্টেন হঠাৎ বিকট স্বরে চিল্লাতে লাগলেন, 'মি. গডফ্রে, সর্বনাশ হয়ে গেল! আপনি জলে ঝাঁপ দিন। জাহাজ ডুবে যাচ্ছে। বোধ হয় ডুবো পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে জাহাজ তলিয়ে যেতে শুরু করেছে।'

গডফ্রে আতঙ্কিত স্বরে বলল, 'সে কী জলে ঝাঁপ দিতে হবে! কিন্তু মাস্টারসাহেব কোথায়?

'মাস্টার সাহেবয়ের কথা পরে ভাবা যাবে। আপনি আগে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচান। সবার ব্যবস্থা করে তবেই আমি নিজের কথা ভাবব। আপনি জলে ঝাঁপ দিন।' ক্যাপ্টেন কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে কথা কটা ছুঁড়ে দিলেন।

কথা বলতে বলতে ক্যাপ্টেন পিছন থেকে এক ধাক্কায় গডফ্রেকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেন। সে সাঁতারে সামানে এগোতেই সামানে একটা দ্বীপ দেখে কোনোরকমে উঠে গেল।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, সত্যি সত্যি জাহাজটা ডুবে যাচ্ছে। অন্ধকার দ্বীপে গডফ্রে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে মুখে হতাশার ছাপ।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই গডফ্রে দ্বীপটার ওপরে চোখ দুটো বার-কয়েক বুলিয়ে নিল খাবার ও পানীয় কিছুই তার চোখে পড়ল না। নিঃসন্দেহ হল নির্জন দ্বীপে তাকে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।সে ভাবতে লাগল, জাহাজের কেউ-ই হয়তো জীবিত নয়, বোটটাও তবে বে-পাত্তা হয়ে গেছে।

গডফ্রে ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। ভাবল, এটা কি আদৌ কোনো দ্বীপ, নাকি অতিকায় এক তিমির পিঠ। ক্যাপ্টেন তো বোট নিয়ে চক্কর মেরে এসে বলেছিলেন, ধারে

www.pathagar.com

কাছে কোনো ডাঙা নেই। তবে! হায়! এ-ও কি বরাতে ছিল। মামার বাড়ি দিব্যি সুখে দিন কাটছিল। দেশ ভ্রমণের পোকা মাথায় ঢুকতেই এমন ঝকমারিতে পড়তে হয়েছে! আজ কোথায় পড়ে রইলেন মামা, কোথায় ফেনা আর কোথায়ই বা মামার বাড়ির সুখ-শান্তি!

হাতাশায় জর্জরিত মন নিয়ে গডফ্রে হাঁটতে লাগল। কোথাও বালি, কোথাও বা টুকরো টুকরো পাথর। আশ্চর্য ব্যাপার তো মানুষ তো দূরের ব্যাপার সামান্য একটা পশু-পাখি পর্যন্ত নেই। না, আছে—কয়েকটা গাঙচিল এখানে-ওখানে অলসভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে।

গডফ্রে ভাবতে লাগল, তবে কি সত্যি, সে দ্বীপেই অবস্থান করছে। হ্যাঁ, এটা দ্বীপই বটে।

আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড় গডফ্রে। সামনের এক দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে তার চোখের মণি দুটো স্থির হয়ে গেল। দেখল, বালির ওপর বিচিত্র দর্শন একটা সামুদ্রিক প্রাণী পড়ে রয়েছে। দুরুদরু বুকে এগিয়ে যেতেই তার মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে এল—'হায় ঈশ্বর! একী করলে তুমি!'

কেন সে এমন আর্তনাদ করে উঠল। ওটা কি আসলে কোনো সামুদ্রিক জন্তু?

না, তার নাচের মাস্টার। কোমরে লাইফ বেল্ট থাকার জন্যই তাকে এমন বিদঘুঁটে দেখাচ্ছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে ছোট্ট করে ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করতেই বেচারা নাচের মাস্টার নড়েচড়ে উঠল। যাক, তবে ধড়ে প্রাণ আছে দেখা যাচ্ছে।

অদ্ভুত চরিত্রের লোক বটে। চোখ মেলে তাকিয়েই পকেটে হাত দিয়ে দেখতে লাগল, তার বেহালা জায়গা মতো আছে কিনা। কোথায় আছে, কোথায় থাকবে, খাবেই বা কি এসব কথা না ভেবে বেহালাটার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছে। প্রাণেই যদি না বাঁচে তবে বেহালা বাজাবে কে? আর শোনাবেই বা কাকে? গুরু ও শিষ্য হাঁটাহাঁটি করতে করতে মাথার ওপরে প্রচুর পাখি উড়তে দেখল। তারা ভাবল, পাখি যখন আছে তখন অবশ্যই কোথাও না কোথাও বাসা আছে। আর বাসায় হানা দিলে ডিম যে পাওয়া যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব অন্তত না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে না এটুকু ভরসা তাদের হল।

ব্যস, পেটের জ্বালা নেভানোর ধান্ধায় গডফ্রে আর তার গুরু চারদিকে হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। সামান্য খোঁজাখুঁজি করতেই তারা পাথরের খোদলের মধ্যে কয়েকটা ইয়া বড় বড় ডিম পেয়ে গেল। ডিম তো জোগাড় হল। কিন্তু আগুন? শুকনো কাঠে-কাঠে ঘষে, পাথরে-পাথরে ঠোকাঠুকি করেও কিছুতেই আগুন জ্বালাতে পারল না। শেষপর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে তারা ডিমগুলো ফাটিয়ে কাঁচা কুসুম দিয়েই পেটের জ্বালা নেভাল। এবার মাথা গোঁজার জায়গার খোঁজে আবার হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে তারা গভীর বনে ঢুকে গেল। দীর্ঘ সময় ধরে হাঁটাহাঁটি করেও মাথা গোঁজার মতো জায়গা তারা খুঁজে পেল না। আগত্যা বালির ওপর শুয়েই তারা রাত্রি কাটিয়ে দিল।

কাকডাকা ভোরে গডফ্রের ঘুম ভেঙে গেল। নিজের জন্য তার যা ভাবনা তার চেয়ে ঢেড় ঢেড় ভাবনা মাস্টাসাহেবকে নিয়ে ভদ্রলোকের বাস্তববুদ্ধি তিলমাত্র নেই। ঘুম ভাঙলেই হয়তো চা-বিস্কুটের জন্য হাঁকাহাঁকি জুড়ে দেবেন।

না, নাচের মাস্টারের ওপর ভরসা করার অর্থই হচ্ছে নিজের পায়ে কুড় লমারা। বাস্তব বুদ্ধি যদি কিছুমাত্র তার থাকত তবে কি এমন কথা তার মুখ দিয়ে বেরতো,

www.pathagar.com

'গডফ্রে সবচেয়ে কাছের ডাকঘরে গিয়ে তোমার মামা কোল্ডরূপকে একটা টেলিগ্রাম করে আমাদের দুরবস্থার কথা জানিয়ে দাও। আর কিছু টাকা পাঠাতেও বলে দিও।' বাস্তব বুদ্ধি থাকলে এরকম নির্জন-নিরালা দ্বীপে কেউ ডাকঘরের কথা ভাবতে পারে?

এদিকে গডফ্রে বনে জঙ্গলে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল যে, এখানকার গাছপালাগুলোতে মার্কিনি ছাপ সুস্পষ্ট। আমেরিকা থেকে কেউ যেন বীজ ও গাছ এনে দ্বীপে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল।

গডফ্রে হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গল পেরিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে হাজির হল। পাহাড়ের গা বেয়ে কিছুটা ওপরে উঠে চারদিক দৃষ্টিপাত করতেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল কেবল জল আর জল। জলবেষ্টিত ছোট্ট এক স্থলভূমির মধ্যে তারা বন্দী হয়ে রয়েছে।

দ্বীপ। গডফ্রে নিঃসন্দেহ হল নামগোত্রহীন এক দ্বীপে তারা বন্দী হয়েছে। মানচিত্রে যার উল্লেখ নেই এরকম একটা দ্বীপে তাদের কেউ উদ্ধার করতে আসবে এরকম সম্ভাবনা তার মন থেকে উবে গেল।

গডফ্রে মনের দিক থেকে একটু-আধটু ভেঙে পড়েছে ঠিকই। কিন্তু অচিরেই মনে বল সঞ্চয় করে নিজেকে সামলে নিল। তার বাগদত্তার নামানুসারে দ্বীপটার নামকরণ করল 'ফেনা দ্বীপ।'

গডফ্রে পাহাড় থেকে নামার সময় যে দিকে আকাশছোঁয়া গাছগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে সেদিক থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখল।

ধোঁয়া? কিসের ধোঁয়া? ধোঁয়ার অস্তিত্ব যেখানে সেখানে তো মানুষের অস্তিত্ব থাকারই কথা। তবে? তবে কি দ্বীপে তারাই কেবল বন্দীদশা ভোগ করছে না। জাহাজডুবির ফলে আরও কেউ না কেউ দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। লম্বা লম্বা পায়ে পাহাড় থেকে নেমে গডফ্রে হাঁপাতে হাঁপাতে নাচের মাস্টারের কাছে এল। নাচের মাস্টার তখন আপন মনে শুকনো কাঠে কাঠ ঘষে চলেছেন আগুন জ্বালাবার দুরন্ত আশা নিয়ে। ইতিমধ্যে কয়েকটা কাঁচা ডিম দিয়ে পেটের জ্বালা একটু নিভিয়ে নিয়েছেন।

কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে গডফ্রে ইতিমধ্যেই নিজেকে বেশ তৈরি করে নিয়েছে। সে এখন পরিস্থিতির সঙ্গে মোটামুটি সমঝোতায় এসে গেছে। কল্পনার জগৎ ছেড়ে সে এখন কঠিন বাস্তবের মোকাবেলা করতে শিখেছে। কাঁচা ডিম খাওয়ার জন্য এক রকম বুনো আপেল আর গেঁড়িগুলি সংগ্রহ করেছে। কাঁচা ডিম খেলে ঠেলে বমি আসতে চায় বটে, তবে পেটের জ্বালা নেভানোর ব্যবস্থা তো করতে পেরেছে।

গডফ্রে এবার বেঁচে থাকার জন্য অন্যান্য জরুরি সমস্যা সমাধানের চিন্তায় মেতে গেল। সবচেয়ে আগে দুটো জিনিস অত্যাবশ্যক। একটা মাথা গোঁজার জায়গা আর অন্যটা আগুন। আগুনের ব্যবস্থা না করলে কতদিন আর কাঁচা খাবারদাবার গলা দিয়ে নামাতে পারবে?

দ্বীপটা ঘুরে দেখতে বেড়িয়ে গডফ্রে কারোও দেখা পায় নি বটে। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে বড় রকমের লাভ তার হয়েছে। মাথা গোঁজার মতো একটা জায়গার খোঁজ পেয়েছে। যেখানে মোটামোটা গাছের মেলা সেখানেই জায়গাটার খোঁজ সে পেল। মাথা গোঁজার জায়গা বলতে একটা গাছের গুড়ির কাছাকাছি গহ্বর। ভেতরটা অন্ধকার থাকায় সে বুঝে উঠতে পারল না গহ্বরটা কত বড়।

গাছের গহ্বরে ঠাঁই নেওয়ার পরও নাচের মাস্টারের মুখ কিন্তু বন্ধ হল না। এখন তার অভিযোগ গহ্বরটায় ধোঁয়া বেরোবার চিমনি নেই কেন?

www.pathagar.com

হায় ঈশ্বর! আগুন জ্বালার উপায়ই এখনো বের করা সম্ভব হল না, নাচের মাস্টার গম গম করছেন গহ্বরের ধোঁয়া বেরোবার চিমনির জন্য অস্থির হয়ে পড়েছেন!

আগুন—আগুন চাই-ই। দ্বীপের ধারে প্রচুর মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। গডফ্রে কায়দা কসরৎ করে কয়েকটা মাছ ধরে ফেলল। কিন্তু নিদেন পক্ষে আগুনে না ঝলসে কাঁচা মাছ খাওয়া যায় কখনও?

জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে গডফ্রে আরও কয়েকরকম বুনো ফলের খোঁজ পেয়েছে। কিন্তু আগুন না হলে সেগুলোর সদগতি করবে কি করে?

ঈশ্বর মুখ তুলে তাকালেন। ঈশ্বরের করুণাধারা আকাশ থেকে আগুনের রূপ নিয়ে দেখা দিল। একবোরেই অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন আকাশ থেকে আগুন নেমে এল।

একদিন গাছের গহ্বরটায় গুরু-শিষ্য শুয়েছিল। গডফ্রে গহ্বরটার নামকরুণ করেছে 'মামার বাড়ি'।

হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। কড় কড় কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল। পর মুহূর্তেই বিকট গর্জন করে পাশের শুকনো গাছটায় বাজ পড়ল। গাছটায় আগুন লেগে গেছে। দেখতে দেখতে পুরো গাছটাই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

বরাত ভাল যে, গডফ্রে একটা জ্বলন্ত ডাল তুলে গাছের গহ্বরটায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। নইলে বৃষ্টির জল পেয়ে আগুন নিভে যেত। কারণ একটু বাদেই ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির জল গাছের আগুন নিভিয়ে দিল। কিন্তু গহ্বরটার আগুন ধিক্ ধিক্ করে জ্বলতেই লাগল।

হ্যাঁ, বহু প্রত্যাশিত আগুন তো পাওয়া গেল। কিন্তু তাকে টিকিয়ে রাখাই সমস্যা। যে-কোনো মুহূর্তে নিভে যাবার সম্ভাবনা। রোজ রোজতো আর বজ্রপাত হবে না।

নাচের মাস্টার শুকনো ডালপালা জোগাড় করে আগুনটাকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব নিল।

আগুন পাওয়ায় মাংস ঝলসে নিয়ে পরমানন্দে উদরপূর্তি চলতে লাগল। কাঁচা ডিম, কাঁচা মাছ আর কাঁচা মাংসের পর ঝলসানো মাংস পরম উপাদেয় হয়ে উঠল।

রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে গডফ্রে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে লাগল। আর নাচের মাস্টার আগুনটাকে টিকিয়ে রাখার কাজে মেতে রইল। মাঝ-রাত্রে ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগায় গডফ্রের ঘুম ছুটে গেল। সে বুঝে উঠতে পারল না হঠাৎ কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে কোত্থেকে? তবে কি বজ্রপাতের ফলে গহ্বরটার কোথাও ফাটলের সৃষ্টি হয়ে গেছে?

গহ্বরটার বাইরে এসেই গডফ্রে আঁৎকে উঠল। এ যে রীতিমতো সর্বনাশ কাণ্ড ঘটতে চলেছে। বাজ কেবলমাত্র পাশের গাছটাতেই পড়ে নি। তাদের গাছটার মাথাও পড়েছিল। বজ্রপাতে গাছের গুঁড়িটা ঝলসে গেছে। তবে তো বৃষ্টিবাদলের সময় গাছের কোটর নিরাপদ আশ্রয় নয়। সে ভাবল, বজ্রপাতে নির্ঘাৎ গহ্বরটার কোথাও ফুটো হয়ে গেছে। বরাত ভাল যে, বজ্রপাত তাদের স্পর্শ করেনি!

সকাল হলে গডফ্রে গাছটা বেয়ে ওপরে উঠল। সামান্য খোঁজাখুঁজিতেই একটা ফুটো দেখতে পেল। আর লক্ষ্য করল গাচের প্রায় মাথা পর্যন্ত ভেতরটা ফাঁপা।

গাছ থেকে নামতে গিয়ে গডফ্রে আবার চমকে উঠল। দেখল সমুদ্রতটের কাছ থেকে ধোঁয়া উঠছে। আর একবার পাহাড়ের ওপর থেকে সে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পেয়েছিল। আজ ধোঁয়ার উৎসটাকে খুঁজে বের করার জন্য সে বদ্ধপরিকর হল।

হন্তদন্ত হয়ে সে সমুদ্রের ধারে গেল। না, ধোঁয়া বা আগুন কিছুই তার নজরে পড়ল না। এমন কি সামান্য ছাই পর্যন্ত খুঁজে পেল না।

www.pathagar.com

এ কী বিচিত্র ব্যাপার রে বাবা! তবে কি এটা ভূতুরে ব্যাপার নাকি?

গডফ্রে এক সময় ছিল সাংসারিক জ্ঞান-বুদ্ধিহীন এক যুবক। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতির চাপে পড়ে, বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সে আজ একটু একটু করে বাস্তবজ্ঞান লাভ করে পাকা সংসারী হয়ে উঠতে লাগল। তার কাছে একটা বহুমুখী ছুরি রয়েছে। তা দিয়ে কাঠ কেটে বসবার টুল আর খাবার টেবিল তৈরি করে ফেলল। অন্য একটা গাছের গহ্বরে বুনো মুরগির পালকে ভরে রাখল। ডিম আর মাংসের জোগানের যাতে ঘাটতি না হয়।

এবার সে একটা জিনিসের অভাব বোধ করতে লাগল। মাছ ধরার একটা জাল আর বঁড়শি। আর বুনো ছাগল-ভেড়াগুলোর জন্য খোঁয়াড় তৈরির কথা এখন না ভাবলেও চলবে। পুরোদমে বর্ষা শুরু হলে দেখা যাবে কি করা যায়। এখন মাঠেই চরে বেড়ায়। দ্বীপবাসীদের দুধ আর মাংসের অভাব তারা পূরণ করছে।

এমন সময় গডফ্রে অদ্ভুত একটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেলল। একদিন সমুদ্রের ধার দিয়ে ঘোরাফেরা করতে করতে অদ্ভুত একটা জিনিস তার নজরে পড়ল। ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে যেতেই দেখল, ইয়া পেল্লাই একটা সিন্দুক। অর্ধেকটা বালিচাপা পড়ে রয়েছে। নির্ঘাৎ কোনো জাহাজডুবির ফলে ঢেউয়ের চাপে এখানে এসে পড়েছে।

সিন্দুকটা খুবই মজবুত। বাইরের দিকটা তামার পাত আর ভেতরের দিকটা দস্তার পাত দিয়ে মোড়া। জল ঢোকার কোনো সুযোগই নেই।

সভ্যভব্যভাবে জীবন যাপন করতে যা কিছু দরকার সবই সিন্দুকটার মধ্যে রয়েছে। অবাক কাণ্ড তো, জাহাজের মালিক কি তবে জানতেন, জাহাজডুবি হবেই আর নির্জন দ্বীপে ঠাঁই নিতে হবে? আর আশ্চর্য ব্যাপার, জিনিসপত্রগুলোর গায়ে কোথাও এমন কোনো চিহ্ন নেই যা দেখে বোঝা যেতে পারে যে সেগুলো কোন্ দেশের তৈরি। থালা, ঘটি, বাটি আর কড়াই, খুন্তি থেকে শুরু করে যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, দূরবীণ, ঘড়ি, কাঁটাকম্পাস আর জামাকাপড় পর্যন্ত এমন কিছু নেই যা সিন্দুকের ভেতরে পাওয়া যায় নি।

গডফ্রে সিন্দুকটা চারদিক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে খুঁজে দেখল কোথাও লেখা নেই কোন্ দেশে সেটা তৈরি।

রহস্যজনক সিন্দুকটা গডফ্রেকে বড়ই ভাবনায় ফেলল। সে নাচের মাস্টারের সহযোগিতায় সিন্দুকের জিনিসপত্র নিয়ে গাছের গহ্বরটায় জড়ো করতে লাগল। তারপর ঠেলে ধাক্কে খালি সিন্দুকটাকে নিয়ে এল কোটরের গাছটার কাছে।

গডফ্রে একটা আলমারির অভাব বোধ করছিল। সিন্দুকটা পাওয়ায় সে অভাব দূর হল। বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু দরকার সবই তো সিন্দুকটার ভেতরে পাওয়া গেছে। ব্যস, কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

গডফ্রে এবার সিন্দুক থেকে পাওয়া যন্ত্রপাতি দিয়ে গহ্বরটার মধ্যে কয়েকটা তাক তৈরি করে নিল। বাসনপত্র অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি যা কিছু সবই তাক গুলোতে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখল। রাতজাগা জন্তু জানোয়ারের ভয়ে দ্বীপবাসীরা এতদিন নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে নি। তাই অস্ত্রপাতি দিয়ে গহ্বরটার মুখে একটা পাল্লা লাগিয়ে নিল।

গডফ্রে বন্দুক-কাঁধে দ্বীপের পাড়ের দিকে চক্কর মারতে আসত। দীর্ঘদিন ধরে ঘোরাফেরার ফলে একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হল, দ্বীপে কোনো হিংস্র জানোয়ার নেই। বন্দুক দিয়ে হরিণ ও নিরীহ প্রাণী হত্যা করে তারা খাদ্যের অভাব মেটাতে লাগল।

www.pathagar.com

এতকিছু সত্ত্বেও গডফ্রের মনে শান্তি নেই। পাহাড়ের ওপরে উঠে আবারও ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পায়। কিন্তু কিসের ধোঁয়া? আগুনটা অবশ্যই কোনো না কোনো মানুষ জ্বেলেছে। তবে মানুষটা গেল কোথায়?

আর একদিন পাহাড়টার ওপরে উঠে ধোঁয়ার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে চমকে উঠল।, ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা দ্বীপের ভেতর থেকে নয়, সমুদ্র থেকে উঠে আসছে।

গডফ্রে উর্ধ্বশ্বাসে পাহাড় থেকে নেমে সমুদ্রের ধারে গেল। ব্যাপারটা এবার তার কাছে পরিষ্কার হল। সে বুঝল, ধোঁয়ার উৎস একটা জাহাজ। ধীর মন্থর গতিতে জাহাজটা এগিয়ে আসছে। সেটা দ্বীপটার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে গডফ্রে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ার জোগার হল।

জাহাজটার গতিপথ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল। দ্বীপ থেকে মাইল দুই দূর দিয়ে সেটা পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইছে।

একী আজব ব্যাপার! একী নিয়তির এক নিষ্ঠুর পরিহাস! এতদিন পর যদিও বা একটা জাহাজ চোখে পড়ল তাও সটকে পড়ল। সেটাকে আমেরিকান জাহাজ বলে গডফ্রের মনে হয়েছিল।

হায় অদৃষ্ট! জাহাজের লোকগুলো অন্ধ নাকি! দ্বীপের গায়ে এতবড় একটা লাল পতাকা উড়ছে তাও দেখতে পেল না কেউ! তবুও জাহাজটা এগিয়ে এসে ভিড়ল না!

গডফ্রে ক'দিন আগে সিন্দুক থেকে পাওয়া একটা লাল পতাকা গাছের ডালের মাথায় টাঙ্গিয়ে দিয়েছিল। তার সে প্রয়াস বৃথা গেল। উপায়ান্তর না দেখে সে ঝটপট কিছু শুকনো ডালপালা জড়ো করে আগুন ধরিয়ে সঙ্কেত জানাল। কোনো কাজই হল না। জাহাজটা তার গতি অব্যাহতই রাখল। গডফ্রে হতাশ মনে গাছের কোটরে ফিরে এল।

পরের দিন নাচের মাস্টার জঙ্গলিদের একটা নৌকা দেখতে পেয়ে ভয়ে একেবারে মিইয়ে গেল। ছুটতে ছুটতে কোটরে ফিরে এসে গডফ্রেকে ব্যাপারটা জানাল।

জঙ্গলিদের কথা শুনেই গডফ্রে ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে যাবার জোগাড় হল। পর মুহূর্তেই নিজেকে একটু সামলে নিয়ে চোখ দুটো কপালে তুলে বলল, 'স্যার, এ দ্বীপে জঙ্গলি আসবে কোত্থেকে মাথায় আসছে না তো। আমি তো দ্বীপটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি, এখানে কোনো মনুষ্য বসতিই নেই। জঙ্গলি-টঙ্গলি বোধ হয় আপনার চোখ ও মনের ভুল।

'ভয়াল দর্শন একদল জঙ্গলি নৌকা করে এসে দ্বীপে নামল, আমি যে নিজের চোখে দেখে এলাম। আর তুমি বলছ কিনা চোখের ভুল! অসম্ভব! এত বড় ভুল আমার হতেই পারে না।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফ্যাকাসে মুখে গডফ্রে বলল, 'হায় ঈশ্বর! একী সর্বনাশ ঘটতে চলেছে! এত কষ্ট করে বেঁচে থাকার মতো ফিকির করে নিলাম আর শেষপর্যন্ত কি তবে অসভ্য জঙ্গলিদের হাতে জান খোয়াতে হবে! কপালে এ-ও লেখা ছিল!'

গডফ্রে ভাবল, দ্বীপে মানুষ এসে ঘাঁটি গেড়েছে জানতে পেরে জঙ্গলিরা হামলা হুজ্জতি করার জন্য হাজির হয়েছে। আর যদি দেখে, কোটরে জীবনযাত্রার এত সুন্দর ব্যবস্থাদি করে রাখা হয়েছে তবে জঙ্গলিদের হাতে জান খোয়াতে হবেই। দুটো প্রাণীকে খুন করে গাছের কোটর ও অন্য সবকিছু দখল করতে কতক্ষণ।

সময় নষ্ট না করে গডফ্রে নাচের মাস্টারকে নিয়ে ঝটপট শুকনো লতাপাতা এনে গাছের কোটর ও অন্যান্য সবকিছু ঢেকে দিল। ব্যস, এবার গাছের কোটরের ওপরের অংশে উঠে গেল।

www.pathagar.com

গডফ্রে সেখানে বসে নাচের মাস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করল। জঙ্গলিরা যদি ভবিষ্যতে আর কোনোদিন তাদের পিছু নেয় তবে গাছের কোটর থেকে গুলি চালিয়ে তাদের খতম করে ছাড়বে।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে গডফ্রে আর তার নাচের মাস্টার রাত্রি কাটাল। বার বারই তাদের মনে হয়েছে কে বা কারা যেন গাছটার চারপাশে চক্কর মারছে।

সকাল হলে কোটরের ছিদ্রটা দিয়ে গডফ্রে উঁকি দিয়ে দেখল, জঙ্গলিরা পালিয়েছে। সমুদ্রের ধারে তাদের নৌকোটাও নেই। অতএব এখনকার মতো তারা নিরাপদ। তবে দ্বীপে মনুষ্য বসতির কথা তারা টের পেয়ে গেছে। চোখে দূরবীণ লাগিয়ে লাল কাপড়টার খোঁজ করল। দেখতে পেল না। তারা নিঃসন্দেহ হল, জঙ্গলিরা যাবার সময় সেটা নিয়ে গেছে। এখন তারা কাপড়টার মালিকের খোঁজে মাতবে। এবার সংঘাত অনিবার্য। গডফ্রে আর তার নাচের মাস্টার খুঁজবে জঙ্গলিদের আর জঙ্গলিরা খুঁজবে তাদের। ব্যস, তার পরই শুরু হবে গুলি আর তীর বৃষ্টি। দুটো বন্দুক আর পিস্তলের সঙ্গে সামান্য তীর-ধনুক পারবে কেন?

সমস্যা তো মাস্টারকে নিয়ে। সে নাচতে পারে বটে। কিন্তু বন্দুক-পিস্তলের কাছে কাবু। গডফ্রে এবার কোমরে-পিস্তল আর কাঁধে বন্দুক নিয়ে জঙ্গলিদের খোঁজে বেরোলো। সঙ্গে রইল নাচের মাস্টার। তারা ব্যস্ত-পায়ে দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দিনভর খুঁজে বেড়াল। না কোথাও তাদের দেখা পেল না। হতচ্ছাড়ারা হয়তো বা একরাত্রি হামলা চালিয়েই হতাশ হয়ে চম্পট দিয়েছে।

ধোঁয়া। আবার ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা দিল। ব্যাপার কি? দু-দুবার রহস্যজনক ধোঁয়া দেখা দিয়েছে। কিন্তু যে বা যারা আগুন জ্বেলেছে তারা গোপন অন্তরালেই রয়ে যাচ্ছে। গডফ্রে কিন্তু এত সহজে রণে ভঙ্গ দিল না। উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করতে করতে এক সময়ে খুঁজে পেল আগুন আর ধোঁয়ার উৎসটাকে। একটা পাথরের গর্তে ধিক্ ধিক্ করে আগুন জ্বলছে আর কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। ঘাড় ঘুরাতেই গডফ্রে যেন আচমকা এক হোঁচট খেল। দেখল, কয়েকজন ভয়াল দর্শন জঙ্গলি অদূরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের নীরব চাহনির অর্থ কিছুই বুঝতে পারল না। গডফ্রে দেখল, একজন জঙ্গলিকে সরু একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। গডফ্রের লাল কাপড়ের টুকরোটা সর্দারের কাঁধে ঝুলছে। আর নৌকোটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে গাছের ডালের সঙ্গে।

গডফ্রে নিজেকে 'রবিনসন ক্রুসোর' সঙ্গে তুলনা করতে লাগল। সে কাহিনীতে ফ্রাইডে নামক এক জঙ্গলিকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু পরাক্রমশালী ক্রুসো তাকে রক্ষা করে। পরবর্তীকালে জঙ্গলিটা তার পরম অনুগত ভক্তে পরিণত হয়ে যায়।

গডফ্রে মনে মনে স্থির করে ফেলল, এ মুহূর্তে তার করণীয় কি? অদৃষ্ট বিড়ম্বিত জঙ্গলিটাকে রক্ষা করাই তার একমাত্র কর্তব্য।

জঙ্গলি-সর্দারের হুকুমে হতভাগা জঙ্গলিটাকে বাঁধন খুরে টেনে হিঁচড়ে আগুনের কাছে নিয়ে আসা হল। সে মরিয়া হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। কিন্তু হাত-পা বাঁধা। তা ছাড়া এতগুলো নরখাদকের সঙ্গে সে পেরে উঠবে কেন?

গডফ্রে পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দিল। জঙ্গলি-সর্দার তাকে দেখল বটে। কিন্তু গ্রাহ্যই করল না।

www.pathagar.com

একী আশ্চর্য ব্যাপার! সে চেয়েছিল তার মতো এক জন অপরিচিত, সভ্য সমাজের মানুষকে দেখে জঙ্গলি-সর্দার বা তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা মারমুখী হয়ে তেড়ে আসুক। সে সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক আর পিস্তলের কেরামতি শুরু করে দেবে।

জঙ্গলি-সর্দারের দিক থেকে হম্বিতম্বির কোনো লক্ষণ না দেখে গডফ্রেই এক তরফা লড়াই শুরু করে দিল। রাইফেল থেকে ঝট করে একটা গুলি ছুঁড়ে দিল সর্দারকে লক্ষ্য করে। ব্যস, চোখের পলকে গাট্টাগোট্টা জঙ্গলি সর্দার আচমকা একটা বিকট আর্তনাদ করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল। ওষুধে কাজ হয়েছে। সর্দারের মর্মান্তিক অবস্থা দেখামাত্র অন্যান্য জঙ্গলিরা পড়ি কি মরি করে যে, যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল। নৌকায় চেপে চটপট দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে গেল।

পর মুহূর্তেই রবিনসন ক্রুসোর অন্য আর একটা দৃশ্য ঘটে গেল। যে-জঙ্গলিটাকে আগুনে পুরিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল সে ছুটে এসে গডফ্রের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এ যেন বইয়ের কাহিনীটা গডফ্রে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মধ্যে দেখা নয়, না স্বপ্নে নয়, যেন বাস্তবে দেখছে।

গডফ্রে আর নাচের মাস্টার জঙ্গলিটাকে নিয়ে তাদের গহ্বরে ফিরে এল। তারা সহজেই তাকে পোষ মানিয়ে ফেলল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাকে অনেক কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে নিল। তবে কি ইংরেজিতে দরকারী কথাবার্তা চালানোর মতো বিদ্যা রপ্ত করাতে গিয়ে গডফ্রের কালঘাম ছুটে গেল। শেষপর্যন্ত হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। একদিন শিকারে বেরিয়ে জঙ্গলিটা আচমকা ইয়া পেল্লাই একটা কচ্ছপকে উল্টে দিয়ে দ্বীপবাসীদের তাকে লাগিয়ে দিল। সেটার মাংস অসময়ের, শীতের দিনের জন্য নুন মাখিয়ে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হল।

জঙ্গলিটাকে নিয়ে আর একদিন তারা শিকারে বেরিয়ে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি হল। হরিণের পিছু নিলে জঙ্গলিটা দেখল, দশাসই একটা ভাল্লুক গডফ্রের ঘাড়ে লাফাবার জন্য ওৎ-পেতে বসে। জঙ্গলিটা, দৌড়ে গিয়ে গডফ্রেকে জাপ্টে ধরে না ফেললে জানোয়ারটা নখের আঘাতে তার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিত।

গডফ্রে বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ল। তার হাতের নিশানা ভুল হবার নয়। গুলিটা ভাল্লুকটার গায়ে নির্ঘাৎ লেগেছে। কিন্তু তার শেষ পরিণতি দেখা তাদের সম্ভব হল না। দৌড়ে পালিয়ে গেল। একটু বাদে তারা ফিরে এসে একবারে তাজ্জব বনে গেল। সে জায়গাটায় এক ফোটা রক্ত দেখতে পেল না। একটা জখমি জানোয়ার মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাৎরিয়েছে, অথচ গাছপালা ডাঙা বা মাটিতে কোনোরকমের আঁচড়টাচড় পাওয়া গেল না। ব্যাপারটা বাস্তবিকই রহস্যজনক। গডফ্রের্ পক্ষে রহস্যটার কিনারা করা সম্ভব হল না। ভাল্লুকের দেহটা হাফিস হয়ে যাওয়ায় রহস্যটা আরও গভীরতর হয়ে উঠল।

দ্বীপবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হল। তারা গাছের গহ্বরের দরজার পাল্লাকে আরও মজবুত করে নিল।

নভেম্বর মাস এল। দ্বীপে বর্ষা নামল। বর্ষার সমস্যার কথা গডফ্রে আগেই ভেবে রেখেছিল। তাই মুষলধারে বৃষ্টি নামলেও দ্বীপবাসীদের তেমন সমস্যায় পড়তে হল না। বিপদ এবার নতুনতর রূপ নিয়ে দেখা দিল। ভাল্লুকের পর বনে বাঘের হামলা শুরু হল। গডফ্রে গুলিবিদ্ধ করল বিশালাকায় বাঘটাকে। বিকট আওয়াজ করে হিংস্র জানোয়ারটা মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে বুকফাঁটা আর্তনাদ জুড়ে দিল। জঙ্গলিটা ছুটে গিয়ে জখমি বাঘটার বুকে হাতের ছুরিটাকে আমূলে গেঁথে দিল। কাৎরাতে কাৎরাতে আহত বাঘটা

www.pathagar.com

সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ল। ব্যস, জোয়ারের টানে মুহূর্তের মধ্যেই সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

একী রহস্যরে বাবা! যে-দ্বীপে ইতিপূর্বে বাঘ-ভাল্লুক তো দূরের ব্যাপার একটা শেয়ালও দেখা যায় নি সেখানে বাঘ-ভাল্লুকের উৎপাত শুরু হলে তো পিতৃদত্ত জীবনটাকে টিকিয়ে রাখাই সমস্যা।

বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক বা যে কোনো হিংস্রপ্রাণী হোক না কেন গডফ্রে এখন আর আতঙ্কে কুঁকড়ে যায় না মোটেই। তার স্নায়ু এখন ঢের, ঢের সবল হয়ে গেছে।

গডফ্রে একদিন গহ্বরের ধারে, মাটিতে একটা বেড়া দিচ্ছিল। ঠিক তখন অদূরবর্তী জঙ্গল থেকে জঙ্গলিটা তীব্রস্বরে হাঁকডাক জুড়ে দেয়। গডফ্রে দূরবীণটা হাতে নিয়ে তরতর করে পাশের একটা গাছের মগডালে উঠে পড়ল। দূরবীণটা চোখে লাগিয়েই সে চমকে উঠল। ধোঁয়া, দেখল গাছের মাথা ছাড়িয়ে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

ব্যস্ততার সঙ্গে গাছ থেকে নেমে সে জঙ্গলিটাকে খুঁজে বের করল। তাকে নিয়ে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলল। আরও দু-দুবার ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল। তবে আজকের ধোঁয়ার পরিমাণ বেশি এবং অধিকতর ওপরে উঠে যাচ্ছে।

একী ভূতুড়ে ব্যাপার রে বাবা। ধোঁয়াটা হঠাৎ কর্পূরের মতো উবে গেল যে। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? যে জায়গাটা থেকে ধোঁয়া উঠেছিল ছুটতে ছুটতে তারা সেখানে পৌঁছে দেখে পোড়া কাঠ, অঙ্গার পড়ে রয়েছে। কিন্তু যে বা যারা আগুন জ্বেলেছিল সে বা তারা মুহূর্তের মধ্যে কোথায় বে-পাত্তা হয়ে গেল?

গডফ্রে হতাশ হয়ে গহ্বরের আশ্রয়ে ফিরছে। এমন সময় জাঙ্গলিটা পিছন থেকে তাকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা মারল। সে কোনো রকমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ঘাড় ঘুরাতেই চমকে উঠল। দেখল, প্রচণ্ড একটা বিষধর সাপ গাছের ফাঁক দিয়ে প্রকাণ্ড গ্রিবা বিস্তার করে রয়েছে আর নূপুর বাজানোর শব্দ ভেসে আসছে। র‍্যাটল সাপ। এদের লেজের দিককার হাড়গুলো আলগা। লেজ দোলাবার সময় হাড়ে হাড়ে ঠোক্কর লাগায় চমৎকার নূপুরধ্বনি উত্থিত হয়। তবে জঙ্গলিটার উপস্থিত বুদ্ধি আর সতর্কতার জন্য এ যাত্রায়ও গডফ্রের প্রাণ রক্ষা পেল। পর মুহূর্তে আরও একটা সাপ ঝোপের ফাঁক দিয়ে কিলবিলিয়ে উঠল। জঙ্গলিটা কুড় লের এক কোপে তাকে খতম করে দিল।

গডফ্রে যারপরনাই অবাক হল যে-দ্বীপে একটা কেঁচো পর্যন্ত দেখা যায় নি সেখানে এত সাপ আমদানি হল কোত্থেকে, কীভাবে? প্রথমে ভাল্লুকের আবির্ভাব। তারপর নরখাদক বাঘের উৎপাত। সবশেষে বিষধর সাপের ফোঁসফোঁসানি। একী অবাক কাণ্ডরে বাবা।

গডফ্রে জঙ্গলিটাকে নিয়ে গহ্বরটার কাছাকাছি আসতেই নাচের মাস্টারের আর্ত চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল। ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখে, বিশাল দেহী নাচের মাস্টার অনবরত ছুটছে আর বিকট স্বরে চেঁচাচ্ছে। সে ছুটতে ছুটতে আঙুলি-নির্দেশ করে কী যেন দেখাতে চাচ্ছে। গডফ্রে তার অঙ্গুলি-নির্দেশিত পথে তাকিয়েই আৎকে উঠল। দেখল, প্রায় ঢেঁকীর মতো লম্বা একটা কুমির নাচের মাস্টারকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ভয়ে সিঁটকে লেগে থাকার সময় এটা নয়। আগে হতচ্ছাড়া কুমিরটাকে পরপারে পাঠানো দরকার। সেটাকে ঘায়েল করতে গডফ্রেকে তিন-তিনটে বন্দুকের গুলি খরচ করতে হল।

www.pathagar.com

গডফ্রের মধ্যে নতুনতর উপদ্রবটা ভাবনার সঞ্চার করল।

বর্ষা বিদায় নিল। দ্বীপটায় শুরু হল শীতের প্রকোপ। কিছুদিনের মধ্যে তুষারবৃষ্টিও শুরু হয়ে গেল। সিন্দুকটার ভেতর থেকে যে সব শীতবস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল তা দিয়ে দ্বীপবাসীরা অনায়াসেই শীতের মোকাবেলা করতে পারল। এখন আর শুকনো ডালপালার অভাব রইল না। আগুনটাকে জিইয়ে রাখাও কিছুমাত্র সমস্যা হল না।

গডফ্রের মাথায় চমৎকার একটা মতলব খেলল। একটা মই তৈরি করে নেওয়া দরকার। ঝটপট গহ্বরটার ওপরের দিকে উঠে যাওয়ার জন্য একটা মই দরকার। জঙ্গলিটার সাহায্যে সে মজবুক একটা মই তৈরি করে ফেলল।

তিন দ্বীপবাসী এক রাতে গহ্বরটার ভেতরে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। এমন সময় গডফ্রে অদূরবর্তী ঝোপঝাঁড়ের আড়াল থেকে একদল জন্তু-জানোয়ারের ক্রুদ্ধগর্জন শুনতে পেল। গডফ্রে নাচের মাস্টার জঙ্গলিটাকে ডাকাডাকি করে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। ক্রোধমত্ত জন্তু-জানোয়ারদের বুক-কাঁপানো হাঁকাহাঁকি যেন ক্রমে বেড়েই চলল। আর তাদের সংখ্যাও যেন বেড়েই চলেছে। ব্যাপার দেখে নাচের মাস্টারের তো আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যাবার জোগাড় হল।

বরাত ভাল যে তারা দ্বীপবাসীদের কোটরটার হদিস পায় নি।

হঠাৎ কোটর থেকে পিস্তল গর্জে উঠল। তবু ভাল যে, গুলিটা দরজা ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে গেছে। নাচের মাস্টার বিছানায় শুয়েই কাঁপতে কাঁপতে পিস্তলের ঘোড়াটা টিপে দিয়েছে। আর একটু হলেই কেলেঙ্কারী ঘটে যেত।

পিস্তলের আওয়াজ হতেই গাছের কোটরে কারো না কারো উপস্থিতি সম্বন্ধে জানোয়ারগুলো নিঃসন্দেহ হল। তারা সদলবলে কোটরের দরজাটার ওপর হামলা শুরু করে দিল। পায়ের নখ আর দাঁত দিয়ে দরজার গায়ে অনবরত আঁচড় কাটতে লাগল। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে গডফ্রে নাচের মাস্টার আর জঙ্গলিটাকে নিয়ে মই বেয়ে কোটরটার ওপরের দিকে উঠে গেল।

কোটরের ফাটলটা দিয়ে গডফ্রে আর জঙ্গলিটা এবার বন্দুক আর পিস্তল একের পর এক গুলি ছুঁড়তে লাগল। জঙ্গলিটার কাণ্ড দেখে গডফ্রের তো চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবার জোগাড় হল। যার চৌদ্দপুরুষে কেউ বন্দুক দেখে নি সে কিনা বেমালুম গুলি করে চলেছে। তাও একটা গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি।

গুলির আঘাতে পর পর কয়েকটা জানোয়ার ধরাশায়ী হয়ে পড়েছে দেখে বাকিরা লেজ তুলে পালাতে লাগল।

ইতিমধ্যে কয়েকটা জানোয়ার কোটরের পাল্লার ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। ভাঙা-পাল্লাটা পড়ল আগুনের ওপর। মুড়ির মতো শুকনো কাঠে সহজেই আগুন লেগে গেল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

আচমকা ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে বিস্ফোরণ ঘটল। গোলাবারুদে আগুন ধরে গেছে। এতে একটাই লাভ হল। জানোয়ারদের কয়েকটা মারা পড়ল আর বাকিরা প্রাণের মায়ায় চোঁ-চাঁ দৌড় দিল। দ্বীপবাসীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এদিকে বারুদের স্তূপে আগুন লাগায় চোখের পলকে সম্পূর্ণ গাছটাই জ্বলতে শুরু করল।

বেচারা দ্বীপবাসীরা প্রমাদ গুনল। কোটরের ওপরের অংশ থেকে নেমে আসার কোনো ফিকিরই করতে পারল না। ফলে আগুনে জ্বলতে জ্বলতে সেটা এক সময় হুড়মুড় করে কাৎ হয়ে পড়ল।

www.pathagar.com

একের পর এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ায় গডফ্রে রীতিমতো মুষড়ে পড়ল। বরাতে যে আরও কত কী লেখা রয়েছে, কে বলতে পারে? এভাবেই হয়তো এক দিন তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে।

ঠিক তখনই পরিষ্কার ইংরেজিতে কে যেন অন্ধকার বনভূমি থেকে চিল্লিয়ে বলতে লাগল—'মি. মরগ্যান, ভোরেই আপনার মামা মি. কোল্ডরূপের এ-দ্বীপে আসার কথা। তিনি যদি না আসেন তবে কারোরই বাঁচার আশা নেই।'

গডফ্রে মরগ্যান কোনোরকমে গলা বাড়িয়ে দেখল, তাদের সঙ্গীটা পরিষ্কার ইংরেজিতে কথাটা বলেছে। যাকে এতদিন ধরে চেষ্টা করেও ইংরেজি ভাষাটা রপ্ত করাতে পারে নি তার মুখে এমন শুদ্ধ ইংরেজি ও পরিষ্কার উচ্চারণ শুনে গডফ্রে মূর্চ্ছা যাবার জোগাড় হল।

একটু বাদেই ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ হতে লাগল। সে সঙ্গে একদল খালাসির হৈ হট্টগোল দ্বীপবাসীদের কানে এল। খালাসিদের পিছন থেকে কে যেন তারস্বরে চিৎকার করে বলছেন, 'গডফ্রে, গডফ্রে, আমি এসে গেছি।'

কণ্ঠস্বরটা গডফ্রের খুবই পরিচিত। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কণ্ঠস্বরটার মালিক কাছে এগিয়ে এসে মুচকি হেসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, এই সে রবিনসন ক্রুসো, কেমন আছিস বল?'

গডফ্রে চমকে উঠে বলে উঠল, 'আরে মামা! তুমি,এখানে এলে কি করে মামা?'

'আরে এতে এমন অবাক হবার কি আছে? দ্বীপটার মালিক তো আমিই। আমার দ্বীপে আমি আসব এতে তো অবাক হবার কিছু নেই।'

'এটা তো ফেনা দ্বীপ। এটা তোমার দ্বীপ?'

'ফেনা দ্বীপ! সে কী রে, এটা তো স্পেনসার দ্বীপ। ছ-মাস আগে নিলাম ডেকে আমি এর মালিকানা কিনে নিয়েছি। এটা আবার ফেনা দ্বীপ কি করে হল মাথায় আসছে না তো!'

পিছন থেকে মিষ্টি-মধুর স্বর ভেসে এল। 'বাবা, গডফ্রে আমার নামানুসারে দ্বীপটার নামকরণ করেছে। এর নাম দিয়েছে ফেনা দ্বীপ।'

'কি রে গডফ্রে, অভিযানের সাধ মিটেছে কি? নাকি দ্বীপটায় আরও কয়েক মাস থাকার ইচ্ছা রয়েছে?'

'না মামা, অভিযানের সাধ আমার চিরদিনের মতো মিটে গেছে। কিন্তু মামা, তোমার জাহাজটা ডুবে যাওয়ায় অনেকগুলো ডলার ক্ষতি হয়ে গেছে।'

'ধ্যুৎ! জাহাজটা মোটেই ডোবে নি। তোকে ঘাবড়ে দেয়ার জন্যই ক্যাপ্টেন জাহাজ ডোবানোর অভিনয় করে। তুই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেই পাম্প করে জল বের করে ফেলে। তারপরই সেটাকে নিয়ে তিনদিনের পথ পাড়ি দিয়ে জাহাজটা নিয়ে সানফ্রান্সিসকোতে হাজির হয়। জাহাজের কেউই প্রাণে মারা যায় নি। তবে হ্যাঁ, সেই সে চিনেম্যানটা কেবল তার পাত্তা পাওয়া যায় নি।'

'কিন্তু মামা নৌকো বোঝাই জঙ্গলিদের ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না তো।'

'দূর পাগলা কোথাকার। ওরা জঙ্গলি হতে যাবে কেন? তারা তো আমার ভাড়া করা অভিনেতারে। তবে বরাত ভাল যে, তোদের বন্দুক-পিস্তলের গুলিতে কারো প্রাণ যায় নি। আর তোর সঙ্গী জঙ্গলিটা? ওতো আমার নিগ্রো অনুগামী রে!'

'বাঘ-ভাল্লুক যেভাবে রাত্রের অন্ধকারে আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল?'

www.pathagar.com

'আরে ও দুটো তো খড়ের বাঘ-ভাল্লুক রে। রাত্রির অন্ধকার বলেই আসল-নকলের পার্থক্যটা বুঝতে পারিস নি। তোর নিগ্রো সঙ্গীটাই তাদের সাজিয়ে-গুছিয়ে পথের ধারে রেখে দিয়ে তোর মধ্যে ভীতির সঞ্চার ঘটাত রে।'

'কিন্তু কুমির আর সাপের ব্যাপারটা? তাদেরও কি—'। কুমির আর সাপের কথা শুনে মিস্টার কোল্ডরূপ আঁৎকে উঠলেন। চোখ দুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'কুমির আর সাপ? কই না তো, কুমির আর সাপ তো আমি পাঠাই নি। আরে স্পেনসর দ্বীপে কোনো হিংস্র জন্তু-জানোয়ার নেই, দলিলেও লেখা রয়েছে। দলিলের বক্তব্যের ওপর ভরসা করেই তো তোকে এখানে পাঠিয়েছিলাম গডফ্রে।'

ক্যাপ্টেন এবার খালাসিদের দিয়ে গাছের মগডাল থেকে পৌনেমরা নাচের মাস্টারকে নামিয়ে আনলেন।

'মামা, আমাকে উচিত শিক্ষাই যখন দিতে চেয়েছিলে তখন আর শুধু শুধু সিন্দুক ভর্তি এতসব জিনিসপত্র না পাঠালেই তো পারতে?'

'সিন্দুক? জিনিসপত্র কই সিন্দুক তো আমি পাঠাই নি!' কথা বলতে বলতে তিনি জিজ্ঞাসুদৃষ্টি মেলে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালেন।

বেচারা ক্যাপ্টেন থতমত খেয়ে বললেন, 'স্যার, আমার কোনো দোষ নেই। সবই ফেনার কারসাজি। সে আমাকে এমন পীড়াপীড়ি শুরু করল যেন না বলার উপায় ছিল না।'

রুডলাফ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মুচকি হাসলেন। মুখের হাসিটুকু অব্যাহত রেখেই বললেন, 'শোন গডফ্রে, এ দ্বীপটা আমি তোকেই দান করেছি। বিয়ে থা করে তুই আর ফেনা এখানেই থেকে যা।'

ফেনা আর গডফ্রের বিয়ে হয়ে গেল। গডফ্রে যে কুমিরটাকে গুলিবিদ্ধ করে নাচের মাস্টারের জীবনরক্ষা করেছিল সেটার গায়ে একটা লেবেল সাঁটা দেখা গেল। কোনো চিড়িয়াখানা থেকে সেটা কেনা হয়েছে তার লেবেল। মি. টাসকিনার সেটা খরিদ করে গোপনে দ্বীপে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বীপটাকে নিলামে কিনতে না পেরে রাগের বশে শত্রুতা করেছেন। শুধুমাত্র কুমিরই নয় প্রচুর ডলারের বিনিময়ে হিংস্র জন্তু জানোয়ারগুলোকে চুপিচুপি ছেড়ে দিয়ে গেছেন।

গডফ্রে এবার বলল, 'মামা, সবইতো বুঝলাম। কিন্তু একটা রহস্য এখনো চাপা পড়েই রইল। ধোঁয়ার ব্যাপারটা কী?'

'ধোঁয়ার রহস্যটাও উদ্‌ঘাটন করা গেছে। জাহাজের খোলের মধ্যে সে চিনাম্যানটা আশ্রয় নিয়েছিল এটা তারই কাজ। জাহাজডুবির অভিনয়ের সময় সেও এ-দ্বীপেই আশ্রয় নিয়েছিল। সেই মাঝে মধ্যে আগুন জ্বালত। ছয় মাস সে এখানে একা কাটিয়েছে। জানিসই তো চিনারা একা থাকতে ভালোবাসে, কষ্টও করতে পারে। তাই সে তোদের সংস্রব এতদিন এড়িয়ে চলছে।

চিনাম্যানটাই ধোঁয়ার মাধ্যমে গডফ্রের পিলে চমকে দিয়েছিল।

ফেনা আর গডফ্রে সুখে বিবাহিত জীবন যাপন করতে লাগল। কিন্তু হিংস্র জন্তু-জানোয়ারগুলো একে অন্যকে খেয়ে সাবাড় না করা পর্যন্ত তারা কেউ-ই 'ফেনা দ্বীপে' থাকতে রাজি নয়।

----

www.pathagar.com

ইন টু দ্য নাইজার বেন্ড

দেশের সব কয়টা খবরের কাগজের পাতায় 'সেন্ট্রাল ব্যাংকের অদ্ভুত কারবার' নামক শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাবার মতো খবরটা ছাপা হয়েছিল। খবরটা প্রথম পাতাতেই স্থান পেয়েছিল। এ শতকের গোড়ার দিকে ঘটনাটা ঘটেছিল। এমনতর রহস্যজনক ঘটনা এর আগে আর কোনদিন ঘটে নি। আজও কিন্তু সে কাহিনী শোনার জন্য মনের দিক থেকে খুবই উৎসাহ পাওয়া যায়, কৌতূহল জাগে।

তখন সেন্ট্রাল ব্যাংকের ডিকে শাখার ম্যানেজার ছিলেন লর্ড ব্রেজেনের ছেলে রবার্ট লুই ব্রেজেন। এ শাখাতেই ডাকাতি হয়েছিল।

সুবিশাল ঘরের এক ধারে, পিছনের দিকে ম্যানেজারের ঘর। বড় হলঘর থেকে বেরিয়ে প্রেডনিডপ পথে ওঠা যায়। মোটাসোটা লোহার গারদে গিয়ে রাখা হয়েছে স্ট্রংরুমটাকে। সেটা রয়েছে, কাচের দরজা ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকলেই বাঁ দিকে।

পাঁচটা কুড়ি। ব্যাংকের পাঁচজন কর্মচারীর মধ্যে দুজন মাথা নিচু করে লেখালেখিতে ব্যস্ত। আর বাকি তিনজন মক্কেলদের সঙ্গে কথাবার্তায় মেতে রয়েছে। ক্যাশিয়ার আপনমনে নোট গোনার কাজে ডুবে রয়েছেন। মোট বাহাত্তর হাজার উনআশি পাউন্ড দু-শিলিং চার পেন্স ব্যাংক জমা পড়েছে।

আর মাত্র মিনিট কুড়ি পরেই ব্যাংকের সদর-দরজায় তালা পড়বে।

হঠাৎ দরজায় একটা পুরুষমূর্তি দেখা গেল। অকস্মাৎ ডান-হাতে তিনটে আঙ্গুল উঁচিয়ে সঙ্কেত করল—'তিন'। বুঝাতে চাইছে, কাউন্টারে মোট তিনজন কেরানি রয়েছে, তার আঙুলের ইঙ্গিত কেউ দেখতে পেল না।

দরজাটা সাধ্যমত কম আওয়াজ করে বন্ধ করার পর রহস্যজনক আগন্তুক ধীর পায়ে মক্কেলদের পিছনে এসে দাঁড়াল। এমন একটা ভাব চোখে-মুখে ফুটিয়ে তুলল যেন অন্য সবের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হলে সে কিছু কথা বলতে আগ্রহী। সে দীর্ঘদেহী যুবক। পেশীবহুল চেহারা। চোখ-মুখে কর্তব্য সিদ্ধির দৃঢ়তা। ইয়া লম্বা ডাস্টকোটে গলা পর্যন্ত ঢেকে নিয়েছে। মক্কেলদের একজন প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে এক এক করে বেরিয়ে যেতেই আর একজন বেটেখাটো গাট্টাগোট্টা যুবক কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল। তার মুখের অর্ধেকটা ইয়া লম্বা দাড়ি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। এর গায়েও সিল্কের লম্বা ডাস্ট কোট। সে এক মক্কেলের পিছনে এসে দাঁড়াল আর সামনের মক্কেল কাজ সেরে বিদায় নিতেই দ্বিতীয় আগন্তুক এগিয়ে গিয়ে কাউন্টারের কেরানিটাকে একথা সেকথার মাধ্যমে ব্যস্ত রাখল। পাশের কাউন্টারের একজন মক্কেল কাউন্টার থেকে সরে আসতেই আর একজন বেঁটেখাটো পেশীবহুল চেহারাধারী যুবক, মুখে লম্বা কালো দাড়ি, এসে সে কাউন্টারটার কেরানি বাবুর সঙ্গে কাথাবার্তা জুড়ে দিল।

দু-চারটে কথা সেরে তৃতীয় মক্কেল বেরিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই অন্য দু-যুবক সদর-দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে এল। উভয়ের গায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে পড়া ছাই রঙের অলস্টার। এ সময়ে কেউ ইয়া লম্বা অলস্টার পরতে পারে ভাবাই যায় না। উভয়ের মুখেই মুখের অনেকাংশই ঝাঁকড়া দাড়িতে ভর্তি।

www.pathagar.com

কয়েক পা এগিয়ে ঝট করে খাড়া হয়ে পড়ল। গায়ের কোটটা খোলার ভঙ্গিমার মাধ্যমে যে করণীয় সম্পন্ন করে নিল। ব্যাস দরজার পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে কারোর আর ঢোকার উপায় রইল না। কর্মরত কেরানি-বাবুরা এসবের কিছু অনুমানও করতে পারল না।

দু-মিনিট যেতে না যেতেই লম্বা আগন্তুক দরজা দিয়ে ক্যাশিয়ারের সামনে এল। বলল, 'স্যার ম্যানেজারবাবু আপনাকে ডাকছেন।'

ক্যাশিয়ার ব্যস্ত-হাতে একটা অ্যাটাচি আর লেবেল সাঁটা তিনটে মোড়কে সারাদিনের জমাপড়া অর্থ স্ট্রং রুমে ঢুকিয়ে রেলিং ঘেরা খোপ ছেড়ে বাইরে এলেন।

ক্যাশিয়ার ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে থমকে গেল। চেয়ার ফাঁকা, ম্যানেজার নেই। ব্যাপারটা নিয়ে ভাববার সুযোগ না দিয়েই পিছন থেকে দুটো হাত যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে এসে তার গলার দু-পাশ আঁকড়ে ধরল। তিনি টু শব্দটিও করতে পারলেন না। সংজ্ঞা লোপ পেল। চোখের পলকে তাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলা হল। যন্ত্রচালিতের মতো চারজন আগন্তুক চারজন কর্মরত কেরানির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে চারজনই সংজ্ঞা হারিয়ে যে, যার চেয়ারে লুটিয়ে পড়ল। তার ওপর ইস্পাতের তার দিয়ে চারজনকেই চেয়ারের সঙ্গে আচ্ছা করে বেঁধে ফেলা হল।

প্রথম পর্বের কাজ মিটিয়ে আগন্তুকরা পরস্পরের চোখে চোখ রেখে ইশারায় কাজ সেরে নিল। ইতিমধ্যে ম্যানেজারের ঘর থেকে লম্বা লোকটা ফিরে এসে চাপা স্বরে বলে উঠল, 'সাটার নামিয়ে দাও।'

ঠিক সে মুহূর্তেই ক্রিং-ক্রিং শব্দে টেলিফোনের ঘন্টা বেজে উঠল। টেলিফোনের ঘন্টা বেজে উঠতেই শাটারটাকে মাঝ-পথে থামিয়ে দেওয়া হল। আগন্তুকদের একজন ফোন ধরল। মি. লিওনার্ড নামক একজন বাইরে থেকে ফোন করেছে। সে জিজ্ঞেস করল ভ্যান পৌঁছে গেছে কিনা। এদিক থেকে জবাব গেল, ভ্যান এখনও আসে নি। বাইরে থেকে নির্দেশ এল ভ্যান আসামাত্র যেন 'এস' শাখায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এদিক থেকে আদেশ পালনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। এবার জানতে চাওয়া হল সারাদিনে কত পাউন্ড জমা পড়েছে? জবাব গেল, বিশ হাজার পাউন্ড। আগন্তুকদের একজন ব্রেজন নামধারী ক্যাশিয়ারের হয়ে আগন্তুকদের সর্দার ফোন ধরে ক্যাশিয়ারের হয়ে জবাবগুলো দিল। তবে তাকে একটু-আধটু গলার কায়দা কসরৎ করতেই হল।

রিসিভারটা সশব্দে ক্রোডেলের ওপর নামিয়ে রেখে দলের পাণ্ডা সহকর্মীদের সাহায্যে সংজ্ঞাহীন ক্যাশিয়ারের গা থেকে পোশাক খুলে নিজেদের গায়ে চাপিয়ে নিল। কোটের পকেট থেকে চাবি বের করে ঝটপট ক্যাশিয়ারের রেলিং-ঘেরা দরজাটা খুলে ফেলল। এবার তেমনি ব্যস্ততা সহকারে স্ট্রংরুম খুলে ফেলল। অ্যাটাচিটা, মোড়ক তিনটে আর একটা হুন্ডির বান্ডিল তার ভেতর থেকে বের করল।

ঠিক তখনই বাইরে, সদর-দরজার মুখে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করানোর শব্দ শোনা গেল। ব্যাংকের ডেলিভারি ভ্যান। সর্দারের নির্দেশে সবাই গা থেকে ওভার কোট খুলে আলমারির তলায় চালান দিয়ে দিল।

সর্দার ফিসফিসিয়ে নির্দেশ দিল-দরজার আড়ালে গিয়ে তৈরি হয়ে থাক। কেউ ভেতরে ঢোকামাত্র ধরাশায়ী করে ছাড়বে।

www.pathagar.com

এবার হাত চালিয়ে সংজ্ঞাহীন ক্যাশিয়ার ও অন্য তিনজন কেরানিকে টেনে হিঁচড়ে কাউন্টারের তলায় চালান দিয়ে দেওয়া হল। কাজ সেরে সবাই এবার চরম পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য তৈরি হয়ে দরজায় আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল।

লম্বা চেহারাধারী সর্দার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গাড়ির কাছে গেল। গাড়ি চালক সচকিত হয়ে বলে উঠল, 'আপনি? স্টোর কোথায়?'

'তিনি ছুটি নিয়েছেন'। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাশিয়ারকে লক্ষ্য করে এবার বলল, 'ডলারের থলেটা নিয়ে আসবেন কি?'

'তা কী করে সম্ভব? গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ নেই।'

'কতক্ষনের আর ব্যাপার। আমি বরং আপনার হয়ে গাড়ি চালাচ্ছি। আপনি গিয়ে টপ করে ডলারের থলেটা নিয়ে আসুন।'

'সময় নষ্ট না করে ক্যাশিয়ার ভদ্রলোক লম্বা লম্বা পায়ে ব্যাংকের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ক্যাশিয়ার বিদায় নিতেই লম্বা লোকটা ডেলিভারি ভ্যানের চালককে দরজা খুলতে বলল। ভ্যানের দরজা পিছনে বা পাশে নয়। চালকের সিটের তলায়। কয়েকটা মোড়ক আর একটামাত্র অ্যাটাচির জন্য এত হাঙ্গামা হুজ্জুতি করে ভ্যানের দরজা না খুলে চালক সামান্য ঝুঁকে ধাতব ডালাটাকে পাশে সরিয়ে দিয়ে অ্যাটাচিটা হাতে নিল। তার কোমরের নিচের অংশ কেবলমাত্র বাইরে রইল। আর কোমর পর্যন্ত অংশ গাড়ির ভেতর চালান করে অ্যাটাচিটা রাখার জন্য কায়দা কসরৎ শুরু করে দিল।

লম্বা পুরুষটা উঠে চালকের গায়ের কাছে চলে গেল। ভাবটা এমন করল যেন সে ভ্যানের ভেতরের অংশের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করছে।

ব্যস, মুহূর্তের মধ্যেই লম্বা পুরুষটার হাত দুটো ভেতরের দিকে সিঁধিয়ে গেল। চোখের পলকে চালকের সংজ্ঞাহীন দেহটা সিটের নিচে চালান হয়ে গেল। পথচারীরা ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। আসলে আসল ব্যাপারটা কারোরই বোধগম্য হল না। লম্বা লোকটা ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে নিল। গলগলিয়ে রক্ত ঝরছে। গাড়ির ফাঁক ফোকর দিয়ে রক্ত পড়তে পারে আশঙ্কায় সে গাড়ির ভেতরে ঢুকে গিয়ে চালকের কোট খুলে ক্ষতস্থানটায় ঠেসে ধরল।

ব্যস, কাজ হাসিল। হাত আর ছোরাটা মুছে ঝটপট বাইরে বেরিয়ে এল। এক লাফে ব্যাংকের দরজায় গিয়ে ডাকাত-সর্দার দরজার গায়ে টোকা মারল। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা ফাঁক হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে ব্যাংকের ভেতরে যে সব ডাকাত ছিল তারা ক্যাশিয়ার ও স্টোরকে পিঠমোড়া করে বেঁধে ব্যাংকের সংজ্ঞাহীন কর্মীদের পাশে ফেলে রেখেছে। সর্দার হাত চালিয়ে স্টোরের গা থেকে তার কোটটা খুলে ফেলল। তার পোশাক নিজের গায়ে চাপিয়ে নিল। দুজন ডাকাতকে ব্যাংকের ভেতরে থাকার নির্দেশ দিয়ে অন্য দুজনকে নিয়ে গাড়িতে ফিরে এল। সঙ্গীদের বাইরে রেখে সর্দার গাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। ভেতরে যেসব মোড়ক ছিল সব বাইরে বের করে আনল। পথচারীরা দেখল গাড়ির জিনিসপত্র ব্যাংকের ভেতরে যাচ্ছে। অতএব কেউ-ই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার মনে করল না। ডলার, দলিলপত্র, সোনা, রূপো, আর হুন্ডির গোছা ব্যাংকের ভেতরে নিয়ে এক জায়গায় স্তূপাকার করা হল। এবার সবকিছু সমান পাঁচটা ভাগ করে সবাই নিজের পেটের সঙ্গে বেঁধে কোটচাপা দিয়ে দিল। কেবলমাত্র দলিলপত্র পড়ে রইল।

www.pathagar.com

এবার ডাকাত-সর্দারের নির্দেশে তার সাগরেদরা ডলার-ও সোনা-রূপা প্রভৃতি ভ্যানের ভেতরে রেখে আবার ব্যাংকে ফিরে গেল। সব ক'টা জানালা বন্ধ করল। সদর-দরজায় দুটো তালা ঝুলিয়ে চাবিগুলো নর্দমায় ফেলে দিল। কাচের দরজার একটা পাল্লায় ব্যাংকের সব ক'টা শাখার ঠিকানা লেখা ছিল। সেগুলো থেকে সর্দার 'এস' শাখার ঠিকানাটা মুখস্থ করে নিল। অলস্টারগুলোকে এমন জায়গায় ফেলা হল যাতে সেগুলো সহজেই সবার নজরে পড়ে। এবার সবাই পিছনের বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে এল।

এবার ছদ্মবেশী চালক লাগাম ধরে গাড়ি নিয়ে ব্যাংকের 'এস' শাখার দরজার হাজির হল।

সর্দার গটমট করে যেখানে নোট গোনা হচ্ছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। তাকে দেখেই প্রবীণ ক্যাশিয়ার থতমত খেয়ে বলে উঠল, 'আপনি কে? বড্রুক কোথায়? ওপর-ওয়ালারা কী যে সব খেয়াল খুশি কাজ করে মাথায় ঢোকে না! যাকে চিনি না, কোনদিন দেখিও নি এমন সব লোকদের পাঠিয়ে দেন!'

'শুনুন, 'বি' শাখা থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছে। এখানে প্রচুর ডলার জমা পড়েছে, সেন্ট্রাল অফিস থেকে টেলিফোনে খবর পেলাম।'

'সবই বুঝলাম সাহেব। কিন্তু যাকে চিনি না, কোনদিন চোখেও দেখি নি—পরিচয়পত্র সঙ্গে আছে?'

ডাকাত-সর্দার সামান্যমাত্র বিচলিত না হয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দিল—'অবশ্যই আছে।'এবার ভাবতে লাগল পরিচয়পত্র যে কেমন তাও জানে না। দেখার তো প্রশ্নই ওঠে না। কিভাবে সে পরিস্থিতিটা সামাল দেবে ভাবতে লাগল। পকেট হাতিয়ে এক গাদা কাগজ বের করে আনল। তার মধ্যে একটা পরিচয়পত্র পেয়ে গেল। চিফ ক্যাশিয়ার বড্রুক নামক এক ক্যাশিয়ারকে টাকা আনা-নেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে পরিচয়পত্র দিয়েছেন। তার মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি খেলে গেল। এটাকে ক্যাশিয়ার ভদ্রলোকের হাতে দিলে সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে। সে ঝট করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল, ক্যাশিয়ার আপনমনে নোট গুণে চলেছেন। মুহূর্তের মধ্যে সে পরিচয়পত্রটাকে দু-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। যে অংশে বড্রুক-এর নাম লেখা রয়েছে সেটাকে কোটের পকেটে চালান করে দিল। বাকি অংশটা ক্যাশিয়ারের দিকে বাড়িয়ে দিল।

পরিচয়পত্রের টুকরোটার দিকে চোখ মেলে তাকিয়েই ক্যাশিয়ার ভদ্রলোক চশমার ফাঁক দিয়ে বিরক্তি ভরে তাকিয়ে বলে উঠল, 'একী সাহেব! অর্ধেকটা পরিচয়পত্র।'

'আর বলবেন না, সর্বদা পকেটে পকেটে নিয়ে ঘুরতে হয়। সামান্য একটা কাগজ কতদিন আর আস্তো থাকে বলুন? বাক্সে কাগজপত্রের সঙ্গে কখন যে ফেলে দিয়েছি খেয়ালই নেই। যাক গে, এত ঝকমারিতে যাওয়ার আমার দরকার কি। আমি চললাম। আপনি সদর দপ্তরের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেবেন সাহেব।'

ক্যাশিয়ার পরিচয়পত্রটা আবার নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে চিফ ক্যাশিয়ারের স্বাক্ষরটা তার নজরে পড়ল। আশ্বস্ত হলেন। ডাকাত-সর্দারের হাতে নোটের মোড়কটা তুলে দিয়ে তাকে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিলেন। একটা ডাকাত-সর্দার কিছুমাত্র না ঘাবড়িয়ে হিজিবিজি স্বাক্ষর করে দিল। এবার মোড়কটা নিয়ে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এল। ব্যস, চোখের পলকে গাড়ি হাঁকিয়ে মুহূর্তের মধ্যে হাফিস হয়ে গেল। পরের দিন সকাল হতে না হতেই ইংল্যান্ড জুড়ে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল।

www.pathagar.com

ডাকাতদের ধারণা ছিল সকালে ঝাড় দার ব্যাংক ঝাড় দিতে এসে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলে রাখা ব্যাংকের কর্মীদের দেখতে পাবে। তারপরই চারদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে যাবে।

কিন্তু ডাকাতদের কাজে সামান্য ফাঁক রয়ে গিয়েছিল। সে রাত্রেই শহরের হাইড পার্কের অদূরবর্তী ছোট্ট অন্ধকার গলিতে ব্যাংকের গাড়িটাকে দেখতে পেয়ে ব্যাংকেরই কর্মীর মনে সন্দেহ জাগে। এগিয়ে গিয়ে গাড়ির ভেতরের দিকে উঁকি দিতেই তিনি চমকে ওঠেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে এল। ব্যাংকের ডিকে শাখার সদর-দরজার তালা ভাঙা হল। পীঠমোড়া করে বেঁধে ফেলে রাখা ব্যাংক কর্মীদের মুখে শুনলেন, ডাস্টকোট আর অলস্টার গায়ে, দাড়িওয়ালা পাঁচজন ডাকাত ব্যাংকে হানা দিয়েছিল। তারা বেলা পাঁচটার কাছাকাছি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। লম্বা চেহারাধারী একজন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ভাওতা দিয়ে ক্যাশিয়ারকে ম্যানেজারের ঘরে পাঠায়। কিন্তু তিনি ছুটে গিয়ে ম্যানেজারের চেম্বার ফাঁকা দেখতে পান।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ম্যানেজার কোথায় উধাও হলেন? তিনি কি তবে ডাকাতদের সঙ্গেই সরে পড়েছেন?

প্রহরীকে জেরা করে কোনোসদুত্তর পাওয়া গেল না। সারাদিন ব্যাংকে তো কত লোকই আনাগোনা করে। সবার মুখ চিনে রাখা কি সম্ভব? পাঁচটার পরে চারজন বেরিয়ে যায়। তার ধারণা ছিল তারা ব্যাংকেরই কর্মী।

পুলিশ ছুটে আসার একটু আগেই, রাত্রি সাড়ে সাতটার কাছাকাছি একজন এক বস্তা কয়লা নিয়ে ওপর তলায় চলে যায়। একটু বাদেই নেমে আসে। বলল, 'ভুল ঠিকানায় চলে আসে। কয়লার বস্তাটা মাথায় নিয়েই চলে যায়। তবে সিঁড়ির গায়ে কয়লার চাঙড় পড়েছিল। পরে পাঁচ তলায় একজনের কাছে শোনে কয়লার বস্তা নিচে রেখে লোকটা ভুল একটা নাম নিয়ে উপরে উঠে আসে সে নামে কাউকে না পেয়ে আবার নিচে নেমে আসে। উদ্দেশ্য ঠিকানাটা যাচাই করে নেওয়া।

জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ নিঃসন্দেহ হল ঘটনাটার সঙ্গে ম্যানেজারের নির্ঘাৎ যোগসাজস রয়েছে। নইলে ক্যাশিয়ার গিয়ে তাঁকে কেবিনে পেলেন না কেন? ডাকাত পাঁচজন কাজ সেরে সরে পড়ার পর ম্যানেজারও চম্পট দিয়েছেন।

ব্যস, আর দেরি নয়। ম্যানেজারের নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়ে গেল। ইংল্যান্ডের ব্রেজন অবশ্যই এটুকু সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ড থেকে কেটে পড়তে পারেন নি। অতএব ধরা না পড়ে তার পার পাওয়ার জো নেই। কর্তব্য পালন করে পুলিশ নিশ্চিন্ত হয়ে বিদায় নিল।

এদিকে সে রাত্রেই লন্ডন শহর থেকে পাঁচজন পুরুষ সাদামটন স্টেশনে নামল। কারো ইয়া মোটা গোঁফ আর কারো বা দাড়ি কামানো পরিষ্কার মুখ। গার্ডের ঘর থেকে একটা ভারি বাক্স আর কতকগুলো ছোট-বড় মোড়ক নামিয়ে স্টিমারে নিয়ে তোলা হল। তাদের গন্তব্যস্থল দাহামের অন্তর্গত কোটানৌ। অতএব ব্যাপারটা নিয়ে কারোর মনে খটকা লাগার কথা নয়। জোয়ার আসার সঙ্গে স্টিমারটা হেলেদুলে গভীর সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল। পুলিশ পরের দিন ভোরে যখন ডাকাতদের ধরার জন্য লন্ডন শহর তোলপাড় করতে লাগল তখন স্টিমারটা ইংল্যান্ড থেকে বহুদূরে, সমুদ্রের বুকে আলোড়ন সৃষ্টি করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে।

www.pathagar.com

পুলিশের ছুটোছুটিই সার হল। ফলাফল শূন্য। ম্যানেজার ব্রেজনের টিকির নাগালও পেল না। ডাকাতরা হাফিস হয়ে গেছে। কয়লাবাহী লোকটার ব্যাপারটাও কুয়াশাচ্ছন্নই রয়ে গেল। এমন বহু রহস্য থাকে যাদের হিল্লা করা সম্ভব হয় না। এ ঘটনাটাকেও লন্ডন পুলিশ ধামাচাপা দিয়ে রাখল।

* * *

অখ্যাত অবজ্ঞাত এক গ্রাম, কোনাবিস। তবে এটা ফরাসি গিনির রাজধানী এবং গভর্নর জেনারেলের আবাসস্থল।

সেদিনটা ছিল সাতাশে নভেম্বর। গ্রামের সর্বত্র উৎসবের জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। গ্রামের সবাই গভর্নর জেনারেলের হুকুম অগ্রাহ্য করতে না পেরে বন্দরে বন্দরে হাজির হল। ব্যাপারটা হল কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভ্রমণার্থী নাকি স্টিমার থেকে নামবেন, সাতজন ফরাসি সুদানের অন্তর্গত নাইজারবেন্ড নামে একটা গ্রামে তদন্তের কাজে যাবেন। ফরাসির প্রধান কার্যালয় নাকি তাদের ওপর তদন্তের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। তারা পার্লামেন্টারি কমিশনের উচ্চপদস্থকর্মী। মাস কয়েক আগেই আফ্রিকার বিশেষ-এ অঞ্চলে অভিযাত্রীদের পাঠানোর ব্যাপারে বিবাদ নিষ্পত্তি সংস্থা পরিষ্কার বুঝে নিয়েছেন, দুই দলের বিবাদ মিটিয়ে শান্তি পুনঃস্থাপন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তারা কোনদিন বিবাদ বিসম্বাদ ভুলে হাত মেলাতে, হৃদ্যতার সম্পর্ক ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে না। দুই দলের দুজন দেশ বরেণ্য ব্যক্তির মধ্যে সদ্ভাব ফিরিয়ে আনা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাঁদের একজনের নাম বদ্রিয়ার্স অন্যজনের নাম বারজাক। বদ্রিয়ার্স ধিড়িঙ্গি লম্বা। রোগা পটকা চেহারা। মুখ পরিষ্কার—দাড়ি কামানো। নাকের তলায় চওড়া গোঁফ। মুখ আর গায়ের জোর দুই সমান। সর্বদা হাতাশা-জ্বরে ভোগেন। নিজেকে সবার অলক্ষ্যে রাখাতেই আগ্রহী। আর বারজাক? তিনি নাদুসনুদুস চেহারাধারী। মুখভর্তি দাড়ি। সদাহাস্যময়। কথাবার্তায়ও খুবই পটু আর উদার প্রকৃতির। উপনিবেশের ব্যাপার স্যাপার সম্বন্ধে তাঁরা দীর্ঘকাল পরস্পরের বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। কোনোব্যাপারে বিবাদ বিসম্বাদ দেখা দিলে ভোটাভুটির মাধ্যমে ফয়সালা করতে হয়েছে।

বর্তমানে উভয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, ফরাসি সুদানের অংশে বিশেষে ভোট ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দান করার প্রস্তাব রাখলেন বারজাক। বদ্রিয়ার্স তীব্র প্রতিবাদ করলেন।

বারজাকের মতে নিগ্রোরা এখন খুবই সভ্য হয়েছে। এখন আর তাদের ক্রীতদাস করে রাখা সঙ্গত নয়। সরকারের উচিত তাদের শাসকের সমানাধিকার দান করা।

এতে বদ্রিয়ার্সের তীব্র আপত্তি। তাঁর মতে নিগ্রোরা আজও হিংস্র প্রকৃতির, অসভ্য। অতএব এরকম মানুষদের ভোটাধিকার দেওয়া নিছকই বদ খেয়াল। এরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গেলে সরকারের বিপদে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্টই। ফরাসিদের অধিকৃত অঞ্চল চিরকালই ফরাসিদেরই দখলে থাকবে।

শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল মন্ত্রী সাহেব একটা কমিটি গঠন করে দেবেন যারা নাইজার বেন্ডে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি সরজমিনে তদন্ত করে আসবে। কমিটির নেতা কাকে করা হবে এ নিয়ে নতুন করে বিবাদের সূত্রপাত হল। স্বাভাবিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব না হওয়ায় ভোটের পথ নেওয়া হল। এবার পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠল। বদ্রিয়ার্স এবং বারজাক সমান সমান ভোট পেলেন।

www.pathagar.com

শেষপর্যন্ত তাঁদের দুজনকেই নেতা করে দিয়ে আফ্রিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। এতে অন্যান্যারা অন্তত ঝগড়া চেঁচামেচি শোনার হাত থেকে অব্যাহতি পাবে। আর এও ঠিক করা হল, বারজাক হিসাব মাফিক বদ্রিয়ার্সের চেয়ে তিনদিনের বড়। অতএব তাঁকেই তদন্ত কমিটির নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হল। তাঁদের সঙ্গে আরও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হল। তাদের সঙ্গে একজন পঞ্চান্ন বছরেরও কম বয়স্ক ড. চাতোন্নে। চোখ-মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। সদা হাস্যময়। চেহারার বিশেষত্ব হচ্ছে ইয়া লম্বা, মাথাভর্তি টাক।

আর একজন সুদেহী মঁসিয়ে ইসিদোর তামিস। আর অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন—মঁসিয়ে কইর, মঁসিয়ে হেইর আর মঁসিয়ে পঁসি। সাতজন অফিসার। অষ্টম ব্যক্তিদৈনিক সংবাদপত্রের সাংবাদিক। তাঁর নাম ন্যস তামিদি ফ্লোরেন্স। লা এক্সপ্যানসন ফাঁসেকে নিয়মিত সংবাদ দিয়ে পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত করা।

তদন্ত কমিটির আটজন সদস্য জাহাজ থেকে নামার পর চিফ সেক্রেটারিকে নিয়ে গভর্নর স্বয়ং জাহাজঘাটে উপস্থিত থেকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। গভর্নর হাউসে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হল। এখানে তাঁরা তিনদিন থাকবেন। তদন্তের পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ করা হবে।

আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হল, কমিটির সদস্যরা দুদলে ভাগ হয়ে যাবেন। ফরাসির তিনলক্ষ বর্গমাইল এলাকা ঘুরে ঘুরে তদন্ত করতে হবে। দুটো দল না হলে এমন একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন করাই যে সম্ভব নয়। আর এও ঠিক হল, বারজাকের নেতৃত্বে একটা দল পূর্বাঞ্চলে যাবে তদন্ত করার জন্য আর একটা দল বদ্রিয়ার্সের নেতৃত্বে পশ্চিমাঞ্চলে যাবে। অক্টোবর নগাদ বারজাক কৌটোনৌ হাজির হবেন। আর অন্য দল নিয়ে বদ্রিয়ার্স আগস্ট মাসে গ্রান্ড-বাসায় পৌঁছেবেন।

মঁসিয়ে ইসিদোর তামিসের মনে অফুরন্ত আনন্দ আর উৎসাহ-উদ্দীপনা। পহাড়া-পর্বত, নদী-নালা আর জঙ্গলে শুরে ঘুরে বহু নতুন তথ্য সংগ্রহে মওকা পাওয়ার জন্যই তাঁর এমন উল্লাস।

রহস্যময় নাইজারবেন্ডে কতই না রহস্য ছড়িয়ে রয়েছে। তবে সম্প্রতি সেখানে সিপাহী প্রহরায় নিযুক্ত। পথের বিপদ বা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার তেমন সম্ভাবনা নেই।

ডিসেম্বরের প্রথম দিনে দুইদলের দুইদিকে তদন্তের কাজে পা-বাড়াবার কথা। যাত্রার আগের রাত্রি প্রহরী এসে জানাল, বিচিত্র দর্শন দুইজন' লোক বারজাকের সঙ্গে দেখা করতে চায়। কলোনির লোক বলে মনে হয়। একজন প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্ক পুরুষ আর দ্বিতীয় জন মহিলা। তার বয়স কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে।

প্রহরীর সঙ্গে ঘরে ঢুকেই আগন্তুক ভদ্রলোক বারজাককে যথোচিত সম্ভাষণ সেরে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, 'আমার নামটা অতি বদখটে। সবাই এর জন্য দ্য সেন্ট-বেরেন বলে সম্বোধন করে। অবিবাহিত। রেনেজ শহরে জমি জায়গা রয়েছে। এবার পাশের মহিলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, ইনি মিস জেন মোরনাস। সম্পর্কে আমার মাসি। আমরা উভয়েই অভিযাত্রী। নতুন নতুন আবিষ্কারের আশা বুকে নিয়ে ঘর ছেড়ে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা কেউ-ই কোনাক্রিতে থাকতে চাইছি না। আরও ভেতরে যাওয়ার পরিকল্পনা যখন করছি ঠিক তখনই শুনতে পেলাম, একটা তদন্ত কমিশন দল অগ্রসর হওয়ার জন্য তৈরি। আপনি কমিটির নেতা। দেশটা ভালো সত্য। তাই আমরা ঠিক করেছি আপনাদের দলের সঙ্গে অগ্রসর হ'ব।

www.pathagar.com

'আপনাদের উদ্দেশ্য তো শুনলাম। কিন্তু আমার সহযোগীর সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। সবচেয়ে বড় কথা, কোনো মহিলা সঙ্গে থাকলে পথে হাজার ঝক্কি-ঝামেলা দেখা দিতে পারে, স্বীকার করছেন তো? আমাদের পরিকল্পনাকে শীঘ্র বাস্তবায়িত করার পথে প্রতিবন্ধকতা আসা কিছুমাত্রও অসম্ভব নয়।

'আপনার বক্তব্য খুবই যুক্তিপূর্ণ, সন্দেহ নয়। তা সত্ত্বেও আপনাকে বলে রাখছি, আমার মাসি মিস মোরনাস মহিলা হলেও পুরুষ মানুষের চেয়ে চটপটে। মহিলা হিসাবে তাকে বিচার না করলেই সমস্যা অনেকাংশে লাঘব হয়ে যাবে। আর আমাদের সঙ্গে তেজি ঘোড়া রয়েছে। তাছাড়া দুজন পথপ্রদর্শক আর কুলিও সঙ্গেই রয়েছে। তারা দোভাষীর কাজ চালিয়ে উপকার করবে।

বারজাক তাঁর সহযোগীর সঙ্গে পরামর্শ করে মতামত জানিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতিতে তাদের বিদায় করলেন। আর এও বললেন, আগামীকাল তাঁরা যাত্রা করবেন।

বারজাক মিস মোরনাসের চোখ ধাঁধানো রূপে মুগ্ধ। তার ওপর বয়স কম। এরকম এক রূপসী যুবতী সঙ্গে থাকলে পথের ধকল অবশ্যই পীড়াদায়ক হবার কথা নয়। বদ্রিয়ার্স কিন্তু ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক ভাবতে উৎসাহ পেলেন না। তাদের মনে কোনো দুরভিসন্ধি তো থাকতে পারে। লোকমুখে মিনিস্ট্রি অব চেম্বার সম্বন্ধে বহু লোমহর্ষক কাহিনী তিনি ইতিপূর্বে শুনেছেন। তাদের সঙ্গে আগন্তুকদের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা তাই বা কে জানে।'

তাঁরা এ-ব্যাপারে গভর্নরের সঙ্গে কথা বললেন। সেনেগান থেকে তারা স্টিমারে এখানে এসেছে এবং দিন পনের এখানে অবস্থান করছে'—গভর্নর জানালেন। তিনি শেষপর্যন্ত এও বললেন, 'তবে নিছক দেশভ্রমণে বেরিয়েছে এবং সঙ্গে যেতে চাইছে বলেই আমার বিশ্বাস। তাদের মনে কোনো কুমতলব আছে বলে তো আমার অন্তত মনে হচ্ছে না।'

গভর্নরের বক্তব্য বারজাকের মধ্যে মহিলাটির ব্যাপারে উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দিল বদ্রিয়ার্স ও আর অমত করতে পারলেন না। তবে খুব উল্লসিতও হতে পারলেন না।

* * *

এদিকে গ্লেনর দুর্গের লর্ড ব্লেজন বিষণ্ন মনে নিজের ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিন কাটাচ্ছেন। তার সুনাম, খ্যাতি আর জীবন সবই আজ নষ্ট। তিনিই ষাট বছর আগে পূর্বপুরুষদের খ্যাতি ও বীরত্বের মর্যাদা রক্ষা করে নৌবাহিনীর উচ্চপদে বহাল হয়েছিলেন। দেশের স্বার্থে যাঁরা অকাতরে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করেছিলেন তাদের বংশমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। ইংল্যান্ডের ইতিহাসের পাতায় ব্লেজন পরিবারের অবদানের কথা স্থান পাওয়ার মতো কাজ করতে পেরে তিনি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেছিলেন।

বাইশ বছর বয়সে বিয়ে করেন। এক বছর পরে একটা মেয়ে জন্ম লাভ করে। তার কুড়ি বছর পরে তাঁর একটা ছেলে জন্মায়। দ্বিতীয় ছেলে জন্মায় এর পাঁচ বছর পরে। এ ছেলেটাকে প্রসব করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী ইহলোক ছেড়ে যায়।

স্ত্রীর মৃত্যুতে ব্লেজন মনমরা হয়ে পড়লেন। কিছুদিন পর তার শোক থিতিয়ে পড়ল। এক সহকর্মীর বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করে নতুন করে ঘর বাঁধলেন। স্ত্রীর সঙ্গে এল তার ষোল বছরের ছেলে উইলিয়াম। কয়েক বছর পর ব্লেজনের একটা মেয়ে জন্মাল। নাম

www.pathagar.com

নাম রাখলেন জেন। ব্রেজনের দ্বিতীয় স্ত্রীও মারা গেল। তখন তাঁর বয়স ষাট বছর চলছে। এ বয়সে নতুন করে বিয়ের আসরে যাওয়া, নতুন জীবনের পথে পা-বাড়ানো সম্ভব নয়। আগেই এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল।

এদিকে সৎ ছেলে উইলিয়াম কিছুতেই ব্রেজন ও তাঁর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারল না। সে মদ আর জুয়ায় মাতলো। তার জুয়ার টাকা কোত্থেকে আসছে এটা ব্রেজনের মনে রহস্যেরসঞ্চার করল। ব্যাপারটা খোলসা হয়ে গেল যখন ব্রেজনেরই সই করা একটা মোটা ডলারের ড্রাফট ব্রেজনের হাতে এল। সইটা খুবই সতর্কতার সঙ্গে নিখুঁত করে তোলা হয়েছে। কোনোরকমে হৈ-হট্টগোল না করে ব্রেজন ড্রাফটে উল্লিখিত অর্থ মিটিয়ে দিলেন। তারপর উইলিয়ামকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। ব্রেজন পরিবারের ওপর তার আক্রোশের প্রধান কারণ, পরিবারের সম্পত্তি থেকে তার বঞ্চিত হওয়া। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার সময় অবশ্য ব্রেজন তাকে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলেন। সে সেটা প্রত্যাখ্যান করে রাগে গস্ গস্ করতে করতে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। বিধির বিধান খণ্ডন করা মানুষের সাধ্যাতীত।

ব্রেজনের বড় ছেলে জর্জ সেনাবাহিনীতে যোগ দিল। কিছুদিনের মধ্যেই উচ্চপদে বহাল হয়ে সে বাপের না রাখল। ঠিক তখনই খবর পাওয়া গেল জর্জ বিদ্রোহী হয়েছে। ডাকাতি করে চারদিকে ত্রাসের সঞ্চার করছে। তাকে দমন করার জন্য যে অফিসার পাঠনো হল, তারই গুলির আঘাতে জর্জ-এর মৃত্যু ও অফিসারটিও সেদিনই মারা গেল।

খবরটা ইংল্যান্ডে এলে চারদিকে নানারকম সমালোচনা হতে লাগল যা লর্ড ব্রেজনের কাছে মৃত্যুর সামিল বলে মনে হল। খবরের কাগজগুলো আরও বাজার গরম করল। লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে ব্রেজন ঘরের কোণে মুখ লুকালেন। ব্যস, সেই থেকে তিনি ঘরে স্বেচ্ছাবন্দি হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

দুর্ভাগ্য কিন্তু ব্রেজনের পিছন ছাড়ল না। বাড়ির চাকর এসে একদিন খবর দিল তাঁর দ্বিতীয় ছেলে সেন্ট্রাল ব্যাংকে ডাকাতি করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ব্রেজন তাঁর এ-ছেলেটা সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করতেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ চিন্তা ভাবনাও করেছিলেন ব্রেজনের দ্বিতীয় ছেলেকে উচ্চপদে বহাল করে ব্যাংকের কর্তৃত্ব তার হাতে তুলে দেবেন। খবরটা শোনা মাত্র ব্রেজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। নড়াচড়া, এমন কি কথা বলার শক্তিও তিনি হারিয়ে ফেলেন। এরই ক'দিন বাদে তাঁর ছোট মেয়ে আফ্রিকায় পাড়ি জমিয়েছে। কোথায় যাচ্ছে জানতে পারলে ব্রেজন অবশ্যই আঁৎকে উঠতেন। তার গতিবিধি জানে একমাত্র ব্রেজনের বড় মেয়ের ছেলে এজনর দ্য সেন্ট বেরেন। সে বয়সে মাসি জেনের চেয়ে পনের বছরের বড়। বিয়ে করে ঘর সংসার পাতে নি। মেয়েদের সম্বন্ধে তার বরাবরই অবিশ্বাস। সে মাসি জেনকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে।

একদিন এজনর আর তার মাসি জেন জর্জ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলছিল। এজনর জর্জ-এর অপকীর্তির কথা খোলসা করে জেন-এর কাছে বলল।

জেন প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলল, 'সব তো সত্য নাও হতে পারে। প্রমাণ কি?'

এজনর বলল, 'প্রমাণ পাওয়ার আর অসুবিধে কিই বা থাকতে পারে? আফ্রিকায়, যেখানে জর্জকে সমাধিস্থ করা হয়েছে সেখানে গেলে অবশ্যই প্রমাণ পাওয়া যাবে।'

ব্যস, এজনর আর জেন আফ্রিকা অভিযানে বেরিয়ে পড়ল।

www.pathagar.com

জেন আফ্রিকার ভৌগোলিক বিবরণ সম্বন্ধে বিস্তর বই ঘাঁটাঘাঁটি করে জ্ঞান লাভ করেছে। অতএব সে জায়গাটা সম্বন্ধে পুঁথিগত বিদ্যা সে যথেষ্টই রপ্ত করেছে। আফ্রিকার জঙ্গলিদের সম্বন্ধেও অনেক কিছুই পড়াশোনার মাধ্যমে জানতে পেরেছে। অস্ত্র দিয়ে তাদের দমন করা সম্ভব নয়। মনভোলানো কিছু খেলনা সঙ্গে নিয়েছে যা দিয়ে তাদের বশ করা যাবে।

সব বন্দোবস্ত পাকা করে জেন বিদায় নেবার জন্য বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, আফ্রিকায় যাওয়ার অনুমতি আদায় করতে। জেন ভালোই জানে বাবার সঙ্গে তার এটাই শেষ দেখা। একমাত্র বড় ভাইয়ের বিশ্বাসঘাতক উপাধিটাকে ঘুচাবার জন্যই সে দুর্গম আফ্রিকার জঙ্গলের পথে পা বাড়াচ্ছে। আফ্রিকার কথা শুনে ব্রেজনের মুখের এতটুকুও পরিবর্তন হল না। জেন ভালোই জানে আফ্রিকার থেকে কিছুতেই তার আর ফেরা হবে না। বাবার সঙ্গে আর দেখা হবে না। ফিরলেও সে বাবাকে আর জীবিত দেখতে পাবে না।

এজনর আর জেন ট্রেনে চাপল। তারা জানতেও পারল দ্বিতীয় ছেলের কীর্তি-কলাপের খবর পেয়ে ব্রেজন পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে।

জানুয়ারির এক তারিখে লাঁ এক্সপ্ল্যানসনস পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে মঁসিয়ে আমিদিন লিখলেন।

বিশেষ সংবাদদাতা কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধটার শিরোনাম দেওয়া হয়—'বারজাক কমিশন।'। পয়লা ডিসেম্বর, জঙ্গল থেকে প্রেরিত প্রবন্ধটার বক্তব্য ছিল—আগেই বলা হয়েছিল বারজাক কমিশন আজ সকাল দুটায় অভিযানে বেরোচ্ছে। আটজনের অভিযানে আরও দুজন স্বেচ্ছায় অভিযাত্রী দলে যোগ দিয়েছেন। তাদের একজন ফরাসি তরুণী মিস জেন মোরনাস। আর দ্বিতীয় জন তাঁর মামা (সম্পর্কটা উল্টোপাল্টাই বটে। প্রায়ই গোলমাল হয়ে যায়)। তাঁর নাম এজনর দ্য সেন্ট বেরেন। লোকটার মাথার স্ক্রু একটু ঢিলে।

দুজন নিগ্রো চাকর তাঁদের সঙ্গে রয়েছে। পথ প্রদর্শকের কাজটা করিয়ে নেওয়া যাবে। দোভাষীর কাজটা মামা-ভাগ্নী ভালোই চালিয়ে নিতে পারবেন।

সকাল সাড়ে পাঁচটায় আমরা আস্তানার সামনে মিলিত হলাম। মঁসিয়ে বারজাক, মিস মোরনাস উভয়েই জঙ্গলিদের সৈন্য দেখিয়ে ঘাবড়ে দিতে রাজি নন। উভয়েই ভালোবাসা দিয়ে আপন করে নিতেই আগ্রহী। কিন্তু কমিশনের ডেপুটি চিফ বদ্রিয়ার্সের ইচ্ছা অন্য রকম। গভর্নরও তাঁরই পক্ষে। তাঁদের বক্তব্য সৈন্য সঙ্গে না থাকলে সরকারী অভিযাত্রীদের মানমর্যাদা বজায় থাকে না। এছাড়া বছর দশেক ধরে ক্রমাগত নাইজার অঞ্চল থেকে রহস্যময় অভিযানের খবর আসছে। তাতে একের পর এক গ্রাম ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। দাঙ্গা, লুঠপাট, হত্যাযজ্ঞ চলছে, আগুন দিয়ে বহু গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হচ্ছে। অতএব সৈন্য সঙ্গে যাওয়ার একান্ত দরকার। তাই ক্যাপ্টেন মারসিন দুশো অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকবেন। গভর্নরের এরকম ব্যবস্থায় বদ্রিয়ার্স খুবই প্রীত।

এক সময় সেনাবিভাগে নেটিভ আফিসার ছিল এমন এক নিগ্রো পথপ্রদর্শক আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। মিস মোরনাস পিছনে রয়েছেন। মঁসিয়ে বারজাক আর ক্যাপ্টেন মারসিন উভয়েই তার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত। তা নিয়ে উভয়ের মধ্যে একটু-আধটু রাগারাগিও হয়ে চলেছে। আমাদের যুবক পাঠকপাঠিকাদের যাবতীয় খবরাখবরই সময় মতো জুগিয়ে যাব।

www.pathagar.com

এদিকে মঁসিয়ে বদ্রিয়ার্স কিন্তু রূপসী সহযাত্রিনীকে কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না। গোমড়া মুখে প্রথম দলের প্রথম দিকে থেকে পথ পাড়ি দেবেন। তার ঠিক পিছনে রয়েছে দুজন ভূ-তত্ত্ববিদ আর ড. চাতোন্নে। তাঁরা এথনগ্রাফির বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা নিয়ে এরই মধ্যে গভীর আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন। তাদের পিছনে কনভয়টা থাকছে।

ক্যাপ্টেন মারসিনের সশস্ত্র অশ্বারোহী বাহিনী দু-ধারে অবস্থান করে প্রহরায় নিযুক্ত। আর এ বেচারা এদিক থেকে ওদিক হাঁটাহাঁটি করে বেড়াচ্ছে। টোনগানে ও চৌমিকি নামে মিস মোরনাসের দুই ভৃত্য সবার পিছন পিছন থাকছে।

ঠিক ছ'টায় যাত্রা শুরু করার কথা। প্রস্তুতি পর্ব সেরে এখন শুধুমাত্র ঘোড়ার লাগাম টানার নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে সবাই। ঠিক তখনই বিশ্রী একটা ঘটনা ঘটে গেল। দেখা গেল, সেন্ট বেরেন-এর পাত্তা নেই। সবাই ব্যস্ত তাঁর খোঁজ করতে লাগল। কেবলমাত্র মিস মোরনাসকেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাশূন্য দেখলাম। তিনি রাগে টঙ হয়ে রয়েছেন। আমাকে নিয়ে কোনাক্রি দ্বীপে হাজির হলেন। সমুদ্রের ধারে গিয়ে যা দেখলাম তা ভাবতেও পারিনি। দেখলাম, মঁসিয়ে দ্য সেন্ট বেরেন সমুদ্রের দিকে মুখ করে গম্ভীর হয়ে বসে রয়েছেন। এক নিগ্রো কয়েকটা বঁড়শি তার চোখের সামনে ধরে গুণাগুণ বুঝিয়ে দিচ্ছে। তারপর যন্ত্রচালিতর মতো তড়াক্ করে উঠে নৌকার দিকে হাঁটতে লাগল। আমারা গিয়ে হাজির না হলে নৌকা নিয়ে মাছ ধরতেই চলে যেতেন। ঠিক তখনই মিস মোরনাস গম্ভীর স্বরে হাঁকলেন —'বোনপো! বোনপো!'

এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল, মঁসিয়ে দ্য সেন্ট বেরেন তবে মিস মোরনাসের বোনপো।

নিগ্রোটাকে সামান্য কিছু বকশিস দিয়ে মঁসিয়ে দ্য সেন্ট বেরেন আমাদের কাছে ফিরে এলেন। মাসিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আমাদের সঙ্গে ফিরতে লাগলেন। পথ চলতে চলতে কেবল সঙ্কোচে বললেন, 'ছিঃ! দেরি করে ফেল্লাম তাই না?'

তখন পূর্ব-আকাশে সবে সূর্য উঁকি দিতে শুরু করেছে। প্রায় আড়াইশো মাইল পথ পাড়ি দিতে পারলে টিম্বো পৌঁছানো যাবে।

সকার দশটার কাছাকাছি ছোট্ট একটা নদী পেরিয়ে আমরা আবার এগোতে লাগলাম। আফ্রিকার এদিকটায় জালের মতো ছোট-বড় নদী চড়িয়ে রয়েছে।

দশটার কিছু পরে অস্বাভাবিক গরমের জন্য পথ চলা দায় হয়ে পড়ল। গাছের ছায়ায় বসে আহারাদির ব্যবস্থা চলতে লাগল। ঠিক হল রোদ পড়লে, সূর্যের তেজ কমলে পাঁচটা নাগাদ আবার যাত্রা করা হবে।

মঁসিয়ে পঁসি ঘাসের ওপর বসে সর্বক্ষণ কি যে লিখেই চললেন, মাথায় এল না। দম ফেলবার ফুরসতও যেন তাঁর ছিল না। তাঁর কপালটা এত উঁচু, যার ফলে বুঝলাম লোকটা নির্ঘাৎ ধীশক্তির অধিকারী, নয় তো অসম্ভব মূর্খ—বোকা হাঁদা।

রান্নার ব্যবস্থা জোর কদমে চলেছে। মেরেলিরে আমার দিকে এক টুকরো মাংস এগিয়ে ধরে বলল, 'স্যার, মাংসটা একদম নরম। ঠিক যেন কচি শিশুর মাংস!'

কথাটা শুনেই আমার মধ্যে শিহরণের সঞ্চার ঘটল। ফ্যাকাসে মুখে বললাম—'তুই কি কোনদিন কচি শিশুর মাংস খেয়েছিস?'

www.pathagar.com

মেরেলিরে নির্বিকারভাবে বলল, 'না, আমি কোনদিন খাইনি বটে। তবে আমার বাবা খেয়েছেন।'

খাওয়ার ব্যবস্থাদি ভালোই হয়েছে দেখলাম। বিদেশ-বিভুঁইয়ে, জঙ্গলের ভেতরে এমন উপাদেয় খাদ্যবস্তুর কথা ভাবাই যায় না।

খাওয়ার আসরে সেন্ট বেরেনকে না দেখে সবাই অবাক হলাম। উৎকণ্ঠিতও কম হই নি।

তখন আমাদের খাওয়া প্রায় শেষের দিকে। হঠাৎ অদূরবর্তী স্থান থেকে বিকট আর্তস্বর ভেসে এল। কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে অসুবিধা হল না, বেরেনই আর্তনাদ করছে।

সবাই খাওয়া ফেলে কণ্ঠস্বরটাকে অনুসরণ করে জাগয়া মতো গিয়ে দেখি, বেচারা বেরেন, ডোবায় পড়ে কাৎরাচ্ছে। কাদায় পা আটকে গেছে। বহু চেষ্টা করেও উঠতে পারছেন না। বেচারা মাছ ধরতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন। আমরা টানাটানি করে কোনোরকমে তাকে পাড়ে তুলে আনলাম। শেষপর্যন্ত দেখা গেল, কোটের পকেট থেকে দুটো দাড়ি ব্যাঙ বের করছে। ছিপ নয়, কাদা-জলে হাতিয়ে হাতিয়ে সে ব্যাঙ দুটোক ধরেছে। ব্যাঙের মাংসের লোভ সংবরণ করতে না পেরে তিনি এমন মরণফাঁদে পড়েছিলেন।

পাঁচটার কাছাকাছি আমরা কফি খেয়ে যাত্রার উদ্যোগ নিতে লাগলাম। ঠিক তখনই দেখা দিল নতুনতর এক সমস্যা। নিগ্রোরা কিছুতেই রওনা দিতে রাজি নয়। তাদের বক্তব্য, চাঁদ দেখার আগে রওনা দিলে ভয়ঙ্কর বিপদে পড়তে হবে। উপায়ন্তর না দেখে আমাদের হাত-পা গুটিয়ে ঘন্টা দুই বসে থাকতে হল। এক সময় মেঘের একটা টুকরো সরে গিয়ে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হতেই নিগ্রো কুলিরা ঝটপট মালপত্র মাথায় তুলে নিল। আবার নতুন করে যাত্রা শুরু হল।

রাত্রি ন'টার কাছাকাছি জঙ্গলের সামান্য ভেতরে একটা কুঁড়েঘর দেখে আমরা থেমে গেলাম। কার কুঁড়েঘর, কেনই বা তৈরি করা হয়েছে বুঝে উঠতে পারলাম না। সেটা খালিই পড়ে রয়েছে। মিস মোরনাসকে কুঁড়েঘরটায় থাকতে দিয়ে আমরা বাইরে তাঁবু খাঁটিয়ে রাত্রি কাটাতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই মিস মোরনাসের আর্তস্বর শুনে ছুটে কুঁড়েঘরটার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি একটি নিগ্রো মেয়ে কুঁড়েঘরটার ভেতরে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখেই মিস মোরনাস ভয়ে আর্তনাদ শুরু করে দিয়েছেন। আমাদের সঙ্গের নিগ্রো কুলিরা তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারল নিগ্রো মেয়েটাই কুঁড়েঘরটার মালিক। জঙ্গলে গিয়েছিল শুয়োপোকা ধরতে। চাটনি খাবে। ফিরে এসেছে। তবে সে কিন্তু মিস মোরনাসকে তার কুঁড়েতে রাত্রিবাস করতে দিতে ওজর আপত্তি করছে না। তার কথা বুঝতে না পেরে তিনি আতঙ্কে আর্তনাদ জুড়ে দিয়েছেন। মিস মোরনাসকে নিগ্রো মেয়েটার তত্ত্বাবধানে রেখে আমরা আবার তাঁবুতে ফিরে এলাম।

আধ ঘন্টাও পেরোয় নি। আবার মিস মোরনাসের আর্তনাদ কানে এল—'বাঁচান! বাঁচান! কে, কোথায় আছেন, আসুন! বাঁচান!' আমরা হুড়মুড় করে তাবু থেকে বেরিয়ে আবার কুঁড়েঘরটার সামনে হাজির হলাম। দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখি, নিগ্রো মেয়েটা মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর বিকট স্বরে গোঙাচ্ছে। রক্তাক্ত তার দেহ। চাবুকের দাগ।

www.pathagar.com

মিস মোরনাস কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'এই মাত্র এক নিগ্রো পুরুষ আচমকা কুঁড়েতে ঢুকে নিগ্রো মেয়েটাকে বেধড়ক চাবুক মারতে লাগল। সাদা চামড়ার মানুষকে কুড়েঁতে ঠাই দেওয়ার অজুহাতে সে মেয়েটার ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে পালিয়েছে। শেষপর্যন্ত কুঁড়েঘরের পিছনে তাকে পাওয়া গেল। তার সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে ঠিক হল নিগ্রো পুরুষটা আদ্যিকালের চকমকি বন্দুক একটা, কাপড় এক টুকরো আর বিশ ফ্রাঁ নগদ পেলেই নিগ্রো মেয়ে চির মালিকের স্বত্ব ত্যাগ করতে রাজি। মিস মোরনাস মেয়েটাকে আমাদের দলের সঙ্গে নিয়ে যেতে খুবই উৎসাহী হওয়ার জন্যই আমরা নিগ্রোটার সঙ্গে এধরণের আলোচনা করতে আগ্রহী হলাম। আমাদের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা মোটামুটি এরকম। প্রবন্ধের শেষে 'আমিদি ফ্লোরেন্স' নাম ছাপা হয়েছে।

* * *

আঠারোই জানুয়ারি 'লা এক্সপ্যানসন ফ্রাঁসে' পত্রিকায় আমিদি ফ্লোরেন্স-এর দ্বিতীয় প্রবন্ধটা ছাপা হয়। এবারও প্রবন্ধটায় বারজাক কমিশন নামেই ছাপা হয়। আর বিশেষ প্রতিনিধি কর্তৃক দাউহেরিকো থেকে ষোলোই ডিসেম্বর এটা লিখিত হয়েছে। প্রবন্ধটার প্রথমেই লিখেছেন, আগেকার বিবরণীটা তিনি জঙ্গলে বসে লণ্ঠনের আলোয় লিখেছিলেন। তারপর আর তেমন লক্ষণীয় কোনো ঘটনাই ঘটে নি। দোসরা ডিসেম্বর তাঁবু খুলে তাঁরা আবার নতুন উদ্যমে যাত্রা করলেন। পথ চলতে চলতে স্থানীয় অধিবাসীদের দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশা দেখে অভিযাত্রীরা বড়ই মর্মাহত হতে লাগলেন। পথের একদিকে ঘন জঙ্গল আর একদিকে চাষের জমি। প্রখর রোদের তাপে জঙ্গল চাষের জমি একেবারে ঝলসে গেছে। গ্রামের নামগুলোও অদ্ভুত।

ঘাউলিয়া গ্রামে যখন আমরা পৌছলাম তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে না এলেও প্রকৃতির বুকে তখন আলো-আঁধারীর খেলা চলছে। তাঁরা তাঁবু খাটালেন। রাত্রে শুতে গিয়ে প্রবন্ধকার অবাক হয়ে গেলেন। দেখেন, সেন্ট বেরেন তার ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে কি যেন খুঁজছেন। পাজামা খুঁজছেন। গতরাত্রে চৌমিতে রাত্রি কাটিয়েছেন। সেখানেই ফেলে এসেছেন কিনা তাই বা কে বলতে পারে। আর এদিকে তাঁবু জুড়ে এর-ওর জামা-প্যান্ট ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার করেছেন।

পরের দিন সকালে তাঁবু গুটিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলেন অভিযাত্রীরা। পথচলা শেষ করতে না করতেই প্রবন্ধকার লক্ষ্য করলেন, কয়েকজন ইয়া তাগড়াই নিগ্রো ঝোপের ফাঁক দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছে।

ক্যাপ্টেন মারসেনে দুজন সশস্ত্র সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। বেগতিক দেখে নিগ্রোরা সটকে পড়ল। একটু বাদে অন্য একটা ঝোপের ফাঁক দিয়ে আর একদল নিগ্রোকে দেখা গেল। অভিযাত্রীদের সঙ্গী নিগ্রো মেরিলিয়ে এগিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে জানতে পারল, আগন্তুক নিগ্রো ব্যাপারীরা সওদা বেচতে এসেছে। ড. চেতোন্নের আগ্রহে তাদের ডেকে কিছু কোলা বাদাম কেনা হল। এজন্যই তো তিনি ইউরোপ থেকে গোপনে কিছু নুন ব্যাগের কোণে করে নিয়ে এসেছেন। এখানে নুন জোগাড় করা সম্ভব নয়।

এবার ডাইনি-চিকিৎসকদের ডেকে আনা হল। ঝাড়-ফুক তুকতাকের সঙ্গে নিগ্রো নাচ আর গান চলল দীর্ঘ সময় ধরে। অভিযাত্রীরাও আর নিজেদের সংযত রাখতে

www.pathagar.com

পারলেন না। তাঁরাও বে-সুরো গানের সঙ্গে মহা উল্লাসে ধেই ধেই করে নাচতে লেগে গেল।

মিস মোরনাসের তাঁবুর গায়ে প্রবন্ধকারের তাঁবু পড়ল। একটু রাত্রি বাড়তেই তিনি শুয়ে পড়লেন। সবে দু-চোখে তন্দ্রা ভর করেছে। এমন সময় মিস মোরগানকে টোনগানের সঙ্গে কথা বলতে শুনলেন। তন্দ্রা কেটে গেল। উৎকর্ণ হয়ে তিনি তাঁদের কথোপকথন শুনতে লাগলেন।

কথা প্রসঙ্গে টোনগানকে বলতে শোনা গেল ক্যাপ্টেন ব্রেজনের জন্যই সে কিছুদিন সেনেগানেতে থাকতে চায়। তিনিও তাঁরই বাহিনীতে ছিল। ক্যাপ্টেন ব্রেজন বিদ্রোহ করার জন্যই ইংরেজরা তাঁদের ওপর বেধড়ক গুলি চালিয়েছিল। ক্যাপ্টেন ব্রেজন খুব-জখম, দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর লুঠপাট করে বেড়াতে লাগলেন। তার হুকুমে একের পর এক গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দিতে লাগল। আর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে খুন করে চলল। এমন কি অশতিপর বৃদ্ধ আর শিশুরাও তাঁর পাশবিক আচরণের শিকার হল।

তবে টোনগান নাকি তাকে কোনদিন দেখেও নি। অন্য একজন শাদা চামড়ার মানুষ আসার পর তিনি সেই যে ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছেন তারপর থেকে তাঁকে আর কেউ-ই দেখতে পায় নি। তিনি টোনগানেদের সঙ্গে পাঁচ-ছ' মাস ছিলেন। জঙ্গলেই তাদের প্রথম দেখা হয়েছিল। ক্যাপ্টেন ঘরের কোণে আশ্রয় নেবার আগের দিন পর্যন্ত সে ক্যাপ্টেন ব্রেজনের খুন-জখম আর লুঠপাটের সঙ্গী হয়েছিল।

মিস মোরনাস এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো টোনগানের মুখ থেকে ক্যাপ্টেন ব্রেজনের কীর্তি-কাহিনী শুনছিলেন। অত্যুগ্র-আগ্রহান্বিত হয়ে এবার মুখ খুলল, 'ভালো কথা, শাদা-চামড়ার লোকটার কি নাম, মনে আছে কি?' তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই তাঁবুর বাইরে বিকট এক আওয়াজ হল। শেষ কথাটা আর তাঁর শোনা হল না। তার জন্য অনুশোচনা নেই। অতীতে কাদা ঘেঁটে আমার কি লাভ?

মিস মোরনাস বললেন, 'ইংরেজ তোমাকে আক্রমণ করার পর কি হল বল তো?'

'আগেই তো বলেছি, আমাকে ডাকারে চাকরি দেয়। তারপর কি হল শুনুন —ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জঙ্গলে পালিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকলাম। ফিরে এসে দেখি, লড়াই শেষ। চারদিকে কেবল লাশের ছড়াছড়ি। ক্যাপ্টেন ব্রেজন ও সহকার্মীদের কবর দিলাম। সেখানে কিছুদিন চাকরি করার পর সেনেকালে যাই। সেখানে আপনার সঙ্গে দেখা ও পরিচয় হয়।'

'ক্যাপ্টেন ব্রেজনের কবরটা কোথায় বল তো?'

টোনগানকে বিদায় দিয়ে মিস মোরনাস শুয়ে পড়লেন, শব্দ কানে এল।

বিদ্রোহী ক্যাপ্টেন ব্রেজন! ডাকাত ব্রেজন! খুনী-দাঙ্গাবাজ ব্রেজন! প্রবন্ধকার-সাংবাদিক অবশ্য বহু আগেই তাঁর পত্রিকার সম্পাদককে বলেছিলেন, জঙ্গলে গিয়ে ব্রেজনের খবরটা নিয়ে আসার অনুমতি দেওয়ার জন্য। অর্থ ব্যয়ের কথাটা চিন্তা করে তখন তাঁকে অনুমিত দেওয়া হয় নি। ব্রেজন যখন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন তারপর তাকে সে অনুমতি দেওয়া হল।

মিস মোরনাস, সেই ক্যাপ্টেন ব্রেজের কাহিনী টোনগানের মুখে শুনেছিলেন।

এ আবার কী ভূতুড়ে কাণ্ড রে বাবা!

সকাল হল অভিযাত্রীরা আবার যাত্রা করলেন।

www.pathagar.com

বারোই ডিসেম্বর অভিযাত্রীরা বোরোনিয়া গ্রামে পৌছলেন। এক যুবক গ্রামের মুখিয়া। অভিযাত্রী-অতিথিদের খুব যত্নআত্তি করলেন। সামান্য নুন, কিছু বারুদ আর ঘোড়ার দুটো ক্ষুর পেয়ে সে তো মহাখুশি। লোকজন ডেকে গ্রামের বাইরে দিব্যি বিশাল কুঁড়েঘর তৈরি করে ফেলল অতিথিদের থাকার জন্য।

তেরোই ডিসেম্বর সকালে অভিযাত্রীরা টিম্বো গ্রামে পৌছল। মাটির প্রচীরে ঘেরা তিনটে গ্রাম। প্রতিদিন প্রত্যেক গ্রামে হাট বসে। সপ্তাহে একদিন হাট খুব জমজমাট হয়। গ্রামবাসীরা মেয়ে-পুরুষ সবাই খুবই কুৎসিত। মেয়েদের সাজগোজের বাহার দেখলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। এখানে অভিযাত্রীরা দুদিন থেকে ক্লান্তি অপনোদনের মাধ্যমে চাঙা হয়ে নিলেন।

অভিযাত্রীরা আবার পথে নামলেন। এর পর থেকে পথ খুই বন্ধুর। প্রকৃত অভিযান বলতে যা বুঝায় এবার তা শুরু হল। একটা পাহাড় ডিঙিয়ে তাঁরা ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ দাউহোরকো গ্রামে হাজির হলেন।

গ্রামের মুখিয়ার খাতির যত্নে বারজাক যারপরনাই খুশি হলেন।

গ্রামের সবচেয়ে ভালো কুঁড়েঘরগুলো অভিযাত্রীদের থাকার জন্য ছেড়ে দিল। মুখিয়ার নিজের ডেরায় মিস মোরনাসের থাকার ব্যবস্থা করে দিল।

বাদ সাধল অভিযাত্রীদের সঙ্গী নিগ্রো মেয়ে মালিক। সে বার বার মিস মোরনাসকে বারণ করল মুখিয়ার কুঁড়েতে যেন না যান। প্রবন্ধকার-সাংবাদিক এবং ক্যাপ্টেন তার সাবধানবাণী শুনতে পেয়ে যায়। ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেললেন, গ্রামের কুঁড়েঘরে নয়, গ্রামের বাইরে তাঁবু টাঙিয়ে রাত্রি কাটানো হবে। তাঁর হুকুমে নিগ্রোকুলিরা ঝটপট তাঁবু টাঙিয়ে ফেলল।

নিগ্রোদের চরিত্র সম্বন্ধে ক্যাপ্টেনের ভালো ধারণা আছে বলেই তিনি এ-সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। নিগ্রো মেয়ে মালিক কেন এমন করে সতর্ক করে দিল? বারজাকের চিন্তা ঠিক, নাকি রাত্রিবাসের সিদ্ধান্ত ঠিক নিয়েছেন, ব্যাপারটা প্রবন্ধকারের মনে ধন্ধের সৃষ্টি করল।

* * *

পাঁচই ফেব্রুয়ারি। আমিদি ফ্লোরেন্সের তৃতীয় প্রবন্ধটা লা এক্সপ্যানসন ফ্রাঁসে সংবাদপত্রে ছাপা হল। এবারও প্রবন্ধে শিরোনাম ছাপা হল 'বারজাক কমিশন'। আর প্রবন্ধটা লেখা হয়েছে ক্যানকান থেকে চব্বিশে ডিসেম্বর তারিখে। প্রবন্ধের বক্তব্য মোটামুটি এরকম—গতকাল সাকলে অভিযাত্রীরা এখানে পৌছেছেন। আগামীকাল, বড়দিনের ভোরে ফের যাত্রা করবেন। গত প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল, নিগ্রো মেয়ে মালিক অভিযাত্রীদের কালো মানুষদের গ্রামে রাত্রিবাস না করার জন্য বার বার সতর্ক করে দিয়েছিল। সেখানে আশ্রয় নিলেই নাকি নির্ঘাৎ যমের দুয়ারে হাজির হতে হবে। ক্যাপ্টেন এমনই সাবধান হয়ে যান যে, গ্রামের লোকদের সাবধান করে দেন, তাঁবুর ধারে কাছে পঁচিশ গজের মধ্যে এলে মৃত্যু অনিবার্য। এ ব্যবস্থায় বারজাক রাগে একেবারে কাঁই হয়ে যান। কিন্তু বদ্রিয়ার্স মহাখুশিই হন।

বারজাক রাগে গম্ গম্ করতে করতে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন-

'আপনি কার আদেশ অনুসারে কাজ করবেন?'

ক্যাপ্টেন ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দেন—'কার আবার, আপনার আদেশ মেনে—'

www.pathagar.com

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বারজাক এবার বললেন, 'আমার আদেশেই যদি বলেন তবে জানতে চাইছি গ্রামবাসীদের আতিথেয়তা প্রত্যাখ্যান করা হল কেন, জানতে চাই?'

'আমি কিন্তু আপনার নিরাপত্তার জন্যই একাজ করতে বাধ্য হয়েছি। আর এটাই আমার কর্তব্য জ্ঞান করছি। আসলে জানতে পেরেছি, একটা গোপন চক্রান্ত—।'

'বাজে কথা। টিম্বো থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল বনের গভীরে নিগ্রোরা আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে, অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কার মুখে চক্রান্তের কথা শুনেছেন, জানতে পারি কি?'

'নিগ্রো মেয়ে মালিক-এর মুখে।'

'ছিঃ! সামান্য একটা নিগ্রো মেয়ের কথায় আপনি এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। বহুৎ আচ্ছা! আমি নিগ্রোদের গ্রামে চললাম। তাদের কুঁড়েতে তাদের সঙ্গে রাত্রি কাটাব।'

ক্যাপ্টেন এবার একটু চড়া গলাতেই উচ্চারণ করলেন—'দেখুন, আমি কিন্তু কর্তব্য পালনে ত্রুটি করব না। আপনি যেতে চাইলেও নিরাপত্তার তাগিদে আমি প্রতিবন্ধকতা করব। প্রয়োজনে জোর করে আপনাকে তাঁবুতে আটকে রাখব।— কথাটা বলেই ক্যাপ্টেন তাঁবুর বাইরে চলে গেলেন।

মিস মোরনাস তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে উভয়ের বাক্‌যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করছেন। ক্যাপ্টেন চলে যেতেই তিনি এগিয়ে এসে বারজাককে লক্ষ্য করে বললেন, 'দেখুন, মালিকের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আমারই কথা হয়েছে। বলুন তো 'ভোঔং কোনো' কথাটার অর্থ কী?'

ড. চাতোন্নে আগ বাড়িয়ে বললেন, 'আমি জানি। ভোঔং কোনো-এর অর্থ হচ্ছে এক ধরনের তীব্র বিষ। এর বিষক্রিয়ার প্রকাশ আটদিনের মধ্যে ধরা যায় না। এ-বিষ তৈরির উপায় হচ্ছে—জোয়ারের বোঁটা মড়ার পেটের ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে দেওয়া হয়। ওখানে তিন সপ্তাহ থাকার পর সেটাকে বের করে গুঁড়ো করা হয়। সেগুলোকে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিলে আট দিন বাদে পেট ফুলে ঢোল হতে থাকে। স্বাদ ও গন্ধহীন বলে খাওয়ার সময় কিছুই বোঝা যায় না। শত ওষুধপত্রে কোনো কাজই হয় না। দুদিন বাদেই তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়।'

মিস মোরনাস বললেন, 'আমি জানি, নিগ্রোদের গ্রামে গিয়ে মালিক তাদের চক্রান্তের কথা জানতে পেরে গেছে বলেই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছে, আজ রাত্রেই আমাদের দুধ বা সরবতের সঙ্গে ওই বিষ খাইয়ে দেওয়া হবে। মালিক আরও জানতে পেরেছে, কাল আমরা যাত্রা করলে তারা আমাদের পিছু নেবে। পথে আমাদের মৃত্যু হলে জিনিসপত্র যা কিছু পাবে হাতিয়ে নেবে।'

কথাটা শোনামাত্র বারজাকের মাথায় রক্ত ওঠার উপক্রম হল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'সকাল হলেই শয়তানদের গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করে দেব।'

মোরনাস বাধা দিয়ে বললেন, 'সে কী কথা! গ্রামের একজন মানুষকে দিয়ে গ্রামের সব মানুষের বিচার করাটা কি সঙ্গত হবে?

বারজাক অল্পেতে মাথা গরম করেন সত্য। কিন্তু সুবিবেচক। নিজ কৃতকর্মের জন্য করমর্দনের মাধ্যমে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে ব্যাপারটাকে মিটিয়ে নিলেন।

বুঝতে পারা গেল, তাঁদের হৃদ্যতার সম্পর্কে কোনদিনই ভাঁটা পড়বে না।

www.pathagar.com

এ সমস্যাটা তো মিটল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সেন্ট বেরেনকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

শেষপর্যন্ত টোনাগানে তাকে খুঁজে বের করল। তিনি একটা জলাধারের পাশে বসে ব্যাঙ ধরছেন মাছ ধরার জন্য। ব্যাঙটাকে বঁড়শিতে গেথে জলে ফেলতেই অতিকায় কুদর্শন একটা জলজপ্রাণী গেঁথে গেল। সেটা ইগুয়ানা।

টোনগানে বলল, 'ইগুয়ানার মাংস খুব সুস্বাদু। কাল চমৎকার করে রান্না করা হবে।'

পরদিন ষোলই ডিসেম্বর। ভোর হতে না হতেই অভিযাত্রীরা তাঁবু গুটিয়ে যাত্রা করলেন। গ্রামের যুবক মুখিয়াকে দেখা গেল। সে রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল।

পথ পাড়ি দিতে গিয়ে অভিযাত্রীরা বেশ বড়সড় একটা নদী পেল। জলহস্তী আর কুমির ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘোড়াগুলো দিব্যি নদী পেরিয়ে গেল। সমস্যা দেখা দিল গাধা ক'টাকে নিয়ে। তারা জলে নামতে নারাজ। নিগ্রো কুলিদের একজন বুদ্ধি করে তাদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিল। তখন ছায়ার তাপমাত্রা ছিয়াশি ডিগ্রি। ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়া পেয়ে তারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অভিযাত্রীরা পাহাড় ডিঙিয়ে টিনকিসো উপত্যকায় হাজির হল। আবার জঙ্গল আরম্ভ হল।

এবার একটা মজার ব্যাপার ঘটল। বন্দুক দেখে নিগ্রো গ্রামবাসীরা যাতে ঘাবড়ে না যায়, অভিযাত্রীদের শত্রু না ভাবে সেজন্য ক্যাপ্টেনের নির্দেশে সব ক'টা বন্দুক বস্তায় পুরে রাখা হল। এত কিছুর পরও একটা গ্রামের গা দিয়ে যাবার সময় তিনটে নিগ্রো অতর্কিতে তাদের ওপর দমাদম ঢিল মারতে শুরু করল। ঢিল পড়তে লাগল সেন্ট বেরেন-এর গায়ে। সেন্ট বেরেন বন্দুক, বন্দুক বলে গলা ছেড়ে চেঁচাতে লাগল। হায়! বন্দুকে যে বস্তাবন্দি করে রাখা হয়েছে। ক্রোধোন্মত্ত বেরেন অনন্যোপায় হয়ে নিগ্রোদের উদ্দেশ্যে গালমন্দ করতে করতে খালি হাতেই তেড়ে গেলেন।

সেন্ট বেরেন অদ্ভুত চরিত্রের লোকই বটে। মোরিলিরের জন্যই অভিযাত্রীদের ক্যানক্যানে পৌছোতে দেরি হয়ে গেল। তেইশ তারিখের আগে পৌছোতেই পারল না। ব্যাপারটা ঘটেছিল বাইশ তারিখে। আহারাদি সেরে রওনা হবার মুখে দেখা গেল, মোরিলিরে নেই। ফিলে এসে অজুহাত দেখাল, আগের তাঁবু যেখানে ফেলা হয়েছিল সেখানে ক্যাপ্টেনের মানচিত্রটা ফেলে এসেছিল। কিন্তু সেন্ট বেরেন-এর বক্তব্য শোনার পর তার কথাটা মেনে নেওয়া গেল না। শেষ রাত্রে তিনি পূর্বদিক থেকে হনহন করে তাকে হেঁটে আসতে দেখেছেন, অভিযাত্রীদের যেদিকে যাবার কথা সেদিকে। কিন্তু আগের তাঁবু পশ্চিমদিকে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু সেন্ট বেরেন-এর কথা অভিযাত্রীরা বিশ্বাস করল না। আসলে তাঁকে সবাই খামখেয়ালি প্রকৃতির লোক বলে মনে করেন।

ক্যানক্যানে পৌছনোর পর ছোট্ট আর একটা ঘটনা ঘটল। মোরিলিরে ক'দিন যাবৎই বলছিল, অভিযাত্রীদের ডাইনি-চিকিৎসকের জারিজুরি তুকতাক দেখাবে। ক্যানক্যানে এমন একজন নামকরা ডাকিনী-চিকিৎসক রয়েছে যে নাকি অবিশ্বাস্য ভেল্কি দেখিয়ে চমক লাগিয়ে দিতে পারে। তার কথায় কেউ-ই আমল দেন নি। দুর্গম আফ্রিকার জঙ্গলে এসে শেষপর্যন্ত ঠকবাজদের খপ্পরে পড়তে কেই বা রাজি হয়?

www.pathagar.com

ক্যানক্যানে পৌঁছে তাঁবু খাটিয়ে, সামান্য কিছু আহারাদির পর প্রবন্ধকার আমিদি ফ্লোরেন্স, বারজাক, চৌমৌকি, সেন্ট বেরেন, মিস মোরনাস ও মোরিলিরেকে নিয়ে আশপাশের অঞ্চলগুলো হাঁটাহাটি করে দেখতে বেরোলেন।

পথ চলতে চলতে মোরিলিয়ে এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গোড়াতে ব্যাপারটা বুঝতে পারা যায় নি। একটু বাদে দেখা গেল তাঁরা ডাইনি-চিকিৎসকের বাড়িতে দাঁড়িয়ে। মোরিলিরে আর চৌমৌকি ডাইনি চিকিৎসকের ভেলকি দেখার জন্য জোর পীড়াপীড়ি করতে লাগল। যাকে বলে একেবারে অতিষ্ঠ করে তোলা। মাত্র তো সামান্য কয়েকটা কড়ির ব্যাপার। অনন্যোপায় হয়ে অভিযাত্রীরা তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

বিদঘুটে চেহারার মাঝ-বয়সী একলোক, ডাইনি-চিকিৎসক, বালির ওপর কাঠি দিয়ে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত, সরলরেখার মাধ্যমে অদ্ভুত একটা চিত্র এঁকে ফেলল। এবার অর্ধেক লাল ও অর্ধেক সাদা কোলা বাদাম কয়েকটা অঙ্কিত চিত্রটার ওপর রাখল। প্রায় অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র আওড়াল। এবার অভিযাত্রীদের সামনে হাত পাতল, প্রাপ্য চাওয়ার ভঙ্গিতে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। প্রবন্ধকার অন্যান্যরা এক এক করে তার কাছে প্রশ্ন করলেন। সবার প্রশ্নের জবাব এক সঙ্গে দিল।

প্রবন্ধকারকে বলল, 'তোমার পাত্তা কেউ-ই পাবে না।' সেন্ট বেরেনকে বলল, 'ক্ষতস্থানের জ্বালা-পোড়ার জন্য বসতেই পারবে না।' এবার মিস মোরনাসকে লক্ষ্য করে বলল, 'সিকাসো অতিক্রম করা মাত্র শাদা চামড়ার মানুষ, হয় দাসীবৃত্তি, নয় তো মৃত্যু বরণ।

প্রবন্ধকারের মনে খটকা লাগল, মোরিলিরে আর চৌমৌকি নির্ঘাৎ তাকে আগে থাকতে অভিযাত্রীদের ব্যাপার-স্যাপার বলে রেখেছিল। অভিযাত্রী চারজনের সমস্য কি কি? তা নইলে তাদের মনের খবর সে পেল কি করে? প্রবন্ধকার যে খবর পাঠাবার জন্য অভিযানে বেরিয়েছেন তা কি করে ডাইনি-চিকিৎসকের পক্ষে জানা সম্ভব হল? আবার সেন্ট বেরেন যে বঁড়শির আঘাত পেয়েছেন, ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তাই বা জানল কী করে? আবার ক্যাপ্টেন যে মিস মোরনাসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন তাই বা সে কি করে জানল? সবশেষে এও লক্ষ করার মতো যে, বারজাক যে অভিযানটাকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য সর্বক্ষণ ভাবিত তাও তো তার জানার কথা নয়। তবে?

রাত্রে খেতে বসে অভিযাত্রীরা ব্যাপারটা নিয়ে অনেকক্ষণ হাসিঠাট্টা করলেন। ব্যস, তারপরই ব্যাপারটাকে সবাই মন থেকে মুছে ফেললেন। কিন্তু প্রবন্ধকার আমিদি ফ্লোরেন্সের মনে ঘটনাগুলো গাঁথা হয়ে রইল। তাদের একটা হচ্ছে—মড়ার পেটের বিষ খাইয়ে অভিযাত্রীদের মারার চক্রান্ত। আর দ্বিতীয়টা—ডাইনি-চিকিৎসকের ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ বাণীর ব্যাপার।

প্রথম ব্যাপারটা সম্বন্ধে বলতে হয়—সামান্য এক নিগ্রো মুখিয়ার এত সাহস কি করে হতে পারে? মাত্র মাইল পঁচিশেক দূরে টিম্বোতে সৈন্যদের ঘাঁটি। তবু ঘোড়াসওয়ার সৈন্য সমেত এতগুলো মানুষকে বিষ খাইয়ে মারার চক্রান্ত—কম দুঃসাহসের ব্যাপার নয়। আর ধাপ্পাবাজ ডাইনি-চিকিৎসকের ভবিষ্যদ্বাণী করার মতো অলৌকিক শক্তি কি সত্যি আছে? নাকি এর পিছনে কারোর গোপন চক্রান্ত রয়েছে? অভিযানটাকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে? তবে কি মোরিলিরে কারোর কাছ থেকে প্রচুর অর্থ পেয়ে দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত? হতেও পারে। মনের সঙ্গে দীর্ঘ বোঝাপড়া করেও

www.pathagar.com

প্রবন্ধকার নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে পারলেন না। প্রবন্ধের শেষে অন্যবারের মতো এবার আমিদি ফ্লোরের নামটা ছাপা হয়েছে।

২৬ ডিসেম্বরের তারিখ উল্লেখ করে প্রবন্ধকার পুনশ্চ দিয়ে আরও একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। ব্যাপারটা গতকাল রাত্রেই ঘটেছিল। ক্যানক্যান থেকে যাত্রা করে অভিযাত্রীরা দিনভর পথ চলে কুড়ি মাইল পথ অতিক্রম করলেন। খোলামেলা একটা জায়গা পেয়ে তাঁবু টাঙালেন। বারো মাইল পিছনে রয়েছে দিয়ানগানা গ্রাম। আর ত্রিশ মাইল সামনে সিকোরো গ্রাম।

সারাদিনের পরিশ্রমে অভিযাত্রীরা ক্লান্ত। তাঁবুর তলায় সতরঞ্চি পেতে শুতে না শুতেই ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। বিচিত্র এক আওয়াজে সবাই হুড়মুড় করে উঠে বসে পড়ল। পশ্চিম দিক থেকে বিশালাকায় এক ঝাঁক পোকা কর্কশ স্বর করে গুঞ্জন করছে। আর আতঙ্ক সঞ্চারকারী অদ্ভুত আওয়াজটা ক্রমেই কাছে আসতে লাগল। বিকট স্বরে তর্জন গর্জন করতে করতে পশ্চিমদিক থেকে আসা আওয়াজটা মাথার ওপর দিয়ে পূর্বদিকে চলে গেল।

আতঙ্ক সঞ্চারকারী রহস্যজনক আওয়াজটায় অভিযাত্রীরা তো মুষড়ে পড়তেই পারেন। এমন কি নিগ্রো পথ প্রদর্শক ও কুলিরা পর্যন্ত মাটিতে মুখ গুঁজে ভয়ে সিঁটকে লেগে পড়ে রইল।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত আতঙ্ক সঞ্চারকারী রহস্যজনক আওয়াজটা পাঁচ পাঁচাবার বিকট স্বরে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে চলে গেল।

যেহেতু ভয়ঙ্কর শব্দটা শেষবারও পূর্বদিকে গেছে তাই নিগ্রোরা কিছুতেই পূর্বদিকে যেতে রাজি হল না।

ঘণ্টা তিনেক ধরে ক্যাপ্টেন মারসিনে নিগ্রোদের বুঝিয়ে শুনিয়ে তবে রাজি করাতে পারলেন। রহস্যসঞ্চারকারী শব্দ যেদিকে গেছে অভিযাত্রীরা সেদিকেই অগ্রসর হতে লাগলেন। পথ চলতে গিয়ে কয়েকটা অত্যাশ্চর্য দাগ দেখে ক্যাপ্টেন মারসিনে থমকে গেলেন। সবার আগে আগে তিনি পথ চলছিলেন। একটা বা দুটো দাগ নয়, পর পর দশটা—পাঁচ জোড়া দাগ।

মাটি খুড়ে এগিয়ে যাওয়া চাকার দাগের মতো সেগুলো। রাত্রে পর পর পাঁচবার বিকট স্বরে গর্জন আর পাঁচ জোড়া চাকার দাগের মধ্যে কি যে সম্পর্ক আছে বুঝা গেল না। দেখা যাক ভবিষ্যতে যদি এর সদুত্তর পাওয়া যায়। প্রবন্ধকারের নাম আমিদি ফ্লোরেন্স-এর নাম আবারও ছাপা হয়েছে।

* * *

সেদিনটা ছিল বারোই জানুয়ারি। সমুদ্র থেকে প্রায় সাত শ' মাইল দূরবর্তী সিকাসো গ্রামে অভিযাত্রীরা হাজির হলেন। এরপর সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্সের লেখা আর কোনো প্রবন্ধ লা এক্সপ্যানসন ফ্যাঁসে-এর পত্রিকার দপ্তরে আসে নি।

কেন যে আসে নি জানা গেল না। এটা আমিদি ফ্লোরেন্স জানেন না। তাঁর দিনলিপির পাতা থেকে বারজাক তদন্ত কমিশনের অভিযানের বিবরণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পেশ করা হল—

সেন্ট বেরেন বাস্তবিকই এমন একজন মানুষ যার প্রতিটা কথা ও কাজ সহযাত্রীদের হাসির খোরাক জুগিয়ে যাচ্ছে। ক্যানক্যান থেকে সিকাসো পৌছনোর পথে তাঁর দু-একটা

www.pathagar.com

মজার কাণ্ড ছাড়া আর কিছুই ঘটে নি। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল, চৌমৌকি তার পুরনো বন্ধু টোনাগানের কাছ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। মোরিলিরের সঙ্গে তার সম্পর্ক ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

এদিকে ডাইনি-চিকিৎসকের ভবিষ্যদ্বাণী চারটের কোনটাই আজও বাস্তবে পরিণত হয় নি। আগেকার প্রবন্ধে আমিদি ফ্লোরেন্স লিখেছিলেন, কেউ না কেউ তাদের পিছনে টিকটিকির মতো লেগে থেকে অভিযানটাকে বানচাল করে দেওয়ার ধান্ধায় রয়েছে। আজ অবধি তেমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণ মেলে নি।

অভিযাত্রীরা সিকাসোতে মহানন্দেই ক'দিন কাটালেন। এখান থেকে অভিযান দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। এক দল বদ্রিয়ার্সের নেতৃত্বে দক্ষিণ দিকে যাবেন আর অন্য দল বারজাকের সঙ্গে পূর্বদিকে অগ্রসর হবেন। সৈন্যরা দুটো দলে ভাগ হয়ে দুদিকে চলবেন। এখন সমস্যা বাঁধল মিস মোরনাসকে নিয়ে। তাঁকে কোনো দলে দেওয়া হবে? মিস মোরনাসই সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তিনি বারজাকের দলে যাবেন। বেরেন একই দলে থাকবেন। কারণ, তিনি তো এ পথেই যাবেন বলে ইউরোপ থেকে যাত্রা করেছিলেন। কেউ কেউ বললেন—তৈয়ারেগ আউলিমিডে উপজাতির বাস সে-অঞ্চলে। তারা খুবই দুর্ধর্ষ, হিংস্রও বটে। মিস মোরনেসে সবের পাত্তা না দিয়ে নিজের মতোই আকড়ে ধরে রইলেন। কোনো মহিলার মতামতের ওপর কারোর আপত্তিই টেকে না। শেষপর্যন্ত তাঁর ইচ্ছাতেই সবাই সম্মতি জ্ঞাপন করেত বাধ্য হলেন।

আসল ঝামেলাটা বাধল এবারই। ঠিক হয় বারজাকের দলের সঙ্গে পথ-প্রদর্শক মোরিলিরে যাবে। একে তার দলেই পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন। সবচেয়ে বড় কথা, তার বাড়িও সেদিকেই। সে কিন্তু বদ্রিয়ার্সের সঙ্গে যাবে।

একটা সমস্যার সমাধান হতে না হতেই আর একটা সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কুলিরা আর অগ্রসর হতে নারাজ। তাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল, সিকাসো পর্যন্ত আসার জন্য। শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে নতুন পথ-প্রদর্শক ও কুলি জোগাড় করা হল।

এবার মোরিলিরে মত ঘুরে গেল। সে বারজাকের সঙ্গেই যেতে রাজি হল। কুলিরাও এবার যেতে রাজি হয়ে গেল। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল, মোরিলিরেই গোপনে কুলিদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল।

একুশে ফেব্রুয়ারি অভিযাত্রীরা আবার পথে নামলেন। বদ্রিয়ার্স নিরাপদেই অগ্রসর হতে লাগলেন। কিন্তু বারজাকের ভাগ্যে যত বিপর্যয় ঘটতে লাগল। তবে স্বীকার করতে হবে, আফ্রিকার দুর্গমতম অঞ্চলে মোরিলিরেই বারজাককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নইলে তাঁর বরাতে যে কি ছিল ভাবাই যায় না।

* * *

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স-এর দিনলিপির পাতায় 'মোরিলিরে' শিরোনাম দিয়ে কিছু লেখা পাওয়া গেছে। তাই উল্লেখ করা হল। দিনলিপির পাতায় লেখা রয়েছে—বাইশে জানুয়ারি। সিকাসো থেকে রওনা দেওয়ার পর দুদিন কেটে গেছে। মনে হল ডাইনি-চিকিৎসকের ভবিষ্যদ্বাণী এখন থেকে বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে নইলে কুলি, গাধা প্রভৃতি দুদিনেই এমন ক্লান্ত হয়ে পড়বে কেন?

২৩ জানুয়ারি। যদিও পথ খুবই খারাপ, ঘন ঘন চড়াই-উৎড়াই তবু গতি এত মন্থর হওয়ার তো কথা নয়। ২৩ জানুয়ারি। চার দিনে মাত্র ত্রিশ মাইল পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

www.pathagar.com

২৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় দুদিনে ত্রিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে কাপেন নামক গ্রামে পৌঁছনো গেল। অতএব মোট দশদিনে ষাট মাইল পথ। হিসাব মতো দৈনিক গড়ে ছ'মাইল দাঁড়াচ্ছে। কোকোরো নামে একটা গ্রামে অভিযাত্রীরা পৌঁছলেন। এবার একটা খাড়া পাহাড় ডিঙোতে হবে। কেবলমাত্র পূর্বদিকে সমতলভূমি। আর বাকি তিনটে দিকই পাহাড়ে ঘিরে রেখেছে।

ক্যাপ্টেন মারসিনে বস্তামোড়া বন্দুকগুলি বের করে, হাতে নিয়ে সবাইকে তৈরি থাকতে বললেন। যদি ইতিপূর্বে সেগুলোতে হাত দেওয়ার দরকার হয় নি। তবে বেকায়দায় না পড়লে যেন গুলি চালানো না হয়। কেন বন্দুক বের করার নির্দেশ? কারণ, ত্রিশে জানুয়ারি কোকোরো গ্রামে পা দিতেই প্রায় শ' আটেক অসভ্য জঙ্গলি অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে অভিযাত্রীদের ঘিরে ধরে। ঠিক তখনই সেন্ট বেরেনের ঘোড়াটা বিকট চিৎকার করে সজোরে এক লাফ দিল। সেন্ট বেরেন জঙ্গলিদের মাঝখানে গিয়ে পড়লেন। ঠিক তখনই মিস মোরেনাস ঘোড়া নিয়ে জঙ্গলিদের মাঝখানে চলে গেলেন। ব্যাস, ক্রোধোন্মত্ত জঙ্গলিরা তাকে ঘিরে ধরল। গোটা কুড়ি বর্শা তাঁর দিকে উঁচিয়ে ধরল।

ঠিক সে মুহূর্তেই মিস জেন মোরনাস অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড করে বসলেন। জ্যাকেটের পকেট থেকে ছোট্ট টর্চটা বের করে চিৎকার করে উঠলেন, 'সবাই চুপ কর। আমি ডাইনি! আমি ডাইনি!! অসভ্য জঙ্গলিদের বুঝাতে চাইছেন, দেখ, আমি ডাইনি-বিদ্যার বলে আকাশের বিদ্যুৎকে কেমন হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছি। শুধু বিদ্যাৎ নয়, বজ্রকেও।'

ব্যস, ব্যাপার দেখে জঙ্গলিদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড় হল। যন্ত্রচালিতের মতো হাতের বর্শা নামিয়ে সবাই জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এদিকে সেন্ট বেরেন আতঙ্কে সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছেন। দাঁত কপাটি লেগে গেছে। ড. চেতোন্ন ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে সেন্ট বেরেনকে সুস্থ করে তোলার জন্য প্রয়াসী হলেন।

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্সের মনে পড়ে গেল সে ডাইনি-চিকিৎসকের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। ভাবলেন, তার দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী তবে সত্যি হল। প্রথমটাও বাস্তব রূপ পেতে চলেছে। তিনি ভাবলেন, তিন-তিনটা প্রবন্ধ পাঠানো হয়েছিল সেগুলো ঠিকানা মতো পৌঁছেছিল কি?'

এবার জঙ্গলি-সর্দার নিজেদের অপরাধ স্বীকার করতে গিয়ে সেন্ট বেরেনকে দেখিয়ে করজোড়ে নিবেদন করল, 'তিনি বন্দুক নিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েই তো আমাদের মাথায় খুন চড়িয়ে দিয়েছিল।'

ব্যাপারটা আলোচনার মাধ্যমেই নিষ্পত্তি ঘটে গেল। মিস মোরনাস এবার সেন্ট বেরেন-এর কাছ থেকে বঁড়শি নিয়ে জঙ্গলিদের মধ্যে বিতরণ করলেন। তারা দুর্লভ বস্তু হাতে পাওয়ার মতো আনন্দে নাচানাচি শুরু করে দিল। হাত ধরাধরি করে নাচ-গান করল দীর্ঘ সময় ধরে।

দোসরা ফেব্রুয়ারি। মাসি-বোনপো ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ায় তার পরের দিনটাতে কোকোরোতেই জঙ্গলিদের অতিথি হয়ে তাদের থেকে যেতে হল। তেসরা ফেব্রুয়ারিও কোকোরোতেই থাকতে হল।

www.pathagar.com

চৌঠা ফেব্রুয়ারি সকাল ছ'টায় তারা যাত্রা করলেন। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় একই জায়গায় ফিরে আসতে হল। আসলে কুলিদের নষ্টামির জন্যই এরকম একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটল। কিছুদূর গিয়ে মোরিলিরের মনে হল পথ ভুল হয়েছে। টোনাগানে বলল—না, ঠিকই আছে। পথ মোটেই ভুল হয় নি। দোটানায় পড়ে অভিযাত্রীরা শেষপর্যন্ত আবার কোকোরোতেই ফিরে আসতে বাধ্য হলেন।

দোসরা ফেব্রুয়ারি ভোরে নতনু করে যাত্রা করার পূর্ব মুহূর্তে মোরিলিরে মুখ কাচুমাচু করে বলল, 'স্যার, এখন ভাবছি, কাল পথ ঠিকই ছিল।' চৌমৌকি সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমর্থন করল। ব্যাপারটা কেমন রহস্যজনকই মনে হল। হয়ত উভয়ের গোপন আঁতাতেরই ফল।

সকালে যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে একটা গাধা ঢলে পড়ল। মুখ দিয়ে গেঁজলা উঠল। মারা গেল। ভয়ে অভিযাত্রীদের বুক ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেল। বিকেল হতে না হতেই একটা কুলি বেপাত্তা হয়ে গেল। সন্ধ্যার দিকে রহস্য আরও গভীর হল। দেখা গেল, কুলিরা সবাই বেহেড মাতাল হয়ে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, টলছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তারা গভীর জঙ্গলে মদ পেল কোত্থেকে?

কুলিরা শাসনের বাইরে, কিছু বলতে গেলে হয়ত কেটে পড়ার মতলব করবে।

অভিযাত্রীদের কেউ কেউ ভাবলে লাগলেন, 'এত ঝকমারি করে কেন এগিয়ে চলেছে? নাইজার বেন্ডের অসভ্য-জঙ্গলিদের হাতে অধিকার ছেড়ে দেওয়া নিছকই মূর্খামি ছাড়া কিছু নয়।'

আসল অভিযাত্রীদের মধ্যে ক্যাপ্টেন মারসিনে ফিরতে রাজি না হওয়ার কারণ হচ্ছে—তিনি আদেশ দিতে পারেন, নিজের ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দিতে পারেন না। আবার মিস জেন মোরনাস যতদিন দলে থাকবেন ততদিন তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাদের বিয়ে হলেও অবাক হবার কিছু নয়। তাদের ব্যাপার দেখে বারজাকও হতভম্ব। আর মঁসিয়ে পঁসি তো, আদেশ পালন করতে অভ্যস্ত। সেন্ট বেরেনও? তিনি নিজের চোখে নন, মাসির চোখ দিয়ে দেখেন। মাছ ধরা ছাড়া আর কিছুই তিনি বোঝেন না। মিস মোরনাস কেন যে আফ্রিকার জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সবশেষে সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স? তিনি অভিযান চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি। কারণ, লেখার মতো ঘটনা যত পাওয়া যাবে ততই তার লাভ। ঝামেলা হুজ্জতি যত বাড়বে লেখার মালমশলাও তার ততই জোগাড় হবে। এবার মঁসিয়ে বারজাক কেবল বাকি রইলেন। তিনি কারোর আদেশ মানতে বাধ্য নন। লেখার মালমশলার দিকে তার কোনো আগ্রহই নেই। কারোর সঙ্গে সম্পর্ক গড়া বা সম্পর্ক অব্যাহত রাখার ধারও ধারেন না। ব্যাপারটা নিয়ে জিজ্ঞাসা করেও কোনই সদুত্তর পাওয়া যায় নি।

মাঝ-রাত্রে আবার সেই রহস্যসঞ্চারকারী আওয়াজটা কানে এল। হুড়মুড় করে উঠে বিছানায় বসে পড়লাম। দেড়টা নাগাদ পূর্বদিক থেকে আওয়াজটা ভেসে এল। সোয়া দুটোর কিছু পরে আবার সে আওয়াজটা কানে এল। পূর্বদিকেই সেটা মিলিয়ে গেল।

আতঙ্কিত বুকে তাঁবু থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে সেন্ট বেরেন-এর তাঁবুতে এসে চমকে উঠলাম। তিনি তাঁবুতে নেই। পরক্ষণেই মনে পড়ল, ভদ্রলোক তো একটা ভেলা তৈরি করেছিলেন। হয়ত চুপিচুপি তাঁবু থেকে বেরিয়ে ভেলা নিয়ে মাছ ধরে বেড়াচ্ছেন।

www.pathagar.com

ভাবলেন, তাকে এবার দুটো কড়া কথা না শোনলেই চলছে না। হ্যাঁ, নদীর পাড়ে গিয়ে দেখলেন, যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই। দিব্যি ভেলায় চেপে মাছ ধরে চলেছেন। বেশি কথা বলতে হল না। তাঁকে দেখেই জাল ফেলে সুর সুর করে তাঁবুতে ফিরে এলেন।

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স বেরেনকে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে আসার একটু বাদেই নদীর দিক থেকে বিকট আর্তনাদ ভেসে এল। তাঁরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে নদীর দিকে গেলেন। দেখলেন, সেন্ট বেরেন যে-জালটা দিয়ে মাছ ধরছিলেন সেটাতে জড়িয়ে দিয়ে নিগ্রো বীর মোরিলিরে খাবি খাচ্ছে। উদ্ধার করা হল। একটু আগেই তাকে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে দেখা গিয়েছিল। সে এখানে এসে জালে জড়িয়ে পড়ল কিভাবে?

বিশ্বাসঘাতক মোরিলিরে! বিশ্বাসঘাতক মোরিলিরে পথপ্রদর্শক। হতচ্ছাড়াটা এবার হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল। ব্যাপারটা হল সে একটা কাঠের গুঁড়ির মাথায় নিজের টুপিটা চাপিয়ে বিছানায় শুইয়ে, চাদরমুড়ি দিয়ে রেখে চুপিচুপি নদীতে চলে যায়। পালিয়ে যাওয়ার ধান্দায় ছিল। সাঁতরে নদী পার হতে গিয়ে অন্ধকারে বেরেন-এর ছড়িয়ে রাখা জালে জড়িয়ে গিয়ে মরতে বসেছিল। জাল ছাড়িয়ে ডাঙায় তুলে আনতেই সে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। সেন্ট বেরেন তাকে জাপ্টে ধরে ফেলেন। ঠিক তখনই সে হাতের মুঠো থেকে দলাপাকানো একটা কাগজের টুকরো অতর্কিতে মুখে পুরে গিলে ফেলার চেষ্টা করল। টানাটানি করে কাগজটা বের করা সম্ভব হল বটে। কিন্তু বেশির ভাগটুকু পেটে চালান দিয়ে দিয়েছে।

মুখের লালা ভেজা কাগজটা ক্যাপ্টেন মারসিনের কাছে পৌঁছে দেওয়া হল। আরবি হরফে লেখা। তার ওপর ভিজে যাওয়ায় এক বর্ণও উদ্ধার করতে পারলেন না। তিনি আরবিভাষা কিছু কিছু পড়তে পারেন বটে। তবে দিনের আলোয় চেষ্টা করে দেখবেন। মোরিলিরকে জেরা করার জন্য তার তাঁবুতে যেতেই সবার তো চক্ষুস্থির। যে-দড়িটা দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল সেটা মেঝেতে পড়ে, সে উধাও। কী ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোকরে বাবা! একটা নিগ্রোর মাথায় এমন দুর্বুদ্ধি থাকতে পারে, ভাবাই যে যায়!

* * *

ক্যাপ্টেন মারসিনের তাঁবুতে সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স-এর ডাক পড়ল। আরবি ভাষায় লেখা চিঠিটার অবশিষ্ট অংশটুকুর মর্মার্থ তিনি উদ্ধার করেছেন। রক্ষী চারজনও অবাক। দড়ি পড়ে রয়েছে, মোরিলিরে উধাও। তারা কাউকে পালাতেও দেখেনি।

এমন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখে ক্যাপ্টেন রেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেলেন। রক্ষীদের শাস্তি না দিয়ে ছাড়লেন না। চিঠিটার মর্মার্থ সম্বন্ধে তিনি বললেন, 'ইউরোপিয়ানদের বরদাস্ত করতে পারছেন না। তারা এখনও আসছে। চিঠি পেলেই সৈন্যরা হাজির হবে...সে আদেশ দেবে। আদেশ পালনও করবে। আরম্ভও করেছে। এমুহূর্তে প্রভু—'

ক্যাপ্টেন মারসিন সবাইকে ব্যাপারটা খোলসা করে বোঝাতে গিয়ে বললেন, 'চিঠিটার প্রথম অংশের বক্তব্য খুবই সহজ। কোথাও এক প্রভু বা শাসক আমাদের কিছু কিছু কাজ করতে দিতে রাজি নন। তার কাছে যেন আমরা উটকো আপদ বিশেষ। মোরিলিরে চিঠিটার যে অংশটুকু পেটে চালান দিয়ে দিয়েছে তার মধ্যে নির্ঘাৎ কোনো ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু তা যে কি আমাদের কাছে অজ্ঞাত, জানার কোনো রাস্তাও নেই। এবার শেষের ছত্র দুটোর কথা আলোচনা করা যাক—'চিঠি পেলেই সৈন্যরা

www.pathagar.com

হাজির হবে'। ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না। তার পরের বক্তব্য 'সে আদেশ' দেবে। 'সে' বলতে কার কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে? কী 'আদেশ'ই বা দেবে?'

কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বারজাক মুখ খুললেন। চিঠির বক্তব্য থেকে তিনটি সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ পথপ্রদর্শক মোরিলিরে বেইমানি করেছে। সে আমাদের অভিযান ভণ্ডুল করতে আগ্রহী আর টিকটিকি হয়ে আমাদের পিছু নিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ অজ্ঞাত ব্যক্তিটা অবশ্যই ক্ষমতাবান। তাই ছদ্মবেশী গুপ্তচর নিযুক্ত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। তৃতীয়তঃ লোকটার ক্ষমতা নগণ্য। সে জন্যই কাজটা নিছক ছেলেখেলা হয়ে গেছে। সেজন্য প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নি। সত্যই ছেলেখেলা—'

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স প্রতিবাদ করতে গিয়ে বললেন, 'আমার পক্ষে আপনার কথা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। রহস্যসঞ্চারকারী লোকটা আড়াল থেকে নানাভাবে আমাদের প্রতিরোধ করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ক্যানক্যানে ডাইনি-চিকিৎসকের ব্যাপার আর ভোওঁং-কোনো বিষের ব্যাপারটার কথা ভাবলেই ব্যাপারটা খোলসা হয়ে যাবে।'

বারজাক দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'আর এতেই তো আমার বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের বিরুদ্ধ শক্তি মোটেই এমন কোনো শক্তি ধরে না যার দ্বারা আমাদের গতিরোধ করে দিতে পারে। তাই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের ঘাবড়াবার কিছুই নেই।'

বারজাকের কথা সবাই একবাক্যে মেনে নিলেন। সবাই কেন যে তাঁর কথা মেনে নিলেন সাংবাদিকের অন্তত অজানা নয়। কিন্তু বারজাক কেন এত আশঙ্কা সত্ত্বেও যে শেষপর্যন্ত অভিযান চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এমন জেদ ধরছেন তা সত্যই নিরর্থক।

কিন্তু এটা অবশ্য সত্য যে মোরিলিরের স্বগোত্রীয় চৌমোকিকে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।

শেষপর্যন্ত টোনগানে ও চৌমোকি গিয়ে কুলিদের বুঝাল, মোরিলিরেকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে হয় পালিয়েছে, নয়তো কুমিরের পেটে গেছে। কুলিরা নীরব রইল

নই ফেব্রুয়ারি। মোরিলিরে থাকতে অভিযাত্রীদের পথ চলা যেমন শম্বুক গতিতে চলছিল তার অবর্তমানেও গতির কোনই পরিবর্তন হল না। তার ওপর চৌমোকি যে-পথে তাদের নিয়ে যাচ্ছে শেষে দেখা যাচ্ছে সে পথ ভুল করেছে। অমানুষিক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে আবার ফিরে আসতে হচ্ছে। কিন্তু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, টোনগানের প্রদর্শিত পথ মোটেই ভুল নয়। সংক্ষিপ্ত পথ দিয়ে সে অভিযাত্রীদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সঠিক পথ নির্বাচন করতে গিয়ে চৌমোকি ও টোনগান নিজেদের মধ্যে এমন কথাকাটাকাটি শুরু করে দিচ্ছে যার মীমাংসা করতে ঘন্টার পর ঘণ্টা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এমন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে আড়াই দিনে মাত্র কুড়ি মাইল পথ অভিযাত্রীরা অতিক্রম করতে পারলেন।

এগারোই ফেব্রুয়ারি দুপুরের দিকে অভিযাত্রীরা 'বাসা' গ্রামে পৌছলো। গ্রামের কাছাকাছি পৌছেই অভিযাত্রী একদল ভূততাড়ানো রোজাদের শোভাযাত্রা দেখতে পেল। সবাই শকুনের ঝালরে মুখ ঢেকে পথ পাড়ী দিচ্ছে। অদ্ভুত তাদের পোশাক পরিচ্ছদ। ভূততাড়ানো ছাড়াও বৃষ্টি নামানোর ক্ষমতাও তাদের আছে। এ-অঞ্চলে তারা 'দৌ' নামে পরিচিত।

বাসা গ্রামে পৌছে চৌমৌকি আর এক বাহানা শুরু করল। কুলিরা নাকি পথ চলে চলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। গ্রামে রাত্রি কাটিয়ে বিশ্রাম নেওয়া একান্ত দরকার।

www.pathagar.com

চৌমৌকির দুরভিসন্ধি টোনাগানে পরিষ্কার ধরতে পেরে গেছে। তাই সে ইশারায় অভিযাত্রীদের বাসা গ্রামে রাত্রিবাস করতে বারণ করল। তার পরমর্শানুযায়ী অভিযাত্রীরা গ্রামে না থেকে গ্রামের ধারে এক ফাঁকা জায়াগায় তাঁবু খাটিয়ে রাত্রিবাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ব্যাপারটা চৌমোকির মোটেই পছন্দ হয় নি। সে রীতিমতো হম্বিতম্বি করতে লাগল।

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স রাত্রির অন্ধকারে একাই বেরিয়ে পড়লেন হাঁটাহাঁটি করে গ্রামটাকে দেখে নেওয়ার জন্য। গ্রামের পথে হাঁটতে হাঁটতে তিনি এক জায়গায় দেখতে পেলেন এক নিগ্রো গ্রামবাসী জ্বরে গোঙাছে। গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার অদ্ভুত উপায়ে তার চিকিৎসা করছে।

কাঠের তৈরি এক উপদেবতার মূর্তি রোগীর শিয়রে রাখা হয়েছে। রোগীকে তার সামনে উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। রোগীর মুখে ছাইয়ের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। সাদা রঙের কাঠের মূর্তিটাকে ঘিরে উলঙ্গপ্রায় একদল গ্রামবাসী তাণ্ডব নৃত্যে মগ্ন। আর চিকিৎসক গলা ছেড়ে অবোধ্য ভাষায় মন্ত্র পড়ছে। এক সময় তার চোখ-মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠল যেন রোগ ও রোগাক্রান্ত স্থান সে নির্ণয় করে ফেলেছে। ব্যস, রোগীর শরীরের একজায়গায় খপ্ করে হাত রেখেই মুহূর্তের মধ্যে হাতটাকে মুঠো করে তুলে ফেলল। হাতের মুঠো মেলে ধরতেই দেখা গেল ছোট্ট একটা হাড়। ব্যাপারটায় বুঝাতে চাইল, রোগীর দেহের ভেতর থেকেই হাড়ের টুকরোটা বের করা হয়েছে। আসলে পুরো ব্যাপারটাই বুজরুকি। হাত সাফাইয়ের ব্যাপার।

রোগী যেন চোখের পলকে রোগমুক্ত হয়ে গেছে এমন ভাব করে যন্ত্রচালিতের মতো তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে জায়গা ছেড়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে সে লোকটাই অভিযাত্রীদের তাঁবুতে হাজির হয়। দেখা করে ডক্টর চেতোন্নর সঙ্গে। কানাঘুষো শুনতে পেয়েছে তিনি নাকি একজন নামজাদা রোজা। ডক্টর চেতোন্ন রোগীকে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কয়েকটা কুইনাইন দিলেন কিন্তু কয়েকটামাত্র বড়িতে তার মন ভরে নি, তার চোখমুখের ভাব দেখে স্পষ্ট বুঝা গেল।

বারোই ফেব্রুয়ারি অভিযাত্রীরা বাসা গ্রাম ছাড়ার জন্য তাঁবু গুটিয়ে যাত্রা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঠিক তখনই রোগীটা ছুটতে ছুটতে এসে বহুভাবে ডক্টর চেতোন্নকে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল। তার রোগ নিরাময় হয়ে গেছে। ডক্টর চেতোন্ন তাঁকে আরও কয়েকটা পুরিয়া দিয়ে নিয়মিত সেবন করতে বললেন।

অভিযাত্রী আবার যাত্রার উদ্যোগ নিতে লাগলেন। চৌমৌকি নষ্টামি চালিয়েই যেতে লাগল। সে ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করল, সেদিন যাত্রা না করে পরের দিন যাত্রা করে কুলিদের আরও কিছু বিশ্রাম দরকার। ক্যাপ্টেন সম্মত হলেন। কুলিরা নীরব চাহনি মেলে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাল।

তখন বিকেল দুটার কাছাকাছি। আবার সে অত্যাশ্চর্য রহস্যসঞ্চারকারী আওয়াজটা কানে আসতেই অভিযাত্রীরা সচকিত হয়ে পড়ল। ক্যানক্যানতে তাঁবুতে থাকাকালীন যে অদ্ভুত আওয়াজটা অভিযাত্রীদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিল তার কথা বলা হচ্ছে। এবারও পূর্বদিক থেকে ভেসে আসতে লাগল। সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স উদ্ভ্রান্তের মতো পূর্বদিকের পাহাড়টার কাছে ছুটে গেলেন। পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলেন। তার শীর্ষে পৌছে কিছুই দেখতে পেল না। হতাশ হতে হল। ক্রমে পাহাড়টাকে সন্ধ্যার

www.pathagar.com

অন্ধকার ছেয়ে ফেলল। ব্যস, আওয়াজটাও অন্ধকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে একটু একটু করে আরও পূর্বদিকে সরে যেতে লাগল। সাংবাদিক আওয়াজটার রহস্য ভেদ করতে না পেরে তাঁবুতে ফিরে এসে বিবরণী লিখতে বসে গেলেন।

দশই ফেব্রুয়ারি। সকাল থেকেই চৌমৌকিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে দিয়েই সাংবাদিক সদ্য শেষ করা প্রবন্ধ পাঠানোর চিন্তা করেছিলেন। তাকে পাওয়া না যাওয়ায় সে আশা ত্যাগ করতেই হল।

চৌদ্দই ফেব্রুয়ারি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা ঘটে গেল। সকাল আটটা পর্যন্ত চৌমোকিকে খুঁজে না পাওয়ায় অভিযাত্রীরা তাকে ছাড়াই যাত্রা করার জন্য তৈরি হলেন। ঠিক তখনই অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড লক্ষিত হল। একদল সৈন্য পশ্চিমদিক থেকে দ্রুত পদে তাঁবুর দিকে এগোতে লাগল। কিছুটা অগ্রসর হতেই দেখা গেল, তিনজন ইংরেজ অফিসার কুড়িজন নিগ্রো সৈন্যকে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের একজন লেফটেনান্টের পোশাক পরিহিত। তিনি সোজা ক্যাপ্টেনের তাঁবুর সামনে এসে ঘোড়া দাঁড় করালেন।

লেফটেন্যান্ট নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, 'আমি লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর। বাসাকো থেকে আসছি। মাত্র কয়েক দিন দেরি হওয়ার জন্য শিকাগোতে আপনাকে ধরা সম্ভব হয় নি। যাক, এ চিঠিটা পড়লেই আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত হতে পারবেন।' কথা বলতে বলতে ক্যাপ্টেন মারসিনের দিকে একটা চিঠি এগিয়ে দিলেন।

চিঠিটা চোখের সামনে ধরতেই ক্যাপ্টেনের মুখ চকের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

চিঠিটা নিয়ে তিনি সরাসসি মঁসিয়ে বারজাকের তাঁবুতে এসে কোরকম ভূমিকা না করেই বললেন, 'দুঃখের সঙ্গে জানাছি, আপনাদের ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। তিনি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন শুনে মিস মোরনাস সচকিত হয়ে বললেন, 'সে কী, আপনি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন!' তার মুখ দেখে মনে হল আকস্মিক খবরটা তাঁকে খুবই মর্মাহত করে তুলেছে। কেবলমাত্র তিনিই নন, বারজাক ছাড়া সবার মুখেই নেমে এল বিষাদের কালো ছায়া!

ক্যাপ্টেনের প্রতি নির্দেশ এসেছে তিনি যেন টিম্বাকুতে চলে যান।

চিঠিটার ওপরে ঠিকানা লেখা ছিল—ফরাসি গণতন্ত্র, গভর্নর জেনারেল দ্য সেনেগাল, সার্কল দ্য বাসাকো।

চিঠিটার বক্তব্য মোটামুটি এরকম—ক্যাপ্টেন পিয়েরি সারমিনেকে কর্নেল কমান্ডিং লা সার্কল দ্য বাসাকোসেন্ট আবান নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি যেন যত শীঘ্র সম্ভব সিগো সিকারোতে রিপোর্ট করেন। আর ডিস্ট্রিক্ট কামান্ডারের কাছে তাঁরে রিপোর্ট করতে হবে। আর বলা হয়েছে, কলোনিয়্যাল ইনফ্রেন্টির কুড়িজন সুদানিজ স্বেচ্ছাসেবক লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর ক্যপ্টেন মারসিনের কার্যভার বুঝে নেবেন। নাইজারবেন্ডের এক্সট্রা পার্লামেন্টারি কমিশন চিফ বারজাকের নির্দেশে পরিচালিত হবে।

সাংবাদিক আমিদি ফ্রোরেন্স চিঠিটা নকল করে দিতে ব্যস্ত হলেন। এদিকে বারজাক চিঠিটা পড়েই রেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেলেন।

চিঠিটা আসল না জাল তা নিয়ে বারজাকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হল। তিনি এগিয়ে গিয়ে শিষ্টতা বজায় রেখে লেফটেন্যান্টকে লক্ষ্য করে বললেন, 'একটা কথা, হঠাৎ এমন অদ্ভুত চিঠি পাঠাবার কারণ কি, বলুন তো?'

'তৌয়ারে আউলিমেদেনরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তাই টিম্বাকুতে সৈন্য সংখ্যা বাড়ানো দরকার হয়ে পড়েছে। আর আমাদের সৈন্য সংখ্যা কুড়িজন হলেও ভয়ের কোনই কারণ নেই। সবচেয়ে বড় কথা এ-অঞ্চলটা নিরুপদ্রব।'

'দেখুন,আর যাই বলুন না কেন, নাইজার কিন্তু মোটেই উপদ্রবশূন্য নয়।'

'এক সময় ছিল বটে। কিন্তু এখন তো খুবই শান্ত।

বারজাক বললেন, 'আপনার কথা আমি অন্তত মানতে পারছি না।'

কথোপকথন আর বেশি দূর অগ্রসর হল না। বারজাকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যাপ্টেন ওপরওয়ালার হুকুম তামিল করার জন্য যাত্রা করলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই শো খানেক অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তিনি বনের মধ্যে অদৃশ্য হলেন।

* * *

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স দিনলিপির পাতায় লিখেছেন—সেদিনই সন্ধ্যার কথা। তাদের সঙ্গে করে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করতে মনের দিক থেকে তিনি তিলমাত্র উৎসাহও পাচ্ছেন না। তা সত্ত্বে তাকে যেতেই হচ্ছে। অনুমান করছেন হাড়িকাঠে মাথা দিতে চলেছেন বটে। কিন্তু বিপদটা যে কি ধরনের সে সম্বন্ধে ধারণা করতে পারছেন না। বিপদের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য চোখ-কান সর্বদা সজাগ রাখতে হচ্ছে।

সঙ্গে করে তিনি কাদের নিয়ে চলেছেন? যেসব সশস্ত্রপ্রহরী এসেছে, অভিযাত্রীদের বিপদ থেকে রক্ষা করার কাজে যারা নিযুক্ত তারাই বা কারা? তাদের প্রকৃত পরিচয় কী? আমিদি ফ্লোরেন্সের নিশ্চিত ধারণা, তারা দুষ্কৃতকারী। লুঠতরাজ, ডাকাতি করাই তাদের একমাত্র লক্ষ। রহস্যময় চিঠিটা যে কর্নেল সেন্ট অবানেরই লেখা তাতে কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই যদি হয় তবে তার ভয়ের কি থাকতে পারে? তবে কুড়িজন নতুন সশস্ত্রপ্রহরী আর তাদের কমান্ডারকে দেখে তার মধ্যে কেন যে আতঙ্কের সঞ্চার হচ্ছে নিজেই বুঝতে পারছেন না।

সত্যিই কি তারা সেনাবিভাগের লোক? এন. সিও সার্জেন্ট দুজন যে সেনাবিভাগেরই লোক এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু নিগ্রো সেনাদের মুখের আদল দেখলেই মনে হয় তারা নিষ্ঠুর জানোয়ার ছাড়া কিছু নয়।

আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার মনের মধ্যে খচখচানি শুরু হয়ে গেল। যারা পনের দিন ক্রমাগত পথ চলেছে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ এমন কেতাদুরস্থ কি করে থাকতে পারে। পরিষ্কার মনে হচ্ছে সদ্য ভাজ ভেঙে পোশাক গায়ে চাপিয়েছে। এ ব্যাপারটাও কম রহস্যের উদ্রেক করছে না। কেবলমাত্র পোশাক পরিচ্ছদই নয়, চোখমুখেও তিলমাত্র অবসাদের ছাপ নেই।

লেফটেন্যান্ট বড্ড বেশি চাকচিক্য বজায় রেখেছেন। একই পথ পাড়ি দিয়ে সাগরেদের পোশাক যেখানে ধুলোয় মাখামাখি সেখানে তিনি এমন কেতাদুরস্ত কি করে রইলেন?

এবার সার্জেন্ট দুজনের প্রসঙ্গে আসা যাক। তাদের গায়ে সেনাবাহিনীর পোশাক হলে বেশ কয়েক জায়গায় ছেঁড়া-ফাঁটা। অন্যের পোশাক জোর করে পড়ালে যে দশা হয় এ ক্ষেত্রে যেন ঠিক তাই হয়েছে।

আমিদি ফ্লোরেন্স ভাবছেন, তাঁর অনুমান ভ্রান্তও হতে পারে। কিন্তু বিচার বিবেচনা দ্বারা তিনি যেটুকু বুঝতে পেরেছেন তাই দিনলিপির পাতায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

www.pathagar.com

সশস্ত্রবাহিনীতে যারা রয়েছে তারা তিনটা দলে বিভক্ত হয়েছে। কুড়িজন নিগ্রো স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে প্রথম দলটাতে। আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে, তারা কেউ-ই কারোর সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। ব্যাপারটা কিন্তু নিগ্রোদের স্বভাব বিরুদ্ধ। মুখ বুজে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কথা না বললেও সার্জেন্ট দুজনকে অস্বাভাবিক সমীহ, সমীহ বললে ভুলই হবে, ভয় করে বলাই ভালো।

এন.সি.ও. সার্জেন্ট দুজন রয়েছেন দ্বিতীয় দলটাতে। কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যে তাঁরা দু-চারটে কথা বলে। তাও আবার খুবই চাপা স্বরে—ফিসফিসিয়ে।

লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর নিজে রয়েছেন তৃতীয় দলটাতে। চেহারা ছবি খুব একটা লক্ষ্যণীয় নয়। তবে স্বীকার করতেই হয়, খুবই ডাকসাইটে অফিসার। জঙ্গলে সঙ্গদানের জন্য এমন একজনকে সঙ্গে রাখতে সাংবাদিক মোটেই উৎসাহী নয়। সারাটা দিন মিস মোরনাস আর চৌমোকি কাউকেই দেখা যায় নি।

পঁচিশে ফেব্রুয়ারি। সকাল থেকে সবাই তাঁবুর ভেতরেই শুয়ে বসে কাটাতে লাগল। গতকাল তো বিশ্রাম নেওয়াই হয়েছে। আবার আর একদিন বিশ্রামের দরকার কি? ব্যাপারটা রহস্যের সঞ্চার করল।

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স বিশ্রামের ব্যাপারটা নিয়ে লেফটেন্যান্টকে জিজ্ঞাসা করে জবাব পেলেন, মঁসিয়ে বারজাকের হুকুম নাকি এরকমই।

মঁসিয়ে বারজক কেন অভিযান বন্ধ করে দিলেন? সশস্ত্র রক্ষীর সংখ্যা কমে গিয়ে এক পঞ্চামাংশ হয়ে পড়ার জন্যই কি তিনি এ-পথ বেছে নিতে বাধ্য হলেন? সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স বিভ্রান্তিতে পড়ে গেলেন। তাঁর কাজ শিকেয় উঠল। শেষপর্যন্ত তার সামনে হাজির হলেন, আমার কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্যে কাটিয়ে এক সময় মুখ খুললেন, 'দেখুন ব্যাপারটা নিয়ে আপনি দ্বিতীয়বার বলুন তো? তবে আপনার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে আমার দ্বিধা নেই। দেখুন, অভিযান চালিয়ে গেলে লাভ কিছুই হবার নয়, আপনি কি বলেন? আর এত কম সংখ্যক রক্ষী নিয়ে জঙ্গলে চলাফেরা করা কি নিরাপদ, বলুন?'

সাংবাদিক ভদ্রলোক বললেন, 'তবে এও তো সত্য এর চেয়ে কম সংখ্যক রক্ষী নিয়ে অভিযান চালিয়ে সাফল্য লাভ করেছে, জানেন তো?'

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স ভাবলেন, সুযোগ যখন পাওয়া গেল তখন তার সদ্ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এবার সদ্য আসা রক্ষী-বাহিনী নিয়ে আর অফিসারদের নিয়ে তাঁর উদ্বেগের কথা মঁসিয়ে বারজাকের কাছে তুলে ধরলেন।

ধৈর্য ধরে শুনে মঁসিয়ে বারজাক বললেন, 'আপনার অনুমান অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে কর্নেল আবানের চিঠিটা জাল নয়। স্বাক্ষরটা যে তারই তা ক্যাপ্টেন মারসিনে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন।

'এমনও তো হতে পারে সেটা তার অজান্তে, মানে চুরি করে—'

'সৈন্যদের হাত থেকে কর্নেল আবান-এর চিঠিটা কেড়ে নিতে গেলে লড়াই অনিবার্য ছিল। যারা এখানে এসেছেন তাদের গায়ে লড়াইয়ের চিহ্ন, মানে জখম বা রক্তের ছোপ অবশ্যই থাকত, ঠিক কিনা? আর যদি তা হত তবে সে খবর কর্নেলের কানে পৌছতে দেরি হত না। তবে হ্যাঁ, আগন্তুক সার্জেন্টদের গায়ের ময়লা, ছেঁড়াফাঁটা পে'শাকের কথা অবশ্য আপনি উল্লেখ করতে পারেন। ভেবে দেখুন তো, ক্যাপ্টেন মারসিনের

www.pathagar.com

সার্জেন্টরাও কি এরকম পোশাক ব্যবহার করত না? জঙ্গলে চলাফেরা করতে গেলে পোশাকের একরম হাল হওয়াটাই তো স্বাভাবিক, ঠিক কিনা?'

'সবই বুঝলাম। কিন্তু লেফটেন্যান্টের গায়ের পোশাক কি করে ঝকঝকে চকচকে রয়ে গেল?'

'যারা কেতাদুরস্ত থাকতে পছন্দ করেন তাদের পক্ষে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তিনি ব্যাগে করে ধোলাই করা পোশাক নিয়ে এসেছিলেন, সম্ভব কিনা? যাকগে, কাল যাত্রা করার ব্যাপারে আপনার কোনো আপত্তি আছে?'

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স বললেন, 'ঠিক আছে, তাই করুন। কিন্তু সেখানে গিয়ে ফায়দা কিছু হাবার নয় জেনেও কেন যে আপনি—'

তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বারজাক বলে উঠলেন, 'এ পরিস্থিতিতে অভিযান চালিয়ে যাওয়া নিতান্তই দরকার।' তারপর গলা নামিয়ে বললেন, 'আমিও ভালই জানি, অসভ্য জঙ্গলিদের ভোটাধিকার দান করে ফায়দা কিছুই হবার নয়। নেহাৎ আপনি বলেই কথাটা বললাম, চেম্বারে কিন্তু এরকম কথা অবশ্যই বলব না। আর দেখবেন, বদ্রিয়ার্স আমার ঠিক বিপরীত বিবরণ দান করবেন। কমিশন দুটো বিবরণ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে। পরিণামে দেখা যাবে, তারা আমার সম্মানার্থে হয়ত বা জনা কয়েক নেটিভ ভোটার তৈরি করবে। ব্যস, আসলে ফল কিছুই হবে না। সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই সবার মন থেকে ব্যাপারটা মুছে যাবে। তবু অভিযান মাঝপথে বন্ধ করে ফিরে গেলে বিরুদ্ধপক্ষরা আমার আদ্যশ্রাদ্ধ করে ছাড়বে। মনে রাখবেন সাহেব, রাজনীতিতে একটা কথা হচ্ছে, ভুল করলেও তা স্বীকার না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

আর যাই হোক, সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স বারজাকের অভিমত জানতে পেরেছেন।

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স বারজাকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে আসার পথে পঁসির তাঁবুতে উঁকি দিয়ে দেখেন ভেতরে কেউ নেই। ছোট্ট একটা ভাঁজকরা টেবিলের ওপর কয়েকটা কাগজ এলোমেলো ভাবে পড়ে রয়েছে। তার একটাতে পি.কে.সি ১৩৫.০৮, পি.জে. ০.০০৯ আর ম. ৭৬১৮ প্রভৃতি লেখা।

রহস্যজনক তথ্যগুলির অর্থ তিনি বুঝতে পারলেন না। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে মমার্থ করে নেওয়ার আশায় নোটবই বের করে ঝটপট সেগুলো কপি করে নিলেন।

বিকেলের দিকে টোনাগানেকে নিয়ে তাঁবু থেকে অদূরবর্তী এক ফাঁকা জায়গায় পায়চারি করতে লাগলেন। এক সময় চরম বিতৃষ্ণার সঙ্গে টোনাগানে বলে উঠল, 'বেইমান কাহিকার! মৌরোলিরে। চৌমৌকিও কম যায় না। জোর কদমে না হাঁটার জন্য কুলিদের গোপনে সোনার টাকা আর মদ দিত।

টোনাগানেকে একটা ফরাসি সোনার মোহর বকশিস স্বরূপ দিয়ে বড় রকমের একটা কাজ হাসিল করতে পারলাম। সেটা হাতে পাওয়া মাত্র সে রীতিমতো উল্লাসিত হয়ে পড়েন। মোড়ানো একটা কাগজ বের করতেই সাংবাদিক সাহেব বিস্ময়ের হতবাক হয়ে পড়লেন। আমারই লেখা প্রবন্ধ। চতুর্থ থেকে যে ক'টা প্রবন্ধ চৌমৌকিকে দিয়েছিলাম সবই জমিয়ে রেখেছে। ঠিকানা অনুযায়ী পত্রিকার দপ্তরে একটাও পাঠায়নি।

পথ চলতে চলতে পথের ওপর অদ্ভুত সে দাগ আবারও নজরে পড়ল। ক্যানক্যানেতে রহস্যজনক আওয়াজ শোনার পর যে-দাগ দেখেছিলাম এগুলোও ঠিক

www.pathagar.com

সেরকমই। কিসের আওয়াজ? কেনই বা মাটিতে এরকম গাড়ি চাকার মতো দাগের সৃষ্টি হয়, উভয়ের মধ্যে কি-ই বা সম্পর্ক কিছুই অনুমান করা গেল না। ভয়ডর কাকে বলে তিনি জানেন না। বুকের ধুকপুকানি কিন্তু অব্যাহতই রইল। টোনাগানের কথাটা শোনা মাত্র বাজপড়া রোগীর মতো নীরবে তার মুখের দিকে সাংবাদিক তাকিয়ে রইলেন।

সে বলল, 'লেফটেন্যান্টের কথাবার্তা হাবভাব কিন্তু মোটেই ভালো না।'

কিছু না ভেবেই ফ্যাকাসে মুখে তার কথায় সম্মতি জানাতে গিয়ে সাংবাদিক সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই।'

সতেরোই ফেব্রুয়ারি অভিযাত্রীরা বনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে চললেন। চৌমৌকি দলে অনুপস্থিত। কুলিদের মধ্যে মুহূর্তের জন্য বাক্যালাপ লক্ষিত হল না।

লেফটেন্যান্ট বারজকের পাশাপাশি চলছেন। মিস মোরনাসের লেফটেনান্টে এর সঙ্গ ভালো না লাগায় তিনি সেন্ট বেরেনের কাছাকাছি পাশাপাশি হাঁটছেন।

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স সবকিছুর মধ্যে যেন অনিশ্চিত বেইমানির গন্ধ পাচ্ছেন। কিন্তু কেন তা তিনি নিজেও ভালো জানেন না।

সকাল ন'টার কাছাকাছি অভিযাত্রীরা জঙ্গলিদের একটা গ্রামে হাজির হল। গ্রামটার ভেতরে একটা ঝুপড়ির দরজার কাছাকাছি পৌঁছেই তাঁরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দুটো মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। রক্তে মাখামাখি। আর একজন জখমি বুড়ো নিগ্রো অসহ্য যন্ত্রনায় মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। গায়ে বেশ কয়েকটা ক্ষত দিয়ে তিরতির করে রক্ত ঝরছে। মৃতদেহ দুটোর গায়ে ইয়া বড় বড় ক্ষতচিহ্ন রয়েছে দেখা গেল।

ডক্টর চেতোন্ন ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে জখমি বুড়োটার ক্ষতের চিকিৎসায় মেতে গেলেন। ঔষধ দিয়ে পট্টি বেঁধে দেওয়ায় বুড়োটার যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হয়েছে মনে হল।

বুড়োটা একটু সুস্থ হয়ে যা বলল তা মোটামুটি এরকম—ঠিক দুদিন আগে, অভিযাত্রীদের প্রহরী বদল হওয়ার তিনদিন পরে একদল নিগ্রো সৈন্য নাকি তাদের ওপর জোর হামলা চালায়। দুজন শাদা চামড়ার অফিসার তাদের নেতৃত্ব দেয়। তারাই তাদের এ-হাল করে দিয়ে গেছে। গ্রামের অসহায় মানুষগুলো সেই যে গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলের দিকে ধাওয়া করেছে আজও তাদের হদিস নেই।

বুড়োর কথায় সাংবাদিকের শরীরের সব ক'টা স্নায়ু এক সঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠল। আজানা ভয় তাঁকে পেয়ে বসল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই একজন সার্জেন্টের দিকে চোখ পড়ল। তিনি চোখ গরম করে আহত বুড়োটার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। আর এজন্যই বুড়োটার বাক্‌শক্তি মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেছে।

সাংবাদিকের বুকের ভেতরে খচখচ করতে লাগল। রহস্য! একের পর এক রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল। এসব রহস্যের কিনারা করা তাঁর পক্ষে কোনদিন সম্ভব হবে কিনা ভাবতে পারলেন না।

আঠারোই ফেব্রুয়ারি সকালে দেখা গেল সশস্ত্র রক্ষীরা উধাও হয়ে গেছে। রাতারাতি এতগুলো লোক বাতাসে উবে গেল নাকি? খোঁজ করে দেখা গেল, কেবল রক্ষীরাই নয়, পথপ্রদর্শক ও গাধার মালিক নিগ্রোরাও বে-পাত্তা হয়ে গেছে। আর? হ্যাঁ, আরও আছে। লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর, সার্জেন্ট দুজন উধাও হয়ে গেছে। একরম রহস্যের উত্তর কে দেবে?

www.pathagar.com

অভিযাত্রীরা নিজেদের কয়েকটা ঘোড়া, সামান্য ক'টা বন্দুক আর ছত্রিশটা গাধা নিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে নিদারুণ অসহায় বোধ করতে লাগলেন। আর কিছু খাবারদাবার অবশ্য সঙ্গে রয়েছে। এখন উপায়?

বারজাক কমিশনের সদস্যরা মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন। অকস্মাৎ একটা চাপা আর্তনাদ শুনে সবাই উর্দ্ধশ্বাসে সেদিকে ছুটতে লাগল। এগিয়ে যেতেই দেখা গেল আহত টোনগান ঝোপের আড়ালে পড়ে গোঙাচ্ছে। তার হাত-পা শক্ত লতা দিয়ে বাঁধা। অভিযাত্রীরা টোনগানের মুখে শুনল ভোরে চোখ মেলে তাকিয়েই সে দেখেছিল নিগ্রো সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়ে চম্পট দিচ্ছে। আর দুজন গাধার মালিক অদূরে কি যেন করছে। কৌতূহলের শিকার হয়ে সে লম্বা লম্বা পায়ে ব্যাপারটা দেখতে গিয়েছিল। দুজন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখে কাপড় গুঁজে দেয়। শক্ত লতা দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলে। ব্যস, দমাদম ঘা কতক বসিয়ে দেয়। কয়েক জায়গা দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। তারা পালিয়ে যাওয়ার সময় দশটা পিস্তল, সাতটা বন্দুক, এক ঝোলা কার্তুজ,কয়েকটা ঘোড়া ও গাধা আর সে সঙ্গে প্রায় এক পাউন্ড মূল্যের মালপত্র ফেলে যায়।

যাবার আগে লেফটেন্যান্ট রবার্টকে বললেন, 'একী আহাম্মকি কাজ হচ্ছে। সে আমাদের অনেক কিছুর সাথী! তাকে জ্যান্ত ফেলে রেখে যাওয়া উচিত হবে না। একেবারে খতম করে দিয়ে তবে—'

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই রাবার্ট বেয়োনেট চালিয়ে দিল টোনাগানকে লক্ষ্য করে। টোনাগানে আচমকা কাৎ হয়ে যাওয়ায় বেয়োনেটটা বুকের এক পাশ দিয়ে চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে গেল। ঝোপের আড়াল থেকে রবার্ট বা অন্যান্যরা ভাবল, কাজ হাসিল। তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে দিকে এগিয়ে গেল।

অভিযাত্রীরা নিঃসন্দেহ ল্যাকোরে তাঁর দলবল নিয়ে চিরদিনের মতো চম্পট দিয়েছেন।

এবার তাঁরা তিন লক্ষ কড়ির বিনিময়ে ছত্রিশটা গাধা বিক্রি করে দিলেন। কড়ির বিনিময়ে পথপ্রদর্শক ও মাল বহনের জন্য আবার নিগ্রো কুলি সংগ্রহ করা হল। চিকিৎসার মাধ্যমে টোনগানকে সুস্থ করে তোলা হল।

বারজাক অভিযাত্রীদের নিয়ে এক সভা করলেন। সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন 'আপনারা বুঝতেই পারছেন সমুদ্র উপকূল থেকে বহুদূরে আমাদের অসহায় অবস্থায় ফেলে তারা সরে পড়েছে। আমরা এখন অবস্থান করছি সমুদ্র উপকূল ও সুদানের মাঝামাঝি কোনো এক স্থানে। পঁসি পকেট থেকে নোটবই বের করে, একটা পাতায় চোখ বুলিয়ে বললেন, 'এখান থেকে কোনাক্রির প্রায় নশো মাইল দূরে আমরা এখন রয়েছি। সবার আগে আমাদের কর্তব্য নিকটতম কোনো ফরাসি ঘাটিতে হাজির হওয়া।' বারজাক বললেন, 'সায়ে, নাইরের অন্তগর্ত জায়গাটা। সেখানে যদি যাওয়া যায়—'

'এখান থেকে সায়ের দূরত্ব কম করেও পঁচিশ মাইল। প্রতি পদক্ষেপে পঁচিশ ইঞ্চি গেলে পঁচিশ মাইলের জন্য আমাদের এক লক্ষ এগার হাজার এক শ' এগারোবার পা ফেলতে হবে।'

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'ব্যাপারটাকে আরও বেশি জটিল করে তোলা হচ্ছে নাকি? বললেই তো হয় প্রতিদিন দশ মাইল করে পাড়ি দিলে লাগবে তিপ্পান্ন দিন। আর যদি প্রতিদিন সাড়ে বারো মাইল যাওয়া যায় তবে

www.pathagar.com

চল্লিশ দিনে পথটুকু পাড়ি দেওয়া যাবে। তার চেয়ে বরং চলুন, সিকোরোতেই যাওয়া যাক। দূরত্ব এক শ' মাইল।'

'কেন? সিকাসাতে ফিরে গেলে। দূরত্ব মাত্র বিশ মাইল।'

'তাতে ফল হবে, অভিযান ব্যর্থ হয়েছে বলে সবাই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে। দেখুন আজ পর্যন্ত শত্রুরা আমাদের শাসিয়েছে, ভয় দেখিয়েছে। এর পর কিন্তু মোক্ষম ব্যবস্থা করবে।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভেবে বারজাক বললেন, 'বহুৎ আচ্ছা। সিকাসাতে ফিরে যেতে আমি রাজি। তবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে সিগৌ-সিকোরোতে যাওয়া অভিযান শেষ না করে ফিরে যাওয়ার কথা কেউ তুললে, আমাদের বক্তব্য থাকবে সরকার শেষ অবধি প্রহরীর ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন নি। আমাদের অক্ষমতা নয়, সরকারের দোষেই—।

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মিস মোরেনাস বললেন, 'দেখুন, আপনারা যা ভালো মনে করেন করতে পারেন। আমরা গন্তব্য স্থলে যাবই।' সৈন্য বা পথপ্রদর্শক পাব এরকম আশা নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরোই নি। পথে কুলি পেলে ব্যবস্থা করে নেব। তবে জানবেন, অদৃশ্য শত্রুদের ক্ষোভ আপনাদের ওপর নয়, পুরোটাই আমাদের ওপর। আমি কতর্ব্য সম্পাদন করতে চলেছি। একটা কথা আজ স্বীকার করা দরকার মনে করছি—'আমি এতদিন আপনাদের কাছে মিথ্যা কথা বলেছি। আমি এক ইংরেজ মহিলা। জেন ব্লেজন আমার নাম। আর মঁসিয়ে সেন্ট বেরেন জাতে ফরাসি। আপনাদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। আমার বাবা লর্ড ব্লেজন। ক্যাপ্টেন ব্লেজন আমার দাদা। সে কৌবার কাছে কবরে চির শান্তিতে বিরাজ করছে। অতএব বুঝতেই পারছেন, আমাকে কৌবায় যেতেই হবে।'

জেন ব্লেজন এতদিন তাঁর আফ্রিকায় যাওয়ার আসল কারণ সবার কাছে ব্যক্ত করলেন। বললেন 'কুৎসা আর কটূক্তিতে তাঁর বাবার মাথাকাটা যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। বুকের পাঁজরের সমান ছেলের অপকর্মের কথা শুনে লজ্জায়, ঘৃণায় আর অপমানে আজ ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছেন। দাদার নামে মিথ্যা অপবাদ ঘোচাবার জন্য বোন জীবনপণ করে পথে নেমেছেন।'

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স বললেন, 'আপনি আর কাউকে না পান অন্তত আমাকে আপনার দুর্গম অভিযানের সঙ্গী হিসাবে অবশ্যই পাবেন মিস ব্লেজন। আপনি তো জানেনই আমার পেশা সাংবাদিকতা। ব্লেজন কেসের মতো চাঞ্চল্যকর খবরের লোভ সম্বরণ করা আমার পক্ষে কি সম্ভব, বলুন। পত্রিকার সম্পাদক প্যারিসে আমার খবরের প্রত্যাশায় বসে। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমি হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছি জানতে পারলে তিনি কি আমাকে ছেড়ে কথা বলবেন, বলুন?'

ডাক্তারও তাঁদের সঙ্গদান করার জন্য স্বেচ্ছায় সম্মত হলেন।

বারজাক দেখলেন, এক এক করে সবাই মিস ব্লেজনের দিকে ভিড়ছেন। অতএব তিনিও সম্মতি জ্ঞাপন করতে গিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে আমরা সবাই তবে নাইজারের ভেতর দিয়ে কৌবা যাচ্ছি।'

* * *

অভিযাত্রীরা নতুন করে যাত্রা করার ব্যাপারে এক মতো হলেন। গ্রামের মুখিয়ার সহায়তায় দুজন নিগ্রো কুলি জোগাড় হয়ে গেল।

www.pathagar.com

চব্বিশে ফেব্রুয়ারি ভোরে বারজাক কমিশন আবার পথে নামল।

পাঁচদিন পথ চলে তাঁরা নব্বই মাইল পথ পাড়ি দিলেন। রাত্রি কাটানোর জন্য জঙ্গলের ভেতরেই একটা খোলামেলা জায়গায় তাঁরা তাঁবু ফেললেন। কয়েক পা ঘোরাফেরা করে বোঝা গেল যে কোনো এক দল এখান থেকে তাঁবু তুলে যাত্রা করেছে। কারা? সাদা চামড়ার মানুষ, নাকি কালো চামড়ার নিগ্রো। হঠাৎ একটা বোতাম কুড়িয়ে পেলে সবাই নিঃসন্দেহ হল, সভ্য মানুষরাই এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। আর তারা একই দিকে গেছে—পায়ের ছাপ প্রমাণ দিচ্ছে।

অকস্মাৎ দুটো ঘোড়া মৃত আবিষ্কার করা হয়েছে। ডক্টর চেতোন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বুঝলেন দুটো ঘোড়াকেই বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে। ব্যাপারটি গভীর উৎকণ্ঠা ও রহস্যের সঞ্চার করল সন্দেহ নেই। কিন্তু কে বা কারা এমন ন্যাক্কারজনক কাজটা করেছে বহু চেষ্টা করেও তা আবিষ্কার করা সম্ভব হল না। অবশিষ্ট পাঁচটা ঘোড়া সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হল।

অভিযাত্রীরা পাঁচ তারিখ দিনভর পথ চললেন। দু-তারিখের প্রায় পুরো দিনটা হতাশা আর হাহাকারের মধ্য দিয়েই কেটে গেল। কোনো গ্রামই চোখে পড়ল না। শেষপর্যন্ত ছ' তারিখে দুপুরের দূরবর্তী একটা গ্রাম অভিযাত্রীদের চোখে পড়ল। গ্রামবাসীরা তাঁদের প্রতি মোটেই ভালো ব্যবহার করল না।

সাতই মার্চ ভোরে অভিযাত্রীরা আবার যাত্রা করলেন। বিষক্রিয়ায় আর একটা ঘোড়া মারা গেল। ডক্টর চেতোন্ন বললেন, 'এত সতর্কতা সত্ত্বে কি করে ঘোড়াকে বিষ খাওয়ানো হচ্ছে, হয়ত আপনারা ভাবছেন। আমি বলব, সব কয়টা ঘোড়াকেই একই সঙ্গে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল। সবার প্রতিরোধ শক্তি সমান নয়। আশঙ্কা করা হচ্ছে দুদিন আগে আর পরে সবক'টা ঘোড়াই মরবে।'

আটই মার্চ খাবারের পরিস্থিতি দেখে অভিযাত্রীরা চমকে উঠলেন। দেখলেন, যা খাবার আছে তাতে মাত্র আর একটা দিন কোনোরকমে চলবে, ব্যস, তারপরই শুরু হবে লাগাতার উপবাস। যাত্রা করল পর কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা গ্রাম পাওয়া গেল বটে। কিন্তু জনমানব শূন্য। আরও একটু এগোতেই উৎকট গন্ধ নাকে এল। নিগ্রোদের মৃত দেহ পড়ে রয়েছে। পচা-গলা নিয়ে মোট দশটা মৃদেহ। গুলি করে মারা হয়েছে।

সাংবাদিক ফ্লোরেন্স চমকে উঠে বললেন, 'এসব নতুন সৈন্য নিয়ে যাত্রা করার আগে একজন নিগ্রোর কাধে যে বুলেটের দাগ দেখেছিলাম এটাও সেই—একই বুলেট।'

গ্রামে ঢুকে দেখা গেল তুমুল লড়াইয়ের ফলে হামলাবাজরা গ্রামটা একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—কারা? ঘোড়ায় চড়ে যারা দশদিনের পথ এগিয়ে রয়েছে তাদের নাগালের মধ্যে পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

জঙ্গলের ভতেরই খোলা জায়গায় অভিযাত্রীরা তাঁবু টাঙিয়ে রাত্রি কাটালেন। সামান্য খাবার দিয়ে সবাই পেটের জ্বালা নিভিয়ে বাকি খাবারটুকু রেখে দেওয়া হল ভবিষ্যতের জন্য।

বাকি দুটো ঘোড়া দশই মার্চ পৃথিবীর ছেড়ে চেলে গেল। একে খাবারদাবার ফুরিয়েছে তার ওপর আবারও একটা ঘোড়া মারা গয়েছে আর কুলি দুজনও সুযোগ বুঝে সটকে পড়েছে।

www.pathagar.com

ব্যস, ব্যাপার দেখে সবাই মনমরা হয়ে গেছে। জেন ব্রেজন সবচেয়ে মর্মাহত হয়ে পড়েছেন। ভাবলেন, তার জন্যই তো এতগুলো মানুষ এমন দুর্গতির মুখোমুখি হয়েছেন।

আলোচনার মাধ্যমে শেষপর্যন্ত সাব্যস্ত হল কুলি যখন সব কজনই পালিয়েছে তখন মালপত্র টানাটানি করা সম্ভব নয়। পড়ে থাক। সঙ্গে অর্থ-কড়ি রয়েছে। যখন, যেখানে, যা কিনতে পাওয়া যায় তা দিয়েই ঠেকা কাজ চালিয়ে যাওয়া যাবে।

বারোই মার্চ অভিযাত্রীরা নতুন একটা গ্রামে হাজির হলেন। এখানকার বাসিন্দাদের ওপরেও হামলা হুজুতির লক্ষণ দেখতে পেল। এতএব সাহায্য পেতে হলে নাইজারই একমাত্র সম্বল। তার আগে কোনো সুবিধাই হবার নয়।

গ্রামের নিগ্রো অধিবাসীরা সভ্য মানুষের ওপর রেগে একদম কাঁই হয়ে রয়েছে। ফলে অভিযাত্রীরা সামান্য পানীয় জলও তাদের কাছ থেকে পেল না।

অভিযাত্রীরা এত কষ্টেও এতটুকু দমলেন না। অভিযান চালিয়ে যেতে লাগলেন। পেটের জ্বালা সইতে না পেরে বারজাক ফরাসি সরকারের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে লাগলেন। আর মিস ব্রেজনের মুখ ফ্যাকাসে। টু-শব্দটিও নেই। আসলে নিজের খিদে-তেষ্টার জ্বালার সঙ্গে সহযাত্রীদের দুর্ভোগের জন্য অনুশোচনা প্রভৃতির জন্যই তার এরকম আকস্মিত নীরবতা।

বারোই মার্চ সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্সের মনে দানা বাঁধা সন্দেহটা হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বিষ খাইয়ে ঘোড়াগুলোকে মারা, গুলি করে মানুষ মারা একের পর এক জঙ্গলিদের গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া, সদ্য তাঁবু তুলে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন, দূরে মিলিয়ে যাওয়া ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ, ঝোপের আড়াল থেকে ভেসে আসা মানুষের অনুচ্চ কণ্ঠের কথাবার্তা, আচমকা অন্ধকারের ছায়ামূর্তির আবির্ভাব মুহূর্তে মিলিয়ে যাওয়া প্রভৃতি সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্সের মনে গভীর রহস্যের সঞ্চার করল। তাই তার মধ্যে ধারণা আরও পাকা হল যে, লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর এবং তাঁর অধীনস্থ দুজন শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট আর কুড়িজন নিগ্রো সৈন্যের যে দল রয়েছে ঠিক এরকমই অন্য আর এক দল এর পেছনে গোপনে কাজ করে চলেছে। আর তারা লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর এখানে আসার আগে থেকে কাজ করছে। বারজাক তার এরকম ধারণার কারণ জানতে চাইলে তিনি খোলসা করেই বললেন, 'দলে আগেকার সৈন্য দল পরিবর্তে কুড়িজন সৈন্যের নতুন দল আসার পর মানুষ খুনের যে প্রথম দৃশ্য চাক্ষুষ করেছিলাম পর পর একই দৃশ্যের মুখোমুখি আমাদের হতে হয়েছে। অতএব সবই একই দলের কারসাজি। আমি সবকিছু বুঝেও না বোঝার ভান করে রয়েছি। মুখ খুলি না যাতে আপনারা আরও বেশি আতঙ্কিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে না পড়েন।'

মিস ব্রেজনের বহু আকাঙ্ক্ষিত সমাধি ক্ষেত্রের কাছাকাছি অভিযাত্রীরা পৌঁছে গেছেন। অতএব এত কষ্ট স্বীকারের পরও যদি সব কিছু ভেস্তে যায় তবে আর আক্ষেপের সীমা থাকবে না। শত্রুপক্ষ আজ অবধি তাদের মুখোমুখি হয় নি। প্রায় শেষমুহূর্ত উপস্থিত। এবার অবশ্যই গোপন অন্তরাল ছেড়ে মুখোমুখি হবে।

সকাল দুটা নাগাদ সবাই টৌনাগানে এর পিছন পিছন সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। হায়! কবর তো দূরের কথা, কবরের চিহ্নও দেখতে পেলেন না। টৌনগান কিন্তু নিঃসন্দেহ, এটাই সমাধিক্ষেত্র, মিস ব্রেজনের বাঞ্ছিত সামধিক্ষেত্র। সবাই উম্মাদের মতো মাটি খুঁড়তে শুরু করল। সামান্য খোঁড়াখুঁড়িতে কয়েকটা হাড়ের টুকরো বেরিয়ে এল।

www.pathagar.com

তারপর একটা নরকাঙ্কাল। নিখুঁত পাঁজরের ওপর একটা থলে। তাতে বিবর্ণ একটা চিঠি। জর্জ ব্রেজনকে লেখা বোনের চিঠি। উন্মাদিনীর মতো কাগজটা হাত দিয়ে তুলতেই গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেল।

মিস ব্রেজনের অনুরোধে ডক্টর চেতোন্ন কঙ্কালটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দিলেন, "আমি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব মেডিসিন লরেন্স চেতোন্ন পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দিচ্ছি যে, এর নরকঙ্কালের গালে পিস্তল বা বন্দুকের গুলির চিহ্ন অনুপস্থিত, পিঠে ছুরিকাঘাত করে লোকটাকে খুন করা হয়েছে। বাঁ দিকের কাঁধের পাশ দিয়ে ছুরির ফলাটা ঢুকে হৃদযন্ত্রে আঘাত হেনেছিল। আর ছোরার ফলাটা এখনও হাড়ের ফাঁকে গেঁথে রয়েছে।"

মিস ব্রেজন ডক্টর চেতোন্নর কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'খুন করা হেয়ছে? পিছন দিক থেকে খুন করা হয়েছে? তবে আমার দাদা নিরপরাধ! সৈন্যদের বন্দুরেক গুলিতে নয়, ছুরির আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, সৈন্যরা ছোরা ব্যবহার করে না। দয়া করে একটা সার্টিফিকেট লিখে দেবেন।'

ডক্টর চেতোন্ন তাঁকে সমর্থন করতে গিয়ে বললেন, 'অবশ্যই।' নোটবইয়ের পাতায় ডক্টর চেতোন্ন সার্টিফিকেট লিখতে বসলেন।

ছোরার হাতলটা দীর্ঘদিন মাটিচাপা পড়ে থাকায় তার হাতলের গায়ে লেখা কেবল ইংরেজি হরফ 'আই' এবং 'এল'ই পড়া যাচ্ছে। ব্যস, আর সবমাটি আর জলে নষ্ট হয়ে গেছে।'

হাতলটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মিস ব্রেজন দাঁতে দাঁতে চেপে বলে উঠলেন, 'এ অক্ষর দুটোকে দিয়েই গুপ্তঘাতককে খুঁজে বের করা যাবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতেই হবে।'

অভিযাত্রীদের এবার গন্তব্যস্থল কৌবো। শত্রুদের চোখে ধুলো দিতে পেরে অভিযাত্রীরা রাত্রি গভীর ঘুমের মধ্যে ডুবে রইলেন। এদিকে, তাই পশ্চিম দিকে অদূরে যে মিট মিট করে কয়েকটা আলো জ্বলছে তা কারোর নজরে পড়ল না। আবার পূর্বদিকেও দেখা গেছে অধিক উজ্জ্বল কয়েকটা আলো। তাও তাদের অজ্ঞাতেই রয়ে গেছে। মোদ্দা কথা, অন্য সব দিনের মতো কেউ-ই সতর্ক ছিলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলোগুলো এগিয়ে আসতে আসতে এক সময় অভিযাত্রীদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। এবার সেই অদ্ভুত ও রহস্যসঞ্চারকারী গর্জন, যে গর্জন ক্যানক্যানেতে শুনতে পেয়েছিল—সেই বুক-কাঁপানো গর্জন ক্রমে কাছে এগিয়ে আসতেই অভিযাত্রীদের ঘুম ভেঙে গেল। সাবই হুড়মুড় করে উঠে বসলেন। ব্যাপারটা সম্বন্ধে তারা কোনো ধারণা করার আগেই আচমকা কয়েকটা গাট্টাগোট্টা লোক অভিযাত্রীদের ওপর চড়াও হল। এক এক করে সবাইকে মাথার ওপরে তুলে আছাড় মারতে লাগল।

অন্ধকারের মধ্য থেকে একজন গম্ভীরস্বরে বলে উঠল, 'ব্যস, এবার উঠুন, রওনা দেওয়া যাক।'

কাজ সেরে আক্রমণকারীরা চোখের পলকে গা-ঢাকা দিল।

---

www.pathagar.com

সিটি ইন দ্য সাহারা

পৃথিবীর প্রায় তিনলক্ষ বর্গমাইল এলাকা মরুভূমির অবস্থান। এ শতকের প্রারম্ভে আধুনিক মানচিত্রে এ জায়গাকে ফাঁকা দেখানো হয়েছে। বারজাক কমিশন যখন অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট স্বীকার করে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন এ মরুভূমি অতিক্রম করা তো দূরের ব্যাপার কেউ পদচিহ্নও আঁকেনি এর বুকে। আসলে সাহারা তখনো সভ্য মানুষের কাছে অজানা-অচেনা ছিল। তখন থেকে এ-অঞ্চলটাকে নিয়ে কতই না মজার মজার কল্পকাহিনী লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াত। কারো কারোর মুখে শোনা যেত, লকলকে আগুনের শিখা মুখ দিয়ে অনবরত নির্গত করতে করতে আগুন-পাখি মরুপ্রান্তরের ওপর দিয়ে চক্কর মেরে বেড়াতে দেখেছে। তার চোখ দুটো দিয়েও নাকি আগুনের শিখা ঠিকরে বেরতো। আবার লাল দৈত্যাকৃতি দস্যুরা নাকি দল বেঁধে মরুভূমির বুকের ওপর দিয়ে ছুটে যেত। আগুনে জ্বালিয়ে পুরিয়ে খাক করে দিত একের পর এক শহর। লুঠ করে আবার উল্কার বেগে ধেয়ে যেত মরুভূমির বুকে। মোট কথা মরুভূমি ছিল অপদেবতাদের নিশ্চিন্ত বাসস্থল। কেউ এ রহস্যভেদ করতে প্রয়াসীও হয় নি। সমগ্র নাইজার এবং মরুভূমির প্রান্তদেশ থেকে প্রায় একশো মাইল পর্যন্ত আজও অসহায় মানুষরা এমনি হাজারো গুজবে আতঙ্কিত বুকে শুনেছে। ভয় ভরে সিটকে থেকে এমনি করে কাটিয়েছে সহায়সম্বলহীন মানুষগুলো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আর বছরের পর বছর।

কিন্তু কেউ যদি দুঃসাহসের কাঁধে ভর করে মরুভূমির অভ্যন্তরে ঢুকে যেত তবে চমৎকার একটা শহর দেখে চোখ ও মনকে তৃপ্ত করতে পারত। শহর বলতে যা বুঝায় সবই তার রয়েছে। এর বয়স্ক অধিবাসীর সংখ্যা ছ'হাজার আটশো আট। কিন্তু ম্যাপে স্থান লাভ করার সৌভাগ্য এর হয়নি। সাহসে ভর করে যে কোনো অভিযাত্রী মরুর কেন্দ্রস্থলের দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানতে পারবে শহরটার নাম 'ব্ল্যাকল্যান্ড'।

আফ্রিকার জঙ্গলে যখন বারজাক কমিশন অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে পথ পাড়ি দিচ্ছিলেন, তখন ব্ল্যাকল্যান্ড শহরে অবস্থান করছে পাঁচ হাজার সাতশো আটাত্তর জন সাদা চামড়ার মানুষ। তাদের অধিকাংশই জেল পালানো কয়েদি আর এরকমই কোনো না কোনো অসামাজিক কাজে অপরাধী। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পালিয়ে এখানে এসেছে বলে তাদের জাত, ধর্ম ও ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। তবে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ইংরেজরা। তাই সরকারী কাজকর্ম সবই চলত ইংরেজিতে। ব্ল্যাকল্যান্ডে 'থান্ডার বোল্ড' নামে একটা দৈনিক সাংবাদপত্রও প্রকাশিত হত ইংরেজি ভাষাতেই। সংবাদপত্রটার রকমসকম কেমন অদ্ভুত প্রকৃতির ছিল, তা তার কয়েকটা সংখ্যার বক্তব্য পড়লেই সম্যক ধারণা করে নেওয়া সম্ভব। একটা সংখ্যায় ছাপা হয়েছে—নিগ্রো কোরোমোকো মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পাইপ আনতে ভুলে যাওয়ার জন্য জন অ্যান্ড্রু তাকে ফাঁসির কাঠে ঝুলিয়েছেন। আর একটা কাগজে ছাপা হয়েছে, 'কর্নেল হিরাম হার্বার্ট দশজন মেরিফেলোসহ হেলিপ্লেনে চেপে আগামীকাল সন্ধ্যা ছটায় কৌরসৌ ও বিডি

www.pathagar.com

যাচ্ছেন। তিন বছর বাদে ফের গ্রামের ওপর হামলা হুজ্জতি চালিয়ে, বেধড়ক হত্যা আর লুঠতরাজ চালিয়ে প্রচুর ধনদৌলত নিয়ে চম্পট দেবে।' আর একদিনের খবর—খবর পাওয়া গেছে বারজাক নামক এক ডেপুটির অধিনায়কত্বে কোনাক্রি থেকে অতি শীঘ্র এক ফরাসি অভিযাত্রী দল যাত্রা করছে। কমিশন সিকাসো ও ওখাদৌগৌয়ের ওপর দিয়ে নাইজারে যাবে। দুজন মেরিফেলো এবং বিশজন ব্ল্যাক গার্ড নিয়মিত কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে। পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড রুফুজের দলে যোগ দেওয়ার কথা, তিনি পদাতিক সেনাবাহিনীর একজন পলাতক সৈনিক। তিনি কৌশলে সুযোগ মতো লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর ছদ্মনামে বারজাকের অভিযাত্রীদের দলে ভিড়ে যাবেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে অভিযাত্রীরা যাতে নাইজারে পৌঁছতে না পারে, কৌশলে সে প্রয়াস চালিয়ে যাবেন।

কাউন্সিলর এ হল উইলিস ভাবলেন মেরিফেলো কনস্টানটিন বার্নাডের মাথার খুলির মধ্যে কয়েকটা কার্তুজ ঢুকিয়ে দিতে হবে। তাঁর মাথার খুলির ওজন এমনিতেই বেশি, তার ওপর কার্তুজের ওজন যোগ হলে সেটা অনায়াসেই রেড রিভারের জলে ডুবে যাবে। বার্নাডের পরিবর্তে গিলম্যান হিলিকে নতুন মেরিফেলো নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি জার্মানি, ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের আদালত থেকে সতেরো বার শাস্তি পেয়ে মোট উনত্রিশ বছর কারাগারে এবং পঁয়ত্রিশ বছর জাহাজের খোলের অন্ধকারে কাটানোর শাস্তি পেয়েছিলেন। গিলম্যানক সিভিল বডি থেকে মেরিফেলোর বাড়িতে আনা হল।

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ব্ল্যাকল্যান্ড কেবলমাত্র চিফ এবং জনা কয়েককে ছাড়া কাউ-কই পদবি অনুযায়ী সম্বোধন করা হবে না। একমাত্র 'চিফ'ই পদবি জানবেন। তাই খবরগুলোতে কেবলমাত্র পদের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। চিফের এক নাম অবশ্যই আছে। সে নাম শুনলেই বুকের ভেতরে ঢিবঢিবানি শুরু হয়ে যায়। ভয়ঙ্কর সে নামটা হচ্ছে—'হ্যারি কিলার'।

বারজাক কমিশনের অভিযান ব্যর্থ হওয়ার দশ বছর আগে হ্যারি কিলার এখানে আস্তানা গেড়েছিল। সে যে কোনো দেশের কোনো অঞ্চল থেকে এখানে উদয় হয়েছিল কারোরই জানা নেই। সাম্প্রতিককালে যে অঞ্চল ব্ল্যাকল্যান্ড বলে চিহ্নিত সেখানে একটা তাঁবুর খুঁটি মাটিতে গুঁজে দিয়ে ঘোষণা করেছিল, 'এখান থেকেই নগর পত্তন করা হোক।' ব্যস, এবার ভেজবাজির খেলার মতো বিস্ময়কর নগরী 'ব্ল্যাকল্যান্ড' গড়ে উঠল।

তখন তাফাসেট আউদ একটা মজে যাওয়া খাল বা খাদ। হ্যারি কিলারের প্রয়াসে সেটা জলপূর্ণ হয়ে একটা নদীতে পরিণত হয়ে গেল। তার বাঁ দিকে গড়ে উঠল নগর। তার ক্ষেত্রফল তিনশো বিঘার কিছু বেশি। প্রাচীর তুলে নগরটাকে তিনটে ভাগে বিভক্ত করা হল। নদীটার নাম দেওয়া হল 'হ্যারি কিলার রেড রিভার'। নদীর তীরবর্তী নগরটার ব্যাসার্ধ দুশো পঞ্চাশ গজ। একটা চমৎকার বাগিচা নদীর তীরের প্রথম অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় আর তৃতীয় অংশের সংযোগ সাধন করেছে। এতে প্রথম অংশের সঙ্গে ক্ষেত্রফল বেড়ে গিয়ে মোট ক্ষেত্রেফল দাঁড়িয়েছে প্রায় এক শো বিঘা।

নগরের প্রথম অংশে বসাবাস করে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা। তাদের নামকরণ করা হল 'মেরিফেলো'। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক হচ্ছে, মেরিফেলোর পুরনো সাকরেদ, আরও উন্নতি করার সম্ভাবনা যাদের রয়েছে। তারাই মেরিফেলোর মূল ও প্রচীন বাসিন্দা। এবার নগরের চারদিকে এসে বসতি গড়ে তুলতে শুরু করল। তাদের কেউ জেল-পালানো

www.pathagar.com

দুষ্কৃতকারী আর কেউ বা জাহাজ-পালানোর ডাকাত। তারা নিজেদের মেজাজ মর্জি মাফিক দুষ্কর্ম সাধনের বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ পাবে এরকম আশা ভরসা হ্যারি কিলারের কাছ থেকে পেয়ে তারা নিশ্চিন্ত হল। মেরিফেলোরা সংখ্যায় পাঁচশো তেষট্টি জন। এ সংখ্যা বাড়ানো হবে না সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

তাদের ওপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। সেনাবাহিনীর মতো ব্ল্যাকল্যান্ডের হয়ে তাদেরই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যদের মোকাবেলা করতে হয়। তাদের অভিধানে যুদ্ধের সংজ্ঞা হচ্ছে লুঠতরাজ, হত্যা করা, গ্রাম পুড়িয়ে ছাড়খার করে দেওয়া, অসহায় নিগ্রোদের জোরজবরদস্তি ধরে নিয়ে এসে এনে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখা। চাষবাস থেকে শুরু করে যাবতীয় কায়িক পরিশ্রমের কাজকর্ম করতে হয়। অদৃষ্ট বিড়ম্বিত নিগ্রো ক্রীতদাসদেরই। চিফের দেহরক্ষী হিসাবে তাদের লিপ্ত থাকতে হয়। নগরের দ্বিতীয় অংশে তাদের বাস।

আর নগরের তৃতীয় অংশে? সিভিল বডি অর্থাৎ নগরের প্রথম অংশে যেসব সাদা চামড়ার ব্যক্তিরা থাকার অনুমতি পায় না তাদের বসবাসের জন্য এ স্থান নির্ধারিত। তবে নিজেদের আচার-আচরণ ও কাজকর্মের মাধ্যমে তারা তৃতীয় অংশ থেকে প্রথম অংশে স্থানলাভের যোগ্যতা অর্জন করে থাকে। কালোমুল্লুকের ভয়ঙ্কর শাসনব্যবস্থায় যেকোন মুহূর্তে মেরিফেলোদের কতল করে রেড রিভারের জলে ফেলে দেওয়া হয়। শূন্যপদ পূরণ করা হয় নগরের তৃতীয় অংশের সিভিল বডির মাধ্যমে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, মেরিফেলো স্বর্গতুল্য আর সিভিল বডি জঘন্য নরকের মতো বিবেচিত হয়।

চিফের ওপর কেব মেরিফেলোদের ভরণপোষণের দায়িত্ব বর্তায়। সিভিল বডির ওপর তাঁর কোনো দায়দায়িত্বই নেই। তাই নিজেদের খাওয়া-পরার অর্থোপার্জন করতে হয় হরেকরকম ফন্দি ফিকিরের মাধ্যমে। চিফ লুঠতরাজের মাধ্যমে যেসব দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করে তা কারাবারীদের মারফৎ বাজারে বিক্রি হয়। তবে ইউরোপিয় দ্রব্যসামগ্রী কীভাবে চিফের কাছে পৌছায় সে হদিস একমাত্র তার নিকটতম পার্শ্বচররা ছাড়া আর কেউই পায় না।

নগরের তৃতীয় অংশে পঁয়তাল্লিশজন নারীসহ মোট দুশো ছেচল্লিশজন বাসিন্দা রয়েছে। মেয়েরাও পুরুষদের মতোই বিভিন্ন প্রকার অসামাজিক কাজকর্মের মাধ্যমেই অর্থোপার্জন করে থাকে।

ভোরে নগরের চারটে দরজা খুলে দেওয়া হলে নিগ্রো দাসরা দল বেঁধে মাঠে যায় চাষ-আবাদ করতে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর ক্লান্তদেহে ফেরে নিজ নিজ ঝুপড়িতে। নগরের দরজা আবার বন্ধ হয়। ফের ভোরে খোলা হয়। তাদের নগর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কোনো পথই খোলা নেই।

একদিকে সিভিল বডি আর অন্যদিকে মেরিফেলোদের কড়া নজর রয়েছে নিগ্রো দাসদের ওপরে। একটু বেগড়বাই করলেই মেরিফেলোদের গুলির আঘাতে বেচারাদের প্রাণ দিতে হয়। সে জায়গায় গ্রাম থেকে আমদানি করা হয় নতুন দাসদের। এ-ব্যবস্থা হচ্ছে রেড রিভারের ডান তীরের নগরের। আর বাম তীরের নগরটা বিপরীত তীরের নগরের তুলনায় আয়তনে সামান্য ছোট, প্রাচীর দিয়ে দৈর্ঘ্য বরাবর দু-ভাগ করা হয়েছে। এখানে গড়ে তোলা হয়েছে ফোর্ট্রেস উদ্যান। এখান থেকে গার্ডেন ব্রিজ অতিক্রম করে সিভিল বডি আর মেরিফেলোদের বসতিতে যাওয়া যায়।

www.pathagar.com

আর অন্য অংশটা পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত। এটা নগরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পাবলিক গার্ডেনের গায়ে প্রাচীর ঘেরা একটা পাকাবাড়ি রয়েছে। এটা রাজপ্রাসাদ। হ্যারি কিলার আর তার ন'জন পার্শ্বচরের বাসস্থান। চিফ যত সব দুষ্কর্মে লিপ্ত হয় ও সম্পাদন করে তাকে পার্শ্বচররা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাকে সাহায্য করে থাকে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, চিফ সর্বদা গোপন অন্তরালে অবস্থান করে। তাকে কেউ-ই দেখার সুযোগ পায় না, কাছে ঘেঁষতে পারে না, তার হুকুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ কারেও কোনো ফায়দা হয় না।

আর একটা ব্রিজ রয়েছে ব্ল্যাকল্যান্ডের প্রধান কেন্দ্র থেকে ডান তীর অবধি। এটা কাসল ব্রিজ নামে পরিচিত। রাত্রে এটা বন্ধ করে রাখা হয়। রাজপ্রাসাদের গায়ে ব্যারাকে পঞ্চাশজন পৈশাচিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন নিগ্রো সদা জাগ্রত অবস্থায় থাকে। তাদেরই ব্ল্যাকগার্ড নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্য আর একটা ব্যারাকে চল্লিশজন শ্বেতাঙ্গ। এরাও পঞ্চাশজন ব্ল্যাকগার্ডের মতোই এক একটা দানব বিশেষ। তারাই হেলিপ্লেন চালানোর দায়িত্বে রয়েছে। বাস্তবিকই হেলিপ্লেন অত্যাশ্চর্য এক আবিষ্কার। একবার মাত্র জ্বালানী ভরে দিলে ক্রমাগত তিন হাজার মাইল পাড়ি দিতে পারে ঘন্টায় গড়ে দুশো পঞ্চাশ মাইল গতিতে। এরই সাহায্যে ব্ল্যাকল্যান্ডের দুষ্কৃতকারীরা চোখের পলকে বাঞ্ছিত স্থানে উপস্থিত হয়ে কাজ মিটিয়ে আবার মুহূর্তে চম্পট দিতে পারে। একরম একটা অত্যাশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য যান্ত্রযানের দৌলতেই হ্যারি কিলার একনায়কতন্ত্র চালিয়ে যেতে পারছে।

ব্ল্যাকল্যান্ড অজানা অচেনা অঞ্চলটার রাজধানী, একসা-এ সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে হ্যারি কিলার সুবিশাল অঞ্চলে স্বেচ্ছাচার চালিয়ে যেতে পারছে। বিক্ষোভ-বিদ্রোহের আশঙ্কা মন থেকে ঝেড়েমুছে ফেলা কিন্তু হ্যারি কিলারের পক্ষে সম্ভব হয় নি, কালো অথবা সাদা চামড়ার মানুষ যেকোন সময়, যেকোন অজুহাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, এই আশঙ্কাতেই তো রাজপ্রাসাদটাকে এত ওপরে তৈরি করা হয়েছে। অতিকায় কামানগুলোর মুখ নগর, ব্যারাক আর টাউন হলের দিকে ঘোরানো হয়েছে। বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ একজন খুনী হ্যারি কিলার। সামান্য ফোঁস করামাত্র তার মাথার খুলিটাকে উড়িয়ে দেওয়া হবে। মরুভূমি ডিঙিয়ে যাওয়ার চিন্তা পাগলের প্রলাপ মাত্র। ডাকাতের আস্তানায় একবার যে মাথা গলিয়েছে সেখান থেকে জান নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা নিছকই আত্মঘাতী হওয়া। তবে ব্ল্যাকল্যান্ডের পরিস্থিতি খুবই চমৎকার। পাইপের জল আর বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি এরকম পথ, বাড়িঘর খুঁজে পাওয়া ভার। দাসদের ঝুপরিতে পর্যন্ত বিজলি বাতির রোশনাই দেখা যায়। দশ বছর আগে ব্ল্যাকল্যান্ডের গোড়াপত্তন কিন্তু বালির রাজ্যের উপর গড়ে উঠেছিল। আজ অবিশ্বাস্য জাদুকাঠির ছোঁয়ায় বালির রাজ্যকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। শাক-শবজি আর ফলমূল চাষ হচ্ছে। চাষ-আবাদের পদ্ধতিই অদ্ভুত ধরণের।

একাজের পিছনে কুমতলব না থাকলে হ্যারি কিলারের এ কাজ অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই, সত্যই এ অসম্ভবকে সম্ভবনাময় করে তুলেছে। শুষ্ক বালির রাজ্যে এমন সতেজ শাক-শবজির ক্ষেত যে সে কি করে তৈরি করল! জলই জীবন। জল ছাড়া বসুমতী অকৃপণ হতে পারে না। যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সারা বছর এক ফোঁটা জল হয় না সেখানে কোন্ অলৌকিক শক্তিবলে এমন ভোজবাজির খেলা সে দেখাতে পারল? তবে

www.pathagar.com

কি ধরে নিতে হবে, স্রেফ ভোজবাজির তুকতাকের বশেই সে অসম্ভবকে সম্ভব করল? না, অবশ্যই নয়। হ্যারি কিলার জাদুবিদ্যা তুকতাক কিছুমাত্রও জানে না, কিন্তু যাই করুক না কেন, যেকোন শক্তি এর পিছনে, কার্যকারী হোক না কেন, হ্যারি কিলার কিন্তু একা নন। আর এক ব্যক্তি তার কাছাকাছি পাশাপাশি অবস্থান করে, কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে তার প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করতে প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েছে। কে সে? কার উন্নত মস্তিষ্ক এর পিছনে রয়েছে? সে প্রসঙ্গে যথা সময়ে উত্থাপন করব।

প্রথম নগরটার মধ্যেই যেন অন্য আর একটা নগর গড়ে তোলা হয়েছে। একটা শহরে যা কিছু বাঞ্ছনীয় সবই এখানে লক্ষিত হয়। এর সবকিছুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। বিরাট একটা কারখানা ষাট বিঘা জমি নিয়ে মাথা উঁচিয়ে অবস্থান করছে। হ্যারি কিলার একে গড়ে তুলতে খইয়ের মতো টাকা ছিটিয়েছে, এমন কি হ্যারি কিলার নিজেও এ কারখানাটাকে ভেতরে ভেতরে ভয় পায়, সমীহ করে। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে এ-শহরটাতে। হ্যারি কিলার যে নগরের পত্তন করেছে তার নক্সা কিন্তু এ কারখানা থেকে বেরিয়েছে, সমগ্র ইউরোপ যা ধারণায় আনতেও পারবে না এমন সব যন্ত্রপাতি আর কলকজার উপস্থিতি এ কারখানাতে লক্ষ্য করা যাবে। আগামী দীর্ঘ কয়েক বছরেও ইউরোপের বৈজ্ঞানিকরা এমন অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করতে পারবেন বলে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

অত্যাধুনিক এ কারখানার প্রাণপুরুষ হচ্ছেন এর ডিরেক্টর। শতক খানেক কর্মী তার সহকারী। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের বাছাই করা মস্তিষ্ক সোনার ওজনে সংগ্রহ করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। রাজার হালে রাখা হয়েছে।

তাদের মধ্যে অধিকাংশই মেকানিক। তাদের অনেকেই বিয়ে-থা করেছে। তাই সাতশো মহিলা রয়েছে। ছেলেপুলের সংখ্যাও কম নয়। তবে ব্ল্যাকল্যান্ডের অন্যান্য বাসিন্দাদের চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এক কথায় তারা সচ্চরিত্র উন্নত জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ। তবে হ্যাঁ, তাদের জীবনধারণের মতো যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে সত্য, কিন্তু সে সঙ্গে নগর ছেড়ে যাতে বাইরে না যেতে পারে তার জন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। চাকরিতে বহাল হবার সময় সবাই জেনে গেছে মোটা বেতনের বিনিময়ে বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রায় বন্দি জীবনযাপন করতে হবে। এমন কি চিঠিপত্রের মাধ্যমেও বাইরের জগতের কারোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে না। বাইরের কোনো দেশ থেকে এখানে চিঠিপত্রও আসে না। গোছা গোছা নোট ফেলে দরকারই বা কি? তাই কোনোরকম দ্বিধা না রেখেই তারা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে এখানে কাজে যোগ দিয়েছে। তারপরই জাহাজে চাপিয়ে তাদের আনা হয়েছে পর্তুগিজ গিনি উপকূলের সামান্য দূরবর্তী বিশানো দ্বীপপুঞ্জের একটা জনমানবহীন ছোট্ট দ্বীপে। এবার তাদের চোখ বেঁধে একটা হেলিপ্লেনে তোলা হয়েছে। ছ-ঘন্টারও কম সময়ে চৌদ্দশো মাইল পথ পাড়ি দেওয়া হয়েছে। চোখে পট্টি খুলে তাদের হাজির করা হয়েছে কারখানার অভ্যন্তরে। চুক্তির মেয়াদকাল অবধি তারা এখানেই রয়েছে। মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে যে, যার দেশে ফিরে গেছে। হ্যাঁ, চুক্তি করার সময় এরকম শর্ত অবশ্যই ছিল, কারখানার কাজকর্মে যদি উৎসাহ না পায়, ভাল না লাগে তবে চুক্তির সময় উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই তাদেরকে নিজের দেশে ফিরে যেতে দেওয়া হবে। তাদেরকে নিজের দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হেলিপ্লেনে তোলা হয়।

www.pathagar.com

তারপর যে তার কি গতি হয় তা কারখানার কমরেডরা জানতে পারে না, ব্ল্যাকল্যান্ডের গোপনীয়তা সভ্যজগতের কাছে গোপনই থেকে যায়। তবে বড়জোর দু—একজন ছাড়া কেউ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য পীড়াপীড়িও করত না। ফলে মরু সাম্রাজ্যের পৈশাচিক কাজকর্মের কথা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। আবার নিগ্রো দাস মেয়ে-পুরুষদের ক্ষেত্রে একই নিয়ম কার্যকরী হয়, তবে তাদের মতে নিজের দেশের চেয়ে এখানেই বেশি সুখে নিরাপদে জীবনযাপন করছে।

তাদের ডিরেক্টর এক ফরাসি ভদ্রলোক। নাম তাঁর মারসেন ক্যামারেট। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। কারখানার কর্মীরা তাকে দেবজ্ঞানে মান্য করে। কেবল তারই ব্ল্যাকল্যান্ডের সর্বত্র অবাধে যাতায়াতের অধিকার আছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে তিনি স্বাধীন জীবনযাপন করলেও ব্ল্যাকল্যান্ডের মনুষ্যরূপী দৈত্যদের ব্যাপারস্যাপার সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধ্যান-ধারণা নেই—জানার আগ্রহও নেই। কেউ এ প্রসঙ্গে কিছু জানতে চাইলে সংক্ষেপে সাফ জবাব দিতে, 'আমি কিছু জানি না।'

কারো কারোর মতে ডিরেক্টর মারসেন ক্যামারেটের নির্ঘাৎ মাথার দোষ আছে। তবে মাত্রাতিরিক্ত প্রতিভাবানরা সর্বদা কামকাজে ও কথাবার্তায় স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পারেন না, খুবই সত্য বটে। তবে তার মধ্যে যে অস্বাভাবিকতা লক্ষিত হয় তা খুব সামান্যই বটে।

ভদ্রলোক খুবই ভীতু প্রকৃতির সত্য, কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন অবশ্যই নন। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্তর্জগৎ, মানে আপন চিন্তায় সর্বক্ষণ বিভোর হয়ে থাকাতেই তার আগ্রহ বেশি। তাঁর যাবতীয় চিন্তাভাবনার মূলে রয়েছে কারখানার উন্নতি সাধন। একের পর এক সমস্যা দেখা দিচ্ছে, গভীর নিরবচ্ছিন্ন চিন্তার মাধ্যমে সে সবের সমাধানের সূত্রও তিনিই বের করছেন। তাঁর চিন্তার মূলে রয়েছে ভয়ঙ্কর ও নিরীহ একটা যন্ত্র। অন্যমনস্কতার জন্য তিনি যে কতবার হুমড়ি খেয়ে রেড রিভারের জলে পড়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। এমন কি নিজের ক্ষিদে তেষ্টা সম্বন্ধে তাঁর হুঁস থাকে না।

অদ্ভুত এ যন্ত্রটার মস্তিষ্কে নকল বৃষ্টিপাতের অত্যাশ্চর্য এক পরিকল্পনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

পরিকল্পনাটা উদ্ভট হলেও বাস্তবতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সত্যই বিনা মেঘে নকল বৃষ্টি ঝরল।

ব্যস, যাত্রা শুরু হল। ক্যামারেট এবার একের পর এক নিত্যনতুন আবিষ্কারের দিকে ঝুঁকলেন। করলেনও বহু অবিশ্বাস্য আবিষ্কার। তার প্রায় একশো অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের মাধ্যমে হ্যারি কিলার যারপর নাই উপকৃত হলেন। তাঁর জঘন্য মনবৃত্তি-চরিতার্থ করার কাজে অনেকগুলো ধাপ অগ্রসর হতে সক্ষম হলেন। আবিষ্কারক ভুলেও কিন্তু কৌতূহলী হলেন না। জানতে উৎসাহী হলেন না তাঁর অভাবনীয় আবিষ্কারগুলোর মাধ্যমে কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হচ্ছে।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, কোনো আবিষ্কার কুকর্মে ব্যবহৃত হলে তার জন্য আবিষ্কারকের কাঁধে দোষ চাপানো সঙ্গত নয়। তবে হ্যাঁ, পিস্তলের আবিষ্কারক অবশ্যই জানতেন তাঁর আবিষ্কারকে কোনো কাজে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু মি. ক্যামারেটের ব্যাপারে এ যুক্তি প্রযোজ্য হয়। তাঁকে প্রচলিত কামানের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী কোনো কামান তৈরি করে দিতে অনুরোধ করলে তিনি তা তৈরি করার পর বিরাট

www.pathagar.com

ধ্বংসকান্ডের খবর তাকে শোনালে তিনি চোখ দুটো কপালে তুলে বলেন, 'সে কী হে! এমনটা হবে আমার তো জানা ছিল না!'

মোদ্দা ব্যাপার হচ্ছে তিনি কামান তৈরি করবেন অফুরন্ত আবিষ্কারের মোহ নিয়ে। কিন্তু তার প্রয়োগ সম্বন্ধে তার তিলমাত্রও ভাবনা চিন্তা নেই।

বৃষ্টি প্রত্যাশা করেছিলেন হ্যারি কিলার। মি. ক্যামারেট বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে তাঁর সে প্রত্যাশা পূরণ করেছিলেন। হ্যারি কিলার কৃষিকাজের যন্ত্র চেয়েছিলেন। মি. ক্যামারেট এমন এক যন্ত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন যেটা ব্যবহারের মাধ্যমে জমিতে লাঙল দেওয়া, বীজবোনা, আগাছা পরিষ্কার করা এবং গাছ থেকে পাকা শষ্য ঝাড়াই বাছাই করে গাছ থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়েছিল। একটা মাত্র যন্ত্র দিয়ে এতগুলো কাজ সম্পন্ন করা আশ্চর্য তো বটেই। হ্যারি কিলার শূন্যে একনাগাড়ে তিন হাজার বার অতিক্রম করার উপযুক্ত ওড়ারযন্ত্র তৈরি করে দিতে বলেছিলেন। ক্যামারেট দিব্যি হেলিপ্লেন বানিয়ে দিলেন।

ক্যামারেট তাঁর আবিষ্কার কোনো কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার খোঁজখবর নেওয়া তো দূরের কথা জানার জন্য সামান্যতম কৌতূহলও বোধ করেন নি। তার পরিবর্তে মস্তিষ্ক চিন্তারূপ উপাদান যোগান দিয়ে সমস্যার সমাধান করাতেই তিনি অধিকতর উৎসাহ-আনন্দ পান। এভাবেই তো মরুভূমির রুক্ষ রুষ্ট বালির ওপর ব্ল্যাকল্যান্ড নগর গড়ে উঠল। কিন্তু প্রথম যন্ত্র তৈরির কলকব্জা ও কাঁচামাল, পরবর্তী অগণিত যন্ত্র তৈরি করার কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি কোত্থেকে, কীভাবে এসেছে তা জানার কিছুমাত্র আগ্রহও তিনি অনুভব করেন নি। তিনি শ্রমিক জোগান দিতে বললেন। ব্যস, যেন ভোজবাজির খেলার মতো অত্যল্প কালের মধ্যে একের পর এক শ্রমিক আসতে লাগল ক্যামারেটের কাছে। আর এই অপরিমিত অর্থই বা কোত্থেকে আসছে তা নিয়েও মুহূর্তের জন্য তার মাথাব্যথা হয় নি।

একদিনের কথা, সেদিন বেলা এগারোটায় হ্যারি কিলারের বৈঠকখানার টেলিফোন বেজে উঠল। গৃহকর্তা হ্যারি কিলার সে ঘরেই আপন মনে চিন্তার জট ছাড়িয়ে চলছেন।

টেলিফোনের রিসিভারটা কানের কাছে ধরতেই শুনতে পেলেন, 'পশ্চিম-দিকে,সতের ডিগ্রি দক্ষিণে, দশটা হেলিপ্লেন অগ্রসর হতে দেখা যাচ্ছে।'

ত্রিশ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটা টাওয়ারের চূড়ার ওপর থেকে একজন মেরিফেলো টেলিফোন করছেন।

হ্যারি কিলার ক্রেডেলের ওপর টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসপ্লানেড, কারখানা ও রাজপ্রাসাদের মধ্যবর্তী স্থানে হাজির হলেন। ফোন ছাড়ার আগে কোনোরকমে মেরিফেলোকে নির্দেশ দিয়ে এসেছিলেন, কাউন্সিলরদের যেন যত শীঘ্র সম্ভব খবর দেওয়া হয়। মেরিফেলোর কাছ থেকে হ্যারি কিলারের জরুরি তলব পেয়ে কাউন্সিলররা পড়ি কি মরি করে ছুটে এলেন।

হ্যারি কিলার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হেলিপ্লেন দেখতে ব্যস্ত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেগুলো এসপ্লানেডে নেমে এল। মোট দশটা। তাদের চারটেতে রয়েছে শুধুই পাইলট। আর বাকি ছ'টা থেকে পাইলট ছাড়াও দুজন করে আরোহী নেমে এল। মুখ ঢাকা পিঠমোড়া করে বাঁধা কয়েদি আর একজন ব্ল্যাকগার্ড।

হ্যারি কিলারের নির্দেশে তাদের হেলিপ্লেনের বাইরে এনে চোখ মুখ ও হাত পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হল।

www.pathagar.com

অতিকায় হেলিপ্লেনগুলো, কারখানার চিমনি, ধোঁয়া আর আকাশচুম্বী ইস্পাতের কাঠামো আর ছাউনি প্রভৃতি দেখে তো তারা যেন সদ্য আকাশ থেকে পড়ল ত্রিশজন ব্ল্যাকগার্ড। তারা কোথায় অবস্থান করছে এ মুহূর্তে সে চিন্তায় তারা অস্থির হয়ে পড়ছে। তারা আফ্রিকা-মানচিত্র বহুবার বহু কারণে ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। কিন্তু এমন অদ্ভুত কর্মযজ্ঞের নজির কোথাও প্রত্যক্ষ করবেন স্বপ্নে ভাবে নি।

হ্যারি কিলারের ইঙ্গিতে ছ'জন ব্ল্যাকগার্ডকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

অজানা-অচেনা সাম্রাজ্যের রাজধানী ব্ল্যাকল্যান্ডের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হ্যারি কিলারের হাতের মুঠোয় বন্দি হলেন বারজাক, মিস ব্লেজন, আমিদি ফ্লোরেন্স, চেতোন্ন আর মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স। কয়েদখানার দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল।

* * *

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্সের দিনলিপির পাতায় চব্বিশে আগস্ট তারিখে লেখা হয়েছিল, 'আমরা চব্বিশ ঘণ্টা আগে এখানে পৌঁছেছি। কিন্তু কোথায় এসে হাজির হয়েছি? যদি কেউ বলে আমরা চাঁদে এসেছি, কিছুমাত্রও বিস্মিত হব না। সত্যি, এ যে কোনো দেশ, কোনো অঞ্চল, কিছুই বুঝতে পারছি না। আসল ব্যাপার হচ্ছে, আমরা কয়েদ হওয়ার পর পুরো চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। রাত্রিটা মোটামুটি শান্তি-স্বস্তিতে কাটার ফলে শরীর-মন একটু সতেজ হয়ে উঠেছে। তাই তো দিনলিপিটা নিয়ে বসা সম্ভব হয়েছে। আকাশযানে না চড়ে উপায় ছিল না। সেন্ট বেরেন কোমরের বাতে একটু-আধটু কাবু হয়ে পড়লেও আমরা বাকি সবাই যে সুস্থ-স্বাভাবিক রয়েছি তা অবাক হবার মতো ব্যাপারই বটে।'

গত পরশু শেষ রাত্রের দিকে বিকট আওয়াজ কানে এল। একবার নয়, তিনবার ভয়ঙ্কর আওয়াজটা কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবার জোগাড় করেছিল। মাথার ওপর দিয়ে অস্বাভাবিক আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের কান ও চোখ দুটোর কর্মক্ষমতা লোপ করে দিচ্ছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিটা কাটিয়ে ওঠার আগেই কারা যেন অকস্মাৎ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুখে ন্যাকড়া গুঁজে দিল। দড়িদাড়া দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

পর মুহূর্তেই লেফটেন্যান্ট ল্যাকো হেড়ে গলায় বলে উঠলেন, 'সবাই আছে তো? একটু বেগড়বাই করলে গুলির আঘাতে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।'

তাদের কথোপকথনের মাধ্যমে জানতে পারলাম জঙ্গলের গাছপালার বাইরে, কৌরবৌসৌয়ের দিকে আমাদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। সেখান থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে সে জায়গাটা। লেফটেন্যান্ট ল্যাকো বলল, 'তবে সক্কালেই যাত্রা করতে হবে।' পরমুহূর্তেই আচমকা আকাশ-গর্জনটা অনেকাংশে বেড়ে গেল। তারপর দূরে সরতে সরতে এক সময় একেবারে মিলিয়ে গেল। আওয়াজটা যে কিসের তা অনুমানও করতে পারলাম না।

এবার আমাদের হাত-পা ধরে জাহাজের মালের মতো দম দম করে ঘোড়ার পিঠে ফেলে দিল। উল্কার বেগে ছুটে চলল বুনো ঘোড়াগুলো। আমার মাথা ছিল ঘোড়ার একদিকে আর বিপরীত দিকে পা দুটো। সে যে কী অসহনীয় অবস্থা তা আর বলার নয়। চলন্ত অবস্থাতেই শুনতে পেলাম, 'বজ্জাত মেয়েটা বুঝি পটল তুলেছে।'

www.pathagar.com

পাশ থেকে হেঁড়ে গলায় জবাব এল, 'না, সংজ্ঞা লোপ পেয়েছে। এলিয়ে পড়ে রয়েছে।'

'ঠিক আছে বাঁধন খুলে দাও। ডাক্তারের বাঁধনও খুলে ফেল।'

এবার চলন্ত ঘোড়ার পিঠেই আমার বাঁধন ক্রমে আলগা হতে লাগল। বুঝতে পারলাম, আমাকে ডক্টর চেতোন্ন ভেবে ভুল করেছে। কিন্তু মুখের কাপড় সরাতেই আমাকে চিনতে পেরে আবার ঝটপট কাপড়টা মুখের ওপর তুলে দিয়ে বাঁধাবাঁধি শুরু করে দিল। হতচ্ছাড়াটাকে চিনতে পারলাম, লেফটেন্যান্ট ল্যাকো। শয়তানটাকে দেখেই আমার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে গেল। অনুশোচনায় দগ্ধে মরতে লাগলাম—তখন যদি নচ্ছাড়টার মুখোশ খুলে দিতাম, প্রকৃত পরিচয় ফাঁস করে দিতাম তবে আজ আর দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হত না। কোনোদিন মওকা পেলে এর শোধ তুলে ছাড়ব।

লেফটেন্যান্ট ল্যাকোয়ের আসল নাম যে ক্যাপ্টেন রুফুজ এবার জানতে পারলাম।

আমি বস্তাবন্দি থেকে থেকে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবার জোগাড় হলাম। তার ওপর বে-কায়দায় ঘোড়ার ওপর পড়ে থাকার ধকল তো রয়েছেই।

অবোধ্য ভাষায় লেফটেন্যান্ট, মানে ক্যাপ্টেন রুফুজ কি বলল। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যে দুজন আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমার দেহ-তল্লাসি চলতে লাগল। এমন কি আমার স্বাক্ষরযুক্ত দিনলিপির খাতাটাও কেড়ে নিল। এবার আমাকে বস্তা থেকে বের করে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল। সে মুহূর্তে মনে হল পুনর্জন্ম হল আমার।

সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়লাম না। অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে সবকিছু দেখতে লাগলাম। যত দেখছি ততই যেন অবাক হতে লাগলাম। ইস্পাতের প্লাটফর্মের ওপর ইস্পাতের কাঠামোর একটা পাইলন। উচ্চতা বারো থেকে পনেরো ফুট। মধ্যস্থলে রয়েছে দুটো প্রপেলরের ব্লেড। ঠিক যেন উড়ন্ত, ডানামেলা একটা বক। বিশালকায় একটা বক। ডানা দুটো সূর্যের কিরণে চকচক করছে। তাদের মোট দৈর্ঘ্য আঠারো ফুট। এরকম দশটা কলকব্জা। পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। এদের কোনো কাজে লাগানো হবে আমার মাথায়ই এল না।

আমার সঙ্গী-সাথীরা মাটিতে পড়ে। মিস ব্লেজনের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। কাগজের মতো শাদা হয়ে গেছে তাঁর মুখ। ডক্টর চেতোন্ন তাঁর শিয়রে বসে। সেন্ট বেরেনের অবস্থাও তথৈবচ। তবে পঁসি আর বারজাকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু টোনাগানে কোথায়? ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে বেচারার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায় নি তো? সে জন্যই নিগ্রো সন্তান মালিকের চোখে জল দেখা যাচ্ছে।

আমি কোনোরকমে মিস ব্লেজনের কাছে গেলাম। আমার আগেই ক্যাপ্টেন রুফুজ তাঁর কাছে পৌঁছে গেছেন দেখলাম। ডক্টর চেতোন্নকে বললেন, 'মাদাম মোরনাস কেমন আছেন বলুন তো? এখন কি যাত্রা করা যেতে পারে?'

আমি তাঁর কথায় একটু অবাকই হলাম। মিস ব্লেজনকে তিনি এখনো তাঁর আগেকার সে ছদ্মনাম 'মোরনাস' বলেই জানেন দেখছি।

ডক্টর চেতোন্ন জবাব দিলেন, 'এখন একটু ভাল। তবে অনন্ত ঘণ্টা খানেকের আগে যাত্রা করা সম্ভব নয়। একটা কথা, ওই রকম জন্তু-জানোয়ারের মতো নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলে কিন্তু কেউ-ই প্রাণে বাঁচবে না।'

ক্যাপ্টেন রুফুজ তাঁর কথার জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে চলে গেলেন।

www.pathagar.com

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পঁসি আর বারজাক মিস ব্লেজনের কাছে এসে দাঁড়ালেন। মিস ব্লেজন চোখ মেলে তাকিয়েই কেঁদে ফেললেন। কান্নাপ্লুত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'আমি দুঃখিত! আমার জেদের জন্যই আপনাদের এমন দুর্ভোগ।'

তাঁকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা বৃথা অনুমান করে প্রসঙ্গটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে বললাম, 'মিস ব্লেজন, ক্যাপ্টেন রুফুজ কিন্তু আপনাকে মাদাম মোরনাস বলেই জানেন।'

মিস ব্লেজনের আসল নামটা শয়তানগুলো জেনে ফেললে ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা থাকতে পারে অনুমান করে তাঁর আসল নাম ও পরিচয় গোপন রাখার সিদ্ধান্তই সবাই নিলেন। এও সিদ্ধান্ত নিলেন, এবার থেকে তাকে মিস মোরনাস নামেই সম্বোধন করা হবে।

হঠাৎ যমদূতাকৃতি গাট্টাগোট্টা একদল লোক ছুটে এল। যন্ত্রচালিতের মতো আমাদের সবাইকে হাত-পা বেঁধে বস্তায় পুরে ফেলল। না, মাজেস্পার মতো আবার ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে জন্তু-জানোয়ারের মতো নেওয়ার ব্যবস্থা না করে একটা সমতল স্থানে দুম্ করে বস্তাবন্দি আমাকে ফেলে দিল। ঘোড়ার পিঠে ফেললে অন্য রকম বোধ হত। আমি উপুড় হয়ে শুয়ে বার বার এদিক-ওদিক দোল খেতে লাগলাম। ক্যানক্যানে যে রহস্যজনক আওয়াজ শুনেছিলাম, অবিকল সেরকম ভয়ঙ্কর শব্দ আমার কানের পর্দা ফাঁটিয়ে দিতে চাইছে। ক্রমেই আওয়াজটা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। আর একটা ব্যাপার স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলাম, যেন লিফটে করে উঁচুতে, অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছি। এক সময় পরিস্থিতিটাকে শরীর ও মন সামাল দিতে পারল।

এক সময় বুঝলাম, আমার হাতের বাঁধন শিথিল হয়ে গেছে। আসলে নড়াচড়া করতে করতে অল্প অল্প করে বাঁধন খুলেছে। তবে পরিস্থিতিটা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখলাম।

একটা হাত কোনোরকমে পকেটে চালান করে দিয়ে ছোট্ট ছুরিটা বের করে আনলাম। পেন্সিল কাটা হয় এটা দিয়ে। চোখের কাছের বস্তার কিছুটা কেটে দেখার মতো ব্যবস্থা করে নিলাম। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর, একেবারেই অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠল। চমকে উঠলাম। যা দেখেছি তা, পাঁচশো গজ নিচে ভূ-পৃষ্ঠ রয়েছে। নিঃসন্দেহ হলাম, উড়ন্ত যানে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার গতিবেগ এক্সপ্রেস ট্রেন থেকেও অনেক অনেক বেশি।

বেশিক্ষণ চোখ মেলে তাকিয়ে সে দৃশ্য দেখতে পারলাম না। বুকের ভেতরে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। ভাবলাম, এ কাদের খপ্পরে পড়েছি রে বাবা!

উড়ন্তযানটার গতিবেগ কত? ঘণ্টায় একশো নাকি দুশো মাইল? পায়ের তলায়, পাঁচশো মাইল নিচের ভূমি মরুভূমির মতো।

ভয়ে ভয়ে আবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, আর ওপরে ও নিচে একই রকম আরও উড়ন্তযান তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। তবে এরা উড়ন্ত যান তৈরি করেছে? উড়ন্ত কল! কলকব্জায় পাখির ডানার শক্তি নিয়োগ করেছে? এক সময় যা উপকথা হয়ে লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াত, ইকারাসের কাহিনীর অত্যাশ্চর্য ভাবনাকে কৌশলের মাধ্যমে বাস্তবতায় পরিপূর্ণ করে তুলেছে? ছোট্ট ছিদ্রটা দিয়ে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যাচ্ছে না। তবু একের পর এক মরুদ্যান পাড়ি দিয়ে উড়ন্ত যানগুলি এগিয়ে চলল অবিশ্বাস্য গতিতে।

www.pathagar.com

মাত্র তো পাঁচশো গজ ওপর দিয়ে উড়ন্ত যানগুলি ধেয়ে চলেছে। বিকট গর্জন যে ভূমি পর্যন্ত অনায়াসে পৌঁছে গেছে তার প্রমাণ পেলাম মরুদ্যানের বাড়িগুলো থেকে মানুষকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে। শুধু কি এই! হাত মুঠো করে আমাদের শাসাচ্ছে। নাগালের মধ্যে পেলে যেন মুণ্ডপাত করে ছাড়বে।

মরুদ্যানের ভেতর সারিবদ্ধভাবে খুঁটি পোতা রয়েছে দেখলাম। এর আগেও এরকম খুঁটির সারি দেখেছিলাম বটে। দড়ির মতো তারও পাতা দেখলাম, সেগুলোর ওপর। তবে? টেলিফোন, নাকি টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা। একী স্বপ্ন, নাকি সত্য? সাহারা মরুভূমিতে টেলিফোন বা টেলিগ্রাফ? না, আর ভাবতে পারলাম না। মাথার ভেতরে ঝিমঝিম করতে লাগল।

তৃতীয় মরুদ্যানের সারি পার হতে না হতেই আরও অবাক হতে হল শস্যক্ষেত্র দেখে। নিগ্রো চাষীরা কোথাওবা লাঙ্গল দিচ্ছে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আরও একটু এগোতেই দেখলাম, কয়েকজন নিগ্রো বিকট গর্জন শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেল। বাইরে দিকে শাদা চামড়ার মানুষদের আধিক্য লক্ষ্য করলাম। তারাও হাত মুঠো করে হম্বিতম্বি করছে। আমাদের ওপর তাদের ক্রোধের কারণ কি, বুঝতে পারলাম না।

উড়ন্ত যান এবার নিচে নামতে নামতে একটা নাম না জানা নদী অতিক্রম করল। বৃত্তাকার পথ ধরে নামার জন্য মাথা চক্কর মারছে।

প্রপেলারের হম্বিতম্বি ক্রমে স্তিমিত হতে হতে এক সময় একেবারে থেমে গেল। বুঝলাম, উড়ন্ত যান আমাদের নিয়ে ভূমি স্পর্শ করেছে।

আচমকা টান মেরে বস্তাটাকে সরিয়ে নিয়ে আমাকে বাইরে বের করে আনা হল। এরকম পরিস্থিতির কথা ভেবে আমি আগেভাগেই দড়ির বাঁধনে হাত দুটো গলিয়ে রেখেছিলাম। আমি চোখ-মুখ বন্ধ করে ঘাপ্‌টি মেরে পড়ে রইলাম। আমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে বাজখাই গলায় উঠে দাঁড়ানোর জন্য হুকুম দিল। হুকুমদারের মুখটা দেখা গেল না।

ঘরটায় দরজা-জানালা আছে বটে। সামান্যতম ছিদ্র তো নেই-ই, এমন কি ঘুলঘুলি পর্যন্ত নেই। ঘরটার একদিকে অতিকায় টাওয়ার। কারখানা? সুউচ্চ একটা পাইলনও নজরে পড়ল। টাওয়ার থেকে শো খানেক গজ উঁচু। আর ডানদিকে বিশাল প্রাসাদ। পাশাপাশি দুটো প্রাসাদ। তাদের মাঝখানে একটা দুর্গ-প্রাসাদ সদম্ভে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মালিক ছাড়া আর সবাইকেই এক এক করে দেখতে পেলাম। কিন্তু সকালেও তো তাকে দেখা গেছে। বস্তার ভেতর থেকে সবে মুক্তি পাওয়া আমার সঙ্গী-সাথীদের চোখে আচমকা আলো পড়ায় চোখে যেন ধাঁধাঁ লেগে গেছে। সুযোগ করে নিয়ে আমি যা কিছু দেখেছি তারা তো সেসব কিছুই দেখতে পায় নি। তাদের চোখ স্বাভাবিকতা ফিরে পাওয়ার আগেই সবাইকে নিয়ে অন্ধকার কারাগারে পুরে দিল। ইতিমধ্যে ঘা কতক সবার পিঠে পড়ে গেছে।

আমরা যে কোন্ পাষণ্ডের কবলে পড়েছি, কারাগারে বন্দি হয়েছি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আর কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে আমাদের পাকড়াও করে নিয়ে এসেছে, তাও মালুম হল না। আর জায়গাটাই বা কোথায় কিছুই আন্দাজ করতে পারলাম। না অন্ধকার কামরায় হতভম্ব হয়ে বসে থাকা ছাড়া কিছুই করার রইল না।

www.pathagar.com

*   *   *

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্সের দিনলিপির পাতায় ছাব্বিশে মার্চ তারিখে লেখা রয়েছে—কারাকক্ষে প্রায় অন্ধকারে বসে তিনি লিখেছেন—মাজেপ্পার ভূমিকায় অভিনয় সাঙ্গ করে এখন তিনি পেলিকোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সিলভিও কারাবারোনারির সঙ্গে গুপ্ত সমিতিতে লিপ্ত থাকার অপরাধে দশ বছর যার কারাদণ্ড হয়েছিল, ইতালির এক নাট্যকার, লর্ড বায়রনের এক বন্ধু, যার কীর্তি-কাহিনী নিয়ে নাটক রচনা করেছিলেন।

গত পরশুর আগের দিন দুপুরে তাকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সশস্ত্র প্রহরীরা কড়া নজর রাখছে। পালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কামরাটার বারো ফুট উঁচুতে একটা মাত্রই জানালা। মোটা মোটা লোহার শিক দেওয়া। দরজায় ইয়া পেল্লাই তিনটে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি একা বসে আকাশপাতাল ভেবে চলেছেন। প্রায় দু-ঘন্টা ধরে তন্ময় হয়ে ভাবার পর দুম্ করে দরজা খুলে গেল। সম্বিৎ ফিরে পেলেন তিনি। এমন একজন ঘরে ঢুকে এল যে একেবারেই অপ্রত্যাশিত, কল্পনাও করা সম্ভব নয়। চৌমৌকি। সেই বিশ্বাসঘাতক নিগ্রো চৌমৌকি। যে সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্সের প্রবন্ধগুলো ঘোড়ার জিনের সঙ্গে গুঁজে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল, এ সেই চৌমৌকি।

তিনি রাগে গস্ গস্ করতে করতে তেড়ে যাবার উদ্যোগ নিতেই সে দুম করে দরজা বন্ধ করে দৌড়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

নিতান্ত অনিচ্ছায় হলেও যার অতিথি অন্ধকার কারাগারে তিনি ধুঁকছেন সবাই তাঁকে হ্যারি কিলার বলে সম্বোধন করে। রাজা, এখানকার সর্বেসর্বা। তাঁর কৃতিত্বকে অস্বীকার করেন কি করে। উড়ন্তযানে শুয়ে, বস্তার ফুটো দিয়ে তিনি যে সবই দেখতে পেয়েছেন।

একথা সত্য যে, মোরিলিরেই চৌমৌকিকে দল থেকে কৌশলে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে এসেছিল। সে হ্যারি কিলারের একেবারে হাতের মুঠোয়, একেবারে কাছের লোক।

খেতে বসে সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স চৌমৌকির কাছে টোনগানের খবর জানতে চাইলে মুহূর্তে তার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বুঝতে পারলেন, সে দুনিয়া ছেড়ে গেছে।

চৌমৌকি যে রাত্রে চম্পট দিয়েছিল সে রাত্রিই কলের উড়ন্তযানে চড়ে ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড রুফুজের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাদের চেড়ে পালিয়ে আসার সময় নিছক তামাসা দেখার জন্যই সার্জেন্ট দুজন নিগ্রো সৈন্যদের দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম লুঠতরাজ করে, আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। উড়ন্তযানে চড়ে চৌমৌকি এখানে হাজির হয়েছিল। তাই তখন তার বিকট আওয়াজটা এত কাছ থেকে শুনতে পাওয়া গিয়েছিল।

চৌমৌকির মুখেই সাংবাদিক সাহেব জানতে পারলেন, তিনি এখন মরু অভ্যন্তরস্থ ব্ল্যাকল্যান্ড নগরের কারাগারে বন্দি-জীবন যাপন করছেন। পৃথিবীর কোনো ভূগোলবিদই এ নগরটার খবর জানেন না। মানচিত্রে এর উল্লেখ নেই।

প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তিনি চৌমৌকিকে হাতের মুঠোয় আনার চেষ্টা করলেন। বিমর্ষ মুখে সে সবিস্ময়ে বলল, 'সে কী! কেটে পড়বেন কি কর্ত্তা! চারদিকে বিশাল মরুভূমি, আকাশ ছোঁয়া প্রচীরে ঘেরা নগরী। তার ওপর চারদিকে বন্দুক-হাতে প্রহরী নিযুক্ত! খবরদার পালাবার চিন্তাও মাথায় আনবেন না। নির্ঘাৎ জানে মরতে হবে।'

পরের দিন পঁচিশে মার্চ সাংবাদিক চৌমৌকি ছাড়া কাউকেই দেখতে পেলেন না। উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলও না।

www.pathagar.com

তারপরের দিন ছাব্বিশে মার্চ মরুনগরী ব্ল্যাকল্যান্ডের সর্বেসর্বা, রাজা হ্যারি কিলারকে সাংবাদিকের দেখা সৌভাগ্য হল। সারাদিন চৌমৌকি আসেনি। বিশ্বাসঘাতক শয়তান মোরিলিরে এল সঙ্গে করে কুড়িজন নিগ্রোকে নিয়ে। বুঝলেন, সেই তাদের পাণ্ডা। তাদে পেছনে হাত-বাঁধা অবস্থায় সেন্ট বেরেন ছাড়া সবাই রয়েছে দেখা গেল। সাংবাদিকসহ সবাইকে নিয়ে লম্বা বারান্দা আর বহু গলি-ঘুপচি পেরিয়ে ইয়া বড় একটা কামরায় নিয়ে যাওয়া হল। মোরিলিরে বাইরে, একটা সমতল জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

মদের গ্লাস হাতে নিয়ে মূর্তিমান শয়তান হ্যারি কিলার আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বসে। গায়ে হাতির শক্তি ধরে। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি মনে হলেও আসলে তার চেয়ে অনেক বেশি। চোখের তারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ সুস্পষ্ট। তবে আচমকা দেখলে মনে হয় লোকটা শয়তানের সাক্ষাৎ চর ছাড়া আর কিছু নয়।

ডক্টর চেতোন্ন ইঙ্গিতে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন শয়তান হ্যারি কিলার মাত্রাতিরিক্ত মদ খেয়ে চুর হয়ে রয়েছে।

উপস্থিত সবার মুখের ওপর ঢুলুঢুলু লাল চোখের মণি দুটো একবার বুলিয়ে নিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় হ্যারি কিলার বললেন, 'আপনারা ছ'জন শুনেছি, কিন্তু পাঁচজন এসেছেন যে।'

ডক্টর চেতোন্ন দ্বিধাহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'আপনাদের মাত্রাতিরিক্ত আপ্যায়নে একজন অসুস্থ, শয্যাশায়ী।'

'কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে আমাদের দেশে হানা দিয়েছেন, জানতে পারি কি? গোয়েন্দাগিরি করতে নাকি?'

'স্যার, অনুগ্রহ করে অপরাধ নেবেন না।' বারজাক মোলায়েম স্বরে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন।

বাজখাই গলায় হ্যারি কিলার গর্জে উঠলেন, 'স্যার নয়—বলুন 'মাস্টার'। সবাই আমাকে 'মাস্টার' বলেই সম্বোধন করে। খোলসা করে বলুন, কোন্ কুমতলব নিয়ে আমাদের এখানে হানা দিয়েছেন? সাফ কথা শুনুন, আমার রাজ্যের ধারে কাছে কাউকে ঘুর ঘুর করতে দিতে আমি কিছুতেই রাজি নই।'

অভিযাত্রীরা নীরবে, চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ এঁকে তাকিয়ে রয়েছেন দেখে হ্যারি কিলার যন্ত্রচালিতের মতো দুম করে লাফিয়ে সোজাভাবে খাড়া হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখের তারা দুটো দিয়ে যেন আগুনের হল্কা ছিটকে বেরোচ্ছে। সাধ্যমত গলা চড়িয়ে গর্জে উঠলেন, 'আপনারা যদি ভেবে থাকেন আপনাদের কুমতলবের কথা কিছু বুঝতে পারিনি তবে খুবই ভুল করবেন। ফরাসিরা টিম্বাকটু পর্যন্ত এসে, সেখানে অবস্থান করে প্রায়ই লইজারে টিকটিকিদের পাঠিয়ে দিচ্ছে-আমার কাণ্ডকারখানার খবরাখবর নিয়ে যাবার জন্য। জানেন কি, আপনাদের হাড়গোড় ভেঙে একসার করে দিতে পারি? ঠিক এরকম করে—' কথা বলতে বলতে টেবিলের ওপর থেকে একটা কাচের গ্লাস নিয়ে দড়াম করে আছাড় মেরে টুকরো টুকরো করে ফেললেন।

মুহূর্তকাল নীরবে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসতে লাগলেন শয়তানরূপী হ্যারি কিলার। এক সময় বোম ফাটার মতো গর্জে উঠলেন, 'আমি বার বার সাবধান করে দিয়েছি—কেউ কান দেয় নি। ভোঔং-কোনো বিষের ব্যাপারটা আমি আপনাদের কাছে ব্যক্ত করি। আপনাদের হিতসাধনের ব্যাপারে, সতর্ক করে দেওয়ার সেটাই ছিল আমার প্রথম

www.pathagar.com

পদক্ষেপ। তারপর সতর্ক করে দিয়েছিলাম ওঝাকে দিয়ে। আপনাদের পথরোধ করার জন্য আমিই কৌশলে মোরিলিকে পাঠিয়েছিলাম। সে সিকাসোতে আপনাদের সঙ্গে মিলিতও হয়েছিল। আমার দিক থেকে সেটাই ছিল আপনাদের হিতসাধনের শেষ প্রয়াস। সৈন্যদের সরিয়ে আনার পরও আপনাদের হুঁস হল না। যাক নাইজারে তো পৌছেই গেছেন, প্রভুদের এবার কি বলবেন, বলুন তো?'

কথা বলতে বলতে হ্যারি কিলার গুলি খাওয়া বাঘের মতো, বদ্ধ উম্মাদের মতো ঘরময় দাপিয়ে বেড়াতে লাগলেন। তারপর এক সময় বারজাকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তেমনি গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আপনাদের গন্তব্যস্থল তো ছিল 'সায়ে' তাই না? তাই যদি হয় তবে হঠাৎ উল্টো পথে কৌবোতে-যাওয়ার কারণ কি?'

বারজাক স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল 'টিম্বাকটু', 'সায়ে' নয়।'

মুহূর্তকাল গুম হয়ে কাটিয়ে এবার অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে বললেন, 'তবে কি নাইজারের পূর্বদিকে যাওয়ার ইচ্ছা আদৌ আপনাদের ছিল না? হুম্ আগে আমার জানা থাকলে আপনাদের এত কষ্ট করে এখানে আসার কোনো দরকারই ছিল না।'

বারজাক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমাদের এত কষ্ট দিয়ে এখানে না এনে যদি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতেন। তবে তো ফরাসি সরকারের কানে জল ঢুকত।'

'কানে জল তো এখনো ঢুকতে পারে। আর তা ঢুকবেও।'

'তাই তো সহজে আপনাদের এখানে নিয়ে আসতে উৎসাহী হই নি। ফিরিয়ে দিতে সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছিলাম।'

শয়তান হ্যারি কিলারের উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করার মতো বটে। সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স এবার আগ বাড়িয়ে বললেন, 'তা-ই যদি হয় তবে তো আমাদের যেখান থেকে তুলে এনেছেন সেখানেই রেখে দিয়ে আসতে পারেন।'

'আর আপনারা দেশে ফিরে গিয়ে ব্ল্যাকল্যান্ড আর আমার কাণ্ডকারখানার কথা ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে দিন, তাই না? আমার সাফ কথা শুনে রাখুন একবার এখানে যে মাথা গলায় সে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে না। আপনাদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবার নয়।'

'আপনি যত যাই করুন না কেন সরকার পক্ষ থেকে তদন্ত কমিশন আসবেই।'

'আসুক। লড়াইয়ে আমিই জিতব। কিন্তু আমার ইচ্ছা আপনাদের দিয়ে অন্যভাবে কাজ হাসিল করতে। কীভাবে, তাই না? জামিন থাকুন। তাতে আপনাদের লাশের চেয়ে বড় কাজ হবে। আমি নিঃসন্দেহ।'

অভিযাত্রীরা এটুকু অন্তত বুঝতে পারলেন, 'তাঁদের জান খতম করার অভিপ্রায় নেই।'

হ্যারি কিলার এবার বললেন, 'আপনারা জামিন থাকুন তাতে আপনাদের খুন করার চেয়েও বেশি উপকার আমার হবে। আমার শেষ কথা শুনুন, হয় জামিন থাকুন, নয় তো আমার কর্মযজ্ঞের সহযোগী হয়ে এখানেই নিরাপদে বসবাস করুন। সত্যি কথা কি জানেন? ফরাসি সৈন্যরা আজ না হোক কাল আমার রাজ্যের সন্ধান পাবেই। আমি বালির ফসল ফলানোর কাজে মেতে রয়েছি, তারা ব্যস্ত নাইজার কলোনি নিয়ে। দুই রাজ্য হাত মিলিয়ে, বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে কাজ করলে উভয়েরই মঙ্গল।'

www.pathagar.com

বারজাক অভিযাত্রীদের সবার হয়ে জবাব দিতে গিয়ে বললেন, 'বন্ধুত্ব? আপনার সঙ্গে?'

'ব্যঙ্গ করছেন নাকি সাহেব। আপনারা এখন সমতল ভূমি থেকে একশো কুড়ি ফুট ওপরে অবস্থান করছেন। চারদিকে নজর ঘুরিয়ে তাকান, আমার কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কিছুটা অন্তত অনুমান করতে পারবেন। বারোশো বর্গমাইল জুড়ে আমার রাজ্য। অন্তত দশ বছর ধরে একে আমি গড়ে তুলেছি। এর কোনো এক প্রান্তে অবাঞ্ছিত কোনো ঘটনা ঘটামাত্র টেলিফোন মারফৎ আমার কাছে খবর চলে আসবে। টেলিফোনের তার টেনে রাখার জন্য সারিবদ্ধভাবে খুঁটি পোতা রয়েছে। আর ওই যে আকাশ-ছোঁয়া টাওয়ার দেখছেন, এটা আলো নির্গত হয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দিনের আলোর মতো আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়ে। এখান থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়ে অনেক উন্নত মানের 'সাইকোসকোপ' নামক যন্ত্রের সাহায্যে এ টাওয়ারটার ওপর থেকে আমার রাজ্যের সর্বত্র নজর রাখি।'

অভিযাত্রীদের দিকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা এগিয়ে দিয়ে হ্যারি কিলার বললেন, 'ইচ্ছে হলে দূরবীক্ষণ চোখে লাগিয়ে দেখতে পারেন।'

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স দূরবীক্ষণ যন্ত্রটায় চোখ লাগিয়েই চমকে উঠলেন।

হ্যারি কিলার বললেন, 'কী, দুজন নিগ্রোকে দেখতে পাচ্ছেন? মনে করুন, তারা পালিয়ে যাবার ফিকির করছে। বেশি দূর যাওয়া হিম্মতে কুলোবে না। লক্ষ করুন আমি তাদের কি হাল করি।' কথা বলতে বলতে এক নম্বর টেলিফোন ট্রান্সমিটার তুলে বললেন, 'সাকের চৌদ্দ নম্বর। আর ব্যাসার্ধ পনেরশো দুই।' এবার বন্দি অভিযাত্রীদের দিকে মুহূর্তের জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'তামাশাটা কি হয় দেখুন।'

মুহূর্তের মধ্যেই একটা কালো দাগ দেখা গেল। তার ওপর দেখা গেল ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালো দাগটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। হ্যারি কিলার এবার বললেন, 'লোকটাকে নিকেশ করে দিয়েছি।"

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স বললেন?—এ কী অমানুষিক কাজ! লোকটাকে খতম করে দিলেন?

হ্যারি কিলার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলেন, 'ধুৎ। এ আবার একটা সমস্যা নাকি? একটা গেলে হাজারটা নিগ্রো আমদানি করা যাবে। কিন্তু আমার হিম্মৎ, আকাশ টর্পেডের হিম্মৎটা চোখের সামনেই দেখলেন তো? কী ভয়ঙ্কর গতিশক্তি, অব্যর্থ টিপ্—একচুলও হেরফের হবার নয়।'

কী পাশবিক প্রবৃত্তি! অভিযাত্রীদের মনপ্রাণ বিষিয়ে উঠল।

অকস্মাৎ কালো মতো একটা বস্তু আকাশের গায়ে আবির্ভূত হল। উল্কার বেগে আর একটা কালো বস্তু প্রথমটার দিকে ধেয়ে চলল। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অভিযাত্রীরা কিছুই বুঝতে পারলেন না।

মিস মোরনাস ভীত-সন্ত্রস্ত স্বরে বললেন, 'লোকটাকে কি পরপারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, নাকি ইহলোকেই আছে?'

'পরলোকে নয়, ইহলোকেই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চোখের সামনে দেখতে পাবেন।' কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই হ্যারি কিলার সেখান থেকে চলে গেলেন।

আমরা চাতালে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম কালো মতো একটা বস্তু শূন্যপথে অভিযাত্রীদের দিকে ছুটে আসছে। একটু বাদেই সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স বুঝতে

www.pathagar.com

পারলেন, যে-উড়ন্ত যন্ত্রের সাহায্যে তাঁদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে এটা সেই যন্ত্রযান। কিন্তু যন্ত্রযানটার নিচে যেন কি একটা ঝুলছে।

হ্যারি কিলার পিছন থেকে বললেন, 'এটাই আমার আকাশযান 'হেলিপ্লেন'। মুহূর্তের মধ্যেই বুঝতে পারবেন, আমার খপ্পর থেকে পালাবার চেষ্টা করার পরিণাম কী ভয়ঙ্কর!'

হেলিপ্লেনটা অভিযাত্রীদের মাথার ওপরে আসতেই অদৃষ্ট বিড়ম্বিত একটা নিগ্রো সেটা থেকে দুম্ করে আছাড় খেয়ে তাদের সামনে পড়ল। তার মাথার খুলিটা টুকরো টুকরো হয়ে খিলু চারদিকে ঠিকরে পড়ল। আর সর্বাঙ্গ থেৎলে গেল।

মিস মোরনাস বিকট আর্তনাদ করে দু-হাতে মুখ ঢাকলেন। পরমুহূর্তেই উম্মাদিনীর মতো ছুটে গিয়ে হ্যারি কিলারের গলা টিপে ধরে গর্জে উঠলেন, 'শয়তান! পিশাচ কাহিকার!'

হ্যারি কিলার তাঁর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ঝট করে কয়েক হাত সরে গেলেন।

ব্যস, যমদূতাকৃতি প্রহরীরা ছুটে এসে কেবলমাত্র মিস মোরনাসকেই নয়।, অন্যান্যদেরও জাপ্টে ধরে ফেললেন। সবাইকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। হ্যারি কিলার বিকট স্বরে হাসতে লাগলেন, শয়তানের হাসি।

হ্যারি কিলার তাঁর সুসজ্জিত কামরায় আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে বসে। এমন সময় রক্ষীরা অভিযাত্রীদের তাঁর সামনে হাজির করল। তাঁদের ঘরে ঢুকতে দেখেই তিনি তড়িৎ-গতিতে সোজা হয়ে বসে পড়লেন। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন মিস মোরনাসের মুখের দিকে। তাঁর দৃষ্টিতে শয়তানের লালসা সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেল।

এক সময় হ্যারি কিলার গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করলেন, 'আমার হিম্মৎ তো আপনারা চোখের সামনেই দেখলেন। ভবিষ্যতে আরও দেখার সৌভাগ্য হবে। এবার যা বলছি তার জবাব দিন। শুনেছি, আপনাদের মধ্যে একজন চিকিৎসক, একজন রাজনীতিজ্ঞ, একজন সাংবাদিক আর দুজন নিরেট বোকা রয়েছেন। হ্যাঁ প্রয়োজনে ফ্রান্সের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে পারেন, কথা দিচ্ছি রাজনীতিজ্ঞ, চিকিৎসকের হাসপাতাল গড়ে দেব আর সাংবাদিকের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করব ব্ল্যাকল্যান্ড থান্ডারবোল্টের। আর বাকি দুজনেরও জন্য উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করে দেব। আর রূপসী যুবতী? তাকে আমার খুবই চোখে লেগেছে। তাকে বিয়ে করে আমার স্ত্রীর মর্যাদা দেব মনস্থ করেছি।'

বারজাক ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'স্বেচ্ছায় কোনোটাই হবার নয়, জেনে রাখবেন। তবে বলপূর্বক যেটুকু করতে পারবেন করে নেবেন।'

শয়তানের হাসি হেসে হ্যারি কিলার বললেন, 'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! আরে এত ব্যস্ততার কিছু নেই। এক মাস সময় আপনাদের দিচ্ছি। ভাবুন, ভেবে আপনাদের সিদ্ধান্তের কথা আমাকে জানাবেন।'

এবার রক্ষীদের হুকুম দিলে বন্দিদের জেলখানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য।

বারজাক গর্জে উঠলেন, 'এক মাস পরেও যদি আপনার প্রস্তাবে রাজি না হই তবে কোন্ পথ গ্রহণ করবেন?'

তাচ্ছিল্যের স্বরে হ্যারি কিলার জবাব দিলেন, 'তখনকার কথা তখনই না হয় ভাবা যাবে। হয়তো বা ফাঁসির হুকুমই দিতে হতে পারে।'

রক্ষীরা বন্দিদের নিয়ে কয়েদখানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

www.pathagar.com

*   *   *

শয়তান! হ্যারি কিলার সাক্ষাৎ শয়তান। কেবলমাত্র নিজের ক্ষমতা জাহির করার জন্য একটা নিগ্রোকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলেন। হিংস্র জন্তু জানোয়ার ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে এরকম অমানবিক কাজ করা একেবারেই অসম্ভব।

উপরোক্ত ঘটনার পর থেকে অভিযাত্রীরা কয়েদখানায় বসেই উপলব্ধি করতে লাগলেন হ্যারি কিলার যেন কেমন বদলে গেছেন। আগেকার নিষ্ঠুরতা, পৈশাচিক মনোভাব তাঁর মধ্যে থেকে অন্তর্হিত হয়ে সেখানে মমত্ববোধ নিয়েছে। তাঁরা সকাল-বিকাল কয়েদখানার বাইরে এসে খেয়ালখুশি মাফিক ব্ল্যাকল্যান্ড নগরের সর্বত্র ঘোরাফেরা করতে পারছেন। কেউ বাধা দিচ্ছে না। তবে রক্ষীরা প্রতিনিয়ত তাদের চোখে চোখে রাখছে। কিন্তু পালানোর চিন্তা পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়।

রেড রিভার ছাড়া পালাবার সামান্যতম সুযোগও নেই। সেও দুরাশা, পাগলের চিন্তা, রেড রিভার পেরোবার মতো নৌকা কোথায়? তাও আবার নব্বই ফুট নিচে। দড়িদাড়া থাকলে না হয় ঝুলতে ঝুলতে নামার চেষ্টা করা যেত।

কয়েদখানার ছাদে দাঁড়িয়ে বন্দি-অভিযাত্রীরা ব্ল্যাকল্যান্ড শহর আর কারখানাটাকে বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। শহরের ভেতরে শহর। কারখানা উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত। কিন্তু এমন সুরক্ষা-ব্যবস্থার কি-ই বা দরকার ছিল? এ-ওতো কম বিস্ময়ের উদ্রেক করছে না। নিছক কারখানাই যদি হয় তবে ধোঁয়া বেরোবার চিমনি দেখা যাচ্ছে না তো? এরও একটা টাওয়ার রয়েছে। উচ্চতা একশো গজের কম নয়। কারণ কি? উঁচু প্রাচীরটা রেড রিভার আর এসপ্লানেডে এসে শেষ হবার পিছনেই বা কোন্ কারণ রয়েছে? আরও অবাক কাণ্ড! ছোট্ট একটা নগর যার বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। হ্যারি কিলার নিজেই এখানকার যাবতীয় চাহিদা পূরণ করছেন।

অভিযাত্রীরা দিনের পর দিন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করেও পালাবার মত উপযুক্ত কোনো পথের হদিস করতে পারলেন না। কার্সল ব্রিজে একজন মেরিফেলো সর্বদা পাহারায় নিযুক্ত। তার ওপর শান্ত্রীরা তো রয়েছেই। অতএব পালানোর চিন্তা পুরোপুরি বাতিল।

তেসরা এপ্রিল। সেদিনই পরপর দুটো রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেল। দুপুর তিনটার কাছাকাছি নিগ্রো পথপ্রদর্শক মালিক এসে হাউমাউ করে কেঁদে পড়ল জেন ব্লেজনের পায়ে। টোনাগানের খবর তার জানা নেই। তারা উভয়েই অভিযাত্রীদের দল ছেড়ে গোপনে পালিয়েছিল।

আর দ্বিতীয় ঘটনাটা? বিকাল পাঁচটার কাছাকাছি সে ঘটনাটা ঘটে। চৌমৌকি হ্যারি কিলারের হুকুমে ছুটে এসেছে। তিনি তাকে হুকুম দিয়েছেন মিস মোরনাসকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অভিযাত্রীরা তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, কিছুতেই তাঁকে কাছ ছাড়া করবেন না। বরাতে যাই ঘটুক, বাধা সৃষ্টি করে যাবেনই। একটু বাদেই চৌমৌকি উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সেখানে হাজির হল জানাল, মিস মোরনাসকে যদি তাঁর সামনে হাজির করা না যায় তবে ছ'জনকেই ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে।

মিস মোরনাস সহ-অভিযাত্রীদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে রাজি হলেন। তিনি শয়তান হ্যারি কিলারের কাছে যাওয়ার জন্য পা—বাড়ালেন, কারোর বাধাই মানলেন না। ঘন্টা তিনেক পর তিনি তাঁদের কাছে ফিরে এলেন। এদিকে সেন্ট বেরেন তিন ঘন্টা ধরে আকুল হয়ে কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন।

www.pathagar.com

সেন্ট বেরেনের প্রশ্নের উত্তর মিস মোরনাস ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'শয়তানটা নিজের বড্যারক্সের কথা শোনাবার জন্যই আমাকে ডাকিয়ে নিয়েছিল। আমাকে বিয়ে করে নাকি রানীর হালে রাখবেন। আমি ফোঁস করে উঠলাম,এক মাস সময় তো দেওয়াই হয়েছে। তার আগে একথা তো বলা উচিত নয়। মুখে শয়তানের হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, 'বহুৎ আচ্ছা, এক মাস সময়ের ব্যাপারটাই তবে বহাল থাকবে। তবে ইতিমধ্যে রোজ বিকালে একবার করে এসে আমারে সঙ্গে কিছুটা করে সময় কাটাতে হবে, মনে থাকে যেন। '

এবার থেকে মিস মোরনাস রোজ তিন ঘণ্টা করে হ্যারি কিলারের সঙ্গ কাটিয়ে রাত্রি আটটায় সহ-অভিযাত্রীদের কাছে ফিরে আসতে লাগলেন। সেখানে তিনি দেখতেন হ্যারি কিলার রোজ সন্ধ্যায় কাউন্সিলারদের নিয়ে সভা করেন। রাজ্য চালাতে গিয়ে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলোর সুষ্ঠু মীমাংসাই সভার আলোচ্য বিষয়। তার রাজ্য চালানোর মধ্যে কোনো অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যখন দেখলেন, হ্যারি কিলার মাঝে মাঝে কাউন্সিলারদের সঙ্গে কানে কানে শলা পরামর্শ করছেন। কিন্তু আলোচ্য বিষয় যে কি সে সম্বন্ধে মিস মোরনাস তিলমাত্র ধারণাও করতে পারলেন না। সবার শেষে হ্যারি কিলার একা আধ ঘণ্টার জন্য পাশের ছোট্ট একটা কামরায় চলে যান। তখন ঘরটার ভেতর থেকে কাতর আর্তস্বর ভেসে আসে। কে যেন অসহ্য যন্ত্রনায় ছটফট করে।

নির্দিষ্ট সময় অন্তে হ্যারি কিলার ফিরে এলে মিস মোরনাস গ্লাসের পর গ্লাস মদ নিজে হাতে তাকে খাওয়ান। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বিছানায় এলিয়ে পড়ে। একেবারে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। মিস মোরনাস একাধিক দিন ভেবেছেন, তার কোর্টের পকেট থেকে চাবিটা নিয়ে তালা খুলে দেখবেন, ছোট্ট কামরাটায় কে বা কারা রয়েছে। কিন্তু সাহস পান নি।

হ্যারি কিলার এক ঘণ্টারও বেশি সময় বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকে। তখন অনায়াসে তার বুকে ছুরি গেঁথে দেওয়া যায়, মিস মোরনাস মাঝে-মধ্যে একথাও যে ভাবেন নি তা নয়, পর মুহূর্তেই ভেবেছেন, শয়তানটা তো একা নয়। ব্ল্যাকগার্ড, কাউন্সিলার আর মেরিফেলোরা তো রয়েই যাবে। অতএব তাকে খতম করে কি-ই বা ফয়দা হবে।

কিন্তু শান্তি চুক্তি হলেও ব্ল্যাকল্যান্ড যে শেষপর্যন্ত তার দাম দেবে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? আর একমাত্র হ্যারি কিলারই ভাবছে, কয়েদিদের হত্যা বা কয়েদ করে রাখার চেয়ে মুক্তি দিলেই লাভ বেশি। অতএব তাকে বাঁচিয়ে রাখলে তাদের লাভের সম্ভাবনাই বেশি। তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলে তার সহকর্মীদেরই মওকা। আপদ নিকেশ হলে তারা স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করতে পারবে। আর রাজ্যের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারবে। এক এক করে পাঁচটা দিন কেটে গেল।

অবশেষে এল আটই এপ্রিল। রেড রিভারের লাগোয়া প্রসাদের ছাদের ওপর অভিযাত্রীরা জড়ো হয়েছেন। মিস মোরনাস হ্যারি কিলারের সেদিনের কাণ্ডকারখানা বলার জন্য সবে মুখ খুলেছেন। হঠাৎ ছাদের এক ধারে ধুপ্ করে একটা আওয়াজ হল। সবাই অন্ধকারে স্থবিরের মতো বসে রইলেন। বুকের ভেথরে ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেছে।

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স সাহসে ভর করে উঠে গিয়ে একটা ছোট্ট পাথরের টুকরো কুড়িয়ে আনলেন। পাথরটার গায়ে দড়ি বাঁধা। সরু দড়ি। সেটা ধরে টানতেই

www.pathagar.com

ত্রিশ ফুটে মতো মোটা দড়ি উঠে এল। এক সময় সেটা আটকে গেল। দড়ির প্রান্তটা একটা শক্ত লোহার আঙটার সঙ্গে আচ্ছা করে বেঁধে দেওয়া হল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দড়িটা বেয়ে উঠে এল টোনগানে। জানা গেল, সে হেলিপ্লেনের তীব্র সার্চ লাইটের এক্তিয়ারের বাইরে ছিল। ফলে সহজেই আত্মগোপন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। অশ্বারোহী সৈন্যদের পিছনে এঁটুলির মতো লেগেছিল। দিনে ত্রিশ মাইল পথ দৌড়ে এতটা পথ অতিক্রম করে সে এখানে, ব্ল্যাকল্যান্ডে পৌছাতে পেরেছে। পথে একটা পরিত্যক্ত কুঁড়েঘরে এক গোছা দড়ি পেয়েছিল। আসার সময় সেটা সঙ্গে নিয়ে আসে। আবছা অন্ধকারে মনিবদের হাঁটাহাঁটি করতে দেখে চুপি চুপি পাথর বেঁধে দড়ির প্রান্তটা ছুঁড়ে দেয়।

ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরি না করে অভিযাত্রীরা নেমে এলেন নিচে। টোনগানে রেড রিভারে একটা নৌকা বেঁধে রেখেছিল। চার-পাঁচ রাত্রি নৌকা চালালে দুশো আশি মাইল পথ পাড়ি দেওয়া যাবে। সেখান থেকে সায়েরের অদূরবর্তী বিকিনি গ্রামে হাজির হওয়া যাবে, অভিযাত্রীরা তরতর করে নিচে নেমে গেলেন, টোনগানে সবার শেষে নামল। তারা নদীর পাড়ে হাজির হলেন, অন্ধকারে রক্ষীবাহিনীর নজর এড়িয়ে। দশটার একটু বাদেই নৌকার নোঙর খোলা হল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে। সর্বনেশে কাণ্ডটা ঘটে গেল। নগরটাকে পিছনে ফেলে নৌকাটা এগিয়ে যেতে যেতে আচমকা কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। নদীর একূল-ওকূল জুড়ে পেতে রাখা হয়েছে একটা লোহার জাল, পাশেই সিবিল বডি আর মেরিফেলোর কোয়ার্টাল।

পালিয়ে যাবার রাস্তা বন্ধ। হ্যারি কিলার তো বলেছেই ব্ল্যাকল্যান্ডে কেউ একবার এলে তার পক্ষে আর জ্যান্ত পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। নদীপথ রাত্রির অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে জাল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ব্যাপার দেখে অভিযাত্রীরা হতোদ্যম হয়ে পড়লেন, নদীপথ ছাড়া স্থলপথে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা পাগলের প্রলাপ।

এখন উপায়? তবে কি তারা রাজপ্রাসাদে ফিরে গিয়ে রাজা সাহেব হ্যারি কিলারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। না, যমলোকেও তাঁরা যেতে রাজি, কিন্তু শয়তানটার খপ্পরে আর নয়।

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্সের মাথা দিয়েই অত্যাশ্চর্য মতলবটা বেরোলো। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সবাই গুটিগুটি কারখানার দরজায় হাজির হলেন। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। দ্বাররক্ষী নিজের জায়গা ছেড়ে গুমটির ভেতরে চলে গেছে। চুপি চুপি গুমটির মধ্যে ঢুকে সেন্ট বেরেন আচমকা পিছন দিক থেকে রক্ষীকে জাপ্টে ধরলেন। টোনগানে আর আমিদি ফ্লোরেন্স তার মুখে জোর করে রুমাল গুঁজে দিয়ে বাক্‌শক্তি রহিত করে দিরেন। টোনগানে দড়িটা সঙ্গেই নিয়ে এসেছিল। সেটা দিয়ে তাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে মেঝের কোণে ফেলে রাখল।

কাজ হাসিল করে পলাতক অভিযাত্রীরা এবার এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। কিন্তু হায় গুমটি ঘরটার ভেতরের দিকের দরজাতেও ইয়া পেল্লাই দুটো তালা ঝুলছে। ভাঙতে গেলে লোকজন ছুটে আসবে। উপায়ন্তর না দেখে সবাই প্রাচীরের গা—ঘেঁষে হাঁটতে লাগলেন। সামনে পেলেন আর একটা দরজা। তালা ঝুলছে। হঠাৎ দেখলেন বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে এক বুড়ো ধীরপায়ে জল-কাদা বাঁচিয়ে ছোট-বড় পা ফেলে দরজাটার দিকেই এগোচ্ছে। প্রাচীরের সঙ্গে সেঁটে সবাই লুকিয়ে রইলেন।

www.pathagar.com

বুড়োটা এবার পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে তালা খোলার উদ্যোগ নিল। আটজন পলাতক অভিযাত্রী পা টিপে টিপে তার পিছনে এসে দাঁড়াল।

তালা খুলে দরজার পাল্লা সরাতেই সবাই মিলে ঠেলে ধাক্কে বুড়োটাকে দিলেন ভেতরে ঢুকিয়ে। নিজেরা ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন।

মিস মোরনাস বৈদ্যুতিক টর্চ জ্বালতেই টোনগানে এবং অদ্ভুত বুড়োটা পরস্পরকে দেখে চমকে উঠলেন। বুড়োর পরিচয় হচ্ছে 'মারসেন ক্যাম্যারেট। টোনগানে কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল, 'আরে, আপনি ক্যাম্যারেট।'

ক্যাম্যারেটের নামটা শোনামাত্র মিস মোরনাসও সচকিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'ক্যাম্যারেট তো আমার নিহত দাদার সহকর্মী ছিলেন! তবে কি ইনি সেই ক্যাম্যারেট।'

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'মঁসিয়ে ক্যাম্যারেট আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা—'

ক্যাম্যারেট স্বাভাবিক স্বরেই বললেন, 'কথা? আমার সঙ্গে? ঠিক আছে আসুন আমার সঙ্গে।'

ক্যাম্যারেট পলাতক অভিযাত্রীদের নিয়ে বেশ বড় সড় একটা ঘরে ঢুকলেন। আগোছাল হলেও আলমারি, চেয়ার, টেবিল সবই ঘরটায় রয়েছে।

সত্যই ক্যাম্যারেট নামধারী ভদ্রলোক বিচিত্র চরিত্রের। একটু আগে জেটিতে পলাতক অভিযাত্রীদের অন্ধকারে হাঁটাহাঁটি করতে দেখেও কিছু ভাবেন নি। তালা খুলতেই তাকে ঠেলে ধাক্কে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলে সামান্য অবাক হয়েছেন বটে। কিন্তু চেঁচামেচি করেন নি। শিশুর মতোই সহজ সরল তার মন।

বারজাক ঘরে ঢুকেই ক্যাম্যারেটের কাছে সবিনয় নিবেদন রাখলেন, 'মঁসিয়ে ক্যাম্যারেট, আমরা চরম বিপদাপন্ন। আপনার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছি। আমাদের প্রাণ বাঁচান। নইলে আমাদের—।'

'বাঁচাব? কার কাছ থেকে বাঁচাতে হবে?'

'অত্যাচারী দাম্ভিক হ্যারি কিলারের কবল থেকে।'

'সে কী হ্যারি কিলার অত্যাচারী! দাম্ভিক! এমন কথা তো আমার জানা নেই।'

'কই আমি তো—হ্যারি কিলার নগরের ব্ল্যাকল্যান্ড নামকরণ করেছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, আর হ্যারি কিলার লোকটা অত্যাচারী—দাম্ভিক—স্বৈরাচারী, নাকি পাগল সঠিক বলা মুশকিল। তবে কিছু না কিছু মাথায় দোষ তাঁর অবশ্যই আছে।'

একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করা গেল। অভিযাত্রীদের পরিচয় জানার কিছুমাত্র আগ্রহও অদ্ভুত মানুষ ক্যাম্যারেটের মধ্যে লক্ষিত হল না।

বারজাক আবার মুখ খুললেন, 'একটা কথা, টোনগানে তো আপনার দীর্ঘদিনের পরিচিত, তাই না? আপনি নিজে তো একজন ফরাসি, ঠিক কিনা?

'যে কথা বলতে চাইছি, ফরাসি গভর্নমেন্টের হুকুমে একটা কমিশন মিশরে আসে। বারজাক কমিশন। আমি নিজেই সে কমিশনের পরিচালক। আর এই সঙ্গীরা আমার সহযোগী। হ্যারি কিলার কেবলমাত্র যে আমাদের পথই আগলাচ্ছেন তাই নয়, আমাদের ওপর অত্যাচারও চালাচ্ছেন। আসলে তাঁর গোপন কাণ্ড-কারখানার কথা ইউরোপের কেউ জানতে না পারে। এমন কি এখানে কয়েদখানায় আমাদের পুরে রেখেছেন।'

www.pathagar.com

'এ কি করে হয়! ইউরোপের কাছে এখানকার কথা গোপন থাকার তো কথা নয়। এখানকার যেসব কর্মী দেশে ফিরে যাচ্ছে তারা অবশ্যই সেখানে এসব কথা বলছে ও বলেছে। 'না। এমন কথা ভাবাই যায় না—ভাবতে উৎসাহই পাওয়া যায় না।'

'তবুও সম্পূর্ণ সত্য। আপনাকে তো বললামই, হ্যারি কিলার আমাদের ওপরও অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে। এমন কি ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবে বলে শাসাচ্ছে। আরও আছে, নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিতে গিয়ে একজন নিগ্রোকে শূন্য থেকে আছড়ে ফেলে আর অন্যজনকে আকাশ—টর্পেডো মেরে খুন করেছে।'

মারসেন ক্যাম্যারেট যেন আচমকা হোঁচট খেয়ে সম্বিৎ ফিরে পেলেন। বাস্তব জগতের শ্বাসরুদ্ধ হওয়া পাশবিকতার কথায় তিনি যেন আচমকা ভাবনার জগৎ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন। এমন একটা মানুষ নামধারী নরপিশাচের সঙ্গে এতদিন কাটিয়েছেন ভেবে তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল।

এবার বারজাক বললেন, 'এমন জঘন্যতম কাজ যে করেছে সে নির্ঘাৎ আরও অনেক, অনেক দুষ্কর্ম করেছে যা আমাদের ধ্যানধারণা বহির্ভূত। একটা কথা ভেবে পাচ্ছি নে মঁসিয়ে ক্যাম্যারেট, হ্যারি কিলারের মগজ তো মদ আর অপকর্মের চিন্তা ভবনায় ভোঁতা হয়ে গেছে। তাই যদি হয় তবে মরুভূমির বুকে ব্ল্যাকল্যান্ডের মতো শহর, কারখানা, চাষের জমি, টেলিফোন-ব্যবস্থা প্রভৃতি সৃষ্টির মূলে কার অবদান রয়েছে?'

ক্যামারেট চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ এঁকে বললেন, 'হ্যারি কিলারের কিছুই করার ক্ষমতা নেই। তবে হ্যাঁ, গোয়ার্তুমিই তার চরিত্রের একমাত্র সম্বল। ব্ল্যাকল্যান্ডে যা কিছু দেখছেন সবই আমার মাথা দিয়ে বেরিয়েছে। আমিই এর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা।'

ডক্টর চেতোন্ন সবিস্ময়ে বললেন, 'সে কী! নিজের যাবতীয় সৃষ্টি আপনি ওই নরপিশাচ হ্যারি কিলারের হাতে তুলে দিলেন! আপনি ভুলেও ভাবেন নি, হ্যারি কিলার আপনার সৃষ্টিকে কোন্ কাজে লাগিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে? এরকম একটা নগর প্রতিষ্ঠার চিন্তাই বা আপনার মাথায় আসার কারণ কি?"

'ধ্যুৎ সাহেব! ব্ল্যাকল্যান্ড পত্তনের চিন্তা আমার মাথায় আসতে যাবে কেন? এ তো পুরোটাই হ্যারি কিলারের পরিকল্পনা। আমি এর রূপকার মাত্র। শুনুন তবে বলছি—একবার জর্জ ব্রেজন নামে এক ক্যাপ্টেন ইংরেজ সেনাবাহিনী নিয়ে অফ্রিকা অভিযানে আসেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। টোনগানে ছিল সে-বাহিনীর সার্জেন্ট। আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার। পৃথিবীর জলভাগ, পর্বত প্রভৃতি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে তখন আমি লিপ্ত ছিলাম। দুমাস বাদে পথে একসময় আমাদের অভিযানে যোগদেন হ্যারি কিলার। ব্যস, তার পর থেকে আমরা একে অন্যের কাছাকাছি পাশাপাশি রয়েছি।'

এবার মিস মোরনাস মুখ খুললেন, 'দলে যোগদানের পর সুচতুর ও কূটনীতিজ্ঞ হ্যারি কিলার এসে ক্যাপ্টেন ব্রেজনকে কোণঠাসা করে নিজে তাঁর জায়গা দখল করে বসলেন, ঠিক কি না?'

'এখবর আমি রাখিনি। আসলে আমি সর্বদা নিজের চিন্তার জগতে ডুবে থাকতাম। তারপর কি বলছি, শুনুন-আটচল্লিশ ঘন্টা ব্যক্তিগত অভিযান সেরে আমি একদিন তাঁবুতে ফিরে তাজ্জব বনে গেলাম, দেখি, সৈন্য-সামন্ত আর যন্ত্রপাতি সবই বে-পাত্তা হয়ে গেছে। কেউ নেই-কিচ্ছু নেই। হতাশ হয়ে পড়লাম। একা মনমরা হয়ে বসে। হঠাৎ হ্যারি

www.pathagar.com

কিলার পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, ক্যাপ্টেন ব্রেজন সবাইকে নিয়ে উপকূলের দিকে পাড়ি জমিয়েছেন। আমার সঙ্গে কুড়িজন লোক রয়েছে। উপায় নেই। চলুন, বাকি পথটুকু আমরাই অভিযান চালাই। আমি নিরুপায়। অনন্যোপায় হয়ে তাঁর সঙ্গ নিতেই হল। পথ পাড়ি দিতে দিতে আমার মাথায় উঁকি দেওয়া কয়েকটা পরিকল্পনার কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করি। তিনি শেষমেশ আমাকে এখানে হাজির করলেন।

আমাকে একদিন বলল, 'আপনার যা মন চায় করুন, আমি আপনার পিছনে। আছি। ব্যস, আমি এবার আবিষ্কারের কাজে মেতে গেলাম।'

মিস মোরনাস বললেন, 'আপনি যে সব ঘটনার কথা জানেন না, অবশ্য জানার কথাও নয়। কারণ, আপনি যে অন্য জগতের লোক। যাক, হ্যারি কিলার অভিযানে যোগ দেওয়ার পর থেকে অভিযাত্রীরা মারদাঙ্গা, খুন-খারাপি আর লুঠ-তরাজ সমানে চালিয়ে যেতে লাগল। সৈন্যদল হয়ে উঠল লুঠেরা।'

'মানতে পারছি না। আমার চোখে কি তবে কিছুই পড়ত না?'

'এখানকার ভয়ঙ্কর সব ঘটনা তো কিছুই আপনার চোখে পড়ে নি। দশো বছর ধরে, আপনার উপস্থিতিতে, আপনার সামনেই বহু বহু নারকীয় কাণ্ড ঘটেছে। অথচ শয়তানটা কিন্তু আপনার শক্তিতেই শক্তিধর, ঠিক কিনা? সত্য তো সর্বদাই সত্য থেকে যায় মঁসিয়ে ক্যাম্যারেট।'

'তলে তলে এত কিছু ঘটে অথচ আমি কিছুই জানতে পারলাম না!'

'হ্যারি কিলারের প্ররোচনায় ও সক্রিয় অংশগ্রহণে নৃশংস ঘটনাবলীর কথা ইউরোপে পৌঁছে যায়। সভ্যজগৎ লজ্জায় মুখ ঢাকে। সশস্ত্র সৈন্যদল পাঠানো হয় ক্যাপ্টেন ব্রেজনের লুঠেরাদের দমন করার জন্য। তারা লুঠেরাদের ধ্বংস করে। তাই আপনি ব্যক্তিগত অভিযান থেকে ফিরে তাঁবু ফাঁকা দেখেছিলেন। ক্যাপ্টেন ব্রেজনকে খুন করা হয়েছে। ছুরির আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়।'

'সে কী! তাকে খুন করা হয়েছে!'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। দেখুন আমি মিস মোরনাস ছদ্মনাম ধারণ করে এখানে রয়েছি। আমার আসল নাম জেন ব্রেজন। ক্যাপ্টেন ব্রেজনের ছোট বোন আমি। আমার দাদা যে নিরপরাধ তা প্রমাণ করার জন্যই দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এ পর্যন্ত ছুটে এসেছি। দাদার নামে সারা ইউরোপে যে সব কুকর্মের কথা লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবই যে মিথ্যা তা প্রমাণের জন্যই আমার এ কষ্ট স্বীকার, এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। অন্য একজন আমার দাদার নামে ডাকাতি খুনখারাপি করে শেষপর্যন্ত সে-ই তাকে গুম্ করে দিয়েছে।'

কথা বলতে বলতে জামার তলা থেকে একটা ছোরা বের করে মিস মোরনাস এবার বললেন, 'হ্যাঁ,এটা দিয়ে আমার দাদাকে পিছন থেকে আঘাত করে খুন করেছে। দাদার কবর খুঁড়ে তার কঙ্কাল থেকে এ ছোরাটাকে উদ্ধার করেছি। হাতলে খুনির নাম লেখা ছিল। সবগুলো অক্ষর নেই। এখন বুঝতে পারছি, পুরো নামটা ছিল 'হ্যারি কিলার।'

ক্যাম্যারেট আৎকে উঠে বললেন, 'কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ডরে বাবা! আমি এসবের কিছুই জানি না!'

মিস মোরনাস এবার বললেন, 'কি ভাবছেন মঁসিয়ে ক্যাম্যারেট, আমরা আপনার কাছে আশ্রয় পাব তো?'

www.pathagar.com

'অবশ্যই এমন জঘন্যতম অন্যায় যে করেছে তার সঙ্গে সমঝোতার আর প্রশ্নই ওঠে না। আপনারা যে আমার আশ্রয়ে রয়েছেন একথা হ্যারি কিলার জানে না। আর যদি জানেও তবু আপনাদের চিন্তার কোনোই কারণ নেই।'

ক্যাম্যারেট পলাতক অভিযাত্রীদের নিজের আশ্রয়ে রেখে দিলেন।

সকালে ক্যাম্যারেট হাসিমুখে অভিযাত্রীদের কাছে এলেন। বিনম্র বিনয়ে বললেন, 'ভাইসব, এখনই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।' কথা বলতে বলতে হাতের কাছের একটা বোতামে টিপ দিলেন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় ঘণ্টা বাজতে শুরু হল।

ক্যাম্যারেট এবার অভিযাত্রীদের নিয়ে কারখানায় হাজির হলেন। তার নির্দেশে শ্রমিকদের হাজিরা খাতা খুলে রিগড নাম ডাকল। দেখা গেল,সবাই উপস্থিত।

ক্যাম্যারেট এবার শ্রমিকদের কাছে আগন্তুক অভিযাত্রীদের পরিচয় দিলেন তারপর গতরাত্রে শোনা হ্যারি কিলারের নৃশংস কাণ্ডকারখানার কথা সবিস্তারে তাদের কাছে ব্যক্ত করলেন।

শ্রমিকরা ডিরেক্টরকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে। তাঁর কোনো কথা অবিশ্বাস করার মতো ইচ্ছা তাদের নেই।

ক্যাম্যারেট এবার বললেন, 'একজন খুনী ডাকাতকে আমরা না জেনে সাহায্য করে যাচ্ছি। এর প্রতিকার অবশ্যই করতে হবে। বারজাক কমিশনের কোনো অভিযাত্রীর ওপর অত্যাচার করা বা বন্দি করে রাখার কোনো অধিকার জল্লাদ হ্যারি কিলারের নেই। আরো গভীর রহস্য হচ্ছে, মরুভূমির কেন্দ্রস্থলে যে এমন নগর ও কারখানা গড়ে তোলা হয়েছে তা ইউরোপের মানুষের কাছে অজ্ঞাত। এখানে কাজ করতে করতে বাড়ির জন্য, আপনজনের সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রত্যেকেরই মন কাঁদে। তোমাদেরও একই অবস্থা। কালরাত্রি হিসাব করে দেখেছি, মোট একশো সাইত্রিশ জন শ্রমিক-কর্মচারী কারখানার কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে গেছে। তাদের দুচার জনও যদি দেশে পৌঁছতে পারত তবে এখানকার কাণ্ডকারখানার কথা সারা ইউরোপে প্রচার হয়ে যেত। তবে কি এটাই মনে করা যেতে পারে, একশো সাইত্রিশ জনের একজনও শেষপর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি? তাদের পরিণাম কি হয়েছে, তোমাদের আর খোলসা করে বলার দরকার আছে বলে মনে করি না। হ্যারি কিলার আমাদের কাউকেই শেষপর্যন্ত দেশে পৌঁছতে দেবে না। অতএব আমাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে, বিদ্রোহে সোচ্চার হতে হবে।'

উত্তেজিত শ্রমিক সমস্বরে বলে উঠল, 'আমরা আপনার সঙ্গে আছি। বুদ্ধি দিন, কোন্ পথে, কীভাবে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।'

শ্রমিকদের আশ্বাস দিয়ে ক্যাম্যারেট কারখানা থেকে বেরিয়ে অভিযাত্রীদের নিয়ে নিজের বাসভবনে ফিরে এলেন। ঠিক তখনই হ্যারি কিলারের ফোন এল। কথা বললেন। ক্রেডলের ওপর রিসিভারটা রেখে বললেন, 'হ্যারি কিলার ফোন করেছিলেন, আপনারা যে আমার আশ্রয়ে রয়েছেন তা সে জেনে গেছে, চৌমৌকি নামে এক কর্মচারী খবরটা তাকে দিয়েছে।'

বারজাক তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'আমাদের আত্মরক্ষার জন্য রাইফেল দিন।'

মুচকি হেসে ক্যাম্যারেট বললেন, 'রাইফেল আর পিস্তল এখানে পাওয়া যায় না। ওসব দিয়ে কাজ হবার নয়। অন্যভাবে, অন্যপথে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে হবে।

www.pathagar.com

একটা কথা জানবেন, আমি চাইলে নগর, কারখানা আর সবকিছু চোখের পলকে উড়িয়ে দেওয়ায় হিম্মৎ রাখি। আর আমার ক্ষমতার কথা হ্যারি কিলারের অজানা নয়। তা ছাড়া কারখানার অর্ধেকটাই শেল—প্রুফ। কামান দেগে এর একচুল ক্ষতিও করা সম্ভব নয়। আর কারখানাটাই তার সব শক্তির মূল।'

ঠিক তখনই একটা চাপা গুম্ গুম্ শব্দ শোনা গেল। মুহূর্তকাল উৎকর্ণ হয়ে শুনে ক্যাম্যারেট বললেন, 'ওই দেখুন, শয়তানগুলো দরজা ভাঙার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালাচ্ছে। কিন্তু ভাঙা সম্ভব নয়।'

ক্যাম্যারেট এবার অভিযাত্রীদের নিয়ে কারখানার নিরাপত্তা-ব্যবস্থাদি দেখালেন। প্রাসাদ-দুর্গে যেমন একটা সাইক্লোসকোপ আছে ঠিক তেমনি এখানেও একটা রয়েছে। এটা বসানো হয়েছে পাইলনের মাঝামাঝি জায়গায়। ক্যাম্যারেট অভিযাত্রীদের নিয়ে সাইক্লোসকোপটার ভেতরে ঢুকে গেলেন। সেটা দেখাতে গিয়ে বললেন, 'প্রাসাদ-দুর্গের সাইক্লোসকোপটার মতো এটা দিয়ে বেশি দূরবর্তী অঞ্চলের জিনিস দেখা যায় না। প্রাসাদ-দুর্গের বিভিন্ন কোণে কৌশলে কতগুলি আয়না বসানো রয়েছে। কারখানার প্রাচীরের তলদেশ পর্যন্ত আয়নাগুলোতে প্রতিফলিত হয় এটাতে তা দেখা যায়। আমি এ ব্যবস্থায় দেখতে পেয়েছি হ্যারি কিলার কারখানার ভিতরে লোক ঢোকাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। বহুৎ আচ্ছা। মেরিফেলোরা মই বেয়ে উঠে প্রাচীরের মাথা স্পর্শ করা মাত্র নাচানাচি জুড়ে দিল। যেন আঠায় তাদের হাত আটকে গেছে। সবাই পুতুলের মতো শূন্যে ভাসছে। নিরেট বোকা তারা। বিদ্যুৎ পরিবাহিতা শক্তি যার তামার চেয়ে একশো গুণ বেশি আমার আবিষ্কৃত এমনই এক রকম ধাতু দিয়েছি। তাতে এ. সি. বিদ্যুৎ চালিয়ে দিয়েছি। পরিণাম তো নিজের চোখেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তারপর ঘটল আরও অবিশ্বাস্য কাণ্ড। যারা মাটিতে ছিল তারা ওপরের লোকগুলো স্পর্শ করামাত্র আরও অত্যাশ্চর্য নাচ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নেবার উপায় নেই।

'এবার আরও আশ্চর্যজনক একটা খেলা দেখুন।'

কথা বলতে বলতে ক্যাম্যারেট একটা বোতামে টিপ দিলেন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ঝুলন্ত লোকগুলো দুম দাম পড়তে লাগল।

ক্যাম্যারেট এবার বললেন, 'এর রহস্য কি জানেন? ইথারের মধ্যে যাবতীয় শক্তি বিশেষ বিশেষ কয়েকটা কল্পনামাত্র। বিশেষ এক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কম্পনের ফল আলো। বিদ্যুতেও একই—একমাত্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য স্বতন্ত্র প্রকৃতির। আমি মনে করি শেষের কম্পন আর তাপমাত্রার মধ্যে কোথাও সাদৃশ্য বর্তমান। কিন্তু প্রকৃতির কারণটা যে কি তা আমিও জানতে পারি নি। কিন্তু ইথারের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করতে আমি সক্ষম, প্রমাণ তো চোখের সামনেই পেলেন।'

সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে ক্যাম্যারেট বললেন, 'এবার যারা দরজা ধাক্কাধাক্কি করছে তাদের একটু তামাশা দেখানো যাক, চলুন।'

ক্যাম্যারেট এবার টেলিফোন ট্রান্সমিটার তুলে বললেন, 'বিগড তৈরি হয়েছ? ঠিক আছে ছেড়ে দাও।'

কথাটা শেষ হতে না হতে দুর্গটার দিক থেকে চোঙের মতো অত্যাশ্চর্য একটা যন্ত্র বেরিয়ে এল। একটা মুখ মোচার অগ্রভাগের মতো ছুঁচালো। বিচিত্র দর্শন চোঙটার পিছনে চারটে প্রপেলর লাগানো। সবকটা তীব্রবেগে ঘুরছে। এবার শূন্যে, অনুভূমিক

www.pathagar.com

অবস্থায় প্রাচীরের গা বরাবরা উড়ে যেতে লাগল। একই রকম বিচিত্র দর্শন একের পর এক বেরিয়ে একই দিকে উড়ে যেতে লাগল। পর পর কুড়িটা যন্ত্র। এবার সেগুলো থেকে লাখে লাখে ভিমরুল বেরিয়ে হানাদারদের মাথার ওপর ভন ভন্ করে চক্কর মারতে লাগল। আসলে এক ঝাঁক মেশিনগানের গুলি সেগুলো, তাদের পিছনে উড়ে এল আর এক ঝাঁক। তার পেছনে আর এক জাঁক। হানাদাররা গুলির ঘায়ে কাবু হয়ে বিকট আর্তনাদ করতে করতে যে, যেদিকে পারল চোঁ চাঁ দৌড় দিল।

* * *

ক্যাম্যারেট এবার আগন্তুক অভিযাত্রীদের কারখানা দেখাতে নিয়ে গেলেন। তাদের সামনের কারখানার পূর্ণাঙ্গ নকসাটা মেলে ধরলেন। কারখানাটার দৈর্ঘ্য তিন'শ ষাট গজ আর প্রস্থ আড়াইশো গজ, ক্ষেত্রফল ষাট বিঘা। রেড রিভারের তীর বরাবর এর অবস্থান। ষাট বিঘার প্রায় ছত্রিশ বিঘাই বাগান। সেখানে খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন করা হয়। বাকি খাদ্যবস্তু বাইরে থেকে আমদানি করা হয়, আর জেটির লাগোয়া জমিতে আড়াইশো গজ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট জমির ওপর কারখানাটা গড়ে তোলা হলেছে। তারই মধ্যে রয়েছে চৌদ্দটা চারতলা বাড়ি। একশো কুড়িটা ফ্ল্যাট। একশো লোক বৌ-ছেলেপুলে নিয়ে বাস করে।

ক্যাম্যারেট এবার তাঁদের নিয়ে কারখানার নিচের তলায়, যেখান থেকে ভিমরুল উড়ছে সেখানে গেলেন। ভিমরুলদের ছোট্ট ছোট্ট কামরাগুলোর পাশেই গোলা-বারুদের গুদাম। সেগুলোর ওপর দিয়ে এবার হাজির হলেন সারিবদ্ধ ওয়ার্কশপে।

এগুলোতে ঢালাই থেকে শুরু করে ফিটিং পর্যন্ত আলাদা আলাদা যাবতীয় বিভাগ রয়েছে।

কারখানা থেকে বেরিয়ে বাগানে আসতেই দেখা গেল প্রাসাদ-দূর্গের চূড়ায় দাঁড়িয়ে হ্যারি কিলার তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আচমকা বিকট আওয়াজ করে একটা বুলেট অভিযাত্রীদের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল।

ক্যাম্যারেট তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বলে উঠলেন, 'এক্কেবারেই বোকা হাঁদা দেখছি!' কথা বলতে বলতে ডান-হাতটা শূন্যে তুলে ইশারা করলেন। প্রাসাদ-দূর্গের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করলেন। দেখা গেল প্রাসাদ-দুর্গের চূড়ার সাইক্লোসকোপটা যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে।

ক্যাম্যারেট বললেন, 'বাছাধন এতেই ব্যাপার কি বুঝতে পারবে। সাইক্লোসকোপ আর আকাশ টর্পেডো যাই বলা হোক না কেন সবই তো আমারই আবিষ্কার। ওদের চেয়ে আমার শক্তিই কিন্তু বেশি মনে রাখবেন।'

ক্যাম্যারেট এবার আগন্তুক অভিযাত্রীদের নিয়ে নিরাপদে বাগানটা অতিক্রম করলেন। এবার সবাইকে নিয়ে তিনি পাওয়ার হাউসে গেলেন। ইতিপূর্বে কাঠ পুড়িয়ে বয়লার চালানো হত। তাতে অনেক হাঙ্গামা। তাই এখন আকাশ থেকে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে, নদী সৃষ্টি করে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। ছ' মাইল দূরে, নদীর ওপর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটা গড়ে তোলা হয়েছে। ধোঁয়া নেই বলে চিমনির প্রয়োজন হয় না। জেনারেটর থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতে দরকার মেটানো হয়।

ক্যামারেট এবার সবাইকে নিয়ে অস্ত্রকারখানায় নিয়ে গেলেন। ট্রান্সফরমার, ডায়নামো, অলটারনেটর আর কয়েলে বোঝাই ঘরটা। উৎপাদিত বিদ্যুতের সাহায্যে তিনি অস্ত্রপাতি তৈরি করেন। যন্ত্রপাতির মধ্যে অধিকাংশই তিনি নিজ হাতে তৈরি করে

www.pathagar.com

নিয়েছেন, বাকি প্রয়োজনীয়টুকু বাইরে থেকে আনানো হয়েছে। আর এত সব কাঁচামাল যে কোত্থেকে আসছে সে খবর তিনি রাখেন। চাহিদা অনুযায়ী হ্যারি কিলার সরবরাহ করেছেন। আর যাবতীয় অর্থও তিনিই জোগাড় করেছেন।

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স চোখ দুটো রীতিমতো কপালে তুলে বললেন, 'হ্যারি কিলার এমন অঢেল অর্থ পেলেন কোথায়। তাঁর কি টাকার গাছ আছে নাকি!'

'ধ্যুৎ ছাই! এসব নিয়ে আমি কোনোদিন মাথা ঘামিয়েছি নাকি যে বলব? যা বলতে চাচ্ছি, দেখাতে চাচ্ছি দেখে যান। প্রশ্ন যা কিছু পরে করবেন।' এবার অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'এটা কমপ্রেসর্স। বহু রকম তরল গ্যাস আর তরল বাতাস এখানে ব্যবহার করা হয়। যাবতীয় গ্যাসই তরল অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। গ্যাসকে নির্দিষ্ট চাপ ও তাপে রাখলে তরল হয়ে যায়। চাপ বিচ্ছিন্ন করলে আবার তা তরল অবস্থা থেকে গ্যাসীয় অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু আমি একটি পাত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে তা আর হতে দিই নি। আর একটা আবিষ্কার যাকে সম্পূর্ণ অ্যান্টি-ডায়াথারসিক—যার ভেতরে তিলমাত্র উত্তাপও প্রবেশ করতে পারে না। এটা দিয়ে তৈরি করে গ্যাস বা তরল রেখে তাদের তাপমাত্রার পরিবর্তন কিছুমাত্রও হয় না। তরল গ্যাস—গ্যাসীয় অবস্থায় ফিরে এসে পাত্রটাকে ফাটিয়ে দিতে পারে না। তারপর এ-আবিষ্কারকে কাজে লাগালাম। হেলিপ্লেন, এটাও আমারই সৃষ্টি। এটার তিনটে বৈশিষ্ট্য বর্তমান—স্থির থাকা, আকাশে ওড়া আর অনবরত তিন হাজার মাইল ওড়ার ক্ষমতা। মোদ্দা কথা এর চলনশক্তিকে মোটিভ পাওয়ার বলা হয়।

এবার বলছি, কীভাবে হেলিপ্লেন স্থির অবস্থায় থাকে। জীববিজ্ঞানীগণ যাকে রিফ্লেক্স-অ্যাকশন বলে আমি তা এতে প্রয়োগ করেছি। পাইলনের ওপরের দিকে এক জোড়া ডানা আপনারা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। তবে সবার মূলে কাজ করছে ভারকেন্দ্র হ্রাস করার উপায়। পাইলন ডানার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ব্যবহার করা হয় নি। পাইলন শীর্ষ বিন্দুকে কেন্দ্র করে প্রয়োজনে সামান্য দুলতে পারে, কীভাবে? আসলে উচ্চতা ও দিক্‌নির্দেশি হালের বাধা থাকার ফলেই এটা সম্ভব হয়। এর ফলে কম-বেশি ঝাঁকুনি লাগলে বুঝা যায় না।

এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা শুনুন, ভূমি থেকে আশমানে ওড়ার ক্ষমতা বলতে চাইছি। টেক-অফের সময় ডানা দুটো নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, পাইলনের গায়ে সেঁটে দেওয়া হয়। তখন অনভূমিক অবস্থায় প্রপেলার ভন্‌ভন্‌ করে ঘুরতে আরম্ভ করে। এর ফলে হেলিকপ্টার হেলিপ্লেনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। প্রপেলারের জন্যই উড়ন্তযানটা শূন্যে ভেসে থাকতে পারে। অনেকটা ওপরে উঠে গেলে ডানা দুটো ছড়িয়ে পড়ে। আর তখনই প্রপেলার সামনের দিকে ঝুঁকে যায় এরই ফলে হেলিপ্লেনটা এরোপ্লেনে রূপান্তরিত হয়। হেলিপ্লেনের গতিবেগ ঘণ্টায় আড়াইশো মাইল। জ্বালানী বোঝাই করে নিলে একনাগাড়ে তিন হাজার মাইল পথ পাড়ি দিতে পারে।'

ক্যাম্যারেট এবার অভিযাত্রীদের নিয়ে কারখানার প্রধান কেন্দ্রে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, 'আমরা টাওয়ারের যে তলায় অবস্থান করছি, আমাদের মাথার ওপরে এরকমই আরও পাঁচটা তলা রয়েছে। সবগুলোই এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতিতে ভরা। টাওয়ারের ওপরে সে অতিকায় পাইলনটা রয়েছে সেটা আমার ওয়েভ-প্রোজেক্টর। ব্যাপারটা খোলসা করে বলছি, হার্জ-জার্মানি বৈজ্ঞানিক। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন,

www.pathagar.com

ইনডাকশন তার থেকে একটা ইলেকট্রিক স্পার্ক যদি একটা কনডনসরের টার্মিনাল পয়েন্টে দুটো ছিদ্র দিয়ে চালিয়ে দিলে স্পার্কের জন্য যন্ত্রটার মেরু দুটোর ভেতরে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। কারো কারো কাছে কনডেনসর অসিলেটর নামে পরিচিত। এবার পয়েন্ট দুটোর মধ্যে যে-দোলনের উদ্ভব হল তা পয়েন্ট দুটোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ইথারেও আলোড়ন সৃষ্টি করে।'

ইথার কি? কাকে আমি ইতার বলতে চাইছি, শুনুন—সে গ্যাসীয় পদার্থের কথা বলছি। যা ওজনহীন, লঘু এবং অনুভূত হয় না তা কিন্তু এক নক্ষত্র থেকে অন্য একটা নক্ষত্রের মধ্যবর্তী মহাশূন্য থেকে আরম্ভ করে বস্তুর মধ্যস্থিত এক কোষ থেকে অন্য কোষের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানকে পূর্ণ করে রেখেছে। প্রত্যেকটা প্রতিটা দোলন অনুরূপ ইথারিয় অনু ভাইব্রেশনের উদ্ভব ঘটায়। এই ভাইব্রেশনই ইজিয়ান ওয়েভ নামে পরিচিত। এ ওয়েভকে বাস্তবে প্রয়োগ করার কথা কারোর মাথাতেই এতদিন আসে নি। বলতে দ্বিধা নেই, সর্বপ্রথম আমিই ব্যবহার করেছি।

ইতিপূর্বে বহু বিজ্ঞানীই লক্ষ করেছিলেন, আলোকরশ্মি যেমন আয়নায় প্রতিফলিত হয়, এ-ওয়েভকেও প্রতিফলিত করা সম্ভব। লক্ষ করলে কী হবে, কারোর পক্ষেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। প্রাচীরের মাথায় আমার আবিষ্কৃত যে সুপার কনডাকটিভ মেটার ব্যবহারের এমন রিফ্লেকটর নির্মাণ করেছি, সে যেকোন দিকে আমি ওয়েভসের সম্পূর্ণ শক্তিকে সংহত করতে সক্ষম। আকাশ পথে পাড়ি দেওয়ার সময় একতিল শক্তিও অপচয় না হওয়ার জন্য শুরুতে যা ছিল শেষেও তা-ই থেকে যায়। এবার রিসিভার তৈরিতে হাত দিলাম, ওয়েভ যে ফ্রিকোয়েন্সিতে সৃষ্টি হয় সেই একই ফ্রিকোয়েন্সি সম্পন্ন রিসিভার তৈরি হওয়া চাই। এই রিসিভারকেই আমি বহু কাজে ব্যবহার করে নগরটাকে অত্যাশ্চর্য করে তুলেছি।'

অভিযাত্রীরা এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো ক্যাম্যারেটের বক্তব্য শুনছিলেন। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই বারজাক বলে উঠলেন, 'এবার বলুন তো, আপনি এখান থেকে নগরটাকে ধ্বংস করে ফেলতে পারেন?'

ক্যাম্যারেট বললেন, 'অবশ্যই। এক তুড়িতে উড়িয়ে দিতে পারি। হ্যারি কিলারের ইচ্ছা অনুযায়ী আমি অজেয় নগরটা তৈরি করে দিয়েছি। কারখানা, বাড়িঘর প্রভৃতি প্রত্যেকটার তলায় এমন উচ্চশক্তি সম্পন্ন বারুদ রেখে দিয়েছি, আর এমন বিস্ফোরক লাগিয়ে রেখেছি যার সঙ্গে বিশেষ প্রকৃতির ওয়েভের সিনটোনাইজেশন আছে। আর সে ওয়েভের কথা আমি ছাড়া আর কোরোরই জানা নেই। এখান থেকে ওয়েভ চালান করে দিলে একটার পর একটা মাইন ফাটতে থাকবে। ব্যস, মুহূর্তে সব কিছু ছারখার হয়ে যাবে।'

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স দিনলিপির পাতায় ঘটনাবলী লিখতে লিখতে বললেন, 'তা যদি হয় তবে হ্যারি কিলারের হম্বিতম্বি বন্ধ করে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।'

মুচকি হেসে ক্যাম্যারেট বললেন, 'ওয়েভ বেশি দূরে পাঠাবার দরকার দেখা দিল আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত ঘটানোর তাগিদে। একদিন আমার এ-পরিকল্পনার কথা শুনে হ্যারি কিলার আমাকে সার্বিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। মেঘ লক্ষ করে আমি বিফ্লেক্টর পাইলনের সাহয্যে দিলাম ওয়েভ পাঠিয়ে। তড়িৎ প্রবাহের মাধ্যমে মেঘের জলরাশিকে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করি। তখন মেঘের পক্ষে জল ধারণের আর ক্ষমতা থাকে না।

www.pathagar.com

মাটির ভেতরের প্রচ্ছন্ন শক্তি এবং আকাশের পাশাপাশি দুটো মেঘ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে—অল্পক্ষণের মধ্যেই তা ঘটে যায়। তখনই ঝড়ের উদ্ভব ঘটে, বৃষ্টিপাত ঘটতে থাকে। এভাবেই আমি অনুর্বর মরুভূমিকে উর্বর করে তুলি।

তবে হ্যাঁ, আকাশে মেঘ না থাকলেও আর্দ্র আবহাওয়াতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সম্ভব। আজ না হোক কাল মেঘ জমবেই। সমস্যা হয় তা এখানে বৃষ্টিপাত না ঘটিয়ে ভাসতে ভাসতে অন্যত্র চলে যায়। তা থেকে জলরাশি নামানো আমার কাজ। সমস্যা আছে, উপায়ও বের করেছি।

দেখুন, আপনারা লক্ষ্য করতে পারছেন না বটে, কিন্তু এখনই পাইলনের শীর্ষদেশ থেকে ওয়েভ ছুটে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এদের হরেক রকম কাজে লাগানো সম্ভব। বিনা তারে পৃথিবীপৃষ্ঠে টেলিফোন বা টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা পত্তনের কথা আমি ভাবছি। কায়দামত একটা রিসিভার তৈরি করে নিতে পারলেই তারের কোনো দরকার পড়বে না। আমার এ গবেষণার কাজ প্রায় শেষের দিকে। সাধারণ টেলিগ্রাফে মর্স যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।' এবার একটা যন্ত্রের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললেন, 'এটা একটা বিশেষ ধরনের সার্কিট। এটাকে তড়িৎ প্রবাহের পথে বসিয়ে দিয়েছি। বোতাম টেপামাত্র সার্কিট ওয়েভ সৃষ্টিকারী তড়িৎ সাংযোজন ঘটবে। মার্স-চাবি নামানো থাকলে পাইলন থেকে ওয়েভ যাবে। মার্স-চাবি তোলা থাকলে কিন্তু হার্জিয়ান ওয়েভ পাঠানো সম্ভব নয়। রিসিভারটায় রিসিভার রয়েছে জানা না থাকলে এ বোতামটা টিপে রিফ্রেক্টরকে লাইন থেকে বাদ দিয়ে দিলেই কাজ মিটে যাবে। কোথাও রিসিভার থাকলে সেখানে আমার টেলিগ্রাফের বার্তা পৌছে যাবে।'

মিস মোরনাস ভুরুদুটো কুঁচকে বললেন, টেলিগ্রাফের ব্যাপারটা অনুগ্রহ করে একটু খোলসা করে যদি বলেন—'

'দেখুন, টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান রয়েছে তাদের জানা আছে বোতাম টিপে কীভাবে মার্স-হরফ পাঠানো হয়। মনে করুন কোথাও একটা রিসিভার রয়েছে, এবার বলুন কার কাছে টেলিগ্রাফ পাঠাতে চাচ্ছেন।?'

থতমত খেয়ে মিস মোরনাস বলে উঠলেন, 'মনে করুন ক্যাপ্টেন মারসিনেকে—।'

'তাঁর ঠিকানা?'

'হয়ত এখন টিম্বাকটুতে।'

বার কয়েক বোতাম টিপে ক্যাম্যারেট বললেন, 'এবার বলুন তার কাছে কি খবর পাঠাতে চাইছেন?'

'তিনি আমাকে জেন মোরনাস নামে জানেন।'

'এটা কোনো সমস্যই নয়। আসলে এ খবর তাঁর কাছে আদৌ পৌছাবে না। তবে খবর পাঠাচ্ছি-মিস জেন মোরনাসকে ব্ল্যাকল্যান্ড থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।'

আরে ব্ল্যাকল্যান্ড তো দুনিয়ার কাছে অজ্ঞাত। তবে ঠিকানার পরিবর্তে বলছি—১৫ ডিগ্রি ৫০ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ। আর দ্রাঘিমা—'

হ্যারি কিলার কারেন্ট বন্ধ করে দিল যে! একটু আগে আপনাদের বলেছিলাম, এখান থেকে ছ' মাইল দূরবর্তী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে এখানে কারেন্ট সরবরাহ করা হয়, মনে আছে তো? হ্যারি কিলার কারেন্ট পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু কারেন্ট বন্ধ করেও তার ফায়দা কিছুই হয় নি।' কথা বলতে বলতে অভিযাত্রীদের নিয়ে ওপর তলায় উঠে

www.pathagar.com

গেলেন, সাইক্লোসকোপে গিয়ে ঢুকলেন। প্রাচীরের বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, দেখলেন মেরিফেলোরা উল্লাস প্রকাশ করতে করতে ছুটে আসছে। আবার আক্রমণ চালাতে চায়। প্রচীরের ওপারে ভিমরুলদের গায়ে হাত দেওয়ামাত্র বিকট আর্তনাদ করে পরিখার ভেতরে ছিটকে পড়তে লাগল। এবার আর হতচ্ছাড়াদের বাঁচানোর চেষ্টা করব না। হ্যারি কিলার কারেন্ট বন্ধ করে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পাত্রের মুখ খুলে দিয়েছে। নালা গ্যাসে বোঝাই হয়ে গেছে। বাতাসের চেয়ে এটা বেশি ভারি বলে ওপরে উঠতে না পেরে নালার মধ্যেই জমা থাকবে, যে ছিটকে নালার ভেতরে পড়বে তারই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। দম বন্ধ হয়ে পটল তুলবে।

কিছু মনে করবেন না, এখন আর আমার পক্ষে ওদের রক্ষা করা সম্ভব নয়। ব্যবস্থাদি আগেভাগেই করা রয়েছে। বিদ্যুৎশক্তির পরিবর্তে তরল গ্যাসের সাহায্যে যন্ত্রটাকে চালানোর ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। সামনের দিকে তাকালেই বুঝতে পারেবন ভিমরুল ঝাঁকে ঝাঁকে উড়তে শুরু করেছে।'

ভিমরুলের হুলের ভয়ে মেরিফেলোরা অনুগামীদের নালার মধ্যে রেখেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল।

* * *

বারজাক কমিশন ছেড়ে আসতে গিয়ে ক্যাপ্টেন মারসিনকে বড়ই মর্মবেদনা ভোগ করতে হয়েছিল। সত্যিকারের সৈনিক বলতে যা বুঝায় তিনি ঠিক তা-ই। দেশের কল্যাণার্থে নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে তিনি পিছপাও নন। বাইশে ফেব্রুয়ারি হাজির হন সিকৌসিকোরো নগরে। ন' দিনে তিনশো মাইল পাড়ি দিয়েছেন।

ক্যাপ্টেন মারসিন পরের দিন সকালে কর্নেল সেন্ট আবানের আদেশনামা নিয়ে কর্নেল সারজাইন্সের সামনে হাজির হলেন। যথোচিত সম্ভাষণ জানিয়ে আদেশনামাটা তাঁকে দেখালেন। আদেশনামাটার ওপর পর পর তিনবার চোখ বুলিয়ে কর্নেল সারজাইন্স চোখ দুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে বললেন, 'একী অবাক কাণ্ড। সিকাসো থেকে টিম্বাকটু থেকে লোক পাঠাবার হুকুম দেওয়া হয়েছে।'

'লেফটেন্যান্ট ল্যাকো তো বললেন টিম্বাকটুতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া আমাদের আগমনবার্তা পান নি?'

'না, তা ছাড়া পিরোলিজতো গতকালই এখান দিয়ে গেছেন। টিম্বাকটু থেকে যে ডাক্তার যাচ্ছেন এমন কোনো ইঙ্গিতও তিনি দেন নি। টিম্বাকটুতে যাওয়ার আদেশ যখন আপনার ওপর বর্তেছে তখন অবশ্যই যাবেন। তবু আমি বলছি, আদেশনামাটার বিন্দুবিসর্গও আমার হৃদয়ঙ্গম হল না।'

ক্যাপ্টেন মারসিন আটদিন ধরে সবকিছু গোছগাছ করে দোসরা মার্চ টিম্বাকটুর উদ্দেশে যাত্রা করলেন এখানে পৌঁছলেন সতেরই মার্চ।

কর্নেল মোরনাস সেন্ট আবানের আদেশনামাটা কর্নেল অ্যালিগ্রের হাতে তুলে দিলেন। সেটা পড়ার পর তাঁর তো চক্ষু স্থির। তার মনটা খচখচিয়ে উঠল ব্যাপার কি, স্বাক্ষরটা কি তবে নকল?

কেনই বা এমন কাজ করতে যাওয়া। এ যে বারজাক কমিশনকে জেনে শুনে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া। ক্যাপ্টেন খুবই মর্মাহত হলেন। সন্দেহটা আরও গাঢ় হল, লেফটেন্যান্ট ল্যাকোরের নাম কেউ শোনেও নি জানতে পেরে। এদিকে মিস মোরনাসের যে কী পরিণতি হয়েছে তা ভেবেই মুষড়ে পড়লেন।

www.pathagar.com

সমস্যা আরও বেড়ে গেল সেন্ট আবানের স্বাক্ষর পরীক্ষা করার পর দেখা গেল সেটা মোটেই নকল নয়। অতএব আদেশনামাতে ছল চাতুরির আশ্রয় নেওয়া হয় নি।

পাক্কা দশ মাইল পথ পাড়ি দেওয়া এবং সেখান থেকে ফেরা সমস্যা বটে। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন পেরিগনি নামে ক্যাপ্টেন সারসিনের এক বহু দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেখানে হাজির হলেন। কাজের ফাঁকে বিজ্ঞান চর্চা করেন। যন্ত্রপাতি সর্বদা সঙ্গেই থাকে। তাঁর এ ঝোঁকের জন্য সহকর্মীরা প্রায়ই তাঁকে নিয়ে রঙ্গ রসিকতাও কম করেন না।

একদিন তাঁর তাঁবুর সামনে গিয়েই ক্যাপ্টেন মারসিন থমকে গেলেন।

তাঁকে টেলিগ্রাফের রিসিভার যন্ত্রটা দেখিয়ে তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'এসো বন্ধু, তোমাকে আজ ডাকিনি-বিদ্যার জারিজুরি দেখাব।'

ক্যাপ্টেন মারসিন ভেতরে ঢুকে আসন গ্রহণ করলে ক্যাপ্টেন পেরিগনি বললেন, 'শোন, কিছুদিনের মধ্যে বিশ্বের দুজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী দুটো আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তাঁদের একজন ইতালির মার্কনি। তিনি শূন্যে হার্জিয়ান ওয়েভস প্রেরণ করার কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। আর দ্বিতীয় জন ফরাসির ডক্টর ব্রানলি। তিনি ওয়েভকে ধরার উপযোগী রিসিভার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন লোহা-চূঁড়ের তড়িৎ পরিবাহিতা শক্তি খুবই কম, নেই বললেও চলে। কিন্তু হার্জিয়ান ওয়েভসের সংস্পর্শে আসামাত্র তাদের মধ্যে তড়িৎ পরিবাহিতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। সরু ও ছোট্ট একটা নল দেখিয়ে এবার বললেন, 'এটার ভেতরেই সংশক্তি-প্রবণতার ভোজবাজির খেল চলে। আসলে এটা তখন ওয়েভ-ডিটেকটরের ভূমিকা পালন করে। লোহা-চূঁড় পূর্ণ নলটাকে সংযোগস্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নলটাকে তড়িৎ পরিবাহী করে তোলা। তড়িৎশক্তি প্রবেশ করবে ব্যাটারি সার্কিটের ভেতরে। এর পরের যা কিছু সবই আমার মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছে। তড়িৎশক্তি মার্স রিসিভারকে সক্রিয় করে তোলার ফলে তা থেকে কাগজের ফিতে ছাপা হয়ে বেরোতে থাকে। সে সময় ছোট্ট হাতুড়িটা অনবরত আঘাত করতে থাকে ওয়েভ ডিটেকটার অর্থাৎ নলটার গায়ে। আঘাতের ফলে লোহা-চূঁড়গুলো পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কারেন্ট আসা বন্ধ হয়ে যায়। কাগজের ফিতে ছাপাও বন্ধ হয়ে যায়। মানে রিসিভার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এভাবে একের পর এক পয়েন্ট ছাপা হতে পারে, যতক্ষণ হার্জিয়ান ওয়েভ অ্যান্টেনার ভেতর আসবে। টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে যার জ্ঞান আছে সে পয়েন্টের সারি দেখেই কি লেখা আছে ধরে ফেলতে পারবে।'

ঠিক তখনই যন্ত্রটার মধ্যে আওয়াজ হতে লাগল। ঠিক যেন কেউ বার্তা প্রেরণ করছে। পেরিগনি অনুসন্ধিৎসু নজরে যন্ত্রটার দিকে তাকালেন। দেখলেন, যন্ত্রে ক্যাপ্টেন মারসিনে শব্দ লেখা হয়েছে।

ক্যাপ্টেন মারসিন যন্ত্রে তাঁর নাম দেখে যারপর নাই অবাক হলেন। একটু বাদে তার ঠিকানা 'টিম্বাকটু' ছাপা হল। আবার সব নিস্তব্ধ। পরমুহূর্তেই কাগজের ফিতার গায়ে আবার লেখা হল, 'আমি সেন্ট ব্রেজন'।

মারসিনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কই আমি তো একে চিনি না। নির্ঘাৎ কেউ আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছে, বুঝলে পেরিগনি?'

আবার যন্ত্রটা সক্রিয় হয়ে উঠল। ভেতর থেকে আওয়াজ উত্থিত হতে লাগল। পরমুহূর্তেই কাগজের ফিতার গায়ে লেখা ফুটে উঠতে লাগল, 'জেন মোরনাস....ব্ল্যাকল্যান্ডে কারারুদ্ধ....উদ্ধার করুন!'

www.pathagar.com

পেরিগনি চোখ দুটো কপালে তুলে বললেন, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার বল তো ব্ল্যাকল্যান্ডের অবস্থান যে কোথায় তাই তো বুঝতে পারছি না।'

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই আবার যন্ত্রটা থেকে আওয়াজ নির্গত হতে লাগল। কাগজের ফিতার গায়ে আবার লেখা ছাপা হল—১৫ ডিগ্রি ৫০ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ।

ব্যস, এবার যন্ত্রটা সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয়ে গেল, আর কোনো রেখা ছাপা তো হলই না, যন্ত্রটা থেকে তার গোঁ গোঁ আওয়াজটাও উত্থিত হল না।

পেরিগনির মনে ভাবনার উদয় হল। সভ্য জগৎ থেকে দূরে, ধরতে গেলে জনমানবহীন প্রান্তরে সখের বেতারযন্ত্র নিয়ে কাজে মেতে রয়েছেন। তবু তাকে কেউ না কেউ আবশ্যই চেনে।

মারসিনে জেন মোরনাসকে ভালই চেনে। মোরনাস যে তাঁরই পথ চেয়ে বসে। তাকে বিয়ে করে ঘর পাতবার আসায় অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছেন, তিনি আজ বিপদাপন্ন। মর্স ফিতেতে নিজের নাম দেখে যারপারনাই উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন। সেন্ট আবানের জাল আদেশনামা পাঠিয়ে সৈন্য তুলে নেওয়া হয়েছে। জেন মোরনাসকে কারারুদ্ধ করার জন্যই এত কারসাজি।

পেরিগনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'বিপদ যত কঠিনই হোক না কেন জেন মোরনাসকে উদ্ধার করা আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। আর তিনি একা অবশ্যই কারারুদ্ধ হন নি। নইলে বেতার প্রেরক যন্ত্র পাওয়ার কথা নয়, এর আবিষ্কারক অবশ্যই একজন বিরল প্রতিভাধর,আর তিনিই তাকে অর্থাৎ পুরোদলটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। বন্ধু, তিনি তোমার কাছে দুঃসংবাদটা পৌঁছে দিলেন।'

এবার তাঁরা দুশ্চিন্ত মাথায় নিয়ে কর্নেলের শরণাপন্ন হলেন।

কর্নেল ফিতার বক্তব্য পড়ে কপালের চামড়ায় ভাজ এঁকে বললেন, 'বারজাকের প্রসঙ্গ তো এতে উল্লেখ নেই। মিস মোরনাস তাঁর সঙ্গে ছিলেন। পরে অন্য দলের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন কি? সমস্যা হচ্ছে এত উঁচু দ্রাঘিমায়?'

'হ্যাঁ, মিস মোরনাস উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা বলেছিলেন।' মারসিনে বললেন।

'তবে তো সমস্যার আর কিছুই রইলো না। বারজাক কমিশন সরকারী অভিযান। তারা সমস্যার সম্মুখীন হলে সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য।'

মারসিনে বললেন, 'যারা জাল আদেশনামা দিয়ে আমাকে মারিয়েছে তাদের হাতেই মিস মোরনাস বন্দি হলেছেন কিনা তাই বা কে জানে।'

'সবই বুঝলাম, ব্ল্যাকল্যান্ড যে কোথায় অবস্থিত তাই তো আমার মাথায় আসছে না। আর যে দ্রাঘিমার কথা ফিতার বার্তায় রয়েছে সেটা তো মরুভূমির প্রায় কেন্দ্রস্থলে। এমন এক অজানা উদ্দেশ্যে ঝুঁকি নেওয়া যে একেবারেই অসম্ভব। তা ছাড়া সে জায়গার অদূরেই ইংরেজ কলোনি সোকোটো। সৈন্য পাঠিয়ে শেষপর্যন্ত হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম নয়। কিছু মনে করবেন না ক্যাপ্টেন মারসিনে, এ পরিস্থিতিতে সৈন্যসহ আপনাকে সেখানে যাওয়ার হুকুম দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মিস মোরনাস একবার যখন টেলিগ্রাফ মারফৎ খবর পাঠিয়েছেন তখন অবশ্যই আবার যোগাযোগ করবেন।'

'হ্যাঁ, এরকম সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে। কিন্তু, যদি টেলিগ্রাম না আসে, অর্থাৎ মাঝপথে বন্ধ হলেও অধিকতর বিপদ মনে করা যেতে পারে।'

www.pathagar.com

'সে যাই হোক, আমি নিরুপায় ক্যাপ্টেন। ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন আইন আমার হাত-পা বেঁধে রেখেছে। আবার যদি আপনি একাই যেতে চান তবু ছুটি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে, আমি তবে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিচ্ছি।' ক্যাপ্টেন মারসিনে রাগত স্বরেই বললেন।

'সে কী! আপনার ইস্তফা পত্র নেওয়া আমার এক্তিয়ার বহির্ভূত। যথাস্থানে পাঠালে ওপরওয়ালার বিবেচনার ব্যপার। আপনার মেজাজ মর্জি এখন স্বাভাবিক নয় বলেই আমার মনে হচ্ছে। এখন বিশ্রাম করুন গে। কাল যা হয় করবেন।'

ক্যাপ্টেন মারসিনে বিষণ্নমনে কর্নেলের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

* * *

৯ এপ্রিল হ্যারি কিলার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে নিজের ফাঁদে নিজেই মাথা গলিয়ে দিলেন। পরের দিন আবার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিলেন। ফলে নগরের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট ও কারখানা সর্বত্র অন্ধকারে তলিয়ে গেল। দশই এপ্রিল আবার বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করে হ্যারি কিলার ক্যাম্যারেটকে ফোন করলেন। কয়েদিদের ফিরিয়ে দিতে বললেন, ক্যাম্যারেট সরাসরি না বলে দিলেন।

হ্যারি কিলার রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। কারখানার সবাইকে না খাইয়ে মারবেন বলে হুমকি দিতেও দ্বিধা করলেন না। শুনে ক্যাম্যারেট তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাসলেন।

ক্যাম্যারেট হিসাব করে দেখলেন গুদামে যা খাবার আছে তা দিয়ে এতগুলো লোকের হপ্তা তিনেক ভালভাবে চলে যাবে। বারজাক ও তার সহযাত্রীদের আশ্বস্ত করতে গিয়ে বললেন, 'মুষড়ে পড়ার কিছু নেই মি. বারজাক। দুদিনের মধ্যে আমি হেলিপ্লেন বানিয়ে ফেলছি। বারোই এপ্রিল আপনারা তাতে চড়ে পরীক্ষা করতে পারবেন।'

তা' না হয় করলেন। কারখানার এতগুলো লোকে, ছেলেপুলে, মেয়ে মোট দেড়শ লোককে একটামাত্র হেলিপ্লেনে করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাবেন কি করে মি. ক্যাম্যারেট?'

'এখান থেকে সায়ের দূরত্ব দুশো মাইল। আর সাড়ে চারশো মাইল টিম্বাকটু। আকাশ টর্পেডোর আক্রমণ বাঁচিয়ে হেলিপ্লেনে প্রতি ক্ষেপে দশজন করে পার করলে দেড়শো লোককে পাঁচদিনে সায়ে পৌছে দেওয়া যাবে। আট দিন লাগবে টিম্বাকটু পৌছোতে, বুঝতে পারছেন?'

অস্থিরচিত্ত অভিযাত্রীদের কাছে দশটা দিন যেন দশ বছরের সমান মনে হতে লাগল।

এবার আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেল। পাম্প বিকল হয়ে গেছে। জলের বাধা না মেনে পাম্পটা শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পিস্টনটা তোলা হল, ভেঙেছে কিনা দেখার জন্য, মেরামতে লেগে গেল।

ক্যাম্যারেটের হেলিপ্লেন তৈরির কাজ সম্পন্ন। খবরটা শোনামাত্র অভিযাত্রীদের বুকে উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের ঢেউ বয়ে গেল। রাত্রেই টিম্বাকটু পৌছে যাবেন। শয়তানের থাবা থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবেন।

পাম্প মেরামত হয়ে গেল। পাম্পের পিস্টন বসিয়ে দেওয়া হল।

www.pathagar.com

অতিথিরা যখন বাগানে পৌঁছল তখন রাত্রি সাড়ে আটটা। এখান থেকেই হেলিপ্লেনে ওঠার কথা। যাত্রী মোট আটজন।

হেলিপ্লেনের দরজা খোলামাত্রই সর্বনেশে কাণ্ডটা ঘটে গেল, দরজার পাল্লা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর শব্দ করে বিস্ফোরণ ঘটল। চোখের পলকে হেলিপ্লেনটা ধ্বংস হয়ে গেল। তার বিভিন্ন অংশ খইয়ের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ছাই আর ধ্বংসপ্রাপ্ত হেলিপ্লেনের টুকরোগুলো সরাতেই ক্যাম্যারেট চমকে উঠলেন। দেখলেন, মাটিতে ইয়া বড় একটা ছিদ্র। ক্যাম্যারেট আঁৎকে উঠে কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন, 'ডিনামাইট! ডিনামাইট!' কীভাবে এল। ব্যাপারটা কি দেখার জন্য র‍্যাবিশ পুরোপুরি সরাতে গিয়ে একটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহ বেরিয়ে এল। অভিযাত্রীদের চিনতে দেরি হল না। চৌমৌকি। বেইমান চৌমৌকির খণ্ডবিখণ্ড দেহ এটা।

অবাক হবার মতো ব্যাপারই বটে। সে এখানে ঢুকল কি করে? একজন যখন ঢুকতে পেরেছে তখন অন্য যে কেউ-ও ঢুকতে পারে।

ক্যাম্যারেটের নির্দেশে চৌমৌকির দেহ খণ্ডগুলোকে প্রাচীর টপকে বাগানের বাইরে ফেলে দেওয়া হল। উদ্দেশ সবাই দেখুক বেইমানি করতে এসে তার দেহ পাওয়া গেল। তবে তার মধ্যে এখনো প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে।

ডক্টর চেতোন্ন চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তুললেন। উদ্দেশ্য, তার মুখ থেকে প্রকৃত ব্যাপারটা জানতে হবে।

ক্যাম্যারেট অভিযাত্রীদের আশ্বাস দিলেন, মাস দুইয়ের মধ্যেই তিনি আর একটা হেলিপ্লেন তৈরি করে ফেলবেন।

দু-মাস। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আর মাত্র হপ্তা দুইয়ের খাবার রয়েছে। ব্যাপারটা অভিযাত্রীদের কাছে সত্যই বড়ই দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যাম্যারেট কিন্তু এসব নিয়ে মোটেই ভাবিত নন বলেই বুঝা গেল।

* * *

অভিযাত্রীদের মনোবল ভেঙে গেল। সারা রাত্রি নির্ঘুম অবস্থার মধ্যেই সবাই কাটালেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাঁরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কোনো পথই বের করতে সক্ষম হলেন না।

তবে ক্যাম্যারেট মুখে প্রকাশ করুন আর নাই করুন ভেতরে ভেতরে তিনি যে ভাবিত নন এ কথা জোর দিয়ে বলা চলে না। দু-মাসের আগে নতুন হেলিপ্লেন তৈরি করা সম্ভব নয়। এপ্রিল মাস শেষ হবার আগেই খাবারের ভাড়ার খালি হয়ে যাচ্ছে।

ডা. চেতোন্নের চেষ্টায় আহত লোকটাকে সুস্থ করা সম্ভব হল। সে এখন ক্যাম্যারেটের বন্দি। তার পরিচয় জানার জন্য সবাই মিলে যারপর নাই পীড়াপীড়ি করলেন। ক্যাম্যারেটও কম চেষ্টা করলেন না। বৃথা চেষ্টা। আন্যোন্যপায় হয়ে তাঁকে বাঁকা পথ বেছে নিতেই হল। বন্দি পায়ের এবং হাতের চারটে বুড়ো আঙুলের তলায় একটা করে ধাতব পাত বেঁধে দিলেন। তারের মাধ্যমে পাতগুলোর সংযোগ সাধন করে তারটাকে প্লাগে লাগিয়ে দিলেন। এবার দিলেন বোতাম টিপে। ব্যস, বন্দির সর্বাঙ্গ ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর মতো বার বার বেঁকে যেতে লাগল। যন্ত্রণায় চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। আবার বোতাম টিপে বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ করলেন। তার মুখ থেকে কথা বের করার চেষ্টা করলেন। তাতেও কাজ হল না। ক্যাম্যারেট হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন

www.pathagar.com

না। আবারও বোতাম টিপলেন। আবার তার সর্বাঙ্গ বার বার বেঁকে দুমড়ে যেতে লাগল। চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। চোখের মণি দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। ক্যাম্যারেট আবার বোতাম টিপে বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ করে দিলেন।

হ্যাঁ, এবার কাজ হয়েছে। বন্দি নিজের নাম বলল, ফারগুস ডেভিড। এটা ছদ্ম নাম। ধমক খেয়ে এবার আসল নাম বলল—ডেনিয়েল ফ্রাসনে। ইংরেজ। ব্ল্যাকল্যান্ডের কাউন্সিলার। হ্যারি কিলারের সরকার যারা চালান তাদেরই একজন। সে আরো বলল, 'হ্যারি কিলার একসময় ব্রেজন বাহিনীতে ছিল। আর চেহারার পরিবর্তনের জন্যই ক্যাম্যারেট তাকে আজ আর চিনতে পারছেন না।'

এবার জেন ব্রেজনের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ডেনিয়েল ফ্রাসনে বলল, 'হ্যারি কিলার দলে আসার পর থেকেই ডাকাতি, লুঠতরাজ আর খুন জখম শুরু করে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে ক্যাপ্টেন ব্রেজনের কোনোই হাত ছিল না।'

জেন ব্রেজন এবার প্রশ্ন করলেন, 'ক্যাপ্টেন ব্রেজনের মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল?'

ডেনিয়েল ফ্রাসনে বলল, 'লড়াই করতে গিয়ে। পরিস্থিতি তাঁকে লড়াই করতে বাধ্য করেছিল।'

ক্যাম্যারেট বললেন, 'আর একটা কথা, এ-নগরে এত নিগ্রোর আদমানি কি করে হল?'

'এ তো সাধারণ কথা! গ্রাম থেকে জোর করে আনা হয়েছে?'

'এখানে এতসব যন্ত্রপাতি কোত্থেকে আমদানি করা হয়েছে? কীভাবেই বা আনা হয়েছে?'

'ইউরোপ থেকে। জাহাজে করে।'

'বহু নিগ্রোর মৃত্যু হয়েছে নিশ্চয়?'

'তা তো হয়েছেই। যত নিগ্রো জন্মেছে তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি মারা গেছে।'

ক্যাম্যারেট এবার বললেন, 'ব্ল্যাকল্যান্ডে এত টাকা কোত্থেকে আসে?'

'আশ্চর্য প্রশ্ন তো! আপনার হেলিপ্লেনগুলো তৈরি করার উদ্দেশ্য কি, জানেন না? এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন কিছুই জানেন না আপনি। হেলিপ্লেনে করে হ্যারি কিলার আমাদের নিয়ে প্রায়ই বিশাগো দ্বীপে যেতেন। আর সেখান থেকে জাহাজে গিয়ে ইউরোপের ব্যাংক আর কঞ্জুস ধনকুবেরদের বাড়ি হানা দিয়ে টাকার পাহাড় নিয়ে ফিরে আসতেন। বছরে তিন-চারবার তো যেতামই। চার মাস আগে শেষ যাওয়া হয়।'

'আবার কার বাড়ি হানা দেন?'

'সেবার আমি দলের সঙ্গে যাই নি। তবে শুনেছি, একটা ব্যাংক ডাকাতি করে প্রচুর অর্থ আনা হয়।'

'এবার জবাব দিন, কারখানায় কি করে ঢুকেছিলেন?'

এবার একটু মুশকিলেই পড়ল ডেনিয়েল ফ্রাসনে। কিন্তু আর না দিয়েও উপায় নেই। আমতা আমতা করে বলল, 'রিজার্ভারের ভেতর দিয়ে। গত পরশুর আগের দিন ওয়াটার গেট বন্ধ করা ছিল। পাম্প করে জল তোলা যায় নি। তাই প্রাসাদ ও কারখানার রিজার্ভার দুটোই খালি হয়ে যায়। জলনালির ভেতর দিয়ে আমি হামু দিয়ে কারখানার ভেতরে ঢুকে আসি।'

www.pathagar.com

ক্যাম্যারেট এরকম চিন্তা করেই চৌমৌকির খণ্ডবিখণ্ড লাশটাকে প্রাচীর টপকে কারখানার বাইরে ফেলে দেন। ফলে সবাই দেখে বুঝতে পারবে, কারখানার ভেতরে যে ঢুকবে তারই এ-হাল হবে।

ক্যাম্যারেট তাকে আর কোনো প্রশ্ন করার দরকার মনে করলেন না।

মেরিফেলোরা কারখানার চারদিকে কড়া পাহারা দিচ্ছে। খাবারের ভাড়ার খালি না হওয়া পর্যন্ত তারা পালা করে পাহারা চালিয়ে যাবে, অনুমান করা হচ্ছে।

চৌদ্দ তারিখে সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্সের মাথায় একটা ফন্দি এল। টোনগানের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে ক্যাম্যারেটের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলেন। দুদিন ক্যাম্যারেটকে আর দেখা যায় নি। তাঁর মন-প্রাণ বিষিয়ে উঠেছে, তাঁকে দিয়ে হেলিপ্লেন তৈরি করিয়ে শয়তান হ্যারি কিলার ইউরোপ আর আফ্রিকায় সমানে লুঠতরাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নিরীহ নিগ্রোদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে, বারজাক কমিশনকে ভেঙে তছনছ করেছে, ক্যাপ্টেন ব্রেজনকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত বুদ্ধি-কৌশলকে কাজে লাগিয়ে যে একের পর এক জঘন্যতম কাজ হাসিল করেছে। অথচ তিনি এসবের বিন্দু বিসর্গ জানেন না। নিজের কাজের জন্য তিনি ভিতরে ভিতরে জ্বলেপুড়ে খাঁক হতে লাগলেন। দুদিন দাঁত দিয়ে একটা কুটোও কাটেন নি।

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স ক্যাম্যারেটকে বললেন, 'এ পরিস্থিতিতে শয়তান হ্যারি কিলারের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ ছাড়া উপায় নেই। নির্যাতিক নিগ্রোরা আমাদের হয়ে অবশ্যই লড়বে, তারা সংখ্যায় চার হাজার পুরুষ ও দেড় হাজার মেয়ে। এখন কথা হচ্ছে, মি. ক্যাম্যারেট যদি একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করে দিতে পারেন তবে গোপনে বাইরে গিয়ে নিগ্রোদের সঙ্গে কথা বলে তাদের কাছে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানানো যেতে পারে।'

ক্যাম্যারেট জানালেন। কয়দিনের মধ্যেই তিনি সুড়ঙ্গ তৈরি করে দেবেন। আর নিগ্রোদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বন্দুক, বর্শা, বল্লম, তরবারি আর কুড়োল প্রভৃতিও তৈরি করে দিতে পারবেন।

আমিদি ফ্লোরেন্স এবার বললেন, 'আমি যে-পরিকল্পনা করে রেখেছি টোনগানে সুড়ঙ্গ-পথে কারখানার বাইরে, মাঠে-ময়দানে গিয়ে কর্মরত নিগ্রোদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমাদের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তাদের এককাট্টা করবে, হ্যারি কিলারের ওপর ক্ষেপিয়ে তুলবে।'

তাঁর পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে ক্যাম্যারেট ও টোনগানে থেকে শুরু করে অভিযাত্রীরা পর্যন্ত সবাই রাজি হয়ে গেল। কাজ শুরু হয়ে গেল।

এবার খাবার ফুরিয়ে এল। পেটে টান পড়ল, ক্যাম্যারেট বিষণ্ন মনে ঘরের কোণে বসে। তবে দেখা যাচ্ছে, হ্যারি কিলারের শক্তিই বেশি।

হ্যারি কিলারের তো দাবি একটাই। সে মিস মোরনাসকে বিয়ে করতে চায়। একটা মেয়ের জন্য কারখানার এতগুলো শ্রমিক থেকে শুরু করে অভিযাত্রীরা পর্যন্ত সবাই উপোষ করে মরবে?'

ব্যাপারটা নিয়ে জেন মোরনাসও কম ভাবিত নন। তারই জন্য এতগুলো লোকের চরমতম দুর্গতি, একথা তাঁরও অজানা নয়। সুড়ঙ্গ খোড়ার কাজ শেষ হল। ব্যস, আর দেরি নয়। ১ মে টোনগানে সুড়ঙ্গ-পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার শুরু হল তার সবুজ সঙ্কেতের জন্য অধীর প্রতীক্ষা।

www.pathagar.com

এদিকে খাবারের অভাবে এতগুলো প্রাণী ক্ষিদের জ্বালায় ভুগতে লাগল। মে মাসের পাঁচ তারিখ হয়ে গেল। তবু টোনগানের কোনো খবর নেই। তার কাছ থেকে কোনোরকম সঙ্কেতই পাওয়া গেল না।

সবার একই কথা। মরতে হয় সবাই এক সাথে না খেয়ে শুকিয়ে মরবে, তবুও মিস মোরনাসকে শয়তানটার খপ্পরে পাঠাতে রাজি নয়।

পাঁচই মে অন্ধকার ভেদ করে একটা মিটমিটে আলো দেখা গেল। নিগ্রো দাসদের কোয়ার্টারের প্রাচীরের ওপর থেকে আলোর সঙ্কেত পাঠানো হচ্ছে। সবাই আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন।

দাস কোয়ার্টার আর কারখানার প্রাচীরের মধ্যে দড়ির সেতু তৈরি করা হল, কামান দেগে দড়ির গোলা নিক্ষেপ করা হয়। দড়িটার এক প্রান্তে নোঙর বাঁধা। সেটা গিয়ে দাস কোয়ার্টারের প্রাচীরে আটকে গিয়ে দিব্যি সেতুটাকে তৈরি করে নিয়েছে। এটার সাহায্যেই বন্দুক, বর্শা, বল্লম, তরবারি ও কুড় ল প্রভৃতি কারখানার ভেতর থেকে নিগ্রো কোয়ার্টারে রাত্রে অন্ধকারে চালান করে দেওয়া হল। যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গেল। এখন হই হই করে ঝাঁপিয়ে পড়লেই হল।

এদিকে মিস মোরনাসকে খুঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। কারখানার আনাচে-কানাচে সর্বত্র চিরুনি তল্লাশি চালিয়েও তাঁর হদিস পাওয়া গেল না।

* * *

কারখানার সামনের দরজায় তালা দেওয়া ছিল না। সেই সুযোগে চুপি চুপি চম্পট দিয়েছেন। সাইক্লোস্কোপে তাঁকে দেখা গেছে। তবে নিশ্চিত করে চেনা যায় নি। অনুমান করা হচ্ছে, তিনি হ্যারি কিলারের কাছে গেছেন, তার একার জন্য এতগুলো মানুষ বা মেয়ে শুকিয়ে মরতে বসেছে, এরকম অনুতাপ-জ্বালায় দগ্ধ হয়েই তিনি স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিতে চলেছেন। আসলে টোনগানে সঙ্কেত পাঠাতে দেরি করার জন্যই এরকম একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল।

নিগ্রো ব্ল্যাকগার্ডরা তাঁকে চেনে। তারা দরজা খুলে তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

হ্যারি কিলার মিস মোরনাসকে দেখে চমকে উঠল। এরকমটা হওয়াই তো স্বাভাবিক, এ যে তার কাছে একবারেই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার, তাঁকে দেখেই চমকে উঠে হ্যারি কিলার কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল, 'কারখানা থেকে এলেন?'

'হ্যাঁ, আত্মাহুতি দিতে, নিজেকে আপনার হাতে তুলে দিতে ছুটে এলাম।'

'কেন? হঠাৎ এমন মতি—'

'কিছুদিন আগে আপনি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, রাজি হই নি। আজ স্বেচ্ছায় নিজেকে আপনার হাতে তুলে দিতে এসেছি। তবে একটা শর্তে, আমার দলের সবাইকে মুক্তি দিতে হবে।'

'শর্তটর্ত বুঝি না। আপনি না এলে কারখানাসহ সবাইকে উড়িয়ে দিতাম। স্বেচ্ছায় এসেছেন বলে রেহাই পাবেন ভেবেছেন? কে আপনাকে রক্ষা করবে? যাকগে, এসব কথা বলে এমন সুন্দর রাত্রিটা নষ্ট করা ঠিক হবে না। আসুন একটু আনন্দ করা যাক।' কথা বলতে বলতে হ্যারি কিলার মদের বোতলটা উপুড় করে গলায় ঢেলে দিলেন।

মিস মোরনাস দেখলেন, দাদার হত্যাকারীর প্রতিশোধ নেবার এই সুযোগ, সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই হবে। ছোরাটা জামার তলায়ই রয়েছে।

www.pathagar.com

হ্যারি কিলার কিছুক্ষণের মধ্যেই মদের নেশায় আরাম-কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ল।

মিস মোরনাস এবার ভাবলেন, কাজ হাসিল করার আগে যা হোক কিছু খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে নেবেন। দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকেই তিনি চমকে উঠলেন। দেখলেন—ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে বসে রয়েছেন লুই ব্রেজন—তাঁর দাদা, লুই রবার্ট ব্রেজন। সবাই জানে পাঁচ মাস আগে ব্যাংক ডাকাতি করার পর তিনি বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিলেন। লুই ব্রেজন তাঁর বোনকে দেখে চিনতে পেরে গেছেন।

লুই ব্রেজনের গায়ে অসংখ্য কাটা-দাগ, বোনকে জড়িয়ে ধরে শিশুর হতো কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন, 'পাঁচ মাস আগে ব্যাংকে বসে থাকার সময় পিছন থেকে কে যেন আমার ঘাড়ে আচমকা আঘাত করল। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম। যখন সংজ্ঞা ফিরে পেলাম তখন দেখি আমি একটা সিন্দুকের মধ্যে বন্দি। ব্যস, তার পর থেকেই এখানে কাটাচ্ছি।'

* * *

আচমকা ঘাড় ঘুড়িয়েই ভাই-বোন দেখলেন, মূর্তিমান শয়তান হ্যারি কিলার দরজায় দাঁড়িয়ে। বিকট স্বরে হেসে বলল, 'হায় সুন্দরী, এত সহজে হ্যারি কিলারের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ হাসিল করবে ভেবেছ! অসম্ভব! মিস মোরনাস জামার তলা থেকে ঝট করে ছোরা বের করে গর্জে উঠলেন, 'খবরদার। এক পা এগোলে ছোরা বুকে গেঁথে দেব বলে দিচ্ছি!'

লুই ব্রেজন হকচকিয়ে গেলেন। অপলক চোখে বোনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মিস মোরনাস এবার বললেন, 'এটা কিন্তু সাধারণ একটা ছোরা নয়। কৌবার একটা খবর থেকে উদ্ধার করেছি। এতে কিলার নামটা লেকা রয়েছে।'

'কিন্তু বোন, এর আসল নাম হ্যারি কিলার নয়। আসল নামটা তোমার খুবই পরিচিত বোন।' লুই ব্রেজন বললেন, 'উইলিয়ম ফারনি এর আসল নাম, আমার বাবার সঙ্গে তোমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল, হয়তো শুনে থাকবে বোন। উইলিয়াম ফারনি তোমার সৎ দাদা।

উইলিয়ম ফারনি গম্ভীর স্বরে বলল, 'এবার বুঝলাম, তুমিই তবে জেন ব্রেজন, মিস মোরনাসনও।' দাঁতে দাঁতে চেপে পরম বিতৃষ্ণায় কথাটা ছুটে দিল। 'তবে তুমি কৌবা গিয়েছিলে, কি বলঃ হ্যাঁ, আমি তোমাদের দুজনকে খুন করে রক্ত দিয়ে হোলি খেলব। তোমরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। আর আজ সেই তোমরাই আমার প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছ। তোমরা ভেবেছ, সবই জেনে গেছ। আসলে কাঁচকলা, কিছুই জানতে পার নি। আমিই বলছি, তোমাদের বাবা তো আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। আজ তোমাদের সেই পাষণ্ড বাবাকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছি, আমিই তোমাদের মেরে যমের দুয়ারে পৌছে দিয়েছি। তোমাদের বাবা আমাকে শেয়াল-কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিল, তারপর রোজগারের ধান্ধা করলাম। কাড়ি কাড়ি নোট আর এত এত সোনা রোজগার করলাম, তোমরা যাকে নাক সিটকে বল জঘন্য—খুন-জখম, লুঠতরাজ করে রোজগার করেছি আমি। আমি প্রতিহিংসার মাধ্যমে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধ পরিকর ছিলাম। তাই তো জর্জের পিছনে ধাওয়া করলাম। অনুতাপ জ্বালায় জর্জরিত হচ্ছি এরকম বাহানা করলাম। জর্জ আমার অভিনয়ে প্রীত হল, ভুলে গেল। তার তাঁবুতে আমাকে ডেকে নিয়ে থাকতে

www.pathagar.com

দিল। আমি গোপনে তার খাবারের সঙ্গে রোজ একটু একটু করে আফিং মিশিয়ে দিতাম। ব্যস, জর্জ ব্রেজন আমার কব্জায় এসে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই আমি সেনাবাহিনীর সর্বেসর্বা হয়ে গেলাম। তার নামে হুকুম জারি করতে লাগলাম, দেশজুড়ে জর্জ ব্রেজনের নামে হই হই পড়ে গেল। সবাই তাকে বেইমান, উন্মাদ, খুনী আর দাঙ্গাবাজ প্রভৃতি বিশেষণে সম্বোধন করতে লাগল। এবার জর্জ ব্রেজনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলাম। তাকে বাঁচিয়ে রাখলে সে আমার কীর্তির কথা ফাঁস করে দিত।

এবার এখানে, মরুভূমির দেশে হাজির হলাম। যাকে একদিন শেয়াল কুকুরের মতো তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই গড়ে তুলল ব্ল্যাকল্যান্ড নগর। আমি এখানকার রাজা-বাদশা, আমি প্রভু। এতেও আমার মন ভরল না। তোমাদের বাবার যে আরো একটা ছেলে আর মেয়ে রয়েছে তাই তো একটা ব্যাংকে লুঠ করলাম। টাকা জোগাড় করতে লুইয়ের মাথায় ডাণ্ডা মেরে অজ্ঞান করে বাক্সবন্দি করে এখানে এনে ফেললাম। একেও নির্মমভাবে হত্যা করব। আর তোমাকে বিয়ে করে সহধর্মিনী করব ভেবেছিলাম। জানতে পারলাম, তুমি আমার বোন। তাই তোমাকে আমি নিজে বিয়ে না করে আমার সবচেয়ে বখাটে ক্রীতদাস, পৈশাচিক মনোবৃত্তিত সম্পন্ন নিগ্রো ক্রীতদাসের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে আমৃত্যু যাতে জ্বলেপুড়ে দগ্ধে মরতে হয় তার ব্যবস্থাই করব। আর লর্ড ব্রেজন থাকবে একা, একেবারেই নিঃসঙ্গ। ব্যস, তবেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। ব্রেজন বংশের মেষ সলতেটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।'

প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র জানোয়ারের মতো এতক্ষণ তর্জন গর্জন করল উইলিয়ম ফারনি। ঠিক তখনই আচমকা যেন বিস্ফোরণের শব্দ হল। সবকিছু থর থরিয়ে কেঁপে উঠল। উইলিয়ম ফারনির মুখ অকস্মাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কারারক্ষী ব্ল্যাকগার্ড দৌড়ে এসে জানাল, শহরে আগুন লেগেছে।

উইলিয়ম চমকে উঠল। লুই আর জেন তার পথ রোধ করার চেষ্টা করলেন। সজোরে ধাক্কা মেরে তাদের ছিটকে ফেলে দিয়ে সে উম্মাদের মতো ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

* * *

লুই খুবই দুর্বল। বলতে গেলে তার হাঁটা চলার শক্তি নেই। জেনের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি কোনোরকমে শয়তান উইলিয়মের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। চারদিকে কবরস্থানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। ব্ল্যাকগার্ড নিগ্রোর বারান্দায় পাহারায় নিযুক্ত থাকার কথা। কিন্তু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তারা চম্পট দিয়েছে। কোনোরকমে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেন। ঘর খালি।

দুর্বল লুইকে একটা চেয়ারে বসিয়ে রেখে জন ব্রেজন একাই আকস্মিক আওয়াজটার রহস্য ভেদ করতে বেরিয়ে পড়লেন, একের পর এক ঘরে গেলেন। সবই ভোঁ ভোঁ। ঘরগুলো খালি।

এত বড় একটা প্রাসাদে রক্ষীদের একজনও উপস্থিত নেই।

ব্যাপার দেখে জেন ব্রেজন রীতিমতো হকচকিয়ে গেলেন। এবার ছাদে গেলেন। কারখানার অত্যুজ্জ্বল আলোয় দেখতে পেলেন প্রাসাদের ছাদে অনেকেই এসে জড়ো হয়েছে। উইলিয়মও সেখানে উপস্থিত। ব্ল্যাকগার্ড আর নিগ্রো দাসরাও রয়েছে। সবাই

www.pathagar.com

কোমরে পিস্তল, হাতে রাইফেল নিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে কি যেন বলাবলি করছে। আচমকা উইলিয়মের নজর গেল জেন ব্রেজনের দিকে। গলাছেড়ে রক্ষীদের কি যেন হুকুম দিল। জেন ব্রেজন আতঙ্কে ঝট করে সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি দিয়ে দিল।

ব্ল্যাকগার্ডরা দমাদম দরজায় আঘাত হানতে লাগল। ইস্পাতের দরজা। ভাঙতে পারল না। জেন ব্রেজন লম্বা লম্বা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলেন এক এক করে প্রাসাদের সবকটা দরজা বন্ধ করে দিলেন। এবার হাজির হলেন মেজদা লুইয়ের কাছে।

শয়তান উইলিয়ম ফারনি তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে ছাদে বন্দি হয়ে পড়েছে। হতাশায় ভেঙে পড়ল। আগুন রেড রিভারের ডানদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে। নিগ্রো দাসদের বস্তি পুড়ে ছাই হচ্ছে। এবার সিভিল বডির কোয়ার্টারে, মেরিফেলোদের কোয়ার্টারে আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দাসরা বিদ্রোহে সোচ্চার হয়েছে। জেন ব্রেজন এবং লুই দুজনে মহাফাঁপড়ে পড়ল। এ-অবস্থায় প্রাসাদের বাইরে বেরোলে বিক্ষুব্ধ নিগ্রোদের হাতে তাদের প্রাণ দিতে হবে। তারা প্রাসাদে খোঁজাখুঁজি করে দুটো পিস্তল, দুটো রাইফেল কিছু গুলি পেলেন, সেগুলো নিয়ে তারা দরজার কাছে এসে দেখলেন, চল্লিশটা হেলিপ্লেন তার ব্ল্যাকগার্ডদের কোয়ার্টার, আগুনের কবলে পুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে।

এদিকে শয়তান উইলিয়ম ফারনি আর তার সাকরেদ ব্ল্যাকগার্ডরা ছাদ থেকে অনবরত গুলিবৃষ্টি করে চলেছে। নিগ্রোরা এতটুকুও দমল না। মৃত্যু তাদের কাছে তুচ্ছ।

আবার প্রচণ্ড শব্দ করে বিস্ফোরণ হল, ইয়া লম্বা প্রাচীরের বেশ কিছুটা অংশ ধ্বসে গেল।

বিস্ফোরণের পিছনে যে-কোনো রহস্য কাজ করছে বুঝার উপায় নেই। তবে পরিকল্পনা মাফিক যে কাজ হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রথম বিস্ফোরণের চার পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই আবার পর পর দুটো বিস্ফোরণ ঘটল। সর্বনাশ যা কিছু সিভিল বডির কোয়ার্টারে হতে লাগল।

কালো চামড়ার মানুষগুলো গুলি খাওয়া বাঘের মতো ক্ষেপে গেল। সাদা চামড়ার মানুষগুলো ভয়ে কেঁচো হয়ে গেল, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত মেরিফেলোরাই শেষপর্যন্ত যুদ্ধে জয়লাভ করল।

* * *

এদিকে শয়তান উইলিয়ম ফারনিরা যাঁতাকলে আটাক পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করতে লাগল। দরজার পাল্লায় দমামদ্ লাথি মেরে ভাঙার চেষ্টা করতে লাগল। বৃথা চেষ্টা। ইস্পাতের দরজা। ভাঙা তো দূরের ব্যাপার সামান্য ঘায়েলও করতে পারল না।

কারখানার কর্মীরা অনেক আগেই ব্ল্যাকল্যান্ডের অধিবাসীদের অগোচরে বেশ কিছু সংখ্যক ডিনামাইট, কার্তুজ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র কোয়ার্টারে চালান দিয়ে দিয়েছে। সবই মারসেন ক্যাম্যারেট ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

অস্ত্রশস্ত্র চালান দেওয়ার একটু পরেই প্রবল বিস্ফোরণ ঘটল। আবার বিক্ষুব্ধ ক্রীতদাসরা সিভিল বডির বাড়িতে হানা দিয়ে বাসিন্দাদের নির্মমভাবে হত্যা করতে লাগল।

এদিকে অভিযাত্রীরা পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে ব্যস্ত হয়ে কারখানায় ফিরে গেলেন। তারা নিঃসন্দেহ হতে পারলেন না, কে বা কারা এ কাজ করছে।

www.pathagar.com

আসলে মারসেন ক্যাম্যারেট, তিনি রীতিমতো ক্ষেপে গেছেন। নিজে হাতে গড়া ব্ল্যাকল্যান্ড নগরকে নিজে হাতেই ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর। তিনি একজন অনন্য প্রতিভার অধিকারী। বিস্ময়কর তার আবিষ্কার। তার ভারসাম্য কোনোদিনই ছিল না। সর্বদা আনমনা, অপ্রকৃতিস্থ ভাব। তার ওপর এমন জঘন্য একটা বিশ্বাসঘাতকতার পর তিনি প্রায় উন্মাদদশা প্রাপ্ত হয়েছেন। তারপর যখন ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে সিভিল বডি আর দাসদের কোয়ার্টারগুলো হুড়মুড় করে পড়তে শুরু করল তখন তিনি উন্মাদের মতো বারবার চিল্লিয়ে উঠলেন, 'শেষ! আমার সৃষ্টি আজ ধ্বংস হতে চলেছে। ব্ল্যাকল্যান্ড নগরের ওপর পরম পিতার অভিশাপ লেগেছে।' কথা বলতে বলতে তিনি এমনভাবে হাত দুটোকে চালাতে লাগলেন যে, 'পরম পিতা' তিনি যেন নিজেকেই বুঝাতে চাইছেন। তিনিই সৃষ্টিকর্তা। আবার নিজের সৃষ্টি তিনি নিজেই ধ্বংস করছেন।

তরল গ্যাসের শক্তিতে জেনারেটর চলতে লাগল। বিস্ফোরণ সমান তালেই চলতে লাগল।

সারারাত্রি ক্যাম্যারেটের দেখা মেলে নি। ভোরের আলো ফুটতেই গম্ভীর মুখে প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ালেন। এক সময় উম্মাদের মতো গলা ছেড়ে চিল্লিয়ে উঠলেন, 'পরম পিতার অভিশাপ—পরম পিতার অভিশাপ লেগেছে! পালাও—সবাই পালাও। সবকিছু ছারখার হয়ে যাবে।' চিৎকার করতে করতে তিনি টাওয়ারে ঢুকে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা দুম করে বন্ধ হয়ে গেল। ব্যস, আর তাঁকে দেখা গেল না।

এদিকে উইলিয়ম ফারনিরা দরজা ভাঙার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। ছিটকিনি বা দরজার পাল্লা কোনোটাই ভাঙা সম্ভব হল না। এবার দরজার পাশের পাথর খসানোর কাজে প্রাণান্ত প্রয়াস চালাতে লাগল উইলিয়ম ফারনিরা এবং চারতলায় আটকাপড়া হতভাগারা। ছাদের দরজাটা বেশি সময় আঘাত সহ্য করতে পারল না। এক সময় সশব্দে হুড়মুড় করে পড়ে গেল। এবার তারা তিনতলার ও দোতলার সিলিং এক এক করে ভাঙল।

এদিকে ধ্বংসকার্য অব্যাহতই রইল। একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটতে লাগল। এমন বিস্ফোরণ আরও ঘন ঘন ঘটতে লাগল। নিজের সৃষ্টি নিজে হাতে ধ্বংস করে ক্যাম্যারেট যেন অপরিসীম আনন্দ পাচ্ছেন।

ভোর চারটে থেকে ধ্বংসলীলা যেন প্রলয়ঙ্কর রূপ নিল। সারাদিন ধরে চলল বিক্ষুব্ধ নিগ্রো শ্রমিকদের আস্ফালন। ব্ল্যাকল্যান্ড নগরীকে একেবারে ধূলিস্যাৎ না করা পর্যন্ত যেন তাদের স্বস্তি নেই। মোদ্দা কথা, তাদের ভগবান হ্যারি কিলারের ওপর তাদের এখন আর তিলমাত্রও ভক্তি শ্রদ্ধা নেই। তবে এ ও সত্য এতদিন তারা যে তাকে দেবতা জ্ঞান করেছে তা ভক্তিতে নয়, ভয়ে। তার পৈশাচিক আচরণের ভয়ে।

সকাল নটা পর্যন্ত অনবরত বিস্ফোরণ চলল। অব্যাহত রইল ধ্বংসলীলা। তারপরই মেরিফেলোরা দোতলার একটা দেওয়াল ফুটো করে তাতে বারুদ গুঁজে দিল। এবার অগ্নি সংযোগ করতেই প্রচণ্ড আওয়াজ করে বিস্ফোরণ ঘটল। দোতলার শিলিংটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। অভিযাত্রীরা প্রমাদ গণলেন। আর একটা দেওয়াল বা সিলিং ভাঙতে পারলেই গুলি খাওয়া বাঘের মতো তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

একটু বাদেই নতুনতর একটা বিস্ফোরণ ঘটল। এতক্ষণ যে ধরনের আওয়াজ করে বিস্ফোরণ ঘটেছে। এবারের আওয়াজটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আওয়াজটা এসেছে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্ল্যাকল্যান্ড নগরীর দিক থেকে। আবার—আবার একটা বিস্ফোরণ ঘটল।

হঠাৎ দেখা গেল, হ্যারি কিলার ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা সিলিং বা দেয়াল ভাঙা ছেড়ে দিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো ছাদে উঠে গেল। এ কী কাণ্ড! সবাই আবার ছাদে উঠল কেন? অভিযাত্রীরা প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে এসপ্ল্যানেডে বেরিয়ে এলেন। মেরিফেলোরা কেন আবার ছাদে উঠে গেল তা বুঝার জন্য।

এমন সময় বিউগল বাজার শব্দ শোনা গেল। হ্যাঁ, বিউগলই বাজছে বটে। কারখানার ভেতর থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল নিগ্রো শ্রমিকের দল। এবার ক্যাপ্টেন মারসিনেকে দেখা গেল। তিনি বিউগল বাজিয়ে সবাইকে আশ্বাস দিয়েছেন। ক্যাপ্টেন মারসিনে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্ল্যাকল্যান্ড নগরীকে দেখে বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন। তিনি মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কোথায় মেয়েটার খোঁজ করবেন। যদি খুঁজে পানও তবে তাকে যে জীবন্ত অবস্থায় পাবেনই তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

জেন ব্রেজনই ক্যাপ্টেন মারসিনকে আগে দেখতে পেলেন। আনন্দে আত্মহারা প্রায় জেন ব্রেজন ছুটতে ছুটতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। অনাবিল আনন্দের জোয়ারে ভাসতে লাগলেন উভয়ে।

ঠিক তখনই প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে এসপ্ল্যানেডের দুদিক থেকে দু-দুটো প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে কারখানা আর দুর্গ-প্রাসাদ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

টাওয়ারের চূড়ায় দেখা গেল এক অভানীয় দৃশ্য। উইলিয়াম ফারনি আর তার বাইশ জন সাকরেদ করজোড় প্রাণ ভিক্ষা চাইছে ক্যাপ্টেন মারসিনের কাছে।

পরমুহূর্তেই আবার পর পর দুবার বিকট আওয়াজ হল। বিস্ফোরণ। প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। ব্যস, চোখের পলকে প্রাসাদ-দুর্গ ও কারখানা-দুর্গ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। ব্যস, সব শেষ। ব্ল্যাকল্যান্ডের স্রষ্টা মারসেন ক্যাম্যারেট আর হ্যারি কিলার তার সাকরেদদের নিয়ে পাথরচাপা পড়ে চিরদিনের মতো দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল।

---

www.pathagar.com

মাস্টার জ্যাকারিয়ুস

রোন নদীর ওপর ছোট্ট একটা দ্বীপ। এ দ্বীপেরই এক পুরনো বাড়িতে বাস করেন মাস্টার জ্যাকারিয়ুস। সবাই তাঁকে ঘড়ির কারিগর মাস্টার জ্যাকারিয়ুস বলেই জানে। তাঁর চেহারা দেখে বয়স সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব নয়। কুচকুচে কালো মানুষটার বয়স যে কতো তা কারোরই জানা নেই। তাঁর তৈরি ঘড়িগুলো বাস্তবিকই বিচিত্র। তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেছেন ঘড়িনির্মাতা হিসেবে।

মাস্টার জ্যাকারিয়ুসের হাতে তেমন কাজ না থাকলে আপনমনে নদীর দিকে তাকিয়ে তার রূপ সৌন্দর্য উপভোগ করেন। এমনিভাবেই তন্ময় হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টার কাটিয়ে দেন।

মাস্টার জ্যাকারিয়ুস শহরের ঘড়িগুলোতে দম দেয়ার সময় ছাড়া ভুলেও বাড়ির ত্রিসীমানায় বের হন না। তবে খাবার সময় অবশ্য তাঁকে বেরোতেই হয়। তাঁর ঘড়ির কারখানার জন্য আলাদা কোনো ঘর নেই। শোবার ঘরটাতেই তিনি কারখানা গড়ে তুলেছেন। সারাক্ষণ টেবিল আর ঘরের মেঝের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে ঘড়ির ছোট-বড় সব যন্ত্রাংশ। তবে সবই তার নিজেরই আবিষ্কৃত। তবে তার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হচ্ছে, ঘড়ির প্রাণ। একটি ছোট্ট যন্ত্র তৈরি করে তিনি তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে তাকে সচল করে তোলেন। যাবতীয় ঘড়ির ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। আর এটা নাকি তাঁর একান্তই নিজস্ব আবিষ্কার।

বাড়ির সবচেয়ে সাজানো গোছানো একটা ঘরে বাস করেন জেরাঁদে—মাস্টার জ্যাকারিয়ুসের আদরের দুলালী। সে এতই সুদর্শনা যে, কয়েকটা শহর ঘুরে এলেও সৌন্দর্যের দিক থেকে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর মতো কাউকেই পাওয়া যাবে না। সে অষ্টাদশী, পূর্ণ যৌবনা। মাস্টার জ্যাকারিয়ুস, তাঁর মেয়ে জেরাঁদে আরও দুজন এ বাড়িতে বাস করে। তাদের একজন তাঁর সহকারী ও শিষ্য অবর্টা। আর অন্যজন পরিচারক স্কলাস্টিকা।

রোজ তারা চারজন একসঙ্গে, একই টেবিলে বসে নৈশভোজ সারে। এক রাতে এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য লক্ষিত হল। টেবিলে সব উপাদেয় খাবার সাজানো থাকলেও মাস্টার জ্যাকারিয়ুস কিছুই মুখে তুললেন না। তিনি কিছু না খেয়েই, অভ্যাসমতো মেয়েকে আদর না করেই কারখানা ঘরে চলে গেলেন।

বাবার অভাবনীয় কাণ্ড দেখে জেরাঁদে হতভম্ব হয়ে বসে রইল। ভাবল, তবে কি তিনি সুস্থ নন। এ বাড়িতে এ যে একোবারেই অবিশ্বাস্য কাণ্ড। ইতিপূর্বে এমন কোনো ঘটনা তো আর ঘটে নি। তবে?

স্কলাস্টিকা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কর্তা সাহেবের মধ্যে কদিন ধরে অদ্ভুত একটা ভাবান্তর লক্ষিত হচ্ছে। তবে কি ঘাড়ে ভূত চাপল নাকি? ডাক্তার দেখানো দরকার।'

'উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তাঁর মধ্যে ভর করেছে। কিসের উদ্বেগ, কেনই-বা তাঁকে এমন অস্থিরতা গ্রাস করে ফেলল, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

www.pathagar.com

কর্তা সাহেবের শিষ্য অবার্ট বলল, 'এ অস্বস্তির কারণ আমি জানি। কয়দিন যাবত অত্যাশ্চর্য একটা কাণ্ড ঘটে চলেছে। তাঁর তৈরি ঘড়িগুলো ইদানীং এক-এক করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তিনি সারাই করতে গিয়ে কলকজাগুলো খোলাখুলি করেও গলদ ধরতে পারছেন না। সবই ঠিকঠাক, অথচ—'

আগ বাড়িয়ে স্কলাস্টিকা বলে উঠল, 'হবার কথা তো বটে! তামা-পেতল দিয়ে বানানো ঘড়ি আবার ভালো হয় নাকি। দম দিয়ে কি আর ঘড়িকে সচল রাখা সম্ভব? এর চেয়ে বরং 'ছায়াঘড়ি' অনেক ভালো ছিল। কোনো জটিল যন্ত্রাংশ নেই। দম দেবার দরকারও হয় না।'

জেরাঁদে সেদিকে কান না দিয়ে বলল, 'এক কাজ করা যাক বরং। চলো গির্জায় গিয়ে বিকল ঘড়িগুলোকে আবার সচল করে দেয়ার জন্য আমরা পরমপিতার কাছে প্রার্থনা জানাই, যাতে তিনি বাবার তৈরি ঘড়িগুলোকে আবার সচল করে দেন।'

এবার তাঁরা মোমবাতি জ্বেলে, হাঁটুগেড়ে ঈশ্বরের কাছে সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করল। তারপর সবাই নিজের নিজের ঘরে শুতে চলে গেল।

জেরাঁদে বিছানায় শুয়ে নিদারুণ অস্থিরতার মধ্যে কাটাতে লাগল। কিছুতেই ঘুমোতে পারল না। বাবার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তার মধ্যেও ভর করল। এ কী অদ্ভুত কাণ্ড। যাঁর হাতে ঘড়ি তৈরি তিনিই তার ত্রুটি ধরতে পারছেন না! এ নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার!

জেরাঁদে যন্ত্রচালিতের মতো লাফ দিয়ে বিছানার ওপর বসে বসে শুনল। হঠাৎ ঝড় উঠেছে। প্রবল ঝড়। ঠিক তখনই ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে কার যেন কণ্ঠস্বর জানালা দিয়ে ভেসে এল। উৎকর্ণ হয়ে নিঃসন্দেহ হবার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, করুণ আর্তস্বরই বটে। খাট থেকে নেমে জানালা দিয়ে উঁকি দিতেই আরও চমকে উঠল। তার বাবার ঘরের জানালা খোলা। আলো জ্বলছে। ব্যাপার কী? এত রাতে তাঁর ঘরে আলো কেন?

জেরাঁদে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে গিয়ে দেখে তার বাবার ঘরের দরজার পাল্লা হাট হয়ে খোলা আর তিনি স্থবিরের মতো দাঁড়িয়ে। ঘড়ির কারিঘর জ্যাকারিয়ুস পাগলের মতো বিড়বিড় করে বলে চলেছেন, 'আমার জীবনে কী-ই আর অবশিষ্ট থাকল? ঘড়িগুলোর মধ্যে আমি আমার প্রাণটাকেই টুকরো টুকরো করে বিলিয়ে দিয়েছিলাম। আমার প্রাণের কণাতেই ঘড়িগুলোর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলাম। সোনা, রূপা, লোহা, তামা আর পেতলের মধ্যে আমি মাস্টার জ্যাকারিয়ুসই তো সূক্ষ্মভাবে অধিষ্ঠান করছি। আমি তাদের স্রষ্টা, দেবতুল্য। তারা এতদিন আত্মার অংশ নিয়েই প্রাণবন্ত ছিল। কিন্তু আজ তারা একে একে থেমে গেছে। তবে তো তারা থেমে যাওয়ায় আমার প্রাণের অস্তিত্বও থাকবে না, থেমে যাবে।' এমন সব কথা বিড়বিড় করে বলতে বলতে তিনি টেবিল আর ঘরময় ছড়ানো যন্ত্রাংশগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। মনে হল কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন, পাচ্ছেন না। বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট যন্ত্রাংশ হাতে তুলে পরমুহূর্তেই আবার ছুড়ে ফেলে দিতে লাগলেন। সবই আছে, সবই আছে ঠিকঠাক। কেবল প্রাণের স্পন্দনেরই অভাব। এতদিন যে-প্রাণকে তিনি সযত্নে আগলে রেখেছিলেন আজ তা কর্পূরের মতো উবে গেছে।

জেরাঁদে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে বাবার প্রায় অস্ফুট কথাগুলো শুনে ভাবতে লাগল—ঠিকই তো নিজের আত্মা দিয়ে ঘড়িগুলোকে সৃষ্টি করেছিলেন। এ যে বাস্তবসত্য। একবর্ণও মিথ্যা প্রলাপ নয়।

www.pathagar.com

কখন যে অবার্ট তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে জেরাঁদে টেরই পায় নি। সে বলল, 'জেরাঁদে, রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। ঘরে চলো—শুয়ে থাক গে।'

অবার্টের কথায় জেরাঁদে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আচ্ছা অবার্ট, ঘড়িগুলোর মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য বাবা কি পরমপিতার কাছে অপরাধী হয়েছেন?'

এর কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে অবার্ট বলল, 'জানি না অপরাধী কি না। রাত হয়েছে, শোবে চলো।'

অবার্টের সঙ্গে জেরাঁদে নিজের ঘরে ফিরে এল। আর মাস্টার জ্যাকারিয়ুস জানালা দিয়ে অপলক চোখে উত্তাল উদ্দাম নদীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

* * *

জেনেভার ব্যবসায়ীদের সততার সুনাম ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে। আজ লজ্জায় মাস্টার জ্যাকারিয়ুসের মাথা কাটা যাবার অবস্থা।

এতকাল সবাই বলাবলি করত, মাস্টার জ্যাকারিয়ুস নাকি একজন প্রেতসাধক। ডাইনিদের সঙ্গে তাঁর যোগাসাজোস রয়েছে। তাই তিনি ধাতুর মধ্যেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। পারেন ঘড়ির মধ্যে হৃদযন্ত্র স্থাপন করে দিতে। আজ সেগুলোই স্তব্ধ। এবার সবাই সরব হল, মাস্টার কি তবে সত্যই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী? তা যদি নাই হবেন তবে ঘড়িগুলো নিজে থেকেই এক-এক করে স্তব্ধ হয়ে যাবার কারণ কী? যন্ত্রপাতি সবই জায়গামতো ঠিকঠাক রয়েছে। অথচ ঘড়ি বন্ধ। এ কী ভূতুড়ে কাণ্ড রে বাবা!

সকাল হলে গুরু-শিষ্যের আলোচনা শুরু হল। আলোচনা ঠিক নয়, জোর তর্কবিতর্ক। কথাপ্রসঙ্গে শিষ্য অবার্ট বলল, 'স্যার, আপনার খুবই অহমিকা। বিজ্ঞান নিয়ে এত বড়াই করা ঠিক নয়।'

'বলো কী হে! বড়াই করব না! আমি তো শুধুমাত্র ঘড়ির কারিগরই নই, প্রাণদাতাও বটে! আমার পরামর্শ অনুযায়ীই তো তুমি ঘড়ি মেরামত—'

'হ্যাঁ, তা করি বটে। কিন্তু আপনিও তো আমার দক্ষতার কথা একবাক্যে স্বীকার করেন।'

'হ্যাঁ, তা করি সত্য। কিন্তু ঘড়িতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পার কি? না, অবশ্যই পার না। লোহা, তামা আর পিতলের মধ্যে তোমার প্রাণকে তো বিলিয়ে দাও না। তাই ঘড়ির মৃত্যুতে তোমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে না। যাবে কি? কিন্তু আমার মৃত্যু কিন্তু অবশ্যই হবে।'

গুরুকে উষ্মা প্রকাশ করতে দেখে অবার্ট তোয়াজ করতে লাগল, 'স্যার, ঘড়ির কাজে আপনার জুড়ি মেলা ভার। কোয়ার্জ-ঘড়ি নিয়ে আপনার গবেষণার কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।'

মাস্টারের মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। বুক ফুলিয়ে তিনি বললেন, 'খুবই সত্যি কথা বলছে অবার্ট। কোয়ার্জকে কেটে কেটে কীভাবে হীরের আকৃতিবিশিষ্ট করে তোলা সম্ভব সে কৌশল তো আমিই তোমাকে শিখিয়ে দেব হে।'

বাস্তবিকই কোয়ার্জ কাটার কাজে মাস্টার অনন্য দক্ষতা অর্জন করেছেন। কোয়ার্জ কেটে কেটে তৈরি করেন। অত্যাশ্চর্য আধার, ঘড়ির চাকা, সূক্ষ্ম ও জটিল সব যন্ত্রাংশ তৈরি করেছেন। এ ঘড়ি নিখুঁত সময় নির্দেশ করবে। ঘড়ি চলাকালীন মনে হবে ঠিক যেন হৃদপিণ্ড ধুকপুক করছে। সত্যি অত্যাশ্চার্য ব্যাপারই বটে।

www.pathagar.com

একটু দম নিয়ে বুড়ো বললেন, 'আমাকে যত বোকাই তোমরা ঠাহর কর না কেন, প্রাণ কী বস্তু আমি কিন্তু তা আবিষ্কার করে ফেলেছে। জানতে পেরেছি, দেহ আর আত্মার মধ্যে কোনো যোগসূত্রের অস্তিত্ব রয়েছে।'

অবার্ট গুরু মাস্টার জ্যাকারিয়ুসের মুখের দিকে বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সত্যিই তাঁর এ অহমিকা অমূলক নয়। তাঁর শৈশবকালে ঘড়িশিল্প তখন আঁতুরঘরেই রয়েছে বলা যেতে পারে। তখন ঘড়ির সময়ের দিকটা নয়, সৌন্দর্যের দিকেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হত। সোনা, রূপা, তামা ও কাঠ প্রভৃতি খোদাই করে ঘড়ি গড়ে তোলা হত। আসলে তখনকার মানুষ ঘড়ি ধরে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল না।

কালের পরিবর্তন ঘটল। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হতে লাগল। কিন্তু মাস্টার ঘড়ির পেন্ডুলামের মধ্যে একটা কৌশল আবিষ্কার করলেন। আর তা তাঁর তৈরি ঘড়িগুলোর মধ্যে ব্যবহার করতে লাগলেন। গতি নিয়ন্ত্রণের মূল রহস্যটা আবিষ্কার করে, নির্ভুল সময় দেয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারায় তিনি নিজেকে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর জ্ঞান করলেন। ভাবলেন, প্রাণের রহস্য তাঁর হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। দেহ ও আত্মার মিলনস্থল তিনি ধরতে পেরে গেছেন।

কথাপ্রসঙ্গে অবার্টকে বললেনও তাই। একটু নড়েচড়ে বসে বলতে লাগলেন 'শোনো অবার্ট, প্রাণ আসলে কী? প্রাণ কতকগুলো স্প্রিংয়ের সমষ্টি বৈ কিছুই নয়। নিজের দেহটাকে বাইরে থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই আমি প্রাণতত্ত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। দেহটা সুস্থ-স্বাভাবিক থাকলেই প্রাণও ঠিকঠাক থাকে। এটাকে ঠিকঠাক চালানোই তো প্রাণের কাজ। অতএব নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত চাকা বানাতে পারলেই আমার আবিষ্কৃত ঘড়ির প্রাণ, আমার প্রাণেরই কণা ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের প্রাণ কী? দেহের গতি ও আত্মার নিয়ন্ত্রণই হচ্ছে আমাদের প্রাণ। অর্থাৎ, প্রাণ হচ্ছে একটি অত্যাশ্চর্য ফল—।'

স্বয়ংক্রিয় নিখুঁত ও নির্ভুল ফল ছাড়া আর কী-ই বা একে বলতে পারি?'

তাঁর মেয়ে জেরাঁদে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বাবার কথা এতক্ষণ শুনছিল। এবার সে চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল, 'বাবা আমার বুকে হৃদযন্ত্রের বদলে একটা স্প্রিং থাকলে কি আমি তোমাকে এমন করে ভালোবাসতে পারতাম, বলো?'

মাস্টার পরিস্থিতিটা সামাল দেবার আগেই সদর-দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হল। ফ্যাকাশে—বিবর্ণ মুখে মাস্টার জ্যাকারিয়ুস বললেন, 'আর একটা ঘড়ি বুঝি খারাপ হল। যাও অবার্ট, দেখে এসো তো। আমার হৃদপিণ্ড তো ভুল করতে পারে না।'

* * *

মাস্টার জ্যাকারিয়ুস শয্যা নিলেন। কঠিন ব্যামো। চিকিৎসক এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিধান দিয়ে গেলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর রোগ নিরাময় করা সম্ভব হল না। জেনেভার ঘড়ির কারিগররা তার বিচিত্র ব্যামোর কথা শুনে বড়ই ভাবিত হয়ে পড়ল। একদিকে তাঁর ঘড়িগুলো এক এক করে বিকল হয়ে পড়ছে, আর সে সঙ্গে তাদের সৃষ্টিকর্তা মাস্টারও শয্যা নিলেন। চিকিৎসকরা মাঝে মধ্যেই লক্ষ্য করেছেন তার হৃদযন্ত্রের গতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েও, পরমুহূর্তে আবার টিকটিক করে চলতে শুরু করে। উপায়ান্তর না দেখে তারা শেষপর্যন্ত সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। অদ্ভুত—একেবারেই অবিশ্বাস্য কাণ্ড বটে।

আগেকার গুজবটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তবে কি মাস্টার জ্যাকারিয়ুস সত্যিই শয়তানের চর—সাক্ষাৎ শয়তান। পিশাচসিদ্ধ পুরুষ? ডাইনির সঙ্গে তাঁর যোগসাজোস রয়েছে?

www.pathagar.com

মেয়ে জেরাঁদে আর শিষ্য অবার্ট যথাসাধ্য সেবাযত্নের মাধ্যমে তাঁকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করতে লাগল।

মাস্টার জ্যাকারিয়ুসের ইচ্ছা, একটু সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁর সাধের জেরাঁদেকে অবার্টের হাতে তুলে দিয়ে তাকে জামাই করে নেবেন। শহরের বাসিন্দারা বলাবলি করত, বুড়ো মাস্টার শিষ্যের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাকে ঘরজামাই করে রাখার ধান্ধায় রয়েছেন। এ-প্রসঙ্গ নিয়ে কথা উঠলে অদ্ভুত একটা দৃশ্যের অবতারণা ঘটতে দেখা যায়। অতি কদাকার একটা মূর্তিকে নজরে পড়ে। একে এর আগে কোনোদিনই শহরে দেখা যায় নি। তার মুখটা ঠিক যেন একটা ঘড়ির ডায়াল। আর ঘড়ির দেহটার মতো তার দেহকাণ্ডটা। হাত থেকে ঘড়ির কাঁটার মতো থেকে থেকে নাড়াচাড়া করে। বুকে কাত করে রাখলে নির্ঘাত শোনা যাবে ভেতরে অনবরত টিকটিকানি চলছে। গ্রীবা বিস্তার করলে মনে হয় বুঝি বা খাঁজকাটা দাঁতগুলোর মধ্যে দিয়ে অনবরত চাকা ঘুরে চলেছে। লক্ষ করলে দেখা যায়, বেটেখাটো কুদর্শন মানষুটা প্রতি ঘণ্টায় এক লিগ পথ রোজ পায়ে হেঁটে পাড়ি দেয়। বৃত্তাকার পথে চলে। রোজ দুপুর বারোটার ঘণ্টা বাজার সময় তাকে গির্জার তলায় ঠিক মোতায়েন থাকতে দেখা যায়।

এবার থেকে কুদর্শন বেটে লোকটাকে সর্বত্র দেখা যেতে লাগল। তবে জেরাঁদে আর অবার্টের বিয়ের কথা যেখানেই উত্থাপন করা হয় সেখানে সে আচমকা দেখা দেবেই। শুধু কি এই? খাঁজকাটা দাঁতের পাটি বের করে বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলে ওঠে—'ধ্যুৎ! এ বিয়ে কিছুতেই হবার নয়!'

এক বিকালে জেরাঁদে তার বাবাকে নিয়ে পথে পায়চারি করার সময় অত্যাশ্চর্য মূর্তিটাকে দেখতে পেল। তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে। মুখের দিকে চোখ পড়ামাত্র ফিক করে হিসে ফেলে।

আর একদিন বেড়াতে বেড়াতে কুদর্শন সে লোকটাকে দেখেই জেরাঁদে চমকে উঠে তার বাবার হাত চেপে ধরল। ভীত সন্ত্রস্ত, কাঁপা কাঁপা গলায় কোনোরকমে উচ্চারণ করল, 'বাবা, ওই কিম্ভূতকিমাকার লোকটা আমার দিকে কেমন ড্যাবা ড্যাবা চোখে তাকাচ্ছে।'

মাস্টার জ্যাকারিয়ুস মুচকি হেসে মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'কেন শুধু শুধু ভয় পাচ্ছিস জেরাঁদে। ওটা একটা ঘড়ি। ঠিকই তো চলছে। এখন চারটে বাজে।'

চোখের তারায় অবিশ্বাসের ছাপ এঁকে জেরাঁদে তার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করল, 'ঘড়ি? এ কী অদ্ভুত কথা! বাবা কি সত্যি মানুষ, নাকি তাঁর মধ্যে পিশাচ ভর করেছে? মানুষের মুখে ঘড়ির কাঁটা কী করে খুঁজে পেলেন, মাথায় আসছে না তো!'

মাস্টার জ্যাকারিয়ুস বাড়ি ফিরে কারখানা ঘরে ঢুকলেন। কয়েক মুহূর্তে নিশ্চল-নিথর পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন ঠিক পাঁচটা। আশ্চর্য ব্যাপার! ঘড়িগুলোতে আগে পরে পাঁচটার ঘণ্টা বাজতে লাগল। এর আগে এমন ঘটনা ঘটে নি কোনোদিন। সব কয়টা ঘড়িতে একইসঙ্গে পাঁচটার পর ঘণ্টা বাজত। সামান্য হেরফের হত না। একের পর এক ঘড়ির ঘণ্টা পনের মিনিট ধরে বাজল। ব্যাপারটা তাঁর মধ্যে

www.pathagar.com

আরো বেশি অস্থিরতা জাগিয়ে তুলল। এমন এক চরম মুহূর্তে হঠাৎ কে যেন তার দরজায় করাঘাত করল। ঝট করে দরজা খুলতেই দেখা গেল অবিকল ঘড়ি মতো দেখতে মূর্তিমান সেই কিম্ভূতকিমাকার লোকটা দাঁত বের করে দরজায় দাঁড়িয়ে।

কোনোরকম ভূমিকা না করে সে বলে উঠল, 'আমি আপনার সেবা করার ইচ্ছা নিয়ে এসেছি। সূর্যের ওপর খবরদারি করাই আমার একমাত্র কাজ। আমি নির্ঘাত আপনার বাগ না মানা ঘড়িগুলোকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে সক্ষম হব।'

শুকনো গলায় মাস্টার জ্যাকারিয়ুস বললেন, 'আমি কি ততদিন পৃথিবীতে থাকব? ধড়ে কি প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে?' কথাটা বলেই তিনি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।'

খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে অদ্ভুত লোকটা বলল, 'কী যে বলেন! পৃথিবীতে থাকবেন না কেন, বলুন তো? অবশ্যই থাকবেন।'

মাস্টার জ্যাকারিয়ুস উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠলেন, 'ঠিকই তো। ঠিক কথাই তো বলেছ। কেন বাঁচব না! আমার তো মৃত্যু হবার কথা নয়। ঘড়ির সৃষ্টিকর্তা আমি। ঘণ্টা, মিনিট আর সেকেন্ডের জন্মদাতা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা পরমপিতার মতোই আমি মৃত্যুঞ্জয়ী। আমার মৃত্যু নেই। আমি অমরাত্মা! আমি মৃত্যুঞ্জয় পরমপিতারই সমান। সমান ক্ষমতাধর।'

'দেখুন স্যার, শয়তান ও নিজেকে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে তুলনা করে থাকে। তাই তো আমি যে আদপ ঘড়িগুলোকে টিট করতে ছুটে এসেছি।'

'কিন্তু কীভাবে তো সম্ভব করবে, বল তো?'

'উপায় জানার আগে আপনার মেয়েটাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।'

'সে কী কথা! এ যে নিতান্তই অসম্ভব প্রস্তাব! অবার্টের সঙ্গে তার বিয়ে দেব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে আমি নিয়ে রেখেছি।'

'একেবারেই অলীক কল্পনা। অবার্টের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে কিছুতেই হবার নয়।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার সে বলল, 'বহুৎ আচ্ছা। তবে আমি বিদায় নিচ্ছি। শুনে রাখুন সাহেব, বিয়েটা না হলে আপনার রোগ নিরাময়ও হচ্ছে না। ঘড়িগুলোও মেরামত হচ্ছে না। বিদায়, বিদায় মাস্টার জ্যাকারিয়ুস।' লম্বা লম্বা পায়ে সে বাড়ির সীমানার বাইরে চলে গেল। ঠিক তখনই তাঁর বুকের ভেতরে কে যেন পর পর দুবার হাতুড়ির আঘাত হানল। ছয়টা বাজল।

* * *

মাস্টার জ্যাকারিয়ুসের রোখ চেপে গেল। তাঁকে বাঁচতেই হবে। যে করেই হোক ঘড়িগুলোকে মেরামত করে আবার চালু করবেন। অবার্টের সঙ্গে আদরের দুলালী জেরাঁদেয়ের বিয়ে তিনি দেবেনই। বারবার তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে অদ্ভুতদর্শন লোকটার ভবিষ্যদ্বাণী জেগে উঠতে লাগল, 'অবার্টের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে কিছুতেই হবার নয়।' কথাটা যখনই তাঁর মনের কোণে ভেসে ওঠে তখনই অধিকতর উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ঘড়ি সারাইয়ের কাজে মেতে ওঠেন। প্রতিটা যন্ত্রাংশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করনে। না, কোথাও কোনো ত্রুটিই তো ধরা পড়ছে না। এ কী অদ্ভুত কাণ্ড! তবে কেন ঘড়িগুলো অচল-অনড় হয়ে পড়ছে।

মাস্টার জ্যাকারিয়ুসের আত্মম্ভরিতা কিন্তু এতটুকুও হ্রাস পায় নি। এখনো তিনি নিজেকে সৃষ্টিকর্তা পরমপিতার সমান জ্ঞান করেন। শহরের কোথাও, কারো বাড়িতে

www.pathagar.com

ঘড়ি বিকল হয়েছে খবর পাওয়ামাত্র উদ্ভ্রান্তের মতো সেখানে ছুটে যান। ঘড়ি বারবার নাড়াচাড়া করেন, কষে দম দেন। কিন্তু হায়! পেন্ডুলাম কিছুতেই দোলে না। স্থবির, একেবারে অনড়। প্রায়াস বারবারই ব্যর্থ হয়ে যায়।

অবার্ট ভেবে চিন্তে বলে, 'স্যার, দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে যন্ত্রাংশগুলো হয়তো ক্ষয় কয়ে গেছে। চাকার দাঁত ক্ষয় হয়ে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কি-লক জায়গা মতো না বসায়—'

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মাস্টার জ্যাকারিয়ুস ধমক দিয়ে ওঠেন, 'ধ্যুৎ! যতসব অবান্তর কথা, চাকার দাঁত ক্ষয় হয়ে গেছে—অসম্ভব। প্রত্যেকটা তামার টুকরো আগুনে নরম করে, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে নিজে হাতে যন্ত্রাংশগুলো তৈরি করেছি। আর যে-সব স্প্রিং ব্যবহার করেছি তাও মামুলি স্প্রিং মোটেই নয়। কিছুতেই সেগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে অকেজো হয়ে পড়তে পারে না। নির্ঘাত ঘড়ির ভেতরে ভূতপ্রেত ঢুকে ঘাপটি মেরে রয়েছে।'

ঘড়ির মালিকদের ঘন ঘন যাতায়াতে বাড়িতে তিষ্টনোই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্তব্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়ি ফেরত—তারা কড়া কথা, গালমন্দ করতেও দ্বিধা করছে না। টাকার থলেতে টান পড়ল। এবার তিনি বাসনপত্র বিক্রি করে ঘড়ির ক্রেতাদের দাম ফেরত দিতে লাগলেন। তারপর আসবাবপত্রেও হাত পড়ল। শেষপর্যন্ত অবার্ট নিজের সঞ্চিত অর্থ তুলে দিয়ে শিক্ষাগুরুর মান বাঁচাতে লাগল।

পরিচারিকা স্কলাস্টিকা তার প্রভুর অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার কথা বড়াই করে প্রতিবেশীদের কাছে বলে। কেউ তার প্রভুর কুৎসা গাইলে সে ছেড়ে কথা বলে না। বরং বুক ফুলিয়ে বলে, 'সব ঘড়ি বিকল হয়ে যাচ্ছে কোন নিন্দুক বলে? লোহার সে-ঘড়িটার কথা মনে নেই? দাম এতই বেশি যে জেনেভার কারোর হিম্মতেই কুলোয় নি। আঁদেনাতের বাগানবাড়িতে সেটা গেলে আজ দেখা যাবে।'

হ্যাঁ, তার কথা শতকরা একশো ভাগই সত্যি। অত্যাশ্চর্য যে লোহার ঘড়িটা মাস্টার জ্যাকারিয়ুসের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি, স্বীকার করতেই হয়। বিশ বছর ধরে প্রাণবন্ত মানুষের মতো আজও সেটা রীতিমতো সচল রয়েছে। নিজে থেকে চলে। কারো দেখার করার দরকার পড়ে না।

মাস্টার জ্যাকারিয়ুস মনের দিক থেকে ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছেন। শেষপর্যন্ত মেয়ে জেরাঁদের বিয়েটা দিয়ে যেতে পারবেন কি না, যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে।

সম্প্রতি তার গির্জায় যাওয়া, প্রার্থনাসভায় যোগদান করা শিকেয় উঠে গেছে। শয়তান ক্রমেই কাঁধে চাপছে, ঈশ্বর দূরে সরে যাচ্ছেন।

এক রবিবার সকালে জেরাঁদে তাঁকে খুব করে বুঝিয়ে শুনিয়ে গির্জায় নিয়ে গেল। তিনি গির্জার এক কোণে জুবুথুবু হয়ে বসে রইলেন। তাকে দেখেই উপস্থিত সবাই ভয়ে সরে গেল।

সবাই যখন প্রার্থনাসঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করল তিনি তখন জুলজুল করে তাকিয়ে রইলেন। ভাবটা এমন যে, তিনি ঈশ্বরের চেয়ে কোন অংশে কমতি? একেই বলে শয়তান কাঁধে চাপা।

গির্জার নিয়ম অনুযায়ী দুপুর ঠিক বারোটায় দেবদূতের প্রার্থনা হয়। সবাই ঘড়িতে বারোটা বাজার জন্য অপেক্ষা করছে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে বারোটার কাছাকাছি এগিয়ে

www.pathagar.com

গল। হঠাৎ মাস্টার জ্যাকারিয়ুস উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন। ঘড়ির কাঁটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেছে। আর কোনোদিন বারোটা বাজবে না। কোনোদিনই না।

গির্জার ভক্তরা মাস্টারকে আচ্ছামতো পিটুনি দিল। সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। আশ্চর্য ব্যাপার। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তিনি আবার চিৎকার করে উঠলেন, 'আমার মৃত্যু নেই! আমি জ্যাকারিয়ুস! আমি অমর! কে বলল আমি মারা যাব? আমার হিসেবের খাতা কোথায়?'

কথা বলতে বলতে তিনি তাক থেকে একটা খাতা টেনে নিয়ে উন্মাদের মতো তার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তাঁর ঘড়ি বিক্রির সংখ্যা দেখে নিলেন। হাতে ক্রেতাদের নাম-ঠিকানা বিস্তারিতভাবে লেখা। দেখলেন, একটা ঘড়ি ছাড়া বাকি সব ঘড়িই তাঁর কাছে ফিরে এসেছে। একমাত্র লোহার ঘড়িটার কথা উল্লেখ নেই। তবে? সেটা এখনো স্তব্ধ হয়ে যায় নি? তাতে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে? তবে সেটা এখনো ঠিকঠাক। আছে। আবার উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠলেন, 'বন্ধ হয় নি। এখনো চলছে সেটা। আমি যাব। তল্লাশ করে বের করব লোহার ঘড়িটাকে। কিছুতেই বন্ধ হতে দেব না, কিছুতেই না। তার প্রাণপাখি এখনো সাড়া দিচ্ছে, ধুকপুক করছে। সেটাকে জিইয়ে রাখলেই আমিও বেঁচে থাকব। আমি হব মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুকে জয় করে বেঁচে থাকব অনন্ত কাল।' কথা বলতে উত্তেজনাবশত আবার তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

* * *

মৃত্যুপথযাত্রী মাস্টার জ্যাকারিয়ুসের মধ্যে এক অভাবনীয় অমানুষিক শক্তি আশ্রয় নিল। মৃত ব্যক্তি যেন সমাধিক্ষেত্র থেকে প্রাণ ফিরে পেলেন। হঠাৎ একদিন তিনি বেপাত্তা হয়ে গেলেন।

জেরাঁদে সারা জেনেভা শহর তন্নতন্ন করে খুঁজেও বাবার হদিস পেলেন না।

অবার্টও গুরুর খোঁজ করে হতাশ হয়ে বলল, 'তিনি নির্ঘাত ওই লোহার ঘড়িটার খোঁজে ছুটেছেন। তাঁর প্রাণপাখি যে ওই ঘড়িটার মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে।'

অবার্ট আর জেরাঁদে হিসাবের খাতা ঘেঁটে বের করল লোহার ঘড়িটার ক্রেতার নাম, ঠিকানা। দেখল, সেটা সুইজারল্যান্ডের শেষপ্রান্তে আঁদেরনাতের বাগানবাড়িতে, জেনেভা থেকে বিশ ঘণ্টার রাস্তা।

মুহূর্তমাত্র দেরি না করে অবার্ট আর জেরাঁদে পরিচারিকা স্কলাস্টিকাকে নিয়ে সুইজারল্যান্ডের আদেরনাতের বাগানবাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

পথ চলতে চলতে তারা তিনজন রাত্রির অন্ধকারে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে এক মঠে হাজির হল।

মঠের পাদরির সামনে জেরাঁদে কাঁদতে কাঁদতে তার বাবা মাস্টার জ্যাকারিয়ুসের অন্তহীন অহমিকার কথা বলতে লাগল।

এমন সময় দরজায় দমাদম করাঘাত হতে লাগল। দরজা খুলতেই উন্মাদপ্রায় জ্যাকারিয়ুস ছুটে এসে ঘরের মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

জেরাঁদে বাবাকে বাড়ি ফিরে যাবার জন্য বহুভাবে বুঝাতে লাগল।

বুড়ো জ্যাকারিয়ুস উন্মাদের মতো গর্জে উঠলেন, 'কোথায় যাব? কেনই বা যাব? আমার প্রাণের অস্তিত্ব যেখানে নেই সেখানে আমি তো থাকতে পারি না। আমি তো সেখানে প্রাণহীন জড়পদার্থ। আমি আমার প্রাণের কাছে—আঁদেরনাতের

www.pathagar.com

বাগানবাড়িতে। আমাকে তোরা বাধা দিসনে। আমার বাঞ্ছিত প্রাণের কাছে আমাকে যেতে দে! আঁদেরনাতের বাগানবাড়িই—'

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মঠের পাদরি সাহেব সহানুভূতির স্বরে বললেন, 'মাস্টার জ্যাকারিয়ুস, আমার কথা শুনুন—আত্মার মৃত্যু নেই। আত্মা অক্ষয়-অমর।'

'আমি একথা জানি, মানিও। সে অক্ষয়—অমর আত্মাকে তো আমিই সৃষ্টি করেছি। আমি মাস্টার জ্যাকারিয়ুস, আত্মাকে সৃষ্টির পর লোহার খাঁচায় বন্দি করে রেখেছি। আমার সৃষ্ট আত্মা এখন বন্দি হয়েই রয়েছে।

পাদরি সাহেব বুকে ক্রশ এঁকে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'এ কী পাপকথা! এ কী পাপ! একথা শুনলেও যে নরকগামী হতে হবে! এ কী পাপকথা।'

মাস্টার জ্যাকারিয়ুস একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুহূর্তে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আমি যাই আমার সৃষ্ট আত্মার কাছে। আমার আত্মার কাছে—আমারই সৃষ্ট আত্মার কাছে।'

অবার্ট, জেরাঁদে আর পরিচারিকা স্কলাস্টিকা তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল।

হায়! এ কী হল। কোথায় গেলেন মাস্টার জ্যাকারিয়ুস? অন্ধকার আর দুর্যোগের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেলেন তিনি?

মাস্টার জ্যাকারিয়ুসের মধ্যে যেন অমানুষিক শক্তি ভর করেছে। অন্ধকার আর দুর্যোগ অপেক্ষা করে উন্মাদের মতো তিনি হাজির হলেন আঁদেরনাতের বাগানবাড়িতে, পুরনো ভাঙাচোরা দুর্গে।

লোকে বলে, আঁদেরনাতের বাগানবাড়ির দুর্গে অশরীরীরা ছাড়া নাজি কেউ থাকে না। একসময় যে দুর্গপ্রাসাদ মানুষের কর্মচাঞ্চল্যে গমগম করত, আজ সেখানে বিরাজ করছে অবর্ণনীয় নিস্তব্ধতা। অশরীরী আত্মা আর বিষধর সাপের নিশ্চিন্ত আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে।

মাস্টার জ্যাকারিয়ুস উন্মাদের মতো দুর্গের দরজায় করাঘাত করতে করতে চিৎকার করতে লাগলেন, 'দরজা খোলো! দরজা খোলো! আমার আত্মা—আমার সৃষ্ট আত্মা আছে এখানে।'

অমানুষিক শক্তি প্রয়োগ করে অনবরত ধাক্কাধাক্কিতে পুরনো দুর্বল দরজা বেশিক্ষণ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারল না। একসময় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। জ্যাকারিয়ুস উন্মাদের মতো ছুটে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলতে লাগল, 'আমার আত্মা! কোথায় আমার আত্মা—আমার সৃষ্ট আত্মা!'

তার পিছন পিছন অবার্ট, জেরাঁদে আর পরিচারিকা স্কলাস্টিকা প্রেতপুরীর মতো অন্ধকার কামরাটায় ঢুকে গেল।

মাস্টার জ্যাকারিয়ুসের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি, তাঁর সৃষ্ট অতিকায় লোহার ঘড়িটা দেয়ালের গায়ে ঝুলছে। বিশ বছর আগে তিনি মনপ্রাণ সঁপে, নিজেকে নিঙড়ে দিয়ে তিল তিল করে তৈরি করেছিলেন নিজের হৃদপিণ্ডের সমান অত্যাশ্চর্য এ লোহার ঘড়িটাকে।

অন্ধকার ভেদ করে কিম্ভূতকিমাকার সেই বেঁটেখাটো লোকটা মাস্টার জ্যাকারিয়ুসের সামনে এসে দাঁড়াল।

www.pathagar.com

মাস্টার জ্যাকারিয়ুস সচকিত হয়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, 'কে? কে তুই? কী চাস এখানে? কে তুই?'

কিম্ভূতকিমাকার লোকটা উন্মাদের মতো বিকট স্বরে দাঁত বের করে হেসে, জবাব দিল, 'আমি এ ঘড়ির মালিক। আমার নাম পিত্তোনোচ্চিয়ো। মাস্টার জ্যাকারিয়ুস, উচিতমূল্য দিয়ে আমি এ-ঘড়িটা আপনার কাছ থেকে ক্রয় করেছিলাম। এখন এর একমাত্র মালিকানাস্বত্ব আমার।'

'আমার আত্মা যে এ ঘড়ির মধ্যে বাঁধা আছে। আমার আত্মা—'

তাকে মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে অদ্ভুত দর্শন লোকটা এবার বলল, 'মাস্টার জ্যাকারিয়ুস, তাই তো ঘড়িটা আপনার হাতেই তুলে দেয়ার জন্য আমি উদগ্রীব। এর বিনিময়ে আমি কী চেয়েছিলাম, আশা করি ভুলে যান নি? আমার হাতে আপনার মেয়েকে তুলে দিতে হবে। মানে আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।'

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে অবার্ট গুলিবিদ্ধ জানোয়ারের মতো গর্জে উঠল—বজ্জাত শয়তান! বামুন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে চাচ্ছিস। তোর বিয়ের সাধ জন্মের মতো মিটিয়ে দেব!' ঘুষি পাকিয়ে তার দিকে এগিয়ে যেতেই তাকে হঠাৎ থমকে যেতে হল। কাকে মারবে? কোথায় কিম্ভূতকিমাকার লোকটা? সে যে চোখের পলকে বাতাসে মিলিয়ে গেছে। একেবারে ভোঁ-ভোঁ।

জমাটবাধা অন্ধকারে কবরস্থলের নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। অলৌকিক নীলাভ এক আলো যেন ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। মৃত্যুঘড়িটা থেকে থেকে নীরবতা ভঙ্গ করে বেজে উঠতে লাগল।

একসময় ভাঙা জানালা দিয়ে ভোরের আলো উঁকি দিল। কিন্তু মাস্টার জ্যাকারিয়ুস কোথায়? সবাই ছুটোছুটি করে ভাঙাচোরা দুর্গপ্রাসাদের সর্বত্র তন্ন তন্ন করে উন্মাদের মতো তাঁর খোঁজ করতে লাগল। নাম ধরে বারবার ডাকাডাকি করল। না, কেউ সাড়া দিল না।

সর্বত্র তন্নতন্ন করে খুঁজে সবাই উদ্ভ্রান্তের মতো বিশালায়তন হলঘরটায় হাজির হল। হঠাৎ দেখতে পেল মড়ার মতো আড়ষ্ট অবস্থায় বুড়ো জ্যাকারিয়ুস এক কোণে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। আর একটা শ্বেতপাথরের টেবিলের কাছে অদ্ভুতদর্শন সে লোকটা বসে।

তারা ঘরে ঢুকতেই মাস্টার জ্যাকারিয়ুস উন্মাদের মতো ছুটে এসে জেরাঁদের মাথায় হাত রেখে বলে উঠলেন, 'জেরাঁদে—মা আমার, ওই দেখ, তোমার ভাবী স্বামী বসে রয়েছে। ওর সঙ্গেই আমি তোমার বিয়ে দেব। দেখ, ভালো করে চেয়ে দেখ।'

জেরাঁদে দুহাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠল, 'না, না! এ যে অসম্ভব বাবা! একেবারেই অসম্ভব!'

অদ্ভুতদর্শন লোকটা দাঁতের পাটি বের করে হো হো করে হেসে উঠল।

মাস্টার জ্যাকারিয়ুস উন্মাদের মতো গর্জে উঠলেন, 'এ কী কথা! আমার কথা অমান্য করবে জেরাঁদে!' পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে আবেগমধুর স্বরে বলতে লাগলেন, 'আমার কথা শোনো মা, আমাকে বাঁচতে দাও। ওই ঘড়িটার মধ্যে আমার প্রাণপাখি বাঁধা রয়েছে। এখনো লোকটা এর মালিক। ঘড়িটার চাবিকাঠি ওর কাছে গচ্ছিত আছে। দম দিতে হবে। কতদিন ওটাতে দম দেওয়া হয় নি। অনেকদিনের ময়লা জমে রয়েছে। দম

www.pathagar.com

দিতে হবে। চাবি চাই। জেরাঁদে—মা আমার, আমাকে তুমি কি মেরে ফেলতে চাও? ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেলে আমার মৃত্যু অনিবার্য। তুমিই—হ্যাঁ, জেরাঁদে একমাত্র তুমিই পার আমাকে বাজাতে। আমি বাঁচতে চাই! আমাকে বাঁচতে দাও জেরাঁদে। পাঁচটা বাঁচল। শোনো, কান পেতে শোনো জেরাঁদে, আমার প্রাণপাখি কী বলে।'

ঠিক সে মুহূর্তেই দেয়ালের অতিকায় লোহার ঘড়িটা ঢং-ঢং করে পাঁচটার শব্দ করল। তখনই অদৃশ্য কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হল, 'তোমাকে বিজ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতেই হবে। অবশ্যই খেতে হবে।'

অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখে জেরাঁদে আর অবার্ট রীতিমতো আঁতকে উঠল। এ কী সর্বনেশে বাণী রে বাবা। এমন কোনো ঘটনা, এমন বাণী তো তার বাবার তৈরি কোনো ঘড়ি থেকে কোনোদিনই নির্গত হয় নি। এ কী ভূতুড়ে কাণ্ড রে বাবা!

মাস্টার জ্যাকারিয়ুস মেয়ের হাত ধরে ভাবাপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'জেরাঁদে—মা আমার, আমি বাঁচতে চাই। অনেক, অনেক দিন বাঁচতে চাই। আমাকে তুমি বাঁচতে দাও। আমি অবিনশ্বর হতে চাই মা। আমার সৃষ্ট ঘড়িগুলোর মধ্যে একমাত্র একটাই এখনো সচল, এখনো বেঁচে আছে। আমি এর মধ্য দিয়েই অক্ষয় অমর হব। একমাত্র তুমিই পারো আমাকে বাঁচাতে। রাজি হয়ে যাও মা।'

জেরাঁদে ফ্যাকাশে-বিবর্ণ মুখ তুলে অবার্টের দিকে তাকিয়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'প্রিয়তমে, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। বুঝতেই পারছ, আমার বাবার প্রাণ, তাঁর মরণ-বাঁচন একমাত্র আমার ওপরই নির্ভর করছে।'

মেয়ের সম্মতি পেয়ে মাস্টার জ্যাকারিয়ুস উল্লসিত হয়ে কিম্ভূতকিমাকার লোকটাকে বললেন, 'আমি রাজি। জেরাঁদে তোমাকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছে। আজ রাত ঠিক বারোটায় আমি তোমার হাতে আমার আদরের দুলালী জেরাঁদেকে তুলে দেব। তোমাদের বিয়ে হবে।'

কথা বলতে বলতে বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে তার হাত থেকে চাবিটা নিয়ে উন্মাদের মতো ঘড়িটার কাছে ছুটে গেলেন। কাঁপা কাঁপা হাতে তাতে দম দিতে লাগলেন। দম দিতে দিতে বললেন, 'যাক, একশো বছর, এক শতকের জন্য নিশ্চিন্ত। অনেক, অনেক দম দিয়েছি। এক শতকের জন্য নিশ্চিন্ত। আমার আত্মার স্পন্দন অব্যাহত থাকবে।' কথা বলতে বলতে তিনি দুম করে মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন।

এদিকে একটা প্রাণের বিনিময়ে কিম্ভূতকিমাকার লোকটার হাতে প্রেয়সীকে তুলে দিতে চলেছেন দেখে অবার্ট হতাশ হয়ে বৃদ্ধ পাদরির কাছে ছুটে গেল।

পাদরি সাহেব অবার্টের সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে দেখলেন, জেরাঁদে নিশ্চল-নিথর পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

বুড়ো মাস্টার জ্যাকারিয়ুস অতিকায় লোহার ঘড়িটায় কান লাগিয়ে তন্ময় হয়ে শুনেছেন তার টিক্-টিক্-টিক্ শব্দ। তার হৃদপিণ্ডটায় থেকে থেকেই এই টিক্-টিক্-টিক্ শব্দ উত্থিত হচ্ছে। ঘড়ির কাঁটাটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে—বারোটার ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে ধীরমন্থর গতিতে। আর মাত্র কয়েক ঘর, মাত্র কয়েক ঘর এগিয়ে গেলেই ঢং-ঢং-ঢং করে বারোটার ঘণ্টা বাজবে।

www.pathagar.com

মঠের পাদরি যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘড়ির কাঁটাটাকে চেপে ধরলেন। ঘড়িটার টিকটিকানি বন্ধ হয়ে গেল, স্তব্ধ হয়ে গেল ঘড়িটা। আর কোনোদিনই বারোটা বাজবে না।

মুহূর্তে বিকট আওয়াজ হল। যেন বাজ পড়ল। ঘড়িটা ভেঙেচুরে একসার হয়ে গেল। আর যন্ত্রাংশগুলো চারদিকে ছিটকে পড়ল। অদ্ভুত কৌশলে স্প্রিংটা সর্পিলগতিতে এগিয়ে চলল। উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে মাস্টার জ্যাকারিয়ুস স্প্রিংটাকে ধরতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। ঝট করে মুঠো থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। কিম্ভূতকিমাকার লোকটা সেটা ধরে ফেলল। তার কুদর্শন মূর্তিটা যেন মুহূর্তে মাটিতে মিলেয়ে গেল।

মাস্টার জ্যাকারিয়ুস মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর নিথর দেহটা মেঝেতে এলিয়ে পড়ল। নিষ্প্রাণ নিস্তব্ধ। শেষ! সব শেষ!

পাদরির উপস্থিতিতে অবার্ট আর জেরাঁদের বিয়ে সুসম্পন্ন হয়ে গেল। তারা জীবনভর বিজ্ঞানতাপস মাস্টার জ্যাকারিয়ুসের আত্মার শান্তির জন্য পরমপিতার কাছে প্রার্থনা জানাল।

মিস্টিরিয়াস ডকুমেন্ট

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের উনত্রিশে জুলাই।

নর্থ চ্যানেল দিয়ে হেলতে দুলতে একটা ছোট্ট জাহাজ এগিয়ে চলেছে। তার চোঙ দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মাস্তুলের ডগায় ব্রিটিশ পতাকাটা পৎপৎ করে উড়ছে। আর সোনালি সুতো দিয়ে আঁকা ইংরেজি 'ই. জি.' অক্ষর দুটো, মার্কুইসের নিম্নপদস্থ অভিজাত আর্লের সম্মানসূচক চিহ্ন।

জাহাজটার গায়ে তার নাম 'ডানকান' কথাটা স্পষ্টা অক্ষরে লেখা। মালিকের নাম লর্ড গ্লেনারভান। তিনি ইংল্যান্ডের রয়্যাল টেমস ইয়ট ক্লাবের এক নামকরা সদস্য। তাঁর সহধর্মিণীও লেডি হেলেনা সঙ্গে রয়েছেন। আর রয়েছেন তাঁর খালাতো ভাই ম্যাকনবস।

জাহাজ উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের বুক চিরে উল্কার বেগে ধেয়ে চলেছে। হঠাৎ দূরে, অনেক দূরে একটা বিশালায়তন মাছ দেখা গেল।

জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করে লর্ড গ্লেনারভান জানতে পারলেন, সেটা একটা হাঙর। এরা স্থানীয় মানুষদের কাছে 'ব্যালেন্স ফিস' নামে পরিচিত। দুর্দান্ত প্রকৃতির। লর্ড গ্লেনারভান ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দিলেন হাঙরটাকে মারার জন্য।

ব্যাপারটা লেডি হেলেনাকে দেখানোর জন্য তাঁকে ডেকে আনানো হল।

নাবিকরা মোটা দড়ির মাথায় শক্ত বঁড়শি বেঁধে তার সঙ্গে মাংসের টুকরো গেঁথে দিল। এবার সেটাকে ফেলে দেয়া হল সমুদ্রের পানিতে। মাংসের গন্ধে হাঙরটা দ্রুত বেগে ধেয়ে এল। তার কালো আর ছাই রঙের ডানাটা কেবল জলের ওপর ভেসে রইল। থেকে থেকে তার মাথাটা ভুস করে জলের ওপর ভেসে উঠতে লাগল। হাঁ করামাত্র ঝকঝকে চকচকে দাঁতের পাটি সূর্যের কিরণে স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। ক্যাপ্টেন ঠিকই বলেছেন, এরা মৎস্যপরিবারের জঘন্যতম প্রাণী।

www.pathagar.com

ছুটতে ছুটতে এসে হাঙরটা টপ করে বঁড়শিসহ মাংসের টুকরোটা গিলে ফেলল। ব্যাস, দড়ি ধরে টানতে শুরু করল। তাকে কাবু করার জন্য এবার তারা ল্যাজে দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে সবাই মিলে ডেকের ওপর তুলে নিল। একজন নাবিক মসৃণ কুড় লের এক কোপে তার ল্যাজটাকে কেটে ফেলল।

নাবিকরা এবার তার পেট চিড়ে সোনা দানা কিছু আছে কি না দেখতে লাগল।

লেডি হেলেনা সে বীভৎস দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে না পেরে দ্রুত নিজের কেবিনে চলে গেলেন। হাঙরটার ওজন প্রায় দুশো পাউন্ড। আর দৈর্ঘ্য দশফুট তো হবেই। সেটাকে টুকরো টুকরো করে নাবিকরা জলে ফেলে দেয়ার জন্য তৈরি হতে লাগল। ঠিক তখনই দেখা গেল তার পাকস্থলিতে পাথরের টুকরোর মতো কী যেন ঝুলছে। ঘাঁটাঘাটি করে তারা একটা বোতল বের করল। ক্ষিদের জ্বালায় কবে এটাকে গিলে ফেলেছিল কে জানে। বোতলের কথা শুনে কেবিন থেকে লেডি হেলেনা ছুটে এলেন। বোতলের ছিপিটা খোলা হল। তার ভেতর থেকে বের করা হল কয়েকটা কাগজের টুকরো। খুবই জীর্ণদশা। কী সব লেখা সেগুলোর গায়ে। প্রায় মুছে গেছে। তিনটে কাগজেরই একই হাল হয়ে গেছে। লর্ড গ্লেনারভান কাগজ তিনটেকে আলোর সামনে নিয়ে বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। তিনটে দলিল। ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান তিন ভাষায় তর্জমা করা। যেটুকু ইংরেজিতে লেখা তা হল—'Sink, a land, this, and, los, শব্দগুলো সম্পূর্ণ। আর 'Skipp' এক জায়গায় লেখা, শেষেরটুকু মুছে গেছে। লর্ড গ্লেনারভান বললেন, 'Skipp' বলতে 'Skipper' বুঝানো হচ্ছে। আর একজায়গায় লেখা রয়েছে 'gr'। লর্ড গ্লেনারভান বললেন, 'মনে হচ্ছে 'gr' জাহাজটার নামের অংশবিশেষ। অর্থাৎ যে জাহাজটা সমুদ্রে তলিয়ে গেছে তার কথা বলতে চাইছি।'

ক্যাপ্টেন কাগজটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলতে লাগলেন, 'docum এবং assistance শব্দাংশ দুটোর বক্তব্য অবশ্য পরিষ্কার। নিশ্চয়ই এদের একটার দ্বারা document এবং Assistance অন্যটার দ্বারা বুঝে নিতে হবে।'

'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু অনেকগুলো ছত্র যে মুছে গেছে। জাহাজের নাম, জাহাজডুবির জায়গাটার নাম-ঠিকানা কিছুই তো পাওয়া যাচ্ছে না।' মেজর কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে বললেন।

এবার ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় কাগজটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, 'সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে এটার। এখানে লেখা '7 Juni' মানে ৭ জুন, ইংরেজি কাগজটার সঙ্গে তারিখটা জুড়ে দিলে মানে দাঁড়াচ্ছে, ৭ জুন, আঠারোশো বাষট্টি। জার্মান glas-এর পাশে ইংরেজি 'gow-কে এনে রাখলে মানে দাঁড়াচ্ছে 'Glasgow'। এতে বোঝা যাচ্ছে, জাহাজটা গ্লাসগো বন্দরের। কিন্তু দ্বিতীয় ছত্রটার অস্তিত্বই নেই। সম্পূর্ণ মুছে গেছে। তবে তৃতীয় ছত্রে দুটো খুবই দরকারি দুটো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। জার্মান ভাষায় 'Zwei' মানে দুই। আর 'atresen' বা 'matrosen' উভয়ের অর্থই নাবিক। চতুর্থ ছত্রে দেখা যাচ্ছে 'graus' শব্দটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছি নে। তৃতীয় কাগজটা থেকে যদি এর অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। আর বাকি শব্দ দুটো—'bring ihem' আর 'bring ihhen'-কে ইংরেজি 'assistance' অথবা 'assistance'-এর পাশে রাখলে হবে 'bring them assistance'—এতে বুঝাচ্ছে সাহায্য পাঠাও।

লর্ড গ্লেনারভার বললেন, 'সাহায্য পাঠাতে বলছে। কিন্তু কীরকম সাহায্যের কথা বলতে চাইছে তার পরের কাগজটা থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।' তৃতীয় কাগজটা হাতে

www.pathagar.com

তুলে নিয়ে তিনি এবার বললেন, 'এটা ফরাসি ভাষায় লেখা। আমাদের কারোরই পড়তে অসুবিধা হবে না। এই যে, এখানে লেখা 'trois' এবং 'ats'—বলতে চাইছে, 'trois mats' অর্থাৎ তিনটে মাস্তুল বিশিষ্ট জাহাজ! ফরাসি আর ইংরেজি কাগজ দুটোর বক্তব্য জুড়ে জাহাজটার নাম পাওয়া যাচ্ছে 'Britania' এবং 'Austral'-এর ফরাসি ও ইংরেজিতে একই অর্থ—দক্ষিণ দিক।'

ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'তবে বুঝা যাচ্ছে, ভূগোলকের দক্ষিণার্ধে জাহাজডুবিটা হয়েছে, তাই না?' লর্ড গ্লেনারভান বললেন, হ্যাঁ। তারপর দেখুন, Èabor' হচ্ছে 'aborder'-এর প্রথম অংশ। এতে বুঝাচ্ছে জমিতে নামার কথা বলতে চাইছে। অর্থাৎ নাবিকরা জমিতে নেমেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোথাকার জমিতে? এবার দেখা যাচ্ছে 'contin' বলতে অবশ্যই 'continent' অর্থাৎ মহাদেশ বুঝানো হচ্ছে।'

ক্যাপ্তেন বললেন, 'cruel' বলতে জার্মান শব্দ 'grus' বলতে বুঝানো হচ্ছে grausam—নিষ্ঠুর।'

এ পর্যন্ত পড়ার পর ব্যাপারটা সম্বন্ধে লর্ড গ্লেনারভানের আগ্রহ তুঙ্গে উঠে গেল। তিনি এবার পড়তে লাগলেন, 'এখানে 'Indi' লেখা রয়েছে। এতে 'India' বুঝানো হয়েছে। এবার 'ongit'-এর অর্থ কী? বুঝেছি, বলতে চাচ্ছে 'Longitude' মানে দ্রাঘিমা। আর 'Latitude' অর্থ তো অক্ষাংশ। তবে বলতে চাচ্ছে অক্ষাংশ—সাঁইত্রিশ ডিগ্রি এগারো মিনিট। যাক তবে কোনোরকমে ঠিকানাটা উদ্ধার করা গেল।'

ম্যাকনবস বলল, 'সবই তো হল, কিন্তু দ্রাঘিমা কত তা তো পাওয়া গেল না।

লর্ড গ্লেনারভন এবার তিনটে কাগজের বক্তব্য একত্রে ইংরেজিতে লিখেত বসলেন। ডামবার্টন নামে একজন নাবিক এসে জাহাজের গতি কোনদিকে হবে জানতে চাইলে লর্ড গ্লেনারভান তাকে বললেন, 'শুনুন, লেডি হেলেনা ম্যালকম দুর্গে যাবেন। আমি লন্ডনের নৌ-বিভাগের অফিসে যাব। এ কাগজ তিনটে তাঁদের দেখাব ভাবছি।'

নাবিককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে এবার উপস্থিত সবাইকে লক্ষ করে লর্ড গ্লেনারভান বললেন, 'শুনুন আপনারা, কাগজ তিনটের বক্তব্য মোটামুটি এরকম—১৮৬২ সালের ৭ জুন তিনটে মাস্তুল বিশিষ্ট কামানসহ ব্রিটানিয়া নামক একটা যুদ্ধজাহাজ গ্লাসগো থেকে যাত্রা করে সমুদ্রে ডুবে গেছে। জাহাজটার ক্যাপ্টেন ও দুজন নাবিক সাঁইত্রিশ ডিগ্রি এগারো মিনিট অক্ষাংশে এ কাগজ তিনটে বোতলে পুরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে সাহায্য প্রত্যাশ করেছে। আর বুঝা যাচ্ছে ভূগোলার্ধের দক্ষিণাংশের সমুদ্রে সেটা ডুবেছে। তবে সমস্যা হচ্ছে 'gonie' শব্দটার সাহায্যে কী বুঝাতে চাইছে? এটা কি 'country' শব্দের অংশ?'

লেডি হেলেনা কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে বললে, 'Patagonie ফরাসি শব্দ। এর ইংরেজি সমার্থক শব্দ হচ্ছে Patagonia।' মেজর চট করে বলে উঠলেন—ঠিকই তো Patagonia সাঁইত্রিশ ডিগ্রি অক্ষাংশের অন্তর্ভুক্ত। এবার ব্যাপারটা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করে নেয়া যেতে পারে, তারা একটা মহাদেশের মাটিতে পদার্পণ করেছিল। এবার 'pr' বর্ণ দুটোর কথা ভাবা যাক। এর সাহায্যে 'Prisoner' বুঝানো হয়েছে। তারপর 'cruel indi' এতে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে, 'cruel indi'—অর্থাৎ তারা নির্মম নিষ্ঠুর ইন্ডিয়ানদের হাতে কয়েদ হয়েছিল—এরকম হতে পারে কি না, বলুন?'

www.pathagar.com

লর্ড এবার বললেন, 'আমাদের কাজ হচ্ছে, গ্লাসগো গিয়ে খোঁজ নেয়া ব্রিটানিয়া জাহাজটা কোনদিকে পাড়ি জমাচ্ছিল?'

ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে জাহাজি গেজেট বের করে পাতা উল্টে এক জায়গায় অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'আঠারোশো বাষট্টির ত্রিশে মে ক্যাপ্টেন গ্রান্ট ব্রিটানিয়া জাহাজে ক্যালাও থেকে গ্লাসগো যাত্রা করেছিলেন।'

লর্ড গ্লেনারভন আঁতকে উঠে বললেন, 'গ্রান্ট! ক্যাপ্টেন গ্রান্ট তো প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নতুন স্কটল্যান্ড গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন।'

'ঠিকই বটে। তিনি আঠারোশো বাষট্টিতে গ্লাসগোতে হাজির হয়ে ব্রিটানিয়া জাহাজটা নিয়ে যাত্রা করে বেপাত্তা হয়ে যায়। ব্যস, তার আর হদিস পাওয়া গেল না।'

'তবে আমাদের ধারণাকে আরো অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। ত্রিশে মে ক্যালাও থেকে যাত্রা করে—৭ জুন—অর্থাৎ ঠিক সাতদিন বাদে প্যাটাগোনিয়া উপকূলে জাহাজটা তলিয়ে যায়। এখন দরকার দ্রাঘিমা নির্ণয় করা।'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'দ্রাঘিমা না হলেও চলবে, জায়গাটা আমার পরিচিত। জায়গামতো ঠিক হাজির হয়ে যাওয়া যাবে।'

লর্ড গ্লেনারভন বললেন, 'চমৎকার! তবে বক্তব্যটা দাঁড় করিয়ে ফেলি, "আঠারোশো বাষট্টির ৭ জুন গ্লাসগোর তিনটে মাস্তুলবিশিষ্ট যুদ্ধজাহাজ ব্রিটানিয়া দক্ষিণ গোলার্ধে প্যাটাগোনিয়ার সমুদ্রে তলিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন গ্রান্ট দুজন নাবিকসহ মহাদেশের ভূখণ্ডে নামার চেষ্টা করবেন—মাটিতে পদার্পণ করামাত্রই নির্মম নিষ্ঠুর ইন্ডিয়ানদের হাতে কয়েদ হবে। কাগজ তিনটে বোতলে পুরে তাঁরা সাঁইত্রিশ ডিগ্রি এগারো মিনিট অক্ষাংশে সমুদ্রের বুকে ফেলে দেন। যেখানে জাহাজটা সমুদ্রে তলিয়ে গেছে সেখানে সাহায্য পাঠান।"

লর্ড গ্লেনারভান কাগজ থেকে কলমটা তুলে এবার বললেন, 'এ বক্তব্য পড়ে সরকার অবশ্যই সাহায্য পাঠাবেন, আর ক্যাপ্টেন গ্রান্টের স্ত্রী পুত্র-কন্যার খরচ আমিই বহন করব।'

জাহাজ বন্দরে ভিড়ল। লেডি হেলেনা গাড়ি নিয়ে ম্যালকম দুর্গপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

লন্ডনগামী ট্রেনে ওঠার আগে লর্ড গ্লেনারভান মর্নিং ক্রনিকল আর টাইমস পত্রিকায় টেলিগ্রাম করলেন, 'তিনটা মাস্তুলবিশিষ্ট যুদ্ধজাহাজ ব্রিটানিয়ার খবর কেউ জানতে আগ্রহী হলে লর্ড গ্লেনারভানের সঙ্গে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। ম্যালকম দুর্গপ্রাসাদ, লাস্ ডামবারটন, স্কটল্যান্ড।'

* * *

ম্যালকম দুর্গপ্রাসাদ। লাসের অদূরবর্তী হাইল্যান্ডে এর অবস্থান। লর্ড গ্লেনারভান-এর স্বত্বাধিকারী। স্কটল্যান্ডের সামাজিক বিপ্লবে অনেকের মৃত্যু ঘটেছে, দেশ ছেড়ে পালিয়েছেও অনেকেই। কিন্তু গ্লেনারভান পরিবার এখানেই রয়ে গেছেন। প্রজাদেরও আশা ভরসা দিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। তাদের কেউ কেউ প্রাসাদের নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করছে। আবার কেউ-বা গ্লেনারভারের ডানকান জাহাজে কাজ করছে।

লর্ড গ্লেনারভান অগাধ অর্থের মালিক।

দেশবাসীর স্বার্থরক্ষা করতে তাঁর কোনোরকম কার্পণ্য লক্ষিত হয় না। এককথায় তিনি একজন উদারহৃদয় ব্যক্তি। তাঁর বয়স বত্রিশ বছর। অসীম সাহসী। পরোপকারব্রতী। মাত্র তিন বছর আগে লেডি হেলেনাকে বিয়ে করে তিনি ঘর বাঁধেন।

www.pathagar.com

লেডি হেলেনা স্কটল্যান্ডের মেয়ে। তাঁর বাবা বিখ্যাত পরিব্রাজক উইলিয়ম টাফনেল। দরিদ্র। লর্ড গ্লেনারভান বিয়ের পর ডানকান জাহাজটা তৈরি করালেন সস্ত্রীক সাগরবিহারের উদ্দেশ্যে। জাহাজ থেকে নেমে স্ত্রীকে ম্যালকম প্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়ে লর্ড গ্লেনারভান লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। পরের দিনই লেডি হেলেনা একটা টেলিগ্রাম পেলেন, লর্ড গ্লেনারভার শীঘ্রই ফিরছেন। সে রাত্রেই আর একটা টেলিগ্রাম পেলেন, তার ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে। পরস্পর বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত টেলিগ্রাম দুটো পেয়ে লেডি হেলেনা বড়ই চিন্তিত হলেন।

একটা ছেলে আর একটা মেয়ে বহু দূর থেকে ট্রেনে চেপে লর্ড গ্লেনারভানের সঙ্গে দেখা করতে এল। তাঁর অবর্তমানে লেডি হেলেনা তাদের সঙ্গে কথা বললেন। খুবই গরিব। ছেলেটার বয়স বারো, নাম রবার্ট। আর মেয়েটার ষোল বছর, নাম মেরি—ভাই-বোন। তারা ক্যাপ্তেন গ্রান্টের খবর জানতে এসেছে। তাঁর ছেলে-মেয়ে।

লেডি হেলেনা তাদের কাছে বোতলের ভেতরে পাওয়া কাগজ তিনটে এবং তাতে লেখা বক্তব্যের কথা তাদের কাছে ব্যক্ত করলেন। আর এও বললেন, লর্ড গ্লেনারভান সে কাগজগুলো নিয়ে নৌ-বিভাগের অফিসে গেছেন। আগামীকাল ফিরবেন।

রবার্ট আর মেরি লেডি হেলেনার আতিথ্য গ্রহণ করে ম্যালকম দুর্গপ্রাসাদে রয়ে গেল।

* * *

লেডি হেলেনা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রবার্ট আর মেরির কাছে আসল কথাটা গোপন করলেন। ক্যাপ্টেন হার্ট অসভ্য জঙ্গলিদের হাতে বন্দি হয়েছেন। লর্ড গ্লেনারভান নিজে গিয়েও নৌ-বিভাগের সাহায্য আদায় করতে পারছেন না, এসব কথা তাদের কাছে গোপন রাখলেন।

নৈশ ভোজের পর লেডি হেলেনা রবার্ট আর মেরির মুখ থেকে তাদের দুর্দশার কথা শুনলেন। অসীম সাহসী ক্যাপ্টেন গ্রান্ট স্বাধীন স্কটল্যান্ডের কলোনি গড়ে তোলার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জাহাজ ভাসিয়েছিলেন। এক প্রৌঢ়া আত্মীয়ার তত্ত্বাবধানে ছেলে-মেয়ে দুটোকে রেখে যান। কিছুদিনের মধ্যে আত্মীয়াটি মারা যান। তারা জানতে পেরেছে তাদের বাবাও আজ পৃথিবী ছেড়ে গেছেন।

খবরের কাগজের বিজ্ঞপ্তিটা পড়েই রবার্ট আর মেরি ছুটে এসেছে লর্ড গ্লেনারভানের কাছে। তারা এবার বুঝতে পেরেছে, তাদের বাবা তবে জীবিত।

পরের দিন ভোরে লর্ড গ্লেনারভান ফিরে এলেন। কোনো বিহিত করতে পারলেন না। সরকার হাজারো অজুহাত তুলেছেন। দু-বছর আগে সাগরের বুকে তলিয়ে যাওয়া জাহাজের খোঁজে যাওয়ার অর্থ সময় ও টাকার অপব্যয়মাত্র। আর দলিলের বক্তব্যও পরিষ্কার নয়, নিতান্ত ঝাপসা। তার ওপর মাত্র তিনজন স্কটল্যান্ডবাসীর জন্য পুরো একটা জাহাজ কী করে পাঠানো যায়।

লর্ড গ্লেনারভানের মুখে সবকিছু শুনে রর্বাট ও মেরি হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিলে লেডি হেলেনা বাধা দিলেন। রানীর সঙ্গে কথা বলে কিছু করা যায় কি না দেখতে চাচ্ছেন। লর্ড গ্লেনারভান বললেন, 'কোনোই উপায় হবে না।'

লেডি হেলেনা এবার লর্ড গ্লেনারভানকে অনুরোধ করলেন, 'শোনো, তোমার নিজেরই তো ডানকান জাহাজ রয়েছে। সেটা নিয়ে এদের বাবার খোঁজ করলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব।'

www.pathagar.com

লর্ড গ্লেনারভান স্ত্রীর পরামর্শও এ-ব্যাপারে তার অত্যুগ্র আগ্রহ দেখে যারপরনাই খুশি হলেন।

* * *

ডানকান খুবই ছোট্ট একটা জাহাজ। মাত্র দুশো দশ টনের জাহাজ। তবে এটুকু ভরসা, কলম্বাস আর ম্যাগেলান তো এর চেয়েও ছোট জাহাজ নিয়ে উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছে যেতে পেরেছিলেন।

পালে হাওয়া না পেলে ডানকান একশো ষাট অশ্বশক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিনের বলে চলে। এটা ঘন্টায় সতের মাইল গতিবেগে ছুটতে পারে। এটা নিয়ে অনায়াসে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসা যায়। তবে সে সঙ্গে নতুনতর কিছু ব্যবস্থা করে নেয়া হল।

লর্ড গ্লেনারভান ছোট্ট একটা কামান কিনে জাহাজের সামনে বসিয়ে দিলেন। আর কাপ্তেনের সাহস, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা ও উপস্থিত বুদ্ধি অতুলনীয়। সে সঙ্গে অভিজ্ঞ নাবিক ফার্স্টমেন্ট টম আস্টিন। ক্যাপ্টেন আর মেটসহ মোট পাঁচিশজন কর্মী সফরের জন্য নিযুক্ত করা হল। আর সঙ্গে গেলেন লর্ড গ্লেনারভান, লেডি হেলেনা ও তাঁদের ছেলে-মেয়ে। আর রবার্ট আর মেরি তো আছেই। শেষপর্যন্ত মেজর ম্যাকনবসও এসে হাজির হলেন। ম্যালকম দুর্গপ্রাসাদেই থাকেন, স্কটল্যান্ডের অধিবাসী।

২৫ আগস্ট রাত ঠিক বারোটায় ডানকান জাহাজ বন্দর ছেড়ে যাত্রা করল। ডামবারটনের পাহাড় যখন পেরিয়ে গেল তখনও ভোর হয় নি। তিনটে বাজে।

ডানকান যখন গিয়ে সমুদ্রে পড়ল তখন সকাল ছয়টা। জাহাজ তখন ঘন্টায় সতের মাইল বেগে ছুটে চলেছে। পাঁচ ছয় সপ্তাহের মধ্যেই কেপহর্নে পৌঁছে যেতে পারবে কাপ্তেনের বিশ্বাস।

এদিকে বালক রবার্ট খুশিতে ডগমগ হয়ে জাহাজের সর্বত্র দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। তা দেখে লর্ড গ্লেনারভান হাসতে হাসতে মেরিকে বললেন, 'একদিন তোমার ভাইকে আমি একজন জবরদস্ত নাবিক বানিয়ে দেব।'

মেজর রোগা ও লম্বাটে চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ-মুখ। হাসিখুশি স্বভাব। তবে খুবই অন্যমনস্ক।

জাহাজে অপরিচিত এক ভদ্রলোকের উপস্থিতি মেজরকে অবাক করল। চল্লিশের কাছাকাছি তার বয়স। খুবই আনমনা। সর্বদা একটা টেলিস্কোপ কাঁধে ঝুলিয়ে রাখেন। খুবই চঞ্চল স্বভাব। এক সময় কাঁধ থেকে টেলিস্কোপটা নামিয়ে টেনে লম্বা করলেন। সেটা প্রায় চারফুট লম্বা। দিগন্ত পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত হলেন। তিনি ছয় নম্বর কেবিনের প্যাসেঞ্জার। ভদ্রলোকটি প্যারিস জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি। বার্লিন-বোম্বে-আর্মস্টাড-লিপসিক-লন্ডন-পিটার্সবার্গ-ভিয়েনা-নিউইয়র্ক সোসাইটির মেম্বার। আর রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল অ্যান্ড এথনগ্রাফিক্যাল ইস্ট ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউটেরও মেম্বার তিনি। দীর্ঘ বিশ বছর ঘরে বসে ভূগোল নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। এবার ইন্ডিয়ায় চলেছেন, সেখানে পায়ে হাঁটাহাঁটি করে বিজ্ঞানচর্চায় নিজেকে লিপ্ত করতে। লর্ড গ্লেনারভান তাঁর পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন। আগন্তুক ভদ্রলোকের নাম জ্যাকুইস পাজালেন। লর্ড গ্লেনারভান সোসাইটির বুলেটিনে পাজালেনের বহু আবিষ্কারের কথা পড়েছেন। বলা যায় বিজ্ঞান আর ভূগোল বিষয়ে তিনি বিশ্ববিখ্যাত। তিনি আগন্তুক জ্যাকুইস পাজালেনের সঙ্গে করমর্দন সারতে সারতে জানতে পারলেন, গতপরশু রাত আটটায় তিনি জাহাজের

www.pathagar.com

ছয় নম্বর কেবিনে উঠেছেন। খুবই ক্লান্ত ছিলেন বলে টানা ছত্রিশ ঘণ্টা ঘুমিয়ে ক্লান্তি অপনোদন করে নেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করবেন। জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কাজ বলে বড়লাটের কাছে সেরকমই সুপারিশসহ আবেদন গেছে।

জ্যাকুইস পাজালেনের এবারের পরিকল্পনা তিব্বতের ইয়ারো-জাংবো চৌ নদীটা হিমালয়ের দক্ষিণদিক থেকে এগিয়ে আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীতে পতিত হয়েছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন। ক্রিক আঠারো শো ছেচল্লিশে এ কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু বিফল মনোরথ হয়েছিলেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে জ্যাকুইস পাজালেন যখন শুনলেন এটা স্কোটিয়া জাহাজ নয়, ডানকানের নাম তখন একদম মুষড়ে পড়লেন। কথাটা কানে যেতেই তিনি হতাশায় ভেঙে পড়ে আর্তনাদ করতে করতে ছয় নম্বর কেবিনে চলে গেলেন। তাঁর অন্যমনস্কতার জন্যই ভুল করে অন্য জাহাজে উঠে পড়ে বিপদে পড়েছেন।

লর্ড ভাবলেন তাঁর জাহাজ প্রথমে চিলি বন্দরে নোঙর করবে, ভদ্রলোককে সেখানেই নামিয়ে দেবেন। সেখান থেকে অন্য জাহাজ ধরে তিনি গন্তব্যস্থলে চলে যেতে পারবেন।

একটু বাদেই আগন্তুক জ্যাকুইস পাজালেন আবার লর্ডের কাছে ফিরে এলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলেন ডানকান চিলি-দক্ষিণ আমেরিকায় যাবে। কপালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন তিনি। এ যে কেলেঙ্কারী ব্যাপার। সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলেছেন।

লর্ড বললেন, 'ইচ্ছা করলে আপনিও আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন। তা নইলে আপনাকে মাদিরা বন্দরেই নামিয়ে দিতে পারি। সেখান থেকে জাহাজে ইউরোপে চলে যেতে পারবেন।'

'উপায় থাকলে অবশ্যই আপনাদের সঙ্গী হতাম। কিন্তু একটা জরুরি সভায় আমাকে যোগদান করতেই হবে। ভালো কথা, দেখে তো মনে হচ্ছে আপনারা দেশ পর্যটনে বেরিয়েছেন। দক্ষিণ আমেরিকার দিকে না গিয়ে তার চেয়ে বরং ভারতবর্ষ, মানে কলকাতায়ই চলুন না কেন।'

'কিন্তু আমাকে জরুরি একটা কাজের তাগিদে প্যাটাগোনিয়ায় যেতে হচ্ছে, লর্ড গ্লেনারভান বললেন।'

পাজালেন লর্ড গ্লেনারভানের সঙ্গে প্যাটাগোনিয়ায় যেতে কিছুতেই সম্মত হলেন না। কথাপ্রসঙ্গে পাজালেন জানতে পারলেন লেডি হেলেনা বিখ্যাত ব্যক্তি উইলিয়ম টাফনেলের মেয়ে। টাফনেল তাঁর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ছিলেন। বন্ধু-তনয়ার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় এবং একই জাহাজে যাত্রা করার জন্য তিনি বহুভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন।

* * *

ডানকান জাহাজ ৩০ আগস্ট মাদিরা বন্দরে নোঙর করল। পাজালেন এখানে নামতে রাজি হলেন না। এখানে নাকি দর্শনীয় কিছুই নেই। জাহাজ এরপর ক্যানারিতে নোঙর করলে নেমে যাবেন, লর্ড গ্লেনারভানকে জানালেন। লর্ড গ্লেনারভান তাঁর ইচ্ছার কথা শুনে নীরবে ঠোঁট টিপে হাসলেন।

ডানকান আবার বন্দর ছেড়ে এগিয়ে চলল। প্রায় আড়াইশো মাইল দূরবর্তী ক্যানারি বন্দরে পৌঁছতে পরের দিন দুপুর গড়িয়ে গেল। পাজালেন এখানে পৌঁছে আবার বাহানা জুড়ে দিলেন। লর্ডকে মুখ ব্যাজার করে বললেন, 'ভেবেছিলাম বটে ক্যানারিতে নামব।

www.pathagar.com

কিন্তু এখানে হামবোল্ডট পাহাড়ের যে পাঁচটা অংশ আছে তা অনেক আগেই আমি দেখে নিয়েছি। এমন কি আগ্নেয় পর্বতের ভেতর পর্যন্ত নেমে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছি। দেখার মত আর কিছুই এখানে নেই। আপনারা তো এরপর কেপ ভাদিতে জাহাজ নোঙর করছেন। আমি বরং সেখানেই নেমে যাব। যদিও সেখানেও দর্শনীয় কিছুই নেই। তবে একটা কথা কী জানেন, দেখার মতো চোখ মন থাকলে সবকিছু বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে। আর পর্যবেক্ষণের অন্য নমাই তো বিজ্ঞান।'

৩ সেপ্টেম্বর ডানকান কেপ ভাদিতে নোঙর করল। কর্কটক্রান্তি অতিক্রম করার সময়ই আকাশ মেঘে ছেয়ে রেখেছিল। এবার মূষলধারে বৃষ্টি নামল। পাজালেন এখানে এসেও বাহানা শুরু করে দিলেন। কিছুতেই জাহাজ থেকে নামতে রাজি হলেন না। অজুহাত দেখালেন, দেড় দুই মাসের আগে এখান থেকে ফেরার জাহাজ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর যা বৃষ্টি, মূল্যবান সব যন্ত্রপাতি ভিজে বরবাদ হয়ে যাবে। আর দেখার মতো তেমন কিছু নেই, যাতে এতগুলো দিন কাটাতে পারবেন।

লর্ড গ্লেনারভান মুচকি হেসে বললেন, 'এবার কিন্তু একেবারে চিলি বন্দরে গিয়ে জাহাজ ভিড়বে। যদি চান তো আমাদের সঙ্গেই চলুন, প্যাটাগোনিয়ার ইন্ডিয়ানদের দেখে ও আলাপ-পরিচয় করে আনন্দ পাবেন। তারা অবিকল পাঞ্জাবের ভারতীয়দের মতো। তিব্বতের 'ইয়ারো-জাবো-চৌ দেখতে না পেলেও রিও কলোরাডো দেখেও চোখ ও মন কম তৃপ্ত হবে না।'

লেডি হেলেনাও তাঁকে তাঁদের সঙ্গী হতে অনুরোধ করলেন।

শেষপর্যন্ত আমতা আমতা করে হলেও ডানকান জাহাজেই থাকবেন, প্যাটাগানিয়াতেই যাবেন।

* * *

আগন্তুক পাজালেন বারক রবার্টের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বাছা, তোমাকে আমি একজন নামজাদা ভৌগোলিক তৈরি করে ছাড়ব।'

বালক রাবার্টকে নিয়ে কতজন কতরকম চিন্তাই না করেছেন। ইতিপূর্বে ক্যাপ্টেন তো বলেই রেখেছেন, তাকে পাক্কা নাবিক তৈরি করবেন, লর্ড গ্লেনারভানেরও একই ইচ্ছা। তবে তিনি তাকে একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক তৈরি করবেন। মেজর মত প্রকাশ করেছেন, তাকে রীতিমতো দুরন্ত ও অসম সাহসী করে তুলবেন। আর লেডি হেলেনা চান সে ভবিষ্যতে একজন সহৃদয় দয়ার অবতার হয়ে উঠুক।

পেজালেন জাহাজের ডেকের এক কোণে একগাদা বই পেলেন। সেগুলো সবই স্পেনীয় ভাষায় লেখা। বইগুলো পাঠোদ্ধার করতে হলে সবার আগে স্পেনীয় ভাষাটা রপ্ত করতেই হয়। অত্যুগ্র আগ্রহ ও অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি মাত্র কদিনের মধ্যেই ভাষাটা রপ্ত করে ফেললেন।

পেজালেন একদিন ডেকের ওপরে রবার্টকে নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাকে আমেরিকার ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানদান করছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন, 'পরিতাপের বিষয় কী জানো রবার্ট? অদৃষ্ট বিড়ম্বিত কলম্বাস কিন্তু জানতে পারেন নি, তিনি একটা মহাদেশের আবিষ্কারক। তাঁর অনন্য কীর্তির কথা জানার আগেই তাঁকে পরপারে পাড়ি জমাতে হয়েছে। তিনি দেশ থেকে যাত্রা করেছিলেন এশিয়ায় পাড়ি জমানোর সোজা পথ আবিষ্কারের আশা নিয়ে। কিন্তু তিনি মধ্য আমেরিকায় পৌঁছে ধরেই নিলেন, জাপান বা চীনের ভূখণ্ডে পৌঁছে গেছেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি, নতুন এক মহাদেশের

www.pathagar.com

মাটিতে অবস্থান করছেন। সেজন্যই তো তাঁর নামে কোনোকিছুই নামকরণ হল না। আমেরিকা নামকরণ হয়েছে আমেরিগো ভেসপুসির নামানুসারে। আর ম্যাগেলান অন্তরীপের নাম দেয়া হয়েছে নাবিক ম্যাগেলানের নামানুসারে।

ম্যাগেলান অন্তরীপে জাহাজ হাজির হল। এখানকার মানুষগুলো অদ্ভুত আকৃতি ও দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। এদের দেহকাণ্ডের তুলনায় পা দুটো খুবই ছোট। বসে থাকলে একরকম উচ্চতা মনে হয়। আবার যখন সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন অন্যরকম দেখা যায়। অবাক হবার মতো ব্যাপারই বটে।

* * *

ডানকান জাহাজ ক্লাইভ বন্দর ছাড়ার বিয়াল্লিশ দিন পর তালকাহুয়ানো উপসাগরে পৌঁছল।

জাহাজ নোঙর করামাত্র লর্ড গ্লেনারভান পাজালেনকে নিয়ে তীরে নামলেন। তাঁরা সোজা কাস্টমস হাউসে গিয়ে ঢুকলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলেন প্রায় একঘন্টা গেলে ইংরাজ কনসালের দেখা পাওয়া যাবে। জরাগাটার নাম কনসিপসিয়ন। দুটো ঘোড়া ভাড়া করে উভয়ে কনসাল ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করলেন।

ইংরাজ কনসাল লর্ড গ্লেনারভানের মুখে তাঁদের আগমনের কারণ শুনে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, ক্যাপ্টেন গ্রান্টের জাহাজডুবির কথা তিনি কারো মুখে শোনেন নি।

উপায়ান্তর না দেখে তাঁরা হতাশ হয়ে ফের বন্দরে ফিরে এলেন। ছয় জন লোক নিযুক্ত করা হল, উপকূল ধরে এগিয়ে গিয়ে স্থানীয় লোকজনের মুখ থেকে জাহাজ ডুবির কোনো খবর সংগ্রহ করতে পারেন কি না। বৃথা চেষ্টা। তারাও বিষণ্নমুখে ফিরে এল।

এবার বোতল থেকে পাওয়া কাগজ তিনটের বক্তব্য ভালো করে পাঠ করে পাজালেন বললেন, 'লর্ড, দেখা যাচ্ছে কয়েকটা শব্দের ভুল অর্থ করা হয়েছে বলেই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। কই ক্যাপ্টেন গ্রান্ট তো 'বন্দি হব' এমন কোনো কথা লেখেন নি। হয়ত তিনি বলতে চেয়েছেন 'বন্দি হয়ে গেছি'। ইন্ডিয়ানদের হাতে বন্দি হওয়ার পর তিনি এ কাগজ তিনটের বক্তব্য লিখেছিলেন। আর কাগজ তিনটে সহ বোতলটা ভাসতে ভাসতে সমুদ্রে হাজির হয়েছে। এখন আমাদের কর্তব্য একটাই—সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখা আমেরিকার উপকূলকে যেখানে স্পর্শ করেছে সে রেখা বরাবর জাহাজ নিয়ে আটলান্টিকে হাজির হওয়া। আশা করা যাচ্ছে, জাহাজডুবির লোকজনদের কারোর না কারো দেখা মিলবেই। আর এটাই কিন্তু একমাত্র সম্ভাবনাময় লর্ড।'

'কিন্তু আমরা কি—' লর্ডকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই পাজালেন আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রিও নিগ্রো বা রিও কিলোরাডো নদী কোনো না কোনো শাখানদীর নিকটবর্তী কোনো রেড ইন্ডিয়ানদের হাতে ক্যাপ্টেন গ্রান্ট কয়েদ হয়েছেন। আমরাই তাঁকে উদ্ধার করব। আর যদি প্রয়োজন হয় তবে মেজর ম্যাকনাবসের সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিতে পারব।'

১৪ অক্টোবর সেন্ট অ্যাটোনিও এবং কেপ করিয়েনতিসের মধ্যবর্তী স্থানে ডানকানকে দাঁড় করিয়ে লর্ড, পাজালেন, মেজর এবং রবার্ট জাহাজ থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন। আর জাহাজে রইলেন, রইলেন লেডি হেলেনা আর মেরি। লর্ডের সঙ্গে তিনজন নাবিকও গেল।

কূলে নেমে লর্ড এক ছোকরা ও তিনজন স্থানীয় লোককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সঙ্গে নিয়ে নিলেন। একজন ইংরেজ তাদের দলপতি। তার নাম কাটাপেজ। তার

www.pathagar.com

পেশা জাহাজের যাত্রীদের পথ দেখিয়ে কর্ডিলেরার গিরিসংকট অতিক্রম করে আর্জেন্টিনার পথ প্রদর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ঘোড়ায় চেপে তাঁরা যাত্রা করলেন।

১৭ অক্টোবর দূরবর্তী একটা পর্বত তাদের নজরে পড়ল। পথে যেতে যেতে যে-সব নদী পড়ছে তাদের মধ্যে যাদের নাম মানচিত্রে স্থান পায়নি পেজ্যালেন তাদের নাম বিবরণাদি দিনলিপির পাতায় টুকে নিতে লাগলেন।

এবারই অভিযাত্রীরা পথ চলার কষ্ট কাকে বলে হাড়ে হাড়ে টের পেলেন। পাহাড়, পার্বত্যপথ, ঘন ঘন চড়াই উৎরাই। আন্দিজ পর্বত ডিঙোনোর জন্য আনটুকো গিরিসঙ্কটের পথ ধরতে হল। বড়ই দুর্গম এ-পথ। খচ্চর পর্যন্ত পথ পাড়ি দিতে নাজেহাল হয়ে যায়। কাটাপেজ এপথে যেতে রাজি হল না। খচ্চর আর তার দলবল নিয়ে সে এখান থেকে কেটে পড়ল। অল্প সময়ে পথ পাড়ি দিতে পারবে বলেই অভিযাত্রীরা একরকম জেদ করেই এ-পথ বেছে নিলেন।

বারো হাজার ফুট ওঠার পরই সবার শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে। ফুসফুস ফেটে যাওয়ার জোগাড় হল। সবাই কাহিল হয়ে পড়ল। শেষপর্যন্ত প্রায় বুকে হেঁটে পথ পাড়ি দিতে লাগল। আর বালক রবার্টকে তো একজন নাবিক কাঁধে করে আবার টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। অভিযাত্রীরা যখন একেবারে সঙ্গীন হয়ে পড়ল তখন অদূরে একটা ঝুপড়িঘর দেখতে পেল।

* * *

ঝুপড়িঘরটার কাছে গিয়ে অভিযাত্রীরা দেখল, সেটা প্রায় বরফচাপা পড়ার জোগাড় হয়েছে। এটা রেড ইন্ডিয়ানদের আস্তানা। বরফ সরিয়ে মেজর সেটাকে কোনোরকমে রাত কাটানোর উপযোগী করে তুললেন।

বিকট একটা শব্দ শুনে অভিযাত্রীরা ঘুম থেকে হুড়মুড় করে উঠে পড়লেন। ভয়ঙ্কর এক সঙ্কটের মুখে পড়েছে তারা। ঝুপড়িঘরটাসহ পাহাড়ের বিশালায়তন একটা অংশ ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে নিচে নেমে যেতে লাগল। যে যেদিকে পারল ছিটকে পড়ল। তুষারের রাজ্য থেকে নিচের বনাঞ্চলে এসে হাজির হল।

মেজর কোনোরকমে পরিস্থিতিটা সামাল দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এক-এক করে সবাইকে খোঁজাখুঁজি করে বের করলেন। কিন্তু দীর্ঘ তল্লাশি চালিয়েও রবার্টকে কোথাও পেলেন না।

ভূমিকম্প! ভূমিকম্পের ফলেই অভিযাত্রীদের এমন অবর্ণনীয় দুর্গতি।

* * *

রবার্ট? কোথায় হারিয়ে গেল সে। তাকে না নিয়ে ক্যাপ্টেন গ্রান্টের সামনে অভিযাত্রীরা দাঁড়াবেন কী করে? সবাই মিলে উন্মাদের মতো তার নাম ধরে ডাকাডাকি করল। না, কেউই সাড়া দিল না।

দুপুর পর্যন্ত হন্যে হয়ে তল্লাশি চালিয়ে সবাই যখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন ঠিক তখনই অতিকায় একটা কনডর পাখিকে দেখা গেল। সবাই একে দক্ষিণ আন্দিজের বাদশা বলে। বিশ হাজার ফুট ওপর থেকেও এরা নিচের শিকার বাদুড়, ছাগল, ভেড়া, খচ্চরের বাচ্চা প্রভৃতি দেখতে পায়। চোখের পলকে ছোঁ মেরে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে চলে যায়।

মুহূর্তে কনডরটা ঠোঁট আর পায়ের নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে একটা দেহকে বয়ে নিয়ে যেতে দেখল অভিযাত্রীরা। মেজর যন্ত্রচালিতের মতো লর্ড গ্লেনারভানের হাত থেকে

www.pathagar.com

রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে চালিয়ে দিলেন কনডরটাকে লক্ষ্য করে। লক্ষভ্রষ্ট হল গুলিটা। পর মুহূর্তেই গোপন অন্তরাল থেকে একটা গুলি ছুটে এসে কনডরটার মাথায় আঘাত করল। শূন্যে কয়েকবার পাক খেয়ে অতিকায় পাখিটা নদী থেকে ফুট দশেক দূরে ধীরে ধীরে পড়ে গেল। সবাই উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করে গিয়ে দেখল আহত কনডরটার ডানার ভেতরে রবার্টের মাথাটা ঢুকে রয়েছে।

লর্ড গ্লেনারভান টানাটানি করে রবার্টের মাথাটা পাখির ডানার ভেতর থেকে বের করে ব্যস্ত হয়ে তার বুকে কান পেতে সোল্লাশে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আছে! প্রাণ আছে! বেঁচে আছে। রবার্ট বেঁচে আছে। নদী থেকে রুমাল ভিজিয়ে এনে তার চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দিতেই সংজ্ঞা ফিরে এল।

সবার মনে একই প্রশ্ন। মেজরের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে থাকলে কার গুলিতে কনডরটা আহত হয়ে মাটিতে পড়ল। কে সে? সে পরোপকারব্রতী ব্যক্তিটা কে? কী-ই বা তার পরিচয়? মুহূর্তকাল পরেই দীর্ঘাকৃতি এক পুরুষমূর্তিকে দেখা গেল একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে। ফিতে দিয়ে মাথার লম্বা চুলগুলো বাঁধা। চোখ-মুখে কালো, সাদা আর লাল রঙের ছোপ। শেয়ালের চামড়ার কোটটা হাঁটুর তলা পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। ষাঁড়ের চামড়ার বুটটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে।

পাজালেন ও লর্ড গ্লেনারভান তার সঙ্গে কথা বলে নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা করলেন। ইচ্ছা থাকলেও কেউ, কাউকে মনের কথা বোঝাতে পারলেন না। তবে লোকটা আকার ইঙ্গিতে যা বলল তাতে কোনোরকমে উদ্ধার করা গেল, অজানা-অচেনা পাহাড়ী হিতাকাঙ্ক্ষীর নাম থালকেভ। এর অর্থ বজ্র। পেশায় পথপ্রদর্শক। থালকেভ দৌড়ে গিয়ে কিছু বুনো পাতা এনে রস করে রবার্টের ক্ষতস্থানে ঘষাঘষি করে তার স্বাভাবিকতা ফিরিলে আনল।

অভিযাত্রীরা থালকেভকে পথপ্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে নিয়ে নিল। সে লর্ড গ্লেনারভানকে সাতটা ঘোড়া কিনিয়ে দিল। পথ যতই বন্ধুর হোক না কেন, পথ পাড়ি দিতে তার পা দুটোই যথেষ্ট।

* * *

২২ অক্টোবর অভিযাত্রীরা থালকেভের পরামর্শে পশ্চিম থেকে আরো পূর্বে অগ্রসর হতে লাগল। সারাদিন পথ চলে তারা আটত্রিশ মাইল অতিক্রম করে একটা নদীর তীরে হাজির হল। পাজালেন যেন একটা জ্যান্ত ভূগোল বই। এক এক করে নদী, পাহাড় প্রভৃতির নাম অভিযাত্রীদের কাছে বলে যেতে লাগলেন। ঝড়ের সম্ভাবনা দেখা দিলে ঝোলা থেকে ব্যারোমিটারটা বের করে তার পারদস্তম্ভের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'পারদস্তম্ভের গতি ঊর্ধ্বমুখী। পারদস্তম্ভ নিম্নমুখী হলে বুঝা যেত ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব ভয়ের কিছু নেই।'

কার্যত হলও তাই। সন্ধ্যার দিকে সামান্য ঝড় উঠলেও রাত একটার মাধ্যে থেমে গেল।

পথপ্রদর্শক থালকভ কথাপ্রসঙ্গে পাজালেনকে বলল, 'হুজুর, আপনারা সোজা পূর্বদিকে চলেছেন যে বড়? সেদিকে আপনাদের কাউকে কয়েদ করে রেখেছে বুঝি? শুনেছি, গত বছর দুই আগে এক শ্বেতাঙ্গকে রেড ইন্ডিয়ানরা কয়েদ করে রেখেছে। ব্যস, এর বেশি কিছু বলতে পারব না।'

www.pathagar.com

পথপ্রদর্শক থালকেভের কথায় অভিযাত্রীদের মধ্যে অবর্ণনীয় আশার সঞ্চার হল। ছাব্বিশে অক্টোবর অভিযাত্রীরা রেড ইন্ডিয়ানদের চামড়ার সেতু ধরে ধরে কোরোরকমে কলোরাডো নদী অতিক্রম করল। এবার তারা বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ তেঁতো জলের হ্রদের ধারে উপস্থিত হল। এবারের পথ আরও বন্ধুর। অভিযাত্রীদের পথ পাড়ি দিতে নাকের জল আর চোখের জল একাকাকার হতে লাগল। তার ওপর ইয়া বড় বড় মশার কামড়ে পাজালেনের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। অভিযাত্রীরা যখন লেক সালিনার তীরে পৌছলেন তখন রাত্রি আটটা বাজে। লেকে এক ফোঁটাও জল নেই। এক সময় সোডিয়াম ক্লোরাইডের জন্য বুইনস আয়ারস নগরে এর জল নিয়ে যাওয়া হত। অভিযাত্রীরা এবার দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখা বরাবর গেলেন লর্ড গ্লেনারভান, রবার্ট, আর পথপ্রদর্শক থালকেভ, আর অন্য দলটা জলের খোঁজে দক্ষিণ দিকে পঁচাত্তর মাইল পথ ঘুরে। শেষমেশ দুই দলের এক জায়গায় মিলিত হওয়ার কথা। লর্ড গ্লেনারভানের দল পরের দিন হাজির হল গুয়ামিনি নদীর পাড়ে। নদীর ঠাণ্ডা পানি খেয়ে ঘোড়া আর মানুষগুলোর প্রাণ বাঁচল।

একটা পরিত্যক্ত খোঁয়াড়ের মধ্যে তারা রাত কাটাতে লাগল। মাঝরাতে থালকেভের ঘুম চটে গেল। ঝিম মেরে পড়ে রইল খড়ের বিছানায়। অকস্মাৎ জমাটবাঁধা অন্ধকারে অনুজ্জ্বল একটা আলো দেখে সে ঝট করে বসে পড়ল। তার মনে হল কারা যেন অন্ধকারে বারবার সরে যাচ্ছে। ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে পড়ছে। হঠাৎ নেকড়ে আর কুকুরের গর্জন শোনা গেল। বিচিত্র কণ্ঠের গোঙানি শুনে থালকেভ যন্ত্রচালিতের মতো রাইফেলটাকে বাগিয়ে ধরল। গুলির শব্দে লর্ড গ্লেনারভান আর রবার্ট হুড়মুড় করে উঠে বসে পড়লেন। উভয়ের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। থালকেভ বলল, 'একটা আগুয়ারাস উৎপাত জুড়ে দিয়েছিল। পমপাসের লাল নেকড়ে। খুবই হিংস্র। এক গুলিতেই খতম করে দিয়েছি।'

ব্যস, আর যাবে কোথায়। প্রায় একশো নেকড়ে একসঙ্গে তর্জন গর্জন জুড়ে দিল। তাদের মাথা শেয়ালের মতো আর ধড়টা দেখতে কুকুরের মতো। রাতের অন্ধকারে যা পায় ছিঁড়ে ফেড়ে খায়। ভোরের আলো ফুটলে তাদের টিকির নাগালও পাওয়া যায় না। থালকেভ আগুন জ্বেলে খোয়াড়ের মুখ বন্ধ করে দিল। এবার শুরু করল বন্দুকের আওয়াজ। নেকড়ে-দল ঝটপট খোয়াড়ের পিছনে চলে গেল। কাঠের খুঁটি উপড়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। থালকেভ এবার একলাফে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। ঘোড়ায় চেপে সে নেকড়েগুলোকে দূরে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। ঘোড়া এতই ক্ষিপ্র গতিতে ছুটতে লাগল যে, নেকড়ের দল শত চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারল না। ভোর হতে আর দেরি নেই। তখন রবার্ট সবার অলক্ষ্যে অন্য একটা ঘোড়ায় চেপে থালকেভকে অনুসরণ করল। পাজালেন হঠাৎ দেখলেন, রার্বাট ঘোড়ায় চেপে ছুটে চলেছে। তিনিও অন্য একটা ঘোড়া নিয়ে তৎক্ষাণাৎ তার পিছন পিছন ছুটলেন।

ভোরের আলো ফুটে উঠলে পাজালেন আর রবার্ট ফিরে এল। গ্লেনারভান বললেন, 'কী ব্যাপার রবার্ট, তুমি এ বিপদের মুখে হঠাৎ ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেলে কেন? যে-কোনো সময় হিংস্র নেকড়ের খপ্পরে পড়ে যেতে যে।' রবার্ট বলল, 'বিবেকের তাড়নায় আমাকে যেতেই হল। আমার বিপদে নিজের প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে সে আমাকে রক্ষা করেছিল। আর আপনি আমার বাবাকে উদ্ধার করতে চলেছেন বলে আমি নেকড়েগুলোকে তাড়িয়ে আপনার প্রাণ রক্ষা করলাম। নইলে নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হত।'

www.pathagar.com

*   *   *

সকালে, একটু বেলা পড়লে অভিযাত্রীরা আবার পথে নামলেন। ৩ নভেম্বর পম্পাসের সীমান্তে পৌঁছল। বাইশ দিনে মোট তারা সাড়ে চার শো মাইল অতিক্রম করেছে। অর্থাৎ আজ পর্যন্ত যাত্রাপথে তিন ভাগের দুভাগ পথ পেরিয়ে এসেছে।

একটা রহস্যের সমাধান করা কিছুতেই সম্ভব হল না থালকেভও কোনো কিনারা করতে পারল না। এ পরিবেশে ইন্ডিয়ানদের ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা ইন্ডিয়ানকেও অভিযাত্রীরা দেখতে পেল না। একদিন অবশ্য অস্ত্রশস্ত্রসহ তিনজন রেডইন্ডিয়ানকে মুহূর্তের জন্য দেখতে পেয়েছিল। অভিযাত্রীদের দেখামাত্র ঝট করে গা-ঢাকা দিয়ে দিয়েছিল। ব্যাপারটা কারোরই মাথায় এল না। এমনকি থালকেভও কোনো সদুত্তর দিতে পারল না। এখন তো উত্তরে বায়ুর দাপট নেই। তাই মেজর পাজালেনকে ব্যাপারটা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

পাজালেন মুখ বিকৃত করে বললেন, 'এরা মোটেই গচোস নয়। ঠিক যেন গুণ্ডাদের মতো দেখতে সবাই।

কথার মোড় ঘুরিয়ে থালকেভ বলল, 'হুজুর, আরো ষাট মাইল গেলে আমরা ইন্ডিপেন্টেন্স ফোর্টে হাজির হব। সেখানে পৌঁছে খোঁজখবর করে দেখা যাবে, ক্যাপ্টেন গ্রান্টকে যারা কয়েদ করে রেখেছে তাদের হদিস যদি মেলে।'

তার কথায় অভিযাত্রীরা আশ্বস্ত হল।

৬ নভেম্বর পথের ধারে কিছুসংখ্যক স্যালডেরোস দেখা গেল। এগুলো মাংসের নুন মাখানোর ঘাটি। কিন্তু কোন মানুষের টিকি দেখা গেল না। লতার দড়ির ফাঁস পরিয়ে ষাঁড়, গরু, বুনো ছাগল আর ভেড়াকে নিয়ে এসে জবাই করা হয়। নাড়িভুঁড়ির লোভে ষাট মাইল দূর থেকে শকুনের পাল উড়ে আসে। ভোঁটকা গন্ধে কাছে যাওয়া তো দূরের ব্যাপার, দুএক মাইলের মধ্যে যায় কার বাপের সাধ্যি।

অভিযাত্রীরা একসময় ইন্ডিপেন্ডেন্স ফোর্টের ভাঙাচোরা প্রাচীরের গায়ে হাজির হল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এক হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত এ স্থানটা সিয়েরা টানডিল নামে পরিচিত।

বাইরে থেকে পোর্টটাকে পরিত্যক্ত বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাঙা প্রাচীর দিয়ে অভিযাত্রীরা ভেতরে ঢুকেই রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেল। দেখল, একদল কুচোকাচা কুচকাওয়াজ করছে। একটা করে প্যান্ট পরনে। বেল্ট বাঁধা। খালি গা। ফরাসি ঢঙে ইয়া লম্বা তরবারি আর বন্দুক নিয়ে কসরৎ করে চলেছে। সবার মুখের আদল দেখে মনে হল সবাই একই পরিবারভুক্ত। তারা সংখ্যায় তেরোজন। এখানকার রীতি এটাই। এক এক পরিবারে নয়টা ছেলে মেয়ে তো আখছারাই দেখা যায়।

পোর্টটার মালিক সার্জেন্ট ম্যানুয়েল। একসময় ফরাসি ছিলেন। স্থানীয় মেয়ে বিয়ে করে ঘর বেঁধেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে ক্যাপ্টেন গ্রান্টের পাত্তা মিলল না। তবে পয়ুচিস সম্প্রদায়ের ইন্ডিয়ানরা কয়েক বছর আগে একজন ফরাসি আর একজন ইতালিয়ানকে বন্দি করে নিয়ে এসেছিল। সুযোগ বুঝে ফরাসি লোকটি চম্পট দেয়। আর বেচারা ইতালিয়ানটাকে কোতল করে। তারা কিন্তু মোটেই ইংরেজ নয়।

কথাটা শোনামাত্র পাজালেন সোল্লাশে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'আরে ব্বাস! এতিদন তবে ভুল কথা জানতাম। এখন বুঝলাম তাদের একজনের নাম মার্কোভাজেলো আর অন্যজনের নাম গুইনার্ড।'

www.pathagar.com

থালকেভ ভুল খবর দেয়ার জন্য যারপরনাই লজ্জিত হল। ইন্ডিয়ানদের সাধারণত একরম ভুল হওয়ার কথা নয়। সার্জেনই রহস্যটা খোলসা করে দিলেন, কেন রেড ইন্ডিয়ানদের চোখে পড়ছে না। বুয়েনস আরিয়ান আর প্যারাগুয়ানরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে মেতেছে। রেড ইন্ডিয়ানরা সুযোগের সদ্ব্যবহারে মেতেছে। উভয় সম্প্রদায়ের জিনিসপত্তর বেপরোয়াভাবে লুটপাট করছে।

তবে এটুকু অন্তত জানা গেল, রেড ইন্ডিয়ানদের হাতে ক্যাপ্টেন গ্রান্ট কয়েদ হন নি। পাজালেন আবার বোতলে পাওয়া কাগজগুলো পাঠ করতে লাগলেন। সেগুলোর বক্তব্য উদ্ধার করতে কোনো না কোনো ভুলচুক হতেও পারে। তার বিশ্বাস, ক্যাপ্টেন গ্রান্ট কোথায় রয়েছেন তা হদিস করতে পারবনেই ।

* * *

সেখান থেকে দেড়শো মাইল দূরে আটলান্টিক পথের পাশে খরগোস দেখতে পেয়ে কুসংস্কারের দাস নাবিকরা আগেই আশঙ্কা করেছিল বিপদ সামনে ওঁত পেতে রয়েছে। কার্যত হল তাই। দেখা গেল লম্বা লম্বা ঘাসের ফাঁক দিয়ে জোড়া জোড়া ষাঁড়ের শিং উঁকি দিচ্ছে। তেড়ে এসে ভুঁড়ি ফাসিয়ে দিতে তাদের জুড়ি নেই। কোনরকমে খুঁজে একটা রাঞ্চোতে রাত্রিটুকু কাটানো গেল। মুষলধারে বৃষ্টি নামল। আবার যাত্রা শুরু করল অভিযাত্রীরা। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ঘোড়াগুলোকে নিয়ে। বিপদাশঙ্কায় তারা এতই মুষড়ে পড়ছে যে তারা আর এগোতেই রাজি নয়। থেকে থেকে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে।

হঠাৎ গম্ভীর গম গম শব্দ কানে এল। মুহূর্তে নদীতে বান এল। জলোচ্ছ্বাস। পানি তীরবেগে ধেয়ে আসতে লাগল। বিপদ বুঝে থালকেভ সবাইকে বিশালায়তন একটা গাছে তুলে নিল। পানির তোড়ে থাউকা নামে ঘোড়াটা করুণ আর্তনাদ করতে করতে ভেসে যেতে লাগল। থালকেভ গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে জাপ্টে ধরল ঘোড়াটাকে। মানুষ আর ঘোড়া উভয়েই ভেসে যেতে লাগল।

আরো চল্লিশ মাইল যেতে পারলে আটলান্টিক মহাসাগরের দেখা পাওয়া যাবে।

খাবারের ব্যাগ পানিতে ভিজে গেছে। মেজর ব্যাগটা তুলে সবাইকে দেখালেন। খাবার যা আছে আর মাত্র দুদিন কোনোরকমে টেনেটুনে চলবে। ব্যস, তারপরই নিরম্বু উপবাস।

গাছের ডালে বসেই পাজালেন বললেন, 'আমেরিকা থেকে বেরিয়ে সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখা আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে ত্রিসদান দ্য আকুহান দ্বীপ অতিক্রম করে গুডহোপ অন্তরীপের দুই ডিগ্রি নিচ দিয়ে ভারত মহাসাগরে আমস্টারডাম আর সেন্টপলস দ্বীপের ধার দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের ওপর দিয়ে অনায়াসে—'

পাজালেনের মুখেরকথা শেষ হবার আগেই গাছের দুটো ডালের ফাঁকে কাত হয়ে পড়লেন। সংজ্ঞা লোপ পেয়ে গেল তাঁর। মেজর ঝট করে হাত বাড়িয়ে ধরে না ফেললে ঝপাৎ করে জলেই পড়ে যেতেন।

সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে পাজালেন রীতিমতো হায় হায় করে উঠলেন, 'আমি বোকার হদ্দ! সত্যি আমি বোকা! ক্যাপ্টেন যেখানে নেই ঠিক সে জায়গাতেই আমরা হন্যে হয়ে তার খোঁজ করে মরছি! তিনি কোনোদিনই সেখানে যান নি।' লর্ড গ্লেনারভান অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বলে উঠলেন, 'ব্যাপার কী বলুন তো। কাগজগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে আপনি এমন কোনো গোপন রহস্য উদঘাটন করলেন যার ফলে এমন জোর দিয়ে কথাটা বলতে পারলেন?'

www.pathagar.com

পাজালেন বোতল থেকে পাওয়া কাগজ তিনটের একটা লর্ড গ্লেনারভারের সামনে মেলে ধরে বললেন, 'দেখুন, আমরা এতক্ষণ 'Austral'কে পুরো শব্দ মনে করে দারুণ ভুল করেছি। আসলে এটা হবে 'Australia'-র অংশ। কারো কারোর মতে অস্ট্রেলিয়া একটা দ্বীপ হলে ভূগোলবিদদের কাছে সেটা কিন্তু একটা মহাদেশ।'

লর্ড গ্লেনারভান তৎক্ষণাৎ অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়াই স্থির করে ফেললেন। কিন্তু ডানকান জাহাজ রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগরে। তার কাছে পৌঁছতে পারলে তবেই অস্ট্রেলিয়ার দিকে যাত্রা করা সম্ভব।

বন্যার পানি থাকায় অভিযাত্রীরদের পুরো একটা দিন গাছের ডালে বসেই কাটাতে হল।

গাছের ডালে বসেই তারা ক্রমে রাতের অন্ধকার নেমে আসতে দেখল।

রাত একটু গভীর হতেই তারা অবিশ্বাস্য এক দৃশ্যের মুখোমুখি হল। টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ রহস্যজনক একটা গুম্‌গুম্‌ আওয়াজ তাদের কানে এল। কারা যেন মাদল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে এগিয়ে আসছে। কয়েকটা মশাল মিটমিট করে জ্বলছে। রহস্যটা ফাঁস করে দিলেন পাজালেন। মাদল মশাল কিছুই না। আসলে ঝাঁকে ঝাঁকে টিউকো পোকা উড়ে বেড়াচ্ছে। কারো কারোর কাছে এরা ফসফরাস পোকা নামে পরিচিত। এক ইঞ্চির বেশি লম্বা। ঠিক যেন হীরে, জ্যান্ত হীরে। এখানকার আদিবাসী মেয়েরা গয়না তৈরি করে পরে। অন্ধকারেও ঝকমক করে।

একটু বাদেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সে কী বৃষ্টি। সবকিছু যেন ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবে।

সকাল হল। ঠিক তখনই দেখা গেল বানের পানিতে ভেসে যাওয়া থালকেভ আর থাউকা নামক ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে জলের টানকে কোনোরকেম সামাল দিয়ে দুটো গাছের ফাঁকে আটকে গিয়ে তারা জীবনরক্ষা করতে পেরেছে। পানি সরে গেলে একটা পরিত্যক্ত ঝুপড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। থালকেভ জানত, বন্যার পানি নেমে গেলে অভিযাত্রীরা এপথেই আসবে।

অভিযাত্রীরা থালকেভের ঝুপড়িটাতেই কোনোরকমে রাত কাটাল।

রাত্রি আটটায় তারা আটলান্টিক থেকে মাত্র সাত মাইল দূরবর্তী এক ফাঁকা জায়গা হাজির হল। ভেবেছিল এখান থেকে ডানকান জাহাজকে দেখা যেতে পারে। সবাই মিলে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে দূরবর্তী সাগরের দিকে তাকিয়ে খোঁজাখুঁজি করল। বৃথা চেষ্টা। জাহাজ তো দূরের কথা, জাহাজটার মাস্তুলটা পর্যন্ত কারোর নজরে পড়ল না।

ফাঁকা মাঠেই অভিযাত্রীরা রাত কাটাতে বাধ্য হল। ভোরে আবার সুমদ্রের দিকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। হ্যাঁ, এবার দেখাতে পেয়েছে। তাদের বাঞ্ছিত জাহাজ ডানকান দেখতে পেল।

থালকেভ কয়েকবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করল। কাজ হয়েছে মনে হল। একটু বাদেই কালোমতো একটা বস্তুকে দেখা গেল। হ্যাঁ, অনুমান অভ্রান্ত। একটা নৌকা তরতর করে এগিয়ে এসে অভিযাত্রীদের সামনে দাঁড়াল।

অভিযাত্রীরা হুড়মুড় করে নৌকায় উঠে পড়ল। কিন্তু থালকেভ তার প্রিয় ঘোড়া থাউকাকে নিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে রইল। সে আর যাবে না। এটা তার দেশ। কাছেই তার বাড়ি।

অভিযাত্রীরা দক্ষিণ আমেরিকা অভিযান সেরে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল।

www.pathagar.com

অন দ্য ট্র্যাক

লর্ড গ্লেনারভান ডানকান জাহাজে ফিরে সহধর্মিণী লেডি হেলেনার কাছে তাঁদের দক্ষিণ আমেরিকা সফরের ব্যর্থতার কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। তিনি একথাও বলতে ভুললেন না, আসলে বোতল থেকে উদ্ধার করা কাগজের বক্তব্য উদ্ধার করতে গিয়েই তাঁরা মারাত্মক ভুল করেছিলেন।

পাজানেল কাগজ তিনটে নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা চালিয়ে যে অর্থ উদ্ধার করেছেন তা নিম্নরূপ—

'আঠোরোশো বাষট্টির সাতই জুন ব্রিটানিয়া নামক তিন মাস্তুলবিশিষ্ট গ্লাসগোর যুদ্ধজাহাজটা অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে জলমগ্ন হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন গ্রান্ট দুজন নাবিকসহ মহাদেশের মাটিতে পদার্পণ করেন। তাঁরা নির্মম-নিষ্ঠুর অসভ্য আদিবাসীদের হাতে কয়েদ হন। তাঁরা কাগজসহ বোতলটাকে —সাঁইত্রিশ ডিগ্রি এগারো মিনিট অক্ষাংশে সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করেন। যেখানে জাহাজটা তলিয়ে গেছে সেখানে সাহায্য পাঠান।'

পাজালেন বিবরণীটা পাঠ শেষ করা মাত্র মেজর বলে উঠলেন, 'কিন্তু আমি বলব, অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানোর আগে আমাদের ব্যাপারটাকে একটু তলিয়ে দেখা দরকার। একবার ভুল যখন হয়েছে তখন আবারও যে আমাদের ভুলের হ্যাপা পোহাতে হবে না তারইবা নিশ্চয়তা কোথায়?'

'সবার আগে আমাদের দেখা দরকার সাঁইত্রিশ ডিগ্রি এগারো মিনিট অক্ষাংশ কোন মহাদেশের ওপর দিয়ে বিস্তৃত। মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে সেটা যে-সব জায়গার ওপর দিয়ে অবস্থান করছে তাদের অধিকাংশই পানি। স্থলের পরিমাণ খুবই কম। দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ আমেরিকার পর স্থলভূমি পড়ছে ত্রিস্তান দ্য কুন্হা আইল্যান্ড। কাগজে এর নামগন্ধও নেই। অতএব একে বাদ দেয়া যাক। এরপর পাওয়া যাচ্ছে ভারত মহাসাগরের অন্তর্গত আমস্টারডাম আইল্যান্ডে। কাগজ তিনটেতে উল্লেখ না থাকায় বাদ দিলাম। এবার পাওয়া যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়াকে। ইংরেজিতে লেখা বিবরণীটার 'stra' এবং ফরাসি ভাষায় লেখা বিবরণীটার austral-এর অর্থ বুঝাচ্ছে 'Australia'। অস্ট্রেলিয়ার পর পাওয়া যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। আদৌ মহাদেশ নয়। আসলে দুটো আইল্যান্ডের সমষ্টি। এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন দক্ষিণ আমেরিকা ও নিউজিল্যান্ড উপকূলের বিশালায়তন সমুদ্রের মধ্যে একটামাত্র ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে অক্ষাংশ বিস্তৃত। সেটা হচ্ছে মেরিয়া থেরেসা নামক আইল্যান্ড। কিন্তু কাগজ তিনটার কোনোটাতেই মেরিয়া তেরেসার উল্লেখ নেই। এবার আপনারাই স্থির করুন কোনদিকে, কোথায় যেতে চাচ্ছেন?'

অভিযাত্রীরা সমস্বরে বলে উঠলেন, 'অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া।'

* * *

ডানকান দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল। দুই হাজার একশো মাইল দশদিনেই অতিক্রম করল। সবাই জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচু ত্রিস্তান পর্বতের শিখরটাকে দেখল।

জাহাজ নোঙর করা হল। গভর্নর লর্ড গ্লেনারভানকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু বহু লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করেও ব্রিটানিয়া জাহাজ বা ক্যাপ্টেন গ্রান্টের হদিস পেলেন না। রাত্রির অন্ধকারেই ডানকান দ্বীপ ছেড়ে আবার যাত্রা করল।

www.pathagar.com

৬ ডিসেম্বর ডানকান আমস্টারডাম আইল্যান্ডে নোঙর করল। মাত্র তিনজন দ্বীপটায় বাস করে। তাদের দুজন নিগ্রো মুলাটো আর একজন ফরাসি প্রৌঢ়। তাদের মুখে জানা গেল ব্রিটানিয়া জাহাজের কোনো নাবিক বা ক্যাপ্টেন কেউই এ-দ্বীপে আসেন নি।

পরের দিন আমস্টারডামে কাটিয়ে ডানকান ফের এগিয়ে চলল।

পাজানেল এবার বোতলের কাগজ তিনটার বক্তব্যের নতুন অর্থ বের করলেন। তিনি বললেন, 'তবে কি ব্রিটানিয়ার পক্ষে পেরু উপকূল পেরিয়ে ভারত মহাসাগরে পড়া সম্ভব?'

'একদিনে অর্থাৎ প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় দশ মাইল পথ পাড়ি দিতে পারলে যে-কোনো জাহাজের পক্ষে এক মাসে আমেরিকা থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে যাওয়া সম্ভব', লর্ড গ্লেনারভান বললেন।

পাজালেন মুহূর্তকাল নীরবে চিন্তা করে কাগজ তিনটার মধ্যে একটার ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে বললেন, 'এক মাসে যদি যাওয়া সম্ভবই হয় তবে এর সাত তারিখের আগে এক বা দুই যা হোক কিছু লেখা ছিল, মুছে গেছে।'

* * *

ডানকান জাহাজ বিশে ডিসেম্বর বারনউইলি অন্তরীপে পৌঁছে গেল। দু-বছর বাদে ব্রিটানিয়া জাহাজটার ধ্বংসাবশেষ—ভাঙাচোরা অংশের হদিস এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়। তবে এত হ্যাপা করে যখন এসেই পড়া হয়েছে তল্লাশি চালিয়ে দেখতেই হবে।

লর্ড গ্লেনারভান মনস্থির করে ফেলেছেন, এখানে যদি নেহাৎই ব্রিটানিয়া জাহাজটার বা ক্যাপ্টেন গ্রান্টের হদিস না পান তবে ইউরোপেই ফিরে যাবেন। কারণ পাজালেন তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ব্রিটানিয়া এখানে তলিয়ে না গিয়ে যদি অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে তলিয়ে গিয়ে থাকে তবে অনেক আগেই ক্যাপ্টেন গ্রান্ট ইউরোপে ফিরতেন। সেখানে ফেরার জাহাজের সমস্যা নেই আর ইংরেজদের উপনিবেশও রয়েছে সেখানে। কিন্তু ডানকান বর্তমানে যেখানে অবস্থান করছে পশ্চিম উপকূলে উপনিবেশ তো দূরের কথা, কেবলই মরু অঞ্চল।

জাহাজ থেকে নেমে অভিযাত্রীরা সামান্য এগোতেই এক পল্লীতে হাজির হল। বেশ বড়সড় একটা বাড়ি থেকে এক প্রৌঢ় চারটে ছেলে ও চারটে কুকুর নিয়ে তাদের কাছে এল। তাদের অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল। আপ্যায়ন করে অতিথি ভোজন করাল। খাবার টেবিলে বসে লর্ড গ্লেনারভান একথা সেকথার পর কাপ্তেন গ্রান্ট এবং ব্রিটানিয়া জাহাজের প্রসঙ্গ তুললেন।

গৃহকর্তা প্রৌঢ় তাকে হতাশ করল। সবার মন যারপরনাই বিষিয়ে উঠল।

সে মুহূর্তেই কে যেন আচমকা বলে উঠল, 'ক্যাপ্টেন যদি সত্যি জীবিত থাকেন তবে তিনি অস্ট্রেলিয়ারই কোথাও না কোথাও আছেন।'

লর্ড গ্লেনারভান উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে? কে একথা বলল? কে?'

সেই বাড়িরই এক কর্মচারী বলল, 'আমি। ব্রিটানিয়া জাহাজে আমি নিজেও ছিলাম। আমার নাম আয়ারটন। স্কটল্যান্ডের অধিবাসী। জাহাজের কোয়ার্টার মাস্টার ছিলাম।' আয়ারটনের বয়স পয়তাল্লিশের কাছাকাছি।

লর্ড গ্লেনারভান সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'তুমি—তুমি ব্রিটানিয়া জাহাজে ছিলে?'

'অবশ্যই, জাহাজ তলিয়ে যাওয়ার পর আমি ক্যাপ্টেন গ্রান্টের সঙ্গে ডাঙায় উঠতে পারি নি। ডেক থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছিলাম।'

লর্ড গ্লেনারভান এবার বললেন, 'বোতলের ভেতরে পাওয়া কাগজে দুজন নাবিকের কথা লেখা রয়েছে। তুমি কি তাদের মধ্যে একজন নও আয়ারটন?'

www.pathagar.com

'না, বোতলের ব্যাপারে আমার কিছুই জানা নেই। আমার ধারণা ছিল, ক্যাপ্টেন গ্রান্টের সলিল সমাধি হয়ে গেছে। আর একমাত্র আমিই জীবিত রয়েছি।'

'কিন্তু একটু আগেই তো তুমি বললে ক্যাপ্টেন গ্রান্ট জীবিত। ব্যাপারটা কি খুলে বলো তো।'

'হ্যাঁ, আমি বলেছি তিনি জীবিত থাকলে অস্ট্রেলিয়াতেই আছেন।'

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, 'বুঝলাম। কিন্তু ব্রিটানিয়া কোথায় ডুবেছিল, বলো তো?"

'অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে। সাঁইত্রিশ ডিগ্রি অক্ষাংশে। পূর্ব উপকূলে। সেটা ছিল আঠারো শো বাষট্টির ২৭ জুন রাতের ঘটনা।'

লর্ড গ্লেনারভান উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে চিৎকার করে উঠলেন, 'আরে আরে, তারিখটা ঠিক মিলে যাচ্ছে!'

আয়াটন এও বলল, রবার্ট আর মেরিকেও সে ছোট্টবেলা থেকেই চেনে। রবার্টের বয়স তখন দশ বছর ছিল। রবার্ট তার কথায় সায়দিল, 'ঠিক। ঠিকই বলেছেন।'

আয়ারটন যা কিছু বলল তাতে কারোর মনে কিছুমাত্রও সন্দেহ রইল না।

আয়ারটন এবার যা বলল তা হল, ক্যাপ্টেন গ্রান্ট তখন নাকি পাপুয়ার পশ্চিম উপকূলে নতুন এক স্কটল্যান্ড গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। ত্রিশে মে ব্রিটানিয়া জাহাজ ক্যালাও অতিক্রম করে ভারত মহাসাগর হয়ে ইউরোপের দিকে যাচ্ছিল। ঠিক তখন তুমুল ঝড় উঠল। সে যে কী ঝড়ের তাণ্ডব ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। জাহাজের ভেতরে ছয় ফুট জল জমে গেল। জাহাজ ডুবে যাওয়ার জোগাড় হল। বাইশে জুন অস্ট্রেলিয়ার উপকূল নজরে পড়ল। চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ থমকে গেল। তখনই আয়ারটান ডেক থেকে সমুদ্রের বুকে আছাড় খেয়ে পড়ে। ব্যস, তারপর ক্যাপ্টেন গ্রান্টের আর কোনো খবর সে পায় নি। সে নিঃসন্দেহ হয়েছিল, ব্রিটানিয়া টুফোল্ড উপসাগরে তলিয়ে গিয়েছে। কেউই প্রাণে বাঁচতে পারে নি। লর্ড গ্লেনারভানের কাছে এখন শুনল, ক্যাপ্টেন গ্রান্ট দুজন নাবিকসহ অসভ্য জঙ্গলিদের হাতে কয়েদ হয়েছে। জঙ্গলিদের হাতে আয়ারটনও বন্দি হয়। তারা তাকে দাস বানিয়ে রাখে। দুবছর পরে মওকা বুঝে সে পালিয়ে আসে। তখন থেকেই এখানে, এ-বাড়িতে চাকরি করছে। সে এবার মেজরের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আমি যে ব্রিটানিয়ার কোয়ার্টার মাস্টার ছিলাম, সে-সব কাগজপত্র কিছুতেই নষ্ট হতে দিই নি। সঙ্গে করে নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটু অপেক্ষা করুন, নিয়ে আসছি।' কথা বলতে বলতে সে পাশের ঘরে চলে গেল।

মিনিটখানেকের মধ্যেই আয়ারটন একগোছা কাগজ নিয়ে আবার অভিযাত্রীদের কাছে ফিরে এল।

কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে মেজর তার মুখের দিকে তাকালেন।

লর্ড গ্লেনারভান বললেন, 'আয়ারটন, এখন তুমিই বল, এ-পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য কী?'

কয়েক মুহূর্ত ভেবে আয়ারটন বলল, 'ক্যাপ্টেন গ্রান্ট অবশ্যই অসভ্য জঙ্গলিদের হাতে কয়েদ হয়েছেন। ডানকানে চেপে জাহাজডুবির স্থানে যাওয়ার দরকার, সেখান থেকেই আমাদের তল্লাশি আরম্ভ করা উচিত।'

ক্যাপ্টেন জানালেন, 'জাহজের কিছু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে।মেরামত না করলে আর চলছে না। কদিন সময় লাগবে।'

উপায়ন্তর না দেখে অভিযাত্রীরা এবার জাহাজ ছেড়ে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে সাঁইত্রিশ ডিগ্রি বরাবর এগোতে লাগল। ঠিক হল টুফোল্ড থেকে জাহাজ তাদের তুলে

www.pathagar.com

নেবে। গাড়ি রোজ বারো মাইল পথ পাড়ি দিতে পারলে অস্ট্রেলিয়ায় একমাসেই পৌঁছে দিতে পারবে। হেলেনাও তাদের সঙ্গে গাড়িতে যেতে রাজি হলেন।

সিদ্ধান্ত পাকা হল লর্ড গ্লেনারভান জাহজের ছুঁতোর মিস্ত্রিকে গাড়ি তৈরির কাজে লাগিয়ে দিলেন। ছয় জোড়া বলদ জোগাড় করে নিয়ে এল আয়ারটন। কদিনের মধ্যেই চার চাকাওয়ালা বিশ ফুট লম্বা চমৎকার একটা গাড়ি তৈরি হয়ে যায়। এবার খাবারদাবার ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রী সদ্য তৈরি গাড়িটাতে তুলে নেয়া হয়।

অভিযাত্রীদের নিয়ে বিশালায়তন গাড়িটা ছয়জোড়া তেজি বলদের টানে দিব্যি এগিয়ে চলে। জাহাজটাকে মেলবোর্নে নিয়ে যেতে নাবিক দরকার। তাই গাড়িতে তাদের বেশিসংখ্যক না নিয়ে জাহাজেই বেশি রাখা হল। মেলবোর্নে জাহাজ মেরামত করা সম্ভব না হলে সেটাকে টুফোল্ডে নিয়ে যাওয়া হবে।

* * *

আঠারোশো চৌষট্টির তেইশে ডিসেম্বর। ছয় জোড়া বলদে টানা গাড়ি এগিয়ে চলেছে। এখানকার অধিকাংশ কলোনিই উপকূলের গা ঘেঁষে অবস্থিত। সুখের বিষয় সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখার দু-ধারের জায়গাগুলো জনবসতিশূন্য নয়।

দুই তিনদিন একনাগাড়ে গাড়ি চলার পর অভিযাত্রীরা 'ক্রাউন ইন' নামক সরাইখানায় রাত কাটালেন। অস্ট্রেলিয়ার ভৌগোলিক বিবরণ সম্বন্ধে কিছু শোনার জন্য অভিযাত্রীরা পাজালেনকে ঘিরে বসলেন। তিনি যে তথ্য পরিবেশন করলেন তা হল—অস্ট্রেলিয়া সত্যই অদ্ভুতত্ত্বের দাবি করতে পারে। এখানাকার মাটি, জল, বাতাস আর গাছ-পালা প্রভৃতি সবকিছুই বৈচিত্র্যে ভরপুর। তাই, বিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে পৃথিবীর সেরা জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে আজও এ মহাদেশটা রীতিমতো রহস্যসঞ্চার করে চলেছে। এখানাকর গাছগুলো 'পাতাঝরা' নয়, বছরে একবার করে ছাল পাল্টায়। নদীগুলো ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছে। আরও বিচিত্র ব্যাপার, গাছের পাতাগুলো উর্ধ্বমুখী—সূর্যের দিকে মাথা উঁচিয়ে না থেকে নিচের দিকে ঝুলেছে। ফলে ছায়া দানে অক্ষম। কাঠের গায়ে আগুন ধরাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যায়। আরো অবিশ্বাস্য ব্যাপার হচ্ছে, বৃষ্টির জল এখানকার পাথরকে গলিয়ে দেয়। চতুষ্পদীদের পাখির মতো ঠোঁট রয়েছে। ক্যাঙারুগুলোর পা অবিশ্বাস্যরকম লম্বা। শেয়াল, বানরের মতো এগাছ থেকে ওগাছে লাফালাফি করে বেড়ায়। ভেড়াগুলোর ধরে যেন শুয়োরের মাথা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাখির মতো গাছের ডালে বাসা বানিয়ে ইঁদুরগুলো দিব্যি বাস করে। বিচিত্র সুরে গান গায় আবার মুখে এমন বিচিত্র শব্দ করে, হঠাৎ করে শুনলে মনে হয় কেউ যেন গানের সঙ্গে তবলা বাজাচ্ছে। এখানকার মানুষগুলোর চরিত্রেও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। তারা সকালে ঘুম থেকে উঠেই কারণে অকারণে হো-হো রব করে হাসে, আবার রাতে শুতে যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ বিলাপ করে কাঁদে। পৃথিবীর কোন দেশের নিয়মের সঙ্গেই এখানকার প্রচলিত নিয়মের সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। আর অক্সিডাইড না হওয়ার ফলে এখানকার কোনো ধাতুই চরমতম শত্রু মরচের দ্বারা আক্রান্ত হয় না। আবার বায়ুতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত কম, অক্সিজেন বেশি। তাই এখানকার মানুষ, বন্যপ্রাণী, গাছগাছালি, ধাতু এবং অন্যান্য জড়বস্তু অশুদ্ধ তো হয়ই না বরং স্থানমাহাত্ম্যে অশুদ্ধরা শুদ্ধ হয়ে যায়। এরকম অদ্ভুতত্ত্বের কথা বিবেচনা করে পৃথিবীর জঘন্যতম অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মশুদ্ধির জন্য অস্ট্রেলিয়ায় নির্বাসন দেয়া হয়। আরো অত্যাশ্চর্য ব্যাপার এখানাকার কোনো প্রণীই হিংস্র নয়।

www.pathagar.com

একদিন গাড়িটা বিগড়ে গেল। মেরামত না করলে আর চলছে না। বাধ্য হয়ে আয়ারটন প্রায় বিশ মাইল দূরবর্তী ব্ল্যাকপয়েন্ট স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সেখান থেকে পাকা মিস্ত্রিকে আনিয়ে গাড়িটাকে মেরামত করে নেবে।

আয়ারটন ফিরে না আসা পর্যন্ত অভিযাত্রীদের নিয়ে লর্ড গ্লেনারভান তাঁবু খাঁটিয়ে সেখানেই রয়ে গেলেন। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন, আয়ারটন মিস্ত্রী না পেলে এখানে শুয়ে বসে কদিন যে নষ্ট করতে হবে কে জানে।

সকাল হতে না হতেই অভিযাত্রীদের যাবতীয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে আয়ারটন গাড়ির মিস্ত্রি নিয়ে ফিরে এল। ওস্তাদ বটে, ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই সে গাড়িটাকে মেরামত করে ব্যবহারোপযোগী করে দিল।

অভিযাত্রীরা আবার নির্দিষ্ট লক্ষে যাত্রা করল। কিছুদূর এগিয়ে গাড়িটা রেললাইন ও পথের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে পড়ল। সিটি দিতে দিতে একটা ইঞ্জিন পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সবে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। সেতু ভেঙে কয়েকটা বগি নদীতে পড়ে গেছে, সবার শেষে যে লাগেজ ভ্যানটা ছিল একমাত্র সেটাই অক্ষত রয়েছে। ইঞ্জিনটার সারভেয়র এসেছে দুর্ঘটনা পরিদর্শন করতে, যে যেখানে ছিল দুরু দুরু বুকে ছুটে এসেছে ব্যাপারটা দেখার জন্য।

ঠিক তখনই একটা রোমহর্ষক দৃশ্যের মুখোমুখি হল সবাই। রক্তমাখা একটা লাশ সেতুর কাছ থেকে ধরাধরি করে নিয়ে এল। তার বুকে একটা ছোরা গাঁথা। ক্ষতস্থানটা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। পুলিশের কর্তাব্যক্তি ওসারভেয়র ভদ্রলোক এরকম আশঙ্কাই করছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বন্দিদের এখানে ছেড়ে দেয়ার প্রতিক্রিয়া ফলতে শুরু করেছে। তারাই ব্রিজ খুলে রেখে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। লাগেজ ভ্যানের মালপত্তর লুঠ করাই ডাকাতদের একমাত্র উদ্দেশ্য। করেছেও তাই।

অভিযাত্রীরা পথের ধারের এক কবরখানায় একটা ছোট্ট ছেলেকে শুয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দেখতে পেল। তার গলায় সুতোয় বাঁধা একটা চিরকুট দেখা গেল। তার গায়ে একটা কুলির নাম লেখা। তার হেফাজতে টোলিন নামে এ-ছোট্ট ছেলেটাকে তুলে দেয়া হল ঠিকানামতো পৌছে দেবার জন্য। অভিযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে কথাবর্তার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌছল, ছেলেটার বাবা ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ছেলেটা ঘুম থেকে উঠে বসল। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে সে বলল, 'আমি মিশনারি স্কুলের ছাত্র। ভূগোলে প্রথম পুরস্কার পেয়েছি। বাবা-মাকে খুশির খবরটা দিতে যাচ্ছিলাম। স্যার তাকে শিখিয়েছেন, ইংরেজ জাতটা সারা পৃথিবীর ভাগ্যনিয়ন্ত্রা। এমন কি ফ্রান্সের অধীশ্বর। তার কথা শুনে ভূগোলবিদ পাজালেন বিস্ময়ে হতবাক হলে গেলেন। লর্ড গ্লেনারভান ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার থেকে রিচার্ডসনের লেখা একটা ভূগোল বই তাকে উপহার দিলেন। পরের দিন সকালে অভিযাত্রীরা এক অভাবনীয় ঘটনা লক্ষ করল। লেডি হেলেনার বুকের ওপর একগোছা ফুল আর উপহৃত ভূগোল বইটা পাজানেলের কোর্টের পকেটে গুজে রেখে ছেলেটা উধাও হয়ে গেছে।'

৩১ ডিসেম্বর, ক্লান্ত অবসন্ন অভিযাত্রীরা সোনার পাহাড় আলেকজান্ডার মাউন্টেনে উপস্থিত হলেন। লর্ড গ্লেনারভান সহযাত্রীদের নিয়ে খনি থেকে সোনা উত্তোলনের কারসাজি দেখলেন।

www.pathagar.com

৩ জানুয়ারি অভিযাত্রীরা রাতে এক সরাইখানায় আশ্রয় নিল। একটা ব্যাপার দেখে তারা যারপরনাই অবাক হল। এই অঞ্চলের সব বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ। ভেতর থেকে খিল দেয়া। ভুলেও কেউ দরজা খুলল না।

সরাইখানার মালিকের সঙ্গে কথা বলে লর্ড গ্লেনারভান জানতে পারলেন, ট্রেন ডাকাতির খবর পাওয়ার পর থেকেই এ অঞ্চলের মানুষ খুবই সতর্ক হয়ে গেছে। আর অস্ট্রেলিয়ান গেজেটে নাকি ছাপা হয়েছে ট্রেন ডাকাতদের পাত্তা মিলেছে। ব্যাপারটা লেডি হেলেনা আর রবার্ট ঘুমিয়ে পড়লে অভিযাত্রীরা সরাইখানার মালিককে খুঁচিয়ে আর যে গুরুত্বপূর্ণ খবরটা বের করল তা হল ছয় মাস আগে নরফোক আয়ারল্যান্ডে চালান দেয়ার সময় উনিশজন নামকরা ডাকাত পুলিশের হেফাজত থেকে হাফিস হয়ে গেছে। তাদের সর্দার জয়েস। সে বহু কুকর্মের নায়ক। অনেক চেষ্টা করেও পুলিশ তার হাতে বেড়ি পড়াতে পারে নি। তার অস্ট্রেলিয়ায় আগমনের ব্যাপারটাও রহস্যজন্য। সেতুর ওপরের দুর্ঘটনাটা তারাই ঘটিয়েছে। কী পাষাণ তাদের হৃদয়!

খবরটা শোনার পর লর্ড গ্লেনারভানের কলিজা শুকিয়ে গেল। তিনি মেলবোর্ন থেকেই ডানকান জাহাজে ওঠার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আর যাই হোক ডাকাতদের হাতে জান খোয়াতে কিছুতেই তিনি রাজি নন।

আয়ারটন তাঁর মনে সাহস সঞ্চার করাতে গিয়ে বলল, 'কর্তা, সঙ্গে আটটা বন্দুক তো রয়েছেই। এগুলো দিয়ে ঊনত্রিশটা ডাকাতকে ঘায়েল করা কোনো সমস্যাই নয়।' শেষপর্যন্ত এগিয়ে যাওয়াই স্থির হল।

* * *

৫ জুলাই অভিযাত্রীরা মুরে নামক এমন এক জেলায় হাজির হলেন যেখানে কেবল অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের নিশ্চিন্ত বাসস্থল। কালো চামড়ার মানুষগুলো গ্রামের গণ্ডীর বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু শ্বেতাঙ্গরা অবাধে যাতায়াত করে।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাজালেন বললেন, 'আজ এখানে আর আদিবাসীদের তেমন দেখাই যায় না। অচিরেই শ্বেতাঙ্গরা অস্ট্রেলিয়ার একাধিপত্য বিস্তার করে ফেলবে।'

ঠিক তখন গাছের ডালে কারা যেন লাফালাফি দাপাদাপি করছে মনে হল। অভিযাত্রীরা এগিয়ে-পিছিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে হেলে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ব্যাপারটা সম্বন্ধে ধারণা নেয়ার জন্য তৎপর হল। কী জানি বলা তো যায় না, এখানে হয়তো শেয়ালের মতো উড়ন্ত বানর থাকলেও থাকতে পারে।

পাজারেনই শেষপর্যন্ত উৎকণ্ঠা দূর করতে গিয়ে বললেন, 'অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা এমন করে, বানরের মতো গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায়। হ্যাঁ, নামে মানুষ বটে, কিন্তু মুখ চোখ বানরের মতোই।'

আয়ারটন এরকমই একজন আদিবাসীর দাস হয়ে দু-দুটো বছর কাটিয়েছে। এদের মেয়েদেরকে কৃতদাসীর মতো শিশু লালনপালন থেকে শুরু করে শিকার করে পুরুষদের পেটের জোগাড় করা পর্যন্ত যাবতীয় কাজ করতে হয়। পান থেকে চুন খসলেই পুরুষরা লাঠির মাধ্যমে আদর-সোহাগ করে। নারীজাতীয় এমন হীন জীবনযাত্রা দেখে লেডি হেলেনার দুচোখ জলে ভরে গেল, তিনি নিজেদের খাবার থেকে দুঃখিনী মেয়েদের জন্য খাবার দিলেন। হায়! হতচ্ছড়া পুরুষগুলো জবরদস্তি ছিনিয়ে নিয়ে গোগ্রাসে গিলতে লাগল।

www.pathagar.com

আয়ারটন শুকনো গলায় বলল, 'ক্যাপ্টেন গ্রান্ট হয়ত এরকমই কোনো আদিবাসীদের মহল্লায় বন্দিজীবন যাপন করছেন। তবে পালিয়ে এসে আমি দাসবৃত্তি করে যে অমানুষিক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেছি তার চেয়ে আদিবাসীদের হাতে আমৃত্যু কয়েদ হয়ে থাকা অনেক অনেক বেশি শান্তির।

এমন সময় একদল এমু পাখি দেখে আদিবাসীরা লাঠিসোটা নিয়ে তেড়ে গেল, আরেব্বাস! তারা ঘোড়ার চেয়ে তীব্রবেগে ছোটে। তারা অভিজ্ঞ হাতে পাঁচ পাঁচটা এমু পাখিকে ঘায়েল করে ফেলল। আসলে ডানার পরিবর্তে দেহের দুপাশে মাংসপিণ্ড থাকার জন্য তারা উড়তে পারে না।

আদিবাসীদের মহল্লায় আরো অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার দেখা গেল। গাছের মগডালে নীলাভ কয়টা কাকাতুয়াকে মারার জন্য দুই ফুট ওপর দিয়ে তীর বেগে বাঁগানো একটা কাঠের টুকরো ছুঁড়ে দিল। সেটা প্রায় চল্লিশ ফুট ধেয়ে গিয়ে হঠাৎ একলাফে প্রায় একশো ফুট ওপরে উঠে গিয়ে ডজন খানে কাকাতুয়াকে ধরাশায়ী করে কাঠটা আবার নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে এল, এমন জাদু একমাত্র অস্ট্রেলিয়ানরাই দেখাতে পারে। আশ্চর্য জাত বটে!

পরের দিন ভোরে অভিযাত্রীরা আবার পথে নামলেন। কিছুদূর যেতেই প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু ও পনের মাইল লম্বা অস্ট্রেলিয়ান আল্পস পবর্তমালার কাছাকাছি পৌঁছলেন।

আয়ারটন এক সারাইখানার মালিকের কাছ থেকে জেনে নিল, কোন পথে পাহাড়টা ডিঙোনো সম্ভব।

সরাইখানা ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় দেয়ালের গায়ে সাঁটা একটা বিজ্ঞপ্তির দিকে লর্ড গ্লেনারভানের চোখ পড়ল। পুলিশ কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি। বেন জয়েসের সন্ধান যে দিতে পারবে তাকে নগদ একশো পাউন্ড পুরস্কার দেয়া হবে। বিজ্ঞপ্তিটার পড়ে তিনি চোখ মুখ বিকৃত করে বলে উঠলেন, 'অপদার্থটিকে ফাঁসির দড়িতে লটকে দেয়া দরকার।'

আয়ারটন বলল, 'কর্তা, তাঁর মাথার দাম কিন্তু একশো পাউন্ড হওয়া উচিত নয়।'

পাহাড় ডিঙোতে গিয়ে একটা বদল আর একটা ঘোড়া অক্কা পেল। শেষ রাত্রির দিকে আরো একটা বলদ আর ঘোড়া পৃথিবী ছেড়ে গেল। এ যেন বলদ আর ঘোড়ার মড়ক লেগে গেল।

পাহাড়ের গুহায় অভিযাত্রীরা রাত কাটাতে লাগল। তখন রাত প্রায় এগারোটা। হঠাৎ মেজরের ঘুম ভেঙে গেল। যন্ত্রচালিতের মতো ঝট করে বসে পড়লেন। দেখতে পেলেন ফসফরাস ফার্নের নীল আলোকচ্ছটায় প্রায় আধমাইল অঞ্চল জুড়ে আলোর বন্যা বয়ে চলেছে। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে আদিম যুগের অসভ্য জঙ্গলিদের মতো এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে ধারণা নেয়ার চেষ্টা করলেন।

একটু বাদেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল, সে সঙ্গে অনবরত কর্কশস্বরে মেঘ ডাকাডাকি করতে লাগল। অভিযাত্রীরা উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটাতে লাগল। এদিকে মেজর যে গুহায় নেই, সেদিকে কারোর খেয়ালই নেই। কিন্তু তাঁর পক্ষে কিছুই আবিষ্কার করা সম্ভব হল না। হতাশা হয়ে ফিরে এলেন।

মেজর কিন্তু ঘোড়া আর বলদগুলো মরার ব্যাপারে আয়ারটনকে তলে তলে সন্দেহ করে চলেছেন। পাজালেনও ভাবছেন, সে গোপনে পলাতক কয়েদিদের সঙ্গে গোপন

www.pathagar.com

আঁতাত, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় নি তো? তিনি অভিযাত্রীদের কাছে মনের কথা ফাঁস করতে ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চেপে ধরলেন, 'সে কী সাহেব! একই মুখে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলছেন যে বড়! এত বড়াই করে বলেছিলেন, ভিক্টোরিয়ায় কোনো কয়েদি থাকে না। আপনিই আবার আশঙ্কা করছেন, আয়ারটন হয়তো কয়েদিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বদল আর ঘোড়াগুলোকে মেরেছে।'

পাজালেন একদম বেকুব বনে গিয়ে মুখে কলুপ এঁটে বসে রইলেন।

পরিস্থিতি বড়ই সঙ্গীন, গাড়ির আশা ছেড়ে দিয়ে এখন পায়ে হেঁটে পথ পাড়ি দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। টুফোল্ড উপসাগর মাইল-পাঁচেকের পথ। লেডি লেহেনা ও মেরি হাঁটতে রাজি হলেন। তবে ভিক্টোরিয়ার সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চলের ওপর দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। মাথা সমান উঁচু ঘাস। সেগুলো কেটে কেটে পথ তৈরি করে তবেই অগ্রসর হওয়া যাবে। তবে কোনোরকমে টুফোল্ড উপসাগরে ডানকান জাহাজটা যদি চলে আসে তবে কোনো সমস্যাই থাকে না।

শেষপর্যন্ত অভিযাত্রীরা দীর্ঘ আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, আয়ারটন ঘোড়ায় চেপে লক্ষ্ণৌ রোড ধরে মেলবোর্নে হাজির হবে। সময় লাগবে চারদিন। টুফোল্ড পৌঁছতে লাগবে দুদিন। সাতদিনের মধ্যেই সে ডানকান জাহাজকে টুফোল্ডে নিয়ে আসতে পারবে, কথা দিল।

লর্ড গ্লেনারভান জাহাজের কাপ্তেনের কাছে চিঠি লিখতে বসলেন। মেজর বললেন, 'আমরা মুখে কথা বলার সময় আয়ারটন বলি বটে। কিন্তু লিখতে গেলে 'বেন জয়েস' লিখতে হয়, খেয়াল রাখবেন।'

* * *

বেন জয়েস! বেন জয়েসের নামটা উচ্চারিত হওয়ামাত্র অভিযাত্রীদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হল। চোখের পলকে কোটের ভেতরের পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে আয়ারটন লর্ড গ্লেনারভানকে গুলি করল। ব্যস, বাইরেও গুলির আওয়াজ হতে লাগল।

আয়ারটনকে ধরার জন্য জন ম্যাঙ্গলস ছুটল, ব্যর্থ হল। সে জঙ্গলে ঢুকে তার সাকরেদদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেল।

লর্ড গ্লোনারভানের আঘাত তেমন কিছু নয়। চামড়া ছুঁয়ে গুলিটা বেরিয়ে গেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সহধর্মিণী লেডি হেলেনা আর মেরিকে টেনে গরুর গাড়ির ছাউনির মোটা চামড়ার আড়ালে নিয়ে চলে গেলেন। আর অন্যান্য অভিযাত্রীরা শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে পড়ল। মেজর ম্যাঙ্গলসকে নিয়ে শত্রুর খোঁজে এগিয়ে গেলেন। হতাশ হয়ে একটু বাদেই ফিরে এলেন। আয়ারটন বা তার কোনো সাকরেদকেই চোখে পড়ল না।

দেখা যাচ্ছে, বিপদ নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল।

লেডি হেলেনা আর মেরির কাছে রেল ডাকাতির খবরটা এতদিন গোপন রাখা হয়েছিল। মেজর এবার তাদের কাছে ব্যাপারটা খোলসা করে বললেন। আর নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার গেজেটের পাতাটাও দেখালেন। আর এও বললেন গোড়া থেকেই আয়ারটনের ওপর তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। এবার তিনি কতকগুলো টুকরো টুকরো ঘটনার মাধ্যমে তাঁর এরকম সন্দেহের কারণ তুলে ধরলেন। সেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে, আয়ারটন গাড়ি মেরামতের জন্য যে মিস্ত্রিকে ডেকে এনেছিলেন তার সঙ্গে তার ইশারায় কথাবার্তার মধ্যে তিনি উভয়ের গোপন আঁতাতের গন্ধ পেয়েছিলেন। তারপর কোনো

www.pathagar.com

গ্রাম বা শহরে ঢোকার কথা উঠলেই আয়ারটন কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়ত। আবার ডানকান জাহাজকে টুফোল্ড উপসাগরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আয়ারটন বারবার যেভাবে পীড়াপীড়ি করেছে, সেটাও মেজরকে ভাবিয়ে তোলে। সবশেষে ঘোড়া আর বলদগুলোর দেখভালের দায়িত্ব তার ওপর বর্তেছিল। কিন্তু তারা একেক করে মারা যাওয়ায় ব্যাপারটাও তাঁর মনে কম রহস্যের সঞ্চার করে নি। সবকিছু জেনে-বুঝেও একমাত্র উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তিনি আয়ারটনকে কিছু বলতে পারেন নি। ভেতরে ভেতরে ছটফট করা ছাড়া কোনো উপায়ও তো তাঁর ছিল না। গতরাতে প্রমাণ হাতেনাতে পেয়ে গেলেন, সেটা হচ্ছে, ফসফরাসের আলোয় তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন, গাড়ির সে মিস্ত্রি, আয়ারটন আর একজনকে ঠিক চিনে উঠতে পারলেন না। তাদের টুকরো টুকরো কথাবার্তাও শুনেছেন। যেমন গ্যাসট্রোলিয়ানের পরিমাণ এতই বেশি যে, পুরো একটা অশ্বারোহী দলকে মেরে সাবাড় করে দেয়া যাবে—এ পরিকল্পনাটায় বেন জয়েস সাফল্যলাভ করলে মনে করব, তার মতো ঘাঘু কোয়ার্টার মাস্টার দ্বিতীয় আর কেউই নেই—এমন আরো কিছু কথা তারা আলোচনা করছিল, যাতে মেজর নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন, যে তার ছদ্ম নাম বেনজয়েস। আসল নাম আয়ারটন। কুখ্যাত ডাকাত-সর্বদার বেনজয়েস।

অভিযাত্রীরা বুঝলেন, আয়ারটন কোনোদিনই সেই ব্রিটানিরয়া জাহাজে কাজ করে নি, তবে ক্যাপ্টেন গ্রান্ট তার পরিচিত। তবে ব্রিটানিয়ার কোয়ার্টার মাস্টারের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার হাজির হওয়া কীভাবে সম্ভব হল? কিন্তু এও সত্য যে, আয়ারটন আর বেনজয়েস যে একই ব্যক্তি, পুলিশ তা আজও জানতে পারে নি।

সব কিছু শুনে ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে লেডি হেলেনা বললেন, 'শয়তানটা নির্ঘাত কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে লোকটার বাড়িতে চাকরির নামে মাথা গুঁজেছিল।'

'অবশ্যই, সেখানেও হয়তো চরম বেইমানি করত। কিন্তু আমাদের সঙ্গ নেয়ায় সে বেচারা বেঁচে গেল।'

মেরির চোখে মুখে হাতাশার কালো ছায়া নেমে এল। সে নিঃসন্দেহ হল তার বাবাকে পাওয়ার চিন্তা নিতান্তই দুরাশা। আর আয়ারটনই যে কুখ্যাত ডাকাত বেনজয়েস এ ব্যাপারটা খোলসা হয়ে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন গ্রান্টের হদিস পাওয়ার ব্যাপারে অভিযাত্রীরা যারপরনাই হতাশ হয়ে পড়ল। আর তারা এও বুঝল, ব্রিটানিয়া জাহাজ অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে, টুফোল্ড উপসাগরে নিমগ্ন হয় নি, এবারও বোতল থেকে পাওয়া কাগজ তিনটের বক্তব্য উদ্ধার করতে পাজালেনও ভুল করেছেন।

অভিযাত্রীরা ভাবল শয়তান আয়ারটন অবশ্যই তার সাকরেদদের ডেকে আনতে গেছে। অতএব সাধ্যমতো সতর্ক থাকতে হবে। দুজন নাবিক বন্দুক হাতে সারারাত পাহারায় নিযুক্ত রইল।

আয়ারটন দুদিন আগে যে প্রস্তাব দিয়েছিল ম্যাঙ্গলস এবার সে প্রস্তাবই দিল, ঘোড়া নিয়ে কোনো একজন দুশো মাইল দূরবর্তী মেলবোর্নে যাওা দরকার। দুদিনের মধ্যে ডানকান জাহাজকে টুফোল্ডে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হোক। অনেকেই যেতে চাইল। বাধ্য হয়ে লটারির মাধ্যমে স্থির করা হল মুলরাদি যাবে। ডানকানের মেট টম অস্টিনের নামে লর্ড গ্লেনারভান চিঠি লিখে দিলেন, পত্র পাওয়ামাত্র তিনি যেন ডানকানকে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে নিয়ে যান।

www.pathagar.com

মুলরাদি লর্ড গ্লেনারভানের আদেশপত্র নিয়ে ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

একটু পরেই মুলরাদি যে দিকে ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করেছে সেদিক থেকে হঠাৎ গুলির আওয়াজ ভেসে এল। অভিযাত্রীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড় হল। সে নিশ্চয় বিপদাপন্ন। লর্ড গ্লেনারভান এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মেজর তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালেন। ঠিক তখনই করুণ আর্তস্বর ভেসে এল, 'বাঁচাও! বাঁচাও! কে, কোথায় আছো—বাঁচাও!'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রক্তাপ্লুত অবস্থায় মুলরাদি বিকট আর্তনাদ করতে করতে অভিযাত্রীদের কাছে হাজির হল। পাঁজরে গুলি লেগেছে। রক্ত ঝরছে। সে লর্ড গ্লেনারভানকে বলল, 'কর্তা, চিঠিটা শয়তান বেনজয়েস...' ব্যস, সংজ্ঞা হারিয়ে সে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে যন্ত্রণাকাতর মুলরাদি কোনোরকমে যা বলল তার মর্মার্থ হল, 'তাকে গুলি করে বিশ্বাসঘাতক বেনজয়েস জোর করে পকেট থেকে চিঠিটা নিয়ে নেয়। যাবার আগে সে বলে, দু-চারিদিনের মধ্যেই আমরাই ডানকান জাহাজের মালিক হচ্ছি। তারপর নিজেই চিঠিটা নিয়ে ডানকান জাহাজের মেট মি. টম অস্টিনের কাছে ছুটল। আর তার সাকরেদদের বলে গেল, তারা যেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে টুফোল্ডে গিয়ে অপেক্ষা করে।

দুঃসংবাদটা পাওয়ামাত্র পাজালেন ক্যাপ্টেনকে নিয়ে টুফোল্ডের দিকে রওনা হলেন। ডাকাতদের আগেই তাঁরা সেখানে পৌঁছে যেতে চান। শেষপর্যন্ত ডানকান জাহাজ ডাকাতদের কবলে পড়বে, কিছুতেই হতে দেয়া যায় না।

কিন্তু শেষপর্যন্ত দশ মাইল পায়ে হেঁটে, হতাশায় জর্জরিত হয়ে ক্লান্ত দেহে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। কেম্পল পায়ার সেতু ছাড়া স্নোয়ি নদী অতিক্রম করার অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। শয়তান বর্বর ডাকাতরা সেটাকে পুড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু সাধের ডানকান জাহাজ ডাকতদের কবলে চলে যাবে এটা লর্ড গ্লেনারভান হতে দিতে রাজি নন। তিনি টুফোল্ডেযাবার জন্য যারপরনাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

অনেক চেষ্টার পর ১৮ জানুয়ারি মাঙ্গলসগাছের মোটা মোটা ছাল জুড়ে জুড়ে চমসৎকার একটা ভেলা তৈরি করে ফেলল। কিন্তু তার ক্ষমতা যাচাই করার জন্য মহড়া দিতেই সেটা জলের চাপে ফেঁপে গেল। এবার ২১ জানুয়ারি পেজালেনের পরামর্শ মাফিক গাছের গুঁড়ি দিয়ে একটা ভেলা তৈরি করা হল। কোনোরকমে অভিযাত্রীরা সেটায় চেপে স্নোয়ি নদী অতিক্রম করলেন।

২৫ জানুয়ারি বেলা এগারোটায় অভিযাত্রীরা টুফোল্ড থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী ডেলিগেট নামক গ্রামে, সেখান থেকে একটা গাড়ি ব্যবস্থা করে তারা সমুদ্রোপকূলে সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখায় উপস্থিত হল। হতাশ হল। ডানকান জাহাজের দেখা পাওয়া গেল না।

গ্লেনারভান সহযাত্রীদের নিয়ে একটা সরাইখানায় আশ্রয় নিলেন। মেলবোর্নে টেলিগ্রাম করে জানতে পারলেন। আঠারোই জানুয়ারি ডানকান যাত্রা করেছে। কিন্তু কোথায়, কোনদিকে গেছে বলতে পারল না।

লর্ড গ্লেনারভানের ফুসফুস নিঙড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এ—তবে কি ডানকান সত্যি ডাকাতদের কব্জায় চলে গেল।

---

www.pathagar.com

দ্য সিক্রেট অব দ্য আয়ল্যান্ড

আজ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল। রহস্যময় লিঙ্কন দ্বীপে আজ সত্যি সত্যিই জাহাজ এসে নোঙর করল। কিন্তু দ্বীপবাসীরা মোটেই আনন্দিত হতে পারছে না। কেন? নির্বাসন-জীবনের অবসান ঘটতে চলেছে, তবু কেন তাদের মনপ্রাণ আনন্দের বদলে বিষাদে ভরপুর? আসলে দীর্ঘদিন অবস্থানের ফলে দ্বীপের প্রতিটা জিনিসের সঙ্গে আত্মিকযোগ, নাড়ীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আজ সে সম্পর্ক চিরদিনের মতো ছিন্ন হতে চলেছে।

চোখে দূরবীণ লাগিয়ে পেনক্রফট জাহাজটার ওপর সতর্কদৃষ্টি রেখে চলেছে। জাহাজ ও দ্বীপের মধ্যে এখন বিশ মাইল ব্যবধান। দ্বীপবাসীরা বন্দুকের গুলির মাধ্যমে আওয়াজ করে পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বেলে এবং নিশানের মাধ্যমে সঙ্কেত জানিয়ে জাহাজের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনোরকম ত্রুটি রাখল না।

ব্যাপারটা কিন্তু ভাববার মতোই বটে। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত অখ্যাত অবজ্ঞাত এ দ্বীপটার খোঁজ কারোরই জানা নেই। তাই যদি হয় তবে জাহাজটা গতি এমুখো কেন? কী তার উদ্দেশ্য? হার্বার্টের সন্দেহ হল, এটা ডানকান জাহাজ হলেও হতে পারে। স্পিলেটের পরামর্শে টেলিগ্রাফ করে আয়ারটনকে তলব করা হল। সে দূরবীণটা চোখে লাগিয়েই বলে উঠল—'ধ্যুৎ এটা ডানকান জাহাজ হতে যাবে কেন। ডানকানের তো আসার কথাও নয়।'

পেনক্রফট চোখে দূরবীণ লাগিয়েই রেখেছে। একসময় দেখল, জাহাজ অন্যদিকে মোড় নিয়েছে।

হার্ডিং কিন্তু ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক মনে করতে পারলেন না। এ দ্বীপের দিকে জাহাজ আসার এমন কী কারণ থাকতে পারে?

পেনক্রফট আর নেব পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বালার উদ্যোগ নিতে লাগল। পরমুহূর্তেই দেখা গেল, আবার জাহাজটার মুখদ্বীপের দিকে ঘুরে গেছে। তবে কি জাহাজটা বেলুন বন্দরেই নোঙর করবে?

আয়ারটন দূরবীণের সাহয্যে স্পষ্ট লক্ষ করল, এতে ধোঁয়া বেরোবার চিমনি অনুপস্থিত। অতএব এটা কিছুতেই ডানকান হতে পারে না।

পেনক্রফট দূরবীণটা চোখে লাগিয়ে রেখেই বলে উঠল—'জাহাজের মাস্তুলের ওপরের উড়ন্ত নিশানটা ইংল্যান্ডের নয়। ইংল্যান্ডের নিশানার রঙ লাল। আমেরিকারও নয়। জর্মানি বা ফ্রান্সেরও নয়। স্পেনেরও নয়। সে দেশের নিশান হলুদ। আর রাশিয়ার হলে সাদা হত। তবে যাই হোক না কেন এক রঙের—'

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই আয়ারটন দূরবীণের মুখটাকে অস্থিরভাবে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে সচকিত হয়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল—'কী সর্বনাশা কাণ্ড! এ যে কালো নিশান বলেই মনে হচ্ছে। তবে? তবে কি জলদস্যুদের জাহাজ ওটা!'

হার্ডিং সবাইকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা ভাববারই বটে। তবে এত সহজে মুষড়ে পড়লে চলব কেন? আবার এমনও তো হতে পারে লিঙ্কলন দ্বীপ তাদের লক্ষস্থল নয়। তবু আমাদের সতর্ক হতেই হবে।'

www.pathagar.com

নেব আর আয়ারটন দৌড়ে গিয়ে বায়ুকলের ছাউনি নামিয়ে নিল। যাবতীয় আগুন নিভিয়ে দিল। আর ডালপালা দিয়ে গ্রানাইট হাউসের দরজা-জানালাগুলো চাপা দিয়ে দিল।

হার্ডিং এবার নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে গিয়ে বললেন, 'জলদস্যুরা যদি লিঙ্কলন দ্বীপ বা আমাদের ওপর চড়াও হয়, তবে আমাদের কর্তব্য কী হবে?'

সবাই সমস্বরে গর্জে উঠল, 'আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রতিরোধ করব। জীবন গেলেও লিঙ্কলন দ্বীপের দখল হাতছাড়া করব না।'

রাত ক্রমে গভীর হল। আচমকা কামান দাগার শব্দে উৎকণ্ঠিত দ্বীপবাসীরা সচকিত হয়ে পড়ল। কামানের গর্জন আর আলোর ঝলকানির মধ্যে সময়ের পার্থক্য ছিল মাত্র ছয় সেকেন্ড। হিসাবমতো দ্বীপ থেকে জাহাজটার দূরত্ব তখন প্রায় সওয়া মাইল।

হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নোঙর ফেলার শব্দ দ্বীপবাসীদের কানে এল। মনে হল জলদস্যুরা বুঝি গ্রানাইট হাউসের গায়েই জাহাজ ভিড়িয়েছে। সেখানেই রাতের অন্ধকারে ঘাপটি মেরে রয়েছে।

হার্ডিং বেগতিক দেখে শত্রুপক্ষের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন।

এগিয়ে গিয়ে আয়ারটন কাপ্তেন হার্ডিংয়ের কাছে অনুমতি চাইল, অন্ধকারে সবার নজরের আড়াল থেকে দেখে আসবে জাহাজে কয়জন জলদস্যু রয়েছে। সওয়া মাইল সাঁতারে যাওয়া তার পক্ষে মোটেই সমস্যা নয়। কাপ্তেন হার্ডিং দেখলেন, আয়ারটনের আগ্রহ এমন অত্যুগ্র যে, তাকে বাধা দেওয়ার পরিণাম ভালো হবে না।

আয়ারটন কাপ্তেন হার্ডিংয়ের অনুমতি পাওয়ামাত্র পেনক্রফটকে নিয়ে তীরের দিকে যাত্রা করল। আর নেব মার্সি নদীর তীর থেকে ছোট্ট ডিঙিটা নিয়ে এল। সেটা দুজনকে নিয়ে অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চলল। দ্বীপের অন্যদিকে পৌঁছে আয়ারটন নৌকো থেকে পানিতে নামল। আর পেনক্রফট পাহাড়ের পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করে রইল।

আয়ারটন সাধ্যমতো সতর্কতার সঙ্গে জাহাজটার নোঙরের শেকল বেয়ে ডেকের ওপরে উঠে গেল। দেখল একধারে খালাসিদের পোশাক শুকোতে দিয়েছে। ঝট করে একটা জামা প্যান্ট টেনে নিয়ে গায়ে চাপিয়ে নিল। এবার দুই পা এগিয়ে গিয়ে জলদস্যুদের বাক্যালাপ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল। সে জানতে পারল, জাহাজটার নাম 'স্পিডি' আর কাপ্তেনের নাম বব—বব হার্ডি।

বব হার্ডি নামটা শোনামাত্রই আয়ারটনের বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। সে যে তার খুবই পরিচিত। সে অস্ট্রেলিয়ার জেল পলাতক বন্দিদের নিয়ে যে ডাকাত দলটা গড়ে তুলেছিল বব হার্ডি সে দলে ছিল। সে ছিল আয়ারটনের খুবই অনুগত। তার মধ্যে দু-দুটো গুণ রয়েছে। অসীম সাহসী অকুতোভয় আর পাকা নাবিক।

বব হার্ডি নাকি অস্ট্রেলিয়ার নরফোক দ্বীপে স্পিডি জাহাজটাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। খাবার দাবার অস্ত্রপাতি ও প্রচুর গোলাবারুদ জাহাজে রয়েছে। বর্তমানে তার অভিপ্রায় লিঙ্কলন দ্বীপটা তার মনে ধরে গেলে এখানেই গোপন আস্তানা গড়ে তুলবে।

কথাটা শোনামাত্র আয়ারটনের শরীরের সব কটা স্নায়ু একসঙ্গে সতর্কিত হয়ে উঠল। বুকের ভেতরে ফুসফুসের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। কাপ্তেন সাইরাস হার্ডিং লিঙ্কলন দ্বীপটাকে যেভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছেন তাতে এটা দেখামাত্রই তার যে মনে ধরে যাবে আশ্চর্য হবার কিছুই নয়।

www.pathagar.com

জাহাজের চারদিকে চারটে কামান বসানো রয়েছে। আর জলদস্যুরা সংখ্যায় জনা পঞ্চাশেক। এমন পরিস্থিতিতে দুজনের পক্ষে শত্রুপক্ষের মোকাবেলা করা খুবই সমস্যা। কিন্তু যে-কোনোভাবে শয়তানগুলোর পরিকল্পনাটাকে ভেস্তে দিতেই হবে। জাহাজের ডেকের অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎকর্তব্য সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে ঝট করে ভয়ঙ্কর একটা ফন্দি তার মাথায় এল। তবে এতে নিজের প্রাণও অবশ্যই যাবে। কিন্তু যারা তার উপকারের চূড়ান্ত করেছে তারা তো বেচেঁ যাবে। আর তার একটামাত্র প্রাণের বিনিময়ে কাপ্তেন সাইরাস হার্ডিংয়ের নিজেহাতে গড়া স্বপ্নসাধের লিঙ্কলন দ্বীপটা তো রক্ষা পেয়ে যাবে। এমন মৃত্যুতেও শান্তি। কিন্তু কীভাবে সে স্পিডি জাহাজটাকে ধ্বংস করতে চাইছে? বারুদের গুদামে আগুন দিয়ে জাহাজটাকে উড়িয়ে দেবে।

আয়ারটন মাতাল নাবিকদের নজর এড়িয়ে গুটিগুটি এগিয়ে জাহাজের পিছনের দিকে গিয়ে দেখল, গোলাবারুদের ঘরের দরজাটা বন্ধ। ইয়া পেল্লাই একটা তালা ঝুলছে। সে প্রমাদ গুণল। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার অবস্থা। মাস্তুলের চারদিকে পিস্তল আর বন্দুক ঝুলতে দেখে এসেছিল। আগের মতো পা টিপে টিপে গিয়ে একটা পিস্তল নিয়ে জামার তলায় গুঁজে নিল। আত্মরক্ষা ছাড়াও বারুদের গুদাম ধ্বংস করতে একটামাত্র পিস্তলের গুলি ব্যবহার করলেই কাজ হাসিল, সে আবার গুদামটার কাছে গেল। শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে দিয়ে তালাটাকে ভেঙে ফেলল। আচমকা তার বুকের ভেতরে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। কাজ প্রায় হাসিল হতে চলেছে, খুশি হবার কথাই বটে। ঠিক তখনই কার যেন একটা হাত তার কাঁধে নেকড়ের মতো থাবা বসিয়ে বাজখাই গলায় গর্জে উঠল—'কি রে শয়তান, এখানে কী করছিস?'

আয়ারটন ঝট করে ঘাড় ঘুরিয়েই চিনতে পারল, বব হার্ডি। তার একসময়ের অনুগত সাকরেদ। বর্তমানে স্পিডি জাহাজের মালিক জলদস্যু বব হার্ডি তার কাঁধটাকে সাঁড়াশির মতো আকড়ে ধরেছে। বব হার্ডি কিন্তু তাকে চিনতে পারল না। বব হার্ডির গলা শুনে দু-তিনজন গাট্টাগোট্টা দলদস্যু হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

আয়ারটনের গায়ে যেন আচমকা আসুরিক শক্তি ভর করেছে। সে পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে দুজনকে ধরাশায়ী করে দিল। ঠিক তখনই জলদস্যুদের একজন তার কাঁধে ছুরির ফলা গেঁথে দিল। বব হার্ডি ঝট করে বারুদের গুদামের পাল্লাটা টেনে বন্ধ করে দিল। পরিস্থিত অনুকূল নয় ভেবে আয়ারটন চম্পট দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, পিস্তল থেকে দু-দুটো গুলি ছুড়ল, একটা বব হার্ডির গা-ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। বেঁচে গেল সে। চিৎকার চোঁচামেচি পিস্তলের আওয়াজ শুনে অন্যান্য জলদস্যুরা ছুটোছুটি করে সেখানে হাজির হল। হঠাৎ এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে তারা যেন রীতিমতো ভড়কে গিয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

আয়ারটন আচমকা গুলি চালিয়ে লণ্ঠনটাকে ভেঙে ফেলল। জাহাজের বুকে নেমে এল ঘুটঘুট্টে অন্ধকার। আয়ারটন এবার ডেকের ওপর থেকে লাফিয়ে পানিতে পড়ে গেল।

জাহাজের জলদস্যুরা এবার যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। তারা পিস্তলের মুখ জলের দিকে নামিয়ে দমাদম গুলি চালাতে লাগল। কিন্তু আয়ারটন ইতিমধ্যে ডুবসাঁতারে নিরাপদ স্থানে পৌছে গেছে।

তখন রাত প্রায় বারোটা, আহত আয়ারটনকে নিয়ে পেনক্রফট অন্য দ্বীপবাসীদের কাছে হাজির হল। জাহাজটাকে ধ্বংস করতে গিয়ে আয়ারটন ব্যর্থ হয়েছে শুনে সবার

www.pathagar.com

বুক কেঁপে উঠল। তারপর যখন শুনল, জাহাজে জনাপঞ্চাশেক জলদস্যু রয়েছে তখন তাদের আত্মা খাঁচাছাড়া হয়ে যাবার অবস্থা হল। পঞ্চাশজনের বিরুদ্ধে মাত্র দুজন লড়াই কারতে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে আত্মহত্যার জন্য এগিয়ে যাওয়া। তবু দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত লড়ে যেতে হবে। তারা ভোরের আলো ফোটার আগেই যুদ্ধের কৌশল স্থির করে ফেলল। দুজন করে চার দলে ভাগ হয়ে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আক্রমণ চালাবে। জলদস্যুরা যাতে মনে করে দ্বীপবাসীরা সংখ্যায় অনেক।

সকাল ছয়টা নাগাদ কুয়াশার পর্দা সরে গিয়ে পরিবেশ ক্রমশ ফরসা হয়ে এল। হার্ডিং চোখে দূরবীণ লাগিয়েই চমকে উঠল। দেখল, জাহাজ থেকে চার চারটে কামানের মুখই দ্বীপের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

একটু বাদেই জলদস্যুরা জাহাজ থেকে একটা ক্যানো নামিয়ে তাতে করে সাতজন বন্দুক পিস্তল নিয়ে দ্বীপের দিকে যাত্রা করল।

পাথরের আড়ালে বসে পেনক্রফট আর আয়রটন বন্দুক বাগিয়ে ক্যানোটার দিকে তাক করে বসে রইল। ক্যানোটা বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসামাত্র দু-দুটো বন্দুক গর্জে উঠল। ব্যস, দুজন জলদস্যু খতম হয়ে গেল।

জলদস্যু সর্দার কামান দাগল। বিরাট একটা আগুনের গোলা পেনক্রফট আর আয়ারটনের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে পাহাড়ের মাথায় আঘাত হেনে চূড়াটাকে গুঁড়িয়ে দিল।

ক্যানোটা মার্সি নদীতে এসে পড়ল। এবার স্পিলেট আর নেবের বন্দুক থেকে দুটো গুলি ছিটকে গিয়ে আরো দুজন জলদস্যুকে ঘায়েল করল।

ব্যস, আবার একটা কামানের গোলা প্রবল বেগে ছুটে এসে পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ল। পাথর টুকরো টুকরো হল বটে। কিন্তু দ্বীপবাসীদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না।

এদিকে চারজন জলদস্যু খতম হওয়ায় অবশিষ্ট তিনজন অনন্যোপায় হয়ে ক্যানোর মুখ ঘুরিয়ে জাহাজের দিকে প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল। বন্দুকের পাল্লার বাইরে থাকার জন্য হার্বাট ও হার্ডিং তাদের গুলি করার চেষ্টা করলেন না।

ক্যানোটা জাহাজের গায়ে ভেড়ামাত্র বারোজন জলদস্যু ঝটপট তাতে চেপে বসল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ থেকে আরো একটা ক্যানো নামিয়ে দিয়ে তাতে আটজন জলদস্যু চেপে তীরবেগে দ্বীপের দিকে এগিয়ে গেল। একটা ক্যানো ছুটে মার্সি নদীর দিকে আর দ্বিতীয়টা উপদ্বীপের দিকে এগোতে লাগল।

একটা ক্যানো বন্দুকের গুলির পাল্লার মধ্যে আসতেই আয়ারটন আর পেনক্রফটের বন্দুক থেকে দুটো গুলি ছিটকে বেরিয়ে এসে দুজন জলদস্যুকে ধরাশায়ী করে দিল। এবার ক্যানো থেকে একের পর এক গুলি বেরিয়ে এসে পাথরের গায়ে আছড়ে পড়তে লাগল।

এদিকে নেব আর স্পেলেট আটজন জলদস্যুর ক্যানোটার দুজন জলদস্যুকে খতম করতেই সেটা বার-কয়েক প্রচণ্ড দুরে উঠেই পাথরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল। তার ছয়জন জলদস্যু বন্দুক বাগিয়ে ধরে তীরে এসে দাঁড়াল তারা ছুটতে ছুটতে ফোর্টসাম পয়েন্টের দিকে গিয়ে উধাও হয়ে গেল।

পরিস্থিতি এবার সঙ্গীন দেখে পেনক্রফট আর হার্ডিং গ্রানাইট হাউসে গিয়ে আত্মগোপন করার জন্য ছুটতে লাগল।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, হার্ডিংয়ের অনুমান অভ্রান্ত। জাহাজটার নোঙর তুলে জলদস্যুরা খড়ির দিকেই এগোতে লাগল। জলদস্যু সর্দার বব হার্ডি এবার কামান দেগে চিমনিটা গুড়িয়ে দিতে লাগল। দ্বীপবাসীরা এরকমই আশঙ্কা করেছিল, জলদস্যুরা সবার আগে চিমনিটা গুঁড়িয়ে দেবে। কার্যত করলও তাই। দ্বীপবাসীরা অনন্যোপায় হয়ে গ্রানাইট হাউসে ঢুকে ঘাপটি মেরে রইল।

গ্রানাইট হাউসের জানালা দিয়ে আয়ারটন উঁকি মেরে দেখতে পেল খাড়ির মুখে জাহাজটা দাঁড়িয়ে। আর কামান থেকে অনবরত গোলা ছুড়ে চলেছে। চোখের পলকে একটা গোলা ছিটকে এসে গ্রানাইট হাউসের জানালার গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। জানালার গায়ে ডালপালা চাপিয়ে দিয়েই তারা আসল ভুলটা করেছিল। ন্যাড়া পাহাড়ের গায়ে ডালপালা দেখলে সবারই সন্দেহ হবার কথা। আবার ভুল পথে ছুটে এসেও কামানের গোলাটা জানালাটার গায়ে আঘাত হানতে পারে।

মুহূর্তে কীভাবে যে কী হয়ে গেল, দ্বীপবাসীরা টেরও পেল না। হঠাৎ জাহাজের দিক থেকে ভয়ঙ্কর একটা শব্দ বেসে এল। পর-মুহূর্তেই জলদস্যুরা সমবেত কণ্ঠে বিকট চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল। দ্বীপবাসীরা উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করে জানলায় এসে ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য চাক্ষুষ করল। একেবারেই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। এতবড় জাহাজ স্পিডি অকস্মাৎ যেন ছিটকে গিয়ে পড়ল বেশ কয়েক গজ দূরবর্তী গভীর পানিতে। তার তলা ফেঁসে গেল। জলদস্যুদের নিয়ে জাহাজের টুকরো দুটো চোখের পলকে পানিতে ডুবে গেল। দ্বীপবাসীরা তো দূরের ব্যাপার, জাহাজের এতগুলো জলদস্যুর কেউই বুঝতে পারল না এমন ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার কী করে ঘটে গেল।

* * *

জলদস্যুদের জাহাজ স্পিডি জলে তলিয়ে যাওয়ামাত্র দ্বীপবাসীরা গ্রানাইট হাউস থেকে বেরিয়ে ছুটোছুটি করে খাড়ির মুখে হাজির হল।

পেনক্রফট রহস্যটার মীমাংসা করতে গিয়ে বলল, 'আমি কিন্তু এর মধ্যে সামান্যতম রহস্যের গন্ধও পাচ্ছিনে। হয়ত বা অসতর্কতার জন্য জলদস্যুদেরই বন্দুকের গুলি ছিটকে গিয়ে বারুদের গুদামে পড়ে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে, জাহাজটা ধ্বংস হয়ে যায়।'

বেলা একটু বাড়লে জোয়ারের জল হুড়হুড় করে নামতে লাগল। এবার ভাঙা জাহাজের টুকরো দুটোর অনেকাংশ ভেসে উঠল। দ্বীপবাসীরা ছুটোছুটি করে জাহাজের টুকরো দুটোর ওপর উঠে জাহাজটা কেন ধ্বংস হয়েছে তার কারণ বের করতে প্রয়াসী হল।

পেনক্রফটের অনুমান সত্য নয়। জাহাজটার সামনের দিকটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু পিছনের দিকটা সম্পূর্ণ অক্ষত রয়ে গেছে।

গোলা বারুদের গুদাম ছিল জাহাজটার পিছনের দিকেই। তার কোনো ক্ষতিই হয় নি। অতএব বারুদের গুদামে আগুন লাগার ফলে জাহাজটা অবশ্যই ধ্বংস হয় নি। তবে? দ্বীপবাসীরা এর উত্তর খুঁজে পেল না।

একটু বাদেই আবার জোয়ার আসবে। তখন হুড়মুড় করে জল এসে জাহাজের টুকরোগুলোকে তলিয়ে দেবে। তাই দ্বীপবাসীরা ব্যস্তহাতে জাহাজ থেকে যন্ত্রপাতি, বাসনপত্তর, খাবারদাবার, বাক্স-পেটরা ও সিন্দুক প্রভৃতি নামিয়ে দ্বীপে নিয়ে যেতে লাগল। শুধু কি এই? গাদাগাদা বন্দুক পিস্তল আর সিল করা কুড়িটা বারুদের পিপে তারা নামিয়ে নিল।

সবশেষে প্রাণপণ চেষ্টার মাধ্যমে চার-চারটে কামানও দ্বীপবাসীরা নামিয়ে গ্রানাইট হাউসের গায়ে নিয়ে গেল। সেগুলোকে গ্রানাইট হাউসের চারটে জানালায় বসিয়ে দিল।

৩০ নভেম্বর হার্ডিং সমুদ্রের ধার দিয়ে আসার সময় একটা ভাঙা টর্পেডোর টুকরো কুড়িয়ে পেয়ে যারপরনাই বিস্মিত হলেন। স্পিডি জাহাজটা ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে এর যে যোগসাজোস আছে এ ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। জাহাজ ধ্বংস করতে ভয়ঙ্কর এ অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। রহস্য! গভীর রহস্য দ্বীপবাসীদের মধ্যে দানা বাঁধল। কে ভয়ঙ্কর এ অস্ত্রটা ছুড়ে জলদস্যুদের জাহাজ স্পিডিকে ধ্বংস করে দ্বীপবাসীদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে? বহু আলোচনা ও চিন্তা ভাবনা করেও দ্বীপবাসীরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না।

* * *

সাইরাস হার্ডিং আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় টর্পেডের জাহাজ ধ্বংসকারী ক্ষমতা অনেকবার চোখের সামনে দেখেছেন। তার কাছে ছোট্ট জাহাজ স্পিডি তো খুবই নগন্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন হিতাকাঙ্ক্ষী খাড়ির মুখে জাহাজ ধ্বংসকারী টর্পেডোটাকে রেখে দিয়ে দ্বীপবাসীদের অশেষ উপকার সাধন করেছে? দ্বীপবাসীরা আলোচনার মাধ্যমে সে অদৃশ্য হিতাকাঙ্ক্ষীর প্রসঙ্গে এল। আড়ালে থেকে দ্বীপবাসীদের একের পর এক উপকার করে বিভিন্ন সময়ে তাদের রক্ষা করছে। কে সে? কী-ই বা তার উদ্দেশ্য দ্বীপবাসীরা স্থির করে ফেলল, যে করেই হোক অজ্ঞাত পরিচয় হিতাকাঙ্ক্ষীকে তারা খুঁজে বের করবেই।

দ্বীপবাসীদের মনে নতুনতর এক ভাবনার উদয় হল। যে ছয়জন জলদস্যু ক্যানোটা উল্টে যাবার পর দ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছে তাদের খুঁজে বের করতে বদ্ধপরিকর হল। এ মুহূর্তে দ্বীপবাসীদের সামনে দুটো জরুরি কর্তব্য—অদৃশ্য হিতাকাঙ্ক্ষীকে খুঁজে বের করা আর পলাতক জলদস্যুদের বের করে নিজেদের নিরাপত্তা বজায় রাখা।

আয়ারটন খোঁয়াড়ে গিয়ে পশুদের পরিচর্যায় মন দিল। টেলিগ্রাফ মারফত কুশল জানিয়ে দিল।

এদিকে পেনক্রফট আর হার্বাটকে নিয়ে স্পিলেট বন-অ্যাডভেঞ্চারকে দেখতে গেল। কাছে গিয়ে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সেটা স্বাভাবিকভাবেই জলের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। তার কাছে গিয়ে পেনক্রফট চমকে উঠে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'এ কী সর্বনেশে কাণ্ড! নোঙরের দড়িতে এমন করে গিঁট দিল কে? এরকম গিঁট তো আমি কোনদিনই দিই নি। ব্যাপারটা সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে তারা বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়ল।

বিকেলের দিকে খোঁয়াড়ে আয়ারটনকে টেলিগ্রাম করা হল। আশ্চর্য ব্যাপার! তার দিক থেকে কোনো উত্তরই এল না।

আয়ারটন রাতে ফিরল না। সকালে আবার টেলিগ্রাফ করা হল। এবারও তার দিক থেকে কোনো জবাব এল না। ব্যাপারটা সবাইকে ভাবিয়ে তুলল। নেবকে গ্রানাইট হাউসের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রেখে বাকি চারজন গুলিভরা বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে খোঁয়াড়ের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। তারা টেলিগ্রাফের খুঁটি অনুসরণ করে এগোতে এগোতে মাইল দুই এসে একজায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, চুয়াত্তর নম্বর টেলিগ্রাফের খুঁটিটা মাটিতে পড়ে রয়েছে। কে বা কারা যেন সেটাকে উপড়ে ফেলেছে আর তারগুলোও ছিঁড়ে জাড়িয়ে রয়েছে।

www.pathagar.com

আতঙ্কিত দ্বীপবাসীরা ব্যস্তপায়ে খোঁয়াড়ের দিকে ছুটল। কাছাকাছি গিয়ে তারা আয়ারটনের নাম ধরে গলা ছেড়ে ডাকাডাকি করতে লাগল। না, খোঁয়াড়ের দিক থেকে কোনো প্রতি উত্তরই ভেসে এল না। তারা অধিকতর ক্ষিপ্রগতিতে এগোতে লাগল। আচমকা খোঁয়াড়ের দিকে থেকে একটা বন্দুকের গুলি ছুটে এসে হার্বাটের বুকে গেঁথে গেল। সে সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হার্ডিং আর স্পিলেট তাকে ধরাধরি করে খোঁয়াড়ে নিয়ে চলল। হঠাৎ একজন জলদস্যু একলাফে তাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তার বন্দুকের গুলি ছুটে এসে হার্ডিংয়ের টুপিটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। চোখের পলকে হার্ডিং তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতের ছুরিটা তার বুকে গেঁথে দিল। জলদস্যুটা বিকট আর্তনাদ করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। গল গল করে রক্ত বেরোতে লাগল ক্ষতস্থানটা দিয়ে। কয়েকবার দাপাদাপি করে হতচ্ছাড়াটা নিশ্চল নিথরভাবে এলিয়ে পড়ল।

এদিকে স্পিলেট পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারল, বন্দুকের গুলিটা হয়ত হার্বাটের ফুসফুস স্পর্শে করতে পারে নি। পাঁজর ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে। তবু কেন সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল?

পরের দিন, ১২ নভেম্বর হার্বাট সংজ্ঞা ফিরে পেল।

আয়ারটনকে খোঁয়াড়ে পাওয়া গেল না। কী হল তার? তবে কি সে আবার জলদস্যুদের দলে ভিড়ে গেল?

এদিকে নেবকে নিয়েও স্পিলেট আর হার্ডিংয়ের ভাবনার শেষ নেই। বলা তো যায় না, আয়ারটনকে ঘায়েল করার পর জলদস্যুরা হয়ত খোঁয়াড়ের ভেতরেই থেকে গিয়েছিল। তাদের আসতে দেখে চুপিচুপি গা ঢাকা দিয়েছে।

দ্বীপবাসীরা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিল, শিকারি কুকুর টপ খবর নিয়ে গ্রনাইট হাউসে যাবে। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে সে খবর নিয়ে আবার খোঁয়াড়ে ফিরে আসবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী হার্ডিং একটা চিরকুটে লিখলেন—'হার্বাট গুলিবিদ্ধ জখম। আমরা খোঁয়াড়ে অবস্থান করছি। তুমি যেন ভুলে গ্রনাইট হাউসের বাইরে বেরোবার চেষ্টা করো না। জলদস্যুদর কি কাছেপিঠে চোখে পড়েছে? টপকে দিয়েই খবর পাঠাও। সাবধানে থেকো।'

হার্ডিংয়ের লেখা চিঠিটা দাঁতে চেপে ধরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিকারি কুকুর টপ ছুটল গ্রানাইট হাউসের উদ্দেশ্যে।

এক ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই আচমকা বন্দুকের গুলির গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল। দ্বীপবাসীরা খোঁয়াড়ের দরজা সামান্য ফাঁক করতেই অদূরবর্তী ঝোপের ভেতর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেল। ঠিক তখনই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে টপ দরজার ফাঁকটুকু দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

তার দাঁতে চেপে রাখা নেবের লেখা চিরকুটটা নিয়ে হার্ডিং ব্যস্ততার সঙ্গে পড়তে লাগল—'না, গ্রানাইট হাউসের কাছে পিঠে জরদস্যুদের দেখা মেলে নি। আমি আপনাদের পরামর্শ অনুযায়ী গ্রানাইট হাউসের বাইরে যাব না। সাবধানে থাকব। ইতি–নেব।'

হ্যাঁ, দ্বীপবাসীদের অনুমানই তবে অভ্রান্ত। স্পিডি জাহাজটা ধ্বংস হয়ে গেলে ছয়জন জলদস্যু গুটি গুটি এসে খোঁয়াড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। জায়গাটা দ্বীপের একান্তে।

www.pathagar.com

খাবার দাবারের অভাব নেই। শুয়োর ছাগলের মাংস খেয়ে ছয়জন পিতৃদত্ত জীবনরক্ষা করতে পারবে। সবার সঙ্গেই বন্দুক ও কার্তুজ রয়েছে, আত্মরক্ষার চেষ্টা তো অন্তত করতে পারবে।

জলদস্যু ছয়জন খোঁয়াড়েই রয়ে গেল। আচমকা একদিন আয়ারটন একা খোঁয়াড়ে হাজির হল। তাকে অনায়াসেই তারা ঘায়েল করে ফেলল। কিন্তু পরবর্তীতে দ্বীপবাসীদের চারজনের দলকে আসতে দেখেই তারা বেগতিক দেখে ঝটপট গাঢাকা দিয়েছে।

২২ নভেম্বর। হার্বাটের ক্ষত প্রায় শুকিয়ে এসেছে। তবে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ সময় শুয়ে বসেই কাটায়। ভাগ্য ভালো সে গুলিটা চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল। নইলে হাত কেটে বাদ দেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকত না।

নেব নির্বাক। তার কাছ থেকে আর কোন খবরই আসে নি, তবে তার জন্য ভাবনা নেই। সে থাকতে গ্রানাইট হাউসে ঢোকা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়, তার ওপর দ্বীপবাসীদের একটু অন্তত ভরসা রয়েছে।

দ্বীপবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ সন্দেহ করছে আয়ারটন জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দেয় নি, জলদস্যুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের দলের সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু স্পিলেট ও পেনক্রফট কিছুতেই আয়ারটনকে এতটা নীচ ভাবতে পারল না।

সাতাশে নভেম্বর স্পিলেট টপকে সঙ্গে নিয়ে খোঁয়াড় থেকে প্রায় সোওয়া মাইল দূরবর্তী গভীর জঙ্গলে ঢুকে জলদস্যুদের তল্লাশে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে এক সময় চমকে উঠল। টপ হঠাৎ বিকট স্বরে ঘেউ ঘেউ করতে করতে উন্মাদের মতো দাপাদাপি করতে লাগল।

মনে হল ব্যাপারটা এমন যে, টপ যেন হঠাৎ কোন একটা রহস্যের গন্ধ পেয়ে এমন করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। একসময় সে ঝোপের মধ্যে প্রায় সমস্ত শরীরটাকে চালন করে দিয়ে একটা রক্তমাখা ন্যাকড়া বের করে আনল।

মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে স্পিলেট রক্তমাখা ন্যাকড়াটা নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে খোঁয়াড়ে হাজির হল। এক নজরে দেখেই বুঝা গেল, ন্যাকড়াটা গ্রানাইট হাউসের কারখানাতেই তৈরি। আয়ারটনের ওয়েস্ট কোর্টের ছেঁড়া টুকরো।

দ্বীপবাসীর এবার নিঃসন্দেহ হল আয়ারটন জলদস্যুদের দলে ভেড়া তো দূরের ব্যাপার তাকে রীতিমত টানাটানি করে, জোর জবরদস্তি করে নিয়ে যেতে হয়েছে।

তবে কি আয়ারটন এখনও জীবিত? কিন্তু তাকে তো খোঁয়াড়ের ভেতরে খুন করা হয় নি। অতএব সে হয়ত জীবিতই রয়েছে। এদিকে গ্রানাইট হাউসে ফিরে যাওয়ার জন্য হার্বাট পীড়াপীড়ি শুরু করে দিয়েছে। তার একদিন বাদে, ঊনত্রিশে নভেম্বর আবার টপের মধ্যে দারুণ অস্থিরতা লক্ষিত হল। সে গলা ছেড়ে ডাকাডাকি শুরু করে দিল, সেই সঙ্গে অনরবত লেজ নাড়াতে লাগল, তবে রাগতভাব নয়, খুশির প্রকাশ বলেই মনে হল। নির্ঘাৎ তার পেয়ারের কাউকে আসতে দেখেই তার মধ্যে এমন উল্লাস জেগেছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই একটা ছায়ামূর্তি এসে খোঁয়াড়ের দরজার কাছে দাঁড়াল। জাপ। তার গলায় একটা থলে ঝুলছে। স্পিলেট ছুটে গিয়ে থলের ভেতর থেকে এক চিলতে কাগজ বের করল। নেবের হাতের লেখা। তাতে লেখা—'শুক্রবার, সকাল ছয়টা। জলদস্যুরা প্লেটো আক্রমণ করেছে। —ইতি, নেব।'

www.pathagar.com

হার্বাট গ্রানাইট হাউসে যাবার জন্য যারপরনাই পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল।

অনন্যোপায় হয়ে দ্বীপবাসীরা গ্রানাইট হাউসে ফিরে যাওয়াই সাব্যস্ত করল।

গাড়িতে ওনেগা জুড়ে দেয়া হল। পেনক্রফট গাড়ি চালাতে লাগল। আহত হার্বার্টকে লতাপাতার বিছানায় শুইয়ে দেয়া হল। হার্ডিং আর স্পিলেট বন্দুক হাতে গাড়ির দুদিকে বসল।

গ্রানাইট হাউসের কাছাকাছি যেতেই পেনক্রফট বুকফাটা আর্তনাদ জুড়ে দিল—'হতচ্ছাড়াগুলো সব কিছু ছারখার করে দিয়ে গেল।'

পোলট্রি আর উইণ্ডমিল থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখে দ্বীপবাসীদের হা হুতাশ আর শতগুণ বেড়ে গেল।

গাড়ির চাকার ঘরঘর আওয়াজ শুনে নেব হাপিত্যেশ করতে করতে এগিয়ে এসে বলল, 'একটু আগে, আধঘন্টা হল হতচ্ছাড়া জলদস্যুরা সবকিছু ছাড়খার করে দিয়ে চম্পট দিয়েছে।'

গ্রানাইট হাউসের দরজায় পৌছে আহত হার্বাটকে নামাতে গিয়ে দেখা গেল, আবার তার সংজ্ঞা লোপ পেয়েছে। গায়ে জ্বর। গা যেন পুড়ে যাচ্ছে, পেরুভিয়ান গাছের চাল বা কুইনাইন, কিছুই নেই যা দিয়ে তার জ্বরের উপশম করানো যেতে পারে।

হার্ডিং ব্যস্ত পায়ে লেকের ধার থেকে উইলো গাছের ছাল নিয়ে এলেন। তার রস করে হার্বাটকে খাইয়ে দেয়া হল। তার লিভার আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখন ঘটেছে মস্তিষ্ক বিকৃতি। এর নাম ম্যালিগনান্ট ফিভার। কুইনাইন ছাড়া এর উপশম কিছুতেই হবার নয়। সে জলা থেকে এ জ্বরটা আমদানি করেছে। উইলো গাছের ছালে কুইনাইনের পরিমাণ খুবই নগণ্য।

কুইনাইন ছাড়া হার্বাটের জ্বর ছাড়ার নয় শুনে পেনক্রফট গম্ভীর হয়ে ভাবতে বসল, কোথায় কুইনাইন পাওয়া যেতে পারে।

এদিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য সংজ্ঞা ফিরে পেলেও পর মুহূর্তেই সে আবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। এমনি করেই সারাদিন কাটল, রাত্রিও কাটল একইরকম সঙ্গীন অবস্থার মধ্য দিয়েই। কুইনাইন না দিতে পারলে সে নির্ঘাত মৃত্যুর শিকার হবে। হার্বাটের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে পড়ল। ঠিক তখনই একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড গটে গেল। দেখা গেল, গ্রানাইট হাউসের দরজায় ছোট্ট একটা কৌটো পড়ে রয়েছে।

সাইরাস হার্ডিং দৌড়ে গিয়ে কৌটোটা হাতে নিয়ে দেখলেন, তার গায়ে তিনটে শব্দ লেখা রয়েছে 'সালফেট অব কুইনাইন।

কৌটোর মুখটা খুলতেই দেখা গেল, সাদা রঙের গুড়ো ভর্তি। প্রায় দুশো গ্রেন গুড়ো। স্পিলেট তার কয়েকটা দানা আঙুলে করে তুলে নিয়ে জিভে ঠেকিয়ে বুঝল, আস্বাভাবিক তেতো। অতএব এগুলো যে কুইনাইন এতে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রইল না।

দশদিন ধরে ঠিক তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর কুইনাইন খাইয়ে হার্বাটকে চাঙা করে তোলা সম্ভব হল। কিন্তু দুর্বলতা কাটাতে আরও কদিন সময় লাগল তবে তার নিরাময়ের ব্যাপারে স্পিলেটের অবদান যথেষ্ট। তার সেবাযত্নও হার্বাটের রোগ নিরাময়ের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। দলের সবাই তাকে এবার থেকে ডক্টর স্পিলেট বলে সম্বোধন করতে লাগল।

দ্বীপবাসীদের কাছে এখন দুটো কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। প্রথমত পাঁচ জলদস্যুকে নিপাত করা আর তাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর গোপন ঘাঁটির তল্লাশ করা।

www.pathagar.com

১৪ ফেব্রুয়ারি দ্বীপবাসীরা গ্রানাইট হাউস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। টপ আর জাপও সঙ্গে গেল। গ্রানাইট হাউস রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেউই রইল না।

ওনাগা গাড়ি টানছে। হার্বার্ট গাড়িতেই রইল। সে সুস্থ হলেও বনজঙ্গল আর পার্বত্যপথের ধকল সে সইতে নাও পারে।

গভীর জঙ্গলে ঢোকার পর একটা ব্যাপার সাইরাস হার্ডিংয়ের মনে দাগ কাটর। জন্তু-জানোয়াররা তাদের দেখেই উর্ধ্বশ্বাসে যে যেদিকে পারল প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল। ব্যাপারটা তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। তারা ইতিপূর্বে নিশ্চয়ই মানুষের বা জলদস্যুদের সংস্পর্শে এসেছিল। মানুষের নিষ্ঠুরতার পরিচয় না পেলে কখনও এমন ভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ছুটোছুটি দাপাদাপি করতে পারে না।

পথ চলতে গিয়ে ছেঁড়া লতাপাতা, ভাঙা ডালপালা এবং আধপোড়া কাঠ ও ছাই দেখে জলদস্যুদের খোঁজ মিলল বটে। সে সঙ্গে মাটিতে পায়ে ছাপও এখানে ওখানে দেখতে পেল।

ঝর্নার ধারে প্রায় সমতল একটা অতিকায় পাথরের ওপর শুয়ে বসে দ্বীপবাসীরা রাত কাটাল। ভোরের আলো ফুটলে ঝর্নার পাড় ধরে হাঁটাহাঁটি করতে গিয়ে তারা জলদস্যুদের কটা পায়ের ছাপ দেখতে পেল। অনুসন্ধিৎসু নজরে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসতে পারল, পাঁচজনের পায়ের ছাপ রয়েছে। দ্বীপবাসীরা নিঃসন্দেহ হল, জলদস্যুরা অবশ্যই আয়ারটনকে দলে ভেড়াতে পারে নি। অর্থাৎ সে তার পুরানো ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় নি।

দ্বীপবাসীরা পরের দিন দ্বীপের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার! জলদস্যুর দল বা সে হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের টিকির নাগালও পেল না।

* * *

এতো ভারী অবাক কাণ্ড! ব্যাপার কী! জলদস্যুরা কোথায় গা-ঢাকা দিল! তবে কি ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের কোন গোপন গুহায় হতচ্ছাড়গুলো লুকিয়ে রয়েছে? সাইরাস হার্ডিং পরামর্শ দিরেন, খোঁয়াড়কে কেন্দ্র করে তল্লাশি চালানো হোক। সবাই এক কথায় তাঁর প্রস্তাবের রাজি হয়ে গেল। তবে সেখানে ঢোকার আগে ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে জলদস্যুরা ইতিমধ্যে সেখানে ঘাঁটি গেড়েছে কিনা।

উনিশে ফেব্রুয়ারি কেবল পেনক্রফটকে নিয়ে স্পিলেট খোঁয়াড়ের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

খোঁয়াড়ের সদর দরজার কাছাকাছি গিয়ে তারা মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে সামান্য আঁচ নিয়ে নেবার চেষ্টা করল। খোঁয়াড়ের দরজা বন্ধ। সামনের ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে দরজায় হাজির হওয়াই সমস্যা, রীতিমতো ঝুঁকির ব্যাপার। শত্রুপক্ষ, জলদস্যুরা ভেতর থেকে দমাদম গুলি চালাতে শুরু করলে এক মিনিটও লাগবে না দুজনকে ধরাশায়ী করতে।

দরজা যখন ভেতর থেকে বন্ধ তখন হতচ্ছাড়াগুলো নির্ঘাত খোয়াড়ের ভেতরেই মাথা গুঁজেছে।

তারা রাতের অন্ধকার নামার অপেক্ষায় ঝোপের আড়ালে বসে রইল। অন্ধকার নেমে এলে স্পিলেট আর পেনক্রফট প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগিয়ে দরজার কাছে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। দরজাটা কোলা। একটু আগে, অন্ধকার নামার আগেও দরজাটা বন্ধ ছিল। তবেকি জলদস্যুরা অন্ধকারে চম্পট দিয়েছে? ইতিমধ্যে সাইরাস হার্ডিং ভেতরে ঢুকে পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে ধারণা নিয়ে এসেছে। মিটমিট করে আলো জ্বলছে।

www.pathagar.com

আলোর কথা শুনে কাপ্তেন সাইরাস হার্ডিং গলা নামিয়ে প্রায় অস্ফুটস্বরে বললেন, 'শয়তানগুলো তবে খোঁয়াড়ের ভেতরেই রয়েছে। হতচ্ছাড়া জলদস্যুদের খতম করার এটাই অপূর্ব সুযোগ।' কথা বলতে বলতে তিনি অন্যান্যদের নিয়ে গুটি গুটি ভেতরে ঢুকে গেলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তারা ছাউনির দরজায় পৌঁছে গেলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিতেই চোখে পড়ল, একজন মেঝেতে শুয়ে।

কাপ্তেন সাইরাস হার্ডিং এবার এগিয়ে এসে ভেতরে উঁকি দিয়েই ঝট করে একেবারে খাড়া হয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন, 'আরে এ যে আয়ারটন।'

তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই অন্য সবাই হুড়মুড় করে পাতার ছাউনিটার ভেতরে ঢুকে গেল। আয়ারটন আহত। কথা বলার শক্তি ধরতে গেলে রহিত।

সাইরাস হার্ডিংয়ের নির্দেশে গাড়িটাকে খোঁয়াড়ের ভেতরে নিয়ে আসা হল।

এমন সময় টপ আর্তনাদ করতে করতে দ্বীপবাসীদের কাছে ফিরে এল। তার এমন অস্থিরতায় দ্বীপবাসীরা নতুনতর কোনো রহস্যের গন্ধ পেলেন। টপ কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল না, সে অনবরত ঘেউ ঘেউ করতে করতে অন্ধকার বনভূমির দিকে ছুটতে লাগল। দ্বীপবাসীরা গুলিভরা বন্দুক বাগিয়ে ধরে লম্বা লম্বা পায়ে তাকে অনুসরণ করতে লাগল। বেশকিছুটা পথ গিয়ে টপ একজায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দ্বীপবাসীরা এগিয়ে গিয়ে দেখল, প্রায় সমতল একটা পাথরের ওপর পাঁচ পাঁচটা মৃতদেহ এলিয়ে পড়ে রয়েছে। তাদের বুঝতে ভুল হল না, শয়তান জলদস্যুদের মৃতদেহ এগুলো। শত্রুরা নিপাত হয়েছে।

* * *

এ কী অবিশ্বাস্য কাণ্ড! এমন এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার কী করে সম্ভব হল! ষণ্ডামার্কা পাঁচ পাঁচটা জলদস্যুকে কে ঘায়েল করল?

সকাল হল। আয়ারটনের সংজ্ঞা ফিরে এল। তবে খুবই দুর্বল। কথা বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। তবু ক্ষীণকণ্ঠে, দম নিয়ে নিয়ে নিজের দুঃখ দুর্দশার কথা কাপ্তেন সাইরাস হার্ডিংয়ের কাছে বলতে লাগল। সে যেদিন খোঁয়াড়ে হাজির হয়েছিল সে রাতেই জলদস্যুরা তার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে হাত পা বেঁধে ফেলল। শেয়াল কুকুরের মতো টানতে টানতে নিয়ে গেল তাদের গুহায়। সে গুহাটাই ছিল তাদের মাথাগোঁজার জায়গা। তাদের একজন তাকে চিনে ফেরল—সে অস্ট্রেলিয়ার বেন জয়েস। তাদেরই দলে ছিল। তাই তাকে হত্যা করতে গিয়ে বাঁচিয়ে রাখল। আয়ারটনই একসময় অস্ট্রেলিয়ার জলদস্যুদের দলে থাকার সময় বেন জয়েস নামে পরিচিত ছিল। ব্যস, তাকে আবার দলে টানার জন্য জলদস্যুরা সাধ্যমতো প্রায়াস চালাতে লাগল। তাদের ইচ্ছা ছিল, দ্বীপবাসীদের ঘায়েল করে দ্বীপের সর্বময় কর্তৃত্ব দখল করবে।

আয়ারটন কিন্তু শত নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতনেও দ্বীপবাসীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজি হল না। পাষণ্ড জলদস্যুরা তার চোখ ও কান দুটো প্রায় নষ্ট করে দিয়েছে। খুবই ক্ষীণ তার দৃষ্টিশক্তি আর ধরতে গেলে কানে শোনেই না।

এর পরের ঘটনা কিছুই সে বলতে পারল না। কীভাবে যে সে খোঁয়াড়ে এসেছে তাও তার অজানা। এও এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড বটে। আয়ারটনকে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হল মৃতদেহ পাঁচটার কাছে। রহস্যজনক ব্যাপারটা তার মধ্যেও কম বিস্ময়ের সঞ্চার করল না।

মৃতদেহগুলো বার বার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও কোনো ক্ষতচিহ্ন লক্ষিত হল না। তবে প্রত্যেকের দেহে একটা করে বিশেষ চিহ্ন দেখা গেল। তবে সবার দেহের একই

www.pathagar.com

স্থানে অবশ্যই নয়। কারোর হাতে, কারোর বুকে, কারোর পিঠে আবার কারোর কাঁধে অত্যাশ্চর্য চিহ্ন আঁকা রয়েছে। বিশেষ ধরনের অস্ত্রের দাগ। মনের করা যেতে পারে মারণাস্ত্রটা বিদ্যুৎচালিত।

সবার মনেই একই প্রশ্ন চক্কর মারতে লাগল, অস্ত্রটা যে ধরণেরই হোক না কেন জলদস্যুদের খতম করে দ্বীপবাসীদের পথের কাঁটা সরিয়ে দিয়েছে? তাকে খুঁজে বের করা এমুহূর্তে দ্বীপবাসীদের প্রথম ও প্রধান কাজ। আরও একটা জরুরি কাজ তাদের সেরে ফেলতে হবে। ট্যাবর দ্বীপের প্রন্তে একটা বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দিতে হবে। বলা তো যায় না, নইলে ডানকান জাহাজ এসে ফিরে যেতে পারে।

দ্বীপবাসীরা সবাই মিলে আর একটা বড়সড় নৌকা তৈরি করে ফেলল। এত বড় একটা নৌকা তৈরি করতে পাঁচ ছয় মাস লেগে গেল। এ সময়ে তারা আশ্রয় নিয়েছিল আগ্নেয়গিরির জঠরে। একদিন যে পর্বত উত্তপ্ত গলিত লাভাস্রোত আর বিষাক্ত গ্যাস উদগীরণর করতে আজ তাই মানুষের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে।

দ্বীপবাসীদের সবার মধ্যে একই চিন্তা কাজ করে চলেছে, কোথায় হিতাকাঙ্ক্ষী পরোপকারী অধিদেবতা? দেখা দাও, একটিবারের জন্য তোমাকে দেখে চোখ ও মনকে তৃপ্ত করা সুযোগ দাও। সুযোগ দাও কৃতজ্ঞতা জানাবার। কিন্তু কোথায় সে অদৃশ্য বান্ধব, দ্বীপবাসীদের আত্মার আত্মীয়? অলৌকিক শক্তিধর সে মহাত্মা কি তবে কোথাও নেই? এতগুলো মানুষের ধারণা কি শেষপর্যন্ত ভ্রান্ত হয়ে যাবে?

২৫ ফেব্রুয়ারি দ্বীপবাসীরা সদ্য তৈরি বিশালায়তন নৌকাটায় চেপে গ্রানাইট হাউসে ফিরে এল। হার্বার্ট সম্পূর্ণ সুস্থ। আয়ারটনও প্রায় স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে।

* * *

ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের মাথা দিয়ে তিরতির করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পাহাড়টা তবে মৃত আগ্নেয় পাহাড় নয়। এতদিন সুপ্ত অবস্থায় ছিল। আজ আবার জেগে উঠেছে। আগুন, গলিত লাভা আর বিষাক্ত গ্যাস নির্গত করতে শুরু করেছে। তবে এখনো পুরোপুরি জেগে ওঠে নি। কিন্তু যদি সে রুদ্ররূপ ধারণ করে তবে লিঙ্কলন দ্বীপের চেহারা কি আর এরকম থাকবে? রীতিমত একটা আগুনের কুণ্ডে পরিণত হতে দেরি লাগবে না। আর যদি পাহাড়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে, আগেকার সে পথে লাভাস্রোত গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে তবে খোঁয়াড়টা চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বিপদ দুয়ারে হানা দিতে চলেছে। করে যে দ্বীপবাসীদের ওপর ঈশ্বরের অভিশাপস্বরূপ লাভাস্রোত গড়িয়ে এসে পড়ে জীবন্ত দগ্ধে মারবে তাই বা কে বলতে পারে। পাহাড়ের মাথা দিয়ে তিরতির করে ধোঁয়া অনবরত বেরিয়েই চলেছে। তাই দ্বীপবাসীরা দ্বিগুণ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে জাহাজ তৈরির কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। জাহাজের কাঠামো তৈরির কাজ অনেক আগেই সেরে ফেলেছে। এখনো অনেক অনেক কাজ বাকি। অক্টোবরের পনের তারিখে একেবারে নতুনতর অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড ঘটে গেল।

দ্বীপবাসীরা নৈশভোজ সেরে গল্পগুজবের মাধ্যমে সারাদিনের ক্লান্তি অপনোদনে লিপ্ত। হঠাৎ খোঁয়াড়ের কলিং বেল বেজে উঠল। সবাই তো রীতিমতো স্তম্ভিত। আশ্চর্য ব্যাপার তো! খোঁয়াড়ে তো কেউই নেই। তবে? সেখান থেকে কলিং বেল বাজিয়ে সঙ্কেত দিচ্ছে কে? এ কী অলৌকিক কাণ্ডরে বাবা!

www.pathagar.com

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে পেনক্রফট মুখ খুলল, 'শুননু মি. হার্ডিং, যেই কলিং বেল বাজান না কেন, আবার বাজাবেন। আর বাজাচ্ছেন নির্ঘাত সেই তিনি, আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত অধিদেবতাটি।'

হ্যাঁ, পেনক্রফটের ধারণা অভ্রান্ত প্রামাণিত হল। মিনিট দুয়ের মধ্যে আবার ঘণ্টাধ্বনি হল। হার্ডিং একলাফে যন্ত্রের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যালো, কী চাই? কাকে চাই? কে আপনি?'

হার্ডিংয়ের প্রশ্নগুলোকে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে গিয়ে বিপরীত দিকের কণ্ঠস্বরের মালিক খুবই ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলে উঠল, 'এক্ষুনি চলে আসুন, যত শীঘ্র সম্ভব খোঁয়াড়ে চলে আসুন।'

ব্যস, আর কোনো কথা শোনা গেল না। ব্যাপারটা হার্ডিংয়ের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করল। হ্যাঁ, এমনটা হবার কথাই তো বটে। দ্বীপে পা দেবার পর থেকে যিনি সবার অলক্ষে থেকে একের পর এক অবিশ্বাস্য ঘটনার মাধ্যমে রহস্য সঞ্চার করে চলেছেন তার দর্শন দ্বীপবাসীরা অচিরেই পেয়ে যাবেন।

কেবলমাত্র জাপ আর টপের জিম্মায় গ্রানাইট হাউসটা রেখে দ্বীপবাসীরা খোঁয়াড়ের উদ্দেশ্য রওনা হল। খোঁয়াড়ে পা দিয়েই দ্বীপবাসীরা হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়ার জোগাড় হলেন। কোথায় সে বাঞ্ছিত ব্যক্তি? কোথায় অধিদেবতা? খোঁয়াড় ফাঁকা।

সাইরাস হার্ডিং তাঁর নির্দেশ স্পষ্ট শুনেছেন, 'এক্ষুনি চলে আসুন। যতশীঘ্র সম্ভব খোঁয়াড়ে চলে আসুন।'

ব্যাপারটা এবার হার্ডিংয়ের কাছে খোলসা হয়ে গেল। টেলিগ্রাফটা অবশ্যই খোঁয়াড় থেকে করা হয় নি। পুরনো তারের সঙ্গে তারের সংযোগ সাধন করে বার্তা প্রেরক নিজের আস্তানা থেকে টেলিগ্রাফ করেছিল।

তার অনুমানটা আরও বিশ্বাসযোগ্য হল যখন তাকের ওপর চিরকুট পাওয়া গেল। হার্ডিং সেটা তুলে চোখের সামনে ধরতে একটা মাত্র ছত্র দেখতে পেলেন, 'নতুন তার ধরে ধরে চলে আসুন।'

মুহূর্তমাত্রও সময় নষ্ট না করে হার্ডিং টেলিগ্রাফের নতুন তার অনুসরণ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন। অন্যান্যরা চলল তার পিছন পিছন। চলল তারটা পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেছে। আকাশে মেঘের আস্ফালন। পিলে চমকানো বাজ পড়ার আওয়াজ আর বিদ্যুতের ঝলকানি। এ যেন রীতিমত এক প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটতে চলেছে।

দ্বীপবাসীরা যখন দ্বীপের পশ্চিমদিকে হাজির হল তখন রাত্রি এগারোটার কাছাকাছি। এখান থেকে তার বাঁক নিয়ে পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে তারা এক সময় একেবারে সমুদ্রের ধারে হাজির হল।

হার্ডিং দেখলেন, একটা সুড়ঙ্গ জলের তলা দিয়ে এগিয়ে গেছে। তার ভেতর দিয়ে তারটা চলে গেছে। গুহার মুখের কাছাকাছি ছোট্ট একটা ক্যানো বাঁধা দেখতে পেল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সবাই সেটায় চেপে বসল। আয়ারটন, পেনক্রফট আর নেব দ্রুত হাত চালিয়ে দাড় টেনে ক্যানোটাকে সুড়ঙ্গটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। সুড়ঙ্গের ছাদটা ধনুকের মতো বাঁকানো। তারের লাইন ধরে তারা ক্যানোটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

সুড়ঙ্গটা ক্রমেই চওড়া হতে লাগল। ব্যাপারটা এমন হল যে সেটা যেন পাতালের কোনো একটা হ্রদে গিয়ে শেষ হয়েছে।

www.pathagar.com

হ্যাঁ, দ্বীপবাসীদের অনুমান অভ্রান্তই বটে, সুড়ঙ্গটা এগোতে এগোতে একসময় একটি সুবিশাল হ্রদে গিয়ে শেষ হয়েছে। ক্যানোটা হ্রদে পড়তেই জলে অতিকায় একটা বস্তুকে ভাসতে দেখা গেল। এমনই বিশাল সে, ঠিক যেন একটা তিমি মাছ ভুস করে জলের ওপরে ভেসে উঠেছে। কিন্তু মাকুর মতো। দুদিন ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। আরো আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে তার একপ্রান্তে জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। সে দুটো দিয়ে বৈদ্যুতিক আলোর অত্যুজ্জ্বল দ্যুতি যেন বেরিয়ে আসছে।

ভাসমান অত্যাশ্চর্য বস্তুটার আরো কাছাকাছি ক্যানোটাকে নিয়ে গেলে দেখা গেল, তার দৈর্ঘ্য কম হলেও আড়াইশো ফুট তো হবেই। আর উচ্চতা? দশ-বারো ফুট। একেবারেই স্থিরভাবে জলের ওপরে ভাসছে।

দ্বীপবাসীরা, বিশেষ করে সাইরাস হার্ডিং উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপতে লাগলেন। হার্ডিং আচমকা স্পিলেটের হাত দুটো চেপে ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করলেন, 'তিনিই! হ্যাঁ, আমি বলছি তিনিই বটে! তিনি ছাড়া অন্য কেউই হতে পারেন না, অবশ্যই না।' কথা বলতে বলতে এক পা সরে গিয়ে স্পিলেটের কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় অস্ফুটস্বরে একটা নাম বললেন।

নামটা কানে যেতেই স্পিলেট যন্ত্রচালিতের মতো ঝট করে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নামটা তারও পরিচিত। ভয়ঙ্কর এক আপরাধী, সমাজবিরোধী! জেল পলাতক কয়েদি!

সাইরাস হার্ডিং ভাগ্য ঠুকে সদলবলে অতিকায় বস্তুটার ওপর উঠে গেলেন। ওপরের চৌকোণা ডালটা তুলে যন্ত্রচালিতের মতো সবাই ঝপাঝপ লাফিয়ে নিচে নেমে গেল। ভেতরটা অনেকটা জাহাজের ডেকের মতো দেখতে। অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় দিনের মতো ঝকমক করছে।

সাইরাস হার্ডিং এগিয়ে গিয়ে একপ্রান্তে দরজার পাল্লা হেঁচকা টানে খুলে ফেললেন অত্যাধুনিক দ্রব্যসামগ্রীতে সাজানো গোছানো একটা ঘর। তার পাশেই গ্রন্থাগার। বড় বড় আলমারি ও তাকগুলো দেশী-বিদেশী বইয়ে ঠাসা। এবার দরজা ঠেলে এমন এক ঘরে গেলেন যাকে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যসামগ্রীর মিউজিয়াম বলা চলে।

ঘরটার দ্রব্যসামগ্রীর ওপর চোখ বুলাতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন, এক বৃদ্ধ আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বসে।

হার্ডিংয়ের চিনতে ভুল হল না, ইনি ক্যাপ্টেন নিমো। ধীরপায়ে দুপা এগিয়ে গিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে উচ্চরণ করলেন, 'ক্যাপ্টেন নিমো, আমরা এসেছি। আপনার নির্দেশ পেয়ে আমরা এসেছি।'

সাইরাস হার্ডিংয়ের উপস্থিতি ভদ্রলোক এতক্ষণ টের পান নি। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন। অত্যুজ্জ্বল চোখের মণি দুটোতে এমন এক সুস্পষ্ট ছাপ তিনি লক্ষ করলেন, যেন কারো হুকুম তামিল করতে নয়, হুকুম পালন করানোই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় মুনি-ঋষিদের মতো লম্বা পাকা দাড়ির গোছা বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। একনজর দেখলেই স্পষ্ট বুঝা যায় এক সময়ের দীর্ঘাকৃতি দশাসই চেহারা আজ জরার কবলে পরে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'আমি নাম-গোত্রহীন। আমার কোনো নামই নেই।'

'সে যা-ই হোক, আপনার সব বৃত্তান্ত আমার জানা আছে ক্যাপ্টেন।'

'ভালো কথা। যদি জেনেই থাকেন তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। আমি তো পরপারের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েই রয়েছি।'

www.pathagar.com

স্পিলেট বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেন নিমোর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, হার্ডিং ওনাকে ভালোই চেনেন দেখা যাচ্ছে। নাম ধাম সবই জানেন, কী করে সম্ভব হল?

ক্যাপ্টেন নিমোর কথায় স্পিলেটের ভাবনায় ছেদ পড়ল।

ক্যাপ্টেন নিমো হার্ডিংয়ের মুখের পর নিস্তেজ চোখেরমণি দুটোকে আবদ্ধ রেখেই বললেন, 'আপনি আমাকে চেনেন বলছেন? আমার আগের নাম জানেন আপনি?'

'হ্যাঁ, জানি। আপনার ডুবো জাহাজ নোটিরাসের ব্যাপার স্যাপারও আমার নখদর্পণে।'

'আশ্চর্য ব্যাপার তো! আমি তো একনাগড়ে তিন তিনটা বছর সাগরের তলায় স্বেচ্ছা নির্বাসন, অজ্ঞাতবাসে—খবরটা চাউর করল কে?'

'এমন এক ব্যক্তি আপনার অজ্ঞাতবাসের খবরটা চাউর করেছে যার ওপর আনপার প্রভাব থাকার কথা নয়। আবার বিশ্বাসঘাতক বলেও তাকে ধিক্কার দিতে পারবেন না ক্যাপ্টেন।'

'হ্যাঁ, এবার ধরতে পেরেছি। এক ফরাসি ভদ্রলোক। নাম তাঁর অধ্যাপক ম্যারোনাক্স। ষোল বছর আগে ধরতে গেলে ধূমকেতুর মতোই তিনি একদিন হঠাৎ জাহাজে এসে পড়েছিলেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নরওয়ের কুখ্যাত ঘূর্ণিপাকে পড়ে তিনি পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন।'

'ঠিকই। প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। স্বদেশের মাটিতে ফিরে আপনার বৃত্তান্ত, আপনার নোটিলাসের কীর্তিকথা নিয়ে 'টোয়েন্টি থাউজেন্ড লগিস আন্ডার দ্য সি' নামে এক মহামূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।'

'আমার জীবনের মাত্র সাত মাসের কীর্তিকথা বলুন।'

'হলই বা সাত মাসের, তাতেই আপনি বিখ্যাত ও স্মরণীয় হয়ে উঠেছেন।'

'বিখ্যাত? স্মরণীয়? অপরাধী, সমাজবিরোধী হিসেবে বিখ্যাত?'

ক্ষীণকণ্ঠে সাইরাস হার্ডিং উচ্চারণ করলেন, 'ক্যাপ্টেন নিমো, আপনার অতীত কীর্তিকথা নিয়ে সমালোচনা করা একেবারেই এক্তিয়ার বহির্ভূত। এরকম বিচিত্র জীবনযাপনের পথ যে কেন আপনি বেছে নিয়েছিলেন তা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তা জানার তিলমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই। তবে এটুকু জানি আমরা লিঙ্কলন দ্বীপে আসামাত্র আপনি পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, অভিন্নহৃদয় বন্ধু ও আত্মার আত্মীয়রূপে আমাদের প্রতিমুহূর্তে রক্ষা করেছেন। একমাত্র আপনার অকৃত্রিম স্নেহ-মায়া-মমতার জন্যই আমরা আজও পৃথিবীতে নিজেদের অস্তিত্ব অব্যাহত রাখতে পেরেছি।'

ক্যাপ্টেন নিমো আরাম কেদারাটায় সোজা হয়ে বসতে বসতে বললেন, 'আমার অতীত কাহিনী আগে আপনারা শুনুন। সবকিছু শুনে, বিচার বিবেচনা করে যা বলার তারপরই না হয় বলবেন।'

ক্যাপ্টেন নিমো নিজের প্রসঙ্গে যা কিছু বললেন তা মোটামুটি এরকম, 'ক্যাপ্টেন নিমো একজন ভারতীয়। একসময় স্বাধীন রাজ্য বুন্দেলখণ্ডের রাজকুমার ছিলেন। তিনি রাজকুমার ডক্কার নামে পরিচিত ছিলেন। রাজা পুত্রকে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য ইউরোপে পাঠান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষালাভান্তে স্বদেশে ফিরে অন্তত বুন্দেলখণ্ডকে যাতে ইউরোপীয় ধাঁচে গড়ে তুলে উন্নত রাজ্যে পরিণত করতে পারেন। রাজপুত্র ডাক্কার

www.pathagar.com

ছিলেন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন। দীর্ঘ বিশ বছর সে-দেশে অবস্থান করে তিনি বিজ্ঞান. শিল্প আর সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। সেই সঙ্গে সমগ্র ইউরোপে ঘুরে বেড়ালেন। একে রাজকুমার তার ওপর অগাধ বিত্তসম্পদের অধিকারী। তাই সবাই তাঁকে খুবই খাতির করত।

রাজকুমার ডক্কারের মধ্যে চিরদিনই বিলাস ব্যসন ও আনন্দ স্ফূর্তির প্রতি দারুণ অনীহা ছিল। জ্ঞানলাভের জন্য তিনি প্রতিনিয়ত মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করতেন। ভবিষ্যতে তিনি যাতে এক স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতির কর্ণধার হয়ে উঠতে পারেন এটাই ছিল তাঁর উচ্চাভিলাষ—সর্বক্ষণের ভাবনা।

১৮৪৮। রাজকুমার ডক্কার বুন্দেলখণ্ডে স্বদেশের মাটিতে ফিরে এলেন। বিয়ে থা সংসার পাতলেন। দুই পুত্রের পিতা হলেন। কিন্তু ঘরের বাঁধন তাকে আটকে রাখতে পারল না। মহৎ ব্রতে নিজেকে আহূতি দিলেন। আর তাতেই আত্মমগ্ন হয়ে রইলেন।

এল ১৮৫৭ সাতান্ন খ্রিস্টাব্দ। সিপাহী বিদ্রোহে ভারতবর্ষে উত্তাল হয়ে উঠল। বিদ্রোহের আগুন থেকে রাজকুমার ডক্কার নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে না। যুদ্ধে সমিল হলেন। দশটা যুদ্ধে সর্বাঙ্গে বিশ-বিশটা ক্ষতচিহ্ন আঁকলেন। বিদ্রোহীরা এঁটে উঠতে পারল না। পরাজয়ের গ্লানি গায়ে মেখে নিতে বাধ্য হল। লড়াই করতে গিয়ে রাজকুমার ডক্কার এমন অসম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন যার ফলে তাঁর নাম ভারতীয়দের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাঁর দিকে ইংরেজ শাসকের শ্যেন দৃষ্টি পড়ল। ঘোষণা করলেন, তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার দেবেন। উপায়ান্তার না দেখে রাজকুমার ডক্কার গোপন আস্তানায় আশ্রয় নিলেন।

ইংরেজ শাসকরা আবার স্বাধীন রাজ্যগুলোকে এক-এক করে গ্রাস করে নিল। বুন্দেলখণ্ডের পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করলেন রাজকুমার ডক্কার। এতদিনের ইচ্ছা, এতদিনের সাধনা আর প্রায়স মুহূর্তের মধ্যে তাসের ঘরের মতো ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে এ তো হতে দেয়া যায় না। কিন্তু তিনি নিরুপায়, অসহায়। সভ্যসমাজ ও সভ্যজাতের ওপর তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন, বিষিয়ে উঠল মনপ্রাণ। তাই বিত্তসম্পদ যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা একত্র করলেন। বিশ জন একান্ত অনুগত ভক্ত নিয়ে বিফল মনোরথ রাজকুমার ডক্কার একদিন বেপাত্তা হয়ে গেলেন। কেউই তাঁর হদিস পেল না। সবার মনেই একই প্রশ্ন, লোকটা কি কর্পূরের মতো উবেই গেল নাকি? ব্যস, তারপর থেকে তিনি বেপাত্তা হয়েই রইলেন।

বিফলকাম হতোদ্দম রাজকুমার ডক্কার তাঁর অনুগামীদের নিয়ে অতল সমুদ্রের তলদেশে আশ্রয় নিলেন। সেখানে কারোর হুকুম খাটে না। শ্বেতাঙ্গরা যেখানে তার টিকির নাগালও পাবে না এরকমই এক স্বাধীন রাজ্য হল তাঁর আশ্রয়স্থল।

একদিন প্রশান্ত মহাসাগরের এক আখ্যাত অবজ্ঞাত জনমানবহীন দ্বীপে তাঁকে অনুগামীদের সঙ্গে দেখা গেল। জাহাজ তৈরির কারখানা গড়ে তোলা হল। নিজেরই তৈরি নকশা অনুযায়ী বানিয়ে ফেললেন অত্যাধুনিক এক সাবমেরিন। সমুদ্রের তলদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপায় আবিষ্কার করলেন। সে শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কেবল সাবমেরিনটা চালনাই নয়, সাবমেরিনের ভেতরের বায়ু উত্তপ্ত রাখা, বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো প্রভৃতি বিভিন্ন অবিশ্বাস্য কাজ সম্পান্ন করতে লাগলেন। সাবমেরিনটা তৈরি করে পৃথিবীর কারিগরি বিদ্যার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন রাজকুমার ডক্কার। সমুদ্রের তলদেশে অফুরন্ত খাদ্যসম্ভার। নিজে ক্যাপ্টেন নিমো ছদ্মনাম ধারণ

www.pathagar.com

করলেন। ব্যস, ক্যাপ্টেন নিমো এবার আশ্চর্য জলযান নোটিলাসকে নিয়ে সাগর-মহাসাগরের বুকে চক্কর মেরে বেড়াতে লাগলেন।

নোটিলাস ক্রমে উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু, পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল। সমুদ্রের বুকে কত জাহাজ কত সব ধনসম্পদ নিয়ে নিমগ্ন হয়, ক্যাপ্টেন নিমো তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সে-সব সংগ্রহ করে নিজের প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করতে লাগলেন। তার একটা বড় অংশ স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। তিনি সাহায্য সহযোগিতা করে যান ঠিকই, নিজের পরিচয় সতর্কতার সঙ্গে গোপন রেখে চললেন।

সেটা ছিল ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ। ক্যাপ্টেন নিমো পৃথিবীর সভ্য সমাজ সংসার থেকে নিজেকে সতর্কতার সঙ্গে গোপন রেখে চললেও একদিন ঘটনাচক্রে তিনজন নোটিলাসে আশ্রয় নিলেন। তাঁদের একজনের নাম অধ্যাপক অ্যারোনাক্স এক ফরাসি প্রবীণ। আর একজন তাঁর গৃহভৃত্য, তৃতীয়জন একজন জেলে। সমুদ্রের দানব ভেবে আমেরিকার এক জাহাজ নোটিলাসের পিছু নেয়। আক্রমণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। কিন্তু নোটিলাসের সঙ্গে চক্কর মেরে নিজেই হুড়মুড় করে পানির তলায় তলিয়ে যায়। তারই তিনজন যাত্রী নোটিলাসে আশ্রয় নেয়। অধ্যাপক অ্যারোনাক্সর মুখেই ক্যাপ্টেন নিমো জানতে পারেন, পৃথিবীর মানুষ নোটিলাসকে জলদস্যুদের জাহাজ বলেই জানে। ক্যাপ্টেন নিমো তিনজনকে নোটিলাসের ভেতরে কয়েদ করে রাখেন। পৃথিবীর মানুষের কাছে তাঁর কাণ্ডকারখানার কথা গোপন রাখার জন্যই তিনি এ পথ বেছে নিতে বাধ্য হন। দীর্ঘদিন বহু কায়দা কসরত করে শেষপর্যন্ত আঠারো শো সাতষট্টির বাইশে জুন নোটিলাসেরই এক বোটে চেপে তাঁরা পালিয়ে যান। সমুদ্রের সে জায়গাটায় তখন দারুণ ঘূর্ণিপাক চলছিল। ফলে ক্যাপ্টেন নিমো নিঃসন্দেহ হলেন, তিনজনেরই সলিল সমাধি হয়েছে।

না, অধ্যাপক আরানো এবং তাঁর সঙ্গী দুজনের কেউই মারা যান নি। দেশের মাটিতে পা দিয়ে অধ্যাপক আরানো তাঁর সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা এবং অত্যাশ্চর্য জলযান নোটিলাসের কাণ্ডকারখানার বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত 'টোয়েন্টি থাউজেন্ড লিগস আন্ডার দ্য সি' নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

তারপরও ক্যাপ্টেন নিমো বেশ কয়েক বছর সমুদ্রের বুকে চক্কর মেরে বেড়িয়েছেন। নানা ঘটনা-দুর্ঘটনায় তাঁর বিশজন শিষ্যই এক-এক করে দুনিয়া ছেড়ে চলে যায়। আজ কেবল বেঁচে রয়েছেন ক্যাপ্টেন নিমো, অতিবৃদ্ধ। তাঁর সাধের নোটিলাস জীর্ণদশা প্রাপ্ত হয়েছেন। ক্যাপ্টেন নিমো কোনোরকমে নড়বড়ে নোটিলাসকে চালিয়ে নিয়ে এলেন লিঙ্কলন দ্বীপের তলদেশে। এখানে মাথা গোঁজার পরই বিপদের সম্মুখীন হলেন। দীর্ঘ ছয় বছর তিনি এখানে কাটান। আগ্নেয় পাহাড়ের লাভাস্রোত, তার বেরিয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। ছোট-বড় নৌকা যাতায়াত করতে পারলেও নোটিলাসের পক্ষে বেরোনো একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ল।

এক সকালে দ্বীপের কিনারা দিয়ে পায়চারি করার সময় ক্যাপ্টেন নিমো দেখলেন কজন লোককে নিয়ে একটা নৌকা দ্বীপে থামল। দেখলেন, তাঁরা সংখ্যায় পাঁচজন। ব্যস, তাঁর মাথায় তখনই চিন্তার উদয় হল অসহায় মানুষগুলোকে কীভাবে রক্ষ করা যায়। তবে তাদের কাছ থেকে দূরে, গোপন অন্তরাল থেকেই যা কিছু করার করতে হবে। তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে এরকম মমত্ববোধ ও সহমর্মিতার উদয় হওয়ার সবচেয়ে

www.pathagar.com

বড় কারণ, দ্বীপে আশ্রিত মানুষগুলো সৎ, পরিশ্রমী ও উদ্যমী। আর নিজেদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়াও রয়েছে। গোপনে তাঁদের আলাপ আলোচনা থেকে তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে জানতে পারলেন। এরকম লোকদেরও তো তিনি এতকাল গোপনে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে এসেছেন।

তিনি সাইরাস হার্ডিংকে রক্ষা করা ছাড়াও টপকে চিমনিতে নিয়ে যান, বিপদাপন্ন টপকে হ্রদের পানি থেকে উদ্ধার করে ভয়ঙ্কর ডুগংটাকে মেরেছিলেন। অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী বোঝাই করে সিন্দুকটাকে তিনিই সমুদ্রের ধাপে গোপনে রেখে আসেন। তিনিই মার্সি নদীতে বোটটাকে নোঙর করে রেখে দিয়েছিলেন, আয়ারটনের খবর দিয়ে তিনিই সমুদ্রের পানিতে বোতলটাকে ভাসিয়ে দেন, টর্পেডো নিক্ষেপ করে জলদস্যুদের জাহাজটাকে উড়িয়ে দেয়ার নায়ক ছিলেন তিনিই, আগুনের সঙ্কেত দিয়ে তিনিই পেনক্রফটকে ভুল পথ থেকে সঠিক পথে নিয়ে আসেন। শুধু কি এই? ইলেকট্রিক বুলেট নিক্ষেপ করে পাঁচ পাঁচটা জলদস্যুকে তিনি সাবাড় করেন আর মৃত্যুপথযাত্রী হার্বার্টকে কুইনাইন দিয়ে জীবনরক্ষা তিনিই করেন।

ক্যাপ্টেন নিমো জানতেন না যে, সাইরাস হার্ডিং তার নাড়িনক্ষত্র সবই জানেন। তা যদি জানতেন তবে কষ্ট করে টেলিগ্রাফের তারের সংযোগ সাধন করে তাদের অবশ্যই তলব করে এখানে নিয়ে আসতে উৎসাহী হতেন না। তবে তাঁদের নিয়ে এসেছেন কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে উপকার করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে।'

ক্যাপ্টেন নিমো মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে আবার মুখ খুললেন, 'আমার অতীত কাহিনীর অনেক কিছুই আপনি জানেন দেখছি। এবার বলুন তো, আমার সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা কী জন্মেছে?'

তার কথার ইঙ্গিত সাইরাস হার্ডিং বুঝতে পেরেছেন। 'টোয়েন্টি থাউজেন্ড লিগস আন্ডার দ্য সি' গ্রন্থে এক জাহাজডুবির বর্ণনা রয়েছে। তাতে অসহায় নারী ও শিশুও ছিল। নোটিলাস তাদের সমেত জাহাজটাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। ব্যাপারটা নিয়ে পৃথিবীর জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। এতে ক্যাপ্টেন নিমোও কম মর্মাহত হন নি। তবে পরিস্থিতির চাপে পড়েই তাকে এমন নিষ্ঠুর একটা কাজে উৎসাহী হতে হয়েছিল।

সাইরাস হার্ডিং অন্যমনস্কতার ভান করে তাঁর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে রইলেন।

ক্যাপ্টেন নিমো অনোন্যপায় হয়ে বলতে লাগলেন, 'জাহাজটা কিন্তু শত্রু পক্ষের ছিল। আমি নই, তারাই আমার পিছনে ছুটতে থাকে। আমার পালানোর রাস্তা পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়। সঙ্কীর্ণ একটা উপসাগরে আটকা পড়ে যাই। আমাকে বে-কায়দায় ফেলে পিছনে ধাওয়া করার জন্যই নিজেকে বাঁচার তাগিদে জাহাজটাকে ডুবিয়ে দিতে হয়েছেল। এবার বলুন তো, আমার কি কোনো অপরাধ এতে হয়েছিল?'

'ক্যাপ্টেন নিমো, আপনার কাজের সমালোচনা করা আমার অধিকার বহির্ভূত। মানুষ তো পরমপিতার হাতের পুতুলমাত্র। তিনি যা করান মানুষ তাই করে। তাই মানুষের কাজের বিচার তিনিই করেন। তবে আমি কেবল একটা কথাই বলতে চাই ক্যাপ্টেন, আপনার মতো একজন পরোপকারী সুহৃদকে হারালে আমাদের পরিতাপের সীমা থাকবে না।' কথা বলতে বলতে সাইরাস হার্ডিং ক্যাপ্টেন নিমোর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর ডান হাতটা টেনে চুম্বন করলেন।

www.pathagar.com

ক্যাপ্টেন নিমো তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, 'পরম পিতা তোমার মঙ্গল করুন। তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হোক।'

পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন নিমো দ্বীপবাসীদের সঙ্গে নিয়ে নোটিলাসের সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। তারপর দেখা গেল, সংগ্রহশালার ওপরে নোটিলাসের মহান আদর্শের কথা বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—'মোবিলিস ইজ মোবাইল'।

কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর হাঁপাতে লাগলেন। দুর্বল হয়ে পড়েছেন। স্পিলেট তাঁর হাত ধরে নিয়ে আরাম কেদারাটায় বসিয়ে দিল। নাড়ি পরীক্ষা করে দেখল, গতি খুবই ক্ষীণ। জীবনীশক্তি অনেকাংশে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তাঁকে আর বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যাবে না। অচিরেই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরপারে পাড়ি জমাবেন। বাইরে নিয়ে গিয়ে কিছু সময় রোদে বসিয়ে রাখতে পারলে পরিস্থিতির উন্নতি হত। কিন্তু নোটিলাস ছেড়ে কোথাও যেতে তিনি নারাজ।

তিনি ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'না, আমি নোটিলাস ছেড়ে কোথাও যাব না। নোটিলাসেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই। আপনাদের কাছে আমার শেষ ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করছি। তা রক্ষা করলেই জানবেন যাবতীয় ঋণ শোধ হয়ে যাবে। আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব। আমার অনুগামীদের মতোই আমিও সমুদ্রের জলে অন্তিম নিদ্রায় শায়িত হব। এখানে, খুবই গভীর পানিতে আমার স্বপ্ন সাধের নোটিলাস অবস্থান করছে। চিরদিন এখানেই এমনি করে ডুবে থাকবে। এটাই হবে তার সমাধি।

শুনুন, আগামীকাল আমার দেহাবসানের পর আপনারা এ স্থান ত্যাগ করবেন। রাজকুমার ডক্কারের পক্ষ থেকে এক বাক্স হীরা আপনাদের উপহারস্বরূপ দান করছি। আমি যখন স্বামী ছিলাম, সন্তানের পিতা ছিলাম এসব হীরা আমার তখনকার সঞ্চয়। এগুলো ছাড়াও বেশকিছু মণিমুক্তা নোটিলাসে রয়েছে। আপনাদের সততার ওপর আমার আস্থা আছে। আশা করি এসব বিত্তসম্পদ আপনারা সৎ কাজেই ব্যয় করবেন। আর যা-কিছু মূল্যবান সামগ্রী রয়েছে সবকিছু নিয়ে নোটিলাস চিরদিনের মতো সলিল সমাধিতে নিমগ্ন থাকবে। তবে এও জানবেন, মৃত্যুর পরও আমি আপনাদের কাছাকাছি পাশাপাশিই থাকব।

আপনারা বোটে উঠে নোটিলাসের সামনের দিকে দুটো ছিদ্র দেখতে পাবেন, সে দুটো মুখ খুলে দেবেন। ব্যস, সমুদ্রের পানি দ্রুত নোটিলাসের ট্যাঙ্কে ঢুকতে থাকবে। ফলে এটা ভারী হতে হতে একসময় সমুদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে।'

দ্বীপবাসীরা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল।

ক্যাপ্টেন নিমো এবার বললেন, 'তবে আমাকে কিছুটা সময় একা থাকতে দিন। আমি আত্মমগ্ন—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই দ্বীপবাসীরা এক-এক করে ঘর ছেড়ে যেতে লাগল।

নৈশভোজের পর ক্যাপ্টেন নিমোর জীবনীশক্তি ও চোখের জ্যোতি কিছুটা ফিরে এল। তিনি দ্বীপবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনারা কি এ দ্বীপে ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে চাইছেন?'

'আমরা চাচ্ছি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে লিঙ্কলন দ্বীপের সংযোগ সাধন করি। এটা প্রশান্ত মহাসাগরের একটা ঘাঁটিরূপে গড়ে তুলব।'

ম্লান হেসে ক্যাপ্টেন নিমো এবার বললেন, 'মি. হার্ডিং, আপনার সঙ্গে গোপনে দুটো কথা বলতে চাচ্ছি। যদি—'

www.pathagar.com

তাঁর কথা শেষ না হতেই সাইরাস হার্ডিং ছাড়া অন্যান্য দ্বীপবাসীরা ঘর ছেড়ে গেল। একটু পরে যখন সবাই আবার একসঙ্গে মিলিত হল, তিনি এ ব্যাপারে কারোর কাছে মুখ খুললেন না। অন্যান্যরাও কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না।

এদিকে ক্যাপ্টেন নিমো ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগলেন।

রাত তখন একটা, মৃত্যুপথযাত্রী ক্যাপ্টেন নিমো প্রায়-অস্ফুট উচ্চারণ করলেন–'পরম পিতা!—স্বদেশ!' তাঁর মাথাটা একপাশে কাত হয়ে পড়ল। ব্যস, সব শেষ, ক্যাপ্টেন নিমোর অবিনশ্বর আত্মা পরমপিতার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অনন্ত সুন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

ক্যাপ্টেন নিমোর নির্দেশ অনুযায়ী দ্বীপবাসীরা হীরার বাক্সটা নিয়ে নোটিলাস থেকে বেরিয়ে এল। তাঁর সবকটা নির্দেশ এক-এক করে পালন করা হল। সবশেষে সবাই বোটে চেপে নোটিলাসের সামনে গিয়ে বড় বড় ছিদ্র দুটোর মুখ স্টপ কর্ক ঘুরিয়ে খুলে দিতেই হুড় হুড় করে জল জলাধারে ঢুকতে লাগল। ডুবোজাহাজটা ভারী হয়ে পড়ায় ধীরে ধীরে সমুদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে লাগল। রাজকুমার ডক্কারের মৃতদেহসহ ডুবোজাহাজ-কফিনটা চিরদিনের মতো পানির তলায় আশ্রয় নিল।

* * *

ভোরের আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই দ্বীপবাসীদের নিয়ে বোটটা সুড়ঙ্গের মুখে ফিরে এল। সুড়ঙ্গটার নামকরণ করা হল—'ডক্কার সুড়ঙ্গ।'

সাইরাস হার্ডিং এবার তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে বড়সড় একটা নৌকা তৈরির কাজে মেতে গেলেন। ট্যাবর দ্বীপে যত শীঘ্র সম্ভব খবর রাখা একান্ত দরকার। দেরি হলে ডানকান জাহাজটা এসে ফিরে যেতে পারে।

১৮৬৯-এর পয়লা জানুয়ারি প্রকৃতি রুদ্ররূপ ধারণ করল। লিঙ্কলন দ্বীপটার ওপরই যেন তার যত আক্রোশ। প্রলয়ঙ্কর তুফান, বিদ্যুতের ঝলকানি আর ঘন ঘন বজ্রপাত দ্বীপটাকে যেন ধ্বংস করে দেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর। বজ্রাহত হয়ে বড় বড় গাছগুলো যেন জ্বলেপুড়ে খাঁক হয়ে যেতে লাগল। সাইরাস হার্ডিং অনুভব করলেন। আকাশের এ বল্গাহীন উন্মত্ততার সঙ্গে পাতালপুরীর নিবিড় যোগসাজোশ রয়েছে। তা যদি নাই হবে তবে আগ্নেয়পর্বতটার মধ্যে এমন অস্থিরতা কেনই বা প্রকাশ পাবে?

৩ জানুয়ারি হার্বার্ট প্লেটোতে উঠেই চমকে উঠল। দেখল পাহাড়টার শিখরদেশ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সাইরাস হার্ডিং ব্যাপারটা একনজরে লক্ষ করেই নিঃসন্দেহ হলেন, আগ্নেয় পর্বতটার আগুন ঠিকরে বেরিয়ে এল বলে।

ব্যাপারটা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হবার জন্য আয়ারটন মুহূর্তের জন্যমাটিতে কান পাতল। ব্যস, তড়াক করে লাফিয় উঠে চিৎকার করতে লাগল, 'আরে সর্বনাশ! মাটির নিচ থেকে গম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসছে!'

আয়ারটনের দেখাদেখি অন্যান্যরাও মাটিতে কান ঠেকিয়ে অবাঞ্ছিত আওয়াজটা শুনল। গুম গুম আওয়াজ হতে হতে হঠাৎ প্রচণ্ড গম্ভীর আওয়াজ হচ্ছে।

সাইরাস হার্ডিং হতাশায় ভেঙে না পড়ে বরং নৌকা তৈরির বাকি কাজটুকু সেরে ফেলার জন্য তৎপর হলেন।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতের অন্ধকার নামতে না নামতেই পাহাড়ের মাথা দিয়ে আগুন বেরোতে দেখো গেল। কোনো দৈত্য যেন পাহাড়ের মাথায় বিশাল একটা মশাল জ্বেলে দিয়েছে। আর সে সঙ্গে অনবরত গুরু গম্ভীর আওয়াজ হয়েই চলেছে।

www.pathagar.com

সাইরাস হার্ডিং প্রামাদ গণলেন। তিনি চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠলেন—'এ কী কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটতে চলেছে। এত তাড়াতাড়ি যে সর্বনাশা ব্যাপারটা শুরু হয়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবি নি।'

স্পিলেট ফ্যাকাশে মুখে বলল, 'মি. হার্ডিং তাড়তাড়ি তো নয়। আড়াই মাস আগেই ব্যাপারটা আমাদের জানান দিয়েছিল। তখন আগুনের শিখা ছিল ক্ষীণ, এখন প্রলয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে।'

আগুনের সঙ্গে নতুন একটা উপসর্গ এসে যোগ দিল। মাটির কাঁপুনি। থেকে থেকে মাটি ভয়ানক কেঁপে উঠতে লাগল। ভূমিকম্পেও মাটি কেঁপে কেঁপে ওঠে বটে। কিন্তু ভূমিকম্পের সঙ্গে এ কাঁপুনির যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। তিরতির করে কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ প্রবল ঝাঁকুনি দিচ্ছে। লাল টকটকে পাথরের টুকরো লাফিয়ে শূন্যে উঠে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই আবার পাহাড়ের মুখের কাছেই আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। এ যেন ভোজবাজির খেল। শুধু কি এই? আকাশ থেকে অনবরত কালো গুঁড়ো পড়তে লাগল।

সাইরাস হার্ডিং প্রমাদ গণলেন। তিনি নিঃসন্দেহ হলেন, অচিরেই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা ঘটে যাবে। খনিজ পদার্থের গুঁড়োগুলোই সর্বনাশের পূর্বাভাস। আগুন পাহাড়টার উদরে যে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে চলেছে তারই লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে এগুলোর মাধ্যমে। তিনি ব্যস্তপায়ে গন্ধক প্রস্রবণে গিয়ে লক্ষ্য করেন, সেখানে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে। পাশাপাশি কাছাকাছি তেরোটা গন্ধক প্রস্রবণ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়েছে। ভেতর থেকে কোন অমিত শক্তিধর দৈত্য যেন মাটি ফাটিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। উৎকট গন্ধযুক্ত গ্যাস ও কার্বনিক অ্যাসিড পুরো অঞ্চলটাকে যেন বিষম করে তুলেছে। মাটি অস্বাভাবিকভাবে কাঁপতে শুরু করেছে। তিনি ভেবে অবাক হচ্ছেন, পাহাড়টা তো এখনও গলিত লাভা বমন শুরু করে নি। তবে? তবে কি ক্যাপ্টেন নিমোর অনুমানই অভ্রান্ত? তিনি তো বারবার বলেছিলেন, 'বিপদ এখানে ঘটবে না, এখানে না।'

সাইরাস হার্ডিং অন্য সবার কাছে ফিরে এলেন। একে বাতাসে উৎকট গন্ধ তার ওপর কালো গুঁড়োতে চারদিক ছেয়ে ফেলেছে। আগুনের মতো গরম বাতাস গায়ে ফোস্কা ফেলে দেয়ার জোগাড় করল। বাতাসের অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেছে। নইলে শ্বাসক্রিয়ার এমন কষ্ট হবে কেন?

সাইরাস হার্ডিং আয়ারটনকে নিয়ে বোটে চেপে বসলেন। দ্রুত দাঁড় টেনে হাজির হলেন দ্বীপের বিপরীত প্রান্তে। চারদিকে জমাটবাধা অন্ধকার। নোটিলাস থাকলে না-হয় বৈদ্যুতিক আলো জ্বেলে নেয়া যেত। এখন তো সেও জলের তলায় চিরনিদ্রায় সমাচ্ছন্ন। পাতাল সুড়ঙ্গে একটামাত্র গুম গুম আওয়াজই বারবার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। পাথরের দেয়াল ফুটোফাটা হয়ে গেছে। লণ্ঠনটাকে দাড়ের মাথায় বেঁধে নিয়ে হার্ডিং প্রতিটা ফাটল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। আগুনপাহাড়ের কেন্দ্রস্থলটাকে দেয়ালটা ঘিরে রেখেছে। একা কতটা পুরু তাই বা কে জানে। সাইরাস হার্ডিং বুঝলেন, ক্যাপ্টেন নিমোর কথাই সত্যি। ভয়ঙ্কর বিপদের কেন্দ্রস্থল এটাই বটে।

পরীক্ষা নিরীক্ষা সেরে সাইরাস হার্ডিং বোট নিয়ে ফিরে এলেন।

পরের দিন, আটই জানুয়ারি সাইরাস হার্ডিং আয়ারটনকে নিয়ে ডেরায় ফিরে এলেন। সবাইকে কাছে ডেকে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ডক্কার সুড়ঙ্গে ফাটল দেখে এলাম। অভাবনীয় সর্বনাশা বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোন সম্ভাবনাই দেখছি না!' মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্যে কাটিয়ে তিনি আবার মুখ খুললেন, 'এখন বুঝছি, ক্যাপ্টেন

www.pathagar.com

নিমো যা কিছু বলে গেছেন তার প্রতিটা বর্ণ সত্যি। আমাকে তখন গোপনে একথাই বলেছিলেন, লিঙ্কলন দ্বীপের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অন্য দশটা দ্বীপের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে-কোনো মুহূর্তে পুরো দ্বীপটাই সমুদ্রের অতল গহ্বরে ডুব দেয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। সমুদ্রের পানি আর আগ্নেয় পর্বতটার মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে একটামাত্র পাথরের দেয়াল। পর্বতটার উদরে যে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে চলেছে তার চাপের ফলে যে-কোনো সময় দেয়ালটা ফেটে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে। তখন সমুদ্রের পানি আগ্নেয় পর্বতটার গায়ে আছাড় খেয়ে পড়বে। অভাবনীয় উত্তাপে যেখানে লাভা টগবগ করে ফুটছে সেখানে জল গিয়ে পড়লে সে কী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে তা কল্পনা করা যাচ্ছে না। মুহূর্তে রাশি রাশি বাষ্প সৃষ্টি হয়ে সম্পূর্ণ দ্বীপটাকে শুকনো পাতার মতো উড়িয়ে নিয়ে মাঝ দরিয়ায় ফেলে দেবে।'

দ্বীপবাসীরা এবার বুঝতে পারল, কী ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি তারা দাঁড়িয়ে নিশ্চিত সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায়ই নেই। ডক্কার সুড়ঙ্গের পাথরের দেয়ালটা যতদিন চাপ সহ্য করে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে ততদিনই তাদের পরমায়ু।

দ্বীপবাসীদের দুচোখের কোল বেয়ে পানি বেরিয়ে আসার জোগাড় হল। যে লিঙ্কলন দ্বীপের সঙ্গে তারা আত্মিকসম্বন্ধ গড়ে তুলেছিল, যাকে মনের মতো করে সাজিয়ে তুলেছে, যাকে স্বর্গপুরী করে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছিল, আজ তা সমূলে ধ্বংস হতে চলেছে। এর পরমায়ু কয়েক বছর, কয়েক মাস হতে পারে। আবার কয়েক ঘণ্টা হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তারপরই চিরদিনেই মতো যবনিকা পতন।

২৩ জানুয়ারি লিঙ্কলন দ্বীপে আচমকা ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ দ্বীপটা প্রচণ্ড কেঁপে উঠল।

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ভেবে দ্বীপবাসীরা ছুটোছুটি করে গুহার বাইরে এসে আতঙ্কে কাঁপতে লাগল। হ্যাঁ, যা আশঙ্কা করেছিল সে-রকমই একটা ব্যাপার ঘটে গেল বটে। পাহাড়ের চূড়াটা উধাও হয়ে গেছে। প্রায় এক কোটি পাউন্ড ওজনের চূড়াটা হাজারখানেক ফুট ওপর থেকে গড়িয়ে হুড়মুড় করে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে। আর অতিকায় ছিদ্র দিয়ে আগুন আর উষ্ণ বাতাস গলগল করে বেরিয়ে আসছে। কেবল আগুন! আগুন! আগুন! আর তার সঙ্গে প্রবল বেগে পাহাড়ের গা বেয়ে লাভাস্রোত ধেয়ে আসছে। উত্তপ্ত গলিত লাভা খোঁয়াড়ের কাছাকাছি পৌঁছনোর আগেই পশুগুলো শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে খোঁয়াড়েরর বেড়া ভেঙে গভীর জঙ্গলের দিকে মরিয়া হয়ে ছুটতে লাগল।

উত্তপ্ত লাভার ছোয়া লাগামাত্র বিশাল বিশাল গাছগুলো দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল। দেখতে দেখতে বন-জঙ্গল আর পানীয় জলের ঝর্না নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

পাহাড়ের উপরাংশ থেকে অসংখ্য ছোট বড় উত্তপ্ত পাথরের টুকরো ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

লাভার স্রোত গড়াতে গড়াতে হ্রদের দিকে ধাওয়া করলে সাইরাস হার্ডিং অস্ত্রপাতি নিয়ে বাঁধ দেয়ার কাজে লেগে গেলেন। বাঁধ দিয়ে লাভার স্রোতের গতিপথ ঘুরিয়ে হ্রদের পানিতে ফেলার জন্য অমানুষিক কসরত করে চলেছেন। হ্যাঁ, পরিকল্পনা মাফিকই কাজ হয়েছে। লাভার স্রোত লাফাতে লাফাতে হ্রদের পানিতে এসে পড়তে লাগল। আশ্চর্য ব্যাপর! উত্তপ্ত গলিত লাভা ঠাণ্ডা পানির সংস্পর্শে আসা মাত্র শক্ত পাথরে পরিণত হতে

www.pathagar.com

লাগল। গ্রান্ট হ্রদের জল বাষ্পীভূত হয়ে উঠে যেতে দেরি হল না। হ্রদের পানি নিশ্চিহ্ন হল বটে। কিন্তু লাভাস্রোত অনবরত ধেয়ে আসতেই লাগল। একসময় যেখানে অগাধ পানি ছিল এখন সেখানে গড়ে উঠতে লাগল লাভার পাহাড়। পানির সংস্পর্শে এলে আগুন নিভে যায়। কিন্তু আগুনের সংস্পর্শে এসে পানি হয়ে গেল নিশ্চিহ্ন! অদ্ভুত হলেও বাস্তবে তাই ঘটল।

লাভার স্রোতকে মোড় ঘুরিয়ে হ্রদের দিকে চালান দেয়ার ফলে কিছুদিনের জন্য অন্তত প্রফেক্ট হাউস, গ্রানাইট হাউস আর নৌকার কারখানাটাকে বাঁচানো সম্ভব হল।

চব্বিশ থেকে ত্রিশে জানুয়ারি পর্যন্ত দ্বীপবাসীরা একনাগাড়ে ছয়দিন নৌকা তৈরির কাজে লেগে থেকে অন্তত বিশ দিনের কাজ সেরে ফেলল। ফলে তারা গ্রনাইট হাউসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মার্সি নদীর তীরে তাঁবুর তলায় বাস করতে লাগল। মরুভূমি? না, লিঙ্কলন দ্বীপ দেখতে দেখতে শ্মশানে পরিণত হয়ে গেল।

নৌকা তৈরির কাজ যে গতিতে চলছে তাতে অনুমান করা যাচ্ছে, ২০ ফেব্রুয়ারি এটাকে পানিতে নামানো যাবে। আজ বিশে জানুয়ারি, আরো পুরো একটা মাস একনাগাড়ে মেহনত করলে তবেই অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে। এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন লিঙ্কলন দ্বীপ এতদিন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে কি?

আগুনপাহাড়ের অনির্বাণ আগুনের শিখায় দ্বীপবাসীরা রাতদিন নৌকা তৈরির কাজে লেগে রইল। ৩ মার্চ দেখা গেল, আর মাত্র দিনদশেক কাজ চালিয়ে যেতে পারলে নৌকাটা তৈরি হয়ে যাবে। দ্বীপবাসীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল, এখান থেকে নৌকা নিয়ে তারা প্রথমে ট্যাবর দ্বীপে যাবে।

মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই আগুন পাহাড়টা রুদ্রমূর্তি, একেবারে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল। উত্তপ্ত গলিত লাভা এবার বৃষ্টির মতো লক্ষ-কোটি ফোটার আকারে পড়তে লাগল। আগুন আর বাষ্পবৃষ্টিতে আকাশ যেন ঢেকে ফেলেছে। এতদিন কোনোরকমে পিতৃদত্ত জীবনটাকে টিকিয়ে রাখা গেছে বটে। ব্যস, এ পর্যন্তই। এবার আর রেহাই নেই। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সময় আর নেই। অসমাপ্ত নৌকাটাকে জলে ভাসানো ছাড়া আর উপায় নেই। আর একটা দিন এ দ্বীপে থাকতে হলে অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থাতেই পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

সাইরাস হার্ডিং ভাবলেন, ডক্কার সুড়ঙ্গের দেয়ালে নির্ঘাত বিশাল ফাটল দেখা দিয়েছে। আর সমুদ্রের পানি ফাটল দিয়ে প্রবল বেগে আগুন পাহাড়ের উদরে ঢুকে যাচ্ছে।

৮ মার্চ হঠাৎ আগুন পাহাড়ের জ্বালামুখ দিয়ে গরম বাষ্প আর আগুন ভয়ানক শব্দে গলগল করে বেরিয়ে আসতে লাগল। আর টুকরো টুকরো অসংখ্য পাথর প্রচণ্ড বেগে আকাশের দিকে উঠতে শুরু করল। একসময় আরও ভয়াবহ ব্যাপার ঘটে গেল। আগুন পাহাড়টা টুকরো টুকরো হয়ে সবেগে আকাশের দিকে উঠে গিয়ে পরক্ষণেই সেগুলো সাগরের বুকে এক এক করে পড়তে লাগল। এরকম নরকীয় দৃশ্য চোখে না দেখলে বলে বুঝানো সম্ভব নয়। লিঙ্কলন দ্বীপটা একেবারে বেপাত্তা হয়ে গেল। সাগরের বুকে আকাশছোঁয়া ঢেউ ছাড়া সে তল্লাটে আর কিছুই নজরে পড়ল না। তবে অতিকায় একটা পাথরের টুকরো সদম্ভে সাগরের বুকে মাথা উঁচিয়ে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে লাগল। সেটা ত্রিশ ফুট লম্বা আর কুড়িফুট চওড়া। সাগরের জল থেকে দশ ফুট ওপরে তার মাথাটা উঁকি দিচ্ছে। পাহাড়ের এ ভগ্নাংশটাই লিঙ্কলন দ্বীপে সাক্ষীস্বরূপ অবস্থান করছে।

www.pathagar.com

লিঙ্কলন দ্বীপের মাত্র সাতটি প্রাণী আজ জীবিত। জন্তু জানোয়ার আর যা-কিছু ছিল সবাই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। সাতটা প্রাণীর মধ্যে ছয়জন দ্বীপবাসী আর তাদের প্রিয় শিকারি কুকুর টপই কেবল জীবিত।

দ্বীপবাসীরা টপকে নিয়ে পাহাড়ের ওই অবশিষ্ট ভগ্নাংশটুকুতে আশ্রয় নিয়ে নয়টা দিন কাটাল। মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনে তারা পাথরটার ওপর শরীর এলিয়ে পড়ে রইল। সঙ্গে যা খাবার রয়েছে তা দিয়ে কোনোরকমে দিন দুই চলতে পারে।

২৪ মার্চ। দূরে, বহু দূরে সমুদ্রের বুকে একটা কালো মতো কী যেন আয়ারটন দেখতে পেল। কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়েই দেখল। কী ভেবে আচমকা উঠে বসল। এবার কালো বস্তুটার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে ইঙ্গিত দিতে লাগল।

কালো বস্তুটার আয়তন ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। আরও কিছুক্ষণ বাদে তার মনে হল সেটা একটা পালতোলা জাহাজ। মাস্তুলটা জলতল থেকে অনেকটা উঁচুতে থাকায় এবার সেটাকে স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। আয়ারটন আচমকা যন্ত্রচালিতের মতো খাড়া হয়ে পড়ল। এবার সে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছে, পালতোলা জাহাজটা তাদের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। তার কাঁপা কাঁপা গলা দিয়ে কোনোরকমে বেরিয়ে এল—'ডানকান! ডানকান জাহাজ!' ব্যস, আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সংজ্ঞা হারিয়ে পাথরটার ওপর লুটিয়ে পড়ল।

দ্বীপবাসীরা এক-এক করে সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে দেখল, একটা জাহাজের কেবিনে শুয়ে।

দ্বীপবাসীরা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে কী করে জাহাজটার কেবিনে এল?

ডানকান! এটা ডানকান জাহাজই বটে। জাহাজটা চালাচ্ছে ক্যাপ্টেন গ্রান্টের ছেলে রবার্ট গ্রান্ট। আয়ারটনকে ট্যাবর দ্বীপে ছেড়ে দেবার মুহূর্তে সেও উপস্থিত ছিল। আজ বারো বছর পরে তাকে নিয়ে যাবার জন্য সে ডানকান জাহাজ নিয়ে হাজির হয়েছে। কিন্তু এটা তো ট্যাবর দ্বীপ নয়, লিঙ্কলন দ্বীপের অংশমাত্র। তাছাড়া ট্যাবর দ্বীপ অখ্যাত অবজ্ঞাত একদ্বীপ। মানচিত্রে খোঁজাখুঁজি করে এর হদিস মেলে না। তবে? রবার্ট গ্রান্ট ট্যাবর দ্বীপে না গিয়ে এখানে আসতে গেল কেন?

সাইরাস হার্ডিংয়ের মুখে সবকিছু শুনে রর্বাট গ্রান্ট তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠল, 'এ কী কথা বলছেন মি. হার্ডিং!' এবার কোটের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে তাঁর সামনে মেলে ধরে বলল, 'এই তো, আপনাদেরই টাঙানো বিজ্ঞপ্তিটা। এর মধ্যে কেবল আয়ারটন নয়, আপনাদের সবার খবরই তো রয়েছে।'

সাইরাস হার্ডিংয়ের এবার ব্যাপারটা বুঝতে আর বাকি রইল না। পরোপকারব্রতী ক্যাপ্টেন নিমোই বিজ্ঞপ্তিটা টাঙিয়ে রেখে এসেছিলেন।

তাদের অজ্ঞাতে তিনি আরো একটা উপকার করে গেছেন, কারোর মনে তিলমাত্র দ্বিধা রইল না।

দ্বীপবাসীরা পরমপিতার কাছে ক্যাপ্টেন নিমোর অমর আত্মার শান্তির জন্য আবার প্রার্থনা করল।

আয়ারটন এবার ক্যাপ্টেন নিমোর দেয়া হীরার বাক্সটা সবার সামনে রেখে বলল, 'এটাকে এবার কোথায় রাখবেন ব্যবস্থা করুন। মৃত্যু অবধারিত জেনেও আমি কিছুতেই এটাকে হাতছাড়া করি নি।'

www.pathagar.com

আয়ারটনের আচরণে সাইরাস হার্ডিং থেকে শুরু করে রবার্ট গ্রান্ট পর্যন্ত সবাই মুগ্ধ হলেন। আগুনে পুড়ে পুড়ে যেমন সোনা খাঁটি হয় ঠিক তেমনি সৎসঙ্গে মেলামেশা করে ও নিরবচ্ছিন্ন দুঃখযন্ত্রণা সয়ে তার চরিত্রের কালিমাটুকু ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। সাইরাস হার্ডিং আকস্মিক উচ্ছ্বাসটুকু সামলাতে না পেরে 'আয়ারটন! আয়ারটন! বলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

কয়েক সপ্তাহ অনবরত জাহাজ চালিয়ে রবার্ট গ্রান্ট দ্বীপবাসীদের নিয়ে আমেরিকায় উপস্থিত হল।

ক্যাপ্টেন নিমোর দেয়া হীরা-মুক্তোগুলো বিক্রি করে আইওয়া রাজ্যে অভিযাত্রীরা আর একটা লিঙ্কলন দ্বীপ গড়ে তুলল। লিঙ্কলন দ্বীপে ছয়জন অধিবাসী আর পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গেল না। তারা সাইরাস হার্ডিংয়ের নেতৃত্বে নিজ নিজ ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সদ্য প্রতিষ্ঠিত লিঙ্কলন দ্বীপকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে লাগল। আর ওইদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ঢেউ ভেদ করে আর সদম্ভে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মাত্র অতিকায় পাথর, ক্যাপ্টেন নিমো আর লিঙ্কলন দ্বীপের সমাধির ওপর অবস্থানরত প্রস্তরফলক।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com